সচিত্র

মাসিক বসুমতী

২৪শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

স্থাপিত

১২৮৭ সাল

সম্পাদক

শ্রীযামিনীমোহন কর

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ] ১৩৫২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সৌন্দর্য্যে
নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—
তাঁর ঘন কৃষ্ণ কেশদাম।
কেশের বর্ধনে ও পোষণে
অদ্বিতীয়, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ-
কর, সেকালের শাস্ত্রীয়
মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের
সহিত সুরভি সংযোগে
প্রস্তুত হয়েছে—
নাগার্জুন
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
নাগার্জুন আয়ুর্বেদ
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৪, বেলিয়াঘাটা মেন রোড
কলিকাতা

SOVEREIGN REMEDY
AMRUTANJAN
নকল হইতে সাবধান!
অমৃতাঞ্জন
৫০ বৎসরের প্রসিদ্ধ "পকেট ডাক্তার"
লক্ষাধিক বিক্রীত, সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
অমৃতাঞ্জন লিঃ, পোঃ বক্স নং ৬৮২৫, কলিকাতা

ইরাণী
আমলা
ওরিয়েণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ
২৯, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

ক্যাষ্টর ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল
বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল
ও ক্যান্থারাইডিন সংযোগে
প্রস্তুত। কেশ-পরিচর্য্যায় অপরি-
হার্য্য। নিয়মিত ব্যবহারে কেশ ঘন
কৃষ্ণবর্ণ ও বর্দ্ধিত হয়। মস্তিষ্ক শীতল
রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়।
ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স
ক্যানিং ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কাশি

প্রতিরোধ করুন।

সামান্য কাশিও গোপন করা বা চেপে রাখা কর্ত্তব্য নয় ব্রঙ্কাইটিস্, টিউবারক্যুলোসিশ অথবা শ্বাসনালীর প্রদাহ—যা থেকেই কাশির সূত্রপাত হোক না কেন, নিরাপদে, সত্বর ও আরামজনক উপায়ে

টাসানল

ব্যবহারে তা নিরাময় করুন।

TUSSANOL

MARTIN & HARRIS LTD.
CALCUTTA
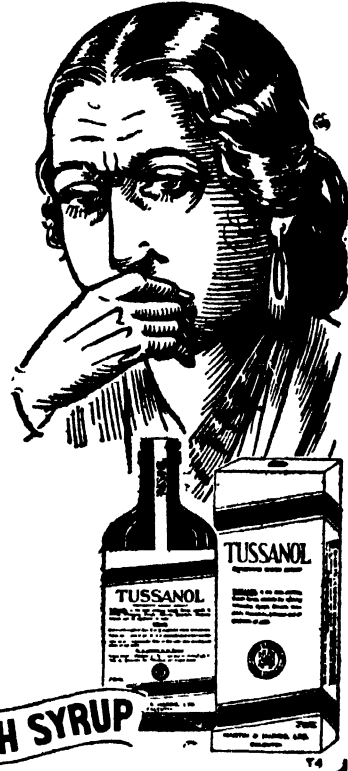
বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে

নিরাপদে টাকা আমানতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন)

২৬-৪-৪৬ তারিখের হিসাব :—

আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ), ও সংরক্ষিত তহবিল	৩৩,৭৭,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি	২,৪৭,৬২,০০০৲
আমানত	৪,৩৯,০২,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৫,১০,৩৩,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

নকল হইতে সাবধান

পাকা চুল কাঁচা হয়

(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের সুগন্ধিত সেনট্র মোহিনী তৈল ব্যবহারে সাদা চুল পুনরায় কাল হইবে এবং উ ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েক গাছি চুল পাকি ২৷০, উহা হইতে বেশী হইলে ৩৷০। আর মাথার সমস্ত চু পাকিয়া সাদা হইলে ৫৲ মূল্যের তৈল ক্রয় করুন। ব্যর্থ প্রমাণি হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে।

দীনরক্ষক ঔষধালয়, No. 26, পো: কাতরীসরায় (গয়া

ব্যাধি

জটিল, দুরারোগ্য ও দুশ্চিকিৎস্য হইলে একমাত্র "দৈ- শক্তিই" রোগীকে ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি দি পারে। রোগীর বিশেষ বিবরণ পত্র দ্বারা জানান আমরা রোগমুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করি। পত্রাদি গোপ রাখা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি য়্যাসট্রলজিক্যাল রিসার্চ্চ ইন্‌স্টিটিউট

অধ্যক্ষ—শ্রীপঞ্চানন জ্যোতীরত্ন কাব্যতীর্থ

চাতরা, শ্রীরামপুর (বেঙ্গল)।

২৪শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৫২ [১ম সংখ্যা

প্রমথ চৌধুরী

গত বৎসর Croft সাহেব তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Graduateদিগের হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনরূপ উন্নতি হইতেছে না —এবং কখনও যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের নেতা হইবে এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই।

কথাটা আমাদের পক্ষে যে খুব আশাজনক তাহা নহে সুতরাং সহজেই অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু একটুখানি ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে কথাটা বিশেষরূপে সত্য।

আধুনিক ইংরাজি শিক্ষার ভিতর যাহাতে আমাদিগকে সাহিত্য রচনার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত করিতে পারে এরূপ অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান আছে।

প্রথমতঃ—যে ভাষায় লিখিতে হইবে সে ভাষাটি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক কিন্তু আমরা কেহই বাংলা ভাষা ভাল করিয়া জানি না, জানিবার চেষ্টাও করিনা। আমরা যে ভাষায় কথা কই ও যে ভাষা সর্ব্বদা শুনতে পাই তাহা বিশুদ্ধ বাংলা কিম্বা বিশুদ্ধ ইংরাজীও নহে—তাহা বাংলা ও ইংরাজীতে মিশ্রিত একপ্রকার খিচুড়ি বিশেষ। যখন একটি ভাব বাংলায় প্রকাশ করিতে সুবিধা হয় না, তখনই চট্ করিয়া একটি ইংরাজি কথা আনিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লই। সুবিধামত ইংরাজি ও বাংলা কথা ব্যবহার করায় আমাদের কথা-বার্ত্তার কাজ অবাধে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে ইংরাজী কিম্বা বাংলা দুয়ের কোনও একটিও ভাষা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিনা। ভাল করিয়া কোন ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে তাহাতে বিশেষ করিয়া মনঃসংযোগ করা চাই, অনেক যত্ন ও পরিশ্রম সহ তাহার অন্তরে প্রবেশ করা চাই।

আমাদের মানসিক ভাব মাত্রেরই প্রকাশক ভাষা কিছু সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে হাজির থাকেনা, অনেক কষ্টে অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া অনেক চেষ্টার পর আমরা মনের ভাব ঠিক করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি। এইরূপ অনেক চেষ্টা ও যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত যে কোনও কথা আমরা আয়ত্ত করি তাহার সমস্ত ভাবটুকু আমাদের হস্তগত হয়। আমরা এই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে চাহিনা বলিয়া আমরা যেখানে দেখি যে সহজে বাংলায় ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা সেস্থলে ইংরাজীর সাহায্য গ্রহণ করি, কাযে কাযেই উভয় ভাষারই একটা উপর উপর রকম অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে জন্মায় আর যথার্থ পূর্ণজ্ঞান আমাদের মধ্যে এত বিরল।

দ্বিতীয়তঃ—আমাদের বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় অত্যন্ত অল্প, আমরা বাংলা বই পড়া সময়ের অপব্যয় স্বরূপ মনে করি ; বাস্তবিক সচরাচর বাংলা পুস্তকে শিখিবার মত কিছু নাই। আমরা যদি ইংরাজি ছাড়িয়া বাংলা পড়িতে আরম্ভ করি তাহা হইলে বাংলা ভাষার উপর খানিকটা দখল হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক উন্মেষ ও যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

কেবল মাত্র ইংরাজি পড়িলে আমাদের বাংলায় লিখিবার ক্ষমতা জন্মায় না—আবার বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিলে আমাদের কিছুই লিখিবার বিষয় থাকে না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালীরা বাংলা সাহিত্যের কিছুই একটা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

আমাদের ভিতর যাঁহারা ইংরাজিশিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের ভাষার অসুবিধা ব্যতীত আরও কতকগুলি বাধা আছে।

ইংরাজি চিন্তা ও ইংরাজি জ্ঞান আমাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির আয়ত্তের অনেকটা বাহিরে। নানারূপ প্রগাঢ় ইংরাজি চিন্তা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিনা—আর—আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে—ইংরাজি বিজ্ঞানের বিপুল জ্ঞানেরও স্থান হয় না।

ইংরাজি Philosophy এবং ইংরাজি Science আমরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিব না বলিয়া আমরা অনেকে হতাশ হইয়া ঐ সকল চর্চ্চা হইতে একেবারেই বিরত হই। কেহ কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়েন ও একেবারেই মানসিক পরিশ্রমের পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়া যান।

এই সকল কারণে ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে অনেকটা Practical কাযের মধ্যেই রুদ্ধ রাখে। কিন্তু সাহিত্য Practical লোকদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্টিলাভ করেনা।

আজ থেকে পঞ্চান্ন বৎসর আগের লেখা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পুরাতন খাতার এক পাতা। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দেরও আগের অপ্রকাশিত রচনা।

দৈহিক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বক্ষের মাঝে মম
আপনা হতেই শান্ত হয়েছে ক্ষুধা সে আদিমতম।
যতটুকু পাই ততটুকুতেই
তৃপ্তি আমার। আগ্রহ নেই
ধরিতে কিছুই বাড়াইয়া বাহু লুব্ধ শিকারী সম।
প্রেমে প্রিয়তম হতেছে সে জন যে আছিল নির্ম্মম।

এই সংসার মাঝে
প্রেম ও শান্তি এই দুটি সুর জানি শেষাশেষি বাজে।
জেগে উঠে প্রেম সব সহিবার
অম্লান মুখে যত বহি ভার
চিতে আনন্দ জাগে অনিবার ছোট বড় সব কাজে।
যাহা কিছু ছিল রঙছুট তাই সাজে যে রঙীন সাজে।

শেষ হয়ে আসে দিন
সুর-মাধুরীতে হয় সে মধুর বেসুরা ছিল যে বীণ।
যত দিন যায় বাড়ে ভালবাসা,
স্বর্গ মানি যে ধরণীর বাসা
এই ধরণীর ধূলা ও মাটিব বেড়ে বেড়ে যায় ঋণ।
মনের দৃষ্টি তত যায় খুলে আঁখি যত হয় ক্ষীণ।

সবারে প্রণাম করি
আমার আকাশ আমার বাতাস যারা দিলে গানে ভরি।
মৃত্যুলক্ষ্যে চলিয়াছি যারা
বুঝিতেছি মোর আত্মীয় তারা
তাহাদেরি মাঝে বাঁচিতে যে চাই যতবার যাই মরি।
জীবন—মৃত্যু দুই তীর, করে পারাপার দেহ-তরী।

এ দেহের গাহি জয়—
এপার ওপার আঁধার মাঝারে দেহ যে জ্যোতির্ম্ময়।
দেহ-বন্দনা গাহি অনিবার
কাল-সমুদ্র হতে চাই পার—
সেই অক্ষয় লক্ষ্যে লইতে তিলে তিলে যার ক্ষয়।
মৃত্যুর ভয় ভাঙিয়া এ দেহে হই যেন নির্ভয়।

কত আর, ঘর ছেড়ে তোর পথ বিপথে ফেলবি বেদের টোল্
ওরে ও, লক্ষ্মীছাড়া মন রে আসর স্বপ্ন-দেখা ভোল।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঈশানে মেঘ করেছে
ঈশানে মেঘ করেছে, সুর ধরেছে কালনাগিনীর দল
আকাশে ফোঁস ফোঁসিয়ে উগ্‌রে ঢালে বিদ্যুতে গরল।

ঘনালো ভীষণ আঁধার
ঘনালো ভীষণ আঁধার বিপুল বাধার অত্যাচারের মেঘ,
নদীতে বান ডেকেছে প্রাণ জেগেছে বাড়ছে হাওয়ার বেগ।

বেঘোরে মরবি কেন ?
বেঘোরে মরবি কেন ? ঘর চিনে নে সবুজ সোণার গাঁয়
ফিরে চল প্রাণের টানে প্রেমের গানে শ্যামল বনের ছায়।

যে পথে চলিস একা
যে পথে চলিস একা বড়ই বাঁকা ঠিক-ঠিকানা নেই,
মিছে তোর ভাবনা-সুতোর জট্ পাকাবে মিলবেনাকো খেই

বুনো হাঁস দেয় না ধরা
বুনো হাঁস দেয় না ধরা রক্তঝরা বনের অভিসার
দিয়ে যায় কাঁটার ক্ষত আঘাত শত বন-ঘোরাটাই সার।

জানি তোর বুদ্ধি অনেক
জানি তোর বুদ্ধি অনেক থাম্ রে ক্ষণেক দেখ রে দেশের হাল
দু'মুটো ভাতের জন্য আজ বিপন্ন সাত কোটি কঙ্কাল।

চেয়ে দেখ মরেছে ধুঁকে
চেয়ে দেখ মরেছে ধুঁকে শুক্‌নো বুকে কুঁকড়ে-যাওয়া প্রাণ,
থামা তোর ধ্যানের খাদ্য জ্ঞানের বাদ্য প্যান্‌প্যানানি গান !!

জানি তোর ফক্কিকারী
জানি তোর ফক্কিকারী কী ঝক্‌মারী মন-ঠকানো সুর,
গোঙানি শোন্ বাসুকির মাটির তলায় গর্জ্জে রে গুর্ গুর্ !

ঈশানে ঝড় উঠেছে
ঈশানে ঝড় উঠেছে ছিঁড়লো এবার স্বপ্ন-ধরার ফাঁদ,
আকাশে বাজের মতো দিচ্ছে আওয়াজ মেঘের সিংহনাদ !

(৭ই বৈশাখ, ১৩৪২)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক

আমার মনের চিত্রশালায় কয়েকটি সুবিচিত্র চরিত্র-চিত্র আছে। সেই-সব ছবি আমি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলুম জীবনের রাজপথে চলতে চলতে। আজ তারই একখানি ছবি আপনাদের দেখাতে চাই।

তার নাম পাগ্‌লা। এটা তার পিতৃদত্ত নাম কিংবা জনসাধারণের কেউ তার এই নামকরণ করেছিল, সে-কথা আমি জানি না। কিন্তু আমিও তাকে পাগ্‌লা ব'লে ডাকতুম।

সে ছিল এক জগতের লোক, আর আমি ছিলুম অন্য জগতের বাসিন্দা। আমাদের দু'জনের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতার সুযোগ। কিন্তু তবু দিনে দিনে তার সঙ্গে ধীরে ধীরে জ'মে উঠল আমার পরিচয়।

পূর্ণবেগে চলছিল তখন আমার সাহিত্য-সাধনা। সকাল থেকে বৈকাল পর্য্যন্ত আমার নীচেকার পড়বার ঘরটিতে একলা বসে থাকি। কখনো কলম চালাই, কখনো কেতাবের পাতা ওল্টাই, কখনো কল্পনালোকে বেড়িয়ে বেড়াই এবং কখনো টেবিলের সামনে ব'সে ওপাশের জানলা দিয়ে রাজপথের প্রবহমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকি। সারা-দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় কিছুই বুঝতে পারি না।

এক দিন হঠাৎ আমার জানলার সুমুখে এসে দাঁড়াল একটি মূর্ত্তি। মাঝারি আকারের চেহারা, শ্যামবর্ণ, মাথায় লম্বা লম্বা চুলগুলো রুক্ষ ও উস্কো-খুস্কো। পরণের আধ-ময়লা কাপড়খানির খানিকটা খুলে উত্তরীয়ের মতন গায়ে জড়ানো, পায়ে জুতো নেই। মূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য না হ'লেও, তার মুখে-চোখে ছিল এমন একটি বুদ্ধির ও মিষ্ট ভাবের আভাস যে, তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে নিতান্ত মন্দ লাগে না।

আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই সে অত্যন্ত পরিচিতের মতন একটুখানি হেসে দুই হাত জোড় ক'রে আমাকে একটি নমস্কার করলে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলুম নীরবে।

সে বললে, "আমার নাম পাগ্‌লা।"

আমি হেসে ফেলে বললুম, "তাই না কি? তুমি কি চাও বাপু?"

সে বললে, "একটা গান শুনবেন?"

—"তুমি গান গাইতে জানো?"

—"গান গেয়েই তো আমার পেট চলে স্যার!"

—"ও, গান গেয়ে তুমি ভিক্ষা কর?"

ভিক্ষা শব্দটা পাগ্‌লার কানে বোধ হয় কটু শোনালো।

সে মাথা নেড়ে বললে, "না স্যার, আমি ভিক্ষে করি না। আমি গান শোনাই বটে, কিন্তু মুখ ফুটে কারুর কাছে ভিক্ষে চাই না!"

—"তা হলে তোমার পেট চলে কি করে?"

—"আমার গান শুনে সকলে খুসি হয়ে আমায় কিছু কিছু বখ্‌সিস্ দেন। সেটা কি ভিক্ষে স্যার? বড় বড় গাইয়েরাও তো গান গেয়ে টাকা আদায় করে!"

আমি হাসতে হাসতে বললুম, "পাগ্‌লাবাবু, তোমার যুক্তি অকাট্য। আচ্ছা, আমাকেও তুমি একটা গান শোনাতে পারো।"

পাগ্‌লা আমার পড়বার ঘরের দরজায় চৌকাটের উপরে উবু হয়ে ব'সে গান গাইতে আরম্ভ করলে।

তার কণ্ঠস্বরকে মধুর বলা যায় না এবং সে যে এক জন ভালো গাইয়ে তাও নয়। কিন্তু তার গলায় ছিল দরদ ও আকর্ষণী-শক্তি।

আমাকে সব-চেয়ে আকৃষ্ট করলে তার গানের কথাগুলো। এ গান যিনি রচনা করেছেন তিনি আধুনিক নন্ বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে খাঁটি কবিত্ব আছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

গান শেষ হলে পর পাগ্‌লার হাতে চারটে পয়সা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এ গান তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ?"

পাগ্‌লা বললে, "আমাদের গাঁয়ে একটা লোক থাকে, সে গান বাঁধে। তার কাছ থেকে আমি অনেক গান শিখেছি।"

—"বটে! তোমাদের গ্রামের নাম কি?"

উত্তরে বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রামের নাম শুনলুম, কিন্তু নামটি এখন আর আমার মনে নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কি জাত?"

—"কায়স্থ।"

একটু বিস্মিত হয়ে বললুম, "তুমি কায়স্থের ছেলে! তোমার কি আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?"

পাগ্‌লা মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বললে, "দেশে আমার বাবা আছেন, মা আছেন, ছোট ছোট দু'টি ভাই আছে।"

অধিকতর বিস্ময়ে বললুম, "তবু তুমি কলকাতার পথে পথে এমন ছন্নছাড়ার মতন টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াও? ছিঃ!"

পাগ্‌লা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তার পর নত চোখে মৃদু স্বরে বললে, "আমার মা সৎ-মা। এ পক্ষের দু'টি ছেলে হবার পরেই বাবা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

পাগ্‌লার জীবনে 'ট্রাজেডি'র আভাস পেয়ে আমার মনটা কিঞ্চিৎ নরম হয়ে এল। ধীরে ধীরে দরদ-ভরা গলায় বললুম, "তুমি চাকরি কর না কেন?"

—"পেটে তো বিদ্যে আছে স্যার ফিপ্‌থ্‌ ক্লাস পর্য্যন্ত! যা পড়েছিলুম তাও ভুলে মেরে দিয়েছি! আমায় চাকরি দেবে কে?"

—"এমন অনেক কাজ আছে যাতে পুঁথিগত বিদ্যার দরকার হয় না। তুমি যদি চাকরি কর, তা'হলে তোমার জন্যে আমি সেই রকম কোন কাজের চেষ্টা করতে পারি।"

—"থ্যাঙ্ক্‌ ইউ স্যার! কিন্তু আমি কারুর চাকর হ'তে পারব না স্যার! আচ্ছা নমস্কার!" এই ব'লেই পাগ্‌লা তার যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম, এর চরিত্রে কিছু-কিছু নূতনত্ব আছে ব'লেই মনে হচ্ছে। ভিক্ষাও করে, অথচ ব্যবহার ভিখারীর মতন নয়। ভদ্রতার ভাবটা এখনো ভুলতে পারেনি। কিন্তু একটা বড় ভুল হয়ে গেল যে! ওর গানের রচনাটি ভালো, যদিও গ্রাম্য কবির রচনা। গানটি আমার 'নোট-বুকে' তুলে নেওয়া উচিত ছিল! লোকটা হঠাৎ চ'লে গেল, হয়তো জীবনে আর এ-পথ মাড়াবে না।

দুই

হপ্তাখানেক পরে।

'ভারতী' পত্রিকার জন্যে একটি গল্প রচনা করছিলুম। বেলা প্রায় বারোটা, রাজপথে পথিকের পদশব্দ ক্রমেই ক'মে আসছে।

এক-মনে লিখছি, হঠাৎ জানালার ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর জাগল, "দাদাবাবু, আজ আর একটা গান শুনবেন না কি?"

মুখ তুলে চেয়ে দেখি, হাসি-হাসি মুখে পথের উপরে দাঁড়িয়ে আছে পাগ্‌লা।

বললুম, "সেদিন ছিলুম 'স্যার,' আজ আবার দাদাবাবু হ'লুম কেন?"

পাগ্‌লা বললে, "স্যার কথাটা বিলিতি। ও নামে অচেনা লোককেই ডাকা চলে। কিন্তু আপনাকে দেখলে কেমন যেন আপনার লোক ব'লেই মনে হয়, তাই দাদাবাবু ব'লে ডাকছি। এবার থেকে মাঝে মাঝে এসে আপনাকে গান শুনিয়ে যাব।"

—"বেশ, তা'হলে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

পাগ্‌লা আবার আমার দরজার চৌকাটের উপরে উবু হয়ে ব'সে গান সুরু ক'রে দিলে।

আজকে একটা নতুন গান গাইলে এবং এ-গানের ভাষার ভিতরেও আছে সত্যিকার কবি-প্রাণের সুমধুর অভিব্যক্তি।

গান শেষ হ'লে পর বললুম, "পাগ্‌লা, তুমি এ-রকম গান আরো কত জানো?"

পাগ্‌লা বললে, "কত গান জানি, তার কি আর হিসেব রেখেছি দাদাবাবু? তবে অনেক গান জানি, অনেক!"

—"তোমার যে গানগুলি ভালো লাগবে, আমার খাতায় সেগুলি টুকে রাখতে চাই। তুমি রাজি আছ?"

পাগ্‌লা একটু ভেবে সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, "আমার গান নিয়ে আপনি কি করবেন?"

আমি হেসে বললুম, "ভয় নেই পাগ্‌লা, তোমার গান গেয়ে আমি ভিক্ষাও করব না, কি অন্য কারুকে শেখাবও না। আমার কি সখ জানো? ভালো গান শুনলেই আমি নিজের খাতায় টুকে রাখি!"

পাগ্‌লা নাচার ভাবে বললে, "দাদাবাবু যখন বলছেন তখন আমি তো আর না বলতে পারি না!"

আমি পাগ্‌লার হাতে একটি সিকি গুঁজে দিয়ে বললুম, "আমাকে নতুন নতুন গান শোনাতে পারলে, প্রত্যেক গান-পিছু তোমাকে একটি ক'রে সিকি বখ্‌সিস্‌ দেব।"

পাগ্‌লার মুখে জাগল খুসির হাসি। তাড়াতাড়ি আমার পা-দু'টো ধ'রে বললে, "থ্যাঙ্ক্‌ ইউ দাদাবাবু! আপনি হুকুম করলেই আপনাকে নতুন নতুন গান শুনিয়ে যাব।"

সত্য সত্যই তখন আমার অভ্যাস ছিল, অজানা কবির রচিত উল্লেখযোগ্য গান শুনলেই খাতার ভিতরে তাকে বন্দী ক'রে রাখা। এই ভাবে বাংলার নানা জেলার বহু গ্রাম্য বা মেঠো কবির গান আমি সংগ্রহ করেছিলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে খাতাখানি এখন হারিয়ে গিয়েছে।

তার পর থেকে পাগ্‌লা প্রায়ই আমার কাছে এসে নতুন নতুন গান শুনিয়ে যেত। আগেই বলেছি, গানের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠত তার প্রাণের দরদ। তাই সে যখন আমাকে গান শোনাতে বসত, তখন পথের উপরে জমত একটি ছোট-খাট জনতা। এমন কি আমার আশ-পাশের বাড়ী থেকেও গান শোনাবার জন্যে তার ডাক আসত। এবং বলা বাহুল্য, কোন বাড়ী থেকেই তাকে শূন্যহস্তে ফিরে আসতে হ'ত না। এই ভাবে তার পসার ক্রমেই এমন বেড়ে উঠল যে পাথুরেঘাটা অঞ্চলে সে হয়ে পড়ল একটি দস্তুরমত সুপরিচিত ব্যক্তি।

এক দিন খুব সকালে পাগ্‌লা হন্তদন্তের মত আমার কাছে এসেই হাত পেতে বললে, "দাদাবাবু গান পরে শোনাব, আগে আনা-কয়েক পয়সা দিন।

পাগ্‌লাকে এমন দাবি করতে কোন দিন শুনিনি।

বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে দেখি, তার মুখে-চোখে কেমন-একটা শ্রান্তিভরা যাতনার চিহ্ন। বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে গুঁজে দিলুম কয়েক আনা পয়সা। সে প্রায় ছুটে চ'লে গেল আমাদের গলির ভিতর দিকে।

কৌতূহলী হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দরজার কাছে এসে বাইরে

উঁকি মেরে দেখলুম, পাগ্‌লা দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেল আলগু-সর্দারের আস্তানার ভিতরে !

আলগু বাইরে ছিল গরু বা মোষের গাড়ীর গাড়োয়ানদের সর্দার। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে পুষত একটি দুর্দ্দান্ত গুণ্ডার দল। তার আড্ডায় নিয়মিত ভাবে চলত জুয়াখেলা ! এবং এ-অঞ্চলে তার চেয়ে বড় কোকেন-বিক্রেতা আর কেউ ছিল না।

অবাক্ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, পাগ্‌লার মতন লোক অমন ব্যস্ত হয়ে আলগুর আড্ডায় ঢুকল কেন ?

একটু পরেই দেখি, দুই হাতে ছোট্ট এক-টুকরো কাগজ মুখের কাছে নিয়ে সাগ্রহে চাটতে চাটতে পাগ্‌লা বেরিয়ে আসছে আলগুর আড্ডার ভিতর থেকে। বুঝতে পারলুম, পাগলার কোকেন খাওয়ার অভ্যাস আছে।

পাছে সে লজ্জিত হয়, এই ভয়ে পাগ্‌লা আমাকে দেখবার আগেই আমি নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লুম।

তিন

পাগ্‌লা কেবল তার গান শোনাতো না, আমার কাছে ব'সে ব'সে তার জীবনের অনেক কাহিনীই বলত। সে-সব কাহিনী শুনতে আমার খারাপ লাগত না। কারণ তার মধ্যে আমি পেতুম মনুষ্য-হৃদয়ের চির বিচিত্র আলো এবং ছায়ার ছন্দ।

কিছু দিন পরেই আমার মনে হতে লাগল, পাগ্‌লা যেন আমাকে তার অভিভাবকের পদেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়! সম্প্রতি লক্ষ্য করলুম, পাগ্‌লা ধীরে ধীরে সৌখীন হয়ে উঠছে। আগে তার মাথার চুল থাকত রুক্ষ এবং তার উপরে থাকত না চিরুণী-চালনার কোনই চিহ্ন। আজ-কাল সে তার তেল-চক্‌চকে চুলের উপরে সুদীর্ঘ টেরী কেটে আমার কাছে এসে বসে তার গান শোনাবার জন্যে। আগে তার গায়ে জামা ছিল না, এখন সে পরতে সুরু করেছে রঙিন গেঞ্জী। তার উপরে ফর্সা কাপড় পরে, কোঁচা দোলায় এবং পায়ে পরে সস্তা-দামের বার্ণিশ-করা জুতো।

পরিবর্ত্তনটা রহস্যময়। কিন্তু আমার স্বভাব, কেউ যদি নিজে থেকে কিছু না বলে, আমি তাকে যেচে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি না। কারণ আমার বিশ্বাস, এ-সব ক্ষেত্রে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে অরসিকের লক্ষণ! কারুর আত্মপ্রকাশ হয় যখন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত তখনি তার মধ্যে লাভ করা যায় মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য।

পাগ্‌লার সৌখীনতার কারণ বোঝবার জন্যে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না।

এক দিন পাগ্‌লা এল। তার পর দরজার চৌকাঠের উপরে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

খানিকক্ষণ পরে আমি বললুম, "কি পাগ্‌লা, চুপ করে কেন ? তোমার গানের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে না কি ?"

পাগ্‌লা বললে, "না দাদা বাবু, এখনও আমার গানের পুঁজি ফুরোয়নি। আমি অন্য কথা ভাবছি।"

আমি আর কিছু বললুম না। যে বইখানা পড়ছিলুম দৃষ্টি নিবদ্ধ করলুম আবার তার দিকেই।

খানিকক্ষণ পরে পাগ্‌লা হঠাৎ বাধো-বাধো গলায় ডাকলে, "দাদাবাবু !"

বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে আমি তার দিকে তাকালুম।

—"আপনাকে একটা কথা বলব কি না ভাবছি।"

—"কথা বলবে তার জন্যে আবার ভাবনা কিসের ?"

—"আজ্ঞে, আপনি যদি রাগ করেন ?"

—"তুমি এমন কি কথা বলবে পাগ্‌লা, যার জন্যে আমার রাগ হবে ?"

—"আপনি যদি অভয় দেন তো কথাটা ব'লেই ফেলি !"

—"আমি রাগ করব না। তোমার যা বলবার আছে বলো।"

পাগ্‌লা তবু খানিকক্ষণ ইতস্তত ক'রে তার পর নীচের দিকে মুখ নামিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বললে, "দাদাবাবু, আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বললুম, "নিমন্ত্রণ ! কিসের নিমন্ত্রণ ?"

—"আজ্ঞে দাদাবাবু, কাল আমার বিয়ে ?"

—"কাল তোমার বিয়ে ! কার সঙ্গে ?"

পাগ্‌লা তার ডান হাতখানি কপালের তলায় রেখে নিজের চোখ-মুখ ঢাকবার চেষ্টা ক'রে বললে, "একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। জেতে সে বাউরী। আজ কাল আমাদের বাসাতেই থাকে।"

—"তুমি হচ্ছ কায়স্থের ছেলে, বিয়ে করবে বাউরীর মেয়েকে ?"

পাগলা হঠাৎ মুখ তুলে কিঞ্চিৎ তপ্ত স্বরেই বললে, "বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাত রেখে এসেছি আমি বাবার কাছেই। দুনিয়ায় যার কেউ নেই, তার আবার জাত কি দাদাবাবু ?"

পাগ্‌লার মনে আঘাত লেগেছে দেখে তাড়াতাড়ি আমি প্রসঙ্গ বদলে বললুম, "কিন্তু তুমি কোথায় থাকো সে-কথা তো আমায় কোন দিন বলনি !"

—"দাদাবাবু, আমি আপনাদের কাছেই থাকি "

—"কোথায় ?"

—"এই শেঠের বাগানে ভিখিরি-পাড়ায়। আপনি দয়া ক'রে যাবেন তো ?"

শেঠের বাগানের ভিখারি-পাড়া! তার নাম আমি শুনেছি এবং সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায় না কি জীবন-নাট্যের সেই-সব দৃশ্যই, যা থাকে জনসাধারণের চোখের আড়ালে, আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের বাইরে। তখন আমি প্রায় প্রতি রাত্রেই কলকাতার বহু নিষিদ্ধ পল্লীতে পল্লীতে বিচরণ করতুম জনসাধারণের চোখের সামনে অদৃশ্য জীবন-নাট্যের এই-সব দৃশ্য দেখবার জন্যেই। আবার তারই কোন নূতন নিদর্শন দেখবার সম্ভাবনায় আমার বোহেমিয়ান্ চিত্ত তখনি হয়ে উঠল সচেতন এবং উত্তেজিত !

মনের ভাব বাইরে প্রকাশ না ক'রে শান্ত ও সহজ স্বরেই বললুম, "পাগ্‌লা, তোমাকে যখন ভালোবাসি তখন তোমার নিমন্ত্রণ কি আমি ঠেলতে পারি ? বেশ, আমি যাব—কিন্তু কাল তোমাকে নিজেই এসে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হবে।"

পাগ্‌লা তখনি দণ্ডবৎ হয়ে মেঝের উপরে প'ড়ে দুই হাত দিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "আমি জানতুম দাদাবাবু, আপনি যে আমার কথা ঠেলতে পারবেন না, আমি তা জানতুম! থ্যাঙ্ক্‌ ইউ দাদাবাবু, থ্যাঙ্ক্‌ ইউ! আপনি কেবল আমার দাদাবাবু নন, আপনি আমার মা, আপনি আমার বাপ, আপনি আমার চোদ্দ-পুরুষ ! থ্যাঙ্ক্‌ ইউ !"

এই হচ্ছে মনুষ্য-চরিত্র! যে হচ্ছে সর্ব্বহারা', পৃথিবীর সকলের স্নেহ থেকে বঞ্চিত, সে যদি কারুর কাছ থেকে পায় সহানুভূতির মাধুর্য্য, তবে তার পায়ে গোলামের মত নত হয়ে থাকতে কোন আপত্তিই করে না।

চার

চিৎপুর রোডের নতুন বাজারের সামনেই হচ্ছে শেঠের বাগান। ঠিক তার দক্ষিণ দিকেই ছিল প্রকাণ্ড একটা বস্তি, এখন তার জায়গায় আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত মস্ত বাড়ীর পর বাড়ী।

শ্যাম মল্লিক লেনের ভিতর দিয়ে ঢুকে সেই সুদীর্ঘ বস্তিটা বাঁ-পাশে রেখে আমি পাগ্‌লার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। পথের ধারে পাশাপাশি পায়রার খোপের মত সারি সারি পনেরো-বিশখানি ঘর এবং প্রায় প্রত্যেক ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক একজন ক'রে হাড়-কুৎসিত স্ত্রীলোক। কুরূপের পসরা সাজিয়ে তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তাদের চেয়েও অধঃপতিত পুরুষদের!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পাগ্‌লা আমাকে নিয়ে বস্তির ভিতরে ঢুকে অলি-গলির ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে হঠাৎ এক-জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পর চীৎকার ক'রে ডাকলে, "ক্ষীরি! অ ক্ষীরি! ওরে কালা মাগী! আলো নিয়ে শিগ্‌গির এদিকে আয়।"

বাড়ীর ভিতর থেকে খন্‌খনে গলায় জবাব এল, "ভারি যে নবাব-পুত্তুর হয়েছিস্ রে, আলো না দেখালে ভেতরে আসতে পারবি না?"

পাগ্‌লা ক্ষাপ্পা হয়ে বললে, "ওরে হারামজাদী মাগী, আমার জন্যে তোকে আলো দেখাতে বলছি না কি? বাইরে বেরিয়ে ছাখ আমার সঙ্গে কে এসেছে!"

—"তুই আবার কোন্ রাজা-মহারাজাকে সঙ্গে করে এনেছিস্ রে!" বলতে বলতে একটা জ্বলন্ত কেরোসিনের ডিপে নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বীভৎস এক মূর্ত্তি!

ম্লান হলদে আলোতে তার সমস্ত বীভৎসতা ভালো ক'রে প্রকাশ পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু যেটুকু দেখতে পেলুম আমার পক্ষে সেইটুকুই হ'ল যথেষ্ট।

সেই পেত্নী-মূর্ত্তির তৈলাক্ত, কালো-কুচকুচে, শীর্ণ দেহের উপরার্দ্ধ ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন! আমাকে দেখেই এতখানি জিভ বার ক'রে আলোর ডিপেটা সশব্দে মাটির উপরে বসিয়ে রেখে, দুই হাত দিয়ে বুকের উপরকার দোদুল্যমান ও কদর্য্য স্ত্রী চিহ্ন দু'টো ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে মূর্ত্তিটা সাঁৎ ক'রে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের ভিতরে।

এমন চেহারার ভিতরেও লজ্জার অস্তিত্ব দেখে মনে মনে কৌতুক অনুভব করলুম।

পাগ্‌লা মাটি থেকে ডিপেটা তুলে নিয়ে বললে, "ক্ষীরি-বাঈউলী আপনাকে দেখে পিঠটান দিয়েছে। আসুন দাদাবাবু, আমিই আপনাকে পথ দেখাই।"

কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে উঠানের সামনে গিয়ে পড়লুম। উঠানটা বেশ লম্বা এবং তার অন্য প্রান্তে রয়েছে বড় রোয়াকের মত খানিকটা বাঁধানো উঁচু জায়গা। রোয়াকের মাঝখানে বসানো একটা হারিকেন লণ্ঠনের ধোঁয়া-কালো চিমনির অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, সেখানে বসে জটলা করছে পনেরো-ষোলো জন স্ত্রী-পুরুষ। সেখানে যে গাঁজার কল্কে চলছে ঘ্রাণের দ্বারা সেটা বুঝতেও দেরি লাগল না।

তাদের ভিতর থেকে কে এক জন চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "কে রে, পাগ্‌লা না কি?"

পাগ্‌লা জবাবে বললে, "এই যে, তোরা সব এসে জুটেছিস্ দেখছি!"

সেই লোকটা বললে, "এসে তো জুটেছি, কিন্তু আমাদের পাঁটু আর চাটু কই রে?"

পাগ্‌লা তার কথার কোন জবাব না দিয়ে আমার দিকে ফিরে গলা নামিয়ে বললে, "দাদাবাবু, আমি আগে ওদের ঠাণ্ডা ক'রে আসি। আপনি পাশের ঘরটাতে গিয়ে একটু বসুন, ওটা আমারই ঘর। ওখানে গেলে মৌরির সঙ্গেও দেখা হবে।"

—"মৌরি কে?"

—"মৌরি আমার হবু বৌ!"

—"মৌরি আবার নাম হয় না কি?"

—"মৌরির দিদির নাম গৌরী। তারই নামের সঙ্গে মেলাবার জন্যেই ওর মা ঐ নাম রেখেছে।"

পাশের ছোট্ট ঘরখানাতে ঢুকেই হারিকেনের আলোতে প্রথমে চোখে পড়ল, সামনের দেওয়াল জুড়ে বিরাজ করছে মস্ত-বড় একখানা বিজ্ঞাপনের ছবি।

তার পর চোখ নামিয়েই দেখি, এক প্রকাণ্ড ষণ্ডা চেহারার ও কাফ্রীর মতন কালো লোক ঊর্দ্ধমুখে একটা দেশী মদের বোতল থেকেই সুরাপান করছে এবং তার কোলের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি যুবতী স্ত্রীলোক।

মুখ থেকে বোতলটা নামিয়ে লোকটা সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। লক্ষ্য করলুম তার মুখখানা কেবল কুৎসিতই নয়, সে একটি চক্ষু থেকেও বঞ্চিত।

লোকটা কর্কশ স্বরে বললে, "এ আবার কি মূর্ত্তি বাবা!"

ভুল ক'রে অন্য কারুর ঘরে ঢুকে পড়েছি ভেবে আমি তাড়াতাড়ি আবার বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকলুম, "পাগ্‌লা!"

পাগ্‌লা আবার আমার কাছে ফিরে এসে বললে, "কি বলছেন দাদাবাবু?"

—"এ ঘরে যে অন্য কারা রয়েছে!"

—"কই, দেখি" ব'লে পাগলা ঘরের ভিতর ঢুকেই কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিতের মত।

তার পর সে কুপিত কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ রে খ্যাঁদা, তুই নিজেদের বস্তি ছেড়ে আমার এখানে এসে জুটেছিস্ বড় যে? আমি তো তোকে নেমন্তন্ন করিনি।"

ঘরের ভিতর থেকে সেই খ্যাঁদা নামক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠল। তার পর হাসতে হাসতেই বললে, "কে তোর এখানে পাত্‌ চাট্‌তে এসেছে রে? আমি এসেছি মৌরিকে নিয়ে যাবার জন্যে।"

পাগ্‌লা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না, থতমত খেয়ে বললে, "কি, কি বললি?"

—"ওরে ক্যাকারাম, মৌরিকে আমি আবার নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

মৃত্যু-জল্পনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

জানি না মৃত্যুর কাছে আমাদের কী প্রার্থনা আছে
জীবনের লগ্ন বয়ে মৃত্যু এসে কাঁধে করে ভর
বিক্ষুব্ধ বাত্যার মতো, শ্যামল মাটীর খুব কাছে
তখন নিশ্বাস ফেলি; সকরুণ আমাদের স্বর।
স্বার্থের জটিল চক্রে যে-জীবন ফুলে ফেঁপে ওঠে,
যারা দীর্ণ মানুষের বল্গা ধরে' উচ্চাসনে বসে ;
কঙ্কালের স্তূপ থেকে যাদের বাগানে ফুল ফোটে,
চক্রবৃদ্ধি হারে যারা শোষিতের থেকে সুদ কষে—

তারাও মৃত্যুর কাছে এক দিন মুখোমুখী হ'য়ে
তেমনি কঙ্কাল হয়, তবু মানুষের সংসারের
হীনবৃত্ত শেষ নয়, মৃত্যুর পীড়ন সবি সয়ে'
সহসা শতধা করে গুপ্ত স্বার্থ ছদ্ম জীবনের।
আজ তাই মৃত্যু নয় মৃত্যুর কারণ খুঁজে খুঁজে
আমরা সর্ব্বত্র ঘুরি, চোখ থাকে মাঠের সবুজে ॥

—"কিন্তু মৌরির সঙ্গে আজ আমার বিয়ে হবে, তা কি তুই জানিস্ না ?"

খ্যাঁদা আবার হো হো স্বরে হেসে উঠে বললে, "ওরে ক্যাব্‌লাকান্ত, আমি তো মৌরির বিয়ে দেখতেই এসেছিলুম, কিন্তু আমাকে আবার দেখেই মৌরীর মন বদ্‌লে গেছে যে! বলছে, ও আমাকে ছেড়ে আর কারুর সঙ্গেই থাকতে পারবে না! ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে মৌরি এখন আমার পায়ে প'ড়ে কান্নাকাটি করছে! আমিও রাজি না হয়ে কি আর করি বল্? নিজেই ঝগড়া ক'রে পালিয়ে এসেছিল, নিজেই আবার ফিরে যেতে চাইছে!"

পাগ্‌লা অভিভূত স্বরে বললে, "হ্যা মৌরি, এ কথা কি সত্যি ?"

বাহির থেকে মৌরিকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনলুম, "হ্যা ভাই পাগ্‌লা, খ্যাঁদাকে আমি এখনো ভুলতে পারিনি! ও যদি আজ এখানে না আসত, তাহ'লে আমি নিশ্চয় তোকেই বিয়ে করতুম! কিন্তু খ্যাঁদাকে দেখে আজ আমার খালি কাঁদতে ইচ্ছে করছে!"

পাগ্‌লা ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, "এই এক মাস ধ'রে তোকে কত আদর করলুম, কত ভালো খাবার খাওয়ালুম, একস্থুট রূপার গয়না পর্য্যন্ত গড়িয়ে দিলুম! তুই বললি, খ্যাঁদা তোকে উঠতে বসতে লাথি-ঝাঁটা মারে, পেটে খেতে পরতে কাপড় দেয় না, তুই আর তার নাম মুখেও আনবি না! আর আজ আমার বিয়ের দিনে এ কি তুই বলছিস্ ?"

মৌরি খিল্-খিল্ ক'রে সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, "ওরে পাগ্‌লা, পিরীতের রীত, তুই কি বুঝবি রে? যাকে ভালোবাসি তার হাতে মার খেয়েও কত সুখ! এ যে আমার সোনার খ্যাঁদা!—তার পরই একটা চুম্বনের শব্দ।

পাগ্‌লা নীরবে ঘরের বাইরে এসে অবসন্নের মত ব'সে পড়ল। দেখলুম তার চোখ-দু'টো চক্-চক্ করছে, খুব সম্ভব সে কেঁদে ফেলেছিল।

ইতিমধ্যে রোয়াকের ওধারে ব'সে যে-মূর্ত্তিগুলো জটলা করছিল, তারাও ঘরের বাইরে এবং ভিতরে এসে জনতার সৃষ্টি করেছে।

তাদেরই এক জন ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠল, "না, না! পাগ্‌লার সঙ্গে আমরা মৌরি ছুঁড়ীর বিয়ে দেবই! নইলে আমাদের মস্ত মাইফেল একেবারে মাটি হয়ে যাবে!"

খ্যাঁদার কণ্ঠ বললে, "মাইফেল? কিসের মাইফেল ?"

—"পাগ্‌লা বলেছে আজ আমরা যত চাইব তত খাঁটির বোতল পাব! কিন্তু মৌরি যদি তোর সঙ্গে চম্পট দ্যায়, পাগ্‌লা আমাদের বোতল দেবে কেন ?"

—"ও, এই কথা? পাগ্‌লা তো ভিখিরী, ওর সাধ্যি কতটুকু? আমি তোদের এক ডজন বোতল যোগাতে পারি—সঙ্গে সঙ্গে পেট ঠেসে খাঁটের ব্যবস্থা! এর পর তোদের আর কিছু বলবার আছে ?"

—"কিছু না, কিছু না! খ্যাঁদার মুখে ফুল-চন্দন্ পড়ুক্—মৌরি বেটির জন্যে আর আমাদের কোন মাথাব্যথাই নেই!"

ঘরের ভিতর থেকে আবার খিল-খিল্ ক'রে হেসে উঠে মৌরি গান ধরে দিলে—

"আমার বাড়ী যেও বঁধু, রাখব তোমায় আদরে,
আর, যাবার সময় বেঁধে দেব মিছ্‌রি বঁধুর চাদরে!"

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।

* * * *

দিন-পনেরো পরে একটি সকালে পড়বার ঘরে ব'সে রচনাকার্য্যে নিযুক্ত আছি, রাস্তা থেকে হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে শুনলুম, "দাদা-বাবু, একটি গান গাইব কি ?"

সাগ্রহে চোখ তুলে পাগ্‌লার মুখের দিকে তাকালুম। তার মনের ভিতরে এখনো ঝড় বইছে কি না জানি না, কিন্তু তার মুখের উপরে খেলা করছে মৃদু মৃদু হাসি। মানুষের মুখ আর মানুষের মন, এদের মধ্যে মিলন হয় কালে ভদ্রে, কদাচ।

আমার সম্মতি পেয়ে সে দিনও পাগ্‌লা আগেকার মতই ঘরের চৌকাটের উপরে ব'সে গান শুনিয়ে গেল।

আমিও তার বিয়ের প্রসঙ্গ তুললুম না, সেও আর কোন কথা বললে না।

ভবঘুরের চিঠি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

ভায়া, এতদিন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলাম তাই জানতে চেয়েছ। সে অনেক কথা। সবটা বুঝিয়ে বল্‌তে পারবো কি না জানিনে। একেবারে প্রাণের ভিতরকার সুখ-দুঃখের কথা কাগজে-কলমে ফুটিয়ে তোলা বড় শক্ত। শরৎ চাটুয্যের প্রাণ আর শরৎ চাটুয্যের কলম যদি চুরি করতে পারতুম, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম।

তোমরা যে দিন খদ্দর পরে আর মাথায় গান্ধী টুপি এঁটে মোটরে চড়ে রিষড়ায় কুলিদের কাছে চাঁদা আদায় আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ ও ত্যাগধর্ম্মের মহিমা প্রচার করতে গিয়েছিলে, সে দিনটা মনে পড়ে? ফেরবার মুখে তোমরা যখন কেল্‌নারের দোকান থেকে এক এক গ্লাস বরফ আর লিমনেড খেয়ে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলে, তখন আমি ষ্টেশনের বাইরে এককোণে চুপটী করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। একে গরম তায় ধূলো। মেজাজটা যে খুব ঠিক ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তার উপর তোমাদের ত্যাগধর্ম্মের সঙ্কীর্ত্তন যে আমার কোন কালেই বরদাস্ত হয় না, তা তো তুমি বিলক্ষণই জান।

কিন্তু যাক্ সে কথা। চুপ করে তোমাদের ত্যাগধর্ম্মের বহরটা দেখে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ পকেটটাতে একটু টান পড়তেই পিছন ফিরে দেখি একটা ছোট্ট ছেলে আমার পকেটের রুমালখানা নিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুট দিচ্ছে। ছেলেটা তো আমার মতো শিল্ড ম্যাচে ফরওয়ার্ড হয়ে খেলেনি! আমার সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন? ধরা পড়তেই একেবারে ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেল্‌লে। বলে কি না—'ভুখা হ্যায়।'

"বেটা আমার!—ভুখা হ্যায়।"—বোলেই আমি ধাঁ করে একটা চড় কসিয়ে দিলুম। বলা নেই, কওয়া নেই—ছেলেটা একেবারে লোটন পায়রার মতো লুটতে লুটতে পড়ে গেল।

তোমরা ত্যাগধর্ম্ম সেরে ফিরে এলে। আমার আর ফেরা হলো না। কি মনে হতে লাগলো জানিনে। ছেলেটার মাথার কাছে চুপ করে বসলুম। মরে গেল না কি ছোঁড়া? না, বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, ধুক ধুক করছে।

* * * *

ঝম্ ঝম্ করে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা গাছতলায় এসে দাঁড়ালুম। মুখে বৃষ্টির ছাঁট লেগেই হোক আর যে কারণেই হোক, ছেলেটা দেখলুম সেই সময় চোখ খুলে মিট মিট করে চাইছে। বারো-তেরো বছরের ছেলে হবে, কিন্তু হাল্‌কা যেন সোলা। বুকের পাঁজরগুলো এক একখানা করে গোণা যায়। মাথার ভিজে সপ্‌সপে চুলগুলো মুখ-চোখের উপর পড়েছিল। সেগুলো সরিয়ে দিতে দেখলুম দুটো বেশ ডাগর ডাগর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখের চাহনিতে তখনও ভয়-মাখানো।

"মাৎ মারো, বাবুজী, মাৎ মারো।"

'না রে না, মারবো না। তোর বাড়ী কোথা?'

ঊর্দ্ধমুখ রাক্ষসের মতো কলগুলো যেখানে চিমনি মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা হাত বাড়িয়ে সেই দিকে দেখিয়ে দিলে। আমি বললুম—চল, তোকে বাড়ী রেখে আসি।

তাদের বাড়ীর কাছে যখন এসে পৌঁছুলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাড়ীই বটে! চারটে বাঁশের খুঁটির উপর একখানা গোলপাতার চালা। তিন দিক্ দরমা দিয়ে ঘেরা, আর এক দিকে একখানা ছেঁড়া চট ঝুলছে। সুমুখে একটু দাওয়া; তার উপরের চালা আধখানা ভেঙ্গে পড়েছে। দাওয়ার এক কোণে একখানা ভাঙ্গা শিল, আর আধখানা নোড়া। কি খানিকটা বাটনা বাটা হয়েছিল; তার অর্দ্ধেকটা জলে ধুয়ে মেজের কাদার সঙ্গে মিশে গেছে। ঘরের কোণে একটা খুঁটির সঙ্গে পা-বাঁধা একটি বছর খানেকের মেয়ে খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাতে-মুখে কাদা মাখছে; আর তারই কাছে একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর খান-দুই জরাজীর্ণ কাঁথা মুড়ি দিয়ে কে এক জন পড়ে আছে।

ছেলেটা ঘরের দরজার কাছ থেকে ডাকলে—'মায়ী।'

মায়ীর সাড়াও নেই, শব্দও নেই। ছেলেটা তাড়াতাড়ি তার মায়ের মুখের উপর থেকে কাঁথাখানা সরিয়ে কপালে হাত দিয়ে দেখলে। তার পর মায়ের বুকের উপর পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

* * * *

কেন জানিনে, কিন্তু সেখান থেকে চোঁচা দৌড় দিলুম। পোয়াটাক পথ ছুটে এসে যখন গঙ্গার ধারে পড়লুম তখনও আমার গা কাঁপছে। কপালে পিল্ পিল্ করে ঘাম বেরুচ্ছে। পকেট থেকে রুমালখানা বার করতে গিয়ে রুমালে বাঁধা টাকাটা হাতে ঠেকলো। ছেলেটার গালে চড় মেরে ঐ টাকাটাই কেড়ে নিয়েছিলুম। উঃ!

ছুঁড়ে টাকাটা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম।

ভদ্রলোকের পোষাক আমার গায়ে যেন কামড়াচ্ছিল। সেগুলো খুলে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বললুম—ব্যস!

চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না। আবার সেই গোলপাতার কুঁড়ের কাছে আস্তে আস্তে ফিরে গেলুম।

উঁকি মেরে দেখলুম ছেলেটা উপুড় হয়ে মেঝের উপর পড়ে আছে। আস্তে আস্তে তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলুম—'ভেইয়া।'

সেই জীর্ণ-শীর্ণ অপরিচিত ছেলেটা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'ভেইয়া!'

আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। তার পর যখন আরও দু' তিন জন কলের কুলিকে ডেকে তার মায়ের সৎকার করে ফিরলুম তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে গেছে। মনে হ'লো মনের অন্ধকারও যেন অনেকখানি কেটে গেছে।

* * * *

ঠিক করলুম একবার ছোটলোক হতে হবে। ভদ্রলোকের উপর অরুচি ধরে গেছে। ভদ্রলোক মানে একটা জামা, একখানা উড়ুনি আর একজোড়া জুতো বৈ তো নয়। তা থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? তা ছাড়া আমার মা-কুলে মাসী নেই, বাপ-কুলে পিসি নেই যে খোঁজ করতে আসবে। আমার ভেইয়ারও সংসারে আর কেউ নেই। বাপ কলে কাজ করতো। এক দিন কাজ করতে গিয়ে আর ফিরলো না। কেউ বললে গুর্খা পুলিসের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল, সে খুন হয়ে গেছে। কেউ বললে জলে ডুবে মরেছে। মোট কথা, সে আর ফিরে এলো না। তার মাকে আট মাসের মেয়ে কোলে করে কুলি-লাইন থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে যে রোগ তাকে ধরেছিল তা বেড়েই চললো। ভেইয়া কলে চাকরী করতে গিয়েছিল; কিন্তু সর্দ্দারেরা সেলামী চায়। কোথায় পাবে সে সেলামী? তাই ভেইয়া কখন কখন ভিক্ষা করতো; আর কখন কখন লোকের পকেটে হাত পুরে দিত।

সকাল বেলা ভেইয়াকে বললুম—"কুছ পরোয়া নেহি। ডরো মাৎ। তুই খুকিকে নিয়ে বসে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি।"

তারপর একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে সর্দ্দারজীকে একটু তোয়াজ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লুম। যখন ফিরলুম তখন সতের সিকে হপ্তা হিসেবে তাঁত ঘরে একটা মজুরী বাগিয়ে ফেলেছি। ভারি স্ফূর্ত্তি হলো। কলকাতার মেসের ভাত খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় "বঙ্গ আমার, জননী আমার" বলে অনেক আর্ত্তনাদ করে বেড়িয়েছি। বঙ্গজননীর আসল চেহারাটা এইবার দেখতে পাবো, এই আশা এত দিনে মনে হলো। সেই গোল-পাতার চালার ভিতর ছেঁড়া মাদুরে বসে ভেইয়াকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ভেইয়া, রাঁধতে পারবি? ডাল আর ভাত, আর মুলো ভাতে?"

ভেইয়া জিজ্ঞাসা করলে—"আর খুকি?"

"খুকি? ও! তাও তো বটে! কুছ পরোয়া নেহি। খুকি খাবে ফেন আর ডালের ঝোল।"

* * * *

দু বছর পরে ভেইয়াকে আমার চাকরীতে ভর্ত্তি করে দিয়ে চলে এসেছি। খুকির পেটে ফেন আর ডালের ঝোল সইল না। সে তার মায়ের কাছে চলে গেছে।

তুমি চিঠিখানা পড়ে কি ভাবছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মাথা একটুও খারাপ হয়নি। এই দু' বছরে বুঝতে পেরেছি ইউরোপে বল্‌শেভিকদের জন্ম হলো কেন! আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি, তোমাদের মতো সৌখীন স্বদেশ-হিতৈষীরা এ দেশকে কস্মিন্ কালেও নাড়তে পারবে না।

যাক, বক্তৃতা দেবার আর প্রবৃত্তি নেই। দেখা হলে সব কথা খুলে বলবো।

ইতি—

আমার খাটের কোণে একটি ছারপোকার বাস ছিল। দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়াছি দুই জনে। দুইজনেই সংসারে একাকী, নিঃসঙ্গ—উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় আত্মিক যোগও অলক্ষ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহাকে ভালবাসিতাম; আমার রক্তে তাহার দেহ পুষ্ট, স্বভাবতই তাহার প্রতি আমার একটা বাৎসল্যবোধ ছিল। সে-ত আমাকে সমুচিত কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা দেখাইত—জাগ্রত অবস্থায় দংশন করিয়া আমাকে উত্যক্ত করিত না। নিবিড় ঘুমে যখন আমি সচেতন তখনই মাত্র আসিয়া যেটুকু প্রয়োজন রক্ত খাইয়া যাইত। আবশ্যকের অতিরিক্ত দাবি করে না, উত্যক্ত করে না, এই গুণটির জন্যই আমার তাহাকে ভাল লাগিয়াছিল।

তারপর অকস্মাৎ তাহার জীবনে নারীর আবির্ভাব ঘটিল। এক দিন দেখিলাম, সে একা নয়। আরও একটি ছারপোকা তাহার সঙ্গে রক্ত খাইতে আসিয়াছে। একটু লাজুক প্রকৃতির মনে হইল, ঠিক যেন সাহস সঞ্চয় করিয়া কাছে আসিতে পারিতেছে না, একবার একটু কাছে আগায়, আবার ফিরিয়া যায়, বালিশের তলায় চোখের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া নূতন সাহস সঞ্চয় করে, আবার অগ্রসর হয়—এমনই একটা লুকোচুরির ভাব।···বেশ লাগিল একটু ভাল করিয়া তাহাকে তাকাইয়া দেখিলাম। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স, কৃশকায়—কাব্যের ভাষায় তন্বী তরুণীই বলা চলে তাহাকে। বালিশের তলায় ঢুকিয়া গিয়াছিল, বালিশটা একটু সরাইয়া দেখিতে যাইতেই লজ্জায় একেবারে গতিহীন হইয়া, বিবর্ণ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে আর বিরক্ত করিলাম না, পুরানো ছারপোকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কে হে?

বিস্মিত হইতেছেন? ভাবিতেছেন বাজে গল্প? ভুল। সকল জীবেরই ভাষা আছে, ছারপোকারও আছে। তবে, তাহাদের ধ্বনি ক্ষীণ। যাহাদের বড় বড় কান, বড় বড় শব্দ শুনিবার জন্য তৈরী, তাহাদের কানে সে ভাষা ধরা পড়ে না। আমার কান ছোট, আমি শুনিতে পাই।

ছারপোকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কে হে?

সে বিনয়ে একেবারে গদগদ হইয়া পড়িল। চক্ষু বুজিয়া হাত কচলাইয়া দেহটাকে নানা ভাবে মোচড় দিয়া বুঝাইল, ও প্রশ্নের উত্তর দিতে তাহার ভারি লজ্জা।

কহিলাম, এই কথা? তা বেশ তো, এখন এক দিন খাওয়াইয়া দাও আমাদের, কি বল?

শুনিয়া সে আর একবার গদগদ হইয়া পড়িল; ছারপোকানীও মধুর রকম একটু জিভ কাটিয়া মুখ ফিরাইল।

দুই জন ছিলাম, তিন জন হইলাম—? মোটেই না। বরং আবার এক জন হইলাম বলা চলে। ছারপোকার আর দেখা পাই না। আগে সময়ে অসময়ে আসিয়া দুদণ্ড বসিত, দু'টা সুখ-দুঃখের কথা হইত—আর আসে না। আমাকে দিয়া তাহার প্রয়োজন মাত্র রক্ত খাওয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; ঘুমের মধ্যে কখন এক ফাঁকে আসিয়া দিনের মত এক চুমুক খাইয়া যায়। খোঁজ লইয়া জানিলাম, সে গৃহস্থালী রচনায় ব্যস্ত। এত কি তাহার গৃহস্থালী তাহাও বুঝি না—খাদ্যের সংস্থান তো আমার দেহেই সঞ্চিত রহিয়াছে ছারপোকার অফিস নাই, পড়াশোনা নাই, বাজারে যাওয়া নাই রান্নাবাড়া কাঠ-ফাড়া জল তোলা ঘর ঝাঁট দেওয়া কিছুই নাই —তবে? ভারি রাগ হইতে লাগিল আমার। মনে হইল, ইহার চেয়ে যদি জাগ্রত অবস্থায়ও রক্ত খাইতে আসিত তাহারা, তবু একা নিঃসঙ্গতা কাটিত। কিন্তু সে কথা বলিব কাহাকে? ছারপোকার দিনান্তে দেখাই পাই না, তোষক তুলিয়া ডাকাডাকি করিতে গেলে ছারপোকানী জিভ কাটিয়া দৌড় মারে। তাহাকে মাঝে মাঝে দূর হইতে দেখিতাম, বেশ মোটা সোটা হইতেছে।

তাহাদের পাত্তা না পাইয়া অগত্যা ভগবানকেই মনে মনে জানাইলাম, ভগবান ইহাদের সুমতি দাও, অন্ততঃ যখন জাগিয়া থাকি তখন রক্ত খাইতে আসুক।

ভগবান কথা শুনিলেন। অচিরাৎ বিছানা ভরিয়া ছারপোকা-শিশুর আবির্ভাব ঘটিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল টুকটুকে দেহ, গুড় গুড় গুড় গুড় করিয়া দিবারাত্র বিছানায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রথম

কয়েক দিন বেশ লাগিল। লাল টুকটুকে দেহটা আমার রক্তে ভরা বলিয়াই লাল, একথা জানিয়াও মন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। আহা! উহারা খাইবে না তো আমার একদেহ-ভরা রক্ত রহিয়াছে কেন। খাউক না, আমার অনেক আছে।

বুড়া দাদামহাশয়ের সঙ্গে নাতিরা খেলা করে, তেমনই করিয়া তাহারা আমার সঙ্গে সারাদিন লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। কখনও দল বাঁধিয়া লাল লাল পেট উঁচাইয়া মার্চ করিয়া বেড়ায়, কখনও বই খাতার মধ্যে লুকায়, কখনও বা চুলের মধ্যে বা আমার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

কিন্তু প্রথম কয়েক দিন যেটাতে কৌতুক বোধ হইয়াছিল, ক্রমে সেইটাই অত্যাচারে দাঁড়াইয়া গেল। ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে যাহা শোভন ও সুন্দর ধেড়ে ছেলেরা করিলে সেইটাই অসহ্য ন্যাকামি বলিয়া মনে হয়। বাচ্চারা বড় হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের দৌরাত্ম্য কমে না। তখন দেখিলাম, না আছে তাহাদের সহবৎ শিক্ষা, না হইতেছে সময় অসময়ের বোধ—লিখিতেছি, একটা হয়তো আচমকা আসিয়া কলমের মুখেই আটকাইয়া গেল; কোনটা জলের গ্লাসের মধ্যে পড়িয়া মরিয়া ফুলিয়া রহিল; কোনটা—বা কোন অভ্যাগত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় নিঃশব্দে পিঠে উঠিয়া একেবারে কাঁধ বাহিয়া সম্মুখে আসিয়া থামিল, অতিথি ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন।

অনেক সহিয়া সহিয়া, শেষে এক দিন বাধ্য হইয়া ছারপোকাকে ডাকিয়া কথাটা বলিলাম। কহিলাম, ছেলেমানুষ বোঝে না—মার-ধর করিও না, ভাল কথায় একটু বুঝাইয়া দিও। এই তো সহবৎ শেখার সময়।

ছারপোকা উত্তেজিত হইয়া কহিল, উহাদের শিখানো আমার বাবার সাধ্য? সম্পূর্ণ মামার বাড়ীর প্রকৃতিটি পাইয়াছে। আমার কিছু বলবার নাই, উত্ত্যক্ত যখন করিবে আপনি কান ধরিয়া ঠাস ঠাস করিয়া চড় বসাইয়া দিবেন।

আমি কহিলাম, তার পর? আমার চড় খাইলে তাহাদের কি দশা হইবে, ভাবিয়া দেখিয়াছ?

সে কহিল, যা হয় হউক। আমি আর পারি না—আমাকে জ্বালাইবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে হতভাগারা। মরুক, মরিলে আমি বাঁচি।

আমি কহিলাম, ছি, ছি, এমন করিয়া বলে না।

ছারপোকা কহিল, বলিব না তো কি? আমি চুপ করিয়া থাকিলেই কি ভগবানও চুপ করিয়া থাকিবেন? ওগুলা এক একটা যা হইতেছে অপঘাতে মরা উহাদের কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। আপনি আমার বহুকালের রক্তদাতা, আশ্রয়দাতা; আপনার হাতে মরিলে অন্ততঃ এটুকু বলিব অন্যায় বিচারে মরে নাই।

অতিকষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া তোষকের তলায় পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিদারুণ চেঁচামেচিতে বিছানা মুখরিত হইয়া উঠিল। ছারপোকা ও ছারপোকানী ঝগড়া করিতেছে; বাচ্চাগুলাও তাহার তালে তালে চ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া গোল বাড়াইতেছে। পরকীয় দাম্পত্য-কলহ বহুটা শুনিয়াছিলাম সুখশ্রাব্য; সত্যই কেমন দেখিবার জন্য বালিশে কান পাতিয়া শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিলাম।

ছারপোকা চাপা গলায় কহিল তোমার বাচ্চাদের জন্য কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব আমি?

ছারপোকানী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, তুমি কেন, আমি মরিলেই তো আপদ যায় তোমার। কেন, বাচ্চারা কি করিয়াছে, শুনি?

ছারপোকা কহিল, চাঁচাইও না।

ছারপোকানী কহিল, একশ'বার চাঁচাইব, হাজার বার চ্যাঁচাইব। সারাক্ষণ কেবল বাচ্চা তুলিয়া খোঁটা দিবে, কেন, বাচ্চা কি আমার একার?

ছারপোকা কহিল, ঘাট হইয়াছে বলিয়াছি, এখন থামো। মুখ একবার ছুটিলে যে আর থামিতে চায় না—

ছারপোকানী কহিল, আমার মুখই দেখ সারাদিন। আমি যে সারাদিন সারাক্ষণ মুখ চক্ষু বুজিয়া ভূতের খাটুনি খাটিয়া যাইতেছি, তাহার হিসাব কেহ রাখে?

ছারপোকা কহিল, কি, খত কবুল দিতে হইবে?

ছারপোকানী কহিল, তা দিবে বৈ কি? না হইলে ভদ্রলোক হইলে বই। ঐটাই তো বাকি আছে কি না।

ছারপোকা কহিল—(পাঠক! পাঠিকা! সে কলহের ভাবাটাই মাত্র আমি লিখিয়া জানাইতে পারি, সুরের মাধুর্য্য আমি লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহা বুঝিতে হইলে নিজেদের কথা ভাবুন, আপনি নিজে যেরূপ সুরে অনুরূপ কলহ করেন, তাহার কথা স্মরণ করুন।)

ছারপোকা কহিল, ভদ্রতার ভাবি বাকি রাখিয়াছ আমার। তোমার গলার চোটে তোমার বাচ্চাদের চরিত্রে আমি পাড়ায় মুখ দেখাইতে পারি না। উঃ, ইহার চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল আমার, মৃত্যু ভাল ছিল!

ছারপোকানী কহিল, তা এতই যদি আমরা আপদ বালাই হইয়া থাকি, আমাদের দূর করিয়া দিলেই তো হয়। দিয়া, তার পর আবার সুন্দরী কম বয়সী দেখিয়া নূতন ছারপোকানীকে লইয়া সংসার পাত, তাহার বাচ্চারা গায়ে মলত্যাগ করিলেও তখন তোমার চন্দন বলিয়া মনে হইবে। আমার কপাল ভাঙিয়াছে, তাহা কি আমি বুঝি নাই?

বলিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল। ছারপোকা কি করিল জানি না, সম্ভবত ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিংবা হয়তো অন্য কোন প্রকারে মান ভাঙাইবার চেষ্টা করিল। তোষকের কোণটা তুলিয়া, কাণ্ডখানা কি হইতেছে এক-নজর দেখিয়া লইতে বড় কৌতূহল হইতেছিল, কিন্তু সাহস হইল না। বাবা, যা ছারপোকানী, তাড়িয়া আসিয়া যদি আমাকেই দু'কথা শুনাইয়া দেয়!

কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করিয়া ছারপোকানীর মন শান্ত হইল। ফ্যাঁৎ করিয়া নাক ঝাড়িয়া কহিল কি করিয়াছে আমার বাছারা তাই বল না, শুনি।

ছারপোকা কহিল, তোমার ধৈর্য্য থাকিলে তো বলিব?

ছারপোকানী কহিল, আহা শুনিই না, কাহার পাকা ধানে মই দিল উহারা।

ছারপোকা কহিল, আর কাহার। যাঁহার খাইয়া এতকাল বাঁচিয়া আছি—মালিকের।

ছারপোকানী কহিল, এই কথা? অতটুকুটুকু বাচ্চা, কতখানি

করিয়াই বা রক্ত খায়। সেইটুকুর জন্য বুঝি আবার তোমাকে ডাকিয়া নালিশ করিলেন তিনি?

ছারপোকা কহিল, তাহার জন্য কেন হইবে। আমাদের মালিক তেমন লোক নন, দেবতুল্য লোক তিনি। কিন্তু এই যে সময় নাই অসময় নাই তাঁহার গায়ে উঠিয়া জিনিষপত্রের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করে—

ছারপোকানী কহিল, সেই কথা বলিলেন বুঝি? বুড়া ধাড়ি মিনসে, ঐটুকু বাচ্ছারা খেলিতে খেলিতে কি করিয়াছে তাই লইয়া আবার নালিশ ফরিয়াদ করিতে আসিয়াছে, লজ্জা হয় না? তুমি বলিয়া তাই। আমি হইলে খুব দুই কথা শুনাইয়া দিতাম।

ছারপোকা কাঁচুমাচু হইয়া কহিল, তিনি বলিবেন কেন, আমি নিজে দেখিতে পাই না? সারাক্ষণ উপদ্রব করে তাঁহার উপর, নেহাৎ ভাল মানুষ বলিয়াই সহিয়া যান।

ছারপোকানী কহিল, আহা! উপদ্রব করে, করিতে শিখাইয়াছে কে, তাই শুনি? তিনি আগ্রহ করিয়া ডাকিয়া লইতেন বলিয়াই না ওরা যায়? কখন হঠাৎ তাঁহার মেজাজ বিগড়াইবে, ওরা জানিবে 'কি করিয়া? বলে বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

ছারপোকা কহিল, না জানিয়া শুনিয়া খামকা তাঁহাকে দোষ দাও কেন?

ছারপোকানী কহিল, তাঁহাকে দোষ দিব কেন, দোষ দিই আমার কপালকে। হতভাগারা যায় কেন সেখানে মরিতে, তোমাদের আর চুলা জোটে না?

ঠাস্ ঠাস্ দুম্ দুম্ কয়েকটা শব্দ। ভ্যাঁ ভ্যাঁ, প্যাঁ প্যাঁ নানাবিধ চীৎকার। ছারপোকানী কহিল, চ্যাঁচাইস্ না, চ্যাঁচাইলে মারিয়া ফেলিব। ফের যদি কোন দিন যাইবি তো—

আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম, শার্ট হাতে লইলাম। ছারপোকা কহিল, বড় কথাই বলিলে। যাইবে না, খাইবে কি?

ছারপোকানী কহিল, খাইবে বাসি উনানের ছাই। অমন বদ্ধ কঞ্জুষ ছোটলোকের খাইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে—

এবার দুম্ দুম্ করিয়া কয়েকটা খুব বড় শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলা বাচ্ছার নিদারুণ চীৎকার। ছারপোকানীর তীব্র স্বর শুনিলাম, বটে, এত-দূর!

আমি গলা-খাঁকারি দিয়া কহিলাম, এই ছারপোকা, ও-সব কি হইতেছে।

বলিতেই সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল। খালি একটা অস্পষ্ট বুঁ বুঁ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল—বোধ হইল কোন একটা ছোট বাচ্ছা কিছুতেই থামিতেছে না, তাহার মা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে।

আমি শার্ট হাতে লইয়াই বাহির হইয়া গেলাম।

অনেকক্ষণ পরে ঘরে ফিরিলাম; সমস্ত বিছানা নীরব নিস্তব্ধ, জনপ্রাণী সেখানে বাস করে এমন মনে হয় না।

তারপর দুই তিন দিন আর বাচ্ছাগুলার সাড়া পাইলাম না। রক্ত খাইতেও আর তাহারা আসে না—কচিৎ কখনও তোষকের কাঁকে মশারির ভাঁজে এক আধটা বাচ্ছা চোখে পড়ে, শীর্ণ, সাদা, রক্তের অভাবে পাৎলা পর্দাময় পেটটা স্বচ্ছ দেখাইতেছে। অথচ ডাকিয়া খাওয়াইব তাহারও উপায় নাই, চোখে চোখে পড়িবামাত্র ফুরুৎ করিয়া দৌড় দেয়। আবার পরক্ষণেই দেখি, দূরে আর একটি গোপন অন্তরাল হইতে তৃষিত বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলিয়া আমার গায়ের দিকে চাহিয়া আছে। বড় মায়া হইতে লাগিল, কিন্তু কি করিব? ছারপোকানীর উপরে অসম্ভব রাগ হইল, সহবৎ শিখানো ভাল, তাই বলিয়া কি ঐ টুকু টুকু ছোট শিশুকে না খাওয়াইয়া মারার কোন অর্থ হয়? এ কী অন্যায় রাগ! চোখের উপর বাচ্ছাগুলা না খাইয়া শুকাইতেছে, আর আমি নিজে নিশ্চিন্ত মনে খাইয়া মোটা হইতেছি, ভাবিয়া এক এক সময় ভারি লজ্জা লাগিতে লাগিল, বহু বার ভাবিলাম, হাতের শিরা কাটিয়া অনেকখানি রক্ত ঢালিয়া ফেলিয়া দিই, প্রায়শ্চিত্ত হউক। কিন্তু তাহাতেও তো উহাদের পেট ভরিবে না!

ক্রমে দেখিলাম, বাচ্ছাদের যেটুকু সাক্ষাৎ পাইতাম তাহাও আর পাই না। তবে কি অনাহারে মরিয়াই গেল তাহারা? ছারপোকারও সাড়াশব্দ নাই। চিন্তায় চিন্তায় আরও দুই এক দিন কাটাইলাম, তার পর আর থাকিতে না পারিয়া তোষক তুলিয়া দেখিতে গেলাম। বাচ্ছাদের ও ছারপোকানীর চিহ্ন মাত্র নাই; একা কোণে ছারপোকা মলিন মুখে শুইয়া আছে। ডাকিয়া কহিলাম কি হে, কি খবর?

এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাক,—সাড়াই নাই। তখন শঙ্কিত হইয়া সতরঞ্চি ধরিয়া একটা জোর ঝাঁকুনি দিলাম; সে যেন হঠাৎ চেতনা পাইয়া আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। কহিলাম, ব্যাপার কি, বৌ কই?

সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর ভগ্নস্বরে কহিল, সিনেমায় গিয়াছে। বলিয়া ঝর-ঝর করিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল।

হউক ছারপোকা, পুরুষমানুষ তো। তাহার এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কহিলাম, সে তো অল্পক্ষণের ব্যাপার। তিন ঘণ্টার বিরহে এতখানি কাতর হইয়া পড়া—ছিঃ!

সে গলদশ্রুলোচনে কহিল, তিন ঘণ্টা নয়। আর আসিবে না তাহারা।

সে কি কথা? জন্মের মত সিনেমায়—তবে কি হতভাগিনীকে আধুনিকতায় পাইল? উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলাম, প্লে করিতে গিয়াছে?

ছারপোকা কহিল, না। খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে বাধিয়া ছিল, ধীরে ধীরে সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া মন হালকা করিল। তার পর কহিল, সিনেমার হলে গিয়াছে, সেইখানে আছে। সেখানে অনেক মানুষ বসে, অনেক রক্ত।

বলিতে বলিতে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

মুশকিল! বুঝাইয়া সুঝাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিয়া তাহাকে কোণ হইতে বাহির করিয়া আনিলাম। বালিশের উপরে বসাইয়া দিয়া কহিলাম, গিয়াছেই যদি, তুমিও শোধ নাও; সে যেমন তোমাকে ভুলিয়াছে, তুমিও তাহাকে ভুলিয়া যাও। দেখ তো, কি চেহারা হইয়াছে!

বলিয়া তাহাকে আয়না দেখাইলাম। দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কহিলাম, খাও নাই কত দিন?

সে কহিল, কি জানি! মনে নাই।

কহিলাম, বেশ করিয়াছ। এখন আইস, আগে যা হোক একটু খাইয়া লও।

সে কিছুতেই খাইবে না—শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর আমার পা হইতে ছোট এক চুমুক মাত্র রক্ত খাইল। খাইয়া একটু সুস্থ হইল। তখন তাহাকে নানাবিধ ভাল ভাল সান্ত্বনা বাক্য বলিলাম। কহিলাম, জীবনে দুঃখ আসেই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা লইয়া বৃথা শোক করেন না। ভাবিয়া দেখ, কয় দিনের জীবন, কয় দিনেরই বা বিরহ ?

সে কানই দেয় না, বলিল, দিনের মাপে কি দুঃখের মাপ ? বিরহ কি মাহিনার টাকা ?

আমি কহিলাম, অবুঝ হইও না, দুর্ভাগ্য যখন আসে, বৃহত্তর দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইতে হয়। কবিতা আছে, 'একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে'—পড়িয়াছ ?

সে কহিল, না।

আমি কহিলাম, লেখাপড়া জানিলে পড়িতে। তুমি খালি ভাবিতেছ তোমার একারই বুঝি দুঃখ—আমার কি হইয়াছিল জান ?

সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

কহিলাম, তবে শোন, শুনিলে বুঝিবে তোমার চেয়েও বড় আঘাত অনেকে পায়। তোমার আর ক্ষোভ কিসের, তুমি তো তাহাকে কাছেই পাইয়া লইয়াছ। আর আমার যে—শুনিবে সে কাহিনী ?

সে আর্দ্র চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। কহিল, শুনিব।

আমি কহিলাম, শোন তবে। আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি, তখন আমার বয়স অল্প, বছর সাত আট।

ছারপোকা মুখ তুলিয়া তাকাইল, একটি চোখ মুছিয়া কহিল, খুব অকালপক্ব ছিলেন তো ?

আমি কহিলাম, তা ছিলাম। এবার শোন। তখন প্রতি-বৎসর পূজার ছুটিতে আমাদের শহরে সার্কাস আসিত। ছোট ছোট দেশী দল, শহরের এখানে সেখানে তাঁবু ফেলিয়া বসিত, দু'আনা চারআনা টিকিট লইয়া প্যারালেল বার, হরাইজণ্টাল বারের ফিগার দেখাইত, আবার টিয়াপাখীর খেলা, বাঘের খেলাও দেখাইত। আমাদের বাড়ির পাশে প্রত্যেক বারই তাহাদের তাঁবু পড়িত।

সেবারও সার্কাস আসিয়াছে, মহা হৈ হৈ শব্দে বিজ্ঞাপন দিতেছে, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার তারের উপরে নৃত্য, আসুন দেখিয়া যান। দেখিতে গেলাম। নানা রকম খেলা টেলা অনেক দেখাইয়া তার পর তারের খেলা আসিল। সুন্দর টুকটুকে একটি মেয়ে বেশ টাইট টাইট গড়ন সড়ন, আঁটো জামা আর গেঞ্জির পেণ্টুলান পরা, তারের উপর উঠিয়া কতরকম খেলা দেখাইল। হাঁটিল, নাচিল, পাশ ফিরিল, তারের উপরে এক ঠ্যাংওয়ালা চেয়ার পাতিয়া তাহাতে বসিয়া বই পড়িল।

দেখিয়া শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম, বিবাহ যদি কোন দিন করিতে হয়, উহাকেই করিব। বয়সের ছোট বড় বিচারের জ্ঞান তখনও হয় নাই; আর ঐ রকম যে আরও দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে পারে, সে কথা তখন কেহ বলিতে আসিলে তাহার মাথা ফাটাইয়া দিতে পারিতাম।

ছারপোকা উঠিয়া বসিল। অন্য চক্ষুটিও মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তারপর ?

আমি কহিলাম, তারপর দিন দুই যাবৎ সকাল বিকাল খালি তাঁবুর আশেপাশে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইলাম, যদি কোন ফাঁকে আবার তাহার সাক্ষাৎ পাই। পাইলাম না—দিনের বেলায় সার্কাস-ওয়ালারা তাহাদের লুকাইয়া রাখে। যাত্রাওয়ালারাও রাখে দেখিয়াছি, এমন সুন্দর সুন্দর রাজকন্যা আর সখী গানের সময় আসরে আসে, অথচ দিনের বেলা কিছুতেই তাহাদের দেখা যায় না। আবার তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু কি করিব ? আবার সার্কাস দেখিতে চাহিলে বাড়িতে পিটুনী খাইব। অগত্যা সারাদিন সারারাত খালি মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবান আর একবার দেখা করাইয়া দাও; আর খুব উদাস মন করিয়া গান গাহিতে লাগিলাম, "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে।"

ভগবান ডাক শুনিলেন। আমাদের পাড়ার নিয়ম ছিল, সার্কাস আসিলে পাড়ার মেয়েরা একদিন দুপুরে তাঁবুতে যাইতেন, বাঘ দেখিয়া আসিতেন। দিন তিনেক পরে একদিন মেয়েরা দল বাঁধিয়া বাঘ দেখিতে চলিলেন, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চলিলাম। মনে তখন কি ফূর্ত্তি! তাঁবুতে ঢুকিয়া সকলে বাঘের খাঁচার দিকে গেলেন, বুড়া ম্যানেজার আসিয়া খাঁচা খুলিয়া দিল। আমার বাঘের দিকে মন নাই, আমি খালি চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া খুঁজিতেছি, সে কোথায়। চোখে পড়িল না। এক পাশে একটা মস্ত বড় কাঠের সিন্দুক। বুঝিলাম ঐটার মধ্যে নিশ্চয় তাহাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সে সিন্দুক ভাঙিব কি করিয়া।

ছারপোকার চক্ষু জলজল করিতে লাগিল। কহিল, তার পর ?

আমি কহিলাম, তাঁবুতে ঢুকিয়াই দেখিয়াছিলাম, একটা চোয়াড়মতন চেহারার লোক, একপাশে বেঞ্চিতে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। বয়স বাইশ চব্বিশ হইবে। দাড়ি গোঁপ কামানো, বেঁটে খুব কালো আর খুব জোয়ান। গেঞ্জি ফুঁড়িয়া সর্ব্বাঙ্গের ডুমো ডুমো মাস্‌ল দেখা যাইতেছে। বাঘ দেখিয়া মায়েরা ফিরিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে হতাশ মনে ফিরিতেছি, এমন সময় আর একটা লোক তাঁবুতে ঢুকিল। তাহাকে চিনিলাম, সে হরাইজণ্টাল বারে পা বাঁধিয়া লম্বা হইয়া ঘুরিয়াছিল। আসিয়াই, বেঞ্চির লোকটাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, সর, বে—দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, জায়গা দে, বলিয়া তাহার মুখ হইতে বিড়িটা কাড়িয়া লইল, বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া সেইটা খাইতে শুরু করিল।

সেই দিন স্থির বুঝিলাম, নারী সত্যই ছলনাময়ী, যত চাকচিক্য বাহিরে, ভিতরে সকলেরই ঐ রকম কালো রং আর ডুমো ডুমো মাস্‌ল। সেই হইতে আর নারীকে বিশ্বাস করি না, তাহার মোহে ভুলি না।

ছারপোকা বহুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, শেষে এক সময়ে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াই, তাড়াতাড়ি দুই হাত মুখে চাপা দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, আপনি ঠাট্টা করিতেছেন ?

আমি কহিলাম, দোহাই, তোমার গুরুর দিব্য, আমি ঠাট্টা করি নাই। এমন একটা মর্ম্মান্তিক ব্যাপার লইয়া ঠাট্টা করিব, আমি কি একেবারেই একটা পাষণ্ড ?

সে কেবলই কাঁদে আর বলে, আপনি হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। আপনার রক্ত খাইয়া খাইয়াই সে অমন হৃদয়হীনা হইতে পারিয়াছে। নহিলে সে তো এমন ছিল না।

আমি কহিলাম, তুমিও তো আমার রক্তই খাইয়াছ; তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিন খাইয়াছ।

সে কহিল, সকলের হয় না। হজম-শক্তি কি সকলের সমান?

বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। আবার তাহাকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা দিলাম। কহিলাম, বেশ তো, তুমি যখন তাহাকে এত ভালই বাস, সে সেখানে সুখে আছে, প্রচুর খাইতে পাইতেছে, বাচ্ছারাও আনন্দে খাইয়া মোটা হইতেছে—এই কথাটা ভাবিয়াই নিজেকে সান্ত্বনা দাও না কেন?

সে একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, তাহাও ভাবিয়াছি, কিন্তু মন মানে কই।

বলিয়া আবার একটু কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিল, আমাকে খুব ঠাট্টা করিয়া একটা চড় মারিতে পারেন? কহিলাম, কেন?

সে কহিল, মরিয়া যাইতাম। এখন মরিলেই আমার হাড় জুড়ায়।

আমি কহিলাম, ছি ছি, এমন কথা বলিতে নাই।

বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলাম।

ছারপোকার ভাঙা মন কিন্তু আর জোড়া লাগিল না। সে সময়ে খায় না; সময়ে ঘুমায় না—দিনরাত উদাস হইয়া বসিয়া থাকে, আর কি যেন ভাবে। দেখিয়া শুনিয়া আমারও মন খারাপ হইয়া গেল—ইহাদের সুখের সংসারটি যে এই ভাবে ভাঙিয়া গেল, ইহার মূলে কি আমারই দায়িত্ব প্রধান নয়? আমার কথা উপলক্ষ করিয়াই তো ইহাদের ঝগড়া—আমি একটু সহিয়া থাকিলে আর এই সমস্ত কিছুই হইত না। ভাবিয়া আমার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, নিজের অপরাধের স্মৃতি, ছারপোকার উদাস মলিন মুখ, খাটের কোণের একদা কলরব-মুখরিত এবং অধুনা-নির্জন স্থানটি—সমস্তই যেন আমাকে অহর্নিশ পীড়ন করিতে লাগিল। স্থির করিলাম, আর না, এই মেস পরিত্যাগ করি, তবে যদি স্মৃতির দংশন হইতে মুক্তি পাই।

ছারপোকার গতিবিধিও দিন দিন রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। কিছুদিন সে একেবারেই কোণ ছাড়িয়া বাহির হইল না—অনেক ডাকাডাকিতে হয়তো একবার বাহিরে আসিয়া ঈষৎ একচুমুক রক্ত খাইয়া চলিয়া যাইত, এইমাত্র। অনেক দিন এমনও হইয়াছে, গায়ে কামড় দিয়া তারপর হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া রক্ত না চুষিয়াই ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এই ভাবে কিছু দিন কাটিল। তার পর হঠাৎ দেখিলাম, তাহার মনে একটা জ্ঞানচর্চার ঝোঁক আসিয়াছে। এক দিন কলেজে যাইব বলিয়া বই গুছাইতেছি, মোটা একখানা পলিটিক্সের বইর মধ্য হইতে ছারপোকা হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া একটু যেন অপ্রতিভও হইল, আমি আর তাহাকে ধমক চমক করিতাম না, কহিলাম, কি ব্যাপার, বইর মধ্যে যে?

সে একটু কাল দ্বিধা করিল, তারপর হঠাৎ কহিল, আচ্ছা, সোশ্যাল রিভলিউশন করা যায় না? খুব কি বেশী লেখাপড়া জানা লাগে?

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, তাহা তো একটু লাগেই। কেন?

সে বিমর্ষ মুখে কহিল, তবে আর হইল না। কতকটা আপন মনে কহিল, ঐ রকম একটা কিছু লইয়া থাকিতে পাইলেও বাঁচিতাম।

ছারপোকানীর সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা হইল। আমাকে কি কেহ কোন দিন এমন করিয়া মনে রাখিবে? মুখে কহিলাম, ওসব চিন্তা ছাড়। ভগবানকে ডাক, দুঃখীর মনে তিনিই সান্ত্বনা দিতে পারেন।

ছারপোকা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, ঠিক বলিয়াছেন।

ইহার পর তাহাকে প্রায়ই বইর শেলফে, নানাবিধ বইর আশে-পাশে দেখা যাইতে লাগিল, একদিন দেখিলাম, অক্ষয় দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইর মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। সেদিন তাহাকে ধমক দিলাম, কহিলাম, অত কঠিন বইর কাছে যাইও না, দাঁত ভাঙিয়া যাইবে। রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে, তাই পড়।

সে মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, কিছু না কিছু না, সব বেটা সমান ফাঁকিবাজ। আসল পথের সন্ধান কেহই দেয় না।

আর একদিন দেখিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। কহিলাম, কি হইল?

সে অন্যমনস্ক ভাবে কহিল ভাবিতেছি। বলিয়া আবার চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া গেল।

আমার নূতন মেসে যাইবার দিন আসন্ন হইয়া আসিল। যাইবার দিন সকালে ছারপোকাকে ডাকিয়া কহিলাম, আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি। তুমি এখন কি করিবে?

সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, আমিও যাইব, আর এখানে থাকিব না।

কহিলাম, কোথায় যাইবে?

সে কহিল, আমি পরিব্রাজক হইব।

সে কি! সবিস্ময়ে কহিলাম, প্রব্রজ্যা লইবে?

সে কহিল, অত দূর কি আর আমার হইয়া উঠিবে? তা তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে হইতেও পারে—তাঁহার অসাধ্য কি আছে। বলিয়া দুই হাত তুলিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিল।

আমি কহিলাম, আপাততঃ কি করিবে স্থির করিয়াছ?

সে কহিল, ট্রামে চড়িব। এই শহরেই সে আছে; আমিও ট্রামে চড়িয়া এই শহরের পথে পথে সারাক্ষণ তাহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। যদি আমার ভালবাসা আমার সাধনার মধ্যে ফাঁক না থাকে—

আমি কহিলাম, আমি তাহা হইলে আজ চলি? আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না।

এমন করুণ কথাটাকেও সে গায়েই মাখিল না, শুধু কহিল, অনেক দিন একসঙ্গে ছিলাম, একটু পায়ের ধুলা দিয়া যান।

বহু দিন পরে তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। খিদির-পুরের গাড়িতে চড়িয়া আসিতেছিলাম। পরিশ্রান্ত দেহ, বসিয়া
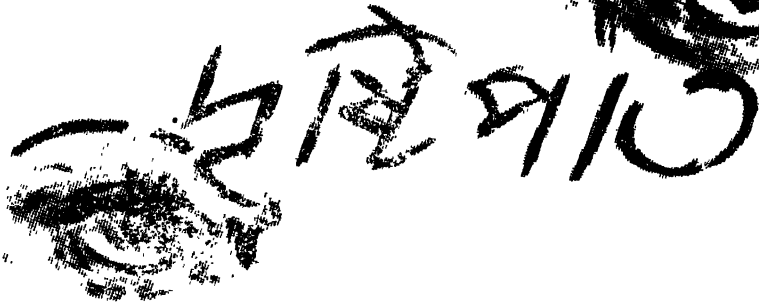
যাযাবর

চার

নিজামুদ্দিনের দরগায় প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়ে আউলিয়া-খনিত সে-পুকুর। আজও নিঃশেষে বারিহীন নয়, সামান্য একটু জল আছে তলায়। পানযোগ্য নয়। গন্ধ, স্বাদ এবং বর্ণ ভীতিজনক। তার পাশ দিয়ে আসা গেল এক প্রশস্ত চত্বরে, যার মাঝখানে সমাধিস্থ হয়েছে ফকিরের দেহ।

সমাধির উপরে ও আশে-পাশে রচিত হয়েছে সুদৃশ্য ভবন ও অলিন্দ। সম্রাট সাজাহান সমাধির চারিদিক্ ঘিরে তৈরী করেছেন শ্বেত পাথরের খিলান, প্রাঙ্গণ বেষ্টিত করেছেন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত জালিকাটা পাথরের দেয়ালে। দ্বিতীয় আকবর রচনা করেছেন সমাধির উপরিস্থ গম্বুজ। ফকিরের পুণ্য নামের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে নিজেকে তাঁরা ধন্য জ্ঞান করেছেন।

গিয়াসুদ্দিনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত, বি, বি, সি, আই রেলওয়ের লাইন গেছে তার উপর দিয়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং টুরিষ্টদের দ্রষ্টব্য হিসাবে তার গুরুত্ব। নিজামুদ্দিনের দরগায় আজও মেলা বসে প্রতি বছর, দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যকামীরা আসে দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। সেদিনের রাজধানী তার অভ্রভেদী অহঙ্কার নিয়ে বহু দিন আগে মিশেছে ধূলায়; দীন সন্ন্যাসীর মহিমা পুরুষানুক্রমে ভক্তজনের সশ্রদ্ধ অন্তরের মধ্য দিয়ে রয়েছে অম্লান। তার আকর্ষণ দূরকালে প্রসারিত।

হিন্দুর অন্তিম অভিলাষ গঙ্গাতীরে দেহরক্ষার জন্য শত শত বর্ষ ধরে দিল্লীর বিত্তশালীরা কামনা করেছেন আউলিয়ার কবরের নিকটে সমাধিস্থ হতে, চেয়েছেন জীবনান্তে নিজামুদ্দিন আউলিয়া মীর মজলিসের সান্নিধ্য। তাই তার আশে-পাশে আছে সংখ্যাতীত আমির-ওমরাহের সমাধি। তারই মধ্যে একটির গর্ভে আছে কবি আমির খসরুর দেহাবশেষ।

খসরুর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর; খ্যাতি ছিল বহু-বিস্তৃত। দিল্লীর কবিগোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। আলাউদ্দিন খিলজীর কাব্য-রসিক পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল গভীর, আপন অনুপম ছন্দে গ্রন্থিত করে খিজির খানের বীরত্ব কাহিনীকে তিনি কালজয়ী অমরত্ব দান করে গেছেন।

নিজামুদ্দিনের সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে আর একজন কবি রয়েছেন চিরনিদ্রিত, যাঁর রচনা আজও উর্দ্দু সাহিত্যে অজাতশত্রু। জগতে বহু ঐশ্বর্য্যময় সৌধ রচিত হয় অক্ষম ব্যক্তিদের সমাধির উপরে। কিন্তু কবি 'পরে তার থাকে নিজ মেমোরিয়্যালের।

কবি গালিবের সমাধিটি আড়ম্বরহীন, সাধারণ প্রস্তর-বেদিকায় মাত্র আবৃত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর উর্দ্দু সাহিত্য অম্লান রেখেছে তাঁর স্মৃতি,—কাব্যে ও গাথায়। পূর্ব্ব-বাংলার স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের রচনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে তাঁর কোন কোন শেয়রের।

হিন্দু-যুগে রেওয়াজ ছিল না স্মৃতিসৌধের। তার কারণ মরলোকের চাইতে পরলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল বেশী। তাই শ্মশানে দালান খাড়া করে প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করার কথা কখনও তাদের মনেও হয়নি। মৌর্য্য-রাজাদের আমল থেকে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত কোন হিন্দু রাজা রাখেননি কোন স্মৃতি-সৌধ। রাজপুত রাজন্যেরা গড়েননি কোন এতমদ্দৌলা, সফদারজঙ্গ বা হুমায়ুন্‌স্ টুম্ব। তারা জলাশয় খনন করেছেন, মন্দির স্থাপন করেছেন, ভূমিদান, গোদান করেছেন ব্রাহ্মণকে। সমস্তই জগৎহিতায়। অশোক যে স্তম্ভ রচনা করেছিলেন, তা' নিজ কীর্ত্তি ঘোষণার জন্য নয়, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে। বুদ্ধ গড়েছিলেন চৈত্য ও বিহার সংঘের জন্য;

বসিয়া ঢুলিতেছি, অকস্মাৎ তীব্র দংশনজ্বালা অনুভব করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই চক্-চক্ চক্ করিয়া একটা অনুতাপাত্মক ধ্বনি কানে আসিল। চেনা গলা। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সেই বটে। কিন্তু সে জীর্ণ কাতর চেহারা আর নাই—ফুলিয়া এমন টাইট্ হইয়াছে, ঘাড়ে গর্দ্দানে প্রভেদ করা দুষ্কর।

কহিলাম, কি হে, কেমন আছ?

সে সসম্ভ্রমে কহিল, আজ্ঞে কোন-রকমে কাটিয়া যাইতেছে।

কহিলাম, তারপর, করিতেছ কি এখন?

সে কহিল, তখনই তো বলিয়াছিলাম। পরিব্রাজক হইয়াছি, ট্রামে ট্রামে বেড়াই, যাত্রীদের নিকট হইতে রক্তের মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া তাহাতেই জীবনধারণ করি। আর আপনার আশীর্ব্বাদে ছোটখাট একটি ব্যাঙ্কও খুলিয়াছি, মানে ব্লাড ব্যাঙ্ক।

কহিলাম, ভিক্ষার জোর আছে বটে, এ-যে একেবারে মাড়োয়ারী বনিয়া গিয়াছ দেখিতেছি!

সে বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে চুপ করিয়া রহিল।

কহিলাম, বৌয়ের খবর কি?

সে কহিল, জানি না। আর দেখা হয় নাই।

আমি কহিলাম, তা, এখন তো আর খাওয়ার চিন্তা নাই এবার ভাল দেখিয়া আর একটি বিবাহ করিলেই পার।

সে শিহরিয়া কহিল, পাগল!

শঙ্করাচার্য্য স্থাপন করেছেন মঠ বেদান্ত চর্চ্চার মানসে। সে-যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্য্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা উর্দ্ধমুখীন। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানে উদ্দিষ্ট। ঐহিকের সম্পর্ককে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। যখন 'কস্তে কান্তা কস্তে পুত্র', তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী? 'মায়াময়মিদং অখিলং বিশ্বং'। কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং তপঃ, স্বামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, স্ত্রীকে হতে হয়েছে সহধর্ম্মিণী। নারী যে সহমৃতা হয়েছে তার কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুণ্যলোভ বশে তা বলা শক্ত। স্বয়ম্বরা যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা প্রেমে পড়ে নয়। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈভবের জন্য, যেমন একালের তরুণীরা গাঁটছড়া বাঁধেন আই, সি, এসের চাদরে।

মুসলমানেরাই আনলো ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তাদের নয়। তারা পরকালকে খোড়াই পরোয়া করলো; ইহকালকে করলো বরণ। তারা জীবনকে করলো ভোগ, কাঁদলো, কাঁদালো এবং ভালোবাসলো। তাই নারীর জন্য করলো লুণ্ঠন, প্রেমের জন্য করলো অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম্ম সাধন।

বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে? মেনে চলে নীতির অনুশাসন? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা? মহাভারতের অর্জ্জুন করেছে? বৃন্দাবনের কানু করেছে? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেস্কা, বা ম্যাদাম লুপেস্কু?

মুসলমানেরা প্রিয়তম প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কাল-জয়ী, রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর, এমন কি উপপত্নীর সমাধিতে।

হিন্দুরা তপস্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রংমহল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানেরা গুণী, তারা দিয়েছে সঙ্গীত। হিন্দুর গর্ব্ব মেধায়, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের। এই দুই নিয়েই ছিল ভারতবর্ষের অতীত; এ দুই নিয়েই হবে তার ভবিষ্যৎ। একটিকে বাদ দিলেই হয় পাকিস্থান—মহম্মদ আলী জিন্না না চাইলেও।

যাত্রাসহচরী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর সমাধির প্রতি। সেটি সম্রাট-দুহিতা জাহানারার।

জাহানারাকে আমার ভালো লেগেছে শৈশব থেকে। মোগল রাজকন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। ইতিহাস পরীক্ষার পূর্ব্বক্ষণে সন তারিখ কণ্টকাকীর্ণ মুঘল-কাহিনী কণ্ঠস্থ করবার দুরূহ প্রয়াস করতেম প্রাণপণে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী। ঘুমে চোখের পাতা আসতো জড়ায়ে, দেহ হতো অলস, মাথা ঝিমিয়ে পড়তো ঢুলুনীতে। ওরই মধ্যে জাহানারার উপাখ্যান পড়ে কল্পনায় আঁচ করবার চেষ্টা করতাম তার চেহারা।

প্রথম যৌবনে জাহানারা পাটেশ্বরীর বেগমের মর্য্যাদা ভোগ করেছেন বিপুল মহিমায়। হারেমে করেছেন একাধিপত্য, অপ্রতিহত অনুগ্রহ ও শাসন বিতরণ করেছেন দুই হস্তে। কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সাজাহানের প্রিয়তমা। তাঁরই জন্য সম্রাট তৈরী করেছিলেন দিল্লীর জাম্মা মসজিদ, ভারতের বৃহত্তম মুস্লিম ভজনালয়। জাহানারার স্নেহভাজন ছিল এক বাঁদী। অতর্কিতে একদিন আগুন লাগলো তার বসনে। সে-আগুন নেবাতে গিয়ে শাহাজাদী নিজে দগ্ধ হলেন সাংঘাতিকরূপে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এল হাকিম, হলো নানা রকম এলাজ; কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সম্রাটনন্দিনীর জীবন সংশয় দেখা দিল।

বিচলিত সাজাহান এত্তেলা দিলেন এক সাহেব চিকিৎসককে, গ্যাব্রিয়েল বাউটন। সুরাটে ইংরেজের কুঠীর ডাক্তার। বাউটন বললেন, ওষুধ দিতে হলে রোগিণীকে চোখে দেখা চাই। শুনে সভাসদেরা হতবাক্ হলেন। বলে কি বেয়াদপ, শাহানশাহ বাদশাহের জেনানা মানে না, কাম্বক্ত? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পিতৃস্নেহ জয়লাভ করলো সামাজিক প্রথার উপরে। সাজাহান সম্মত হলেন বাউটনের প্রস্তাবে। অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য লাভ করলেন জাহানারা। তাঁর অনুরোধে সাজাহান বাউটনকে দিতে চাইলেন পুরস্কার, যা চাইবে তাই পাবে। আভূমিনত কুর্নিশ করে বাউটন বললে, "নিজের জন্য কিছুই চাইনে। কলকাতার ১৪০ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে ইংরেজের কুঠী নির্ম্মাণের জন্য প্রার্থনা করি কিছু ভূমি। ইংরেজকে দান করুন এদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।"

বাউটনের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। সম্রাট বাংলার শাসনকর্ত্তা শাহজাদা সুজাকে হুকুম করলেন ইংরেজকে অবিলম্বে ফর্ম্মান্ দিতে। স্বজাতিহিতৈষণার এত বড় দৃষ্টান্ত আর একটি মাত্র আছে আধুনিক কালে। সেটি ইহুদী বৈজ্ঞানিক ডাঃ জেইম ভাইজম্যানের।

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের যখন সঙ্কটজনক কাল, ইংলণ্ডে বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব, তখন কৃত্রিম অ্যাসিটোন তৈরীর ভার নিলেন ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ বললেন, "প্রোফেসার, সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতার উপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।"

অধ্যাপক বললেন, "তথাস্তু।"

দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অ্যাসিটোন। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ্জ তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভাইজমান প্রত্যাখ্যান করলেন অম্লান বদনে।

লয়েড জর্জ্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "পিয়ারেজ? অর্থ?"

"কিছু নয়। একটি মাত্র যাচ্ঞা আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দ্দিষ্ট একটি দেশ; ইহুদীদের ন্যাশন্যাল হোম।"

কিছুকাল পরে বালফোর ঘোষণায় ইহুদীদের জন্য প্যালেষ্টাইনে নির্দ্দিষ্ট হলো 'জাতীয় বাসস্থান'। অবশ্য কাগজে-পত্রে আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না তাদের। বরং ইদানীং কনসার্ভেটিভরা প্যালেষ্টাইনে আরবদেরই করতে চাইছেন সুয়ো-রাণী মধ্য-প্রাচ্যে ইংরেজ-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে। কৃতজ্ঞতা কথাটা আছে ইংরেজের ভাষায়, নাই ইংরেজ-চরিত্রে।

জাহানারার অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে। সেই জাহানারার চরিত্রেই কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচনা করছে ইংরেজ। এতে বিস্মিত হইনে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে ব্রাইটন কোর্ণওয়ালে বাড়ী হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন

সব চেয়ে জোর-গলায়। জিলপোন্ড এমেরীই ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার সব চেয়ে বিরোধী, কারণ তাঁর জন্ম যুক্তপ্রদেশের গোরখপুরে।

জাহানারার জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যগুলি বেদনাবিধুর।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারা সিকো ছিলেন পিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিভাজন। কিন্তু তাঁর অনুরক্তি ছিল খ্রীষ্টধর্মে। সেটা মুস্লিম সমাজে জনপ্রিয়তার উপায় নয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদে সুজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রওনা হলেন দিল্লী অভিমুখে। বারাণসীর যুদ্ধে দারা তাঁকে করলেন পরাজিত। আওরঙ্গজেব তখন মোরাদকে বললেন, এ ছলনা-চাতুরীময় পৃথিবীর কোন কিছুতেই লোভ নেই তাঁর। তাঁরা দুজনে মিলে কাফের দারাকে পরাজিত করলে সাজাহান যদি পরলোকগত হন—আল্লার দোয়ায় তিনি যেন সেরে ওঠেন—তবে দিল্লীর সিংহাসন হবে তাঁর অর্থাৎ মোরাদের। মদ্যপ মোরাদের প্রতীতি হলো এই আশ্বাসে। দারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন পাঞ্জাবে। এক উৎসব-রজনীর অবসানে সুরামত্ত মোরাদ হলো বন্দী, আরঙ্গজেব নিজকে ঘোষণা করলো সম্রাটরূপে, পিতা সাজাহানকে কয়েদ করে আবদ্ধ করলো আগ্রা দুর্গের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

আওরঙ্গজেব জাহানারাকে দিতে চেয়েছিলেন পাদশাহ বেগমের পদ। কিন্তু জাহানারা প্রত্যাখ্যান করলেন সে অনুরোধ। স্বেচ্ছায় বরণ করলেন সহ-বন্দিত্ব। পিতার পরিচর্য্যার জন্য। চতুর্দিকে ক্রুর প্রবঞ্চনা, সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার ঘন অন্ধকারের মধ্যে সেদিন একমাত্র জাহানারা রইলো অচল, অটল, অকম্পিত দীপশিখার মতো দীপ্তিময়। সাজাহানের দ্বিতীয় কন্যা রোসেনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিলেন, হলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী। দিল্লীর সিভিল লাইনসে আছে তাঁর উদ্যান। সেখানে এ আমলে স্থাপিত হয়েছে রোসেনারা ক্লাব, দিল্লীর মাণ্টকালো। দশ টাকা পয়েণ্ট থেকে ব্রিজ খেলার খ্যাতি আছে তার উত্তর-ভারতে।

ইতিহাসে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন বিধর্মী নির্য্যাতনের দুরপনেয় কলঙ্কে মলিন; সে তথ্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আছে। কিন্তু এই হৃদয়হীন অথচ অমিতবিক্রমী যোদ্ধা নৃপতির জীবন যে দুটি বিশিষ্ট উপক্রান্তা বন্দিনীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত ছিল, সে কথা যথোচিত বিদিত নয় জগতে।

জাহানারা ও জেবুন্নেসা দু'জনেই ছিলেন আওরঙ্গজেবের অতি নিকটতম আত্মীয়া। একজন অনুজা, অপর জন আত্মজা। দু'জনেই ছিলেন রূপসী, দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ নির্ভীক ও তেজস্বিনী। দু'জনেই চিরকুমারী এবং দু'জনেরই জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে আওরঙ্গজেবের কারাগৃহে।

কিন্তু এর চাইতেও আর এক জায়গায় এই দুই দুর্ভাগিনীর মিল ছিল গভীরতর। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন কবি, মুঘল-যুগের মহিলা কবি।

জাহানারার সমগ্র রচনা সযত্নে রক্ষিত হয়নি। গহন অরণ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো প্রায় সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলিতে হয়েছে বিলীন। দু'-একটি মাত্র নিদর্শন আছে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। জেবুন্নেসার কাব্য-খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত। "জেব-উল্ মুনশোয়াতে" সত্যিকার কবিপ্রতিভার চিহ্ন আছে। বিখ্যাত পারস্য কাব্যগ্রন্থ "দিওয়ানে মখ্‌ফীর" রচয়িত্রীরূপেও জেবুন্নেসার উল্লেখ আছে অনেক গ্রন্থে, যদিও পণ্ডিতেরা সম্প্রতি তাতে সংশয় প্রকাশ করছেন।

সম্রাট-নন্দিনী জেবুন্নেসা বন্দিনী ছিলেন সালীমগড় দুর্গে। ভগিনী জাহানারা ছিলেন আগ্রা দুর্গের পাষাণ-প্রকোষ্ঠে।

দিনের পর দিন গত হয়, মাসের পর মাস। চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয় ষড়ঋতু। গ্রীষ্ম গত হয় তার উত্তাপ ও প্রভঞ্জন আহুতি নিয়ে। বর্ষায় মেঘকজ্জল দিবসের দীর্ঘ ছায়া নামে যমুনার কালো জলে, বর্ষণমুখর রাত্রির বিদ্যুৎ চমকে উৎফুল্ল ভবন—শিখীরা নৃত্য করে প্রাসাদের মর্ম্মর অলিন্দে। শরতের আলো-ছায়া বিজড়িত প্রভাতে নদীতীরে কাশের বনে লাগে দোলা। হেমন্ত আনে কুহেলী; শীত দেয় হতাশ্বাস। বসন্তে ফুলের মঞ্জরী বিলম্বিত হয় শিরিষের শাখা-প্রশাখায়। আগ্রার প্রাসাদ-প্রাচীরের অন্তরালে জাহানারার বন্দি-জীবনে একটি করে বৎসর হয় বৃদ্ধি, আয়ু থেকে খসে পড়ে একটি করে বছর। কর্ম্মহীন অবসরে শাহাজাদী কবিতা রচনা করেন আপন মনে।

একদা নিশীথকালে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সাজাহানের কাছে এসে পৌঁছল একটি সুদৃশ্য মোড়ক। পুত্র পাঠিয়েছে পিতাকে উপহার। তবে কী অনুতপ্ত পুত্রের ক্ষমা-প্রার্থনার প্রথম নিদর্শন? আগ্রহকম্পিত হস্তে বৃদ্ধ সাজাহান খুললেন মোড়ক। পরতের পর পরত। খুলতে খুলতে শেষকালে হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারা সিকোর মুণ্ড। সম্রাট মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন জাহানারার অঙ্কে।

সাজাহানের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জাহানারা রইলেন তাঁর পাশে, স্থবির পিতার পরিচর্য্যা করলেন অমিত নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্য্যে। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তন করলেন দিল্লীতে।

অবশেষে রমজানের এক পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শান্ত-শীতল ক্রোড়ে মুক্তি লাভ করলো বন্দিনী। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর দেহ সমাধিস্থ হলো ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির পার্শ্বে। সে সমাধির উপরে না রইল মণ্ডপ, না রইল আচ্ছাদন, না রইল ঐহিক ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র আভাস। তাঁরই স্বরচিত কবিতা উৎকীর্ণ হলো তার গায়ে—

"বেগায়র সব্‌জা না পোশাদ
কসে মাজারে মারা
কে কবর পোষে গরিবান্
হামিন্ গিয়াহ বসন্ত।"

"একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির উপরে। আমার মতো দীন অভাজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন।"

পুণ্যশ্লোক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অনুগামিনী সাজাহান-দুহিতা নশ্বর জাহানারার এইতো যোগ্য সমাধি।

আসন্ন সন্ধ্যার শান্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানম্র চিত্তে সামনে এসে দাঁড়ালেম আমরা তিন দর্শনার্থী। কারো মুখে ছিল না কথা, কিন্তু মনে ছিল ভার।

নব শ্যাম দুর্ব্বাদল ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার সমাধি। নির্ম্মল নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির, প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণ-রেখা, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলি আলোকের সোনালী আভা। তারা কি পায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সমাধিস্থ সেই অঙ্গের ললিত সুবাস? পায় তাঁর সুকুমার বক্ষের নীচে স্তম্ভিনত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দন-ধ্বনি? [ক্রমশ:

রাজপুতানার ম্যাপ খুললে কিংবা ঐ লাইনের রেলওয়ের ম্যাপ দেখলে সেলাইয়ের ফুলকাটা কাজের মতন যে রেখাবলী এঁকে-বেঁকে নগর, অরণ্য, নদী, বাঁধ, রেলপথ ঘিরে-ঘিরে চলেছে দেখতে পাওয়া যায়, সেই আরাবল্লীরই ছোট্ট কোলের শিশুর মত একটি গণ্ডশৈলের পাশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে 'ধাপি' জন্মেছিল।

বড় বোনের নাম ছিল 'মোহর', মেজো মেয়ের নাম হয়েছিল 'কেশর,' সেজোর নামও ভালই রেখেছিল মা-বাপ—'কস্তুরী' ছিল; কিন্তু এর বেলায় আর ধৈর্য্য রইল না তাদের, জন্ম-মুহূর্ত্তেই এর নামকরণ হয়ে গেল—ব্রাহ্মণ সজ্জন স্বজন দ্বারাই। কে রাখলো, কে বললো ঠিক্ বোঝা গেল না, কিন্তু নাম হয়ে গেল—'ধাপি'। ও-দেশে কোনো কিছু সুখ দুঃখ যথেষ্ট হলে, বা পেট ভরে গেলে, গ্রাম্যভাষায় ওরা বলে 'ধাপ গিয়া'। অর্থাৎ 'যথেষ্ট' বা 'ঢের হয়েছে'। এক কথায় 'আর না' 'থাক্' আমাদের 'আন্নাকালী' 'থাকমণির' মত আর কি।

দূরে দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণীর নীচে বাজরা, যব, গম ও ভুট্টার লীলায়িত ক্ষেত; ছোট ছোট বালির পাহাড় আর গণ্ডশৈলের পাশে, ধূ-ধূ করা বালির মাঝে গণ্ডগ্রামগুলি; কয়েক ঘর চাষী, কিছু অন্য জাতি—ক্ষত্রিয় রাজপুত নাপিত দারোগা কিছু বা ব্রাহ্মণ-বেণে; মাটির দেওয়াল-দেওয়া খড়ে-ছাওয়া ঘর, বলদে জল-টানা গভীর অতলস্পর্শী কয়েকটি কুয়া, সকাল-সন্ধ্যায় তারি পাশে জলার্থিনী কলসী-মাথায় নারীর ভিড়, পুরুষের তারি একান্তে তাম্রকূট সেবন আর সুখ-দুঃখের আলোচনা,—এই নিয়ে গ্রাম। ব্রাহ্মণ-বেণের (বৈশ্যের) সাধারণ ঘরের মেয়েদের গোল ভাবের শান্ত মুখ, প্রায়-ফরসা রং, ধীর চোখ, কোমল হাসি, অনতিদীর্ঘ দেহ; আর রাজপুত-ক্ষত্রিয়ানীদের অবনী বাবুর রেখাটান শক্তি-মূর্ত্তির মত লম্বা ধরণের মুখের তীক্ষ্ণ গঠন, কালো দীপ্ত দৃষ্টি, পাতলা বাঁকা ঠোঁট, উজ্জ্বল গৌর রং এবং দীর্ঘাঙ্গী!

দারোগা জাতটা এদেরই ঘরের সঙ্কর। রাজপুত-ক্ষত্রিয় ঘরের দাস-দাসীর সন্তান অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতার দাসীর সন্তান। এদের 'দারোগা' বলে। বহু দিন ধরে ক্রমশঃ এরাই একটা জাত হয়ে গেছে।

'ধাপি' ছিল এই দারোগা-ঘরের মেয়ে। "যৌবনে বহুপরিচর্য্যারত" ভর্তৃশালিনী কি ভর্তৃহীনা জানা নেই; এক পিতামহী বা মাতামহীর ক্রোড়ে যে ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মলাভ করেছিল সে তার পৈত্রিক রক্তধারার রূপের বৈশিষ্ট্য পুরো পেয়েছিল। 'ধাপি'রাও তার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি! কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রসাদ পেয়েছিল 'ধাপি'। কোনো পূর্ব্ব-প্রপিতামহীর রূপের আলো তার তনুটিকে যে অপরূপ দীপ্তি দিয়েছিল, পাশাপাশি কাছাকাছি আর কোনো গ্রামে বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দারোগা ঘরে তেমন সুন্দরী আর কেউ ছিল না।

জন্ম-মুহূর্ত্তে 'ধাপি' নাম হলেও আদর করে রাঙা "আঙ্‌রাখা" রঙীন ঘাগ্‌রা কপালে টিপ মাথায় লাল সুতো দিয়ে বিনানো "চোটি" (বেণী), পায়ে 'নুপাটি' (মল), কানে 'পিপ্‌ল' পাতা ঝুমকো, গলায় 'বালওড়া' (রূপার মোটা হার) হাতে পৈঁছা-কঙ্কণে তার সাজের ক্রটি রাখেনি মা-বাপ-বোনেরা।

কুয়ার পাশে বাঁধানো প্রণালী, তার পাশে 'খেলি' (ছোট চৌবাচ্ছা), প্রকাণ্ড চামড়ার 'চড়শ' (থলে) করে জল উঠে আসছে, আর প্রণালী বয়ে খেলিতে পড়ছে, তারপর চাষীর কাটা মাটির আলবাঁধা পথে যেতে যেতে চলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে গ্রামের মেয়েরা বাঁধানো প্রণালী থেকে মাটি বা পিতলের কলসে জল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে খাবার জল হাতে করেই ডোলে করে টেনে তুলে নিচ্ছে,—এই নিয়ম-বাঁধা দৈনিক কাজ।

কেশররা তিন বোন তিনটি 'চরি' (পিতলের ও-দেশী কলসী) নিয়ে আসে। ছোট্ট একটি 'চরি'-মাথায় 'ধাপি'ও তাদের সঙ্গে আসে। গ্রামের বয়স্থা, প্রৌঢ়া, বালিকা, তরুণী কলসী-মাথায় বাসন-হাতে সবাই আসে, শ্রেণী করেই দাঁড়ায় এখনকার 'কিউ'য়ের মতই। তার মাঝে গল্প হাসি কলহ কোলাহল সমান ভাবে চল্‌তে থাকে। যাদের হাতে বাসন থাকে, তারা খেলির পাশে মাজতে বসে। যারা জল ভরে তারা জল নিয়ে চলে যায়। নানা রকমের হল্‌দে নীল গোলাপী রংয়ের ওড়না, খয়েরি রঙের মোটা 'রেজা'-র (খদ্দরের) ওপর সাদা ফুল ছাপা ঘাগ্‌রা, গায়ে নানা টুকরা-জোড়া রঙীন কাঁচুলি, মাথায় 'বোরলা' (রূপার খুঁটে, নারীর ভূষণ—কুমারী ও সধবা পরে), সর্ব্বাঙ্গে ভারি ভারি রূপার গহনা, কারো বা সোনারও একটি আধটা আছে; মাথার বিঁড়ের উপরি-উপরি কলসী বসিয়ে, লুগড়ি কোমরে গুঁজে অনায়াসে তারা আবার গল্প করতে করতে ঘরে চলে যায়।

সহসা এক দিন গ্রামের চিমে তালের ছন্দ কেটে গেল। জল ভরতে গিয়ে মেয়েরা বেশী করে ঘোমটা টেনে দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটি করে চোখ বার করে দেখতে পেলে, কুয়ার ধারের প্রকাণ্ড অশ্বত্থতলায় যেখানে পুরুষেরা তামাক খায়, বিশ্রাম করে, সেখানে লাল রংয়ের আচ্‌কান-পরা কোমরে তকমা আঁটা, হাতে রূপার

আশাসোটা, মাথায় সহুরে রঙীন "লহরিয়া" (ঢেউখেলান) রংয়ের 'সাকা' (পাগ্ড়ী) পরা দু'-তিন জন লোক এসে বসে গল্প করছে। দু'জন বর্ষীয়সী নারীও রয়েছে একটু দূরে আর একটা গাছতলায়।

মেয়েদের দেখে মেয়েরা দু'জন এদিকে এগিয়ে এলো। তাদের সহুরে সভ্য পরিচ্ছদ,—মলমলের রঙীন ঘাগ্রা, হাল্কা পাতলা কাপড়ের চওড়া জরিপাড় 'লুগ্ড়ি' (ওড়না) গায়ে, কাঁচুলির উপর সদ্রি (হাতওলা জরীর কাজ-করা জামা), সর্ব্বাঙ্গে সোনা-রূপার বিপুল ওজনের গয়না ঝল্মল করছে।

ঘোমটা যারা দিয়ে রইল তারা ঘোমটাও খুললো না কথাও বললো না। কিন্তু তাদের আশ-পাশের বালক-বালিকা-শিশুর দল কয়েক মুহূর্ত্তেই গ্রামে রটনা করে দিল,—অজস্র গহনা-পরা, লহরিয়া রংয়ের পাগড়ি, লাল রংয়ের আচকান পরা নরনারী কারা এসেছে তাদের গ্রামে। তাদের সঙ্গে আশাসোটা শিঙাধারী চোপদার ও সঙীনধারী সেপাই এসেছে। মাঝে মাঝে তারা শিঙা বাজাচ্ছে। দেখতে দেখতে গ্রামের বর্ষীয়সী অর্দ্ধবয়স্কা মেয়েদের সমাগম হতে লাগলো।

'ধাপি'রাও মাথার চরি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। মলিন সবুজ আধবাখি পরা, হলদে রংয়ের খদ্দরের ওপর সাদা বুটিদার মোটা ঘাগরা পরা ধাপিকেও দেখা গেল। গ্রামে জল্পনা-কল্পনার আর শেষ রইল না। মেয়েরা বলাবলি করে,—আগন্তুকদের ওড়না ঘাগরার বিচিত্র রংয়ের কথা, গহনার গুরুভারের কথা, কাচের চুড়ীর বাহারের কথা। গ্রামের বর্ষীয়সীরা সেই নবাগতা বর্ষীয়সীদের কাছে শুনে আসে দূর সহরের অপরূপ কথা; রাজ-অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য্যের কথা, সোনা রূপা হীরা মুক্তার ঝলমলে বসন-ভূষণ পরা রাণীদের কথা, তাদের সখীদের কথা এবং আরো কত কি রহস্যময় জীবন-মৃত্যু-প্রেমের কাহিনী। যার কিছুটা ওরা বুঝতে পারে অনেকটাই বুঝতে পারে না, শুধু অভিভূত হয়ে শোনে! প্রকাণ্ড প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অট্টালিকা সৌধময় জনাকীর্ণ অপরূপ নগরী, যার পথ বাঁধানো, পথের কেরোসিন্ আলো, গাড়ী-ঘোড়া তাঞ্জাম রথের পালকীর শেষ নেই, সেখানকার মেয়েরা চিত্র-বিচিত্র নানাবিধ বসন, অলঙ্কারে, রকমের সুখের বিলাসের উপকরণে পরিপূর্ণ। সেখানে সব সময়ে সব পাওয়া যায়, দোকানে বাজারে সাজানো থাকে সব জিনিস, হাটের দিনের জন্য কারুকে অপেক্ষা করতে হয় না। পুরুষেরা কত রকমের কাজ করে। শুধু চাষ-বাস? ছিঃ! কত লেখা-পড়ার কাজ, কাছারী, আদালত, মহকুমা খাস, মহকুমা আম (মহকুমা)। তাতে কত লোক, কত মানুষ, কত জাতি! ওরা ধবধবে সাদা রংয়ের সাহেব দেখেছে, ওরা ঘোড়া-গরুহীন হাওয়া গাড়ীও দেখেছে, ওরা কতবার রেলগাড়ীতে চড়েছে। ওদের দেশে 'নাটকঘর' আছে, সেখানে বিলিতী ছবির ছায়াবাজী দেখা যায়। সবাই দেখে টিকিট কিনে। মেয়েরা? শুধু জল তুলে গম পিষে রুটী গড়ে দিন কাটায় না। আটা কিনিতে পাওয়া যায়। জল তোলার লোক আছে। মেয়েরা বড় বড় ঘরে সবাই বসেই থাকে। শুধু বসে থাকে? ইচ্ছা হলে গান গায় পান খায় শুয়ে থাকে—কিছু করে না, করতে হয় না। তারা নাটক দেখতে যায় বেড়াতে যায়!

বিবরণের পর বিবরণ, কাহিনীর উজ্জ্বল বর্ণনা গ্রামটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। শ্রোত্রীদলের বর্ষীয়সীরা বাড়ী এসে গল্প শেষ করে প্রতিদিনই নিশ্বাস ফেলে; বলে, 'তা আর কি আমাদের কখনও ও-সব দেখা হবে এবং বালিকা কিশোরী তরুণী সব বয়সের মেয়ে সকলেই সে কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মত বার বার শুনতে চায়। তাদের কৌতূহলের সীমা থাকে না সব কথা শোনবার জন্য। আর? আর যদি কোনো দিন কেউ নিয়ে যায় সেই স্বপ্নের মত অপরূপ দেশে!

বড়রা বর্ষীয়সীরা গ্রাম্যবৃদ্ধারা অনুপস্থিত থাকলে, এরা বলে তাদের কাছে রাজ-অন্তঃপুরের কাহিনী, কত সখী, কত অপরূপ সুন্দরীর কথা—যারা কোনো দিন হয়ত রাণীদের অতিক্রম করে রাজার সুনজরে পড়বে! তার পর? রহস্যময় ভাবে চোখ টিপে বলে—রাণীরাও তাদের ভয় করেন! তারা রাজার প্রিয়পাত্রী পরম আদৃতা, তারা খোজাদেরও শাসন করে—কখনো কখনো। তাদের গায়ে রাণীদের মতই গহনা, পায়ে সোনার মল, মুরাঠা, পাঁয়জোড়।

অবাক্-বিস্ময়ে শ্রোত্রীদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। সোনার মল, পাঁয়জোড়? সোনার জিনিষ তো পায়ে পরে না কেউ। ঠাকরাদের মেয়ে মনফুলী বিজ্ঞভাবে বলে, 'কই, সোনা তো এখানে 'পাটেল'জীর বাড়ীর মেয়েরাও পায়ে পরে না, তারা তো খুব বড়লোক! সোনা পায়ে পরতে নেই।'

সহরবাসিনীরা হেসে উঠে, বিদ্রূপ করে বলে—'বড়লোক! পরতে নেই! 'পাটেলজী'! চল না তোরা আমার সঙ্গে, আমি তোদেরই একদিন সোনার মল পরাব। 'তাজিমী' চেয়ে রাজা নিজের হাতে সোনা পরিয়ে দেন তাদের পায়ে। কত সুন্দর মেয়ে আমরা নিয়ে গেছি। ঐ তো সুন্দরী সাঁইয়া— 'পাত্রী' থেকে 'পাদায়েত' হল আমাদেরই সামনে। এখন সোনার মল পায়নি? মহারাজা তাকে দেখে উঠে দাঁড়ান, রাণীদের দাঁড়াতে হয়, দু'জন লাল্জী সাহেবের মা সে! তার কত সম্মান, 'তাজিমী' পেয়েছে, তার আলাদা 'রাওলা' (মহল) গাড়ী পালকী রথ। ছিল তো তোদেরই মত গেঁয়ো মেয়ে। কপাল ফিরে গেল না তার? সহরের [illegible] কি?'

মনফুলী, ঝিমা, ধাপি, কেশর, কাবেরী সব অবাক্ হয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। মৃদু হেসে একজন সহরবাসিনী বলে, 'তোরা যদি যাস তো আমি নিয়ে যাব।' আশা অপেক্ষা কৌতূহলে বালিকারা মূক মুগ্ধ হয়ে যায়! যদি? যদি যেতে দেয় মা-বাপ; উৎকণ্ঠিত বালিকারা জিজ্ঞাসা করে, 'কবে ফিরে আস্'তে পাবে যদি যেতে পায়?' সহরবাসিনীরা অট্ট হেসে ওঠে—'ফিরে? ফিরে এসে কি হবে? তখন রাণীদের মত নিজের 'মহলে' থাকবি, তোদের তালুক-মুলুক হবে, হুজুর সাহেব তোদের 'রাওলায়' এসে বসবেন কত দিন, তোদের ছেলেমেয়ে হবে, ছেলে লালজী হবে, মেয়ে বাঈজী লাল হবে। ফিরবি কি জন্য এই ধু-ধু করা বালিভরা পাহাড়ে মরুভূমির দেশে?'

কেশর কাবেরী নতমুখে বসে থাকে। তারা বড় হয়েছে। কিছু যেন বুঝতে পারে ভিতরের কথা।

কিন্তু সহরবাসিনীরা ওদের দিকে চেয়ে বলে, 'ওদের নেব না। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে যে। আমরা সুন্দরী 'কুমারী' মেয়ে খুঁজছি!' তারা ধাপি, মনফুলী ঝিমিদের দিকে চায়। 'আমরা বিয়ে হওয়া মেয়ে নিই না,' আবার বলে।

আশা-উৎকণ্ঠায় ধাপি মনফুলী চঞ্চল উদ্বেগ হয়ে উঠে। ওরা কুমারী, এখনো বিয়ে হয়নি সৌভাগ্যক্রমে।

আর কাবেরী কেশরও যেন মনে মনে একটু নিরাশ হয়ে যায়, কি আকাঙ্ক্ষা যেন কিসে প্রতিহত হয়ে গেল। সোনার মল? গহনা? অথবা অপরূপ না-দেখা সহরের জন্য? কিম্বা নাটকঘর, হাওয়া-গাড়ী?

সহসা এক দিন গ্রামের লোকেরা শুনলে, যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে গতরাত্রের শেষ প্রহরে যখন গ্রামের সকলে ঘুমচ্ছিল তখন মনফুলী ধাপি আর মনফুলী ধাপির বাপ সহরে চলে গেছে!

ধাপির মা-বোনেরা কিছু জানে না, মনফুলীর বাড়ীর কেউ জানে না।

সমস্ত গ্রাম যেন মূঢ় স্তব্ধ হয়ে গেল।

ধাপির মা হতবুদ্ধির মত কোলের ছেলেটিকে স্তন্যপান করায়, তার ওপরের মেয়েটিকে নিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা,—কেশর মোহর রুটী গড়ে, ভাই-বোন-মাকে খেতে দেয়। মা অন্যমনে একটু মুখে দেয় আর উন্মনা ভাবে চার দিকে তাকায়, কি ভাবে মুখে কিছুই বলে না। কয়েক দিন পরে ধাপির ও মনফুলীর বাবা সহর থেকে ফিরে এলো। সহর দেখার গর্ব্বে উৎফুল্ল এবং কন্যাদের ভাবী কালের সৌভাগ্য আশায় গর্ব্বিত তাদের মুখে দরিদ্র গ্রামের কৌতূহলী সকলে ঈর্ষ্যাকাতর হয়ে, বিতৃষ্ণাভরে উদাসীন ভাবে শুনল, যারা এসেছিল তারা ধাপিকে রাজ-অন্তঃপুরের জন্য নিয়েছে, ওকে দু'শো টাকা দিয়েছে। আর মনফুলীর জন্য একশো টাকা দিয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বল্লে, 'তুমি বেচে দিলে তোমার মেয়ে?'

ক'দিন সহরে থেকে, গতরাত্রে 'কলালে'র দোকানে পান আহার করে তাদের আমীরি মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠলো এ কথায়। মনফুলীর বাবা বললে, 'বেচব কেন? এত দিন মানুষ করিনি? তার তো খরচ লেগেছে! হুজুর সাহেব অমনি-অমনি নেবেন কেন?'

কন্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত ধাপির বাপ বললে, 'গাঁয়ে তো কত মেয়ে রয়েছে তা আর কারুকেই নিল না কেন?'

ঐশ্বর্য্য-বিলাসহীন নিতান্ত দরিদ্র গ্রামের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে ঘরে ফিরে গেল, আর বিশেষ কিছুই বললে না।

ছোট পাহাড়ের পিছন দিকে সূর্য্য অস্ত গেল, সঙ্গে সঙ্গে সহরের দিকের বেলগাড়ীখানার দূরের বড় গ্রামের ষ্টেশন পার হয়ে চলে যাবার ঝিক্-ঝিক্ শব্দ মিলিয়ে গেল। গ্রামবিচ্ছিন্নাদের অনাগত ভাবী কালের ঐশ্বর্য্যময় বিলাস-ব্যসনময় দিনের আশার স্বপ্ন যেন ঐ শব্দে নিস্তব্ধ গ্রামের অন্তর মথিত করে তুলতে লাগল। যেন তা সুখ নয়, যেন তা দুঃখও নয়, তারো চেয়ে গভীর কিছু। যেন চিরন্তন মূঢ় শূন্যতাময় অন্ধ বিরহ-বেদনা। আর মাটীর দেওয়ালে খড়ের চাল দেওয়া ছোট ঘর দু'খানিতে মা-বাপের কাছে ভাই-বোনের মাঝে শুধু দুটি ছোট জায়গা চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত ভাবে খালি হয়ে গেল; তাদের মূঢ় মূক জননীরা তাদের খাবার থালা পেড়ে নিয়ে আবার তুলে রাখে, শোবার জায়গা বাড়তি হয় সে দিকে উন্মন হয়ে চেয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে ধাপির বাবা বলে তামাক খেতে খেতে,—'এখন তো 'পাত্রী' হবে; ব্যাখ্যা করল—'এই ছোট মেয়ে নাচ গান শিখলে তাদের 'পাত্রী' বলে। তার পর চাই কি হুজুর সাহেবের নেক-নজরে পড়লে 'পর্দ্দায়েত' হয়ে যাবে। তার পর জোর-কপাল হলে মেয়ে আমাদের 'পাশোয়ান' হবে। পর্দ্দায়েত হল পাশোয়ানের চেয়ে একটু নীচে, 'পাশোয়ান' রাণীর পরেই! সরবতী বাঈ এখন 'প্রেম-রায়' খেতাব পেয়েছে—'পাশোয়ান' হয়ে গেছে।'

ধাপির মার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে, সে কিছুই বলতে পারে না। ঐশ্বর্য্য-বিলাস-আকীর্ণ ওর একান্ত অজানা সেই সুখ-ব্যসনের কোনো কল্পনা তার মনে জাগে না, শুধু ধাপির মুখ, হাসি আর কথা তার মনে পড়ে।

বহু বৎসর কেটে গেছে—প্রায় দশ বছর। ছোট লাল কুর্ত্তা আর লাল চুড়ীদার পাজামার ওপর ওড়না 'পাত্রীদের' নির্দ্দিষ্ট পোষাক-পরা ধাপির বালিকা-তনুদেহ ক্রমে ক্রমে অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা সখীরা দেখে মুগ্ধ হয়। সর্দ্দার খোজা 'খুশনজরজী'র মনে একটা অপূর্ব্ব স্নেহ আর অদ্ভুত ভয়-ভাবনা জাগে তার জন্য। এত রূপ! রাণীদের 'পাশোয়ান'দের ঈর্ষ্যাতিক্ত দৃষ্টি অতিক্রম করে যায়নি। সকলের চোখ পড়েছে সেদিকে, কেউ বা মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, কত জন বা তিক্ত, কত জন ভীত-শঙ্কিত চোখে দেখে তাকে—পাছে রাজার মুগ্ধদৃষ্টিও তার ওপর পড়ে কোনো দিন, আর তারা তাদের বহু-মানসমাদৃত স্থানভ্রষ্ট হয়!

বিরাট অন্তঃপুর। জনাকীর্ণ! শুধু মেয়ে কিন্তু। দাসী, সখী, সেবিকা, সহচারিণী, প্রতিহারিণী সব মেয়ে—যেন অসংখ্য। তিন রাণী—তাঁদের এক একজনের এক এক প্রাসাদ! তাঁদের পিত্রালয়ের সখী দাসী;—রাণীত্ব লাভের পর পতিগৃহের সখী সেবিকাতে নিজ নিজ অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। এ ছাড়া 'পাশোয়ান' 'পর্দ্দায়েত'দের 'বাওলা' (মহল) ভরা দাসী সহচারিণী।

পুরুষ শুধু রাজা! এবং লালজী সাহেব দু'জন,—প্রেমরায়ের ছেলে। অবশ্য তাদের শুধু খুশনজরজীর অনুমতি নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশের যাতায়াতের অধিকার আছে মাত্র।

মাঝে মাঝে জলসা হয়। উৎসব-প্রাঙ্গণে নাচ-গান-অভিনয় হয়। রাজার স্বর্ণখচিত আসন পড়ে,—তারপর পদানুসারে মহারাণীর পর অন্য রাণী, 'পাশোয়ান,' পর্দ্দায়েতদের আসন পড়ে। তারপর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সমাগতদের আসন থাকে। একের পর এক নাচের দল, গানের দল, গান গেয়ে নেচে চলে যায়।

রাজার সামনে থাকে রূপার থালায় মধুর মদের পানীয়, তার জন্য ছোট ছোট কাচের গেলাস, সোনার তবকে মোড়া পান, লবঙ্গ, এলাচ।

কোন্ পুরাকালের প্রথামত মহারাণী পানীয় প্রথমে ঢেলে দেয় মহারাজার গ্লাসে, তার পর সেটা রাজার ওষ্ঠ-পৃষ্ট হয়ে রাণীর অধর-স্পর্শ লাভ করে। তার পর একে একে অন্য রাণী, পাশোয়ান, পর্দ্দায়েতদের এবং লালজীদের মধ্যে ঘুরে আসে।

নাচের গানের—বার বার পুনরাবৃত্তি ও পানীয় পাত্রের একই ভাবে মুখে মুখে আবর্ত্তনে রাত্রির প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

সেদিনের জলসা প্রেমরায়ের মহলে। প্রেমরায়ের পাত্রীর দলের মধ্যে সহসা দেখা যায় ধাপিকে। মদিরামুগ্ধ রাজা সখীদের দিকে চেয়েছিলেন। সহসা প্রেমরায় মহারাণীর আসনের কাছে এসে নত হয়ে কুর্নিশ করে—কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যাবার আবেদন জানালেন। নিয়মমত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সখীর দলও চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল তাঁর অনুসরণ করবার জন্য।

খুশনজরজী এসে দাঁড়ালেন প্রথানুসারে প্রত্যুদ্গমনের জন্য, তারপর মুহূর্ত্তের জন্য তার মাঝে চকিতের মত ধাপিকে দাঁড়ানো

দেখা গেল। চাঁপাফুলের মত উজ্জ্বল রং, কালো চুলে ঘেরা অপূর্ব্ব সুন্দর মসৃণ পরিচ্ছন্ন কপাল, কালো সফরী-নেত্র, চমৎকার টুকটুকে দুখানি ওষ্ঠাধর সহসা যেন ঝকমক করে উঠল ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় এবং নিমেষের মধ্যেই আর তাকে দেখা গেল না। সকলের আড়ালে মিলিয়ে গেল। প্রেমরায়ও দেখতে পেলেন তাকে ঐ এক মুহূর্ত্তই।

মহলে এসে প্রেমরায় ডাকলেন, 'গোদাবরী বাঈ!'

ধাপি এসে কুর্ণিশ করে সামনে দাঁড়াল। রাজ-অন্তঃপুরে এসে ধাপির নাম হয়েছিল, 'গোদাবরী'। 'ধাপি' নামটা গ্রাম্য।

'তোমাকে বার বার বলেছি না, তুমি হুজুর সাহেবের 'জলসায়' যাবে না?' প্রেমরায় গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন। ফসরি, আসব ও ক্রোধের উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে—মুখের ভাব তিক্ত বিরাগে হিংস্র ঘৃণায় ভরা!

'আমি চাই না, তোমাকে হুজুর সাহেব দেখতে পান।' তারপর খানিকক্ষণ কি ভেবে বল্লেন, 'আচ্ছা, আর তোমাকে দেখতে কখনো কেউ পাবে না।' প্রধানা সখী 'বড়ারণ'জীর দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ওকে বাঁদী কুইয়ের একটা ঘরে রাখগে।'

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ঘরখানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো বাঁদীর এমন শাস্তি ওরা দেখেনি। সহসা দ্বারের কাছে বৃদ্ধ খুশনজরজীকে দেখা গেল, তিনি অতর্কিতে নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে 'কাকে?' জিজ্ঞাসা করেই কৌতূহল সম্বরণ করে জানালেন, 'হুজুর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।'

প্রেমরায়ের কঠিন মুখ কঠিনই রইল। শুধু শান্ত ভাবে 'যো হুকুম' বলে তিনি খুশনজরজীর অনুগমন করলেন।

দুর্গ-পরিখার নাম 'তালকটোরা'। অর্থাৎ যে তটিনীর আকার বাটির মত। বহু কালের জমা জলে স্রোতহীন গভীর হ্রদ—নদী নয়। বর্ষায় কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, গরমে শুকিয়ে কোথায় নেবে যায়, শীতে স্থির শীতল মুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে প্রাসাদের ছায়া বুকে নিয়ে। অসংখ্য কুমীরে সমাকুল। তারাও বর্ষায় ভেসে বেড়ায়, কখনো গরমে কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, শীতে পরিখা-কিনারে স্থিরভাবে রৌদ্রে শুয়ে থাকে।

দুর্গতল বর্ষায় পরিখার সঙ্গে প্রায় সমান সমতল হয়ে যায়। সেদিন প্রাসাদের নীচের ঘরগুলিতে জল ভরে যায়। বহু গ্রীষ্মের বিলাস-শয়নাগার, দাসী-বাঁদীর গ্রীষ্মের শোবার ঘর, থাকার ঘরও ঐ গৃহশ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

তারি মাঝে আছে বন্দিশালা। নিরপরাধ, নিরীহ অপরাধিনীদের নির্ব্বিচার কারাগৃহ। প্রধান অপরাধ—যাদের রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা কণ্ঠের স্বরের শ্রেষ্ঠতা; অথবা অকারণ বিঘ্নকারিতার অপরাধ তো আছেই। সলিটারি সেলের মত যেন!

এখনো লাল চুড়ীদার কুর্ত্তা ওড়না-পরা স্বল্পপরিণত কিশোর তনুশালিনী সামান্য 'পাত্রী' মাত্র—সখীও নয় বহু আকাঙ্ক্ষিত পর্য্যায়েত তো নয়ই,—ধাপি ওরফে গোদাবরী বাঈ প্রধানা সখীর হাত ধরে গ্রাম থেকে অজানা-পথে প্রাসাদে আসার পর, আজ আবার নতুন করে আর এক না-জানা পথে ধীরে ধীরে নেমে গেল। সব সঙ্গিনী দাসীরা এক মুহূর্ত্তেই ওদের দেখে সরে গেল। সমবেদনার সাহস তাদের নেই, কথা বলার ভরসা নেই, আতঙ্কে সকলে যেন ভোজবাজীর মত মিলিয়ে যেতে লাগল।

নির্জ্জন অজানা গলি সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে যন্ত্রচালিতের মত কত সিঁড়ি কত নীচু গড়ানে পথ 'মড়মড়ি' খেয়ে ধাপি নেবে এলো।

সারি সারি ঘর। দিনেও অন্ধকার যেন। উপরে অনেক উঁচুতে ছোট ছোট জানলার মত আছে। বর্ষায় সেখানে জল পৌঁছায় না।

ঠাণ্ডা ঘরের মেজেতে দু'খানা চট এবং একটা কম্বল পড়ে আছে। ধাপিকে সেখানে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বড়ারণজী বললে, 'সন্ধ্যে বেলা আলো দিয়ে যাবে আর খাবারও পাবি ঠিক সময়ে।'

কালো হরিণের মত ফ্যালফেলে হতবুদ্ধি চোখ দুটি মেলে সে চেয়ে রইল তার মুখপানে, কিছুই কথা বলতে পারলে না। হয়ত বড়ারণের করুণা হ'ল, তার মুখ দেখে বললে, ভয় নেই, 'আমি আসব আবার।'

সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অভিভূত ধাপি অশ্রুহীন চোখে শুয়ে থাকে। সহসা কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। দেখে—সামনে দু'খানা রুটী, এক ঘড়া জল আর একটি প্রদীপ রেখে গেল একজন দাসী। চেয়ে দেখলে, ওপরের জানলায় আলোও আর নেই। অকস্মাৎ তার মনে পড়ে যায়, সে একেবারে একা। এই গৃহ-শ্রেণীর মাঝে কোথাও কেউ নেই। এবং বহু কাহিনী আশে পাশে থমথম করছে। একদা যারা এখানে ছিল তারা আর কোনখানে যেতে পায়নি, তাদের কথা মনে করে তার সর্ব্বাঙ্গে যেন কাঁটা দেয়। নিস্তব্ধ ঘরের আশে-পাশে কোনোখানে মানুষের সাড়া নেই, জীবিত জীবের সংস্পর্শ নেই!

ধাপি রুটী খেতে পারে না, গলা কাঠ হয়ে গেছে, জল খায় শুধু। তারপর প্রদীপটা বাড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। পিঠে দেওয়াল থাকে, আর আশপাশে সামনে বার বার চায়। তার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় কিন্তু কণ্ঠস্বর তার একেবারে বসে গেছে যেন।

সারারাত সে জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরের পাশে পরিখায় জলের শব্দ হয় ছলাৎ ছলাৎ করে, তার মনে হয় যেন তাল-কটোরার জলটা তার জীবিত সঙ্গী।

সকালবেলা রুটী নিয়ে বড়ারণ এলো। ভয়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রেতের মত ধাপিকে দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো, বললে, 'তুই খাসনি কেন?' আজ এই সামান্য কথাই সহসা যেন ধাপিকে সাহস দিল। সে বড়ারণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, কাঙ্গালের মত বললে, 'আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও বড়ারণজী। আমি আর কখনো এখানে আসব না, হুজুর সাহেবের সামনে বেরুব না।'

বড়ারণ বললে, 'তোকে পাঠালে যে আমার গর্দ্দান যাবে, নইলে আমি কি মানুষ নয় তোর মত বাচ্চাকে এই কয়েদ-ঘরে রাখি। আচ্ছা তুই খা তো, দেখি তোর 'মাপ' হয় কি না।'

ধাপি আকুল হয়ে কাঁদে শুধু। খাবারের দিকে ফিরে চায় না। যার কোনো সভ্য সমৃদ্ধ শোভা নেই, অলঙ্কার নেই, সেই ছোট্ট গ্রাম আর জননীর শান্ত মুখ তার মনে পড়ে।

রাত্রির পর দিন আসে। কত দিন কত রাত্রি গেল ধাপি জানে না। দিন দিন সে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে যায়—দিনের বেলায়ও সে কোনো দিকে চায় না, ভয় করে। কোনো দিন এক টুকরা রুটী খায় কোনো দিন খায় না।

প্রুফ-রীডার

শ্রীহরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সংবাদপত্রের অফিস। পুরাদমে কাজ চলিতেছে। সম্পাদক মহাশয়ের টেবিলের উপর নানা স্থান হইতে প্রেরিত প্রবন্ধরাশি স্তূপীকৃত হইয়াছে, তিনি সেই স্তূপের মধ্য হইতে একটি প্রবন্ধ বাহির করিলেন এবং উহা তাঁহার মনোমত হওয়ায় তাহা প্রেসে পাঠাইয়া দিলেন। প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ হইলেও তাহার মধ্যে কতকগুলি মারাত্মক ভুল এবং কয়েক স্থানে অত্যন্ত অসঙ্গতি ছিল। কম্পোজিটর তাহার সহিত আরও কতকগুলি ভুল যোগ করিয়া প্রুফ তুলিয়া দিল। এই প্রুফ গেল এমন এক ব্যক্তির কাছে, যিনি প্রবন্ধটির সমস্ত ত্রুটি ও অসঙ্গতি অতিশয় ধৈর্য্য সহকারে সংশোধন করিয়া উহাকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। পরদিন সংবাদপত্রে উহা পাঠ করিয়া আমরা লেখকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলাম। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রবন্ধের অসঙ্গতি ও ত্রুটি দূর করিয়া লেখককে উপহাসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া কৃতিত্বের অধিকারী করিলেন, তাঁহাকে কেহ জানিল না। এই ব্যক্তিটি কে? ইনি প্রুফ-রীডার।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপেক্ষিত এই প্রুফ-রীডার সম্প্রদায়। তাঁহারা নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া যাইতেছেন। ত্রুটি সংশোধন করাই তাঁহাদের কাজ এবং তাঁহারা না থাকিলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গকেও উপহাসাস্পদ হইতে হইত। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদকগণ অনেক সময় এমন কথা লিখিয়া ফেলেন, যাহার অর্থ ও সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল বিপদ হইতে তাঁহাদের রক্ষা করেন এই প্রুফ-রীডার সম্প্রদায়।

জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—

"If publishers and newspaper editors, following the example of the Film-makers decided to point the names of all the people who co-operated in production and publication, one name would stand high in the list. It is the name of the proof-reader.

তিনি আরও বলিয়াছেন, "He is the unknown, unsung and often forgotten hero of the world of print and one may say truthfully that but for him the illiteracy of authors and editors would be betrayed to the world."

এই উক্তির যাথার্থ্য গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণ মনে মনে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। সংবাদপত্রের অফিসে প্রুফ রীডারদের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক এবং তাঁহাদের অতিশয় দ্রুত কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদকগণ অনেক সময় এমন কথা লিখিয়া ফেলেন, যাহা প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ বিস্মিত হইতেন। অবশ্য একথা সত্য যে, তাঁদের সতর্কতা সত্ত্বেও অনেক সময় ভুল বাহির হইয়া যায়। এজন্য প্রুফ-রীডার নির্ব্বাচনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাঁহাদের কার্য্যের গুরুত্ব ও পরিশ্রমের তুলনায় তাঁহাদের যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা অতি নগণ্য। ফলে ভাল প্রুফ-রীডার পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও তাঁহাদের ঐকান্তিক ও আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায় না। ফলে পুস্তকাদিতে এবং প্রধানতঃ সংবাদপত্রে ক্রমাগত হাস্যোদ্দীপক কথা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই কারণেই আমরা সংবাদপত্রে মহাত্মা গান্ধীকে পেনিসিলিন ইঞ্জেকসন দেওয়ার পরিবর্তে "ডাঃ পেনিসিলিন নিজেই ইঞ্জেকসন দেন", কমন্স সভার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে 'খুকি দুধ খায়," কোন সংবাদের নীচে "সুকোমল বাবুর অংশ" প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে দেখি।

এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা মজার একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার প্রশ্নপত্রে "Prove how matter is indestructible" এই প্রশ্নটির মধ্যে matterএর "এ" "ও" এবং দ্বিতীয় "টি" "এইচ" হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রুফ-রীডিংএর দোষে প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়ায়—"Prove how mother is indestructible. কোন ছাত্রই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই, কেবল একটি ছাত্র নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিয়াছিল :—

"I lost my mother at the age of ten. Next year my father brought me a second mother, but she also followed my first mother. Thus my father went on bringing mother after mother and they also began to pass away one after another. Now I am under the care of my tenth mother and thus it is proved that mother is indestructible."

সহসা একদিন সকালে এলেন খুশনজরজী বড়ারণের সঙ্গে, ধাপিকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সে ঘুমচ্ছিল—পাড়াশ মুখ যেন মৃতের মত।

করুণাভরে ডাকলেন, 'বাঈ, গোদাবরী বাঈ।'

রাত্রির বিনিদ্র-ক্লান্ত আরক্ত চোখ মেলে সে বললে, 'জী।'

খুশনজর বললেন, 'আমার কাছে যাবে? আমি নিয়ে যেতে পারি, হুকুম পেয়েছি।'

সে চোখ বুজেছিল আবার, একটু হেসে চোখ বুজেই বললে, 'জী', অর্থাৎ আচ্ছা। বড়ারণ তাকে বললে, 'ওঠ, সেলাম কর।' সে কথা কইলে না। খুশনজর ওপরে উঠে গেলেন, বললেন, 'কাল ওকে নিয়ে যাব।'

সকাল হল। সিঁড়ির মাথার লোহার দরজা খুলে গেল।

বহু মিনতি করে আজ মনফুলী ওদের সঙ্গে এসেছে। তিন জনে নেবে এলো। ধাপির ঘরে কাল আর প্রদীপ জ্বলেনি, যেমন তেমনি তেলে ভরা রয়েছে। রুটী পড়ে আছে। শুধু জলের ঘটিটা গড়িয়ে গেছে ঘরের এক দিকে।

ধাপির আজ আর ঘুম ভাঙল না।

ভারতীয় চিত্রকলার ছায়াপথ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা পূর্ব্বাঞ্চলের রূপসম্পদ্ আলোচনা প্রসঙ্গে জটিল ও গূঢ় সৌন্দর্য্যরচনায় কৃতিত্বের জন্য চৈনিক সভ্যতাকে স্বর্ণ পদক দান করেছেন। চীনাদের উদ্ভট কালোয়াতীতে এঁরা মশগুল হওয়াকে সমজদারের লক্ষণ মনে করেন। কাল্পনিক রম্যলোক-রচনায় পারস্য সাধনাকে শিরোভূষণে অলঙ্কৃত করেছেন এবং বর্ণ ও রেখাকুহকের যাদুকর হিসেবে জাপানী রচকদের প্রশংসার মণিখচিত তরবারি পারিতোষিক দান করেছেন। উদ্যমের এতটা প্রগতিকে যা হোক্ ভালই বল্‌তে হবে—কিন্তু ভারতের বিচারেই এসেছে বহু অনর্থ, প্রতিবাদ, বিরোধ ও অস্বীকৃতি! এ ক্ষেত্রে এঁরা পুলিস-প্রহরীর পোষাক পরেই ঘোরাঘুরি করেছেন। তাঁদের মতে এ রকমের ভূমিকায় তাঁরা যথেষ্ট চোরাই মাল ধরেছেন ভারতবর্ষে! অর্থাৎ ভারতের রচনা হচ্ছে এঁদের ভাষায় একটা ধারাবাহিক জাল ও জুয়াচুরি! যারা ভারতীয় চিত্রকলার জন্য বাহবা খুঁজে আত্মহারা হয় তারা জানে না এদের কনট্রোলের শিলমোহরে সমস্ত ভারতীয় রচনাকে দাগী করা হয়েছে; আবার এ কথাও ভাল করে বলা হয়েছে, এদেশ আলো ও ছায়ার প্রয়োগ জানে না; বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা এদেশের চোখে অসহনীয়; কঙ্কালশাস্ত্রের (anatomy) জ্ঞান ভারতের পক্ষে অকল্পনীয় ইত্যাদি। এ সব বাজে লোকের কথা নয়—বহু মহারথী পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এসব উক্তি করেছেন—আমরা ভাতা দিয়ে ও অর্থসাহায্য করে এঁদের এদেশে এনে এসব গালাগালি শুনতেও ইতস্ততঃ করিনি। যাদুঘরের প্রকোষ্ঠে ও বিশ্ববিদ্যার ভাঁড়ারে এ সব মতামতের শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় মোগলাই চিত্রের নূতন নমুনার বাহবা দিয়েই বা ফল কি এবং রাজপুতকলা অধ্যাত্ম-রুচির জয়ধ্বনি করেই বা লাভ কি? এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষকে নিঃসঙ্গ কারাগারের গহ্বরে ফেলে দেওয়া হয়েছে অথচ এর কোন প্রতিবাদ বা প্রতি-ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা কারও দেখা যাচ্ছে না।

যারা মনে করে উপরোক্ত মন্তব্য সমূলক নয় তাদের জন্য শুধু দু'-একটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। অনেকেরই বিশ্বাস ভারতের প্রতি জগৎ শ্রদ্ধাশীল, কারণ আমরা "আধ্যাত্মিক" জাতি। আধ্যাত্মিকতার অস্পষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়ে ঐহিকতার রসোজ্জ্বল ক্ষেত্রে আমাদের বর্ব্বর ও অমানুষ বলে যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করেছে সে ভারতেরই বৃত্তিতেই প্রতিপালিত হয়েছিল এবং ভারতেই নিজের কৃতিত্ব জাহির করেছিল। এর নাম হচ্ছে সার জন মার্শাল। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভৃত্যরূপে এর অক্ষগোলকের চারিদিকেই ঘোরাঘুরি করেছে। মার্শাল সাহেব কিছুতেই ভারতকে পার্থিব কলাকৃতিত্বে মর্য্যাদা দিতে চায়নি—প্রতিপদেই বলেছে, ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রীক প্রভৃতি সভ্যতা হ'তে নিজের রূপের ধর্ম্ম চুরি করেছে। এর মতে "It was from Persia that Indian craftsmen learnt—the Greak ideal of beauty and intellect awakened no response in Indian mind" ইত্যাদি।*

এর জুড়িদার হলেন A. Foucher সাহেব। ইনি ফরাসী হলেও সাম্রাজ্যবাদী। এঁর মতে "It was from the West she (India) received and absorbed Arabian, Scythian, Parthian, Greek, Persian,

* Sir I. Marshal Cambridge History of India P 649

and other tribes who have left written proofs of their passage"। * ফুসে সাহেবের ফন্দ দেখে অনেকে আঁৎকে উঠবেন সন্দেহ নেই। এক জন জার্ম্মাণ সমালোচক ও Dr. W. Cohns এঁদের প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলছেন—"In ancient Indian art, we have established Aegean, Assyrian, Persian, Grecian, Hellenic, Roman, Chinese, Islamic and modern European influence." † যে কটা জাতি ফুসের লিষ্টি বাকি ছিল তাদের নাম ইনি জুড়ে দিলেন এই লিষ্টিতে। কাজেই দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় কলা একটা ধারাবাহিক তস্কর-বৃত্তির অধ্যায়মাত্র। এক সময় ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যকেও চোরাই ও জালিয়াতি ব্যাপার বলা হয়েছিল এ কথা মনে রাখা দরকার।

এসব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এবং বেমালুম হজম করা হয়েছে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক! পরবর্ত্তী যুগের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের চেষ্টাতেও এ চৌর্য্যবৃত্তির ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে। রাজপুত-কলা মোগল-কলার অনুসরণ একথা ওদের তালেই অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রমুখ আলোচকেরা বলেছেন—যদিও এ দুটি চিত্রকলার প্রতিপাদ্য লক্ষ্য একেবারে বিভিন্ন। ‡ এ বিষয় স্থানান্তরে আলোচনা করেছি। যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এ ক্ষেত্রে ইংরেজদের পদাঙ্ক অনুসরণ মাত্র। রাজপুত চিত্রকলাকে সমরকন্দ ও হিরাট পদ্ধতির বা আদর্শের অনুসরণ যে বলে সে বাতুল। অথচ মোগল-কলার উপজীব্যও যে এসব ভারতের অঞ্চলের কল্পনা তা'ও বলা হয়েছে। কাজেই এ সমস্ত মতামতের সমাহার হচ্ছে হিন্দু চিত্রকলার মৌলিকতা বা ঐশ্বর্য্যের অভাব। আজ পর্য্যন্ত এই রকমের চোখেই এসব সঞ্চয় দেখা হচ্ছে।

কথিত আছে, মানুষ যখন সিংহকে আঁকে তখন তাকে মানুষের হাতে আবদ্ধ ও মৃত্যুমুখীন অবস্থাতেই করা হয়। অথচ সিংহের যদি আঁকবার ক্ষমতা থাকত তাহলে সে মানুষকে তার দংষ্ট্রার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অবস্থাতেই আঁকত সন্দেহ নেই। ভারতের দিক্ হতে এ সমস্ত অপঘোষণার কোন বিপরীত উক্তি বা অবস্থার প্রতিপাদন কি সম্ভব নয়?

অন্ততঃ ভারতীয় চিত্রকলার একটা প্রকৃষ্টতর প্রতিপাদনের রেখাচিত্র আঁকার প্রয়োজন হয়েছে। এ কাজ করতে অগ্রসর হলে গোড়াতেই মনে করতে হবে ভারতের বিস্তৃত চিত্রসম্পদ্ জাতির আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের মত একটা বিন্দুস্থানীয় ব্যাপার নয় বা সপ্তর্ষির মত একটা রেখানিবদ্ধ ইঙ্গিতের মত নয়। এ চিত্রকলা একটা ধারাস্থানীয় ব্যাপার—যেন একটা প্রবল হিল্লোল—দিগন্তব্যাপী। একে ছায়াপথের মত কল্পনা করাই ভাল। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এর সমুজ্জল ছায়া-স্তর বিস্তৃত। ইউরোপ হতে এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত এর দুর্লক্ষ্য অথচ দীপ্তিমান্ বিম্ব বিস্তৃত হয়ে আছে। এই বিরাট দিক্ হতে দেখতে গেলে পূর্ব্বতন সমগ্র বিচারই হবে অপ্রচুর ও অপভ্রংশস্থানীয়। ভারতীয় চিত্রকলার সুদীর্ঘ ছায়াপথ অনুসরণ করেই এর পরিপূর্ণ শ্রী দেখতে হবে। অজন্তা গুহার গুপ্ত কক্ষে বা বাদামীর রুদ্ধ পল্লবে এর চরম আসন বা আধার কখনও ছিল না। ভারতীয় চিত্রকলা পক্ষপুট বিস্তার করে সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপকে প্রদক্ষিণ করেছে নব নব বিজয়ের অব্যাহত দুন্দুভির ভিতর। সে কাহিনী মুক্ত করা প্রয়োজন—না হয় ভারতীয় কলাবিদ্যার সকল প্রসঙ্গই পরিহাসের মত হয়ে উঠে।
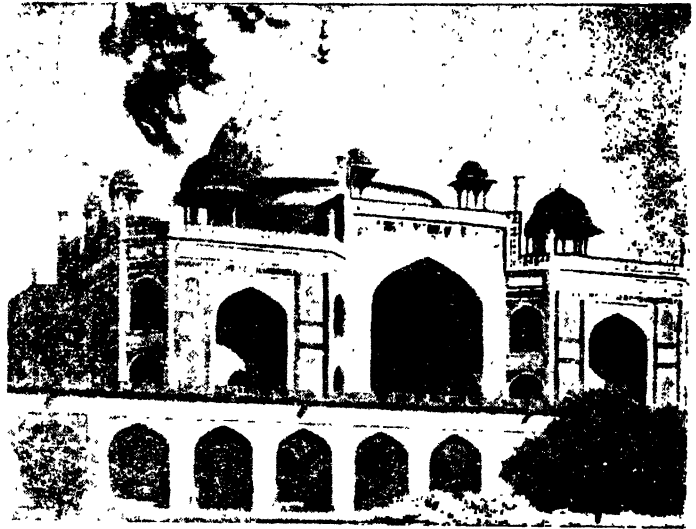
হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ

কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষ দিক্‌দিগন্তে পাঠিয়ে দিয়েছিল উদ্বেলিত মেঘপুঞ্জকে, নিজের অফুরন্ত বিরহব্যথার বার্ত্তা বহনের ভার দিয়ে। এ রকমের বর্ণনায় যে পথ আলোকিত, তাহা সেকালের অজ্ঞাত বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করেছে; এমন কি বৈজ্ঞানিক আবহবিদ্যার অভিনব দিক্‌বিচারও কারও মতে প্রস্ফুট হয়েছে। ভারতীয় রূপযানের ছায়াপথও এভাবে বহু চিত্রপর্য্যায় কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হয়ে বিশ্বের নানা অঙ্কে চতুরঙ্গের মত ক্রীড়াপট প্রসারিত করেছে। এজন্য চিত্রার্পিত রূপোজ্জ্বল দিগ্বিদিক্‌কে একবার প্রদক্ষিণ করা প্রয়োজন।

কিন্তু গোড়াতেই রীতির দিক্ হ'তে একবার ভারতীয় চিত্রকলার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ, এর ভিতরেই চিত্রশতদলের রূপাঙ্কের প্রেরণা আছে। অর্থাৎ ভারতীয় রীতির পক্ষে বিশ্বের কোন্ কোন রীতির সহিত সামাজিকতা করা বা কোন্ পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব তা' এ সন্ধিস্থলেই বিচার করা প্রয়োজন। পারস্য, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মধ্য-এসিয়া এক দিকে; অন্য দিকে

---

* A. Foucher, Beginnings of Buddhist Art P.346

† Rupam, July 1920

‡ ভারতীয় চিত্রকলার অন্তরঙ্গ তত্ত্ব, শ্রীযামিনীকান্ত সেন—বঙ্গশ্রী দ্রষ্টব্য।

...বার, বৈজন্তীয় ও ইউরোপীয় রচনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোন্ ভিত্তির ...পায় প্রতিষ্ঠিত তা' বোঝা দরকার। এ পরীক্ষা হলে দেখা যাবে, ...রতীয় রচনার স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ প্রভাব অতীতে কোথাও সুস্পষ্ট ভাবে কার্য্যকরী হয়েছিল।

ইউরোপীয় আলোচকেরা খুবই জোর দিয়ে বলে থাকে প্রাচ্য রচনার বিশেষত্ব রেখার সৌকুমার্য্যের উপর নিহিত। বর্ণের স্তবসমুচ্চয় প্রয়োগে বা আলো ছায়ার লীলাকমল উদ্ঘাটনে ইউরোপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। Percy Brown সাহেব ইউরোপের পক্ষ হ'তে বলছেন: "As the painting of the West is an art of mass so that of the East is as art of line. The Western artist conceives his composition in contiguous planes of light and shade and

অজন্তা

colour. The beauty of oriental painting lies in the interpretation of form by the convention of pure line." * বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন। ভারতীয় চিত্রকলা যাদের সুবোধ্য হয়েছে তারা এ কথা বলতে পারে না। চিত্রকলার অন্যতম রসজ্ঞ লরেন্স বিনিয়ন (Lawrence Binyon) অজন্তার চিত্রপদ্ধতিতে "reticent light and shade" অর্থাৎ অনুগ্র আলো ও ছায়ার প্রয়োগ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বর্ণের প্রলেপেও অজন্তা বিশ্ব-চিত্রকলার বহু দিকেই অগ্রদূতস্থানীয়। চৈনিক চিত্রের প্রামাণ্য আলোচক ওয়ালি সাহেব (Waley) অজন্তা হ'তেই এ রকমের সংযত আলো ও ছায়ার লীলা চৈনিক চিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে এ কথা স্বীকার করেছেন। কাজেই এর ভিতর রন্ধ্র আবিষ্কার করে' এর অসত্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। বস্তুতঃ ইউরোপ ভারতীয় কলালক্ষ্মীর শুধু ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি দেখেই কর্ত্তব্য নিঃশেষ করেছে—এর কমলে-কামিনী শ্রী হৃদয়ঙ্গম করার অধিকার পায়নি। জাপানী ও চৈনিক চিত্রের রেখা প্রয়োগের সাধনা অসাধারণ ও অসামান্য সন্দেহ নেই। জাপানী কলায় কোরিন প্রভৃতি শিল্পীর বর্ণ-ব্যঞ্জনাও অলৌকিক। তবুও প্রাচ্য চিত্রকলাকে রেখাপ্রধান বলে ওকে ক্ষুদ্র করার উদ্যমে ইউরোপের উৎসাহ নিঃশেষ হচ্ছে না।

এজন্য ভারতীয় সভ্যতা ও শীলতার গঙ্গোত্রীকে একবার দেখতে হয়। ভারতীয় কলাবিদ্যার অন্তর্নিহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে বিচার করা দরকার হয় অর্থাৎ কোথা হতে এর ব্যঞ্জনা বা শ্রীর অস্ফুরন্ত প্রেরণা আসে তা খুঁজতে হয়—তা' না করলে কোন রকমের অঙ্গবিচার ফলোপধায়ী হবে না। ভারতবর্ষের সভ্যতা মঙ্গোলীয় প্রেরণার উপর নিহিত নয়। সভ্যতা সম্পর্কে ভারতবর্ষ কিছুটা আর্য্য প্রেরণারও অধিকারী। এজন্যই ইউরোপের সহিত অনেক বিষয়ে এদেশের সমানধর্ম্ম আছে। আবার শীলতা ও সভ্যতার দিক্ হ'তে ভারতবর্ষ প্রাচ্য—কাজেই চীন ও জাপানের সহিত ভারতের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। এজন্য এদেশেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সভ্যতার মিলন সম্ভব হয়েছে ভারতীয় আত্মবক সভ্যতার ব্যাপক প্রভাবে। এর প্রমাণ দর্শন ও কলায় সহজেই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীন রসিকেরা এর কোন্ অঙ্গকে মুখ্য বিবেচনা করেছে? Percy Brown-এর কল্পিত রেখাজালকে মোটেই নয়। এ সম্বন্ধে ভারতীয় রূপশাস্ত্রের প্রমাণ কি? বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এ প্রসঙ্গে বলেছে:—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ।"

এতে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে, রেখা, বর্ত্তনা, আলঙ্কারিক শ্রী ও বর্ণ-গৌরব চিত্রকলার অপরিহার্য্য উপাদানগত চতুরঙ্গ। কোন প্রতীচ্য লেখককে এ বিষয় সমাহিত হ'তে এ পর্য্যন্ত দেখা গেল না। অথচ ভারতীয় কলা আলোচনায় এদের পঞ্চমুখ দশ দিক্ উদ্‌গিরিত হচ্ছে! উপরোক্ত উক্তির ভিতর কোন রহস্য নেই, অস্পষ্টতা নেই বা কষ্টকল্পনার অবসর নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে এ আদর্শ যদি ভারতের হয় তবে এ আদর্শ সমগ্র জগতের সম্বন্ধে খাটে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। অন্য উক্তি দ্বারাও এই রকমের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত করা হয়েছে। গুণগত ষড়ঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে রূপকার বলছেন:—

"রূপভেদঃ প্রমাণানি ভাবং লাবণ্যযোজনং।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকং।"

এ শ্লোকটির স্বদেশে ও বিদেশে যত দুর্ব্ব্যাখ্যা হয়েছে, এমন আর কোন শ্লোকের হয়নি—এ' দেখে অবাক্ হতে হয়। বস্তুতঃ, এ শ্লোকের সহিত উপরি উদ্ধৃত শ্লোকার্থের সামঞ্জস্য স্থাপন করেই

* Brown Indian Painting P. 7.

ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হতে হবে; যথেচ্ছ বাক্‌প্রপঞ্চ আলোচকের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মাত্র। আদ্যোপান্ত শাস্ত্রের নির্দ্দেশের ভিতর সামঞ্জস্য স্থাপিত না করে' অগ্রসর হ'লে বিচারক্ষেত্রে মূঢ়তাই প্রকাশ হয়। অথচ ভারতীয় শিল্পকলার দুর্ব্বলতা প্রতিপাদনে ইউরোপ এতটা অধীর যে, সে যা' একটা কিছু উদ্‌ধৃত করেই যা' তা ব্যাখ্যা করতেও লজ্জিত হয় না। এদেশেও সে রকমের কথার প্রতিধ্বনি করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আণবিক বোমার সাহায্যে অতীতের সব কিছুই মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। তাই ভারতীয় রূপ-লক্ষ্মীর কুণ্ডলিনীর জাগরণ কি ভাবে কল্পিত হয়েছে তা' বিবৃত করা আজও অসম্ভব হচ্ছে না।

উপরোক্ত শ্লোকটি নিয়ে ব্যাসোফার (Bachhofer) এক ঈশপের উপকথা ফেঁদে বসেছেন এবং তা' নিয়ে তার একটি গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করেছেন। সুখের বিষয়, তাতে করে এই উক্তিটিকে কোন প্রকারেই চিরতরে দুর্ব্যাখ্যা দুষ্ট করতে সমর্থ হননি। যখন তাঁর বইখানির ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে স্থান হবে ভারতীয় কলার রূপব্যাখ্যায় প্রযুক্ত আদিম ও সনাতন উক্তির স্বচ্ছতা ও ব্যাপকতা তখনও মলিন হবে না।

রূপভেদের মূল কোথা? একমাত্র "বর্ত্তনার" সাহায্যেই তা' সম্ভব হয়, তা না হলে সব হয় একস্তরের ব্যাপার—উচ্চনীচ ভেদ-শূন্য। কাজেই "রূপভেদের" মানে হচ্ছে উচ্চনীচ স্তরের সৃষ্টি। 'প্রমাণ' শব্দের দ্বারা এর ভিতরকার মননশীল (intellectual) পরিমাপাদির কথা বলা হয়েছে। কাজেই মার্শেল সাহেব যে বলছেন হিন্দু-রচনায় মননশীলতার কোন পরিচয় নেই তা' আজগুবী উক্তি মাত্র। বলা প্রয়োজন ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য্যাদিতে "ভাবের" প্রতিষ্ঠা একটা প্রধান ব্যাপার। পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক রসিক Hsiseh Ho চীনচিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ লক্ষণটির উল্লেখ করেননি।* "লাবণ্যযোজন" হচ্ছে আলঙ্কারিক দিক্‌কে পুষ্ট করা, তা' ছাড়া লাবণ্য সঞ্চার সম্ভব হয় না। "সাদৃশ্য" কথাটিতে প্রমাণ হয় যে, ভারতীয় নাটকাদিতে প্রতিরূপ বা হুবহুরূপ রচনার যে উল্লেখ আছে দেখা যায়, তাতেও ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ নয়। পরবর্ত্তী রাজপুত ও মোগল চিত্রকলায়ও সাদৃশ্য রচনার সূক্ষ্ম সফলতা সকলকে অবাক্ করে। "বর্ণিকাভঙ্গ"ও হচ্ছে "রূপভেদের" মত বর্ণের সাহায্যে বর্ত্তনার সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। বর্ণের যথেচ্ছ প্রয়োগ নয়—শুধু বৈজ্ঞানিক ও রসগত প্রয়োগে এ সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়।

কাজেই এ শ্লোক পূর্ব্বতন শ্লোকেরই পরিপোষক; এ দুটি মিলে ভারতীয় সৃষ্টির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অতি সুস্পষ্ট ভাবে। এর ভিতরে ব্যাসোফারের মত পল্লবগ্রাহী লোক দুর্ব্যাখ্যার যা' আবোল তাবোল বকেছে তা' গুরুতর ভাবে আলোচনারও যোগ্য নয়।
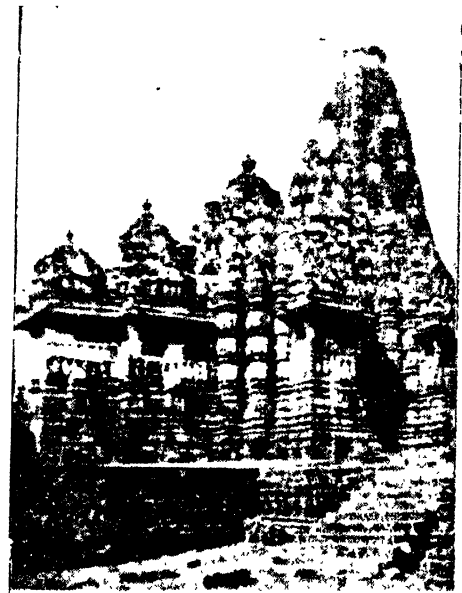
লোমশ ঋষি গুহা

খাজুরাহো মন্দির

ভারতীয় চিত্রকলার এই যে স্বরূপ নির্ণয় হ'ল তাতে এই অভিনব তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে যে, ভারতীয় চিত্রকলার রূপশ্রীতে সকল দেশের চিত্রকলার অপরিহার্য্য উপকরণগুলির এক নূতন সামঞ্জস্য হয়েছে। একান্ত ভাবে চৈনিক রেখাচিত্রের যাদু বা ইউরোপীয় আলো ও ছায়ার কারসাজি এতে নেই। কাজেই ভারতীয় চিত্রকলাকে অঙ্গহীন ভাবে অধ্যয়ন না করে' সমগ্র ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। তা' করতে হ'লে শুধু ভারতবর্ষের গুহাগুলি ঘুরলে চলবে না রূপচক্র বিচারের জন্য। সমগ্র এসিয়ার দিগ্‌দিগন্তে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির লালিত্য পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে নানা

* Kokka 338

জাতির ভিতর। রৌপ্য-সমুজ্জ্বল আকাশ-জোড়া ছায়াপথের মত এ চিত্রকলার পরিধি দেখতে হবে এসিয়ার সারা অঙ্গে। এটাই ভারতীয় চিত্রকলার বিশ্বরূপ। মধ্য-এসিয়া, তিব্বত, জাপান, নেপাল, চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, যবদ্বীপ, দণ্ডন ইউলিক এবং পারস্য সব জায়গাতেই এই ছায়াপথ একটা বিরাট রূপযাত্রাকে বিস্থিত করেছে। অজন্তায় আমরা পাই এক দিকে যেমন বোধিসত্ত্বের ঐশ্বর্য্য ও রাজন্যদের ঘটা—অন্য দিকে সাধারণ জনতার জীবনের নানা অবস্থার দ্যোতক বহু চিত্রপর্য্যায়। রমণীদেহেই এরূপ সীমাহীন রূপভঙ্গী জগতের কোনও শিল্পকেন্দ্রে পাওয়া যায় না। আলোচক গ্রিফিত বলেছেন :—"their varietly is infinite repetition is rare"। ইয়াজদানিও (Yazdani) এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছে।

তা'ছাড়া গন্ধর্ব, কিন্নর, নাগ ও দৈব জগতের সকল চক্র খোটানে হেলেনিষ্টিক, ভারতীয়, পারস্য ও চৈনিক সভ্যতার একটা অন্তরঙ্গ সংমিশ্রণ হয়। ষ্টিন ও ল্যাকক দণ্ডন ইউলিকে যা আবিষ্কার করেছে তা ভারতীয় চিত্র-কলার আদর্শকেই শিরোধার্য্য করেছে। Chiutzuতে ল্যাক্ অনেক ছবি আবিষ্কার করেছেন যা অষ্টম শতাব্দীর রচনা। চৈনিক আলোচক Teng Chunএর মতে নালন্দায় চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা হ'ত এবং বাংলা দেশেও তিব্বতের ঘন সম্পর্কে এই কলাটি তিব্বতের বহু বিহারে বিস্তৃত হয়। ইদানীং V. G. Tucci প্রমুখ ইতালীয় পরিব্রাজকেরা হিমালয়ের গর্ভে, পশ্চিম তিব্বতের বহু মন্দিরের দেয়ালে ভারতীয় চিত্রের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।* এক সময় Kyzilএ পারস্য, রোমক ও চৈনিক প্রভাব ভারতীয় ব্যঞ্জনার সহায়ক হয়। তুন্ হুয়াঙ্ চীন দেশে হলেও বহু বিদেশী এক সময় এখানে বাস করত। এখানকার সহস্র বুদ্ধগুহার চিত্রপর্য্যায়ে ভারতীয় প্রভাব অবিসম্বাদিত! চীনের কাই-ফেন মন্দিরে বাংলার চিত্রপদ্ধতিও কেউ কেউ দেখেছেন।

বুলন্দ দরওয়াজা—ফতেপুর সিক্রী

অজন্তা

জাপানের হরউইজি মন্দিরের চিত্রকলায় অজন্তার রূপাঙ্ক সুস্পষ্ট। ভারতীয় প্রভাব ও ধর্ম্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশ ভারতীয় মূর্ত্তি ও চিত্রের আদর্শ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় চিত্র-কলার একটি বহুমুখী নির্দ্দেশ থাকাতে সকল দেশের চিত্রকলার পক্ষেই এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ান কঠিন হয়নি। গোড়াতে ইউরোপীয়েরা এ সব চিত্রকে ভারতীয় মনে করত।

চৈনিক চিত্রকলার বহু লক্ষণ যে ভারতবর্ষ হতে অনুকৃত ও গৃহীত হয়েছে এ কথা আলোচকেরা বার বার স্বীকার করেছেন। এর ভিতর ওয়ালে (Waley) খুব বিশদ ভাবেই এ সমস্ত হের-ফেরের বিচার করেছেন। এমনি করে চৈনিক চিত্রকলায় ভারতীয় ছায়ার মূর্চ্ছনা প্রস্ফুট হয়েছে।†

অজন্তার রূপের মুকুরে ফলিত হয়েছে। অজন্তার শিল্পী কর্ত্তৃক রূপের মণ্ডল এমনি বিরাট করেই সৃষ্টি হয়েছে। বাগগুহায় (Bagh) অজন্তারই ছন্দতরঙ্গ মুখর, তা'তে সাদা, লাল, ব্রাউন, সবুজ, ও নীল রঙের ব্যবহার হয়েছে। উড়িষ্যা রামগড় শৈলে এবং পঞ্চম শতাব্দীর শ্রীগুপ্তের রচনায় নীল রঙ দেখা যায় না—অজন্তাতেও পীত রঙের ব্যবহার অতি সামান্য, এগুলি হ'ল বিশেষত্ব। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাগগুহার রমণী দর শোভা-যাত্রা একটা লক্ষ্য করার বিষয়। এটা মার্শাল সাহেবের অধ্যাত্ম বিহার নয়—গুপ্তযুগের বিলাসকারুতার নিদর্শন। শুধু শোভাযাত্রা বা নৃত্যগীতিতে ও রচনায় ভারতীয় চিত্রকলা নিজেকে নিঃশেষ করেনি। দূরদিগন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এর ব্যাপক পরিধি দেখে অবাক্ হ'তে হয়। গান্ধার, বলক্, কাশগর, খোটান, কুচি, শানসি ও হোনানকে জড়িয়ে ভারতীয় রূপবিস্তার বহুমুখী ছায়াকীর্ত্তি প্রকট হয়েছে। পূর্ব্ব-তুর্কীস্থান ও তিব্বতের বহু রচনায় ভারতীয় শ্রীর অশ্রান্ত উদ্ভিন্ন দেখে আমরা মুগ্ধ হই। পূর্ব্ব-তুর্কীস্থানের খোটান এক সময় ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এক সময় পারস্যের ধনিগণ চিত্ররচনায় চীনে কারিগর নিযুক্ত করত—কারণ ছবি আঁকা মুসলমান ধর্ম্ম অনুমোদন করেনি সব সময়। এ সব চৈনিক চিত্রকরদের নকাস-ই-চীন বলা হত। পারস্য দেশের আবহাওয়ার ভিতরে এ শ্রেণীর রচনা ভারতীয় কলা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই পারস্য চিত্রে ভারতীয় রূপস্পন্দন মুখর হয়েছিল। তার'পর যখন আবার মোগল আমলে বাদশাহগণ পারস্য চিত্রকরদের পক্ষপাতী হ'ন, তখন বস্তুতঃ ভারতীয় রচনারই একটা দিক্ দিল্লীতে অভিনন্দিত হল।

ব্রহ্মদেশের অবেয়দান মন্দিরের রচনাতে অজন্তার রূপ-সম্পদ্ বিস্থিত হয়েছে। ব্রহ্মদেশের এ সব চিত্রে ভারতীয় আদর্শের দিগন্ত

* New Asia Vol No. 1 P 12

† Waley Chinese Painting P 125

বং বিস্তৃত প্রসার ও প্রভাব প্রমাণিত হয়। এ সবকে বর্জ্জন বা পেক্ষা করে' ভারতীয় রচনার পরিপূর্ণ শ্রীকে যথার্থ ভাবে উপভোগ ম্ভব নয়। ভারতীয় চিত্র সাম্প্রদায়িক নয়, কোন সঙ্কীর্ণ দেশের য়োজন-সিদ্ধির জন্য এর সৃষ্টি হয়নি। সর্ব্বত্রই ভারতের রূপ-ল্পনা যেন একটা সৌন্দর্য্যের দেবযানপথ সৃষ্টি করেছে। হু জাতি ও সভ্যতাকে উপচিত করে' এই বিরাট পথ বিস্তৃত হয়েছে।

শ্যামবাজ্যের রচনায় মহাযানবাদের আতিশয্য ও ত্যুক্তি তিব্বতের মতই মাঝে মাঝে উৎকট হয়ে প্রকাশ য়েছে। যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের মুখোস ও নৃত্যের রা এই চিত্রকলা দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। শ্যামদেশের চিত্রকলায় রামায়ণের উপাখ্যানের এক অপরূপ প্রসঙ্গ দেখে বাক্ হতে হয়। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের চিত্রকীর্ত্তি ভারতীয় ভাবে ভরপুর—এর ভিতরকার মঙ্গোলীয় অনুশাসন ারতীয় সৌকুমার্য্যকে অধিক স্ফুরধার করেছে।

তুঙ্গ হুয়ানের সহস্র-বুদ্ধ-গুহার রচনায় এক অপূর্ব্ব াপার লক্ষিত হয়। ভারত ও চীনের ধারার গঙ্গাযমুনা ম ঘটেছে এখানে। তুঙ্গ হুয়ানের বিচিত্র রচনার মধ্যস্থিত ারতীয় মূর্ত্তি ও অলঙ্কার সমূহ চারি দিকের আবেষ্টনের সহিত প্রথমটা সঙ্গত হয়নি, একথা AurelStein লিপিবদ্ধ রেছেন। ভারতীয় কলাকে মধ্যমণি করে' ক্রমশঃ চৈনিক বিদ্যা নিজেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। চিত্রকলার তিহাসে এ সমস্ত অধ্যায় আলোচিত না হলে ভারতীয় -শাসনের প্রশস্ত প্রমাণগুলিকেই উপেক্ষা করা হয়। তঃ খণ্ড আলোচনা ভারতীয় রূপবিধির বহুমুখী ঐশ্বর্য্যের তি বিমুখ হয় মাত্র। এ জন্যই ভারতীয় সৃষ্টির বিচারে সে অকিঞ্চিৎকর আদর্শ এবং কূপমণ্ডুকত্বের প্রেরণা।

এ সমস্ত কারণে ভারতীয় চিত্রবিদ্যায় প্রতীচ্য বিচার কবারে অপ্রামাণ্য হয়েছে।

জাপানের নারাযুগে [৭০০-৮০০ খৃঃ] ধর্ম্ম, সাহিত্য ও ল্পের যে প্রভাব দেখা যায় তা'তে ভারতের দান চুর। * পূর্ব্ববর্ত্তী হেইয়ান যুগে [৭৮২-৮৮৮ খৃঃ] র্ম্মপুণ্ডরীকের (Yendai) ও মন্ত্রযানের (Shignon) তিবিম্ব অতি সুস্পষ্ট। Zenএর বা ধ্যান-চক্রের প্রভাবে পানের আত্মবাদ জাপানকে অমর করে। চীনের ত্যাঙ্গ ার কলা-পদ্ধতির প্রেরণা সম্বন্ধে ওকাকুরা বলেন: Kalidas's poetry, Varahamihir's astronomy, high wallpaintings of Ajanta and sculptures of the Ellora caves gave its inspiration to the Tang Art of China" † সহস্র-বুদ্ধ-গুহার াবলি এ যুগের। বস্তুতঃ জাপানের সুদৃঢ় আধুনিকতার পশ্চাতে ছে গুপ্ত সভ্যতা ও শীলতার দক্ষিণ হস্ত এবং ভারতীয় আত্মবাদের র তিলক। জাপানী চিত্রকলার অফুরন্ত রূপের পাত্রে আছে মের মর্ম্মর ভিত্তি ও আত্মবাদের উন্মনা উৎসাহ। এক্ষেত্রে লাবণ্য-যোজনের সঙ্গে আছে প্রমাণের জয়কার ও বর্ণিকাভঙ্গের সীমাহীন উপচার। চৈনিক চিত্রে কনফুসীয় শাসন বহিরঙ্গ রূপভেদ ও রেখা-কৌলীন্যের দিকে জাতীয় চিত্রকে আকর্ষণ করেছে; এর ভিতর প্রমাণ ও বর্ণিকাভঙ্গও অক্ষক্রীড়ার ফলকের মত বিচিত্র যাত্র

গোল গুম্বজ—বিজাপুর
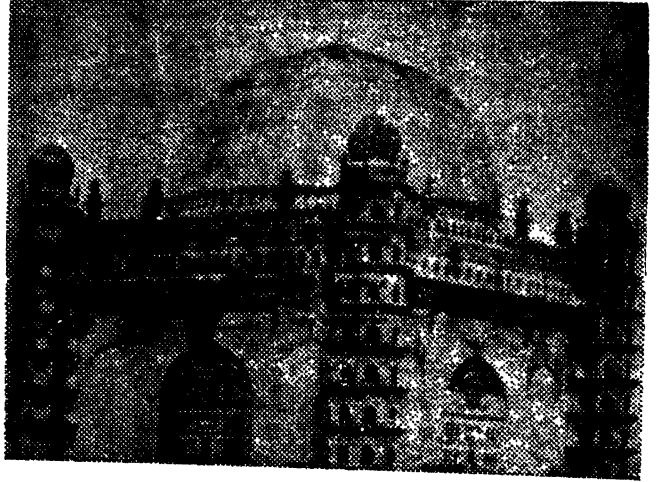
ভাজার স্থাপত্য

সঞ্চারিত করেছে। ত্যাঙ্গ যুগের তান্ত্রিক প্রেরণাও একটা গভীর অধ্যাত্ম সম্ভ্রমে চৈনিক চিত্তকে আহ্বান করে। তাতেই এখানকার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির এক অফুরন্ত মাদকতা ঘনীভূত হয়েছে।

তিব্বতীয় কলায় আছে সহজযানের দুরূহ ও জটিল বিভ্রম। তা'তে রহস্য কোলাকুলি করেছে বাস্তবতার সঙ্গে। রেখা ও বর্ণচ্ছটা প্রমাণের স্তরেই সকল প্রমাণের বাইরে যেতে উৎসাহিত হয়েছে। "মণি-পদ্ম-হুম" ভোজবাজির পেছনে আছে পদ্মসম্ভব ও অতীশা কর্ত্তৃক চালিত ভাবের সম্ভার! লাল টুপী ও হলদে টুপীর প্রভাব

* Ency. Brct vol 12 P 923
† Okakura Ideals of the East P 75

ঘনীভূত করেছে তিব্বতের বাস্তব ও অবাস্তব জটিলতা। এখানকার বর্ণাঢ্যতা রেখাকেও ভূষণাত্মক করেছে। লাবণ্য-যোজনের খাতির রূপভেদের বিচিত্র সংহতির অতুলনীয়তা সম্ভব করেছে।

মধ্য-এসিয়ার রচনায় যে পাঁচমিশেলী রঙের গালিচা তৈরী

উড়িয়্যার পুঁথির আবরণ

হয়েছে তারই আবর্ত্তিত পশমী অন্তরালে তুর্কী, পারস্য, চীন প্রভৃতির দান সুস্পষ্ট। হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম্ম, ম্যানিকীয় ধর্ম্ম, নেষ্টোরীয় খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি বহু ধর্ম্মের গুপ্ত মুখরতা তাতে আছে। এ সবকে ঐক্যদান করেছে ভারতীয় সৌন্দর্য্যবিধির সমাশ্লেষী আকর্ষণ।

ব্রহ্মদেশের হীনযানের বিশীর্ণ ঐক্যবাদ বাংলাদেশ হ'তে প্রচারিত একাদশ শতাব্দীর মহাজন ও তন্ত্রের বিচিত্র রূপরাগে হয়েছে। বাংলাদেশ হতে বিস্তৃত উত্তর-ব্রহ্মের অরি-ধর্ম্ম সমগ্র সঙ্কীর্ণতা ভেঙেছে রূপবিন্যাস। Kubezat payar একাদশ ও দ্বাদশ শতকের জাতক চিত্রাদি এবং Kyanzithu গুহার চিত্র সম্বন্ধে ইউরোপীয় আলোচকেরাও যে মত প্রকাশ করেছেন তাতে এ সব রচনার সহিত বাংলাদেশ ও নেপালের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। পাগানের 'লকহ্ তাই কা' মন্দিরের চিত্রাদি ও মিন পাগান শুরেয়দান মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র অজন্তার প্রভাবে ভরপূর। এ সব রচনায় লাবণ্যযোজনের খাতির প্রমাণকে অব্যাহত রেখেছে এবং রেখাজালকে হৃদ্য করেছে।

ইন্দোচীন ও শ্যামের দিগন্তে ভারতীয় প্রভাব মঙ্গোলীয় অত্যুক্তিতে সংযত করতে পারেনি, চৈনিক একদেশদর্শিতা ভারতীয় রূপভঙ্গকে নিষ্পিষ্ট করেছে। সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গের খাতিরে তা' ভূষণাত্মক বিধির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

লঙ্কাদ্বীপের পলন্নুরেওয়ার রূপহিল্লোল অজন্তার পদাঙ্কে ছড়িয়েছে নবতর কুঙ্কুমের আলেয়া। জীবনের রক্তিম বাস্তবতা অজন্তার সংযমকে ভেদ করে এখানে উন্মনা হয়েছে ঐন্দ্রিয়িক রসবিতানকে মগ্ন করতে। একই তালের রচনা এখানে মাংসল মোহকে শাণিত করেও নিজের রূপবিধিগত স্বাজাত্য রক্ষা করেছে—এ সিদ্ধি অসাধারণ। লঙ্কার দ্বৈপায়ন সভ্যতার এই কৃতিত্বের মূল আছে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি—যা' চারি দিকের ঊর্ম্মিমুখর সমুদ্রকেও অনিবার্য্য করে তুলেছে।

রূপকলার ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভারতে বিস্তৃত এ জটিল ছায়াপথে—গ্রীক সভ্যতার প্রেমিক ইউরোপীয়ের অগ্রসর হওয়া কোন কালেই সম্ভব নয়। আজকের বিশ্লেষক পাশ্চাত্য চিত্ত ভারতীয় গণকলার পক্ষপাতী হয়েছে। কিন্তু গণকলাও বিধি মানে এবং সে বিধি ইউরোপীয় নয়। মাতিস বা গোগ্যাঁর দোহাই এ পিচ্ছিল রাজ্যে ঢোকবার নিরাপদ রক্ষা-কবচ নয়। বাশৌলী চিত্রকলা, জৈন চিত্রপদ্ধতি, মথুরা, কালীঘাট কালী ও পুরীর রচনার আলুলায়িত ঐশ্বর্য্যেও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের কোন কোন বিধির নির্দ্দেশ স্থান পেয়েছে—সব কিছু বর্জ্জিত হয়নি। ইউরোপের অপ্রাকৃত রচনার নেশা এখানে লক্ষ্য হয়নি। অশ্রান্ত কালের রাজপথে গণপ্রবাহের অগণ্য তরঙ্গভঙ্গ সামান্য হলেও বিরাট সমুদ্রের বিক্ষোভকেই জয়যুক্ত করে। গণকলাতে তাই মানবদেহের ভৌম দিকগুলিই রেখার ও বর্ণের আকারে ছন্দায়িত হয়ে পড়ে, তাতে খুঁটিনাটি জালি কাজ সম্ভব হয় না। মহত্তের দিকে চোখ ফেরালে অণুর মন্দিরে সব সময় আরতির

বাগ গুহার চিত্র

আলো জ্বালান চলে না। ভারতের গণকলাও এই বিরাট ছায়াপথের পথিক। ভারতীয় চিত্রের কলাকলাপে—এভাবে দু'-ধারাতেই রূপযজ্ঞের কল্পিত শিখাসমুচ্চয়ের প্রতিরূপ বিম্বিত হয়েছে। কলাকে খণ্ডভাবে দেখা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

আদিম মানস

শুভেন্দু ঘোষ

প্রথম যখন এদেশে রেল-লাইন খোলা হল, সেকেলে একটা ইঞ্জিন (আজকের দিনের দানবগুলোর তুলনায় সেটা ছিল বামনাকৃতি) ভয়ানক কাসৃতে কাসৃতে, হাঁফাতে হাঁফাতে, লম্বা শুঁড়টা দিয়ে ঝলকে ঝলকে রাশি রাশি ধোঁয়া উদ্গার করতে করতে, অবলীলাক্রমে খান পাঁচ-ছয় গাড়িকে টেনে নিয়ে ঘণ্টায় আট-দশ মাইল বেগে দৌড়ে হাতী-ঘোড়াকে টেক্কা দিয়ে, ভীম-পরাক্রমে হাওড়া থেকে আসানসোল আর আসানসোল থেকে হাওড়া এই দীর্ঘ পথটা মাড়িয়ে বেড়াত; আর লৌহবর্ত্মটার দুই পাশে, বিশেষ করে ষ্টেশনগুলোতে, দূর দূর পল্লী থেকে এসে জুটত কৌতূহলী যাত্রীদল। ষ্টেশনগুলো হয়ে উঠেছিল তীর্থ, যাত্রীরা আসত ইঞ্জিন দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় করতে। এতোগুলো গাড়ীকে যা একটা কড়ে আঙুল দিয়ে টেনে নিয়ে চলে, এতটুকু ভ্রান্তি আসে না; এ শক্তি তো সাধারণ শক্তি নয় এ শক্তি অলৌকিক, দৈবশক্তি। অগ্নিগর্ভ লৌহকায় এই ইঞ্জিনটা তো কোনো মর্ত্ত্য জীব নয়—ইনি দেবতা!

উপরের কথাগুলো অত্যন্ত সরল অর্থেই বলা হল, এর মধ্যে অণুমাত্র ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তি নাই। বাড়িয়েও বোধ হয় বলা হয়নি এতটুকু। রেল খোলার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ যা পাওয়া যায়, তা থেকেই এরকম একটা ধারণা না হয়েই পারে না।

প্রথম যেদিন রেলগাড়ী চলল, সেদিনের কথাটা কল্পনা করা যাক্। নতুন পাতা রেল-লাইনের দুই পাশে চাষীরা ক্ষেতে কাজ করতে এসেছে; মনে হল, যেন একটা ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ আসছে কোথা থেকে, অদ্ভুত আওয়াজ—এমনটা তারা সাত জন্মেও শোনেনি। উৎকর্ণ হয়ে উঠল তারা, একবার মাটির দিকে চাইল, মাটির নীচে থেকে শব্দ আসছে না তো! একবার আকাশের দিকে চাইল—না, মেঘের আওয়াজ এ নয়; বুকে কান লাগালে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি। একটা অন্ধ অজানা আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে লাগল। শব্দটা ক্রমেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে, দূর থেকে এগিয়ে আসছে। তামাকের কলকেটায় একটা জোর টান লাগিয়ে তারা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তার পর, শব্দের দিক্ লক্ষ্য করে চোখ ফেরাতে দূর আকাশপ্রান্তে তরুচ্ছায়ার মাথার উপর কালো ধোঁয়ার মত কি একটা দেখা গেল; তার পর চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে হাতীর মত মস্ত কৃষ্ণকায় একটা বিস্তৃতকিমাকার দৈত্য বিকট আওয়াজ করতে করতে তাদের দিকে তাড়িয়ে এল। লাঙল ফেলে চাষীরা কেউ মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ল; কেউ বু-বু করতে করতে ভিরমি গেল, কেউ বা প্রাণপণে দৌড়ে কাছে-পিঠে কোনো ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গিয়ে ভয় পাওয়া ভেড়ার মত চোখ দুটো বুজে, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিপুল আগ্রহে দেবতাদের নাম জপ করতে লাগল, আর্তহৃদয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, ঐ দৈত্যটার বিষদৃষ্টি যেন তার উপরে না পড়ে যায়।

দু'-চার দিন যাওয়ার পর, যখন দেখা গেল, ও-গাঁয়ের হারু মণ্ডলের মাঠ হতেই জ্বর নিয়ে যাওয়া আর এ গাঁয়ের পুরানো হেঁপো রোগী রহিম চাচার দম আটকে মরে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি; যখন দেখা গেল ঐ দৈত্যটা লোহা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে এ-দিক্ ও-দিক্ ধাওয়া করে না, লোকে ভরসা পেল। তারা দূর থেকে সেটাকে চলে যেতে দেখল, যতক্ষণ দেখা গেল অতি ভয়ে ভয়ে তীব্র সজাগতার সঙ্গে লক্ষ্য করল, সেটা চোখের অগোচর হয়ে গেলে হাত জোড় করে, নয়তো বা মাটিতে গড় হয়ে দণ্ডবৎ করল ঐ অজ্ঞাত মহাশক্তির উদ্দেশে। ষ্টেশনের কাছাকাছি যারা থাকত, কয়েক দিন পরে তারা সাহস করে দৈত্যটার কাছে গিয়ে, তার তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তার গায়ে সিন্দুর লেপন করে আসল…হয়তো বা কিছু মানসও করল। মানুষের আদিম মানস দেব আর দৈত্যের মধ্যে বিভেদ করে না; অজ্ঞাত মহাশক্তি মাত্রই পূজার্হ; তাই ইঞ্জিন-দৈত্য দু'চার দিনের পরিচয়ের পর দেবতারূপে দেখা দিল। কিন্তু হায় রে আধুনিক যুগ! এ দেবত্ব তার ফুটতে না ফুটতেই মিলিয়ে গেল। কেন গেল তার আলোচনা আমরা পরে করব।

এদেশে রেলপথ পত্তনের এই ধরণের একটা কাহিনী আমাদের এক অধ্যাপকের মুখে শুনেছিলাম। শুনে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি মনের ভিতর একটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত করুণার সঞ্চার হয়েছিল। ভেবেছিলাম, 'কি বেকুব ছিল আমাদের দেশের লোকগুলো।' নিজেকে আশ্বাস দিয়েছিলাম, পশ্চিম দেশের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এ-সব এখন নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছে। এ-রকম হওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

ভুল ভাঙতে দেরী হয় নাই। বস্তুতঃ, ভুল হওয়াটাই উচিত ছিল না। নিজের বিচারবুদ্ধির উপর অতি-বেশী শ্রদ্ধা রাখি বলে কথাটা বলে ফেলেছি—বলা উচিত ছিল, ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও ভুল করাটা অনুচিত হয়েছিল। যে মনোবৃত্তির বশে ইঞ্জিনকে প্রণাম করা অথবা তার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়েছিল, সে মনোবৃত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের ছেলেবেলা থেকেই হয়ে আসছে,—এখনও হচ্ছে, তবে সেগুলোকে কোনো দিনই অদ্ভুত বলে মনে হয়নি; তার কারণ, প্রথাগত কার্য্যের কারণ জিজ্ঞেস করা আমাদের সংস্কৃতি-বহির্ভূত। ভূমিকম্পের সময়, গ্রহণের সময় আমাদের ঘরে ঘরে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে—বাড়ীর বয়স্করা, বিশেষ করে, মেয়েরা জপমালা নিয়ে বসেছে; এ-সবের পিছনে যে মনোবৃত্তি, সে তো ইঞ্জিন-পূজোর মনোবৃত্তির সমগোত্রীয়। তফাৎ-এর মধ্যে এই যে, ইঞ্জিন-দেবতার দেবত্ব বেশী দিন টেকেনি; আর বাসুকি ও রাহুর প্রভাব, সামান্য কিছু ক্ষুণ্ণ হলেও এখনও চলেইছে। তার কারণ বোঝাও শক্ত নয়। যে মহাশক্তির মূর্ত্ত প্রতীক হিসেবে ইঞ্জিন দেবতা হলেন, দেখা গেল, সে শক্তিটা নিতান্তই মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, সুতরাং সেটার মধ্যে আর কিছু রহস্য রইল না। ভূমিকম্পের পিছনকার, গ্রহণের পিছনকার শক্তি, যদি বা বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের বোধগম্য হয় আজও তারা মানুষের বশে আসেনি। তাছাড়া, এগুলো সম্বন্ধে শত সহস্র বৎসর ধরে যে 'সংস্কার' গড়ে উঠেছে সে 'সনাতন' সংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজন, জাতির সমগ্র জীবনধারায় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ধারায় বিপ্লব; সেটা শুধু শুষ্ক বৈজ্ঞানিক-তথ্যের কাজ নয়।

এই ত হল এক নম্বরের ভুল। ভুল আরও একটা করেছিলুম—সেটা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর অতখানা বিশ্বাস করা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এক ইংরেজ অধ্যাপককে দেখেছি, মই-এর নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় শঙ্কাকুল হয়ে উঠতে। বিলেতের সাধারণ লোকের বহুকালের একটা সংস্কার, মই-এর নীচে দিয়ে গেলে কি যেন একটা ভীষণ অকল্যাণ হয়। এই

যৌক্তিক ধারণাটা কাটিয়ে ওঠা ঐ শিক্ষিত অধ্যাপকের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তার কারণ, সংস্কার কাটানো সব সময়েই সাধারণ বোধের কাছে একটা শক্ত ব্যাপার; তার কারণ, ইংরেজরা বিজ্ঞানে অনেকটা উন্নত হতে পারলেও, প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর উপর অনেকখানা প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারলেও, প্রকৃতিকে বশ মানানোর বোধ ইংরেজদের জাতীয় জীবনের সাধারণ সত্তায় তা অন্ধ হয়ে উঠতে পারেনি; বিজ্ঞান আজও তাদের জাতীয় সংস্কারে অনুক্রমিত হতে পারেনি। পারেনি, তার কারণ, ইংরেজের অর্থনীতি, যাকে কেন্দ্র করে মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রা সেই অর্থনীতি, তাদের জীবনকে নিয়ে এখনও ছিনিমিনি খেলতে পারে; এখনও তারা অর্থ-সঙ্কটে ভোগে, এখনও শাসকশ্রেণীর ইঙ্গিতে অন্ধভাবে যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়। অথচ, প্রকৃতিকে পোষ মানানোর সবল অর্থ হওয়া উচিত, নির্ভয়ে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে জীবনপথে চলতে পারা।

যাক্ এ সব কথা। ইঞ্জিন-পূজোর যুগ যে আমরা কাটিয়ে উঠিনি—এই সত্যটা কি করে আমার মর্মংগম হল, সে-কাহিনী বলি। ইংরিজি ৩২ কি ৩৩ সাল হবে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার একটা বড় কেন্দ্র এই কলকাতারই কোনো সহরতলীতে গৃহস্থদের রন্ধনশালায় একটা মহা আতঙ্কের রুদ্র ছায়াকে ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার করতে দেখা গেল। কি? না, শিলনোড়ার উপর মা শীতলার কৃপা হয়েছে! ঐ সময় একটা বাড়ীতে—যথেষ্ট ইংরিজি লেখা-পড়া জানা এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে—নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখি, তরকারী-পাতিতে হলুদ কি লঙ্কা-বাঁটার নাম-গন্ধ নাই; শিলনোড়া একটা হলুদ-রাঙা বস্ত্রখণ্ডে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে স্বতন্ত্র স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমার বিস্ময় দেখে, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা একটু লজ্জিত সঙ্কোচে বল্‌লেন, মেয়েদের সংস্কার! এ দিকের সব বাড়ীতেই এ কয় দিন এই রকম ব্যবস্থা চলেছে। পুরুষেরা যেন একেবারেই মায়ের কৃপা-টৃপা বিশ্বাস করেন না, শুধু মেয়েদের পাল্লায় পড়ে নির্হলুদ ব্যঞ্জনটা সহ্য করে যাচ্ছেন!

মনে পড়ে, কলকাতায় কোন কলেজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক শিলনোড়ার বসন্ত রোগ সম্বন্ধে কোনো একটা দৈনিক কাগজে লিখেছিলেন, যেটাকে শিলনোড়ার গুটি বলা হচ্ছে তা হচ্ছে এক প্রকারের ফাঙ্গাস্—অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় চামড়া-টামড়ার উপর যে ছাতা পড়ে সেই জাতীয় উদ্ভিদ্। অধ্যাপক মশায়ের এই ঘোর নাস্তিকতায় শিলনোড়ার বিশ্রামে কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল কি না, জানা নাই।

এই শিল-নোড়া-গৃহস্থ সংবাদে আমরা পাচ্ছি, মানুষের শারীর ধর্ম শিলনোড়ার উপর আরোপ করা হচ্ছে; রোগকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা ইঞ্জিন-পূজোর চেয়েও হাস্যকর, কিন্তু যাঁরা সেদিন ইঞ্জিন-পূজো দেখলে পূজারীদের বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখে দারুণ অবজ্ঞায় নাক সিটকোতেন তাঁরাই শিল-নোড়ার বিশ্রামের আয়োজন করেছিলেন। ইঞ্জিন যে একান্তই ইঞ্জিন!—অর্থাৎ তার ক্ষতি করার শক্তি কতখানি তা তো সকলেরই জানা আছে; কিন্তু মা শীতলা? কে জানে বাবা, কি করতে কি হয়! সাবধান হওয়াই ভাল!

সত্যিই, যা কিছু দুর্বোধ্য, যা কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণাতীত, যা কিছু বিস্ময়কর, রহস্যময় অথবা ভীষণ, মানুষের আদিম মানসের স্বাভাবিক ধর্ম হল তার সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা পোষণ করা; সেই ভয়কে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে তার তৃপ্তি-সাধনের ব্যবস্থা করা, তার স্তুতি করে, তার ভোগের আয়োজন করে। এর নানা প্রমাণ নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বিভিন্ন মহাদেশের অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ডাকোটাদের মধ্যে, ফিজির আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, মাওরি-মাশাই প্রভৃতি জাতিগুলোর মধ্যে দেখা যায়, তারা দেবতা বোঝাতে যে শব্দ প্রয়োগ করে, বিস্ময়কর অস্বাভাবিক বা রহস্যময় কোনো কিছু বোঝাতেও প্রায়শঃ সেই শব্দই ব্যবহার করে থাকে। অপ্রাকৃত, দুর্বোধ্য শক্তিকে দেবতা বানানো; জড়কে প্রাণবন্ত জ্ঞান করা—আদিম মনের এই সব লক্ষণও সব দেশেই পাওয়া যায়। সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। [ক্রমশঃ

সাগর

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সাগরের লোনা জল ডাক দিল এত দিন পর।
পাহাড়ের রুক্ষ দ্বীপে এত দিন বেঁধেছিনু ঘর—
নীরস জীবন ছিল তালীবন শিরায় শিরায়,
কাঁটা ভরা সরু পথ কাঁকর ও পাথরের দেশে
মাঝে মাঝে মুখটি ফিরায়,
আর যেখানেতে এসে
জ্ব'লে-যাওয়া ছোট ঘাস পাহাড়ী মাটির সাথে মেশে,—
যেখানে সহজ পথ হঠাৎ হয়েছে কিছু ঢালু,
মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে ধূ-ধূ করা মরুভূর বালু:
সেই পাহাড়ের দ্বীপে, ক্লিষ্ট প্রাণ মানুষের সাথে
এত দিন করিয়াছি বাস ধুক্ ধুক্ প্রাণ নিয়ে হাতে।

আজ এত দিন পর
ফেলে এসে রুক্ষ, শীর্ণ, সঙ্কীর্ণতম ঘর
লোনা জীবনের ছিনিমিনি খেলার পেয়েছি আহ্বান।
বহু দূরে তীর আছে ঘুম-ভাঙা স্বপনের মত,
সাগর-দোলায় দেখি ঘুম-চোখে স্বপনেরা যত।
এখানের ভাঙা হাল, এখানের ছেঁড়া পাল
এখানের ডুবে-মরা ভয়—
আগেকার জীবনের মত ধীর পায়ে স্থির হয়ে চলা
এখানের নিয়ম জানি নয়;
কোন দিন কোনও তীর বাঁধিবে না সাগরের ঢেউ,
বাঁধিব না আমরাও কেউ,

সাগরের জলে জলে এই মত ভেসে যাব শুধু—
আমাদের ঘিরে র'বে চিরকাল এ সাগর ধূ-ধূ।

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

বিজয় বাবুকে পরের দিন সকালেই রওনা করিয়া দেওয়া হইল। প্রথমটা তিনি খুবই সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার আগ্রহের এই নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়া এবং ভূপেনের পীড়া-পীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইলেন। কল্যাণীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, অন্ধ পিতাকে একেবারে পরের ভরসায় ছাড়িতে চাহিল না, ভূপেনও জেদ করে নাই। সত্যই, বিজয় বাবু যে প্রকৃতির লোক, শত অসুবিধা হইলেও কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। তার চেয়ে কল্যাণী সঙ্গে থাকাই ভাল, তাহাকে আর বলিয়া দিতে হয় না, পিতার সামান্যতম সুবিধা-অসুবিধাও সে বোঝে। ছেলেদের লইয়া এখানে একটা সমস্যা উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কল্যাণীর পিসীমা আশ্বাস দিলেন, চোখে না দেখিলেও দুই-তিনটা দিন তিনি চালাইয়া লইতে পারিবেন। তা ছাড়া ডাক্তার বাবুর বিধবা শ্যালিকাও এই কয়টা দিন এখানে আসিয়া থাকিবেন—ডাক্তার বাবু নিজেই উপযাচক হইয়া এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বড় ডাক্তারের কাছেই পাঠানো হইল বটে, তবু ফলাফল সম্বন্ধে ভূপেনের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং যদি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থই হয় ত কি উপায় হইবে, সে অবস্থাটা সে কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছিল না। এই ভাবে আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া যখন সে ইহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রহর গণিতেছে সেই সময় অকস্মাৎ আর একটি দায়িত্ব তাহার উপর আসিয়া পড়িল। বিজয় বাবুর অসুখের জন্য এ কয়টা দিন কোচিং ক্লাস না লইলেও সালেকের অসুখের খবরটা সে ক্লাসেই পাইয়াছিল। তাহার না কি প্রবল জ্বর, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা—খুব সম্ভব ইনফ্লুয়েঞ্জা। তবু কিছুতেই সময় করিয়া এ দুইটা দিন তাহার খবর লইতে যাওয়া হয় নাই, এজন্য ভূপেন মনে মনে লজ্জিতই ছিল। বিজয় বাবুদের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে সেই কথাটাই মনে পড়িয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আজ স্কুলের ফেরৎ সোজা সালেকদের হোষ্টেলেই ঢুকিবে।

কিন্তু স্কুলে পা দিতেই অপূর্ব্ব বাবু শুষ্ক মুখে কহিলেন, ও মশাই, শুনেছেন?

কিছু পূর্ব্বেই সকলে হোষ্টেলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন, অপূর্ব্ব বাবু কয়েক মিনিট আগে আসিয়াছেন এই মাত্র—ইহার মধ্যেই শুনিবার মত কি ঘটিল অনুমান করিতে না পারিয়া ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—না, কি হয়েছে?

মুখটা বিকৃত করিয়া অপূর্ব্ব বাবু কহিলেন, সালেকের গায়ে না কি মায় অনুগ্রহের গুটি বেরিয়েছে!

সে কি!

আর কি—ঐ ত আব্বাস্ বলছে!

আব্বাস ঐ হোষ্টেলের দ্বিতীয় এবং শেষ অধিবাসী। তাহাকে জেরা করিয়া ভূপেন জানিল কথাটা সত্যই। সে বেচারা ছেলেমানুষ, রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছে। কাল না কি যন্ত্রণায় সালেক সারা রাত চেঁচাইয়াছে, তখনও আব্বাস ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সালেককে ভূতে পাইয়াছে এমনি একটা সন্দেহও হইয়াছিল তাহার; তার পর আজ সকালেও সালেক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কিছু দেখা যায় নাই, আব্বাসও খুব সম্ভব ভূতের ভয়েই, তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করে নাই। এইমাত্র দেখিতে পাইয়াই সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

সংবাদটাতে ভূপেনের ভয় ততটা হইল না—যতটা হইল এ দুই দিন সংবাদ না লইবার জন্য অনুশোচনা। সে অপূর্ব্ব বাবুকে প্রশ্ন করিল, এখন কি করবেন তাহ'লে?

আমরা আর কি করব, হেড মাষ্টার মশাই আসুন।

ভবদেব বাবু সকালের দিকে প্রায় প্রত্যহই কিছু দেরী করিয়া আসেন। আহ্নিক পূজার চাপে সকাল বেলা আর ঠিক অন্য মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে আহারে বসিতে পারেন না। এজন্য তিনি প্রথম ঘণ্টাটা নিজের খালি রাখিয়াই রুটিন করিয়াছেন। আজও ভবদেব বাবু আসিলেন মিনিট পনেরো পরে। অপূর্ব্ব বাবুর মুখে সব বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, তাই ত, রাধারাণীর আবার এ কি লীলা। জয় রাধে!

ভূপেন একটু অসহিষ্ণু ভাবেই জবাব দিল, কিন্তু রাধারাণী ত আর এখানে হেড্ মাষ্টারী করেন না—এখানে দায়িত্ব আপনারই, একটা কিছু করুন।

ভবদেব বাবু একটু অসহায় ভাবেই অপূর্ব্ব বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। অপূর্ব্ব বাবু কহিলেন, আব্বাসকে ত বাড়ী পাঠাতেই হবে—এ সব কেস অবিলম্বে সিগ্রিগেট করা দরকার। ওকেই বলুন যাবার সময় সালেকের বাড়ী খবর দিতে, ওর বাপ এসে নিয়ে যাক—

এই সহজ ব্যবস্থায় ভবদেব বাবু খুশী হইয়া উঠিলেন। ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে পক্স-এর কেস?

গো-গাড়ী করে নিয়ে যাবে।

গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান নিয়ে যেতে রাজী হবে?

ওরা যেখান থেকে হোক নিয়ে আসবে গাড়ী। তাছাড়া আমরা আর কি করব বলুন। ব্যাপারটা যত সহজে উহারা মিটাইয়া দিলেন তত সহজে কিন্তু মিটিল না। আব্বাস বিকালের দিকে আসিয়া খবর দিল সালেকের বাবা ও মা দুই জনেই ছুটিয়ারী সরিফে বড় পীরের দরগায় বহু দিনের মানসিক পূজা দিতে কলিকাতায় গিয়াছেন, সেখান হইতে হুগলীতে কোথায় কুটুম্ববাড়ী দুই-এক দিন কাটাইয়া দেশে ফিরিবেন। আর যাহারা বাড়ী আছে তাহারা কোন দায়িত্ব নিতে রাজী নয়।

এবার অপূর্ব্ব বাবুর মুখও বিকট হইয়া উঠিল। সরকারী হাসপাতাল সেই সদরে, এখান হইতে ট্রেণে করিয়া লইয়া যাইতে হয়, নয়ত গো-গাড়ীতে আটাশ মাইল!

কি করা যায় এই লইয়া যখন সকলে গবেষণা করিতেছেন তখন ভূপেনেরই একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, একথা আগেই মনে আসা উচিত ছিল, নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াই এত বড় ভুল হইয়াছে। সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ওর খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে?

সকলে আব্বাসের মুখের দিকে চাহিল। সে মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, এ ক'দিন ত বার্লি আর মুড়িটুড়ি খাচ্ছিল। আজ—

আজ কি?

আজ সকালেও বার্লি নিয়ে গিয়ে রেখেছিলুম বটে কিন্তু সে ক দিয়ে আসা হয়নি। খাবার জলও—

তার মানে কি? ভূপেন প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, ঐ সাংঘাতিক ... বিনা পথ্যে, বিনা জলে একা পড়ে আছে সমস্ত দিন? আর ... নতুন তাতের সময়!

ভবদেব বাবু অপ্রতিভ হইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন, ...াই ত! অপূর্ব্ব বাবু, এটা আপনাদের দেখা উচিত ছিল।

অপূর্ব্ব বাবু আব্বাসকেই ধমক্ দিয়া উঠিলেন। যেন সব দোষ ...াহারই। ভূপেন একটু বিদ্রূপের সুরে কহিল, আপনারা বয়স্ক ...াক ভয়ে মরে যাচ্ছেন—ও ত ছেলেমানুষ, ওর অপরাধ কি! ...চ্ছা, কিছু করতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। আব্বাস, তুই বাড়ী ...লে যা, যত দিন না ও ভাল হয় আমি এ হোষ্টেলেই থাকব।

এই বলিয়া সে আর বাদানুবাদের অবকাশ না রাখিয়াই দ্রুত ...হোষ্টেলের পথ ধরিল। অপূর্ব্ব বাবু পিছন হইতে হাঁকিয়া প্রশ্ন ...রিলেন, আপনার টিকে নেওয়া আছে ত?

তা ত আছেই—ভূপেন চলিতে চলিতেই ঘাড় ঘুরাইয়া উত্তর ...ল—তা ছাড়া জ্বর হলেই সরকারী হাসপাতালে চলে যাবো। ...আপনাদের ভয় নেই।

অপূর্ব্ব বাবু মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন, শুনলেন মাষ্টার মশাই ...থাটা। ওর এই ধরণের ইম্‌পার্টিনেন্স অসহ্য হয়ে উঠেছে।...আমার ...উটি জিগ্যেস করা, তাই—

কাছেই পণ্ডিত মশাই দাঁড়াইয়া ছিলেন, কহিলেন, ভায়ার ...আমার ডিউটি জ্ঞানে এতটুকু ত্রুটি নেই। তবে কি জানো ভাই, ...দের ওটা কাঁচা বয়সের গরম—

ভবদেব বাবু একটা ছোটখাটো দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে ...লিয়া উঠিলেন, রাধে! রাধে!

সালেকদের হোষ্টেলে ঢুকিয়া ভূপেন দেখিল তাহার অনুমানই ...ঠিক—বেচারা জ্বরে ও যন্ত্রণায় প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, ...পিপাসায় জিভ এত শুকাইয়া উঠিয়াছে যে, কথা কওয়া প্রায় অসম্ভব। ...প্রথমেই খানিকটা জল খাওয়াইয়া বার্লিটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল ...ালই আছে। কিন্তু শুধুই বার্লি—না চিনি, না নুণ, লেবু ত ...কল্পনারও অতীত। অগত্যা সে নিজেদের হোষ্টেলে গিয়া রান্নাঘরের ...াহির হইতেই একটু চিনি চাহিয়া লইল এবং চাকরকে দুইটা টাকা ...য়া ষ্টেশনে পাঠাইল, যদি পাতি লেবু ও কমলা বা অন্য কোন ফল ...য়।

তার পর সালেককে বার্লি খাওয়াইয়া সে ছুটিল ডাক্তারের বাড়ী। ...ার সব শুনিয়া একটু হাসিলেন। কহিলেন, এ সব রোগে এখানে ... ডাক্তার ডাকে না, বিশেষ করে মুসলমানরা ত নয়ই। যা ... ঐ শেতলার বামুন।...তা ওকে যে এখনও মাষ্টার মশাইরা ...লে রেখেছেন?

ইচ্ছে করে রাখেননি—দায়ে পড়ে রেখেছেন।

ভূপেন সে কাহিনীটাও খুলিয়া বলিল। ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, ... না আসল বসন্ত বোঝা যাচ্ছে—না, এখন সম্ভব নয়?

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল, না—it's too early।

তবে কালই আমি যাবো। আজ এই ওষুধটা নিয়ে যান।

তিনি একটা ঔষধ নিজেই তৈয়ারী করিয়া দিলেন। আহার্য্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়া আবারও বলিয়া দিলেন, কাল আমি দুপুর নাগাদ যাবো—বুঝলেন। ও ত তাড়াতাড়ি কিছু করবার নেই।

সেখান হইতে হোষ্টেলে ফিরিয়া সালেককে ঔষধ খাওয়াইতে গেলে প্রথমটা সে রীতিমত আপত্তি করিল। এ সব রোগে ডাক্তারী ঔষধ খাওয়াইলে রীতিমত বাড়িয়া যায়—এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা মুসলমান বটে তবু এ সব রোগে শীতলার বামুনকেই তাহারা বরাবর ডাকে। অনেক বুঝাইয়া মৃদু ধমক দিয়া ভূপেন শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ঔষধ খাওয়াইল বটে কিন্তু ভয়টা যে তাহার তবু কাটিল না সেটা বেশ বুঝিতে পারিল। এই প্রসঙ্গে সালেক তাহার বোনের মৃত্যুর কাহিনীটাও শুনাইয়া দিল। মাত্র বৎসর কতক আগে তাহার এক বোনের হাম হইয়াছিল। খুব বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাহার মা নিজে গিয়াছিলেন গ্রামান্তরের এক বসন্ত-চিকিৎসকের বাড়ী। তিনিও শীতলার পূজারী, এই হিসাবে চিকিৎসক। তিনি বিধান দিলেন সওয়া ছয় গণ্ডা লঙ্কা বাটিয়া চুণের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিতে হইবে। বাড়ী ফিরিয়া প্রলেপ দিবার সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করিয়া মেয়েটা মারা গেল—বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে।

এ সব কাহিনী শোনে আর ভূপেন শিহরিয়া ওঠে। অশিক্ষা ও কুসংস্কার দেশের মর্ম্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছে। দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। আট শত বছরের পরাধীনতার ফল এই অবস্থা, ইহার চেয়ে খারাপ হয় নাই বলিয়াই বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে নেতাদের মধ্যে যখন এ বিষয়ে মতবিরোধ হয় তখন তাহারও ঐ প্রশ্নটা মনে জাগে। কোন্‌টা আগে—নিজেদের সংস্কার আগে পরে স্বাধীনতা—না স্বাধীনতা আগে পরে সংস্কার। মনে হয় শেষেরটাই বোধ হয় সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি।...

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। ভূপেনের হাতে কাজ নাই—বইও নাই। সে ইতিমধ্যেই সালেকের বিছানাটা পাল্‌টাইয়া দিয়াছে। ময়লা বিছানাগুলি কাল এখানেই সাবান জলে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া দিতে হইবে। চাকরদের উপর চাপানো যাইবে না—তাহাদের যে ভয় এ সব ফরমাস করিলে হয়ত কাজ ছাড়িয়াই পলায়ন করিবে।...নিজে আব্বাসের বিছানাটাই চলনসই করিয়া লইয়াছে, নিজের বিছানা আনিয়া আবার হাঙ্গামা করিতে ইচ্ছা হইল না। আব্বাসের শয্যার মলিনতা ও দৈন্যে প্রথমটা সঙ্কোচ আসিয়াছিল বটে কিন্তু জোর করিয়া সে মনকে শাসন করিল।

বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সালেক প্রশ্ন করিল, আপনি কখন ফিরবেন মাষ্টার মশাই? (আগে সে মাষ্টার সাহেব বলিত—ভূপেনই বলিয়া সেটা বদলাইয়াছে)

আব্বাস নাই—একা থাকিতে হইবে এই জনমানবহীন পুরীতে, সেই প্রশ্নটাই তাহার মনকে তখন হইতে পীড়া দিতেছে। ভূপেন সেটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় নেই আমি তোমার কাছে থাকব রাত্রে।

রাত্রেও থাকবেন আপনি?

বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় সালেকের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

হ্যাঁ—যত দিন না তুমি সেরে ওঠ, আমি তোমার কাছেই থাকব সালেক। কিন্তু এরা এখনও তোমার বার্লি কল দিয়ে যাচ্ছে

না কেন? আলোতেও বেশী তেল নেই মনে হচ্ছে। তুমি একটু একা থাকতে পারবে? আমি একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

সালেক কহিল, তা পারব, মাষ্টার মশাই। তা ছাড়া আপনি দয়া না করলে ত সারারাতই একা থাকতে হত। আর কেউ আসত না—

হোষ্টেলে গিয়া ভূপেন দেখিল, চাকরটি লেবু, ফল সবই আনিয়াছে, বার্লিও প্রস্তুত কিন্তু সে খবরটা পর্য্যন্ত কেহ দেয় নাই।

চাকরকে প্রশ্ন করিতে সে মাথা চুলকাইয়া কহিল, আজ্ঞে, ওখানে আমরা যেতে পারব না।

আশ্চর্য্য! হাাঁ রে তোদের কি অসুখ-বিসুখ করবে না কখনও। এত ভয় কেন?

চাকরও রুখিয়া উঠিল, মিছিমিছি শাপ-মন্যি দিও না বাবু। মুসলমানের অসুখে অত দায় আমরা নিতে পারব না। তাছাড়া পাল বাবুও বারণ করেছেন—বলেন ছোঁয়াচ লেগে তোর অসুখ করলে, এখানে কাজকর্ম্ম পণ্ড হবে।

পাল-বাবু অর্থাৎ অপূর্ব্ব বাবু। ভূপেন কথাটা বুঝিল। ভবদেব বাবু বাহিরে বসিয়াই মালা জপ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি কহিলেন, না মুসলমান বলে নয়। খাবারটা দিয়ে আসবে তাতে আর কি—তবে জানেন ত ওরা ভীষণ ভয় পায় এসব রোগকে। দরকার হলে আমাদের কাউকেই দিয়ে আসতে হবে—

অত কিছু করতে হবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ভাতটাও কি তা'হলে ওখানে পাঠানো সম্ভব হবে না?

তা আর কি ক'রে হবে বলুন। সেই একই বাধা হয়েছে বুঝলেন না! তা ছাড়া ও হোষ্টেলে আবার এখানকার বাসন পাঠানোর একটা মুস্কিল আছে—

আপনি ত বৈষ্ণব মাষ্টার মশাই! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভূপেন প্রশ্ন করিল।

লজ্জিত হইয়া ভবদেব বাবু বলিলেন. না, না, আমার কথা বলছি না। তবে পাঁচ জনের পাঁচ রকম মত বোঝেন ত—

হারিকেনে তেল ভরিয়া লইয়া ভূপেন ফিরিয়া গেল। ইঁহাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে কিম্বা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে কেমন যেন বিতৃষ্ণা বোধ হইল। মূল হইতে ডগা পর্য্যন্ত সমস্তটাই পচ ধরিয়াছে—কোন একটা অংশের চিকিৎসা করিতে যাওয়াই মূর্খতা!

পরের দিন দুপুরে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গেলেন। অধিকাংশই পান-বসন্ত, তবে দুই-একটি তাহারই মধ্যে আসল বসন্তের গুটিও আছে। বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই এই আশ্বাস এবং আর একটি ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ না থাকিলেও ভূপেনকে দিন-রাত এই রুগীকে লইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। একেবারে একা এই ছেলে-মানুষকে ফেলিয়া তাহার এক পা-ও বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হইত না। ঔষধ-পথ্য-শুশ্রূষা সবই তাহার হাতে। কোন শিক্ষক একবার উঁকি পর্য্যন্ত মারেন না। শুধু সে যখন খাবার ঘণ্টা পড়িলে কিম্বা সালেকের পথ্য লইতে হোষ্টেলে যায় তখন ভবদেব বাবু ও পণ্ডিত মহাশয় দুই-একটি প্রশ্ন করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সমাধান করেন।

চেয়ে যে ব্যাপারটায় ভূপেনের হাসি পাইল, সেটা হইতেছে অপূর্ব্ব বাবুর কাণ্ড দেখিয়া। তিনি সুপারিটেণ্ডেণ্ট—পাছে তাঁহাকে কর্ত্তব্যের খাতিরে কোন খবরাখবর লইতে হয়, খুব সম্ভব সেই কারণেই, বিশেষ জরুরী কাজের অছিলায় বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অবশ্য ইহার জন্য ভূপেনের কোন দুঃখ ছিল না। ঘৃণা বা ভয় তাহারও যথেষ্ট ছিল, আগে হইলে সে-ও বোধ হয় এ সব রোগের ত্রিসীমানায় ঘেঁষিত না—কিন্তু এই কয় বৎসর মোহিত বাবুর সঙ্গে তাহার চরিত্রে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, সে কথা সে যখন ভাবে তখন মনে মনে তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ না করিয়া পারে না।...

সব চেয়ে সে বিব্রত বোধ করে কল্যাণীর ছোট ছোট ভাইগুলির খবর লইতে না পারার জন্য। তিন দিন হইয়া গেল বিজয় বাবুরা গিয়াছেন—কোন চিঠি বা সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই, খুব সম্ভব পরীক্ষা করিতেই দেরী হইতেছে। কিন্তু এদিকে দেখাশুনা করিবার একটা দায়িত্ব সে লইয়াছিল, সেটা ঠিকমত করিতে না পারার জন্য লজ্জা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। অবশ্য ডাক্তার বাবু খবর লন, তাঁহার একটি অল্পবয়সী বিধবা শালীও আছেন—এ ছাড়া সে যতীন বাবুকে রোজই একবার করিয়া খবর লইতে পাঠায়, একরূপ জোর করিয়াই পাঠাইতে হয়—তবু যতীন বাবু শেষ পর্য্যন্ত যান—অন্য কাহাকেও রাজী করাই যায় না। অনেকেরই মনে মনে ভয় যে, যদি বিজয় বাবু একেবারে অন্ধই হইয়া যান ত এখন যাহারা বেশী খবরাখবর লইবেন দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার ভারটাও তাঁহাদের উপরেই আসিয়া পড়িবে। অত হাঙ্গামার প্রয়োজন কি?

অবশেষে পঞ্চম দিনের দিন বিজয় বাবুর বড় ছেলেটির মুখে খবর পাওয়া গেল, কল্যাণী চিঠি দিয়েছে সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে তাহারা আসিয়া পৌঁছিবে। সে দিন সালেকও একটু সুস্থ ছিল, তাহার কাছে কথাটা পাড়িতেই সে সন্ধ্যাটা ঘরে আলো জ্বালা থাকিলে স্বচ্ছন্দে একা থাকিতে পারিবে জানাইল। তখন ভূপেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া যতটা সম্ভব নিজেকে বীজাণুমুক্ত করিয়া বিজয় বাবুর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

সে যখন পৌঁছিল বিজয় বাবু তাহার কিছু পূর্ব্বেই আসিয়াছেন আগেকার মতই শান্ত ভাবে বাহিরের চৌকিটাতে পড়িয়াছিলেন. চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বোধ হয় ঔষধ লাগানই আছে। ভূপেনের পদশব্দে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এস ভায়া, ভূপেন বাবু না?

হাাঁ দাদা, আমি। খবর কি? ভূপেন রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করিল।

বলছি ভাই। সালেকের খবর কি, ভাল আছে একটু? সব শুনলুম আমি ষ্টেশনে নেমেই ছেলের মুখে। তোমারই সার্থক জন্ম ভাই, মানুষের উপকারে লাগলে। তা তাকে একা রেখে এলে যে—অসুবিধা হবে না?

না দাদা, সে সুস্থ আছে একটু। কিন্তু আপনার খবর কি বলুন।

সহজ সংযত কণ্ঠেই বিজয় বাবু উত্তর দিলেন, ডাক্তার ত তিন দিন ধরেই পরীক্ষা করলেন, ওষুধও দিয়েছেন—ডায়েট ঠিক করে দিয়েছেন। সন্ধ্যা-মাও ত আমায় এক গাদা ওষুধ কিনে সঙ্গে

দিলেন, তবে আশা যে আর বিশেষ নেই তা ডাক্তারের কথাতেই বেশ বুঝতে পারা গেল।

এত নিশ্চিন্ত ভাবে কথাটা তিনি বলিলেন, যেন সেটা তাঁহার দুর্ভাগ্যের চরম কথা নয়—সাধারণ একটা সংবাদ মাত্র, তাও অপরের।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন যেন কণ্ঠস্বর খুঁজিয়া পাইল। প্রায় চুপি চুপি কহিল, বলেন কি দাদা? এত sudden—!

কি করবে ভাই—ভগবানের মার। প্রাণশক্তি না কি একেবারেই ছিল না দেহে, তাই একটুও resist করতে পারেনি।

আরও খানিকটা দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর বিজয় বাবুই আবার কথা কহিলেন, মেয়েটা এসেই বোধ হয় ঘরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়েছে—একটু দেখগে ভাই, দুটো কথা বলোগে। ও বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছে—

কল্যাণীর অবস্থা ভূপেন আগেই খানিকটা কল্পনা করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে তাহাকে কী বলিবে—কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে তা তাহার মাথাতেই আসিতেছিল না—তবু উঠিতে হইল। কল্যাণী ঘরের মেঝেতে মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার রোদনের কারণ ঠিক না বুঝিলেও ছোট দুটি ভাই পাশেতে শুষ্ক মুখে বসিয়াছিল, এখন ভূপেনকে আসিতে দেখিয়া তাহারাও কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপেন খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পাশে মাটিতেই বসিয়া পড়িয়া কল্যাণীর পিঠে একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী মুখ তুলিয়া প্রায় রুদ্ধ অথচ আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল, শুনেছেন—বাবা আর কোন দিন বোধ হয় চোখে দেখতে পাবেন না—আর কোন দিন না!

ভূপেন তেমনিই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—এ কথার কী-ই বা উত্তর দিবে। কল্যাণী মুহূর্ত্ত কয়েক যেন একটা কিছু সান্ত্বনার আশাতেই তাহার মুখের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া রহিল, তার পর সেখানে কিছুমাত্র আশ্বাস খুঁজিয়া না পাইয়া তাহার পায়ের উপরই মুখটা গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, কি হবে ভূপেন বাবু আমাদের? বাবাকে, এই ছোট ছোট ভাই-বোনগুলোকে কি করে বাঁচাবো?

ভূপেনের চক্ষুও কান্নার ছোঁয়াচে সজল হইয়া উঠিয়াছিল, তবু সে জোর করিয়া কল্যাণীর মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া জবাব দিল, ভয় কি কল্যাণী, আমি—আমরা ত আছি।

১৬

সালেকের বাপ-মা দেশে পৌঁছিয়া খবর পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন। তত দিনে সালেকও একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং ভূপেন কয়েক দিনের জন্ম তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির করিল। কিন্তু বিপদ্ বাধিল সালেককে লইয়া—সে মাষ্টার মশাইকে ছাড়িয়া বাপ-মায়ের কাছেও যাইতে চায় না। ভূপেন অনেক করিয়া বুঝাইয়া, ধমক দিয়া তবে রাজী করাইল। সে কিছু ফল এবং এক শিশি ঔষধ উহাদের সঙ্গে দিল এবং কোন মতে ঠাণ্ডা না লাগা বা পেটের গোলমাল হইতে পারে, এমন খাদ্য না দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করিয়া দিল।

সালেক গাড়ীতে উঠিয়াও বহুক্ষণ তাহার হাতটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল, শেষে অসহিষ্ণু গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিতে ভূপেন যখন এক রকম জোর করিয়াই হাতটা টানিয়া লইল তখন তাহার হাতের অনেকখানিই সালেকের চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। ইহারা কিশোর, ইহারা অল্পবয়সী—ইহাদের কৃতজ্ঞতা যতটা ভাবপ্রবণ ততটা স্থায়ী নয়, তবু ভূপেনের মনটা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভার হইয়া রহিল। এখানে আসিয়া বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু এই ছেলেগুলির যে প্রীতি সে পাইয়াছে তাহার মূল্য কি কম?

তবু সালেককে বিদায় দিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। এই কয় দিনে সে দেহে ও মনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর বিজয় বাবুর চিন্তা অহরহ তাহার মস্তিষ্ক পীড়িত করিতেছিল। সে কল্যাণীকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, তাহারাও একান্ত নির্ভরে ভূপেনেরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে—কিন্তু কী-ই বা সে করিতে পারে? স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, অসুস্থতার অজুহাতে আরও দুই মাস তাঁহারা পুরা বেতনে ছুটি দিবেন, তাহার পর দুই মাস অর্দ্ধ বেতন—এর চেয়ে বেশী কিছু তাঁহারা করিতে পারেন না। স্কুলের যা আর্থিক অবস্থা তাহাতে আর কিছু করা সম্ভবও নয়। অর্থাৎ কায়ক্লেশে মাস চারেক কাটিতে পারে—কিন্তু তাহার পর?

হয়ত সম্পাদক বলিলে কিছু কিছু মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু সে ত ভিক্ষা। তা ছাড়া সে-ই বা কতটা চাওয়া যায়? যতটা পাওয়া যাইবে তাহাতে কতটা চলিবে তারও কিছু ঠিক নাই। এবং সে সাহায্য চাহিবার কোন অধিকারও ভূপেনের আছে কি না—সে সন্দেহও বার বার ভূপেনের মনে জাগিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিন কল্যাণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, একবার শুনুন?

ভূপেন বারান্দার এক ধারে গিয়া দাঁড়াইতে সে বিনা ভূমিকায় বলিল, গদাধরপুর প্রাইমারী ইস্কুলে না কি এক জন মাষ্টারের চাকরী খালি আছে, মাইনে অবশ্য বেশী নয় কিন্তু তাদের তেম্‌নি পাশ-টাস করারও অত দরকার নেই ...আমাদের, রাখুকে দিলে কি হয়?... আপনি একটু তদ্বির করলে হয়ত হয়ে যেতে পারে।

রাখু কল্যাণীর পরেই যে ভাই—ছেলেদের মধ্যে সে-ই বড়। বছর পনেরো-ষোল বয়স, সবে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছে।

বিস্মিত হইয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, রাখু!...কিন্তু ও ত নিজেই ছেলেমানুষ!...তাছাড়া সে মাইনেই বা আর কত পাবে?

নতমুখে কল্যাণী উত্তর দিল, শুনেছি টাকা দশেক। কিছুই নয় অবিশ্যি কিন্তু উপোষ ক'রে মরার চেয়ে ত ভাল।

একটু যেন আহত কণ্ঠেই ভূপেন বলিল, উপোষ ক'রে ত মরতে হয়নি এখনও—এরই মধ্যে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু ভাবতেই সময় দাও না।

কল্যাণী খুন্তিটা লইয়া মুহূর্ত্ত কয়েক নাড়া-চাড়া করিয়া বলিল, আপনি যখন আছেন তখন যা-হয় একটা উপায় হবেই জানি কিন্তু সেটা ত আপনার ওপরই পীড়ন করা হবে। হয় নিজের পকেট থেকে দিতে হবে নয় ত আপনাকে ভিক্ষে ক'রে আনতে হবে।... তা ছাড়া সে-ত রইলই—যদি কিছুও আনতে পারে রাখু, ক্ষতি কি? যতটা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে ততটাই ভাল নয় কি?

ভূপেন কহিল, ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা ত পায়ে ভর দিয়ে চলা নয় কল্যাণী, ওটা খুঁড়িয়েই চলা। আর ওতে চিরকাল

অমনি খুঁড়িয়েই চলতে হবে।···বরং কোন মতে যদি ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারে ত বহু দোরই খোলা থাকবে ওর সামনে।··· আচ্ছা, দেখি—

সে আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই চলিয়া আসিল। কল্যাণী সম্পূর্ণ ভাবে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না। এ কথাটা কাঁটার মতই বহুক্ষণ ধরিয়া খচ খচ করিতে লাগিল। তবে এ কথাটাও মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, জোর করিয়া আশ্বাস দেয় সে কল্যাণীকে—আমি তোমাদের সমস্ত ভার লইলাম এমন সাহসও তাহার নাই। তাহার ক্ষমতা কতটুকু, সে কথা তাহার চেয়ে বেশী আর কে জানে!

সুতরাং দিন-দুই পরে এক দিন তাহাকে গদাধরপুর যাত্রা করিতে হইল। কোন্ পথ, কোথা দিয়া যাইতে হয়—কত দূর, কিছুই ধারণা ছিল না। কোন মতে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া পৌঁছিল। এই গ্রামে সালেকদের বাড়ী, অনেক দিন আগে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে-ই পথটা দেখাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং মোটামুটি কোন্ দিকে গ্রামটা সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহার ছিলই।

সে স্কুলের ছুটির একটু আগেই বাহির হইয়াছিল, তবু সেখানে পৌঁছিতে তাহার অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিল। ছোট গ্রাম, কয়েক ঘর মাত্র লোক, তাহার মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুবই কম। যে কয় জন লোক আছে তাহারাও এখানকার অন্য গ্রামের অধিবাসীদের মতই অর্দ্ধমৃত—দারিদ্র্যে, অনাহারে, ম্যালেরিয়ায় ও অশিক্ষায় একেবারে পুরাপুরি পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী। প্রশ্ন করিলে তাকাইয়া থাকে, কথা বুঝিতে দেরি হয়। মনে হয় বুঝি উত্তর দিবার মত দৈহিক শক্তিও আর তাহাদের অবশিষ্ট নাই।

ভূপেন গ্রামে প্রবেশ করিতে এখানকার সব গ্রামের মতই উলঙ্গ, কৃষ্ণকায়, শীর্ণ ছেলেমেয়ের দল ঘিরিয়া দাঁড়াইল, দুই-এক জন যথারীতি 'আপনার নিবাস কোথায়?' তা-ও প্রশ্ন করিল কিন্তু পাঠশালাটা যে কোন্ দিকে সে উত্তরটা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিতে ভূপেনকে রীতিমত বেগ পাইতে হইল। অনেক বকাবকির পর তাহার প্রশ্নটা বুঝিতে পারিয়া একটি ছোকরা যখন 'মশাই' বা পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীটা দেখাইয়া দিল তখন সন্ধ্যার আর খুব বেশী দেরি নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত মশাই বাড়ীতেই ছিলেন। বাহিরে আসিয়া পরিচয় পাইতেই বিশেষ সমারোহ করিয়া বসাইলেন। এমন কি অনেক চেষ্টা ও তদ্বিরের পর রসগোল্লা খাস বালুসাহীর সঙ্গে এক কাপ চা-ও আসিয়া পৌঁছিল।

জলযোগ ও কুশল-বিনিময়ের পর ভূপেন সরাসরি কাজের কথাই পাড়িল। কথাটা শুনিয়া পণ্ডিত মশাই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বিজয় বাবুকে আমি ভাল করেই চিনি বাবু, অমন মানুষ হয় না। তাঁর ছেলেকে আমি কাজ দেব এতে আর কোন কথাই চলে না। তার বিপদের কথাও শুনেছি সব—এ অঞ্চলে বেরিবেরি হয়ে বহু লোকেরই চোখ গেছে বাবু, তবে অমন চোখ যেতে শুনিনি আর কখনো। হবে কি বাবু, তেলে যে কি ভেজাল না দিচ্ছে তা বলতে পারি না। সের-করা এক-পো নির্ভেজাল থাকে না। কি করব, ঐ আমাদের খেতে হবে—উপায় কি! যাক্—যা বলছিলুম, ওর ছেলের কাজের কথা—মাইনে ত বাবু সাতটি টাকার বেশী আমি দিতে পারব না। তাতে কি ওদের পোষাবে? এই দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে যাওয়া আর আসা।

সাত টাকা? ভূপেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, মোটে সাত টাকা?

লজ্জিত মুখে পণ্ডিত মশাই উত্তর দিলেন, তার বেশী আর কোথা থেকে দেব বলুন। সরকারী গ্র্যাণ্ট পাই মোটে কুড়িটি টাকা। মাইনে ওঠে কোন মাসে দশ, কোন মাসে বারো—যে মাসে খুব বেশী ওঠে, পনেরো টাকা। আট আনা আর চার আনা মাইনে, তা অর্দ্ধেক ছেলেই দিতে পারে না। এখানে কি ইস্কুল চলে? চলে না। আমাদের উপায় নেই বলেই জোর করে চালানো। আমি নিই পনেরো টাকা—আমার ভাইকে দিই দশ। তার কমে আমাদের সংসার চলে না। বাকী কি থাকে আর কি দেবো বলুন দিকি। অথচ আর একটা মাষ্টার না রাখলে ইনস্পেকটার বকাবকি করে। কে আসবে ঐ মাইনেতে?···আমাদেরই কি পোষায়? কলাটা মুলোটা আদায় হয় মধ্যে মধ্যে—কেউ বা লাউ এনে দেয়, কেউ বা সুয্যি কুমড়ো। আর আয়ের মধ্যে ক'খানা বই বিক্রী হয় বছরের গোড়াতে, তাই বা ক'টা ছেলে বই কিনতে পারে, যা-ও কেনে তাও ধার। সম্বচ্ছর ধরে বইয়ের দাম আদায় দিতে হয়।

ভূপেন প্রশ্ন করিল, আপনারাই বই বেচেন?

বেচি বৈ কি। নইলে চলবে কি করে? ঐ সিজন-এর মুখে বই-ওয়ালারা আসে, যার বই বেশী কমিশন তার বই-ই খানকতক নিয়ে রাখি—সেই বই-ই পড়াই। পেটের দায়ে সবই করতে হয় বাবু, খারাপ বই পড়াতে অসুবিধা হয়, তবু বেশী কমিশন পাই বলে তাই ইস্কুলে ধরাই। নইলে চলবে কেন?

খারাপ বই জেনেও ধরান?

কি করব বলুন? এ ত আপনাদের হাই স্কুল নয়—এখানে ঐ কমিশনের ওপরই বই চলে। কেউ হয়ত পঁচিশ টাকা শতকরা কমিশন দেবে বললে, তার বই রাখলুম খানকতক—আর এক জন ত্রিশ টাকা কি তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা বললে—এর বইটা চালালুম, ওর বই ফেরৎ দিলুম। তবে বই দু-একখানা ক'রে চেয়ে-চিন্তে সকলের কাছ থেকেই আদায় করে রাখি। সেই বই-ই প্রাইজে চালাই। প্রাইজ খাতে খরচ দেখাতে হবে ত? টাকা পাবো কোথায়—ঐ সব চকচকে পাঠ্যপুস্তকই চালিয়ে দিই। ঐটেই একটা খরিদ দেখানো হয়। উপায় কি বাবু?

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, সে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, কিন্তু এতে ত ছেলে-পিলেদের পড়ার ক্ষতি হয়?

কিছু না, কিছু না! ওদের কি কারো লেখাপড়া হবে ভেবেছেন? কারো না, ও শুধু শুধুই পণ্ডশ্রম। আর এরা পড়বেই না কি কেউ এর পরে? ঐ যা হ'ল হ'ল, তার পর ত বাড়ী বসে ম্যালেরিয়ায় ভুগবে আর যাদের জমি আছে তারা চাষ করবে।···আপনিই যেমন বাবু, ওদের পেছনে খেটে লাভ কি? পড়াশুনো হয় সহর বাজারের ছেলেদের—তারাই পাশ-টাস করে—চাকরী-বাকরী তাদের হয়। এরা কি চাকরী করতে যাবে?···দিচ্ছেই বা কে এদের চাকরী বলুন—বেশী পড়ে লাভ কি?

তবু ভূপেন হাল ছাড়িল না—মৃদু প্রতিবাদের সুরে কহিল, কিন্তু চাকরীটাই ত আর লেখাপড়া শেখার প্রধান উদ্দেশ্য নয়—

তা ছাড়া আর কি বলুন। পণ্ডিত মশাই প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কেউ না হয় কেরানী হ'ল—কেউ বা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, যা ই বলুন না কেন চাকরী ত? ডাক্তার উকীল আর কটা হচ্ছে, তা ছাড়া লেখাপড়া একটা ভাগ্যের কথা, যাদের হবার ঠিক হয়। এই ত কত বড়লোকের ছেলে দেখছি—বাপ-মা কত চেষ্টা করে, কত পয়সা খরচ করে কিছু হয় না। আবার রাঁধুনী বামুনের ছেলে বিদ্যেসাগর হয়। তা ছাড়া বই কি আর এমন কিছু ইতর-বিশেষ হ'তে পারে, গুণ-ভাগ সব অঙ্কের বইতেই আছে, বোঝেন না?

তার পর একটু থামিয়া কহিলেন, তা ছাড়া ভাল বই কি আর পাস হয় বাবু। এক দফা সরকার বই পাস করে দিলে ইস্কুলের জন্য, আবার এক দফা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থেকে পাস করাতে হয়। আমাদের প্রাইমারী বইতে ঝঞ্ঝাট কত।...সে ঐ মিটিংএর সময় যে কেরাণী বাবুকে আর মেম্বারদের ঘুষ দিতে পারবে তারই বই পাস হবে। এ বছর আমাদের জেলায় একখানা মোটে ব্যাকরণ পাস হ'ল, বলুন কি বাবু আড়াই শ'র ওপর ভুল বইটায়। শুনলুম ঐ বইয়ের যে প্রকাশক সে না কি চেয়ারম্যানের বৌকে আর্মলেট গড়িয়ে দিয়েছে!

ইহার পর আর ভূপেনের বেশী শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। সে দুই একটা কথা কহিয়াই উঠিয়া পড়িতে গেল কিন্তু পণ্ডিত মশাই বিনয় করিয়া কহিলেন, বাবু চললেন কিন্তু আমার একটা ভিক্ষা আছে।

কি ব্যাপার? ভূপেন যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার কাছে আবার কি ভিক্ষা?

পণ্ডিত মশাই মাথাটা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, অনেক দিন ধ'রেই ভাবছি ওপরওলাদের কাছে আর কিছু গ্র্যাণ্ট বাড়াবার জন্য দরখাস্ত করব তা লেখাবার লোকের অভাবে হয়ে উঠছে না। আজ যখন ভগবান আপনাকে এনে দিয়েছেন তখন আর ছাড়ছি না। হাজার হোক্ আপনারা হাই ইস্কুলের মাষ্টার, গ্রাজুয়েট নিশ্চয়ই—আপনারা লিখে দিলে নিশ্চয়ই গ্র্যাণ্ট বাড়বে। আর যদি পাঁচটা টাকাও বাড়ে তাহলে আমি বিজয় বাবুর ছেলেটাকে দশ টাকা মাইনে দিতে পারি। ওকে নিলে অবিশ্যি আমার লোকসান নেই, এখানে ত পড়াশুনোর তেমন চাপ নেই—চাই কি দুপুরের দিকে আমার কয়লার দোকানের খাতাটা ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারি—

আপনার আবার কয়লার দোকান আছে না কি?

সবিনয় হাস্যে পণ্ডিত মশাই জবাব দিলেন, সম্প্রতি করেছি সেই ইষ্টিশানের ধারে। ছোট দোকান—এখানে ক'টা লোকই বা কয়লা পোড়ায়। তবু বলি যা কিছু আসে, দুটো পয়সাই বা দেয় কে? তবে বলতে নেই কয়লা লক্ষ্মী। ঐ আপনি যে ইস্কুলে মাষ্টারী করছেন, ভবদেব বাবুর আগে ওখানে হেড মাষ্টার ছিলেন বঙ্কিম বাবু—আগে ভদ্রলোক সদর বাজারে কয়লার দোকান দিলেন, তার পর বইয়ের দোকান, সব শেষ—কাপড়ের। তিনটে দোকানই চলছে এখনও, ছেলে ভাইপো ভায়ে—সকলকারই ভাত-কাপড় হচ্ছে ঐ দোকান থেকে। তা ছাড়া জোর কত। দোকানগুলো চালু হওয়ায় ইদানীং প্রায়ই ওঁর কামাই হত। তাইতে বুঝি সেক্রেটারী এক দিন কি বলেছিল—দিলেন এক কথায় চাকরী ছেড়ে। আমাদের অবিশ্যি সে বরাত নয়, তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! সত্যি কথা বলতে কি বাবু, এ গরু চরানো আর ভাল লাগে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিত মশাই ঘরের মধ্য হইতে কাগজ কলম আনিয়া দিলেন। কোন মতে একটা দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া ভূপেন যখন উঠিয়া পড়িতেছে, তখন পণ্ডিত মশাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তাই ত, এ ধারে সন্ধ্যাও ত উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আপনি কি এতটা পথ চিনে যেতে পারবেন? তার চেয়ে আজ গরীবের ঘরে যা হোক দুটো শাক-ভাত খেয়ে কাটিয়ে গেলে হ'ত না রাতটা?

দৃঢ় কণ্ঠেই ভূপেন কহিল, না, আজ আমাকে ফিরতেই হবে। এখানে আমাদের এক ছাত্র আছে সালেক বলে, গফুর সেখের ছেলে, তার সঙ্গে দেখা করলে সে-ই আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারবে।

ও, গফুর সেখের বাড়ী, সে এখানে নয় প্রায় আধ ক্রোশ তফাৎ আরও, রায়না গ্রাম। তবে রাস্তা এই সিধে—মাঠের ওপর দিয়ে বেশী ঘোর-প্যাঁচ নেই। অন্ধকার রাত এই যা—

আমার কাছে টর্চ্চ আছে—

এই বলিয়া ভূপেন আর কথাবার্ত্তার সুযোগ না দিয়াই বাহিরে আসিয়া পড়িল। কঠিন ডাঙ্গার উপর দিয়া শীর্ণ পায়ে-হাঁটা পথ, ভুল হইবার কোন কারণ নাই। সে দ্রুত হাঁটিতে সুরু করিল।

সালেক প্রথমটা কানকে যেন বিশ্বাস করিতে পারে নাই—পরে যখন সন্দেহের অবকাশ রহিল না, তখন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তার পর কোথায় তাহাকে বসিতে দিবে—কি পাতিয়া দিবে, কিছু যেন সে ভাবিয়া পায় না, একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। গফুর ও তাহার স্ত্রীও ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিলেন, ভূপেন তাঁহাদের ছেলের ঐ সাংঘাতিক অসুখের সময় যা করিয়াছে—যে অসুখে লোকে ছায়া মাড়ায় না, সেই অসুখে নিজের প্রাণের ভয় না করিয়া সে যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছে—তাহার কৃতজ্ঞতা মুখে প্রকাশ করিবার যেন তাহাদের ভাষা নাই। স্বামী ও স্ত্রী, দুজনেই সে কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এমনি প্রথম খানিকটা আলাপ সম্ভাষণের পর ভূপেন ফিরিবার প্রস্তাব করিতেই সকলে লাফাইয়া উঠিলেন। গফুর কহিলেন, পথ বলে দেবার জন্য কিছু নয় বাবু মশাই। সে আপনি যদি নিতান্তই যেতে চান তাহলে আমি যেমন করেই হোক্—পৌঁছে দিয়ে আসব কিন্তু এখনই ত প্রায় এক পহর রাত হয়ে গেল—কখন্ই বা পৌঁছবেন ওখানে? তাছাড়া আমাদের ঘরে যখন পায়ের ধুলো পড়লই—একটা রাতও কি সেবা করতে পারব না? আজকের রাতটা থেকেই যান না বাবু, কি আর ক্ষতি হবে?...আমাদের এখানে থাকতে কি ঘেন্না ক'রে?

ছি ছি, কি বলেন গফুর মিয়া! ভূপেন লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল।

তবে থেকে যান মাষ্টার মশাই!

সালেক ছল-ছল চোখে অনুরোধ করিল।

তখন রাতও হইয়াছে অনেকটা, ভূপেনের অনভ্যস্ত পা একটানা এতটা হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর এখানে এই ঐকান্তিক মিনতি সবটা জড়াইয়া ভূপেন যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল। ঠিক থাকিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কহিল, আচ্ছা, তাই হবে।

কিন্তু গফুর মিঞা যখন প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা আয়োজন করিয়া দিবেন ভূপেনকে রাঁধিয়া লইতে হইবে এবং রান্না ও খাওয়ার জলটাও কুয়া হইতে তাহাকেই তুলিতে হইবে তখন সে রীতিমত বাঁকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তাহ'লে কিন্তু আমি এখনই চলে যাবো। আমি সে রকম ভাবলে আসতুম না—থাকা ত দূরের কথা।···আপনারা যা খাবেন আমিও তাই খাবো। আপনারা যত্ন করে যা রেঁধে দেবেন তা কি অখাদ্য?

কথাটা সালেক বুঝিল কিন্তু গফুর রীতিমত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এক দিনের জন্য হিন্দু ভদ্রলোককে তাঁহাদের রান্না খাওয়াইতে কিছুতেই মন উঠিল না তাঁহার। শেষ পর্যন্ত আহার্য্য যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন দেখা গেল যে ভূপেনের জাত বাঁচাইবার জন্য তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, ঘন দুধ, খই, কলা এবং মোণ্ডার ব্যবস্থা হইয়াছে। রীতিমত ফলারের আয়োজন। শুধু তাই নয়, পাড়ার একটি হিন্দু ছেলে আসিয়া পানের জল তুলিয়া দিয়া গেল। ভূপেন তখন অত্যন্ত শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচে, সে আর প্রতিবাদ করিল না, কোন মতে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু সব চেয়ে তাহার হাসি পাইল যখন সে শুইয়া পড়িতে সালেক আসিয়া পদসেবা করিতে বসিল। সে পা-টা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ঈষৎ তিরস্কারের ভঙ্গীতে কহিল, ও কি সালেক, ছিঃ!

সালেক তাহার পা-দুটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না স্যার, আজ আমি কোন কথা শুনব না। আজ আমার কত ভাগ্য আপনি আমার বাড়ী এসেছেন—এ দিন কি আর পাবো!

তাহার মনের আবেগ বুঝিতে পারিয়া ভূপেন আর বাধা দিল না। শুধু বলিল, পা টিপতে হবে না, যদি দিতেই হয় ত এমনি হাত বুলিয়ে দাও।

তার পর দুটা একটা কথা কহিতে কহিতেই সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সালেক কতক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি বসিয়া বসিয়া তাহার সেবা করিয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই। ঘুম যখন ভাঙিল তখন দেখিল তাহার পায়ের কাছে, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিসর স্থানের মধ্যেই সালেক তাহার পা-দুটা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইতেছে।

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার এই সহজ এবং সুন্দর প্রকাশ দেখিয়া সে সন্ধ্যাকেই স্মরণ করিল, মনে মনে বলিল, যত গ্লানি, যত কষ্টই থাক্ তবু জীবিকা-উপার্জ্জনের এই পথই আমার ভাল। তোমাকে ধন্যবাদ সন্ধ্যা, এই পথ তুমিই দেখিয়ে দিয়েছ। [ক্রমশঃ।

★

শেষ অধ্যায়

শ্রীমধু বর্মণ

সভ্যতা কি থেমে যাবে এখানেই,
বদ্ধতার ঘোলা জলে
মানুষের ইতিহাস
শেষ হবে সুরু না হতেই!

হাজারো বছর ধরে
সংঘাতের আঁকাবাঁকা পথে
যে সংস্কৃতি যুগে যুগে নব রূপান্তরে
এগিয়েছে দীপ্ততর নতুন অধ্যায়ে,
পূর্ণতার প্রারম্ভেই সে কি থেমে যাবে?
সভ্যতা কি ঘুরপাক খাবে
চক্রাকারে পুরোনো পথেই!

অনেক বছর ধরে
শাসনের হাজারো প্রাচীরে
বাধা পেয়ে,
প্রতিহত হয়ে বারে বারে
মানুষের যে বেদনা
মরে গেছে ভাষাহীন,
রেখে কি যায়নি তারা চেতনার বীজ
অজ্ঞতার কুপানো মাটিতে?
বিপ্লবের যাত্রাপথ
এতোটুকু হয়নি প্রশস্ত
বিশ্বজোড়া হাজারো মৃত্যুতে?

যুগে যুগে
মানুষের মুক্তির সংগ্রাম শেষ হবে,
থেমে যাবে বারে বারে
আপোষের বাঁধা সড়কেই?
অনেকের অনেক রক্তেও
"মুক্তি কি যাবে না কেনা—"
পৃথিবী কি সবার হবে না?
মানুষের অবাধ জীবন আজো মিথ্যা
আজো শুধু রবে কল্পনাই!

একান্ত বিশ্বাস নিয়ে নতুন দিনের,
চোখ রেখে ভবিষ্যের উজ্জ্বলতা পানে
অমুর্ব্বর যুগ-সন্ধিক্ষণে
আজো তাই, তৈরী করে যাই
বিপ্লবের একেকটি সোপান
নিজেদের বন্ধ্যা মৃত্যু দিয়ে।

যোগসিদ্ধি

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

নবম পরিচ্ছেদ

সিদ্ধির সপ্তভূমি

পৃথিবীতে মানব-প্রকৃতির রকমারির অন্ত নাই, কোন দুইটি মানুষই এক রকম নয়। জগতে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মগ্রহণ করছে; তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখাকৃতি, নাকমুখ চোখের গঠন যেমন এক রকম নয়, তাদের প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব তেমনি স্বতন্ত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সদৃশ মুখাবয়ব মানুষ পাই বটে, তাই দেখেই আমরা বলি অমুক দেখতে অমুকের মত, কিন্তু সে সৌসাদৃশ্য আংশিক, সে সব ক্ষেত্রে সদৃশ মানুষদের প্রকৃতির মাত্র কিছু কিছু মিল পরস্পরের সঙ্গে থাকে। মানুষের স্বভাব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন ও ভঙ্গী পৃথক্ বলে মানুষের ঊর্দ্ধগতির পথ—তার বিকাশের ধারাও তাই স্বতন্ত্র ও অভূতপূর্ব্ব। একটা বাঁধা ধরা mechanical পথে পুঁথিপত্র দেখে সাধনা করা এই জন্য ঠিক নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাতে শুধু দীর্ঘকাল ধরে পণ্ডশ্রমই হয়, সাধনার বহিরঙ্গ ভাবনৈতিক কসরৎই সার হয়, দীর্ঘকালের প্রযত্নের অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত ফললাভ ঘটে না। অবশ্য কোন দীপ্তশিখা পূর্ণ জ্ঞানী সিদ্ধ যোগী যদি হাত ধরে কাউকে বাঁধাধরা ক্রিয়া-যোগের পথে নিয়ে চলেন, তা হ'লে বুঝতে হবে, এত বড় সহায় পাওয়ায় সেই পথই তার পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ, কারণ সে সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন যোগী পুরুষ সাধনার্থীর প্রকৃতি ও স্বভাব বুঝেই তাকে ও পথে প্রেরণা দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের বিশিষ্ট পথ আছে—বিকাশের অনুকূল ধারা আছে, সে পথ যখন সেই সাধকের অনুভূতির মধ্যে জাগে তখন তার আর চিনতে ও বুঝতে বাকি থাকে না যে, এইটিই আমার অভীষ্টলাভের সহজ ও সুগম পথ; প্রথম থেকেই সে পথে চলেও সুখ—যেন কত দিনের আমার চেনা রাস্তা, আর সে পথে গতি এবং উন্নতিও হয় অবাধ ও নিরঙ্কুশ। পথটি যেন মানুষটিকে পেয়ে বসে, তার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার শিখা ধরে টেনে নিয়ে চলে, অনেক ক্ষেত্রে সে আপনি জানা পথে না চললে—সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্রোতকে বাধা দিলে নানা অনর্থ ঘটে, সাধকের অশান্তির ও পীড়াদির কারণ হয়। ভুলপথে যাত্রার ফলেই যোগের ক্ষেত্রে এত পাগল, রোগী ও ব্যর্থ জীবনের সৃষ্টি হয়।

বহু বিচিত্র এবং বিভিন্ন হলেও তবু মানুষের সাধনার বিকাশের একটা সাধারণ ক্রমও আছে যা মোটের উপর সকলেরই ক্ষেত্রে এক। সেই গুলিই হচ্ছে ধাপ বা পৈঠা (steps), চেতনার সেই ধাপগুলি বেয়ে মানুষ স্থুল চেতনা থেকে ক্রমশঃ ওঠে সূক্ষ্মে এবং সেখান থেকে সূক্ষ্মতর চেতনায়—সিদ্ধির কল্পলোকে। শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতির এই বিকাশকে বলছেন heightening of consciousness—চেতনাকে তার স্থুল স্পন্দন থেকে সূক্ষ্মে প্রবল স্পন্দনে তার intensityতে নিয়ে যাওয়া—জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে, মন থেকে অতি মানসে, তোমার আমার অর্দ্ধ-পশু অর্দ্ধ-মানবী এই অপূর্ব্ব বিকাশ থেকে আমাদের সত্তাকে পূর্ণ মানবত্বের মধ্যে দিয়ে তার অন্তর্নিহিত দেবসত্তায় বিকশিত করে চলা।

এই অভিব্যক্তি হবে সমগ্র মানুষটির বিকাশ নিয়ে তার আংশিক বিকাশে নয়—শুধু মনের বা প্রাণের শুদ্ধি ও রূপান্তরে নয়, তার মন বুদ্ধি প্রাণ ও দেহ সব কিছুকে দীপ্ত ব্যাপক পূর্ণতায় ফুটিয়ে তুলে। এই অভিব্যক্তির ফলে মানুষের জড় সঙ্কীর্ণ মন বুদ্ধি গলে সূক্ষ্ম হয়ে লাভ করবে "Spiritual height, wideness, depth, subtlety, plasticity, integral capacity of the being"—তার চেতনার পারমার্থিক ব্যাপ্তি, উত্তুঙ্গ গতি, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা ও সমগ্রতার পূর্ণাঙ্গ সামর্থ্য। এই বহুমুখী গতি ও প্রকাশের পথে বাধা হচ্ছে মাটি—আমাদের প্রকৃতির জড়তা বা ক্ষিতিধর্ম্ম। "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"—তোমাকে আমাকে কাটাতে হবে এই মাটির মায়া, তার এই নিরেট অটল মৃত অপরিবর্ত্তনীয়তা। দেহকে "আমি" বলে স্বীকার করে অবাধ সূক্ষ্ম সর্ব্বগ সর্ব্বময় আত্মবস্তু হয়ে পড়েছে নিরেট জড়, তার নিজের অনন্ত রূপায়ণের সামর্থ্য ও নমনীয়তা হারিয়ে সে পেয়েছে মাটির ধর্ম্ম, তার অজ্ঞান, তার কঠিন করে দেওয়া গঠন। আকাশের দেশকালের পরপারের অচিন্ত্য সূক্ষ্ম বস্তু এখন মাটির শিশু হয়ে আমরা ঘর বেঁধেছি মাটির বোঝ গড়ে, তাই মাটি আমাদের পেয়ে বসেছে! কচ্ছপ একটা শক্ত হাড়ের খোল গড়ে তার মধ্যে বাস করে, সেই তার ঘর ও আবরণ এবং আশ্রয়কে পিঠে করে গুটিগুটি পিঠে সে চলে। সেই ভারী খোলে গোলাটি দেয় তার দ্রুত গমনে বাধা। দেহও আমাদের তেমনি খোল, আশ্রয়, আবরণ। দেহের ক্ষিতিধর্ম্ম পেয়ে বসেছে আমাদের মনকে, প্রাণকে, বুদ্ধিকে; এই দেহের সঙ্গে একাত্ম আমরা এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুর্ব্বল রুগ্ন দেহের সঙ্গেই মরি বাঁচি, দেহের সঙ্গে সঙ্গে রুগ্ন হই, শ্রান্ত হই, শীতার্ত্ত হই, ঘর্ম্মাক্ত হই, ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর হই, আমাদের স্বপ্রভ ভাস্বর জ্ঞান হারিয়ে মূক ও মূঢ় হয়ে থাকি। দেহের চোখে দেখতে গিয়ে দেহের কানে শুনতে গিয়ে জড় ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে দেখতে বা শুনতে পাই না; শব্দবোধ, রূপবোধ, রসবোধ, ঘ্রাণবোধের সীমা বা নাগাল আমাদের এই একান্তই সীমাবদ্ধ। জড় দেওয়াল ভেদ করবার, আকাশে চলবার, মানস কল্পনার সঙ্গে মুহূর্ত্তে লক্ষ যোজন যাবার সে সর্ব্বগ গতি, আমরা ফেলেছি হারিয়ে! মনের চেয়েও আমরা পঙ্গু!

কেন এ সীমা, কেন এ বন্ধন, এ limitation? কারণ মাটির সঙ্গে একান্ত একাত্ম হতে গিয়ে আমাদের মন বুদ্ধি গেছে মাটির ধর্ম্মে রঙে, সেই রঞ্জিত পরাশ্রয়ী physical mind বা জড় মনের নাই নমনীয়তা, প্রসার গুণ; আলস্যের সংস্কারে সে আবদ্ধ। যোগশক্তি দেয় এই জড় মন বুদ্ধির সংস্কার পাশ থেকে মুক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন Death is a bad habit—মৃত্যু তোমার এক বদ অভ্যাস, তোমার অন্ধ সংস্কারের খেলা। দেহগত আমির বাঁধন কাটতে হবে, অহংগ্রন্থি শিথিল করে চেতন ভাস্বর সর্ব্বগ সর্ব্বময় সেই নিজের স্বরূপের বহুমুখী রূপায়ণের সামর্থ্যে আমাদের যেতে হবে ফিরে। ক্রম-সঙ্কুচিত জড়াকার চেতনার এই ক্রমবিকাশ—কুণ্ডলিত মহানাগের এই বিস্তৃতি—এই অহংগ্রন্থি ভেদই যোগসাধনা।

কি করে এই স্বরূপ লাভ হবে, দেহের ও তদ্গত মন বুদ্ধি প্রাণের অষ্ট পাশ কেটে কি করে আমরা ফিরে যাব দেশ-কাল-নিরবচ্ছিন্ন পরম সত্তায়? আমরা সজ্ঞানে চেষ্টা করি আর না করি এই বন্ধন মোচনের বা অহং বিনাশের কাজ চলেছে অবিরাম গতিতে; কারণ, জীবনই যোগ, জীবন-জলের সঞ্চিত বেগ আপন স্রোতোবেগে আপন ক্রমবর্দ্ধিত চাপে ক্ষইয়ে আনছে আমিত্বের বাঁধের তলদেশ, একদিন বাঁ-

মহাসিন্ধু সে ভঙ্গুর বাঁধ ঠেলে এসে একাকার করে দেবে মহাপ্লাবনে এই আমিত্বের ক্ষুদ্র জলাশয়, বাহির ও ভিতর হয়ে যাবে অনন্ত বিস্তারে একাকার।

শ্রীঅরবিন্দের মতে অপরাশক্তির খেলা এই বাসনাত্মক জীবন হচ্ছে প্রাইমারী স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা। অতএব এই রূপ গ্রহণ নিরর্থক নয়; এই নিরেট কঠিন করে গড়া মানবাধার—এর অন্তরস্থ মন প্রাণ চিত্ত ও দেহাদির বিকাশ হতে হতে ক্রমে পূর্ণত্ব পেয়ে এই মানবাধারই গজিয়ে ওঠে তার দেবত্বে; মনের বৃদ্ধিতে ক্রমে মনের সীমা যায় বিস্তৃত হতে হতে মুছে, প্রাণ মন দেহ হতে থাকে বিশাল থেকে বিশালতর; সঙ্কীর্ণ আমির কেন্দ্র ছাড়িয়ে গ্রাস করতে থাকে বিশ্বকে—আপনাকে বিরাটে দিয়ে দিয়ে—মেলে মেলে। তখন স্বতঃই তার জাগে আপন ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করবার ইচ্ছা, আপন গণ্ডীতে সঙ্কীর্ণ পিঁজরায় তার আর স্বস্তি থাকে না, সে চায় বিস্তীর্ণ মহাকাশে ছাড়া পেতে, অখণ্ড নভোমণ্ডলকে বুক পেতে নিতে ও তার মাঝে ডানা মেলে সন্তরণ করতে। তখন স্বল্প ভোগে, স্বল্প আনন্দে, স্বল্প শক্তিতে ও জ্ঞানে তার আর পেট ভরে না; তখনই হয় উচ্চ শিক্ষার—সজ্ঞান যোগে সাধনার আরম্ভ।

একটু আগেই বলেছি, মানব-চেতনার ক্রমবিকাশের কতকগুলি সাধারণ (ক্রম বা steps) ধাপ আছে, সেইগুলি বেয়ে সাধক ওঠে তার পরম সূক্ষ্ম বিপুলতায়—তার অখণ্ড স্বরূপে। নানাশাস্ত্রে এই ধাপগুলিকে নানা ভাবে নানা নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যোগবাশিষ্ঠে একে সিদ্ধির সপ্তভূমি—'তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ' বলে দেখানো হয়েছে, তারা হচ্ছে—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুর্য্যগা। শ্রীঅরবিন্দও বলছেন—'Out of the sevenfold ignorance toward the sevenfold knowledge—chap VIX, vol II. part II.

—'সপ্তধা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের সাতটি ভূমির দিকে এগিয়ে চলা'। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রান্তদেশ বলেও এর নামকরণ শাস্ত্রে আছে; কারণ, সঙ্কীর্ণ মনের স্থুল জ্ঞান ধাপে ধাপে সূক্ষ্মে অতিমানসে গিয়ে বিস্তার পায়, সেই প্রজ্ঞা উজ্জ্বল ভাস্বর ও ব্যাপক হতে হতে ক্রমে পরম সত্তায় পর্য্যবসিত হয়। যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তি প্রকরণে আছে—

> জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
> বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা॥
> সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততো সংসক্তিনামিকা।
> পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা।

মানুষ যখন স্থুল বাসনাময় জীবন থেকে প্রথম পরমার্থের দিকে মুখ ঘোরায় এবং পরে দীর্ঘ সাধনার পর ধাপে ধাপে উঠে পরম সিদ্ধির ভূমিতে আসন পায়, এই সমস্ত পথটুকুকে সাত ভাগে ভাগ করে, বোঝাবার প্রয়াসই এই শুভেচ্ছা আদি অবস্থার বর্ণনা। অল্পবিস্তর সকলেরই এই সাতটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। প্রথমে জাগে মুক্তির শুভ কামনা ও সংসারের প্রতি কিছু বিরতি, তাই একে শুভেচ্ছা নাম দেওয়া হয়েছে; বিচারণার অবস্থায় উঠে সাধক বেশ অন্তর্মুখ ও ধ্যানপরায়ণ হয়েছে, এখন সে সূক্ষ্ম বিচারে বিশ্লেষণ করতে নেতি নেতির পথে এগিয়ে চলেছে জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম সত্তাভিমুখে। তৃতীয় অবস্থা তনুমানসা আরও মুক্ত অবস্থা, তখন সাধকের মনের অনেকখানি তনুতা বা ক্ষীণতা এসে গেছে, সেই তরল ক্ষীণ মনে সংস্কার ও দ্বন্দ্ব মিলিয়ে আসছে, ছিন্নসূত্র মালার মত স্থুল জগৎ হারাবো হারাবো হয়েছে তাই এই অবস্থাকে "সবিকল্পা সমাধিরূপা" বলছে। চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ সত্তাপত্তিতে পৌঁছে সাধকের নির্ব্বিকল্প সমাধি অর্থাৎ জড় সমাধি হতে থাকে—"সত্যাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্তাপত্তিরুদাহৃতা", তখন নির্ম্মল সৎপদার্থে মন ডুবছে, সূক্ষ্মতা পেতে পেতে পরম বস্তুতে একাত্মতা আসছে।

তার পরের দুইটি অবস্থা অতি অনির্ব্বচনীয়, তার নাম অসংসক্তি ও তুর্য্যগা; তখন সমাধিতে বার বার থাকতে থাকতে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন এই ত্রিপুটি লয় হয়ে নিরতিশয় আনন্দের পথে অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎকারে সাধক নিত্য থাকতে আরম্ভ করেছে। যোগবাশিষ্ঠ-কথিত এই সপ্তসিদ্ধির ভূমি সমস্ত মুক্তি পথটির একটি নক্সা বা মানচিত্র এঁকে দিয়েছে আমাদের চক্ষে।

পাতঞ্জল যোগসূত্র একে আবার প্রজ্ঞার সাতটি প্রান্তভূমি বলেছে—'তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ',—এ আবার আর এক রকম classification, আর এক দিক্ থেকে সাধনমুখী মনের ক্রমশঃ ক্ষীণতা লাভ করার ইতিহাস বা কাহিনী। এই হিসাবে প্রথম প্রজ্ঞাতে বিষয়ের দুঃখময়ত্বের সম্যক্-জ্ঞান হয়, যে অবস্থা পেয়ে বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য সংসার ছেড়ে চলে যান। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে ক্লেশ ক্ষয় চেষ্টা সফল হওয়ায় সে বিষয়ে আর কোন কর্ত্তব্য নাই এই বোধের উদয় হয়; এই অবস্থায় সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান হয়ে যায়, সংযম চেষ্টার নিবৃত্তি ঘটে, মুক্তির প্রথম আস্বাদনে সাধক স্থির সুখময় আসনে বসে থাকে। তৃতীয় প্রজ্ঞায় চরম গতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি ঘটে, এবং চতুর্থ প্রজ্ঞায় চিত্তে আর কোন যোগধর্ম্মের ভাবনীয়তা থাকে না, কুশল ধর্ম্মোৎপাদনের চেষ্টা পর্য্যন্ত থেমে যায়। এই চার রকম প্রজ্ঞার নাম শাস্ত্রকার দিচ্ছেন কার্য্য বিমুক্তি বা কর্ম্মক্ষয়। এই চারটি অবস্থায় সাধনার সকল প্রয়াস শেষ হয়ে যায়, সিদ্ধি বা মুক্তির বাসনাও থাকে না, কারণ ego অহঙ্কার দেহাত্মবুদ্ধি ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় ঊর্দ্ধের বিপুল সত্তায় পাকা স্থিতি লাভ ঘটে।

তার পর ক্রমে ক্রমে বাকি তিনটি প্রজ্ঞা আপনি উদিত হতে থাকে, তার নাম চিত্ত বিমুক্তি। পঞ্চম প্রজ্ঞায় সাধকের ভোগ অপবর্গ শেষ হয়েছে মনে হয়, আর কিছু ভোগ করবার এমন কি ভোগ নাশেরও কোন বাসনা থাকে না। ষষ্ঠ প্রজ্ঞায় বুদ্ধির স্পন্দন অর্থাৎ তরঙ্গ অবধি থেমে যায় এবং আর সে ঢেউ উঠবে না এই জ্ঞান জাগে; সকল ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট সংস্কারের অপগমে চিত্তের যে শাশ্বত নিরোধ বা নিবৃত্তি হবে তারই স্ফুট প্রজ্ঞা এই অবস্থায় জাগে। পর্ব্বত-চূড়া থেকে চ্যুত উপলখণ্ডের মত গুণ সকল পুরুষ থেকে খসে পড়ে, গিরি চূড়াস্খলিত পাষাণ যেমন আর সে শিখরে ফিরে আসে না, তেমনি নিবৃত্ত লয়প্রাপ্ত সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ আর পুরুষে জাগে না। এই অবস্থায় সাধকের সত্তা স্বপ্রকাশ অমল, নির্গুণ হয়ে বিরাজ করে; পাতঞ্জলের মতে এ ঠিক কৈবল্য নয় কিন্তু কৈবল্য বিষয়ক প্রজ্ঞা—অর্থাৎ কৈবল্য বোধ বা বুদ্ধি দিয়ে সেই অবস্থার উপভোগ বা রসাস্বাদ। বৈদান্তিক মতে একে জীবন্মুক্তি বলা যায়। যোগীরা একে শ্রুতানুমানজ প্রজ্ঞা বলেছেন, যোগমতে জীবন্মুক্তি এরও ঊর্দ্ধে। কারণ, কৈবল্য সম্বন্ধে শুনতে শুনতে অনুমান করতে করতে মনে কৈবল্য ভাবনা জাগে; এটি আসল অবস্থা নয়।

খোলা তলোয়ার

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

আমার কলম আজ জ্বলে ওঠে খাপ খোলা বাঁক তলোয়ার :
আমার কবিতা আজ মৃত্যুযুদ্ধে হাঁক দেয় সংগ্রামের মাঠে—
পুরোনো বনেদে তাই ঝমাঝম লাথি মারি কপাটে কপাটে :
অন্দরে অন্দরে ঢুকে খিলেনে খিলেনে তুলি রূঢ় হাহাকার !

পুরোনো বনেদী রক্তে আজো দেখি থরোথরো শশকের প্রাণ :
সারমেয় মীরজাফর বাসা বেঁধে আছে আজো রক্তকণিকায় ;
পুরোনো ঘুমোনো রক্তে, তবু ত' খানিক ছিল বারুদের ঘ্রাণ :
পলাশীর তাজা খুন, শহীদের কাঁচা ধড়—কোথা তারা হায় !

গাছের আড়াল হ'তে কতবার কত সূর্য্য ফেলে গেলো রোদ :
রক্তমাখা লাল পাখী কতবার জানালায় দিয়ে গেলো শিস ;
ক্ষ্যাপা সাগরের ঝড় পায়ে পায়ে, নুয়ে নুয়ে জানালো নালিশ—
তবু মুঠি ভেঙে গেলো : একবার তুলে শুধু নির্জ্জীব বিরোধ !

এবার আগুন জ্বালি : দাউ দাউ দাবানল বিবরে বিবরে—
জ্ব'লে পুড়ে খাক হোক মিনারের ইট হ'তে খোড়ো চালা-ঘর ;
আগষ্টের লাল ভোরে যে-ঘুম ভাঙেনি ক্রূর বুলেটের স্বরে :
সে ঘুম এবার ভাঙি : দু'হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে মমির নগর !

শ্রীঅরবিন্দের মতে মনের ঊর্দ্ধে অতিমানসেই মানুষের জীবভাব পরিহার করে শিবত্ব লাভের ভূমি। ঐ ঊর্দ্ধলোকে উঠেই মুক্তি লাভকে বা পরম তত্ত্বে লীন হওয়াকে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের পরাগতি লাভ বলে মনে করেন না, ব্যক্তিগত মুক্তি ত মুক্তিপদবাচ্য নয়, পূর্ণ নয়, যতক্ষণ সেই ঊর্দ্ধলোকের সত্যে নীচের মন প্রাণ দেহ অবধি রূপান্তরিত না হচ্ছে। সত্তার এই সব ধাম অমুজ্জ্বল, মূঢ় থাকলে—দিব্য সত্তার ও উপাদানে রূপান্তর লাভ না করলে মুক্তি মোক্ষ পরাগতি কিছুই সম্পূর্ণ হলো না ! এই পূর্ণ রূপান্তরকেই শ্রীঅরবিন্দ দেবমানবত্ব super-manhood বলেছেন।

রাগদ্বেষাদি ক্লেশ থেকে নির্লিপ্ত সুখ-দুঃখাদি বৃত্তি বিকারের অনুরঞ্জনা বা মিথ্যা জ্ঞান থেকে মুক্ত অন্তঃকরণের বাসনাহীন দগ্ধবীজ অবস্থা—চিন্মাত্র সত্তাও স্থিত ঘন-চৈতন্য কৈবল্যই যোগবাশিষ্ঠের বা পাতঞ্জলীর সাধনার লক্ষ্য। সে ইহবিমুখ অবস্থায় অপরা প্রকৃতির মাঝে কোন রূপান্তর বা পরিবর্ত্তনের কোন বালাই নাই ! দ্বন্দ্ব থেকে একত্বের অখণ্ডে উঠে মন লয় পেতে পারে তার বিস্তারে মহিমায় ; স্থূল থেকে উপরে উঠতে উঠতে এরূপ নানা অবস্থা হতে পারে যাকে সাধক মোক্ষ বা মুক্তি বলে ধরে নেয়। শ্রীঅরবিন্দের মত কোন যোগীই এই মনের ঊর্দ্ধের পরাভূমিকে ও তাতে ওঠা ও সিদ্ধ হওয়ার অবস্থা পরম্পরাকে এমন বিশদ করে স্তরের পর স্তরে মেপে দেখান নাই। তাঁর বোঝানোর ধারাও তাঁর কথিত দিব্যসিদ্ধি তাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদের ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। দ্বন্দ্বাতীত হয়ে ক্রমশঃ পরম তত্ত্বে উঠে তাতে লীন হওয়াকে তিনি অস্বীকার করছেন না, যে সাধকের সত্তার গঠন ও ধর্ম্ম শুধু উত্থানেরই অনুকূল, তার পক্ষে পরম স্বরূপে আত্মনিমজ্জনই স্বাভাবিক। তাঁর লিখিত "দিব্যজীবনের" দ্বিতীয় ভাগে দ্বিতীয় খণ্ডে Man and the Evolution—মানুষ ও ক্রমবিকাশ পরিচ্ছেদে তিনি লিখছেন—

অধ্যাত্ম বিকাশই জন্য যদি আমাদের জড়ের স্তরে জন্মগ্রহণ হয়ে থাকে, চৈতন্যের ক্রমবিকাশই যদি হয় প্রকৃতির মূল রহস্য, তা হলে মনের মানুষই তার শেষ কথা, শেষ পরিণতি নয়। মনবুদ্ধির মানুষ একান্তই অপূর্ণ, মন চেতনার আংশিক বিকাশ, মানসসত্তা এমন কি তার পূর্ণতা পরাকাষ্ঠা ও সেই সম্বিততত্ত্বের ক্রমবিকাশের মাঝামাঝি ধাপ বা স্তর। মন যদি নিজের গণ্ডী নিজে না ভাংতে পারে তা হলে নূতন ঊর্দ্ধতর লোকের এক অতিমানস শক্তি ও জ্ঞান এসে সে মানস সীমা সে পঙ্গুতা দেবে বৃহত্ত্বের মাঝে ভেঙে বিস্তৃত করে। তখন অতিমানব নেবে মানস জীবের স্থান—

"If a spiritual upfolding on earth is the hidden truth of our birth into Matter, if it is fundamentally an evolution of consciousness that has been taking place in Nature then man as he is cannot be the last term of that evolution ; he is too imperfect an expression of the spirit, mind itself a too limited form and instrumentation, mind is only a middle term of consciousness, the mental being can only be a transitional being. If then, man is incapable of exceeding mentality, he must be surpassed and supermind and superman must manifest and take the lead of creation.

বিবাহ + অর্থ

(নাটিকা)

শ্রীযামিনীমোহন কর

প্রথম অঙ্ক

জমীদার কমলেশ চৌধুরীর বাড়ীর বসবার ঘর। সামনে বাগান। অতি আধুনিক সরঞ্জামে ঘরটি সাজান। কমলেশের বাপের আমলের চাকর গোবিন্দ ঘরে আসবাব পত্র পরিষ্কার করছে। একটা মোটা খাতা হাতে করে এক জন লোক ঘরে ঢুকল।

লোক। জমীদার বাবু বাড়ী আছেন ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে না।

লোক। কখন আসবেন ?

গোবিন্দ। ঠিক বলতে পারি না।

লোক। বিশেষ দরকার ছিল !

গোবিন্দ। যদি আমাকে বলে যান, তিনি এলে আমি বলে দিতে পারি।

লোক। আমি এসেছিলুম চাদার জন্য। 'বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি।' এই কাজগটা তিনি এলে দিয়ে দিও। আমি না হয় কাল আর একবার আসব। [প্রস্থান।

গোবিন্দ। সমস্ত দিন ধরে কেবল লোক আর লোক। কেউ চায় চাঁদা, কারোর মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য, কারোর বাপের চিকিৎসা হচ্ছে না—খালি টাকা আর টাকা। দোহন। এদের বাপ ঠাকুর্দ্দা কি গয়লা ছিল ? আর দাদাবাবুও হয়েছেন তেমনি ! কাউকে না বলতে পারেন না। এত নরম মন হলে জমীদারী রাখবে কি করে ?

(আর এক জন লোকের প্রবেশ)

লোক। মিষ্টার চৌধুরী আছেন ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে না।

লোক। কখন আসবেন বলতে পার ?

লোক। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। একটা বক্সের টিকিট রেখে যাচ্ছি। ২৫ টাকার। কাল সন্ধ্যায় আমাদের নাচ-গানের জলসা আছে। টিকিটটা মিষ্টার চৌধুরীকে দিয়ে দিও। আমি না হয় কাল এসে টাকাটা নিয়ে যাব।

গোবিন্দ। আপনি নিজে দিলেই ভাল হ'ত। তিনি যদি টিকিট না নেন। শেষে আমায় বকুনি খেতে হবে।

লোক। টিকিট তিনি নেবেনই। প্রত্যেক ক্লাবে, সমিতিতে চাঁদা দিচ্ছেন, আর আমাদের নাচ-গানে যাবেন না। তা কখনও হয় ! মিক্সড ক্লাব। ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে নাচবে। উনি যাবেনই। তুমি কিছু ভেব না। আমি না হয় ঘণ্টা-খানেক পরে একবার ফোন করব।

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। এই ভাবে আর কিছু দিন চললেই কর্ত্তার এত কষ্টের জমীদারী ফাঁক হয়ে যাবে। আমি তখনই দাদাবাবুকে কলকাতায় এসে বসবাস করতে বারণ করেছিলুম—এখানে টাকা ওড়ে।

(অবনী সেন ও তাঁর কন্যা গোপা সেনের প্রবেশ)

অবনী। মিষ্টার চৌধুরী আছেন ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে না, বাইরে গেছেন ?

অবনী। বাড়ীতে নেই ?

গোবিন্দ। বাইরে গেলে বাড়ীতে কি করে থাকবেন ?

গোপা। মিছিমিছি এত তাড়া-হুড়ো করে আসবার কি দরকার ছিল ?

অবনী। কোন শুভ কাজে দেরী করা আমি পছন্দ করি না। হ্যাঁ হে, তিনি কখন ফিরবেন বলতে পার ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে না, কিছু বলে যাননি।

অবনী। আমরা না হয় অপেক্ষা করছি।

[গোবিন্দ পাখা খুলে দিয়ে চলে গেল।

গোপা। সেধে লোকের বাড়ী আসা কি ভাল হল ? তিনি তো আমাদের আসতে ইনভাইট করেননি ?

অবনী। নিজের গরজে বিনা নিমন্ত্রণেই আসা উচিত কিন্তু বিনা গরজে নিমন্ত্রণ করলেও অ্যাবসেণ্ট হওয়া চলে। এখন আমাদের গরজ রয়েছে—

গোপা। গরজটা কিসের ?

অবনী। সেটুকু বোঝবার বয়স এবং বুদ্ধি তোমার হয়েছে !

গোপা। তাই বলে সেধে—

অবনী। এ সব নিয়ে প্রশ্ন করো না গোপা। যা কিছু করছি তোমার ভাল'র জন্যই।

গোপা। ভাল যা, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। মিষ্টার চৌধুরীর জমীদারীটা হাতাবার চেষ্টায় আছ। কিন্তু সুনীল বাবু—

অবনী। আবার সুনীল বাবু! তার না আছে চাল না আছে চুলো। কত টাকা তার আয়। বাপ কি এমন রেখে গেছে? একদম ভ্যাগাবণ্ড আপষ্টার্ট—

(কমলেশ চৌধুরীর প্রবেশ)

কমলেশ। ভ্যাগাবণ্ড আপষ্টার্ট, এসব কি বলছেন অবনী বাবু! হঠাৎ কার ওপর রেগে উঠলেন? আপনার প্রিয় সম্বোধনের পাত্র আমি নয় তো?

অবনী। না, না। কি যে বলেন আপনি!

কমলেশ। মিস সেনকেও নিশ্চয়ই এই সব বিশেষণে ভূষিত করছিলেন না। নমস্কার মিস সেন। ভাল আছেন তো।

গোপা। নমস্কার। ধন্যবাদ। আপনি ভাল আছেন?

কমলেশ। এর এখন কেউ আছে। তার পর অবনী বাবু হঠাৎ চটলেন কার ওপর।

অবনী। সে এক জন আছে। আপনি চেনেন না।

গোপা। পিছনে গাল মন্দ না করে—

কমলেশ। ঐখানেই ভুল করছেন মিস সেন। গাল মন্দ যদি করতেই হয় তো আড়ালে। বিপদের কোন ভয় থাকে না। ঐ জন্যই ত আড়ালে লোকে বাজার মারেও ডাইনী বলে। মনের ঝাল মিটিয়ে অথচ কোন কুফল ভোগ করতে হয় না! তার পর অবনী বাবু, হঠাৎ কি মনে করে?

অবনী। আজ সকালে কোন এনগেজমেণ্ট ছিল না। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।

কমলেশ। বেশ, বেশ। খুবই আনন্দিত হলুম। আমি আপনাদের জন্য চা আনতে বলি। [প্রস্থান।

অবনী। তুমি মা এইবার একটু বাগানে বেড়িয়ে এস।

গোপা। মানে?

অবনী। কমলেশ বাবুর সঙ্গে দু' একটা কথা আছে, তোমার সামনে বলাটা ঠিক হবে না।

গোপা। ধার—

অবনী। না, না—

গোপা। বিশ্বাস নেই। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে টাকা ধার নেওয়া তো তোমার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমার লজ্জা না করতে পারে কিন্তু আমার করে।

অবনী। না, না। এবার সে রকম কিছু নয়।

গোপা। ভালই।

[প্রস্থান।

অবনী। এবার আর দু'-পাঁচশ' টাকা ধার নয়। একেবারে কায়েমী কাজ। শ্বশুর হয়ে বসে সমস্ত সম্পত্তিটা আত্মসাৎ করব।

(কমলেশের প্রবেশ)

কমলেশ। এ কি! মিস সেনকে দেখছি না?

অবনী। গোপা একটু বাগানে বেড়াচ্ছে। আপনার ফুল দেখে সে আর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। মা আমার ফুল ভালবাসে। আমি বাড়িয়ে বলছি না কমলেশ বাবু, গোপা আমার যেমন ফুলের মত দেখতে, মনটাও ঠিক তেমনই ফুলের মত কোমল।

কমলেশ। আজ্ঞে হাঁ! সে তো বটেই। আমি নিজে গিয়ে ওঁকে বাগানটা ভাল করে দেখিয়ে আসি।

অবনী। বেশ তো! তবে আপনার সঙ্গে আমার দু'-এক দরকারী কথা ছিল।

কমলেশ। বলুন।

অবনী। গোপার সম্বন্ধে। আপনাদের—না, তোমাকে আর আপনি বলব না, তুমি তো আমার ঘরের ছেলের মত—তোমাদের ঘনিষ্ঠ আলাপ নিয়ে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে। অবশ্য আমি তোমাদের মেলামেশায় কোন দোষ দেখি না, কিন্তু লোকের মুখে তো হাত-চাপা দেওয়া যায় না।

কমলেশ। তাই না কি। শুনে ভারী দুঃখিত হলুম। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আলাপ, মেলামেশা,—পেলেন কোথায়? দু'-এক বার পার্টিতে দেখা হয়েছে। দু'দিন আপনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে যা হোক, ভবিষ্যতে মেলামেশা না করলেই চলবে। কিংবা এক দিন দুজনে ঝগড়া অথবা আপনাতে আমাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বচসা মারামারি—লোকেরা স্বচক্ষে দেখতে পাবে, মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেল।

অবনী। না কমলেশ, ব্যাপারটা এত হাল্কা নয়। ঠাট্টা করে উড়ানো চলবে না। আমার মান-ইজ্জত আছে তো। এর একটা বিহিত করতেই হবে।

কমলেশ। কি করতে চান বলুন?

অবনী। তুমি কি বুঝতে পারছ না, এ রকম ক্ষেত্রে কি করা উচিত! আমাদের দিক থেকে সব ঠিক। এখন তুমি যদি একবার বল—

কমলেশ। কিসের কি বলব। আর আপনাদের দিক থেকে যদি সব ঠিকই থাকে তা হলে আমার কিছু বলবার আর অবকাশ কোথায়?

অবনী। বেশ, বেশ। তা হলে তুমি রাজী। আমি জানতুম তুমি আপত্তি করবে না। গোপাকে বলেও ছিলুম। মেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ভারী লাজুক! এখন আর একটা কথা আছে। ব্যাপারটা ভারী ডেলিকেট। পয়সা-কড়ির কথা, বুঝছো তো?

কমলেশ। আজ্ঞে না, কিছুই বুঝছি না। আপনার কি কিছু ধার চাই?

অবনী। না। ধার চাইব কেন?

কমলেশ। তবে? আগেকার ধার এখন শোধ করতে পারছেন না? বেশ তো, সময় মত দেবেন।

অবনী। সে কথা নয়। মানে আমার হাতে এখন বিশেষ টাকাকড়ি নেই। সব লক্‌ড আপ!

কমলেশ। সে তো সকলেরই অবস্থা। হাতে করে আর কে টাকাকড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সকলেই সেফে লক আপ করে রাখে। ব্যাঙ্কে, সেফ ডিপোজিট ভল্টে—

অবনী। তা বলছি। মানে প্রায় সব টাকাই আটকে আছে।

কমলেশ। তাই না কি! কোথায়? পাওনাদারদের ঘরে—

অবনী। শেয়ারে। এখন যা মার্কেটের অবস্থা বিক্রী করলে

লোকসান হবে। আমি সময় মত তোমাকে টাকা দোব কথা দিচ্ছি।

কমলেশ। আপনার টাকা আমাকে দেবেন কেন? ওঃ, সেই ধারের কথা বলছেন। তা সুবিধা মত দিলেই চলবে, তাড়াতাড়ি কি?

অবনী। আমি যৌতুকের কথা বলছি। এই যে গোপা আসছে। তুমি বাবা ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও। মনের ভাবটাও জেনে নিও! আমরা বুড়ো মানুষ। এসব বিশেষ বুঝি না।

(গোপার প্রবেশ)

গোপা। চমৎকার বাগান আপনার কমলেশ বাবু!

কমলেশ। আপনার ভাল লেগেছে দেখে খুবই আনন্দিত হলুম।

অবনী। খুব ভাল বাগান বুঝি মা। তাহলে আমিও একবার ঘুরে আসি।

[প্রস্থান।

কমলেশ। আপনার বাবা কি বললেন জানেন?

গোপা। কি করে জানব বলুন? আমি তো এখানে ছিলুম না।

কমলেশ। তিনি একটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—

গোপা। আপনার ইচ্ছা হয় তো তাঁর ইচ্ছা পালন করবেন, না হয় রিজেক্ট করবেন। এতে আমার কি বলবার আছে!

কমলেশ। তিনি আমাকে বিয়ে করতে বলেছেন।

গোপা। খুব ভাল কথা। আপনার অর্থ আছে, রূপ আছে, বিয়ের বয়সও আছে। সুতরাং আপনি বিয়ে করবেন। এত দিন করেননি কেন তাই ভাবছি।

কমলেশ। আপনার বাবা পাত্রীও ঠিক করে দিয়েছেন।

গোপা। তাই না কি! কে সেই ভাগ্যবতী?

কমলেশ। আপনার খুবই চেনা। তাঁর নাম মিস্ গোপা সেন।

গোপা। (সলজ্জ ভাবে) যান, আপনি ভারী দুষ্টু।

কমলেশ। (গোপার হাত ধরে) গোপা, তোমার এতে কোন অসম্মতি নেই তো। আমি বড়লোক নই। সামান্য জমীদারী! মাসে হাজার দশেক টাকা আয় মাত্র। আর বুদ্ধি— জানই তো, ও বালাই আমার নেই। আমাকে লোকে হাবা-বোকাই বলে। এর পরও যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে—

(গোবিন্দর প্রবেশ)

গোবিন্দ। দাদাবাবু—

কমলেশ। (গোপার হাত ছেড়ে) আচ্ছা গোবিন্দ, তোমার কি সময় অসময়ের জ্ঞান নেই?

গোবিন্দ। আজ্ঞে আমার সে জ্ঞান খুবই আছে, কিন্তু যাঁরা দেখা করতে এসেছেন তাঁদের সে জ্ঞানের বিলক্ষণ অভাব।

কমলেশ। কাঁরা এসেছেন?

(অবনীর প্রবেশ)

গোবিন্দ। মিসেস রায় আর তাঁর মেয়ে ইভা না প্রভা। বললেন দার্জ্জিলিঙে আলাপ হয়েছিল। নাম বললেই চিনতে

অবনী। ব্যাপার কি?

গোপা। ইভা আবার কে?

গোবিন্দ। আজ্ঞে তা তো আমি জানি না। ঐ যে ওঁরা নিজেরাই আসছেন। খবর দেবার জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না।

[গোবিন্দর প্রস্থান।

অবনী। কমলেশ, তুমি ওঁদের চেন না কি?

কমলেশ। ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয় চিনি। হয় তো দার্জ্জিলিঙে পরিচয় হয়েছিল। বিদেশে এমন অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়—

(মিসেস অনিলা রায় ও ইভার প্রবেশ)

অনিলা। বাঃ, চমৎকার বাড়ী তো। তার পর কমলেশ, আমাদের চিনতে পারছ তো?

কমলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা ভাল আছেন?

অনিলা। হ্যাঁ। ধন্যবাদ। এই ক'দিন হ'ল দার্জ্জিলিং থেকে নেমেছি। ভাবলুম যাই কমলেশের সঙ্গে দেখা করে আসি। ইভা কি আসতে চায়। ভারী লাজুক আর অভিমানী মেয়ে। বলে বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়াটা ঠিক নয়।

কমলেশ। আপনারা কলকাতায় আছেন জানলে আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসতুম। ইভা, এটা তোমার রাগের কথা।

অনিলা। রাগ নয় বাবা, অভিমান!

কমলেশ। আপনারা এসেছেন, এতে যে আমি কি আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলব। বসুন। ইভা বস।

ইভা। না, আজ আর বসব না। বড় অসময়ে এসে পড়েছি, ক্ষমা করবেন। অন্য সব অতিথিরা রয়েছেন—

কমলেশ। তাতে কি! আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি মিসেস রায় আর ইনি তাঁর মেয়ে ইভা। ইনি হলেন মিষ্টার সেন আর ইনি তাঁর মেয়ে গোপা।

(সকলে সকলকে নমস্কার করলেন)

ইভা। (গোপার প্রতি) আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারী আনন্দ হ'ল। কমলেশ বাবুর সঙ্গে আপনার কদ্দিনের পরিচয়?

গোপা। বহু দিনের। আর আপনার?

ইভা। আমারও বহু দিনের। দার্জ্জিলিঙে বলতে গেলে আমরা একসঙ্গেই ছিলুম!

গোপা। পুরীতে আমরাও প্রায় একসঙ্গেই ছিলুম বলা চলে—

কমলেশ। বেলা হয়ে গেল। আজ আপনারা এইখানেই সকলে খাবেন।

ইভা। না, আমরা থাকলে আপনাদের অসুবিধা হতে পারে—

গোপা। আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলুম। এ সময় আপনাকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না—

কমলেশ। কি যে বলেন। আপনাদের উপস্থিতি আমায় খুবই আনন্দ দিচ্ছে। আপনাদের না খেয়ে কিছুতেই যাওয়া হবে না। গোবিন্দ—

(গোবিন্দর প্রবেশ)

গোবিন্দ। আজ্ঞে—

থাবেন। চলুন, ততক্ষণ আপনাদের আমার বসরাই গোলাপের বাগান দেখিয়ে আনি।

[গোবিন্দ ছাড়া সকলের প্রস্থান।

গোবিন্দ। দিবা জমে গেছে, এইবার লেগে যাবে। নারদ, নারদ—

(পিসীমার প্রবেশ)

পিসীমা। কমলেশ কোথায় গেল রে গোবিন্দ ?

গোবিন্দ। এক প্রকাণ্ড দল নিয়ে বসবাই গোলাপের বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনাকে বলতে বলে দিয়েছেন, তাঁরা সবাই আজ সকালে এখানেই খাবেন।

পিসীমা। কত জন হবে ?

গোবিন্দ। এখন পর্য্যন্ত চার জন। পরে আরও কত হবে বলা শক্ত। এক জন ভদ্রলোক এসেছেন মেয়ে নিয়ে দাদাবাবুকে গছাতে। আর এক ভদ্রমহিলা এসেছেন মেয়ে নিয়ে দাদাবাবুর ঘাড়ে চাপাতে।

পিসীমা। বলিস্ কি ? দু'জনকেই বিয়ে করতে হবে ?

গোবিন্দ। তাই ত দাঁড়াচ্ছে। দাদাবাবু কাউকেই চটাতে ভালবাসেন না। দু'টোকেই বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি!

পিসীমা। গোবিন্দ, তুই দাদার আমলের লোক। এ রকম বাড়ী বয়ে যারা মেয়ে গছাতে আসে তারা কখনই লোক ভাল নয়—

গোবিন্দ। লোক তো ভাল নয়ই। ওরা কি দাদাবাবুর জন্য এসেছে ভাবছেন ? ওরা এসেছে দাদাবাবুর টাকার জন্য।

পিসীমা। এদের যে রকম করেই হোক তাড়াতে হবে। কমলেশ বড় কানপাতলা ছেলে। কি যে করে বসবে—

গোবিন্দ। তুমি কিছু ভেব না পিসীমা। আমি সব ঠিক করে দেব। দাদাবাবুর কোন ক্ষতি আমি থাকতে হতে দেব না। ঐ এক জন আসছেন—

পিসীমা। আমি তাহলে যাই। আমার মুখ তো জানিস্। চটে গেলে জ্ঞান থাকে না। কি বলতে কি বলে ফেলব—

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি খুব রেগেছে। শেষে আমায় গাল-মন্দ না করে—

(ইভার প্রবেশ)

ইভা। পাখাটা খুলে দাও। ভয়ানক গরম।

গোবিন্দ। (পাখা খুলে) শরবত আনব ?

ইভা। না শরবত আনতে হবে না। আচ্ছা কমলেশ বাবুর মাথার ওপরে কেউ নেই ?

গোবিন্দ। মাথার ওপর মানে ? ঝক্কি ?

ইভা। না, অভিভাবক।

গোবিন্দ। তিনি তো নিজেই এখন নিজের অভিভাবক।

ইভা। কিন্তু তার যা বুদ্ধি-শুদ্ধি, নিজের অভিভাবক হবার ক্ষমতা আছে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা তুমি কদ্দিন এঁদের বাড়ী আছ ?

গোবিন্দ। বহু দিন। কর্ত্তার আমল থেকে।

ইভা। তা হলে তোমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। এই যে একটা কোথাকার কে এসে তার মেয়ের সঙ্গে তোমাদের বাবুর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, তোমরা যদি বাধা না দাও, তা হলে কমলেশ বাবুর কি সর্ব্বনাশ হবে ভেবে দেখেছ ?

গোবিন্দ। আমরা চাকর, মনিবকে কি করে বাধা দিই ?

(কমলেশের প্রবেশ)

কমলেশ। (ইভার প্রতি) হঠাৎ এমন করে পালিয়ে এলে কেন, ইভা ?

ইভা। উপায় কি! আপনার এবং সেই মেয়েটার বিশ্রম্ভালাপে বাধা সৃষ্টি করেছিলুম বই তো নয় ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে আপনাদের চা তৈরী হয়ে গেছে। বাগানে দিয়ে আসব কি ?

কমলেশ। গোবিন্দ—

গোবিন্দ। আজ্ঞে ?

কমলেশ। তুমি দয়া করে এখান থেকে সরে পড় তো দেখি। প্রত্যেক কথার মাঝে তোমার কথা আমার ভাল লাগে না।

গোবিন্দ। আজ্ঞে যাচ্ছি, কিন্তু চা—

কমলেশ। চা বাগানে দিয়ে এস।

গোবিন্দ। আচ্ছা।

[গোবিন্দর প্রস্থান।

কমলেশ। আচ্ছা ইভা, তুমি আজ এ রকম পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ?

ইভা। আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। দার্জ্জিলিঙ থেকে হঠাৎ পালিয়ে এলেন কেন বলতে পাবেন ?

কমলেশ। অত্যন্ত জরুরী কাজে আমায় চলে আসতে হয়েছিল।

ইভা। কি কাজ ?

কমলেশ। জমীদারী সংক্রান্তীয়।

ইভা। কিন্তু খবর দিয়ে আসতে পারতেন তো ?

কমলেশ। চেষ্টা করেছিলুম। আপনারা বাড়ী ছিলেন না।

(মিসেস্ অনিলা রায়ের প্রবেশ)

অনিলা। বাঃ বাঃ, চমৎকার বাড়ী তোমার কমলেশ। আর বাগানই বা কি ? দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। ফার্নিচার ইত্যাদি যেখানে যেটি মানায়—কেবল একটি জিনিষের অভাব—

কমলেশ। কিসের অভাব বলুন তো ? টেলিফোন রেডিও, মোটর সবই তো করেছি।

অনিলা। না, না, সে দিক্ দিয়ে কোন ত্রুটি নেই। অভাব একটি স্ত্রীর।

কমলেশ। স্ত্রী কি হবে। একটা খরচ, ঝক্কি বই তো নয়। মাসে মাত্র দশ হাজার টাকা আমার আয়, বুদ্ধি-শুদ্ধিও বিশেষ কিছু নেই, তার ওপর বয়সও প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি হল—

অনিলা। পাত্র হিসেবে এমন ছেলে বাঙ্গালা দেশে কটা মেলে। যে কোন মেয়ের পক্ষে তপস্যার বস্তু। আর দেরী কোরো না বাবা। এইবার বিয়ে-থা করে স্থিতি হয়ে বস।

কমলেশ। বিয়ে করলে যে বসিয়ে দেবে তা আমি জানি। কিন্তু—

অনিলা। আর কিন্তু নয়। দেরী না করে—

কমলেশ। আর দেরী করা যে উচিত নয়, সে আমি বুঝেছি—

অনিলা। বেশ, বেশ। কোন মেয়েকে পছন্দ—

কমলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। একটি মেয়েকে পছন্দ হয়েছে—

অনিলা। (ইভার দিকে চেয়ে একটু হেসে) পছন্দও হয়েছে না কি! বাঃ! শুনে খুবই সুখী হলুম। তোমার পছন্দ কখনও খারাপ হতে পারে!

কমলেশ। মেয়েটিও ঈষৎ—

অনিলা। তাই না কি। বেশ বেশ। খুব ভাল কথা। এরই মধ্যে এত দূর এগিয়েছে অথচ আমি কিছুই জানতে পারলুম না।

কমলেশ। এখনও কাউকে কিছু জানাইনি। মেয়ের বাপের মতামতটা—

অনিলা। মেয়ের বাপ! কি বলছ তুমি! ইভার বাবা তো অনেক দিন গত হয়েছেন।

কমলেশ। আমি গোপার বাবার কথা বলছি—

অনিলা। এর মধ্যে গোপার বাবা কোত্থেকে এল?

কমলেশ। তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে হলে তাঁর মতের প্রয়োজন আছে বই কি—

অনিলা। তুমি কি এতক্ষণ তাদের কথা বলছিলে—

কমলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনিলা। (রেগে) এ রকম ভাবে আমাদের—

ইভা। মা, চুপ কর—

অনিলা। বেশ চুপই করছি, কিন্তু এখানে আর এক দণ্ডও নয়।

কমলেশ। সে কি কথা। আপনাদের খাবার প্রস্তুত আর আপনারা চলে যাবেন? তা কি কখনও হয়? ইভা, তুমিই বল।

অনিলা। ইভা আবার কি বলবে?

ইভা। না মা, ভদ্রলোক যখন বলছেন আমরা না হয় দু' দণ্ড পরেই যাব।

অনিলা। বেশ, কিন্তু এখানে আর নয়। আমি বাগানে যাচ্ছি—ছিঃ ছিঃ— [প্রস্থান।

কমলেশ। তোমার মা যেন একটু রাগ করলেন মনে হচ্ছে—

ইভা। না, না, রাগ করবেন কেন? আপনার সৌভাগ্যে তিনি এত আনন্দিত হয়েছেন যে প্রশংসা করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

(গোপার প্রবেশ)

গোপা। আশা করি, আপনাদের নিভৃতালাপনে ব্যাঘাত করলুম না।

ইভা। মানে?

গোপা। পুরোনো বন্ধু, বহু দিন পরে দেখা। কত কথা থাকতে পারে, যা পাঁচ জনের সামনে হয় তো বলা চলে না।

ইভা। আপনার বক্তব্যটা যেন হেঁয়ালীর মত ঠেকছে। আপনি কি নিজের মাপকাটি দিয়েই সকলকে বিচার করেন?

গোপা। আপনার ধৃষ্টতা দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। আমি এ বাড়ীর ভাবী বধূ, এটা ভুলবেন না।

কমলেশ। (গোপার হাত ধরে) আহা গোপা, কি ছেলেমানুষী করছ। চুপ কর—

(গোবিন্দর প্রবেশ)

গোবিন্দ। আজ্ঞে শুনছেন—

কমলেশ। গোবিন্দ, তোমার জ্বালায় তো বাড়ীতে টেঁকা দায়। সময় নেই অসময় নেই—

গোবিন্দ। আমার জ্বালায় নয় আগন্তুকদের জ্বালায়। তাঁরা অসময়ে এলে আমি কি করি বলুন।

কমলেশ। এখন বাজে কথা না কয়ে তোমার বক্তব্যটা কি চট করে বলে এখান থেকে বিদেয় হও।

গোবিন্দ। আজ্ঞে বক্তব্যটা আপনার কাছে নয় ওঁর কাছে। (গোপাকে দেখাল)

গোপা। (বিস্মিত হয়ে) আমার কাছে?

গোবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ। এক জন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

গোপা। আমার সঙ্গে—

ইভা। এক জন লোক—

গোপা। নাম কি বললেন?

গোবিন্দ। সুনীল বাবু। বললেন আপনার খুবই পরিচিত। নাম করলেই চিনতে পারবেন।

গোপা। এখানে কেন? আচ্ছা চল, দেখছি।

[গোপার ও গোবিন্দর প্রস্থান।

ইভা। আপনার ভাবী পত্নী একটু মুস্কিলে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

কমলেশ। কেন?

ইভা। খুব পরিচিত পুরানো বন্ধু এ সময় এই বাড়ীতে—

কমলেশ। তাতে কি?

ইভা। কিছুই না। এমনি বললুম। ঐ যে ওঁরা আসছেন। চলুন আমরা আড়ালে যাই—

কমলেশ। আড়ালে কেন?

গোপা। আমাদের সামনে ওঁরা প্রাণ খুলে কথা কইবেন কি করে?

কমলেশ। বেশ চল। [উভয়ের প্রস্থান।

(একটু পরে গোপা ও সুনীলের প্রবেশ)

গোপা। আপনি—তুমি এখানে এলে কেন?

সুনীল। কি করি বল। না এসে থাকতে পারলুম না। আজই কলকাতায় ফিরেছি। ফিরেই তোমাদের বাড়ী গেলুম। সেখানে জানতে পারলুম তুমি এখানে। তাই সোজা এখানে চলে এলুম তোমায় দেখতে।

গোপা। কিন্তু—

সুনীল। এতে আবার কিন্তু কোথায় গোপা! সে সব কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে।

গোপা। না ভুলিনি, কিন্তু এখন সে সব ভুলে যাওয়াই উচিত। কমলেশ বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক।

সুনীল। তা কি করে হতে পারে? তুমি আপত্তি করলে না কেন?

গোপা। করেছিলুম। কিন্তু বাবার ইচ্ছা—

সুনীল। আর তোমার—

গোপা। আমারও অমত নেই।

(ইভা ও কমলেশের প্রবেশ)

কমলেশ। (সুনীলকে দেখিয়ে) গোপা, এঁকে তো চিনতে পারছি না।

গোপা। ইনি সুনীল মজুমদার। আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। আর ইনি জমীদার কমলেশ চৌধুরী। ইনি মিস্ ইভা রায়।

কমলেশ। তোমার বন্ধু মানেই আমার বন্ধু। সুনীল বাবু, আজ সকালের আহারটা কিন্তু এইখানেই সারতে হবে।

সুনীল। মিছিমিছি আপনাদের কষ্ট—

কমলেশ। কিছু না। আমরা খুবই আনন্দিত হব।

(অবনী বাবুর প্রবেশ)

অবনী। এ কি! সুনীল না!

সুনীল। আজ্ঞে হাঁ!

অবনী। তা এখানে কেন?

সুনীল। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

অবনী। দেখা তো হয়েছে, এখন যেতে পার—

সুনীল। যেতে অবশ্য পারি, কিন্তু যাব না। কমলেশ বাবু আমাকে সকালে এখানেই খেতে বলেছেন। চলে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে!

অবনী। তুমি এঁকে খেতে বলেছ কমলেশ?

কমলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। গোপা বললে ইনি আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। সুতরাং আমারও ফ্রেণ্ড, নয় কি!

সুনীল। গোপা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল—

অবনী। গোপার সঙ্গে তোমার কোন কথা থাকতে পারে না।

সুনীল। সব কথা কি মেয়ের বাপ-মা'রা জানেন, না, তাঁদের সামনে সব কথা বলা চলে—

গোপা। আপনার যা বলবার আছে, বাগানে চলুন, বলবেন।

[গোপা ও সুনীলের প্রস্থান।

অবনী। কিন্তু—

কমলেশ। এতে আবার কিন্তু কোথায়? পুরোনো ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড যে।

ইভা। আমিও যাই, মা কি করছেন দেখে আসি।

[প্রস্থান।

অবনী। গোপার এ আবার বাড়াবাড়ি। তুমি বাবা কিছু মনে কোরো না—

কমলেশ। এতে মনে করার কি আছে। বরং সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। আমাদের সামনে যদি সুনীল বাবু তেমন একটা কিছু বলতেন তাহলে সকলকেই অপ্রস্তুতে পড়তে হ'ত।

অবনী। না, না। এতটা উদারতা ঠিক নয়। আমি নিজেই দেখি—

[অবনীর প্রস্থান।

কমলেশ। ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই সুনীল বাবুটি কে? তাকে এরা এত ভয়ই বা করছে কেন?

(অনিলার প্রবেশ)

অনিলা। ইভা, ইভা—

কমলেশ। ইভা যে এই মাত্র আপনাকে খুঁজতে বাগানে গেল—

অনিলা। ওঃ। যাক, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হ'ল। তোমার ভাবী পত্নীকে দেখি বাগানে আর এক যুবকের সঙ্গে গভীর আলাপনে মগ্না।

কমলেশ। আলাপের মধ্যে দোষের কি আছে?

অনিলা। কিন্তু যদি সে আলাপে হাতে হাত, চোখে জল—

কমলেশ। আপনি কি যা তা বলছেন—

অনিলা। আমি এটাকে কর্ত্তব্য বলেই মনে করি। তা না হলে বলতুম না। তোমার বিশ্বাস না হয় নিজের চোখে দেখে আসতে পার।

কমলেশ। না দেখবার দরকার নেই। কিন্তু আপনি এ কর্ত্তব্যটি দয়া করে পালন না করলেই সুখী হতুম।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। দাদাবাবু, খাবার তৈরী।

কমলেশ। তাহলে ওঁদের খবর দিতে হয়। গোবিন্দ, না থাক—আমিই যাচ্ছি।

[কমলেশের প্রস্থান।

অনিলা। তুমি এখানে কদ্দিন আছ?

গোবিন্দ। তা অনেক দিন হবে বৈ কি। কর্ত্তার আমল থেকে আছি, দাদাবাবুকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি—

অনিলা। তাহলে কমলেশের প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে নিশ্চয়ই। এই যে এক জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা-বার্ত্তা ঠিক হয়ে গেল—

গোবিন্দ। কই, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানি না। পিসীমাও না, আমিও না।

অনিলা। আবার সে মেয়েটিও বিশেষ ভাল নয়। মানে স্বভাব-চরিত্র—

গোবিন্দ। কিন্তু দাদাবাবুর বিয়ে তো এখন হওয়া ঠিক হবে না—

অনিলা। বিয়ে হওয়া উচিত। বিয়ের বয়স হয়েছে বৈ কি। আর কমলেশের ভাবনার তো কিছুই নেই। রূপ আছে, স্বাস্থ্য আছে, পয়সা আছে—এক কথায় বিয়ে করে সুখী হবার জন্য যা যা দরকার সবই আছে—

গোবিন্দ। দাদাবাবুর স্বাস্থ্য রূপ আছে ঠিক কথা, কিন্তু পয়সা—

অনিলা। মানে? কমলেশের পয়সার অভাব কি?

গোবিন্দ। বিলক্ষণ অভাব। এই তো নায়েব মশাই ক'দিন আগে পিসীমাকে বলছিলেন, জমীদারী রাখা যায় কি না সন্দেহ! দেনার দায়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর শেয়ার খেলে দাদাবাবু বিলক্ষণ লোকসান দিয়েছে—

অনিলা। তাই না কি! কই কমলেশ তো এ বিষয়ে কিছু বলেনি।

গোবিন্দ। নায়েব মশাই দাদাবাবুকে এখনও কিছুই জানাননি। তিনি একবার শেষ চেষ্টা করছেন। আমি যাই খাবারের জায়গা করতে বলি গে।

[গোবিন্দের প্রস্থান।

অনিলা। তা কমলেশ যদি সেই জোচ্চোরটার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, আমি আর কেন বাধা দেব। তবে ইভাকে সাবধান করে দিতে হবে।

[অনিলার প্রস্থান।

(গোবিন্দের পুনঃ প্রবেশ)

গোবিন্দ। যাক, একটা ভূত নামল! ইনি আর নিজের মেয়ের সঙ্গে দাদাবাবুর বিয়ের চেষ্টা করবেন না। এইবার আর একটা—এই যে স্মরণ করতে না করতেই—

(অবনীর প্রবেশ)

অবনী। কমলেশ কোথায় জান?

গোবিন্দ। তিনি যে আপনাদের ডাকতে বাগানে গেলেন। খাবার তৈরী—

অবনী। তাই না কি! কই, আমার সঙ্গে তো কমলেশের দেখা হল না। আচ্ছা গোবিন্দ, তুমি এ বাড়ীতে ক'দ্দিন আছ?

গোবিন্দ। তা বেশ অনেক দিন। সেই কর্ত্তার আমল থেকে। দাদাবাবুকে বলতে গেলে আমিই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।

অবনী। কমলেশ বড় সরল, অত ভাল মানুষ হলে সংসার করা চলে না।

গোবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে যা বলেছেন। ধড়ীবাজ লোকেরা সর্ব্বদাই ওঁর মাথায় হাত বুলোবার জন্য মুখিয়ে আছে।

অবনী। কিন্তু এ ভাবে প্রশ্রয় দিলে জমীদারীই বা কি করে টিঁকবে আর বিয়ে-থা করে ঘর-সংসারই বা করবে কি করে?

গোবিন্দ। সংসার, বিয়ে এ সব তো পরের কথা। আগে জমীদারী টিঁকলে বাঁচি!

অবনী। মানে? জমীদারীর কোন গণ্ডগোল—

গোবিন্দ। বিলক্ষণ গণ্ডগোল। এই তো নায়েব মশাই ক'দিন আগে পিসীমাকে বলছিলেন, জমীদারী রাখা যায় কি না সন্দেহ। দেনার দায় মাথায় চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর শেয়ার খেলে দাদাবাবু বিলক্ষণ লোকসান দিয়েছেন—

অবনী।—বল কি! কই, কমলেশ তো আমাকে এ সব কথা কিছু বলেনি।

গোবিন্দ। নায়েব মশাই দাদাবাবুকে এখনও কিছুই জানাননি। তিনি একবার শেষ চেষ্টা করছেন। আমি যাই খাবারের যায়গা করতে বলি গে।

[গোবিন্দের প্রস্থান।

অবনী। ভাগ্যিস্ চাকরটা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলে। আর একটু এগোলেই মুস্কিল হ'ত। গোপাকে সাবধান করে দিতে হবে। আর সুনীলকে একটু তোয়াজ করতে হবে। ছোকরা মাসে শ'পাঁচেক টাকা রোজগার করে। কপর্দ্দক-হীন ঋণগ্রস্ত বেকার জমীদারের চেয়ে ভাল।

(গোপার প্রবেশ)

গোপা। তোমার জন্ম আমি যে কি বিপদে পড়েছি বাবা—

অবনী। কেন মা, কি হ'ল?

গোপা। কমলেশ বাবুকে আমরা কথা দিয়েছি, কিন্তু সুনীল বাবুকে—

অবনী। কমলেশের কথা আর বোলো না। ওর চাকর গোবিন্দ সব ফাঁস করে দিয়েছে। দেনার দায়ে জমীদারী যায় যায়। ওর চেয়ে সুনীল ঢের ভাল।

(ইভার প্রবেশ)

ইভা। (গোপার প্রতি) কমলেশ বাবুর সঙ্গে আপনার বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেছে শুনলুম। মাই কনগ্র্যাচুলেশন।

গোপা। ভুল শুনেছেন। এ রকম কোন সম্ভাবনাই নেই। আপনি কমলেশ বাবুর পুরোনো বন্ধু, ইচ্ছে করলে অনায়াসে আপনি তাঁকে বিয়ে করতে পারেন।

(ইতিমধ্যে অনিলার প্রবেশ)

অনিলা। এতক্ষণ এ মহানুভবতা কোথায় ছিল? একেবারে তো জোঁকের মত লেপটে ছিলে রক্তের লোভে। যেই জেনেছ সে রক্তহীন অস্তঃসারশূন্য, অমনি দান দেখান হচ্ছে, আপনি তাঁকে বিয়ে করতে পারেন! তোমার রিজেক্ট করা প্রেমিককে আমার মেয়ে কোন্ দুঃখে বিয়ে করতে যাবে?

ইভা। আঃ মা, থাম না! ব্যাপারটা কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না।

অনিলা। কমলেশের জমীদারী দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে। আজ বাদে কাল ওকে পথে দাঁড়াতে হবে।

ইভা। (গোপার প্রতি) ওঃ! তাই এত দরদ! নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত।

গোপা। মানে? এতক্ষণ আপনি মুখ চূণ করে তাঁর পিছন পিছন ঘরে বেড়াচ্ছিলেন না?

অনিলা। মুখ সামলে কথা বলবে—

অবনী। সাবধান, মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না—

(কমলেশ ও সুনীলের প্রবেশ)

কমলেশ। কি ব্যাপার! এত গণ্ডগোল কিসের?

[সকলে নিরুত্তর।

কমলেশ। গোপা, ইভা, ব্যাপার কি বল তো?

অনিলা। ভবিষ্যতে আমার মেয়েকে মিস রায় বলে ডাকলে সুখী হব।

অবনী! আর আমার কন্যাকে মিস্ সেন বলে ডাকবেন।

ইভা! এবং আপনি বলে সম্বোধন করবেন—

গোপা। অবশ্য সম্বোধন না করলেই আরও সুখী হব।

কমলেশ। কিন্তু ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ভাবী পত্নীকে—

অবনী। কে আপনার ভাবী পত্নী। গোপার সঙ্গে আপনার বিবাহের কোন প্রশ্নই আর উঠতে পারে না—

কমলেশ। এই একটু আগেও তো—

অবনী। তখনও আপনার ভণ্ডামী আমরা জানতে পারিনি।

কমলেশ। মানে ?

অবনী। মানে আপনার জমীদারী দেনার দায় বিকিয়ে যাবার উপক্রম। শেয়ার মার্কেটে বিস্তর দেনা—এ সব কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?

কমলেশ। তার পূর্ব্বে আমি প্রশ্ন করতে পারি কি, এ সব খবর আপনি কোথায় পেলেন ?

অবনী। আপনাদের বাড়ীর পুরোনো চাকরই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে।

কমলেশ। পুরোনো চাকর ! মানে—গোবিন্দ।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। আজ্ঞে, আমায় ডাকছেন ?

কমলেশ। আমি এ সব কি শুনছি ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে, ঠিকই শুনছেন।

কমলেশ। তুমি এ সব খবর কোত্থেকে পেলে ?

গোবিন্দ। মাথা থেকে বার করলুম—

অবনী। তার মানে ? তুমি যে বললে নায়েব মশাই বলেছেন—

অনিলা। তবে কি বলতে চাও সব মিথ্যে—

গোবিন্দ। আজ্ঞে হাঁ। মিথ্যে বৈ কি ! মাথা থেকে বার হলেই তো মিথ্যে !

কমলেশ। এ রকম ভাবে মিথ্যে কথা বলে লোকচক্ষে আমাকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যটা কি ? তুমি কি ভেবেছ, বাবার আমলের চাকর বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলবে, আর আমি তা মুখ বুজে সহ্য করব ?

গোবিন্দ। অপদস্থ করার জন্য নয়, অপদস্থ হওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য। আপনার চোখ খুলে দেবার জন্য। এখনও কি বুঝতে পারছেন না ওঁরা আপনাকে চাননি, চেয়েছিলেন আপনার টাকাকে। আর কর্ত্তার আমলের চাকর বলেই এটা আমি কর্ত্তব্য মনে করেছি।

সুনীল। কমলেশ বাবু, আমি তা হলে আজ যাই।

কমলেশ। সে কি ? না খেয়ে—

সুনীল। মাফ করবেন। আর এক দিন আসব। কিন্তু আজ পালাই ! আপনার অবস্থা শোচনীয় শুনে অবনী বাবু আর তাঁর কন্যা আমায় দিব্য তোয়াজ করছিলেন। আমি বেশ একটু অবাক্ হয়ে পড়েছিলুম। তখন কি জানি এই ব্যাপার। এখন আপনি আবার প্রতিষ্ঠিত, অতএব আমি বিতাড়িত। ওঁদের পাল্লায় পড়ে আপনার মত লোকেরই যখন এই অবস্থা, তখন আমার যা হবে বুঝতেই পারছি। অতএব ওঁরা থাকতে আর এখানে নয়। তবে আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন।

[সুনীলের প্রস্থান।

অবনী। আপনার বাড়ীতে আমাদের এই রকম অপমান—

অনিলা। আর আপনি চুপ করে রইলেন—

গোপা। অসহ্য !

ইভা। আমরা এক্ষুনি চলে যাব—

কমলেশ। কিন্তু না খেয়ে—

অবনী। কোন প্রয়োজন নেই—

গোবিন্দ। খাবার ফেলা যাবে—

অনিলা। যাক। চলে আয় ইভা—

অবনী। চল গোপা।—

[কমলেশ ও গোবিন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গান

অমল ঘোষ

পাখী যখন বলবে ডেকে, যায় গো বেলা যায়।
দিনের আলো বিদায় নেবে নিতল ঘন ছায়।
বৃন্ত হ'তে ফুলগুলি সব পড়বে ঝরে ঝরে
কাঁটা লতায় উঠবে যে পথ মলিনতায় ভরে
কাঁদবে বাতাস বনের 'পরে গভীর হতাশায়
পাখী যখন বলবে ডেকে যায় গো বেলা যায় !

বেচা-কেনা মিটিয়ে ঘরে ফিরবে গাঁয়ের লোকে
বিজন হাটে জ্বলবে না দীপ নিঝুম নিরালোকে,
উঠবে ফুটে একটি তারা আকাশ-সীমানায়
পাখী যখন বলবে ডেকে যায় গো বেলা যায় !

সেই লগনে মরণ যদি দাঁড়ায় আসি দোরে
বাঁধবে কি গো আমায় তুমি চির বাহুর ডোরে ?
পারি কি গান গাইতে তখন তোমার ভরসায়
পাখী যখন বলবে ডেকে যায় গো বেলা যায় !

হীনমন্যতা

চিত্রগুপ্ত

৩

মানুষ মাত্রেই একটা না একটা কোনো দিকে নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করেই। সে রকম ক্ষেত্রে জীবনের সেই বিশেষ দিক্‌টার চাপে সে বেশ বিব্রত বোধ করে এবং বুঝ্‌তেও পারে যে একা একা সে অসুবিধার সঙ্গে ল'ড়ে ওঠা তার পক্ষে মুস্কিল। সেই জন্যেই মানুষের মধ্যে সমাজগত জীবনের প্রতি আগ্রহ এত প্রবল। সে জানে একা একা বাস করা যেখানে কঠিন ব্যাপার সেখানে দল বেঁধে বাস করাটা বেশ সুবিধাজনক। বাস্তবিক সমাজ জীবন মানুষকে অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক অযোগ্যতার অসুবিধের হাত থেকে বাঁচিয়েচে! অর্থাৎ প্রত্যেকটি লোক আলাদা আলাদা বাস ক'রে একা একা যে সব অসুবিধে কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারতো না, দল বেঁধে সমাজগত ভাবে বাস করার জন্যে পরস্পরের সান্নিধ্য ও সহযোগিতার ফলে আপনা আপনি সে সব দুর্ব্বলতা ও অসুবিধার পরিপূরণ হ'য়ে যায়।

মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জীবদের বেলায়ও এই একই ব্যাপার আমরা দেখতে পাই। সেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জীবগুলি যুথবদ্ধ হ'য়ে বাস ক'রে প্রবল শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসী। সেখানে বাঘের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনে মহিষরা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে। কিন্তু বাঘ, সিংহ, গরিলারা এ রকম প্রয়োজন অনুভব করে না ব'লে স্বতন্ত্র ভাবে যে যার একক জীবন যাপন করে। প্রতিকূল জগতে নিরাপদে একক জীবন যাপন করতে অক্ষম মানুষ সেদিক্ দিয়ে মহিষ-ধর্ম্মী। তাই মানুষকে নিরাপত্তার খাতিরে সমাজগত ভাবে বাস ক'রতে হয়। অর্থাৎ পৃথক্ ভাবে ব্যক্তিগত জীবন অসম্পূর্ণ ব'লেই মানুষকে সমাজ সৃষ্টি করতে হ'য়েচে। কারণ সব মানুষ সব দিক্ দিয়ে সমান ভাবে সবল নয়। সে ক্ষেত্রে সমাজগত ভাবে বাস ক'রে যে যার এক দিক্‌কার কম্‌তিটুকু পুষিয়ে নেয় অপরের অন্য দিকের বাড়্‌তি সবলতাটুকুর ওপর ভাগ বসিয়ে এবং তার বদলে নিজের অন্য দিকের বাড়্‌তি থেকে অপরকে কিছুটা ভাগ দিতে তার গায়ে লাগে না। তা'ছাড়া সমাজের দুর্ব্বল মানুষগুলি সবলদের ঠেক্‌নো পেয়েও অনেকটা আরামে বাস ক'রতে পারে। নিজেদের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাদের একেবারে অসহায় হ'য়ে প'ড়তে হয় না।

এই সব দিক্ বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে কথায় কথায় সমাজকে অস্বীকার করতে যাওয়ার স্পৃহাকে সাধারণ ভাবে সমর্থন করা যায় না। অবশ্য অসাধারণ শক্তি, সামর্থ্য, সহনশীলতা ও ত্যাগশীলতা-সম্পন্ন অতি-মানবদের কথা আলাদা। সাধারণ মানুষের মাপকাঠিতে তাদের বিচার ক'রতে যাওয়াটাই ভুল।

যাই হোক্, এ্যাড্‌লার মানুষের হীনমন্যতার প্রতিষেধক হিসেবে সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাশীলতার প্রতি খুব বেশী আস্থাবান্। তাঁর মতে সুব্যবস্থিত সমাজে বাস করে সমাজের পাঁচ জনের সহযোগিতা লাভ ক'রেই দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে তার দুর্ব্বলতা কাটিয়ে ওঠা বা অন্ততঃ পক্ষে দুর্ব্বলতার অসুবিধাটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। নচেৎ যে সব মানুষ কোনো একটা দিকে 'ঊন' তার পক্ষে সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপন ক'রে সে 'ঊনতা' কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় না।

এই ঊনতা সম্পর্কে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেটা হ'চ্চে এই যে; এ্যাড্‌লার মানুষের জন্মগত শারীরিক ঊনতাকে (দেহ-বৈকল্য প্রভৃতি) স্বীকার করলেও মানুষের জন্মগত হীনমন্যতায় বিশ্বাসী নন। তিনি বলেন, হীনমন্যতা মানুষ জন্মের পর অর্জ্জন করে। তাঁর মতে হীনমন্যতা মানুষের মধ্যে জন্মায় সমাজে তার নিজেকে খাপ খাইয়েনিয়ে চল্‌বার পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটার জন্যে। তা ছাড়া সে যে-সমাজের মধ্যে বর্দ্ধিত সেই সমাজের পরিবেশ এবং সমাজের প্রতি তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীও তার এই হীনমন্যতার জন্যে দায়ী।

তোৎলামির কথাই ধরা যাক। কোনো এক জন তোৎলা লোককে ধরে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে জন্মের সময় থেকেই সে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে পারেনি। ছোটো বেলায় কোন কিছুতে যোগ দেবার তার উৎসাহ ছিল না। বন্ধুত্বের প্রতিও তার কোনো দিন আস্থা ছিল না। কথা বলায় তার যে অসুবিধে, সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে তার পক্ষে পাঁচ জনের সঙ্গে বেশী ক'রে মেলামেশা এবং কথাবার্ত্তা বলাই দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে সে লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যকে পরিহার ক'রেই চ'লেছে বরাবর। আর সেই জন্যেই তার তোৎলামিটাও সারবার অবকাশ পায়নি।

আবার যে-তোৎলামি সারেনি সেই তোৎলামিটাকে নিজের জীবনে একটা অভিশাপ ব'লে মনে করবার অভ্যাসের ফলে এ সম্পর্কে তার মনে একটা হীনমন্যতা বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে। এই হীনমন্যতার জন্যেই সে সমাজের আর পাঁচ জন মনুষকে আগে থাক্‌তেই নিজের শত্রু বলে ধ'রে নিচ্ছে এবং ভাবছে যে সমাজের পাঁচ জন স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা বলতে সক্ষম মানুষ তার এই তোৎলামি নিয়ে আড়ালে বা মনে মনে খুব হাসাহাসি করছে। এই সব ভাবার ফলে সমাজের লোকগুলোকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারছে না এবং ক্রমাগত তাই সমাজকে এড়িয়ে এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করচে। আর তার ফলে যতই সে মানুষ ও সমাজকে এড়িয়ে চ'লে একা একা থাকচে ততই চর্চ্চার অভাবে তার সহজ বাক্‌পটুতার স্ফূর্ত্তির সুযোগটা কম ঘট্‌ছে ব'লে তার তোৎলামিটাও সারা চুলোয় যাক্, বেড়েই চ'লেছে। তোৎলাদের মধ্যে দু'রকমের ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। এক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার ঝোঁক, আর লোককে পরিহার করে চলবার ঝোঁক।

যে সব লোক সমাজকে পরিহার ক'রে মানুষ হয়, বড় হ'লে তাদের মধ্যে প্রায়ই stage fright জিনিষটার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এর কারণ তারা শ্রোতাদের শত্রু বলে মনে করে। নিজেদের কল্পনায় তারা তাদের শ্রোতাদের যখন শত্রুভাবাপন্ন কঠোর সমালোচক হিসেবে দেখে তখনই সেই সব শ্রোতার সামনে আসবার সময়ে তাদের মনের ওপর হীনমন্যতার আধিপত্য ঘটে। এ সম্পর্কে আসল কথাটি হ'চ্চে এই যে, কোনো লোক যখন তার নিজের এবং শ্রোতাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে তখনই কেবল সে তাদের সামনে সহজে এবং ভালো ভাবে বক্তৃতা দিতে পারে। সে অবস্থায় আর তার কিছুতেই stage fright ঘটতে পারে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, হীনমন্যতার সঙ্গে মানুষের সামাজিক শিক্ষার সম্বন্ধটি একেবারে ওত-প্রোত। সামাজিক পরিবেশটি ঠিকমত না হলে মানুষের মধ্যে হীনমন্যতার উদ্ভব হয়। আবার হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে হ'লেও উপরোক্ত সামাজিক শিক্ষাই হোলো প্রাথমিক উপায়। সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যখন আমরা বলি লোকে তাদের সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যেই তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠে তখন সেই

সাধারণ বুদ্ধি বলতে বুঝতে হবে, সমাজের অনুমোদিত সাধারণ বুদ্ধি। পাগল, নিউরটিক বা অপরাধী (criminal) সুলভ ব্যক্তিগত বিশেষ ধরণের বুদ্ধি নয়—যে-ব্যক্তিগত বিশেষ বুদ্ধির প্রভাবে পাগল, নিউরটিক বা অপরাধীরা নিজেদের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষ রকমের উন্নত শ্রেণীর মানুষ বলে মনে করে। এ্যাডলার এই সমাজ-সম্মত সাধারণ বুদ্ধি জিনিষটার ওপর বিশেষ রকম জোর দিয়েচেন। তিনি এইটিকেই স্বাভাবিকতার 'মাপকাঠি' বলে ধরে নিয়ে মানুষের সমাজপ্রীতি অনুশীলনের ও সামাজিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী ব্যক্তিগত দম্ভ ও ঈর্ষ্যা প্রণোদিত প্রতিযোগিতাকে পরিহার ক'রে সাম্য ও প্রীতি-প্রণোদিত সহযোগিতার দ্বারাই মানুষ সহজ ভাবে বেড়ে উঠতে পারে এই কথাটাই এ্যাডলারের মূল বক্তব্য। তিনি বলেন, পাগল অপরাধী প্রভৃতিরা মানুষ, সমাজ ও সামাজিক নীতি প্রভৃতিকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অথচ মজা এই যে, এর মধ্যে দিয়েই অর্থাৎ এগুলির প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হ'তে পারলেই তাদের পক্ষে অস্বাভাবিকতা ও তার অবশ্যম্ভাবী কুফলের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া সম্ভব হতো। এই সব লোকদের রোগ সারাতে গেলে আমাদের কর্ত্তব্য হবে সামাজিকতার প্রতি তাদের আগ্রহকে উদ্‌বুদ্ধ ক'রতে চেষ্টা করা। দুর্ব্বল-স্নায়ু লোকেরা—তাদের ভিতরে একটা 'সং ইচ্ছা' রয়েচে এটা জেনেই সুখী হয়। কিন্তু তাদের মাথায় এইটা ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার যে, শুধু সং ইচ্ছাতেই কোনো কাজ হয় না—সমাজ শুধু সাধু উদ্দেশ্য দেখেই তৃপ্ত নয়, সে চায় সং কর্ম্ম। সুতরাং সমাজে স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তি ব'লে গণ্য হ'তে গেলে—এক কথায়—সাফল্য লাভ ক'রতে হ'লে—সত্যি সত্যি তারা সমাজকে কি দিচ্ছে, সত্যি সাত্য কি কাজ ক'র'ব সেইটা দেখা দরকার। এই সত্যটা যদি তাদের মাথায় কোনোক্রমে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা'হ'লে তারা সত্যি সত্যি সেরে উঠে সংসারের পক্ষে কেজো লোক হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

এ্যাডলার বলেন, কোনো না কোনো এক দিকে উনতা মানুষের থাকলেও মানুষ ছোটো বেলার উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষার ফলে সেই উনতাকে কাটিয়ে উঠে জীবনে সাফল্য ও সার্থকতা লাভ ক'রতে পারে। আবার প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিপন্থী দৃষ্টি-ভঙ্গী ও উল্টো রকমের শিক্ষা (অভ্যাস) প্রাপ্তির ফলে সে উনতা কেটে না গিয়ে তার বদলে তার মনের ওপর 'হীনমন্যতা' চেপে বসতে পারে। তার উনতার ফলটা কোন্ রাস্তা নেবে সেটা সব ছেলেমেয়ে-দেরই জীবনের প্রথম চার পাঁচ বছরের ভেতরেই ঠিক হ'য়ে যায়। নিজের নিজের উনতা কাটিয়ে বড়ো হয়ে উঠতে সবাই চায়। সেই বড়ো হয়ে উঠতে চাওয়াটা সমাজসম্মত সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হ'য়ে সহজ রাস্তা নিলেই মঙ্গল; আর তা' না হয়ে তার ব্যক্তিগত বিশেষ (বিকৃত) বুদ্ধির দ্বারা চালিত হ'য়ে উল্টো রাস্তা ধরলেই মুস্কিল। এই সময়টাতে হীনমন্যতা তাকে পেয়ে না বসলেই সে বেঁচে গেল। তাতে সে ধীরে ধীরে নিজের উনতা কাটিয়ে উন্নতিই করতে থাকবে। কিন্তু এ-অবস্থায় যদি তার মনে হীনমন্যতা জিনিষটা কোনোমতে শেকড় গাড়তে পাড়ে তাহলে ঐ হীনমন্যতাই সে ছেলেকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেবে। সেই জন্যে সর্ব্বনাশা হীনমন্যতার আক্রমণ থেকে শিশুদের রক্ষা করাটা অত্যন্ত দরকার। প্রথম চার পাঁচ বছর বয়েসের মধ্যেই শিশুরা তাদের উনতা কাটিয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার পক্ষে মনের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই একটা 'আদর্শ' গড়ে ফেলে। এই আদর্শই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করে। তার ভবিষ্যৎ জীবনের 'একটা নমুনার' (Prototype) ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়ে যায় ঐ ছোটো বয়সেই। এই আদর্শটি ভুল হ'লেই ভবিষ্যতে ঘটায় সর্ব্বনাশ আর ভুল না হ'য়ে ঠিক হ'লেই তার জীবনে এনে দেয় সাফল্য।

যারা কাজ-কর্ম্মে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করে কিম্বা বাঁ হাতের ব্যবহারে বেশী নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় অর্থাৎ যাদের চলতি কথায় 'ন্যাটা' বলা হয়, সেই সব ছেলেদের কথাই ধরা যাক। এদের এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে যদি এদের প্রথম বয়েসে বকা-ঝকা মার-ধোর, কঠোর সমালোচনা কিম্বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাসাদি করা যায় তা' হ'লে সাধারণতঃ এদের মনে ঐ নিয়ে অবশেষে একটা পুরোপুরি হীনমন্যতার আধিপত্য দেখা যেতে পারে। ডান হাতের অপটুতা নিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবন দুর্ব্বহ মনে হ'তে পারে। এমন কি ভবিষ্যতে তার মনে এমন ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে যে, সে একটা দুনিয়া-ছাড়া, সৃষ্টি-ছাড়া জীব, এ জগতে সে আর পাঁচ জনের মতন সহজ স্বাভাবিক ভাবে খাপ খাবে না। আর এর ফলে তার একথাও মনে হতে পারে যে এই শক্ত দুনিয়া থেকে সে যত শীঘ্র মুক্তি পায়, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারে ততই ভালো। অর্থাৎ এক কথায় জীবন তার কাছে একেবারে তিক্ত বিষময় ব'লে মনে হ'তে পারে। অপর পক্ষে বিচক্ষণ অভিভাবক বা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়লে সেই ছেলেই হয়তো জানতেই পেতো যে ডান হাতের ব্যবহারের ব্যাপারে তার কোন খুঁৎ আছে। বিচক্ষণ অভিভাবক বা শিক্ষকের হয়তো ঐকান্তিক যত্নসহকারে শুধু তাকে ডান হাতের সম্যক্ ব্যবহারে কুশলী ক'রে তুলতেই চেষ্টা ক'রতেন। যার ফলে ডান হাতের সঠিক ব্যবহারের সম্পর্কে ক্রমশঃ সযত্ন চেষ্টার ফলে ঐ বিষয়ে তার আগ্রহ বেড়ে যাওয়াতে সে ছেলেটি হয়তো কালে একজন বড়োদরের শিল্পীও হ'য়ে উঠতে পারতো। বহু ক্ষেত্রেই এ রকম হ'য়েছেও। ডান হাতের ব্যবহার সম্বন্ধে ছেলেকে পরম যত্নে অধিকতর আগ্রহশীল ক'রে তোলার ফলে সে ছেলে সাধারণ পাঁচ জন ছেলের চেয়ে উচিয়ে গেছে এমনও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে যে ঠিক ভাবে চালিত হওয়ার ফলে মানুষের উনতাই এক দিন তার শ্রেষ্ঠত্বলাভেরও কারণ-স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। অপর পক্ষে শিক্ষা ও চালনার দোষে একই অবস্থায় অন্য ছেলের মনে হীনমন্যতা বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে। সাধারণ অবস্থায় এ জাতীয় উনতা-যুক্ত ছেলেরা গোড়াতে উচ্চাভিলাষীই থাকে এবং স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের দুর্ব্বলতা কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াসী থাকে, কিন্তু এ নিয়ে অতিরিক্ত তাড়না-তিরস্কারাদি করাটাই হ'চ্চে শিক্ষা ও চালনার দোষ। তাতে তার মনের ওপর অন্যায় রকম চাপ পড়ে। সেই মাত্রাতিরিক্ত চাপটা তার মন সহ্য করতে না পেরে অবশেষে স্বাভাবিক মানুষদের সম্বন্ধে অজ্ঞাত ঈর্ষ্যা-দ্বেষ প্রভৃতি বাঁকা বাঁকা পথে ধাবিত হ'য়ে 'তেড়ে-বেঁকে' যায় এবং অবশেষে দেহের গাঁটে গাঁটে দুশ্চিকিৎস্য বাতে ধরার মতন তার মনের ঐ সব বাঁকা গাঁটে হীনমন্যতার সর্ব্বনাশা বাতিক ধরে।

ঠিকমত শিক্ষা ও ঠিক পথে চালিত সংনিষ্ঠ সাধনার ফলে মানুষের উনতাই যে তাকে পরে একদিন শ্রেষ্ঠতা এনে দিতে পারে তার প্রমাণ পাই আমরা বহু প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জীবন দেখে।

আপন দৃষ্টি শ্রবণ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির ঊনতা লক্ষ্য ক'রে ঠিক পথে চালিত একনিষ্ঠ সাধনার ফলে বহু প্রতিভাবান্ শিল্পী সেই সব শক্তির উন্নতি সাধন ক'রে জগতে অমরত্ব লাভ ক'রেছেন এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। অনেক লোক বাল্যে নিজের পরিপাক-শক্তির ঊনতা বশতঃ আহারাদির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে শিক্ষা লাভ ক'রে উত্তর জীবনে খাদ্যতত্ত্ববিদ্ বা অন্ততঃ পক্ষে নিপুণ রন্ধনশিল্পী হ'য়ে উঠেছেন। আবার অন্য রকমও হয়। যেমন পরিপাক শক্তিতে 'ঊন'ব্যক্তি সম্যক্ আহার গ্রহণের অক্ষমতার পরিপূরক হিসেবে খাদ্যের বিকল্প হিসেবে অন্য জিনিষের প্রতিও অতিরিক্ত আগ্রহশীল হ'য়ে উঠতে পারে। যেমন টাকা। এ ধরণের লোকদের আহার্য্যের প্রতি লোভের গতির 'মোড়'টা ফিরে যায় টাকা জমানোর লোভের দিকে। ভবিষ্যৎ-জীবনে এরা হয় কৃপণ আর না হয় ব্যাঙ্কার হ'য়ে দাঁড়ায়। এই লোভ খুব উগ্র হ'য়ে উঠে এদিকে তাদের দিবারাত্রি প্রচণ্ড পরিশ্রম করায়। এ অবস্থায় এরা ব্যবসা বা টাকা বাড়ানোর চিন্তাকে মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারে না। এর ফলে সমব্যবসায়ীদের পরাস্ত ক'রে অনেক সময় সেদিক্ দিয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করতে পারে। সেই জন্যেই প্রায়ই আমরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ প্রভূত ধনশালী কৃতী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেরই পরিপাকশক্তির ঊনতার কথা শুনতে পাই। দেহ ও মনের পারস্পরিক যে সম্বন্ধের কথাটির উল্লেখ অহরহঃই দেখতে পাওয়া যায় সে কথাটাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে শরীরগত কোনো ঊনতার ফল সকল লোকের পক্ষে একই রকমের হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন রকমে দেখা দেয়। এটা হয় কেন? কারণ দৈহিক ঊনতার সঙ্গে 'জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' এবং 'জীবনযাত্রা প্রণালীর' মধ্যে কোনো সত্যিকার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে ঠিকমত ওষুধপত্র ও বলকারক পথ্যাদির ব্যবস্থা ক'রে দেহগত ঊনতার অন্ততঃ পক্ষে কথঞ্চিৎ প্রতিকারও করা যেতে পারে। কিন্তু তা হ'লেও দেখা যায় যে তবুও রোগীর উন্নতি হয় না। এর কারণ আর কিছুই নয়, এর কারণ হ'চ্ছে এই যে, সে ক্ষেত্রে রোগীর জীবনের অসাফল্যের জন্যে তার দৈহিক 'ঊনতা'টাই ঠিক দায়ী নয়—আসলে দায়ী হ'চ্ছে জীবনের প্রতি রোগীর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি—তার জীবনকে গ্রহণ করার দুষ্ট প্রণালী।

সেই জন্যে Individual psychologyতে জীবনে অসাফল্যের কারণ হিসেবে দৈহিক ঊনতা স্বীকৃত নয়। এ ধারার মনোবিজ্ঞানীর মতে দৈহিক ঊনতা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটাই তার অসাফল্যের কারণ। সেই জন্যে Individual psychologistরা, ছেলেরা তাদের মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ ও নমুনাটি যে বয়সে গড়ে নেয় তাদের সেই চার-পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই হীনতাবোধের বিরুদ্ধে তাদের শিক্ষিত করার পক্ষপাতী।

অনেক লোকের মধ্যে ধৈর্য্যের অভাব দেখা যায়। এরা অসুবিধা অতিক্রম করবার জন্যে যেটুকু দরকার সে সময়টুকু প্রতীক্ষা করতে পারে না। যখনই আমরা এই ধরণের লোক দেখবো যারা সব সময়ই ছটফট্ আর 'ধড়ফড়' করে বেড়াচ্ছে আর একটুতেই 'রেগে-মেগে' ক্ষেপে অস্থির হ'য়ে উঠছে তখনই বুঝতে হবে যে সে লোক তীব্র রকমের হীনমন্যতা রোগে ভুগচে। কারণ যে-লোক জানে যে অসুবিধাকে অতিক্রম করার তার শক্তি আছে, সে লোক কখনো 'ধৈর্য্য-হারা' হয় না। এমন কি যতটা দরকার ততটা সাফল্য অর্জ্জিত না হ'লেও তারা 'দমে' যায় না।

অবাধ্য, একগুঁয়ে এবং কলহপরায়ণ ছেলেরাও হীনমন্যতার রোগী। এ-রকম ক্ষেত্রে আমাদের দেখা উচিত যে ছেলেটির সত্যিকার অসুবিধাটা কি। প্রকৃত অসুবিধার সন্ধান আবিষ্কার করতে পারলে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর হয়। এ অবস্থায় ছেলেদের গঠিত বা গঠনোন্মুখ নমুনায় (prototypeএ) ত্রুটি দেখলে সে জন্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তাড়না বা শাস্তি-বিধান করা কখনও উচিত নয়। ছেলেদের মনের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শনির্দ্দেশক এই সব প্রাথমিক নমুনা গঠনের সময়টিতে (তাদের চার-পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে) তাদের মনের গতি ও ধরণ-ধারণ সব অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুদের মধ্যে এটা রীতিমত লক্ষ্য করবার জিনিষ। নানা অদ্ভুত জিনিষের প্রতি তাদের আগ্রহ পুষ্ট হতে থাকে—অন্য ছেলেদের অতিক্রম করে বড়ো হ'য়ে ওঠবারও নানান রকমের পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করে।

এক ধরণের ছেলে দেখতে পাওয়া যায় যাদের নিজেদের চলা-বলা প্রভৃতি প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়ে তাদের নিজেদের ওপরে অবিশ্বাসের অভাবটি সুস্পষ্ট ভাবে সূচিত হয়। এ সব ছেলেরা জীবনে আর সবাইকে বাদ দিয়ে চল্‌তে চায়। নতুন পরিবেশের মধ্যে যেতে এরা নারাজ। এরা নিজেদের জীবনের সুপরিচিত সঙ্কীর্ণ-পরিধিটুকুর মধ্যেই নিশ্চিন্তে থাকতে চায়। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রে—স্কুলে, সমাজে, এমন কি নিজেদের বিবাহ-ব্যাপারে পর্য্যন্ত এদের এই মনোভাবটি সব সময়ই এদের ওপর আধিপত্য করতে থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বদাই এরা নিজেদের ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যেই বড়ো হয়ে থাক্‌তে চায় আর জীবনের সব ব্যাপারেই ওই রকম জানাশোনা ধরা-বাঁধা ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকুর মধ্যে 'বড়ো' হ'য়ে থেকে যাবার আশাই পোষণ করে।

এরা ভুলে যায় যে 'সাফল্য' লাভ করতে হ'লে সব রকম অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকাটাই আগে দরকার। এরা বোঝে না যে সাফল্য লাভের মূলমন্ত্রই হ'চ্চে সব রকমের প্রতিকূলতার সঙ্গে 'মুখোমুখি' দাঁড়াবার সাহস এবং অভ্যাস। বেছে বেছে কতকগুলো পরিবেশ এবং কতকগুলো মানুষকে বাদ দিয়ে চলবার ইচ্ছাটা সহজ সাধারণ বুদ্ধিপ্রণোদিত ইচ্ছা (common sense) নয়—এ হ'চ্চে তার নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ ধরণের বুদ্ধি (private intelligence)। এ ধরণের private intelligenceকে সমাজ সহজ সুবুদ্ধি বলে স্বীকার করে না। সুতরাং সমাজে প্রতিষ্ঠা বা সাফল্য লাভ করতে হলে এ ধরণের বুদ্ধি ও মনোভাব একেবারেই 'অচল'। পাকা ইমারত ভালো ভাবে তৈরী ক'র্‌তে হ'লে তাকে রোদ-জল খাইয়ে নিতে হয়। ভালো আসবাব তৈরী করতে হলে তার কাঠটাকে শক্ত করবার জন্যে সেটাকে রোদে-জলে আগে পোক্ত (season) করে নেওয়া চাই। তবেই পরে প্রতিকূল আবহাওয়াতেও সে কাঠ আর কমে বেড়ে আসবাবের গঠনকে (shape) বিকৃত করে দিতে পারবে না।

রোদ-জল থেকে বাঁচিয়ে পরম যত্নে 'পুতু পুতু' করে লালন করতে হয় পরগাছাকেই (orchid), বট-অশ্বত্থের মত বড় বড় বৃক্ষ বেড়ে ওঠে ছাদের কঠিন কার্ণিশে, শক্ত পাথরের ফাটলে—রোদ-

জলকে অগ্রাহ্য ক'রে তার প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই। সমাজের বড় বড় প্রতিভাধর মনীষীরা হচ্চেন সেই সব বড় বড় গাছ যে সব বড়ো বড়ো গাছে ঝড়টা সব চেয়ে আগে লাগে এবং তবুও যারা সে সব প্রতিকূল ঝড়ের মুখেও শক্ত শেকড়ের সাহায্যে মাটি আঁকড়ে খাড়াই দাঁড়িয়ে থাকে। এঁরাই হচ্চেন সত্যিকার বড়ো মানুষ—আদর্শ মানুষ। এঁদেরই সমাজ খাতির করে। 'পুতু পুতু' ক'রে বেঁচে থাকা 'অর্কিড' জাতীয় মানুষকে কেউ খাতির করে না; সমাজে সে মানুষ অশ্রদ্ধেয়।

অবশ্য পরে শক্তিমান মহীরুহ হয়ে দাঁড়ায় এমন গাছকেও যে শৈশবে সযত্নে রক্ষা করার দরকার না হয় তা নয়। কিন্তু সে যত্নেরও সীমা আছে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে রোদ-জলের মধ্যেই তাকেও বড় হ'তে হয়। কেবল রোদ-জলের আধিক্য থেকে আর জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে তাকে প্রথম দিক্‌টায় একটু রক্ষা করতে হয় মাত্র—তার বেশী নয়। চিন্তাশীল দার্শনিক হয়ে যিনি সমাজের কল্যাণ সাধন করবেন, প্রাথমিক সাধনার সময়ে তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নির্জ্জন বাস প্রভৃতি অনুকূল সুযোগের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়, এ কথা ঠিকই। কিন্তু তাঁকেও আবার পরে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দিয়েই বেড়ে উঠতে হবে—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। তা না হ'লে তিনি তাঁর চিন্তার জগতেও ভারসাম্য রক্ষা করতে শিখবেন না। বাস্তব জগতের সঙ্গে তাল রেখে চিন্তার জগতে ভারসাম্য রক্ষায় অক্ষম দার্শনিক সমাজের পক্ষে মূল্যহীন।

সমাজের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন সর্ব্বত্রই একটি জিনিষ চোখে পড়ে: সেটা হচ্চে এই যে, সবাই কেবল সুযোগ খুঁজচে যে, কোথা দিয়ে কেমন ক'রে সে বড়ো হ'য়ে উঠবে। এটা কিছু দোষের ব্যাপার নয়, বরং এইটাই জীবনের ধর্ম্ম। কিন্তু এই বড়ো হয়ে ওঠার 'কায়দাটা' কার কেমন হবে, তার ওপরই নির্ভর ক'রচে সমাজের পক্ষে সে কেজো হবে কি অকেজো হবে। বড়ো চোর, জালিয়াৎ, ডাকাত, খুনীরা তাদের private intelligence-এর হিসেবে বড়ো হতে পারে কিন্তু সমাজ তাদের সেই বিশেষ ধরণের বড়ত্বকে কোন মূল্যই দেয় না। যে সব ছেলেদের মধ্যে হীনমন্যতার প্রভাবটা বেশী প্রবল তারা কেবলই 'শক্ত' ছেলেদের পরিহার করে নিজের চেয়ে দুর্ব্বল ছেলেদের মাঝখানেই থাকতে চায়, তাদের সঙ্গে খেলা করতেই ভালোবাসে। কারণ নিজের চেয়ে দুর্ব্বল ছেলেদের ওপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব করার তার সুযোগ থাকে। এদের উৎপীড়ন করে শাসনে রেখে এদের ওপর 'মোড়লি' করে তার 'বড়ো হয়ে থেকে যাওয়ার' স্বপ্নটা সফল হয়। এ ধরণের হীনমন্যতার দস্তুরমত চিকিৎসা হওয়া দরকার কারণ রোগটি এখানে বেশ প্রবল।

হীনমন্যতার নানান রকমের রূপ ও ক্রম দেখতে পাওয়া যায়। এমন লোক আছে কর্ম্মস্থলে যার হীনমন্যতা ধরা পড়ে না, কারণ সেখানে নিজের করণীয় কাজটুকু সম্বন্ধে তার আত্মবিশ্বাস অটুট। কিন্তু সেই লোকেরই হীনমন্যতা আমরা ধরতে পারি সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সে যখন আসে, কিম্বা সে পুরুষ হ'লে নারীর কিম্বা নারী হ'লে পুরুষের সংস্পর্শে যখন সে এসে পড়ে। অর্থাৎ পরিবেশ বদল করলেই অনেক লোকের 'গুপ্ত' হীনমন্যতা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ছেলেদের যেমন ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করা যায়, ছেলেটিকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েও আমরা তার সেখানকার ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সহজভাবে মেলা-মেশা করচে, না, তাদের এড়িয়ে চ'লচে সেটা লক্ষ্য করার জিনিষ। যদি দেখা যায় যে এমন অতি উৎসাহ বা ধূর্ত্ততার লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যার দরুণ তাকে 'বিচ্ছু' ছেলে বলাও চলতে পারে তা' হ'লে বুঝতে হবে যে, কারণ অনুসন্ধানের জন্যে তাকে পরীক্ষা করা দরকার হ'য়ে প'ড়েচে। যে-ছেলের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা বা দ্বিধার ভাব দেখা যাচ্ছে বুঝতে হবে তার ভবিষ্যৎ জীবনটাও ঐ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে চলেচে। এই ভাবে চলতে থাকলে পরে সমাজের বিস্তৃততর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং তার বিবাহের সময় এই মনোভাবের আধিপত্যই আত্মপ্রকাশ ক'রবে।

আমরা তো 'হামেশা'ই এমন লোকদের সংস্পর্শে আসছি যারা বলে, 'আমি হ'লে কাজটা এই ভাবে করতুম', 'আমি ঐ চাকরীটা নিতুম' কিম্বা 'আমি ওই লোকটাকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিতুম'—যদি না…' শেষের দিকে একটা মস্ত 'যদি না'-যুক্ত এই ধরণের উক্তি মাত্রই হ'চ্ছে এই সব লোকের হীনমন্যতার পরিচায়ক। এরা সব সময়েই সংশয়ের দোলায় দুলচে। বিরাট উঁচু ঐ 'যদি না'র পাঁচীলটার ধাক্কা খেয়ে এদের ভালো ভালো সব সাধু ও মহৎ উদ্দেশ্য সারাজীবন ধরেই ব্যর্থ হ'তে হ'তে এদের জীবনটাই শেষে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। মহিলা কবির ভাষায় এদের ব্যাপার হ'চ্ছে সেই,—

> 'করিতে পারি না কাজ,
> সদা ভয় সদা লাজ,
> সংশয়ে সঙ্কল্প সদা টলে—
> পাছে লোকে কিছু বলে।' (গোছের।

এদের চেয়ে যারা স্পষ্ট কথায় বলতে পারে আমি অমুক কাজটা 'করবো' কিম্বা 'করবো না'—এদের দ্বারা সংসারে কাজ হয় তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়।

অনেক লোকের মধ্যে একটা পরস্পরবিরোধী ভাব সব সময়ই দেখতে পাওয়া যায়। কুমারসম্ভবে কবি কালিদাস-বর্ণিত ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, ঈষৎ আন্দোলিত চিত্ত মহেশের সম্মুখে তাপসী উমার সেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব। কাব্যের রসসৃষ্টির পক্ষে যেমনই হোক বাস্তব জীবনে চাকরীর জন্যে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে সার্ভিস কমিশনের বা সিলেকশন বোর্ডের মেম্বরদের সামনে কর্ম্মপ্রার্থীর এই যে মনোভাব—এ মনোভাব হীনমন্যতা-প্রসূতই। শরৎচন্দ্রের বড়দিদির নায়ক সুরেন্দ্র চাকরী খুঁজতে গিয়ে বড়োলোকের বাড়ীর ফটক থেকে প্রথম দিন ফিরে এসেছিলো এই ধরণের হীনমন্যতার প্রভাবেই।

এদের চিত্তের এই দ্বিধান্দোলিত অবস্থা থেকে এদের মুক্ত করা দরকার। এবং তাই করবার উপায় হচ্চে সত্যিকার সহানুভূতি ও প্রীতির সঙ্গে এদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করা। উৎসাহ দিয়ে এদের ভালো করে এই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া যে এরা আসলে মোটেই ছোটো নয়। বোঝানো যে, 'তোমরাও পারো, দিব্যি পারো।' কাজটা তোমাদের পক্ষে সত্যি সত্যি একটুও কঠিন নয়। এই ভাবে আত্মবিশ্বাস জিনিষটিকে এদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েই এদের সারিয়ে তুলতে হয়।

[ক্রমশঃ।

পথ-জিজ্ঞাসা

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মত দুজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন লইয়া বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভ। কিন্তু বেদব্যাস বাদরায়ণের একটা সুবিধা ছিল, উত্তরটা তিনি উপনিষদের ঋষিদের নিকট হইতে উপস্থিত-তৈয়ারী (ready made) অবস্থায় পাইয়াছিলেন। আমাদের পথ-জিজ্ঞাসা অতি বাস্তব, হয়ত বা শ্রৌত দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে হইলেও উপস্থিত তৈয়ারী কোন উত্তর পাওয়া সত্যই কঠিন বলিয়া মনে হয়। পথ-জিজ্ঞাসার উত্তর সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ঋষিরা সকলে একমত নহেন। কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা, মুস্লিম লীগ, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, রায়বাদী এবং মার্কস্‌বাদীদের আরও বিভিন্ন দল ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অবশ্য 'যত মত তত পথেব' একটা আপ্ত বাক্যের কথা আমরাও শুনিয়াছি। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে উহার যতই মূল্য থাকুক, রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছিবার পক্ষে উহার কার্য্যকারিতা আজিও প্রমাণিত হয় নাই। বরং বিভিন্ন মত ও পথেব ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এ পর্য্যন্ত শুধু বানচাল হইয়াই আসিয়াছে। নানা পথেব ঘূর্ণাবর্ত্তেব মধ্যে প্রকৃত পথেব সন্ধান পাইবার একটি দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের সন্ধান ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিব অবশ্য আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহাকেও পথ-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ', তাঁহাব এই উত্তরে বকরূপী ধর্ম্ম খুশি হইলেও আমাদের সমস্যার সমাধান তাহাতে হয় না। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলিব মধ্যে 'মহাজন কে' এই জিজ্ঞাসার উত্তর আমাদেরই নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাস দ্বারা পাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন, দেশের যিনি অবিসংবাদী নেতা, বিনা প্রতিবাদে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলাই একমাত্র মহাজন-নির্দ্দেশিত পথ। তাঁহার প্রদর্শিত পথকে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাস দ্বারা যাচাই করিতে গেলে নেতৃত্বকে খাটো করা হয়, নেতার মর্য্যাদাহানি হইয়া থাকে। দেশবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য নেতার আদেশ নির্ব্বিচারে প্রতিপালন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করা। ইংরেজ কবি টেনিসনের কথায় বলা যায় 'Their's not to reason why, their's but to do and die.' উত্তরটা তাক লাগাইয়া দিবার মতই বটে! কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শেষ পর্য্যন্ত দেশের অবিসংবাদী নেতা সম্বন্ধে অবিসংবাদী মত পাওয়া যায় না। আবার নেতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে গেলেও নিরীহ বেচারীর মাথা ফাটিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে। আর নিরীহ না হইলে মাথা ফাটাফাটি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। পূর্ব্ববঙ্গে অবশ্য একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে, 'চার বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র, তার উপর ডাঙ্গাই অস্ত্র।' ইহার সার মর্ম্ম এই যে, চাব বেদ এবং চৌদ্দ শাস্ত্রের উপরেও বড় শাস্ত্র লাঠি। লাঠির দ্বারা পথ নির্দ্দেশ শুধু ফ্যাসিষ্ট-সুলভ নীতি কি-না জানি না, কিন্তু লাঠির মীমাংসা স্থায়ী হয় না কোন দিনই তা সে যত বড় লাঠিয়ালের লাঠিই হউক। কিন্তু একথা অতি সত্য যে, জাতির জীবনে নানা মত ও পথের ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি হওয়া নূতন কোন ঘটনা না হইলেও বর্ত্তমানে নানা দিক্‌-অভিমুখী পথ নির্দ্দেশের আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতবাসী আজ বিমূঢ়প্রায়। ডেনমার্কের দুর্ব্বলচিত্ত রাজকুমার হ্যামলেটের মতই বর্ত্তমানে ভারতবাসীর কাছে "The time is out of joint" বলিয়া অবশ্যই মনে হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া

"...O cursed spite,
That ever I was born to set it right!"

এ কথা বলিয়া ভাগ্যকে ধিক্কার দিলে তাহাদের চলিবে না, সত্যিকার পথ অবশ্যই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

অবিশ্বাস, আশঙ্কা, সন্দেহ, বিদ্বেষ এবং পরস্পরের প্রতি কটূক্তির তীব্রতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অতীতে কোন সময়েই তাহার তুলনা মিলে না। পাকিস্থানের কণামাত্র কম হইলেও মিঃ জিন্নার চলিবে না। শুধু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট নহেন। হিন্দু-মুসলমান যে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি, মুসলমানদের একমাত্র নেতা যে মিঃ জিন্না এবং মুস্লিম লীগই মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি, ইহাও সেই সঙ্গে মানিয়া লইতে হইবে। হিন্দু-মহাসভা 'অখণ্ড হিন্দুস্থান' ছাড়িয়া 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ছয় শতাধিক দেশীয় রাজন্যবর্গের অস্তিত্ব সত্ত্বে ভারতেব অখণ্ডত্ব কিরূপে রক্ষিত হইবে, অখণ্ড হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠার উৎসাহে সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কোচিন ষ্টেট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে মেনিফেষ্টো প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভাবী স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে কোচিন রাজ্য একটি স্বাধীন রাজনৈতিক ইউনিট (independent political unit) হিসাবে মহারাজের শাসনাধীনে থাকিবে। দেশীয় রাজন্যবর্গেব স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা সম্বন্ধে মহাসভা ও মুস্লিম লীগেব মধ্যে কোন মতানৈক্য আছে বলিয়া আমরা জানি না। কংগ্রেস অখণ্ড ভারত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সামঞ্জস্য বিধানের এই চেষ্টার মধ্যে একটা অস্পষ্টতা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কোন জনগণকে তাহাদের বিঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকিবার জন্য কংগ্রেস বাধ্য করিতে পারে না। কিন্তু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এলাহাবাদ অধিবেশনে অখণ্ড ভারত অথবা যৌথ রাষ্ট্রসমন্বিত ভারত হইতে কোন অঞ্চলের সম্পর্কচ্ছেদের দাবী মানিয়া লইয়া কংগ্রেস ভারতকে বিভক্ত হইতে দিবে না, এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। উভয় প্রস্তাব যে পরস্পরবিরোধী তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য উভয় প্রস্তাবেব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেব চেষ্টায় সদ্য সমাপ্ত ওয়ার্কিং কমিটির পুণা অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এখানে তাহা বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সামঞ্জস্য যে সাধিত হইয়াছে তাহা মনে করা কঠিন। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি বিশেষভাবে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা হইতে কংগ্রেস এবং মুস্লিম লীগই যে সম্পূর্ণরূপে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে কি? নতুবা কংগ্রেস-লীগের ঐক্য সাধিত হইলেই জাতীয় ঐক্য সাধিত হইল, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়? রায়বাদিগণ (র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি) বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্নই শুধু করেন নাই, কংগ্রেসের তাঁহারা ঘোর বিরোধী। তাঁহারা মনে করেন, এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এখন

শুধু ভারতীয় জনগণের উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিলেই আমাদের স্বাধীন হওয়ার আর কিছু বাকী রহিল না। রায়বাদী দল ভারতের জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (people's plan) এবং শাসনতন্ত্রের একটি খসড়াও তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে পৃথক্ ভাবে বিশেষ কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না। যুগান্তর দল বরাবরই কংগ্রেসে আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের বৈপ্লবিক মত সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তবে কার্য্যকরী নীতি হিসাবে কংগ্রেসকেই তাঁহারা অনুসরণ করিয়া চলিবেন, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। কংগ্রেসের মধ্যে অন্য দলকে তাঁহারা সহ্য করিবেন কি না, ফরওয়ার্ড ব্লকের ব্যাপারে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে এখন পর্যন্ত যতটুকু বুঝা যায়, কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করায় কংগ্রেসের মধ্যে দ্বিতীয় কোন দলের সার্থকতা তাঁহারা হয়ত স্বীকার করিবেন না। কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইলেও ফরওয়ার্ড ব্লক আসলে গান্ধীপন্থীদের মধ্যে বামপন্থী ছাড়া আর কিছুই নহেন। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দল সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে Socialism Reconsidered-এর পরে মহাত্মা গান্ধীর জমিদার ও প্রজা, মিলমালিক ও শ্রমিকে এক ঘাটে জল খাওয়াইবার প্রচেষ্টার সম্মুখে কাল মার্কসের শ্রেণীসংগ্রাম একান্ত সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। সে কালের অনুশীলন দল বর্ত্তমানে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলে (R. S. P.) পরিণত হইয়াছে। কার্য্যকরী নীতি হিসাবে যুগান্তর দলের মত কংগ্রেসকেই তাঁহারা অনুসরণ করিয়া চলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় সমূহের এবং জাতীয়তা-বাদী মুসলমানদের কথা উল্লেখ না করিলে ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা সমূহের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আম্বেদকার-পন্থীরা কংগ্রেসকে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধি স্বীকার করেন না। এই বিষয়ে মুসলিম লীগের সহিত তাঁহাদের মত-সাদৃশ্য বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে বাংলার কৃষক-প্রজাদল, মজলিসে অহ্‌রার, জমায়েৎউল উলামায়ে হিন্দ, মোমিন সম্মেলন প্রভৃতির মতবাদ পৃথক্ ভাবে এখানে আলোচনা করার স্থানাভাব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবী-দাওয়ার মধ্যে একটা কথা সত্য যে, সকলেরই লক্ষ্য স্বাধীনতা,—এমন কি মিঃ জিন্না এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় সমূহ পর্য্যন্ত এই দাবী হইতে বাদ পড়েন না। লীগ যে ভারতের পূর্ণ জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার, এ কথা ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে মিঃ জিন্না তাঁহার অভিভাষণে এক স্থানে বলিয়াছেন, "আমরাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার দাবীদার। কিন্তু..............." সকলেই অবশ্য বলিবেন যে, এই 'কিন্তুই' হইয়াছে কাল। মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবই কালক্রমে পাকিস্থান প্রস্তাব নামে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। অথচ লাহোর প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্থানের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই, পাকিস্থানের মূলতত্ত্বও এই প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমান যে দুই স্বতন্ত্র জাতি তাহাও এই প্রস্তাবে বলা হয় নাই। মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবীই এই প্রস্তাবের মূল কথা। কিন্তু আজ মিঃ জিন্নার কাছে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার, স্বাধীনতা এবং পাকিস্থান একার্থ-বোধক। এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে যে, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ইহার সকলের লক্ষ্যই যদি স্বাধীনতা হয়, তাহা হইলে কেহ পাকিস্থান কেহ অখণ্ড হিন্দুস্থান প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী দাবী তুলিয়া স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন কেন? এই সকল দাবী-দাওয়া কি আসলে আমাদের শাসকবর্গের 'Divide and rule' নীতি হইতেই প্রসূত হয় নাই? এই প্রশ্ন দুইটি প্রকৃতপক্ষে একই সমস্যারই দুইটি দিক্ মাত্র। তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিই অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে, এই দাবী স্বীকার করার পরেও দুইটি প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। অনৈক্য সৃষ্টি করিবার মত উপাদান কি আমাদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, না, আমাদের শাসকবর্গ কৃত্রিম উপায়ে এই অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছেন? দ্বিতীয়তঃ, শাসকবর্গের ভেদনীতির জন্যই অনৈক্য সৃষ্টি হইয়াছে, এই সত্য যদি সত্যই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি তাহা হইলে শাসকবর্গের ভেদনীতিকে ভেদ আমরা করিতে পারিতেছি না কেন? তাঁহাদের ভেদনীতির অস্ত্রকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমরা কেন প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না? ভারতবাসী হিসাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত আমরা করিতে পারি নাই। ইহা সত্য কথা। বৈদেশিক শাসকবর্গের ভেদনীতির জন্যই আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি ইহাই নহে যে, অনিচ্ছুক শাসকবর্গের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিতে আমরা ব্যর্থকাম হইয়াছি? আমরা যখন কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তুলিয়া ঘোষণা করি, আমাদের শাসকবর্গের ভেদ-নীতির জন্যই আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছি না, তখন কি আমরা ইহাই প্রত্যাশা করি যে, শাসকবর্গ আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সুবিধা দিবার জন্য ভেদনীতির অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বিরত থাকিবেন। ইংরেজ স্বেচ্ছায় কিছুতেই ভারতকে স্বাধীনতা দিবে না এবং না দিবার অজুহাত-স্বরূপ সাম্প্রদায়িক অনৈক্য সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, ইহাই যদি যথার্থ কথা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের এই অজুহাতটাকে আমরা টিকিয়া থাকিতে দিতেছি কেন? অন্য দেশকে অধীন করিয়া রাখা পাপ মনে করিয়া ইংরেজ লোটা-কম্বল সহ জাহাজে চড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহা যদি আমরা প্রত্যাশা না করি, তবে স্বাধীনতা আমাদের নিজেদের সামর্থ্য দ্বারাই অর্জ্জন করিতে হইবে, ইহার জন্য যত কিছু ত্যাগ স্বীকার তাহার কোনটা করিতেই বিরত থাকা চলিবে না, সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অশুভ ও অকল্যাণকেই শুভ এবং কল্যাণে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমরা কি চাই, ঐতিহাসিক দৃষ্টি কেন্দ্র হইতে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্যও আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

আমরা কি চাই, তাহার উত্তরটা খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। আমরা চাই স্বাধীনতা, শুধু স্বাধীনতা নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝি? বুঝি ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান। তার পর কি হইবে? আমরা স্বাধীন হইব। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বরূপ কি হইবে? এইখানেই আসিয়া পড়ে শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্ন, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন শ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণ

অধিকারের দাবী। বৈদেশিক শাসনের অবসানই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়—স্বাধীনতাই স্বাধীনতার লক্ষ্য নয়, স্বাধীনতা আরও বৃহত্তর কিছু অর্জ্জনের উপায়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, স্বাধীনতা লাভই স্বাধীনতার শেষ কথা, স্বাধীনতার দাবী আমাদের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতার দাবী আমাদের রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করিব না, শুধু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, স্বাধীনতার দাবী রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ভেদ-বিদ্বেষ-অনৈক্য ভুলিয়া সমগ্র দেশবাসী স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদানের জন্য উন্মাদের মত দলে দলে ছুটিয়া আসে না কেন? কোন্ টানের কাছে রক্তের টান ব্যর্থ হয়? আমাদের জাতীয় আন্দোলনগুলির ইতিহাস শুধু ব্যর্থতার ইতিহাস কেন? স্বাধীনতার দাবী রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও ভেদনীতি আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিতেছে কিরূপে? যাঁহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা স্বাধীনতাকে শুধু সস্তা আবেগ উত্তেজনার বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না—স্বাধীনতাকে তাঁহারা আরও বৃহত্তর উদ্দেশ্যের উপায় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈদেশিক শাসন ও শোষণ হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। অর্জ্জিত স্বাধীনতা আমরা কি ভাবে ভোগ করিব তাহা লইয়া আগেই কালনেমির লঙ্কাভাগ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করিতে গেলে স্বাধীনতাই আমরা অর্জ্জন করিতে পারিব না। প্রথমে চাই পরাধীনতার উচ্ছেদ। ইহাই আমাদের প্রথম কাজ। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার পর দেশের সকলেই যাহাতে উহা ভোগ করিতে পারে তাহার উপযোগী করিয়া সমাজ গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহাদের এই যুক্তির সারবত্তা মোটেই উপেক্ষার বিষয় নহে। হিন্দু সম্রাট্ হইবে, না মুসলমান বাদশাহ হইবে, ইহা লইয়া যখন আমরা ঝগড়া করিতেছিলাম, ইংরেজ সেই সুযোগে ভারতের শাসন-রজ্জু দখল করিয়া লইয়াছে। আজও সেই ঝগড়ার জের চলিতেছে। কিন্তু আমরা যদি স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই স্বাধীনতার ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া ঝগড়া সুরু করিয়া দিই, তাহা হইলে স্বাধীনতাই আর লাভ হইবে না। কিন্তু সমস্যার সমাধান অত সহজে যে হয় না অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। পাকিস্থান এবং অখণ্ড হিন্দুস্থানের লড়াই বন্ধ রাখিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কাহাকেও আমরা দেখিতেছি না। আমরা দেখিতেছি, মুসলিম লীগ পাকিস্থানের জন্য শেষ রক্ত-বিন্দু পর্য্যন্ত লড়াই করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দু মহাসভাও পাকিস্থানের বিরোধিতা করিবার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত লড়াই করিতে প্রস্তুত। গত ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এফেয়ার্সের বোম্বাই শাখার অধিবেশনে স্যার পি, সি, রামস্বামী আয়ার জানাইয়াছেন যে, দেশীয় রাজন্যবর্গ পাকিস্থান বা ভারতকে বিভক্ত করিবার জন্য অনুরূপ কোন কল্পনার বিরোধী। কিন্তু ভাবী স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য যে স্থান তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্য এক একটি স্বতন্ত্র স্থান ছাড়া আর কিছুই হইবে না। অখণ্ড হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, তপশীলভুক্তদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান দাবীর মূল কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। কংগ্রেসই বা মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিতে চায় কেন এবং হিন্দু মহাসভা এই প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চক্ষে কে দেখে, এই প্রশ্নও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

বৈদেশিক শাসনের অবসানের অতিরিক্ত স্বাধীনতার আরও কো তাৎপর্য্য আছে কি না, এই প্রশ্নকে বাদ দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে যে শক্তিশালী করা সম্ভব নয় তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি সিপাহী-বিদ্রোহ যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন, ইহা আজকা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ যে স্বাধীনতা-জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য যে ঠিক সেই স্বাধীনতা নয়, এ কথাও বোধ হয় সকলেই স্বীকা করিবেন। সিপাহী-বিদ্রোহ যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি তাহা ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর খোস-খেয়াল মাফিক দেশ শাসন করিবার স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের তৎকালীন ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিগণ, বাংলার হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়, পাঞ্জাবের শিখগণ সিপাহী-বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভারতে নূতন শিল্পপতি শ্রেণীর অভ্যুদয় আরম্ভ হইলেও ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহারা তখনও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ইংরেজ এ দেশের রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সহযোগিতা পাইয়াছিল, একথা ঐতিহাসিক সত্য। এই সহযোগিতা হইতেই ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উৎপত্তি। ধনী জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর সকলেই ইংরেজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেস সৃষ্টির গোড়ায় ইঁহারাই ছিলেন ইহার পরিচালক। তাঁহাদের নিকট ধনী ও শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার অর্জ্জন করাই ছিল জাতীয় অধিকার অর্জ্জনের অর্থ। কংগ্রেসে মুসলমান একেবারেই যোগ দেয় নাই তাহা নয়, কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যাও ছিল তৎকালে খুব কম। সরকারের নিকট এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রাধান্য তখন শিক্ষিত হিন্দুদেরই। কিন্তু দেশে যে উদীয়মান শিল্পপতিদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কংগ্রেসে চরমপন্থী দলের সৃষ্টির মধ্যে। চরমপন্থী দল যে ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে তীব্র বিরোধের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়াও অনুরূপ বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তফাৎ এই যে, ১৯০৬ সালে যাঁহারা বামপন্থী ছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় তাঁহারাই দক্ষিণপন্থাতে পরিণত হইয়াছেন এবং সৃষ্ট হইয়াছে নূতন বামপন্থী দল। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং সভাপতি দাদাভাই নৌরজী স্বরাজ কথাটি সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেন। এই বৎসরই মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক ডেপুটেশন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার আসলে একটা command performance—হুকুম মাফিক কাজ ছাড়া যে আর কিছু ছিল না তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাক্ষাৎকারের ফলেই বৃটেনের ভারতীয় নীতি সাম্প্রদায়িকতার পথে পরিচালিত হওয়া স্থির হয়। ইহারই ফলস্বরূপ মুসলিম লীগ প্রসূত হইল। হিন্দু মহাসভার জন্মও ঠিক এই বৎসরেই।

বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলন ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ১৯১৪—১৮ সালের যুদ্ধের সময়ও বিদেশী পণ্য আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে শিল্পোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে উহার প্রতিক্রিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি ভারতীয় শিল্পপতি শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মধ্যে। শিল্পপতি শ্রেণী যখন প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিল তখন কংগ্রেস হইতে দক্ষিণ-পন্থীদের প্রভাব বিলুপ্ত হইল। ভারতে শিল্পপতিদের মুখপাত্ররূপে বামপন্থীরা কংগ্রেস দখল করিয়া লইলেন। সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজ শা মেটার কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। বৈদেশিক পুঁজির অসম প্রতিযোগিতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে মর্ম হইয়া উঠিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই স্বায়ত্ত শাসন লাভ করি অথবা পূর্ণ স্বাধীনতাই লাভ করি, কি পাইলে সত্যকার স্বাধীনতা পাওয়া হয়, স্বাধীনতা কাহার জন্য, এই প্রশ্ন জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ, জাতীয় আন্দোলন যতখানি গণতান্ত্রিক হয় স্বাধীনতা বা স্বরাজও ততখানি গণতান্ত্রিক হওয়ার আশা আমরা করিতে পারি। বোধ হয় বিপিনচন্দ্র পালই সর্ব্বপ্রথম গণতান্ত্রিক স্বরাজের কথা বলিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, স্বরাজ জনসাধারণের জন্য। শ্বেত আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে কালো আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যে স্বরাজের লক্ষ্য নয় এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। শ্বেত আমলাতন্ত্রের শক্তির উৎস বৃটিশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ। সুতরাং কালো আমলাতন্ত্রের শক্তির উৎস যে ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি জনগণের জন্য না হয় তাহা হইলে সেই স্বাধীন ভারতে ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাই হইবেন ভারতের ইংরেজ। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, 'তা হউক, বিদেশীদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হওয়া অপেক্ষা স্বদেশবাসী দ্বারা শাসিত ও শোষিত হওয়া অধিকতর শ্রেয়ঃ।' তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আমরা অস্বীকার করি না! কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বদেশবাসী দ্বারা শাসিত ও শোষিত হওয়ার লোভ জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে নাই। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে সভাপতি মিঃ রাঘবাচারী তাঁহার অভিভাষণে সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলেন। কিন্তু ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসের পূর্ব্বে কংগ্রেস প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করে নাই।

১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কংগ্রেস বুর্জ্জোয়া-পরিচালিত নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই হয় নাই এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে উহাতে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ, ত্রিপুরী কংগ্রেসে জাতীয় দাবী অপেক্ষা পন্থ-প্রস্তাব কেন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল ইহা মোটেই তাৎপর্য্যহীন নয়। এই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে জাতীয় আন্দোলনের গোড়া হইতেই আলোচনা আরম্ভ করা আবশ্যক। অসহযোগ আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন ভারতের জনগণ মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না এবং তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন চেষ্টাও করা হয় নাই। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হইলে দেখা গেল, জনসাধারণ আন্দোলনকে গ্রহণ করিবার পক্ষে যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। কংগ্রেসের আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিবর্ত্তিত হইতে খুব বেশী বাকীও ছিল না এবং নূতন নেতৃত্ব গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল। ঠিক এমনি সময়ে কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত সম্বন্ধহীন চৌরীচৌরার হিংসাত্মক ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন থামাইয়া দিলেন। আন্দোলন থামিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের মধ্যে। জাতীয় মনোভাবের পরিবর্ত্তে অতি উগ্র হিন্দু মনোভাব ও মুসলিম মনোভাব দেশকে পাইয়া বসিল। অসহযোগ আন্দোলন হইতে মহাত্মাজী যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের অধিকার সীমাবদ্ধ রাখিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। "When I am arrested' শীর্ষক প্রবন্ধে (২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০) মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, "Mass movement have, all over the world, thrown up unexpected leaders. This should not be exception to the rule. Whilest, therefore, every effort imaginable and possible should be made to restrain the forces of violence, C. D. once began this time, can not be stopped so long as there is single civil resister left free and alive."

মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিতে গণনেতৃত্ব অপ্রত্যাশিত নেতৃত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, গণ-আন্দোলন এবং আন্দোলন ছাড়া আর কিছু হইতে পারে বলিয়াও তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না, জাতীয় সংগ্রামের তাঁহারা বিরোধীই ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসীদের মধ্যেও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব অনুভূত হইতেছিল। উহার পরিচয় আমরা পাই, করাচী কংগ্রেসের জনগণের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে। কিন্তু করাচী প্রস্তাব ভারতের পুঁজিপতি এবং জমিদারদের মনে যথেষ্ট আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে (১৯৩৪) গৃহীত একটি প্রস্তাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন এবং শ্রেণী-সংগ্রাম যে কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ, সে সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়া দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদিগকে প্রসন্ন করিবার এবং তাঁহাদের আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁহারা সমাজতান্ত্রিক দলভুক্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী একদা বলিয়াছিলেন, "এই দলের কর্ম্মতালিকার পশ্চাতে এই ধারণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জনসাধারণ ও কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে এরূপ স্বার্থের বিরোধ নিশ্চয়ই রহিয়াছে যে, তাহারা কখনই একযোগে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারে না। আমি এই ধারণার পক্ষপাতী নহি। আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত ধারণারই পরিপোষক।" বস্তুতঃ, কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব শুধু একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। উহা ভারতের উদীয়মান ধনতন্ত্রের নেতৃত্ব। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মহাত্মার নেতৃত্বের

অভ্যুত্থান হইয়াছে, যত দিন তাহার পরিবর্ত্তন না হইতেছে তত দিন মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সেবা করিবেন। মহাত্মা গান্ধী এখনও ভারতীয় ধনিশ্রেণীর অভিপ্রায়কে স্পষ্ট ভাবে রূপ দিতে সমর্থ। তাই ১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলেও কংগ্রেসের দায়িত্বহীন নেতৃত্বে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্ব্ব পর্যান্ত উহা নিয়মানুগ ছিল না। পন্থ-প্রস্তাব দ্বারা উহাকে নিয়মানুগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই দায়িত্বহীন নেতৃত্বের সহিত যাহাতে খাপ খায় সেই উদ্দেশে ত্রিপুরী কংগ্রেসে এ-আই-সি সিকে কংগ্রেসের যে কোন বিধি-বিধান পরিবর্ত্তন ও কার্য্যকরী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই কি পন্থ-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল? জাতির পরম কল্যাণ সাধনই কি এই প্রস্তাবের প্রেরণা? এই সকল প্রশ্ন দেশবাসী ভাবিয়া দেখে নাই আজ পর্য্যন্তও।

বীর সাভারকর, মিঃ জিন্না এবং ডাঃ আম্বেদকারের জন্যই আমরা স্বাধীনতা পাইতেছি না, অনেক বার এ কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ভারতের অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষেও একরূপ অপ্রতিহত ও অমোঘ শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব যে, সরকারী ভেদ-নীতিপ্রসূত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল দলের পরস্পরবিরোধী দাবী সত্ত্বেও আমাদের শাসকবর্গ অনিচ্ছায় হইলেও কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনগণের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহযোগিতাই কংগ্রেসের স্বাধীনতা অর্জ্জনের শক্তিকে দুর্ব্বার করিয়া তুলিতে সমর্থ। জাগ্রত জনগণের এই শক্তি গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু গণ-জাগরণের সম্মুখে অপ্রত্যাশিত নেতৃত্বের অভ্যুদয় আশঙ্কায় মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় নেতৃত্বকে স্তম্ভিত হইতেও কি আমরা দেখি নাই? যত দিন জনগণের অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠে তত দিন তাহাদিগকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব। যত দিন এই সুযোগের সম্ভাবনা ছিল কংগ্রেস তত দিন গণ-সংযোগের জন্য উদ্যোগী হয় নাই। হয়ত বা কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব এবং এই নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা-ভূমি ভারতীয় শিল্পপতিদের মনে এই আশঙ্কা জাগিয়াছিল যে, গণশক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলে তাহারাই রাষ্ট্র-শক্তিকে অধিকার করিয়া বসিবে। এই আশঙ্কার জন্যই কংগ্রেস আন্তরিকতার সহিত গণ-সংযোগের কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করে নাই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই দেখা গেল, ভারতীয় কৃষক-শ্রমিকদের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস এই সকল কৃষক-শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা লাভ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিকে অব্যর্থ করিয়া তুলিতে পারিতেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে অস্পৃশ্য করিয়াই রাখিয়াছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে কার্ল মার্কসের মতবাদ লইয়া আরও অনেক বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কথা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি অবশেষে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া জাতীয়তাবাদের সহিত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহার পূর্ব্বে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের উদ্ভব হয়। আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে এবং তিন তিনটি গোল-টেবিল বৈঠকের কথা এখানে শুধু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আমাদের ঘাড়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতি' হিন্দু মহাসভার কাছে কংগ্রেসের 'মুসলিম তোষণ নীতি' বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে হিন্দু-মুস্লিম নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে সম্মিলিত স্মারক-লিপি দাখিল করিয়াছিলেন, কাহার অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য তাহা গৃহীত হইল না এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক এওয়ার্ড দিতে বাধ্য হইলেন, আজ সে কথা এখানে আলোচনা করিবার সুযোগ আমরা পাইব না। ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব্ব সাফল্য আমাদের শাসকবর্গকেও বিস্মিত না করিয়া পারে নাই। ১১টি প্রদেশে মোট ৪৮২টি মুস্লিম আসনের মধ্যে মুস্লিম লীগ মাত্র ১১০টি আসন দখল করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু অতঃপর ৭৮টি উপনির্ব্বাচনে মুস্লিম লীগই ৭৫টি আসন দখল করে। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ইস্লামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলিয়াই মিঃ জিন্না যে এইরূপ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইলে মুসলমানগণ হিন্দুদের দ্বারা অতিশয় নির্য্যাতিত হইবেন, এইরূপ আশঙ্কাও মুশ্লিম লীগ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ডাঃ আম্বেদকার আশঙ্কা করেন, ভারত স্বাধীন হইলে রাষ্ট্র উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারাই শাসিত হইবে! ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ করপোরেশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "নির্ব্বাচনগুলি যদি কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তবে তাহা এই যে, ভারতে এমন একটি শ্রেণী আছে—যে শ্রেণীর শাসক শ্রেণী হওয়া সুনিশ্চিত।"

১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনের পর দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী কৃষক-শ্রমিকগণ আশা করিয়াছিল যে, ফৈজপুর প্রস্তাব ও নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতি অন্ততঃ কতক পরিমাণে হইলেও কার্য্যে পরিণত করা হইবে; কিন্তু কৃষক-শ্রমিকদের দাবী যখন মুখর হইয়া উঠিল তখন কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে লব্ধ ক্ষমতা কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য ব্যবহার করিতে ত্রুটি করা হয় নাই। কংগ্রেস ভারত-শাসন আইনকে অচল করিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, এ কথা আমরা শুনিয়াছি। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগিতায় কংগ্রেসের শক্তি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়া আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে পারিত; কিন্তু কংগ্রেস সেই সুযোগ গ্রহণ করে নাই। বরং যে সকল কাজের জন্য আমরা বৃটিশ আমলাতন্ত্রের কঠোর নিন্দা করিয়া থাকি, কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে এবং আরও কোন কোন প্রদেশে শ্রমিকদের উপর গুলী বর্ষিত হইয়াছে। কংগ্রেসী প্রদেশ সমূহে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে যে প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলি দ্বারা কৃষকের কোনই লাভ হয় নাই, সুবিধা হইয়াছে শুধু ভূম্যধিকারীদের। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, "গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমিদার ও ভূম্যধিকারীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য অনুপ্রেরিত করিয়াছিলেন।

এই সব ভূম্যধিকারীর সত্ত্ব-সমূহকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।" কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমলে প্রবর্ত্তিত ভূমি-সংক্রান্ত আইনের দ্বারা কৃষকদের কি সুবিধা হইয়াছিল তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে আমরা দিব। মহাত্মা গান্ধীর চতুর্দ্দশ দফা কর্ম্মসূচী লইয়া যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি যে সকল কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করা স্থির করেন তন্মধ্যে একটি হইতেছে এই যে, যুক্তপ্রাদেশিক প্রজাস্বত্ব আইনের ১৭১ ধারার ফলে যে সকল প্রজা ভূমি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদিগকে ঐ জমি প্রত্যর্পণ করিবার অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাদের জন্য জমি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রজাস্বত্ব আইনকেই 'স্বাধীনতার সনদ' বলিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী যুক্তপ্রদেশের কৃষকদিগকে উপহার দিয়াছিলেন।

কংগ্রেস পছন্দ করুক আর নাই করুক, কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন বামপন্থী দল ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে। দেশের বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি এই সকল বামপন্থী দল দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে তাহাদের প্রাথমিক জয় সূচিত হয়। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন এবং সংগ্রামের কর্ম্মপদ্ধতি লইয়াই তাঁহারা ত্রিপুরী কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবের এক লগুড়াঘাতে তাঁহাদের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। পন্থ-প্রস্তাবের বিনিময়ে যে সম্মিলিত ফ্রণ্ট তাঁহারা গঠন করিলেন তাহা আসলে দক্ষিণপন্থীদের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আসলে যাহা হইল তাহা এই যে, বিভিন্ন বামপন্থী দলের মধ্যে ঐক্য সাধিত হওয়ার যে একটা সম্ভাবনা ছিল তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল।

আইন অমান্য আন্দোলনের পর হইতেই আপোষ-আলোচনার পথে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার আগ্রহ কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট দেখা যায়। স্বাধীনতা লাভের ইহাও অবশ্য একটা পথ সন্দেহ নাই। এই পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের শাসকবর্গ আমাদিগকে স্বাধীনতা না দিবার পক্ষে যে সকল অজুহাত উপস্থিত করিয়াছেন সেগুলির সমূলে উচ্ছেদ সাধন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই পথে সাফল্য লাভ করাও যে সম্ভব হয় নাই সিমলা সম্মেলন পর্য্যন্ত তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আগষ্ট প্রস্তাবে কংগ্রেসের সংগ্রামমুখী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর হইতে দেশকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতে কোন চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়া আগষ্ট প্রস্তাবের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব আছে এইরূপ সন্দেহ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন বন্দি-শিবিরে তখন দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল কংগ্রেস তাহার দায়িত্ব স্বীকার করে নাই, যদিও সিপাহী-বিদ্রোহের সহিত এক-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এই আন্দোলনের উচ্চ প্রশংসাই করা হইয়াছে। এই আন্দোলন সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে আরোপিত তথাকথিত অভিযোগ সত্ত্বেও এই আন্দোলনের মধ্যে কংগ্রেসের দুর্ব্বলতা বিশেষ ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোথায় এই দুর্ব্বলতা নেতৃবর্গ যদি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারেন তাহা হইলে আগষ্ট আন্দোলনের শিক্ষাও আমাদের জীবনে ব্যর্থ হইবে। কংগ্রেসকে হয় এমন শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে যে, আমাদের শাসকবর্গ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন, না হয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের বাধাস্বরূপ যে সকল অজুহাত আমাদের শাসকবর্গ উপস্থিত করেন কংগ্রেসকে সেগুলি সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে। এই দুইটি ছাড়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের আর তৃতীয় কোন পথ নাই। কংগ্রেস যদি স্বাধীনতার জন্য শেষোক্ত পথটি গ্রহণ করেন তাহা হইলে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী সম্পর্কে সন্তোষজনক মীমাংসা তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু কোন দিন তাহা সম্ভব হইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। কারণ, কোন সম্প্রদায় যখন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী করে তখন প্রকৃতপক্ষে ঐ দাবীটা আসে ঐ সম্প্রদায়ের ধনি-শ্রেণীর নিকট হইতে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রকৃতপক্ষে স্ব-সম্প্রদায়ের কৃষক ও শ্রমিকদিগকে নিরঙ্কুশ ভাবে শোষণ করিবার অধিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্য যে দেশে বহুসংখ্যক সম্প্রদায়ের বাস সেখানে প্রভাব প্রতিপত্তি-শালী সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্ব্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সন্দেহ ও বিদ্বেষ এত প্রবল আকার ধারণ করে যে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

কংগ্রেস যদি শেষোক্ত পথ গ্রহণ না করিয়া প্রথমোক্ত পথ গ্রহণ করেন তাহা হইলে সংগ্রামের পথেই স্বাধীনতা অর্জ্জনের আয়োজন করিতে হইবে। সংহত জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই এই সংগ্রামে জয়লাভের সুতীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ অস্ত্র। কিন্তু কংগ্রেসের শাখা-স্বরূপ কৃষক ও শ্রমিকদল গঠন করিতে গেলে এই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রস্তুত করিবার আশা ব্যর্থই হইবে। আজ কৃষক ও শ্রমিকদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিভিন্ন বামপন্থী দলের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার ভিতর দিয়াই কংগ্রেসকে গণসংযোগের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কৃষক ও শ্রমিকের আত্মচেতনা, শোষকদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য কংগ্রেসেরই অমূল্য সম্পদ এবং সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের শক্তিশালী অব্যর্থ অস্ত্র। কৃষক-শ্রমিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী দলগুলির সহযোগিতা গ্রহণে কংগ্রেস যদি বিরত থাকেন তাহা হইলে স্বাধীনতা অর্জ্জনের অমোঘ শক্তি হইতেই বঞ্চিত থাকিবেন।

—আগামী সংখ্যায়—

বাংলার লোকদেবতা ও দেবতা
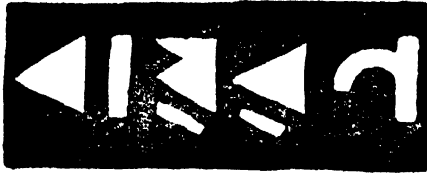
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বায়রণ ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে যে অশান্ত চিত্ত লইয়া তিনি একবার যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ততোধিক অশান্তির বহ্নি বক্ষে লইয়া তিনি আবার বাহির হইয়া পড়িলেন। বায়রণের প্রথম জীবনের চাইল্ড হেরল্ড যে তাঁহার পরবর্তী জীবনে এমন ভাবে সত্য হইয়া দেখা দিবে তাহা কি তিনি পূর্ব্বেই কল্পনা করিয়াছিলেন?

অয়ি মোর জন্মভূমি! বিদায়! বিদায়!
অস্তাচলে ছুটে চলে দেব দিনমণি
শেষ রশ্মি সাথে তার আমিও জননি
চলে যাই—ডুবে যাই—জনমের মত!

আমি চলিয়া গেলে কাহার ক্ষতি? কে-ই বা আমার জন্য কাঁদিবে? কাঁদিলেও মিথ্যা মায়া-ক্রন্দনে ভুলিব না। অবিশ্বাসিনী নারী দু'দিন বাদেই সব ভুলিয়া যাইবে।

For who would trust the seeming sighs
Of wife or paramour?
Fresh feeres will dry the bright blue eyes
We late saw streaming o'er.
For pleasures past I do not grieve,
Nor perils gathering near;
My greatest grief is that I leave
Nothing thet claims a tear.

* *

And now I'm in the world alone,
Upon the wide, wide sea:
But why should I for others groan,
When none will sigh for me?
Perchance my dog will whine in vain,
Till fed by stranger hands,
But long ere I come back again
He'd tear me where he stands.

প্রেয়সীর দীর্ঘশ্বাসে নায়িকার ছলনায়,
বলো তুমি, জেনে শুনে কে আর ভুলিতে চায়?
যে উজ্জ্বল নীল আঁখি বিরহের বরষায়
ঝরিবে অঝোর ঝরে, মুছাইয়া দিবে তায়
আবার নবীন সাথী—সে কোন নূতন প্রিয়;—
ফুটিবে আননে পুনঃ রাঙা আভা কমনীয়।
পুরাতন সুখ-স্মৃতি স্মরিয়া না দুখ পাই,
আকাশে জমিছে মেঘ—তাতে কোন ভয় নাই;
আমার প্রধান দুখ সেইখানে শুধু ভাই,
কাঁদিব যাহার তরে এমন কিছুই নাই।

★

বিশাল বারিধি 'পরে—অসীম সাগর-মাঝ—
সাথীহারা সর্ব্বহারা জগতে একাকী আজ।
অপরের তরে আমি কেন বৃথা করি শোক?
ফেলিতে একটি শ্বাস নাই যদি কোন লোক।
হয়ত কুকুর মোর ঘেউ ঘেউ করি রব
বৃথাই খুঁজিবে মোরে আঘ্রাণ লয়ে সব;
খাদ্য পাইয়া পরে অপরিচিতের হাতে,
কিছু পরে ফিরে এলে মোরেই ছিঁড়িবে দাঁতে।

ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া বায়রণ বেলজিয়াম ঘুরিয়া জেনেভায় গমন করিলেন। সেইখানে তিনি শেলী ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী মেরির সহিত পরিচিত হন। শেলীরাও এই সময়ে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহযাত্রিণী ছিল জেন ক্লেয়ারমণ্ট নাম্নী এক তরুণী। এই তরুণী পূর্ব্ব হইতেই বায়রণের প্রতি অনুরক্ত ছিল, এবং তাহারই প্ররোচনায় শেলীরা জেনেভায় আসেন ও বায়রণের সহিত পরিচিত হন। মিথ্যা অপবাদে প্রতিষ্ঠা হারাইয়া অশান্তচিত্ত বায়রণ যখন দিন দিন পাপের পথে নামিয়া যাইতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে জেন আপনাকে তাঁহার কাছে ধরা দিল। কিন্তু কিছু দিন পরেই জেনের বায়রণের প্রতি মোহ কাটিয়া গেল এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই অবৈধ প্রণয়ের ফলে কিছু দিন পরে কন্যা অ্যালেগ্রার জন্ম হয় এবং তখন হইতে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া কন্যার ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইয়া বায়রণকে কিছু অশান্তি ভোগ করিতে হয়। পরিশেষে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অ্যালেগ্রার মৃত্যু হইলে তিনি দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পান।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবশেষে শেলীরা যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন বায়রণ শরৎকালে তাঁহার বাসা ভেনিসে স্থানান্তরিত করিলেন। জেনেভায় অবস্থিতি কালেই তাঁহার "চাইল্ড হেরল্ড"এর তৃতীয় সর্গ এবং "The Prisoner of Chillon" প্রকাশিত হইয়াছিল। ভেনিসে আসিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল "Manfred" এবং "The Lament of Tasso." ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ সর্গ লিখিয়া তিনি "চাইল্ড হেরল্ড" শেষ করিলেন। এই শেষ সর্গটিই ছিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে বাহির হইল "বেপ্পো" এবং তাহার দুই মাস পরেই "ডন জোয়ানের" প্রথম দুইটি সর্গ প্রকাশিত হইল। ইহার পর মাঝে মাঝে তিনি "ডন জোয়ানে" লেখনী নিয়োগ করিলেও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর দেখিতে পাই এমন সুন্দর পুস্তকটি অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভেনিসের এক সান্ধ্য সম্মেলনে কাউন্টেস গুইসিয়োলী—তেরেসা দেলে গাম্বি নাম্নী অসামান্যা রূপবতী সপ্তদশবর্ষীয়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া এক বিবাহিতা কিশোরী তরুণ বায়রণকে দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। তেরেসার স্বামী ছিলেন তেরেসা অপেক্ষা অনেক বড়। তাই সেই সান্ধ্য সম্মেলনে বায়রণকে দেখিয়াই সদ্য-জাগ্রত-যৌবনা কিশোরী মনে মনে তাঁহাকে ঘিরিয়া এক সুন্দর প্রেম-সৌধ গড়িয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, দুই পক্ষ হইতেই পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিছু দিন ধরিয়া দু'জনের মধ্যে ভাব-বিনিময় চলিল। তেরেসার স্বামী কাউন্টের পক্ষে কিন্তু এই নির্লজ্জ আচরণ সহ্য করা সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। কাউন্ট আবার ছিলেন বায়রণের সহিত কিরূপ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। তেরেসার বায়রণ-প্রীতি তাঁহাকে লজ্জায়

ক্ষোভে, বেদনায় অস্থির করিয়া তুলিল। পরিশেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পোপ এই কাউন্ট ও তেরেসার বিবাহের চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া দিলেন। তেরেসা তখন বায়রণের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। এই তেরেসাই বায়রণের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তেরেসার সাহচর্য্যে তিনি যেন নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইলেন। যে বায়রণ ভেনিসে অবস্থান কালে লাম্পট্য-লীলায় আপনি মাতিয়া অনেককে মজাইয়াছিলেন সেই বায়রণ যেন সহসা কাহার মন্ত্রপূত স্নেহস্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুতাপ আরম্ভ হইয়া গেল। বায়রণের ভাষাতেই আমরা বলিতে পারি—

In my youths summer I did sing of one,
The wandering outlaw of his own dark mind;

গাহিয়াছি যৌবনের মধ্যাহ্ন বেলায়
যেই গান আমি যার অন্ধকার চিত্ত তার
ভ্রাম্যমান বিপথে গাঢ় বেদনায়।—

আজ আর সে গান গাহিতে চাহি না। সকল ভালবাসারও আজ অবসান হইয়াছে। আজ আমি যুবতী রূপসীর মায়ায় ভুলিব না।

My days of love are over, me no more
The charms of maid, wife, and still less of widow.
Can make the fool of which they made before,—
In short, I must not lead the life I did do.

আমার জীবনে গেছে মধুমাস—
ভালবাসা মোর হয়েছে গত,—
ভুলাতে নারিবে আগের মতন
কুমারী, প্রেয়সী, বিধবা যত।
রূপের মোহেতে ছিনু হতজ্ঞান,
অবসান হল আজিকে তার,
একটি কথায়—করিব না আমি
আগের জীবন যাপন আর।

My springs of life were poison'd. 'T is too late!
Yet I am changed, though still anough the same
In strength to bear what time cannot abate,
And feed on bitter fruits without accusing fate.

মোর জীবনের উৎস-ধারা যে একেবারে গেছে বিষিয়া—
বড় দেরী হ'ল—তবু, তবু, আমি এসেছি এখন ফিরিয়া
যদিও এখনো সেই এক-ই জ্বালা হইবে আমারে সহিতে,
সময় যে ভার লাঘবিতে নারে সে ভার হইবে বহিতে
তিক্ত সে ফল খাইব, তথাপি ভাগ্যে না দায়ী করিব,
জানি জানি তাই ফিরেছি, বরং স্বখাত সলিলে মরিব।

My days are in the yellow leaf;
The flowers and fruits of love are gone;
The worm, the cauker, and the grief
Are mine alone!
The fire that on my bosom preys
Is lone as some volcanic isle;
No torch as kindled at its blaze—
A funeral pile.

দিনগুলি মোর শুষ্ক পত্র সম,
প্রেমের পুষ্প সেথায় নাহিক আর,
আছে শুধু কীট-দুষ্ট সে ক্ষত মম—
আমার জীবনে কেবলি দুঃখ সার!
হুতাশন যাহা জ্বলিতেছে দিবা-রাতি
বক্ষে যেন তা আগ্নেয় দ্বীপ প্রায়,
সেই সে আলোতে জ্বলিবে না কোন বাতি—
চিতার আগুন দিন-রাত জ্বলে হায়!

বায়রণ আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন। যে তেরেসার সাহচর্য্যে তাঁহার নব জীবনের সূচনা হইল সেই তেরেসাকেও আর আপনার অভিশপ্ত জীবনের সহিত জড়াইতে চাহিলেন না। তিনি ভেনিস ত্যাগ করিয়া গ্রীস যাত্রা করিলেন। তার পর তেরেসা দ্বিতীয় বার Marquis de Boissyকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বায়রণকে ভুলিতে পারেন নাই।

ইতিমধ্যে ডন জোয়ানের আরও খানিকটা লেখা হইল, এবং ১৮১৯ হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীস যাত্রার পূর্ব্বে বাহির হইল "Mazeppa", ও তাঁহার সুন্দর নাটকগুলি যথা—"Marino Faliero", "Sardanapalus", "The Two Foscari" এবং "Cain". ১৮২১ খৃষ্টাব্দেই প্রকাশিত হইল "The Prophecy of Dante". এই বইখানি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়া তিনি তেরেসার নামে উৎসর্গ করেন।

বায়রণ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পিসায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি নানারূপ বিচিত্র পশুপক্ষী ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমোদ পাইতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস অবধি তিনি সমস্ত সময় শেলীর সাহচর্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে লী হাণ্ট তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া বায়রণের গৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময় বায়রণ ও শেলী হাণ্টকে সম্পাদকরূপে লইয়া "The Liberal" নামে এক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় বায়রণের অবদানই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "Heven and Earth," "Morgante Maggiore"এর প্রথম সর্গের অনুবাদ, "The Blues", "Two my Grandmother's Review" ও "The Vision of Judgment" নামক ব্যঙ্গ-কাব্যে বায়রণের কাব্য প্রতিভার চরমোৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে। পিসায় অবস্থান কালেই তিনি "Werner", "The Deformed Transformed" এবং "Don Juan"এর ষোড়শ সর্গের রচনা শেষ করিয়াছিলেন (যদিও শেষোক্ত রচনা দুইটি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল)। কিন্তু "The Liberal" বেশী দিন স্থায়ী হইল না। মাত্র চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহার কারণ ১৮২২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নৌ-বিহার কালে

সেই হেতু মূঢ় মত বলিয়া বোধ হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না। টলেমি (Ptolemy) যখন পৃথিবী গোলাকার—এই নূতন মত প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তাহাও ঐরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সে প্রতীতি অপসৃত হইয়াছে। এই যে অপরূপ আইন্‌ষ্টাইনের সিদ্ধান্ত, তাহা কি? প্রথমে আইন্‌ষ্টাইনের বর্ণিত গতির আপেক্ষিকতা (Relativity of motion) বুঝা যাউক, পরে তাঁহার সময়ের আপেক্ষিকতা (Relativity of time) আলোচনা করা যাইবে।

মনে করুন, যখন আপনি রেলের Express গাড়ীতে চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে যাইতেছেন তখন উপবেশন-স্থল হইতে উঠিয়া আপনি গাড়ীর এক ধার হইতে উহার গতির উল্টা দিকে অপর ধারে যাইলেন। আপনি কত দিকে চলিলেন? নিশ্চয়ই তিন দিকে—উঠিবার সময় কিছু উপর দিকে, এবং চলিবার সময় কিছু দূর ধারের দিকে ও কিছু দূর পশ্চাৎ দিকে। আপনার সহযাত্রিগণ আপনার গতি এইরূপই দেখিলেন এবং তাঁহাদের প্রতীয়মান হইল যে, সর্ব্বসমেত প্রায় কুড়ি সেকণ্ডে ১২ ফুট আন্দাজ যাইলেন। কিন্তু Express গাড়ী সেই সময় কোন ষ্টেশন পার হইতে থাকিলে ষ্টেশন-স্থিত কোন ব্যক্তি আপনি যে পশ্চাৎ দিকে চলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিবে না, আপনার ক্ষণিক দর্শনে তাহার বোধ হইবে যে ট্রেণের সহিত আপনিও ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে সম্মুখ দিকে ধাবিত হইতেছেন। আবার যদি কোন পরিদর্শক সূর্য্যমণ্ডলে বসিয়া শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পৃথিবীকে দেখিতে থাকে তাহা হইলে দেখিবে যে, এই বঙ্গদেশ ও ইহার সমস্ত রেলপথ পৃথিবীর উপর আবর্ত্তনের সহিত ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও অধিক বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এক্ষণে পরিদর্শককে যদি অতি দূরবর্ত্তী রক্তবর্ণ তারকা বৃহৎ কুকুরমণ্ডলে (Canis Major) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহিত পাঠান যায়, তিনি কি দেখিবেন? দেখিবেন যে সূর্য্য চতুর্দ্দিকস্থ গ্রহগুলির সহিত প্রতি সেকণ্ডে হাজার হাজার মাইল বেগে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে।

এইখানেই ইহার শেষ নহে। হয়ত বৃহৎ কুকুরমণ্ডলও অন্য কোন তারকামণ্ডলের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং তাহাও আবার অন্য আর একটির দিকে ছুটিতেছে! এইরূপে প্রকৃত স্থিতিশীল কোন দ্রব্যই আমাদের কখনও নয়নগোচর হয় না। আবার যদি ট্রেণে যাইতে যাইতে সমান গতিবিশিষ্ট অপর একটি ট্রেণের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তখন নিজেকে স্থির বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই পৃথিবীস্থ কোন স্থির-বস্তুর দিকে তাকাইলে নিজেকে গতিশীল বলিয়া বোধ হইবে। ঐ স্থির-বস্তুও পৃথিবীর গতির সহিত ঘুরিতেছে। অতএব প্রত্যেক গতিই পরস্পরের তুলনায় আপেক্ষিক গতি (Relative motion) এবং কোন গতিই পরম গতি (absolute motion) নহে, কারণ কোন বস্তু গতিশীল বলিয়া বোধ হইলে ঐ জ্ঞান অপর কোন বস্তুর সহিত তুলনার দ্বারাই উদয় হয় এবং তখন এই দ্বিতীয় বস্তুকে আমরা বিরামবিশিষ্ট (at rest) বলিয়া ধরিয়া লই। কিন্তু জগতে কোন বস্তুই বিরামযুক্ত নহে। আইন্‌ষ্টাইন গতির এই পারম্পর্য্যের বিষয়কেই "গতির আপেক্ষিকতা (relativity of motion)" এই বাক্যের দ্বারা উদ্দিষ্ট করিয়াছেন।

সময়ের আপেক্ষিকতা কিছু ভিন্ন প্রকার। মনে করুন, আজ প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার আগে কেহ দুষ্টামী করিয়া জগতের সর্ব্বপ্রধান ঘড়ি (অর্থাৎ সময়কে) এরূপ ভাবে চালাইয়া দিয়াছে যে প্রত্যেক বস্তুই ১০০ গুণ অধিকতর বেগে ধাবিত হইতেছে। আপনি নিদ্রাভঙ্গে এই পরিবর্ত্তন কিছুই বুঝিতে পারিবেন না! কারণ আপনার ঘড়িও এবং এমন কি সূর্য্য ইত্যাদি সেই সঙ্গে ঐরূপ বেগে চলিতেছে। মোটর গাড়ী, রেল এবং সকল প্রকার যানবাহনও ঐরূপ চলিতেছে। আবার যদি ইহার উল্টা ব্যাপার ঘটে, অর্থাৎ সময়ের গতি ১০০০ গুণ কমিয়া যায় তাহা হইলেও ঐ একই অবস্থা! আপনি পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না! এইরূপে সময়ের গতি যদি একবার দ্রুত এবং পরক্ষণেই ধীর এই প্রকারে বার বার পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহা হইলেও আপনার ইহা বুঝিবার কোন উপায় নাই, কারণ, সকল বস্তুই সমানক্রমে ঐভাবে চলিবে। আইন্‌ষ্টাইনের মতানুসারে সত্য সত্যই এইরূপ ঘটিতেছে, অর্থাৎ সময় কখনও দ্রুত এবং কখনও ধীরে চলিতেছে! ইহা কিরূপে হইতে পারে তাহা নিম্নে বুঝান যাইতেছে।

কোন কোন প্রাণীর জীবন-কাল কয়েক দিন মাত্র, কোন কোন পতঙ্গের কয়েক ঘণ্টা মাত্র, আবও নিম্নশ্রেণীর জীবের কয়েক মিনিট মাত্র। এই শেষোক্ত জীবের পক্ষে কয়েক মিনিট সময় আমাদের এক জীবনকালের সমান, তার আমাদের এক সেকণ্ড সময় জীবের নিকট কয়েক সপ্তাহের সমান বলিয়া পরিমেয় হয়। আবার আমাদিগের এক বৎসর সময় দেবলোকের উচ্চতর সত্ত্বার নিকট কয়েক সেকণ্ড অপেক্ষা বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আবও তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উচ্চশ্রেণীর সত্ত্বার নিকট এই পৃথিবীর সমগ্র স্থিতিকাল (যাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌রা কোটি বৎসর বলিয়া স্থির করিয়াছেন) তাহাদের অঙ্গুলি সঞ্চালনের কিংবা "বাঃ" এই কথাটি উচ্চারণ করিবার সময় মাত্র—অর্থাৎ কেবল এক সেকেণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এইরূপ সময়ের যুগপৎ দ্রুত এবং ধীর গতিকে আইন্‌ষ্টাইন্ "সময়ের আপেক্ষিকতা (relativity of time)" এই বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার এই মত হইতে আমাদের শাস্ত্রোক্ত "ব্রহ্মার এক দিবস" এই বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আইন্‌ষ্টাইন্ তাঁহার আপেক্ষিকবাদ হইতে সকল বস্তুর উপর পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয়ের—যথা গতি ও সময়, ইহাদের নিম্নলিখিত ক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

কোন বস্তু যখন অত্যধিক বেগে ধাবিত হয় তখন এক আশ্চর্য্য বিষয় ঘটে। ঐ বস্তুর তখন সঙ্কোচন হইতে থাকে এবং এই সঙ্কোচনকে "ফিটজেরাল্ড সঙ্কোচন (Fitz Gerald Contraction)" বলে। কোন বস্তুর বেগ বৃদ্ধি পাইয়া আলোকের গতি-বেগের সমান হইবার উপক্রম হইলে ইহার আকৃতির পরিবর্ত্তনও অধিকতর হয় এবং যখন উহার সমান হয় (অর্থাৎ ইহা আলোকের গতির ন্যায় প্রতি সেকণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়) তখন উহার আকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া অর্দ্ধেক হইয়া যায়। যদি বন্দুক হইতে একটি লাঠি প্রতি সেকণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীস্থ মানুষের চক্ষে ইহা পূর্ব্ব-দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি ঐ লাঠির সহিত একই বেগে ধাবিত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজেও ঐরূপ সঙ্কুচিত হইয়া যান বলিয়া লাঠির কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবেন না।

আইন্‌ষ্টাইনের মতে কোন প্রকার শক্তি আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা কাহাকেও দ্রুততর চালিত করিতে পারে না। কিন্তু যদি

কেহ নিজেকে আলোক অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে চালিত করিতে পারিতেন তাহা হইলে অন্য পরিদর্শকের চক্ষে তিনি বিপরীত দিকে চলিতেছেন এইরূপ দেখা যাইত। আপনি হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—ইহা কি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না? কিন্তু ভাবিয়া দেখুন যে, পৃথিবী সমতল (flat) ইহাই যখন লোকের ধারণা ছিল, তখন যদি কেহ বলিত, এই পৃথিবীর উপর দিয়া কোন ব্যক্তি একই দিকে ১২,০০০ মাইল (অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধি পরিমিত স্থান) চলিলে পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে, তাহা হইলে তাহার উক্তি পৃথিবীর মণ্ডলাকারত্বের (roundness) সত্য আবিষ্কার অভাবে ঐরূপই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সকলেই (যথা drake প্রভৃতি) মানুষে উপরিউক্ত পথ চলিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ইহা দেখা গিয়াছে।

অত্যন্ত মন্দ গতির প্রভাবে ইহাপেক্ষাও অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সংঘটিত হয়। যদি আপনি ব্যোমের মধ্য দিয়া আলোকের গতিবেগের কুড়ি হাজার অংশের এক অংশ অপেক্ষা কম বেগে চলিয়া, ধরুন দুই বৎসরে, কোন দূরবর্ত্তী তারকায় যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, তবে তখন নিশ্চয়ই মনে ভাবিতেন যে, আপনি পূর্ব্বাপেক্ষা বয়সে কেবল দুই বৎসর মাত্র প্রবীণ হইয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন যে, ইহাতে সকল বস্তুই এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, সবই ২০০ বৎসরের পুরাতন হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ পৃথিবীতে তখন ২১৪৫ খৃষ্টাব্দ চলিতেছে (বর্ত্তমানে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ)। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, গতির প্রভাবে আপনি ভবিষ্যতের গহ্বরে প্রবেশ করিতে সক্ষম। গতি ও সময়ের মধ্যে এইরূপ অতি নিকট সম্বন্ধ। অপর পক্ষে, যদি আপনি আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা দ্রুত চলিতে পারিতেন তাহা হইলে অতীতের মধ্যে প্রবেশে সক্ষম হইতেন। আপনি ঐরূপ বেগে চলিয়া দুই বৎসর পরে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন যে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ চলিতেছে।

উপরের বিষয় সহজ ভাবে এই উপায়ে বুঝান যায়। ধরুন আপনি আলোকের অপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে পৃথিবী হইতে উড়িয়া গিয়া ২ মাস পরে একটি দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কে অবতরণ করিলেন এবং তথা হইতে একটি অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর আলোকরশ্মির ঐ পথ ভ্রমণ করিতে আপনার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ মাস সময় লাগিবে। কিন্তু আপনি পৃথিবী হইতে আসিবার দুই মাস পরেই আলোকরশ্মি দেখিতেছেন,—অতএব আপনি পৃথিবী ত্যাগ করিবার ২ মাস পূর্ব্বের আলোকরশ্মি ও তাহার সহিত অতীত ঘটনাবলী পুনরায় লক্ষ্য করিবেন। আপনি নিজে পৃথিবীতে ঐ দুই মাস যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার অর্থাৎ অতীতের ঘটনাগুলির পুনরাভিনয় দেখিবেন। ইহার বিপরীত ব্যাপারও এইরূপ বুঝান যায়। তাহা হইলে প্রতীতি হইল যে, অধিক বেগের দ্বারা অতীত ঘটনাবলী এবং বেগের অত্যধিক হ্রাসের দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী লক্ষ্য করা সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আলোকের গতি বা ভ্রমণ সময় (Light time) স্থান (Space) এবং বস্তু (Material body) এই কয়টি বিষয় আইনষ্টাইনের নূতন তথ্য অনুসারে অদ্ভুত ভাবে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ অনেক অভূতপূর্ব্ব তথ্য বা ফল প্রসব করিয়াছে; যথা—এই সম্বন্ধ হইতে প্রমাণিত হয় যে শূন্য স্থান কেবল স্বয়ং থাকিতে পারে না, ইহা প্রকৃতই আলোক হইতে সৃষ্ট। বোধ হয় এই কারণেই ভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে আলোক সৃষ্টি করিতে মানস করিয়াছিলেন (Let there be light and there was light)। আরও, এই যে অবিচ্ছিন্ন শূন্যমণ্ডল বা ব্যোম (continuous space) ইহার অভ্যন্তরে বস্তু সকলের অবস্থান হেতু সেই সেই স্থানে বক্র হইয়া দুমড়াইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানও এরূপ বক্র হইয়া গিয়াছে যে, তথায় আলোকরশ্মি সরল রেখায় চলিতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্যগ্রহণের সময়ে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তারকামণ্ডলী হইতে আগমনশীল আলোকরশ্মি সূর্য্যের নিকট দিয়া যাইবার সময় সত্যই কোণ ঘুরিয়া যায়। অন্য কথায় বলিতে হইলে বৃহদাকার কোন বস্তুর (material body) আকর্ষণে আলোকরশ্মি সরল নিজ পথ হইতে বাঁকিয়া যায়। অতএব যদি কোন কোন বিরাট বস্তু থাকে যাহা আলোকরশ্মিকে যথেষ্ট বাঁকাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে আমরা তাহার ঠিক পশ্চাতের বস্তুও দেখিতে পারি।

উপরে বলা হইয়াছে যে, শূন্য স্থান বা ব্যোম ইহার অন্তরে বস্তু সকলের স্থিতির নিমিত্ত ইতস্ততঃ বক্রভাব ধারণ করিয়া আছে। ইহাতে ইহাও বেশ প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত সরলরেখা (straight line) পাওয়া সুকঠিন, কারণ রেখাটি ঐরূপ বক্র স্থানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় দুমড়াইয়া যাইবে। আরও ঐরূপ বক্র স্থানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সমান্তরাল সরল রেখাদ্বয়ের (parallel straight lines) মধ্যে অন্ততঃ একটি সরল রেখা বক্র হইয়া গিয়া আর একটির সহিত মিলিতে পারে। অতএব আমরা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা করিয়াছিলাম যে, সরল রেখা কোন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব (Straight line is the shortest distance between two points) তাহাও সেই একই কারণে হইতে পারে না। আর যদি সরল রেখা বলিয়া কিছুই না থাকে তাহা হইলে এই বিশ্ব-জগৎ কোন দিকেই অসীম হইতে পারে না, কারণ সরল রেখাই আমাদের কল্পনা মতে অসীমত্বে চলিয়া যায়, অন্য কিছু যায় না। আইনষ্টাইনের আপাততঃ অযৌক্তিক উক্তি যে, "এই জগৎ সসীম (limited) অথচ অন্তবিহীন (boundless)" উপরের বিষয়েরই ভিত্তির উপর রচিত।

সর্ব্বশেষে আইনষ্টাইন এই মূল উক্তি (fundamental statement) করিয়াছেন যে, আমরা তিন দিকের পরিমাণমূলক (three dimensional) চিন্তায় এইরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, চতুর্থ পরিমাণ (fourth dimension) সময়ের বিষয় অভ্যস্ত হইতে কিছু দিন লাগিবে। এই নিমিত্তই জগতের যে সকল অদ্ভুত ঘটনা আমাদের বোধগম্য হয় না তাহাও বুঝিতে সময় লাগিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

২

নাট্যপ্রসিদ্ধির নিমিত্ত—নাট্যপ্রয়োগ যাহাতে প্রসিদ্ধিলাভ করে এই উদ্দেশ্যে জর্জ্জর-পূজা কর্ত্তব্য। জর্জ্জরপূজায় নাট্য-বিঘ্ন-হানি হইয়া থাকে।

মূল :—হে মহেন্দ্রের প্রহরণ! সর্ব্বদানবসূদন! সর্ব্ববিঘ্ন-নিবর্হণ! তুমি সকল দেবতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছ। ১৩॥

সঙ্কেত :—জর্জ্জরের আবাহন-মন্ত্র এইটি। মহেন্দ্রের প্রহরণ অবশ্য বজ্র। কিন্তু বিঘ্ননাশার্থ মহেন্দ্র শক্রধ্বজ ব্যবহার করিয়াছিলেন (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সেই শক্রধ্বজই জর্জ্জর। এই কারণে জর্জ্জরকে মহেন্দ্রের প্রহরণ বলা হইয়াছে। দানবসূদন—দানবনাশন। বিঘ্ননিবর্হণ—বিঘ্নবিনাশন।

বরোদা-সংস্করণের পাঠ—"ত্বং মহেন্দ্রপ্রহরণ সর্ব্বদানবসূদন! নির্ম্মিতস্ত্বং সর্ব্বদেবৈঃ সর্ব্ববিঘ্ননিবর্হণ!"—এ পাঠে 'মহেন্দ্রপ্রহরণ' 'সর্ব্বদানবসূদন', 'সর্ব্ববিঘ্ননিবর্হণ'—এ তিনটি পদ সম্বোধন-পদ। কাশীর পাঠ—"ত্বং মহেন্দ্রপ্রহরণং সর্ব্বদানবসূদনম্। নির্ম্মিতশ্চ সর্ব্বদেবৈঃ সর্ব্ববিঘ্ননিবারণম্"। এ স্থলে 'ত্বং' প্রথমান্ত পদ। অপর পদগুলি দ্বিতীয়ান্ত বলিয়াই গ্রহণীয়; কারণ এগুলিকে ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার একবচন বলা যায় না—যেহেতু 'শক্রধ্বজ' বা 'জর্জ্জর' পুংলিঙ্গ শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ নহে। ইহাতে অন্বয় হয় না। এ কারণে বরোদার পাঠটিই সমীচীন বোধ হয়।

মূল :—রাজার বিজয় ও শত্রুগণের পরাজয়, গো-ব্রাহ্মণের মঙ্গল ও নাট্যের বিবর্দ্ধন (তুমি) সূচনা কর। ১৪॥

সঙ্কেত :—শংস—কীর্ত্তন কর—অর্থাৎ সূচনা কর। নৃপস্য বিজয়ং শংস (ব); নৃপায় বিজয়ং দেহি (কা)।

মূল :—এইরূপ করিয়া যথাবিধি নাট্যমণ্ডপে উপাসনা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, নিশা প্রভাত হইলে এই স্থলে পূজা আরম্ভ করা উচিত। ১৫॥

এবং কৃত্বা (মূল)—এইরূপ করিয়া অর্থাৎ এই ভাবে জর্জ্জরের আবাহনাদি করিয়া। যথান্যায়ম—যথাবিধি। উপাস্যং—উপাসনা (অর্থাৎ পূজা) কর্ত্তব্য। জর্জ্জর ও নাট্যদেবতাগণের পূজা কর্ত্তব্য—পূজাবিধি পরে উক্ত হইবে। কাশীর পাঠান্তর—উষিত্বা নাট্যমণ্ডপে—নাট্যমণ্ডপে বাস করিয়া; সেই রাত্রি নাট্যাচার্য্য নাট্যমণ্ডপে বাস করিবেন—ইহাই সরলার্থ। পূজনং প্রক্রমেদিহ—এই স্থানে (অর্থাৎ নাট্যমণ্ডপে) পূজারম্ভ করিতে হইবে—নাট্যাচার্য্যই পূজারম্ভ করিবেন। কাশীর পাঠ—পূজনং প্রক্রমেদ্ বুধঃ—(রাত্রি প্রভাতে) ধীমান্ (নাট্যাচার্য্য) পূজারম্ভ করিবেন। কাশীর পাঠের তাৎপর্য্য—এইরূপে জর্জ্জরের আবাহনাদি করিয়া সেই রাত্রি নাট্যমণ্ডপে অবস্থানপূর্ব্বক রাত্রি প্রভাত হইলে ধীমান্ নাট্যাচার্য্য পূজারম্ভ করিবেন।

মূল :—আর্দ্রা বা মঘা বা যাম্য ও তিনটি পূর্ব্বা (নক্ষত্রে) অথবা অশ্লেষা ও মূলা (নক্ষত্রেও) রঙ্গপূজা কর্ত্তব্য। ১৬।

সঙ্কেত :—যাম্য নক্ষত্র—যম যাহার অধিদেবতা এমন নক্ষত্র অর্থাৎ ভরণী। তিনটি পূর্ব্বা নক্ষত্র—পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী। আশ্লেষা—অশ্লেষা।

মূল :—আর যুক্ত, শুচি ও দীক্ষিত আচার্য্য-কর্ত্তৃক রঙ্গের উদ্যোতন ও দেবতাগণের পূজা কর্ত্তব্য। ১৭।

সঙ্কেত :—রঙ্গস্যোদ্যোতনং (বরোদা); রঙ্গস্যোদ্যাপনম্ (কাশী)। উদ্যোতন—আলোকদান, উদ্দীপন। উদ্যাপন—পরিসমাপ্তি।

মূল :—দিনান্তে দারুণ ঘোর ভূত-দৈবত মুহূর্ত্তে যথান্যায়ে আচমনপূর্ব্বক দেবতাসমূহকে নিবেশিত করিবে। ১৮।

সঙ্কেত :—দিনান্ত—সন্ধ্যাকাল। ভূতদৈবত মুহূর্ত্ত—যে মুহূর্ত্তের অধিপতি দেবতা ভূতগণ, রাক্ষসী বেলা। যথান্যায়—যথাবিধি। আচমনপূর্ব্বক—অভিনব বলিয়াছেন—জ্বলিত দর্ভোল্মুক-দ্বারা স্পর্শ নীরাচমন নামে প্রসিদ্ধ—"জ্বলিতদর্ভোল্মুকেন স্পর্শনং নীরাচমনমিতি প্রসিদ্ধম্"—অঃ ভাঃ পৃঃ ৭৪। দর্ভ—কুশ। উল্মুক—অলাত, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, উল্কা, torch.

মূল :—পূজিত রক্তগন্ধ-যুক্ত রক্ত প্রতিসর-সমূহ, সূত্র ও রক্ত-পুষ্পসকল, আর রক্ত ফল যাহা হইতে পারে,—। ১৯।

সঙ্কেত :—প্রতিসর—সূত্রনির্ম্মিত, গ্রন্থিযুক্ত কঙ্কণবিশেষ (সূত্রবিনির্ম্মিতা গ্রন্থিমন্তঃ কঙ্কণবিশেষাঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭৪)।—ইহারই বাঙ্গালা নাম সূতার ডোর বা তাগা।

"রক্তাঃ প্রতিসরাঃ সূত্রং রক্তগন্ধাশ্চ পূজিতাঃ" (বরোদা); ইহা অপেক্ষা কাশীর পাঠ ভাল—"রক্তাঃ প্রতিসরাস্তত্র রক্তগন্ধাশ্চ পূজিতাঃ"—'রক্তগন্ধাঃ' ও 'পূজিতাঃ'—পদদ্বয় 'প্রতিসরাঃ' পদের বিশেষণ হইতে পারে; অথবা উহাদের পৃথগ্ গ্রহণও সম্ভব।

মূল :—যব-সিদ্ধার্থ-লাজ-অক্ষত-শালিতণ্ডুল-সমূহ, নাগপুষ্পের মূল ও বিতুষীকৃত প্রিয়ঙ্গু-সমূহ দ্বারা—। ২০।

সঙ্কেত :—এই সকল দ্রব্য দ্বারা দেবতাগণের নিবেশন করিতে হইবে—২১ শ্লোকের সহিত অন্বয় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধার্থ—শ্বেতসর্ষপ বা গৌরসর্ষপ, লাজ—খই; অক্ষত—আতপ তণ্ডুল। লাজৈরক্ষতৈঃ (বরোদা); লাজৈর্লক্ষিতৈঃ (কাশী)। বরোদার পাঠ ভাল। শালিতণ্ডুলৈঃ (ব); লাজতণ্ডুলৈঃ (কা)। বরোদার পাঠ ভাল। কাশীর পাঠে 'লাজ' শব্দটির পুনরাবৃত্তি আছে। নাগপুষ্প—পাঠান্তর নাগবস্ত (অঃ ভাঃ টীকা)। নাগপুষ্প—চম্পক অথবা পুন্নাগ। নাগপুষ্পস্য মূলেন (ব); চূর্ণেন (কাশী)। বিতুষ—খোষা ছাড়ান। প্রিয়ঙ্গু—শ্যামবর্ণ লতাবিশেষ।

মূল :—এই সকল দ্রব্যসংযুক্ত দেবতাগণের নিবেশন করিতে হইবে।

পূর্ব্বে যথাস্থানে যথাবিধি মণ্ডল আলিখিত করিবে। ২১।

সঙ্কেত :—নিবেশন—অভিনবগুপ্ত ইহার অর্থ করিয়াছেন—আবাহনকালে অর্ঘ্যদান; এই অর্ঘ্যের উপাদানরূপে রক্তকঙ্কণ রক্তগন্ধ, রক্তপুষ্প, রক্তফল, যব, সিদ্ধার্থ, লাজ, অক্ষত, শালিতণ্ডুল, নাগপুষ্পমূল, বিতুষ প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদি সংগ্রহণীয়। মতান্তরে 'নিবেশন' অর্থে—যাহাতে নিবেশ করা যায়, এমন মণ্ডল বুঝিতে হইবে। নিবেশন-পদটি মণ্ডলের বিশেষণ।

মূল :—আর মণ্ডল চারিদিকে ষোড়শ হস্ত কর্ত্তব্য। আর ইহাতে বিধানানুসারে চতুর্দ্দিকে দ্বারসমূহ করিতে হইবে। ২২।

সঙ্কেত :—চারি দিকে মিলিয়া মোটের উপর যাহাতে ষোল হাত হয় এরূপভাবে মণ্ডল আঁকিতে হইবে; তাহা হইলে উহার প্রত্যেক দিকে চার হাত পরিমাণ হইবে। রঙ্গপীঠের পৃষ্ঠেই (অর্থাৎ উপরে) এই মণ্ডল অঙ্কিত করার বিধি। এই প্রসঙ্গে অভিনব একটি সুন্দর

বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। শঙ্কুক প্রভৃতি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতে—রঙ্গপীঠের উপর চারি দিকে ষোড়শ হস্ত অবকাশই থাকা সম্ভব নহে; (কারণ, বিকৃষ্টে রঙ্গপীঠ ১৬ × ৮ হস্ত; আর চতুরস্রে ৮ × ৮ হস্ত; তাহার উপর স্তম্ভ-আসনাদিও ত আছে—অতএব মণ্ডল অঙ্কনের স্থান কৈ? শঙ্কুকাদি ব্যাখ্যাতৃগণ সমস্ততঃ ষোড়শ হস্ত বলিতে প্রতি দিকে ১৬ হাত (১৬ × ১৬) বুঝিয়াছেন। কিন্তু অভিনবের ব্যাখ্যা ৪ × ৪ হাত; চারিটি দিকের মোট দৈর্ঘ্য—১৬ হাত। এরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে শঙ্কুকাদির আপত্তি আর টিঁকে না। (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭৫)।

মূল :—আর ইহাতে মধ্যস্থলেই তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধগামী দুইটি রেখা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের কক্ষ্যাবিভাগানুযায়ী দেবতাগণের নিবেশ করিতে হইবে ।২৩।

সঙ্কেত :—তির্য্যক্—টেরচা—দক্ষিণ ও উত্তর দিকে টানা (একটি রেখা)। ঊর্দ্ধগতা রেখা অপরটি—পূর্ব্ব-পশ্চিমে টানা। চতুরস্র মণ্ডল। তাহার কেন্দ্রস্থল দিয়া এই দুইটি রেখা (পূর্ব্ব-পশ্চিমে একটি ও উত্তর-দক্ষিণে একটি) টানিলে মণ্ডলটি চারটি ঘরে (কক্ষ্যায়) বিভক্ত হয়। ঐ সকল কক্ষ্যায় দেবতা-সন্নিবেশ নিয়োক্ত পদ্ধতিতে কর্ত্তব্য।

মূল :—তাহার মধ্যে পদ্মে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে নিবেশিত করিতে হইবে। আদিতে ভগবান্ ভব ভূতগণ সহ নিবেশনীয় ।২৪।

সঙ্কেত :—তাহার মধ্যে—মণ্ডলের মধ্যস্থলে।—তস্য মধ্যে (ব); রঙ্গমধ্যে (কাশী)। পদ্মে উপবিষ্ট ব্রহ্মা—মণ্ডলের মধ্যস্থলে পদ্ম একটি অঙ্কিত করিতে হইবে—উহাতে ব্রহ্মার নিবেশ কর্ত্তব্য। ভগবান্ ভব—দেবদেব মহাদেব; কাশীর পাঠ—শিব। আদিতে—আদিভাগে অর্থাৎ ঈশান কোণে। ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে দেবতার সন্নিবেশ ও আবাহনের কথা বলা হইয়াছে। অতএব 'আদিতে' অর্থে—আদিদেশে ও আদ্যাবসরে।

মূল :—নারায়ণ ও মহেন্দ্র, স্কন্দ, সূর্য্য, অশ্বিদ্বয়, শশী, সরস্বতী ও লক্ষ্মী, শ্রদ্ধা ও মেধা পূর্ব্বদিকে (নিবেশনীয়) ।২৫।

সঙ্কেত :—স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়। অশ্বিদ্বয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসত্য ও দস্র।

মূল :—পূর্ব্ব-দক্ষিণে (অগ্নিকোণে) স্বাহাসহ বহ্নি নিবেশনীয়—আর বিশ্বদেবগণ, গন্ধর্ব্বগণসহ রুদ্রগণ ও গণ সমূহ ।২৬।

সঙ্কেত :—নিবেশ্যঃ স্বাহয়া সহ (ব, কা); পাঠান্তর—চন্দ্রমা ভানুরেব চ। রুদ্রাঃ সর্ব্বগণাস্তথা (ব); রুদ্রাশ্চ ঋষয়স্তথা (কাশী)।

মূল :—পক্ষান্তরে, দক্ষিণ (দিকে) যম ও অনুগসহ মিত্র নিবেশনীয়। পিতৃগণ, পিশাচগণ, উরগগণ ও গুহ্যকগণকে নিবেশিত করা কর্ত্তব্য ।২৭।

সঙ্কেত :—মিত্র—সূর্য্যেরই একটি বিশিষ্ট রূপ—প্রতি মাসে সূর্য্য এক একটি বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হন—দ্বাদশ মাসের এই দ্বাদশ রূপের নাম—দ্বাদশ আদিত্য। মার্গশীর্ষে সূর্য্যের রূপের নাম—'মিত্র'। অনুগ—অনুগামী, অনুচর। উরগ—সর্প। গুহ্যক—দেবযোনি-বিশেষ।

মূল :—নৈঋ্ঋতে রাক্ষসগণ ও ভূতসমূহকে নিবেশিত করিতে হইবে। পশ্চিম (দিকে) সমুদ্রসমূহ ও যাদঃপতি বরুণকে (নিবেশিত করা উচিত) ।২৮।

সঙ্কেত :—বরুণং যাদসাং পতিম্ (ব); বরুণং চ নিবেশয়েৎ (কাশী)। যাদঃ—জলজন্তু, জল।

মূল :—আর বায়ব্য দিকে সপ্তবায়ুকে নিবেশিত করিতে হইবে। সেই স্থানেই পক্ষিগণসহ গরুড়ও সন্নিবেশনীয় ।২৯।

সঙ্কেত :—মূলে আছে—বায়ব্যাং দিশি; এস্থলে 'দিক্' অর্থে—বিদিক্ বা কোণ।

মূল :—আর উত্তর দিকে ধনদকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। আর নাট্যের মাতৃগণ ও গুহ্যকগণসহ যক্ষগণকে (সন্নিবেশিত করিতে হইবে) ।৩০।

সঙ্কেত :—উত্তরস্যাং দিশি তথা ধনদং সন্নিবেশয়েৎ (ব); উত্তরস্যাং কুবেরঞ্চ সর্ব্বৈরনুচরৈঃ সহ (কাশী)। ইহার অর্থ—আর উত্তরে সকল অনুচরসহ কুবেরকে (নিবেশিত করিবে)। সগুহ্যকান্—পাঠান্তর সহানুগান্—এই পাঠটি ভাল—পুনরুক্তি হয় না।

মূল :—আর উত্তর-পূর্ব্বেই (ঈশান কোণে) নন্দী প্রভৃতি গণেশ্বর সমূহকে, ব্রহ্মর্ষি-ভূত-সঙ্ঘ-সমূহকে যথাভাগে নিবেশিত করিতে হইবে। ৩১।

সঙ্কেত :—নন্দ্যাদ্যাংশ্চ গণেশ্বরান্ (ব); নন্দিনং চ গণেশ্বরান্ (কা)। যথাভাগং—যথাযথ ভাগ (অর্থাৎ বিভাগ) অনুসারে। যথাভাগং নিবেশয়েৎ—কাশী সংস্করণে এ অংশটুকু খণ্ডিত।

ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ঈশান কোণেই সমাপ্ত করা হইয়াছে। অভিনব বলিয়াছেন—কেবল মণ্ডলমধ্যে একটি মাত্র পদ্ম ব্রহ্মার আসনরূপে অঙ্কিত করিলেই চলিবে না, প্রতি দিকে ও বিদিকে এক একটি পদ্ম অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য; অতএব, মণ্ডলটি হইবে নবপদ্ম মণ্ডল ("প্রতিদিশঃ সম্বন্ধনীয়ত্বেন নবপদ্মমণ্ডলমিত্যুক্তং ভবতি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭৬)।

মূল :—অতঃপর স্তম্ভে দেবতা-সন্নিবেশ-বিধি। দক্ষিণ স্তম্ভে সনৎকুমার ও দক্ষকেই, আর উত্তর স্তম্ভে গ্রামণ্যকে পূজার্থ—সন্নিবেশিত করিতে হইবে। ৩২।

সঙ্কেত :—অভিনবের মতে—'দক্ষিণ স্তম্ভে' অর্থে—দক্ষিণ-পূর্ব্ব স্তম্ভে—আগ্নেয় স্তম্ভে; 'উত্তর স্তম্ভে' অর্থ—উত্তর-পূর্ব্ব স্তম্ভে—ঈশান-স্তম্ভে। এরূপ অর্থ করার উদ্দেশ্য আছে। রঙ্গ-পীঠের ঠিক উত্তর-দক্ষিণে বা পূর্ব্ব পশ্চিমে কোন স্তম্ভ স্থাপনের বিধি নাই—চারিটি কোণে—স্তম্ভ স্থাপনের কথাই উক্ত হইয়াছে। গ্রামণ্য—মহাগ্রামণী—গণপতি। গ্রামণ্যমুত্তরে স্তম্ভে পূজার্থং সন্নিবেশয়েৎ (ব, কা)—...পশ্চিমে স্কন্দমেব চ—পাঠান্তর।

মূল :—ঐ বিধানানুসারেই যথাস্থানে যথাবিধি সুপ্রসাদ সকল দেবতাকে নিবেশিত করিতে হইবে। ৩৩।

সঙ্কেত :—সুপ্রসাদ—দেবতার বিশেষণ। অভিনব অর্থ করিয়াছেন—যথাস্থানে নিবেশিত (পাঠান্তর—ধ্যানানুসারে বা ধ্যান-পূর্ব্বক নিবেশিত)। সুপ্রসাদানি—পাঠান্তর—সুপ্রসন্নানি। সুপ্রসাদানি—এই পাঠ অভিনব ধরিয়াছেন; অতএব উহাকেই প্রামাণিক বলা উচিত। শ্লোকটির সমগ্র দ্বিতীয়ার্দ্ধের পাঠান্তর—বর্ণকপাশ্বিতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সন্নিবেশয়েৎ (কাশী)—উক্ত বিধানানুসারেই যথাস্থানে যথাবিধি বর্ণরূপ-বিশিষ্ট দেবতাসমূহ সন্নিবেশিত করিতে হইবে। বর্ণ—রক্ত-শুক্ল-কৃষ্ণ ইত্যাদি রঙ্। রূপ—আকৃতি—দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, চতুর্ম্মুখ ইত্যাদি।

মূল :—স্থানে স্থানে যথাক্রমে দেবতাসমূহকে বিনিবেশিত করিয়া তৎপর তাঁহাদিগের যথার্হ পূজা করা কর্তব্য। ৩৪।

সঙ্কেত :—স্থানে স্থানে—নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে। যথান্যায়ে—যথাবিধি। যথার্হং (মূল)—আগমসমূহে যে দেবতার যেরূপ পূজাবিধি উক্ত হইয়াছে, তদনুযায়ী।

মূল :—দেবতাগণকে শ্বেত মাল্য ও অনুলেপন প্রদেয়। বহ্নি, সূর্য্য ও গন্ধর্ব্বগণকে রক্ত মাল্য ও অনুলেপন (দেয়)। ৩৫।

সঙ্কেত :—অনুলেপন—গন্ধ, চন্দনাদি।

মূল :—গন্ধ-মাল্য সমূহ ও ধূপ যথাবিধি অনুক্রমে প্রদান পূর্ব্বক তৎপর বলি ও পূজা যথাবিধি কর্তব্য। ৩৬।

সঙ্কেত :—অনুপূর্ব্বশঃ :—(মূল)—অনুক্রমে, যেটির পর যে উপচারটি প্রদেয়, ঠিক সেই ক্রম অনুসারে; যথা—প্রথমে গন্ধ তার পর পুষ্প ও মাল্য, পরে ধূপ ইত্যাদি। বলির বিবরণ পরে দেওয়া হইতেছে। বলি—ভোজ্য-রূপ উপহার।

মূল :—ব্রহ্মাকে মধুপর্ক-দ্বারা, সরস্বতীকে পায়স-দ্বারা (পূজা করা কর্তব্য); পক্ষান্তরে, শিব-বিষ্ণু-মহেন্দ্রাদি মোদক দ্বারা সম্পূজ্য। ৩৭।

সঙ্কেত :—মধুপর্ক—মধু, ঘৃত, জল, দধি, ও শর্করা একত্র মিশ্রিত হইলে মধুপর্ক হয়। ব্রহ্মাণং মধুপর্কেণ (ব); দ্রুহিণং···(কা)। দ্রুহিণ—ব্রহ্মা। পায়স—পয়োবিকার; দুগ্ধজাত দ্রব্য; জল দেওয়া ঘন দুধ (যাহাকে বাঙ্গালায় বলে ক্ষীর—সংস্কৃতে 'ক্ষীর' দুগ্ধেরই পর্য্যায়)। মধুপর্ক, পায়স এইগুলিই বলি। কোন দেবতার কি বলি তাহা এই শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে।

মূল :—ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন-দ্বারা হুতভুক্; পক্ষান্তরে সোম ও অর্ক গুড়-মিশ্রিত অন্ন-দ্বারা; গন্ধর্ব্বগণ-সহ বিশ্বদেবগণ (ও) মুনিগণ মধু-মিশ্রিত পায়স-দ্বারা (পূজনীয়)। ৩৮।

সঙ্কেত :—ঘৃতৌদনেন হুতভুক্ (ব)···বহ্নিশ্চ। ঘৃতৌদন—ঘি-ভাত। হুতভুক্—বহ্নি। সোম—চন্দ্র। অর্ক—সূর্য্য।

মূল :—আর যম ও মিত্র অপূপ ও মোদক দ্বারা সম্যগ্‌রূপে পূজনীয়। পিতৃগণ, পিশাচগণ ও উরগগণকে ঘৃত-মিশ্র ক্ষীর-দ্বারা তর্পিত করা উচিত। ৩৯।

সঙ্কেত :—মিত্র—সূর্য্যের বিশিষ্ট রূপ। অপূপ—পিষ্টক। মোদক—মোয়া। উরগ—সর্প। যমমিত্রৌ চ সম্পূজ্যাবপূপৈর্মোদকৈস্তথা (ব); যমমিত্রৌ সমভ্যর্চ্চৌ মোদকৈঃ সূপমিশ্রিতৈঃ (কা) যম ও মিত্র সূপ-মিশ্রিত মোদকসমূহদ্বারা সম্যগ্‌রূপে অর্চনীয়। সূপ—ঝোল, soup সর্পিঃক্ষীরেণ—সর্পিঃ—ঘৃত। ক্ষীর—দুগ্ধ।

মূল :—পক্বান্ন, মাংস, সুরা, সীধু ও ফলাসব দ্বারা ও মাংসাপ্প ক চণকসমূহ-দ্বারা ভূতসঙ্ঘদিগকে অর্চনা করা উচিত। ৪০।

সঙ্কেত :—পক্বান্নেন (ব); পক্বামকেন (কা)। সুরা—গৌড়ী, মাধ্বী, পৈষ্টী—ত্রিবিধা সুরা। সাধু (সীধু-কাশী, সীথু-ব)—গুড়জাত মদ্য। ফলাসব—ফল-রস গাঁজিয়া উঠিলে তাহা চুয়াইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়। চণকৈঃ : পললাপূপৈঃ—চণক-চানা, ছোলা। পলল—মাংস অথবা তিল-চূর্ণ ও শর্করার সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন; তিলকুটা।

মূল :—ঐ প্রকার বিধানেই মত্তবারণী সম্পূজনীয়।

পক্ষান্তরে, পক্বান্ন ও মৎস্যজাত (খাদ্য) দ্বারা রাক্ষসগণ সম্যগ্‌রূপে পূজনীয়। ৪১।

সঙ্কেত :—ঐ প্রকার বিধানে—৪০ শ্লোকে উক্ত বিধানানুসারে। পক্বান্নেন তু মাংসেন (ব), পক্বামকেন মাংসেন (কা), অন্য পাঠান্তর পক্বান্নেন তু মাংসেন।

মূল :—সুরা-মাংস-প্রদান-দ্বারা দানবগণকে প্রতিপূজিত করা উচিত। তদ্বিষয়ে জ্ঞানবান্ (নাট্যাচার্য্য) অবশিষ্ট দেবগণকে অপূপ ও উৎকারিকাসহ অন্নদ্বারা (পূজা করিবেন)। ৪২।

সঙ্কেত :—সুরামাংসপ্রদানেন দানবান্ প্রতিপজয়েৎ (ব); বিধিনা প্রতিপূজয়েৎ (কা); সুরয়া গুড়ধানেন মাংসৈশ্চ বিধিনার্চ্চয়েৎ—পাঠান্তর। শেষান্ দেবগণাংস্তজ্জ্ঞঃ (ব);···প্রাজ্ঞঃ (কা)। উৎকারিকা, উৎকরিকা—দুগ্ধ, গুড় ও ঘৃত সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ।

মূল :—সাগরসমূহ, সরিদ্‌গণ ও বরুণকেও মৎস্য ও পিষ্টকাদি ভক্ষ্যসমূহ-দ্বারা সম্যগ্‌রূপে পূজা করিয়া ঘৃত-মিশ্রিত পায়স প্রদান করিতে হইবে। ৪৩।

সঙ্কেত :—পিষ্টভক্ষ্যৈশ্চ—পিষ্ট—পিষ্টক; ভক্ষ্য—কঠিন খাদ্য—চর্ব্ব্য।

মূল :—আর নানারূপ মূল-ফলাদি-দ্বারা মুনিগণের সম্যগ্‌রূপে প্রতিপূজন করা কর্তব্য। বায়ুসমূহ ও পক্ষিগণকে বিচিত্র ভক্ষ্য-ভোজনসমূহ-দ্বারা (পূজিত করা উচিত)। ৪৪।

সঙ্কেত :—প্রতিপূজন—পূজা। বায়ুসমূহ—ঊনপঞ্চাশ বায়ু। ভোজন—ভোজ্য। কাশীর পাঠ—বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজন।

মূল :—নাট্যের সেই মাতৃ-সকলকে ও অনুগগণ সহ ধনদকে লিপিকা-মিশ্রিত অপূপ ও ভক্ষ্য-ভোজ্য-দ্বারা প্রযত্ন-সহকারে (পূজা কর্তব্য)। ৪৫।

সঙ্কেত :—ধনদ—কুবের। লিপিকা (ব); লোপিকা (কা) পাঠান্তর লেপিকা; অর্থ অজ্ঞাত।

[ক্রমশঃ

হিটলারের সময়ে জার্ম্মাণীতে নারীর স্থান

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

আজ জার্ম্মাণী পর্য্যুদস্ত হইলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবর্গ যখন জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের নেতাকে আহ্বান করিয়া শাসন-ক্ষমতার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন জার্ম্মাণীর যে শোচনীয় গভীর নৈরাশ্যময় অবস্থা ছিল, মাত্র ৭।৮ বৎসরের চেষ্টায় রহস্যপরিপূর্ণ হিটলারের কর্ত্তৃত্বে ও তাঁহার সহচর ও অনুচরবৃন্দের ঐকান্তিক প্রযত্নে জার্ম্মাণীর সেই অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল। একদিন যেখানে ছিল হতবুদ্ধিতা, শৃঙ্খলাহীনতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সার্ব্বজনিক আত্মগ্লানি, দুঃখানুভূতি ও সম্মানহানি, মাত্র কয়েক বৎসর পরেই সেখানে দেখা গিয়াছিল সুপরিচালিত কর্ম্মব্যবস্থা, অসাধারণ কর্ম্মতৎপরতা, অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা, অন্তর্দ্বন্দ্বহীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সার্ব্বজনিক আত্মপ্রত্যয়, গৌরবানুভূতি ও নব নব সম্মানলাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা! কি মোহন মন্ত্রবলে, কি অভূতপূর্ব্ব কৌশলে এ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছিল হতভাগ্য ভারতবাসীর তাহা জানিবার জন্য আকুলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

প্রাচীন ভারতে নারীজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা ও কর্ম্ম-ব্যবস্থা যে নীতি ও আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিল, প্রাচ্য জাতিগুলি একরূপ সকলেই আজ পর্য্যন্তও তাহার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন-সাধনে সমর্থ না হইলেও পাশ্চাত্য জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনেক-কিছু নূতন ব্যবস্থা বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের (National Socialism-এর) নেতা নারীজাতি সম্বন্ধে কি নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এ প্রবন্ধে সে বিষয়েই কিছু আলোচনা করিব।

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদীরা যখন স্বদেশে ক্ষমতা-লাভের জন্য সংগ্রামরত ছিলেন তখন জার্ম্মাণ-রমণীরা সেই উদ্দেশ্য-সাধনে যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন হিটলার তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। নুরেমবার্গ পার্টি কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"জার্ম্মাণ-রমণীর নিষ্কাম অনুরাগ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ব্যতীত আমার মতানুবর্ত্তীদিগকে জয়ের পথে পরিচালিত করা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।" তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিয়াই জনসাধারণের সেবা-জাতীয় যে সব কার্য্যে রমণীগণের ধৈর্য্য, অনুভূতি প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিনিচয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বজন স্বীকৃত, সেই সেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে রমণীজাতির সম্পূর্ণ অংশ-গ্রহণের দাবী হিটলার পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কোন একজন বিশিষ্ট লেখক কয়েক জন বৈদেশিক বার্ত্তা-সংগ্রাহকের সঙ্গে গিয়া 'রাইখ' (Reich) নারীনেত্রী ফ্রগেরট্রুড শোল্‌টস-ক্লিঙ্ক (Frau Gertrud Scholtz-klink)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিটলার-জার্ম্মাণীতে নারীর স্থান ও কেন জার্ম্মাণ-রমণীরা প্রথম হইতেই হিটলার-আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—

"জীবন-সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ সমগ্র জাতীয় সত্তার ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষয়িক উন্নতির উপরে বিশেষ নির্ভর না করিয়া জাতীয় আত্মার উপরই ইহা বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। আর জাতীয় আত্মার সহিত যাহা সংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে কিছু নির্দ্ধারণের ভার অধিকাংশের মতের উপর নির্ভর করে না, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জার্ম্মাণ-পুরুষজাতির চিত্ত ইহারই সমাধানে বিশেষভাবে নিবিষ্ট ছিল, তথাপি বহু জার্ম্মাণ-রমণী জার্ম্মাণজাতির আত্মাধিকারের এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে পুরুষজাতির সহিত অবিচলিত আনুগত্যে সুসংবদ্ধ ছিল।

"অবিচলিত আনুগত্য-লাভের জন্য আমরা স্ত্রীজাতির বিশেষ স্বার্থ-সমূহ উপেক্ষা করিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ আমাদের নিন্দা করিয়াছেন। তদুত্তরে আমার ইহাই বক্তব্য যে, জাতীয় সমাজতন্ত্রের চিন্তা ও কর্ম্ম-ধারার মূল আদর্শে বরাবরই ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টিগত স্বার্থের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতিকে সাহায্য করিতে সমর্থ হওয়ার পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বা তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ চিন্তা ও কর্ত্তব্যবিধির বিষয়গুলি কোনমতেই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য বলিয়া গৃহীত হওয়ার প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই। যত দিন জার্ম্মাণ জনসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতি জার্ম্মাণ-পুরুষদিগের মন একাগ্রভাবে অধিকার করিয়াছিল তত দিন পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা সমগ্র জার্ম্মাণজাতির কথাই আমাদের স্ত্রীলোকদের পক্ষেও বেশী প্রয়োজনীয় ছিল।"

জার্ম্মাণ-রমণী সম্বন্ধে বাহিরে নানা কুসংস্কার ও ভ্রান্তিমূলক ধারণা প্রচলিত আছে, জার্ম্মাণীর ও জার্ম্মাণজাতির সহিত সুপরিচিত না হওয়ার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বের্লিনের উপবনে পোষা কুকুরের সহিত ভ্রমণশীলা ক্ষীণা ছোট রমণীকে দেখিয়া জার্ম্মাণ-রমণীর সম্বন্ধে কোন ধারণা করা চলিবে না, আবার বের্লিনের ধনি-পরিবারের গোলাপী রঙের মহিলাদের দেখিয়া জার্ম্মাণ-রমণী-সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে গেলেও ভুল করা হইবে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে জার্ম্মাণ রমণীগণ আঁটাসোটা পোষাকের পক্ষপাতী হইলেও পোষাকে সাদাসিধে ভাবটাকেই তাঁহারা বেশী ভালবাসেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের চরিত্রের সরলতা প্রকাশ পায়। বিগত হিটলার-যুগে (১৯৩৩-১৯৪৫ খৃঃ) যদিও তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের

নারীনেত্রী ফ্র-গেরট্রুড শোল্‌টস-ক্লিঙ্ক

শিক্ষালাভে ততটা আগ্রহশীল ছিলেন না, এবং রাজনীতিতে নিজেদের একটা নাম করার লোভ তাঁহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় নাই; তথাপি তাঁহাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, এবং সঙ্গীত, সাহিত্য ও অন্যান্য

কলাবিদ্যায় তাঁহাদের জ্ঞান তাঁহাদিগকে বিশেষ প্রশংসাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে জাৰ্ম্মাণীর বনস্যার্ট-হল বা বক্তৃতা-গৃহগুলির শ্রোতা বা দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই দেখা যাইত নারী।

তবে নবীন জাৰ্ম্মাণ-তরুণীদের কাছে পারিবারিক জীবনই প্রধান কর্ম্মস্থল বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহাদের চিন্তাধারা পারিবারিক জীবনে প্রবেশেচ্ছার দ্বারাই প্রভাবিত হইত। জাৰ্ম্মাণ-তরুণীরা ভবিষ্যৎ জননীরূপে তাহাদের যে দায়িত্ব আছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ জাগরুক ছিল। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের উৎসবাদিতে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যোগদান করিলেও এবং হিটলারের স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বক্তৃতাদি হইতে উত্তেজনা ও উৎসাহ লাভ করিলেও নারীত্ব-সম্বন্ধে তাহারা সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধান ছিল এবং এ বিষয়ে সমগ্র জগতে তাহাদের তুলনা মিলে কি না সন্দেহ। প্রত্যেক স্ত্রীই সুগৃহিণীরূপে সুখ্যাতি-প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব পিতৃগৃহ অথবা জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের নারীসংঘ বা বিদ্যালয়গুলি হইতে যে যে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

কোন জাৰ্ম্মাণ-রমণীর উপর যে সমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব পতিত হয় তাহা পালনের সময়ে সমগ্র জাৰ্ম্মাণজাতির প্রতি তাহার যে কর্ত্তব্য আছে তাহা সে কখনও বিস্মৃত হয় না। এ বিষয়ে কোন এক জন সাংবাদিক প্রশ্ন করায় জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী মহিলা-সংঘের এক জন সদস্যা বলিয়াছিলেন যে, "আমরা আমাদের জাতির জীবন-রক্ষার সেবায় নিযুক্ত আছি, আমাদের দৈনন্দিন গৃহকর্ম্মকে সমগ্র জাতির শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সঞ্চয় ও রক্ষার উপায় বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি।"

জীবনের নূতন আদর্শ জাৰ্ম্মাণ-রমণীদের চিন্তাধারা ও আচরণে বিশেষ পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল। সহস্র সহস্র যুবতী 'বুবিকফ' (Bubikopf)এর পরিবর্তে সাদাসিধে বাদামী জ্যাকেট ও কাল স্কার্টের ইউনিফর্ম্ম পরিধান করিতে গর্ব্ব অনুভব করিত। তাহা দ্বারা মনে হইত যে, জাৰ্ম্মাণ-যুবতীগণ মৌলিক ভাবে অনেকটা নৈতিক উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহারা তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে এবং কৃত্রিম লজ্জাশীলতার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া এখন অপরের সমালোচনার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। জাৰ্ম্মাণ-পুরুষ জাতির প্রতি জাৰ্ম্মাণ-রমণীদের শ্রদ্ধা অনেকটা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এই পরিবর্তন সহজসাধ্য হইয়াছে। বেকার-জীবনের হ্রাস, কার্য্যের সুযোগবৃদ্ধি, সৈন্যবিভাগে এবং শ্রমিক-বিভাগে যুবকদের নিয়োগ, রাস্তাগুলিতে এবং আমোদ-প্রমোদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অতিরিক্ত উৎসাহী যুবকবৃন্দের সংখ্যা-হ্রাস প্রভৃতি কারণে যুবকেরা এখন সামাজিক জীবনের রীতি-নীতি ও আদর্শ জানার সুযোগ লাভ করিয়া রমণীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব-যুগে জাৰ্ম্মাণীর রাজধানীতে কোন পরিদর্শক আসিলে প্রথমেই যুবকদের চরিত্রগত শিথিলতা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের প্রতি তাহাদের আচরণই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জাৰ্ম্মাণ-যুবকদের পক্ষে অবশ্য-গ্রহণীয় সৈনিকবৃত্তি (compulsory military training) বিশেষ উপকারী হইয়াছিল, কারণ ইহার ফলে তাহারা স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে একটা বীর-জনোচিত মনোভাব পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

নীতিশাস্ত্র এবং নৈতিক চরিত্র-সম্বন্ধে এই নবীন মনোভাব জাৰ্ম্মাণ-যুবতীদের মনে সুদৃঢ় করিবার জন্য রাইখ (Reich) যুব-নেতা জাৰ্ম্মাণ-বালিকাসঙ্ঘের (Girl Leagueএর) সভ্যাদের নিকট এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে তোমাদের যে কর্ত্তব্য আছে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বালিকা-জীবনেই তোমাদের শিক্ষালাভ করিতে হইবে, এক দিন তোমাদিগকেই জাৰ্ম্মাণ-পুরুষদের গৃহিণীরূপে এবং নবীন জাৰ্ম্মাণীর জননীরূপে যে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে তজ্জন্য যথোচিত শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। জাৰ্ম্মাণজাতির ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব যে সমস্ত যুবক গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের জন্য তোমাদের মত শ্রদ্ধাশীল, দৃঢ়চিত্ত এবং স্বামীর সঙ্গে সাংসারিক দুঃখকষ্ট-বরণে ও ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত গৃহিণী একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক বালিকার এই উচ্চ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক. স্ব স্ব জীবনে সাধারণ এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রত্যেক বালিকাকে বহু বৎসর যাবৎ দৈহিক শক্তি, কর্ম্মপটুতা ও প্রকৃত সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে এবং নিজের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।"

বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন যুবতী কোন আফিসে বা ফ্যাক্টরীতে কার্য্য করিলেও মোটের উপর বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই থাকে; ইহা দ্বারা তাহার পিতার পরিবারের আর্থিক কিছু সুবিধা হয়, সাধারণতঃ তাহার আয় হইতে বেতনের সে সংসারে দেয় এবং বাকীটা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করে। সাধারণতঃ মেয়েরা সেবা শুশ্রূষার কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। জাৰ্ম্মাণীতে নার্সিং-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে, এবং ইহাতে শিক্ষানবীশ-ভাবে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন কার্য্য করিতে হয়। বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও কোন যুবতী বিবাহিত জীবন-যাপনে ইচ্ছুক হইলে সে তখনই (তাহার চাকুরীতে ভবিষ্যতে সুযোগ সুবিধার যতই আশা থাকুক) সন্তুষ্টচিত্তে চাকুরী ত্যাগ করিয়া নিজের গৃহ ও পরিবারের কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এই জাতীয় অধিকাংশ বিবাহই ঠেট হইতে যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে, বহু দিন পর্য্যন্ত এই সব ঋণ স্ব স্ব ব্যবসায় বা কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সাংসারিক কার্য্য করিবার জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইত মাত্র তাহাদিগকেই দেওয়া হইত।

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ স্ত্রীজাতির আদর্শ এবং জাতির প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্টভাবে স্থির করিয়া দিয়াছে। হিটলারের মতে জাতির জীবনে দুইটি জগৎ (world) আছে, নর-জগৎ এবং নারী-জগৎ। প্রকৃতির ব্যবস্থাই এই যে, পুরুষ পরিবারের রক্ষক হইবে এবং সমষ্টিগতভাবে জাতির রক্ষার দায়িত্বও তাহার উপরই পড়িবে; আর পরিবার, স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও গৃহের মধ্যে সন্তুষ্টচিত্তা নারীজাতির কর্ম্মস্থল সীমাবদ্ধ থাকিবে। সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্য হইতেই নারী সমগ্র জাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবে। এই নর-জগৎ ও নারী-জগতের সমন্বয়েই একটা জাতি বাঁচিতে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়।

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ নারীজাতির পক্ষে প্রকৃতিগত আদর্শই নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে এবং পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর নিয়োগ সেখানে বিশেষ সমর্থন লাভ করে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা ও অধিকার-সাম্য হইতে বঞ্চিত

করিয়াছে বলিয়া অন্যান্য দেশে যে প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছে, জার্ম্মাণীতে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়া থাকে। হিটলারের একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"যত দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ জাতি সুস্থ ও পরাক্রান্ত থাকিবে (আমরা জাতীয় সমাজতন্ত্র-বাদীরা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিব), তত দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীতে হাত-বোমা বা বন্দুকের গুলী ছুঁড়িবার জন্য কোন নারীদল গঠিত হইবে না, কারণ তাহাদ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হয় না, তাঁহাদিগের উচ্চ বা মহৎ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে অবনমিত করা হয়।"

নবীন জার্ম্মাণীতে স্ত্রীজাতির পক্ষে অপরিমেয় বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে, স্ত্রীজাতিকে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করা হইয়াছে বলিলে নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাইবে। নবীন জার্ম্মাণীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই যে, স্ত্রীজাতিকে সাংসারিক জীবন যাপন করিতে সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদান করা হইতেছে, কারণ যদি কোন রমণী সুসন্তানের জননী ও উপযুক্ত গৃহিণীরূপে একটি সুস্থ, সবল ও সুখী পরিবার গঠন ও পরিচালনে সমর্থ হন, তাহা দ্বারাই তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে তাঁহার দেশের ও জাতির সেবা করিতে পারিবেন। কোথাও যদি একজন সাংসারিক জীবন-যাপনে অনভ্যস্ত সর্ব্বজন-পরিচিত প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোক ব্যবহারাজীব থাকেন, আর তাঁহারই প্রতিবাসী যদি এমন এক জন জননী থাকেন যিনি পাঁচ, ছয় বা সাতটি সন্তানকে যথোচিত ভাবে লালন-পালন করিয়া সুস্থ, সবল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও প্রকৃত কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিতীয় রমণী যতই অপরিচিতা হউন না কেন, প্রথম, অপেক্ষা তাঁহার জীবনের সার্থকতা অনেক বেশী ও মূল্যবান্। হিটলারের মতে প্রত্যেক ষ্টেটের কার্য্য এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অর্থনৈতিক অন্তরায়গুলি যথাসম্ভব দূরীভূত হয়। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি উভয়েরই স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া ও অনুরোধ করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেকেই যাহাতে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য্য অপেক্ষা নিম্ন-স্তরের কার্য্যে নিযুক্ত না হয় তাহারই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রকৃতিগত প্রভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই এবং কর্ম্মক্ষেত্রেও তাহাই মাত্র করা হইয়াছিল। নবীন জার্ম্মাণীতে স্ত্রীজাতিকে রাজনীতিতে বা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষা অনেক উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছিল। গৃহকর্ম্ম ফলপ্রসূ নহে—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। জার্ম্মাণীর অতীত যুগে এই জাতীয় ধারণা অনেকের ছিল, সে যুগে কর্ম্মপ্রসূতার মাপকাঠি ছিল ব্যক্তিগত লাভ বা সুযোগ-সুবিধা, সমষ্টিগতভাবে জাতির কি লাভ বা ক্ষতি হইল তাহা তখন বিবেচিত হইত না। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, কোন কার্য্যের ফলে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতি লাভবান্ হইলে পরোক্ষভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহাতে লাভবান্ হইয়া থাকে।

★

গান

কানাই সামন্ত

বঁধু সুখের ফুলে মালা গাঁথি।
তুমি আসবে ব'লে হৃদয়খানি পাতি
এই ধূসর-বরণ পথের ধূলিতলে।
আমার মন যে বলে,
তুমি আসবে আসবে আসবে, মরমসাথি!

হেরো পশ্চিমে ঐ কনক অরুণ
শেষে নিবল বিদায়-বেলার করুণ ভাতি।
তুমি আসবে আসবে আসবে, মরমসাথি!

বঁধু, অশ্রু-ধোওয়া আমার সুখের ফুলে,
বলি, হার গেঁথে তাই ঊর্দ্ধে তুলে,
তোমার তারার হারে লজ্জা দিল, হেরো, নিশীথ রাতি।
তুমি আসবে আসবে আসবে, মরমসাথি!

সোনার পাথরবাটী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা বাল্যকাল হইতে সোনার পাথরবাটী, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, পটোলের আলুর দম ও স্বদেশী বিলাতী মাটির কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এইরূপ আরও অনেক শব্দ আছে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে সোনার পাথরবাটী জাতীয় হইলেও আমরা সব সময় তাহা ধরিতে পারি না। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবে লিখিয়াছেন—

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ। ৫।৭৮।

"ওগো সন্ন্যাসী এ মহাবিশ্ব দৃশ্য মূরতি যার
উজ্জ্বল-মণি ফণী বিষধর কিবা না ভূষণ তার।
যার হাতে দেখ ভিক্ষা-কপাল ইন্দু তারই যে ভালে
কখন সাজে সে ক্ষৌমদুকূলে কখন দ্বিরদছালে।"
(পণ্ডিতবর যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্যের অনুবাদ)

এই শ্লোকটিতে গজচর্ম অর্থে গজাজিন শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। অজিন-শব্দটি অজ-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন সুতরাং উহার প্রাথমিক অর্থ অজ-সম্বন্ধীয়। অতএব ছাগচর্ম অর্থে অজিন-শব্দের প্রয়োগ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ, কিন্তু মৃগচর্ম অর্থে মৃগাজিন, গজচর্ম অর্থে গজাজিন প্রভৃতি সোনার পাথরবাটী জাতীয়।

কুমারসম্ভবের ঐ সর্গেই আর একটি শ্লোক আছে—

নিবার্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্। ৫।৮৩।

"মানা কর সখি মুখর বটুরে পুন কি কহে না জানি
আর কিবা যেন বলিতে বলিয়া কাঁপিছে অধরখানি।
নিন্দা করে যে মহাজনে সই সেই শুধু পাপী নহে
সেও মহাপাপী সে পাপভাষণ শুনিতে সেথা যে রহে।"
(পণ্ডিতবর যামিনীকান্তের অনুবাদ)

এই শ্লোকে স্ফুরিতোত্তরাধরঃ-পদ শুনিলেই যেন মনে হয়, যাহার উপরের ঠোঁট কাঁপিতেছে। এই অর্থ ধরিলে উত্তরাধর শব্দটি সোনার পাথরবাটী জাতীয়। কেন না, অধর শব্দের প্রকৃত অর্থ নিম্নতর (lower) বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৫।২) আছে—অধরেণৌষ্ঠেন, সদ্ উত্তরেণ। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে অধর-শব্দের অর্থ হয় নিম্নোষ্ঠ (lower lip); সুতরাং উত্তরাধর শব্দের অর্থ দাঁড়ায় উপরের নীচের ঠোঁট। এই কারণে টীকাকারগণ অর্থ করেন —স্ফুরিত-ভূয়িষ্ঠ অধর যাঁহার অর্থাৎ যাঁহার নীচের ঠোঁট খুব কাঁপিতেছে। এইরূপ অর্থ করিলে অথবা উত্তর শব্দের অর্থ উপরের ঠোঁট ধরিলে আর অধর শব্দের অর্থ নীচের ঠোঁট ধরিলে কোন গোল থাকে না।

কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় (৩।১৮) * নলিনীদল-তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজনের উল্লেখ করিয়াছেন। তালবৃন্ত শব্দের অর্থ তাল পাতার পাখা, সুতরাং 'নলিনীদল-তালবৃন্ত' ঠিক সোনার পাথরবাটী জাতীয় শব্দ। বাণভট্টের 'কিসলয়-তালবৃন্ত' সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

ভারবি তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয়ে (৫।৩৯) † বিকচ স্থলকমলিনী বন হইতে উৎথাপিত সরসিজ-পরাগের বর্ণনা করিয়াছেন। সরসিজ শব্দের অর্থ পদ্ম বটে, কিন্তু যে পদ্ম সরোবরে উৎপন্ন সেই পদ্ম অর্থাৎ জলপদ্ম। শকুন্তলায় (১।১৭) আছে—সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্। সুতরাং 'স্থলনলিনীবন' হইতে উদ্ধৃত 'সরসিজপরাগ' সোনার পাথরবাটী জাতীয়। স্থলসরোজ, স্থলাব্জ প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

তৈল শব্দের প্রকৃত অর্থ—তিলের নির্যাস। সুতরাং তিলতৈল বলিলে পুনরুক্তি হয়, আর নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল প্রভৃতি বিপ্রতিষিদ্ধ, সোনার পাথরবাটী জাতীয়। ইংরাজীতেও oil শব্দের প্রকৃত অর্থ জলপায়ের তৈল। সুতরাং castor oil mustard oil প্রভৃতি সোনার পাথরবাটী জাতীয়, আর olive oil পুনরুক্তি দোষগ্রস্ত।

ঠিক এই ভাবে স্ত্রীলোক শব্দটা বিপ্রতিসিদ্ধ। প্রথমে স্ত্রীশব্দের অর্থ ছিল স্ত্রীজাতীয় যে কেহ, ইংরাজীতে যাহাকে woman in general বলে।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ ভর্ত্তরি প্রেতে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

প্রভৃতি স্থলে এই অর্থ সুপরিস্ফুট। ক্রমশঃ অর্থটি সঙ্কুচিত হইয়া যে স্ত্রীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেই স্ত্রী অর্থাৎ পত্নী দাঁড়াইল। তখন সাধারণ ভাবে স্ত্রীজাতীয় বুঝাইবার জন্য একটি পৃথক্ শব্দের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ফলে স্ত্রীশব্দের সহিত একটি লোক যোগ করিয়া স্ত্রীলোক শব্দের সৃষ্টি হইল।

ইংরাজীতে woman শব্দে আমরা ঠিক এই জিনিষই দেখিতে পাই। Wife শব্দের অর্থ প্রথমে স্ত্রী ছিল, fish-wife প্রভৃতি শব্দে এখনও আমরা এই অর্থ দেখিতে পাই। Wifeএর জার্ম্মান্ জ্ঞাতি Weib শব্দ এখনও স্ত্রী-লোক অর্থে প্রযুক্ত হয়। ক্রমশঃ wife শব্দের অর্থ দাঁড়াইল—পত্নী। তখন স্ত্রীবাচক একটি শব্দের প্রয়োজন হওয়ায় wifeএর শেষে man যোগ করিয়া woman করা হইল! সুতরাং বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের ন্যায় ইংরাজীতে womanও যে সোনার পাথরবাটী জাতীয় শব্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!

সূধাতুর অর্থ প্রসব করা। ধাতুপাঠে আছে—ষূঙ্ প্রাণিগর্ভ-বিমোচনে। শূকরী একেবারে অনেকগুলি সন্তান প্রসব করে বলিয়া তাহাকে ইংরাজীতে sow বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, এই সূধাতুর

* কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ।

† উৎফুল্লস্থলনলিনীবনদমুষ্মা-
দুদ্ধূতঃ সরসিজসম্ভবঃ পরাগঃ।
বাত্যাভির্বিয়তি বিবর্ত্তিতঃ সমন্তা-
দাধত্তে কনকময়াতপত্রলক্ষ্মীম্।

উত্তর তৃ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈ করিলে সোত্রী হয়, সেই সোত্রী-শব্দই ওকার লোপের ফলে বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে স্ত্রী আকারে দেখা দেয়। অর্থ—যে প্রসব করে। সংস্কৃত সূনু ও ইংরাজী sow এই সূধাতু-নিষ্পন্ন। সুতরাং পিতার পুত্র ও মাতার সূনু বেশ চলিতে পারে, কিন্তু পিতার সূনু, দশরথের সূনু, father's son প্রভৃতি সোনার পাথরবাটী জাতীয়।

সংস্কৃত শালা শব্দ ইংরাজীতে hall আকার ধারণ করিয়াছে। শালা-শব্দের অর্থ গৃহ, যেমন পাঠশালা (বিদ্যালয়), আরোগ্যশালা (হাসপাতাল) ইত্যাদি। শালা অর্থাৎ গৃহ আছে যাহার সে শালী, যেমন গুণ আছে যাহার সে গুণী, জ্ঞান আছে যাহার সে জ্ঞানী। সুতরাং দেখা গেল শালী (শালিন) শব্দের অর্থ গৃহবিশিষ্ট। অতএব বলশালী, জ্ঞানশালী, "চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী", "শস্যশালিনী বসুনা" প্রভৃতি সোনার পাথরবাটী জাতীয়।

ইংরাজীতে চটককে cock-sparrow ও চটকাকে hen-sparrow বলা হয়। এই দুইটিই সোনার পাথরবাটী জাতীয় শব্দ। জার্মান ভাষায় মহিষীকে বলা হয় Bueffel-kuh অর্থাৎ গাই-মহিষ। উহাও এই জাতীয় শব্দ। সংস্কৃতে বৃষা-কপি শব্দ পাওয়া যায়। বৃষা পদটি পুরুষবাচক ও যোষা পদ স্ত্রীবাচক। সুতরাং বৃষা-কপি শব্দের অক্ষরার্থ—মদ্দা বানর। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে হয় 'বৃষা-কপায়ী'—অর্থ মদ্দা মাদী বানর। শব্দটি বিপ্রতিষিদ্ধ। ইংরাজীতে bull-dog এর স্ত্রীলিঙ্গ bull-bitchও বিপ্রতিষিদ্ধ।

বাঙ্গালায় আমরা অনেক সময় বলি দু ডবল, তিন ডবল, চার ডবল ইত্যাদি। দু ডবল পুনরুক্তিদোষদুষ্ট, আর তিন ডবল চার ডবল প্রভৃতি সোনার পাথরবাটী জাতীয়।

বিম্ব শব্দের অর্থ সূর্য বা চন্দ্রের মণ্ডল। প্রতিবিম্ব শব্দের অর্থ জলাদিতে প্রতিফলিত সূর্য বা চন্দ্রের মণ্ডল। সুতরাং মানুষের প্রতিবিম্ব সোনার পাথরবাটী জাতীয়।

গোময় শব্দের অর্থ গোবর, সুতরাং উষ্ট্রগোময়, মহিষগোময় প্রভৃতি শব্দও এই জাতীয়।

গোষ্ঠ শব্দের অর্থ যে স্থানে গোরু থাকে অথবা গোচারণের মাঠ। সুতরাং গোগোষ্ঠ বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয় আর মহিষ-গোষ্ঠ বিপ্রতিষিদ্ধ। অথচ এইগুলি ভাষায় চলিয়া গিয়াছে *।

গোযুগ শব্দের অর্থ এক জোড়া গোরু, অথচ মহিষ-গোযুগ, উষ্ট্র গোযুগ প্রভৃতি বলা হয়। এই শব্দগুলি সোনার পাথরবাটী জাতীয়।

সিদ্ধিদাতা গণেশের ধ্যানে আছে—খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনম্। তনু শব্দের অর্থ ক্ষীণ, কৃশ, সুতরাং কৃশতনু পুনরুক্তিদোষগ্রস্ত আর স্থূলতনু সোনার পাথরবাটী জাতীয়। 'ভারী হাল্কা'ও এই জাতীয়।

কিশোর শব্দের অর্থ অশ্বশাবক, উহার স্ত্রীলিঙ্গে কিশোরী হয়, সুতরাং মনুষ্যজাতীয়ের সম্বন্ধে যখন কিশোর কিশোরী শব্দ প্রয়োগ করা হয় তখন সোনার পাথরবাটীর মত শোনায়।

ইংরাজীতে horse beef শব্দেও সোনার পাথরবাটী ভাব সুপরিস্ফুট। Blackberries are red when they are green—এই বাক্যটিও সোনার পাথরবাটী জাতীয় বাক্যের সুন্দর উদাহরণ।

ফরাসী ভাষায় হিন্দুকে 'ব্রাহ্মণ হিন্দু' ও মুসলমানকে 'মুসলমান হিন্দু' বলা হয়।

জার্ম্মান ভাষায় দস্তানাকে Handschuh বা 'হাতের জুতা' বলা হয়।

ইংরাজীতে orthography শব্দের অর্থ 'ঠিক বানান' সুতরাং যখন correct orthography বলা হয় তখন পুনরুক্তিদোষ হয়, আর incorrect orthography হইতেছে সোনার পাথরবাটী।

Cicero ঘটীযন্ত্র (water-clock) কে aquasolarium বা water-sun-dial বলিয়াছেন।

গ্রীক ভাষায় অশ্বারোহি-(সাদি)-বাচক শব্দ আছে কিন্তু শুধু আরোহী বোঝায় এমন কোন সুবিধাজনক শব্দ নাই, সেই জন্য হস্ত্যারোহী (নিষাদী) বুঝাইতে গ্রীকগণ হস্তীর উপর অশ্বারোহী এই শব্দসমষ্টি ব্যবহার করিতেন। আর আমরা যেমন সোনার পাথর বাটী বলি, Theocritus ঠিক সেই ভাবে সোনার অ্যালাষ্টার বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীসে বহুমূল্য অঙ্গরাগ রক্ষার জন্য মঞ্জুষাগুলি প্রায়ই অ্যালাষ্টার বা শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত হইত, ফলে উহাদের অ্যালাষ্টার বলা হইত। স্বর্ণনির্মিত অঙ্গরাগ বুঝাইতে সোনার অ্যালাষ্টার বলা ছাড়া আর উপায় কি?

* এই কারণে কোন কোন বৈয়াকরণ গোষ্ঠ প্রভৃতিকে প্রত্যয়ের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। মহাভাষ্যে (৫।২।২৯।৩) আছে—গোষ্ঠাদয়ঃ প্রত্যয়াঃ স্থানাদিষ্বর্থেষু পশুনামাদিভ্যো বক্তব্যাঃ। গোগোষ্ঠম্। অবিগোষ্ঠম্।......গোযুগশব্দশ্চ প্রত্যয়ো বক্তব্যঃ। উষ্ট্রগোযুগম্। খরগোযুগম্। তৈলশব্দশ্চ প্রত্যয়ো বক্তব্যঃ। ইঙ্গুদতৈলম্, সর্ষপতৈলম্ ইত্যাদি।

একটি সনেট

শ্রীভাস্কর দেব

আকাশের চাঁদ আকাশেই থাক্ আঁকা
মাটীর ধরায় হাসিটুকু তারি ভাব,
গুমরি কাটিবে ভাবের ফানুষ তার
বুভুক্ষা-তিয়া-অভাবে এ ধরা বাঁকা।

বন্ধ্যা-ভূমার প্রসবে ভরে না ঝাঁকা—
চিমনীর ধূমে ঘামে ভেজে বুক তার,
নিষ্ফল চাষে স্বপ্ন রহিবে কার?
সেথায় চাঁদের হাসি যার রবে আঁকা।

মরুভূ-তিয়াসে ফাটে মানুষের বুক
জোছনার চেয়ে দামী এক ফোঁটা জল,
অমৃত পুত্র কাঁদে না সুধার লাগি'—
মুষ্টি অন্ন তরে, এ ক্ষুধার দুখ,

ফলা বীজ চায়—ফলে না বাঁচার ফল—
হেসে সারা চাঁদ যুগের গগনে জাগি'!

রূপ-কথার রাজকন্যার মতো রূপ নিয়ে কম মেয়েই জন্মায় একথা সত্যি, কিন্তু সুন্দর হতে ইচ্ছা কোনো দিন যার মনে জাগেনি এমন মেয়েও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া শক্ত। রূপ মেয়েদের জীবনে যখন একটি মূলধন বিশেষ, তখন সুন্দর হবার আকাঙ্ক্ষা থাকা মেয়েদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। সর্ব দেশে, সর্ব কালে মেয়েরা তাই প্রসাধন-সজ্জা দিয়ে তাদের সৌন্দর্যের ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করেছে; যারা সুন্দরী তারা তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলতে প্রসাধন-সজ্জার সহায়তা নিয়েছে। সেই জন্যই মেয়েদের প্রসাধনের এত আড়ম্বর, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে শিল্পকলার মতোই মেয়েদের প্রসাধনে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা গড়ে উঠেছে। সৌন্দর্যলাভের মোহ নারীচরিত্রের একটি বিশেষত্ব, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

অনেকের ধারণা যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার ঢেউ লেগেই আমাদের দেশে এ যুগের মেয়েরা বেশভূষা সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন হয়ে উঠেছে। স্নো-ক্রীম-পাউডার মেখে তাদের নিজের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা নেহাৎই একটা হাল-ফ্যাসানি বিলাসিতা। কিন্তু পাশ্চাত্যের 'বিউটি-কালচার' জন্মাবার বহু পূর্বে এদেশের মেয়েদের রূপ-চর্চা সম্বন্ধে জ্ঞান ও নৈপুণ্য যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অধুনা 'বিউটি-কালচারের' প্রধান কেন্দ্র আমেরিকা যখন আবিষ্কার হয়নি, ইংলণ্ডের অধিবাসীরা যখন বর্বর-জীবন যাপন করতো, সেই সুদূর অতীত কালেও ভারতের মেয়েরা প্রসাধন-শিল্পে কত নিপুণ ছিল তার প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যের নায়িকাদের প্রসাধন-বর্ণনা, এমন কি মহেঞ্জো-দারো হারাপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকেই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের মেয়েরা যখন প্রথম প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবহার শিখল, তখন সে-সব প্রসাধন-সামগ্রীর উপাদান, গন্ধদ্রব্য—সমস্তই মিশর, আরব ও ভারত থেকে রপ্তানী হতো। রূপ-চর্চার উদ্ভবই যে প্রাচ্যে, একথা আধুনিক 'বিউটি-স্পেশালিষ্ট'রা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না।

এখন যুগটা গেছে বদলে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রসাধন-সামগ্রীর ভূরি-উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ার ফলে পাশ্চাত্যের প্রসাধন-সামগ্রী পাশ্চাত্য ছাপিয়ে সারা প্রাচ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। সহজ ও সুলভ উপায়ে সুন্দর হবার লোভ মেয়েরা কাটিয়ে উঠতে পারে না, কাজেই সুদূর চীনের সৌখীন মেয়েদেরও 'এলিজাবেথ্ আর্ডেনের' প্রসাধন সামগ্রী ছাড়া আর কিছু পছন্দ হয় না।

আর আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এ যুগের আধুনিকাদের মা-দিদিমারাই কি প্রসাধন ব্যবহারে উদাসীন ছিলেন? না সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপাদন সম্বন্ধে তাঁদের খুঁটিনাটি জ্ঞান বড় কম ছিল? এখন বদল যেটুকু হয়েছে তা শুধু প্রসাধনের রীতি-নীতিতে। তেমন রীতি তো কতই বদলেছে। নিমের দাঁতন ছেড়ে লোকে টুথব্রাশ-টুথপেষ্ট ব্যবহার করছে, মেয়েরাও সর-ময়দা ছেড়ে স্নো-ক্রীম ব্যবহার করতে শিখেছে তা আর বিচিত্র কি? অনেকে হয়তো বলবেন যে, প্রসাধন-ব্যাপারে আজকাল অনেক সময় রুচির অভাব চোখে পড়ে, কিন্তু সেজন্য আধুনিক মেয়েদের সব ক্ষেত্রে দোষও দেওয়া যায় না। সুরুচি নিয়ে জন্মগ্রহণ সবাই করে না আর সুরুচির মাপকাঠিই বা তারা আজ পাবে কোথায়? আমাদের প্রসাধনের প্রাচীন রীতি-নীতি কালের স্রোতে ভেসে গিয়েছে, আর পাশ্চাত্যের আমদানী-করা রীতি-নীতির কোন্‌টা আমাদের মানায় কোন্‌টা মানায় না—এটা ঠিক বিচার করে বেছে নেবার ক্ষমতা সব মেয়েরই থাকবে এটা আশা করাই বৃথা। 'চলতি ফ্যাসান' বলে যেটা তারা দেখে-শোনে, সিনেমা-থিয়েটারে পরিবেশিত হয় সেটাই তারা গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্যে অবশ্য রুচি নিয়ে না জন্মালেও সুরুচি শিক্ষার উপায় আছে অনেক। দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিই অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকতার ভার নেয়, তাছাড়া 'ফ্যাসান' পত্রিকাগুলি তো আছেই। 'ফ্যাসান' ব্যাপারটা পাশ্চাত্যে এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে ওটা শুধু মেয়েদের খেয়াল-তুষ্টির ব্যাপার আর নেই, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের হেরফেরও অনেক ক্ষেত্রে ঐ 'ফ্যাসানে'র অদল-বদলের সঙ্গে জড়িত। একথা বিশেষ ভাবে ফরাসী দেশ সম্বন্ধে খাটে। ফরাসী দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিই অনেকখানি ঐ 'ফ্যাসান'-উদ্ভূত বাণিজ্য-শিল্পগুলি। সে দেশের হাজার হাজার লোকের জীবিকা নির্ভর করে ঐ 'ফ্যাসান' বজায় রাখার মাল-সরবরাহ করবার ওপর। কাজেই ফরাসী জাতির কাছে 'ফ্যাসান' মোটেই একটা হালকা ব্যাপার নয়। কি রঙের, কি কাপড়ের, কি ছাঁটের পোশাক সারা পাশ্চাত্যের মেয়েরা পরবে, কি গন্ধদ্রব্য, কি রঙের পাউডার লিপষ্টিক তারা মাখবে—এসমস্তই ফরাসী রাজধানী প্যারিসে নিয়ন্ত্রিত হয়। প্যারিসের নির্দেশ পেলে তবে অন্যান্য দেশে তাঁতকলে সেই ধরণের কাপড় বুনতে, পোশাক-বিক্রেতারা সেই ছাঁটের জামা-কাপড় সেলাই করতে, প্রসাধন-ব্যবসায়ীরা সেই রকম লিপষ্টিক পাউডারের রঙ নকল করতে বসে যায়। ইতিমধ্যে ফরাসী-ব্যবসায়ীরা দেশ-বিদেশে তাদের বিশিষ্ট দ্রব্যসম্ভার পরিবেশন করতে সুরু করে দেয়। পাশ্চাত্যের সৌখীন মেয়েরা ফরাসী পোশাক, ফরাসী গন্ধদ্রব্য, ফরাসী প্রসাধন-সামগ্রী, রেশমী-বস্ত্র ব্যবহার করতে না পারলে জীবনই বৃথা বলে মনে করে।

এই 'ফ্যাসানের' অদল-বদল হয় বছরে মোটামুটি তিন বার। প্যারিসের বিখ্যাত পোষাক-বিক্রেতারা ঐ সময় একটি 'ফ্যাসান' প্রদর্শনী করে। নতুন ফ্যাসানের কাপড়, পোষাকের ছাঁটকাট ইত্যাদি কিভাবে এরা নিয়ন্ত্রণ করবে জানার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বিলাস-দ্রব্য-ব্যবসায়ীদের চর এই সব কেন্দ্রের আশে-পাশে ঘুরতে থাকে, যদি কোনো রকমে টুকরা-খবর জানতে পারে—

নিজের দেশে সে খবরগুলি পৌঁছে দিতে পারলে তারা তাড়াতাড়ি সেই রকম ফ্যাসানের জিনিষপত্র তৈরী করে ফেলতে পারবে। ফরাসী-ব্যবসায়ীরা আবার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, তারাও সব বৃত্তান্ত গোপন রাখায় তেমনি পটু, কোনো রকমে ফ্যাসান-প্রদর্শনীর নির্ধারিত দিন ছাড়া যাতে কোনো খবর বেরিয়ে না যায় সেদিকে কড়া নজর রাখে। এই তিনটি বিশেষ 'ফ্যাসান' সভা বসে বসন্ত, শরৎ ও শীতকালে।

প্যারিসের 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনীর পর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে, বিশেষ করে লণ্ডন ও নিউইয়র্কে এই রকম 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিসের কোনো 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনী আমি দেখিনি, কিন্তু লণ্ডন ও নিউইয়র্কে এরূপ দুটি প্রদর্শনী আমি দেখেছিলাম শুধু কৌতূহল নিবৃত্তি করার জন্যই—আমাদের পক্ষে এরূপ প্রদর্শনীর যে কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে তা কল্পনা করাই অসম্ভব। কিন্তু ও-সব দেশে এই 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনীগুলি রাজনৈতিক সভার মতোই গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

এই বিশেষ বিশেষ সভাগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ, শুধু বিভিন্ন পত্রিকার ফ্যাসান-সম্পাদক, ও রিপোর্টাররা নিমন্ত্রিত হয়। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের এই 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনী আমি দেখতে পেয়েছিলাম শুধু সেখানকার বিশিষ্ট মহিলা-সাংবাদিকদের বিশেষ প্রচেষ্টার ফলে। গিয়ে দেখি, সারবন্দী চেয়ারে সাংবাদিকরা নোট-বই ধরে পেনসিল্ উঁচিয়ে বসে আছেন, প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে একটি ছোট ষ্টেজের মতো জায়গা—সেই দিকে। এক একটি পোশাক পরে, এক এক রকম কায়দায় কেশবিন্যাস করে, মুখের মেইক-আপ করে এক-একটি সুশ্রী সুন্দর তরুণী সেই ষ্টেজে নামছে: সোজা হয়ে, পিছন ফিরে, পাশ ফিরে পোশাকগুলি তারা দেখাচ্ছে—আর অমনি খসখস করে নোট-বইতে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি টুকে নিচ্ছে রিপোর্টাররা। ঘুম থেকে উঠে রাত্রে শোওয়া পর্যন্ত কি ধরণের পোশাক মেয়েরা পরবে, সাঁতার দেবে কি পরে, ছুটিতে বেড়াতে যাবে কি পোশাকে, চা-পার্টি, নৈশ-ভোজ, বিয়ের কনে, নিত-কনেদের পোশাক, তরুণী, বয়স্কা, বৃদ্ধাদের উপযোগী সব রকমের পোশাক, জুতো, ছাতা, ব্যাগ, গহনা, মেয়েদের প্রসাধনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিস কি ফ্যাসানের হবে সে সমস্তই এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। তার পর সাংবাদিকদের মধ্যে এ সব পোশাক পরিচ্ছদের আলোচনা-সমালোচনা হয় কিন্তু সব আলোচনার সমাপ্তি: প্যারিস বলেছে এই—অতএব তথাস্তু বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কারো উপায় নেই। প্যারিসের ফ্যাসান-অনুশাসনের যে ছোট-খাটো অদল-বদল না হয় দেশবিশেষে এমন নয়, কিন্তু মোটা-মুটি নির্দেশগুলি সবারই পালন করতে হয়—ফ্যাসানের জগতে প্যারিসের এমনই প্রতিপত্তি।

যুদ্ধের সময় অবশ্য যখন ফরাসী দেশ ও প্যারিস জার্মাণদের দখলে ছিল, তখন লণ্ডন-নিউইয়র্কের ফ্যাসান ব্যবসায়ীদের মনে আশা জেগেছিল এইবার বুঝি ফ্যাসান-রাজত্বের ওপর প্যারিসের প্রতিপত্তি চিরকালের মতো ঘুচে গেল। কিন্তু ফরাসী দেশ জার্মাণ-কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, ফ্যাসান-সাম্রাজ্য পুনর-ধিকার করার জন্য প্যারিস তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। তাদের ছিল না খাবার, ছিল না কয়লা, ছিল না বৈদ্যুতিক আলো—তা সত্ত্বেও যে করে হোক তক্ষুনি একটি ফ্যাসান-প্রদর্শনী করার মাল-মশলা তারা মজুত রেখেছিল। সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে—এই ব্যবসাগুলির ওপরই আমাদের দেশের হাজার হাজার লোকের জীবিকা নির্ভর করছে—এক প্যারিস সহরেই ৭০০০০ মেয়ে সেলাই-এর কাজ করে জীবনধারণ করে, কাজেই যুদ্ধের দিনেও আমরা যে কোনো উপায় এই ব্যবসাগুলি চালু রেখেছি—এমন কি তার জন্য বিজয়ী জার্মাণ সেনা-নায়কদের পরিবারের কাছে পোশাক, বিলাস-দ্রব্য প্রভৃতি বেচতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিনি।

যাহোক, এ সব ফ্যাসানের অনুশাসন মানবার প্রয়োজন আমাদের নেই, তার কারণ শাড়ির মতো এমন সুন্দর পোশাক পৃথিবীর আর কোনো দেশের মেয়ের নেই—যার লীলায়িত গতিরেখা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, চিরশ্রীমণ্ডিত—ছাঁটকাট ফ্যাসানের অদল-বদলের ওপর যার সৌন্দর্য নির্ভর করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, প্রসাধনের সৌষ্ঠব যে ব্যক্তিগত রুচির ব্যঞ্জনা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশের উপর নির্ভর করে না এমন নয়: প্রসাধন একটি শিল্পবিশেষ, এবং এ সম্বন্ধে মোটামুটি খানিকটা জ্ঞান সকলেরই দরকার। যেমন ধরুন, আমাদের মধ্যে অনেকেরই কি রঙ কাকে মানায় সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। অনেকে ভাবেন গাঢ় শাদা শাড়ী ফরসা-কালো সব মেয়েকেই মানায়—গোল বাধে রঙীন বা পোশাকি কাপড় নির্বাচনের সময়। অনেকে ভাবেন, রঙ ফরসা হলে লাল-কালো প্রভৃতি গাঢ় রঙগুলিই মানাবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের রঙ খুব ফরসা তাদের রঙেও খানিকটা হলদে আভা আছে। মেমেদের মতো ঠিক গোলাপী-শাদা রঙ আমাদের কারুরই হয় না। আর যে সব ফরসা মেয়ের রঙে হলুদ আভাটাই প্রবল তাদের অনেককেই টকটকে লাল বা

নীলিমা দেবী

কালো রঙের কাপড় পরলে একেবারে পাংশু ও অসুস্থ দেখায়। মোটের উপর আমাদের বেশির ভাগ মেয়ের রঙই বাদামী-ঘেঁষা—কারুর বা গাঢ়, কারুর বা ফিকে; কাজেই রঙ ময়লা হলেই ফিকে রঙের কাপড়ই মানায় এ ধারণাটাও ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে যাদের রঙ ময়লা বা কালো, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েকেই গাঢ় রঙ—যেমন কাঁসচে লাল, মরা সবুজ, নীলাম্বরী-ঘেঁষা নীল, গাঢ় বেগুনী—এগুলোই মানায় বেশি।

যে সব প্রদেশের মেয়েরা চিরকাল রঙিন শাড়ি পরতে অভ্যস্ত—যেমন মাদ্রাজী বা মারাঠি মেয়েরা—তারাই এ ক্ষেত্রে অনুকরণ-যোগ্য। ব্যক্তিগত ভাবে এ সব মেয়েদের যে বাঙালী মেয়েদের চেয়ে রঙ নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা বেশি আছে তা নয়—প্রাচীন কালের কোনো শিল্পী-কারিগরেরা রঙগুলি এদের জন্য নির্ব্বাচন করে দিয়েছিল এবং পরম্পরাগত ভাবে এ সব প্রদেশের মেয়েরা সেই সব রঙের কাপড়ই পরে আসছে বলেই শাড়ির রঙ নির্ব্বাচন করা তাদের পক্ষে সহজ।

আবার আজকাল যদিও অনেক মেয়েই লিপষ্টিক পাউডার প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করেন, কিন্তু ঠিক উপযোগিতা বুঝে সব জিনিস সবাই বেছে নিতে পারেন না। প্রথমতঃ, অনেকেই পাউডার মাখেন রঙ ফরসা দেখাবে সেই আশায় এবং সাদা বা হালকা গোলাপী রঙের পাউডারের একটি গাঢ় প্রলেপ দেন মুখের উপর, তাতে কিন্তু গায়ের আসল রঙটা সত্যিই ঢাকা পড়ে না। তাছাড়া যারা পাউডার মাখার প্রথার চল করেছে, সেই পাশ্চাত্যের মেয়েরা রঙ ফরসা দেখাবে বলে পাউডার ব্যবহার করে না—করে মুখের তৈলাক্ত ভাব দূর করে চামড়াটা মসৃণ রাখার জন্য। পাশ্চাত্যের রূপ-চর্চা-বিশারদেরা সব সময়ই বলেন যে, গায়ের রঙের চেয়ে এক শেড গাঢ় রঙের পাউডার ব্যবহার করা উচিত, যাতে পাউডারের প্রলেপটা কোনো রকমে নজরে না পড়ে। আমাদের পক্ষে অবশ্য এ নির্দ্দেশটা মেনে চলা শক্ত, কারণ বেশির ভাগ মেয়ের গায়ের রঙের চেয়ে গাঢ় রঙের পাউডার কিনতেই পাওয়া যায় না। কারণ, বিদেশী প্রসাধন-ব্যবসায়ীরা পাউডারের রঙ তাদের দেশের মেয়েদের গায়ের রঙ মিলিয়ে সৃষ্টি করে; আর আমাদের স্বদেশী প্রসাধন-ব্যবসায়ীরাও তাদের নকল করেই ক্ষান্ত থাকেন, আমাদের প্রয়োজন বুঝে পাউডারের রঙ সৃষ্টি করেন না। তবুও পাউডার কেনার সময় তারই ভেতর থেকে সব চেয়ে গাঢ় রঙ যেমন—'ডার্ক-সান্‌ট্যান' বা 'ওকার-রোজি' জাতীয় রঙ বেছে নিলে এ অসুবিধা খানিকটা কাটানো যায়। আর লিপষ্টিক নির্ব্বাচনের সময় এমন লাল রঙ বেছে নেওয়া উচিত যা ব্যবহার করলে পান-খাওয়া ঠোঁটের মতো স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে লিপষ্টিকের রঙটা মুখের সঙ্গে মানিয়ে যাবে; এবং গায়ের রঙ যত বেশি ময়লা, লিপষ্টিকের লালটা ততই বেশি গাঢ় হলেই মানায়।

মোট কথা এই, প্রসাধন যত আড়ম্বরবর্জিত, সাদাসিদে ও স্বাভাবিক হবে, ততই রুচির পরিচায়ক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালী মেয়ের স্নিগ্ধ শান্ত শ্রী ফুটিয়ে তোলার জন্য উপকরণের বাহুল্য প্রয়োজন হয় না এবং পরিবেশের সঙ্গে মানান-সই প্রসাধনই যথার্থ সার্থক।

আমাদের শিক্ষা

অরুণা সরকার

অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে বিলীন হওয়াতেই যেমন গিরি-কন্দর-নিঃসৃত ক্ষুদ্র জলধারার যাত্রাপথের পরিসমাপ্তি সেইরূপ মানুষের শিক্ষার পরিসমাপ্তিও সেই পরম সত্য, সেই অনন্ত রসঘন বিশ্বস্রষ্টার মধ্যে নিজেকে বিলীন করায়; জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে সেই একমেবাদ্বিতীয়মকে উপলব্ধি করা। এই স্রষ্টার অনুভূতি জ্ঞান জন্মাবার জন্যই আমাদের বারে বারে এই জগতে যাওয়া-আসা করতে হয়। অনন্ত কাল ধরে শিক্ষা লাভ করতে হয়। সমস্ত জীবনটাই তাই শিক্ষার সময়। সেই জন্যই পরমহংসদেব বলেছেন—"আমরা যত দিন বাঁচি তত দিন শিখি।" ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিসমাপ্তি ইহাই। কিন্তু—

"অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু
হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।"

জগতের শিক্ষার বিষয় এত বেশী যে স্বল্পায়ু মানুষের পক্ষে অনন্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠে তার প্রায় কিছুই শেখা যায় না। এই জন্য সে চায় সাধারণতঃ মোটামুটি জ্ঞান যা তার এই স্বল্প জীবন কালের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে চলবার শক্তি দেবে, তার দৈনন্দিন জীবন যাপনকে সহজ সরল করে তুলবে, আর দিনের পর দিন তার জীবনকে মহতো মহীয়ান্ করে তুলতে সাহায্য করবে। তাই হাঁস যেমন জল-মেশান দুধ থেকে দুধের সারটুকুই গ্রহণ করে, জলীয় অংশ বাদ দেয়; মানুষও তেমনি, প্রত্যেক শিক্ষার সারবস্তু গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। তবে জগতের প্রত্যেকটি লোকেরই যে এই উদ্দেশ্য একথা আমি বলছি না। এই মত খাটে কেবল সাধারণ লোকের বেলায়। ক্লাসের সাধারণ ছেলে যারা, তারা পড়ার নির্দিষ্ট

standardটি ধরেই এগিয়ে চলে পরীক্ষায় কেবল পাশ করবার জন্য, কিন্তু যারা অসাধারণ তারা আরও অনেক বেশী শিখে তাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিয়ে নিতে পারে, জ্ঞানের রাজ্যে তারা চটপট এগিয়ে চলে, সাধারণ ছেলে তাদের নাগালই পায় না। জগতের মানুষের মধ্যেও ঠিক এই রকম ভাগ আছে। জগতের জ্ঞানপিপাসুর দল ঠিক ঐ রকমেই সাধারণ মানুষকে ছাড়িয়ে যায়—অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্রের মধ্যে তারা ডুব দেয় রত্নের সন্ধানে। কাজেই তাদের বেলায় উপরিউক্ত সাধারণ নিয়ম খাটবে না। আমাদের এই ভারতেও এই রকম মহাপুরুষেরা অনন্ত কাল তপস্যার দ্বারা পরম সত্যের যে সন্ধান লাভ করেছিলেন তারই তথ্য জানিয়ে দিয়ে গেছেন সাধারণ মানুষের জীবনকে সুগম করে তোলবার জন্য। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যদি আমরা ফিরে যাই দেখতে পাব ভারতের শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিরা ক্ষমা, ভক্তি ও সংযমের মধ্য দিয়ে ভারতের নবীন জীবন যে যুব-সমাজ, তাকে কেমন সুন্দর ও মহৎ করে গড়ে তুলছেন। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তাঁরা ফিরে যেতেন গৃহস্থাশ্রমে। সেখানেও এই মহাপুরুষদের অনুশাসন মেনে নিয়ে তাঁরা কর্ত্তব্য সাধন করতেন। ভারতে মানুষের জীবনকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই যে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছিল তা মানুষের জীবনকে উন্নত হতে উন্নততর করে তুলতো। সেই প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি নারী, কি পুরুষ সকলের জীবনেই অপরিহার্য্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। মানব-জীবনের আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম ও নারী এই আশ্রমের কেন্দ্রগত শক্তি বলে তাদের সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী শিক্ষাই দেওয়া হত। ক্ষমা, স্নেহ, ভালবাসা, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, পাতিব্রত্য, সেবা, দয়া প্রভৃতি নারী-মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি যা পর্ণকুটীরকে স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত করে তুলতে পারে, তারই উৎকর্ষ-সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'ত এবং সেই শিক্ষা সংসারাশ্রমের মধ্যেই তাঁরা লাভ করতেন। তাই সংসারে তখন নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল জননী, জায়া, ভগিনী ও কন্যারূপে। আর এই আদর্শের সমুদ্র মন্থন করেই ভারতবাসী পেয়েছিল স্বামি-প্রেমের জীবন্ত প্রতীক—সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা; যাঁরা আজও ভারতের মানস-আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজমানা। কিন্তু কেবল গৃহস্থাশ্রমের গণ্ডীর মধ্যেই নারীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়নি। যে সমস্ত নারী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, উচ্চ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার তাঁরা অবাধ অধিকার পেয়েছিলেন। তা না হলে আমরা গার্গীকে সভা মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিচার করতে দেখতে পেতাম না। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লীলাবতী, জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত খনারও সাক্ষাৎ পেতাম না। রাজনীতি সমরনীতির ক্ষেত্রেও নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, তা না হলে রণস্থলে সুভদ্রা, রাণী দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ, তারাবাঈ প্রভৃতি তেজস্বিনী রমণীগণের প্রহরণধারিণী ভয়াবহ মূর্ত্তি পুরুষের প্রাণে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারত না। এছাড়া জীবের প্রতি করুণা, ভগবৎপ্রেম এ সমস্তও নারীর জীবনে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল; মীরাবাঈয়ের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের উৎস হতে যে অমৃত-স্রোত উৎসারিত হয়েছিল, শতাব্দী শেষে আজও তা ভারতের কূল উপকূল প্লাবিত করে চলেছে। গিরিধারিনাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাপ্রভাবে তিনি সংসারের শত প্রলোভন উপেক্ষা করে সেই চির-বাঞ্ছিতের সন্ধানে ছুটে গিয়েছিলেন, তা আজও জগৎবাসীকে বিস্মিত করে তোলে। সেই রকম রাণী অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানীর পুণ্য করুণা-ধারায় স্নাত হয়ে কত আর্ত্ত অসহায় যে ধন্য হয়ে গেল তার ইয়ত্তা নাই। আরও এক কথা, এই সমস্ত রমণী উচ্চ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা অবাধ বিচরণশীলাও ছিলেন না আবার অসূর্য্যম্পশ্যাও ছিলেন না। অথবা সংসার ছেড়ে নারী-প্রগতির ধ্বজা উড়িয়েও বেড়াননি। তারা সবাই ছিলেন সংসারী। সে যুগে গার্গীর মত মেয়েরা যেমন রাজসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের মত পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার করতেন সেইরূপ শকুন্তলার সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদার মত অপরিচিত রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ আলোচনাও করতে পারতেন। সে দিনের রাজস্থানের ইতিহাস রাজপুত রমণীদের এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবহারের পরিচয় দিয়ে থাকে। কাজেই দেখতে পাই, জড়তা বলে জিনিষ সে যুগেও ভারতে ছিল না। তবে একথা স্বীকার্য্য, দেশে যখন ইসলাম-প্রভাব দেখা দেয়, তখন নারী নিজের রক্ষার জন্য পর্দার আড়াল নিতে বাধ্য হয়েছিল এবং তার জীবনস্রোতও অনেকখানি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। আবার অপেক্ষাকৃত ইসলাম-প্রভাবশূন্য অন্ধ্র প্রভৃতি দেশে মেয়েরা কেমন স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে বেড়ে উঠেছিল এবং আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই ছিল আধুনিক যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় নারীর শিক্ষা ও নারীত্বের বিকাশ।

কিন্তু বর্ত্তমানে পশ্চিমের সভ্যতার ঢেউ এসে লেগেছে পূবের ঘাটে, ভাঙ্গন-ধরা কূলে উপকূলে তা গভীর আবর্ত্তের সৃষ্টি করেছে, আর তারই মাঝখানে পড়ে ভারতবাসী আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। না পারছে সামনে এগিয়ে যেতে না পারছে কূলে উঠতে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহারকে সে ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারেনি। দুঃখকে জীবনে বরণ করে নিয়ে তিতিক্ষা ও ধৈর্য্যের দ্বারা দুঃখ সহিয়া সহিয়া তাহার দহনজ্বালা দূর করাই হ'ল ভারতবাসীর ব্রত, আর দুঃখকে সর্ব্বপ্রকারে দাবিয়ে রেখে আপন শৌর্য্যবলে সুখ লাভ করাই পাশ্চাত্যবাসীর জীবনের চরমোৎকর্ষ। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক,—দুঃখের নিবৃত্তি। তবুও দুই আদর্শ সম্পূর্ণ বিরোধী। তাদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আর পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে প্রাচ্যের সঙ্গে এক করতে গিয়ে ভারতবাসী সেই সংঘাতই বাঁধিয়ে তুলেছে জীবনের প্রতিপদে। কি মেয়ে, কি পুরুষ, সবাই আমরা আজ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জীবনের আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি, কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল তবুও আমরা এই শিক্ষাকে ঠিক ধাতস্থ করে তুলতে পারলাম না। এই শিক্ষা আমাদের জীবনে শান্তি আনতে পারল না। এর ডাকে অন্তর তো সাড়া দিলই না, পরন্তু কি মেয়ে কি পুরুষ প্রত্যেকের জীবনই অনাবশ্যক আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই শিক্ষা যেন স্কুলের বাইরে টাঙ্গানো সাইনবোর্ডের মত বাইরেই রয়ে গেল। "তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভাল জিনিষ আছে তার অনেকখানি আমাদের নোট-বুকেই আছে। সে কি চিন্তায়, কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না। আজ চারি দিকে স্কুল-কলেজের ছড়াছড়ি, দলে দলে ছেলে-মেয়ে ট্রাম-বাস বোঝাই হয়ে চলেছে। আর ইউনিভার্সিটির যাঁতা-কলে পিষ্ট হয়ে বছর বছর ৪০।৫০ হাজার ছেলে-মেয়ে চাপরাশ

[illegible] বেন [illegible] যাঁরা [illegible]

স্কুল জীবনের সঙ্গে [illegible] বিসর্জন দিয়ে যেন শ্মশান থেকে ফিরে এল। তার পর চাকরীর উমেদারীতে ছোটাছুটি করে জীবনের শেষ শক্তিটুকু ক্ষয় করে জুটল ৫০ টাকার কেরাণী-গিরি, নয়তো মাষ্টারী, অথবা বড় জোর একটা প্রফেসারী। শুধু এখানেই সংঘর্ষের শেষ নয়। চাকুরী লাভের পরে প্রবেশ করতে হল বিবাহিত জীবনে এবং এখানেই বাধল যত গোল। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে যারা চিরদিন সম্পদের স্বপ্নই দেখে এসেছে; বিলাসিতাকে যারা আলো-হাওয়ার মতই জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে মনে করেছে; জীবনে দারিদ্র্যকে, অনাড়ম্বরকে তারা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারল না। পদে পদে অভাব অভিযোগ তাদের দাম্পত্য জীবনকে করে তুলল বিষময়। যে শান্তির নীড় গড়বার আশায় তারা পরস্পর মিলিত হল, তা দুঃখের ঝড়ো হাওয়াতেই উড়ে গেল। যারা কোনও রকমে ধৈর্য্য ধরল, তারাও জীবনকে বিধাতার অভিশাপ বলেই গ্রহণ করল। স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন সন্তান-সন্ততিদের মুখে না পারল তৃপ্তির হাসি ফোটাতে, না পারল তাদের জীবনকে উচ্চ আদর্শে গড়ে তুলতে। শিক্ষা-দীক্ষা কোথায় গেল ভেসে। এই সব শিশুরাই আবার দাস্যমনোভাব নিয়ে ছুটে চলল ডিগ্রী ও চাকুরীর মোহে গতানুগতিকতার পথে। জাতীয় জীবনটা এই ভাবে তলিয়ে উঠতে লাগল। বিশেষ করে বাঙ্গালীর জীবন। ভারতের অন্যান্য জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে আজ বেশ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, স্বাস্থ্য-সম্পদেও আজ তারা কিছুমাত্র হীন নয়, জীবনযাত্রাকে আজ তারা তবু অনেক সহজ সরল করে নিয়েছে; কিন্তু যে বাঙ্গালী ভারতের সব জাতের সেরা সে নিজের ধনভাণ্ডার অপরের হাতে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একমুষ্টি অন্ন আর একখানি বস্ত্রের জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্য সব ছেড়ে আজ তারা ছুটে চলেছে ডিগ্রীর মোহে। "বাংলা দেশের শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিতেছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছন দিকে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন-মুখে চলিব কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উঠিবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টা দিকে গজাইবে।" বাংলা দেশে এক দিকে উচ্চশিক্ষার সঙ্ক জলতে জলছে মিট মিট করে তার আলোর চেয়ে ভূসোই বেশী, আর এক দিকে রয়েছে কালো আঁধার। আলোক প্রতীক ডিগ্রী ধারিণীরা আর আঁধারের প্রতীক কুসংস্কারে জর্জ্জরিত, রোগগ্রস্ত, ক্ষিন্ন অশিক্ষিতা বঙ্গরমণী। দেশের পক্ষে আজ কেউই আশাপ্রদ নয়।

মনে পড়ে এই ভারতেই একদিন রাজনন্দিনী সীতা, সাবিত্রী, মেবারের রাজবধূ, সবাই আজন্ম বিলাসের মধ্যে লালিত হয়েও স্বামীর সঙ্গে বনবাসের অশেষ কষ্ট সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন, জীবনকে এঁরা কোন দিন বিধাতার অভিশাপ বলে গ্রহণ করেননি। জাতীয় জীবনেও তাঁরা জটিলতার সৃষ্টি করেননি। সংসারকে বরং তাঁরা মধুর করে তুলেছিলেন, বীরজননী হয়ে ভারতের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিদুষী [illegible] চাঁদবাই, জোনাবাই, মোহনবাই, [illegible] বন্ধ হয়েছে, যারা দেশের জন্য জাতির [illegible] দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও যে সকল [illegible] তাঁদের নব নব বস্তু ও চিন্তাধারার প্রভাবে [illegible] প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, তাঁরাও [illegible] জন্মেছিলেন। এঁদের যাঁরা জননী, তাঁরা শুধু [illegible] মত জগতের এত বৈচিত্র্য ও এত বিভিন্ন রকমের [illegible] সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাননি। অথচ যে সকল [illegible] পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতার সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠেছেন জননী জায়া বা ভগ্নী নন, শুধু নারীত্বের দাবী নিয়েই যাঁরা প্রগতির পথে ছুটে চলেছেন, শিক্ষিতা বলে বিশেষ গর্ব্ব বোধ করেন, অন্দর নিয়েই যাঁরা তৃপ্ত নয়—বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন (সখ করেই হোক আর দায়ে পড়েই হোক) তাঁদের কাছ থেকে জাতীয়তার দিক দিয়ে আমরা আজ কি পাচ্ছি, তাঁদের ক'জন আজ বীরজননী বীরজায়া হতে পেরেছেন, ক'জনই বা আড়ম্বরহীন সংসারকে মহান্ করে তুলতে পেরেছেন? অথচ এঁদের কাছ থেকে আমাদের সবচেয়ে বেশী পাবার কথা।

আজকের এই শিক্ষার শেষে আমরা কল্যাণের স্পর্শ পাচ্ছি না, এই শিক্ষা আমাদের নিয়ে চলেছে অন্ধকারের ভবা অভ্রংলিহ সর্ব্বনাশা খাদের অভিমুখে, যেখানে জাতির অপমৃত্যু ওৎ পেতে রয়েছে। ভারতের জীবনে এই যে একটা অভূতপূর্ব্ব উল্টপালট হল, এর একটা কারণ দেখা যাচ্ছে শিক্ষা-প্রণালীর ভুল পথে পরিচালনা। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, শিক্ষা আজ আমরা লাভ করছি তার উপযুক্ত বাহনের অভাব। অনেকখানি আয়াস স্বীকার করে বিদেশী ভাষার সিংহদ্বার পেরিয়ে তবে শিক্ষণীয় বিষয়টির কাছাকাছি পৌঁছাই কিন্তু তার অনেকখানি রস থেকেই আমরা বঞ্চিত হই, তবুও যেটুকু নিঙড়ে বার করতে সমর্থ হই তাও মনের মধ্যে তেমন গেঁথে বসে না, বইয়ের জিনিষ বইয়েতেই রয়ে যায়, মাঝখান থেকে অতটা পরিশ্রমই সার হল। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে এই শিক্ষা সার্ব্বজনীন হয়ে উঠল না। তার কারণ হচ্ছে আড়ম্বরের আতিশয্যে তার গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণ করে রাখার ফলে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে এর কোনই সংযোগ রইল না, তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার একথা মানি, কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরী করার মত হইবে। ইতিহাসের নজীর মেলালে দেখতে পাব যে, আমাদের দেশে যারা জাতির গৌরবের বস্তু হয়েছিলেন, শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন—তাঁরা দরিদ্রের কুটীরেই জন্মেছিলেন। কাজেই "এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না।" সরল অনাড়ম্বর জীবনের মধ্য দিয়েই ভারতবাসী মুক্তির সন্ধান পেয়ে এসেছে।

[শিল্পী—অবনী সেন

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, আজকের এই শিক্ষা জাতির দেহে নবীন প্রাণের সঞ্চার করতে পারছে না, পরন্তু তার জীবনধারাকে দিন দিন জটিল করে তুলছে। পাশ্চাত্যের ছাঁচে গড়তে গিয়েই আমরা জীবনে জট পাকিয়ে তুলছি। স্ত্রী-পুরুষ সবার জীবনই আজ ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ হারাচ্ছে তার নব নব কর্মের উদ্দীপনা আর স্ত্রী আজ ছুটে চলেছে নারী-প্রগতির উন্মত্ত স্রোতের দিকে। ঘর আজ তাকে তৃপ্তি দিতে পারল না। একদিন যে ভারতীয় নারীর জীবনের চরম উৎকর্ষ ছিল আত্মবিলোপ আজ সে চায় জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আদর্শের এই দ্বন্দ্ব আজ তার জীবনে উৎকট রূপ ধরেছে। কিন্তু সংসারের যে নারী কেন্দ্রগত শক্তি, সংসারে থেকে স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতাকে সে নব শক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারল না, বাইরে বেরিয়ে এলেই কি তার পক্ষে তা সম্ভব ?

কাজেই এই শিক্ষার গতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়েছে সবচেয়ে বেশী। সেই শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা, যা আমাদের ভারতের নারী ও পুরুষ করে গড়ে তুলবে। আমাদের শিক্ষার শেষ হবে সেইখানে, যেখানে রয়েছে পরম মঙ্গলময়ের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা ভারতবাসী। ভারতের আদর্শই হবে আমাদের আদর্শ। আমরা সবাই এক। মনে রাখতে হবে একদিন এই ভারতেরই পুণ্যভূমিতে মুনি-ঋষিরা—

"তপস্যা বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।"

অবশ্য এই আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করার জন্য আমাদের তপোবনের যুগে ফিরে যাবার প্রয়োজন হবে না। আর ক্রমাবর্ত্তনের ঢেউ সরিয়ে পিছনে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। হিমালয় যেমন শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে মাথা তুলে আজ পর্য্যন্ত কালের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভারতের চিরন্তন আদর্শও কালের প্রবাহ ভেদ করে আজও চির অচঞ্চল ভাবে বিরাজ করছে এবং ভারতকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্যের রঙীন আলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, তাই আমরা যা চিরন্তন ও শাশ্বত, সেই ভারতীয় শিক্ষা ও ভারতীয় আদর্শকে চিনে নিতে পারছি না। তাই আমরা আজ হয়ে পড়েছি অসহায়, হীনবীর্য্য। তাই অলক্ষ্মী তার রুক্ষ মূর্ত্তি ও শূন্য ঝুলি নিয়ে ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। তাই জাতির মুখে আজ হাসি নেই, প্রাণচঞ্চলতা নেই। তাই আমরা সর্ব্বংসহা সীতা-সাবিত্রীর সাক্ষাৎ পাই না। ঘরে ঘরে আজ গৃহিণীর মত গৃহিণী, মায়ের মত মা দেখতে পাই না। আজ আমাদের জাগার প্রয়োজন হয়েছে, আমাদের জাগতে হবে, আপনাদের ভারতবাসী বলে চিনতে হবে।

"না জাগিলে যত ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

এস ভাই-বোন, আজ আমরা সবাই ভারতের যজ্ঞবেদীতে মিলিত হই। আর "বীর সন্ন্যাসী বিবেকের" কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে বলি—"হে ভারত এই পরানুবাদ, পরানুকরণ এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য বর্ব্বরতা, এই লইয়া তুমি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে ? হে বীর সাহস অবলম্বন কর, বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার—

অমলা রাহা

সম্প্রতি একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে জনৈক পত্রপ্রেরক একটি অপরূপ প্রস্তাব এনে বাংলার শিক্ষিতা নারীসমাজকে তাজ্জব বনিয়ে দিয়েছেন। সংবাদপত্রটা আবার ইংরেজী, আশঙ্কিত ও লজ্জিত হচ্ছি এই ভেবে যে আমাদের সংকীর্ণ মনোবৃত্তির এই নমুনাটা বিদেশী পাঠকেরও গোচরীভূত হবে। পত্রপ্রেরকের প্রস্তাব হচ্ছে এই, যেহেতু একটি মেয়েকে চাকরী দেবার অর্থ হল,—একটি পুরুষকে যুগপৎ একটি স্ত্রী ও একটি চাকরী থেকে বঞ্চিত রাখা, অতএব সমাজ-কল্যাণের খাতিরেই দেশের নিয়োগকর্তাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে মেয়েদের চাকরীতে নিয়োগ না করতে। অবশ্য বাংলা দেশে বেকার-সমস্যা এখন আর তত জটিল নয়। লেখক অদূর-ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বেকার-সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, ভবিষ্যতে এই নীতিটা সত্যই বাঞ্ছনীয় হবে কি না?

শিক্ষিতা মেয়েদের একটা বড় সুবিধা হয়েছে এই যে, শিক্ষা তাদের সামাজিক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, আত্ম-সচেতন করেছে, আত্মোপলব্ধির সহায়তা করেছে—খানিকটা স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছে। পূর্ব্বে এক সময় যখন মেয়েদের কোন ভদ্রলোকের বধূ, কারও মাতা, বা কারও বিধবা মাসী-পিসি-ভাগ্নি-ভাইঝি জাতীয় ব্যাধতামূলক বোঝা ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ সত্তা ছিল না, মেয়েদের সেই অসহায় ও পরনির্ভর অবস্থা বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথের মনীষাকে পর্য্যন্ত বিচলিত করেছিল। পুরুষ-নিরপেক্ষ, স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল সবলা নারীর আপন ভাগ্য জয় করে সার্থকতার পথ খুঁজে নেবার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কালের বহু কবিতায় প্রকটিত। স্বামী বিবেকানন্দও আমেরিকা-প্রবাসের সময় সেখানকার মেয়েদের পুরুষের সমান স্বাধীনতা ও অবাধগতি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন: হায়, কবে আমাদের মেয়েরা এমন হবে। বহু দিন পরে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, জড়তা, শাসন অতিক্রম করে মেয়েদের একাংশ আজ পূর্ব্বাচার্য্যদের সেই স্বপ্ন সফল করে তুলতে চলেছে। সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমাদের চোখের সামনে রচিত হচ্ছে। কিন্তু ঠিক চোখের সামনের নিত্যকার ঘটনা বলেই আমরা এর যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি না। যেমন সকল ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্বই সমসাময়িক মানুষ ভালো করে বুঝতে পারে না।

এই সব চাকুরীজীবী মেয়েরা কারা? ভ্যানিটি দুলিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে আফিস-টাইমে যারা কুণ্ঠার সঙ্গে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে দশটা পাঁচটার কয়েদে আফিসের নীরন্ধ্র কক্ষে চলে রুজি উপার্জ্জন করতে?

এরা সেই মধ্যশ্রেণীর মেয়ে, দুটোর বেশী তিনটে মেয়ে হলে যাদের পক্ষে পরবর্ত্তীদের ভালো বিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এদের পক্ষে এ দেশের সেই সনাতন বুলি, নারীজীবনের চরম সার্থকতা সুগৃহিণী ও সুজননী হওয়া এবং নির্জ্জন গৃহকোণ রচনায়—সেই তথ্যের আলোচনা করে দেখা যাক। একটু চোখ খুলে চাইলেই দেখা যাবে, এ পথে সার্থকতা আসা জীবনে অতি অল্পসংখ্যক মেয়ের ভাগ্যেই ঘটে। সম অবস্থাপন্ন ঘরে না পড়লে, আর্থিক কৌলীন্য ও দৈহিক সৌন্দর্য্য না থাকলে না-পড়ার সম্ভাবনাই বেশী. খুব কম মেয়েরই জীবন এই পথে সুখে ও সার্থকতায় ভরে ওঠে। এ দিক্ দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু মধ্য-সম্প্রদায়ের কন্যাদায় জটিলতর হয়ে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য। একই বাড়ীতে সমশিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন-মানে পালিত কন্যার পিতার পক্ষে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই কন্যাকে সমস্তরের সুপাত্রের দাবী মিটিয়ে পাত্রস্থ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহিত মেয়েটি অনেক সময়ে সুখী হতে পারে না—বিশেষ করে শিক্ষিতা মেয়েদের পক্ষে ত নয়ই। কারণ যে দুর্দৈবকে তারা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারত স্বাবলম্বনের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে, পিতৃ-মাতৃভক্ত হয়ে তাকে মেনে নেবার সান্ত্বনা অনেকেই পাবে না। তাছাড়া, সুন্দর চেহারার গৌরব না থাকলে এবং আর্থিক সঙ্গতির জোর না থাকলে খুব কম মেয়েরই ভালো বিয়ে হয় না কিংবা আদৌ হয় না। কাজেই যাকে কেন্দ্র করে কোন একটি মেয়ের জীবন সার্থকতায় ভরে উঠবে বলা হয়, তার গোড়াতেই গলদ! বাংলা দেশে আমরা পাঁচমিশালী রক্তে তৈরী জাতি—যে কোন একটি জনতার চেহারা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। এখানে অপ্সরাকান্তিসুষমা ক'টা মেয়ের আছে? তার পর বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ। স্বামি-নির্ব্বাচনে এই চালুনি-ছাঁকার ব্যবস্থা থাকায় যেখানে কোন একটি মেয়ের স্বয়ম্বর সভায় দেশের সমগ্র যুবসমাজের আহূত হবার কথা নিজ গণ্ডী ও গোত্রের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখতে গিয়ে সেই ডাক কার্য্যতঃ গিয়ে পৌঁছায় মুষ্টিমেয় জন-কয়েকের কাছে। এর মধ্যে মেয়েটির যোগ্য পাত্র হয়ত নেই কোন, কিংবা তার যোগ্য ও স্বনির্ব্বাচিত পাত্রটি হয়ত এ গণ্ডীর বাইরে। তাই যদি বিনা বিদ্রোহে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপন ভাগ্য মেনে নিয়ে মেয়েটি জীবনের পথে পাড়ি জমায়, তাহলে প্রথম থেকেই যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি থেকে যাবে তা বলাই বাহুল্য! এই প্রকৃতির নির্দ্দেশ উপেক্ষিত বিবাহের ফল হবে কি? হবে তিক্ত, দুবিষহ, বিস্বাদ দাম্পত্য-জীবন, শীর্ণ বিকলাঙ্গ সন্তান-সন্ততি।

এই নরকের মধ্যে কোন মেয়ে যদি প্রবেশ করতে না চায়, তবে মানবতার দিক্ দিয়ে তাকে বাধা দেবার কিছু আছে কি? আমি নরকই বললাম একে, কারণ যে জীবনযাত্রায় একটি মেয়ে অভ্যস্ত, আর্থিক ও শারীরিক দৈন্যের জন্য তার চেয়ে হীন অবস্থার কোন পুরুষের ঘরণী হয়ে দারিদ্র্য, অনাটন, মালিন্য ও এক পাল অপোগণ্ড-সহ সারা জীবন দগ্ধীভূত হওয়া এক জাতীয় নরক-যন্ত্রণা ছাড়া আর

কি ? এখানে জীবনের মাধুর্য্য থাকে না কিছুই, থাকে শুধু দিন-যাপনের গ্লানি, কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা—যাতে নিত্যই মানুষের অন্তর-দেবতা হয় লাঞ্ছিত !

জেনে-শুনে কোন আত্ম-সচেতন নারীই এই বনবাসে সম্মত হবে না। তাই সুযোগ ও সুবিধা হলে যদি তারা আত্মনির্ভর হয়ে স্বাবলম্বী হতে চায়, তাহলে কি শুধু নারী বলেই তাদের সে অধিকারে বঞ্চিত রাখা হবে ? কারণ এ কথা অবশ্য কেউই অস্বীকার করবেন না যে মেয়েরা আগে মানুষ পরে মেয়েমানুষ। মানুষ হিসাবে মানুষের মৌলিক অধিকার অর্থাৎ আপন অভিরুচি অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার স্বাধীনতা অবশ্য সামাজিক উপযোগিতার গণ্ডী লঙ্ঘন না করে বিবাহিত বা অবিবাহিত থাকবার স্বাধীনতা, জীবিকা অর্জ্জনের স্বাধীনতা সকল সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশই স্বীকার করে। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল কুখ্যাত নাৎসী-রাষ্ট্রে ! কাজেই যে পত্রলেখক বাংলা দেশের নিয়োগ-কর্ত্তাদের নিকট মেয়েদের চাকরী বন্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, তিনি সমস্ত ব্যাপারটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। তাই তিনি আচমকা এমন ধারা অসঙ্গত আবেদনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ আবেদন যে কোন কাজেই কার্য্যকরী হবে না, তা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ যে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পটভূমি অর্গল মুক্ত করে মেয়েদের জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে এনে ফেলেছে—মেয়েদের চাকরী দেওয়া বন্ধ হলেই তা অপসারিত হবে না। অপর পক্ষে মেয়েরা যে উত্তরোত্তর আরও বেশী সংখ্যায় চাকরীক্ষেত্রে এসে ভীড় করবে এমন সম্ভবনাই বেশী।

অনেকে এখন প্রশ্ন করবেন : তা হলে এই সব নিষ্প্রভ-লাবণ্য, জ্যোতিহীন, শীর্ণদেহী চাকুরে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি ? এর উত্তরে বলা চলে : আমাদের ক্ষীণ তনু, দীপ্তিহীন কনিষ্ঠ কেরাণীকুল যাঁরা চাকুরে মেয়েদের বিপরীত দিকে রয়েছেন, তাঁদেরই বা ভবিষ্যৎ কি ? তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন কেউ মাথা ঘামায় না, তখন এদের জন্যই বা এত মাথাব্যথা কেন ? চাকুরীজীবী পুরুষেরাও যেমন একদা জীবিকা, বিবাহ, প্রেম, অপ্রেমের বাঁধা পথেই জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, আর্থিক স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও মেয়েরাও যে তা করবে না এমন আশঙ্কার কি কারণ আছে ? অন্য দেশেও ত এমনি দৃষ্টান্তই দেখা যায়। জীবনের পরম লগ্নে, প্রেমের আলোকে অশাঙ্কিনী করে, ধীরহস্তে বরমাল্য নিয়ে সেই বাঞ্ছিত পুরুষ যদি আসে তার জীবনে, সুন্দরী হোক, কুৎসিত হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, যাকে কেন্দ্র করে মধুময় হয়ে উঠবে তার জীবন, তা হলে কোন্ মেয়ে আপত্তি করবে সেই প্রেয়কে বরণ করতে ? কাজেই এ সম্বন্ধে মাথা-ঘামানোর কোন আবশ্যক দেখি না !

[শিল্পী—অবনী সেন

দি গুড আর্থ

অনুবাদক
শিশির সেনগুপ্ত
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
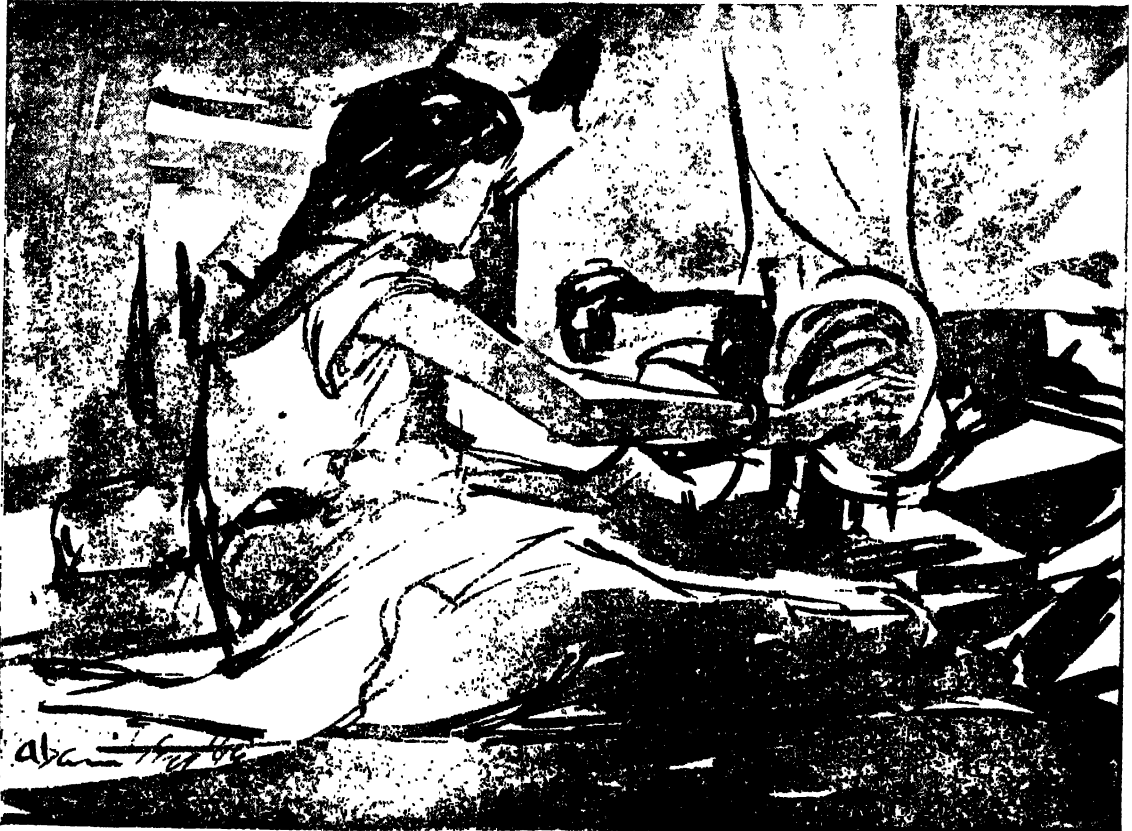
চোখ চেয়ে তাকাতেই নজরে পড়ল একটি পরিচ্ছন্ন মেয়ে। মেয়েটির পা দু'টি অ-বাঁধা। দেখে ভারী হতাশ হয় ওয়াঙ। বধূটির কথা ভাবতে ভাবতেই সেই বৃদ্ধ মহিলা আবার তাঁর বক্তব্য সুরু করেন। প্রথমে প্রহরীকে লক্ষ্য করে বলেন—'ফটক অবধি বাক্স পৌঁছে দিয়ে ওদের বিদায় করে দেবে বুঝলে।' তার পর ওয়াঙকে লক্ষ্য করে বললেন—'ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমার কথা শোনো।' তাঁর আদেশ পালিত হয়েছে দেখে তিনি আবার বললেন—'এই মেয়েটি দশ বছর বয়সে আমার সংসারে এসেছিল—এখন ওর বয়স কুড়ি। এক বছর দুর্ভিক্ষের সময় ওর পিতামাতা না খেতে পেয়ে দক্ষিণে ভিক্ষার জন্য এসেছিল। সেই সময় ওকে আমি কিনেছিলাম। পরে তারা আবার উত্তরে সানটাঙে ফিরে যায় কিন্তু তাদের আর কোন সমাচার আমি পাইনি। এই মেয়েটিরও সেই দেশের মত বলিষ্ঠ শরীর—চওড়া চোয়াল। তোমার সংসারে ও মাঠে কাজ করবে, জল তুলবে—সব করবে। সু-রূপা নয়। আর সুন্দরী বৌ নিয়ে তুমিই বা কি করবে? যাদের অবকাশ আছে প্রচুর তাদেরই সময় কাটানোর জন্য নিত্য-নতুন সুন্দরী মেয়ের প্রয়োজন ঘটে। মেয়েটি খুব চতুরও নয়। তা হোক, ও তোমার কথামত চলবে আর ওর মেজাজ খুব ভাল। যত দূর জানি আমি ও আজও কুমারী। আমার সংসারে রান্না-বাড়ীতে কাজ না করলেও ওর রূপ দেখে মজত না আমার কোন ছেলে বা নাতি। যদি কোন কিছু ঘটেও থাকে হয়ত কোন চাকর-বাকরের সঙ্গে হয়ে থাকবে। এ প্রাসাদের হাজারো সুন্দরী অল্পবয়সী ক্রীতদাসী থাকতে ওর প্রতি নজর কারুরই পড়েনি এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার সংসারে ওকে নিয়ে যথেচ্ছা ব্যবহার কর। বোকা-বুদ্ধি বটে মেয়েটার, তবু দাসী হিসেবে ও খুব প্রয়োজনীয় ছিল এখানে। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে—আমার বংশের ধারা বজায় রাখার জন্য আরো ছেলেমেয়ে সংসারে এনে দেবতার প্রীতিসাধন করতে পারব না, নইলে রান্নাবাড়ীর জন্যে ওকে আমি আরো কিছু দিন রাখতুম। আমার সংসারে যে সব দাসীরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে অথচ আমার বংশের দুলালরা যাদের চায় না তাদের আমি বিয়ে দিয়ে সংসার করে দি। এই আমার নিয়ম।'

তার পর মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বললেন—'একে মান্য করে চলিস্। এর ঘর ছেলে-মেয়েতে ভরে তুলিস। আর প্রথম ছেলে হলে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাস—বুঝলি।'

নতমুখী হয়ে মেয়েটি বললে—'তাই হবে রাণীমা।'

দু'জনেই বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়াঙ বুঝে উঠতে পারে না, তার কিছু বলা উচিত কি না।

যাও—চলে যাও' —রুক্ষ কণ্ঠে তিনি আদেশ দিলেন। দ্রুত প্রণাম করে ওয়াঙ চলে আসে। পিছনে আসে মেয়েটি—তাকে অনুসরণ করে প্রহরী কাঁধে বাক্স নিয়ে। যে ঘরে ওয়াঙ তার ঝোড়া রেখেছিল, সেখানে বাক্স নামিয়ে দিয়ে প্রহরী কোন কথা না কয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই প্রথম ওয়াঙ তার নববধূর দিকে চোখ তুলে তাকাল। চওড়া মুখ, বেঁটে মোটা নাক—বড় হাঁ সেই মুখে। কালো চোখ দু'টি ছোট ছোট কিন্তু সেই চোখে যেন কত কান্না জমে আছে। এমন সরল সে দু'টি চোখ! মুখ দেখলেই মনে হয় যে সহজে কথা কয় না মেয়েটি। স্বামীর চোখে চোখ রেখে বধূটি যেন প্রতীক্ষা করে। তার চোখে কোন ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে না। ওয়াঙ এইতেই পুলকিত হয়ে ওঠে যে সুশ্রী না হোক তার বৌ তবু তার মুখে বসন্তের দাগ ত নেই—ঠোঁট ত তার ফাটা নয়। ওয়াঙের দেওয়া সোনার জলের দুল বৌয়ের দু'কানে দুলছে, আঙুলে তারই দেওয়া আঙটি। একটা গোপন আনন্দে ওয়াঙ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এত দিনে তার বৌ হোল।

'এই যে বাক্সটা আর ঝোড়াটা'—সে বলে বৌকে।

কোন কথা না কয়ে মেয়েটি বাক্স তুলে নেয় নিজের কাঁধে, তার পর ঘাড় তুলতে দুঃসাধ্য চেষ্টা করে। তাকিয়ে দেখে দেখে শেষে ওয়াঙ বলে—'ওটা আমায় দাও—তুমি ঝোড়াটা নাও।'

নিজের দামী পোষাক সত্ত্বেও ওয়াঙ বাক্সটি কাঁধে তুলে নেয়। মেয়েটি তেমনিই চুপচাপ ঝোড়াটি হাতে নেয়। এই বোঝা কাঁধে নিয়ে সেই একশ' মহল পার হ'য়ে যাওয়ার কথায় শংকিত হয়ে ওয়াঙ বলে—'যদি কোন খিড়কির দরজা থাকত, তাহলে—'

স্বামীর কথা শুনে যেন না বুঝেই মেয়েটি ঘাড় নাড়ে: তার পর পাশের একটি পরিত্যক্ত আঙিনা পার হয়ে মজা পুকুরের পাশ দিয়ে গোল দরজার পাশ কাটিয়ে স্বামীকে নিয়ে পথে নেমে পড়ে।

ওয়াঙ ফিরে ফিরে দেখে বৌকে। আশ্চর্য ভাবহীন মুখে পথ

চলেছে মেয়েটি ভারী ভারী পা ফেলে—যেন এই পথে সে সারা জীবন হেঁটেছে। নগর-দরজার কাছে থমকে থামে ওয়াঙ। ট্যাঁক থেকে দু'টি পেনী কষ্টে বার করে দু'টি কাঁচা ফল কিনে বৌকে দেয়।

'খাবে, জানো।'

কথা কয় না বটে কিন্তু শিশুর মত আগ্রহে মেয়েটি সেগুলি নিয়ে মুঠোয় ভরে রাখে। গম-ক্ষেতের ধার দিয়ে যাবার সময় ওয়াঙ আবার যখন ফিরে চায়, দেখে মেয়েটি একটি ফলের খোসা ছাড়াচ্ছে! স্বামীর দিকে চোখ পড়তেই সে সেটিকে মুঠির ভিতর গোপন করে। মুখের নড়াচড়া থেমে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে পশ্চিম মাঠের পারে পৃথ্বীমায়ের মন্দিরে তারা পৌঁছে যায়। মাটি রঙের ইঁট দিয়ে তৈরী এক মানুষ উঁচু ছোট মন্দিরটি। এই মন্দিরটি তৈরী করেছিলেন ওয়াঙের ঠাকুরদা। নিজে সে ক্ষেত কর্ষণ করতেন, ওয়াঙ আজো যে মাঠ চষে—তারই উপর এটি তৈরী করেছিলেন। নিজের ঠেলাগাড়ীতে ইঁট এনে ছিলেন সহর থেকে। ভাল ফসল হয়েছিল এক বছর, তখন এক জন শিল্পী দিয়ে মন্দির-গাত্রের সাদা চুণকামের উপর পাহাড় আর বাঁশ বনের ছবি আঁকিয়েছিলেন। তার পর বহু বৎসরের জল-ঝড়ে সেগুলি ফিকে হয়ে গেছে। এখনো শুধু চোখে পড়ে বাঁশ বনের দু'-একটি বর্ণনা।

মন্দিরের ভিতরে এই জমিরই মাটি দিয়ে তৈরী দু'টি ছোট্ট গম্ভীর মূর্তি। একটি দেবতা আর একটি তার দেবী। দেব-দেবীর অঙ্গে লাল আর গিল্টি-করা সোনার কাগজের সাজ। দেবতার মুখে সত্যি কারের গোঁফ। প্রতি বর্ষারম্ভে ওয়াঙের বাবা নতুন লাল কাগজ কিনে যত্ন করে ছেঁটে তাদের সাজ বানিয়ে দেন। তার পর সারা বৎসরের ঝড়-জল-তুষারে সে পোষাক নষ্ট হয়ে যায়। তার পর আবার বর্ষারম্ভে নূতন বেশসজ্জা। এখনও নূতন বৎসর বলে দেবদেবীর অঙ্গের সাজ অম্লান। ওয়াঙের বুক আনন্দে ভরে যায় দেখে। বৌয়ের হাত থেকে ঝোড়া নিয়ে সে যত্ন করে ধূপকাটি খুঁজে বার করে। তার পর দেবদেবীর সম্মুখের ধূনোশেষের ছাইয়ের ভিতর সেগুলিকে গুঁজে দেয়।

চকমকি ঠুকে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে সে ধূপে অগ্নিদান করে। মন্দিরের সেই ধূপের গন্ধের মধ্যে এই দু'টি নরনারী দেবতার সামনে দাঁড়ায়। ধূপটি ধীরে ধীরে জ্বলছে। শীর্ষে জমে উঠেছে ছাই। মেয়েটি যত্ন করে সেটুকু সরিয়ে দেয়। তার পর কেমন যেন আতঙ্কিত হয় নিজের কাজে। স্বামীর দিকে দু'টি বোবা-চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু বৌয়ের সব কিছু ভাল লাগে ওয়াঙের। এই যে ধূপ পুড়ছে এ তাদের দু'জনের। এই ওদের বিবাহের লগ্ন। সেই ভাবে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্ছিদ্র নীরবতার মধ্যে অনেকক্ষণ। সূর্য অস্ত যায় দেখে অবশেষে ওয়াঙ কাঁধে বাক্স নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

সূর্যের শেষ আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পিতা। নূতন বধূ নিয়ে ছেলে ফিরছে দেখেও তাঁর কোন সাড়া জাগে না যেন। নূতন বৌকে দেখা যেন তাঁর পক্ষে অর্থহীন। তাই দূরে মেঘের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বলেন—'চেয়ে দেখ ওয়াঙ। নূতন চাঁদের বাঁ অঙ্গে যে মেঘটুকু উঠেছে ওটি বর্ষার মেঘ। কাল রাত্তিরের মধ্যেই জল হ'বে দেখো।'

ওয়াঙ বৌয়ের হাত থেকে ঝোড়া নামাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন—'পয়সা খরচ করেছ ত?'

টেবিলের উপর ঝোড়াটি রেখে ওয়াঙ বলে—'আজ যে ক'জন খেতে আসবে।' তার পর বাক্সটি শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের পোষাকের পেটরার পাশে রাখে। কেমন আশ্চর্য লাগে সবটা। দরজার কাছে এসে বাপ বকবক্ করতে থাকেন—'এ বাড়ীতে ঘরের অন্ত নেই।'

ছেলে যে লোক নিমন্ত্রণ করেছে এতে গোপনে পুলকিত হলেও ছেলের কাছে পিতা অনুযোগ করতে ছাড়েন না। নূতন আসা বৌকে যেন গোড়াতেই দেখাতে চান যে, এ সংসারে বাজে খরচ করা চলবে না।

বাপের কথায় কোন জবাব না দিয়ে ওয়াঙ ঝোড়া নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যায়। বৌ যায় পিছনে পিছনে। খাদ্যবস্তুগুলো ঠাণ্ডা উনুনের পাশে রেখে বৌকে বললে—'এই রইল গরু আর শুয়োরের মাংস আর মাছ এই। সাত জনের মত রান্না করতে পারবে ত?'

বৌয়ের মুখের দিকে তাকায় না ওয়াঙ।

বৌয়ের শুষ্ক কণ্ঠ শোনা যায়—'হোয়াঙ পরিবারে যাবার পর থেকেই আমি রান্নাঘরের দাসী হয়ে ছিলাম। সেখানে প্রতিবারের রান্নাতেই মাংস [illegible]।'

সেই কথা শুনে খুশী হয়ে ওয়াঙ তাকে রান্না-ঘরে রেখে ফিরে এল। [illegible] একে একে অতিথিরা এসে জমা হোল। [illegible] সকলেই [illegible] চায়। সবাই যখন আসন গ্রহণ করল তখন ওয়াঙ [illegible] গিয়ে বৌকে বললে পরিবেশন সুরু করতে।

'আমি [illegible] দিয়ে দেব তুমি সেগুলি টেবিলে রেখে দিও। [illegible] আমি বেরুতে চাই না।'

[illegible] খুশী হয়ে [illegible]। [illegible] এই [illegible] ভয় পায় না কিন্তু [illegible] সামনে [illegible] হাত থেকে পাত্রগুলি নিয়ে সে টেবিলের [illegible]। [illegible] প্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে বলে—'[illegible] খুব খাও পেট ভরে।'

[illegible] চেঁচিয়ে বললে—'আমাদের নতুন [illegible] দেখতে পাব না না কি আমরা?'

দৃঢ় কণ্ঠে ওয়াঙ জবাব দেয়—'আজো আমাদের মিল হয়নি কাকা। নতুন বৌকে নিয়ে ঘর না করে তাকে আপনাদের দেখানো উচিত হবে না।'

খেতে খেতে নিমন্ত্রিতেরা রান্নার প্রশংসা করে। ওয়াঙ তাদের বলতে থাকে—'জিনিষপত্র ভাল পাইনি। তা ভিন্ন রান্নাও সুবিধে হয়নি।'

অই কটি মাংস আর সামান্য আনাজ ও মদ দিয়ে বৌ এত সুন্দর করে রান্না করেছে যে ওয়াঙ আর কখনো তেমন রান্না খায়নি। গর্বে ওয়াঙের বুক ভরে ওঠে।

সে রাত্রে অতিথিরা চায়ের কাপ নিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। গল্প চলে রসিকতা জমে ওঠে—রাত্রি গভীর হয়। অবশেষে যখন সকলে বিদায় নিয়ে যায় ওয়াঙ তখন ফিরে এল রান্নাঘরে। এসে দেখলে উনুনের পাশে খড়ের গাদার ধারে তার নতুন বৌ বুকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওয়াঙ তাকে জাগাতেই হঠাৎ দু'টি হাত

[illegible] মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গিমা করে। [illegible] পরিবেশে [illegible] একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে একাকী বাস করার চিন্তায় যেন লজ্জায় কাতর হয়ে পড়ে ওয়াঙ। নিজেকে বোঝায়—'এই আমার বৌ। এই আবার ছেলেমেয়ের মা হবে।'

নিজের পরিধান খোলে ওয়াঙ।

আর বৌ পরদার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে শয্যা প্রস্তুত করে। ওয়াঙ তাকে বলে—'শোবে যখন আলোটা নিভিয়ে দিও।'

বিছানায় শুয়ে ভারী লেপ কাঁধ অবধি টেনে ওয়াঙ ঘুমের ভান করে। কিন্তু ঘুম আসে না চোখে। নতুন উত্তেজনায় শরীরের সব ক'টি স্নায়ুকেন্দ্র উন্মুখ হয়ে থাকে। তার পর বহুক্ষণ পরে যখন একটি নারী তার শরীরের পাশে এসে আশ্রয় নেয়—একটা প্রবল উল্লাস যেন ওর দেহদুর্গকে চুরমার করে দিতে চায়। অন্ধকারে হেসে ওঠে ওয়াঙ। তার পর বৌকে বুকে জাপটে নেয়।

২

ওদের জীবনে এই বিলাসিতাটুকু আছে। পরের দিন সকালে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করতে লাগল সেই মেয়েটিকে যে এখন তার সম্পূর্ণ আপনার। মেয়েটি উঠে অসংবৃত বেশ গুছিয়ে নিয়ে গা ভাঙতে ভাঙতে কোমরে গলায় আঁটসাট করে জড়িয়ে নিলে পোষাকটা। তার পর কাপড়ের জুতায় পা ঢুকিয়ে পিছনের ফিতেটা লাগিয়ে দিল। জানলার ছিদ্রপথে ভোরের আলো একটি রেখায় এসে পড়েছে মেয়েটির গায়ে। ওয়াঙ আবছা তার মুখ দেখতে পায়। মেয়েটির মুখে কোন জোয়ার-ভাঁটা নাই। এও ওয়াঙের কাছে এক বিস্ময়। ওর মনে হয়, রাত বুঝি ওর জীবনে এনে দিয়েছে আমূল পরিবর্তন। এই মেয়েটি আজ সকালে তারই বিছানা থেকে উঠেছে—যেন তার জীবনের প্রতি সকালেই এমনি ধারা সে উঠে এসেছে এত দিন! মেটে সকালের গর্ভ থেকে ভেসে আসে বৃদ্ধের কাশির অপ্রসন্ন আওয়াজ। ওয়াঙ বলে বৌকে—'বাবাকে একবাটি গরম জল দিয়ে এস।'

কাল যে সুরে কথা কয়েছে আজও ঠিক তেমনি কণ্ঠেই প্রশ্ন করল—'জলে কি চা-পাতা দেওয়া হবে?'

এই সামান্য প্রশ্ন ওয়াঙকে বিব্রত করে তোলে। তার বলতে ইচ্ছে হয়—'নিশ্চয়ই চা-পাতা থাকবে। তুমি কি মনে কর আমরা ভিক্ষুক।' তার ইচ্ছা হচ্ছিল মেয়েটি ভাবুক এ বাড়ীতে চা-পাতা দিয়ে কিছু হয় না। হোয়াঙ-প্রাসাদে অবশ্য প্রত্যেক পাত্রের জল চা-পাতায় সবুজ হয়ে থাকে। সেখানে সামান্য ক্রীতদাসীও হয়ত শুধু জল পান করে না! কিন্তু সে জানে, প্রথম দিনই যদি বাবাকে শুধু জলের পরিবর্তে চা দেওয়া হয় তিনি হয়ত ক্ষেপে উঠবেন। তাছাড়া সত্যিই ত তারা বড়লোক নয়। কাজেই একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই সে বলে—'চা? না—না—চা খেলে ওঁর কাশি বাড়ে।'

আবার সে খুশী মনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরাম করে। মেয়েটি রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে জল গরম করছে। আরো ঘুমুতে সে পারত কিন্তু এত বছর প্রতিদিন সকালে উঠে উঠে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে পোড়া চোখে আর ঘুম আসে না। [illegible] করে। দেহ-মনের এই কুঁড়েমি নিয়ে যেন [illegible] এখনও নিজের বৌয়ের কথা ভাবছে যেমন [illegible] তেমনি ভাবে ওয়াঙ মাঠের কথা, শস্য-শাকের [illegible] মাঠে কেমন ফসল হবে। ভাবে যদি [illegible] কাছ থেকে যে শাদা শালগমের বীজ কিনবে [illegible] প্রতিদিনের এই চিন্তার মধ্যে আজ আর একটি মধুর নতুন [illegible] বুনে চলে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাল লাগে জীবনের নতুন [illegible] কথা। গত রাত্রের কথা মনে পড়তেই হঠাৎ মাথায় আসে—আচ্ছা, মেয়েটি কি আমায় পছন্দ করেছে? এও আর এক নতুন বিস্ময়। ওয়াঙ শুধু নিজেকে প্রশ্ন করেছে—মেয়েটিকে তার পছন্দ হবে কি না। কখনো ভাবেনি তার সংসারে তাকে নিয়ে সে খুশী হবে কি না। মুখে তার না থাক সৌন্দর্য—হোক না তার হাত দু'টি কর্কশ, তবু রাতের অন্ধকারে ওয়াঙ অনুভব করেছে তার বৌয়ের কুমারী-দেহের স্নিগ্ধ কমনীয়তা। একথা মনে হতেই ও হেসে উঠল। কাল রাতে এমনি ধারা হাসিই ও হেসেছিল। হোয়াঙ-প্রাসাদের ক্ষুদে কর্তারা তাদের রান্নাঘরের ক্রীতদাসীর মুখের এই অতি সাধারণতার অতীত আর কোন বস্তুরই নাগাল পায়নি। মেয়েটির সারা শরীরে অফুরন্ত যৌবন। হাড়ের উপর সুডৌল নরম মাংস। মেয়েটি স্বামী হিসেবে তাকে পছন্দ করুক এ ভাবনা হঠাৎ মাথায় এল ওয়াঙের। কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা লজ্জা এসে বাধা দিল।

দরজা খুলে গেল। দু'হাতে বাষ্পিত পাত্র নিয়ে মেয়েটি নিঃশব্দে ভিতরে এসে ঢুকল। উঠে বসে ওয়াঙ বাটিটা নিল। জলে চায়ের পাতা ভাসছে। চকিত হয়ে ওয়াঙ বৌয়ের দিকে চায়। স্বামীর চাউনিতে ভয় খেয়ে মেয়েটি বলে—'তোমার কথামত বুড়ো বাপকে চা দিইনি। কিন্তু তোমায়—'

মেয়েটি ভয় পেয়েছে দেখে সে খুশী হয় মনে মনে। তাকে বক্তব্য শেষ করতে দেবার আগেই সে বলে—'আমি খুব পছন্দ করি—খুব পছন্দ করি—' গভীর আনন্দে সশব্দ চুমুকে সে চা টেনে নেয় মুখে।

'আমার বৌ আমাকে খুব ভালবাসে'—এ কথা নিজের মনের কাছেও সরবে উচ্চারণ করতে তার লজ্জা হয়। এক নতুন আনন্দে ওর মনের পাত্র চলকে ওঠে।

পরের ক'টি মাস সে শুধু বৌকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে, এই তার মনে হোল। যদিও কোদাল কাঁধে করে সে নিজের ক্ষেতে গিয়েছে, শস্য রয়েছে—জোয়ালে বলদ জুতে পশ্চিমের মাঠগুলিতে পেঁয়াজ আর রশুনের জন্য লাঙল দিয়েছে। কিন্তু কাজ এখন ওয়াঙের জীবনে বিলাস। সূর্য যখন মাথার শিয়রে এসে দাঁড়ায় সে বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ীতে এখন তার জন্য খাবার তৈরীই থাকে। পরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর বাটিগুলি আর ভাতের কাঠিগুলি সুষ্ঠুভাবে সাজান থাকে। এত দিন অবধি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েও বাড়ী ফিরে নিজেকেই খাবার তৈরী করে নিতে হয়েছে। হয়ত কোন দিন অসময়ে বৃদ্ধ বাপের খিদে চনচনিয়ে উঠলে তিনি আগে আগেই সামান্য কিছু রেঁধে খেয়ে নিতেন। হয়ত এক টুকরো চেপটা শক্ত রুটি সেঁকা থাকত, তার জন্যে—বাড়ী ফিরে পেঁয়াজ কলির সঙ্গে জড়িয়ে খেয়ে নিত সে।

আজকাল যা কিছুই হোক খাবার প্রস্তুতই থাকে। মাঠ থেকে ফিরেই টেবিলের ধারে বেঞ্চে বসে সে খেতে লেগে যায়। মাটির মেঝে

করে নিকোনো থাকে—জ্বালানির পাঁজা ভরাট হয়ে থাকে। সে মাঠে চলে গেলে বৌ আঁচড়া আর দড়ি নিয়ে বাড়ীর জমিগুলি নিড়োয়। হয়ত এক মুঠো ঘাস, কোথায় হয়ত একটা ডাল, কোথায় বা এক মুঠো ঝরা পাতা সংগ্রহ করে দুপুরের রান্নার জন্য জ্বালানী তৈরী করে নেয়। এতে ওয়াঙ খুশী হয়ে ওঠে, কারণ তাকে আর পয়সা খরচা করে জ্বালানী কিনতে হয় না আজকাল।

বিকাল গড়িয়ে এলে বৌ খোন্তা আর ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে সহরে যাবার সদর রাস্তায় যায়। পথচারী গরু ঘোড়া আর গাধার গোবর যোগাড় করে উঠানে এনে জমা করে ক্ষেতে সার হ'বে বলে। না বলতেই নিঃশব্দে এ সব কাজ সে করে। দিন শেষ হলেও তার কাজ সারা হয় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বলদটাকে খাওয়ান হচ্ছে। জল নিয়ে এসে পশুটার নাকের কাছে ধরে—পশুটা জলপান করে আপন ইচ্ছামত। ততক্ষণ সে একটুও জিরোয় না।

ছেঁড়া পোষাক নিয়েও বসে সে। এক পাঁজা তুলা থেকে বাঁশের তকলীতে নিজেই সুতো কেটে নিয়ে শীতের পোষাকের ছেঁড়াগুলো রিপু করতে চেষ্টা করে। বালিস-বিছানা আঙিনায় রোদে দেয়—চাদরগুলো খুলে নিয়ে কেচে শুকোতে দেয় বাঁশেতে। যে সব তোষকের তুলা বহু বছরে ধূসর ও কঠিন হয়ে উঠেছে তাদের বের করে নেয়—ভাজে ভাজে যে উকুন বাসা বেঁধেছে তাদের মেরে সেগুলিকে রোদে দেয়। দিনের পর দিন একটার পর একটা কাজ সে করে যায়—ঘর-দোর পরিচ্ছন্ন শ্রীমন্ত হয়ে ওঠে। বুড়োর কাশির অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। বাড়ীর দক্ষিণ ধারের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে তিনি তন্দ্রায় ঢলে পড়েন। মন ভরে থাকে আরাম আর খুশীর আমেজে।

শুধু সংসারের খুঁটিনাটি ছোট ছোট দরকারী কথা ছাড়া মেয়েটি একটিও অতিরিক্ত কথা বলে না। ওয়াঙ লক্ষ্য করে মেয়েটি কেমন নিঃশব্দে বড় বড় পা ফেলে সারা বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায়। ওয়াঙ অলক্ষিতে তাকায় তার বৌয়ের বোকা বোকা চেহারা, চৌকো মুখ আর শংকা-জড়ান বোবা-চোখের দিকে। কিন্তু বৌকে মুখ ফুটে কিছুই বলে না সে। অনেক রাত্রে মেয়েটির পেলব কঠিন দেহকে মুঠোর মধ্যে সে ধরতে পায়। কিন্তু সকালে সাধারণ পোষাকের আড়ালে ঢাকা পড়ে সেই জানা দেহটি। বোবা বিশ্বস্ত দাসীর মত মেয়েটি কাজ করে যায়। দাসী ছাড়া আর কি-ই বা সে! কাজেই স্বামী কখনো তাকে বলেও না—'কেন কথা কও না তুমি?' বৌ যে তার কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে এই যথেষ্ট মনে হয় চাষী ওয়াঙের।

কখনো কখনো মাঠে কাজ করতে করতে ওয়াঙের মনে পড়ে যায় মেয়েটির কথা। সেই একশ' মহল প্রাসাদে কি দেখেছিল সে? সেখানে কেমন করে কাটত তার দিন? ভেবেও কূল-কিনারা পায় না। আবার তখনই নিজের অনাবশ্যক কৌতূহলতায়, তার সম্বন্ধে অহেতুক উৎসাহে লজ্জা অনুভব করে। হাজার হোক সে মেয়েমানুষ বইত কিছু নয়!

কিন্তু যে মেয়ে এত দিন ক্রীতদাসী ছিল, সকাল থেকে মাঝ রাত্রি অবধি যার খাটুনির অন্ত ছিল না—তার পক্ষে তিনটি ঘর আর দু'বেলার রান্নায় নিজেকে ভরে রাখা সহজ নয়। এখন মাঠে মাঠে গমশীর্ষ পুরন্ত হয়ে উঠেছে—ওয়াঙ তাদের নিয়ে মহা ব্যস্ত। খাটতে খাটতে এক এক সময় ক্লান্তিতে তার পিঠ শিরশির করে ওঠে! এমনি একটি দিনে কর্ষিত মাটির উপর ঝুঁকে থাকা ওয়াঙের ছায়ার উপর আর একটি ছায়া এসে পড়ে। মেয়েটি কোদাল হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

'রাতের আগে ঘরেতে করবার আর কিছু নেই'—শুধু এইটুকু বলে মেয়েটি ওয়াঙের বাঁ-দিকের উদ্ভিন্ন জমিতে কাজে লেগে যায় নিঃশব্দে!

নূতন গ্রীষ্মের রোদ ঝাঁঝিয়ে দেয় ওদের। দেখতে দেখতে মেয়েটির মুখ ঘামে চিকচিক করে। ওয়াঙ কোট খুলে আদুল গায়ে কাজ করে। মেয়েটির গায়ের পাতলা জামা ঘামে ভিজে যেন গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপটে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটিও কথা না বলে তারা পরিপূর্ণ ঐক্যে কাজ করে। এক সময় ওয়াঙের পিঠের ব্যথাও যেন কমে আসে। কোন কিছুর সম্বন্ধেই তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। শুধু একটা ছন্দিত আনন্দে তারা দু'জনে মাটি কেটে বার বার উলটে-পালটে দেয়। এই মাটিই তাদের ঘর—এই মাটিতেই তাদের দেহ গড়ে উঠেছে—এই মাটিই তাদের স্বপ্নের দেবতা। সুফলা কালো মাটি কোদালের তীক্ষ্ণ ফলার মুখে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দু'ধারে খসে খসে পড়ে। মাঝে মাঝে কোদালের মুখে উঠছে এক টুকরো ইঁট বা একটা কাঠের টুকরো। এ আর কিছুই নয়। হয়ত বহু দিন আগে এই মাটিতে কোন চাষীর জন্যে শেষ-শয্যা রচনা করা হয়েছিল। হয়ত কোন চাষার বাড়ী ছিল এই জমির বুকেই। কালের দাপটে সেখানি ধূলিসাৎ হয়ে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। এমনি ধারা হয়ত তাদেরও বাঁধা ঘর এক দিন মিশে যাবে মৃত্তিকায়—তাদের অস্তিত্ব জগতে প্রত্যেক জীবের জীবনে সেই সবশেষের দিনটি আসবেই। নিঃশব্দে তারা দু'টিতে কাজ করে চলে। কাজের ছন্দে [illegible] করে তোলে অহল্যা মাটি।

সূর্য ডুবে গেলে ধীরে ধীরে উঠে পিঠ সোজা করে ওয়াঙ তাকায় মেয়েটির দিকে। মেয়েটির মুখে স্বেদ আর মাটি। মাটির রঙ লেগেছে তার সর্ব্বদেহে। ঘামে ভেজা পোষাক গায়েতে সেঁটে গেছে। শেষ মৃত্তিকা নিড়িয়ে মেয়েটি সমান করে দেয় ধীরে ধীরে। তার পর সেই সহজ ভঙ্গিমায় বলে—আজ সন্ধ্যায় তার কণ্ঠে যেন আরো বেশী স্নিগ্ধতা।

'আমার খোকা হবে।'

চাষী ওয়াঙ নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এ কথায় উত্তরে সে কি বলবে? মেয়েটি নত হয়ে এক টুকরা ইঁট ভাঙ্গা তুলে নিয়ে ফেলে দিল ক্ষেতের বাইরে। ব্যাপারটা যেন সাধারণ মনে হয় মেয়েটির কাছে—যেন সে বলেছে—'চা এনেছি তোমার জন্যে।' অথবা বলেছে—'এবার খাওয়া যাক।' কিন্তু ওয়াঙ কেমন করে বোঝাবে সে এ সংবাদ তার জীবনের কতখানি। এত দিনে তারা দু'টিতে যেন ফলন্ত জীবনের মুখোমুখী হ'তে চলে। এখন থেকে পৃথিবীতে তাদের বাঁচার পালা এল।

হঠাৎ ও মেয়েটি হাত হতে কোদাল নিয়ে বললে ভারী গলায়—'দিন শেষ হয়ে এসেছে। আজকের মত থাক। বাবাকে জানাতে হবে এ কথা।'

দু'জনে ঘরমুখো হয়। স্বামীর দশ-বারো পা পিছনে বৌ। এ রকমই রীতি এখানে। ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ বাপ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরেতে বৌ এসেছে—এখন আর তিনি ত নিজের হাতে খাবার তৈরী

রোগা ও মোটা

পশুপতি ভট্টাচার্য্য

অস্বাভাবিকরূপে মোটা হওয়াও ভালো নয়, আবার রোগা হওয়াও ভালো নয়। অবশ্য মোটা হওয়ার বা রোগা হওয়ার কতকটা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। প্রকৃতপক্ষে মোটা বা রোগা হওয়া অনেকটা আমাদের নিজেদের দোষ-গুণের উপরেও নির্ভর করে। অধিকন্তু, চেষ্টা করলে আমরা মোটা থেকে রোগা হ'তে পারি, আবার রোগা থেকে মোটাও হ'তে পারি। অতএব কোন কোন্ কারণে আমাদের স্থূলতা আর কৃশতা সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে, সেটা বিবেচ্য।

মেদবাহুল্যের দ্বারাই আমরা মোটা হই, আর মোটা হলেই আমাদের দেহের ওজন বাড়ে। বয়স ও শরীরের দৈর্ঘ্য অনুসারে কার কতটা ওজন হওয়া উচিত তা'র একটা মোটামুটি নিয়ম আছে। দেহের ওজন তার চেয়ে বেশি হ'লেই বুঝতে হবে আমি মোটা হয়েছি। অবশ্য হাড় বা মাংসের বাহুল্যের জন্যও কিছু ওজন বাড়তে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ওজন বাড়তে থাকাই উচিত, কারণ তখন পর্যন্ত শরীরের গঠন ও বৃদ্ধি চলেছে। ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর আর ওজন বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, কারণ, তখন একমাত্র অনাবশ্যক মেদবাহুল্যের দ্বারাই ওজন বাড়তে থাকে, শরীরের তাতে কোনো উন্নতি নেই।

মেদ বা চর্বি খানিকটা থাকা দরকার, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকা অনিষ্টকর। যারা মোটা মানুষ, তাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তারা ইচ্ছামত নড়াচড়া করতে পারে না, তাড়াতাড়ি কোনো কাজ করতে পারে না, অল্পেই ক্লান্ত হয়, শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে আর গুরু ভার টেনে চলতে তাদের জীবন দুর্বহ হ'য়ে ওঠে। অবশ্য ইচ্ছা ক'রে লোকে মোটা হয় না। মোটা হবার এক-রকম ধাত আছে, সেটা অনেকটা বংশগত। তবে যে কারণে সাধারণতঃ মোটা হয় সেগুলি বর্জন করতে পারলে কতকটা ভার লাঘব হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কি কি কারণে লোকে মোটা হয়?—

(১) খাদ্য বেশি পরিমাণে খেলে মোটা হয়। তার কারণ শরীরের ব্যয় ও পরিশ্রম অনুযায়ী যতটা খাদ্যের দৈনিক প্রয়োজন তার অতিরিক্ত খেতে থাকলেই সেটুকু উদ্বৃত্ত চর্বিরূপে দেহমধ্যে সঞ্চিত হয়। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য ও চর্বিজাতীয় খাদ্য—অর্থাৎ এক দিকে ভাত-রুটি-আলু ও মিষ্ট দ্রব্যাদি এবং অন্য দিকে ঘি তেল মাখন প্রভৃতির থেকেই চর্বির সৃষ্টি হয়। যাঁরা মোটা মানুষ তাঁরা এই কথা শুনলেই দুঃখ ক'রে বলে থাকেন যে, ঐ সব খাদ্য আমরা খুবই কম খাই, প্রায় ছেড়ে দিয়েছি বললেই চলে, তবু আমাদের ওজন কমে না। তাঁদের কথা মিথ্যা নয়, হয়তো তাঁরা ঐ সকল সামগ্রী সত্যই এখন খুব অল্প খান, কিন্তু আগে নিশ্চয় বহু পরিমাণে খেয়েছিলেন। তাতেই তাঁদের মেদবৃদ্ধি হয়েছে, তার পর এখন অল্প খেলেও সেটুকুই পূর্বার্জিত বৃদ্ধিকে বজায় রেখে চ'লছে। ব্যাঙ্কে যদি আগের থেকে অনেক টাকা জমানো থাকে তবে তার উপর সামান্য যোগান দিলেই সেই টাকা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। অতএব যাঁরা সত্যই চর্বি কমাতে চান তাঁদের ঐ সকল খাদ্য কিছু কালের জন্য একেবারেই বর্জন করতে হয়।

(২) শারীরিক পরিশ্রম কম থাকলে মোটা হয়। খাটুনি খুব কম, অথচ বিশ্রাম ও ঘুমের পরিমাণ বেশি, এতে সহজেই শরীরে চর্বি জমে। খাদ্য যা দৈনিক যোগান দিচ্ছে, পরিশ্রমের দ্বারা তার দৈনিক ব্যয় হওয়া চাই, তবেই শরীরের ওজন মাপসই থাকবে। যাদের পরিশ্রম করবার কিছু প্রয়োজন নেই, তাদের অন্ততঃ ব্যায়াম অভ্যাস করা দরকার। পরিশ্রমও নেই অথচ খোরাক কমানোও সম্ভব নয়, এমন যাদের অবস্থা তাদের রীতিমত ব্যায়াম করাই কর্তব্য। হয় শরীরকে পুরাদস্তুর খাটিয়ে নিতে হবে, নতুবা খোরাকের মাত্রা কমাতে হবে, নইলে আয়-ব্যয়ের কোনো সামঞ্জস্য থাকবে না।

(৩) যাদের মন কোনো পরিশ্রম করে না তারাও মোটা হয়। যাদের আমরা সুখী লোক বলি, যাদের কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই, মাথা ঘামিয়ে যাদের দিনপাত করতে হয় না এবং নিশ্চিন্তে যাদের দিন কেটে যায়, তারা অল্পেই মোটা হ'য়ে পড়ে।

(৪) যারা মদ্যপান করে তারাও অনেকে মোটা হয়। মদ্যের এই ধর্ম যে, তা পেটে গেলে শরীরের সঞ্চিত চর্বিকে সহজে আর খরচ হ'তে দেয় না।

এইগুলি মেদবৃদ্ধির মোটামুটি কারণ বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই কারণগুলি দূর করা কঠিন। হঠাৎ একেবারে উপবাস করতে শুরু করা যায় না। তাতে শরীর ভেঙে যেতে পারে। সুতরাং সব দিক্ বিবেচনা ক'রে ধীরে ধীরে রোগা হবার ব্যবস্থাই করা উচিত। তার জন্য নিম্নলিখিত মত ব্যবস্থা করাই প্রশস্ত—

(১) দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ কিছু কিছু ক'রে কমাতে হবে। কোন্ খাদ্যটি কমাতে হবে এ বিষয়ে নানা মত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, কার্বোহাইড্রেট খাদ্য অর্থাৎ ভাত-রুটি-আলু প্রভৃতি একেবারে ছেড়ে দিয়ে কেবল মাছ-মাংস, শাকসব্জি, ফলমূল ও ছানা খেয়ে থাকতে হবে, আর গরম জল পান করতে হবে।' এ ব্যবস্থা খুবই ভালো কিন্তু সকলে এটা পারে না। অতএব যথাসাধ্য খোরাক কমিয়ে দিয়ে প্রতি সপ্তাহে শরীরের ওজন নিয়ে দেখতে হয় যে, তাতে ওজন কিছু কমলো কি না। যদি না কমে তবে ঐ সকল খোরাক আরো কিছু কমাতে হয়। অনেকে বলেন যে, মোটা মানুষদের প্রতি সপ্তাহে দুই দিন সমস্ত খাদ্য বর্জন ক'রে শুধু দুধ খেয়ে কাটানো উচিত। শুধু দুধ যতটাই খাওয়া হোক তাতে চর্বি বাড়বে না, এবং শরীরও দুর্বল হবে না

(২) আহারের সময় জল খাওয়া মোটেই উচিত নয়। আহারের দুই ঘণ্টা পর থেকে যতটা ইচ্ছা জল পান করা যেতে পারে।

(৩) শারীরিক ও মানসিক দুই রকম পরিশ্রমই নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু থাকা চাই।

(৪) প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে স্নান করা উচিত।

(৫) প্রত্যহ কিছু ফল খাওয়া দরকার। মাঝে মাঝে জোলাপ প্রভৃতি দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করা নিতান্তই দরকার।

(৬) মোটা লোকের পক্ষে পাহাড়ে ওঠা সব চেয়ে চমৎকার পরিশ্রম। সমতল রাস্তায় হাঁটলে যত পরিশ্রম হয়, পাহাড়ে উঠলে তার ঠিক কুড়ি গুণ পরিশ্রম হয়, সুতরাং অল্পেই অনেক কাজ হ'য়ে যায়। মোটা লোকের রোগা হবার পক্ষে এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নেই।

(৭) ওষুধ খেয়ে রোগা হবার চেষ্টা করা একেবারেই উচিত নয়, কারণ, তাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

অতিরিক্ত রোগা হওয়াও বিপজ্জনক। মেদের অভাব থেকেই লোকে কৃশ হয়। কৃশ দেহে কোনো রোগ না থাকলেও তাকে স্বাস্থ্যবান বলা চলে না। যাদের শরীরে কিছুমাত্র মেদের সঞ্চয় নেই তাদের নিঃসম্বল দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাদের শরীরে এমন কোনো উদ্বৃত্ত সঞ্চয় থাকে না যাতে তারা রোগ বা কোনো আকস্মিক বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারে। যারা রোগা তাদের রোগপ্রবণতাও যেমন বেশি, তাদের রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তিও তেমনি কম। যক্ষ্মা রোগা লোকদিগকেই সহজে আক্রমণ করে।

সংসারে দুই রকমের রোগা লোক দেখা যায়। এক রকম যারা জন্মাবধিই রোগা দেখতে, আর এক রকম যারা বয়স বাড়বার সঙ্গে রোগা হয়েছে। রোগা হবার এক রকম ধাত আছে, এবং যাদের গোড়া থেকেই এই ধাত তারা কিছুতেই মোটা হয় না। কিন্তু এ রকম রোগা লোক সংখ্যায় খুবই কম। যদি উচিত মত খাওয়া হয় এবং সে খাদ্য হজম হয়, তাহলে অধিকাংশ লোকই অন্ততঃ খানিকটা মেদ শরীরে সঞ্চয় করে নিতে পারে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, চেষ্টার দ্বারা মোটা থেকে রোগা হওয়া বরং সহজ, কিন্তু রোগা থেকে মোটা হওয়া তার চেয়ে অনেক কঠিন।

(১) যে সকল খাদ্যে মেদবৃদ্ধি হতে পারে রোগা লোকদের তাই বেছে বেছে অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত। আমরা জানি যে, সাধারণতঃ ভাত-রুটি ও মিষ্টদ্রব্যাদি আর ঘি-দুধ বেশি পরিমাণে খেতে পারলেই মোটা হওয়া যায়। যারা বেশি খেতে কষ্টবোধ করে আর বেশি খাওয়া সহজে হজম করতে পারে না, তারা অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই দোষ কাটিয়ে উঠতে পারে। অনেকে বলেন, বেশি খাবার পরে পেটের উপর গরম সেঁক দিলে (hot water bag) শীঘ্র হজম হয়ে যায়। রোগা লোকদের খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বেশি রকম বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত। যারা কৃশকায় মানুষ, তারা প্রায়ই অত্যন্ত চঞ্চল হয়। তাদের নার্ভাস সিস্‌টেম সর্ব্বদাই যেন উত্তেজিত হয়ে থাকে; সুতরাং তারা সর্ব্বদাই অতি ব্যস্ত, অনাবশ্যক কারণেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত চালনা করতে থাকে। সুতরাং বিশ্রামের সময়েও যেন তারা সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু ভোগ করতে পারে না। রোগা মানুষদের পক্ষে [illegible] করা উচিত, আর আহারের পর কিছুক্ষণ রীতিমত বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

(২) রোগা লোকদের পক্ষে দুধ খাওয়া অভ্যাস করা নিতান্তই দরকার। প্রত্যহ তাদের অন্ততঃ দেড় সের খাঁটি দুধ খাওয়া উচিত। যদি নিয়মিত ভাবে এটি করা যায় তবে তাতেই তিন মাসের মধ্যে শরীরের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যেতে পারে।

(৩) ঘি, মাখন, আলু, মিষ্টদ্রব্যাদি, বাদাম, পেস্তা, খেজুর প্রভৃতি মোটা হবার পক্ষে উপযোগী খাদ্য।

(৪) আহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জলপান করতে অভ্যাস করলে তা মোটা হবার পক্ষে সাহায্য করে।

(৫) মানসিক উদ্বেগ আর অশান্তি রোগা হ'য়ে যাবার একটি প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিক বলেন যে, যারা রোগা চেহারার লোক তাদের খুব গভীর ভাবে প্রেমে পড়াও উচিত নয়। প্রেমে পড়লেই মানুষ দিবারাত্র সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তাতে শরীর খুব শুকিয়ে যায়। যাঁরা মোটা হ'তে চান তাঁদের সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করা উচিত। মনের সুখই রোগা লোকদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট টনিক।

(৬) রোগা মানুষদের সর্ব্বদা গায়ে জামা দিয়ে থাকা উচিত। আর শারীরিক পরিশ্রমও তাদের সামান্য ক্ষণের জন্যই করা উচিত। পাহাড়ে ওঠার ব্যায়াম রোগা লোকদের পক্ষে নিষেধ। এ ছাড়া তাদের নিদ্রার পরিমাণ খুব বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

(৭) গরম জলে স্নান করা রোগা লোকদের পক্ষে উপকারী।

চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্ব্বেদের স্থান

শ্রীপ্রণবানন্দ ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে সভ্য-জগতে যতগুলি চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রধান। এতন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অতি প্রাচীন ও সর্ব্বজন-বিদিত। আমরা প্রাচীন গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, আয়ুর্ব্বেদের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই চিকিৎসা পদ্ধতি যে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ইহার কারণ আমাদেরই ঔদাসীন্য। আজ-কাল আমরা প্রত্যেক বিষয়েই পশ্চিমকে অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছি। পাশ্চাত্ত্যের মোহেই আমরা নিজস্ব ভাল-মন্দ জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষি-বিরচিত এই অমূল্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি যে অবলুপ্তপ্রায় হইতেছে তাহারও প্রধান কারণ আমাদের পাশ্চাত্ত্য-প্রিয়তা। কেবল চিকিৎসা-পদ্ধতি কেন, আমাদের নিজস্ব সমস্ত অমূল্য রত্ন এই ভাবে হারাইতেছি। আমাদের প্রাচীন ভারতে এমন অনেক কিছুই ছিল—যাহা কোন অংশেই পাশ্চাত্ত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। রাষ্ট্র, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রভৃতিতে আমরা পাশ্চাত্ত্য অপেক্ষা কোন দিক্ দিয়াই হীন ছিলাম না; অধিকন্তু অনেক উপরেই ছিলাম! কিন্তু আমরা ঐ সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ দিনে দিনে অবনতিই করিতেছি। আমাদেরই নিজস্ব [illegible] না। ক্রমে ক্রমে আমরা

এতই নীচে নামিয়া যাইতেছি যে, পরে আমাদের প্রত্যেক বিষয়েই পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হওয়া ব্যতিরেকে অন্য উপায় থাকিবে না। আমরা আমাদের নিজস্বতাকে হারাইতে বসিয়াছি। বিবেকানন্দ তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "এক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক আমাদের গীতাকে অত্যন্ত নিন্দা করিতেছিল, কিন্তু যখন এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সেই গীতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন তখন ঐ যুবকেরও মত পরিবর্ত্তন হইল।" কি লজ্জার কথা! আমাদের নিজস্ব জিনিষ ভাল কি মন্দ—তাহাও বিদেশীয়দের কাছে জানিতে হইবে!

আমাদের প্রাচীন আর্য্যযুগে যখন পাশ্চাত্যের কোনও চিহ্ন ছিল না, তখন এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য পরিচালিত করিতে হইত। তখন কি দেশস্থ লোকেরা বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত? কিন্তু তাহা কদাচ সত্য নহে। পরন্তু তখনকার লোকেরা বর্ত্তমান যুগের লোকের ন্যায় হীনবীর্য্য ও স্বল্পায় ছিলেন না। কিন্তু আজ-কাল দেখা যায়, প্রত্যেকেই ভগ্নস্বাস্থ্য, অকর্ম্মণ্য, ও উৎসাহহীন হইয়া কোন প্রকারে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে সকলেই আশাতীত পূর্ণ-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু হইয়া আনন্দে সংসার-ধর্ম্ম করিত। এই ব্যতিক্রমের কারণ কি? ইহার কারণ আমাদের নিজস্বতাকে পরিত্যাগ। নিজের জিনিষ নিজের পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়। যে দেশে বসবাস করা যায় সেই দেশের সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধম্ হিতম্।" অর্থাৎ যে দেশে বসবাস করা যায় সেই দেশজাত ঔষধই সমধিক কার্য্যকরী। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী আমাদের একান্ত গ্রহণীয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এতই অমূল্য জিনিষ যে, ইহাতে কেবলমাত্র চিকিৎসা-পদ্ধতিই পাওয়া যায় না, পরন্তু ইহাতে মানব-জীবনের সমস্ত রকম গ্রহণীয় বিধানও সন্নিবেশিত আছে, পুরাকালে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দ্বারাই মানব-জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। অর্থাৎ ইহাতে মানবের সারা জীবনের করণীয় কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ আছে।

অনেকের ধারণা, এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা কতকগুলি গাছ-গাছড়ার সমষ্টি, ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত কোন দ্রব্যই নাই। এ কথা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রমবশতঃ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন খুব কম দ্রব্যই আছে যাহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদে নাই। বিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা, দ্রব্যগুণ, রোগনিদান—কোন অংশেই আমরা কম নহি বরং উপরে। প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই দেখা যাক, আমাদের আয়ুর্ব্বেদে বিজ্ঞানসম্মত অনেক পদার্থই আছে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেকেই বেশ বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এমন খুব কম ধাতব পদার্থ আছে যাহা আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহার হয় না। এই ধাতব পদার্থগুলির জারণ ও মারণ প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। এবং এই সমস্ত জারণ ও মারণের ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদেও উল্লিখিত আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে ধাতুঘটিত কোন ঔষধই প্রস্তুত সম্ভব হইত না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় অত্যন্ত সুচতুর ছিলেন। ধাতুঘটিত ঔষধ, মৃতসঞ্জীবনী, মকরধ্বজ প্রভৃতি যাহা আজকাল সভ্য জগতে এমন কি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও অভিনন্দিত ও ব্যবহৃত হইতেছে তাহা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। অনেকে মনে করেন, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে অস্ত্রো-পচারের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহাও অত্যন্ত ভুল। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে অনেক অস্ত্রের কথা উল্লিখিত আছে। তখনকার দিনে পাথর ঘষিয়া এত সূক্ষ্ম অস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা আজ-কাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও বিরল অনেকে হয়তো ইহা আদৌ বিশ্বাস করিবেন না। তাহার কারণ তাঁহারা কখনও ভুলেও একবার ইহার দিকে ফিরিয়াও দেখেন না। দ্রব্যগুণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের একটি বিরাট সম্পদ। আয়ুর্ব্বেদে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে এত সুন্দর ভাষায় লেখা আছে, যাহা আর অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। আমাদের চক্ষুর সামনে কত লতাপাতা পড়িয়া থাকে তাহার দিকে হয়তো আমরা একবারও ফিরিয়া দেখি না কিন্তু তাহা যে এক একটি কত মহোপকারী বস্তু তাহা আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ পাঠ করিলেই জানা যায়। একটি সামান্য লতা যে কত অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে তাহা ভাষাতীত স্বর্ণভস্ম করা অতীব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি জানি, কেবলমাত্র একটি লতার রস দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বর্ণভস্ম করা যায়। এইরূপ আরও কত অনির্ব্বচনীয় গুণসম্পন্ন লতা আছে তাহা আমাদের নিকট অপরিচিত। তাহা হয়তো পুরাতন আয়ুর্ব্বেদীয় পাণ্ডুলিপিতে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমরাই আলোচনা অভাবে তাহাদের নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। আয়ুর্ব্বেদের রোগনির্ণয় প্রণালী অতি সুন্দর, সহজ ও সরল। নাড়ীবিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদের নিজস্ব সম্পদ্। পাশ্চাত্য চিকিৎসায় রোগনির্ণয় করিতে গেলে নানা প্রকার যন্ত্রপাতির আবশ্যক হয়। যাহার ব্যবহার অতি ব্যয়সাধ্য ও কঠিন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কেবলমাত্র নাড়ী দেখিয়াই দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব ও অসুবিধা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন। রোগনির্ণয় করিতে যাইয়া তাহাদের অনর্থক কতকগুলি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। নাড়ী ধরিয়াই তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। অবশ্য আলোচনা অভাবে ইহাও দিনে দিনে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

আর একটি কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুমান করা যায় যে, আমাদের এই চিকিৎসাশাস্ত্র কত উচ্চে। আমরা বর্ত্তমানে রোগী পাই কখন? যখন রোগীর শেষ ও মুমূর্ষ অবস্থা। সামান্য সর্দ্দি, কাসি ও জ্বর হইলেই আমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষিত চিকিৎসকের শরণাগত হই। কিন্তু যখন রোগ পাশ্চাত্য চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দুরারোগ্য হয়, তখন অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। এমতাবস্থায় রোগীর মৃত্যু হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিন্দনীয় হন। এইরূপ অল্পসংখ্যক রোগীও যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে তবে ঐ সমস্ত চিকিৎসক অত্যন্ত প্রসংসার্হ। কাজেই দেখা যায়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কত অসুবিধা। ইহার কারণ—আমাদের নিজস্ব জিনিষের প্রতি অবহেলা।

তবে আশার কথা এই যে, আজ-কাল অনেক স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবক ইহার দিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। অনেক আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

নিশা-নগরে মুক নামে এক বাঁটকুল বাস করত। মুকের অনেক বয়স হলেও সে চার বিঘতের বেশী লম্বা ছিল না। বেশ সুশ্রী অথচ অদ্ভুত তার গঠন। মাথাটি সাধারণ লোকের চেয়েও বেশী বড়; সুতরাং এতটুকু শরীরের সঙ্গে মাথাটি তার অদ্ভুত রকমের বেমানান বোধ হত। মুকের চাল-চলন ছিল আরও অদ্ভুত। মস্ত একটা বাড়িতে সে একা বাস করত, নিজেই রান্না করত এবং সারা মাসের মধ্যে মাত্র একটি দিন সে বাড়ির বার হ'ত। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে. তাও বুঝবার জো ছিল না। শুধু দুপুরের দিকে তার বাড়ি থেকে একটি কুণ্ডলীপাকান ধোঁয়া উঠতে দেখা যেত এবং বিকালে রাস্তা থেকে তার বাড়ির ছাদের দিকে তাকালে ছাদে মস্ত বড় একটা মাথা ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যেত। সহরে একদল দুষ্টু ছেলে ছিল। তারা প্রায় সকলেরই পিছনে লাগত, কাজেই যে-দিন মুক বাইরে আসত সে-দিন তাদের কাছে একটা আনন্দের দিন ব'লে মনে হ'ত। তারা ঠিক মনে রাখত কোন্ তারিখে মুক বের হবে। সে দিন তারা দলে-বলে গিয়ে মুকের বাড়ির দরজায় অপেক্ষা করত। দরজা খোলা মাত্রই প্রথমে চোখে পড়ত মস্ত একটা মাথা, তার উপরে আবার মাথার চেয়েও বড় একটি জরির পাগড়ী। এর পরে চোখে পড়ত তার ক্ষুদে দেহ। অসম্ভব রকমের বড় ইজের, চাপকান পরনে। পায়ে প্রকাণ্ড বড় ডিঙ্গি নৌকার মত একজোড়া চটি জুতো—কোমরে চওড়া কোমরবন্ধ এবং তার সঙ্গে আঁটা প্রকাণ্ড এক তরবারি। তরবারি মুককে নিয়ে চলেছে কি মুক তরবারি বহন করছে, তা সহজে ঠাহর করতে পারা যেত না। এইরূপ বেশে যখন সে বের হ'ত তখন ছেলেরা আনন্দধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলত। ছেলের দল মাথার টুপি শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে মুককে ঘিরে পাগলের মত নাচ সুরু ক'রে দিত। মুক কিন্তু গম্ভীর ভাবে ছেলেদের অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকত। তার হাঁটার সময় অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা যেত—এ শব্দ তার রাক্ষুসে চটি জুতোর। ছেলের দল, পিছনে পিছনে চীৎকার করতে করতে ছুটত—"মুক বাঁটকুল, মুক বাঁটকুল!" মুকের সম্মানার্থে তারা একটি ছড়া ও গান করতে থাকত।—

"বাঁটকুল মুক বাঁটকুল মুক
তোমার লাগি কি উৎসুক
থাকি মোরা সারা মাস
বারেক দেখে না পোরে আশ—
মস্ত বাড়িতে তোমার বাস।
বেঁটে হ'লেও মস্ত বীর
পাহাড় যেন তোমার শির
মোদের দিকে ফিরাও মুখ
বাঁটকুল মুক, বাঁটকুল মুক।"

এক দিন দুষ্টু ছেলেদের তামাসা চরমে উঠল। তারা নানারূপে ভ্যাংচাতে লাগল। কেউ বা মুকের কোট ধরে টানাটানি করতে লাগল। এদের মধ্যে এক জন মুকের চটি ধ'রে টান দিতে মুক মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেল। এমন সময় এক জন সম্ভ্রান্ত পথিক ছেলেদের ব্যবহারে রেগে গিয়ে অনেকের কান মলে দিলেন এবং মুকের প্রতি দুর্ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগকে কড়াভাবে তিরস্কার করলেন। তার পর ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'তোমরা মুককে জান না, তাই তার সঙ্গে এরূপ অভদ্র ব্যবহার করতে সাহস পাও—এস, চুপ ক'রে বসে মুকের কাহিনী শোন।"

"—মুকের পিতা এই সহরের এক জন গরীব অথচ অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও ছেলের মত নিরিবিলি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর স্ত্রী এই ছেলেটি রেখে মারা যাওয়ার পর তিনি এই অদ্ভুত চেহারার ছেলেটিকে নিয়ে উদাসীন ভাবে বাস করতেন। ছেলেটির চেহারার জন্য একে তিনি লোক-সমাজে বের করতেন না। ষোল বছর বয়সেও মুক ছোট্ট একটি খোকার মতই রয়ে গেল—দেখে পিতার মনে দুঃখের সীমা ছিল না।

"কিছু দিন পরে বৃদ্ধ এক দিন পড়ে গিয়ে চোট পেয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। মুক বিষম বিপদে পড়ে গেল। কারও সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় নাই, এদিকে ঘরে টাকা-পয়সাও বিশেষ নাই। বাড়িওয়ালার অনেক দিন থেকেই ভাড়া বাকি ছিল, এবার সে এসে মুককে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলল। মুক তার পিতার পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ভাগ্য অন্বেষণে বের হবে স্থির করল। তার পিতা ছিলেন লম্বা এবং স্থূলকায় পুরুষ: কাজেই তাঁর পোষাক মুকের গায়ে লাগবে কেন? অগত্যা মুক চাপকান ও ইজের লম্বার দিকে কেটে ছোট করে নিল কিন্তু পাশের দিকে কাটতে ভুলে গেল। তার পর পিতার প্রকাণ্ড পাগড়ী, কোমরবন্ধ, লাঠি ও ডামস্কস তরবারি প্রভৃতিতে অদ্ভুত ভাবে সেজে মুক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

"সারাটি দিন সে আনন্দে বেড়াল। যা দেখে তাতেই তার খুসী ধরে না। সে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়েছে—শীঘ্রই সে অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে বলে তার ধারণা। সামান্য খোলামকুচিতে রোদ প'ড়ে চিকমিক ক'রে ওঠে, সে দূর থেকে ভাবে ওটি বুঝি দামী

হীরা-জহরৎ। কাছে গেলেই তার স্বপ্ন ভেঙে যায়—ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এবং ভাগ্য সম্বন্ধে ক্রমশঃ সন্দিহান হয়ে সে দুই দিন চলল। মাঠের পথের ধারের সামান্য ফলমূলে সে ক্ষুধা নিবারণ করে—কঠিন মাটির উপরেই শুয়ে রাত কাটায়। তৃতীয় দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটি উঁচু জায়গার উপর থেকে সে দূরে একটি সহর দেখতে পেল। টিনের উপর অর্দ্ধচন্দ্র ঝলমল করছে—মসজিদের ছাদের উপর পতাকা উড়ছে—দেখে সে বিস্মিত ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই সহরের কথা ভাবতে লাগল। মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, ঐখানে মুক তার সৌভাগ্য খুঁজে পাবে—ঐখানে না হ'লে কোথাও নয়।' এই বলে সে তার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে ঐ দিকে রওনা হল। কিন্তু যদিও ঐ সহর নিকটে মনে হচ্ছিল তবু সেখানে পৌঁছিতে তার দুপুর হয়ে গেল। কয়েক দিনের পরিশ্রম ও অনাহারে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে একটি গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিয়ে চাপকানটি ঠিক করে পাগড়ীটি সুন্দর করে মাথায় পরল, কোমরবন্ধ আর একটু এঁটে তরবারিখানা ঠিক করে নিল। তার পর জুতোর ধুলো ঝেড়ে লাঠিগাছি মাতব্বরের মত হাতে নিয়ে সহরের মধ্যে ঢুকল।

"সে কয়েকটি রাস্তা ঘুরল। মনে তার কল্পনার অন্ত নাই। ভাবছে, হঠাৎ দরজা খুলে কেহ তাকে ডেকে বলবে—'এস বাছা মুক—এখানে তোমার খাদ্যপানীয় প্রস্তুত, খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর।' কিন্তু ভাগ্যের এমনই লিখন যে, কেউ তাকে ডেকেও জিজ্ঞেস করল না।

"সে আগ্রহের সহিত একটি সুন্দর বড় বাড়ির দিকে চাইতেই দেখল সে, ঐ বাড়ির একটি জানালা খুলে এক জন বৃদ্ধা এদিক্ ওদিক্ চেয়ে সুমিষ্ট স্বরে ডাকছেন—

'এস বাছা তাড়াতাড়ি
খাবার রেখেছি বাড়ি'
খাবারের মিষ্টি ঘ্রাণ
বন্ধুদের ডেকে আন্।
রেঁধেছি যতন করি
খাও সবে পেট ভরি'।'

"দেখতে দেখতে ঐ বাড়ির দরজা খুলে গেল এবং অনেকগুলি কুকুর এবং বিড়ালকে মুক্ত বাড়ির ভিতর যেতে দেখল। সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল, তাকেও খেতে ডাকছে কি না। তার এত খিদে পেয়েছিল যে আর লজ্জা না করে সে সোজাসুজি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। তার ঠিক আগে আগে ছোট একজোড়া বিড়াল যাচ্ছিল, সে তাদের পিছন পিছন যেতে যেতে ভাবল—এরা কোন্

"মুক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠামাত্রই বৃদ্ধার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। মুককে খুব ক্লান্ত ও দুঃখিত দেখে তার অভিপ্রায় বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল। মুক জবাব দিল—'আপনি সকলকে আপনার এখানে খাওয়ার জন্য ডাকছিলেন শুনে আমিও এসে পড়েছি। আমি খিদেতে খুব কষ্ট পাচ্ছি।' বৃদ্ধা হেসে উত্তর দিল—'তুমি দেখছি বেশ অদ্ভুত লোক—তোমাকে এ সহরে নতুন মনে হচ্ছে। কারণ, সহরশুদ্ধ লোকে জানে যে আমি কেবল আমার বিড়ালদের জন্যই রান্না করি এবং তাদের প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবদেরও খাইয়ে থাকি। যাক আজ তোমাকেও তাদেরই এক জন বন্ধুরূপে পেলাম।'

"বাঁটকুল মুক বলতে লাগল, তার পিতার মৃত্যুর পর সে কিরূপ বিপদে পড়েছে। সমুদয় শুনে বৃদ্ধার মনে দয়া হল; সে আদর-যত্ন করে মুককে খাওয়াল। খেয়ে-দেয়ে মুক সুস্থ ও সবল হ'লে বুড়ী তার দিকে চেয়ে কি ভাবল; তার পর বলল, 'বাঁটকুল মুক, তুমি আমার এখানেই কাজে লেগে যাও। এখানে পরিশ্রমের কাজ বিশেষ নাই, তার পর খাওয়াদাওয়াও তোমার এখানে ভালই হবে। মুকের কাছে বিড়ালদের জন্য রাঁধা খাবার বেশ মুখরোচক বোধ হয়েছিল—কাজেই সে লোভে-লোভে এখানেই কাজে লেগে গেল। কাজ খুই হাল্কা অথচ অদ্ভুত ধরণের। বুড়ীর ছিল দুটি মদ্দা বিড়াল এবং চারটি মেনী বিড়াল। রোজ সকালে মুককে এ গুলির লোম চিরুণি দিয়ে আঁচড়িয়ে দামী পাউডার মাখিয়ে দিতে হত—বুড়ী বাইরে গেলে এদের দেখাশুনা করতে হত, খাবার সময় এদের থালাগুলি সাজিয়ে দিতে হত এবং রাত্রে রেশমের গদীর উপর তাদের শুইয়ে—ভেলভেটের লেপ দিয়ে তাদের ঢেকে দিতে হত। বিড়াল বাদে বুড়ীর কয়েকটি ছোট কুকুরও ছিল, তবে তাদের বিড়ালের মত যত্ন ছিল না। বিড়ালগুলিকেই বুড়ী নিজের সন্তানের মত দেখত। কিছুদিন মুকের এই কাজে বেশ আনন্দেই কাটল—বুড়ী তার কাজে খুব খুসী ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বিড়ালগুলি দুষ্টু হয়ে উঠল। বুড়ী বাইরে বেরোন মাত্র বিড়ালগুলি যেন ভূতে পাওয়ার মত তড়াক ক'রে উঠে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াত, জিনিষপত্র ছিট্‌কিয়ে ফেলে দিত, অনেক দামী বাসনপত্র তাদের ছুটাছুটির সময় পায়ে লেগে ভেঙে যেত। আশ্চর্য্য এই যে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনামাত্রই বিড়ালগুলি ছুটে গিয়ে বিছানায় শুয়ে আস্তে আস্তে লেজ নাড়তে থাকত; এমন ভাব দেখাত যে তারা কিছুই জানে না। ঘরময় জিনিষপত্র ছড়ান এবং দামী বাসনপত্র ভাঙা দেখে বুড়ী রাগে জ্বলে উঠত এবং যত দোষ নির্দ্দোষ মুকের উপর চাপাত। মুক অনেক কাকুতি-মিনতি করে নিজে নির্দ্দোষ বলে বুঝাতে চেষ্টা করত কিন্তু বুড়ী তার কোনও কথাতেই কান দিত না। বিড়ালদের সে মুকের চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাস করত।

"দুঃখ ও বিরক্তিতে মুক খুব দমে গেল। এখানে তার উন্নতির কোনও আশা নাই দেখে সে কাজ ছেড়ে দেবে ঠিক করল। এত দিন সে মাহিনা এক টাকাও পায় নাই। হাতে পয়সা না থাকলে পথ চলায় যে কি কষ্ট সে এর আগেই বুঝেছে; কাজেই তার কেবল চিন্তা, মাহিনার টাকাটা হাতে পেলেই সে এখান থেকে সরে পড়বে। মুক দেখত যে, বুড়ীর একটি ঘর সব সময় তালাবন্ধ থাকে। বুড়ী প্রায়ই সে ঘরে যেত—ঐ ঘরে কি লুকান আছে দেখবার জন্য মুকের

*টেবিলে ভাল খাবার তা নিশ্চয়ই [illegible]

গুপ্তধনের কথা তার মনে পড়ল কিন্তু ঘরটি সব সময় তালাবন্ধ থাকায়—সে ঘরে ঢুকা তো তার পক্ষে অসম্ভব।

"বুড়ী একটি কুকুরকে খুব অনাদর করত। এই কুকুরটিকে মুক কিন্তু ভালবাসত, একারণ কুকুরটি মুকের খুব বাধ্য ছিল। একদিন সকালে বুড়ী বাইরে গেলে এই কুকুরটি এসে মুকের ইজের ধরে এমন ভাবে টানতে লাগল যেন সে তাকে তার সঙ্গে কোনও জায়গায় যেতে বলছে। মুক কুকুরের সঙ্গে খেলা করতে ভালবাসত। সে কুকুরটির সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বুড়ীর শোবার ঘরের মধ্যে ছোট একটি দরজার সামনে উপস্থিত হল। এই দরজাটা সে আগে কখনও লক্ষ্য করেনি। দরজা আধ-খোলা ছিল, কুকুরটি সেই দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর গেলে মুকও সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে গেল। মুক আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল যে, সে এই ঘরের কথাই অনেক দিন যাবৎ ভাবছিল! সে ঘরের ভিতরটা খুব ভাল করে দেখল কিন্তু সোনাদানা কিছুই চোখে পড়ল না। কেবল পুরাতন কাপড় চোপড় ও অদ্ভুত ধরণের বাসনপত্র সে দেখতে পেল। একটি পাত্র তার খুব ভাল লাগল—পাত্রটি স্ফটিক দিয়ে তৈরী এবং তার উপরে সুন্দর সুন্দর ছবি খোদাই করা। সে ঐ পাত্রটির চার পাশ ভাল করে দেখবার জন্ম নাড়া চাড়া করতে উপরের ঢাকনিটি হঠাৎ পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল। ঢাকনিটি যে আলগাভাবে লাগান ছিল আগে সে তাহা লক্ষ্য করেনি। ঢাকনি ভেঙে যাওয়াতে সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এ ব্যাপার টের পেলে বুড়ী যে তাকে আস্ত রাখবে না সে ইহা বিলক্ষণ জানত। এখনই এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই স্থির করে—পথচলার জন্ম কিছু এ ঘর থেকে লওয়া যায় কি না, ভেবে সে চারি দিকে চেয়ে দেখল। প্রথমেই তার নজরে পড়ল মস্তভারী ও শক্ত একজোড়া চটি জুতো—তার নিজের জোড়া ছিঁড়ে যাওয়ায় পথচলার মত অবস্থা ছিল না—তার পর এত-বড় এই জুতো পায়ে দেখলে লোকেও তাকে সাবালক ভেবে মান্য করবে ভেবে সে চটিজোড়া নিয়ে নিল। কোণে একগাছি সিংহের মাথাওয়ালা বাঁটের সুন্দর ছড়ি দেখে সেখানিও নিয়ে সে তাড়াতাড়ি তার নিজের ঘরে গেল। সেখান থেকে তার পাগড়ি, চাপকান, কোমরবন্ধ ও তরবারি এবং তার সঙ্গে এই নতুন পাওয়া দুটি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে সে যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বুড়ীর ভয়ে প্রথমে সে যত জোরে পারে সহরের সীমানা ছেড়ে যাবার জন্ম দৌড়তে লাগল। শেষকালে এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল যে সে আর যেন সহ্য করতে পারে না। জীবনে সে এত দ্রুত দৌড়ায়নি। মনে হল, সে যেন কিছুতেই থামতে পারছে না—কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। অবশেষে সে বুঝতে পারল এই নতুন চটির দরুণ সে এত বেগে চলছে। কারণ, চটি মাঝে মাঝে পা থেকে খুলে গিয়ে যেন তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে থামবার জন্ম অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তার পর নিরুপায় হয়ে লোকে ঘোড়াকে যেরূপ থামায় মুক সেইরূপ চীৎকার করে বলতে লাগল—'থাম থাম, থাম।' এই কথা বলা মাত্রই চটিজুতা থেমে গেল এবং পরিশ্রান্ত মুক মাটির উপর বসে পড়ল।

"চটিজুতার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হল। মনে মনে ভাবল, এত দিন কাজ ক'রে সে বাস্তবিক উপকারী একটি জিনিষ পেয়েছে, যার দৌলতে সে তার সৌভাগ্যের পথ খুঁজে পাবে। আনন্দে বিভোর হ'লেও দীর্ঘপথ চলার পরিশ্রমে সে এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, সে মাটিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে মুক স্বপ্নে দেখল, যে কুকুরটির সাহায্যে সে বুড়ীর বাড়িতে এই চটিজুতা পেয়েছে, সে তাকে বলছে—'প্রিয় মুক, তুমি এখনও চটি জোড়ার ব্যবহার ঠিকমত শেখনি—মনে রেখো, যখন তুমি এর মধ্যে পা দিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে তিন পাক ঘুরবে তখন যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে সেখানে উড়ে যেতে পারবে। ছড়িগাছির সাহায্যে তুমি গুপ্তধন লাভ করতে পারবে। যেখানে সোনা পোঁতা আছে সেখানে ছড়ি দিয়ে তিনবার এবং রূপার জায়গায় দুইবার টোকা দিলেই গুপ্তধন পাওয়া যাবে।' ঘুম থেকে উঠেই সে এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ভাবল এবং তৎক্ষণাৎ ইহা পরীক্ষা করা মনস্থ করল। চটি পায়ে দিয়ে সে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরতে চেষ্টা করল কিন্তু অত-বড় চটি নিয়ে ঘোরা সহজ নয়—তার মোটা মাথা একবার এদিক্ একবার ওদিক্ দুলতে লাগল এবং একবার সে পড়ে গিয়ে নাকে বেশ চোট পেল। কিন্তু চেষ্টা সে না করে ছাড়বে না। অনেক বারের পর যেই সে ঠিক মত ঘুরেছে অমনি চটি জুতা তাকে নিয়ে আকাশে উঠতে লাগল। সে পরবর্ত্তী সহরে যাবে মনে করল। বায়ুবেগে মুক আকাশ-পথে চলল। কখন মেঘের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কখনও বা মেঘগুলি তার অনেক নীচে। এত উপরে উঠে গেছে যে নীচের বাড়ি ঘর গাছপালা সব যেন সমতল দেখাচ্ছে, বড় বড় নদী সরু রূপার হারের মত দেখাচ্ছে; এই সব দেখে মুক যে কিরূপ আনন্দ পেল তা মুখে বলে শেষ করা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নীচের দিকে নামছে মনে হলো এবং সত্য সত্যই একটি বড় সহরের বাজারের মধ্যে এসে পড়লো। কত দোকান-পাট কত লোক কত রকমের পোষাক কেনাবেচায় ব্যস্ত। বাজারের মধ্যে তার চটি নিয়ে নিজেকে সামলানো কষ্টকর, পাছে অসাবধানে তার তরবারি কারো গায়ে লেগে গোলমালের সৃষ্টি হবে, এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি একটা নির্জ্জন রাস্তায় সরে পড়ল।

"মুক গম্ভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল, কেমন করে সোনার তাল পাওয়া যেতে পারে! তার ছড়িগাছি গুপ্তধন প্রকাশ করতে পারে কিন্তু যে জায়গায় সোনা বা রূপা পোঁতা আছে সে জায়গার সন্ধান কি করে হবে? সোনা পাওয়ার আগে তার প্রাণে বাঁচার উপায় দেখা দরকার। হঠাৎ তার মনে হল, তার চটি জুতার দৌলতে ডাক হরকরার কাজে সে খুব যোগ্যতা দেখাতে পারে। এই দেশের রাজা এরকম কাজের জন্ম নিশ্চয়ই মোটা মাইনে দেবেন ভেবে সে রাজবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। সদর দরজায় যে দারোয়ান বসে ছিল, সে মুকের আসার কারণ জিজ্ঞেস করল। সে একটি চাকরীর চেষ্টায় এসেছে শুনে দারোয়ান তাকে ক্রীতদাসদের ইন্‌স্পেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। মুক তার কাছে অনুরোধ জানিয়ে রাজদূত পদের জন্ম একটি প্রার্থনা করল। ইন্‌স্পেক্টর মুকের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলে উঠলেন—'তিন বছরের শিশুর মত হাত পা, তার আবার ইচ্ছা করে রাজার প্রধান ডাকহরকরা হতে? যাও পথ দেখ—এ রকম পাগলামি শোনবার আমার সময় নেই।' মুক তাঁকে আশ্বাস

দিয়ে বললে যে, সে দৃঢ়তার সঙ্গেই এ কথা বলছে— তামাসা করতে সে আসে নাই। সে যে কোনও লোকের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিতে প্রস্তুত আছে। ইনস্পেক্টর তামাসার ছলেই বললেন— 'আচ্ছা, আজ বিকালে রাজবাড়ীর মাঠে দৌড়ের বাজি হবে।' এই বলে মুকের ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে তিনি রাজার নিকট গিয়ে একটি বাঁটকুলের আবেদন ও বিকালের দৌড়ের বাজির কথা নিবেদন করল। রাজা খুব আমুদে লোক ছিলেন। ইনস্পেক্টর বাঁটকুল মুককে নিয়ে একটা তামাসা দেখাবেন, এটা রাজার কাছে আমোদের ব্যাপারই মনে হল। রাজা হুকুম দিলেন—দৌড়ের বাজি যেন দুর্গের পিছনের বড় মাঠে হয়, তাহলে রাজবাড়ির সকলেই বেশ আরাম করে দৌড় দেখতে পাবেন, সেই সঙ্গে মুকের যত্নের ত্রুটি না হয় সে সম্বন্ধেও কড়া হুকুম দিয়ে দিলেন। রাজা রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণকে ডেকে বলে দিলেন—আজ বিকালে একটা ভাল খেলা আছে। তারা আবার তাদের বন্ধু ও ভৃত্যদের কাছে এ-খবর দিল। বিকালে মাঠে এই মজার দৌড় দেখবার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সবাই উৎসুক ভাবে বাঁটকুলের দৌড়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল। রাজা তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলে বাঁটকুল মুক জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে তাঁকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালে। এই অতি ছোট্ট লোকটিকে দেখতে পেয়ে সমবেত জনতা সমস্বরে আনন্দধ্বনি ক'রে উঠল; কারণ, সে দেশের লোকে এত ছোট বামন আগে কখনো দেখে নাই। ফিনফিনে ক্ষুদে দেহের উপর পাহাড়ের মত একটা মাথা, প্রকাণ্ড বড় চাপকান, চওড়া ইজের, চওড়া কোমরবন্ধের সঙ্গে লাগানো প্রকাণ্ড এক তরবারি এবং ছোট্ট পায়ে মস্ত বড় চটিজুতা —সবগুলি মিলে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল যে কাহারও পক্ষেই হাসি চেপে রাখা সম্ভব ছিল না।

"কিন্তু এত হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও মুক তিলমাত্র দমে নাই। সে সদর্পে তার ছড়ি হাতে করে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতীক্ষা করছিল। মুকের অভিপ্রায় অনুসারে ইনস্পেক্টর রাজ্যের সেরা দৌড়বাজকে এনে হাজির করলেন। সেই ব্যক্তি মুকের পাশে এসে দাঁড়ালো এবং উভয়ে দৌড়ের আদেশের প্রতীক্ষায় রইলো। রাজকন্যা আমোর্জা তাঁর পর্দার ভিতর থেকে একটি লক্ষ্যের দিকে দুটি তীর ছুড়িবামাত্র দৌড় শুরু হল।

"প্রথমে মুকের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক দূর এগিয়ে গেল কিন্তু চটিটা ঠিকমত পরে নেবার পরে মুক মুহূর্তের মধ্যে তাকে পেছনে ফেলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেল। দর্শকগণ যারপরনাই বিস্মিত হয়ে গেল। তার পর রাজা হাততালি দিতেই জনতা আনন্দধ্বনি করে উঠলো। 'আজকের দৌড়ে বিজয়ী বাঁটকুল মুক দীর্ঘজীবী হোক—চিরজীবী হোক।'

"ইতিমধ্যে লোকে মুককে নিকটে আনলো। মুক রাজাকে প্রণাম করে বললে—'মহা প্রতাপশালী রাজন্, আমি আমার ক্ষমতার একটি সামান্য মাত্র পরিচয় দিয়েছি—আশা করি আমাকে আপনার ডাকহরকরার একটি পদ দেওয়ার আদেশ করবেন।' রাজা উত্তর দিলেন—'না, তুমি আমার শরীর-রক্ষকপদে সর্ব্বদা আমার পাশে পাশে থাকবে। বৎসরে তুমি এক শত স্বর্ণ-মুদ্রা বেতন পাবে এবং আমার প্রধান ভৃত্যের টেবিলে তুমি খাবে।'

"এত দিনে দিনের নাগাল পাওয়া গেল ভেবে সে মনে মনে খুব খুসী এবং উল্লসিত হল। তার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, রাজার সে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছে। রাজার গোপনীয় যে-সব বিষয়ে তাড়াতাড়ি কোথাও পাঠাতে হবে সে সব ব্যাপারের ভার তিনি মুকের উপর দিতেন, মুকও এই সব কাজ যারপরনাই সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন করায় রাজা দিন দিনই তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

"এদিকে মুকের উপর রাজার অন্যান্য ভৃত্যদের ঈর্ষা দিনের পর দিন বেড়ে চলল। তারা ভেবেই পায় না, এই ছোট্ট লোকটি কি করে দ্রুত সংবাদ পাঠানর কাজে রাজার অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। তারা মুকের ক্ষতি করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করল কিন্তু রাজা মুককে তার গুণের জন্য এত বিশ্বাস করতেন যে, শত্রুদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।"

[ক্রমশঃ

বিষ্ণুগুপ্ত

১০

শ্রীরবিনর্ত্তক

রাজাকে বররুচির জন্যে 'হায় হায়' করতে দেখে শকটাল্ ভাবলেন—'বররুচিকে প্রকাশ করবার এই ঠিক সময়।' তাই তিনি রাজার কাছে এসে যোড়হাত ক'রে জানালেন— 'মহারাজ! অপরাধ না নেন ত একটা কথা বলি!'

দুঃখে-শোকে-অনুতাপে ভেঙে-পড়া রাজা কোন রকমে মাথা তুললেন, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার, মন্ত্রিবর?'

শকটাল্—'মহারাজ! আপনার এত কাতর হবার কারণ নেই—মন্ত্রী বররুচি বেঁচে আছেন।'

শকটালের কথায় মহারাজ যেন হাতে পেলেন আকাশের চাঁদ। তাঁর সব দুঃখ-শোক-অবসাদ এক নিমেষে মিলিয়ে গেল। দারুণ উত্তেজনায় তিনি লাফিয়ে উঠে মন্ত্রী শকটাল্‌কে জড়িয়ে ধ'রে বললেন —'বল কি শকটাল্! বররুচি বেঁচে আছেন! এ কি সত্যি! না, তুমি আমায় স্তোক দিয়ে ভুলোতে চাও?'

শকটাল্ সবিনয়ে নিজেকে রাজার বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে মুখ নীচু ক'রে ধীরে ধীরে বললেন—'আপনার আদেশ সত্ত্বেও আমি তখন তাঁকে মারতে পারিনি—লুকিয়ে রেখেছিলুম নিজের বাড়ীতেই। আপনাকে মিছে ক'রে বলেছিলুম—তাঁকে মেরে ফেলেছি। আজ আপনার অনুমতি হ'লে তাঁকে আপনার সামনে আনতে পারি।'

রাজা আনন্দে দিশেহারা। মন্ত্রীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে ঝাঁকি মারতে মারতে বললেন—'দেরী কেন? এখনই এই দণ্ডেই নিয়ে এস তাঁকে—বল ত আমিই না হয় সঙ্গে যাই।'

শকটাল্—'না, মহারাজ! তার দরকার হবে না। আমি এখনই তাঁকে আনছি। কিন্তু আমি যে আপনার আগের আদেশ লঙ্ঘন করেছি, আবার আপনার সামনে মিছে কথা বলেছি—তার শাস্তি কি হ'বে প্রভু!'

যোগনন্দ গম্ভীর হ'য়ে বললেন—'বুঝেছি, শকটাল্! আমি তোমার উপর অযথা নিদারুণ অত্যাচার করেছি—সে কথা তুমি ভুলতে পারছ না—ভোলা সম্ভবও নয়। তাই পদে পদে তুমি অভিমান কর। এ অভিমান তোমার সাজে বটে! কিন্তু শাস্তি তুমি পাবে না—শাস্তি যদি কেউ পাবার থাকে ত সে হচ্ছে আমি। বররুচির মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমি মহাপাপ করতে বসেছিলুম। কিন্তু তুমি সে দণ্ড কৌশলে ফাঁকি দিয়ে আমায় ঐ মহাপাপ থেকে বাঁচিয়েছ। বন্ধু! তোমার উপর যে অত্যাচার করেছি, তুমি তার অতি মহৎ প্রতিশোধ নিয়েছ, মন্ত্রিবর! তুমি শাস্তি চাইছিলে না। এই তোমার শাস্তি।'—বলতে বলতে মহারাজ যোগনন্দ নিজের গলার রত্নহার খুলে শকটালের গলায় পরিয়ে দিলেন। তার পর বললেন—'এই বার—শীগ্গির বররুচিকে নিয়ে এস, বন্ধু।'

* * * *

বররুচি রাজসভায় এসে উপস্থিত হলে রাজা নিজে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁর সাম্নে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে তাঁর দুই হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছিল। বররুচিও তাঁর আগেকার বন্ধু ও সহপাঠী ইন্দ্রদত্তের—এখনকার মহারাজ যোগনন্দের এই আন্তরিক অনুতাপ দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—'উঠুন, মহারাজ! আমার মনে কোন দুঃখ নেই।'

তার পর মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন চুপি-চুপি—'সখা—বররুচি—মন্ত্রিবর! তুমি নতুন রাণীর তিলের কথা জানলে কি করে?'

বররুচিও উত্তর দিলেন তাঁর কাণে কাণে—'ভাই ইন্দ্রদত্ত! না-না—ভুল হয়েছে—মহারাজ যোগনন্দ! এই কথাটা ত আগে একবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেই সব গোলমাল মিটে যেত। তুমি যেমন যোগ জান—আমিও তেমনই দেবী সরস্বতীর কৃপায় জ্যোতিষ-সামুদ্রিক জানি। তারই সাহায্যে রাণীর গোপন অঙ্গের তিলটির কথা পর্য্যন্ত জেনেছিলুম।'

যোগনন্দ—'বুঝলুম। সত্যিই আমি রাজ্য পেয়ে বিগড়ে গেছি—নইলে তোমার মত বন্ধু মন্ত্রী বিজ্ঞ পণ্ডিতকে আমি এই ভাবে পীড়া দিতে গিয়েছিলুম। এখন বল দেখি, ছেলেটির কি হল?'

এতক্ষণে বররুচি সকলের সাম্নে বললেন—'রাজকুমার মিত্রদ্রোহী—কৃতঘ্ন। সেই পাপের ফলে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। দেবী সরস্বতীর কৃপায় কি ঘটনা ঘটেছিল—আমি সবই জানি।' এই বলে রাজপুত্র—ভাল্লুক আর সিংহের ব্যাপার যা ঘটেছিল—সব ঠিক ঠিক তিনি সকলের সাম্নে জানিয়ে দিলেন। রাজা, শকটাল্, সভার সব লোক ত শুনে অবাক্।

এর পর রাজা বল্লেন—'মন্ত্রিবর! 'সব ত শুনলুম! রোগের কারণ বোঝা গেল। এখন উপায়?'

বররুচি হেসে উত্তর দিলেন—'উপায় ভগবানের হাতে। রাজকুমারকে একবার নিয়ে আসুন—এখানে! দেখি, কি করতে পারি।'

তখনই রাজপুত্রকে সভায় আনা হ'ল। বররুচি মন্ত্রবলে রাজকুমারকে শাপমুক্ত নীরোগ ক'রে দিলেন। আরাম হ'য়ে রাজকুমার বনের ব্যাপার নিজেই বললেন সকলের সামনে! তখন সবাই বুঝলেন যে, বররুচি আগে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, রাজপুত্রের বর্ণনার সঙ্গে তার কিছু তফাৎ নেই।

যোগনন্দ বররুচিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মন্ত্রিবর! এত নিখুঁত ভাবে এ সব ব্যাপার আপনি জানতে পারলেন কি ক'রে?'

বররুচি হাসিমুখে উত্তর দিলেন—'দেবতার কৃপা আর শাস্ত্রের জ্ঞান থাকলে সবই জানা সম্ভব। এই ভাবেই ত আপনার রাণীর তিলের কথাও জেনেছিলুম।'

তখন সভার সকলে বুঝলেন বররুচি সত্যিই নির্দোষ। তাঁর এ অদ্ভুত দৈবশক্তি আর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে রাজ্যের সব লোক 'ধন্য ধন্য' করতে লাগল।

এর পর মহারাজ যোগনন্দ অনেক অনুরোধ করলেন বররুচিকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে থাকতে। কিন্তু বররুচির আর রাজকার্য্যে মন সরছিল না। তিনি ভাবলেন যে, আজ রাজা অনুতাপ করছেন বটে, কিন্তু আবার কোন কারণে অসন্তুষ্ট হ'লে তাঁর মাথা যে আবার হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠবে না—তার নিশ্চয়তা কি! তাই মনে মনে স'রে যাবার ইচ্ছাই তাঁর হ'ল খুব বেশী। তিনি শকটালকে প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে নিজে বিদায় নিলেন রাজসভা থেকে। যাবার সময় বলে গেলেন—'আমি বড়ই কষ্টক্লান্ত—কিছু দিন বিশ্রাম চাই। যদি বিশেষ দরকার হয়, আমায় জানালেই আমার যথাসাধ্য সাহায্য করবো। তবে মন্ত্রী শকটাল্ রইলেন—দুর্ভাবনার কিছু নেই।'

রাজসভা থেকে বাড়ী ফিরে যেতেই বাড়ীতে তাঁর কান্নায় কোলাহল পড়ে গেল। ব্যাপার কি! বাড়ীতে যে তাঁর কোন বিপদ ঘটে থাকতে পারে—এ চিন্তাও তাঁর মনে আসেনি একটি বারও—তাহলে তিনি তার প্রতিবিধান করতে পারতেন ঠিক সময়ে। যাই হোক্! তিনি ত বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেলেন। সকলে একটু ঠাণ্ডা হলে তার শ্বশুর আচার্য্য উপবর্ষ বললেন—'বৎস কাত্যায়ন! মহারাজ যোগনন্দের আদেশে যে দিন তোমার বধদণ্ড হয়, সেই দিনই তোমার সাধ্বী স্ত্রী—আমার দুলালী মেয়ে উপকোশা চিতায় পুড়ে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছেন। আর তোমার পূজনীয়া মাতৃদেবী ছেলে ও বৌএর শোক সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছেন।'

বররুচি এ দারুণ শোক সংবাদ শুনতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না—তাই প্রথমটা তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু জ্ঞানবান্ তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর শ্বশুর উপবর্ষ ও উপবর্ষের দাদা তাঁর গুরুদেব বর্ষ দুজনে তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন বটে, কিন্তু বররুচির মনে তখন বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। ব্যাড়ির মত তিনিও সংসার ছেড়ে বনে চলে গেলেন তপস্যায় শান্তি পাবার আশায়।

[ক্রমশঃ ।
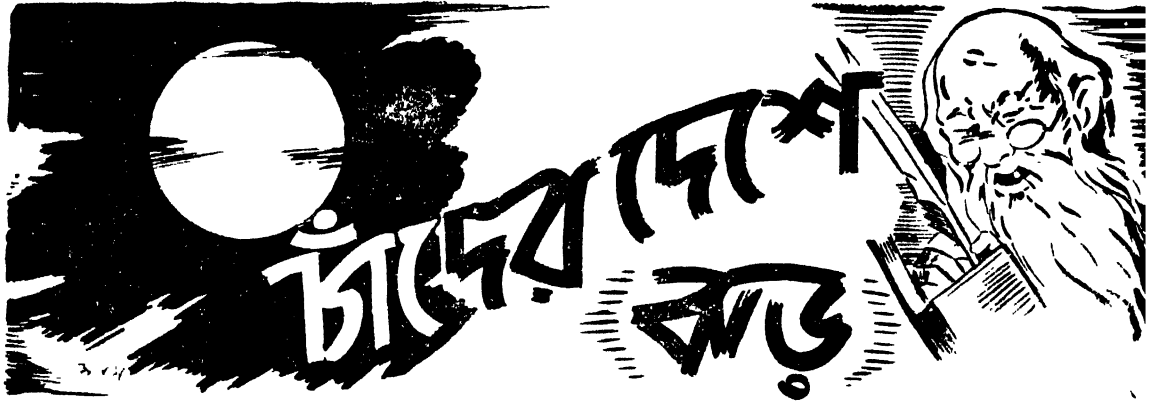
শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

অনেক সাগর—অনেক পাহাড় ভেঙে,
তেপান্তরের সীমানা যেখানে শেষ ;
তার পরে যাও অনেক শূন্যপথে :
তারো পরে পাবে চন্দ্রমামার দেশ।
সে-দেশে সকলি চাঁদের মতন সাদা—
সবি ধব্‌ধবে সাদা
দুধ দিয়ে ধোয়া সেখানে সবুজ মাঠ।
পাহাড়ের গায়ে বরফের ঢাকা দেওয়া।
সেই দেশ জুড়ে চাঁদের বাজার—
চাঁদমুখ ছেলে-মেয়ে।
শুধু আনন্দ, হাসি, কলরব,
অবিরাম নাচ-গান।
যত দূরে যাবে—যেখানে সেখানে—
শুধু হাসি-হুল্লোড়।
খাও দাও আর বেড়াও ঘুমাও,
নাই তো গণ্ডগোল।
তার পরে ভাই শোনো মন দিয়ে
বিস্ময়কর কথা :
চন্দ্রলোকের শোনো নব ইতিকথা।
খোকা ও খুকুরা যতো
চলো এক বার স্বপ্ন-দাদুর বাড়ী।
রামধনু-আঁকা সিংহদুয়ার খোলো
নড়বড়ে তার ফোক্‌লা দাঁতের ফাঁকে
চন্দ্রলোকের বিস্ময়-কথা শোনো :

* * *

একদা দাদুর কী যে মনে হলো,
সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিলো।
লোটা কম্বল
করে সম্বল
ছুট দিলো দূর পথে।
স্বপ্নের গাঙে পাল তুলে দিয়ে,
মনের নৌকা সোজা পাড়ি দিয়ে
একদা উঠলো এসে
চন্দ্রমামার দেশে।

চন্দ্রমামা তো অতি খুশী মনে
ভাগনেরে নিলো ডেকে।
আদরে যত্নে রাখে।
দিনে দিনে দিন চলে।
বসে বসে আর কতো ভালো লাগে,
হোক না মামার বাড়ী।
একদা দাদুর মনে হলো তাই,
যা হোক একটা কিছু করা চাই,
খেয়ে দেয়ে আর শুয়ে বসে ভাই
কতো দিন দেব পাড়ি ?

* * *

শেষে ঠিক হলো কথা,
চন্দ্রলোকের যতো ছেলে মেয়ে
হৈ-হুল্লোড় সব ছেড়ে দিয়ে
মন দিয়ে সবে পড়বে জ্ঞানের পড়া।
পাঠশালা হলো আটচালা ঘরে,
চারদিক্ হতে পড়ুয়ারা আসে,—
স্বপ্নদাদুর জুটলো কপালে পণ্ডিতগিরি পালা।
লেখা আর পড়া বেশ জমে এলো।
মাতব্বরেরা ভারী খুসি হলো।

* * *

স্বপ্নদাদুর ভারী নাম ডাক,
হেন পণ্ডিত লাখে জোটে এক,
মানুষ তো নয়, যেন সে একটা মহাবিদ্যার পিপে
পড়াতে পড়াতে এক দিন দাদু
পড়ায় নতুন কথা ;
সৌর জগতে কারা করে বাস,
তারি নাম-ধাম ঠিকানা বয়েস,—
একে একে হয় পড়া,
সূর্য্য আছেন অগ্নির ধ্যানে ;
তারে ঘিরে নাচে ধরণীর মেয়ে ;
তারি চারিধারে ঘোরে পাহারায়
চন্দ্রমোহন রাজা।

যতো বড়ো রাজা মনে করো তারে,
আসলে সে নয় তত বড়ো মোটে,
সবি তার ধার-করা।
এই যে এমন ধব্‌ধবে মুখ,
জমকালো সব পোষাকের ধূম,—
নিজের তাহার কিছুই তো নয় ভাই।
সূর্য্যের কাছে ধার করে তবে
বাবুয়ানা রোশ্‌নাই!

* * *

—বলেন কি স্যার ?— ছেলেরা চেঁচায় জোরে
—আমাদের রাজা সূর্য্যের কাছে ধারে ?
স্বপ্নদাদুর মুখে মৃদু হাসি,
ঠোঁটটি বাঁকিয়ে বলে :
এ শর্ম্মা শুধু সত্যকথাই জানে।
এ সত্য কথা কার জানা নাই
চাঁদের নিজের কোনো আলো নাই !
সূর্য্যের আলো ধার করে নিয়ে
যতো রোশ্‌নাই জ্বালা ?
যতো স্তুতিপাঠ—চিত্র কবিতা
সকলি মিথ্যা খেলা ?

* * *

যতো শোনে ততো রেগেমেগে ওঠে,
বৃথা বেদনায় করাঘাত হানে,
ক্ষোভে ও দুঃখে লাজে অপমানে
হিতাহিত জ্ঞান ভোলে।
চন্দ্রলোকের ছেলে ও মেয়েরা
কিশোর-কিশোরী যতেক পড়ুয়া
বই ছুঁড়ে ফেলে বলে চীৎকারে ;
এ কি দুঃসহ জ্বালা ?
পরের আলোয় দেশ আলো করে,
সেই সুখে আছি গর্ব্বেতে মেতে ?
নিজ-ঘরে আছি পরবাসী হয়ে—
এ ব্যথা অগ্নিজ্বালা।
এই বলে সব কিশোর-কিশোরী
ছেলে ও মেয়ের দল,

চীৎকার করে বাহিরায় পথে,
যারে কাছে পায়
তারে পাশে ডাকে
ডাকে আর বলে ভাই,
ধার-করা সুখে আর কাম নাই,
এ আলো তাড়াতে চাই ;
কেউ হাসে।
কেউ বিস্ময় মানে।
কেউ ভাবে তা তো ঠিক।
ঋণ করে সুখ ? ঘৃতং পিবেৎ ?
নৈব—কখনো নয়।
যতো ভাবে ততো ধিক্কার লাগে,
অতীতের সুখ তৃণসম দহে,
ঋণ পরিশোধে ব্যগ্র বাসনা জাগে।
এই ভাবে ক্রমে চন্দ্রলোকের
পথে ও পথান্তরে,
ভীড় জমে যায় মুক্তিকামীর,
ঋণ পরিশোধে আগুয়ান বীর,
দলে দলে সবে চলে—
ধার-করা সাজ এবার খসাতে হবে।

* * *

—চাঁদের দেশেতে জাগলো ঝঞ্ঝা,
থেমে গেলো হাসি-গান।
পরাধীনতার দারুণ লজ্জা
অঙ্গে এঁটেছে বেদনা-সজ্জা।
সেই যাতনায় জ্বলে দেহ-মন,
চাঁদের ছেলেরা আজ দৃঢ়পণ,
লজ্জা ঘোচাতে হবে।
সজ্জা খসাতে হবে।
পরাধীনতার কলঙ্ক-রেখা
রক্তে মোছাতে হবে।
এই বাণী ওঠে আকাশে-বাতাসে,
চন্দ্রলোকের মাঠে ও বাটেতে।
শান্তির দেশে ওঠে মহাঝড়।
ভেঙে চুরে যায় কতো বাড়ী-ঘর।
দুধে-ধোয়া যতো সবুজ মাঠেরা
লালে লাল হয়—রক্ত-মাখুয়া।
বরফেরা গলে পাহাড়ের গায়
বহে রক্তের ধার।
তাই দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠিলো
চন্দ্রমামারা সবে।

* * *

আদ্যিকালের যতেক বুড়োরা
—থেকো ও নুড়ো, লাঠি ভর দিয়ে—
তারাই চেঁচিয়ে বলে :
করিস্ কি তোরা লক্ষ্মীছাড়ারা
কারেরে তাড়াতে চাস্ ?
ফিরে নেয় যদি যতো আছে আলো,
রাগ করে যদি দেবতা সূর্য্য,
থাকবি যে তোরা চির আঁধারে,—
থামা এ সমর তূর্য্য।
কিশোর কিশোরী গলা ছেড়ে কয় :
তাই যদি হয়, আঁধারে থাকব,
ধার-করা আলো তবু নাহি চাব।
অক্ষমতার দুঃখ-সাগরে
ডুবে রব চির আঁধারের তলে।
সেইখানে রব ধেয়ানে মগ্ন
নতুন আলোর তরে।
আঁধারের শর প্রতিক্ষণে ক্ষণ
হৃদয়ে জ্বালাবে ব্যথার দহন,
বেদনার শব-সাধনার শেষে
সৃজিব নতুন সূর্য্য।
বুকের আগুনে আবাহন তার,
হৃদয়-রক্তে অঞ্জলিভার,
তারি লাগি আজ রণ-আয়োজন,—
বাজুক সমর-তূর্য্য।

* * *

ঝড়ের বাতাসে দেখি আচমকা
খুলে গেছে মোর শিওরে জানলা।
ভিজে গেছে চুল,
মুখে চোখে জল,
নয়নে ক্লান্তি,
বক্ষে পিপাসা,—
ভাবি স্বপ্নের কথা।
তাকাই বাইরে, ঝড়ের আকাশ।
আঁধারে ঢেকেছে চাঁদের আভাস।
মাঝে মাঝে দেখি বিদ্যুৎ জ্বলে,
ঘন আঁধারের যবনিকা-তলে
চলেছে কি তবে শব-সাধনার পালা
নতুন অগ্নি-জ্বালা ?

যাদুকর পি, সি, সরকার

মায়াবী "ম্যাজিক ওয়াণ্ড"

প্রত্যেক যাদুকরেরই একটি যাদুযষ্টি বা 'ম্যাজিক ওয়াণ্ড' থাকে, মূলতঃ উহাতে কোন কিছু না থাকিলেও কার্য্যতঃ উহা অনেক উপকারে আসে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, যত কিছু যাদু ও ম্যাজিক দেখান হয় সমস্তই ঐ যাদুর কাঠিটির মাহাত্ম্যে। আমাদের দেশে সাধারণ লোকদের এখনও বিশ্বাস যে ম্যাজিক খেলা হয় যাদুমন্ত্র ও দ্রব্যগুণে এবং বশীকরণ নজরবন্দী প্রভৃতি গুপ্ত বিদ্যার সাহায্যে। ঐ সমস্ত ক্রিয়ায় 'যাদুর কাঠি' অনেক সাহায্য করে। কোন কোন যাদুকর মড়ার মাথা এবং হাড় এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমার মতে যাদুযষ্টিতে কোন গুণই নাই—উহা একটি সাধারণ যষ্টি মাত্র। তবে জিনিষটা খুবই দামী হওয়া উচিত। এর কারণ এই যে, সর্ব্বসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে হইবে যে সমস্ত যাদুতেই ঐ যাদুকাঠির বিশেষ প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে যাদুকাঠি অনেক উপকারেই আসে। হাতে কোন জিনিষ লুকাইয়া রাখিয়া যাদুর কাঠিটিসহ হাত মুঠা করিলে লোকে মনে করে শুধু কাঠিটাই ধরা আছে—নতুবা হাত একেবারে খালি। টেবিলের উপরে কোন জিনিষ লুকাইয়া আনিতে হইলে বা লুকাইয়া ফেলিতে হইলে যাদুযষ্টি অনেক সাহায্য করিবে। টেবিলের উপর হইতে যাদুর কাঠি আনিতে যাইয়া সেই কার্য্য সমাধা করা চলে। আজকাল যাদুর কাঠিতেও কৌশল করিয়া খেলা দেখান হয়—যেমন টাকা-ধরা কাঠি, রুমাল অদৃশ্য করার কাঠি ইত্যাদি। যাদুযষ্টির এইরূপ খেলা আবিষ্কৃত হইয়া উহার মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়াছে।
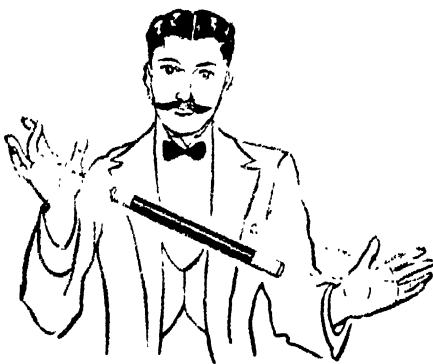
জনৈক আমেরিকান যাদুকর 'মায়াবী ম্যাজিক ওয়াণ্ড' খেলাটির আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাকে শূন্যে ভাসমান 'যাদুযষ্টির খেলা' বলা চলে। এই খেলা খুব পাতলা এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা একটি পিতলের বা সেলুলয়েডের নল দুই পার্শ্ব বন্ধ করিয়া করিতে হয়। দুই পার্শ্ব দুইটি বল দ্বারা বন্ধ করিতে হয় এবং ঐ বলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি সূক্ষ্ম সূতা বা চুল প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। সূতাটি দুই প্রান্তে দুইটি বাঁকা আলপিন বাঁধা থাকিবে এবং সেই আলপিন দুইটি কোটের দুই হাতের পাশে সূতাটিকে আটকাইয়া রাখিবে। বাকী অংশ অতিশয় সহজ। যাদুকর দুই হাতের আঙ্গুলের মধ্য দিয়া সূতাটি চালাইয়া দিবেন এবং নিজে হাত আস্তে আস্তে ফাঁক করিতে থাকিবেন, তখন যাদুর কাঠিটি আস্তে আস্তে শূন্যে ভাসিতে থাকিবে। যাদুকর তাঁহার হাত দুইটি এদিক ওদিক করিলে 'যাদুর কাঠি' নানারূপ ভাবে অবস্থান করিবে এবং এতদ্দর্শনে সকলেই অবাক হইবেন। আমি এই খেলাটি জীবনে বহু বার বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি। খেলা শেষ করিতে হইলে হাত দুইটি একটু জোরে ফাঁক করিলেই সূতা ছিঁড়িয়া যাইবে এবং আপনা আপনি খেলা শেষ হইবে। তখন যাদুর কাঠিটি লোকের হাতে দিলেও তাঁহারা উহাতে কোন প্রকার কৌশল খুঁজিয়া পাইবেন না। এমন কি যাদুযষ্টির দুই মুখে যে দুইটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে উহা তাঁহাদের লক্ষ্যে পড়ে না।

কাগজ ছিঁড়িয়া জোড়া দেওয়া

খুব পাতলা (Tissue) কাগজের লম্বা একটি ফালি লইয়া উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া পুনরায় জোড়া দেওয়ার খেলাটি জগৎ-প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বড় যাদুকরই এই খেলাটি দেখাইয়া থাকেন এবং এক এক জনে এক এক ভাবে ইহা করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রথম বিখ্যাত চাইনিজ যাদুকর চিং লিং ফুং (আসল চাইনিজ) কৌশল প্রকাশ করিয়া যাইতেছে। আমরা যদি তৈয়ার করিবার নিমিত্ত যেরূপ পাতলা, রঙ্গিন কাগজ ব্যবহার করি ঐ কাগজে এই খেলা খুবই ভাল হয়। প্রথমে একই প্রকার (রং ও আকৃতির) দুইটি লম্বা সরু ফালি কাটিয়া লইতে হয়। কারণ সকলেই জানেন যে কাগজ ছিঁড়িয়া কখনও জোড়া লাগান যায় না।
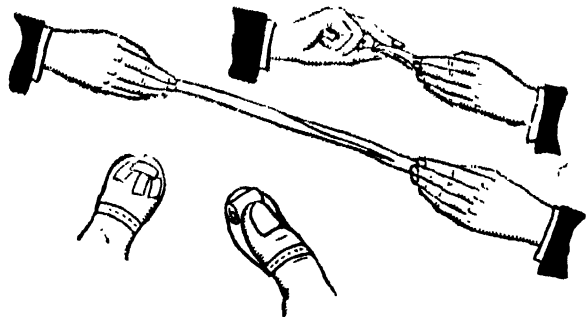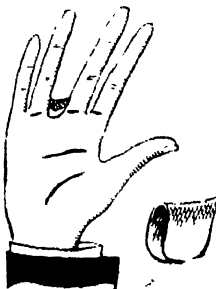
পক্ষান্তরে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলি কৌশলে সরাইয়া ফেলিয়া উহার পরিবর্ত্তে অপর অনুরূপ একটি কাগজ বাহির করিতে হয়। 'কৌশলে ছেঁড়া কাগজ সরাইয়া ফেলা' কথাটি লেখা এবং বলা যত সহজ কার্য্যকালে কিন্তু উহা ভয়ানক কঠিন। এইটুকুর জন্যই পৃথিবীর সমস্ত যাদুকর বহু বৎসর মাথা ঘামাইয়াছেন এবং এক একজন এক এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ...

ছোট ছোট যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন—এই যন্ত্রগুলির ইংরেজী নাম (gimmick) 'গিমিক' বা ((fake) 'ফেক'। আমরা সংক্ষেপে ইহাকে 'ফেক' বলিয়াই অভিহিত করিব। এই 'ফেক' আবিষ্কার করাই যাদুকরদিগের পরম লক্ষ্যের চরম 'সার্থকতা। চিং লিং ফু' সাহেব ছোট একটি টিনের পাত ভাঁজ করিয়া তাহার নীচে ছেঁড়া কাগজ লুকাইয়া ফেলিতেন। তিনি মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দুইটির মধ্যবর্ত্তী স্থলে ঐ 'ফেক' আটকাইয়া রাখিতেন। চিত্রে ঐ 'ফেক' ও কি ভাবে উহা লাগাইতে হয় তাহা দেখান হইয়াছে। ঐটি খুবই সহজ ও সুন্দর উপায়। বলা বাহুল্য, টিনের পাতটিকে শরীরের রংয়ে রঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। কাগজ ছেঁড়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ফেক'এর নির্দ্দেশ দিয়াছেন ইংলণ্ডের যাদুকর-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্ব্বতন সভাপতি যাদুকর 'উইল গোল্ডষ্টন' সাহেব। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর একটি নূতন বৃদ্ধাঙ্গুলি তৈয়ার করিয়া লাগাইয়া লইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহার ইংরাজী নাম নকল বৃদ্ধাঙ্গুলি (false thumb); উহা দেখিতে অনেকটা কৈতুলের খোসার ন্যায় এবং সাধারণ এলুমিনিয়ম বা তামা প্রভৃতি হালকা ধাতু দ্বারা তৈয়ারী এবং শরীরের রংয়ে রঞ্জিত করা হয়। প্রথমে ঐ নকল বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে একটি আস্ত কাগজ গুটাইয়া রাখিয়া অপর হাতে অপরটি লইয়া ছিঁড়িতে হয়। পরে ছেঁড়া কাগজগুলি ঐ ফেকের মধ্যে লুকাইয়া অপরটি বাহির করিয়া লইলেই হইল। নকল বৃদ্ধাঙ্গুলি যাদুকরের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর লাগান থাকে, বিশেষ করিয়া একই রং থাকায় উহা দর্শকদের লক্ষ্যেই পড়ে না। আমি প্রায়ই অবাক হই যে, যখন 'ফেক'-পরিহিত বৃদ্ধাঙ্গুলি আমার আসল অর্থাৎ প্রকৃত বৃদ্ধাঙ্গুলি অপেক্ষা প্রায় আধ ইঞ্চি বেশী লম্বা, দর্শকগণ তাহাও লক্ষ্য করেন না। প্রকৃত কথা এই যে, দর্শকগণ ঐরূপ একটা উপায়ের কথা চিন্তাই করিতে পারেন না এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগেই যাদুকর তাহার খেলা দেখাইয়া থাকেন। ম্যাজিকে ইহাই মজা।

ভৌতিক দিয়াশলাইর খেলা

এইবারে ভৌতিক দিয়াশলাইর খেলাটির গোপন তথ্য প্রকাশ করিব। এই খেলাটিও অতিশয় সহজ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা 'সেন্ট্রাল এভিনিউ' নামক প্রসিদ্ধ রাজপথে এক জন বেদিয়াকে আমি এই খেলাটি দেখাইতে দেখি। সে তাহার

(১)
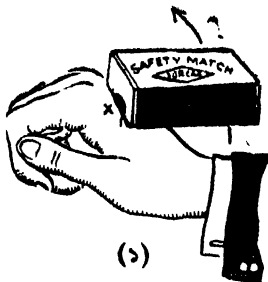
হাতের তালুর পশ্চাতে একটি দিয়াশলাইর বাক্স রাখিয়া উহার উপর দিয়া আস্তে আস্তে হাত চালাইতে লাগিল এবং সেই দিয়াশলাইর বাক্সটি আস্তে আস্তে দাঁড়াইতে লাগিল। এই ভাবে দিয়াশলাই-বাক্সটি তাহার হাতের পশ্চাতে একবার দাঁড়াইতে লাগিল এবং একবার পড়িয়া যাইতে লাগিল। এই খেলা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়াছিলেন। এই খেলাটির মূল কৌশল খুবই সাধারণ ছিল। যাদুকর দিয়াশলাইর বাক্সটি হাতের পিঠে বসাইবার সময় উহার ভিতরকার খোলটি খুলিয়া নীচের দিকে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধ করেন, যাহাতে তাহার হাতের পিঠের চামড়ায় কিছু অংশ ঐ বাক্সের মধ্যে আটকাইয়া যায়। চিত্রে x চিহ্ন দিয়া ঐ স্থান দেখান হইয়াছে। এক্ষণে হাত একটু ঢিলা দিয়া রাখিলে দিয়াশলাইর বাক্স পড়িয়া থাকিবে কিন্তু হাত মুঠা করিবার ন্যায় একটু শক্ত করিলেই ভিতরের চামড়ায় টান পড়িবে এবং আপনা আপনি ঐ দিয়াশলাইর বাক্স সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিবে। কি ভাবে দিয়াশলাইর বাক্স দাঁড়াইয়া উঠে চিত্রে তাহা তীর চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে। হাতের চামড়া সংকোচন ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাক্স উঠা-নামা করিতে থাকিবে। দর্শকগণ উহা বুঝিতে পারেন না বলিয়া অতিশয় সহজেই অবাক্ হন। ভারতীয় পথের বেদিয়ারা এই সমস্ত ব্যাপারে এমনই চতুর ও অভিজ্ঞ যে তাহাদের কৌশল খুব সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ছাড়া ধরা সম্ভবপর হয় না। বিলাতের যাদুকর-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা উইল গোল্ডষ্টন সাহেব এই খেলারও একটা সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইংরেজগণ সমস্ত খেলাই যান্ত্রিক কৌশল বা 'ফেক' সাহায্যে করিবার পক্ষপাতী এবং সেই হিসাবে এই খেলাটি উপযোগীই হইয়াছে। তিনি হাতের পিছনে দিয়াশলাইর বাক্স না রাখিয়া তালুর উপরে বসাইয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং সেখানেই উহা উঠা-নামা করিতে থাকিবে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইবেন। বলা বাহুল্য, এই খেলাতে যাদুকরদের প্রিয়বন্ধু সেই সরু কাল সূতার সাহায্য লইতে হয়। চিত্রে দেখান হইয়াছে কি ভাবে সূতার একটি (loop) 'লুপ' দিয়াশলাইর বাক্সের ভিতর দিয়া গলিয়া আসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বেষ্টন করিয়া আছে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি শক্ত করা ও নরম করার উপরই দিয়াশলাইর বাক্স উঠা-নামা নির্ভর করে। এই খেলা লিখিয়া বুঝান কষ্টকর—চিত্রে বিশদ ভাবে দেখান হইয়াছে। বাড়ীতে একটি দিয়াশলাইর

(২)

(৩)

বাক্স লইয়া উহার ভিতর দিয়া সূতা প্রবিষ্ট করিয়া নিজে নিজে করিতে চেষ্টা করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে কেহ কৃতকার্য্য হইবেন। খেলাগুলির কয়েকটিই খুবই সহজ কিন্তু ঠিকমত করিতে পারিলে ছোট খেলা দ্বারাও বড়দিগকে কব্জা যায়।

কামধেনু

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

ধরমপুর গাঁয়ে এক অভিনব ব্যাপার ঘটিয়াছে। সচরাচর এরূপ ব্যাপার ঘটে না। পচাই হাড়ির গাভীটি সন্তানবতী না হইয়াও দুগ্ধবতী হইয়াছে। ঘটনাটা এ অঞ্চলে বড় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দলে দলে লোক গাভীটিকে দেখিতে আসিতেছে। পচাইয়ের উঠানের এক পাশে একটি পেয়ারা গাছ; গাভীটি সেই পেয়ারা গাছে বাঁধা; সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট দেহ; গায়ে যেন কে তেল ঢালিয়া দিয়াছে; এমনই তাহার দেহের কান্তি। হেমবর্ণ তাহার গায়ের রং। পচাইয়ের স্ত্রী মাধু ওরফে মাধবী তাহার সার্থক নাম রাখিয়াছে হেমা।

হেমা নামটি হেমবর্ণ হইতে ব্যুৎপন্ন হয় নাই; এই হেমা নামেরও একটা ইতিহাস আছে; ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে তাহার কোন সূত্র বাহির করা যায় না। মাধুর কোন ছেলেপিলে নাই; কয়েক বছর আগে এই গোবৎসটি প্রসব করিয়াই তাহার মা মারা যায়। মাধুই তাহাকে এত বড়টি করিয়াছে। গোবৎসকে কেন্দ্র করিয়া মাধুর মাতৃত্ব চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। মাধু যে কি কষ্টে আর কি যত্নে হেমাকে বাঁচাইয়াছে, তা মাধুই জানে। কচি বাছুরটিকে জড়াইয়া ধরিয়া সে ওই দাওয়ায় বসিয়া কত রাত্রি কাটাইয়াছে। কচি ঘাস বাছুরটির মুখে তুলিয়া দিয়াছে, কত কষ্টে ভাতের ফেন খাওয়াইয়াছে; তবেত আজ হেমা এত বড় হইয়াছে। মাতৃহারা গোবৎসটি যখন হাম্বা-হাম্বা করিয়া ডাকিত, মাধু তাহারই অনুকরণে প্রায় গো-সুলভ কণ্ঠে উত্তর করিত—'হাম্-মা, হাম্-মা, হাম্-মা—হেমা।' ক্রমে বাছুরটির নামই হইল 'হেমা।' মাধু ডাকে 'হেমা।' হেমা তাহার সে কণ্ঠস্বর শুনিলেই ছুটিয়া আসে—'হাম্বা—হাম্বা।'

মাধু হেমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিত; আর হেমা তাহার হাত চাটিয়া আদর জানাইত। পচাই ও মাধুর কত আশা তাহাদের হেমা সন্তানবতী হইবে। কিন্তু তাহা হইল না; অকস্মাৎ এক দিন আবিষ্কৃত হইল, হেমা দুগ্ধবতী হইয়াছে। ক্রমে কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হইল। তাই আজ দলে দলে লোক কৌতূহল নিবারণ করিতে আসিতেছে। পেয়ারা গাছে হেমা বাঁধা রহিয়াছে; তাহার কপালে কে সিঁদুর দিয়া সাজাইয়া দিয়াছে; শিং দুইটিও সিঁদুরে রাঙান। পায়ের কাছে স্তূপাকারে ফুল বেলপাতা পড়িয়া আছে। দর্শকদের কেহ কেহ তাহার পায়ে ফুল ও বেলপাতার অঞ্জলি দিতেছে। নিঃসন্তান দুগ্ধবতী গাভী—হিন্দুশাস্ত্রে কামধেনু-সুরভি বলিয়া আখ্যাত; তিনি স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মী; কাজেই এই ফুল-বেলপাতা আর সিঁদুর।

গোরুর গোবর ও মূত্র পবিত্র জিনিস, তাহাতে আবার কামধেনুর গোবর। এক ফোঁটা গোবর বা মূত্র পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই; একটুখানি গোবরের জন্যও কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। কয় দিন হল, গাঁয়ের পঞ্জাবী গোবিন্দ চক্রবর্তী আসিয়া কামধেনু স্বহস্তে দোহন করে। কামধেনু না কি অব্রাহ্মণে দোহন করিতে নাই। দুধ লাগে নারায়ণের ভোগে।

জমিদার রামলোচন বাবু কথাটা শুনিলেন: কুলগুরু তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিলেন, বুঝেছ লোচন, কামধেনু সাক্ষাৎ ভগবতী। এই অজাত হাড়ির বাড়ীতে তাহাকে ত ফেলিয়া রাখা যায় না। শাস্ত্রে বলে,—

'গোমাতা জগতি লক্ষ্মী: কামধেনু ভগবতী।
পূজয়েদ্ যো প্রযত্নতঃ নরো নিত্যং শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ।।"

অর্থাৎ কি না তাহার পূজা-অর্চনার বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রামলোচন গম্ভীর প্রকৃতির লোক! তিনি বলিলেন, কি করিতে হইবে আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।

তর্কচূড়ামণি বলিলেন, বেটা হাড়ির বাড়ী হইতে আগে মাকে আমার উদ্ধার কর। তার পর পূজা-অর্চনা ও ভোগের ব্যবস্থা হইবে। অস্পৃশ্য হাড়ি, তার বাড়ীতে থাকবেন তিনি! এই পাপে গাঁ শুদ্ধ লোকের নিরয়গমন!

জমিদার শিহরিয়া উঠিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি। অন্ততঃ আমরা তা দেখতে পাই। তিনি তখনই পাইক উপেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপেন আসিলে জমিদার হুকুম করিলেন, যেন অবিলম্বে গাভী শুদ্ধ পচাইকে লইয়া আসা হয়। আর তর্কচূড়ামণির ব্যবস্থানুযায়ী কামধেনুর পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজে মিটিল না। পচাই গাভীটাকে ছাড়িয়া দিতে নিমরাজি হইলেও মাধু কিছুতেই হেমাকে ছাড়িয়া দিল না। অগত্যা পাইক পচাইকে জমিদারের সম্মুখে হাজির করিল। জমিদার তাহাকে মূল্য দিতে চাহিলেন। চূড়ামণি বলিলেন, দেখ বেটা, এ তোর মহা ভাগ্যি! মা আমার তোর গৃহে আবির্ভূতা হয়েছেন। তাই বলে কি তুই তাঁকে রেখে তাঁর অমর্য্যাদা করবি? তোর পাপে তুই কি গাঁ শুদ্ধ লোককে নিরয়গামী করবি?

পচাই বলিল, কি করি কর্ত্তা, মোদের কি আর অসাধ আছে? তবে কি না বউ একে এত বড়টি করেছে। তাই বড় টান

চূড়ামণি বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝি সব! এসব টাকারই টান,—ঘোর কলি কি-না। সেই বশিষ্ঠ মুনির গল্প জানিস্ ত? সেই বশিষ্ঠের কামধেনুকে লইয়া বিশ্বামিত্রের কি লাঞ্ছনা!

পচাই অবশ্য বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনী জানে না; তাই কোন উত্তর করিল না। জমিদার রামলোচন সম্ভবতঃ কামধেনু কাড়িয়া লইতে গিয়া বিশ্বামিত্রের যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া পচাইকে বলিলেন, তা বাপু, তোকে গোটা কুড়ি টাকা দিচ্ছি। তুই গরিব মানুষ। এ গাইয়ের বাছুর হবে না, একে পুষে তোর কি লাভ বল! তুই বরং ভাল দেখে একটা গাই-বাছুর কিনে নে।

পচাই কত কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তর্কচূড়ামণির উপদেশ ও শাস্ত্রব্যাখ্যার আলোড়নে সে নিরুত্তরই রহিল। জমিদার বলিলেন, আজই গাইটা দিয়ে যাস্।

পচাই ঘরে ফিরিয়া মাধুকে অনেক বুঝাইল। কিন্তু মাধু কিছুতেই রাজি হইল না। হেমাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিবে না। পচাই বলে, শোন্ মাধু, হেমাকে রাখায় বিপদ্ আছে। আমরা ছোট লোক। ঠাকুর-দেবতাকে আমাদের ছুঁতে নাই।

মাধু বলিল,—রেখে দাও তোমার ঠাকুর-দেবতা। আমরা ত তাকে ডেকে আনিনি! আমাদের ছুঁলে যদি তাঁর জাত যায়, তবে আমাদের ঠাঁই তিনি আসবেন কেন? দেবতারও জাত আছে না-কি?

পচাই কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না। দেবতারও জাত আছে, না-কি? মন্দিরে মন্দিরে এত ছোঁয়াচ বাঁচাবার ঘটা কেন? জমিদার

বাড়ীর দুর্গোৎসবে দূর হইতে প্রতিমা দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। বিসর্জ্জনের দিন প্রতিমা সে নিজে ছুঁইতে পায়। এই হাড়ি আর বাউড়ীরাই কাঁধে করিয়া প্রতিমা লইয়া যায়। তখন ত দেবতার পবিত্রতা নষ্ট হয় না। তাই বিসর্জ্জনের দিনটা তাহার সব চেয়ে ভাল লাগে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর সে বলে, দেবতার আবার জাত কি?

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কামধেনু দোহনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কথাটা শুনিয়া বলিলেন, আরে মাধু, কথাটা বুঝিস্ না। ছোট লোকের ছেলে কি আর জজ-ম্যাজিষ্টর হয় না? আজ-কাল ত লেখাপড়া শিখে আকছারই হচ্ছে। তোর হেমা সে রকম একটা কিছু হয়েছে, মনে কর। তাকে ত জজ-ম্যাজিষ্টরের মত রাখতে হবে।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কথাটা মাধুর মনে বেশ লাগিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অগত্যা রাজি হইল।

* * *

জমিদার-বাড়ীতে মহা ধুমধাম। ঠাকুরঘরের পাশে যে এক-চালাটা আছে, তার মেজেটা নূতন কাঠের পাটাতনে মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরে বিচিত্র চাঁদোয়া টাঙ্গান হইয়াছে। ভিতরে কামধেনু, তাহার চারি দিকে বাঁশ বাঁধিয়া গড়ের মত করা হইয়াছে; যেন বাহির হইতে না পারে। আজ কামধেনুর প্রতিষ্ঠা হইবে! তর্কচূড়ামণি নিজে পূজার ভার লইয়াছেন। ষোড়শ-উপচারে বিবিধ আয়োজন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নব দূর্বাদলের একটি বৃহৎ নৈবেদ্যও আছে। শঙ্খ,ঘণ্টা ও কাঁসরের আওয়াজে কামধেনু অস্থির; ধূপ-ধুনার অনভ্যস্ত ধোঁয়ায় সে ত্রাহি-ত্রাহি হাম্বা রব তুলিয়াছে। তর্কচূড়ামণি সভয়ে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। দূরে দাঁড়াইয়া মাধু তা দেখে; তাহার মন এক অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া যায়; তাহার হেমা দেবতা!

ব্যাপার কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল; ষোড়শ-উপচারের পূজা পাইয়াও গোমাতা আজ দুই দিন উপবাসী। হেমা একটি ঘাসও মুখে দেয় নাই। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি চিক্কণ তণ্ডুলের সুস্বাদু অন্ন প্রস্তুত করিয়া কামধেনুর সম্মুখে ধরিয়াছেন, তবুও দেবীর মুখে তাহা রুচে নাই। এদিকে মাধুও দুই দিন জল পর্য্যন্তও স্পর্শ করে নাই। পচাইও ছটফট করিতেছে। সে আসিয়া জমিদারকে বলিল, হুজুর আমার হেমাকে ফিরাইয়া দিন। না হলে ও মারা পড়বে।

জমিদার বলিলেন, আমি ত আর শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিতে পারি না। তুই যা, প্রথম প্রথম এ-রকমই হয়। আজই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তর্কচূড়ামণি বলিলেন, বেটা অজ্ঞাত, তোর দোষে কি গোষ্ঠিশুদ্ধ লোক নিরয়গামী হবে।

এর উপর আর কোন কথা চলে না। হেমার 'হাম্বা হাম্বা' রব সে শুনিতে পায়। এ ব্যাকুল আর্ত্তনাদ তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে। পচাই দ্রুতপদে বাহির হইয়া যায়; তখন সন্ধ্যা।

* * * *

হেমা রাত্রে গড় ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মাধু সযত্নে তাহাকে ঘাস খাওয়াইতেছে; আর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। দাওয়ায় পচাই বসিয়া তামাক টানিতেছে। তখন ভোর হইয়াছে, জমিদারের পাইক ও লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। পাইক বলিল, চল, পচাই গাইটি নিয়ে।

পচাই বলিল, সে আমি পারব না বাপু! তোমরা পার নিয়ে যাও।

পাইক হেমাকে বাঁধতে গেল। কিন্তু সে কিছুতেই যাইবে না। জমিদারের লোকেরা টানাটানি করে, আর হেমা হাম্বা হাম্বা করিয়া মাধুর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়। হঠাৎ কি যেন হইয়া গেল। পচাই এক গাছা লাঠি হাতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমার গাই আমি দেব না।

তাহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া জমিদারের লোকেরা চলিয়া গেল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহারা আবার ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে আসিল কয়েক জন পুলিশ। পচাই গরু চুরি করিয়াছে। পুলিশ আসিয়া হুকুম করিল, গাইটা নিয়ে চল্।

পচাই কিন্তু তাহাতে রাজি হইল না। অগত্যা পচাইয়ের হাতে দড়ি পড়িল। পুলিশেরা পচাইকে লইয়া অগ্রসর হইল। আর কয়েকজন গাইটিকে বাঁধিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

হেমা হাম্বা-হাম্বা ডাকিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ হেমা শিং উঁচাইয়া সকলকে তাড়া করিল। হেমা—হেমা—আনন্দে মাধু গড়াগড়ি দিতেছে। আর হেমা হাম্বা-হাম্বা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। রাস্তায় দাঁড়াইয়া তর্কচূড়ামণি ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। চূড়ামণিকে দেখিতে পাইয়া হেমা যেন আরও ক্ষেপিয়া গেল। শিং উঁচাইয়া তাঁহাকে তাড়া করিতেই চূড়ামণি মুক্তকচ্ছ হইয়া ছুট দিলেন।

পচার জেল হইল না। অবশ্য সে কয়েক দিন হাজতে ছিল। তাহার কাণে ধ্বনিত হইতেছিল—হাম্বা—হাম্বা।

ফটো—অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়

বিনয় ঘোষ

"Evolution is the dance, Revolutions are the steps."
—C. Day Lewis.

আমাদের এই পৃথিবীটা একটা গ্রহ। বাষ্পদেহ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্য থেকে ঠিক্‌রে এসেছিল একদিন। তার পর ধীরে ধীরে জীবের বাসোপযোগী হয়ে জমাট বাঁধতে এর কোটি কোটি বছর কেটে গিয়েছে। প্রায় দেড়শ কোটি বছর ধরে ভাঙ্গাগড়ার এক বিপুল দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে দানা বেঁধে উঠেছে আমাদের ইঁটের টুকরো এই মাটির পৃথিবী। গোটা পৃথিবীটা যেন একটা প্লাম্‌-কেক্‌। স্লাইস্‌ করে কাটলে দেখা যাবে কিস্‌মিস্‌-বাদাম-পেস্তাদানার মতো ভূগভস্থ শৈলবিন্যাসের স্তরে স্তরে নানাবিধ সব খনিজ পদার্থ দানা বেঁধে রয়েছে। প্লাম কেক্‌খানা পুরু প্রায় মাইল পঞ্চাশ হবে। ওটা এই পৃথিবীর গায়ের চামড়া। এই চামড়া শিলা দিয়ে গঠিত, শিলা গঠিত নানাবিধ খনিজের দানা দিয়ে। শিলাগুলি সাধারণতঃ তিন রকমের: আগ্নেয় শিলা, স্তরিত শিলা, রূপান্তরিত শিলা। গরম তরল অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমে কঠিন রূপ নিয়েছে আগ্নেয় শিলা, যেমন গ্র্যানাইট, ব্যাসল্ট। ভাঙ্গাচোরা বস্তু মিশে আর ঘোলাটে জল থিতিয়ে স্তরে স্তরে জমে রাসায়নিক ক্রিয়ায় হয়েছে স্তরিত শিলা, যেমন বালি থেকে বেলে পাথর, প্রাণিকঙ্কাল থেকে চূণেপাথর, কয়লা। আগ্নেয় ও স্তরিত শিলা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে, তাপ-চাপের ঘাত-প্রতিঘাতে রূপ বদলে হয়েছে রূপান্তরিত শিলা, যেমন চূণেপাথর থেকে মার্ব্বেল। পাষাণ পৃথিবীর বুক এই রকম নানা শিলায় শিলিত।

শিলাগুলোকে ঠেলা দিয়ে এমন ভাবে ভূগর্ভে পাঠালো কে? কেই বা সেগুলো এমন ভাবে সাবধানে-অসাবধানে, খেয়ালে-খুশীতে গোছালো অগোছালো করে সাজালো? প্রকৃতি। শিলাগুলোকে সৃষ্টিই বা করল কে? প্রকৃতি।

স্থলের ভাগ পৃথিবীতে আজও অনেক কম, জলের ভাগ বেশী। এই স্থলটুকুই থিতিয়ে ঠেলে উঠতে অনেক কোটি বছর সময় লেগেছে। তাই এখানে আজ স্থলচর জীবজন্তু এবং আমরা বসবাস করছি। যে ভূগোল আজ আমরা পড়ি, প্রকৃতি সেই ভূগোল বহু কাল ধরে রচনা করেছে। যে কোন কালে এই স্থল-জল, পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-নদী তলিয়ে উল্‌টিয়ে এক ভূ-বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে। তখন আবার ভূগোল নতুন করে লিখতে হবে। এই ভাবে অনেক ভূগোল বদলে নতুন করে [illegible] এই [illegible] লেখা হয়েছে। এই ভূগোলের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেন তাঁদের আমরা বলি ভূবিদ্‌।

আমাদের পৌরাণিক ঋষিরা ভূবিদ্‌ না হ'লেও সুপ্রাচীন কিংবদন্তীর সূত্র ধরে তাঁদের কল্পনা বাস্তব সত্যের কাছাকাছি এসেছে অনেকটা। "অগ্নিপুরাণ" বলছেন: "অনন্তর ভগবান প্রজাসৃষ্টি কামনায় আগে জল সৃষ্টি করলেন। তাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষিপ্ত হল। জল "নার" শব্দে অভিহিত, ঐ জল 'নর'নামা ভগবান বিষ্ণুর পুত্র। "অয়ন" শব্দে স্থান; জলপূর্ণে বিষ্ণুর বাসস্থান ছিল বলেই তিনি "নারায়ণ" শব্দে অভিহিত হয়ে থাকেন।"

সমুদ্রের ঢেউ, নদীর স্রোত বা বৃষ্টিধারার কথা ভাবলেই জলের প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হবে। জলস্রোতের বহন-শক্তি আমরা কল্পনা করতেও পারব না। জলের স্রোত যদি দ্বিগুণ বাড়ে, তার বহনশক্তি বাড়ে চৌষট্টি গুণ। কাঁকর, বালি, ধুলো, ভাঙ্গা পাথর, নুড়ি, বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই, সব নদনদী উপনদী দিনরাত অবিরাম ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। নদী যত হ্রদ বা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে তত তার গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসে, এবং ঠিক সেই অনুপাতে তার বহনশক্তিও কমে যায়। ফলে সে যা বয়ে নিয়ে যায় সেগুলোকে ফেলে যেতে হয় পিছনে, প্রথমে খুব ভারী পাথর থেকে আরম্ভ করে নুড়ি কাঁকর এবং সবার শেষে ধুলো কাদা পর্য্যন্ত। এই ভাবে নদীগর্ভে যা জমা হয় তারও একটা ক্রমিক সূক্ষ্মতার হার আছে দেখা যায়। শুধু বৃষ্টির জল থেকেই উৎপত্তি হয়েছে এ রকম অনেক নদী-উপনদী আছে, যেমন আমাদের নর্ম্মদা, গোদাবরী, কাবেরী ইত্যাদি। আবার শৈলশিখরের বরফ-গলা নদীও আছে। এদের স্রোতের বেগে শিলাদেহ ও ভূপৃষ্ঠ নিরন্তর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ক্ষয়ের অংশটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এরা সমুদ্রের বুকে। এরা যেন সমুদ্রের বেতনভুক ভূপৃষ্ঠের ঝাড়ুদার। মিসিসিপি, দানিয়ুব, গঙ্গা, হোয়াং-হো প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীর ক্ষয়শক্তি হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, গড়ে একটা নদী প্রায় তিন হাজার বছরে তার অববাহিকার এক ফুট ক্ষয় করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতেও তার উপকূল গড়ে প্রায় তিন হাজার বছরে এক ফুট ক্ষয় হয় এবং এই ভাবে ক্ষয় হতে হতে সমগ্র পাঠের তলায় চলে এলে সমুদ্রও এগিয়ে যায়। এখন হিসেব

করে দেখা যাক্ এই ক্ষয়ের পরিণামটা কি ? তবু তো ঝড়-বাতাসের ক্ষয়শক্তির হিসেব এখানে করলাম না। প্রচণ্ড ঝড় বা বাতাসও যথেষ্ট ধুলো, বালি, মাটি ভূপৃষ্ঠ থেকে নিয়ে গিয়ে নদীতে ও সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। গড়ে ৩ হাজার বছরের নদী তার অববাহিকার এক ফুট ক্ষয় করছে, নদীর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ১৩,২০০ বছরে আরও এক ফুট ক্ষয় হচ্ছে, সমুদ্র ক্ষয় করছে ৩ হাজার বছরে আরও এক ফুট। এই ভাবে ৬৬ হাজার বছরে প্রায় ৪৯ ফিট ক্ষয় হচ্ছে। গোটা ইউরোপীয় মহাদেশের গড়পড়তা উচ্চতা হ'ল ৬৭১ ফিট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রায় দশ লক্ষ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে গোটা ইউরোপটা ক্ষয় হয়ে হয়ে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে। আরও দশ গুণ না হয় সময় লাগুক পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ ও দেশগুলি ক্ষয়ে যেতে! এক কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীটাই তো ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। এই এক কোটি বছর কাল-কালান্তরের ইতিহাসের তুলনায় আমাদের জীবনের সাতটা দিন কি না সন্দেহ। তাহ'লে কি ভবিষ্যতে "নারায়ণের" শুধু "নার"ই থাকবে, "অয়ন" একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ? যাবে না।

বৃষ্টির জলে অনেক শিলা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নদীর জলে মিশে সমুদ্রে যাচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে কাঁকর, বালি, ধুলো, মাটি, নুড়ি, পাথর ক্ষয় করে নিয়ে যাচ্ছে নদ-নদী সদা সর্ব্বদা সমুদ্রের বুকে। বায়ুমণ্ডল থেকেও ধুলো এসে সমুদ্রের বুকে জমছে। মরুভূমির বালি থেকে সুরু করে সব কিছুই ঝড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করছে সমুদ্রে। এই ভাবে সমুদ্রের চর-অনুচরেরা যেন ষড়যন্ত্র করে ভূপৃষ্ঠ ক্ষয় করে দিচ্ছে। সব এজেন্টের চেষ্টায় সমুদ্র-গর্ভে তলানি জমা হচ্ছে স্তরে স্তরে। বহু কাল ধরে এই তলানি চাদরের মতো অনুভূমিক স্তরে স্তরে জমা হয়ে অন্য বস্তুর সংমিশ্রণে, চাপে ও তাপে পালিলিক শিলায় পরিণত হয়। কখনও দেখা যায় অনুভূমিক স্তরের উপর খাড়াই স্তর জমা হয়েছে এবং তার ফলে বিরাট ফাটল ও ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে শিলাগাত্রে। কখনও বা সমুদ্রগর্ভের প্রচণ্ড চাপে ও তাপস্পর্শে এই স্তরিত শিলা কুঁচকে, ভাঁজ হয়ে বলিত পর্ব্বতশ্রেণী ও গিরিক্রমাকারে উপরে ঠেলে ওঠে। এই ভাবেই সমুদ্রগর্ভ থেকে গাত্রোত্থান করেছে এই পৃথিবীর বিরাট বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী ও গিরিক্রম। সেই পর্ব্বত-শ্রেণীর দেহ ক্ষয় করে নদীর স্রোতধারা পাথরের নুড়ি-বালি-মাটি বয়ে নিয়ে এসে সমভূমি তৈরী করেছে। যেমন আমাদের হিমালয়দুহিতা সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের গাত্রক্ষয় করা উপাদান বয়ে এনে আর্য্যাবর্ত্তে ছড়িয়ে সমভূমি তৈরী করেছে এবং গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে শতধারায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পলিমাটি ঢেলে ঢেলে পূর্ব্ব-সাগরের কতকটা ভরাট করে গড়ে তুলেছে আমাদের এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসবা, নদীমাতৃকা বাংলাদেশ।

এই ভাবে নিরন্তর ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলছে প্রকৃতির। দেশ-মহাদেশ, উপকূল-উপত্যকা, নদনদী, পর্ব্বতশ্রেণী সব ঠেলে উঠছে সমুদ্রগর্ভ থেকে, আবার তলিয়ে যাচ্ছে সেই গর্ভে। যেন প্রসব-বেদনাতুরা প্রকৃতির ললাটের কুঞ্চিত রেখা ভূপৃষ্ঠের পর্ব্বত-শ্রেণীগুলি। কালান্তরের বেদনায় যখন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয় তখনই হয় ভূপৃষ্ঠে বিরাট বিপর্য্যয়,—নদনদী, গিরি-উপত্যকা, মহাদেশের অভ্যুত্থান। এই ভাবেই হিমালয়, আল্পস, ককেসাস, কার্পেথিয়ান পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্যুত্থান হয়েছে, আমাদের পৌরাণিক কবিরা যাদের উত্তিষ্ঠমান, কম্পিতকায়, মহাবরাহরূপী অবতার বলে বন্দনা করেছেন। এই ভাবে ভারতবর্ষ, ইউরোপ, চীন, আফ্রিকা, সাইবেরিয়া প্রভৃতি মহাদেশ গাত্রোত্থান করেছে। ভাবী কালে একদিন এই হিমালয়, আলপস্, ককেসাস্, কার্পেথিয়ানের সমুন্নত শির হেঁট হয়ে আসবে, তাদের সুবিশাল তরঙ্গায়িত অঙ্গ বিশ্লিষ্ট ও ক্ষয়িত হয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে আবার যে তলানি জমা করবে তাই থেকে ঠেলে উঠবে নতুন এক ভূপৃষ্ঠাংশ, আবার এক নতুন উদ্ধতশির তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশ্রেণী।

এই হ'ল নর্ত্তিনী প্রকৃতির নৃত্যের তাল। কালান্তরের ছন্দ। সৃষ্টির নূপুরশিঞ্জন। ধ্বংসের ঝংকৃত কিঙ্কিণী।

এ-পৃথিবীর নিস্তব্ধ বিস্ময়স্তব্ধ পর্ব্বতশ্রেণীগুলির দিকে চেয়ে আমরা বলতে পারি :

হে প্রকৃতি !

"তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি চিহ্ন সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি সম।"

মহাকবি কালিদাসের উপমা অতুলনীয়। তাহ'লেও একটা উপমা দিচ্ছি। মদনের পুষ্পবাণ যখন ব্যর্থ হল, তিনি যখন রুদ্রের ললাটনেত্রোদ্দীপ্ত লক্‌লকে অগ্নিশিখায় ভস্ম হয়ে গেলেন, তখন চিত্রার্পিতার ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পার্ব্বতী দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যর্থতার ব্যথায় পার্ব্বতীর অন্তর কি তখন গুমরে ওঠেনি ? উমার ভ্রূভঙ্গী ও কটাক্ষ বেদনায় পাষাণ হয়ে কি এই পর্ব্বতশ্রেণীর রূপ পায়নি ? অভিমানে বিক্ষুব্ধ বক্ষ তাঁর গুমরে ফুলে উঠে কি এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেনি ? আজও হয়ত মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কোন এক মুহূর্ত্তে উমার মনে জেগে ওঠে ব্যর্থতার সেই পুরাতন স্মৃতি, মনে পড়ে রুদ্রের সেই ভয়ংকর মূর্ত্তি, ভয়ে তাঁর বুক দুর্-দুর্ করে' কেঁপে ওঠে, পৃথিবী টলমল করে, ভূকম্পন হয়। কন্দর্পের ধৃষ্টতার কথা রুদ্রেরও মনে পড়ে, অমনি তাঁর ললাটনেত্র থেকে ধক্-ধক্ করে আগুন জ্বলতে থাকে, এ পৃথিবীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়।

"ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল," সেই তালেই নিরন্তর প্রকৃতির ভাঙ্গা-গড়ার নৃত্য চলছে। মৃদঙ্গ ও করতালের তালে তালে বিশ্বের রঙ্গশালায় চলেছে বিবর্ত্তনের তাণ্ডব, বিপ্লবের পায়ের তাল। কোটি কোটি বছরের কাল কালান্তরের দৃশ্য তার পশ্চাৎ-পট।

এই বিবর্ত্তন ও বিপ্লবের ইতিহাস ও ছন্দ বর্ণনা করেছেন ভূবিদ্—"It is to him the last 'Still' so far developed of a cosmic cinematographic film, many reels of which are forgotten or partially destroyed and others as yet unexposed."

অজৈব জগতের এই ক্রমাবর্ত্তনের সংগে জৈব জগতের বিবর্ত্তনের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। নানা শ্রেণীর উদ্ভিদের ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীতে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তারা কেউ বিলুপ্ত হয়েছে, কেউ উন্নততর প্রাণীর বিকাশের পথ সুগম করেছে। এই

জৈব জগতের প্রগতিশীল বিবর্ত্তন হয়েছে, উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছে তার ক্রমবিকাশ। অজৈব জগতের বিবর্ত্তনে এই তর পদচিহ্ন আছে কি না তা ভূবিদ্‌রাই বলতে পারেন। দের মনে হয় নিশ্চয়ই আছে, কারণ সেকালের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড দেশের চেয়ে আমাদের আজকের দক্ষিণ-ভারত, আফ্রিকা, মালয় পুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া উন্নততর নিশ্চয়ই। তবে এ-কথা ঠিক যে, লিয়ার আদিম অধিবাসীরা গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের সরীসৃপ বাসিন্দাদের অনেক উন্নততর জীব।

জৈবিক ক্রমবিকাশের এই কোটি কোটি বছরের ইতিহাস আমরা কাছে শুনবো? কোথায় সেই ইতিহাস লেখা রয়েছে? তার ও বর্ণমালাই বা কি?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের "পাষাণের কথা" র ভূমিকায় লিখেছিলেন:

"বুড়া মানুষে না হয় এক শত দেড় শত বৎসরের কথা বলিবে র অধিক হইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। খায় পড়ায় রাখিয়া গেলে সে কথা অনেক দিন থাকে সত্য, কিন্তু যে নিয়ে লেখা হয়, সে ত আর বেশী দিন টিকে না। কাগজ আট নয় ত বৎসর টিকে, তালপাতা বার চৌদ্দ শত বৎসর টিকে, ভূর্জ্জপত্র নর ষোল শত বৎসর টিকে, পেপিরস না হয় দু'হাজার বৎসর কিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে গেলে কাহার কাছে নিব, পাথর ভিন্ন অন্য উপায় নাই।..."

"সেকালের রাজা-রাজড়ারা বাটালি দিয়া কুঁদিয়া পাষাণে দুই রিটি কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন. পাষাণ তাই প্রতিধ্বনি করে ত্র। যখন হাজার হাজার বৎসর পরে বাটালির দাগ মিলাইয়া ইবে, তখন সে প্রতিধ্বনি বন্ধ হইবে..."

শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের কথা বলছেন। যদি লক্ষ লক্ষ কাটি কোটি বছরের ইতিহাস শুনতে হয়, এই পৃথিবীর ও প্রাণি-গতের জীবনের ইতিবৃত্ত জানতে হয় তা'হলে নানাশ্রেণীর পর্ব্বত-ালার কাছে যেতে হবে। এই সব পর্ব্বতমালার পাঁজরে পাজরে থাদাই করা রয়েছে কোটি কোটি বছরের জীবজগতের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস। বিভিন্ন শিলার সংস্থান ও খনিজ উপকরণ থেকে ভূবিদ্‌রা (Geologists) তার বয়সের প্রাচীনত্ব বিচার করেন, এবং তারই পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে শিলীভূত উদ্ভিদ্ ও প্রাণিকঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করে জীবাশ্মবিদ্‌রা (Paleontologists) জৈবিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা করেন। এই ইতিহাসের কথাই এবার আমরা বলব!

প্রথমেই বলেছি, প্রায় দেড়শ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে উদ্দাম আলোড়নের ফলে বিভিন্ন অজৈব পদার্থের ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে বিশ্বের রঙ্গশালায় সৃষ্টি, ধ্বংস ও পরিবর্ত্তনের অবিরাম কাজ চলছিল। তারই ফাঁকে বিশ্ব-প্রকৃতির নৃত্যের ছন্দে কখন প্রাণের প্রথম বিকাশ হ'ল তা বলা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে ইলেকট্রন-প্রোটন জাতীয় বিদ্যুৎকণার ঘাত-প্রতিঘাত জড় বস্তুর অণুসমষ্টির বিশেষ পরমাণু-বিন্যাসের (atomic structure) এমন ভাবে রূপান্তর ঘটে, যার ফলে জীব-জগতের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ প্রাণের বিকাশ হয়। তারপর জড়ের বিপরীতধর্ম্মী প্রাণ আত্মরক্ষা-বিভাজন ও প্রজননের অদম্য প্রয়াসের ভিতর দিয়ে একটি জীব-কোষকে প্রাণলোকের নব নব বিচিত্র সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বিবর্ত্তনের এ ঐ দীর্ঘকালের ইতিহাসের আদিপর্ব্ব আমাদের শুনতে হবে জীবাশ্ম-বিদের কাছে। তিনি কি বলেন দেখা যাক্।

প্রত্নজীবক কাল

জীবাশ্মবিদ্ বলছেন, জীবনের প্রাথমিক বিকাশের চিহ্ন যা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত নগণ্য। চুণে পাথর ও গ্রাফাইটের স্তূপের মধ্যে কতক-গুলি প্রায় অস্পষ্ট ফসিল ভিন্ন আর্কেওজোয়িক ও প্রেটেরোজোয়িক কালে আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ এই দুটো কাল মিলেই কিন্তু সমস্ত ভূতাত্ত্বিক মহাকালের একশ' ভাগের পঞ্চান্ন ভাগ, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশি অধিকার করে আছে। পেলিওজোয়িক বা প্রত্নজীবক কালের গোড়াতে **কাম্‌ব্রিক যুগে** জীবাশ্মের প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবই অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক জীব। সুতরাং তার আগের কালে যে এই অমেরুদণ্ডী জীবের ক্রমবিকাশ হয়েছে এবং তখনও পর্য্যন্ত যে অগভীর জলের বা স্থলের বাসিন্দা ছিল না পৃথিবীতে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই অমেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে স্পঞ্জ, প্রবাল, ট্রাইলোবাইট্‌ই উল্লেখযোগ্য। কাম্‌ব্রিক যুগে জীবের প্রধান বিকাশ হয়েছিল ট্রাইলোবাইটের মধ্যে। প্রধান জীব (Dominant life) বলতে কিন্তু বিবর্ত্তনের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ জীবকে বুঝায় না, যে-জীবের প্রাচুর্য্য ও আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী থাকে কোন যুগে, সেই জীবকেই বুঝায়। কাম্‌ব্রিক যুগে ট্রাইলোবাইটের প্রাচুর্য্য ও প্রভাব বেশি ছিল বলেই "The Cambrian has been known as the Age of Trilobites." ট্রাইলোবাইটরা আজকালকার চিংড়ী ও কাঁকড়ার আদি-পুরুষ। তারা গুড়ি গুড়ি দিয়ে চলত, থাকত সমুদ্রের গভীর তলদেশে, আকারে এক ইঞ্চিরও ছোট থেকে সাড়ে সাতাশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড়ো ছিল। জীববিদ্‌রা বলেন যে, এই ট্রাইলোবাইটরাই নাকি যাবতীয় কংচী, বিছা, মাকড়সা, সহস্রপদ কেন্নো, এমন কি পতঙ্গজাতীয় জীবেরও আদিম পূর্ব্ব পুরুষ।

অর্দোভিসীয় যুগে বোধ হয় প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ হয় এক রকমের সামুদ্রিক অ্যালজী বা শাওলা থেকে, কিন্তু ফসিলের সংখ্যা থেকে বুঝা যায় যে এই যুগের প্রধান জীব হ'ল "গ্রাপ্‌টোলাইট।" এরা দেখতে নানা রকমের ছিল, ছোট ছোট করাতের মতো দুই দিকে দাঁতওয়ালা অথবা গাছের পাতার মতো একক ও শাখা-বিভক্তই বেশী। এরা সব অঙ্গারিত হয়ে শিলাগাত্রে খোদিত হয়ে গিয়েছে। এই জন্যই এদের বলা হয় "গ্রাপ্‌টোলাইট," (গ্রীক 'Graptos'-এর অর্থ লিখিত বা চিহ্নিত এবং 'lithos'-এর অর্থ পাথর) অর্থাৎ শিলালিখিত জীব'।

সিলিউরিক যুগে আমরা সর্ব্ব প্রথম শ্বাস-প্রশ্বাসী জীবের সন্ধান পাই। তার আগে স্থলজ উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে নিশ্চয়ই, কারণ উদ্ভিদ্ হ'ল প্রাণীর অগ্রজ। প্রথম যে শ্বাস-প্রশ্বাসী জীবের সন্ধান পাই আমরা তার নাম কাঁকড়া-বিছা. কোটি কোটি বছরেও যার আকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। এরা উদ্ভিদ্-ভোজী নয় বলেই বুঝা যায়, এদের আগে এদের খাদ্যোপযোগী আরও অন্যান্য জীবের আবির্ভাব হয়েছিল।

ডিভোনিক যুগে আমরা আমাদের মৎস্যাবতারের সাক্ষাৎ পাই। এ যুগের প্রধান জীব হল মাছ, সেই জন্যে একে "Age of

Fishes" বলা হয়। এরা সংখ্যায় প্রচুর তো ছিলই, এদের বৈচিত্র্যও ছিল খুব। পুরাতন লাল বেলে-পাথরের শিলাস্তরে এদের অজস্র ফসিল পাওয়া গিয়েছে। এই ফসিলগুলির মধ্যে হাঙ্গর জাতীয় জীব থেকে আধুনিক নানা শ্রেণীর মাছের ক্রমবিকাশের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এরা গভীর জলের মাছ নয়, অনেক উপরে টাটকা জলের স্তরেই এরা বাস করত। জলাভাবের সময় যখন জল থেকে অক্সিজেন পেত না, তখন বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন টেনে এরা বেঁচে থাকত।

ডিভোনিক যুগ ছিল হিমোত্তর যুগ। আর্দ্রতার অভাবে মধ্যে মধ্যে নদ-নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত এবং আবদ্ধ জলে এরা বন্দী হয়ে থাকত। হাজার হাজার বছর ধরে অনার্দ্রতার মধ্যে জীবন ধারণ করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ক্রমেই প্রাকৃতিক পরিবেশ যত কঠিন শুকনো রূপ ধারণ করতে থাকল, তত তাদের জীবনধারণের সমস্যাও কঠিনতর হয়ে উঠলো। তখন তাদের নতুন ভাবে জীবন ধারণের চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। এই প্রচেষ্টার বিকাশ হ'ল স্থলচর জীবনে,—"by actual emergence and the assumption of a terrestrial mode of life." কত কাল ধরে পাশ-মোড়া দিয়ে দিয়ে, কুঁচকে দুমড়ে, বেঁকে প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে ক'রে পেশী-বিন্যাস ও অস্থি-বিন্যাস বদলে দৃঢ় করে, মাছের একজোড়া পাখনা, পোছা, বাঁশী ফুলকা (Gill) সব রূপান্তরিত হয়ে প্রথম মেরুদণ্ডী স্থলচর জীব সরীসৃপের (Reptile) আকার ধারণ করেছে তার ঠিক নেই। জীবনের উৎপত্তি এবং কৃমি-জাতীয় কোন জীব থেকে প্রথম মেরুদণ্ডী জীবের বিকাশের পর বিজ্ঞানীরা বলেন, এই জলচর মেরুদণ্ডী জীব থেকে স্থলচর মেরুদণ্ডী জীবের বিকাশই বিবর্তনের ইতিহাসে সব চেয়ে যুগান্তরী ঘটনা। মেরুদণ্ডী জীবের ক্রমবিকাশের এই নতুন স্থলজ রেখাই (Terrestrial line) সর্পিল গতিতে সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী জীব থেকে মানুষ পর্যান্ত উচ্চতর স্তরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

প্রথম স্থলজন্মী জীব কিন্তু অমেরুদণ্ডী কাঁকড়া-বিছা, গোলক-মাছ, কৃমি ও সহস্রপদ কেন্নোর দল। আজ পর্য্যন্ত তাদের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। মেরুদণ্ডী জীবেরই জয় হল এখানে, বিবর্তনের প্রশস্ত পথে তারাই দৃপ্তপদে দলে দলে এগিয়ে চলল। বিবর্তনের সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথের বাঁকে বাঁকে নানা শ্রেণীর মেরুদণ্ডী জীবেরই পদচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

অঙ্গারবহ যুগে (Carboniferous Period) দেখা যায়, সামুদ্রিক গাদের স্তরের মধ্যে মধ্যে কয়লার স্তরের বিন্যাস। কয়লার উৎপত্তি হল অগভীর জলাভূমির জঙ্গল থেকে। এই সময় জলাভূমির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিশ্চয়ই আদিম ট্রাইলোবাইটদের বংশধর জল-ফড়িং-এর (dragon-fly) মতো নানারকমের পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে বিবর্তনের উচ্চতর ধাপে উড়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে কিন্তু প্রথম মেরুদণ্ডী স্থলচর জীব "ষ্টেগোসিফালিয়ান"দের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আসল সরীসৃপেরও আবির্ভাব হয়েছে। এই সরীসৃপেরাই পরবর্ত্তী মধ্যজীবক কালের হর্তাকর্তা। ষ্টেগোসিফালিয়ানদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা স্থলের ও জলের উভচর জীব। জলেই তারা ডিম পাড়ে, তাদের বাচ্চারা কিছু কাল ফুলকা দিয়েই শ্বাস টানে, তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হলে ফুসফুস দিয়ে শ্বাস টানতে শেখে।

পার্মিক যুগ হিমযুগ। এত দিন পতঙ্গদের একটা ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটেছিল। এইবার তাদের এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটল। আদিম জলফড়িং-এর দল লোপ পেয়ে গেল। নতুন রূপান্তরিত পতঙ্গশ্রেণী মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতির উদ্ভব হল। নতুন পতঙ্গশ্রেণীর উদ্ভবের পর অমেরুদণ্ডী জীবের ক্রমবিকাশ কিন্তু শেষ হয়ে গেল। দৈহিক সামান্য একটু-আধটু অভিযোজন ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন বিবর্তনের চিহ্ন পাওয়া যায় না। পার্মিক যুগের পর প্রত্নজীবক কাল শেষ হয়ে গেল। ট্রাইলোবাইটের মতো অনেক অমেরুদণ্ডী জীব লোপ পেয়ে গেল এবং যারা রইল তাদের বিবর্তন বন্ধ হয়ে গেল। এর পর থেকে মেরুদণ্ডী জীব ও পুষ্পোদ্ভিদের রাজত্বকাল আরম্ভ হল বলা চলে।

মধ্য-জীবক কাল

মধ্য-জীবক কাল হ'ল সরীসৃপের (Age of Reptiles) রাজত্ব কাল। এই সময় স্থলে, জলে, শূন্যে সর্ব্বত্রই এদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র সমুদ্রের গভীর জলে এরা প্রবেশ করতে পারেনি। ক্ষুদে আকার থেকে বৃহত্তম আকারের এরকম শক্তিশালী হিংস্র স্থলচর জীব পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি। সাপ, টিকটিকির মতো স্তন্যপায়ী জীবের দল হিংস্রতায় এই সব সরীসৃপের কাছে শিশু বলা চলে। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে, প্রায় আঠার রকমের বিভিন্ন জাতের সরীসৃপের আবির্ভাব হয়েছে মধ্যজীবক কালে। তার আবার অসংখ্য শ্রেণী, গোষ্ঠী ও পরিবারে বিভক্ত।

ত্র্যায়াসিক (Triassic), **জুরাসিক** (Jurassic) ও **খটিক** (Cretaceous)—এই তিনটি যুগ নিয়ে মধ্যজীবক কাল। ত্র্যায়াসিক যুগের পারিপার্শ্বিক অনার্দ্রতার মধ্যে প্রথমে ডাইনোসার জাতীয় সরীসৃপের উৎপত্তি হয়। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, তৃণজীবী, মাংসজীবী, সকল শ্রেণীর ডাইনোসারের ফসিল এই তিনটি যুগে পাওয়া গেছে। আফ্রিকা, ইয়োরোপ, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, সর্ব্বত্রই একদিন এদের রাজত্ব ছিল। প্রথম দিকে এরা শুকনো ডাঙ্গায় বাস করত। তারপর জুরাসিক যুগে নিম্ন উপকূল এলাকা জলাভূমি ও মন্দগতি নদীতে এই বৃহত্তম, শক্তিশালী সরীসৃপশ্রেণী বাস করতে থাকে। জুরাসিক যুগে আমরা ব্রন্টোসার, এ্যালোসার ষ্টেগোসার প্রভৃতি বৃহদাকার, কদাকার, বীভৎস, হিংস্র ডাইনোসারদের সাক্ষাৎ পাই। ব্রন্টোসারের মেরুদণ্ডের বাঁক পর্য্যন্ত উচ্চতা ছিল ১০ ফিট অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৈর্ঘ্য যদি সাড়ে পাঁচ ফিট ধরা যায়, তাহ'লে মাথার উপর পা দিয়ে দিয়ে হেবটি মানুষ সাজিয়ে দিলে তবে ব্রন্টোসারের পিঠের নাগাল পাওয়া যাবে। ব্রন্টোসারের দেহের ওজন প্রায় ৩৭ টন, মন্দিরের মোটা মোটা স্তম্ভের মতো চারখানা পা, আঁটসাঁট নাতিদীর্ঘ দেহ, প্রকাণ্ড লম্বা গলা ও লেজ, বেলের মতো ছোট একটি মাথা, আর চোয়ালের সামনে চামচের মতো একগোছা দাঁত। একমাত্র শূন্য ছাড়া, জল স্থল দলিত মথিত করে এদের আমেরী চালে চলে বেড়াবার শক্তি ছিল। খাদ্যের দিক থেকে এরা ছিল গোঁড়া নিরামিষাশী। এ্যালোসারদের ছিল বাঁকানো ভোজালির মতো দাঁত আর পায়ে লম্বা লম্বা ধারালো নখর। দৈর্ঘ্যে এরা প্রায় ৩৪ ফিট হবে। এরা ছিল ব্রন্টোসারদের শত্রু, তাদের আক্রমণ করে মেরে ফেলে দিব্যি আরামে তাদের মাংস খেত। এ্যালোসারেরা

ল আমিষভোজী। স্টেগোসারগুলি দেখতে অপেক্ষাকৃত ছোট হ'লেও তারা ভয়াবহ ও কিম্ভূতকিমাকার। পিঠের উপর দুইসারি ঢালের মত প্লেট, লেজের দিকে কয়েক জোড়া মোটা তীক্ষ্ণ হাড়ের ছোরা। দেহটি বৃহত্তম—হাতির চেয়েও বৃহত্তর, কিন্তু মাথাটির ওজন মাত্র দুই থেকে আড়াই আউন্স। এ-যুগে আবার ক্যাম্পটোসারের মত দ্বিপদ উদ্ভিদভোজী ডাইনোসারও দেখা যায়।

এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সরীসৃপ হ'ল টাইরানোসার, ডাইনোসারদের রাজা বলা চলে। পৃথিবীতে এই ধরণের কদাকার, বীভৎস ও হিংস্র মাংসাশী জীব আর কখনও পদার্পণ করেনি। লম্বায় প্রায় ৪৫ ফুট। পিছনের পদস্তম্ভযুগলে ভর দিয়ে প্রায় ১৮ ফিট উঁচুতে এই বিশাল লম্বা দেহটাকে তুলে ধরে যখন টাইরানোসাররা আধ ফুট লম্বা দাঁতওয়ালা প্রকাণ্ড মাথাটাকে দোলাত, তখন মনে হত যেন গোটা পৃথিবীটাকে এরা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে দেবে। ডাইনোসারদের চরম বিকাশ বোধ হয় এইখানেই শেষ হয়ে যায়।

খটিক যুগে এই শ্রেণীর ডাইনোসারদের আধিপত্য শেষ হয়ে গেল। ট্রাকোডন-শ্রেণীর (Tischodon) নূতন ডাইনোসারদের আমদানী হ'ল। পায়ের পাতা আর হাত দিয়ে এরা ঠিক আধুনিক কুমীরদের মত সাঁতার দিতে পারত জলে। আকারে এরা ব্রন্টোসারের অর্দ্ধেক ছিল প্রায়। আর এক শ্রেণীর শিংওয়ালা ডাইনোসার এই সময় দেখা যায়, তাদের সরাটপ্‌সিয়া (Cerotopsia) বলে। [illegible] অন্যান্য সরীসৃপের মধ্যে বৃহদাকার কচ্ছপ, কুমীর, মসাসার বাসিলাস, প্লেসিওসার প্রভৃতি সামুদ্রিক সরীসৃপগুলি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল ইথিওসোর নামে এক রকমের মৎস্যাকৃতি সামুদ্রিক সরীসৃপ। এছাড়া আধুনিক পাখীদের আদিম পূর্ব্ব পুরুষ বলে যে শ্রেণীর উড়ন্ত সরীসৃপেরও আবির্ভাব হয় এই সময়। তারা সবাই লোপ পেয়েছে।

মধ্যজীবক কালের শেষ হয়ে এল। নানা শ্রেণীর কিম্ভূতকিমাকার, সৌর্দণ্ড-প্রতাপ সরীসৃপদের বিদায় নিতে হবে। এবার যাদের যুগ আসছে তাদের আবির্ভাব হয়েছে ইতিমধ্যে। তারা চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী জীব (Mammals), বুদ্ধিমান মানুষের আদি-পুরুষ। "সাইনোডন্ট" নামে এক রকমের কুকুরের মত দাঁতবিশিষ্ট সরীসৃপ থেকে নাকি এই স্তন্যপায়ীদের বিকাশ হয়েছে। সরীসৃপদের দাঁত নানারকমের ছিল বটে, কিন্তু স্তন্যপায়ীদের মত কৃন্তক, ছেদক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর দাঁত ছিল না তাদের। তাছাড়া যে শিলাস্তরে সাইনোডন্ট সরীসৃপের ফসিল পাওয়া গিয়েছে সেইখানেই আদিম স্তন্যপায়ী জীবেরও ফসিল অনেক পাওয়া গিয়েছে। তাই থেকে জীববিদ ও ভূবিদরা মনে করেন যে এই শ্রেণীর সরীসৃপ থেকেই স্তন্যপায়ীদের প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে। যাই হোক, মধ্যজীবক কালের এই স্তন্যপায়ীরা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র তো ছিলই, শক্তিতেও অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সংগ্রাম করে শক্তিমদমত্ত সরীসৃপদের বিতাড়িত করবার সাধ্য তাদের ছিল না। প্রকৃতি তাদের সহায় হ'ল। সরীসৃপদের চরম বিকাশ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। যারা পূর্ণতা ও প্রায়-পূর্ণতায় পৌঁছেছে, তারা আর নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারল না। ধ্বংস হয়ে গেল। নূতন স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। অভাব ছিল শুধু সুযোগের ও অনুকূল পরিবেশের। প্রকৃতি সেই সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করল।

নব্যজীবক কাল

নব্যজীবক কালের কাহিনী স্তন্যপায়ী জীবের কাহিনী। স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমবিকাশের দু'টি ঢেউ এসেছে। প্রথম ঢেউয়ে হয়েছে আদিম স্তন্যপায়ীদের বিকাশ, দ্বিতীয় ঢেউয়ে হয়েছে আধুনিক স্তন্যপায়ীদের বিকাশ, যাদের আজ আমরা এই পৃথিবীতে দেখতে পাই। এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের শীর্ষে হ'ল "মানুষের" স্থান।

প্রধানতঃ তিনটি আঙ্গিক বিশেষত্বের ক্রমবৃদ্ধিকেই কেন্দ্র করে স্তন্যপায়ীদের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে বলা চলে। প্রথমটি হ'ল "পা," দ্বিতীয়টি "দাঁত" আর তৃতীয়টি "মাথা" বা "মস্তিষ্ক" (Brain)। মধ্যজীবক কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিক মধ্যযুগ পর্যন্ত যেসব জীবের আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে তাদের আঙ্গিক বিশেষত্ব প্রথম দু'টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল পা ও দাঁত। কারণ, পা ও দাঁতই তখন প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছে বেশী, তাই তাদের বিচিত্র বিকাশ হয়েছে। কিন্তু মস্তিষ্কের বিকাশ হয়নি। সরীসৃপদের মস্তিষ্কের কোন বালাই ছিল না বলা চলে, বিরাট বপু নানা রকমের বিশ্রী দাঁত আর পদস্তম্ভ নিয়ে তারা সংগ্রাম করেছে। নব্যজীবক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হ'ল এই মস্তিষ্কের বিকাশ। জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা-বৃদ্ধির ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত 'মস্তিষ্ক' ধীরে ধীরে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আদিম স্তন্যপায়ীদের (Archaic mammals) মধ্যে এই তিন আঙ্গিক বিশেষত্ব [illegible] কিন্তু কোনটিতেই তারা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব অর্জন করতে পারেনি। [illegible] পাঁচ আঙুল ক্ষুর ও নখর-বিশিষ্ট পা, আধুনিক [illegible] বিশেষত্ব তারও নেই, দাঁত প্রায় [illegible] খাদ্য চিবানো [illegible]। মস্তিষ্কের বিকাশ হয়েছে বটে, কিন্তু [illegible] স্থূল দেহের তুলনায় আকারে অত্যন্ত ছোট, [illegible] প্রত্যক্ষ বোধেন্দ্রিয় ও পেশী-নিয়ন্ত্রণ [illegible]। মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম পিণ্ড [illegible] মানব-বক্ষ যেগুলি, [illegible] স্তন্যপায়ীদেরও আমরা [illegible]। তবে এ-কথা ঠিক যে [illegible]।

[illegible] (Paleocene), প্রাগাধুনিক (Eocene) ও অল্পাধুনিক (Oligocene) যুগ এই সব আদিম স্তন্যপায়ীদের আধিপত্যের যুগ বলা চলে। মধ্যাধুনিক যুগে আধুনিক স্তন্যপায়ীদের বিকাশ হয়। আধুনিক যুগের বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, হাতী, গরু, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, এরা সব এই আধুনিক স্তন্যপায়ীদের বংশধর। এদের পা, দাঁত, মস্তিষ্ক—এই তিনটি অঙ্গেরই বিকাশ হয়েছে, বিশেষত্ব বেড়েছে। কেউ কেউ বলেন, বহ্বাধুনিক যুগে (Pliocene) আদিম মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। হয়তো পাবে হয়ত একদিন। কিন্তু আদিমতম মানুষের ফসিল আমরা যা পেয়েছি আজ পর্যন্ত, তা হ'ল সব অত্যাধুনিক (Pleistocene) যুগের। জাভায়, চীনে, আফ্রিকায় ইউরোপে এই আদিম মানুষের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে—'জাভা মানব' (৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বছর বয়স) হাইডেলবার্গ মানব (প্রায় ৪ লক্ষ বছর বয়স), পিল্টডাউন মানব (২ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে ৪ লক্ষ বছর), পিকিং মানব (প্রায় সমবয়সী), নিয়ান্ডার্থাল মানব (২৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার

বছর), রোডেসিয়ান মানব (নিয়ানদার্থালের বংশ), আধুনিক ক্রো-ম্যাগনন মানব (২৫ হাজার বছর). এরা সব আমাদের আদি পুরুষ। অত্যাধুনিক যুগের হিমবাহের (Glaciation) মধ্যে এরা আদি প্রস্তর-সভ্যতার (Paleolithic) ভিৎ গঠন করেছে। আধুনিক সভ্যতার অভ্রংলিহ সৌধ এই ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি অঙ্গের মধ্যে যেটির বিশেষত্ব ও অদ্ভুত বিকাশের ফলে মানুষ 'মানুষ' হয়েছে সেটি হল 'মস্তিষ্ক'। পা ও দাঁতের বিশেষত্ব মানুষের তেমন কিছুই নেই, এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় এদিক থেকে মানুষের কৃতিত্ব অনেক কম। মানুষের কৃতিত্ব ও চরম আঙ্গিক বিকাশ হল 'মস্তিষ্ক' (Brain)। এই মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম মনন ও অনুভূতিশক্তি-সম্পন্ন মস্তিষ্কে বিবর্তিত হয়েছে। তাই তো মানুষের আজ এত দৌরাত্ম্য ও আধিপত্য। ভূতাত্ত্বিক মধ্যযুগের সেই বিরাট-কায় ডাইনোসারের পাশে আধুনিক আলবার্ট আইনষ্টাইনকে কত নগণ্যই না মনে হবে। যেন একটা ছোটখাট পাহাড়ের পাশে একটি ক্ষুদে পতঙ্গ। কিন্তু তাতে কি? এই ক্ষুদে পতঙ্গের সামনে ভয়ে পাহাড় কাঁপবে, গোটা পৃথিবীটা কাঁপবে। ব্রন্টোসার, টাইরানোসার প্রভৃতি সমস্ত ডাইনোসার শ্রেণীকে আহ্বান করে ক্ষুদে আইনষ্টাইন বলতে পারেন, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে তিনি ডাইনোসারকুল পর্য্যন্ত একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। গোটা সরীসৃপ-জগৎটাই পুড়ে ঝলসে যাবে আধুনিক মানুষের 'মস্তিষ্কের' তেজে।

এই মস্তিষ্ক ও মনের বিকাশ ও আধিপত্যের জন্যেই আধুনিক কালকে ভূবিদ্‌রা বলেন **মনোজীবক কাল** (Psychogoic age)। মানুষই হল এই মনোজীবক কালের রাজা। এই মন, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিকাশের ফলে এক যুগান্তরী ঘটনা ঘটল পৃথিবীতে। এতদিন পৃথিবীর সমস্ত জীবই ছিল প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র, একেবারে প্রকৃতির করুণার মুখাপেক্ষী। কিন্তু করুণা করবার পাত্রী প্রকৃতি নয়। তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও বিন্যাস নতুনভাবে খাপ খাইয়ে, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে, আভ্যন্তরীণ বিরোধের সমন্বয় ঘটাবার প্রচণ্ড প্রয়াসে সমস্ত জীবেরই প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশই লোপ পেয়েছে, বাকি যারা আছে তাদের প্রগতির পথ রুদ্ধ। একমাত্র মানুষই এক কল্পনাতীত কালান্তরের সৃষ্টি করল। মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রথম বুঝতে চাইল প্রকৃতিকে। যেন পূর্ব্বপুরুষদের কোটি কোটি বছরের সংগ্রামের ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত প্রতিহিংসা নিয়ে "মানুষের" আবির্ভাব হল পৃথিবীতে। মানুষের প্রথম প্রশ্ন, প্রথম রহস্য, প্রধান সমস্যা ও প্রধান শত্রু হ'ল এই "প্রকৃতি"। এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অনিরুদ্ধ অভিযান, সেই অভিযানের উত্থান-পতন ও প্রগতির কাহিনীই হ'ল মানব-সভ্যতার মর্ম্মকথা। এই অভিযানের আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথে মানুষ তার সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা গড়েছে। এই সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ভূতাত্ত্বিক বিবর্ত্তনের প্রতিচ্ছবি মাত্র। ভূতাত্ত্বিক বিবর্ত্তনের ছন্দেই মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হ'চ্ছে।

বিবর্ত্তনের ছন্দ

বিবর্ত্তনের যে-ইতিহাস আমরা বর্ণনা করলাম তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। কি অজৈব, কি জৈব-জগতে বিবর্ত্তন (Evolution) একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। প্রাচীন যুগের মহা প্রলয়ের কল্পনার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না বলেই তাকে শুধু নিছক কল্পনাই বলা চলে। বিবর্ত্তনকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে বিশ্বাস করবার মতো, অথবা আবিষ্কার করবার মতো কোন তথ্যের সন্ধান তখনও মানুষ পায়নি, তাই তাকে মহাপ্রলয় ও মহাকালের কল্পনা করতে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে হাটন (Hutton), স্ক্রোপ (Scrope), লায়েল (Lyell) প্রমুখ ভূবিদ্‌রা তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যের দ্বারা প্রলয়বাদের (Catastrophism) ধ্বংসস্তূপের উপর বিবর্ত্তনবাদের (Evolution) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিবর্ত্তনবাদী ভূবিদ্‌রাই ডারুইনের আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার করে দেন। ডারুইন এই বিবর্ত্তনের সূত্রটি আবিষ্কার করতে গিয়ে বললেন যে বিবর্ত্তন হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রকারণে (continuous variation) এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural Selection) নিয়মানুযায়ী। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রেখে যারা চলতে পেরেছে তারাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, যারা পারেনি তারা ধ্বংস হয়েছে। এইভাবে জীবজগতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। এই হ'ল ডারুইনের বিশ্বাস। এতেই অন্ধকার। এতদিন বৈপ্লবিক সত্যকে তথ্যের বেদীতে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন, সমসাময়িক বুধ ও সুধী-সমাজ তাঁদের "Cranks," "Quacks", 'designing atheists" প্রভৃতি বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন। কিন্তু সত্য যা তা চিরকালই বিদ্রূপকে চূর্ণ ক'রে সগৌরবে স্বীকৃত হয়। বিবর্ত্তনবাদও হল। ডারুইনের জয় হ'ল। ডারুইন চিন্তাজগতে যুগান্তর আনলেন।

ডারুইন যা বললেন না তা উনবিংশ শতাব্দীর কোন বিজ্ঞানীই বলতে পারেননি। পদার্থ-বিজ্ঞানী তখন বলছেন বৈদ্যুতিক শক্তি একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র, জীববিজ্ঞানীও বলছেন বিবর্ত্তন একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রকারণ মাত্র। পরবর্ত্তী কালে আরও অনেক উন্নত গবেষণা, পর্য্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের ফলে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে অণু-পরমাণুর মধ্যে সব সময় একটা বিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন চলছে, বিকিরণও (Radiation) একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নয়, বিচ্ছিন্ন প্রবাহ, ধাপে ধাপে, ঝলকে ঝলকে তার তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভূবিদ্‌রাও গবেষণা-লব্ধ নূতন তথ্যের বিশ্লেষণ করে বলছেন, প্রাকৃতিক ও জৈব বিবর্ত্তন একটা যান্ত্রিক নিরবচ্ছিন্ন গতি নয়, দ্বন্দ্বময়, বিরোধ-বন্ধুর বৈপ্লবিক প্রগতি। জীববিদ্‌রাও বলছেন বিপরিণতির (Mutation) কথা, অর্থাৎ জৈবিক ক্রমবিকাশ নিরবচ্ছিন্ন প্রকারণ নয়, বিচ্ছিন্ন প্রকারণ। এক কথায় বিজ্ঞানীরা আজ বলছেন, কি অজৈব-জগৎ, কি জৈব-জগৎ, কোন ক্ষেত্রেই প্রগতি যান্ত্রিক নিয়মে হয়নি, হয়েছে দ্বন্দ্বময় বৈপ্লবিক নিয়মে। দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও বৈপ্লবিক রূপান্তর, এই হ'ল প্রগতির ধর্ম্ম। একেই বলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)!

বিবর্ত্তনের ধাপগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ক্রমবিকাশ প্রধান থেকে প্রধানের দিকে হয়নি, প্রধান থেকে অপ্রধানের প্রাধান্যের দিকে হয়েছে। বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ্ রিচার্ড সোয়ান্ লাল্ বলছেন :

"It is interesting to note that each wave of dominance arises out of what were humbler and less specialised forms. Dominant never produces dominant of the same lineage. It is a *replacement*, not a succession in the sense of

related beings as the succession of the kings of the house of Stuart or of Hapsburg."

(Fossils : P. 72)

আর একজন বিখ্যাত জীববিদ্ বলছেন :

"The more we study nature the more we find that what is apparently stable turs out to be the battlefield of opposing tendencies. The continents are the field of a struggle between erosion, which tends to flatten them, and folding and vulcanising, which build mountains. For this reason they have a history. Animals and plants are never completely adapted to their environment. On the contrary they evolve just because they are imperfect. The same principle holds for human societies." (J. B. S. Haldane)

পর্ব্বতশ্রেণী, গিরিব্রজ, সব নিরন্তর ক্ষয় হয়ে হয়ে সমভূমি তৈরী করছে। মহাদেশের অভ্যুত্থান হ'চ্ছে এই ভাবে। আবার এই ক্ষয়ের জঞ্জাল স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে হঠাৎ একদিন তাপে-চাপে ভাঁজ হয়ে ঠেলে উঠছে উপরে পর্ব্বতশ্রেণীরূপে। এইভাবে আপাতদৃশ্যমান স্থিরতার মধ্যে অশান্ত প্রকৃতির পরস্পর-বিরোধী শক্তির লীলা চলছে অবিরাম, ধ্বংস ও সৃষ্টির কাজ চলছে নিরন্তর। আজও চলছে। চিরকাল তাই চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সকলেই পরিপূর্ণ ভাবে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলেই, যারা পারেনি তাদের বিবর্তন হয়েছে। প্রধান জীব থেকে পরম্পরায় সেই প্রধান জীবেরই নিরবচ্ছিন্ন প্রকাবণ হয়নি, স্বল্প প্রধানেরা প্রধানকে রাজ্যচ্যুত ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের অমেরুদণ্ডী প্রধানেরা হয় ট্রাইলোবাইটদের মত লোপ পেয়ে গেল, না-হয় কয়েক পা কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত এগিয়ে আর অগ্রসর হ'তে পারল না। স্বল্পপ্রধান অমেরুদণ্ডী জীব থেকেই একদিন মেরুদণ্ডী জীবের হঠাৎ রূপান্তর ঘটল। মেরুদণ্ডী জলচর প্রধানেরা অর্থাৎ মাছেরা কত কাল পাশমোড়া দিয়ে দিয়ে হল স্থলচর সরীসৃপ। সরীসৃপের যুগেও দেখেছি. সেই মধ্যযুগের বড়ো বড়ো নবাব বাদশাহ ডাইনোসারের দলও ধ্বংস হয়ে গেল, দাসানুদাস ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীরা সগর্ব্বে রাজ্যজয় করলে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও কত বড় বড় প্রধানেরা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে তাদের রাজত্ব দখল করল অপ্রধানেরা। এই অপ্রধান স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আমরাই, অর্থাৎ মানুষই আজ সর্ব্বপ্রধান। মানুষই আজ এই প্রকৃতির রাজা, **মাটির রাজা। মানুষই আজ বিশ্বকর্মা।**

আগামী সংখ্যায় ঃ—

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)

অজিত দত্ত

মেঘ

সুনীল ঘোষ

ধূসর মেঘেরা হেথা দল বেঁধে উড়ে উড়ে যায়
যেন কটা বালুহাঁস,
সুদূর দিগন্তে ওরা এলোমেলো ঘুরে আর ফিরে
গতির ইঙ্গিতে কাঁপে থর থর থর—
নাহি কিছু পিছু টান—এতটুকু তাড়া—
ওরা যেন গতির আয়াসে মাতোয়ারা।

এ-যুগের মেঘ ওরা
বুকভরা শুধু হাহাকার!
চোখে শুধু আগুনের কণা
বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুন;
সাগরের ধার ওরা ধারেনাতো কিছু;
মরণের চিতানলে ওরা জন্ম লভেছে নতুন—
জীবনেরে করে পরিহাস।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে জতুগৃহ পুড়ে হ'লো ছাই—
সেই সব মুঠো মুঠো ছাই—
কংকালের আগ্নেয় নিশ্বাস
গলিত লাভার মত
দূর নভে নিয়ে যায়
এ পৃথ্বীর রিক্ত ইতিহাস।

আগুনের আঁচে কত ম'রে গেল
কত পুড়ে ছাই হ'লো;—
জীবনের শ্যামল সম্পদ
ধূলিশায়ী ঝটিকার কোপে,
আমাদের মত আজ বেঁচে গেল যারা
চিতার ছোঁয়াচ থেকে—
আষাঢ়ের কালো মেঘে তারা ভয় পায়;
হয়তো বা কখন্ সহসা
ঐ সব মেঘেদের বুকে
কালো আশা রাঙা হ'য়ে যাবে—
বজ্রের হুঙ্কারে আর আগুনের স্রোতে
পুড়ে যাবে এ পৃথ্বীর বনেদি প্রাসাদ!

সমস্ত আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘনীভূত হয়;
সৃষ্টিরে পিছনে রেখে
কোথা উড়ে কত দূরে আগুনের ঝড়—
হেথা ক্ষুদ্র বাতায়নে
ভীরু চোখে মোরা চেয়ে থাকি—
ব্যথিতের অভিশাপ ছেয়ে গেছে আকাশ বাতাস।
মাঝে মাঝে শুনি কাণ পেতে
অনাগত ভবিষ্যের দ্বারে—
পৃথিবীর কোলাহল থেমে গেছে যেন কত দূরে!
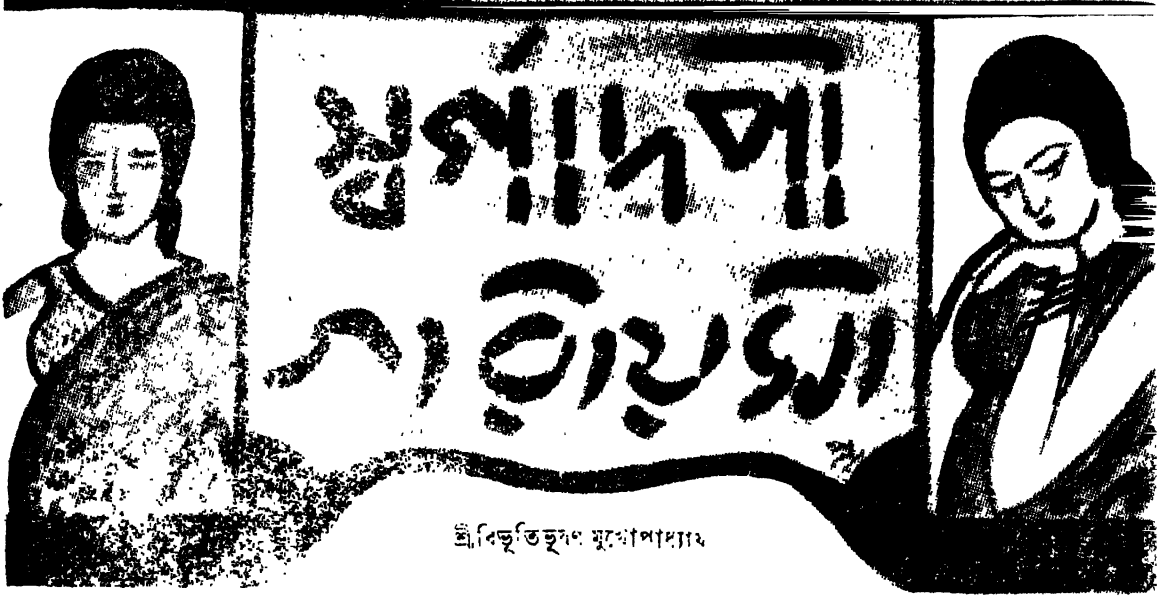
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের চুম্বক

প্রথম খণ্ড

বেলে-তেজপুরের স্নিগ্ধ পল্লী-আবেষ্টনীর মধ্যে গিরিবালাকে আমরা প্রথম দেখি খেলা ঘরে মায়ের রূপে। ছেলে একটি হাত-ভাঙা মাটির পুতুল; কিন্তু নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মাটির আর তাহারও উপর হাত-ভাঙা বলিয়াই মায়ের মনে আরও দরদ ফুটাইয়াছে। দুপুর গড়াইয়া যায় তবু বরদাসুন্দরী মেয়েকে ডাকিয়া আহারে বসাইতে পারিতেছেন না। অবস্থাটা এই রকম: গিরিবালার খেলার সঙ্গী ছোট ভাই হরিচরণ আর পাশের বাড়ির নন্তী। পুতুল গেল তো বাপ রসিকলাল আছেন, জ্যেঠা অন্নদাচরণ আছেন, ছেলের অভাব ঘটে না গিরিবালার। রসিকলাল মানুষটি আবার নিতান্তই ঢিলেঢালা, আপন-ভোলা গোছের। ডাক্তারি করেন, উপায়ও মন্দ নয়, কিন্তু নিতান্তই ভুল আর বে-হিসাবের জন্য এক দিকে দাদা অন্য দিকে স্ত্রী বরদাসুন্দরীর গঞ্জনার মধ্যে কাটাইতে হয়। এর উপর আবার কবিতা লেখার বাই আছে। সব মিলাইয়া এমন একটি অসহায় গোছের মানুষ—যাহার মায়ের মতোই একটি অবলম্বন নিত্য দরকার। গিরিবালা এই অভাবটি পূরণ করে, তা সে এত ভালো করিয়া যে, আসল মা বাঁচিয়া থাকিলেও ততটা সম্ভবপর ছিল না।

এই ভাবে বেলে-তেজপুরের নকল মাতৃত্বের যুগ বহিয়া চলিল। বয়সও একটু বাড়িল। বেলে-তেজপুরের বাহিরে যে একটা জগৎ আছে সে সন্ধান গিরিবালা প্রথম পাইল মামার বাড়ি সিমুরে গিয়া। জায়গাটি বেলে-তেজপুরের চেয়ে একটু বড়, এটা-ওটা পাঁচ রকম অনুষ্ঠান হয়; একটি বড় জগতের মধ্যে গিরিবালার মনটি হঠাৎ যেন একটু প্রসার লাভ করে। এতে আরও একটু সাহায্য করে মাসি কাত্যায়নীর আদর আর মামাত ভাই বিকাশের উপদেশ। কাত্যায়নী নিঃসন্তান, বিধবা, তাঁহার মনটি একেবারে গিয়া ছোট বোনঝিটিকে জড়াইয়া ধরিল। গিরিবালা যত দিন সিমুরে রহিল কাত্যায়নীর কাজই হইল তাহাকে ধোয়ানো, মোছানো, সাজানো, সঙ্গে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় দেখাইয়া ফেরা, বোনঝির প্রতি লোকের আদর ও প্রশংসা কুড়াইয়া বেড়ানো। প্রশংসা জিনিসটাই এমন যে নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেয়। ছেলেবেলার মনের ভাব স্পষ্ট নয়, তবু গিরিবালার মনে হয় বেলে-তেজপুরই সব নয়, জীবনে অনেক কিছু যেন পাওয়ার আছে, আর শ্রান্ত অন্তরে নাকি তিনি পাওয়ার যোগাও। অর্থে ও পরিজনে বিরাট পরিবারের অংশিনী চৌধুরী-গিন্নিকে দেখিয়া কতকটা যেন ধারণাও হয় মেয়ে হইয়া এই বিরাটত্বের জীবনের কি করিয়া অংশীদার হওয়া যায়। একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা জাগে। একে পরিপুষ্ট আর একটি বিশিষ্ট পথে নির্দিষ্ট করে বিকাশের লেকচার।

বিকাশ স্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র। পড়ার দিকে ভাল ছেলে, তদুপরি তাহার মাথায় আবার অনেকগুলি আইডিয়া আছে। এমন নিরীহ প্রায় অক্ষর-জ্ঞানহীন ভগিনী পাইয়া তাহার বিদ্যা জাহির করিবার স্পৃহা জাগে। টেবিলের উপর গাঁদ-করা বই দেখাইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে, যাদুকরের মতো সেই স্তূপ হইতে হঠাৎ অভিধানটা তুলিয়া লইয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া বলে—"পৃথিবীর মধ্যে যতো কথা আছে তুমি এর মধ্যে পাবে, নাম করো—যে কোন কথা।"

বিদ্যার বহরটা তাহার কিরূপ সেটা দেখান শেষ হইলে তাহার কিশোর মনের সব চেয়ে যাহা বড় থিয়োরী সেইটা আনিয়া ফেলে। গিরিবালাকে বড় হইয়া ভালো জননী হইতে হইবে। বিকাশ, নেপোলিয়ান, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী হইতে বোনকে শোনায়, বলে দেশ বড় করিতে হইলে ভালো মায়ের দরকার আগে, গিরিবালাকে বড় হইয়া এই সাধনা করিতে হইবে। বড়দের কাছে বিকাশের গুরু-গাম্ভীর্য্য যেমনই হালকা শোনাক না, নীরব শ্রোত্রী গিরিবালার মনে একটা কিছুর সুর তোলেই, তা সে যতই অস্পষ্ট হোক না কেন। হয়তো স্থায়ী সুর নয়, মিলাইয়া যায়; কিন্তু আবার আসে ফিরিয়া, অন্য একটা কিছুকেই আশ্রয়

করিয়া ;—খেলাঘরের পুতুলের স্মৃতি, বেলে-তেজপুরে একলা বাপ রসিকলাল—গিরিবালা কাছে নাই যে আগলাইয়া ফেরে ; আসিবার সময় দুলাল বাগ্‌দির স্ত্রী—রোগা মেয়ে কোলে রসিকলালের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে ; সেদিন যাত্রা দেখিতে গিয়া গিরিবালা দেখিল সপ্তরথী মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে বধ করিল, শুনিল সুভদ্রার কান্না—একে একে এই সব কথাগুলি মনকে অধিকার করিয়া বসে।···মায়ের সবটাই যেন বেদনা। এ-সবের পাশে জাগে চৌধুরী-গিন্নির পরিপূর্ণ সংসারের ছবি, বিকাশ দাদার গল্প,—বিদ্যাসাগর মায়ের কথায় ভরা বর্ষায় দামোদর নদ পার হইয়া গেলেন।···বেদনায়, আশায়, আকাঙ্ক্ষায় একটি অব্যক্ত চেতনা গিরিবালার কিশোর মনে ধীরে ধীরে রূপ ধরিতে থাকে।

মানুষের বিষয়-বুদ্ধি যে-পরিমাণে কাঁচা থাকে সেই পরিমাণে তাহার সাধ-আকাঙ্ক্ষাগুলো হয় বেশি উত্তুঙ্গ। রসিকলালের আকাঙ্ক্ষা ছিল গৌরীদান করিবেন, আকাঙ্ক্ষার পুষ্টিসাধন করিতেন পণ্ডিত মশাই। রসিকলালের মতো অতটা অবিমৃষ্য নয়, তবে আরও বেশি ভাবপ্রবণ। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাই ছিল, আয়োজন করার যে শক্তি আর দায়িত্ব-জ্ঞান দরকার সেটা তো আর ছিল না রসিকলালের। এক দিন ঘুম ভাঙিলে দেখা গেল, গৌরীদানের বয়স তো উৎরাইয়া গেছেই, এখন যে-কোন উপায়ে বিবাহ না দিয়া দিলে আর চলে না, কন্যা প্রায় এগারো-বারো বৎসরের হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে অন্নদাচরণও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। অথবা যতটা ব্যাকুল না হন তাহার চেয়ে বেশি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন স্ত্রী বসন্তকুমারীর গঞ্জনায়। বড় ভাই, দায়িত্ব তাঁহারই বেশি, অথচ চেষ্টা করিলেই যে রাস্তা বাহির হইতেছে এমন নয়, খাইয়া পরিয়া প্রয়োজন মতো অর্থ সংগ্রহ করিয়া ওঠাও একটা সমস্যা। আরও একটা কথা আছে, তবে সেটাকে নিতান্তই মনের এক কোণে, অতি সঙ্গোপনে রাখিতে হয়,—নয়নের পুতুলি ভাইঝিকে বিদায় করিবার চিন্তাতেই মনটা টনটন্ করিয়া ওঠে, যত যাবার সময় হইয়া আসিতেছে, নূতন নূতন তন্তু বাহির করিয়া গিরি যেন আরও নিবিড় করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। এক এক সময় আসে বৈ কি স্পষ্ট শিথিলতা, অন্নদাচরণ ভাবেন—যাক্ না এই করিয়া যটা দিন যায়।···ভাবেন কিন্তু মনের একেবারে সেই কোণটিতে—অতি সঙ্গোপনে!

দিন আগাইয়া যায়। একটি ছোট্ট পরিবারের সবার আদর আর দুশ্চিন্তার মধ্যে গিরিবালা এগারো থেকে বারো, বারো থেকে তেরোয় উপনীত হয়।

এই সময় আমরা দেখা পাই নিকুঞ্জলালের। নিকুঞ্জলালের কোন পূর্ব-পুরুষ এই গ্রামে আসিয়া অন্নদাচরণেরই এক পূর্বপুরুষের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হন। কোন পুরুষে সদ্ভাব কোন পুরুষে অসদ্ভাব এই করিয়া চলিয়া আসিতেছে, কোন পুরুষে আবার সদ্ভাব-অসদ্ভাব দুইটিই মেশামিশি করিয়া আছে। ফলে, জ্ঞাতি না হইয়াও দুইটি পরিবারের মধ্যে এক ধরণের জ্ঞাতিত্ব দাঁড়াইয়া গেছে। বাড়ি পাশাপাশি। সম্বন্ধে নিকুঞ্জ অন্নদাচরণের বড় ভাই।

লোকটি অতিরিক্ত ধূর্ত। উপরে অত্যন্ত মিষ্ট-মুখ, ভিতরে ভিতরে সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে; অর্থাৎ মিছরির ছুরির কারবারি। কাজ গুরুগিরি, মকর্দমার সাক্ষী, ঘটকালি; আরও যে এই ধরণের কত কি তাহা বেলে-তেজপুরের লোক ঠিক মতো জানে না। অন্নদাচরণ এড়াইয়া চলেন, তবে মিষ্ট কথায় ভুলিয়া মাঝে মাঝে দিতেও হয় ফাঁদে পা। গিরিবালার বয়স যেমন বাড়িতে লাগিল, অন্নদাচরণকে দূরদর্শী এবং নানা রকমে প্রভাবশালী নিকুঞ্জদাদার সাহায্য-প্রত্যাশী হইতে হইল। নিকুঞ্জর ফাঁদ তৈয়ারই ছিল।

এক দিন, যেন নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই সুদূর হরিহরপুরের জমিদার পাল্কি করিয়া নিকুঞ্জর বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকুঞ্জ তাহার গুরু, পরেশ গাঙ্গুলী গুরুগৃহে আসিয়াছে। লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, এক হিসাবে কদাকারই, সর্বদা একটি আধ-আধ ছেলে-মানুষী ভাব ফুটাইয়া রাখিবার চেষ্টা আছে। নিকুঞ্জ নিতান্ত উদ্দেশহীন ভাবে অন্নদাচরণকে ডাকাইয়া আনিয়া নিজে শিষ্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, আলাপ পরিচয় হইল, গুরুর ভাইকে গুরুর মতোই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া, প্রণামী প্রভৃতি দিয়া একেবারে দ্রব করিয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় হরিহরপুরের "রাজা" পরেশ গাঙ্গুলী চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্নদাচরণকে হরিহরপুরে একবার পদধূলি দিবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া গেল।

পরদিন নিকুঞ্জ অন্নদাচরণকে ডাকাইয়া আনিল। রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা লইয়া অন্নদাচরণ দোমনা হইয়াছিলেন—নিকুঞ্জ অনেক রকম বিষয়-বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে রাজি করিল—অত বড় একটা লোকের সহায়তা যখন অযাচিত ভাবে পাওয়া যাইতেছে তখন হেলায় হারান উচিত নয়; একটি মেয়ে ঘাড়ে, আরও হইতে কতক্ষণ।—তাহা ভিন্ন রসিকেরও এই সুযোগে যদি রাজবাড়িতে একটু প্রতিপত্তি জমিয়া যায় তো টাকা খায় কে?—ইত্যাদি। সব শেষে নিকুঞ্জ জানাইল তাহার তলে তলে আরও একটি মতলব আছে, কিন্তু সে কথা পরে।

অন্নদাচরণ গেলেন, রাজার অমায়িক ব্যবহারে আরও দ্রব হইয়া, তদুপরি বেশ মোটা রকম একটা প্রণামী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বেশ ভালো ভাবে মুঠার মধ্যে করিয়া একদিন নিকুঞ্জ আসল কথাটা পাড়িল। পরেশ গাঙ্গুলীকে বিবাহে রাজি করিয়াছে, সব ঠিক-ঠাক, এখন অন্নদা রাজি হইলেই হয়।

অন্নদাচরণ কখন এ দিক্‌টা ভাবিয়াও দেখেন নাই; দোজবরে কদাকার, তদুপরি অবস্থারও এই অসম্ভব তারতম্য, একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সময় চাহিলেন। কিন্তু এই মূঢ়তার অবস্থাই তো নিকুঞ্জের সুযোগ, আবার নূতন করিয়া বিষয়-বুদ্ধি দিল, কিন্তু সময় দিল না; পাকেচক্রে সেই দিনই অন্নদাচরণের মত আদায় করিয়া লইল।

এদিকে আর একটি ফিকড়ি বাহির হইয়াছে। বোনঝিটিকে পাইয়া অবধি কাত্যায়নীর ভিতরে ভিতরে সংসারের ক্ষুধা জাগিয়াছে। তিনি একদিন আসিয়া বসন্তকুমারীকে ধরিয়া তাঁহার দেওরপোর জন্য গিরিবালাকে চাহিয়া লইলেন। সে এক অপদার্থ গ্রাম্য যুবক। এ ব্যাপারটা কিন্তু বেশি দূর গড়াইল না। কাত্যায়নীর ভালোবাসাটা ছিল একেবারেই খাঁটি, বিধবার অপূর্ণ সাধ তাঁহার মধ্যে একটা ক্ষণিক বিভ্রম আনিয়াছিল, কিন্তু সিংহবাহিনী দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়া তিনি নিজের লালসার ভীষণতায় নিজেই ক্ষুব্ধ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন; ফিরিয়া আসিয়া সিমুরে যাত্রা করিবার মধ্যে এক রকম

আঁচলের গেরোয় বাঁধা রতনই বসন্তকুমারীকে ফিরাইয়া দিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইলেন। গিরিবালা নিষ্কৃতি পাইল।

বিবাহের আলোচনা এদিকে রসিক আর পণ্ডিত মশাই এই দুই গুরুশিষ্যের মধ্যেও চলিতেছে। কেহই পরেশ গাঙ্গুলী-সংক্রান্ত ব্যাপারটা জানেন না। পণ্ডিত মশাই লোকটি উদার প্রাণ, কাব্যরসিক সেকেলে পণ্ডিত, স্কুলে রসিকলালদের হেড-পণ্ডিত ছিলেন, তাহার পর দূরের টানে নবদ্বীপ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি কয়েক জায়গায় চাকরি করিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। সংসারে নিজে আর স্ত্রী। মনটি বড়ই স্বচ্ছ, শিষ্যকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন, এখন আবার নূতন একটি স্নেহের ধারা গিয়া পড়িয়াছে নাতনি গিরিবালার উপর। গণনা করিয়া জানিয়াছেন গিরির জন্ম না কি দেবী-অংশে, বিবাহও ঐ ভাবেরই হইবে, ইহার আর খণ্ডন নাই। এ সব কথা বাহিরে যায় না, গেলে লোকে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া হয়তো ধরিত; কিন্তু গুরুশিষ্যে অটুট শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসে নিজেদের কল্পলোক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

কাত্যায়নী'র প্রস্তাবে রসিকলাল নিজেও রাজি হইয়াছিলেন, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাই তো? যখন ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল তাড়াতাড়ি গুরুকে খবর দিতে আসিলেন। পণ্ডিত মশাই ইহার পূর্বে নিতান্ত দৈবক্রমেই একটি সম্বন্ধের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কাত্যায়নীর প্রস্তাবের সংবাদে রূঢ় আঘাত পান, কিন্তু সব ঠিক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শিষ্যকে আর সেই নূতন সম্বন্ধের কথা বলিয়া অধিকতর ক্ষুব্ধ করিতে চাহেন নাই। এইবার মনের আনন্দে সব বলিলেন। ব্যাপারটা এই:—

এইবার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি হইতে ফিরিবার সময় গাড়িতে তাঁহার বহু পূর্ব-পরিচিত একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বাড়ি সাঁতরায়—কিন্তু বহু দিন হইতে সুদূর মিথিলায় একটি নীলকুঠিতে কাজ করিতেছেন। পূর্বে দেখা হয় পণ্ডিত মশাই যখন উজ্জয়িনী যান। এবার সাক্ষাৎ হইতে জানাইলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাঁতরায় থাকে, তাহার বিবাহ দিয়া কর্মস্থানে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। একটি ভালো পাত্রীর সন্ধান পণ্ডিত মশাইকে দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অতি সুপুরুষ বিচক্ষণ ব্যক্তি, পণ্ডিত মশাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, এঁর পুত্রই গিরিবালার জন্য দৈবনির্দিষ্ট পাত্র। গিরিবালার কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে একরূপ রাজিই করাইয়াছেন পণ্ডিত মশাই। রসিকলাল গিয়া একবার দেখা করিয়া ঠিক-ঠাক করিয়া আসুন।

পরদিনই একটা চিকিৎসার পরামর্শে কলিকাতায় যাইবার নাম করিয়া রসিকলাল সাঁতরায় গেলেন। কোষ্ঠীর এত চমৎকার মিল হইল যে পাত্র বিপিনবিহারীর জ্যেঠা ভগবতীচরণ এবং পিতা মধুসূদন দুজনেই তিন দিনের মধ্যে বিবাহ ধার্য্য করিয়া ফেলিলেন। কন্যা-আশীর্ব্বাদ, বিবাহ—এক দিনেই সব। রসিকলাল অমত করিবার লোকই নন, জীবনে এত বড় সাফল্যপূর্ণ অভিযান তাঁহার আর হয় নাই। সব ঠিক-ঠাক করিয়া বিজয়-গর্ব্বে ফিরিলেন।

ফিরিতেই অন্নদাচরণ ডাকিয়া পাঠাইলেন, রসিকলাল উপস্থিত হইলে আনন্দ সংবাদটা জানাইলেন—হরিহরপুরের রাজার সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, শুভস্য শীঘ্রম্, রাজা-রাজড়ার মেজাজ তো? কখন হুট করিয়া বদলাইয়া যায় বলা যায় না—পরশুই তাহারা আশীর্বাদ করিতে আসিতেছে।

—অর্থাৎ রসিকলাল সেদিন সাঁতরায় বিবাহ পাকা করিয়া আসিয়াছেন! প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া রসিকলাল একটু দাঁড়াইয়া রহিলেন, দাদার সামনে কখনও মুখ তুলিয়া কথা কহিবার সাহসই হয় নাই। "বেশ হয়েছে" বলিয়া যন্ত্রচালিতের মতো ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। সাঁতরার সম্বন্ধের কথা আর দাদাকে বলা হইল না।

এইবার হারাণের পরিচয়টা দেওয়া একটু দরকার। হারাণ পরামাণিক রসিকলালের চাকর। স্কুলযুগে ছিল রসিকলালের খেয়ালের সঙ্গী, এখন রসিক যখন ফকরে ঘোড়াতে চড়িয়া প্র্যাকটিস করিতে যান, মাথায় ঔষধের ব্যাগটা লইয়া হারাণ পাশে পাশে চলে, নানা রকম সুখ-দুঃখের কথা হয়। রসিক রোগী দেখিতে ভিতরে গেলে শ্রোতার দল সৃষ্টি করিয়া লইয়া ডাক্তারদা'র প্র্যাকটিস আর নিজের প্রতিপত্তি লইয়া লম্বা-চওড়া হাঁকড়ায়। বাড়িতে আসিয়া রসিক ঘুড়ি ছাড়িয়া দিলে, হারাণ ঘাস-জল দিয়া ডলাই-মলাই করে। নিজের পরিচয় দেয় ডাক্তারদাদার "কম্পুণ্ডার"। তেমন দরকার হইলে বুক দিয়া পড়ে। আবার তেমন অবস্থা হইলে মুখে কিছু আটকায়ও না। সে যাই হোক, হারাণ কিন্তু কাজের লোক।

রসিকলাল বিশবাঁও জলে পড়িলেন। দুইটি দলের সংঘর্ষে কী সে উৎকট অবস্থাটা দাঁড়াইবে ভাবিয়া আর কূল পান না। কাহাকেই বা বলেন, কী-ই বা ব্যবস্থা হয়? পণ্ডিত মশাইয়ের কথা মনে পড়িল। গিয়া তাঁহার স্ত্রীর কাছে শুনিলেন, তিনি হঠাৎ মেয়ের বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। রসিকলাল একেবারে পাগলের মতো হইয়া বাড়ি ছাড়িয়া ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন। অবশেষে হারাণের কথা মনে পড়িল।

গভীর রাত্রে রসিকলাল বাল্যবন্ধু হারাণের বাড়ি গেলেন। হারাণ সব শুনিল, তাহার পর বলিল, এই তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য এত ঘোরাঘুরি! নিশ্চিন্ত হইয়া রসিক বাড়ি ফিরিলেন।

হারাণের খুড়শ্বশুর মার্টিনের লাইনে ডোমজুড় ষ্টেশনে হোটেল চালায়। অত্যন্ত খলিফা লোক, তাহার অসাধ্য কাজ নাই। কী গভীর চক্রান্তে সে হরিহরপুরের দলের যাত্রা মাটি করিল সে একটি আলাদা কাহিনী, অল্প কথার গণ্ডির মধ্যে আসে না। মোটের উপর তাহাদের গুষ্টির থাল পারাইয়া আর বেলে-তেজপুরের মুখ দেখিতে হইল না।

আশীর্বাদের ব্যবস্থাটা বেশ বড় করিয়াই করা হইয়াছে, একটি মাঝারি রকমের ভোজেরই ব্যাপার, রাজার মর্যাদা জড়িত তো? কিন্তু সকাল হইয়া গেল, দুপুর হইয়া গেল, লোক আর কেহ আসে না। নিকুঞ্জর ভগিনী দামিনী ভাইয়ের মতো এক ধাতুতেই গড়া। বলিয়া ফিরিতে লাগিল অন্নদা, বিশেষ করিয়া 'বিটলে বামন' রসিক কোন কু-চাল চালিয়াছে।···নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হইতে লাগিল এবং উৎসবের বাড়িতে বিপদের ছায়া ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। নিকুঞ্জই পাণ্ডা, তাহারই উদ্দেশ্য পণ্ড হয়, সে দু'-এক জন লোক সঙ্গে করিয়া ডোমজুড় ষ্টেশনের দিকে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিল।

গিরিবালার প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিবার বয়স নয়, তবু এইটুকু ভালো করিয়া বুঝিল যে, তাহাকে ঘিরিয়াই বাড়িতে এই অনর্থের সৃষ্টি। সমস্ত দিন গা-ঢাকা দিয়া বেড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; এক সময় গিয়া জ্যেঠাইয়ের ঘরে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিল।

বসন্তকুমারীর বিবাহটা একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল, কিন্তু তিনি নিরুপায়, ভিতরে ভিতরে গুমরাইতেছিলেন, একটু আগে বিছানা আশ্রয় করিয়াছেন। গিরিবালাকে কাছে টানিয়া গভীর সহানুভূতিতে পিঠে হাত বুলাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ "বর এসেছে! বর এসেছে! কি সুন্দর বর—খোট্টা চাকর!"—বলিয়া একটি তুমুল কলরব উঠিল; এবং আনন্দ সংবাদটা দিতে ছেলের ও বড়র একটা দল আসিয়া বসন্তকুমারীর দরজার সামনে দাঁড়াইল, সামনে কাত্যায়নী, তিনি এইমাত্র সিমুর হইতে আসিয়াছেন। সিংহীর মতো গিরিবালাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বসন্তকুমারী উগ্রভাবে উঠিয়া বসিলেন; আর কাহাকেও না পাইয়া কাত্যায়নীর উপরই আক্রোশ মিটাইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন—"নিজে গিলতে পারলিনি, দেখতে এসেছিস অন্য কোন্ রাক্ষসের পেটে গেল?···ডাক, কে আমার কাছ থেকে গিরিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাকে!···"

এমন সময় আনন্দে প্রায় পাগলের মতো হইয়া অন্নদাচরণ নিজে ছুটিয়া আসিলেন,—অসংলগ্ন কথা—"ওগো শুনছ?··· রাজপুত্তুর এনেছে রসিক—রসিক নিজে—আজই বিয়ে!···আশীর্বাদ পর্য্যন্ত সেরে এসেছ!···"

কাজের বাড়ি, সব আয়োজনগুলা শুধু বাড়াইয়া দেওয়া হইল। অন্নদাচরণদের শুভাকাঙ্ক্ষী ঘোসাল কাকা বুক দিয়া পড়িলেন। নিকুঞ্জর উপর সকলেরই শ্যেনদৃষ্টি, কিন্তু অন্নদাচরণ যাচিয়া কাঁদে পা দেওয়ায় সকলকেই নীরব থাকিতে হইয়াছিল, এইবার তীব্র মন্তব্য ও তর্জনের একটা ঝড় উঠিল। নিকুঞ্জ অবশ্য সেদিন আর ফিরিল না! ভগিনী দামিনীও এক সময় চুপি চুপি বাহির হইয়া গিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করিতে বসন্তকুমারীর একটু সময় লাগিল; অত বড় নিরাশার পরই এই আনন্দ—সহজে মন যেন বিশ্বাস করিতে চায় না।···তাহার পরও সব আনন্দের মধ্যে বুকে একটি কাঁটা যেন খচখচ করিতে লাগিল—কাত্যায়নীর মতো মানুষকে অসংযমের মাথায় অতটা গঞ্জনা দিলেন।

কাত্যায়নী কিন্তু এ-সবের অনেক উর্দ্ধে, বোনঝির বিবাহের আনন্দে সমস্ত মন ঢালিয়া দিয়াছেন,—তাহার কোথাও এতটুকু গ্লানির লেশমাত্র নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড

গিরিবালার নূতন জীবনে সাঁতরার গঙ্গার ঘাটটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জলে আর দুই কূলে জীবনের বিচিত্র চাঞ্চল্য লইয়া গঙ্গা যেন তাঁহার মনকে একটা বড় কিছুর দিকে দ্বিতীয় বার উন্মুক্ত করিয়া দিল; প্রথম বার দিয়াছিল সিমুর; প্রভেদ এই—গঙ্গা আরও বেশি করিয়া দিল।

প্রথম বার আসিয়া সাঁতরার মাসখানেকের জীবনটা কাটিল একটা অদ্ভুত ধরণের নূতনতর চেতনায়;—পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, নূতনের সহিত পরিচয়—একটা মিশ্র অনুভূতি। আদর-যত্নের সীমা নাই। জ্যেঠ-শ্বশুর অত্যন্ত শুচিবাইগ্রস্ত পণ্ডিত মানুষ, শুচিতা লইয়াই মেজাজ খুব খিটখিটে, শুধু বাড়ির লোকই নয়, পাড়ার সকলেও সদা সন্ত্রস্ত; বধূ আসিতে দেখা গেল, এই শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যেও কোথায় রসটা লুকান ছিল, উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন। ভয় ছিল ননদ লইয়া—"ননদিনী বাঘিনী" লইয়া মেয়েদের ভয়টা সবচেয়ে বেশি, জ্যেঠতুত ননদিনী মনোমহিনী দেখা গেল সেই রকম; প্রখরা, ঠিক কলহপ্রিয়া না হোন, কলহে মোটেই পেছপা নয়, বাড়িতে একমাত্র মানুষ যাহার কাছে পিতা ভগবতীচরণকে নরম থাকতে হয়। গিরিবালার অদৃষ্টে ইনিও সুপ্রসন্না বরদাদেবীরূপেই অবতীর্ণা হইলেন, এক কাত্যায়নী ছাড়া আর কাহার কাছেও গিরিবালা এত আদর পান নাই।

এই আনন্দ-অনুভূতির মধ্যে হঠাৎ একটা উৎকট বিষাদের সুর উঠিল। শক্তিচর্চা লইয়াই বিপিনবিহারীর অর্দ্ধেক জীবন। বৌভাতের দিনের কথা; গঙ্গায় সাঁতার কাটিতেছিলেন, ঢেউ খাওয়ার লালসায় হোরমিলার কোম্পানীর জাহাজের নীচে পড়িয়া যান অদ্ভুত সন্তরণ-কুশলতায় এবং কতকটা দৈবানুগ্রহে কোন রকমে বাঁচিয়া যান। কয়েক মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু খবরটায় কাজের বাড়ি তোলপাড় করিয়া দেয়। বাঁচিয়া যে গেলেন তাহার যশটা স্বভাবতঃই গিরিবালা পাইলেন, তাঁহারই কপালের সিঁদূরের জোরে ফাঁড়াটা কাটিল, পরিবারে এবং গ্রামেও তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

সাঁতরায় আর যাহাদের সঙ্গে পরিচয় হইল তাহাদের মধ্যে দেবর চণ্ডীচরণ আর মনোমোহিনীর পুত্রবধূ—খেন্তনের বৌ! চণ্ডীচরণ বয়সে বোধ হয় একটু ছোট, স্কুলে পড়ে, বড় বড় গল্প করিয়া, ভাজকে সীতার বনবাস শুনাইয়া নিজে সে নিতান্ত তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের লোক নয়, প্রমাণ করিতে ব্যস্ত থাকে। খুব ভাব হইল। খেন্তনের বৌটি আবার বড় নিরীহ রুগ্ন গোছের। দুজনেই দুই ভাবে গিরিবালার সেই মাতৃত্বকে আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল। এটা হইল নিত্য সাহচর্যের ফল। তাঁহার ভিতরের মা'টিকে বিস্ময়ে আর বেদনায় জাগাইয়া তুলিল আরও দুইটি আকস্মিক অভিজ্ঞতা। সাঁতরার শীতলা দেবীর মন্দিরে যাইতে যাইতে দেখিলেন, সন্তানের কল্যাণে একটি স্ত্রীলোকের দণ্ডী কাটা,—গঙ্গার ঘাট হইতে মন্দির পর্য্যন্ত দীর্ঘ-পথ ধরিয়া এই কঠোর ব্রত, তাহার পাশেই আবার মন্দিরে গিয়া দেখিলেন, একটি খুব বড়-ঘরের বধূ নিজের চঞ্চল ছেলের উপর বিরক্ত হইয়া মন্দিরে বসিয়াই তাহাকে গালাগালি দিতেছে। দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের ব্যাপার তাঁহার মনটা খুবই প্রবলভাবে নাড়া দিল।

এ সবের অতিরিক্ত সময়টা কাটিত হারাণের বৌ আর জ্যেঠতুত ভাই সাতুর সঙ্গে, বাপের বাড়ি হইতে সঙ্গে আসিয়াছে। হারাণের বৌ বেশ রহস্যপ্রিয়া; সাতু জীবনটাকে খুব গম্ভীর ভাবে দেখে; একটু চিন্তিত হইলেই বলিয়া ওঠে—"উরে ব্বাস্ রে!"

ষোল দিন পরে গিরিবালা যখন বেলে-তেজপুরে ফিরিলেন, দেখিলেন, পুরান বেলে-তেজপুর অনেকটা নূতন হইয়া গেছে যেন! বেশি দিন থাকা চলিল না। মধুসূদনকে কর্মস্থান পাণ্ডুয়ায় চলিয়া যাইতে হইল। বিপিনবিহারীও বেশি দেরি করিতে পারিলেন না। কয়টা দিন ভালই কাটিল, গ্রামের নব-বিবাহিত কন্যা, কয়েক জায়গায় নিমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণেই কাটিল, এক দিন নিকুঞ্জর বাড়িতেও। সব চেয়ে জমিল পণ্ডিত মশায়ের বাড়িতে। পণ্ডিত মশাই রসিক-লালের অনুগত দুলাল বাগ্দীর পরিবার-সুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া একটি ছোটখাট ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। রন্ধনের অন্নপূর্ণা হইলেন গিরিবালা, সঙ্গে রহিল তাঁহার সঙ্গিনী, নিকুঞ্জের কন্যা নন্তী, আর হারাণের বৌ; পণ্ডিত মশাইয়ের স্ত্রী রহিলেন অন্তরালে।

রসিকলালের বাড়িরও সবাই নিমন্ত্রিত ; একটা পুরা-দিন খুব হুল্লোড় হইল। তাহার পর পাণ্ডুল যাত্রা—সুদূর মিথিলায় প্রবাস-জীবন, একেবারে একটা অন্য ধরণের অভিজ্ঞতা।

পাণ্ডুলে মাত্র একটি বাঙালী পরিবার,—মধুসূদনের। আর সবই মৈথিল। প্রথমটা হাঁফ ধরিয়া গেল, তাহার পর আবার ক্রমে সহিয়াও গেল, এক সময় ভালও লাগিল। জীবনের তো ধারাই এই। পরিবারের মধ্যে শ্বশুর, শাশুড়ি নিস্তারিণী দেবী, দেবর চণ্ডীচরণ, ননদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিরাজমোহিনী, মোতিবালা, ত্রিনয়নী, অভয়া। বিরাজমোহিনী বিবাহিতা, বয়সে গিরিবালার চেয়ে একটু বড়। মোতিবালা প্রায় গিরিবালার বয়সী, ত্রিনয়নী বছর আষ্টেকের, অভয়া কোলে। এখানে একেবারে কড়া অবরোধ—মাত্র ত্রিনয়নীর বাহিরে যাওয়ার অধিকার আছে।

নিস্তারিণী দেবী স্বল্পভাষিণী তীক্ষ্ণধী স্ত্রীলোক। অবরুদ্ধ থাকুন, কিন্তু সংসারের সর্বেশ্বরী। এ দিকে খুব ধর্মশীলা। একে মধুসূদন কুঠীর প্রায় সর্বেসর্বা তার পরিবারটিও স্বধর্মনিষ্ঠ, "মধুবাবু"র পরিবারের সমস্ত অঞ্চলটাতেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। পুরুষের মধ্যে আর আছেন কৈলাসচন্দ্র, মধুসূদনের ভাগিনেয়, কুঠীতেই কাজ করেন।

বাড়িতে দাসদাসীর বাহুল্য আছে, এক দিক্ দিয়া তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট খঞ্জনী দাসী। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, দাঁত উঁচু, গোল গোল শাদা শাদা চোখ, অটুট স্বাস্থ্য, বয়স সতের-আঠার। ওর কাজ ছেলে-মেয়েদের সামলান, দশ বছর ধরিয়া এক কাজ করিতেছে—মোতিবালা হইতে আরম্ভ করিয়া। অদ্ভুত মায়া বসিয়া গেছে তাহার, শ্বশুরবাড়ি থাকিতে পারে না, পলাইয়া আসে। সমস্ত জীবনটা নিঃসন্তান বহিয়া গেল।

বাহিরে যাহাদের সঙ্গে সখ্য হইল তাহার মধ্যে মুখ্য দুলারমন, প্রতিবেশী মৈথিল ব্রাহ্মণের কন্যা, বিবাহিতা। সুন্দরী, সদাহাস্যময়ী রহস্যপ্রিয়া। দুলারমনের আর একটা দিক্ তাহার মনের প্রসারতা, নূতনকে গ্রহণ করিবার জন্য দুলারমন সদাই উন্মুখ, বাঙালীদের জীবনে যেটিই ভালো দেখে—চুলবাঁধা-পদ্ধতি থেকে জীবনের খুটিনাটি—সেটির উপরই গিয়া তাহার দৃষ্টি পড়ে। বাপের মনটাও একটু উন্মুক্ত,—কন্যার স্কুলের ইংরাজী-পড়া ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে। তাহা হইলেও প্রশংসা করিয়াই দুলারমনকে ক্ষান্ত হইতে হয়, গ্রহণ করিবার তো জো নাই।

এই আবেষ্টনীর মধ্যে গিরিবালাকে একাদিক্রমে চার বৎসর থাকিয়া যাইতে হইল প্রথম বার। সেকালে পুরাপুরি রেল হয় নাই, নানা অসুবিধা তো ছিলই, তাহা ভিন্ন একটা না একটা বাধা উপস্থিত হইলই। চার বৎসরের মাথায় প্রথম সন্তান শশাঙ্ককে কোলে লইয়া গিরিবালা বাপের বাড়ি আসিলেন।

একটা বিরাট্ মুক্তি, চার বৎসর পরে মুক্তভাবে বেড়ান, চারি দিকেই বাংলা কথা শোনা, মুক্তকণ্ঠে শুধুই বাংলা বলা, এও যেন একটা নূতন জীবন। গিরিবালা অসুখে পড়িয়া যাওয়ায় বিপিনবিহারীকে পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিতে হইল, গিরিবালা বেলে-তেজপুরেও প্রায় পাঁচ মাস রহিয়া গেলেন, যাওয়ার মুখেই সাঁতরাটা সারিয়া লইয়াছিলেন।

আরোগ্যলাভ করিয়া এক দিন সিমুরে গেলেন। সিমুরের এক দিক্ দিয়া উন্নতি হইয়াছে, বিকাশ দাদার বিবাহ হইয়াছে, স্কুলে চাকরি হইয়াছে, তিনি তাঁহার বড় আদর্শ আর লোকসেবাব্রত লইয়া থাকেন। বেশ কাটিল, কিন্তু বড় চোট লাগিল গিরিবালার যখন কাত্যায়নীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি আর এখানে থাকেন না। দেওরপোর বিবাহ দিয়া সংসার পাতিবার নেশায় মাতিয়া ছিলেন, নিরাশ হইয়া তাঁহার অত রূপ, অমন মন, অত ভালবাসিবার ক্ষমতা সব গেছে ; চোখের দীপ্তি তিক্ত, বিষাক্ত, ক্ষুধিত —সব যেন বিকৃত হইয়া গেছে। কারণটা খুব সোজা : বিকাশের কথায় বলিতে গেলে—কাত্যায়নী মেয়ে হইয়াও মেয়ে হওয়ার সার্থকতা পান নাই জীবনে। কেবলই হাতড়াইতে হাতড়াইতে নিরাশ হইতে হইতে শেষে অপদার্থ দেওরপোর বিবাহ দিয়া সংসার পাতিয়া ওঁর ঐ পরিণতি।

পাঁচ মাস পরে পাণ্ডুলে ফিরিয়া গিরিবালা প্রথমেই এক দুঃসংবাদ শুনিলেন। দুলারমন তাঁহার সামনেই শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়াছে, একরূপ বিতাড়িত হইয়াছে বলাই চলে, কেন না, তাহার স্বামী তাহারই গহনা লইয়া পলাইয়াছে। ছেলেটি বরাবরই একটু বারমুখো ছিল, অনেকে বলিল কলিকাতায় গিয়াছে অনেকে বলিল জাহাজের খালাসী হইয়া বিলাত চলিয়া গেছে। এক দিন দুলারমন আসিল ; অমন সোনার প্রতিমা একেবারে কালি হইয়া গেছে, গর্ভে একটি সন্তান আসিয়াছিল, গঞ্জনা নির্য্যাতনে সেটি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গেছে। হাসি দিয়া চাপা দিবার চেষ্টাতেই মনের দুঃখ যেন আরও উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

পাণ্ডুলের জীবন আবার পুরাতন খাতে বহিয়া চলিল। গিরিবালা আর একটি পুত্র-সন্তানের জননী হইলেন। বছর তিনেক গড়াইয়া গেল ; ইতিমধ্যে দুই বার দেশও ঘুরিয়া আসিলেন, এক বার ছোট ভাই কিশোরের পৈতায়, আর এক বার মোতিবালার বিবাহে।

তাহার পর বাড়ীতে অকস্মাৎ একটি বিপদপাত হইল। মধুসূদনের বাগানের সখ ছিল, এক দিন আফিস থেকে আসিয়া বীজ মটরের শিশি খুলিতে গিয়া বোতলের মুখটা হঠাৎ ভাঙিয়া গিয়া তাঁহার ডান হাতের দুইটা শিরা কাটিয়া গেল। কুঠীর সাহেবের সাহায্যে প্রাণটা কোন রকমে বাঁচিল কিন্তু ডান হাতটি বেকার হইয়া গেল, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া কুঠীর কল্যাণে যে কলম চালাইয়া আসিয়াছেন তাহাকে আর তুলিয়া লইতে হইল না।

সাহেব অনুগত সহকারীর জন্য সবই করিল ; আগের মাহিনাতেই তাঁহাকে পরামর্শদাতা করিয়া রাখিল। বিপিনবিহারীর চাকরি পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এদিক্ দিয়া খুব অসুবিধা হইল না ; কিন্তু দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় মধুসূদনের শরীর ভাঙিয়া পড়িল। জীবনে যা উপার্জ্জন করিয়াছেন দান-ধ্যানেই গিয়াছে ; পূর্ণ স্বচ্ছলতা আর প্রবল প্রতিপত্তির মধ্যে কখনও ভাবিতে পারেন নাই—একটা সময় আবার এই করাল মূর্ত্তিতেও আসিতে পারে। এদিকে কুঠীর অবস্থাও খারাপ হইয়া আসিতেছে। চিন্তায় চিন্তায় শেষে মধুসূদনের হৃদ্‌রোগ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গেই বিপিনবিহারী সবাইকে লইয়া চিকিৎসার জন্য সাঁতরায় চলিয়া গেলেন। কয়েক দিনের চিকিৎসার পর অবস্থা অনুকূল বলিয়া মনে হইল। তখন আবার সংসারের ভাবনা পড়িল। চাকরি আর শক্তির উপর নয় ; মাসখানেক গেলে মধুসূদন এক রকম জোর করিয়া বিপিনবিহারীকে পাণ্ডুলে পাঠাইয়া দিলেন। রোগীর শুধু দুশ্চিন্তাই বাড়িতেছে দেখিয়া অন্য সকলেও

জোর দিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপিনবিহারীকে পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিতে হইল, খালি পিতার সেবা লইয়াই সাঁতরায় ছিলেন, তাই বিদায়টা আরও মর্ম্মঘাতী হইয়া উঠিল। তবু বড় ছেলের দায়িত্ব।

ফিরিয়া আসিয়া কয়েক দিন পরে টেলিগ্রাম পাইলেন মধুসূদন আর ইহজগতে নাই।*

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পর্য্যায়

১

মাকে শৈলেনের প্রথম মনে পড়ে একটি বর্ষার সন্ধ্যায়। সব মিলাইয়া যেমন মনে হয়, ওর নিজের বয়স তখন বোধ হয় সাত থেকে আটের মধ্যে। ওর ছোট ভাই অভি একটু জ্বর-জ্বর গোছের ছিল; মা তুলসীমঞ্চের সামনে দাঁড়াইয়া তাহার মাথাটা মঞ্চের আলসেতে আলগা ভাবে চাপিয়া প্রণাম করাইতেছেন—বিশ্বাস, ঐ করিলে অভি নীরোগ হইয়া যাইবে। শৈলেন ওদিককার ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—"মা, আমিও।"

প্রণামের জন্য নয়, যদিও সেটাও একটা কম হুজুগ নয় সে-বয়সে, আসল কথা তুলসীর মাটি খাইতে হইবে। মূলে পাকা করিয়া শুকাইয়া গিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া বেশ সোঁদা সোঁদা গন্ধ আনে, শৈশব-রসনার কাছে খুব একটা উপাদেয় বস্তু। মঞ্চটা উঁচু, তাই মায়ের উপর নির্ভর।

"তা হ'লে আয় শীগ্‌গির"—বলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই এক ঝলক আলো কোথা হইতে আসিয়া মা'র মুখের উপর পড়িল।

"ও মা। এখনও সূয্যি ডোবেনি,—আর আমি এদিকে সন্ধ্যে জ্বেলে বসলাম!"—বলিয়া মা আকাশের পানে চাহিলেন, মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে অল্প অল্প হাসি লাগিয়া আছে,—যেন সূর্য্যদেবের এই লুকোচুরির জন্যই।

ঠাকুরমা পশ্চিমের দাওয়ায় মালা জপিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"পশ্চিম দিকে মেঘটার বুঝি গোড়া কেটে গেল?"

আরও কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ে,—কোন কোনটাতে শুধুই মা আছেন, কোনটা মায়ের সঙ্গে অল্প-বিস্তর জড়িত, কোনটা বা সম্পূর্ণই আলাদা।...একবার কি একটা দুষ্টামির জন্য শৈলেনের উপর রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন,—একটা পা সামনে বাড়ানো, ডান হাতটা উঁচানো, মুখে হাসি ...পূর্ব্বে বোধ হয় কোথাও বলা হইয়াছে, গিরিবালার রাগের সঙ্গে হাসির একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল, ওঁর নিজের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বোধ হয়।

খজনীর কথাও খুব বেশি করিয়া মনে পড়ে। গোল-গোল চোখ, দাঁত একটু উঁচু, অসম্ভব রকম কালো; কিন্তু কি অসম্ভব রকম ভালো লাগিত খজনীকে! তখনকার জীবনে সেই যেন ছিল সব কিছু। শৈলেনের স্মৃতিটা যখন থেকে একটু স্পষ্ট সে সময় একেবারে কোলের ছেলে বলিতে ওর ছোট ভাই অভি, মাঝখানে আর একটি ভাই হবেন, সেও বড় হইয়া খজনীর কোল ছাড়িয়াছে। তাহার মানে শৈলেনের সঙ্গে খজনীর আর কোন সম্পর্কই না থাকবার কথা। একটি করিয়া শিশু আসিতেছে, খজনীর কোল অধিকার করিতেছে, বড় হইয়া পরের শিশুটিকে জায়গা ছাড়িয়া দিতেছে, খজনী আবার নবাগতকে অন্তরের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে—এই ছিল খজনীর জীবনের ইতিহাস। ক্রমাগতই বিদায় দিতে দিতে ওর স্নেহ বিদায় দেওয়ায় যেন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, শুধু শৈলেন আসার কোথা ব্যতিক্রম ঘটিল। স্নেহ তো একটা অভ্যাস নয়;—যখন মনে হয় যে একটা অভ্যাসের পথ ধরিয়া সামনেই চলিয়াছে, হঠাৎ দেখা যায় তাহার সাধ হইয়াছে একটিকে আশ্রয় করিয়া বাসা বাঁধিবার। তাই, মাঝে অনেক শিশু আসিয়া গেল, কিন্তু শৈলেনের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘোচে নাই খজনীর। শিশু আর কিছু না চিনুক, স্নেহ চেনে; নবপরিত্যক্ত স্বর্গের স্বাদ আছে কি না তাহাতে; তাই শৈলেনেরও খজনী না হইলে এক দণ্ড চলিত না, সেই অন্ধকার মূর্ত্তি এক দণ্ড না দেখিলে তাহার নিজের চোখের আলো যেন নিবিয়া যাইত।

খজনীর মতো মিষ্ট ছিল খজনীর বাড়ির মেড়ুয়ার রুটি। প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা ছোট একখানা চাটুর মতো কালো রঙের রুটি তাহার বাড়িতে খুব নীচু চাঁচা-বেড়ার ঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসাইয়া খজনী খাইতে দিত, সঙ্গে থাকিত একটু শাক, কি বেগুনের একটা তরকারি—টকে, ঝালে, নুনে গরগরে; কখনও বা চুনো মাছ।... বেশ মনে পড়ে শৈলেনের,—খজনী নিজে খাইতেছে, ভাঙিয়া ভাঙিয়া তাহার মুখে দিতেছে, ঝালে এক একবার তাহার সাদা সাদা গোল গোল চোখ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। খুব গল্প জমিয়াছে—"তুই আমিকে বেশি ভালবাসিস না তোর মাকে রে খোকা?" শৈলেন বলিল—"তোকে; মাকে কিন্তু বলিসনি খজনী।"..."কেনো রে?"..."মা তাহ'লে মরে যাবে।" খজনীর চোখ দুইটা আয়ত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহযোগে অদ্ভুত দেখাইতেছে, মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"হুঁ, তুই বড় বেইমান আছিস খোকা, তুজনিকেই বেশি ভালোবাসিস তুই; আমিও তোরে ছেড়ে মরে যাবো, তখন সমঝাবি, হুঁ!"

তাহার পর উভয়-সমস্যায় পড়িয়া শৈলেনের মুখের কাঁদ-কাঁদ অবস্থা দেখিয়া রুটি-তরকারির হাতেই তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকে জড়াইয়া ধরিল, দুলিয়া দুলিয়া বলিয়া উঠিল—"নই রে বউয়া, তোরা ছোড় ক' নই মরবেই রে!"

নিজের অংশ থেকে আরও খানিকটা মাছ দিল; খাওয়া হইলে এঁটো মুখটা নিজের কাপড়ে মুছাইয়া, অভিকে কোলে লইয়া তাহার শৈলেনদের বাসা-মুখো হইল।

---

* 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' সম্বন্ধে গুটিতিনেক কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন—প্রথমতঃ, কাহিনীটি গিরিবালার পুত্র শৈলেনের স্মৃতির সাহায্যে রচিত, তাই মাঝে মাঝে তাহার মন্তব্য, বিশ্লেষণ প্রভৃতি পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কাহিনীটির মূল সুর নারীর মাতৃত্ব—সন্তান লইয়া বা সন্তানের অভাবে মনের যা পরিণতি কয়েকটি প্রধান নারীচরিত্রে তাহাই ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, দুইটি খণ্ড বাহির হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে তৃতীয় খণ্ড 'বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ তিনটি খণ্ডই আত্মসম্পূর্ণ। ধারাবাহিকতার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু চুম্বকেই পাওয়া যাইবে, তাহার পর কাহিনীর রসাস্বাদনে পাঠক-পাঠিকার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।

সম্পাদক—'মাসিক বসুমতী'

রুটি-অভিযানের কথা চাপা থাকিত না, ঠাকুরমা শূদ্রের বাড়িতে খাওয়ার জন্য হৈ-চৈ বকাবকি করিতেন, পিসিমারা গঞ্জনা দিতেন, মা ভয় দেখাইতেন, এবার নিশ্চয় মরিয়া যাইবেন। বিপিনবিহারীর কানে উঠিলে তিনি একেবারে জাতে ঠেলিবার ব্যবস্থা করিতেন। শৈলেনের বেশ মনে আছে, পিতা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনয়টির তোড়জোড় করিতেন,—ছেলেকে জাতিচ্যুত করা হইতেছে বলিয়া নিস্তারিণী দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া সবাইকে উঠানে জড়ো করা হইত শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্য। শৈলেন অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, পাশেই খঞ্জনী, সেই জাত খাইয়াছে, তাহাকেই বিলাইয়া দেওয়া হইবে। শৈলেন এক একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেছে, যাহার মুখের দিকেই চায়—গম্ভীর। ঘরের দুয়ারে মা দাঁড়াইয়া, ঘোমটার মধ্যে মুখটি দেখা যায় না বলিয়া অশ্রু ভিন্ন আর কিছু কল্পনার মধ্যেই আসে না। দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া বড় ভাই শশাঙ্ক; ভাইকে হারাইবার ভয়ে মুখখানি শুকাইয়া গেছে। এখন শৈলেন বুঝিতে পারে ঐ একটি মাত্র লোক তাহারই মতো হইত প্রভাবিত।

ব্যাপারটাতে সত্যের রূপ ফুটাইবার জন্য এক এক সময় আবার মোহনা চাকরকে বামনপাড়ায় পুরুত ঠাকুরের নিকট দৌড় করাইয়া দেওয়া হইত, সে অল্প সময়ের মধ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিত—পণ্ডিতজী বিধান দিলেন শূদ্রের বাড়ির রুটি খাইয়াছে, এ-ছেলেকে জাতের বাহির করিয়া দেওয়া ভিন্ন কোন উপায় নাই।

দৃশ্যটা অবশ্য বেশি ক্ষণ এভাবে থাকিত না। এ-মুখ ও-মুখ চাহিয়া কোন খানেই আশার বিন্দুমাত্র সঙ্কেত না দেখিয়া শৈলেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। এইটুকুরই অপেক্ষা, অশ্রু নামিলেই চারি দিক্ থেকে বিপিনবিহারীর নিকট সুপারিশ পৌঁছিত —"থাক্, তাহলে না হয় এবার ছেড়ে দে বিপিন···এবারটা থাক্ দাদা, আর খাবে না, বেধে না হয় আমরা একটু গোবর খাইয়ে জাতে তুলে নিচ্ছি···আবার যদি খায় তো ওর খঞ্জনীকে হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলা হবে···"

খঞ্জনীর গঞ্জনাটা আগেই এক প্রস্থ হইয়া যাইত, এ সময়েও কয়েকটা ঝাপটা গিয়া তাহার উপর পড়িত—"তুই পোড়ারমুখী যা-তা খাওয়াস কেন ওকে অমন ক'রে?···তোর রাক্ষুসে পেটে হজম হয় বলে সবার পেটেই সইবে ঐ সব!"

শৈলেনকে প্রতিজ্ঞা করানো হইত—না, সে আর কখনও খাইবে না—কখনও নয়—এ জন্মে নয়। সেদিনটা আর হয় না; বোধ হয় তাহার পরদিনও নয়, তেমন সুযোগ না পাইলে বোধ হয় আরও এক-আধটা দিন যায়। তাহার পর আবার সেই গোপন পরামর্শ, গোপন অভিযান, ধরা পড়া, আবার সেই সব ব্যাপারের পুনরাবর্তন।

স্মৃতির আলোড়নে কথাগুলা সব এলোমেলো হইয়া আসিতেছে। মায়ের কথা মনে পড়ে বেশি করিয়া। বাড়ির একটু দূরে গিয়া পড়িলেই মা'র জন্য মনটা কেমন করিতে থাকিত। খঞ্জনী সঙ্গে আছে, এদিকে মেড়য়ার রুটির মতো অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ চলিতেছে —এমন দুর্লভ যোগাযোগে বোধ হয় থাকিত খানিকটা অন্যমনস্ক, তবুও একটু ফাঁক পাইলেই মনটা মায়ের কাছে গিয়া পড়িত। তাহার কারণ ছিল,—ছেলের ধাতটা একটু ঘরছাড়া গোছের দেখিয়া গিরিবালা প্রায়ই শাসাইতেন—"তুই বটতলা কি অশথ-তলার ওদিকে গেলেই আমি মরে যাব, এসে আর দেখতে পাবিনি।"···

সে এক অসহ্য রকম দোটানা অবস্থা—বাহিরে না গিয়াও উপায় ছিল না, অথচ সর্বদাই মাকে হারাইবার একটা ভয়। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল,—দূরে গেলেই যে মাকে হারাইতে হইবে, বাড়ির কাছে থাকিলেও এ-ভয়টা মনের কোথায় যেন জড়াইয়া থাকিত। মোট কথা, বাড়ির বাহিরে পা দিলেই মনটা বাড়িতে ফিরিয়া যেন মায়ের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহিত—একটা অবুঝ আশঙ্কায় আগলাইয়া আগলাইয়া।···ঐ এক জন যাহাকে কত ভাবে যে পাওয়া গেল জীবনে। কেহ তো বলিয়া দেয় নাই সে সবচেয়ে নিকটতম, তাহা ভিন্ন একে একে ছোট ভাই-বোনেরা আসিয়া অল্প অল্প করিয়া কাছে থেকে দূরে—আরও দূরে করিয়া দিয়াছে, আর ওদিকেও জ্ঞানতঃ খঞ্জনীর চেয়ে কেহই আপনার ছিল না, কেহই প্রতিপদে অত অপরিহার্য ছিল না, তবু সদা হারাইবার ভয়ের মধ্যে, শুধু মাত্র আছেন এই ভরসার মধ্যে, কি অপূর্ব যে ছিলেন ছেলেবেলার মা!···মায়ের মুখে, ঠাকুরমার মুখে যত সব দুঃখিনী মায়ের গল্প শুনিত, সবার সঙ্গে মাকে মিলাইয়া ফেলিত শৈলেন। মাকে যেন ঐতেই মানায় বেশি; হাসি আছে, সবই আছে, তবু বেদনাই যেন মায়ের প্রাণ। তাই সেদিনকার সন্ধ্যার ছবিটি মনে পড়িয়া পড়িয়া মনের সঙ্গে একেবারে গাঁথিয়া গিয়াছিল শৈলেনের,—রুগ্ন, ক্ষীণজীবী অহিকে লইয়া মা তুলসীমঞ্চের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—মুখে সূর্যের শেষ অস্তরাগ আসিয়া পড়িল।···কৈ, কারুণ্যে মাধুর্যে অমন একটা ছবি তো আর চোখে পড়িল না জীবনে!

একটা বেশ কৌতুকের কথা মনে পড়ে শৈলেনের,—ভালোবাসার চুল-চেরা বিচার করিতে করিতে খঞ্জনী একবার নিজের একটা চোখের নীচেটা টানিয়া ধরিয়া বলিল—"তুই জানিস্ না, দেখ খোঁকা, তুই আমির আঁখের ভিতরে রয়েছিস।"···সত্যই খঞ্জনীর চোখের মধ্যে একটি ছোট্ট মানুষের প্রতিচ্ছবি, শৈলেন একটু ডাইনে বাঁয়ে দুলিতে সেও দুলিল। একটা কৌতুকময় আনন্দের সঙ্গে শৈলেনের মনটা বেশ খানিকটা চিন্তাকুল হইয়া রহিল। বাড়ি আসিল। গিরিবালা অহিকে কোলে শোওয়াইয়া কাজল পরাইতেছিলেন, শৈলেন আসিয়া মায়ের মুখের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া বলিল—"তোমার চোখ দেখি তো মা।" নিজেই চোখের নীচেটা টানিয়া ধরিল।··· আছে, মায়ের চোখের মধ্যেও সে আছে! গিরিবালা ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই সে নাচিতে নাচিতে বাহিরে চলিয়া গেল। এর বেশি কৌতূহল কখনও হয় নাই—তাহার প্রশ্নের ঐখানেই ছিল অবধি, তাই রহস্যটা কখনও ভাঙে নাই,—সমস্ত ছেলেবেলা জুড়িয়া একটা বিস্ময় আর আনন্দ ছিল,—যে ভাবেই হোক, শুধু খঞ্জনীই নয়, মাও তাহাকে যত্ন করিয়া চোখের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন!

ঠাকুরদাদাকে মনে পড়ে না, পড়িবার কথাও নয়। ঠাকুরদাদাকে লইয়া এ-পরিবারের যে জীবনাংশ সেটা তখন ইতিহাসের সামিল হইয়া গেছে। শুইবার সময়, কিম্বা শীতকালে আগুনের কাছে বসিয়া, কিম্বা কোন বর্ষার দিনে, খেলার পাট যখন বন্ধ থাকিত শৈলেনরা ঠাকুরমার, কিম্বা মা'র, হয়তো বা কোন পিসিমার কাছে গল্প শুনিত। ঠাকুরদাদা খুব সুপুরুষ ছিলেন, পায়ের চেটো, হাতের চেটোর রং ছিল যেন দুধে-আলতা—খুব না কি বড় হওয়ার লক্ষণ; অশেষ প্রভাব ছিল এই পাওুলে তাঁহার—তাঁহার পুণ্যধর্ম

জীবনের কাহিনী সব, যখন যেটা মনে পড়িত বক্তার। এ-বাড়ির অবস্থা খুব ভালো ছিল, অনেক দাসদাসী-অতিথি-অভ্যাগত। সেই সঙ্গে আসিয়া পড়িত বাবা, কাকা, পিসিমাদের বাল্য-কথা ও মা কি করিয়া আসিলেন এ সংসারে। তন্দ্রার অস্পষ্টতা, কি বাহিরে শীত, ঘরের মধ্যে মিঠা উত্তাপ, কি অঝোর-ঝরা বাদল—এই সবের মধ্যে নিজেদের অতীত জীবনের রোম্যান্স মূর্তি ধরিয়া উঠিত ···এই সেজ পিসিমা কি এই রকম ছিলেন?—সমস্ত উঠানে চক্র দিয়া বলিতেন—"লোটন ঝা খেতে বসেছে—এ—এ—এ ···লোটন ঝার পকাশটা বস্তাই আম হয়ে গেলো—ও—ও—ও—"

শশাঙ্ক, শৈলেন, হরেন হাসিভরা কৌতূহলের দৃষ্টিতে চায় পিসিমার দিকে, ত্রিনয়নী কপট রাগের সঙ্গে বলেন—"আচ্ছা, হয়েছে; এত মিছে কথাও আসে তোমাদের! আমি না কি ঐ রকম ছিলুম!"

কথা-কাটাকাটির মধ্যে কতকটা অযথাই সবার মুখে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।

এখন অবস্থাটা সে আগের চেয়ে খারাপ, ঠাকুরদাদার গল্প না শুনিলে সে জ্ঞান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমত: তখন সে বয়স নয়, দ্বিতীয়ত: তখনও এমন একটা কিছু ছিল যাহার জন্য আশে-পাশের সবাইয়ের চেয়ে নিজেদের একটু বিশিষ্ট বোধ হইত।··· বাবা কুঠীতে চাকরি করিতেন, কুঠীতে যাওয়া বারণ ছিল বলিয়া কুঠীটা ছিল একটা অভেদ্য রহস্য। বৈকালে পিতার ফিরিবার সময় হইলেই তিন ভাইয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে গুলমোহর গাছের নীচে শাদা ফটকটার দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি বাহির হইলেই হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইত। সমস্ত দিনের পর বাবাকে পাওয়ার একটা আনন্দ তো ছিলই, তাহার উপর ছিল ফুলের লোভ। বাবার খুব ফুলের সখ, সাহেবের বাগান থেকে অনেক রকম ফুল লইয়া আসিতেন—শীতকালে কত রকম বিচিত্রবর্ণ মৌসুমী ফুল, অন্য সময়ে গোলাপ, আরও নানা রকম ফুল। সেগুলা ভাগাভাগি করিয়া তিন ভাইয়ে লইয়া আসিত বাড়িতে; আত্মসাৎ করিবার উপায় ছিল না, তবে বাড়ি পর্যন্ত এ-যে লইয়া আসা, তাহার মধ্যেই কী যে একটা উন্মাদনা ছিল! আর, প্রতিদিনের একটা রুটিন;—পড়া বা জোর করিয়া দুপুরবেলা ঘুমানোর মতো রুটিন নয়,—বাবাকে পাওয়া, বাড়ির ভালো-মন্দ খবর আগে ভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া, ফুলের সমারোহ—সব মিলিয়া এ রুটিনে একটা অভিনব মাদকতা ছিল, সময় যত অগ্রসর হইতে থাকিত, খেলার মধ্যে তিন ভাইয়ে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত।

ওদিককার বিবাহের পাট শেষ হইয়া গিয়াছিল—দুই পিসিমার, কাকার, সকলেরই। শৈলেনের স্মৃতির শেষ রেখায় তাহাদের সংসারের যে চিত্রটি ফুটিতেছে তাহাতে রহিয়াছে ঠাকুরমা, বাবা, মা; এদিকে তাহারা চার ভাই, ছোট পিসিমা।

ছোট পিসিমার বিবাহ হইয়া গেছে, কিন্তু তিনি তখনও পাণ্ডুলেই, হয়তো যে সময়ের স্মৃতিটা উজ্জ্বল হইয়া আছে সেই সময়টায় তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু দিন যাবৎ এখানে আসিয়া আছেন,—মোটের উপর তাঁহাকে সে-সময়ের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে পড়ে।··· কাকা চণ্ডীচরণ কাছেই বৈরামে কুঠীতে কাজ করিতেছেন। কাকিমা বেশি দিন পাণ্ডুলেই থাকেন, কখনও যখন বৈরামে যান, কেহ সঙ্গে যায়। শৈলেনরাও কখনও কখনও যায় পাণ্ডুলের বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে একটা উৎসব-গোছের। কাকিমার আসাটাও একটা উৎসবের অঙ্গ,—টুকিটাকি কি সব কিনিয়া আনেন, আসিলেই ইহারা সবাই ঘিরিয়া দাঁড়ায়, যাহা পায় তাহাতেও অতিরিক্ত লোভ থাকে। কাকিমার সেটা জানা বলিয়া থাকেন সতর্ক, বিশেষ করিয়া হরেনের কাছে। সে-সময়ের কাকিমার মধ্যে একটা ছেলেমানুষির মনে পড়ে শৈলেনের,—সতর্কতার মধ্যে থেকেও হরেন বোধ হয় চিলের মতো ছোঁ মারিয়া একটা জিনিস লইয়া গেল—একটা হাড়ের বলই সবচেয়ে লোভনীয় ছিল—কাকিমা টপ করিয়া বাক্সর ডালাটা ফেলিয়া চাবিটা ঘুরাইয়া দিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিলেন। বাড়ির বৌ দৌড়াইয়া ধরিবার তো উপায় নাই-ই, চেঁচামেচি করিবার পথ বন্ধ, নিরুপায় ভাবে শশাঙ্ক আর শৈলেনের সাহায্য চান—কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলেন—"যা বাবা, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আয়, আমি ওটা দিতে পারব না—তোদের জন্যে তো এনেছি কিনে কত কি···যা বাবা, লক্ষ্মীটি; শৈলেন, তুই-ই যা বাবা, শশাঙ্ক পারবে না আঁটিতে ও ডাকাতের সঙ্গে···"

কখনও বোধ হয় গিরিবালা আসিয়া পড়েন, বলেন—"কেন ও হতভাগাকে ডাকিস? তোদের যেমন বাই!···দাঁড়া দেখি।"

কাকিমা তাকে ধরিয়া ফেলেন, ভীত ভাবে বলেন—"না দিদি, তুমি থামো, এক্ষুনি মা, বড়ঠাকুর টের পাবেন। শৈলেন যাচ্ছে। এলেই জানি কাকিমা বলে ঘিরে দাঁড়াবে—মন কেমন করে না?— ফিরিওলা এলেই একটা একটা করে কিনে রাখি···না, আমি বলটা দিতে পারব না কিন্তু···"

শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলেন—"তুই যা বাবা, বলবি হরেন বড় হোলে ওকেই দিয়ে দোব—সত্যি ওর জন্যেই তো রেখেছি···ততদিন আমার কাছে থাক্ ওটা···"

শৈলেনের মনে পড়ে, এক এক সময় চক্ষু পর্যন্ত ছল ছল করিয়া উঠিতেছে যেন কাকিমার। গিরিবালা রাগিয়া বলেন—"খুড়িমা,— কোথায় বেশ রাশভারী হয়ে থাকবি তা না—ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষ সেজে—জানি না বাপু!···"

শৈলেন বরাবরই পাণ্ডুলে দুইটি বাঙালী-পরিবার দেখিয়া আসিয়াছে, এক তাহাদের নিজের আর এক জ্যেঠামশাইদের। কৈলাসচন্দ্রের পরিবারেও মনে পড়ে জ্যেঠাইমা, বড়দাদা, ছোটদিদি, মেজদাদা,—এঁরা তিন জনেই শশাঙ্কদের চেয়ে বড়; তাহার পর শৈলেনের সঙ্গী তারাপদ, তাহার পর বিজয়। দুইটি পরিপূর্ণ জ্ঞাতি পরিবার, একেবারেই গায়ে গায়ে বাড়ি। বিদেশের কঠিন পর্দা বাঁচাইয়া যাহাতে সর্বদাই মেয়েছেলেদের যাওয়া-আসা চলে তাহার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বছরের মধ্যে দৈবাৎ বরে ও দূরের এলাকা থেকে কোন বাঙালী-পরিবার দেখা করিতে আসিলে বাঙালীর মুখ দেখিবেন —সে আত্মর ভাবটা আর নাই গিরিবালার জীবনে।···সে তো হইয়াও গেল বহু দিন, গিরিবালা এ বাড়িতে পা দিয়াছিলেন বয়স যখন তেরো, বারো-তেরোটা বৎসর অতীত হইয়া গেল—একটা যুগ। হাজার মন্থর হইলেও পাণ্ডুলের জীবনের একটা গতি তো আছেই, খানিকটা পরিবর্তন তো হইবেই।

গিরিবালার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়,—সংসারে তাহার গৃহিণীপনার যুগ যে পরিবর্তিত সমাবেশের মধ্যে আরম্ভ হইল, তাহার মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া রহিল। [ক্রমশঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল-প্রতিযোগিতা :—

আই এফ এর প্রাক্তন সভাপতি পরলোকগত সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর স্মৃতিরক্ষা কল্পে ভারতীয় ফুটবল-কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় নিখিল ভারত আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল-জগতে সন্তোষ স্মৃতি-প্রতিযোগিতা পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত হয়। ১৯৪১ সালে এই অনুষ্ঠানের প্রথম উদ্বোধন হয়। প্রথম বৎসর বাঙলা নিজ প্রদেশে খেলিয়া শেষ খেলায় দিল্লী প্রাদেশিক দলকে ৫—০ গোলে অনায়াসে পরাজিত করিয়া ভারতীয় ফুটবল মহলে নিজস্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অটুট রাখে। পরবর্তী দুই বৎসর যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতির জন্য যাতায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে। গত বৎসর দিল্লী নিজ মাঠে ২—০ গোলে বাঙলাকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব পরাজয়ের গ্লানি দূর করে। গতবারের বিপর্য্যয়ের সংবাদ বাঙলার আশাবাদী ক্রীড়া-কর্ত্তৃপক্ষ কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা দেরীতে হোলেও উপলব্ধি করলেন যে ফুটবল-জগতে বাঙলার শীর্ষস্থান শাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে হোলে নিশ্চেষ্ট বসে থাকলে হবে না। রীতিমত অনুশীলন বা প্রয়াস প্রয়োজন। যাই হোক, এবার বাঙলা দুর্ব্বার গতিতে প্রতিযোগিতার অভিযান আরম্ভ কোরে শেষ পর্য্যন্ত জয়তিলক মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছে।

আমাদের জয়যাত্রী খেলোয়াড়গণকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছে বাঙলার অগণিত ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ। তারা আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছে—বাঙলার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার কোরেছে। প্রথম পরিচয়ে বাঙলা রাজপুতানাকে ৭—০ গোলে শোচনীয় ভাবে বিপর্য্যস্ত করে। সাতটি গোল দেওয়ার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দাবী করে আমাদের স্থানীয় লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল দলের আক্রমণ বিভাগের কর্ণধার—বাঙলা-প্রবাসী বর্মী খেলোয়াড় পাগসলী। হায়দ্রাবাদকে পরাজিত করতে বাঙলাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নাই। প্রথমার্দ্ধে তিনটি ও পরে আরও দুইটি গোল দিয়া তাহারা জয়ী হয়।

অপর প্রান্তে যথাক্রমে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ঢাকা ও দিল্লীকে পরাজিত করিয়া বোম্বাই চরম মীমাংসার জন্য বাঙলার সহিত শেষ পর্য্যায়ে মিলিত হয়। ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। বাঙলার খেলোয়াড়গণের অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রতিপক্ষ দলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। প্রথমার্দ্ধের পঞ্চম মিনিটে আর, দাস ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে এস, নন্দী জয়মূলক গোল দুইটি দেয়। গোলে ইসমাইল অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখায়।

এম, ডি, ডি

বাঙ্গালা :—ইসমাইল; এস দাস ও তাজ মহম্মদ; ডি চন্দ্র, টি আও এবং মহাবীর, আর দাস, আপ্পারাও, পাগসলী, ঘোষ এবং নন্দী।

বোম্বাই :—সঞ্জীব, ম্যাগুন এবং প্যাপেন, আর্ণল্ড, রবিনসন, এবং গোবিন্দ, ভ্যাণ্ডোকাস, টিপল, ককলিন, ম্যাকজল এবং ডাকুরাম।

রেফারী :—এটকিনসন।

বাঙলা-পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী খেলাগুলিতে ডি, সেন, পি, চক্রবর্ত্তী ও কাইজারকে নিজ নিজ অভ্যস্ত স্থানে খেলিতে দেখা যায়।

আই, এফ, সি, শীল্ড :—

অমৃতবাজার পত্রিকা ক্লাব উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠতম ফুটবল-প্রতিযোগিতা লক্ষ্ণৌর আই, এফ, সি, শীল্ড জয় করিয়া বাঙলার বাহিরে বাঙলার প্রতিষ্ঠা বজায় করিয়াছে। স্থানীয় লীগবিজয়ী লক্ষ্ণৌ সিটি ক্লাবকে প্রথম দিন গোলশূন্যভাবে অমীমাংসার পরে তাহারা ২—০ গোলে পরাজিত করে।

ইতিপূর্ব্বে বাঙলার আলোচ্য বৎসরের শ্রেষ্ঠ দল ইষ্ট বেঙ্গল ও অন্যতম শক্তিশালী অফিস টীম এলবার্ট ডেভিড বোম্বায়ে রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ইষ্ট বেঙ্গল এলবার্ট ডেভিডের নিকট পরাজিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করে। এলবার্ট ডেভিড, ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াও পরাজিত হইয়াছিল। তাহাদের পরাজয়ের মূলে অন্যান্য বিভিন্ন কারণের মধ্যে খেলোয়াড়গণের মধ্যে সহযোগিতা ও নিয়মানুগতার অভাব দেখা যায়। পত্রিকা ক্লাবের এই সাফল্যে আমরা বিশেষ গর্ব্বিত যে, তাঁহারা আমাদের সদ্য অর্জ্জিত সফর কালীন দুর্নাম কতকাংশে দূর করিয়াছেন। সঙ্ঘবদ্ধতা ও নৈতিক সততার ফলে তাহাদের খেলোয়াড়গণ অনুরূপ গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সামরিকগণের সন্তরণ-প্রয়াস :—

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সুইমিংপুলে সম্মিলিত সামরিকগণের প্রচেষ্টায় উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রদর্শনী ওয়াটার পোলো খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ অনুষ্ঠানের ফলে আমাদের স্থানীয় সাঁতারু খেলোয়াড়গণ অনুশীলনের বিশেষ সুযোগ পায়। কলেজ স্কোয়ার ও হাটখোলা যথাক্রমে ৮—৭ ও ৭—৬ গোলে ব্রিটিশ ও মার্কিণ সামরিকগণের সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে জয়ী হয় কিন্তু বাঙলা এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের ওয়াটার পোলো লীগবিজয়ী বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির ৭—৫ গোলে সামরিকগণের বিরুদ্ধে পরাজয়ে ওয়াটার পোলোর অগণিত সমর্থকগণ হতাশ হইয়াছে।

মার্কিণ সামরিকগণের প্রচেষ্টায় ইহার পর দুই দিন ব্যাপী এক বিরাট প্রদর্শনী সন্তরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভূতপূর্ব্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু মিস্ হেলেন মিলি প্রথম দিন বিভিন্ন সন্তরণ-কসরৎ প্রদর্শনে সমবেত দর্শকগণকে আনন্দ দেন।

★

—উপন্যাস—

প্রতিভা বসু

৭
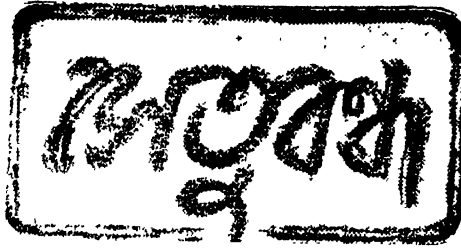
পরের দিন সকালবেলা চা খেতে বসে অভিলাষ বলল, 'রুনি, ৃ বোধ হয় জানো যে তোমার বাবা রুকেই আমাদের রেজিস্ট্রি করবার ল্প করেছিলেন কিন্তু ভেবে দেখলাম ,ত তোমাকে নিতান্তই জবরদস্তি । হয়। আমি আজ চলে যাচ্ছি— লা করে তুমি ভেবে দেখ।'

বুঝলাম বাবার সঙ্গে এরকমই কোনো ামর্শ হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে অভিলাষ ল গেল এবং বাবার মুখে—মাকে প্রণাম করতে গিয়ে সে কেঁদে ল। মার হৃদয় জয় করা যে কত সহজ এ-কথা সে জানতো— । কলারও তার অভাব ছিল না। মা মুখ ফেরালেন— ন্যই হয়তো তাঁর খারাপ লাগছিল। অভিলাসের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এঁদের মনে এমন ভাবেই মিশে গিয়েছিল যে শত দোষ ও ওকে ত্যাগ করতে এঁদের হৃদয়ে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। মি জানলা দিয়ে ওর বিদায়-দৃশ্য দেখলাম।

এর পরে কয়েক দিন পর্যন্ত বাবা একেবারে গুম হয়ে রইলেন। । সঙ্গে পর্যন্ত কথা বললেন না।

অভিলাষ চলে যাবার পরেই আমি মণ্টুকে দিয়ে দোকানে ছোট চিঠি পাঠালাম, 'আমার সঙ্গে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত তুমি ার সঙ্গে কোনো কথা বলতে এসো না। আশা করি ভালো আছ।'

দিন কয়েক কাটলো একটা চাপা অশান্তিতে, তারপর আস্তে-স্ত হাওয়া যখন একটু লঘু হয়ে এসেছে এমন দিনে মণ্টু এসে ষ্ম মুখে বললে, 'দিদি, শ্যামলদার খুব অসুখ। আমি গিয়েছিলাম ানে।' বলাই বাহুল্য—আমি ছিলাম বন্দিনী। দোকানদারের দেখাশোনা হোক এটা তো কেবলমাত্র আমার বাবাই নন—এতে াব মার মনেও ঘোর আপত্তি ছিল। বেরুবার পথ আমার বারেই বন্ধ। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি গেলে বাবা নিয়ে যান— জই ফিরিয়ে আনেন। মণ্টুর খবরে আমি বিচলিত হলাম। াস্ত পায়ে ঘরের এদিক্ থেকে ওদিক্ হাঁটতে লাগলাম। মণ্টু স, 'বাবা বলেছেন, বাড়ি থেকে যেন আমি এক পা না বেরুই। ান দোকানে গিয়েছি—হঠাৎ দেখি বাবাও সেখানে ছন।'

'বাবা!' আমি চমকে উঠলাম 'বাবা গিয়েছিলেন? সত্যি? জানিস্?'

'হ্যাঁ—আমাকে দেখে বাবা রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তারপর মলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দোকান কি আপনার?' মলদা মাথা নাড়তেই বাবা বললেন, 'একটু বেরিয়ে আসুন, পনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'—আমাকে বললেন, 'তুই চলে ।' তারপর থেকে আমাকে আর বেরুতে দেন না, তোমার কাছেও একলা এলে ওঁরা পছন্দ করেন না। কাল আমাদের জন মাষ্টার মশাই আসেননি—শেষ ঘণ্টার ক্লাশটা আর হোলো —তখন আমি গিয়েছিলাম ওখানে। মাসিমা ভয়ানক কাঁদছেন।'

আমি বললাম, 'মণ্টু, আমাকে একবার নিয়ে যাবি আজ ানে?'

'কী করে? তোমাকে তো ওঁরা বেরুতেই দেবেন না।'

'ওঁদের কথা আমি শুনবো না।'

'তাহ'লে যাবে—যেতে পারবে সত্যিই?'

'নিশ্চয়ই যাব মণ্টু, সত্যি আমি যাব। তুই আমার সঙ্গে যাবি।'

আমি চটপট কাপড় ছেড়ে নিচে মার কাছে নেমে এলাম। বসবার ঘরে অন্য লোকের গলা পেলাম—খুব পরিচিত গলা—ও কে? মণ্টু পরদা ফাঁক করে মাথা গলাতেই মা বললেন, 'মণ্টু, দিদিকে ডেকে নিয়ে এসো তো, বল গিয়ে জ্যাঠামশাই এসেছেন—তোমার অভিলাষদার বাবা।'

মণ্টু মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, 'দিদি, সর্বনাশ! বুড়ো তো এসেছে।'

আমি ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে বললুম, 'চুপ।'

আমি মাকে বলতে শুনলুম "কেন আমার অমত হয়েছে সে কথা আমি কাউকেই বলবো না। তবে দেখুন, আমার ইচ্ছেটাই তো ইচ্ছে নয়—মেয়েও তো বড় হয়েছে!'

'সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি হঠাৎ কেন বেঁকে বসলেন সেটাই আমার অবাক্ লাগছে!'

'এ বিবাহ না হলে অভি সাংঘাতিক আঘাত পাবে। আপনি জানেন, অভি পাত্র হিসেবে লোভনীয়—সে যে-কোনো সমাজে যে-কোনো পিতামাতার কাছে। কিন্তু আমি ওর কাছে অনেক ভালো-ভালো মেয়ের প্রস্তাব করেও ব্যর্থ হয়েছি। এখানে ওর ছেলেবেলাকার সম্বন্ধ'—মা একটু নরম হলেন—বললেন 'কিন্তু কী করবো দত্ত মশাই, মেয়ে আমার ছোটো নেই—তার নিজেরই যখন মনস্থির হচ্ছে না তখন আমাদের আর বলবার কী আছে?'

'ও, মেয়ে!'—অভির বাবা হাসলেন, 'ছেলেমানুষ—কোথায় কোন মোহ লেগেছে চোখে—ও আর কদ্দিনের বলুন?'

ইতিমধ্যে বাবা ঢুকলেন ঘরে, 'আরে, গোপালবাবু যে—কবে এলেন?'

'এসেছি ভাই আজকেই—কিন্তু তোমাদের কী ব্যাপার বল তো? অভি তো কেঁদে কেটে প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখেছে আমাকে।'

'সে কিছু না'—বাবা কোট ছেড়ে একটা কৌচে বসে পড়লেন।

'তোমার স্ত্রীরও তো দেখছি মন বিগড়েছে।'

'আর মেয়েদের কথা বলেন কেন? আজকালকার ছেলে-মেয়েদের অসভ্যতার অন্ত আছে? তাঁরা এখন নিজেরা করবেন পাত্র নির্বাচন। যত সব—' বাবা বিরক্তি ভরে কথাটা আর শেষ করলেন না।

গোপালবাবু বললেন 'সত্যি নাকি হে, একটা কোন দোকান-দারই নাকি'—

'রাবিশ! রাবিশ।—অভি লিখেছে নাকি আপনাকে এ-সব কথা?'

'তাই তো আমি এলাম—আমার ছেলে পাগল হয়ে আছে তোমার মেয়ের জন্য। আর হবেই বা না কেন বল? এইটুকু থেকে তো?'

'নিশ্চয়ই। আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ দোকানদার ছোঁড়াকে কোনোমতে সরাতে হবে এখান থেকে—কিন্তু

দেখুন. দোকানদারি করে বটে ছোঁড়া, কিন্তু কী অদ্ভুত কথাবার্তা,—আর তেজ কত !'

'তুমি গিয়েছিলে নাকি সেখানে ?'

'গিয়েছিলাম একদিন—আচ্ছা করে শাসিয়ে দিয়ে এসেছি।'

এতক্ষণ মা চুপ ক'রে ছিলেন, বললেন 'কী অন্যায় ! আমি তো এ-কথা জানিনে। তুমি শাসাবার কে ?'

'তুমি চুপ করো। ওঃ হো'—বাবা পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে মার হাতে দিলেন—'অভি লিখেছে দেখ। আর শোনো—আমার চা-টা এ-ঘরেই পাঠিয়ে দাও গিয়ে। রুনি কোথায়, রুনিকে ডাকো।'

মা উঠছিলেন, আমি নিজেই গিয়ে ঘরে দাঁড়ালাম।

'এই যে মা এসো এসো—'অভির বাবা তাঁর চিরধূর্ত চক্ষু দিয়ে—আমাকে লক্ষ্য করে উঠে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, আমি নিচু হয়ে প্রণাম করলাম।

মা চিঠি খুলে পড়তে-পড়তে বললেন, 'রুনি, যা তো মা ওদের চা-টা একটু দেখে নিয়ে আয়।'

আমি চায়ের ব্যবস্থা করে খাবার ঘরে ঢুকতেই মা আমার হাতে অভিলাষের চিঠিটা দিলেন। একটু এ-কথা ও-কথার পরে বেরিয়ে এলাম চিঠি নিয়ে। ইচ্ছা করলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি কিন্তু নিতান্তই কৌতূহলবশত চিঠিখানা আমি না-পড়ে পারলাম না।—

'কাকিমা

আমাকে যে অপরাধের জন্ম আপনি এত বড় শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন—আর কেউ না জানলেও আমি মনে মনে জানি, অত বড় শাস্তি আমার প্রাপ্য নয়। যে কথা বলে আমি আপনার অপ্রীতিভাজন হয়েছি, সে কথা একান্তই আমার কল্পনাপ্রসূত নয়—তার প্রকৃত কারণ ছিল বলেই আমি অকপটে তা প্রকাশ করেছিলাম—হতে পারে সেটা আমার ভুল ধারণা, তবে এ ধারণা সত্যিও হতে পারতো। অবিশ্যি সত্যি না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। লুকোচুরি করা আমার ধাত নয়, সেটাই শেষ পর্যন্ত আমার শাস্তি-ভোগের কারণ হল ?'

এই পর্যন্ত পড়ে ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠলো ! অভিলাষ আর কত নিচে নামবে ? ভগবান, তুমি তো জানো—তুমি তো আছো—তুমি আমাকে রক্ষা করো—বাঁচাও আমাকে এ অপমান থেকে। সমস্ত শরীরে মনে আমি বল আনবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আমার শরীর-মন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে চাইল।

মা কিন্তু ঐ চিঠি নিয়ে আর কোনো কথা আমাকে বললেন না—হয়তো তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল কে জানে। বিনা অপরাধে আমি চোরের মত চলা-ফেরা করতে লাগলাম।

৮

তিন চার দিন কেটে গেলো, আমি তার কোনো খবর পেলাম না—কেমন আছে সে কিছু জানলাম না, মণ্ট ও কাঁক পেলো না যাবার। আমার মনের অবস্থার কি কোনো বর্ণনা আছে ? এর মধ্যেই ধুমধাম করে একদিন আমার আশীর্বাদ হয়ে গেল—মা ঠেকাতে পারলেন না বাবাকে (কিম্বা চেষ্টাই করেছিলেন কিনা তা-ও জানি না)।

সমস্ত ঠিকঠাক করে—একেবারে বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে—সমস্ত পাকা ব্যবস্থা করে অভির বাবা বিদায় নিলেন।

মা দু'এক দিন চুপ করে থাকলেন, তারপর আস্তে আস্তে বোঝাতে লাগলেন 'অভি যদি কোন মন্দ কাজ করেই থাকে—তোকে পাবার জন্যই করেছে। তা ছাড়া কী করবো বল—ওঁর জেদ তো জানিস্।'

ঘৃণায় মার দিকে তাকাতে পারলাম না। ভাবলাম, মৃত্যু তো অন্তত আছে।

অভি রাক্ষস ! এই দেহের গন্ধ ওর নাকে লেগেছে। ও ছাড়বে না—কিছুতেই ছাড়বে না ভোগ না-করে। তারপর দেবে ফেলে। আমার অহংকারের শাস্তি দেবে ও।—আচ্ছা !

সময় বয়ে যেতে লাগলো—লক্ষ-লক্ষ হাতি যেন আমার বুক মাড়িয়ে যেতে লাগলো—আমি শুকিয়ে গেলাম—আমার চোখ-মুখ বসে গেল—কিন্তু আমার বাবার দয়া হ'লো না।—আমার মার মনের কথা জানিনে—কেননা, তিনিও ক্রমশঃই বিষণ্ণ হয়ে যেতে লাগলেন।

ক্রমশ বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো—আস্তে-আস্তে আত্মীয়স্বজনে ভরে উঠলো বাড়ি। বাবা প্রচুর উৎসাহে গহনা গড়াতে দিলেন, এলো শাড়ির দোকানের লোক—বিছানা বাক্স—খাট-টেবিল চেয়ার—মৃতের মত নির্জীব চোখে সমস্ত দেখতে লাগলুম আমি। আমার নানা সাইজের নানা সম্পর্কের ভাই-বোন—কাকা জ্যাঠা মামা মামী—আত্মীয় স্বজন কেউ বাদ গেল না বিয়েতে আসতে।

আমি কথা বললুম না—আত্মহত্যা করবার সুযোগ খুঁজলুম না।—মনে-মনে বললাম, যাঁরা আমাকে এ-সংসারে এনেছেন তাঁদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। কিন্তু সে কেমন আছে ? যদি একবার তাকে দেখতে পেতাম !—

সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে আছে লোকজনে। ঠাট্টা তামাসা রসিকতা—আমি চেয়ে থেকেছি মুখের দিকে—কানে যায়নি কিছু।

বিয়ের দিন আমার মন পাগল হয়ে উঠলো। কী করি—কোথায় যাই,—কেমন করে রক্ষা পাই এদের হাত থেকে। বুকের মধ্যে কান্না কেবল গুমরে উঠতে লাগল। কেমন করে মানুষ আত্মহত্যা করে ? আমি ভেবে উঠতে পারলাম না, কী উপায়ে আমি মৃত্যুর অতল শান্তিতে পৌঁছতে পারি।

সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাজানো হ'লো। মূল্যবান শাড়িতে গয়নাতে আলতায় কাজলে—মেয়েরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে দেখে-দেখে মুগ্ধ হতে লাগলেন—এর মধ্যে রব উঠলো 'বর এসেছে, বর এসেছে।' 'অভিলাষ এসেছে ?' সমস্ত শক্তি আমার হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো ওর বিরুদ্ধে—সবাই একযোগে ছুটলো বর দেখতে—মুহূর্তে আমি আলনা থেকে একটা শাদা চাদর টেনে সমস্ত শরীর ঢেকে বাথরুমের পিছনের দরজা খুলে মেথরের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সোজা এসে নামলাম রাস্তায়—তার পর দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে আমি কেমন করে যে ঠিক রাস্তা দিয়ে দোকানে এসে পৌঁছলাম জানি না। ওর কাছে গিয়ে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

ঘরে ঢাকনা দেওয়া মৃদু আলো জ্বলছিল—চুপ ক'রে চোখ বুজে

ভয়েছিল কপালে হাত রেখে—আমার স্পর্শে হঠাৎ চমকে ব'লে উঠলো, 'কে ? কে ?'

'আমাকে রক্ষা করো, আমাকে 'বাঁচাও'—আমি ওর পায়ের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলাম। 'তুমি এসেছ ? তোমার না আজ বিয়ে!' ওর গলার স্বর শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলো। 'তুমি কি—তুমি কি পালিয়ে এসেছ ?' বলতে বলতে ও কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে ব'সে আমার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'তুমি তো আমাকে কেড়ে আনলে না, ছিনিয়ে আনলে না ওদের কাছ থেকে—' আমার মুখ ও তুলে ধরলো, মুগ্ধচোখে তাকিয়ে বললো, 'ঈশ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—এই ভালো হলো, তুমি নিজেই এলে আমার কাছে। কেড়ে আনা—সে তো কেড়ে আনা, সেটা তো জয় নয়—এই আমার জয় হলো।' ক্লান্তভাবে ও আবার শুয়ে পড়লো—বললো, 'আমি বড়ো দুর্বল, বড়ো অসুস্থ, তুমি কাছে এসো।'

আমি ওর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললো, 'এখানে কেউ সাক্ষী নেই, কিন্তু উপরে যিনি আছেন—যাঁর কাছে মানুষের আর কোনো পরিচয় নেই, যাঁর দয়ায় আমরা এমন অদ্ভুত দুর্দৈবের মধ্যেও মিলিত হতে পারলাম—তিনি থাকলেন সাক্ষী।' আমার হাত ধ'রে ও ঈষৎ আকর্ষণ করলো—আমি মুখ নিচু করলুম—আমাদের বিবাহের প্রথম প্রণয়-চিহ্ন ও এঁকে দিলো আমার মুখে। মুখ তুলতেই দেখলুম, দরজায় ওর মা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাকে দেখে ও বললো, 'মা, ও এসেছে, ঈশ্বর রইলেন সাক্ষী—তার চেয়ে বড়ো পুরুত তো আর নেই—তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো।' আমি আনত মুখে উঠে দাঁড়ালাম। ওর মা কাছে এসে নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বাইরের দরজায় ত্রস্ত করাঘাতে আমরা তিন জনেই এক সঙ্গে আঁৎকে উঠলাম। আমার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মা বললেন 'কিছু ভয় নেই, তুমি ওর কাছে বোসো—আমি দেখছি।' দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই যিনি সবেগে ঘরে ঢুকলেন তাঁর আকুলকণ্ঠে টের পেলাম তিনি আমার মা। 'কোথায় আমার মেয়ে, নিশ্চয়ই এখানে আছে, দিন, বার করে দিন'—বলতে-বলতে তিনি ওর মাকে গ্রাহ্য না ক'রে ভিতরের দিকে এগিয়ে এলেন—সঙ্গে-সঙ্গে আমিও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। 'হতভাগী, এই তোর মনে ছিলো ? এত লজ্জা, এত অপমান আজ তোর জন্ত !' আমি মার বুকে মুখ রেখে বললাম 'আমার লজ্জা, আমার অপমান, সেও তো তোমরা দেখনি, মা।'

মা ব্যাকুলভাবে বললেন 'রুনি, তুই আমার মেয়ে, আমার দিকে তাখ—তোর খোঁজ পড়তেই আমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে রেখে মুহূর্তে এখানে ছুটে এসেছি—আমি বুঝেছি তুই এখানেই এসেছিস। আমার মান রাখ—আমাকে সমাজ থেকে এ-ভাবে চ্যুত করিসনে—চল তুই, আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, মুহূর্তে তোকে লুকিয়ে নিয়ে যাব। কেউ জানতেও পারবে না।'

আমি নিষ্ঠুরের মতো মার উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দিকে নিরুত্তরে তাকালাম, আর মা আমার হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরেই তিনি আমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ওর দিকে—ওর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিজের গা থেকে বহুমূল্য সমস্ত অলংকার একটি একটি ক'রে খুলতে-খুলতে বলতে লাগলেন, 'সমস্ত নাও—সমস্ত নাও, কেবল আমার মেয়েকে ফিরে যেতে বলো—তুমি বললেই ও যাবে—আমাকে বাঁচাও—আমার সমস্ত লজ্জা আজ ঢেকে দাও তুমি—' পিছন থেকে এবার ওর মা এগিয়ে এলেন।—'সুবালা, টাকা কি তোকে আজ এতই নিচে নামিয়ে এনেছে, মেয়েকে পণ্য করতেও তোর লজ্জা হয় না ?' গলা শুনে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালেন আমার মা।

মার সেই ভঙ্গি আমার চিরজীবন মনে থাকবে—হঠাৎ একটা সাপের উপর পা পড়লে মানুষের যে চমক লাগে, ঠিক সে-রকম ক'রে তিনি আঁৎকে উঠে আর্তস্বরে বললেন, 'দিদি, তুমি ?'

'সুবালা, তুমি এঘরে এসো—'

তিনি আমার মার হাত ধ'রে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন—আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

সে-রাত কেমন করে কেটেছিল তার নির্দিষ্ট কোন চেতনা আমার ছিলো না—এটুকু জানি, আরো অনেক রাত্রির মতো সে-রাতের পরেও আবার ভোর হয়েছিল, সূর্য উঠেছিল।

কিন্তু এ-লজ্জা আমি লুকোবো কোথায়! এ আমি কী করলাম ? কেন করলাম ? নিজের মনের কাছে লক্ষ-লক্ষ বার কেবল এই প্রশ্ন ক'রে-ক'রে আমার রাত ভোর হ'য়ে গেলো। আস্তে-আস্তে রোদ এলো জানলা দিয়ে—কিন্তু আমি ঘর থেকে বেরুতে পারলাম না, অপরাধের গুরু ভারে আমি স্থবির হ'য়ে ব'সে-ব'সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম।

পাশের ঘরে ওর মার চলাফেরার শব্দে আমার শরীর যেন আরো কণ্টকিত হয়ে উঠতে লাগলো। ওর গলা শুনতে পেলাম 'মা, ও কি এখনো ওঠেনি ?

ওর মা বললে, 'জানিনে।'

'মা, তুমি কি রাগ করেছ ?'

'রাগ ? রাগ করবো কেন রে ?'

'তোমাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।'

'বুঝিস না তুই ? কী একটা ঝড় হয়ে গেল—এমন কখনো সত্যি-সত্যি মানুষের জীবনে ঘটে ?'

'কিন্তু ওর কি দোষ মা— এ ছাড়া ওর উপায়ই বা ছিল কি। আর তুমি তো সমস্তই জানো—সত্যি-সত্যিই যদি ওর সঙ্গে অভিলাষের বিয়ে হয়ে যেতো তবে আমরা কি কখনো ওকে ক্ষমা করতে পারতাম ? এ-কথা কি তুমিও বলতে না যে ইচ্ছে না-থাকলে কি কখনো কেউ কাউকে বিয়ে দিতে পারে ?'

ওর মা হেসে ফেললেন—ঠাট্টা করে বললেন, 'খোকা—তুই তো এর মধ্যেই বেশ বৌর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শিখেছিস—'

এর উত্তরে খোকা হাসলেন কিনা আমি জানিনে; ওর মা-ই আবার বললেন, 'তোর দোকানটা আজও বন্ধ থাক, এত দিনই গেছে।'

'ওরা আসেনি ?'

'এসেছে, কিন্তু ওদের দিয়ে একটু অন্য কাজ করবো। তোর মদনকে নিয়ে আমি একটু বেরুবো—ও বেচারা আর বেনারসি শাড়ি পরে কতক্ষণ থাকবে বল ?'

'শাড়ি কিনতে যাচ্ছো ?'

'কিনবো না! আর ক' দিন পরে—বৈশাখের তেসরাই—

একটা বিয়ের তারিখ আছে—সমস্ত আয়োজন আমাকেই তো করতে হবে—'

'সে কী ?' ও আঁৎকে উঠলো।

'বাঃ তুই বিয়ে করবি নে ? সমাজে বাস করতে গেলে কত অনুষ্ঠান দরকার তা কি আমায় বোঝাতে হবে তোকে ?' খোকার শব্দ পাওয়া গেল না।

ওর মা আবার বললেন, 'কিছু ভাবিসনে তুই—সমস্ত আমি ঠিক করবো—আর তুই অত উঠে-উঠে ঘুরিসনে—শরীর খারাপ না হয়ে পড়ে।' এর পরে উনি আমার ঘরে এলেন। আমাকে ব'সে থাকতে দেখে বললেন, 'তুমি উঠেছ ? আমি একটু বেরুচ্ছি, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে ঐ ছোকরা চাকরটাকে বোলো, ও চা ক'রে দেবে—'

আমি ত্রস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম—উনিও দেরি না-ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

আমি চুপ ক'রে এসে দরজা ধরে দাঁড়ালাম। ও ডাকলো—কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মধুর হেসে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখলাম ওকে কী সাংঘাতিক রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু সেই রুক্ষ এলোমেলো চুলে ভরা শীর্ণ মুখশ্রীতে কী যে অদ্ভুত আনন্দের আভা ছিলো—যা দেখে আমি আর চোখ ফেরাতে পারলুম না। হেসে বললো, 'কী দেখছ ?' আমি লজ্জিত হয়ে চোখ নামালুম। বললো, 'মা একটু বাইরে গেছেন—আমি তো অচল—কী করবো অতিথিকে আদর যত্ন করবার আর আমার সাধ্য নেই, তুমি নিজেই দেখে-শুনে একটু চা'টা খেয়ে নাও।' আমি এসে মাথার কাছে দাঁড়ালুম—ঘন অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে হাত রেখে বললুম, 'আমি বুঝি অতিথি ?'

'অতিথি না ? এর চেয়ে বড় অতিথি আর হয় না কি ? আর এর চেয়ে যোগ্য ?'

'যাও—' আমি ওর মাথার উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলুম রাগ করে।

ও আমার হাত টেনে এনে কাছে বসালো। আদর করে বললো, 'তুমি যে অতিথি নও, তার একটা প্রমাণ দাও তো তবে—এক্ষুনি যাও রান্নাঘরে, রামুকে বলে এসো চা দিতে।'

'বসি না তোমার কাছে একটু,—খাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ কেন ? সত্যি খেতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।'

'না, না—মা এসে রাগ করবেন—আর কাল রাত তো গেছে উপোসেই ! যাও, লক্ষ্মী তো—'

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গেলুম—রান্নাঘর অবধি আমাকে যেতে হলো না—দেখলুম বাচ্চা চাকরটা হাসিমুখে চা নিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে—চেয়ে দেখলুম, সেখানে শুধু চা-ই নেই, আনুষঙ্গিক খাদ্য-দ্রব্য এত ছিল যে কাছে আসতেই আমি বললুম, তুমি করেছো কী—অত আমি খাব নাকি ?'

'হুঁ বৌদি, তোমাকে নিঘ্‌ঘাৎ খাতে অবে—মা বলে গেচেন'—বিগলিত হাস্যে সে একেবারে গলে পড়লো।

ঘর থেকে ও ডেকে বলল 'রামু, সব তুই নিয়ে আয়—বৌদির কথা শুনিস্‌নে।'

রামু তার দাদাবাবুর আদেশ তক্ষুনি পালন করলো—আমি মুখ ধুতে চ'লে গেলুম।

ফিরে এসে দেখি, ভীষণ মনোযোগ সহকারে সে চা ঢালতে বসেছে—আমাকে আসতে দেখেই হেসে বললো 'নাও—তুমিই এ-সব করো, ভেবেছিলুম পারবো—কী করে যে মেয়েরা এসব কাজ ম্যানেজ করে', —হাত গুটিয়ে সে স'রে বসলো—আমি দেখলুম বিছানার চাদরে ট্রের উপরকার কাপড়ে মেঝেতে সর্বত্র চায়ের জলের দাগ। বললুম, 'এ তুমি কি করেছ ? কে বলেছিল ?'—তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে এনে মুছে দিলুম—ব্যস্ত হয়ে ছোকরাটাকে ডেকে মেঝেটা পরিষ্কার করতে বললুম—ও নির্নিমেষে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার ভাবভঙ্গি দেখে বললো 'রাণী, আমার মনেই পড়ছে না যে কোনোদিন তুমি ছিলে না এ-সংসারে।'—হঠাৎ আমি লজ্জাবোধ করলুম। সত্যি কথাই তো, ঘর নোংরা হয়েছে বা বিছানার চাদরে চা পড়েছে এটা আমাকে এমন বিব্রত করবে কেন ; এ-বাড়ির সঙ্গে আমার কতটুকু সময়ের পরিচয় ?

আমাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে বললো, 'চাদরটাকে যত্ন করে মুছলে, মেঝে পরিষ্কার করবার আদেশ দিলে আর আমি অভাগা যে চিনি-ভরা চিটচিটে—হাতে বসে আছি—' হেসে সে আমার দিকে দিব্যি পরিষ্কার হাত বার করে দিল।

আমি দুষ্টুমি বুঝে বললাম, 'সব তোমার চালাকি—কিছু হয়নি তোমার হাতে।'

'না সত্যি—দাও না মুছিয়ে হাতটা।' আমি হেসে কোলের উপর হাত টেনে নিয়ে পরিষ্কার হাত আরো পরিষ্কার ক'রে দিতে লাগলুম। এ-খেলা আমাদের কতক্ষণ চলতো জানি না—গভীর আবেশে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলুম—হঠাৎ আমি পিছনে তাকিয়ে অভিলাষকে দেখে থর থর করে কেঁপে উঠলুম। আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দে ও-ও চমকে চোখ তুললো।

'বাঃ, দৃশ্যটি বেশ' মুখের এক অশ্লীল ভঙ্গি ক'রে অভিলাষ পাশের একটা চেয়ারে কায়েমি হয়ে বসলো আর আমি ত্রস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। ও অভিলাষের দিকে তাকিয়ে একটু যে বিব্রত না হয়েছিলো তা নয়, কিন্তু তক্ষুনি সে-ভাব সামলে নিয়ে বললো, 'কী খবর অভিলাষ ?' আমার দিকে তাকিয়ে বললো 'অভিকে একটু চা দেও রাণী'।

'উঃ, আবার নামকরণও হয়েছে দেখছি।' ও হেসে বললো, 'জানো তো যে মেয়ের মধ্যে সমস্ত গুণ থাকে তাকেই কেবল রাণী আখ্যা দেয়া যায়।'

'আমি ফাজলেমি করতে আসিনি, শ্যামল—এসেছি তোমাকে সাবধান করতে। কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে তুমি জলে বাস করবে ? এত স্পর্ধা তোমার কেমন ক'রে হ'লো ?'

'তবে আমারো একটা কথা বলবার আছে অভি—তোমারো তো স্পর্ধার সীমা দেখছিনে—কোন্ অধিকারে আমার অনুমতি ছাড়া আমার শোবার ঘরে এসে তুমি দাঁড়িয়েছো ?'

'তোমার আবার শোবার ঘর !'—অভিলাষ হাসিতে ফেটে পড়লো 'সারাবাড়ি একঘর—বার আর অন্দর—হাসালে, হাসালে কিন্তু তুমি। এখান থেকে যাও রুনি ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

আমি ভীত চকিত দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে—ও খপ্ কোরে আমার হাত ধরে বললো, 'যা বলবার আমার স্ত্রীর সাক্ষাতেই বলতে পারো অভি—তুমি এখানে বোসো রাণী', ওর পাশে আমাকে ও জোর করে বসিয়ে দিল।

অশ্রু-অর্ঘ্য

ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জনপ্রিয় কংগ্রেসকর্ম্মী ও জনসেবক স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও লব্ধ-
প্রতিষ্ঠ বায়োকেমিক চিকিৎসক ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত
শ কার্ত্তিক টালীগঞ্জস্থ বাসভবনে হৃৎ

ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার
প্রায় ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি গত ৬ মাস যাবৎ
ন আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন।

ডাঃ প্রবোধকুমার বন্দোপাধ্যায়

ডাঃ প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ার স্বনামখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার প্রবোধ-
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭শে আশ্বিন মহাষ্টমী দিবসে অকস্মাৎ
হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার
অমায়িক সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তিনি আমাদের সর্ব্বশ্রেণীর জনগণের
নিকট অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হাওড়ার সকল
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ডাঃ জে, এন, সেনগুপ্ত

অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন (বি এ্যাণ্ড
ও) ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গত ২১শে

ডাঃ জে, এন, সেনগুপ্ত

জুলাই ৬৫ বৎসর বয়সে 'করোনারি থ্রম্বসিস্' রোগে পরলোক গমন
করিয়াছেন। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী,
সংস্কৃত, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দি সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।
তিনি আগ্রার দয়ালবাগস্থিত রাধাস্বামী সৎসঙ্গের অন্যতম প্রধান
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রধান মেডিক্যাল অফিসার এবং
কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহু দুঃস্থ
পরিবার তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইত। অমায়িক
ব্যবহারের জন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

'তোমার স্ত্রী! তোমার স্ত্রী! স্কাউণ্ড্রেল—কাকে তোমার স্ত্রী
ছো। লজ্জা করে না? জিজ্ঞেস করো তো ওকে—কার সন্তান
হন করছে দেহে।'

এ-কথার পরে আমি আর্ত্তস্বরে ডেকে উঠলুম, 'অভিলাষ!' দপ্
রে ওর মুখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো—আমাকে আড়াল কোরে
কাঁপতে-কাঁপতে রুখে দাঁড়ালো—তারপর একেবারে অভিলাষের
ার কাছে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মনে হলো,
ভিলাষ এই চাইছে—ওর হাতে আজ অসামান্য ক্ষমতা—ও একটা
ার কর্ত্তা—ওর গায়ে আজ যদি কেউ হাত তোলে রক্ষে আছে
। আমি গিয়ে জড়িয়ে ধরলুম ওকে. জোর করে টেনে নিয়ে
ম বিছানায়—কাঁদতে-কাঁদতে বললুম, 'তুমি যদি ওঠো আর যদি
টি কথা বলো—মাথা খুঁড়ে মরবো আমি এখানে।' তারপর
লাষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, জোড়হাত করে বললাম, 'তুমি
বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—যা তুমি পারো—যত শত্রুতা
করতে তোমার প্রাণ চায় সব তুমি কোরো কিন্তু এই পাপ মুখ আর
দেখিয়ো না আমাকে—আর যে মুখ দিয়ে অত বড় মিথ্যা কথা তুমি
রটিয়ে বেড়াচ্ছ আমার নামে—সে-মুখ যেন তোমার পুড়ে ছাই হয়ে
যায়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' আমার হাতে এক প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে অভিলাষ
বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি মুখ ফিরিয়ে ওর কাছে যেতেই ও উত্তে-
জিত হয়ে বললো, 'ওকে খুন করে ফেলবো আমি—তাতে যা সর্বনাশ
হয় হবে—ফাঁসি যাবো তাও ভালো—ছাড়বো না, ছাড়বো না ওকে
আমি—যে-মুখ দিয়ে ও ঐ কথা উচ্চারণ করেছে সে মুখ আমি ভেঙে
ফেলবো।' বলতে-বলতে ও হাঁপাতে লাগলো। আমি ভয় পেয়ে
কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলাম, 'তুমি
কি পাগল হলে—তুমি কি ছেলেমানুষ!'

[ক্রমশঃ

এবার এশিয়ায়—

কিছু দিন পূর্ব্বে 'আমেরিকান মার্কারী' পত্রে বিশিষ্ট পররাষ্ট্র-নীতি-বিশারদ আন্দ্রে জিগসন মন্তব্য করেছিলেন—"নিকট প্রাচ্যে বড় তিন শক্তির স্বার্থ এক রকম অভিন্ন। কাজেই তিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক।" এ মন্তব্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

পশ্চিম এশিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা—

ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল কথা ছিল যেমন ভারতের পথ কণ্টকমুক্ত করা, সে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের চরম কথাও এই ভারত-পথ রক্ষা করা—ছলে, বলে ও কৌশলে। বর্ত্তমান রাক্ষসী যুগের বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতা রক্ষার জন্য যে পেট্রোলের প্রয়োজন ইংরেজ তার প্রাচ্য-পথ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তা লাভ করেছিল, আর এই পেট্রোল হাত-ছাড়া যাতে না হয় তার জন্য মরণ-পণ সে করবে। বৃটেনের এই স্বার্থে বাদ সাধতে চায় আমেরিকা আর রুশিয়া। পশ্চিম-এশিয়ার তৈল লাভ ও ভারতের বাণিজ্য-পথের সুবিধা সংগ্রহ করতে আমেরিকা ও রুশিয়া আজ প্রস্তুত হয়েছে। ইরাণে আমেরিকান অয়েল কর্পোরেশনগুলো আবার ফিরতে চেষ্টা করছে। আমেরিকা দাবী করছে যে তার পশ্চিম-এশিয়ার নৌ ও বিমান ঘাঁটিগুলোর জন্য যে তেলের দরকার, তা তাকে ইরাণ থেকেই নিতে হবে। ইংরেজরা বোধ হয় আমেরিকার এই দাবী সমর্থন করবে। কারণ বলছি।

কারণ—পশ্চিম-এশিয়ার ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্রগুলোর জনসাধারণ শ্বেতাঙ্গ-প্রভাব নির্ম্মূল করতে চায়। মাত্র প্যালেষ্টাইনে নয়, সিরিয়া, ইরাক, ইরাণ, সাউদী আরব—সর্ব্বত্র ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে উত্থানের চেষ্টা পরিস্ফুট। ইংরেজের সৃষ্ট প্যান-ইসলামের ধুয়ায় কেউ আর সাড়া দিতে চাচ্ছে না। এরা প্রত্যেকে চায় স্বাধীনতা—বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত নিষ্কণ্টক স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য তারা স্বদেশে যেমন স্বার্থরক্ষার নির্ম্মম সংগ্রাম চালাতে চায়, তেমনি সে সংগ্রামের প্রয়োজনে ত্রয়ী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগও নিতে চায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজ এংলো-স্যাক্সন, তথা সাম্রাজ্যবাদী ধনিক ও বণিকতন্ত্রমূলক আঁতাত আমেরিকার সাহায্যে গড়ে তুলতে ব্যগ্র।

কারণ—সোভিয়েট রুশিয়া পশ্চিম-চীনেও কোরিয়ায় যেমন এক বাহু প্রসারিত করেছে, এদিকেও তেমনি আর এক হাত প্রসারিত করেছে। এ পথে রুশিয়ার বাহন নানাবিধ। কমুনিজম আদর্শের প্রয়োগ করতে রুশিয়া ব্যগ্র না হলেও পশ্চিম-এশিয়ার আরব দেশগুলিতে যে কমুনিষ্ট আন্দোলন চলছে, সে আন্দোলনকারীদের সাহায্য সে নেবে। রুশিয়ায়ও আবার অভিনব প্যান-ইসলামের ধুয়া উঠেছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নে ইসলাম ধর্ম্ম আবার মর্য্যাদা পেয়েছে। অল সোভিয়েট মসলেম কংগ্রেস আর গ্রীক অর্থডক্স চার্চ্চ তাদের প্রভাব পশ্চিম এসিয়ায় প্রসারিত করেছে। এ সব রুশ-পরিকল্পনার পেছনে আছে পেট্রোল আর প্রাচ্যের পথ।

পৃথিবীতে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি হ'ল—আমেরিকা আর সোভিয়েট রুশিয়া। যাতে সোভিয়েট প্রভাব প্রবলতম হয়ে এশিয়ার শ্বেতাঙ্গ বণিকদের সম্পদ অর্জ্জনের পণ্যক্ষেত্র এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপ গ্রাস না করে তার জন্য আমেরিকার রাজনীতি-বিশারদরা বলছেন, পশ্চিম-এশিয়ায় মাত্র নয়, পূর্ব্ব-এশিয়া থেকেও আমেরিকার এখনও সরে পড়বার সময় আসেনি—যে হেতু ইংরেজ সোভিয়েটে সম্পর্ক চটে যাবে ("The United Statees should not retire form the area because it would be highly dangerous for her to ignore anything that might prove hazardous to Soviet British relations")।

প্যালেষ্টাইনে এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক আরব রাষ্ট্র গঠন করবার দাবী সেখানকার ৫টি রাজনৈতিক দল (Arab Front Group) করেছে। এরা সর্ব্বরকমে ইহুদীদের বর্জ্জন করবে বলে সঙ্কল্প করেছে।

ইংরেজরা এতে একটু চঞ্চল হয়েছে। ওরা মনে করেছে, প্যালেষ্টাইনে যদি য়ুরোপের সব ইহুদীকে স্থান দেওয়া হয় তাহলে মধ্য-প্রাচ্যতে আরবরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কিন্তু পশ্চিম-এশিয়ায় আরবসঙ্ঘকে অস্বীকার করবার উপায় নাই দেখে ইংরেজের তাঁবে একটা আরব লীগ গঠন করা হয়েছে। ধ্বনি অবশ্য—আরব আরবীদের জন্যই। উদ্দেশ্য—লেভান্টে ফ্রান্সকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, প্যালেষ্টাইনে আর ইহুদীকে আসতে দেওয়া হবে না।

এ সব রাজনৈতিক চেষ্টা ও পাল্টা চেষ্টার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে এখনও সব খবর এসে পৌঁছাচ্ছে না।

পূর্ব্ব-এশিয়ায়—

পূর্ব্ব-এশিয়াতেও ত্রিশক্তি খেলা চলছে চীনে। যে কমুনিষ্ট ও কুওমিনতাং বিরোধ আজ পেকে উঠেছে তাতে না কি কুওমিনতাং দল সাহায্য পাচ্ছে আমেরিকা আর জাপানী সৈন্যের—অন্ততঃ চীনা কমুনিষ্টরা এই অভিযোগ করছে। আমেরিকানরা ঐ অভিযোগের প্রতিবাদ করেছে। কমুনিষ্টরা বলছে, যে সব অঞ্চল আজ জাপ-কবলমুক্ত হয়েছে, সে সব অঞ্চল কুওমিনতাং ফৌজের দখলে কেন যাবে? এ জন্য তারা যে বাধা দিবে তাতে ঘরোয়া যুদ্ধ ত অনিবার্য্য। ঘরোয়া প্রবল যুদ্ধ বেধেছেও। কমুনিষ্টরা দাবী করেছে মার্কিণ ফৌজ চীন থেকে সরে যাক অবিলম্বে। কিন্তু চিয়াং কাইসেকের দলের সঙ্গে তুমুল লড়াই-এর বিরাম নাই। এ লড়াই-এর ফলে কমুনিষ্টরা যদি জয়লাভ করে তা হলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়ায় তিষ্ঠান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কোরিয়ায়—

কোরিয়া জাপানের আয়র্ল্যাণ্ড। গত ৪০ বছর কোরিয়ার বিপ্লবীরা জাপানীদের বাধা দিয়ে এসেছে। জাপানের পতনের পর তারা আশা করেছিল যে, এবার তারা মুক্তি পাবে। কিন্তু আজ কোরিয়ার উত্তরাঞ্চল রুশ ও দক্ষিণাঞ্চল মার্কিণ সামরিক সরকার

হয়েছে। অন্য দিকে ওদের ঘরোয়া বিরোধও বেধে উঠেছে। চীনে
কোরিয়াতেও তেমনি কমুনিষ্টরা (Peoples' Republican
) এই সুযোগে বলপ্রয়োগ করে শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভের চেষ্টা
রাজনৈতিক দল সেখানে ছোট-বড় নিয়ে ৫৩টি। মাকিণ তরফ
সাহায্য নেওয়া হচ্ছে রক্ষণশীল গণতান্ত্রিক দল ও নারী-জাতীয়তা-
দের। দুটো দলই অবশ্য রিপাবলিকান দলের মতই বড়।
পলস্ পার্টির নেতা লিউ-উন-হিয়ুং। বহু কাল একে জাপানের
রে বসে শেকল গুণতে হয়েছে। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা
সামরিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। নীতি—
প্ত সম্প্রদায় বর্জ্জন, নর-নারীর সমান অধিকার, যেচ্ছাবৃত্তি
। কোরিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে এ দল প্রবল।
ভাজদের ভেদনীতির ফলে কোরিয়ার সুপ্রাচীন মুক্তি
ন ভেসে যাবে কি না তা লক্ষ্য করার মত ব্যাপার।

অধিকৃত বর্ম্মা—

রেজরা বর্ম্মা ফিরে পাবার পর, সেখানকার সব রাজনৈতিক
The Supreme Council of the Anti-Fascist
es' Freedom League—ফাসিস্ত বিরোধীদের
-সঙ্ঘের চরম পরিষদ বা বর্ম্মা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট গঠন করা
ভারতের বড়লাট যেমন ভারতের কেন্দ্রী শাসন পরিষদ গঠনের
দল দলের নেতাকে ডেকেছিলেন, বর্ম্মার গবর্ণরও তেমনি বর্ম্মার
র ডেকেছিলেন। প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট বলেছেন, শাসন পরিষদের
ত্যর মধ্যে ১১ জন সদস্যকে তাঁদের দল থেকে নিতে হবে।
ফ্রন্টের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য স্থানের
াতেও বিপ্লবীরা প্রবল হয়ে উঠেছে। জাপানীরা যে সকল অস্ত্র-
ফেলে গেছল তা'ও যেমন তারা হস্তগত করেছে, জাপানীদের
রবার জন্য ইংরেজরা বর্ম্মী গেরিলাদের হাতে যে সব অস্ত্র-শস্ত্র
ল সেগুলিও বিপ্লবীদের হাতে গিয়েছে। বিপ্লবীরা এবার
ম চণ্ড-প্রচেষ্টা সুরু করেছে। ভারতে এমন প্রচেষ্টার আভাস
কলেও, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর মত বর্ম্মীরাও আজ নিয়ম-
লড়াইএ মেতেছে বলে মনে হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লব—

ইন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের প্রাণ-সম্পদ্। এই দ্বীপগুলো ছিল
ওলন্দাজরা শক্তির বড়াই করত। নেদারল্যাণ্ডের পাঁচ
এক ভাগ লোককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ইন্দোনেশিয়ার উপর
ভাবে নির্ভর করতে হয়। যবদ্বীপ জাপ-কবলমুক্ত হবার
সঙ্গে ৬০ হাজার ওলন্দাজ এখানে চাকরী চায়। জাতীয়তা-
যদি এখানকার রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করে তা হলে ওলন্দাজ
হয়ত পৃথিবী থেকে মুছে যাবে।
যবদ্বীপ ইংল্যাণ্ডের চেয়ে আকারে ঢের বড়। জনসংখ্যা
ণ্ডের জনসংখ্যার অপেক্ষা ৫০ লক্ষ বেশী। সমগ্র ইন্দো-
য়ার জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এসিয়ার অন্যান্য দেশের
সীদের মতন এরাও শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষী। জাপান এদের হাতে
ক অস্ত্রপাতি দিয়েছিল।
দ্বীপগুলির বেশীর ভাগই ওলন্দাজদের ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার
বন-জলতরঙ্গ রোধিবার শক্তি আজ ওলন্দাজদের নেই
তাদের হয়ে ইংরেজদের অনুধাবণ করতে হয়েছে।

ওলন্দাজরা সংবাদ দিয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিকামী সৈন্যবল বর্ত্তমানে প্রায় ৭০ হাজারে বাড়তেও পারে। এদের পিছনে আছে না কি কয়েক জন জার্ম্মাণ ও জাপ সামরিক পরামর্শদাতা। জাপানীদের যে সব হাতিয়ার ধরা পড়েছিল, এরা না কি সে সব হস্তগত করেছে। একটা সহরে (যবদ্বীপের জোগ-জাগার্ত্তা) মাত্র এক দিনে বিপ্লবীরা ৬২খানা এরোপ্লেন, ১৮০০ বোমা, ৮০টা মর্টার কামান, ৬৪টা মেশিন গান, ১৩০০ গ্রেনেড, ৭৫ হাজার বন্দুকাদি দখল করে।

১৬ই অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ান পিপ্‌লস্ আর্ম্মির সদরগুলি থেকে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়—

"আমাদের আদেশ, প্রত্যেক ইন্দোনেশিয়ান তার নিজ নিজ অস্ত্র খুঁজে নিক। অস্ত্র—সব রকমের আগ্নেয়াস্ত্র, বিষ-তীর ও বর্শা অগ্নি, সব রকমের বন্য পশু—যেমন সাপ। গেরিলা লড়াইয়ের সঙ্গে চলবে অর্থনৈতিক লড়াই। শত্রু যেন কোন খাদ্য না পায়। বাজারগুলো পাহারা দিতে হবে।"

এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই বেধে উঠে। ইংরেজরা ওলন্দাজদের ভাল করেই সাহায্য করছে। ইংরেজরা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ হতে যে প্রবল আক্রমণ করছে ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবীরা মরিয়া হয়ে তার প্রতিরোধ করছে।

নেতাদের পরিচয়—

ইন্দোনেসিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের নেতাদের পরিচয় একটু জানা দরকার।

ডাঃ সুকর্ণ

পিতা যবদ্বীপবাসী বড় লোক। মাতা বালিদ্বীপবাসিনী। সুকর্ণের জন্ম ১৯০১ খৃষ্টাব্দে, সুরাবায়ায়। বনিয়াদী বংশের ছেলে হ'লেও, এক অতি দরিদ্র বালকের সঙ্গে তাঁর ছিল মিতালী। প্রায় তাকে জিজ্ঞেস্ করতেন, এত গরীব কেন হলে? এই বালক সুকর্ণকে শৈশব থেকেই রাজনৈতিক বুদ্ধি দেয়। বড় হয়ে সুকর্ণ জাতীয় ইন্দোনেশিয়া দল (Partai Nasional Indonesia) গঠন করেন (১৯২৭)। এ সময় ইন্দোনেশিয়ায় কমুনিষ্ট আন্দোলন বড় প্রবল। কর্ত্তৃপক্ষ এ আন্দোলন দমন করে। সুকর্ণ তাঁর দলের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্ম্মীদের সমবেত করেন। দরিদ্রের মধ্যে তাঁর প্রভাব আশ্চর্য্য। তাঁর বক্তৃতায় জনসাধারণ মুগ্ধ। তারা ভালবেসে তাঁর নাম রেখেছিল বুং কর্ণ। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জাতীয় দলের সভাপতিরূপে ডাঃ সুকর্ণ ও তাঁর তিন জন বন্ধুকে ওলন্দাজ সরকার গ্রেপ্তার করে বন্দী করে। দু'বছর পর মুক্তি দেওয়া হ'লেও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করা হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণরা হল্যাণ্ড আক্রমণ করলে, সুকর্ণ হল্যাণ্ডকে সমর্থন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারকে সাবধান করে দেন যে, জাপানীরা আক্রমণ করবে। জাপানীরা সত্যি সত্যিই যখন আক্রমণ করল, তখন নির্ব্বাসিত ডাঃ সুকর্ণ ওলন্দাজ সরকারকে অনুরোধ করে বলেন, জাপানীদের বাধা দিতে হবে, আমায় মুক্তি দিয়ে যবদ্বীপে পাঠিয়ে দাও। ওরা তাকে মুক্তি না দিয়ে পালিয়ে গেল। জাপানীরা তাঁকে কারাগার থেকে ধরল। জাপানী দখল সময়ে ডাঃ সুকর্ণ বাহিরে জাপানীদের সঙ্গে ভাব করলেন, কিন্তু তলে তলে গুপ্ত ভাবে মুক্তির আয়োজন করতে লাগলেন। যে নেতা জাপানের বশ্যতা মানল না

জাপানীরা তাদের হত্যা করল। ডাঃ শুসিও ও অন্য ২ শত নেতার শির গেল। বর্ত্তমানে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র সরকারের প্রচার-সচিব আমির সরিফুদ্দীনকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সুকর্ণ চোরা গোপ্তা লড়াই-এর জন্য গেরিলা দল তৈরী করতে লাগলেন, জাপানকে বুঝালেন যে, এ মাত্র মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণে বাধা দিবার আয়োজন। জাপ-আত্ম-সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সুকর্ণের দল তাদের প্রকৃত মতলব প্রকাশ করলেন জাপ-রাজপুরুষদের হত্যা করে আর প্রভূত জাপ অস্ত্র-শস্ত্র দখল করে ১৭ই আগষ্ট (১৯৪৫)। জাপান আত্মসমর্পণ করবার দুই দিন পরে ডাঃ সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করলেন। তিনি হলেন প্রেসিডেণ্ট, ডাঃ মহম্মদ হাত্তা হলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট, বিপ্লবী বিশিষ্টরা স্থান পেলেন তাঁর মন্ত্রিসভায়।

ডাঃ হাত্তা

ডাঃ মহম্মদ হাত্তা সুমাত্রার এক উচ্চবংশীয় মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের ছাত্রাবস্থা কালে চরম রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রত্যেক স্থানে মুক্তিকামী যুব-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, ইন্দো-ইন্দোনেশিয়ার ছাত্ররাও ঐ সময় (১৯০৮) হল্যাণ্ডে ইন্দোনেশিয়া এসোসিয়েসন গঠন করেন। এই এসোসিয়েসান ক্রমে 'ফ্রি ইন্দোনেশিয়া' বিপ্লবী দলে পরিণত হয়। ক্রুশেলসে আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের (Inter Nasionale Liga) অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারী ১৯২৭) পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে এ সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ হাত্তার বন্ধুত্ব হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা বিপ্লীবের প্রচেষ্টায় শঙ্কিত হয়ে হাত্তাকে হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত করে ইন্দোনেশিয়ায় কমুনিষ্ট আন্দোলনও তারা সম্পূর্ণ দমন করে। এ সময়ে হাত্তা হল্যাণ্ডে বার্ত্তা-শাস্ত্রে পি, এইচ ডিগ্রী লাভ করেন।

হাত্তা অবশ্য সুকর্ণের মত দুর্জ্জয় বিপ্লবী নন। তিনি দেশকে শিক্ষার ভিতর দিয়ে গড়তে চেয়েছেন, সুকর্ণের মত—আঘাত করে করে প্রথমে শেকল ছেঁড়ে। হাত্তা ব্যবসায়-সূত্রে জাপানে যান। ফিরতেই (১৯৩৪) তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাঙ্গা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তাঁর চিঠির আদান-প্রদান হয়।

ভেদ প্রয়োগ—

ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবীদের মধ্যে ভেদ বাধাবারও চেষ্টা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের নতুন মন্ত্রি-সভা গঠন করা হয়েছে মিঃ শারিয়ারকে প্রধান মন্ত্রী করে। এতে আছেন আমির শরিফুদ্দীন। ডাঃ হাত্তাকে সহ-সভাপতি করে রাখা হয়েছে। গদি পেয়েই নতুন প্রধান-মন্ত্রী বিপ্লবীদের ফ্যাসিষ্ট ও জাপ-সমর্থক বলে ঘোষণা করেছেন।

বিপ্লবী এনাম—

ইন্দো-চীনের পুরান নাম এনাম। এনাম ৮০ বছর পরাধীন। এনাম ফ্রান্সের জমীদারী। জাপান কেড়ে নিয়েছিল। ফ্রান্স আবার ফিরে পেয়েছে। অবশ্য নাবালক রাষ্ট্র হিসাবে বৃটেন ও আমেরিকা আজ তার অছিগিরি করতে ব্যস্ত।

ইন্দোচীনেও বিপ্লব। বিপ্লবী নেতা ত্রান ভান জিউ (৩২)। ১২ বছর বয়সে ইনি ফ্রান্সে লেখা-পড়া শিখতে গিয়ে ফরাসী কমুনিষ্ট দলে নাম লিখান। ১৯৩২ সালে তাঁকে ফ্রান্স থেকে ইন্দোচীনে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। দেশে এসে জিউ জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করতে থাকলে ধর-পাকড় আরম্ভ হয়। জিউ পালিয়ে যান রুশিয়ায়। মস্কোএর ষ্টালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ফরাসী কমুনিষ্ট নেতা মরিস থোরেজ, আর যুগোশ্লাভিয়ার নেতা টিটো। যুদ্ধের সময় দেশে ফিরে এসে জিউ ইন্দোচীনের প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছেন।

বিপ্লবী ইন্দোচীনে স্বেচ্ছামৃত্যুব্রতী ("ভিট মিন্‌হ") দল গঠন করা হয়েছে। আনাম দখল করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের যে সব সৈন্য চেষ্টা করেছে, এ দলের উদ্দেশ্য তাকে বাধা দেওয়া। এরা ঘোষণা করেছে—

"এ সময় প্রত্যেক আনামীকে বাধা-প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে হবে। চোরা-গোপ্তা গেরিলা-পদ্ধতিই উপায়। শত্রুর পথ-ঘাট ধ্বংস কর। ওদের রসদ পাবার পথ নষ্ট কর। আনামী বিভীষণদের বেছে বের কর। শত্রুর ছিদ্রের সন্ধান নাও, সর্ব্বদা অতর্কিতে কর আক্রমণ। স্বেচ্ছামৃত্যুব্রতীরা পথ, সেতু ধ্বংস করবে, কারখানাগুলোয় আগুন দেবে, শত্রুর সৈন্য যেখানে সংখ্যায় কম সেখানে করবে আক্রমণ। জনসাধারণ শত্রুর সঙ্গে যেন সহযোগিতা না করে। ওদের কাছে খাবার বিক্রী করা চলবে না। এ পন্থায় কাজ করলে এক দিন ওরা দেখবে যে, আনামীদের শোষণ করবার জন্য কোন গাঁড়া-তন্ত্র গঠন করা চলবে না। ফরাসী বে-সামরিক প্রত্যেকটি লোকের প্রত্যেক সম্পত্তি, কারখানা, সওদাগরী আফিস, রবার-বাগান—সমস্ত জ্বালিয়ে দিতে হবে।

"গেরিলারা লড়াই করে প্রাণ দিবে দেশের জন্য। দেশবাসী যারা লড়াই করতে পারবে না, তারা যেন এদের খাদ্য সরবরাহ করে, আশ্রয় দেয়, বিভীষণদের শিক্ষা দেয়, আর শত্রুর সব সংবাদ বিপ্লবীদের জানায়। গেরিলাদের ঘেরাও করলে জনসাধারণকে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও নামতে হবে।"

আজ ইন্দোচীনের দেশবাসীরা উকীল, মধ্যবিত্ত অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক গেরিলা দলে যোগ দিয়েছে। তারা দিনে অলক্ষ্য স্থান থেকে হাত গ্রেনেড ছোড়ে, রাতের বেলায় চালায় গোলা-গুলী।

ইন্দোচীনে ৮০ হাজার জাপ সৈন্যকে মিত্রপক্ষের নির্দ্দেশে ব্যবহার করা হবে বলে শুনা যাচ্ছে। চোলোন অঞ্চলে ৩ লক্ষ চীনা সৈন্য। তার পর ক্রমাগত আসছে ফরাসী মদের পিপার সঙ্গে ফরাসী সৈন্য। ইংরাজের সৈন্যরা ত আছেই।

জানি না, এশিয়ায় যে নিপীড়িতের মাথা তোলবার চেষ্টা চলছে তা সার্থক হবে কি না। এও জানি না যারা শত শত নয়, হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে মার খেল তাদের জেগে ওঠা মাথার উপর অণু-বোমার আক্রমণ চলবে কি না। যদি চলে প্রাচ্যের চির দুঃখের অবসান হবে। যদি না হয়, তবে স্বর্ণপ্রাচ্য—স্বর্ণে না হোক আবার ধন-ধান্যে সম্পন্ন হবে। সে দিনের প্রতীক্ষা করে বেঁচে রইতেই হবে আমাদের।

আজাদ হিন্দ ফৌজ
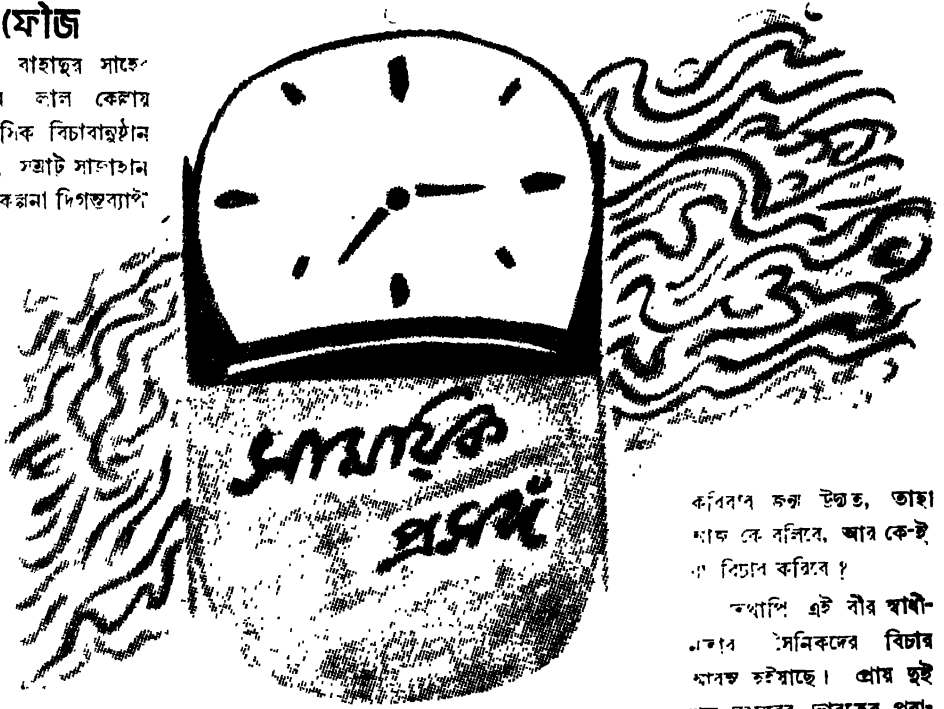
দিল্লীর শেষ বাদশাহ্ বাহাদুর সাহের বিচারশালা দিল্লীর লাল কেল্লায় ...তর আর একটি ঐতিহাসিক বিচারানুষ্ঠান ...ত হইয়াছে। জানি না, সম্রাট সাজাহান ... দিন তাঁহার বাদশাহী কল্পনা দিগন্তব্যাপী ...ত করিয়াও ভাবিতে ...য়াছিলেন কি না যে ... তিন শত বৎসর ... তাঁহারই নির্মিত ... ভারতের ইতিহাসের ...পেক্ষা চাঞ্চল্যকর এক ...য় রক্তাক্ষরে লিখিত ... পলাশীর যুদ্ধের ... ভারতের স্বাধীন... এইরূপ আর ... ঘটনা ঘটে নাই ...ই আমাদের বিশ্বাস। ...তর স্বাধীনতাযুদ্ধের ...ন্দর বিচার করিতে- ... আজ বিদেশী ...জ্যবাদী শাসকশ্রেণী। এক দিকে মহিমান্বিত স্বাধীনতা কাঠগড়ায় ...মান, অপর এক দিকে মহিমান্বিত পরাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদী ... তাহার বিচারক। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

...তি ৫ই নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন অধিনায়ক ...ন সেহগল, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ও ক্যাপ্টেন ধিলনের বিচার ... হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাঁহারা বৃটিশ ...র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং রাজানুগত্য পরিত্যাগ ... তাঁহারা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া ...ধিক ১২০০ ভারতীয় সেনাকে শিক্ষিত করেন। বৃটিশ ...র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ মিথ্যা না হইতে পারে, ...স্বেচ্ছাচারী বিদেশী শাসকের রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে পরাধীন দেশ-... যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ঘোষণা অপরাধ কি না তাহার বিচার কে ...? পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য যে যুদ্ধ, যে বিদ্রোহ, ...অন্যায় ও অপরাধ বলিয়াই যদি গণ্য হয়, তাহার জন্য যদি ...াড়ম্বরে বিদ্রোহীদের বিচারের আয়োজন করিতে হয়, তাহা ...এই কয় বৎসর কেন লক্ষ লক্ষ লোককে মহাযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে ...বিসর্জন দিবার জন্য আহ্বান করা হইল, কেন এবং কাহার ... এত কামান-গোলা-বোমা-বারুদ ব্যয় করা হইল তাহা আজ ...খ্যা করিয়া দিবে? যে-আদর্শের জন্য স্থল জল শূন্য দলিত-... করিয়া এই মহা প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল, এত সনদ, এত ..., এত সদিচ্ছাপূর্ণ বিবৃতি ও বক্তৃতার অনুষ্ঠান করা হইল, ...াদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য যাহারা জীবন পণ ... সংগ্রাম করিয়াছে, ত্যাগে ও বীরত্বে যাহারা কোন অংশেই ...ও অপেক্ষা নগণ্য নয়, স্বাধীনতার দীপ্ত অগ্নিশিখা যাহাদের ...র পথের দুর্গম অভিযানে প্রেরণা যোগাইয়াছে, তাহারা আজ ... মহা অন্যায়ের জন্য অপরাধী, এবং কেন যে আজ প্রতিহিংসা-... মৃত্যুর শাণিত দণ্ড তাহাদের পৃথিবীর বুক হইতে অপসারিত করিবার জন্য উদ্যত, তাহা ...াজ কে বলিবে, আর কে-ই ...া বিচার করিবে?

তথাপি এই বীর স্বাধী-...নতার সৈনিকদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসরের ভারতের পরাধীনতার তাম্রপট্টকে যাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আজ বৃটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধে অপরাধী এবং দিল্লীর লাল কেল্লার আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। তাহাদের কাহিনী আমরা প্রথমে বর্ণনা করি।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট

১৯৪৩ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র টোকিওতে যান। তাঁহার আগমনের ফলে ভারতের এই মুক্তি আন্দোলনের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তিনি প্রথমেই ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গঠিত কর্ম্ম-পরিষদকে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে রূপান্তরিত করেন। তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি করিয়া একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করা হয়। ১৯৪৩ সালের ২৪শে অক্টোবর এই গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নয়টি গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া নেয়।

সুভাষচন্দ্র বসু

মালয় ও ব্রহ্মের পতনের পর জাপানীরা ভারতীয়দের আনুকূল্য লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া ওঠে এবং ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের

প্রতি বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতে থাকে। ওদিকে জাপ কর্তৃপক্ষের সহিত প্রবাসী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক আলোচনাও চলিতে থাকে।

ভারতীয়দের সমর্থন লাভের জন্য জাপানীদের প্রচেষ্টার তিনটি কারণ থাকিতে পারে: (১) ভারত আক্রমণের কালে ভারতীয়দের আনুকূল্য লাভের জন্য প্রচার-কার্য্যের সুবিধা, (২) ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সাহায্য লাভ, (৩) মোলমিন-ব্যাঙ্কক রেল-রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে বিনা বাধায় ভারতীয় মজুর সংগ্রহ।

ফৌজ সংগঠনের ইতিহাস

ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশ সেনাপতি ও সৈনিকরা যখন ভারতে চলিয়া আসে, তখন বহু ভারতীয় সৈন্যকে তাহারা ফেলিয়া আসিয়াছিল। এই সকল সৈন্যকে তখন তাহারা প্রয়োজনবোধে কার্য্য করার নির্দেশ দিয়া আসিয়াছিল। পরে জাপানীরা ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুর দখল করিলে তাহাদের উৎসাহ ও সহায়তায় এই সকল প্রাক্তন বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী অ-সামরিক ভারতীয়দের লইয়াই আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিত্তি গঠিত হয়।

প্রবাসী ভারতীয়দের অস্ত্রবলে ভারত অধিকারের চেষ্টা এই প্রথম হইলেও প্রবাসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এই নূতন নয়, বহু পূর্ব্বেই উহার পত্তন হইয়াছিল। যে সকল ভারতীয় জাপান, চীন ও সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশে দীর্ঘ কাল যাবৎ ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। এক্ষেত্রে জাপান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। জাপানে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ প্রবাসী ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়া আসিতেছিল। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী আনন্দমোহন সহায় রাসবিহারী বসুর সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেন। মিঃ সহায়ই চীনে ভারতীয় জাতীয় সমিতি ও জাপানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্যামে স্বামী সত্যানন্দ পুরী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান বহির্জগতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে জোরালো প্রচার-কার্য্য চালাইতে থাকে। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যখন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বৃটিশের পূর্ব্ব-এশিয়া সাম্রাজ্যের উপর আঘাত করিল তখন বৃটিশের পশ্চাদপসরণ ছাড়া সাম্রাজ্য রক্ষার কোনও সামর্থ্য ছিল না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ মালয়ে বহু ভারতীয় সৈন্য আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইল, সিঙ্গাপুরের বহু সৈন্য যুদ্ধ-বন্দীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

এই সকল ভারতীয় সৈন্যরা পরে মালয়স্থিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে এবং দেরাদুন সামরিক কলেজ হইতে শিক্ষা-প্রাপ্ত বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর প্রাক্তন সেনানী ক্যাপ্টেন মোহন সিং নামে এক জন পাঞ্জাবীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অঙ্গীভূত হয়।

প্রবাসী ভারতীয়দের শক্তির সংহতির উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে টোকিওতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক প্রবাসী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। পরে ১৯৪২ সালে ১০ই জুন ব্যাঙ্ককেও অনুরূপ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আসিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা লীগে যোগ দেয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে, লীগের নীতি ও কর্ম্মপন্থা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ হইবে। ভারতে অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতীয় বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের একটি নিয়মতন্ত্র রচিত হয় এবং মালয়, ব্রহ্ম, শ্যাম, জাপান, সুমাত্রা, আন্দামান প্রভৃতি অঞ্চলে উহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে একটি প্রতিনিধি-পরিষদ ও কর্ম্ম-পরিষদ গঠনেরও সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে স্থির হয়।

প্রবাসী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের জাপানীদের সহযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই: (১) পূর্ব্ব এশিয়াস্থ ভারতীয়দের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (২) তিন লক্ষ সৈন্যের সমবায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন পূর্ব্বক স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা।

সুভাষচন্দ্র পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে জাপানীরা এই আন্দোলনে সহায়তায় দ্বিধা ও দীর্ঘসূত্রতা প্রদর্শন করিয়াই আসিতেছিল। সুভাষচন্দ্র সুদূর প্রাচ্যে পৌঁছানোর পর আন্দোলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল, তবে তিন লক্ষ সৈন্যের পরিবর্ত্তে তিন হাজার সৈন্য (জাতীয় বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে) লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইল। তবে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহে জাপানীরা গোড়া হইতেই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালে ইহা লইয়া সুভাষচন্দ্রের সহিত তাহাদের যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়কে উহার প্রজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল, ফলে, সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহে যথেষ্ট সুবিধা হইল। মতান্তরে, এই বাহিনীতে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। জাতীয় বাহিনীর ব্যয়-সঙ্কুলনার্থ মোট না কি আট কোটি টাকা সংগৃহীত হয়।

জাতীয় বাহিনীর নায়কেরা বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সেনানীরাই ঐ বাহিনীর উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিত, জাপানীদের কোনও আধিপত্য ছিল না। সৈন্যদের শিক্ষা-দীক্ষার ভারও ছিল ভারতীয় শিক্ষকদের হাতে, জাপানীদের কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। এই বাহিনীতে জাতি বা সম্প্রদায়গত কোন বিভেদ ছিল না, খাদ্য লইয়াও কোনও বিরোধ বা আপত্তির উদ্ভব হইতে দেওয়া হয় নাই। সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়া হইত হিন্দুস্থানীর সাহায্যে। আজাদ হিন্দ ফৌজের নিজস্ব সঙ্গীত ছিল, তাহারা 'জয় হিন্দ' বলিয়া অভিবাদন জানাইত। জাতীয় বাহিনীর সেনানীরা অনেকেই স্যাণ্ডহার্ষ্ট বা দেরাদুন ফেরত এবং বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর প্রাক্তন সেনানী। যত দূর জানা যায়, থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনানীদের সামরিক শিক্ষার জন্য গোটা দুই-তিন কেন্দ্র এবং সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্যও কয়েকটা শিবির ছিল।

সৈন্যদের পোষাক ও প্রতীক

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনানী ও সৈন্যদের পোষাক ও প্রতীক চিহ্ন ছিল এইরূপ:

(ক) পদমর্য্যাদার ব্যাজ :

কর্ণেল—ইহাদের কাঁধে সাধারণ ধরণের ষ্ট্রাপ, লাল পাইপিং এবং ...দ হিন্দ ফৌজ' লেখা পিতলের ব্যাজ থাকিত। উভয় পার্শ্বে ...ত একটি করিয়া সোনালী তারকা এবং সোনালী 'বারে' পদ-...ার কথা লেখা থাকিত।

মেজর—অন্য সমস্ত প্রতীক কর্ণেলের মতই, কেবল একটি সোনার ' পদমর্য্যাদা লেখা থাকিত।

ক্যাপ্টেন—কর্ণেলের মত সমস্ত প্রতীক ছাড়া তিনটি নীল রং-এর দ্বারা পদমর্য্যাদা সূচিত হইত।

লেফটেনান্ট—উপরের মত অন্য সমস্ত প্রতীক ছাড়া ইহাদের ...হইত দুইটি নীল 'বার'।

...কেণ্ড লেফটেনান্ট—ইহারও সমস্ত প্রতীক উপরের মতই, পদ-...জ্ঞাপনের জন্য থাকিত একটা নীল 'বার'।

...র অফিসার—উপরের মত সবগুলি প্রতীক থাকিলেও, ইহাদের ...থাকিত না।

...আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সৈন্য ও সেনানীদের বুকের বাম দিকে ত্রিবর্ণ কংগ্রেস ব্যাজ এবং মাথার ফেটিগ ক্যাপে 'আজাদ হিন্দ ...' লেখা পিতলের ব্যাজ থাকিত। ব্যাজে ছিল ভারতের ...ত্রের বহিঃ-রেখা অঙ্কিত, আর উহার মধ্যে লেখা থাকিত ...ক এতমাদ কোরবাণী' (সহযোগিতা, ন্যায় ও আত্মোৎসর্গ)।

(খ) বিভিন্ন ব্রিগেড ও রেজিমেন্টের সৈন্যদের পোষাকে রং-এর ছিল এইরূপ :

...ক নম্বর গরিলা রেজিমেন্ট (বসু)—লাল ও সবুজ।
...ই নম্বর গরিলা রেজিমেন্ট (গান্ধী)—সবুজ।
...ন নম্বর গরিলা রেজিমেন্ট (নেহরু)—ধূসর।
...র নম্বর গরিলা রেজিমেন্ট (আজাদ)—শাদা।

(গ) ব্যাটালিয়ানের চিহ্ন—প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানের সৈন্যরা বাম ...নিম্নদেশে বিভিন্ন ধরণের ব্যাজ পরিধান করিত। ব্যাটালিয়ান ...গেডের অন্তর্ভুক্ত থাকিত, সেই ব্রিগেডের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই পোষাকের রং নির্দ্ধারিত হইত। ব্যাজের আকৃতির পার্থক্য ...রূপ :

...থম ব্যাটালিয়ন—গোলাকার ব্যাজ।
...তীয় ব্যাটালিয়ন—ত্রিকোণাকৃতি।
...তীয় ব্যাটালিয়ন—চতুষ্কোণ।
...৬ কোয়ার্টার, এস এস বাহিনী ও সিগন্যাল প্লেটুনের সৈন্যদের ...ল হীরকাকৃতি।

বিচারের সম্মুখীন আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েক জন নেতৃবৃন্দ

...জাদ হিন্দ ফৌজের তিন জন অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ধিলন, ...শাহ নওয়াজ, ও ক্যাপ্টেন্ সেহগল আজ লাল কেল্লায় ...সম্মুখীন। মেজর জেনারল ভোঁসলাও হিন্দ ফৌজের এক জন অধিনায়ক। ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল :

ক্যাপ্টেন জি সিং ধিলন

...প্টেন জি সিং ধিলন পূর্ব্বে পাঞ্জাব রেজিমেন্টে ছিলেন। পরে ...রতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন। ক্যাপ্টেন ধিলনও দিল্লীর লাল কেল্লায় আছেন। গত ৩০শে অক্টোবর ধিলনের পত্নী বসন্ত কাউর কারাগারে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ক্যাপ্টেন ধিলন

১৯৪১ সালে ধিলন সামরিক কার্য্যব্যপদেশে মালয়ে যান, তাহার পর স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎকার। বসন্ত কাউর পাঞ্জাবী পল্লী-নারী হইলেও সুশিক্ষিতা, তিনি বেশ ভাল হিন্দী ও গুরুমুখী জানেন, ইংরাজীও বলিতে পারেন। আজাদ হিন্দ ফৌজে ধিলন ক্যাপ্টেনের পদ হইতে কর্ণেলের পদে উন্নীত হন।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ

৫ই নভেম্বর ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর যে তিন জন সেনানীর বিচার আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ অন্যতম।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ

ইনি লাহোর হাই-কোর্টের জাষ্টিস আবদুল কাদেরের পুত্র। শাহ নওয়াজ পূর্ব্বে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতে ছিলেন, পরে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন এবং ক্যাপ্টেনের পদ হইতে কর্ণেলের পদে উন্নীত হন। শাহ নওয়াজ দুই-বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার সন্তান-সন্ততি বর্ত্তমান।

কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান না কি কারাগারে শাহ নওয়াজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মামলায় তাঁহার পক্ষ সমর্থনের প্রস্তাব করিয়াছিল। শাহ নওয়াজ তাহার উত্তরে তেজোদৃপ্ত ভাষায় জানাইয়াছেন যে, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার সহিত ধর্ম্ম, ভাষা ও এলাকার কোনও সম্পর্ক ছিল না; মামলায়ও তিনি কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লইতে ইচ্ছুক নহেন।

শাহ নওয়াজ পরিচালিত বাহিনী স্বতন্ত্র ভাবে মণিপুরে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। প্রকাশ, ইনিই সর্ব্বপ্রথম মণিপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

ক্যাপ্টেন শাহ্ নওয়াজের পরিবারের বাষট্টি জন পুরুষ বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে আছেন। ব্রহ্মের যুদ্ধের কালে এক সময়ে শাহ্ নওয়াজের এক ভ্রাতা বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে থাকিয়া তাহারই বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছিল।

ক্যাপ্টেন সেহগল

ক্যাপ্টেন সেহগল লাহোর হাইকোর্টের জাষ্টিস অচ্ছরামের পুত্র। ইনি পূর্ব্বে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে ছিলেন। জাতীয় বাহিনীতে যোগদানের পর তাঁহাকে ক্যাপ্টেনের পদ হইতে কর্ণেলের মর্য্যাদায় ভূষিত করা হয়। সেহগল, ধিলন ও শাহ নওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রায় বার শত সেনানীকে সামরিক শিক্ষা দেন।

ক্যাপ্টেন সেহগল

মেজর জেনারেল ভোসলা

সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে নেতৃত্ব করার জন্য যাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস-বিখ্যাত ভোঁসলা বংশসম্ভূত মেজর জেনারেল জগন্নাথরাও কৃষ্ণরাও ভোঁসলাও আছেন। এই ভোঁসলা বংশেই শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম হইতে জাতীয় বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হইলে মেজর-জেনারেল ভোঁসলা তথায় বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে বন্দী হন।

জগন্নাথরাও জাতীয় বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সাত হাজার পাঁচ শত সেনানীকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। জাতীয় বাহিনীতে যোগদানের পূর্ব্বে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতে তিনি লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং সিঙ্গাপুরে বৃটিশ জেনারেল ষ্টাফে স্থান পাইয়াছিলেন।

কর্ণেল ভোঁসলা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের কালে ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্ষ্ট সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য মনোনীত হন। তাঁহার সঙ্গে আরও তিন জন ভারতীয় ছাত্র এই শিক্ষার জন্য মনোনয়ন লাভ করে। ইহার পূর্ব্বে আর কোনো ভারতীয় ছাত্রের স্যাণ্ডহার্ষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয় নাই। ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পর তাঁহাকে লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল পদে নিয়োগ করিয়া করাচীতে রাখা হয়।

জগন্নাথরাওর বয়স বর্ত্তমানে প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর।

প্রবাসী ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের কৃতিত্ব

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদানের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের উদাত্ত আহ্বান ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুর-প্রবাসিনী ভারতীয় নারী-সমাজেও এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। নারীদের মধ্যে এই দেশসেবার অকৃত্রিম প্রেরণা হইতেই ঝান্সীর রাণী ব্রিগেডের উদ্ভব হইয়াছিল।

যত দূর জানা যায়, প্রায় বার শত মহিলা এই বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রধান কাজ ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ হাসপাতালে আহত ও পীড়িতদের পরিচর্য্যা করা। কিন্তু কিছু দিন কাজ করার পরই ইঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রাণীর নামে গঠিত বাহিনীকে শুধু হাসপাতালে সেবাকার্য্য লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে, ইহা তাঁহাদের কাছে মনঃপূত হইল না।

এই নারী-বাহিনীর অধিনায়িকা ছিলেন ক্যাপ্টেন ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন। সদস্যারা ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী মারফত সর্ব্বাধিনায়কের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন পাঠাইলেন:

ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন

"পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কোনও প্রভেদ নাই, তাহা আপনিই আমাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। আপনি আমাদের পুরুষোচিত শিক্ষা দিয়াছেন, রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার উপযোগী মনোবল ও সাহস দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ণাঙ্গ সামরিক শিক্ষালাভ করিয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের রণাঙ্গনে পাঠানো হইতেছে না কেন? আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা এই যে, অবিলম্বে আমাদের রণাঙ্গনে প্রেরণ করুন।"

মহিলারা আঙ্গুল কাটিয়া সেই রক্ত দিয়া আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ইহাদের রণাঙ্গনেও পাঠানো হইয়াছিল, তবে তথায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব খুব সম্ভবতঃ বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচারকার্য্য ও সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষায়ই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঝান্সীর রাণী ব্রিগেডের এই নারী সৈনিকেরা কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন তাহারও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ইহারা ফুল প্যাণ্ট ও খাকী শার্ট পরিতেন। মাথায় থাকিত 'ফেটিগ' ক্যাপ, পায়ে বরাবের বুট।

এই ব্রিগেডের অন্যতম সদস্যা বেলা দত্ত নাম্নী ষোড়শবর্ষীয়া এক জন বাঙ্গালী তরুণী তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসাধারণ মনোবল ও অসম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আসামী পক্ষের কৌঁসুলিগণ

ভারতীয় নারী-সমাজে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর বীরত্ব, সেবাপরায়ণতা ও সংগঠন-কুশলতা এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। লক্ষ্মী মাদ্রাজের প্রখ্যাতনাম্নী কংগ্রেসনেত্রী শ্রীযুক্তা আম্মু স্বামীনাথনের কন্যা। লক্ষ্মী ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ভেষজশাস্ত্র ও অস্ত্রোপচার বিদ্যায় ডিগ্রী অর্জ্জনের পর চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি অবসর-বিনোদনের জন্য সিঙ্গাপুরে যান, কিন্তু পরে সেখানেই বসবাসের সঙ্কল্প করেন।

ডাঃ লক্ষ্মীর প্রথম স্বামীর নাম বি, কে, নানজুন্দা রাও। ইনি মাঙ্গালোরের অধিবাসী। মিঃ রাও এক জন বৈমানিক, ইনি ভারতসিংহল আকাশপথে টাটা কোম্পানির বিমান চালনা করিয়া থাকেন। কিছু দিন পরে লক্ষ্মী তাঁহার সহিত বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সিঙ্গাপুরে যান এবং সেখানে আব্রাহাম নামক এক জন সিরীয় খৃষ্টানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। আব্রাহাম এক সময়ে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে লক্ষ্মীর সতীর্থ ছিলেন।

লক্ষ্মীর মাতা মিসেস আম্মু স্বামীনাথন বলিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরে বেশ সুপরিচিতা হইয়া পড়েন এবং আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসার জন্য বারংবার পত্র লিখিলেও সিঙ্গাপুর ত্যাগে অসম্মত হন। মিসেস আম্মু আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সিঙ্গাপুরে যান এবং তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু লক্ষ্মী তখন কোন মতেই সিঙ্গাপুর ত্যাগে রাজী হন না। পরে সিঙ্গাপুরের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে জাহাজে স্থানাভাবে সে প্রচেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হয়।

মাতার বিবৃতি হইতে প্রকাশ, লক্ষ্মী না কি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম সদস্যা ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর বেতার হইতে ইংরাজী ভাষায় বৃটিশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন বলিয়াও শোনা গিয়াছিল। পরবর্তী কালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর ডাঃ লক্ষ্মী রেঙ্গুণে বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং সেখানে বৃটিশ হাসপাতালে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আত্মসমর্পণের (শুনা যায়, তিনি না কি আত্মসমর্পণ করেন নাই, ধরা পড়িয়া বন্দী হইয়াছিলেন) পর ডাঃ লক্ষ্মী তাঁহার মাতার নিকট প্রথম যে পত্র লেখেন তাহা ২৪শে আগষ্ট (১৯৪৫) তাঁহার নিকট পৌঁছায়। উহার পর হইতে তিনি প্রতি সপ্তাহেই মাতার নিকট পত্র লিখিতেছেন।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর বর্ত্তমান বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর।

সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ও পথ

যে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী আমরা বর্ণনা করিলাম তাহার সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই ফৌজ গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল কি? সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই এক জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁহার এই উদ্দেশ্য পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত দীর্ঘ দিন জড়িত থাকিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বাহিরের কোন শক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করিলে বিদেশী শাসকশ্রেণীর কবল হইতে কখন দেশোদ্ধার করা সম্ভব হইবে না।

তাই তিনি তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া এই পথে পা বাড়াইয়াছেন। ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, ফ্যাশিষ্টদের জয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি ইহাও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করিবার জন্য প্রস্তুত। ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেও ফ্যাশিষ্টরা উৎসুক। ফ্যাশিষ্টদের বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ নাই। সুভাষচন্দ্র এমন কথাও জোর করিয়া বলেন যে, যাঁহারা ফ্যাশিষ্টদের আদর্শের প্রতি আস্থাবান্ নন, তাঁহাদের তিনি অজস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিবেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে ফ্যাশিষ্টরাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। এখানে আমরা সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"By travelling abroad I could see things for myself and could study the respective positions of the belligerent powers. Thereafter, when I came to the conclusion that the defeat of Anglo-American Imperialisim was assured, I conveyed that information to my countrymen at home. Then I was delighted to find that my countrymen all over the world were wide awake and were anxious to undertake their share of the national struggle. *I was also gratified to find that the Axis powers were really eager to see India free and they were prepared to render any help that was within their power should the Indian people desire it*......As to the attitude of the Axis powers if anybody has the slightest doubt or suspicion I can easily convince him with overwhelming proofs that outside the ranks of our countrymen, *they are the best friends we have in the world today.*"

(Speech delivered in Singapore on July 9, 1945 and quoted by "Hindusthan Standard" of Nov 11, 1945)

সুভাষচন্দ্র এইখানে ইতিহাসের গতিধারার যে ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা ভুল এবং মারাত্মক ভুল। এত-বড় ভুল তিনি কেন করিয়াছিলেন তাহা চিরকাল ইতিহাসের এক অদ্ভুত রহস্য হইয়া থাকিবে। ফ্যাশিজমের আদর্শ, ফ্যাশিজমের আবির্ভাবের কাহিনী এবং ফ্যাশিজমের ঐতিহাসিক ভূমিকার তিনি যথার্থ বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্যবাদের সহিত ফ্যাশিবাদের কোন পার্থক্য নাই, থাকিতেও পারে না। সুভাষচন্দ্রের কথায় ভারতের বাহিরে যদি ফ্যাশিষ্টরাই ভারতের একমাত্র বন্ধু হইত এবং ফ্যাশিষ্টরা যদি কায়মনোবাক্যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিত, তাহা হইলে ফ্যাশিষ্টদের পৈশাচিক বর্ব্বরতা ইতিহাসকে এই ভাবে কলঙ্কিত করিতে পারিত না এবং ইয়োরোপ ও এশিয়ার এতগুলি রাষ্ট্রকে এই ভাবে বলপূর্ব্বক পদানত করিয়া ফ্যাশিষ্টরা শাসন, শোষণ ও অকথ্য পীড়ন করিতে পারিত না। ইয়োরোপ ও এশিয়ার প্রত্যেকটি নর-নারী-শিশু আজ ফ্যাশিষ্টদের এই বর্ব্বরতা ও পররাজ্য-লোলুপতা একবাক্যে স্বীকার করিবে। ইয়োরোপ ও এশিয়ার কোটি কোটি জনসাধারণ যে ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াছে, যাহাদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন আজও মুছিয়া যায় নাই, তাহারা কখনই পরাধীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হইতে পারে না, তাহারা কখনই ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করিতে পারে না। সুভাষচন্দ্রের ভুল হইয়াছিল এইখানে। ফ্যাশিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি ভুল করিয়াছিলেন। তিনি ফ্যাশিবাদের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রভেদ ও পার্থক্য স্বীকার করিয়া ভুল পথে পা বাড়াইয়াছিলেন। ইহাই ট্র্যাজিডি।

কিন্তু সেই জন্য যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অপবাদ দিয়া থাকেন তাঁহারাও মারাত্মক ভুল করেন। সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া যান। সেই ইতিহাসের মধ্যে কোথাও এতটুকু কলঙ্ক-চিহ্ন নাই। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতা ভারতবাসী অথবা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস কোন দিন অস্বীকার করিতে পারিবে না। তিনি ভুল করিতে পারেন, এক শত বার করিতে পারেন। ভুল করেন নাই এমন রাজনৈতিক নেতা ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও নাই। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ঠিকই ছিল। অচঞ্চল ধ্রুবতারার মত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য তাঁহার কর্ম্ম-জীবনকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের পরিবর্ত্তে জাপানী ফ্যাশিবাদের শাসন কায়েম করিবার ষড়যন্ত্র করেন নাই। কোন জটিল ষড়যন্ত্রের নায়ক তিনি হইতে পারেন নাই। সুভাষচন্দ্র নরওয়ের কুইজ্‌লিং, ফ্রান্সের দার্লা, চীনের ওয়াং চিং ওয়াই নন। তিনি সরল বিশ্বাসেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই ভুল পথে পা বাড়াইয়াছিলেন। ষড়যন্ত্র যদি কেহ করিয়া থাকে তাহা হইলে জাপানী ফ্যাশিষ্টরাই ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার যদি যোগাযোগ হইত, যদি বাস্তবক্ষেত্রে কোন দিন জাপানী ফ্যাশিষ্টরা ভারতকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুভাষচন্দ্রই তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। বর্ম্মার আউঙ্গ সান্, ইন্দোনেশিয়ার ডাঃ হাত্তা, ডাঃ সোয়েকার্ণো প্রমুখ জাতীয় নেতারা—যাঁহারা আজ সেখানকার জাতীয় আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহারাও তো সকলেই এক সময় জাপানীদের সহিত যোগ দিয়া সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সুযোগ আসা মাত্রই তাঁহারা তাহা কাজে লাগাইতে দ্বিধা করেন নাই। দুঃখের বিষয়, এই ঐতিহাসিক সুযোগ সুভাষ-চন্দ্রের জীবনে আসে নাই! যদি আসিত তাহা হইলে আজ আমরা দেখিতে পাইতাম যে, সুভাষচন্দ্রই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছেন এবং তাঁহারই গঠিত "আজাদ হিন্দ ফৌজ" বর্ম্মার আউঙ্গ সান্-গঠিত "Burmeese Patriotic Army"র ন্যায় সেই আন্দোলনে, সেই সংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধার ন্যায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজ তাই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ সুভাষচন্দ্র এবং "আজাদ হিন্দ ফৌজের" বিরুদ্ধে করা যায় না। তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম অন্ধ হইয়া ভুল পথে ছুটিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের আজ দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করা অন্যায় ও হাস্যকর। আরও হাস্যকর ব্যাপার এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ সেই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ইহাদের বিরুদ্ধে আনিয়াছেন। কাহার দেশ, কোন্ দেশের প্রতি তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, দেশদ্রোহিতা করিয়াছেন? করেন নাই, যদি করিয়া থাকেন ভারতের

প্রতি করিয়াছেন এবং তাহার বিচার করিবে স্বাধীন ভারতবাসী, ভারতের জনসাধারণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নহে। ভারতবাসী তাঁহাদের আজ দেশদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিতে রাজী নহে। ভারতবাসী আজ তাঁহাদের নির্ভীক দেশপ্রেমিক বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। আর স্বাধীনতার জন্য, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যদি বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অপরাধ হয়, তাহা হইলে ইতিহাসে "ন্যায়" বলিয়া যে কি গণ্য হইবে, ন্যায্য অধিকার বলিয়া যে কি স্বীকৃত হইবে তাহা আমরা জানি না।

কংগ্রেসের আদর্শ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের অহিংস ফাশিষ্ট-বিরোধী আদর্শের সহিত সুভাষচন্দ্রের আদর্শ এবং তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিত জওহরলাল, নাইডু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক গতিধারার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কংগ্রেস ১৯৪২ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত কোন দিন সেই ভাবে বিশ্লেষণ করে নাই। ফ্যাশিষ্টদের কোন দিনই কংগ্রেস ভারতবর্ষের বন্ধু বলিয়া স্বীকার করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই, ফ্যাশিজমের আবির্ভাবের সময় হইতেই, কংগ্রেস তাহাকে বিশ্ব-মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং কোন দিন ভুলিয়াও তাহাকে সমর্থন করে নাই। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ যদি স্বাধীনতার শত্রু হয় তাহা হইলে ফ্যাশিবাদ আরও মারাত্মক শত্রু। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদ সহোদর ভাই। এই ফ্যাশিবাদের বর্ব্বর আদর্শের বিরুদ্ধে কংগ্রেস চিরদিন দৃঢ়কণ্ঠে তাহার নিজের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত কোন দিন কংগ্রেস এমন কথা বলে নাই যে, বিদেশী শক্তির সাহায্য ভিন্ন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না। ভারতের চল্লিশ কোটি জনসাধারণের সংহত শক্তি ও সঙ্কল্পের উপর কংগ্রেস কোন দিন আস্থা হারায় নাই। অতএব সুভাষচন্দ্রের পথের সহিত কংগ্রেস-অনুসৃত নীতির বা পথের কোন মিল নাই, থাকিতে পারে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যেমন পথ ভুল করিয়াছিলেন, কংগ্রেসও তেমনি পথ বহু বার ভুল করিয়াছে। পথের ভুল লইয়া কাহারও দেশপ্রেমের আদর্শ ও আন্তরিকতার বিচার করা মূর্খতা। জীবনে আদর্শের পথে চলিতে পথ ভুল করে নাই এমন মহামানব অথবা মহা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে একটিও নাই। সুতরাং পথের বিচার করিয়া সুভাষচন্দ্র অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ যাচাই করা সম্ভব নহে। সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজের যে আদর্শ, কংগ্রেসের চিরদিনের সেই একই আদর্শ, চল্লিশ কোটি ভারতবাসীরও সেই আদর্শ। "স্বাধীনতার আদর্শ" ভিন্ন কংগ্রেসের দীর্ঘকাল অস্তিত্বের ও সংগ্রামের আর কোন আদর্শ নাই। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই সুভাষচন্দ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ তাহাদের অমর কীর্ত্তি-কাহিনী রচনা করিয়াছে। সেই জন্যই আজ তাহাদের অপরাধী বা দেশদ্রোহী বলিবার অধিকার কাহারও নাই। সেই জন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি দলনির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতের জনসাধারণ মুক্তকণ্ঠে দাবী করিতেছে। কংগ্রেস আজ তাই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অধিবক্তা। পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের আদর্শ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ-সমর্থনের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া এই কথাই বলিয়াছেন:

"I see no inconsistency at all in Congress attitude towards I. N. A. defence. Indeed, it is the outcome of the whole congress outlook in regard to India freedom...Every political organisation as well as many non-political groups have sided with congress on this issue...This general sympathy is mainly based on the belief on bonafides and patriotic motives that had inspired these people. *Whether they were right or wrong in their action is a matter on which people may well disagree but their general motives are unquestioned.*"—

("Hindusthan Standard," Nov 3, 1945)

আন্তর্জ্জাতিক আইন ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

আন্তর্জ্জাতিক আইনের (International Law) দিক দিয়াও বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে "আজাদ হিন্দ ফৌজ" রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কোন অপরাধ করে নাই। বে-আইনী আইনের স্বেচ্ছাচার হইতে রাজা যদি প্রজাকে রক্ষা না করেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্মগত অধিকার প্রজার আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই বিষয় লইয়া কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশ জনসাধারণের রাজার প্রতি যে আনুগত্য তাহা রাজা তাহাদের চারটি অধিকার যাহা "The Magna Charta," "The Petition of Rights", "The Bill of Rights" এবং "The Act of Settlement"-এর মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া আছে তাহা মানিয়া চলেন বলিয়াই সে আনুগত্য বজায় রহিয়াছে। তিনি বিখ্যাত আন্তর্জ্জাতিক আইনজ্ঞ এ্যাডামস্ (Adams)এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন। "The conditional right to rebel is asmuch the foundation of the English constitution today as it was in 1215." সুতরাং প্রজার আনুগত্য রাজা-প্রজার পারস্পরিক কর্ত্তব্য ও আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। রাজা যদি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন, রাজা যদি প্রজাকে স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায় ও অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করেন, বিপদে আপদে রক্ষা করেন, তাহা হইলে প্রজার বিদ্রোহ রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাহা না হইলে আইনের ছদ্মবেশে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি-দের বে-আইনী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রজার আছে। আজ যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার করা হইতেছে তাহারা কি অপরাধে অপরাধী? রাজদ্রোহের অপরাধে! কোন্ রাজার বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিয়াছে? বিদেশী বৃটিশ রাজার বিরুদ্ধে! বিদেশী রাজা যে দেশের ন্যায়সঙ্গত রাজা তাহা কোথাকার কোন্ আইন-শাস্ত্র বলিয়াছে আমাদের জানা নাই, আইন-বিশেষজ্ঞরাও জানেন না। বিদেশী শাসকের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে অধিকৃত ইয়োরোপের জনসাধারণ যখন বিদেশী ফ্যাশিষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল তখন তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়সঙ্গত মহৎ কাজ করিয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল কেন? জার্ম্মাণী যদি

ইংলণ্ড আক্রমণ করিত তাহা হইলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ কি ফ্যাশিষ্ট জার্ম্মাণকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত — বলিয়া মানিয়া লইত? যাঁহারা আজ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারক তাঁহারা এই সব প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইল, আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি কোন অপরাধই করিয়া থাকে সে-অপরাধ তাহারা ভারতের মাটিতে করে নাই। যত দূর জানা যায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির চার ধারা অনুযায়ী (Indian Penal Code, Sec 4) তাহাদের বিচার করা হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রজাদের এক রাজা হইতে আর এক রাজার প্রতি আনুগত্য বদলাইবার অধিকার আছে। যদি কেহ বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে আবার দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাকে অনুগত হইতে হইবে। কিন্তু বিদেশে থাকাকালীন সে আনুগত্য তাহা কখনই স্বদেশের রাজার প্রতি হইতে পারে না। যদি কোন ইংরেজ আমেরিকায় যান, এবং সেখানে British Embassyর নিকট তিনি আইনের কোন আশ্রয় চান, তাহা হইলে তিনি তাহা পাইবেন না। আমেরিকার আইনই তাঁহার উপর প্রযোজ্য হইবে। অব- তিনি যদি তাঁহার ইংরেজত্ব ত্যাগ করিয়া মার্কিণত্ব গ্রহণ করি- মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন তাহা হইলে ইংরেজ রাজার বিচারাধী- তিনি নন!

"আজাদ হিন্দ ফৌজ" সুভাষচন্দ্রের "সাময়িক স্বাধীন ভারতী- গবর্ণমেণ্টের" প্রতি অনুগত। ভারতের সীমানার মধ্যে এই গবর্ণমে- গঠন করা হয় নাই। যখন "আজাদ হিন্দ ফৌজ" বৃটিশরাজে- বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল তখন তাহারা বৃটিশ রাজা- অধীন নহে, প্রজাও নহে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুযা- বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের, অথবা বর্ত্তমান ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কোন ন্যা- সঙ্গত অধিকার নাই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার করার। আ- তাই লাল কেল্লায় মহা সমারোহে যে বিচারের অনুষ্ঠান হইতে- তাহা আন্তর্জ্জাতিক আইন-বিরুদ্ধ, নীতি-বিরুদ্ধ এবং অন্যায়। উদ্ধ- বিদেশী, সাম্রাজ্যবাদের স্বেচ্ছাচারিতার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহর- বলিয়াই ইতিহাস এই বিচারকে ঘৃণা করিবে। শুধু ভারতবাসী নহে- বিশ্ববাসী এই বিচারকে ন্যায়বিচারের প্রহসন বলিয়া মনে করিবে।
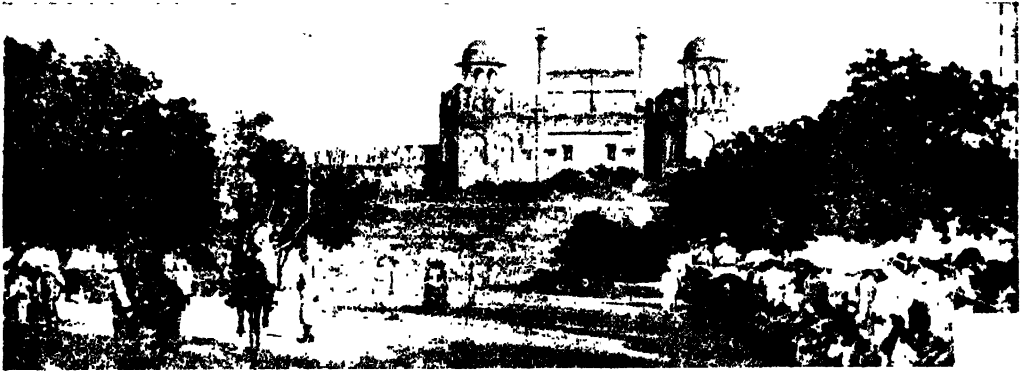
আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা
খুশীসে গীত গায়ে জা
য়ে জিন্দগী হৈ কৌম্ কী
(তো) কৌম্ পৈ লুটায়ে জা।
তু শের-ই-হিন্দ আগে বঢ়
মরনেসে ফিরভী তু ন ডর
আসমান্ তক্ উঠাকে সির্
জোশে বতন্ বঢ়ায়ে জা॥

তেরী হিম্মৎ বঢ়তী রহে
খুদা তেরে সুনতা রহে
জো সামনে তেরে চড়ে,
তো থাক্‌সে মিলায়ে জা॥
চলো দেহলী পুকারকে
কৌমী নিশান্ সম্হালকে
লাল কিলে পৈ গাড়কে
লহ্‌রায়ে জা লহ্‌রায়ে জা॥

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইন্দুপ্রভা দেবী

তুমি চলে গেলে মাতা, বিষণ্ণ রাত্রির অবসানে
স্বর্গগত দয়িতের, সন্তানের স্বর্গীয় আহ্বানে
রেখে গেলে এ সংসার শোকাচ্ছন্ন বিষাদ গভীর,
অগণিত সন্তানের চিত্ত আজ শোকার্ত্ত অধীর।
মহিয়সী হে জননী দুঃসময়ে তাই বারবার
আত্মার উদ্দেশে তব শ্রদ্ধাভরে করি নমস্কার!

পুণ্যব্রতা ইন্দুপ্রভার মহাপ্রয়াণ

'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' ও 'দৈনিক বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ইন্দুপ্রভা দেবী গত ২রা পৌষ সোমবার রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার কাশীর বাড়ীতে ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বহু দিন হইতে তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রের অকাল বিয়োগে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। পুত্রের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পরে স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং তিনি এতকাল একরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন। অবশেষে মৃত্যুর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি সকল জ্বালার অবসান করিলেন।

ইন্দুপ্রভা দেবী কটকের বিশিষ্ট উকীল পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা ছিলেন। তিনি ১৩০৬ সালে কটকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়া তিনি কর্ম্মবীর সতীশ-চন্দ্রের সহধর্ম্মিণীরূপে বসুমতী পরিবারে প্রবেশ করেন। তিনি গৃহলক্ষ্মীরূপে বসু-মতী পরিবারে প্রবেশ করিবার পর হইতেই বসুমতীর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন স্বামীর দক্ষিণহস্ত। তাঁহারই পরামর্শ, প্রেরণা ও উৎসাহেই সতীশ-চন্দ্র বসুমতী সাহিত্য মন্দির এরূপ এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সতীশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, গৃহিণী ও সচিব।

৫টি কন্যা ও একমাত্র পুত্র সহ তাঁহারা সুখে শান্তিতে কাল কাটাইতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার বোধ হয় তাহা অভিপ্রেত ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার মধ্যমা কন্যা প্রীতি টাইফয়েড রোগে অকালে মারা যান। কন্যার এই অকাল বিয়োগে পিতামাতার মনে নিদারুন আঘাত লাগে। তখন হইতে শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবীর স্বাস্থ্য ও মন ভাঙ্গিয়া যায়।

গতবর্ষ পঞ্চাশের ফাল্গুন মাসে 'বংশের তিলক' একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রকে অকালে চিরতরে বিদায় দিয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। তাহার প্রায় দুই মাস পরে ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী সতীশচন্দ্র তাঁহার অনুগমন করেন। উপর্য্যুপরি এই দুইটা নিদারুণ শোকে তাঁহার দেহ মন এমনভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে যে, তখন হইতেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তিনি তাহার পর আর শয্যা ত্যাগ করেন নাই।

স্বামীগৃহে তাঁহার নানাবিধ সদ্‌গুণের
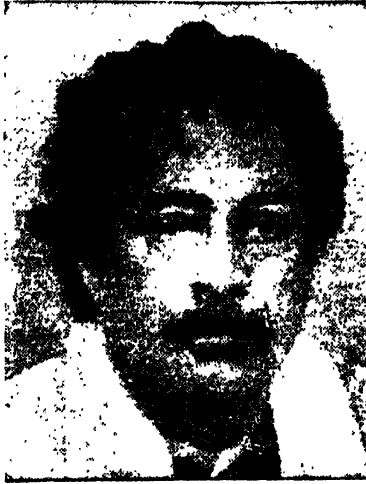
উপেন্দ্রনাথ

সতীশচন্দ্র

তাঁহার স্বভাব ছিল যেমন নম্র, তেমনই মার্জিত। ক্রোধ প্রকাশ করিতে কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই। কিন্তু কোমলে-কঠোরে মিলিয়া তাঁহার চরিত্রে যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, সংসার পরিচালন ব্যাপারে তাহা বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার মুখে মৃদু হাসি সকল সময়ই লাগিয়া থাকিত। অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় তিনি যেমন অক্লান্ত ছিলেন, তেমনই সংসারের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়টিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। দাসদাসীদের সুখ-সুবিধার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু সংসার পরি-চালনের ব্যাপারে তাঁহার কর্ম্মশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বামীর ব্যবসায় পরিচালনে তিনি ছিলেন প্রধান সচিব।

তিনি ছিলেন আদর্শ মাতা। তাঁহার প্রত্যেকটি সন্তানের উপর মাতার সুশিক্ষা, মার্জিত ব্যবহার ও চরিত্রের প্রভাব বর্ত্তমান। রামচন্দ্রের স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে যে সকল প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার মূলেও ছিল জননী ইন্দুপ্রভার শিক্ষা ও চরিত্রের প্রভাব। প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুর পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই সংসারে খুব বেশী দিন তাঁহাকে থাকিতে হইবে না। সমস্ত বিষয় তাড়াতাড়ি মিটাইয়া লইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ইন্দুপ্রভা দেবী যেমন বুদ্ধিমতী ও কর্ম্ম-কুশলা ছিলেন, তেমনি ভগবানে ভক্তিও ছিল তাঁহার অগাধ। আজকালকার দিনে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা মহিলা দুর্লভ। তিনি যেরূপ ধর্ম্মশীলা ছিলেন সেইরূপ দানশীলাও ছিলেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে তিনি বহু লোককে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি তাঁহার পরলোকগত পুত্রকন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনকে ৩ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, দশ হাজার টাকা এবং প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত খড়-দহের সন্নিহিত রহড়া গ্রামের ৪খানি বাগান-বাড়ী রামকৃষ্ণ মিশনকে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করা হয়। ঐ স্থানে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে তিনি উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাস-পাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এজন্যও তিনি ৬ লক্ষাধিক টাকা দান করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রমের প্রতি নজর রাখিবার জন্য তিনি জামাতাদেরও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার সাহিত্য, সংবাদপত্র, অনাথ আশ্রম, হাসপাতাল প্রভৃতি ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের নামের পার্শ্বে তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী

সতীশচন্দ্র ও ইন্দুপ্রভা দেবী

২৪শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ [২য় সংখ্যা

হিন্দি দার্শনিক সাহিত্যে সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাসের আসন সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিতে পারা যায়। তাঁহার রচিত বিচার-সাগর এবং বৃত্তিপ্রভাকর গ্রন্থ দেখিলে এ কথা বলিতে বোধ হয় কাহারও সংকোচ বোধ হইবে না। হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী সাধু-সন্ন্যাসী খুব অল্পই আছেন, যাঁহারা এই দুইখানি অধ্যয়ন করেন নাই। এই গ্রন্থ দুইখানি হিন্দি দার্শনিক সাহিত্যের সম্পদ্ এতই বৃদ্ধি করিয়াছে যে, তাহা এক প্রকার অতুলনীয়। কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাসের জীবনবৃত্ত আজ ৮২ বৎসরের মধ্যে এক প্রকার বিস্মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইলে গ্রন্থকারের জীবন একটি মহান সহায় হয়। এ জন্য যাঁহারা উক্ত গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থকারের জীবন-চরিত্রের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। নিম্নে আমরা যথাসাধ্য এই সাধু মহাত্মার জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিলাম।

সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাস

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ

প্রবাদ মাত্র হইতে এই মহাত্মার জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা গেল, তাঁহার শৈশব জীবন সম্বন্ধে বড়ই মতভেদ রহিয়াছে।

কনখল-নিবাসী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি সংগৃহীত প্রবাদ হইতে জানা যায়- নিশ্চলদাসের জন্মস্থান পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তঃপাতী 'ভিওয়ানী' নামক স্থানের সাত ক্রোশ বায়ু-কোণে 'ধনানা' নামক একটি গ্রাম। ১৮৪৯ সংবৎ অর্থাৎ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী দিবসে অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর দিন জাঠ শিখ-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। নিশ্চলদাসের পিতার নাম মুক্তজী। অবস্থা অত্যন্ত দরিদ্র। মাত্র ১৮ কাঠা জমি তাঁহার সম্বল ছিল। গৃহে আর আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিলেন না। ছয় বৎসর বয়সে নিশ্চল-দাসের মাতৃবিয়োগ হয়। গড়গঙ্গাতে মাতার সংকারের জন্য পিতা মুক্তজী নিশ্চলদাসকে সঙ্গে লইয়া "ধনানা" গ্রাম ত্যাগ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে দেহলী বা দিল্লী নামক স্থানে আসিলে এক দিন রাত্রি হয়। সেখানে দাদু সম্প্রদায়ের সাধু অলখরামজীর একটি স্থান ছিল। উহা দিল্লী হইতে ফতেহপুরিয়া বাজারে ভবানীশঙ্করের ছাতার নিকট অবস্থিত। মুক্তজী দাদু সম্প্রদায়ের শিষ্য বলিয়া ইহা তাঁহার গুরুস্থান ছিল। রাত্রি হওয়ায় মুক্তজী তাঁহার সেই গুরুস্থানেই সেই রাত্রি অবস্থিতি করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রাতঃকাল হইলে মুক্তজী পত্নীর মৃতদেহ লইয়া সংকারার্থ গড়গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিশ্চলদাসকে আর সঙ্গে লইলেন না। তিনি তৎকালের মঠস্থ সাধুগণের নিকট পুত্রকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাই একটি প্রবাদ।

দ্বিতীয় প্রবাদ—নিশ্চলদাস-রচিত "যুক্তিপ্রকাশ' নামক দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা যায়, নিশ্চলদাসের পিতা মুক্তজী দারিদ্র্যনিবন্ধন পুত্রকে স্কন্ধে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দিল্লী আগমন করেন। নিশ্চলদাসের জননীর সংকারার্থ তিনি দিল্লী আগমন করেন, এরূপ কোন কথা নাই। উক্ত ভূমিকা মধ্যে আরও বলা হইয়াছে, দিল্লীতে দাদুপন্থী সাধু-দিগের যে স্থান ছিল, তথায় অমরদাসজী নামক মহাত্মা মঠা-ধীশরূপে ছিলেন। ঐ স্থানটি যে অলখরামজীর স্থান এরূপ কথা তথায় কিছু বলা হয় নাই। তাহার পর নিশ্চলদাসের পিতা মুক্তজী, পুত্রকে এই অমরদাসজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সাধুদীক্ষা দিবার জন্য অমরদাসজীকে অনুরোধ করেন, স্বামী শঙ্করানন্দজীর সংগৃহীত প্রবাদে অমরদাসজীর কথা জানিতে পারা যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে অলখরামজীর স্থানে যে সব মহাত্মা থাকিতেন, তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে মুক্তজী তাঁহার পুত্র নিশ্চলদাসকে ঐ স্থানে রাখিয়া যান। ইত্যাদি।

এই উভয় কথার সামঞ্জস্য করিতে গেলে মনে হয়, দিল্লীতে দাদুপন্থীদিগের যে স্থান ছিল, যেখানে [illegible] অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি অলখরামজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং অমর-দাসজী সেই সময় সেই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারই চরণে মুক্তজী নিশ্চলদাসকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সাধুদীক্ষা দিবার

জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিশ্চলদাসের সাক্ষাৎ গুরু অমরদাসজী। অলখরামজী তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। এবং মহাত্মা দাদূ তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। দ্বিতীয় কথা এই জানা যায় যে, নিশ্চলদাস সাধু-বিশেষ ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার সাধুদীক্ষা লাভ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি গৃহস্থ ছিলেন না, বা বিবাহাদি করেন নাই। তিনি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও এবং পূর্ণ অদ্বৈতবাদী হইলেও যে দাদূ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেই দাদূ-সম্প্রদায় সাধু সম্প্রদায়-বিশেষ। সন্ন্যাসী না হইলেও যে তিনি ত্যাগি-সম্প্রদায়-ভুক্ত, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

মুক্তজীর পত্নী-সৎকার করিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল। বোধ হয় দারিদ্র্য এবং পত্নীবিয়োগে কাতর হইয়া তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে কিছু দিন পথিমধ্যে নানা স্থানে অতিবাহিত করিতেছিলেন। এ দিকে সাধু অমরদাস নিশ্চলদাসের স্বভাব-চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত করিলেন। এ জন্য তিনি সাম্প্রদয়িক ইষ্টদেবতার নমস্কার, মঙ্গলাচরণ, আরতি ইত্যাদি এবং সারবী, দোহা, চৌপাই ছন্দঃ, দাদূজী মহারাজের বাণী, সুন্দরদাসজীর সুন্দরবিলাস, জ্ঞানসমুদ্র প্রভৃতি ভাষাগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করাইলেন। অনুষ্ঠান সহকৃত শিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন লাভের সুযোগ হয় না। এই জন্যই বোধ হয় অমরদাস এই অনুষ্ঠানসহ শিক্ষাই নিশ্চলদাসকে প্রথম দান করিলেন।

কিছু দিন পরে নিশ্চলদাসের পিতা মুক্তজী ফিরিয়া আসিলেন, এবং পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সাধুসঙ্গের প্রভাবে পুত্রের জীবনের আদর্শ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। তিনি গৃহে যাইতে অসম্মত হইলেন। পুত্রের এই ভাবান্তর দেখিয়া পিতার মনেও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনিও আর গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, এবং সেই স্থানে থাকিয়া সাধু-সেবা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সাধুসেবার ফল ব্যর্থ হয় না। মুক্তজীও যথাকালে অমরদাসের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তিনিও পুত্রের ন্যায় ধীরে ধীরে সুন্দরবিলাস এবং জ্ঞানসমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সৎপুত্র হইতে কুল পবিত্র হয়, ইহাই তাহার সূচনা।

নিশ্চলদাসের প্রতিভা দেখিয়া সাধু অমরদাসের ইচ্ছা হইল, তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইবেন। তিনি তদনুসারে দিল্লীতেই অমৃতরামজীর নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ, কোষ এবং কাব্যাদি গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় জলন্ধর নামক স্থানটি সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। অমরদাসজী, নিশ্চলদাসজীর পিতার সঙ্গে তাঁহাকে জলন্ধরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

সেখানে কিছু দিন অধ্যয়নের পর কাশীতে বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধার কথা শুনিয়া নিশ্চলদাসের কাশী যাইবার ইচ্ছা হয়। তিনি তখন পিতার সহিত দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় হঠাৎ এক দিন রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত মুক্তজীর সাক্ষাৎকার হয়। রাজা রণজিৎ সিংহ পিতা এবং পুত্রের সদ্বৃত্তির পরিচয় পাইয়া যারপর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নিশ্চলদাসকে কাশী পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মুক্তজীর আর্থিক অবস্থার কথা শুনিয়া রাজা রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে একখণ্ড নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। এই রণজিৎ সিংহ পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ কি না তাহা বলা যায় না। ভবিষ্যৎ যাহার উজ্জ্বল হয়, ভগবান্ তাহার সহায় হন।

এইরূপে নিশ্চলদাসজী অমরদাসজীর নিকট ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াই অমৃতরামজীর নিকট সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে অতিবাহিত করিলেন। এই সময় নিশ্চলদাসজীর নিজগ্রাম "ধনানা" হইতে স্বরূপানন্দ নামক এক পরমহংস দিল্লীতে আগমন করেন; নিশ্চলদাসের সহিত পরিচয় হইলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ মিত্রতা জন্মিল। উভয়েরই সংস্কৃত পড়িবার অনুরাগ ছিল। সুতরাং মিত্রতা আরও সুদৃঢ় হইল। কিন্তু দিল্লীতে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের আশানুরূপ সুবিধা না দেখিয়া উভয়েই কাশী যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। উভয়েই কাশী আসিলেন। নিশ্চলদাসের এই পরমহংস-সঙ্গই তাঁহার অদ্বৈত বেদান্তবিদ্যার প্রতি অনুরাগের হেতু হইল।

কাশী আসিয়া উভয়ে দেখিলেন—কাশীবাসী মূর্খের সঙ্গেও বহু বিদ্বানেরই তুলনা হয় না। অজ্ঞাতসারে অজ্ঞ হৃদয়ে বিদ্যা সংক্রমিত হয়, অজ্ঞও বিজ্ঞ হইয়া উঠে। এই কারণে কাশী আসিয়া উভয়েরই মহান্ উৎসাহের সঞ্চার হইল।

উদ্যমের জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়। নিশ্চলদাস অমৃতরামজীর নিকট যেটুকু সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং পরমহংস স্বরূপানন্দের সহিত যেটুকু শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বেদান্তশাস্ত্রের উপর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনিলেন, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী এ সময় সন্ন্যাসী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; তিনি তখন তাঁহার বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন. কিন্তু স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ক্রমে নিশ্চলদাসের জাঠ-শিখ জাতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে বেদান্তবিদ্যার অনধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নিশ্চলদাস লোকপরম্পরায় ইহা শুনিলেন, এবং নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তথাপি তিনি তখন অন্য স্থানে অধ্যয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই একরূপ ব্যবহার পাইলেন। কারণ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ যখন জাতিগত বাধার জন্য অধ্যাপনায় অনিচ্ছুক তখন অপর কোন্ সাধু পণ্ডিত আর নিশ্চলদাসকে শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন? স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রভাবে কাশী তখন প্রভাবিত।

নিশ্চলদাস ইহা দেখিয়া যারপর-নাই দুঃখিত হইলেন এবং কৌশল অবলম্বন করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা কাশীধাম ত্যাগ করিলেন এবং বৎসরাবধি কাল অন্যত্র অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণকুমার সাজিয়া আবার কাশী আসিলেন।

এবার তিনি আর স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট গমন করিলেন না। গৃহস্থ মহারাষ্ট্রীয় এক মহাপণ্ডিত শ্রীকাকারাম শাস্ত্রীর শরণাপন্ন হইলেন। ইনি শঙ্করানন্দ-বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ আত্মপুরাণের টীকাকার। বেদান্তে ইহার প্রতিষ্ঠা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ অপেক্ষা কোন অংশে অল্প ছিল না। পণ্ডিত কাকারাম শাস্ত্রী নিশ্চলদাসের প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, এবং সাধুবৃত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং প্রাণ খুলিয়া নিজ বিদ্যাভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কাকারাম শাস্ত্রী

নিশ্চলদাসকে অধ্যাপনা করিয়া যারপর-নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যের যোগ্যতা গুরুর যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইতে লাগিল। ক্রমে নিশ্চলদাস পণ্ডিত কাকারাম শাস্ত্রীর নিকট হইতে অদ্বৈত-বেদান্ত বিদ্যার সমুদায় রহস্য অবগত হইতে লাগিলেন। ইঁহার নিকট হইতে তিনি বেদান্তের সমুদায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার অধীত গ্রন্থের তালিকা তিনি কতক পরিমাণে তাঁহার বিচার-সাগর গ্রন্থের সপ্তম তরঙ্গের ১১১।১১২ কবিতা মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—সাংখ্য, ন্যায়, ব্যাকরণ, অদ্বৈতবেদান্ত, এবং নিবন্ধ প্রভৃতি।

নিশ্চলদাসের যেমন অসাধারণ প্রতিভা তেমনই অত্যাশ্চর্য্য মেধা ছিল। তিনি একবার যাহা শুনিতেন তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া থাকিত। কালাত্যয়ে তাহার বিস্মৃতি ঘটিত না। তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রীজীর নিকটে অবস্থান করিতেন এবং অপরের পাঠ শুনিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। অপর বিদ্যার্থিগণ যেরূপ পাঠ অভ্যাস করিত তাহা তিনি করিতেন না। প্রবাদ আছে, কোন এক সময় তাঁহার ১৭ লক্ষ সংগ্রহ শ্লোক কণ্ঠস্থ ছিল। এই সকল শ্লোক তাঁহার কিড়োহলী আশ্রমে এখনও সংরক্ষিত আছে শুনা যায়। নিশ্চলদাসের প্রতিভা দেখিয়া সহাধ্যায়িগণের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাহারা শাস্ত্রীজীর নিকট নিশ্চলদাসের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিন্দার বিষয় এই যে, তিনি পাঠ অভ্যাস করেন না। অথচ শাস্ত্রীজীর তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। বুদ্ধিমান্ শিষ্য বিপথে যাইবে ইহা সদ্‌গুরু কখন সহ্য করিতে পারেন না। তিনি নিশ্চলদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি না কি পাঠ অভ্যাস কর না। আচ্ছা আজ হইতে তোমার অধীত পাঠ অগ্রে শ্রবণ করিব, পরে তোমায় নূতন পাঠ প্রদান করিব। বল ত তুমি কল্য কি পড়িয়াছিলে ?"

ইহা শুনিয়া নিশ্চলদাস এক মাস পূর্ব্বের অধীত পাঠও যথাযথ ভাবে বিশুদ্ধরূপে আবৃত্তি করিয়া দিলেন। গুরুদেবের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এইরূপে কাকারাম শাস্ত্রীর নিকট হইতে ক্রমে ছয়খানি দর্শন এবং অন্যান্য শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন। নিশ্চলদাসের শিক্ষা প্রায় শেষ হইয়া গেল।

পণ্ডিত কাকারাম শাস্ত্রী মহারাষ্ট্রীয় এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহার এক কন্যার বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল। তিনি সৎপাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। নিশ্চলদাসের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সদাচার দেখিয়া তাঁহাকেই কন্যাদান করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন, এবং নিশ্চলদাসকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

নিশ্চলদাস গুরুদেবের প্রস্তাব শুনিয়া চমকিত হইলেন। তিনি তখন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "দেব! আপনার কন্যা আমার ভগ্নী, আমি তাঁহাকে কি করিয়া বিবাহ করিব? ইহা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় এবং অসম্ভব কথা। আপনার ন্যায় এরূপ অদ্বিতীয় পণ্ডিত এ কথা কি করিয়া হৃদয়ে স্থান দিলেন?" কাকারাম অগাধ পণ্ডিত, তিনি ঋষিকুলের বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা নিশ্চলদাসের আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিলেন। নিশ্চলদাস নিরুত্তর হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এখন যদি আমি গুরুদেবকে আত্মপরিচয় না দিই, তাহা হইলে এই বিবাহে বাধাদান অসম্ভব। এক দিকে নিজ গুরুদেবের জাতি নাশ এবং নিজ সাধু-জীবন বর্জ্জন, অপর দিকে গুরুদেবের আজ্ঞালঙ্ঘন, এবং তাঁহার ক্রোধ, কঠিন সমস্যা। অবশেষে তিনি গুরুদেবের জাতিনাশে অসম্মত হইলেন, গুরুদেবের অভিসম্পাত শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তখন গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষাপূর্ব্বক নিজ জাতিকুলের পরিচয় প্রদান করিলেন।

কাকারাম পণ্ডিত নিশ্চলদাসের আত্মপরিচয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। নিশ্চলদাসের এই প্রবঞ্চনায় তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নিশ্চলদাসের বিদ্যার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া এবং তাহার বিদ্যাবত্তা স্মরণ করিয়া তাঁহার সে ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, শরণাগতের উপর মহতের ক্রোধ কতক্ষণ থাকে? তখন কাকারাম বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন হইতে প্রত্যহ একদণ্ড-কাল জ্বর-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" নিশ্চলদাস ইহা শুনিয়া গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "আপনার এই অভিসম্পাত আমার শিরোধার্য্য, আপনি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন।" গুরুদেব ইহা শুনিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার বিদ্যা কোথাও পরাভব প্রাপ্ত হইবে না।" বস্তুতঃ, নিশ্চলদাস কোথাও অপ্রতিভ হন নাই। অতঃপর নিশ্চলদাস শাস্ত্রীজীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাশীধামে স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রচর্চ্চায় ও অধ্যাপনায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কাশীধামে একটি বিরাট পণ্ডিত-সভা হয়। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে এই সভায় শাস্ত্রীয় বিচার হইতেছিল। কাকারাম শাস্ত্রী নিশ্চলদাস প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। একটি বিচারে এমন সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হইল যে, কেহই তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছিলেন না এমন সময় নিশ্চলদাস দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনারা যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা করি।" সভাস্থ পণ্ডিতগণ এই যুবকের সাহস দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনুমতি দান করিলেন। নিশ্চলদাস অনতিবিলম্বে সমস্যার সমাধান করিলেন। সকলেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাতে তাহার পাণ্ডিত্যের যশঃ চারি দিকে প্রচারিত হইল। নিশ্চলদাসের এইরূপ যশোবিস্তার দেখিয়া অনেকেই ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়েন। অতঃপর নিশ্চলদাস যেখানেই লোকসমক্ষে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, ইহারা প্রায়ই সেই স্থলে যাইয়া গোপনে গোপনে তাঁহার জাতি-কুলের পরিচয় দিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেন। কারণ, কাকারামজীর আশ্রয় ত্যাগের পর নিশ্চলদাসের জাতিকুলের কথা আর গুপ্ত থাকিল না। তিনি এই শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গের ব্যবহারে যারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইতেন। তিনি তখন মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, অতঃপর তিনি প্রচলিত সরল হিন্দি ভাষার এমন গ্রন্থ রচনা করিবেন, যাহাতে পণ্ডিত-মূর্খ-উচ্চ-নীচ সকলেই শাস্ত্রের রহস্য নিজে নিজেই অনায়াসে জানিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানচর্চ্চা যে জাতি-কুলে আবদ্ধ নহে, তাহা তিনি প্রদর্শন করিবেন। সংস্কৃত ভাষার আবরণ উন্মোচন করিয়া তিনি এমন হিন্দি গ্রন্থ রচনা করিবেন যাহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বেদান্তবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে, যাহাতে এই জাতীয় পণ্ডিতগণের কৃপাপাত্র আর না হইতে হয়। বস্তুতঃ, নিশ্চলদাসের এই সঙ্কল্প ভগবান তাঁহার দ্বারা বিচার-সাগর এবং বৃত্তিপ্রভাকর গ্রন্থ রচনা করাইয়া যথাকালে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসুকিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝাল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙ্গা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরানো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিঁকে আছে, ছ'মাসের সুযোগেও কেউ হাত দেয়নি। আর সব গেছে, বেড়া, খুঁটি, মাচা, তক্তা—মাটির হাঁড়ি কলসীগুলি পর্য্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা কেশব আর তোলেনি। কার জন্য তুলবে? দাওয়ার দু'পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত হয়ে পড়া চালার নীচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর একটি ছেলে।

এদের মধ্যে এক জন রামপদর বৌ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমত কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সুরমার ঘোমটা সীঁথির সিঁদূরের রেখাটুকুও ঢাকেনি ভাল করে। এতে আর শাড়ী-পরার ভঙ্গিতে আর চলন ফিরন বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষাভূষো গেরস্থঘরের বৌ, অন্য দু'জন সহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে বৌ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি সুকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে, শাড়ীখানা বুঝি দামীই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর সুরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামী ময়লা শাড়ী মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানসুকিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মা-ঠাকরুণরা রামপদর বৌকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদর ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি গগনের পান-বিড়ির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ও পাশের ধার ঘেঁষে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

ক'জন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীবন হয়ে ওঠে। বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকাণ্ড, এমন ভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুণে ওখানে নজর আটকে যায়।

'রামের বৌটা তবে এল?'

'তাই তো দেখি।' নিকুঞ্জ বলে, তার আধ-পোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কি না ভাবতে ভাবতে। এক পয়সায় চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও-বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, রাম নেবে ওকে?'

'না নে'ব তো না নেবে। ওর বয়ে গেল।' যোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেয়া।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না, তুই থাম ছোঁড়া বলে'। তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিরুদ্ধে। গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, ফিরবার কি দরকার ছিল ছুঁড়ির?

গোকুল ইয়ারকি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হাল্কা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মত সুদাসেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়ীখানা। সকলের মত সেও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকা-বাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এরিয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তবু গাঁ তো অরণ্য হয়নি, পাড়া পেড়োতে হয়, ঘন বসতি কোনটা, কোনটা ছড়ানো। ভদ্রমানুষেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতুহলে। চাষা-ভুষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ খানিকটা দূর পর্য্যন্তই পৌঁছে। বয়স্কারা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা দেওয়া ছ্যাঁকা লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কম উৎপীড়ন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছু দিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান লা মাগি?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, 'ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কে পাটা নিয়ে? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ! যা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হল্‌কায় হল্‌কায় আগুন বরিয়ে আসে হিংসার' বিদ্বেষের। সুরমা স্মিতমুখে মিষ্টি কথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁঝে একপা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা বুঝি শেষ পর্য্যন্ত আঁচড়ে কামড়েই দেবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েক জন। এক জন কোমরে তার গামছা-পরা আর মাথায় কাপড়খানা পাগড়ীর মত জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। এক জন বলে, বাঃ বাঃ, বেশ। এক জন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পেরোবার জন্ত পাতা তাল গাছের কাণ্ডটার এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরের মানুষকে হাঁক দেবার মত জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, গিরির মা। বলি ওগো গিরির মা!'

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে? শুনতে পাও না?'

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙ্গা মানুষের মত ক্ষণিক সম্বিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মত, তার পর যেন চোখের পলকে এলিয়ে যায়।

'ডাকছে? অ্যাঁ, ডাকছে না কি গিরি? যাই লো গিরি, যাই!'

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট্‌ করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মত চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরানো কাঁটাল গাছের ছায়ায় বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজেছে একটুখানি, ডুমুর ফলের মত। তামাক পাওয়া বড় কষ্ট। মুক্তাকে সাথে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুঁকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে যোগাড় করা তামাক।

'আসেন।' রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়িত ভীরু অসহায়ের মত। তিন জন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার ওপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

'তোমার বৌকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর এক দিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়ে তো গেলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে এক বার সে ঢোঁক গেলে, চোখের পাতা পিট্‌-পিট্‌ করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দ্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্ব্বাঙ্গ-জোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

'যাবে বলেছিলে, গেলে না কেন রামপদ?'

'তাই তো মুস্কিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস আর কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা ক'জন। ঘনশ্যাম এক রকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষা-ভুষোদের, অর্থাৎ চাষী গয়লা কামার কুমার তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সেই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্ত ক'জন উপস্থিত

ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদর, একটু ভাবনা হয়েছে।

একটু!

নৌকাতে পাতবার সতরঞ্চিটা কাঁটাল তলায় বিছিয়ে তিন জন বসে। রামপদকেও বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদর মুখের দিকে। বৌয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোন দিন দ্যাখেনি।

এ সমস্যা তুচ্ছ করার মত নয়। এক জন বড় মাতব্বর আর তার ধামাধরা ক'জন তুচ্ছ রামপদর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কর্ত্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। দু'-চার জন হয়তো ঠাট্টা বিদ্রূপ করত কিছু দিন, দু'-চার জন হয়তো বর্জ্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণ ভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না। চারি দিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কি কাণ্ড? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ, কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ীর দশ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দু'জন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় ক'মাস নষ্টামী করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার একটা গণ্য করার মত ঘটনা? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু ঘনশ্যামেরা ক'জন যখন গায়ে পড়ে উস্কে দিতে চাইছে সবাইকে, কি জানি কি ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে 'যাই_হোক, বৌয়ের জন্ম ভাত তো রেখেছ রামপদ?'

'আজ্ঞে আপনারা?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে দু'টি খেতে দাও তো তুমি। চালাটা তোলনি কেন?'

'তুলব। তুলব।'

সুরমাই বলে বলে নেয়ে দু'টি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদর সঙ্গে। বাইরে যা যটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝা-পড়া হওয়া দরকার। গ্রামের এক জন কর্ম্মী শঙ্করের বাড়ীতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভাল জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আরেকটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে?' রামপদ শুধোয়।

'মোর জন্যে রেঁধে রেখেছো!' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু?'

এগার মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি-বেশী রয়ে' রয়ে' অল্প দু'টি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড় যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আসে: ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের রামপদ যখন বিদেশে যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

'খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক কোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরালে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হল।

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয়! আগে পারত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জ্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে। গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তার।

শেষ দু'টো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মত বেঁকে—'

মুক্তা এবার কাঁদে।

'কেউ কিছু করলে না?'

'দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম। বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সেও মরল।'

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভাল বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় লোক পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মদ্দ এসে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।'

'দাসমশায় তো খুব করেছেন মোদের জন্যে!' রামপদ বলে চাপা ঝাঁঝালো সুরে।—'যা তুই, নেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝাল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের হাঁক আসে: রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন-পাচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারী সমনজারির পেয়াদার মত গম্ভীর গাম্ভীর্য্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয়নি।

'বৌ এসেছে রামপদ?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে নিয়েছিস্?'

'আজ্ঞে।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক্।'

'ভাত খাচ্ছে।'

রামপদর ভাবসাব জবাব-ভঙ্গি কিছুই ভাল লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, 'তোর মতলব কি?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে রাখবি ঘরে?'

'বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কি করে?'

এই নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় মানসুকিয়ার চাষাভূষোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে।

নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার পরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয় তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট। সবাই যদি সব রকমে বর্জ্জন করে রামপদকে, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদর। সমাজের নির্দ্দেশ অমান্য করলে শুধু এক-ঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না, তাও জানা কথা। টিটকারি, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে ক্রমে। সবাই এসব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে কোণ-ঠাসা করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যার উপর যা খুসী অত্যাচার করলেও কেউ ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড় ভালবাসে এমন যারা আছে ক'জন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড় খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়েরই মত। মনগুলি ভাঙ্গা, দেহগুলিও। আজ কি করে বাঁচা যায় আর কাল কি হবে এই চিন্তা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যটা বেরিয়ে আসে। রামপদর কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়ে সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুণ কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না রামপদর বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েক জন তো স্পষ্টই বলে বসল, 'ছেড়ে দ্যান্ না, যাক্ গে। অমন কত ঘটছে, ক'দিক সামলাবেন? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপন জনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য সহরে পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশী জোরালো! এ রকম কিছুই ঘটেনি এমন পরিবারও ক'টাই বা আছে।

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

'বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।'

'বটে?'

'সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল ক'রে দিতেন এক দিন, চুকে যেত। বিচার-সভা ডেকে বসলেন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, মান কোথা? দুগ্‌গার কথা যদি তোলে কেউ?'

'তুই চুপ থাক হারামজাদা।' ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে কিন্তু হাত তার উঠে গিয়ে ঘাঁটিতে থাকে বুকের ঘন লোম। জ্বালাও করে মনে রামপদর স্পর্দ্ধায়। সে না কি দাওয়ার চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে না কি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিঁকতে দিলে বৌকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও! আগের চেয়ে কত বেশী খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদর কাছে সে হার মানবে! মনটা জ্বালাও করে ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জরুরী কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা দু'টোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মত হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে-রকম। মনটা তাই আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতী খাবার। গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্নে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌঁছবে ঠিক সময়ে।

গোকুলকে সব চেয়ে কমদামী বিলাতী বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাদুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, দু'জন তার চেনা। মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও সুযোগ মেলে না, 'এই! শোন, শোন।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

'ভাগছো যে? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।'

'ওনারা কারা?'

'তা দিয়ে কাজ কি তোমার?' গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের, পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ণ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে। ঢোঁক গিলে দাঁতে দাঁত ঘসে।

'মা না কি ভাল আছে, বেশ আছে. মোর না?'

'আছে না?'

'আছে? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর? ক্ষেপেছে কে, মুই! তা ক্ষেপিছি। তা ক্ষেপিছি, মাথা মোর ঘুরতে লেগেছে। ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—'

'ও গিরিবালা!' সুরমা ভেতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মোর বাপকে টাকা দিয়ে বিভূঁয়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি?'

'মিছে বলেছে?' গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, 'ও বাবা। মোর লেগে তুমি খুন হলে গো বাবা! এ নচ্ছার মেয়ার ধরে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকে: 'ও গিরিবালা! তোমার বাবা মরেছে কে বললে? খবর তো পাওয়া যায়নি কিছু। বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

'নিখোঁজ তো হয়েছে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক্ ওদিক্ চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁটো বাসনগুলির অখাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ! সুরমারা চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরী থেকো।'

'সকালে আসবে কেন?'

'মোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এস, বসবে।'

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায় ঘরে। ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কি করা যায় কি করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাদুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেসে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কি করবি গিরি? আমি বরং—'

'বরং টরং রাখ তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি, যত টাকা লাগে। নয়তো কি কেলেঙ্কারি করি দেখো।' ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরও অপরূপ, মারাত্মক। সাধে কি ওকে পাবার জন্য অত করেছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে না। কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে সে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছু দিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত! আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে পড়তে হত না ভদ্রঘরের ও ধিঙ্গি মাগিগুলোর কল্যাণে।

'এত পয়সা করেছে, বিড়ি টানে!' গিরিবালা বলে মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, 'রামপদর পেছনে না কি লেগেছ তুমি? একঘরে করবে? সাধুপুরুষ আমার! মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?'

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে রুগ্নের যাতনাভরা লোলুপতা, নিষিদ্ধ বস্তুর বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

'বিলিতী?'

গোকুল সায় দেয়।

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, 'যাক, এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু।'

মদের গ্লাসে দু'-চার বার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোন উপায় নেই। ভয় দেখানো, জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো, কিছুই খাটবে না। সে গিরি আর নেই, সেই ভীরু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'কি করি বল? কাল একবার যেতে হবেই। মার জন্য আঁকুপাঁকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব ক'দিন পরে। মাঝে মাঝে গাঁয়ে যেতে দিও মোকে, এঁ্যা? ভেবো না, ফিরে আসব।'

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ী ভিজে যায় গিরির। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচার-সভায় লোক খুব বেশী হল না, মানসুকিয়ায় ঘেঁষাঘেঁষি পাঁচ-ছ'টা গাঁ ধরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম-ধরা, নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্-গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার-সভা বসেছিল এই চাষাভুষো শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গম্ গম্ করছিল। কি ঔৎসুক্য ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়! তার তুলনায় এ যেন সরকারী জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কি করা উচিত বুঝিয়ে দিতে!

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝ-বয়সী আর বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে—উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিত ভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রামপদ, এদের আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্ত, গিরির গায়ে লেগে। সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁষে বসেনি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েছে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হয়নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বার বার গিরির ওপরে গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব্ব-পরামর্শ মত বুড়ো টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা সুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে আর একটা হাত ছাড়া ময়লা খাকি সার্টগায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী উঠে চেঁচিয়ে বলে, 'কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদর বৌ কোন দোষ করেনি।'

সবাই জানে, বনমালীর বৌকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌটাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনো সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, 'আহা, দোষ করেছে কি করেনি তাই তো মোরা বিচার করব।'

বনমালী রুখে বলে, বটে? কোন দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করেনি? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোন মেয়েছেলে গাঁ ছেড়ে ক'দিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ!'

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে, 'ঠিক কথা। গাঁয়ে থেকে

পায়নি, সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের ?'

কে এক জন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে : 'সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দু'টি খেতে-পরতে দিতে ?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বৌ আর বড় ছেলের বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবার নয়, যায়ওনি তাই। উঠে দাঁড়াতে দেখা যায় সে থর থর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায় : 'প্রাণে বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কি ? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তা ভগবান আছেন।'

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পড়ায় শঙ্করের মত অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজ গাজ ফিস-ফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মত মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা ঠিক পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—'

গিরি তড়াক্ করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে : 'খেটে খায়নি তো কি ? মোরা এক সাথে খেটে খেয়েছি। এ পাড়ায় দু'বাড়ী ঝিগিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন্ মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার ?'

প্রায় সকলেই জানে এ কথা সত্য নয় গিরির। কয়েক জন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছু কাল আগে গাঁয়ের লজ্জাবতী লতার মত কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য্য করে দেয়—খুব বেশী নয়। যে দিন-কাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথা টেকো নন্দই শুধু বলে, 'কিন্তু বহু লোকে ও চোখে দেখেছে। ফণি বলেছে সে নিজের চোখে—'

মাঝবয়সী রোগা ফণি চট্ করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, 'না না, আমি তা বলিনি। আমি কেন ও-কথা বলতে যাব ?'

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দু'হাত খানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'যাক্, যাক্। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কি, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদর ইস্তিরি নাম-মাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।'

বনমালী ফুঁসে ওঠে, 'কিসের প্রাচিত্তির ? দোষ করেনি তো প্রাচিত্তির কিসের ?'

গিরি গলা চেরে : 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে না! কি তবে ?'

তার পর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। বনমালীর বৌ চোখ-ভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধরে চুমা খেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়-চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিত ভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিত ভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, 'বৌকে যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই ?'

বনমালী আশ্চর্য্য হয়ে যায়।—'ফিরে নেব না তো খুঁজে মরছি কেন ?'

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মত অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘর-সংসার আর যোগ্য থাকে না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘরসংসারের। কিন্তু কি হবে ও-কথা বলে বনমালীকে ? মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মত লোকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌ হিসাবে ওর বৌয়ের মরণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে যা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব মানুষের জগতে, সেটা আগে জানা দরকার।

'চেষ্টা করে দেখি কি হয়।' বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজের বন্ধুর হাত যেমন ভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানস্তকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলায় ভূতের ভয়—বছরখানেক বছর-দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজ-কাল বেলতলার ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মনস্তকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, 'তুমি যদি না বলতে ব্যাপারটা চাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোখ-কান নেই ? ছ্যাখোনি, আমি কি বলি না বলি তাতে কি আসতে যেত ? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।'

গিরির বাড়ী কাছেই বেলতলার। বেলতলায় সে ভয় পায়নি, বাড়ী যেতে পথের পাশে নালার ওপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

'কে গা ?'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অ: ! এত রাতে এখানে বসে আছ ?'

'এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো গিরি এলো, গাঁয়ে গিরির মন টিঁকবে কি টিঁকবে না।'

'কি দেখলে ?'

'টিঁকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মত একটা ছেলেপিলে যদি হত তোর, ক'বছর ঘর সংসার যদি করতি, তবে হয় তো—না, গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না, ঘরে।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙ্গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির দু'টো ভারি কথা না শুনেই, ভাল-মত টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কিসে যেন টান পড়ে টন-টন করে উঠেছে বুকের শিরা-টিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আরেক বার মুখ বাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, 'মা ? ওমা ?

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, 'কে গো বাছা তুমি ? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে ?'

অপত্য স্নেহ

ক্যাঙ্গারু ছানা বড্ড ভয় পেয়েছে।

মা বলছে—'ভয় কি বাবা। লুকিয়ে বস।'

সিংহ-শিশু বায়না ধরেছে

'মা আমি পিঠে চড়ব।'

মা ছেলেকে স্নান করাতে এসেছে। হাতীখোকা বলছে—
'উঃ বড় শীত—স্নান করব না।'

বাঘের ছেলেরা মার সঙ্গে চোর চোর খেলেছে।
মা এক জনকে ধরেছে—'চোর ধরেছি—এইবার।'

ছেলে আবদার ধরেছে গল্প শুনবে।
মা তাই গল্প পড়ে শোনাচ্ছে।

মা ছোট ভাইকে আদর করছে।
তাই বড় ভাই অভিমান করেছে:—
'ওকে ভালবাস, আমায় বাস না।'

মা ছেলেকে ঘুম পাড়াতে বসে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভবঘুরের চিঠি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

ভায়া, গতবারের চিঠিখানা পড়েই তুমি ঠাট্টা সুরু করে দিয়েছ—ভেবেছ আমি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছি। কিন্তু তোমার রসিকতা মাঠে মারা গেছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই কম। তাদের মতবাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানি তার সবটুকু যে সত্য, তা' আমার মোটেই মনে হয় না। তবে তাদের গোড়াকার কথাটা যে খুবই খাঁটি, তাতে আর ভুল নেই।

কথাটা এই যে, পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে যে গণতন্ত্রের ঢক্কানিনাদ শোনা যাচ্ছে সেটা মেকি মাল। পার্লামেন্টের ফাঁদ পেতে, সকলকে এক একটা ভোট দিয়ে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ধরবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য বা কল-কারখানা করে যারা হাতে বেশ দু' পয়সা জমিয়েছে, আইন-কানুন গড়বার ক্ষমতা তাদেরই হাতে। শাসনযন্ত্র তারাই চালায়, সন্ধি-বিগ্রহ তারাই করে, আন্তর্জাতিক সভা-সমিতি ডেকে তারাই মোড়লী করে। যাদের পয়সা নেই, তাদের কেতাবী স্বাধীনতা থাকতে পারে; কিন্তু সে স্বাধীনতায় পেট ভরে না, দুঃখ ঘোচে না।

এই দুঃখের চাপে, পেটের জ্বালায় সাধারণ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সব দেশেই তারা শাসনযন্ত্রটা অধিকার করবার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার অপরাধ এই যে, সে কাজটা তারা সকলের আগে করে ফেলেছে। তাই ইউরোপ আর আমেরিকার মোড়লের দল চারিদিক্ থেকে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। আর তাদের দেখাদেখি আমরাও সেই চীৎকারে যোগ দিয়েছি। ব্যাপারটা যে সব সময় বেশ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি, তা' নয়।

আমাদের দেশে ঐ জিনিষটা এখনও ষোল আনা এসে পড়েনি; তবে ক্রমশঃ এসে পড়াও বিচিত্র নয়। আমাদের দেশের রাজনীতিজ্ঞ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই এখনও পার্লামেন্টের স্বপ্ন দেখছেন তা' জানি। কিন্তু তার কারণ শুধু এই যে, তাঁরা প্রধানতঃ ইংরেজের লেখা ইতিহাস আর অর্থশাস্ত্র পড়ে রাজনীতি শিখেছেন, আর জানই তো ইংরেজের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে পার্লামেন্টের ইতিহাস একেবারে জড়ানো। তাঁদের ধারণা হচ্ছে এই যে, ইংরেজ যখন পার্লামেণ্ট পেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তখন আমরাও এই রকম একটা কিছু পেলে বেশ গুছিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়াটা অত সোজা বলে মনে হয় না। ইংলণ্ডের যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তারাই সেখানকার অভিজাত শ্রেণীকে মেরে ধরে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়েছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের হাতেই রাজ্য চালাবার ক্ষমতা এখনও পর্য্যন্ত রয়েছে। তারা শুধু ইংলণ্ডের নয়, এ দেশেরও হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা যখন আমাদের দেশে বাণিজ্য করতে আসে তখন মোগল রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছে; দেশের শাসনভার তখন ছোট-খাট রাজা-রাজড়াদের উপর। সে সমস্ত রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে দেশের লোকের বড় একটা নাড়ীর যোগ ছিল না। তাই এ দেশের লোকের সাহায্য নিয়েই সে সমস্ত রাজা-রাজড়াকে হটিয়ে দেওয়া ইংরেজের পক্ষে বিশেষ শক্ত হয়নি। এত বড় দেশকে কি করে জয় করে ফেললুম, এ কথা ভেবে ইংরেজ মাঝে মাঝে নিজের বাহুবলের খুব তারিফ করে থাকেন; কিন্তু এটাতে অবাক্ হবার বিশেষ কিছু নেই। তখন ভারতবর্ষে যে শাসন-প্রণালী ছিল সেটা Feudal system। ইংরেজের সঙ্ঘবদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধাক্কায় সেটা ভেঙ্গে গেল। এ দেশের তখন যে রকম অবস্থা তাতে একটা প্রবল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। তা' যদি পারত, তা হলে ভারতবর্ষ অধিকার করা ইংরেজের পক্ষে অত সোজা ব্যাপার হোতো না। দীপ-শিখা নিবে যাবার আগে যেমন একবার জ্বলে ওঠে, ১৮৫৭ সালে Feudal ভারতও তেমনি একবার জ্বলে উঠেছিল।

তার পর বর্ত্তমান ভারতের আরম্ভ। ইংরেজের আমলে দেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে কংগ্রেস প্রধানতঃ তাদেরই সৃষ্টি। যাঁরা ইংরেজের রাজত্বকালে ধনবান্ হয়ে উঠেছেন, ইংরেজের সঙ্গে সমান অধিকার পাবার ইচ্ছা ও কল্পনা তাঁদেরই মনে জেগে উঠেছে। জমিদারই বলো, আর উকিল ব্যারিষ্টারই বলো, আর বোম্বাই, আমেদাবাদের কলওয়ালাই বলো, সবই ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি। ইংরেজের ক্ষুরে এদের মাথা মুড়ানো। সুতরাং ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে রকম, এঁদেরও অনেকটা তাই। এঁরা মুখে যে স্বাধীনতার কথা বলেন, সেটার সোজা বাংলা মানে হচ্ছে এই যে, ইংরেজের বদলে এঁরা এ দেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার চান।

কিন্তু কল-কারখানা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বা জমিদারী চালিয়ে যেখানে দশ জন ধনবান্ হয়েছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ দশ হাজার জন দরিদ্র হয়েছে। এই সব দরিদ্রের মধ্যে যারা শিক্ষিত, তারা যে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সুহৃদ্ নয়, তা' বলাই বাহুল্য। এই

সমস্ত লোক যেদিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে সেদিন থেকে এই কথাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এদের স্বার্থে আর ধনবানদের স্বার্থের মধ্যে অনেকটা বিরোধ আছে। সেই দিন থেকে Moderate and Extremistএর সৃষ্টি। যারা ধনবান্ তারা সহজে গোলমালের মধ্যে বা অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাইবে না। নিজেদের ধন-সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তিটা একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই তারা ষোল আনা বিদেশী শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী হয়ে উঠবে আর হচ্ছেও তাই। কংগ্রেসের এক দল যে মাঝে মাঝে negotiation and conciliationএর কথা বলেন, এইটাই হচ্ছে তার নির্গলিতার্থ। আজ যারা Nationalismএর পতাকা তুলেছে, সরকারী বা আধা-সরকারী চাকরীর বাজার যদি একটু সস্তা হয়ে যায়, তা হলে এ দল থেকেও অনেক লোক ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে সৌখীন Nationalismএর পিছনে একটা পেটের জ্বালার Nationalism লুকিয়ে আছে। তার সন্ধান পেয়ে জাতীয় দলের অনেক নেতা এখন থেকেই আঁতকে উঠেছেন। অথচ সেটা এক দিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই। দেশের অন্ততঃ বারো আনা লোকই দীন, হীন, কাঙ্গাল। দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে এই সর্ব্বস্বান্ত, দরিদ্রদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। দেশ স্বাধীন না হলে তাদের দুঃখ ঘোচে না; সুতরাং তারা মাঝ-রাস্তায় ভেঙ্গে পড়বে না। ঘুষ দিয়ে তাদের ভোলান যাবে না।

সেদিন আমার এক জন তথাকথিত সনাতনী বন্ধু বলছিলেন—"এরা তো শূদ্র। এদের হাতে রাজশক্তি গিয়ে পড়লে সেটা তো শূদ্ররাজ্য হয়ে পড়বে! আর শূদ্ররাজ্য তো ভারতের আদর্শ নয়। ওটা একেবারে Bolshevik ব্যাপার।

কথাটা মিথ্যা বলেই আমার ধারণা। Bolshevikরা কি চায় তা আমি জানি নে; কিন্তু আমি যা চাই সেটা খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, যারা শরীর বা মন দিয়ে পরিশ্রম করে অন্নসংস্থান করে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাই তাদের অন্তর্গত। যারা পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে নিজেদের পেট ভরাতে চায় সমাজে তাদের স্থান নেই। তাদের স্থান হওয়া উচিত জেলখানায়। শাস্ত্রমতে তারা ব্রাহ্মণও নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, বৈশ্যও নয়, শূদ্রও নয়। তারা অপাংক্তেয়, বেদবাহ্য।

খাঁটি ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা Aristocracy বা Bourgeois দলভুক্ত নন; তাঁরা এই proletariatএর অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ এই proletariatএর মাথা, এদের শিক্ষাগুরু। ব্রাহ্মণের কাজ এদের শিক্ষিত, সমর্থ, সংঘবদ্ধ করে তোলা। আজকাল যারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নামে পরিচিত, তারা প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয়ও নয়, বৈশ্যও নয়। তারা ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের শাস্ত্রীয় আদর্শ মানে না। তারা নিজেদের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। সমাজকে তারা রক্ষাও করে না, ভরণ-পোষণও করে না। তাদের ধ্বংসই অবশ্যম্ভাবী।

আজ-কাল আমাদের দেশে nationalist বলে পরিচয় দিয়ে যাঁরা লম্বা লম্বা বুলি ঝেড়ে আসর জমাচ্ছেন, খাঁটি nationalismএর ধাক্কায় তাঁরা ভেঙ্গে-চুরে যাবেনই। যারা অর্থ চায়, প্রতিপত্তি চায়, বচন দিয়ে কাজ সারতে চায়, তারা আর বেশী দিন টিঁকতে পারবে না। যারা সমাজকে ঐশ্বর্য্য বা আভিজাত্যের চাপে দাবিয়ে রাখতে চায়, যারা সমগ্র সমাজের মঙ্গল না দেখে শুধু নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চায়, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যারা দেশকে চায়, সমাজকে চায়, স্বাধীনতাকে চায়, তাদের ঐ লাঞ্ছিত দীন-দরিদ্রদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; আর তাদের মাঝখান থেকে নূতন ব্রাহ্মণ, নূতন ক্ষত্রিয়, নূতন বৈশ্য সৃষ্টি করে তুলতে হবে। এই নূতন সমাজ গড়ে তোলবার ভার যারা নেবে—তারাই এ যুগের ব্রাহ্মণ। তাদের নির্লোভ হওয়া চাই, নির্ভীক হওয়া চাই, জ্ঞানী হওয়া চাই,—সমাজের মঙ্গলের জন্যে তাদের সর্ব্বত্যাগী হওয়া চাই।

ঠিক এ রকম সমাজ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে গড়ে ওঠেনি; কিন্তু এইটাই যে এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের আদর্শ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ রকম সমাজ গড়ে তোলা যাঁদের লক্ষ্য ছিল তাঁরাই সমাজের শাসন-ক্ষমতা জ্ঞানী, নির্লোভ ব্রাহ্মণের হাতে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাঁরা শুধু জন্মের গুণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে পরিচিত, তাঁরা এ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন; কিন্তু আদর্শটা এ দেশে বেঁচে আছে। এ দেশ শুধু লাঠির শাসন বা টাকার শাসন মানবে না। টাকা বা লাঠি যদি ব্রাহ্মণের অনুগত না হয় তাহলে এ দেশে তা' চলবে না। এই আদর্শের নামে যারা দেশকে ডাক দেবে, তারাই দেশের ভবিষ্যৎ গড়বে। তারাই সমগ্র সমাজের সংহত শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে দেশে স্বাধীনতা আনবে।

তোমার Aristocracy বা Barristocracy কেন যে সন্দেহের চক্ষে দেখি, কেন যে শুধু মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া আদর্শে আমার মন ভরে না, কেন যে গরীবদের উপর ঝোঁক দিই, তা হয় ত বুঝেছ। এটা খাঁটি এদেশী আদর্শ, বিদেশ থেকে আমদানি করা মাল নয়। তোমরা ইংরেজের পুঁথি পড়ে যে স্বরাজের আদর্শ আমদানি করছ সেটা ইউরোপের পচা democracy। ইউরোপের অঙ্গ থেকেই তা খসে পড়তে আরম্ভ করেছে।

যাকগে। চিঠিখানা ক্রমশঃ যেন বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করছে। সুতরাং আজ এইখানেই ইতি।

যাযাবর

পাঁচ
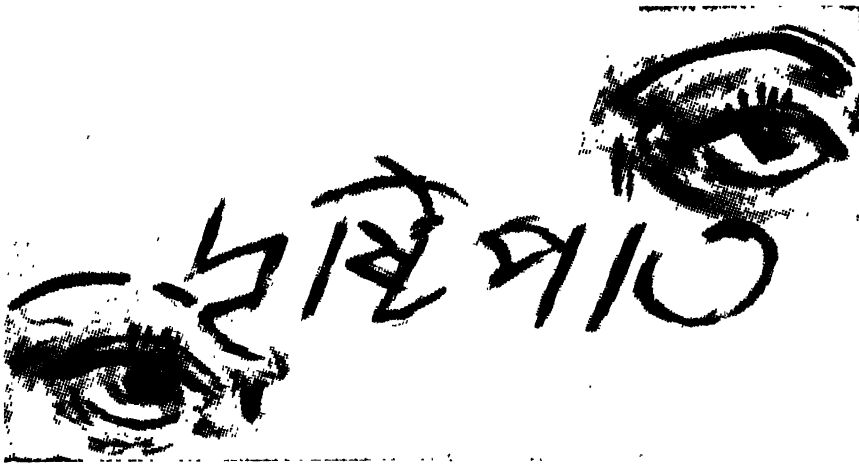
সপ্তাহের সব চেয়ে বড় সেনসেশান। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ক্রীপস্ প্রস্তাবের সার মর্ম্ম। নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্ত সূত্র পাওয়া স্পেকুলেশন। শোনা গেল, গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হয়েছেন এ সংবাদ Leakage-এ। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ত্তারা তদন্ত সুরু করেছেন সংবাদের সূত্র সম্পর্কে।

সাংবাদিক মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কারণ, প্রস্তাবগুলির কিছুটা আঁচ আমরা সবাই পেয়েছিলাম গত ক'দিন ধরেই। প্রকাশ করা হয়নি, জেণ্টলমেনস্ এগ্রিমেণ্ট স্মরণ করে। ইংরেজ ও আমেরিকান সহ-সংবাদদাতারা অনুমান করেন, ভাইসরয়স্ কাউন্সিলের কোন মহামান্য সভ্যের কাছ থেকে বেরিয়েছে এ খবর।

জনশ্রুতি এই যে, ক্রীপস্ যে-দিন এলেন বেলা সাড়ে বারোটা থেকে অনাহারে ভাইসরয়স্ হাউসে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এই মাননীয় সদস্যগণ। বেলা দু'টোয় এলেন ক্রীপস্। লর্ড লিনলিথগো আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে সারিবন্দী দণ্ডায়মান নিজ সহকর্ম্মীদের। ক্রীপস করমর্দ্দন করলেন সবার সঙ্গে, নিরাসক্ত-কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন How d' ye do ?—দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হলেন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে।

তাঁরা আশা করেছিলেন, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে ক্রীপস্ তাঁর প্রস্তাব আলোচনা করবেন তাঁদের সঙ্গে, জানতে চাইবেন তাঁদের অভিমত। সে দিক্ দিয়েও হতাশ হলেন। ক্রীপস প্রস্তাবের সার মর্ম্ম অনুদ্ঘাটিত রইলো তাঁদেরও কাছে। আশ্চর্য্য নয় যে, তাঁরা ক্ষুন্ন হলেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর হলেও হাজার হোক মানুষের শরীর তো! শোনা যায়, অবশেষে ভাইসরয়ের সুপারিশে বিগত রাত্রে লাট-প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় ক্রীপস প্রস্তাবের চুম্বক জানিয়েছেন তাঁদের। আজই প্রভাতে সংবাদপত্রের উৎসাহী নিজস্ব রিপোর্টারের জবানীতে ঘটলো তার প্রকাশ। ধূম দ্বারা যদি পর্ব্বতের বহ্নি অনুমান করা সম্ভব হয়, তবে বিদেশী সংবাদদাতাদের সন্দেহ একেবারে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সংবাদ স্কুপ করার অধিকার সাংবাদিকের আছে। কিন্তু সেই অনাগত বিধাতাদেরও একটা অলিখিত মাত্রা আছে। জাতির বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে সাংবাদিকের আপন বিবেক সেন্সর করে তার কপি। এডোয়ার্ড দি এইটথের রাজ্য ত্যাগের ঘটনা মনে পড়ছে সুস্পষ্ট। মে মাস থেকে ব্রিটেনের সকল সংবাদপত্র জানতো সিম্পসন-এডোয়ার্ড প্রণয়-কাহিনী। ফ্লিট ষ্ট্রীটে কানাঘুষায় শুনেছি বহুবার। কেউ প্রকাশ করেনি ঘূণাক্ষরে। অন্ততঃ মুদ্রিতাক্ষরে। সরকারী দপ্তরের কোন অনুশাসন ছিল না, ছিল না কোন আইনগত বাধা। এক দিন জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে সেকেণ্ড ফ্রণ্ট হবে। কোথায়, কোন্‌খানে করবে মিত্রশক্তি আক্রমণ সে-তথ্য জানা হয় তো সম্ভব হতে পারে ষ্টুয়ার্ট গেলডার, বা রেমণ্ড ক্ল্যাপারের। তাঁরা কদাচ প্রকাশ করবেন না সে সংবাদ, যদিও ক্রীপস্ প্রস্তাবের চাইতে সে কম বড় স্কুপ নয়।

সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন সততার। ক্রীপস আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ভারতের কল্যাণের নামে। আমরা সবাই সম্মতি দিয়েছিলাম বিনা প্রতিবাদে। পূর্ব্ব প্রকাশের দ্বারা এই ভারতীয় সাংবাদিক ভঙ্গ করলেন সে-প্রতিশ্রুতি। তাই লজ্জিত বোধ করছি আমরা সমস্ত ভারতীয়েরা। জেণ্টেলমেন যদি জার্নেলিষ্ট হতে পারেন, তবে জার্নেলিষ্ট জেণ্টলম্যান হতে পারবেন না কেন?

ভাইসরয়স্ হাউস থেকে ক্রীপস্ এসেছেন তিন নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার এণ্ড্রুক ক্লোর বাংলোয়। ক্লো আসামের আগামী গভর্ণর। গদি দখলের পূর্ব্বে দু'মাসের ছুটি নিয়ে গেছেন মুসৌরী না কি আলমোড়ায়, বিশ্রাম মানসে।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাড়ীগুলি সরকারী। সুদৃশ্য। একতলা দালান। ঈষৎ পীতাভ রং; সামনে অতিবিস্তৃত অঙ্গন। এত বড় যে, দু'দিকে গোলপোষ্ট খাড়া করে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের ম্যাচ খেলা যায়। সবুজ ঘাস, লন্ মোর দিয়ে পরিপাটি ছাঁটা। মাঝখানে বৃত্তাকার ফুলের কেয়ারী। তাকে বেষ্টন করে টক্‌টকে লাল সুরকীর রাস্তা; মোটর ঘোরাতে বেগ পেতে হয় না এতটুকুও। ফটকের গায়ে এক পাশে কাচের উপরে বড় হরপে লেখা বাড়ীর নম্বর। কাচের একদিকে ছোট্ট একটু খুপরি। রাত্রিবেলায় তাতে লণ্ঠন জ্বেলে রাখা হয়, অনেক দূর থেকেও যাতে বাড়ীর নম্বরটা চোখে পড়ে। দালানের সম্মুখে পোর্চ, তার নীচে গাড়ী দাঁড়ায়। বারান্দার দু'পাশে দুটি ছোট কুঠুরি। সেখানে অনারেবল্ মেম্বারের সেক্রেটারী ও ষ্টেনোগ্রাফারের দপ্তর।

হুবহু একই ধরণের দু'টি বাড়ী। সেক্রেটারিয়েটের সমুখ থেকে দুই বাহুর মতো দুদিকে প্রসারিত দুটি রাস্তা—কিং এডোয়ার্ড ও কুইন্ ভিক্টোরিয়া রোডের উপরে। যেন দু'টি যমজ ভাই, ডায়মো কুণ্টোপ্লেটসের দোসর।

আতিশয্যের দ্বারা অত্যন্ত ভালো জিনিষকেও যে কতখানি হাস্যকর করে তোলা যায় তার দৃষ্টান্ত আছে নয়াদিল্লীর নগর

পরিকল্পনায়। ইউনিফর্মিটির বাতিকে পাওয়া স্থপতিরা সহরটাকে শ্রী দিতে গিয়ে ছাঁচ দিয়েছেন, বাড়ী দিতে গিয়ে ব্যারাক্। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মূলগত ঐক্যকে প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি। গড়, ফুট বা ইঞ্চি মিলিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের নাম নকলনবিশী। প্রথমটা যিনি করেন তাঁকে বলি ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টা যিনি করেন তাঁর নাম বিশ্বকর্ম্মা। প্রথমটার মধ্যে আছে আর্ট, পরেরটার মধ্যে আছে ক্র্যাফ্ট্।

পুরাকালে নগর-পত্তনের গোড়াতে ছিল নৃপতি। রাজার অবস্থিতি ও অভিরুচি অনুসরণ করে গড়ে উঠত জনপদ, তাঁর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহেরা তুল্‌তো সৌধ, সাধারণেরা বাঁধতো বাসা, শ্রেষ্ঠীরা সাজাতো বিপণি। রাজশক্তির পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর ভাগ্যে এসেছে বিপর্য্যয়, নগনগরীর ঘটেছে বিলুপ্তি বা বৃদ্ধি। আগ্রা, আওরঙ্গাবাদ ও ফতেপুরসিক্রিতে আজও রয়েছে তার নির্ভুল নিদর্শন।

একালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদর বেশী। লেডী ডাক্তারের স্বামীর মতো রাজার মহিমাও এখন আর আপন বীর্য্যবত্তায় নয়, প্রজাদের বাণিজ্যবিস্তারে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্য দেশেও এখন বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে—কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে। তাই এযুগের মহানগরীর Centre of Gravity থাকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বা হর্ণবি রোডে। তাদের প্রেরণার মূল চেম্বার অব প্রিন্সেস নয়, চেম্বার অব কমার্স। তাই ওয়াশিংটনের চাইতে নিউইয়র্কের গুরুত্ব হয় বেশী, লক্ষ্ণৌকে ছাপিয়ে ওঠে কাণপুর, পাটনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় জামসেদপুর।

আধুনিক ভারতবর্ষে নয়াদিল্লী হচ্ছে একমাত্র সিটি যেখানে ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রভুত্ব নেই। সেখানে বৈশ্য নেই। ব্রাহ্মণও না। আছে শুধু ক্ষত্রিয়। অবশ্য তাদেরও আয়ুধের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান ক্ষত্রিয়েরা অসিজীবী নয়, মসীজীবী। প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা ব্যূহ রচনা করে হাত পাকিয়েছিলেন। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ব্যাস সবই রুল-মাফিক্। আধুনিক ক্ষত্রবীরেরা ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে হাত এবং চুল দুই-ই পাকিয়ে দেন, তারও নির্দ্দেশ হলো Precedent। সুতরাং নয়াদিল্লীর পথ, ঘাট, বাড়ী, ঘর সব কিছুরই পিছনে আছে কেবলই এক রকম হওয়ার প্রয়াস। দোকান-পাট থেকে সুরু করে রাস্তা, পার্ক, কোয়ার্টার, মায় পথের পাশে জামগাছের সারি পর্য্যন্ত সব কিছুই যেন খাকী কোর্ত্তা-পরা পল্টনের মতো সঙ্গীন উঁচিয়ে এটেনশানের ভঙ্গিতে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে!

নতুন আস্তানায় ক্রিপসের সভা বসলো পাত্র-মিত্র নিয়ে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড, এবং কানাডার সমাজতন্ত্রী গ্রেহাম স্প্রাই আছেন তাঁর দপ্তরে।

কুপল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার লণ্ডনের এক বিতর্ক-সভায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য আছে যথেষ্ট, ঔদার্য্য আছে কিনা জানিনে।

ক্রীপসের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেছেন, মৌলানা আজাদ, গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহরু ও মিষ্টার জিন্না। আজাদের সঙ্গে দোভাষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর এক জন কংগ্রেসী মুসলমান, ব্যারিষ্টার মিষ্টার আসফ আলী। আসফ আলীর জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশ, কর্ম্মস্থান দিল্লী, শ্বশুরবাড়ী বাংলায়। তাঁর স্ত্রী অরুণা আসফ আলীর পৈত্রিক উপাধি ছিল গাঙ্গুলী, অতি নিকট আত্মীয় সম্পর্ক আছে রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবীর সঙ্গে।

পণ্ডিত জওহরলালের ইংরেজী জ্ঞানের খ্যাতি তাঁর দেশপ্রীতিরই মতো বহুবিদিত। জীবিত ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর তুল্য ইংরেজী রচনাকুশলী বড় বেশী নেই, এ-কথা স্বীকার করেছেন বহু ইংরেজ। গান্ধীজির ইংরেজী জওহরলালের ন্যায় সাহিত্য-প্রধান নয় কিন্তু তার স্বচ্ছতা ও অলঙ্কারহীন মাধুর্য্য বহুক্ষেত্রে বাইবেলের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিষ্টার জিন্না ছিলেন প্রথিতযশা ব্যবহারাজীব, ইংরেজীতে সওয়াল করার দক্ষতা অসাধারণ। ক্রীপসের সঙ্গে একটি মাত্র লোক আলাপ করেছেন—ক্রীপসের ভাষায় নয়, নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয়, উর্দ্দুতে। যদিও কাজ চালাবার মতো ইংরেজী তিনি জানেন বলে জনশ্রুতি শুনেছি বহু বার। মৌলিকতা আছে কংগ্রেসের মুসলিম সভাপতি মৌলানা আজাদের। তাঁর জয় হোক্।

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়। কিন্তু ইংরেজী আমাদের শিখ্‌তে হয়। তাতে ক্ষোভ নেই। হয়তো লাভই আছে। স্বাজাতিকতার আধুনিক ধারণা, ইংরেজীতে যাকে বলে ন্যাশন্যালইজম, তার বেশীটা আমরা পেয়েছি ইংরেজী শিক্ষার ফলে। কিন্তু এদেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্ম্মকুশলতার মাপকাঠি দাঁড়িয়েছে ইংরেজী বলা ও লেখার কৃতিত্বে—এটা হাস্যকর। কলেজে পরীক্ষার খাতায় যে ছেলে ভালো ইংরেজী লেখে চাকুরীর বাজার থেকে বিবাহযোগ্যা কন্যার উদ্বিগ্না জননী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তার আদর আছে। এ-দেশের নেতাদের সম্পর্কেও তাই বিদেশী পত্রিকারা যখন বলে যে He speaks faultless English আমরা তখন আনন্দে গদগদ হই। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সকৌতুক সতেজ প্রতিবাদ আছে মৌলানা আজাদের আচরণে; ক্রীপস হন ভোজ, লাটসাহেবই হোক, কিম্বা স্বয়ং জজ্জ দি সিক্সথই হোন, যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভাষা না বলতে চান বা না পারেন তবে আমিই বা তার ভাষা বলতে যাবো কেন? সাবাস্!

গান্ধীজি ক্রীপসের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। তাঁকে বারান্দার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন ক্রীপস্। মুহূর্ত্তমধ্যে সাংবাদিকেরা চক্রব্যূহ রচনা করলেন তাঁকে ঘিরে। চোখে তাদের জিজ্ঞাসা, মুখে তাদের আগ্রহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগের ছাপ। স্মিতহাস্যে উদ্বেলিত জনতাকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বিনাবাক্যে নিরস্ত করলেন বহু উদ্যত প্রশ্ন।

ক্রীপসের রসবোধ আছে। রহস্য করে বললেন, গান্ধীজির হাসি দেখে সাংবাদিকেরা যেন ক্রীপস প্রস্তাবের গুণ বিচার না করেন। ঘর থেকে বেরোবার সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তিনি গান্ধীজিকে শিখিয়ে দিয়েছেন! প্রবল হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো এই কৌতুকালাপে।

কিন্তু কাশীর পাণ্ডা, বিয়ের ঘটক ও বীমার দালালের চাইতেও নাছোড়বান্দা আছে জগতে। তার নাম রিপোর্টার। গান্ধীজির আলোচনা সম্পর্কে জান্‌তে চাইলেন তাঁরা। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ক্রীপসকে দেখিয়ে উত্তর করলেন মহাত্মা, "একে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কিছুই বলার নেই।"

"প্রস্তাবটি এমনই চীজ যে, দেখেই আপনি হতবাক্?" প্রশ্ন করলেন এক ঝানু সাংবাদিক।

"You naughty Boy" বলে প্রসন্ন হাস্যে সমাপ্তি ঘটালেন আলোচনার। মোটরে উঠে যুক্তকরে অভিবাদন করলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে। প্রস্থান করলেন বিড়লা ভবনোদ্দেশে।

ইনফরমেশন বিভাগের ক্যাম্প হয়েছে পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, সাংবাদিকদের সুবিধার্থে। সেখানে হানা দিচ্ছি আমরা ঈগলাক্ষী রিপোর্টারের দল প্রত্যহ প্রাতে, দুপুরে, বিকালে ও সন্ধ্যায় অমিত উৎসাহে। যদিও কবে কখন কোন ভারতীয় নেতা ক্রিপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন তার বেশী আর কিছুই জানার উপায় নেই সেখান থেকে।

ক্যাম্প-অফিসের কর্তা জগদীশ নটরাজন ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মারের প্রতিষ্ঠাতা বোম্বের বিখ্যাত সাংবাদিক কে, এস, নটরাজনের পুত্র। পাইওনীয়ারের সম্পাদকগোষ্ঠী থেকে এসেছেন গভর্ণমেণ্টে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের তথ্য জানেন অনেক, ইংরেজী বলেন স্বচ্ছন্দে, উচ্চারণে নেই মদ্রজনোচিত ধ্বনি-বিকৃতি। এক দিন নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর গৃহে।

নটরাজন-গৃহিণী মাদ্রাজী নন—এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাঁর পিতৃকুল বড় পরিবারের খ্যাতি আছে টেনিস খেলায়, মাতৃকুলের অতিপুরাতন মূল আবিষ্কার করা যায় বঙ্গদেশে। তাঁর মাতামহী ব্যানার্জ্জী-কন্যা ছিলেন। সে হিসাবে বল্লাল সেনের সৃষ্ট কৌলীন্যে দাবী আছে।

আধুনিক অনেক প্রগতিশীল বাঙ্গালী পরিবারেরও ভারতীয় রূপটি খুব স্পষ্ট নয়। গৃহের কর্তা হয়তো বিদ্যার্জ্জন করেছেন বিদেশে। অক্সফোর্ডে ইংরেজী, গ্লাসগোতে ইঞ্জিনীয়ারিং, এডিনবরায় ডাক্তারী বা লিঙ্কনস্ ইনে ব্যারিষ্টারী পড়ে দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কর্মজীবনে, অর্থার্জ্জন করছেন অজস্র ধারে। তাঁদের বসনে স্যুট, অশনে স্যুপ, এবং আসনে কৌচ। তাঁদের গৃহিণীরা পার্টি দেয়, ক্লাবে যায়, ব্রিজ খেলে পুরুষ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অসঙ্কোচে। সে গৃহে চাকরেরা বয়, মায়েরা মেমসাব এবং মেয়েরা মিসি বাবা।

বিলাতে না গিয়ে যারা সাহেব তারা আরও দুর্দ্ধর্ষ। কংগ্রেস থেকে লীগে যোগ দেওয়া মুসলমানের মতো, হিরোকে করেন আর্টি-হিরো। স্লিপিং পাজামা না পরে ঘুমানো বা ছুরি-কাঁটা দিয়ে না খাওয়াকে তাঁরা প্রায় মধ্য যুগের গঙ্গায় সন্তান বিসর্জ্জন বা সতীদাহের ন্যায় রোমহর্ষক বর্ব্বরতা জ্ঞান করে থাকেন।

তবুও একথা মানতেই হবে যে, ইংরেজ অথবা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিয়ে করে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক মূল থেকে যেমন উৎপাটিত হই এমন আর কিছুতেই নয়। বাঙ্গালী গৃহিণীরা যতই চুল খাটো করুক, গিমলেট গিলুক, রংকরা ঠোঁটের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ফিরিঙ্গী উচ্চারণে ভুল ইংরেজী বলুক, সংস্কার থাকে coty বা ম্যাক্সফ্যাক্টর ঘষা চামড়ার তলায়। রক্তে থাকে ঠাকুমা দিদিমাদের অন্ধ বিশ্বাসের বেড়ে কাপাদল, তাই মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করতে খোঁজ পড়ে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার, স্বামীর অসুখে লুকিয়ে মানত করেন স্বচনীর, ছেলের কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীর দিনে থাকেন উপোস। পুরুষেরা হোটেলে যতই খান স্টেক বা ভিল, মা-বাবার শ্রাদ্ধ করেন গুরু পুরোহিত ডাকিয়ে যথারীতি।

সব চেয়ে দুর্ভাগা ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জনক-জননীর সন্তানেরা। তারা পিতার সমাজ থেকে বিচ্যুত, মাতার সমাজ দ্বারা বর্জ্জিত। তারা না ভারতবর্ষের, না ইংলণ্ডের। কোন্ দেশের প্রতি তাদের দেশাত্মবোধ জাগবে, কোন্ জাতির প্রতি মমত্ব-বোধ? তারা বাবার কাছ থেকে পাবে নামের পদবী, মায়ের কাছ থেকে পাবে গায়ের রং। কার কাছ থেকে পাবে মনোভাব? তারা সত্যিকার বর্ণসঙ্কর। শুধু জন্মে নয়, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, ভারতীয়-য়ুরোপীয়ের বিবাহজাত সন্তানেরা আজ পর্যান্ত হয়নি কোন উঁচুদরের শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সঙ্গীতজ্ঞ। তাদের দৌড় বড় জোর রেলের বড় সাহেব, নয়তো টেলিগ্রাফের ডিরেক্টার।

য়ুরোপের সমাজ অনেকটা সার্ব্বজনীন। ইংলণ্ড থেকে ইটালী পর্য্যন্ত মোটামুটি তার একই রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, চেক, হাঙ্গেরিয়ানের প্রায় একই বেশ, একই পরিবেশ, একই আচার-আচরণ। সমগ্র য়ুরোপে লোক ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার ও সাপারে বসে ঘড়ি ধরে, সায় ছুরি কাঁটায়। থিয়েটারে যায় শনিবার রাত্রে, গির্জ্জায় জানু পেতে ভজনা করে রবিবারে। ভাষার বিভেদ ছাড়া য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে মোটামুটি একটা সামাজিক মিল আছে প্রায় সর্ব্বত্র।

লণ্ডনে ইংরেজ স্বামীর অষ্ট্রীয়ান স্ত্রীকে দেখেছি অন্য আর পাঁচ জন ইংরেজ-গৃহিণীর মতো অনায়াসে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তার গৃহের সঙ্গে অন্য আর পাঁচটি ইংরেজ-পরিবারের নেই তফাৎ। ছেলে-মেয়েরা বেড়ে উঠছে ঠিক অন্য আর পাঁচটি ডিন, পল বা হ্যারিংটন পুত্র-কন্যার মতো। অবশ্য সমস্যা যে একেবারে নেই, তা নয়। সে সমস্যা প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখা দেয় স্বামি-স্ত্রীর মনে। যেমন লর্ডসে টেষ্ট ম্যাচের সময় কোন্ পক্ষের এ্যাসেজ লাভ কামনা করবে ইংরেজ স্বামী আর অষ্ট্রেলিয়ান স্ত্রী; মহাযুদ্ধে কার জয়লাভে উৎফুল্ল হবে জার্ম্মেণ মিষ্টার, কোন্ পক্ষের পরাজয়ে মুহ্যমান হবেন তাঁর রাশিয়ান মিসেস্?

তবুও দূর ভবিষ্যতে কোন দিন ইউনাইটেড ষ্টেটস অব ইউরোপ যদি গড়ে ওঠে, যদি সম্ভব হয় এক কথা ভাষা, তবে কল্পনা করা কঠিন নয় য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর বৈবাহিক যোগাযোগ; তখন স্পেনের তরুণ হামেশা বিয়ে করবে নরওয়ের তরুণী ঠিক যেমন এখন করে স্কচেরা ওয়েলসের। যেমন আমাদের কোন্নগরের কনেকে ঘরে নিয়ে আসে, বরিশালের বর।

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জীবনের মর্ম্ম আলাদা, সমাজের গঠন বিভিন্ন। একান্নবর্তী পরিবারের কথা বাদ দিলেও আমাদের সমাজ কেবল ব্যক্তি ও তার স্ত্রী-পুত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ, নয়, বহু আত্মীয় ও পরিজনগোষ্ঠীর প্রতি নানাবিধ দায়িত্ব এবং সম্পর্কের দ্বারা তার প্রভাব ও ক্ষেত্র দূর প্রসারিত তাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বৈবাহিক যোগাযোগে ব্যক্তিগত জীবন সুখের হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্তু তা দ্বারা কোন কালে ঘটবে না দুই মহাদেশের সামাজিক মিলন। কিপলিঙের দু'-একটা কথা অন্ততঃ সত্য। য়ুরোপের স্ত্রীলোক মাত্রই আমাদের পক্ষে পরস্ত্রী।

নটরাজনের ভোজসভায় পরিচয় ঘটলো এক মারাঠী ব্রাহ্মণের সঙ্গে। বয়স চল্লিশের ওপরে, মাথায় কালোর চাইতে শাদার ছোপ বেশী, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা। সব চেয়ে আশ্চর্য্য

দার চোখ দু'টি। দীর্ঘায়ত নয়ন, অবনী ঠাকুরের আঁকা ভারতীয় চিত্রকলার অজুনের মতো। তাতে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে বটে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে আছে আষাঢ়ের জলভারনত ঘন মেঘের মতো কালো গম্ভীর ছায়া। সচরাচর চোখে পড়ে না পুরুষের এমন অসাধারণ চোখ।

কিন্তু নয়া দিল্লীর সোসাইটিতে চারু দত্ত আধারকারের খ্যাতি পানীয় ঘটিত। এক বৈঠকে তিনি দশ পেগ হুইস্কি পান করতে পারেন অবলীলাক্রমে। চোখের পাতা কাঁপবে না একটুকু। সেটা অনন্যপূর্ব নয়। আরও দু'চার জন পাবেন তা'। কিন্তু আধারকারের কৃতিত্ব শুধু পানীয়ের গ্রহণে নয়, উদ্ভাবনেও। সংখ্যাতীত মিক্সার জানা আছে চারু দত্তের। ককটেল তৈরীর বহু পদ্ধতি তার নখাগ্রে। ডিনার পার্টিতে নিমন্ত্রণকারিণীরা আগে ভাগে পরামর্শ করেন আধারকারের সঙ্গে। মহানন্দে মন্ত্রণা দেন তিনি। "কে কে আসছে? কত জন আসছে? যদি তিন রাউণ্ডেই খায়েস করতে চাও, তবে প্রথমে দাও রাম অরেঞ্জ, তার পরে জিন এণ্ড লাইম। তার পরে হুইস্কি। মেয়েদের জন্য মাঝখানে শেরী দিতে পার লিমোনেডের সঙ্গে মিশিয়ে। কি বললে? রাম অরেঞ্জ কেমন করে করবে জানো না? তৈয়ারি এ পিটি। আচ্ছা শিখিয়ে দিচ্ছি shaker এর মধ্যে সিকি ভাগ দাও ইটালীয়ান ভার্মুথ। ইটালীয়ান নেই? আচ্ছা অভাবে ফ্রেঞ্চই দাও। মিশাও সিকি ভাগ কমলালেবুর রস, আদ্ধেক ঢালো রাম। বেশী করে বরফ, আর সামান্য একটু দারচিনির রস। ব্যস। আচ্ছা করে মিশিয়ে এবার ককটেল গ্লাসে পরিবেশন কর।"

নটরাজন-গৃহিণী বললেন, "মিনি সাহেব (আমার মিনি সাহেব নামটা সেন সাহেবের অন্দরমহল থেকে বাহির বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধুজনের সকৌতুক সম্বোধনে) যদি নতুন নতুন ককটেল চাখতে চান তো মিঃ আধারকারের বুদ্ধি নেবেন।" স্মিত হাস্যে আধারকার বললেন "হ্যা, চাকরী থেকে রিটায়ার করে আমার রেসিপিগুলোর পেটেন্ট নেবো ভাবছি। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো If it's a drink consult Adherkar. ঘরে ঘরে মিসেস বিটনের মতো নতুন গৃহিণীদের আলমারীতে থাকবে আধারকারস্ বুক অব ড্রিঙ্কস্।"

কিন্তু আমার জন্যে এ সবের চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ভোজন-পর্বের শেষে অতিথিদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বেহালা বাজিয়ে শোনালেন আধারকার। দরবারী কানাড়া সুর। গৎ নয়, শুধু আলাপ। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে বাজালেন অপূর্ব্ব দক্ষতায়। বাজনা শেষে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "বলতে পারো কী সুর বাজালেম, মিনি সাহেব?" বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেম খানিকক্ষণ, উত্তর দেওয়ায় কথাই মনে রইল না। পরিষ্কার বাংলা।

"কী একেবারে থ' হয়ে রইলে যে।" এ বারও বাংলায়।

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, "আপনি আশ্চর্য্য। এমন বাংলা শিখলেন কেমন করে?"

"এ কি একটা প্রশ্ন? তুমি এমন ইংরেজী শিখেছ কেমন করে?

"আমি শিখেছি পেটের দায়ে।"

"আমি শিখেছি প্রাণের দায়ে। না, না, আর প্রশ্ন নয়, curiosity is a femenine vice"

বিদায় নেওয়ার আগে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "মিনি সাহেব, 'তুমি' বলছি বলে চটোনি তো মনে মনে? তুমি তো বয়সে অনেক ছোটই হবে। আমি থাকি রবার্টস রোডে, ২২ নম্বর। এসে এক দিন সন্ধ্যাবেলা, বাংলা বলবো, বেহালা শোনাবো, আর দেব জিন স্লিপার। জিন স্লিপার জানো তো? জানো না? এক পেগ জিন, কোয়ার্টার রাম দু চামচ লাইমজুস, বাকীটা সুইট। এক টাম্বলার-ফুল। মার্ভেলাস।" মুখে চোখে এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন তখনই আস্বাদনই করছেন সেই অপূর্ব্ব পানীয়।

আধারকারের বাড়ীতে এক দিন গেলাম। জিন স্লিপারের লোভে নয়, লোকটির আশ্চর্য্য আকর্ষণে। এক দিন গেলাম, দু'দিন গেলাম। তার পর প্রত্যহ, কখনও বা সকালে এবং বিকালে। অনেক দিন ব্রেকফাষ্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্য্যন্ত সবই সমাধা হলো তার ওখানে। অল্প সময়ে আন্তরিকতা এত ঘনিষ্ঠ হলো যে আধারকার পুরুষ না হলে নিন্দুকের কুৎসা রটনায় কলঙ্কিত হতে পারতো আমার নাম। তার বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকলে নয়াদিল্লীর গৃহিণীরা সম্ভবপর বর কল্পনা করে মুখরোচক আলোচনায় অবসর বিনোদন করতে পারতেন অপরাহ্ণে।

কিন্তু কন্যা দূরে থাক, কন্যার জননীর চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না অকৃতদার আধারকারের গৃহে। গোটা তিন-চার চাকর, বেয়ারা, খানসামা নিয়ে আধারকারের হোম গভর্ণমেণ্ট। তার একমাত্র রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের ভার তার নিজের, বাকী এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ, জুডিশিয়ারী পর্য্যন্ত সমস্তটাই চাকরদের হাতে। খাঁটি প্রজাতন্ত্র। মজাতন্ত্র বললেও ক্ষতি নেই, ভৃত্যদের পক্ষে।

তর্ক চলে, আলোচনা হয়। রাজনীতি, ধর্ম্ম, ওয়ার ষ্ট্র্যাটেজী, মায় সিনেমা ষ্টার পর্য্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে কাব্যালোচনা হয়। রবি ঠাকুরের বহু কবিতা ও কবিতাংশ আধারকারের কণ্ঠস্থ। গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করেন "মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।" আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন 'বল, কোথায় আছে?' বলতে পারলে বলেন, সাবাস্।" Now you have earned a drink. নাও একটা ড্রাই মার্টিন। খানিকটা গোর্ডনস্ জিন, একটু লাইম ও একটু সিনামন, সঙ্গে নাটমেগ্। এই বয়, মারকোবাস্তে—"। কোন দিন বলেন, "আজ পরীক্ষা। বল কোথায় আছে—"আমারে যে ডাক দেবে তারে বারম্বার এ জীবনে ফিরেছি ডাকিয়া। সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে, খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া" পারলে না? আচ্ছা আর পাঁচ মিনিট সময় দিলুম। তবু পারলে না, হাঃ হাঃ, বাঙ্গালী হয়ে বাংলা কবিতার বাজীতে অবাঙ্গালীর কাছে হারলে। লোকে শুনলে বলবে কি হে। আচ্ছা আগে মাথা সাফ করে নাও। বয়, লাও একটু জিন টার্ণার। চার আউন্স গর্ডনের জিন, এক এক চামচে চিনি, বরফ, তার ওপরে একটু পাতিলেবুর চাকতি। ডিলিসস্।"

এক দিন জিজ্ঞাসা করেন, "মিনি সাহেব, প্রেমে পড়েছ কখনও?"

"না।"

"বল কিহে ইয়ং ম্যান, বিলেতে ছিলে, প্রেমে পড়নি, একথা বিশ্বাস করবে কে?

"বিশ্বাস করা উচিত। There are more things in heaven and earth"

"কিন্তু There are more girls in Picadelly and Licster Square ওতো বটে।"

একটি কবিতা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

গ্রন্থ-বিলীন পুরাণের পথে চলাফেরা,
আকাশের সাথে মিতালী করার দিন গেলো।
ছোট ষ্টেশনের খ্যাতিহীন দিনযাত্রা গো
ক্ষীণতোয়া নদী—হে জীবন লঘু পাখা মেলো!
মোর দিকে আসা মেঠো পথ দিয়ে আসে কারা?
আগন্তুকের বন্য দীপ্তি নেই চোখে!
ওরা বুঝি সব সমারোহ থেকে বঞ্চিত—
করুণ ক্লান্তি তবু কুসুমিত মরলোকে।
আমাকে ছাড়িয়ে সে পথ মিশেছে দিগন্তে—
দীর্ঘ, নদী পায় দূরগামী পালে সান্ত্বনা।
অনেকের লাগি একাকী এ মন স্পন্দিত—
সাগরের পানে ছোটো গেয়ো নদী উন্মনা।

মন মধুকর, কুঞ্জে নহে তো গুঞ্জিত—
হিংস্র-নখর ধ্বংস হয়েছে পুঞ্জিত—
লোকান্তরিত নির্জন পথ ধুলা মাখা—
উষা ও সন্ধ্যা বাঁধে পুরাতন সূর্য্যকে।
শুনি দূর থেকে মেঘের প্রাসাদ ও গর্জ্জিত—
সহস্র হাত, শত বিক্রমে তর্জ্জিত,—
বাজালো দিনের সিংহদ্বারের তূর্য্যকে॥

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

"প্রেমে পড়লে চেহারাটা বড় বোকা বোকা দেখায়, সিনেমায় দেখেছি। সে ভয়ে এগোতে সাহস করিনি।"

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন আধারকার। "এক্সেলেন্ট. বোকা বোকা দেখায়, হাঃ, হাঃ হাঃ, most original। চমৎকার বলেছ। Just imagine—প্রেমে না পড়ার কারণ—বার্ণাড শ'এর চাইতে ভালো কিছু বলতে পারতেন না। তুমি একটি জিনিয়স্। না, তোমাকে আজ নতুন কিছু না দিতে পারলে মান থাকে না। Try রাম ক্রইয়ট। চার চামচ রাম, এক চামচ লাইম, এক রত্তি চিনি, আধ পেয়ালা ব্ল্যাক কফির সঙ্গে মিশিয়ে।

দিনের পর দিন বাড়ে বিস্ময়, ক্রমশঃ আকৃষ্ট হই এই মারাঠা ব্রাহ্মণের প্রতি।

আশ্চর্য্য এই আধারকারের জীবন! কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে গভীর এর অনুরাগ, বেহালা বাদনে অসাধারণ এর দক্ষতা। আয় করেন প্রচুর, ব্যয় করেন প্রচুরতর। বেশীর ভাগই মদ খাওয়া এবং খাওয়ানোয়! অথচ অশোভন আচরণ করতে দেখিনি কখনও। দন্ত করে বলেন, "মিনি সাহেব, তোমাদের শরৎ চাটুয্যে লিখেছেন, যে মদ খায় সে কোন দিন না কোন দিন মাতাল হয়েছে নিশ্চয়। যে অস্বীকার করে সে হয় মিছে কথা বলে, নয়তো মদের বদলে জল খায়। শরৎ চাটুয্যে দেখেননি চারু দত্ত আধারকারকে; দেখলে বই থেকে ঐ লাইন দুটি তুলে দিতেন।

স্ত্রী নেই আধারকারের সে-কথা সবাই জানে। কিন্তু আত্মীয় পরিজন? কারও জানা নেই কোন তথ্য। আদরে অভ্যর্থনায় প্রাণখোলা অট্টহাস্যে সরগরম রাখেন মজলিশ, মুখরিত করেন নিজ গৃহের প্রাত্যহিক বন্ধু-সমাগম। তবু চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, 'এহ বাহ্য।' কী এক গভীর দুঃখের ভার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ ভাবানত নয়নের অন্তরালে, নিঃসঙ্গ জীবনের পশ্চাতে আছে অপরিসীম বেদনার ইতিহাস। কিন্তু কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আবৃত্তি করেন আধারকার, "আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইতে এত লীলার ছল্। বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল।"

[ক্রমশঃ

জম্মুতে একটি দিন

হেমেন্দ্রচন্দ্র কর

কর্ম্মোপলক্ষে শিয়ালকোটে কিছু কাল যাপন করিয়াছিলাম। এই স্থান হইতেই কাশ্মীর-জম্মু রাজ্যের বরফে-ঢাকা পর্ব্বতমালা চোখে পড়ে। শৈশবের দিনগুলি আমার পাহাড়ের কোলেই অতিবাহিত হইয়াছে, তাই পাহাড়ের মায়া আমি কাটাইতে পারি না। অথচ জম্মু কারণে অনেক দিন যাওয়া হয় নাই। তাই এক রবিবার আমি দুই জন সঙ্গী সহ জম্মু যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম।

শিয়ালকোট হইতে জম্মু যাইবার একমাত্র গাড়ী সকাল সাতটায়। কথা ছিল, আমার সহযাত্রীদিগকে আমি পথে তুলিয়া লইব। শেষ রাত্রিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল কিন্তু এই অঞ্চলের দুরন্ত শীতে বিছানার মায়া ত্যাগ করা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। শেষ পর্য্যন্ত উঠিয়া গায়ে যাবতীয় গরম পোষাক চাপাইয়া জাম্বুবান সাজা গেল। রাস্তায় যখন বাহির হইয়া পড়িলাম তখনও বেশ অন্ধকার। সঙ্গীরা প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন—তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইলাম।

শিয়ালকোট হইতে জম্মুর দূরত্ব ত্রিশ মাইলের বেশী হইবে না। পাঞ্জাবের এই অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপাদন হয়। রেলওয়ে লাইনের দুই পাশের ক্ষেতগুলি দর্শন করিলে বাংলার স্মৃতি মনে জাগরিত হয়। আন্দাজ দুই ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই জম্মুসহরে পৌঁছিয়া গেলাম।

জম্মু কাশ্মীর-রাজ্যের শীতকালের রাজধানী। বাগান, উদ্যান, ময়দান, রাস্তা এবং মনোজ্ঞ পার্ব্বত্য-শোভার জন্য এই স্থানটি চির-

বানিহালের জলপ্রপাত

প্রসিদ্ধ। সহরটি বেশ সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া সহরে চলিলাম। সহরের পাশ দিয়াই একটি পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিতা। তাহার উপর একটি সুন্দর সেতু নিৰ্মাণ করা হইয়াছে। আমরা স্থানীয় কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তথায় চা পান করিয়া আবার রাস্তায় বাহির হওয়া গেল। গৃহকর্ত্রী বলিয়া দিলেন, ১টার মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য ফিরিতে হইবে। কাজেই এই সময়টা স্থানীয় বাজারে ঘুরাঘুরি করা গেল। বাজারটি বেশ সমৃদ্ধ। বাজারে শাকসব্জী এবং বিলাসের সামগ্রী প্রচুর মেলে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দেখিতে বেশ সুন্দর—তবে পাঞ্জাবীদের ন্যায় তাহাদের চেহারা পৌরুষ-ব্যঞ্জক নহে, কিছুটা মেয়েলী, আমাদের ভাল ছেলের মত। ধুতি বা শাড়ী খুব কম লোকেই পরে। মেয়েরা সালোয়ার

দরবার [illegible]

এবং এক প্রকারের ঢিলা কামিজ পরে এবং একটি রঙিন্ দোপাট্টা বক্ষোদেশের উপর ঝুলাইয়া দেয়। এই পোষাকে মেয়েদের বেশ সপ্রতিভ মনে হয়। আমাদের পাশেই রঘুনাথজীর মন্দির। এত বড় মন্দির এ অঞ্চলে আর নাই। এখানে প্রায় সকল দেবতারই পূজা হয়। বাবণও বাদ পড়েন নাই। মন্দির হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখা গেল, খাবার আয়োজন যথেষ্ট। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। সুলভে একটি টাঙ্গা করা গেল। প্রথমে আমরা জম্মু কলেজটি দেখিতে গেলাম। কলেজটির নাম—'প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলেজ', বি-এ পর্য্যন্ত পড়ানো হয়। কলেজের সঙ্গেই বৃহৎ ছাত্রাবাস। সেই স্থান হইতে আমরা

'প্রিন্স অব ওয়েলস্' কলেজ

মাধ্যমিক

অমিতাভ ঘোষ

অর্ব্বুদ বুদ্‌বুদ ফেটে যায়
নিরবধি তরঙ্গিত কালের জোয়ারে
স্থান-কাল-পাত্রাধীন উচ্ছ্বাসের সমুদ্র-দোলায়।
বিধাতা ক্রন্দন করে : কোথায়, কোথায় ?
—মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ ?

মৌন মূক কাতারে কাতার
কোথা যায় উচ্ছৃঙ্খল প্রত্যক্ষ-বিনাশ
ভ্রান্তির আলেয়ালোকে ঝলোমলো অর্ব্বুদ বুদ্‌বুদ
বিষণ্ণ মৃত্যুর সমারোহে ?

বিশ্বের পর্ব্বতমালা রুধি' স্বর্গদ্বার
সদম্ভে উন্নতশির,
সামুদ্রিক ব্যবধানে ঊর্দ্ধ অধঃ সংশয়-পীড়িত,
সেতুহীন বিপুল বিস্তার !

তারি মাঝে নিরালম্ব নিরাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কুর দল
স্তিমিত চৈতন্য-শিখা অর্ব্বুদ বুদ্‌বুদ
দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে ফেটে ফেটে যায়
নিরাকার নিরুপাধি কালের জোয়ারে।

দিব্যদৃষ্টি দাও বিরোচন !
দাও ঋজু মেরুদণ্ড, বুদ্‌বুদের দীপ্ত অবয়ব
ভ্রান্তির আলেয়ামুক্ত অর্ব্বুদ আত্মায়
সঙ্ঘবদ্ধ দাও সুস্থ মন।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অমর মহল

গেলাম রাজপ্রাসাদ দেখিবার জন্য। এই প্রাসাদের নাম 'অমর মহল'। প্রাসাদটি নির্ম্মাণ-কৌশলে এবং স্থাপত্য-গৌরবে অপূর্ব্ব। প্রাসাদের অনতিদূরেই দরবার-গৃহ। কাশ্মীর-রাজ্যে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইতে দুই জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং সরকারী বাজেটও প্রতিনিধিদিগের আলোচনা করার অধিকার আছে শুনিলাম।

রাস্তায় আমার এক বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল—নাম ক্যাপ্টেন চোপরা, আমাদের পল্টনেই কাজ করেন। বাড়ী জম্মু—ভদ্রলোক 'যুদ্ধের ছুটী' লইয়া দেশে আসিয়াছেন। তাঁহাদের গাড়ীটি পাওয়ায় বানিহাল রাস্তার বিখ্যাত জলপ্রপাতটি দেখার সুযোগ হইয়া গেল। প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবেশের মধ্যে এই জলপ্রপাতটি অবস্থিত। এখানে আসিলে সংসারের শত দুঃখ-ব্যথা ভুলিয়া যাইতে হয়—মনে হয়, এখানে পৃথিবীর শত কোলাহলের বাহিরে নীড় বাঁধিয়া জীবনের শেষের দিনগুলি কাটাইয়া দিই। কখন সন্ধ্যা হইয়াছে টেরও পাই নাই। অদূরে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের গায়ে রঙের অপূর্ব্ব খেলা চলিতেছিল—প্রকৃতির অপর্য্যাপ্ত সম্পদ্ আর কখনও এমন নিবিড় ভাবে চোখে পড়ে নাই।

কিন্তু সময় আমাদের বাঁধা, কবিত্ব করার অবসর অত্যন্ত অল্প। সুতরাং বাড়ীর পথ ধরিতে বাধ্য হইলাম।

ওর দোষ কি ?

আমিনুর রহমান

নাঃ, আজকালকার ছোঁড়াগুলো হয়েছে যেন কেমন। বিয়ে করে এসে নতুন বউ নিয়ে এমন মাখামাখি বাবার কালেও দেখিনি। বাপ, দাদা, বাড়ীর পাঁচটা গুরুজনের সামনে অমন ধারা—ছি ছি, ভাবতেও ঘেন্না হয়। আবার দু'বেয়-নাতায় আপিস কামাই। বউ যদি একটু শাশুড়ীর কাছে বসেছে কি অমনি বাবুর মাথা ধরল, শীগ্‌গির এসো মাথা টিপে দাও, কেন রে বাবু, এত বাল কে তোর মাথা টিপত। বিয়ের পর বউ গিয়েছে বাপের বাড়ী, ভায়া আমার বিবাগী হলেই চলে। দু'দিনেই তার চেহারা ঝোড়ো কাকের মত হয়ে গেছে মানুষের বউ নয়েও এমন ধারা হয় না। নাওয়া-খাওয়া ত ভুলেই গেছে রাত জেগে জেগে চোখ বসে গেছে। তিন দিনেই একখানা আস্ত চিঠির প্যাড খতম। চিঠি ত নয় যেন এক একখানা পার্শেল।

তার পর টুপ্ করে এক দিন ডুব মারলো। ব্যাপার কি? গিন্নির কাছে খোঁজ নিয়ে জানলুম ভায়া গেছেন শ্বশুরবাড়ী, চিঠি এসেছে না কি বৌয়ের জ্বর। তা বাপু আমি ত বড় ভাই রয়েছি, আমাকে জানালেই পারতিস্। তোর বউয়ের জ্বর তা তুই তিন-তাড়াতাড়ি গিয়ে কি করবি? গিন্নি রেগিয়া হয়ে বল্লেন—যেন দিন দিন ন্যাকা হচ্ছ, এ ব্যামো কি ডাক্তার-বদ্যিতে ভালো করতে পারে? এই সেরেছে! এ আবার কি রকম ব্যামো রে বাবা! চুলোয় যাকগে। কলিকালের ছাওয়াই বেয়াড়া। বউটাই বা কি রকম বেহায়া গা। জ্বরের ছুতো করে ডেকে পাঠায়। দু'দিন পরেই ত আনতে যেতুম একটু তর সইল না? বউ আর আনতে যেতে হল না, গুণধর ভাই আমার নিজেই সঙ্গে করে এনেছেন। ছি ছি, এরা আমায় বিয়ের উপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। আমারও ত এক দিন বিয়ে হয়েছিল আর পরীক্ষার সময় তিন মাস গিন্নিকে বাপের বাড়ী রেখে দিব্যি লেখাপড়া করে পাশ করলুম; তোরা তা পারবি? স্রেফ পাগল হয়ে যাবি!

ছোট ভায়েরই বা দোষ দিই কেন? সে-বার আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকরুণ কোলকাতায় এসে আমার বাসায় উঠলেন। শিয়ালদা ষ্টেশনে তাঁকে আনতে গেলুম। ট্রেণ থেকে আমার শাশুড়ী যখন নামলেন তখন আমার চক্ষু চড়কগাছে উঠেছে। তিনি ত ধরতে গেলে একাই এসেছেন কিন্তু সঙ্গে এনেছেন প্রায় এক ওয়াগন মোট-ঘাট। ভিড়ের চাপে জিনিসপত্র গাড়ীময় ছড়িয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। মালের মধ্যে বিছানা-পত্র, পানের বাটা, লোটা, জলের কুঁজো ইত্যাদি ছাড়া গোটা কতক "বসবতির কাঁটাল", দু'ঝুড়ি "হুগোর আম", ডাব, নারকোল, কলার ডাঁটা, ওলের ডাঁটা, নটেশাক ইস্তক ঝাঁটার কাঠি পর্য্যন্ত সঙ্গে করে এনেছেন। কোলকাতায় না কি এসব জিনিষ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। তা ছাড়া তাঁর মেয়ের হয়ত দেশের জিনিষ সব সময় খাওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু তিনি ত বোঝেন না যে, এদিকে কুলি-ভাড়ায় বৌ বিকিয়ে যাচ্ছে। যেখানে খালি হাতে এলে চার পয়সায় ট্রামে কি তিন ছ'আনায় রিক্সা করে বাসায় আসতে পারতুম সে যায়গায় দু'টাকা কুলি-ভাড়া আর ছ'টাকা দিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বাসায় এলুম। তার পর বাসায় পা দিয়েই প্রথম ফরমাস "দাও ত বাবা একটা পোষ্টকার্ডে দু'টো লাইন লিখে যে 'আমি ভালোয় ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছি,' নইলে বুড়ো ওদিকে ভেবেই সারা হবেখন।" কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীর বাইরে পা দিতে না দিতেই ভাবনা সুরু।

কথা ছিল, শাশুড়ী ঠাকরুণ মাসখানেক আমাদের বাসায় থাকবেন। প্রথম দু'-এক সপ্তাহ বেশ কাটল; ইতিমধ্যে শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে তিনখানা পত্র এসে গেছে, যত দূর শুনেছি তাতে খবরের মধ্যে 'ভোমলা গাই' তিনপো করে দুধ দিচ্ছে, কালো গাইটার ক্ষুরে ঘা হয়েছে, পাঁচখানা বাঁটিল চুরি গেছে, কলার কাঁদিগুলো গেল হাটে ভাল দরেই বিকিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলুম, আমার শাশুড়ী যেন একটু উস্-খুস্ করছেন, বাড়ীর জন্য মন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে চিঠি আসতে দেরী হলে অন্যমনস্ক মেয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলেন 'তাই ত অনেক দিন খবর পাচ্ছি না, বাড়ীর সব কেমন থাকল কে জানে?' অন্যমনস্ক ভাবে মেয়ে জিজ্ঞাসা করে "কার কথা বলছ মা? দাদার কথা? তবে—বৌদি, রাণী, বেলা? ও তাই বল, বাবার জন্য মন কেমন করছে?" বলেই মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে। মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলেন, "ওরে চুপ কর মুখপুড়ি, জামাই শুনতে পেলে কি বলবে?" যথাসময়ে সংবাদ জামায়ের কানে পৌঁছায়। কিন্তু জামাই বেচারা কি করবে? গিন্নিকে বলি "তোমার মায়ের এখন যাওয়া-টাওয়া হবে না। এসেছেন যখন তখন দু'-দশ দিন থেকে গেলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে না।" গিন্নির আবার পেটে কোন কথা থাকে না, মায়ের খবর আমাকে জানাবে আবার আমাকে যে জানিয়েছে সেটা গিয়েও মাকে বলবে। ফলে শাশুড়ী ঠাকরুণ তাঁর হাবলা মেয়ের মুণ্ডপাত করে চুপ-চাপ হয়ে গেলেন, কেন না, লজ্জায় তিনি হাজার ইচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ী যাবার তাড়া দিতে পারছেন না। ওদিকে শ্বশুর মহাশয়েরও টনক নড়েছে। চিঠি এলো, সংসারে সব অগোছালো হয়ে পড়েছে, খাওয়া দাওয়ার নানান অসুবিধা, তাড়াতাড়ি চলে আসা প্রয়োজন। গিন্নি যখন কথাটা আমার কাছে পাড়লেন, আমি বললুম "কেন রাণী, বেলা আছে, তা ছাড়া বৌদিই ত সংসারের সব কিছু দেখা-শুনা করেন, শুনতে পাই তোমার মাকে কুটোটি পর্য্যন্ত আজকাল নাড়তে হয় না, তবে আর কিসের জন্য সংসার অচল হয়ে পড়েছে? তোমার মা বাড়ীতে থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি?" গিন্নি কিছু ভেবে কূল করতে পারল না, তার মাকে গিয়ে আমার অভিমত জানাল। অগত্যা শাশুড়ী ঠাকরুণ আবার চুপ করে গেলেন। কিন্তু দু'দিন পরে আবার পত্র এলো "আমি বুড় মানুষ একা পড়ে আছি, বেঁচে থাকলুম কি মলুম সেটা একবার খোঁজ নিলে না, তুমি ত দিব্যি জামায়ের বাড়ীতে ফুর্ত্তি করছ বাড়ী ফেরবার নাম নেই। বেশ থাক তুমি মনের সুখে, আমি চল্লুম যে দিকে দু'চোখ যায়।" শাশুড়ী ঠাকরুণ এবার সোজাসুজি আমাকে এসে ধরলেন "এবার আমাকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কর বাবা! ক'দিন থেকে ওঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, আমার এখন না গেলেই নয়।" আবার মিথ্যে অসুখের দোহাই! নাঃ, বুড়-বুড়ীই যদি দু'দিন কাছ-ছাড়া হয়ে থাকতে না পারে তাহলে ছোট ভাইটা এমন কি দোষ করেছে?

গল্প-সাহিত্যের ইতিহাস

শ্রীসত্যভূষণ সেন

প্রাচীন যুগ

সাধারণ হিসাবে নাটক উপন্যাসও গল্প, পুরাণ ইতিহাসও গল্প এবং অনেক কাব্যের মধ্যেও পাওয়া যায় গল্প। গল্পের এই সাধারণ স্তর হইতে জন্মলাভ করিয়াও যে শিল্পরূপ বর্ত্তমান জগতে এবং আধুনিক যুগে ছোট গল্প নামে এক স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে গল্প বলিতে ছোট গল্পই আলোচ্য বিষয়।

এই গল্পের ইতিহাসও গল্পের মতই সুন্দর ও রুচিকর এবং বহুদূর অতীত পর্য্যন্ত প্রসারিত; হয়ত আর কোনও প্রকার শিল্পের এমন সুন্দর এবং এমন দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাস নাই। গল্প মানুষের জীবনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; মানব-জীবনের বিকাশে এবং প্রকাশে উপাদান হিসাবে গল্পের মূল্য সামান্য নয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই গল্প ধর্ম্মপ্রচারের ও ধর্ম্মশিক্ষাদানের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; আমাদের দেশের এবং সকল দেশের পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আমাদের দেশের জাতকের গল্প, পুরাণের গল্প, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের গল্প, মিশরের প্রাচীন যুগের গল্প, বাইবেলের গল্প, ঈশপ্‌স্ ফেবল্‌স্‌এর গল্প প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার শেক্সপীয়ারের ন্যায় অসামান্য কৃতী নাট্যকারও বহু বাল্য-প্রচলিত গল্প হইতেই তাঁহার অনুপ্রেরণা এবং উপকরণ লাভ করিয়াছেন। যুগে যুগে গল্পের বাহ্যরূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য কিন্তু শিল্প হিসাবে ইহার অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হইবার নয়, কারণ, জীবনের মতই ইহারও আছে একটা সজীব প্রবাহ।

গল্পের ইতিহাসের মূল উৎসের সন্ধান পাইতে হইলে আমাদিগকে হয়ত যাইতে হয় কালপ্রবাহের সেই প্রাচীন অতীতে যখন কতকগুলি বানরের মত আকৃতি অদ্ভুত প্রাণী তাহাদের বন্য আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কতকটা স্পষ্ট উচ্চারিত ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য সেই সময়ের কোনও নিদর্শন পাইবার উপায় নাই। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসী যাযাবর বুশম্যানদের নিকট হইতে এবং অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর দেশের অধিবাসী কৃষ্ণকায় লোকদের নিকট হইতে যে সকল গল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গল্পগল্পের প্রাথমিক আকারের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল যুগে এই গল্পের মূল্য বড় সামান্য ছিল না। প্রাচীন যুগের সেই সকল গল্প-কাহিনীর অসামান্য মূল্যের কথা শুনিলে আধুনিক মানব হয়ত বিস্ময় অনুভব করিবেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেই প্রাথমিক বর্ব্বর যুগে যে সকল মানুষ বাস করিত জগতের সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট—যেন একটা চির-পরিবর্ত্তনশীল কল্পজগৎ যাহার উপর কোনও কিছুর জন্যই স্থায়ী নির্ভর করা চলে না। সেই জন্য এই জগতে তাহারা যেন ভয়ে ভয়ে বাস করিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জাতীয় রহস্যের আধার কতকগুলি গল্প ছিল; এই গল্পগুলি কতকগুলি সুচতুর বৃদ্ধ লোকের আয়ত্তে থাকিত। এই সকল গল্পের কার্য্যকরী ক্ষমতা ছিল অসামান্য। ইহাদের মধ্যে থাকিত যাদুবিদ্যার সন্ধান, যাহার দ্বারা মানুষ বর্ষার মেঘকে আহ্বান করিয়া আনিতে পারিত, বনের পশু এবং আকাশের পাখী বশ করতে পারিত এবং এইরূপে সকলকে নিজ আয়ত্তে আনিয়া সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিত বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই যে, সকল গল্পের সন্ধান পাইবার জন্য সেই যুগের এক জন যাযাবর শিকারী তাহার নিজের ও পরিবারের খাদ্য-সংগ্রহের প্রধান সহায়ক তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিকারের অস্ত্রটি পর্য্যন্ত দান করিতে পারিত। আবার কতকগুলি কথা-কাহিনী ছিল যাহার প্রভাবে মানুষ তাহার দেবদেবী, ভূতপ্রেত এবং গোষ্ঠীর প্রতীক সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিত এবং এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া সে সকলের উপর আধিপত্য করিতে পারিত। ফলে ঔষধ বিতরণ করিয়াই হউক বা যাদুমন্ত্র বিস্তার করিয়াই হউক, সে হইয়া বসিত স্বজাতীয়দের মধ্যে সকল রোগের চিকিৎসক।

এইরূপে এস্কিমোদের অধিষ্ঠান-ভূমি শুভ্র তুষার-মণ্ডিত মেরু প্রদেশ হইতে উত্তপ্ত আবহাওয়া-বিশিষ্ট আফ্রিকার মধ্য প্রদেশের ক্ষুদ্র অধিবাসীদের মধ্যে পর্য্যন্ত নানা প্রকার গল্প বা কথা-কাহিনীর যাদুপ্রভাব প্রসার লাভ করিল। কথা-কাহিনীর এইরূপ অপ্রাকৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে লাগিল প্রত্যেকের প্রতিবেশীর চরিত্র ও জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল এবং জীবনের নানা প্রকার ঘটনাকে লইয়া নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা ও নব কাহিনীর সৃষ্টি। সাধারণ লোকে প্রায়শঃই দলপতিদের, বয়োজ্যেষ্ঠদের এবং যাদু-চিকিৎসকদের অত্যাচারের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করিত। জীবনের এই কঠোরতা হইতে শান্তিলাভ করিয়া জীবনে সরসতা সঞ্চারের অভিপ্রায়ে তাহারা সকলে মিলিয়া দিবসের কর্ম্মাবসানে আগুনের চারি দিকে বসিয়া নানা প্রকার কাল্পনিক গল্প-কাহিনীর জাল বুনিয়া চলিত। এক দিকে যেমন মানুষের চরিত্র এবং জীবনের নানা ঘটনা আশ্রয় করিয়া গল্প গড়িয়া উঠিত, অপর পক্ষে তাহাদের পরিচিত পশুপক্ষীদের জীবনধারা হইতেও তাহারা কথা-কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করিত।

বহু খাঁটি রূপকথা, উপকথা প্রস্তর-যুগের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই জন্যই সেই সব কাহিনী শিশুদের চিত্তে এত সহজে আনন্দ দান করিতে পারে ও তৃপ্তিবিধান করিতে পারে; কারণ, সেই প্রাথমিক যুগের মানুষের এবং শিশু-মনের কল্পনার ধারা এবং ক্ষমতা প্রায় সমস্তরের। তাহাদের নিকট এই পৃথিবী একটি বিস্ময়কর কল্পজগৎ, যেখানে অতি অসম্ভব চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাও বাস্তবরূপ লাভ করে এবং সকল প্রকার অসম্ভব কল্পনা সত্যের আকার ধারণ করে—বিশেষতঃ যখন কথা-কাহিনীর শিল্পকলার মধ্য দিয়া বিশিষ্ট আকারে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের শিশুদের নিকট যাহা চমৎকার গল্প তাহাই হয়ত তাহাদের বহু-প্রাচীন পূর্ব্ব-পুরুষদের নিকট অনেক সময় ছিল ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাভূমি। রূপকথায় যে সকল পশু পক্ষী ইতর প্রাণীদিগকে মানুষের মত কথা বলিতে দেখা যায়, তাহারা প্রাচীন মানবদের জীবনের নানা ক্ষেত্রের অধিদেবতার স্মৃতি বহন করিতেছে—যাঁহারা নানা প্রকার ইতর প্রাণীর রূপ ধরিয়া দেখা দিতেন ও তাঁহাদের মঙ্গলবিধানের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতীক হিসাবে তাঁহাদের নিকট পূজালাভ করিতেন। পুস্ ইন বুট্‌স্ (Puss-in-Boots), বিউটি এণ্ড দি বীষ্ট (Beauty and the beast) এবং আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রচলিত

ব্রার র‍্যাবিট (Brer Rabbit)এর গল্পসমূহ এই সকল গল্প-গুলির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে সেই প্রাথমিক যুগের বর্ব্বর জাতি এবং বর্তমান যুগের সভ্য জাতি উভয়ের ইতিহাসেই এই সকল রূপকথার বিশিষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল গল্পের মধ্যে বহু-পরিচিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বহু গল্প সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকা কর্তৃক রূপান্তরিত হইয়া নূতন আকার লাভ করিয়াছে। ফলে হইয়াছে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ', সুতরাং খাটি জিনিষের পরিচয় লাভ করিতে হইলে সেই সকল গল্পের মূল সন্ধানে যাওয়াই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

মিশর দেশ

গল্প-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন পাওয়া যায় মিশর দেশে। সে সময়ের প্রায় ৬৮০০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—যখন বিখ্যাত পিরামিড-নির্ম্মাতা খুফু (Khufu) অথবা চিওপস্ (Cheops) তখন মিশরের অধিপতি। বলা বাহুল্য, মিশর দেশে স্থাপত্য-শিল্প, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গই তখন চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। খুফু কাব্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রগণ ও পারিষদবর্গ তাঁহার চারি দিকে সমবেত হইলে এক এক জন করিয়া প্রাচীন যাদুকরদের গল্প আবৃত্তি শুনিতে চাহিতেন। এই গল্পগুলি পরে বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হয় অপর এক জন লেখক কর্তৃক—যিনি খৃঃ পূঃ ৩৮৫৯ সালে জীবিত ছিলেন। ইহারই এক গল্পের সর্ব্বপ্রথম গল্পটির মূল রচয়িতা ছিলেন চিওপস্-এরই পুত্র রাজা খাফরি (King Khafr i) যিনি গ্রেট পিরামিড-নির্ম্মাতাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় ছিলেন। রাজা খাফরি এই লেখকের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। অতএব সাহিত্য-জগতের সর্ব্বপ্রথম গল্প-রচয়িতা ছিলেন অতি প্রাচীন রাজবংশের এক জন চতুর্থবংশীয় রাজা।

প্রাচীন যে রাজবংশের সন্তান ছিলেন তাঁহারা রাজপদের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেবতার পুরোহিতের পদও অধিকার করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। রাজা খাফরি যে যাদুকরদের (পুরোহিতেরাই ছিলেন যাদুকর) কথা-কাহিনী সংগ্রহ করিবার জন্য যে কষ্টস্বীকার করিতেন তাহাও তাঁহার রাজনীতিরই অংশ ছিল। এই যুগেও মিশর দেশের ধর্ম্মে-কর্ম্মে পুরোহিতেরা বশীকরণ প্রভৃতি নানা প্রকার সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ করিয়া আসিতেছিলেন; রাজা খাফরি সেই সকল সম্বন্ধে পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিবার অভিলাষী ছিলেন।

খাফরির রচিত সর্ব্বোত্তম গল্পটি "খাফরির গল্প" নামে পরিচিত। সাধারণ হিসাবে এই গল্পটি এক অসতী স্ত্রী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বামীর একটি অতি সাধারণ কাহিনী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার মূল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই গল্পের মধ্যে সেই সময়কার মিশর দেশের সভ্যতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে মিশর দেশে নারী ছিলেন সম্পত্তির মালিক, স্বামী যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিতেন, তাহা স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়া দিতেন—তখন ছিল মাতৃতন্ত্রের যুগ। এই ব্যবস্থার মূলে হয়ত ছিল এই ধারণা যে, পুরুষেরা যখন পরিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহের অভিপ্রায়ে শিকারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন স্ত্রীলোকেরা তখন কৃষিকার্য্যের পত্তন করিয়া কৃষিকার্য্যের সকল অংশ নিজহাতেই রাখিয়া দিতেন। যাহাই হউক, নারী যখন বিবাহ করিবার অভিলাষী হইতেন তখন তিনি তাঁহার মনোনীত পুরুষের নিকট উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার প্রেরণ করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতেন। এক পতিতে বীতস্পৃহ হইলে আবার তাঁর এক-প্রস্থ পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার পাঠাইয়া তিনি দ্বিতীয় পতি বরণ করিয়া লইতেন। এইরূপ প্রথা বর্তমান যুগেও কোন কোন অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। মিশর দেশে পুরোহিত-তন্ত্রের যুগে এই প্রথা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু রাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সম্পত্তিতে অধিকার এবং বিবাহ-প্রথার পরিবর্তন হয়। খাফরির এই গল্পের নায়িকাকে এই হিসাবে এক জন সাধারণ অসতী নারী মনে করিলে ভুল হইবে, বরং তাহাকে এক জন বিদ্রোহিনী বলিয়া মনে হয়, প্রাচীন প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ছিল যাহার আদর্শ। গল্পে নায়িকার পরাজয় এবং প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় অপঘাত মৃত্যু পরিণতিতে স্পষ্টই মনে হয়, যাহাতে তৎকালীন অবলুপ্ত প্রাচীন প্রথা আবার চলিতে না পারে তাহারই প্রয়াস।

মিশর দেশের অপর একটি "রাজকুমারী আহুরির গল্প" (The Tale of Ahuri) সুবিখ্যাত মিশররাজ রামেসিসের (Rameses) সময়ের, যাঁহার রাজত্বসময়ে সম্ভবতঃ মোজেস (Moses) বাস করিতেন। এই গল্পের পাণ্ডুলিপি পরবর্তী যুগের মিশরের ইতিহাসের টলেমির আমলের লিপিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গল্পটি খৃঃ পূঃ ১৩০০ সালের কথা।

রামেসিসের পুত্র রাজকুমার সেটনা (Setna) রাজা খাফরির মতই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের যাদুমন্ত্রাদির রহস্য জানিবার অভিলাষী ছিলেন। থথ দেবতা (God Thath) কর্তৃক লিখিত একখানা যাদুবিদ্যার পুস্তকের কথা প্রচলিত ছিল যাহার প্রভাবে সকল জীবজন্তুর ভাষা আয়ত্ত করা যাইত এবং পৃথিবী ও স্বর্গ নিজ আয়ত্তে আনা যাইত। সেটনা এই পুস্তকের সন্ধানে এক রাজসমাধি উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক রাজপুত্র এবং এক রাজকন্যার (পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী) আত্মা সেখানে বসবাস করিতেছে—ইহারাও পার্থিব জীবনে এই পুস্তকের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেটনা সমাধিতে তাঁহাদের পার্শ্বস্থিত পুস্তকখানা তুলিয়া লইবার জন্য যাইতেই, রাজকুমারী আহুরি (Princess Ahuri) তাহার নিজ জীবন-কাহিনী বিবৃত করেন—এই যাদুমন্ত্রের পুস্তকখানা ব্যবহার করিবার চেষ্টার জন্য তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতার উপর থথ দেবতার অভিসম্পাতের কাহিনী। গল্পটি সম্ভবতঃ কোনও পুরোহিত-তন্ত্রের লেখক দ্বারা রচিত—উদ্দেশ্য স্পষ্ট, মিশরের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের স্বাধিকার এই যাদুবিদ্যার সন্ধানের জন্য রাজকুমার সেটনা যেন প্রশ্রয় না পান।

ভারতবর্ষ

মিশরের পরে ভারতবর্ষ। বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মকথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য কতকগুলি গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাঁহার শিষ্যগণও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এইরূপে পাঁচ শত পঞ্চাশটি গল্প সঙ্কলিত হয়। এই সকল গল্প রূপকথা-জাতীয়—অনেক ইতর জীবজন্তুর কথা নির্ব্বিচারে এই সকল গল্পে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধমতে জন্মান্তরবাদ আছে—কর্ম্মফল অনুসারে মানুষ জন্মান্তরে ইতর প্রাণীর পর্য্যায়েও গিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে

অথবা মানুষের মধ্যেও আসিয়া হীন অবস্থায় বা উৎকৃষ্ট অবস্থায় জন্মলাভ করে। এই সকল জন্মজন্মান্তরের মধ্যে একটা পরম্পরা বজায় থাকাতে বুদ্ধদেবের মত এক জন পুণ্যাত্মা নিঃসন্দেহ নিজ পুণ্যবলে তাঁহার সকল পূর্ব্বজন্মের কথাই স্মরণ করিতে পারিতেন। এই সকল বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সেই জন্য এই সকল গল্প "জাতকের গল্প" বলিয়া পরিচিত। এই সকল গল্পের মধ্যে "বুদ্ধদেবের বিচার"এর সহিত বাইবেলের গল্প "সলোমনের বিচার" (Judgment of Solomon)এর গল্প অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত-মহলে এখনও জল্পনা-কল্পনা চলে যে, হিব্রু ইহুদিগণ যখন ব্যবিলনে (Babylon) অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন তখন ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন কি না।

এই সকল জাতকের গল্প ভারতবর্ষ হইতে পারস্য এবং ক্রমশঃ সীরিয়া হইতে গ্রীস দেশে গিয়া বিস্তৃতি লাভ করে। প্ল্যানিউডিস (Planudes) নামে এক জন গ্রীক ধর্ম্মযাজক (monk) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই সকল গল্পের মধ্যে কতকগুলি গল্প নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন এবং ঈশপের রচিত বলিয়া প্রচলিত করেন। এইরূপে জাতকের কতকগুলি ছোট ছোট গল্প ঈশপ্‌স্ ফেবল্‌স্ নামে অযথার্থরূপে প্রচারিত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে।

জাতকের গল্পগুলি লিপিবদ্ধ হয় ৩৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে অথবা প্রায় ঐ সময়ে। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ তখন ঐ সকল গল্পের উৎকর্ষ এবং কার্য্যোপযোগিতা উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহারা জাতকের গল্প হইতেই কতকগুলি গল্প একত্র সংগ্রহ করিয়া পঞ্চতন্ত্র নামক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন প্রায় খৃঃ পূঃ ২৫০ সালে। ব্রাহ্মণদেরও উদ্দেশ্য ছিল এই সকল গল্প আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপ্রচার—বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিয়া তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মের প্রসার। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রজাদের অপেক্ষাও রাজা ও রাজন্যবর্গের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করা অধিকতর প্রয়োজন ছিল। সে জন্য তাঁহারা জাতকের কতকগুলি গল্পকেই ভিত্তি করিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত একখানা পুস্তক সংগ্রথিত করিলেন—"হিতোপদেশ"। "রাজপুত্র এবং বণিকের পত্নী" একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যাহা পাশ্চাত্যদেশে বহু প্রচার লাভ করিয়াছে। এইরূপ কতকগুলি গল্পে নারী জাতির চরিত্র সম্বন্ধে হীন আদর্শের কল্পনা দেখা যায়, এবং ইহার প্রভাব ইউরোপীয়গণের মনের উপরে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। অনেকে মনে করেন, কতকটা এই প্রভাবে প্রশ্রয় পাইয়াই ইউরোপে মধ্যযুগে নারী জাতির চরিত্র সম্বন্ধে হীন আদর্শ কল্পনা সম্ভব হয়। "বিশ্বাসী ভৃত্য" আর একটি গল্প যাহা পাশ্চাত্য দেশে বহু প্রচারিত—ইহার মধ্যে নৈতিক আদর্শ অনেকটা উন্নত।

গ্রীস

এমন কি, বুদ্ধদেবের জীবিত কালেও নারী জাতির চরিত্রের শিথিলতা সম্বন্ধে তদানীন্তন পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষে হিন্দুদের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এইরূপ শিথিল চিত্রে বহু উৎকৃষ্ট গল্প সংগৃহীত ছিল। এই সকল গল্প মাইলেশিয়ান (Milesian tales) নামে প্রচলিত ছিল। এই সকল গল্প এশিয়া মাইনরের গ্রীক নগর সমূহে যে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার স্রোতঃ প্রবাহিত ছিল সেখান হইতে উদ্ভূত অ্যারিষ্টিডিসের (Aristidis) গ্রন্থে এইরূপ বহু গল্পসমষ্টি ছিল, কিন্তু সেই গ্রন্থ এখন লুপ্ত। কিন্তু গ্রীক গল্পসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গল্পের নিদর্শনের জন্য আমরা আর এক জন এশিয়াবাসী গ্রীক গল্পকারের নিকট ঋণী—হেরোডোটাস (Herodotus) যিনি প্রায় ৪৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে হালিকারনাসাসে (Halicarnasus) জন্মগ্রহণ করেন। হেরোডোটাস বহু দেশ পর্য্যটন করেন এবং অনেক লোকের সহিত আলাপ করেন। পরে যখন তিনি ইতালীতে আসিয়া বসবাস করেন তখন সকল প্রকার সংগৃহীত গল্প লিপিবদ্ধ করেন। এই সকল গল্পের মধ্যে "Palycrates and his Qing", "The Treasure of King Rhampsiruites" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

গ্রীক সাহিত্যের স্বর্ণ যুগে লেখকগণ গল্প-সাহিত্যে কোন গল্প রচনা করেন নাই যাহার নিদর্শন আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহারা নাটক, ইতিহাস ও দর্শন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। গ্রীক সাহিত্যের রৌপ্য যুগে সিসিলীর এক জন প্রসিদ্ধ লেখকের নিকট হইতে আমরা বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করিয়া প্রথম গল্পের নিদর্শন পাই। ইনি থিওক্রিটাস (Theocritus —৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সাইরাকিউজ (Syracuse) নগরে জন্ম তাঁহার লিখিত "সাইরাকিউজের রমণীগণ" (The Ladies of Syracuse) অতি প্রসিদ্ধ গল্প।

গ্রীকজাতি সকল প্রকার শিল্পের ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান যুগের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের সহিত তুলনায় বর্ত্তমান যুগের উৎকর্ষ শুধু সেই ক্ষেত্রে যেখানে গ্রীকগণ আসিয়া অবতরণ করেন নাই দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু বড় উপন্যাসের কথা বলা চলে। তথাপি, এই সকল ক্ষেত্রেও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কতটা উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারিতেন সেই সকল পূর্ব্বসূরিগণ তাহারও আশ্চর্য্য নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের রচনায় জীবনের গভীর ভাবের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনায় বর্ত্তমান যুগের বাস্তব গল্প-উপন্যাসের জীবনের পরিচয় নিষ্প্রভ। পেট্রোনিয়াস (Petronius) ছিলেন রোম নগরীর বিলাসিতার ও চরিত্রহীনতার একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন বা দৃষ্টান্তস্থল। সকল প্রকার অপরূপ পাপের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বয়ং নীরোরও (Nero) দীক্ষাগুরু; সম্রাটের অনুগ্রহ-প্রসাদ হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। এই পেট্রোনিয়াস একখানি শ্লেষাত্মক উপন্যাস রচনা করেন—এই গ্রন্থের দুইটি অধ্যায় মাত্র বর্ত্তমান যুগে আসিয়া পৌছিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে গল্প-সাহিত্যের অতি বিখ্যাত একটি নিদর্শন—এফিসাসের বিধবা রমণী (The Widow of Ephisus) এশিয়া মাইনরে মাইলেশিয়ান গল্প নামে যে সকল গল্প উদ্ভূত হইয়াছিল এই গল্পটি হয়ত সেই গল্পেরই একটি পরবর্ত্তী সংস্করণ। পেট্রোনিয়াসের রচনার মধ্যে আরও একটি চমৎকার গল্প পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের রুচি হিসাবে তাহা অচল বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় না ঠিক এই কারণেই লুসিয়ান (Lucian) নামে এক জন বিখ্যাত লেখকের গল্প অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। [ক্রমশ

মণিপুর ও মণিপুরের রাস-নৃত্য

মণি বর্দ্ধন

ঝাঁকুনি খেয়ে কোন মতে টাল সামলে গেলাম। ট্রেনের 'বাঙ্ক' থেকে পড়ি আর কি। কানে এলো মণিপুর ইম্ফাল—এক কপেয়া কোথায় বা···। উঁকি মেরে দেখি মণিপুর রোড ষ্টেশন, আমার গন্তব্যস্থল। গাড়ী থেকে নামলাম।

এবারের পাড়ি বাসে। ইম্ফাল মণিপুরের রাজধানী—এখান থেকে একশ'-চৌত্রিশ মাইল। বাস চলল। দু'ধারে ফাঁকা মাঠ। সামনে চোখে পড়ে পাহাড়ের সারি মসীরেখার মত। ভোরের আলো মনটা স্নিগ্ধ করে দিল। তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম এই সেই মণিপুর। ছোটবেলায় কত গল্প শুনেছি দিদিমার কোলে চেপে। হীরের হালে চষে চাষা—সেথায় মুক্তা ফলে বার মাসা। কই···। মহাভারতে পড়েছি ভুবনবিজয়ী বীর পার্থ এদেশে এসে উলুপী, চিত্রাঙ্গদার রূপে ভুলেছিল। উলুপী এ ডিমাপুর অঞ্চলেরই রাজকুমারী। এদেশের রাজপুত্র বভ্রুবাহন—পার্থ হেন বীরকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু কই এদেশের আকাশে বাতাসে তেমন অলৌকিক একটা কিছুর ছাপ তো নেই। এমনি কত কথাই ভেবে চলেছি। বাস থেমে গেল। শুনলাম এখানে ছাড় পত্র দেখাতে হবে। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বাঙ্গালী কি না। সে দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—দেশে তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ গরম, ধরপাকড় অন্তরীণ পুরোমাত্রায় চলেছে। আমি একে তো বাঙ্গালী তায় বয়সে তরুণ, সন্দেহ হবারই কথা। কিন্তু ছাড়পত্র পড়ে নাম দেখে হঠাৎ হেসে বললেন, 'ও তাই বলুন, আপনার নৃত্যবিষয়ক প্রবন্ধ পড়েছি, নামও শুনেছি, মণিপুরে নাচ শিখতে যাচ্ছেন বুঝি? বসুন, চা খেয়ে যেতে হবে। কোন প্রকারে তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে গিয়ে বাসে বসলাম। বাস চলল।

দু'ধারে মাঠ, সামনে সোজা রাস্তা অনেক দূরে যেয়ে মিশে গেছে। গাড়ী পূর্ণগতিতে ছুটে চলল। আকাশের প্রান্তে আঁকা ক্ষীণ মসীরেখা ক্রমে দীর্ঘতর হয়ে আসে। শুনলাম, পাহাড়ের অপর পারে ইম্ফাল, মণিপুরের রাজধানী। ভেবে আনন্দ হ'ল, ওদেশেই যাব। কেমন না জানি সে দেশ, কি রকম সেখানকার অধিবাসী, কেমন না জানি তাদের আচার-ব্যবহার। একটা ভয়-মিশানো আনন্দে বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল। বাসের গতি মন্দ হয়ে আসতেই সচেতন হলাম, দেখি সামনেই পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা চলে গেছে আঁকা বাঁকা হয়ে। ডান ধারে রইল বড়াইল গিরিশ্রেণী—বাস চলল।

আটাশ উনত্রিশ মাইলের পর "পিপহীম" পথের উপর গাছপালা বিরল হয়ে এসেছে—দু'ধারে পাহাড়। তার উপর দিয়ে চলে গেছে রাস্তা আঁকা বাঁকা হয়ে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল, একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিলাম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট নির্ঝর লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে; সূর্য্যের কিরণে ঝিকমিক করছে, রূপোর মত, মনে হয় যেন পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের রাজ্যের পারে পরীদের দেশ থেকে নেমে আসছে গলা রূপোর নদী, কত শত অপ্সরার রাঙ্গা-পা-ধোয়া জল বুকে নিয়ে—কোন অভিশপ্ত নিরুদ্দেশ যক্ষের খোঁজে।

এবার ধূম্রবর্ণ মেঘের গায়ে ভেসে উঠল অভ্রস্পর্শী 'কোহিমা' নাগা পাহাড়ের রাজধানী। বাস থেকে দূরে নাগাদের পর্ণকুটীরগুলি ছোট ছেলেদের খেলাঘরের মত দেখাচ্ছিল। গা-কাটা পাহাড়ের মাঝে মাঝে ধানক্ষেত, তার পর বন আর বন—পাহাড় আর পাহাড়—যেন আর শেষ নেই। আন্দাজ দশটায় কোহিমায় বাস পৌছাল। কোহিমার পর "মাউ"। বেলা দুপুরে যখন মাউএ এসে উপস্থিত হলাম, পথের দুর্গমতায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে ক্লান্তি আসা তো দূরের কথা, আধাআধি এসে গেছি জেনে মন খুসীতে ভরে উঠল। উদার প্রকৃতির বিচিত্রতার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে পথশ্রান্তির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানে এসে দেখি কতকগুলি বাস আমাদের অপেক্ষায় আছে। এবার এরা নোঙ্গর তুলল। বিপরীত দিকের বাসগুলি এসে এখানে পৌছে গেলে আবার যে যার গন্তব্য-স্থলে যাত্রা করে। কারণ পাহাড়ের রাস্তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—পথে দুর্ঘটনা অনিবার্য্য।

"মাউ"এর পর "কানকপি"—তার পর ইম্ফাল। মাঝে সেই বনানী গিরিরাজি—কোথায়ও বা রাস্তার পাশে কোথায়ও বা আকাশ-ছোঁয়া। আশ্চর্য্য এই যে, এই একঘেয়েমির মধ্যেও যেন একটা মাধুর্য্য আছে—ক্ষণিকের জন্যও মনে অবসাদ আনে না। হঠাৎ ধোঁয়ার মত খণ্ড মেঘ এসে জামা-কাপড় অর্দ্ধসিক্ত করে দিয়ে গেল—গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসলাম। তার পরক্ষণেই এক অপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটল, যার ছবি এখনও চোখে ভাসছে। দেখি বাসের একেবারে সুমুখে হঠাৎ ছুটে এসে একটি নাগা মেয়ে খিল খিল করে হাসছে। গৌরবর্ণ, কপালে ছোট ছাঁটা চুল, পরণে লুঙ্গি, এক হাতে পানগুয়া (পান সুপারি), অন্য হাতে বাস থামাবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। বাস থামল। মেয়েটি ড্রাইভারের হাতে পানগুয়া গুঁজে দিয়ে পাশে বসল। পানগুয়া দেবার উদ্দেশ্য, তার হাতে পয়সা নেই কিন্তু বাসেই যেতে হবে। ঘটনাটি অতি সামান্য কিন্তু সেই পার্ব্বত্য মেয়ের সহজ সরল খিল খিল হাসিটি এখনও মনে ভাসছে। তার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রকৃতির সন্তান, লজ্জা নেই ভয় নেই, লোকনিন্দার ভয়ে পদে পদে পেছনে তাকাতে হয় না—সবাই আপন। উদার প্রকৃতির কোলে আজও এরা মানুষ। কৃত্রিমতার আবরণে জীবনকে পঙ্গু করে তোলেনি।

ইম্ফালে এসে যখন পৌছলাম—প্রায় সন্ধ্যা। স্নানাদির পর সবে চা নিয়ে বসেছি, দেখি মিঃ নরেন কর, মিঃ অনিল নন্দী স্থানীয় জনকতক সম্ভ্রান্ত মণিপুরী ভদ্রলোক সহ ঘরে ঢুকে সহাস্য বদনে অভিবাদন জানালেন। তন্মধ্যে মিঃ খানিং, মিঃ সেনাচোবা ও নির্ব্বাসিত রাজা কুলচন্দ্রের পুত্র টিকেন্দ্রধ্বজও ছিলেন—যাঁরা আমাকে মণিপুরে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। আমিও তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করলাম কিন্তু মুস্কিল বাধল চায়ের বেলা। অন্যের ছোঁওয়া জল বা চা এঁরা খেতে পারেন না, "মাংবা" অর্থাৎ জাতিচ্যুত অপাংক্তেয় তাহলে হতে হবে। আমার অনুরোধ রক্ষা করতে না পেরে এঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আবহাওয়া হাল্কা করবার জন্যে বললাম, এখানে না হয় ছোঁয়া বাঁচিয়ে জাত বাঁচালেন কিন্তু স্বর্গে গিয়ে যদি আমি পুণ্যফলে আপনার পাশের

কামরাই পাই, খাবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বার বার আপনাদের ছুঁয়ে দিয়ে হয় উপবাসী রাখব নয় তো আপনাদের এই সযত্নরক্ষিত জাতটি অশুদ্ধ করে ছাড়ব। ম্লান হাসি হেসে তাঁরা বললেন—মিঃ বর্দ্ধন, আমরা স্বীকার করি মানুষের মনে ব্যথা দিলে তা ফিরে আসে. সবার উপরে মানুষ সত্য কিন্তু দেশের সমাজ সংস্কার মেনে আমাদের চলতে হয়. মনুষ্যত্ব স্ফুরণের জন্যই সামাজিক বিধি-বিধানের সৃষ্টি হয়েছিল. পদে পদে বাধা দেবার জন্য নয়—ধর্ম্ম ছেড়ে ধর্ম্মের খোসা নিয়েই টানাটানি করছি বুঝি তবুও······আপনার ছোঁওয়া খাবনি বলে যেন ভাববেন না আপনাকে ঘৃণা করি। আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাই করি নয় তো এখানে আসতাম না। এঁদের দুঃখ করতে দেখে আমার দুঃখ হলো, হেসে বললাম, স্বর্গে বোধ হয় সামাজিক বিধি-বিধানের অনুশাসন নেই, সেখানে একত্রে গিয়ে মনের দুঃখ মেটানো যাবে কি বলেন ?···সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। আলোচনা উপযোগী আবহাওয়ায় ফিরে এলো। আমি নাচ শিখতে এসেছি শুনে বিশেষতঃ কোলকাতা থেকে—যে কোলকাতা সম্বন্ধে এঁদের অত্যন্ত উঁচু ধারণা—তাঁরা বিস্মিত হলেন; তাঁদের দেশের নাচে যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যার আকর্ষণে মহানগরী কোলকাতা থেকেও লোক ছুটে আসবে, একথা তাদের ধারণার বাইরেই ছিল। ছোট বেলা থেকেই এঁরা, গোষ্ঠ বা রাসের নৃত্য অভ্যাস করছেন প্রায় সকলেই। দেখে আসছেন ঠাকুরঘরের সম্মুখে নাচ হয়—ছয় ঋতুতে ছয় রাস। এতো স্বাভাবিক। এর মধ্যে আবার নূতনত্বই বা কি আর বৈচিত্র্যই বা কিসের। আমাদের দেশে পূজার প্রধান অঙ্গ যেমন নৈবেদ্য তেমনি মণিপুরে পূজার প্রধান অঙ্গ কীর্ত্তন গান ও নৃত্য। নৃত্য ব্যতীত পূজা সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া রোজই তো কোথাও না কোথাও লেগেই আছে রাস, গোষ্ঠ, কীর্ত্তন। খবর পেলে আশে পাশের গাঁ থেকে লোক আসে। নিমন্ত্রণের কোন বালাই নেই। কৃত্রিম সৌজন্যকে এরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। সেই বৈশিষ্ট্যকে যে সভ্য জগৎ সানন্দে গ্রহণ করতে পারে, একথা শুনে এঁরা আনন্দিত হলেন। কথা-প্রসঙ্গে বললাম, শুনলাম আপনাদের মণিপুরী হিন্দু মহা-সভার প্রথম অধিবেশন মণিপুরে ইতিমধ্যেই হবে. সব দেশেই তো তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সরকার থেকে সাহায্য করা হয়! আপনারাও দরবার থেকে মহারাজের সাহায্য যাতে পান সে চেষ্টা করুন না। বিদেশীর মুখে নিজের দেশের সংস্কৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে এঁরা মনে মনে গর্ব্ব বোধ করছিলেন—আমার প্রস্তাবে তখনই রাজী হয়ে গেলেন এবং বহু আলোচনার পর বিদায়কালে আমাকে হিন্দুসভাতে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেলেন।

এঁদের এগিয়ে দিতে বাইরে এসে দেখি, দূরে সারি সারি আলো জ্বলছে—ছায়ার মত অস্পষ্ট অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে, একটা চাপা গমগমে আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছে। অন্ধকারের বুকে সারবাঁধা লাল আলো ও আবছা মানুষের চলাফেরা, আমার মনে কিন্তু কবেকার সেই ঠাকুরমার কাছে শুনা নিশুতি রাতে সাতবিলার পারে সেই জটেভরা প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে পরীদের মেলার কথাই মনে জাগিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, হাট বসেছে। এখানে দিনে তারা কর্ম্মব্যস্ত থাকে বলে রাতেই হাট বসে এবং হাটে সওদা কেনা-বেচা মেয়েরাই করে থাকে—পুরুষদের দেখা যায়, বিশেষ করে যুবকদের হাতে ছড়ি নিয়ে ভাল জামা-কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব কৌতূহল হল। মেয়েরাই দোকানী, মেয়েরাই খদ্দের, আশ্চর্য্য বটে—অনেকটা বর্ম্মা দেশের মত। নিজের দেশে দেখে এসেছি মেয়েরা অন্তঃপুরচারিণী। মিঃ করকে টেনে নিয়ে চললাম বাজার দেখতে।

বাঁধ নো রাস্তা সোজা চলে গেছে। রাস্তার দু'পাশে চাঁপা ফুলের গাছ—চাঁপার গন্ধে রাস্তা ভরপুর। গিয়ে দেখি, বাজার বসে গেছে—কেরোসিনের ডিবা জ্বেলে। মেয়েরাই কিনছে মেয়েরাই বেচছে—। মেয়েদের কারো খোঁপা করে চুল বাঁধা, কারো কপালের দিকে চুল ছোট করে ছাঁটা, দু'পাশে দুটো চাঁপা ফুল বাঁধা। পরনে লুঙ্গি বুক থেকে পা পর্য্যন্ত 'ফানেক' পাৎলা চাদরে দেহ আবৃত। ক্রেতা-বিক্রেতার কলরবে বাজার গমগম করছে; নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে আমি চেয়ে দেখছিলাম, ভাবছিলাম আমি যেন অতি দূর দেশ থেকে ছিটকে এসে রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি। কারো ভাষা বুঝি না—কাউকে চিনি না। সেই একঘেয়ে কলরবের মধ্যে আমার যেন কেমন একটা নেশা ধরে গেল, আমি সম্মোহিতের মত চলতে লাগলাম। সবার মুখেই সরল—মিষ্টি হাসি। মনে পড়ল ইতিহাসের সেই মোগলযুগের দুর্গের ভেতর 'জেনানা বাজারের কথা'—যেখানে হাট বসতো শুধু মেয়েদের নিয়ে। তবে এখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার আছে। হাটে জিনিস পত্র সবই সস্তা। জীবন-সংগ্রাম তাদের এখনও কঠোর হয়ে ওঠেনি। বিদেশী সভ্যতার প্রসাদে আজও এরা বিলাস-ব্যসনে কায়দা-দুরস্ত হয়ে উঠার সৌভাগ্য লাভ করেনি—অনাড়ম্বরে শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছে।

পরের দিন সকালে মিঃ কর ও মিঃ থানিংএর চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক জন বৃদ্ধ মণিপুরী ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। শুনলাম ইনি "লাই হারাউবা" নৃত্য জানেন—আমাকে শেখাতে রাজী হয়েছেন। চা-পর্ব্ব শেষ করেই নৃত্যচর্চ্চা সুরু হলো। তিনি বললেন, মণিপুরে এ নৃত্য ইদানীং অচল—মৈরাং অঞ্চলেই হয়ে থাকে। কারণ, লাই হারাউবা নৃত্য শাক্ত ও শৈবদের মধ্যে প্রচলিত. মণিপুরীরা এখন বৈষ্ণব, তাই তাদের মধ্যে এ নৃত্যের প্রচলন এখন নেই। শুধু শৈব ও শাক্তগোষ্ঠী—যারা মৈরাং অঞ্চলে বসবাস করেন তাঁরাই এ নৃত্য-পদ্ধতি রক্ষা করে আসছেন। বৎসরে সপ্তাহব্যাপী মৈরাং-এ "থাংজিন" দেবতার সম্মুখে এ নৃত্যোৎসব হয়ে থাকে এবং শেষ দিনে শোভাযাত্রা বের হয়ে বাজার অবধি যায় এবং দীর্ঘকাল নৃত্যোৎসব হয়। এ নৃত্যের রূপ, রীতি, পদ্ধতি—রাস নৃত্য এবং মণিপুরের অন্যান্য নৃত্যরূপ হতে পৃথক্ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দক্ষিণী নৃত্য—যা মান্দ্রাজ ও তাঞ্জোর অঞ্চলে প্রচলিত এবং ভরতোক্ত নাট্যশাস্ত্রে যে নৃত্যবিধি পাওয়া যায়—তৎসঙ্গে এর অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে আছি। চন্দ্র জ্যোৎস্না পড়েছে। আবছা আলোতে দূরের পাহাড় যেন নিঝুম হয়ে আসছে। ডান ধারে নাগা পল্লী; এখন নিস্তব্ধ—দুরন্ত ছেলে যেন মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। খিল খিল হাসি কানে আসতেই তাকিয়ে দেখি, ষোল সতরটি মেয়ে সার বেঁধে চলেছে। পরনে লাল হলুদ রং-বেরং-এর লুঙ্গি, গায়ে পাৎলা "ফানেক" কপালের ছোট চুলে দু'ধারে বাঁধা দু'টি করে চাঁপা কলি। গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারা। নাকটি একটু চেপ্টা, চোখগুলো

ছোট ছোট—হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে যেন উপলখণ্ড হতে উপলখণ্ড ছুটেছে নির্ঝর কলকল রবে। সারা দিনের কর্মক্লান্তির পরে চলেছে এরা রাসনৃত্য দেখতে। অবাধ মেলা-মেশাতে এখানে কারো আপত্তি নেই। এরা জানে ময়লা জমে উঠে বদ্ধ জলেই, স্রোতের জলে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এদের দৈনন্দিন জীবনে নৃত্যে, গানে বেশ যেন একটা বলি দ্বীপের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এমনি বহু কথাই না ভাবছিলাম, হঠাৎ করমশাই ঘরে ঢুকে বললেন, "সাগোল বন্দে" নৃত্যোৎসব হচ্ছে। সাইকেলে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

দিন ডুবে গেছে। চার ধারে অন্ধকার। রাস্তার দু'পাশে বাঁশ-ঝাড় বাতাসে ঝির ঝির করছে। লোকজনের চলাচল বড় নেই, কেবল রাসনৃত্য দেখতে যারা উৎসুক তারাই চলেছে। গন্তব্য স্থলে এসে পৌছলাম। নাচ তখনও সুরু হয়নি। নাটমণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। মাঝখানে যতটুকু জায়গা ফাঁকা—রাসমণ্ডল; ওখানেই নৃত্য হবে। গৃহস্বামী আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে যথারীতি অভ্যর্থনা করলেন। একটা মোড়া দেওয়া হল আমাকে বসতে; তার পর হুঁকো হাতে গলবস্ত্র হয়ে হুঁকোটি সামনে ধরলেন। বিস্মিত হলাম যখন থালায় করে পান নিয়ে এলো—থালার উপরে কলাপাতা কেটে বের-করা নানা রকমের লতা পাতা পাখী, আরও কত কি। তার কোনটার মধ্যে খয়ের, কোনটাতে সুপারী, এমনি নানা মসলা নানা জায়গায়। পানের থালায়ও এদের রুচি-রসবোধের স্বকীয়ভাব ছাপ দেখে মনে হল এরা আজও মরেনি। নিত্যকারের প্রয়োজন মিটিয়ে অবসর মুহূর্তগুলোকে এরা মনের রং লাগিয়ে তুলতে জানে। কয়েকটি মণিপুরী ছেলে এগিয়ে এলো আমার সঙ্গে আলাপ করতে। ভাঙ্গা ইংরেজীতে কেউ আমাকে প্রশ্ন করলো—মণিপুর আমার কেমন লাগছে—মণিপুরী নৃত্য আমাদের দেশের লোকের ভাল লাগবে কি না? হঠাৎ একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করে বসল, আমাদের দেশের নৃত্যের "চালির" বোল কি। প্রথমতঃ কিছুই বুঝতে পারলাম না। করমশাই বুঝিয়ে দিলেন—সবাইকে এখানে ছোট বেলায় ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক রাসনৃত্য বা গোষ্ঠ শিখতে হয় ও রাসমণ্ডলে নামতে হয়। এদের বিশ্বাস ছেলে যদি একবার কৃষ্ণ কিম্বা সখা এবং মেয়ে যদি রাধিকা বা সখী সাজে তবে শৈশবেই না কি পরকালের পথ অনেকটা এগিয়ে যায় এবং ঐহিক জীবনেও শান্তি লাভ হয়। তাই মণিপুরে সবাই অন্ততঃ "চালির" বোলটি জানে। আমি কিন্তু পড়লাম মুস্কিলে। বাংলাদেশে নাচই বা কোথায় আর "চালির" বোলই বা কি? হার মেনে ওদের শ্রদ্ধা নষ্ট করতে মন রাজী হলো না। জয়পুরী "কথক" নৃত্যের চার অওরাতদার এক বোল ওদের শুনিয়ে দিলাম, ওরা শুনে আমাকে সত্যিকারের গুণী ও নাচের দেশের লোক বলেই সানন্দে স্বীকার করে নিল।

এবার নাচ সুরু হবে; গৃহকর্তা আমার জন্য একখানা মোড়া সকলের সামনে দিয়ে গেলেন। আমি সেখানে বসতে অস্বীকার করে সকলের সঙ্গেই নীচে বসে গেলাম, ইচ্ছা ওদের মধ্যে

একজন হয়ে দেখবো। কর্তা তো ভারি খুস। সকলের কৌতুহল দৃষ্টি এসে পড়ল আমার উপর। আমার চেহারা, পরিচ্ছদ ঠিক ওদের মত নয়। মেয়েদের দিক্ হতে একটা চাপা হাসি ভেসে আসছিল। অস্ফুট শুনলাম "বাংগালী জগেশাবা"।

হঠাৎ শঙ্খ বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর সুর। এবার নাচ সুরু হল। শ্রুতিধর ধরলেন গান—"পদগতি নূপুর রুণু ঝুণু বাজে।" হাতে মন্দিরা, একটু উঁচুতে বসে—মুখে শান্ত সমাহিত ভাব। মৃদঙ্গ বেজে উঠল "থৈই থৈই তাতা খিতাতা খিনতাং"—হস্তে মুরলী, পরিধানে পীতবাস, চন্দনে চর্চ্চিত দেহ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলে প্রবেশ করলেন। শ্রুতিধর তখন গাইছেন "মুরলী অধরসরঙ্গ; চন্দনে চর্চ্চিত পীতধুতি

কর অঞ্চলে ; চন্দনধূসর শ্যামঅঙ্গ"—সুর আমাদের দেশের বেহাগের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাটিয়ালীর সুর মিশ্রণে অপূর্ব্ব এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। তার পর চলল শুধু মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য—দেখবার মত। সমস্ত কোলাহল নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্রুতিধর গাইছেন—"চলসি নবনাগরী কুঞ্জবরগামিনী।" চেয়ে দেখি দূরে রাসমণ্ডলের পথ ধরে সখীরা শ্রীরাধিকাসহ রাসমণ্ডলে আসছেন। সখীরা সংখ্যায় চব্বিশ-পঁচিশ জন। পরণে শক্ত ঝক-ঝকে ঘাঘরা—আলো পড়ে ঝিকমিক করে উঠল। মাথার চূড়ায় কেবল শ্রীরাধিকার সঙ্গে সখীদের পোষাকের বৈসাদৃশ্য। একই ভঙ্গীতে, একই পাদ-চালনায় সন্তর্পণে হেলে দুলে চব্বিশ-পঁচিশ জন যখন আসছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন সারবাঁধা সূর্য্যমুখী ফুলে লেগেছে মলয়ের পরশ—একই সঙ্গে হেলছে দুলছে তালে তালে। তার পর মণ্ডলে এসে সবাই একসঙ্গে যখন "লোংলাই" (অর্থাৎ একই স্থানে চক্কর দিয়ে ঘুরা) করে ঘুরে গেল, মনে হল যেন বসন্তের ঝরা পাতায় লেগেছে ঘূর্ণির হাওয়া। সঙ্গে সঙ্গেই যখন আবার "হানবা" ও "হায়বা" করে একসঙ্গে সবাই পাশে হেলে পড়ল, মনে হল ঝড়ের গতি মন্দীভূত হয়ে এসেছে। তার পর মৃদঙ্গে 'দশকুসী' বেজে উঠল আর সখীদের দশকুসী বোলে সমবেত নৃত্য দেখে মনে হল, বিরাট বনস্পতি যেন মাতাল ঝড়ো-হাওয়ার সঙ্গে হেলছে দুলছে—তার প্রাণেও বুঝি লেগেছে আবেশ। সখীদের অগণিত হস্ত একসঙ্গে উঠছে—একই সঙ্গে নামছে—একই তালে—একই ছন্দে। কোনটিই সারিভ্রষ্ট হচ্ছে না—যেন এক সূতায় এক সুরে বাঁধা। "থাবাক" অর্থাৎ বক্ষকম্প, 'খুজেং' মণিবন্ধের কাজ, এমন কি সবার গ্রীবাকম্প পর্য্যন্ত একই সঙ্গে হচ্ছে। মনে হয় সমষ্টির অঙ্গচালনায় যেন সৃষ্টি হয়েছে একটি নৃত্য—কোথায়ও বিচ্ছিন্নতা নেই। মনে পড়ল একদিন যখন কোলকাতায় রং-বেরংএর আলোক প্রক্ষেপ ও রূপসজ্জার মধ্যে এক বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে পশ্চিম জগতের গৌরব ও আদর্শস্থানীয়া "এনা পাভলোভা"-সম্প্রদায়ের দীর্ঘ সাধনার্জ্জিত ও বহু আয়াস-সাপেক্ষ সমবেত নৃত্যের সুশৃঙ্খলার পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছিল, সঙ্কোচে ভেবেছিলাম আমাদের দেশের নৃত্যে এমন সুশৃঙ্খলা সম্ভব নয়। কিন্তু রুটিন মাফিক মহড়া না দিয়েও মণিপুরী শিল্পীরা যে সুশৃঙ্খলার পরিচয় আজ দিল, তাতে মন গর্ব্বে আনন্দে ফুলে উঠল। বরং মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে যে লালিত্য, মাধুর্য্য, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দাবেগের যে সহজ সরল অনাড়ম্বর রূপ দেখলাম, রাশিয়ান নৃত্যে যেন তার অভাব ছিল। তাদের নৃত্যের প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে পাদক্ষেপে যেন দীর্ঘ অভ্যাসের ছাপ সমস্ত সুশৃঙ্খলাকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল, এমন কি শিল্পীর ভাবব্যঞ্জনায় যেন সেই দীর্ঘ অভ্যাসের ছাপ রেখাপাত করেছিল—আজ তা বিশেষ করে উপলব্ধি করলাম। কলাশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য না আওড়িয়ে বিলাস-ব্যসনে অজ্ঞ, সভ্য জগতে পার্ব্বত্য জাতি নামে খ্যাত মণিপুরের নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যশিল্পের যে অপূর্ব্ব নিদর্শন দিলেন সভ্য জগতের পণ্ডিত রসকলাশাস্ত্রবিদ্‌গণ বহু বর্ষব্যাপী আলোচনায় এর চেয়ে সুন্দরতর রূপসৃষ্টিতে সক্ষম হননি—অন্ততঃ এদেশে।

শ্রীকৃষ্ণ এসে ফিরে গিয়েছে—অভিমানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু তাঁর বিরহে এখন শোকাতুরা। সখীদের প্রবোধ বাক্যেও তার মন মানে না। বিরহ-বেদনায় শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সখীরা তখন শ্রুতিধরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিলাপ করে গাইছেন—"হায় কি হলো গো সখি রাধে, তোর বিষম দশা হেরি হেরি। অবলার প্রাণ ধরতে নারে, উঠ বিনোদিনি দেহ গো উত্তর" সুর বড় করুণ। প্রতিটি মূর্চ্ছনা, প্রতিটি রেশ কেঁপে কেঁপে আবহাওয়াকে যেন ব্যথাতুর করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল, এ সুরে যেন রয়েছে প্রিয়কে না পাওয়ায় মানব-মনের অশান্ত চির-ক্রন্দন। বেহাগ সুর যে এত করুণ হতে পারে তা জানতাম না। তখন মধ্যরাত্রি, চারি দিক্ আলোটাও যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাতাসে যেন সমস্ত আবহাওয়া জমাট বেঁধে গেছে। প্রায় সবার চোখেই জল! মৃদঙ্গের বোল মন্দ হয়ে আসছে ব্যথার আবেগে। মৃদঙ্গধারী দু'জন গিয়ে রাসমণ্ডলে হু হু করে কাঁদতে লাগল, কিন্তু তাতে কারো হাস্যোদ্রেক হলো না, চার পাশে তাকিয়ে দেখি সবারই মুখ বিষণ্ণ, অনেকেরই চোখে জল। বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম, অলক্ষিতে আমার চোখের কোলেও কখন্ জল এসে গেছে। সভ্য জগৎ হয়তো এ ভাবালুতায় নাসিকা-কুঞ্চন করে হাসবেন। এক সময়ে কীর্ত্তনের আসরে পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের চোখে জল দেখে আমরাও হেসেছি কিন্তু আজ বুঝলাম অনুভূতি কি? তাহা শিক্ষাভিমানের—পদমর্য্যাদার ধার ধারে না, সময়-বিশেষে অস্বাভাবিক ব্যাপারও অতি সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। মণিপুরে পল্লীগ্রামে মণিপুরীদের মধ্যে বসে যদি না এ নৃত্য আজ দেখতাম, রঙ্গমঞ্চে নানা সাজ-সজ্জার মধ্যে অনেক বার মণিপুরী নৃত্য দেখেও মণিপুরী নৃত্যের অন্তরাত্মা ও রস উৎস কোথায়, তা এমন ভাবে আমার কাছে ধরা পড়তো না।

কি করে যে একটানা দেখাব ভেতর রাত কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। হুঁস হল পাখীর ডাকে। ফিরে দেখি, পূব-আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে—শ্রুতিধর গাইছেন—"নৃত্যতি গো রাসে নন্দকুমার"।

শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করে চলেছেন—ব্যথাতুর আবহাওয়া শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের চঞ্চল চরণক্ষেপে ও মৃদঙ্গের বোল-বাণীতে যেন আবার আনন্দে ভরপুর হতে চলেছে। মৃদঙ্গ বেজে চলেছে—"ধেইন তাতা ধে, তাতা তাতাতা—খিত্তা ধে তাথি না খিন্"

শ্রুতিধর শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করে গাইছেন—"কর্ণে মকর-কুণ্ডল শোভিত—"

তন্ময় হয়ে দেখছি—সমবেত কণ্ঠের গীত কানে আসতেই তাকিয়ে দেখি, ফাগুথালা, ফুল ইত্যাদি নিয়ে সখীগণ এগিয়ে আসছেন গাইতে গাইতে "মধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে"!

নৃত্যে আগেকার সেই ব্যথার ছাপ আর নেই। প্রতি দেহ হিল্লোলে ফুটে উঠছিল ফাগুখেলার জন্য ব্যাকুল অধৈর্য্য। শান্ত সমুদ্রে যেন লেগেছে জোয়ারের ঢেউ—বেগোচ্ছল হয়ে উঠছে। বসন্ত-সমাগমে শীতের জড়তায় যেন জেগেছে প্রাণের স্পন্দন। আরও আশ্চর্য্য হলাম দেখে যে, সমবেত শুষ্ক বিষণ্ণ দর্শকমণ্ডলীতেও একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে, চোখে-মুখে সবারই যেন একটা আনন্দের দীপ্তি। বোধ হয় ভাবটা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ—যিনি শ্রীরাধিকার এত দুঃখ-ব্যথার কারণ, এবার সখীদের হাতে তার লাঞ্ছনার শেষ নেই—যেন এরই অপেক্ষায় এরা এতক্ষণ ছিল। আজীবন রাস দেখার ফলে পরিসমাপ্তিতে যে দুষ্ট চপল শ্রীকৃষ্ণ সখীদের কাছে ফাগুখেলার সময় লাঞ্ছিত হয় ও সমুচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—তা তাদের খুব জানা আছে। এদের উল্লাস দেখে আমিও তাজা হয়ে উঠলাম। মধ্যরাত্রিতে যে আমাদের সকলেরই চোখে জল ছিল মনেই রইল না।

শ্রুতিধর তখন গাইছেন—

"খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়—
অনুগত ভবত কমলিনী রাই"

জোর ফাগু উৎসব চলেছে—ফাগুখেলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে একাকী শ্রীকৃষ্ণ তখন সখীদের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ইতস্তত পরিভ্রমণে ব্যস্ত (অবশ্য নৃত্যরীতিতেই)।

সখীরা গাইছেন—

"এখন কেন পালাবে
সে দিনের কথা মনে নাই রে,
তুমি তরু-ডালে
মোরা যমুনার জলে—
সে দিনের কথা—"

মাঝে মাঝে শ্রুতিধর যোগ দিয়ে গাইছেন—

অঞ্জলি ভরি ভর পিচোরি
মারত পুনঃ পুনঃ শ্যাম-অঙ্গ ঘিরি।"

ফাগু উৎসবে মেতে উঠেছে সবাই। শ্রুতিধর, মৃদঙ্গধারী, সখীগণ এমন কি দর্শকমণ্ডলী পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় ভারি আমোদ উপভোগ করছিল—বিশেষ করে মেয়েরা। (এ ক্ষেত্রে বলা ভাল—মণিপুরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর, যৌবনের লীলাভেদ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় ছোট ছেলেই হয়তো বা কখন ছোট মেয়ে ছেলের বেশে অবতীর্ণ হয় এবং অনেক সময় শ্রীরাধিকাও সখাদের অনুপাতে শ্রীকৃষ্ণকে খুবই ছোট দেখায়)।

উৎসব খুব জোর চলেছে, মৃদঙ্গধারী প্রাণপণে বাজিয়ে চলেছে—"ধেন ধাগাধা ধেন ধাগধা-ধেন ধাগাধা ধাঘিন"। সমবেত দর্শকমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—শ্রুতিধর গাইতে সুরু করলেন—

"মধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে
ব্রজবনিতা ফাগু দেয় শ্যাম-অঙ্গে।"

উৎসব শেষ হয়ে গেল। গৃহকর্তা সখী, শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ, রাসধারী, শ্রুতিধর, মৃদঙ্গধারী ও অন্যান্য শিল্পীদের একখানা করে কাপড় উপহার দিলেন। আগত ভিন-গাঁয়ের "ওঝা" অর্থাৎ ওস্তাদ ও দলের ওস্তাদ, মৃদঙ্গবাদক পরস্পর প্রণাম করে অভিবাদন জানালেন। পাশে তাকিয়ে দেখি, ছোট ও বড় মেয়েদের অনেকেই সখীদের হাতে পান-গুয়া গুঁজে দিচ্ছে। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে মনের আবেগ জানাবার ও প্রশংসা জ্ঞাপনের রীতি দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাদের সভ্য জগতের রীতি-ব্যবহারের সঙ্গে মনে মনে সমালোচনা করছি—করস্পর্শে ফিরে দেখি মিঃ কর। তিনি বললেন, চলুন এবার যাওয়া যাক। সাইকেল ঠেলে চলতে চলতে সারা রাস্তা নাচের আলোচনায় এত মজে ছিলাম যে, কখন আস্তানায় এসে গেলাম, জানতেই পারিনি। আশ্চর্য হবার অবসর না দিয়েই আমার মণিপুরী ভৃত্য ইবম্ মোচা দূর থেকে দেখে এক গাল হেসে বলল—চা একদম রেডি। মিঃ করকে নিয়ে চা-পর্বে বসে গেলাম।

রাসনৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। এমন নাচ আর হয় না। ওস্তাদ বললেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধিকাসহ সখীদের নিয়ে এ নৃত্য করতেন। অবশ্য সব দেশের ওস্তাদগণই তাদের নিজ নিজ পদ্ধতির প্রবর্তক ও প্রথম প্রচারক হিসাবে ভগবানকে টেনে তাদের নৃত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন। "কথক" শিল্পীরাও তাই বলেন। এমন কি, শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রথম প্রচারক হিসাবে—অভিনয়-দর্পণের চতুর্থ শ্লোকে উল্লিখিত আছে, চতুর্মুখ ভরতকে নাট্যবেদ প্রদান করেন এবং স্বয়ং হর ভরতকে তণ্ডুকে দিয়ে তাণ্ডব এবং পার্বতী দ্বারা লাস্য নৃত্যশিক্ষা প্রদান করেছিলেন—নাট্য, নৃত্ত, নৃত্য প্রয়োগের ইহাই ইতিহাস।

আমার কিন্তু মনে হল, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের নব রস পরিপূর্ণ ভাবে মণিপুরী নৃত্যে বিকাশ লাভ করতে পারেনি—তা হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, মণিপুরী রাস-নৃত্যের রীতি রূপবন্ধের স্রষ্টা শিল্পিগণ বৈষ্ণব ছিলেন, তাই তাঁদের নৃত্যে পাওয়া যায় বৈষ্ণব-মনের শান্ত ছাপ—শান্ত, করুণ রসই রাসের আঙ্গিক অভিনয়ে ও অঙ্গচালনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে প্রভেদ ঘটবার কারণ—দক্ষিণী নৃত্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশে হওয়ায় দক্ষিণী নৃত্যে বীর, রৌদ্র, বীভৎস ও অন্যান্য রস স্ফুরণ অধিক ঘটেছে। শৈব ও শাক্ত-মনের রৌদ্ররসের ছাপ নটরাজের পরিকল্পনা, তাণ্ডবের নৃত্যরূপই সে দেশের শিল্পীর মধ্যে লীলায়িত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রোক্ত করণ, অঙ্গহার, চারী, উৎপ্লাবন, মণ্ডল, স্থানক ইত্যাদির মধ্যে যেগুলি শান্ত ও করুণরস-ব্যঞ্জনার উপযোগী মণিপুরী রাস-নৃত্যে সেগুলিই গৃহীত হয়েছে—দেখলাম, তাও অন্য নামে। কিছু যে অদল বদল হয়নি তাও নয়। নাট্যশাস্ত্রোক্ত আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যাবর্তিত, পরিবর্তিত এই চারি কর-করণের প্রয়োগ মণিপুরের নৃত্যেও হয়েছে চালির বোলে "খিতা ধিনতা ধিন তেইন তা" তবে কর-করণেও মণিপুরের অভিনবত্ব রয়েছে। গ্রীবাকম্পের সংযোগে এই বিশেষ রূপবন্ধটি অধিকতর লালিত্য ও মাধুর্য্যব্যঞ্জক এবং শান্তরস-প্রধান হয়েছে।

শাস্ত্রীয় 'চারী' বিভিন্ন গতির প্রয়োগ অল্পবিস্তর সব দেশেই আছে কিন্তু প্রয়োগ-রীতি বিভিন্ন ও বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক, যেমন গজলীলাগতি সুদূর সিংহল দেশের কাণ্ডী-নৃত্যে দেখেছি—"তা নাং তাম দেনা তাম দ-না নাং তাম দেনা তাম দ" এই বোলের সঙ্গে। তৎসঙ্গে ভেসে আসা গান—"ছাং ছিয়ে গেণেকী, এক পোকুনকী, ছিও মালেকী ছিও মাল পেতেকী"। উপরোক্ত গান ও বোলের ছন্দের দোলনের সঙ্গে গজগমনের দোল চমৎকাররূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই গজগমন আবার 'কথক'-নৃত্যের শিল্পীদের রসবোধে রূপায়িত হয়েছে অন্য ভাবে, যেখানে দোলার চেয়ে কসরৎ ফুটে উঠছে অধিক। "গজগতি" ইঙ্গিত থাকলেও গজপরণই শিল্পীর মন অধিকতর আকৃষ্ট করেছে। গজগমনের যে দেহ-হিল্লোল তার ব্যঞ্জনা দেহরেখায় না ফুটিয়ে 'কথক'-শিল্পী হঠাৎ গজপরণ "তাও থুঙ্গা তাকিটী থুঙ্গা তাকিটী তাক্ ধাকিটী দগদগ থুঙ্গাত' ইত্যাদি বোলের সঙ্গে এক নিমেষে পাদকম্পে মাটিতে হস্তীর এক চিত্র অঙ্কিত করে। চতুষ্পার্শ্বে গর্বিত দৃষ্টিতে শিল্পী একবার চেয়ে নিলেন। তখনও হয়তো দর্শক-মণ্ডলীর অনেকের নিকটেই হাতীর রূপটি দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। তৎপরে শিল্পী নিজে তর্জনী সঞ্চালনে হস্তীর চারিটি পা, লেজ, শুঁড় যখন দেখিয়ে দিলেন—হাতীর রূপের কতকটা জনসাধারণের মধ্যে বোধগম্য হল। অবশ্য এতে কসরৎ ও রেয়াজের পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু হস্তীর এ অস্পষ্ট রূপের আড়ালে যে হস্তীর দেহ-হিল্লোলের আসল রূপটি চাপা পড়ে রইল শিল্পীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। গজগতি বলতে গজপরণ ও সমে আসাটাই সব তাঁর কাছে। তিনি হয়তো সগর্বে

তখন বুঝিয়ে চলেছেন—কবে, কোথায় কোন্ দরবারে কাগুর উপর হুবহু হস্তিপদ অঙ্কিত করে কত পেতো। তোড়া উপহার পেয়েছেন। মণিপুরে কিন্তু গজগমনের যে দেহ-ভঙ্গিমা দেখলাম তাতে হস্তিপদ চিত্রিত করার কোন প্রয়াসই ছিল না। দেহ জুড়ে ছিল শুধু হস্তীর দেহহিল্লোলের মীড় ও আমেজটুকুই—

মণিপুরের রাসনৃত্য দেহের মধ্যে সংযমকে পূর্ণ, কিন্তু আবার লাইহারাউবা ও খাম্বা থয়বীর (আদি নৃত্য) রূপরীতি ভিন্ন প্রকারের রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রসের, দেহবেগই অধিক। রূপকর্ম, রূপবন্ধ সম্পর্কে তারা অতি সচেতন। প্রত্যেক রাসে (মহারাস, কুঞ্জরাস, নিত্যরাস, বসন্তরাস ইত্যাদি, নানা প্রকার রূপবন্ধের বিধি-বিধান রয়েছে। কোন রাসে ভঙ্গি পরে বৃন্দা নৃত্য করে ও খুরম পরে; আবার কোন রাসে খুরম পরে নিষিদ্ধ ইত্যাদি অনেক প্রকার বৈচিত্র্যই রয়েছে।

সভ্যদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন সুদূর পাহাড়ের নিভৃত কোণে প্রকৃতির সন্তান এই মণিপুরীরা তাদের অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অবসর-মুহূর্ত্তগুলিকে মনের রঙে রাঙিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে যে রূপরসের সৃষ্টি করেছে দেখলে নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অপূর্ব্ব দেশ এই মণিপুর।

রাত্রি জাগরণের অবসাদে শরীর অবসন্ন হলেও কিন্তু নৃত্যভঙ্গী ও কীর্ত্তনের সুর এখনও মনে ভাসছে। মনে পড়ল ওস্তাদের কথা—পূর্ব্বজন্মের সাধনা চাই, তবে শ্রদ্ধা জন্মে, কৃষ্ণনামে রস মিলে। চাই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ও কাতর প্রাণে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা ও ধৈর্য্য। কিন্তু এবার এখানে কেন জানি না আমার প্রতিবাদ বা তর্ক করার ইচ্ছা হয়নি। সরল বিশ্বাসের কাছে আমার শিক্ষাভিমান যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অভিমানে, ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে বিদেশীর অনুকরণে কৃষ্ণের লোকলীলা, অবতার, জন্ম, অসুর-সংহার, চৌর্য্য, মৃদ্‌ভক্ষণ, গোপী-রাসলীলা প্রসঙ্গে কথা উঠলেই উপরোক্ত লীলা সমূহের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব না জেনে অন্তর থেকে শুধু বস্ত্রহরণ ও শৃঙ্গাররসাত্মক রাসলীলায় গোপিনীসহ বিহার-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের অশ্লীল ইঙ্গিত করে মুখ টিপে হাসি। কিন্তু উপরোক্ত লীলারূপকে ভাবতেন না যে ঋষি শিল্পী আধ্যাত্মিক জগতের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সমূহ সাধারণ মানুষের মনে গ্রাহ্য করে যে কিরূপে সহজ ভাবে রূপায়িত করেছিলেন তা বুঝবার অবহিত হবার কোন প্রয়াস নেই। বিদেশীর মত আমাদের দৃষ্টি আজ বহির্মুখী হয়েছে, ফলে দৃষ্টি কৃষ্ণলীলার উপরের আবরণে আবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তিরূপা বাঁশী—যা অনাদি কাল হতে অনুরণিত হয়ে চলেছে জীবের স্বাভাবিক আনন্দলিপ্সা জাগাতে—সে সুর আমাদের অন্তরে গিয়ে আজ পৌঁছায় না। শুদ্ধ চৈতন্য, আজ ভোগলিপ্স দেহেন্দ্রিয়ে ঢাকা, আকর্ষণী সুর আর আমাদের আকর্ষণ করে না। ব্রজের গোপিনীগণ এ মোহন বাঁশরূপে অলৌকিক—বাঁশীর মোহন সুর শুনতে কুল ছেড়ে ছুটেছিল—যমুনায় উজান বয়েছিল।

শ্রুতি বলেন, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ।

মহাভারতে আছে—"কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ"

"কৃষ" সত্তাবাচক শব্দ এবং মূর্দ্ধণ্য "ণ" পরমানন্দবাচক শব্দ। কৃষ ও মূর্দ্ধণ্য "ণ" মিলনে কৃষ্ণ শব্দ সম্পন্ন হয়েছে। সত্য ও পরমানন্দের মিলনের নাম কৃষ্ণ অর্থাৎ যাহাতে পরমানন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেই বস্তুই কৃষ্ণ। যাহা তত্ত্বে পরমানন্দ মাত্র, লীলায় তাহাই ঘনীভূত বিগ্রহ এবং যাহা বেদে ব্রহ্ম, তাহাই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ গোপীগণের মন আকর্ষণ করবার জন্য বাঁশী বাজালেন ও রাস-মণ্ডলে নৃত্য করলেন।

সংস্কারবদ্ধ এ বৃদ্ধ ওস্তাদের ভক্তিকে অন্ধভক্তি বলতেও আমার বাধল। রাসনৃত্য আমরা করি কিন্তু রাসলীলা-তত্ত্বের ধার ধারি না, নৃত্যে তেহাই, তোড়া ও দর্শকের হাততালির কথাই ভাবি—ফলে নৃত্য হয় প্রাণহীন। রম্য কলা-জগতে এ নৃত্যই কিন্তু বিশেষ স্থান অধিকার করে, এ নৃত্যই হয় সমাদৃত।

রম্য কলা-জগতে মণিপুরী নৃত্যের স্থান কোথায় যদি প্রশ্ন উঠে—উত্তর দেওয়া খুব সহজ হবে না। এ নৃত্যে উত্তর-ভারতীয় "কথক"-নৃত্যের ন্যায় বিভিন্ন তাল-লয়-বাট-ছন্দের বৈচিত্র্য নেই। "কথাকলি" নৃত্য বা দক্ষিণী নৃত্যের মত অঙ্গহারে, করণে, অভিনয়ে, পাদকর্ম্মে ততটা সমৃদ্ধ নয়—কিন্তু তবু চমৎকার অতি সুন্দর মণিপুরী নৃত্যের রীতি-রূপবন্ধ। প্রাচীন ভারতের নৃত্য ব্যাকরণের রীতি রূপবন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ না থাকলেও মণিপুরী নৃত্যে যে মন রসাপ্লুত হয়, আনন্দের সৃষ্টি হয়—একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কেহ বলেন, ললিতকলার ধর্ম্ম হচ্ছে—রেখা, বর্ণ, ধ্বনি ও অঙ্গচালনার ব্যঞ্জনায় মানবের ভাবোত্তমকে বাহ্যজগতে রূপায়িত করে রস সৃষ্টি করা। কেহ বলেন, সঙ্কীর্ণতার উপরে ভূমার সংস্পর্শে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে ললিতকলার কাজ। কারো মতে ললিতকলা হচ্ছে, স্রষ্টার অনুভূতিকে রসাপ্লুত করে দ্রষ্টার মনে সংক্রামিত করার উপায় মাত্র।

মণিপুরী নৃত্যে অঙ্গচালনায় বিভিন্ন ব্যঞ্জনার মাধুর্য্যও আছে। নৃত্যে মণিপুরবাসীর ধর্ম্মানুশীলনও দেখলাম। ভূমার সংস্পর্শে না নিয়ে গেলেও রসাপ্লুত নৃত্য যে এদের মনে ধর্ম্ম-প্রবণতা জাগায় এবং মনকে অন্তর্মুখী করে এ কথাও ঠিক। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার নৃত্যলীলাব্যঞ্জনার অন্তর্নিহিত রস দর্শকমণ্ডলীতে সংক্রামিত হয়। তাদের নৃত্যকলা অন্য প্রদেশের নৃত্যরীতি রূপবন্ধের অনুকরণ নয়। রূপবন্ধ মণিপুরের শিল্পীর স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নৃত্যবিষয়বস্তু সেই সম্প্রদায়বিশেষের রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। ধর্ম্মকে ভিত্তি করে তাতে আছে সার্ব্বজনীন আবেদন। সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে কষ্টসাধ্য ভঙ্গিতে অতর্কিতে মনে উত্তেজনা জানাবার প্রচেষ্টা নেই। রম্য কলা-জগতে মণিপুরী নৃত্যকে বিশেষ স্থান দিলে সমালোচকের সমালোচনা পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হবে না। মণিপুরী নৃত্য শান্তিপ্রিয় ভক্তিনম্র মণিপুরী কেবল শিল্পীর শান্ত-সমাহিত চিত্তের সৌন্দর্য্যবিকাশ মাত্র। অন্য প্রদেশের সঙ্গে তাদের নৃত্যের তারতম্যের হেতু তাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন। যদিও এ নৃত্য প্রাচীন নৃত্য শাস্ত্রকেই ভিত্তি করে সংগঠিত হয়েছে।

মার্কিণ বনাম সোভিয়েট—

লণ্ডনের 'অবজার্ভার' পত্রের চীনা সংবাদদাতা মাঞ্চুরিয়া ঘুরে সব অবস্থা বুঝে অভিমত দিয়েছেন যে, হয় আমেরিকা চীন থেকে সম্পূর্ণ সরে যাক, না হয় সে চীনকে ভাল করেই সাহায্য করুক। মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের যে ২০ ডিভিসন সৈন্য কমুনিষ্টদের সঙ্গে লড়াই করছে তারা মার্কিণ হাতিয়ারে সজ্জিত! উত্তর চীনে এখনও সওয়া তিন লক্ষ জাপ সৈন্য (ইয়োলো নদীর তট থেকে মহাপ্রাচীর পর্য্যন্ত স্থানে) আছে। এদের মাত্র প্রায় ৫০ হাজারের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এ অঞ্চলে কুওমিনতাংএর প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য ছাড়া ৫০ হাজার মার্কিণ সৈন্যও আছে। কাজেই অবস্থা খুব ভাল নয়। যদি জাপানীদের সম্পূর্ণ হাতিয়ার হীন করে উত্তর চীন থেকে হটিয়ে দেওয়া না নয়, তা হ'লে সামরিক ভাবে না হোক—ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয়ে অন্তত: তারা প্রবল হয়ে উঠবে। গত ৪ বছর আমেরিকা চীনে অনেক দাদন করে আজ সেখানে ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের পত্তন গাড়তে পেরেছে। কিন্তু আমেরিকানরা মনে করেছে যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে যে চিয়াং কাইশেকের সরকারকে তারা সমর্থন করেছে, সে সরকার আজ তাদের দিকে টেনে কাজ করবে। এই জন্যই "America who, of all nations at present has the most influence and power in China urges and aids the Southern forces to make a large scale war on their brothers in the North."

এ-সব দেখে-শুনে প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক লুই ফিশার বলছেন, মাঞ্চুরিয়ায় যা ঘটছে তার ফলে স্থির হয়ে যাবে, আমেরিকার সঙ্গে রুশিয়ার সম্পর্ক কি দাঁড়াবে।

মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বৈশিষ্ট্য কি রুশিয়া ভাল করেই জানে। মাঞ্চুরিয়া জার্ম্মাণীর চাইতেও বড়। জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। জাপান ওখানে শ্রমশিল্পের ও যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি করেছিল। সম্প্রতি সোভিয়েট সরকার মাঞ্চুরিয়ার দুই বড় রেলপথ ও দুই বড় ও প্রধান বন্দরের অধিকার সংগ্রহ করেছে। ১৯১৭ সালে রুশিয়া থেকে প্রায় ১ লক্ষ রুশ মাঞ্চুরিয়াতে পালিয়ে গেছল, গত নভেম্বরে সোভিয়েট সরকার তাদের সোভিয়েট প্রজাধিকার দিয়েছে। এরাই মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট প্রভাবের পত্তন করবে। ও দিকে চীনা কমুনিষ্টরাও মাঞ্চুরিয়া চিয়াং কাইশেকের কবলমুক্ত করতে চেষ্টা করছে।

মার্কিণ ক্রুসলানি—

মাত্র রুশিয়ার দোষ দিলে হবে কেন? চীনে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারল প্যাট্রিক হার্লে কাজে ইস্তাফা দিবার সময় স্পষ্ট করেই বলেছেন—

"Professional foreign service men sided with the Chinese Communist party and the imperialist block of nations whose policy was to keep China divided against herself"...

"The same professionals openly advised the Communist armed party to decline unification of the Chinese Communist Army with the National Army unless the Chinese Communists are given control"

নরম-গরম—

পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রত্যক্ষ সোভিয়েট করপ্রসারের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ জাতরা স্থানীয় জাত ও দল-গুলোর মধ্যে ভেদ বাধাবার চেষ্টা যেমন করছে, তেমনি এশিয়ার আরও কতকগুলো দেশে—একটু আপোষের মনোভাবও বাহিরে দেখাতে চেষ্টা করছে। এ সব দেশেও জাতীয় উত্থান প্রবল, কিন্তু ওরা এক দিকে যেমন গুলী চালাচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি মিতালীর কর প্রসারণ করছে। এনাম দুর্ব্বল। বিদ্রোহীদের আপাত-দৃষ্টিতে কাবু করে ফরাসীরা মিতালীর সুর শোনাচ্ছে। শ্যামে জনসাধারণ চায় প্রজাতন্ত্র। বর্ম্মার দশা ভারতের চাইতেও বোধ হয় খারাপ।

ইন্দোনেশিয়ায়—বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ মোটেই করেনি। ওলন্দাজ প্রভুরা বলছে—ঔপনিবেশিক অধিকার নিয়ে তুষ্ট থাক। ওরা বলছে—ছোঃ। ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ "জয় ভায়ায়" লিখা আছে—৮শ' বছর আগের হিন্দু সাম্রাজ্যের পতনের পর একদিন সাদা মানুষ ওখানে আসবে (১৫৯৫ খৃঃ)! তারা অনেক বছর দ্বীপ শাসন করবে। তার পর তিন বছর এক পীত মানুষ (জাপান) শাসন করবে। তার পর দেশ হবে জনসাধারণের। এ স্বপ্নের প্রেরণায় আজ ইন্দোনেশিয়ার যে দেশভক্তরা মেতেছে, তারা এঁটো-কাঁটায় খুশী হবে কেন?

যবদ্বীপ থেকে স্বাধীনতার হাওয়া সুমাত্রায় প্রসারিত হচ্ছে!

এসব অঞ্চলে ইংরেজের মতলব সম্বন্ধে মার্কিণ সিনেটর জোশেফ ও' মাহোনি স্পষ্ট বলেছেন—"The British...have gone so far as to organise Japanese mercenaries to carry on a war, the object of which is to maintain the system of imperialistic exploitation of Asia"

জানি না কি হবে!—

তিন জাত—আমেরিকা রুশিয়া আর বৃটেন আজ ঘরের মাতন শেষ করে এশিয়ায় জাত গুলোকে লুটবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। জানি না কে জিতবে। জানি না এসব সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান হবে কি না। জানি না বিশ্ব ভ্রাতৃতন্ত্র কোনও কালে বাস্তব হবে কি না। এটলি চায়, 'এটম বোমা'। আমেরিকা বলে, দেব না। রুশিয়া বলে, দেখে নেব। তার মানে, জার্ম্মানী জাপান ধ্বংস করে এরা এশিয়ার শবের উপর এই ছিন্নমস্তার তাণ্ডব নাচতে চায়। বিশ্বের ত্রিমূর্ত্তি নাকি ভাবেই সমাধান করতে চায় বিশ্ব-সমস্যার। কিন্তু—

"There is no solution of the China problem or of other grave problems which trouble the relations between America, England and Russia, unless all the three of them renounce their expansion and imperialism. The end of empires would pave the way to the world federal government. Then and then only the world have peace. Then and they only will the atomic bomb or worse instruments of death and destruction cease to terrorize humanity."—(Louis Fischer)

বাঁধ

প্রাণগোবিন্দপুরে সমুদ্দুর উঠে আসছে! পিঙ্গল ঘোলাটে সমুদ্দুর। আসমান-ছোঁওয়া প্রকাণ্ড আলিসান ঢেউ গ্যাঁজলা কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে জনপদের দিকে।

একশ কাণ্ডি বামাক্ষ্যাপার মাঠখানা এক-ছুটে দৌড়ে গিয়ে যেখানে বাগানের সীমানায় তালগাছের বুড়ী ছুঁয়েছে, সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে ডাইনে একেবারে বিশালাক্ষী নদীর ব্রীজ পর্যন্ত—গোটা পূব দিকের আকাশটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে আসছে ঘোলা জলের হিমালয়।

দেখতে না দেখতে তিন-জলার মাঠটা ডুবে গেল। দূরে নলখাগড়া বনের ধারে বাজ পড়া নারকেল গাছটা দু' একবার ফৎনার মত চকিতে ভেসে উঠল দু' চোখের সামনে। ব্যস্, তার পরই আর কোথাও কিছু নেই। বড়বাগের মাথাটা লাফ মেরে টপকে লম্ব-ময়ালের ফোঁস ফোঁসানি মুখে ক'রে জলোচ্ছ্বাস ছুটলো আরও পূবে—সেরপুর মৌজার দিকে।

মহাপ্রলয়ের দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে উঠেছে যশোদার আধবোজা ঘুমন্ত লাল চোখে। সঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে পাঁজরার কাছটায় কষ্টিপাথরের মত কালো এক ফালি পেশী থেকে থেকে ভুড়কি তুলছে। আর দাঁত-চেপা মুখ দিয়ে ছুঁচের মত ধারালো এমন একটা বিশ্রী শব্দ বেরুচ্ছে, যেন সব সময় গায়ে বিঁধছে। বিঁধছে আর মনে হচ্ছে ম'রে যাবে। দম আটকে হাঁপিয়ে ম'রে যাবে যশোদা।

পাশেই ঘুমুচ্ছিল. ঠিক ঘুমুচ্ছিল বলা যায় না, শুয়ে ছিল যজ্ঞেশ্বর। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল আর ঠ্যাং নাচাচ্ছিল বেতালা। ধাক্কা মারলে বউকে—এই ভাল হ'য়ে শো, কাত ফের, হেই!

হুঁস নেই যশোদার। সেরপুর মৌজাটাকে পাক দিয়ে বেড়ে উচ্ছল জলরাশি তখন অতিকায় একটা সরীসৃপের মত ডঙ্ক তুলে হুহুঙ্কারে এগিয়ে আসছে যজ্ঞেশ্বরের দোচালাটার দিকে। প্রাণ ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে যশোদার সারা অঙ্গ! বুকের ওপর হাঁটু-গেড়ে ব'সে দুঃস্বপ্নের ভূত টুঁটি

জ্বালালে তো দেখছি; অতিষ্ঠ হ'য়ে টপকে উঠে বসে যজ্ঞেশ্বর। ঘামে-ভেজা আদুড় পিঠে ঠেলা মেরে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ সমঝে যায়। যশোদার মুখ কিংবা নাকের কোন একটা ছেঁদা দিয়ে বাহারী একটা সরু সুর অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে মীড় খেয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যশোদা গান করে না কি! বেশ কৌতুক লাগে যজ্ঞেশ্বরের। এক-গাল হাসি মুখে নিয়ে যশোদার পাশে জাবড়ে বসে যজ্ঞেশ্বর। তার পর কান তারিয়ে ডান হাতের তর্জনীতে ভুতুড়ে সুরের সাপ খেলায়। সর্পিল সুর আঙুলের ডগায় মোচড় খেয়ে ভেঙ্গে পড়তেই যজ্ঞেশ্বর ঠোঁটের মুখে তাল দিয়ে ব'লে চলে—এই, এই, এই। তাল-ফাঁকের মাঝামাঝি জায়গাটায় যজ্ঞেশ্বরের নেড়া মাথাটা লাট খেয়ে ঝটকা মেরে ওঠে বার বার।

মনোহর দাসের আটচালা টপকে কালো জল ততক্ষণে লাফিয়ে এসে উঠেছে যজ্ঞেশ্বরের চারা নারকেল গাছটার মাথায়। গেল বুঝি এইবার যজ্ঞেশ্বরের দোচালাখানা। জ'লো বাতাসের দমকা ঝাপটা লেগে সকল'কে দাঁড় ডগাগুলো সব ভ'য়ে মাথা কোটাকুটি আরম্ভ ক'রেছে মাচার ওপর। যশোদার ঠোঁট দুখানাও নীল হ'য়ে ফুলে ফুলে উঠছে আতঙ্কে। বড় বড় ঢেউগুলো যেন ওর বুকে ভাঙতে ভাঙতে মিলিয়ে যাচ্ছে সারা দেহে। নাক দিয়ে এখন আর সেই মিহি সুরটা বেরুচ্ছে না। মৃত্যুভয় এখন দু' হাঁটু-গেড়ে চেপে বসেছে ওর কণ্ঠায়। আঁই···উঃ···ক'রে গোঙাচ্ছে যশোদা চাপা গলায়।

জ্বর এলো না কি কাঁপিয়ে যশোদার আবার এত রাতে—'ম্যালেরিয়া' জ্বর। আস্তে আস্তে কপালে হাত দিয়ে দেখে—না, কপাল ঠাণ্ডা। জ্বর এলে তো খই ফুটবে কপালে তাতে! তবে! ঠিক ঠাহর ক'রতে পারে না যজ্ঞেশ্বর। একবার ভাবে, যদি ম'রে যায় যশোদা, যজ্ঞেশ্বরের প্রাণটা টন্ টন্ ক'রে ওঠে এই কথা ভেবে। এই ধরণের খারাপ কথা ভাবাই বা কেন আর কষ্ট পাওয়াই বা কেন, তার কোন কারণ খুঁজে পায় না যজ্ঞেশ্বর। বোকার মত হাঁটুতে থুঁত্‌নি ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ আপন মনেই অন্ধকারে চোখ তারা তারা করে বসে থাকে। তার পর এক অসতর্ক-মুহূর্ত্তে মালাই চাকি থেকে থুত্‌নিটা সরে গিয়ে একটা ঝুল খেতেই সমঝে যায় যজ্ঞেশ্বর,

বিজন ভট্টাচার্য্য

কেন, মরবে কেন যশোদা খামখা! বিব্রত বোধ করে যজ্ঞেশ্বর মনে প্রাণে। এ সব দুশ্চিন্তা মনে আসার কি কোন মানে হয়? অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে উঠে যজ্ঞেশ্বর নিজেই নিজের গালের ওপর গোটা চারেক চড় মারে। ডান হাতের কড়া-পড়া দুটো আঙুল দিয়ে দাবনার ওপর কষে কষে গোটা কয়েক রামচিমটি কাটে। তার পর বাঁ পায়ের হোঁচট-খাওয়া ওল্টানো বুড়ো নখটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে অনর্থক কষ্ট পায়।

... ওল্টানো নখে ছোঁওয়ার তর সয় না। চলতে

ফিরতে একটু লাগলেই মাথায় যেন বিজুলির চাবুক মারে। এমনি যন্ত্রণা। যজ্ঞেশ্বর অতঃপর নিজেকে ধিক্কার দেয়। সামান্য একটি স্ত্রীলোকের জীবনের তুচ্ছতম সাধ-আহ্লাদ মিটোতে গিয়ে যেখানে যেখানে তার পৌরুষ নির্লজ্জের মত অক্ষমতার দোহাই পেড়েছে, সেই সব পরাজয়ের কথা রসিয়ে রসিয়ে স্মরণ করে যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর ভাবে, কাজ কি মিছে এ জীবনে।

ঘা-খাওয়া কেউটের সমুদ্ধত ফণার মত লোনা জলের ডঙ্ক এবার অনিবার্য্য ভাবে লাফিয়ে এসে পড়ার কথা যশোদার মাথার ওপর। মুখটেপা গোঙানির শব্দে এবার আর কোন ছেদ নেই। উঁচু বুকটার মাঝখান দিয়ে ফাটিয়ে এবার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাবেই। যজ্ঞেশ্বরের শরীরটাও কাঁপছে ঐ সঙ্গে। সব চাইতে বীভৎস লাগছে গলার ভেতরে ঐ ঘর্ ঘর্ শব্দটা। হাড়ে হাড়ে চেনে যজ্ঞেশ্বর এই শব্দটাকে। মাত্র ছ'মাস আগে বর্ষামুখর এক বাদলা-রাতের মাঝামাঝি পাঁচ বছরের ছেলে হরিহরের গলায়ও যজ্ঞেশ্বর ঠিক এমনিতরো শব্দ শুনেছিল। শত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি যজ্ঞেশ্বর হরিহরকে। ঘড়ঘড়ি উঠলে মানুষ না-কি আর বাঁচে না।

হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে যায় যজ্ঞেশ্বরের। সমস্ত শরীরটা পাকিয়ে স্নায়ুতে চাড় দিয়ে রুখে ওঠে প্রতিরোধের একটা বজ্রমুঠ। যজ্ঞেশ্বরের চোখের শাণিত দৃষ্টি ঠিকরে পড়ে যশোদার গলার ওপর। কিছু দেখা যায় না। যজ্ঞেশ্বরের কাণে আসে শুধু একটা চাপা ঘর্ ঘর্ শব্দ—যশোদার গলার কালো চামড়ার গহীনে কাছিমের মত নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মরণ বিজগুড়ি কেটে চলেছে। যজ্ঞেশ্বর যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, মসৃণ কালো কঠার কাছে কুট তুলতে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছে মরণ বুকের দিকটায়। যশোদা এইবার মরে যাচ্ছে।

চোখের পলকে যজ্ঞেশ্বরের হস্তে থাবাটা ক্যাঁক্ করে চেপে বসে যশোদার নরম গলার ওপর। লোহার মত শক্ত আঙুলগুলো ঘাড়ে গর্দানে পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করে দেয় যশোদার।

এতক্ষণে জলোচ্ছ্বাসটা বজ্রের মত ভেঙ্গে পড়ল যশোদার মাথার ওপর। মাত্র একবার মনে হলো যশোদার স্বামী যজ্ঞেশ্বরের কথা। বিশাল জলরাশির মাঝখানে লাউমাচা-সমেত বিধ্বস্ত দোচালা-খানা একবার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে চকিতে ভেসে উঠেই পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল। সামনে পেছনে মাথার ওপরে শুধু জল আর জল—ঢেউগুলো যেন সব হাজার হাজার অতিকায় শ্বাপদের মত দন্তুর আক্রোশে ফুসে বেড়াচ্ছে আসমান-জমিন ব্যবধানের মাঝখানে।

নাকে মুখে জল ঢুকে দম পাচ্ছে না কিছুতেই যশোদা। যজ্ঞেশ্বরের নিষ্ঠুর পাঞ্জার চাপ লৌহ-কঠিন। সমস্ত শরীরটা তবতাজা মাছের মত লাফাচ্ছে যশোদার মাটির ওপর। নখে দাঁতে পায়ে হিংস্র পাল্টা আঘাত করে চ'লেছে যশোদা যজ্ঞেশ্বরের শরীরে। যজ্ঞেশ্বরও তুখন্দ হয়ে উঠেছে। ডান হাতের পাঁচ আঙুলে টুঁটি টিপে ধরে যজ্ঞেশ্বর বাঁ হাতের আঙুলটা দৃকপাত না করে চালিয়ে দিয়েছে একেবারে যশোদার আলটাকরার কাছাকাছি। যজ্ঞেশ্বর জানে, কাছিমের মত ঝিমিয়ে আছে মরণ স্বরঝিল্লীর কোন একটা দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরালে।

কয়েকটা চঞ্চল মুহূর্ত্ত মাত্র। যশোদার জোড় পায়ের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যজ্ঞেশ্বর ঘর থেকে বারান্দায়। জোরেই লেগেছে চোটটা। খুঁটির গায়ে মাথাটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম্ ধরে থাকে যজ্ঞেশ্বর। যশোদাও মনে হয় সামলে নিয়েছে কিছুটা ইতিমধ্যে। ডুবতে ডুবতে যেন সে বেঁচে গেছে কোন মতে। স্বপ্নের ঘোর তখনও সবটা কাটেনি। ঘোলা জলের সমুদ্দুর তখন যশোদার স্নায়ুতে গোঙাতে গোঙাতে পিছু হটছে।

গেলে কুথায় গো: অন্ধকারে খেজুরপাটির ওপর এলোপাথাড়ি হাতড়ে অস্ফুটে আর্ত্তনাদ করে ওঠে যশোদা।

যজ্ঞেশ্বরও ততক্ষণে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বলে আমাক্ নি ডাকিস্।

—হে গো, সমুদ্দুর। দ্যাখ নি, ঘর বাড়ী বুঝি ভাসাইল বানে।

বান ?—লাফ মেরে ওঠে যজ্ঞেশ্বর।

রাত্তিরেও খাদ থেকে মাটি কেটে বাঁধ বেঁধে এসেছে যজ্ঞেশ্বর। পায়ের তলাকার ভিজে কাদা তখনও ভাল করে শুকোয় নি।

শব্দ নি শোন বানের: মুহূর্ত্তে ছুটে বেরিয়ে আসে যশোদা ঘর থেকে। যজ্ঞেশ্বরের মাথার ভেতরটায় যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

—কি বান। রাতজাগা দু'চোখের সামনে বিশালাক্ষী নদীর ঢেউগুলো যেন সব ফুলে কেঁপে গর্জ্জে উঠে ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখের পলকে চালের বাতায় থেকে তেরছা কোদালখানা কাঁধে ফেলে যজ্ঞেশ্বর দৌড়তে আরম্ভ করে বাঁধের দিকে। আর যজ্ঞেশ্বরের পরনের কাপড়টাকে লক্ষ্য করে অন্ধকারে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলে যশোদা।

মেঘলা ছেঁড়া পাতলা জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে বাদাক্ষ্যাপার মাঠে। বাধাবন্ধহীন মেঠো হাওয়া বুক দিয়ে কেটে ঊর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে চলে যশোদা।

সামনেই আঁকাবাঁকা বিসর্পিল মাটির পাহাড়—বাঁধ। গোটা গোবিন্দপুর ও সেরপুর মৌজার গরীব চাষীদের সহস্র হাতের সম্মিলিত স্বাক্ষর।

এক কোপে কোদালখানা মাটির বুকে গেড়ে বসিয়ে উঠে দাঁড়ায় যজ্ঞেশ্বর বাঁধের ওপর। কোথায় বান? ভিজে জ্যোৎস্নায় ধু ধু বালুচরের ওপর দিয়ে উড়ন্ত ছেঁড়া মেঘেরা সব ছায়া ফেলে সরে সরে যাচ্ছে। দূরে দেখা যায় খরতোয়া বিশালাক্ষীর অপূর্ব্ব রূপোল্লাস। ঢেউ ছলকে চাঁদের সোনার থালাটা যেন কোন দেশে ঢ'লকে নিয়ে চলেছে।

বিসর্পিল বাঁধের পিঠের ওপর থেকে যজ্ঞেশ্বরের দৃষ্টিটা আপনা পিছলে গিয়ে পড়ে বিশালাক্ষী নদীর ওপর। মসৃণ চলকানো রূপে জিঘাংসার কোন বাঁকা রেখা নাই।

যজ্ঞেশ্বর একটু হেসে যশোদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, এখনকার যোগিনী তুমি করে যে কোন সম্ বাঘিনী রূপ ধরবে হে নদী; জানিস্ না বউ।

উঁ: বাঁধের মত নিরেট যজ্ঞেশ্বরের কালো কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ তুলে ধরে যশোদা বিশালাক্ষীর দিকে।

যজ্ঞেশ্বর অস্ফুটে বলে, বানটাক্ তাহ'লে তুই কি শুনলি।

যশোদা কোন কথা কয় না। এই রূপবতী বিশালাক্ষী যে কেমন ক'রে এমন দিনে ফুঁসে উঠে ফি বছর তার দোচালাখানা ভেঙ্গে দিয়ে যায়, এই কথার সে কিছুতেই থই পায় না।

যজ্ঞেশ্বর ঝামটা মেরে ব'লে ওঠে, বান না হাতী। খামখা তুই আমাক্ ছুট করালি অন্ধকার রাইতে বাঁধ তক্।'

অতঃপর

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রেমের কবিতা লিখবো বলে তো বসেছি।
অথচ এ-আমি এই কিছু দিন আগেও,
সম্বল যার অশ্রু-সজল পাথেয়
সেই কাব্যকে শ্লেষবন্ধনে কসেছি।

যুগের ধর্ম্ম মানতেই হবে বাঁচ্‌লে,
আমারও মনন তাই সে ছোঁয়াচ ধরেছে।
প্রথম প্রণয় যত বিস্ময়ে ভরেছে
প্রতিক্রিয়ায় তুমি সখি তত ভাস্‌লে।

তোমার ভাগ্য, কবিতার বিধিলিপি
দুরূহ প্রতীক-ধোঁয়ায় করেছি কাণা,
কাব্য হয়েছে শুদ্ধ কঠিন দানা
তুমি উবে গেছ, রয়েছে শোলার ছিপি।

আজ সন্ধ্যায় বেবাক্ শূন্য মনে
কৃষ্ণতিথির নিথর আকাশে চেয়ে
দেখি লাল নেই; শুধু ফিকে নীল ছেয়ে
নামে হেমন্ত নিবিড় কথার বনে।

সেথা কিছু নেই। শুধুই বেদনা-নীল
কুয়াসার ঘোরে জড়িত স্বপ্ন-সারি,
সেই ফাঁকে ফাঁকে নরম আলোর ঝারি
ছিটিয়েছে সুর, কি আশ্চর্য্য মিল!

মনে রঙ লাগে। যুগান্তরের পারে
মানুষ আবার সুস্থ স্বাধীন ভাবে
স্বাধিকার-জোরে ভালোবাসা ফিরে পাবে,
হয় তো পৃথিবী হারাবে শূন্যতারে।

এখন কোথায় সত্তা তোমার-আমার?
কি সব ভাবছি—কি যে হ'ল মোর আজ!
পরতে-পরতে খোলে মস্কের ভাঁজ
দুলে দুলে ওঠে মন-কেমনের ভার।

ও হো! তাই বলি, স্নিগ্ধ সান্ধ্য বেশে
তুমি এলে ঘরে বেঘোর চিন্তা-শেষে!
রোজই দেখি—তবু এমন করে তো দেখিনি
তুমিই তা' হলে চমক-হারানো হরিণী!

যশোদা কি বলবে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁধের [illegible] খুঁটতে খুঁটতে যশোদা চুপি চুপি বলে, ই হাতীটাক্ আরও [illegible] কইরবা না কাল মাটি দিয়া!

—দিব তো। কেনে, ডর কিসের!

যশোদার চোখের সামনে দোচালার ওপরকার কচি লাউ-ডগাগুলো [illegible]

সে যে কি দুঃস্বপন তা আমি তোমাক্ বুঝাইতে লারব গো: যজ্ঞেশ্বরের পাঁজরায় মুখ চেপে কেঁদে ফেলে যশোদা।

যজ্ঞেশ্বরের চোখটাও ছল ছল ক'রে ওঠে মমতায়। ধরা-ভাঙা গলায় যজ্ঞেশ্বর যশোদার পিঠে হাত বুলিয়ে জোরে জোরে আশ্বাস দেয়; দিব, দিব। ই হাতীটার পিঠে মাটি দিয়া একেরে উঁচা [illegible] দিম। চপ, যা!

সাহিত্যের সংজ্ঞা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

মানুষের মন চায়, জীবনের সব জিনিসকেই বুদ্ধিদত্ত একটি শাণিত সংজ্ঞার দ্বারা একেবারে কাটা-ছাঁটা করিয়া একান্ত পরিচ্ছন্নরূপে গ্রহণ করিতে; কিন্তু নিরন্তর গোল বাধে এইখানেই; কারণ জীবনের কোন জিনিসই অমনতর ভাবে কাটা-ছাঁটা হইয়া সংজ্ঞা পরিবেষ্টিত হইতে নারাজ. জোর করিতে গেলে দেখিতে পাইব, সংজ্ঞার এদিকে রহিয়াছে অনেকখানি ফাঁক, ওদিকে রহিয়াছে ফাঁকি,—অর্থাৎ জীবনের সেই বিশেষ জিনিসটি সংজ্ঞাকে এড়াইয়াও চলিয়াছে অনেক দূরে, সংজ্ঞার পরিবেষ্টনের পরিধিকে অতিক্রম করিয়াও চলিয়া গিয়াছে অনেক দূরে। অতএব জীবনের যাহা কিছুকেই আমরা বুঝিতে যাই, একটু খোলা মন লইয়া অগ্রসর হইতে হয়, নতুবা আমরা হই একদেশদর্শী, না হয় হই অদেশদর্শী।

সাহিত্যকে আমরা এইরূপে যাচাই করিতে চাহিয়াছি অনেক সংজ্ঞা দ্বারা, এবং অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া পাকচক্র খাইয়া শেষ অবধি আমরা আসিয়া দাঁড়াই সেই 'রসালাপে।' কিছু দিন সুন্দরের উপর ভর করিয়াছিলাম, দেখিতেছি সে-ও রসিক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু সময় সময় মনে হয়, সব কথা ধরা পড়ে নাই আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট রসের কথায়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি. বারোয়ারী বাজীপুজার প্রাঙ্গণে চলিতেছে পালা-কীর্তন। তাহার শ্রোতার একমাত্রা বোধ হয় বারোয়ারীকেও অতিক্রম করিয়া 'তেরোয়ারী'তে গিয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এই সব পালা-কীর্তনের সাধারণ নাম 'ঢপ' গান। আজকালকার পালা 'নৌকা-বিলাস'। মূল গায়েন (অধিকারী) ফোঁটা-তিলক কাটিয়া নামাবলী গায়ে গান করিতেছেন। যমুনার ঘাটে শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে, অমনি বৃন্দাবনের গোপীগণ শ্রীরাধিকাকে মধ্যমণি করিয়া রওনা হইল ঘাটে। কারণ, সেই বাঁশীর সুরে—

রাখাল শুনিল বাঁশী চল গোঠে যাই ভাই।
বিনোদিনী শোনে বাঁশী ঘাটে এস যাই যাই।

মূল পদ ছাড়িয়া অধিকারী আখর ধরিলেন। গোপীরা সবে—

সারি সারি চলেছে। (সার বাঁধিয়া)
গৃহকাজ সারি সারি—সারি সারি চলেছে।
পরিধানে নীল শাড়ী—সারি সারি চলেছে।
কৃষ্ণ নামের সারী (সারিকা, সারী পাখী)—
সারি সারি চলেছে।
ভব উপার একটিও নয় (অপরিণত-সার)
সব সারী সারী (সার আছে যার) চলেছে।
সারী সারী গোপীগণ (ভক্তিমতী ও চতুরা)—
সারি সারি চলেছে।

এমনি করিয়া অধিকারী চমকের চমক দিতে লাগিলেন। আমরা শ্রোতারা যত নূতন 'সারি'র কথা পাইতেছি, ততই উল্লসিত হইয়া উঠিতেছি এবং সব 'সারি' (সব রূপভেদ লইয়া) যখন একত্রিত হইল তখন ক্রমবর্ধমান আনন্দের আতিশয্যে ঘন ঘন উচ্চ হরিধ্বনিতে সভামণ্ডপ কম্পিত করিয়া তুলিতাম। আজ বসিয়া ভাবি সেই 'তেরোয়ারী' শ্রোতার ভিতরে হস্ত-সঞ্চালন, শিরঃকম্পন এবং হরিধ্বনির হুঙ্কারের দ্বারা যে উল্লাসকে প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে উল্লাস কিসের? সে ধর্মের নয়, মূলতঃ সাহিত্যের। বিজ্ঞ লোকে শুনিয়া আজ প্রাকৃত-জন, সংস্কৃত-জন বা অপ্রাকৃত-জন যে আখ্যাতেই অভিহিত করুন না কেন, সেদিন ঐগুলি 'সারির' চমকে যে চমকিত এবং উল্লসিত হইয়াছিলাম তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোন সংস্কার—কোন কৃত্রিমতা ছিল না সেই উল্লাসের ভিতরে,—আমি বলিব, এটা আদিম মনের সহজ উল্লাস।

তেমনিতর ভাবে মনে পড়িতেছে 'বৈরাগী'দের গানের স্মৃতি। প্রতি সোমবারে ছিল বৈরাগীদের ভিক্ষার পালা। দেখা পাইতাম বহুবিধ 'বৈরাগী'র, গানও শুনিতাম তাহাদের কাছে অনেক রকমের, একদিন শুনিলাম 'স্বপ্ন-বিলাসে'র গান। নন্দরাণী প্রভাতে উঠিয়া ব্রজরাজকে পূর্বরাত্রের স্বপ্নের কথা বলিতেছেন। স্বপ্নে কৃষ্ণ একবার গোপাল-বেশে আসিয়াছিল। তাহার—

নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সকাতিরে ডাকে মা ব'লে। যত কাঁদে বাছা বলি, সর সর,
আমি অভাগিনী বলি, সর সর, বল্লেম নাই অবসর, কেবা দিবে সর
অমনি সর সর বলি ফেলিলেন ঠেলে।

ভিখারী গান গাহিয়া ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার 'সরা'শ্রিত স্বরের গুঞ্জন আমার মন হইতে আর কিছুতেই চলিয়া যাইতেছিল না, অনেক দিন তাহাকে লইয়া মনে মনে একা একা অনেক বিস্ময় ও আলোড়ন অনুভব করিয়াছি। আজ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এ আলোড়নকে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইতেছে সাহিত্য বোধেরই একটা অস্ফুট স্পন্দন বলিয়া। তাহাকে স্থূল বলিয়া ভারাক্রান্তই করি, আর সূক্ষ্ম বলিয়া আকাশেই উড়াই, সে সাহিত্যেরই সামগ্রী, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না।

পরবর্তী কালের বিশ্লেষণী বুদ্ধি লইয়া এই সকল উল্লাস, আনন্দ ও আলোড়নের উপরে রসের সংজ্ঞাটিকে নানা রকমে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই যেন মনের মত হয় না; জোর জবরদস্তির দ্বারা যদি কিছু করা যায়, ভিতের সহজ সংযোগের অভাবে সে কেমন যেন খসিয়া যায়।

সংস্কৃত কবি ভারবি, মাঘ প্রভৃতির কাব্য পড়িয়া স্থানে স্থানে মনে হইয়াছে, সাহিত্যের আসরে ইহা পালোয়ানী কসরৎ। একাক্ষর এবং দ্ব্যক্ষরাবৃত্তির পায়তারা ও বহুবিধ 'বন্ধে'র প্যাচ কষিয়া পাঠকের ভীতি-উৎপাদন-জনিত বাহবাবই সেস্থলে তাহারা চরম পুরস্কার মনে করিয়াছেন। কিন্তু শব্দালঙ্কারের ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে মনে এইরূপ ভাব ঘটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। এইখানেই ব্যাখ্যা আসিবে, রসের আক্ষেপে রসেরই পরিপোষকতা-রূপে যে অলঙ্কারের উদ্ভব তাহাই সার্থক, শব্দালঙ্কারই হোক আর অর্থালঙ্কারই হোক। কিন্তু বড় বড় কবির কাব্যের বড় বড় উদাহরণের কথা ছাড়িয়া দিতেছি,—আমি উপরে যে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি সেখানকার শব্দালঙ্কার কোন্ রস-পূরণের জন্য একান্ত অপরিহার্য ছিল? তাহার ভিতরে যেটুকু রহিয়াছে অর্থের দ্যোতনা তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য এতখানি আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? তাহা কিছুই বলিতে পারি না, —কিন্তু আবার বলিতেছি, আমি উহাতে আনন্দ পাইয়াছিলাম, —অনেক আনন্দ।

বলা যাইতে পারে, আমি পূর্বে যে উল্লাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহা অশিক্ষিত আদিম মনের একটা স্থূল হ্লাদ-বৃত্তি—উহাকে ঠিক সাহিত্যের কোঠায় তুলিয়া সাহিত্যের সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে থিওরি-ভারাক্রান্ত শিক্ষিত মন

অপেক্ষা আদিম অশিক্ষিত মনের উপরে আমার শ্রদ্ধা অনেক বেশী। আদিম মনের সাক্ষ্যের ভিতরে সত্যকে পাওয়া যায় অনেকখানি অমিশ্র ভাবে; অধিকন্তু, তাহার সহিত বিশ্বমনের মিলও অনেক বেশী এবং সহজ। সুতরাং এই সকল আদিম মনোবৃত্তির অবলম্বনে সত্য লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশী বলিয়া মনে হয়।

আদিম অশিক্ষিত মনের কথা না হয় ছাড়িয়া দিতেছি,—আধুনিকতম সুশিক্ষিত মনের কথাই বলিতেছি। অত্যাধুনিক নামাঙ্কিত—অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী—ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্য এবং তথাকথিত রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কাব্য-সাহিত্য লইয়া যখন আলোচনা করি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে সেই একই সংশয় উপস্থিত হইতে থাকে,—এ সাহিত্যের সংজ্ঞা কি? রসের কথায় ত মন আর সন্তুষ্ট হইয়া ওঠে না, রস বাদ দিয়াও যে বিরস হইয়া পড়ি। এই সকল কাব্য-কবিতার ভিতরে অনেক স্থান আছে যাহা আমার চেতন, অবচেতন, অচেতন—সকল বোধের অগমপারে অবস্থিত,—তাহাদের প্রকৃতিগূঢ় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আমার হৃদয়ের তটে আসিয়া কোন আঘাতই করে নাই, এ-সব স্থল লইয়া কোন সমস্যাই নাই। কিন্তু ইহার ভিতরে অনেক জিনিস আছে যাহা বুঝিতে না পারিলেও গ্রহণ করিতে পারি এবং গ্রহণ করিয়া একটা আনন্দ অনুভব করি। ঠিক বুদ্ধির প্রসাদ-জনিত আনন্দ নয়,—আবার রতি-শোক-হাস্য প্রভৃতির অবলম্বনে কোন রসও নয়,—তবে ইহারা কি? ভালও লাগে, আবার একান্ত লৌকিকও নয়—অতএব পড়ে আসিয়া সাহিত্যেরই কোঠায়—কিন্তু কোথায় তাহার নির্দেশক সংজ্ঞা?

সে সংজ্ঞার সন্ধান করিতে গিয়া মনে আসে একটা কথা—উহা চিত্ত-চমৎকৃতি। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মধ্যে যিনিই যে-মতের পোষক হোন না কেন, এই চিত্ত-চমৎকৃতির ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই এক। রসবাদীরাও রসের আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'রসে সারশ্চমৎকারঃ'—চমৎকারই হইতেছে রসের সার বস্তু। বাস্তবেও দেখিতে পাই, যে জাতীয় লেখাই হোক না কেন, তাহাকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই তখনই যখন সে চিত্তে দান করে একটা চমৎকার। আমি প্রথমে যে-সকল কবিতা ও গানের কথা বলিয়াছি সেগুলিও সাহিত্য। তাহার চমৎকৃতিতে—চিত্তকে সে সচকিত করিয়া একটা আনন্দের উদ্বোধ করিতেছে। আধুনিক যত কাব্য-কবিতা তাহাকেও সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন কষ্ট হয় না তাহার এই চমৎকৃতির জন্য। নাই বা থাকুক শৃঙ্গার-বীর-করুণ-হাস্য প্রভৃতি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কোন রসের ব্যঞ্জনা—সে যদি চমৎকার হইয়া ওঠে—যে কারণেই হোক—তবেই সে আসিল সাহিত্যের কোঠায়।

কথা উঠিবে, এই চমৎকার জিনিসটাই বা আবার কি। ইহারও উত্তর দিয়াছেন প্রাচীন এক জন আলঙ্কারিক—এই চিত্ত-চমৎকৃতির অর্থ চিত্তের প্রসার। যে-জিনিসের দ্বারা আসে চিত্তের সঙ্কোচন তাহাই সাহিত্যেতর বা অসাহিত্য; যে-জাতীয় সাহিত্যই হোক না কেন তাহাকে যাচাই করিয়া দেখিবার একমাত্র উপায় হইল তাহাকে আনিয়া একবার চিত্তপ্রসারের কষ্টিতে ছোঁয়াইয়া দেখা। রস হইলেই যে কোন কিছু সাহিত্য হয় তাহার কারণ রসের ভিতরে রহিয়াছে চিত্তের বিদ্রুতিজনিত প্রসার। রসের উদ্বোধে চিত্ত শুধু বিদ্রুত হয় না, সেই বিদ্রুতির ভিতরেই আছে একটা প্রসার। এই চিত্ত-প্রসারক চমৎকৃতিকে আমি রসের সংজ্ঞা হইতে ব্যাপকতর বলিয়া মনে করি। রসের উদ্রেকে চিত্ত প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু রস ব্যতীত আর কোনো স্থলেই চিত্তের প্রসারণ ঘটিতে পারে না, এমন কথা হলফ করিয়া বলা চলে না। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, শ্লথ নিদ্রালু মন যেখানে কথার ঝাঁকুনিতে সচকিত হইয়া উঠিতেছে,—সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যেখানে সুচতুর বক্রোক্তিতে তর্কবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে ঈষৎ কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে, সেখানে একটা চমৎকৃতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সেই চমৎকৃতির ভিতরে চিত্তের প্রসার রহিয়াছে, এই জন্যই সে আলঙ্কারিক রসের কোঠায় না পৌঁছিয়াও সাহিত্যের কোটায় পৌঁছিয়াছে।

বলা যাইতে পারে, উপরিউক্ত চমৎকৃতি-জনিত চিত্তের প্রসার অতি অগভীর এবং ক্ষণস্থায়ী। যেখানে চিত্তের প্রসার অগভীর এবং অস্থায়ী সেখানে সাহিত্যও অগভীর এবং অস্থায়ী; কিন্তু সে স্থলে সাহিত্যের কোঠায় পৌঁছানই যায় নাই এমন কথা বলা যায় না। রসের ভিতরেও তারতম্য রহিয়াছে এবং সেই তারতম্য অনুপাতে চিত্ত-প্রসারেরও তারতম্য হয়; সেখানকায় 'তম'কে সাহিত্য বলিয়া 'তর'কে একেবারে অ-সাহিত্য বলিয়া বর্জ্জন করিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটিকে টানিয়া বুনিয়া আনিয়া বিস্ময়ভাবাশ্রিত অদ্ভুত রসের কোঠায় দাঁড় করান যাইতে পারে, কিন্তু সেখানকার আসল কথা চিত্তের বিস্তার। তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ, তাহার প্রত্যেকটি অলঙ্কার চিত্তকে শুধু প্রসারিত করিয়া দিতেছে—চিত্ত যতই প্রসারিত হইয়া উঠিতেছে ততই চিত্তের আনন্দ; তাহার কারণ, ভূমাতেই সুখ, ভূমই সুখ, যাহা ক্ষুদ্র অল্প তাহাতেই দুঃখ, অল্পই দুঃখ। বহু কবির বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু কবিতা রহিয়াছে, সেগুলি স্পষ্ট কোনও রসাশ্রিত নহে। এই কথাই বলিয়াছেন কোন কোন আলঙ্কারিক, যেখানে তাঁহারা বলিয়াছেন, স্বভাবোক্তি কোন রসাশ্রিত নহে,—তবু তাহা সাহিত্য। প্রকৃতি-বিষয়ক প্রায় সকল কবিতাতেই দেখিতে পাইব, সেখানে বড় কথা কোন রস নহে—সেখানে বড় কথা চিত্তের চমৎকৃতি—চিত্তের নিঃসীম প্রসার।

সাহিত্যের ভিতরে যে আমাদের চিত্তের মুক্তি আছে এ কথাটা নেহাৎ একটা কাব্যিক কথা মাত্র নয়, যেখানে সাহিত্য সেইখানেই চমৎকার, যেখানে চমৎকার সেইখানেই চিত্তের প্রসার, চিত্তের প্রসারেই মুক্তি—চিত্তের সঙ্কোচনেই বন্ধন। আর সাহিত্য যে অলৌকিক এ কথাটাও একটা পণ্ডিতি বাগাড়ম্বর মাত্র নয়; এই কারণে যে, যে জিনিস লৌকিক সে কখনও মুক্তি দিতে পারে না। সে চিত্তকে নিরন্তর বাঁধে! লৌকিক এবং অলৌকিকের ভিতরে মৌলিক তফাৎই এইখানে, যাহা কিছু লৌকিক তাহা বহুবিধ বন্ধনের ভিতরে চিত্তকে নিরন্তর সঙ্কুচিত করিয়া ছোট করিয়া রাখে, অলৌকিক শুধু চিত্তের প্রসারের ভিতর দিয়া কেবলই চায় চিত্তকে মুক্তি দিতে। একই প্রেম-কাহিনী দেখা দেয় লৌকিক এবং অলৌকিকরূপে, লৌকিকরূপে সে চিত্তকে সংকুচিত করিয়া টানিয়া আনিবে কামনা-লালসার প্রবৃত্তির রাজ্যে, অলৌকিকরূপে সে চিত্তকে ছড়াইয়া দেয় বিশ্বের নর-নারীর হৃদয়-আকাশে; যত সে গভীর—চিত্ত-প্রসারক—তত সে চমৎকার! তাই ত তখন দেশ-কালের বন্ধনও যায় খসিয়া—দেশ-কালের ঊর্দ্ধে চিত্তের যেখানে গভীর ব্যাপ্তি সেইখানেই ত মুক্তি—সেইখানেই সাহিত্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২

মধুসূদনের মৃত্যুর পর নিস্তারিণী দেবী সংসারটা পুত্রবধূর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডুল তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, বু সে কোন রকমে চোখ-কান বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কারণ, াড়াতেই একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল যাহাতে নিস্তারিণী দেবী টানার মধ্যে পড়িয়া যান। সাঁতরার ঘটনা মধুসূদনের শ্রাদ্ধাদির র বিপিনবিহারী যখন মায়ের কাছে সকলের পাণ্ডুলে প্রত্যাগমনের থা বলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বেশ খানিকটা বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন রিলেন—"সকলের গিয়ে কি হবে? শুধু শুধু এক গাড়ি টাকা রচ তো বাবা।"

বিপিনবিহারী মায়ের চেয়ে কিছু কম বিস্মিত হইলেন না, ানিকক্ষণ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"বুঝলাম না মা থাটা।"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"আর পাণ্ডুলে কি রইল যে সেখানে রে যাবো বাবা? তুই একলা যা, যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনবার াছে নিয়ে আয়, তার পর এখানে একটা কিছু যোগাড় যন্ত্র করে াস; আর পাণ্ডুল কেন?"

সময়টা এমন যে সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। পিতার ৃত্যুর পরও যে সংসারের দাবিগুলি যথাপদ্ধতি মিটাইতে হইবে, বটা ছেলে হইয়া বিপিনবিহারী সেটা বুঝিলেও বেশ সবিস্তারে মায়ের ঙ্গে আলোচনা করিতে পারিলেন না। কিছু কিছু করিলেন, কিন্তু শোকটা দু'জনের পক্ষেই জীবনে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম, তাহার মধ্যে থা বাধিয়া যাইতে লাগিল। ফল হইল, এক দিকে পাণ্ডুলে ফিরিবার জদে আর এক দিকে না ফিরিবার জিদের মধ্যে পড়িয়া মাঝখানে ানিকটা ভুল ধারণা রহিয়া গেল। বিপিনবিহারী স্থির করিলেন, কাই পাণ্ডুলে যাইবেন, তাহার পর যে কি করিবেন সেটা আর প্রকাশ করিলেন না।

কথাটা মা-ছেলের মধ্যেই রহিল, তাহার পর জানাজানি হইল াওয়ার আগের দিন, যখন যাত্রার আয়োজন করিবার সময় হইয়াছে। গবতীচরণের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীকে বলিলেন—"বউ, তুই করছিস কি এ? বিপিন ওর বাপ হারিয়েছে, তাঁর আয় ছিল না; কিন্তু তুই জ্যান্ত থাকতেই তোকে হারালে যে আজ। এই যে বাপ-মা হারা হয়ে যাচ্ছে..."

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"ও তেমন কিছু তো বলেনি দিদি, বৌমাকেও তো রেখে যাচ্ছে।"

"কত বড় যে ওর অভিমান সেটা বুঝতে পারিসনি বউ। ওর এখন যে কথায় কথায় অভিমান হবে হাজার শোকেও এটা কি তোর ভোলা চলে? ওর যা বয়েস তাতে শোকটাকে ও বাপের ওপর অভিমান করেই দেখবে—বেয়াক্কিলের মতন কচি ছেলের ঘাড়ে এত বড় সংসারটা ফেলে দিয়ে গেল ঠাকুরপো। তুই রইলি বাকি, তোর কথায় কি ব্যবহারে একটু এদিক-ওদিক্ হলে সেটা সে ও অভিমানের ভাবেই নেবে এটা বুঝতে পারছিস না? তোর মাথার ঠিক নেই বুঝি, তবু ঠাকুরপোর সব জিনিস বজায় রেখে যাবার জন্যে যে জোর করে ঠিক রাখতে হবে মাথা।"

নিস্তারিণী দেবী অশ্রু-দ্রব কণ্ঠে বলিলেন—"অভিমানের আমি তো কিছু বলিনি দিদি, আমার কথাটা বুঝবে না বিপিন? চল্লিশ বছর আগে আমি পাণ্ডুলে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘর বাঁধতে ভয় পাইনি, আজ পাণ্ডুল সহর হয়েও আমার পক্ষে সে জঙ্গলের চেয়েও..."

বড়-জা অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া নিজের অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—সব ভোল বউ, মেয়েদের অদেষ্ট যে কত বড় কঠিন তা কি বলে দিতে হবে? বুক জ্বলে গেলেও আমাদের হাসি টেনে রাখতে হয় মুখে, নইলে—এ প্রবঞ্চনাটুকু না করলে সৃষ্টি নষ্ট হয় যে। মনে যা থাকুক্ তুই এখন যা! যদি সাঁতরায় চলে আসাই ঠিক মনে হয় তো কাছে থেকে আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে বিপিনকে, ও নিজেও বুঝবে। জবরদস্তি করতে গিয়ে হাতের কাজটুকু খুইয়ে যদি আরও দিশেহারা হয়ে পড়ে...বরং সে-ও ভালো, কিন্তু বাপের সঙ্গে মা-ও ঠেললে—এই ভাব যদি বসে যায় ওর মনে তো সর্ব্বনাশের আর ওষুধ খুঁজে পাবিনি বউ এ জন্মে।"

তাহার পর কয়েক বৎসর গড়াইয়া গেছে, কিন্তু যতই দিন গেছে নিস্তারিণী দেবী উত্তরোত্তর নিজে আরও ভালো করিয়াই নিজের ভুলটা উপলব্ধি করিয়াছেন। পাণ্ডুলের সে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই নাই, তব

...সে বজায় ছিল বলিয়াই সেই অবস্থা থেকে নিজেকে অল্পে অল্পে ...য়া তুলিয়া পুত্র দুইটি-ভগিনীর বিবাহ দিল, ছোট ভাইকে এক স্থানে ...ষ্ঠিত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অল্প করিয়া একটু ভবিষ্যতের ...ে করিয়া লইতেছে। বিপিনবিহারী বলেন—"মা, কথাটা তাহলে ..., জানি না রাগ করবে কি না! সাঁতরায় বাবা ছেলেবেলায় অতি ...র পায়ের ধুলো ঝেড়ে এসেছিলেন, আর পাণ্ডুলে আছে বাবার ...পাদ।...কি জানি, আমি বোধ হয় পাণ্ডুলকে ভালোবাসি বলেই ...ি কথাটা, কিন্তু এখানে আমার মনে হয়, বাবা যেন কুঠি থেকে ...ে পর্যন্ত সব জায়গায় আর উদয়াস্ত প্রত্যেকটি কাজে আমায় ...র রয়েছেন।"

বিপিনবিহারীর ওটা অনুমান, কিন্তু নিস্তারিণী দেবী যেন সেটা ...ন করেন, প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসটা গিয়া এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া ...য়াছে। তবু হাসিয়া বলেন—"তুই সেখানেই থাকিস, তাঁর ...শীর্বাদ সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; তবে হাঁ, নিজের হাতে-গড়া জায়গায় ...নুষেরও মাতাত্মা জড়িয়ে থাকে বৈ কি—একটা সামান্য পুতুল ...েও তাতে কারিগরের মনের ছাপ লেগে থাকে যখন..."

কিন্তু এগুলা হইল বিচারের কথা। একটা জায়গা থেকে মন ...ঠিয়া গেলে বিচার আসিয়া সে-মনকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে ...রে না। বিপিনবিহারী সেটা বুঝিতেন। মা পাণ্ডুল ছাড়িতে ...ছিলেন তিনি সে তর্কের জোরে বা অভিমানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে ...রয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন না এটা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ...স্তারিণী দেবী যেমন ওদিকে বুঝিয়াছেন পাণ্ডুলে আসাটা ভালো ...ইয়াছিল সে-সময়, এদিকে তেমনই বিপিনবিহারীও উপলব্ধি করিবার ...র পাইয়াছেন যে মায়ের পক্ষে পাণ্ডুলে আসা, পাণ্ডুলে থাকার ...ধ্যে কী সুগভীর বেদনা,—পুত্রের অভিমান-ভরা মুখ দেখিয়া কী ...বিপূর্ণ ভাবেই না নিজেকে ভুলিয়াছিলেন মা।

বিপিনবিহারী যতটা সাধ্য চেষ্টা করেন মায়ের মনটা ভুলাইয়া ...খিতে। সংসারের সে-সমস্যাগুলিতে শুধু নিরুপায় চিন্তাই আছে, ...গুলো সমাধানের সম্ভাবনা নাই, স্বামি-স্ত্রীর কেহই সেগুলা মায়ের ...চরে আনেন না; যতটা পারেন মা তাঁহার পূজা লইয়া থাকুন। ...মন কি, যতটা সাধ্য তাহারও অতিরিক্ত করিয়া মাসের মধ্যে এক-...আধ বার বাবার সময়ের এক-আধটা দিন ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা ...রেন: মে-ভোজটা ছিল প্রাত্যহিক, এক একদিন তাহার অনুষ্ঠান ...য়; আহ্নিক তাড়াতাড়ি সারিয়া নিস্তারিণী দেবী লুচি ভাজিতে ...সেন; গিরিবালা, ছোট বৌ প্রভাবতী, কন্যা অলকা কেহ চাকি-...বেলন, কেহ বঁটি লইয়া বসেন, দাওয়ার নীচে কামারটুলি থেকে বোধ ...স পড়াউয়ের বৌ, কি শনিচরার মা আসিয়া বসে, নানা রকমের গল্প ...য়...বিপিনবিহারী আসিয়া অভ্যাসে উপলক্ষ করিয়া বলেন—...তোমরা মাকে কেন টানতে গেলি?—নিজে সামলাতে পারবি না ...বুঝি?"

নিস্তারিণী দেবী বলেন—"তা হোক, পাঁচটা ব্রাহ্মণের মুখে যাবে, ...চুপটি করে মালা ...সে বসে থাকতে কি লাগে ভালো বাবা?"

"ভালো লাগলেও বসে থাকতে দোব না; কিন্তু আগে আশীর্বাদ ...করো মা, কাজগুলো যেন তোমার যুগ্যি ক'রে করতে পারি।—...বাবার আমলে যেমন হোত।"

স্মৃতির আলোড়নে একটু বেদনায় গুমরে ওঠে বুকে, তবুও কিন্তু বেশ লাগে,—পুরানো একটা দিনের সৌরভ ভাসিয়া আসে। ভাবের পূর্ণতায় যদি মুখ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতে না-ও পারেন নিস্তারিণী দেবী তো সে-আশীর্বাদ অন্তরে আরও ভাব-ঘন হইয়া ওঠে।

বিপিনবিহারী যতটুকু করেন তাহার উপর সময় খানিকটা জোগান্ দিয়া অনুকূলতা করে। আগেকার সেই প্রয়োজনের বেশি চাকর-দাসী, লোক-লস্করের অভাব পূরণ করিয়া তুলিতেছে আপন-জনে। নাতিরা বাড়ি ক্রমে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হোক ছোট, হোক সংখ্যায় কম, কিন্তু মন থেকে আবষ্ট করিয়া বাড়ি-ঘর-দুয়ার পূর্ণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের অশেষ—এক দিক্ দিয়া চারটিতেই চল্লিশের সমকক্ষ। তাহার পর যখন বড় মেয়েদের কেহ আসে, সব মিলাইয়া ঘরে-দুয়ারে আর জায়গা থাকে না; পূজা হইতেও সময় কাটিয়া সবাইকে বণ্টন করিতে হয়।...নিস্তারিণী দেবী অভাব ভোলেন; শুধু এইটুকু মনে করিয়া প্রাণটা হয়তো গুমরাইয়া ওঠে যে, আরও এক জন যাহার এই সব, সেই রহিল কোন্ সুদূর অজ্ঞাত পথের শেষে।

সাতটা বৎসর গেল, তাহার পর নিস্তারিণী দেবীর মনে পাণ্ডুলের প্রতি গোড়ার দিকের সেই নিস্পৃহতা হঠাৎ এক দিন ভীতির আকারে দেখা দিল।

মাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য বিপিনবিহারী যে যে পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহার মধ্যে একটা ছিল মাঝে মাঝে তাঁহাকে সাঁতরা ঘুরাইয়া আনা। বছরে প্রায় একবার করিয়া হইতই; কখনও নিজে গেলেন, কখনও কৈলাসচন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া সঙ্গে করিয়া দিলেন, কখনও বা চণ্ডীচরণ গেলেন। দেখা-শোনা কাছে-পিঠের তীর্থ, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি সারিয়া কিছু দিন কাটাইয়া নিস্তারিণী দেবী ফিরিয়া আসেন। কোন সময় যদি দূর তীর্থের যাত্রী পাওয়া গেল, ফিরিতে বিলম্ব হয়। বেশ খানিকটা বৈরাগ্য ও মুক্তির মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া অনভ্যাসকাতর বিহঙ্গীর মতো শান্ত-মনে নিজের পিঞ্জরে আসিয়া বসেন।

এবার পূজার পর সাঁতরা থেকে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরে একটা ব্যাপার ঘটিল। এখানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় স্নানের খুব একটা ঘটা হয়। বেশির ভাগই কমলা নদীতে যায়, তবে আজ-কাল গাড়ির সুবিধা হওয়ায় গঙ্গাস্নানার্থীর সংখ্যাও খুব বাড়িয়া গেছে, দিনকতক আগে থেকেই বেশ সাড়া পড়িয়া যায়।

নিস্তারিণী দেবী আসিবার পর বামনপাড়া, ছুতারপাড়া, কামার-পাড়ার বর্ষীয়সীরা দেখা করিতে আসিল। এক দিন আসিল দুলার-মনের মা, সঙ্গে দুলারমন। এই পরিবারটির সহিত হৃদ্যতা, কিন্তু দুলারমনের দুর্ভাগ্যের পর হইতে সমস্ত পরিবারটি কেমন যেন মনমরা হইয়া গেছে। এই রকম একটা বিশেষ উপলক্ষ না হইলে বাড়ির বাহির হয় না বড় একটা, বউটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হইবে। কন্যা দুলারমনের মতোই স্বভাবটা একটু হাস্যচপল, এখন অবশ্য তাহার উপর একটা বিষাদের আবরণ পড়িয়াছে। আসিল একটু সন্ধ্যা ঘেঁসিয়া; নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"এসো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম সবাইকে—দুলারমনের মা এখনও এল না কেন।"

গিরিবালা একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া দুলারমনকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন; সে আজ কাল আরও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

গল্প আরম্ভ হইল; শাশুড়ি ভালই আছে, আরও খিট্‌খিটে

হইয়া পড়িয়াছে। না, জামাইয়ের কোন তল্লাস পাওয়া গেল না এ পর্য্যন্ত ; মেয়েটার কপাল চিরতরেই পুড়িয়াছে, আর তো চাওয়া যায় না ওটার দিকে। শাস্ত্রের বিধান মতো বারো বৎসর পরে, কপালে ঐ যে সিঁদুরটুকু আছে ওটাও ঘুচিয়া যাইবে। দুলারমনের মা চোখ দুইটি মুছিয়া বলিল—"মা হয়ে কথাটা মুখে আনতে বাধে, দুলহীন, কিন্তু মনে হয় সতীরাণী মা-জানকী যেন তার আগেই ওকে সরিয়ে নেন, দুলারীকে আমায় যেন শাদা কাপড়ে না দেখতে হয়।"

খানিকটা অশ্রু মোচন করিয়া বুকটা হালকা হইল। নিস্তারিণী দেবী সান্ত্বনা দিলেন, অমঙ্গলের কথা ভাবিতে বারণ করিলেন, তবে বেশ জোরের সঙ্গে নয়, এমন কি শুষ্ক চোখেও নয়। বুক বেশ খানিকটা হালকা হইলে কথা অন্য দিকে ঘুরিল। দুলারমনের মা একবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"এবার বেশ পূজোর সময়ই দেশে গেলে, আসতেও দেরিও হোল, কার্তিকী পূর্ণিমার গঙ্গাস্নানটা সেরে এলে না কেন দুলহীন? আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম।"

এবার দল পাইয়া নিস্তারিণী দেবী সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন ; তাহার পর শরীরটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত সাঁতরায় আর থাকিতে ভালো লাগিল না। এ কথাটা বলিলেন না, বলিলেন—'মা-গঙ্গা না মনে করলে হয় না দুলারির মা, পাপের শরীর তো ?"

দুলারমনের মা কৃত্রিম রোষের সহিত বলিল—"অমনি আরম্ভ হোল দুলহীনের পাপের শরীর—পাপের শরীর !···সাধ করে কি আসতে চাই না ?"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল—"আমি জানি গঙ্গা-মাঈ কেন আটকে রাখেননি তোমায় দেশে।"

চটুল দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি এবারে বুড়িকে রাজি করেছি, দুলারির বাপকেও করেছি রাজি দুলহীন, গঙ্গাস্নানে যাব।"

নিস্তারিণী দেবীর উপর সংবাদটার প্রতিক্রিয়ার জন্য সামান্য একটু বিরতি দিয়াই দুলারমনের মা একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল— "অনেক দিনের সাধ দুলহীন, এবার যাবই আমি। তুমিও চলো···না, ও-রকম ফাঁকির হাসি চলবে না, যেতেই হবে ; ঠিক এই জন্যেই গঙ্গা-মাঈ তোমায় দেশে আটকে রাখেননি, নৈলে পূর্ণিমার স্নান ছেড়ে না কি তুমি চলে আসবার মেয়ে ? চণ্ডীকে ছুটি নেওয়াও ; চলো দুলহীন, আমার মাথার কিরা—চমৎকার হবে। তুমি যাবেই ; এত দিন পরে গঙ্গা-মাঈ আমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন যখন ; ভালো করেই চেয়েছেন ; তোমায় সঙ্গী করে দেবেনই···"

হঠাৎ স্বরটা নামাইয়া দিয়া, দৃষ্টি আরও চটুল করিয়া বলিল— "আমি কি গঙ্গা পর্যন্ত গিয়েই ছেড়ে দোব ভেবেছ না কি ? গঙ্গাজির নাম করে বেরুচ্ছি শুধু···"

নিস্তারিণী দেবীর বড় কৌতুহল হইল, প্রশ্ন করিলেন—"তবে ?— জামাইয়ের মতন পালাবে না কি ?"

দুলারমনের মা হাত নাড়িয়া বলিল—"আরে দুৎ, দুলহীন কিছু বোঝেন না !"

আরও গলা নামাইয়া বলিল—"আমি যাব গঙ্গা-সাগর, মনে মনে এঁচে বসে আছি ! একবার তো গঙ্গাজির নাম করে বেরুই···তাই তো মা আট-দশ দিন আগে বেরুব।"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"তোমার পেটে পেটে কম মতলব নয় তো দুলারির মা ! কিন্তু দুলারির বাপ তো সঙ্গে যাবে, রাজি হবে কেন ?"

দুলারমনের মা ঠোঁট চাপিয়া নিস্তারিণী দেবীর পানে আড়চোখে চাহিয়া এমন একটা হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরাইয়া লইল যে-হাসি শুধু মেয়েছেলেতেই বোঝে ; একটু ব্যঙ্গের টানে বলিল— "ঈস্, হবে না রাজি ! চিরজন্মটা···"

আর বলিবার দরকার হয় না ; হাসিটাকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া শেষ করিয়া ফেলিল, তাহার পর আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল —সাগর-সঙ্গমে সে যাইবেই ; সে না কি বড় অপরূপ স্থান—মা গঙ্গার কূল-কিনারা নাই একেবারে, আর সামনে সমুদ্র—যত দূর দৃষ্টি যায় খালি নীল জলের বড় বড় ঢেউ—হাজার হাজার যাত্রীরা স্নান করিতেছে, বড় অপূর্ব্ব জায়গা না কি—দুলারমনের মা যে যাইবেই তাহাতে আর সন্দেহ নাই, রাত্রে স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিয়াছে কতবার, মা'র দয়া হইবে বলিয়াই তো,নৈলে মিছে লোভ দেখাইবার দরকার কি মায়ের ?···নিস্তারিণী দেবীকেও যাইতে হইবে। বিপিনবাবুকে বলা নয়, তাহার পর বাহিরে গিয়া চণ্ডীচরণকে মানাইয়া লইলেই হইবে···

নিস্তারিণী দেবীর কৌতুকের অবধি থাকে না, প্রশ্ন করেন—"কিন্তু তোমায় এ-সব মতলব দিলে কে দুলারমনের মা ? গঙ্গাসাগরের ও রকম বর্ণনাই বা পেলে তুমি কোথা থেকে ?"

দুলারমনের মা'র মুখটা হাসির আভাসে আবার উজ্জ্বল হইয়া ওঠে ; এবার গলাটা আরও খাটো করিয়া বলে—"তবে বলব সব কথা ? কিন্তু কাউকে বলো না দুলহীন, মাথার কিরা।···ওই শাশুড়ি বুড়ী, —এত দিন চেপে রেখে সেদিন আপিনের ঝোঁকে সব বড়-বড় করে বলে ফেললে—আজকাল শরীরটা একটু বেশি খারাপ, আপিনের মাত্রাটা বাড়িয়েছে কি না।···তখন বয়েস অনেক কম বুড়ো-বুড়ীতে যুক্তি করে এই রকম গঙ্গাস্নানের আর বৈদ্যনাথ দর্শনের নাম করে একেবারে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত···"

আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, তাহারই মধ্যে দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল—"দুলহীন মনে করছেন দুলারির মার এটা নতুন মতলব···এ বংশের সে ধারাই এই তা।···"

তিন দিন পরে বামনপাড়ায় হঠাৎ কান্নার রোল উঠিল। হাতের কাজ ফেলিয়া নিস্তারিণী দেবী আর গিরিবালা উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কাহাদের বাড়ি কি হইল ? এখানে রোগ-লুকান আবার মস্ত বড় একটা ব্যায়রাম সকলের। খজনীর মাকে পাঠাইতেছিলেন, এমন সময় খজনী আসিয়া খবর দিল—দুলারমনের মা মারা গিয়াছে। ডাইনে পাইয়াছিল, খুব কম্প দিয়া জ্বর আসে, কাল সমস্ত দিন ভুল বকে, আজ সমস্তক্ষণ অজ্ঞান ছিল ; ঝাড়-ফুঁকে কিছুই ফল হইল না।

সকাল দশটা-এগারটার সময় মারা গেল দুলারমনের মা। নিস্তারিণী দেবী সমস্ত দিন গুম হইয়া রহিলেন। আহারে বসিলেন মাত্র। এত বড় দুর্ঘটনাটা লইয়া সবাই আলোচনা করিল, উনি অন্যমনস্ক হইয়া শুধু—'হুঁ'—না' বলিয়া দু'-এক বার সায় দিলেন।

পরদিন বিপিনবিহারী সকালে আফিস যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, নিস্তারিণী দেবী আসিয়া দুয়ারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিনবিহারী বলিলেন—"মা তুমি কাল রাত্রিবেও খাওনি মাম ; শরীর খারাপ হয়েছে না কি ?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"না, শরীর ঠিকই আছে। বলছিলাম আমায় সাঁতরায় পাঠিয়ে দে বিপিন, আর মোটেই দেরি করিসনি ; ছুটি নিয়ে আসিস আফিস থেকে।"

বিপিনবিহারী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাকাইলেন।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"না বাবা, আর একটুও অমত স নি। তা যদি বলিস—জীবনে আমি কখনও ছেলেমেয়েদের—ক হুকুম বলে তা করিনি, আজ তোকে এই প্রথম করছি। তুই ছেলে কথাটা কাটিসনি। আটটা বছর কাটাতে আমার তেমন কষ্ট নি, আর কিন্তু একটা দিনও আমার অসহ্যি হয়ে উঠেছে এখানে। আমি ভিটে আর গঙ্গা ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারছি না বিপিন।"

বুঝিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। জীবনে সব চেয়ে প্রিয় সে যখন ছাড়িয়া যায় তখন মানুষ আর সবই দিতে পারে, শুধু নিজের মৃত্যুর কথাটুকুই ভাবিতে পারে না। কথায় ক্ষোভে, অভিমানে শুধু এইটুকুই মনে হয়—ও বেশ গেল, ফাঁকি দিয়া ; আমাকেই দীর্ঘ জীবনের পূর্ণ মেয়াদটা টিয়া শেষ করিতে হইবে, একা অসহায় ভাবেই ; ওর ছাড়িয়া-বোঝা পর্যন্ত মাথায় বহিয়া। অবশ্য বোঝা বওয়ার আর থাকে না, মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই সে জীবনের গুণ টানিয়া চলে ; শুধু মৃত্যুর আকস্মিকতার কথাটা ভাবিতে পারে না। অন্তর্নিরুদ্ধ অভিমানে আর এই নিরানন্দ আশায় মনে হয় এই ভাবেই চলিতে হবে—দূর—দূর—বহু দূর, অভিশপ্ত এই দীর্ঘায়ুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। যাহার আশীর্বাদ সে কি মাঝপথে হঠাৎ সাক্ষাৎ পায় তাহার কখনও ?

সাত বৎসর পরে দুলারমনের মার জীবনে মৃত্যুর আকস্মিকতা দেখিয়া নিস্তারিণী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন। মৃত্যু যদি যে কোনো মুহূর্তেই এমনি করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে তো তাঁহাকেও দুলারমনের মায়ের মতোই হা-গঙ্গা হা-গঙ্গা করিয়াই মরিতে হইবে। গঙ্গার তীরের মেয়ে তিনি, গঙ্গার তীরের বধূ—মায়ের উপর কন্যার আবদারের মতোই তাঁহার একটা সাহস ছিল ; একটা সহজ বিশ্বাস ছিল—মধুসূদনকে তিনি ডাকিয়া লইয়াছেন, নিস্তারিণী দেবীকেও ভুলিবেন না। দীর্ঘ অবসাদের পর সময় আসিবে, মধুসূদনের দায় হইতে থেকে নামাইয়া নিস্তারিণী দেবী শেষ শান্তির জন্য মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইবেন। শত দুঃখের মধ্যেও নিশ্চিন্ততাটুকু ছিলই।

দুলারমনের মায়ের মৃত্যু সব ধারণা দিল উল্টাইয়া।

দেখিলেন সে-মৃত্যু তাঁহার আশীর্বাদ, সে হঠাৎ যে-কোন মুহূর্তেই অভিশাপ হইয়া দেখা দিতে পারে—তাঁহার এত বড় অধিকার থেকে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া !

৩

ছুটি লইতে, আয়োজন করিতে সপ্তাহখানেকের আগে হইয়া উঠিল না একটা ভালো দিনও দেখিতে হয়। একটা প্রতিক্রিয়াও ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। পাওুলেরও তো একটা মায়া আছে !—এত দিনের দীর্ঘ-প্রবাস। শুধু প্রবাসই নয়,—জীবনের সব চেয়ে দুখের দিনগুলা কাটিল এখানে, হৃদয়ের তন্তুগুলা যেখানে যেখানে গিয়া জড়াইয়াছিল টানা পড়ার ব্যথায় জাগিয়া উঠিল, এবং এই তন্তুদল যে ছিঁড়িয়া যাইতে হইবে এই চিন্তায় মনটা ক্রমেই বিষণ্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সাঁতরা নিস্তারিণী দেবীর পরকাল,—গঙ্গা আছেন, তীর্থের সুযোগ, স্বামীর চিতাভস্মও সেইখানেই—এদিক দিয়া পরকালের সঙ্গে যোগটা আরও যেন নিগূঢ় ; কিন্তু ইহকাল বলিতে যাহা কিছু সে সমস্তই তো পাণ্ডুলে ; এত সহজে কি তাহাকে জীবন থেকে ঝাড়িয়া ফেলা যায় ?

টান পড়িতে বেদনার মধ্যে দিয়া আরও একটা জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিল,—ভাঁড়ার ছাড়িয়া, দিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে মুক্ত হইয়া গেলেই সংসার থেকে মুক্ত হওয়া চলে না। ইচ্ছা ছিল ও-সময়টা ভগবানের চরণে অর্পণ করা। তাহার আড়ম্বর ছিলই; কিন্তু এখন দেখা গেল চারিটি নাতিতে একে একে আসিয়া কখন নিঃসাড়ে সেই উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। থাকার কালে যে-চুরিটা ধরা পড়ে নাই, যাওয়ার সময় সেটা আত্মপ্রকাশ করিল। বরং আরও শঙ্কার কথা—পূজায় বসিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন নিস্তারিণী দেবী, তাহাতে বেশ টের পাইলেন ওরা চার জন ভগবানের প্রাপ্য নিয়মিত সময়টুকুতেও অধিকার জমাইয়াছে।

রাত্রে গল্প শুনিবার জন্য জুটিয়াছে সবাই। জায়গা লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে, গিরিবালা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ধমক দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, যা দুটো দিন আছেন, তোরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খা। আরও তাড়াতাড়ি পালান মা।"

নিস্তারিণী দেবী সবচেয়ে দুষ্টুটির গায়ে হাত বুলাইতে বলিলেন—"তুমি ওই বলছ বৌমা, আর আমি কি ভাবছি জানো ? ভাবছি থাকব কি করে সাঁতরায় গিয়ে। মুখে আনতে বাধে বটে, কিন্তু সত্যিই এক একবার মনে হচ্ছে, যাচ্ছি বটে মা-গঙ্গার লোভে, কিন্তু এদের এই উপদ্রবের লোভটাই বড় হয়ে উঠে আমায় না আবার টেনে আনে।"

গিরিবালার বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফুটিল, বলিলেন—"ওমা, ওই ভূতেদের দিয়ে যদি অন্ততঃ সে-উপকারটুকুও হয় তাহ'লে যে আমি বাঁচি ; বল না মা, ওদের আমি আরও লেলিয়ে দিচ্ছি।"

নিস্তারিণী দেবীও হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"অমনিতেই যা অবস্থা করেছে তার ওপর আবার…"

একটু চুপ করিয়া গেলেন ; সামনে একটু চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। গিরিবালা ঘরের কাজটুকু সারিয়া ফিরিতেছিলেন, নিস্তারিণী দেবী একটু ধরা-গলায় বলিলেন—"মনের কথা লুকিয়ে রাখা পাপ, বলে এক জনকেও অন্ততঃ শুনিয়ে রাখা ভালো : আমি বড্ড দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি বৌমা, কি করে থাকব এই সব ছেড়ে ? আমার কি মনে হয় জান বৌমা ?—আমার সংসারের সাধ মেটবার আগেই উনি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। মেটেনি, আমার সাধ মেটেনি বৌমা, আমি এ-মন কি ক'রে মা-গঙ্গার পায়ে দোব ? উনি আমায় নানা দিক্ দিয়ে বঞ্চিত করে গেলেন বৌমা।"

নূতন বিচ্ছেদের মুখে স্বামীর শোক নূতন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গিরিবালাও সারা দিন চোখ মুছিয়া মুছিয়া বেড়াইতেছিলেনই,

শশাঙ্কদের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে শাশুড়ি-বৌ উভয়েই চোখে অঞ্চল চাপিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্যবস্থাটা কি মধুসূদন করিবেন? যেমন ভাবে যোগাযোগটা ঘটিল তাহাতে সেই রকমই একটা সন্দেহ হয় বটে। নাতিরা বড় হইলে নিস্তারিণী দেবী গল্প প্রসঙ্গে বলিতেন—"যেমন করে দিলাম খোঁটা তোদের ঠাকুরদাদাকে, ব্যবস্থা করতে পথ পেলেন না তিনি। একেবারে পাগুল ছেড়ে যাওয়া সেই প্রথম, তোরা দুটো না থাকলে, গঙ্গা ছেড়ে পালাবার লজ্জা ঢাকতে বোধ হয় আমায় গঙ্গায় ডুবে মরতে হোত।"

ব্যাপারটা এইরূপ—

যাইবার দুই দিন আগে বিপিনবিহারী বেশ একটু সকাল সকাল আফিস থেকে বাহির হইলেন। মা যাইতেছেন বলিয়া দুপুরবেলা বরাজমোহিনী আসিয়াছেন। বৈকালে বৈঠক হইতে চণ্ডীচরণ আসিবেন; এর মাধ্য অনেকগুলা গোছগাছও করিবার আছে।... ছুতারটুলির সামনে আসিয়া একটা দৃশ্য দেখিয়া রাগে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে বিপিনবিহারীর সমস্ত শরীরটা যেন জর্জরিত হইয়া উঠিল। বড় রাস্তা থেকে বাহির হইয়া একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে. তাহার দুই দিকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে ছুতার-কামারদের বাড়ি। খানিকটা দূরে—রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি দশ-বারো জন অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা ছেলেদের সঙ্গে তাহার নিজের তিনটি পুত্র! একটা মস্ত বড় হুল্লোড় চলিয়াছে, মিশ্র কলরবের সঙ্গে একটা ছড়ার অংশ উদ্ধার করা যায়—"পড়াউ লড়াউ বকড়ি চড়াউ, ধিয়া-পুতাকে বেচ্ বেচ্ খাউ।"...পড়াউ নামে একটা বৃদ্ধ কালা ছুতার-মিস্ত্রি আছে, তাহারই খ্যাপান; অর্থটা হইতেছে পড়াউ ছাগল চড়ায় এবং ছেলেপুলেদের বেচিয়া বেচিয়া প্রাণধারণ করে। মাতনটাকে যথেষ্ট উগ্র করিয়া তুলিবার জন্য ধুলা ছোঁড়াছুঁড়ি চলিতেছে, তাহাতে সবার চেহারার এমন অবস্থা হইয়াছে যে চিনিয়া ওঠা দায়। শশাঙ্ক একটু দূরে 'বড়্মতরা' (ব্রহ্মোত্তর) নামক জায়গায় গুরুজির পাঠশালায় যায়, পলাইয়া আসিয়া এই কাণ্ড করিতেছে। ছেলেটাকে শান্ত বলিয়াই জানে সবাই, হয়তো গুরুজি ক্ষেত তদারকে গিয়া থাকিবে, ফাঁকতালে খানিকটা মুক্তির আনন্দ লুঠিয়া লইতে আসিয়াছে বাবু।

দুপুরের দৈনন্দিন ইতিহাসটা তাহা হইলে এই? ছোটটা একটু দুরন্ত আর ছোটলোক-ঘেঁসা হইয়াছে, এ সংবাদটা মাঝে-মাঝে আসে বিপিনবিহারীর কাছে। বেত আরম্ভ করিতে হইয়াছে, একটু একটু ফলও পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বড়টা যে ইতিমধ্যে এত-দূর আগাইয়া গেছে, বিপিনবিহারী কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই কখনও। চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া একবার যে চোখ পড়িবা গেল. সেইটুকুই. তাহার পর লজ্জায় অপমানে বিপিনবিহারী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না সেখানে। ডাকিলেনও না পুত্রদের. চিন্তিত ভাবে মাথাটা নীচু করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।

মনের যা অবস্থা তাহাতে তিনটাকে ধরিয়া আনাইয়া উত্তম-মধ্যম দেওয়াই হইত স্বাভাবিক, কিন্তু বিপিনবিহারী এবারে সে-ধরণের কিছুই করিলেন না। তাঁহার মনটা ও-রাস্তাই লইল না, পরন্তু এই উপলক্ষ করিয়া মায়ের উপর অভিমানে মনটা ভরিয়া উঠিল, যদিও নিস্তারিণী দেবী যাওয়ার কথাটা তোলা পর্য্যন্ত প্রসন্ন ভাবেই তিনি সব আয়োজন করিয়া যাইতেছিলেন। বাড়ীতে আসিতে, অতিরিক্ত বিষণ্ণতা দেখিয়া মা যখন একটু চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিপিন-বিহারী একটু চুপ করিয়া রহিলেন। মনের ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মনের দুঃখ না কি খুবই বেশি, পারিলেন না; একটু হাসিয়া বলিলেন—"মা, বাবা আমার ঘাড়ে দুটো বোন চাপিয়ে বেশ গেলেন চলে, তোমাদের দুজনের আশীর্বাদে বেশ উঠলামও সামলে-সুমলে কোন রকম করে, এখন তুমি কি ঘাড়ে চাপিয়ে সাঁতরায় যাচ্ছ, দেখো।"

অবসন্ন কণ্ঠে চাকরটাকে কামারপাড়া থেকে ছেলে তিনটেকে ধরিয়া আনিতে হুকুম করিলেন, যেমন আছে ঠিক সেই অবস্থাতেই।

চাকরের পিছনে পিছনে তিনটিতে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপিনবিহারী মায়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমি এখন পেটের সংস্থান করি কি এদিকে সামলাই বলো?...যাক্, আর ভাবতে পারি না, বাবা ছিলেন পাগুল-কুঠির সর্ব্বেসর্ব্বা, আমি হয়েছি কেরাণি, ওরা কলিগিরি ভিন্ন আর কি করবে? নিজের নিজের অদৃষ্ট।"

জামা-জুতা ছাড়িবার জন্য ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

শৈলেনের বেশ মনে পড়ে দৃশ্যটা: উহারা তিন ভাইয়ে মনবাহ্‌না চাকরের পিছনে পিছনে ঠেঁমাথায় প্রবেশ করিয়া একবার চোখ তুলিয়া দেখিল নটুয়ার নাচ দেখার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে লোকে, সেই ভাবে সকলে তাহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, অবশ্য ঠাকুরমা, মা, আর বড় পিসিমা ছাড়া। ঠাকুরমার মুখে কি রকম একটা চিন্তান্বিত অপ্রতিভ ভাব, মা আর পিসিমার মুখে ভয়; মা আধা-ঘোমটা টানিয়া দুয়ারের চৌকাঠের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন। বাকি সবাই উৎসুক দর্শনার্থী, কম কয়টি নয়,—পিসিমার মেয়ের দল, ও-বাড়ির বড়দাদা, ছোট দিদি প্রভৃতি অনেক গুলি। বাবার হাতে নাচটা সে সবার কিরূপ উপভোগ্য হইবে, কল্পনা করিতে করিতে তিন জনে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইল। পায়ের নখ থেকে মাথার টিকি পর্য্যন্ত ধুলায় ধুলায় আচ্ছন্ন, তাদের আবার উৎসাহের মাথায় কামারপাড়ায় খানিকটা কয়লার ছাই হাতের কাছে পাইয়া গিয়াছিল, ঘামে, ধূলায়, ছাইয়ে তাহার রংটা গঙ্গা-যমুনা-গোছের দাঁড়াইয়াছে, তিন জনকে লইয়া চাকরটাও উদ্বাস্ত থাকে বলিয়া একটা কণা কাহাকেও দেহ হইতে খসাইতে দেয় নাই। শশাঙ্কর চোখে বালি পড়িয়া জল নামিয়াছিল, মুছিবার অবসর না পাওয়ায় সে-ও একটা অপরূপ জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভিমান ব্যর্থ বুঝিয়া বিপিনবিহারীর রাগটা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, জামাজুতা ছাড়িতে ছাড়িতে ঘর থেকেই হুকুম করিলেন—"মনবাহ্‌না, একঠো ছড়ি লে আও।"

বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন—"এই দেখো মা, তা ভাবনায় আমিও কিছু রাখব না, তোমার সামনেই শেষ করে দিচ্ছি তিনটাকে।"

ব্যাপার যে এত গুরুতর ভাবিতে পারে নাই, শৈলেন একবার ঠাকুরমার মুখের পানে চাহিল, কাঠের পুতুলের মধ্যে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরমার মুখের চেহারা এমন কখনও দেখে নাই শৈলেন।...দর্শকেরা খুব উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে, ভালো জায়গার জন্য একটু-একটু ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেছে!

বশেষে বিরাজমোহিনী সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিপিন-
বলিলেন—"বিরাজ, তুমি সরে যাও, ওদের বাঁচাতে
না।"

বাজমোহিনীর কোলে তাঁহার শিশু-কন্যাটি, দাদার বারণ না
সিঁড়ি দিয়া উঠানে নামিয়াছেন, মেয়েটি হঠাৎ মুখটি ঘুরাইয়া
াপিয়া ধরিল এবং তিনি অতটা খেয়াল না করিয়া আরও দুই
গ্রসর হইতে আর একবার তিন জনের পানে চাহিয়া ভয়ে
র আঁৎকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

কচ হাসির বেগ চাপিতে সবার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।
মোহিনীর মেজ মেয়েটি একটু গিন্নিবান্নি গোছের, নামিয়া
ত আসিতে বলিল—"ভয় কি খুকু? আকোস নয়, চুড়েল নয়;
, মামুর ছেলে, কত সন্দেশ দেবে।"

রাধ হয় সত্য সত্যই তিনটাকেই আবার সন্দেশ দিতে অগ্রসর
 কি না একবার দেখিয়া লইবার জন্য ঘাড়টা ঘুরাইয়াই খুকী
কার উৎকটতর চীৎকার করিয়া দিদির কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।
আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতেই সবার হাসি চাপিয়া রাখা দায়
ল, এবার আর কেহই সেটাকে মুক্তি না দিয়া পারিল না।
র সমস্ত গাম্ভীর্য্য এক মুহূর্তে নষ্ট হইয়া গেল, বিপিনবিহারী
হইবার ভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বিরাজমোহিনী নিজের
র সবাইয়ের আধ-চাপা হাসির মধ্যে ভাইপোদের নাহিবার
দকে লইয়া গেলেন।

সিলেন না শুধু নিস্তারিণী দেবী। ছেলের কথাটা একটু
ছে প্রাণে। উহারই মুখ চাহিয়া সাতটা বছর তো কাটাইলেন
, চিরকালটাই কি আগলাইয়া থাকিতে হইবে? তাঁহার পরকাল
আর, ছেলে যদি দুরন্তপনা করে, তিনি স্ত্রীলোক, বাড়ীর মধ্যে
করিতেই বা কতটা কি পারেন!...তা নয়, ছেলে একটা
বিপিনবিহারী আসলে চান মা চিরকাল এই সংসারে মুগ্ধ
থাকুন। প্রসন্ন ভাবে সমস্ত আয়োজনের মধ্যে ভিতরে
তাহার একটা অভিমানের ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সেটা একটু
ইয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িল!...কথাটা লইয়া যতই মনে মনে
না করিতে লাগিলেন, ততই সেটা শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত
ইতে লাগিল এবং তাহাদেরই বর্ধমান জটিলতার মধ্যে কোন
য তাঁহার মনেও অভিমান ঘনাইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময়
চণ্ডীচরণ আসিলেন, মাকে দেখিলেন বড় গম্ভীর। আসন্ন
লক্ষণ মনে করিয়া কিছু প্রশ্ন করিলেন না। প্রাথমিক
বাদের পর যখন যাওয়ার কথা উঠিল, নিস্তারিণী দেবী মুখটা
ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"যাব বললেই কি যাওয়া হয় বাবা?
দুখভোর করলেও যে-দিন থাকার উপায় থাকবে না, সেই দিন
কেবারে।"

ণ সবাই জাগিয়া রহিলেন, আলোচনা চলিল, ততক্ষণ এই রকম
নের কথাই বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর সকলে যখন
, রজনী নিস্তব্ধ, বিনিদ্র-শয্যায় শুইয়া শুইয়া সমস্ত ব্যাপারটা
বে বিচার করিবার সময় পাইলেন নিস্তারিণী দেবী। দুলার-
া মরিয়া আ-ঘাটায় মরার যে কী একটা ভয় দেখাইয়া গেল—
যেন উভয়-সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে ক্রমে ক্রমে। প্রথম
জনের ঝোঁকে যাওয়াটা তিনি যত সহজ ভাবিয়াছিলেন আসলে
নয় ততটা সহজ। শুধু আজ হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়া ছেলের
অভিমান নয়, তিনি কি এ সব ছাড়িয়া সেখানে শুধু গঙ্গা আর তীর্থ
লইয়া থাকিতে পারিবেন? সেদিন পুত্রবধূর কথায় বলিয়া ফেলিয়া-
ছিলেন—"আমার কি মনে হয় জান বৌমা?—আমার সংসারের সাধ
মিটিবার আগেই উনি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।" কথাটা যে কী
একান্ত ভাবেই মনের কথা ওঁর সেটা যেন অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি
করিলেন। এর উপর বিপিনের অভিমান,—অভিমানভরা মুখে তাকে
যেন শিশুর মতোই অসহায়, প্রতিপাল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল,
যাহাকে বুকের উত্তাপ দিয়াই বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। মনে পড়িল বড়
জায়ের কথা—"তুই রইলি বাবি, তোর কথায় কি ব্যবহারে একটু
এদিক ওদিক হলে ও যে সেটা অভিমান ভরেই নেবে।"...তাই যে
লইতেছে বিপিন, শিশুর মতোই অবুঝ আর প্রতিপাল্য বলিয়াই তো?

কিন্তু থাকাই কি সহজ? আজ চণ্ডীচরণকে কথাটা বলিলেন—
সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখখানা শুকাইয়া গেল বেচারির। বিপিনও শুনিয়াছে
নিশ্চয়, আহারের সময় ও-প্রসঙ্গটাই তুলিল না; অথচ ওর তো
উৎফুল্ল হইয়া উঠিবারই কথা। এই অভিমানের—হয়তো রাগেরই
থাকিয়া-যাওয়ায় ছেলের মনে কিসের অন্তঃশীলা সুরু হইয়াছে কে
জানে!...এ কি অসহ্য রকম ভুল বোঝা-বুঝির পালা চলিয়াছে!

আরও একটা কথা,—সত্যই এইখানেই বাঁধা পড়িয়া থাকিতে
হইবে তাঁহাকে? এইখানেই মরিতে হইবে? স্বামী যেখানে গেছেন
সেখানকার একটু মাটির জন্য মনটা যে অবাধ্য ভাবেই কাতর হইয়া
ওঠে।

নিস্তারিণী দেবী সমস্ত রাত আর চক্ষু বুজিতে পারিলেন না।

পরদিন মাতাপুত্রে যখন দেখা হইল তখন উভয়ের মনই বেশ
প্রসন্ন, মনে হয় বিপিনবিহারীও মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া
লইয়াছেন। আফিস যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন, নিস্তারিণী
দেবী বিরাজমোহিনীর কোলের মেয়েটিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন।
বিপিনবিহারী বলিলেন—"বেটি তোমার বড় ন্যাওটো হয়ে উঠেছে
দেখছি মা।"

নিস্তারিণী দেবী উত্তর করিলেন—"আমিই ওর ন্যাওটো হয়ে
উঠেছি, কাল যা করে ছেলে তিনটেকে তোর হাত থেকে বাঁচালে..."

দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"সত্যি বড্ড
রাগ ধরেছিল...ঠিক কথা, তুমি না কি রাগ করে থেকে গেলে মা?...
বাঃ, কেন?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—'রাগ করিয়ে চলে যাওয়ার চেয়ে রাগ
করে থেকে যাওয়াটাই ভালো হবে না?"

বিপিনবিহারী জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, না, আমি
রাগ করব কেন? তুমি যাও!...মা, ভেবে দেখলাম তুমি এখন নিত্যি
গঙ্গাস্নান করে ওদের আশীর্বাদ করো, তাইতেই ওদের মঙ্গল।
তোমায় বঞ্চিত করলে ওদের কি করে ভালো হবে?"

হাসিয়াই বলিলেন নিস্তারিণী দেবী—"এও এক ধরণের রাগের
কথাই হোল বিপিন; হয়তো সেটা তুই ধরতে না পেরেই বলেছিস্।
তা ভিন্ন তুই আমার দিকটা ভালো করে ভেবে দেখিস্‌নি।"

বিপিন জামা পরিতেছিলেন, থামিয়া, কতকটা ভীত ভাবেই
বলিলেন—"সে কি মা?"

লাইফ-বয়

অমল ঘোষ

কালনাগিনীর সহস্রমুখী মাথায়
টুকরো হ'য়ে গুঁড়িয়ে গেল সার্চলাইট।
—তীরে দাঁড়িয়ে একলা নিরুপায়।
সেই ঝঞ্ঝারাতে
রিক্ত হাতে
ফিরেচে এই লাইফ-বয়
অ্যাটলান্টিকের বরফগলা হাওয়ায়।

নিস্তরঙ্গ জল নীল।
সুদূর দিগন্তে এক টুকরো কালো আঁচিল
সর্বনাশা রাতের শেষ-চিহ্ন।

ঝলমলে সকালের রোদে
স্বর্ণ-বালুর বুকে ধীবর শিশুদের খেলা।
নির্ভীক ভেলায়
জাল হাতে খুসীর উজ্জ্বল মূর্ত্তিদের,
সমুদ্র-মেলা।

শুধু নির্জন এ-দ্বীপের অংশে
রিক্ত হাতে ফিরে এসেচে
এই লাইফ বয়।

ইষ্টিশান

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

এ-জীবন ইষ্টিশান!
ছোট-খাটো সিগ্‌ন্যাল নাই।
বিফল আশার হাতে লাল-নীল দুই ফ্ল্যাগ্ উড়িছে সদাই।
বড় বড় মেল ট্রেণ! এক্সপ্রেশ্যাল।
মিলিটারী গাড়ী।
কাঁপায় বুকের হাড়। চলে যায়। চোখ জলে ভারী।

ছ্যাকড়া লোক্যাল ট্রেণ:
অনুদিন ছোট কাঁদা-হাসা।
আপীস। লেজার। আর বড়বাবু! রাতে তাস-পাশা।
ছেলেদের লেখাপড়া। ঘটকালি।
মান-অভিমান!
এই নিয়ে আসে যায় একঘেয়ে বাষ্পীয় যান!

জীবনে বৃহৎ আশা।
দূর স্বপ্ন। সমুদ্র-সাধনা।
তবু ডাকে। সিটি দেয়। বুকে জাগে দিগন্ত-যাতনা।
বুকের পাঁজর কাঁপে।
উদ্বেলিত স্টেশনের ঘর।
মেল-ট্রেণ চলে যায়। পক্ষিরাজ। বক্ষ থরো-থর।

"তা বৈ কি; গঙ্গা না পেলেই বঞ্চিত হব, ওদের না-পাওয়াটা বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে পড়ে না।…ওসব নয়, আমি কাল ভেবে ভেবে ঠিক করেছি, আমি কোনও দিক্ থেকে বঞ্চিত হব না,—শশাঙ্ক আর শৈলেনকে আমার সঙ্গে দে, চণ্ডী যেমন সাঁতরায় পড়াশোনা করছিল, এরাও সেই রকম করুক; সত্যি, এখানে থাকলে বিগড়ে যাওয়ারই কথা এদের। চণ্ডীর যতটা সুবিধে ছিল, আমি রইলাম, তার চেয়ে এদের বেশি সুবিধেই হবে। পড়াশোনার তেমন বুঝি না, কিন্তু আমার মনে হয় এরা এমনই অনেকটা পেছিয়ে গেছে; সেই কবে হাতে-খড়ি হয়েছে, কী-ই বা করেছে এর মধ্যে? বড়ঠাকুর নেই, তেমনি খেতন রয়েছে, স্কুল, পাঠশালা—যেমন সুবিধে হয় ভর্ত্তি করে দেওয়া যাবে—নিয়মের টানে পড়াশোনা আপনি হয়ে যেতে থাকবে।"

ছেলেকে দ্বিধা-সঙ্কোচের কোন অবসর না দিবার জন্যই নিস্তারিণী দেবী যেন এক নিশ্বাসে তাঁহার প্রস্তাবের স্বপক্ষে যা' যা' আছে সব বলিয়া গেলেন, তাহার পর একটু থামিয়াই বলিলেন—"আরও একটা কথা এই সঙ্গে বলেই দিই—আমিও তাহলে টেঁকতে পারব বাবা। একটু স্বার্থপরের মতন শোনাচ্ছে বোধ হয়, কিন্তু তুই এক বার চারি দিক্ ভেবে দেখ।"

বিপিনবিহারী জামার একটা বোতাম দিতে দিতে থামিয়া গেছেন, মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন, মস্ত বড় একটা সমস্যা মিটিয়া যাওয়ায় একটা মৃদু হাস্যের সঙ্গে মুখটি যেন আলোয় ছাইয়া গেছে, বলিলেন—"মা!…"

আরও কি বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঐ একটি কথার মধ্যেই সমস্ত আনন্দ আর ভরসা যেন উজাড় করিয়া দিয়া মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর মনটাকে গুছাইয়া লইয়া বলিলেন—"আমার মাথায়ও কথাটা কেন যে আসেনি তাই ভাবছি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও যে হচ্ছে মা—তোমার ঘাড়ে আবার এই বোঝা চাপিয়ে দোব? —কোথায় একটু হাল্কা হয়ে যাবে, না…"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বোঝাটা তোরও নয় আমারও নয় বিপিন; যাঁর বোঝা তিনিই আড়ালে থেকে ব্যবস্থা করছেন। সত্যি সামান্য কথাই কাল সমস্ত রাত জেগে জেগে শেষ কালে যখন হঠাৎ মনে হোল, মনে হোল খুব খানিকটা ভাবিয়ে ভাবিয়ে তিনি এক কথাতেই সমস্যাটা যেন পূরণ করে দিয়ে গেলেন।…তুই আর অমত করিস্‌নি বিপিন।"

[ক্রমশঃ]

জামাই ষষ্ঠী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মাতা জগদম্বা বললেন,—

'বাবা, এবার একবার শ্বশুরবাড়ী বেড়িয়ে এসো। তিন বছর তোমার বিয়ে হয়েচে, একবারও শ্বশুরবাড়ী যাওনি—'

'কেন, বিয়ের সময় ত গিয়েছিলাম—'

'আরে বোকা ছেলে, তখন কি তাকে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া বলে?'

'ওঃ! হ্যাঁ, তার পরে আর ওদিকে যাওয়া হয়নি বটে। কিন্তু এত দূর যে মা!'

'হ্যাঁ সেই জন্যেই ত ফি-বারে তাঁদের নেমন্তন্ন একটা-না-একটা কারণ দেখিয়ে ফেরৎ দেওয়া হয়। এবারে বেয়ান অনেক করে আমাকে লিখেছেন, আর—বৌমাটিও যুগ্যি হলো!'

মাতা ঠিক কি বললেন, তা না বুঝলেও রঞ্জিতের এটুকু বুঝতে বিলম্ব হলো না যে এবারে আর আপত্তি করা চলবে না। সে বলে উঠলো 'আমার কিন্তু 'গদা' দুটো নিয়ে যেতে হবে'—রঞ্জিৎ বক্সিং শিখছে—তার বড় সাধ ঘুষি-লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ন হবে। সে বক্সিং গ্লাভ্‌কে বলতো 'গদা'।

মা বললেন, 'কি? শাশুড়ীর সঙ্গে বক্সিং লড়তে যাবি না কি?'

রঞ্জিৎ বললে 'তিনি কি খুব বকসিং লড়তে পারেন না কি?'

'দূর মুখ্যু কোথাকার! মেয়ে-মানুষে আবার বক্সিং করে না কি?'

'হ্যা মা। তুমি জান না, আজ-কাল অনেক মেয়ে বক্সিং, যুযুৎসু শেখে। তুমি দেখনি?

'না, বাবা, আমাদের কোনও পুরুষে ও-সব মদ্দানি জানে না। তা যাক্, তুমি ঐ দুটো কিম্ভুত কিমাকার জিনিষ নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।'

'তুমি ত বলে দিচ্চ, কিন্তু রোজ একটু করে এক্সাইজ (Exercise) না করলে আমার ক্ষিদেও হয় না, আর মেজাজ যায় বিগড়ে—'

'তা যাক্‌গে' বলে মাতা রঞ্জিতের স্যুটকেস্ গুছিয়ে দিলেন, শাশুড়ীর প্রণামী, পাথেয় ইত্যাদি তার পার্সে ভর্ত্তি করে দিতে ভুললেন না।

রঞ্জিৎ মাতার পায়ের ধূলো নিয়ে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে কটকে রওনা হলো। রঞ্জিতের শ্বশুর ভীমাপদ বাবু কটকের মোক্তার।

২

কলকাতা হতে কটক যেতে আজ-কাল বেশী সময় লাগে না। কিন্তু এরি মধ্যে রঞ্জিতের মেজাজ ধীরে ধীরে প্রধূমিত হয়ে উঠ্‌ছিল। শরীর একসাইজের অভাবে আড়ষ্ট, মন অবসন্ন এবং মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠবার উপক্রম হয়েছিল। ভোরে সে শ্বশুরবাড়ী পৌছুল; তার শাশুড়ী এসে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সে প্রণাম করতেই প্রথমটা ভুলে গেল। তার পর শাশুড়ী যখন নিজে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেম, তখন রঞ্জিতের মাথা নোয়াবার কথা স্মরণ হলো। কিন্তু প্রণামীর টাকাটা ঠিক কোন্ সময়ে দাতব্য, তা স্থির করবার মতো স্থির-মস্তিষ্ক তার তখন ছিল না।

কারও কারও ব্যায়াম, সঙ্গীত প্রভৃতি নেশার মত হয়ে দাঁড়ায়। আমার এক জনের কথা মনে পড়ছে, তিনি রোজ সকালে তিন মাইল করে' ভ্রমণ করতেন। যে-দিন বৃষ্টি-বাদলের জন্যে বেরুতে পারতেন না, সে-দিন একতলা থেকে দুতলা বার-বার ওঠা-নামা করতেন। তা হলেও তাঁর মেজাজ সে দিন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতোই অন্ধকার হয়ে থাক্‌তো। স্ত্রীর সঙ্গে সে দিন যে আলাপ-আলোচনা হতো অন্যের পক্ষে তা তত সুশ্রাব্য হতো না, ছেলে-মেয়েদের ব্যবহারে একটির পর একটি ত্রুটি বের হতো এবং বামুনঠাকুর দাক্ষিণ্যের অভাবে নোটিশ দিয়ে বসতো।

রঞ্জিতের প্রকৃতিটা ঠিক সে ধরণের ছিল না। সে ছিল সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলে, জীবনে তার অন্য কোনও খেয়াল ছিল না। হয়ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পড়লে দুই-একটা সিগারেট বা দুই-এক পাত্র পানীয় কখনও কখনও প্রত্যাখ্যাত হতো না। তবে পয়সা খরচ করে সে এ সকল ব্যসনকে মোটেই প্রশ্রয় দিত না। বস্তুতঃ, সে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিল। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক সম্বন্ধে শোনা যায়, তিনি সুরার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁকে এক দিন পানের মজলিসে এক জন সমধর্মী—লেখক হিসাবে নয় সুরাসক্তি বিষয়ে—জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ মদ্য পছন্দ করেন? লেখক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন 'অন্য লোকের খরচায় যে কোনও মদ্য আমার পছন্দ।'

রঞ্জিতের এ সব দোষ ছিল না; সত্যই তার স্বভাবে কেউ কোনও দোষ দিতে পারতো না। এমন কি, রমণীর রূপও তাকে তেমন আকৃষ্ট করতো কি না সন্দেহ। এই শ্বশুরবাড়ী এসেও তার সে-দিকে বেশ আগ্রহ দেখা দিল না। হয়ত তার নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চাটা স্থগিত না হলে মেজাজ থাকতো ভাল; আর পরিবারকে নতুন করে' দেখবার সখও মনে আসতো। তার স্ত্রীরও যে সে-দিকে খুব ঔৎসুক্য, তা-ও মনে করবার তেমন প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ক্রমে বেলা বেড়ে গেল। অন্দর মহলে নানা প্রকার খাদ্যের

অবসরে শ্যালক ও শ্যালিকার ব্যঙ্গ-কৌতুক আস্বাদন করতেই দিনের প্রথম ভাগ ভালই কাটলো। কিন্তু স্ত্রীর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তার অবশ্য অপরাধ নেই। সে বেচারী একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোয়। তার আবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘট্‌লে সে চোখ-মুখ না ধুয়েই কাঁদ্‌তে বসে। সে জন্মে কেউ তার অকাল-নিদ্রা ভঙ্গ করে না। কটকের জল-বায়ুর গুণে তার স্বাস্থ্যও কিছু অতিমাত্রায় ভাল। বিয়ের সময়কার চুড়ি বাজু বালা সব কেটে বের করে' আবার নতুন করে গড়তে হয়েচে। তার স্বাস্থ্যের যেমন উন্নতি হয়েছে, সেই অনুপাতে ওজনও বেড়ে গেছে এবং চলা-ফেরা স্বতরাং কিছু মন্থর হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভীমাপদ বাবুর লক্ষ্মীর সংসার। বামুন ঝি চাকরের কলরবে গৃহ সর্বদাই মুখরিত। উড়ে চাকর বামুনদের আর যে কোনও দোষ থাক্, ওরা একসঙ্গে হলে বাড়ী বাজার-রাস্তা-ঘাট গুলজার করে তুলে।

রঞ্জিৎ একটু গোল বাধালে যখন অন্দর মহলের প্রভাব এড়িয়ে ভীমাপদ বাবুর বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হলো। ভীমাপদ পসার-অলা মোক্তার। সকালে তাঁর মক্কেলরা একে একে আসতে থাকে এবং তাদের আগমনের শব্দ প্রেয়সীর মলের ঝমর-ঝমর শব্দ অপেক্ষাও তাঁর কর্ণে মধুবর্ষণ করে। তাদের যত্ন ও খাতিরের অবধি নেই। কারণ, মক্কেলই হলো উকীল-মোক্তারের টাঁকশাল।

ভীমাপদর এক মক্কেল তাঁর প্রয়োজনান্তে প্রস্থানোন্মুখ। এমন সময় সেখানে রঞ্জিতের আবির্ভাব। মক্কেলটির গঠন বেশ গোলগাল! মস্তকে মোটা একগুচ্ছ কেশ, অবশিষ্ট খুব ছোটো করে' ছাঁটা। কপালে প্রকাণ্ড চন্দনের ফোঁটা, দুই কানের ডগায় পুরু চন্দনের টিপ। চুয়া-চর্চিত পানের রসে মোটা অধর স্বরঞ্জিত, বয়েসও অল্প।

রঞ্জিৎ তাকে নমস্কার করে' বল্‌লো 'মশাইয়ের বক্‌সিং আসে? তা হলে এক হাত?'

উড়ে ভদ্রলোক তার কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে' চেয়ে রইলেন। রঞ্জিৎ তার বোধশক্তির শোচনীয় অভাব বুঝতে পেরে নিজে বেশ ঘুষি বাগিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। তখন সে ভদ্রলোক অবোধ্য ভাষায় চীৎকার করে' উঠলেন। ভীমাপদ তাড়াতাড়ি উঠে ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারলেন না। উড়ে ভদ্রলোকটি যে অত্যন্ত অপমানিত হয়েছেন, সেটুকু বুঝতে তাঁর বিলম্ব হলো না। কিন্তু তাঁরই জামাই, বিশেষতঃ নতুন জামাই—অকারণে তাঁর মক্কেল এক জন অপরিচিত লোককে কেন অপমান করবে, ভেবে কূল পেলেন না। তাঁর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়লো—না পারেন নতুন জামাইকে ধমক দিতে, না পারেন মক্কেলকে ঠাণ্ডা করতে। রঞ্জিৎও একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। কাজটি যে খুব শিষ্ট হয়নি, তা তার বুদ্ধিতে অস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। কিন্তু বক্‌সিং ত অত্যন্ত নির্দোষ আমোদ। এতে চটবার কি কারণ আছে? উড়ে মনুষ্য কি না! ধ্যেৎ—

ভীমাপদ বিরল-কেশ মস্তকে হাত বুলাতে বুলাতে একেবারে অন্দরে গিয়ে গৃহিণীর শরণাপন্ন হলেন। গিন্নী কিছু না বুঝ্‌লেও, জামাইয়ের স্নানের সময় হিমকল্প তৈল মাখিয়ে দেবার জন্য চাকরকে বিশেষ ক'রে বলে দিলেন। সেই হলো আর এক বিভ্রাট।

পুরাতন চাকর মোহন স্নানের ঘরে সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো। জামাইবাবু আসতেই সে ঘটা ক'রে কোমরে কাপড় বেঁধে, হিমকল্প তেল মাথায় দেবার জন্মে যখন তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো, তখন রঞ্জিৎ প্রথমটা তার মতলব বুঝে উঠ্‌তে পারেনি। সে-ও মালকোঁচা দিয়ে বকসিং-এর ভঙ্গীতে আত্মরক্ষায় তৎপর হলো। সে বেশ ঘুষি বাগিয়ে দুই-এক চক্র ঘুরতেই মোহন হেসে আকুল। সে যা বল্‌লো তা অবশ্য রঞ্জিৎ কিছু মাত্র বুঝতে পারলো না। তবে তার মনে সন্দেহ রইলো না যে সকালবেলার মক্কেল-ঘটিত দুর্ঘটনার ফলে এই ষড়যন্ত্র হয়েচে! কিন্তু তার ভয়ের কোনও হেতু ছিল না, কারণ করবক্ষা-কবচ দুটি না থাকলেও এই পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ভৃত্যকে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হবে না! সে নানাপ্রকার কসরৎ করে' মোহনকে যখন ভূপাতিত করে' ফেল্‌লো, তখন মোহনের বুঝতে বাকী রইল না যে আর যাই হোক্ নতুন জামাইবাবু ঠাট্টা করছেন না।

স্নানের ঘরে ভারী জিনিষ পড়ার মতো শব্দ শুনে অন্য চাকর ছুটে এল এবং দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে' মোহনের ধরাশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করে' খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেল! ক্রমে বাড়ীর অন্য লোকও জমায়েৎ হলো এবং রঞ্জিতের শাশুড়ী যোগমায়া ব্যতীত আর সকলেই মোহনের অবস্থা দেখে হাস্য সংবরণ করতে পারেনি।

যোগমায়া অবস্থাটা কথঞ্চিৎ বুঝে নিয়ে বললেন 'বাবা, তুমি আপনি তেল মাখ্‌তে পারবে? মোহন তুই যা তো ওপরের ঘর থেকে রূপোর থালা-বাটি নিয়ে আয়।'

মোহন গামছা দিয়ে পিঠের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে নিতান্ত বোকার মতো প্রস্থান করলো!

রঞ্জিৎ মনে মনে কিছু বিরক্ত হলো যে এক জন ষণ্ডামার্ক উড়ে চাকরকে তেল মাখাবার নাম করে' এরূপ অসভ্য আচরণ করবার জন্মে প্ররোচিত করবার কি দরকার ছিল? যা হোক, ব্যাটার শিক্ষা হয়েছে—সহসা আর কারও গায়ে হাত দিতে সে সাহস করবে না!

মোহনের অহঙ্কার ছিল যে সে বাবুর চাকরদের মধ্যে সব চেয়ে বল রাখে—তার সে অভিমান চূর্ণ হওয়াতে সে যে খুব খুসী হলো তা বোধ হলো না! কিন্তু এক জন খুব মনের সঙ্গে খুসী হয়েছিল—সে রঞ্জিতের স্ত্রী। স্বামীর পৌরুষ কোন্ স্ত্রীকে না খুসী করে?

৩

অধিক রাত্রে যখন রঞ্জিৎ তার জন্য নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো তখন দরজা পার হতেই তাকে অভ্যর্থনা করলো ভীষণ নাসিকা-গর্জন। সে দেখলো তার স্ত্রী পরম শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছেন এবং সে শয্যায় আগন্তুকের জন্য সুপরিসর স্থানের একান্ত অভাব। রঞ্জিতের মনে ছিল না শান্তি। আগের রাত্রির অধিকাংশ সময় ট্রেণে ভাল ঘুম হয়নি। জামাই-ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় শ্বশুর যে ভোজের আয়োজন করেছিলেন, তাতে অর্দ্ধেক রাত্রি কাবার হয়ে গেল। রঞ্জিৎ ভাবলো যে অবশিষ্ট রাত্রিটা কোনও রূপে কেটে যাবে। সে জড়ো-সড়ো হয়ে কোনও প্রকারে শুয়ে পড়লো।

ঘুম আস্‌তে কিছু বিলম্বই ত হলো। একে নাকের ঘর্ঘর শব্দ তাতে আবার 'একসাইজে'র অভাবে দেয়ালীর রাতের একরাশ শ্যামাপোকা পিল্ পিল্ করে' যেন তার সর্ব্বশরীরে গতাগতি করছে।

একটু পরে স্ত্রী তার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লো, 'ওগো ভাল হয়ে শোও, তোমার নাক ভীষণ ডাকছে।' তখন রঞ্জিতের সবে একটু তন্দ্রা এসেছে।

দেশলাই

অজিত দত্ত

প্রমিথিয়ুসের অতো কষ্টে আনা আগুন এলো আমাদের পকেটে পকেটে—হৃতগৌরবের লজ্জায় কালো মুখোস এঁটে।

আদিম মানবের কাছে অগ্নি ছিলো দেবতা—এমন কি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সূর্য-চন্দ্র-আকাশ, প্রকৃতির আর যে-সব প্রাণদায়ক মঙ্গলময় রূপ সে প্রত্যক্ষ করতো তাদেরও সে দেবপর্যায়ে তুলেছিলো বটে, কিন্তু অগ্নির কাছে ছিলো সকলেই তুচ্ছ। কেন না এমন প্রচণ্ড, প্রত্যক্ষ, সর্বগ্রাসী শক্তি আর কার? সূর্য-চন্দ্র, আকাশ-বাতাস, মেঘ ও সমুদ্রের রূপ ও গুণ উপভোগ ও অনুভব করিবার জন্য হয়তো খানিকটা ভাবপ্রবণতা, খানিকটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্তু আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, গুহামুখে আগুন জ্বেলে রাখলে হিংস্র-শ্বাপদের ভয় থাকে না, অগ্নিতে দগ্ধ করলে মাংস সুস্বাদু হয়, এসব কথা নির্বোধতম আদিম মানবের স্বল্পতম কালের মধ্যে বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি।

এমন প্রচণ্ড শক্তি যাঁর, মানবের এমন হিতকারী বন্ধু যিনি, তিনি শক্তিমান্, কল্যাণময় দেবতা ছাড়া আর কি হতে পারেন? অগ্নি দেবাদিদেব, তাঁর পূজা তাই সর্বাগ্রে, ঋগ্বেদ তাই সেই পুরোহিত অগ্নির স্তোত্র দিয়ে শুরু। সব কাজের প্রারম্ভে তাই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি—অগ্নিদেবকে খাদ্যে, পূজায় তুষ্ট করা।

মানুষ যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমা থেকে ঈশ্বরকে আলাদা করে নিলে, সেদিনও কিন্তু আগুনের প্রতি তার সভয় শ্রদ্ধা ও সমাদর তিলমাত্র কমেনি। বরং সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের প্রয়োজন গেছে বেড়ে। মানুষ শিখেছে, কেবল পশুমাংস নয়, শস্যাদিও কি করে অগ্নিতে সুপক্ক, সুস্বাদু করে নিতে হয়। অগ্নি যে কেবল দহনই করে না, আলোও দেয়, এ-ও তার নতুন শিক্ষা। আগুনের একটি শিখাকে তাই সে বেঁধে রাখল প্রদীপে। ঘরের অন্ধকারের চিহ্ন শুধু পড়ে থাকলো কম্পমান ছায়ায় ছায়ায়। তার পর সে অগ্নিশিখাটি ছড়িয়ে পড়লো পথে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, আলোয় আলোয়। প্রচণ্ড, ভয়াবহ, লোলজিহ্ব, বুভুক্ষু বহ্নিদেবকে মানুষ দিলে খণ্ড খণ্ড করে—তার সাংসারিক, সামাজিক প্রয়োজনে। আগুনের বিভীষিকা সে প্রায় ভুলেই গেলো। এমন কি যে কল্যাণ সে আগুনের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আদায় করে নিতে লাগলো, তার মর্যাদা দিতে পর্যন্ত তার মনে আসলো না। কেন না আগুনকে সে আজ বেঁধেছে। যে দেবতার কাছে একদিন সে নতমস্তকে বরভিক্ষা করেছিলো, আজ তাকে সে করতে শিখলো অবহেলা।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যে বহ্নি ছিলো শুধু মানুষের গৃহে ও সমাজে বন্দী, মানুষের চক্রান্তে সে দু'ইঞ্চি বাক্সে বন্ধ হয়ে এলো পকেটে। যার বিশাল দেহ ছোট একটু শিখার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে বিস্তৃত করবার জন্যে ছটফট্ করতো, তার সেই কম্পমান শিখাটিকেও মানুষ বারুদের কালো মুখোস এঁটে দিলে অবরুদ্ধ করে। একটা দেশলাইয়ের কাঠির ডগা দেখে কে বলবে এটা আগুন! আলাদীনের দৈত্য কি এর চেয়েও আশ্চর্যের?

সেই ঋগ্বেদের দেবতা আলাদীনের দৈত্যকে আমরা পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরছি। যদিও জানি না; কিংবা ভুলে থাকি, কী প্রচণ্ড শক্তি আমার পকেটে, তবু দেশলাইটা পকেটে না থাকলে নিজেকে যেন বড় অসহায়, বড় দুর্বল মনে হয়। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। আগের মুহূর্তেই একটি সিগারেট নিঃশেষ করে' থাকলেও তক্ষুনি একটা সিগারেট জ্বালাবার ইচ্ছা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। নিজের অজ্ঞাতে হাতটা বার-বার পকেটে চলে যায়, খুঁজে বেড়ায় সেই পোষা দৈত্যটাকে যার স্ফুলিঙ্গ থেকে ইচ্ছে করলেই একটা খাণ্ডব-দহন করে দিতে পারি। এমন আজ্ঞাবাহী, এত প্রচণ্ড শক্তি আমাদের মতো সামান্য সাধারণ মানুষের আয়ত্তে—ভাবতে অদ্ভুত লাগে। মনে হয়, অবচেতন মনে এ বোধটা বোধ হয় আজও আছে।

নিজের কথা বলি; দেশলাই ছাড়া আমি হৃতগাণ্ডীব অর্জুনের মতো ম্রিয়মাণ। আমার পকেটে দেশলাই নেই এ কথা জেনে নিজে যতোখানি পীড়িত বোধ করি, অপরের কাছে এ কথা স্বীকার করতে—অপরকে এ কথা জানাতেও আমার লজ্জা তার চেয়ে কম নয়। বালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসি যেতে ট্রামে উঠে যখন দেখি পকেটে সিগারেট প্যাকেটটা নিঃসঙ্গ পড়ে আছে, তখন দু'-দু'বার লোকের কাছ থেকে দেশলাই চাইতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। কেন না আমি যে আজ হৃতশক্তি, দেশলাই চাওয়া তো তারই স্বীকারোক্তি। কেবল তাই নয়, আমি যে-শক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন আর এক জন সে শক্তির অধিকারে গৌরবান্বিত, এ কথা ভাবতে কি ভালো লাগে? জানি, যা চেয়ে নিচ্ছি আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে তার দাম কিছুই নয়। তিন পয়সার একটি দেশলাই—ষাটটি তাতে মুখোস-আঁটা অগ্নিবাণ। তার থেকে একটি কাঠি দরিদ্রও অকাতরে দিয়ে দিতে

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

রঞ্জিৎ অবাক্ হয়ে গেল। সে বললো 'তোমারই নাক ডাকার জন্যে ত আমি ঘুমুতে পারছিনে।'

কুললক্ষ্মী উচ্চহাস্য করলো—রঞ্জিতের স্ত্রীর নাম কুললক্ষ্মী। কুললক্ষ্মী বললো, 'তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি নে। কিন্তু আমার নাক যে ডাকে তা ত জানতাম না—'

রঞ্জিৎ উত্তর করলো "কি আশ্চর্য্য! আমিও ত ঠিক সেই কথাই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। না;—আজ রাত্রে অদৃষ্টে আর ঘুম লেখা নেই দেখ্‌ছি'—

কুললক্ষ্মী একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললো 'না-ই বা হলো এক রাত্রি ঘুম। রোজ ত কুম্ভকর্ণের পূজো করা হয়—এক দিন না-ই বা হলো—'

রঞ্জিৎ দেখ্‌লো এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। রাত্রিটুকু গল্প-সল্প করেই না হয় কাটানো যাক্। দু'জনের গল্প-কৌতুকে অনেক রাত্রি কেটে গেল।

তার পরে কখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা বুঝতে পারেনি।

পারে। কিন্তু শুধু পয়সায় কি সব জিনিসের দাম মাপা যায়? এই যে হেমন্তের সূর্যের আলো, এই যে চাঁদ, এই বাতাস আর নদী আর সমুদ্র আর পাহাড়—ইংরেজ তো আজও এদের বাজারে এনে কন্ট্রোলের দাম বাঁধেনি। দেশলাইয়ের দাম যতোই চড়ুক আজও ইংরেজ আগুনের দাম বেঁধেছে অল্পই। পৃথিবীর যে-কটা সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে মহিমান্বিত জিনিষ, হাটে-বাজারে তার দাম নেই! কিন্তু তাই বলে তো তাদের মর্যাদা দিতে ভুলতে পারি না।

পথে-ঘাটে এক শ্রেণীর লোক হরদম দেখা যায় যাঁরা অল্প মাইনের অনেক দিনের পাকা কেরাণী। এঁদের চিনতে কোনো কষ্ট নেই, ট্রাম-বাসে কোনো রকমে একটু জায়গা অধিকার করে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এদের চোখ দু'টি আসে বন্ধ হয়ে, মাথা পড়ে বুকের উপর ঝুঁকে অথবা পাশের যাত্রীর কাঁধের উপর। কিন্তু যতোই ঘুমোন, কখনো এরা গন্তব্য স্থান পেরিয়ে যান না, এমন কি কোন্ মোড়ে এসে বিড়ি ধরাতে হবে তা পর্যন্ত খেয়াল রেখে নিদ্রাদেবীকে এঁদের মত মেনে চলতে হয়! পরশুরামের বিখ্যাত "তিনে কত্তি তিন"-এর জাত এঁরা। বিড়িই এঁরা খান। কিন্তু এ-জাতের লোক খুব কমই দেখেছি যাঁরা পকেট থেকে বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই বার করেন। বহু দিনের অভিজ্ঞতায় এ-সত্য ওঁদের ভালো করেই জানা আছে যে, যেখানেই তিন জন মানুষ আছে, সেখানেই অন্তত এক জনেরও পকেটে দেশলাই থাকতে বাধ্য! কাজেই বিড়ি ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের অভাব এঁদের কখনো হয় না—তা সে-ট্রামে-বাসেই হোক কিম্বা রাস্তায়-ঘাটে আফিসেই হোক। দেশলাই জিনিষটা চাইলেই লোকের কাছে পাওয়া যায়। আমার মতো দেশলাই-গর্বে গর্বিত যাঁরা তাঁরা খুশি হয়েই লোককে দেশলাই ধার দেন। তাছাড়া কলকাতার মতো জন-সমুদ্রের একই লোকের কাছে রোজ রোজ দেশলাই ধার করবার সম্ভাবনা কম। রোজই এমন একটা ভার দেখানো চলে যে দেশলাই আমার পকেটে রোজই, সর্বদাই থাকে, শুধু আজই জীবনে এই এক দিনই একবারই মাত্র অপরের একটি দেশলাই-কাঠি পোড়াতে হচ্ছে।

এই যে দেশলাইবিহীন অগণিত বিড়িপায়ী কেরাণীর দল—এঁদের দেশলাইহীনতার দোষ দেবার কিছুই নেই। একটা বিড়ির শেষ পর্যন্ত খেতে অন্তত তিনটে দেশলাই-কাঠি পোড়াতে হয়। দশ-বারোটা বিড়ি পোড়াতে আজকালকার "ওয়ার কোয়ালিটি" দেশলাইয়ের বাক্স ফাঁক হয়ে যায় (দেশলাইয়ের পয়সাগুলো বাঁচাতে পারলে আরো কিছু বিড়ি পকেটে আসে। এক্ষেত্রে এমন কোন্ মূর্খ আছে যে, বিড়ির পয়সা দেশলাইয়ে খরচ করবে? বিশেষতঃ এ-শ্রেণীর লোক যে আগুনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উদাসীন তা আমরা পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি! পাশের যাত্রীর কাছ থেকে দেশলাই ধার করে বিড়ির আগুনে তারই ধুতি বা পাঞ্জাবী পুড়িয়ে দিয়ে এঁরা নির্বিকার থাকেন। চোখ বুজে অকুতোভয়ে বিড়ির আগুন ছড়াতে ছড়াতে এঁরা ট্রামে-বাসে চলেন। নিজেকে বাঁচিয়ে যতক্ষণ চলা যায়, ততক্ষণ আগুনের ক্ষমতার কথা এঁদের মনে কখনোই জাগে না। কাজেই দেশলাই পকেটে না থাকলেই বা এঁদের মনঃকষ্ট কেন থাকবে?

আর এক জাতের লোক দেখেছি, দেশলাই যাদের প্রাণ, আমার চেয়েও যাঁরা দেশলাই-ভক্ত। দেশলাই সংগ্রহই এঁদের জীবনের ব্রত। এঁরা যে অভাবগ্রস্ত তা নয়। বরং অনেকেই সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন। কৃপণও এঁরা নন। আড্ডা দিতে বসে খুসি-মনে এই দুর্দিনেও এক টিন সিগারেট বন্ধু-বান্ধবকে বিলিয়ে দিতে এঁরা কুণ্ঠিত নন। কিন্তু এঁদের সাহচর্য উপভোগ করার পর প্রায়ই দেখা যায়, বন্ধু-বান্ধবের দেশলাইগুলো সকলেরই অজ্ঞাতে যেন কোন মন্ত্রবলে এই ভদ্রলোকের পকেটস্থ হয়ে গেছে। অপরের দেশলাই সুযোগ পেলেই এঁরা পকেটস্থ করে থাকেন, এবং সেটা বহু দিনের অভ্যাসবশে অনেক সময় নিজেরও অজ্ঞাতসারে এমনি সুচারুরূপে করেন যে, এক-ঘর লোকের সজাগ চক্ষুও এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পকেটান্তর লক্ষ্য করতে পারেন না। আমি দিল্লীতে এক ভদ্রলোককে জানতাম—যিনি রাজ-সরকারে হাজারখানেক টাকার মাইনের বড় চাকরি করতেন। যুদ্ধের আগে এ-চাকরী নেহাৎ সামান্য ছিলো না। ভদ্রলোক ছিলেন প্রৌঢ়—গণ্য-মান্য-সম্ভ্রান্ত এবং অবিরাম ধূমপায়ী। বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কেউ এলে তৎক্ষণাৎ পকেটস্থ সিগারেট-কেস মেলে ধরতে তাঁর কার্পণ্য ছিলো না। কিন্তু দেশলাইটি নয়। সর্বদাই ইনি আগন্তুকের কাছ থেকে দেশলাই ধার করে সিগারেট ধরাতেন এবং সে দেশলাই তার মালিক ফিরে পেত কমই। ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা এতই বেশী ছিলো যে, তাঁর বন্ধুদের দেখেছি তাঁর বাড়ি গিয়ে প্রায়শই দেশলাই-হীনতার ভাণ করতো।

আরেকটি ভদ্রলোক আমাদেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সারা বিকেল আড্ডা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন তাঁর পকেটে তিন-চারটে দেশলাই প্রায়ই পাওয়া যেত আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, এই রেটে দেশলাই জমালে ভবিষ্যতে শুধু দেশলাই বিক্রি করেই তিনি কলকাতায় বাড়ি করে ফেলবেন! হায় রে! তখন কি আর ভবিষ্যৎ জানি? বন্ধুবর যদি শুধু দেশলাই সংগ্রহ করেই তাদের সম্বন্ধে নিস্পৃহ না হতেন, যদি দেশলাই সঞ্চয় করে একখানা ঘরও ভর্তি করে ফেলতে পারতেন, তাহলে কি আর যুদ্ধের বাজারে একখানা ছোটো-খাটো বাড়ী করা তাঁর পক্ষে কষ্ট হোতো?

এই সব দেশলাই-ভক্তদের দেশলাই সংগ্রহের ব্যাপারটাকে চুরি বললে মহা অপরাধ হবে। এঁরা হচ্ছেন অগ্নিহোত্রীর জাত। পুরা কালে এঁরাই ছিলেন যজ্ঞাধিকারী। আলাদীনের দৈত্য এঁদের চিরদিনের ক্রীতদাস। আমার মত বেকায়দায় এঁদের কখনোই পড়তে হয় না।

এই সব নমস্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরি। খাওয়া-দাওয়া সেরে গভীর রাত্রে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে দেখি দেশলাই আমার পকেটে নেই, যদিও বা কোনো রকমে উনুনের নিবন্ত আগুন থেকে সিগারেট ধরানো চলে, কিন্তু দারুণ ঘুম পেলেও দেশলাইহীনতার কথা ভেবে কিছুতেই আর ঘুমোতে পারি না, বারংবার ধূমপানের স্পৃহা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। সেই মধ্যরাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে পান-বিড়ির দোকান তখনও খোলা পাওয়া যায়। একটার জায়গায় দুটো দেশলাই সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরি—এখন যতো ইচ্ছে সিগারেট খেতে পারবো এই সান্ত্বনা নিয়ে। কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ধূমপানের স্পৃহা কোথায় চলে যায়। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসে। আলো নিবিয়ে মুহূর্তে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার অনুগত অদ্ভুতকর্মা বেতাল যে আমার শিয়রেই আছে, এই অনুভূতি মনে প্রগাঢ় শান্তি আনে। কাল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই পাবো অগ্নির প্রাণদায়ী স্পর্শ, অগ্নিদেবের আশীর্ব্বাদ।

হীনমন্যতা

শ্রীচিত্রগুপ্ত

৪

'চালিয়াৎ' লোকদের কে না চেনে? তাদের অসার চালিয়াতির শূন্য দম্ভের স্বরূপটা যে কত কদর্য্য, সেটা শুধু তারা নিজেরা ছাড়া আর সকলেই বুঝতে পারে। নেহাৎ বেচারা তারা। আসলে এরা কৃপারই পাত্র—ক্রোধের নয়।

একটা ইংরেজী কৌতুক-কণা পড়েছিলুম, সেটা এখানে বিবৃত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক ধনী মেম সাহেবের দরিদ্রা দাসীটি মনিব-বাড়ীর দামী দামী খাবার-দাবার, আনাজ-কোনাজের খোসা ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশগুলোকে বাড়ীর সামনের জঞ্জাল ফেলার জায়গায় না ফেলে সেগুলোকে কোথায় যেন নিয়ে যেতো। ব্যাপারটি লক্ষ্য ক'রে তার মনিব মেম সাহেবটির এক দিন কৌতূহল জাগলো। তিনি দাসীকে বললেন, 'মেরি! তুমি জঞ্জালগুলো আঁস্তাকুড়ে না ফেলে রোজ কোথায় নিয়ে যাও?' উত্তরে মেরী লজ্জা আর কুণ্ঠায় এঁকে-বেঁকে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে, 'কি জানেন মেম সাহেব? আমি ওই জঞ্জালগুলো এখানে ফেলে নষ্ট না ক'রে বয়ে নিয়ে গিয়ে ওই দিয়ে আমার নিজের বাড়ীর 'আঁস্তাকুড়'টা সাজাই। ওই সব দামী দামী জিনিসের খোসা-টোসাগুলো সেখানে প'ড়ে আমাদের আঁস্তাকুড়টার খাসা খোলতাই হয়। [illegible] এমন stylish যে দেখ্‌তে হয় সে আর কী বলবো মা!'

নিজেদের জীবনের আঁস্তাকুড়টাকেও এই ভাবে 'ষ্টাইলিশ' দেখাতে যে সব চালিয়াৎ লোক, তারা হীনমন্যতারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক ছেলে, যাদের বাবা হয়তো 'খান সাহেব' বা 'রায় বাহাদুর' খেতাবের অধিকারী বড়ো চাকুরে কি মফঃস্বলের কিছু জমি-জমার মালিক—যাঁদের মাসিক আয় বড়জোর পাঁচ-সাতশো কি হাজার দেড় হাজার—চালিয়াতিতে তেমন ছেলেদের 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো'পনা হয়তো অনেকেই দেখেছেন। তারা হয় মাসিক পাঁচ-সাত হাজার খরচ করার মিথ্যে গল্প করে, আর না হয় সত্যি সত্যি কিছু বেশী খরচও ক'রে বসে—ধারধোর ক'রে। মোট কথা, এরা সব সময়েই দেখাতে চায় যে এরা মস্ত লোক!

'বড়াই'টা অবশ্য সব সময়ে টাকার না হ'য়ে, সাঁতার কাটা, মাছধরা কিম্বা 'বাঘমারা'র কাহিনীও হ'তে পারে। এদের 'বাঘমারা'র কাহিনী লোকে যতই কেন না অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠুক, এরা নিজেরা এই ভাবে 'বাঘ মেরে' কিন্তু যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

আর এক রকমের 'বাঘমারা' চালিয়াতি দেখতে পাওয়া যায়—সেগুলো হ'চ্ছে 'যদি-মার্কা'। এরা সব কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কীর্ত্তিত 'হতেম পারেম' জাতীয় বীর বা কবি। এই দেশীয় লোকদের অনেক সময়েই বলতে শোনা যায়, 'আমি যদি রাতে ঘুমোতে পেতুম তাহ'লে আমি কী না হ'তে পারতুম?' অর্থাৎ এরা বল্‌তে চায় যে এদের অনিদ্রা রোগের জন্যেই যা এরা জীবনে মহৎ কিছু হ'তে বা ক'রতে পারলে না। তা' নইলে···ইত্যাদি। ভাবটা এই যে, তোমরাও এতে সায় দিয়ে বলো, 'তাই তো! সত্যিই তো! তা বটেই তো। আহা বেচারা! অমন একটা মানুষ কি না তার ওই পোড়া রোগটার জন্যেই জীবনে কিছু ক'রতে পারলে না! কিন্তু কী আর করা যাবে? রোগের উপরে তো আর মানুষের কোনো হাত নেই? নইলে মানুষটি কি একটা যা-তা' লোক?'

আবার এমন জ্ঞান-পাপীও আছে, যারা নিজের কুঁড়েমী নিয়েই চালিয়াতির 'বেসাতি' করতে 'পিছ-পা' হয় না। তারা বলে, "প্রতিভা'টা কি আর আমার সোজা, হায়? কী বলবো, ভগবান্ আমায় 'কুঁড়ে' করেই যে একদম মেরে রেখেছেন। নইলে একবার দেখিয়ে দিতুম জীবনে উন্নতি করা কাকে বলে!" অর্থাৎ বলতে চায় যে, ওই কুঁড়েমীটুকু না থাকলে এরা এদের আর সব গুণের জোরে হয়তো বা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টই হতে পারতো। মুখে নিজের কুঁড়েমীর কথা স্বীকার করলেও এরা তা বলে 'ছাড়নে-ওয়ালা' নয়। নিজের সম্বন্ধে একটা মিথ্যে বড়াইকে তবুও এরা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

অন্য এক ধরণের মানুষ আছে তাদের চালিয়াতির স্রোতটা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। এরা হয়তো সত্যি সত্যি ধনবান্। এখন এঁদের ধনের খ্যাতির পোষকতা করে যদি কেউ এঁদের একটু তোয়াজ করতে যায়, তাহলেও এঁরা বলে ওঠে, "আরে, তোমরা তো বলেই খালাস যে আমি বড়লোক, কিন্তু বড়লোক হওয়া যে কী জ্বালা, তা যদি বুঝতে তা হ'লে আর ওকথা বলতে না! এই দেখ না কেন, কত জায়গায় চাঁদা দিতে হয়, কত প্রতিষ্ঠানে দান করতে হয়, কত পুষ্যিকে খাওয়াতে হয়, তাছাড়া কত গোপন দান আছে, বড়মানুষী বজায় রাখতে কত হাজারো রকমের খরচ আছে আর এই সব দেখাশুনো করতে, টাকার ভার সামলাতে কত রকমের দুশ্চিন্তা আর ঝঞ্ঝাটই না পোহাতে হয়। বলচো তো বড়লোক, কিন্তু এ-সব তো আর ভেবে দেখো না?"

আসলে এ-সব কথাগুলো তাঁর নিজে মুখ ফুটে বল্‌বার মত কথা নয়। তাঁর পক্ষে এ-সব বলার দরকারও নেই, বলা উচিতও নয়; কিন্তু সে কথা তখন কে তাঁকে বোঝাতে যাবে? তিনি যে তখন নিজের বাহাদুরীর বোমস্তনেই 'বুঁদ' হ'য়ে আছেন।

এক কালে অবস্থা ভালো ছিলো এখন প'ড়ে গেছে—এ রকম লোকদেরও 'বড়াই'এর 'কড়াই ভাজা চিবুতে' দেখেননি এমন লোক মিলবে কি না সন্দেহ। এঁরা সর্বদাই লোককে ধ'রে ধ'রে শোনাতে ব্যস্ত যে, এক কালে তাঁদের কী সাংঘাতিক রকমের ধন সম্পত্তি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল—ক্রিয়াকর্ম্ম দান-ধ্যানের কী 'বোল-বোলাও'ই না ছিল! এমন কি উৎসাহের আতিশয্যে কী প্রচণ্ড রকমের অপ-কর্ম্ম, দুশ্চরিত্রতা ও 'মাতালে বেলেল্লাগিরি'র সুনাম (?) ছিলো তারও বাহান্নো দফা ফিরিস্তি সবিস্তারে শুনিয়ে দিতে তাঁদের মুখে বাধে না।

সদম্ভ আস্ফালনের বাধাহীন ধাপ বেয়ে বেয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার উচ্চ মঞ্চে আরোহণ ক'রে পরিত্যক্ত বিশ্ব নিখিলের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিপাত করে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে অনেক তথাকথিত ধর্ম্ম-সাধককে পর্য্যন্ত দেখা যায়। বিশ্বের লোকের কষ্টার্জ্জিত-সুফলের নৈবেদ্যের চূড়োয় ব'সে ব'সে তাদেরই 'সংসার-পঙ্ক-নিমগ্ন' মায়া বদ্ধজীব' ব'লে সুপ্রচুর তিরস্কারে লাঞ্ছিত ক'রতে এদের একটুও আটকায় না।

আর আত্মঘাতী ধাপ্পাবাজের দল? নিজেদের 'মৃত্যুভয়-বিরহিত' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মহাবীর' ব'লে প্রতীয়মান করবার সংকল্প নিয়ে নিজেদের চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যায়, যে সব আত্মহত্যাকারী কাপুরুষের দল, তারাও ম'রতে ব'সেও নিজেদের মিথ্যা আত্মাভিমান-টুকু ছাড়তে পারে না। তখনও তারা আশা করে, পিছনে পরিত্যক্ত জগৎ-সংসার এক দিন তাদের বীরত্বকে (?) পূজো করবে।

দম্ভস্ফীত যে-মনিব কথায় কথায় তার প্রসাদাশ্রিত ভৃত্যকে নিষ্ঠুর ভাবে লাঞ্ছিত করে, পাড়ার-মাঝে-আপনি-'তালেবর' যে-সব 'চোয়াড়'-প্রকৃতির বেকার ব্যক্তি পথের ফিরিওয়ালাকে কিম্বা বাজারের 'ফোড়েকে' কথায় কথায়, মেরে 'তক্তা-বানিয়ে' দেয় বা মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবার ভয় দেখায় কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে কাল্পনিক কোনো প্রতিপত্তিশালী মুরুব্বির নাম নিয়ে ব'লে ওঠে,

'আজকে যদি থাকতো মামা
পিটিয়ে তোকে ক'র্‌তো ঝামা'

তারাই বা সব কী প্রকৃতির লোক ?

ওপরের সব কয়টি উদাহরণ থেকেই মনে হ'তে পারে যে এরা সব আসলে হীনমন্যতার (Inferiority Complex) রোগী নয় এদের এ-রকম আচরণের আসল কারণ বুঝি এদের ভেতরকার শ্রেয়মন্যতা (Superiority Complex)। আসলে কিন্তু তাতেও ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। যে-সব লোক মনে মনে ভাবে 'আমি অতি হীন' 'আমার দ্বারা কিছু হবে না' এবং মুখেও সেই কথাই প্রচার করে, তাদের হীনমন্যতাটা যত সহজে আত্মপ্রকাশ করে, ওপরে বর্ণিত মানুষগুলোর হীনমন্যতাটা সে-ভাবে ফোটে না—তফাৎ শুধু এইখানটায়! কিন্তু তবুও এদের ভেতোরের হীনমন্যতার অস্তিত্বটা একটু ভেবে দেখলেই টের পাওয়া যায়! এরা এই যে 'চালিয়াতিটা' দেখায় এটা প্রকৃত পক্ষে এদের হীনমন্যতাকেই ঢাকবার জন্যে। শুধু যে জেনে-শুনে বাইরের লোকের কাছেই সেটা ঢাকবার জন্যে, তাও না হতে পারে; নিজেদের কাছেও স্পষ্ট ভাবে সেটা স্বীকার করতেও এরা আসলে নারাজ। তাই এদের মধ্যে উদ্ভব হয় এই পরিস্থিতির।

লোকের কাছে 'আমি ছোটো নয়' এটা দেখানোর প্রয়োজন যেমন এদের থাকে, নিজের মনেও তেমনি, 'আমি ছোটো নই' এটা অনুভব করার প্রয়োজন এদের একটুও কম থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নিজেকে নিজে ছোটো জেনেও শুধু লোকের কাছে নিজেকে 'বড়ো' ব'লে জাহির করার চেষ্টায় থাকে। কিন্তু একেবারে হীনমন্যতা নিরপেক্ষ নিছক শ্রেয়োমন্যতার দৃষ্টান্ত ওপরের কোনোটাই নয়। বরং বলতে গেলে এদের প্রত্যেকেরই ভেতরের আপাত-প্রতীয়মান নিছক শ্রেয়োমন্যতার যে রূপটা আমাদের চোখের সামনে পড়ে সেটা এদের হীনমন্যতারই উলটো পিঠটা। এ শ্রেয়োমন্যতা আসলে এদের হীনমন্যতারই ছদ্মবেশ। কিম্বা কোনো কোনোটার বেলায় এ-ও বলতে পারা যায় যে, সেখানে একই লোকের মধ্যে হীনমন্যতা আর শ্রেয়োমন্যতার অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে মাত্র। অর্থাৎ হীনমন্যতাকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধু শ্রেয়োমন্যতার একাধিপত্য কোনো ক্ষেত্রেই ঘটেনি। মোট কথা, এ-সব ক্ষেত্রে হীনমন্যতা আর শ্রেয়োমন্যতার মধ্যে তফাৎ কর'তে যাওয়াটাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ তা কর'তে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে।

এ্যাড্‌লার এ নিয়ে যে-ভাবে আলোচনা করেছেন তাতে এইটাই বোঝা যায় যে, হীনমন্যতাকে বাদ দিয়ে শুধু শ্রেয়োমন্যতার অস্তিত্বই সম্ভব নয়। কারণ হীনমন্যতামূলক Individual Psychology জিনিষটাই গড়ে উঠেছে প্রত্যেক মানুষের মনের কোনো না কোনো ঊনতা-বোধকে কেন্দ্র ক'রেই—যে-ঊনতাকে মানুষ মাত্রেই অতিক্রম ক'রতে চায়। এ্যাড্‌লার বলেন, ঊনতা-বোধটা অস্বাভাবিকও নয়, কোনো রোগও নয়। বরং এই জিনিষটাই প্রকারান্তরে মানুষকে উন্নতি ক'রতে, বড়ো হ'তে সাহায্য করে, যদি সেটি ঠিক পথে চালিত হয়। অপর পক্ষে সমাজ-অনুমোদিত ঠিক পথটিকে বর্জ্জন করে 'ভুল-পথে গড়ে-ওঠা' 'বে-হিসেবি' মানুষের অবলম্বিত সমাজ-বিরোধী ভুল পথে চালিত ঊনতা-বোধটাই পরে উৎকট হীনমন্যতা নামক রোগের রূপ গ্রহণ করে।

যাই হোক, এত কথা বলা হচ্চে বলে এ-কথাটি মনে করলে ভুল হবে যে, শ্রেয়োমন্যতা জিনিষটা বুঝি বা তাহলে নিন্দনীয় নয় বা 'রোগ' নয়। আসলে তা কিন্তু মোটেই নয়। হীনমন্যতা-বিবর্জ্জিত নিছক শ্রেয়োমন্যতা মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব হলে সেটাও কিছু প্রশংসনীয় ব্যাপার হতে পারে না। তাছাড়া সেটাও একটা অস্বাভাবিক জিনিষই হয়। এবং সে-দিক্ দিয়েও সেটা রোগের পর্য্যায়েই পড়ে। এ্যাড্‌লার স্পষ্ট করে হীনমন্যতা-বিবর্জ্জিত নিছক শ্রেয়োমন্যতার সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দেশ দেননি বলেই কথাটা নিয়ে এতটা আলোচনা করতে হোলো।

এখন, এই শ্রেয়োমন্যতার ছদ্মবেশে পরিস্ফুট হীনমন্যতা মানুষের মধ্যে কেন দেখা দেয়, সেটা দেখা যাক্। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, মানুষ মাত্রেই কোনো না কোনো একটা ব্যাপারে নিজের ঊনতা অনুভব করে। স্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সুস্থ মানুষ সেই ঊনতা সম্বন্ধে সচেতন থেকে সেই ঊনতাকে কাটিয়ে উঠে বড়ো হয়ে উঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ব্বল লোকে সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। আর পারে না বলেই সে জন্যে অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেতে থাকে। উৎসাহের বদলে অবসাদ এসে যখন তার মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে যে, সে মনঃপীড়া সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তখনই সে এই কষ্টের অবসান ঘটাতে চায় ভুল উপায়ে। কাজে না পারলেও সে তখন মিথ্যে ক'রেও দেখাতে চায় যে সে 'বড়ো।' এমন কি শুধু অন্যকে দেখানো নয় মনঃকষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে নিজের মনকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দেবারও তার দরকার হ'য়ে পড়তে পারে। এ-রকম অবস্থায় তার ধরণ-ধারণ চাল-চলনে শ্রেয়োমন্যতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়তে থাকে এবং ক্রমে চালিয়াতিটা তার মজ্জাগত স্বভাবেই পরিণত হয়ে যায়।

অপর পক্ষে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মধ্যে কখনো শ্রেয়োমন্যতার বালাই দেখা দেবার কোনো কারণ ঘট্‌তে পায় না বা থাকবার দরকার হয় না। অর্থাৎ স্বাভাবিক মানুষ নিজেকে স্বাভাবিক সুস্থ লোক জেনেই খুসী থাকে। সে যা' কিছু করে, তাতে সে বাহাদুরীর কিছুই দেখে না। অর্থাৎ তার ভাবখানা এই থাকে যে, আমি শুধু আমার পক্ষে (এক জন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে) যা' করা দরকার, যা' করা স্বাভাবিক এবং যা' করা সম্ভব তাই ক'রেছি। তার বেশী নয় তার কমও নয়। এই জন্যই তার মনের মধ্যে এক দিকে বিশেষ রকমের কোনো বাহাদুরীর ভাব যেমন থাকে না, তেমনি অপর দিকে বিশেষ রকমের কোনো ক্ষোভের ভাবও থাকে না। সেই জন্য 'মার দিয়া কেল্লা'-গোছের কোনো মনোভাব এসে যেমন তাকে উল্লাসে অভিভূত ক'রে তার উন্নতিতে ছেদ এনে দিতে পারে না, অপর পক্ষে তেমনি 'হম্‌তো কুছ কাম্‌কা নেহি'-জাতীয় কোনো মনোভাব এসে তাকে উন্নতির চেষ্টা থেকে 'হালছাড়া' অবসাদে অবসন্ন করে দিতে পারে না। তার মন যেন বলতে থাকে 'সব ঠিক হ্যায়।'

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই যে 'ভাব'টার

চীন-কৃষক

সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

সুবৃহৎ চীনের বিরাট জন-সমষ্টির (৪৩৫০০০০০০ হইতে ৪৮০০০০০০০) শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জনের কৃষিকার্য্যই একমাত্র জীবিকা। জীবন-ধারণের জন্য তাহারা একান্ত ভাবেই মাতা বসুন্ধরার করুণার মুখাপেক্ষী।

চীনের সমাজ-শরীরের মেরুদণ্ড তাহার কৃষক-সম্প্রদায়। আর এই সম্প্রদায়ের ভাগ্যের সহিত চীনের জাতীয় উন্নতি একই সূত্রে গ্রথিত। Professor Tawneyর কথায়—"A tolerable standard of well-being cannot be said to prevail as long as some considerable proportion of her (China's) rural population is under-fed and under-housed, decimated by preventible disease and liable to be plunged in starvation by flood and drought. A stable state is equally difficult of creation until the social conditions of China have been substantially improved."—(Land and Labour in China)। কাজেই কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে না পারিলে সর্ব্বভাবে জাতীয় উন্নতির যে কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য।

অদৃষ্টের পরিহাসে চীনের কৃষক সমাজ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র চীনের সর্ব্বত্রই কৃষকের অবস্থা ঠিক এক প্রকার নহে। কিন্তু এ কথা বলিতে বাধা নাই যে, মোটের উপর তাহারা দরিদ্র। চোখে না দেখিলে সে দারিদ্র্যের স্বরূপ কল্পনা করা যায় না। চীন-কৃষকের সাধারণ জীবনযাত্রার মান কত নিম্ন, তাহাও চোখে না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না।

এই অন্তহীন দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, কৃষকের জমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। বড় জোত একেবারে নাই এমন নহে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য এবং যেগুলি আছে, তাহাও অতি দ্রুত অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। প্রচলিত আইন অনুসারে পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমস্ত পুত্রের অধিকার সমান। কাজেই প্রত্যেক পুরুষেই কৃষকের অধিকৃত জমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক এবং ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় জমির উন্নতি সাধনে একেবারেই অনবহিত। উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন না করিয়া ইঁহারা সেই অর্থ দ্বারা সহরে বাড়ী করেন, জিনিষপত্র বন্ধক রাখিবার দোকান খোলেন, আর না হয় লগ্নী-কারবার করেন। তাহাতে লাভও হয় বেশী। এদিকে জমি চাষ করে যে কৃষক, উন্নততর ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার দিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা তাহার অমানুষিক। স্বীয় কার্য্যে দক্ষতাও তাহার অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাকে একান্ত ভাবে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে একেবারেই শক্তিহীন।

গণ-শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম খ্যাতনামা কর্ম্মী Dr. James Yeth জাপ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পিকিং হইতে ২৮০ মাইল দূরে টিং-সিয়েনের কৃষকদিগকে উন্নততর ধরণের কৃষি-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। স্থানীয় জনসাধারণ এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে কি না সে সম্বন্ধে গোড়ার দিকে সন্দিহান থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রচেষ্টার সফলতার কথা সমগ্র চীনে ছড়াইয়া পড়িবার ঠিক মুখেই প্রতিবেশী জাপানের সঙ্গে চীনের জীবন-মরণ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় এই ধরণের অন্য কোন প্রচেষ্টা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

কৃষিকার্য্যের জন্য বেতনভোগী শ্রমজীবীর প্রয়োজন চীনদেশে খুব বেশী হয় না। ইহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথমতঃ, সাধারণ কৃষকের জমির পরিমাণ খুব কম এবং দ্বিতীয়তঃ, একটু বয়স হইলেই কৃষক-পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ক্ষেতের কাজে মাতা-পিতাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। কাজেই বিত্তহীনের দল উদরান্নের জন্য কর্ম্ম-সংগ্রহের চেষ্টায় সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী সহরে যায়, আর না হয় সৈন্য অথবা দস্যুদলে যোগ দেয়।

[পূর্ব্ব-পৃষ্ঠার পর]

কথা বলা ভালো, এটা সত্যি সত্যিই তার মনের ভাব হওয়া চাই—মুখে বললে হবে না। অর্থাৎ দেখতে হবে যে 'ভাবের ঘরে চুরী' না থাকে। নইলে সত্যের সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত—

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু—ভগবান্ বুকে
এঁকে দিই পদচিহ্ন'

গোছের গর্ব্বোক্তি এবং—'ম্যয় তো হুজুরকী জুতীকা বরাবর হুঁ' গোছের অতি বিনয় যেমন দোষের, নিজেকে গীতা-কথিত, হর্ষ-অমর্ষ, ভয়-উদ্বেগ, শীত-উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখে সমানুভূতিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ বলে জাহির করা বা কল্পনা করাও তেমনি দোষাবহ।

এ বিষয়ে শেষ কথা এই যে, চেষ্টা ক'রে বা কল্পনা ক'রে কোনো 'ভাব' মনে 'আনা'র কথাই এখানে ওঠে না। সুস্থ, স্বাভাবিক লোকের মনে আপনা হ'তেই একটা ভারসাম্যযুক্ত (Balanced) ভাব থাকে। যাতে অবিচলিত ভাবে সে শুধু উন্নতির সোপান বেয়ে উঠতে থাকে। গীতার 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' কথাটা এদের মনোভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই খাটে। এদের মন নিরন্তর কর্ম্মে এবং উৎসাহে কানায় কানায় ভরা থাকে ব'লে নিজের সম্বন্ধে কোনো রকম ভ্রান্ত ধারণা (False valuation) এদের কাছাকাছি ঘেঁসবারও সম্ভাবনা থাকে না—যে False valuationই হ'চ্ছে মনের রোগের গোড়া।

[ক্রমশঃ।

কৃষক জমির খাজানা নগদ টাকা অথবা ইচ্ছা করিলে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য দ্বারা দিতে পারে।

১৯৩৭ সালে যখন জাপানের সহিত চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন সমগ্র চীনে মোট প্রায় ৫ কোটি কৃষিক্ষেত্র ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের গড় আয়তন প্রায় ৪ একর। জাপানে কৃষকের অধিকৃত জমির পরিমাণ কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই চীন-কৃষকের সাধারণ অবস্থা খুব খারাপ হইবার কথা নহে।

কিন্তু হইলে কি হইবে? কতকগুলি কারণে দারিদ্র্য তাহার ঘুচিতে পারে না। প্রথমত: চীনে একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত। বিবাহিত পুত্রেরা সকলেই সপরিবারে পিতৃগৃহে বাস করে। একই গৃহে পিতামহ, পুত্র এবং পৌত্রের সমাবেশ বিরল নহে এবং এই ধরণের একটি পরিবারের জনসংখ্যা কোন ক্ষেত্রেই ১০।১২ জনের কম নহে। দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র মঙ্গোলিয়া ভিন্ন চীনের অন্য কোথাও কৃষকেরা পশুপালন করে না (অবশ্য কৃষিকার্য্যের পক্ষে অপরিহার্য্য পশুর কথা ছাড়িয়া দিলে)। তৃতীয়তঃ, প্রচণ্ড শীতের জন্য বৎসরের অর্দ্ধেক না হইলেও এক-তৃতীয়াংশ সময় ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং বিপর্য্যয়ের কথাও মনে রাখিতে হইবে। কাজেই ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেও কৃষক জন্মগ্রহণ করে দারিদ্র্যের মধ্যে। দারিদ্র্যের মধ্যেই সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং এই দারিদ্র্যের মধ্যেই তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চীন-কৃষকের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অমানুষিক। জমিতে জল-সেচন বিষয়ে চীন-কৃষক অপ্রতিদ্বন্দ্বী। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে সিচুয়ান প্রদেশে প্রচলিত জল সেচ ব্যবস্থা এত সুন্দর যে ইহা বর্ত্তমান পূর্ত্তশিল্পীদিগের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এবং মহাজন (তুলনীয় ভারতবর্ষের কৃষকের অবস্থা); জমিদার সাধারণতঃ জমিদারিতে থাকেন না। আর যখন থাকেন, তখনও প্রজার প্রতি ভূম্যধিকারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, জমিদার জানেন যে জমিদারি শীঘ্রই ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া যাইবে। কাজেই প্রজাদের নিকট হইতে যত কম সময়ে যত বেশী আদায় করিয়া লওয়া যায়, সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। আর যখন জমিদারের অনুপস্থিতিতে গোমস্তা কর্ত্তা হইয়া বসে, তখন কৃষকের দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উঠে। জমিদারের খাজানার সঙ্গে সেলামিও তাহাকে জোগাইতে হয়। কৃষকের তৃতীয় শত্রু মহাজন। দারিদ্র্যের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ না হইয়া তাহার উপায় নাই। মহাজনও সুযোগ বুঝিয়া অতি উচ্চ হারে সুদের দাবী করিয়া থাকে। ঋণ-পরিশোধের জামিনস্বরূপ কিছু দিন পূর্ব্বে পর্য্যন্তও কৃষককে অনেক সময় ফসল বন্ধক রাখিতে হইত।

ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য বাজারে পাঠাইবার ব্যয় এবং অসুবিধাও বিস্তর। দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় শুল্ক সংগ্রহের ঘাঁটী রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ঘাঁটীতেই কিছু কিছু সেলামি দিতে হয়। অল্প দিন পূর্ব্বেও 'হ্যাংকাও'তে উৎপন্ন চা ৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী 'সিনিসি'তে আনিতে হইলে পথে অন্যূন দ্বাদশটি বিভিন্ন ঘাঁটীতে শুল্ক দিতে হইত। চীন দেশে উৎপন্ন চা এবং রেশম পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে এই সমস্ত কারণে ইহাদের রপ্তানি খুবই কমিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। সৈন্যাধ্যক্ষের পর সৈন্যাধ্যক্ষ জুলুম করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সিচুয়ান প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রজাদের ২০ বৎসরের খাজানা অগ্রিম দেওয়া হইয়া গিয়াছে। কৃষকের বিপদ্ এইখানেই শেষ হয় নাই। সৈন্যদল বারবার তাহাদের গৃহ এবং সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে।

১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন-কৃষকের অবস্থার আংশিক উন্নতি ঘটে। T. V. Soong ছিলেন এই সময় নানকিং সরকারের অর্থ-সচিব। তাঁহার চেষ্টায় দেশের মধ্যে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় জিনিসপত্র পাঠাইবার শুল্ক একেবারে না হইলেও বহুলাংশে উঠিয়া যায়। এদিকে কৃষি-দপ্তর কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করে যে, উন্নততর ধরণের কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক এবং তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বীজ, বিশেষতঃ তুলার বীজ বিতরণ করিতে আরম্ভ করে। নূতন নূতন রেলপথ এবং হাজার হাজার মাইল মোটর-চলাচলের রাস্তা নির্ম্মিত হওয়াতে কৃষকের দুর্ভাগ্যের বোঝা কিছুটা লাঘব হইল। বহু সমস্যার সমাধান কিন্তু তখনও বাকী রহিয়া গেল। জমিদার এবং মহাজনের ক্ষমতা তখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম-চীনে সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর ৪র্থ দশকে চীন কৃষকের অবস্থা যে তৃতীয় দশকে তাহার অবস্থা অপেক্ষা মোটের উপর উন্নত ছিল, একথা অস্বীকার করা চলে না।

জাপ-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। আক্রমণকারী জাপ-সৈন্যদল কৃষকের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন করিয়াছে আর স্ত্রীলোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। (তুলনীয়—"And wherever a Japanese regiment goes all available women from grandmothers to little things of seven or eight years, are swept into the "Consolation House" for the use of Japanese soldiers"—The Story of China's Revolution, P.171 - O. M. Green)।

এই অপরিসীম দুঃখ,দুর্গতির মধ্যেই নবারুণ-রেখা দেখা যাইতেছে! কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের জোয়ার আসিয়াছে। দিনের পর দিন নব জীবনের স্পন্দন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চীন সরকার চুংকিং-এ সরিয়া যায়। তাহার পর জাতীয় জীবনের ঘোরতর দুর্য্যোগের মধ্যেও কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে।

কৃষকের অবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রম-সমবায় আন্দোলনের (Industrial Co-operative Movement) স্থান সর্ব্বোচ্চে। কি ভাবে ইহার সূচনা হয় বলা শক্ত। জাতীয় সরকার চুংকিঙে সরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই গুটিকয়েক এই ধরণের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে Mr. Rewi Allen (ইনি নিউজীলণ্ডবাসী) এবং চীনের Y. M. C. A.র সম্পাদক Mr. George Hogg এবং Dr. H. H. Kungএর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রম-সমবায় আন্দোলন জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং ইহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র চুংকিঙে অবস্থিত। যে সমস্ত অঞ্চল

সম্পূর্ণরূপে জাপ-আক্রমণ-আশঙ্কামুক্ত নহে, সে সমস্ত অঞ্চলে "গরিলা" শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে চীনে প্রায় ….০০ শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠান (Industrial Co-operative) ছিল। বিগত কয়েক বৎসরে ইহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বন্দুক, মেশিন-গানের গুলী, সৈন্যদের ব্যবহার্য্য পোসাক, কম্বল, জুতা, ঝোলা এবং চামড়ার জিনিস, গৃহসজ্জার আসবাব, তৈজস-পত্র, সাবান, দেয়াশলাই, চর্ব্বি-বাতি এবং নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হয়।

নূতন শিল্প-সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে স্থাপনকারী সদস্যদিগকে মূলধনের ১০ ভাগের ১ ভাগ সংগ্রহ করিতে হয়। বাকী ৯ ভাগ সরকার নিজেদের অথবা নিজ দায়িত্বে কোন ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া দেয়। সমবায়-প্রতিষ্ঠান সমূহ যত শীঘ্র সম্ভব এই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সরকার সমবায়-প্রতিষ্ঠান সমূহকে যে টাকা ঋণ দিয়াছিল, ১৯৪২এর পূর্ব্বেই তাহার বেশীর ভাগ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মোট মাসিক উৎপন্নের মূল্য ৩ লক্ষ পাউণ্ড।

এই আন্দোলনের ফলেই চীন দেশের কৃষক-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ না হইলেও অংশতঃ কৃষি-নিরপেক্ষ হইতে সক্ষম হইয়াছে। শীতকালে যখন চাষের কাজ বন্ধ রাখিতে হয়, তখন সে ঘরে বসিয়াই নিয়মিত ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। এই আন্দোলনের ফলেই আবার অভিনব সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে। শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধগুলির সম্যক্ প্রতিপালন এবং নিজেদের সন্তান-গণের শিক্ষার প্রতি ইহাদের সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই আবার কর্ম্মিগণ শিল্পনৈপুণ্য অর্জ্জন করে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পে এই উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

সমবায় আন্দোলন চীনের জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে কি না জোর করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে বহু চীন-সন্তান যে কলের মজুর বা কারখানার বেতনভোগী শ্রমিক হওয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া দৈহিক, মানসিক এবং চারিত্রিক অপঘাতের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে চুংকিঙ সরকারের National Land Administration বিভাগ স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, কৃষক যে জমি চাষ করে তাহাকে সেই জমি কিনিতে সাহায্য করা। অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে কুসীদজীবীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছে। কৃষকগণ প্রধানতঃ Farmers' Bank, The Central Bank of China এবং The Bank of Communications হইতে প্রয়োজন মত ঋণ পাইয়া থাকে। শেষোক্ত দুইটি চীনের প্রধান সরকারী ব্যাঙ্ক। সমবায়-প্রতিষ্ঠানসমূহও টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। টাকা ধার করিবার উদ্দেশ্যের উপর সুদের হার নির্ভর করে। সাধারণতঃ বার্ষিক শতকরা ১২ হইতে ৬।৭ পর্য্যন্ত সুদ নেওয়া হইয়া থাকে।

এ কথা অবশ্য বলা চলে না যে, চীনের কৃষককুলের আজ আর কোন অসুবিধা নাই। বহু বিষয়েই এখনও তাহাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হইবে এবং প্রতিবন্ধকও রহিয়াছে সংখ্যাতীত। বিনিযুক্ত স্বার্থবান সম্প্রদায় আশঙ্কা করে যে, কৃষকের অবস্থার উন্নতি তাহাদের (প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের) সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পরিপন্থী। প্রতি-ক্রিয়াশীল দল সংস্কারকদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে সচেষ্ট। চিয়াং-কাইশেকের সহিত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের একাধিক-বার মতান্তর ঘটিয়াছে। চোরা-কারবারী এবং চাউলের মজুতদার-গণই বিশেষ করিয়া কৃষকের কল্যাণ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং করিতেছে (তুলনীয় ভারতবর্ষের অবস্থা)।

মুদ্রাস্ফীতিজনিত আর্থিক বিপর্য্যয়ের ফলে সরকারকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে কম নয়। ইহার ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যতটা অসুবিধা হইয়াছে, কৃষকদের ততটা হয় নাই। যদিও সব জিনিস-পত্রের দামই ৭।৮ গুণ হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ গুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি কৃষিজাত দ্রব্যের উচ্চ মূল্যের জন্য কৃষক-সম্প্রদায় অন্যদের মত অসুবিধায় পড়ে নাই।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, শ্রম সমবায়-প্রতিষ্ঠান, New Land Administration এবং অল্প সুদে ঋণদান ব্যবস্থা নীচ-কৃষকের পক্ষে অভিনব এবং পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল জীবন যাপন করা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

চলো যাই

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

চলো যাই, পেরিয়ে অরণ্য, গাছ, নদী, মাঠ, গ্রাম
অনেক যোজন দূরে—বহু দূরে, পিছনে মুছিয়ে ফেলে
আমাদের নাম।
মুছে দিয়ে খড়ির দাগের মত এখানের স্মৃতির স্বাক্ষর,
যেমন মিলায় গিয়ে সোনালী রৌদ্রের রঙ ছায়ার ভিতর;
চলো যাই, আমরা উধাও হ'য়ে যাই,
এখানে বাজতে থাক আমাদের নাম ল'য়ে মৃত্যুর শানাই:
চলো দূরে হাওয়ায় মিলাই।

পথ খুঁজে খুঁজে
যেখানে মিলেছে পথ হরিৎ মাটির রঙে সবুজে-সবুজে
আকাশের মসৃণ বিস্তার
কমলা লেবুর মত হলদে-সবুজে পরিষ্কার
আমরা থেমেছি, যেন সে পথ যেখানে,
রচেছি একটি নীড় স্পর্শে আর ঘ্রাণে;
চলো যাই, চলো যাই—
তারার ভিড়ের মত তোমার উজ্জ্বল কানে কানে
জীবনের কবিতা শোনাই,
সমুদ্র-ঢেউএর মত তাকে লেগে মাটিতে ছড়াই।
সে জীবন কত দূর?—
পার হ'য়ে কত সমুদ্দুর
কত পথ পাহাড় বন্ধুর।
এখানে আমরা নেই, মনে করো মুছে গেছি জলের রেখার মত,
অদৃশ্য চিলের মত আকাশে-আকাশে,
অনেক যোজন দূরে তুমি আর আমি এক পাশে।

আদিম কালে পুস্তক-ব্যবসা

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতে 'পুস্ত' ধাতুর অর্থ বাঁধা। 'পুস্তক' শব্দ হইতে 'পুঁথি' উৎপন্ন। 'গ্রন্থ' অর্থেও গাঁট বাঁধা। দুইটি শব্দ হইতেই আদিম কালে বইএর আকার কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় পাই। ছাপাখানার যুগে আজ পুস্তক প্রকাশ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে-কালে তাহা ছিল না। ব্যাবিলোনিয়া ও আসীরিয়ায় রৌদ্রদগ্ধ মৃন্ময়-ফলকে উৎকীর্ণ পুস্তকগুলির প্রচার নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বাইবেলের Ecclesiastes নামক খণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, পুস্তকরচনার ইয়ত্তা নাই। এই ইঙ্গিত হইতে আমরা যেন সিদ্ধান্ত না করি যে, সেকালে সংখ্যাতীত বই লেখা হইত। এদেশেও উল্লিখিত আছে যে 'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্'। সেকালে লিখিত বা মুখে মুখে কথিত পুস্তকের সংখ্যা যতই হউক না কেন, ছাপাখানার যুগের সঙ্গে তাহাদের তুলনা চলে না। এদেশে পণ্ডিতগণ গ্রন্থ রচনা করিতেন, শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লিপিকরেরা তাহার অনুলিপি করিতেন। প্রকাশকের কোন অবকাশ ছিল না। পিণ্ডার নামক গ্রীক কবির একটি খণ্ড কবিতায় লেখা আছে যে, প্রকাশকগণ গ্রন্থকারদের মাথার খুলিতে মদ্যপান করিতে ভালবাসেন। (এই উক্তি নিতান্ত পরবর্তী যুগের বলিয়া মনে হয়, কারণ, অসাফল্যে মনোভঙ্গ হইয়া অনেক লেখকই প্রকাশকের বিরুদ্ধে মুখর হইয়াছেন)।

আদিম কালের অন্ধকারে খুঁজিতে খুঁজিতে যে প্রথম প্রকাশকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, সে এক জন ঈজিপ্টের চণ্ডাল। চণ্ডাল-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পুস্তক-প্রকাশবৃত্তি গড়িয়া উঠে। "মৃতজনের পুস্তক" নামক গ্রন্থের অনেক কাপি সে বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা মজুত রাখিত। শোকার্ত্ত লোকেরা এই গ্রন্থ তাহার নিকট কিনিয়া মৃতের কবরে অর্পণ করিত। তাহা হইলে মৃতব্যক্তি পরলোকের পথে মহাযাত্রা করিবার সময় কোন বাধা পাইবে না। খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্বে ইয়োরোপে নানা বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়। এ সমস্তই হস্তলিখিত। কিন্তু গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির পূর্ব্বকালে ইয়োরোপে পুস্তক-প্রকাশের কোন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চম খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গ্রীসে কিছু কিছু বই প্রকাশিত হইলেও এক শত বৎসর পরে আলেকজাণ্ডারের সময়েই এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয়। সাময়িক খ্যাতি ও ভবিষ্যতের যশোলিপ্সা সেকালের গ্রন্থকারগণের বিশেষ কাম্য ছিল। গ্রীক-সংস্কৃতি ও বাগ্মিতার শেষ কবি লুশিয়ান তাঁহার "নিরক্ষর বই-পাগলা" (The Illitrate Bibliomanic) গ্রন্থে আথেন্সের গ্রন্থবিক্রেতা ও তাহাদের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের একটি বিশদ চিত্র প্রদান করিয়াছেন:

"তোমরা বোধ হয় মনে কর যে অনেকগুলি ভাল বই কিনিলেই বুঝি মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে তোমাদের মূর্খতাই ধরা পড়িয়া যাইবে। অনেক সময় বাজে বই কিনিয়া ফেলিবে, বা অপরের মুখে কোন বইএর প্রশংসা শুনিয়া বিনা দ্বিধায় সেই বই কিনিবে। পুস্তক-বিক্রেতা তোমাকে নির্ব্বোধ মনে করিয়া চড়া দামে অসার বই বেচিয়া লাভ করিবে।···তবে বুদ্ধি করিয়া তুমি যদি কালিনাস বা আটিকাসের মত প্রাজ্ঞ প্রকাশকের নিকট উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপি ক্রয় কর, তাহা লইয়াই বা তুমি কি করিবে? অন্ধ প্রণয়ী যেমন তাহার আদরের পাত্রীর সুন্দর চোখ বা রক্তিম গণ্ড দেখিতে পায় না, তুমিও সেইরূপ এই সব গ্রন্থের গৌরব বুঝিবে না। মানিয়া লইলাম যে, তুমি ডেমস্থিনীসের সমগ্র গ্রন্থাবলী, থুকিডিডিসের স্বহস্তলিখিত একখানি গ্রন্থ, বা সুলা আথেন্স জয় করিয়া যে-সব গ্রন্থ ইটালিতে পাঠাইয়া দেন—এই সব তুমি সংগ্রহ করিয়াছ। কিন্তু তাহা লইয়া তুমি কি করিবে? এই সব গ্রন্থের বিপুল শয্যা আস্তরণ বা তাহাকে নিজের অঙ্গ সজ্জিত করিলেও তুমি বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। প্রবাদ আছে যে, বানরকে হীরা-জহরতে সাজাইলেও সে বানরই থাকে···আমরা বহু পরিশ্রমে যে জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি, তোমরা ধনিসম্প্রদায় অবশ্য এক মুহূর্ত্তের প্রমোদে তাহা কিছু টাকায় কিনিয়া লইতে পার। এ অবস্থায় কোন পণ্ডিতই পুস্তকবিক্রেতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, কারণ, তাহারা জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডারের রক্ষক; দিন-রাত বইএর মধ্যে ডুবিয়া থাকায় তাহাদের রুচি মার্জ্জিত ও বিচার-বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ।"

এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, লুশিয়ানের সময়ে পুস্তক-প্রকাশক গ্রীসে বিদ্যমান ছিল। রোম কর্ত্তৃক গ্রীস অধিকৃত হইবার বহু কাল পরে যখন আলেকজাণ্ড্রিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির কেন্দ্র হইয়াছে, এই রচনাটি আথেন্সের পুস্তক-ব্যবসায়ের সেই অধঃপতনের যুগে লিখিত। আলেকজাণ্ড্রিয়ায় পুস্তক প্রকাশের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে গ্রীস, রোম, ঈজিপ্ট ও ভারতবর্ষের যে সব পাণ্ডুলিপি আলেকজাণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল, সেগুলির রাজসংস্করণ বাহির হইত। দুঃখের বিষয়, প্রকাশকদের নাম বা প্রকাশনার সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের জানা নাই। পরে রোম শহর পুস্তক-প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রোমানগণের অধীন টলেমিদের শহর বহু কাল ধরিয়া প্রতিভা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রথম খৃষ্টাব্দের অর্দ্ধশতকে পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের কেন্দ্র রোম শহরে উঠিয়া যায়। ষ্ট্রাবো নামক ভৌগোলিকের মতে রোমান পুস্তক-প্রচারের ব্যবস্থা আলেকজাণ্ড্রিয়ায় গ্রন্থব্যবসায়ের ভিত্তি অবলম্বনে গঠিত।

সেকালে রোম শহরে আর্জিলেটম্ (Argiletum) গৃহের আবহাওয়া একালের কলেজ ষ্ট্রীটের মত ছিল। ইহার আশপাশের দোকানগুলির স্তম্ভগাত্রে ভিতরে যে-যে বই পাওয়া যাইবে তাহাদের নাম লেখা থাকিত। এই অঞ্চল সাহিত্যিকগণের প্রিয় বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পুস্তকগুলির মূল্য ছিল অসম্ভব রকম সস্তা। কয়েক আনা খরচ করিলেই একখানি সুখপাঠ্য বই পাওয়া যাইত। ইহা হইতে আমরা যেন না মনে করি যে, লেখক তাঁহার লভ্যাংশ পাইতেন না। পুস্তকের সুলভতার অন্য কারণ ছিল। প্রকাশক খুব কম খরচে ক্রীতদাসের সহজলভ্য পরিশ্রমে এত সস্তায় বই বাহির করিতে পারিতেন। ইহার জন্য ছাপাখানা বা অন্য কোন কৃত্রিম যান্ত্রিক উপায়ের প্রয়োজন ছিল না। প্রকাশকগণ খুব কম সময়ের মধ্যে দাস-লেখকগণের দ্বারা সহজেই যে কোন দুর্ম্মূল্য পুস্তকের সুলভ সংস্করণ বাহির করিতে পারিতেন। "ছাপাখানার 'ভূতের' বালাই ছিল না, কপি মিলাইতে হইত না, প্রুফ দেখিবার তাগাদা ছিল না। লেখকের পাণ্ডুলিপি আসিলেই প্রকাশক তাহা ক্রীতদাসগণকে প্রদান করিতেন এবং সাধারণ আট-দশ কর্ম্মার

ই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হস্তলিখিত হইত। অবশ্য কপি করিবার মধ্যে নানারূপ ভুল ও ত্রুটি থাকিয়া যাইত।

পাণ্ডুলিপি কপি করিবার জন্য ক্রীতদাসগণকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। মার্শাল্ (Martial) নামক ল্যাটিন লেখকের বর্ণনানুসারে তাহার Epigrams পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এক জন অনুলেখক এক ঘণ্টায় কাপি করিয়া দেয়, ইতিমধ্যে সে আবার বহু কিছু অন্য কাজও করিয়াছিল। কিন্তু ঐ পুস্তকে প্রায় সাত ছয় শত পংক্তি আছে, এক ঘণ্টায় তাহা কপি করা সম্ভব নহে। এই মার্শালের উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হয়। তবে এইরূপ গ্রন্থ-প্রকাশের ফলে আশু প্রয়োজন সহজেই মিটাইতে পারা যাইত। কখন কখন কখন প্রকাশক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনুলিপি করাইতেন। আটিকাস্‌কে লিখিত সিসেরোর পত্রাবলী ও অন্যান্য সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেকালে অনেক মাল অবিক্রীত থাকিয়া যাইত। পুরাতন বইয়ের ব্যবসায় সেকালে চল না বলিয়াই মনে হয়। পুরানো বইগুলির কাগজ-যন্ত্রে গলাইয়া নূতন বইয়ের জন্য আবার ব্যবহার করিবারও কোন পন্থা ছিল না। এই পুরাতন বা অবিক্রীত পুস্তকের পত্রগুলি দোকানে মাছ প্রভৃতি মোড়কের কাজে ব্যবহৃত হইত। মার্শাল তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন (চতুর্থ অধ্যায়, ৮৬ শ্লোক): "আপোলিনারিস্ তোমায় ত্যাগ করিলে তুমি জেলের কাছে ছুটিতে পার, বা ছোট ছেলেরা তোমার উপর মক্‌সো করিতে পারে।" এইরূপে অনেক বহুমূল্য পাণ্ডুলিপি বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে পুস্তকের আকার ছিল আজকালের ঠিকুজী-কোষ্ঠীর মত পাকানো। ইয়োরোপে আধুনিক [illegible] পুস্তকের আকার প্রচলিত হয় পঞ্চম শতাব্দীতে। প্যাপিরস্ বা পার্চমেণ্টের উপর এক পৃষ্ঠায় লেখা থাকিত। পুস্তকের দৈর্ঘ্য অনুসারে পাকানো পুঁথিরও আকার হইত। এক এক সংস্করণে পাঁচ শত হইতে হাজার কপি অনুলিপি তৈয়রি হইত। রেগুলাস [illegible] উপলক্ষে যে গ্রন্থ রচনা করেন, প্লিনি তাহার নিন্দা করিয়া [illegible] পত্রে লিখিতেছেন: "বাপ্! একটা ছেলের কাহিনী লইয়া [illegible] কেতাব!" (Epistles চতুর্থ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)। রেগুলাস আবার এই গ্রন্থের এক হাজার অনুলিপি সমগ্র রাজ্যের [illegible] বিতরণ করেন।

প্রথম খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে অগষ্টাসের শাসনকালে পুস্তক-ব্যবসায় বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে দেখিতে পাই। এই সময়ে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশক ছিলেন তাঁহার নাম টাইটাস্ পম্পোনিয়াস আটিকাস। প্রাচীন রোমে আটিকাসের নাম সুবিখ্যাত ছিল। সাধুতাগুণে তিনি এই ব্যবসায়টি উন্নত করিয়া তুলেন। তিনি নিজেও সুপণ্ডিত [illegible] এবং সিসোরার সাহিত্যিক বন্ধু, পরামর্শদাতা ও প্রকাশক ছিলেন। দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের প্রতি তিনি যে বদান্যতা দেখাইতেন তাহা এ দেশের কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং বিলাতের Dictionary of National Biography প্রকাশের জন্য যিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করেন, সেই জর্জ স্মিথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

জর্জ স্মিথের মত আটিকাসেরও ব্যবসায়বুদ্ধি ও কর্ম্মতৎপরতা ছিল। তাঁহার পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় বিরাট্ ও দূরপ্রসারী ছিল। মৌলিক গ্রীক সংস্করণ পাইবার জন্য তিনি শুধু আলেক-জাণ্ড্রিয়ার উপর নির্ভর করিতেন না; অনুলিপি করিবার জন্য তাঁহার এক দল শিক্ষিত ক্রীতদাস ছিল। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের নাম ছিল 'আটিকিয়ান্স' এবং লিপিসৌন্দর্য্যে এই সংস্করণ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। কালক্রমে আটিকাস সমস্ত প্রদেশে তাঁহার পুস্তক-প্রকাশের শাখা স্থাপন করেন।

কয়েক জন রোমান-সম্রাট্ পুস্তক-প্রকাশের উপর কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ করেন। সম্রাট্ অগষ্টাস্ প্রধান পুরোহিতের পদে বৃত হইয়াই যে সব পুস্তকালয়ে ও ভদ্রগৃহে সিবিল-কথিত গ্রীক ও ল্যাটিনে লিখিত তান্ত্রিক জাতীয় পুস্তক আছে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া অগ্নিসাৎ করেন। সম্রাট্ ডোমিশিয়ান্ লেখক ও প্রকাশকদের উপর অনেক অমানুষিক অত্যাচার করেন। সিউটোনিয়াসের বর্ণনানুসারে ইনি টার্শাসের ঐতিহাসিক হার্মোজিনিসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও ইতিহাসের অনুলিপিকরগণকে শূলে বিদ্ধ করেন।

গ্রন্থকার ও প্রকাশকের মধ্যে ব্যবসায়-সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। তবে হরেস্ ও অন্যান্য লেখকদের নানারূপ উক্তি হইতে জানা যায় যে, লেখকগণ নিজ রচনার জন্য Royalty গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আবার অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, সেকালের লেখকগণ নিজ রচনা হইতে কিছুই মুনাফা পাইতেন না। এই মতই প্রামাণিক মনে হয়, কারণ একবার কোন লেখকের রচনা সমগ্র রোমে প্রচারিত হইলে তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া যাইত। যে-কোন অনুলিপিকর যে কোন পুস্তক কপি করিয়া কয়েক সহস্র খণ্ড সহজেই বিক্রয় করিয়া উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিত। ইহাতে বাধা দিবার মত কোন কপিরাইট আইন সেকালে প্রচলিত ছিল না। এ দেশেও কালিদাসের পূর্ব্ব-বর্ত্তী যুগে কাব্যতস্কর বর্ত্তমান ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এই কাব্য-চৌরগণের বিশিষ্ট নাম ছিল 'চন্দ্রবেণু'।

হরেসের Ars Poetica গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রকাশকের হস্তে তাঁহার পাণ্ডুলিপি একবার পড়িলে প্রকাশক তাহার শত শত অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া দেশ-বিদেশে ও সমুদ্রপারে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে: লেখকের ভাগ্যে জুটিবে শুধু দেশব্যাপী খ্যাতি। হরেসের দশম সংখ্যক লিপিতে (Epistles) উল্লিখিত আছে যে, তাঁহার গ্রন্থ জেনাস্ ও ভার্টুম্নাস মন্দিরের আশে-পাশে নানা পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

তখনকার দিনে জনপ্রিয় লেখকদের পুস্তক কিরূপ সমাদৃত হইত, তাহার আংশিক বিবরণ হরেসের মৃত্যুর প্রায় ষাট বৎসর পরে মার্শালের সময়ে আমরা জানিতে পারি। মার্শাল লিখিয়াছেন: "শুধু শহরের আরামা-প্রিয় লোকেরাই আমার পুস্তক পড়িয়া আনন্দ পায় না। শীতপ্রধান গেটিক দেশে যুদ্ধ রত সেনাবৃন্দ, এমন কি সুদূর ব্রিটেনের লোকেরাও আমার কবিতা গান করে। কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ হয় জান? আমার গাঁটে খ্যাতি ছাড়া আর কোন লাভ নাই" (একাদশ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)। মার্শালের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। হরেস্ মিসেনাস্ নামক এক জন বদান্য ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে সেবিয়ান্ ষ্টেট্ জায়গীর পাইয়াছিলেন, ভার্জিল এক কোটি সেস্টারসিস্ (প্রায় দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কাটাল্লাস্ ও লুক্রেশিয়াসের মত লেখক

কণ্টক

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কণ্টক মোরা সবল মোদের গতি—
উচ্চ এ শির করে না কারেও নতি।
বিঁধিতে কারেও করি নাকো দ্বিধা
আমরা সরল, কার্য্যও সিধা
কোথাও মোদের নাহিক অসঙ্গতি।

ক্র রকেও মোরা করি আশ্রয় দান,
বাঁচায়েছি কত সর্পশিশুর প্রাণ !
দূর্গে মোদের ময়নার বাস,
নির্ভয়ে জীব ফেলে নিশ্বাস
শক্ত আমরা সহি নাকো অপমান।

কুসুমেরা হয় যদি কাননের গীতি
মোরা অন্তঃ বটি কাননের ভীতি,
বলি 'সাবধানে চল হে পথিক
এ ধবার ভাল নয় তো গতিক
ফুলের সঙ্গে কণ্টক থাকা রীতি।'

নাই মানুষের দুরাশার সীমা হায়
যমের দুয়ারে কণ্টক দিতে চায় !
হইতে নেহাৎ নিষ্কণ্টক—
কাঁটা দিয়া তা'রা তোলে কণ্টক,
কমে না—মোদের সংখ্যাই বেড়ে যায়।

আমরা করেছি নীলকণ্ঠকে প্রীত—
স্মরি আনন্দে গাত্র কণ্টকিত।
'পুণ্যিপুকুর' মোরা শোভা করি
বিঁধে মারি যত অরিষ্ট অরি,
দিই না সুফল হইতে যে অপহৃত।

হই না আমরা যতই দোষেতে দোষী,
ফুল হয়ে মোরা ফুটিবার আশা পুষি'।
কাঁটা হয়ে আছি বনের মাঝার,
ফুলহার হব কণ্ঠে বাজার,
কেতকীরে ফুল করিল বিধির খুসী।

মোরা দিই তাই সবারে ধন্যবাদ
হবে একদিন ভঞ্জন অপবাধ।
করিবেন পেয়ে হয় তো আঘাত
'নিত্যানন্দ' কৃপা আঁখিপাত
জগাই মাধাই হইবার আছে সাধ !
ক্ষয় নাহি হয় যদিই শক্রভাব,
যদি এই বুকে নাই আসে অনুতাপ।
মোরা কাঁটা বই নহি তো অন্য
হরি-পদে ফুটে হইব ধন্য
এ 'গয়াসুরের' হবে হরিপদ লাভ।

[পূর্ব্ব-পৃষ্ঠার পর]

নিজে ক্রীতদাস দিয়া অনুলিপি করাইতে পারিতেন না বলিয়া প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি প্রদান করিতেন।

কুইনটিলিয়ান নামক এক জন ল্যাটিন লেখক ট্রাইফো নামক প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি দান করেন। ট্রাইফো বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিতেন। মার্শাল এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আমার পুস্তক কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা আপনাদের জানা না থাকিলে বলিয়া দিতেছি যে, শান্তি-মন্দিরের পশ্চাতে ও পালাস্ দেবীর চত্বরে সিকণ্ডাস নামক অধুনামুক্ত দাসের দোকানে পাইবেন।" যাহাতে এক পুস্তক বিভিন্ন প্রকাশক বাহির না করে, সে জন্য দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশকদের এক সংঘ গঠিত হয়। এই সংঘের সভ্যেরা এক জন ... করিয়াছেন, আবার তাহা প্রকাশ করিয়া ... া।

... রচনা সুধীসমাজে বা সাধারণ ... বার শুনিয়া ...

বক্তৃতা একবার মাত্র শুনিয়া সঠিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন। পারস্য রাজ কাইরাস এমন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে প্রত্যেক সৈন্যের নাম বলিতে পারিতেন। এ দেশেও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোকের অভাব কোন কালেই ছিল না।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রকাশ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ধর্ম্মমঠে ও গির্জায় স্থানান্তরিত হইল। অনুলিপিকরেরা সাধারণতঃ বিদ্বান্ হইতেন। তাঁহারা অনুলিপি-বিদ্যায় এমন বিশারদ হইয়াছিলেন যে, অর্দ্ধালোকিত কক্ষে হাঁসের কলমে ও রংএর সূক্ষ্ম তুলিকায় নানা বিচিত্র বর্ণে পার্চমেণ্টের উপর যে কপি তৈয়ারি করিতেন তাহা বহু শতাব্দী অন্তে আজ দেখিলে সদ্যলিখিত বলিয়া মনে হইবে। ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামে এরূপ বহু প্রাচীন অনুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে। এদেশেও বিচিত্র ভঙ্গীতে সজীব চিত্রের ন্যায় লিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি এখনও নানা গ্রন্থাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে পুঁথির প্রকাশ ও প্রচার প্রাচীন কালে ব্যবসায়ের আকার ধারণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

... বলিয়া সাধারণ ... ট। এই ... বিদেশীরা ... বিদ্ধারের ... পক্ষ

ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের যুদ্ধকালীন ভাবধারা

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

দেখিতে দেখিতে আরও একটি বছর কাটিয়া গেল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে যে নূতন যুগের সূচনা হয়, তাহার গৌরবময় পরিণতি লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৪ সালে।

এ বছরে ব্যাঙ্ক সমূহের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় স্যার সোরাবজি পোচখানাওয়ালা প্রতিষ্ঠিত "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার" নিট্ মুনাফা হইয়াছে এক কোটি সতের লক্ষ টাকার উপর। ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় কীর্ত্তি। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ ৬৫ লক্ষ টাকা নিট মুনাফা অর্জ্জন করিয়া গৌরবের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ ও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ যথাক্রমে ২৪ ও ২৩ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া ছোট-বড় অন্যান্য ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কারবার, মোটের উপর ভালই হইয়াছে। এই সকল বিবরণী পাঠকবর্গের নিকট প্রকৃতই সুখপাঠ্য হইত, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না "ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার" উল্লেখ না করিয়া। কিন্তু আমার মনে হয়, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক, তাহার নামটুকু মাত্র ছাড়া, ভারতীয় ব্যাঙ্ক বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সূচনা হইবার পূর্ব্বে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক এক প্রকার সরকারী ব্যাঙ্করূপে গণ্য হইত। আজও যে সব স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হয় নাই, সেই সব স্থানে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কারণে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে চলতি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছে। তাহার সহিত অন্যান্য সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের কার্য্যতঃ কোন প্রকার তুলনা চলে না।

১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে অর্দ্ধবার্ষিক হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের নিট্ মুনাফা হইয়াছিল ১৪ লক্ষ টাকা। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে এই ব্যাঙ্ক যে বিপুল পরিমাণ কমিশন লাভ করিয়া থাকে, যদিও তাহার যথাযথ হিসাব পাওয়ার কোন উপায় নাই, তবুও তাহার অঙ্ক একেবারে তুচ্ছ নয়। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে "ভারতীয় ব্যাঙ্কিং বিল" সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত টি, টি, কৃষ্ণমাচারী বলেন— এই কমিশনের পরিমাণ ১৯৪৩ সালে দাঁড়াইয়াছিল ৫৬ লক্ষ মুদ্রা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই প্রতিনিধি হিসাবে কার্য্য করিবার সৌভাগ্য ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের পক্ষে আরব্যোপন্যাসের "আলাউদ্দিনের প্রদীপে"র মত কার্য্য করিয়া থাকে। যদি বা কখনও অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা দেখা দেয়, মুনাফা যদিও বা হ্রাস পায় তবুও এই কমিশন ঘাটতি পরিমাণ অনেকটা পূরণ করিবে না কি? পাঠক নিশ্চয় আমার সহিত দ্বিমত হইবেন না যে, এই সকল কারণে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ককে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। সুতরাং পরবর্ত্তী আলোচনায় ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের পরিচালনা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিব না। (যদিও ১লা এপ্রিল ১৯৪৫ হইতে নূতন চুক্তি অনুযায়ী ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অনেক নিম্নহারে কমিশন পাইবে তথাপিও উপরোক্ত যুক্তির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করার কারণ ঘটে নাই)।

বস্তুতঃ যুদ্ধের এই কয়েক বৎসরে ব্যাঙ্ক সমূহের মুনাফা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাই মনে হয় যে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যদি মুনাফার উপরই কোন ব্যবসায়ের ভাল মন্দ নির্ভর করিত তবে উপরোক্ত ধারণা কতকাংশে সত্য বলা যাইতে পারিত। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা অসাফল্য তাহার লভ্যাংশ ঘোষণা করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, তেমনই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে না একমাত্র তাহার মুনাফা অর্জ্জনের শক্তির উপর। ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, কি ভাবে উহার মুনাফা অর্জ্জিত হইতেছে; যে পরিমাণ আয় হইতেছে তাহার কি পরিমাণ অর্থ পরিচালনায় ব্যয় হইতেছে; কি পরিমাণ লভ্যাংশ অংশীদারদের ঘোষণা করা হইতেছে এবং পরিশেষে আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে মোটের উপর কার্য্যদক্ষতা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না?

যুদ্ধের সংঘাতে ভারতের অর্থনৈতিক আবহাওয়ার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বের শান্তিময় দিনগুলিতে টাকার মূল্য অদ্যকার তুলনায় ঢের বেশী ছিল। মালপত্রের প্রাচুর্য্যের জন্য অল্প পয়সায় অনেক জিনিষ পাওয়া যাইত। ধীরে ধীরে সেই সব জিনিষপত্র যুদ্ধদানবের প্রয়োজনে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল, তাহার স্থলে দেখা দিল টাকার ছড়াছড়ি। ফলে সস্তা বাজারের পরিবর্ত্তে আমরা সম্মুখীন হইতেছি এক অভাবনীয় দুর্মূল্যের অভিমুখে।*

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০০৯.৬০ কোটি মুদ্রার উপর, আর যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে উহাই ছিল ১৮২,৪৪ কোটি টাকা মাত্র। সুতরাং চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৪৫৩.৩৮ ভাগ। মুদ্রাস্ফীতির ফলে এই যে বিপুল অর্থের উদ্ভব হইল তাহা কোথায় লুক্কায়িত থাকিতে পারে? তখনও ভারতবর্ষের উপর জাপানী বোমার উৎপাত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সিমেণ্ট, লোহা প্রভৃতি মাল মসলার অভাবে ইমারত তৈয়ারীর কাজ, সামরিক প্রয়োজন ভিন্ন প্রায় একরূপ বন্ধ ছিল। জনসাধারণ ভরসা করিয়া জমি-জমা খরিদ করিতে সাহস পাইত না। শেয়ার বাজারে, কোম্পানী কাগজ ও অন্যান্য কাগজপত্রের দাম তাহাদের প্রকৃত মূল্যের বহু ঊর্দ্ধে থাকায় ফটকাবাজী ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লেন-দেন হইত না। সরকার তখনও স্বর্ণ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন নাই, তাই জনসাধারণ তাহাদের অর্থের কিছুটা সরকারী ঋণে নিয়োজিত করিল, কোন কোন

---

* এই প্রসঙ্গে লেখকের ১৩৫২ আসাঢ় মাসের মাসিক বসুমতীতে [illegible]

অতি হুঁসিয়ার ব্যক্তি মাটির নীচে সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রাখিয়া দিল—বাদবাকি অর্থ অন্য কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যাঙ্কগুলির হাতে আসিয়া জমা হইল। বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির মোট জমার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৬ কোটি টাকা, তাহাই ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষে দাঁড়াইয়াছিল ৮১৯.০০ কোটি মুদ্রায়। আমানতের পরিমাণের বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাঙ্ক সমূহের মুনাফা বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক এবং এই প্রকার পটভূমিকার সম্মুখে আমাদের বিচার করিতে হইবে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের কর্ম্ম-কুশলতা।

ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে তাহাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার। যে সব ব্যবসায়-কেন্দ্রে কোন প্রকার ব্যাঙ্ক ছিল না, ধীরে ধীরে তাহারা সে সব যায়গায় যাইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়তা করিতেছে। সুখের কথা বটে। ১৯৩৯ সালে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৬১; ১৯৪৪ সালে তাহাই হইয়াছে ৮৪। ব্যাঙ্কগুলির শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ছিল ১৯৩৯ সালে ১২৭৭; তাহাই বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৪ সালে হইয়াছে ২৪৪৩। ইহার মধ্যে ১৯৪৩টি শাখা হইতেছে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের; ৮০টি অভারতীয় বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির; বাদবাকি ৪২০টি শাখা ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের।

এখন দেখা যাক, যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুদ্ধের সমসাময়িক কালে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ধন-সম্পত্তি কি ভাবে নিয়োজিত করিয়াছে—

সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের একত্রিত হিসাব

(কোটি মুদ্রায়)

		২৯·২·৪৪	১,৯·৩৯
১।	ভারতবর্ষে আমানত প্রভৃতি	৮১৯·০১	২৩৬·৬০
২।	নগদ তহবিল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকা	১০৬·০৭	৩১·৮৭
৩।	দাদন	২৩৬·৮০	১০৬·০০
৪।	হুণ্ডি প্রভৃতিতে লগ্নি	১৩·০০	৪·০০
৫।	রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত উদ্বৃত্ত অর্থ	৩৮·৭৩	১৬·৪১

উল্লিখিত হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধকালে দাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদপত্রে এই ক্রমবর্দ্ধমান দাদন প্রসঙ্গে বহু লেখালেখি হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক সমূহকে সতর্ক-বাণী শুনাইয়াছিলেন। নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া যাহাতে ব্যাঙ্ক সমূহ দাদন দিয়া ফটকা-বাজদারদের সাহায্য না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সরকারের দ্বারা প্রবর্ত্তিত "কন্ট্রোলের" ফলে কাঁচা মালের উপর দাদন দেওয়া কার্য্যতঃ একপক্ষে কল্পনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বর্ণের উপর দাদন দেওয়া বন্ধ ছিল। সর্ব্বোপরি যানবাহনের অসুবিধার ফলে রেল-রসিদ প্রভৃতির উপর দাদন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও দাদন খাতের অঙ্ক যে অল্প-পরিসর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে চিন্তান্বিত হইবার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্ক সমূহের আমানত প্রভৃতির শতকরা ৪৪·৯১ ভাগ নিয়োজিত হইত দাদনে আর ১৯৪৪ সালে উহার পরিমাণ হইয়াছে শতকরা ২৮·৮১ ভাগ। হুণ্ডি প্রভৃতিতে লগ্নির পরিমাণ ১৯৩৯ সালে ছিল আমানত প্রভৃতির শতকরা ১·৬৯ ভাগ, আর ১৯৪৪ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ১·৫৮ ভাগ মাত্র। তাহা হইলে দাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল কি করিয়া?

ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের একত্রিত বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের বিবরণী যে ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা নানান্ দিক্ দিয়া অকিঞ্চিৎকর। উহার মধ্যে আবার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার প্রভৃতিতে যে পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত থাকে তাহার বিশদ বিবরণের অভাব। এই বিবরণের অভাবের জন্য কোন্ ব্যাঙ্কের মোট আমানতের কত অংশ কোম্পানী কাগজ ও শেয়ারে নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা সঠিক্ ভাবে নির্ণয় করা এক সমস্যার ব্যাপার। যখন সমস্ত সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের একত্রিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়, তখন আমরা গুটিকতক ব্যাঙ্কের, যাহারা বাজারে নিজেদের কর্ম্মকুশলতার দ্বারা সুনাম ও জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের নিয়ম-পদ্ধতি আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। অবশ্য এই প্রকার অনুসন্ধানে কোন নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না, তথাপি ইহা আমাদের আলোচনার উপর অনেকটা আলোকসম্পাত করিবে। নিম্নে ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের বিবরণ দেওয়া গেল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে ১৯৩৮ সালের তুলনায় কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য শেয়ারে নিয়োজিত অর্থের কি ধারায় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১নং তালিকা	১৯৩৮		(লক্ষ মুদ্রায়)
	মোট জমা	কোঃ কাগজ ও শেয়ারে লগ্নি	(২) এর পরিমাণ শতকরা (১) এর
	(১)	(২)	(৩)
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩১০২	১৪৫০	৪৬·৭৪%
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া	১৭২৪	৮০৫	৪৬·৬৯%
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	৭১২	৩৩৪	৪৬·৮০%
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	৬৭৮	১৮১	২৬·৬০%
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	৩৩৬	১৪৭	৪৩·৭৫%

২নং তালিকা	১৯৪৪		(লক্ষ মুদ্রায়)
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৯৪৪৯	৫৬৮৭	৬০·১৮%
ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডিয়া	৬০৮২	৪১৩৬	৬৮·০০%
ব্যাঙ্ক অফ, বরোদা	২৬৯৩	১৬৩১	৬০·৮৬%
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	৩৭৭৬	২২৭০	৬০·১১%
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	১০৫২	৫৭৫	৫৪·৬৬%

১৯৩৮ সালে ব্যাঙ্ক সমূহের মোট আমানতের শতকরা ৪৬·৪৭ ভাগ অর্থ নিয়োজিত হইত কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে আর ১৯৪৪ সালে উহার পরিমাণ হইয়াছে আমানতের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। তথাপিও ব্যাঙ্কের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থের ঘাটতি দেখা যায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চলতি আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ ও স্থায়ী আমানতের দুই ভাগ অর্থ জমা রাখিয়াও ব্যাঙ্কগুলির উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে যথাক্রমে ৬০·৫৪ এবং ৩৮·৭৪ কোটি মুদ্রা মাত্র। সুতরাং এ অনুমান বিন্দুমাত্রও ভ্রান্ত নয় যে ব্যাঙ্ক সমূহের হাতে উপযুক্ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও সে অর্থ যথোচিত নিয়োগের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না; এ যেন প্রাচুর্য্যের মধ্যেও হাহাকার!

ব্যাঙ্ক সমূহের কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে এই বিপুল অর্থ নিয়োগের ফলে এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যুদ্ধান্তে যখন এক এক করিয়া "কন্ট্রোল"গুলি তুলিয়া লেওয়া হইবে তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অর্থের বিরাট চাহিদা দেখা দিবে। সন্তোষজনক লাভের আশায় ব্যাঙ্কগুলি তখন কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে যে অর্থ নিয়োজিত আছে তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে এবং প্রয়োজনমত ঐ সব কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। অতিরিক্ত বিক্রয়ের চাপে কোম্পানীর কাগজের বাজারে মন্দা দেখা দিতে পারে। এইরূপ এক পরিস্থিতি কি সরকার কি জন সাধারণ কাহারও নিকট বাঞ্ছনীয় নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইংলণ্ডে কি ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ইংরেজ সরকার এই প্রকার এক পরিস্থিতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতীয় "ট্রেজারী বিলের" মত "ট্রেজারী ডিপোজিট রিসিট" বিক্রয়ের দ্বারা ইংরেজ সরকার সেখানকার ইংরেজী ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ১৳ পার্সেণ্ট সুদ হারে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা অর্থ-নৈতিক বাজারে ইহার কেনা-বেচার ফলে কোন প্রকার চাপ পড়ে না। নিম্নে বিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ইকনমিষ্টে' প্রকাশিত তালিকা প্রদত্ত হইল—যাহা হইতে দেখা যাইবে ইংরেজী ব্যাঙ্ক সমূহ "ট্রেজারী রেসিটে" কি ভাবে অর্থ নিয়োগ করিয়াছে।

(১০ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)

	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩
আমানত	২২৫৪	২৪৪১	২৮০০	৩৩২৯	৩৬২৯	৩০৩২
যাহা যে সব সম্পত্তি নগদ টাকায় পরিবর্তিত করা যায় তাহার মধ্যে	৭২৩	৯০১	১১৯৬	১৫৯৮	১৮১২	২২১৪
"ট্রেজারী ডিপোজিট রসিদ"	—	—	৩১৪	৭৫৮	৮৯৬	১৩০৭
কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে লগ্নি	৬৩৫	৬০৯	৭৭১	৯৯৯	১১২০	১১৫৪
ঋণে নিয়োজিত অর্থ	৯৬৬	১০০২	৯০৬	৮০৭	৭৭৩	৭৪৩

উপরের তালিকা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলির লগ্নি বা দাদনে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইয়াছে, তাহার স্থলে নগদ টাকা, চেক প্রভৃতির (যাহা অতি সহজে নগদ টাকায় পরিবর্তিত করা যায়) পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে এই সকল নগদ টাকার পরিমাণ ছিল আমানতের শতকরা ৩২ ভাগ আর ১৯৪৩ সালে উহাই হইয়াছে শতকরা ৫৫ ভাগ। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও ব্যবসায়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য "ট্রেজারী রসিদ" ভাঙ্গাইলে কার্য্য সমাধান হইবে। কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে হাত না দিলেও কোন অসুবিধা হইবে না।

ব্যবসায়ী যেমন কেনা-বেচা বন্ধ করিয়া মালের উপর চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারে না, তেমনি ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানও তাহার টাকা না খাটাইয়া নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। আমানতকারীদের টাকার উপর সুদ আছে, চেক-বই, খাতাপত্র প্রভৃতির খরচ আছে, তাহার উপর যুদ্ধের দরুণ মাগ্‌গি ভাতা প্রভৃতি আছে। এই সব মিলিয়া খরচের পরিমাণ বাড়িয়াছে। খরচ-পত্র মিটাইয়া অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা আজকাল প্রবল। ব্যাঙ্কের যাঁহারা খরিদদার (আমানতকারী বা ঋণপ্রার্থী), তাঁহারা এই প্রতিযোগিতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। সময় সময় ইঁহারা নানা ধরণের অযৌক্তিক প্রস্তাব লইয়া ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের নিকট উপস্থিত হন এবং ইঁহাদের প্রস্তাব গৃহীত না হইলে খাতা বন্ধ করিয়া দিবেন এই প্রকার হুমকি দেখান। আজকাল ভাল ভাল ব্যাঙ্ক সমূহের সংখ্যা কম নয়। কাজেই এক যায়গায় খাতা বন্ধ করিয়া অন্য যায়গায় তাহারা নির্ব্বিবাদে কাজ চালাইতে পারেন। অধিকন্তু যে সব নূতন নূতন ব্যাঙ্ক হইয়াছে তাহারা পুরাতন ব্যাঙ্কের তুলনায় অল্প খরচে কাজ না করিলে খরিদদার পাইবেই বা কেমন করিয়া? পুরাতন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে তবুও কতকটা নিয়ম-কানুন আছে যাহা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা কাজ করেন না—কিন্তু নূতন নূতন ব্যাঙ্ক সমূহ যখন যাহা সুবিধা তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। কতক কতক ব্যবসায়ী তাই আজ এই ব্যাঙ্কে কাল ঐ ব্যাঙ্কে কাজ করিয়া সর্ব্ববিধ সুবিধা গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বস্তুতঃ ইহা যারপরনাই পরিতাপের বিষয় যে, ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা এই প্রকার নীচ মনোবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন। যে প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহারা এত কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন আজ হঠাৎ তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে কি একটুকুও বাধে না? হইতে পারে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। আমানতকারীদের উচিত বিষয়টি ব্যাঙ্কের উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নজরে আনা—তাহার প্রতিকার করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীর মধ্যে টাটা, বিড়লা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ি-পরিবার ভিন্ন "সুনাম" বলিয়া যে জিনিষ তাহা কাহারও আছে কি না কে বলিবে? সেইরূপ কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে এ কথা দৃঢ় ভাবে বলা কঠিন যে, অমুক তাহার নিজের খরিদদার। এই বিষয়ে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আমাদের প্রচুর শিক্ষণীয় আছে।

ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে এই হীন প্রতিযোগিতা তাহাদের আয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। আজকাল ব্যাঙ্কের কমিশন ও এক্সচেঞ্জের হার আগের তুলনায় অনেক কম। ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় যে মানবের সেবার জন্য আগে যে মূল্য দিতে হইত এখন আর তাহা দিতে হয় না; কিন্তু আবার ইহা ভুলিলেও ভুল হইবে যে অন্যান্য ব্যবসায়ের মতন ব্যাঙ্ক পরিচালনা এক প্রকার ব্যবসায়ই। তবে এইটুকু মাত্র তফাৎ যে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সামগ্রী হইয়া থাকে নানা রকমের মাল-মসলা আর ব্যাঙ্কের বেলায় সেটা শুধু টাকাকড়ি। ব্যবসায় চালাইয়া যদি শেষ পর্য্যন্ত কিছু মুনাফা না দাঁড়ায় তবে এত পরিশ্রম চিন্তা-ভাবনা, ঘনঘটার কি প্রয়োজন? তবে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়, সে কথা স্বতন্ত্র।

অলক্ষ্যে আর একটি সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমাগত প্রতিযোগিতার ফলে সরকারী দাদন-হার (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেট) নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ মার্কিণ সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সস্তায় ঋণ গ্রহণ করা। অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সাথে সাথে তাহারা সরকারী দাদনের হার নীচু করে। ১৯৩৯ সালের ২৬শে অক্টোবর ইংলণ্ড তাহার "ব্যাঙ্ক রেট" শতকরা

৩ পাউণ্ড হইতে ২ পাউণ্ডে নাবায়, আর ১৯৪২ সালের ২১শে অক্টোবর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তাহার "ব্যাঙ্ক রেট" শতকরা ১ হইতে অর্দ্ধ ডলারে স্থিরীকৃত করেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যুদ্ধকালে তাহার দাদন-হারের কোনরূপ অদল-বদল করেন নাই। ইহাতে সরকার সুখী হইতে পারেন, কিন্তু যে হারের সঙ্গে বাজার-দরের কোন সমতা লক্ষিত না হয় তাহার অস্তিত্ব কোথায়? আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি গচ্ছিত রাখিয়া ভাল ভাল ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা দুই বা আড়াই টাকা মাত্র সুদের হারে ঋণ করা যাইতেছে—যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সুদের হার ছিল শতকরা ৩ হইতে সাড়ে ৩ টাকা। স্থায়ী আমানতের সুদের হার শতকরা ২৲ হইতে ১৷০ টাকায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ট্রেজারী বিলে টাকা খাটাইয়া শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদের স্থলে ১৲ টাকা মাত্র পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দাদন-হার মোটেই কার্য্যকরী নয়। অর্থনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী "ব্যাঙ্ক রেট" বাজার-দরকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু যখন ইহা তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে তখন ইহার পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার দাদন-হার অনতিবিলম্বে পরিবর্ত্তিত না করেন, তবে উহাকে বাস্তব ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শুধু সরকারী দপ্তরের খাতাপত্রেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

সরকারী দাদন-হার ও বাজার-দরের মধ্যে এই অসংলগ্নতা ব্যাঙ্কগুলির উপার্জ্জন-ক্ষমতাকে বহুলাংশে পঙ্গু করিয়াছে। যথাযথ হিসাবের অভাবের জন্য সমুদয় সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের একত্রিত আর্থিক অবস্থা বিচার করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ককে মানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও আংশিক ভাবে সমাধান করিব। আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ব্যাঙ্কগুলির নিকট আমানতকারীদের বা অংশীদারদের যে অর্থ গচ্ছিত আছে, তাহার অনুপাতে ব্যাঙ্কগুলির মুনাফার পরিমাণ বাড়িতেছে কি না? আমাদের দেখিতে হইবে, ব্যয়ের পরিমাণ কমিতেছে কি না? যদি মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি হয় আর ব্যয়ের অংশ হ্রাস পায় তবেই বলা যাইতে পারে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতি সত্যই সাধিত হইতেছে; অন্যথায় নয়। নিম্নে তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল :—

ব্যাঙ্কের নাম	গচ্ছিত অর্থের তুলনায় স্থূল মুনাফার পরিমাণ		গচ্ছিত অর্থের তুলনায় ব্যয় হার		গচ্ছিত অর্থের তুলনায় নিট মুনাফার পরিমাণ		স্থূল মুনাফার তুলনায় কর্ম্মচারীদের বেতনের হার	
	১৯৩৮	১৯৪৪	১৯৩৮	১৯৪৪	১৯৩৮	১৯৪৪	১৯৩৮	১৯৪৪
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ	২·১৫	২·৫৫	১·৩৩	১·৪৮	·৮২	১·০৭	৩৪·৩	২৫·০৫
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ	১·০১	১·৭৪	·৮৮	·৭২	১·১৩	১·০১	২৭·১	১৮·০১
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ	১·৭৪	১·৪১	১·০৮	·৫১	·৬৬	·৮১	৩২·৫	২৮·০৮
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ	২·১১	২·১৪	২·২২	১·৪৩	·৬৯	·৪১	—	৩২·০৬
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ	২·৩৫	৩·০০	১·৫৭	১·০১	·৭৮	১·০১	৫৭·১	২৫·৩০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	—	১·৬৪	—	·১৮	—	·৬৫	—	২৪·৩৭
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	—	১·৮২	—	১·৩৮	—	·৪৩	—	৩৬·৮১

পূর্ব্ব-বর্ণিত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃএর ক্ষেত্রে স্থূল লাভের মাত্রা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও ব্যাঙ্ক অফ বরোদার বেলায় উহা হ্রাস পাইয়াছে। অথচ গড়ে উহা প্রায় একরূপই রহিয়াছে। আবার ব্যয়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উহা সেন্ট্রাল, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ও ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃএর বেলায় বৃদ্ধি পাইয়া, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও ব্যাঙ্ক অফ বরোদার বেলায় হ্রাস পাইয়াছে, আর গড়ে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফলে যদিও নিট লাভের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই বৃদ্ধির পরিমাণ তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নিট লাভের বৃদ্ধির পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৪৪ সালে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ বরোদা যথাক্রমে নিট লাভের হার শতকরা ·২৫ এবং ·১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পুরাতন ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও নূতন ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় তেমন কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে পারিতেছে না। নূতন ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিস্বরূপ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ও হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে ধরিলে দেখা যায় যে, তাহাদের কার্য্য-পরিচালনা প্রশংসনীয়। অর্থবল অনুপাতে নিট লাভের অংশ তাহাদের ক্ষেত্রে পুরাতন ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় মন্দ নয়।

তাই এই প্রতীতি জন্মে যে, কি পুরাতন, কি নূতন, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যক্ষেত্র প্রায় একই প্রকারের। কাহারও অর্থবল কিঞ্চিৎ বেশী, কাহারও বা কম। কিন্তু কর্ম্মধারা বা পদ্ধতি সকলেরই অভিন্ন। বস্তুতঃ ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণ হইতে অল্প সুদে আমানত গ্রহণ করিয়া দৈনিক প্রয়োজন মিটাইতে যে পরিমাণ নগদ টাকার দরকার তাহা নিজের কাছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অপর কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া, বাদবাকি টাকা কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার বা অন্য কোন প্রকার সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া খরিদদারকে ধার দিয়া থাকে। এইরূপ বাঁধা-ধরা নিয়মে চলিতে থাকিলে যুদ্ধের পর যে যুগ দেখা দিবে, তাহাতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় দীপ্তিহীন হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। আমাদের খুঁজিতে হইবে নূতন পথ; গ্রহণ করিতে হইবে নূতন পদ্ধতি। বিনিময়-কার্য্য বর্ত্তমানে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির প্রায় একরূপ একচেটিয়া ব্যবসায়। সে-পথে অগ্রসর হওয়া বাধা-বিঘ্নময়; তবুও তাহা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তেজারতি করিয়া দিন-গুজরানের পালা শেষ হইয়াছে। ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় যদি বদ্ধপরিকর হয় যে বিদেশী ব্যবসায়ে, ব্যাঙ্কের যেটুকু কাজ করিবার আছে তাহা ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকেই দিবে, তবে বিনিময়-কার্য্য প্রাথমিক বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এ আশা করা যাইতে পারে।

একটি বিষয়ে প্রায় সকল ব্যাঙ্কগুলিই সমতা রক্ষা করিয়াছে।

শিকার-স্মৃতি

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

গারো পাহাড়ের দক্ষিণে ছোট ছোট টীলা হইতে সময় সময় গুলদার বাঘের (Leopard অথবা Panther) উৎপাতে কাছাকাছি গ্রামবাসী অস্থির হইয়া উঠে। গারো পাহাড়ের সংরক্ষিত জঙ্গলে (Reserve Forests) দিনের বেলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিয়া সন্ধ্যার মুখে সকলের অলক্ষিতে কখন ব্যাঘ্র গ্রামের নিকটে ছোট ছোট ঝোপের আশ্রয়ে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে তাহা বলা বড়ই কঠিন। তবে ভোরের বেলায় শোনা যায় কাহারও বাছুর, ঘোড়া, ছাগল কিম্বা বকরী লইয়া বাঘ পলায়ন করিয়াছে—যাতায়াতের নিদর্শন-স্বরূপ স্পষ্ট পদচিহ্ন মাত্র রাখিয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া শোবার ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়াও হয়ত চড়াও করিয়াছে এমনও শোনা যায়। খাদ্য-সংগ্রহে এত দুঃসাহসিকতা এবং অসীম পটুতা থাকিলেও এই অঞ্চলের বাঘ মানুষকে আক্রমণ করিয়াছে, এমন প্রায় শোনা যায় না। বাংলার অনেক অঞ্চলেই গুলদার বাঘ সহজপ্রাপ্য, সুতরাং ইহাদের মাজ্জার-সুলভ স্বভাব অনেকের সঙ্গে অল্প-বিস্তর অনেকেই পরিচিত। এই জাতির বাঘের সাধারণ স্বভাবের উল্লেখ বাংলা পাঠকের নিকট অনাবশ্যক। রহস্যভেদ-তৎপর ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের একাগ্রতা এবং অনুসন্ধিৎসার অবধি থাকে না, অতি সাধারণ বিষয় হইতেই বিশেষ তত্ত্ব উদ্ধার করা তাঁহাদের স্বভাব।

কয়েক বৎসর ধরিয়া সংবাদ পাইতেছি, একটা বড় গুলদার প্রায় রাত্রিতেই কাহারও গরু মারিয়াছে এবং 'মড়ির' (অর্থাৎ মৃত জন্তুর) কিছু একটু অংশ রাত্রির মধ্যে খাইয়াই গারো পাহাড়ে ফিরিয়া গিয়াছে। দুই একবার মাচা বাঁধিয়া এই বাঘ শিকারের চেষ্টা বিফল হইয়াছি। এক রাত্রিতে স্থানীয় কোনও শিকারী গুলী লাগাইয়া না লাগাইতে পারায় বাঘটা আরও সতর্ক হওয়ার ফলে উহাকে শিকারের সমস্ত চেষ্টা ৬।৭ বৎসর হইল ব্যর্থ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং এই বাঘ শিকারে কৃতিত্ব অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা মনে চাপিয়া বসিয়াছিল।

[illegible] বানাই এই অঞ্চলেই বাস করে। তাহাকে বলিয়া [illegible], বাঘটা সুবিধামত কোথাও মড়ি করিলে, 'মড়ি,' শকুন, [illegible] এবং গারোদের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সংবাদ দিলে তাহাকে উপযুক্ত বকসিস্ দিব। 'মড়ির' চামড়া ছাড়াইয়া লইলে প্রায় তৎক্ষণাৎ শকুনি সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলে, এবং বাঘ সেই মড়ি খাইতে রাত্রিতে আর প্রায়ই আসে না। তা ছাড়া গারোরা বাঘে-মারা জন্তুর খোঁজ পাইলেই তাহা লইয়া খাইয়া ফেলে। সুতরাং প্রায়ই 'মড়ি'র সুবিধামত সংবাদ পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এক দিন হঠাৎ এক সুযোগ আসিয়া দেখা দিল। মাঘ মাসের শেষ। ধানকাটা সারা হইয়াছে। শীতের শেষে বসন্তের আভাস কচিৎ পাওয়া যাইতেছে। গৃহস্থ ধান মাড়াই দিবার পর, গোলায় ধান উঠাইবার পূর্ব্বে এবং পরে, পাহাড়তলীর হাজং ও বানাই পাড়াগুলি আনন্দের কলোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে। প্রাচুর্য্যের দিন কয়টা তাহাদের একটানা অভাবের জীবনে ক্ষণস্থায়ী। সঙ্কটের কঠোরতা তাহাদের জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে নীরস করিয়া রাখে না। পাহাড়ের কোলে পরিবর্দ্ধিত এই সব লোকের অনিশ্চিত জীবনও পর্ব্বতের সঞ্জীবনী রস আনন্দে ভরপুর করিয়া রাখে। কবে গ্রামে হামজ্বর দেখা দিয়াছিল—গ্রামের বাহিরে পাহাড়ের নীচে, বৎসরের পরে কামাখ্যাবাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় মানত আদায় হইবে—তাই গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সে-দিন কীর্ত্তন ও উৎসবানন্দে বিভোর।

পদ্দু সকালবেলায় সংবাদ দিল যে, তাহার নিকট এক ব্যক্তি একটা ঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিয়াছিল, গত রাত্রিতে বাঘে সেই ঘোড়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এই মাত্র-প্রবরকে শিকারের জন্যই আমরা উৎসাহিত ছিলাম।

পদ্দু গ্রামের বাহিরে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা টীলায় একা বাসা বাঁধিয়া থাকিত। ঘোড়া মারার পর, বাঘ সেই টীলার নীচেই একটা শুক্‌না পুকুরের ধারে পাহাড়ের পাশে লইয়া গিয়া তাহার প্রায় পাছার অর্দ্ধেক অংশই খাইয়া ফেলিয়াছে। শকুনে যাহাতে না খায় সেই উদ্দেশ্যে মড়ি ভাল করিয়া পাতায় ঢাকিয়া পদ্দু আমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছিল। পদ্দুর মতে বাঘ দিনের বেলায় গারো পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘোড়ার মাংস বাঘের প্রিয় খাদ্য, এজন্য পেট ভরিয়া খাওয়া সত্ত্বেও বাঘ নিশ্চয় সন্ধ্যার মুখেই ফিরিয়া 'মড়ি' খাইবে।

গারো পাহাড়ের নীচেই মৈমনসিং জেলার সমতল। গারো পাহাড় ঘন বনানীতে পরিপূর্ণ। মৈমনসিং জেলায় যে কয়টি ছোট ছোট টীলা আছে তাহার চতুর্দ্দিকেই ধানের ক্ষেত, এবং এই সকল টীলার জঙ্গলও অপেক্ষাকৃত অল্প। অবাধ গোচারণ এবং গ্রামবাসীদের নির্ব্বিচারে গাছ কাটার ফলে এই টীলাগুলি প্রায় বৃক্ষহীন হইয়া গিয়াছে।

[illegible], যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বের তুলনায় কর্ম্মচারীদের বেতনের হার [illegible] হ্রাস করা। যুদ্ধ-ভাতা, মাগ্‌গি-ভাতা প্রভৃতিতে যে [illegible] অর্থ ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের দেওয়া হয়, উহা তাহাদের সমসাময়িক [illegible] অফিসের কর্ম্মচারীদের তুলনায় অতীব সামান্য। এ কথা [illegible] করিতে হইবে যে, ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের দায়িত্ব বড় কম নয়। [illegible] কর্ম্মদক্ষতা শুধু উচ্চপদস্থ দুই-চারি জন সাহেব-সুবার উপরই [illegible] নির্ভর করে না, ব্যাঙ্কের কর্ম্মদক্ষতা নির্ভর করে "চাকতি" [illegible] কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বড় সাহেব পর্য্যন্ত সকল [illegible] কর্ম্মচারীর উপর। কিন্তু ব্যাঙ্কের এক জন সাধারণ কর্ম্মচারী [illegible] বেতন পাইয়া থাকে—মাসিক ৫০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা [illegible] বেশী নয়। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সুষ্ঠুরূপে চালাইতে হইলে [illegible] কর্ম্মচারীর প্রয়োজন যাহাদের সাধারণ জ্ঞান বেশ ভাল আছে। অর্থ-নৈতিক ও আইন-বিষয়ক জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত ধরণের কর্ম্মচারী রাখিতে হইলে তাহাদের বেতনও সেই অনুপাতে দেওয়া প্রয়োজন নয় কি?

উপসংহারে ইহাই বলিতে চাই যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে তাহা অচিরে অবসান করা উচিত। আমাদের এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি একই বৃক্ষের বিভিন্ন কাণ্ড মাত্র। যদি কোন ভারতীয় ব্যাঙ্ক সাফল্যের সহিত কার্য্য করিতে থাকে তাহাতে অন্য কোন ব্যাঙ্কের ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ভারতের নিজের ব্যবসায় যেন বিদেশীর হাতে চলিয়া না যায়। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে একের সহিত অপরের সংঘাত নয় বরং বৃহদাকারের সহযোগিতা—বিদেশীর হাত হইতে আত্মরক্ষা।

স্টীমের শক্তি

পি, এস

স্টীমের শক্তি নিজস্ব নহে, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ধার করা শক্তি ; স্টীমের মধ্য দিয়া তৈল, কয়লা বা কাঠের অন্তর্নিহিত তাপ-শক্তি রূপান্তরিত হইয়া কাজ করিয়া থাকে। গত শতকে Reciprocating Engine অর্থাৎ পারস্পরিক বা পর্য্যায়-ক্রমে অগ্রপশ্চাদ্গামী পিষ্টন-বিশিষ্ট ইঞ্জিন দ্বারাই কাজ চালানো হইত। রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ইহার সুপরিচিত উদাহরণ। বয়লার, ভ্যাল্ভ-গীয়ার এবং পিষ্টন হইতে—চাকার গতি-শক্তি চালনা করিবার কলকব্জা নূতন নূতন উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে অনেক উন্নতি লাভ করিলেও মোটের উপর ইহাতে তাপশক্তির বহু অপচয় হয়। স্টীমটার্বিনের আবিষ্কারের দ্বারা এই অপচয়ের বহুলাংশ নিবারণের ফলে এখন স্টীমের শক্তি দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ জলপ্রবাহের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে স্টীমের সাহায্যে সরাসরি চাকা ঘুরানো হয়। স্টীমের এই শক্তির কথা প্রাচীন গ্রীকরাও অবগত ছিলেন। কিন্তু স্যার চার্লস পার্সন্সের উদ্ভাবনী শক্তিই ইহাকে সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী করিয়া তুলে। অবশ্য পরে অনেক ইঞ্জিনিয়ার ইহার নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। পারস্পরিক ইঞ্জিনে স্টীমের শক্তিতে চালিত পিষ্টনের গতি অগ্রপশ্চাৎ ক্র্যাঙ্কের সাহায্যে চাকা ঘোরায়। টার্বিনে স্টীমের চাপ সরাসরি চাকা ঘোরায়। হাওয়া-কলের মত টার্বিনও একটি "Prime-mover" অর্থাৎ মৌলিক গতি-উৎপাদক। উভয় যন্ত্রে কাঠ তৈল বা কয়লার অন্তর্নিহিত তাপশক্তি স্টীমের সাহায্যে কার্য্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তবে পারস্পরিক ইঞ্জিনের গতি সবিরাম (Intermittent) এবং টার্বিনের চাপ অবিরাম বলিয়া টার্বিনে শক্তির অপচয় পারস্পরিক ইঞ্জিন অপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে। টার্বিন এবং রোটর (Rotor "ঘূর্ণক") কেসিংএ ঢাকা থাকে বলিয়া ইহার কাজ পারস্পরিক ইঞ্জিনের মত চাক্ষুষ হয় না। একটি হাওয়া-কল একটি ঢাকের (Drum) মধ্যে ঢাকা আছে মনে করিয়া লইলে ইহার কাজ সহজে বুঝা যায় কেবল হাওয়ার বদলে স্টীমের ধারার (Jet) বেগে পাখাগুলি (Vanes) ঘোরানো মাত্র। কেসিংয়ের বাহিরে ঘূর্ণিত দণ্ড বা শাফ্‌ট উহাতে আঁটা পাখা ঘোরাব ফলে ঘোরে। 'জেট'গুলি এমন ভাবে কেসিংয়ে লাগানো থাকে যাহাতে সেগুলির বেগ পূর্ণ শক্তিতে কাজ করিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে পাখাগুলি অসংখ্য ধাক্কা খাইয়া টার্বিনটি ঘুরায় বলিয়া এই টার্বিনকে ইমপালসিভ টার্বিন (ধাক্কাটার্বিন) বলা চলে। স্টীমের পূরা কাজ পাইতে হইলে ইহার গতি অন্ততঃ সেকেণ্ডে ৪০০০ ফুট হওয়া আবশ্যক, এবং টার্বিনের চাকার ব্যাস ১ ফুট হইলে ইহা কমপক্ষে সেকেণ্ডে ৬০০ বার ঘুরিয়া আসা চাই। অন্যথা তাপশক্তির বহু অপচয় হইয়া থাকে। ইহাতে অসুবিধা এই যে, (১) এত জোরে ঘুরিয়াও টিকিয়া থাকিবার মত শক্ত ধাতু পাওয়া প্রায় অসম্ভব এবং (২) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রচণ্ড গতি কাজে লাগাইতে পারা যায় নাই। শেষোক্ত অসুবিধা গীয়ারিং (চাকা-কল) সাহায্যে দূর করা যায় বটে তথাপি এই ধরণের টার্বিন খুব ছোট ছোট কারখানা ছাড়া ব্যবহার করা হয় না। স্যার চার্লস পার্সন্সের উদ্ভাবিত টার্বিনে পাখাগুলি কেবল ঘূর্ণন-দণ্ডের উপরই পর পর আঁটা থাকে না, কেসিংএর সঙ্গেও আঁটা থাকে। ধাক্কা এই টার্বিনে ঢুকিয়া স্টীম যেমন প্রসারিত হইতে থাকে তেমনই উহা ক্রমশঃ পর পর বড় বড় পাখায় লাগে এবং দণ্ডের উপরে আঁটা পাখায় ধাক্কা দিবার পর ইহা ফিরিয়া কেসিংয়ে আঁটা পাখায় প্রতিহত হইয়া আবার ঘূর্ণনদণ্ডে আঁটা পরের পাখায় আসিয়া ঠিক মত ধাক্কা দেয়। এই পাখাগুলি কাগজের মত পাৎলা। বড় বড় টার্বিনে এগুলি সংখ্যায় লক্ষাধিক হইয়া থাকে, অতএব প্রত্যেক পাখার উপর চাপের পরিমাণ ২।১ পাউণ্ড হইলেই চলে। স্টীমের গতি ইহাতে অনেক কম হইলেও চলে এবং ইহার ঘূর্ণন তত অধিক নয় বলিয়া ইহা বিনা গীয়ারিংএ ডাইনামোর সহিত জুড়িয়া দেওয়া যায়। এই নূতন ধরণের টার্বিন আবিষ্কারের ফলে গত ২৫।৩০ বৎসর আবার শক্তি-ব্যবহার ক্ষেত্রে স্টীমের যুগ ফিরিতেছে। কয়লা পোড়াইবার উন্নত নূতন পদ্ধতিও উহার আর এক কারণ। এখন নূতন পদ্ধতিতে কয়লা পোড়াইয়া টার্বিনের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রস্তুত করা বাঁধা-জলের শক্তির সাহায্যে ডাইনামো ঘুরাইয়া সরাসরি প্রস্তুতের অপেক্ষা শস্তা ; কারণ বিদ্যুৎ দূরে লইয়া যাওয়ার খরচ অনেক। অবশ্য স্থানীয় ব্যবহারের জন্য—'মুক্ত' জলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনই সবচেয়ে শস্তা।
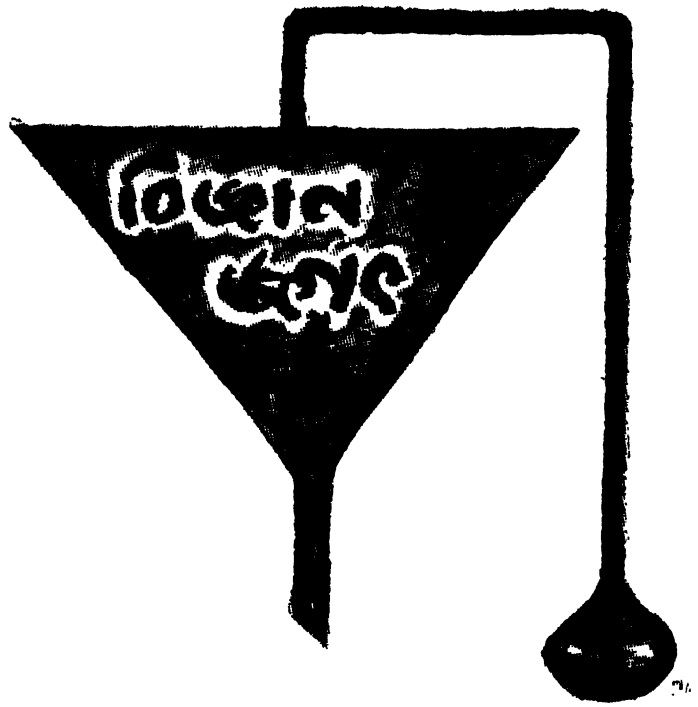
কয়লা পোড়ানোর নূতন পদ্ধতিতে—নূতন ধরণের চুল্লী ব্যবহৃত হয়। এগুলিতে তাপমান অনেক অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে চিমনীর গায় গ্যাস সরাসরি বাতাসে মিশিয়া যাইতে দেওয়া হইত বলিয়া ইহার উত্তাপ কোন কাজে আসিত না। এখন ইহাকে [illegible] বায় পোরেশ-পাথর চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছাড়া হয় ;

জলে হাওয়া গরম করিতে যে কয়লা লাগিত—তাহা বাঁচিয়া যায়। খরচ বাঁচিবার আর এক কারণ অতি গরম ও ঠাণ্ডা ষ্টীমের ব্যবহার। উপরিস্থ চাপ প্রতি ইঞ্চি ১২০০ পাউণ্ড হইলে ষ্টীম ৫৫০ পর্য্যন্ত গরম করা যায়—ইহাকে আবার জল সংস্পর্শের বাহিরে একটি গরম নলের মধ্য দিয়া লইয়া যাইলে আরও ৩৫০ পর্য্যন্ত গরম হয়। ষ্টীমকে এইরূপ অতি গরম করিবার জন্য অবশ্য বিশেষ বিশেষ মিশ্রিত ধাতু (Alloys) নির্ম্মিত পাত্র আবশ্যক। যেমন উপরিস্থ চাপ বাড়াইয়া ষ্টীমের তাপ বাড়ানো যায় সেইরূপ উহা কমাইয়া তাপ কমানোও যায়। ষ্টীম বাহিরে যাইবার সময় ঠাণ্ডা করিবার পাত্রের (Condenser) সহিত সংযুক্ত রাখার ফলে আংশিক ভ্যাকুয়ম সৃষ্টি দ্বারা ১০° বা তাহারও কম উত্তাপের ষ্টীম পাওয়া যায়। ইহার ফলে অত্যুত্তপ্ত ষ্টীম যেমন পাখাগুলিকে এক দিক হইতে ঠেলে সেইরূপ ঠাণ্ডা ষ্টীম সে গুলিকে বিপরীত দিক হইতে টানে এবং ইহাদের মিলিত শক্তির ফলে পাখাগুলি আরও সহজে ঘুরিতে পারে—এক ঘন ইঞ্চি (cube inch) অত্যুত্তপ্ত ষ্টীম ঠাঁ সেকেণ্ডের মধ্যে ১০০০ ঘন ইঞ্চিতে পরিণত হয় বলিয়া ইহাতে বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্ট হইয়া থাকে! টার্বিনে বহির্গত ষ্টীম ঠাণ্ডা করিতে প্রচুর জলের আবশ্যক হয়। নিউইয়র্কের টার্বিন সাহায্যে শক্তি উৎপাদক একটি কারখানায় ব্যবহৃত জলের পরিমাণ সহরের সমস্ত লোকের ব্যবহৃত জল অপেক্ষা অধিক! নদী হইতে জল টানিয়া লইয়া তাহাতে কণ্ডেন্সারের জল ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে নদীর সমগ্র জলের তাপ কয়েক ডিগ্রী বাড়িয়া যায়।

অকেজো টায়ারের কাজ

পুরানো টায়ার। একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কোন কাজে লাগবে না। ফেলে দেওয়া যাক্। কিন্তু না। ফেলবেন না। ঐ

অকেজো টায়ারকে কাজে লাগান

অকেজো টায়ারই কাজে লাগবে। ওকে এখনও অনেক শত মাইল চালানো যাবে। টায়ারের মধ্য-স্থানটা, যেখানটা ক্ষয়ে যায়, লাইন ধরে বেশ বড় বড় গর্ত্ত করে নিন। তার পর চার ধারের লোহার সাথে যে সেলাই আছে সেটা খুলে ফেলুন। এইবার এই পুরানো টায়ারটা নতুন টায়ারের ওপর চড়িয়ে দিন—ওভারকোটের মত। তার পর চাকায় হাওয়া ভরুন। যা কিছু ধকল বাহিরের পুরানো টায়ারে পড়বে। অথচ স্কিড করবার ভয় নেই। মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত থাকায় মাটি কামড়ে ধরতে পারবে। খুব লম্বা সফর অথবা অত্যধিক জোরে গাড়ী চালাবার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কিন্তু ছোট সফরে ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইল স্পীডে অনায়াসে গাড়ী চালান চলতে পারে।

কামানের নতুন ব্যবহার

কামানের গোলা গিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করে, একথা সকলেই জানে। এই যুদ্ধে শত্রুকে ধ্বংস করা ছাড়া আর একটি কাজে

এ কামানের গোলায় শত্রু ধ্বংস করে না—সৈন্যদের খাবার জোগায়

কামান ব্যবহার করা হয়েছে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল হয়ত দূরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। তাদের খাবার ফুরিয়ে আসছে। কি করা যায়! তখন কামানের ফাঁপা গোলার মধ্যে পুরে সামান্য একটু বিস্ফোরকের সাহায্যে কামান দাগা হল। এদিকে গুড়ুম! গুড়ুম!! ওদিকে সোঁ সোঁ শব্দে গোলা পড়তে লাগল! কিন্তু পড়ে আর ফাটে না। সৈন্যরা বুঝলে খাবার আছে গোলার মধ্যে। ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যরা পেল আহার। বাঁচল তাদের জীবন। আজ কামান শুধু জীবন নেওয়ার কাজেই লাগছে না, জীবন দানও করছে।

বৈদ্যুতিক পাখায় ঝড়

অনেকটা জায়গা জুড়ে হাওয়া করতে হলে বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডগুলো প্রকাণ্ড করতে হয়। বেশী বড় ব্লেড হলে, ওজন বেড়ে

নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক পাখা

যায়। হাওয়া কাটতেও অসুবিধা হয়। দুমড়ে যাবার সম্ভাবনাও খুব বেশী। তা ছাড়া পাখার গতিও কমে যায়। সেই জন্য আজ-কাল এক নতুন ধরণের পাখা তৈরী হয়েছে। ছোট ব্লেড, কিন্তু হাওয়া হয় ঝড়ের মত। প্লাষ্টিকের তৈরী ব্লেড। সৃষ্টি করে ঘূর্ণি হাওয়া। আশ-পাশের স্তব্ধ হাওয়াকে নাড়া দিয়ে হাওয়ার স্রোত বইয়ে দেয়। আবার ব্লেডের পেছনে থাকে হাওয়া পরিচালনা করবার কোন। সেই কোন ব্লেডের হাওয়াকে ঘুরিয়ে বাহিরের দিকে ঠেলে দেয়।

রঙ দেখে গোয়েন্দাগিরী

দুধ, মদ, সাবান অথবা ধাতুতে যদি ভেজাল মেশানো হয় অনেক রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া করে বলে দেওয়া যায়, কি কি এবং কত কত পরিমাণে ভেজাল মেশানো আছে। কিন্তু এই সব প্রক্রিয়াগুলি সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু আজ-কাল পনেরো মিনিটের মধ্যেই বৈজ্ঞানিকরা বলে দিতে পারেন ভেজালের কথা। কি করে? রঙ দেখে। অর্থো-ফেনানথ্রলিন জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে দিলেই ভেজাল থাকলে রঙ যাবে বদলে। দশ সের জলে এক চিমটি লৌহচূর্ণ মিশে গেছে। বৈজ্ঞানিক এই নতুন ওষুধ লোহার সঙ্গে মিশিয়ে রক্তবর্ণ এক সলিউশন তৈরী করলেন। তার পর জলের মধ্যে ফেলতেই রঙ গেল বদলে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধরে ফেললেন জলের মধ্যে লোহা মেশানো আছে। এই ভাবে, তামা, ক্রোমিয়াম, নিকেল, দস্তা, কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতু যদি জলের কোন খাদ্যের অথবা অন্য কোন ধাতুর সঙ্গে মেশানো থাকে, এই গোয়েন্দা ওষুধ তখনই চোর ধরে ফেলবে।

দড়াম্—কলিশন

দু'টো মোটর সামনাসামনি এসে পড়ল রাত্রের অন্ধকারে পূরো হেড-লাইট জ্বালিয়ে। তার পর-মুহূর্ত্তেই বিকট শব্দ, বিরাট কলিশন। কেন? কারণ, হেডলাইটের আলো দু'জন ড্রাইভারেরই চোখ দিল ধাঁধিয়ে। তাই আলোকে নিষ্প্রভ করবার জন্য এক নতুন রকমের কায়দা বেরিয়েছে। কোন গাড়ী কাছে এলেই বৈদ্যুতিক চোখ তা দেখে ফেলবে, অমনি আপনা হতেই আলো কমে যাবে। ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণে এই কাজ হবে।

মোটর গাড়ীর নূতন হেড-লাইট

কম্পাসের কাজ ঘড়িতে

ধরুন, আপনি বনে গিয়ে পথ হারিয়েছেন। কাছে কম্পাস নেই। দিগ্‌নির্ণয় করতে পাচ্ছেন না! তখন ঘড়ি দিয়ে দিক্ ঠিক করতে পারবেন। অবশ্য সূর্য্য দেখতে পাওয়া চাই। ঘণ্টার কাঁটা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়ে নিন। কাঁটার ছায়াটা যেন ঠিক তলায় পড়ে। ধরুন, চারটে বেজেছে। তাহলে বারোটা আর চারটের মধ্যে যে কোণ হবে সেইটাকে সম-দ্বিখণ্ডিত করলেই দক্ষিণ পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ দুইয়ের দাগটা দক্ষিণ, অতএব উল্টো দিকে আটের দাগটা উত্তর।

ডাক্তারী স্পঞ্জ

ষ্টাচ দিয়ে তৈরী এক নতুন রকম স্পঞ্জ বেরিয়েছে। অপারেশনের পর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বন্ধ করবার জন্য ডাক্তাররা স্পঞ্জ ব্যবহার করেন। পরে সেলাই করার সময় স্পঞ্জ বার করে নেন। অনেক সময় ভুল বশতঃ স্পঞ্জ থেকে যায়—সে এক বিভ্রাট। কিন্তু এখন আর কোন অসুবিধা নেই। স্পঞ্জ শুদ্ধ সেলাই করে দাও। স্পঞ্জ আপনি গলে যাবে। ঘা-ও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। ইচ্ছামত স্পঞ্জের ভেতর পেনিসিলিন অথবা সালফা ড্রাগ পূরে সেই স্পঞ্জ ব্যবহার করলে স্পঞ্জ গলে যাবার পর সেই ওষুধ নিজের কাজ করবে।

প্রতিভা বসু

৯

একটু পরে ও শান্ত হয়ে চোখ বুজে বললো—'ছাখো, অভিলাষের বাবা গোপাল দত্ত যখন খেতে না-পেয়ে মরে যাচ্ছিলো তখন আমার বাবা আশ্রয় দিয়েছিলেন ওকে। কয়লার কারবার ছিলো ওদের—বাড়ি-বাড়ি কয়লা দিয়ে যেতো। আমাদেরও কয়লা আসতো ওর দোকান থেকে। এর মধ্যে একদিন ওঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করে মারা গেলেন। ভীষণ হৈ-চৈ পাড়ায়—আমার অস্পষ্ট মনে আছে ব্যাপারটা! অভিলাষ তখন বছর চারেকের হবে—আমি বছর পাঁচেকের।' এই পর্যন্ত ব'লে ও চুপ করলো, আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে বললাম 'তার পর'—

'শুনবে? শুনবে ওদের সব কীর্তি?' হাতের উপর মাথার ভর রেখে ও আবার বললো, 'আসলে উনি অভিলাষের মা ছিলেন না, ওদের বাড়িতে একটি বিধবা বৌ ছিল—অভিলাষের খুড়তুতো বৌদি বোধ হয়—তারই পাপের পিণ্ড এই অভিলাষ। বৌটি নিতান্ত নিঃসহায় ছিলো—একদিন সে কেঁদে পড়লো শাশুড়ির কাছে—মুখ ফুটে বললো সে শ্বশুরের অত্যাচারের কথা—সমস্ত শুনে ভদ্রমহিলা স্তব্ধ হয়ে গেলেন—কিন্তু সন্তান তিনি কিছুতেই নষ্ট করতে দিলেন না—বৌ নিয়ে তিনি কোথায় কোন নির্জনে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে ছেলে কোলে নিয়ে নিজে ফিরে এলেন, কিন্তু বৌ আর এলো না। অভিলাষকে তিনিই মানুষ করে তুলতে লাগলেন।

'কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন তা কে জানে—লিখে রেখে গিয়েছিলেন, এ জন্য কেউ দায়ী নয়—।

'অনেক দিন ধ'রে এ নিয়ে চললো হৈ হৈ—তারপর কেমন করে ওর দোকান উঠে গেল—আর গোপাল দত্ত ছেলে নিয়ে একেবারে ভেসে বেড়াতে লাগলো। এর মধ্যেই একদিন দেখি আমার বাবা অভিলাষকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন বাড়িতে—আমাকে ডেকে বললেন, "খোকা, এই দেখ, তোর জন্য কেমন বন্ধু এনেছি।" মা এসে দেখে বললেন, "ও মা, এ যে গোপাল কয়লাওলার ছেলে—বাঃ, ভারি সুন্দর তো।" বাবা বললেন, "মানুষ করো না তুমি—দেখছো কী উজ্জ্বল চোখ—বেঁচে থাকলে মানুষ হবে।" ময়লা কাপড়-জামা শুদ্ধুই মা ওকে কোলে জড়িয়ে আদর করতে লাগলেন।

'এই ছেলের সূত্র ধরেই এলেন গোপাল দত্ত—খাল কেটে কুমীর আনলেন বাবা। তিনি ছিলেন মস্ত উকিল, বললেন "থাক লোকটা—মক্কেল টক্কেল এলে বেশ দেখা শোনা করবে, বসাবে টসাবে।" সামান্য কিছু মাইনের ব্যবস্থাও হল। তারপর ক্রমে ক্রমে ওর বাধ্যতায় কর্মকুশলতায়—নম্রতায় বাবা এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে ও তাঁর ডান হাত বাঁ হাত হয়ে উঠলো। বাবা নিজে ছিলেন অত্যন্ত উদারচেতা সরলপ্রাণ মানুষ, গোপাল দত্তের ধূর্তামির তিনি তল পাবেন কেমন ক'রে? আমার মা-ও ওর ধূর্তামিতে দিক্‌ভ্রান্ত হলেন—অর্থাৎ কয়েক বছরের মধ্যে ও এ বাড়ির সর্বময় কর্তা হয়ে দাঁড়ালো। আর অভিলাষকে ভালো না-বেসে উপায় ছিলো না—প্রথমত ও খুব তুখোড় ছেলে হ'লো। ঐটুকু বয়সেই বোঝা গেলো যে ও মানুষ হবে—আর তার উপর দেখতে ভালো। আমার যখন এগারো বছর বয়স—তখন হঠাৎ একদিন বাবা কোর্ট থেকে যে ফিরলেন তা সজ্ঞানে নয়। স্পষ্ট মনে আছে মা খবর পেয়ে ছুটে গেলেন গাড়ির কাছে—বাবার অচেতন দেহ ধরাধরি ক'রে নামানো হ'লো, বরাবরই তাঁর ব্লাড প্রেশার ছিলো—তার মধ্যে কোনো নিয়ম মানতেন না—ঐ তাঁর শেষ শয্যা হ'লো। সমস্ত টাকাপয়সা পড়লো এবার গোপালের হাতে। মা পাগলের মতো দু'হাতে খরচ করতে লাগলেন—আর সে-খরচাটা হ'তে লাগলো গোপালের হাত দিয়ে। জন বল্‌তে একমাত্র গোপালই ছিলো কাছে—আর সে করলোও খুব—এমন করা করেছিলো যে নিজের ছেলেও কখনো বাবাকে অত করতে পারে না। কে জানে হয়তো বাবাকে ও ভালোই বাসতো। বেঁচেছিলেন বাবা মাত্র পনেরো দিন—পনেরো বছরও বোধ হয় মানুষের তার চেয়ে সহজে কাটে।

'বাবার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই গোপাল আমার মাকে একেবারে পথে বসালো। ইনশিওরেন্স ছিল চল্লিশ হাজার টাকার—নগদ টাকাও ছিলো কিছু আর টাকাপয়সা সব গোপালের হাত দিয়েই তো মা তোলাতেন—বুদ্ধিও গোপালই মাকে দিয়েছিল:—অবশেষে তো দেখতেই পাচ্ছো। সমস্ত নিয়ে ও একদিন স'রে পড়লো ছেলে নিয়ে। মা আর কী করবেন।—বাড়িখানা ছিল—আর মার গয়না যা ছিল তাই দিয়ে চললো অনেক দিন। আমি স্কলারশিপ পেতাম—তাতেও অনেক সুবিধে হ'লো। এম-এ-পাশ করবার পরে বাড়ি বিক্রী ক'রে দিয়ে মাকে নিয়ে কলকাতা চ'লে এলুম। চাকরির জন্য ঘুরলুম কিছুদিন, তারপর মার বুদ্ধিতেই দোকান দিলুম।'

এক নিশ্বাসে এত কথা ব'লে ও একটু চুপ করলো—তার পরে মৃদু হেসে বললো, 'অবিশ্যি দোকান দিয়েছিলুম ব'লেই না তোমার দেখা পেলাম। অভিলাষ টাকার মালিক হ'লো—কিন্তু ছাখো, ভবিতব্য এসে কোথায় ঠেকলো, ঐ হতভাগ্য পারলো না তোমাকে জয় করতে।'

আমি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, কথা বেরুলো না মুখ দিয়ে। খানিক পরেই ওর মা এলেন—গায়ের চাদরটা ছেড়ে চেয়ারের হাতলে রেখে বললেন 'খোকা আজ একটা সাংঘাতিক কাণ্ড দেখে এলাম। তোর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম।'

আমি চমকে চোখ ফেরালাম। উনি হেসে বললেন, 'বলছি—ওরে', তিনি আবার বাইরে গিয়ে চাকরকে ডাকলেন—'ঐ ছাখ, দোকান ঘরে একটা বাক্স রেখে এসেছি—নিয়ে আয় তো ঘরে।'

ঘরে এসে ওঁর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভালো আছিস তুই? খেয়েছিলি কিছু? ওমা এ কী! সব যে যেমন-তেমন পড়ে আছে।'

আমি অপরাধীর দৃষ্টি তুলে ধরলাম তাঁর দিকে—বললাম 'খেতে পারিনি।'

সঙ্গে-সঙ্গে ও বললো, 'অভিলাষ আমাকে শাসাতে এসেছিল মা—কোনো বিপদে ফেলবার মতলব আছে।'

'এসেছিলো অভিলাষ? কী আশ্চর্য! ও-বাড়িতে কী কাণ্ড অভিলাষের বাবা ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার টাকার দাবিতে মোকদ্দমা করবে ব'লে শাসাচ্ছে তোর শ্বশুরকে—আবার এদিকে অভিলাষ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে কখনো যে কাকে যে ক'রে পারে

নবেই কেড়ে—আজ হোক কাল হোক—মুখে কাপড় বেঁধে হোক যে করে হোক। এই তাণ্ডবের মধ্যে হঠাৎ এক পাহাড়ি মেয়ে এইটুকু এক ছেলে কোলে ক'রে এসে হাজির—অনেক খুঁজে-খুঁজে সে অভিলাষের খোঁজ পেয়েছে—সে বলছে যে এই ছেলে অভিলাষের। ছেলে যখন সাত মাসের পেটে তখনই সে সটকেছে—অনেকবার সে চিঠি লিখে জবাব পায়নি। তার জাত-ভাইয়েরা সকলে বলছে বাংগালী-বাবুরা এরকমই—তুমি চ'লে যাও সেখানে—বলো গিয়ে হয় তোমাকে নিয়ে থাকুক, নয়তো এতদিনকার সব খরচ—আর খোরপোষের ব্যবস্থা ক'রে দিক্;' অভিলাষের বাবা বলছে এই ছেলে যে অভিলাষের তার তো কোন প্রমাণ নেই। মেয়েটা কেঁদে ভাসাচ্ছে—বলে যে আমি একটা ভদ্র মেয়ে, আমি কি এ ভাবে মিথ্যে বলে নিজেকে বে-ইজ্জৎ করবো? ওকে ডাকো—ও বলুক আমার কাছে এ ছেলে ওর কি না—যদি মিথ্যা কথা বলে আমি ওকে কেটে টুকুরো করে ফেলবো।'

আমি আর ও স্তম্ভিত হয়ে পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কী আশ্চর্য! যে-মিথ্যা অপবাদে ও আমাকে এমন কলঙ্কিত করলো—সে-অপবাদই সত্যি হ'য়ে দেখা দিলো ওর জীবনে!—

ওর মা এবার সুটকেসটা টেনে কাছে এনে বললেন, 'এসো মা—দ্যাখো এসে তোমার জিনিশপত্র পছন্দ হয় কিনা।'—শাড়িতে গয়নায় সুটকেসটি ভরে আছে। সমস্ত তুলে-তুলে তিনি আমাকে দেখালেন। বললেন, 'তোমার বাবার গয়না তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ো মা—তুমি হলে আমার গরিবের ঘরের বৌ—ও-গয়না কি তোমার গায়ে মানায়? খোকা যে-দিন পারবে—সমস্ত গা মুড়ে দেবে তোমাকে সোনা দিয়ে।'—একটু হেসে বললেন 'আর গয়নায় কী-ই বা দরকার—কি আমার সোনার ছেলে—অমন স্বামী পেলে কি আর মেয়েদের অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে? কী বলো?' আমার মাথায় তিনি হাত রাখলেন। ও হেসে বললো, 'বেশি বোলো না মা—নিজের ছেলেকে অমন সবাই ভাবে। কিন্তু একটা কথা না বলে পারলাম না—বিয়ে তো একা-একা ওরই না—আমারও তো বিয়ে, আমার জন্য তো কিছু আনলে না?'

'আনিনি? এই দ্যাখ' হেসে তিনি বার করলেন ধুতি—তোয়ালে—সিলকের গেঞ্জি—তারপর হাতের আড়ালে লুকিয়ে বললেন, বল তো আর কী এনেছি—বলতে না-পারলে পাবি না।'

'বলবো? বলবো? আচ্ছা—একখানা জিভ-বের-করা কালীমার ছবি। না, না, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ওঃ হো—'

'দুষ্টু ছেলে—কী আমার ভক্তির সাগরখানা রে' হাসতে-হাসতে তিনি বার করলেন সুন্দর একটি দামী ফাউন্টেন পেন।

ছোটো ছেলের মতো আনন্দে অধীর হয়ে সে কেড়ে নিলো মার হাত থেকে কলমটা—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো বারে-বারে।

হাসিমুখে মা বললেন, 'এই কলম দিয়ে কিন্তু প্রথমে আমি লিখবো।'

'ঈশ, সে আর হয় না।'

'সে হতেই হবে—তাহ'লে কলমটা খুব ভালো বৌনি হবে—পয়া হবে তাহ'লে কলমটার। কী লিখবো তা তো তোরা ভাবতেই পারবি না। কিন্তু আর এবার সময় নেই—আমাদের রাধুনেজ এতক্ষণে কী করছেন কে জানে।' ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি আমাকে জিনিশপত্র গুছিয়ে রাখতে ব'লে রান্নাঘরে গেলেন।

খেতে-খেতে আমাদের বেলা গেলো। খেয়ে উঠে তিনি আমাকে দিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি লেখাতে বসলেন ঐ কলম দিয়ে লাল কাগজের উপর। অতি অল্পই কয়েক জন—তার মধ্যে একখানা আমার বাবার নামে—সে-চিঠিখানা এই রকম—

'প্রিয় বিজয়,

'তুমি এতক্ষণে আমার কথা অবশ্যই সুবালার কাছে শুনেছ। সংসারটা এই রকমই—মানুষে গড়ে আর বিধাতা ভাঙেন—আবার বিধাতা গড়েন, মানুষ ভাঙে—এই ভাঙাগড়ার খেলাই চলছে কেবল লোকে আর অলৌকিকে।

'তোমার কন্যা তোমার পক্ষে এবং আমার পুত্র আমার পক্ষে দু-ই-ই দুয়ের পক্ষে সমান আদর ও আনন্দের জিনিশ। সন্তানের তুল্য স্নেহের জিনিশ আর মানুষের জীবনে কিছুই নেই। নিতান্ত হতভাগ্য না-হ'লে মানুষ এ-আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না—এই স্নেহের অনুভূতি যে কী তীব্র, কী আনন্দময়, সে-কথা প্রত্যেক পিতা-মাতাই জানে—আর সন্তানের জীবনেও পিতা-মাতা যে কী জিনিশ তা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করতে পারি—যখনই কোন পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে আমরা দেখি। এতখানি ভূমিকা করলাম এই জন্যে যে, আমার পুত্র আজ তোমার কন্যার পাণিপ্রার্থী এবং তোমার কন্যা আজ আমার পুত্রকে বরণ করতে ইচ্ছুক—এদের এই যুগল ইচ্ছাকে আমি অভিনন্দিত করবার মানস করেছি—তুমি এবং সুবালা এদের মিলিত জীবনকে কি প্রাণ ভরে আশীর্বাদ জানাবে না?

'এর পরে কয়েকটি কথা আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—তোমাদের পক্ষেও ঋণ-শোধের এমন উপলক্ষ আসবে না—আমার পক্ষেও সে দান গ্রহণ করবার আর অন্য-কোনো উপলক্ষ আসবে না।

'মনে থাকতে পারে—তোমার আর সুবালার মিলনের মধ্যে আমি যে পার্টটি গ্রহণ করেছিলাম সেটি নিতান্ত অবহেলার যোগ্য ছিলো না। সুবালার দরিদ্র পিতা যখন কিছুতেই মেয়ের বিবাহ দিতে পারছিলেন না এবং তখনকার আট বছরের গৌরীদানের যুগেও যখন সুবালা ষোলো বছরের হ'য়ে ঘরে থাকলো—সেই সময়ে তার সঙ্গে তোমার দেখা আমার স্বামীর সূত্রেই হয়েছিল—এবং যুবজনোচিত মুগ্ধতায় তুমি তাকে না-পেলে আত্মহত্যা পর্যন্ত করবার সংকল্প করেছিলে এবং তোমার দাম্ভিক পিতা বলেছিলেন, "ভিখারীর ঝাড় বাড়িতে আনবো আমি? আমি কি শেষে বিজয়ের বাপ হয়ে বিজয়ের ইচ্ছাকেই বড়ো করে দেখবো? তার চেয়ে অমন ছেলেকে আমি চাবুক দিয়ে সোজা করবো না?"'

এই সময় আমি কলম থামিয়ে অবাক হ'য়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম 'কী আশ্চর্য!'

উনি বললেন, 'আশ্চর্য বইকি, মা—নিজে ভুক্তভোগী হ'য়েও তিনি বাপের দম্ভ ফলালেন তোমার উপর! হ'লো তো শিক্ষা?'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম 'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে বাবারই বা কী ক'রে আলাপ, মারই বা কী ক'রে আলাপ?'

মা বললেন—

'আমার শ্বশুর ছিলেন মস্ত উকিল। প্রথম পাশ ক'রে বিজয় আমার শ্বশুরের জুনিয়র ছিলেন অনেক দিন—সেই সময় তোমার

শ্বশুরের সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। উনি তোমার বাবার চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন কিছু, আর বিয়েও আমাদের খুব ছোটো বয়সে হয়েছিলো। সুবালার বাপের বাড়ি আর আমার বাপের বাড়ি একেবারে পাশাপাশি বাড়ি। শ্যামল যখন হ'লো—সে-সময়ে আমি বাপের বাড়ি ছিলাম—সেই সময়ে যে উনি গেলেন আমাকে দেখতে—তখন সঙ্গে বিজয়কে নিয়ে গেলেন বেড়াতে। তখনই এদের দেখাশোনা হ'য়ে ব্যাপারটা ঘটলো। তোমার শ্বশুর তো তখন ওকালতি করবেন না স্থির করেছিলেন, চাকরি করছিলেন—ইস্কুলমাষ্টারি। পরে অবিশ্যি বাপের পীড়াপীড়িতে ল' পাশ করে উকিল হয়ে বসলেন এবং বলাই বাহুল্য তখন আমার শ্বশুর সমস্ত মনটা ছেলের দিকেই দিয়েছিলেন। বিজয় তখন সুবিধে না-হওয়ায় চ'লে এলো কলকাতা। একেবারে হাইকোর্টে এসে বসলো। সে কি আজকের কথা নাকি! তিরিশ বছর হ'য়ে গেলো। হ্যাঁ, কী না লিখছিলে পড়ো তো একটু—আমি চিঠির শেষাংশটুকু পড়তেই তিনি আবার বলতে লাগলেন—'তোমার বাবার এই কথা শুনে ভয়ে তুমি এতটুকু হ'য়ে গেলে—আমার স্বামীকে বললে, 'আপনি তো ইচ্ছে করলেই আমাকে রক্ষা করতে পারেন—আপনি আমাকে বাঁচান।' তিনি বললেন, 'ভেবো না বিজয়, তোমার বৌদিকে ধরে পড়ো, তিনি নিশ্চয়ই গতি ক'রে দেবেন।' সুবালাকে আমি কত ভালোবাসতাম তা বোধ হয় সুবালা মনে ক'রে না-রাখলেও ভুলে যায়নি।

'মনে আছে? সুবালার গায়ের সমস্ত গহনা তখন আমি গড়িয়ে দিয়েছিলাম? আমার স্বামী তোমাকে বিবাহের খরচ বাবদ ৫০০৲ টাকা দিয়েছিলেন—সমস্তই তুমি ধার ব'লে নিয়েছিলে। তোমার বাবার বাকি দাবি এই ৫০০৲ টাকা যোগ ক'রে সুবালার বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে মেটালেন। ধার তুমি শোধ করোনি, এই নিয়ে অভিযোগ আমি করবার জন্য এই চিঠির অবতারণা করিনি—বিবাহের পরে তোমরা স্বামি-স্ত্রীতে যখন অশ্রুপূর্ণ চোখে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলে তখন আমাদের পায়ে হাত দিয়ে বলেছিলে, "এ-ঋণ তো আমাদের জীবনে অক্ষয় হ'য়েই রইলো, তবু যদি কোনোদিন আপনাদের কোনো কাজে লাগি তো নিজেদের ধন্য মনে করবো।

'কালের প্রভাব বড়ো বিষম—উনি ওকালতি শুরু করাতে তুমি ক্ষুব্ধ হলে—চলে গেলে কলকাতা—তার পর সুখে দুঃখে কত দিন কাটলো (অবিশ্যি যদ্দিন তুমি বিখ্যাত না হয়েছিলে—যদ্দিন পর্যন্ত তোমার ফী-ই ভালো ক'রে জোটেনি তদ্দিন এক-আধখানা চিঠি লিখতে) কিন্তু যখন থেকে বড়োমানুষ হ'লে আর খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজনও তোমার মিটে গেল।

'আমি কলকাতায় আছি অনেক দিন—তোমার খবর অবিশ্যি জানতাম না—নেবার আগ্রহও বোধ করিনি—কিন্তু প্রথম যেদিন তোমার মেয়েকে দেখলাম—ঠিক এই বয়সের সুবালা ভেসে উঠলো আমার চোখে। খবর নিয়ে জানলাম, সন্দেহ আমার অমূলক নয়।

'আজ তোমার কন্যাকে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলাম। আশা করি কায়মনোবাক্যে তাদের জীবনকে জয়যুক্ত হবার আশীর্বাদ করে আমাকে চিরকৃতার্থ করবে। এই আমার নিবেদন—ইতি

তোমার বৌদি অরুন্ধতী মিত্র'

শেষ

হে বনস্পতি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ত' এখানে গ্রামের প্রান্ত সুরু
শ্যামল স্নেহের ছায়ায় ছোঁয়ানো গ্রাম,
দু'ধারে কেবল মাথা তুলে দেওয়া তরু
বন-তুলসীর ঝোপ ঝাড় অবিরাম।

তার মাঝে এই গ্রামের প্রান্তটিতে
বহু বছরের বৃদ্ধ বনস্পতি
কত দূর হতে ধরা দেয় দৃষ্টিতে
চরণে তাহার তৃণপুঞ্জের নতি।

হে বৃদ্ধ বট, আজ কত দিন হ'ল
মূল মেলে দিলে মাটির নরম বুকে—
হে বৃদ্ধ বট, কত দিন হ'ল বল
দেখেছ এ-গ্রাম ইহারই দুঃখে সুখে।

তোমার ছায়ায় মেদুর পথের পরে
দেখেছ কত না বধূর গ্রাম-প্রবেশ
কত উৎসব আবার বিষাদভরে
দেখছ কত না জীবন-পথের শেষ।

মনে আছে সেই শ্রাবণ প্লাবন রাতে
ময়ূরাক্ষীর অভিসার উন্মাদ?
পাগল, নেচেছ মেলে দিয়ে দুই হাতে
ময়ূরাক্ষীর ভেঙে গিয়েছিল বাঁধ।

এই ত' সে দিন বছর দুয়েক আগে
আকালের দিনে তোমারি এ পথ ধরে
নারী আর নর অভিমানে আর রাগে
চলে গিয়েছিল সারা গ্রাম খালি করে।

চূড়ায় তোমার শকুন মেলিল ডানা,
বর্ষার ধারা পাতায় পাতায় ঝরে'
অশ্রুধারায় ভাসাইলে পথ খানা
রিক্ত গ্রামের হাহাকার বুকে করে।

হে বনস্পতি তুমি ত' জানই সব
মহাকাব্যের মহানায়কের মত
সয়েছ বিরহ মরণ মহোৎসব
সয়েছ বর্ষা সয়েছ [illegible] কত।

যোগসিদ্ধি

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস সিদ্ধি

শ্রীঅরবিন্দের প্রতিপাদিত দিব্য সিদ্ধি ও দিব্য জীবন ভারতের যুগ-যুগান্তের যোগ সাধনার ধারা থেকে আপাতদৃষ্টিতে একেবারে ভিন্ন দেখালেও আসলে ভিন্ন নয়,—সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদের অনুসৃত যোগসাধনারই ক্রম-পরিণতি। ভারতের দর্শন ও পরমার্থ চিরকাল এ রকম ইহবিমুখ ছিল না, এ ইহবিমুখতার ছাপ পড়েছে বৌদ্ধ যুগের পর থেকে। ভগবান বুদ্ধের নির্ব্বাণ পথ ও আত্যন্তিক দুঃখ বিমুক্তিই শঙ্করের মায়াবাদের জনক, এই জন্য শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে। বুদ্ধের ভিক্ষু সম্প্রদায় ও পীত বস্ত্র শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায় ও গৈরিক বস্ত্রে পরিণত হয়েছে। উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই দুঃখবাদ ও ইহবিমুখতা নাই, সে ছিল আনন্দবাদের সাধনা —পরম সুখস্বরূপের, মুক্ত অথচ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভাগবত স্বরূপের সন্ধান —বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর আনন্দঘন লীলা-বিগ্রহ।

এত দিনে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সেই আর্য্যকৃষ্টির পূর্ণ আদর্শে ফিরে এসেছে। মানুষকে তার এই জড় জীবনকে এর অন্তর্নিহিত সত্যের ছন্দে বিকশিত করতে গেলে উর্দ্ধের সেই সত্যে আরোহণ করতে হবে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে, মানুষকে হতে হবে সেই সত্যে তন্ময়। তার সঙ্গে সঙ্গে আসবে সেই উপলব্ধ ও আপন সত্তায় আত্মসাৎ করা সত্যকে নীচের জীবনে রূপ দেবার, উর্দ্ধ থেকে নীচে অবধি সমগ্র সত্তাকে সেই পূর্ণ জ্ঞানে আনন্দে অগ্নিময় করার পালা। এত দিন ভারতের সাধনার ইহবিমুখতায় চলেছিল এই সত্যে শুধু আরোহণেরই সিদ্ধি। অপূর্ণ বিকৃত অপকৃষ্ট জীবনকে না ছাড়লে ষোল কলায় পূর্ণ জীবন হবে কি করে? তাই চলেছিল এই বর্জ্জন, এই সন্ন্যাস, এই বিরতি। এখন ভারতের কৃষ্টি ও সাধনার ভগীরথকে শঙ্খ বাজিয়ে আবার নামিয়ে আনতে হচ্ছে সেই স্বর্গের অলকনন্দাকে মর্ত্ত্যেরও জীবনদায়িনী জাহ্নবীধারারূপে। শ্রীঅরবিন্দ তারই শঙ্খহস্ত ভগীরথ। তিনি সেই মহাশিব যাঁর জটাজুট-জালে এই স্বর্গ-গঙ্গার অবতরণ বেগ ধারণ করা সম্ভব হয়েছে, দীর্ঘ সাধনায় এই তপোমগ্ন মহাপুরুষ সে অটুট সামর্থ্য অর্জ্জন করেছেন,—আবিষ্কার করেছেন জড়কে এবং জড়াশ্রিত প্রাণ ও মনকে পরম চেতনায় মেলে সেই দিব্য তত্ত্বে পরিণত করার, জরামরণধর্ম্মী মানব-ধারাকে অতি-মানবের ভাগবত তনুতে রূপান্তর করার পন্থা।

শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধির স্তরগুলি তাই আর এক স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, মন কতখানি সূক্ষ্ম হলো—কতখানি তন্ময়তা লাভ করে স্থূলের সংস্কার ছাড়িয়ে উঠলো, স্থির দীপ্ত সমতায় গলে অটল লীন শিবত্বে কতখানি একাকার হয়ে গেল, কেবল এদিক দিয়েই তাঁর সিদ্ধিকে মাপা হয় নাই। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ-কথিত দিব্য জীবনের পরমা সিদ্ধি জীবের শুধু পরমতত্ত্বে আরোহণের ও পর্য্যবসানের কাহিনী নয়, এ হচ্ছে সেই পরা তত্ত্বে জীবের রূপায়নেরও কথা, মর্ত্ত্যীকরণেরও কাহিনী। তাঁর তত্ত্ববিচারে জড় বলে কোন বস্তু নাই, সেই জড়াতীত পরম বস্তুই সংহৃত হয়ে গুটিয়ে জড়াকার হয়েছে, আবার আপনাকে মেলে-মেলে আপন উর্দ্ধের মহিমায় ও আনন্ত্যে সে প্রতিষ্ঠিত করবে নিজেকে; এই হচ্ছে অখণ্ডের কোলে খণ্ডের জাগার সার্থকতা, শিবতত্ত্বের কোলে জীবভাবের সামঞ্জস্য ও পূর্ণ সিদ্ধি। তাঁর মতে এইখানেই অরূপের রূপ গ্রহণের রহস্য আছে নিহিত।

শ্রীঅরবিন্দের এই নূতন পূর্ণবাদ কি করে হিন্দু শাস্ত্রের আংশিক মোক্ষবাদেরই খাঁটি fulfilment বা পূরক তা' বুঝতে হলে তাঁর তিন খণ্ডে পূর্ণ অভিনব দর্শন "দিব্যজীবন" Life Divineখানি পড়তে হয়; বুদ্ধেতর ভারতের নির্ব্বাণমুক্তি পরম ব্রহ্মে জীবের আত্ম-নিমজ্জনের পরিবর্ত্তে মানুষের সাধনাকে তার পূর্ণ বিকাশ ও সিদ্ধির আদর্শে কি করে তিনি নিয়ে গেছেন তা' তাঁরই অপূর্ব্ব যুক্তি অনুসরণ করেই বোঝা দরকার।

তুরীয়ে জীবের আত্মবিলয়ের পরিবর্ত্তে তিনি কি দিচ্ছেন মানুষকে?—"Our call must be to live on a new height in all our being"—"নূতন এক উর্দ্ধতর চেতনায় সকল সত্তা নিয়ে বাঁচার—রূপায়িত হবার ডাক আমাদের এসেছে।" "Elevation and expansion—our mental, physical, vital existence need not be destroyed by our self exceeding, nor are they lessened or impaired by being spiritualised They become much richer, greater, more powerful more perfect."—"জীবনের উর্দ্ধতর স্থিতি ও ব্যাপ্তি এই হচ্ছে লক্ষ্য—আমাদের মন, প্রাণ ও জড় সত্তা এই আত্মবিস্তৃতির ফলে অমর্ত্ত্যীকরণের ফলে নষ্ট বা ধ্বংস হবার কোন হেতু নাই, তাদের কোন রকম ক্ষুণ্ণতা বা হ্রাসও ঘটবে না, জীবনের এই পারমার্থিক পরিবর্ত্তনে সেগুলি বরঞ্চ এর ফলে হবে সমৃদ্ধতর, বৃহত্তর, অধিকতর শক্তিমান ও পূর্ণতর।" Our true happiness is in the true growth of our whole being"—"আমাদের সত্যকার সুখ আমাদের সকল সত্তার খাঁটি বিকাশেই"। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগসাধনায় ঝোঁক দিচ্ছেন বিকাশের উপর, সমৃদ্ধির উপর, আত্মবিলোপের উপর নয়।

"Growth into full mental being is the 1st transitional movement towards human perfection and freedom, it does not actuely perfect it, does not liberate the soul, but it lifts us one step out of the material and vital absorption and prepares the loosening of the hold of Consciousness"—"মুক্তি ও পূর্ণ মানবত্বের পথে মনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই প্রথম ধাপ, মানুষের আত্মার পূর্ণতা ও মুক্তি না দিতে পারলেও এই মানস পূর্ণতা চেতনাকে জড়ের ও প্রাণের রাহুগ্রাস থেকে দেয় মুক্তি। মনের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তার দৃষ্টির পরিধি যায় ব্যাপক হয়ে, মন হয় স্বাধীন ও স্বরাট, তার গুপ্ত বৃহত্তর শক্তি সব জাগতে থাকে—তার আধ্যাত্মিক রূপান্তরের (spiritualisation) ফলে।

মনের তিন রকম বিকাশ—ত্রিধা রূপান্তর সম্ভব এবং তা পরে পরে একটির পর একটি স্বতঃই আসে। মনের চিন্তা, জ্ঞান, বিচার শক্তি বাড়াতে বাড়াতে আমরা পাই উজ্জ্বল মানস পুরুষ intellectual giantকে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে; এই বিকাশ আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলে আরম্ভ হয় মন অতিক্রমের পালা, তার পারমার্থিক রূপান্তর,—বিপুল নীরবতার মাঝে সে পায় আসন, ক্ষুদ্র বাসনায়

তরঙ্গ যেখানে স্থির হয়ে এসেছে সেই বিশ্বচেতনায় cosmic consciousnessএ সে করে প্রবেশ, ক্ষুদ্র অহমিকা সে বিপুল প্রশান্তিতে গলে যায়, শাপমুক্ত জীবচেতনা যুক্ত হয় পরম শিবের সহিত। এইখানে অতীন্দ্রিয় বিভূতি ও সিদ্ধি সব জাগতে জাগতে সাধকের প্রবেশ ঘটে অতিমানস রাজ্যে supramental (transformation) regionsএ।

অতিমানবের এই পরাভূমির আছে অনন্ত বৈচিত্র্য, এখানকার সমৃদ্ধি ও মহিমার শেষ নাই—'Here we enter the domain of the infinite'—এইখানে আমরা প্রবেশ করি অনন্তের মহা সাম্রাজ্যে। শৃঙ্গের পর উত্তুঙ্গতর শৃঙ্গে উঠে চলেছে এই ভূমির উচ্চ বিপুলতা, নীচের মন থেকে দিব্য মনের মাঝে বিস্তৃত রয়েছে বহু উজ্জ্বল দীপ্ত গলিত কাঞ্চনাভ ভূমি সব। 'It is an incessant gradation. There is no gap anywhere.' অবিরাম স্তরপরম্পরায় বিস্তীর্ণ এই ধামগুলির মাঝে কোন ছেদ নাই। তবু মানুষকে বোঝাবার জন্ম শ্রীঅরবিন্দ করেছেন স্থূল মনের পারে এই জ্ঞানদীপ্ত দ্বারগুলির (luminous approaches) চারটি বিভাগ—তারা হচ্ছে Higher mind, Illumined mind, Over mind ও Super mind—সম্বোধী বা সজ্ঞান মন, দীপ্ত মানস বা জ্ঞানোজ্জ্বল জাগ্রত মন ও উত্তর মানস বা উর্দ্ধতর মন। মন থেকে পারমার্থিক মনে জেগে মানুষ চলতে থাকে পরামনের হৈম লোকে এই উজ্জ্বল সিংহদ্বারগুলি পার হয়ে হয়ে, উর্দ্ধের ঐক্যে ও দীপ্ত জ্ঞানে তখন সকল বৈচিত্র্য যায় সমরসতায় সুসমঞ্জস হয়ে।

এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও বিকাশ সম্ভব হয় এই জন্য যে, আমাদের এই অপরিণত রুদ্ধ মনেরই সম্পুটে আছে শতদলের নিমীলিত দলগুলির মত এই সব উজ্জ্বল মানসভূমি। আমাদের সত্তায় অন্তর্নিহিত ও লীন হয়ে আছে নিখিল শক্তি ও সিদ্ধি; মনই তাই চলে আপন গুপ্ত ও লুপ্ত ঐশ্বর্য্য উদ্ধার করে। যা ছিল সঙ্কীর্ণ দেহান্তর্গত রুদ্ধ অহং চৈতন্য—"Nature of Ignorance with the individual as its closed field," তা ক্রমশঃ হয়ে যায় মুক্ত বিপুল; অজ্ঞান ও অন্ধ সজ্ঞান থেকে পূর্ণ জ্ঞান দীপ্তিতে জীবচেতনা জাগে—চৈত্য পুরুষ থেকে ক্রমশঃ দিব্য পুরুষে। রুদ্ধ জীব-চেতনা ক্রমশঃ বিরাটের ছাঁচে নিজেকে নেয় ঢেলে—The individual must have sufficiently universalised himself, he must have recast his individual mind in the boundlessness of a cosmic mentality, enlarged and vivified his individual life into the immediate sense and direct experience of the dynamic motion of the universal life, opened up the communication of his body with forces of universal nature, before he can be capable of a change which transcends the present cosmic formulation and lifts him beyond the lower henisphere of universality into a consciousness belonging to its spiritual upper hemisphere."

শ্রীঅরবিন্দের কথিত জীবচেতনার এই আনন্ত্যের ছাঁচে ঢালা নূতন রূপান্তরিত আধারের সকল দুয়ার খুলে যাবে অখণ্ডের দিকে, মন হবে বিপুলে বিস্তারিত, প্রাণ হবে অনন্ত প্রাণসিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত এবং সেই শক্তিতে সঞ্জীবিত ও সক্রিয়, দেহের সকল দ্বার বিশ্বপ্রকৃতির কাছে হবে মুক্ত ও যুক্ত; এই রকমটি হ'লে তবে জীবের শিবত্ব লাভ সম্ভব, তবে সৃষ্টির নিম্ন অজ্ঞানমণ্ডল থেকে উর্দ্ধ জ্ঞানমণ্ডলের ছন্দে সত্তা হবে রূপায়িত ও ছন্দিত।

সৃষ্টির আদি সংকল্পের (original intention) বশে নিঃসৃত ও ছন্দিত এই জড় সৃষ্টি বা স্থূল রূপায়ন—এর মাঝে উর্দ্ধের সেই সত্যোজ্জ্বল ঐক্য স্থাপন করা শক্ত। এই সঙ্কীর্ণ মূঢ় অবচেতনার সঙ্কোচনের রাজ্যে বিপুল ও সমগ্রকে—পূর্ণকে জাগাবার বাধা হচ্ছে এর ঐ অজ্ঞানমুখী আদি প্রেরণা। এখানে জীবচেতনা তাই ছিন্ন, বিযুক্ত, রুদ্ধ; তাকে বুঝতে হবে নিজেকে পরম শিবের কেন্দ্র বলে, তারই সত্তায় ও দীপ্তিতে সত্তাবান বলে, পরম ভাগবত পুরুষের প্রকাশ-বিন্দু বলে—"As a power of the supreme being, limited only by the potencies of the supernature, boundless except by its own truth, self-law and will."

সেই স্রষ্টা অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তার অনুমোদনে তুমি সক্রিয়, এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তোমার প্রতি কর্ম্ম হবে সেই স্বয়ম্প্রকাশ পরম সূর্য্যের জ্ঞানে দীপ্ত ও স্বতঃক্রিয়, তেমনি অমোঘ ও অনিবার্য্য—"You receive the sanction of the Infinite because you are yourself a centre and formation of the supreme 'Purusha' and Nature. You then act with the luminous authentic spontaneity, the infallible motion of the self-existent truth of the spirit."

শ্রীঅরবিন্দের এই মন ও অধিমানসের মাঝের ভূমিগুলির বিভাগ আর যোগবাশিষ্ঠের শুভেচ্ছা, বিচারণা তনুমানসা সত্ত্বাপত্তি পদার্থাভাবনী ও তুর্য্যগা আদি সপ্তধা প্রজ্ঞার প্রান্ত বিভাগ পৃথক্ হলেও আসলে একই।

প্রজ্ঞার প্রান্তভূমিগুলিতে ক্রমশঃ জীবভাবের বা অহং বোধের ক্ষয় ঘটছে বলেই স্থূল চঞ্চল মন প্রশান্ত হচ্ছে। মনের চাঞ্চল্যই তার খণ্ডতার কারণ, প্রশান্তিই তার বিস্তৃতির অর্থাৎ অনন্তের সঙ্গে ঐক্যের কারণ। শাস্ত্রকার নিষেধাত্মক negative দৃষ্টি থেকে দেখে এই প্রজ্ঞার প্রান্তভূমিগুলি ভাগ করেছেন; প্রথমে বিষয়ের দুঃখময়ত্বের জ্ঞান, তার ক্লেশ ক্ষয় চেষ্টার অপগম বা সংযমের নিবৃত্তি, তার পর তনুমানসার চরমগতি বিষয়ে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল নিবৃত্তি, এবং চতুর্থ ভূমিতে ধর্ম্মোৎপাদনের চেষ্টা অবধি নিবৃত্তি অর্থাৎ সাধনা পরিহার এই চার রকম কার্য্যবিমুক্তি ঘটবার পর আবার সাধকের তিনটি চিত্তবিমুক্তির ভূমিও পার হওয়ার দরকার হয়ে পড়ে—ভোগ অপবর্গ, নিবৃত্তি, ক্লিষ্টাক্লিষ্ট সংস্কার অপগম ও কৈবল্য বোধে বা প্রজ্ঞায় স্বপ্রকাশ অটল আসন লাভ।

শ্রীঅরবিন্দের মানস থেকে অধিমানস ভূমি লাভের সাধনা ঠিক কিন্তু এরকম নিষেধাত্মক ও নিবৃত্তিমূলক negative দৃষ্টি থেকে দেখে ভাগ করা হয় নাই। এ শ্রেণী-বিভাগে বরঞ্চ প্রাপ্তির দিকটাই লক্ষ্য করে সঙ্কীর্ণ জীব ভাবের বিপুল থেকে বিপুলতর এবং সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর এক ঐশ্বর্য্যময় অবস্থাই লাভই দেখান হচ্ছে। এই উভয় প্রকার ভূমিই সিদ্ধির ভূমি, উভয়ই ক্ষুদ্রের বিপুলীকরণের ক্রমপরিণতি, দুই পথেই পাই অহং ভাবের সঙ্কীর্ণ চঞ্চল খেলার নিবৃত্তি বা পরিহার—বৃহৎ স্বরূপের বিকাশ। পূর্ব্ব আচার্য্যরা এর লাভের দিকটিতে জোর দেন নাই, তাঁরা সংস্কার ক্ষয় ও ভোগাপবর্গনিবৃত্তিকেই পরম লাভ বলে

করেছেন। জীবের এই ক্রমমুক্তি ও ক্রমকৈবল্যের ফলে তার ঈশ্বরত্ব লাভ বা পরম ভাগবত গতির কথা তাঁ'রা চিন্তা বা লক্ষ্য করেন নাই। সৃষ্টির মাঝে শুধু "না"—শুধু নিবৃত্তিই নাই, "না"ই সৃষ্টিতে ফুটে চলেছে বিপুল থেকে বিপুলতর "হাঁ"এ। সাধনার ফলে—ক্রমপরিণতির বশে যা' খসে যাচ্ছে তা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, যা' লাভ হচ্ছে তা' বৃহৎ ও ব্যাপক; নিবৃত্তি আনছে হাত ধরে পরম লাভকে। শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন এই দুই দিককেই, তিনি নিবৃত্তিকে পেয়েছেন পরম সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের উপায়রূপে। জীবের অহংভাবের নাশে তার সত্তার ধ্বংস হয় না, হয় তার ক্ষুদ্রতা ও দৈন্যের অপগম, সত্তার বিস্তার, সত্তা গুটিয়ে হয় অহং, ছড়িয়ে পুনরপি বৃহৎ হয়ে হয় আপন পরম স্বরূপ; অহং ভাব তার একটা মুখোস, তার ছদ্মবেশ, তার ভাবান্তর গ্রহণ। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব্ব ঋষি-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে আমাদের স্বরূপের এই গুটিয়ে যাওয়া ও ছড়িয়ে পড়ার খেলা, এই জীবত্ব গ্রহণের লীলা ও শিবত্ব লাভের প্রণালী, স্তরে স্তরে সাধনার দৃষ্টিতে জেগে উঠেছে পরম স্বরূপের এই ক্রম-আরোহণ ও ক্রমাবতরণের ধাপ বা অবস্থাগুলি।

দেহাত্মবুদ্ধি সাধনার সমতার ফলে যতই কমতে থাকে ততই "ছোট আমি"র নাশই শুধু হয় না, সেখানে হয় "বড় আমি"র জন্ম। সে জন্ম, সে বিস্তার, সে বৃদ্ধি হঠাৎ হয় না—হয় ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে, বিপুল থেকে বিপুলতর মুক্ত থেকে মুক্ততর অবস্থা পেতে পেতে। সেই অবস্থাগুলিকে বিচার করা যায় কতখানি দৈন্য সংকীর্ণতা ক্ষুদ্র আমি থেকে খসে গেল সে দিক দিয়ে যেমন, তেমনি সে অবস্থাগুলিকে বিচার করা যায় ঊর্দ্ধের কি কি সব ব্যাপ্তি, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ তাতে জাগলো সে দিক দিয়েও। যে সাধক নিবৃত্তিমুখী সে স্বভাবতঃই হান বা মুক্তির দিকটাই দেখে, তার ঝোঁক থাকে নিজের ছোট আমিকে পূর্ণের মাঝে ডুবিয়ে দেবার দিকে—এক হিসেবে আত্মঘাতের দিকে; আত্মবিলোপের নেশায় সে চলে ছোট আমির সব কিছু মুছে ফেলার ঝোঁকে। যে বৃদ্ধির লোভী, পাওয়ার ভিখারী সে খোঁজে শক্তি জ্ঞান আনন্দের পুঁজি, অধ্যাত্ম জগতের পুঁজিবাদী সে, তাই সে হয় সিদ্ধাইএর পূজক, Miraclesএর সন্ধানী, তার মাঝে আছে সৃষ্টির 'হাঁ' বা positive দিকটায় ঝোঁক। শ্রীঅরবিন্দ এই দুয়ের ঊর্দ্ধে, তিনি পূর্ণ জ্ঞানী, পূর্ণতার সাধক, তাই তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন পূর্ণ ত্যাগের দ্বারা পূর্ণ প্রকাশের পথ।

শ্রীঅরবিন্দের Higher mind তাঁর কথায় হচ্ছে a luminous thought mind, a mind of spirit-born conceptual thought—দীপ্ত চিন্তা বা আত্মজ সংকল্পের এই মন হচ্ছে অজ্ঞানের তমসার রাজ্যে মানস জ্ঞানেরই প্রথম সুশৃঙ্খল ভূমি। এখানকার সিদ্ধ সংকল্পগুলি জীবন্ত সৃষ্টির বীজ, নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির বলে এই সব সংকল্প বহুমুখী হয়ে রূপায়িত ও সফল হয়ে ওঠে। নলিনী গুপ্তের কথায় সম্বোধী বা সজ্ঞান বোধময় এই মন আমাদের অজ্ঞানাবৃত মনেরই চালক। এ সম্বোধী যুক্তি বিচারে জ্ঞানের দিকে হাতড়ে হাতড়ে চলে না, কারণ এর ভিত্তি-ভূমি অজ্ঞান নয়; এই দীপ্ত সংকল্প মন খেলে আত্মজ্ঞানের আলোয়, ঘনীভূত সিদ্ধ চিন্তার এ গতি এক পলকে দেখে নেয় অনন্ত তত্ত্বকে, কষ্টে অর্জিত বিচারজ নয় এ জ্ঞান, এ হচ্ছে ঊর্দ্ধের জ্ঞান-সূর্য্যের আত্মপ্রকাশ—নীচের সংকল্পময় মনোজগতে।

তার পরে জাগে দীপ্ত মানস Illumined mind; জ্যোতির্ময় এ মনে নাই চিন্তা, আছে আলো; নাই কল্পনা, আছে দৃষ্টি—"A mind no longer of higher thought but of spiritual light;" জ্ঞানের বিদ্যুদ্দীপ্তি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে প্রশান্ত ব্যাপ্ত দিবালোকে, এখানে আছে জ্ঞানের বিপুলতা ও অনন্ত পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবন; জ্যোতি এখানে সৃষ্টি-শক্তিময়, ঊর্দ্ধের এ হৈম প্লাবনে আছে রূপান্তরের অমোঘ বীর্য্য। এ মন চিন্তা বা সংকল্পের দ্বারা কাজ করে না, এ চলে ঋষিদৃষ্টির দ্বারা—চিন্তা হচ্ছে যার যন্ত্র, জ্যোতি হচ্ছে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ আলো। "As Higher mind brings a greater consciousness into the being through the spiritual idea and its power of truth, so the Illumined mind brings in a still greater conciousness through a Truth sight and Truth light and its seeing and seizing power."

তার পরে জাগে Over mind উত্তর মানসভূমি। বিশ্বায়ত এ-ভূমির ক্রমে উদিত বিপুলতায় অহং বুদ্ধি ক্রমশঃ যায় গলে, সব কিছু হয়ে যায় অখণ্ড সীমাহীন, অহং থাকলেও সেই মহাসিন্ধুর তরঙ্গ-ক্রীড়া হয়ে তা' জাগে। এখানে দেহ মন প্রাণ হয়ে থাকে অনন্তের অপৌরুষের প্রকাশ-ক্ষেত্র, সর্ব্বগ এই সত্তা বিশ্বকে নিয়ে বোধসিন্ধু হয়ে উদিত থাকে, জীব-বুদ্ধি হয় সেই শিবত্বের প্রকাশবিন্দু, "Individual in fact of excistence but impersonal in feeling * * * a being who is in his essence one with the Supreme Self, one with the universe in extension and yet a cosmic centre and circumference of the specialised action of the infinite."

ভাস্বর বিভাময় Higher mind ও দীপ্ত দৃষ্টিময় মন Luminous mind দুই-ই কাজ করে অহমিকার গণ্ডীর মধ্যে—ব্যক্তির নিরুদ্ধ ক্ষেত্রে; তার ফলে প্রসারিত ও জ্ঞানোজ্জ্বল হয় সে ক্ষেত্র, ব্যক্তিগত অজ্ঞান যায় গলে হ্রাস পেয়ে, ক্রমশঃ গড়ে ওঠে একটা সম্ভাবনা বিশ্বায়ত অখণ্ডের সেই অপৌরুষেয় খেলার। তার পর নামে ঐ উত্তর মানস Over mind—যার মাঝে ব্যক্তি হয়ে আসে গৌণ, তখন অখণ্ডের ভিত্তিতে রচনা ও রূপান্তর চলে ব্যক্তিকে ভেঙ্গে বিপুল করে বিরাটের স্বরূপে ঢেলে। এইখানে নিম্নার্দ্ধমণ্ডলের অজ্ঞান ভূমি ও ঊর্দ্ধ জ্ঞান-মণ্ডলের মাঝের ব্যবধান যায় সরে, দুই মণ্ডল হয়ে যায় রূপে ছন্দে গতিতে একাকার।

এখানেও Over mindএর খেলায়ও কিন্তু থাকে স্বাতন্ত্র্যতার ভাব; এখানে অখণ্ড এসে খণ্ডকে কোলে নিয়েছে আপন জ্যোতির সত্তায় বিপুল করে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য তখনও বজায় আছে। সে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যগুলি সেই পূর্ণেরই এক এক দিক, অনন্তধা প্রকাশ; তাদের মাঝে কোন ভেদ নাই, সম্পর্কহীন পার্থক্যের খণ্ডতা বা পীড়া নাই; দিব্যের স্বচ্ছন্দ সামঞ্জস্যে তারা সব সুরবাঁধা। এইখান থেকে সত্যকার পরাভূমিতে হয় যাত্রার সুরু, সত্য থেকে পূর্ণতর সত্যান্তরে চলে মানবাত্মার গতি। অজ্ঞান এখান থেকে ক্রমশঃ তিরোহিত হতে আরম্ভ হয়েছে, কারণ ব্যক্তিগত অজ্ঞানে নয়—অবিদ্যার মূল অজ্ঞানের উপর পড়েছে অখণ্ডের cosmic আলো। অবিদ্যার রাজ্য এখানে শেষ হয়ে

আমরা এসেছি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কারা যেন আজ দু'হাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল,
মিছিলে আমরা নিমগ্ন তাই দোলে মিছিল।
দুঃখ-যুগের ধারায় ধারায়
যারা আনে প্রাণ, যারা তা' হারায়
তারাই ভরিয়ে তুলছে সাড়ায় হৃদয়-বিল।
তারাই এসেছে মিছিলে, আজকে চলে মিছিল।

কে যেন ক্ষুব্ধ ভোমরার চাকে ছুঁড়েছে ঢিল,
তাই তো দগ্ধ, ভগ্ন, পুরোনো পথ বাতিল।
আশ্বিন থেকে বৈশাখে যারা
হাওয়ার মতন ছোটে দিশাহারা,
হাতের স্পর্শে কাজ হয় সারা কাঁপে নিখিল।
তারা এলো আজ দুর্বার গতি ছোটে মিছিল॥

আজকে হাল্‌কা হাওয়ায় উড়ুক একক চিল,
জন-তরঙ্গে আমরা, ক্ষিপ্ত ঢেউ ফেনিল।
উধাও আলোর নীচে সমারোহ,
মিলিত প্রাণের এ কী বিদ্রোহ!
ফিরে তাকানোর নেই ভীরু মোহ কী গতিশীল!
সবাই এসেছে, তুমি আসোনি কো, ডাকে মিছিল

একটি কথায় ব্যক্ত চেতনা: আকাশে নীল,
দৃষ্টি সেখানে তাইতো পদধ্বনিতে মিল।
সামনে মৃত্যু-কবলিত দ্বার,
থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়,
ব্যর্থ নোঙর, নদী হবো পার খুঁটি শিথিল।
আমরা এসেছি মিছিলে, গর্জে ওঠে মিছিল॥

মুহূর্ত-বিলাস

গোপাল ভৌমিক

আবেগের মাটির প্রলেপ
মন থেকে খসে যদি
খসে যাক্—
করি না আক্ষেপ:
বুদ্ধির ইস্পাত যদি
ঝক্‌মক্ করে সারাক্ষণ
ক্ষতি নাই—
যাক্ পুড়ে ঘুণ-ধরা বিবর্ণ এ মন।

অনুভবে আবেগের উচ্ছ্রিত সময়—
মুঠো মুঠো হল অপচয়
অপাত্রে অকালে:
তবু কই জয়টীকা তোমার কপালে।
একান্তে ঘরের কোণে তুমি ছিলে বসে—
আনমনে সম্মোহ-রভসে:
সহসা আমার মনে আবেগের ঢেউ—
কানায় কানায় হল জড়ো,
মুগ্ধ সুখে জানালাম—
এ বিশ্বে তোমার চেয়ে বড়ো
আর নেই কেউ—
এই কথা সত্য জেনো তুমি।
দু'জনের স্পর্শ-সিক্ত আবেগের ভূমি:

একটি মুহূর্ত শুধু—
উদ্দাম আবেগে সুমধুর—
তার পর তুমি আমি
দুই জনে বহু বহু দূর।
মাঝখানে জনতার উচ্চ ব্যবধান
মাথা তোলে ধীরে অতি ধীরে:
বুদ্ধির প্রখর সূর্য দেখি তেজোবান্
আবেগ-ফেনায়-কাঁপা সমুদ্রের শিরে।

নিছক জ্ঞানের ভিত্তি আরম্ভ হয়েছে বহুমুখীন সত্যের শিখরমালা নিয়ে, উত্তুঙ্গ থেকে উত্তুঙ্গতর মহিমাময়।

এই হলো মোটের উপর শ্রীঅরবিন্দ-কথিত সপ্তধা জ্ঞানভূমির কাহিনী। তাঁর অপূর্ব্ব স্বচ্ছন্দ যুক্তির ও অমোঘ সাক্ষাৎ দর্শনের ভাষায় তিনি বলে গেছেন এই কাহিনী তাঁর তিন খণ্ড Life Divineএ পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে। এমন বিশদ করে খুঁটিয়ে এই পরাভূমির পথটির মানচিত্র কখন কেউ আঁকেনি, কখন কেউ বলেনি বা দেখায়নি এমন সুস্পষ্ট ক্রমপরিণতির মাঝে সুবীক্ষণের আলোয় ভাগে ভাগে খণ্ডে খণ্ডে ক্রমবিকাশ। সেই পরম সত্যের ভূমিতে গিয়ে সব ভেদ হয়ে যাচ্ছে পূর্ণের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য, জড়ের উপাদান অবধি দেখা যাচ্ছে দিব্যেরই সংহত তত্ত্ব বলে; সত্য মিথ্যা দুই-ই গলে যাচ্ছে পূর্ণের বিশ্ব-কুক্ষিগত করা মহিমায়।

বেদান্তের তুরীয় আর শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণে অনেক প্রভেদ; সে তুরীয় এই পূর্ণের আরোহণের দিকটুকু মাত্র; তার সচ্চিদানন্দময় ঐশ্বর্য্যের দিক নয়। যারা সাধনায় এই ঊর্দ্ধভূমির কিঞ্চিৎ আভাস far glimpseও পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন ত্যাগ ও গ্রহণ এখানে একই যুগ্ম ক্রিয়া, শিবত্ব লাভ মানেই জীবত্বের পরিহার; নিছক ক্ষয় বলে কিছু এ রাজ্যে নাই, বৃদ্ধিই ক্ষয়ের মত দেখায় মাত্র; পূর্ণেরই বিলাস চলে হ্রাসে ও ক্ষয়ে কলায় বৃদ্ধিতে।

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পরের দিনই মেয়েটি রোজকার মত তাদের জন্ত রান্না করে দেয়। শুধু ওয়াঙের সঙ্গে সে মাঠে যায় না সেদিন। ওয়াঙকে একাকীই কাজ করতে হয়। দুপুর গড়িয়ে এলে সে নীল পোষাক পরে সহরে যায়। বাজারে গিয়ে পঞ্চাশটি ডিম কেনে—বেশ টাটকা ডিম। প্রত্যেকটির দাম এক পেনী। ডিমগুলি জলেতে ফুটিয়ে লাল করবার জন্ত লাল কাগজও কেনে ওয়াঙ। তারপর ডিমের ঝুড়ি নিয়ে যায় মিষ্টির দোকানে। এক পাউণ্ডেরও বেশী লাল চিনি কিনে বাদামী কাগজে সতর্ক ভাবে মোড়ক করিয়ে নেয়। দোকানী চিনির ঠোঙাটা রাখবার সময় বাঁশের ঝুড়ির তলায় এক টুকরো লাল কাগজও ঢুকিয়ে দিতে ভোলে না।

'নতুন মায়ের জন্ত বুঝি?'

'প্রথম ছেলে'—উচ্চারণ করতে ওয়াঙের বুক ফুলে ওঠে গর্বে।

'ভাগ্যবান্।' অন্তমনস্ক ভাবেই বলে দোকানী। দৃষ্টি তার সুবেশী নতুন একটি খদ্দেরের দিকে।

প্রতিদিনই এরা এই ধরণের কথা বহু লোককেই বহু বার বলে থাকে। কিন্তু ওয়াঙের কাছে আজ তার বিশেষ ব্যঞ্জনা। সে খুশী হয়ে ওঠে দোকানীর সৌজন্তে। বার বার তাকে নমস্কার করে সে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। ঝাঁঝালো রোদে ধূলিধূসরিত পথে নেমে ভাবে, ওর মত বুঝি ভাগ্যবান্ আর কেউ নেই জগতে।

এ ভাবনায় প্রথমে এল পুলক—তার পরই এল ভয়। এ পৃথিবীতে বেশী সুখ সয় না। আকাশে-বাতাসে সব সময় পরশ্রী-কাতর প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায় যারা লোকের—বিশেষ করে গরীবের সুখ দেখতে পারে না। হঠাৎ ওয়াঙ মোমবাতীর দোকানে ঢুকে পড়ে। এরা ধূপও বিক্রী করে। সে চারটে ধূপকাঠি কেনে—চার জনের জন্ত চারটে। সেই চারটে ধূপকাঠি নিয়ে যায় পৃথ্বীমায়ের মন্দিরে। এর আগে সে আর তার বৌ যে ধূপ পুড়িয়েছিল তার ছাই এখনও জমে আছে সেখানে। সেই ঠাণ্ডা ছাইয়ের মধ্যেই আবার গুঁজে দেয় চারটে কাঠি। কাঠিগুলো সমান জলতে দেখে বাড়ী ফিরে আসে ওয়াঙ। ছোট ছাতের নীচে এই দুটি ছোট বিগ্রহ অটল গাম্ভীর্যে আসীন। বিপদতারণের অসীম ক্ষমতা তাঁদের।

অনুবাদক
শিশির সেনগুপ্ত
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

তারপর একদিন মেয়েটি আবার ফিরে আসে মাঠে। ফসল কাটা সারা তখন। বাড়ীর উঠোনে তারা ধান মাড়াই করে। ওয়াঙ আর তার বৌ পিটিয়ে পিটিয়ে শীষ থেকে ধান বিচ্ছিন্ন করে। তার পর চলে ধান ঝাড়া। কুলোয় করে উঁচু থেকে বিচ্ছিন্ন করা ধান ছেড়ে দেয় মাটিতে—বালি আর তুষের মেঘ ওঠে বাতাসে আর সোণার ফসল ঝির ঝির করে পড়তে থাকে মাটিতে। এর পর বাকি যারা থাকে শেষে কুলোর হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় তাদের। তার পর শীতের শস্যের জন্ত মাঠে মাঠে আবার গম রোপণের পালা। বলদ জুতে ওয়াঙ লাঙ্গল দেয় মাঠে আর তার বৌ কোদাল হাতে তার পিছু পিছু চলে—উল্টিয়ে মাটির ডেলাগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেয়।

এখন মেয়েটি সারাদিন কাজ করে মাঠে আর শিশুটি পুরনো ছেঁড়া লেপের মধ্যে অকাতরে ঘুমায় মাটিতে। ছেলেটি কেঁদে উঠলে মা ছুটে এসে তার পাশে মাটিতে বসে বুকের কাপড় সরিয়ে মাই দেয় ছেলেকে। রোদ পুড়িয়ে দেয় ওদের। শেষ শরতের রোদে এখনও গ্রীষ্মের তপ্ততা যেন থমকে আছে। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া এলে তবে সেটুকু কেটে যাবে। মা আর ছেলে মাটির মত তামাটে হয়ে ওঠে। যেন মাটির গড়া দু'টো মূর্ত্তি। ছেলেটির তুলতুলে কালো মাথায় আর চুলে জমে ওঠে মাঠের ধূলি।

মায়ের বিস্তৃত বাদামী বুক থেকে তুষারের মত শাদা দুধ উপচে পড়ে ছেলের মুখে। একটি স্তন থেকে শিশু যখন দুধ চুষে খায় আর একটি স্তন থেকে আপনা হতেই গড়িয়ে যায় দুধ অজস্র ধারায়। মা সেটুকু ঝরে যেতে দেয়। লোভী শিশুটির যা' দরকার তার চেয়ে ঢের বেশী আছে। অনেক সন্তানের জীবন-রস। সে ঝরে যেতে দেয় হেলায়। নিজের অজস্রতায় সম্পূর্ণ সচেতন মেয়েটি। অনেক অনেক আছে। কখনও কখনও সে বুক খুলে স্তনটি হাত দিয়ে তুলে দুধ গড়িয়ে যেতে দেয় মাটিতে যাতে না জামা-কাপড়ে দাগ ধরে। মাটি শুষে নেয় সেই ধারা আর যেখানে পড়ে সেখানে একটি কালো নরম দাগ হয়ে রয়ে। শিশুটি বেশ মোটাসোটা হয়েছে। বেশ শান্ত শিষ্ট। মায়ের অফুরন্ত জীবন-সুধা পান করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে সে।

শীত আসে। এরাও শীতের জন্ত প্রস্তুত হয়। এবার যা' ফসল হয়েছে এ রকমটি আর হয়নি কখনো এর আগে। ছোট তিন ঘরওয়ালা ভিটে যেন ফেটে পড়তে চায়। খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের কড়িবরগা থেকে দড়ি ঝোলে—শুকনো রশুন আর পেঁয়াজের দড়ি। খুড়োর ঘরে—নিজেদের ঘরেও বসান শরের চাটাই দিয়ে

তরী বড় বড় ডোল—তাতে চাল আর গম ঠাসা। এর বেশীর ভাগই বিক্রী হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়াঙ খুব হিসেবী—অন্য সব পড়শীদের মত জুয়া খেলে টাকা ওড়ায় না, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অথবা বিলাসী আহার্য্য বা মহার্ঘ্য জিনিষপত্রও কেনে না। কাজেই চালের দাম যখন পড়তি-মুখী তখন চালও বিক্রী করতে হয় না। এর পরিবর্তে এরা ফসল ধরে রাখে, তার পর মাঠে মাঠে যখন তুষার জমতে থাকে অথবা নূতন বছরের গোড়ার দিকে সহরবাসীরা যখন যে কোন দামে শস্য কেনে, তখন তারা বিক্রী করে তাদের মাঠের ফসল।

তার খুড়োদের কিন্তু ভাল করে না পাকতেই ধান বিক্রী করে ফেলতে হয়। কখনও কখনও নগদ টাকা হাতে পাবার জন্য মাঠে ধান থাকতে থাকতেই ধান কাটা আর মাড়াই এড়াবার জন্য সব বিক্রী করে ফেলেন তিনি। তাছাড়া তার খুড়ীমা অত্যন্ত নির্বোধ প্রকৃতির মেয়েমানুষ। যেমন মোটা তেমনি অলস। সব সময় ভাল খাওয়া-পরা, এটা-ওটা কেনা কিংবা সহর থেকে নূতন জুতা আনবার জন্য বায়না করেন। কিন্তু ওয়াঙের বৌ নিজেই নিজেদের জুতা তৈরী করে নেয়—নিজের জন্য, শ্বশুরের জন্য, ছোট শিশু আর স্বামীর জন্য। ও-ও যদি জুতা কিনতে চাইত তাহলে সে যে কি করত ভেবে পায় না ওয়াঙ।

খুড়োর পুরানো ধ্বসে-পড়া কুঁড়ের কড়ি-বরগা থেকে কিছুই ঝুলতে দেখা যায় না। কিন্তু ওয়াঙের বাড়ীতে ঝুলছে হয়ত প্রতিবেশী চিংয়ের কাছ থেকে কেনা একটা শূয়োরের ঠ্যাং। আসন্ন রোগের আক্রমণে রোগা হয়ে যাবার পূর্বেই বধ করা হয়েছে তাকে। বেশ প্রকাণ্ড ঠ্যাং। ওলান সেটাকে ভাল করে লবণ মাখিয়ে শুকানো'র জন্য ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওদের নিজেদেরও দু'টো মুরগী মারা হয়েছে। তাদের শুকিয়ে ভিতরে লবণ পূরে পালক শুদ্ধই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যখন উত্তর-পূবের ঊষর মরু থেকে হাড়-কাঁপানো শীতের হাওয়া তেড়ে আসে তখন এই প্রকার প্রাচুর্য্যের সমারোহের মধ্যেই ওয়াঙ-পরিবারের দিন কাটে। বিনা সাহায্যেই ক্রমশঃ শিশুটি বসতে শিখেছে। এক মাসের মুখে আর একটা ষষ্ঠীপূজা হয় পুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করে। তাদের বিবাহ-উৎসবে যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদেরই এবারও বলা হয়। নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে সেই লাল ডিমের দশটা দেওয়া হোল আর ওয়াঙকে যারা অভিনন্দন জানাতে এল গ্রাম থেকে তাদেরও দেওয়া হোল দু'টো দু'টো করে। প্রত্যেকেই হিংসা করতে লাগল তার ছেলেকে। বেশ বড়-সড় নাদুস-নুদুস চাঁদমুখ ছেলে। গালের হাড় ঠিক তার মা'র মতই। সারা শীত ছেলেটা মাঠের পরিবর্তে মেঝেতে বিছানো লেপে বসে থাকে। দক্ষিণের দরজা দেওয়া হয় খুলে। আলো আর রোদ এসে ভরে দেয় ঘর। আর উত্তুরে হাওয়া বাড়ীর উত্তরের পুরু দেওয়ালে ব্যর্থ আক্রোশে আছড়ে মরে।

উঠোনের খেজুর গাছ, উইলো আর মাঠের ধারের পীচ গাছের পাতা খসে পড়ে। শুধু বাড়ীর পূব-দিকে বাঁশ-ঝাড়ের পাতারা ঝরে না। উত্তুরে হাওয়া তাদের ডগাগুলো দুভাগ করে দুমড়ে দিলেও পাতাদের আশ্রয়চ্যুত করতে পারে না।

এই শুক্‌নো হাওয়ায় মাঠে গমের বীজ অঙ্কুরিত হ'তে পারে না। ওয়াঙ দুর্ভর চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করে বৃষ্টির জন্য। তারপর একটি গুমোট দিনে বাতাস থেমে যায়, চারি দিক হয়ে ওঠে শান্ত গুমোট, হঠাৎ আসে বৃষ্টি। ঘরের বাড়-বাড়ন্তের মধ্যে বসে তারা চেয়ে দেখে ধারা বর্ষণ। জলের নিটোল শর সোজা এসে পড়েছে মাঠে, বাড়ীর উঠোনে। খড়ো চালের কোণ থেকে টিপ টিপ করে জল ঝরে। বিমূঢ় শিশু হাত বাড়িয়ে এই পড়ন্ত রূপোর তীর ধরতে চেষ্টা করে—হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। বৃদ্ধও হাসেন তার সঙ্গে। বৃদ্ধ নাতির পাশে থ্যাবড়া মেরে বসে বলেন—'দশটা গ্রামের মধ্যে এমন ছেলে দেখা যায় না। আমার ভায়ের অপগণ্ডগুলো ত হাঁটবার আগে কোন দিকেই চেয়ে দেখে না।' মাঠে মাঠে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে। ভিজে বাদামী মাটি ফুটে কোমল সবুজের বর্শাফলক মাথা ঠেলে উঠছে।

এই রকম দিনে চাষীরা উৎসবে জমায়েৎ হয়। যাক্, ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন। মাঠে জল দেওয়ার জন্য এদের আর পিঠ ভেঙ্গে আসবে না। বাঁকে করে বালতি নিয়ে এদিক ওদিক ছুটতে হবে না। সকালে তারা বাড়ী-বাড়ী জমায়েৎ হয়, চা পান করে, মাথায় কাগজের ছাতা চাপিয়ে খালি পায়ে মাঠের সংকীর্ণ আল ভেঙ্গে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। মিতব্যয়ী মেয়েরা বাড়ীতেই থাকে, জামা-কাপড় সেলাই করে, জুতা তৈরী করে। চলে নূতন বছরের উৎসবের প্রস্তুতি।

কিন্তু ওয়াঙ আর তার বৌ বাড়ীর বার হয় না বেশী। তাদের গাঁয়ের সব ঘরের চেয়ে এদের ঘরে যত প্রাচুর্য্য আর সুখ তেমন আর কোথাও নেই। ওয়াঙ বোঝে খুব মেলামেশা করলে লোকে ধ'র চাইবে তার কাছে। নূতন বছর এল বলে! অথচ উৎসবের খরচ আর নূতন পোষাক কেনার টাকা কার হাতেই বা আছে? কাজেই ওয়াঙ বাড়ীতেই থাকে। বৌ সেলাই করে দিন কাটায়।

ওয়াঙ্ যেমন কৃষির সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তার বৌ ওলানও তেমনি গৃহস্থালীর খুঁটি-নাটি তৈরী করে নেয়। মাটির কলসী ফুটো হয়ে গেলে সে অন্য বৌদের মত নতুন একটা কিনে আনে না। মাটি আর কাদা মিশিয়ে সেই ফুটোয় লেপে দেয়—তার পর অল্প উত্তাপে ফুটো কলসী আবার নতুন হয়ে যায়।

কাজেই তারা বাড়ীতেই থাকে। পরস্পরের উপস্থিতিতে খুশী হয় দু'জনের মন। মুখের কথা তাদের বেশী হয় না। দু'-একটা টুকরো কথার কলি ছাড়া আর কিছু নয়।

'বড় চিচিঙ্গার বীজ রেখে দিয়েছ ত?' 'গমের খড় বিক্রী করে বরং কলায়ের ডগা পোড়ান যাবে।' এমনি ধারা কথা চলে তাদের মধ্যে। ওয়াঙ হয়ত কদাচিৎ বলে—'চমৎকার রেঁধেছ ত।' আর ওলান তার জবাবে বলে—'এবার মাঠ থেকে ভাল গম পাওয়া গেছে যে।'

এবারকার সুবৎসরে ফসল থেকে কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছে ওয়াঙ। এই টাকাটা তার বেল্টে রাখতে ভয় হয়—বৌকে ছাড়া আর কাউকে সে কথা বলতেও সাহস হয় না। টাকাটা কোথায় রাখা হবে তার সলা-পরামর্শ চলে। অবশেষে মেয়েটি ওদের শোবার ঘরের ভিতরের দেয়ালে একটা ছোট গর্ত করে। ওয়াঙ টাকাগুলি ঢুকিয়ে দেয় সেই গর্তে। তার পর মেয়েটি গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয় একটা মাটির ডেলা দিয়ে। আর বোঝবার একটুও উপায় নেই যে কিছু আছে সেখানে। কিন্তু ওয়াঙ আর তার বৌ'য়ের মনে এ গোপন সঞ্চয় ঐশ্বর্যের বোধ জাগায়। যা দরকার তার চেয়েও বেশী আছে এ সচেতনতা আসে ওয়াঙের মনে। যখন সে একাকী বা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ায়, মন তার থাকে স্ফূর্তির লঘুতায়।

৫

নূতন বছরের জন্ত ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন চলতে থাকে। বাতীওয়ালার দোকান থেকে ওয়াঙ কিনে আনে সোনালী জলের কাজ-করা লাল কাগজ। কোনটিতে সুখের কামনা, কোনটিতে বা ঐশ্বর্য্যের। গৃহস্থালী ও মাঠের সব জিনিষে ওয়াঙ সেগুলি এঁটে দেয়—সংসারে শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখবার তুক্ করে। এ ভিন্ন দু'টি লাল কাগজ এনে বৃদ্ধ বাপের হাতে তুলে দেয় ওয়াঙ। মন্দিরের বিগ্রহের জন্ত বেশ তৈরী করেন বৃদ্ধ কম্পমান কুশলী হাতে। সে দু'টি নিয়ে মন্দিরে গিয়ে নববেশে সাজিয়ে দেয় তাঁদের। একটি ধূপ জেলে দেয় নববর্ষের শুভ কামনা করে। মাঝের খাবার-ঘরের দেয়ালে যে দেবতার মূর্তি আঁকা আছে তার নীচে নববর্ষের সন্ধ্যায় টেবিলের উপর ধূপ জ্বালাবার জন্ত দু'টি বাড়তি ধূপ কিনে আনে ওয়াঙ।

এর পর ওয়াঙ আবার সহরে গিয়ে সওদা করে আনে শূকরের চর্বি আর শাদা চিনি। ঘরে-ভাঙ্গা চালের গুঁড়া দিয়ে বৌ তৈরী করে তুলল পিঠা। হোয়াঙ-পরিবারের মতই এ পিঠার নাম হোল চাঁদের পিঠা।

টেবিলের উপর রাখা পিঠাগুলি দেখে গর্বে ওয়াঙের বুক ভরে ওঠে। ধনিলোকেরা যে ধরণের পিঠা খায় তেমন পিঠা তার বৌ ছাড়া আর এ গাঁয়ে কোন চাষার বৌ তৈরী করতে পারে না। কোন কোন পিঠায় সে কিস্‌মিস্ আর হর্থন গাছের ফল-ফুল-লতাপাতার মত করে সাজিয়ে দিয়েছে।

'এত ভাল খাওয়া আমাদের পোষায় না।'

পিঠের রঙে মুগ্ধমতি বৃদ্ধ শিশুর মত টেবিলের চারি পাশে ঘুরে বেড়ান। তিনি বলেন—'তোমার কাকা আর ছেলেমেয়েদের ডেকে আন। তারা দেখুক।'

কিন্তু ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখে ওয়াঙ সম্প্রতি সতর্ক হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষ শুধু ত খাবার দেখেই খুশী হবে না।

'নববর্ষের আগে পিঠা দেখা অলক্ষণ' দ্রুততার সঙ্গে বলে ওয়াঙ।

চালের গুঁড়া হাতে-মাখা বৌ এসে বলে—'হু'-একটি সাধারণ পিঠা ঘরের অতিথিদের খাওয়ান চলবে। এরকম চিনি-চর্বি দেওয়া পিঠা খাবার মত বড়মানুষ আমরা নই। ওগুলি তৈরী করেছি প্রাসাদের রাণীমার জন্ত। নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে এইগুলি ভেট দিয়ে আসব তাঁকে।'

এ কথায় ওয়াঙের আনন্দের শেষ থাকে না। যে হলঘরে এক দিন সে অসহায় ভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, নিজের দীনতায় লজ্জায় মরে গিয়েছিল, সেই ঘরে তার বৌ নতুন লাল জামা-পরা ছেলেকে কোলে নিয়ে ভাল পিঠার ভেট নিয়ে অতিথির মত গিয়ে দাঁড়াবে।

এইটুকু নতুন বছরের আর সব উৎসব-অনুষ্ঠানকে ম্লান করে দেয়। তুলোর কালো যে কোটটা বৌ তার জন্ত তৈরী করে দিয়েছে সেটি পরেই সে বৌ-ছেলেকে প্রাসাদের গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বৎসরের প্রথম দিনটিতে কাকা তার বাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসে প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার পর হৈ হৈ করছেন যখন, তখন ওয়াঙ যেন অস্বস্তি বোধ করে। ভালো পিঠাগুলি ইতিমধ্যেই ঝোড়ার ভিতর লুকিয়ে রেখেছে বৌ। কাকা যখন সাধারণগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন—তার ইচ্ছা হল চীৎকার করে বলে—'তবু ত ভালোগুলি দেখোনি।' তবু মুখ ফুটে সে কথা বলে না ওয়াঙ। ধনীর প্রাসাদে মাথা উঁচু করে ঢুকবেই হ'কেস্তার বৌকে।

বৎসরের প্রথম দিনটিতে পুরুষেরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা-শুনা ক[রে] আহার-পর্ব চলে প্রচুর। দ্বিতীয় দিনটি মেয়েদের সাক্ষাৎকার[ের] দিন। ঐ দিন খুব ভোরে উঠে ওলান ছেলেকে সাজাতে বসে। [গ]ত বৎসরের শেষ দিনে ছেলেটির মাথা কামিয়ে দিয়েছে ওয়াঙ। ছেলে[টির] মাথায় পরিয়ে দেয় লাল টুপি, কপালের দিকে বুদ্ধমূর্তির অলংক[ার] দেওয়া। গায়ে দিয়ে দেয় লাল জামা আর পায়ে বাঘ-মুখো জুতো। নূতন কালো জামা পরে বৌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল প্রসাধন ক[রে।] রূপার জলে ধোয়া পেতলের পিন গুঁজে দেয় মাথায়। সেই বস্ত্র[ে] ওয়াঙও নূতন কালো কোট পরে তৈরী হয়ে নেয়। তারপর ছেলেটি[কে] কোলে নিয়ে পথে নামে ওয়াঙ। বৌয়ের হাতে পিঠার ঝোড়া। শীতের হাওয়ায় উষর মাঠের পথ বেয়ে তারা চলতে থাকে।

হোয়াঙ-প্রাসাদের সিংহদ্বারেই ওয়াঙ তার পুরস্কার পা[য়।] ওলানের ডাকে প্রহরী দরজা খুলে তাকিয়ে থাকে অবাক্ হয়ে। গালের তিলের তিনটি চুল মোচড় দিয়ে বলে—'চাষী ওয়াঙ যে। এবা[র] তিন জনে এসেছ।' এদের পোষাকের দিকে তাকিয়ে আবার ব[লে] সে—'গত সনের চেয়ে এ সনে আরো শ্রী বাড়ুক এ আশাই করি।'

নীচু শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যে ভাবে লোকে তাচ্ছিল্যের সুরে ক[থা] কয়, তেমনি ভাবে বলে ওয়াঙ—'ভাল ফসল. সুজন্মা—।' তার প[র] নিশ্চিত পদক্ষেপে দুয়ার অতিক্রম করে।

বেশ অভিভূত কণ্ঠে প্রহরী বলে—'আমার চালা-ঘরে এক[টু] অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে তোমার স্ত্রী-পুত্রদের রাণীমার সঙ্গে দে[খা] করিয়ে দিয়ে আসি।'

তার স্ত্রী-পুত্র এই অভিজাত-পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলার স[ঙ্গে] সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে মহল পেরিয়ে, তাই চেয়ে দেখে ওয়াঙ। এ তা[র] কত বড় সম্মানের তাই সে ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মহলের পর মহ[ল] পেরিয়ে অবশেষে যখন তারা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন ওয়া[ঙ] প্রবেশ করে প্রহরীর ঘরে। মাঝের ঘরের টেবিলের পাশেই প্রহরী[র] মুখে বসন্ত দাগ বৌ যখন তাকে বসার জায়গা দেখিয়ে দেয়, সে ক[ি] যেন তাকে কৃতার্থ করে। চায়ের কাপ গ্রহণ করে ঈষৎ মাথা ঝাঁকি[য়ে] এ ধরণের চায়ের পাতা সে তার খাওয়ার উপযুক্ত নয়, এমনি এক[টা] ভঙ্গিমায় তখনি পানপাত্র নিঃশেষ করতে ব্যাকুল হয় না।

অনেকক্ষণ পরে প্রহরীর সঙ্গে ফিরে আসে ওয়াঙের স্ত্রী-পুত্র। প্রথম প্রথম বৌয়ের চওড়া-চৌকো মুখের ব্যঞ্জনার গভীর অর্থ ধর[তে] পারত না ওয়াঙ। এখন সামান্যতম পরিবর্তনের অর্থ শিখেছে। বৌয়ের মুখ নিরীক্ষণ করে দেখে সে। সে-মুখে গভীর তৃপ্তি। হোয়া[ঙ]-পরিবারের অন্দর-মহলে যেখানে তার প্রবেশ নিষেধ হয়েছে সেখানে [কী] সব ঘটল এতক্ষণ, তাই বৌয়ের মুখে শোনার আকাঙ্ক্ষায় অধীর হ[য়ে] ওঠে ওয়াঙ।

প্রহরী আর প্রহরীর বৌকে ছোট একটু প্রণাম জানিয়ে ওয়া[ঙ] ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে করে ওলানকে নিয়ে আবার পথে নামে।

পিছনে-আসা বৌয়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াঙ বলে—'তারপর' স্ত্রীর ধীরতায় অস্থির হয়ে ওঠে তার মন। স্বামীকে কাছে টে[নে] নিয়ে নীচু-গলায় বলে ওলান—'যা দেখে এলাম, সত্যি কথা ব[ল]-কি, এ বছরে ওদের একটু টানাটানি চলছে।' ওলানের কণ্ঠে আ[ফ]-শোষ। যেন বুভুক্ষিত দেবতাদের কথা উল্লেখ করতে শিহরিত হ[য়] ওলানের মন।

'সে কি!—'

কিন্তু ওলান কোন দিনই দ্রুত কথা কয় না। তার মুখের এক-একটি কথা ধরে নিতে হয় শ্রোতাকে।

'রাণীমা এ বছরেও গত বছরের কোট গায়ে দিয়েছিলেন। এ রকম আগে আমি কখনো দেখিনি। দাসেদের কারুরই গায়ে নূতন কামিজ ওঠেনি।' একটু থেমে আবার সে বলে—'আমার গায়ে যে রকম জামা তেমন অবধি কারুর নেই!' তারপর অনেকক্ষণ থেমে ওলান আবার আপন মনে বলে—'বড় কর্তার কোন উপপত্নীর ছেলেই আমাদের ছেলের সঙ্গে পোষাক কিংবা রূপে দাঁড়াতে পারে না।'

ওলানের মুখে স্মিত একটু হাসি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ছেলেটিকে বুকের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে ওয়াঙও উচ্চকণ্ঠে হাসে। কি আনন্দ! মনের এই গর্বিত বোধের মধ্যেই আবার কেমন একটা আতঙ্কের অনুভূতি হয়। এ কি মূঢ়তা করে চলেছে তারা? মেঘলা আকাশের নীচে একটি ছেলেকে বুকে করে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলেছে সে, অথচ ভাবছে না যে বাতাসে ভর দিয়ে কোন অপদেবতা হয়ত তাদের দেখছে। দ্রুত-হাতে কোটের বোতাম খুলে ওয়াঙ ছেলেটিকে বুকের ভিতর গোপন করে নেয়; তারপর চেঁচিয়ে বলে—'কি কপাল আমাদের! কেউ দেখতে চায় না আমাদের মেয়েকে, সারা মুখে তার বসন্তের দাগ এমন মেয়ের মরাই ভাল।'

ততক্ষণে ওলানের মাতৃহৃদয়ও নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কথা বুকে নিয়েছে। সে-ও বলে—'সত্যিই ত, সত্যিই ত।'

নিজের মনকে আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে ওয়াঙ আবার বৌকে জেরা করে—'ওদের গরীব হয়ে যাওয়ার কারণ কিছু বুঝলে?'

'রান্নাবাড়ীর বড় রাঁধুনীর সঙ্গে একটুক্ষণ গোপনে কথা বলতে পেরেছিলাম। সে বললে যে, এ রকম অবস্থা না হয়ে উপায় কি? ছোট-কর্তাদের পাঁচ জন দেশে গিয়ে বেনো জলের মত টাকা বার করে দিচ্ছে বাড়ী থেকে। একের পর এক মেয়ে-ছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাড়ীতে। আবার নতুন নিয়ে মশগুল হচ্ছে। বড়-কর্তার ত বছরে দু'-একটি নূতন উপপত্নী জুটবেই। আর রাণীমা দিনে যত টাকার আফিম খাচ্ছেন তাতে দু'টো জুতো রূপোয় ভরে দেওয়া যায়।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত ওয়াঙ বলে—'সত্যি?'

—'তাছাড়া এ বছর বসন্তে সেজো মেয়ের বিয়ে হবে। তার বিয়েতে বিরাট জমিদারী যৌতুক দিতে হবে। তা ভিন্ন সুচাও আর হ্যাংকাউ থেকে আসছে নতুন নক্সার সব সাটিন কাপড়। তাই দিয়ে আধুনিক ফ্যাশান-মত পোষাক বানাতে এসেছে সাংহাই থেকে দর্জি। পাছে বিদেশে গিয়ে কেউ নিন্দা করে সেই ভয়ে মেয়ে ত আঁতকে রয়েছে।'

'এত যে খরচ হচ্ছে তা বিয়ে হচ্ছে কার সঙ্গে?' এই ধরণের টাকা খরচের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করে ওয়াঙ।

'সাংহাইয়ের এক হাকিমের মেজো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে যে। রাণীমা ত নিজে আমায় বললেন যে, প্রাসাদের দক্ষিণের সুফলা জমি তিনি বিক্রী করে দেবেন। নগর-দ্বারের বাইরের জমিটাতে প্রতি-বছর এমন চমৎকার ফসল হয়। হবে না বা কেন, নগর-দ্বারের পাশের খাল থেকে জল আসে যে জমিতে।'

—'জমি বেচবে!' ওয়াঙ এতক্ষণে যেন গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে—'তবে ত সত্যিই অবস্থা পড়ে আসছে। জমি যে মানুষের রক্ত-মাংস।'

মাথায় আসে এক নূতন চিন্তা। হাতের তালু দিয়ে মাথায় ধাক্কা দিয়ে ওয়াঙ বলে, 'আগে ভাবিনি কখনো। আমরা ঐ জমি কিনব।'

পরস্পরের দিকে তাকায় তারা। ওলান কেমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।

'জমিটা, ও জমিটা'···কথা আটকে যায় মুখে ওলানের।

'ঐটাই কিনব।' দাম্ভিকতার সঙ্গে বলে ওয়াঙ—'হোয়াঙের বনেদী ঘর থেকে ওটুকু আমি কিনে নেবো।'

'কিন্তু এ যে অনেক দূরের কথা। পৌঁছতে যে অর্দ্ধেক দিন কেটে যাবে।'

প্রশ্নের মুখে পড়ে ওয়াঙ শুধু কথাটার পুনরাবৃত্তি করে—'তবু কিনবই।'

যেন সান্ত্বনার সুরে বলে বৌ—'জমি কেনা খুব ভাল। মাটির দেয়ালে টাকা পুঁতে রাখার চেয়ে জমি কিনে ফেলা ঢের ভাল। তার চেয়ে তোমার কাকার জমি কেনো না কেন? আমাদের পশ্চিম ক্ষেতের ধারে যে জমিটুকু তিনি বেচতে চাইছেন ওটুকু আমরা কিনে নিতে পারি।'

কাকার জমি কিনব না। গত বিশ সন ধরে ঐ জমিতে কাকা সার দেননি—শুধু শুষে নিচ্ছেন ফসল। জমি ত চুণের মত খরা হয়ে আছে। হোয়াঙ-পরিবারের জমিই কিনব আমি।'

'হোয়াঙ পরিবারের জমি' কথাটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উচ্চারণ করে ওয়াঙ, যেন হোয়াঙ তার প্রতিবেশী চাষী চিংয়ের সমতুল্য। ঐ প্রাসাদের মানুষদের সমকক্ষ হতে চায় সে। হাতে কাঁচা টাকা নিয়ে ওয়াঙ যাবে কর্ত্তাদের কাছে, গিয়ে, সোজা করেই পাড়বে কথাটা।

যেন বড়কর্ত্তার কাছে গিয়ে ও বলছে (মনে মনে ওয়াঙ শুনতে পায়)—'যে জমি বেচবে তার দাম কত? আমি টাকা নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছি।' বড়কর্ত্তার প্রতিনিধির কাছে গিয়ে বলবে—'আমাকে ক্রেতার সম্মান দাও। কি চাও বল। একটা মীমাংসা হয়ে যাক্।'

যে জমির দাম্ভিকতায় বহু বংশ ধরে হোয়াঙ-পরিবার এত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, যে বাড়ীতে তার বৌ এত কাল ক্রীতদাসী হয়ে কাটিয়েছে, এখন থেকে তার বৌ সে পরিবারের যে কোন মহিলার সমান অভিজাত হয়ে উঠবে।

ওলান যেন স্বামীর গভীর মনের অনুভূতিকে বুঝতে পারে। প্রতিরোধ থামিয়ে সে-ও বলে—'তাই কিনে নাও। জমিটার ধারে খাল আছে—জলের ভাবনা ভাবতে হবে না। তাছাড়া ও-জমিতে ফসলও হয় ভাল।'

ওলানের সারা মুখে আবার বিস্তৃত হয় সেই স্মিত হাসি, যে-হাসি তার দু'টি কালো চোখের বিমর্ষতাকে কিছুতেই উজ্জ্বল করে তুলতে পাবে না! অনেকক্ষণ পরে সে বলে—'গত বছর এমনি সময় ঐ বাড়ীর ক্রীতদাসী ছিলাম আমি।'

এ অনুভূতির নূতনত্বে অভিভূত হয়ে দু'টি নরনারী আবার নিঃশব্দে পথ চলে।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

মুক যদিও তার বিরুদ্ধ দলের কার্য্যকলাপ বুঝত, তবুও সে প্রতিশোধ নেবার কোনও চেষ্টাই করে নাই। কারণ, তার মন ছিল খুব উদার। সে অন্য উপায়ে শত্রুদের বশ করবার চেষ্টা খুঁজছিলো। সে তার ছড়ির গুণ জানতো, সে ভাবলো, এর সাহায্যে সে ধনরত্ন পেলে তাই দিয়ে ওদের খুসী করবে। সে প্রায়ই শুনতো যে, বর্ত্তমান রাজার পিতা রাজধানীর শত্রুর হাতে পড়বার ভয়ে তাঁর অনেক ধন-সম্পত্তি মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছিলেন—কিন্তু হঠাৎ মারা যাওয়ায় কোন্খানে পুঁতেছেন তা তাঁর ছেলেকে বলে যেতে পারেন নাই। এই গল্প শুনার পর থেকে, মুক প্রায়ই তার ছড়িগাছি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, আশা ছিল কোনও না কোনও দিন মৃত রাজার সম্পত্তির সন্ধান সে পাবে। একদিন সন্ধ্যাকালে দৈবক্রমে সে দুর্গ-উদ্যানের একটি অংশে বেড়াচ্ছিল যেখানে সচরাচর কেহ যায় না। হঠাৎ হাতের মধ্যে তার ছড়িটা কেঁপে উঠল এবং তিন বার ঠক্ঠক্ করে মাটিতে শব্দ হলো। সে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তার তরবারি দিয়ে নিকটস্থ গাছের গায়ে চিহ্ন রেখে তাড়াতাড়ি দুর্গে ফিরে এলো। তার পর একখানি কোদালি যোগাড় করে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলো।

যত সহজে ঐ ধন পাওয়া যাবে বলে মুক মনে করছিল ব্যাপার তত সহজ বোধ হলো না। তার দুর্ব্বল বাহুর পক্ষে কোদাল ছিল বেশী ভারী এবং বড় এবং প্রায় দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর সে মাত্র দুই ফুট গর্ত্ত করতে সমর্থ হলো। অবশেষে কোদাল কি একটা শক্ত লোহার মত জিনিষের গায়ে ঠেকে ঠন্ করে শব্দ হলো। মুক উৎসাহের সঙ্গে খুঁড়তে খুঁড়তে একটা প্রকাণ্ড লোহার ঢাকনি দেখতে পেল। সে গর্ত্তের মধ্যে নেমে ঢাকনিটা একটু সরিয়ে দেখলো একটি প্রকাণ্ড পাত্র একেবারে মোহরে ভর্ত্তি। অত বড় পাত্র তোলার মত তার শক্তি ছিল না; কাজেই যত পারল তার ইজের, চাপকান ও কোমরবন্ধে মোহর বেঁধে নিয়ে পাত্রটি আবার ভাল করে মাটি চাপা দিয়ে রওনা হলো। পায়ে চটি ছিল না, তার পর মোহরের অসম্ভব ভার কাজেই এই পথটুকু চলা তার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হয়ে উঠলো। তবু প্রাণপণ শক্তিতে সে তার ঘরে গিয়ে মোহরগুলি খাটের তোষকের নীচে লুকিয়ে রাখলো।

মুক এত মোহরের মালিক হয়ে ভাবল—সে ইহার বলে রাজবাড়ীর সব শত্রুকে এখন বাধ্য এবং বন্ধু করতে পারবে। কিন্তু এইখানেই সে মস্ত ভুল করলো; কারণ, সোনা দিয়ে কখন সত্যিকারের বন্ধু মেলে না। মুক দুই হাতে মোহর বিলিয়ে দেওয়াতে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের ঈর্ষা জেগে উঠলো। রান্নাঘরের তত্ত্বাবধায়ক আহুলি বলতে লাগলো, "লোকটি টাকা জাল করে"। ক্রীতদাসদের ইনস্পেক্টর আহমেদ বলল—"মুক রাজার ধন আত্মসাৎ করছে।" রাজার কোষাধ্যক্ষ আহাদ ছিল মুকের পরম শত্রু। সে নিজে মাঝে মাঝে কোষ থেকে কিছু কিছু সরাতো, সুতরাং সে এই সুযোগে বলতে আরম্ভ করলে—"মুক কোষাগারের ধন চুরি করেছে।"

এই ব্যাপার প্রমাণ করার জন্য তারা একদিন রাজার প্রধান পরিচারক কারগুজকে অত্যন্ত দুঃখিত এবং মনমরা ভাব নিয়ে রাজার কাছে যেতে বলল। তার চাল-চলনে এত গভীর দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছিল যে রাজা তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে উত্তর দিল "আমার দুঃখের কথা আর কি বলব—আমি হুজুরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে?" রাজা উত্তর করলেন—"একি কথা বলছ। কারগুজ তোমার উপরে আমার অনুগ্রহ-সূর্য্যের আলোক তো আগের মতই পড়েছে—কোনো রাহু জুটেছে বলে মনে হয় না।" কারগুজ বিনীত ভাবে বলল— "আপনার নতুন শরীররক্ষক মুককে আপনি মুক্ত হস্তে মোহর দান করছেন আর এ গরীবের ভাগ্যে কানাকড়িও পড়ছে না।"

রাজা মুকের মোহর বিতরণের কথা শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। এদিকে ঐ ষড়যন্ত্রকারী রাজার মনে এ সন্দেহও জাগিয়ে দিল যে মুক রাজকোষ থেকে কোনও উপায়ে মোহর চুরি করেছে। ব্যাপারটি এই ভাবে রাজার নিকটে বলায় কোষাধ্যক্ষের খুব সুবিধা হল, কারণ সে যে টাকা সরাচ্ছে তার কৈফিয়ৎ মিলে গেল। রাজা হুকুম দিলেন মুকের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হোক

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

এবং যাহাতে তাহাকে হাতে হাতে ধরা যায়, তার চেষ্টা করা হোক। মুক মনের সুখে মোহর দান করায় তার আগের আনা মোহর সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, কাজেই সে আবার একদিন রাত্রে কোদাল নিয়ে দুর্গের বাগানের সেই পাত্র থেকে আরও মোহর আনবার জন্য রওনা হ'ল। সে আদৌ বুঝতে পারেনি যে, পাহারাওয়ালা, কোষাধ্যক্ষ আহাদ এবং তার শত্রুদলের আরও অনেকে অলক্ষ্যে তার পিছনে গিয়েছে। মুক কোদাল দিয়ে মাটি সরিয়ে পাত্র থেকে অনেকগুলি মোহর তার চাপকানে বেঁধেছে এমন সময় ওরা গিয়ে তাকে ধ'রে মোহর সমেত বেঁধে রাজার নিকট হাজির করল। একে রাজার কাঁচাঘুম ভেঙ্গে গিয়ে খিটখিটে মেজাজে ছিলেন তার পর এই

ভীষণকাণ্ড, কাজেই তিনি তেলেবেগুনে রেগে গেলেন এবং হতভাগ্য মুকের তখনই বিচার করবেন বললেন। পাহারাওয়ালা মোহরভরা পাত্রটিও তুলে এনেছিল। সেই পাত্র, কোদালি এবং চাপকানে বাঁধা মোহর সব রাজার পায়ের কাছে রাখা হ'ল। কোষাধ্যক্ষ বলল—মুক এই পাত্রটি ভ'রে মোহর মাটির নীচে পুঁততে সুরু করেছিল এমন সময় সে পাহারওয়ালা নিয়ে গিয়ে তাকে ধরেছে।

রাজা মুককে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার সত্য কি না এবং সে এই মোহর কোথা থেকে পেয়েছে।

বাঁটকুল মুক নিজে নির্দোষ, কাজেই বেশ স্পষ্টভাবে বলল যে, সে পাত্রটি বাগানের মধ্যে আবিষ্কার করেছে—মোহর সে মাটির ভিতর পুঁতে রাখতে যায়নি—সে গিয়েছিল মাটির মধ্যে যে মোহর পোঁতা ছিল তাই তুলে আনতে।

মুকের এই উত্তরে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল এবং রাজাও আরো রেগে গিয়ে বললেন—"বদমায়েস, তুমি রাজাকে বড় বোকা ঠাওরেছ—চুরি করে আবার আমার সামনে সেটা ঢাকা দিবার চেষ্টা করছ।—কোষাধ্যক্ষ আহাদ—তুমি তহবিল মিলিয়ে দেখ দেখি রাজকোষে ঠিক এই পরিমাণ মুদ্রা কম্‌তি হচ্ছে কি না?"

কোষাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"মহারাজের কথা ঠিকই, অনেক দিন থেকেই রাজকোষের তহবিলে গণ্ডগোল হচ্ছে, আমি শপথ ক'রে বলতে পারি যে, এই মুদ্রা এবং আরো বহু অর্থ এইরূপে রাজকোষ থেকে চুরি গেছে।"

রাজার আদেশে আঁটোসাঁটো শক্ত বেড়ি পায়ে লাগিয়ে মুককে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। রাজা কোষাধ্যক্ষকে মোহরগুলি রাজকোষে জমা দিতে বলে দিলেন। এই ব্যাপার অভাবিত ভাবে সফল হওয়ায় কোষাধ্যক্ষের খুসীর সীমা পরিসীমা রইল না। সে মনের আনন্দে চকচকে মোহরগুলি বাড়ী নিয়ে গেল। পাপবুদ্ধি এই লোকটির কিন্তু চোখে পড়েনি যে, মোহরের পাত্রটির গায়ে একটি লেবেলে লেখা ছিল—"শত্রুরা আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে সেইজন্য আমার সঙ্কেত ধনের একটি অংশ—এখানে পুঁতে রাখলাম। যে ব্যক্তি এই ধন পাবে সে যদি তৎক্ষণাৎ ইহা আমার ছেলেকে ফিরিয়ে না দেয় তবে তার উপর আমার অভিশাপ থাকবে। ইতি—রাজা সাদী।"

এদিকে বন্দী অবস্থায় মুকের মনে নানারূপ দুশ্চিন্তা আসতে লাগল। সে ভাল করেই জানত যে, রাজকোষের ধন চুরি করার শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু তথাপি সে তার ছড়ি এবং চটিজুতার রহস্যের কথা প্রকাশ করতে যায়নি, কারণ রাজা জানলেই ওদুটি কেড়ে নিবেন। তার পায়ের শিকল এত আঁটভাবে লাগান ছিল যে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘোরা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কাজেই চটির দ্বারা তার কোনো সাহায্য হবার আর উপায় ছিল না। পরদিন তার ফাঁসির হুকুম বেরোলে সে ভাবল, এই ম্যাজিক ছড়ি গিয়েও যদি প্রাণ বাঁচে সেই ভালো। এই ভেবে সে রাজার সঙ্গে গোপনে কথা বলবার অনুমতি চেয়ে তাঁর নিকট সব ভেঙ্গে বলল। রাজা প্রথমে মুকের কথায় বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু মুখ শপথ ক'রে বলল যে, রাজা যদি তার মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই করে দেন তবে সে হাতে হাতে তার ছড়ির গুণপণা দেখিয়ে দেবে। রাজা তাকে কথা দিলেন এবং তার ছড়ির গুণ প্রমাণের জন্ত তার অসাক্ষাতে বাগানের এক জায়গায় কয়েকটি মোহর পুঁতে রেখে তার উপর তাজা ঘাস লাগিয়ে দিলেন। দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে, সে জায়গা শীঘ্র খুঁড়া হয়েছে। তার পর রাজা মুককে ডেকে মোহর খুঁজে বের করতে বললেন। মুক ছড়িগাছি নিয়ে পায়চারী করতে করতে এক জায়গায় তার ছড়ি তিন বার হাতের মধ্যে কেঁপে উঠে মাটিতে ঠক ঠক শব্দ করল। তখন ঐ জায়গা খুঁড়ে মোহর পাওয়া গেল। রাজার তখন বুঝতে বাকী রইল না যে কোষাধ্যক্ষ তাঁকে কিরূপে ধরিয়েছে। তিনি তাকে তখনই ডেকে পাঠালেন। হঠাৎ রাজার আগের দিনের মোহরের পাত্রটির কথা মনে পড়ায় "সেটিও দেখতে চাইলেন" এবং তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন তাঁর স্বর্গীয় পিতার সহিযুক্ত পাত্রের গায়ের লেবেল দেখলেন। রাজা মুকের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি তোমার ম্যাজিক ছড়ির রহস্য জানতে পেরে তোমার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে তোমায় চিরজীবন বন্দী থাকবার আদেশ দিলাম। তোমার চটিজুতার রহস্য যদি প্রকাশ কর তবে আমি তোমায় মুক্তি দেব। মুক এক রাত্রি বন্দিশালায় আটক থাকাতেই সারাজীবন বন্দী থাকার যে কি অসহনীয় কষ্ট তার কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছে, কাজেই সে রাজাকে বলল, এই চটিজুতা পায়ে দিলে দ্রুত চলা যায়। চটি পরে গোড়ালীর উপর তিনবার ঘুরলে যে আকাশপথে উড়া যায় সে কথাটি মুক গোপন রাখল। রাজা মুকের কথা পরীক্ষা করার জন্ত যেই চটি পায়ে দিলেন, অমনিই পাগলের মত তিনি বাগানের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে থামেন কিন্তু কি করে থামতে হয় তা তো তিনি জানেন না, মুকও রাজার উপর একটু প্রতিহিংসা নেবার জন্তই এটুকু তাঁকে শেখায় নাই। অবশেষে মূর্চ্ছিত হয়ে রাজা মাটিতে পড়ে গেলেন। মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেলে রাজা তাঁর দুরবস্থা ঘটানর জন্ত মুকের উপর যারপর নাই চটে গিয়ে বললেন,—"আমি তোমার প্রাণ ও মুক্তি ভিক্ষা দিয়াছি কাজেই আমার কথা উলটাতে পারবো না—যা হোক তুমি আজ বেলা বারটার মধ্যেই আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে, যদি অন্যথা হয় তবে তোমায় আবার বন্দী করে বিচার করা হবে।" এই বলে রাজা চটি জোড়া ও ছড়িগাছি তাঁর কোষাগারে রেখে দিলেন। অতি দীন এবং বিষণ্ণ ভাবে মুক ঐ রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে, যাবার সময় তার বোকামীর জন্ত নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল; কারণ একটু হুসিয়ার হয়ে চললে রাজসভায় সে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারতো। যে রাজ্য, সে ছেড়ে চলেছে সে রাজ্য তার সৌভাগ্যের পক্ষে খুব বড় ছিল না কারণ মাত্র আট ঘণ্টা হাঁটার পরেই সে ঐ রাজ্যের সীমান্তে এসে পৌঁছালো—এই দীর্ঘপথ হাঁটার সময় বার বার তার চটির কথা মনে হচ্ছিলো।

ঐ দেশের সীমান্তে এসেই সে চলতি রাস্তা ছেড়ে গভীর বনের নির্জ্জন পথ ধরে চলতে লাগলো। সে মানুষের সমাজে যে ব্যবহার পেয়েছে তাহাতে সকল মানুষের প্রতিই তার মন তিক্ততায় ভরে উঠেছিলো। গভীর বনের মধ্যে একটি জায়গা তার বড় ভাল লাগল। নির্ম্মল জলের ছোট্ট একটি ঝরণা তর-তর করে বয়ে যাচ্ছে পাশে। একটি সবুজ ঘাসের ছোট্ট মাঠ, চারপাশে বড় বড় ডুমুর গাছ ঘন ছায়া করে আছে। মুক মনে মনে ঠিক করল, অনাহারে প্রাণত্যাগ করার এটি উপযুক্ত স্থান। এই চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত শরীরে ঘাসের উপর যেই সে শুয়েছে অমনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন ভীষণ ক্ষিদেয় তার পেট চোঁ চোঁ করছে, সে বুঝলো না খেয়ে মরা বড় কষ্টের ব্যাপার, কাজেই সে চার দিকে চেয়ে দেখলো কিছু খাবার মেলে কিনা।

যে ডুমুর গাছের ছায়ায় সে ঘুমিয়েছিল সেই গাছে এত সুন্দর সুন্দর পাকা ডুমুর ঝুলছিল যে দেখে তার জিভে জল এল। সে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে অনেকগুলি পাকা সুগন্ধ ডুমুর পেড়ে পেট ভরে খেয়ে নিলো এবং পরে পিপাসা নিবারণের জন্য ঝরণাতে জল খেতে গেল। জল খেতে খেতে হঠাৎ জলের মধ্যে দেখতে পেল যে, তার কাণ দুটি লম্বা গাধার কাণের মত এবং নাকটি মোটা এবং লম্বা হয়ে গেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপারে মুক ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভয়চকিত হয়ে সে কাণে হাত দিয়ে দেখে সত্য সত্যই তার কাণ এক হাতের উপর লম্বা হয়ে ঝুলছে।

মুক বলে উঠল—আমার তো গাধার কাণই প্রাপ্য; কারণ আমি আমার নিজের ভাগ্য বোকা গাধার মতই পায়ে ঠেলে এসেছি। সে গাছের চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং আবার ক্ষিদে পাওয়াতে ডুমুরের খোঁজ করতে লাগলো কিন্তু সে গাছে আর একটিও খাওয়ার উপযুক্ত ডুমুর দেখতে পেল না। খুঁজতে খুঁজতে সে অন্য একটি গাছে পাকা ডুমুর দেখতে পেয়ে তা পেড়ে নিয়ে এসে যেই খেয়েছে অমনি তার কাণ ও নাক যেন পাতলা মনে হতে লাগলো। সে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে নদীর জলের নিকট গিয়ে তার ছায়া দেখে বুঝলো যে তার নাক কাণ ঠিক হয়ে গেছে। সে ভেবে দেখলো যে, প্রথম গাছের ফল খাওয়াতে সে গাধার নাক ও কাণ পেয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় গাছের ফল খাওয়াতে আবার মানুষের মত হয়েছে; তখন সে খুব খুসী হয়ে মনে মনে ঠিক করলো যে নতুন উপায় হাতে এসেছে, এর দ্বারা সে আবার তার সৌভাগ্যের পথ খুঁজে পাবে। সে তখন দুই গাছ থেকেই পাকা ডুমুর পেড়ে দু'টি পৃথক্ পৃথক্ ঝুড়িতে চিহ্ন দিয়ে রাখলো এবং যতটা বইতে পারে ততটা নিয়ে যে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছে সেই রাজ্যের দিকে রওনা হলো। সে প্রথমে একটি ছোট সহরে পৌঁছে নতুন পোষাক কিনে এমন ভাবে সেজে নিল যে, বাঁটকুল মুক বলে আর তাকে চেনা যায় না। এই পোষাক পরে ডুমুরের ঝুড়ি দুটি নিয়ে সে যে রাজার নিকট হতে বিতাড়িত হয়েছিল সেই রাজার রাজধানীর দিকে রওনা হলো। সহরের কিছু দূরে একটি নির্জন যায়গায় জঙ্গের অলক্ষ্যে সে দ্বিতীয় ঝুড়িটি লুকিয়ে রেখে প্রথম ঝুড়িটি নিয়ে সহরে প্রবেশ করল।

বৎসরের এই সময়টিতে পাকা ফল প্রায় বাজারে উঠত না।

মুক সোজাসুজি গিয়ে রাজবাড়ীর সদর দরজার সামনে তার ফলের ঝুড়ি নিয়ে বসে গেল। সেইখান থেকে রাজ-পাকশালার প্রধান কর্মচারী রাজার জন্য মুখরোচক খাদ্যাদি কিনত। সে এসে দু' একটি দোকান দেখে মুকের কাছে এসে তার ঝুড়ি দেখে বলল "আহা, এ যে সুন্দর অকালের ফল, কোথায় পেয়েছ এগুলো, এতে আমাদের রাজা খুব খুসী হবেন—তা এ ঝুড়ির কত দাম নেবে? মুক মোটামুটি একটা সস্তা দামই চেয়ে বসল। দাম দিয়ে ঝুড়িটি একটি ক্রীতদাসের মাথায় তুলে লোকটি চলে গেল। মুকও লম্বা পায়ে সেখান থেকে সরে পড়ল, কারণ মনে মনে ভয় ছিল পাছে তার ফল খাওয়ার ফলে লম্বকর্ণ রাজা ফলবিক্রেতাকে পাকড়াও করে উচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

রাজা খেতে ব'সে খুব খোস মেজাজে প্রধান পাচককে তার রান্নার সুখ্যাতি করলেন এবং সে সর্বদাই নতুন নতুন এবং দুষ্প্রাপ্য মুখরোচক খাবার সংগ্রহ করিয়া আনে, সেজন্যও প্রশংসা করলেন। পাচক তখনও সদ্য-আনীত লোভনীয় ডুমুরগুলি দেখায় নাই; কাজেই সে বিনীতভাবে বলল—"শেষ ভাল সব ভাল।" এই কথায় রাজার ছেলেমেয়েরা ভাবলো আরো যেন কি মজার খাবার আছে। প্রধান পাচক যখন লোভনীয় পাকা টক্‌টকে ডুমুরগুলি এনে টেবিলের উপর রাখল, তখন উপস্থিত সকলেই সমস্বরে —"আহা কি চমৎকার" বলে উঠলেন। রাজা বললেন 'বা কি সুন্দর পাকা, এত লোভনীয় অকালের ফল কোথায় পেলে? তোমার প্রভুভক্তির বাস্তবিক তুলনা নাই।" রাজা এরূপ দুষ্প্রাপ্য খাবারের বেলায় বরাবরই বড় হিসাবী ছিলেন। তিনি নিজের হাতেই ফলগুলি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক রাজকুমার ও রাজকুমারীকে দুটি ক'রে, রাণীদের এবং মন্ত্রীদের জন্য একটি ক'রে বরাদ্দ করে রেখে অবশিষ্টগুলি নিজের পাত্রে নিয়ে চটপট খেয়ে ফেললেন।

এমন সময় রাজকুমারী অমরা চীৎকার করে উঠলো—"বাবা, বাবা, তোমাকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন?" সকলেই বিস্ময়ে

অবাক হ'য়ে রাজার দিকে চেয়ে রইল। রাজার কাণ দুটি অসম্ভব লম্বা হয়ে মাথার দুই দিকে ঝুলছে—নাকটা মোটা এবং লম্বা হয়ে চিবুকের নীচে পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। রাজা নিজে ভয়ে ও বিস্ময়ে নির্বাক্ ভাবে চিন্তা করতে লাগলো। যারা ফল খেয়েছিল সবারই অবস্থা অল্পবিস্তর রাজার মতই অদ্ভুত দেখতে হ'লো।

সকলেই রাজ-পরিবারের এই ভয়ানক দুরবস্থার কথা চিন্তা ও বলাবলি করতে লাগলো। সহরের বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দলে দলে রাজবাড়ীতে আসতে লাগল—মিকশ্চার, বড়ি, প্রলেপ যত রকমের ঔষধ আছে সবই একে একে দেওয়া হতে লাগলো কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হ'ল না; সহরের সব চেয়ে বড় সার্জন

রাজকুমারের একটি কাণ অদৃশ্য করলেন কিন্তু কাটিবামাত্রই কাণ আবার বড় হ'য়ে গেল। নিরুপায় রাজপরিবার দুঃখের সাগরে ভাসতে লাগলেন।

মুক লুকিয়ে রাজপরিবারে দুর্দশার সব খপরই রাখছিল। যখন শুনল সব ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিয়ে চলে গেছে, তখন সে ভাবল এখন তার সময় এসেছে। সে তার ডুমুর বিক্রয় করা টাকা দিয়ে বড় সম্ভ্রান্ত ডাক্তারের মত বেশভূষা কিনে নিল, সব শেষে ছাগলের লোম দিয়ে বড় দাড়ি লাগিয়ে নিল যাহাতে রাজবাড়ীর কেহ তাহাকে চিনতে না পারে। একটি সুদৃশ্য থলের মধ্যে ডুমুরগুলি নিয়ে সে বিদেশী ডাক্তার বলে নিজের পরিচয় দিয়ে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলো। প্রথমে লোকে তাকে বিশ্বাস করে নাই কিন্তু সে রাজার একটি ছেলেকে তার থলে থেকে বের ক'রে একটি ডুমুর খেতে দেওয়ায় তৎক্ষণাৎ তার নাক কাণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় সকলেরই তার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল। রাজার অন্য ছেলে-মেয়ে যাদের নাক কাণ বড় হয়ে গিয়েছিল তারাও নবাগত ডাক্তারের নিকট থেকে একটি ক'রে ডুমুর খাওয়ায় সুস্থ হয়ে গেল।

রাজা ব্যাপার দেখে চমৎকৃত হয়ে বিদেশী ডাক্তারের হাত ধরে নিঃশব্দে নিজের কামরায় গেলেন এবং সেখান থেকে একটি দরজা খুলে তাঁকে নিয়ে কোষাগারে ঢুকলেন। রাজা বললেন—"এই আমার কোষাগার, এখান থেকে যে ধনরত্ন যত ইচ্ছা আপনি নিতে পারেন যদি আপনি আমার এই লজ্জাকর ব্যারাম সারাতে পারেন।" রাজার এই কথাগুলি মুকের কর্ণে মধু বর্ষণ করল। ঘরে ঢুকেই তার চটি ও ছড়ির উপর নজর গেল। সে যেন রাজার ধনরত্নের তারিফ করবার জন্যই ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগল। তারপর তার চটির ভিতর দুই পা ঢুকিয়ে ছড়িগাছি হাতে নিয়ে তার নকল দাড়ি টান দিয়ে খুলে ফেলে রাজার সামনে ধীর অবিচলিত কণ্ঠে বলতে লাগল "অকৃতজ্ঞ রাজা, আপনি বোধ হয় এখন আপনার সেই হতভাগ্য দেহরক্ষীকে চিনতে পেরেছেন। যার কাছে সৎকাজের পুরস্কারের পরিবর্তে লাঞ্ছনা পেতে হয় তার পক্ষে এই হচ্ছে উপযুক্ত শাস্তি। আমি আপনার নাক কাণ এখনই সারাতে পারি কিন্তু আমি তা করব না, কারণ এইরূপ নাক কাণ থাকলে আপনি যত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন মুকের উপর যে অবিচার করেছেন তা আপনার মনে থাকবে;" এই কথা বলে মুক গোড়ালির উপর তিনবার ঘুরে ঘর থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাপার ঘটে গেল যে, রাজা সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকবার অবসরও পেলেন না।

মুক পথে একটি পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখতে পেয়ে তার ছড়ির সাহায্যে সেখান থেকে প্রচুর মোহর নিয়ে বাড়ি এসে উপস্থিত হ'ল। সেই থেকে সে রাজার চালে বাস করছে। মানুষের সমাজ সে আগে যে ব্যবহার পেয়েছে তাহাতে তার মন এত বিষিয়ে গিয়েছিল যে সে মানুষের সমাজ বর্জন করে নির্জনে একাকী বাস করে। সে তার অভিজ্ঞতার ফলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছে যদিও তার চাল-চলন উপহাসের চেয়ে বিস্ময়ই বেশী উৎপাদন করে।

পথিক মুকের এই গল্প বলায় ছেলেরা এত দিন মুকের মত একজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোকের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্য অনুতপ্ত হ'ল। ছেলেরা তাদের বন্ধুদের নিকট মুকের এই অদ্ভুত কাহিনী বলায় সকলেই খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করল এবং সেই থেকে মুক যত দিন বেঁচেছিল তাকে সকলেই কাজী বা মুফতির মত গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত।

ডিম্বের নৃত্য

পি, সি, সরকার

ডিম্বের নৃত্য বা Dancing Egg খেলাটি দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইবেন। 'ছেলেদের ম্যাজিক' পুস্তকে ইতিপূর্ব্বে আমি ভৌতিক ডিম্বের নৃত্য' নাম দিয়া একটি খেলা প্রকাশ করিয়াছি

—তাহাতে একটি সাধারণ হাঁসের ডিম টেবিলের উপর রাখিলে আপনা-আপনি নাচিয়া উঠে। সেখানে খেলাটিতে ঔষধপত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কারণ, ডিম্বের খোলার মধ্যে পারদ প্রবিষ্ট করাইবার নির্দেশ দিয়াছি এবং পরে ডিমটিকে সামান্য উত্তাপ দিতে লিখিয়াছি। উত্তাপ পাইয়া ভিতরে পারদ লাফাইতে আরম্ভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিমটিও টেবিলের উপর লাফাইতে আরম্ভ করিবে। এখানে কিন্তু ঔষধপত্রের কোন প্রকার বালাই নাই। টেবিলের উপরিস্থিত ডিসে অনেকগুলি ডিম রহিয়াছে—যাদুকর সেগুলি হইতে যে কোন একটি বাছিয়া লইলেন। তার পর তিনি দর্শকদের নিকট হইতে দুইটি সাধারণ টুপী চাহিয়া লইলেন এবং নিম্নোক্তরূপ বক্তৃতা দিলেন।

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এই দেখুন আপনাদের সম্মুখে আমি একটি হাঁসের ডিম লইলাম, এবং এই টুপী দুইটিও অতিশয় সাধারণ—ইহাতে কোন প্রকার চালাকী করা নাই, কারণ ইহা আপনাদেরই টুপী। এইবার আমি ডিমটিকে এই এক নম্বর

টুপীতে রাখিলাম কিন্তু উহা আমার মায়ামন্ত্র (!) প্রভাবে দুই নম্বর টুপীতে লাফাইয়া চলিয়া আসিবে। দেখুন "ওয়ান-টু-থ্রি" ব্যাস—"

দর্শকগণ অবাক্ হইলেন যে ডিমটি এক নম্বর টুপী হইতে লাফ দিয়া দুই নম্বর টুপীতে চলিয়া আসিল! প্রথম চিত্রে এই খেলার সম্মুখের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। যাদুকর দর্শকদের নিকট হইতে টুপী দুইটি চাহিয়া লইয়া পাশাপাশি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বাম পার্শ্বে টেবিলের উপর ম্যাজিকের অপরাপর সাজসরঞ্জামের সহিত ডিসের মধ্যে অনেকগুলি হাঁসের ডিমও রহিয়াছে এবং ডিমটি এক নম্বর টুপী হইতে দুই নম্বর টুপীতে লাফাইয়া চলিয়া গিয়াছে
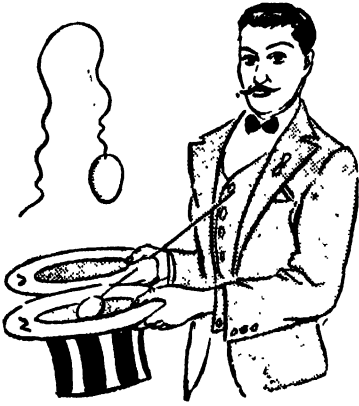
এক্ষণে খেলাটির মূল কৌশল প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহাতে কোন প্রকার ঔষধপত্রের দরকার হয় না এবং টুপী দুইটিতেও বাস্তবিকই কোন কৌশল করা নাই। প্রথম একটি হাঁসের ডিম লইয়া তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ভিতরের সমস্ত লাল-শাদা-হলুদ জিনিষগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। তখন ডিমের খোলাটি মাত্র রহিল। ক্ষুদ্র ছিদ্রটি সাদা চুণ বা রং দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অতিশয় নিকট হইতেও বুঝা যাইবে না যে উহা খোলা ডিম। এইবার ডিমের মধ্যে অনেকগুলি ভাল ডিম রাখিতে হয় এবং সকলের উপরে ঐ খোলা ডিমটিকে রাখিতে হয়। যাদুকর জানেন যে খোলা ডিম কোন্‌টি। দর্শকগণ কেহই উহা জানেন না। ইহা বাদে যাদুকরের কোটের বোতামের সঙ্গে লম্বা খুব সরু কাল সূতা দেড় ফুট আন্দাজ লম্বা আটকান আছে। আমি invisible thread নামক যাদুকরদের 'অদৃশ্য সূতা' ব্যবহার করিয়া থাকি—পাঠকগণ মেয়েদের চুল দ্বারাও এই খেলা সাফল্যের সহিত করিতে পারিবেন। চুলের এক প্রান্ত কোটের বোতামের সঙ্গে আটকান থাকিবে—এবং অপর প্রান্তে সামান্য একটু মৌচাকের মোম আটকাইয়া রাখিতে হয়। মোমের আঠার সুবিধা এই যে, কোন জিনিষের উপর একটু চাপিয়া ধরিলেই উহা আটকাইয়া যায় এবং পরে জোরে টানিয়া দিলেই খুলিয়া যায়। যাদুকরগণ এই মোমগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করিয়া লন, তাহাতে নরম হয় এবং কাজের পক্ষে খুব সুবিধা হয়। ইহা conjuror's wax নামে পরিচিত—মৌচাকের ভাল মোম দ্বারা ইহা বেশ করা যায়। এক্ষণে যাদুকর টেবিলের উপর হইতে ঐ খোলা ডিমটি তুলিয়া লইলেন এবং দর্শকদিগকে দেখাইবার সময় ঐ মোমযুক্ত সূতার প্রান্তটি ডিমের উপর চাপিয়া ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সূতাটি ডিমের সহিত আটকাইয়া গেল এবং অপর প্রান্ত কোটের বোতামের সহিত পূর্ব্বেই আটকান আছে। এইবার যাদুকর হস্তস্থিত টুপী দুইটিকে একটু সম্মুখের দিকে, একটু বাম দিকে, একটু ডান দিকে এই ভাবে নাড়াচাড়া করিলেই ডিমটি নাচিতে নাচিতে এক টুপী হইতে অন্য টুপীতে যাইতে আরম্ভ করিবে—সঙ্গে সঙ্গে শরীরটি একটু সোজা করিতে হয়। দ্বিতীয় চিত্রে উহা (পার্শ্বের দৃশ্য) ভালরূপে দেখান হইয়াছে। এই অংশ অতিশয় সহজ, যে কেহ বাড়ীতে নিজে নিজে চেষ্টা করিলে ইহা সহজ বোধগম্য হইবে। খেলা শেষ হইয়া গেলে ডিমটি দুই আঙ্গুলে ধরিয়া সামনের দিকে টানিয়া নিলে—চট্ করিয়া মোমের আঠা খুলিয়া যাইবে এবং কাল প্যাণ্টের উপর কাল সূতা বা চুল ঝুলিয়া পড়িবে। কাল প্যাণ্টের উপর কাল সূতা খুব কাছে হইতেও দেখা যায় না। (যাদুকরগণ এই জন্যই কাল পোষাক ব্যবহার করেন আর রাত্রিতে ম্যাজিক করেন।) এইবার ডিমটি ভুল করিয়া পকেটে রাখিতে হয় এবং পকেটে অপর একটি আসল ভাল ডিমের সহিত বদলাইয়া পুনরায় টেবিলের ডিসে রাখিয়া দিতে হয়। যদিই বা দর্শকগণ পরে ঐ ডিমগুলি পরীক্ষা করিতে আসেন। হ্যাঁ, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি পূর্ব্ব হইতে একটি ভাল ডিম পকেটে রাখিয়া এই খেলা করিতে হয়। খেলাটা খুবই মজাদার।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

১১

বররুচি রাজ্যের মন্ত্রিপদ থেকে বিদায় নেবার পর শকটালের মনে প্রতিহিংসার আগুন আবার দ্বিগুণ জোরে জ্বলে উঠল। এবার ত আর তাঁকে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু অন্য আট জন নন্দ যতই বোকা হোক না কেন, যোগনন্দ ত আর সে রকম নির্ব্বোধ নন। তিনি ত আসলে ইন্দ্রদত্ত—ব্যাড়ির ভাই—বররুচির সহপাঠী। না হয় রাজপাটে ব'সে তাঁর মনটা একটু দেমাকে হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু বুদ্ধি ত কম পড়েনি। তাই তিনিও শকটালের ওপর খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌লেন। শকটাল্‌ও তা বুঝতে পেরে প্রথমেই রাজার সঙ্গে কোন রকম বিরোধ বাধালেন না—এমন ভাবে রাজার সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগ্‌লেন, যেন তিনি রাজার বিশেষ অনুগত পুরানো মন্ত্রী—কোন দিন রাজার সঙ্গে তাঁর কোন শত্রুতা হয়নি।

এই ভাবে দিন যায়। শকটাল্ জানতেন যে সারা রাজ্যের মধ্যে এক জনকে অন্ততঃ তাঁর ব্যথার ব্যথী পাবেন—তিনি হলেন আগেকার সেনাপতি মৌর্য্যের ছোট ছেলে চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত তখন নন্দদের রাজসরকারে এক জন অতি সাধারণ কর্ম্মচারী—রাজ্যের অন্নসত্রগুলি দেখ্‌বার ভার তাঁর ওপর। শকটাল্ চর পাঠিয়ে চন্দ্রগুপ্তের মন বুঝবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রীর কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত বেশী দিন নিজের মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে পার্‌লেন না—মন্ত্রীর কাছে তাঁর মনের গোপন কথা ধরা পড়ে গেল। শকটাল্ দেখ্‌লেন যে, চন্দ্রগুপ্তের বুকের মাঝেও প্রতিহিংসার আগুন রাবণের চিতার মতই ধিকি-ধিকি জ্বলছে চিরদিন—এত দিনেও তার তেজ একটুও কমেনি। মনে তাঁর আনন্দ হ'ল—এত দিনে সত্যই তাঁর একজন যোগ্য দোসর মিলল। হাজার হোক্ তিনি ত বুড়ো হয়েছেন—একজন আগুনের ফুল্‌কির মত তরুণের সাহায্য ছাড়া একটা দীর্ঘ দিনের প্রকাণ্ড রাজ্য ধ্বংস করা কি তাঁর একার পক্ষে সম্ভব হতে পারে? এর পর যথাকালে একদিন গভীর নিশীথে শকটালের বাড়ীতে চন্দ্রগুপ্তের নেমন্তন্ন হ'ল। ভোরের দিকে চন্দ্রগুপ্ত যখন মন্ত্রীর বাড়ী থেকে

বেরুচ্ছিলেন, তখন মনে হ'ল পূবদিকের আকাশের গায়ে উষার অরুণ রাগ লাগ্‌বার আগেই এই সুন্দর কিশোরটির মুখে তার অনুরাগের স্পর্শ এসে পড়েছে।

অন্নসত্রের পরিদর্শক চন্দ্রগুপ্ত। সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘুড়ে বেড়াতে হয়! এক দিন ভুপুর রোদে তিনি ঘোড়ায় চেপে প্রকাণ্ড এক তেপান্তর মাঠ পার হয়ে পাশের গ্রামে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন একি কাণ্ড! এক ব্রাহ্মণ—তপ্ত কাঞ্চনের মত গায়ের রঙ, বয়স্ খুব বেশী নয়—তবে চন্দ্রগুপ্তের চেয়ে অবশ্যই বড়—চল্লিশের কাছাকাছি হয়ত হবে—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। মাঠের ওপর বসে এক এক গাছি করে কুশের গাছ মূল-শুদ্ধ উপড়ে তুলছেন—আর সেই মূলের গোড়ার গর্ত্তে হাতের ভাঁড় থেকে একটু করে ঘোল ঢেলে দিচ্ছেন। এ ব্যাপার দেখে তাঁর আর কাজে যাওয়া হ'ল না। ফিরে এলেন তিনি তখনই মন্ত্রী শকটালের বাড়ী। মন্ত্রী মশায় তখন সবে খেতে বস্‌তে যাচ্ছেন—এমন সময় চন্দ্রগুপ্ত হেসে হাঁক দিলেন—'মন্ত্রী মশায়! খাবেন'খন পরে। যে অবস্থায় আছেন, চলে আসুন আমার সঙ্গে—অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখাব। বোধ হয়, এত দিনে ভগবান্ আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবার উপক্রম করছেন'। শকটালের অনেক প্রশ্নেও চন্দ্রগুপ্ত আর কোন কথা ভাঙলেন না। প্রায় একরকম টান্‌তে টান্‌তেই মন্ত্রী মশায়কে ধরে নিয়ে গেলেন ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সেই তেপান্তরের মাঠে।

জনশূন্য মাঠ। তখনও তেমনি কুশ তুলে চলেছেন সে ব্রাহ্মণ। মাথার ওপর ভুপুরের সূর্য্য আগুনের গোলার মত। মাটি তেতে আগুন—পা দিলে পা পুড়ে যায়। রোদে ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ মুখখানা লাল হ'য়ে প্রায় ঝলসে যাবার মত হয়েছে। সারা গায়ে ছুটছে অজস্র ঘামের ধারা। তবু সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই—আপন মনে নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার ভাবে বিনা বিরক্তিতে তাঁর সেই কুশ-ওপ্‌ড়ানো আর ঘোল-ঢালার কাজ তিনি ক'রে চলেছেন। এরূপ অলৌকিক দৃঢ়তা—আর এরকম অমানুষিক প্রতিহিংসার ছবি দেখে শকটালের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল, তিনি দূর থেকে কিছুক্ষণ দেখে এগিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণের কাছে। দেখ্‌লেন, ব্রাহ্মণের সে দিকে কোন খেয়ালই নেই, আপন মনে নিজের কাজে ব্যস্ত। তখন তিনি মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলেন—'ঠাকুর মশাই! আপনি এই ভুপুর রোদে মাঠে ব'সে কি করছেন এতক্ষণ ধরে? ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, আপনার এ এমন কি কাজ যে এত কষ্ট ক'রে করতে হচ্ছে'?

এবার সে ব্রাহ্মণ একবার মুখ তুলে বললেন—'কি জানেন, মন্ত্রিবর!—'

শকটাল্ বাধা দিয়ে বললেন—'আমি যে মন্ত্রী, তা আপনি জানেন যে দেখ্‌ছি'!

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দ হাসি হেসে বললেন—'জানি আমি সবই। প্রথমে মৌর্য্যের ছেলে আমাকে দেখে গেলেন। তার পর আপনাকে সঙ্গে টেনে আনলেন। অনেকক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে আপনারা দেখছিলেন আমি কি করছি—বোধ হয় ভাবছিলেন পাগলামি! মন্ত্রী ম'শায়! আমি উন্মাদ নই! মাঠে চলতে চলতে এই সব কুশের অঙ্কুর কাঁটার মত পায়ে বিঁধে পা রক্তারক্তি করে দিয়েছে আমার। তাই একটি একটি করে কুশের গাছগুলি উপড়ে ফেলছি আমি। কিন্তু এতেও এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। যদি গোড়ার শেকড় এক কণাও থাকে মাটির মধ্যে তা হ'লে আবার গজাবে—তাই এদের মূলের গর্ত্তে মিষ্টি ঘোল ঢেলে দিচ্ছি—যাতে পিঁপড়েরা ঘোলের গন্ধে এখানে এসে ঘোল খেতে গিয়ে কুশের মূলের টুকরোগুলো পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলে। বাস! তা হ'লেই এ রক্তবীজের ঝাড় নির্ব্বংশ হবে। শুন্‌লেন ত আমার কথা। এখন যান, যে যার কাজে। আমিও আমার হাতের কাজটুকু সেরে ফেলি'।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে শকটাল্ আর চন্দ্রগুপ্তের মনে হতে লাগ্‌ল—'এই রকম রাগী মেজাজ, ক্রূর কুটিল ও জেদী ব্রাহ্মণকেই আমাদের দরকার। এঁরই সাহায্যে নবনন্দের বধ—নন্দবংশের ধ্বংস করা সম্ভব হবে'।

শকটাল্ মুখ ফুটে বল্‌লেন—'তেজস্বি ব্রাহ্মণ! আপনার চরণে শত শত প্রণাম। কিন্তু এই ছোট কাজে আপনার দিন কাটান ঠিক হবে না—অনেক বড় কাজ আপনার দ্বারা করা যেতে পারবে'।

ব্রাহ্মণও হেসে বল্‌লেন—'তথাস্তু। কি দরকার, বলুন'।

শকটাল্ চারদিক্ চেয়ে চুপি চুপি বল্‌লেন—'সে কথা অতি গোপন—এ নির্জ্জন মাঠেও বলা যায় না—হয়ত হাওয়ায় ভেসে গিয়ে পৌঁছুতে পারে এমন লোকের কাণে যাঁর কাণে কথাটা উঠ্‌লে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'তে পারে'।

ব্রাহ্মণ গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—'নির্জ্জন মন্ত্রণা-গৃহের দেওয়ালেরও কাণ থাক্‌তে পারে। আমার মতে নির্জ্জন গৃহের চেয়েও চতুষ্পথই গুপ্ত মন্ত্রণার ভাল জায়গা। কারণ, চৌমাথায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে পরস্পর কথা কইলে কেউ সন্দেহ করে না যে এরা গোপন কথা কইছে। আচ্ছা, যাক্। মন্ত্রীমশায়! আপনার বাড়ীতেই চলুন'।

শকটাল্ এবার ব্রাহ্মণের বুদ্ধি দেখে অবাক্-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, ব্রাহ্মণ! আপনার এ অদ্ভুত জেদ আর অসাধারণ বুদ্ধি আমার মস্তিষ্কের অভিমান ঘুচিয়ে দিচ্ছে। আপনার চরণে আমার মাথা নুয়ে পড়তে চাইছে। এখন একটা কথা আমি জান্‌তে পারি কি—এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা কইবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে?'

ব্রাহ্মণের মুখ মৃদু হাসিতে ভ'রে উঠ্‌ল। বললেন—'আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব নামকরণের সময় আমার নাম রেখেছিলেন—বিষ্ণুগুপ্ত'।

মেঘমুক্ত নীল আকাশ থেকে যদি বজ্র নেমে এসে ঠিক সামনে পড়্‌ত—তা হ'লেও বোধ হয় শকটাল্ আর চন্দ্রগুপ্ত এতটা বিস্মিত হতেন না। চম্‌কে উঠে চন্দ্রগুপ্ত হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়্‌লেন হাত জোড় ক'রে তাঁর পায়ের তলায়। শকটাল্ বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি—আপনিই মহামতি কৌটিল্য'!...

ব্রাহ্মণের মুখে সেই বাঁকা হাসি। বাধা দিয়ে বললেন—'মন্ত্রিবর! কৌটিল্য নই—কৌটল্য; কুটল ঋষি ছিলেন আমাদের গোত্রের প্রবর্ত্তক; তাই গোত্র নামে আমি কৌটল্য। তবে আমার বুদ্ধির বদনাম যদি দিতে চান, তবে 'কৌটিল্য'ই বলবেন—সচরাচর লোকেরা ত তাই ব'লেই ডাকে আমায়'।

চন্দ্রগুপ্ত এতক্ষণে বাক্য ফিরে পেয়ে বললেন—'প্রভু! আপনিই চাণক্য'!

চাণক্য তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন—'হাঁ বৎস! চণক দেশে আমার বাড়ী, তাই আমি চাণক্য'।

শকটাল—'আমরা শুনেছিলুম যে, মহামতি বিষ্ণুগুপ্ত তপস্যার জন্তে ব্যাড়ি আর বররুচির সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলেন'।

চাণক্য—'ঠিকই শুনেছিলেন মন্ত্রিবর! কিন্তু যোগনন্দের অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে অনুরোধ ক'রে বররুচি আমায় ফেরৎ পাঠালেন আবার এই দেশে। চলুন, মন্ত্রিবর'! [ক্রমশঃ

যাঁদের মৃত্যু নেই

রঞ্জিৎ সিংহ

এক

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগেকার কথা—
১৭৪২ সাল······

শীতের সন্ধ্যা। ভিয়েনা শহরের রাজপথে অন্ধকার নেমে এসেছে। অপরিসর গলির আশে-পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার—মাঝে মাঝে দুয়েকটা গ্যাসের আলো টিম্‌টিম্ করছে! সমস্ত শহর শাদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন—পথে-ঘাটে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই! আকাশে কালো মেঘের সমারোহ—হয়ত একটু পরেই বৃষ্টি নামবে।

এমন সময়ে এক অপরিসর গলির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটি ছেলে—সুন্দর মুখখানায় স্নিগ্ধ একটা উজ্জ্বলতার ভাব, কোঁকড়ানো রেশমের মতো চুল। হাতে ছোট একটি বেহালা। আপন মনে ছেলেটি বেহালা বাজিয়ে চলে···পথে পথে বেহালা বাজিয়ে ভিক্ষা করে তার দিন কাটে।

একটি মদের দোকানের সামনে এসে ছেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সারাদিন পথে পথে ঘুরেও কিছু ভিক্ষা মেলেনি—ক্ষুধাতুর দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটি দোকানের দিকে তাকায়—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক শ্যাম্পেন খেয়ে নেশায় ঢুলছেন! তাঁর চমক ভাঙ্গতেই ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দেয়—যে-হাত দৈন্যের চাপে কাঁপতে থাকে থর-থর করে—তার মন কেঁদে ওঠে!

—কিছু ভিক্ষা দাও, আমি অনাহারে রয়েছি কাল থেকে। ছেলেটি বলে।

ভদ্রলোক তার হাতে কি একটা জিনিষ ছুঁড়ে দেন। ছেলেটি অনুভব করে তার হাতে এক মার্ক! তাড়াতাড়ি সে পথে নেমে পড়ে, বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করে। তার আজ কি আনন্দ—উৎসাহের আতিশয্যে সে বেহালাটাকে বগলে করে দৌড়ুতে শুরু করে—

ঝির্-ঝির্ করে বৃষ্টি নামে।

সমস্ত শহরে নেমে আসে বর্ষার অন্ধকার···

একটি ছোট গলির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটি। তার বাড়ী এসে গেছে—ঐ তো তাদের জানলা দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। বাড়ীর কাছে এসে সে ডাকতে শুরু করে—মা! মা!

ঘরে এসেই হাতের বেহালাটি এক-পাশে রেখে দেয়, তার পর মা'র কাছে ছুটে আসে। ছোট্ট একখানি মাত্র ঘর,—তার ভেতরেই মা ও ছেলে অনেক কষ্টে দিন কাটায়। ঘরের এক কোণে ছেঁড়া একটি বিছানা, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন তার মা। শিয়রের কাছে জ্বলতে থাকে একটি মোমবাতি!

—কে? মা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান ছেলের দিকে।

—মা, আজ এক মার্ক উপহার পেয়েছি, এই দেখো—তোমার জন্তে রুটি আর ওষুধ এনেছি—

রুগ্না মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, আশীর্বাদ করতে গিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে ছেলের কপালে—কি যেন বলতে চান, কিন্তু ঠোঁট দু'খানা বার বার কেঁপে ওঠে···স্নেহে ভালবাসায়···ছেলেটি মা'র বুক জড়িয়ে আকুল স্বরে কেঁদে ওঠে।

মা! মা!

মৃত্যুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন তার মা। মোমবাতিটা হঠাৎ নিবে যায়—সমস্ত ঘর অন্ধকার। ছেলেটির কাছেও চোখের জলে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়।

তবু দিন কাটে।

মৃত্যুকে যাঁরা জয় করে পৃথিবীর মাটিতে হয়ে ওঠেন মৃত্যুঞ্জয়—শত সহস্র আঘাত ও বিপদের মাঝখানেও তাঁদের আত্মার শিখা অনির্বাণ জ্বলতে থাকে। এমনি একটি মানুষ বিশ্ব-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অমর শিল্পী হয়ে চিরকালের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। য়ুরোপের যন্ত্রসঙ্গীতের ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে হাইডেনের নাম।

ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ভিয়েনার স্থান খুব সমাদরযোগ্য। সেই ভিয়েনা শহরেই হাইডেনের জন্ম। তাঁর পিতামাতা ছিলেন গরীব চাষী, ভিয়েনা শহর থেকে কিছু দূরে 'রোহর' শহরের বাজারে ছোট একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে তাঁরা কোন রকমে দিন গুজরান করতেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে হাইডেনের জন্ম হয়। শৈশবের প্রারম্ভেই তাঁর পিতা অমরলোকে চলে যান। তার পর দুঃস্বপ্নের মত কাটে দৈন্যক্লিষ্ট দুঃখের দিনগুলি···পেটের দায়ে কিশোর হাইডেনকে ভিয়েনার রাজপথে বেহালা বাজিয়ে ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। যে সময়ে অন্ত ছেলেরা বই শ্লেট নিয়ে ইস্কুলে যায়, ঠিক সেই সময়ে আপন জীবিকার জন্তে পথে পথে ঘুরতে হয়েছে হাইডেনকে—!

কিন্তু সামান্য এক জন ক্রোসিয়ান চাষীর ছেলে কেমন করে য়ুরোপের আধুনিক যন্ত্রসঙ্গীতের এক জন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়ে উঠলেন, সে এক অপরূপ কথা!

খুব ছোট থেকেই হাইডেনের সঙ্গীতে অনুরাগ জন্মে। হাইডেনের পিতামাতা শিশুর সঙ্গীতপ্রিয়তা অনুভব করে তাকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিশু হাইডেন ছিলেন খুব চঞ্চল, সুতরাং সঙ্গীতশিক্ষায় তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর পিতামাতা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন, কিন্তু কোথায় কে? ঠিক সময়ে হাইডেনকে আর বাড়ীতে পাওয়া যেতো না। অগত্যা বাড়ীতে কিছু সঙ্গীতশিক্ষার পর তাঁকে ভিয়েনার প্রধান গির্জার গায়ক-সম্প্রদায়ে ভর্তি করে দেওয়া হোলো। কিন্তু ফল হোলো বিপরীত! হঠাৎ তাঁর গলা খারাপ হয়ে যায়। তখন গায়ক-সম্প্রদায়ে শিশু হাইডেনের সুনাম হয়েছে বেশ—তিনি সেই সময় থেকেই খুব ভালো বেহালা আর পিয়ানো বাজাতে পারতেন। কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যাওয়াতে গায়ক-সম্প্রদায়ে আর তাঁর তেমন সমাদর রইলো না। বয়স তখন তাঁর খুব অল্প, আচারে ও ব্যবহারে তখন তিনি লীলাচঞ্চল।

সেই সময়কার একটি মজার ঘটনা বলছি। যে ঘটনার পর তাঁর জীবনের পথ ভিন্নপথে চালিত হয়। এটি তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি!

ভিয়েনা শহরের প্রধান গির্জা।

গ্রীষ্মের নির্মল আকাশে সোনালি রোদ ঝল-মল করছে।

গির্জার ভেতরে প্রার্থনা-সঙ্গীত হচ্ছে। চারি দিকে লোকে লোকারণ্য। সবাই সমবেত ভাবে গান গাইছে। গায়ক-সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শিশু হাইডেন, তাঁদের সামনে বাদ্যকর-দলপতি দাঁড়িয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান দেখছেন। গায়ক-সম্প্রদায়ের ছেলেরা গান গাইছে, কিন্তু হাইডেনের সেদিকে খেয়াল নেই। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক ছোট্ট বন্ধু, খুব সুন্দর তার চেহারা, ফুটফুটে চাঁপা ফুলের মত গায়ের রঙ—লম্বা কোঁকড়ানো চুল, পিছন দিকে বেণী করে বাঁধা! ঠিক যেন রূপকথার রাজপুত্র। দূরে গির্জার ঘণ্টা বেজে চলেছে! ঢং-ঢং-ঢং-ঢং…হঠাৎ শিশু হাইডেনের মাথায় এক দুষ্টুমি বুদ্ধি এলো। প্রার্থনা-সঙ্গীতে সমস্ত গির্জা গম-গম্ করছে। এদিকে হাইডেন তাঁর বন্ধুর সেই সুন্দর চুল কাঁচি দিয়ে কচ্‌কচ্ করে কেটে চলেছেন, আর কোন দিকে তাঁর খেয়াল নেই! কি ভয়ানক ব্যাপার বলো ত? ছোট্ট বন্ধুটি প্রথমে কিছুই টের পায়নি। শেষে প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর গায়ক সম্প্রদায়ের ছেলেরা খুব হাসাহাসি করতে লাগলো। হঠাৎ সেখানকার বাদ্যকর-দলপতি আবিষ্কার করলেন যে, বন্ধুর সেই সুন্দর বেণী কাটা, আর হাইডেনের হাতে এক গোছা নরম চুল! মৃদু মৃদু হাসছেন হাইডেন, কৌতুকে চিক্‌চিক্ করছে তাঁর চোখের নীল তারা!

মোজার্ট

কিন্তু শেষ ফল খুব শুভজনক হোলো না। সেই দিনই ভিয়েনার গির্জার গায়ক-সম্প্রদায় থেকে হাইডেনকে বিদায় দেওয়া হোলো।

বয়স তাঁর অল্প, জীবনের অভিজ্ঞতা তখনো হয়নি। এমন সময়ে তাঁর পিতা হঠাৎ অমরলোকে যাত্রা করেন!

সংসারে হাইডেন তখন একা। দৈন্যে ও অনাহারে দিনের পর দিন কেটে গেছে—তবু কিশোর হাইডেন অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সাহসের সঙ্গে জীবনের তীর্থে তীর্থে প্রদীপ হাতে এগিয়ে চলেছিলেন—যে প্রদীপের শিখায় ঘুমন্ত কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে! সৌভাগ্য বশতঃ কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত ভিয়েনাতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এক জন প্রসিদ্ধ পিয়োনো-বাজিয়ে হিসেবে। অবস্থা আর একটু ভালো হলে তিনি এক জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের অধীনে কাজ করতে শুরু করেন। তখন হাইডেনের কৈশোর কাল। দুঃস্বপ্ন ও দীনতার মেঘ কেটে গিয়ে তার পর সুখের দিনগুলি সোনালী আলোয় ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁর সঙ্গীতানুরাগ এতোটুকু কমেনি। এর মধ্যেও তিনি সঙ্গীতজ্ঞ হবার সাধনায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ঘন দুর্যোগের পর যেমন চাঁদ আপনার জ্যোৎস্না নিয়ে আকাশকে উদ্ভাসিত করে তোলে, তেমনি তার পর থেকেই হাইডেনের সঙ্গীত-প্রতিভায় স্ফুরণ হতে থাকে—যে প্রতিভার আলোয় তিনি ইউরোপীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়ে উঠলেন। পৃথিবী হয়ত তাঁকে স্মরণ করে না, কিন্তু সঙ্গীত তাঁকে ভোলেনি—সেখানে তিনি অমর—তাঁর মৃত্যু নেই!

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে বিবাহ করতে হয়। সে সময় ভিয়েনার উচ্চবংশীয় ধনি-পরিবারে স্থায়িভাবে বাদ্য-সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকতো। বিবাহের ঠিক এক বছর পরে হাইডেন ভিয়েনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী-পরিবারে বাদ্যকর-দলপতির কাজে নিযুক্ত হন। ক্রমে ভিয়েনার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ভিয়েনার সর্বত্র তাঁর যন্ত্র-সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর জীবনের পরিবর্তন ঘটে এর পর থেকেই—যে পরিবর্তন এনে দেয় সঙ্গীতের ইতিহাসে বিচিত্র উদ্বোধন!

হাইডেনের সঙ্গে মোজার্টের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মোজার্টের সঙ্গীত-শিক্ষা হাইডেনের কাছেই পূর্ণতা লাভ করে। হাইডেন মোজার্টকে খুব ভালোবাসতেন। সঙ্গীতের ইতিহাসে মোজার্টের প্রতিভা বিস্ময়কর! মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই মোজার্ট গান লিখতে শুরু করেন। অতি দরিদ্র ঘরে তাঁর জন্ম হয়—ফ্রান্স তার জন্মভূমি! শৈশবে দারিদ্র্য ও অনটনে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা ম্লান হয়ে যায়। তবু প্রতিভা যে নির্বাপিত আগুনের মত—এক দিন সে জ্বলে উঠবেই। অতি দুঃখ-কষ্টে তাঁর দিন কাটে, তার ভেতরেই তিনি উনসত্তরটি গান লিখে ফেলেন। মোজার্টের তখন কৈশোর কাল…ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সমগ্র ইউরোপকে চমকে দিয়ে সঙ্গীতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে ওঠেন। ফ্রান্সের রাজপরিবারে তাঁর ডাক পড়ে। তখন ফ্রান্সের রাণী ছিলেন মেরী এ্যান্টোয়িনেট—তাঁর সঙ্গে মোজার্টের ঘনিষ্ঠতা হয়। সমস্ত ইউরোপে তখন মোজার্টের নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

হাইডেনের সঙ্গে মোজার্টের সম্পর্ক বন্ধুর মতোই ছিলো। দুই জনের প্রীতি ও শ্রদ্ধা কোনো দিনের জন্যও শিথিল হয়নি।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে Esterpazys বাদ্যসম্প্রদায় থেকে কোনো কারণে হাইডেনকে বিদায় নিতে হয়। অবরুদ্ধ দেশ জার্মেনী, মুক্তির জন্য হাইডেনের প্রাণ নেচে উঠলো। ইংলণ্ডের দিকে তিনি যাত্রা করলেন। কারণ, তখনকার দিনে ইংলণ্ডই ছিলো একমাত্র দেশ—যেখানে প্রতিভার সমাদর হোতো। ইংলণ্ডে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে মোজার্টের সঙ্গে দেখা। হাইডেনের ইংলণ্ড যাত্রার খবর শুনে মোজার্ট ছুটতে ছুটতে এসেছেন শেষ দেখা করতে। সেখানে হাইডেনের হাত ধরে শিশুর মত কেঁদে ফেললেন মোজার্ট! বললেন—আর বোধ হয় আমাদের দু'জনার দেখা হবে না!

হাইডেন বললেন—আসবো, আবার আসবো!

কিন্তু কে জানতো যে মোজার্টের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হবে! হাইডেন ফিরে আর মোজার্টকে দেখতে পাননি।

ইংলণ্ডের যাত্রাপথে হঠাৎ নামলো ভীষণ বৃষ্টি আর সঙ্গে সঙ্গে তুফান।

জাহাজ সামলানো দায় হয়ে উঠলো, সমস্ত যাত্রীরা প্রাণভয়ে নিজের কেবিনে আশ্রয় নিলো, এদিকে কিন্তু শিল্পী হাইডেন জাহাজের ডেকের ওপর বসে নিবিষ্টচিত্তে প্রকৃতির ভয়াল রূপ উপভোগ করেন—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—অঝোরঝরে বৃষ্টি পড়ছে। শিল্পীর খেয়াল নেই। সেই প্রকৃতির রূপ তাঁর মনে এমন এক রেখাপাত করে যে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে দু'টি গীতি-নাটিকা (Oratorio) 'সৃষ্টি' (Creation) ও 'ঋতু' (Seasons) রচনা করেন।

তার পর অনেক দিনের পর তিনি ভিয়েনায় ফিরে আসেন। সে দিন ভিয়েনা শহরে তারই রচনা 'সৃষ্টি'র অভিনয় হচ্ছিল। হাইডেন সেই সভায় উপস্থিত ছিল। গীতি-নাটিকা অভিনয় শেষ হবার পর গভীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাইডেন চীৎকার করে উঠলেন, "ঐ আকাশ থেকে আমার গান ভেসে আসছে।"

সেই সভায় আর এক জন পৃথিবী-বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন,—তাঁর নাম বেঠোফেন। তিনি ছুটে এসে হাইডেনের হাতে চুম্বন করলেন—হাইডেন নতমস্তকে পৃথিবীর অমর শিল্পীর অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

ফ্রান্সে তখন ফরাসী বিপ্লবের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। হাইডেনের ইংলণ্ড-যাত্রার পর মোজার্ট অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙ্গে পড়লো, তিনি শয্যা-গ্রহণ করলেন। শেষ-জীবন তাঁর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কেটেছে…যে সব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সুখের দিনে মোজার্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছিলো, তারা দুঃখের দিনে তাঁকে গরীব বলে পরিত্যাগ করে চলে গেল। মোজার্ট অত্যন্ত বিপদে পড়লেন। কোনো কোনো দিন মোজার্টের ভৃত্যরা শুনতে পেতো গভীর রাত্রিতে তিনি কাঁদছেন। বেদনার অশ্রু!

যোশেফ হাইডেন্

মৃত্যুশয্যায় মোজার্ট…

অন্ধকার রাত। বাইরে ভীষণ জল-ঝড় হচ্ছে। নিজের ঘরে শুভ্র বিছানায় শুয়ে আছেন মোজার্ট—মৃত্যুর পদধ্বনি তাঁর হৃদয়ের দ্বারে করাঘাত করছে। জীবন-দীপ ধীরে ধীরে নিবে আসছে। মোজার্ট বুঝতে পারলেন মৃত্যুর আর বেশী দেরি নাই। তিনি ভৃত্যদের আর পরিচিত প্রতিবেশীদের ডেকে পাঠালেন। মৃত্যুশয্যার পাশে কয়েক জন বন্ধু দাঁড়িয়ে, জীবনের শেষ অবস্থা নিকটেই! এই অবস্থাতেই তিনি একটি শোক-সঙ্গীত রচনা করেন, তিনি পরলোকে যাবার আগে বন্ধুদের সেই গানটি গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন। বন্ধুরা সজল চোখে সমবেত ভাবে গানটি গাইতে লাগলো, মোজার্ট গানের সুরে সুরে মিশে গিয়ে সেই দিনই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রাত্রে মৃত্যুর পর বন্ধুরা ফিরে গেলেন। পরদিন আবার সেই রাত্রি! সে দিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন—কেউ লোক নেই! শুধু এক জন অনুগত ভৃত্য আর পরিবারবর্গ এলো মোজার্টকে শেষ দেখতে। বাইরে ঘন অন্ধকার—ঝড় আর বৃষ্টি, বিদ্যুৎ আর মেঘ…শাঁ শাঁ করে বাতাস বইছে—সমাধিক্ষেত্রে মোজার্টকে নিয়ে আসা হোলো। সেখানে এসে ভৃত্যটি কেঁদে ফেললো, এমন একটা পয়সা নেই যে কফিন কিনে মোজার্টকে কবর দেওয়া যায়! শেষে অনেক কষ্টে কোনো এক অজানা অচেনা ভিখারীর ভাঙ্গা কফিনে মোজার্টকে সমাধিস্থ করা হয়। তার পর কত বছর কেটে গেলো—মোজার্টের খবর কেউ রাখলো না, জানলো না যে সেই কবরখানার একটি কফিনের ভেতর পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

তার পর এক দিন যখন ভিয়েনার সমাধি-মন্দিরে তাঁর ডাক পড়লো তখন কেউ বলতে পারলো না কোথায় তিনি নিদ্রায় মগ্ন! শেষে এক অনির্দিষ্ট স্থানে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করা হোলো।

হাইডেনের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো এক আশ্চর্য দিনে।

নেপোলিয়ান-বাহিনী ভিয়েনা শহর আক্রমণ করেছে। রাজপথে শোনা যাচ্ছে শত্রুপক্ষের কামানের গর্জন। শত্রুবাহিনী শহরের প্রান্তে এসে পড়েছে। আর এদিকে মৃত্যুশয্যায় হাইডেন সঙ্গীতের স্বপ্নে তন্ময়। হাইডেনের সেদিকে খেয়াল নেই, তিনি তখন স্বপ্নলোকে বিচরণ করছেন। তাঁর ভৃত্যেরা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়লো: কি হবে? দেশের স্বাধীনতা বুঝি আর থাকে না!

স্বপ্নাতুর হাইডেন চোখ মেলে তাকালেন, দরদর করে দু'চোখ বেয়ে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাঁর প্রিয় জন্মভূমি, কৈশোরের লীলাক্ষেত্র ভিয়েনা শত্রুর হাতে চলে যাবে এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না! তার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ!—ঐ শুনুন, শত্রুবাহিনী শহরে ঢুকে পড়েছে! ভৃত্যেরা চীৎকার করে উঠলো।

হাইডেন কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি শিল্পী, স্বাধীনতার সাধক। শত্রুর নির্য্যাতন ও অপমান তিনি সহ্য করতে পারবেন না কোন মতেই। প্রাণের সহস্র তন্ত্রতে বেজে উঠলো এক অপূর্ব মূর্চ্ছনা! মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে তিনি ভৃত্যদের ডেকে বললেন: তুলে ধরো, আমাকে একটু তুলে ধরো…ঐ পিয়ানোর কাছে…

ভৃত্যেরা এসে তাঁকে তুলে ধরলে। মৃত্যুপথের যাত্রী হাইডেন অবশ দেহে বাজিয়ে চললেন অষ্ট্রীয়ার জাতীয় সঙ্গীত। স্বপ্নময় আবেগে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। হাইডেনের দু'চোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছে আর অধীর আগ্রহে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! হাইডেন সেই রাত্রেই পিয়ানোর ওপর মাথা রেখে পৃথিবীর অপর পারে যাত্রা করেন। ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এলো শহরের বুকে…আর দূরে শোনা যেতে লাগলো নেপোলিয়ান-বাহিনীর জয়োল্লাস!

ঠিক সেই মুহূর্তে ভিয়েনার অপর প্রান্তে কোনো একটি অন্ধকার কুঠরীতে বসে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ আপন মনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন, অথচ নিজে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, সেও এক জীবনের পরম বেদনার ইতিহাস। সেই বধির সঙ্গীতজ্ঞের নাম বেঠোফেন।

যাঁদের মৃত্যু নেই, জীবনের কাছে তাঁদের চিরকালের জয়।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১

পেত্‌নি বুড়ির নাত্‌নি ছিল সজনে গাছের ডালে
ঠাকুরদা' তার মরেছিল কোন্‌ সে অতীত কালে
হঠাৎ সেদিন নিঝুম রাতে
ঠাকুরদা'-ভূত লম্বা হাতে
ধুত্‌রো ফুলের মাল্য নিয়ে বললে, "ওলো নাতনি,—
তোর সাথে আজ আমার বিয়ে হাসছে নিশা চাঁদনী।"

২

নাত্‌নি বলে, 'ঠাকুরদা' আজ ঠাট্টা তোমার রাখো
পেত্‌নি বুড়ি ঠাকুরমার ঐ অশথতলায় থাকো,—
ফোক্‌লা ভাঙা ও মুখ নিয়ে,
আমায় তুমি করবে বিয়ে?
বয়েই গেছে তোমায় বিয়ে করবো কিসের জন্য?
ভূতের কি আর অভাব আছে, পাত্র কি নেই অন্য?

৩

ঠাকুরদা'-ভূত বললে তখন, "তুইরে আমার কনে
তোর খোঁজেতে হাজার বছর ঘুরছি বনে বনে,
আজকে এসে সজ্‌নে গাছে
পেলাম তোকে এমন কাছে,
আমার ওপর রাগ ক'রে ভাই পালাস নিকো চটুকে,
তোর ঠাকু'মা'র বয়স গেছে রূপ গেছে তার পটুকে।"

৪

নাত্‌নি বলে তোমার মাথার চক্‌চকে ঐ টাকে
জোয়ান ভূতের মতন টেরী নেইকো থাকে থাকে,
নেইকো উকুন চুলের মাঝে
বাছবো আমি সকাল-সাঁঝে,
শিরদাঁড়াতে ঘুণ ধরেছে হাড় জির জির পাঁজরা
গলায় দড়ি! ম্যাগো তোমার বুকখানা কী ঝাঁঝরা!

৫

ভীষণ রেগে ঠাকুরদা'-ভূত বললে নাকের স্বরে
আমায় যেমন বললি বুড়ো অমন দেমাক ভরে,
তোরও নাত্‌নি নাতির সাথে
ঝগড়া হবে দিবস রাতে
"ওবুড়ি তুই তালের মুড়ি"—বলবে তোকে নিত্য,
থাকবে নাকো রূপের বাহার জলবে রাগে পিত্ত।

৬

নাতনি বলে, "বেশ বেশ বেশ, পালাও তুমি বুড়ো
তালগাছেতে ঘুমাও গিয়ে ফোক্‌লা তালের মুড়ো
এইনা ব'লে এক লাফেতে
কচুর বনে আসন পেতে
লম্বা জিভে চাটুতে গেল পেত্‌নি বুড়ির নাত্‌নি,
কচুরমুখী আকন্দ আর ধুতরো ফুলের চাটুনি।

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

অলৌকিক কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার আগে প্রত্যেক বার একই রকম লক্ষণ দেখা দেয়। হঠাৎ সমস্ত শব্দ—উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্য্যন্ত—এক ভয়াবহ স্তব্ধতায় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু এই স্তব্ধতাকে *ঠিক নৈঃশব্দ্য বলা চলে না, কেন না এটা যে সক্রিয়—নৈঃশব্দ্যের মত নিষ্ক্রিয় নয়—* তা বেশ অনুভব করা যায়। স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুও হঠাৎ কেমন যেন ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে যায়—মনে হয় যেন আমি চেয়ে আছি একখানা রঙীন কাচের ভিতর দিয়ে। ক্রমশঃ অনুভব করি যেন বাস্তব জগতের সীমানা পেরিয়ে আমি এক বর্ণহীন, গতিহীন, শব্দহীন জগতের মধ্যে বিচরণ করছি। মনে পড়ে একবার এই প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেবামাত্র চেষ্টা করেছিলাম আসন্ন দৃশ্যটাকে এড়াবার জন্য, কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল আমার—এক দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি আমার চোখ দু'টো চালিত করেছিল সেই অবাঞ্ছনীয় দৃশ্যটির দিকে এবং আমায় তা দেখতে হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত।

তারিখটা আমার বেশ মনে আছে—৪ঠা অক্টোবর ১৯২৯ সাল। সে-বার পূজোর ছুটিতে আড্ডা নিয়েছিলাম রাঁচীতে। প্রতিদিনকার মতো সে-দিনও বেড়াতে বেরিয়েছি অপরাহ্নের দিকে, বেড়াতে বেড়াতে কখন্ যে মোরাবাদি পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি খেয়াল ছিল না। পাহাড়ের মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা ফিকে হয়ে আসছে, অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে পাহাড়ের নীচে। বাড়ী ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—পথ-ঘাট ভাল জানা নেই, অন্ধকার হয়ে গেলে বিপদে পড়তে হবে। হঠাৎ মনে হল যেন দৃশ্যমান জগৎটা চোখের সুমুখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়াছবির মতো, আর আমি প্রবেশ করছি এক অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্যময় আবেষ্টনীর মধ্যে। এ অভিজ্ঞতা আমার নতুন নয়—এর আগেও বার-কতক হয়েছে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মাঝে মাঝে অলৌকিক ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করি একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে—স্বেচ্ছায় নয়, কে যেন জোর করে আমায় টেনে নিয়ে যায় অশরীরীর রাজ্যে। প্রেতলোকের সঙ্গে যেন কী এক নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে আমার। অশান্তি-ব্যাকুল কায়াহীনের দল যেন তাদের রহস্য-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে চায় আমার কাছে। প্রেততত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা বলেন, আমি না কি ক্লেয়ারভয়েন্ট—আমি যে মাঝে মাঝে অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি সে আমার সহজাত দিব্যদৃষ্টির বলে।

আমার এ বৈশিষ্ট্যের জন্য আমি কিছুমাত্র গর্ববোধ করি না, বরং অনেক সময় অস্থির হয়ে পড়ি এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। আমার এই অসাধারণ শক্তি নিয়ে বন্ধুরা মাতামাতি করলেও আমার কাছে এটা কদর্য্য ব্যাধির মতো ঘৃণ্য, মুক্তি পেলে বেঁচে যাই যেন। আজ পর্য্যন্ত কত অলৌকিক ঘটনাই তো প্রত্যক্ষ করলাম, কিন্তু তাতে লাভ হল কী? ইহজীবন বা পরজীবন কোনটারই সম্বন্ধে নতুন কিছু জানা গেল না। ঐ সমস্ত ঘটনাকে আমি অলৌকিক আখ্যা দিয়েছি বটে, কিন্তু সত্যিই অলৌকিক কি না, সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমার।

যাক, যে কাহিনী বলতে শুরু করেছিলাম তাই এবার বলি। মোরাবাদি পাহাড়ের কাছে লোকজনের বাস খুব কম। দু'-চারখানা খাপ্‌রার ঘর এদিক্ ওদিক্ দেখা যায়। হঠাৎ যখন চারি দিকে এক তন্দ্রা নেমে এল আর পাহাড়ের সন্নিহিত প্রান্তরের দীপ্তি গেল নিভে,

তখনই বুঝলাম, এক ভয়াবহ প্রহেলিকা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। সুমুখের দিকে তাকাতেই দেখি, কে এক জন মন্থর গতিতে চলেছে প্রান্তরের দিকে —আমার কাছ থেকে আন্দাজ আশী গজ দূরে। লোকটির হাতে একটা বন্দুক। খানিকটা গিয়ে সে থম্‌কে দাঁড়াল, প্রথম তাকাল দক্ষিণ দিকে, তার পর বাঁ দিকে—কোন্ দিকে যাবে যেন ঠিক করতে পারছে না। ঠিক সেই সময় খানিকটা দূরে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে এবং একখানা হাত কাঁধের সমান সমান তুলে কি যেন লক্ষ্য করলে। লোকটি এবার ফিরল ডান দিকে এবং তার পরই হাত দু'টো উঁচু করে পড়ে গেল মাটিতে। মেয়েটি ছুটে এল লোকটির কাছে, ক্ষিপ্রহস্তে তার বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে এক মুহূর্ত্ত তুলে ধরলে ছুঁড়বার ভঙ্গীতে, তার পর সেটা মাটিতে রেখে দিয়ে ফিরে চলল ঝোপের দিকে, বড় একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়াল এক মুহূর্ত্ত, তার পর নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।···পরক্ষণেই যেন কোন অদৃশ্য মায়াবীর ইঙ্গিতে যবনিকা গেল সরে, পাখীর কলরবে ভরে উঠল চারি ধার, প্রান্তরে ফুটে উঠল সহজ স্বাভাবিক দীপ্তি। কয়েক মুহূর্ত্ত আগে যে অলৌকিক দৃশ্য প্রতিভাত হয়েছিল প্রান্তরের মাঝে তার সমস্ত চিহ্নই অপসারিত।

আমি আর ওখানে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে বাড়ী ফিরলাম। অতিপ্রাকৃত কিছু একটা দেখলেই মনটা আমার অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। এ অবসাদ কখনও স্থায়ী হয় দু'-চার দিন মাত্র, কখনও বা তারও বেশী। এক্ষেত্রে অবসাদটা মনের মধ্যে এমন একটা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করলে যে, এক সপ্তাহ কেটে যাবার পরেও সুস্থির হতে পারলাম না। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, অতীতের একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে আর তারই রহস্যময় ইঙ্গিত একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে আমার মনে।

সুতরাং ছুটি ফুরোবার আগেই কলকাতায় ফিরলাম এবং যেদিন কলকাতায় পৌঁছুলাম সেই দিনই সন্ধ্যায় দেখা করলাম বাল্যবন্ধু শশাঙ্কর সঙ্গে। শশাঙ্ক কলকাতার এক কলেজের অধ্যাপক, তবে অধ্যাপকতার মধ্যেই তার কর্ম্মধারা সীমাবদ্ধ নয়। অবসর সময়ে সে অনেক কিছু নিয়েই গবেষণা করে এবং তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে criminology অর্থাৎ অপরাধ-বিজ্ঞান। Criminology সম্বন্ধে নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সে সংগ্রহ করেছে বহু অর্থব্যয় ক'রে এবং যখনই কোন দেশী বা বিদেশী পত্রিকায় কোন রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের খবর বেরোয় অমনি সে পরম উৎসাহে লেগে যায় সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য আহরণ করতে। আমার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে তার বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে।

আমাকে দেখেই শশাঙ্ক বলে উঠল, "হঠাৎ ফিরলে যে, অজয়? খবর কী? আবার বুঝি নতুন কিছু দেখেছ?···হুঁ, দেখেছ নিশ্চয়, নইলে তোমার চেহারা এমন হবে কেন?"

"এবার যা দেখেছি সেটার মধ্যে হয়তো অতীতের কোন রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের আভাস আছে, আর সেই জন্যেই ব্যস্ত হয়ে এলাম তোমার কাছে।"

"তাই না কি? ব্যাপারটা তা হলে বলো সবিস্তারে।"

আমার বর্ণনা শেষ হলে শশাঙ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল।— "ঘটনাটা জানা বলেই মনে হচ্ছে। বল দেখি, কোথায় দেখেছিলে ব্যাপারটা?"

"মোরাবাদি পাহাড়ের ধারে।"

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।—"তাহলে যা ভেবেছি তাই। এ ব্যাপারটা ঘটেছিল আজ থেকে পনেরো বছর আগে। খবরের কাগজওয়ালারা এ নিয়ে কি মাতামাতি করেছিল কম! ব্যাপারটা মনে পড়ে না তোমার?"

"কোন ব্যাপারের কথা বলছ?"

"তুমি আমায় অবাক্ করলে, অজয়! তুমি কি বলতে চাও বিহারের জমিদার-খুন মামলার কথা খবরের কাগজে পড়োনি তুমি?"

"পড়েছি বলে মনে হয় না তো। ও-সব ব্যাপারে আমার বিশেষ কোন ঔৎসুক্য নেই।"

"ঐ হত্যাকাণ্ডের রহস্য গোয়েন্দা পুলিস সমাধান করতে পারেনি। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, সে রহস্যের যবনিকা এত দিন পরে উন্মোচিত হল তোমার কাছে।"

শশাঙ্ক শেল্‌ফ্‌ থেকে অনেক দিনের পুরানো একখানা পত্রিকা এনে চেয়ারে বসে বললে, "ঐ খুনের মামলার বিস্তৃত বিবরণ এই কাগজে আছে। আমি কতবার যে এটা পড়েছি তা বলা যায় না, তবু আবার পড়বার ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তুমি জানো না কত বড় শক্তির অধিকারী তুমি—যে রহস্য সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে এত কাল তার সমাধানের পথ আজ খুঁজে পেলাম তোমার কাছ থেকে। শোনো তবে সেই রহস্যময় হত্যার কাহিনী।"

ইসমাইল আমার পিসতুতো ভাই নিবারণের সঙ্গে পাটনা কলেজে পড়েছিল কিছু কাল। নিবারণের কাছ থেকেই অনেক খবর সংগ্রহ করি ইসমাইলের সম্বন্ধে। অভিজাত বংশে জন্মালেও ইসমাইলের চেহারায় আভিজাত্যের কোন চিহ্ন ছিল না। গায়ের রঙ কালো, দেহের গড়নও ভাল নয়, অত্যন্ত মোটা আর বেঁটে। বয়স যখন তার কুড়ি একুশ, সেই সময় সে বাপের সম্পত্তি পেল হাতে—প্রকাণ্ড জমিদারী, নগদ টাকাও যথেষ্ট।

ইসমাইলের বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল কম, মানুষ চেনবার ক্ষমতা ভগবান্ তাকে দেননি। পুরুষের চরিত্র যদিও বা সে কতকটা আন্দাজ করতে পারতো, মেয়েদের চরিত্র তার কাছে ছিল একান্ত দুর্ব্বোধ্য। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সে স্থির থাকতে পারতো না এবং তার পেছনে খরচও করতো অকাতরে। তবে কোনো মেয়েই রূপের ফাঁদে তাকে ধরে রাখতে পারতো না বেশী দিন। ইসমাইল উচ্ছৃঙ্খল হলে কি হয়, ওর স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন সতর্কতার একটু রেশ প্রচ্ছন্ন ছিল। এটা বোধ হয় সে পেয়েছিল তার সাবধানী বাপের কাছ থেকে। দু'-একটি চতুর মেয়ে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করেছিল বিয়ের প্রস্তাব ক'রে, কিন্তু বিয়ে করতে ইসমাইল রাজী হয়নি। বিয়ে করার মতলবও তার ছিল না কোন দিন। কিন্তু সংযম যার নেই, কত কাল সে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে? হঠাৎ এক দিন সে ধরা দিলে এমন একটি মেয়ের ফাঁদে—যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যে-কোন লোকের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

কমেলা ছিল নর্ত্তকী। ওর পূর্ব্ব-জীবনের যেটুকু ইতিহাস আদালতে প্রকাশ পেয়েছিল তা থেকে জানা যায়, ওরা ছিল খুব গরীব, বাপ বাবুর্চ্চির কাজ করতো মুঙ্গেরে এক মুসাফিরখানায়।

ওদের ঘরে রুমেলার মতো রূপসী মেয়ে জন্মালো কি করে তা ভেবেই পাওয়া যায় না। নিবারণ পাটনায় একবার দেখেছিল ওকে—নিবারণ বলে, অতি বড় সংযমী পুরুষও ওর রূপলাবণ্য দেখে উদ্‌ভ্রান্ত না হয়ে পারে না। রুমেলার সঙ্গে ইসমাইলের যখন পরিচয় হয় তখন ওর এক জন প্রণয়ী ছিল—নাম মৈজুদ্দিন। মৈজুদ্দিন ভদ্র-বংশেরই ছেলে, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধিতে তার জোড়া মেলা ভার। বড় লোকের ছেলেদের কুপথে নিয়ে গিয়ে সর্ব্বনাশ করা ছিল ওর ব্যবসা, আর সেই ব্যবসায় ওকে সাহায্য করতো রুমেলা।

রুমেলার রূপের চটকে ও বাক্-বিন্যাসের চাতুর্য্যে ইসমাইল এমন মজে গেল যে, সব সময় সে ওর পিছন-পিছন ঘুরতে সুরু করল গোলামের মতো। রুমেলাও ইসমাইলের দুর্ব্বলতা বুঝে কিছু কিছু টাকা আদায় করতে লাগল নানান্ ছল-ছুতো করে। কিন্তু ইসমাইলের সঙ্গ ক্রমশঃ দুঃসহ হয়ে উঠল রুমেলার কাছে। ইসমাইল এক দণ্ডও কাছ-ছাড়া করতে চায় না—নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এত বড় একটা শিকার হাতে পেয়ে ছেড়েই বা দেয় কি করে? তখনও পর্য্যন্ত মোটা-রকমের একটা টাকাও আদায় করতে পারেনি ইসমাইলের কাছ থেকে।

রুমেলার সঙ্গে ইসমাইলের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে ইসমাইলের বন্ধু-বান্ধবরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে ইসমাইলকে সাবধান করে দিয়ে গেল রুমেলার সম্বন্ধে—রুমেলাকে যেন সে কোন কারণেই বিয়ে না করে। ইসমাইলও তাদের আশ্বাস দিলে, তাদের কথা সে উপেক্ষা করবে না।

সে যাই হোক, রুমেলা যা চাইছিল তার একটা সুযোগ এসে গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ইসমাইল জ্বরে পড়ল হঠাৎ আর সে জ্বর নানান্ চেষ্টা করেও বন্ধ করা গেল না। ডাক্তার পরামর্শ দিলে রাঁচী যেতে—হাওয়া-বদলের জন্য। ইসমাইলের সঙ্গে রুমেলা এল রাঁচীতে। ওরা যে বাংলোয় এসে বাস করতে লাগল সেটা মোরাবাদি পাহাড়ের কাছেই। তুমি যেখানে ঐ অলৌকিক ব্যাপারটা দেখেছ সম্ভবতঃ সেখান থেকে বেশী দূরে নয়।

রাঁচীতে আসার পরও ইসমাইল ভুগল কিছু দিন। সেই সময় রুমেলা হয় সেবা-যত্ন করে নয়তো কৌশলে ইসমাইলকে দিয়ে উইল করিয়ে নিল একটা। উইলে ইসলাইল রুমেলাকে দিলে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের একটা সম্পত্তি। বিচারের সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রুমেলা বলে, উইলের কথা সে জানতো না কিছুই, ইসমাইলের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে শীগ্‌গিরই এইটাই সে আশা করছিল। অনেকে সন্দেহ করে উইলটা জোর করে লেখানো, কিন্তু তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, ঐ উইল সই করা হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং তার আট দিন পরেই অর্থাৎ ৪ঠা অক্টোবর—ঠিক ঐ তারিখেই অলৌকিক ব্যাপারটা দেখেছিলে তুমি—ইসমাইল রুমেলাকে নিয়ে বাংলো থেকে বেরোয় পাখী শিকার করতে। হাতে একটা বন্দুক নিয়ে ইসমাইল রওনা হয় মোরাবাদি পাহাড়ের দিকেই—সম্ভবতঃ ও-অঞ্চলে লোকজনের বাস কম বলে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটা বা দু'টো গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ হয়—আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময় কেউ বলেছিল একটা, আবার কেউ বলেছিল দু'টো—আর রুমেলা বাংলোয় ফিরে আসে ছুটতে ছুটতে, বলে ইসমাইল হঠাৎ পড়ে যায় হঁচোট খেয়ে, পড়বা মাত্র তার বন্দুকের গুলী যায় ঠিকরে এবং সেই গুলী লেগে তার মৃত্যু হয়েছে। সে যে বিবরণ দেয় তাতে সে ছিল পিছনে, কাজেই ঐ দুর্ঘটনা কেমন করে ঘটেছে তা খুব ভাল করে সে দেখতে পায়নি।

ময়না তদন্তের সময় সে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে এবং স্থানীয় ডাক্তার তার কথা সহজেই বিশ্বাস ক'রে যে সাক্ষ্য দেন তাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বিনা দ্বিধায় রায় দেন, ঐ মৃত্যু আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সংঘটিত। এইখানেই হয়তো ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটতো, কিন্তু পাটনা মেডিক্যাল কলেজের সার্জ্জেন মেজর হকিন্সের অযাচিত পত্র পুলিসের মনে সন্দেহের উদ্রেক করলে ইসমাইলের মৃত্যু সম্বন্ধে। স্থানীয় ডাক্তার ইসমাইলের মাথার ক্ষত সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন মেজর হকিন্স তা পড়েন এবং পুলিসকে জানানো কর্ত্তব্য মনে করেন যে, তাঁর মতে ঐ ক্ষত বন্দুকের গুলীতে সৃষ্টি হতে পারে না—এমন কি, খুব কাছ থেকেও যদি বন্দুকের গুলী এসে লাগে তাতেও সম্ভব নয়। ঠিক সেই সময় পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষের কানে এল, ঐ দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষীটি প্রচুর টাকার মালিক হতে চলেছে মৃতের উইল অনুসারে, আর তার চাল-চলন এমনি সন্দেহজনক যে, বার-কয়েক পুলিসের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে নানান্ ব্যাপারে। দৈবক্রমে সেই সময় আবার মৈজুদ্দিনও ধরা পড়ল প্রতারণার অপরাধে। তার কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া গেল একখানা চিঠি যার সূত্র ধরে পুলিস এসে রুমেলাকে গ্রেপ্তার করলে ইসমাইলের মৃত্যু সম্পর্কে। মেজর হকিন্সের মতের উপরেও পুলিস নির্ভর করেছিল কতকটা।

ইসমাইলের মৃতদেহ তোলা হল কবর থেকে, আর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখলেন মেজর হকিন্স এবং আসামী-পক্ষের জন-কতক ধুরন্ধর সার্জ্জেন।

১০ই ডিসেম্বর রাঁচী আদালতে মামলার শুনানী আরম্ভ হল এবং দেশময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল এই ব্যাপার নিয়ে। তুমি যে কিছুই শোনোনি এ সম্বন্ধে এটা ভারী আশ্চর্য্যের কথা।

সরকার-পক্ষে দাঁড়ালেন মিঃ দাশ এবং আসামী পক্ষ সমর্থন করলেন মিঃ বাজপেয়ী। মিঃ বাজপেয়ীর নাম তুমি শুনেছ কি না জানি না, তবে আমি বলতে পারি, তাঁর মতো ব্যারিষ্টার এ-দেশে খুব কম। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন সুললিত, বাগ্মিতাও তেমনি অনন্য-সাধারণ। জুরীকে অভিভূত করতে তাঁর বেশী সময় লাগে না। কত খুনে আসামী যে তাঁর কৃপায় খালাস পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

হাজতে থাকার দরুণ রুমেলার দৃঢ়তা বা সাহস এতটুকু কমেনি। সে এসে আদালতে হাজির হল দিব্য সপ্রতিভ ভাবে।

আসামীকে ঘায়েল করবার পুলিসের অস্ত্র ছিল দু'টি—মেজর হকিন্সের সাক্ষ্য আর মৈজুদ্দিনের বাড়ীতে পাওয়া চিঠি। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী মেজর হকিন্সকে জেরা করেন অনেকক্ষণ। মেজর হকিন্সের সাক্ষ্যের বেশীর ভাগ সাধারণ লোকের কাছে দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু চিঠিতে যে মত প্রকাশ করেছিলেন তার থেকে এক চুলও নড়েননি। আদালতকে তিনি দৃঢ় ভাবে জানান, মাথার ক্ষত বন্দুকের গুলিতে সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে রিভলবারের বুলেটে আর সেই বুলেটটা ছিটকে গেছে আঘাত করার পরই। একথাও তিনি বলেন যে, মৃতদেহ পরীক্ষা করার পর তাঁর প্রাথমিক সন্দেহ যথেষ্ট দৃঢ় হয়েছে। কেবল

একটিমাত্র স্বীকারোক্তি আসামী-পক্ষ তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছিল এবং তা হচ্ছে এই যে, মৃতদেহ কবর থেকে তোলার আগেই পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

চিঠিখানা সম্বন্ধে সরকার-পক্ষ শুধু এইটুকু প্রমাণ করেন যে, ওটা আবিষ্কৃত হয় মৈজুদ্দিনের বাড়ীতে এবং হস্তাক্ষরে বোঝা যায় আসামীরই লেখা। চিঠিখানা এই :— রাঁচী

৭ই অক্টোবর

প্রিয় মৈজু—

তোমার সঙ্গে চুক্তি ছিল এক-তৃতীয়াংশ তুমি পাবে—তার অতিরিক্ত তুমি দাবী কর কি ক'রে? বিপদের ঝুঁকি সবটাই ছিল আমার। টাকাটা হাতে আসতে আরও কিছু সময় লাগবে—দিন কতক ধৈর্য্য ধরে থাকো। ময়না তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এখান থেকে আমি নড়তে পারছি না। ভরসা করি, বাধা-বিপত্তি কিছু ঘটবে না। ক্ব

আসামী-পক্ষের প্রথম সাক্ষী ছিলেন লাহোর হাসপাতালের জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ সার্জ্জেন। শুটিং কেস্ সম্বন্ধে এঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর—তাছাড়া ইসমাইলের মৃতদেহ ইনিও পরীক্ষা করেছিলেন কবর থেকে তোলার পর। সাক্ষ্যে ইনি বলেন, মৃতের মাথায় যে ক্ষত দেখা গেছে তা বন্দুকের গুলীতে হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়, তবে এ সম্বন্ধে জোর করে' কিছু বলা সম্ভব নয়; যেহেতু কবর থেকে তোলার অনেক আগেই মৃতদেহ পচতে শুরু করেছিল।

এক কথায় আদালতের বিচার্য্য বিষয় দাঁড়াল ক্ষতটা বন্দুকের গুলীর না রিভলবারের বুলেটের। ঠিক এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিলাতের Parker caseএ—সেখানেও এ নিয়ে আদালতে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর।

আসামী-পক্ষের সার্জ্জেনের সওয়াল হয় পুরো দু'ঘণ্টা ধরে এবং নানা কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁকে। শেষের দিকে সাক্ষী রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েন, তবে কোন রকমে শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে নিজের মান বাঁচান তিনি।

এর পর আসামী-পক্ষ সাক্ষিরূপে হাজির করলে স্থানীয় এক কৃষককে। কৃষক যা বললে তা অত্যন্ত অদ্ভুত। সে বললে, ঐ দুর্ঘটনার ঘণ্টা দুই পরে সে দেখে, তার একটি ছাগল মরে পড়ে আছে মাঠে এবং পরীক্ষায় জানা যায়, বন্দুকের গুলী লেগেছে তার মাথায়। ইসমাইলের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় ঠিক তার সোজাসুজি খানিকটা দূরে মারা পড়ে সেই ছাগলটা এবং আদালতে এ-ও প্রমাণ হয় যে, ঐ দু'টো স্থানের মাঝখানে যে সব গাছপালা ছিল সেগুলোর গায়ে বন্দুকের গুলীর দাগ স্পষ্ট। কৃষকের সাক্ষ্য থেকে এই অনুমান হয় যে, কেউ সম্ভবতঃ গাছের ফাঁক দিয়ে গুলী ছুঁড়েছিল ছাগলটার দিকে।...তোমার কি মনে আছে অজয়, লোকটা পড়ে যেতে মেয়েটি এসে তার বন্দুকটা তুলে নিয়েছিল?

মেজর হকিন্স বলেছিলেন, গুলীটা রিভলবারের, বন্দুকের নয়। এবার তাই রিভলবার সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হল। পুলিসকে জেরা করে জানা গেল, ঘটনা-স্থলের আশ-পাশ ওরা সন্ধান করেছে ভাল ক'রে, কিন্তু রিভলবার কোথাও পাওয়া যায়নি এবং ঘটনার পূর্ব্বে বা পরে রুমেলার কাছে কোন দিন রিভলবার ছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই।

রুমেলা যখন জবানবন্দী দিতে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল, তখন মিঃ বাজপেয়ীকে একটু চঞ্চল মনে হল। কিন্তু রুমেলার সম্বন্ধে ঘাবড়াবার কোন কারণ ছিল না—রুমেলা এল শান্ত সংযত পদক্ষেপে, মুখে দৃঢ়তার ছাপ। মিঃ বাজপেয়ীর দক্ষ পরিচালনায় সে ইসমাইলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা থেকে শুরু করে সেই শোচনীয় ঘটনার দিন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারের সুসংবদ্ধ বর্ণনা দিলে।

অবশেষে মিঃ বাজপেয়ী মৈজুদ্দিনকে লেখা সেই চিঠির সম্বন্ধে প্রশ্ন শুরু করলেন। অবশ্য চিঠির মধ্যে দু'টো মারাত্মক লাইন ছিল—একটা হচ্ছে 'বিপদের ঝুঁকি সবটাই ছিল আমার', অপরটা 'ভরসা করি বাধা-বিপত্তি কিছু ঘটবে না'। রুমেলা তার কৈফিয়ৎ দিলে চমৎকার। বললে, 'বিপদের ঝুঁকি মানে এই যে, ইসমাইল শেষ পর্য্যন্ত তাকে বিয়ে না করতেও পারে, আর বিয়ে যদি না হয় তাহলে লোকনিন্দার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না কোন মতে। 'বাধা-বিপত্তির' সম্পর্কে সে বললে, উইল নিয়ে যে আপত্তি উঠতে পারে এ ভয় তার বিলক্ষণ ছিল।

মিঃ বাজপেয়ী তাকে আর বেশী কিছু তখন জিজ্ঞাসা করলেন না, সরকারী কৌঁসুলীর সওয়ালটার জন্য অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করলেন।

এবার সরকারী কৌঁসুলী উঠে দাঁড়ালেন এবং এক প্রচণ্ড বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হল। রুমেলা স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে একবার তাকালো তাঁর দিকে। মিঃ দাশ গোড়াতেই চিঠির সম্বন্ধে প্রশ্ন শুরু করলেন।

"আমি ধরে নিতে পারি তোমার ও মৈজুদ্দিনের মধ্যে এই মর্ম্মে একটা চুক্তি হয়েছিল যে, মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে টাকাকড়ি যা তুমি পাবে তার বখরা দেবে ওকে?"

"তা পারেন।"

"এ টাকা তুমি কি ভাবে পাবে আশা করেছিলে?"

"গোড়ার দিকে?"

"হ্যাঁ।"

"ইসমাইলের মনোরঞ্জন ক'রে,—তবে বিয়ে হলেই যে টাকা পাবো অনায়াসে এ আশা আমার ছিল।"

"ইসমাইল তোমায় বিয়ে করতে রাজী ছিল কি?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু তুমি জানো, ইসমাইলের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেছে, তোমার ওপর ইসমাইলের অনুরাগ থাকলেও সে তোমায় বিয়ে করতো না কিছুতেই।"

"জানি। ইসমাইল ছিল দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক, যে যা বলতো তাই সে শুনতো—প্রতিবাদ করার শক্তি তার ছিল না।"

"সে তোমায় বিয়ে করবে, এ বিশ্বাস যখন তোমার ছিল তখন 'বিপদের ঝুঁকির কোন মানে হয় না—ও কথা লিখলে কেন চিঠিতে?"

রুমেলা এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললে, "বিয়ে না হতে পারে এ সম্ভাবনা বরাবরই ছিল।"

"যদিও তুমি নিশ্চিত জানতে ও তোমায় বিয়ে করতে চায়?"

"হ্যাঁ। বিয়ের কথা তো বলা যায় না, কত কি বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই দেখুন না, ওর এই আকস্মিক মৃত্যু বিয়েটা ভেঙে দিলে তো?"

"হঠাৎ ওর মৃত্যু হতে পারে, এ রকম কোন ধারণা তোমার মনে ছিল কি?

"নিশ্চয়ই না।"

"মৈজুদ্দিনের সঙ্গে যখন তোমার চুক্তি হয় তখন কি এ রকম কোন কথা হয়েছিল যে, যে ভাবেই তুমি টাকা পাও না কেন, তার বখরা ওকে দেবে ?"

"হ্যাঁ।"

"উইলে টাকা পেলে তার বখরাও ?"

"হ্যাঁ, যে ভাবেই টাকা পাই না কেন, বখরা দেবো বলেছিলাম।"

"কিন্তু প্রথম বারের জবানবন্দীতে তুমি বলেছিলে, উইলে যে তোমার নামে টাকা আছে তা তুমি জানতে না মোটেই ?"

"হ্যাঁ, আমি জানতাম না—তবে এ ধারণা আমার ছিল, উইল যদি সে করে, তাহলে আমাকে কিছু দিয়ে যাবে।"

"কিন্তু ইসমাইল যে ত্রিশ বছর বয়সে মারা যাবে এ ধারণা করার কোন কারণ ছিল না নিশ্চয়ই। যে ব্যাপারের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিছু নেই, সেটা তোমাদের চুক্তির বিষয়ীভূত হল কি করে ?"

"চুক্তি ছিল, যা কিছু টাকা পাবো সবটার সম্বন্ধে। উইলের বিষয়ে আমাদের কোন কথা হয়েছিল কি না, তা এখন মনে পড়ছে না।"

"মৈজুদ্দিনকে কি তুমি বলেছিলে যে ইসমাইল উইলে তোমায় কিছু টাকা দিয়ে গেছে ?"

"আমার মনে পড়ছে না।"

"একটু আগে তুমি বলেছ যে ইসমাইলকে উইল করার ব্যাপারে তুমি মোটেই উৎসাহ দাওনি ?"

"না, ও কথা বলিনি।"

"কত টাকা ইসমাইল তোমায় উইলে দিয়েছে তা-ও তুমি জানতে চেষ্টা করোনি ?"

"না, জানবার আগ্রহ ছিল না আমার। ইসমাইলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে বরাবর আশা করেছিলাম আমি। আর বিয়ে হলে নিশ্চয়ই সে কিছু টাকার ব্যবস্থা করবে আমার জন্যে, এ আশাও আমার ছিল।"

"বেশ, ও সম্বন্ধে আর আমি কিছু জানতে চাই না।"

সরকারী কৌঁসুলী যখন নথিপত্র দেখছিলেন সেই সময় রুমেলা কপালের ঘামটা মুছে নিলে রুমাল দিয়ে।

"তোমার চিঠির শেষাংশে রয়েছে—'ভরসা করি বাধা-বিপত্তি কিছু ঘটবে না'। কেউ যদি বলে, ময়না তদন্তে ম্যাজিষ্ট্রেট কি রায় দেবেন সে সম্বন্ধে তোমার উৎকণ্ঠা ছিল মনে আর তারই আভাস রয়েছে ঐ চিঠিতে, তাহলে তোমার কি বলবার আছে ?"

"ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় সম্বন্ধে আমার উৎকণ্ঠা ছিল না মোটেই।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে রুমেলা।

"তা হলে উৎকণ্ঠাটা কিসের ?"

"বলেছি তো উইলে যে টাকাটা আমার পাবার কথা তারই সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ছিল আমার।"

"অথচ তুমি যে উইলে কিছু পাবে তা তুমি সঠিক জানতে না ?"

"ইসমাইলের উকিল হয়তো বলে থাকবেন।"

"তুমি জানো তিনি ও-কথা অস্বীকার করেছেন।"

"হ্যাঁ। কিন্তু তার ভুল হতে পারে……"

"কিন্তু তাঁর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে তুমি যে উইলে কিছু পাবে সেকথা একেবারেই জানতে না তুমি ?"

"আমি আগেই বলেছি ইসমাইল যে আমায় কিছু দিয়ে গেছে এ আমি আন্দাজ করেছিলাম মনে মনে।"

"দিয়ে যখন গেছে তবে ওটা পাওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল কেন ?"

"আমার মনে হল, ঐ টাকার সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারে।"

"কী জন্য হ'তে ?"

"হয়তো কেউ বলবে, টাকাটা আমি লিখিয়ে নিয়েছি জোর করে।"

"তুমি কি সত্যি বলতে চাও চিঠিতে তুমি যে বাধা-বিপত্তির উল্লেখ করেছ তা শুধু উইলের ঐ টাকাটা সম্পর্কে, যার অস্তিত্বই তখন অজানা ছিল তোমার কাছে ? তুমি কি সত্যি মনে কর জুরী এ কথা বিশ্বাস করবে নিঃসংশয়ে ?"

"সত্য যা তাই আমি বলেছি। উইলের টাকাটার কথা উকিল আমায় বলেছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস।"

* * * *

শশাঙ্ক বললে, মামলার মোটামুটি বিবরণ এই, তবে এ ছাড়াও আরও দু'-একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। সওয়ালের সময় রুমেলার চরিত্র নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি—চরিত্রের কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল অন্য সব বিষয়ের তর্কে।

রুমেলার উত্তরে যে বিপজ্জনক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, মিঃ বাজপেয়ী এবার সেটা দূর করবার চেষ্টা করলেন।

"তুমি কি এমন কিছু শুনেছিলে যাতে তোমার আশঙ্কা হয় বিয়েটা শেষ পর্য্যন্ত না হতেও পারে ?"

"আমি জানতাম আমার শত্রু যারা তারা ইসমাইলকে সাবধান করে গেছে আমার সম্বন্ধে।"

"আর তোমার ভয় হয়েছিল, ইসমাইল ওদের কথা মতো কাজ করবে ?"

"হ্যাঁ, ওরা যে সাবধান করে গেছে সে কথা ইসমাইল বলেছিল আমায়।"

"আর উইলের ঐ টাকাটা—ওটা আন্দাজ করবার কোন কারণই কি ঘটেনি ?"

"ঘটেছিল বৈ কি। ইসমাইল প্রায়ই আমায় বলতো যে ওর অবর্ত্তমানে আমি যাতে আর্থিক কষ্টে না পড়ি এটা সে দেখবে।"

"যখন তুমি বাধা-বিপত্তির কথা চিঠিতে লিখেছিলে, তখন তোমার মনে কী ছিল তা একটু পরিষ্কার করে বলতে পারো ?"

"আমি ভেবেছিলাম, উইলের ঐ টাকাটা নিয়ে গোলমাল হবে—হয়তো এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা হবে যে আমি জোর করে ওটা লিখিয়ে নিয়েছি, যদিও এ সম্বন্ধে ইসমাইলকে আমি কোন দিনই পীড়াপীড়ি করিনি। আর ও-রকম মনে করার কারণও ছিল, কেন না, আমার শত্রু অনেক।"

* * * *

আসামীর চিঠি সম্পর্কে এই বাদানুবাদ তোমাদের ভাল না লাগলেও আমাদের কাছে অর্থাৎ criminology নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদের কাছে পরম উপাদেয়। এই বিতর্কের বৈচিত্র্য ভাল করে উপলব্ধি করতে হলে আসামীর সওয়াল জবাব বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা রুমেলার জীবন একটি সূক্ষ্ম সূত্র আশ্রয় করে ঝুলছিল যেন—কী যে আছে ওর ভাগ্যে তা কেউই ঠিক অনুমান করতে পারছিল না।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মিঃ বাজপেয়ীকে স্বীকার করতে হল, রুমেলার তরফে হত্যার প্রেরণা ছিল যথেষ্ট। উইলের টাকাটার কথা সে জানতো এটা যদি সত্য হয় তাহলে ইসমাইলকে হত্যা করার বিশেষ কারণ বর্ত্তমান; আর যদি ধরা যায় উইলের বিষয় সে জানতো না কিছুই, তাহলে চিঠিতে লেখা বাধা-বিপত্তির কোনো অর্থই হয় না।

সরকারী কৌঁশুলী যখন উঠে দাঁড়ালেন সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনা করবার জন্য, তখন সবাই ভাবলে রুমেলার জীবনদীপ নিবে এসেছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ তিনি এমন নিপুণ ভাবে উপস্থিত করলেন যে রুমেলার চক্রান্তেই যে ইসমাইলের মৃত্যু ঘটেছে তা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, শুধু সার্জ্জেনদের পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্য ও রিভলবারের অনুপস্থিতি এই দুই কারণে অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হল না। চিঠি সম্পর্কে রুমেলা যা বলেছে তা তিনি একান্ত অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিলেন।

এর পর মিঃ বাজপেয়ী উঠলেন। অমন হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা বোধ করি তিনি আর কখনও দেননি তাঁর জীবনে। জুরীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে আসামী। সে যদি দোষী বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে ঘৃণ্য খুনীর মতো ফাঁসীকাঠে সে ঝুলবে। আমার সমাস্ত শক্তির উপর নির্ভর করছে অভিযোগ খণ্ডন কবার ভার আর আপনাদের মতের উপর নির্ভর করছে ওর মুক্তি বা মৃত্যু। আমাদের উভয়ের দায়িত্বই গুরুতর।

রুমেলার স্বভাব-চরিত্র যে ভাল নয় এটা গোপন করবার তিনি কোন চেষ্টা করলেন না, কিন্তু জুরীকে তিনি বোঝালেন, হত্যা করে যে টাকা সে পেল তার চেয়ে কত বেশী টাকা সে পেতে পারতো ওকে বিয়ে করে এবং তাতে বিপদের ঝুঁকিও থাকতো না কিছুমাত্র। তা ছাড়া উইলের ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়লে সন্দেহটা যে ওরই উপর পড়বে এটা অনুমান করা ওর মতো চতুর মেয়ের পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। সচরাচর দেখা যায়, এ ধরণের অর্থলোভী মেয়েরা হত্যার পক্ষপাতী নয়, ওরা কৌশলে টাকা আদায় করে এবং আসামীর উপর মৃতের যে রকম গভীর অনুরাগ ছিল তাতে এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সে অনায়াসে তার প্রণয়ীকে বাধ্য করতে পারতো ওকে বিয়ে করতে আর এটাও ঠিক বিয়ের পর সে দু'হাতে টাকা লুঠবার সুযোগ পেতো যথেষ্ট।

হত্যার প্রেরণা সম্পর্কে সরকার-পক্ষের যুক্তিটাকে এই ভাবে কাটিয়ে গেলেন মিঃ বাজপেয়ী।

ডাক্তারদের সাক্ষ্য যে এক রকম নয়, দু'জন অভিজ্ঞ সার্জ্জেনের মত যে পরস্পর-বিরোধী, সে বিষয়েও তিনি জুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সার্জ্জেনরা যে ক্ষেত্রে একমত হতে পারেননি, সে ক্ষেত্রে আসামীকে প্রাণদণ্ড দিলে জুরীরা কি কখনও রেহাই পাবেন বিবেকের দংশন থেকে? রিভলবারের বুলেটে ইসমাইলের মৃত্যু ঘটেছে এ মত আদৌ সমর্থন করা যায় না, কারণ আজও সে রিভলবারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই সম্পর্কে মিঃ বাজপেয়ী এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। আসামী যদি রিভলবারের সাহায্যে হত্যা করে থাকে, তবে সে গুলীটা ছুঁড়েছিল কি ভাবে? মৃত ব্যক্তিকে গুলী করা হয় সামনের দিক থেকে আর যে গুলী করে সে ছিল খুব নিকটে। মৃতব্যক্তি নিশ্চয়ই স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আততায়ীকে সুযোগ দিয়েছিল তাকে গুলী করে মারবার। এটা কি সম্ভব?

যে চিঠির উপর সরকার-পক্ষের কৌঁশুলী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন সেই চিঠির সম্বন্ধে মিঃ বাজপেয়ী বলেন, আসামী চিঠির যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়। আলোচনার শেষে জুরীকে তিনি অনুরোধ করলেন সন্দেহের অবকাশে আসামীকে মুক্তি দেবার জন্য। ওজস্বিনী ভাষায় জুরীকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "আসামী যদি দোষী হয়, শাস্তি সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না, কারণ, আমাদের ওপর এক জন আছেন যাঁর অজানা কিছুই নেই—পাপীকে শাস্তি দেবার ভার তাঁরই।"

বিচারক ধীর ভাবে কেস্‌টা জুরীকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি যা বললেন, তাতে আসামীর উপর তাঁর সহানুভূতিই প্রকাশ পেল, পুলিশ যে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেছে তা যথেষ্ট নয়।

অবশেষে জুরীরা আসন ত্যাগ করে ভিতরে গেলেন। রুমেলাকেও এজলাসের বাইরে নিয়ে গেল পুলিস-প্রহরী, তার চোখ দু'টো তখন ছলছল করছে, মুখটা বেদনায় নিষ্প্রভ, দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা জুরীদের পরামর্শ চলে। দর্শকরা এজলাসে ভীড় করে অধীর আগ্রহে। পরে শোনা যায়, জুরীদের মধ্যে দু'জন ছিলেন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষপাতী, তবে তাঁরা শেষটা নিজেদের মত প্রত্যাহার করেন। আলোচনার শেষে জুরীরা যখন ফিরে এলেন বিচারকক্ষে তখন তাঁদের মুখপাত্র গম্ভীর কণ্ঠে জ্ঞাপন করলেন জুরীর মত—"আসামী নির্দোষ।"

আর এইখানেই ঐ চাঞ্চল্যকর হত্যারহস্যের যবনিকাপাত হল। কিন্তু অজয়, তোমার কাছে আজ যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে যেন এত কাল পরে ঐ হত্যারহস্যের সমাধান-সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।"

"রুমেলার পরিণতি কী হল?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"রুমেলা কোথায় যে অন্তর্ধান করলে কেউ জানল না। বছর দুই পরে হঠাৎ এক দিন খবর পাওয়া গেল, মুঙ্গেরে এক ইতর পল্লীতে সে আত্মহত্যা করেছে আফিং খেয়ে। ইসমাইলের উইলে তার নামে যে টাকা ও সম্পত্তি ছিল সেটা নেবার কোন চেষ্টাই সে করেনি, ইসমাইলের আত্মীয়রাই সেটা পায় আদালতের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। আর মৈজুদ্দিন মারা পড়ে জেলে ঐ ঘটনার তিন বছর পরে।···এখন আর একবার বল দেখি, অজয়, ঠিক তুমি কি দেখেছিলে?"

আমি সেই দৃশ্য আবার সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

আমার বর্ণনা শেষ হলে শশাঙ্ক বললে, "প্রথমবার একটা জিনিষ তুমি বলনি যা এবার বললে। তুমি দেখলে মেয়েটি একটা গাছের কাছে এসে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল?"

"হ্যাঁ, দু'-এক সেকেণ্ড সে যেন ইতস্ততঃ করলে একটা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে, তার পরই অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।"

"দেখো অজয়, ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত interesting মনে হচ্ছে। আমি একবার ঐ জায়গাটা দেখতে চাই—যাবে আমার সঙ্গে?"

"নিশ্চয়ই। কালই আমরা রওনা হতে পারি।"

রাঁচীতে ডাক-বাংলোয় উঠলাম আমরা। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দুই বন্ধু উপস্থিত হলাম মোরাবাদি পাহাড়ের ধারে। ঠিক

মীর সৈয়দ আলি ও মুঘল চিত্র-শৈলীর প্রতিষ্ঠা

শ্রীগুরুদাস সরকার

ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রাচ্য পুঁথিশালার অন্তর্গত নিজামী-রচিত একখানি খাম্‌সা (কাব্যপঞ্চক) পুঁথির চিত্রবাজি যে কয় জন চিত্রশিল্পীর প্রযত্নে সুসম্পাদিত হয়, মীর সৈয়দ আলি তাঁহাদিগের অন্যতম। বিহ্‌জাদের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী শিল্পীদিগের মধ্যে যে কয় জন সফাবি যুগে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরই শীর্ষস্থানীয় চারি জনের মধ্যে মীর সৈয়দ আলির নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। কলারসিক লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon) মিরেকও সুলতান মহম্মদের পরেই মীর সৈয়দ আলির উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি, ওস্তাদ মহম্মদীর ন্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন চিত্রকরের পূর্ব্বেই তাঁহার নাম স্থান পাইয়াছে, সুতরাং শিল্পী হিসাবে মীর সৈয়দ আলি যে কৌলীন্যের দাবী করিতে পারেন এ কথা অভিজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য সমালোচক কর্ত্তৃক স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হয়। সৈয়দ আলি ছিলেন একাধারে কবি ও চিত্রকর। তিনি যখন সাহ তহ্‌মাস্পের অধীনে রাজদরবারের শিল্পিরূপে নিয়োজিত ছিলেন। সেই সময়েই ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত এবং সাহ তহ্‌মাস্পের নামের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট এই নিজামী পুঁথিখানি চিত্রিত হইয়াছিল। বিনিয়ন যথার্থই বলিয়াছেন যে, এক একখানি চিত্রিত পারসীক পুঁথি যেন এক একটি ক্ষুদ্রাকার চিত্রশালা (picture gallery), যাদুকরের ভেল্কীর ন্যায় এমন মুগ্ধ করার শক্তি অপর কোনও দেশের চিত্রশিল্পে দেখা যায় না। কল্প-জগতের উজ্জ্বল আলোক এ চিত্রগুলির সর্ব্বত্রই বিচ্ছুরিত রহিয়াছে (১)। ইহা উচ্চ প্রশংসা সন্দেহ নাই, কিন্তু চিত্রের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া অত্যদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন এই সকল চিত্রকরদিগের কথা বিস্মৃত হইলে শিল্প ও শিল্পী উভয়েরই ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত হইবে।

সম্রাট হুমায়ুন শের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কিছু কাল সাহ তহ্‌মাস্পের আশ্রয়ে তাব্রিজে বাস করিয়াছিলেন। সাহ তহ্‌মাস্পের রাজত্বকাল খৃঃ ১৫২৪ হইতে ১৫৭৪ পর্য্যন্ত। বাবরের মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে সাহ তহ্‌মাস্পের সাহায্য লাভ করিয়া হুমায়ুন ভারতের সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিতে সমর্থ হন! পারস্যরাজের সাহায্য ব্যতীত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তাব্রিজে অবস্থান কালেই যে হুমায়ুন মীর সৈয়দ আলি ও তাঁহার সহকর্ম্মী আবদুস্ সামাদের সহিত পরিচিত হন ইহা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সৈয়দ আলি ছিলেন বাদাকৃশানের অধিবাসী। তিনি যে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উপাধি মীর হইতেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার পিতার নাম মীর মনসুর। বিহজাদের যুগে মীর সৈয়দ আলি যে বিহ্‌জাদীয় শৈলীর প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বিহ্‌জাদের প্রভাব তখন যে কিরূপ শক্তিশালী ছিল তাহা বুঝা যায় প্রচলিত একটা কিম্বদন্তী হইতে। সাহ তহ্‌মাস্প না কি তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন না বলিয়া বিহ্‌জাদকে বাহিরের কাজ করার অনুমতি দিয়াছিলেন। মীর সৈয়দ আলি যে শুধু বিহ্‌জাদ নয়, সাহ তহ্‌মাস্পের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষুদ্রক চিত্রাঙ্কন পারদর্শী অপর কয় জন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন মঁসিয়ে সাকিসিয়ান নিজগ্রন্থে (২) সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কনেও মীর সৈয়দ আলি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। সে দিক্ দিয়া কাশিম আলির সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত খামসা গ্রন্থে তাঁহার নিজের স্বাক্ষরযুক্ত মাত্র দুইখানি চিত্র পাওয়া গিয়াছে। একখানিতে নৃপতি বাহ্‌রাম্ গোরের অপূর্ব্ব লক্ষ্যভেদের যে সুপ্রাচীন পরিকল্পনা যুগপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল তদনুসরণে ধাবমান মৃগের পদ ও কর্ণ সুকৌশলে একত্র বিদ্ধকরণের চিত্র শিল্পীর সুদক্ষ তুলিকায় সযত্নে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর চিত্রখানি লয়লা-মজ্‌নুন বিষয়ক। মজ্‌নুনকে বস্ত্রাবাস মধ্যে উপবিষ্টা লয়লার সমক্ষে লইয়া আসিতেছে। পশ্চাতে দলবদ্ধ দুষ্ট বালকের দল পাগলপ্রায় মজ্‌নুনকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে। চিত্রকর শুধু এইটুকু আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি যত্নসহকারে দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য তাঁবুগুলিতে রমণীগণ স্ব স্ব গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা

(১) Laurence Binyon, Parsian painting.

(২) A B. Sakisian, La miniature persane du XIIC au XVII siecle.

যে জায়গাটিতে আমি সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিলাম, সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিলাম বন্ধুকে।

"এই গাছটার কাছে এসেছিল মেয়েটি?" শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে একটা বটগাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে।

"হ্যাঁ।"

"আর সে দাঁড়িয়েছিল এইখানটায়?"

"হ্যাঁ।"

শশাঙ্ক গাছের গুঁড়িটা ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল এবং খানিক পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "এই দেখো এখানে কী রয়েছে।" তার কোমরের সমান-সমান গাছের একটা জায়গায় মাঝামাঝি গোছের একটা গর্ত্তের দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

"আশ্চর্য্য! এ একেবারে কল্পনাতীত। দেখো-দেখি অজয়, এক-খানা ছুরি জোগাড় করতে পারো কি না।"

আধ মাইল তফাতে একটা মুচীদের আড্ডা ছিল। সেখান থেকে একটা ছুরি সংগ্রহ করে ফিরে এলাম শশাঙ্কর কাছে। তখনই সে কাজ শুরু করল ছুরিটা নিয়ে এবং মিনিট কয়েক পরেই ছুরিটা মাটিতে রেখে একটা হাত সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে কাঁধ পর্য্যন্ত। আমি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার উৎসাহদীপ্ত মুখের পানে। মিনিট-খানেক পরে হাতটা বের করে সে আমার দিকে তাকাল—"বল দেখি আমার হাতের মধ্যে কী আছে?

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার দিকে। কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

শশাঙ্ক হাতের মুঠোটা আস্তে আস্তে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল ক্ষুদ্র একটি রিভলবার। রিভলবারের মাঝ-বরাবর চাপ দিতেই খুলে গেল ডিক্‌ষটা, আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, ছ'টা কার্ত্তুজ রয়েছে ভিতরে,—পাঁচটা অব্যবহৃত ও একটা ব্যবহৃত।

রহিয়াছেন। পীঠভূমে শিল্পী পল্লীজীবনের যে একটি চিত্র বিন্যাস করিয়াছেন তাহা অনবদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই জন মেষপালক আপন আপন মেষগুলি মাঠে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। এক জন নিশ্চিন্ত মনে বাঁশী বাজাইতেছে আর অপর ব্যক্তি সম্ভবত: মেষলোমেরই সুতা কাটিতে ব্যাপৃত। আপন কার্য্যে নিরত থাকিলেও তাহারা আসল কর্ত্তব্যে অবহেলা-পরায়ণ নয়। উভয়েই সমভাবে মেষযূথের উপর দৃষ্টি রাখিতেছে। এই চিত্রপটে একাধারে বৈচিত্র্যের ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। দরবারী চিত্রাঙ্কনভঙ্গীর প্রভাব দেখা যায় চিত্র-সন্নিহিত শৈলের পশ্চাৎ পিঠে। পাহাড়ের প্রস্তরময় অংশগুলি নীলারুণ বর্ণে রঞ্জিত। রঙীন পাহাড় পিছনে পড়ায় মেষপাল দুইটির প্রতিকৃতি খুলিয়াছে ভাল। আকাশের রঙ স্বাভাবিক নীলবর্ণ, তাহারই স্থানে স্থানে শ্বেত ও ধূসরবর্ণে অভ্রাংশ সূচিত হইয়াছে। যে গদীমোড়া আসনটিতে লয়লা উপবিষ্টা, তাহার আস্তরণের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে, সাদা জমির উপর, নীল ও গোলাপী বর্ণের নানা প্রসাধক অলঙ্কার সন্নিবিষ্ট। স্থানে স্থানে কাল রঙের স্পর্শও যে পড়ে নাই তা নয়। হিরাট শিল্পকেন্দ্রে কালোরই ছিল প্রবল প্রাদুর্ভাব, আর ছোপের গাঢ়তার জন্য যে দুইটি রঙের প্রাধান্য বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয় তাহার একটি আনীল লোহিত লিলাক্ (lilac) বর্ণ, আর অপরটি আরক্ত কপিশ। বিহ্‌জাদপ্রমুখ ওস্তাদগণের প্রভাব এ চিত্রখানিতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে, এই ক্ষুদ্রক-চিত্রখণ্ড (miniature) হিরাটে চিত্র-শৈলীর সার্থক অনুকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে, সাহ্ তহ্‌মাস্পের চিত্রশালায় বিহজাদোত্তর শিল্পিগণের চিত্রসমূহে হিরাট শৈলীর প্রভাব দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, উত্তরকালে মনস্বী বিহ্‌জাদেরও নিজস্ব শিল্পভঙ্গী কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের চিত্রে হিরাটের আদর্শ যে কতকাংশে পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মোটের উপর ইহাই স্পষ্টত: দৃষ্ট হয় যে, হিরাট শৈলীর, তথা বিহ্‌জাদীয় ধারার মূল প্রভাব হইতে ইঁহারা কেহই একবারে বিনির্ম্মুক্ত নহেন।

১৫৫০ খৃ: অব্দে হুমায়ুন কাবুলে আসিলে পর মীর সৈয়দ আলি ও আবদুস্ সামাদ উভয়েই তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মীর সৈয়দ আলি হুমায়ুন কর্ত্তৃক কাবুলে আমন্ত্রিত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হইলে পর তাঁহার প্রিয় চিত্রী দুই জনও দিল্লীতে চলিয়া আসেন। পারস্য ভাষায় রচিত আমীর হাম্‌জার বিখ্যাত কল্পকথা (romance) চিত্রিত করার জন্য হুমায়ুন মীর সৈয়দ আলিকেই চিত্রকররূপে নিযুক্ত করেন। দিল্লীশ্বর এ পুঁথিতে ক্ষুদ্রক চিত্র (miniatures) সন্নিবেশ করাইতে চাহেন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশমত যে চিত্রগুলি অঙ্কিত হয় তাহার সবগুলিই কতকটা বৃহদায়তনের, অবশ্য ক্ষুদ্রক চিত্রের তুলনায়। মনে হয়, চিত্রাঙ্কনকার্য্য রাজকীয় কুতুবখানাতেই (পুঁথিশালাতেই) অনুষ্ঠিত হইত এবং ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে শিল্পোৎসাহী সম্রাট্ স্বয়ং মধ্যে মধ্যে তথায় আগমন করিয়া পুঁথির চিত্রণ ও অলঙ্করণাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সাহ তহ্‌মাস্পেরও এক সময়ে এ অভ্যাস ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। কুতুবখানার সোপানশ্রেণী হইতে পতিত হইয়া ১৫৫৬ খৃ: অব্দে হুমায়ুনের প্রাণবিয়োগ ঘটে।

সে যুগের শিল্পীরা একবার কোনও কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহাতে আত্মনিয়োগ করিলে তড়িঘড়ির কথা একবারেই বিস্মৃত হইতেন। সর্ব্বান্তঃকরণে উৎকর্ষের সাধনাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। আমীর হাম্‌জার গ্রন্থের চিত্রশালাই মুঘল শৈলীর সূত্রপাত বলিয়া পরিগণিত। ইহা একনিষ্ঠ চিত্রকরের সপ্তবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল। দিল্লীর দরবারী 'কলম' ইহা হইতেই গড়িয়া উঠে, মুসলমান ও হিন্দু চিত্রীদিগের সমবায়ে।

আকবর বাদশাহের আমলেও (খৃ: অ: ১৫৫৬—১৬০৫) রাজকীয় চিত্রশালার অধ্যক্ষ ছিলেন মীর সৈয়দ আলি ও তাঁহার পুরাতন সহকর্ম্মী আবদুস্ সামাদ। এক দিকে বিদেশ হইতে সমাগত পারসীক ও কালমুক্ চিত্রকরেরা যেরূপ বাদসাহী চিত্রশালিকায় সসম্মানে স্থান পাইয়াছিলেন অপর দিকে সেইরূপ দেশীয় চিত্রকরদিগের আদরও সেখানে কম হয় নাই। ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে "গোয়ালিয়র থেকে এলেন নন্দ গোয়ালিয়রী, কাশ্মীর থেকে এলেন কমল কাশ্মীরি, গুজরাট থেকে এলেন ভীম গুজরাটী, লাহোর থেকে এলেন কালু লাহোরী, রাজপুতনা থেকে এলেন বন্‌ওয়ারী, ভগবান, ভগবতী, ভবানী, ভুরামল, চিত্তরমণ, ধন্নূলাল, ধানরাজ, গিয়ানচান্দ ইত্যাদি (৩)। আকবর এইরূপে ভারতের নানা কৃষ্টির কেন্দ্র হইতে গুণী ও প্রতিভাবান শিল্পী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শিল্পী ফারুখের সহিত আকবরনামার চিত্রসম্পাদনে অপর যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেশোলাল, মুকুন্দ, মধু, জগন, মহেশ, ক্ষেমকরণ, তারা, রাম, হরিবংশ, বাসাওয়ান প্রভৃতি ১২।১৩ জন চিত্রশিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় (৪)।

চিত্রশালার অধ্যক্ষরূপে আবদুস্ সামাদও যে কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই—তাহা বুঝা যায় তাঁহার চিত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের সফলতায়। মুঘল যুগের বিখ্যাত চিত্রকর দশবন্তকে তিনিই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন (৫)। আবুল ফজলের উক্তি হইতে জানা যায় যে, আবদুস্ সামাদ বিশেষ করিয়া হিন্দু চিত্রকরদিগকে শিক্ষাদানের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর (খৃ: অ: ১৬০৫-১৬২৭) পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয় চিত্রকর বিষণদাসকে পাঠাইয়াছিলেন পারস্যাধিপ সাহ প্রথম আব্বাসের দরবারে রাজদূত খাঁ আলমের সহিত। আকবর ও জাহাঙ্গীরের চিত্রশালার চিত্র-শিল্পীরা কেবল পারসীক চিত্রণ-রীতি আঁকড়াইয়া থাকেন নাই। ভারতীয় পারিপার্শ্বিকের বাস্তবতা বজায় রাখিয়া চিত্র আঁকিতে গিয়া দেশীয় পদ্ধতির প্রভাবও তাঁহাদে

(৩) মুঘল যুগের চিত্রকলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে আষা[ঢ়] ১৩৫০। (৪) Charles Huart, Les calligraphes e[t] les minituriastes de l'orient Musulma[n] pp. 338, 339.

(৫) Percy Brown, Indian Painting unde[r] Moguls, p. 54, 63.

তুলিকায় উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে যে শৈলী গড়িয়া উঠিল তাহা ইরাণী ও ভারতীয় এই উভয় রসেই সঞ্জীবিত, কিন্তু দুইয়ের কোনও পদ্ধতিরই ঠিক অন্তর্গত নয়। এ যেন দুইটি যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ ফলে এক নূতন পদার্থের সৃষ্টি! ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এ পদ্ধতি সাঙ্কর্য্য-দোষবিমুক্ত। সম্রাট্ আকবরের যুগে তস্বির (প্রতিকৃতি) রচনায় এই নূতন শৈলী যে বিশিষ্ট পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল তাহা আকা মিঞা প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিকেও যেন সহজেই হার মানাইয়াছে। যাহারা চিত্রশিল্পের বিরোধী, আকবর তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। এতৎ-সম্পর্কে হদিসের বিধি-নিষেধ তাঁহার নিকট নিরর্থক বলিয়া বোধ হইত। আকবর বলিতেন যে, চিত্রকরই সৃষ্টিকর্ত্তাকে জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়া থাকে; যেহেতু প্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবদেহ অঙ্কন করিতে গিয়া যখন তাহাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চিত্রপটে একটির পর একটি করিয়া বিন্যস্ত করিতে হয় তখনই সে বুঝিতে পারে যে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের (personality) বিকাশ তাহার অধিগম্য নয়, তাই তাহাকে বাধ্য হইয়া আপনার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যিনি জীবের জীবনদাতা তাহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। নিউইয়াস্কি (Newiasky) যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইস্লামের নৈষ্ঠিকতার অগ্নি যেন ভারতবর্ষে আসিয়া তাহার দাহন-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল (৬)।

ইতর জীবের চিত্রাঙ্কনে পারস্যের শিল্পিসম্প্রদায় বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুঘল মুসাব্বির (চিত্রকর) ও চিত্রশিল্পের এ শাখায় বড় কম পারদর্শিতা লাভ করেন নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ওস্তাদ মনসুর কি ইতর জীব চিত্রণে, কি নিসর্গ চিত্র পরিকল্পনায় অশেষ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু চিত্রীদিগের মধ্যে সমযশের অধিকারী হইয়াছিলেন রাজা মনোহরলাল। মনোহরলাল প্রথম মনসুরের শিষ্য ছিলেন বটে, কিন্তু কৃতিত্বে তিনি সহজেই তাঁহার শিক্ষাগুরুর সমকক্ষতা লাভ করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পরিগণিত হন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর মনোহরলালের তুলিকাজাত জীবজন্তুর চিত্রাদি দর্শনে বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন। শিষ্যের এ সম্মানপ্রাপ্তিতে মনসুর সুখী হওয়া দূরে থাক্, তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন বলিয়াই শুনা যায়। তখনও বিদেশ হইতে যে চিত্রকর না আসিত তা নয়। জাহাঙ্গীর সমরকন্দ হইতে মহম্মদ নাদির ও মহম্মদ মুরাদ নামক দুই জন চিত্রকর আনাইয়াছিলেন।

মুঘল যুগের অপর কয় জন বিশিষ্ট চিত্রকর ছিলেন গোবর্দ্ধন (১৬৩৫-৩৭) অনুপরিচিত বা অনুপচিত্রী (১৬৫৬) ও হুনহার। ইহার মধ্যে প্রথম দুই জন সাহজাহান বাদসাহের রাজত্বকালে (১৬২৮-১৬৫৮) এবং হুনহার ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৫৯-১৭০৭) বিদ্যমান ছিলেন।

মীর সৈয়দ আলির সাধনায় যে মুঘল শৈলীর উদ্ভব হইয়াছিল এ কথা বিস্মৃত হইবার নয়। তাই ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই পারসীক শিল্পীর ভারতে আগমন যে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবতুস সামাদের কথাও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে না। তিনি যে বিহ্‌জাদ-অঙ্কিত চিত্রেও তুলিকাস্পর্শের স্পর্দ্ধা রাখিতেন তাহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একখানি পুরাতন চিত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে (৭)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতের নব জাগৃতির সহিত বঙ্গদেশীয় যে চিত্রশৈলী বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, তাহারই স্রষ্টা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দেশীয় চিত্রকলার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয় দিল্লীর 'ইন্দ্রসভা' নামক একখানি চিত্রিত পারসীক পুঁথি উপহার পাইয়া। তাতেই যেন তাঁর চোখ খুলে গেল' (৮)। এক সময়ে এই শিল্পপদ্ধতির প্রভাব অবনীন্দ্রনাথ একেবারে এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। তাই অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও যে কলিকাতা শৈলী (৯) মুঘলশৈলীর নিকট ঋণী, এ কথা বোধ হয় অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(৬) Mechthild Newiasky, World Review September, 1944, p. 39.

(৭) British Museum, Or. 4615, fol. 103, rev.

(৮) প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৮।

(৯) একজন ফরাসী লেখিকা এই নব-শৈলীর নামকরণ করেন Ecole de Calcutta.

মনে এই আশা

শ্রীকরুণাময় বসু

এসেছে নূতন দিন, মনে তাই পাকা ধানী রং,
পাখীর পালকে দেখি উড়িবার যাতুময় ভাষা;
কাঠ চিরি, হাল ধরি, মাঠে ধান কাটিব বরং,
খেয়ে পরে বেঁচে থাকি মানুষের মনে এই আশা।

আকাশ গভীর নীল, সাগরের ঘোলা লোণা জল,
কবিরা আকাশে থাক, আমরা সাগর পাড়ি দেই;
জলে ভিজে রোদে পুড়ে স্নায়ু পেশী সতেজ সবল,
বন্দর এখনো দূরে, মনে কোন ভয়-ডর নেই।

পাহাড়ের নীল চূড়ো, ওপারে নূতন সূর্য্যোদয়,—
অগণ্য মানুষ দেখি পায়ে হেঁটে চলেছে কোথায়?
সে কোন স্বর্গের দেশ, এক হয়ে মিলে মিশে রয়,
দুস্তীর্ণ পথের প্রান্তে দীপ জ্বলে ঝড়ের সন্ধ্যায়।

প্রাচীর-গগনে দেখি অনিবার্য্য ঝড়ের সংকেত,
কান পেতে শুনিতেছি দূরান্তরে বজ্রের গর্জন;
নড়েছে প্রাচীন দুর্গ, মিথ্যা হ'ল আইন নিষেধ,
অগ্নিদাহী বেদনার সত্য হ'ল মর্ম্মের ভাষণ।

এখনো ঝড়ের খেলা, বিদ্যুতের খর তরবারি
উদ্‌ভ্রান্ত করেছে জানি মানুষের আশা ও বিশ্বাস;
এখনো মশাল জ্বলে, অন্ধকার ভূমিকা বিদারি'
প্রভাতের পটভূমে মানুষের স্বর্ণ-ইতিহাস।

ব্যাধির অবদান

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রোগ, উন্মত্ততা ও অকাল-মৃত্যু যেন মনুষ্য ও মানবতার বিরাট্ অপচয়। অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া স্নেহময়ী মাতাকে যদি ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়, আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া একনিষ্ঠ কর্ম্মীকে যদি কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হয়, প্রতিভাবান শিল্পীকে যদি তাহার বোধ-শক্তি বিচার-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে তাহা বিরাট্ ট্র্যাজেডি—বিয়োগান্ত নাটকের মতই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। ব্যক্তিগত ভাবে আত্মীয়-বান্ধব ও প্রিয়জনের কাছে এই ক্ষতি অপূরণীয়—ব্যাধির এই করাল মূর্ত্তি তাহাদের কাছে ভয়াবহ। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে সমাজ তথা সমগ্র জাতির কল্যাণের দিক্ হইতে দেখিলে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায়। এই সব ব্যাধি ও মৃত্যু বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরীক্ষিত হইলে একে অপরের ব্যাধিক্লেশ ও দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেক শিখিতে ও সাবধান হইতে পারে এবং সাধারণ লোকে উন্নততর জীবনযাপন করিতে সমর্থ হয়। বহু ক্লেশবরণ, স্বার্থত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা হয়। বহু ব্যক্তির ব্যাধি মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জাতির স্বাস্থ্য অর্জ্জিত হইতে পারে।

বিজ্ঞানী অতি-মানব নহেন। তাঁহারাও সাধারণের মতই চিন্তা করিয়া থাকেন। তবে সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা বিজ্ঞানীর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা প্রখরতর এবং বিচার-বুদ্ধি তীব্রতর। নানা পরীক্ষামূলক গবেষণায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। এই সকল পরীক্ষা সাধারণের নিকট অন্ধকারে প্রস্তর ক্ষেপণ বলিয়া মনে হইলেও নূতন নূতন নীতি ও মতবাদ প্রণয়ন করিয়া থাকে। কোন জ্ঞাত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া যে প্রতিপাদ্য প্রণীত হয়, তাহার গুরুত্ব কম নহে এবং তাহা যদি প্রমাণসহ উপস্থাপিত হয় তবে তাহা আইন অথবা অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। অসুস্থতার কারণ, রোগের লক্ষণ ও ঘটনার সংখ্যা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও নানা ভাবে নিরাময়ের উপায় পরীক্ষা করিয়া তবে এক বিশেষ রোগের সাধারণ সূত্রটি প্রণয়ন করিতে পারা যায়। এই ভাবে আমরা বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অতি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতেছি।

কয়েক প্রকার ব্যাধি যে সংক্রামক সে ধারণা পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম লুই পাস্তুরই দেখাইয়াছেন যে, ব্যাধি-জীবাণু জীবন্ত থাকে বলিয়াই তাহা সহজে সংক্রমণ-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে রেশম-পোকার রোগ তাঁহাকে সন্দিগ্ধ করে, পরে ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স রোগের সংক্রামণ দেখিয়া তিনি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হন; তৎপরে কচ্ প্রমাণ করিয়াছেন, কলেরা রোগ জলের দ্বারা বিস্তার লাভ করে;

যদি পানীয় জল ফুটাইয়া লইয়া বিশুদ্ধ ভাবে সংরক্ষিত ও সরবরাহ করা হয় তবে কোনক্রমেই কলেরা হইতে পারে না। পাস্তুর এবং কচের এই প্রকার সফল গবেষণা হইতে লোকের ক্রমশঃ ধারণা হইয়াছে যে, সকল রোগই কোন-না-কোন প্রকার জীবন্ত জীবাণুর আক্রমণ হইতে অর্থাৎ দেহের রক্তে প্রবিষ্ট হইবার ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে যে সকল ব্যাধি সংক্রামক নহে, সেগুলির কারণ নির্ণয় করিবার জন্যও মানুষের মন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির দ্বিতীয় সোপান হইল রোগ-বাহনের (carrier) আবিষ্কার। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, স্যাঁৎসেঁতে বদ্ধ জলাভূমির দূষিত বাতাস হইতে ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এখন সকলে জানে যে, এ্যানোফিলিস মশকই এই রোগের বাহক। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত-কণিকা শোষণ করিয়া মশা প্রথমে এই রোগের জীবাণু সংগ্রহ করিয়া লয় এবং পরে সুস্থ লোকের রক্তপ্রবাহে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহার বিস্ময়কর জীবনেতিহাস নির্ভুল ভাবে অনুশীলন করিতে পারা গিয়াছে। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে যদি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া যাইত, তবে কেহ কোন দিন টাইফাসের উৎপত্তি যে উকুন হইতে, সে বিষয়ে গবেষণা করিতে বসিত কি না সন্দেহ! কারণ, এই গবেষণা অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য ও বিপদ-সঙ্কুল। কেমন করিয়া এই রোগ বিস্তার লাভ করে তাহা দেখাইতে গিয়া অনেকেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তবে উকুনই টাইফাসের একমাত্র বাহক কি না তাহা সঠিক জানা যায় না।

কলেরায় যদি বহু লোক না মরিত, তবে কোন দিন মানুষ তাহার কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ে হয়ত সচেষ্ট হইত না। আবার কলেরার বীজাণু প্রথমে আবিষ্কৃত না হইলে ম্যালেরিয়া লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না। বহু ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর উপর পরীক্ষা চালাইয়া বহু জীবননাশ ও অকৃতকার্য্যতার পরে যখন ম্যালেরিয়া-বীজাণুর জীবনেতিহাস সহ মশকরূপী বাহকের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইল, তখন টাইফয়েড ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ লইয়া গবেষণার সূত্রপাত হইল। এই ভাবে বহু প্রাণের বিনিময়ে মানুষ ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে—মৃত্যুর মধ্য দিয়া ব্যাধি মানুষকে তাহার জীবন-সংগ্রামে ক্রমে ক্রমে জয়যাত্রার পথে পরিচালিত করিয়াছে।

ইহার পর আর এক অধ্যায়ের সূচনা। খাদ্যে বিভিন্ন ভিটামিনের অপ্রাচুর্য্য হেতু বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। নাবিকগণের মধ্যে স্কার্ভি রোগের আধিপত্য দেখা যাইত, কিন্তু কোন মতেই কারণ বুঝা যাইত না। সম্প্রতি স্যর টমাস বার্‌লো আবিষ্কার

করেন যে, ইংলণ্ডের অনেক ছেলেমেয়েও অনুরূপ রোগে ভুগিয়া থাকে। তাহাদের লইয়া তিনি নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পান, প্রত্যহ একটি করিয়া কমলালেবু খাইলে স্কার্ভি হইতে পারে না—অর্থাৎ ভিটামিন 'সি' এই রোগের প্রতিষেধক। নাবিকেরা সাধারণতঃ শুটকি মাছ-মাংস খাইয়া থাকে। তাজা ফলমূল সংগ্রহ করিতে পারে না, তাই উক্ত ভিটামিনের অভাবে দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। এই ভাবে ভিটামিন 'বি,' ও ভিটামিন 'ডি' যথাক্রমে বেরিবেরি ও রিকেট রোগের প্রতিষেধক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক হইলেও যখন অবধারিত, তখন যদি জানা যায় আমার সে মৃত্যুতে পরের উপকার হইবে, তবে খানিকটা সন্তোষ লাভ করা যায়। ঠিক এই ধরণের জগদ্ধিতায় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই দেশপ্রেমিক ও সৈনিক হাসিমুখে আত্মত্যাগ করিতে পারেন। ডাক্তার রোগের কারণ ধরিতে পারিল না, অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া রোগী অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন মৃত্যুর পরে শব-ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে মরিয়াছে সে আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু ইহার ফলে ঠিক অনুরূপ যন্ত্রণাযুক্ত দ্বিতীয় রোগী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং পরে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তাহার গুরুত্ব বিরাট। মস্তিষ্কে টিউমার হইলে যদি তাহা অস্ত্রোপচার দ্বারা অপসৃত না করা হয়, তবে প্রথমে পক্ষাঘাত পরে স্মৃতিশক্তির অবলোপ ও তৎপরে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়। কিন্তু ঠিক কোথায় টিউমারের অবস্থিতি তাহার ধারণা না থাকিলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত হইলেও কোন অস্ত্রচিকিৎসকই মস্তকের অস্থিগুলি খুলিয়া ফেলিয়া সমগ্র মস্তিষ্কে তথ্য-তল্লাস করিতে সাহসী হন না। মৃত্যুর পরে শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে যন্ত্রণার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হয় ও পরে সমগ্র মস্তিষ্ক অনুসন্ধান করিয়া টিউমারের সংস্থিতি বুঝিয়া লইতে হয়। যে ছাত্র যত-বেশী শবব্যবচ্ছেদ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ততই বর্দ্ধিত হইয়াছে। হ্যাল্ডেন বলিয়াছেন, মৃত্যুর পরে শবদেহ শোভাযাত্রা সহকারে শ্মশানে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা যদি তাহা ব্যবচ্ছেদাগারে নীত হয় তবে মরণের পরেও দেশের কল্যাণসাধনে অংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য এ জন্য মানুষকে সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রবণতাযুক্ত হইতে হইবে।

মানসিক ব্যাধি বা উন্মাদ রোগের অনুশীলনের ফলে দেখা গিয়াছে, কয়েক প্রকার উন্মত্ততা ম্যালেরিয়ার বীজাণু দ্বারা নিরাময় হইতে পারে। উন্মাদরোগীর রক্তে প্রথমে ম্যালেরিয়ার বীজাণু সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হয়, পরে এই জীবাণু উন্মাদরোগের বীজাণুগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে; তখন ম্যালেরিয়া হইতে নিরাময় করিয়া উন্মাদরোগীকে সহজেই আরোগ্য করিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত জেনেট, চারকট ও ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আজকাল অনেক মানসিক ব্যাধি দূরীভূত হইতেছে। ঐন্দ্রজালিক ফ্রয়েড অবচেতন মনের নানা রহস্য ভেদপূর্ব্বক স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া এক অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধান দিয়াছেন। যুদ্ধবিগ্রহ শুধু এক প্রকার সমষ্টিগত উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই নহে। আত্মহত্যার মূলেও সেই উন্মত্ততা। যুদ্ধপিপাসু উন্মত্ত জাতিকে বুঝিতে হইলে প্রথম উন্মাদগ্রস্ত লোককে অনুশীলন করিতে হইবে। আত্মহত্যাকারীর মস্তিষ্ক-পরীক্ষার সুযোগ হইতে এই অনুশীলন সহজ হইয়া উঠিবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে মৃত চোর-ডাকাত, হত্যাপরাধীর মস্তিষ্ক লইয়া তাহাদের বিকৃত মনস্তত্ত্বের কারণ নির্ণয়ের জন্য বিরাট গবেষণা চলিতেছে।

স্নান

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পাল

বাংলা স্নান কথাটিতে ত্বকের চেয়ে জলের প্রাধান্যই যেন বেশী। ইংরেজী বাথ কথাটিতে যেন তা নয়। তাই জল বাদ দিয়েও অনেক রকমের বাথের চলন আছে বিদেশী সমাজে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে।

বাংলাদেশ গ্রীষ্মপ্রধান, কাজেই জলের প্রয়োজন এবং খাতির প্রচুর। অবশ্য গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই সে কথা খাটে। অবগাহন স্নান অর্থাৎ জলে আপাদ-মস্তক নিমজ্জন দেহ-মনের পক্ষে যে কত স্নিগ্ধকর, তা আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। বুক পর্য্যন্ত গা ডুবিয়ে গাত্র মার্জ্জনা করলে লোমকূপ পরিষ্কার হয়, লোমকূপের পথে বায়ু-সঞ্চালন আর ঘর্ম-স্রাব সরল হয়। ফলে শিরা এবং স্নায়ুগুলো সুস্থ থাকে। গ্রীষ্মকালে দু'বেলা স্নান কলিকাতার এবং বড় বড় সহরের অধিবাসীদের প্রায় নিত্য ঘটনা তিন বার স্নানও গল্প-কথা নয়। বিশেষ করে স্ত্রীলোকের পক্ষে মাথা ভিজানো কঠিন হলেও পুরুষের পক্ষে সেটা খুবই সহজ। পাড়াগাঁয়ে পুকুরে বা নদীতে স্নান করার পর, বাড়ী পৌঁছে কাপড়-বদলানোর ফাঁকটুকুতে ঠাণ্ডা লাগানোর ভয় থাকতে পারে, পাড়াগাঁয়ে দু'বেলা স্নান তাই ততটা দেখা যায় না। সহরে বাথরুমে বা উঠানের চৌবাচ্চায় স্নান করার এবং সঙ্গে সঙ্গে গায়ে জামা-কাপড় দেওয়ার জন্য সে ভয়টুকু একেবারেই থাকে না।

প্রাতঃস্নান বা উষা-স্নান খুব একটি দামী জিনিষ। এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হতেই এ প্রথাটি চলে আসছে। প্রাতে স্নান সেরে প্রাত্যহিক কাজ সুরু করা একটি সুন্দর অভ্যাস। মনে একটি পবিত্রতা এবং ধীরতার ভাব নিয়ে দিনের কাজে একের পর একে গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করা শুধু সহজ নয় সফলতারও একটি উপায়। বিকালের দিকে অফিস বা অন্য কাজ সেরে আর একবার স্নান—এতে দেহের এবং মনের সঞ্চিত ক্লেদ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়! এই রকমের নিয়মিত অভ্যাস স্নায়বিক এবং মানসিক অনেক রকম অশান্তি দূর করে, সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের লাবণ্য আর মনের প্রফুল্লতাও বাড়িয়ে দেয়। নিয়মিত দুই বেলা স্নানকে জীবনের একটি প্রধানতম ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করলে স্বাস্থ্যের একটি মহৎ কল্যাণ সাধিত হবে।

অবগাহন বা পূর্ণ স্নান সব সময় সম্ভব হয় না। তখন আমরা ঘাড়ে, কপালে, মুখে-চোখে জলের ছিটা দিই। এ-ও এক রকমের স্নান—মনের এবং দেহের অবসাদ দূর করে, প্রফুল্লতাও বাড়ে। এই সময় আরও কতকগুলি অঙ্গসন্ধিতেও আমরা জল সিঞ্চন করতে পারি, যেমন কনুই, হাঁটুর ভিতর দিক, বগল ইত্যাদি। এতে দেহের কতক

স্থান শীতল, অন্য কতক স্থান কিছু উষ্ণ থাকে, ফলে রক্ত-সঞ্চালনের সুবিধা হয়, স্নায়ুমণ্ডলী সুস্থতা লাভ করে, দেহের উত্তম বাড়ে এবং মনঃসংযোগ তীক্ষ্ণ হয়। শীতপ্রধান দেশে জলের বদলে বরফ ব্যবহার করা চলে। ফল অবশ্য একই।

স্নানের পর রৌদ্র-স্নান বা সান-বাথ। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এটি যত্নকৃত নয়, আপনা আপনিই হয়ে থাকে। বিদেশীদের মত ক্লাব গঠন করে ব্যবস্থা করতে হয় না। তবু এ সম্বন্ধেও দু'-এক দিকে বিশেষ মন দেওয়া চলে। মুখ, বুক, হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে প্রচুর রৌদ্রালোক পেলেও কোমর, উরু-সন্ধি এগুলি আমাদের সর্বদাই ঢাকা থাকে। তাদেরও রৌদ্র সেবন প্রয়োজন, এবং বোধ হয় বেশীই প্রয়োজন। বস্তি অংশে জনন-সংক্রান্ত গ্লাণ্ড অবস্থিত আছে, সুতরাং কোমর এবং উরু-সন্ধি, উপস্থ প্রভৃতি স্থানে পরিমিত রৌদ্র-স্নান করিলে সেই গ্লাণ্ডগুলি উৎফুল্ল হয় এবং তাদের ক্রিয়াও ভাল হয়। বিশেষ করে শীতকালে, নির্জন কক্ষে এই ধরণের রৌদ্রস্নান আমরা স্বচ্ছন্দে এক-আধ ঘণ্টা উপভোগ করে নিতে পারি। শীতকালে মাথা, বুক ছায়ায় রেখে সাধারণ পোষাকে শুধু পাছ'টিকে খোলা রেখে, সেখানে রৌদ্র নেওয়ার যে কতখানি আরাম, তা আমাদের অনেকেরই অজানা নেই। শুধু আরাম নয়, স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে এ জাতীয় রৌদ্রস্নানের একান্ত প্রয়োজন।

এইবার ঘর্ষণ-স্নানের কথা, ইংরেজীতে একে বলে ফ্রিক্‌শন্ বাথ। ত্বকের এ একটি বিখ্যাত ব্যায়াম। এ বিষয়ে বিশেষ এক জন ব্যায়ামবিদের আলোকচিত্র-সম্বলিত ব্যায়াম-পুস্তকও আছে। পরীক্ষাস্থলে শুকনো তোয়ালে বা সাধারণ গামছা দিয়ে হাত, পা বিশেষ করে পিঠ, ঘাড় এবং কোমর মার্জ্জনা করলে বুঝতে পারবেন, এ জিনিষটি কতখানি আরামদায়ক। মার্জ্জনা করবার সময়, গামছা বা তোয়ালেকে চওড়া ফিতের আকারে পাট করে ব্যবহার করতে হয়, স্পঞ্জের মত মুঠি করে নয়। ম্যাসাজ, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের সংবাহন বা সাদা কথায় হাত-পা টেপা—এটাও এক রকম ঘর্ষণ-স্নান।

এর পর অন্য কতকগুলি স্নানের কথা বলা যেতে পারে। এগুলির দু'-একটিতে কিছুটা জটিলতাও আছে। আমরা নানা রকমের হট্ বাথ নিই—বিশেষ করে সর্দির সময়। মাথায় অবশ্য গরম জল কখনও ব্যবহার করতে নেই, তবে সর্দির সময় গায়ে ঠাণ্ডা জল দিলেও দোষ নেই। সর্দির সময় কিন্তু গরম জলে স্নান অপেক্ষা গরম জল আর ঠাণ্ডা জল দুটোতেই পর পর স্নান করলে বেশী সুফল পাওয়া যায়! জিনিষটা আর কিছুই নয়। সহ্য মত গরম জল, মাথা বাঁচিয়ে সারা গায়ে বেশ খানিকটা ঢেলে নিতে হবে, আর তার ঠিক পরেই যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা জল মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঢালতে হবে, তাও বেশ খানিকটা। এর পর শুকনো তোয়ালেতে মুছে নিলেই চলবে।

প্যাক্ বাথ জিনিষটা সাধারণতঃ নানা রকম অসুখেই ব্যবহার করা হয়। এর উদ্দেশ্য দেহ হতে খানিকটা ঘাম বের করে দেওয়া আর সেই সঙ্গে তরল আকারে শরীরে অনেক বিষাক্ত জিনিস বেরোনোর ব্যবস্থা করা। পাড়াগাঁয়ের অনেক মেয়েদের দেখা যায়, —হয়ত খুব সর্দ্দি, সারা গা একখানা বা দু'খানা কম্বলে ঢেকে জ্বা রৌদ্রে উঠানে বা ছাদে মিনিট ১০।১৫ শুয়ে থাকে। যখন কম্বল খুলে ফেলে, দেখা যায় সারা দেহ ঘামে ভিজে, এমন কি মুখে কোল্ড ক্রীম মাখলে যেমন হয়, তেমনি মোটা মোটা ঘামের বিন্দু সারা দেহের উপর ছড়ানো।

কোল্ড প্যাক বাথ ঠিক এমনি আর একটি জিনিষ। এটি একেবারে খাঁটি ডাক্তারি ব্যবস্থা এবং কিছু উপকরণ-বহুল। ডায়েবেটীজ রোগীর পক্ষে নিয়মিত ভাবে এর প্রয়োগ খুব উপকারী। এরও লক্ষ্য ঘামের পথে শরীরের বিষ বের করে দেওয়া। রৌদ্রসেবিত উঠানে বা ছাদে একখানি শুকনো কম্বল বিছিয়ে মাথায় বালিশ দিয়ে শুতে হবে, গায়ের উপর আর একখানি মোটা কম্বল জড়িয়ে। এর উপর একটা নিঙড়ানো ভিজে কম্বল চাপিয়ে দিতে হবে। বুকে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা ভাল। সর্বোপরি আর একখানি শুকনো কম্বল ঢেকে দিতে হবে। মিনিট ১০ এই ভাবে থাকার পর মুক্তি। মুক্তির পর ঈষদুষ্ণ জলে ভিজানো তোয়ালে দিয়ে সারা দেহের চটচটে ঘামের ভাবটা রগড়ে তুলে নিতে হবে। তার পর গেঞ্জি কি জামা পরায় ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, প্রখর রৌদ্রের সময়ই এই প্রক্রিয়া সুবিধাজনক।

সিজ-বাথের বা অনুরূপ বাথের প্রচলন আজ-কাল বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। একখানি বড় গামলায় গরম জল রেখে কোমর অবধি ডুবিয়ে নগ্ন ভাবে বসতে হয়, অন্য দিকে মাথার উপর আইস্-ব্যাগ থাকে—এই-ই সিজ্-বাথ। প্রবল জ্বরের সময় এই সিজ-বাথের একটি অতি লঘু সংস্করণ আমরা ব্যবহার করি—মাথায় আইস্-ব্যাগ এবং পায়ের তলায় হট-ওয়াটার ব্যাগ বা অভাবে গরম জলের বোতল। ত্বক্ সংস্পর্শে গরম জলের এবং ঠাণ্ডা জলের নানাবিধ ব্যবহারই সাধারণের মাঝে প্রচলিত। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতির কল্যাণে স্পঞ্জ-বাথ আমাদের অজানা নয়। গরম জলে স্পঞ্জ বা তোয়ালে ডুবিয়ে নিয়ে সেটিকে নিঙড়ে রোগীর সারা দেহ ধীরে ধীরে মুছে নেওয়াই স্পঞ্জ-বাথ। পায়ের বাতের বেদনা বাড়লে নানা রকম লবণ গরম জলে গুলে নিয়ে সেই জলে আমরা পা ডুবিয়ে রাখি—এই-ই ফুট-বাথ। ফুট বাথের অতি সাধারণ একটা প্রয়োগের কথা এখানে বলা যেতে পারে। বাজার করে বা অন্য কাজে খুব খানিকটা পথ হেঁটে আমরা অনেক সময় বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি, পায়ের তলা, গোড়ালি প্রভৃতি খুব টন-টন করে। তখন এই রকম ফুট-বাথ নেওয়া খুব আরামের। একটা বড় গামলাতে কিছু গরম জলে নুণ মিশিয়ে, সেই জলে পা দু'টি ডুবিয়ে রাখতে হবে ১০।১৫ মিনিট, যেমন প্রয়োজন।

ভেপার-বাথ বিশেষ—অনেক সময় ব্যবহার করা হয় মুখে ব্রণ নিবারণের জন্য। একটা বড় বাটিতে আধ বাটির উপর ফুটন্ত জল রাখতে হবে। তার পর ভিজা নরম গামছায় দু'চোখ বেঁধে সেই গরম জলের বাটির কিছু উপর মুখ নাবিয়ে ধরতে হবে, জলের ভাপ কপালে, গালে, নাকে লাগবে। আর সমস্ত মাথা, ঘাড় ঢেকে আর একখানি বড় তোয়ালে মুড়ি দিতে হবে। মিনিট ৫।৭ এমনি ভাবে থাকলেই যথেষ্ট। এতে গাল কপাল ঘামের বিন্দুতে ভরে উঠবে আর চামড়াও হবে তুলতুলে নরম। এর পর ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে ভাল ভাবে রগড়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। এই ভাবে দিনে একবার করে ভেপার-বাথ নিলে মুখের ব্রণ কমে যাবেই, আর ত্বক হয়ে উঠবে মসৃণ আর নরম।

মহামুনি-শ্রীভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

৩

মূল :—এইরূপে ইহাদিগের নানাবিধ ভোজন-সমাশ্রিত বলি (প্রদান) কর্ত্তব্য। পুনরায় মন্ত্রবিধানানুসারে বলিকর্ম্মও বলা যাইবে। ৪৬।

সঙ্কেত :—বলি অর্থে উপহার। এস্থলে বলি ভোজ্য-বস্তুরূপ পূজোপহার। ভোজ্যদ্রব্যরূপ বলি অবলম্বনে নাট্যদেবতাগণের পূজা বিধেয়। কোন্ কোন্ দেবতাকে কি কি ভোজ্যদ্রব্য বলিরূপে প্রদান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতঃপর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কিরূপে বলি প্রদান কর্ত্তব্য, তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

মূল :—(হে) দেবদেব মহাদেব সর্ব্বলোক-পিতামহ! আমার এই সকল মন্ত্রপূত বলি প্রতিগ্রহ করুন। ৪৭।

সঙ্কেত :—দেবদেব মহাদেব—এই সম্বোধন পদ দুইটি শিবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, 'দেবদেব,' 'মহাদেব' শিবেরই নাম। কিন্তু এই মন্ত্রটি শিবের আবাহন-মন্ত্র নহে—ব্রহ্মার আবাহন-মন্ত্র। 'দেবদেব মহাদেব' পদদ্বয় যৌগিক অর্থে সকল দেবতার সম্বোধনেই ব্যবহৃত হইয়াছে—রূঢ় অর্থে শিবের সম্বোধনমাত্র বুঝায় নাই। শিবের সম্বোধন-মন্ত্র ৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। কাশীর পাঠ—'দেবদেব মহাভাগ পদ্মযোনে পিতামহ! মন্ত্রপূতমিমং সর্ব্বং বলিং দেব গৃহাণ নঃ'।—দেবদেব! মহাভাগ! পদ্মযোনে! পিতামহ! দেব! আমাদিগের এই সকল মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ কর।

মূল :—পুরন্দর! অমরপতে! বজ্রপাণে! শতক্রতো! দেব! বিধিমন্ত্র-পুরস্কৃত বলি গ্রহণ করুন। ৪৮।

সঙ্কেত :—কাশীর সংস্করণে এ স্থলে মহাদেবের আবাহন।

মূল :—দেবসেনাপতে! স্কন্দ! ভগবান্! শঙ্করপ্রিয়! ষণ্মুখ! প্রীতমনে বলি গ্রহণ করুন। ৪৯।

সঙ্কেত :—বলিঃ প্রীতেন মনসা (ব); প্রীতেন মনসা দেব (কা)।

মূল :—নারায়ণ! অমিতগতে! পদ্মনাভ! সুরোত্তম! দেব! মৎকর্ত্তৃক অর্পিত মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ করুন। ৫০।

সঙ্কেত :—অমিতগতে—যাঁহার গতি অমিত (সম্বোধন-পদ)—বামন অবতারে তিনি তিন পদে ত্রিভুবন বিনা বাধায় ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূতো ময়াপিতঃ (ব); মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃত :—মন্ত্রজনিত সংস্কার-সংস্কৃত বলি। মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সংস্কার (অদৃষ্ট অভিনব গুণ) উৎপন্ন হয়—উহাদ্বারা বলি সংস্কৃত (অভিনব গুণে গুণবান্ ও পরিমার্জ্জিত)।

মূল :—দেবদেব! মহাদেব! গণেশ! ত্রিপুরান্তক! দেব! মৎকর্ত্তৃক উদ্যত মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ করুন। ৫১।

সঙ্কেত :—এই মন্ত্রটিতে 'গণেশ' পদের প্রয়োগ আছে; উহা হইতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, মন্ত্রটি গজাননের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য। কিন্তু পরবর্ত্তী শব্দ 'ত্রিপুরান্তক' দেখিলে আর এ সন্দেহ মনে স্থান পায় না। ত্রিপুরান্তক—মহাদেব। 'গণেশ' বলিতে বুঝাইতেছে প্রমথগণের অধীশ্বর।

মূল :—দেবদেব! মহাযোগিন্! দেবদেব! সুরোত্তম! দেব! বলিগ্রহণপূর্ব্বক সভাস্থলে উত্থিত বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন। ৫২।

সঙ্কেত :—সদোত্থিতাৎ—'সদস্' শব্দের অর্থ সভা। সদোত্থিত পদটি আর্ষপ্রয়োগ। রক্ষ বিঘ্নাৎ সদোত্থিতাৎ (ব); রক্ষ বিঘ্নান সদোত্থিতান্ (কাশী)—এ পাঠে বিঘ্ন (নাশ পূর্ব্বক) রক্ষা কর—এরূপ অধ্যাহার করিতে হয়; নতুবা বিঘ্নগণকে রক্ষা কর—এরূপ অর্থের কোন সঙ্গতি থাকে না।

কাশীর সংস্করণে এই দুইটি শ্লোকের বিন্যাস একটু অদ্ভুত ভাবে করা হইয়াছে—"দেবদেব মহাদেব গণেশ ত্রিপুরান্তক। ৪৭।
মহাদেব মহাযোগিন্ দেবদেব সুরোত্তম।
সম্প্রগৃহ্য বলিং দেব রক্ষ বিঘ্নান্ সদোত্থিতান্। ৪৮।
প্রগৃহ্যতাং বলির্দেব মন্ত্রপূতো ময়োদ্যতঃ"

বলা বাহুল্য—ইহা লেখক ও সম্পাদকের অনবধানতার ফল।

মূল :—দেবদেবি! মহাভাগে! সরস্বতি! হরিপ্রিয়ে! মাতঃ! মৎকর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত বলি গ্রহণ করুন। ৫৩।

সঙ্কেত :—কাশীর পাঠ—দেবি দেবি!

মূল :—নানানিমিত্তসম্ভূত পুলস্ত্যের বংশধর সেই সকল মহাসত্ত্ব রাক্ষসেন্দ্র আমার বলি গ্রহণ করুন। ৫৪।

সঙ্কেত :—সর্ব্ব এব তে (ব); ...এব তু (কা) | প্রতিগৃহ্নন্তিমং বলিম্ (কা); প্রতিগৃহ্ণন্ত মে বলিম্ (ব)।

নানানিমিত্তসম্ভূত—'নিমিত্ত' বলিতে কি বুঝাইতেছে, তাহা এস্থলে স্পষ্ট বুঝা যায় না। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্য ঋষি—দশ জন প্রজাপতির অন্যতম। তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণ। এই কারণে পৌলস্ত্য বলিতে বুঝায় পুলস্ত্যের বংশধর—রাক্ষস। মহাসত্ত্ব—মহাবল; সত্ত্ব—বল—সত্ত্বগুণ নহে; কারণ রাক্ষসগণ রজোগুণবিশিষ্ট—সত্ত্বাধিক্য তাঁহাদিগের নাই।

মূল :—লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মতি, মেধা—সর্ব্বলোক-নমস্কৃত দেবীগণ আমার এই মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ করুন। ৫৫।

সকল ভূতের অনুভাবজ্ঞ! লোকজীবন! মারুত! দেব! মৎকর্ত্তৃক উদ্যত মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ করুন। ৫৬।

সঙ্কেত :—অনুভাব—প্রভাব। বায়ু জানেন কাহার কত শক্তি। পাঠান্তর ভাবজ্ঞ সর্ব্বভূতানাম্। লোকজীবন—তিনিই লোকের প্রাণস্বরূপ। কাশীসংস্করণে—"নানা নিমিত্তসম্ভূতাঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি এই শ্লোকের পরে সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। মৎোদ্যতঃ—পাঠান্তর ময়ার্পিতঃ

মূল :—দেববক্ত্র! সুরশ্রেষ্ঠ! ধূমকেতো! হুতাশন! দেব! ভক্তিপূর্ব্বক সমুদ্যত বলি সম্যগ্ রূপে গ্রহণ করুন। ৫৭।

সঙ্কেত :—দেববক্ত্র—অগ্নি দেবতাগণের মুখস্বরূপ—দেবগণ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করেন। বক্ত্র—মুখ। ধূমকেতু—অগ্নির নাম—ধূম কেতু (চিহ্ন, লক্ষণ) যাঁহার; ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সমুদ্যত—প্রদানার্থ উদ্যত।

মূল :—সকল গ্রহের প্রবর! তেজোরাশে! দিবাকর! দেব! মৎকর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক উদ্যত বলি সম্যগ্ রূপে প্রতিগ্রহ করুন। ৫৮।

সঙ্কেত :—প্রবর—শ্রেষ্ঠ।

মূল :—সর্ব্বগ্রহপতে ! সোম ! দ্বিজরাজ ! জগৎপ্রিয় ! মৎকর্তৃক উদ্যত মন্ত্রপূত এই বলি প্রতিগ্রহ করুন ।৫৯।

সঙ্কেত :—দ্বিজরাজ—চন্দ্রের এক নাম। মন্ত্রপূতো ময়োদ্যতঃ (ব); মন্ত্রপূতপুরস্কৃতঃ (কা)।

মূল :—নন্দীশ্বর-প্রমুখ মহাগণেশ্বর-সকল ! মৎকর্তৃক ভক্তি-পূর্ব্বক সম্যগ্‌রূপে প্রতি-প্রবর্ত্তিত বলি প্রতিগ্রহ করুন ।৬০।

সঙ্কেত :—সম্প্রতিচোদিত ! (মূল)—প্রতিচোদিত অর্থে প্রতি-প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ—উদ্দেশে নিবেদিত: প্রগৃহ্যতাং বলির্ভক্ত্যা ময়া সম্প্রতিচোদিতঃ (ব); প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং ভক্ত্যা বলিং সম্যঙ্ ময়োদিতম্ (কা); প্রগৃহ্নতামেব বলির্ময়া ভক্ত্যা প্রচোদিতঃ—পাঠান্তর, গৃহ্নতাং মে বলির্ভক্ত্যা ময়া সম্প্রতিচোদিতঃ—পাঠান্তর। সকল পাঠেরই অর্থ হয়। কিন্তু কাশীর পাঠের অর্থ হওয়া কঠিন। 'উদিত' শব্দের অর্থ উক্ত। ময়োদিতং বলিং প্রতিগৃহ্নন্তু—মৎকর্তৃক উক্ত বলি প্রতিগ্রহ করুন। ইহার অর্থসঙ্গতি কোথায় ?

মূল :—পিতৃসকলকে নমস্কার। (তাঁহারা) এই বলি প্রতি-গ্রহ করুন। আর ভূতগণকেও নিত্য নমস্কার যাঁহাদিগের এই বলি প্রিয় ।৬১।

সঙ্কেত :—ভূতেভ্যঃ স্থলে ঋষিভ্যঃ পাঠও আছে। যেষামেষ বলিঃ প্রিয়ঃ (ব); তেষামেষ (কা)।

মূল :—কামপাল ! নিত্য (তোমায়) নমস্কার—যে তোমার (উদ্দেশে) এই বিধি (বলি) কৃত হইয়াছে।

নারদ আর তুম্বুরু, ও বিশ্বাবসু-প্রমুখ সকল গন্ধর্ব্ব আমার এই উদ্যত বলি পরিগ্রহ করুন । ৬২-৬৩ ।

সঙ্কেত :—নারদকে মহর্ষি ভরত গন্ধর্ব্বগণের শ্রেণীতে ধরিতে চাহেন বলিয়া অনুমান হয় (নাঃ শাঃ প্রথম অধ্যায়, ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বিধিঃ (ব); বলিঃ (কা)।

মূল :—ভগবান্ যম আর মিত্র—(এই) দুই লোকপূজিত ঈশ্বর আমার এই মন্ত্রপুংস্কৃত বলি গ্রহণ করুন ।৬৩-৬৪।

সঙ্কেত :—মার্গশীর্ষে সূর্য্যের নাম মিত্র।

মূল :—আর রসাতলগত পন্নগগণকে নমস্কার। পূজিত পাপনাশন (সর্পগণ) নাট্যের সিদ্ধি প্রদান করুন ।৬৪-৬৫।

সঙ্কেত :—রসাতলগতেভ্যঃ (ব); রসাতলচরেভ্যঃ (কা)। পন্নগ—সর্প। পাপনাশনাঃ (ব); পবনাশনঃ (কা)—বায়ুভুক্।

মূল :—সকল জলাশয়ের পতি দেব হংসবাহন বরুণ সমুদ্র-নদী-নদসহ পূজিত হইয়া প্রীতিযুক্ত হউন । ৬৫-৬৬ ।

বৈনতেয় ! মহাসত্ত্ব ! সর্ব্বপক্ষপতে ! বিভো ! দেব ! মৎ-কর্তৃক উদ্যত মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ করুন । ৬৬ ৬৭ ।

সঙ্কেত :—বৈনতেয়—বিনতা-নন্দন। বিনতা—মহর্ষি কশ্যপের এক স্ত্রী। মহ সত্ত্ব—মহাবল।

মূল :—ধনাধ্যক্ষ যক্ষপতি লোকনাথ ধনেশ্বর গুহ্যক ও যক্ষসহ আমার বলি প্রতিগ্রহ করুন । ৬৭-৬৮ ।

নাট্যমাতৃগণকে নমস্কার। ব্রাহ্মী প্রভৃতি (অষ্টশক্তিকে) নমস্কার। সুমুখী ও প্রসন্না তাঁহাদিগের দ্বারা বলি সম্যগ্‌রূপে প্রতিগৃহীত হউক । ৬৮-৬৯

সঙ্কেত :—সগুহ্যকঃ সযক্ষশ্চ (ব); সগুহ্যকৈশ্চ যক্ষৈশ্চ (কা)।

মূল :—সকল রুদ্রপ্রহরণ আমার বলি প্রতিগ্রহ করুন।

হেমন্তের গান

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

ধান কাটা শেষ হলে রিক্ত মাঠে ফাটলের ধারে
কখনো সখনো কোনো নামহীন গোত্রহীন ফুল
হেমন্তের বাষ্প ছুঁয়ে হয়ে গেলে শিশিরে আকুল,
সহরে স্নায়ুতে আনে স্বপনের রঙ বারে বারে;

বুনো ঘাসফড়িঙের দল যায়, ভিড় করে আসে—
রাখে কি রাখে না বুঝি মখমল মোমের মতন,
বিচিত্রিত প্রজাপতি বয়ে আনে স্পন্দিত জীবন,
মেয়েদের মত চঞ্চ কাঁপে ফুল কখনো বাতাসে।

সহরে পাঁচীল ভেঙে হেমন্তের রৌদ্র এলে ঘরে—
কখনো সে-মেঠো ফুল স্বপ্নবহ গন্ধের আতরে
মনে যদি রেখে যায় প্রত্যহের বিস্মৃতির নাম,
নিয়ে যায় কল্পনার যদি কোনো নিভৃত অন্দরে···

কোথায় হেমন্ত স্বপ্ন ? অফিসের বেলা হলে পরে
কেরাণী বোঝাই ট্রামে স্থান করি—জীবন-সংগ্রাম !

আর বিষ্ণুপ্রহরণও বিষ্ণুভক্তিবশতঃ মৎকর্তৃক উদ্যত (বলি) গ্রহণ করুন) । ৬৯-৭০ ।

সঙ্কেত :—রুদ্রপ্রহরণং সর্ব্বং (ব);—চৈব (কা)। রুদ্রপ্রহরণ—পিনাক, ত্রিশূল ইত্যাদি। বিষ্ণুপ্রহরণ—সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা, নন্দক খড়্গ, শার্ঙ্গ ধনুঃ ইত্যাদি।

মূল :—আর কৃতান্ত ও কাল সকলপ্রাণি-বধে ঈশ্বর। মৃত্যু ও নিয়তি—আমার বলি প্রতিগ্রহ করুন । ৭০-৭১ ।

সঙ্কেত :—নাট্যশাস্ত্রমতে যম, কৃতান্ত, কাল, মৃত্যু—পৃথক্ পৃথক্ দেবতা সর্ব্বপ্রাণি-বধেশ্বরৌ (ব); সর্ব্বপ্রাণিবশেশ্বরৌ (কা); পাঠান্তর—সর্ব্বপ্রাণিধনেশ্বরঃ।

মূল :—আর এই মত্তবারণীতে যে সকল বাস্তুদেবতা সংশ্লিষ্ট আছেন (তাঁহারা) আমার এই মন্ত্রপূত বলি সম্যগ্‌রূপে প্রতিগ্রহ করুন । ৭১-৭২ ।

আর অন্য যে সকল দ্যুলোক-অন্তরিক্ষ-ভূমিস্থিত দেব-গন্ধর্ব্ব দিক্ সমাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের (উদ্দেশে) এই বলি প্রদত্ত হইল । ৭২-৭৩ ।

সলিল-সম্পূর্ণ পুষ্পমালা-পুরস্কৃত কুম্ভ রঙ্গমধ্যে স্থাপিত করা উচিত; আর উহাতে সুবর্ণ প্রদান করাইবে । ৭৩-৭৪ ।

সঙ্কেত :—সলিল-সম্পূর্ণং (ব); সলিলপূর্ণং চ (কা)। পুষ্পমালাপুরস্কৃতম্ (ব); পর্ণমালা···(কা)। পুষ্পমালা-পুরস্কৃত—পুষ্পমালাদ্বারা যাহার অগ্রভাগ সজ্জিত।

মূল :—সকল আতোদ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া গন্ধ-মাল্য-ধূপ-ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমূহ-দ্বারা পূজা করিবে । ৭৪-৭৫ ।

সঙ্কেত :—বস্ত্রোত্তরাণি (মূল)—বস্ত্রাচ্ছাদিত; যাহার উপর বস্ত্র বিদ্যমান। 'আতোদ্যানি' পদের বিশেষণ। আতোদ্য-বাদ্য।

অতঃপর জর্জ্জর-পূজা। পরবর্ত্তী সংখ্যায় রঙ্গপূজার বিবরণ সমাপ্ত হইবে। [ক্রমশঃ

বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার

বনদুর্গা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

ময়মনসিংহ, ঢাকা, এবং বাংলার অপর বহু স্থানে, শ্রীহট্টে বহু হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে বনদুর্গা নামক কোনও দেবীর পূজা বা ব্রতের প্রচলন আছে। কেহ কেহ ইঁহাকে দশভুজা-দুর্গার কন্যা, আবার কেহ বা ইঁহাকে তাঁহা হইতে অভিন্না মনে করেন। আবার কেহ ইঁহাকে বনদেবী, কেহ বা গ্রামদেবী, কেহ বা অন্য কোন স্বতন্ত্র দেবী বলিয়াও ভক্তি কামনা জানাইয়া থাকেন।

ময়মনসিংহের পূজায় বা ব্রতে কোন মূর্ত্তি স্থাপন করিতে দেখা যায় না, কিন্তু ঢাকা জেলায় ধামরাই, রঘুনাথপুর, সাভার, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে "চতুর্ভুজা, ব্যাঘ্রাসীনা, ব্যাঘ্রাম্বর-পরিহিতা, নীল জীমূতসন্নাশা" মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বনদুর্গার পূজা করা হয়। ঐ জেলার নাল্লার গ্রামে এক নমঃশূদ্র-বাড়ীতে শ্রীশ্রীবুড়াকালী নামে বনদুর্গা প্রতিষ্ঠিতা আছেন, ইনি মাত্র দেড় শত বৎসরের প্রাচীন। পৌষ-সংক্রান্তি ছাড়া সে অঞ্চলে বৈশাখের শনিবারে অমূর্ত্তি বনদুর্গার পূজারও প্রচলন আছে। ঢাকা জেলার বংশাই ও কাকিলাজানি নদীর সঙ্গমস্থলে 'ত্রিমোহানার ঘাটে' দেবীর অন্যতম পীঠস্থান বলা হয়। কিন্তু বনদুর্গার উৎপত্তি ও জীবন-ইতিহাস বিষয়ে কাহারও ধারণা খুব স্পষ্ট নহে।

ময়মনসিংহের আলাপসিংহ পরগণার এক কায়স্থ বৃদ্ধা বলিলেন, এক দিন দুর্গার ইচ্ছা হইল শাঁখা পরিবেন; তিনি শিবের কাছে শাঁখা চাহিলেন। শিব গরীব; তিনি ভাং-ধুতুরা খান, শ্মশানে থাকেন, শাঁখা দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। দুর্গা বুঝিয়াও বুঝিলেন না, শাঁখা না পাইয়া রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন(১)। শিব অতি বৃদ্ধ, কে তাঁহার সেবাযত্ন করে? অবশেষে এক শাঁখারীর বেশে তিনিও যাইয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। শাঁখা পরিতে আসিয়া শাঁখারীর হাতে এত বড় অভিমানী দুর্গা ধরা পড়িলেন; তিনি স্বামীকে চিনিলেন এবং বিবশ হইলেন। কিন্তু ছদ্মবেশী শিবকে তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষে চেনা সম্ভব হইল না। কিছু-কাল পরে দুর্গার এক কন্যা জন্মিল; লোকলজ্জা ভয়ে সেই কন্যাকে তিনি শেওড়াতলে পরিত্যাগ করিয়া শিবের সংসারে চলিয়া গেলেন। এই পরিত্যক্ত শিবদুহিতাই বনদুর্গা নামে সকলের ভক্তি-অর্ঘ্য পাইয়া আসিতেছেন।

মশিকজিয়াল পরগণার অপর এক সত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা বলিলেন, মেয়েলি আচার-ব্রত যত, সকলই দুর্গাদেবী এক বৃদ্ধার বেশে নরলোকে প্রচার করিয়াছেন। আচার-ব্রত প্রচারকারিণী সেই বৃদ্ধাকেই বনদুর্গা নামে প্রায় সমস্ত শুভকার্য্যে সকলের পূর্ব্বে পূজা করা হয়। বক্তা তাহার মতের সমর্থনে একটি পুরা কাহিনীও কহিলেন; ইহা না কি তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরুর মুখে শুনিয়াছেন।—এক দিন পঞ্চমুখ মহাদেব চতুর্ভুজ গণেশকে বলিলেন, আমি আজ একসঙ্গে পাঁচ পর্ব্বের কথা ব্যক্ত করিব, তুমি লিখিয়া যাও। গণেশ চার হাতে মাত্র চারি পর্ব্বের কথাই লিখিতে পারিলেন, অপর এক পর্ব্বের কথা আর লেখা হইল না। উত্তরকালে মহাদেব উহা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গণেশকে বলিলেন, তুমি কি নিমিত্ত নরলোকের এক-পর্ব্ব কথা নষ্ট করিয়া দিলে? তখন দুর্গা তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন, এ বিষয়ে চিন্তার কিছুই নাই; তোমার মুখনিঃসৃত বাক্য আমি সকলই শুনিয়াছি, সকলই আমার স্মরণ আছে, আমিই তাহা নরলোকে প্রচার করিব। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মেয়েলি আচার-ব্রত শেষে দুর্গা দেবীকেই প্রচার করিতে হইয়াছিল এবং সেইগুলি যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কি না, দেখিবার জন্য তিনি আজিও বনে নিভৃতে অবস্থান করিতেছেন, সেই হেতু দুর্গাই বনদুর্গা।

যাঁহাদের মতে বনদুর্গা গ্রামদেবী বা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহারা বলেন, দেশের যেমন রাজা থাকে, তেমনি এক এক গ্রামের বা স্থানের এক এক জন অধিদেবতা আছেন। ইঁহার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির উপর গ্রামের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। গ্রামের মানুষ, পশু পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, ফলমূল, শস্য সকলই ইঁহার অধিকারে, তাই অন্য দেবতার পূজার প্রাক্কালে, বিবাহ, জাতকর্ম্ম, অন্নারম্ভ প্রভৃতি শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে অগ্রে ইঁহার তুষ্ট্যর্থে পূজা করিতে হয়, নতুবা ইঁহার কোপদৃষ্টিতে সব কিছু পণ্ড হইতে পারে। বনদুর্গা গ্রামের এইরূপ অধিদেবতাদেরই একজন; তবে তাঁহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী, অন্যান্যের ন্যায় গ্রামবিশেষেই তাহা সীমাবদ্ধ নয়, বহু গ্রাম, বহু পরিবার তাঁহার এলাকাভুক্ত।

কেহ আবার বনদুর্গাকে বনদেবী বলিয়া মনে করেন। এক সময়ে সমস্ত দেশ নিবিড় বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, বনে জঙ্গলেই মানুষ বাস করিত, চরিয়া বেড়াইত, ফলমূল খাইত, বল্কল পরিত, ফুলপাতা মাথায় গুঁজিত। এমন যে বন, যাহা মানুষকে সেই আদিম যুগে সর্ব্বতোভাবে জীবন ধারণে সাহায্য করিয়াছিল তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনদেবী উত্তর কালে হয়তো বনদুর্গায় রূপান্তরিত হইয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, বনদুর্গা দুর্গার কন্যা, দুর্গার রূপান্তর, মেয়েলি আচার ব্রতের প্রচারকারিণী বৃদ্ধা, গ্রামদেবী, বনদেবী বা চতুর্ভুজা ব্যাঘ্রাসীনা ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিতা অন্য যে দেবীই হউন না কেন, বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ইঁহার প্রভাব আজও অপরিসীম। ইঁহাকে পূজা না করিলে অনেক শুভানুষ্ঠানই সুসম্পন্ন হয় না, ইঁহার পূজায় সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়—এই ধারণা তাহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। ঢাকা জেলার ত্রিমোহানার ঘাটে, নাল্লার, রঘুনাথপুর, সাভার, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ ঘটা করিয়া ছাগ মহিষাদি বলি দিয়া বনদুর্গার পূজা হয়, তাহাতে ইঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হয়। ময়মনসিংহের ব্রতিনীরা ইঁহাকে আবার একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছেন; ব্রতের অনুষ্ঠানে ও ব্রতগীতিতে দেখা যাইবে যে, বনদুর্গা ব্রতিনীদের সঙ্গে সখীত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোলাকুলি করিতেছেন।

শেওড়া, বট, পাকুড়, এই দেবীর আবাসস্থল। ঢাকা ও ময়মনসিংহের অনেক হিন্দুপল্লীতেই বনদুর্গাধিষ্ঠিত দুই একটি পূজনীয় শেওড়া, বট বা পাকুড়গাছ দেখা যায়; ঐ সকল গাছের গোড়ায় বনদুর্গার পূজা বা ব্রত হইয়া থাকে। গাছগুলি দেবীর আবাসস্থল মাত্র হইলেও সাধারণ লোক এইগুলিকেও বনদুর্গার ন্যায়ই মান্য করে। এই সকলকে

---

(১) দুর্গার শাঁখা পরিবার সাধ, রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়া এবং শিবের শাঁখারী বেশ ধারণ ও সে সাধ পূর্ণ করা—এই উপাখ্যান আমরা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত শিবায়নে এবং অনেক লৌকিক শিবদুর্গা-বিষয়ক গীতিতেও পাই।

অমান্য করিয়া, এই গাছ জোর করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন, এইরূপ কিংবদন্তীর অভাব নাই। অনেক সময় নির্দ্দিষ্ট পূজনীয় গাছের অভাবে ব্রতকালে সাধারণ শেওড়া বা বট পাকুড়ের ডাল পুঁতিয়া ব্রত সম্পন্ন করা হয়।

আমি এখানে ময়মনসিংহের নাশিরুজিয়াল ও হুসেনশাহী দুইটি পরগণার বনদুর্গার ব্রতের আচার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিলাম। সকলই আমার নিজের চোখে দেখা এবং ব্রতিনীদের নিকট হইতে শুনা।

অনেক ব্রতেরই একটি সাধারণ সংস্করণ ও একটি রাজসংস্করণ দেখা যায়। প্রথমটির প্রচলিত নাম 'বনদুর্গার বারান্', আর দ্বিতীয়টির প্রচলিত নাম 'গাছের গোড়ার বর্ত্ত (ব্রত)'

'বনদুর্গার বারানের' মধ্যে আয়োজন উদ্যোগের বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই এবং ইহার প্রচলনই অধিক এবং ব্যাপক। ইহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, গীতবাদ্যও নাই। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ করিয়া সন্তানবতীরাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা, অধিকারী ও পুরোহিত(২) চলিত বৎসরে ঋতুতে ঋতুতে নূতন যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়, ব্রতিনী তাহা অগ্রে বনদুর্গাকে নিবেদন করেন এবং পরে নিজে আস্বাদন করেন। যেমন বৎসরে প্রথম ইলিশ মাছ কি শুটকি মাছ বাজারে উঠিল, নূতন ধান কলাই বাড়ীতে আসিল, বাগানে নূতন শাকসবজী ফল মূল ধরিল,—ব্রতিনী এই সব খণ্ডের যাহা সংগ্রহ করিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করেন,—কখনও খৈ, চিড়া, ঝাঁই(৩), গুঁড়া(৪), কখনও ফলমূল চাল কলা; কখনও বা ভাত ব্যঞ্জন ডাল তরকারী। ঘরের 'মধ্যমপালার(৫) গোড়ায় কলার দুইটি আগপাতায় ঐ ভোগ নৈবেদ্যাদি সাজাইয়া দিয়া ব্রতিনী বনদুর্গার উদ্দেশে ভক্তি কামনা জানান এবং উলুধ্বনি করিয়া একটি ঠাঁইং(৬) নিয়া শেওড়া তলায় অথবা বটতলায় দিয়া আসেন। সেই গাছে তখন দেবীর অধিষ্ঠান হয়, এইরূপ বিশ্বাস।

ঠাইতের যৎকিঞ্চিৎ যদি কাকে গ্রহণ করে, তাহা হইলেই ব্রত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, মনে করা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, বনদুর্গা কাকরূপে আসিয়া ভক্তদের দেখা দেন। যদি কাক না আসে এবং আসিয়াও ভোগ স্পর্শ না করে, তবে ব্রতিনীর দারুণ আশঙ্কা হয়। তিনি গলায় কাপড় জড়াইয়া অজ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পুনর্ব্বার বিশেষ ঘটা করিয়া ব্রত করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। গাছের তলদেশ হইতে দূর্ব্বা, কখনও বা গাছের পাতা কুড়াইয়া সন্তানের মাথায় আশীর্ব্বাদস্বরূপ দেওয়া হয়। বৎসরের যে কোনও শনি বা মঙ্গলবারে দিবসে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত শ্যামাপূজা, দুর্গাপূজা, পদ্মাপূজা প্রভৃতি পূজা পর্ব্ব উপলক্ষে এবং চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখ সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি দিবসেও অনেক পরিবারে খৈ চিড়া গুঁড়া চাল কলা অথবা নিরামিষ ভাত ব্যঞ্জনে বনদুর্গার এই অনাড়ম্বর 'বারান্' অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। [ক্রমশঃ

---

(২) পূর্ব্বে ঢাকায় বনদুর্গা পূজার যে উল্লেখ করিয়াছি, সেই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও অধিকারী পুরুষ।

(৩) চাউল ভাজা। (৪) ভাজা চাউলের কিংবা চিড়ার গুঁড়া।

(৫) প্রধান বাসগৃহের একটি বিশেষ খুঁটি যাহার গোড়ায় ব্রতাদি করা হয়। (৬) দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খৈ চিড়া, ভাত ডাল ইত্যাদি সহ কলার আগপাতা; ইহার অন্ত অর্থ সেই স্থানেই ঠাঁইং খুন।'

রবীন্দ্রনাথের "জীবিত ও মৃত"

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত বহুপঠিত "জীবিত ও মৃত" গল্পটি তাঁর "গল্পগুচ্ছে" পড়বার বহু পূর্ব্বে (অর্থাৎ আমার বয়স যখন দশ কি এগারো) এই রকমের একটি গল্প শুনেছিলাম আমার জ্যাঠামশাইএর কাছে। আমার জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় তারকনাথ অধিকারী ছিলেন তখন পাবনার বিখ্যাত উকীল এবং ঠাকুর-জমিদারবাবুদের ঘরের উকীল ও আমমোক্তার। তিনি বাড়ীর মেয়েদের আসরে রবীন্দ্রনাথের সে সময়কার 'হিতবাদী' সংস্করণ থেকে "জীবিত ও মৃত" গল্পটি পড়ে আমাদের শুনিয়েছিলেন। তাঁর অনুপম পাঠ-ভঙ্গী ও আবৃত্তি তাঁর জমকালো বিরাট চেহারার সঙ্গে মিলে এই গল্পটি আমাদের মনে এমন ভয়ঙ্কর ও করুণ ভাবের সৃষ্টি করেছিল যে, সে সময় কত দিন স্বপ্নে কাকীমার (কাদম্বিনীর) করুণ চেহারাখানা দেখে আমাদের কিশোর-চিত্ত কেঁদে আকুল হয়ে উঠতো। গল্পটিকে আমরা "কাকীমার গল্প" নামে ব'লে এককাল অনেককে মুগ্ধ করেছি।

জ্যাঠামশাই গল্পটি পড়েই বলেছিলেন, অবিকল এমনি একটি সত্য কাহিনী তিনি বাবুমশাইকে (রবীন্দ্রনাথকে) বছর দুই-তিন আগে শুনিয়েছিলেন এবং সে কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। তিনি বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ১৪।১৫ বছরের বড় ছিলেন এবং জমিদারী কাজের অবসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গল্প শুনতে বড় ভালবাসতেন। তাঁর গল্প বলবার ভঙ্গিটি ছিল অপূর্ব ও জীবন্ত, কারণ, তিনি এক জন ভালো অভিনেতা ছিলেন। তাঁর কাছে শোনা সত্য কাহিনীটাই যে রবীন্দ্রনাথের "জীবিত ও মৃত" কাহিনীর আসল উপাদান তা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ (১২৯৭-৯৮) 'হিতবাদী' পত্রিকার জন্যে অনেক গল্প লিখেছিলেন শিলাইদহে বোটে বসে। এবং সে গল্পগুলো তাঁর অনুপম কল্পনা-শক্তিতে কথাসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি বলে আদৃত হলেও তার অধিকাংশ উপাদানই যে পল্লীর বাস্তব কাহিনী থেকে তিনি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়। তিনি নিজেও তাঁর অনেক কাহিনীর বাস্তব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন (প্রভাতবাবুর রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম, ২২২ পৃঃ)।

আমার জ্যাঠামশাইএর কথিত তাঁরই নিজের জীবনের এই সত্য ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের "জীবিত ও মৃত" গল্পটির সঙ্গে কি হুবহু মিলে যায় তা জ্যাঠামশাইএর বর্ণিত ঘটনা থেকেই বেশ বোঝা যাবে। "জীবিত ও মৃত" গল্পের অপূর্ব ভয়াবহ পটভূমিকা এবং জীবন্ত শ্মশানে দুর্য্যোগময়ী গভীর নিশীথে শবদাহের অনুপম কাহিনীটি যেন সত্যকার অভিজ্ঞতার ফল। রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী এই সত্য কাহিনীকে অপূর্ব কল্পনা ও অসামান্য মননশীলতায় কি সুন্দর সার্থকতায় বিকশিত করেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আমার জ্যাঠামশাই নিজেই যেন তাঁর জীবনের মর্ম্মভেদী ভয়াবহ কাহিনীটা বলছেন, এই ভাবে আমি তাঁর বর্ণিত ঘটনাটি বলছি। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে, তাঁর এই প্রত্যক্ষ ঘটনাটিই যে রবীন্দ্রনাথের "জীবিত ও মৃত" গল্পের উপাদান তাতে তাঁর অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

তিনি বলছেন—তখন আমরা পাশ ক'রে পাবনায় উকিল হয়ে বসেছি; পয়সাও বেশ পাচ্ছি। আমাদের তরুণ উকীলদের একটি

দল ছিল ; তাতে উকীল গিরিশ রায়, প্রকাশ রায়, ডাক্তার গৌরীচরণ, জগৎ রায় আর আমি ছিলাম বিশেষ উৎসাহী ও সাহসী। পাবনার সুবিখ্যাত "—"এর জমিদার-পরিবার আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং জমিদারবাবুরা আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন।

সেই সময় ঐ জমিদারবাবুদের বাড়ীতে এক দিন সন্ধ্যায় সকল বন্ধুতে বসে তাস খেলছি। তখন হঠাৎ বাবুদের অন্দর থেকে খবর এলো, তাঁদের বাড়ীর এক বালবিধবার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বাবুদের এক ছেলে "কাকীমা, কোথায় গেলি" বলে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ছে। সদ্যমৃত বিধবাটির নয়নের মণি ছিল তাঁর শিশু দেবর-পুত্রটি। সে-ও ছিল কাকীমা-অন্ত প্রাণ, কারণ, তার মা ছিলেন চিররুগ্না।

শ্রাবণ মাস। সকাল থেকেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। সেদিন কিসের যেন ছুটীতে আদালত বন্ধ। জমিদারবাবু খুব মুসড়ে পড়লেন। তাঁর বিশেষ ভাবনা হল যে, এই দুর্য্যোগে শবদাহ করার কি হবে! মৃত্যুটাও এমন আকস্মিক যে দাহকার্য্যের উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ করা সময়-সাপেক্ষ। জমিদারবাবু তাঁর আমলাদের বললেন। কিন্তু শুকনা কাঠ ঐ ঘন বর্ষায় কোথাও সংগ্রহ করতে না পেরে বাগানের আম গাছ কেটে কাঠ তৈরীর ব্যবস্থা হ'ল। সন্ধ্যার পরেই আকাশ একেবারে কালীবর্ণ হ'য়ে গেল। এদিকে অন্তঃপুরে ছেলেটা "কাকীমা রে কাকীমা" ব'লে কেঁদে গড়াচ্ছে। মেয়েরা সবাই কাঁদছে। একে সন্ধ্যা তাতে দুর্য্যোগ, তাতে আবার শোকের দুঃসহ বেদনায় মনটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল।

রাত একটু হলে যখন জানা গেল কাঠ তৈরী হ'চ্ছে, তখন আমরা চার-পাঁচ জন উকীল ও ডাক্তার-বন্ধু শব নিয়ে শ্মশানে যাত্রা করলুম। কথা রইলো, আমলারা কাঠ চেরাই হলেই বাগান থেকে গাড়ী ক'রে কাঠ নিয়ে শ্মশানে যাবে। বেদনা-ভরা মনে শব কাঁধে নিয়ে রওনা হলাম। ছেলেটা "ও রে কাকীমা রে—কোথায় গেলি রে" ব'লে কেঁদে গড়াতে লাগলো।

শিঙের শ্মশান পাবনা টাউন থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে। নিকটে আর শ্মশান ছিল না। শিঙের শ্মশানকে লোকে মহাশ্মশান বলে থাকে। সেখানে না কি রাত্রি হলেই মা কালী জিভ বের ক'রে চুল এলিয়ে দিয়ে, তাঁর ভয়ঙ্কর দৈত্যদানাদের নিয়ে ভীষণ নৃত্য সুরু করেন। সারারাত নেচে গেয়ে রক্ত খেয়ে হি-হি ক'রে হেসে শেষ রাত্রে ইছামতীর কালো জলের শেওলার মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকেন আর দৈত্য-দানারা মড়ার হাড় চিবিয়ে শ্মশানের বড় বড় তেঁতুল আর অশথ গাছের পাতার মধ্যে শুয়ে থাকে। আমরা দল বেঁধে একটা লণ্ঠন আর হুঁকো-কল্কে নিয়ে রওনা হলাম। মেঘের গর্জ্জন বেড়ে উঠলো ; বিদ্যুৎ চমকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগলো। দেড় ক্রোশ দূরে সেই মহাশ্মশানে উপস্থিত হ'য়ে আমরা ইছামতী নদীর একেবারে কিনারে মড়ার খাটিয়া রেখে সবাই তামাক খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিলাম। খাটিয়া থেকে মড়া বালীর উপরে নামিয়ে মড়া ছুঁয়ে বসে কাঠের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এলো হুড়-মুড় ক'রে ভয়ানক বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন, বিদ্যুতের ভীষণ চমকানি আমাদের যেন কোন্ ভয়ানক প্রেতপুরীতে নিয়ে গেল। আমরা ভয়ে আর কোন উপায় না পেয়ে সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি মাথায় করে তীরে দৌড়ুলাম এবং একটা ভাঙ্গা বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম। থাকলো মড়া ঐখানে। 'চাচা আপন বাঁচা' আমরা তো আর মড়ার সঙ্গে মরতে পারি না।

ঝাড়া দু'ঘণ্টা মুসলধারে বৃষ্টি ; তার পর সুরু হল ঝড়। মড়-মড় করে কতকগুলো বড় বড় তেঁতুলের ডাল ভেঙ্গে পড়লো সামনে। কাঠের গাড়ী এ দুর্য্যোগে শিঙের শ্মশানে যে আসবে, সে কথাটা তখন কল্পনার অতীত ব'লে মনে হল। ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে কয় বন্ধুতে কাঁপতে কাঁপতে শ্মশানে এসে দেখি, কী সর্বনাশ! মড়া নেই, মড়ার খাটিয়ার অর্দ্ধেকটা ইছামতীর জলে দোল খাচ্ছে।

এখন উপায় ? শীতে কাঁপতে কাঁপতে মড়া খুঁজতে লাগলুম। জলের মধ্যে নেবেও খোঁজা সুরু করলাম, কিন্তু হায়, মড়া কোথায়ও পাওয়া গেল না। আমাদের তখন অবস্থা শোচনীয়। প্রাণ যায় আর কি! কী করা যাবে। কেউ পরামর্শ দিলেন, ফিরে গিয়ে বাবুদের বললেই হবে যে শবদাহ হয়ে গেছে। কে আর দেখতে আসছে ? আমরা তিন জন ছিলুম উকীল, আমরা বললুম তাতে বাবুরা খুব সন্দেহ করবেন। মড়া হয়তো ভেসে কোন গাঁয়ে গিয়ে উঠবে—তাঁদের সে কথা কানে যাবে। এদিকে ঝড় বৃষ্টি থেমে গিয়েছে প্রায় দু'-তিন ঘণ্টা হল, এখনও কাঠের গাড়ীর কোন সন্ধান নেই। ভোর হবারও আর দেরী নাই। বৃষ্টির তোড় আর বাতাসের জোরে ইছামতীর স্রোতে মড়া কোথায় গেছে কে তার সন্ধান দেবে।

তবু আমরা নদীর কূলে কূলে খুঁজছি! ভোর হল বটে, কিন্তু আকাশ এমনি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো যে, প্রভাতকে অমাবস্যার রাত বলে মনে হ'তে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে দেখি, ইছামতীর প্রায় এক মাইল উজানে একটা বিধবা মেয়ে নদীর মধ্যেকার একটা গাছের ডালের উপর ঠেস দিয়ে ব'সে রয়েছে। তার ছেঁড়া কাদামাখা কাপড় বাতাসে উড়ছে। মেয়েটিও দিব্যি ডালে ব'সে আরাম ক'রে দোলা খাচ্ছে। ওরে বাপ রে! ওদের বিধবা বৌ তবে নিশ্চয়ই মরে নাই। সন্ন্যাস রোগে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলো, শ্মশানে এসে বৃষ্টির ঠাণ্ডা জলে বেঁচে উঠেছে। কী অসম্ভব ব্যাপার!

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম। বৌটির কাছে যেতেও সাহস হয় না, না গেলেও তো উপায় নেই। এখন এই জ্যান্ত বিধবা বৌকে নিয়ে কি করা যাবে ? আমরা শুধুই ভাবছি, কোনও উপায় ঠিক করতে পাচ্ছিনে। এমন সময় গ্রামের একটা লোক ঐ ঘাটে নাইতে আসছিলো। সে বললো,—"মশাইরা বোধ হয় মড়া পোড়াতে এসেছেন। ঐ-তো আপনাদের মড়া। জলঝড়ে এই ঘাটে ভেসে এসে ঐ ডালে আটকে আছে। যান যান ; লোকে যে ভয়ে মরে যাবে। শীগগির আপনারা নিয়ে গিয়ে দাহ ক'রে ফেলুন গে।"

এতক্ষণে আমাদের বুদ্ধির গোড়ায় জল এলো। কাছে গিয়ে দেখি, কে বলবে মড়া, বাঁ হাতের উপর মাথা রেখে ডালের উপর বসে মেয়েটি যেন চেয়ে রয়েছে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে, আর পা দু'খানা নাচাচ্ছে। শেষে মড়া সেখান থেকে শ্মশানে আনা হ'ল, ইতিমধ্যে কাঠও যথাস্থানে এসে পৌঁছেছিলো। শবদাহ সেরে বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল। জমিদারবাবুদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনলুম, ছেলেটি আকুল হয়ে কাঁদছে—"ওরে কাকীমা রে,—কোথায় গেলি রে।" এই বাস্তব ঘটনার উপরে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার তুলিটেনে যে চিত্র এঁকেছেন, তা কেমন করুণ—তা সকলেই জানেন। তাঁর কাকীমা জীবন্ত ফিরে গিয়ে সত্যি সত্যি মরে প্রমাণ করতে বাধ্য হলেন যে তিনি মৃতা

বিবাহিত জীবনের সাফল্য কিসে?

দীপালী ঘোষ
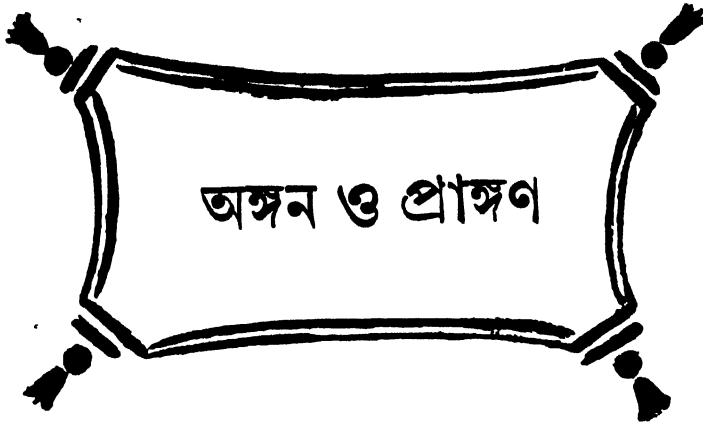
জীবনের আসল বাঁক হোলো বিবাহ। বিবাহের পূর্ব্বের 'আমি' এবং বিবাহের পরের 'আমি'র মধ্যে রীতিমত একটা পরিবর্ত্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্ত্তিত নতুন জীবনকে নতুন ভাবে সুন্দর কোরে তৈরী কোরে তোলাতেই আমাদের আসল দায়িত্ব এবং আসল কৃতিত্ব। যারা যত নিপুণ কারিগরের মতো নিপুণ ভাবে এর ভিৎ গাঁথ্‌তে পারবে ঠিক ততখানিই আনন্দে ভরে' উঠবে তাঁদের জীবন। বিবাহ-বাসরে রঙীন ওড়নার ফাঁকে ফাঁকে জীবনটা যত হালকাই মনে হোক্‌ না কেন, বিবাহিত জীবন মোটেই হালকা নয়—এ-জীবনের ভার আছে, দুঃখের গুরুত্ব আছে এবং আনন্দেরও গভীরতা আছে, এ-জীবনকে প্রথমে বোঝা প্রয়োজন. জানা প্রয়োজন এবং সব চেয়ে বড়ো কথা এবং শেষ কথা 'adjust' করা প্রয়োজন—অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রয়োজন। জীবনের বিকাশের মূল কথা যেমন 'adaptability', তেমনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনেরও মূলকথা তাই। তবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োজন ছোট ছোট জিনিষে—যা ঘটে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়। মিলিত জীবনের মূল সুরটি নষ্ট করে না এমন কোনো কাজ বা অভ্যাস—সে যারই হোক না কেন—আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। এখানে একক দায়িত্বের কোনো প্রশ্ন আসে না—দায়িত্ব দু'জনেরই। তবু তার মধ্যে মেয়েদের উপরেই দায়িত্বের ভারটা একটু বেশী। কারণ ঘর বাঁধে মেয়েরাই—তাকে সযত্নে লালন-পালন কোরে সার্থক কোরে তোলাও মেয়েদেরই কাজ। তা বলে ছেলেদের দায়িত্ব যে একেবারে নেই তা-ও তো নয়। ছেলেদের এবং মেয়েদের মধ্যে যে স্বাভাবিক ব্যবধান থাকে, তার জন্যে যদি মেয়েদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব থাকে, তাদের যদি জীবনের সঙ্গী বোলে গ্রহণ করতে না পারে, তবে তাদের জীবনের আসল সঙ্গীত আরম্ভেই বেসুরো হয়ে যায়। জীবনের সঙ্গিনীকে মানুষের মর্য্যাদা দিয়েই জীবনে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মেয়েদের কাজ কিন্তু আরো সূক্ষ্ম; কারণ, তাদের গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তোলা অর্থাৎ কোনো কিছুর সুষ্ঠু রূপ দেওয়া হালকা ভাবে হেলায় হয় না। আমরা সাধারণতঃ ভেবে থাকি আর্থিক স্বচ্ছলতা যদি থাকে আর পরস্পরের প্রতি যদি ভালবাসা থাকে তবে আর চাই কি—তর্‌ তর্‌ কোরে নৌকোর মতো আনন্দে জীবন বয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়। দু'দিন পরে যদি কোনো দিন চেতনা হয়, চেয়ে দেখবো—কোথায় জীবনের স্পন্দন? গোটা জীবনটাই হয়ে গেছে একটা মেসিন, অনুভূতিহীন ইস্পাতের একটা মেসিন। ভোরবেলা উঠে চালিয়ে দিলেই হোলো একবার। তার পর চলতে থাকবে—খাবো, কাজ করবো, হাসবো, কাঁদবো সবই করবো কিন্তু কোনো কিছুতেই প্রারম্ভের মধুময় স্পর্শ পাবো না। তাই সবার মুখেই এক কথা—বিবাহ কি?—'দিল্লীকা লাড্ডু'—খেলেও পস্তাতে হবে, না খেলেও পস্তাতে হবে। জীবনের সব চেয়ে বড়ো সত্যের প্রতি এমন ধারণার একমাত্র কারণ হোলো আমরা জীবনের ছন্দটা ঠিক রাখ্‌তে জানি না; হয় অতিমাত্রায় সচেতন হই, নয়ত একেবারেই অচেতন হয়ে পড়ি।

আমাদের সাধারণ ঘরে শান্তি বজায় রাখতে হোলে প্রথমেই দরকার অর্থনৈতিক দিক্‌টা ঠিক রাখা। প্রত্যেকের সঙ্গতি অনুসারে গৃহিণীদের রেসন কেনা থেকে সুরু কোরে পাউডারটির পর্য্যন্ত হিসেব কোরে বাজেট করা এবং সেই বাজেট অনুযায়ী মাসের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত চালানো দরকার। এক কথায় সোভিয়েটের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মতো নিখুঁত পরিকল্পনা এবং তদনুযায়ী কাজ। সংসারের এই দিক্‌টা চলবে ঠিক মেসিনের মতো। তারপর আসে ব্যক্তিগত জীবনের কথা। প্রত্যেকেই আমরা স্বতন্ত্র মানুষ—প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আছে, অভ্যাস আছে, দোষ-ত্রুটি কত-কিছু আছে—এগুলির প্রতি একটু উদার মনোভাব থাকা দরকার। যেমন আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরাই নস্য ব্যবহার করে—মেয়েরা দেখেছি ওটা একেবারে সহ্য করতে পারে না। আমার অনুরোধে যদি আমার স্বামী এ-অভ্যাস না ছাড়েন তবে এ-কথা আমার ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, আমাকে তিনি অবহেলা করলেন বা একটু কম ভালবাসলেন। ওটা একটা অভ্যাস। যদি আমাদের দাম্পত্য জীবনে এর কোনো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া না হয় তবে এই ধরণের অভ্যাসগুলি মেনে নেওয়াই ভাল। এ-ছাড়া আছে সমান অধিকারের প্রশ্ন। কোনো কারণে কোনো স্বামী অল্প কারণেই ভয়ানক রেগে ওঠেন। তখন স্ত্রীটিও যদি সমান তালে চেঁচিয়ে ওঠেন তবে ব্যাপারটা রীতিমত সস্তা নাটকেই পরিণত হয়ে যায়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের, বিশেষ কোরে মেয়েরা ছেলেদের মানসিক অবস্থা বুঝে সেই ভাবে চললেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ, বাইরের নানা চিন্তায় ছেলেদের মানসিক অবস্থা সব সময়ে সুস্থ না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং যা-কিছু বলবার বা করবার তা সময় বুঝে বললে বা করলেই আর কোনো হাঙ্গামা থাকে না, এতে সম-অধিকার এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় না। বিবাহিত জীবনে আর একটি জিনিষের প্রয়োজন, যার কথা আমরা বিবাহের এক মাস পরেই একেবারে ভুলে যাই। সে হোলো রূপচর্চ্চা বা প্রসাধন। অনেকে এর প্রতি কটাক্ষ করেন. বলেন যে, তাদের স্বামিদেবতারা ভালবাসা দিয়েই পূর্ণ কোরে রাখবেন। এ-তর্ক অতি হাস্যকর এবং অর্থহীন। যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছি তাকে ভুললে চলে কি? মানুষ চিরকাল সৌন্দর্য্য-পিয়াসী। সারা দিনের খাটুনীর পর বাড়ী

ফিরে এসে স্বামীরা যদি দেখেন যে, স্ত্রীরা এলোচুলে ঝুঁটি বেঁধে মুখে কালি-ঝুলি মেখে তেল-চিটচিটে কাপড় পরে বাড়ীতে বিরাজ করছেন —কেমন লাগে তাঁদের ? প্রত্যেকের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে —চারিত্রিক এবং দৈহিক। সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহজ বিকাশই তাঁরা দেখতে চান—নিজেদের স্ত্রীকে মার্জ্জিত সুন্দররূপে তাঁরা দেখতে চান। ভালবাসা ত নিশ্চয়ই মূল্যবান, সেটাই চাই সবার আগে। কিন্তু তার আনুষঙ্গিক যে এই প্রসাধন তারও মূল্য আছে, তাকে ছাড়াও চলে না। এ হোলো জীবন-চিত্রের "ফিনিশিং টাচ"।

সবার শেষে সব চাইতে বড়ো কথা হোলো আমাদের যৌন-জীবন নিয়ন্ত্রণ। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এর গোড়া পত্তন না হোলে বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হবেই। সব চাইতে বড়ো আর্টিষ্ট আমাদের এখানেই হওয়া প্রয়োজন। এ-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকার জন্তেই আমাদের দেশের অধিকাংশ বিবাহিত জীবন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শূন্য ফাঁকা মাঠের মতো হয়ে যায়। জীবনের কোনো আকর্ষণ আর থাকে না।

মুখমণ্ডলের স্বাস্থ্য

মাধবী দেবী

প্রত্যেক নারীরই একটা ভয় আছে যে, মুখের ওপর বয়সের ছাপ পড়ে বার্দ্ধক্যকে লোকচক্ষের সামনে সুস্পষ্ট ভাবে মেলে ধরবে। পুরুষের চেয়ে নারীর মুখের ওপরই বয়সের ছাপ আগে পড়ে। সেই জন্তই সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে মেয়েরা ব্যবহার করে এত রকমের ক্রীম, স্নো, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক। বাহিরের প্রলেপের সাহায্যে মুখ এনামেল করা যায় বটে, কিন্তু মুখের মধ্যে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফুটিয়ে তোলা যায় না। তাই সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে হলে প্রথম চাই মুখের স্বাস্থ্য। ভাঙ্গা দেয়ালে রং মাখালে দৈন্য আরও বেশী প্রকাশ পায়, সৌন্দর্য্য অথবা আভিজাত্য মোটেই ফুটে ওঠে না।

মুখের স্বাস্থ্য কি করে অটুট রাখা যায় সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। উপায় সহজ। আর খুব বেশী সময়-সাপেক্ষও নয়।

(১) এই জায়গা থেকে প্রথম চুল ওঠা আরম্ভ হয়। কপালে যেখান থেকে চুল আরম্ভ হয় সেখানটা প্রত্যেক দিন মিনিট দু'য়েক ধরে ধীরে ধীরে ঘষতে হবে। আঙুল নাড়া চলবে না। আঙুল চেপে কপালের চামড়া নাড়তে হবে।

যদি চুল রুক্ষ হয় তাহলে একটু তেল লাগিয়ে নিলে সুবিধা হবে। বিশুদ্ধ নারিকেল তেলই ভাল। না হয় ঠাণ্ডা জল।

(২) এই সব স্থানের চুলে প্রথম পাক ধরে। খুব জোরে জোরে ঘষাই প্রকৃষ্ট উপায়। রক্ত-চলাচল বর্দ্ধিত হয়ে চুলের জীবনী-শক্তি ফিরে আসে। ঘষাটা নীচে থেকে ওপর দিকে। ঘাড় থেকে আরম্ভ করে ধীরে কিন্তু বেশ জোর দিয়ে চুলের ধার ধার দিয়ে কান পর্য্যন্ত। তার পর কান থেকে ওপর দিকে মাথার মাঝ অবধি। দশ-বারো বার অন্ততঃ।

(৩) আড়ভাবে কপালে রেখা-চিহ্ন। বার্দ্ধক্যের প্রথম ছাপ। অনেক সময় অত্যধিক চিন্তা অথবা স্বাস্থ্যহানির জন্য অতি অল্প বয়সেও কপালে গভীর রেখা পড়ে। কিংবা হয়ত কারো নিজের অজ্ঞাতসারেই বিরক্তিতে কপাল কোঁচকান, বিস্ময়ে ওপর দিকে ভ্রু তোলা অভ্যাস। তাতেও কপালে এই ধরণের রেখাপাত হয়। রাত্রে শোবার আগে আঙুলে একটু ক্রীম নিয়ে ধার থেকে মধ্যিখান অবধি ঘষতে হবে। তার পর এক দিকের কপালের চামড়া আঙুল দিয়ে চেপে ধরে আর এক হাত দিয়ে অন্য দিকটা ঘষতে হবে মধ্যিখান থেকে কানের দিকে। এই ভাবে প্রত্যহ দশ-পনেরো বার ঘষলে দু'-তিন মাসের মধ্যেই কপাল রেখাহীন হবে।

(৪) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে লম্বালম্বি রেখা-চিহ্ন। সাধারণতঃ কপাল কোঁচকালে অথবা চোখে জোর পড়লে এই ধরণের রেখা পড়ে। বেশ ভাল করে আঙুলে ক্রীম লাগিয়ে নাকের পাশ থেকে কপাল পর্য্যন্ত ঘষা দরকার। তার পর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে। সর্ব্বশেষে ভ্রূদ্বয়ের মধ্য থেকে চোখের নীচে দিয়ে কান অবধি। বেশ অনেকক্ষণ ধরে।

(৫) চোখের কোলে রেখা পড়লে ভাল লোশন দিয়ে চোখ ধুয়ে, চোখের পাতার ওপর এবং চারি দিকে খুব ধীরে ধীরে মধ্যমা দিয়ে ঘষলে তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যায়।

(৬) নাকের ওপর অনেক সময় রোমকূপের গর্ত্ত স্ফীত হয়ে পড়ে। প্রায়ই তার মধ্যে ময়লা ঢুকে বিশ্রী কাল দাগের মত দেখায়। রাত্রে শোবার সময় মুখে ক্রীম লাগিয়ে সকালে ভাল ভাবে মোটা তোয়ালে দিয়ে ঘষলে ময়লা উঠে যায়। স্নানের আগে মুখে গরম জলের ভাপ লাগালে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

(৭) নাকের ধার থেকে নীচের দিকে মুখের পাশে রেখা নেমে এলে বুঝতে হবে বার্দ্ধক্য এসে গেছে। জরা শত্রু জয়ী হতে বসেছে।

মুখে বেশ করে হাওয়া ভরে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়া ছাড়তে হবে। তার পর মুখে ভাল করে ক্রীম লাগিয়ে চিবুকের তলাটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে মধ্যেকার তিনটে আঙুল বেশ জোর

দিয়ে ওপর দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। শেষে রেখার চার পাশে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষতে হবে। অবশ্য এ রেখা যেতে বেশ কিছু দিন সময় লাগে।

(৮) ডবল চিন অর্থাৎ চিবুকের তলায় মাংস জমে আর একটা চিবুক তৈরী হয়ে যায়, বেশী মোটা হলে। অনেক সময় মাথা নীচু করে থাকার অভ্যাসও হয়। ডবল চিন দূর করতে হলে মাথা সর্ব্বদা উঁচু রাখা আর খুব নীচু বালিশে শোওয়া উচিত। মুখে ক্রীম মাখবার সময় চিবুক থেকে কানের দিকে হাত টেনে নিয়ে যেতে হবে। চাটির মতন করে, ধাক্কার ভাবে, ওপর দিকে। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে মাথা না নেড়ে ক্রমাগত মুখ খোলা আর বন্ধ। বেশ বড় করে হাঁ করতে হবে। এতে ডবল চিন অন্তর্হিত হয়। তবে একটু খাটুনি আছে।

আবার বলি, আসল সৌন্দর্য্য হল স্বাস্থ্য, কি মুখের কি দেহের। স্বাস্থ্যের আভা আর মেকী রঙের জলুস এক নয়। স্বাস্থ্য রক্ষা করলে সৌন্দর্য্য আপনি রক্ষিত হবে।

একটা ছবি

লিসি ব্যানার্জ্জী

ভাদ্রের ভরা দুপুর—
সামনে ভরা গঙ্গা—
আকাশে ময়লা মেঘ, বৃষ্টি নেই চড়া রোদ।

ইলসে নৌকো চলেছে—যেন পটে আঁকা ছবি,
এক জন মাঝি, হাল একহাতে, আর হাতে হুঁকো—
আর এক জন রান্না চড়াচ্ছে।
ওপারে একটা মন্দির—স্তব্ধ গম্ভীর।
চড়ার পরে ঘাস আর গাছগুলো যেন ঝলসে যাচ্ছে।
নদীর মাঝে বয়ায় বাঁধা—ষ্টীমহীন ষ্টীমার।
গঙ্গার ঘাটে—অবিরত লোক আসছে।
কেউ অলস অবসরে—
স্নানার্থে কেউ বা
ছুটে নেংটাছেলে জলে পড়ল ডিগবাজী খেয়ে—
একটা মেয়ে ছাইমাখা বাসন হাতে রইল চেয়ে
সেই দিকে,—
আকাশে এক ঝাঁক এরোপ্লেন—
গম্ গম্ করে কাঁপছে সারা পল্লীটা।
আফিসে কেরাণীরা হয়ত
কাজ করছে আপন ভুলে—
শ্রমিক,—বিলাসী—সবাই ব্যস্ত—
ওই কুকুরটা ক্লান্ত
জীব বার করে হাঁপাচ্ছে—
যদি এখন—
পৃথিবীর কেন্দ্রটা ফেটে যায়
এই অনন্তের মাঝে কোথায় আমি।

জাপান

জাপানে মেয়েদের একটু বেশী বয়সে বিয়ে হলে জাত যায় না। তবে সতেরো-আঠারো বয়সেই সাধারণতঃ বিয়ে হয়ে থাকে। সারা জীবন কুমারী থাকা নিষিদ্ধ। পাত্র পছন্দ ব্যাপারে বাপ মা মেয়েদের মত নিয়ে থাকেন। বিয়ের ব্যাপারে ঘটকের সাহায্য নিতে হবেই। এ একটা অবশ্য পালনীয় প্রথা। ঘটক ছাড়া বিয়ের কথাবার্ত্তা চলতেই পারে না। ঘটক বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাপ-মার মত নিয়ে তাঁদের পছন্দমত পাত্র জোগাড় করে দেয়। পাত্র-পাত্রীর জানাশোনা কোন বন্ধুর বাড়ীতে তাদের দেখা-সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করা হয়। উভয়ে উভয়ের রূপগুণের পরিচয় পায়। তার পর যদি উভয় পক্ষই বিয়ে করতে রাজী হয়, তবে পাত্র নিজের কোমরে বাঁধা সিল্কের কাপড় পাত্রীর হাতে অর্পণ করে। পাত্রী সেটি গ্রহণ করলে বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হয়। তখন দুজনের বাপ-মারা মিলে বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

বিয়ে করতে টোপর পরে বর কনের বাড়ী যায় না, কনে বরের বাড়ী যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় নিজের সব জিনিস-পত্তর। খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কাপড়, জামা ইত্যাদি সব, এমন কি খাবার কাঠি (চপষ্টিক) পর্য্যন্ত। তাছাড়া পাঁচ জনের উপহার ইত্যাদি তো আছেই। কেবল মাত্র বর-বধূই যে উপহার পায় তা নয়। বর-পক্ষের আত্মীয়-স্বজন, ছোট-বড়, এমন কি ঝি চাকর পর্য্যন্ত কনের বাড়ী থেকে উপহার পায়।

বিয়ের ব্যাপারে পুরুত, মন্ত্র, স্ত্রী-আচার, নাপিতের গলাবাজী এ সব থাকে না। যে ঘরে বিয়ে হয় সে ঘরে বর এবং কন্যাপক্ষের

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ থাকতে পায় না। ঘরে থাকে কেবল বর-বধূ, একটি রসিকা যুবতী আর ঘটক। যুবতী একটি পাত্রে সাকী (জাপানী মদ) পূর্ণ করে একবার বর একবার কনের মুখে ধরে। একই পাত্রে মদ্যপানের অর্থ যে, আজ হতে তাদের জীবন-পাত্র এক হল, আর উভয়ের সুখ-দুঃখের উভয়েই ভাগীদার হল। ঘটক হল সাক্ষী। তার পর উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনরা এলেন ঘরে। আশীর্ব্বাদ ইত্যাদির পালা চলল। শেষ হল নৃত্যে, বাদ্যে, মদ্যে, খাদ্যে। বিবাহের পর তৃতীয় দিনে কনের বাড়ী ভোজ। সে দিন বরের বাড়ী থেকে উপহার দিতে হবে কনের বাড়ীর সকলকে। আমাদের প্রথার ঠিক উল্টো। সব চেয়ে মজার ব্যাপার, বিয়ের মাস-তিনেক পরে বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠানো হয়, যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছে। কে কি উপহার দিয়েছেন তারও তালিকা থাকে সঙ্গে। আর থাকে "লাল চাল" (কাওামেশী)। যাঁরা মনে করে বিয়েতে এসেছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার জন্ম "লাল চাল" পাঠানো প্রথা।

সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, জাপানীরা বিয়ের ব্যাপারে ধর্ম্ম অথবা আইনের দাবী স্বীকার করে না। এবং ও দুটোর কোনটারই সাহায্য নেয় না। বাপের বাড়ীর রেজিষ্টার খাতা থেকে নাম কেটে কনের নাম শ্বশুর-বাড়ীর খাতায় লেখা হলেই ল্যাঠা চুকে গেল। কনে বরের পরিবারভুক্ত হয়ে গেল।

যদি কোন বাপের কেবল মেয়েই থাকে, ছেলে না থাকে, তা হলে ঘর-জামাই খুঁজতে হয়। সাধারণতঃ বাড়ীর সব চেয়ে ছোট ছেলে ঘর-জামাই হয়। যে ছেলে ঘর-জামাই হয়, জাপানী ভাষায় তাকে বলে "য়োশিয়াই।" তার নাম পিতৃবংশের রেজিষ্টার খাতা থেকে কেটে শ্বশুর-বংশের খাতায় লেখা হয়। শ্বশুরের পদবী তাকে গ্রহণ করতে হয়। নিজের বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক তার আর থাকে না। তার নামে স্ত্রীর পরিচয় হয় না, স্ত্রীর নামে তার পরিচয়। স্ত্রী যেমন স্বামীর ঘর করতে যায়, শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা শোনে, ঘর জামাই স্বামীকে তেমনি স্ত্রীঘর করতে যেতে হয়, শাশুড়ীর কথা শুনতে হয়, ফাই ফরমাস খাটতে হয়। যদি শ্বশুর-বাড়ীর মনোমত না হতে পারে তাহলে তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রী এবং স্ত্রীর ছেলে-মেয়ে বাপের সম্পত্তি পায়, কিন্তু ঘর জামাই স্বামী কিছু পায় না। বিধবা স্ত্রীর মত, স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঘর-জামাই স্বামী (বিধবা?) খাওয়া-পরার মত খরচ পায় মাত্র।

ছেলে-মেয়েদের ওপর মার কোন অধিকার নেই, অধিকার কেবল বাপের। যদি কোন কারণে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্তর জন্ত ছাড়াছাড়ি হয় তা হলে ছেলে-মেয়ে বাপের কাছে থাকে। স্বামী স্ত্রী পৃথক হয়ে গেলে, স্ত্রীর জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীন ভাবে থাকতে হলে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু জাপানী মেয়েরা উপার্জ্জন করবার মত কোন শিক্ষাই পায় না। ফলে স্বামি-পরিত্যক্তা স্ত্রীর পক্ষে পথে দাঁড়ান ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। হয় ভিক্ষা না হয় দেহ বিক্রয়।

জাপানে পুরুষের চেয়ে নারীর নৈতিক জীবন অনেক উঁচু, কিন্তু সতীত্বের স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়। সেখানে পতিব্রতা এবং দৈহিক সতীত্ব দুইটি প্রথম বস্তু। স্বামীকে ঋণ অথবা অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ত যদি কোন স্ত্রী অপর পুরুষকে দেহদান করে তা হলে সমাজে সে পতিতা তো হয়ই না, বরং সকলে তাহার সুখ্যাতি করে। স্বামীর ইচ্ছা এবং আদেশ নির্ব্বিবাদে পালন করাই জাপানী নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সামাজিক জীবনে মেয়েদের স্থান অনেক নীচে। রাস্তা দিয়ে স্বামি-স্ত্রী গেলে, স্বামী যাবে আগে আর স্ত্রী থাকবে পিছনে। স্বামীর চেয়ে এগিয়ে যাওয়া অথবা পাশাপাশি থাকা কোন মতেই চলবে না। কোন কিছু বয়ে নিয়ে যেতে হলে স্ত্রীকে বইতে হবে। স্বামী কোন জিনিষ হাতে করে নিয়ে হাঁটবে না। ট্রেণে অথবা ট্রামে-বাসে ভীড় হলে মেয়েরা আসন ছেড়ে স্থান করে দেবে পুরুষদের বসবার জন্ত।

স্ত্রীর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা শোনা ও মনোমত হওয়া। তার পর সুগৃহিণী হওয়া। স্বামীর সঙ্গিনী এবং মনের মত হওয়ার চেয়ে স্বামীর গৃহের লোকেদের পছন্দমত হওয়া বেশী প্রয়োজন। তাকে হতে হবে স্বামীর দাসী, সঙ্গিনী নয়। স্বামীর প্রতি খেয়াল তাকে পালন করতে হবে নির্ব্বিবাদে। স্বামী যদি বাড়ীতে অপর স্ত্রীলোক নিয়ে আসে, সে অপমানও তাকে সহ্য করতে হবে হাসিমুখে। পতির ভাল অথবা খারাপ যেমনই খেয়ালই হোক্ সেই খেয়াল চরিতার্থ করতে সুযোগ ও সুবিধা করে দিতে হবে। স্বামীকে আনন্দ দিতে গিয়ে স্ত্রীকে বরণ করতে হবে নিরানন্দ, স্বামীর মনের স্ফূর্ত্তির জন্ত নিজের মনকে মেরে ফেলতে হবে গলা টিপে।

ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনার সমস্ত ভার স্ত্রীর। জাপানী মেয়েরা চিরকাল আত্মসংযম শিক্ষা পায়। মা হয়ে সেই শিক্ষা খুবই কাজে লাগে। ছেলেদের শত উপদ্রব সইতে পারে হাসিমুখে। রাগ অথবা মার-ধর প্রায় করেই না। নিজের ছোট বয়সে যে শিক্ষা পেয়েছে, মায়েরা ঠিক সেই শিক্ষা মেয়েদের দেয়। মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মায়েদের হাতে। ছেলেরা অবশ্য বড় হয়ে স্কুলে যায়, মাষ্টারের কাছে পড়ে।

সুঠাম গঠন, মধুর হাব-ভাব, হাস্য এবং লাস্য 'গায়েশা'দের দেখবার মত। দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং আচার-ব্যবহারের মাধুর্য্যের দিকে থেকে জাপানী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। 'গায়েশা' মানে সর্ব্ব-রকমে শিক্ষিতা নারী। লোকেদের মনোরঞ্জন করবার মত সকল রকম কলার শিক্ষা তারা পায়। গান গাইতে, নাচতে, 'সামিসেন' (জাপানী বাদ্য) বাজাতে তারা পটু। তাদের মত মিষ্ট কথাবার্ত্তা, মন ভোলানো হাসি, নয়ন-তৃপ্তিকর বেশভূষা বোধ হয় জগতে খুব কমই দেখা যায়। এ তাদের পেশা। বড় বড় উৎসবে তারা নিমন্ত্রিত হয় সম্মানিত অতিথিদের আনন্দবর্দ্ধন করবার জন্ত।

সাধারণতঃ 'গায়েশা'রা উচ্চবংশের মেয়ে নয়। তবে অনেক সময় বেশ ভাল ঘরে তাদের বিয়ে হয়ে যায়, যদি কোন উচ্চবংশীয় ব্যক্তি তাদের প্রেমে পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পত্নী না হতে পেরে উপপত্নী হয়ে জীবন কাটাতে হয়।

যাদের কোন হিল্লেই হয় না, তাদের শেষ পর্য্যন্ত চরম অধোগতি ছাড়া পথ নেই। বৃদ্ধবয়সে দাসীবৃত্তি অথবা আরও নীচ কার্য্যের দ্বারা করতে হয় উদর-সংস্থান।

জাপানের মেয়েরা অভিনয় খুব ভাল করতে পারে। মেয়েদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ আছে এবং সব চরিত্রেই মেয়েরা অভিনয় করে। পুরুষ এবং নারী একসঙ্গে ষ্টেজে নামে না। সাহিত্যক্ষেত্রেও মেয়েরা খুব নাম করেছে। 'গেঞ্জি মনোগাটারী' (গেঞ্জির রোমান্স) এবং

'মাকুরাজোশী' (বালিশের উপাখ্যান) জগদ্বিখ্যাত সাহিত্য গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থের লেখিকা মুরাসাকি শিকিবু এবং শাইশো নাগন। উভয়েই উচ্চবংশীয়। আর এক সমসাময়িক লেখিকা ইসে নো তায়উ বেশ খ্যাতি লাভ করেন। এঁরা সকলেই একাদশ শতাব্দীর। সেই সময় জাপানে রাজত্ব করতেন সম্রাট ইচিজো। তাঁর সাহিত্যের অনুরাগ প্রবল। বহু সাহিত্যিক তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ ও বৃত্তি পেতেন।

আগেকার দিনে যখন কোন নারীর ব্যর্থপ্রেম অথবা অন্য কোন সাংসারিক অশান্তির জন্য জীবনে ধিক্কার জন্মে যেত, তখন সে সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠে প্রবেশ করত। প্রতিজ্ঞা করত সংসারে আর ফিরবে না। তার পর হয় ত বাড়ীর কোন বর্ষীয়সী নারী অথবা পুরোনো ঝি গিয়ে বললে, তোমার বিরহে তোমার প্রেমিক দিন-রাত অশ্রুপাত করচে। তুমি না ফিরে গেলে সে আত্মহত্যা করবে। তখন সে হয় ত দুঃখিত হল। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে পাবে না। যদি এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে—ব্যস, তখনই তাকে মঠ ছেড়ে সংসারে ফিরে আসতে হবে।

জাপানী নারীদের ধর্ম্মের দিক্‌টা তেমন গড়ে ওঠেনি। কোন একটি মন্দিরের গাত্রে লেখা আছে, এখানে ঘোড়া, গরু অথবা নারীর প্রবেশ নিষেধ। জাপানীরা স্বীকার করে না যে, মেয়েদের ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মে সন্ন্যাসিনী অথবা শিণ্টো (পূর্ব্বপুরুষ পূজা) ধর্ম্মে পূজারিণীর স্থান আছে বটে, কিন্তু নারীর প্রতি কোন নির্দ্দেশ নেই।

অবশ্য আধুনিক আবহাওয়ার ছোঁয়াচ জাপানে খুব বেশী পরিমাণেই লেগেছে। মেয়েদের পোষাকে, প্রসাধনে তার ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু নারীর মর্য্যাদা এখনও সেখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

স্তব্ধ নিশীথে

শ্রীরুচিরা বসু

দূরে থেকে যারা বাসিয়াছ ভালো,
সঁপেছ প্রাণ!
চির অনুরাগী বন্ধু, আমার
শুনেছ গান!

কত প্রভাতের কল সঙ্গীতে,
জাগরণে যাওয়া স্তব্ধ নিশীথে,
কোন্ সাধনার মন্ত্র বেজেছে
প্রাণের পুরে,
তোমরা কখন পেতেছিলে কান,
গানের সুরে!
শত উচ্ছ্বাস-মুখর কক্ষে
ডেকেছ যারে,
সে রয়েছে তার গোপন ঘরের
অন্ধকারে!

এ নহে সেতার, মঞ্জুল বীণা,
গুণীদের মাঝে মানাইবে কি না।
ছোট বেতসের বাঁশীটি আমার
ভরেছে মন!
উৎসব সভা তোমাদের থাক্
বন্ধু জন!

"যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভূপেন হোষ্টেলে আসিয়া পৌঁছিতে সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন—'কী ব্যাপার মশাই? কোথায় ছিলেন? পথ হারাননি ত? আমরা ভেবে মরি!' ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্য চারি দিকে।

সে যখন সংক্ষেপে সব কথা খুলিয়া বলিল, তখন আর সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, অপূর্ব্ব বাবুর মুখ কিন্তু অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে গাম্ভীর্য্যের কারণ তখন ঠিক বোঝা না গেলেও আহারের সময় কাহারও তার বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলকারই থাবার ব্যবস্থা হইয়াছে, শুধু ভূপেনের আসনের সামনে পাতা। সে একটু বিস্মিত হইয়া অপূর্ব্ব বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, থালা কি কম পড়েছে অপূর্ব্ব বাবু?···চুরি-টুরি গেল না কি?

মুখ কালি করিয়া তিনি জবাব দিলেন, না, তা ঠিক নয়।··· আমাকে ত মশাই ঝি-চাকর টিকিয়ে রাখতে হবে, ওরা কেউ আর আপনার বাসন মাজ্‌তে চায় না।

তার মানে?

আসে-পাশের অন্যান্য মাষ্টার মহাশয়রা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। ভবদেব বাবুর ত কথাই নাই। কিন্তু অপূর্ব্ব বাবু সঙ্কোচের ধার ধারেন না, তিনি বলিলেন, আপনি মুসলমানের ছোঁয়া খেয়ে এসেছেন—হাজার হোক এরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ, ওদের নানা রকম কুসংস্কার আছে, তা ত জানেনই।

ভূপেন আসনের উপরই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওদের ওপর দোষ দিচ্ছেন কেন অপূর্ব্ব বাবু! ওদের ত এরই মধ্যে এ কথা শোনবার কথা নয়, আমি বলেছি আপনাদেরই। অবশ্য আপনাদের মতে জাত যায় এমন কোন ঘটনাই সেখানে ঘটেনি, তাঁরা জলটি পর্য্যন্ত তুলিয়ে দিয়েছেন অন্য লোককে দিয়ে, তবে আমার কোন আপত্তি ছিল না ওঁদের হাতে খেতে। সে যাই হোক—আমি এমনি অনায়াসে পাতায় খেতে পারতাম কিন্তু এ অবস্থায় খাবো না।

ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িয়াছিল, যতীন বাবু আর থাকিতে না পারিয়া খপ্‌ করিয়া ভূপেনের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, ভাত খাবার সময় এ সব আবার কি! বসুন বসুন ভূপেন বাবু, অপূর্ব্ব বাবুর সব তাইতে বাড়াবাড়ি। কল্‌কাতায় থেকে কলেজে পড়েছেন, মুসলমানের ছোঁয়া খাননি কে বলুন ত! এখনও আবার ঐ সব মানতে হবে না কি?

ভবদেব বাবুও বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, তাছাড়া এ ক্ষেত্রে ত সে কথা উঠতেই পারে না—উনি যা বল্লেন, তাতে ত—দাও দাও ঠাকুর মশাই, থালা দাও।

যতীন বাবু ততক্ষণে জোর করিয়া ভূপেনকে বসাইয়া দিয়াছেন—সুতরাং ব্যাপারটা তখনকার মত ঐখানেই মিটিয়া গেল।

কিন্তু একেবারে যে মিটিল না, সেটা বোঝা গেল দুই-চারি দিন বাদে, সালেক ফিরিয়া আসিতে। সালেকের অল্প বয়স, কৃতজ্ঞতা-বোধটা সহজে মন হইতে মুছিয়া যাইবার কথা নয়—সুতরাং এবারে বাড়ী হইতে ফিরিয়া সে ছায়ার মতই ভূপেনের সহিত লাগিয়া রহিল। ভূপেনের কোচিং ক্লাসে পদন প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছেলে আছে, সেখানে সে মনের মত করিয়া সকলকেই শিখাইতেছে বটে কিন্তু সালেককে এত কাছে পাইয়া সে-ও যেন উৎসাহ বোধ করিল। এই ছেলেটির মাথা ভাল, সেটা বরাবরই সে লক্ষ্য করিয়াছে, তবে খাটিবার শক্তি তাহার কম। কিন্তু সে যদি একেবারে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহাকে কাছে পায় তাহা হইলে সালেককে বেশী খাটিতেও হইবে না—হয়ত এই ছেলেটিকে তাহার আশানুরূপই মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি, অন্ততঃ ভূপেনের কাছে, বড় কথা নয়—তাহার আশা অনেক বেশী। বৃত্তি পদনও পাইবে—অবশ্য যদি এমনি ভাবে তাহাদের সে পড়াইতে পারে—কিন্তু সালেক এক দিন মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবে, এ স্বপ্ন ভূপেন ইতিমধ্যেই দেখিতে শুরু করিয়াছে। সন্ধ্যার মত প্রখর বুদ্ধির আভা সালেকের চোখে নাই সত্য কথা, রোগে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার প্রাণশক্তিই স্তিমিত, তবু তাহার প্রত্যেকটি কথা সে তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই শোনে এবং বুঝিতে পারে। এইটিই ছিল ভূপেনের বড় আশ্বাস, ইহার বেশী ছাত্রের কাছে সে কিছু চায় না।

সুতরাং সে সালেকের এই কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সুযোগ পূর্ণমাত্রাতেই গ্রহণ করিল; সকাল বেলা উঠিয়া দাঁতন করিতে করিতে সে যখন মাঠে পায়চারি করে, সালেক তখনই তাহার সঙ্গ গ্রহণ করে আর ছাড়ে না,—কোচিং ক্লাস পর্য্যন্ত সারিয়া একেবারে স্নানাহারের সময় সে নিজেদের হোষ্টেলে ফেরে; ছুটির পরও, কোন মতে বই ক'খানা রাখিয়া আসিতে যা দেরী, যে দিন ভূপেন এমনি মাঠে মাঠে বেড়ায় সে দিন ত সঙ্গে থাকেই—যে দিন বিজয় বাবুদের বাড়ী যায় সে দিনও ছাড়ে না। ভূপেন যখন ভিতরে ঢোকে তখন সে বাহিরের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, নয় ত রাখুর সহিত গল্প করে, আবার ফিরিবার সময় একসঙ্গে ফেরে। হোষ্টেলে ফিরিয়া ভূপেন আবারও তাহাদের লইয়া পড়াইতে বসে অর্থাৎ তখনও সালেকের আর নিজেদের হোষ্টেলে ফিরিবার প্রয়োজন হয় না, রাত্রে আহারের ঘণ্টা না পড়া পর্য্যন্ত সে মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গেই থাকে।

এমনি ভাবে মাস-খানেক কাটিবার পর হঠাৎ এক দিন ভূপেন স্কুলে থাকিতে থাকিতেই সেক্রেটারীর দুই-ছত্র চিঠি পাইল—

'একবার দয়া ক'রে আসবেন? বাতে শয্যাগত বলে আমি নিজে যেতে পারলুম না।'

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝিলেও অপূর্ব্ব বাবুর সহিত এই আহ্বানের যে একটা যোগাযোগ আছে সেটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না! কারণ আগের দিনই রাত্রে সে যতীনের মুখে খবর পাইয়াছে, সুদখোরটা রোজ রোজ সেক্রেটারীর বাড়ী কেন যাচ্ছে বলুন ত? নিশ্চয়ই কারোর নামে লাগাতে যায় মশাই। খুব সাবধান, ওর মতলব ভাল নয়, তা আমি বলে দিচ্ছি—দেখে নেবেন বরং—

তখন সে অতটা গ্রাহ্য করে নাই কিন্তু এখন কথাটা মনে পড়িয়া গেল! তবু চিঠির যা ভাষা তাহাতে না যাওয়াটা অভদ্রতা, তা ছাড়া তাহার না যাওয়ার কারণও কিছু ছিল না। সুতরাং সেই দিনই সে ছুটির পর হোষ্টেলে না ফিরিয়া সোজা সেক্রেটারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

তিনি খাতির করিয়া বসাইলেন, প্রচুর জলযোগ করাইলেন;

তার পর ভূমিকা দিয়া শুরু করিলেন, আপনাকে একটা কথা বলব কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দিন যে, কোন রকম অফেন্স নেবেন না!

ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি বলুন ত? আমার নতুন কি অপরাধ ঘটল?

ঐ ত মশাই! আপনি আগে থাকতেই চটে উঠলেন। না, সত্যি সত্যি আপনাকে কথা দিতে হবে।

হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল, বেশ অভয় দিলাম—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বলুন।

তবু তিনি তখনই কথাটা পাড়িতে পারিলেন না, অনেক ইতস্তত: করিয়া, মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, দেখুন আমি বলছিলুম কি, মাষ্টারদের সঙ্গে ছাত্রদের খুব বেশী মাখামাখি করা ঠিক নয়—এটা মানেন ত?

না, মানি না।

মানেন না? বিস্মিত হইয়া সেক্রেটারী প্রশ্ন করিলেন।

না। বরং আমার ধারণা ঠিক বিপরীত। অবশ্য সমবয়সী ভাল ছেলেদের সঙ্গেও কিছু মেলামেশা করার প্রয়োজন আছে, এটা আমি স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষকদের সঙ্গে ওদের যদি একটা ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা সব দিক্ দিয়েই নিরাপদ নয় কি? ছেলেদের বেগড়াবার সম্ভাবনা কমে যায়, তাছাড়া ওদের শিক্ষারও সুযোগ ঢের বেশী বাড়ে তাতে। কটিন-বাঁধা পড়াশুনায় কতটুকু শিক্ষা লাভ হয় বলুন ত? মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু ওরা শিখতে পারে, পড়াশুনোর দিকে ঝোঁকটাও বাড়ে ক্রমশ:। তাই নয় কি?

সেক্রেটারী যেন একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। কহিলেন, তা অবশ্য বটে তবে এর আর একটা দিক্‌ও আছে ভূপেন বাবু। আমি আপনাকে চিনি, আপনি যে খাঁটি ইস্পাত তাও আমার জানতে বাকী নেই. তবে আপনাদের যা প্রফেসন তাতে পাঁচ জনকে পাঁচ কথা বলবার সুযোগ দেওয়াও ঠিক নয়। তাতে করে অন্য ছেলেদের মনের ওপর ব্যাড্ এফেক্ট হয়।

ভূপেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু আপনার এ সব কথাগুলোর সঙ্গে আমার কি ব্যক্তিগত ভাবে কোন সম্পর্ক আছে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মানে—ঐ ক্লাস নাইনের সালেক ছোক্‌রা—ও আজ-কাল দিন-রাতই প্রায় আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এতে সবাই নানা রকমের ঠাট্টা-তামাসা করছে। একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি?

তখনও আসল কথাটা ভূপেনের মাথায় ঢুকিল না। সে খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে মহেশ বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু এতে ঠাট্টা-তামাসা করার কি আছে তা-ত আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বলুন—

মহেশ বাবু বলিলেন, সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয় ভূপেন বাবু। তবে আপনাদের সম্পর্কটা সম্বন্ধে—মানে আপনারা ত বন্ধু নন—অথচ অ-সমবয়সী দু'জন লোকের অমন সব সময়ে একসঙ্গে চলা-ফেরা করা, একটু দৃষ্টিকটু হয়, এই আর কি!

স্কাউণ্ড্রেল! ভূপেন এতক্ষণে কিছু আলো দেখিতে পাইয়া যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ঐ অপূর্ব্ব বাবু বলেছেন ত? আশ্চর্য্য, এ সব কথা ওদের মাথাতেও যায়! মন না আঁস্তাকুড়?

অপ্রতিভ হইয়া মহেশ বাবু বলিলেন, না, দেখুন সত্যি কথা বলতে কি একা অপূর্ব্ব বাবু নন, এই শ্রেণীর ইঙ্গিত গত সপ্তাহে আরও দু'-এক জনের কথা থেকে পেয়েছি। আপনি রাগ করবেন না, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই তা জানি, তবে যদি সম্ভব হয় ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে দোষ কি! নিন্দুকের রসনাকে স্বয়ং রামচন্দ্রও ভয় করে গেছেন।

বহুক্ষণ গুম্ খাইয়া বসিয়া থাকিয়া ভূপেন কহিল, ঐ ছেলেটার দ্বারা হয়ত এক দিন আপনাদের স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি হতে পারত মহেশ বাবু! সেই চেষ্টাই করছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, বাঙ্গালীর ছেলেরা কেরাণীগিরির চেয়ে মাষ্টারীকে কেন ছোট মনে করে।

একটু হাসিয়া মহেশ বাবু কহিলেন, কিছুই বুঝতে পারলেন না ভূপেন বাবু,কেরাণীগিরি করতে গেলে আরও বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'ত। আপনাকে এখনও অনেক ঘা খেতে হবে। সংসার বড় কঠিন জায়গা—

তা বটে। ভূপেন একেবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনাদের এখানে এসে পর্য্যন্ত যা তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাইতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।···তা দেখুন, আমাকে দিয়ে যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাহ'লে আমি আনন্দের সঙ্গেই বিদায় নিচ্ছি—

না, না,—ঐ দেখুন! ঐ জন্যেই আমি আগে আপনার কাছ থেকে কথা নিয়েছিলুম! সে কথাই নয়। তবে আপনাদের দায়িত্ব যে কত বেশী তা ত জানেনই. এ সব ক্ষেত্রে একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি? সেই জন্যই আমি কথাটা আপনাকে জানিয়েছিলুম। আপনি তা বলে রাগ করতে পারবেন না—

না, না, আমি একটুও রাগ করিনি, আপনি বিশ্বাস করুন। শুধু, এই সব ব্যাপারে মনটা বড় ভেঙ্গে যায়। আচ্ছা, নমস্কার!

ভূপেন আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় পড়িয়া প্রথমেই যে চিন্তাটা তাহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল সেটা হইতেছে অবিলম্বে স্কুলের চাকরী ছাড়ার কথা। প্রতিদিনকার নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতায় সত্যই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, আর ভাল লাগে না। এমন করিয়া মানুষের অকারণ বিদ্বেষের সঙ্গে আর কত লড়াই করা যায়! একটা কথা ইদানীং সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, অপূর্ব্ব বাবু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই-এক জন শিক্ষক সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই আড়াল হইতে তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করেন এবং অনেক ভাল কথারও বাঁকা অর্থ গড়িয়া লইয়া যথাস্থানে অর্থাৎ হেডমাষ্টারের কাছে লাগাইয়া আসেন। তাহার প্রমাণও ভবদেব বাবুর কথাবার্ত্তা হইতে একাধিক দিন সে পাইয়াছে। শুধু শুধু এই সামান্য বেতনের জন্য অহোরাত্র ইতরদের সঙ্গে লড়াই করিয়া পড়িয়া থাকার প্রয়োজন কি? চল্লিশ টাকার মাষ্টারী বাঙ্গালা দেশে আরও ঢের পাওয়া যাইবে!

কিন্তু ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়া হাটিতে হাঁটিতে উত্তেজনাটা যখন কিছু কমিয়া আসিল তখন মনে হইল যে, অপূর্ব্ব বাবুর দল পৃথিবীতে হয়ত সর্ব্বত্রই আছে। যদি শিক্ষকতা করিতেই হয় ত এরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার অভাব ঘটিবে না—হয়ত ঢের বেশী তিক্ততা সহ্য করিতে হইবে। তবু ত এখানে সে সেক্রেটারীকে সহায় পাইয়াছে—যতীন বাবুর মুখে অন্য স্কুলে সেক্রেটারী ও মেম্বারদের যে-সব জুলুমের কথা শুনিয়াছে, তাহাতে অন্যত্র আত্মসম্মান বজায় রাখা হয়ত শুধু দুঃসাধ্য নয় অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কতবারই বা ইস্কুল বদল করিবে সে? তাছাড়া তবু এখানে রাধাকমল বাবু আছেন;

ভবদেব বাবু আছেন, ইঁহারা লোক তত খারাপ নন। ইহার পর অদৃষ্টে কি জুটিবে তাহার ঠিক কি? তাছাড়া এখানকার ছাত্রগুলি বড় নিরীহ, বড় বেচারা! ইতিমধ্যেই তাহারা ভূপেনের মনে অত্যন্ত মায়ার সঞ্চার করিয়াছে, ইহাদের ছাড়িয়া যাইতেও খানিকটা কষ্ট হইবে বৈ কি! আর···সব চেয়ে বড় কথা কল্যাণীরা, অন্ধ বিজয় বাবু একান্ত ভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছেন! অবশ্য সে আর কতটুকু করিতে পারিবে, তবু এমন ভাবে ছাড়িয়া যাওয়াও যায় না।

না, বাধ্য না হইলে সে এখানকার চা'করী ছাড়িবে না। কিন্তু, বেচারী সালেক! চাকরী যদি ছাড়া সম্ভব না-ই হয় তাহা হইলে তাহাকে একটু সতর্ক হইতেই হইবে। এমনি ত ব্যাপারটা যথেষ্ট খারাপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর সে সরিয়া না দাঁড়াইলে সালেকের উপর কী অত্যাচার হইবে তাহারই বা ঠিক কি!

বড় ডাঙ্গাটা পার হইয়া তালবনের বাঁকে পড়িতেই ভূপেনের সহিত প্রথম যাহার দেখা হইল সে সালেক! সন্ধ্যার আব্‌ছায়া আলোতেও সে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

কাছে আসিতে সে একটু অনুযোগের সুরেই কহিল, কোথায় গিয়েছিলেন মাষ্টার মশাই? কাউকে কিছু বলে যাননি।

ভূপেনের দুই চোখ জ্বালা করিয়া যেন জল ভরিয়া আসিল, সে সহসা দুই হাতে সালেককে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কেন, মাষ্টার মশাইয়ের জন্ত তোর মন-কেমন কচ্ছিল? সেক্রেটারীর বাড়ী গিয়েছিলুম!

সালেক বিস্মিত হইয়া ভূপেনের মুখের দিকে চাহিল। শুধু যে এই আবেগটা আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত তাহাই নয়—ভূপেনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল। ভূপেনও তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, তবু সে তাহাকে ছাড়িল না, বরং আরও জোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সালেক, একটা কথা বল্‌ব, তুই কিছু মনে করিস্‌নি।···তুই—তুই আর যখন-তখন আমার কাছে আসিস্‌নি ভাই—শুধু যখন কোচিং ক্লাস নেব তখন সকলকার সঙ্গেই পড়তে আসিস্!

একটা আশঙ্কা ও ব্যথা একই সঙ্গে সালেকের দৃষ্টিতে ঘনাইয়া আসিল। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সেক্রেটারী কি সে জন্তে রাগ করেছেন মাষ্টার মশাই?···আমারই অন্তায় হয়েছিল, মুসলমানের সঙ্গে অত মেলামেশা—

ওরে না, না, সে জন্তে নয়। তুই বিশ্বাস কর্‌, আমি সত্যিই বলছি—অন্ত কারণ আছে। কিন্তু সে আর নাই বা শুন্‌লি। ওঁরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন তাই ত যথেষ্ট!

সালেক আর একটিও কথা কহিল না, শুধু ধীরে ধীরে নিজেকে ভূপেনের হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া তাহাকে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, তাহার পর নিঃশব্দ-দ্রুত গতিতে নিজেদের হোষ্টেলের পথ ধরিল।

সে যে কী সুগভীর অভিমান তাহার ক্ষুদ্র বুকখানিতে বহিয়া লইয়া গেল তাহা ভূপেন ভাল করিয়াই বুঝিল; তবু সে আর তাহাকে ডাকিবার বা ফিরাইবার চেষ্টা করিল না, শুধু অনেকক্ষণ সেই অন্ধকারের মধ্যেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইহার পর মাস-খানেক এক প্রকার শান্তিতেই কাটিল। অপূর্ব্ব বাবু ব্যাপারটাকে তাঁহার ব্যক্তিগত জয়লাভ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সগৌরবে পাঁচ জনের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু ভূপেন তাহা গায়ে মাখিল না—শুধু সাধ্যমত তাঁহার দলটিকে এড়াইয়া চলিতে শুরু করিল। তবে অপূর্ব্ব বাবু যে তাহার কোচিং ক্লাসটি বন্ধ করিবার জন্তও চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেক্রেটারী সে কথা একেবারেই কানে তোলেন নাই বরং তাঁহাকেই ধমক্ দিয়াছেন—এ কথাটাও ভূপেনের অগোচর রহিল না, যতীন বাবুর কৃপায় সবই সে শুনিতে পাইল। সে অবশ্য যতীন বাবুর কাছে এ সব কথা শুনিতে চায় না—যতীন বাবুই গায়ে পড়িয়া বলেন। তাঁহার স্বভাবটাই কিছু অদ্ভুত। তিনি ভূপেনকেও ঈর্ষা করেন এবং অপূর্ব্ব বাবুদের চক্রান্তে তাহার উৎসাহের অভাব নই, অথচ ভূপেনের বিরুদ্ধে যত কিছু ষড়যন্ত্র হয় সে কথাগুলিও তাহাকে না বলিয়া থাকিতে পারেন না, আর সে সময় অপূর্ব্ব বাবু সম্বন্ধে এমন চোখা চোখা গালাগালি উচ্চারণ করিতে থাকেন যে, সে সব শুনিয়া এখনও ভূপেনের মুখ লাল হইয়া ওঠে। ভূপেন একটা কথারও জবাব দেয় না—কোন দিন কোন প্রকার আগ্রহও প্রকাশ করে না, সে জন্ত যতীন বাবু ক্ষুণ্ণ হন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার তরফ হইতে উৎসাহের অভাব ঘটে না। সবটা জড়াইয়া যতীন বাবু মানুষটা ভালই—ভূপেন মনে মনে ভাবে, এবং তাঁহার কথা মনে হইলে সে আপন মনেই হাসিয়া ওঠে।

কিন্তু ইতিমধ্যে স্কুলে যে সকলের অলক্ষ্যে একটা মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল এ কথাটা যতীন বাবুও জানিতেন না। সেক্রেটারী কয়েক দিন যাবৎই ঘন ঘন স্কুলে আসিতেছেন এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই হেডমাষ্টার মহাশয়ের সহিত অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কী পরামর্শ করিতেছেন সেটা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল; আর সে জন্ত একটু অস্বস্তিও বোধ করিতেছিল কিন্তু তাহার আসল কারণটা কাহারও কল্পনাতে পর্য্যন্ত আসে নাই, এমন কি অতি-চতুর অপূর্ব্ব বাবুরও না। যতীন বাবুর ধারণা যে এবার সকলকার একটা সাধারণ মাহিনা-বৃদ্ধির জল্পনা চলিতেছে—রাধাকমল বাবুর ধারণা, স্কুলের খরচা কিছু না কমাইলে চলিতেছে না, পরামর্শটা হইতেছে সেই দিক ঘেঁষিয়া। কিন্তু আসল কথাটা এক দিন একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই তাহাদের কানে আসিয়া বাজিল।

দিন-পনেরো আগে অক্ষয় বাবু সহসা কী একটা কাজের অছিলায় বাড়ী চলিয়া যান আর ফিরিয়া আসেন নাই। অবশ্য সে অছিলাও যে তিনি দিয়াছিলেন, এটা অনুমান মাত্র, কেহ দিতে শোনে নাই। শুধু অল্প লোকের মধ্যে এক জন অনুপস্থিত থাকায় অসুবিধাটা সকলেই ভোগ করিতেছিলেন এবং মনে-মনে অক্ষয় সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য করিতেছিলেন। এক দিন সকালবেলায় খবর পাওয়া গেল অক্ষয় বাবু আর একেবারেই ফিরিবেন না, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন!

তার পরই সব খবর একেবারে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। অক্ষয় বাবু ইদানীং হেডমাষ্টার মহাশয়ের একটু বেশী রকম প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন—বিশ্বস্তও বটে। স্কুলের টাকা-কড়ির যে ভার তাঁহার ব্যক্তিগত সেটা তিনি সম্পূর্ণই অক্ষয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাধন-ভজন করিতেছিলেন। এই অবসরে অক্ষয় স্কুলের অনেকগুলি টাকা ভাঙ্গিয়াছেন—বহু দিন ধরিয়াই তিনি কিছু কিছু করিয়া খরচ করিয়াছেন। আরও ঢের আগেই ধরা পড়িবার কথা কিন্তু ভবদেব বাবু ইতিমধ্যে একবারও হিসাব দেখিবার চেষ্টা করেন

নাই। বৎসর শেষ হওয়ার অনেক পরেও যখন হিসাব-নিকাশ শেষ হইল না তখন সেক্রেটারী তাগাদা দেওয়ায় ভবদেব বাবু হিসাবটা দেখিতে চান—সে সময়ে কথাটা আর চাপিয়া রাখা সম্ভব হয় না। অক্ষয় বাবু পলাইয়া যান এবং কর্ত্তারা দুই জনে মিলিয়া অনেক কষ্টে সেই হিসাব উদ্ধার করেন। স্কুলের টাকা তছরুপের ব্যাপার—অগত্যা শেষ পর্যন্ত পুলিশেও খবর দিতে হইল। অক্ষয় বাবু বেচারা কোন মতেই টাকাটার যোগাড় করিতে না পারিয়া জেলে যাইবার ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন।

ইহার পরের ব্যাপারটাও কম অপ্রীতিকর নয়। টাকাটা ভবদেব বাবু নিজে নেন নাই সত্য কথা (যদিও যতীন বাবুর সে বিষয়ে একটা সন্দেহ থাকিয়াই গেল—তাঁহার বিশ্বাস, 'ঐ বেটা ভণ্ডই অক্ষয়কে জড়িয়েছে, ও কম না কি!')—তবু দায়িত্বটা যে তাঁহারই, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং অনেক টানা-হেঁচড়ার পর তিনি জেলটা যদি-বা এড়াইলেন, চাকরীটা আর রহিল না। চুরী ধরা পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল—তাঁহার বদলে অপূর্ব্ব বাবু একটিনি করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে নূতন হেডমাষ্টারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

ভবদেব বাবু কয়েক দিন হোষ্টেলেই রহিলেন—ব্যাপারটা না মেটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হইল না। যে শিক্ষক মহাশয়রা এত দিন তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া চলিতেন, তাঁহারাই সুযোগ-সুবিধা পাইলে উদ্ধত ও অপমান-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়িলেন না। বিশেষতঃ ছেলেদের মধ্যেও কথাটা ছড়াইয়া পড়িল, তাহারা প্রকাশ্যেই আলোচনা করিতে লাগিল। সে লজ্জা যেন ভবদেব বাবুর চেয়ে অনেক বেশী বাজিল ভূপেনকে—কিন্তু উপায়ই বা কি! সে অপমানের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না বটে, তবে যতটা সম্ভব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। আগে সে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে কখনও ভবদেব বাবুর ঘরে যাইত না, এখন একমাত্র সে-ই প্রত্যহ তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল এবং যতটা সম্ভব আলোচনাটা বৈষ্ণবশাস্ত্র ঘেঁসিয়া চালাইতে লাগিল। ভবদেব বাবু খুব মুশড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, গুম্ খাইয়াই বসিয়া থাকিতেন অধিকাংশ সময়—কেবল ঈশ্বর-উপাসনার এই বিশেষ ধারাটির প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি একটু তাতিয়া উঠিতেন, সেই সময়ই শুধু তাঁহাকে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ দেখাইত, সেই জন্য ভূপেন প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে ঐ বিষয়েই কথাটা আবদ্ধ থাকে।

বিদায়ের দিন ভবদেব বাবু সজল নেত্রে ভূপেনের হাতটা ধরিয়া বলিলেন, বিপদে না পড়লে বন্ধুকে চেনা যায় না ভূপেন বাবু। বিপদে ফেলে রাধারাণী আপনাকে চিনিয়ে দিলেন। হয়ত অবস্থা-গতিকে আপনার ওপর অবিচারই করেছি সময়ে সময়ে, পারেন ত আমাকে মাপ করবেন।

তাহার পর বাক্স খুলিয়া এক খণ্ড 'হরিভক্তিবিলাস' তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বইখানা বড় ভাল বই, মধ্যে মধ্যে পড়বেন। আর ত আমার কিছুই নেই, এইখানা রেখে দিন, তবু আমার কথা মনে পড়বে।

বৃদ্ধের অসহায় ও করুণ মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেনের চক্ষুও সজল হইয়া আসিয়াছিল, সে একটি কথাও বলিতে পারিল না, বইখানি তাঁহার হাত হইতে লইয়া নীরবে শুধু একটা নমস্কার করিল।

[ক্রমশঃ।

এম, ডি, ডি

ভারত-সফরে অষ্ট্রেলিয়া সার্ভিস দল :—

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে বিলাতে অবস্থানকালীন অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের এক সম্প্রদায় টেষ্ট খেলোয়াড় লিণ্ডসে হাসেটের নেতৃত্বে বিলাতে ভিক্টরি টেষ্ট খেলায় যোগদান করে। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে উক্ত দল ভারতে আসে ও সময়াভাব হেতু অল্প দিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট নয়টি খেলায় তাহারা যোগদান করে। অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের ইহা দ্বিতীয় ভারত-সফর। ইতিপূর্ব্বে জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে ক্রিকেট-জগতের গভর্ণর জেনারেল নামে খ্যাত অনন্যসাধারণ খেলোয়াড় ম্যাকার্টানীর সহযোগিতায় এক শক্তিশালী দল ভারত-ভ্রমণে আসে। রাইডারের দল ভারতে ২৩টি খেলার মধ্যে ১১টিতে জয়লাভ করে ও আটটি খেলায় পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। বাকী চারিটি খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই।

হাসেটের নেতৃত্বে আগন্তুক অষ্ট্রেলিয়া দলটি সামরিক খেলোয়াড়গণের সমন্বয়ে গঠিত। এই দলভুক্ত অন্যতম খেলোয়াড়দ্বয় কার্মোডী ও সিসৃমে যথাক্রমে বিলাতে ১৯৪৩—৪৪ সালে অষ্ট্রেলিয়া আর, এ, এফ, বাছাই দলের অধিনায়কত্ব করেন।

লিণ্ডসে হাসেটের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ব্র্যাড্‌ম্যানের অধিনায়কতায় হাসেটকে অষ্ট্রেলিয়া পক্ষে ইংলণ্ডের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ায় ও বিলাতে টেষ্ট খেলায় দেখা গিয়াছে। মিলার (সরকারী অধিনায়ক), কার্মোডী, পেপার, পেটিফোর্ড, হুইটিংটন ক্রেমনার, রোপার, ওয়ার্কম্যান, এলিস-সিসৃমে, প্রাইস, ক্রিষ্টোফানী ও উইলিয়ামকে লইয়া অষ্ট্রেলিয়া সার্ভিসদল গঠিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট জনসন এই দলের ম্যানেজার হইয়া আসেন। সর্ব্বসমেত ১৮ জন লইয়া এই দল ২২শে অক্টোবর ভারতে আসিয়া পৌঁছায়। বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনার আতিশয্যে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়গণ অভিভূত হইয়া পড়ে। বোম্বায়ে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সরকারী ভাবে তাহাদিগকে সাদরসম্ভাষণ জানায়।

তাঁহারা মোট নয়টি খেলায় যোগদান করেন। তুইটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করিয়া মাত্র একটি খেলায় জয়ী হন। বাকী ছয়টি খেলা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। ভারতের চারিটি অঞ্চলীয় দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় প্রিন্সেস একাদশের বিরুদ্ধে ব্যতীত যথাক্রমে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে তাঁহারা ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে বেসরকারী খেলায় যোগদান করেন।

ফলাফল :—

প্রথম খেলা—লাহোর

উত্তরাঞ্চল :—১ম ইনিংস—৪১০ (হাফিজ ১৭৩, ইমতিয়াজ নট আউট ১৩৮ ; ক্রিষ্টোফ্যানী ৩৮ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৭ উইকেটে ১০৩ (পেপার ৪৫ রাণে ৭টি)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৫১ (পেপার ৯৭, হ্যাসেট ৭৩ হাফিজ ১৫৫ রাণে ৫টি।

খেলা—অমীমাংসিত থাকে।

দ্বিতীয় খেলা—দিল্লী

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৪২৪ (হ্যাসেট ১৮৭, উইলিয়ামস—নট আউট ১০০, সি, এস, নাইডু ১৩৮ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৫ উইকেটে ৩০৪ (হ্যাসেট নট আউট ১২৪, সি, এস, নাইডু ১৩৮ রাণে ২টি, আমীর এলাহী ১৮৭ রাণে ২টি)

প্রিন্সেস একাদশ—১ম ইনিংস—৪০১ (মুস্তাক আলী ১০৮, অমরনাথ ১৬৩, এলিস ১০ রাণে ৪টি) খেলার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই।

তৃতীয় খেলা—বোম্বাই

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৬২ (মিলার ১০৬, প্রাইস ৫৫, মানকড় ৬৫ রাণে ৩টি, আমীর এলাহী ৮৭ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—২ উইকেটে ৮৬।

পশ্চিমাঞ্চল—১ম ইনিংস—১ উইকেটে ৫০০, (মুদী ১৬৮ মার্চেন্ট ৭৭, হাজারী ৭৩, এলিস ১১৩ রাণে ৪টি)

খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

চতুর্থ খেলা—বোম্বাই

প্রথম বেসরকারী টেষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৫৩১, (কার্মোডী ১১৩, পেটীফোর্ড ১২৪, পেপার ১৪, হাজারী ১০১ রাণে ৫টি ও সি, এস, নাইডু ১৪১ রাণে ৩টি)—২য় ইনিংস—১ উইকেটে ৩১,

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৩৩১ (হাজারী ৭৫, অমরনাথ ৬৪)

২য় ইনিংস—৩০৪ (মার্চেন্ট ৬১, অমরনাথ ৫০, পেপার ১০ রাণে ৩টি ও প্রাইস ৫৪ রাণে ৩টি)

সময়াভাবে ভারতীয় দলের পরাজয়ের গ্লানি হইতে অব্যাহতি ও খেলা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

পঞ্চম খেলা—পুণা

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩০০ (হ্যাসেট ১৫, পেপার ৫০, সিন্ধে ১১০ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৩ উইকেটে ৮৫

ভারতীয় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়—১ম ইনিংস—১ উইকেটে ৩৮৫ (মেজো নট, আউট ২০০, হাফিজ নট, আউট ১৭১)

প্রবীণ খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর এই খেলায় অধিনায়ক মনোনীত হইলেও তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, কে, মন্ত্রীকে অধিনায়কত্ব করার সুযোগ দেন। খেলার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই।

ষষ্ঠ খেলা—কলিকাতা

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১০৭ (এন, চৌধুরী ৩৫ রাণে ৩টি সি, এস, নাইডু ২১ রাণে ৩টি ও সর্ব্বাতে ৮ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৩০৪ (হ্যাসেট ১২৫, ক্রিষ্টোফ্যানী ৬১ ; এন চৌধুরী ৩০ রাণে ৩টি ও সর্ব্বাতে ৬৩ রাণে ৩টি)

পূর্ব্বাঞ্চল—১ম ইনিংস—১৩১ (মুস্তাক আলী ৪৬ ; ক্রিষ্টোফ্যানী ৪৬ রাণে ৪টি, প্রাইস ১৪ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৮ উইকেটে ২৮৪ (ডেনিস কম্পটন ১০১ মুস্তাক আলী ৫৮)—পূর্ব্বাঞ্চল তুই উইকেটে জয়ী হয়।

অষ্ট্রেলিয়া দলের ভারতে ইহা প্রথম বিপর্য্যয়। বিলাতী আন্তর্জাতিক পেশাদার ডেনিস কম্পটনের শতাধিক রাণে ও খেলার শেষাবস্থায় হোলকার দলের নিম্বলকরের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং-এর জন্য পূর্ব্বাঞ্চল দল জয়ী হইতে পারে।

সপ্তম খেলা—কলিকাতা

দ্বিতীয় বেসরকারী টেষ্ট

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৩৮৬ (মানকড় ৭৩, মুদি ৭৫, হাজারী ৬৫, পেপার ১২০ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৪ উইকেটে ৩৫০ (মার্চেন্ট নট্ আউট ১৫৫, হাফিজ নট্ আউট ৮৬, পেপার ৯৪ রাণে ৬টি)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৪৭২ (হুইটিংটন ১৫৫, পেটীফোর্ড ১০১ ; মানকড় ১৪৭ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—২ উইকেটে ৪১ খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

অষ্টম খেলা—মাদ্রাজ

দক্ষিণাঞ্চল—১ম ইনিংস—১৫১ (আয়বারা নট, আউট ৪১, পালিয়া ৪৮, এলিস ২১ রাণে ৪টি, প্রাইস্ ৩৩ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—২৩৩ (আয়বারা ৪৫, রামসিং ৪২, গোপালন ৪১, মিলার ১১ রাণে ৩টি)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১১৫ (ডার্কম্যাম ৭৬, গোলাম আমেদ ৫৬ রাণে ৪টি ও রামসিং ৫৭ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৪ উইকেটে ১১৮ (গোলাম আমেদ ৫১ রাণে ৪টি ; কার্মোডী নট্ আউট ৮৭)

অষ্ট্রেলিয়া দলের একমাত্র জয়লাভ ছয় উইকেটে। দক্ষিণাঞ্চল পরাজিত।

নবম খেলা—মাদ্রাজ

তৃতীয় বেসরকারী টেষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৩১ (ব্যাসেট ১৪৩, পেপার ৮৭, ব্যানার্জী ৮৬ রাণে ৪টি ও সর্ব্বাতে ৯৪ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—২৭৫ (কার্মোডী ৯২, হুইটিংটন ৬৭ ; ব্যানার্জী ৮১ রাণে ৪টি ও সর্ব্বাতে ১১৪ রাণে ৪টি)

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৫২৫ (অমরনাথ ১১৩, মুদী ২০৩, গুলমহম্মদ ৫৫, ও এস, নাইডু ৬৪ ; পেপার ১১৮ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৪ উইকেটে ৯২

ভারতীয় একাদশ ছয় উইকেটে জয়লাভ করে।

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতই কংগ্রেসের আদর্শ

গত সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, জনসাধারণের অবগতির জন্য এবং নির্ব্বাচন-প্রার্থী কংগ্রেসী সদস্যদের নির্ব্বাচন পরিচালনার সুবিধার জন্য কংগ্রেসের আদর্শ, নীতি ও কর্ম্মপন্থা বিশ্লেষণ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি যত শীঘ্র সম্ভব একটি ইস্তাহার রচনা করিবেন এবং উহা বিবেচনা ও গ্রহণ করিবার জন্য নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। এদিকে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্ব্বাচন-কালও আসন্ন। এরূপ অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়া উক্ত ইস্তাহার তাহার সমক্ষে উপস্থিত করা সম্ভব নহে। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি নিজেই উহা রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ইস্তাহারে একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের পরিকল্পনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক তাহার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে উক্ত শাসনতন্ত্র রচিত হইবে এবং দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা অবাধে ভোট দিয়া উহার আইন সভা গঠন করিবে। অনুন্নত অথবা দুর্গতদের উন্নতি ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিতে ভুলিবে না। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস স্বাধীন রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের পক্ষপাতী। এইরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত বিশেষ করিয়া তাহার প্রতিবেশী-রাষ্ট্রগুলির সহিত মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিবে। সুদূর প্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও পশ্চিম-এশিয়ার সহিত প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ সেই প্রাক্তন সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে। কংগ্রেস দীর্ঘকাল যাবৎ অহিংসার ভিত্তিতে তাহার স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে। তাই বিশ্বশান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপরেই কংগ্রেসের আস্থা বেশী। কংগ্রেস পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম চিরকাল সমর্থন করিয়াছে, এখনও করে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার প্রয়োজন এবং এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন সার্থক করিবার জন্য কংগ্রেস সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকিবে।

কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জনগণকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা দান করা। ইস্তাহার রচয়িতারা ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশের প্রধান ও জরুরী সমস্যা হইতেছে, কি ভাবে জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা যায়। ভারত সম্বন্ধে কু-খ্যাত জন-প্রবাদই আছে যে, এ-দেশের শতকরা ১০ জন লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া বিলাসিতা বলিয়া মনে করে। পণ্ডিত নেহরুও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য দুই বেলা প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান আমাদের করিতেই হইবে এবং এই দারিদ্র্যের কলঙ্ক আমাদের দূর করিতেই হইবে। এই জন্য ইস্তাহারের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যেই ইস্তাহারের মধ্যে পরিষ্কার ঘোষণা করা হইয়াছে যে সর্ব্বাঙ্গীন জনকল্যাণের জন্য দেশের প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, রেলপথ, জল-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, জাহাজী ব্যবসা প্রভৃতি সরকারের আয়ত্তে থাকিবে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ব্যাঙ্কিং ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। বিভিন্ন দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া ভূমি-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ বিশেষ প্রদেশের মধ্যে সন্নিবেশিত না করিয়া যত দূর সম্ভব প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাই নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের সারমর্ম্ম।

গত ১০ই ডিসেম্বর (১১৪৫) কলিকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত এবং ১২ই ডিসেম্বর, বুধবারে প্রকাশিত কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

৬০ বৎসর ধরিয়া জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই দীর্ঘ দিনের ইতিহাস হইতেছে ভারতের জনসাধারণের ইতিহাস—এই ইতিহাস হইতেছে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টার ইতিহাস। ক্ষুদ্রাকারে আরম্ভ হইয়া ইহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া এই বিশাল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস সহরের অধিবাসী ও দূরান্তবর্তী পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জনসাধারণের

নিকট হইতেই কংগ্রেস শক্তি অর্জন করিয়া একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেস আজ ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের কামনার জীবন্ত প্রতীক। বহু কাল ধরিয়া কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কংগ্রেসের নামে এবং কংগ্রেসের পতাকাতলে দেশের বহু লোক তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে এবং বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছে। সেবা ও ত্যাগের দ্বারা কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের অন্তরে স্থান লাভ করিয়াছে; জাতির প্রতি কোন অসম্মানের নিকট মাথা হেঁট করিতে অস্বীকার করিয়া কংগ্রেস বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে।

জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য গঠনমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করা এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করাই কংগ্রেসের ব্রত। কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বহু সমস্যা এবং এক বিরাট সাম্রাজ্যের সশস্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস নূতন শক্তি অর্জন করিয়াছে। গত তিন বৎসরের অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান ও নিষ্ঠুর ভাবে তাহা দমন করার পরে কংগ্রেস পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছে এবং জনসাধারণের অধিকতর প্রীতি অর্জন করিয়াছে।

কংগ্রেস ভারতের প্রত্যেকটি লোকের সমান অধিকার লাভের পক্ষপাতী। কংগ্রেস সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, পরমত সহিষ্ণুতা এবং পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা স্থাপনের পক্ষপাতী। সকলেই যাহাতে আপনাদের ইচ্ছামত নিজেদের উন্নতি বিধানের সুযোগ লাভ করে কংগ্রেস তাহাই চাহে। জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং অঞ্চল বিস্তৃততর কাঠামোর মধ্যে নিজেদের জীবন ও কৃষ্টির উন্নতি সাধন করুক, কংগ্রেস এই নীতিই সমর্থন করে। কংগ্রেস এই উদ্দেশ্যে যত দূর সম্ভব ভাষা এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে অঞ্চল ও প্রদেশ গঠনের কথা বলিয়াছে। যাহারা সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করে, কংগ্রেস তাহাদের অধিকার সমর্থন করে এবং সকলের সমান অধিকার লাভের পথে যে সকল বাধা আছে কংগ্রেস তাহা দূর করিবার পক্ষপাতী।

কংগ্রেস এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছে—উহাতে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে। এই রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শে গঠিত হইবে—উহার বিভিন্ন অংশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উহার আইন-সভাগুলি গঠিত হইবে। এই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উহার বিভিন্ন অংশ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবেই সংযুক্ত হইবে। বিভিন্ন অংশকে সর্বাধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্যে সকল অংশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য সাধারণ ও প্রয়োজনীয় কতকগুলি ফেডারেল বিষয়ের একটি তালিকা করা হইবে; সাধারণ বিষয়ের আর একটি তালিকা করা হইবে—উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া না-হওয়া বিভিন্ন অংশের ইচ্ছাধীন বলিয়া ধার্য্য করা হইবে।

শাসনতন্ত্রে যে সকল মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইবে তাহার মধ্যে এইগুলিও থাকিবে :—

(১) প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিবার, স্বাধীন ভাবে সভা-সমিতি করিবার এবং আইনের ও নৈতিক আদর্শের বিরোধী নহে, এরূপ ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ ভাবে অস্ত্র-শস্ত্র না লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে।

(২) প্রত্যেক নাগরিকের নিজের বিবেক অনুসারে কাজ করিবার এবং জনসাধারণের শৃঙ্খলা ও নৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিরুপদ্রবে তাহার নিজের ধর্ম আচরণ ও প্রচার করিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

(৩) সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন ভাষাগত এলাকার সংস্কৃতি, ভাষা ও বর্ণমালা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) আইনের নিকট জাতিধর্ম্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৫) সরকারী চাকুরী, ক্ষমতা বা মর্য্যাদাসম্পন্ন পদ অথবা কোন ব্যবসায় বা বৃত্তি সম্পর্কে জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণাদির বৈষম্য করা হইবে না।

(৬) রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় অর্থে অথবা ব্যক্তি-বিশেষের অর্থে সাধারণের ব্যবহারার্থ নির্ম্মিত কূপ, পুষ্করিণী, রাজপথ, বিদ্যালয় অথবা সাধারণ বিশ্রামাগার প্রভৃতিতে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে।

(৭) প্রত্যেক নাগরিকের অস্ত্র রাখিবার ও বহন করিবার অধিকার থাকিবে, তবে এই সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অনুসারেই উহা রাখিতে হইবে।

(৮) আইনের বিধান ব্যতীত কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা হইবে না অথবা কাহারো বাড়ী বা সম্পত্তি দখল বা বাজেয়াপ্ত করা হইবে না।

(৯) সমস্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিবে।

(১০) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই সর্বজনীন ভাবে ভোটাধিকার থাকিবে।

(১১) রাষ্ট্র বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে বনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে।

(১২) প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীন ভাবে ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করিতে বা উহার যে কোন স্থানে বসবাস করিতে অথবা যে কোন ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিবেন; আইন অনুসারে বিচার বা রক্ষার ব্যবস্থা ভারতের সর্বত্র সকলের পক্ষেই সমান থাকিবে।

অনুন্নত শ্রেণীর রক্ষা ও উন্নতির সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা থাকিবে। তাহারা দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়া জাতীয় জীবনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। উপজাতিসমূহের উন্নতির ব্যবস্থা হইবে এবং তপশীলী শ্রেণীর শিক্ষা ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা থাকিবে।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া বিদেশী শাসনের ফলে জাতির অগ্রগতির পথ বন্ধ হইয়াছে। কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে, অনতিবিলম্বে তাহার সমাধান প্রয়োজন। দীর্ঘদিনব্যাপী শোষণের ফলে জনসাধারণ দুঃখ ও অনশনের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুধু রাজনৈতিক দিক্ দিয়াই দেশ পরাধীন নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মের দিক্ দিয়াও দেশ অবনতির চরমে পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধ-কালে দায়িত্বহীন কর্ত্তৃপক্ষ কর্তৃক ভারতীয় স্বার্থ-বিরোধী শোষণের ফলে এবং অযোগ্য শাসন-ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি

ও শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে। স্বাধীনতা ভিন্ন এই সকল সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাও বুঝিতে হইবে।

দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনধারণের মান কি করিয়া উন্নত করা যায়—ইহাই প্রধান সমস্যা। জনসাধারণের এই মঙ্গলবিধান করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই পথে যে সকল প্রতিবন্ধক তাহা দূর করিতে হইবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি এই জন্যই। শিল্প, কৃষি, সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা ও জনকল্যাণকর কার্য্যাদির জন্য সর্ব্বদাই উৎসাহ দেওয়া হইবে। তজ্জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে যাহাতে ধন-সম্পদ্ না আটক পড়ে ও সমাজ-বিরোধী কায়েমী স্বার্থের উদ্ভব যাহাতে না হয় সেই জন্য শিল্প-ব্যবস্থাসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইবে। যাহার ফলে স্বাধীন ভারত একটি সমবায়সম্পন্ন কমনওয়েলথে পরিণত হইতে পারে। সেই কারণে প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ, খনিজ সম্পদ্, রেলপথ, খাল, নদী, জাহাজী ব্যবস্থা ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থা, মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্স প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে। দারিদ্র্য ভারতের সর্ব্বত্র; কিন্তু উহা বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার কারণ জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে এবং ধনোৎপাদনের অন্যবিধ ব্যবস্থার অভাব। বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ পল্লীর দিকে ঝুঁকিয়াছে; তাহার কারণ, জীবনযাপনের অন্যবিধ পথ তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাজেই ভূমির সমস্যা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান করিতে হইবে; শিল্প-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে; বিবিধ আকারের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাহাতে উহাতে অধিকতর সংখ্যক ভূমি-নির্ভরশীল ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। শিল্পোন্নয়নে ও পরিকল্পনায় অবশ্য বেশী মনোযোগ দেওয়া হইবে। তবে উহার জন্য নূতন করিয়া বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে না। পরিকল্পনা যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইবে। ভূমিহীন কৃষকের জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান করা হইবে। ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার অত্যাবশ্যকীয়। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোনরূপ তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব রাখা হইবে না। তবে মধ্যস্বত্ব লোকের সমান প্রাপ্য মূল্য দেওয়া হইবে। ব্যক্তিগত ভাবে কৃষকের ভূমির মালিকানা স্বত্ব থাকিবে। সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার পত্তন করা হইবে। তবে সকল শুভ প্রচেষ্টাই কৃষকের সম্মতির ফলেই সম্ভব হইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষাসাপেক্ষ সমবায় কৃষিপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইতে পারে। বৃহৎ সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীর নিমিত্ত ও পরীক্ষার জন্য খোলা হইবে। ভূমি ও শিল্পোন্নয়নের জন্য পল্লী ও সহর অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে হইবে। অতীতে পল্লীর অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবহেলা করা হইয়াছে। পল্লীর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নগর ও সহর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে। পল্লীবাসী ও সহরবাসীর মধ্যে সমতা আনয়নের চেষ্টা করা হইবে। ভূমি ও কারখানার উন্নতি ব্যাপারে পল্লী ও সহর অর্থনীতির মধ্যে সমতা আনয়ন করিতে হইবে। কোন বিশেষ প্রদেশেই কেবল কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে না উহা সর্ব্বপ্রদেশেই সমান হারে স্থাপন করা হইবে। তবে উৎকর্ষ হ্রাস না করিয়া উহার চেষ্টা করা হইবে। ভারতের নদীগুলি ভারতের শিল্পোন্নয়নে যথেষ্ট সহযোগিতা করিবে। কিন্তু আজ তাহার শক্তি বৃথা ব্যয়িত হইবে। পরিখা খনন প্রভৃতি ব্যাপারে নদী-কমিশনের বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। বন্যা প্রভৃতির নিরোধকল্পে ও ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে উহা প্রয়োজন। দেশের বহুবিধ উন্নতি এই পথেই সম্ভব। বিজ্ঞান মানুষের জীবনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। সর্ব্ববিধ উন্নতি ইহারই উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাই অত্যাবশ্যকীয়। রাষ্ট্র কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থও রক্ষা করিবে। তাহাদের বেতন, বাসভবন প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিবে, নিজস্ব ইউনিয়ন গঠনের তাহাদের অধিকার থাকিবে। ইহা ছাড়া, তাহাদের বৃদ্ধ বয়স, ব্যাধি প্রভৃতির জন্য বিশেষ রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। পল্লীতে ঋণভারে অতীতে কৃষক সমাজ ধ্বংস হইয়াছে। যদিও সম্প্রতি কয়েক বৎসর বিবিধ ব্যবস্থার ফলে উহা আংশিক হ্রাস পাইয়াছে, তবু ঋণভার এখনও রহিয়াছে। উহাকে অবশ্যই অপসারিত করা হইবে। আশু ও জরুরী ব্যবস্থা সমূহ কেবল যুক্ত ও পূর্ব্ব পরিকল্পনানুযায়ী সম্ভব করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সরকারের অক্ষমতা ও শাসনকার্য্যে অপটুত্বের ফলেই লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দুর্নীতির প্রভাব সর্ব্বত্র পড়িয়াছে। এই জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে কংগ্রেস স্বাধীন বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের পক্ষপাতী, অবশ্য যত দিনে উহা সম্ভব হয়। ভারত সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বভাব রাখিতে চাহে, বিশেষ করিয়া সুদূর প্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, ও পশ্চিম এশিয়ার সহিত সে মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপন করিবে। এই সমস্ত দেশের সহিত ভারতের সহস্র বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। কাজেই স্বাধীনতা পাইলে সে যে তাহাদের সহিত নূতন করিয়া সম্পর্ক স্থাপন করিবে ইহা স্বাভাবিক। ভারত অহিংস উপায়ে চিরদিন স্বাধীনতা-সংগ্রাম করিয়াছে। বিশ্ব-রাজনীতিতেও সে শান্তি ও সহযোগিতার পক্ষপাতী। ভারত অন্যান্য পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমর্থন করিবে। কারণ, সাম্রাজ্য-বাদের বিনাশে ও জনগণের স্বাধীনতার উপরই বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাহার পর উহা ভারতের ইতিহাসে অতি পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। উহারই দাবী ও চ্যালেঞ্জ লইয়া কংগ্রেস আজ দণ্ডায়মান। ঐ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া এবং উহাকেই সংগ্রাম-ধ্বনিরূপে গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস নির্ব্বাচনে নামিয়াছে। তাই দেশের সমস্ত ভোটদাতার নিকট কংগ্রেস তাহার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট-দানের জন্য আবেদন করিতেছে। আজিকার মুহূর্ত্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় ভারী। তাই এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে সকলে ইহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান। নির্ব্বাচনে ছোটখাট ব্যাপার গণ্য করা উচিত নয়; ব্যক্তি-বিশেষ কিম্বা সাম্প্রদায়িক চীৎকার গ্রহণযোগ্য নহে। একমাত্র দেশের বন্ধনমুক্তি ও স্বাধীনতাই আজ স্মরণযোগ্য। তাহা হইতেই জনগণের সকল স্বাধীনতা সুলভ হইবে। বহুবার ভারতবাসী স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। আজ আবার তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত আদর্শ বহু বার আমাদের আহ্বান করিয়াছে।

আজ আবার ডাকিতেছে! দিন আসিতেছে, যে দিন আমরা পূর্ণভাবে ইহাতে সাড়া দিব। এই নির্ব্বাচন উহার একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা-ক্ষেত্র মাত্র। বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি সুরু হইয়াছে। যাঁহারা ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতা কামনা করেন, তাঁহারা সাহস ও শক্তিসহ এই পরীক্ষায় সাড়া দিন। আমাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ভারতের দিকে অগ্রসর হউন।

ইস্তাহারের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই অন্যান্য স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হইবে। ভারতের জনসাধারণ ইতিপূর্ব্বে বহু বার মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পূর্ব্বে বহু বার ভারতের জনসাধারণের পক্ষে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন এবং স্বাধীনতা দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের কথাও দেশবাসী অনেক বার শুনিয়াছে। এইবার ইস্তাহারের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে শুধু একটিমাত্র প্রশ্নই জাগিবে।

ইস্তাহার ও ইতিহাস

দেশবাসীর মনে আজ যদি কোন প্রশ্ন জাগে তাহা হইলে ঐ একটি-মাত্র প্রশ্নই জাগিবে—"হায়, ইস্তাহার? তুমি কি শুধু ইস্তাহার? কাগজে লিখা?" তাছাড়া ইস্তাহারের বিরুদ্ধে বলিবার কাহারও কিছু নাই। কংগ্রেসের শত্রু যাঁহারা তাঁহারাও এই ইস্তাহারের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিবেন না। কারণ, এই ইস্তাহারের মধ্যে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর দীর্ঘ দিনের কামনা, বাসনা ও স্বপ্ন যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কোটি কোটি মূঢ়, ম্লান ও মূক ভারতের জনসাধারণ এই ইস্তাহারের মধ্যে কোটি কণ্ঠে তাহাদের দাবী, তাহাদের অধিকার ঘোষণা করিয়াছে। সাম্য, স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের যে মন্ত্র এই ইস্তাহারের প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেশবাসীকে অফুরন্ত প্রেরণা দিবে এবং আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামে নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ইস্তাহার যেন শুধু মুখের কথার ইস্তাহার না হয়, শব্দ ও প্রতিশব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হইয়া ইস্তাহার যেন মহাব্যোমে বিলীন না হইয়া যায়। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের এই কমলা-লেবুর ন্যায় পৃথিবীতে কত হাজার হাজার ইস্তাহার, মহামূল্য চার্টার, মহাবাণী, স্বর্ণপ্রতিশ্রুতি ও বজ্রকণ্ঠের বিবৃতি পথের ধূলায় সমাধিস্থ হইয়াছে। ইস্তাহার ও চার্টারের কত ভাষার স্বপ্ন-প্রাসাদ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গুপ্ত বোমার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারের শেষ পরিণতি যেন বিশ্বের অধিকাংশ চার্টার ও ইস্তাহারের মতো বাক্য-সর্ব্বস্ব না হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইস্তাহারের প্রতিটি অক্ষর কার্য্যক্ষেত্রে পালন করিয়া যেন প্রমাণ করিয়া দেন যে, এ পৃথিবীর প্রতারণা ও অসাধুতার পথ, ধাপ্পা ও মিথ্যার ঘৃণ্য পথ কংগ্রেসের নহে। কংগ্রেসের পথ সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ।

তথাপি এই আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সাধুতার প্রশ্ন উত্থাপন করার আজ প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা করিলাম। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, স্খলন, পতন-ত্রুটি হইতে কংগ্রেস শিক্ষালাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেসকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই প্রস্তাব যদি প্রত্যাশিত স্বাধীনতার পরিকল্পনার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং কংগ্রেসের দাবী যদি তাহার মধ্যে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে কংগ্রেস-নেতারা কি করিবেন, তাহা দেশবাসী আজও সঠিক জানিতে পারে নাই। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন করিবার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাঁহাদের নাই। বড়লাট ও বাঙ্গালার ছোটলাটের সহিত গান্ধীজী ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই অবশ্য 'আপোষ ও আন্দোলন' দুই নীতিই কংগ্রেস গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; রাজনৈতিক ভাবগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে কংগ্রেস "আপোষের" (Policy of Reconciliation) পথেই অগ্রসর হইবে। নির্ব্বাচনের পর যদি কংগ্রেস-নেতারা আপোষ-রফাই করেন (মুসলিম লীগকে বয়কট করিয়া, না হাত মিলাইয়া ?), তাহা হইলে "স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের" যে পরিকল্পনা নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে রূপ পাইয়াছে তাহার পরিণাম কি হইবে? ১১৩৬ সালের ফৈজপুর কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয় এই মর্ম্মে যে, ১১৩৫ সালের "গবর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে" পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র কংগ্রেস সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছে; কংগ্রেসের মতে এই শাসনতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করার অর্থ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য কায়েম করা।

"The Congress reiterates its entire rejection of the Government of India Act of 1935 and the constitution that has been imposed on India against the declared will of the people of the country. In the opinion of the congress any co-operation with this constitution is a betrayal of India's struggle for freedom and a strengthening of the hold of British Imperialism···"
(Faizpur Congress Resolution, Dec 27 & 28, 1936)

দুঃখের বিষয়, ১১৩৬ সালের ডিসেম্বরে এই বৈপ্লবিক ও তেজস্বী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ১১৩৭ সালের মার্চ মাসেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়। তাহার ফলে সে-দিন স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছিল কি না, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য কায়েম করিবার পথ সুগম করা হইয়াছিল কি না, তাহার বিচার দেশবাসীর করিবার অধিকার আছে কি? রাজনীতির কি অপূর্ব্ব নিষ্ঠুর পরিহাস! মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেসের অবস্থা কি হইয়াছিল? নির্ব্বাচনী-ইস্তাহার তখনও প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং সেই ইস্তাহার অনুযায়ী কংগ্রেস-মন্ত্রীরা কি করিয়াছিলেন? পণ্ডিত নেহরুর মুখ হইতেই তাহা শ্রবণ করুন:

"In April 1938 I wrote to Gandhiji expressing my dissatisfaction at the work of the Congess Ministries; 'They are trying to adapt themselves for too much to the old order and trying to justify it. But all this, bad as it is, might be tolerated. What is worse is that we are losing the high position that we have built up, with so much labour, in the hearts of the people. We are sinking to the level of ordinary politicians."—(Autobiography : P. 603).

আমাদেরও আশঙ্কা এইখানে ও এই কারণে। আজকের বিপ্লবী নেতারা যদি আগামী কল্য মন্ত্রিত্বের মসনদে বসিয়া "ordinary politician"এর অতিনিম্ন স্তরে নামিয়া আসেন, তাহা হইলে নির্বাচনী ইস্তাহারের পরিণাম কি হইবে, এবং আমরাই বা কোথায়, কোন্ অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া যাইব? তাই বলিতেছি, ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি না হয় এবং শুধু পটে-লিখা ছবির মতো ইস্তাহার যেন শুধু কাগজে-লিখা ইস্তাহারই না হয়। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারত গঠনের পথে কংগ্রেস সত্যই যেন আজ জয়যাত্রা করে। ইহাই দেশবাসীর অন্তরের কথা ও কামনা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবাবলী

গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে অহিংস নীতি এবং কমুনিষ্টদের সম্বন্ধে প্রস্তাব দুইটি উল্লেখযোগ্য। দেশের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া দ্রুতগতিতে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং কংগ্রেসের নাম করিয়া এক শ্রেণীর লোক যে-ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপর প্রকাশ্যে গুণ্ডামি ও কুৎসা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইয়াছে যে, কংগ্রেসের নীতি সম্পূর্ণ অহিংস নীতি। রাষ্ট্রপতি আজাদ আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এইবারের প্রস্তাবগুলির মধ্যে অহিংস নীতি সম্বন্ধে প্রস্তাবই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোন নির্ব্বাচিত পদে থাকিতে পারিবে না। সাধারণ সভ্য হইবার অধিকার হইতে কম্যুনিষ্টদের অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটি বঞ্চিত করেন নাই। আমরা ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত- প্রস্তাবগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

১। আইনতগত পক্ষ সমর্থন ছাড়াও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের সম্বন্ধে বহুবিধ সমস্যা দেখা দেওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটি আজাদ হিন্দ ফৌজ পক্ষ সমর্থন কমিটি হইতে পৃথক্ একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন; এই কমিটি ঐ সব সৈন্যদের খোঁজখবর লইবেন এবং প্রয়োজন মতো তাঁহাদের সাহায্য দিবেন। এই কমিটির নাম হইবে "আজাদ হিন্দ ফৌজ অনুসন্ধান ও সাহায্য কমিটি।" উক্ত কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের যে-সব সৈন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া মারা গিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গের পুরোপুরি খবর-সংগ্রহের চেষ্টাও কমিটি করিবেন। নিতান্ত জরুরী ক্ষেত্র ছাড়া গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াই সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"আজাদ হিন্দ ফৌজ অনুসন্ধান ও সাহায্য কমিটি"তে নিম্নলিখিত সদস্যগণ থাকিবেন: (১) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (চেয়ারম্যান) (২) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (৩) আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী (৪) শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু (৫) মিঃ রফি আহমেদ কিদোয়াই (৬) মহম্মদ দাউদ গজনবী (৭) শ্রীপ্রকাশ (সেক্রেটারী) (৮) রঘুনন্দন শরণ (৯) খুরশেদ নওরোজী (১০) রাও সাহেব পটবর্দ্ধন (১১) সর্দার প্রতাপ সিং এবং (১২) বোম্বাই আজাদ হিন্দ ফৌজ কমিটির এক জন প্রতিনিধি।

ইঁহারা আরও সদস্য লইতে পারিবেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যিনি কোষাধ্যক্ষ, তিনিই আজাদ হিন্দ ফৌজ পক্ষ সমর্থন এবং অনুসন্ধান ও সাহায্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ হইবেন।

ব্রহ্ম ও মালয়

২। ব্রহ্ম ও মালয় কর্ত্তৃপক্ষ সেখানকার ভারতীয়দের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহার সংবাদ গভীর উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেককে গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ অথবা কারারুদ্ধ করা হইয়াছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদও পাওয়া যাইতেছে না এবং সংবাদের অভাবে ভারতবর্ষে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব দেশে আর্থিক অবস্থায় অবনতি এবং খাদ্যাভাব ও এ যাবৎ প্রচলিত মুদ্রা বাতিল হওয়ার দরুণ অসামরিক জনসাধারণ অভাবগ্রস্ত ও দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে অনেক ভারতীয় আছে এবং তাহাদের দুর্ভোগ আরও বেশী হইতেছে; কারণ, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্য বা রক্ষা করিতেছেন না। ফলে তাহাদের অবস্থা রাষ্ট্রাশ্রয়হীন লোক বা গোষ্ঠীর সামিল হইয়াছে, যেন ইহাদের দায়িত্বভার লইবার কেহ নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশে অবস্থিত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না, অথচ পক্ষসমর্থন ও সাহায্য কমিটির প্রতিনিধি এবং নেতৃবৃন্দকে ব্রহ্ম ও মালয়ে গিয়া স্বদেশবাসীদের এই জরুরী প্রয়োজনে সাহায্য দেওয়ার সুযোগও তাঁহারা দিতেছে না। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্ম ও মালয়ে গিয়া সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা তদন্ত করিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি ব্রহ্ম ও মালয়ে যে-সব ভারতীয় আছেন, তাঁহাদের আপন আপন অঞ্চলে পক্ষসমর্থন ও সাহায্য-কমিটি গঠন করিয়া নিজেদের ও সেখানকার দুর্গত স্বদেশবাসীদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। এই কমিটিগুলিকে ভারতে যে কেন্দ্রীয় পক্ষসমর্থন কমিটি আছে তাহার সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে।

আঞ্জুমান-ই-ওয়াতান

৩। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বেলুচিস্থানের আঞ্জুমান-ই-ওয়াতানের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি তাহাদের নিম্নরূপ প্রতিনিধি মঞ্জুর করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দুই জন সদস্য এবং কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সাত জন প্রতিনিধি।

অহিংস নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব

অহিংস নীতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটি এইরূপ:—

"১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর নেতাবিহীন জনগণ নিজেদের হাতেই পরিচালন ভার গ্রহণ করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। জনগণ বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং অনেক বীরত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু তাহারা

এমনও অনেক কার্য্য করিয়াছে যেগুলি অহিংস নীতির পর্য্যায়ে পড়ে না। সুতরাং জনগণ যাহাতে ঠিক পথে পরিচালিত হয় তজ্জন্য কংগ্রেসের পক্ষে পুনরায় ইহা দৃঢ় ভাবে জানান প্রয়োজন হইয়াছে যে, ১৯২০ সালে কংগ্রেস যে অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সাধারণের সম্পত্তি জ্বালাইয়া দেওয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেলগাড়ী লাইনচ্যুত করা এবং ভীতি প্রদর্শন করা অহিংস নীতির পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, ১৯২০ সালে কংগ্রেসের প্রস্তাবে যে অহিংস নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার ক্রমবিকাশ ও অভিব্যক্তির ফলে এবং উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করার ফলে ভারতবর্ষ আজ বহু উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটি আরও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চরকা হইতে আরম্ভ করিয়া খাদি-কেন্দ্র পর্য্যন্ত কংগ্রেসের যাবতীয় গঠনমূলক কার্য্যাবলী অহিংস নীতিরই প্রতীক এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য সর্বপ্রকার কার্য্য যাহাতে গান্ধীজী-বর্ণিত গঠনমূলক কার্য্যাবলীর সহায়ক হইতে পারে, সেইরূপ ভাবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

জনগণ কর্তৃক ব্যাপক ভাবে গঠনমূলক কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন করা কল্পনাতীত বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে প্রস্তাব

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে বিদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে যে স্বাধীন সেনাবাহিনী গঠিত হইয়াছিল, তাহার ত্যাগ, শৌর্য্যবীর্য্য, নিয়মানুবর্তিতা, একতা এবং সাহসিকতায় কংগ্রেস গর্ব অনুভব করে এবং এই ফৌজের যে সকল সদস্যের বিচার হইতেছে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা ও ফৌজের দুঃস্থ জনগণকে সাহায্য করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেস-কর্মিগণ যেন ইহা ভুলিয়া না যান যে, এই সমর্থন ও সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ ইহা নহে যে, স্বরাজলাভের জন্য যে শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, কংগ্রেস তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

ব্রহ্ম ও মালয়স্থিত ভারতবাসীদের সাহায্যদানের প্রস্তাব

ব্রহ্ম ও মালয়স্থিত ভারতীয়গণ খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার অভাবে যে কষ্ট পাইতেছে, তাহা নিরসনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব করিতেছে যে, ভারতীয়গণ এবং বিশেষ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সদস্যদের চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রকার সাহায্যদানের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এক দল চিকিৎসক প্রেরণ করা হউক। এই চিকিৎসক দল সংগঠনের ভার কমিটি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপর দিয়াছেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ তদন্ত ও সাহায্যদান সমিতির সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত পরামর্শ করিয়া এ সম্পর্কে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা করিবেন।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে আর একটি পত্র প্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্তা রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মালয় এবং ব্রহ্মদেশে এক দল চিকিৎসক প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট উক্ত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ছাত্রদের উপর পুলিসের গুলীচালনা

কলিকাতায় শোভাযাত্রী ছাত্রদের উপর পুলিসের গুলীচালনা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

"২১শে নবেম্বর কলিকাতায় ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর গুলী-বর্ষণের ফলে এক জন ছাত্রের অমূল্য জীবনের অবসান হইয়াছে এবং বহু ছাত্র আহত হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে, ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর গুলীবর্ষণ ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন। কমিটি তাহাদের এই অভিমতও লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, কলিকাতার ছাত্ররা বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া অহিংসা-সম্মত সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।"

জাভায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদ

জাভায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের এবং ডাঃ সুকর্ণের অনুরোধক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে জাভায় যাইবার সুযোগ সুবিধা দিতে ভারত গবর্ণমেণ্টের অসম্মতির প্রতিবাদ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

"ইন্দোনেশিয়াবাসীরা তাহাদের নব-অর্জিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অবিচল সাহস ও দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে বৃটিশ ও ওলন্দাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা প্রশংসা ও সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া-বাসীরা একবাক্যে স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করা সত্ত্বেও তাহাদের দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জাভা ও ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য অংশে যে নির্ব্বিচার আক্রমণ করা হইতেছে, এই কমিটি দৃঢ়কণ্ঠে তাহার নিন্দা করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দো-চীনে ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রান্তকে যে কোন স্থান হইতে যে কোন ভাবে সমর্থন করা হউক না কেন, সমগ্র এশিয়ায় তাহার বিরুদ্ধে ধিক্কার উত্থিত হইবে। ঐরূপ সমর্থন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিঘোষিত আদর্শ ও এশিয়ার জাতিসমূহের অনস্বীকার্য্য অধিকারের বিরোধী। ইহা দ্বারা শুধু আন্তর্জাতিক বুঝা-পড়ার সম্ভাবনাই নষ্ট হইবে না, কোন ভবিষ্যৎ বিশ্বসঙ্ঘেরও মূলোচ্ছেদ করা হইবে। দুঃখের বিষয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করিয়া এই সকল সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে প্রশ্রয় দিতেছে। ইন্দোনেশীয় ও ইন্দো-চীনা জাতীয়তাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে যে অপরিসীম ক্ষতি ও দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছেন, তজ্জন্য এই কমিটি তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু কমিটি ইন্দোনেশীয় ও ইন্দো-চীনাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য নিয়োজিত হইতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ভারতীয় সৈন্যদের অপব্যবহার করিতেছেন। কমিটি ভারত গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যকে গভীর ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত নেহরুকে ডাঃ সুকর্ণের আমন্ত্রণে জাভায় যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া দেন নাই দেখিয়া কমিটি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং পুনরায় এই সংকল্প করিতেছেন যে, ভারতের বর্ত্তমান দুঃসহ অসহায়তার জন্য যে রাজনৈতিক অধীনতা দায়ী, সেই রাজনৈতিক অধীনতার অবসান ঘটাইতে হইবে।"

কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে কমিটির সিদ্ধান্ত

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি হইতে কয়েক জন কম্যুনিষ্ট সদস্যকে বহিষ্কৃত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোন নির্বাচনমূলক পদে কোন কম্যুনিষ্ট যাহাতে থাকিতে না পারেন, তজ্জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির পুণা অধিবেশনে কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিলের জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। মঙ্গলবারের সেই সাব-কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সাব-কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ তাহাদের গত তিন বৎসরের কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে নাই। বহু কাল ধরিয়া কংগ্রেস নীতি ও কর্মপন্থার বিরোধিতা করাই কম্যুনিষ্টদের নীতি। তাহারা এমন ভাবে বিরোধিতা করিতেছে যে, কংগ্রেসের মর্য্যাদা নষ্ট করাই তাহাদের লক্ষ্য। সুতরাং কংগ্রেসের আলোচনামূলক কোন কমিটিতে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং কমিটি কম্যুনিষ্টদিগকে কংগ্রেসের কোন কার্য্যকরী কমিটিতে গ্রহণের বিরোধী এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোন কোন কম্যুনিষ্ট সদস্যকে বহিষ্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করিতেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি উহা অনুমোদন করিয়া এই সম্পর্কে এক ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাধ্যক্ষ বড়লাটের প্রস্তাবনা

প্রতি বৎসর বড়লাট একবার এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ্ কমার্সের সভায় বক্তৃতা দেন এবং সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের হালচাল বা ভবিষ্যৎ বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করেন। দেশের নানাবিধ সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে কিছু আভাষও তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে পাওয়া যায়। এ-বৎসরও বড়লাট লর্ড ওয়েভেল তাঁহার বাৎসরিক "চেম্বারী বক্তৃতার" মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি, সাধারণ খাদ্য-ব্যবস্থা, কয়লা, বস্ত্রাভাব, ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা, বাণিজ্যিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিবিধ ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি প্রথমেই কোন রকম ভণিতা না করিয়া বলিয়া দিয়াছেন :

"Quit India will not act as the magic sesame, which opened Ali Baba's cave, nor will the problem be solved by violence, since disorder and violence are the things that may check the pace of India's progress."

(Viceroy's Speech at the Associated Chambers of Commerce, on Dec. 10, 1945)

অর্থাৎ "চিচিং ফাঁক্" ধ্বনির মতো "ভারত ছাড়ো" ধ্বনি করিলেই স্বাধীনতার সিংহদ্বার খুলিয়া যাইবে না। হিংসা অথবা বিশৃঙ্খলার দ্বারাও ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। ইহা বড়লাট লর্ড ওয়েভেলের বক্তব্য। বড়লাট বলিয়াছেন : "আমি এক জন পুরাতন সৈনিক। বিগ্রহ ও রক্তপাতের বিভীষিকা আমি জানি। সে-পথ আমাদের পরিহার করিতে হইবে এবং আমরা তাহা পরিহার করিতেও পারি। পরস্পরের মধ্যে আমাদের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" কথা হইতেছে, কি ভাবে এই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? সে-সম্বন্ধে লর্ড ওয়েভেল্ যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও উপভোগ্য। ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী ওয়েভেল্ সাহেব বলেন : "বিভিন্ন দলকে এক-মত হইয়া ভারত সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে হইবে। এই দলগুলির মধ্যে ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস আছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ আছে এবং তাহাদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ আছেন, স্বয়ং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও আছেন। সকলেই চান ভারত স্বাধীন হোক্, ভারত উন্নতি করুক্। সকল দল এক মত হইলে এমন কোন সমাধান যে সম্ভব ইহা আমি বিশ্বাস করি। শুভেচ্ছা, সুবিবেচনা ও সহিষ্ণুতা সহকারে অগ্রসর হইলে এই দিক্ দিয়া কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। আজ আমরা এক করুণান্ত পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছি। আগামী বৎসর যে আলোচনা আরম্ভ হইবে তাহা যদি জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ দ্বারা ব্যাহত হয়, যদি সেই অবস্থায় বলপ্রয়োগ নীতির উদ্ভব হয়, ভারত এবং সমগ্র জগতের পক্ষে তাহা খুবই মর্ম্মান্তিক হইবে।…আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও তাহাদের প্রতিনিধিরূপে আমি ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে, শাসনতন্ত্র রচনাকালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনে সর্ব্বদলের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও এই সম্পর্কে ইহাই বলিয়াছেন।…" অতঃপর উপসংহারে আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সৈনিক বড়লাট সাফ্ বলিয়া দিয়াছেন :

"I repeat that it is our earnest wish and endeavour to give India freedom but *we cannot and will not abandon* our responsibilities without bringing about some reasonable settlement.' (*Italics* আমাদের)

"আমি আবার বলিতেছি, ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়াই আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা। কিন্তু কোন সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত আমরা ভারতের দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারি না এবং ত্যাগ আমরা করিবও না।"

ওয়েভেল্ সাহেব সমাধানের যে পথ বাত্‌লাইয়া দিয়াছেন তাহা সনাতন পথ। তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে চারটি দলের মধ্যে মীমাংসার প্রয়োজন। প্রথম দল হইল কংগ্রেস, তার পর বোধ হয় দ্বিতীয় দল মুসলিম লীগ (মুসলিমদের প্রতিনিধি), তৃতীয় দল দেশীয় নৃপতিবৃন্দ এবং চতুর্থ দল স্বয়ং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট। ইহাদের মধ্যে যদি মুসলিম লীগকেও বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলেও দেশীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দ এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, এই দুইটি দল থাকেন, অর্থাৎ একটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় স্তম্ভ, আর একটি স্বয়ং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এখানেও আধাআধি ভাগ হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

কংগ্রেস + লীগ = দেশীয় রাজা + বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই "balance of power"ও আলোচনার সময় বজায় থাকিবে না বলিয়া মনে হয়। কারণ, লীগ

লীগ কংগ্রেসের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইবে। একমাত্র কংগ্রেসই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিবে। সুতরাং হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে, চারটি দলের মধ্যে দুইটি দল সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে, আর দুইটি দল বিপক্ষে, তাহার মধ্যে লীগ অন্ধের মতো কংগ্রেস-বিরোধী হইয়া হয়ত নিরপেক্ষ থাকিবে। তাহা হইলে আপোষ-আলোচনার অথবা মীমাংসার ফল হইবে এই যে, কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট ৩—১ ভোটে হারিয়া যাইবে। আর তাহা না হইলে কংগ্রেসকে প্রথমে লীগের সহিত করমর্দন করিতে হইবে, এবং তার পর সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার অনুচরদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। অর্থাৎ হয় "সংগ্রাম", না হয় "আপোষ-আলাচনা" ওরফে "আত্মসমর্পণ"। বোম্বাইয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেস নেতারা অবশ্য "Policy of Negotiation and Conciliation"-এর কথাও পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর কি?

কংগ্রেস অভিনেতাদের রিহার্সাল?

অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতেই আমরা বিচার করিতে পারিব, কংগ্রেস কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে?

যে দিন লর্ড ওয়েভেল্ "এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ্ কমার্স-এ" বক্তৃতা দেন, সেই দিনই (১০ই ডিসেম্বর, সোমবার) অপরাহ্ণ সাড়ে ৬ ঘটিকায় কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট হাউসে গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার হয়। লাট-ভবনে গান্ধীজী প্রায় দুই ঘণ্টা দশ মিনিট ছিলেন, কিন্তু ৫০ মিনিট তাঁহার সহিত বড়লাটের আলাপ-আলোচনা হয়। তার পর ফিরিয়া আসিবার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসের বাহিরে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলেন; "আমি আপনাদের তথা দেশের সেবা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমি সকলকে শৃঙ্খলানুগ হইতে অনুরোধ করিতেছি। ভারত অতীতে শান্তির বাণী বহন করিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর।" আশ্চর্য্য! ঐদিন সোদপুরে প্রার্থনা-সভাতেও গান্ধীজী এই একই বাণী দিয়া লাট-ভবন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

এই বাণীর সহিত "ভারত ছাড়ো", "এশিয়া ছাড়ো", "আগষ্ট আন্দোলনের বীরত্ব" ব্যঞ্জক বক্তৃতার তুলনা করিলে কি মনে হয়? শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়াই যদি স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হয় তাহা হইলে এত অগ্নিবাণীর প্রয়োজন কি? এইখানেই শেষ নয়, ব্যাপারটি আরও অনেক গূঢ় বলিয়াই মনে হয়। ঘটনা-পারম্পর্য্য এইখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়! ১০ই ডিসেম্বর গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকারের পর ১১ই ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেষ দিনের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, প্রস্তাবটিকে রাষ্ট্রপতি আজাদ নিজেই বলিয়াছেন "the most important resolution on the Congress creed of non-violence"—অহিংস নীতির প্রস্তাব পুনর্ঘোষিত ও গৃহীত হয়। স্বয়ং গান্ধী এই প্রস্তাবের রচয়িতা। প্রস্তাবের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়:

"After the arrest of the principal Congressmen in August 1942, the *unguided masses* took the reins in their own hands and acted almost spontaneously. If many acts of heroism and sacrifice are to their credit, there were acts done which could not be included in non-violence. It is, therefore, necessary for the Working Committee to affirm for the guidance of all concerned that the policy of non-violence adopted in 1920 by the Congress continues unabated, and that such non-violence does not include burning of public property, cutting of telegraph wires, derailing trains and intimidation."

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই সাংবাদিকদের একটি বৈঠকে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অহিংস নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবটিকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন:

"১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের পর জনসাধারণের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, দেশবাসীর, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মীদের কংগ্রেসের অহিংসনীতি তেমন বর্ণে বর্ণে অনুসরণ করিবার প্রয়োজন আর নাই। জনসাধারণ ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে তাহাদিগকে কঠোর ভাবে অহিংসনীতি আর অনুসরণ করিতে হইবে না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যই ওয়ার্কিং কমিটিতে অহিংসার আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।"

অতঃপর রাষ্ট্রপতি বলেন, "অহিংসার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতীয় জাতীয়বাহিনী সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতীয় বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমাদের সমর্থন ও সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ এই নহে যে কংগ্রেস অহিংসনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

বড়লাটের বক্তৃতার পরবর্ত্তী ঘটনা হিসাবে যদি এইগুলি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সকলেই অতি সহজে, সরল পাটিগণিতের সূত্র অনুযায়ী অঙ্ক কষিয়াই বলিয়া দিতে পারিবেন, কংগ্রেস রাজনীতি কো‌ন্ পথে অগ্রসর হইতেছে? "আগষ্ট আন্দোলন" ও "জাতীয় বাহিনীর" বীরত্বকে একমাত্র পুঁজি করিয়া কংগ্রেস-নেতারা নির্ব্বাচনী বৈপ্লবিক বক্তৃতা দিতেছেন, কিন্তু হায়! তাঁহারা আজও "আগষ্ট আন্দোলনের" দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না, এবং তাহার নীতিকেও কংগ্রেস-বিরোধী নীতি বলিলেন। জাতীয় বাহিনীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন, অথচ তাহাদের নীতি ও কার্য্য-কলাপ সমর্থন করিলেন না। এদিকে কিন্তু তাই বলিয়া বক্তৃতার বিরাম নাই। গরম বক্তৃতার চোটে জনসাধারণও গরম হইয়া উঠিতেছিল, তাই লর্ড ওয়েভেল্ পরিষ্কার একটি ধমক দিয়া দিলেন, আমাদের নেতৃবৃন্দ তাহা বেমালুম হজম করিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাসের জন্য অহিংস নীতির প্রস্তাব পর্য্যন্ত পুনরায় গ্রহণ করিলেন।

আমরা ভাবিতেছি, কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন শেষ হইতে না হইতেই 'Policy of negotiation and conciliation' এই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। প্রাদেশিক নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত কত দূর পৌঁছিবে কে জানে? এবং নির্ব্বাচন শেষ হইবার পর বাস্তবিকই কি নেতৃবৃন্দ কদম্ কদম্ দিল্লী চলিবেন?

ভারতবাসী আজ স্বাধীনতা চাহে। তাহার জন্য তাহারা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। কংগ্রেসের আহ্বানের জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছে। নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গের মতো তাহারা সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া-ঠেলিয়া-ফেলিয়া ছুটিয়া আসিবে, একমাত্র কংগ্রেসের আহ্বানে। তাহারা আপোষের কপট সংগ্রাম ও বুলি চাহে না।

তাহারা চায় আসল সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। বড়লাট লর্ড ওয়েভেল্ মঞ্চাধ্যক্ষরূপে প্রস্তাবনা পাঠ করুন এবং দেশের নেতৃবৃন্দ অভিনেতারূপে সিমলা অথবা দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে স্বাধীনতার রিহার্সাল দিন, ইহা আজ কোন ভারতবাসীই চাহে না। ভারতবাসী আজ পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিতে চায়।

—

ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক ছাত্রসমাজ

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী দিবস উপলক্ষে কলিকাতার ছাত্রেরা গত ২১শে নভেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা করে। সভার পর ছাত্ররা শোভাযাত্রা সহকারে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া এস্প্লানেড অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে ছাত্রদের গতিরোধ করিয়া তাহাদের উপর পুলিশ লাঠির খেল্ দেখায়। পুলিশের বিক্রম তাহাতেই শেষ হইয়া যায় না। ছাত্ররা ডালহৌসি স্কোয়ারে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু উহা "নিষিদ্ধ এলাকা" বলিয়া তাহাদের যাইতে দেওয়া হয় না। ছাত্ররা চুপ করিয়া পথের উপর বসিয়া থাকে। কোন প্রকার অসহিষ্ণুতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় তাহারা দেয় নাই। হঠাৎ অশ্বারোহী পুলিশের আবির্ভাবে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলী চলিতে থাকে। বাহির হইতে উন্মত্ত জনতা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ যে করে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সহিত নীরবে উপবিষ্ট ছাত্রদের কোন সম্পর্ক ছিল না। পুলিশ একটি অজুহাত খুঁজিতেছিল মাত্র এবং সেই অজুহাত তাহারাই সৃষ্টি করে। শান্তিপ্রিয়, নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর পুলিশ নির্ম্মমভাবে গুলীবর্ষণ করে। কয়েক জন নিহত, এবং অনেকেই আহত হন। আজও আহতদের মধ্যে অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন। কয়েক জন সম্প্রতি মারাও গিয়াছেন। গুলীর জের এখনও মিটিয়া যায় নাই।

পুলিশের জুলুম, গুলী ও হুমকির সম্মুখে ছাত্ররা শান্ত ও সংযতভাবে অপেক্ষা করিতেছিল দেশের নেতাদের নির্দ্দেশের জন্য। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য কয়েক বার অনুরোধ করিয়া পাঠায়। কিন্তু শরৎ বাবু উপস্থিত তো হন নাই, উপরন্তু এমন একটি বাণী দিয়াছিলেন, যাহা পাঠ করিয়া যে কোন স্বদেশবৎসল, আত্মমর্য্যাদা-বোধ-সম্পন্ন যুবক অপমানিত বোধ করিবে। শরৎ বাবু বলিয়া পাঠান: "ছাত্রগণ! তোমরা আমার অবাধ্য হইয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। তোমাদের আমি শান্তভাবে ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তোমরা শোন নাই। তোমরা বাহিরের একদল ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া, আমার অবাধ্য হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিয়াছ। এখনও আমি বলিতেছি তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।" দুঃখের বিষয় ছাত্ররা শরৎ বাবুর অমূল্য বাণীতে কর্ণপাত করে নাই। তাহারা ঐ বাণী প্রত্যাখ্যান করিয়া সমুচিত উত্তর দিয়াছিল। ছাত্ররা শান্তশিষ্ট, সুবোধ বালকের মতো পুলিশের গুলী হজম করিয়া, শাসকদের হুমকি হজম করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায় নাই। সারারাত্র তাহারা একভাবে, শান্ত হইয়া বসিয়া থাকে। বৃহস্পতিবার গুলীচালনার প্রতিবাদে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। পরে বি[illegible] কারখানার ও ইউনিয়নে শ্রমিকেরাও ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ধর্ম্মঘট করে। কলিকাতার দোকান-পাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব বন্ধ হইয়া যায়। চারিদিকে উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত জনতা যেন অন্ধ আক্রোশে ও অপমানে গর্জ্জন করিতে থাকে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস, লীগ, কম্যুনিষ্ট, মহাসভা, খাকসার প্রভৃতি সকল দলের ছাত্ররা সকল রকমের পতাকা লইয়া সমবেত হয়। বুকের রক্ত দিয়া বাঙ্গালার যুবসমাজ এক বিরাট গণ-সংহতির বনিয়াদ গঠন করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়। ভবিষ্যৎ ভারতের সংগ্রামের পথ-নির্দ্দেশ ছাত্ররাই দেয়। এই সর্ব্বদলীয় ঐক্য ও বিরাট গণসংহতির সম্মুখে শাসকের "নিষিদ্ধ এলাকার" পুলিশী প্রাচীর ভাঙিয়া যায়। ছাত্ররা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিষিদ্ধ এলাকা ডালহৌসীর দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদের এই জয় ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।

এই যে বিরাট ঐক্য ও সংহতি ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল, ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য একশ্রেণীর নেতা অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুই অন্যতম। শরৎবাবু শুধু বাণী ও বিবৃতি দিয়া এত বড় একটি ঘটনাকে দলীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সুযোগে তিনি তাঁহার কম্যুনিষ্ট-বিরোধী জেহাদের "V-day" (বিজয় দিবস) ঘোষণা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। বিবৃতিতে ক্ষান্ত না হইয়া শরৎবাবু শ্রীরামপুর হাওড়ার জনসভায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন: "মুষ্টিমেয় কম্যুনিষ্ট যদি বাধা না দিত, তাহা হইলে যুবকেরা কংগ্রেসকর্ম্মী হিসাবে আমার আদেশ মান্য করিত এবং বাড়ী চলিয়া যাইত—একটি প্রাণও নষ্ট হইত না। যুবকদের প্রাণেরও যে মূল্য আছে, কম্যুনিষ্ট নেতারা তাহা মনে করেন না।"

দলগত রাজনীতির নীচতা আমরা এ-দেশে যথেষ্ট দেখিয়াছি। সেই গোপন সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির যুগ হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যেক বারই লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রত্যেক দল তাহার বিরোধী দলের লোককে "স্পাই" বলিয়া রটনা করে। ইহা অতি পুরাতন অপকৌশল। কিন্তু এতদূর বিসদৃশ বাড়াবাড়ি ও মাতামাতি বোধ হয় শরৎবাবু ও তাঁহার পুত্র অমিয় বসুর পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। ইতিহাসে দলীয় রাজনীতির এরূপ দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল।

রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, প্যাটেলপ্রমুখ নেতৃবৃন্দের নিকট শরৎবাবু তাঁহায় নিজের বিবরণ ও ভাষ্য-সম্বলিত "আনন্দবাজার" "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বোধ হয় পাঠাইয়া দেন। দূর হইতে সকলেই শরৎ বাবুর ভাষ্যে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকেই সমর্থন করিয়াই বাণী পাঠান! শরৎ বাবুর নিকট রাষ্ট্রপতি আজাদ এই মর্ম্মে একটি বাণী প্রেরণ করেন:

"কলিকাতার শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য আমি সত্যই বিশেষ দুঃখিত। এই ঘটনার মধ্যে আমি তাহাদের হস্তক্ষেপের নিশ্চিত চিহ্ন দেখিতেছি যাহারা কংগ্রেসের পথে বিঘ্ন ঘটাইতে চাহে। যাহাতে এই প্রকার দায়িত্বহীন শোভাযাত্রা আর না হয় এবং যথাসম্ভব শীঘ্র শান্তির স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয় তাহার জন্য চেষ্টা করুন"।

(শরৎচন্দ্রের নিকট ২৫শে নভেম্বর তারিখে লিখিত রাষ্ট্রপতি আজাদের পত্র—২৮শে নভেম্বর প্রকাশিত)

কিন্তু 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে' বলিয়া একটি লোকপ্রবাদ

আছে। মৌলানা আজাদ শরৎ বাবুর বিকৃত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিজে তদন্ত করিয়া, তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুও ছাত্রদের কার্য্য-কলাপ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদের বিবৃতি এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রত্যেক দেশবাসীর উহা পাঠ করা উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন :

"সংবাদপত্রের রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ছাত্রগণ নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াছে। এইরূপ করিয়া ছাত্ররা ভুল করিয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া ভাল ভাবে সমস্ত ব্যাপার তদন্ত করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হাঙ্গামার প্রথম দিনে ছাত্রদের আচরণ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছিল। দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ যদি যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে ছাত্রগণ যে নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশ পালন করিত, তাহার প্রমাণ যথেষ্টই আছে। কিন্তু যাহা দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, নেতৃবৃন্দ যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নাই। ছাত্রগণ যে ঠিক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুলিশের কার্য্য কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। গুলী-বর্ষণের ফলেই যে জনতা উত্তেজিত হইয়াছিল এ-কথা জোর দিয়াই আমি বলিতে পারি। উত্তেজিত জনতা যাহা করিয়াছে তাহা হয়ত প্রশংসনীয় না হইতে পারে, কিন্তু পুলিশই তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।" (১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

"নেতৃবৃন্দ" বলিতে রাষ্ট্রপতি আজাদ কাহার কথা বলিতেছেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ, একমাত্র শরৎ বাবু ভিন্ন কংগ্রেসের প্রায় সকল নেতাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "সংবাদপত্রের রিপোর্ট" বলিতে কোন্ সংবাদপত্রের প্রতি মৌলানা সাহেব ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, "আনন্দবাজার" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ভিন্ন আর কোন সংবাদপত্রই শরৎ বাবুর ভাষ্য ও মিথ্যা অপব্যাখ্যা ফলাও করিয়া প্রকাশ করে নাই এবং আর কোন সংবাদ-পত্রে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ দলগত স্বার্থে পরিবেশন করা হয় নাই। সত্য কখনও দীর্ঘ দিন চাপা থাকে না। দলীয় রাজনীতির হীন ও মিথ্যা অপপ্রচারের যে জয় হয় না, তাহা রাষ্ট্রপতি আজাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবৃতি হইতেই প্রমাণ হইয়া যায়। অতঃপর আমাদের দেশবাসী এই জাতীয় মিথ্যা অপপ্রচার ও দলীয় রাজনীতির বিষাক্ত প্রভাব সম্বন্ধে সাবধান হইবেন বলিয়াই মনে হয়। শহীদ বীর ছাত্রদের অমর কীর্ত্তি ও স্মৃতি উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমরা কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের ভাষায় বাঙ্গালার যুবক ও ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন জানাইতেছি :

"দেখেছি কিশোর ছেলে অবহেলে প্রাণ দিয়ে গেল
দলে দলে মৃত্যু ভুলে
কচিমুখে বিক্ষোভের আগুনের জ্বালা
শহীদের রক্তঢালা রাজপথে নির্ভীক উদ্দাম,
যুগ যুগ লাঞ্ছনার ঘৃণ্য অপমান
দুর্লভ ঐক্যের বলে পদতলে দেখেছি দলিতে।
দেখেছি উদ্ধতশির মৃত্যুঞ্জয়ী নিরস্ত্র বাহিনী
হৃদয়ে দুর্জ্জয় পণ মুখে দুঃসাহস
দেখেছি সহস্রশীর্ষ মুক্তিকামী ছাত্র-ভগবান্
দেখেছি বিমুগ্ধ চোখে মনে মনে করেছি প্রণাম
নমো নমো ছাত্র-ভগবান।
দেখেছি শিশুর মৃত্যু অগ্নিবর্ষী বন্দুকের মুখে
রক্তে ভাসে নারায়ণ—নীল ঠোঁটে স্তব্ধ অভিশাপ
অপুষ্ট পাণ্ডুর দেহে বীর্য্যবান্ কিশোর দধীচি
রেখে গেছে কচি হাড়
ক্ষোভের পাহাড় দিকে দিকে
লাঞ্ছিত জাতির বুকে বুকে
ভুলে ঘৃণ্য দলাদলি সাম্প্রদায়িকতা
স্বাধীনতামন্ত্রপূত দুর্জ্জয় একতা—
রেখে গেল নগরীর ক্ষুব্ধ বকে ছাত্র-ভগবান।
অদৃশ্য ক্ষতের মতো কোটি বুকে নির্ব্বাক্ যন্ত্রণা-
মন্ত্রে পেল রূপান্তর অগ্নিগর্ভ প্রাণের মন্ত্রণা
গানে গানে আগ্নেয় উদ্দাম
বিজয়ী অনন্তনাগ গেয়ে গেল জীবনের গান।
কবির প্রণাম নাও
আবার আবার গাও
দুর্জ্জয় ঐক্যের ছন্দে হে বাংলার ছাত্র-ভগবান্।"

(ছাত্র-ভগবান্—বিমলচন্দ্র ঘোষ)

তমলুক ও কাঁথিতে সাম্রাজ্যবাদী বর্ব্বরতার কাহিনী

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় সরকারী দমননীতির যে সমস্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেন। গত ২০শে নভেম্বর তমলুক মহকুমার এবং গত ১৭ই ডিসেম্বর কাঁথি মহকুমার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অসহায় নর-নারী-শিশুর উপর নির্ম্মম গুলী ও বোমাবর্ষণ, লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠতরাজ, নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার, গৃহদাহ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি বর্ব্বর সাম্রাজ্যবাদী কার্য্যকলাপের কাহিনীতে এই রিপোর্টের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কোন সভ্য মানুষের পক্ষে ধৈর্য্য ধরিয়া এই রিপোর্ট পাঠ করা সম্ভব নহে। ইয়োরোপের ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরতার সহিত ভারতের এই সাম্রাজ্যবাদী বর্ব্বরতার কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু এই পাশবিক বর্ব্বরতা ও অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া তমলুক ও কাঁথি মহকুমার জনসাধারণের যে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস জানা গিয়াছে তাহা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তরের জন্য এক অমর অধ্যায় অধিকার করিয়া থাকিবে। বিক্ষুব্ধ ও জাগ্রত জনসাধারণ নানাস্থানে যাবতীয় অকথ্য নির্য্যাতন বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া সাময়িকভাবে সরকারী শাসন-ব্যবস্থা পঙ্গু করিয়া দিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে। ইহার সহিত পৃথিবীর যে কোন বিপ্লব ও বিদ্রোহের তুলনা করা যাইতে পারে, এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন গণবিপ্লবের তুলনায় উপেক্ষণীয় নহে। মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে আমরা এখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করিলাম।

তমলুকের কাহিনী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিশ ও সৈন্যরা ২২ টি স্থানে গুলী চালায় এবং তাহার ফলে ৪৪ জন নিহত ১৯১ জন গুরুতরভাবে আহত এবং ১৪২ জন সামান্য আহত হন। এই সময়ের মধ্যে ৭৩ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়, ৩১ জনের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করা হয় এবং ১৫০ জনের শ্লীলতাহানি করা হয়। ৪২২৬ জন লোককে মারপিট করা হয়, ১৮৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, ৫০৭৬ জনকে বে-আইনী ভাবে আটক রাখা হয় এবং ১ জনকে ভাবতরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়। ৪০১ জনকে স্পেশ্যাল কনেষ্টবল করা হইয়াছিল। মোট ১২৪টি গৃহ ভস্মীভূত হয় এবং ইহাতে প্রায় ১৩১৫০০৲ টাকা ক্ষতি হয়। ইহা ছাড়াও ৪১টি গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইহার ফলেও ৮০৭৫৲ টাকা ক্ষতি হয়। ১০৪৪টি গৃহ হইতে ২, ১২, ৭১৫৲ টাকা মূল্যের জিনিষ-পত্র লুন্ঠিত হয়। ১৩,৭৩০টি গৃহে খানাতল্লাস করা হয় এবং ২৭টি গৃহ দখল করা হয়। ৫১টি পরিবারের ২৫,৩৬৫ টাকা মূল্যের ধনসম্পত্তি ক্রোক করা হয় এবং ৫টি ইউনিয়নের উপর মোট এক লক্ষ ১০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হয়। গভর্ণমেণ্ট ১১টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন। অহিংস বিদ্রোহীরা যখন সুতাহাটা থানা দখল করে তখন তাহাদের উপর সরকারী বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করা হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় তমলুক সাবজেলে যত বন্দী থাকিতে পারে তাহার চতুর্গুণ বন্দীকে এই জেলে রাখা হয়। ইহার প্রতিবাদে একজন বন্দী ২০ দিন যাবৎ অনশন ধর্ম্মঘট চালায়। অগ্নি-সংযোগ, লুঠ, বঞ্চনানীতি প্রভৃতির ফলে তমলুক মহকুমায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

আগষ্ট আন্দোলনের সময় তমলুক মহকুমায় যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছিল রিপোর্টের অপর অংশে তাহার কার্য্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার শতকরা ৯০ ভাগ ধ্বংস করা হয় এবং পরের দিন প্রায় ৪০ হাজার অহিংস লোক আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য কয়েকটি থানায় সমবেত হয়। তাহাদের হাতে কোন প্রকার অস্ত্র ছিল না। কার্য্যসূচীতে দেখা যায় যে, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলী ৬টি থানার মধ্যে ৪টিতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই চারিটি থানা হইতেছে সুতাহাটা, নন্দিগ্রাম, মহিষাদল এবং তমলুক। এই চারিটি থানায় সাত বার আক্রমণ চালান হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য ৩০টি পুল ধ্বংস করা হয়। ২৭ মাইলের মধ্যে সমস্ত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলা হয় এবং ১৯৪টি টেলিগ্রাফের পোষ্ট ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। গাছ ফেলিয়া ৪৭টি রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছিল। যে সমস্ত অঞ্চল তাহারা দখলে রাখিতে পারে নাই সেই সমস্ত অঞ্চলে 'পোড়ামাটি' নীতি অবলম্বন করা হয়। এই নীতি অনুসারে নিম্নলিখিত শত্রু-শিবিরগুলি ভস্মীভূত করা হয়—দুইটি থানা, দুইটি সাবরেজিষ্ট্রারের অফিস, তেরটি পোষ্ট অফিস, একটি খাসমহল অফিস, ১৭টি আবগারী অফিস এবং ১২টি ডাক বাংলো। ইহা ছাড়াও ২৪টি জমিদারী কাছারী, ১৬টি পঞ্চায়েত বোর্ড, ১টি ইউনিয়ন বোর্ড এবং ১৪টি জেলা বোর্ড অফিস ভস্মীভূত করা হয়। ১৩ জন সরকারী কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ধৃত সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয় এবং তাহাদিগকে বাড়ী যাওয়ার খরচ দেওয়া হয়। ছয়টি বন্দুক ও দুইটি তরবারি হস্তগত করা হইয়াছিল বটে কিন্তু উহা ব্যবহার না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ১৯৪২ সনের ১৭ই ডিসেম্বর জনসাধারণ এই মহকুমায় একটি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে ৫টি থানা, ৬টি ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েৎ অফিস ছিল। একজন ডিক্টেটর ছিলেন, এই মহকুমা জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বের অধিকারী। ডিক্টেটর মহকুমা কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহাকে লইয়া পরবর্ত্তী ডিক্টেটর মনোনয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ডিক্টেটরকে কংগ্রেস কমিটির সমর্থন লাভ করিতে হইত। পর পর ৪ জন ডিক্টেটর হইয়াছিলেন। চতুর্থ ডিক্টেটর গান্ধীজীর নির্দ্দেশ অনুসারে আত্মসমর্পণ করেন। ডিক্টেটর একটি মন্ত্রিসভার সাহায্যে জাতীয় সরকারের সমস্ত কাজ চালাইতেন। সকলেই মহকুমা কংগ্রেস কমিটির নিকট তাহাদের কার্য্যাবলীর জন্য দায়ী থাকিতেন।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের আদালতে ২১০৭টি মামলা দায়ের হয়। ইহার মধ্যে ১৬৮১টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। ২৫১টি স্থানে তাহারা খানাতল্লাস করে। ২৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ৫২৩ জনের উপর ৩৩,৩৩৭।৶০ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা সেবাকার্য্যে ব্যয় করা হইত। ইহা ছাড়া কয়েক জনকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপর কয়েক জনকে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখা হয়। মেদিনীপুরে ঝড়ের পর এবং দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহারা সেবাকার্য্য করেন। তাঁহারা দুর্গতদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র ঔষধ, দুগ্ধ প্রভৃতি বিতরণ করেন। মোট তাঁহারা সেবাকার্য্যে ১,৫৮,৮৩৫।৶৩ পাই ব্যয় করিয়াছিলেন।

কাঁথির কাহিনী

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে ৬ই আগষ্ট তারিখে কাঁথিতে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। কয় দিন কংগ্রেসকর্ম্মীরা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের আদেশ প্রচারের জন্য মফঃস্বলের থানাসমূহে গমন করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধী ও নিখিল ভারতীয় নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের সংবাদ মফঃস্বলের কর্ম্মীরা অবগত হন এবং তাহার প্রতিবাদকল্পে ১৪ই আগষ্ট পটাশপুর, ভগবানপুর ও খেজুরী থানাসমূহে হরতাল প্রতিপালিত হয়। কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, স্থানীয় হাই স্কুল ও বালিকাদের হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করে ও সহরে শোভাযাত্রা বাহির করে। ২০শে আগষ্ট তারিখে কাঁথিতে সাফল্যের সহিত হরতাল প্রতিপালিত হয়। পরদিন প্রাতে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী পাল এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মালকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। অপরাপর বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ২৮শে আগষ্ট তারিখে মহকুমার কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয়ে হানা দেওয়া হয়, কাগজপত্র হস্তগত করা হয় ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মহকুমার সর্ব্বত্র জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া এবং

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মতালিকার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে মহকুমার প্রায় সকল গ্রামে অসংখ্য সভা আহুত ও শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। প্রায় ৮ হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্ত হন। থানাসমূহে অধিবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক য়ুনিয়নে অন্ততঃ একটি করিয়া শিবির (মোট ৮২টি) স্থাপিত হয়। এই সম্পর্কে মহকুমার কোন গ্রামই বাদ যায় নাই। বহু ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরূপে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। মহকুমার সকল প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী বিত্যালয় বন্ধ হইয়া যায়। হাই স্কুলগুলি ও কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ পরিত্যক্ত হয়। কাঁথি কলেজেও হাই স্কুলসমূহে পিকেটিং ও ধর্মঘট চলে। সরকারী অফিস ও আদালত-সমূহ বর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। কাঁথি সহর তিন সপ্তাহ কাল একরূপ পরিত্যক্ত হয়।

তাহার পর চৌকীদার ও দফাদারগণ পদত্যাগ করে। এক পক্ষ গ্রেপ্তার করে ও গুলী চালায় অপর পক্ষে নানা স্থানে হানা দেওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভীতি প্রদর্শন চলে। আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে এক পক্ষ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করে এবং অপর পক্ষ সৈন্য নিয়োগ করে ও দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। জনসাধারণের নিকট হইতে কি পরিমাণ উৎকোচ আদায় করা হইয়াছিল, তাহার হিসাব করা কঠিন।

১৬ই অক্টোবর তারিখে বাত্যার জন্য কাঁথি মহকুমার সর্বত্র যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। ইহাতে তাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পান এবং প্রথমে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতে অনিচ্ছুক হন। কোন কোন স্থানে যে সকল সর্তে সাহায্য দেওয়া হইতেছিল তাহাতে জনসাধারণ অত্যধিক অভাব সত্ত্বেও তাহা গ্রহণ না করিতে বাধ্য হয়। থানাতল্লাস, লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকে। এক জন অফিসার দিবাভাগে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেন এবং রাত্রিতে বিভিন্ন স্থানে হানা দিতেন।

রাজনৈতিক অবস্থার অজুহাতে বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কার্য্যে যে বাধা সৃষ্টি করা হইত তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সময় অযথা নষ্ট হওয়ায় যে সকল লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহার সঠিক সংখ্যা গণনা করা যাইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু

গত ১ই ডিসেম্বর 'যাদবপুর কলেজ অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেক্নোলজির' সমাবর্তন উপলক্ষে অভিভাষণ প্রদান-প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু ভবিষ্যৎ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কথা উল্লেখ করেন। পণ্ডিতজী বলেন: "আমি প্রায়ই দিবাস্বপ্ন দেখি এবং সকল রকমের অত্যাশ্চর্য্য পরিকল্পনা আমার মনে জাগে। আমার কল্পনাকে রূপ দিবার সুযোগ আমার নাই। তথাপি আমি মনে মনে সেই কল্পনাকেই রূপ দিই এবং ভাবি যে, যদি একবার সুযোগ পাই তবে আমার লক্ষ্য হইবে যেন দেশে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার টেকনিসিয়ান্ বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের উদ্ভব হয়, উকিল কেরাণী নহে।" ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার ও টেক্নিসিয়ানদেরই সমাদর হইবে। ভারতের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বহু উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া ভারত বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমন এক দিন ছিল, যেদিন ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন না হইলেও সমোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল। সেখান হইতে ভারতের আজ পতন হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ভারতের সেই উত্থান ও পতনের করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়া বলেন যে, ভারতের পতনের অন্যতম কারণ হইল এই যে, ভারত পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির উন্নততর কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতার সহিত সমতালে চলিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যে কেবল দর্শন ও অন্যান্য বিষয়েই অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নহে, বিজ্ঞান, গণিত ও কারিগরি বিদ্যাতেও ভারতবর্ষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এক সময় সমগ্র এশিয়ায় ভারতের বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ বছরের মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার যুগেও দেখা যায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, কারিগরি ও স্থাপত্যকলার কতখানি উন্নতি হইয়াছিল। পণ্ডিত নেহরু বলেন, "আমি যখন এই সব কথা বলি তখন আমি বর্তমান অবস্থার সহিত ভারতের তুলনা করি না। তৎকালীন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ কারিগরিবিদ্যায় অগ্রসর হইয়াছিল। বহু সহস্র বৎসর হইতে ভারতে রাং, লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতির প্রচলন ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানে 'শূন্য' চিহ্নের সূচনা এক বৈপ্লবিক উদ্ভাবন। ভারতের প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রের প্রগতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগের পর ভারতের দেহে একটি কঠিন আবরণ দেখা দিল যাহা ভেদ করিয়া আজও সে বাহিরে মুক্ত হইতে পারিল না। কাহাকে স্পর্শ করা যাইবে না যাইবে, কি খাওয়া যাইবে না যাইবে, ইত্যাদি সমস্যা লইয়াই অনন্ত ভারত সেদিন মাথা ঘামাইয়াছে। এই অবস্থায় যদি কোন দেশের পতন হয় তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

পণ্ডিত নেহরু যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ভারতের প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তাঁহার কথা সমর্থন করিবেন। মনীষী ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রাচীন হিন্দু-ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহারা এই একই কথা বলিয়াছেন। ভারতের সেই অতীত গৌরবময় যুগ নূতন সমৃদ্ধরূপে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ভবিষ্যৎ ভারত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের ভারত হইবে। হাজার হাজার ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও সুদক্ষ কারিগর আগামী কালের সমৃদ্ধ ভারতের সৌধ গঠন করিবে। পণ্ডিত নেহরুর "দিবাস্বপ্ন" বাস্তব সত্যরূপে দেখা দিবে। তাঁহার শিল্পীর স্বপ্ন ভবিষ্যতে এক দিন সার্থক হইবেই।

অশ্রু-অর্ঘ্য

জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে যখন বুধবারের গুলী চালনার ফলে নিহত রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতদেহ সহ শোকযাত্রা কেওড়াতলা শ্মশানে যাইতেছিল, তখন বিখ্যাত কংগ্রেস-নেত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা-শোভিত গাড়ীতে শোক-যাত্রার অনুসরণ করিতেছিলেন। রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউ-এর সংযোগস্থলে মিলিটারী লরী সেই মোটরে ধাক্কা মারিয়া মোটরটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। ফলে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া

জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

যায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নীত হইবার অল্প কাল পরেই দেহত্যাগ করেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এক জন শিক্ষাব্রতী ছিলেন, কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল বেশী। বাংলার যে সকল নারী মুক্তি-সংগ্রামের পুরোভাগে স্থান নিয়েছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার নারী-সমাজ এক জন নেত্রীস্থানীয়া মহীয়সী মহিলা-কর্ম্মীকে হারাইল।

কালীনাথ রায়

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদিক 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায় ২৩শে অগ্রহায়ণ প্রাতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। একটি ভাস্বর দীপ্তি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, ভারতীয় জনগণ এবং সংবাদপত্র-সেবায় ঐকান্তিক আত্মনিষ্ঠা, আদর্শের জন্য নিরলস সংগ্রাম অতুলনীয়। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সম্পাদকের আসন হইতে তাহা ঘোষণা করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার নির্ভীক্ তেজস্বিতার পরিচয় আমরা বহু বার পাইয়াছি। ১৯১৯ সালের কুখ্যাত জালিয়াওয়ানলাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর পাঞ্জাবে যখন সামরিক আইন জারী হইয়াছিল, সেই সময় 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যে বিপুল সাহস ও সাংবাদিক-নৈপুণ্যের সহিত উক্ত পত্রিকা তিনি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশের সাংবাদিকের পক্ষেও গৌরবের বস্তু। বিশেষতঃ এই পরাধীন দেশে এই নির্ভীকতার আদর্শ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। একাদিক্রমে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল তিনি সংবাদপত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাংবাদিক-জীবনের সূচনা হয় ১৯০০ সালে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকরূপে। পণ্ডিত

কালীনাথ রায়

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত 'প্রতিবাসী' পত্রিকার সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৫ সালে সর্ব্বপ্রথম তিনি 'পাঞ্জাবী' নামক কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া লাহোরে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে এই পত্রিকাখানি 'ট্রিবিউনের' সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন হইতে তিনি 'ট্রিবিউনের' সম্পাদক নিযুক্ত হন। আজ সংবাদপত্র জগতে 'ট্রিবিউন' যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার সমস্ত কৃতিত্ব কালীনাথ রায়ের। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু 'ট্রিবিউনে'র কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে তাঁহাকে আবার পত্রিকায় যোগদান করিতে হয়।

কালীনাথ রায় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি অন্তরের সহিত ইহা অনুভব করিতেন যে, আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পথে মোটেই সহায়ক নহে। এ সম্পর্কে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে

একবার না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষার খাতায় কোন প্রশ্নের উত্তর না লিখিয়া আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে সমস্ত গলদ রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহার ফলে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হন। তিনি অবশ্য ইহাতে তৃপ্তিলাভ করেন এই ভাবিয়া যে, যাহা তিনি অন্তরের সহিত অনুভব করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কালীনাথ রায় মাত্র ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহা দেশবাসী এবং ভারতীয় সাংবাদিক উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, খুলনা যাইয়া সম্প্রতি পার্লামেণ্টে বৃটিশ সরকারের তরফ হইতে মিঃ পেথিক লরেন্স যে ঘোষণা করিয়াছেন, সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। খুলনা যাইবার পথে গত ১৫ই অগ্রহায়ণ তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পথেই ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হয় এবং কয়েক দিন মাত্র ভুগিয়াই তাঁহাকে মহাপ্রয়াণ করিতে হইল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় সাংবাদিক জগতের যে বিপুল ক্ষতি হইল, তাহা কোন দিন পূর্ণ হইবার নহে।

পাঁচকড়ি দে

পাঁচকড়ি দে

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অপূর্ব্ব রহস্য-শিল্পী পাঁচকড়ি দে ৪ঠা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার রাত্রিশেষে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা ডিটেকটিভ্ সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ

২৭শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণে অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মূল গ্রীক সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় সক্রেটিস সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমীদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভের মৃত্যুতে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত। পাটের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তিনি প্রভূত সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি তাঁতশালা ও সাবানের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা গ্লাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিটীর এবং বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সের উৎসাহী সদস্যরূপে তিনি দেশের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নের বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ

দেশহিতকর নানা কার্য্যের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত ২৪ পরগণা জেলা-বোর্ডের সদস্য, ১৯২৭ হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার এবং ১৯৩০ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন সদস্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তদীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থে বসিরহাটে একটি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন স্বগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ দে

১৪ই কার্ত্তিক সুপ্রসিদ্ধ গণিত-শাস্ত্রবিদ্ ৺গৌরীশঙ্কর দের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺দেবশঙ্কর দে'র পুত্র রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ দে পরলোক গমন করেন। তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাশ ক'রেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যায় সম্মানজনক ডিপ্লোমা লাভ করেন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষায়তন (D. P, H, Classes) প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আবগারী পরীক্ষাগারের প্রধান রাসায়নিকরূপে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

অনাথগোপাল সেন

১লা পৌষ রাত্রে কাশিমবাজারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনাথগোপাল সেন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মহারাণী কাশীশ্বরী নন্দী

স্বর্গত দানবীর মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বিধবা পত্নী ও মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর মাতা কাশীশ্বরী নন্দী গত ২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কাশিমবাজারে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জনহিতের জন্য অনেক দান করিয়াছেন। বহরমপুরের অম্বিকা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও বর্দ্ধমান ধবগ্রামের উচ্চ-ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় তাঁহার নামে নামকরণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

বরদাত্রী কমলা

শিল্পী—চারু রায়

ফিনল্যাণ্ডের শিল্পী জুসি মান্টিনেনের

একটি গ্র্যানাইট ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি

২৪শ বর্ষ] পৌষ, ১৩৫২ [৩য় সংখ্যা

"উঠ, জাগ, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না।"—যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভ-মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে 'অভীঃ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে—'অভীঃ' নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ
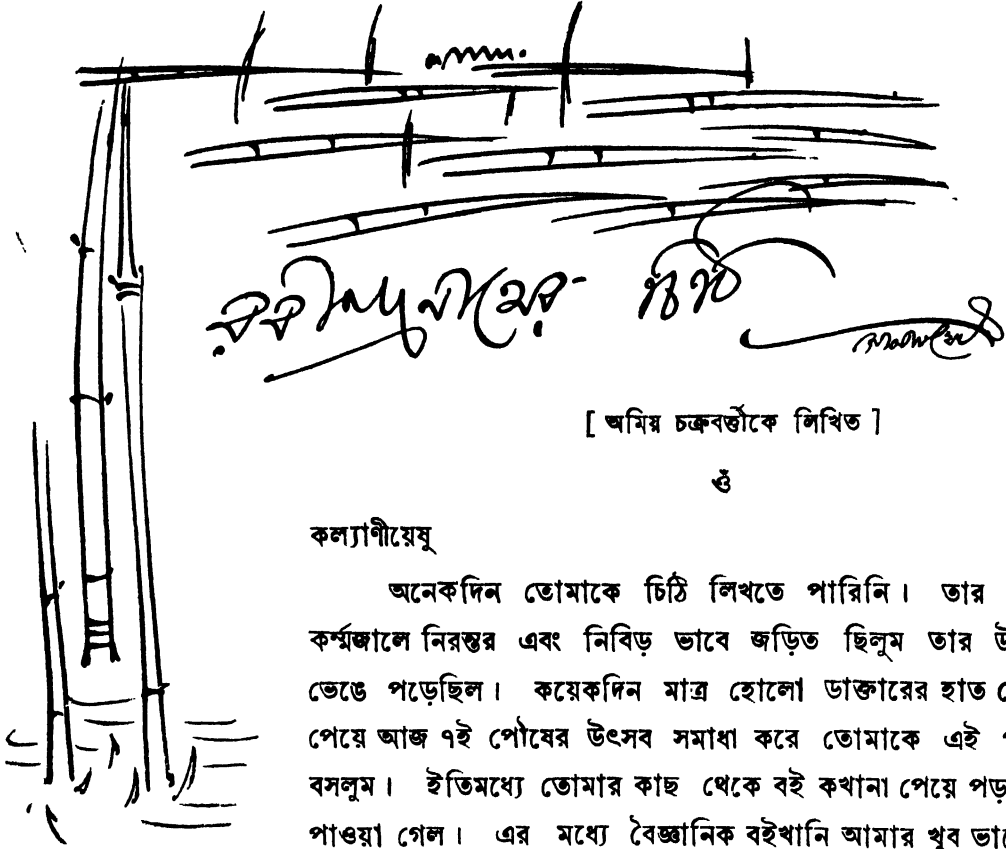
[অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। তার কারণ নানা কর্ম্মজালে নিরন্তর এবং নিবিড় ভাবে জড়িত ছিলুম তার উপরে শরীর ভেঙে পড়েছিল। কয়েকদিন মাত্র হোলো ডাক্তারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আজ ৭ই পৌষের উৎসব সমাধা করে তোমাকে এই পত্র লিখতে বসলুম। ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে বই কখানা পেয়ে পড়বার খোরাক পাওয়া গেল। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বইখানি আমার খুব ভালো লাগচে। ওখানকার আধুনিক কালকে আমার মনে হয় ক্ষণকালের একটা আকস্মিক উৎক্ষেপ, চিরকালের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ—নিজের মধ্যে হঠাৎ চিরন্তনের সম্বল নিঃশেষ হয়ে এসেছে বলেই, নিজের দৈন্যকে নিয়েই জয়-পতাকা বানাবার চেষ্টা করচে। ইতিহাসে কতবার এ রকম মেকি রাজা মহা সমারোহ ক'রে এসেছে, তাদের প্রতাপের আড়ম্বরে ভিড়ের লোক মুগ্ধ হয়েছে, তার পরে হঠাৎ দেখা যায় সেই রাজাও নেই সেই ভিড়ও গেছে সরে। আর আজকের দিনের যে আধুনিক কাল পূর্ব্বতন মানুষের আনন্দের আদর্শকে অবজ্ঞা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এরি কি নূতন ছাপমারা মূল্যের তালিকা চিরকালের বাজারে চলবে? যে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় এ'কে ঠিকমতো যাচাই করা যেতে পারত য়ুরোপ তার বাইরে, তোমরা ওখানে ভিড়ের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে আছ। যাক্ এসব তর্কে কোনো ফল নেই। আমার মন আজ নিতান্ত নিরাসক্ত—মুখের কথা কেনাবেচার হাটে আমার লোভ ক্ষীণ হয়ে এসেচে, জানি সে কতই ফাঁকা। —(১) অমলার অকস্মাৎ মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেচি। তার পরে আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা গভীর ছিল। এমন মনস্বিনী এমন তেজস্বিনী সত্যপ্রতিষ্ঠ মেয়ে কম দেখেছি। তার সংসারে তার অভাব যে কত বড়ো প্রকাণ্ড অভাব তা বুঝতে পারি—কিন্তু কোনো কথা বলবার নেই।

৭ই পৌষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩

ইতি তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) ডাক্তার অমিয় চক্রবর্ত্তীর ভগিনী।

সাদর নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ ওঁ শান্তিনিকেতন

আশা করিয়াছিলাম আপনি কিছুকাল এখানে থাকিয়া আমাদের কাজে যোগ দিবেন, আপনাকে আমাদের সুহৃদ্‌রূপে পাইব। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অস্বাস্থ্যবশত আপনি দূরে চলিয়া গেলেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার আরোগ্য কামনা করি।

স্বদেশ হইতে যখন দূরে থাকা যায় তখন দেশের লোকের মনের ভাব অনেকটা ভুলিয়া থাকি। সেই কারণেই জাপানে থাকিতে মনে করিয়াছিলাম জুজুৎসু বিদ্যা যদি বাংলা দেশে লইয়া যাই তবে দেশের লোকে সানন্দে তাহা গ্রহণ করিবে। কারণ আত্মরক্ষা সম্বন্ধে নিজের পরে বিশ্বাস এবং সে সম্বন্ধে নির্ভয়তা মানুষকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করে। যে ভীরু সে অকৃতার্থ। জুজুৎসু বিদ্যার সাহায্যে আত্মরক্ষার সাধনা আজ জগতে বিখ্যাত। য়ুরোপ এই বিদ্যা জাপানের নিকট হইতে শিক্ষার প্রয়াসী। আমি স্বদেশবাসী বাঙালীর দৈহিক নিঃসহায়তা ও তজ্জনিত অবমাননার দুঃখ অন্তরে অনুভব করিয়া দশ হাজার টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়া সেখানকার একজন শ্রেষ্ঠ গুণীকে আনাইয়াছি। এই দুঃসাহসের দ্বারা দরিদ্র আশ্রমকে আর্থিক সঙ্কটে পীড়িত করিয়াছি। আমার দেশের একজন লোকও দেশের কল্যাণ স্মরণ করিয়া এই বিপদ হইতে আমাদের বিদ্যালয়কে রক্ষা করিবার জন্য লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। এবং বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমি যে সুযোগ সাধন করিয়াছি সেজন্য কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতার কোনো লক্ষণ কোথাও দেখিলাম না।

বাঙালী জাতির দৈহিক বলের চর্চ্চার প্রতি আপনার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে জানি। সেই কারণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যদি এখানে উপস্থিত থাকিতেন তবে জুজুৎসু শিক্ষার উপযোগিতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। আশা করি কোনো একদিন দেখিবার অবকাশ হইবে, এবং ইহাও আশা করি দেশের একান্ত প্রয়োজন ও আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনার বদান্য চিত্ত আমাদের প্রতি অনুকূল হইবে।

আপনার দেহ আরোগ্যের পথে চলিয়াছে এ সংবাদ পাইলে সুখী হইব। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

ভবদীয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাদর নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ ওঁ শান্তিনিকেতন

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। যখন আমার শরীর সক্ষম ও বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, এবং যখন প্রায় অন্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমি নিয়তই ছাত্রদের মধ্যে বাস করিতাম তখন অতিথির পরিচর্য্যাভার আমার উপরেই ছিল। এখনো এই দায়িত্ব আমারই লওয়া উচিত—কিন্তু বহু জটিল কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া যদি অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার শৈথিল্যের জন্য আশ্রমের অন্য কাহাকেও দোষী করিবেন না।

একটি বিষয়ে আপনি আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আজ পঁচিশ বৎসর কাল আশ্রমের কাজে আমার সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি। বাহিরের দিক হইতে ইহার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অন্তরের মধ্যে প্রেরণা আসিয়াছিল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই। বাংলাদেশের লোক যদি আমার কোনো আনুকূল্য না করিয়া থাকেন তবে সেজন্য অনুশোচনা করা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়। নিরতিশয় ক্লান্তি ও সঙ্কটের সময় আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছি যে, যে-দায় আমারই সে দায়িত্বভার অন্য নির্দাবিক ব্যক্তি লাঘব চেষ্টা না করিলে তাহাকে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না। আমার পরে যে আদেশ আছে তাহার সফলতা বিফলতা আমারই। আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে কিছু ক্ষোভ প্রকাশ হইয়া থাকিবে, সেটা আমার পক্ষে শোভন নহে মার্জ্জনীয় নহে—যে সাধন আমি গ্রহণ করিয়াছি সেই সাধনার পক্ষেও ইহা ক্ষতিকর। যাহার নিজের শক্তি সঙ্কীর্ণ ও যে নিজের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে সাধন করিতে অক্ষম সেই অন্য সকলকে দোষী করিতে উদ্যত হয়। ক্ষণে ক্ষণে দুর্ব্বলতাবশত এই অপরাধ করিয়া থাকি, আমাকে উদারচিত্তে ক্ষমা করিবেন।

ইতি ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ ভবদীয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই দুইখানি পত্র শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার আচার্য্য চৌধুরীকে লিখিত]

অন্তদূরের মধ্যে কে আছ,
আছ অন্তরে তবু ;
তোমার নাগাল সহজ নয়তো কভু—
কল্পবিহীন সৃজনব্যথায় শিল্পীকে শুধু যাচ ॥

কোটি হাতুড়ির পিটনিতে তাই
তোমার ধ্যানকে বানাই—
ইচ্ছায় রাখি আগুন।
হলে তুমি রাঙা তপ্ত সোণায়
গন্ গনে বহু গুণ
কী মূর্তি শেষে আনাই।
বার বার জাগে প্রশ্ন কাকে যে বানাই ॥

রোদের দ্রাক্ষা নিঙাড়ি' সানাই
দুপুরের নেশা জাগায় সন্ত,
বাজে ফোঁটা ফোঁটা দ্রব ঝঙ্কারী মন্ত্র।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানসের কোষে
তারি ধারা পশে'
ধাতুর ধ্বনিত নতুন সাহানা সৃষ্টি—
সূর্যসবুজী বৃষ্টি।
গান বেঁধে কার সুরের বেদনা জানাই ॥

যেখানে যা পাই নানাখানা ভাব
নয়নের ভাঁড় ভরানো, তিয়াষ-হরানো,
সাজানো তা দিয়ে কাব্যের আসবাব।
আখর ঐ তো ধূলো-পথে ছোটে,
ঘাসে জেগে ওঠে,
সারি গাছে ঝোলে গুচ্ছ গুচ্ছ ভাব।
জুড়োনো চান্দ্র হাল্কা জরির রাতে
তারাভরা শাল গাঁথে ;
ভোরের আঁধার ছিল কী পুণ্যে
ময়ূরকণ্ঠী নীল দিন ওড়ে শূন্যে,
ছন্দ জড়ানো তাতে।
যা আছে যা নাই কবিতার বশ মানাই ॥

এই তো রূপের হাতুড়ি ॥
ছবির গগনে রংলাগা মনে
রেখা আঁকাবাঁকা ফুলঝুরি কারো ঘুড়ি
উজ্জ্বল ছায়া ছড়ায় স্বপ্নে কার যে।
পাথরী শুভ্রতার যে
মর্ম কঠিন ভেঙে প্রাণ ঢালি'
গড়নের কারো চলেছে বাটালি ;
ইঁটের স্তবকে প্রার্থনা দেশে দেশে
ওঠে কোন্ উদ্দেশে ॥
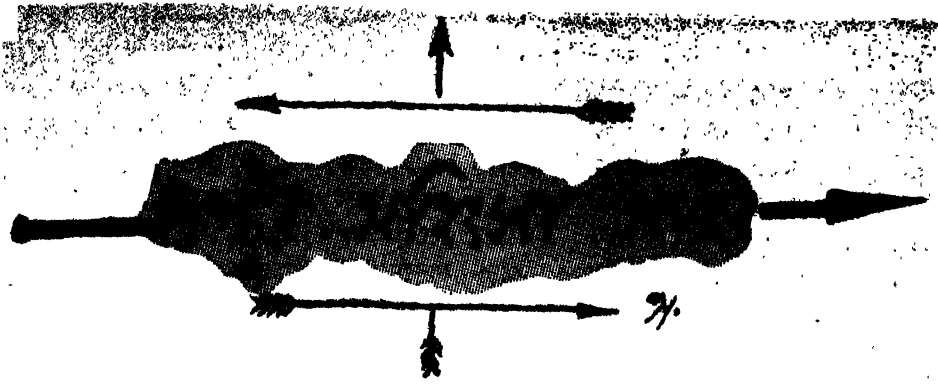
(উনপঞ্চাশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অহিংসার জোরে সত্যি সত্যিই শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায় কি না, এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবছি, আর এত দিন পরে তার একটা সদুত্তর পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। এত দিন মহাত্মাজীর অহিংসা-তত্ত্বের যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা ব্যাপারটার গূঢ় তাৎপর্য্য ধরতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। সে-দিন দেখছিলাম এক জন নবীন ভাষ্যকার লিখেছেন—"বিরুদ্ধ শক্তি যদি দেখে, জনগণ মরবে তবু মারবে না, তখন তাদের নিপীড়নের উগ্রতা কিছু কমে আসবে। *** হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভাবে তাদের অস্ত্রের মুষ্টি শিথিল হবে, হৃদয়ে চমক লাগবে। ক্ষণিকের জন্য হয়ত থেমে তারা ভাববে, জনগণ তা' হলে কী চায়? তখন জনসাধারণের প্রতিনিধিরা তাদের কাছে এসে, কথা ব'লে নিজেদের দাবি কত ন্যায়সঙ্গত তাই বুঝিয়ে বলবে। সকলের পক্ষে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রচনার প্রস্তাব করবে এবং শাসিত ও শাসক উভয়ে মিলে নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে।"

অতি সরল পন্থা! লড়ালড়ির মারামারির বালাই নেই। শুধু নিরস্ত্র হয়ে পড়ে পড়ে ঘা-কতক মার খেয়ে শাসকদের হৃদয়ে একটু চমক লাগিয়ে দিতে পারলেই কার্য্য হাসিল! তার পর বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খাবে; জমিদারেরা তাঁদের লাঠিয়ালদের লাঠিগুলি ভেঙ্গে প্রজাদের জন্যে জ্বালানি কাঠ তৈয়ার করতে লেগে যাবেন, বিড়লা-পার্কে কুলিদের জন্য অট্টালিকা উঠবে, পেথিক-লরেন্স আর পণ্ডিত জহরলাল দু'জনে মিলে স্বাধীন ভারতের খসড়া তৈয়ার করতে লেগে যাবেন··· ইত্যাদি ইত্যাদি। আহা, ভাবতেও সুখ আছে! কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জান,—এমন শাসকও তো আছেন যাঁদের হৃদয়গুলি এমন খাঁটি ইস্পাত দিয়ে মোড়া যে সেখানে কোন চমক লাগবার সম্ভাবনা নেই। এই দেখ না, রাজকোটে স্বয়ং মহাত্মাজী গিয়ে নিরম্বু উপবাস করে পড়ে রইলেন; কিন্তু ঠাকুর সাহেবের যে সে জন্যে আহার-নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটেছিল, ইতিহাসে তো সে কথা লেখে না। মহাত্মাজী রিক্তহস্তে ফিরে এসে বললেন—তাঁর দাওয়াই ঠিক; তবে তাঁর নিজের ভিতর কোথাও হয়তো প্রচ্ছন্ন ভাবে হিংসার বীজ লুকিয়ে ছিল ব'লে দাওয়াইটা লাগেনি। আজন্ম কাল অহিংসা সাধনা করে এই বুড়ো বয়সেও তিনি যদি ষোল আনা অহিংস না হয়ে থাকেন তা হলে রাতারাতি যে দেশশুদ্ধ লোক অহিংসা-সিদ্ধ হয়ে উঠবে, এ রকম কল্পনা করা কি ঠিক? বাংলা-দেশের রাস্তা-ঘাটে হাজার হাজার লোককে পেটের জ্বালায় মরতে দেখেও যে স্যর জন হার্বার্ট বা তাঁর পেয়ারের মন্ত্রীরা দুঃখে নিজেদের আহারের মাত্রা কমিয়েছিলেন, সে রকম প্রমাণও তো পাওয়া যায় না।

তার পর, আরও একটা কথা আছে। হিংসার বিরুদ্ধে যখন অহিংসার অভিযান আরম্ভ হবে, তখন দু' দলে মুখ দেখাদেখি হলে তবে তো শাসকদের প্রাণে চমক লাগবে। কিন্তু শাসকেরা যদি মা ধরিত্রীর বক্ষে পা না দিয়ে দশ হাজার ফুট উপর থেকে আণবিক বোমা ছাড়েন, তা হলে নীচে নেমে এসে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, অহিংসার অভিযান শূন্যে মিলিয়ে গেছে। দাবি-দাওয়া বা রফারফি সব প্রশ্নেরই এক-তরফা মীমাংসা হয়ে গেছে। দু' দলে মিলে নূতন প্রতিষ্ঠান গড়বার কোন প্রয়োজনই হবে না।

এই সব ভেবে-চিন্তে আমার মনে হয় যে, অহিংসার চোটে শত্রুর হৃদয়ে চমক লাগাবার চেষ্টাটা অহিংসা সাধনের বা শত্রুবিজয়ের প্রকৃত পন্থা নয়। অনেক দিন আগে—প্রায় ৪০ বৎসর আগে—এই শত্রুবিজয়ের পন্থা খুঁজতে খুঁজতে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে পড়েছিলাম। এক জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর আখড়ার আশ্রয় নিয়ে কিছু দিন থাকবার পর এক

দিন মনের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করে ফেললুম। সাধু মহারাজ আমার সব কথা শুনে বললেন—"বাবা, পৃথিবীটা তো হিংসায় ভরে গেছে; তোরা আবার একটা রক্তারক্তি আর করে দিয়ে যদি সেই হিংসার মাত্রা বাড়িয়ে তুলিস্ তা হলে কি দেশের মঙ্গল হবে?" আমিও নাছোড়বান্দা। বললুম—"মহারাজ! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার উপদেশ তো শাস্ত্রকারেরা দিয়ে গেছেন। পাষণ্ড-দলনের জন্যে যদি একটু আধটু বৈধ হিংসার আয়োজন করা যায়, তা হলে সে পাতকের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নেই?" সাধু মহারাজ হেসে বল্লেন—"তুই বেটা একটি বাস্তু ঘুঘু। একটা খুনোখুনি না করে তোরা ছাড়বি নে দেখতে পাচ্ছি। যা, যখন কাউকে মারবি, তখন গৌর বলে মারিস্। গৌরহরির নাম করলে সব পাপ খণ্ডে যাবে।" কথাটা আমার বেশ মনে লেগেছিল। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" বলে দাও টপাং করে বন্দুকের ট্রিগার টেনে। তার পর যা হয় তা সামলে নেবেন গৌরহরি। হিংসার সঙ্গে অহিংসার সামঞ্জস্য বিধানের এই ব্যবস্থা নিয়ে আমি দেশে ফিরেছিলাম।

কিন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, এই গৌরহরি পন্থাটা খাঁটি অহিংস পন্থা নয়। শত্রু-দমনের একটা খাঁটি অহিংস পন্থা সত্য সত্যই আছে। আর তার আবিষ্কর্তা আমাদের পন্টু।

পন্টুকে তুমি চেনো তো? সেই পন্টু হে, যে গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে তিনটে গোরার নাক থেকে তিন সের রক্ত বের করে দিয়েছিল! অনেক দিন তার খবর পাইনি। কেউ বোলতো সে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গিয়ে সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে; কেউ বলতো—না, মেদিনীপুরে গণ্ডগোলের পর সরকার বাহাদুর তাকে বক্সার জেলে আটক করে রেখেছেন। ভগবান্ জানেন কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যা। কিন্তু সে দিন মহাত্মাজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে সোদপুরে গিয়ে দেখি, মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভার এক কোণে গায়ে মোটা খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়ে হাত জোড় করে চক্ষু বুজে বসে আছে আমাদের পন্টু!

মহাত্মাজীর সাত কুল উদ্ধার না করে যে জলগ্রহণ করতো না, সেই পন্টু যে আজ খদ্দর এঁটে মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভায় যোগ দেবে—এ যে স্বপ্নের অগোচর! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! পন্টুর দিকে নজর রাখতে রাখতে মহাত্মাজী যে কি বল্লেন তা' আর আমার ভাল করে শোনা হলো না। সভা ভঙ্গ হলে তাড়াতাড়ি আমি পন্টুর কাছে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি রে পন্টু! তুই এখানে?"

পন্টু অতি বিনীত ভাবে আমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বল্লে—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ কি রে! তুই কি সত্যি সত্যিই মহাত্মাজীর অহিংস দলে ভর্ত্তি হলি না কি? কোথায় গেল তোর খাকির হাফ প্যান্ট? কোথায় গেল তোর খেঁটে লাঠি? তোর কোন অসুখ-বিসুখ করে নি ত?" পন্টু হেসে বল্লে—"আজ্ঞে না; আগে এই নশ্বর দেহের ওজন ছিল দু'শো পাউণ্ড; সে দিন সোদপুর ষ্টেশনে ওজন হয়ে দেখলুম আপনাদের আশীর্ব্বাদে ওজন গিয়ে দাঁড়িয়েছে দু'শো চল্লিশ পাউণ্ডে। খেতে পেলে তা হজমেরও কোন ব্যাঘাত হয় না।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তুই এত দিন ছিলি কোথা পন্টু?"

পন্টু বল্লে—"থাকবো আর কোথায়? ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে। নানা তীর্থস্থানে সাধু সন্দর্শন করে বেড়াচ্ছিলুম। শুনলুম মহাত্মাজী আসছেন সোদপুরে। মনে করলুম—যাই একবার মহাগুরুকে দর্শন করে পাপ-তাপ ক্ষালন করে আসি। আর ঐ সঙ্গে তাঁর অহিংসা সাধনের কসরৎটা যদি আদায় করতে পারি তো মন্দ কি? রাজকোটের ব্যাপারের পর থেকেই আমার মনে মনে একটা খট্কা ছিল যে, মহাত্মাজীর সাধন-প্রণালীর ভিতর হয় তো কোথাও একটু ত্রুটি আছে। সে ত্রুটি যে কোথায়, এবারে তা ধরতে পেরেছি।"

আমি হাঁ করে পন্টুর কথা শুনছিলুম। ছোঁড়া বলে কি? ও যে আবার মহাত্মার উপর Super-মহাত্মা হয়ে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞাসা করলুম—"মহাত্মাজীর সাধনের ত্রুটি কি দেখ্লি?"

পন্টু বল্লে—"মহাত্মাজীর অহিংসাও ঠিক, প্রার্থনা-প্রণালীও ঠিক। কিন্তু যে রকম আসন করে বসে প্রার্থনা করলে শত্রুর মনে সহজে অহিংসার উদ্রেক হয়, সেই আসনটা তিনি এখনও রপ্ত করতে পারেননি।"

পন্টুর কি শেষে মাথা খারাপ হলো!

আমি আর অহিংসার কথা তুললুম না। দু'জনে আস্তে আস্তে সোদপুর ষ্টেশনের দিকে আসতে লাগলুম। কাছাকাছি এসে দেখি দুর্ভেদ্য ভীড়। প্রায় শ' দুই-তিন লোক জমা হয়েছে। বিশাল দুই বাহু দিয়ে ভীড় ঠেলে পন্টু ভিতরে ঢুকে পড়লো। আমিও পিছু পিছু গেলুম। গিয়ে দেখি, রাস্তার ধারে একটা মেয়ে পড়ে পড়ে গোঁ গোঁ করছে। দুই-এক জন তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর অদূরে গোঁফ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক জন লালপাগড়ীওয়ালা কনস্টেবল। শোনা গেল, কনস্টেবল সাহেব ভীড় সরাতে গিয়ে ব্যাটন চালিয়েছিলেন, আর সেই শান্তি-রক্ষার প্রয়াসের ফলে মেয়েটি রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। পন্টু তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে কোলে করে ভীড়ের বাইরে

নিয়ে গিয়ে দু'জনকে বললে—"একে আগলাও আর মুখ-চোখে জল দাও; এখানে ভীড় জমতে দিও না।" তার পর আস্তে আস্তে কন্‌স্‌টেবল সাহেবের সুমুখে গিয়ে বললে—"দেখি, বাবা, তোমার ব্যাটনটা।"

কন্‌স্‌টেবল বিস্মিত দৃষ্টিতে পন্টুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পন্টু বললে—"দেখ বাবা, ওটা হিংসাত্মক জিনিষ; হাতে রাখা ভাল নয়। ওটাকে ফেলে দাও, আর যা করেছ তার জন্যে অনুতপ্ত হও।"

কিন্তু দেখা গেল কন্‌স্‌টেবল সাহেব অনুতপ্ত না হয়ে তপ্ত হয়ে উঠলেন। পন্টুকে এক ধাক্কা মেরে বললেন—"হট্‌ যাও।"

পন্টুর দু'শো চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের কলেবর সে ধাক্কায় নড়লো না। কিন্তু দেখতে দেখতে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তা যেমন অহিংস তেমনি অপূর্ব্ব। পন্টু চক্ষের নিমিষে কন্‌স্‌টেবলের হাত থেকে ব্যাটনটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠলো—"বল্‌ কৈ, ভি চলে।" তার পর তার একটি ঠ্যাং আর একটি হাত ধরে আস্তে আস্তে রাস্তার উপর তাকে শুইয়ে দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তার পেটের উপর বসে প্রার্থনা সুরু করে দিলে—

—"হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! কন্‌স্‌টেবল বাবুটির হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার কর।"

(পেটের উপর এক দমক)

"হে দয়াময় ভগবান্‌! এর মোহ কাটিয়ে দাও। দাও এর মনে সুবুদ্ধি।"

(পেটের উপর আর এক দমক)

মিনিট তিন-চার এই রকম প্রার্থনা আর দমকের পরে দেখা গেল, কন্‌স্‌টেবল বেচারীর মুখ নীলাভ হয়ে উঠেছে; তার গোঁফ-জোড়া ঝুলে পড়েছে, আর তার গলার ভিতর থেকে একটা অস্ফুট ধ্বনি বের হচ্ছে, যা প্রার্থনাও হতে পারে, গোঙানিও হতে পারে।

আমি দেখলুম—সর্ব্বনাশ! পন্টু আবার বুঝি একটা খুনের দায়ে পড়ে!

পন্টুর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কন্‌স্‌টেবলের পেট ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে সে মেয়েটি যেখানে শুয়ে ছিল সেইখানে গেল। দেখলে মেয়েটী সামলে উঠেছে। ফিরে এসে আমায় বললে—"চলুন, আজ আপনার ওখানেই থাকবো মনে করছি।"

আমি দ্বিরুক্তি না করে পন্টুর সেই অহিংসা-সাধনার পীঠস্থান থেকে সরে পড়লুম। কিছু দূর গিয়ে পন্টু বললে—"দেখলেন তো, ঠিক আসন করে বসতে পারলে অহিংসা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই হবে আসনটি হওয়া চাই—একেবারে মূলাধার চক্রের ঠিক উপরে।"

বিনিদ্রিত

অজিত দত্ত

সহসা ভাঙিয়া গেছে ঘুম
বাদলের রিম্‌-ঝিম্‌ গানে
আজিকার সারারাতে আর
চোখে ঘুম আসিবে না নামি',
একা শুয়ে শুধু মনে হয়
তুমি যদি থাকিতে এখানে
তবে আজ রাত জাগিতাম তুমি আর আমি।
রজনীর ঘুমের দোলায়
ঘুমায়েছে অভিমান যতো,
বক্র ওষ্ঠে তিক্ত অভিনয়
ফুটিবে না এ ঘোর নিশীথে—
জন্মান্তর-গোপন-চারিণী
আমার সে মালতীর মতো
আজিকে আসিতে যদি তুমি
আজ যদি ফের দেখা দিতে!
হৃদয়ের নিভৃত চড়ায়
ভ্যাখো আজ ভিড়েছে বন্দর,
কুটিল ধোঁয়ায় সেথা আজ
ঢেকে যায় মেঘের ইঙ্গিত
প্রাণ ভরে দিয়েছিল যতো
সবি আজ অযত্ন-ধূসর
যতো সুর নব-যৌবনের
সবি আজ বিস্মৃত সঙ্গীত।
তবু তুমি ফিরে এসো আজ
নিয়ে যাও কৈশোর বেলায়,
মনে মোর অনন্ত শূন্যতা
সেথা তুমি একা এসো নামি'—
জন্মান্তর পরে যেন, আজ রজনী যাপিতে মন চায়
বিনিদ্র বিমূঢ় বাক্য-হারা তুমি আর আমি।

অপরাধ

কে পিছু নিয়েছে। দিনেশ দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল।

গিয়েছিল পাশ-গ্রামে, খেজুরতলায়। অজয়কে দেখতে। অজয় ডেটিনিউ। অন্তরীণ।

তবে কি পুলিশ পিছু নিয়েছে?

না, দেখা করার তার অনুমতি-পত্র ছিল। অজয়ই ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তাতে কি হয়? এমন উৎসাহী পুলিশের লোক হয়তো কেউ আছে যে পুরোমাত্রায় নিঃসন্দেহ হতে পারছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিলে হয় লোকটাকে। না, এখুনি কোনো দরকার নেই। আগে হাটের এ রাস্তাটুকু পার হয়ে যাক্। এখানে অনেক ভিড়। অনেক পরিচিত লোক।

হাটের পথ ছেড়ে দিনেশ মাঠে নামল। এটাই তাদের গ্রামে ফিরে যাবার সোজা পথ, খুব জোরে পা চালিয়ে গেলে বড় জোর আধ ঘণ্টা।

তা ছাড়া মাঠটা মনে হল সবুজ মুক্তির মত। লোক-জনের ঠোকাঠুকি নেই, চোখ চাওয়াচাওয়ি নেই। নেই বা চোখের কোণের কৌতূহলে চিহ্নিত করে রাখা। নিজেরা থেমে পড়ে অন্যকেও থামিয়ে দেওয়া। এখানে অনেক ফাঁকা। দরকার হলে ছুট দেওয়া যায় সহজে।

মাঠে নেমে ঘাড় ফেরাল দিনেশ। লোকটা আর পিছু নেয়নি। আমিরুল্লার বেনেতি মশলার দোকানের সামনে এসেই থেমে পড়েছে।

না, পুলিশের লোক নয়। এ তারক সা।

খেজুরতলার বাজারে তারক সা'র মস্ত বড় কাপড়ের দোকান। দু'বছর আগে তার দোকান থেকে দিনেশ একটা মশারি কিনেছিল, আজও পর্যন্ত তার দাম দেওয়া হয়নি। দেব-দিচ্ছি, আজ-নয়-কাল অনেক টালবাহানা করেছে দিনেশ, তবু কথা রাখতে পারেনি। তলব-তাগাদায় কোনো ফল হয়নি দেখে আজকাল ওরা তার পিছু নেওয়া সুরু করেছে। এত দিন দোকানের ছোকরা ছুটো পিছু নিত, আজ খোদ কর্তা উঠেছে ক্ষেপে।

মশারিটা না কিনে উপায় ছিল না। ছেলে মেয়ে অসীমা ও তার—সকলের প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া। তা ছাড়া মশার কামড়ে কারু পুরো রাত ঘুম নেই।

দাম সে দেবে। তার ইচ্ছে আছে ষোল আনা। দাম যে পাবে তার চাওয়ার মধ্যে যে ন্যায় আছে এ সম্বন্ধে সে সন্দেহ করে না। কিন্তু কোত্থেকে সে দেয়!

নিজের গ্রামে এসে পড়েছে দিনেশ। খালের মুখেই কেশবের সঙ্গে দেখা।

'কি মশাই, কাগজের দামটা দেবেন না ?'

দিনেশ মাথা নামাল। বললে, 'দেব।'

'দেবেন-দেবেন বলছেন তো আজ এক বছরেরও উপর, কথার তো কাণাকড়িরও দাম নেই। মাষ্টারী করেন তো ছেলেদের কি শিক্ষা দেন জিগগেস্ করি ?'

খবরের কাগজের সামান্য একটা হকার। ইস্কুলের চৌকাঠও হয়তো কোনো দিন মাড়ায়নি। সে পর্য্যন্ত গলা উঁচিয়ে দুঃসাহসীর মত তাকে শাসন করে। মনে করে নর্দমার পোকা।

দু' মাসের খবরের কাগজের দাম বাকি। সাত টাকা কয়েক আনা। এক সঙ্গে যে ফেলে দিতে পারে এমন ক্ষমতা নেই দিনেশের। দু' আনা চার আনা করে নিতে কেশব রাজি নয়। সে কি ভিখিরি ?

তার মানে দিনেশ ভিখিরির চেয়েও অধম।

স্বভাব চরিত্র জাত জন্ম নিয়ে কেশব অনেক কুকথা বলতে থাকে পিছন থেকে। শুনলেও শোনেনি এমনি ভাব করতে হয় দিনেশের। ঘেয়ো কুকুরের মত লোকের স্পর্শ বাঁচিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে যায় দিনেশ। লেজ গুটিয়ে মাথা হেঁট করে।

এক বছর সে খবরের কাগজ পড়ে না। জানে না দেশ এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। জানে না কবে ঘুচবে তার এই দারিদ্র্য, এই লজ্জা আর ভয়। তার আর কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো কৌতূহল নেই।

কত দূর এগিয়ে আসতেই নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা। সাব-ডিভিশনের স্কুল ইনস্পেক্টর, প্রায়ই গ্রামে আসেন স্কুল পরিদর্শন করতে। আশে-পাশে যেখানেই যখন আসেন দিনেশের সঙ্গে দেখা করে যান। অনেক দিনের জানা শোনা।

আর, যখনই দেখা করেন, ঘ্যানর-ঘ্যানর ঘ্যানরঘ্যানর করেন অনেকগুলি। বলেন তাঁর দারিদ্র্য দুর্দশার কথা। সকলে কেমন খুঁটে খুঁটে ঠুকরে ঠুকরে ঘুস নিচ্ছে আর তিনি খুঁদকুঁড়োও নিচ্ছেন না, সেই সাধুতা বা অক্ষমতার বর্ণনা। প্রকাণ্ড পরিবার, সামলে উঠতে পারছেন না এই সামান্য আয়ে। বড় ছেলেটাকে পড়াতে পারলেন না বেশি দূর, বেকার বসে আছে। মেয়ে দু'টো ধাড়ি হচ্ছে দিন দিন, পাত্র জুটছে না। নিজের আমাশা না অর্শ, চিকিৎসার পয়সা নেই।

এ তো সব দুঃখের কথা ; মামুলি, এক রঙা এর মধ্যে তো অপমান নেই।

'ধার নেই আপনার ? ছোট-ছোট ধার ?' জিগগেস্ করে দিনেশ।

'না। ধার করি এমন সাধ্য কি। শোধ দেব কোত্থেকে ?'

তা হলে তিনি তো পরম সুখী। যা তাঁর মাইনে তাই দিয়েই কষ্টেসৃষ্টে টায়েটোয়ে তাঁর সংসার চলে যায়। তার পরেও তাঁর অভাব থাকতে পারে কিন্তু লাঞ্ছনা তো নেই। এক ধার শোধ করতে গিয়ে তাঁকে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তো আরেক ধার করতে হয় না। এক গর্ত বোজাতে গিয়ে খুঁড়তে হয় না তো আরেক গর্ত! তিনি তো পৃথিবীতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন। লজ্জায় তাঁকে তো মাথা হেঁট করে চলতে হয়
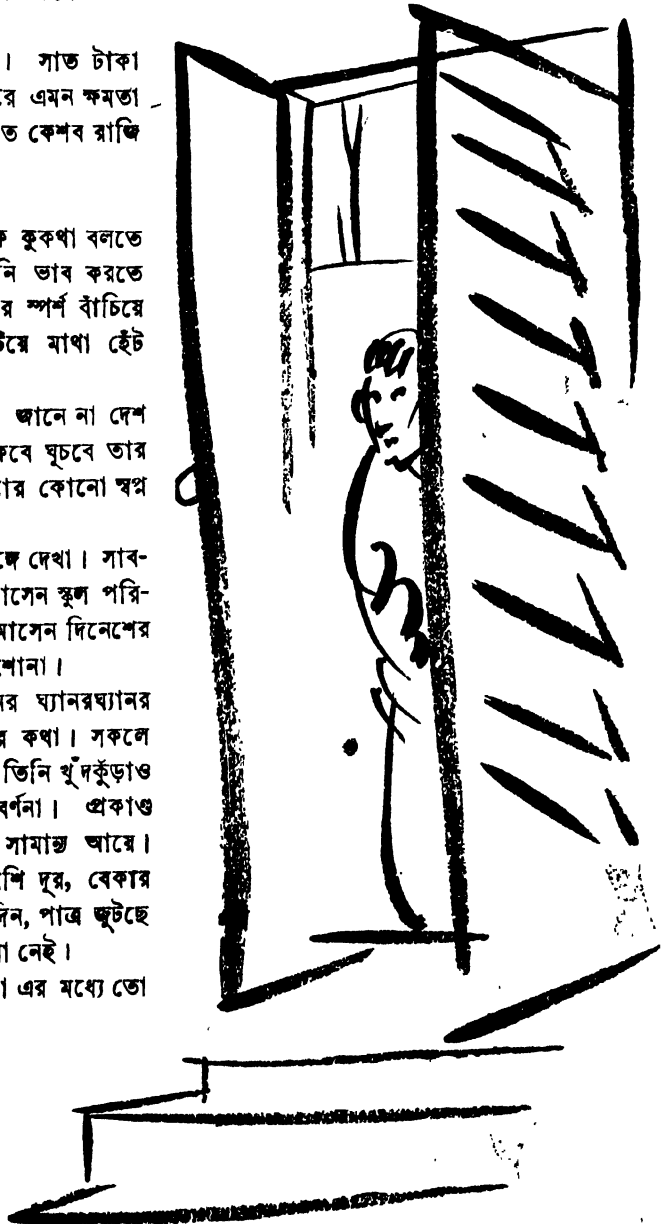
না। ভয় পেয়ে ইঁদুরের মত তো পালিয়ে যেতে হয় না ভিড় দেখে? তাঁর মনের বিফলকামের বেদনা থাকতে পারে কিন্তু অপরাধীর গ্লানি তো নেই। তিনি দরিদ্র হতে পারেন, কিন্তু তিনি তো অপরাধী নন। তাঁকে তো কাউকেও ভয় করবার নেই পৃথিবীতে। তিনি সহানুভূতি পাবেন, ঘেন্না মেশানো অনুকম্পা তো তাঁকে কুড়িয়ে নিতে হবে না।

নগেনবাবুর ঘ্যানর ঘ্যানর আর ভালো লাগে না। তার সঙ্গে তাঁর মিল নেই। সে অপরাধী! সে ঘৃণ্য। সে ধিকৃত।

বাড়ির কাছে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল দিনেশ। বাড়ির মধ্যে আর ঢুকল না। পাশ কাটিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল।

বাড়ির দোরগোড়ায় মহাদেব বল্লভ ব'সে। বল্লভ-মশাই বাড়িওয়ালার লোক। প্রকাণ্ড গোঁফ, প্রচণ্ড গলার আওয়াজ। সব চেয়ে প্রচণ্ড তার অভদ্রতা।

একবার দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল এক সঙ্গে, যেবার অসীমার খুব বড় রকম অসুখ হয়। তারপর যত ভাড়া সে দিয়েছে পর-পর, সব গিয়েছে বকেয়ার উশুলে। কিছুতেই হালনাগায়েৎ হতে পাচ্ছে না। মাঝে এক মাসের জন্য দশ টাকার একটা টিউশনি পেয়েছিল, তা ফেলে দিয়েছে সে ঐ বাড়িভাড়ার অন্দরে। তবু এখনো আঠারো টাকা বাকি। চলতি ভাড়া দিয়ে দিনেশের আর সাধ্য নেই কিছু দিতে পারে বকেয়ার মধ্যে।

কিন্তু কিছু আদায় না করে বল্লভমশাই আজ আর কিছুতেই নড়বেন না।

অসীমা ছেলেকে দিয়ে বলিয়েছে, বাবু বাড়ি নেই, কতক্ষণে ফিরবে কেউ বলতে পারে না, তাই আরেক সময় যেন সে আসে।

বাবু ভিতরে থাকলেও নেই, বাইরে থাকলেও নেই, কিন্তু এক সময় না এক সময় হয় বেরুতে নয় ঢুকতে তাকে হবেই এই দরজা দিয়ে। তাই বল্লভমশাই দরজা ছাড়বেন না কিছুতেই। আজ তাকে ধরে ঠিক টেনে নিয়ে যাবেন কাছারিতে।

অসীমা রান্নাঘরে উনুনের কাছে বসে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। ছেলেরাও যেন অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছে তাদের বাবা অপরাধী, অপদার্থ। তাদের এই জন্ম ও জীবন সমস্তই একটা অগৌরবের কাহিনী।

কেটে পড়লেও বেশি দূর নিশ্চিন্ত হয়ে এগুতে পারল না দিনেশ। কত দূর যেতেই ষ্টার ফার্মেসির অখিলের সঙ্গে দেখা। সরে পড়তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অখিল সরাসরি তার হাত চেপে ধরল।

ওষুধের বিলের পাওনাটা আজও সম্পূর্ণ শোধ করা হয়নি। তাই বলে রাস্তার মাঝে অমনি হাত চেপে ধরবে নাকি?

অথচ একটা যে সমর্থ প্রতিবাদ করে এমন ক্ষমতা দিনেশের নেই। বরং পীড়িতের মত অসহায় মুখ করে বললে, 'এ মাসের মাইনে পেলেই দিয়ে দেব টাকাটা।'

'অনেক মাইনেই তুমি পেয়েছ এ পর্য্যন্ত। আর ও-কথায় ভুলছিনে।' অখিল হাতটা জোরে চেপে ধরে টানতে লাগল সামনের দিকে। যেন কোথায় তাকে নিয়ে যেতে চায়।

'জানো তো সামান্য মাইনে, তায় অসুখবিসুখ, সব দিক্ গুছিয়ে উঠতে পারিনে।'

'সামান্য মাইনে তো, ডাক্তারকে দিয়ে অসামান্য ওষুধ বাতলিয়েছিলে কোন্ সাহসে? তখন খেয়াল হয়নি সামান্য মাইনের থেকে অসামান্য অষুধের দাম দিতে পারবে না?'

'বলো, স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তোলা কি স্বামীর কর্তব্য নয়?' আততায়ীর সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্যে দিনেশ সজল কণ্ঠে বললে, 'তখন কি করে সে বাঁচবে, কি করে সে একটু আরাম পাবে, তারি সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরতে হয়। তখন ওষুধের দাম বেশি কি আমার ক্ষমতা কম এসব কথা কি মনে আসে?'

'সুবিধে আছে যে।' অখিল বিকট ভঙ্গিতে মুখ বেঁকাল: 'তক্ষুনি-তক্ষুনি যে নগদ দাম দিতে হল না। মাষ্টারমানুষ—দেখে তখন যে আমি বিশ্বাস করেছিলাম মাসকাবারেই দামটা পেয়ে যাব। তখন কি জানি তুমি এতখানি জোচ্চোর?'

দিনেশ বুঝতে পেরেছে তাকে পাশেই আর কারু দোকানঘরে জোর করে টেনে নিয়ে যাবে। সেখানে দরজা বন্ধ করে অখিল ও তার বন্ধুরা তাকে মারবে, মেরে গায়ের ঝাল মেটাবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে দিনেশ। তবু বাধা দিতে গিয়েও সে বাধা দিচ্ছে না। একেকবার ভাবছে, মন্দ কি, যদি মার খেয়েই এই ভার নেমে যায়, যাক্, মনের যন্ত্রণা থেকে দেহের যন্ত্রণা অনেক তুচ্ছ, অনেক সহনীয়। তবু, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছে, তার জোর নেই, বৈধতা নেই, তবু বাধা দিচ্ছে। বলছে, মার খেলেও ধার মুছে যাবে না। আবার এমনি আরেক দিন অখিল হাত চেপে ধরবে।

রাস্তা থেকে কারা-কারা এসে ছাড়িয়ে নিল দিনেশকে, প্রৌঢ় ব্যক্তিরা কেউ-কেউ অখিলকে মৃদু তিরস্কার করলে। কিন্তু নির্ভুল ভাব দেখালে সমস্ত ন্যায় ও ধর্ম অখিলের দিকে।

তক্কে-তক্কে থেকে ফাঁকা দরজা পেয়ে দিনেশের বাড়ি ঢুকতে প্রায় আড়াইটে। স্নানাহারের কাছে দিনেশের

চেয়ে আগে বল্লভমশাই পরাস্ত হয়েছেন। লাঠি ঠুকে তিনি শাসিয়ে গেছেন এবার যখন আসবেন চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আসবেন, দেখা যাবে ধরতে পারেন কি না বাছাধনকে। দূরের রাস্তা, আজ আর বেশিক্ষণ ধন্না দেবার তাঁর সময় নেই। পরের বার, যেমন কচু তেমনি তেঁতুল হয়ে আসবেন তিনি।

'এত দেরি হল?' অসীমা এসে জিগগেস্ করলে।

'খেজুরতলা কি সামান্য পথ? তারপর ও ক্লি ছাড়ে!'

'কেন, ডেকেছিল কেন?'

'তিন দিন পর ও ছাড়া পাবে, অর্ডার এসে গেছে নাকি। যাবে কলকাতা। তাই ভারি ফুর্তি দেখলাম।'

'জেলে থাকতেও তো ফুর্তি কম দেখি না।'

'সে তো আর আমাদের মত জেল নয়।' দিনেশ গা থেকে সার্টটা খুলে ফেলল। অনেক নিষ্ফল ক্লেশের দীর্ঘরেখা দিয়ে পাঁজরগুলি আঁকা।

'খেজুরতলা থেকে কলকাতা কোন্ পথে যাবে?'

'বললে যাবার পথে আমাদের এখানে থেকে যাবে এক দিন।'

'কি সর্ব্বনাশ!' অসীমা চমকে উঠল: 'তুমি রাজি হলে?'

'কি করে না করি বল? বড় লোক, তা ছাড়া এত দিন পর ছাড়া পাচ্ছে। আমিই বরং ওকে আগ্রহ করে নেমন্তন্ন করলাম।'

অসীমা ঝলসে উঠল। এমন একজন গণ্যমান্য লোককে অভ্যর্থনা করে বাড়ি নিয়ে আসবার তোমার কী সঙ্গতি আছে? কোথায় দেবে তাকে বসতে, কী বা জোটাবে তার আহার? অতিথি এলে ভালো-মন্দ খেতে দিতে হয়, রান্নায় বিশেষত্ব আনতে হয় একটু, তা সংগ্রহ করবার তোমার সামর্থ্য কোথায়? ঘরে সমস্ত কিছু তোমার বাড়ন্ত, তা ছাড়া, বাজারে ধার মেলে না।

'ডাল-ভাত যাই রান্না করে দেবে তাই খাবে ও তৃপ্তি করে। তোমার রান্না সাধারণ হতে পারে, কিন্তু ও তো সাধারণ নয়। তাছাড়া কত দিন মেয়েদের হাতের রান্না ও খায়নি, পায়নি লক্ষ্মীর হাতের সেবা।'

আহা, কী তোমার লক্ষ্মীর ছিরি! রোগে ভুগে-ভুগে শেওড়া গাছের পেত্নী হয়ে গিয়েছে। পরনে একটা আস্ত শাড়ি নেই, টেনে-বুনুতে কুলোয় না। অপরিচিত কাউকে দেখে যে ঘোমটা টানবে তার উদ্বৃত্তি নেই। ছেলেপিলেগুলোর নোংরা চেহারা, নোংরা ব্যবহার। সমস্ত ঘর-দোর একটা আস্ত আঁস্তাকুঁড়।

'এতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে কেন? যে লোক দেশের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তার কাছে আমাদের কিসের ভয়, কিসের লজ্জা? তার চোখে আমরাও তো তার দেশ। আমাদের এই দুঃখ আর দুর্বলতা তার চোখে তার দেশেরই দুঃখ, দেশেরই দুর্বলতা।'

শুধু কি তাই?

তারপরে সকাল থেকে পাওনাদারের মিছিল বসবে না তোমার দোরগোড়ায়? বিছের কামড়ের মত সর্বাঙ্গে তোমাকে অপমানের দংশন করবে না? তখন কলঙ্কিত মুখ তুলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাতে পারবে? তোমার অপরাধ আর অকীর্তি ঢাকলে কি করে? এমনিতেও যদি সহনীয় হত, বন্ধুর সান্নিধ্যে তা আর সহ্য করতে পারবে না। আত্মদাহ নির্বাণ খুঁজবে তখন আত্মহত্যায়। না, দরকার নেই, বন্ধুকে গিয়ে বলো, বাড়িতে ঘোরতর অসুখ হয়েছে, অভ্যর্থনা সম্ভব হবে না। আমাদের পাপ আর গ্লানি, দুঃখ আর অপমান আমাদের মধ্যেই থাক, আত্মীয়-বন্ধু কাউকে তার মধ্যে উঁকি মারতে দিতে পারব না। মুখে কালি মেখে তুমি মাথা হেঁট করে বসে থাকবে আর পাশে বসে তোমার বন্ধু সকরুণ ভদ্রতায় তোমাকে সহানুভূতি করবেন বা শেষ পর্য্যন্ত অর্থসাহায্য করতে চাইবেন, সে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। ব্যঞ্জনের সঙ্গে চোখের জলের নুণ মেশান এ সইবে না আমার। অপমানিতের মত এক কোণে থেকে আরেক কোণে গিয়ে লুকোব, চোখ তুলে তাকাতে পারব না মুখের দিকে, এই অপমান থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

এবার সত্যিই ভয় পেল দিনেশ। নিজের লজ্জা স্ত্রীর লজ্জা শিশুদের লজ্জা পরের চোখ দিয়ে দেখতে হবে এ জ্বালা সত্যিই অসহ্য। এমন ভাবে দেখেনি সে তার দৈনন্দিন জীবনের চেহারা। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। নিমন্ত্রণ করে এসে এখন আর বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

তারপর অজয় যখন এল এ বাড়িতে, মনে হল নতুন একটি দিন যেন পৃষ্ঠা বদলে দেখা দিয়েছে, আশ্চর্য্য দীপ্তির অক্ষরে। কোথাও দৈন্য নেই, দুঃখ নেই, অসম্মান নেই। সমস্ত পাপের চেয়ে বড় যে পাপ সে ভয় নেই। আমি অক্ষম আমি পরাজিত এ বেদনার কালিমা মুছে গেছে। ঝকমক করে জ্বলছে এখন সাহসের তলোয়ার। জীবনের ছেঁড়া তারে সে হঠাৎ বিদ্রোহের সুর বেঁধে দিয়েছে। শুনিয়েছে দেশের ডাক। নবজীবনের মন্ত্র।

রান্নাঘরে ছিন্ন আঁচলে মুখ ঢেকে অসীমা কাজ করছে আর শুনছে। তার বন্দী প্রাণ-পক্ষ স্পন্দিত হচ্ছে থেকে থেকে।

কিন্তু কে জানে এ মোহ কতক্ষণ।

'বাবুমশাই, আছেন না কি বাড়িতে? নির্ঘাৎ

মহাদেব বল্লভের গলা। 'আজ একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে এসেছি। আজ আর সহজে পথ ছেড়ে দিচ্ছি না।' লাঠি ঠুকতে লাগল মহাদেব। তার পিছনে পাইক পেয়াদা।

আওয়াজ শুনে এতটুকু হয়ে গেল দিনেশ। কি করবে কোথায় লুকোবে ভেবে পেল না। ভেবেছিল, কেন ভেবেছিল কে জানে, অন্ততঃ আজকের দিনটি সে রেহাই পাবে তার বরাদ্দ লাঞ্ছনা থেকে। ভগবান আজ আর তাকে তার বন্ধুর সামনে নাকাল করবেন না।

বাড়ির সামনে খোলা জমিটুকুর উপর একটা চেয়ারে বসে অজয় বই পড়ছিল, জিগগেস্ করলে, কী ব্যাপার!

ব্যাপার ঘোরালো। শালা মাষ্টার বাড়ির ভাড়া দিচ্ছে না। তাগাদা দিতে দিতে পায়ের হাড় খসে পড়ছে পচে পচে, তবু গায়ের চামড়া ফুঁড়ে ভদ্রতা গজাচ্ছে না মাষ্টারের। কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘরের ভিতরে থাকলে বাইরে আসে না, বাইরে থাকলে ভিতরে ঢোকে না। রাস্তায় দেখা হলে দৌড় মারে কিন্তু আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। যখনই হোক, যতক্ষণ পরেই হোক, মাষ্টারকে আজ জমিদারের কাছারি-বাড়ি ধরে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, মধ্যম হিস্তার জমিদারবাবুই বাড়িওয়ালা।

'দিনেশ ! দিনেশ !' সবল কণ্ঠে ডাকতে লাগল অজয়।

'যতই ডাকুন, আমার গলার আওয়াজ পেয়েছে যখন, তখন ও কিছুতেই আসবে না।' মহাদেব গম্ভীর মুখে বললে, 'ও এখন ইঁদুরের গর্ত খুঁজছে। দেখুন গিয়ে লুকিয়েছে হয়ত তক্তপোষের তলায়।'

অজয় আবার তীব্র স্বরে ডাকতে লাগল।

স্ত্রীর দিকে করুণ চোখে তাকাল একবার দিনেশ। না, বাইরে না গিয়ে আর উপায় নেই।

'তুমি বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে আছ কেন ? শুনছ না এই ভদ্রলোক তোমাকে ডাকাডাকি করছেন ?' অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তুমি বোসো এই চেয়ারটায়। হ্যাঁ, আমি বলছি, বোসো। আমি সব শুনেছি ওঁর কাছ থেকে। তাতে তোমার অমন মুখ ম্লান করে থাকবার কথা নয়। কোনোই তুমি অপরাধ করনি যে ভয়ে-ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে। বোসো বলছি চেয়ারটায়।'

দিনেশ বসল।

'মুখোমুখি তাকাও এখন একবার ঐ বল্লভমশাইর দিকে। তাকিয়ে স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বল, টাকা আমি দেব না।'

'দেব না ?' দিনেশ নিজেই চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, দেবে না। মানে, এখন, যতক্ষণ না পার, যতদিন না দিন ফেরে, ততক্ষণ, ততদিন তুমি দেবে না। যেই মুহূর্তে স্বচ্ছলতা আসবে সেই মুহূর্তে দিয়ে দেবে। এর মধ্যে কোনো পাপ নেই, কোনো লজ্জা, কোনো ভীরুতার লেশমাত্র নেই। ওদের বেশি ছিল ওরা দিয়েছে, তোমার অল্পতমও নেই তুমি দিতে পাচ্ছ না। এর মধ্যে এতটুকু অন্যায় নেই। যখন আবার ওদের থাকবে না আমাদের থাকবে তখন আবার ওদেরকে আমরা শোধ দেব। হব সমান সমান। যা সত্য তা কখনো ধর্মের আইনে তামাদি হয়ে যায় না। লেন-দেন হিসাব-নিকাশ সব এক দিন বুঝসমুঝ হয়ে যাবে।'

আশ্চর্য্য, অজয় যা বললে তাই দিনেশ পুনরুক্তি করলে। মহাদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে, স্পষ্ট দৃঢ়-কণ্ঠে। প্রত্যেকটি কথা বুকের মধ্যে অনুভব করে করে। বলতে-বলতে গায়ে তার জোর এল, ভঙ্গিতে এল কাঠিন্য। সে যে অপরাধী নয় চোখে এল সেই অনুভূতির দীপ্তি।

যেন একটা অনড় কুয়াশা উড়ে গেল এক মুহূর্তে। নতুন বাতাসে প্রত্যেকটি নিশ্বাস তার পবিত্র মনে হতে লাগল, রক্তে এল সাহসের তীক্ষ্ণতা। সবাইর সামনে দাঁড়াতে পারে সে মুখোমুখি।

এল খেজুরতলার তারক সা।

'বাবু আছেন ?'

'এই যে আপনার সামনে জলজ্যান্ত বসে আছি দেখতে পাচ্ছেন না ?' স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে বললে দিনেশ। 'কেন মিছিমিছি ঘোরাঘুরি করছেন ? আমার হাতে এখন টাকা-পয়সা নেই, আমি এখন দিতে পারব না। কখন পারি তারো ঠিক নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যখুনি সক্ষম হব যেচে গিয়ে আপনার টাকা দিয়ে আসব। আর যদি কোনো দিন নাই পারি, জানবেন, আপনারই দিন শুধু ফিরেছে, আমরা তেমনি সেই লোকসানের ঘরেই পড়ে আছি। কিন্তু যেদিন লাভের কোঠায় উঠে আসব সেদিন আমার আপনার সকলের লাভ।'

সত্যি, খোলস বদলে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে দিনেশ। অনেক ঘোরাঘুরির পর পেয়েছে ঠিক জায়গা, ঠিক ভঙ্গি। সে অপরাধী নয় পেয়েছে এই আশ্চর্য্য সংজ্ঞা। জীবনে কেউ অপরাধী নয়।

'আমি আদালত করব।' বললে তারক সা। মনে হল সেই এবার ভয় পেয়েছে।

'করো, আদালত লম্বা কিস্তির হুকুম দেবে।' বললে অজয়। 'আজ সে কিস্তি খেলাপ করার অধিকার আছে দেনদারের।'

দিনেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

অনেক বৎসর পর এই তার প্রথম উচ্চ হাসি।

আমার অক্ষমতা আমার অপমান নয়। আমার বিফলতা নয় আমার অপরাধ। দিনেশ আবার হেসে উঠল। অক্ষমতা আর বিফলতা সত্ত্বেও আমার অধিকার আছে বাঁচবার। অধিকার আছে সেই অক্ষমতা ও সেই বিফলতা দূর করে দেবার। লোকসান থেকে লাভের ঘরে চলে আসবার।

ডাক এবার অখিল সমাদ্দারকে। দেখি তার হাতের কবজিতে কত জোর।

অখিল এল না।

তারপর বাকি আছে কেশব। ডাক তাকে। দু' আনা চার আনা করে নিতে তার এমন কি অসুবিধে? আমার ইচ্ছে আমি দু' পয়সা চার পয়সা করে দেব। আমার সুবিধে মত।

এল কেশব। একখানা কাগজ দিয়ে গেল দিনেশের হাতে। বলে গেল, 'যখন যেমন সুবিধে তেমনি দেবেন।'

আজ অনেক দিন পর শান্ত, নিশ্চিন্ত সাহসে বাইরে বেড়াতে বেরুল দিনেশ। সে খুঁজে পেয়েছে দাঁড়াবার ঠিক জায়গা, দেখবার ঠিক ভঙ্গি। সে অপরাধী নয়, সে কাপুরুষ নয়, সে অকিঞ্চিৎকর নয়। সে অভিযাত্রিক। নিজের মাঝে বহন করে বেড়াচ্ছে সে নবীন দিনের সম্ভাবনা।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে শুনতে পেল কার চাপা কান্নার শব্দ।

পা টিপে টিপে এগুলো সে দরজার দিকে।

দেখল, অজয়ের কোলের মধ্যে মুখ রেখে অসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তার পরে ঠিক সময়ে ঘরে বাতি জ্বলল, উনুন ধরানো হল, রান্না করতে গেল অসীমা। অতিথির জন্যে আরেক কিস্তি রাঁধলে নূতন করে। এই রাতটা থেকেই ভোর বেলা অজয় রওনা হয়ে যাবে। বাইরের ঘরে তার বিছানা করে দিয়ে এল অসীমা। তার পর তার নিজের ঘরে সে শুতে এল, দিনেশের পাশটিতে।

কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। সেই নোংরা কাঁথা-তোষক, নোংরা মশারি, সেই উত্তপ্ত অনিদ্রা। সেই প্রতিশ্রুতিহীন কালো রাত্রি!

চোখ বুজে শুয়ে আছে অসীমা। বোঝা যাচ্ছে ঘুমুতে পারছে না। চোখের চার পাশে লেগে আছে এখনো বা জলের মালিন্য।

'আমার দিকে তাকাও। চোখ মেল।' শান্ত কণ্ঠে বললে দিনেশ। একবার চোখ মেলেই আচ্ছন্নের মত আবার অসীমা চোখ বুজল।

'না, চোখের দিকে তাকাও স্পষ্ট করে। তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো লজ্জা নেই। তুমি অপরাধী নও।' অসীমার উন্মীলিত চোখের উপর দিনেশের দৃষ্টির স্নিগ্ধতা চুম্বনের মত নেমে এল। 'যদি তুমি বুঝে থাক তোমার স্বামী তোমার সন্তান তোমার ঘর-সংসার সমস্ত কিছুর চেয়ে তোমার দেশ বড়, তোমার দেশের জন্যে সব কিছু তুমি ছেড়ে চলে যেতে পার মুহূর্তে, তা হলে তুমি কোনোই অপরাধ করনি।'

আজ কালের সমস্যা

[শিল্পী—অবনী সেন

পারমানবিক

বিমলচন্দ্র ঘোষ

শান্তি কোথায়? তারায় তারায় জলন্ত
উল্কার হাড় স্মৃতির পাহাড় চলন্ত
ইন্দ্রের ভয়ে দ্রুত ধাবমান ব্যর্থ-বাসনা দিক্-বিদিক্
অন্ধ-অপার অমেয় আশার দৌবারিক,
মর্ত্ত্যবাসীর বাসনা-বাঁশীর কম্পন-ঘন মৃত্যু-দূত
ব্যোম-সমুদ্রে শরীরী-ব্যথার হে বুদ্‌বুদ—
শূন্যে অনাদ্যন্ত কাল,
হে কঙ্কাল!

অণোরনীয়ান্ প্রলয়ের গান ক্ষণ-বিনাশ
দ্রুত কম্পিত বিচ্ছুরণের চিদ্বিলাস
নিমেষে বিপুল জড়ের বাঁধন
বহ্নি-বলয়ে রুদ্র-সাধন
চূর্ণ ধূমল ক্ষিতিমণ্ডল ক্রুদ্ধ প্রবল অণু-বিদার
নবযন্ত্রের তন্ত্রধার!

হে অদ্ভুত
হে বুদ্‌বুদ,
উচ্চাভিলাষী স্বপ্নদূত
চোখ খুলে চাও, একটু দাঁড়াও হে চঞ্চল
তীব্র দ্যুতির ক্ষণ তৃপ্তির ক্ষুধিত অধীর যে সম্বল-
বক্ষে তোমার ঘুচিয়োনা তার মহাভবিষ্য হে সৈনিক,
করো প্রবুদ্ধ জীবনযুদ্ধ এ দৈনিক।

পান্নাচুনীর স্বর্ণতূণীর পৃষ্ঠে কুমার অহঙ্কর
সৌর-নায়ক শোনায় আদেশ শ্রেয়স্কর-
মন্ত্র অনাদ্যন্তকাল:
একটু দাঁড়াও হে কঙ্কাল।

এসেছে এবার প্রাজ্ঞ-যুগের সন্ধিক্ষণ
জেগেছে প্রাচীন অঙ্গের ঘেরে বন্দী-মন
পাতালে বাসুকি লক্ষ ফণায়
ফোঁসে ঘন ঘন বাষ্প ঘনায়
দেশে দেশে জাগে অনলদীপ্ত অযুত ক্ষিপ্ত অকিঞ্চন
থামাও তোমার স্বপ্ন-প্রাণের রক্তচক্ষু ভ্রূকুঞ্চন।

বাংলা নাচ ও উদয়শঙ্কর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলা নৃত্যকলার ক্ষেত্রে উদয়শঙ্করের স্থান নির্দেশ করতে হ'লে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে, উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের আগে বাংলাদেশে এই বিশেষ আর্টটির অবস্থা ছিল কি-রকম?

সাহিত্য-সেবাই আমার প্রধান ধর্ম্ম হ'লেও সুদীর্ঘ কাল ধ'রে নৃত্যকলা নিয়ে আলোচনা ক'রে আসছি এবং ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছি বারংবার। সুতরাং এক্ষেত্রে নিজের চোখ দিয়েই যদি অতীতকে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা করি, তাহলে কেউ যেন সেটা আমার আত্মপরিচয় দেবার দুশ্চেষ্টা ব'লে ধ'রে নেবেন না। পরের মুখে ঝাল না খেয়ে, যা দেখবার তা নিজের চোখে দেখাই হচ্ছে নিরাপদ্।

মানুষের শিশু কথা কইবার আগে নাচতে চায়, অবোলা পশু-পক্ষীও নাচতে ভালোবাসে এবং নৃত্যের মধ্য দিয়েই হয়েছে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ললিতকলার সূচনা। এইজন্যেই বোধ হয় অধিকাংশ মানুষই বাল্যকাল থেকে নাচের ভক্ত না হয়ে পারে না। আমারও ছেলেবেলা থেকেই নৃত্যকলার দিকে একটা স্বাভাবিক প্রাণের টান ছিল।

সে হচ্ছে অর্দ্ধ শতাব্দী আগেকার কথা। বাংলাদেশে তখন কীর্ত্তন, ঝুমুর ও বাউল প্রভৃতি লোকনৃত্য প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কলকাতা সহরে সাধারণ নৃত্যের নিয়মিত আসর বসত কেবল মাত্র থিয়েটারে থিয়েটারে। আমিও বাল্যকাল থেকেই পেয়েছিলুম থিয়েটার দেখবার সুযোগ। তখনকার বাংলা নাট্যজগতে যাঁরা বিখ্যাত নর্ত্তক ব'লে সুপরিচিত ছিলেন, সেই কাশীবাবু, রাণুবাবু, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও কড়িবাবু প্রভৃতি সকলেরই নাচ আমি অনেকবার দেখেছি। তাছাড়া "প্রমোদরঞ্জন", "আলিবাবা" ও "আলাদিন" প্রভৃতি নৃত্য-গীত-প্রধান নাট্যাভিনয়েও সখীবৃন্দের লাস্যলীলাও দেখেছি যথেষ্ট।

ঐ-সব নৃত্যের দিকে আকৃষ্ট হতুম বটে, কিন্তু ও-শ্রেণীর নাচ কেন যে আমার মনকে ভালো ক'রে স্পর্শ করতে পারত না, তার কারণ তখন বুঝিনি। তবে সেই সময়েই এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম যে, বাংলা রঙ্গালয়ে শিল্পী হিসাবে মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই হচ্ছেন অধিকতর শক্তিশালী।

কোন-কোন বাড়ীতে উৎসবের সময় আর এক শ্রেণীর নাচের আসর বসত এবং [illegible]

খেমটা-নাচের প্রভাব অতিশয় ক'মে গিয়েছে, কিন্তু তখন খেমটাওয়ালীদের আদর ছিল রীতিমত। বিশেষ ক'রে মেয়েলি উৎসবে খেমটা-নাচকে যে একটি প্রধান অঙ্গ ব'লে মনে করা হ'ত, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু খেমটা-নাচকে কোন দিনই আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনি।

ধনীদের আসরে প্রাধান্য লাভ করত বাইজীদের নাচ। গহরজান-প্রমুখ অনেক বাইজীর নাচই আমি দেখেছি এবং তার মধ্যে প্রাণ না থাকলেও ললিতকলার একটি বিশেষ লালিত্য যে আছে, তা অনুভব করতে পারতুম।

তখন আমাদের দৃষ্টি বিস্তৃত হয়নি এবং আশাও ছিল অপ্রচুর। কাজেই অল্পেই খুসি হ'তুম এবং এই-সব নাচের উপরেও যে কোন উচ্চতর শ্রেণীর নৃত্যকলার নমুনা থাকতে পারে, এটা আমরা অনুমান করতে পারতুম না।

তারপর হঠাৎ পেলুম কাল্‌কা-বৃন্দা ভ্রাতৃযুগলের নাচ দেখবার সুযোগ। মন সচকিত হয়ে উঠল পরম বিস্ময়ে! তাঁদের ভাব, ভঙ্গী, অঙ্গহার ও নাচের ছন্দ সজাগ ক'রে তুললে আমার তন্দ্রাতুর কল্পনাকে। বুঝতে পারলুম নৃত্যকলার মধ্য দিয়ে কতখানি কাব্যরস ফুটিয়ে তোলা যায়! মনের ঝোঁকে একজন নৃত্য-গুরুর শিষ্য হয়ে কিছুদিন ধ'রে করলুম নৃত্য-সাধনাও। বলা বাহুল্য, মন নাচ শিখতে চেয়েছিল "শুধু অকারণ পুলকে"ই। পরে যে সেই শিক্ষা রঙ্গালয় ও সিনেমার ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগবে, মনের ভিতরে এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত পাইনি। এবং আমার সেই নৃত্যসাধনা বেশীদিন স্থায়ীও হয়নি।

ক্রমে ক্রমে দেখলুম সাঁওতালিদের ও উড়িষ্যার দেবদাসীদের নাচ। এবং সহরে সহরে দেশী ও বিলাতি যে-কোন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আসতেন তাঁদের কারুকেই দেখবার সুযোগ আমি ত্যাগ করতুম না। এমনি বিভিন্ন সব নাচের ক্ষেত্রে গিয়ে আমার চোখের সামনে খুলে গেল নৃত্য-জগতের বিভিন্ন সিংহদ্বার। কিছুদিন নৃত্যসাধনা ক'রে বিশেষ-কিছুই শিক্ষালাভ করিনি, কিন্তু ভারতের ও য়ুরোপের বিভিন্ন-শ্রেণীর নাচ দেখে এবং তাই নিয়ে মনে মনে চিন্তা করতে করতে আমার মন যে নৃত্যকলা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত হয়ে উঠল, এটুকু বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না।

স্বর্গীয় সঙ্গীতপ্রিয় রাজা স্যর সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের "নৃত্যাঙ্কুর" নামে একখানি পুস্তক পাঠ ক'রে জানতে পারলুম যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা ছিল কি বিচিত্র সৌন্দর্য্যের আকর!

নব্যবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তখনো নৃত্যকলা নিয়ে মাথা ঘামাতে কিছুমাত্র প্রস্তুত হয়নি। বাঙালীর ছেলেরা থিয়েটারে গিয়ে নাচ দেখে হাততালি ও শিষ দিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করত বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! নাচ যে আবার একটা উঁচুদরের আর্ট, অধিকাংশ বাঙালীই জানত না এই সত্যকথাটা।

"হিন্দুস্থান" নামে অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রে এবং একাধিক মাসিক পত্রেও প্রায়ই নাচের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলুম। "হিন্দুস্থানে" একবার একটি প্রবন্ধে লিখে ছিলুম, বাঙালীর মেয়েদের নিয়মিত নৃত্য অভ্যাস করা উচিত—আর্ট হিসাবে না হোক, অন্তত দৈহিক ব্যায়াম হিসাবে। সেদিন এই নূতন প্রস্তাব শুনে লোক যে কত কটু কথা বলেছিলেন, আজ তা মনে করলেও হাসি পায়।

তারপর প্রায় বাইশ বৎসর আগে প্রকাশিত হ'ল মৎসম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র "নাচঘর"। প্রথম সংখ্যাতেই "নৃত্যকলার নূতন প্রস্তাব" নামক একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলুম, "পৃথিবীর অন্যান্য দেশ—এমন কি ভারতেরও অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলার

ভদ্রসমাজে নাচের রেওয়াজ মোটেই নেই। আমাদের থিয়েটার নাচে দেশীয়ত্ব তথা বাঙালীত্ব যদি কিছু থাকে, তবে তা 'হোমিওপ্যাথিক ডোজে'। নাচের মধ্যে ভঙ্গী একটা মস্ত জিনিষ। কিন্তু এদেশী থিয়েটারি নাচে নয়নরঞ্জন ভঙ্গীর কি অভাব! কতকগুলো সেকেলে একঘেয়ে মামুলি ভঙ্গী নিয়েই এখানকার কারবার, এর মধ্যে নূতন বিশেষত্ব দেবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যেন রীতিবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে গ্রীস, রোম ও মিশরের প্রাচীন মন্দিরাদিতে ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য দেখে পুরাতন নাচের ভঙ্গীগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। আমাদের দেশেও তো উপাদানের অভাব নেই, তবে সে চেষ্টা হয় না কেন? আমাদের হাতের কাছে কেবলমাত্র উৎকলের মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি দেখলেই যে বহু-রকম চমৎকার নাচের ভঙ্গী পাওয়া যায়, তা আর বলবার নয়। দেশের দিকে আমাদের প্রকৃত দরদ থাকলে রঙ্গালয়ের নাচেও এত দিনে আমরা দেশীয় ভাব-ভঙ্গীর প্রভাব দেখতে পেতুম। ভারতীয় নাচের সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্ত স্পর্শ করেনি, কিন্তু সুদূর বিলাত থেকে বিদেশীরা এদেশে এসে ভারতীয় নৃত্য-ভঙ্গী শিখে স্বদেশে গিয়ে বাহবা পেয়েছেন। চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতকলায় রবীন্দ্রনাথ একটা নূতন ভাবের আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছেন। নাচও একটা উঁচু-দরের আর্ট, কিন্তু এদিকে এখনো কোন শক্তিমানের সাড়া পাচ্ছি না কেন?" প্রভৃতি।

এর পর আমাদের উক্ত আলোচনার জের টেনে নিয়ে গিয়ে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "নাচের শুদ্ধি" নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "নাচঘরে'র প্রথম সংখ্যায় "নৃত্যকলায় নূতন প্রস্তাব" প্রসঙ্গে আমাদের দেশের পুরোনো নাচের সঞ্জীবন বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে কলানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই একমত হবেন। ভারতীয় নৃত্যকলার যাতে পুনরুজ্জীবন হয়, এ-সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করছেন, 'নাচঘরে'র পরিচালকেরা দেখছি তাঁদের মধ্যে আছেন! এঁরা সকলেই শিক্ষিত লোক, রসজ্ঞ, আর্টিষ্ট। এঁরা অবনীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষীদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাবেন?" প্রভৃতি।

দেখা যাচ্ছে, বাইশ বৎসর আগেও বাংলাদেশে কেউ কেউ নৃত্যকলাচর্চ্চার স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখতে চাননি।

সেই সময়েই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মনোমোহন নাট্যমন্দিরে "সীতা" পালা খোলবার আয়োজন করলেন। সে সুযোগ আমরা ত্যাগ করলুম না। এদেশে একটিমাত্র ভদ্রমহিলাও তখন পর্য্যন্ত করেননি নাচবার চেষ্টা। কাজেই নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে আমরা বাধ্য হয়ে রঙ্গালয়েরই সাহায্য গ্রহণ করলুম। স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি "সীতা" নাট্যাভিনয়ের নৃত্য-পরিকল্পনার ভার পেয়ে বিপুল উৎসাহে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলুম। তখন শিশির-সম্প্রদায়ের নৃত্যাচার্য্য ছিলেন রঙ্গালয়ের বিখ্যাত নর্ত্তক স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, কিন্তু নিজের উদারতা-গুণে তিনি আমাদের কাজে কোন বাধা দিলেন না। "মঞ্জুল ওই নব সাজে" গানটির সঙ্গে আমরা যে নৃত্য-পরিকল্পনা করলুম, তার মধ্যে এদেশী থিয়েটারি নাচের মামুলি রীতি ছেড়ে অবলম্বন করেছিলুম সম্পূর্ণ একটি নূতন ধারা। প্রাচীন চিত্র ও ভারতীয় ভাস্কর্য্য থেকেও আমরা একাধিক নৃত্যভঙ্গী গ্রহণ করেছিলুম।

"সীতা" খোলবার পর রঙ্গালয়ের দর্শকরা যে বিশেষ ভাবে তার

নৃত্যকে অভিনন্দিত করেছিলেন, একথা আজ আর নূতন ক'রে বলবার দরকার নেই। এমন কি, স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও "সীতা"র অভিনয় দেখবার পর বিস্মিত হয়ে লিখেছিলেন: "নৃত্য দর্শনের সময় [illegible]

কপোতহস্তিকা, দ্বিপদিকা প্রভৃতি ভরত-নাট্য-সূত্রের নৃত্যাদি সমূহ ইহারা অভ্যাস করাইলেন?"

"সীতা" পালার মধ্যেই আধুনিক বাংলা নাচে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ গ্রহণ করা হয়।

এর কিছু কাল পরেই দেখলুম, বাংলা নৃত্যকলার দিকেও আকৃষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। তাঁর একাধিক নাট্যাভিনয়ে শান্তিনিকেতনের একাধিক ছাত্রী নৃত্য-নিপুণতা দেখিয়ে জনসাধারণের প্রশস্তি লাভ করেন। ক্রমে শান্তিনিকেতনেও নিয়মিত ভাবে নৃত্যশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। নাচের আসরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব দেখে দেশের অনেক অভিভাবক হলেন কুসংস্কার থেকে মুক্ত। নিজেদের মেয়েদের নাচ শেখাতে তাঁরাও আর আপত্তি করলেন না। এবং তার ফলে দেখা গেল, কলকাতার এখানে-ওখানেও কয়েকটি ভদ্রঘরের তরুণী প্রকাশ্য নৃত্যসভায় এসে দেখা দিচ্ছেন।

দেশের ভদ্র মেয়েদের ভিতরে ধীরে ধীরে নাচের চর্চ্চা বাড়তে লাগল বটে, কিন্তু আমাদের মন তবু বিশেষ সন্তোষ লাভ করতে পারলে না। কারণ, প্রথম: বাংলার তরুণীরা তখন যে-শ্রেণীর নাচ নাচতেন তার মধ্যে খাঁটি ভারতীয় ভাবের ছাপ থাকত অত্যন্ত অল্প! তাঁরা নাচতেন, এইমাত্র! দ্বিতীয়: নাচ বলতে কেবল লাস্য—অর্থাৎ মেয়েদের নাচই বোঝায় না। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের প্রধান দুটি বিভাগ হচ্ছে 'লাস্য' এবং 'তাণ্ডব'—অর্থাৎ পুরুষালি নাচ। নব্য-বাংলার মহিলারা এসে নাচের আসর আলো করেছেন, এটা হচ্ছে খুবই আশার কথা। কিন্তু নব্য-বাংলার তরুণরা কোথায়? নৃত্যকলার মধ্যে নব-জাগরণ আনতে হ'লে যে পুরুষ ও নারী দুজনকেই দরকার!

এমনি সময়ে একদিন স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র ঘোষ (তখনো তিনি নৃত্য-পরিবেবকরূপে সুপরিচিত হননি) আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন একটি অপরিচিত যুবককে সঙ্গে ক'রে। হরেন বললেন, "দাদা, এঁর নাম হচ্ছে উদয়শঙ্কর। ইনি য়ুরোপে আনা পাবলোভার সঙ্গে ভারতীয় নাচ নেচে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। ইনি কলকাতাতেও নাচতে চান। কিন্তু এদেশে ইনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, কেমন ক'রে এঁকে সকলের সামনে আসরে নামানো যায় বলতে পারেন?" যুবকটির দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলুম। একেবারে [illegible]

পৃথিবী-বিখ্যাত অমর নর্ত্তকী আনা পাবলোভা যাঁকে নৃত্যসঙ্গিরূপে নির্ব্বাচিত করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি নিম্নশ্রেণীর শিল্পী নন্। কারণ, য়ুরোপ-আমেরিকার পেশাদার নৃত্য-সম্প্রদায়ে নিম্ন-শ্রেণীর শিল্পীর ঠাঁই হয় না একেবারেই।

কিন্তু মনে একটা সন্দেহ জাগল এবং হরেনও সেই সন্দেহ নিয়েই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন।

সন্দেহটা হচ্ছে এই। নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এদেশী লোকের মন এখনো অপ্রস্তুত। এদেশী দর্শকরা কৌতূহলী হয়ে টিকিট কিনে মাঝে মাঝে ভদ্র তরুণীর নাচ দেখতে যায়, কারণ মহিলাদের নৃত্য তাদের মনে জাগায় পরম বিস্ময়। কিন্তু তারা টিকিট কিনে কোন পুরুষের নাচ দেখবে কি?

মনে পড়ল হঠাৎ সুনীতি বাবুর উপরে উদ্ধৃত উক্তি—"এঁরা অবনীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষীদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাবেন।"

হরেনকে সেই কথাই বললুম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হচ্ছে সকল শ্রেণীর আধুনিক শিল্পীর পক্ষে তীর্থক্ষেত্র। অবনীন্দ্রনাথ যদি সাহায্য করেন, তাহ'লে উদয়শঙ্করের আবির্ভাব নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।

তাই হ'ল। উদয়শঙ্করকে নিয়ে হরেন গেলেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে। এবং পরমরসিক অবনীন্দ্রনাথ তখনি যে পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন, তাই হ'ল এদেশে উদয়শঙ্করের জয়যাত্রার রাজপথ!

দেশের এবং দশের মধ্যে যাঁরা উচ্চ-শ্রেণীর রসিক ব'লে সুপরিচিত তাঁদের এবং বহু উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে গেল হরেনের সাদর আমন্ত্রণ, উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্যে। নাচের আসর বসল 'প্রাচ্য-চিত্রকলা-সংসদে'র সুবিস্তৃত হল ঘরে। নাচের আসর রাখলেন একা উদয়শঙ্করই, কারণ তাঁর সঙ্গে পরে আরো যাঁরা নেচেছিলেন সেদিন তাঁদের সবাই ছিলেন কলকাতা বা বাংলাদেশের বাইরে। এমন কি, নাচের সময় কোন-রকম সঙ্গত ছিল না বললেই চলে। কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায়ের কলাকুশলা কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবী কেবল একটি পিয়ানো বাজিয়ে সঙ্গতের নাম রক্ষা করেছিলেন।

একে তখনো পর্য্যন্ত নৃত্যশীল উদয়শঙ্করকে দেখিনি ব'লে মনে একটা সন্দেহ ছিল যে, হয়তো আমরা যতটা আশা নিয়ে সেখানে গিয়েছি ততটা সফল হবে না। তার উপরে আশঙ্কা হ'ল এত রকম অসুবিধার মধ্যে আজকের নাচ হয় তো কিছুতেই জমবে না!

কিন্তু নাচ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী দেখলুম! নাচ হচ্ছে প্রধানত চোখের জিনিস—কালি-কলমের সাহায্যে তার কি বর্ণনা দেব? উদয়শঙ্কর নাচলেন ভারতীয় নাচ—এবং তাঁর নৃত্যের ভিতরে জীবন্ত হয়ে উঠল স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে ক্ষোদিত ইলোরা-অজন্তার সেই সব শিলাময় মূর্ত্তি,···ধরার ধূলায় যাদের চরণ বর্ত্তমান যুগে সচল হবে ব'লে কেউ কোন দিন সন্দেহ করতে পারেনি।

"গন্ধর্ব্ব নৃত্য", "ইন্দ্রের নৃত্য", "নটরাজের নৃত্য"—এ-সবই হচ্ছে 'ক্লাসিকাল' নাচ। এবং এর প্রত্যেকটি দেখেই আমাদের বারংবার মনে হচ্ছিল, প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা কোন দিনই অস্বাভাবিকতার উপাসনা করেননি। অধিকাংশ অর্ব্বাচীনই বলে, [illegible]

…োদন করেছেন, তা আদপেই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু নৃত্য-নিযুক্ত উদয়শঙ্করকে দেখলে সকলেই পূর্ব্ব-বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হবেন। তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতীয় শিল্পীরা যে-সব দেহ সৃষ্টি করেছেন, জীবন্ত মানুষের দেহেই তাদের অবিকল প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুট করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

স্বর্গীয় কাল্কা-বৃন্দা ভ্রাতৃযুগলের প্রতিভা যে উদয়শঙ্করের চেয়ে উন্নত ছিল, এ-সত্য যিনি অস্বীকার করতে পারবেন না তাঁকেও মুক্তকণ্ঠে মানতে হবে যে, ভারতীয় নৃত্যকলাকে পুনরুজ্জীবিত করবার মতন প্রতিভা, আধুনিকতা ও 'কালচার' অমন দু'জন মানুষের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে আশা হয়েছিল উদয়শঙ্করের নাচ দেখে।

য়ুরোপে 'ক্লাসিকাল' নাচের তার পর-নাই অধঃপতন হয়েছিল। তারপর ডান্‌কান্ ভ্রাতা ও ভগিনী আত্মপ্রকাশ করলেন। পুরাতন গ্রীক ভাস্করের গড়া মূর্ত্তিগুলি দেখে 'ক্লাসিকাল' নাচের ভিতরে নবজীবন এনে আজ তাঁরা অমর হয়ে আছেন।

ভারতীয় নৃত্যকলাকে যথাস্থানে স্থাপন ক'রে উদয়শঙ্করও এদেশে অমর হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্করের গড়া অনেক বিখ্যাত মূর্ত্তির ভঙ্গী তিনি অবিকল ভাবে নিজের নাচের ভিতরে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর অধিকাংশ নৃত্যই ভারতের প্রাচীন শিল্পীদের স্বপ্নকে আধুনিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিপুণ কৌশলে জাগ্রত ক'রে তুলেছে।

গোড়াতেই তাঁর technique and rhythm of the body-movements দেখিয়ে উদয়শঙ্কর সকলকে অবাক্ ক'রে দিয়েছিলেন। ভালো নাচতে হ'লে দেহ ও মাংসপেশীর উপরে নর্ত্তকের কতখানি প্রভুত্ব থাকা দরকার, উদয়শঙ্কর সেদিন তা দেখিয়েছিলেন সকলের চোখে আঙুল দিয়ে। বিশেষ ক'রে তাঁর আঙুলের, বাহুর, গ্রীবার ও কটিদেশের নমনীয়তা বিস্ময়কর—না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ইচ্ছা করলেই দেহের বিশেষ কোন স্থানের মাংসপেশীর ভিতর দিয়ে তিনি যেন ছন্দের স্রোত প্রবাহিত করতে পারেন, অত্যন্ত অবহেলায়।

আর তাঁর দেহ! এ-দেহ যে আদর্শ-নর্ত্তকের দেহ! কোথাও মাংসপেশীর দৃষ্টিকটু প্রভাব বা অভাব নেই—মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ভাস্কর নয়, পৌরাণিক যুগের গ্রীক ভাস্করদের গড়া কোন কোন মূর্ত্তির সঙ্গে আমরা অনায়াসেই উদয়শঙ্করের ঐ হাল্কা ছিপ্‌ছিপে অথচ ঋজু, বলিষ্ঠ দেহের তুলনা করতে পারি। বাংলা নৃত্যকলার মধ্যে নব-জাগরণ আনবার জন্যেই স্রষ্টা যেন বিশেষ ভাবে গঠন করেছিলেন এই দেহখানিকে!

—সিমকী—

সুঠাম দেহের হিন্দোল, যৌবনের উৎস, লাবণ্যের উচ্ছ্বাস! মানুষ নৃত্য ও নর্ত্তককে আলাদা ক'রে দেখতে পারে না—অন্যান্য আর্টের ক্ষেত্রে যা সম্ভব। বৃদ্ধ কবি ও পটুয়ার কাব্য ও চিত্র যুবক-যুবতীরও উপভোগ্য। নাচের আসরেও এটা সম্ভবপর হ'লে মানুষ বৃদ্ধ নট-নটীরও নাচ সহ্য করতে পারত। কিন্তু নাচের আসরে আমরা নৃত্য ও নর্ত্তককে এক ক'রে দেখি ব'লেই নাচিয়ের সুঠাম দেহ ও তরুণ যৌবনের লাবণ্য খুঁজি। কবি Yeats বলছেন:

"O body swayed to music, O brightening glance,
How can we know the dance from the dance ?"

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উদয়শঙ্কর করলেন জনসাধারণের হৃদয় জয়! সেদিন তিনি ছিলেন একাকী, তাঁর এমন কোন সহ-নর্ত্তকী ছিলেন না যিনি চটুল লাস্যলীলার ভক্ত সাধারণ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এমন কি নারী-ভূমিকায়ও নৃত্যাবতরণ করতে হয়েছিল স্বয়ং উদয়শঙ্করকেই! তবু বৃহৎ আসরে জনতার অভাব হ'ল না। এবং তাথেকেই বোঝা গেল যে, বাঙালী অরসিক নয় এবং উচ্চশ্রেণীর ললিতকলার নিদর্শন দেখবার সুযোগ পেলে বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকরাই যৌন আবেদন প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামায় না।

তারপর থেকে বারে বারে নৃত্যকলার ক্ষেত্রে উদয়শঙ্করের বিচিত্র প্রতিভার কতরকম প্রকাশই দেখলুম! বর্ত্তমান যুগোপযোগী সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি এমন সব অপূর্ব্ব নৃত্য-পরিকল্পনা করেছেন যেগুলি আধুনিক হ'লেও প্রকাশ করে ভারতের চিরন্তন আত্মাকেই। তাঁর শেষের দিকে পরিকল্পিত কোন কোন নৃত্যনাট্য দেখলে মনে হয় তাদের উপরে পড়েছে রুস-নৃত্যনাট্যের প্রভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভারতীয় ধর্ম্ম হারিয়ে ফেলেনি।

আর আর্টের ক্ষেত্রে এমন আদান-প্রদানও দোষণীয় নয়। বিলাতী চিত্রকর হুইস্‌লারের উপরে ছিল জাপানী ছবির প্রভাব। কিন্তু তাঁর চিত্রমালা বিলাতী আর্টের নমুনা ব'লেই গৃহীত হয়। সন্ধান করলে দেখা যাবে, প্রতীচ্যের একাধিক ভাস্করের মূর্ত্তির মধ্যে আছে ভারতীয় এবং নানা দেশী ভাস্কর্য্যের প্রভাব, কিন্তু তবু সেগুলি প্রাচ্য বা অন্যদেশীয় কলার নিদর্শনরূপে গণ্য হয়নি। যদি আদর্শ, জাতীয়তা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে, তবে এমন আদান-প্রদানে কোন আর্টই স্বধর্ম্মচ্যুত হয় না।

উদয়শঙ্কর যে কেবলমাত্র নিপুণ নর্ত্তক নন, তিনি যে একাধারে কবি, চিন্তাশীল ও জাতীয় ভাবের ভাবুক, সেটা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করে তাঁর অনেক নাচের পরিকল্পনা।

Lamartine বলেছেন যে "dance is mute poetry"; আমি আরো এগিয়ে যেতে চাই। আমার মতে কেবল নৃত্য কেন, যার মধ্যে ছন্দ আছে তার মধ্যেই কাব্যের সাড়া পাওয়া যায়। কাব্য মাত্রই ছন্দপ্রধান, তাই ভালো গদ্য সর্ব্বদাই কাব্যকে বা সঙ্গীতকে প্রকাশ করে। Pater বলেছেন "All art constantly aspires towards the condition of music." উদয়শঙ্করের নৃত্যে গতি ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে আমি কবিতারও চেয়ে যা সূক্ষ্ম, সেই মৌন সঙ্গীতের অশরীরী সৌন্দর্য্য দেখেছি। সর্ব্বত্রই তিনি সঙ্গীতময়। সঙ্গীত আমরা কাণে শুনতেই অভ্যস্ত; কিন্তু সঙ্গীতও যে দ্রষ্টব্য হ'তে পারে, উদয়শঙ্করের নাচ দেখলে তা উপলব্ধি করা যায়। এবং দেহের ও হস্ত-পদের ভঙ্গী দিয়ে তিনি ছবি আঁকতে পারেন শূন্য-পটেও! অর্থাৎ তাঁর নাচে একসঙ্গে কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্র—এই তিনটি বড় আর্টের মিলন দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলার যা প্রধান বিশেষত্ব!

কবির ধর্ম্ম রূপের সাধনা। পঙ্কে পদ্ম ফুটলেও তাঁর মন শ্লোক

রচনা করে, তখন পদ্মের মূলে পঙ্কের দিকে তাঁর চোখ যায় না। অথবা পঙ্ককে তিনি ধন্যবাদ দেন, কারণ অসুন্দর হয়েও সে সৃষ্টি করতে পেরেছে সুন্দরকে। এইখানে নীতিবিদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। কারণ, নীতিবিদের মনকে পঙ্ক এমন পঙ্কিল ক'রে দেয় যে, নয়নাভিরাম পঙ্কজিনীও হয়ে উঠতে পারে তাঁর চোখের বালি! তখন আর সকলকেও তিনি "পঙ্কপ্রক্ষালন ন্যায়" সম্বন্ধে "অবয়ব" গ্রন্থে গদাধরের টীকা পড়তে হুকুম দেন। কিন্তু গণ্ডীর বাইরে সংস্কৃতি ও ললিত-কলার বৃহত্তর জগতে এসে তাঁর যুক্তি মানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

"The dance is life, animal life, having its own way passionately!" (Arthur Symons) যে স্বাভাবিক উন্মাদনাকে মানুষ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ক'রে তুলেছে, নাচের জন্ম তার মধ্যেই। যারা instinct বা সহজাত বুদ্ধিকে মানে না, তারা একে পাপ বা মন্দ বলবেই। আমাদের নাচের আনন্দ জাগ্রত করে ঐ সহজাত বুদ্ধিই। এর মধ্যে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে এবং নাচ যা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার'বার দেখায় তা হচ্ছে প্রেমের অনন্ত 'প্যাণ্টোমাইম' বা 'মূক নাট্য'। নৃত্য হচ্ছে মানবতা, যৌবন, সৌন্দর্য্য!

বাঙালীর সহজাত বুদ্ধি যে কুসংস্কার-মুক্ত হয়ে নৃত্যকলাকে আবার সাদরে গ্রহণ করতে চাইছে, এর মূলের প্রথমেই দেখি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বদর্শী প্রতিভা। এদেশে আর কেউ নৃত্য-মঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই তাঁকে সকলের কাছে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হ'ত। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান নায়ক ছিলেন না, সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন ধর্ম্ম-সমাজের পূজনীয় নেতাও। তিনি নিজেও সম্ভ্রান্তবংশ-জাত এবং শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের উপরে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। কাজেই তিনি যখন নিজেই অন্তঃপুর থেকে নৃত্যমঞ্চে আসবার জন্য একটি সোজা পথ ক'রে দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না, তখন

নৃত্যকলার বিরুদ্ধে আপত্তি করবার আর কোন উপায় খুঁজে পেলেন না আরো অনেকেই। তাঁদের কাছে নিজেদের বুদ্ধির বা যুক্তির আদেশ নয়, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধই ছিল অমোঘ গুরুবাক্যের মতন পালনীয়।

কিন্তু যত দিন উদয়শঙ্করের আবির্ভাব হয়নি, তত দিন রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। কয়েকটি রবি-ভক্ত বিশেষ পরিবারের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল বাংলাদেশের অপরিপুষ্ট ও শিশু নৃত্যকলা। এবং নাচের নূপুর পরতেন অঙ্গুলী-অগ্রে গণনীয় মাত্র কয়েক জন তরুণী! নৃত্য যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সম্পত্তি, নব্য-বাংলার শিক্ষিত সমাজ তখনো এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি। সুতরাং বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল কেবল আংশিক ভাবেই।

কিন্তু গুণসুন্দর উদয়শঙ্কর তাঁর রূপসুন্দর দেহের কাব্যসুন্দর ছন্দের হিন্দোলায় দুলিয়ে দিলেন নিখিল বঙ্গের প্রাণ-মনকে। এবং তারপর তিনি নিজের পাশে ডেকে আনলেন শ্রীমতী সিমকি ও নিজের ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী কনকলতা-প্রমুখ অন্যান্য মহিলাদেরও। বাঙালীর মন সচমকে জাগ্রত হয়ে উঠল! চোখের সামনে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখে সকলে বুঝলে যে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে পুরুষের স্থান কোথায়! উপরন্তু এ কথা বুঝতেও কারুর বাকি রইল না যে, নৃত্যমঞ্চের উপরে নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলন হ'লে নাচের সৌন্দর্য্য হয় কতখানি অসাধারণ!

সে তো বেশীদিনের কথা নয়! একটা বিষয় আমাদের সকলেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন! উদয়শঙ্করের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার চারিদিকেই জেগে উঠেছিল নাচের রেওয়াজ। ঘরে ঘরে বাঙালীর মেয়েরা—এবং তাঁদের সঙ্গে ছেলেরাও—নিয়মিত ভাবে আরম্ভ ক'রে দিলেন নৃত্যসাধনা। এবং এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানে অনুষ্ঠান হ'তে লাগল নৃত্য-প্রতিযোগিতার। নৃত্য-ভাগীরথীতে এল যেন বিপুল বন্যা।

"অল-বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে" কয়েক বৎসর আমি নৃত্য-বিচারকরূপে নির্ব্বাচিত হয়েছিলুম। সেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল একটা বিষয়ের দিকে। নাচ দেখেছি যে অগুন্তি ছেলে-মেয়ের, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের উপরেই শান্তিনিকেতনের নৃত্যপদ্ধতির কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। উদয়শঙ্কর নৃত্য করেন যে পদ্ধতিতে, তাঁরা অনুকরণই করেছিলেন তারই অপটু অনুকরণের চেষ্টা। এবং আজও যাঁরা প্রায়ই প্রকাশ্য নৃত্যমঞ্চের উপরে দেখা দেন, তাঁদের পরিবেশনের ভিতর থেকে উদয়শঙ্করের বিষয়বস্তু, ভাব ও ভঙ্গী আবিষ্কার করা একটুও কঠিন হবে না ব'লেই মনে করি।

আসল কথা হচ্ছে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ নাচের জন্যে যে পথ কেটে দিয়েছিলেন, সেই পথ আজ জনতায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছে উদয়শঙ্করের অতুলনীয় নৃত্যপ্রতিভা! পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা গিয়েছে, যে-কোন দেশে যে-কোন কার্য্যক্ষেত্রের জন্যে যদি মানুষ ও কর্ম্মীর অভাব হয়, তখন কোথা থেকে এসে দেখা দেন ঠিক যাঁকে দরকার সেই মানুষটিই। বাংলাদেশে যখন আধুনিক নৃত্যের কোন চর্চ্চাই ছিল না, তখন কে জানত যে সাগর-পারের সুদূর শ্বেতদ্বীপে বসে বাংলার একটি অজানা সন্তান ভারতীয় নৃত্যজগতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুলছেন!

দেশে এখন প্রকাশ্য নৃত্যাভিনয় হচ্ছে, ধরতে গেলে বারো মাসই। নাচ দেখিয়ে অল্পবিস্তর নাম কিনেছেন এমন বাঙালীর ছেলের সংখ্যা অল্প নয়। উপরন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে উদয়শঙ্করের অসামান্য জনপ্রিয়তা দেখে বাংলার বাইরে ভারতের নানা প্রদেশে বহু নৃত্যশিল্পীও বিশেষরূপে প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের কেউ কেউ কালাপানির এপারে-ওপারেও যাতায়াত সুরু ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের সকলেরই নাচ দেখবার সুযোগ আমি ত্যাগ করিনি। কিন্তু যে বিচিত্র নিপুণতা, কলাকৌশল, অঙ্গহার, ছন্দ-সুষমা, দেহশ্রী, যুগোপযোগী ভাব, সামঞ্জস্য, বিশিষ্ট পরিকল্পনা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যে উদয়শঙ্কর আজ জনগণমন-অধিনায়ক হ'তে পেরেছেন, তাঁদের কারুর মধ্যেই আমরা একাধারে অতগুলি অপূর্ব্বতার সমাহার আবিষ্কার করতে পারিনি।

উদয়শঙ্কর পৃথিবীর দেশে দেশে জয়তিলক প'রে ফিরে এসেছেন, আমাদের কাছে এইটেই বড় কথা নয়। আমাদের পক্ষে এইটেই হচ্ছে বলবার কথা যে, বাংলার নৃত্যকলায় যথার্থ 'রেনেসাঁস্' বা নবজন্ম এনেছেন উদয়শঙ্কর ছাড়া আর কেউ নন। তাঁর আগমন না হ'লে বাংলার নৃত্যকলা আজ পর্য্যন্ত হয়তো কয়েকটি খেয়ালী তরুণীর নূপুরগুঞ্জনের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকত। নৃত্যজগতে সমগ্র দেশ ও জাতির নবজাগরণ সম্ভবপর হয়েছে প্রধানত উদয়শঙ্করের প্রতিভার প্রসাদেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে আমি ভুলিনি, কিন্তু তাঁর কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করেছেন উদয়শঙ্করই।

আধুনিক বাংলা তথা ভারতের নৃত্যপীঠে উদয়শঙ্কর হচ্ছেন অদ্বিতীয় যুগাবতারের মত। তিনি অতুলনীয়, তিনি অননুকরণীয়, তিনি অমৃতায়মান! তিনি কেবল নিজে নাচেননি, নৃত্যবেদের মন্ত্র পাঠ ক'রে জাগ্রত করেছেন সমগ্র জাতিকেও!

★

অনির্ব্বাণ

জীবনানন্দ দাশ

সর্ব্বদাই এ রকম নয়, তবু
মাঝে মাঝে মনে হয় কোনো দূর
উত্তর-সাগরে কোনো ঢেউ
নেই;
তুমি আর আমি ছাড়া কেউ
সেখানে ঢোকার পথ হারায়ে ফেলেছে।

নেই
নীলকণ্ঠ পাখীদের ডানা গুঞ্জরণ
ভালোবেসে আমাদের পৃথিবীর এই রৌদ্র;
কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দেখা দেয় মিলাবার আগে
এইখানে সে আকাশ নেই;
রাতে নক্ষত্রেরা সে রকম
আলোর গুঁড়ির মত অন্ধকার অন্তহীন নয়।

তবুও আকাশ আছে:
অনেক দূরের থেকে নির্নিমেষ হয়ে
নক্ষত্র দু' এক জন চেয়ে থাকে;
চেয়ে থাকে আমাদের দিকে—
যেন টের পায়
পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা—সব কথা বলা
ডাভেন্ট্রি ডোমেই টাসে ষ্টেফানিতে
যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির
মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে;
—কোনো কথা, কোনো গা·
কাউকেই বলে নাই;
কোন গান
পাখীরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা শুদ্ধতার দেশে
তুমি আর আমি দুই বিভিন্ন রাত্রির দিক্ থেকে
যাত্রা ক'রে উত্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে
এখন মিশেছি।

এখানে বাতাস নেই—তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মত সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখী নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
হংসের আলোর কণ্ঠ র'য়ে গেছে;
কোনো রাণী নেই—তবু—হংসীর আশার কণ্ঠ
এইখানে সাগরের রৌদ্রে সারা দিন।

৬

এই জমিটিই ওয়াঙের জীবনে গভীর পরিবর্তন এনে দিল। মাটির দেয়াল খুঁড়ে টাকা বার করে হোয়াঙ-পরিবারের বড়কর্তার সঙ্গে সমান হয়ে কথা কয়ে যখন সে জমিটিকে কিনেই ফেললে, তখন মনে আনন্দের পরিবর্তে কেমন যেন একটা অবদমনের ভাব হোল। এ অবদমন আফশোষের। ঘরের দেয়ালের শূন্য ফাটলের কথা ভেবে তার মনে হোলো যে, টাকাগুলিই তার ভাল ছিল। এই জমিটির জন্য তাকে আবার পরিশ্রম করতে হ'বে। বিশেষ করে জমিটি বাড়ী থেকে এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশের মত দূরে। এটুকু কেনার স্বপ্নের মধ্যে যে গরিমা ছিল তা সে পায়নি কেনার সময়।

হোয়াঙ-প্রাসাদে ওয়াঙ যখন পৌঁছেছিল তখন দুপুর। প্রহরীকে সে চেঁচিয়ে জানায়—'তোমার বড়কর্তাকে খবর দাও যে জরুরী টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কাজে আমি এসেছি।'

প্রহরী তাকে বললে—'যত টাকাই কবুল কর এখন আমি ঘুমন্ত বাঘকে জাগাতে পারব না। তিন দিন আগে আনা নতুন উপপত্নী পীচব্লসমকে নিয়ে তিনি শুয়ে আছেন এখন। জান গেলেও তাকে এখন জাগাতে পারব না।' তার পর একটু যেন ঈর্ষা-বশেই যোগ করে দিল—'টাকার আওয়াজে তার ঘুম ভাঙবে না। মুঠির মধ্যে রূপা নিয়ে তিনি জন্মেছেন।'

অবশেষে সব কিছু ব্যবস্থা করতে হোল বড়কর্তার ঘুষখোর প্রতিনিধির সঙ্গে। ওয়াঙের মনে হোল যে, জমির চেয়ে রূপাই ভাল। রূপা ত তবু চিক্‌চিক্‌ করে চোখের উপর।

অনুবাদক
শিশির সেনগুপ্ত
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

যাই হোক, জমি সে পেল। নতুন বছরের দ্বিতীয় মাসে এক দিন বিষণ্ণ সকালে ওয়াঙ তার নতুন-কেনা জমি দেখতে গেল। তখনো কেউ জানে না যে এ-জমি ওয়াঙের। নগর-প্রাকারের পাশে ঘুরে যাওয়া ঐ কালো বিস্তৃত মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল ওয়াঙ। লম্বায় তিনশ' পা, চওড়া একশ' কুড়ি। চার কোণে হোয়াঙ-প্রাসাদের নামাংকিত চারটে পাথর জমির সীমানা নির্দেশ করছে এখনো। ও-ক'টি বদলে ফেলতে হ'বে। তাও সে এখন নয়। এখন লোককে জানানো চলবে না যে হোয়াঙ-পরিবারের জমি কেনার মত ধনী হয়ে উঠেছে সে। আরো ধনী হ'বে যখন লোকে তার দিকে সম্ভ্রমভরা চোখে চাইবে, তখন। সেই বিস্তৃত জমিটির দিকে তাকিয়ে ওয়াঙ ভাবে—'ঐ পরিবারের মানুষদের কাছে এ জমি হয়ত কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে এর কত দাম!'

এইটুকু সামান্য জমি নিয়ে মনের এই আনন্দে আবার নিজের প্রতি কেমন করুণা জাগে। নিজের এত দিনের সঞ্চয় যখন ওয়াঙ-প্রতি নিধিরা কাছে তুলে ধরেছিল, একান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেছিল সে—'যাক, এ টাকা ক'টিতে রাণীমার ক'দিনের আফিমের খরচ চলবে।

তবু হোয়াঙ-পরিবারের বিরাটত্বের সমকক্ষ হবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয়েই থাকে। মনের ভিতর রুদ্ধ আক্রোশ জমে ওঠে। মনে মনে সংকল্প করে ওয়াঙ যে এমনি করে বারে বারে নিজের বাস-ঘরের দেয়ালের ফুটো সে রূপার টাকায় ভরে তুলবে। বারে বারে হোয়াঙ-পরিবারের জমি কিনে যাবে, যত দিন না এই সামান্য জমিটুকু আর চোখেই ধরবে না তার।

এই সামান্যতম জমিই ওয়াঙের মনের সংকল্পের প্রতীক হয়ে উঠতে থাকে।

বসন্ত এল। সাথে নিয়ে এল ঝড়ো হাওয়া আর ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে অবিশ্রাম বর্ষা। শীতের আধা-আলো দিনগুলির পর এখন ওয়াঙের দিন কাটে কঠিন পরিশ্রমে। আজ-কাল বৃদ্ধ বাপই নাতিকে দেখা-শুনা করেন বাড়ীতে। স্বামি-স্ত্রী দু'জনে মিলে মাঠে কাজ করে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত অবধি একটানা। এমনি এক দিন স্ত্রীকে পুনরায় সন্তানবতী হ'তে দেখে ওয়াঙের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বেছে বেছে বৌ এই ফসল-কাটার সময়টিতেই কাজের ক্ষতি করে দিল।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্ত তার মন সহজেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—'আর সময় পেলে না পেটে ছেলে ধরবার?'

নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দেয় বৌ—"এবার কিছু ভাবনা নেই। প্রথম বারই বড় কষ্ট হয়।'

তাদের দ্বিতীয় সন্তান সম্বন্ধে আর কোন কথা হয় না। দিনে দিনে ওলান যে গর্ভভারে মন্থর হয়ে আসছে তাই দেখে ওয়াঙ। তার পর শরতে এক দিন নিড়ানি রেখে ওলান মন্থর পায়ে বাসায় গিয়ে ঢোকে। সেদিন দুপুরে খাবারের জন্য ওয়াঙ বাড়ী ফেরে না। আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘ উদ্যত হয়ে আছে। তার জমিতে পাকা ধান আঁটি বাঁধার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। কাজের বিরাম নেই। সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার

আগেই ওলান আবার ফিরে আসে মাঠে স্বামীর পাশে। ওয়াঙ চেয়ে দেখে বৌয়ের সারা শরীরে লঘুতা আর মরে যাওয়ার লক্ষণ। মুখে শুধু সেই নির্ভীক নৈঃশব্দ অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে।

ওয়াঙের বলতে ইচ্ছা হোল—'আজ ত যথেষ্ট শ্রম হয়েছে। গিয়ে শুয়ে পড়।' কিন্তু সারাদিন একা পরিশ্রম করে তার সর্বাঙ্গে বেদনা। বৌ পুত্র-সন্তান প্রসবে যে পরিমাণ শক্তিক্ষয় করেছে, ওয়াঙ তার চেয়ে কিছু কম করেনি আজ। মনের ভিতর একটা নির্দয়তা এসে স্ত্রীর প্রতি মমতার প্রকাশকে রুদ্ধ করল। কাস্তে চালাতে চালাতে সে শুধু প্রশ্ন করল—'ছেলে না মেয়ে।'

শান্ত ভাবে জবাব দিল ওলান—'এটিও খোকা।'

ছ'জনেই আবার চুপচাপ কাজ সুরু করল। ওয়াঙের মনে একটা খুশীর আমেজ এসে বাসা বেঁধেছে। বারে বারে সোজা হওয়া আর বাঁকা হওয়ার পরিশ্রমকে আর তত মর্মান্তিক মনে হয় না।

তার পর চাঁদ যখন বেগুনে মেঘের তটরেখার ধার দিয়ে আকাশে অনেক পথ অতিক্রম করে এল তখন দু'জনে বাড়ীর পথে ফিরে চলল।

বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘর্মাক্ত শরীর পরিচ্ছন্ন করে আহার-শেষে ওয়াঙ তার নব-জাত ছেলেকে দেখতে গেল। নতুন খোকার পাশে শুয়ে আছে ওলান। এ ছেলেটিও বেশ মোটা-সোটা হয়েছে। তবে প্রথমটির মত তেমন দীর্ঘাঙ্গ হয়নি। তৃপ্ত হয়ে ফিরে এল ওয়াঙ নিজের ঘরে। প্রতি বছরেই যদি একটি করে নূতন খোকা হয় কে প্রতি বার লাল ডিম কিনবে? প্রথম ছেলের বেলা ত সে করেছে। এ সংসারে সত্যই মেয়েটি লক্ষ্মীশ্রী এনেছে।

বাপের কাছে গিয়ে সে বললে—'এখন থেকে বড় নাতিটাকে নিজের কাছে নিয়ে তুমি শোবে।'

এ কথায় বৃদ্ধের আনন্দের সীমা থাকে না। বহু দিন ধরে এমনি একটা আশাই তিনি করেছিলেন। এই শিশুটির প্রতি তার অদম্য স্নেহ। তাকে বুকের কাছে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকতে কি সুখ! এত দিন ছেলেটি মা-ছাড়া শুতে পারত না বলে তার ইচ্ছাও পূর্ণ হয়নি। এখন ছেলেটি টলে টলে হাঁটতে শিখেছে। মায়ের পাশে শুয়ে থাকা, আর একটিকে দেখে সেও বুঝি বুঝতে পারে যে তার এত দিনের সিংহাসন টলেছে। দাদুর বিছানায় শুতে আর সে মাথা ঝাঁকায় না।

৭

এই সময় থেকেই ওয়াঙের কাকা নানা রকম ঝামেলা করতে সুরু করলেন। এ সম্ভবনার কথা আগেই ভেবেছিল ওয়াঙ। বাপের ছোট ভাই, সুতরাং রক্তের সম্বন্ধে তিনি এদের উপর কিছুটা আর্থিক নির্ভরতা দাবী করতে পারেন বৈ কি। যত দিন ওয়াঙ আর তার বাবা গরীব ছিল, কাকা নিজের জমিতে চাষ করে কোন প্রকারে স্ত্রী ও সাতটি সন্তানের ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতেন। একবার পেটভাত হলেই তারা সব ক'টি আবার নিষ্কর্মা হয়ে যেত। কেউ আর অন্য কিছু করত না। নিজের কুটীরের পরিচ্ছন্নতাটুকুর জন্যেও খুড়ী কখনো পরিশ্রম করতেন না। খাবার পরে ছেলেমেয়েরা মুখ অবধি ধোয় না। কাকার মেয়েদের বিয়ের বয়স হচ্ছে, তবু তারা বিশ্রী ভাবে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, পুরুষের সঙ্গে কথা কয়। দেখে ওয়াঙ লজ্জায় মরে যায়। এমনি এক দিন বিস্রস্ত কেশ-বেশ বড় বোনটিকে পথের ধারে দেখে ওয়াঙ রাগে জ্বলতে জ্বলতে কাকার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। খুড়ীকে ডেকে সে বল্লে—'রাস্তার সব পুরুষ যাকে দেখছে তাকে বিয়ে করবে কে বল ত? বড়টার বিয়ের বয়স হয়েছে আজ তিন বছর, আজও সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আজ দেখলাম একটা পথের ছোঁড়া তার কাঁধে হাত দিয়েছে আর সে দাঁত বার করে হাসছে।'

সারা শরীরের মধ্যে খুড়ীর জিহ্বার ধারটুকু আজো আছে। তিনি সেই বিষ ঢেলে বললেন—'কথা ত বেশ। তা আমার মেয়ের বিয়ের বরপণ বিয়েব খরচ আর ঘটক-বিদায়ের টাকা কে যোগাবে শুনি? তুমি ত বলবেই। তোমাদের অনেক আছে। এত জমি যে তা দিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছ না। তবু জমানো রূপার টাকা দিয়ে বড়ঘরের জমি কিনছ। তোমার কাকার বরাত খারাপ সুরু থেকেই। ওঁর কি দোষ, ভগবান্ ওঁকে কপাল খারাপ দিয়েছেন। সবই ত ভগবানের ইচ্ছা। যে মাটিতে অন্য লোক বুনলে সোনা ফলে সেখানে ওঁর ভাগ্যে পরগাছা জন্মায়।'

সেই সঙ্গে সশব্দ কান্না আর উচ্চকণ্ঠে আফশোষ সুরু হোল। খুড়ী চুলের ঝুঁটি খুলে ফেল্লেন, মুখে এসে-পড়া খোলা চুলগুলিকে আক্রোশে তচনচ করতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—'পোড়া কপাল কাকে বলে তুমি কেমন করে জানবে? অপরের জমিতে যখন ফসল ফলছে, আমার জমিতে উঠছে আগাছা। অন্য লোকের বাস্তু একশ' বছর পরমায়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমার বাড়ীর মাটি কেঁপে দেয়ালে ফাটল ধরছে। অপরের ঘরে ছেলে জন্মাচ্ছে, আমার পেটে ছেলে এসেও মেয়ে হয়ে পেট থেকে পড়ে। এমনি আবার পোড়া কপাল।'

খুড়ীমার চীৎকারে পড়শী মেয়েরা এসে জড়ো হয়। ওয়াঙ তবু শেষ কথা না বলে বিদায় নেয় না।

'আমার উপদেশ দেওয়া সাজে না জানি, তবু আমি বলছি যে কুমারী থাকতে থাকতেই ও-মেয়ের বিয়ে দাও। পথে বেরোবে অথচ মেয়ে তোমার ঠিক থাকবে, এ কখনো হয় না।'

কথাগুলি শেষ করে ওয়াঙ বাড়ী ফিরে আসে।

এ বছরে আরো জমি কেনবার বাসনা আছে তার। আগামী অনেক বৎসর ধরে এমনি করে নিজেদের জমিদারী গড়ে তোলবার পরিকল্পনা। তা ভিন্ন বাড়ীও কিছু সংস্কার করা প্রয়োজন। একখানা নতুন ঘর তুলতেই হবে। নিজের সুখস্বপ্নের মধ্যে এই বিশ্রী চিন্তাটা এসে বাধা দেয় যে, তাদেরই পরিবারের আর এক জন ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন কাকা মাঠে এসে ওর সঙ্গে দেখা করলেন। ওলান সে-দিন মাঠে আসেনি। দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর দশটি মাস কেটে গিয়েছে, ওলান আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছে। এবার তার শরীর খারাপ হওয়ার জন্য বেশ ক'টি দিন সে মাঠে আসছে না। পরণের জামাটির বোতামগুলি দেন না কাকা, সর্বদাই হাতের মুঠিতে ধরে থাকেন। কোন সময় বাতাসের কৌতুকে হয়ত উলঙ্গ হয়ে পড়তে পারেন। মাঠে অতি-ব্যস্ত ওয়াঙের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ কাজ করার পর চকিত হয়ে ওয়াঙ মুখ ফিরিয়ে রুক্ষতার সঙ্গে বলে—'কাজের সময় খেয়াল হয়নি কাকা, আমায় মাপ করুন।

এই ধানগুলো দু'বার তিন বার করে না বুনে দিলে ভালো ফলে না। আপনার মাঠের কাজ সারা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আমি বড় অকেজো—গরীব চাষী ত।'

ওয়াঙের বিদ্রূপ হজম করে কাকা বলেন,—'আমার কপালই খারাপ। এ বছর কুড়িটা বীজের মধ্যে মাত্র একটি মাথা তুলেছে। আর সেটুকুর জন্যে কোদাল চালাতে ইচ্ছে করে না। এ বছর ধান খেতে হলে আমাদের বাজার থেকে কিনে খেতে হবে।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

ওয়াঙ নিজের মনকে রুক্ষ করে রাখে। কাকা যে কিছু চাইতে এসেছেন এ সে বুঝতে পারে। নিবিড় যত্নের সঙ্গে ওয়াঙ মাটিতে কোদাল চালায়, কুশলী হাতে কর্ষিত জমির ছোট নরম মাটির ডেলাটুকুও গুঁড়িয়ে ফেলে। ধানের চিকণ চারাগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্যের আলোয় তাদের নরম ছায়া পড়েছে মাটিতে।

অনেকক্ষণ পরে কাকা কথা কইলেন—'বাড়ীতে বলছিল তোমার কথা। বড় মেয়েটার সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ তা পাকা। তোমার বিবেচনার তারিফ করি আমি। বিয়ের বয়েস হয়েছে মেয়েটার। পনের বছর বয়স হোল আবার কি? এত দিন বিয়ে হলে মা হতে পারত। আমার শুধু ভয় পাছে পথের কোন ছোকরার সঙ্গে কিছু ক'রে আমার সংসারের নাম ডোবায়। আমাদের পরিবারের মধ্যে এমন ঘটনাটা কি বিশ্রী ব্যাপার বল ত?'

ওয়াঙের হাতের কোদাল আবার মৃত্তিকা স্পর্শ করে। তার ইচ্ছা হচ্ছিল বলে—'তাই যদি, তবে মেয়েকে শাসন করেন না কেন? বাড়ীতে রেখে তাকেও সাংসারিক কাজ শেখান।'

তবু এ ধরণের কথা ত জ্যেষ্ঠদের কাছে বলা চলে না। বাধ্য হয়ে ওয়াঙ চুপ করে থাকে।

কাকা আবার বল্লেন—'আমার যদি কপাল ভালো হোত, যদি তোমার মায়ের মত তোমার খুড়ী ছেলে বিইয়েও সংসারের কাজ করতে পারতেন তাহলে আমিও তোমাদের মত ধনী হতে পারতুম। তা ত নয়, তোমার খুড়ী শুধু মোটা হচ্ছেন আর মেয়ে বিয়োচ্ছেন। আমার যদি টাকা হোত সে টাকা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আমি দ্বিধা করতুম না। তোমার মেয়েদের ভালো ঘর-বরে বিয়ে দিয়ে দিতুম, তোমার ছেলেদের মজুতদারের দোকানে কাজ শেখবার জন্যে খরচ-পত্তর করতুম। তোমাদের জন্যে আমি সব করতে পারতুম। আর করব নাই বা কেন, ভায়ের সঙ্গে ভায়ের সম্বন্ধ যে।'

ওয়াঙ ছোট করে জবাব দেয়—'আপনি জানেন আমরা বড়লোক নই। আমার ঘরে পাঁচটি খাবার লোক, বাবা বুড়ো হয়েছেন, খাটেন না কিন্তু খানও। তা ভিন্ন আবার একটি প্রাণী এতক্ষণ বোধ হয় এসে পড়েছে।'

কাকা ক্ষান্ত হন না—'তুমি দিব্যি পয়সা করেছ আমি জানি। কত বেশী দাম দিয়ে তুমি অত বড়-ঘরের জমি কিনেছ। এ গাঁয়ে আর কোন্ লোকটা ও-রকম জমি কিনতে পারত, বল না?'

এ কথায় ওয়াঙের রাগে গা জ্বলতে থাকে। কোদালটা ছুড়ে ফেলে সে কাকাকে বলে—'আমায় হাতে কয়েকটা টাকা জমেছে, কেন না আমি আর আমার বৌ সারাদিন জান দিয়ে খাটি। লোকের মত জুয়ার আড্ডায় দিন কাটাই না কিংবা ঘরের দরজায় বেকার বসে গল্প ঠুকি না। আমার মাঠে আগাছা জন্মাতে পারে না, আমরা ছেলেমেয়েদের আধ-পেটা করে ছাড়তে পারি না।'

কাকার হলুদবরণ মুখে রক্ত ঝলকে আসে। ভাইপোর দিকে ছুটে এসে তিনি তার গালে এক চড় লাগিয়ে বলেন—'বাপের ভাইকে এমনি ধারা বলিস্? তোর কি সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ধর্ম্ম-জ্ঞানটুকুও খেয়ে বসেছিস্! বয়ঃজ্যেষ্ঠের কাছে মানুষ কখনো উঁচু কথা কবে না, এ কি জানিস্ না।'

নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ওয়াঙ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের কাকার প্রতি একটা রাগ তার মনের ভিতর গুমরে ওঠে।

'তোর কথা আমি সারা গাঁয়ে বলে বেড়াব।' তিনি ভাঙা গলায় চেঁচাতে থাকেন, 'কাল আমার বাড়ী বয়ে পাড়া মাতিয়ে বলে এসেছিস্ যে আমার মেয়ে কুমারী নয়। বাপের অবর্ত্তমানে যে তোর বাপের মত হবে আজ তাকে তুই অপমান করলি। আমার মেয়েরা না থাক কুমারী, তোর মুখ থেকে আমি তা শুনতে চাই না। সকলকে আমি এ কথা বলব।' বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন কাকা—'বলে বেড়াব সারা গাঁ-ময়—ঠিক বলব।'

ওয়াঙ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হোল—'তা আমি কি করব?'

সারা গাঁয়ে এ কথা চালু হবে এ চিন্তায় ওয়াঙের দম্ভ কমা নামায়। নিজেদের ঘরোয়া কথাই ত এ সব।

কাকার রাগ জল হয়ে গেল। ওয়াঙের কাঁধে হাত রেখে হেসে তিনি বললেন—'তোমায় চিনি না আমি। তোমায় ভালই চিনি। তুমি যে ছোকরা ভাল। তা এই বুড়োর হাতে একটা রূপোর টুকরো তুলে দাও, বড় মেয়েটার জন্যে একটা ঘটকের কাছে ব্যবস্থা করি গিয়ে। বিয়ের বয়স হোল ত। তোমার কথাই ঠিক, বিয়ের বয়স হোল বৈ কি। ছোট্ট একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকা আনমনা হয়ে আকাশের দিকে চাইলেন।

কোদালটা তুলে আবার মাটীতে রাখল ওয়াঙ। কাকাকে বললে—বাড়ীতে আসুন। রাজপুত্তুরদের মত আমি ত আর সোনা-রূপো নিয়ে বেড়াই না।' সারা শরীর তেতো লাগে ওয়াঙের। যে পরিশ্রমের উপার্জ্জন থেকে আগামী বৎসরে জমি কেনবার পরিকল্পনা করেছে ও, সেই মূলধন ভেঙে কিছুটা এখন দিতে হবে এই বুড়োর হাতে। সন্ধ্যার আগেই যে রূপোর চাকতিটি জুয়ার আড্ডায় হাওয়া হয়ে যাবে।

বাড়ীর উঠোনের কাছে দু'টি ছেলে উলঙ্গ হয়ে রৌদ্রে খেলা করছিল। তাদের সরিয়ে দিয়ে ওয়াঙ বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকল। কাকা ছেলে দু'টিকে কাছে নিয়ে আদর করলেন, তাদের ঘাড়ের কাছে নাক দিয়ে সেই নধর শিশুদেহের গন্ধ নিলেন প্রাণ ভরে।

দু'টিকে দু' বগলে ধরে গভীর স্নেহের সঙ্গে আদর করে বল্লেন—'দু'টি যে মস্ত হয়ে উঠেছ?'

দ্রুত পায়ে ওয়াঙ নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাইরের আলো থেকে আসার দরুণ ঘরের ভিতরটা অন্ধকার ঠেকছে। কিছুই চোখে পড়ছে না তার। হঠাৎ একটা তাজা রক্তের গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। দ্রুতকণ্ঠে সে বল্লে—'কি খবর—সময় হয়েছে না কি?'

অত্যন্ত নীচু গলায় বিছানা থেকে জবাব এল—'হয়ে গিয়েছে। এবার বলার মত নয়। একটা মেয়ে হয়েছে।'

মৃত্যুঞ্জয়

গোপাল ভৌমিক

তোমরা বীরের দল—
আত্মার ঐশ্বর্যে মহীয়ান্
করে গেছ রক্ত-রাঙা পথের ধূলিকে :
অতর্কিতে উৎসারিত পুলিশের উদ্যত গুলীকে
বুক পেতে দুর্জয় সাহসে
করে দিলে স্তব্ধ ম্রিয়মাণ
নগ্নোদ্ধত রাজশক্তি রাজপথে হল অবসান !

সে এক বিচিত্র দৃশ্য :
রাজপথে সহস্র তরুণ
নিরস্ত্র অহিংস নিরুপায়—
শুধু চায়
নিজেদের স্বাভাবিক পৌর অধিকার—
পথে পথে মিছিল করার।
বলদর্পী শাসকেরা
পরিবর্ত্তে কি দিল তাদের ?
চতুর্দিকে পুলিশের বেড়—
তার পর লাঠি আর অগ্নিবর্ষী বুলেটের ঝাঁক—
এনে দিল দুরন্ত বিপাক।

রাজপথাশ্রয়ী তবু তরুণের দল
রক্ত দিয়ে ভীত নয়
নয় তারা আদৌ দুর্বল :
তারা মৃত্যুঞ্জয়
অহিংসার নীরব সাধক—
বীর শিশু দেশ-মাতৃকার—
রক্ত দিয়ে ভেঙে দিল
উদ্ধত অস্ত্রের অহঙ্কার
তাজা রক্ত-মাখা স্বৈরাচার।

হে দুর্জয় সাহসী তরুণ,
তোমাদের জানাই প্রণাম :
অনন্ত রাত্রির শেষে হাসে নবারুণ—
তোমরা এনেছ তার গোপন সন্ধান।
বিপক্ষের হাতে লাঠি বন্দুক কামান
যতই উঁচানো থাক—
ভীত নয় সত্যাগ্রহী
অহিংসার অস্ত্রে বলবান্।
হে তরুণ তোমাদেরই জয়,
বক্ষ-রক্ত ঢেলে দিয়ে
ভেঙে দিলে জড়তার ভয়—
হলে মৃত্যুঞ্জয় !

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

খাড়া হয়ে দাঁড়াল ওয়াঙ। একটা সশরীর অমঙ্গল যেন পথে এসে দাঁড়িয়েছে! এই মেয়েই ত কাকার বাড়ীতে এত গণ্ডগোল বাধিয়েছে। শেষে তার বাড়ীতেও মেয়ে হোল।

কথার জবাব না দিয়ে ওয়াঙ আধা অন্ধকারে দেওয়ালে হাত দিয়ে অনুভব করলে। অমসৃণ জায়গা থেকে মাটির ঢেলাটা সরিয়ে সে ভিতরের গর্ত্তে হাত ভরে দিল। কয়েকটি রুপার মুদ্রা জমেছে সেখানে। গুণে গুণে ন'টি বার করে নিলে সে।

অন্ধকার থেকে বৌয়ের প্রশ্ন এল—'টাকা নিচ্ছ যে।'

'কাকাকে ধার দিতেই হবে।'

ওলানের ভারী জবাব এল—'ধার বলছ কেন? ওদের বাড়ীতে নেওয়াই আছে দেওয়ার বালাই নেই।'

'তা জানি। এ টাকা দেওয়া মানে গায়ের মাংস কেটে দেওয়া। তবু রক্তের সম্পর্ক ত।'

উঠানের ধারে কাকার হাতে সে ক'টি গুঁজে দিয়ে ওয়াঙ আবার মাঠে ফিরে এল। কোদাল নিয়ে সে কাজ শুরু করল দানবের মত। মাথার মধ্যে শুধু রুপোর চাকতিগুলোর কথা ঘুরছে। কোথায় কোন জুয়ার আড্ডায় ঐ রুপা টেবিলের উপর পড়েছে, কোন বেকার লোক সেগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছে পকেটে। এ তার সেই রুপা, যা সে সঞ্চয় করেছে কত কষ্টে নিজের মাঠ থেকে, যে রুপায় সে নিজের জমির আয়তন বাড়াতে পারত।

সন্ধ্যার মুখে ওয়াঙের রাগ পড়ল। মনে পড়ল বাড়ীর কথা, খাওয়ার কথা। সেই সঙ্গে মনে পড়ল বাড়ীতে নতুন আগন্তুকটির কথা। তার ঘরেও মেয়ে এসে জন্মাল। যে মেয়েকে পরের সংসারের জন্য মানুষ করতে হবে। কাকার উপর আক্রোশের জন্য তখন সে তার মুখও দেখেনি।

কোদালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিষণ্ণতায় ওয়াঙের মন ভরে যায়। আর একটি ফসল উঠলেই সে নতুন জমিটার সংলগ্ন ক্ষেতটুকু কিনে নিতে পারবে। গোধূলির ফ্যাকাশে আকাশে কয়েকটা কাক পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে। তাদের ডাকে মাঠের শান্তির পিঠে চাবুক পড়ছে। কাকের দল ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তারই বাড়ীর দিকে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কোদাল হাতে নিয়ে ওয়াঙ তাদের পিছনে পিছনে চলে গেল। বাড়ীতে ঢোকার মুখে আবার কাকগুলি কোথা থেকে বেরিয়ে এসে তার মাথার উপর কর্কশ চীৎকারে ঘুরতে লাগল।

ওয়াঙের মুখ দিয়ে একটা আতঙ্কের আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল। কি অমঙ্গলের নির্দ্দেশ দিচ্ছে ওরা।

[ক্রমশঃ ।

যাযাবর

ছয়

ইংরেজীতে একটা চলতি কথা আছে, দুজন ইংরেজ একত্র হলে গড়ে একটা ক্লাব, দুজন স্কচ একত্র হলে খোলে একটা ব্যাঙ্ক, দুজন জাপানী করে একটা সিক্রেট সোসাইটি। দুজন বাঙ্গালী একত্র হলে করে কী? দলাদলি? তা' করে এবং বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়ই করে। কিন্তু তা' ছাড়া আরও একটা জিনিষ করে। স্থাপন করে একটি কালীবাড়ী! উত্তর-ভারতের এমন সহর দুর্ঘট যেখানে বাঙ্গালী আছে কিছু সংখ্যক অথচ কালীবাড়ী নেই একটি।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে কালীমূর্তিটি সুখদৃশ্য নয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর সুষমা বা কমলাসনা লক্ষ্মীর শ্রী নেই তার মসীকৃষ্ণ দেহে। ভগবতী দুর্গার হাত দশটি, প্রহরণ সমপরিমাণ। কিন্তু কালী-মূর্তির কাছে তাঁকেও অনেক শান্ত ও সুকুমার মনে হয়। কণ্ঠে তাঁর নরমুণ্ডের মালা, কটিতে তাঁর ছিন্ন বাহুর গুচ্ছ, এক হাতে ধৃত মুক্ত কৃপাণ, আর হাতে দোলে খণ্ডিত শির। অতি বিস্তৃত আননের কোনখানে নেই কমনীয়তার লেশমাত্র আভাস, নয়নে নেই স্নিগ্ধ, নত দৃষ্টি। নিরাবরণ বক্ষ, নিরাভরণ দেহ, লোলায়িত রসনা। স্বদেশীয় ভক্তরা বলেন, মা ভয়ঙ্করা; ক্যাথারিন্ মেয়ো বই লিখে বলেন, বীভৎস।

এই রুদ্র ভয়াল মূর্ত্তিকে ভালোবাসে বাঙ্গালী। শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিস্রোত আনলেন তার চিহ্ন রইল একটি বিশেষ শ্রেণীতে, কালীর ভক্তরা আছেন দেশব্যাপী। শুধু শাক্তপন্থীদের মধ্যেই তাঁর পূজারীরা নিবদ্ধ নয়। তাঁর পূজা নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষকের কুটীর থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পুরাকালে কাপালিকেরা শবাসনে সাধনা করেছে দেবী কালিকার, তান্ত্রিকেরা আরাধনা করেছে শ্যামা মায়ের, দস্যুদল লুণ্ঠন মানসে নির্গত হয়েছে নৃমুণ্ডমালিনী কালীর অর্চনা করে। আধুনিক যুগেও অসুস্থ আত্মীয়ের আরোগ্য কামনায় বাঙ্গালী মেয়েরা মানত করেন মা কালীর কাছে, পল্লীতে মহামারী দেখা দিলে সরলচিত্ত অধিবাসীরা পূজা করে ভক্তি ভরে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁরই সাধনা করেছেন দক্ষিণেশ্বরে, তাঁরই ধ্যান করেছেন সাধক রামপ্রসাদ— রচনা করেছেন শ্যামা-সঙ্গীত।

বাঙ্গালীর পক্ষে এই কালীপ্রীতি আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হবে। তাঁর শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক গঠন হিসাবে সে আকৃষ্ট হবে কোমলতার প্রতি, স্নিগ্ধতার প্রতি, মাধুর্য্যের প্রতি,—এইটেই আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গালীকে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন, তার প্রকৃতিকে যাঁরা যথার্থরূপে অনুশীলন করেছেন তাঁরা জানেন এই আপাত বিরোধিতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কুসুমের মৃদুতা এবং বজ্রের কাঠিন্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার প্রকৃতিতে। তাই ভীরুতার অপবাদ যেমন তার বহু-প্রচারিত, চরম দুঃসাহসিকতার জয়তিলকও তারই ললাটে। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সংঘাত ও সংঘর্ষ আজ বহু-ব্যাপ্ত, আসমুদ্র হিমাচল তার বিস্তার ও বেগ। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব প্রদেশের সর্ব্বসাধারণ। পাঞ্জাবী এসেছে, মাদ্রাজী এসেছে, এসেছে গুজরাতী, পার্শী ও বেহারী; ভরেছে জেল, সয়েছে নির্য্যাতন। কিন্তু স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় বাঙ্গালীই সাধন করেছে অগ্নিমন্ত্রের, দিয়েছে দক্ষিণা, জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছে দেশমাতৃকার ঋণ। একমাত্র বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথায় স্কুলের ছেলে বরণ করেছে ফাঁসি, মেয়েরা ছুঁড়েছে পিস্তল, পলিতকেশ অন্তঃপুরিকা বুক এগিয়ে নিয়েছে গুলীর আঘাত?

রিডিং রোডের উপর যে কালীমন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে মিলিত উদ্যোগ ও আর্থিক প্রচেষ্টায়, তার জন্য নয়াদিল্লীর বাঙ্গালী সমাজের গর্ব্ব করার অধিকার আছে। আত্মঘাতী বুদ্ধির বশনাশা হঠকারিতায় সে কেবলই করে কলহ, ঘটায় ভেদ, ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠান—এ-অপবাদ বাঙ্গালীর। বোধ হয় একেবারে অমূলকও নয়। একক প্রচেষ্টায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব তুলনাহীন। তার মেধা, তার ঋদ্ধি, তার নৈপুণ্য সর্ব্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু বহুজনের সম্মিলিত কর্ম্ম দ্বারা একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় যথেষ্ট শক্তি দেখায়নি বাঙ্গালী—এ-কথা গভীর পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তাই এই কালীবাড়ীটি দেখে মন খুশী হয়। কোন রাজন্য ব্যক্তির অনুগ্রহে নয়, কোন বিত্তশালীর একক অর্থানুকুল্যে নয়; প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রদত্ত ও সংগৃহীত চাঁদায় গড়ে উঠেছে এই মন্দির, স্থাপিত হয়েছে বিগ্রহ। সরকারী দপ্তরখানার জীবিকাঞ্জনের তাগিদে উত্তর-ভারতের এই মহানগরীতে এসেছে বাঙ্গালী। তাদের কেউ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে আয় করেছেন প্রচুর অর্থ, কেউ বা সাধারণ কেরাণীর কাজে পেয়েছেন পরিমিত বেতন। তাঁরা সবাই দিয়েছেন দান,—স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায়। অল্প অল্প করে জমেছে অর্থ, ভরেছে দেবীর ভাণ্ডার। সাধুবাদ দিই তাঁদের। তাঁরা ধন্য।

মন্দিরটির পরিকল্পনা করেছেন যে স্থপতি তাঁর নাম জানিনে, কিন্তু প্রশংসা করি। আড়ম্বরহীন, বাহুল্য-বর্জ্জিত সহজ, সরল গঠন। বড়বাজারের গন্ধ নেই, নেই মার্কিনী ঢংএর অতি আধুনিক ষ্ট্রীমলাইন। দূর থেকে দেখে চোখ তৃপ্ত হয়, কাছে গেলে মনে শুচিতার উদ্রেক ঘটে।

গুটি-কয়েক সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠলে বিস্তৃত অলিন্দ, ঈষৎ উচ্চ জালিকাটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মন্দির, চারি দিক্ ঘিরে পথ। সে পথে দর্শনার্থীরা প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহ, দ্বারে লম্বমান ঘণ্টাধ্বনি করে মন্দিরের ধূলি নেয় মাথায়। আপন অন্তরের কামনা নিবেদন করে ভক্ত নরনারীর দল। আকাশের আলো এবং বাইরের বাতাস আসতে বাধা নেই এতটুকু। মন্দিরের অভ্যন্তরে নেই অন্ধকার, নেই পুষ্পপত্র ও গঙ্গোদকের দ্বারা আর্দ্র অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়া।

মন্দিরের প্রাঙ্গণটি সুপরিসর। এক দিকে আরাবল্লী পর্ব্বতের রীজ। পাথরের খাড়া দেওয়াল সিমেণ্ট দিয়ে জোড়া। অন্য দিকে রাস্তা এবং রেলিং। পিছনে এক কোণে পুরোহিতের বাসস্থান। ছোট একটি কোয়ার্টার, মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের তৈরী।

দূর দেশে দেবীর নিয়মিত পূজার আয়োজনে পুরোহিত সংগ্রহ খুব সহজ নয়। বাংলা থেকে কাউকে এনে রাখতে হলে চাই তাঁর জন্য নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা। তাঁর পরিজন প্রতিপালনের নিশ্চিত আশ্বাস। তাই মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষ পুরোহিতের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেছেন মাসিক মাসোহারা। তার গ্রেড আছে, ইনক্রিমেণ্ট আছে, ছুটির ব্যবস্থা আছে। আছে প্রণামী, দর্শনীর প্রাপ্য অংশ নির্দ্ধারিত। এযুগে দেব-সেবককেও চাকুরীর ফাণ্ডামেণ্ট্যাল রুলস্ মেনে চলতে হয়।

মানুষের জীবন যখন জটিল হয়নি, তখন তার অভাব ছিল সামান্য, প্রয়োজন ছিল পরিমিত। সে-দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক ছিল না বিত্তের। সে বিদ্যাদান করতো ছাত্রকে, জ্ঞানদান করতো শিষ্যকে, ভজন-পূজন করতো নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে। সে নির্লোভ, নিরাসক্ত, শুদ্ধাচারী, সাত্ত্বিক। সে-দিন বিগত, তার সঙ্গে সে ব্রাহ্মণও তিরোহিত। এ-কালে পুরোহিতেরও সংসারযাত্রার উপকরণ হয়েছে বৃদ্ধি। তার স্ত্রীর জন্য চাই সায়া, সেমিজ ও ব্লাউজ, ছেলের জন্য মেলিন্‌স্ ফুড, মেয়ের জন্য হেজ্‌লীন স্নো। ইহকালের সমাজ, সংসার ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু যজমানের পরকালীন মঙ্গল চিন্তা করলে তার নিজের পরকাল ঘনিয়ে আসে। তাই মন্দিরের পূজারীর জন্য রাখতে হয়েছে বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, তাতে বিজলী আলো আছে, কলের জল আছে, আছে ভদ্র স্বল্পবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের উপযোগী সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন।

সিঁড়ির পাশে জুতা খুলে রেখে উঠলাম মন্দিরে। অযাচিত ভাবে পুরোহিত দিলেন দেবীর পাদোদক, দিলেন নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ কণিকা। কলকাতার মতো মন্দির-প্রাঙ্গণে স্যুটপরা বাঙ্গালীর উপস্থিতি এখানকার সমাজে পরিহাসের উদ্রেক করে না। কারণ, বসনকে এখানে ব্যক্তির পরিধেয় বলেই গণ্য করে, মনোভাবের পরিচয়রূপে নয়। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু সহরে বিভিন্ন পরিচ্ছদের মানুষের অবস্থিতির ফলে। এখানে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবী সিং, মহারাষ্ট্রীয় বাঈ, বাঙ্গালী বিধবা আসে প্রণাম নিবেদনে; তাদের বেশ, ভূষা, এমন কি বস্ত্র পরিধানের রীতি-নীতি সমস্তই বিভিন্ন। তারা ভক্ত এইটেই তাদের একমাত্র পরিচয়. পরিচ্ছদটা তাদের শীত, আতপ ও নগ্নতা নিবারণের উপকরণ মাত্র।

মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে শরৎকালে ত্রিপলঢাকা মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয় মহা আড়ম্বরে। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের হাতে-গড়া কারু-শিল্পের প্রদর্শনী বসে। দিনের বেলায় বালক-বালিকারা পায় প্রসাদ, নিশাযোগে থিয়েটারে গোঁফ কামিয়ে মেয়ের পার্ট করে সখের দলের তরুণ-সম্প্রদায়।

কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় কালীকীর্ত্তন হয়। শ্যামা-বিষয়ক গান, কীর্ত্তনের পদ্ধতিতে মূল গায়েন ও দোহার মিলে গাওয়া হয়। রচনা ভক্তি-মূলক, সুর বৈচিত্র্যহীন। তাতে মহাজন পদাবলীর লালিত্য নেই, নেই সাধকের একক ভক্তি-নিবেদনের গাম্ভীর্য্য ও আবেগ। জিনিষটা সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত এবং ভক্তি-তন্ত্রে অনাবশ্যক অনুকরণ। সব দিক্ দিয়েই অসার্থক। কালীর অঙ্গনে রামপ্রসাদী সুরে ভক্তের কণ্ঠে—

শ্মশান ভালো বাসিস বলে,
শ্মশান করেছি এ হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা,
নাচবি বলে নিরবধি।

জাতীয় গানই হচ্ছে শেষ কথা।

গানের আসরে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর পরিচয় ঘটলো তাঁর নাম মোহিতকুমার সেনগুপ্ত। বয়স পঞ্চাশের ওপারে, শরীর অকুশ, দৈর্ঘ্য সাধারণ বাঙ্গালী-জনোচিত। অডিট একাউণ্টস সার্ভিসের লোক, সুদক্ষ অফিসার বলে খ্যাতি আছে সরকারী মহলে, বর্ত্তমানে যানবাহন বিভাগের আর্থিক উপদেষ্টা। বেতন এবং পদমর্য্যাদা দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙ্গালীদের সমুদয় ক্রিয়া-কর্ম্মে যোগ আছে ঘনিষ্ঠ। কীর্ত্তনের আসরে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় অবধারিত।

ফ্লীট ষ্ট্রীটে আছে খবরের কাগজ, সেভিল রোডে দরজি। নয়া-দিল্লীর রিডিং রোডেও তেমনি মন্দির। একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল ষ্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না।

শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বোধ করি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান শতাব্দীতে নির্ম্মিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবনিবাস। শুধু আকারে নয়, গঠন-পারিপাট্যে ও অর্থব্যয়ের বিপুলতায় এর জুড়ী আছে বলে জানা নেই। দূর-দূরান্ত থেকে আসে লোক শুধু ভক্ত নয়, নিছক দর্শনাভিলাষীরাও। আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক ও খৃষ্টান। আসে য়ুরোপীয় ও এমেরিক্যান টুরিষ্ট। সকালে, সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে ফটো তুলে খালি করে ক্যামেরার স্পুল।

প্রায় বারো বছর আগের কথা। পিতার স্মৃতিচিহ্নরূপে যুগল-কিশোর স্থাপন করতে চাইলেন একটি মন্দির, যেখানে হিন্দুমাত্রের থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। বিড়লাদের আদি বাস জয়পুরে, সেখানে এ-মন্দিরের সার্থকতা সীমাবদ্ধ। বছরে ক'জন লোক যায় সেখানে, ক'জন খবর রাখে সেখানকার? স্থান নির্ব্বাচিত হলো দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী। শুধু আজকের ভারতবর্ষের নয়, শত সহস্র বৎসর থেকে। এখানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেছে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব, বাস করেছে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজ। শিরিতে ছিল সম্রাট কুতুবুদ্দিন, লাল কেল্লায় রাজদণ্ড ধরেছে বাদশাহ সাজাহান। যমুনার দুই তীরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আরাবল্লীর বনভূমি, অধুনা-বিলুপ্ত জনপদের পথধূলিতে কত শক, হুণ, পাঠান, মোগল এক দেহে হয়েছে লীন। ভাবী কালের ভারতবর্ষেরও দিল্লী হবে নগরমালিকার মধ্যমণি। আর যাই হোক, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হবে না অর্দ্ধা।

রিডিং রোডের এক পাশে মন্দির, অন্য দিকে কোয়ার্টার। গভর্ণমেন্টের কেরাণী ও অনুরূপ কর্ম্মচারীদের বাসস্থান। লম্বা একটানা ব্যারাক, কোনটার ইংরেজী L অক্ষরের মতো এক প্রান্ত প্রসারিত, কোনটা বা E'র মতো আকৃতি, শুধু মাঝখানের বাড়তিটুকু বাদ। সামনে খানিকটা মাঠ। মন্দির ও কোয়ার্টার,—সুন্দর এবং কুৎসিতের এত নিকট অবস্থিতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর নয় কোনখানে। এক একটা ব্যারাকে ত্রিশ, চল্লিশটি পরিবারের বাস-ব্যবস্থা। অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের জন্য সুলভ সরকারী আয়োজন। এ-পাড়াটা নয়া-দিল্লীর ইষ্ট এণ্ড।

দেখতে ভালো না হলেও থাকতে মন্দ নয় এই কোয়ার্টারগুলি। বিশেষ করে সুলভতা বিচার করলে অভিযোগ করার উপায় থাকে না। বেতনের এক-দশমাংশ ভাড়া, মাসের শেষে আপিস থেকেই কেটে নেয় নিয়মিত। সেক্রেটারিয়েটের কেরাণীদের সর্ব্ব-নিম্ন বেতন ষাট টাকা। সুতরাং ছ'টাকা ভাড়ায় বাড়ী। দু'খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নার, একটি ভাঁড়ার। ভিতরে একটু উঠান, বাইরে ছোট বারান্দা। জলের কল আছে, বাথরুম আছে, আছে ইলেকট্রিক আলো এবং—চমকে উঠো না যেন,—আছে বড় একটি সিলিং ফ্যান। বাড়ীতে রোদ আসে, বাতাস আসে, অবশ্য ধূলিরও বাধা নেই। কলকাতা সহরে এমন ভাড়ায় এমন বাড়ী কোটিকে গুটিক মিলে না। শুধু বাড়ীই নয়। ফার্ণিচারও। বিবাহ-সভায় সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদানের মতো গভর্ণমেন্টের বাড়ীও আসবাবসহ পাওয়া যায়। সেনট্রাল পি, ডব্লিউ, ডির ফার্ণিচার। দু'টাকা মাসিক ভাড়ায় পাওয়া যায় দু'খানা তক্তপোষ, একটি আলমারী, একটি টেবিল ও তিনখানা চেয়ার।

এক একটা ব্যারাক ও তার সামনের খোলা মাঠটুকু নিয়ে এক একটা স্কোয়ার। অধিকাংশই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের নামের দ্বারা গৌরবান্বিত! ক্লাইভ স্কোয়ার হয়েছে সেই ইংরেজ সেনাপতির নামে যিনি পলাশীর আম্রকাননে ছলে, বলে ও কৌশলে বাংলার স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন বিশ্বাসহন্তাদের সহায়তায়, বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভারতবর্ষে। যিনি আশী টাকা বাৎসরিক বেতনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরাণীরূপে ভারতবর্ষে এসে দেশে ফিরেছিলেন তৎকালীন ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনশালিরূপে। ১৭৪৪ সালে মাদ্রাজে আগত খ্যাতিহীন, বিত্তহীন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ সালের ১ই জুলাই যখন সেনানায়ক ক্লাইভরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন ইংলণ্ডে, জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন পোর্টস সাউথ বন্দরে, তখন ইংলণ্ডের "এ্যানুয়েল রেজিষ্টারে" তার সম্পর্কে মন্তব্য ছিল,—"এই কর্ণেলের কাছে নগদ টাকা আছে প্রায় দুই কোটি, তার স্ত্রীর গহনার বাক্সে মণিমুক্তা আছে দুই লাখ টাকার। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডে তার চাইতে অধিকতর অর্থ নেই আর কারো কাছে।"

স্কোয়ার আছে লর্ড ডালহৌসীর নামে, যিনি একে একে পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ যোগ করলেন ভারতসাম্রাজ্যে, জোর করে দখল করলেন পেশোয়াদের সাতারা, কেড়ে নিলেন ঝাঁসি, নাগপুর, নিজামের বেরার, এবং নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র কাছ থেকে অযোধ্যা। স্কোয়ার আছে ওয়রেণ হেষ্টিংস-এর নামে, যিনি কাশীনরেশ চেৎ সিংহের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বহু লক্ষ মুদ্রা, অযোধ্যার বেগমদের পীড়ন করে অর্থ ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকার। যার কু-শাসন, কুকার্য্যের সুদীর্ঘ তালিকা বৃটিশ পার্লামেন্টের বিচারসভায় অভূতপূর্ব্ব বাগ্মিতায় প্রকাশ করেছিলেন এডমণ্ড বার্ক। সে অপকীর্ত্তির রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে পার্লামেন্ট কক্ষে দর্শকের গ্যালারীতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক ইংরেজ রমণী।

আর আছে সিপাহী-যুদ্ধের ছোট বড় ও মাঝারি ইংরেজ সেনাপতিদের নাম। হেভলক্ স্কোয়ার, আউটরাম স্কোয়ার, উইলসন স্কোয়ার, নিকলসন স্কোয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কোয়ার নেই শুধু মেজর জেনারেল হিউয়েটের নামে, যিনি ১৮৫৭ সালের ১ই মে মীরাট সেনানিবাসে ৮৫ জন ভারতীয় সিপাহীকে হাতে পায়ে লোহার শক্ত বেড়ী পরিয়ে সমস্ত সৈন্যদলের সামনে লাঞ্ছিত করেছিলেন। সে-দিন নিরুপায় ভারতীয় সিপাহীরা দাঁড়িয়ে দেখেছিল তাদের সঙ্গীদের এই অবমাননা। তাদের মুখে ছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চক্ষে ছিল আগুন। সে আগুন সামান্য নয়।

পরদিন রবিবার। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আসন্ন রজনীর ঈষৎ অন্ধকার নামলো মীরাটের ছাউনীতে। ব্রিটিশ সৈন্যরা তৈরী হয়েছে চার্চ্চ-প্যারেডের জন্য। ভারতীয় সৈন্যেরা করছে কী—বোধ হয় বিশ্রাম। এমন সময় অকস্মাৎ আওয়াজ এলো,—গুড়ুম্!

পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরছে ব্রিটিশ সেনানায়কদের ঠিক ললাটে। বন্দুকের ঘোড়া টিপছে ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর, প্রান্তর কাঁপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

উত্তর-ভারতে সিপাহী যুদ্ধের সেই হলো প্রারম্ভ।

নেতৃত্বহীন অসংঘবদ্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনাহীন পদ্ধতি, বিভিন্ন অংশে যোগাযোগশূন্যতা এবং কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশের অভাবে ব্যর্থ হলেও এ-কথা আজ স্বীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার ও স্বরাষ্ট্র গঠনের ভারতীয়দের সেই প্রথম উদ্যোগ।

মীরাটের সিপাহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পরদিন প্রভাতে এসে পৌঁছল দিল্লীতে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন দিল্লীর মসনদে। বাবরের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত্ব বা আরঙ্গজেবের রণকুশলতার লেশমাত্র ছিল না এই বৃদ্ধ মুঘল সম্রাটের চরিত্রে। সিপাহীদের শৌর্য্য, শক্তি ও যুদ্ধোপকরণ কাজে লাগাবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। জনসাধারণের সংগ্রামোন্মুখ ব্রিটিশ-বিদ্বেষকে সফল পরিণতি দান করতে পারলেন না তিনি।

দিল্লীর পরিধি সাত মাইল। অধিবাসীরা উত্তেজিত। ইংরেজের শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার রণনিপুণ সিপাহী তার পাহারা। নগর-প্রাচীরের উপরে ১১৪টি বৃহদাকার কামান। দুর্গাভ্যন্তরে বৃহত্তম বারুদখানা। তা'ছাড়া আছে আরও ৬০টি ছোট ছোট কামান! আছে বহু সুদক্ষ গোলন্দাজ;—বেশীর ভাগই দুদিন পূর্ব্বেও ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদলভুক্ত। তারা য়ুরোপীয় যুদ্ধরীতিতে সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুনিপুণ। দিল্লী দুর্গকে সুরক্ষিত করেছে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারেরা যারা আধুনিকতম এঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান লাভ করেছে ইংরেজের সেনাবাহিনীতে। দিল্লী অধিকারের ক্ষীণতম আশার কারণ ছিল না 'রীজে' সমবেত ব্রিটিশ বাহিনীর মনে। লেশমাত্র যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা ছিল না দুর্গপরাজয়ের

কিন্তু তবুও সিপাহীরা হারলো। দিল্লী দখল করলো ইংরেজ। ভারতে মুস্লিম রাজত্বের ঘটলো সমাপ্তি। শতবর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত সম্রাট সাজাহানের লাল কেল্লার শীর্ষে উত্তোলিত হলো ব্রিটিশ-পতাকা।

নগরপ্রান্তে রীজের ইংরেজ-শিবিরে সৈন্যসংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজারের সামান্য কিছু বেশী। এর সবই য়ুরোপীয় নয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছিল ভারতীয় সেপাই। আড়াই হাজার সৈন্য—বলা বাহুল্য, তারাও ভারতীয়—পাঠিয়েছিলেন ইংরেজানুরাগী দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাঁদের জন্য আজ একুশ, এগারো বা পাঁচ, সাত করে তোপধ্বনির বিধি আছে। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে ভারতীয়দের সহায়তায়, রক্ষিতও তাদেরই আনুগত্যে। আজও গান্ধীজীকে জেলে পাঠায় ভারতীয় জজ, স্বেচ্ছাসেবকদের মাথায় মুহু র্মুহু যষ্টি চালনা করে বেহারী পুলিস, দেশকর্ম্মীর পিছনে ঘোরে বাঙ্গালী টিকটিকী।

কর্ণাল থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ব্রিটিশবাহিনী এসে শিবির স্থাপন করল রীজে, যেখানে এখন দিল্লী ইউনিভার্সিটি। বর্ত্তমান সন্নী-কটেতে ঘটেছে দীর্ঘকালব্যাপী অনেক খণ্ড-যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যদের সেই অস্থায়ী আবাস-ভূমিতে পরে রচিত হয়েছে পুরাতন ভাইসরিগ্যাল লজ। সেখানে বসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা ফিজিক্স, কেমেষ্ট্রী বা ইকনমিক্সের নোট টোকে। তারই অনতিদূরবর্তী একটি ভবনে ১৯২৪ সালে তিন সপ্তাহ কাল অনশন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী—দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদকল্পে। প্রথম সর্ব্বদল মিলনের প্রচেষ্টায় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন পণ্ডিত মালবীয়জী।

ইংরেজ জানতো অনতিবিলম্বে দিল্লী অধিকার করতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে চিরতরে। তাই সর্ব্বস্ব পণ করলো তারা। জিতে তো বাদশাহ, হারে তো ফকির! ব্রিগেডিয়ার আর্কডেল উইলসন তখন ব্রিটিশ শিবিরের অধিনায়ক। তিনি জয় সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন না।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা অতীত, শরতের প্রথমার্দ্ধও বিগতপ্রায়। অর্দ্ধেকের উপর ইংরেজ সৈন্য জ্বর, উদরাময় ও অন্যান্য ব্যাধিতে রুগ্ন। পঞ্জাব থেকে সেনাপতি লরেন্স ক্রমাগত উৎকণ্ঠিত পত্র পাঠাচ্ছেন,—আর কত দিন? দিল্লী বিজয়ের আর বিলম্ব কত? সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র পঞ্জাবেই সিপাহীরা তখনও আছে অনুগত. আম্বালার সেনানিবাসে দেখা দেয়নি বিক্ষোভ। কিন্তু আর বেশী দিন শান্তি-রক্ষা কঠিন হবে। দিল্লী, দিল্লীর উপরেই নির্ভর করছে জন্ কোম্পানীর ভাগ্য।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ফিরোজপুর থেকে হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত প্রচুর গোলা বারুদ ও অন্যান্য আগ্নেয় অস্ত্র এনে পৌঁছল রীজের ছাউনিতে। ব্রিটিশ সেনানায়কদের প্রাণে ফিরে এল ভরসা, মনে এলো সাহস। সেনাপতি উইলসনকে অতিক্রম করে যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করল জন নিকলসন।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রাত্রি প্রায় নিঃশেষিত, যদিও আলোর রেখা দেখা দেয়নি আকাশে। ইংরেজবাহিনী আক্রমণ করলো দিল্লী দুর্গ। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় দিন দিবা-রাত্রিব্যাপী গোলাবর্ষণের দ্বারা নগর-প্রাচীর বিধ্বস্ত করা হয়েছে ধীরে ধীরে—মূল আক্রমণের মুখবন্ধরূপে। কাশ্মীরী গেটের দিকে খণ্ড খণ্ড দলে হানা দিল ইংরেজের সৈন্য। দুই পক্ষের কামান-গর্জ্জনে দুরু দুরু কম্পিত হলো দূর-দূরান্তের গৃহ-গবাক্ষ, তাদের অগ্নিবর্ষণের রক্তিম আভায় সীমন্তিনীর সীঁথির মতো রঞ্জিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এই মরণপণ যুদ্ধ চললো প্রহরের পর প্রহর। অবশেষে বিকট শব্দে কাশ্মীরী গেটের রুদ্ধদ্বার বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো ধূলায়। এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্ষুদ্র একটি দল সরীসৃপের মতো বেয়ে উঠেছে প্রাচীরে। বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগের দ্বারা বিচূর্ণ করেছে সুদৃঢ় কাশ্মীরী গেট। তাদের অমানুষিক সাহসের ফলেই জয়লাভ সম্ভব হলো ইংরেজের। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন, এই দলের মধ্যে আট জন ছিল ভারতীয়।

সেই ভগ্নদ্বার-পথে জয়দৃপ্ত ব্রিটিশ বাহিনী প্রবেশ করলো ভীমবেগে, বিপক্ষকে আক্রমণ করলো দ্বিগুণ তেজে। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে নিকলসন পরিচালনা করছিলেন সেই সৈন্যদল। জনৈক সিপাহী নিশানা করলো তাকে। ধূলায় লুটিয়ে পড়লো নিকলসন। গুলী লেগেছিল তার কপালে।

পরাজিত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ পলায়ন করলেন দুর্গ থেকে। আত্ম-গোপন করলেন দিল্লী প্রাসাদের চার মাইল দক্ষিণে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধে। সেখানে এক মুসলমান ফকিরের নিলেন আশ্রয়। জনশ্রুতি এই যে, সেই ফকিরই তাঁকে ধরিয়ে দিলেন ইংরেজের গুপ্তচর বিভাগের এক তরুণ কর্ম্মচারী হাডসনের হাতে।

হামা আজ দস্তে
গয়েঁর নালা কুনান্দ,
শাদী, আজ দস্তে
খেশ্ তান্ ফরিয়াদ্।

নিজের হাতই যখন নিজের গালে চড় বসিয়ে দেয়, তখন, শাদী অপরের হাতে মার খাওয়া নিয়ে আর খেদ করে লাভ কী!

বন্দী সম্রাটকে হাডসন পাল্কী করে নিয়ে এলো দিল্লীতে। সেখানে বিচার হলো তার। দণ্ড হলো নির্ব্বাসন। ব্রহ্মদেশে। সেখানে পাঁচ বছর পরে বন্দিদশায় জীবনান্ত ঘটলো তাঁর। হতভাগ্য বাহাদুর শাহ,—ভারতের শেষ মুস্লিম সম্রাট।

ঠিক যেখানে বাহাদুর শাহ ধৃত হন, সেই হুমায়ুনস্ টম্বেই পর-দিন হাডসন গ্রেপ্তার করলো আর তিনটি পলাতক। বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্র। তাঁরা স্বেচ্ছায়ই ধরা দিয়েছিল। আশা করেছিল তাদেরও বিচার হবে বাহাদুর শাহের মতো।

হাডসন্ তাদের একটি ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে এল দিল্লীতে। দিল্লী গেটের কাছে এসে হাডসন্ থামালো সে-গাড়ী। বন্দুক দিয়ে নিজ হাতে পর পর গুলী করলো বন্দীদের ঠিক বুকের মাঝখানে।

রাজরক্ত ঝর ঝর ধারায় গড়িয়ে পড়ল দিল্লীর ধূলি-ধূসর পথে। মৃতদেহ নিয়ে চাঁদনী চকের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনীরূপে রাখা হলো তিন দিন। তরুণ সম্রাট-বংশধরদের মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল পথচারীর দল, বারম্বার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মার্জ্জনা করল নিঃশব্দে।

[ক্রমশঃ

সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাস

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ

নিশ্চলদাস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ আত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। ইহা তাঁহার বিচারসাগর গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—"বোধ চাহি জাকো সুকৃতি ভজত রাম নিষ্কাম সো মেরা হৈ আত্মা কাকু করুঁ প্রণাম।" নিশ্চলদাসের এই ভাবের অনুকূলে গীতার ৯ম অধ্যায় ১৫ শ্লোকটি স্মরণ করা যাইতে পারে। যথা—"জ্ঞান-যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে। একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখম্।" ইহার ফলে তিনি প্রায়ই রামভক্ত তুলসীদাসের আশ্রমে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার এই ব্যাখ্যায় অপার আনন্দ লাভ করিতেন। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাদ রটিয়াছিল যে, তিনি তুলসীদাসের সমসাময়িক। বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, তুলসীদাসের মহাপ্রয়াণ-কাল ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে, নিশ্চলদাসের জন্ম ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ।

এই ভাবে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিশ্চলদাস কাশীধামে থাকিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া দিল্লী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে সেই অলখরামের আশ্রমে কিছু দিন থাকিয়া দিল্লী হইতে ১৮ ক্রোশ পশ্চিমে কিহড়োলী নামক স্থানে নিজ আশ্রম স্থাপন করিলেন। এখানে এখনও তাঁহার মঠ বিদ্যমান। শুনা যায়, তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত বহু গ্রন্থ এখনও এখানে সুরক্ষিত।

কিহড়োলীতে অবস্থান কালে এক দিন এক দক্ষিণী পণ্ডিত তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে কাশী যাইবার পথে নিশ্চলদাসের আশ্রমে অতিথি হন। তিনি তাঁহাকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া কয়েক দিন তাঁহাকে নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। এক দিন নিশ্চলদাস নিত্যকর্ম্মরূপ দাদূবাণী পড়িতেছিলেন, সেই দক্ষিণী পণ্ডিতটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি পুস্তক পাঠ করিতেছেন?" নিশ্চলদাস বলিলেন—"ইহা আমাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক দাদূজীর বাণী।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"আপনার মত পণ্ডিত আজও হিন্দি ভাষাগ্রন্থ পড়িতেছেন কেন?" নিশ্চলদাস বলিলেন—"ইহাতে সমস্ত শাস্ত্রের সার নিষ্কর্ষ আছে।" অতঃপর এই প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে অনেক শাস্ত্রবিচার হয়। পণ্ডিতজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনার শাস্ত্রজ্ঞান খুবই প্রশংসনীয়, তবে নব্য ন্যায়শাস্ত্রে একটু ন্যূনতা দৃষ্ট হইল।"

এই কথা শুনিয়া নিশ্চলদাসজী অনতিবিলম্বে নব্য ন্যায়ের এক সময় মুখ্য প্রচার-স্থল নবদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় তিন বৎসর থাকিয়া নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ণতা সাধন করিয়া পুনরায় দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহা নিশ্চলদাসজীর একটি অদম্য উদ্যমের দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

অতঃপর এক দিন এক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার একটি শাস্ত্র-বিচার হয়। সেই বিচারে পণ্ডিত মহাশয় পরাজিত হন। কিন্তু তাহাতে তিনি এতই মর্ম্মাহত হন যে, তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার পত্নী তখন একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন নিশ্চলদাসের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনার সঙ্গে বিচারের ফলে আমার পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এখন আমার গতি কি হইবে? আমার পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই, আমার কোন আশ্রয় নাই।"

নিশ্চলদাস ইহা শুনিয়া যারপর-নাই দুঃখিত হইলেন। তিনি সাধু সর্ব্বত্যাগী পণ্ডিত, তিনি তাঁহার কি উপায় করিবেন? তিনি বলিলেন "জননি! আমি আপনার সন্তান এবং দরিদ্র সাধু মাত্র, আমি আপনার কি সাহায্য করিতে পারি? আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনি আমার নিকট অবস্থান করিতে পারেন। আমার যদি উদরান্নের সংস্থান হয় তাহা হইলে আপনি অনাহারে থাকিবেন না। আমি আ-মরণ আপনার সেবা করিব, এতদতিরিক্ত আর আমি কি করিতে পারি?"

পণ্ডিত-পত্নী নিরাশ্রয় হওয়ায় তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং অবশিষ্ট জীবন একটি পরিচারিকাসহ মহাত্মা নিশ্চলদাসের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিশ্চলদাস যেখানে যখন থাকিতেন অথবা শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা উপলক্ষে যেখানে যখন গমন করিতেন, এই মহিলাদ্বয়ও সেই স্থলেই গমন করিতেন। সাধু নিশ্চলদাসের সঙ্গেই ইঁহাদেরও আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক উন্নতি লাভ হইয়াছিল। এই মহিলাদ্বয় নিশ্চলদাসের সঙ্গে থাকায়, নিশ্চলদাসকে অনেক সময় অনেক নিন্দা উপহাস শুনিতে হইত। কিন্তু তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং হৃদয়ের বল এতই অসাধারণ ছিল যে, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। যাঁহারাই নিশ্চলদাসের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইতেন, তাঁহারাই তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতেন। ক্রমে নিশ্চল-দাসের শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময় জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় নামক সহরে বহু শেঠগণের বাস ছিল, শেঠগণ নিশ্চলদাসের সাধুতার কথা শ্রবণ করিয়া বহু আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে তথায় লইয়া যান। নিশ্চলদাস শিষ্যমণ্ডলীসহ কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রো-পদেশ দান করিয়া যারপর-নাই আনন্দিত করিলেন।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চলদাসের নাম দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। ক্রমে পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত বুন্দি নামক রাজ্যে রাজা রামসিংহজী নিশ্চলদাসের কথা শুনিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল, মহাত্মা নিশ্চলদাস একবার তাঁহার রাজ্যে পদার্পণ করেন।

রাজা রামসিংহজী তাঁহার মন্ত্রী মহাশয়কে রামগড় প্রেরণ করিলেন এবং নিশ্চলদাসকে তাঁহার রাজ্যে আগমনের জন্য বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চলদাসকে রাজা মহাশয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নিশ্চলদাস বলিলেন—"দেখুন, আমি যাইতে পারি, কিন্তু কয়েকটি কারণের জন্য আমার মনে হইতেছে—মহারাজের আমার উপর শ্রদ্ধা জন্মিতে পারিবে না। প্রথম কারণ, আমার তাম্রকূট সেবনের অভ্যাস আছে। দ্বিতীয় কারণ, আমার সঙ্গে দুই জন মহিলা বাস করেন, তাঁহারা আমার সঙ্গে সর্ব্বত্র গমন করেন। তৃতীয় কারণ, আমার দেহে নিত্য কিয়ৎক্ষণের জন্য জ্বরভোগ হইয়া থাকে। চতুর্থ কারণ, আমার উদরে বায়ু সঞ্চার হয়, এই সব দেখিয়া মহারাজ কি আমার উপর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে পারিবেন?"

মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চলদাসের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা এবং মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

তিনি বুন্দি আসিয়া মহারাজকে এই সব নিবেদন করিলেন। মহারাজও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি জানিতেন, জ্ঞানীর প্রারব্ধ কখন জ্ঞানীর জ্ঞানের বিরোধিতা করিতে পারে না। তিনি তথাপি নিশ্চলদাসকে নিজ রাজ্যে আনয়নের জন্য আগ্রহ করিলেন। অগত্যা নিশ্চলদাস শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া বুন্দি রাজ্যে আসিলেন। এখানে তাঁহার শাস্ত্রীয় উপদেশ এবং বেদান্ত-বিচার শুনিয়া সকলে যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। ক্রমে রাজার পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বুন্দিরাজ্যের যাঁহারা নিশ্চলদাসের উপর প্রথম প্রথম সন্দেহের দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাঁহারা ক্রমে নিশ্চলদাসের সাধুতায় এবং বিদ্যা-বুদ্ধি দেখিয়া অনুরক্ত হইলেন।

এইখানে অবস্থিতিকালে রাজা রামসিংহজীর অনুরোধে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিচারসাগর গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু ইহা হিন্দি ভাষায় রচিত হওয়ায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজা রামসিংহজী পণ্ডিতবর্গের এইরূপ বিরূপ ভাব দেখিয়া নিশ্চলদাসকে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে বেদান্তের এবং ন্যায় ও মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের সমুদয় সার দুরূহ এবং জটিল কথা স্থান প্রাপ্ত হয়। নিশ্চলদাস তাহাই করিলেন। এই গ্রন্থের নাম হইল বৃত্তিপ্রভাকর। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণের পূর্ব্বভাব আর থাকিল না। অতঃপর জনসাধারণ যাঁহারা নিশ্চলদাসের স্বভাব চরিত্রের উপর সন্দিহান ছিলেন, তাঁহারা সপরিবার রাজার এবং রাজপরিবারবর্গের ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া আর পূর্ব্বভাবের পোষণ করিতে পারিলেন না। ভিত্তিহীন সন্দেহ কখনও স্থায়ী হয় না।

বুন্দিরাজ্যে নিশ্চলদাসের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অনেক সাধু-সন্ন্যাসী পণ্ডিতের তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিল। কারণ, সাধারণের বিশ্বাস এই যে, অব্রাহ্মণ বা নীচকুলসম্ভূত ব্যক্তির নির্ম্মল বেদান্তবিদ্যা কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি জনসাধারণকে উপদেশ দিলে লোকের অপকারই হইবার কথা। এই ভাবিয়া এই সময় কয়েক জন সাধু-সন্ন্যাসী পণ্ডিত নিশ্চলদাসকে অপদস্থ করিয়া উপদেশ দান কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কথায় কথায় সাধুর লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিশ্চলদাস যথাশাস্ত্র সাধুর লক্ষণ বলিলেন। তখন সেই পণ্ডিতগণ বলিলেন, "তবে আপনাতে সেই লক্ষণ সমূহের অন্যথা দেখা যাইতেছে কেন? আপনি সাধু পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত অথচ আপনি স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিয়া থাকেন।"

নিশ্চলদাস ইতিমধ্যেই তাঁহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়াছিলেন। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "আপনারা সাধুর লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তাহা বলিয়াছি, আপনারা ত আমার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং আমার লক্ষণ আমি বলি নাই।"

তখন পণ্ডিতগণ বলিলেন, "আপনি সাধু পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইয়াছেন, পণ্ডিতোচিত শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, বহু লোকে আপনার উপদেশ শ্রবণ করে। আপনি যদি স্ত্রীলোকের সঙ্গ করেন তাহা হইলে সাধু সম্প্রদায়ের মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইবে। সাধু গৃহস্থ অনেকে আপনার অনুসরণ করিবে। ইহাতে কি কপটতা এবং ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না? আপনার কি গৃহস্থ হইয়া বিবাহাদি করা উচিত ছিল না? গৃহস্থ হইয়া সাধু কর্ম্ম করিলেও সাধুপদবাচ্য হয়। সাধু-সন্ন্যাসীর ন্যায় আপনি ধর্ম্ম প্রচার করেন কেন? গৃহস্থ থাকিয়া কি ধর্ম্মপ্রচার করা যায় না? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন প্রদর্শনে কি সাধারণের অল্প উপকার হয়?" সাধু পণ্ডিতগণের মন্তব্য অতি রূঢ় হইয়া পড়িল? কিন্তু নিশ্চলদাস অতি সংযমী ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি তাঁহাদের কথায় কোনরূপ ক্রোধ বা উত্তেজিত ভাব প্রকাশ করিলেন না; প্রত্যুত বলিলেন—আমরা মহাত্মা দাদূ সম্প্রদায়ের সাধু। আমরা গৃহস্থ নহি। এজন্য বিবাহাদি করি না। সাধু বৃত্তি ও সত্য প্রচার দ্বারা পরোপকার করাই আমাদের কর্ম্ম। আপনারা না জানিয়া কেন বৃথা আমার উপর আক্ষেপ করিতেছেন? যে মহিলাদ্বয় আমার সঙ্গে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের পতি মহাপণ্ডিত ছিলেন। আমার সঙ্গে বিচারে পরাজিত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। ইহাতে সেই মহিলা নিতান্ত নিরাশ্রয়া হইয়া আমার আশ্রয় ভিক্ষা করেন। আমিই তাঁহার এই দুঃখের উপলক্ষ হইলাম বলিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণ-পোষণের ভার লইতে আমি সম্মত হই। আমার নিকটে বাস করায় আমার লোকনিন্দা অবশ্যম্ভাবী হইবে, ইহা জানিয়াও আমি তাঁহার ভার লইয়াছি, কারণ, ইহাতে আমার ব্রাহ্মণ-নিধনে উপলক্ষ হওয়ার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অপর মহিলাটি তাঁহার সঙ্গিনী বা পরিচারিকা-বিশেষ। উভয়েই যারপর নাই ধর্ম্মপিপাসু, এই জন্য সভা-সমিতি শাস্ত্রব্যাখ্যা—সকল স্থলেই ইঁহারা আমার অনুগমন করেন। আপনারা এই সব বিষয় না জানিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় বৃথা আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন কেন? স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলেই কি দোষ হয়? এই নিয়ম আপনারা কোথায় পাইলেন? স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকিয়াও কি অনেক সাধুনামধারী গোপনে ব্যভিচার করেন না? যাঁহারা স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকায় আমাতে দোষারোপ করিবেন, তাঁহাদের নিকট সত্য কখন গোপন থাকিবে না, তাঁহারা এক দিন বুঝিবেন, সুতরাং সমাজে অসৎ আদর্শ প্রদর্শন জনিত অপরাধ আমার আর হইবে না। আপনাদিগের সঙ্গে আমার এই বাদ-বিবাদও কি প্রচারিত হইবে না? আপনারা এই মহিলাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করুন আমার সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ কি, আমি ইঁহাদিগের সহিত জননী জ্ঞানে ব্যবহার করি কি না?

নিশ্চলদাসের এই অকপট সাহসপূর্ণ যুক্তিযুক্ত কথায় সাধু পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দিত চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার যশঃ চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যাঁহারা নিশ্চলদাসের চরিত্রে সন্দিহান ছিলেন, তাঁহাদের ক্রমে এই সন্দেহ দূরীভূত হইল। ইহার পর হইতে নিশ্চলদাসের গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণের নিত্যপাঠ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য অনেক সাধু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যক্তিরও আগ্রহ জন্মিল। অতি দুরূহ শাস্ত্রীয় বিচার তিনি এত সরল ভাবে প্রকাশ করিতেন যে আবাল-বৃদ্ধ পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। অন্ধকার কি কখন আলোককে তিরোহিত করিতে পারে? নিশ্চলদাসের জীবন দ্বারা প্রমাণিত হইল, সত্য নিষ্ঠা বেদান্ত বিদ্যা এবং সদাচার জাতি বা কুলবিশেষে আবদ্ধ নহে। নিশ্চলদাসের প্রচেষ্টায় আজ সর্ব্বত্র ভারত বিশেষতঃ বিশাল পাঞ্জাব প্রদেশ বেদান্তবিদ্যায় মুখরিত।

ইহার পর এক দিন নিশ্চলদাস বহু সাধু ও শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া উক্ত মহিলাদ্বয় সহ স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। এক জন রাজাও অনুচরবর্গ সহ সেই সময় সেই পথে যাইতেছিলেন। রাজা মহাশয়

নিশ্চলদাসের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে দেখিয়া সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে স্ত্রীলোক কেন ? ইহাদের দ্বারা আপনার কোন্ প্রয়োজন সাধিত হয় ? নিশ্চলদাস গম্ভীর ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"আপনারা মা মাসি ভগিনীর দ্বারা যে কার্য্য সাধিত করেন আমিও ইঁহাদের দ্বারা সেই কার্য্য সাধিত করিয়া থাকি।" রাজা মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া আর কিছুই বলিলেন না। দোষ থাকিলেই লোকে দমিত হয়, নির্দ্দোষ ব্যক্তি কখনই দমিত হন না।

এই সময় নিশ্চলদাসের নিকট নানা বর্ণের বহু বিদ্যার্থী শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। এক দিন অন্য এক সাধু পণ্ডিতের কতিপয় বিদ্যার্থীর সহিত নিশ্চলদাসের কতিপয় বিদ্যার্থীর শাস্ত্রীয় বিচার হয়। বিচার বিবাদে পরিণত হইল। অন্য বিদ্যার্থিগণ নিশ্চলদাসের বিদ্যার্থিগণকে বলিলেন—"তোমাদের গুরু কুক্কুট।" ইহাতে নিশ্চলদাসের বিদ্যার্থিগণ গুরুর নিকট আসিয়া এই কথা নিবেদন করিলেন। নিশ্চলদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"এজন্য তোমরা দুঃখিত হইতেছ কেন ? তাঁহারা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কুক্কুট যেমন প্রত্যূষে ডাকিয়া লোক সকলকে জাগরিত করে, আমিও তদ্রূপ করিয়া থাকি। শিষ্যগণ নিশ্চলদাসের এই নির্বৈরভাব দেখিয়া গুরুর উপর অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন।

শুনা যায়, কাশীতে নিশ্চলদাসের বিচারসাগর এবং বৃত্তিপ্রভাকর—এই দুই গ্রন্থ লইয়া পণ্ডিতসমাজের মধ্যে বহু বিচার হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ইঁহাদের মধ্যে কোনরূপ ভ্রম-প্রমাদ প্রমাণিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইঁহার সরল ব্যাখ্যাপদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় অতি দুরূহ জটিল বিষয়ও অতিশয় সুখবোধ্য হইয়াছে। এইরূপ নানা কারণে এই গ্রন্থের প্রচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাঞ্জাব ও গুজরাট প্রদেশে ইহা বঙ্গদেশের কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পাঠ করিয়া থাকে। ইংরেজী এবং ভারতীয় সকল ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে! এক্ষণে বঙ্গভাষাতেও ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

সম্বৎ ১৯২০ অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণী অমাবস্যা তিথিতে মহাত্মা নিশ্চলদাস ৭১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নিশ্চলদাসের সম্প্রদায়—সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাস দাদূ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। দাদূ জাতিতে ধুনরি বা মুচি ছিলেন। ভগবৎকৃপায় সিদ্ধিলাভ করেন। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ ফাল্গুন কৃষ্ণাষ্টমী বৃহস্পতি বারে জন্ম, এবং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টমী শনিবারে ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি অর্দ্ধ মুসলমান মহাত্মা কবীর-পুত্র কমালের শিষ্য। দাদূ হইতে ২৪১ বৎসর পরে নিশ্চলদাসের জন্ম হয়। কবীর রামানন্দ সম্প্রদায়ের শিষ্য। রামানন্দ আবার রামানুজ সম্প্রদায়ের শিষ্য। রামানুজ স্বামী অদ্বৈতবাদের প্রবল প্রতিবাদী ছিলেন। কিন্তু নিশ্চলদাস আবার অদ্বৈতবাদী হয়েন। এজন্য উদ্বোধন পত্রিকা ১৩৫২ আশ্বিন স্বামী জগদীশ্বরানন্দের প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের দাদূ সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থ এবং ভারত-বর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ভগবৎ কৃপায় এবং জ্ঞান ও ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ যে জাতিকুলসমাজ বিশেষে আবদ্ধ নয়, কবীর ও নিশ্চলদাস তাহার দৃষ্টান্ত।

গল্প-সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীসত্যভূষণ সেন

বাইবেলের গল্প

ইতিমধ্যে ইহুদিগণ তাহাদের এক অতুলনীয় ধর্ম্ম-সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বাইবেলের পূর্ব্বকাণ্ড (Old Testament) শুধু অধ্যাত্মবিদ্যা এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধিই চরম উৎকর্ষ লাভ করে নাই ; কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা প্রভৃতি সাহিত্যের আধার হিসাবেও উহার মূল্য অপরিসীম। যিনি ভাবের অধ্যায় (Book of Job) রচনা করিয়াছিলেন তিনি কবি হিসাবে এস্কাইলাস, দাস, মিল্টন বা দাঁতের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। যিনি রুথের অধ্যায় (Book of Ruth) লিখিয়াছিলেন, তিনিও আখ্যায়িকা রচনায় একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিঃসন্দেহ। তথাপি গল্প হিসাবে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বাইবেলের উত্তর কাণ্ডেই পাওয়া যায় (New Testament)। পাশ্চাত্ত্য দের মতে যীশুখৃষ্ট যেমন অধ্যাত্ম-সম্পদে বুদ্ধদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তেমনই ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি হীন, দরিদ্র এবং অস্পৃশ্যদের নিকট তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব সহজবোধ্য করিবার জন্য যে আন্তরিকতার সহিত এবং সরল ভাষায় আলাপ-আলোচনা করিতেন তাহাতে তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বহু আখ্যায়িকা শিল্প হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অমিতব্যয়ী পুত্রের কাহিনী (The Parable of the Prodigal Son) পাপীর নিকট যেমন আশা ও আনন্দের বাণী হিসাবে পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ, তেমনই শিল্প হিসাবেও ইহা একটি অনুপম সৃষ্টি। তেমনই সতীত্ব হইতে বিচ্যুত রমণীর কাহিনীটি যেমন মানুষের চিরন্তন দুর্ব্বলতার পরিচয় লইয়া ভগবানের দয়ার পাত্র হিসাবে পরিচিত তেমনই গল্প হিসাবেও ইহা একটি অনবদ্য সৃষ্টি। হিব্রুদের ধর্ম্ম-সাহিত্যে আর একটি উৎকৃষ্ট গল্পও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ—সুসানা (Susana)। সুসানার চরিত্রে অযথা কলঙ্ক আরোপিত হইলে যে কৃতী বিচারক দুর্ব্বৃত্ত দুই জন বিচারকের অভিযোগ হইতে সুসানাকে উদ্ধার করেন তাহার নাম ছিল ড্যানিয়েল। বোধ হয় এই গল্পের মধ্যেই নিহিত আছে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ-বাক্যের মূল—**A Daniel is come to judgment.**

চীনদেশ

চীন অতি প্রাচীন জাতি নিঃসন্দেহ—অতি প্রাচীন কাল হইতেই সে দেশে বিশিষ্ট সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু গল্প-সাহিত্য রচনায় তাহাদের তেমন উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না—নাটক উপন্যাসের উৎকর্ষও তাহাদের দেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কথা। তাও চীন (Tao Chien) নামক এক জন গল্পলেখক তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে একটি ছোট গল্প রচনা করেন (৪২০ খৃষ্টাব্দ)। একটি রূপক "পীচ ফুলের উৎস" (The Peach Blossom Fountain) এই গল্পটি চীন দেশের উৎকৃষ্ট গল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন। আর একটি উৎকৃষ্ট গল্প পাওয়া যায় আর এক জন গল্প-লেখকের—"বংশীবাদিনী বালিকার শোক-গীতি" (The

Lute-girl's Lament)—লেখক পো-চু-ঈ (Po-chu-yi) ইঁহার জন্ম ৭৭২ খৃষ্টাব্দে।

মধ্যযুগের ইউরোপ

চীনদেশে যে সব গল্প হয়ত প্রচলিত ছিল অথচ সঙ্কলিত হয় নাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গল্প মধ্যযুগের ইউরোপে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। নরম্যান রাজাদের সময় হইতে টিউডরদের আমল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব, সীরিয়া এমন কি মিশর দেশের মূল উৎস হইতে সকল প্রকার গল্প ইউরোপের সকল দেশে প্রসার লাভ করিয়া খৃষ্টীয় জগতের সাধারণ ভাবধারার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সকল উপকরণের ভিত্তিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গল্প-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিতে লাগিল। প্রথম সার্থক সৃষ্টি হইল আয়র্লণ্ডে সপ্তম শতাব্দীতে "দীয়ার্দ্রের নিয়তি" (The Fate of Deirdre) সত্য সত্যই মানব-সাহিত্যে একটি সার্থক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। রাজকন্যা দীয়ার্দ্রে সর্ব্বাংশেই ট্রয়ের হেলেন এবং আইসলণ্ডের গুড্রুনের (Gudrun) সমকক্ষ।* কিন্তু তাঁহাকে উপযুক্ত মহিমায় রূপায়িত করিয়া অমর করিয়া রাখিতে পারেন এমন শ্রেষ্ঠ রূপকার এখনও অনাগত।

আয়র্লণ্ডে যখন গেলদের (The Gaels) হাতে তাঁহাদের জাতীয় গল্প-সাহিত্য প্রাথমিক আকার লাভ করিতেছিল তখন ওয়েল্সে সিমরি জাতি (The Cymri) তাহাদের চমৎকার পুরাণ ও মোহময় আখ্যায়িকা গড়িয়া তুলিতেছিল। এই সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকার মধ্যে The Dream of Maxen Wledig একটি অতি চমৎকার নিদর্শন। এই আখ্যায়িকার মোহময় কল্পনার কুহেলিকার অন্তরালে রোমান্ সম্রাট ম্যাক্সিমাসের (Maximus) চিত্রের অস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্থারের গল্প

এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং মনোরম আখ্যায়িকা রাজা আর্থার এবং তাঁহার পার্ষদগণের কাহিনী (King Arthur and his Knights)। এই সকল আখ্যায়িকা প্রথমে কতকটা ইতিহাসের ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ণওয়াল, দক্ষিণ-ওয়েল্স্ ও স্ট্রাথক্লাইডের (Strathclyde) চারণদের হাতে।

কল্পনার মোহময় স্পর্শে অনুরঞ্জিত হইয়া এই সকল আখ্যায়িকা বৃটেনীতে (Brittany) ওয়েলশ-ভাষা-ভাষীদের নিকট গিয়া পৌঁছায়; তাহাদের নিকট হইতে নরম্যাণ্ডির (Normandy) চারণদের দ্বারা গৃহীত হইয়া পরে এই সকল আখ্যায়িকা সমগ্র ফরাসী দেশে এবং ইতালীতে প্রসার লাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর নর্ম্যান (Norman) এবং বৃটন (Breton) কবিগণ এই সকল আখ্যায়িকার উপর ভিত্তি করিয়া খৃষ্টীয় শিভালরি যুগের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন। এই সকল আখ্যায়িকার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাদের গঠন-প্রণালী ওয়েলশ দেশীয়, কিন্তু মূল স্বরে তাহারা—ফরাসী জাতীয়, যেমন পরিচয় পাওয়া যায় ল্যান্সলটে (Lancelot) সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন গল্পে The Knight of the Cart—খৃষ্টিয়ান্ ডি, ট্রয় (Christian de Troys) কর্ত্তৃক রচিত প্রায় ১১৬৪ খৃষ্টাব্দে। আরও পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্যর টমাস ম্যালোরী (Sir Thomas Malory) ফরাসী কবিদের আখ্যায়িকার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত গদ্য মহাকাব্য 'আর্থারের মৃত্যু' (Morte D' Arthur) রচনা করেন। বলা বাহুল্য, এই কাব্যের সকল আখ্যায়িকাই তাঁহার সমসাময়িক কাল অপেক্ষা বহু প্রাচীন।

ফরাসী জাতিই আর্থাররাজের আখ্যায়িকা সমূহ জর্ম্মানীতে প্রসারিত করে। সেখানে বহু কাল পরে ওয়াগনার (Wagner) এই সকল আখ্যায়িকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুলিকে নাট্যরূপ দান করিয়া এবং তাহাতে সুরসংযোগ করেন। বৈজান্তীয় গ্রীকদের (The Greeks of Byzantium) মধ্যে তৎকালে প্রচলিত কতকগুলি কথাকাহিনীও ফরাসীরা নিজ দেশের জন্য গ্রহণ করেন। এই সকলের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল প্রথম দুইটি ধর্ম্মযুদ্ধের আমলে (crusades)। ব্যবসা-বাণিজ্য, পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ ইত্যাদি কারণে গ্রীকদের সহিত ফরাসীদের স্থায়ী কৃষ্টিগত সংযোগ ঘটে। এমনও দেখা যায় যে, অনেক গ্রীক কথাকাহিনীর মূল রচনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সকল কাহিনীর ফরাসী সংস্করণে। এইরূপ একটি বিখ্যাত গল্প—রাজা কন্‌টান্স (King Constans) সামান্য অবস্থাপন্ন একটি খৃষ্টানের ঘরে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জানিতে পারা গেল যে, এই বালক পরিণত বয়সে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবে এবং যথাসময়ে রাজপদে অভিষিক্ত হইবে। রাজা এই স্পর্দ্ধার কথা জানিতে পারিয়া এই বালককে হত্যা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়তির বিধান অলঙ্ঘ্য। রাজকন্যা এই ব্যক্তিকেই পতিত্বে বরণ করেন। রাজার মৃত্যুর পরে ইনিই রাজপদ গ্রহণ করেন। এবং পরে ইঁহার নাম হইতে নগরের নাম হয় কনস্তান্তিনোপ্‌ল্ (Constantinople)। এই গল্প আরব দেশে ও আবিসিনিয়াতেও প্রসার লাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে ইউরোপের রূপকথায় অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ফরাসী দেশে এই আখ্যায়িকা রূপ লাভ করে দ্বাদশ শতাব্দীতে।

দ্বাদশ শতাব্দীরই শেষ ভাগের সার্থক সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে এক জন ফরাসী কবির পরিচয় আধুনিক কালে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার নাম ছিল ওল্ড্ এনটিফ (Old Antif) এবং ইঁহারই রচনা 'অকাসিন ও নিকোলেত্তে (Aucassin and Nicolette) নামে একটি চমৎকার কাব্যগ্রন্থ; অমর প্রেমকাহিনী হিসাবে এই গল্প রোমিও-জুলিয়েটের সমতুল্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই গল্পটি মূলতঃ মূরদেশীয়, কারণ প্রথমতঃ 'অকাসিন' নামের মধ্যে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে একাদশ শতাব্দীর কর্ডোভার (Cordova) এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্তার নামের পরিচয় পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, গদ্য রচনার সহিত কতকাংশ কবিতা রচনা করিয়া গল্প বলা এই অদ্ভুত প্রথাও মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। হয়ত ওল্ড এনটিফ মূর জলদস্যুদের হস্তে বন্দী হইয়া তাহাদের রীতিনীতির সহিত পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই কাহিনীর মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা আছে। অকাসিন যখন তোরেলোরের (Torelore) রাজবাড়ীতে গেলেন তখন রাজা শয্যাগত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বলিলেন, আমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছি, এক মাস আমাকে এ অবস্থায় থাকতে হবে। গল্পলেখকের জানা ছিল যে, এগু মোর্টেস্ (Aigue Mortes)এর লোকদের মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত প্রথার

লোকাপবাদ প্রচলিত ছিল যে, স্ত্রী সন্তান প্রসব করিলে স্বামীকে আঁতুড়শয্যায় থাকিতে হয়। পীরেনীজ (Pyrenes) পর্ব্বত অঞ্চলের বাস্ক জাতির (The Basques) মধ্যে প্রাচীন কালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ত্তমান যুগেও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

গেষ্টা রোমানোরাম (Gesta Romanorum)

যখন ওল্ড এনটিফ প্রভৃতি কবিগণ গল্প রচনা করিয়া জনগণের বিশেষতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন তখন ধর্ম্মযাজকগণ সকলকে ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। মানবচিত্তের পক্ষে যাহা কিছু হৃদয়গ্রাহী তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নানাপ্রকার কথা-কাহিনীর সংযোগে যে ধর্ম্মোপদেশ প্রস্তাব করিতেছিলেন, তাহাও অনেক স্থানে চমকপ্রদ নাটকের ন্যায়ই মনোহর এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিতেছিল। এই সকল কথা-কাহিনীর মূল উপাদান হিসাবে তাঁহারা আরব, বোগদাদ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ এবং ইতালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল দেশ হইতেই প্রাপ্ত ও সংগৃহীত তথ্যাদি ব্যবহার করিতেছিলেন। এই সকল কথা-কাহিনীর শতাধিক গল্প একত্র সংগৃহীত হইয়া "গেষ্টা রোমানোরাম" নামে এক অপূর্ব্ব গল্প-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল ল্যাটিন ভাষায়। সম্ভবতঃ এক জন ইংরেজ এই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি গল্প সমধিক প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করিয়াছে—"সন্ন্যাসী ও সম্পদ্" (The Hermit and the Treasure), "রাজা ফিলিপ ও তাঁহার গ্রীক ক্রীতদাস" (King Phillip and his Greek Slave), "জোভিনিয়নের দুর্দ্দশা" (The humling of Jovunion), "মিশর ও বোগদাদের নাইটদ্বয়" (The Knights of Egypt and Baghdad), "গীডো এবং টীরিয়স" (Guido and Tyrius) "আগ্লায়েসের পতি" (The Husband of Aglaes), "তিনটি কাস্কেট" (The three Caskets)—এই গল্পটি আংশিক ভাবে সেক্সপীয়র তাঁহার অমর নাটক The Merchant of Veniceএ ব্যবহার করিয়াছেন; "তিনটি উপদেশ-বাক্য" (The three Maxims) এই গল্পটি বিভিন্ন আকারে চীন হইতে ইংলণ্ড সর্ব্বত্র পরিচিত; "থিওডিসিয়াস" (Theodisius of Rome) এই গল্পের মধ্যে সেক্সপীয়রের King Lear নাটকের আখ্যান ভাগের মূল উৎস পাওয়া যায়।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া

যে যুগে গেষ্টা রোমানোরামের গল্পগুলি লিপিবদ্ধ হইতেছিল সেই সময় আইসলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসিগণ (Old Viking) তাহাদের চিরাভ্যস্ত সমুদ্রপথে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পশুপালন করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই যুগেই তাহারা কঠোর শীতের অন্ধকারময় রাত্রিতে দিবাবসানে বিশ্রামের সময়ে সকলে প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপের আরামে সম্মিলিত হইয়া যে সকল গল্প রচনা করিয়া চলিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর গল্প-সাহিত্যে অপূর্ব্ব সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুড্রুনের কাহিনী। এই গল্পটি আকারে বড় বলিয়া ছোট গল্প সংগ্রহে স্থান পাইবার কথা নয়। কিন্তু ছোট গল্প রচনায়ও যে তাহাদের অসাধারণ নিপুণতা ছিল তাহারও অনেক নিদর্শন আছে; "ওয়ারউলফ্ (Werewolf) সুইডিস, "সাহসী ফ্রিথিওফ" (Frithiof the Bold) আইসলণ্ডীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী, "গ্লোব এবং আলগার" (Glob and Alger) "নেস রাজা" (The Ness King)।

আরব্য উপন্যাস

ইহার পরেই মোহময় স্মৃতিমণ্ডিত বোগদাদ নগরীর খলিফা হারুন অল রসিদের আমল। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল গল্প প্রচলিত ছিল, তাহা এই সময়ে সঙ্কলিত হয়—ইহাই আরব্য উপন্যাস নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় জগতে যেমন "গেষ্টা রোমানোরাম", মধ্যযুগের মুসলিম-জগতে তেমনই এই আরব্য উপন্যাস। আখ্যায়িকার মাধুর্য্যগুণে এবং সাহিত্য-শিল্পকৃতিত্ব হিসাবেও আরব্য উপন্যাসের গল্প সমূহ খৃষ্টীয় গল্প সমূহ হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। "জেলে এবং দৈত্য" (The Fisherman and the Genei)' গল্পটির উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষ। "একচক্ষু দরবেশ (One-eyed Calender) গল্পটি হারুণ অল রসিদের সময়ে লিখিত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু ইহা বহু পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। "কুব্জের কাহিনী" (The story of the little Hunchback) খাসগড়ের গল্প কিন্তু আখ্যায়িকা-অংশ সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিল। আলাদীনের গল্পটি (সীরিয়া দেশের গল্প) খুবই প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু আলিবাবার গল্পের (মূল পারস্য দেশীয় গল্প) সহিত কাহারও তুলনা হয় না। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর সাহিত্যেই ইহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পারস্য দেশ

গল্প-সাহিত্যে পারস্য দেশও বিশেষ সমৃদ্ধ। এই দেশেরই কতকগুলি প্রাচীন আমলের গল্প ভাষান্তরিত হইয়া খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরব্য উপন্যাসের গল্প-সংগ্রহের প্রাথমিক আকার ধারণ করে। পরে এই সকল গল্পই তাহাদের দেশের পর্য্যটক গল্প-রচয়িতাদের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া কতকাংশে রূপান্তরিত হয়। আরব্য উপন্যাসের যে বর্ত্তমান রূপ দেখা যায় তাহার সঙ্কলন হয় প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। আরব্য উপন্যাসে স্থান লাভ করে নাই এমন অনেক উৎকৃষ্ট গল্প পারস্যদেশীয় গল্পসংগ্রহে আছে। অনেক গল্প সাধারণ জীবনের ঘটনা লইয়া রচিত; যেমন "তীর্থযাত্রী ও দস্যুগণ" (The Pilgrim and the Robbers)। এই কাহিনীতে মরুপথযাত্রায় যে অভিযানের ঘটনা চিত্রিত হইয়াছে সেইরূপ ঘটনা বর্ত্তমান পারস্য দেশেও অহরহঃ ঘটিয়া থাকে। "এমেসার কাজি" (The Kazi of Emessa)ও বিখ্যাত গল্প। বহু শতাব্দীর পূর্ব্বেকার আখ্যায়িকা এবং, ইহাতে তৎকালীন দেশের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ও দেশের রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়; এই গল্পটি আরও প্রসিদ্ধ এই কারণে যে, সেক্সপীয়রের The Merchant of Venice নাটকের আখ্যায়িকার মূল ঘটনা এবং শাইলক-চরিত্রের প্রাথমিক চিত্রও এই গল্পের মধ্যে নিহিত দেখা যায়। সম্ভবতঃ, এই গল্প হইতেই সেক্সপীয়র তাঁহার অমর নাটকের মূল উপাদান সংগ্রহ করেন। ঈর্ষাপরায়ণ উজীর (The Envious Vizier) আর একটি প্রসিদ্ধ প্রাচ্যদেশীয় গল্প যাহা এশিয়া ও ইউরোপে বহু প্রচার লাভ করিয়াছে। জার্ম্মান-কবি শীলার এই গল্পের ইউরোপীয় সংস্করণের কাব্যরূপ দান করিয়াছেন।

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৮

নূতন হেডমাষ্টারের জন্ম যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে দরখাস্ত আসিল একশতরও বেশী। তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া এক জনকে নিয়োগ করা হইল বটে কিন্তু সে ভদ্রলোককে নিয়োগ-পত্র পাঠানো হইল দেড় মাস পরের তারিখ হইতে। অর্থাৎ সামনেই গ্রীষ্মের ছুটি—আর দিন দশ-বারো মাত্র বাকী আছে, *মিছামিছি এই কয় দিনের জন্য* আর ছুটির বেতন দেওয়া হয় কেন! স্থির হইল, অপূর্ব্ববাবুর এই ক'-দিন কাজ চালাইবেন!

ভবদেববাবুর লাঞ্ছনার সময় অপূর্ব্ববাবু সেক্রেটারীর বাড়ী খুব হাঁটাহাঁটি করিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত তিনিই হয়ত হেডমাষ্টারীটা পাইবেন। কিন্তু তিনি ইংরেজীর লোক নন, এমন কি বি-টিও পাশ করেন নাই, এই জন্ম তাঁহার দাবী শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না, স্কুল কমিটির কোন মেম্বারই সে প্রস্তাব কানে তুলিলেন না। অপূর্ব্ববাবু ঐ মর্ম্মে একটা দরখাস্তও করিয়াছিলেন—তাহাতে আবার এক মেম্বার একটু ধমক দিয়াছেন, আপনার কি মাথা খারাপ না কি। জানেন না, হেড্‌মাষ্টারীর কোয়ালিফিকেশন্ আপনার একটাও নেই?

অপূর্ব্ববাবু অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইলেন। শুধু যে পদোন্নতি হইল না সে জন্মও নয়, নূতন হেডমাষ্টার আসিলে তাঁহার এত প্রতাপ থাকিবে কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ রহিয়াছে—হয়ত বা হোষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কয়টা অতিরিক্ত টাকাও চলিয়া যাইবে। সুতরাং ক্ষোভে ও আশঙ্কায় যত তিনি জ্বলিতে লাগিলেন ততই তাঁহার সমস্ত ঝালটা আসিয়া পড়িল ভূপেনের উপর। আরও রাগের কারণ, ভূপেনের কোচিং ক্লাসটা সেক্রেটারীকে অনেক বলিয়াও বন্ধ করিতে পারেন নাই, ফলে তাঁহার মাসিক চার-আনা বেতনের কোচিং ক্লাসের ছাত্রগুলি বিনা মাহিনায় অথচ ভাল কোচিং ক্লাসের দিকে ঝুঁকিতে শুরু করিয়াছে। একটা দৈববল এই যে, ভূপেন ভাল ছাত্র ছাড়া তাহার কোচিং ক্লাসে নেয় না—তবু ত দেখিতে দেখিতে গুটি-আষ্টেক ছেলে সে লইয়াছে, হঠাৎ যদি সংখ্যা বাড়াইয়াই দেয়, বিশ্বাস কি?

অপূর্ব্ববাবুর অত্যাচারে ভূপেনের তিষ্ঠানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল বটে, তবে একটা সুবিধা এই যে. অপূর্ব্ববাবুর ক্ষমতা বেশী দিন নয় এটা বুঝিতে পারিয়া অন্য মাষ্টার মহাশয়রা কেহ সে দিকে যোগ দেন নাই। এবং সে-ও, অল্প সময়ের ব্যাপার বুঝিয়া প্রাণপণে দাঁতে দাঁত দিয়া সব কিছুই সহিয়া গেল। তাহার সহ্য গুণ দেখিয়া আজ-কাল সে নিজেই অবাক্ হইয়া যায়—দিনে-রাতে সহস্র বার ইচ্ছা হয় কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে, আবার নিজেকে সংযত করিয়া নেয়। মনকে প্রবোধ দেয়, দারিদ্র্যের মধ্যে সে যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দাসত্ব করিয়াই যখন জীবনধারণ করিতে হইবে তখন চামড়া অত পাত্‌লা রাখিলে চলিবে কেন? সব কিছু সহ্য করিতে হইবে। আত্ম-সম্মান জ্ঞান বা অভিমান রাখিবার মত ভাগ্য তাহাদের নয়।...

গরমের ছুটিতে সকলেই বাড়ী চলিয়া যাইবে, ঠাকুর-চাকররা পর্য্যন্ত হোষ্টেল বন্ধ থাকিবে। ভূপেন কিন্তু বাড়ী যাইবে না বলিয়াই স্থির করিল। তাহার সামান্য বেতন হইতে বাড়ীতেও কিছু টাকা পাঠাইতে হয়—সেখানকার খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়বাবুকে আগামী মাস হইতে কিছু-কিছু সাহায্য করিতেই হইবে। তাহার মনের মধ্যে একটা গোপন আশা ছিল যে, সন্ধ্যা হয়ত নিজে হইতেই বিজয়বাবুদের খোঁজ লইবে, তাহাদের সাহায্য করিবার কথা পাড়িবে। কারণ, এ-শ্রেণীর মাসিক সাহায্য মোহিত-বাবুর অনেকগুলিই আছে—একটা সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কিছুই আসিয়া যাইবে না। ভূপেন অবশ্য নিজের মনকে এই বলিয়াই সে চিন্তার সময় প্রবঞ্চনা করিত যে, উহারা সাহায্য করিতে চাহিলেও সে সহজে লইবে না, বিজয়বাবুদের ভার সে নিজেই বহন করিবে, যেমন করিয়া হউক—অথচ সে যে এই আশাটার উপর কতখানি ভরসা করিয়াছিল তাহা নিজের মনের কাছে একদা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, যখন পর পর তিনখানি চিঠির মধ্যেও সন্ধ্যা সে কথার কোন উল্লেখ করিল না। বিজয়বাবুদের কুশল-প্রশ্ন সে করে, কিন্তু কোন প্রকার সাহায্যের কথা বা কি করিয়া তাঁহাদের দিন চলিতেছে, সে কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত করে না।

ইদানীং সন্ধ্যার চিঠিও আসে কম—যেগুলি আসে তাহারও বক্তব্য ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ভূপেন মনে মনে একটা অভিমান বোধ করে। কিন্তু সে নিজে যে সন্ধ্যার দুইখানা চিঠি এড়াইয়া গিয়া তৃতীয়খানার জবাব দেয়, এবং সে চিঠির দৈর্ঘ্য যে সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত চিঠির চেয়েও কম, সে কথাটাও মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারে না। তবু মানুষের সহজ স্বার্থপরতায় দেওয়ার কথাটা ভুলিয়া সে পাওনার দিক্‌টাই দেখে এবং সন্ধ্যার চিঠিতেও ইদানীং যে একটা সূক্ষ্ম অভিমানের সুর বাজে তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পায় না। সে অভিমান প্রকাশ পায় ছোট ছোট বিদ্রূপে, খোঁচা দেওয়া ইঙ্গিতে। এ যেন আর এক সন্ধ্যা—তাহার সহজ, সুন্দর, সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণকে যেন আর আগেকার মত চিঠির লাইনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ একখানি চিঠিতে সে কল্যাণী সম্বন্ধে যে একটা ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহাকে অকারণ নীচতা বলিয়াই মনে হইয়াছিল ভূপেনের। সে লিখিয়াছিল, 'কল্যাণীদির আপনার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, একথা বললে তাঁর মনোভাব কিছুই প্রকাশ করা হয় না। আপনার কথা বলতে গেলেই তাঁর চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, দৃষ্টি চলে যায় যেন কোন অতলে, যে দেবতাকে ধ্যান করতেও ভয় করে সেই সুদূর অথচ অন্তরবাসী দেবতার খোঁজে। আর সে সময়ে এমন একটি দীপ্তি ওঁর মুখে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে যে, ওঁর মত সাধারণ চেহারার মেয়েকেও সুন্দরী দেখায়। আপনার ভাগ্য ভাল মাষ্টারমশাই, অনেকেরই অন্তরের পূজা এক্ষেত্রে আপনি পেয়ে গেলেন।...আচ্ছা, বিজয়বাবুরা আপনাদেরই স্বজাতি, না?' তার পরই সে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেছে বটে কিন্তু শেষের এই খাপ্‌ছাড়া প্রশ্নটির মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তাহাতে ভূপেন বিরক্তই হইয়াছে।

সুতরাং ইহার পর নিজে হইতে মোহিতবাবুর কাছে কল্যাণীদের কথা সে তুলিতেই পারে না—সে নিজেই চালাইবে যেমন করিয়াই হউক। তাহার জন্ম যত কৃচ্ছ সাধনই করিতে হয়, করিবে। সেই জন্ম সে কলিকাতায় যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিল। যাওয়া-আসার গাড়ী-ভাড়া ত আছেই, তা ছাড়া শহরে গেলে সমস্ত পুরাতন অভ্যাস

যেন একসঙ্গে মাথা নাড়া দেয়, সহস্র রকমের খরচ সামনে আসে। মা ও বোনেরা খুবই ব্যস্ত হইবেন সত্য কথা কিন্তু উপায় নাই। সে তাঁহাদের চিঠি লিখিয়া দিল যে, এই ছুটিটা নির্জ্জনে থাকিয়া এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। কথাটাও খুব মিথ্যা নয়, সে সংকল্প তাহার ছিলই।

সন্ধ্যার চিঠির জবাবেও সে সেই কথাই লিখিয়া দিল, কারণ, সত্য কথা লিখিলে পরোক্ষভাবে তাহার কাছে সাহায্য চাওয়াই হইবে। পরীক্ষার কথা লিখিয়া শেষে লিখিল, 'কষ্ট খুবই হবে তাতে সন্দেহ নেই। এখন থেকেই মাঠে যেন আগুন-বৃষ্টি হ'তে শুরু করেছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কী হবে তা ভাবতেও পারি না। তবে নতুন একটা অভিজ্ঞতাও হবে বৈ কি! একেবারে এই নিজ্জন জায়গায় এক মাস বাস করা, ভাবতে ভালই লাগছে। একেবারে রীতিমত তপস্যা। কী বলো?'

সে স্থির করিয়াছিল হোষ্টেলে বাস করিবে এবং যে চাকরটি থাকিবে ইস্কুল ও হোষ্টেল-বাড়ী পাহারা দিবার জন্য, তাহার সহিতই একটা বন্দোবস্ত করিবে আহারাদির। কিন্তু কল্যাণীর কাছে কথাটা পাড়িতে সে প্রবল আপত্তি জানাইল, কহিল, তাই কখনও হয়! একা ঐ তেপান্তরের মাঠে পড়ে থাকবেন? অসুখ আছে বিসুখ আছে—তাছাড়া আমরা থাকতে আপনি চাকরের হাতে খাবেন? যদি থাকতেই হয় ত আপনি এখানে এসেই থাকুন। আমাদের ভাঙ্গা বাড়ী, থাকতে কষ্ট হবে, তবু চোখের সামনে থাকবেন, সেবা-যত্ন ত করতে পারব।

ভূপেন লেখা-পড়ার কথা তুলিয়া কী একটা আপত্তি জানাইতে গেল, বাধা দিয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিল, আপনার পড়া-শুনোর কোন ব্যাঘাত হবে না, আমি কথা দিচ্ছি, ভাইদের আমি সামলে রাখব। দোহাই আপনার, পায়ে পড়ি, আর অন্য মত করবেন না। আপনি যদি ওখানে একা পড়ে থাকেন তাহ'লে আমি অন্নজল ত্যাগ করব, তা বলে রাখলুম।

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর যেন একটু বেশী রকমের ব্যাকুল শোনাইল। ভূপেন সে আকুলতায় বিস্মিত হইলেও ঠিক সে-দিক তাহার মন ছিল না, ভাবিয়া দেখিল এই বন্দোবস্তই সুবিধা। এমনি ত এরা থাকায় অসুবিধা আছেই, তা ছাড়া একেবারে হাত পাতিয়া টাকাটা লইতে গেলে ইহাদের মাথা কাটা যাইবে, বাড়ীতে থাকিলে সাহায্য করার অছিলায় তাহার যাহা দেয়, আস্তে আস্তে দিতে পারিবে! এই এক মাসে ব্যাপারটা সহিয়া গেলে পরের মাস হইতে হয়ত অত লজ্জায় বাধিবে না। যাহারা কখনও পরের দয়ায় জীবন ধারণ করে নাই, প্রথম সাহায্যটা তাহাদের বড়ই আঘাত দেয়।

কল্যাণী ব্যগ্রভাবে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার উত্তর আশা করিতেছিল, ভূপেনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, সন্ধ্যাদি' আপত্তি করবেন তাই ভাবছেন?

তাহার কণ্ঠে কোথায় যেন একটা অভিমানের সুর। ভূপেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জবাব দিল, আমি সমস্ত কাজ সন্ধ্যার মত নিয়ে করি, এমন কথা তোমার মনে এল কি ক'রে?

ভূপেন সত্যই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে তিক্ততা তাহার গোপন করিবারও চেষ্টা ছিল না। কল্যাণী কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন মাথা নত করিয়া কহিল, না, আমার অন্যায় হয়েছে ও কথা বলা। কিন্তু থাকবেন ত এখানে? নইলে—নইলে বাবা বড় দুঃখ পাবেন। ভাববেন, আমরা বড় গরীব বলেই—

কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়া ভূপেন কহিল, না এখানেই থাকব।

কল্যাণীর মুখ একবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াই ম্লান হইয়া গেল। একটু যেন ভয়ে ভয়েই বলিল, আপনার কিন্তু খুব অসুবিধা হবে—

হোষ্টেলে একা থাকলে আরও অসুবিধা হতো।

আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়া ভূপেন বাহির হইয়া পড়িল। সেই দিনই সকালে স্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছিল। সে বৈকালে যখন কল্যাণীদের বাড়ী যায় তখনই দেখিয়া গিয়াছে যে হোষ্টেল প্রায় ফাঁকা—অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষকই ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। যে দুই-এক জন ছিলেন, রাত্রে ফিরিয়া দেখিল তাঁহারাও কেহ নাই। এ হোষ্টেলে থাকিবার মধ্যে আছেন অপূর্ব্ববাবু আর ঠাকুর-চাকর। অপূর্ব্ববাবুর হিসাব-নিকাশ মেটে নাই বলিয়াই রাতটা থাকিতে হইল, তাঁহারা কাল ভোরেই রওনা হইবেন। আর না কি ও হোষ্টেলে সালেক এখনও আছে। তাহার কী একটা প্রয়োজন আছে, সেও কাল সকালে চলিয়া যাইবে।

ভূপেনের ইচ্ছা হইল সালেককে একবার ডাকিয়া পাঠায় কিন্তু অপূর্ব্ববাবুর কথাটা মনে পড়িয়া বিরত হইল। সে বেচারা সে-ই যে সে-দিন ম্লানমুখে চলিয়া গিয়াছে, আর এক দিনও ভূপেনের সঙ্গে একা দেখা করে নাই! কোচিং ক্লাসে আসিলেও কোন কথা বলে না শুধু ভূপেন প্রশ্ন করিলে প্রয়োজন মত জবাব দেয়। এমন কি, সে যেন তাহার চোখে চোখ পড়িবার ভয়েই সর্ব্বক্ষণ মাথা নীচু করিয়া থাকে। এ যে তাহার অভিমান তা ভূপেন বোঝে কিন্তু সে নিরুপায়। ঐ নির্ম্মল সরল ছেলেটিকে সে কী করিয়া সব কথা বোঝাইবে? তার চেয়ে ও যা বোঝে তাই বুঝুক, মোটের উপর দূরে থাকিলেই ভাল! কাছে ডাকিয়া সান্ত্বনা দিতে গেলেও হয়ত তাহার কদর্থ হইবে। কাজ নাই আর ঝামেলা বাড়াইয়া।...আজও সেই জন্যই সে ইচ্ছাটা চাপিয়া গেল—বরং এক মাস যদি এখানে একা থাকিতেই হয় ত সেই সময় এক দিন সালেকদের বাড়ী গেলেই চলিবে।

আহারাদির পর অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে দুই-একটি কথা সারিয়া সে ঘরে আসিয়া বসিল। তাহারও জিনিস-পত্র ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। কথা আছে হোষ্টেলের চাকরই তাহার বাক্স-বিছানা বিজয়-বাবুদের বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিবে।

সে বই-কাগজ-পত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া আরও ঘণ্টা-দেড়েক বসিয়া একখানা বই পড়িল। ততক্ষণে হোষ্টেল নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, অপূর্ব্ববাবুও বোধ করি হিসাবের কাজ সারিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন—ঘরে ও বাহিরে কয়েকটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া কোন শব্দ নাই। এ নিস্তব্ধতায় মন ভার হইয়া ওঠে, শহরের মানুষ ভয় পায়।

ভূপেন আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল কিন্তু সহজে তাহার ঘুম আসিল না। অপূর্ব্ববাবুর বিদায়-সম্ভাষণটাই বার বার মনে পড়িতেছিল। কথাগুলি ভদ্র, সাধারণ অর্থে ভালই—তিনি বলিয়াছেন, 'তাই ত আপনার তাহ'লে দেশে যাওয়া হল না ভূপেনবাবু। রাঢ়ের মায়া আপনাকে বেঁধেছে বটে! নইলে এই গরমে—আমরাই খলসে

যাচ্ছি, আর আপনি ঘর-বাড়ী থাকতেও—। অবিশ্যি বিজয়বাবুর বাড়ীতে আপনার কোন কষ্ট হবে না, মেয়েটি শুনেছি ভালই, যত্ন-আত্তি করে খুব। তা ছাড়া, এখন ত প্রকৃতপক্ষে আপনিই ওদের অভিভাবক!···বাস্তবিক বিজয়বাবু আপনাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন, আমরা ত ওর কোন উপকারেই আসতে পারলুম না— তবু আপনি ছিলেন তাই! ভগবান যে কাকে দিয়ে কী করান!' ইত্যাদি—কিন্তু এই সহজ কথার মধ্যে কণ্ঠস্বরে এবং দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস ছিল—সেইটাই ভূপেনের অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক যে তিনি বিদ্রূপই করিতে চাহিয়াছেন এমন কথাও সে হলপ করিয়া বলিতে পারে না, অথচ—কি যে তাহাও বলা শক্ত! মোটের উপর, এখন যদি ব্যবস্থাটা বদল করা চলিত ত সে বোধ হয় রাজী ছিল, সে পরিবর্তনটা নিতান্ত অপূর্ববাবুর ভয়েই করিতে হইবে, এই লজ্জায় সে আর কিছু করিল না।

সে জোর করিয়া মনকে শান্ত করিল বটে, কিন্তু অস্বস্তিটা যেন আর কিছুতেই যাইতে চায় না। কী যেন একটা নোংরা, ক্লেদাক্ত জিনিষ সে স্পর্শ করিয়াছে, এমনি একটা অনুভূতি বহু রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাকে অতন্দ্র রাখিল। অবশেষে এক সময় যখন সমস্তটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন হঠাৎ কী একটা শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেখিল তাহার খোলা জানলাটার কাছে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া প্রশ্ন করিল, কে?

কে সালেক? বিস্মিত হইয়া ভূপেন উঠিয়া বসিল—কী রে?

সালেক যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে—চুপি চুপি বলিল, আমি, আমি একটু আপনার কাছে আসব?

আয়, আয়। ভূপেন উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সালেক নিঃশব্দে রক পার হইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তত রাত্রে কেহই জাগিয়া নাই, তবু সে ঘরে ঢুকিবার আগে একবার সসঙ্কোচে অপূর্ব্ববাবুর ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ভূপেন আবার কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, যা' বিছানায় গিয়ে বোস—

সালেক কিন্তু গেল না। রাজ্যের লজ্জা এবং সঙ্কোচ যেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অবশ করিয়া দিয়াছিল, কোন মতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা না করে কিছুতেই বাড়ী যেতে পারলাম না। আপনি, আপনি কি আমার ওপর রাগ করলেন?

ছি! রাগ করব কেন? আয় আয়—। ভূপেন তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিতেই সে সহসা একেবারে ভূপেনের বুকের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সালেকের সে কী কান্না! এত দিনের সমস্ত বেদনা ও অভিমান যেন জমাট হইয়াছিল, আজ ভূপেনের স্নেহের উত্তাপে গলিয়া অজস্র আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—কোন লজ্জা, কোন ভয়ের বাধা মানিল না!

ভূপেনের খালি গা তাহার চোখের জলে ও দেহের ঘামে ভিজিয়া উঠিল কিন্তু সে কোন বাধা দিল না, বরং এক হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আর এক হাত তাহার মাথায় পিঠে বুলাইতে লাগিল। এই মুহূর্তে সেই দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ মুসলমান বালকটি তাহার অন্তরের মহিমায় ভূপেনের চোখে যেন এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহারও এই শ্রদ্ধাবান্ ছাত্রটি সম্বন্ধে যত স্নেহ এত দিন প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পায় নাই, আজ সমস্তটাই যেন নীরবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ, কিছুটা লজ্জিত হইয়াও, সালেক তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমি তবে যাই মাষ্টার-মশাই—

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল, না, এখন আর ও হোটেলে ফিরে যেতে হবে না। আমার কাছেই থাক্। ভোরে উঠে চলে যাস্—

না মাষ্টার-মশাই, আমি ফিরেই যাই।

তাহার সঙ্কোচের কারণটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া সস্নেহে পিঠের উপর একটা হাত রাখিয়া ভূপেন প্রশ্ন কবিল, কেন রে? ভয় করছে? থাক্ না একটু আমার কাছে।

সালেক যতীনবাবুর খালি চৌকীটার দিকে চাহিয়া রাজী হইয়া গেল। কহিল, আচ্ছা, আমি ঐ চৌকীটার ওপর থাকব এখন। ও-ত কাঠের চৌকী, ওতে কি দোষ হবে?

ও হরি! তুই বুঝি ঐ কথা ভাবছিস্? তাই এতক্ষণ বিছানায় বসিস্‌নি? মানুষের বিছানায় মানুষ বসলে কোন দোষ হয় না। নোংরা মানুষ হ'লেই ঘেন্না করে—নইলে করবে কেন?

সে এক-রকম জোর করিয়াই সালেককে তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তার পর নিজেও তাহার পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ শয্যার উপরই আশ্রয় লইল। সে রাত্রে তাহাদের কাহারও ঘুম হইল না, সালেক ছেলেমানুষের মতই দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া গল্প করিয়া যাইতে লাগিল। অত গরমে ঐ ভাবে শুইয়া থাকিতে ভূপেনের খুব কষ্ট হইলেও, সে তাহার উৎসাহে বাধা দিল না বরং সারা রাত সে-ও উৎসাহের সহিতই বকিয়া চলিল। সালেক মধ্যে মধ্যে বলে, পাখাটা দিন মাষ্টার-মশাই, আপনাকে একটু হাওয়া করি—আপনার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে কথা ভুলিয়া নূতন কোন প্রশ্নে চলিয়া যায়। এমনি করিয়া কোথা দিয়া রাত কাটিয়া গেল তাহা দু'জনের এক জনও জানিতে পারিল না—একেবারে পূর্ব্বাকাশ ফরসা হইয়া উঠিতে চৈতন্য হইল। সালেক তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভূপেনকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কহিল, তাহ'লে এক দিন যাবেন ত মাষ্টার-মশাই—ঠিক? আমি কিন্তু আপনার পথ চেয়ে থাকব।

পায়ের উপর হইতে তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, যাবো রে, যাবো।

১৯

বিজয়বাবুদের দারিদ্র্যের চেহারাটা সম্বন্ধে ভূপেন যত কিছুই অনুমান করিয়া থাক, এখানে বাস করিতে আসিয়া দেখিল যে, তাহার কোনটাই আসলের সহিত মেলে না। কল্যাণী সযত্নে গোপন করিবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু একই বাড়ীতে বাস করিতে গেলে সবটা গোপন রাখা যায় না। ডাল এবং যে-কোন একটা ব্যঞ্জন হয় শুধু বিজয়বাবু, তাঁহার দিদি আর ভূপেনের জন্য। তাঁহাদের ভাতের ফ্যানও গালা হয়; বাকী ভাতের সহিত সমস্ত ফ্যানটা মিশাইয়া একটু নুণ দিয়া কল্যাণী ও তাহার ভাই-বোনেরা খায়! তাও পরিমাণে যে পর্য্যাপ্ত নয় তাহা ছেলেমেয়েগুলির অপরিসীম কৃশতার দিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

ভূপেনের হাতে যে টাকা ছিল তাহাতে কিছু কিছু বাজার-হাট সে করিতে পারিত কিন্তু কলিকাতা হইতে আসিয়া দীর্ঘ দিন এখানে থাকিবার ফলে মানুষের বড় অভাব কোন্‌টা তাহা সে বুঝিতে শিখিয়াছিল, তাই কোন প্রকার রসনাতৃপ্তির আয়োজন না করিয়া সে একেবারে মণ-দুই চাল ও সব চেয়ে সস্তা যে ডাল—খেঁসারি ও মটর, তাই দশ সের হিসাবে কিনিয়া দিল। কল্যাণী কী একটা মৃদু অনুযোগ করিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। আজ হউক, কাল হউক, যখন এই লোকটির কাছে হাত পাতিতেই হইবে তখন আর সঙ্কোচ করিয়া লাভ কি! তবু সে পুরা একটা দিন কিছুতেই যেন আর ভূপেনের চোখের দিকে চাহিতে পারিল না।

কল্যাণী তাহাকে পড়াশুনা সম্বন্ধে যে আশ্বাস দিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সে মিলাইয়া পাইল। একটা ঘর সম্পূর্ণ ভূপেনকে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সকলে অপর একখানি ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল; বিশেষ করিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ভূপেনের পড়াশুনার সময় কোন ভাই-বোন না ঘরে ঢোকে কিংবা ঘরের সামনে চেঁচামেচি করে সে দিকেও কল্যাণীর প্রখর দৃষ্টি থাকিত। তাহার ছোটো-খাটো যত্ন এবং সেবার ও তুলনাই ছিল না। ভূপেন চিরদিন আরাম-প্রিয়, চিরকাল বোনেদের কাছ হইতে সেবা লওয়াই তাহার অভ্যাস, তবু তাহার মনে হয় এ সেবার তুলনা নাই। শান্তি খুবই বুদ্ধিমতী—তথাপি তাহাকে ইচ্ছাটা মধ্যে মধ্যে জানাইতে হইত, কিন্তু কল্যাণী প্রত্যেকটি কাজ তাহার মন বুঝিয়া আগে হইতে করে। এমন কি, দূরে থাকিয়াও যেন সে বুঝিতে পারে কখন কি প্রয়োজন ভূপেনের হইবে। এই দেবতার মত সেবায় সে একটু সঙ্কোচ অনুভব করে, বিশেষতঃ একটি ব্যাপারে তাহার লজ্জা যেন ছুনিবার হইয়া ওঠে—এ বাড়ীতে জলখাবারের পাট কাহারও নাই কিন্তু কল্যাণী প্রাণপণ চেষ্টায় যেমন করিয়াই হউক, দুই বেলাই তাহার একটা কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এতগুলি বুভুক্ষু বালকের মধ্যে বসিয়া মুড়ি খাইতেও যেন তাহার গলায় বাধে, অথচ উপায়ই বা কি? পর্য্যাপ্ত ভাতই যাহাদের কাছে বিলাস, তাহাদের সম্বন্ধে জলখাবারের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা; তবে কল্যাণী এই পর্ব্বটার আগে সকলকে সরাইয়া দেয় এবং বরাবরই তাহার ঘরে খাবার পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

এমনি করিয়া ভূপেনের দিন-রাত্রি কাটে, সুখে না হোক আরামে। কলিকাতার কথা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শান্তি অনুযোগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া চিঠি লেখে—'কত দিন তোমাকে দেখিনি, মা রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন! দু'দিনের জন্য এলেও কি পড়ার ক্ষতি হ'ত?…ঐ গরমে, শুনেছি বীরভূমের গরম কাশী-টাশীর চেয়েও বেশী—যদি অসুখ-বিসুখ করে? ইত্যাদি। আর কেহ, সন্ধ্যা—দুই-চার ছত্র চিঠি, তবে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ সন্ধ্যারও কম নয়, 'অত গরম কি সহ্য করতে পারবেন? অসুখ বিসুখ না হলেই বাঁচি'—এ ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্রই নাই তাহার বাহিরের পৃথিবীর সহিত। স্কুল বন্ধ থাকায় বিজয়বাবুদের বাড়ী কেহ আসে না, সে-ও কাহারও সহিত দেখা করিতে যায় না। রৌদ্রের তাপ এত বেশী যে, সকাল ন'টার পর আর বাহির হওয়া যায় না, আবার তাপ কমিতে কমিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়! গ্রামে জলকষ্টও অত্যন্ত, দুবার স্নান ত নয়ই, একবার স্নান করাই কষ্টকর। প্রায় সব কুয়ারই জল শুকাইয়া আসিয়াছে, একটি কুয়ায় কিছু জল জমে—সারা রাত ধরিয়া পাড়ার মেয়েরা সেই কুয়া হইতে জল সংগ্রহ করে, কল্যাণীও ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেইখানে যায়, কোন দিন তিন বাল্‌তি কোন দিন বা দুই বাল্‌তি জল পায়। তাও এক-একদিন শেষের দিকে যাওয়ার জন্য কাদা-ঘোলা থাকে, থিতাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। সুতরাং সে জলে স্নান করিবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। নিকটের একটি পুকুরে কিছু জল আছে—সেইখান হইতেই পানা সরাইয়া কল্যাণী ঘড়া করিয়া জল আনিয়া দেয়—কোন মতে তাহাতেই একবার স্নান সারিতে হয়। সব বিলাসিতাই তাহার গেছে, কিন্তু পুকুরে নামিয়া পানা সরাইয়া স্নান করিতে এখনও ঘেন্না করে। অথচ এত কষ্টের তোলা-জলে দুই বার স্নান করিবার কথা ভাবিতেই লজ্জা বোধ হয়—সে অধিকাংশ সময়ই রৌদ্র ও ধূলা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, যাহাতে দ্বিতীয় বার স্নান করিবার প্রয়োজন না থাকে।

দুপুরে খুবই গরম, তবে কোন মতে দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া ঘরটাকে ঠাণ্ডা রাখে। ফলে রৌদ্রের ঝাঁজটা আসে না বটে, ঘাম হয় অতিরিক্ত। তবু তাহারই মধ্যে ঘুম তাহার ভালই হয়। অবশ্য কেন যে হয় সে কারণটা এক দিন আবিষ্কার করিয়া সে দস্তুর মত লজ্জিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সহসা এক দিন কী কারণে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখিল যে, কল্যাণী তাহার তক্তাপোষের পাশে দাঁড়াইয়া যতটা সম্ভব সন্তর্পণে এবং নিঃশব্দে বাতাস করিতেছে। ফলে ভূপেন আরামে ঘুমাইতেছে বটে কিন্তু কল্যাণী নিজে যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—আরে! তুমি কি রোজ এমনি বাতাস করো না কি? এ কি কাণ্ড! ছি, ছি, এ ভারী অন্যায়।

কল্যাণী লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কহিল, না—না, রোজ নয়। এমনি হঠাৎ একটা কাজে এঘরে এসে পড়েছিলুম, দেখলুম আপনার বালিস-বিছানা ভিজে উঠেছে একেবারে, তাই—

সে আর দাঁড়াইল না, কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই এক প্রকার ছুটিয়া পলাইয়া গেল।…

সে অস্বীকার করিল বটে কিন্তু ভূপেনের বিশ্বাস সে এমনি রোজই বাতাস করে আর সেই জন্যই এত গরমের মধ্যে তাহার বেশ ঘুম হয়। পরের দিন সে সতর্ক হইয়া শুইয়া রহিল, খানিকটা ঘুমের ভাণ করিয়াও রহিল—কিন্তু সে দিন আর কল্যাণী আসিল না! ধরা পড়িয়া যথেষ্ট লজ্জা পাইয়াছে মনে করিয়া ভূপেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু তিন-চার দিন পরে আবার এক দিন কী একটা শব্দে সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কল্যাণী তেমনি দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছে। তাহার যে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে কল্যাণী বুঝিতে পারে নাই—ভূপেন সহসা তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া কহিল, রোজ রোজ এ কী অত্যাচার বলো ত! এমন করলে কিন্তু আমি আজই হোষ্টেলে চলে যাবো।

হাতটা ছাড়াইয়া লইবার খানিকটা বৃথা চেষ্টা করিয়া কল্যাণী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন, কি করেছি!

কী করেছ! একটা লোক আরামে ঘুমোবে আর তুমি এই গরমে দাঁড়িয়ে বাতাস করবে। বা-রে!

কল্যাণী মাথা নীচু করিয়া কহিল, সুখের জন্য কি মানুষ

করে না ? আমার বাবা, ভাইদেরও ত আমি বাতাস করি, শুধু ত আপনাকে না।

ভূপেন নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার ললাট ও কণ্ঠের ঘাম মুছাইয়া দিয়া জোর করিয়া কল্যাণীর হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, বেশ, তাহ'লে এখন আমি তোমাকে খানিক বাতাস করি, তুমি ঘুমোও—

কল্যাণী প্রাণপণে তাহার মুঠির মধ্য হইতে নিজের হাতটা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, ও মা, ও কি ! ছি, ছি, ছাড়ুন—ওতে যে আমার পাপ হয়—ছি, আপনার ছুটি পায়ে পড়ি—

কেন ? বিদ্রূপের স্বরে ভূপেন কহিল, মানুষের জন্ম কি মানুষ করে না ?

দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া কোন মতে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কল্যাণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ভূপেন হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া কহিল, মনে থাকে যেন !

ইহার পর তিন-চার দিন ভূপেন একেবারেই দুপুরে ঘুমাইল না। এত গরমে আহারের পর অন্ধকার ঘরে চোখ আপনিই বুজিয়া আসিতে চায়—রাজ্যের ঘুম আসিয়া যেন আক্রমণ করে কিন্তু তবু ভূপেন বহু চেষ্টা করিয়া জাগিয়াই রহিল। সে বুঝিয়াছিল যে, ঘুমাইয়া পড়িলে কল্যাণী আবারও অমনি বাতাস করিতে আসিবে। তাহার কষ্ট হইতেছে কল্পনা করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না।··· কল্যাণীর এই নিঃশব্দ সেবায় সে মুগ্ধও হয় বৈ কি !···এখানকার এই সহস্র অসুবিধা, দারিদ্র্যের বীভৎস নগ্ন রূপের মধ্যেও এক এক সময় যে তাহার মনে হয় 'বেশ আছি'—ইস্কুলের ছুটি ফুরাইয়া আসিবার কথা মনে পড়িলে মনটা খারাপ হইয়া যায়, এখান হইতে নড়িতে ইচ্ছা করে না—তাহার মূলেও এক মাত্র এই মেয়েটিরই অক্লান্ত এবং সজাগ সেবা। সে কথা ভূপেন আর নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না। কল্যাণীর অন্তরের সমস্ত চিন্তা যে তাহার দিকে একাগ্র হইয়া আছে, সে কথা মনে করিয়া হয়ত শঙ্কিত হওয়ারই কথা কিন্তু সে যেন কেমন একটা পুলকই অনুভব করে—এই পূজার মধ্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবার যে কারণ আছে, তাহা পৌরুষের অহঙ্কারে সুড়সুড়ি দিয়া যেন নেশার আমেজ আনে মনে মনে। তবু, মনের দুর্ব্বলতার চেয়ে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই প্রবল হইল, সে আর কিছুতেই দুপুরে ঘুমাইয়া এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সুযোগ দিবে না স্থির করিল। নিজের দৈহিক আরামের জন্ম অপরকে এত কষ্ট দিবার তাহার অধিকার নাই, তা হউক না কেন সে কষ্টস্বীকার স্বতঃপ্রবৃত্ত !

তবে দুপুরের ঘুমটা ছাড়িয়া দিয়া একটা অসুবিধা হইল এই যে, মোটের উপর ঘুমটাই কমাইয়া দিতে হইল : কারণ, রাত্রে গরমটা তাহার বেশী লাগিত বলিয়া অনেকটা সময়ই তাহাকে এপাশ-ওপাশ করিয়া, হাওয়া ও জল খাইয়া জাগিয়া থাকিতে হইত—সে ঘুমটা আগে পোষাইয়া লইত দুপুরে। রাত্রে বাকী সকলেই বাহিরের দাওয়ায় শোয় কিন্তু তাহাকে কিছুতেই কল্যাণী বাহিরে থাকিতে দেয় না। এ দেশে গরমে না কি ভয়ানক সাপের উপদ্রব হয়—কল্যাণী তাহার বাবা ও ভাইদের হাতে শ্বেত করবীর ডালের মাদুলী করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সাপের ভয় থাকে না, কল্যাণীর অন্ততঃ তাই বিশ্বাস। ভূপেন মাদুলী পরিতে কিছুতেই রাজী হয় নাই—কল্যাণীও তাহাকে বাহিরে শুইতে দেয় নাই। সেই একমাত্র ঘরে চৌকীর উপর শয়ন করিত। ফলে তাহার কষ্ট হইত সব চেয়ে বেশী। অ এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই সে-দিন এক অঘটন ঘটিয়া গেল—

ভূপেন যখন পড়াশুনা বন্ধ করিয়া শোয়, কল্যাণীর জল-তোলা তখনও শেষ হয় না বলিয়া তাহার ঘরের দরজা খোলাই থাকিত কাজ সারা হইলে কল্যাণী এ দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দু' ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজা দিয়া ও-ঘরে যাইত এবং ও-ঘরের কপাটে বাহি হইতে তালা লাগাইয়া সে পিসিমার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িত প্রতিদিনই এই ব্যাপার চলে বলিয়া ভূপেন ইদানীং আলোও নিভাইত না, সে কাজটাও কল্যাণী সারিয়া চলিয়া যাইত। আগে প্রা ভূপেন তখনও জাগিয়া থাকিত প্রায়, কল্যাণী চলিয়া যাইবার সময় হয়ত দু'-একটা কথাও কহিত—কিন্তু এখন দিনের বেলা ঘুমটা বাদ দেওয়ার ফলে প্রথম রাত্রিতে যত গরমই থাক্, সে ঘুমাইয়া পড়ে খুব তাড়াতাড়ি। এদিনও সে ঘুমাইতেছিল অগাধেই—কল্যাণীর আগমন তাহার টের পাইবার কথা নয় ; চৈতন্য ফিরিয়া আসিতে সে চোখ বুজিয়া বুজিয়াই অনুভব করিল যে, ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে— তখন ধীরে ধীরে চোখ খুলিতে প্রথমেই নজরে পড়িল তাহার বিছানার অত্যন্ত কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কল্যাণী। হয়ত কাজ সারা হইয়া গিয়াছে—আলোটা নিভাইবার জন্য এখানে আসিয়া ঘুমন্ত ভূপেনের দিকে চাহিয়া থাকিবার লোভটা সামলাইতে পারে নাই। তাহার চমকিয়া উঠিবারই কথা কিন্তু কী একটা অদ্ভুত কারণে ভূপেন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, এমন কি সে যে জাগিয়া চোখ মেলিয়াছে, সে কথাটাও প্রায়-নিবন্ত লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় কল্যাণী বুঝিতে পারিল না। আরও মুহূর্ত্ত কয়েক তেমনি চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে নিঃশব্দে আরও খানিকটা কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া আঁচলের কাপড় দিয়া সন্তর্পণে তাহার ঘর্ম্ম-ললাট-বুক মুছিয়া লইল।

লণ্ঠনের আলো সামান্যই, ভূপেনের চক্ষুও অর্দ্ধ নিমীলিত, তবু সে মুহূর্ত্তে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সন্ধ্যার কথাই মনে পড়িয়া গেল। অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট শীর্ণ মুখ সেবা ও প্রেমের একটি অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সেই অতি-সাধারণ মুখকেও রমণীয় ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। আত্মনিবেদনের এই গোপন এবং নিঃশব্দ প্রকাশে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম ভূপেনের মাথায় যেন সব গোলমাল হইয়া গেল—তাহার যাহা কিছু শিক্ষা, সংস্কার, আদর্শ সব যেন একটা আবেগের বন্যায় কোথায় ভাসিয়া তলাইয়া গেল ; সে সহসা কল্যাণীকে দুই হাতে ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া লইল।

ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য, আর অতর্কিত যে, কল্যাণী ত বাধা দিতে পারিলই না—ব্যাপারটা অনুভব করিতেই তাহার একটু দেরী লাগিল। তাছাড়া যে বস্তু ছিল তাহার সুদূরতম কল্পনার দুঃসাহসিক স্বপ্ন হইয়া—প্রিয়তমের সেই আকস্মিক স্পর্শে সে কিছুক্ষণের জন্ম বিহ্বল হইয়া ভূপেনেরই বুকের উপর পড়িয়া রহিল— এমন কি, অন্তর যে তাহার কাজ আপনিই করিয়া যাইতেছে, বহু দিনের বহু বেদনা যে দয়িতের স্নেহের স্পর্শে অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই—একেবারে সম্বিৎ ফিরিল ভূপেনের তপ্তচুম্বন যখন তাহার সমস্ত দেহে বিদ্যুতের শিহরণ সঞ্চারিত করিয়া দিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে 'মা গো !' বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া সবেগে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ ।

এই চাঁদ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এই সেই চাঁদ।
কপালে দিয়েছে টিপ, প্রথম কৈশোরে
চোখে উদ্দীপনা জ্বেলে
হৃদয়কে করেছে উন্মাদ।
এই সেই গোল চাঁদ রূপালী-হলুদ।
দূর নীলে বাঁশবনে তমালের ফাঁকে
মেঘেদের সিঁড়ি ভেঙে চুপে উঠে এসে
যে-চাঁদ দিয়েছে ধরা শিশুদের ডাকে,
গোটা পৃথিবীটা যেন হঠাৎ উঠেছে হেসে
গভীর খুসীতে আপনার,
রাত্রির রজনীগন্ধা স্পর্শে যার হয়েছে উন্মাদ,
এই সেই যুগান্তের চাঁদ।

অশোক তরুর 'পরে দেখা যেতো যারে,
ছায়া সরে' যেতো বনে-বনে,
রূপার থালার মতো প্রতিবিম্ব পদ্মদীঘিপারে,
আলো-বিচ্ছুরিত বাতায়নে,
এই সেই চাঁদ।
যখন দিনের শেষে এ সংসার লেগেছে বিস্বাদ,
প্রত্যহের ঘূর্ণিপাকে ভারাক্রান্ত মন,
বারান্দায় এসে বসা, দেহে লাগে হাওয়া,—
উপলব্ধি হয়েছে তখন
এ পৃথিবী হ'তো যদি চাঁদের মতন!
নির্ম্মল প্রশান্তি এক চন্দ্রিকার কাছেই
যে পাওয়া।
এই সেই চাঁদ।
পথ দিয়ে যেতে যেতে উদাস পথিক
অতর্কিত যাকে দেখে হ'য়েছে উন্মাদ।
ছুটেছে তো বারংবার আলেয়ার পিছু,
হয়েছে মাথা নীচু,
নিস্তরঙ্গ বনস্থলী, ক্রমেই বেড়েছে স্তব্ধ রাত
মাথার উপরে জেগে
সারারাত ধরে' এই স্নিগ্ধদীপ্তি চাঁদ।

মনে পড়ে বেণুমতীতীরে
অপূর্ব্ব পুলকরাশি মনে
কুঞ্জতলে থাকে বসে' একটি যুবতী;
স্বপ্ন নামে দু'নয়ন ঘিরে,
নির্ম্মল যৌবনে
স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক পড়ে
দুঃসহ যৌবন নিয়ে চাঁদ খেলা করে বনে বনে।

অনেক যুবতী
অনেক গভীর ক্ষতি
সয়েছে তো যুগে-যুগে ক্ষমাহীন
প্রেমের সংসারে;
অনেক যুবক
মাঝপথে ফেলে গেছে প্রতিরুদ্ধ হ'য়ে
সদ্যোজাত ফুলের স্তবক;
মধ্যরাতে চাঁদ দেখে গেছে মিটে
অন্য যতো সখ।
যে-কার্থেজ ভেঙে গেছে যে-রোমের
স্বপ্ন আর নেই
যে মিশর ভগ্নস্তূপে ভরা,
লুপ্তপ্রাণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে যুগে যুগে
এই চাঁদ ছিল সেখানেই।
অতিক্রান্ত কতো কাল! তবু তো লাগেনি
দেহে জরা।

ধনী-প্রাসাদের চূড়ে, কৃষকের জীর্ণ চালাঘরে
দিগন্তে অম্বরে
সর্ব্বত্র সমানবেগে জ্বলে
পিতৃপুরুষের এক অনির্ব্বাণ আশীষের মতো
চিরজ্যোতিঃ এই চাঁদ;
চাঁদের কটাক্ষ থেকে বঞ্চিত হয়েই যুগে-যুগে
পৃথিবী কি লেগেছে বিস্বাদ।
রূপালী অজস্র আলো প্রসারিত মাঠের ফসলে
অরণ্যশিয়রে, উচ্চতটতলে;
রাতের পাখীরা উড়ে যায়
ডাল হ'তে অন্য ডালে শাদা জ্যোৎস্নায়;
নিঃশব্দ চরণে
রাত্রি-জাগা পলাতক প্রেমিকের মতো
চাঁদের ছায়ারা বনে বনে।

মাঠপারে কৃষিপল্লী সেখানেও চাঁদ
দাঁড়িয়েছে এসে
হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের বেশে,
মুছে নিয়ে গেছে যতো দিনান্তের জরা অবসাদ
দীর্ঘপথে শূন্যক্ষেতে
কণ্টকিত সংসারের পথে যেতে যেতে
নির্ব্বিকার বিধাতার মতো
এই সেই চাঁদ॥

★

সর্পশক্তি সাধনার ব্যাপ্তি

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

সর্পশক্তি সাধনা কুণ্ডলিনী সাধনার নামান্তর। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সর্পের ন্যায় কুণ্ডলী-আকারে প্রসুপ্তা থাকেন এবং জাগরিতা হইলে সাধারণতঃ সর্পের ন্যায় কুটিল গতিতে মূলাধার হইতে মস্তকস্থ সহস্রারে গমন করেন বলিয়া এই শক্তি সর্পশক্তি নামে অভিহিতা। (১)

প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী শক্তি প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে প্রাণ-শক্তি কার্য্য করিতেছে, সাধকদেহে সেই প্রাণ-শক্তি সংযমিত হইয়া যে গতি রূপ গ্রহণ করে, তাহাই কুণ্ডলিনী। (২) অন্য কথায়, প্রাণের সংযমিত গতিই কুণ্ডলিনী শক্তি। প্রাণায়াম সাধনা বলে সাধকদেহে এই শক্তি জাগরিতা হন এবং সাধক এই শক্তির আশ্রয়েই তত্ত্ববস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

শাস্ত্রগ্রন্থের যেখানেই প্রাণায়াম বা প্রাণ সংযমের উপদেশ আছে, সেখানেই সংযমিত প্রাণের গতি এই কুণ্ডলিনীর কথা আছে। আরও, এই শক্তি-সাধনার ভিতরেই ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের যাবতীয় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ইহা কপোল-কল্পিত কিছু নহে। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ স্বীয় দেহমধ্যস্থ শক্তিকে জাগরিতা করিয়া যে তত্ত্বানুভূতি লাভ করেন, তাহাই লোককল্যাণার্থ জনসমাজে প্রচার করিয়া যান। তাঁহাদের সেই সকল অনুভূতি-লব্ধ বাণীই জনসমাজকে শাসন ও নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ইহা শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। যে ধর্ম্মমতের মূলে অনুভূতি নাই, উহা কৃত্রিম; জনসমাজে এইরূপ ধর্ম্ম কখনই বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না।

সাধারণের এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, কুণ্ডলিনী সাধনার কথা কেবলমাত্র যোগতন্ত্রশাস্ত্রেই পাওয়া যায় এবং ইহা বাস্তবিক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট একটি সাধন-পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু এই লেখায় আমরা ইহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, বিভিন্ন ধর্ম্মমত সমূহের মূলে এই সাধনাই বিভিন্ন রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে।

তত্ত্বলাভ করিতে হইলে মনঃসংযম প্রয়োজন—ইহা শুধু হিন্দু ধর্ম্মমতের কেন, সকল ধর্ম্মেরই স্বতঃসিদ্ধ কথা। যেখানে মনঃসংযম, প্রাণসংযম সেখানে অবশ্যই থাকিবে। কারণ, প্রাণ ও মন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এবং প্রাণসংযমের কথা উঠিলেই প্রাণবায়ুসংযমের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। কারণ, প্রাণবায়ু অন্তর্নিহিত প্রাণেরই বহিঃপ্রকাশমাত্র। জগতের সর্ব্বত্রই প্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছে, এই জন্য শাস্ত্রে জগৎকে প্রাণময় বলা হইয়াছে। আজ-কাল জড়-বিজ্ঞানও এই কথা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রাণ-শক্তি হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃতি-সংজ্ঞায় অভিহিত। এবং এই প্রকৃতি যে আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত, তাহাই ব্রহ্ম—চরমতত্ত্ব, পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ, সাধকের সাধনার ধন, বিশ্বচরাচরের পরম আশ্রয়। শাস্ত্রকার আরও বলেন—এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু নহেন; একই বস্তুকে ব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতি এবং অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্ম বলা হয়। ব্যক্ত অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা প্রকৃতি এবং অব্যক্ত বা স্থির অবস্থা ব্রহ্ম নামে কথিত।

এই সাধনা বৈদিক। বেদের মহাবাক্যসমূহ এই সাধনারই অনুভূতিলব্ধ ধন। কপোল-কল্পিত অনুমানবাক্য নহে। এই জন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়; বেদবাক্য অনুভূতিলব্ধ বাক্য, সুতরাং সিদ্ধান্ত বাক্য—উহার উপর কোন কথা চলে না—চলিতে পারে না। কারণ, সাধারণ মানুষ চিন্তা করিয়া কথা বলে এবং এই চিন্তাপ্রসূত বাক্য ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ; কিন্তু অনুভূতিলব্ধ বাক্য চিন্তাপ্রসূত নহে। যেখানে চিন্তা যাইতে পারে না, সেই মহান গভীর হইতে অনুভূতি সত্যদর্শন করে। সুতরাং অনুভূতির উপর কোন কথা চলে না।

যেখানেই প্রাণসংযমের কথা আছে, সেখানেই প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ কুণ্ডলিনী শক্তির কথা আসিতে বাধ্য। বেদে প্রাণায়াম পদ্ধতির কথা সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের এই প্রাণায়াম-পদ্ধতিই যোগতন্ত্রশাস্ত্রের জন্মদাতা। এতদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের সবগুলিতেই প্রাণায়ামকে তত্ত্বলাভের উপায় রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে দেহমধ্যস্থ নাড়ী-আদির প্রসঙ্গও বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে যেখানেই যোগতত্ত্বের কথা আছে, সেখানেই প্রাণায়াম-প্রসঙ্গ রহিয়াছে এবং 'কুণ্ডলিনী-জাগরণ' প্রাণায়ামের অবশ্যম্ভাবী ফল।

সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদোক্ত ধ্যান ও প্রাণায়ামের বিষয় আলোচনা করা যাউক। শ্বেতাশ্বতরে আছে,—

১। সাধারণতঃ সর্পের ন্যায় গতি হইলেও সাধনার অবস্থা ভেদে কুণ্ডলিনীর বহুবিধ গতি হয়। কপিল-গীতায় কুণ্ডলিনীর পাঁচ প্রকার গতির কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। যথা ;—

"পিপীলিকা বিহঙ্গশ্চ কপিমার্গোঽথ মীনকঃ।
শেষমার্গো হি সংখ্যায়াং পঞ্চমার্গঃ পুরাতনাঃ॥ (২।২৩)

পূর্ব্বজ্ঞানিগণ পঞ্চমার্গ বা গতির কথা বলিয়াছেন। যথা ;—পিপীলিকাবৎ, পক্ষিবৎ, বানরবৎ, মীনবৎ ও সর্পবৎ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এই পঞ্চবিধ গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)।

২। (ক) "সুষুম্নাস্রোত চৈতন্যের ধারা—মনকে জাগাইয়া ঊর্দ্ধমুখী সুষুম্নার এই ধারায় স্থাপিত করিতে হইবে। এই জাগ্রত মন মন্ত্রস্বরূপ, ইহাকে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীর স্ফূর্ত্তিও বলা যাইতে পারে।"

"প্রাণ সুষুম্নার স্রোতে বহিয়া উপরে চলিয়া যায়। মনকেও ঐ স্রোতের সঙ্গে চলিতে হইবে। তখনই প্রাণ ও মনের পূর্ণ মিলন সম্ভব হইবে।" ("গোপীনাথ কবিরাজ-লিখিত মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ প্রবন্ধ")

(খ) "ফ্রয়েড সাহেব যার নাম Id বা It দিয়েছেন, সেই অচেতন মনই (unconcious mind) হচ্ছে কুণ্ডলিনী; কিন্তু ফ্রয়েড যে বলেছেন, এই মন কখনই উপলব্ধির মধ্যে আসে না—কেবল অনুমানের দ্বারা একে বুঝতে হয়, সেটা তাঁর ভুল। সাধনশাস্ত্র এই অচেতন মনকে সচেতন করার পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়।"

(গ) "এতেই দেখা যায়—মামুলি ধরণে কারবার করে, ভাবনা চিন্তা, আশা আকাঙ্ক্ষা করে যে আমিটা, সেটা "আমি"র সবটা, এমন কি আসলটাই নয়। ওটা হচ্ছে "ভাসা" আমি surface self—বাইরের ষ্টলে ব'সে কারবার করে, খুচরো কাঁচা হিসেব রাখে। তার পেছনে একটা "বিরাট সম্ভাবনার" (Infinite possibilities)এর আমি রয়েছে। কুণ্ডলিনী শক্তি তার নাম।"

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
সঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ। ৩।"

এখানে ধ্যানযোগের কথা বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরের অন্যান্য স্থানেও ধ্যানের কথা রহিয়াছে। যথা—

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"

তৎপর প্রাণায়াম সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন—

"প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীতঃ।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥"

সুধী ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রাণবায়ু সংযম করিবেন। তদনন্তর অন্যান্য চেষ্টা পরিহার পুরঃসর প্রাণবায়ু ক্ষীণ হইলে নাসাপুট দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিবেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস নিবন্ধন বায়ু ধারণ করিলে চিত্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। চিত্ত বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলীভাব ধারণ করিলে, সেই চিত্ত একমাত্র ব্রহ্মানুসন্ধানে আসক্ত হয়।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ধ্যান ও প্রাণায়ামের বিষয় স্পষ্ট আলোচিত হইলেও দেহমধ্যস্থ নাড়ীচক্রাদি সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কিছু আলোচনা করা হয় নাই। এই আলোচনা স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদে এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্-ভাষ্যে।

কঠোপনিষদে আছে—

"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাম্মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬॥"

উপরোক্ত শ্লোকের শাঙ্করভাষ্য—

"তত্র শতঞ্চ শতসংখ্যাকা একা চ সুষুম্না নাম পুরুষস্য হৃদয়াদ্বিনিঃসৃতা নাড্যঃ শিরাস্তাসাং মধ্যে মূর্দ্ধানং ভিত্ত্বাহভিনিঃসৃতা নির্গতা একা সুষুম্না নাম তয়াহন্তকালে হৃদয়ে আত্মানং বশীকৃত্য যোজয়েৎ। তয়া নাড্যোর্দ্ধমুপর্য্যায়ন্ গচ্ছন্নাদিত্যদ্বারেণামৃতত্বমমরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকম্।"

মাংসপিণ্ডভূত হৃদয়ের এক শত একটি প্রধানভূতা নাড়ী পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। শরীরাভ্যন্তরে অনন্ত নাড়ী অধিষ্ঠিত আছে বটে, কিন্তু এই এক শত এক নাড়ী শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যেও আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রাভিমুখে গমন করিয়াছে।

এই মূর্দ্ধাভিমুখ নাড়ীপথে গমন করিলে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অপরাপর নাড়ী তির্য্যক্ গতিতে সমন্তাৎ গমন করিয়াছে; আর যে ঊর্দ্ধগামিনী অনেক নাড়ী আছে, ঐ সমস্ত নাড়ী সংসার গমনের দ্বারীভূত। উহারা মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৮ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন;—

"তথাপি গন্তৃগমনাদিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়দেশগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মোপাসকানাং মূর্দ্ধন্যা নাড্যা গতির্বক্তব্যা" তথাপি যাহারা গন্তা ও গমনাদি বিষয়ক সংস্কারসম্পন্ন চিত্ত ও হৃদয়প্রদেশে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের জন্য মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নির্গমন বা দেহত্যাগ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ যাঁহারা হৃৎপদ্ম প্রভৃতি স্থানে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মূর্দ্ধন্য—যাহা হৃদয় হইতে মস্তকে যাইয়া সমাপ্ত হইয়াছে (১) সেই নাড়ী (সুষুম্না) দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।—ইহাই ব্রহ্মোপাসকের নির্গমন-দ্বার এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

শ্রুতির আম্নায় অংশেও ষট্চক্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা,—

"পার্থিবাপতৈজসবায়ব্যনভসনামানি ষট্চক্রাণি শাম্ভবাম্নায়মিতি"

যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের ত কথাই নাই; অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আকারে ষট্চক্র এবং সর্পশক্তি কুণ্ডলিনীর কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৮ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলেন:—

"পূর্ব্বং হৃদয়-পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং ততঃ ঊর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যক্ অপ্রমত্তঃ সন্ স এব বুদ্ধিমান্ যোগী কবিং পুরাণমিত্যাদি লক্ষণং তং পরমং পুরুষং উপৈতি।" অর্থাৎ মরণকালে নিশ্চল হৃদয়ে ভক্তি ও যোগবলযুক্ত হইয়া ভ্রূদ্বয়মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী সুষুম্না নাড়ী দ্বারা ভূমিজয়ক্রমে প্রাণকে আবিষ্ট করিয়া সম্যক্ অপ্রমত্ত সেই বুদ্ধিমান্ যোগী, সেই কবি পুরাণ ইত্যাদি নামের প্রতিপাদ্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্য কথায়, "যোগীর এই প্রকার অবস্থার পূর্ব্বে হৃদয়পুণ্ডরীকে অর্থাৎ অনাহত চক্রে ধারণা দ্বারা চিত্তকে বশীকৃত করিতে হয়। তাহার পর ভূমি জয় করিয়া (ভূমিজয় শব্দের অর্থ পঞ্চভূতের বশীকরণ বা ষট্চক্রের ভেদ) প্রাণকে অর্থাৎ সংযমিত প্রাণের গতি কুণ্ডলিনীকে ভ্রূমধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করিয়া, বুদ্ধিমান যোগী পুরাণ নামের প্রতিপাদ্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" 'ভূমি জয়' শব্দের অর্থই যে ষট্চক্রভেদ, ইহা শিবসংহিতা নামক যোগশাস্ত্রে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে মূলাধারচক্র বর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—

যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারবিচক্ষণঃ।
তস্য স্যাৎ দার্দ্দুরী সিদ্ধির্ভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ।

যে যোগী মূলাধার অর্থাৎ ভূমিচক্র ধ্যান করেন, সেই যোগীর প্রাণশক্তি কুণ্ডলিনী ভেকবৎ গতিতে অন্যান্য ভূমি অর্থাৎ চক্র ভেদ করিয়া সহস্রার-চক্রে উপস্থিত হয়। আনন্দ গিরি ও মধুসূদন সরস্বতী উক্ত ৮ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহা আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাষ্যের অনুরূপ।

শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে ষট্চক্র ও সুষুম্নার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বেদান্ত শারীরক ভাষ্যেও যোগতন্ত্রোক্ত ষট্চক্র সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'আনন্দলহরী' এবং 'শাক্তামোদ' গ্রন্থদ্বয়েও ষট্চক্র তথা কুণ্ডলিনীর প্রসঙ্গ রহিয়াছে।

১। এখানে সুষুম্নার অবস্থান হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু তন্ত্রে মূলাধার (গুহ্যদেশের নিকটবর্ত্তী স্থান) হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সুষুম্নার অবস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। তন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে, ষট্চক্রের যে কোন চক্র হইতেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্ভব; চক্রসমূহের মধ্য দিয়াই মেরুদণ্ডমধ্যে সুষুম্না-পথ।

এই সমস্ত দেখিয়া নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব ব্রহ্মবাদকে যোগতন্ত্রের এই চক্র সাধনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ দিতেছেন। বেদান্তসারের টীকায় নৃসিংহ সরস্বতীও প্রাণায়াম প্রসঙ্গে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এবং ষট্‌চক্র সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ষটচক্র সাধনার বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। যথা ;—

ইত্থং মুনিস্তু পরমেদ্ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্‌বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনা পীড্য গুদং ততোঽনিলং
স্থানেষু ষট্‌সুন্নময়েচ্ছিতক্লমঃ। ১১। (২য় স্কন্ধ, ২য় অঃ)

এইরূপে বিশ্বকে ভাবনা করিয়া ঐ মুনি ক্রমে ক্রমে উপরত হইবেন। তাঁহার ষট্‌চক্রভেদ জনিত বিজ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহার প্রভাবে বিষয় বাসনা সকল ধ্বংস করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। তিনি আপনার পদমূল দ্বারা মূলাধার চক্র নিরোধ করিয়া অশ্রান্ত ভাবে নাভি ইত্যাদি ছয় চক্র ভেদ করত প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে নীত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র—"বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গত:
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা" (২য় স্কন্ধ ২য় অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে দুই প্রকার মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। "ইত্থং মুনিস্তু পরমেদ্ব্যবস্থিতো···"শ্লোকে ষট্‌চক্র ভেদের কথা আলোচিত হইয়াছে—ইহাই সদ্যমুক্তি। ষট্‌চক্র ভেদ করত ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণ বহির্গত করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ ত্যাগ করাই সদ্যমুক্তি। ক্রমমুক্তিতে সদ্যমুক্তির মত মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ ত্যাগ না করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থ মহর্লোক ব্রহ্মলোকাদি ভোগ জন্য তত্তৎ লোকে গতি হয় এবং ভোগাবসানে মুক্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২) সূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া ক্রমমুক্তি সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন,—"নাড়ী-রশ্মি ক্রমে অর্চ্চিরাদি পর্ব্ববিশিষ্ট দেবযানমার্গ অবলম্বনে যাঁহারা প্রত্যুক্ত নানা ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, চন্দ্রলোকাদি ভোগলোকগত জীবগণের ন্যায় ভোগান্তে তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তি হইয়া যায়।"

দেবীভাগবত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদি পুরাণ-গ্রন্থাদিতেও যোগতান্ত্রিক ষট্‌চক্রসাধনার বিষয় বর্ণিত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের সাধনার সহিত তান্ত্রিক ষট্‌চক্রসাধনার পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করেন এবং আরও মন্তব্য করেন যে, বেদে ষট্‌চক্র ও সুষুম্নাদি নাড়ীর অস্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও প্রণালীবদ্ধ কোন সাধন-প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনেও যে ষট্‌চক্র এবং কুণ্ডলিনী সাধনা গৃহীত হইয়াছে প্রথমে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। পাতঞ্জল যোগদর্শনের ভোজরাজকৃত বৃত্তি সুধীসমাজে আদরণীয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। পাতঞ্জল যোগসূত্রের যোগপাদান্তর্গত "যথাভি-মতধ্যানাদ্বা"। ৩৯। সূত্রের টীকা করিতে যাইয়া ভোজরাজ বলিতেছেন,—"নাড়ীচক্রাদৌ বা ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরীভবতি"। ৩৯। উক্ত সূত্রগ্রন্থের বিভূতিপাদান্তর্গত ১ম সূত্রের টীকায় ভোজরাজ বলিতেছেন ;—"দেশে নাভিচক্রনাসাগ্রাদৌ চিত্তস্য বন্ধো বিষয়ান্তর-পরিহারেণ বৎ স্থিরীকরণং সা চিত্তস্য ধারণোচ্যতে। পাতঞ্জলোক্ত "ভূমিযু বিনিয়োগঃ" সূত্রের টীকা করিতে গিয়াও ভোজরাজ চক্র-সমূহের প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

'কুণ্ডলিনী জাগরণ' সম্বন্ধে ভোজরাজ বলিতেছেন ;—"উদ্ঘাতো নাম নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভিহননম্"। ৫০। (পাঃ সূঃ, সাধনপাদ) অর্থাৎ বায়ুকে (প্রাণশক্তি কুণ্ডলিনীকে) নাভিমূল (মণিপুর চক্র) হইতে প্রেরণ করিয়া মস্তকে (সহস্রার চক্রে) স্থাপনকে 'উদ্ঘাত' বলে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'রাজযোগ' গ্রন্থে উল্লিখিত ৫০ সূত্রের টীকা করিতে গিয়া ভোজরাজ-কথিত 'উদ্ঘাত'কে 'কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলিয়াছেন।

বেদোপনিষদে যে ষট্‌চক্র ও সুষুম্নাদি নাড়ীর উল্লেখ আছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। তন্ত্রের ন্যায় প্রণালীবদ্ধ সাধন-প্রক্রিয়া যে বেদোপনিষদে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এই যে, সেই প্রাচীন যুগে সূত্রগ্রন্থেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। বর্ত্তমান কালের ন্যায় লিখনযন্ত্রাদি উদ্ভাবিত না হওয়ায় সেই প্রাচীন যুগে আর্য্য ঋষিগণ স্মরণ রাখিবার জন্য সূত্রের কৌশল অবলম্বন করেন। বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত বিভিন্ন সাধন-প্রক্রিয়ার কোনটিরই প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়া বেদোপনিষদে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী কালে লিখনযন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইলে বেদোপনিষদে যাহা বীজ আকারে ছিল, তাহা পরবর্ত্তী সাধকগণ কর্ত্তৃক পত্র-পুষ্প-ফলে পরিণত হইয়া সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শাস্ত্রসমূহ প্রাচীন বেদোপনিষদাদির ব্যাখ্যা মাত্র। বেদে যাহা সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন, পরবর্ত্তী শাস্ত্রাদিতে তাহা বিস্তৃত, স্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল। বেদে যখন আমরা এই সুগোপ্য রহস্যিক সাধনার বিষয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন আকারে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পাইতেছি, তখন ইহার বৈদিকত্ব তো অস্বীকার করাই যায় না, বরং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ ও বিবরণ দেখিয়া এই সাধনার সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র বেদোপনিষদের সংক্ষিপ্ত রাহস্যিক সাধন-সূত্রসমূহের বিস্তৃত, সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা মাত্র। 'নারদপঞ্চরাত্রে' ষট্‌চক্র ও কুণ্ডলিনী সাধনার বিষয় বর্ণিত দৃষ্ট হয়। এক কথায়, যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতাদি হিন্দুর প্রায় সমস্ত শাস্ত্রে কোন না কোন প্রসঙ্গে এই ষট্‌চক্র বা কুণ্ডলিনী সাধনার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

এইবার বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহেও যে এই ষট্‌চক্র বা কুণ্ডলিনী সাধনা বিভিন্ন রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ভেদে ভারতে প্রধানতঃ তিনটি তান্ত্রিক সম্প্রদায় আছে। শৈব, শাক্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে যে ষট্‌চক্র ও কুণ্ডলিনী সাধনা আছে, এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন; কারণ, এ বিষয়ে অল্পবিস্তর সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েও যে ষট্‌চক্র এবং কুণ্ডলিনীর সাধনা আছে, এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। লোকের সাধারণতঃ একটা ধারণা এই আছে যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রও ভক্তিশাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সহজিয়া বৈষ্ণবগণের সাধনায় এই চক্রসাধনতত্ত্ব রূপ, রস রতি, প্রেম, পীরিতি, লীলা, বিলাস প্রভৃতি সংজ্ঞা ও শব্দের আবরণে হেঁয়ালী ভাষায় কি সুকৌশলেই না বর্ণিত রহিয়াছে। চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম দাস প্রভৃতি সহজিয়া সাধকগণের পদাবলী এবং আগম, আনন্দভৈরব, অমৃতরত্নাবলী,

অমৃতরসাবলী, ভৃঙ্গরত্নাবলী, আত্মসারস্বতকারিকা প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। (১)

বৌদ্ধধর্ম্মেও দেহতত্ত্ব সাধনার বিবরণ পাওয়া যায়। তন্ত্রে যেমন মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান মণিপুর প্রভৃতি চক্রভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীর সহস্রার চক্রে যাওয়ার কথা আছে, বৌদ্ধশাস্ত্রেও সেইরূপ প্রমুদিতা, বিমল, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অধিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী, ধর্ম্মমেঘা নামে স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া বোধিচিত্তের নির্ব্বাণলাভের বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধোপদিষ্ট 'অনাপানস্মৃতি' যোগতন্ত্রোক্ত প্রাণায়ামের নামান্তর মাত্র। প্রাণায়ামের ন্যায় 'অনাপানস্মৃতিতেও' নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের ভাবনা করিতে হয়। বৌদ্ধদের অশুভ ভাবনার মধ্যে এক প্রকার গূঢ় সাধনা আছে, তাহার নাম কসিন বা কৃৎস্নায়তন। এই সাধনার সময় যে দশ বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ভাবনা করিতে হয়, তাহাদের নাম। যথা—মৃৎ, বারি, অগ্নি, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আলোক এবং শূন্য বা ব্যোম ভাবনা। তন্ত্রোক্ত চক্রসমূহের মূলাধারকে পৃথ্বীচক্র বা পৃথিবীর স্থান, স্বাধিষ্ঠানকে জলের স্থান, মণিপুরকে অগ্নির স্থান, অনাহতকে বায়ুর স্থান, বিশুদ্ধ চক্রকে আকাশের স্থান বলা হয়। বৌদ্ধগণের এই কসিন বা কৃৎস্নায়তন যোগতন্ত্রের ভূতজয় বা ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়ার সহিত এক ও অভিন্ন। মৃৎ, বারি, অগ্নি প্রভৃতি ভূতসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করা হয় সেইগুলিকে জয় করিবার জন্য। ষট্‌চক্রসাধনাও ভূতগুলিকে জয় করার সাধনা। ভূতসমূহকে জয় করিয়া তত্ত্বে উপনীত হওয়াই কুণ্ডলিনী সাধনার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধদের 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—এই পবিত্র মন্ত্র তন্ত্রের ন্যায় মণিপুরচক্রে 'হুঁ' বীজ ভাবনা করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

তিব্বতের লামাদের মধ্যে এখনও কুণ্ডলিনী-সাধনসম্পন্ন মহাপুরুষ দেখা যায়। (২) বদরিকাশ্রমের ওপারে তুষাররাজ্যে 'চক্রতীর্থ' নামক স্থানে অলকানন্দা তীরে আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে আমি এক উলঙ্গ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করি। তিনি মৌনী ছিলেন। সেই কুণ্ডলিনী-সাধনসম্পন্ন সমাধিবান্ মহাযোগীর ক্ষণেকের সংস্পর্শে জীবন আমার ধন্য হইয়াছে। এই সদা-সমাধিস্থ মহাযোগী পূর্ব্বে তিব্বতের 'থৈলং' মঠের লামা ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর সত্যই বলিয়াছেন,—"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

বুদ্ধদেব স্বয়ং যোগতন্ত্রোক্ত খেচরীমুদ্রা ও ভস্ত্রাখ্য কুম্ভকের অভ্যাস করিয়াছিলেন। স্বকীয় খেচরীমুদ্রা অভ্যাস সম্বন্ধে মহাসত্যক-সূত্রে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন;—"আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করি। তাহা করিবার সময় আমার কক্ষ (বাহুমূল) হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। যেমন কোন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে, তেমন দন্তে দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিলে আমার কক্ষ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। আমার বীর্য্য আরব্ধ হয়। যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, যাহা সম্মূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন প্রশান্ত হয়।"

উদ্ধৃত উক্তিতে বুদ্ধদেব খেচরীমুদ্রা অবলম্বনের কথাই বলিয়াছেন। যাহার সাহায্যে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপিয়া অনশনে ও অনিদ্রায় হঠযোগাভ্যাসে নিরত থাকিতে পারিয়াছিলেন।

এই খেচরীমুদ্রায় তালুমূলে জিহ্বা সংলগ্ন করিয়া থাকার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইতে ক্ষরিত সুধা সমাধি-মগ্ন ব্যক্তির জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখিতে পারে। যোগশিখোপনিষদের ৫ম অধ্যায়, ৩৭-৪৩ শ্লোকে খেচরীমুদ্রা সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে:

"কণ্ঠং সংকোচয়েৎ কিঞ্চিৎ বন্ধো জালন্ধরো হ্যয়ম্।
বন্ধয়েৎ খেচরীমুদ্রাং দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ॥
কপালবিবরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥
খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি॥
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ মৃত্যুর্ভবেত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্॥"

এই খেচরীমুদ্রায় সমাধিমগ্ন ব্যক্তির জীবনীশক্তিই যে শুধু অব্যাহত রাখে, তাহা নহে; যোগের চরম উদ্দেশ্য চিল্লয় জন্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দেরও সঞ্চার হইয়া থাকে। হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে;—

"শ্রীশাম্ভব্যাশ্চ খেচর্য্যা অবস্থাধামভেদতঃ।
ভবেচ্চিত্তলয়ানন্দঃ শূন্যে চিৎসুখরূপিণি॥"

"অবস্থিতি স্থলের ভেদেই শাম্ভবী ও খেচরীমুদ্রার ভেদ হইয়া থাকে। শাম্ভবীমুদ্রায় বাহ্যদৃষ্টিতে অবস্থিতি এবং খেচরীমুদ্রায় ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। শাম্ভবীমুদ্রার ভাবনা-স্থান হৃদয়, খেচরীমুদ্রার ভ্রূমধ্য। কেবল অবস্থিতি-স্থানভেদেই শাম্ভবীমুদ্রা ও খেচরীমুদ্রার ভেদ। পরন্তু, উক্ত মুদ্রাদ্বয়ে চিল্লয় জন্য আনন্দের কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না।

উক্ত মহাসত্যক সূত্রে বুদ্ধদেববর্ণিত অপ্রাণক বা শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান যোগতন্ত্রশাস্ত্রের কুম্ভক প্রক্রিয়ারই নামান্তর মাত্র। উক্ত সূত্রে তিনি ভস্ত্রাখ্য কুম্ভকের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—"আমি মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। আমার মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অত্যধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। যেমন কামারের গর্গরা (ভস্ত্রা, জাঁতা হাপর) হইতে বায়ু নির্গত হইলে অধিক মাত্রায় শব্দ হয়, তেমন মুখে ও নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে।"

যোগশিখা ও যোগকুণ্ডলী উপনিষদ্ এবং হঠযোগপ্রদীপিকায় ভস্ত্রাখ্য কুম্ভকের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা দৃষ্ট হয়:—

১। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা ১৩৫০, অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত 'সহজিয়া সাধন' প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

২। দেখুন—'With Mystics and Magicians in Tibet' by Alexandra David Neel.
P. P. (29—33)
(Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England.)

"মুখেন বায়ুং সংগৃহ্য ঘ্রাণরন্ধ্রেণ রেচয়েৎ।
শীতলীকরণং চেদং হন্তি পিত্তং ক্ষুধাং তৃষাম্।
স্তনয়োরথ ভস্ত্রেব লোহকারস্য বেগতঃ॥
(যোগশিখা, ১ম অঃ, ৯৫-৯৭ শ্লোঃ)
"যথৈব লোহকারাণাং ভস্ত্রা বেগেন চাল্যতে;
তথৈব স্বশরীরস্থং চালয়েৎ পবনং শনৈঃ॥"
(যোগকুণ্ডলী ১ম অঃ ৩৪-৩৫ শ্লো ও হঠযোগপ্রদীপিকা)

হঠযোগপ্রদীপিকা এবং প্রাণতোষণী তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ভস্ত্রাখ্যকুম্ভকের ফলে কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়। যথা;—

"বাতপিত্তশ্লেষ্মহরং শরীরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
কুণ্ডলীবোধনক্ষক্রে ভাবয়ং শুভদং শুচি॥
ব্রহ্মনাড়ীমুখে সংস্থং কফন্নং মলনাশনম্।
সম্যঙ্মাত্রং সমুদ্ভূতং গ্রন্থিত্রয়বিভেদনম্॥
বিশেষণৈব কর্ত্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকন্তিদম্॥"

বুদ্ধদেব যখন ভস্ত্রাখ্য কুম্ভকের অভ্যাস করিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়াছিল। এই সকল কারণেই আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার দশাবতারস্তোত্রে বুদ্ধদেবকে 'যোগিনাং চক্রবর্ত্তী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মহাত্মা কবীর দাসের ধর্ম্ম সাধনায়ও এই ষট্‌চক্র সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কবীর বলিয়াছেন;—

"উলট্‌ত পবন চক্র ষট্‌ভেদে সুরতি সুন্ন অনুরাগী।
আবৈ ন জাই মরৈ ন জীবৈ তাসু খোজ বৈরাগী॥"

বাউল সম্প্রদায়ের সাধনাও মূলতঃ এই ষট্‌চক্র ভেদ দেহতত্ত্ব সাধনা। বাউল বলিতেছেন;—

"পর অর্থে পরম ঈশ্বর আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল বারামখানা, শতদল সহস্রদলে অনন্ত করুণা।"

সৎনামী সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধনতত্ত্ব এই ষট্‌চক্র সাধনা ব্যতীত অন্য আর কিছুই নহে। যথা;—

"অন্দর খোঁজ মিলে সো জ্ঞানী।
নীচে খ্যুল মূল হৈ উঁচৈ অন্‌ভো অকত কহানি।
সাতদীপ নৌখণ্ড মা সোহং সোধর সন্তন জানি॥"

শাস্ত্রে যেমন দেহমধ্যে সপ্ত ভূমিকার (চক্রের) কথা আছে, সৎনামী সাধকও সেইরূপ দেহমধ্যে সপ্তদ্বীপের (চক্রের) কল্পনা করিয়াছেন।

জৈন সাধক চিদানন্দের পদাবলীতেও ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এবং ষট্‌চক্রের উল্লেখ দেখা যায়। যথা,—

"ইঙ্গলা পিঙ্গলা সুখমনা সাধকে,
অরুণ প্রতিথী প্রেম পগীরী;
বঙ্কনাল ষট্‌চক্রভেদকে,
দশমদ্বার শুভজ্যোতি জগিরী।"

মুসলমান দরবেশ ও ফকিরদের মধ্যেও এই সাধন-তত্ত্বের অনুশীলন দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালায় ইঁহাদিগকে বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। ফকির বলিতেছেন;—

"চেয়ে দেখ নয়নে
খড়ের (শরীরের) কোথা মক্কা মদিনা।"
"আছে আদ মক্কা এই মানব দেহে
দেখ্‌না রে মন ভেয়ে
দেশ দেশান্তরে দৌড়িয়ে এবার
মরিস্ কেন হাঁপিয়ে॥"
(লালন ফকির)

লালন ফকিরের গানে দেহমধ্যস্থ পদ্ম বা চক্রসমূহেরও উল্লেখ দেখা যায়। যথা;—

"অচিন্ দলে বসতি ঘর, দ্বিদল পদ্মে 'বারাম' তার।"

শাহ হোসেনের শিষ্য সৈয়দ সুলতান নামক এক জন মুসলমান সাধুর রচিত 'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থে আছে;—

"মধ্যেতে সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বমধ্যে সার।
আদ্যাশক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার॥
পূরকে পূরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সূচীমুখে সূত যেন করে প্রবেশন॥
ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব উদ্ঘাট।
ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট॥
তিনাতিহনীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ॥
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেস॥
সুনিতে সুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ সেই মহাধন॥
সেই ধ্বনি মধ্যেতে যে জ্যোতি চিনি লৈব।
তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব॥
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থা জানিহ নিশ্চয়॥"

সৈয়দ সুলতান তাঁহার রচিত অন্য একখানি যোগগ্রন্থে ষট্‌চক্রে ষড়্‌ঋতুর কল্পনা করিয়াছেন। (অবশ্য চক্রসমূহে ঋতুগুলির কল্পনা যোগতন্ত্র-শাস্ত্রাদিতেও দৃষ্ট হয়।) যথা;—

"আর এক শুন তুহ্মি অপরূপ কথা।
ষড়্‌ঋতু বসতি করএ যথা তথা॥
আধার চক্রে ত গ্রীষ্ম ঋতুর উদয়।
অধিষ্ঠান চক্রে ত বরিসা নিশ্চয়॥
অনাহত চক্রে ত শরৎ ঋতু বৈসে।
বিশুদ্ধি চক্রে ত জান শিশির প্রকাশে॥
মণিপুর চক্রে ত হেমন্ত ঋতু বৈসে।
আজ্ঞা চক্রে ত জান বসন্ত প্রকাশে॥" ইত্যাদি

মুসলমানী বাঙ্গালায় লেখা 'তন্-তেলাওত' বা তনুসাধন নামে একখানি যোগগ্রন্থ আছে। যোগতন্ত্রের ষট্‌চক্র সাধনা এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। যথা;—

"নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন॥
যোগেতে কহি এ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমন্ত বায়ু বৈসে অবিশ্রাম॥
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তাহাতে অধিকার।
নাসিকা নিরক্ষি জান দুয়ার তাহার॥
তাহার খাটান জান ফেক্‌সার স্থান।

• • • •

দিনে চুয়াল্লিস হাজার শোয়াস বয়।
ঘটমধ্যে রাখি বারি (বায়ু ?) যেন মতে রয়।
যাবতে পবন আছে, তাবতে জীবন।
পবন ঘটিলে হয় অবশ্য মরণ॥
নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব।
কণ্ঠে ত টিপ দিয়া নিয়মে রহিব॥
বাম উরুপরে দক্ষিণ পদ তুলি।
নাসাতে হেরিব দৃষ্টি দুই আঁখি মেলি॥
তবে ঘট হতে শোয়াস বাহির হৈব।
যে হেন কচুর পত্র বরণ দেখিব॥
তার মধ্যে মূর্ত্তি এক হৈব দরশন।
সেই মূর্ত্তি আপ্তমার জানিও বরণ॥

আলি রাজা ওবফে কানু ফকির রচিত 'জ্ঞানসাগর' নামক একটি গ্রন্থে যোগশাস্ত্রীয় অনেক কথা আছে। যথা;—

"পুরাণ কোরাণ বেদ জথ নাম ধরে।
সব হ'তে সারতত্ত্ব জে ধ্বনি নিঃসরে॥
'অনাহত' শব্দ যথা সেলাম ওঁঙ্কার।
গুরু বিনু নাই তার গোপন প্রচার॥
প্রথমে পরম গুরু শুদ্ধ হয় জার।
তবে সে পরম ধ্বনি শুদ্ধ হয় তার॥
গুরু শুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি শুদ্ধ হএ।
ধ্বনি শুদ্ধ হইলে শুদ্ধ হইব হৃদয়॥
ওঁঙ্কার সাধন হৈলে নির্ম্মলতা মন।
নির্ম্মল হইলে মন শুদ্ধ হয় তন॥
কাএ আর সাধন শুদ্ধ হএ জে সবার।
প্রভুর পরম পদ শুদ্ধ হএ তার॥"

বাঙ্গালায় প্রচলিত মুসলমানগণের 'মুর্শীদী' গানগুলির মধ্যেও দেহতত্ত্ব বা ষট্‌চক্র সাধনার বিষয় দৃষ্ট হয়। যথা;—

"মানব দেহের ভেদ জানিয়ে কর সাধনা—
দেল্ কোরাণ না হ'লে পরে আয়াত
কোরাণ কেউ পড়ে না।
দেখ মুণ্ডেতে 'মিম' হরফ্ এলো 'হে-জে'
মাজে ছিল,
'তে-জে' দুই কান গেল,
'আইন-গইন' এই দুই নয়ন।
অধরযুগল 'লাম্‌মীম' সর্ব্ব অঙ্গে 'অলেফের'
আর 'শিন'—
দুই বাজুতে 'সিন্' আর 'শিন্' মুখেতে
'বে' র গঠনা,
'লাম-আলিফ ছাকিনখানি 'ছদ' 'ওয়াও'
কণ্ঠেতে জানি।
'জীমে' হয় জিকেরের ধ্বনি 'হে' তে
হাড়ের গঠনা
'ফে' ফ্যাক্‌সায় পানিপোরা 'কাফে'তে
'বড়্‌কাফ্' নাভিতে জোড়া যেথা দমের ঠিকানা;
'নক্‌স্'তে 'নূ' হরফ এলো টিমারি 'হাম্‌জা' আরো,
'দাল্ জাল্, দুই জানুর পরেও
দলিলে তার নিশানা।
মানবদেহের ভেদ জানিয়ে কর সাধনা।"

মোসলেম ফকিরের অন্য একটি ভাবগানে আছে;

"কুম্ভকে সাধন কর আমার মন হইবে দমন
কাম আদি রিপুগণ।
এই নবদ্বার ঘরে তালাকুঞ্জি মেরে
কুম্ভকে দম পুরে ডাক নিরঞ্জন।"

বাঙ্গালী মুসলমানের দেহতত্ত্ব বা ষট্‌চক্র সাধনা সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচনা করা হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্ম্মসাধনার রাহস্যিক জগতে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান ক্রমশঃ এক লক্ষ্য ও এক পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রাহস্যিক তত্ত্ববিদ্যা অনুশীলনে হিন্দু এবং মুসলমান জাতির গণ্ডী ভুলিয়া গিয়া এক লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য একই পথে যাত্রা করিয়াছে।

মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিম মরহুম প্রণীত "এরশাদে খালেকীয়া" বা 'খোদাপ্রাপ্তিতত্ত্ব' নামে মুসলমানী বাঙ্গালাভাষায় লেখা একটি যোগগ্রন্থ আছে। 'অজুতনামা' নামক আর একটি যোগতাত্ত্বিক গ্রন্থও বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।

ইউরোপে যোগিগণ রহস্যবাদী নামে অভিহিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইউরোপে রহস্যবাদের অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপের এই ধরণের এক গোপনীয় রহস্যবাদী সম্প্রদায়কে Rosicruciau Society বলিত। (১) শোনা যায়, এই সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিগণ গোলাপী রঙের ক্রশ-চিহ্ন ধ্যান করিতেন ও গভীর রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া গোপনীয় অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করিতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপীয়গণ বহু রহস্যবাদী যোগীকে জীবন্ত পোড়াইয়া এবং অন্য বিবিধ নির্দ্দয় উপায় অবলম্বন করত যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। ঈদৃশ পরিস্থিতির জন্যই ইউরোপে রহস্যবাদের প্রসার বেশী ঘটে নাই। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই রহস্যবিদ্যার প্রতি অনুরাগ যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

১। দেখুন—The Rosicrucian Cosmo Conception, or Mystic Christianity—by Heindel Max.

পীতাম্বর কালী-প্রতিমা গড়ছিল তার বাইরের চালা-ঘরটির দাওয়ায় বোসে। দাওয়াটি বেশ চওড়া, চার দিকের আলো এসে পড়েছে। আশে পাশে সাজ-সরঞ্জামগুলি সাজানো। চালাটির পিছনে একটি দরজা, বাড়ীর ভিতরে এই দরজা দিয়ে যাতায়াত চলে। সামনে এক ফালি জমি, তার পরেই গ্রামের রাস্তা। ষাটের কোঠায় পড়লেও পীতাম্বরের দেহ এখনো ভেঙ্গে পড়েনি—দীর্ঘ সরল দেহযষ্টি দিব্যি মজবুত, মনটিও বেশ নির্মল আর স্নেহপ্রবণ, সহজেই গলে যায়; কিন্তু অতি-বড় কোন প্রিয়জনও যদি তার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলে বা করে, তাহলেই এই স্নেহময় মানুষটি এক লহমায় একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে ওঠে। এর ফলে, এমন অনেক অনর্থও তাকে পোহাতে হয় যে কহতব্য নয়।

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রতিমার বায়না নিয়ে যা-তা করে কাজ চালিয়ে দেবার পাত্রই নয় পীতাম্বর। প্রতি প্রতিমাখানি সে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে গড়ে, তাতেই তার আনন্দ। পীতাম্বর ব্রাহ্মণ, শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। সুতরাং ধ্যানমূর্ত্তির সঙ্গে মিলিয়ে সে সত্যিকারের প্রতিমাই গড়ে, এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সে। আর্টের নামে কেহ তাকে এ পর্য্যন্ত আদর্শ-ভ্রষ্ট করতে পারেনি, আর এদিক্ দিয়ে আর্থিক ক্ষতিকেও সে দৃক্‌পাত করেনি। কাজেই তার এই পেশাটি রীতিমত সাধনার মত হয়ে আয়ের পথেও অনেকখানি বাধার সৃষ্টি করেছে।

আজ পীতাম্বরের মনটি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে একটানা এতক্ষণ কাজ করে প্রতিমার চক্ষুদান করে নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। গুন্ গুন্ করে একটি প্রাসঙ্গিক রাম-প্রসাদী গান গাইতে গাইতে নিবিষ্ট মনে তুলি চালাচ্ছিল, হাতের কাজটি শেষ হোতে তুলিটি তুলে ভাবময় দৃষ্টিতে প্রতিমার সমুজ্জ্বল মুখখানির পানে তাকাতে তার মুখখানিও আনন্দে ভরে গেল—জগন্মাতার ধ্যানমূর্ত্তির প্রতিবিম্বই ফুটিয়ে তুলেছে সে। এতক্ষণে তার ছুটি, এখন সে নিশ্চিন্ত। স্নিগ্ধ স্বরে জোর গলায় ডাকল: মায়া, মায়া, কোথায় রে?

ভিতর থেকে মায়া উত্তর দিল: এই যে বাবা, কেন?

পীতাম্বর: দেখে যা মা—মায়ের প্রতিমায় চক্ষুদান করেছি, মনের মতন প্রতিমাই গড়েছি রে। অমনি তামাকটা সেজে আনিস্ মা!

বাহিরের চালার ওদিকে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই পড়ে পীতাম্বরের শয়ন-ঘর। তার একমাত্র কন্যা চতুর্দ্দশী তরুণী মায়া তখন স্নানান্তে সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছে, পরনে ডুরে শাড়ী, ভিজে চুলগুলি পিঠে পড়েছে, কাঁখে জলভরা কলসী।

ঘরের এক-ধারে ছোট একটি জলচৌকির উপর ভরা কলসীটি রাখতে রাখতে মায়া সোল্লাসে বলল: নেয়ে এসেছি বাবা, কাপড়খানা ছেড়েই যাচ্ছি।

আলনা থেকে কাপড়খানি নিতে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় সেই ঘরখানির পিছনে বাগান থেকে অজকণ্ঠের অনুকরণে একটি বিকৃত স্বর শোনা গেল: মা—য়া!

মায়ার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা অমনি বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠলো, কাপড়খানা টেনে নিয়ে বললো: আবার সেই হাবাতে ছাগলটা বুঝি এসেছে? দাঁড়া, আজ ঠেঙিয়ে তোর ছালখানা ছাড়াচ্ছি—

কিন্তু জানলার দিকে দু'পা এগিয়েই দেখে—আওয়াজটা ছাগলের নয়—একটি ছেলের। মায়ার চেয়ে বছর পাঁচেক বড়, দিব্য সুশ্রী সুন্দর বাড়ন্ত ও বলিষ্ঠ গড়নের সেই ছেলেটি জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে—চোখ-মুখ দিয়ে কৌতুক হাসি যেন ঠিক্‌রে পড়ছে মায়ার দিকে।

দেখেই মায়ার মুখেও হাসি ফুটে উঠছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কপট কোপে মুখখানি বেঁকিয়ে মুখের হাসিটুকু চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে উঠলো সে: দাঁড়াতো রে, ছাগলটার কান ধরে বিদেয় করি, রোজ রোজ চুরি করে বাগানে ঢোকা বা'র করি!

ছেলেটির নাম মৃগেন। পাড়া-প্রতিবাসী যাদব রায়ের ছেলে। গরাদের ফাঁক দিয়ে কানটা বাড়িয়ে দিয়েই সে হাসিমুখে বললো: ঐ হাতে ধরা দেবার জন্যেই ত রাত-দিন আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ধরা ত দূরের কথা, দেখাই পাই না যে দু'দণ্ড কথা কই!

মায়া জোর করেই যেন সহাস্য মুখখানাকে শক্ত করে একটু ভারিক্কি ভাবেই বললো: খুব হোয়েছে—আর যাত্রার ঢংয়ে কথা কইতে হবে না মশাই! রাত-দিন যাত্রার পালা লিখে লিখে সব সময়ই যেন যাত্রার অ্যাক্টো চলেছে। এদিকে যাত্রা, ও-ধারে মনসার পালা, বাবা রে বাবা!

মনসার পালার নামেই যেন ছেলেটির পিলে চমকে গেল ভয়ে, বলে উঠলো সে: তোমার ছোড়দা, মানে ঐ অতুলদা বাড়ী আছে না কি?

ছেলেটির ভয় দেখে মেয়েটির মুখে উঠলো হাসির ঝিলিক, কিন্তু ছেলেটির চোখে সে হাসি যাতে না পড়ে এমন কৌশলে চেপে সে কপট গম্ভীর ভাবে বললো: আছে বোলে? দেখ না ওদিকে গিয়ে! তোমারই ত খোঁজ করছিল। দেখতে পেলে না কি···এই পর্য্যন্ত বলেই সে হাতখানি তুলে মারবার ইঙ্গিত করলো।

শুনেই মৃগাঙ্ক মুখখানা চুণ করে বললো: তবে আমি যাই।

মৃগেন গরাদে ছেড়ে নামছিল, কিন্তু মায়া এগিয়ে গিয়ে হাতখানা খপ্ করে ধরে বললো: কাকাবাবু বেছে বেছে নাম রেখেছে মৃগ,

ঠিক হোয়েছে; আমি হোলে আরো একটু এগিয়ে যেতুম, নাম রাখতুম—ভ্যাড়া।

মুখখানা আর একটু বাড়িয়ে মৃগেন বললো: তোমার কাছে ত ভেড়া হয়েই আছি, তাতে ত লজ্জা নেই মায়া! কিন্তু তোমার ঐ ছোড়দার চাউনি পর্য্যন্ত যে সইতে পারি না—আচ্ছা মায়া, তোমার বড়দা ত ও-রকম নয়।

বড়দার নামে একটু উচ্ছ্বসিত হয়েই মায়া বললো: বড়দা আমাদের দেবতা, তা ছাড়া তিনিও তোমাকে চিনেছেন ঠিক আমার মতন করে···

চোখ দু'টো বড়ো করে মৃগেন বললো: তার মানে, তোমার মতন তিনিও ভেবেছেন যে আমি একটা ভ্যাড়া?

মুখ টিপে হেসে মায়া বললো: নৈলে তোমাকে অত ভালোবাসেন!

উৎসাহিত হয়ে মৃগেন বলে উঠলো: সত্যি মায়া, গোকুল দা' আমাকে ভারি ভালবাসেন, দেখলেই হেসে কথা বলেন; কিন্তু অতুলদা'র কথা আর বোল না—দেখলেই এমনি চোখ-মুখ করে, যেন আমি চোর! আর কানাই এলে আহ্লাদে অমনি আটখানা। সোঁও এসে জুটেছে ত ওঁর ঘরে?

মুখখানা মচকে মায়া বললো: কে রাখে ঐ হতচ্ছাড়া বয়াটে ছোঁড়ার খবর, দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়—

খুসি হয়ে গলায় একটু বেশী জোর দিয়ে মৃগেন বললো: ঠিক বলেছ, ঐ ছোঁড়াই ত যত নষ্টের গোড়া, তোমার ছোড়দাকে লাগায় আমার নামে—

মুখ-চোখ ও হাতের ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করে চাপা গলায় মায়া বলে ওঠে এই সময়: চেঁচিও না, বাবা ও-ঘরে ঠাকুর গড়ছেন।—ঐ যাঃ, বাবা যে তামাক চাইলেন, আর এমনি তুমি দুষ্টু, কাপড়খানাও ছাড়বার সময় দিলে না—দাঁড়াও, আসছি।

* * * *

বাইরের ঘরে প্রতিমার সামনে বসে পীতাম্বর। চেয়ে চেয়ে দেখছে এখনো কোথাও কোন খুঁত আছে কি না। কিন্তু কোন ত্রুটি না দেখে খুসিতে মনটি ভরে গেছে—গানের সুরটি ভাঁজতে ভাঁজতে রঙের সরা-তুলি তুলে কুলুঙ্গীর উপরে রাখতে গেছে, এমন সময় দেখতে পেল—রাস্তা দিয়ে যাদব রায় হন্ হন্ করে চলেছে। পীতাম্বর ডেকে দিল: যাদব না কি হে? বলি, দেখতেই যে পাই না আজ-কাল! চলেছ কোথায়?

যাদব রায় প্রতিবাসী এবং স্বজাতি। বয়সে পীতাম্বরের চেয়ে ৪ বছর ছোটই হবে। ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে তার পর পীতাম্বরের বাড়ীর হাতায় ঢুকতে ঢুকতে বললো: আর বল কেন? ঐ বাগ্‌দী বেটার কাছে খাজনার তাগিদে চলিছি। নামে সত্য হলে কি হবে—বেটা মিথ্যের ধাড়ি—সাক্ষাৎ কলি। তিন দিন ধরে ঘুরছি, তবু তার চুলের টিকিটির খোঁজ নেই।

পীতাম্বর হেসে বললো: আরে এসো এসো, একটু গুড়ুক খেয়ে যাও—বসো।

—দাও, দুটো টান মেরেই যাই।···বলতে বলতে তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধা পৈইটে দিয়ে যাদব দাওয়াটির উপরে উঠে এলো। পীতাম্বর বেতের মোড়াটি আগিয়ে দিতেই বসে পড়লো তার ওপর। পীতাম্বরও বসল তার চৌকিতে। বসতে বসতেই বলল সে—তোমরা বেশ আছ ভাই! টাকা···সম্পত্তি···খাজনা···এক গাছ আশা। তা, পাওনাটা কত?

যাদব: সে কথা আর বল কেন। এক টাকা তিন আনা আড়াই পাই—এই আদায় করতে তিন দিনে পায়ের চামড়া উঠে গেল!

পীতাম্বর: ও, তাহলে ত মস্ত সম্পত্তি হে! উঠে-পড়ে লেগে যাও।

যাদব: তুমি ত ঠাট্টা করবেই হে! কিন্তু টাকা-কড়ির ব্যাপারে তিল কুড়িয়ে যে তাল করতে হয়—এ জ্ঞানটুকু তোমার থাকলে ও-সব ছেড়ে-ছুড়ে পুতুল তৈরী কর!

পীতাম্বর: কি বললে? আমি কি তৈরী করি?

যাদব: আরে—আরে, চট কেন? বলি, সংসারধর্ম্ম করতে হলে আয়-টায় বাড়াবার দিকেও ত একটু নজর দিতে হয়! এই যে ঝোঁকের বশে অতবড় বায়নাটা সেদিন ছেড়ে দিলে, বলি কাজটা কি খুব ভালো করেছিলে?

পীতাম্বর: যাও, যাও—তোমার তাগাদায় যাও, আর বক্তৃতা দিতে হবে না।

যাদব: আমার কি বল না, তোমার ভালোর জন্যই বলি। আমার মৃগকে ত আর তোমার মেয়ের আশায় ফেলে রাখতে পারিনে। তার বিয়ের ত চেষ্টা করতে হবে। আর, তোমার মেয়েটারও একটা গতি করতে হবে না কি?

ঠিক এই সময় কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে মায়া বাপের হুঁকাটি নেবার জন্যে বাইরের চালাঘরে আসছিল, সংলাপগুলি শুনতে পেয়েই দরজার আড়ালে থমকে দাঁড়ালো। কান দু'টি তার বাইরের দুই শ্রদ্ধাভাজনের কথোপকথনে নিবিষ্ট হোল।

পীতাম্বর: সে ব্যবস্থা আমি না করেছি না কি? ঐ তালতলার বন্দের দু' বিঘে লাখরাজ ঝেড়ে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব। তোমার পণের টাকা কড়ায়-গণ্ডায় পেলেই ত হোল! সে দু'শো টাকা আমার জোগাড় করাই আছে।

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদব: বেশ, তা হলেই হোল। কৈ, তোমার গুড়ুক কোথায় হে?

পীতাম্বর: রোস না—মায়া সেজে আনছে, মেয়ে এসে কাপড় ছাড়ছিল কি না।—বলেই সে আর একবার মেয়ের নাম ধরে ডাক দিল: অ মা মায়া—হোল রে?

মায়া তখন হাত বাড়িয়ে এঁদের অলক্ষ্যে দেওয়ালে ঝোলানো

হুঁকাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি জল ফেলে ভরতে লাগলো—সাজা কলকেটি ভিতরের দিকের দেওয়ালের গায়ে ছোট একটি কুলুঙ্গিতে রেখে। সেখান থেকেই সাড়া দিল: হোয়েছে বাবা, নিয়ে যাচ্ছি।

যাদব: আমি বলছিলাম নিশ্চিন্তিপুরের সেই বায়নাটা নাও; এখনো আমার হাতে, বল তো কালই পাকা করে ফেলি। এতে পাবে দু'শো টাকা, তোমার ঐ দু' বিঘে লাখরাজ আর বেচতে হয় না—

পীতাম্বর: না—না—না—টাকাটাই আমার রক্তমাংস নয় তোমার মতন; টাকার জন্যে ওদের হুকুম মতন ঐ তোমার কি বলে—'ওরিয়েন,' না 'এরিয়েন্টো'—আমি ওসব গড়তে পারবো না। ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে 'এয়াকি?' সে আমি করতে পারবো না। মাজা সরু হবে, ঘাড় দোলানো হবে, হাত গাছের ডাল-পালার মতন এঁকে বেঁকে থাকবে—না, না, ওসব আমার দ্বারায় হবে না যাদব! মায়ের মূর্ত্তি গড়ি বলে টাকার জন্যে ও-রকম নোংরামী করতে পারব না আমি।

যাদব: কেন পারবে না শুনি? আর সকলেই ত এখনকার পছন্দ মতই ঠাকুর গড়ছে।

পীতাম্বর: ওরা গড়ে বলে আমাকেও গড়তে হবে? জানো, আমি ধ্যানে যা দেখি তাই গড়ি, কারুর পছন্দ বা ফরমাসের কোনো তোয়াক্কাই রাখি না। আমি আমার আদর্শ হারাব না। খবরদার বলছি, যার দিগর আমার সামনে আর ও-কথা বোল না।

যাদব: ও! আদর্শ! ধ্যান! ধেড়ে মেয়ে যার গলায়, তার মুখে ওসব কথা খাটে না। যাদের টাকা আছে বড় বড় বুলি ঝাড়া তাদেরই সাজে। আহা ধ্যানের কি মূর্ত্তিই গড়েছেন—দশ টাকা দিয়েও কেউ নেবে না···

পীতাম্বর: কি! আমার সাধনার অপমান! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! যাও তুমি—আমার মেয়ের বিয়ে তোমার ঘরে আমি দেব না—কখ্‌খনো না—যাও, যাও, যে মস্ত তশীল করতে যাচ্ছিলে সেইখানে যাও।

যাদব: হুঁ? বড় বড় কথা। বেশ, আমিও দেখে নেব—কি করে মেয়ের বিয়ে দাও। এই চললুম।

হুঁকার জল ফিরুতে ফিরুতে শেষের কথাগুলোও মায়া শুনেছিল, চট করে অমনি সে সাজা কলকেটি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে ভিতর দিকের দরজা দিয়ে বাইরে এলো, মুখখানা তুলে বেশ সহজ কণ্ঠেই সহাস্যে বললো: তামাক খেয়ে যান কাকাবাবু,—আমার সঙ্গে ত আপনার ঝগড়া হয়নি।

যাদব তখন চটে গেছে, গায়ে জ্বালা ধরেছে। পীতাম্বরের ওপর যে রাগ জমে উঠেছিল সেটা ঝাড়লো মায়ার ওপর। মুখখানা বিকৃত করে বলে উঠলো: এঃ! কাকাবাবু! বেহায়া ধুম্‌সি মেয়ে কোথাকার······

পীতাম্বর: আমার মেয়েকে গাল দিও না বলছি যাদব, ভালো হবে না······

যাদব: নাঃ—দেবে না!···ফের যদি দেখি কোন দিন মৃগর সঙ্গে মিশছে ত দেখে নেব! বাপের এত বড় মুখ, বলে কি না বেরিয়ে যাও!

হাসি-কান্না

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

হাসবে যদি শুভ্র হাসি
যূথীর রাশি শিশুর মত
সবাই হেসে উঠবে সাথে
হাস্য দেখে হাস্‌তে রত।
কান্না যদি বক্ষ টুটে
অশ্রু উঠে উথলে চোখে
তাহার সাথী কেউ মেলে না
একলা কাঁদো নিজের শোকে।
কান্না মেলে মন দরুণে
সুখ মেলে না তাও তো জানো
দুখের পরে সুখের হাসি
মাঘের মেঘে রোদ পোহানো।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে একটা কলহের কলরব আসছিল বাইরে—পিতা কন্যা উভয়েই যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে: মায়া ক্রুদ্ধ যাদব রায়ের পানে একবার চেয়েই হুঁকোটি পীতাম্বরের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল। যাদব এই সময় বললো: এই বেরিয়ে গেলাম—এর জন্যে এক দিন পায়ে ধরতে হবে···

শুনেই পীতাম্বর তেতে উঠে ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো: যাও, যাও, কে কার পায়ে ধরে তখন দেখা যাবে। তোমার নিজের ছেলেকে সামলাও গে।

'আচ্ছা!'···সরোষে এই কথাটা বলে যাদব হন্ হন্ করে চলে গেল। পীতাম্বরের মনটা তখন দমে গেছে, হুঁকা হাতে করে বসে যাদবের চলে যাওয়াটা উদাস দৃষ্টিতে দেখছে, আবার বাড়ীর ভিতরের গোলমালটাও তার মনে আর একটা ঘা দিচ্ছে যেন। ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েই অনিচ্ছার সঙ্গে সবেমাত্র হুঁকায় মুখ দিয়েছে, এমন সময় মায়া ছুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো: বাবা, শীগ্‌গির বাড়ীর ভেতর চলো, বড়দা আর ছোড়দায় কুরুক্ষেত্র বেধেছে।

হুঁকায় আর টান দেওয়া হল না তার। ক্ষিপ্রহস্তে খুঁটির গায়ে নামিয়ে রেখে রুক্ষ-কণ্ঠে বলে উঠলো: তোরা সবাই মিলে আমার পুড়িয়ে চিবিয়ে খা! এদিকে ছেলের বাপের তম্বী, ওদিকে নিজের ঘরে দুই ভেয়ে ত্রিশ দিন ঝগড়া! উঃ, কি সুখেই আমাকে রেখেছ ভগবান্! দাঁড়া ত, আজ এর নিষ্পত্তি করে তবে নিশ্চিন্তি! একটা দিক্ ভেঙেছি, এবার এদিক্‌টাও ভেঙে দিয়ে—জ-মা জগদম্বা, তোর মতই বেপরোয়া হয়ে বাঁধন খুলে নাচতে থাকি!—কথাগুলো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে বলতে পীতাম্বর ভিতরে চলে গেল।

মায়া কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে—দু'দণ্ডের মধ্যে এসব হোল কি! মহাকালীর নগ্ন মূর্ত্তির পানে চেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে।

বাংলার লোক-দেবতা ও লোকাচার

[বনদুর্গা]

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

শ্রীকামিনীকুমার রায়

বনদুর্গার ব্রতের রাজসংস্করণ—'গাছের গোড়ার বর্ত্ত' বিবাহ, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকাশৌচান্ত, অন্নারম্ভ প্রভৃতি শুভকার্য্য উপলক্ষে সন্তানের মঙ্গল কামনায় ময়মনসিংহের বহু স্থানে বহু হিন্দু পরিবারে বিশেষ আয়োজন-উদ্যোগ করিয়া 'গাছের গোড়ার বর্ত্ত' করা হয় ৭। ইহাতে ছাগ-মহিষাদি পর্য্যন্ত বলি পড়ে এবং অনেক সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতও ডাকিতে হয়; মেয়েলি গীত এবং ঢাক-ঢোলের বাজনারও অভাব থাকে না। অনেকে মানত করেন, 'আমার কিংবা অমুকের যদি সন্তান হয় তাহা হইলে এই এই উপকরণে, এই এই ভাবে বনদুর্গার পূজা করিব বা করিবে।'

মানত অনুযায়ী তাঁহারা বনদুর্গাকে বুক চিরিয়া রক্ত দেন; অনেকে বা সন্তানের সমান ওজনে চিনি-বাতাসা বা অন্য কোনও জিনিস নিবেদন করেন। বুকের রক্ত সাধারণতঃ নাপিত তাহার নরুণের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়; অনেক সময় ব্রতিনী নিজ হাতেও বাহির করেন; পান, শেওড়াপাতা অথবা বটপাতায় করিয়া তাহা দেবীর উদ্দেশে দেওয়া হয়। কেহ বা সন্তানের কুশলার্থ একটি প্রমাণ মাপের শাড়ী গাছে জড়াইয়া দেন; ব্রতান্তে এই শাড়ী মালীতে নেয়, তাহার অভাবে পুরোহিতের প্রাপ্য হইয়া থাকে।

জাতকাশৌচ-অন্ত-দিবসে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের অনেক হিন্দু-সম্প্রদায়-মধ্যে বনদুর্গার ব্রত, বরকুমারের ব্রত, একাচুবার ব্রত, উক্‌-মাইর ব্রত, সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই সব কয়টি অনুষ্ঠানকে একত্রে বলা হয় অশৌচান্তের ব্রত। চলিত কথায় 'অশুজান্তের বর্ত্ত।' অর্থাৎ শরীর ও মনের শুচিতা ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে যে যে ব্রতানুষ্ঠান করা হয়, তাহাদের সমন্বিত নাম অশৌচান্তের ব্রত। 'বাইর বর্ত্ত' নামটিও কোথাও কোথাও (শ্রীহট্ট-প্রান্তে) শুনা যায়। উক্ত দিবসে উক্ত সকল অনুষ্ঠানই ঘরের বাহিরে করিবার নিয়ম। অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মধ্যে অশৌচান্তের ব্রত যথারীতি সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রসূতি পূজনীয়-পূজনীয়াদের স্পর্শ করিতে বা তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতে পারেন না। আলাপসিংহ পরগণায় এত সব ব্রতের হাঙ্গামা নাই; সূর্য্যার্ঘ্যমাত্র প্রদান করিয়াই সে দিকে রেহাই পাওয়া যায়।

গাছের গোড়ার ব্রতের সাধারণ নিয়ম:—পূজনীয় শেওড়া বা বটগাছের (পূজনীয় গাছের অভাবে সাধারণ শেওড়া বা বটের ডাল পুতিয়া তাহার) গোড়ায় কলার পাঁচটি আগপাতায় আতপের চিড়া, চাট খৈ, ৮ ঝাঁই, ৯ গুঁড়া, ঝিকর, ১০ আইট্যা কলা, ১১ ফুল দূর্ব্বা, চিনি বাতাসা প্রভৃতির নৈবেদ্য দিতে হয়। বনদুর্গা গাছের মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন—এই বিশ্বাসে ব্রতিনী গাছের ডালে শাঁখা-সিঁদুর, আয়না-চিরুণী, লাল-হলুদ সূতা, কাপড় অথবা তৎপরিবর্ত্তে হলুদ দিয়া রং-করা কাপড়ের টুকরা, ঝুলের কালিতে রং-করা কাপড়ের পাড়, দুইটি আইট্যা কলা, দুই ভাগে পান-সুপারি ও দুই মুঠ মাখা চিড়া-গুঁড়া দিয়া থাকেন। অপর একটি আগপাতায় পিটুলীর ১২ তৈয়ারী দুইটি মূর্ত্তি ও মাটীর তৈয়ারী কাল রংএর দুইটি গোলাকার চুড়ি দেওয়া হয়। মূর্ত্তি দুইটির প্রচলিত নাম 'শাঁখাপুত্‌লা' এবং চুড়ি দুইটির নাম 'কাঁচ,' এতদ্ব্যতীত কলার খোলের ১৩ দুইটি ডোঙ্গায় ১৪ করিয়া ধান ও চাউল এবং দুইটি হাঁসের ডিম দিবারও রীতি আছে। ছাগ-মহিষাদি বলি দিবার 'মানত' থাকিলে ব্রাহ্মণ আসেন, নতুবা ব্রতিনী ও তাঁহার সহকারিণীগণই পৌরোহিত্য করেন। ব্রতের শেষ দিকে ব্রতিনী 'সই' 'সই' বলিতে বলিতে গাছের সঙ্গে সাত বার কোলাকুলি করেন ১৫ এবং দুই ভাগে দেওয়া পূর্ব্বোক্ত উপকরণাদির এক ভাগ নিজের দিকে টানিয়া আনেন, আর এক ভাগ গাছের দিকে ঠেলিয়া দেন; আবার নিজেরটি গাছের দিকে ঠেলিয়া দেন এবং গাছেরটি নিজের দিকে টানিয়া আনেন। সাত বার এইরূপ করিবার পর ব্রতিনীর সহিত বনদুর্গার সখিত্ব (সইয়ালা) পাকা হয় এবং ব্রতিনী এক ভাগ উপকরণাদি লইয়া ঘরে ফিরেন। গাছের পাঁচটি পাতা এবং ধানের ডোঙ্গাটিও কুলায় করিয়া লইতে হয়; কুলাটি সন্তানের মাথায় ছোঁয়ান হয়।

যে পল্লীতে গাছের তলদেশ পরিষ্কার করিবার জন্য মালী (ভূঁইমালী) আছে, সে পল্লীতে গাছের গোড়ায় ব্রতের পরিত্যক্ত জিনিষপত্র মালীরা লইয়া যায়, নতুবা গাছের গোড়ায়ই পড়িয়া থাকে।

মেয়েলি সঙ্গীত 'গাছের গোড়ার বর্ত্তের' একটি বিশেষ অঙ্গ। এই ব্রতের কোন ব্রত-কথা নাই; গীতগুলিই তাহার স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সব গীত লেখাপড়া না জানা গ্রাম্য মেয়েদের দ্বারা অমার্জ্জিত গ্রাম্য ভাষায় রচিত এবং শাশুড়ী হইতে বধূতে, মা হইতে মেয়েতে, প্রাচীনা হইতে নবীনায় যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষানুক্রমে শুনিয়া শুনিয়া গাহিয়া আসিতেছে। ব্রতকালে ব্রত-স্থানে উপস্থিত থাকিয়া গীতগুলি নিজের কানে না শুনিলে শুধু পড়িয়া তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। কি করিয়া আমি সেই অভিনব সুর—কথার বিচিত্র টান এখানে উপস্থিত করিব? এই গীতগুলি ব্রতটিকে জীবন্ত ও আনন্দমুখর করিয়া তোলে, তাহার প্রাণের কথা কয়।

ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে গীত চলিতে থাকে। এখানে ময়মনসিংহের হুসেনসাহী এবং নসিরুজিয়াল পরগণার কয়েকটি গীত যতদূর সম্ভব গায়িকাদের ভাষায় দেওয়া হইল। গীতোক্ত দুই-চারটি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায় না, গায়িকারাও তাহা বলিতে পারেন না, পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন, সেইরূপ গাহিয়া আসিতেছেন।

বনদুর্গার গীত

(ক)

কই গেলা গো মালী ছেড়া ১৬, এব'১৬ক আইস চাই ১৭
পন্থখানি ১৮ চাইছা ১৯ দেও সইয়ের ২০ বাড়ী যাই।

---

৭ ঢাকাতেও ত্রিমোহানার ঘাটে এইরূপ সমস্ত শুভকার্য্যের পূর্ব্বে বিশেষ ঘটা করিয়া বনদুর্গার পূজা করা হয়। বগুড়ায়ও বিবাহ, অন্নারম্ভ প্রভৃতি ব্যাপারে 'বুড়ীর' পূজা হইয়া থাকে। এই বুড়ী না কি বনদুর্গারই নামান্তর।

৮ বিনা বালুতে ভাজা ধানের খৈ, ৯ চাউল পোড়া, ১০ খাইবার পোক্তা মাটি-বিশেষ, ১১ বীচি কলা-বিশেষ।

১২ চাউল বাটা, ১৩ কলা গাছের আবরণ, ১৪ খোলের তৈয়ারী পাত্র-বিশেষ, ১৫ এই সময়ে ব্রতিনীরা একটি বেশ উপাদেয় গীত গান; এই নিবন্ধের শেষাংশে তাহা দেওয়া হইল। 'চ' গীত দ্রষ্টব্য।

১৬ ছেলে, ছোঁড়া, ১৬ক বিশেষ অর্থ নাই, কথার টান, ১৭ আসত, তোমার আসা চাই, ১৮ পথটি; 'খানি' যোগ করায় 'পন্থের' কর্কশতা দূর হইয়া গিয়াছে। ১৯ চেঁছে, ২০ সখী [illegible]

কই গেলা গো মালী ছেড়ি ২১, এর' আইস চাই
পন্থখানি ছিটাইয়া ২২ দেও সইয়ের বাড়ী যাই।
কই গেলা গো প্রাণের ননদী ২৩ এর' আইস চাই
গয়নাখানি পরাইয়া দেও সইয়ের বাড়ী যাই।
কই গেলা গো প্রাণের দেওরিয়া ২৪ এর' আইস চাই,
সোয়ারিখানি ২৫ আইনা দেও সইয়ের বাড়ী যাই।
কই গেলা গো গুণের শাশুড়ী এর' আইস চাই
শঙ্খ-সিন্দুরে সাজাইয়া দেও সইয়ের বাড়ী যাই।

* * * * *

ব্রতিনী ব্রতের উপকরণাদি লইয়া শেওড়াতলে (অথবা বটতলে) যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বনদুর্গাশ্রিত শেওড়া বা বটগাছ সাধারণতঃ বাড়ী হইতে দূরে বনের অথবা বাগানের প্রান্তে থাকে। সেখানে যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই, ঘাস-জঙ্গল মাড়াইয়া যাইতে হয়; কিন্তু ব্রতিনী তাহা করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে যাইবার পথ পরিষ্কার ও শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বকালে এই দেশে মালী (ভূঁইমালী) সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ ছিল—রাস্তা-ঘাট, উঠান-আঙ্গিনা ইত্যাদি ঝাঁট দেওয়া। বিবাহের সময় তাহাদিগকে মশাল-ধারীর কাজও করিতে হইত। এই সকল কাজের জন্য তাহারা নাখেরাজ ভূসম্পত্তি পাইত এবং পুরুষানুক্রমে তাহা ভোগদখল করিত। এই সম্প্রদায় অনেক গ্রাম হইতেই ক্রমে লোপ পাইয়াছে এবং এখনও যেখানে আছে, সেখানে তাহারা পূর্ব্বের জাতিগত ব্যবসায় করিতে ইতস্ততঃ করে। উপরি-উক্ত গীতটি অধুনাপ্রায় লুপ্ত পূর্ব্ব প্রথারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এখানে ব্রতিনী (এবং তাঁহার সঙ্গিনীরা) পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী পথ পরিষ্কার করিবার জন্য মালীর ছেলেকে এবং গোবর-জল ছিটাইয়া তাহা শুদ্ধ করিবার জন্য মালীর মেয়েকে ডাকিতেছেন—

'কই গেলা গো মালী ছেড়া, এর' আইস চাই'.

ব্রতিনী সখীর (বনদুর্গার) বাড়ী যাইবেন; শুধু পথ পরিষ্কার এবং শুদ্ধ হইলেই ত চলিবে না, নিজেরও একটু সাজিয়া গুজিয়া জাঁক-জমক করিয়া যাইতে হইবে। তাই প্রথমেই ডাক পড়িল প্রাণপ্রিয়া ননদের গয়নাপত্র পরাইয়া দিবার, তার পর ডাক পড়িল প্রাণপ্রিয় দেবরের দোলা আনিবার। গুণবতী শাশুড়ী তিনিই বা বাদ যাইবেন কেন, তাঁহারও ডাক পড়িল শঙ্খ-সিন্দুরে সাজাইবার।

এই গীতে এবং পরবর্ত্তী আরও অনেক গীতে এবং ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানে অনেক স্থলে বনদুর্গাদেবী ব্রতিনীর অন্তরঙ্গ সখী (সই) রূপে পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন। অনন্ত শক্তিসম্পন্ন দেবদেবীকে যে মানুষের মত করিয়া ভাবা, দেখা, দূরের তাহাদিগকে ঘরের অতি নিকটে পরম আত্মীয়-বান্ধবরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, তা যে কত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কে বলিবে? 'আগমনী' সঙ্গীতগুলিতে আমরা আদ্যাশক্তি দুর্গাকে আমাদেরই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের বিবাহিতা কন্যারূপে, আর এই মেয়েলি বনদুর্গার গীতগুলিতে বনদুর্গাকে ব্রতিনীর সখীরূপে দেখিতে পাই। এই যে কন্যাভাবে, সখীভাবে আরাধ্য দেবীর উপাসনা তাহা সাধনার শ্রেষ্ঠ স্তর হইলেও ইহার প্রবর্ত্তক গ্রামের শাস্ত্র-জ্ঞানহীন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক।

(খ)

লাম লাম ২৬ বনদুর্গা যাইট ২৭ শেওড়ার নীচে।
কিমতে ২৮ লামিবাম আমি শাড়ী নাই আমার সঙ্গে?
সইয়ারে ২৯ পাঠাইয়া দিছি নশিরাবাজের ৩০ শ'রে
শাড়ী যে আনিছেন সইয়ায় সিঙ্গিরায় ৩১ বইলে ৩২।
লাম লাম বনদুর্গা যাইট শেওড়ার নীচে
কিমতে লামিবাম আমি শঙ্খ'সন্দুর নাই আমার সঙ্গে
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি শম্ভুগঞ্জের ৩৩ হাটে
শঙ্খসিন্দুর যে আনিছেন সইয়ায় কাগজে বইলে ৩৪।
লাম লাম বনদুর্গা যাইট শেওড়ার নীচে।

ব্রতিনী ব্রতের উপকরণাদি লইয়া শেওড়াতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বনদুর্গাকে শেওড়াগাছ হইতে নীচে নামিয়া আসিতে বলিতেছেন। কিন্তু বনদুর্গার পরিধানে শাড়ী নাই, হাতে শাঁখা নাই, কপালে সিঁদুর নাই, এমতাবস্থায় তিনি এত লোকের মধ্যে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন? ব্রতিনী জানাইলেন, তাঁহার ইতস্ততঃ করিবার কিছু নাই; তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁহার বসন-ভূষণ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন,—তাঁহার সইয়া (সখীর স্বামী) নশিরাবাদের শহর হইতে শাড়ী এবং শম্ভুগঞ্জের হাট হইতে শঙ্খ'সন্দুর আনিয়া দিয়াছেন। কাজেই তাঁহার নামিতে বাধা নাই, নামামাত্রই তিনি পরিধেয় সব কিছু পাইবেন।

পরবর্ত্তী গীতেই আমরা দেখিব যে, বনদুর্গা ইছামতী ও ধলাই (ধলেশ্বরী?) নদী পার হইবার কালে খেয়ানীকে পারের মাশুল-স্বরূপ তাঁহার নাকের বেশর, হাতের শঙ্খ এবং পরিধানের শাড়ী দিয়া আসিয়াছেন। তাই হয়তো এখানে তিনি বিবসনা বিভূষণা।

(গ)

কাটারিয়ে ৩৫ কাটিয়া, বাটারে ৩৬ ভরিয়া
রাজসভা দেবসভা জানাইয়া আইন গিয়া
দেবী যাইবাইন ৩৭ সইয়ালায় ৩৮ গো, কেকে যাইবা সঙ্গে
সই আইস ৩৯ বইস। ৪০
দোলা যে পাঠাইছলাম সই তাতে না আইলা কেন, ৪১
ইচ্ছামতী ৪২ ধলাই গাং ৪৩ কেমনে হইলা পার
সই আইস বইস।

---

২১ মেয়ে, ছুঁড়ী। ২২ গোবর-জল ছিটাইয়া দেও। গ্রামে উঠান-আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়া গোবর-জল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিবার প্রথা হিন্দু মাত্রই বাড়ীতে এখনও প্রচলিত আছে। ২৩ ননদ, স্বামীর ভগিনী, ২৪ দেবর, স্নেহার্থে 'দেওরিয়া' বলা হইয়াছে। ২৫ দোলা।

২৬ নাম, নীচে আস, ২৭ (?), ২৮ কিরূপে, ২৯ সখীর স্বামী—এখানে ব্রতিনীর স্বামী কিংবা বনদুর্গার স্বামীও হইতে পারে। ৩০ নশিরাবাদ; ময়মনসিংহের সদর টাউনকে বলা হয়। নশরৎশাহের শাসনকালে তাঁহার নামানুসারে ময়মনসিংহ জেলা ও তাহার সদর টাউন নশিরাবাদ নামে খ্যাত হইয়াছিল; ৩১ বস্ত্রব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিশেষ, ৩২ বলিয়া, ৩৩ ময়মনসিংহ টাউন হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী একটি বড়বাজার, পাটের কারবারের স্থান। ৩৪ জড়াইয়া, ৩৫ কাটারি দ্বারা, এখানে জাঁতি, ৩৬ পানের বাটা, ৩৭ যাইবেন, (বেন—বাইন) ৩৮ সখিত্ব, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যে বন্ধুত্ব, ৩৯ আস, ৪০ বস, ৪১ আসিলে, ৪২ ইছামতী ঢাকা জেলার একটি নদী, ৪৩ হয়তো

নাকের বেশর সই খেওয়ানিরে ৪৪ দিয়া
এমনে হইলাম পার। সই আইস বইস।
* * * *
পিন্ধনের ৪৫ শাড়ী গো সই খেওয়ানিরে দিয়া
এমনে হইলাম পার। সই আইস বইস
হস্তের শঙ্খ গো সই খেওয়ানিরে দিয়া
এমনে হইলাম পার। সই আইস বইস।

দেবী বনদুর্গা মানবী ব্রতিনীর সহিত সখিত্ব (সইয়ালা) স্থাপন করিতে যাইবেন। এই শুভসংবাদ রাজসভা, দেবসভা সকলকে জানাইয়া আসা উচিত, তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ দেবীর সঙ্গী হইতে পারেন। পুরাকালে কাহাকেও নিমন্ত্রণ বা কোন শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে হইলে তাহার হাতে পানসুপারি দিয়া করিবার প্রথা ছিল। তাই দেবীর সখিত্বের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রেও বাটাভরা পানসুপারির ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে।

দেবী ব্রতিনীর সহিত শেওড়াতলে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা দুই সখী,—কত দিন পরে দেখা। ব্রতিনী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন—'সখি, আস আস, বস! (পথে না জানি তোমার কত কষ্ট হইয়াছে) তোমাকে আনিবার জন্য দোলা পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তুমি আস নাই। খরস্রোতা ইছামতী ও ধলাই (ধলেশ্বরী) নদী তুমি কিরূপে পার হইলে?

ইহার উত্তরে বনদুর্গা যাহা বলিলেন, তাহাতে সখীর প্রতি তাঁহার প্রাণের যে কি গভীর টান তাহাই প্রকট হইয়াছে। নদী পার হইতে খেয়ানি যাহাই চাহিয়াছে তিনি কোনরূপ দ্বিধা-সঙ্কোচ না করিয়া তাহাই দিয়া আসিয়াছেন। তিনি নাকের বেশর দিয়াছেন, হাতের শঙ্খ দিয়াছেন, তাহাতেও খেয়ানির তুষ্টি হইল না। শেষে পরিধানের শাড়ীটি পর্য্যন্ত তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, তবে সে পার করিয়াছে। সখীর প্রতি এমন ভালবাসার তুলনা কোথায়?

(ঘ)

মায়েত' জিজ্ঞাসা করুইন ৪৬ দুর্গাগো ভবানী,
বৈরী দুপরিয়া কালে ৪৭ রইলা কেন একেশ্বরী?
—এক্‌লা নয় গো মা, লগে পঞ্চ দাই ৪৮
ঠাকুর ৪৯ বাপার শেওড়ার নীচে বইয়া পূজা খাই।
খুড়ীয়েত ৫০ জিজ্ঞাসা করুইন দুর্গাগো ভবানী,
বৈরী দুপরিয়া কালে রইলা ৫১ কেন একেশ্বরী,
এক্‌লা নয় গো মা, লগে পঞ্চ দাই
ঠাকুর কাকার শেওড়ার নীচে বইয়া ৫২ পূজা খাই।

এই গীতটিতে দেখা যায়, বনদুর্গা দুর্গা বা ভবানীর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। শেওড়াতলে বসিয়া যিনি 'পূজা খাইতেছেন' তাঁহাকে দুর্গা ও ভবানী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে নিভৃত দ্বিপ্রহরে ঘরের বাহিরে একা একা থাকা উচিত নয়, কারণ এই সময়টা ভাল নয়, অনর্থ ঘটিতে পারে। দুর্গাকে এই বিষয় তাঁহার, কি তাঁহার ব্রতিনী-সখীর মা, খুড়ী সকলে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিন্তু দুর্গা বলিতেছেন, তিনি একাকিনী নন, তাঁহার সঙ্গে পাঁচ জন দাসী (?) আছে, আর তিনি ঠাকুর বাবার, ঠাকুর কাকার শেওড়াতলে বসিয়া 'পূজা খাইতেছেন,' ইহাতে মায়ের বা কাকীমায়ের এত দুশ্চিন্তা করিবারই বা কি আছে?

(ঙ)

আগেত' ঝাপবা ৫৩ শেওড়া গুঁড়িতে ৫৪ মুরলী
ঘুমের ঘুমুলী ৫৫ শেওড়া কে তোরে জাগাইল?
—খৈ চিড়ার বাসে ৫৬ গো আপনে জাগিলাম।
আগেত' ঝাপ্‌বা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী
ঘুমের ঘুমুলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল?
—ভোগ নৈবেদ্যের বাসে গো আপনে জাগিলাম।
আগেত'......................জাগাইল?

এই গীতটিকে ব্রতিনীরা 'গাছ জাগাইবার' গীত বলিয়া থাকেন। ব্রতকালে শেওড়া গাছটিতে দেবীর অধিষ্ঠান হয় এবং উহাকে জাগ্রৎ ও দেবীর সহিত অবিচ্ছিন্ন মনে করা হয়। বন বা বাগানের এক প্রান্তে শেওড়া নীরবে পড়িয়া থাকে; কিন্তু আজ তাহার গোড়ায় পূজার উৎসব, উপকরণ, গীত জোকার! এই গীতে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—ওহে শেওড়া, তোকে আজ কে জাগাইল? তোকে ত কেবলই নিদ্রিত পড়িয়া থাকিতে দেখি? শেওড়া উত্তর দিতেছে,—আমাকে আর কে জাগাইবে? খৈ চিড়া গুঁড়া, ভোগ নৈবেদ্য এই সকলের সুঘ্রাণেই আমি আপনা হইতে জাগিয়াছি। কি সুন্দর!

(চ)

আজি কি আনন্দ সই গো মধুপুর ৫৭ যাইতে
শাড়ী বদল করুইন তানা ৫৮ দুই সইয়ে
আজি কি আনন্দ সই গো মধুপুর যাইতে
শঙ্খ বদল করুইন তানা দুই সইয়ে
আজি কি আনন্দ সই গো মধুপুর যাইতে
সিন্দুর বদল করুইন তানা দুই সইয়ে
আজি কি আনন্দ......

সমাজে 'সই পাতিবা'র (সখিত্ব স্থাপনের) কালে এক সইয়ের অন্য সইয়ের সঙ্গে বসনভূষণ খাদ্যপানীয় ইত্যাদি বদল করিবার প্রথা আছে এবং এইরূপ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই না কি সখিত্ব চিরদিনের জন্য পাকা হইয়া যায়। এক সইয়ের মৃত্যুতে অন্য সইয়ের ত্রিরাত্র অশৌচ ধারণ করিবারও বিধি আছে।

আলোচ্য গীতটিকে ব্রতের অন্যতম প্রথা ব্রতিনী ও বনদুর্গার সখিত্ব স্থাপনের বাক্‌মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। ইহাতে ব্রতিনী ও বনদুর্গাকে তাঁহাদের পরস্পরের শাড়ী শঙ্খ সিন্দুর ইত্যাদি বদল করিয়া সখিত্ব (সইয়ালা) পাকা করিতে দেখা যাইতেছে।

স্থান এবং ব্রতিনীবিশেষে বনদুর্গা ব্রতের আরও অনেক গীত শুনা যায়। সেগুলি অধিকাংশই শিবদুর্গা-বিষয়ক।

ধলেশ্বরী নদীর অপভ্রংশ; ইহাও ঢাকা জেলায় এবং টাঙ্গাইলের কতকাংশে প্রবাহিত। এই দুইটি নদীর উল্লেখে এবং ঢাকা জেলায় যেরূপ সমারোহের সহিত বনদুর্গার পূজা হয় তাহাতে মনে হয়, এক সময়ে সে অঞ্চল হইতেই বনদুর্গার পূজা ব্রত ময়মনসিংহের দিকে প্রচলিত হইয়াছিল। ৪৪ খেয়ানি, ৪৫ পরিধানের, ৪৬ করেন, ৪৭ দ্বিপ্রহর সময়ে, ৪৮ দাসী (?), ৪৯ সম্ভ্রমার্থে বাবার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৫০ কাকীমা, ৫১ রহিলে, ৫২ বসিয়া।

৫৩ ঘন পাতাবিশিষ্ট এবং বিস্তৃত, ঝাঁকড়া, ৫৪ গোড়াটা যেন বাঁশীর মতো সরু; এখানে শেওড়া গাছের বর্ণনা করা হইতেছে, ৫৫ যে কেবলই ঘুমাইয়া থাকিতে ভালবাসে, ৫৬ গন্ধে। ৫৭ বৃন্দাবন, ৫৮ তাঁহারা।

* নিকোলাই নেক্রাসোভের চারিটি কবিতা *

নিকোলাই নেক্রাসোভ (১৮২১-১৮৭৭) তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্যে রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে আসেন। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। সৈন্যদলের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। তখন থেকে কপর্দকশূন্য অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁর সাহিত্য-চর্চা সুরু হয়, এবং কিছু দিনের মধ্যেই তিনি জনপ্রিয় কবি ও রাশিয়ার দুইখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেডিক্যাল্ মাসিক-পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।

রাজধানীতে প্রভূত দারিদ্র্য ও অনশনের মধ্যে তাঁর দিন কাটাতে হয়েছিল, আর সে-জন্যে তাঁর কবিতার ভেতরেও এর সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এই দুইটি জিনিষ ছাড়াও তাঁর কবিতায় রাশিয়ার তৎকালীন প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও তীব্র সমালোচনা সুপরিস্ফুট। তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা, যার জন্যে তিনি রাশিয়ার সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবেন, সেটা হচ্ছে—"Who lives happily in Rissia?"—মহাকাব্য। এর বিশাল অবয়বের ভেতরে তিনি রাশিয়ার কিষাণদের অসহ্য দারিদ্র্য ও অদম্য প্রাণশক্তির বর্ণনা করেছেন।

নেক্রাসোভ কবি হিসেবে লারমনটভের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম-পাদে রাশিয়ার সাহিত্যের প্রাণধারা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক খাদে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই যুগে সবাই উপলব্ধি করেছিল, জীবন সত্যি, এবং শিল্পবোধেই জীবনের চরম পরিণতি নয়। স্থায়িভাবে দাসপ্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়িভাবে সাহিত্যে সৌকুমার্যের অবসান হলো। যে-সাহিত্য সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনামুখী নয় সে সাহিত্যের বর্জন হলো। সাহিত্যে এই কর্তব্যবোধ তাঁর কাব্যকে অনেক স্থলে ক্ষুণ্ণ করেছে—এ কথা নেক্রাসোভ নিজেও স্বীকার করেছেন। নেক্রাসোভের চারটি কবিতার অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো।

১

রাজধানী কাঁপে বক্তৃতাতে

বক্তৃতার গর্জনেতে রাজধানী যায় কেঁপে
একের পর আরেক আসে; কথারা ওঠে ফেঁপে।
তবু রাশিয়ার শেষ-গভীরে আছাড় খেয়ে প'ড়ে
স্তব্ধ কোনো নীরবতা নিজেরে চেপে ধরে।
কেবল সেই বাতাস আছে, বাঁকানো তার শির,
সেই শুধু আসে ও যায়; সেই শুধু অস্থির।
আর রয়েছে ধানের খেত মাটিরে চেপে ধ'রে
পৃথিবী তারে মায়ের মত রেখেছে বুকে ক'রে।
যতদূর যায় দৃষ্টি, শুধু তারেই যায় দেখা—
হেথা ইতিহাস শান্ত মূক, লেখে না কোনো লেখা।

২

আমার কবিতা

আমার কবিতা দেখেছে চেয়ে
ব্যর্থতা-ভরা চোখে ঝরে কতো জল,
কতো সে অশ্রু কালোচোখে টলোমল;
এই পৃথিবীর বিষণ্ণ ব্যথা দিয়েছে যে চোখে দোলা!
আমার কবিতা জন্ম নিয়েছে
আত্মা যখন লুটালো ধূলায় ধূলায়!
ঝড়ের বাতাস হতাশা-বেদনা ধূলায়
"মৃত-পাহাড়ের হৃদয় যে-সব মানুষের, সেই হৃদয়ের দ্বার খোলো
আঘাতের পর আঘাতে;" এই যে শপথ তার।
আঘাতের পর আঘাতে; এই যে শপথ তার!

৩

কাল রজনীতে

কাল রজনীতে খড়ের বাজারে,
সন্ধ্যা ছ'টায়, প্রদোষ আঁধারে,
দেখেছি তাদের প্রহার করিতে তন্বী কৃষক-কন্যা।
শিহরি' উঠেছে সকল অঙ্গ, ঝরিছে বেত্র-বন্যা।
নীরব-আননে সকলি সহিছে,
গোধূলি-বাতাসে বেত্র শ্বনিছে,
কলা-লক্ষ্মীরে কহিলাম আমি, "চেয়ে দেখো তুমি ত্বরা
ঐ যে দাঁড়ায়ে অত্যাচারিতা, তোমারই সে সহোদরা।"

৪

লবণের গান

("রাশিয়ায় কে সুখে বাঁচে?"—কাব্যের অংশ)

শিবের অসাধ্য হ'লো: বন্ধ হ'ল তার সব খাওয়া;
তাকিয়ে দেখছে সবে অনাহারে শিশু ঝ'রে যাওয়া।
যাই আনে, ফেলে দেয়; পেটে জ্বলে ক্ষুধার আগুন।
কিছুই ছোঁবে না ছেলে—"নুণ কোথা?" চাই তার নুণ।
কোথা আছে সে লবণ? ছিল যাহা সবই তো ফুরালো!
নেপথ্যে দেবতা বলে, "বদলে ময়দা দাও, ভালো।"
মুখে এনে দিল ফেলে। দীর্ঘশ্বাসে বাতাসেরা ভার।
"নুণ দাও, দাও নুণ"—চোখে জমে অশ্রুর পাথার।
আবার খাবার আসে, চোখের জলেতে-ভেজা রুটি!
মায়ের দু'চোখে জল; শিশু বুঝি নিতে চায় ছুটি!'
"বাঁচাবো, বাঁচাবো তোরে!" চোখের জলেতে-ভেজা রুটি
পেয়েছে নুণের স্বাদ; লবণ দিয়েছে চোখ দু'টি!

(১) (২) ও (৪) সংখ্যক কবিতা অনুবাদ করেছেন—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (৩) কবিতাটি—নরেন সেনগুপ্ত

পাণ্ডুয়ার ইতিকথা

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান, পূর্ব্বে এই স্থান 'পেঁড়ো-বসন্তপুর' বলিয়া পরিচিত ছিল এবং মুসলমান-রাজত্বকালেও এই স্থান হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হইত। প্রবাদ এইরূপ যে, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্য নামে এক রাজা পাণ্ডুরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পাণ্ডুদাস আমতার অধীন পেঁড়ো-বসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পাণ্ডুদাস নিজ বংশের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাণ্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল দূরে এবং হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাণ্ডুয়া নামক ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত।

পাণ্ডুয়া ঐতিহাসিক স্থান এবং ঐতিহাসিক গৌরবের দিক্ হইতে সপ্তগ্রামের অব্যবহিত পরেই পাণ্ডুয়ার স্থান নিঃসন্দেহে দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও এই স্থান পরবর্ত্তী কালে মুসলমান শাসকগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুদিগের কোন নিদর্শনই বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুদিগের মন্দিরগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হয় এবং হিন্দুদিগের প্রত্যেক দেব-দেবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমস্ত হিন্দুদিগকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করা হয়। ফলে পাণ্ডুয়া হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও হিন্দুদিগের কীর্ত্তি চিহ্ন এই স্থান হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এই সম্বন্ধে লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন—"Pandua was once the capital of a Hindu Raja and is famous as the site of a great victory gained by the Musalman under Shah Safi over the Hindus about 1340 A. D."

পাঠান রাজত্ব-কালে দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের ভগিনী ...গুহায় বাস করিতেন; তাঁহার এক পুত্র ছিল, নাম সাহা সুফি। ...নি এই অঞ্চলের মুসলমানদিগের ধর্ম্মযাজক এবং 'ফকির' বলিয়া ...দিগের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতার ... হয়। পাণ্ডুয়ার রাজার সহিত মুসলমানদের বিরোধ সম্বন্ধে ...কাহিনী প্রচলিত আছে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পাণ্ডুয়ার রাজার এক নবজাত পুত্র হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার ...এক ভোজের বন্দোবস্ত করেন। ভোজের দিবসে রাজার এক ...মান কর্ম্মচারী তাহার বাড়ীতেও ভোজের জন্য একটি গো-হত্যা ... গরুর হাড়গুলি মাটীতে পুঁতিয়া দেয়। কিন্তু রাত্রে কুকুর ... উক্ত হাড়গুলি রাজপথে আনীত হয় এবং সেই জন্য হিন্দু...দিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। প্রজাবৃন্দ যে ...মান গো-হত্যা করিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ... বিফল-মনোরথ হয় এবং রাজপুত্রের জন্যই এই ভোজের ...ছিল হইয়াছিল বলিয়া ক্রোধ বশতঃ তাহারা রাজপুত্রকেই হত্যা ... রাজা মুসলমানদের নিকট হইতে গো-হত্যার জন্য কৈফিয়ৎ ...পাঠান; কিন্তু সমস্ত মুসলমানগণ ভয়ে তাঁহার রাজত্ব হইতে ...ন করে।
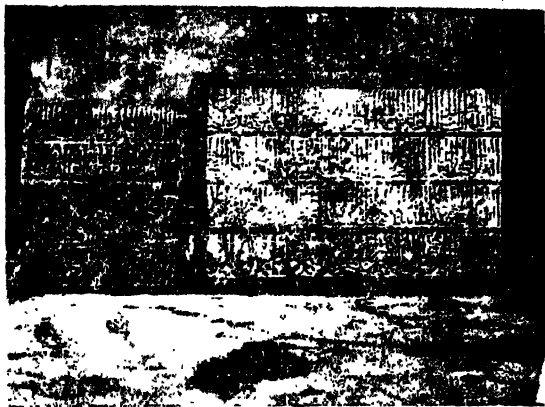
দ্বিখণ্ডিত সূর্য্যদেবের মূর্ত্তির উপর উৎকীর্ণ আরবী লিপি

সাহা সুফির মাতুল দিল্লীর সম্রাট্; সাহা সুফি প্রাণভয়ে দিল্লীতে পলায়ন করেন এবং দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহ সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত বহু সৈন্য দিয়া তাঁহাকে পাণ্ডুয়ায় পাঠাইয়া দেন। সপ্তগ্রাম-বিজয়ী জাফর খাঁ সাহা সুফির খুল্লতাত; তিনি এবং বহরাম সাক্কা সাহা সুফিকে পাণ্ডুয়ার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন। পাণ্ডুয়ার হিন্দু প্রজাবৃন্দ গো-হত্যার জন্য অকারণে রাজার প্রতি বিরূপ ছিল; এই সময়ে সাহা সুফি সসৈন্যে পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিল। হিন্দু রাজার সহিত মুসলমানগণের তুমুল যুদ্ধ হইল এবং কয়েক দিন যুদ্ধের পর রাজা নিহত হইলেন; পাণ্ডুয়া সাহা সুফির করতলগত হইল।

সাহা সুফি পাণ্ডুয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজার প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করিলেন এবং সেই স্থানে মন্দিরের উপকরণ দিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন। এই মসজিদ 'বাইশ-দরজা' নামে পরিচিত, বর্ত্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছে। 'বাইশ-দরজা' অর্থাৎ বাইশটি বৃহৎ খিলানের দ্বারা এই বাড়ীটি নির্ম্মিত ছিল। ইহা পূর্ব্বে দেবমন্দির ছিল, ইহার মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু স্তম্ভ আছে। কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনের ন্যায় একটি 'বেদী' অদ্যাপি দৃষ্ট হয়; এই সিংহাসনের মধ্যে কোন বিগ্রহ-মূর্ত্তি থাকিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিংহাসনের সোপানগুলিও সুন্দর প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বহু মিনার বা স্তম্ভ ছিল; সে কালের হিন্দু রাজগণ প্রাতঃকালে উচ্চ স্থান হইতে সূর্য্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলি বিনষ্ট করিয়া কেবলমাত্র বৃহৎ স্তম্ভটিকে নামাজের আজানের জন্য রক্ষা করা হয়। এই সম্বন্ধে List of Ancient Monument of Bengal নামক পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"The old temple of Pandua was then destroyed and the present mosque built with its remains. The larger tower was used as a minarah for call to prayers and every Hindu was driven out of the town." (Page 36)

পাণ্ডুয়া-বিজয়ী সাহা সুফি মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভটি মুসলমানদিগের বিজয়-স্তম্ভস্বরূপ রাখিয়া দেন; ইহার উচ্চতা পূর্ব্বে ১৩৬ ফিট ছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে স্তম্ভের, উপরিভাগের ১১ ফিট বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ইহার উচ্চতা ১২৫ ফিট দাঁড়াইয়াছে। ইহার আকার ও গঠন-প্রণালী দিল্লীর কুতুবমিনারের অনুরূপ * এবং ইহা বাঙ্গালার প্রাচীনতম স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ইহাই বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনতম ইমারত। এইরূপ ইমারত বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় নাই। লে: কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন, "This minaret is said to be the oldest masonry building of Bengal" (Hooghly Medical Gazetteer)। মিনারটি পাঁচটি তলায় বিভক্ত, প্রথম তলার ব্যাস ৬০ ফিট, ইহা ক্রমশ: সরু হইয়া গিয়াছে, পঞ্চম তলার ব্যাস মাত্র ১৫ ফিট। প্রত্যেক তলায় একটি করিয়া বারান্দা আছে এবং উক্ত বারান্দা দিয়া মিনারটির চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করা যায়। নিম্ন তলার প্রবেশদ্বার 'বাইশ দরজার' পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং নিম্ন হইতে ঘুরাণ-সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়; সর্ব্বশুদ্ধ ১৬১ সিঁড়ি মিনারের মধ্যে আছে। মিনারের চূড়ায় একটি ছড়ি আছে, জনশ্রুতি যে, সুলতান সাহা সুফি উক্ত ছড়ি লইয়া ভ্রমণ করিতেন। মিনারের গঠন ও আকার নিম্নের তালিকাটি হইতে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

পঞ্চম তলার ব্যাস ১২ ফিট উপরে ও ১৫ ফিট নিম্নে;
উচ্চতা ১৮ ফিট।
চতুর্থ তলার ব্যাস ২৩ ফিট ১০ ইঞ্চি উপরে ও ২৬ ফিট নিম্নে;
উচ্চতা ১৮ ফিট।
তৃতীয় তলার ব্যাস ৩৪ ফিট ৮ ইঞ্চি উপরে ও ৩৭ ফিট ৫ ইঞ্চি নিম্নে;
উচ্চতা ৩০ ফিট।
দ্বিতীয় তলার ব্যাস ৪৭ ফিট ৬ ইঞ্চি উপরে ও ৪৮ ফিট ১ ইঞ্চি নিম্নে;
উচ্চতা ২৫ ফিট।
এক তলার ব্যাস ৫৮ ফিট ২ ইঞ্চি উপরে ও ৬০ ফিট নিম্নে;
উচ্চতা ২৫ ফিট।
পঞ্চম তলার উপরের চূড়ার উচ্চতা ৯ ফিট।

মিনারের মোট উচ্চতা———১২৫ ফিট।

বহু প্রাচীন কাল হইতে নববর্ষের প্রথম দিনে (১লা বৈশাখ) এবং মাঘ মাসের প্রথম দিনে এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয়। মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ হাজার লোক পাণ্ডুয়ায় সমবেত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মেলার সময় মিনারের উপর উঠিবার জন্য এরূপ ভীড় হইয়াছিল যে, উপরের সিঁড়ি হইতে একটি লোক পড়িয়া লোকের পদতলে পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মিনারের গাত্রে কোন শিলালিপি নাই।

মিনারের উত্তর-পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি প্রাচীন মসজিদ এবং সুলতান সাহা সুফির সমাধি-মন্দির আছে। মসজিদটি ছোট ছোট ইট দিয়া গাঁথা হইয়াছে। মসজিদের ফটকে একখানি শিলালিপি গ্রথিত ছিল, কিন্তু ফটকটি পড়িয়া যাওয়ায় শিলাখণ্ড

শিলালিপির অন্যদিকে সপ্ত অশ্বযুক্ত বিগ্রহমূর্ত্তি

স্খলিত হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে উহা মসজিদের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত সাহা সুফির সমাধির মধ্যে রক্ষিত আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্চাৎ দিকে হিন্দুদিগের একটি ভগ্ন সূর্য্যমূর্ত্তি খোদিত আছে। কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর খোদিত সূর্য্যদেবের একটি মূর্ত্তি দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহার নিম্নভাগের পশ্চাৎ দিকে আরবী অক্ষরের লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—"হিজরী ৮৮২ অব্দে সামসুদ্দীন ইউসুফ সাহের সেনাপতি কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজত্বের বিলোপসাধন এবং হিন্দুদের বিগ্রহগুলির দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে।" পাঠকগণের অবগতির জন্য এক দিকে শিলালিপি ও অন্য দিকে সূর্য্যমূর্ত্তির নিম্নাংশের আলোকচিত্র দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত আলোকচিত্রে আরও দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহাতে আল্লার নামে মসজিদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে। উহাদের অন্য দিকেও হিন্দুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মূর্ত্তিগুলির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িয়াছে বলিয়া ঐগুলি কোন্‌টা কি দেবতার মূর্ত্তি ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় না। মসজিদের সম্মুখে আর একটি সমাধি আছে; অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা মকদুম সাহেবের সমাধি। উক্ত মকদুম কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে

সুলতান সা-সুফির বিজয়-মিনার

* কুতবমিনার ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তম্ভ এবং ইহার উচ্চতা ২ শত ৪২ ফিট; কথিত আছে যে, সাতাশটি হিন্দু-মন্দিরের উপাদান লইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং সামসুদ্দীন আলতামাস কর্ত্তৃক ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহার গঠনের পরিসমাপ্তি হয়।
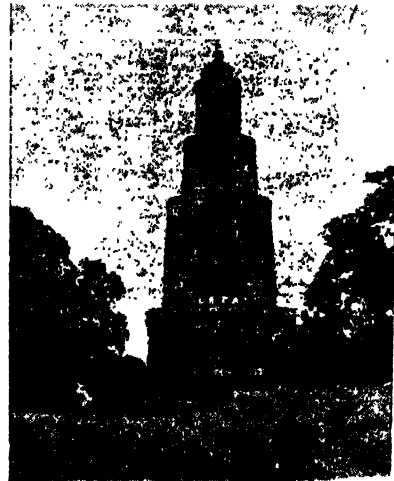
প্রাচীন মন্দির—'বাইশ দরজা' নামে খ্যাত

পারা যায় নাই। পাণ্ডুয়ায় বারটি মসজিদ আছে এবং বহু স্থানে ইতস্ততঃ কবরও দৃষ্ট হয়। হিন্দু রাজার সময় হইতে পাণ্ডুয়ার সীমানা পাঁচ মাইলব্যাপী প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করা ছিল; প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বেকার মানচিত্রেও পাণ্ডুয়ার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বা বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন প্রাচীর দৃষ্ট হয় না।

এই স্থানে 'পীরপুকুর' নামে একটি পবিত্র জলাশয় আছে। ক্রফোর্ট সাহেব ইহা ৪০ ফিট গভীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পীরপুকুর সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা অতি বিচিত্র। এই পুকুরের মধ্যে সত্যপীর অবস্থান করেন এবং তাঁহার দুইটি কুমীর আছে। কুমীর দুটিকে ডাকিলেই তাহারা আসে এবং তাহাদিগকে সিন্নি দিলে যদি তাহারা সিন্নি গ্রহণ করে তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মহানাদ ও দ্বারবাসিনীতেও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দুইটি পুষ্করিণী আছে। পাণ্ডুয়ার পুষ্করিণী পাণ্ডুরাজা খনন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। পাণ্ডুয়ার সমৃদ্ধির সময় কাগজ, নীল, চূণ ও ধানের জন্য এই স্থান বিখ্যাত ছিল। এখনও কাগজিপাড়ায় কোন কোন মুসলমান কাগজ প্রস্তুত করে; ধানের জন্য আজও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং বহু ধানের কল এই স্থানে আছে। পূর্ব্বে প্রায় দশ হাজার লোক এই ক্ষুদ্র স্থানটিতে বসবাস করিত; কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের 'বর্দ্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীতে এই স্থান শ্মশানে পরিণত হয় এবং ৬১৬১ জনের মধ্যে ৫২২২ জনের মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই এই স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রেল-পথ পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন মিঃ হজসন নামক এক জন ইংরেজ প্রথম রেলগাড়ী পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহামারীর জন্য পাণ্ডুয়ায় একটি সরকারী ডাক্তারখানা খোলা হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে যে সকল প্রাচীন স্থান আছে তাহাদের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধি অন্যান্য বহু স্থানের তুলনায় যে অধিক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন স্থানগুলির ইতিহাস অসংখ্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের গৃহের কোণে হিন্দুরাজবংশের ও হিন্দু সভ্যতার স্মৃতি বিজড়িত এই সমস্ত ধ্বংসপ্রায় শ্মশানক্ষেত্রে পদার্পণ না করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই সমস্ত প্রাচীন স্মৃতির উদ্ধারসাধন যে মহা পুণ্যজনক কার্য্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? স্রষ্টা যায় কিন্তু সৃষ্টি চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকে; আজ এই সমস্ত প্রাচীন স্থানের স্রষ্টাগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টির বিক্ষিপ্ত কঙ্কালসমূহ ঘোর নীরবতার মধ্যেও তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের জন্য অট্টহাস্যে মানব-নশ্বরতা ঘোষণা করিতেছে।

'জনান্তিক'

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জনতার মাঝে তবু জনান্তিক থাকি—
শাল-তাল-খর্জ্জুরের ('তমালে'র হ'লে
　　　　ক্ষতি বা কী !
আরণ্যক প্রীতি দিয়ে স্মৃতি ছেয়ে রাখি ;
জন-অরণ্যের বুকে জনান্তিকে থাকি।

দুকূল-আকাশ-প্লাবী সূর্য্যগলা আলো—
দারুণ দুপুর রৌদ্র প্রখর রসালো ;
পান করি, স্নান করি, দোঁহে সৌর-সাকী,
জনান্তিক, জনতার দ্বারমুক্ত পাখি।

উধাও সিঁদুর-সন্ধ্যা, আকাশ ও মাটি
রাগরক্ত প্রণয়ের পরিচয় খাঁটি।
পথে-চলা গান যেথা প্রাণে আছে জাগি'
সেই সান্ধ্য জনান্তিকে ক্ষণমৃত্যু মাগি।

নিকষ-কঠিন রাত্রে (নক্ষত্র প্রলাপ !)—
গত লক্ষ জীবনের কত পুণ্যপাপ,
কত ফুল, কত ভুল ধূলি দিয়ে ঢাকি,—
জনান্তিক !—জনতার প্রেমের এ রাখি।

'জনান্তিক তৃষাতৃপ্তি ব্যর্থ তার ফাঁকি।'—
জীবনমরণ-পথ ব্যথা-দীর্ণ তা কী ?
পরিণীতা সে-পথের উষা যদি বাকি,
জনতার উষাস্বপ্নে জনান্তিকে থাকি॥

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৪

সম্পূর্ণ নিজে হইতেই যে সংসার চালাইবার বয়স হয় নাই গিরিবালার এমন নয়, অভিজ্ঞতাও হইয়াছিল যথেষ্টই, কেন না, নিস্তারিণী দেবী তাঁহার হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এদিকে, তবু একটা মস্ত বড় ভরসা ছিল যে শাশুড়ী মালা-হাতেই হোন বা নাতি-কোলেই হোন, নিকটেই আছেন।······বেশ খানিকটাই দিশেহারা হইয়া পড়িলেন।

আবার এই সময়টিতেই আসিল পুত্রের নিকট হইতে প্রথম বিচ্ছেদ: একটা অদ্ভুত অনুভূতি,—সবই আছে তাহার মধ্যে এরা দুই জন না থাকিয়া মনটাকে যেন অষ্টপ্রহর অধিকার করিয়া রহিল —নিজেরাই একটা শূন্যতা সৃষ্টি করিয়া নিজেদের জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি দিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। এ-সময়ের কথাটা উত্তরকালে গিরিবালা প্রায়ই শশাঙ্ক-শৈলেনের কাছে বলিতেন —"সে কী যে অসহ্য অবস্থা মনে পড়লে আমার এখন পর্যান্ত যেন মনটা কি রকম হয়ে যায়। মা-ও গেলেন চলে, কিন্তু হঠাৎ হোলেও আমি কতকটা তোয়ের ছিলাম। তোরা যেতে আমি যেন কি করব ভেবে উঠতে পারলাম না। আরও মনটা আইঢাই করতে লাগল এই জন্তে যে আমি শেষ পর্য্যন্ত যদি কান্নাকাটি করতে থাকতাম তো বোধ হয় হোত না যাওয়া—বাহাদুরি দেখিয়ে রাজি হলাম বলেই ত সুবিধা হয়ে গেল। মা-ই তুলেছিলেন কথাটা, কিন্তু আমার মনের অবস্থা দেখে প্রথমটা দোমনা হয়ে পড়লেন, তার পর আমি নিজে গিয়ে যখন রাজি হয়ে বললাম মাকে······"

গিরিবালা থামিয়া, ছেলেদের বিস্মিত দৃষ্টির পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠেন, বলেন—"হ্যাঁ রে, আমিই গিয়ে নিয়ে যেতে বললাম মাকে—আর বাহাদুরির কথা বলিস্ কেন? তবে এ-ও বলি, সে কি আমি বললাম? বলালেন আমার মুখ দিয়ে উনি। আমার তো তখন এক রকম মাথারই ঠিক নেই; মা চলে যাচ্ছেন, তার ওপর তোদের যাওয়ার কথা শুনে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছি; একবার ঠাকুরঝিকে ধরছি, একবার ও-বাড়ীর দিদিকে গিয়ে ধরছি, একবার ছোট ঠাকুরঝিকে ধরছি—বলো তোমরা বুঝিয়ে—একে মা যাচ্ছেন, তার ওপর এ-দুটো গেলে আমি বাঁচব না—ওরা ফিরে এসে আমায় দেখতে পাবে না।···মাকে বলতে পারছি না; তিনিই তুলেছেন কথাটা, একলা থাকতে কষ্ট হবে এও বলেছেন, এর ওপর নিজের মুখে গিয়ে বললে ভাববে ছেলের ওপব জোর খাটাচ্চে,—মাথাব ঠিক নেই, কি বলতে কি বলব, রাগ করেই বোধ হয় ছেড়ে যাবেন। দিদি, ঠাকুর-ঝিদেরও মাকে বলতে বারণ করে দিয়েছি—ওঁরা ওঁকে বলুন, উনি মাকে বলুন; ওঁর ঘাড় দিয়ে ফাঁড়াটা কাটিয়ে নিতে চাইছি আর কি।···এমন কি, ঘরের কোণে একবার কাঁদতে দেখে মা জিগ্যেস্ পর্য্যন্ত করলেন—'বৌমা কাঁদছ—ছেলে দু'টোর জন্তে মন-কেমন করছে?'···তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললাম—'না মা, তুমি চলে যাচ্ছ' —বলেই হাপুস নয়নে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলাম।

সেদিন ওঁর বাইরে কি একটা কাজ ছিল, খুব রাত করে খেতে বসলেন। ঠাকুরপো, ঠাকুরজামাই আগে খেয়ে নিয়েছিলেন। মার একাদশী ছিল, খাবার সময় ওঁর কাছে বসতে পারলেন না। ঠাকুরঝিও মার গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিলেন; আমাকেই বসতে হোল। ভাবলাম মন্দ হোল না, একটু সুবিধে পেলেই তোদের যাওয়ার কথাটা পাড়ব, যাতে বন্ধ করে দেন।

খুব যেন অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিলেন, একবার হঠাৎ মুখটা তুলে বললেন—'মা শশাঙ্ক আর শৈলেনকে নিয়ে যাবেন না বলছেন।'

—মুখটা বেশ রাগ'-রাগ'

একটু দমে গেলাম, বললাম "কৈ, আমি তো কিছুই বলিনি।"

বললেন—'বলতে হয় না, সমস্ত দিন যেরকম কেঁদে-কেটে বেড়িয়েছ তাতেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়েছে। ছেলেগুলো আকাট মুখ্যু হয়ে রইল।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনিও চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলেন, তারপর এক বার মুখ না তুলেই বললেন—'তুমি মাকে আবার বুঝিয়ে বলো যাতে নিয়ে যান।'

কোন উত্তর না পেয়ে একবার একটু চোখ তুলে আমায় দেখে নিলেন, বোধ হয় মুখের ভাবটা দেখে বুঝলেন গতিক সুবিধের নয়। চুপ করে আবার খেয়ে যেতে লাগলেন।···বোঝ, কোথায় আমি চেষ্টা করছি ওঁর ওপর দিয়ে বন্ধ করব যাওয়া, উনি মতলব আঁটছেন আমিই গিয়ে মাকে বলে ব্যবস্থা করি!"

গিরিবালা হাসিতে থাকেন। হাসিতে হাসিতেই বলেন—"কিন্তু কি করে জিতলেন শোন্ না, আমি কি পারি এঁটে উঠতে কখনও? ···ভাবটা কি বুঝবার জন্তে ঠায় মুখের দিকে চেয়ে আছি—উনি ঘাড়

হেঁট করে খেয়ে যাচ্ছেন—দেখি, আস্তে আস্তে রাগের ভাবটা গিয়ে মুখটা সহজ হয়ে এল। আলুর দম হয়েছিল, একটা মুখে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে তক্ষুনি আর একটা মুখে ফেলে দিলেন, জিগ্যেস্ করলেন—'এটা কি বিরাজকে দিয়ে রাঁধিয়েছ না কি?'

গিরিবালা এখানটা একেবারে জোরে হাসিয়া ওঠেন, হাসির ঝোঁকে চোখে জল জমিয়া যায়, মুছিয়া বলেন—"সেদিন মনের ঠিক নেই, আলুর দমটা নুণে একেবারে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, ঠাকুরজামাই ঠাট্টা করে বলেলেন পর্য্যন্ত—যাতে কখনও নেমকহারামি না করতে পারি বৌদি তার পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছেন আজ।···সেই আলুর দমের প্রশংসা! মতলবটা আমার ধরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু মেয়েছেলের রান্নার প্রশংসা হলে তো আর তার জ্ঞানগম্যি থাকে না, বললাম—'কেন?—ঠাকুরজামাই বলছিলেন বড্ড নুণ-খরো হয়েছে, মুখে দোবার জো নেই বুঝি?'

উনি সে-কথার উত্তর না দিয়ে আরও দু'টো মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—"ঠাকুরের হাতে খেয়ে খেয়ে ওঁদের জিব পানসে হয়ে গেছে। আলুর দম তো লাউ-ডালনা নয়,—তাতে নুণ চাই একটু; নুণ আর ঝাল।'

চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলেন। আমার মন তখন ভিজে গেছে,—একটু পরে জিগ্যেস্ করলাম—'দোব আর দু'টো?'

বললেন—'দাও, তাহলে আর দু'খানা রুটিও এনো।'

ভুলেও কখনও একখানা বেশি রুটি খাবার মানুষ নন, আমি মনে মনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গোটা আষ্টেক আলু আর দু'খানা রুটি এনে পাতে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। নুণের চোটে জিব হেজে গিয়েছিল,—সেটা কিন্তু আমায় এক বছর পরে বললেন। তখন এমন ভাবটা করে খেয়ে যেতে লাগলেন, যেন কী অমৃতই না খাচ্ছেন!

আলুর দম খাবার সময় কথাটা তুললে আমি হয় তো মতলবটা ধরে ফেলতে পারি, সেই জন্যে এ-কথা-সে-কথা পেড়ে কখন বেলে তেজপুরের কথা এনে ফেললেন, তার পর একেবারে দুধ খাবার সময় রুটি মাখতে মাখতে বললেন—'বিকাশ দাদার কথা মনে আছে তোমার?'

বললাম—'তাঁকে রোজই মনে পড়ে বোধ হয়।'

বললেন—'মনে পড়বার মতন মানুষই। তোমার তো দাদাই, জন্যেই মনে।'

দু'-এক গাল খেয়ে বললেন—'তুমি একবার বলেছিলে—তাঁর বড় চ্ছে তোমার ছেলেরা মানুষের মতন হোক; কেউ উপযুক্ত মা হয়ে ঠছে দেখলে তিনি না কি খুব আনন্দ পান।'

এইটুকু বলেই এক নেকচার—এখনই বলছি নেকচার, তখন কি দি ধরতে পেরেছিলাম?—উপযুক্ত মায়ের কাজ সোজা নয়—ছেলের মুখ চেয়ে তাদের অনেক সময় বুক বাঁধতে হয়—আজ যেটা আদর, যেটা মায়া, এক সময় বোধ হয় সেটা ছেলের পক্ষে বিষ হয়ে পারে—বিশেষ করে কচি বয়সে মা-ই সব কিছু ছেলের পক্ষে, ছেলেবেলাটা শেখবার সময় বলে ছেলের জীবনে মায়ের দায়িত্বটাই —বিকাশ দাদা আমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু দেখেছিলেন, তাইতেই মন আশা করে বলেছিলেন আমার ছেলেদের তিনি বড় দেখা এক দিন।

এই রকম আস্তে-আস্তে বিনিয়ে বিনিয়ে এক-রাশ বলে গেলেন, কি মনে থাকতে পারে? শেষকালে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—'এই দেখো আমার ভুল!—হঠাৎ কি করে বিকাশ দাদার কথাটা মনে পড়ে গেল;—তুমি না আবার ভেবে বস তুমি পাঠাতে নারাজ বলে তোমায় পাকে-প্রকারে রাজি করবার চেষ্টা করছি···'

ভালো তরকারির দোহাই দিতে মনটা ভিজেই ছিল, তার পর বিকাশ দাদার কথা এনে আকাশে তুলে দেওয়া—আমি দিলাম ফাঁদে পা বাড়িয়ে, বললাম—'নারাজ হতে যাব কেন? তবে···?'

চুপ করে গেলাম। উনি একবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—'তাহলে বলবে মাকে?'

আমি চুপ করে রইলাম দেখে বললেন—'তাহলে আমিই বলব মাকে, কি করব?—তুমি যখন চাও না বলতে তখন তো জবরদস্তি নেই; তবে ফল হবে না। মা বলবেন—ওরা চলে গেলে তুমি কেঁদে-কেটে অনর্থ করবে।'

বলে ফেললাম—'কান্নাকাটি কেন করতে যাব?'

বললেন—'নাই কর, কিন্তু মা তো করবে বলেই ধরে নেবেন?'

আবার একটু বোধ হয় চুপ করে গেলাম, তার পর বাহাদুরি দেখিয়ে বললাম—'আমিই না হয় বলব'খন। ওদের ভালোটা আগে দেখতে হবে তো?'

উনি আস্তে আস্তে দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে উঠে গেলেন।

গিরিবালা আবার এক-চোট হাসিয়া ওঠেন, ছেলেদের জিজ্ঞাসু নয়নের পানে চাহিয়া বলেন—'তার পর আর কি? তার পর আমিই গিয়ে মাকে বললাম; কী বোকাই যে বনেছিলাম সে-বার!'

মা বললেন—'বেশ করে ভেবে দেখো বৌমা, পারবে তো থাকতে। না হয় এর পর কেউ গিয়ে ওদের রেখে আসবে'খন।'

বললাম—'না মা, লেখা-পড়ার কথা যখন, তখন আর দেরি করে কাজ নেই, আবার কবে সুবিধে হবে না-হবে···'

যেন পাঠাবার জন্যে আমারই জিদ, আর কেউ গা করছে না!—ঐ যে, উপযুক্ত মা হওয়ার কথা হয়েছে, আর রক্ষে আছে?"

একটু হাসিয়াই সে-দিনের অসহ বিচ্ছেদযাতনার স্মৃতিতে যেন অভিভূত হইয়া বলেন—"তার পর তোরা চলে যেতে যে কী অবস্থা আমার—যেন পাগলের মতন হয়ে গেলাম! তোদের কাউকে ছেড়ে কক্ষনও থাকিনি—যে ঘরেই যাই, যে বাক্সেই হাত দিই—প্রাণ যেন আইঢাই করে ওঠে—কেন মরতে বলতে গেলাম মাকে—আবার উলটে বাহাদুরি করে জিদ করেই পাঠিয়ে দিলাম! বাড়িতে টেঁকতে পারি না; ও-বাড়িতে দিদির কাছে বসি, হাউ হাউ করে কাঁদি। দিদি এক একবার বোঝান, এক একবার ধমক দেন, বলেন—'তুই বৌ, তোর এই দশাই হবে। দুগ্ধপোষা শিশু দু'টো, কী বলে তুই তাদের কাছছাড়া করলি? আমরা তুললাম কথাটা মাসিমার কানে; তিনি যদি মত বদলালেন তো উনি গিন্নিপনা করে জিদ ধরে বসলেন—নিয়ে যাও।···এখন কাঁদলে কি হবে?'

দিদির হাতে-পায়ে ধরে বলি—'তুমি বড়ঠাকুরকে বলে একটা ব্যবস্থা করো। না হয় তার করে দিন আমি মরণাপন্ন, ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।'···ঠাকুরঝিকে বলি—'আমার দুর্বুদ্ধি হোল তো তোমরা কেন সামলে নিলে না? মা যাচ্ছেন, আমার কি মাথার ঠিক ছিল?'

যখন কাছে ছিলি, কিছুই খেয়াল করতাম না। এখন, কবে কি একটু বলেছি, কবে বোধ হয় রাগের মাথায় একটু গায়ে হাত

তুলেছি, কবে কিসের জন্যে মুখটি চুণ করে এসে দাঁড়িয়েছিস্, কাজের মধ্যে বোধ হয় জিগ্যেস্ করাও হয়নি, কখন চলে গেছিস্—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে পড়তে লাগল আর মনটাকে যেন তোলপাড় করতে লাগল। শৈলেন একবার অসুখ-শরীরে বিছানায় শুয়ে কয়েক বার ডেকে ডেকে চুপ করে গিয়েছিল; মার ঘরে আমি কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কাজটা শেষ হতে গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ দিয়ে একটু একটু জল গড়াচ্ছে। তখন অত ভাবিনি, কিন্তু শৈলেনের সেই ঘুমন্ত মুখ মনে পড়ে পড়ে আমায় যেন অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগল। কেবলই অমঙ্গল মনে হতে লাগল,—শৈলেন সেখানে অসুখে পড়ে এই-রকম করে ডাকবে আমায়। আমি শুনতেও পাব না! অত যে বাহাদুরি করে পড়াশোনার জন্যে পাঠানো—তা একবারও কি মনে হোল রে যে তোরা খুব পড়া করছিস্, সুখ্যেত হচ্ছে, উপযুক্ত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস্? তা হলেও তো একটা বল পেতাম মনে। এ শুধু পাণ্ডুলের পুরন কথা সব, আর ও-দিকে সাঁতরার কথা মনে হলেই অমুঙ্গুলে ভাবনা—সে যে কী গেছে ক'টা বচ্ছর!···"

শৈলেনেরও সে সময়ের কথাটা বেশ মনে পড়ে। প্রথম দিক্‌টা মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া যে বিশেষ কোন কষ্ট হইয়াছিল এমন মনে পড়ে না। রেলে চড়িতে পারিবে এই আনন্দের সঙ্গে একটা নূতন জায়গায় নূতন জীবনের রোম্যান্সে মনটা ডুবিয়াছিল। আর সবে দুই দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া গেল বলিয়া সেই আনন্দ আর রোমান্সটা ছিল এত ঘনীভূত যে অন্য চিন্তা প্রায় আসিবার ফাঁক পায় নাই একেবারে।···নাপতে ডাকাইয়া দুই ভাইয়ের চুল একটু ভদ্র করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হইল। বাজার থেকে ভালো ছিট কিনিয়া আনিল, দরজি আসিয়া মাপ লইয়া গেল, যাওয়ার আগের দিন রাত্রে ভালো করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা হইল, তার মধ্যে বাসমতী ধানের চিড়ার পায়সের স্বাদ যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে! ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে এই সব নগদ প্রাপ্তির উন্মাদনায় দুইটা দিন যেন কোথা দিয়া চলিয়া গেল। নিজের সম্বন্ধে এই, কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও ওরই পাশে দাদার সম্বন্ধে মনের ভাবটা ছিল অন্য রকম, এও বেশ মনে পড়ে। দাদা একটু নিরীহ গোছের, শরীরেও একটু দুর্ব্বল, এবং সাধারণতঃ শৈলেনের চেয়ে মা-ঘেঁসা! নিজের উল্লাসের মধ্যে শৈলেনের এক একবার দাদার জন্যে মন কেমন করিতেছিল,—বড় ভাই দুর্ব্বল, ভালোমানুষ হইলে তাহার প্রতি যেন ছোট ভাইয়েরই ভাবটা আসে—শৈলেনের এক একবার মনে হইতেছিল—আহা দাদার কষ্ট হবে, দাদার এখানে থাকলেই ভালো···

বেশ মনে পড়ে পাণ্ডুলের বাহিরে দাদাকে যেন কল্পনাতেই আনিতে পারিতেছিল না।

যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত দুইটা দিনের এই ইতিহাস; অন্ততঃ এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে। আশ্চর্য্যও লাগে,—বাড়ি থেকে একটু দূরে গেলেই যে মার কাছে মনটা পড়িয়া থাকিত, সেই মাকে ছাড়িয়া অত দূরে যাওয়ার কথায় কোন বেদনা ছিল না কেন প্রথম প্রথম!

তাহার পর যাত্রার মুহূর্ত্ত থেকে সব যেন উল্টাইয়া গেল। [illegible]

প্রণাম করিতে আসিল। মা আঁচলে চোখ মুছিতেছিলেন, দুই ভাইয়ে এক-সঙ্গে প্রণাম করিবার জন্য নত হইতে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দুই ভাইয়েই উঠিয়া অপ্রতিভ ভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া নতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কে আগে আরম্ভ করিল মনে নাই, তবে দুই জনেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা দুই জনের কোঁচার খুঁটে একটা করিয়া সিকি বাঁধিয়া দিয়া কান্নার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলিলেন—"চুপ কর বাবা, নৈলে আমার বড় কষ্ট হবে; খুব মন দিয়ে পড়বি, খুব বড় হবি···"

অস্পষ্ট স্বরেই বলিতেছিলেন, বেশ মনে পড়ে—"বড় হবি" বলিতেই মা'র গলার স্বরটা স্পষ্ট আর বিকৃত হইয়া উঠিল, তাহার পর মুখে ঘোমটা চাপিয়া কান্না। ঐ কথা দুইটির উপরই ছিল যে যত অভিমান!

ছাড়াছাড়ির মধ্যে শৈলেন মাকে সেই প্রথম নূতন ভাবে খুব স্পষ্ট আর নিকটে করিয়া পাইল। কোথায় গেল ওর আনন্দের রোম্যান্স, মনটা হঠাৎ যেন অসাড় হইয়া গেল,—মনে হইল মাকে যেন হঠাৎ নূতন করিয়া, বেশি করিয়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই হারাইয়া ফেলিল! সে যে কী কষ্ট! শিশু-হৃদয়ের কী হা-হুতাশ—বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এ-ভাবটা কবে পর্য্যন্ত যায় মন থেকে তাহা মনে পড়ে না, তবে এটা বেশ স্মরণ আছে যে অত সাধের রেলচড়া বিস্বাদ করিয়া দিয়া ক্রমাগতই মায়ের মুখ ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। উত্তর-জীবনে ব্যাপারটাকে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া, জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে; এই বিচ্ছেদের গোধূলি-আলোয় মাকে নূতন করিয়া—অত অদ্ভুত ধরণের আপন জানিয়া পাওয়া, নিজের আত্মারই যেন একটা নূতন উন্মেষ, একেবারেই এক নূতন-লোকের আলোকের সম্মুখীন হওয়া,—মনটি একটি পুণ্য-বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছে।

দিনটি মায়ের কাছেও, শৈলেনের কাছেও খুব স্মরণীয়।

সন্তান লইয়া কি এক রকম বিড়ম্বনা?

দিন-দশেক পরে বিপিনবিহারী সাঁতরা থেকে ফিরিয়া আসিলেন। বোধ হয় মনের কোনখানে এক পাই আন্দাজ আশা ছিল যে তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া কৈলাসচন্দ্র ছেলেদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য তার করিয়া দিবেন, কিম্বা কোন প্রকারে কিছু ঘটিবে, যাহার জন্য বিপিনবিহারীকে ছেলেদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—অহেতুক আশা গভীর দুঃখের যে চিরসাথী। স্বামীকে একলা ফিরিতে দেখিয়া গিরিবালার শোক আবার এক-চোট উথলিয়া উঠিল। খানিকটা অভিমানও হইল। কতকটা কতকটা দুই কারণেই অনেকক্ষণ স্বামীর সম্মুখীন হইলেন না; রান্নাঘরে, ভাঁড়ার-ঘরে একটা না-একটা ছুতা করিয়া কাটাইয়া দিলেন। বিরাজমোহিনী, অভাগা গিয়া দাদার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন, পান-তামাক যাহা দরকার পড়িল জোগাইয়া দিলেন, তাহার পর রেলের কাপড়েই একবার হাজরিটা দিয়া আসিবার জন্য বিপিনবিহারী তাড়াতাড়ি আফিসে চলিয়া গেলেন, একটা দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

খানিকটা সময়ও গেল, তাহা ভিন্ন বোধ হয় এও একটু মনে হইয়া থাকিবে যে, স্বামী ক্ষুন্ন হইয়াই ধূলাপায়ে আফিসে চলিয়া গিয়াছেন; ফিরিয়া যখন জামাজুতা খুলিতেছেন, গিরিবালা গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতেই একটু আড়চোখে দেখিয়া লইয়াছেন—না স্বামীর মুখে রাগের কোন লক্ষণ নাই। প্রণাম

ভাবেই গল্প করিয়া গেলেন—সাঁতরার কি খবর—মায়ের থাকিবার ব্যবস্থা কোন ঘরে হইল—মনোমোহিনী দেবী গিরিবালাকে একবার দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—খেতন বলে সবাইকেই দেশে রাখিয়া তুমি একলা পাণ্ডুলে থাকো, পুরুষানুক্রমে কি পাণ্ডুলেই পড়িয়া থাকিতে হইবে?…ছেলেদের নাম লেখানো হইল—শশাঙ্ককে সিদ্ধেশ্বরী মাইনার স্কুলে, শৈলেনকে মহাদেব মাষ্টারের পাঠশালায়—গিরিবালার বোধ হয় মনে পড়িতে পারে—গঙ্গার ঘাটে যাইতে ঠিক মোড়ের উপর পাঠশালাটা পড়ে, একটা বাদাম গাছের তলায়…

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"খুব কান্নাকাটি করতে লাগল দুই ভাইয়ে তুমি চলে আসবার সময়?"

বিপিনবিহারী চকিতে একবার স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া লইলেন, তাহার পর নিতান্ত অবহেলার স্বরে বলিলেন—"কিছু না, কিছু না; কান্না?—তারা খুব ফুর্তিতে আছে—একটা ভালো জায়গা, আর মনোদিদির যা আদর। একবারও কি বোঝবার জো রেখেছেন যে পাণ্ডুল ছেড়ে রয়েছে? আসবার সময় একবার মনের ভাবটা বোঝবার জন্য বরং জিগ্যেসও করলাম—যাবি তোরা পাণ্ডুল? শৈলেনটা তো মনোদিদির কোল আঁকড়ে এরকম করে বসল যেন সত্যি আমি তাকে জবরদস্তি নিয়ে আসছি!…কান্না?—বয়ে গেছে তাদের কাঁদতে…"

মাথা নীচু করিয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতেই বলিতেছিলেন, শেষ করিয়া উঠিতেই গিরিবালার মুখে দৃষ্টি পড়িতে দেখেন, তাঁহার মুখটা যেন কি-রকম হইয়া গেছে।… এ যে উল্টা ফল হইল। কিন্তু কথাটা ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই ও-বাড়ি থেকে বৌদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গিরিবালা চলিয়া গেলেন।

বিচ্ছেদের ব্যথা অবশ্য মায়ের মন থেকে মেটে না, তবু খুব বড় একটা আঘাত লাগিল গিরিবালার বুকে।—সন্তানেরা এতই শীঘ্র ভোলে?—কি করিয়া সম্ভব হয় ওদের দিক্ থেকে? তাঁহার নিজের মুখে তো দুই দিন একেবারেই অন্ন ওঠে নাই, ও-বাড়ির দিদি টের পাইয়া তৃতীয় দিন হইতে ডাকিয়া নিজের সঙ্গে খাওয়াইতেছেন।… শৈলেন না হয় ছোট, অবুঝ, শশাঙ্ক তো বড় হইয়াছে, মা-অন্ত প্রাণ ছিল, —আসিতেই চাহিল না?—পিসিমার যত্নে মা পর হইয়া গেল?… অভিমানের পাশেই ক্ষমা আসিয়া দাঁড়ায়, গিরিবালা নিজের মনকে বোঝান—আহা, এই রকমই হয় বোধ হয়, বেটাছেলেরা যে আবার বেশি বারমুখো। ওরা ভালো থাক্—হে মা-শীতলা, ওরা তোমার কাছে গেছে, ওদের ভালো রেখো, মাকে ভোলা তো কোন অপরাধ নয়, যদি ভুলেই থাকে ভালো তো, তাই থাক্। যদি এতে কিছুও অপরাধ হয় তো ওরা সু-ভালয় ভালয় ফিরে এলে আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমার পূজা দোব—যদিই কোন দোষ হয়—একটুও—সামান্যও তো আমি সে নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছি…

কেমন করিয়া মনে পড়িয়া যায় কবে কোথায় কোন্ ছেলে মা'র মনে পীড়া দিয়াছে—নানা ভাবেই—কেহ কটু বলিয়া—সে-দিন কামারপাড়ায় লোটনা স্ত্রীকে লইয়া বুড়িমা হইতে আলাদা হইয়া গেল, কত কান্নাকাটি করিল বুড়ি।…এই যে অহি—চিররুগ্ন হইয়া মায়ের গর্ভে আসিয়াছে, চিরকাল দিবে বেদনা।…শ্বশুরের কথাও মনে পড়িয়া গেল—দরিদ্র জননী, দুইটি ছেলে মাত্র সম্বল, একটি একদিন অদৃশ্য হইল। শ্বশুরের নিজের মুখেই শোনা—কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের একটি চোখ চিরতরেই নষ্ট হইয়া যায়।…না, ওদের ওপর অভিমান করিতে নাই, অমঙ্গল হয় সন্তানের,—মা নাড়ীর রক্তে পুষ্ট করুক, সমস্ত শরীর নিংড়াইয়া বক্ষের ক্ষীর উজাড় করিয়া মুখে দিক, চক্ষু দিক, কিন্তু সব দেওয়ার সঙ্গে যেন অভিমানের এতটুকু সন্তানের উপর না পড়ে,—অমঙ্গল হইবে।…"হে মা-শীতলা, তারা যেন ভালো থাকে, যেমনটি নিয়েছ, ফিরিয়ে দিও; তোমায় বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দোব।"

কি করিয়া নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া যায়—সন্তানরূপিণী গিরিবালার দিকে। মনে পড়ে জেঠামশাই, জেঠাইমা, বাবা, মা,—একসঙ্গে সবাইকে। উঃ, কত দিন দেখেন নাই, চিঠি আসিয়াছিল জেঠামশাইয়ের অসুখ; বেশ তো ভুলিয়া আছেন সবাইকে!…হইবে না?—সন্তান যে!…

খঞ্জনী ব'লল—"ভুলহীন, খোঁখা, বড়কা-খোঁখা—ই সব…"

বিশেষ কিছু প্রশ্ন নয়; এই সে-দিন গেল, কই বা প্রশ্ন আছে এমন? খঞ্জনীর প্রশ্নটা অনির্দিষ্ট-ভাবে মাঝপথে এলাইয়া গেল।

অন্যমনস্ক ভাবেই গিরিবালা যেখানটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন সে দিকটা কলতলা। দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া আছেন; খঞ্জনী বোধ হয় অহিকে দুধ খাওইবার জন্য একটা বাটি আনিয়া মাজিতে বসিয়াছে।

গিরিবালা নিজেকে খুব সামলাইবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর একেবারেই ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন—"খোঁখা সব হমর, ভুল গেলেই গে খেঞ্জনী!…"

অত করিয়া সন্তানের পক্ষ হইবার চেষ্টা বিফল হইল। হাতে আঁচলের একটা তাল পাকাইয়া মুখে চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিরাজমোহিনী চলিয়া যাইবেন বলিয়া তাহার পরদিন ও-বাড়িতে সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। দুপুরবেলা এঁরা আফিসে চলিয়া গেলে ননদ-ভাজে মিলিয়া চার জনে আহার করিতে বসিয়াছেন, কৌনির পায়স হইয়া শশাঙ্কর কথা উঠিল। জিনিষটা চালের খুদের মতো এক রকম শস্য, এর পায়স শশাঙ্কর বড় প্রিয় ছিল। অভয়া দেবী বলিলেন—"আহা, দেশে আবার এসব জিনিস পাওয়া যায় না, শশাঙ্কটা বড্ড ভালোবাসত গো!"

বড় জা মুখটা ভার করিয়া রাগিয়া উঠিলেন—"না বাপু, মনে করি কিছু বলব না, কিন্তু না বলেও পারি না;—নিজে জিদ করে ছেলে দু'টোকে পাঠিয়ে দিলে গা!—ধন্যি বলি মায়ের প্রাণ! কাল ঠাকুরপো যখন বলছিলেন এমন রাগ ধরছিল তোর ওপর বৌ! বলেন—কখনও ওদের গর্ভধারিণীর কাছ-ছাড়া হয়নি। থাকতে কি চায় বৌদিদি? যে কটা দিন ছিলাম, সঙ্গে নিয়ে আসব বলে ভুলিয়ে রেখেছিলাম, তা যখনই দেখা হয়—'কবে যাবে বাবা? কখন যাব মার কাছে?'…শৈলেনটা ছোট, আরও হেদিয়ে পড়েছে।—আসবার দিন কাটা ছাগলের মতন দু'টোতে উঠোনে গড়াগড়ি দিতে লাগল…"

গিরিবালা হাত বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—"দিদি!"

—কৌতুকে, বিস্ময়ে এবং তাহার সহিত একটা অদ্ভুত আনন্দের হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

জা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি লো?"

গিরিবালা একটু জোরেই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আর, তোমার দেওর আমায় কি বললেন জানো?—তারা বেশ আছে, দিব্যি আছে, জোর করে বললেন তবু আসতে চাইলে না।…কী মানুষ বাপু, এ রকম করে মিথ্যে!…আর আমি ভাবছি জোর করে বিদেয় করলাম বলে তারা বুঝি সত্যি আমায় ভুলে…"

প্রায় অলক্ষ্যেই হাসিটা মিলাইয়া গিয়া চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল; কথা বন্ধ হইয়া গেল। বুকের বেদনাটা একটা দীর্ঘশ্বাসে হালকা করিয়া বলিলেন—"একটা দোষ করেছি বলে কি সত্যিই তারা আমায় অমন করে ভুলবে দিদি?"

অদ্ভুত হাসির মধ্য দিয়া কথাটা এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল যে, সকলেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, জা আঁচলে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—"চুপ কর বৌ, আমার কথাটা বলাই ভুল হয়ে গেছে। ঠাকুরপো একটা ভেবে তোকে বানিয়ে বলেছিল ও-রকম করে; ভুল হয়ে গেছে আমার, জানতাম না-তো। চুপ কর, খেতে বসে চোখের জল ফেলতে নেই, অকল্যাণ হয়…"

তাহার পর আহারটা নীরবেই হইল। পায়সের বেলায় গিরিবালা বলিলেন—আর কিছু খেতে পারব না দিদি, পেট ভরে গেছে।"

কেহ জিদ করিল না, অবশ্য নিজেও কেহ স্পর্শ করিল না।

কিন্তু এ-ও এক জ্বালা, কোন দিকেই বা যায় মা?—ছেলেরা ভুলিয়া বেশ ভালো আছে, নিশ্চিন্ত আছে—এতেও দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমান; আবার এমন সব কাজের মধ্যেই মনে হয় দুই ভাইয়ে মায়ের অভাবে মুখ চুণ করিয়া নিরুপায় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উঠানে পড়িয়া কাটা ছাগলের মতো ছটফট করিতেছে।…কত রকম ছুতা করিয়া ক্রমাগতই চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া ধরিতে হয়।

তবুও সংসার সংসারই, ছেলেদের চিন্তা চাপা দিয়া দায়িত্বের বোঝা নামিয়া ঘাড়ে ফেলিল।

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি নিস্তারিণী দেবী গেলেন, অগ্রহায়ণ থেকে বাজারে ধানের বোঝা পড়িতে আরম্ভ করিল। মাড়াই হইয়া খামারবন্দী হইতে কিছু দিন গেল, তাহার পর গিরিবালার অধীনে আসিয়া পড়িল। এ একটা অত্যধিক কর্মচঞ্চল জীবন। উঠানে প্রত্যহ কাইয়া প্রত্যহ জড়ো করিবার ব্যবস্থা করা, বেশিভাগ সিদ্ধ করানো, মাইয়ে তুলিবার ব্যবস্থা করা, ধান কোটাইয়া চালের ব্যবস্থা করা, লের ঘরে বড় বড় মাটির কুটিতে তুলিয়া রাখানো—প্রায় দুই মাস ধরিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিবার যো থাকে না। অবশ্য বাহির হইতে নিকটা সাহায্য হয়, তবু প্রায় সমস্তটাই মেয়ে-মজুর লইয়া এবং ভির মধ্যেকার ব্যাপার বলিয়া গিরিবালারই এলাকায় পড়ে। গায় কামারপাড়া হইতে অনেক মেয়েছেলে আসিয়া পড়ে, না দেখিলে কি দেওয়ায় সুদক্ষ। তা ভিন্ন বিলক্ষণ হাতটান আছে, অষ্টপ্রহর ই দিকে চোখ রাখিয়া না চলিলে উপায় নাই। অন্ত বার শাশুড়ি কতেন, অনেকটা সাহায্য হইত। গিরিবালা অবশ্য বলিতেন—তুমি ব'স, পূজোর ব্যাঘাত হবে," কিন্তু নিস্তারিণী দেবী নামিয়াই তেন কর্মক্ষেত্রে। মালাটা হাতেই থাকিত, তবে ঘোরানয় যে হইতেছে সেটা অস্বীকার করিতেন না, হাসিয়া বলিতেন—"মা-কে ঘরে তুলছি বৌমা, এ-ও তো পূজো, বরং আসল পূজো। বের কি দোষ জান বৌমা?—মা সাক্ষাৎ রূপ ধরে এলে তাঁকে চিনতে পারে না;—এই তো সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন মা।" এবারে শাশুড়ি নাই, কিন্তু তাঁহার কথাগুলো, তাঁহার শ্রদ্ধা মনে গাঁথিয়া আছে গিরিবালার। সাক্ষাৎ রূপই বটে মায়ের। মধুসূদনের জমির দিকে ঝোঁক ছিল না, নিশ্চয় অবসরও ছিল না, যখন গেলেন সংসারটিকে একরূপ কপর্দক-শূন্য করিয়াই গেলেন; এই ধান্যরূপা লক্ষ্মীর জোরেই তো বিপিনবিহারী সেই মহাসঙ্কট কাটাইয়া প্রতিষ্ঠার পথে দাঁড়াইয়াছেন। এ-বাড়ির সবাই চেনে এ-রূপকে। গিরিবালা ছোট জাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন, অভয়া দেবী আছেন, তিন ননদ-ভাজে অষ্টপ্রহর লক্ষ্মী তোলায় ব্যস্ত থাকেন, বাঁধে ষোল আনা ভার পড়ায় উৎসাহ আরও যেন বাড়িয়া গেছে।…নিস্তারিণী দেবীর পত্র আসে—আর সব প্রশ্নের মধ্যে ধানের প্রশ্ন আগে—কোন, ধান কত হইল এবারে—চাল কত উঠিল কুটিতে—নবান্নের অমুক দিন, পাঁচ রকম চাল দিয়া যেন নবান্ন করা হয়—চালের ইতর-বিশেষ করা এবাড়ির নিয়ম নয়…

উত্তর দিতে হয় সবিস্তারে; ধান তোলা-পাড়া, সিদ্ধ করানো, চাল-ছাঁটা এই সবের মধ্যে তিন জনে বসিয়া খুঁটিয়া-খুঁটিয়া চিঠি পড়িয়া একটি একটি কথার উত্তর তৈয়ারি করেন। অভয়া দেবী বলেন—"বাবাঃ, সেই যে কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, মারও হয়েছে তাই, ওঁর আবার ঘটা করে গঙ্গাস্নান আর তীর্থ করা!"

খুব হাসি পড়িয়া যায়। ছোট বধূ লেখেন; অভয়া দেবী বলেন—"লেখো—তোমার মাঝের কুটি খাঁ খাঁ করছে—সেটাতে তোমার আদরের বাসমতী চাল থাকত; একেবারে হয়নি ও-ধান এবারে। দেখো না, মা-গঙ্গা, মা-শেতলাকে ছেড়ে যদি 'হা-বাসমতী, হা-বাসমতী'—বলতে বলতে না ছুটে আসেন তো…"

কর্মের আনন্দের মধ্যে হাসির জন্যেই মনটা থাকে উন্মুখ, ধান-কোটার শব্দ আর মজুরণীদের মুখরতার মধ্যে সুবিধাও অনেক, হাসির মধ্যে আর এতটুকু কুণ্ঠা বা খাদ থাকে না।

ধান-চালের পাট সারিতে শীতের অর্দ্ধেকটা এক-রকম করিয়া কাটিয়া গেল। ছেলেদের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়, তবে কর্মের খরস্রোতে কোন কিছুরই গোড়া বসিতে পায় না। কোন একটা অলস অবসাদ-মুহূর্তে হয়তো মনটা চঞ্চল হইয়া পড়ে, চক্ষু দুইটি সজল হইয়া ওঠে, তাহার পর—"হে দুর্গা" বলিয়া কেহ একটা কাজের তাগিদ লইয়া উপস্থিত হয়, চোখের জলের সঙ্গে স্মৃতির আমেজটুকুও মুছিয়া ফেলিয়া কর্মস্রোতে আবার গা ভাসাইয়া দিতে হয়।

ধান-চালের হাঙ্গাম মিটিলে আসিল অবসর, কর্মচঞ্চলতার পর আলস্যে মনটা যেন আরও উদাস করিয়া ফেলে। শীতের অপরাহ্নটুকু স্বল্পায়ুই—সন্ধ্যা আসিলেই নিত্যদিনের কাজ আসিয়া পড়িয়া চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু ঐ একটুখানি সময় কাটানোই প্রতিদিনের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। শুধু ওদের চিন্তা, আর তাঁর সমস্তটাই দুশ্চিন্তা। এক এক দিন গিরিবালা খঞ্জনাকে দিয়া দুলারমনকে ডাকিয়া পাঠান; দুলারমনের নিজের একটা ব্যথা রহিয়াছে বলিয়া তাহার সঙ্গটা লাগে ভালো। সে নিজের কথা খামকা তুলিতে চায় না, তবে গিরিবালার বেদনা-আশঙ্কার ইতিহাস চুপ করিয়া শোনে, ভিজা মন বলিয়া চোখে শীঘ্র জল জমিয়া আসে।…দুলারমন আর আগেকার দুলারমন নাই, আগে ঠিক যেন এখনকার উল্টা

ছিল। ওর মুখের হাসি অবশ্য শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাহার জীবনের কথা আসিয়া পড়ে এই ভয়ে ক্রমাগতই কথার মোড় ফিরাইয়া নিজের সেই পুরান কালের হাস্যমুখরতার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহ রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। মায়ের মৃত্যুর পর ও-চেষ্টাটাই যেন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।···ও যেন নিজের অদৃষ্ট-দেবতার সঙ্গে এক-চোট প্রাণপণে লড়িল, তাহার পর মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে হারিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তবে আসে বেশি আগেকার চেয়ে; ডাকিলে তো আসেই, নিজে হইতেও আসিয়া পড়ে কখন কখনও। গিরিবালাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, আজ-কাল যেন আরও বাসে। মনটা আজ-কাল বড় তরল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভিন্ন লোক কম বলিয়া বোধ হয় সুযোগ বেশি; থামাকা নিজের কথা তোলে না বটে, তবে একবার তুলিলে, পূর্বে যে সব কথা বলিত না, আজকাল মনের কোণকান, হাতড়াইয়া বাহির করিয়া বলে।···একদিন ছেলেদের কথা একটু ঘোরালো হইয়া উঠিল;—চিঠি আসিয়াছে, শশাঙ্কর আমাশয় হইয়াছিল—শৈলেনটা একটু দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, খেলার মাঝে কোন ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। আবেগের মাথায় ভুল করিয়াই গিরিবালার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"হলেও জ্বালা দুলারমন, একরকম ভালো আছ তুমি।"

দুলারমন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আমার যে হওয়া না-হওয়া দু'রকমেরই জ্বালা দুলহীন—অতি বড় শত্রুরও যেন এমন না হয়।"

গিরিবালা চমকিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"কৈ, শুনিনি তো!"

দুলারমনের চোখে দুই বিন্দু জল জমিয়া উঠিল, সে দু'টাকে যেন [illegible]রিয়া রাখিবার জন্যই চিবুক একটু তুলিয়া বলিল—"কেহই জানে [illegible], মাস তিনেকের হয়ে নষ্ট হয়ে গেল। তোমাদের পাহুন (কুটুম) [illegible] রকম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ওরা বড্ড কষ্ট দিয়েছিল আমায়, [illegible]হীন, তাঁর জিনিষ আমি রাখতে পারলাম না। সেটাও যদি [illegible]চে থাকত তবু এত কষ্টের মধ্যে কোন রকম করে······"

—বিন্দু দুইটি চিবুক বহিয়াই নীচে গড়াইয়া পড়িল।

খঞ্জনী আসিয়া উপস্থিত হইল; কোথায় নিদ্রা দিতেছিল, কাঁচা [illegible] ভাঙিয়া যাইবার জড়তা লাগিয়া আছে, কোলে অহি; বলিল "কোন মতে থাকছে না।"

গিরিবালা বলিলেন—"বসিয়ে দে না এখানে।"

তাহার পর দুলারমনকে অন্যমনস্ক করিবার জন্যই হুকুম করিলেন "নিয়ে আয় তো কতকগুলো সুপুরি, দুলারমনকে দিয়ে কুঁচিয়ে [illegible]ই—যখন পেয়েছি!"

খঞ্জনী ঘর থেকে এক আঁজলা সুপুরি আর দুইটা জাঁতি আনিয়া [illegible]কির নীচেটায় বসিল।

সুপারি কুঁচাইতে কুঁচাইতে গিরিবালা দুলারমনের মনটা [illegible]ভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার জন্য বলিলেন—"তা যদি বললে সব চেয়ে খঞ্জনীই ভালো আছে।"

খঞ্জনী নীচের ঠোঁট দিয়া ওপরের ঠোঁট ঈষৎ ঠেলিয়া ধরিয়া মাথা [illegible]ড়া নাড়িয়া বলিল—"কী ভালো আছে গো দুলহীন? আমি [illegible] খঞ্জনীর কথাই হচ্ছিল। খোঁখাকে পাঠিয়ে দিয়ে—'খঞ্জনী ভালো আছে'।···ই—স!"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"তাই তো, খোকার জন্যে বেচারির [illegible]য় না!"

দুলারমনও তাহার সদ্য-মর্দিত, নিদ্রালস চক্ষুর পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া আবার সুপারি কুঁচাইতে লাগিল।

খঞ্জনী চোখ দুইটা নাচাইয়া নাচাইয়া বলিল—"হ্যাগো, করো ঠাট্টা, মার পেটের ছেলে তারই যখন ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, সেই যখন নিজে জিদ করে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়······"

দুলারমন একটু বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ধমক দিল—"চুপ কর, পোড়ারমুখী!"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"বলতে দাও না দুলারমন।······ বেশ তো, প্রাণে লেগেছে তো ভালোই হয়েছে, এবার তুই নিশ্চিন্দি হয়ে ঘর করগে যা, তোর বর তো নিতেও এসেছে শুনলাম।"

খঞ্জনী আবার তাচ্ছিল্যের সহিত উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল—"ই—স, আমায় নিয়ে যাবে! আমিই এখন ক'ঘাটের জল খাওয়াই দেখো।"

বিষাদের হাওয়াটা একেবারে কাটিয়া গেছে, গিরিবালা বলিলেন —"দু'-একটা ঘাটের নাম কর, না খঞ্জনী, শুনতে বড় ইচ্ছে করছে।"

খঞ্জনী চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর তাগাদা খাইয়া বলিল —"হ্যা, বলতে যাই তোমাদের! ফিরে আসি, তার পর আপনিই টের পাবে।"

সত্যই একটা কিছু রহস্য আছে টের পাইয়া, সুপারি-কাটা বন্ধ করিয়া দু'জনেই চাপিয়া ধরিলেন।

খঞ্জনী মুখ গুঁজিয়া কয়েক বার—"না-না" করিয়া ক্লিষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি খোঁখাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—মরে যাব আমি—আমি মরে যাচ্ছি—আমি খোঁখার জন্যে নিজের সব ছেড়েছি। তবু আমায় একবার কেউ জিগ্যেস্ পর্যন্ত করলে না—খোঁখাও বেইমান, যাবার সময় আমি সাম্পেনির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, একটা কথাও কইলে না,···রে খোঁখা, রে খোঁখা, রে বেইমান!···"

হাতের আঁজলায় মুখ ঢাকিয়া খঞ্জনী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তখনও দুই জনের মনে বরকে সাত ঘাটের জল খাওয়ানোর হাসিটা জাগিয়া আছে, তাহার ভিতরে যে এত ব্যথা কে জানিত? দুই জনেই যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। গিরিবালা বলিলেন—"চুপ কর খঞ্জনী, চিঠি এসেছে—তারা শীগ্‌গির আসবে; চুপ কর, কাঁদিস্‌নি।"

৬

এই ভাবে একটা বৎসর কাটিয়া গেল। পাণ্ডুলের জীবন সেই একই রকম—দুলারমন—খঞ্জনী—ও-বাড়ি;—হরেন গুরুজীর পাঠশালায় যায়, দৌরাত্ম্য করে—খেত থেকে কোন নূতন ফসল উঠিল —মাঝে মাঝে এক আধটা ভোজ, ও-বাড়িতে বা এ-বাড়িতে—কোন অতিথি সমাগম হইল হয়তো কোন দিন, মধুসূদনের যশের জের; মাঝে একবার মোতিবালা দেশ থেকে আসিলেন, মাস দুয়েক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন।

বাপের বাড়ির জীবনে কিন্তু মস্ত বড় পরিবর্তন হইয়াছে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া থেকে: জেঠামশাই অন্নদাচরণ মারা গেলেন, এবং এই একটি মানুষ যাইতেই বেলেতেজপুরের বাড়ির ভিৎ যেন আলগা হইয়া গেল। সাতকড়ির কিছু দিন আগে শিবপুরে একটা [illegible]

কিশোরও চলিয়া আসিলেন, চাকরির চেষ্টায়। দেশে রহিলেন শুধু দুই জা এবং রসিকলাল। সে-থাকার মধ্যেও একটা নিস্পৃহতা লাগিয়া রহিল। একটু কারণ ছিল,—ঘোষালমশাই পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন, অন্নদাচরণ যাইতে নিকুঞ্জলাল জো পাইয়া বসিলেন। তাঁহার আক্রোশের বহর এবং শক্তির পরিমাণ—দুইটারই আন্দাজ পাওয়া গেল অন্নদাচরণের শ্রাদ্ধের দিন। কোথা দিয়া যে কি হইল, গ্রামে দুইটা দল হইয়া গেল এবং ভোজ্যের প্রায় অর্ধেকটা অংশ বাগদিপাড়ায় বিতরণ করিয়া দিতে হইল। রসিকলালের দুর্বল মনটা চিরকালই দাদার কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে এমনই ভাঙিয়া পড়িল, তাহার ওপর নিকুঞ্জলালের স্বরূপ প্রকাশে তাঁহার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, বেলেতেজপুরের মাটি আঁকড়াইয়া থাকা আর চলিবে না; এমন কি, আঁকড়াইয়া ধরিবার মাটিটুকু পর্য্যন্ত দখলে থাকিবে কি না তাহাও সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল।

নিকুঞ্জলালের স্ত্রী রায়মণি মারা গিয়াছেন, বোন দামিনী নিজের খুড়শ্বশুরের এক নাতনির সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহ দিবার মতলব আঁটিতেছেন। খুড়শ্বশুর বার দুয়েক সিংহবাহিনী দর্শনের নাম করিয়া এর মধ্যে দেখা দিয়া গিয়াছেন, একবার নাতনিটিকে লইয়া।... নিকুঞ্জলালের ভাবটা ঠিক বোঝা যাইতেছে না,—বাহিরে বাহিরে মালা, মামলা, আর ভগবান গীতায় কবে কি বলিয়াছেন তাহাই লইয়া থাকেন।

সাতকড়ি, হরিচরণ এবং শ্বশুরের হাতের চার-পাঁচখানা চিঠি হইতে সমস্ত খবরটা সংগ্রহ করা বিপিনবিহারীর। হরিচরণের লেখাটা খুব সরস—বিশেষ করিয়া নিকুঞ্জলালের সম্পর্কে যে খবরগুলা দেন, খুব সরস করিয়াই দেন, যদিও কথাগুলা দুঃখেরই। জেঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধে দলাদলির অমন গুরুতর সংবাদটাও বেশ হাসির ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন। চিঠির শেষ পংক্তিটা ছিল—"নিকুঞ্জ-জেঠাকে নেমন্তন্ন করতেই হয়েছিল, কোন উপায় ছিল না তো? কিন্তু তার দ্বারা আমাদের যে পাপটুকু হয়েছিল জেঠামশাইয়ের পুণ্যির জোরে সেটা সন্ত সন্তই কেটে গেল—নিকুঞ্জ-জেঠার দলের বামনদের জায়গায় পাড়ার বাগদিদের খাইয়ে।"

এতগুলা খবরের মধ্যে মাত্র সাতকড়ির শিবপুরে চাকরি হওয়ার খবরটা গিরিবালা পাইলেন। অন্নদাচরণের মৃত্যুর খবরটা দেওয়ার উপায় ছিল না; গৃহস্থালী'র ভাঙনের মূলেও এই মহীরুহপাত, তাই হরিচরণের কথা পর্য্যন্ত বলিলেও, কিশোরের শিবপুরপ্রবাসের কথা বলা হইল না। বাপের বাড়ির এত-বড় দুর্যোগের যেটুকু ইতিহাস যে ভাবে পাইলেন তাহাতে গিরিবালা কতকটা উৎফুল্ল হইয়াই বলিলেন—"বড় চমৎকার হোল, না? সাতকড়ির চাকরি হোল, জেঠামশাইয়ের বোঝাটা অনেক হালকা হোল, শেষ বয়েসেও যে ভগবান একটু মুখ তুলে চাইলেন, এও তাঁর কত দয়া!"

খবরটা টের পাইলেন মাস-আষ্টেক পরে, তাঁহার পঞ্চম সন্তান চাঁদু যখন দুই মাসের। শীত কাল, তাহাকে লইয়া রোদে বসিয়া আছেন, এমন সময় হরেন আসিয়া বলিল—"মা, একটু গোমের ময়দা দেবে?...হ্যাঁ, দাও মা।"

নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে মেশে বলিয়া কথাগুলায় হিন্দির ছুট খুব বেশি। জিনিস যা চায় অপরের জন্যই, সব সময় যে চাহিয়া লয় সেয়ও নয়; গিরিবালা বলিলেন—"না, ময়দা নেই, যাঃ।"

হরেন আবদার ধরিয়া বসিল—"হ্যাঁ, দাও মা, লেই বানাব, গুড্ডি করব।"

গিরিবালা রাগিয়া বলিলেন—"ঘুড়ি করবি কাগজ কোথায় পেলি শুনি? ওঁর টেবিল থেকে সরিয়েছিস্ তো?"

হরেন বলিল—"না রদ্দি কাগৎ, বাবার টেবিলের নিচে পড়েছিল, এই দেখো বরং।"

ও-বাড়ি যাইবার রাস্তায় কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ময়দার লোভে আনিয়া হাজির করিল। আগা-গোড়া লেখা একটা বেশ বড় কাগজ। চিঠির কাগজ নয়, তবে হরেনকে কাছে ডাকিয়া দেখিলেন চিঠিই এবং হরিচরণের হাতের লেখা। কখনও হাতে পড়ে নাই এ চিঠি, একটা কৌতূহল হইল, বলিলেন—"দে তো দেখি।"

হরেন পিছাইয়া গেল, বলিল—"না, এ রদ্দি কাগৎ, আমার গুড্ডি হবে।"

ফেরৎ দিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং ময়দার লোভ দেখাইয়া গিরিবালা চিঠিটা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। অদ্ভুত চিঠি আর অদ্ভুত তার সব খবর!...'মেয়ে সেদিন এসেছিল তার ঠাকুরদার সঙ্গে, চণ্ডীদিদির মেয়ের সঙ্গে খেলা করছিল, দেখলুম...শুনচি নিকুঞ্জ জেঠার পছন্দ হয়েচে...কিশোরের পড়া ছাড়াতে হোল...শ্রাদ্ধের ব্যাপার থেকে বাবা ভয় পেয়ে গেছেন...'

গিরিবালা দারুণ বিস্ময়ের সহিত পড়িয়া যাইতেছিল, শ্রাদ্ধের কথায় বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। আরও উৎকণ্ঠিত ভাবে পড়িয়া চলিলেন, পূর্বের ও পরের অনেক পত্রের মাঝখানে এই একখানা চিঠি, সংবাদের ল্যাজা-মুড়া, কোনটার বা মাঝের অংশটাই বাদ পড়িয়া যাইতেছে—কি এক গোলমেলে ব্যাপার। হরিচরণেরই লেখা, তবে ঐ বেলেতেজপুরেরই খবর না কি?—কোন্ দামিনী পিসিমা কোন্ নিকুঞ্জ-জেঠার জন্য ঘটকালি করিতেছেন? বাবার একলার সামলাইবার কথা কোথা থেকে আসিল?...হাত কাঁপিতেছে, মনটা যেন পাগলের মতো অক্ষরগুলার ওপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; হঠাৎ শেষের দিকে একটা লাইনের উপর আসিয়া আটকাইয়া গেল—'জেঠামশাইয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় নিকুঞ্জ-জেঠা যে কি করবে আবার! আর তো মোটে মাস কয়েক আছে...'

গিরিবালা যেন একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই চেঁচাইয়া উঠিলেন—"হরেন!"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া হরেন অনেকক্ষণই সরিয়া পড়িয়াছে। বিপিনবিহারী অসময়ে এবং একটু ব্যস্ত হইয়াই প্রবেশ করিলেন, সোজা ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছিলেন, গিরিবালার হাতে চিঠিটা দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। একটু রাগিয়াই বলিলেন—"তুমি চিঠিটা কি করে পেলে? আমি ছুটে আসছি—ভুলে বোধ হয় বাইরে ফেলে গেছি, ভেবে..." সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সংযত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"সবটা পড়ে ফেলেছ না কি?"

গিরিবালা খুব বেশি কাঁদিতে পারিলেন না,—এমন অদ্ভুত ভাবে পাওয়া সংবাদটা আর প্রায় এক বৎসরের পুরান হইয়া এমন একটা অদ্ভুত আকার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তদুপরি চারি দিকে অদ্ভুত পরিবর্তনে এমন একটা জটিলতার মাঝখানে পড়িয়া গেছে যে মনটা হঠাৎ যেন [illegible] হঠাৎ

আসিয়া পড়িয়াছেন—মনের উপর প্রভাব হইবে কি করিয়া ?—বিশ্বাস করিয়া সংবাদটা মনে গ্রহণ করা শক্ত।

যে জলটা একটা পথ ধরিয়া বেগে বাহির হইয়া যাইতে পায় না, সেটা ধীরে ধীরে অনেকখানি মাটিকে ভিজাইয়া তোলে ; ভালো করিয়া কাঁদিবার সুযোগ হইল না বলিয়া জেঠামশাইয়ের জন্য শোকটা জীবনকে যেন খুব ব্যাপকভাবে ছাইয়া রহিল।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একটা শুভ খবর আসিল, সাতকড়ির বিবাহ। কত দিন যাওয়া হয় নাই দেশে, আর কত দরকার যে যাওয়া একবার ! কিন্তু কোলের শিশুটি মাত্র চার মাসের। গিরিবালার মনে পড়িল—বিরাজমোহিনীর সঙ্গে একবার ঠাট্টার তর্ক করিতে করিতে নিস্তারিণী দেবী তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"হাঁ, রাখবই তো বেঁধে—সোনার শেকল দিয়ে—একটি একটি করে শেকলের পাব, আমার হাতে আসবে।"···গিরিবালা অভিমান করিয়া বলেন—"বাবা-জেঠাইমারাও আমায় ঠেলে দিয়েছেন, সব জেনে-শুনেও এই [illegible]য় বিয়ের ব্যবস্থা হোল,—আর দিন ছিল না ?···'গিরিকে নিশ্চয় নিয়ে আসবে।'—ব্যস্ চিঠিতে দু'অক্ষর লেখা হয়ে গেল, আর কি ? [illegible]য়ে খালাস হয়ে গেলেন।"

বলিলেন বটে কথাটা, কিন্তু যাইতে পারিলেন না বলিয়া মন যে [illegible] খারাপ হইয়া রহিল এমন নয়। একটু অভিমান হইল, স্মৃতি [illegible]কটু সচেতন হইয়া উঠিল কিছুক্ষণের জন্য, তাহার পর আবার [illegible]জের মধ্যে সব তলাইয়া গেল।···মেয়েছেলের শ্বশুরবাড়ি তাহার [illegible]পের বাড়িকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

সদ্য সদ্য অত ভাবিলেন না, কিন্তু পরে এক দিন কথাটা ভাবিয়া [illegible]খিবার অবসর হইল। ছোট জা প্রভাবতী দেবী বৈয়াম থেকে [illegible]সিলেন ; যেদিন আসিলেন তাহার পরদিনই দেশ থেকে কিশোরের [illegible]ত্র আসিল ; নূতন বৌদিদি পাইয়াছে, খুব আহ্লাদ করিয়া বিবাহের, [illegible]ভাতের, কুটুমবাড়ির নূতন বৌদিদির বর্ণনা দিয়া খুব দীর্ঘ একখানা [illegible]ত্র দিয়াছে। তিন জনে বসিয়া বসিয়া পড়িলেন, প্রভাবতী দেবী [illegible]লেন—"তুমি গেলে না কেন দিদি ? প'ড়ে আমারই মন উদাসে [illegible]ছ—মনে হচ্ছে থাকতে পারলে দিব্যি হোত। আর তোমার বাপের বাড়িই।"

বিবাহের পত্র পাইয়া যতটা হোক না হোক, এখন বর্ণনা পড়িয়া [illegible]ই গিরিবালার মনটা একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত জিনিষটা [illegible] সামনে জাগিয়া উঠিয়াছে। জিনিষটা আশার আকারে, [illegible]নার আকারে যখন আসিয়াছিল, এরকম ছিল না, এখন অনু[illegible]পর আকারে আসিয়া মনটা যেন মথিত করিয়া তুলিল ; [illegible]হইল—প্রথম ভাইয়ের বিবাহ—বাড়িতে প্রথম বধূ আসার [illegible], ঠিক এ-জিনিষটা আর আসিবে না বাড়িতে কখনও, [illegible] জীবনে চিরতরেই বাদ পড়িয়া গেল। আরও একটা কথা হইল—এর আগে যা' কিছু ভাবিয়াছিল তা নিজের দিক্ [illegible], আজ হঠাৎ মনে হইল—আর এক জনের কথাও ভাবিবার [illegible] এর মধ্যে, সে সাতকড়ি—তাহার অভিমান জীবনে [illegible] না।

জায়ের কথার উত্তর দিলেন—"যাওয়া কি সহজ বোন ? একটা [illegible]সের শিশু রয়েছে।"

খুব শক্ত। চার মাসের শিশু [illegible]

নিয়ে যাচ্ছে না যেন লোকে ! না হয় আমিই এসে দেখতাম, ও তো আর মা চিনতে পারেনি এখনও, দুধ আছে এমন একটা মাগিকে বামনপাড়া বা কামারপাড়া থেকে ধরে আনলেই হোত—কিছু পয়সা দিয়ে।"

গিরিবালা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা হোত বটে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।" অবশ্য প্রভাবতী দেবীর জন্য আর অন্য কোন উত্তর ছিল না, তিনি এখনও সন্তানের মা হন নাই, তাঁর বলা চলে ও-কথা। যাওয়া চলিত, খোকাকে লইয়াই, কামারপাড়ার কোন মাগির দুধের ভরসায় ছাড়িয়া দিয়া নয়। তবু গেলেন না কেন ?···

সেদিন রাত্রে ও-বাড়িতে খাওয়া ছিল। দুই বাড়ি লইয়া ছোট ভোজ। রান্নাঘরে বসিয়া সকলে আয়োজনে লাগিয়া ছিলেন, গল্প হইতেছিল, এমন সময় এ-বাড়িতে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল।

বড় জা বলিলেন—"বৌয়ের ছেলে উঠেছে।"

অভয়া বলিলেন—"খজনী আছে, ঠুকে-ঠাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে'খন।"

বাপের বাড়ির কথা লইয়া আজ গিরিবালার মনটা যেন অতিরিক্ত ছল-ছল করিতেছে, সব জিনিষের উপর মায়াটা বাড়িয়া গেছে ; উঠিতেই যাইতেছিলেন, অভয়া দেবীর কথায় বসিয়া গেলেন ; মনে স্নেহটা আজ বেশি তরল বলিয়া প্রকাশ করিতে যেন কুণ্ঠা বোধ হইতেছে। খোকার কান্নাটাও ওদিকে থামিয়া গেল।

মনটা কিন্তু ঐদিকে পড়িয়া রহিল। একটু পরেই আবার কান্না উঠিল—"নাঃ, দিলে বসতে তো ?"—বলিয়া ময়দার হাত ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। একবার ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় খজনী গাঢ়তর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, খোকার কান্নার সঙ্গে সমান তালে নাক ডাকিয়া যাইতেছে।

খোকা ভিতরে রাগ মানিল না বলিয়া গিরিবালা তাহাকে লইয়া বাহিরে আনিয়া দাওয়ায় বসিলেন। স্তন্যপান করিয়া খোকা একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষ ; রাত বেশি হয় নাই, বোধ হয় আটটা হইতে ন'টার মধ্যে, কিন্তু কানের কাছেই এক গাঢ় নিদ্রার শব্দ ছাড়া কিছুই নাই বলিয়া মনে হইতেছে, যেন নিসুপ্ত হইয়া গেছে। চৈত্র মাস, নূতন গ্রীষ্মের একটা একটানা হাওয়া বহিয়া চলিয়াছে, চারি দিকে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মাথায় অসংখ্য নক্ষত্র—ছোট, বড়, পুঞ্জীভূত, একক—হাজারে হাজারে ঝিকমিক করিতেছে, অথচ অন্ধকার এতটুকুও কমে না। এই অনাহত অন্ধকার, ঐ আলোকপুঞ্জ, নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়া গিরিবালার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল, ঘুমন্ত শিশু কোলে চুপ করিয়া সামনে বসিয়া রহিলেন—অনেকক্ষণ।···ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গেছে, ও-বাড়িতে অভয়া বলিলেন—"বৌদি আসেন না যে, ডাকতে পাঠাব ?" প্রভাবতী বলিলেন—"থাক্, হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, ভাইয়ের চিঠি পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে আজ।" ···এই আলোচনাই চলিল একটু একটু।

এমন একটা রাত্রির নিকষে এমনই উদাস দৃষ্টির সামনে কোথা থেকে পুরান স্মৃতির দাগ পড়ে। আজ সমস্ত দিনে সব চেয়ে যা বড়

করিয়া এক একটি ঘটনা গিরিবালার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ঠিক এমনটি আর কখনও হয় নাই—নিজেকে যেন আগাগোড়া দেখিতে পাইলেন একবার।···ও-প্রান্তে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে পুতুল-সন্তান লইয়া ব্যস্ত, আর আজ এ-প্রান্তে শিশুক্রোড়ে পাঁচটি সন্তানের জননী—মাঝখানে তারই কত বিচিত্র রূপ!. গিরিবালা কিন্তু অনুভব করিলেন দুই-ই এক হইলেও পূর্ব্বাপর যোগ নাই—সমস্ত শৈশবটা যেন আলাদা হয়ে গেছে জীবন থেকে—ঠিক কোন্ জায়গাটিতে ছেদ পড়িয়া, কোথায় কবে কেমন করিয়া, ধরা যায় না, তবে আজকের গিরিবালার সঙ্গে ছেলেবেলার গিরিবালার যোগ নাই; বেলেতেজপুর আর পাণ্ডুলের জীবন—দুইটা আলাদা হইয়া গেছে। মনে পড়িল প্রথম-প্রথম আসিয়া বেলে-তেজপুরের জন্য সে কী অসহ্য ব্যাকুলতা!—গ্রীষ্মের দুপুরে সবাই যখন ঘুমাইয়া, জানলার সামনে একটু ছিদ্র দিয়া বাহিরের উত্তপ্ত রোদের দিকে চাহিয়া আছেন—আজ যেমন অন্ধকারের গায়ে, সেদিন তেমনি ঝলমলে রোদের গায়ে বেলেতেজপুর ভাসিয়া উঠিয়াছে—বাপ, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা—মনে হয় ডানা থাকে তো উড়িয়া পলাই!··· কোথায় গেল সে ব্যাকুলতা? কবে থেকে গেল? কত দিন পরে, আজ এই প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের মাথায় বেলেতেজপুর এমন সবিস্তারে মনে পড়িয়াছে! সব মেয়েরই এই জীবনকাহিনী না কি? তাই নিশ্চয়, মা বাপের বাড়ি যাইতে না পারিলে প্রায়ই বলিতেন—"মেয়েদের বাপের বাড়ি কুটুমবাড়ি মা,—কুটুমবাড়িরও বাড়া!"···আরও মনে পড়ে বাবার মুখে শোনা—পণ্ডিতমশাই না কি বলিয়াছিলেন—"গৌরী চাইলে কি বাপের বাড়ি ঘন-ঘন আসতে পারে না রসিক? চায় না তাই আসে না, বছরে বছরে একবার করে তেরাত্তির কাটাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে—একটা ঠাট বজায় রাখা কোন রকম করে।"···ঠিকই-তো, সব মেয়েই দুর্গার ধাতে গড়া. ইচ্ছা করিয়াই ভোলে বাপের বাড়িকে।······সাতুর বিবাহ হইল—সাতুর—বাড়ির প্রথম ছেলের!—দিদি বলিতে অজ্ঞান হইত; গিরিবালা গেলেন না!

একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল, চিন্তা একটু অন্য পথ ধরিল।—কেন হয় এমনটা? কে ভুলাইয়া দেয়?—ছোট জা তো বেশ আছে······

প্রশ্নটা আপনা আপনিই যেন উত্তর পাইয়া গেল। গিরিবালা একটু ঝুঁকিয়া ঘুমন্ত শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন,—এরাই—এরাই; এক একটি করিয়া আসে আর ওদিকে খানিকটা খানিকটা করিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করে; এদের লইয়াই অনবরত চিন্তা করিতে করিতে আর কিছুই মনে থাকে না—সুখের চিন্তাও আছে, আবার দুঃখের চিন্তাও আছে।···অদ্ভুত এরা,—এক সময়ের যে আদরের মেয়ে তাহাকে একবার মা করিয়া লইয়া একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লয়, কী যাদুই যে জানে!

এদের কেহ নাই বলিয়াই তো খঞ্জনী বাপের বাড়ি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, জা প্রভাবতী বলিতে পারিল—"একটা ব্যবস্থা করে চলে গেলে না কেন?"···গিরিবালা বুঝিলেন তাঁহারও না যাওয়ার মধ্যে কোথায় একটু লুকানো আশঙ্কা ছিল—খোকার কষ্ট হইবে, অহি বড় দুর্বল—তাই হয়তো জন্মিয়া ওরা যে বাপের বাড়ির সম্বন্ধটাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে সে-সম্বন্ধ লইয়া অত টান হয় নাই। জা প্রভাবতী এ রহস্য কি করিয়া বুঝিবে?

গিরিবালার বুকের কোথায় কি একটা ব্য—জানাজ কি বোঝা ঠাহর করিতে পারেন না। খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরেন; মনে মনে বলেন—এরা এমনি করে অনেক জিনিষই নেবে,—তা নিক্—নিক্··

৭

পাণ্ডুলের কুঠির ইতিহাস এক জায়গায় খানিকটা দেওয়া হইয়াছে; আবার একটু দেওয়া প্রয়োজন, কেন না, ইতিহাসের ধারাটা আগের তুলনায় খানিকটা বদলাইয়া গেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাণ্ডুলের কুঠির শাসন ছিল একটু নরম সুরে বাঁধা—অবশ্য অন্য কুঠির তুলনায়। মধুসূদনের পর কৈলাসচন্দ্রের হাতে ভার পড়িলে, এই সুরটি যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য তিনিও খুব সচেষ্টও রহিলেন। ওদিকে সাহেব-মহলেও একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনিবরা নাই, এখন ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজারের হাতে কুঠি। সুনাম আর দুর্নাম একটা বিষয়েই দুই দিক্। রায়তের কাছে পাণ্ডুলের কুঠির সেটা ছিল সুনাম, কুঠিয়াল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইটাই ছিল দুর্ণামের কারণ। 'নেটিভ'দের কি প্রাপ্য, তাহাদের কি করিয়া ঠাণ্ডা রাখিতে হয় সে-সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র ধারণা ছিল। একটা কথাই চলিয়া গিয়াছিল—'আগে লাৎ পিছে বাৎ'। পাণ্ডুল, এবং পাণ্ডুলের মতো আরও দু'-একটা কুঠি যাহারা 'নেটিভ'দের মানুষের সমশ্রেণী করিয়া লইয়া বাজার নষ্ট করিতেছে। ক্লাবে, পার্টিতে তাহাদের প্রচ্ছন্ন বা প্রকট বিদ্রূপ শুনিতে হইত। মনিবেরা চলিয়া গেলে যখন ম্যানেজারদের শাসন আরম্ভ হইল, তখন বিদ্রূপটা বোধ হয় একটু বাড়িলই। সূর্য্যের অতটা তাত না থাক, তা বলিয়া বালিরও দাহিকা শক্তি থাকিবে না—এ কেমন কথা।

কিন্তু একটা ট্র্যাডিশান চট করিয়া ভাঙা যায় না। পুরাতন পদ্ধতি ধরিয়া নূতন বাবুর আমলেও বেশ চলিয়া যাইতেছে, তাহা ভিন্ন সময়ও বদলাইয়াছে—সম-ব্যবসায়ীদের কথা বড়সাহেব গায় মাখিত না।

কিন্তু ছোটসাহেব অন্য প্রকৃতির। তাহার রক্ত উষ্ণতর, সে কুঠির শাসনের সুবর্ণ যুগটি ফিরাইয়া আনিতে চায়। তাহার নিজের সব থিয়োরি আছে—বাংলায় কুঠিয়ালদের প্রতিপত্তি কেন গেল, বিহারেই বা কেন যাইতে বসিয়াছে;—এর প্রতিবিধান সম্বন্ধেও তাহার থিয়োরি অনুরূপ, বড়কর্ত্তার গা-এলানো ভাবটা তাহার পছন্দ হয় না। ছোকরা একটু মিন্‌মিনে গোছের; বড়সাহেবকে সোজাসুজি কিছু বলিতে পারে না, বা বলে না; কৈলাসচন্দ্রের উপর প্রতিপত্তি জমাইবার চেষ্টা করে। সুবিধা হয় না। কেন না এ বালখিল্যকে আসন দিবার পাত্র তিনি নহেন। ভিতরে ভিতরে খিটিমিটি হয়, এবং একটু ঘোরালো হইলেই কথাটা বড়সাহেবের কানে পৌঁছায়। তিন-চারবার এই-রকম হইয়া গেল; বড়সাহেব একটু একান্তে ডাকিয়া বলিল—"Leave it to the Babu Mr.···" (বাবুর হাতেই এসব ছেড়ে দাও)

তিন-চারবারই কথাটা এই ভাবে বড়সাহেবের কাছে গিয়া চাপা পড়িতে কৈলাসচন্দ্র বুঝিলেন, তাঁহারই জিৎ চলিতেছে; কিন্তু তবু ব্যাপারটা তাঁহার খুব প্রীতিপ্রদ হইল না। এক দিন বিপিনবিহারীকে বলিলেন—"গতিক তেমন সুবিধের নয় বিপিন, অবশ্য মনে হচ্ছে বড়সাহেব ছোটসাহেবকে নেহাৎ যদি দাবড়ানি না দিয়েও থাকে তো উৎসাহও দেয়নি—যেমন করে মুখটি চুপ করে থাকে; কিন্তু [illegible] আছে

আমার কথাই বজায় রেখেছে, কান ভাঙাতে ভাঙাতে এ-ভাবটা কত দিন স্থায়ী হবে বলতে পারি না। তা ভিন্ন এ-ব্যাটাই যে এক দিন ঐ চেয়ারে বসবে না কে জানে?—চান্স, তো তারই বেশি। তাই বলছিলাম সাবধান হওয়াই ভালো, অর্থাৎ বাইরেও একটু নজর রাখতে হবে এবার থেকে।"

বছর দু'য়েক গেল, তাহার মধ্যে বড়সাহেব আরও বার-দুয়েক ঐ Leave it to the Babu বলিয়াই নিষ্পত্তি করিলেন, তাহার পর কৈলাসচন্দ্রের কথা ফলিল:

বামনটুলির পিছনে বিঘা-তিনেকের একটা চাকলা ছিল। জমিটা একটানা নয়, খানিকটা আঁকাবাঁকা; সে অংশটা গ্রামের ভিতরের পানে চলিয়া গেছে; বাকিটা—প্রায় বিঘা-খানেক হইবে—সামনের দিকে পড়ে এবং সেটা কুঠির জিরাত অর্থাৎ খাস-আবাদির পাশেই বলিয়া বহু দিন হইতে তাহাতে নীল চাষ হইয়া আসিতেছিল। একটি ব্রাহ্মণ-বিধবার সম্পত্তি; পূর্বে নীলের যখন দর ছিল তখন কুঠি যাহা দিত তাহাতে ধানের মতো লাভ না থাক্, বিশেষ লোকসান ছিল না।—চলিয়া যাইতেছিল।

চলিয়া যাওয়ার মধ্যেও একটা ব্যাপার ছিল; মধুসূদনের সময়ে এবং তাহার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের আমলেও বিধবা স্ত্রীলোকটি কয়েক বার বাড়িতে আসিয়া কর্ত্রীদের ধরে—ওটুকু জমি কুঠি হইতে ছাড়াইয়া তাহাকে ইচ্ছামতো ধান বা অন্য রকম ফসল তুলিতে দেওয়া হয় তো তাহার বিশেষ উপকার হয়। উপকার যে হয় এটা সবারই জানা; কিন্তু একটু বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যে অংশটা গ্রামের ভিতরে চলিয়া গেছে সেটাও যে এই চাকলার সামিল সাহেবের এটা খেয়াল ছিল না। ঐ সামনের জমিটুক লইয়া কথা উঠাইতে গেলেই বাকি অংশটা—যেটা এত দিন আত্মগোপন করিয়া আছে সেটার কথাও উঠিবে নিশ্চয়। যেখানে কুঠির স্বার্থ সুপ্রকট, সেখানে সুবিচার সুনিশ্চিত নয়। হয়তো সাহেব ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে এও সম্ভব যে, যদি আলোচনা প্রসঙ্গে বাকি অংশটুকুর সন্ধান পায় তো সেটাও গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। ঐটাই বড় অংশ—দুই বিঘা; সুতরাং এ-বিষয়ে আপাততঃ যেমন আছে সেইরূপ ব্যবস্থাই থাকিতে দেওয়া সমীচীন—এইরূপ পরামর্শ দিয়া মামা-ভাগনে উভয়েই স্ত্রীলোকটিকে নিরস্ত করিতেন; বুঝাইয়া দিতেন কুঠির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে এ-ও একটা সুবিধা,—আত্মীয়-স্বজনের উৎপীড়ন থেকে বাঁচিয়া আছে। স্ত্রীলোকটি চলিয়া যাইত, আবার আত্মীয়-স্বজনেরাই পরামর্শ দিত, মাইজীদের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িত। এই করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

স্ত্রীলোকটির একটি পুত্র ছিল। মধুবাণী স্কুল হইতে এনট্রান্স দিয়া মোক্তারি পড়িতেছিল, বছর-দুয়েক হইল পাস করিয়া প্র্যাকটিস্ করিতেছে। সে এক দিন জমিটার জন্য কৈলাসচন্দ্রকে আসিয়া ধরিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান, নিজে হইতেই স্বীকার করিল যে, ইঁহারা দুই জনেই বুদ্ধি করিয়া এবং দয়াপরবশ হইয়া জমির বেশি ভাগই কুঠির কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও কথা তুলিতে গেলে আগে যে বিপদের ভয় ছিল সেটা আসিয়া পড়িতে পারে। তবে পূর্বের তুলনায় আইন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত—জেলায় দেওয়ানি কোর্ট আসিয়া গেছে, এমন কি মহকুমা মধুবাণীতে পর্যন্ত এক জন মুন্সেফের চৌকি পড়িয়াছে। সাহেব যদি গা-জুরি করিতে চায়, সে আদালতের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে; মধুবাণীর কয়েক জন উকিল তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন।···বেশ খোলাখুলি অথচ ধীর ভাবে আলোচনা করিল যুবক।

ব্যক্তিগত ভাবে ইহাদের সহানুভূতি ছিলই বিধবাটির দিকে; এখন তাহার পুত্র উপযুক্ত, সে যদি ঝক্কিটা লইতে রাজি থাকে তো কৈলাসচন্দ্রের আর আপত্তি কি? বাড়িতে বুড়ি আসিয়া কান্নাকাটি করে, অন্ততঃ সেটুকু থেকে নিষ্কৃতি পান। বলিলেন, তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন, একটা দরখাস্ত দেওয়া হোক।

সাহেবের কাছে যখন দরখাস্তটা পেশ করিলেন, সেখানে ছোটসাহেব ছিল। সব শুনিয়া একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত বড়সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল—"Why must we reverse an arrangement that has been standing so long?—Just because her son has become a mukhtear? We cannot afford to be coward!" (বাঃ, এত দিন যে-ব্যবস্থাটা চলছিল সেটা বন্ধ করে দিতে হবে? কেন, ওর ছেলে মোক্তার হয়ে এসেছে বলে? আমাদের কাপুরুষ হলে চলবে না তো)

বিপিনবিহারীও কি একটা কাজ হাতে করিয়া পূর্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখটা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু দুই সাহেবেরই পিছনে থাকায় তাহারা দেখিতে পাইল না।

সহকারীর কথায় বড়সাহেব কৈলাসচন্দ্রের পানে চাহিলেন। কৈলাসচন্দ্রেরও মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, খুব কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রথমে বিপিনবিহারীকে একটা কাজের ছুতা করিয়া সরাইয়া দিলেন, তাহার পর যুক্তির স্বরেই বলিলেন—"The factory has a prestige of its own. It won't be quite elegant if it were dragged to the court of justice" (কুঠির একটা সম্ভ্রম আছে, যদি তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যায় তো সেটা তার পক্ষে বেশ শোভন হবে না)

ছোটসাহেব এবার কৈলাসচন্দ্রের দিকেই ফিরিয়া চাহিল, বলিল—"Personally I fail to see Babu how it affects our prestige so long as we fight for our rights; that's what a law court stands for." (ব্যক্তিগত ভাবে আমি তো বুঝতে পারি না যে যতক্ষণ ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ছি ততক্ষণ মর্য্যাদাহানি কি করে হয়। কোর্টের তো কাজই এই)

বড়সাহেব একটু যেন সমস্যায় পড়িয়া গেছে। মুখটা নীচু করিয়া একটা কলম দিয়া ব্লটিং কাগজ আঁচড়াইতে লাগিল। কৈলাসচন্দ্র একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ছোটসাহেবের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"If you know the history of the factory, you would not speak in this view Mr.···Till recently she combined in herself the authority of a law-court also" (তুমি কুঠির ইতিহাস জানলে আর এ কথাটা বলতে না; সে দিন পর্য্যন্ত কুঠিই আদালতের কাজ করে এসেছে)

বুদ্ধির জয় হইল ; কৈলাসচন্দ্র এমন জায়গাটিতে ঘা দিলেন যে, ছোটসাহেব তো চুপ করিয়া রহিলই, বড়সাহেবের মনটাও খানিকটা গর্বে, খানিকটা দুঃখে ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু মনটা কৈলাসচন্দ্রের কথায় সায় দিলেও ছোটসাহেবকেও বাঁচাইতে হইল ; প্রশ্ন করিলেন—"But are you sure we have no case Babu ?—Supposing we have to resort to law or are dragged into it ?" (তুমি কি নিশ্চয় জানো, আমাদের জেতবার আশা নেই—ধরো যদি আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়, অথবা বাধ্য হয়েই যেতে হয় সেখানে)

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—"I am absolutely sure sir." (আমি খুবই ঠিক জানি)

বড়সাহেব ব্লটিঙে কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া আবার খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—"Best thing—let Mr.···enquire & report." (সব চেয়ে ভাল হবে মিষ্টার···অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট দিন)

কৈলাসচন্দ্রের মুখটা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কি একটা বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বড়সাহেব হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"Well Babu, so much for the present ; I would go and inspect the Jirat." (আপাততঃ এই পর্য্যন্তই থাক্, আমি একবার গিয়ে জিরাত পরিদর্শন করব)

বাহির হইয়া গেলেন।

বিপিনবিহারী নিজেদের আফিস-ঘরের দুয়ারের কাছেই। কৈলাসচন্দ্র সাহেবের কামরা থেকে বাহির হইতে প্রথমেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল, প্রশ্ন করিলেন—"সব গুছে বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ দাদা, ছোটসাহেবকে এনকোয়ারি করতে দিলে।"

"আমি তোমায় এক দিন বলেছিলাম—বাইরে নজর রাখতে হবে—এখানে আর বেশি দিন নয়। বুঝলে অন্যায় করছে, শুধু শাদা চামড়ার প্রেষ্টিজ রাখবার জন্যে এই হুকুমটা দিলে। দ্বারভাঙ্গার বাড়িটা ওরা বিক্রি করবে বলছিলে না ? তুমি তো বলছিলেও নিয়ে নিতে। সামনের রবিবারে একবার চলে যাও, দরদস্তুর করো। মামার মর্য্যাদা যে দিন রাখতে পারব ততদিনই ওঁর চেয়ারে বসব ; পাণ্ডুলের নীলকুঠির প্রেস্টিজ যে আসলে কার প্রেস্টিজ ওদের বুঝিয়ে দোব এক দিন।"

দ্বারভাঙ্গা-বাসের সেই গোড়াপত্তন হইল, পাণ্ডুলের শিকড় আলগা হইল।

কৈলাসচন্দ্রের দুই পুত্র দ্বারভাঙ্গায় একটি বাড়িতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন। খবর পাওয়া গিয়াছিল বাড়ির মালিক বাড়ীটি বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। বিপিনবিহারীর ইচ্ছা ছিল কিনে লন বাড়িটা, কিন্তু কৈলাসচন্দ্র দোমনা হইয়াছিলেন এত দিন, *এই ঘটনার পর মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই* বাড়িটা কেনা হইয়া গেল।

এ দিকে বিপিনবিহারী নিজেও যে কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সাঁতরায় ছেলেদের রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার যে পরীক্ষাটা করিতেছিলেন সেটা চারি দিক দিয়াই বিফল হইবার মতো হইয়া আসিতেছিল। বড় ছেলের স্বাস্থ্য টিকিতেছে না, মেজটির ওপর একটু কড়া নজর রাখা দরকার, এখান থেকে সেটা অসম্ভব, ওখানে মা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চাকরি যদি এখানে যায়ই তো দেশে যাইয়া চাকরি করা পোষাইবে না, এই দিকেই অন্যত্র কোথাও খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে হইবে, পারতপক্ষে কোন নীলকুঠিতেই। প্রতিপত্তির কেমন একটা নেশা যেন রক্তের মধ্যে আসিয়া গেছে দুই পুরুষের নীলকুঠি-জীবনে, অন্যত্র চাকরির কথা যেন ভাবাই যায় না ! পাণ্ডুলে সম্পত্তিও আছে কিছু, তাহা ভিন্ন পাণ্ডুল যে হাতছাড়া হইবেই তাহারই বা স্থিরতা কি ? এ সাহেব গিয়া ভালো সাহেবও তো আসিতে পারে আবার,—এমন তো কয়েক বারই হইল তাঁহার জীবনে। পাণ্ডুলের মাটির উপর একটা মায়াও জন্মিয়া গেছে,—ইচ্ছা করে কাছে-পিঠেই থাকি।

দ্বারভাঙ্গায় একটু সুবিধা হইল। কৈলাসচন্দ্রের বাড়ির পাশেই খানিকটা জায়গা পাওয়া গেল। সুযোগটুকু ছাড়িলেন না, বিপিনবিহারী জায়গাটি কিনিয়া রাখিলেন।

পাণ্ডুলের চাকরি পূর্ব্ববৎই চলিল। বড়সাহেব লোকটা ধূর্ত্ত। কুঠির বেশ সুদিন যাইতেছে না,—এমনই সময় পুরাতন এবং বিচক্ষণ কর্মচারীদের ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন হইবে না এটা তিনি ভালো রকমই জানিতেন। ও-হুকুমটা ছোটসাহেবের মান রাখিবার জন্য ঐ ভাবে দিলেন বটে, তবে তাঁহারই ইঙ্গিতে ছোটসাহেব অনুসন্ধান করা আর রিপোর্ট দেওয়ায় গড়িমসি করিতে লাগিল। দিন কুড়ি অপেক্ষা করার পর বড়সাহেব অজ্ঞতার ভাণ করিয়া একদিন কৈলাসচন্দ্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোটসাহেব কি ও-বিষয়টা লইয়া অনুসন্ধান সুরু করিয়াছেন—তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি ?

কৈলাসচন্দ্র জানাইলেন যে, তখন পর্য্যন্ত করে নাই।

সাহেব যেন একটু বিরক্ত ভাবেই বলিলেন—"O, he will near find time to do it. Put up the file Babu, I will pass orders." (ওর আর সময় হবে না ; তুমি ফাইলটা নিয়ে এসো বাবু ; আমি হুকুম দিয়ে দিই।)

ফাইলটা হাজির করা হইলে বৃদ্ধার জমিটা ফিরাইয়া দিবার হুকুম দিয়া দিলেন।

এবারেও জিত ; কিন্তু ঐ যে মাঝের অংশটুকু—ছোটসাহেবকে রিপোর্ট দিতে বলা—তাহার গ্লানিটুকু এঁরা ভুলিলেন না ; দুই ভাইয়ে সতর্কই রহিলেন।

মহামুনি শ্রীভরত-কৃত
নাট্যশাস্ত্র
তৃতীয় অধ্যায়
শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

৪

মূল :—যথাক্রমে সকল দেবতার পূজা করিবার পর জর্জ্জরের অভিপূজন কর্তব্য; তাহাতে বিঘ্নজর্জ্জর হওয়ার সম্ভাবনা। ৭৫-৭৬।

সঙ্কেত :—যথাক্রমে—যে-ক্রম অনুসারে পূর্ব্বে দেবগণের নাম ও পূজাবিধি লিখিত হইয়াছে। ততঃ (মূল)—তাহার পর, অথবা সেই হেতু (জর্জ্জর-পূজা-হেতু)।

মূল :—শিরোদেশে শ্বেত বস্ত্র হইবে; রৌদ্র-পর্ব্বে নীল (বস্ত্র); বিষ্ণু-পর্ব্বে পীত; স্কন্দের পর্ব্বে রক্ত; পক্ষান্তরে, হিতার্থি-কর্তৃক মূল-পর্ব্বে চিত্র বস্ত্র দেয়। ৭৬-৭৭।

সঙ্কেত :—শিরোদেশে—শিরঃপর্ব্বে—সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বে। জর্জ্জর বা শক্রধ্বজ পঞ্চ-পর্ব্ব-বিশিষ্ট। উহার শিরোদেশস্থ সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বের অধিপতি ব্রহ্মা—উহাতে শ্বেত বস্ত্র বেষ্টন করিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্ব্বের অধিপতি শঙ্কর বা রুদ্র—এই রৌদ্র (অর্থাৎ রুদ্রাধিষ্ঠিত) পর্ব্বের গাত্রে নীল বস্ত্র বেষ্টনীয়। তৃতীয় পর্ব্বের অধিপতি দেবতা বিষ্ণু—উহার চতুর্দ্দিকে পীতবর্ণ বস্ত্র বেষ্টনীয়। চতুর্থ পর্ব্ব স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়)-কর্তৃক অধিষ্ঠিত—উহার চতুর্দ্দিকে রক্ত বস্ত্র প্রদেয়। পঞ্চম বা সর্ব্বনিম্ন বা মূল পর্ব্বের অধিপতি তিন মহানাগ—শেষ-বাসুকি-তক্ষক—এই পর্ব্বের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র বেষ্টন করিতে হইবে। ইহাই জর্জ্জর-সজ্জা-বিধি।

মূল :—আর সদৃশ ধূপ-মাল্য-অনুলেপন প্রদেয়। আর আতোদ্য-গুলি বস্ত্র-সমূহ-দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিতে হইবে। ৭৮।

সঙ্কেত :—সদৃশ—অনুরূপ—বস্ত্রানুরূপ। যে পর্ব্বের চতুর্দ্দিকে যে বর্ণের বস্ত্র বেষ্টনীয়, তাহার অধিপতি দেবতার পূজার বস্ত্রবর্ণানুরূপ বর্ণযুক্ত ধূপ-মাল্য-অনুলেপন প্রদেয়; যথা—শিরঃ পর্ব্বে শ্বেতবস্ত্র বেষ্টনীয়, উহার অধিপতি ব্রহ্মার পূজায় শ্বেত ধূপ, শ্বেত মাল্য, শ্বেত অনুলেপন (গন্ধ—শ্বেতচন্দন) ব্যবহার্য্য। এইরূপ অন্যান্য পর্ব্বেও বুঝিতে হইবে।

মূল :—অ র মাল্য-ধূপ-ভক্ষ্য-ভোজ্য সমূহ দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ৭৯।

সঙ্কেত :—৭৮ শ্লোকের শেষার্দ্ধের সহিত অন্বয়। আতোদ্যগুলিকে বেষ্টিত করিয়া গন্ধাদি-দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

মূল :—গন্ধ-মাল্যানুলেপন-সমূহ-দ্বারা এইরূপে বিধি সম্পাদন-পূর্ব্বক বিঘ্ন জর্জ্জরণের নিমিত্ত জর্জ্জরকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। ৭৯-৮০।

সঙ্কেত :—অভিমন্ত্রণ-বাক্য পরে প্রদত্ত হইল। সর্ব্বমেবং বিধিং কৃ(ব); সর্ব্বমেব (ক)।

মূল :—এস্থলে বিঘ্নবিনাশার্থ মহাবীর্য্য বজ্রসার মহাতনু তুমি পিতামহ-প্রমুখ সুরগণ-কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছ। ৮০-৮১।

সঙ্কেত :—অত্র বিঘ্নবিনাশার্থং পিতামহ-মুখৈঃ সুরৈঃ (ব)। দানবানাং শাসনার্থং হি দেবৈর্ব্রহ্মপুরোগমৈঃ (কা)—বিঘ্নসমূহের প্রশমনার্থ ব্রহ্মপুরোগামী দেবগণ-কর্তৃক (তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ ইত্যাদি)।

মূল :—সর্ব্ব-দেবগণ-সহ ব্রহ্মা তোমার শিরোদেশ রক্ষা করুন। ৮১। দ্বিতীয় (পর্ব্ব) হর রক্ষা করুন, ও তৃতীয় জনার্দ্দন। আর চতুর্থ (রক্ষা করুন) কুমার ও পঞ্চম পন্নগোত্তমগণ। ৮২।

নিত্য সকলেই তোমাকে রক্ষা করুন; আর তুমিও পুনরায় মঙ্গলকর হও।

সঙ্কেত :—দ্বিতীয়স্ত হরঃ পাতু (ব); হরঃ পর্ব্ব (কা)। পন্নগোত্তমাঃ (ব); পন্নগোত্তমঃ (কা)। বরোদার পাঠ ভাল; কারণ, তিন পন্নগশ্রেষ্ঠ (শেষ-বাসুকি-তক্ষক) মূল পর্ব্বের অধিপতি; অতএব, বহুবচন হওয়াই উচিত। নিত্যং সর্ব্বেঽপি পান্তু ত্বাং পুনস্ত্বং (ব); নিত্যং সর্ব্বে হি পান্তু ত্বাং সুরাস্ত্বং (কা)।

মূল :—অরিসূদন তুমি শ্রেষ্ঠ অভিজিৎ নক্ষত্রে জাত। রাজার জয় ও অভ্যুদয় সম্যগ্‌রূপে বহন কর। ৮৩-৮৪।

সঙ্কেত :—শ্রেষ্ঠে জাতস্ত্বমরিসূদনঃ (ব); ত্বং চ প্রসূতো রিপু-সূদনঃ (কা)। অভ্যুদয়—উন্নতি। পার্থিবস্য (মূল)—রাজার।

মূল :—জর্জ্জর পূজা করিয়া ও বলি সকল নিবেদন করিয়া ততঃ-পর মন্ত্রাহুতি-পুরঃসর অগ্নিতে হোম করিবে। ৮৪-৮৫।

সঙ্কেত :—বলি—অভিনব ব'লয়াছেন—এক্ষেত্রে সুরা প্রভৃতিই বলি মধ্যে প্রধান। আহুতি—অগ্নিতে ঘৃতাদির প্রক্ষেপ।

মূল :—হোম করিয়া উহাকে দীপ্ত উল্কাসমূহ-দ্বারা পরিমার্জ্জনা (করিবে)। ৮৫।

সঙ্কেত :—এ শ্লোকটির পাঠ দুষ্ট—অন্বয় হয় না—"হুত্বা স এব দীপ্তাভিরুল্কাভিঃ পরিমার্জ্জনম্ (ব; কা)—ইহার অর্থ হয় না। আমরা যথাসম্ভব অনুবাদ উপরে দিয়াছি।

মূল :—নৃপতি ও নর্ত্তকীগণের দীপ্তির অভিবর্দ্ধন করিবে।

সঙ্কেত :—পূর্ব্ব শ্লোকার্দ্ধের সহিত এই শ্লোকার্দ্ধের অন্বয় করিলে কোনরূপে একটা সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে—'স এব' বলিতে নাট্যাচার্য্যকে বুঝাইতেছে। তিনিই (অর্থাৎ নাট্যাচার্য্য) হোম করিয়া দীপ্ত উল্কাসমূহ-দ্বারা নৃপতি ও নর্ত্তকীগণের পরিমার্জ্জন করিয়া দীপ্তির অভিবর্দ্ধন করিবেন—এরূপ অর্থ করা যায়।

মূল :—আতোদ্য সহ নৃপতি ও নর্ত্তকীকে অভিদ্যোতিত করিয়া মন্ত্রপূত জল দ্বারা তাঁহাদিগকে পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিয়া বলিবেন। ৮৬-৮৭।

সঙ্কেত :—অভ্যুক্ষণ করা—জলের ছিটা দেওয়া। নর্ত্তকীং তথা (ব); নর্ত্তকীস্তথা (কা)—এই পাঠটি ভাল—পূর্ব্বশ্লোকে যখন নর্ত্তকীগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এই শ্লোকে নর্ত্তকী মাত্র এক জন বলা উচিত নহে।

মূল :—'আপনারা মহাকুলে প্রসূত ও গুণসমূহ-দ্বারা অলঙ্কৃত; যাহা আপনাদিগের জন্মগুণোপেত তাহাই নিত্য (আপনাদিগের) হউক। ৮৭-৮৮।

সঙ্কেত :—প্রসূতাশ্চ (কা); ইহা অপেক্ষা বরোদার পাঠ 'প্রসূতাঃ স্থ'—ভাল—(যেহেতু) আপনারা হন মহাকুলে প্রসূত। তদ্বৈ ভবতু (ব); তদ্বো (কা)। জন্মগুণোপেত—জন্ম ও গুণদ্বারা উপেত (অর্থাৎ যুক্ত)। ইহার তাৎপর্য্য—যাহা আপনাদিগের জন্ম ও গুণ অনুসারে হওয়া উচিত, তাহাই আপনাদিগের নিত্য হউক।

মূল :—[illegible]

বাক্য বলিয়া নাট্যযোগ-প্রসিদ্ধ্যর্থ আশীর্ব্বাদ সম্যগ্‌রূপে প্রযুক্ত করিবেন—৮৮—৮৯ ।

সঙ্কেত :—ভূতয়ে (মূল) অভ্যুদয়ার্থ ; মঙ্গলার্থ । ভূতি—ঐশ্বর্য্য । বুধ—নাট্যাচার্য্য । নাট্যযোগ-প্রসিদ্ধ্যর্থ—'নাট্যযোগ' অর্থে নাট্যপ্রয়োগ । নাট্যপ্রয়োগ যাহাতে প্রসিদ্ধি লাভ করে—তদুদ্দেশ্যে, আশীর্ব্বাদ-বাক্য পরে দেওয়া হইতেছে ।

মূল :—'সরস্বতী, ধৃতি, মেধা, হ্রী, শ্রী, লক্ষ্মী, মতি, স্মৃতি—(এই) সৌম্য মাতৃগণ আপনাদিগের সিদ্ধিদা হউন' ॥৮৯—৯০ ॥

সঙ্কেত :—বরোদার পাঠে দুই বার 'ধৃতি' আছে—সরস্বতী ধৃতির্মেধা হ্রীঃ শ্রীর্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মতিঃ; কাশীর পাঠ—মতিঃ স্মৃতিঃ। ইঁহারা দিব্য মাতৃগণ। ধৃতি—ধৈর্য্য। মেধা—কণ্ঠস্থকরণের শক্তি। হ্রী—লজ্জা। শ্রী—সৌন্দর্য্য। মতি—বুদ্ধি। মাতরঃ সৌম্যাঃ (ব) ; মাতরঃ সর্ব্বাঃ (কা) ।

মূল :—সমন্ত্রক হবি যথাবিধি হোম করিয়া তাহার পরই নাট্যাচার্য্য প্রযত্নসহকারে কুম্ভ-ভেদ করিবেন ॥৯০—৯১ ॥

পক্ষান্তরে, কুম্ভ অভিন্ন (থাকিলে) স্বামীর শত্রু হইতে ভয় হইতে পারে ; আর অপর পক্ষে ভিন্ন হইলেই স্বামীর শত্রুসংক্ষয় বিজ্ঞেয় । ১১—১২ ।

সঙ্কেত :—মন্ত্রপুরস্কৃতম্—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অর্থাৎ সমন্ত্রক (হোম) করিয়া··· । হবিঃ—হবনীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ ঘৃত ।

কুম্ভভেদ—কুম্ভ (পূর্ব্বস্থাপিত) ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য । অনেকটা ঘেঁটু-পূজার মত ব্যাপার । অভিন্ন—অভগ্ন । ভিন্ন—ভগ্ন । স্বামী—রাজা ।

মূল :—কুম্ভ ভিন্ন হইলে ততঃপরই নাট্যাচার্য্য প্রযত্ন-সহকারে দীপ্তা দীপিকা প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণপূর্ব্বক সমগ্র রঙ্গকে প্রদীপিত করিবেন ॥ ১২-১৩ ॥

সঙ্কেত :—দীপিকা—উল্কা প্রযত্নতঃ (ব) ; অপেতভীঃ (কা) —বিগতভয় ।

মূল :—ক্ষ্বেড়ন, স্ফোটন, বল্‌গন, প্রধাবন সহকারে সেই দীপ্তা দীপিকা (উল্কাকে) সম্যগ্‌রূপে প্রযুক্ত করিবেন ॥ ১৩-১৪ ॥

সঙ্কেত :—ক্ষ্বেড়িতৈঃ (মূল)—অব্যক্ত শব্দ সহকারে । স্ফোটিতৈঃ—সশব্দে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার নাম স্ফোটন—কড়্ কড়্ করিয়া মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রকাশের ন্যায় । বল্‌গিতৈঃ—চলন, কম্পন, লম্ফন ও নৃত্য সহকারে । প্রধাবিতৈঃ—ধাবন—দ্রুত-গমনসহকারে । তাৎপর্য্য—নাট্যাচার্য্য উল্কাটি এরূপ ভাবে ঘুরাইবেন—যাহাতে বোঁ-বোঁ সোঁ-সোঁ শব্দ হয় (ক্ষ্বেড়ন), হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইবার মত তীব্র শব্দ উৎপন্ন হয় (স্ফোটন) ; উল্কাটি হস্তে লইয়া তিনি লম্ফ-ঝম্প-নৃত্য করিবেন ও ইতস্ততঃ দ্রুত ধাবন করিবেন—এইরূপে সেই প্রদীপ্তা উল্কা উল্কাটিকে রঙ্গমধ্যে চালনা করিবেন ।

মূল :—শঙ্খ-দুন্দুভিসমূহের নির্ঘোষসহ, মৃদঙ্গ-পণব (ধ্বনি) সহকারে সকল আতোদ্য বাজাইয়া রঙ্গ-যুদ্ধ করাইবেন ॥ ১৪-১৫ ॥

সঙ্কেত :—দুন্দুভি—ঢক্কা, জয়ঢাক । মৃদঙ্গ—খোলের মত বাদ্য বা পাখোয়াজের মত । পণব—ক্ষুদ্র ঢক্কা । দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব তিনটিই ঢক্কা-জাতীয় বাদ্য (পুষ্কর-বাদ্য) ।

রঙ্গে যুদ্ধানি (কা) ; রঙ্গযুদ্ধানি (ব)—কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয়, mock-fight. কিন্তু কৃত্রিমযুদ্ধেও অনেক সময় আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে । পরে দেখুন ।

মূল :—তাহাতে ছিন্ন, ভিন্ন, বিদারিত, শোণিতাক্ত, ক্ষত, প্রদীপ্ত আহত ইত্যাদি নিমিত্ত সিদ্ধি-লক্ষণ ॥ ১৫-১৬ ॥

সঙ্কেত :—রঙ্গযুদ্ধে যদি কেহ ছিন্ন-ভিন্ন ইত্যাদি হন, তবে ঐ সকল নিমিত্ত সিদ্ধির লক্ষণ বুঝিতে হইবে । নিমিত্ত—শকুন, omen. এই ছেদনাদি নিমিত্ত শুভ শকুন । ছিন্ন—কাটা । ভিন্ন—ফোঁড়া । দারিত—চেলা হওয়া । প্রদীপ্ত—জ্বলিয়া উঠা । আয়স্ত—আহত হওয়া । পাঠান্তর—আয়ত্তং (কা), আবদ্ধ । আয়ত্ত—বন্দী হওয়া ; আবৃত্তং—চারিদিক্ কাটিয়া যাওয়া ।

মূল :—সম্যগ্‌রূপে পূজিত রঙ্গ নিশ্চয় স্বামীর শুভ আবহন করিয়া থাকে । ১৬ ।

সঙ্কেত :—ইষ্টঃ—পূজিত : যাগাদি দ্বারা পূজিত । স্বামী—রাজা, রঙ্গের অধিপতি । সেকালে রাজাই রঙ্গের অধিপতি হইতেন ।

মূল :—আবার পক্ষান্তরে রঙ্গ দুষ্টভাবে পূজিত ও দেবগণ-কর্ত্তৃক দুষ্টভাবে অধিষ্ঠিত হইলে সবালবৃদ্ধ জনপদ ও নৃপের অশুভ করে ও নাট্য বিধ্বংসন করিয়া থাকে ॥ ১৭-১৮ ॥

সঙ্কেত :—পুনঃ সবালবৃদ্ধস্য (ব)-পুনরায় বাল-বৃদ্ধসহ জনপদের অশুভ করে । সবালবৃদ্ধস্য জনপদস্য পদের বিশেষণ হইলেই অর্থ সঙ্গতি হয়—কিন্তু মধ্যে 'তথা' ও 'চ' থাকায়—স্পষ্টান্বয় সম্ভব নহে । মনে হয় যেন সবালবৃদ্ধ পদটি অন্য কোন পদের বিশেষণ ; অথচ সেরূপ কোন পদ নাই । সবালবৃদ্ধ জনপদের কি করে ?—তাহাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । অগত্যা তৃতীয় চরণের সহিত অন্বয় করিতে হয়—'নাট্যবিধ্বংসনং কুর্য্যান্নৃপস্য চ তথাশুভম্'—নাট্যবিধ্বংসনং কুর্য্যাৎ, তথা নৃপস্য অশুভং কুর্য্যাৎ তথা সবালবৃদ্ধস্য জনপদস্য চ অশুভং কুর্য্যাৎ—নাট্যধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ; ও নৃপের অশুভ করিতে পারে ; আর সবালবৃদ্ধ (নিরীহ নিরপরাধ যাঁহারা তাঁহারাও বাদ পড়েন না—ইহাই তাৎপর্য্য) জনপদের অশুভ করিয়া থাকে । পুরস্য বালবৃদ্ধস্য (কাশীর পাঠ) ; পুরস্যাবালবৃদ্ধস্য (পাঠান্তর) । দুরিষ্টঃ—দুষ্টভাবে পূজিত ; যথাবিধি পূজা না করিয়া, দোষযুক্ত ভাবে পূজা করা হইলে । দেবতাগণ-কর্ত্তৃক দুরধিষ্ঠিত—দেবতাগণ নাট্যগৃহে অধিষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু প্রসন্নভাবে নহে—বিমুখভাবে । নৃপস্য চ তথা শুভম্ (কা)—পাঠে অর্থসঙ্গতি নাই ; তথাশুভম্ (তথা অশুভম্) পাঠে—অর্থসঙ্গতি থাকে । কারণ, অযথা পূজায় শুভ হইতেই পারে না বরং অশুভ হওয়াই স্বাভাবিক ।

মূল :—যে এরূপ বিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেচ্ছ (নাট্য) সম্প্রয়োগ করে, (সে) শীঘ্র অপচয় প্রাপ্ত হয় ও তির্য্যগ্‌যোনি গমন করে । ১৮-১৯ ।

সঙ্কেত :—যথেষ্টং—যথেচ্ছ, উচ্ছৃঙ্খল, অবৈধভাবে, অযথাবিধি । সম্প্রয়োগ—নাট্যপ্রয়োগ । অপচয়—ক্ষতি, নাশ—ঐহিক ফল । তির্য্যগ্‌যোনি গমন করে—তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ করে—পারত্রিক ফল । তাৎপর্য্য—অযথাবিধি নাট্যপ্রয়োগকারী—শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও মরণানন্তর তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হয় ।

মূল :—যেহেতু এই রঙ্গ-দৈবত-পূজা যজ্ঞের স্বরূপ, অতএব রঙ্গ পূজা না করিয়া প্রেক্ষার প্রয়োগ করিবে না । ১৯-১০০ ॥

সঙ্কেত :—১৬ শ্লোকে 'সম্যগিষ্টঃ' ও ১৭ শ্লোকে 'দুরিষ্টঃ' পদ আছে । ইষ্ট—অর্থে যাগবিধি অনুসারে পূজিত । এই শ্লোকে স্পষ্ট

জানা গেল যে, রঙ্গপূজা যজ্ঞের সমান। এই কারণে 'ইষ্ট' পদের প্রয়োগ সার্থক। প্রেক্ষা—নাট্যপ্রয়োগ।

মূল :—ইঁহারা পূজিত হইলে পূজা করেন, মানিত হইলে মান দান করেন। ১০০।

অতএব, সর্ব্বপ্রযত্নে রঙ্গপূজা কর্ত্তব্য।

সঙ্কেত :—এতে (মূল)—ইঁহারা—রঙ্গদেবতাগণ। পূজয়ন্তি—রঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষগণকে দর্শকগণের পূজাযোগ্য করিয়া থাকেন।

মূল :—বায়ু-দ্বারা সম্যগ্‌রূপে উদ্দীপিত অগ্নি (ও) তত শীঘ্র দাহ করে না, যেরূপ ক্ষণমধ্যে অপপ্রয়োগ প্রযুক্ত হইলে দাহ করিয়া থাকে। ১০১-১০২।

সঙ্কেত :—অপপ্রয়োগ প্রযুক্ত হইলে—ইংরাজী cognative এর মত—অপপ্রয়োগ হইলে বলাই ভাল। অপপ্রয়োগের নাশকর্ত্তা-শক্তি বায়ু-দ্বারা সন্ধুক্ষিত অগ্নি অপেক্ষাও ক্ষিপ্র।

মূল :—শাস্ত্রজ্ঞ, বিনীত, শুচি, দীক্ষিত, শান্ত নাট্যাচার্য্য-কর্ত্তৃক রঙ্গপূজা কর্ত্তব্য। ১০২-১০৩।

সঙ্কেত :—বিনীত—জিতেন্দ্রিয়। নম্রস্বভাব। শুচি—বাহ্য-আভ্যন্তর শৌচবিশিষ্ট।

মূল :—পক্ষান্তরে, উদ্বিগ্নচিত্ত যিনি স্থানভ্রষ্ট বলি প্রদান করেন, মন্ত্রহীন হোতার ন্যায় তিনি প্রায়শ্চিত্তী হইয়া থাকেন। ১০৩-১০৪।

সঙ্কেত :—উদ্বিগ্নমানসঃ (মূল)—অনবহিত—অন্যমনস্ক। প্রায়শ্চিত্তী প্রায়শ্চিত্তার্হ। হোতা—হোমকর্ত্তা।

মূল :—এইরূপ এই যে রঙ্গদৈবতপূজায় বিধি দৃষ্ট হয়, নব নাট্যগৃহে ও (নব) প্রেক্ষায় প্রযোক্তৃগণ-কর্ত্তৃক তাহা কার্য্য। ১০৪-১০৫।

সঙ্কেত :—নূতন নাট্যগৃহ নির্ম্মিত হইলে এইরূপ বিধানানুসারে রঙ্গদৈবত পূজা কর্ত্তব্য। আর নূতন প্রেক্ষা (অর্থাৎ নাট্যপ্রয়োগ) হইলেও এইরূপ পূজা কর্ত্তব্য। ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। অপরের মত—প্রথম নাট্য-প্রয়োগের আরম্ভেই পূজা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক নূতন প্রেক্ষায় নূতন করিয়া এইরূপ পূজার প্রয়োজন নাই। মহা-মাহেশ্বর অভিনবগুপ্ত দুইটি মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

"ইতি শ্রীভারতীয়-নাট্যশাস্ত্রে 'রঙ্গদৈবত-পূজন'-নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।"

শকাব্দই বুদ্ধাব্দ

শ্রীসুনীতকুমার দেব

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥

বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতা—১৩ অধ্যায়—৩ শ্লোক।

মুনয়ঃ—সপ্ত ঋষয়ঃ আসন মঘাসু অর্থাৎ সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন। কখন? না, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন সময়ে। ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ ইতি শব্দঃ শককালঃ ইতি শব্দস্য বিশেষণম্। শককালঃ কীদৃশঃ? —"ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ"।

অস্যার্থঃ—৬২৫২; অঙ্কস্য বামাগতিরিতি ২৫২৬। তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন; সেই সময় হইতে শককাল পর্য্যন্ত সময়ের পরিমাণ ২৫২৬ বর্ষ। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন মঘানক্ষত্রের তৃতীয় পাদে অল্প কএক বর্ষ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল; কারণ, মহাভারতের বনপর্ব্বের ১ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, কুরুক্ষেত্র-সমরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কৃত্তিকানক্ষত্রে সূর্য্যের বাসন্তিক ক্রান্তিপাত আরম্ভ হইয়াছিল। সূর্য্যের বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অশ্বিনী নক্ষত্রে হইয়া রেবতী নক্ষত্র বরাহমিহিরের, গর্গের, সূর্য্যসিদ্ধান্তের, সোমসিদ্ধান্তের, ব্রহ্মসিদ্ধান্তের এবং বৃদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ধান্তের মতে ৪২১ শকাব্দে বা শককালে অয়নাংশশূন্য হইয়াছিল; ৪২১ শকাব্দ খৃষ্টপূর্ব্ব ... বর্ষ। সুতরাং সূর্য্যের বাসন্তিক ক্রান্তিপাত কৃত্তিকানক্ষত্রে ও দক্ষিণায়ন মঘানক্ষত্রে তৃতীয়পাদের অন্তে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১৫৪ বর্ষ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, সূর্য্যের নক্ষত্রান্তর ৪৮ বিকলা অয়ন-গতি হিসাবে সহস্র বর্ষে হয়।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১৫৪ বর্ষের কিছু পরে হইয়াছিল এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল। এক্ষণে এই আলোচ্য শ্লোক সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বরাহমিহির বৃদ্ধ গর্গের মতে উক্ত শ্লোকে লিখিয়াছেন যে শকাব্দে ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ শকাব্দারম্ভের ২৫২৬ বর্ষ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাব্দ বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল পাওয়া যায়: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিজয় স্মরণার্থে যুধিষ্ঠিরাব্দ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এখন শকাব্দ কোন্ শকের স্মরণার্থে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল? ইহার উত্তরের পূর্ব্বে শক কে, তাহা জানা দরকার এবং তাহার পর কোন্ মহান্ শকের স্মরণার্থে শকাব্দ প্রবর্তিত হইয়াছিল, বিচার করা আবশ্যক।

এই শক কে, তাহা পুরাণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত প্রভৃতি সকপুরাণে বলা হইয়াছে যে, বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নরিষ্যন্ত। শক এই নরিষ্যন্তের পুত্র (২৮-১০ অধ্যায় হরিবংশ)। তদ্বংশধর শক বা শাক বা শাক্য নামে অভিহিত। এখন যাঁহারা শক বা সিথিয়ানগণকে অনার্য্য বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, এই শকগণ অযোধ্যার মহান রাজবংশধর অনন্তর সন্তান, না অনার্য্য। বৈবস্বত মনু ভূর্লোকে বা ভারতবর্ষে প্রথম আর্য্য সম্রাট্ ছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী অযোধ্যায় ছিল এবং এতন্নিমিত্ত শকগণ অযোধ্যার মহান্ রাজবংশধর অনন্তর সন্তান। এক্ষণে কোন মহান্ শকের নামে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। শকজাতির মধ্যে কে জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্বরেণ্য? শুদ্ধোদন-পুত্র বুদ্ধদেব। শকবংশে জন্মগ্রহণ করায় মানবদেবতা বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ বিশেষণে ভূষিত। বুদ্ধদেব মগধরাজ বিম্বিসারের ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক লোক ছিলেন। জগতে বুদ্ধদেবের মত আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। যুধিষ্ঠিরের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ বর্ষ; ৩১০১—২৫২৬=৫৭৫ খৃষ্টপূর্ব্ব বর্ষ বরাহ-মিহিরোদ্ধৃত গর্গের মতে "শককালঃ"। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭৫ বর্ষই বুদ্ধদেবের জন্মনির্দেশক "শককালঃ" এবং এই বর্ষ স্মরণার্থে বুদ্ধাব্দ বা শকাব্দ

তৎকালে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা ইতিহাস হইতে এবং চীন-ক্যাণ্টনের বিন্দুপঞ্জী হইতে অবগত হই যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৭ বর্ষে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ হইয়াছিল এবং ইহাও আমরা জানি যে, বুদ্ধদেব ঐতিহাসিকগণের মতে ৮০ বর্ষের অধিক কাল জীবিত ছিলেন; অতএব বুদ্ধদেবের জন্মকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭৫ বর্ষ।

এখন বর্ত্তমান জগতে প্রচলিত মত এই যে, শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়। তাহা হইলে এই হিসাবে গর্গের ও বরাহমিহিরের গণনা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে গর্গের ও বরাহমিহিরের গণনা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত। শকাব্দ বলিয়া যাহা চলিতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা বুদ্ধাব্দ। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে পরাস্ত করিয়া যে অব্দের প্রচার করেন তাহা কি দুর্য্যোধনাব্দ? যিনি বিজেতা তাঁহারই নামে অব্দ চলিবে, বিজিতের নামে চলিতে পারে না। শালিবাহন শকগণকে পরাস্ত করিয়া নিজের নামেই অব্দ প্রচার করেন এবং তাহাই শালিবাহনাব্দ হয়, তবে এই শালিবাহনাব্দ শকাব্দে পরিণত কি করিয়া হইল? ইহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত ভগবান্ বুদ্ধের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ভারতের ব্রাহ্মণসমাজ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মে যাহা কিছু আছে তাহা নিশ্চিহ্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বত্র বুদ্ধদেবের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিয়াছিল, ইতিহাস হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাহারাই এই বুদ্ধাব্দকে বা শকাব্দকে লুপ্ত করিয়া শালিবাহনাব্দের সহিত এক করিয়া পুরাণেও বর্ণনা করিয়াছে। কারণ, বুদ্ধের ন্যায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের (বেদোক্ত ধর্ম্মের নহে) এত বড় মহাশত্রু আর দ্বিতীয় নাই।

ব্রাহ্মণ পুরাণকারগণ বৌদ্ধকীর্ত্তির নাশার্থে প্রচার করিলেন যে, শালিবাহন যুদ্ধজয় করিয়া পরাজিত শকের নামে অব্দ প্রচার করিলেন ও সেই জন্য আজও ভারতীয় আর্য্য হিন্দুর ইতিবৃত্ত ঘোরতমসাপূর্ণ। যাহা প্রকৃত শকাব্দ বা বুদ্ধাব্দ তাহা শকবিজয়ী শালিবাহনের স্কন্ধে আরোপণ করিয়া জগদ্বরেণ্য ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের অব্দকে বিলুপ্ত করত তৎকালীন ব্রাহ্মণজাতি আর্য্য হিন্দু জাতির বিশেষ অনিষ্ট সর্ব্ব বিষয়ে করিয়াছিল এবং এই কাল হইতেই বেদের, উপনিষদের এবং শ্রীগীতার ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ জাতির নব এবং অলৌকিকত্বযুক্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে বিকৃত অর্থ লাভ করিল। ভারতের কৌটিল্য বা অদ্বিতীয় নীতিবিদ্ চাণক্য বলিয়াছেন যে "আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ"। আত্মরক্ষার্থেই ভারতের ব্রাহ্মণ এই শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি বুঝিল না যে আত্মবিনাশেই আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না।

যথার্থ কথা এই যে, শকমুনি বা শ্রীবুদ্ধদেব খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭৫ বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে ঐ বর্ষের স্মরণার্থে শকাব্দ ঐ কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই অব্দ বুদ্ধাব্দ বা শকাব্দ বলিয়া তৎকালের পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ও এই জন্য বরাহমিহিরোদ্ধৃত গর্গ জ্যোতিষীর মতে ২৫২৬ শকাব্দপূর্ব্ব যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব বুদ্ধাব্দও যাহা, শকাব্দও তাহা হয় প্রমাণিত হইল। ইহার দ্বারা আরও অবগত হওয়া যায় যে, যাহা যুধিষ্ঠিরাব্দ তাহাই কল্যব্দ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠির হইতে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের মধ্যে যে কাল পরিমাণ তাহাই গর্গ জ্যোতিষী ও তদর্থে বরাহমিহির গণনা করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা ঐ কালেই রচিত বলিয়া তিনি গর্গমতে গণনা করেন, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রদ। কারণ, বরাহমিহির রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭ বর্ষের সময়কার লোক। যখন বরাহমিহির বৃদ্ধ গর্গের মতাবলম্বন করিয়া উক্তি করিতেছেন তখন বেশ বুঝা যায় যে, তিনি শ্রীবুদ্ধের ও গর্গের পরবর্ত্তী কালের লোক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণ পুরাণকারগণ এবং প্রক্ষিপ্তকারগণ এই বিষয়ে অসত্যাশ্রয়ী ছিলেন দেখা যায়। পুরাণরূপ পুরাবৃত্তে এই যথার্থ শকাব্দের উল্লেখ নাই। কারণ, তাহা হইলে সত্য প্রকাশিত হয়; ফলে যুধিষ্ঠিরাব্দ বহু কালের জন্য অন্ধকারে বিভ্রমলাভ করিল। এই নিমিত্ত সমস্ত ঐতিহাসিকগণের এতদ্বিষয়ে কালগণনার ভুল হইয়াছে; কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭৫ বর্ষ হইতে ৭৮ খৃষ্টপরবর্ষের শিক্ষিত মানবগণের আমাদের ন্যায় ভ্রম হয় নাই দেখা যায় ও তাঁহাদের দয়াতে এই লুপ্ত শকাব্দের বা বুদ্ধাব্দের যথার্থ কাল নির্ণয় করা যায়।

গান

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

মালতি ও মালতি,
মলয় কি আজ পথ ভুলেছে?
মাধবীর কুঞ্জে গিয়ে
তার কাছে সে প্রাণ খুলেছে।

কুহকীর প্রণয়-বিষে
তোরে আজ ভুল্‌লো কি সে,
তাই কি রে তোর আঁখিতে জল
অভিমানে ঠোঁট ফুলেছে?

সে যে আজ পাগল হোলো
মাধবীর মান ভাঙাতে,
ঠোঁটে তার কাঁপন লাগে
মানিনীর গাল রাঙাতে,
মাধবী প্রেমপিয়াসী সর্ব্বনাশী
প্রণয়-সুরের ঢেউ তুলেছে।

দলছুট

ননী ভৌমিক

১

জেল-হাসপাতালের সিক্‌-বেডের পাশে দাঁড়িয়ে যোগেশ্বর অন্যমনস্কের মতো বন্ধুর বরাদ্দ পথ্যের পাউরুটির কোণ থেকে খানিকটা ভেঙ্গে নিয়ে মুখে পূরে দিল।

—তুই বাইরে যাচ্ছিস্‌, কতো কাজ রয়েছে করবার, আমরা কবে বেরুব ঠিক নেই।

কপির চারায় খুরপী চালাচ্ছে কয়েদীরা। এখন মুখের ভাবটা স্বতঃই গম্ভীর হয়ে ওঠা উচিত। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মানে বাইরের সহস্র কঠিন কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করা। তবু পাউরুটির কাইগুলো জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে খসাবার চেষ্টা করতে করতেই হাসল যোগেশ্বর। খুসী হলে ও-রকম ভাবে হাসে মানুষ।

তার পর জেল-অফিস থেকে চার বছরের পুরোন জামা-কাপড় গায়ে চড়িয়ে দ্বিতীয় বার নির্লজ্জের মতো হাসল। হাসবে না ঠিক করেছিল, তবু।

বাড়ি গেল না। গিয়ে উঠল মফঃস্বল শহরের পুরানো বন্ধুর বাসায়। বন্ধু নিজের কথা প্রথমে বলে নিল খানিক: অবস্থা ভালো নয় ভাই। এই দেখ না, বাখারির বেড়াগুলো মেরামত করা দরকার। টিনের চালের ওপর কয়েকটা তালি দিতে হবে। মাটির দাওয়াটা গলে গলে খসে যাচ্ছে—কয়েকটা ইট দিয়ে সারিয়ে নেওয়া উচিত। ইত্যাদি। তার পর জিজ্ঞেস্‌ করেন—তুই খেয়েছিস্‌? নে, চান-টান করে নে—

বেরিয়ে গেল। ডিষ্ট্রিক্‌ট বোর্ডে নতুন কেরাণীর কাজ পেয়েছে ও, দেরী হলে বড়ো বাবু খ্যাচ্‌-খ্যাচ্‌ করবে।

বন্ধুর বাড়তি কাপড় ছিল না। চান করে উঠে তাই শান্তিকণার একখানা আধ-ময়লা শাড়ী পরতে হল যোগেশ্বরকে। শান্তিকণা বন্ধুর মামাতো বোন। চৌকো কাঠের ফ্রেমের আয়নাটা মেঝের ওপর বসিয়ে ঘাড় নীচু করে অনেকক্ষণ নিজের মুখ দেখলে যোগেশ্বর। মনে পড়ল দাড়িগুলো কামিয়ে ফেলতে হবে।

শান্তিকণা ডাকলে—আসুন।

না, না,—আমার—বিব্রত ভাবে যোগেশ্বর কি একটা বলতে চেয়েছিল বোকার মতো। অথচ সত্যি কথা বলতে খুব বেশী রকম খিদেই ওর পেয়েছিল।

শান্তিকণা একটা পাড়-সেলাই-করা আসন পেতে দিলে—বসুন।

খুব খিদে পেয়েছিল যোগেশ্বরের তাই অনেকগুলি ভাত খেল।

—আর দেবো! শান্তিকণা জিজ্ঞেস্‌ করেছিল, ডাল-তরকারী কিছু নেই কিন্তু।

আচ্ছা অল্প দুটিখানি দাও—

খুব বেশীরকম খিদে পেয়েছিল যোগেশ্বরের, তাই প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে মনে হ'তে শঙ্কিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে যোগেশ্বর—তুমি খেয়েছ?

শান্তিকণা হাসেনি। অল্প লেখাপড়া-জানা আইবুড়ো মেয়েরা বেশী হাসে না। বললে—খান না আপনি।

এবার কি কথা পাড়বে ভেবে পায় না যোগেশ্বর। বকতে শুরু করে আজেবাজে।—জেলে থাকতে আমাশা'য় খুব ভুগিয়েছে আমাকে, জানো?

—এক মাস। এক মাস না; দেড় মাস প্রায়। পাখীর মতো রোগা হ'য়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাকে দেখে ঠাট্টা ক'রত, এত বিচ্ছিরি চেহারা হ'য়ে গিয়েছিল আমার! তার পর থেকে, জানো, খুব খিদে পায় আমার! সব সময় খাই-খাই করে ভেতরটা। কিন্তু ওতো অসুখের খিদে, নয়?

খুব করুণ ভাবে শান্তি শুনছিল ওর কথা। চোখ দুটো মিটমিট করেছিল ওর। তারার মত ও রকম চাউনি মানুষের ভেতরটা খুঁড়ে খেতে চায় না, নরম নরম চাউনি।

—তার পর থেকে যতো খাই, পেটের ভেতরটা খালি খালি ঠেকে। অথচ পেটে জায়গা নেই। আর কি রকম ফুলে উঠেছে দেখেছ?

যোগেশ্বর হাফ-সার্টের ঝুলটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে শান্তিকণাকে দেখাল তার পেটের আয়তন। পাঁজরার হাড়গুলো পাকস্থলীর জায়গা ক'রে দিয়ে নীচের দিকে চওড়া হয়ে গেছে। তুলনায় সরু লাগে বুকটা।

—তুমি ভাবছ পিলে হয়েছে? কালাজ্বরে ভুগলে এ-রকম হয়। কিন্তু কালাজ্বর আমার হয়নি। ঐ আমাশা'র পর থেকেই এ-রকম

রান্নাঘরের চৌকাটে ব'সে শান্তিকণা সহানুভূতিতে চুপ ক'রে রইল। অনেক দুঃখ-কষ্ট পেরিয়ে এসে বেশী বয়সী মেয়েরা অন্য লোকের আরো অনেক দুঃখ-কষ্টের কথা যে ভাবে শোনে। আর সব দুঃখ-কষ্টের চেহারাই তো এক রকম।

—এই তো জেল থেকে এলাম? বাড়িতে সবাই বলবে চাকরী বাকরী করতে। অথচ চাকরী ক'রে কি হবে?

একটু হাসল শান্তিকণা— আপনার যা খিদে, চাকরী না করলে খিদে মেটাবেন কি করে?

একটুখানি হেসেছিল, তার পর চুপ করে গেল। অন্যায় হয়েছিল হাসিটা। যোগেশ্বর কষ্ট পাবে ব'লে নয়, অত্যন্ত সহজ সাধারণ রসিকতায় হেসে উঠতে গিয়েছিল ব'লে!

ঝাপসা ভাবে তখন যোগেশ্বর একটু অস্বস্তি অনুভব করেছিল। একটু ইতস্তত: ক'রে তাই বলছে—তুমি খেয়েছ? প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল শান্তিকণা—উঠুন আপনি, আমি জায়গাটা পরিষ্কার করেনি।

তার মানে কি? শান্তিকণা ওর কথার উত্তর দিল না কেন?

হাত-মুখ ধুয়ে বন্ধুর বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান খাড়া ক'রে রইল যোগেশ্বর, খুঁটে খুঁটে শুনল প্রত্যেকটি শব্দ: ওটা রান্নাঘরে ঢোকার শব্দ; বাসন রাখার, এখন মোটেই শব্দ নেই, শেকল দেওয়ার শব্দ···

কি ভালো মেয়েটা। মনের ভেতর কতোখানি দয়ামায়া রয়েছে ওর। কান খাড়া করে থেকেও এমন কোনো শব্দ শোনা যায়নি যাতে মনে হবে শান্তিকণা খেতে বসেছে। সত্যি সত্যিই তাহলে খায়নি ও। নিজের ভাতটা পর্য্যন্ত অসময়ের মানুষ যোগেশ্বরকে দিয়ে নিজে শুকিয়ে থাকবে হয়ত।

ভর-পেট খাওয়া-দাওয়ার পর রোগা শরীরে নেশার মতো ভাব আসে। ঘুম আসে তখন। ঘুম আসার আগে ভিজে মাটির মতো একটা সোঁদা আস্বাদে ভবে গিয়েছিল যোগেশ্বরের মন।

তাই শান্তিকণাকে বিয়ে করেছে ও।

খবর পেয়ে দস্তিদার এসেছিল। চাষা-ভুষো মানুষদের ভেতর কাজ ক'রে ক'রে ওর চেহারাটা কি রকম পাটকিলে হয়ে গেছে। গা দিয়ে ঘাসপাতার গন্ধ বেরোয়। চোখ দুটো কখনো কখনো রোদ-ঠিকরানো অভ্রের মতো থেকে থেকে ঝিকিয়ে ওঠে!

কিন্তু যোগেশ্বরকে দোষ দেয়নি দস্তিদার। এক সময় হেসে কথাটাকে হাল্কা করে বলেছিল—তুই সরে যাচ্ছিস্, মাঠে মাঠে ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তিন বেলা না খাওয়ার পর বাঁকিচরার সদরুদ্দিনের বাড়ি মুরগীর ঝোল খাওয়ার সুখ ফুরিয়ে গেল তোর।

হেসে, ঠাট্টা করে, পেট পূরে খেয়ে চলে গেল লোকটা। বগলে তুলে নিল জুতো-জোড়া। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, খোলা পায়ে হাঁটাই ভালো— ফোস্কা পড়বে না।

২

হারিয়ে-যাওয়া জনতা শব্দহীন কোলাহলে চিৎকার ক'রে উঠেছিল। ঝাপ্‌সা ভাবে এক সময় মনে হয়েছিল খুব অন্যায় একটা কিছু হয়েছে। অত্যন্ত গর্হিত নৃশংসতা একটা, যার জন্য শাস্তি পেতে হবে। খুব কঠিন শাস্তি দিও না আমাকে। না, দিও না। আগে থেকে বুঝতে পারলে এ রকম গাফিলতি আর হবে না। অনুতাপের মতো কেবল একটা মোচড়ে বুকের ভেতরটায় খুব কষ্ট হয়েছিল এক সময়···

তার পর বুঝতে পারল ঝিরঝিরে শব্দটা সকাল বেলাকার কল থেকে আসছে। কয়েকটা শব্দ-স্বর অসম্ভব উঁচু হয়ে ধাক্কা মারছে কানের ওপর। বিছানার ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে বড়ো মেয়ে জয়ন্তী ছোট ছোট হাতে ওর পায়ের বুড়ো আঙুলটা মুঠো করে ধ'রে নাড়িয়ে [illegible] ডাকছে— বাবা ওঠো। বেলা হয়ে গেছে যে।

তাই ভুলে গেল জাগবার আগে ঝাপসা ভাবে কি মনে হ'য়েছিল এক সময়।

বড়ো লোকের টাকায় তৈরী তেতালা বাড়িটায় যতোগুলি ঘর আছে ততগুলি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। তাদের সমবেত প্রাক্-অফিস কর্মব্যস্ততা অতো ভয়ঙ্কর কোলাহল ব'লে মনে হল না আর। কোলকাতার লোকের স্বাভাবিক অভ্যাসে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলে যোগেশ্বর—ক'টা বেজেছে রে?

কলতলায় যেতে হবে মুখ ধুতে। কল খালি নেই এখন। আধভর্তি চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে নেয়া যায় অবিশ্যি, কিন্তু অন্তত: পাঁচটা সরু-মোটা বউ ওখানে ব'সে ব'সে বাসন ধোবে; খুকিদের জামা-কাপড়—কাঁথা কাচবে। পুরুষ মানুষ দেখলে লজ্জা ক'রে সব সময় ঘোমটা টেনে দেয় না বটে, গায়ের কাপড় ঠিক মতো সামলে নেয়ার সতর্কতাও হয়ত নেই, তবু, যে কারণেই হোক, স্বল্পসঞ্চয় জলের ওপর অবাঞ্ছিত হাত পড়লে মেয়েমানুষের মুখের কড়া কড়া কথা শুনতে পাওয়াও বিচিত্র নয়।

—বেলা হয়ে গেছে খুব?

কোণের দিকে তোলা উনুনে গনগনে আঁচ দিয়ে বসে আছে শান্তিকণা। ভাত চড়াবে তাই তাড়া দিল— নাও, চা খেয়ে নাও! বেলা হয়নি আবার! দোতলার নৃপেন বাবু কখন বাজার নিয়ে ফিরেছে।

যে ভাবে জল খায় মানুষ, সে ভাবে চা খায় না। তবু ঢক্ ঢক্ ক'রে অর্দ্ধেকটা চা খেয়ে নিল যোগেশ্বর। শান্তিকণাকে কি একটা বলতে চাইল।

—তোমার যা যা কিনতে হবে ঠিক করে রেখেছো তো?

আপন মনে শাটির জ্বাল পরীক্ষা করে শান্তিকণা। উত্তর দেয় না।

—আজকে মাইনে পাব, বুঝেছ? ঠিক করে রেখেছ তো?

এখন যদি শান্তিকণা চ'টে ওঠে তাহলেও হয়ত দোতলার মেয়েরা ওকে দেখিয়ে বলবে, মাগো, বউটা কি ঝগ্‌ড়াটে!

—হ্যাঁ, হ্যা, হ্যা, ঠিক করে রেখেছ তো?

কোলের রিকেটি ছেলেটা দেয়ালের গোড়ায় শুয়ে আছে। তার বুকের হাড়ে, হাঁটুর ভাঁজে, আলগা চামড়া কুঁচকিয়ে রয়েছে। সেই দিকে কিছুক্ষণ চিন্তাহীন ভাবে তাকিয়ে রইল যোগেশ্বর। তার পর বেরিয়ে যেতে গিয়ে শান্তিকণার প্রশ্নে আটকে গেল।

—বলেছ?

—কি? ভাবনাহীন যোগেশ্বরের তাকানি।

শান্তিকণার মুখের চেহারা ক্রমশ: পালটে যাচ্ছে; ঠোঁটের একটা কোণ একটু ফাঁক হ'য়ে গেছে।

অর্থাৎ বিরক্তি।

অস্পষ্ট ঘৃণায় যোগেশ্বরের গলার স্বর অল্প একটু বেঁকে গেল— কি বলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

তবু কথা বলতে দেরী করল শান্তিকণা। অসহ্য, অস্বাভাবিক একটু বিলম্ব, যা ধাক্কা দিয়ে যোগেশ্বরকে বুঝিয়ে দেবে তার অপরাধ।

—সেই কাজটার কথা?

—না, বলব না।

এবার যোগেশ্বরের লজ্জা পাওয়া উচিত। তবে নিজের কণ্ঠস্বরে

বিরোধের সুরটা কেমন ফিকে মনে হল হয়ত, তাই দাঁড়িয়ে রইল, অযথা।

আস্তে আস্তে শান্তিকণা ফিরে আসছে নিজের ভেতর। আপন মনে শটির আল পরীক্ষা করার মতো স্বাভাবিক অবস্থা। রিকেটি ছেলের মা হওয়ার মতো। তাই স্বাভাবিক ঝাঁঝ টেনে বললে—শ' দুই টাকা উপরি পেতে এতো আপত্তি তোমার?

—উপরি? যোগেশ্বরের চোখে আরো অনেক কথা রয়েছে, যা ওর স্বাভাবিক বোকামিতে বলতে পারছে না, উপরি, না ঘুষ?

—উপরি ছাড়া কি? আজকালকার বাজারে কে উপরি নেয় না বলো! মাসে বাড়তি টাকা ক'টা পেলে কোনো রকমে সংসার চালান যেত আর কি।

—উপরি? দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করল যোগেশ্বর।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই মনে হল, ভেতরে ভেতরে যে ধোঁয়াটে অতৃপ্তিটা রয়েছে তা ঠিক মতো চা না খাওয়ার দরুণ। খালি পেটের ভেতরের খিদেটা চন্‌চন্ করছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলে আনা চারেক পয়সা আছে। একটু ইতস্তত: করে লোভীর মতো দু'আনার সিঙাড়া কিনল। তার পরেও যে খিদে পাচ্ছে ওর, সেটা সুস্থ নয়। অসুখের খিদে। যতো খাও শরীর ভালো হবে না। অনেক দিন আগে জেলে একবার আমাশা' হয়েছিল, তার পর থেকে—

তখন মনে পড়ল শান্তিকণাকে কি বলতে চেয়েছিল: দস্তিদার মারা গেছে: চাষাভুষো মানুষরা ভালোবেসে মুরগীর ঝোল ফুস্‌ফুসের ক্ষয় রুখতে পারেনি।

৩

—শুনেছ?

রাত্রে বাড়ি ফিরে কি রকম আনমনার মতো জিজ্ঞেস্ করলে যোগেশ্বর। শান্তিকণা উৎসাহ প্রকাশ করলে না। খুব কম কথা বলা অভ্যাস ওর। একটু ক্লিষ্ট ভাবে অপেক্ষা করলে যোগেশ্বর।

খেতে বসল যখন মুখের ওপর থেকে সেই আনমনার ভাবটা কেটে যায়নি। খেতে ব'সে ঢুলুনি আসে। ঢুলে ঢুলে খায় যোগেশ্বর, শব্দ করে করে। ডাল ভাত খেয়ে তৃপ্ত থাকার শব্দ। শান্ত বিতৃষ্ণায় তাকিয়ে থাকে শান্তিকণা। অনেকক্ষণ ঢুলে ঢুলে ব'লে বসে যোগেশ্বর—শুনেছ? দস্তিদার মারা গেছে।

তাতে কি হয়েছে?—শান্তিকণার চুপ করে থাকার এই মানেটা ধরতে পারল না ও। মুখের ওপর আনমনা ভাবটা ঘন হয়ে বোকামী অথবা স্বপ্নের মতো দেখায়।

সাংসারিক কাজকর্ম। এঁটো পরিষ্কার করে নেওয়া। অমসৃণ মেঝের ওপর শান্তিকণার ভোঁতা-হ'য়ে-আসা আঙুলগুলো খস্‌খস করে ওঠে। স্তব্ধ একটা ছায়ার মতো রিকেটি ছেলেটাকে কোলের ওপর নিয়ে ফিডিং বট্‌ল্ দিয়ে শটি খাওয়ানো।

—ও আর আমি একসঙ্গেই জেলে গিয়েছিলাম, প্রথম যখন জেল হয় আমার,—শান্তিকণার ছায়ার দিকে তাকিয়ে যোগেশ্বর বললে।

—শটি খেতে চায় না ও; বমি তোলে।

—আমাদের ওদিকে সেই গাণ্ডী-তোলা আন্দোলন হয়েছিল জানো? খুব মেতে উঠেছিল চাষীরা। হাটে হাটে স্বেচ্ছাসেবক খাড়া করে কেনা-বেচা চলত।···এক পয়সা তোলা দেওয়া হবে না জমিদারকে। ওরা পুলিশ মোতায়েন রাখত আগে থেকে। হলে কি হবে, পঞ্চাশটা গাঁয়ের পাঁচ হাজার চাষী আপনি এসে জুটত গুলীও চালিয়েছিল সে-বার। দস্তিদার গেঁয়ো ভাষায় বক্তৃতা দিত—

ছেলেকে দুধ খাইয়ে ক্লান্ত ভাবে অপেক্ষা করছে শান্তিকণা: ভেজা জায়গাটা শুকুলে বিছানা পাততে হবে ওখানে। অন্ধকূপ বাড়ির কেরোসিন তেলের ল্যাম্পের ধোঁয়াটে একটু আলোয় পরিচিত মানুষদের চেহারা অন্য রকম লাগে।

—তাতে কি হয়েছে? বেমানান প্রশ্ন করল শান্তিকণা।

—না এমনি বলছি।

শান্তিকণা হাত দিয়ে পরখ ক'রে দেখল জায়গাটা, ক্ষয়ে-যাওয়া আঙুলের ডগা দিয়ে। শুকিয়ে গেছে। তোরঙ্গের ওপর থেকে বুকে করে বিছানা-পত্তরগুলো নিয়ে এসে পাততে শুরু করলে। হাঁটু গেড়ে ব'সে কাঁথার কোণগুলো সমান করে দিল। পেট-ডিগডিগে রোগা ছেলেটা এক কোণে ঘুমুচ্ছে। নিশ্বাস নেওয়ার সময় বিচ্ছিরি ভাবে উঠছে নামছে পেটটা। বুকের ভেতর কি একটা ঠেলে উঠতে চায়! অনেক কাল আগে জেলে থাকতে একবার আমাশা হয়েছিল···দরজার গোড়ায় একটা গেলাস রয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর যোগেশ্বর তাইতে জল খেয়েছিল। জল খেয়ে ওইখানেই রেখে দিয়েছে। এই রকমই অভ্যাস। হয়ত শান্তিকণা বিছানা পাতা হয়ে গেলেও দেখতে পাবে না গেলাসটা। তুলে রাখার কথা মনে হবে না ওর। ঘুমের ঘোরে জয়ন্তী হাসছে, বড়ো মেয়ে জয়ন্তী। ছেঁড়া অয়েল-ক্লথটা খানিকটা গুটিয়ে ঠিক করে নিল শান্তিকণা। ছেলেটাকে ওখানে শুইয়ে দেবে এবার।

—কালকে কাজটা ঠিক করে নেবো, বুঝেছ। উপরি আজকাল কে নেয় না বলো?

—না নিলে এই দুর্দিনে সংসার চালাতে পারে কেউ? ছেলেকে কাত করে শুইয়ে কাল্পনিক জেগে ওঠা সামলে নিতে কানের ওপর ছোট ছোট থাপড় মারল শান্তিকণা।

—ভাবছি এক জন ভালো ডাক্তার দেখাব। ঐ অসুখের খিদেটা যাচ্ছে না কিছুতেই।

দরোজা বন্ধ করার সময় শান্তিকণা গেলাসটা দেখতে পেয়েছিল, তবু কিছু বলেনি যোগেশ্বরকে। ভালোবাসায় ভিজে গেল যোগেশ্বরের মন।

ছেলের এ পাশে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে শান্তিকণা। বালিসের কোণগুলো ঠিক ক'রে নেয় একটু। নিজের হাতের পাড়-তোলা সুতোয় ফুল-ফোটানো ঢাকনিতে মাথা দিয়ে শুতে আরাম পায় মানুষ। শোয়ার পর আঁচলের তলে হাত দিয়ে দিয়ে পিঠের ঘামাচি খুঁজে বার করে।

—আলোটায় তেল নেই বেশী।

—তাহ'লে নিবিয়ে দাও, বালিশের তলে দেশালাই রেখেছি।

রাত্রে খোকা উঠলে আলো দরকার হবে, তাই তেলটুকু বাঁচানো ভালো। আলো নিবাতে গিয়ে কেমন একটু দেরী করে যোগেশ্বর। তার পর এমন ভাবে ফুঁ দিল যেন খুব দুঃসাধ্য একটা কাজ করছে। মেঝের ওপর এক ঝট্‌কায় জমাট কালো একটা অন্ধকার আছড়ে প'ড়ে স্বাভাবিকতায় ক্রমশ: ফিকে হয়ে এল। শুয়ে পড়া উচিত, তবু তখনই শুয়ে পড়ল না যোগেশ্বর।

—কয়েকটা টাকা পাওয়া গেলে সংসারের কতো সুবিধা!

ঢুলুনি এসেছে হয়ত যোগেশ্বরের, কথা বললে না। শান্তিকণা তাই আবার জিজ্ঞেস করলে—কি?

যোগেশ্বরকে উত্তর দিতে হল—অনেক সুবিধা। খোকার একটা হরলিক্স্ কেনা যাবে।

শান্তিকণা পাশ ফিরে শুল। খোঁপাটা খুলে বালিসের ওপর দিয়ে এলিয়ে দিল চুলগুলো—জয়ন্তীর ফ্রকের কাপড় কিছু। আমার দুটো শাড়ী।

—আর কি কি কিনতে হবে বলো।

স্বর একটু অবাক্ হয়ে এ-পাশ ফিরল শান্তিকণা—ও কি?

যোগেশ্বর শোয়েনি। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা নামিয়ে রেখে চাপা প্রশ্ন করলে—কি?

—তোমার সর্দি হয়েছে। গলাটা ভেঙে গেছে কেমনধারা।

কিছুক্ষণ কথা বললে না যোগেশ্বর। যখন বললে, আওয়াজটা আরো ভাঙা শোনাল—অদ্ভুত ভাবপ্রবণ ছেলে, কী লাভ হল?

ঘুম এসে গেছে শান্তিকণার। নেভা কৌতূহলে বললে—কে?—ঐ দস্তিদার!

…কঠিন শাস্তি দেবে আমাকে? না, দিও না। আগে থেকে জানতে পেলে এ-রকম গাফিলতি আর হবে না। কিন্তু উদ্যত শাস্তি। সমস্ত হাত-পা পাথর হয়ে গেছে যোগেশ্বরের। হাজার চেষ্টাতে শরীরের একটা পেশীও কুঞ্চিত হয়ে উঠবে না। সাময়িক একটা পক্ষাঘাতে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে চাপ-খাওয়া গোঙানি।

ঘুম ভেঙে গেল শান্তিকণার। বিরক্ত হয়ে ধাক্কা দিল—পাশ ফিরে শোও। চিত হয়ে শুলেই তুমি ও-রকম করো।

দুপুরে

অমল ঘোষ

দুপুরে গলন্ত শূন্য খাঁ খাঁ করে,
ঝরন্ত পাতারা ঝরে
শুক্‌নো কাঁকরে
টুপটাপ!

বাতাস শীকার ধরে,
ছুটোপুটি ছুটোছুটি
ধরে ঝুঁটি ছাড়ে ফের হিংস্র আদরে কাটে
চুপচাপ।
কঞ্চির বেড়া-ঘেরা পোড়ো জমি, চরে
বাঁশের খোঁটার বাঁধা
সাদা কালো ডোরা-কাটা পাঁঠা
নধর নরম

উলুর ছাউনি নীচে টাইম কিপার,
বাস থামে ধুলো ওড়ে,
কণ্ডাকটার,
রোদ থমথম।

ঝগড়া লাগায় দুটো নেড়ী কুত্তোয়,
ষ্টেশনের লাল ডালে কাপড় শুকোয়,
দোলে বাঁশ ঝাড়।
স'তুটোর ট্রেণ এল হুস্ হুস্ হুস্
জান্‌লায় মাথা রেখে মেয়েটা বেহুঁস
জ্বলে লাল পাড়;

পান বিড়ি সিগারেট কচি ডাব চাই,
ছোঁড়াটা দোকান ছেড়ে বেঘোরে চেঁচায়,
বাজে হুইসেল,
সাতটা পঁচিশে ট্রেণ এল হাওড়ায়,
পুল পার হ'য়ে বাসে-ধর্মতলায়
নামল মিছিল।

আবার প্রভাত

বিমল দাস

হেথায় সহস্রধারা মুছে যায় মরুর উপর
লতা-পাতা দূরের তিমির,
হাজারো কালের জল, ঘন নীল কালো জল—
ফেলে যায় নিস্ফল কম্মের সারি,
দূরে যায় মাটির মানুষ
বিজ্ঞানীর ভাঙ্গাগড়া ভেসে যায় অখণ্ডের স্রোতে—
মানুষের হাত, ফেল মারে আগামী প্রভায়
শুধু জাগে অবিচ্ছিন্ন রাত
আবার প্রভাত।
হেথায় শুধুই জ্বলে নূতন কিরণ
লাখ লাখ পৃথিবীর জীব,
সোণালী আলোকে ভরা পৃথিবীর আকাশ-বাতাস
জেগে ওঠে গণ-কোলাহলে,
একটি চাঁদের আলো ভরে দেয় নবীন ঊষায়
রাতের কুহক ভাঙে পাখীর বাসায়
কত দিন কত রাত কেটে যায় মাথার উপর
আমাদের দিন কেটে যায়;
আসে অবসাদ—গত জীবনের অবসাদ,
চোখ থেকে ঝরে পড়ে শুধু জল—
লেলিহান শিখা জাগে দ্বিগুণ প্রভায়
ভেসে যায় সকল জীবন
নেমে আসে মোদের মরণ।
হেথায় শুধুই জাগে আবার মিলায়ে যায়
দিন হতে দিনান্তরে
পাড়ি পড়ে আগামী যাত্রীর
আকাশের বুক থেকে খসে পড়ে তারকার দল
জোনাকী আলোয় কাঁপে আঁধারের রাত
থেমে যায় জীবন-সঙ্গীত,
অস্ফুট আলোয় কাঁপে অনাগত কাল
মাঝে জাগে অবিচ্ছিন্ন রাত
জাগিবে প্রভাত।
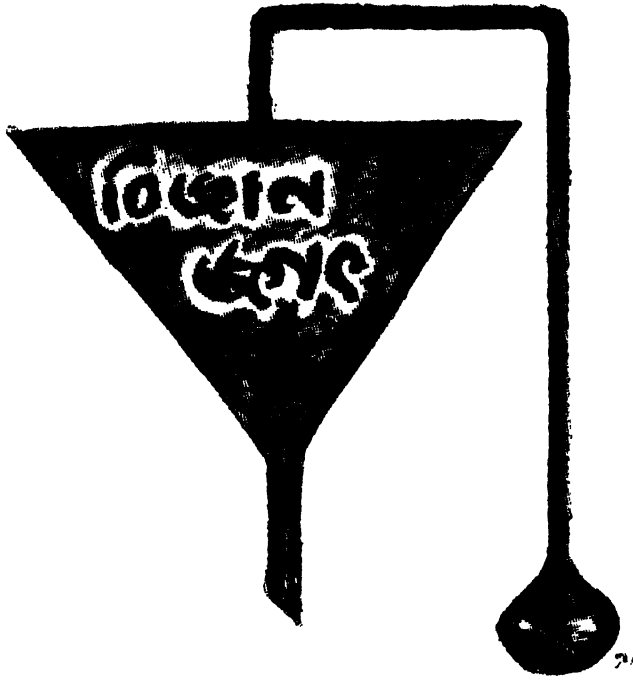
তেজস্ক্রিয়তা ও পরমাণুর রূপান্তর

শ্রীসূর্য্যেন্দুবিকাশ

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্‌ ইলেক্‌ট্রন (electron) আবিষ্কার করেন। কোনো আবদ্ধ পাত্রের ভেতর স্বল্প পরিমাণ বাতাস রেখে তাতে বিদ্যুৎ চালিয়ে তিনি দেখলেন বিদ্যুৎবর্ত্তনীর (circuit) ঋণফলক (cathode) থেকে এক প্রকার রশ্মি বেরুচ্ছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, এগুলি একক ঋণ-বিদ্যুদ্‌বাহী বস্তুকণা (unit negative electricity)। এগুলির ভর (mass) হাইড্রোজেন (Hydrogen) পরমাণুর (atom) ১/১৮৫০ ভাগ। এইগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ইলেক্‌ট্রন। বাতাসের পরিবর্ত্তে অন্যান্য বায়ব পদার্থ নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেল তারাও এই ইলেক্‌ট্রন রশ্মির জন্ম দেয়। তার পর জার্মান বিজ্ঞানী রন্‌জেন (Rontgen) এই রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় হঠাৎ দেখলেন এরা কোন জড়বস্তুর ওপর প্রতিহত হ'য়ে এক বিদ্যুৎহীন রশ্মির উদ্ভব করে। এরা হ্রস্ব ঈথর-তরঙ্গ (short electromagnetic waves) ছাড়া আর কিছু নয়। এদের তরংগ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট বলেই এদের তীব্র ভেদ-শক্তি (high penetrating power) রয়েছে। এই অজানা অদ্ভুত রশ্মিটির নাম দেওয়া হ'লো এক্সরশ্মি (X-rays)। এক্সরশ্মির গতি-পথে বায়ব (gaseous) পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে যায় ও আমরা পাই ইলেক্‌ট্রন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ডাল্‌টন্‌ যে পরমাণু-বাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মূলে এবার যেন একটু ভাঙনের ছায়া দেখা গেল। অবিভাজ্য পরমাণুর চাইতে ক্ষুদ্রতর এই ইলেকট্রন-কণাই যে প্রায় সমস্ত পরমাণুর উপাদান—এই সংশয় বৈজ্ঞানিকদের চোখে উপস্থিত হ'ল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরেল বস্তুর এক নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার করেন। ইউরেণীয়াম নামক এক মৌলিক পদার্থ (element) নিয়ে পরীক্ষা করার সময় তিনি হঠাৎ দেখলেন যে, ঐ ধাতুটির পার্শ্বস্থিত একখানা ফটোগ্রাফিক প্লেট কালো আবরণের ভেতর সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও নষ্ট হ'য়ে গেছে। সাধারণ আলোক দ্বারা এটা কখনও সম্ভবপর নয়। রঞ্জনরশ্মি (X-rays) জাতীয় কোন শক্তির সত্তা নিশ্চয়ই এই ধাতুটির ভেতর রয়েছে, এই অনুমানই তিনি করলেন। বহুবিধ পরীক্ষার পর তিনি প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত মৌলিক পদার্থের ধর্ম (property) থেকে স্বতন্ত্র একটি ক্রিয়া এই ধাতুটির ভেতর রয়েছে। ইউরেণীয়ামের এই নূতন ধর্মটির নাম দেওয়া হ'ল তেজস্ক্রিয়তা (Radio-activity)। বেকেরেল দেখলেন. ইউরেণীয়াম থেকে অনবরতই তিনটি রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এগুলির নাম দেওয়া হ'য়েছে আল্‌ফা, বীটা ও গামা। চুম্বক-ক্ষেত্রের (magnetic field) সাহায্যে পরীক্ষায় দেখা গেল, আল্‌ফা-রশ্মি ধনবিদ্যুৎবাহী (positive electrical) বস্তুকণা। এদের ভেদশক্তি খুব কম। বীটা-রশ্মি আমাদের পূর্বপরিচিত সেই ইলেক্‌ট্রন-কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের ভেদ-শক্তি আল্‌ফা-কণার চাইতে কিছু বেশী কিন্তু রাসায়নিক শক্তিতে এরা আল্‌ফা-কণার চাইতে কম। গামা-রশ্মিতে কোন বিদ্যুৎ নাই বা এরা বস্তুকণা নয়। এক্সরশ্মি থেকে এদের ভেদশক্তি আরো বেশী তাই এদের তরংগদৈর্ঘ্য সব-চেয়ে ছোট। বলা বাহুল্য, এই শক্তিশালী রশ্মিটি অতি হ্রস্ব ঈথর-তরংগ ছাড়া আর কিছু নয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মহিলা-বিজ্ঞানী মাদাম কুরী পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় ইউরেণীয়াম্‌ থেকে বহু গুণে শক্তিশালী 'পিচ্‌ব্লেণ্ড' (pitchblende) নামক যৌগিক পদার্থটি পরীক্ষা করেন। বহু সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি এই যৌগিক পদার্থের কয়েক টন থেকে মাত্র কয়েক চামচ বহু মূল্যবান মৌলিক পদার্থ রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেণীয়াম থেকে বহু গুণে বেশী। বলবত্তর তেজস্ক্রিয়তার জন্যই একে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত করা হ'য়েছে। রেডিয়াম যৌগিক অবস্থায় পিচ্‌ব্লেণ্ডেতে থেকেও তার তেজস্ক্রিয়তা অণুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি হ'তে দেয় না। এ থেকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন তাপ, আলো বা রসায়ন ক্রিয়া প্রভৃতি কোন শক্তিই তেজস্ক্রিয়তাকে বাধা দিতে পারে না।

অতঃপর থোরিয়াম, এক্‌টিনিয়াম্‌ প্রভৃতি অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কৃত হ'লো। এখন বৈজ্ঞানিকেরা আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন। তাঁরা দেখ্‌লেন, রেডিয়াম ধাতুর তেজস্ক্রিয়তা আপনা আপনি হ্রাস পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভর ও ধর্ম যাচ্ছে বদ্‌লিয়ে। বিস্মিত বৈজ্ঞানিকের চোখে পড়লো মৌলিক পদার্থ রেডিয়াম ক্রমশঃ সীসকে পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে। মাঝখানে 'রেডিয়াম এমানেশান', রেডিয়াম এ, বি কতকগুলি বিভিন্নধর্মী মৌলিক পদার্থের উদ্ভব হ'চ্ছে। আর তার শেষ পরিণতি দাঁড়াচ্ছে সীসকে। এই বিরাট রূপান্তর কিছু এক দিনে হয় না—দীর্ঘ সময় লাগে। গণনায় দেখা গেছে, রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার অর্দ্ধ হ্রাস-কাল (half

value period) ১৬০০ বছর। অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির ওপর পরীক্ষা করেও দেখা গেল, তারা ক্রমে ক্রমে এক মৌলিক পদার্থ থেকে অন্য মৌলিক পদার্থে বদ্‌লিয়ে যায়। একটি মৌলিক পদার্থ যখন অন্য একটি মৌলিক পদার্থে পরিণত হ'চ্ছে, তখন নিশ্চয়ই প্রথমটির পরমাণু অন্যটির পরমাণুতে রূপান্তরিত হ'য়েছে। ডাল্টনের মতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু ছিল বিভিন্নধর্মী ও অবিভাজ্য, কিন্তু এক পরমাণু যদি অন্যটিতে পরিণত হয় তবে এই-ই সম্ভব যে, পরমাণুর ভেতর আরও ক্ষুদ্রতর কোনো বস্তুকণা রয়েছে যারা এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

এই বিশ্বাস ক্রমশঃ আরও দৃঢ়তর হ'বার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ডও বহ্‌র পরমাণুর গঠন-তথ্যের রচনা করেন। তাঁদের মতে পরমাণুর অবিভাজ্যতা ও অবিনাশিতা প্রভৃতি বাতিল হ'য়ে গেল। তাঁরা বললেন, প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রীনে (neucleus) রয়েছে এক বা ততোধিক প্রোটন (proton)। প্রোটনগুলি হ'ল একক ধনবিদ্যুৎবাহী (unit positive eletricity) বস্তুকণা। এদের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। এই প্রোটনের চারি দিকে বৃত্ত বা উপবৃত্ত (ellipse) পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতক ইলেক্ট্রন। প্রোটনের বিদ্যুৎ-পরিমাণ ইলেক্‌ট্রনের সমান। উদাসীন (neutral) বস্তুতে প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের সংখ্যা সমান থাকে। তাঁরা প্রমাণ করলেন, হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে রয়েছে একটি প্রোটন আর তার চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ইলেক্ট্রন। প্রোটনের ভরের তুলনায় ইলেক্ট্রনের ভর উপেক্ষণীয়। বস্তুতঃ, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর তার কেন্দ্রীনস্থিত প্রোটন ছাড়া আর কিছু নয়। হিলিয়ামের কেন্দ্রীন ৪টি প্রোটন ও ২টি ইলেক্ট্রনের সমষ্টি। তার চারি দিকে ঘুরে বেড়ায় দু'টি ইলেক্ট্রন। আমাদের পূর্বকথিত আল্‌ফা-কণা হিলিয়ামের কেন্দ্রীন ছাড়া আর কিছুই নয়, এটাও পরে প্রমাণ হ'য়েছে। এই ভাবে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর চিত্রগুলি জগতে আনলো যুগান্তর। নানা দিক্ থেকে বিচার করে সব দেশের বৈজ্ঞানিক পরমাণুর এই বৈদ্যুতিক রূপ নিঃসন্দেহে মেনে নিলেন। এখন বুঝ্‌তে পারা গেল যে, পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা তার কেন্দ্রীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার স্বাভাবিক ফল। পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীন থেকে হিলিয়াম্ কেন্দ্রীন ও ইলেক্ট্রন অনবরত বেরিয়ে তাকে নিম্নস্তরের পরমাণুতে রূপান্তরিত করে। পরিণতিতে এরা এমন ধাতুতে এসে যায়, যার আর তেজস্ক্রিয়তা নেই। এখন আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির ভেতর রয়েছে আত্মহত্যার উন্মাদনা। পৃথিবীর কোন শক্তি এদের বাধা দিতে পারে না। এরা এ অনুপ্রেরণা কোত্থেকে পেয়েছে—তা আজও ঠিক হয় নাই।

পরমাণুর এই স্বাভাবিক রূপান্তর (transmutation) বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যক্ষ করে কৃত্রিম উপায়ে ইহা সম্ভব কি না, সেই গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও ও তাঁর পত্নী ইরেন কুরী কৃত্রিম উপায়ে সাধারণ ধাতুতে তেজস্ক্রিয়তা প্রণোদিত করেন। বোরন প্রভৃতি পরমাণুর ওপর আল্‌ফাকণার প্রয়োগ করে তাঁরা দেখ্‌লেন যে, আল্‌ফাকণা সরিয়ে নেবার পরও এই ধাতুগুলি রেডিয়ামের অনুরূপ রশ্মি বিকিরণ করে। এই আবিষ্কারটির ফলে তাঁরা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই সময় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওপর নানা শক্তি প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে তাদের কেন্দ্রীন ভেঙে অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা চল্‌ছিল। আল্‌ফাকণার ভেদ-শক্তি যদিও খুব কম, তবু বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ইহার সাহায্যে কতগুলি পরমাণুর কেন্দ্রীন চূর্ণ করেন। জার্মান বৈজ্ঞানিক বোদে বেরিলিয়াম্ ধাতুকে আল্‌ফাকণা দিয়ে বিচূর্ণ করবার সময় অতি ভেদক এক রশ্মির সন্ধান পান। গামারশ্মির চাইতে এর ভেদশক্তি আরও বেশী। গামা-রশ্মির মত একে অতি হ্রস্ব ঈথর-তরংগ বলে ভুল করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক স্যাড্‌উইক্ প্রমাণ করলেন যে, এই রশ্মিটি ঈথর-তরংগ নয়—এরা বিদ্যুৎহীন ক্ষুদ্র বস্তুকণা। এদের ভর প্রোটনের সমান। পরমাণুর কেন্দ্রীনের এরা অন্যতম উপাদান—এও প্রমাণিত হ'য়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে ডাঃ স্যাড্‌উইক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই বস্তুকণাটির নাম দেওয়া হ'য়েছে (neutron) নিউট্রন। জীবদেহের ক্ষতস্থানে নিউট্রন-কণা অক্ষত মাংসপিণ্ডের কোন ক্ষতি করে না; পরন্তু, ক্ষতদুষ্ট স্থানের জীবাণু বিনাশে এদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা রয়েছে। দুরারোগ্য ক্যান্সার চিকিৎসায় তাই রেডিয়ামের ওপর নিউট্রনের স্থান হয়েছে। যাক্ সে কথা। বিজ্ঞানী ফার্মি ও তাঁর সহকর্মিগণ এই নিউট্রনকণা প্রয়োগ করে প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থকে তেজস্ক্রিয় করতে সমর্থ হন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ করা হয় অদ্ভুত ভাবে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসকে জীবদেহে প্রয়োগ করে তার গতিবিধি ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই সমস্ত আবিষ্কার থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্রুততর উন্নতি হবে—এ রকম আশা করা অন্যায় নয়। তার পর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ বদ্‌লিয়ে দেয়।

প্রাচীন রসায়নবিদ্‌রা (alchemist) ভাবতেন, রসায়ন-ক্রিয়ায় কি উপায়ে লোহা, তামা প্রভৃতি বস্তুকে সোনায় পরিণত করা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দেখলেন, রেডিয়াম যখন আপনা আপনি সীসকে পরিণত হ'চ্ছে, তখন লোহা, তামা প্রভৃতির সোনায় পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। পরমাণুর বৈদ্যুতিক চিত্রগুলি থেকে অনায়াসেই হিসেব করে বলা যায়, লোহা বা তামার কেন্দ্রীন থেকে যদি যথাক্রমে ৫৩টি বা ৫০টি প্রোটন সরিয়ে দেওয়া যায় তবে তারা সোনায় পরিণত হ'বে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হওয়ার পর এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। তেজস্ক্রিয়তা তো কেন্দ্রীনের ভেঙে-পড়া বা disintegration ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎসাহী বৈজ্ঞানিকেরা তাই পরমাণু-রূপান্তর বিজ্ঞানে তার কেন্দ্রীন চূর্ণ করাটাই সহজ পথ বেছে নিলেন। নিউট্রনের তীব্র ভেদশক্তিকে বৈজ্ঞানিকেরা কেন্দ্রীন চূর্ণীকরণের এক বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করলেন—কারণ, এরা বিদ্যুৎহীন হওয়ায় কেন্দ্রীন বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক আবেষ্টনী (potential barrier) ভেদ করার শক্তি এদের অসীম। এই বৈদ্যুতিক আবেষ্টনীই কেন্দ্রীনকে অখণ্ড ভাবে থাকতে বাধ্য করে। আল্‌ফাকণারও যে কেন্দ্রীন চূর্ণীকরণে সামান্য পটুতা রয়েছে সে কথা আগেই বলেছি। অত্যধিক তেজঃসম্পন্ন গামারশ্মি দিয়েও অনেক পদার্থের পরমাণু ভেঙে ফেলা যায়। ডয়েটরন (Deutoron) বা ভারী হাইড্রোজেন (Heavy Hydorogen)ও কতকগুলি পরমাণুর কেন্দ্রীন চূর্ণীকরণের বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। দেখা যায়, কোন

কোন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন (atomic weight) সব সময়ে এক থাকে না। অক্সিজেন—মৌলিক পদার্থটির পরমাণুর ওজন কখন হয় ১৬ কখনও বা ১৭। কিন্তু এই দুইটি পরমাণুর ধর্ম বদ্‌লে যায় না মোটেই। সাধারণতঃ অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬। তাই ১৭ ওজনের অক্সিজেনকে পূর্বটির সমধর্মী (isotope) বলা হয়। সমধর্মী পরমাণুর মূল কথা সম্বন্ধে এইটুকু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এদের কেন্দ্রীনে ধনভরণ (positive electric charge) সমান থাকে। ধনভরণের ওপরই পরমাণুর ধর্ম নির্ভর করে। কিন্তু কেন্দ্রীনে একটি নিউট্রন যুক্ত হ'লে পরমাণুর ওজন বাড়ে কিন্তু তার ধর্মের ইতর-বিশেষ হয় না। কোন মৌলিক পদার্থ এই ভাবে এক বা ততোধিক সমধর্মীর জন্ম দেয়। ডয়েটরন হাইড্রোজেনের একটি সমধর্মী ও তার পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনের দ্বিগুণ।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় বিজ্ঞানী লরেন্স সাইক্লোট্রন (cyclotron) নামক যে সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্রটির আবিষ্কার করেছেন, তার দ্বারা পরমাণু চূর্ণীকরণ সহজসাধ্য হ'য়েছে। অধুনা কলিকাতা বিজ্ঞান-বিদ্যাভবনে এই যন্ত্রটি স্থাপিত হ'য়ে তার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। যা হোক্ অতঃপর পরমাণুর অংশসংখ্যা (atomic number) ১২এর থেকে বেড়ে গেছে। জড়-পরমাণুর পরস্পর রূপান্তর বিজ্ঞান-জগতে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। ফলে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি বিজ্ঞানের দ্রুততর প্রগতি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সপ্ল্যাংক্ তেজের তরংগবাদই (wave theory) আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে সুবিখ্যাত কোয়ান্টাম মতবাদের (quantum theory) প্রচার করেন। জড়-পরমাণুর মত তেজেরও যে পরমাণু (quanta) রয়েছে তা আমরা প্রথমে জান্‌তে পারলাম। তার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পরম বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁর প্রসিদ্ধ 'আপেক্ষিকবাদ' (theory of relativity) প্রকাশ করেন। এই মতবাদে তিনি গণনায় দেখিয়েছেন যে, তেজেরও ভর রয়েছে। তাই জড় ও তেজের পরস্পর রূপান্তর যে অসম্ভব নয়, এ-কথা অনেকটা নির্দ্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় এখন জড়-পরমাণু (atom) ও তেজ-পরমাণুর পরস্পর রূপান্তর বাস্তবিক সম্ভব হ'য়েছে।

এ সম্বন্ধে বল্‌তে হ'লে পরমাণু কেন্দ্রীনের অন্যতম উপাদান পজিট্রনের (positron) একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক এণ্ডারসন্ নভোরশ্মি (cosmic rays) সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় এই রশ্মিতে পজিট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। পজিট্রন একক ধনবিদ্যুৎবাহী বস্তুকণা, কিন্তু ইহার ভর ইলেকট্রনের অনুরূপ। প্রোটন ও পজিট্রনে বিদ্যুতের মাত্রা ও ধর্ম এক সত্ত্বেও এদের ভরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এণ্ডারসন পার্থিব বস্তু থেকে পজিট্রনের আবির্ভাব প্রমাণ করতে পারেন নাই! কিছু দিন পরে ব্ল্যাকেট্ প্রভৃতি কয়েক জন বৈজ্ঞানিক পোলোনিয়াম্ থেকে নির্গত আলফাকণা দিয়ে 'থোরিয়াম্ সি' (Thorium C) নামক তেজসৃক্রিয় পদার্থটিকে বিধ্বস্ত করে পজিট্রন পান।

গামারশ্মি প্রয়োগ করেও কোনো কোনো মৌলিক পদার্থ থেকে পজিট্রন পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায়, গামারশ্মি কোন কোন পরমাণু থেকে একসঙ্গে পজিট্রন ও ইলেকট্রনের জন্ম দেয়। বিস্ময়ের কথা যে, এই ভাবে নির্গত পজিট্রন ও ইলেকট্রনের তেজঃশক্তি নিযুক্ত গামারশ্মি তেজের সঙ্গে সমান। বিখ্যাত জোলিও-দম্পতি এই ব্যাপারটিকে 'তেজের জড়ীভবন' আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক সাহা একে বলেছেন, "তেজঃকণার দ্বিখণ্ডীকরণ" বা electro-fission of quanta. আবার কোন জড় পদার্থের উপর পজিট্রন প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, পরমাণুর বহিঃস্তরে অবস্থিত ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে এরা গামারশ্মির জন্ম দেয়। এই দু'টি অভিক্রিয়া (experiment) তেজঃ-পরমাণু ও জড়-পরমাণুর পরস্পর রূপান্তর প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করে। তাই আজ বৈজ্ঞানিকের চোখে শক্তি ও জড়-জগৎ এক হ'য়ে গেছে—দু'টিতেই দু'টির প্রকাশ রয়েছে অভিন্ন ভাবে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক তাই দেখিয়েছেন, পার্থিব সমস্ত বস্তুই শক্তি-তরংগের গুচ্ছ ছাড়া আর কিছু নয়।

বিজ্ঞানের এই দিক্‌টায় এখনো বহু সমস্যা ও প্রশ্ন স্তূপীকৃত হ'য়ে রয়েছে। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অদূর ভবিষ্যতে এদেরও সমাধান অবশ্যম্ভাবী।

সংসার

আশীষকুমার বর্মণ

নতুন বিয়ের পর নতুন দু'টো ঘরে নতুন করে নিজের সংসার পাতল রাধা। সম্পূর্ণ নিজের সংসার পাতায় কেমন এক নির্ভর দায়িত্ব প্রথম থেকে অনুভব করল সে। সুস্থ সুন্দর করে তোলার একটা প্রেরণা পেল। সচেতন ভাবে নয় কেমন এক উজ্জ্বল আনন্দে সে গুছিয়ে নিল তার দু'ঘরের দু'লোকের ছোট্ট সংসার।

তার ভরা হৃদয়ে প্রেমের ভাব। সংসার-পর্ব্ব শেষ হলে, উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বাড়ীময় আলাপ করে এলো অন্য বাসিন্দেদের সঙ্গে। আর সবচেয়ে জমল ভালো এক-তলার গিন্নীর সঙ্গে। রাধার চেয়ে ভদ্রমহিলা বয়স্থা, সুস্থ আর শুভ্র; মহা খোসমেজাজি। মাসীমা পাতিয়ে নিলে রাধা।

আপনারা ক'দ্দিন আছেন মাসীমা?

—আমরা? তা মন্দ কী, বছর দেড়েক।

—অ, তা হ'লে তো আপনারা কৌটোর মধ্যে বাসি পরটা! রাধা নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলে।

—সত্যিই—মাসীমাও হাসেন. বলেন—তোদের মতন অমন খাস্তাও নই; আর বাড়ীটাও বাড়ী নয়, আলো-বাতাসহীন কৌটোই বটে।

—আচ্ছা বলুন দিকি—রাধা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে—বাড়ীওলা কেমন?

—ভালোই। পাগলাটে; আপন-ভোলা চিম্‌সে পোড়া লোক।

রাধা হেসেই অধীর। ওর মনের মধ্যে জলকল্লোল সমস্ত ক্ষণ ছলছল করে: সামান্য নুড়ির ঘায়েও তা অস্থির উদ্বেল হয়ে ওঠে। হাসিতে ভাঙা-ভাঙা স্বরে সে বলে—'চিমসে পোড়া!'—কী মজার মজার যে আপনি কথা বলেন মাসীমা।

—মজার! দেখতেই পাবি সত্যি কি-না; প্যাঁকাটির মত হাড়গিলে।

তা হবে,—রাধা অন্য কথা পাড়ে।

—আর, কল-পায়খানা নিয়ে অসুবিধের পড়তে হয় না-কি মাসীমা?

—না; তবে মাঝে মাঝে একটু হয়। দো'তলায় তোদের সামনে যারা ভাড়াটে, সে বৌ আবার শুনি কোন্ এঁদো-পোড়া জমিদারের মেয়ে: ওর জন্তেই এক-এক সময় মুস্কিলে পড়ি।

তবে তেমন কিছু মুস্কিলে যে পড়তে হয় না তা দু'-এক দিনের মধ্যেই রাধা বুঝতে পারে। তফাৎ এই এক যে ওরা মেসামেশা করলেও ও-বৌ জমিদার-কন্যাত্ব বজায় রেখে কিছু তফাতেই থাকে। থাকুক; ওরাও নির্বিকার হয়ে যায়।

কিন্তু উদ্বেল হয়ে ওঠে রাধা মাসীমার ছোটো বাচ্চা মাধুকে দেখলেই। নিস্তরঙ্গ বুকের মধ্যে বিচলিত হয়ে ওঠে রক্তস্রোত: যেমন হয় স্বামীর নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে।

—ও মাধু-মাধু; মুধুয়া-মুধু—রাধা বাচ্চাটাকে চটকে-মটকে দেয়, বলে—দেখি-দেখি, একটু হাস; এই—এ্যা···ই!

নির্বোধ শিশুর হয় তো সোজা মাড়িটা দেখা যায়; আর রাধা তাকে চেপে ধরে নিজের বুকের সঙ্গে।

দিন রাত্রি প্রায় এই চলেছে। রাধা আর মাধু; মাধু আর রাধা, বুঝি একেবারে একাকার হয়ে গেল।

মাসীমা আছেন নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে! সময় মত সমস্ত হচ্ছে; যত্নে আর প্রেমে মধু গদগদ।

মাধুর সর্দি লেগেছে মাসীমা! রাধা এসে অভিযোগ করে।

তাই না কি?

—হ্যাঁ, মা হয়ে সে খবরও রাখেন না?

মাসীমা হেসে ফেলেন, বলেন—মা বটে, কিন্তু যাদুকরী তো নই, কী করে জানব বল? কতোক্ষণ ও থাকে আমার কাছে?

কথাটা ঠিক, দিনে তো নয়ই রাত্রেও কোনো-কোনো দিন মাধু মার কাছে আসে না। তার আসার তো ক্ষমতা নেই, তাকে দিয়ে যায় না: রাধা নিজের কাছে নিয়ে শোয়। ওঠায় খাওয়ায় হাসায় কাঁদায়।

—দেখো দিকি একবার কোলে নিয়ে, কী সুন্দর মাধু আমার। স্বামীর সামনে নিয়ে গিয়ে মাধুকে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে দেয় রাধা।

—থাক; তুমি নিজেই নিয়ে থাকো। তার পর তোমার নিজের মাধু যখন আসবে, তখন তাকে ধূলোয় লুটোতে দিও।

—তুমি তাকে না ধরলে সে লুটবেই: তাই বলে আমার এ মাধুকে তো আমি মাটিতে ফেলে দোব না। রাধা হাসতে হাসতে মাধুর মাথাটা স্তনের ওপর চেপে ধরে।

—ওকে মাটিতে ফেলে দেবে! স্বপ্নেও সে দুরাশা আমার নেই; বরং আমাকেই কবে ঝাঁটার সঙ্গে ঝাঁট দিয়ে দেবে।

—ছি-ছি-ছি; ও কী অলক্ষুণে কথা!—রাধা স্বামীর গা ঘেঁসে বসে, বলে—ও রকম কথা বললে আমি কিন্তু চলে যাব।

স্বামীর নজরে পড়ে রাধার দু'চোখ গাঢ় হয়ে এসেছে অভিমান আশঙ্কায়।

—রাধু রাগ করলে? রাধার হাত ধরে মিনতি-মাখা কাকুতি জানায় স্বামী।

—করব না, অমন কথা আর বলবে?

—কক্ষনো না; কখনোই না: এই তোমার গা ছুঁয়ে······

আবার! তীব্র প্রতিবাদে মাঝপথে গা ছুঁতে অগ্রসরমান স্বামীর হাতটা স্তব্ধ হয়ে যায়।

—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

—শুধু গা ছুঁলে হবে না।

—আর কি ছোঁব?

——সরে এসো আরো, বলছি।

একটা চুম্বন এঁকে দেয় স্বামীর ঠোঁটে।

আর স্বামীর চুমু বিপর্যস্ত করল বাচ্চাটাকে।

সকাল হতেই সিঁড়ি নামতে নামতে রাধা ডাক দিত—মাসীমা, ও মাসীমা, মাধু উঠেছে?

—না রে।

—ওঠেনি! বড় বাবু হয়ে উঠছে আজ-কাল।

—না-না, কাল রাত্তিরে মোটেই ঘুমোয়নি, কেবল আমায় জালিয়েছে। এই তো ভোরের দিকে ঘুমুলো।

—আপনারই দোষ, ঘুম পাড়াতে পাড়েন না: আমায় দিয়ে দিন ছেলেকে।

—দিয়ে দেবার জন্তে কী আর রেখেছিস্; নিয়েই তো নিয়েছিস্।

—এবার লোকজন ডেকে সবার সামনে আমার দখলী করে নোব।

—বেশ। মাসীমা হাসতেন।

এমনি চলতো: চলেছিল অনেক দিন ধরে। বছর খানেক। মাধু তখন বেশ হামা দেয়: চলার চেষ্টা করে।

সে সময় বুক ভরে এলো রাধার। স্তন উঠলো টাটিয়ে। এলো দূরে স্রোত। আর এলো সে দুধের উত্তরাধিকারী। গোল-গাল গাব্দা। পিট্‌পিটে চোখ আর চিকচিকে চিকণ কালো চুল। হাত-পা'গুলো শুভ্র। দেখলে শান্তি হয়, তৃপ্তি হয়।

আর রাধার বুক ছাপিয়ে, ভুরু ছাপিয়ে, চোখ ছাপিয়ে এলো সবগুলো। এলো অন্ধ আনন্দে।

তার পর, মাধু যখন গুড়ি গুড়ি চুপি-চুপি আসত, রাধা তখন আরো নিবিড় ভাবে সন্তানকে বুকে চেপে ধরে বিশুষ্ক হাসত।

কবির খেয়াল

শ্রীকালীপদ চৌধুরী

ওগো কবি, কল্পনাতে নিত্য-নূতন ছবি—
মনের রঙে রাঙিয়ে তোলো খেয়াল মতো সবি!
আকাশ তুমি রাঙিয়ে তোলো বর্ষা-ঝরা দিনে
সিংহাসনের স্বপ্ন দেখাও দুঃস্থ অন্নহীনে!
সাত সাগরের দৃশ্য আঁকো ছোট্ট নদীর বুকে
হিমালয়ের চূড়ায় ওঠো ছাদের ওপোর সুখে।

দিন দুপুরে দেখাও তুমি রাত দুপুরের ছবি
অস্তাচলে কুটিয়ে তোলো উদয়কালের রবি।
মরুভূমির স্বপ্ন ছাখো গহন বনের দেশে
হাসির সময় কান্না কোটাও কাঁদার সময় হেসে!
জমিন্ থেকে এক ছুটে যাও সুদূরের আস্‌মানে
কেউ জানে না কখন কি যে জাগবে তোমার প্রাণে!

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

নারীর অধিকার

অরুন্ধতী সেন

নারীর অধিকার মস্ত বড় কথা। নারীর লেখনী যখন নারীর অধিকার ঘোষণা করে তখন কেউ কেউ হয়তো তাতে অতি হয়তো 'অবলার ক্রন্দনই বল' সাব্যস্ত করে নিয়ে ঈষৎ একটু করুণার হাসি হেসেই নীরব হয়ে যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে করুণাটুকু আন্তরিকতাশূন্য উপহাসের নামান্তর মাত্র, এমন কথা বলি না; কারণ এ-কথা সত্য যে, ভগবান যদি নারীকে দুর্ব্বল করেই গড়ে থাকেন, তিনিই আবার পুরুষের হৃদয়ে দুর্ব্বলের জন্য ব্যথা দিয়েছেন। সে ব্যথা নারীর অধিকারের দাবীর অপমান করে না—শ্রদ্ধাই করে। সংসারে যথার্থ হৃদয়বান্ ব্যক্তিরও অভাব নেই।

প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার বলে একটা কিছু আছে; আর নারীও যখন মানুষ তখন তারও অবশ্যই একটা অধিকার আছে। সেই অধিকারের কথা স্মরণ করেই বোধ হয় বাংলার নারী-কবি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"জায়া মাতা হতে সবে পারি বা না পারি
সর্ব্ব অগ্রে নারী মোরা সর্ব্ব শেষে নারী।"

দাম্ভিকতার পরিচয় পেয়ে ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠেন; আবার কেউ

কিন্তু সেই অধিকার কোথায়? তার বিশেষ রূপটি কি? এই নিয়েই তর্ক ওঠে। ভোট, ডাইভোর্স, পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিজ্ঞজন-আলোচিত অসংখ্য বিষয়ে নারীর যে অধিকার তা নিয়ে আজ আলোচনা করতে বসিনে। দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থা-বিশেষে এগুলিতেও তার যে অধিকার আছে তা অস্বীকার করাও চলে না। কিন্তু এগুলি সবই বাইরের পোষাকী অধিকার। এগুলিতে তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু এগুলিকে ছেড়েও সে অনেক উর্দ্ধে নিজের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগে নারীর অধিকারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, আর প্রেরণা আসে তার অন্তর থেকে। বাইরের চেয়ে অন্তর নিয়েই নারীর কারবার। তাই সেই মহান্ অধিকারকে যেখানে সে আপন গৌরবে ফুটিয়ে তুলতে চায়—সেই খানেই সে হয় মহীয়সী। এই জগতের অনেক কিছুতেই পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু অন্তরের এই অধিকার নারীর একেবারেই নিজস্ব। এ-নিয়ে কেউ তার সঙ্গে বিতণ্ডা করে ধৃষ্টতার পরিচয় দেবে না। নারীর নারীত্ব ত্রেতা-দ্বাপর থেকে আরম্ভ করে আজ এই কলিযুগেও সমভাবে পূজা [illegible], নারীত্বের পূর্ণতম বিকাশেই নারীর [illegible]মা; নারীত্বের সাধনাই তার একমাত্র তপস্যা। সেই তপস্যার সিদ্ধিলাভেই তার নারীজন্মের পরিপূর্ণ সার্থকতা। সেই তপস্যার পথে যদি বাধা আসে, দুঃখ আসে তাহলে অবলীলায় সে সব অতিক্রম করতে হবে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে কণ্টকক্ষত রক্তচরণে দুর্গম যাত্রী হবার মত সাহস, ধরিত্রীর মত অটল ধৈর্য্য বুকের মধ্যে সঞ্চয় করে নিতে হবে। কেন না দুঃখকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে উঠবার মত ক্ষমতা একমাত্র নারীরই আছে। এ যে তার জন্মের প্রসাদ! গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন—"কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা"—অর্থাৎ নারীদের মাঝে আমিই কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি' মেধা, ধৃতি ও ক্ষমারূপে প্রকটিত হই। এই কথার যথার্থতা যদি সত্যই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, তাহলে নারীর অধিকার যে কোথায়, আর তার দায়িত্ব যে কত গভীর, কত উচ্চ, কত মহিমোজ্জ্বল তা বুঝে নিতে কষ্ট হবে না। পৃথিবীর কোনও দেশেই—বিশেষ করে আমাদের দেশে একথা বোঝবার জন্য কোনও কষ্ট-কল্পনা করবার প্রয়োজন হবে না। তাই বুঝি এদেশে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুন্দেন্দু-তুষারধবলা শ্বেতপদ্মাসীনা বাণী বীণাপাণি—নারী; সুখ-সম্পদ্, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্ব্বশুভদায়িনী কল্যাণী কমলা—নারী; এবং ধৃতি ও শক্তির প্রতিষ্ঠাত্রী দেবতা সিংহবাহিনী বরাভয়প্রদা দুর্গা—তিনিও নারী। দেবপূজার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অধিবাসী তাই যুগে যুগে নারীত্বের উদ্দেশেও তাদের শ্রদ্ধানত হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে।

এই যে নারীত্বের অধিকার—যাতে না কি তার স্বত্ব জন্মগত, একে নারী ফুটিয়ে তুলতে পারে তখনই—যখন সে বিশ্ববাসীর মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ায় তার সব চেয়ে স্বাভাবিক সহজরূপে। ঘরে ঘরে জননী, ভগিনী, জায়া, কন্যার মধ্যেই যে বিশ্বের এক পরম নারী—যিনি অর্দ্ধনারীশ্বরের অর্দ্ধেক অঙ্গ, তিনি তাঁর আপন সত্তা মিশিয়ে দিয়েছেন। জননী-ভগিনী-জায়া-কন্যার কর্ত্তব্য ও অধিকারের সমষ্টি নিয়েই হলো নারীর কর্ত্তব্য—নারীত্বের অধিকার।

মায়ের অধিকার যে কত বড় অধিকার—কত বড় শক্তির উপরে তার প্রতিষ্ঠা তা তখনই বুঝতে পারা যায়, যখন দেখা যায় তাঁর সন্তানের মধ্যে মনুষ্যত্বের দীপ্তি অক্ষুণ্ণ গৌরবে শুধু যে তার চরিত্রকেই মহৎ করেছে তা নয়—সমস্ত সমাজকে, সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করেছে। শিশুকাল থেকে তিলে তিলে জ্ঞানে, স্নেহে, বীর্য্যে, গরিমায় সন্তানকে মানুষ করে তোলার অধিকার প্রধানতঃ মায়েরই। তাই যদি না হবে, তাহলে সেই সন্তান—সেই অতিবড় দুঃখের ধন যখন সারা দেশের—সারা বিশ্বের বরেণ্য, নমস্য হয়ে ওঠে তখন সেই সংবাদ মাতৃবক্ষকেই সর্ব্বাগ্রে আনন্দে উদ্বেল করে তুলবে কেন? সর্ব্বাগ্রে মায়ের চোখেই গৌরবের অশ্রু এনে দেবে কেন? মাতৃত্বের সূত্রপাতে যে অনির্ব্বচনীয় দুঃখ রয়েছে মাতৃত্বের এই অধিকারেই হলো তার অবসান। আমাদের আশুতোষ, বিদ্যাসাগরের কথা যখন ভাবি,—আমাদের দেশের মহাপুরুষদের কথা যখনই চিন্তা করি, তাঁদের জননীর কথা মনে করে শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তর ভরে ওঠে। এই

জন্যই বুঝি আমাদের দেশে জন্ম... ...দপি গরীয়সী' বলা হয়। এমন কি পশ্চিমের ভুবনবিখ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত বীর নেপোলিয়ানও তাঁর মায়ের প্রসঙ্গে ছল ছল নেত্রে শ্রদ্ধাবিগলিত হৃদয়ে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছিলেন—"The hand that rocks the cradle, rules the world"—শিশুর দোলনা যে মায়ের হাতে তারি কাছে জগৎ মাথা পাতে। সব দেশে, সব কালে অন্তরালে থেকেও সমাজকে গড়ে তোলেন মায়েরাই। এ কি সামান্য অধিকার!

মায়ের পরেই মনে আসে পত্নীর কথা। কিন্তু যে দেশের পত্নীর অন্য নাম সহধর্ম্মিণী, যে দেশের কবির অমর লেখনী—"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কথাবিধৌ"—এই সামান্য কয়েকটি অক্ষরে পত্নীর আদর্শ এঁকে দিয়ে গেছে, সে দেশেও কি পত্নীর অধিকারের মর্য্যাদা বুঝিয়ে দিতে হয়? যাঁরা পত্নী বলতে স্বাধীন সত্তাহীন দাসীকে বোঝেন, তাঁদের মনই বিকৃত, এবং সেই বিকৃত মন দিয়ে শাস্ত্রকে তাঁরা বিকৃত করে দেখেন। সেটা শাস্ত্রের দোষ নয়। অন্ধকারময় পঙ্কিল হৃদয়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা আধারকে শাস্ত্রের বিধান বলে মেনে নেন বলেই তাঁরা পদে পদে এমন সাংঘাতিক ভুল করে বসেন। মন যদি তাঁদের পরিষ্কার থাক্‌তো তাহলে দেখতেন শাস্ত্রের কোথাও এসব কথা নেই। বুঝতেন সতীত্বের সঙ্গে পত্নীত্বের যেমন কোনও বিরোধ নেই, তেমনি আবার ব্যক্তিবিহীন দাসীত্বের সঙ্গেও তার কোনখানে কোনও যোগই নেই। সতী তো শঙ্করের দাসী ছিলেন না!

এতক্ষণ ধরে শুধু জননী, ভগিনী, জায়ারূপিণী নারীর ঘরের মধ্যকার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এযুগে আর এইটুকু বললেই সব বলা হয় না। নারীর অধিকার আজ শুধু ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাইরেও তাকে প্রতিষ্ঠা করবার দিন এসেছে। আজ আর অন্তরালে থেকে অসূর্য্যম্পশ্যা হয়ে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে, অগণ্য বাধাবিপত্তির মাঝখানে, শত রূঢ় কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে তাকে নিজের স্থান করে নিতে হবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এখানেও সে দেখা দেবে, অন্তঃপুরের সেই কোমল, ধৈর্য্য-দৃঢ় কল্যাণী জননী, ভগিনী ও দুহিতার মূর্ত্তিতেই। যেখান দিয়ে সে চলে যাবে সেখানে ফুটে উঠ্‌বে সৃষ্টির শতদল; ভাঙ্গাকে জোড়া দেওয়াই হবে তার কাজ। আজকের এই দুর্দ্দিনে অধর্ম্মের প্লাবনে দেশ যখন ভরে গেল,—অত্যাচার ও অবিচারের দুঃসহ বজ্রকঠিন বেদনায় মানবাত্মা যেখানে পদে পদে পীড়িত, অপমানিত—সেখানে নারীকে আজ দেখা দিতে হবে অক্লান্ত সেবারতা সহিষ্ণুতার প্রতিমারূপে। অজ্ঞানতার আঁধার যেখানে মানুষকে নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে নিয়ে পশুর সমপর্য্যায়ে এনে ফেলেছে—সেখানে নারীকে দেখা দিতে হবে জ্ঞানের বর্ত্তিকা-হস্তে দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তিতে। বীর্য্যের অভাব যেখানে মানুষকে মনুষ্যত্ব ভুলিয়ে দুর্ব্বল কাপুরুষে পরিণত করেছে—সেখানে নারীকে দেখা দিতে হবে উদ্দীপনাময়ী বরাভয়-দায়িনী শক্তিরূপে। স্বজন-পরিবেষ্টিত, স্নেহ-কল্যাণে ভরা তার আপনার রচা কুঞ্জ থেকে আজ মহামানবের সাগরতীরে নারীর ডাক এসেছে। আকাশ বাতাস ছাপিয়ে তার গভীর আহ্বান শোনা যাচ্ছে—

"পাষাণে বাঁধন টুটি ভিজায়ে কঠিন ধরা
বনেরে শ্যামল করি ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি' দিয়া জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।"

এই ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই তার অসম্মান। নিজের ঘরে একটিমাত্র মানব-সন্তানের পালনভার হোতে আজ বিশ্ব-মানবের পালনভার তার হাতে এসে পড়েছে। একে যেন সে আজ দাম্ভিকতায় উপেক্ষা করে না যায়। এই মহান্ অধিকারের মর্য্যাদা যেন সে রক্ষা করতে পারে। পুরাকালের সেই প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ এই বিংশ শতাব্দীর মৈত্রেয়ীরাও যেন নিঃসংশয়ে ঘোষণা করতে পারে—"যেনাহং না মৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"—বস্তু-জগতের বাস্তবতার মোহ যেন তাদের জীবন সর্ব্বস্ব হয়ে তাদের গ্রাস করে না ফেলে। সকল বিষয়ে সকলের সঙ্গে সমান অধিকার তারা দাবী করুক, তবু একথা যেন ভুলে না যায় সে নারী—নারী, পুরুষ—পুরুষ। সব ক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অধিকারের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। তাকে অতিক্রম না করাই তাদের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর।

আমাদের শিক্ষা

পারুল সরকার

কার্ত্তিক সংখ্যা বসুমতীতে প্রকাশিত অরুণা সরকারের 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধটি পড়েছি। প্রবন্ধটি যে চমৎকার হয়েছে তা' না ব'লে উপায় নেই, লেখিকা প্রশ্ন তুলেছেন যে, আমাদের দেশের শিক্ষাটি সর্ব্বজনীন হ'য়ে উঠল না। তার কারণও দেখিয়েছেন বেশ। 'আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি হয় ধনীর চালে তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরী করার মত হইবে।' 'আমাদের শিক্ষা' বলতে ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে। প্রবন্ধটির শেষে ভারত ললনাকে জাগতে আহ্বান ক'রে বিবেকানন্দের একটি উদ্দীপনা-পূর্ণ বাণী উদ্ধৃত করেছেন লেখিকা। কিন্তু সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে, ভারত ললনার ক'জনে এই প্রবন্ধটি পড়েছেন। ভারতীয় নারী-জাগরণ অতি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু কি ভাবের? শিক্ষা-পদ্ধতিই বা কি রকম হওয়া উচিত? আমি আজকের চিঠিতে এ সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই।

আজ হাসি পায়, আমরা এক সঙ্গেই ত লেখাপড়া শিখেছি। অথচ আজ আর মনে পড়ছে না, কি শিখলুম। তুমি হয়েছ সরকারী অফিসের কেরাণী, আর আমার ভাগ্যে জুটল স্কুল-মাষ্টারী। আজ তথাকথিত শিক্ষিত পর্য্যায়ে উঠে মনে হ'চ্ছে, আমরা বাস্তবিকই শিক্ষিত হইনি। হ'য়েছি বিদেশী শাসন স্বদেশে কায়েম রাখার যন্ত্রস্বরূপ। তুমি ত প্রত্যক্ষ কাজে লেগেছ। আর আমি পরোক্ষে সেই কল ঘুরিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধানতম সমস্যা হ'ল মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা লাভ করা। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তোমায় স্বীকার করতে হবে যে, এরই মধ্যে আমাদের দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসারও প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে—বিশেষতঃ, আমাদের নারী-সমাজে। তুমি ত জান, আমাদের এ জায়গায় কাকীমা, মাসীমা যাঁরা আছেন তাঁদের অবস্থা। তাঁদের কাছে দু'দণ্ড গিয়ে কথা বলতে বসলেই তাঁরা প্রথমে বলবেন, "কি রান্না হ'ল রে আজ তোদের?" আর প্রায়ই আমি তার উত্তর

দিই, "ছাই ; আর কিছু কি জানবার নেই, কাকীমা ?" মনে মনে কি ভাবেন তাঁরা জানি না, মুখে বলেন, "তোর যত বড় বড় কথা, আমরা মুখ্য-সুখ্যু মানুষ। আমাদের কাজই ত ছেলেপুলে মানুষ করা আর রান্না-খাওয়া।" এর পর আর কি মন্তব্য করব ? মনে মনে ভাবি, তাও ত সুসম্পন্ন হ'চ্ছে না। এই ত গেল আমার কাকীমা, মাসীমা। বাকী যারা বেশী পড়ে রইল, ছেলেপুলে মানুষ বা রান্না-খাওয়া এটাও সম্পূর্ণ হয় না তাদের দৈনিক জীবনের নানা অসুবিধার জন্ম। আর্থিক অভাব,—তাই স্বভাবগত এবং চারিত্রিক নানা দোষে তারা জর্জ্জরিত। একটি যে-কোন দরিদ্র-পরিবারের দৈনিক কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করে আমি একদা নিজেই খুব অশান্তি ও বিব্রত ভাব অনুভব করেছিলাম। সেই জন্মই আমি তোমায় আজ এত কথা লিখতে বসেছি। তা নইলে ও প্রবন্ধের মন্তব্য ত প্রথমেই করেছি—চমৎকার।

তুমি প্রবন্ধটির এই ক'টি কথাতে আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছ যে, "আলোর প্রতীক ডিগ্রীধারিণীরা আর আঁধারের প্রতীক কুসংস্কারে জর্জ্জরিত, রোগগ্রস্ত, খিন্ন অশিক্ষিতা বঙ্গরমণী। দেশের পক্ষে কেহই আজ আশাপ্রদ নয়।" আমি এ কথা ভাল ভাবেই বুঝেছি অনেক আগে। অথচ আমার করার কিছু কৈ এখনও খুঁজে পেলুম না ত! সব বুঝে-সুঝে মনে হচ্ছে, আমাদের এই পিছিয়ে থাকার, আমাদের জাতিগত আশাহীনতার মূলে রয়েছে পরাধীনতা। তুমি কি বলবে জানি না, হয়ত এটা আমার ভাববার ভুল। তাই বা বলি কি ভাবে ? দেখলুম ত—লক্ষ্মী স্বামিনাথন, বেলা দত্ত, শিপ্রা সেন। বর্ত্তমান ভারতীয় নারী-সমাজের এঁরাই আজ আদর্শ। অনেক দিন ধ'রে আমরা শুনে আসছি ;—স্বামিপ্রেমের জীবন্ত প্রতীক্ সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা ; রাজনীতি-সমর-নীতিতে মনে করি সুভদ্রা, রাণী দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ, তারাবাঈ ; শাস্ত্রজ্ঞ গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, খনার আদর্শ তুলে ধরি ; অহল্যা, রাণী ভবানীর দান ও সেবার তুলনা করি। সত্যি বলতে কি, ও-সব যেন শুধু ছেলে-ভুলোনো অবসর সময়ের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার মুখের অনেক দিন আগেকার ঘটনার গল্পের মত শোনায়—এ সব প্রাচীন কাহিনী ছোট ছোট স্কুলের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা পাশের জন্ম পাঠ্যপুস্তক থেকে বানান মানে মুখস্থ করে পড়ে,—আদর্শ হিসাবে নিতে শেখে না, তাই তার গুরুত্ব (importance)ও যেন অনেক লঘু হয়ে গেছে আজ। আমি অস্বীকার করছি না, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে। এ কথাও আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে, যে সময় ইউরোপীয় শক্তি সকল ভারতবর্ষ গ্রাস করতে উন্মত্ত, সে সময় আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চাদর্শ যা আমরা কথায় কথায় তুলে ধরছি তা অনেক নীচুতে নেমে গিয়েছিল। সে এক ভারতের সঙ্কটময় যুগ। ইংরেজ সেই সুযোগ নিয়েছিল।

তারপর ইংরেজ যখন বেশ জেঁকে বসল এদেশে, তখন তারা তাদের প্রয়োজন মত শিক্ষার ব্যবস্থা করে আমাদের মানুষ করতে আরম্ভ করল !—না পশু ! যাই বল না কেন, তাদের এই মানুষ বা পশু তৈরীর কারখানা থেকেই আমরা আমাদের বিশেষ দৃষ্টির সাহায্যে তাদের এই ফাঁকি ধরে ফেলে গরম গরম বক্তৃতা, প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে মনের ঝাল মিটিয়ে "প্রগতির পথে" এগিয়ে চলেছি! পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ লেগে আমরা ভাঙ্গন-ধরা কূলে হাবুডুবু খাচ্ছি সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সন্ধিক্ষণে যদি ইংরেজ বা তার এই সভ্যতা না এসে দেখা দিত, তাহ'লে আমাদের ভাগ্যে কি হ'ত বলা যায় না। সেই জন্মই আমি প্রাচীন সংস্কৃতি সভ্যতার আদর্শ তুলে ধরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালটুকু ফেলে মেকীটুকু অনুকরণ করে মহা-অপরাধ করে ফেলেছি বলে হা-হুতাশ বা স্কন্ধে দোষারোপ করে বেড়ানর চাইতে, বর্ত্তমানকে খাপ খাইয়ে চলারই পক্ষপাতী। বর্ত্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তারই সুস্পষ্ট কার্য্যকরী সমাধান চাই। অতীতের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। আমরা সব-কিছুর সমন্বয় দেখেছি, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লক্ষ্মী, বেলা, শিপ্রার মধ্যে। তাঁরা বীরাঙ্গনা, তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞা, তাঁরা দানশীলা ও সেবাপরায়ণা। বর্ত্তমান ভারতীয় নারী সমাজের তাঁরাই আদর্শস্থানীয়া। তাই বলছিলাম, আমাদের সব সমস্যার মূলে রয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা, স্বাধীন ভারতে সব কিছু সম্ভব হবে।

তার আগে বর্ত্তমান অবস্থাতেই অনেক কাজ বাকী পড়ে রইল। এই আদর্শ স্থাপন বা 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী' প্রেরণ যদি আজ বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে সম্ভব হয় তবেই এই রকম প্রবন্ধের বা বক্তৃতার সার্থকতা প্রমাণিত হবে। তা নইলে আমাকে যদি ঐ প্রবন্ধ শুধু পড়তে বল, তবে আমি বলব, "ও ত আমার জানা। কিন্তু কি করছি আমরা ?" পড়ে কিছু একটা করার আগ্রহে সচেতন হই, পথ পাই না। আর কতক পাঠিকা আছেন, যাঁরা সংসারের কাজ-কর্ম্ম সেরে দিবানিদ্রার পূর্ব্বে একটু কিছু চোখ-বুলানকে আনুসঙ্গিক চাটনি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাই তাঁদের শেষ কর্ত্তব্য। আমার প্রশ্ন, এই আদর্শ—এই বাণী নিয়ে যাবে কে ? এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করার জন্ম কি আজ পর্য্যন্ত কিছু করা হয়েছে ? 'আমাদের শিক্ষা' তবে কি শুধু আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ? এই আদর্শ ও বাণী বহন সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের কাজ এক্ষুনি আরম্ভ করা দরকার। এ কাজের ভার পড়বে এই তথাকথিত শিক্ষিতাদের ওপরই। কয়েকটি মহিলা প্রতিষ্ঠান শুনেছি আছে, যথা—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নারীমঙ্গল সমিতি ইত্যাদি। কিন্তু সমিতির সব সমস্যাই সহরে উদ্ভব হচ্ছে ! আর তার কাজ বোধ হয় বার্ষিক অধিবেশন—সহরেই শেষ হ'চ্ছে। গ্রামের পথে অগ্রসর হওয়া নিষেধ ! সেখানে ত কোন সমস্যাই নাই। গ্রামবাসী অশিক্ষিত, তারা ত বেশ সুখে আছে !

বঙ্গনারীসুধী-কুলে আমার এই বার্ত্তা পাঠাতে স্বতঃই ইচ্ছে হয়, তাঁরা গ্রামের দিকে ফিরে চান, গ্রামের সমস্যায় হস্তক্ষেপ করুন, সহর অপেক্ষা গ্রামেই নারী-সমস্যা প্রচুর। সহরের ট্রামে-বাসে চলাচলের অসুবিধা বা ভদ্রঘরের মেয়েদের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া উচিত কি অনুচিতগোছের অতি সাধারণ তুচ্ছ সমস্যা রেখে তাঁরা গ্রামের দিকে অগ্রসর হউন। দেখুন—দেখে বলুন তাঁরা, এই অবস্থা দেখে চোখের জল রোধ করা সহজ না কঠিন ! দেশে কি কঠোর সমস্যা অথচ আমরা কত উদাসীন ! অধিবেশন বসিয়ে সমস্যা মিটবে না। খুব বড় কথা একটা বলতে হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন,—"বাগাড়ম্বর ত্যাগ কর, কর্ম্মে অগ্রসর হও।" সংগঠক, কর্ম্মবীর, দেশগৌরবের এই বাণী দিয়েই আমি দেশবাসীকে আহ্বান করতে চাই। দেশের সব সমস্যার একমাত্র কারণ অশিক্ষা, এবং অশিক্ষা রাজনৈতিক তথা সামাজিক পরাধীনতার জন্ম। অশিক্ষা ও পরাধীনতার পূর্ণ উচ্ছেদে অগ্রসর হতে হবে।

প্রসাধনের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল পরিষ্কার—কানের পাশ পর্য্যন্ত

রূপচর্চ্চা

শুন্দরী চন্দ

'মেক-আপ এর রাজ্যে আজ যুগান্তর এসেছে। কত শিক্ষা, কত নৈপুণ্য দরকার হয় মেক-আপে। 'মেক-আপ' করে দেবার জন্ত রীতিমত শিল্পীর প্রয়োজন ছোট নিষ্প্রভ চোখকে বড় এবং উজ্জ্বল করা, খ্যাঁদা নাককে বাঁশীর মত টিকল করা, মোটা ঠোঁটকে গোলাপ পাপড়ীর মত পাতলা ও রঙীন করা এই রকম ছোট-খাট অনেক কিছুই করা যায়। তবে আরও বড় বড় কাজ করা যায়—যে কাজ ম্যাজিকের মতই আশ্চর্য্যজনক। চেহারা এমন ভাবে বদলে দেওয়া যায় যে, অতি অন্তরঙ্গও চিনতে পারবে না। তবে সে জন্ত দরকার হয় সত্যকারের শিক্ষিত নিপুণ শিল্পীর। কিন্তু এই রূপান্তরের ভোজবাজী করতে যা মাল-মসলা লাগে তা অত্যন্ত সামান্ত এবং নগণ্য। যে কোন কেমিষ্টের দোকানে সে সব কিনতে পাওয়া যায় অ'ত অল্প মূল্যে।

প্রথম কাজ হচ্ছে, বেস তৈরী করা। 'ওয়াটার কলার' (জলে রঙ গোলা) বেসই সব চেয়ে ভাল। তেলের বেসে মুখ তেলা এবং চকচকে দেখায়। এক টুকরো স্পঞ্জ রঙে ভিজিয়ে গলা থেকে চুল অবধি টেনে দিতে হয়। তার পর রঙ শুকিয়ে গেলে খুব নরম ব্রাশ দিয়ে মুখ ঘষে ফেলতে হয়। তাতে রঙ সর্ব্বত্র সমান হয়, কোথাও রেখা দেখা যায় না।.

দ্বিতীয় হলো চোখের পাতার ওপর হাল্কা কাল রঙ দিয়ে 'শ্যাডো' করা। এতে চোখ বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অবশ্য চোখের তারার রঙের সঙ্গে 'শ্যাডো'র রঙেরও তারতম্য করতে হয়।

তৃতীয় কাজ হল ভ্রূ রঙ করা। ব্রাউন (কালো নয়) রঙের পেনসিল খুব সরু করে কেটে ভ্রূর ওপর বোলাতে হয়। তার পর আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘসে রঙটাকে 'শ্যাডো'র রঙের সঙ্গে মিশ খাইয়ে দিতে হয়। সেই সঙ্গে চোখের ওপর আর নীচের পাতাগুলোতেও রঙ লাগা'তে হয়। চোখের ধারে যদি খুব সরু করে রেখা বাড়িয়ে দেওয়া হয় কাজল পরার মত, তবে চোখ বড় এবং উজ্জ্বল দেখায়। ভ্রূযুগলকেও রেখা সাহায্যে বাড়ান যায়, তাতে চোখ ভারী সুশ্রী দেখায়।

চতুর্থ কাজ গালে রঙ লাগান। শুকনো রঙ (রুজ) লাগানোই সব চেয়ে সুবিধাজনক—বিশেষতঃ ওয়াটার কলার বেসের ওপর। প্যাডের চেয়ে ব্রাশে করে লাগানই ভাল। পাউডার এবং রুজের ব্রাশ দুটি পৃথক্ রাখা উচিত; কারণ, ব্রাশে একবার রুজ লাগলে আর সে রঙ ছাড়ানো যাবে না।

এখন কথা হচ্ছে, রুজ লাগানো হবে কি ভাবে এবং কতখানি? লাল রঙটা সাধারণতঃ চোখে লাগে। আর আলোর তারতম্য হলেই সেই লাল রঙ কালো দেখায়। স্বাস্থ্য প্রকাশ পায় গোলাপী আভায়। লাল রঙ বেশী হয়ে গেলে স্বাস্থ্যের নয়, মাতালের মেক-আপ বলে মনে হয়। তাই রুজটা খুব অল্প পরিমাণে লাগান উচিত। আর কোথায় লাগাতে হবে নির্ভর করে মুখের কাঠামোর ওপর। গোল মুখে

চোখের পাতায় কাল রঙ

ঠোঁঠে লিপষ্টিক

রুজ লাগাতে হয় নাকের কাছাকাছি, তাতে মুখটা রোগা এবং লম্বা দেখায়। আর লম্বা মুখে গালের অনেকটায় রঙ লাগালে মুখটা পুরন্ত দেখায়। তবে লাল রঙের গোল দাগ কোন মতেই চলবে না। আউট লাইন বেশ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

পঞ্চম কাজ ঠোঁটের প্রসাধন। ঠোঁটের গঠন যেমনই হোক না, রঙ দিয়ে ঠিক মানানসই করে নিতে হবে। যদি ওপরের ঠোঁট পাতলা এবং নীচেরটা মোটা হয়, তা হলে ওপরের ঠোঁটে রঙ দিয়ে মোটা করে নিতে হবে। তাহলে সমতা রক্ষিত হবে। উল্টো হলে উল্টো ভাবে রঙ লাগাতে হবে। ছোট মুখের দু'ধারে রঙ দিয়ে হাঁ বড় করে দেওয়া চলে। আবার হাঁ যদি বড় হয়, তবে যতখানি দরকার ততটায় লিপষ্টিক লাগিয়ে বাকীটায় সাদা রঙ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব আনতে গেলে ঠোঁটের দুই কোণ রঙ দিয়ে একটু ওপর দিকে তুলে দিতে হবে।

মুখে আটার কলার লেপ

নাকের পাশে শেড

চোখের ওপর কালচে শেড

ভ্রু অঙ্কন

আর একটা কথা। আলো, দিনেই হোক আর রাতেই হোক, ওপর থেকে এসে পড়ে; ফলে নীচের ঠোঁটে আলো বেশী পড়ে আর ওপরের ঠোঁট অন্ধকারে থেকে যায়। সেই জন্য ওপরের ঠোঁটের রঙ গাঢ় এবং কালচে দেখায়। ওপর নীচে এক রকম রঙ দেখাতে হলে, ওপরের ঠোঁটে কম এবং নীচের ঠোঁটে একটু বেশী রঙ লাগাতে হয়।

ষষ্ঠ—চোখের পরিচর্য্যা। চোখের পাতার ওপরটায় 'শ্যাডো' লাগান হয়ে গেছে। ওপরের ও নীচের পাতায় রঙ দেওয়া হয়েছে। ব্রাউন রঙ—একেবারে কাজল-কালো হয়। 'মাস্কারা' রঙ সব চেয়ে ভাল। ঠিক ভাবে রঙ লাগাতে পারলে সাধারণ মেয়েকে সুন্দরী করে তোলা হয়।

চোখ যদি খুব ছোট হয়, তার এক উপায় আছে। চোখের ওপরে এবং নীচে শ্যাডো দিয়ে চোখ থেকে একটু দূরে ত্রিকোণের মত করে মিশিয়ে দেবে। আর সেই ত্রিকোণের ফাঁকে শাদা তেলে-গোলা রঙ লাগিয়ে দেবে। চোখ দিব্য বড় দেখাবে। তবে বড় চোখ কখন ছোট করবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আর ভ্রূ কখনও কামানো চলবে না। তাতে ভ্রূর চুল ভয়ানক বেশী হবে আর চারি ধারে ছড়িয়ে পড়বে।

সপ্তম কাজ হল নাকের সেবা। নাক যদি চ্যাপ্টা ও মোটা হয় তবে নাকের দুই ধারে চোখের কাছ থেকে নাকের ডগা অবধি কালচে রঙ লাগালে নাকটি সোজা এবং টিকল দেখাবে। আর রোগা নাক মোটা করতে হলে নাকটার ওপরে হাল্কা ভাবে কালচে রঙ লাগিয়ে মুখের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। লম্বা নাক ছোট করতে হলে ওপরোষ্ঠের ওপরটায় ও নাকের ডগায় কালচে রঙ (শ্যাডো) লাগাতে হয়।

এই বার শেষ কথা। ডবল চিন। গলার কাছটা মোটা হলে অনেক সময় দুটো চিবুক দেখা যায়। গলকম্বলের মত! কি করে দূর করা যায়। চিবুকের কাছ থেকে নীচের দিকে শ্যাডো নিয়ে যেতে হবে, গাঢ় থেকে ক্রমেই হাল্কা করে। এতে দূর থেকে ডবল চিন একেবারেই দেখা যাবে না। অবশ্য গলায় যদি খুব বেশী মাংস না জমে থাকে।

নারী

চীন

চীনারা সাধারণতঃ রক্ষণশীল। কোন কিছু নতুন তারা স্বীকার করতে মোটেই রাজী নয়। মেয়েরা তো এমনই রক্ষণশীল হয়ে থাকে। সুতরাং তারা যে অত্যধিক রক্ষণশীল হবে এ তো অতি সোজা কথা। অবশ্য আজকের দিনে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে লেগেছে প্রগতির ঢেউ। সেই ঢেউয়ে হয় এগোতে হবে, না হয় স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নাকে-মুখে জল ঢুকবে। চীন দেশে নারীদের যে সামাজিক অবস্থা, তাতে পরিবর্ত্তন তাদের কাম্য। কিন্তু সেখানকার পুরুষরা এই প্রগতির বিরুদ্ধে। কলিকাতাবাসী কয়েক জন আধুনিক বাঙালী মহিলাদের দেখে যেমন বাঙ্গালার প্রকৃত নারী সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যেতে পারে না, তেমনই এখানকার চীনা মেয়েদের দেখে সেখানকার অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব।

পূর্ব্বপুরুষ-পূজা চীনে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। পিতৃ-আজ্ঞা পালন চীনা সামাজিক জীবনের মূল কথা। শুধু ছেলে বয়সে নয়, সর্ব্ব বয়সে এ শিক্ষাদান চলতে থাকে। রাজা-প্রজা, উচ্চ-নীচ, সকলকেই এই নিয়ম মানতে হবে। অতি নগণ্য চাষী আর মহামান্য সম্রাট উভয়ের পক্ষেই এই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ পিতাকে দেবতা মনে করবে। সম্রাট সকলের পিতা, অতএব মহা দেবতা। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ভগবান্ (অথবা পূর্ব্বপুরুষ) সম্রাটের পিতা। এই ভাবেই গড়ে উঠেছে পিতৃ-পূজা এবং পূর্ব্বপুরুষ-পূজার সোপান।

ধর্ম্ম এবং সামাজিক রীতি-নীতি জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং চরিত্র-গঠনের প্রধান অংশ। মেয়েদের জীবনের উপর পিতৃপূজার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বয়ঃজ্যেষ্ঠের সম্মান তাদের আদব-কায়দার ভিত্তি। জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে এর ছাপ পরিস্ফুট। বাড়ীর এক দল বেড়াতে বার হলে সকলের আগে থাকবে সব চেয়ে বেশী যার বয়স। তার পর বয়স অনুপাতে এক জনের পিছনে এক জন। সর্ব্বশেষে সর্ব্ব কনিষ্ঠ।

মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, তারা মেয়ে আর সেই দুঃখের সাথে পরিচয় ঘটে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে। শিশুকন্যার আগমন মোটেই সুখের নয়। কেউ তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করে না। তাকে পালন করা হয় অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। না পায় ভাল খাবার, না কাপড়-জামা, না শিক্ষা। বেচারী থাকে একেবারে একলা—সঙ্গিহীন হয়ে। এমন কি, নিজের ভাইদেরও সে খেলার সাথী হিসেবে পায় না। যদি মিশতেও পায় তবে সঙ্গী হিসাবে নয়, অনেকটা ঝি হিসাবে। বংশ-রেজিষ্টার খাতায় পর্য্যন্ত তার নাম থাকে না, কারণ শেষ অবধি বিয়ে হয়ে গেলে, সে তো পরের বাড়ী যাবেই।

বিবাহ ঘটকের সাহায্যেই হয়। কুমারী জীবনের শেষ ক'টা দিন কেঁদেই কাটায়। সেই ক্রন্দনে পাড়ার সমবয়স্কা কুমারীরাও যোগদান করে। আসন্ন বিবাহের দুঃখেই বোধ হয় কাঁদে। ক্রন্দনই তাদের সম্বল। বিয়ের পর বধূর জীবন—ক্রীতদাসীরও অধম। বেচারী না পায় দয়া, না পায় সহানুভূতি। শ্বশুর-গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির সে যেন ঝি। শুধু অবহেলাই তার প্রাপ্য! সব চেয়ে কষ্ট পায় তারা শ্বশুর-বাড়ীর বর্ষীয়সী মহিলাদের হাতে। শাশুড়ী বৌকে শাসন করে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে। মেয়েদের জীবনের সুখ, আনন্দ স্বামীর ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে শাশুড়ীর ওপর। মেয়ের বাপ-মার প্রাণে সে ব্যথা বাজে। সেই জন্য কন্যার জন্ম তাদের আনন্দ দেয় না। কিন্তু ব্যথা কি সত্যই বাজে? যদি বাজত, তা হলে পরের মেয়ে নিজের বাড়ী এলে নিশ্চয়ই তারা ভাল ব্যবহার করত।

মেয়েদের ওপর বাপ-মার টানও থাকে কম। তারা মনে করে, আজ বাদে কাল যে পরের বাড়ী চলে যাবে তার ওপর স্নেহের টান কেন? তাদের সুখ-শান্তি, সেবা-যত্ন করবে নিজের মেয়ে নয়, পরের মেয়ে—কন্যা নয়, পুত্রবধূ। নিজের মেয়ে তো পরের বাড়ী গিয়ে শাশুড়ীর সেবাতেই জীবন কাটাবে। অতএব—

অনেক ক্ষেত্রে ছোট বয়সেই বাক্‌দান হয়ে যায়। বাক্‌দত্তা মেয়ের আর অন্যত্র বিবাহ হতে পারে না! বড় হয়ে ছেলে কি দাঁড়াবে বলা শক্ত! প্রায়ই দেখা যায় যে বিবাহ সুখের হয় না। তাই আজকাল এ প্রথা ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে। গরীবদের মধ্যে, যারা মেয়েকে যৌতুক ইত্যাদি দিতে পারবে না, পাল্টা বিয়ের ব্যবস্থা আছে। নিজের মেয়ে দিয়ে, তাদের মেয়েকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করা।

নারী-জীবনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিবাহ। শুধু চীনে কেন —সর্ব্বত্রই। কিন্তু সেখানে মেয়েদের কোন বক্তব্য নেই, কিছু বলার অধিকারও নেই। বর এবং কন্যাপক্ষে বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়! দেনা-পাওনার কথা উভয়ের পক্ষের মনোমত হলেই বিয়ে। কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, পাত্র কেমন দেখতে, স্বভাব-চরিত্র-স্বাস্থ্য কেমন, এসব কথা মেয়ের জানবার অধিকার নেই। বাপ-মা তাকে বলা প্রয়োজনও মনে করে না।

বিবাহের সংবাদে মেয়েরা আনন্দিত হয় না। ভয়ে ভাবনায় সিটিয়ে থাকে। বিয়ের আগে চিরটা কাল সে মানুষ হয়েছে একলা, এক-ঘরে হয়ে। হঠাৎ তাকে ঠেলে দেওয়া হবে অপরিচিতদের মধ্যে। যে নিজের বাড়ীর সকলের সঙ্গে খোলাখুলি সমান ভাবে মিশতে পারেনি, সে এই অজানা স্থানে নতুন সংসারে কেমন ভাবে খাপ খাওয়াবে। তাও হয়ত এক রকম পারত, যদি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সে স্নেহ পেত। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে পায় লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন। নব-বধূর রূপ ও গুণের সমালোচনা করে শ্বশুরবাড়ীর সব মেয়েরা,—এমন তীব্র ভাবে, এমন অমার্জ্জিত ভাষায় যে বধূর মনে হয়,—"হে ধরণি, দ্বিধা হও।" সব মেয়ের ভাগ্যেই এই দুঃখ, এই লাঞ্ছনা।

নববধূর মাথায় অন্যান্য কুমারী মেয়েরা ভুষি বর্ষণ করে! এও একটা প্রথা। তেল-চুকচুকে মাথায় ভুষিগুলো আটকে গিয়ে এক অপরূপ চেহারা হয়ে ওঠে বেচারীর। বিবাহিতা মহিলাদের নিজের নাম নিজেদেরই মনে থাকে না। চিরকাল তাদের সম্বোধন করা হচ্ছে, 'অমুকের স্ত্রী, অমুকের মা' বলে। তাদের নিজেদের নাম কোন দিনই ব্যবহার করার সুযোগ হয় না। স্বামীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তারা বলে 'অমুকের বাবা!' অথবা কোন রকমে অন্য কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পরিচয় খুঁজে বার করতে হয়।

সন্তানের জননী হলে নারীর সম্মান বাড়ে। যত দিন জননী না হয় তত দিন ঝিএর মত তাকে খাটতে হয় শ্বশুরের সংসারে। সন্তানের জননী হলেই সে বাড়ীর কর্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়। অবশ্য সেই সন্তান পুত্র হলেই মর্য্যাদা বেশী বাড়ে। তাই প্রত্যেক বধূ একান্ত মনে ভগবানকে ডাকে পুত্র-সন্তান কামনায়।

নারীর জীবনে সব চেয়ে কাম্য এবং আনন্দদায়ক ব্যাপার হল পুত্র-সন্তানের জন্ম। কারণ, তখনই শুধু সে পায় কর্ত্রীর মর্য্যাদা। স্বামী এবং পুত্র ছাড়া আর সকলের উপরই তার কর্ত্তৃত্বের অধিকার জন্মে। চীনা নারী ধরিত্রীর মত সহনশীলা। শত লাঞ্ছনা-নির্য্যাতনেও মুখে রা কাড়ে না। সকল অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি! তার জীবনে আনন্দ কোথায়? কুমারী অবস্থায় সে থাকে একান্তে, এক-ঘরে হয়ে, বিয়ের পর সে থাকে ঝিয়ের মত, লাঞ্ছন-নির্য্যাতনের মধ্যে। জগতের কোন কিছুর সঙ্গেই তার থাকে না কোন সংস্রব। তাই চীনা মেয়েরা সামাজিক হয়ে উঠতে পারে না। আচারে, ব্যবহারে, শিক্ষায়, তারা থাকে অনেক পিছিয়ে। এতই কুনো হয়ে যায় তারা যে, স্বামী অথবা নিজের সহোদরের সঙ্গেও প্রাণ খুলে মিশতে পারে না। অবশ্য আজ-কাল কিছু কিছু শিক্ষা তারা পাচ্ছে। কিন্তু এখনও অনেক পেছিয়ে।

কেবল স্কুলের শিক্ষাতেই উন্নতি হতে পারে না, যদি না তাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি হয়। আর সে উন্নতির জন্য চাই নারীর প্রতি নারীর করুণা, সহানুভূতি।

মুক্তি

আশা দেবী

গান কি হোয়েছে গাওয়া ?
দেখ না কি চেয়ে শ্যাম বন-পথ
ঝরা ফুলদলে ছাওয়া।
বসন্ত চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ
তারি আবাহনে উষর ধরণী রহস্তে নিমগন।
খাঁচায় রুদ্ধ কুহু
ডাকিছে মুহুর্মুহু
দলা-তৃণ-পথে পদরেখা কার
পথিক-বধূরে ডাকে বার বার,
না-বলা ব্যথায় গুমরি যেন রে
উঠিতেছে ঝোড়ো হাওয়া
গান কি হোয়েছে গাওয়া ?

আজ শুধায়ো না বাণী
না-করা যে কাজ না-বলা যে ব্যথা
পড়ে থাক পিছে রাণী।
তোমার মাঝারে নিজেরে হারায়ে
খুঁজে মরি আমি মিছে
আমার ছায়ারে আমি চিনি নাই
খুঁজিয়া মরিনু পিছে।
তুমি মোর কেহ নহ ?
এ কি ব্যথা দুঃসহ
পাষাণ স্তব্ধ মোর ব্যথা-ভার বহি,
জলহারা মেঘ বিদ্যুৎহীন
জেগে রয় সে বিরহী।
ঝরেছে শেফালী শিশির-নয়না
ধূলিলীনা অভিমানী—
আজ শুধায়ো না বাণী।

মুক্ত তুমি যে আজ
বাঁধি নাই তোমা কোন বন্ধনে
পরি নাই কোন সাজ,
সবার মাঝারে তোমারে করিব নত ?
নিঠুর বেদনা আসিবে অযুত
আঘাত আসিবে শত।
মিলন-মধুর গান
হোক তবে অবসান,
ফিরে চ'লে যাও বিজয়ী পথিক
সমাপ্ত তব কাজ—
মুক্তি দিয়েছি হে চির-যাত্রী
মুক্ত তুমি যে আজ॥

রাণী ছায়া

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

সুন্দর আশ্রম—আশ্রমের গ্রন্থগৃহটিও চমৎকার। বিসর্পী গিরিশ্রেণীর সামনে বিস্তৃত সমতলভূমির উপর স্বামীজীর আশ্রমের সারিবদ্ধ ছোট-বড় বাড়ী অপরাহ্ণের ম্লান সূর্য্যালোকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। পাশ দিয়ে পার্ব্বত্য নদীটি বয়ে চলেছে গতির আনন্দে। বাগানে ম্যাগনিলায়া ও বিলাতী ঝাউগাছের সারের মধ্য দিয়ে নুড়ির পথ এঁকে-বেঁকে উপনীত হয়েছে গ্রন্থগৃহের সম্মুখে। সন্ধ্যা আসন্ন। বড় রাস্তার প্রকাণ্ড গেটে বিরাট মোটর গাড়ী এসে এঁকা-বেঁকা পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে দাঁড়াল আশ্রমের সম্মুখে—গাড়ীটি রাণী ছায়া দেবীর।

রাণী গাড়ী থেকে নামতেই এক জন সন্ন্যাসী তাঁর আস্‌বাবপত্র নামালেন। আর দু'জন সেই আস্‌বাবপত্র বহন করবার জন্য এগিয়ে এলেন। রাণী হাত তুলে সকলকে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিন্‌তে পারেন? অনেক দিন আসিনি"—কথা বলতে বলতে অগ্রসর হয়ে আশ্রমের বারান্দায় গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "গুরুদেব কোথায়?" তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কত দিন তাঁকে দেখিনি।"

গুরুদেব উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রাণী আগ্রহের আতিশয্যে ছুটে গিয়ে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম জানালেন। মাথায় হাত দিয়ে তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন। গুরুদেবের হাতখানি নিয়ে দুই চোখে ও ওষ্ঠাধরে ঠেকিয়ে প্রীতি-ভক্তির অভিবাদনে সিক্ত করে দিলেন, বললেন—"কত দিন তোমায় দেখিনি ঠাকুর—তবুও এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারিনি। সব দুঃখ, সব ব্যথা দূর হয়ে যায় ঠাকুর, তোমার কাছে এলে!"

রাণীর উজ্জ্বল দু'টি চোখ ক্রমে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এলো। অতি-গম্ভীর বৃদ্ধ মানুষটি কেবল বললেন—"আমি সব বুঝি মা—তুমি বিশ্রাম কর, বড় পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছো।"

রাণী চা-পান সমাপন করে নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন।

নির্জ্জন আশ্রম। কোন কোলাহল নেই, চিন্তা নেই, সংসারের দ্বেষ, হিংসা, লালসার কোন স্থান নেই। অসীম নীরবতার মধ্যে নদীর কল্লোল, পাখীর গানের ঝঙ্কার, পত্রপুষ্পের মর্ম্মর কী মধুর আবেশ এনে দেয় হৃদয়ে। এই নির্জ্জনতার ভেতর তিনি কেন নিজেকে ভুলতে পারেন না? পার্শ্বের সরু পথ দিয়ে এক দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধকে আসতে দেখে তাঁর মনে হোল যে ইনিই সেই ডাক্তার, যিনি এক সময়ে তাঁর রাজ্যে চীফ্ মেডিকাল অফিসার ছিলেন।

রাণী শুনেছিলেন যে ডাক্তারের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। সেই জন্য ডাক্তারের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতে তার কাছে গিয়ে বললেন, "কী গোঁসাইজী, চিন্‌তে পারছেন না?" ডাক্তার একটু থতমত খেয়ে বললেন—"রাণীমা। নমস্কার।" রাণী বললেন—"আপনার স্ত্রী-বিয়োগের কথা আমি শুনেছি। বড়ই আঘাত পেয়েছেন, বৃদ্ধ-বয়সে।" ডাক্তার ব'ললেন—"সত্যিই বড় আঘাত পেয়েছি রাণীমা—তিনি ছাড়া তো আমার আর কোন অবলম্বন ছিল না—এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় দুঃসহ।" রাণী বল্‌লেন—"গোঁসাইজী, সবই দয়াময়ের ইচ্ছা। সংসারে থাকতে হলে সবই ভগবানের দান বলে নিতে হয়।" ডাক্তার বললেন—"হ্যাঁ রাণীমা, সবই তাঁর ইচ্ছা জানি কিন্তু মন বোঝে কই? যদি মন না বোঝে, শুধু কথার সান্ত্বনায় কী লাভ রাণীমা।" ডাক্তার রুক্ষভাবেই এই কথাগুলি বল্‌লেন। রাণী ভাবলেন, এ-ছাড়া তিনি আর কি বলতে পারতেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাণী বল্‌লেন—"আপনার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, এই সময়ের মধ্যে আমার জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আপনি চলে আসার পর রাজাকে নিয়ে বিলেতে যাই, সেখানে রাজার মৃত্যু হয়, অবশ্য এ কথা আপনি জানেন। তার পর কতো রকম ঝড়-ঝাপটা এই জীবনের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে—কতো পরিবর্ত্তনই হয়েছে—কতো ভুলই না করেছি।"

ডাক্তার বললেন—"হ্যাঁ, কতো ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই।" ডাক্তারের কথায় রাণী চমকে উঠলেন। রাণী ভাবলেন যে, সত্যিই তিনি অনেক ভুল করেছেন বটে, কিন্তু ডাক্তার এসব ভুলের খবর জানেন কী? কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? তখন তো তিনি রাজ্যে ছিলেন না।

রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ভুলের কথা আপনি বল্‌ছেন?"

ডাক্তার বললেন—"আপনি তো নিজেই ভুলের কথা বল্‌ছিলেন, তারই আমি পুনরুক্তি করেছি মাত্র।" রাণী বললেন—"না না, সে কথা নয়—আমি কী ভুল করেছি এবং তার আপনি কি জানেন।… আমি শুনতে চাই। আমি সত্য কথা শুনতে বড় ভালবাসি।"

ডাক্তার বললেন—"আমি আপনার বিচারক হ'তে আপনার কাছে আসিনি।" রাণী একটু উষ্ণ হয়েই বললেন—"আপনি যে বিচারক নন্ সে কথা আমি জানি, কিন্তু ভুলের কথা বলতে এইটুকুই জিজ্ঞাসা করছি যে ভুলগুলো কি?" ডাক্তার ব'ললেন—আপনি পীড়াপীড়ি করছেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব সময়ে আমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারি না এবং লোকেও প্রায়ই আমার কথা ঠিক ভাবে ধরতে পারে না—কিছু না বলাই ভালো ছিল রাণীমা।" রাণী বললেন—"আপনাকে অভয় দিয়েছি বলেই প্রশ্ন করছি।" ডাক্তার একটু নীরব থেকে পরে বললেন—"ভুল আপনি একটু আধটু করেননি, গলদ প্রচুর—গোড়াতেই। ঘৃণা দিয়ে রাণীমা রাজ্য চালান যায় না—তাতে যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাকে ঠিকমত চলা কি বলতে পারা যায়? প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ—কিন্তু তা কি আপনার আছে?"

রাণী বিস্মিত চোখে ডাক্তারের দিকে চাইলেন, কিন্তু তখনও তিনি বলেই চলেছেন—"আমার প্রতিই আপনার ব্যবহারের কথা ভাবুন একবার। আমার কী দোষ রাণীমা? রাজা বাহাদুর আমাকে ভালবাসতেন। তাঁকে বেশী মদ্য পান করার জন্য অনেক তিরস্কার করেছি, তিনি তার জন্য কখনও বিরক্ত হননি। বিরক্ত হলেন আপনি। আপনি দাঁড়ালেন আমার বিরুদ্ধে। ঐ ঘৃণা থেকেই বিরুদ্ধ-ভাবের জন্ম। আমি আপনার সামান্য চাকর। রাজাবাবুর অশুভ ভেবে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা চাকরের শোভা পায় না এই তো। কোন কিছু বলা নেই, আমিও জানি না, হঠাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারলাম যে, আমার চাকরী গিয়েছে। আমার ছেলে-মেয়ে ছিল না, স্ত্রী অত্যন্ত হিসেবী, তাই তো, তা না হলে কী উপায় হোত আমার? আমি যে আপনাকে স্পষ্ট কথা বলতে রুক্ষ হয়েছিলাম তার জন্য আমার স্ত্রী আপনার পা জড়িয়ে ক্ষমা চেয়েছে, আপনার দয়া হয়নি। আমাকে না জানিয়ে সে যে আমার কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিল, তার জন্য সে নিজেও কম ধিক্কার পায়নি আমার কাছে।" ডাক্তার আর অপেক্ষা না করে তখনই সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

রাণী এসেছিলেন আশ্রমে কিছু দিন থাকতে, কিন্তু ডাক্তারের কথার পর হঠাৎ তার মত বদলে গেল। আশ্রমে ফিরে গুরুদেবকে প্রণাম করে জানালেন, তিনি দু'দিন তাঁর ছোট বোন লক্ষ্মীর বাড়ীতে কাটিয়ে আসবেন। গুরুদেব বিস্মিত হ'লেন, কিন্তু না বললেন না। গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে রাণী এলেন রমা দেবীর কাছে। তিনি গুরুদেবের দিদি। গুরুদেব তাঁকে প্রণাম করলেও রাণী তাঁকে হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

রাণী এসে দাঁড়ালেন মোটর গাড়ীর কাছে। সন্ন্যাসীরা সকলে ও রমা দেবী গাড়ীর কাছে এলেন। রাণী গাড়ীতে উঠে যখন গাড়ী ছাড়বে তখন মুখ বাড়িয়ে একবার মধুর হাসি হেসে বললেন—"আবার শীগগীর দেখা হবে"—তিনি নমস্কার করলেন—সকলে প্রতি-নমস্কার জানাল।

২

ছোট বোন মহারাণী লক্ষ্মীর কাছে রাণী ছায়া এসেছেন। রাণীর সময় বেশ কাটছে—মহারাজা শালীকে নিয়ে মোটর গাড়ীতে খুব ঘুরছেন, কখনও জলপ্রপাতে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। কখনও দুই মাইল দূরে পাহাড়ের গুহায় যোগী আছেন তাঁকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন—বেশীর ভাগ সময় মহারাজার কাটছে শ্যালিকার সঙ্গে আর মহারাজা নিজেই ড্রাইভ্ করেন; পাশে শ্যালিকা গা ঘেঁষে বসেন।

লক্ষ্মী পূজো নিয়েই বেশীর ভাগ ব্যস্ত থাকেন। বাকী যেটুকু সময় থাকে ছোট কুমারকে দেখতেই কেটে যায়।

সে দিন তিন-চার ঘণ্টা মহারাজার সঙ্গে বেড়িয়ে এসে যখন রাণী ছায়া লক্ষ্মীর কাছে গেলেন, ভগিনীর মুখের চেহারা বিশেষ ভাল বোধ হ'ল না। ছায়া হেসে ব'ললেন—"কি খুকী, কমলের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটী হয়েছে না কি?" লক্ষ্মী ব'ললেন—"না দিদি, ঝগড়া কেন করবো, আর ঝগড়া করবার দরকারই বা কি?—তোমার কথাই ভাবছি আমি, কিন্তু তোমার এই রকম আশ্রমে আসার তো কারণ খুঁজে পাইনে।"

ছায়া বললেন—"তুই আশ্রমে কখনও থাকিস্‌নি তাই বুঝতে পাচ্ছিস্ নে—থাকলে কারণ খুঁজে পেতিস্।" লক্ষ্মী ব'ললেন—"আশ্রমে যদি যেতে চাও, যাও, সাধিকা হয়ে জীবন কাটাও তাতে আমি গর্ব্বই অনুভব ক'রবো; কিন্তু এ কি?" ছায়া চটে বললেন—"মানে?" লক্ষ্মী ব'ললেন—"মানে এই যে, আমার স্বামীটির ওপর তোমার এতো নজর কেন?" ছায়া বিরক্ত হয়ে বললেন—"সে কি খুকী, এখনো তোর সন্দেহ গেল না, কখন আমায় শ্রদ্ধা করে তুই দেখতে পারিস নে।"

লক্ষ্মী চ'টে বললেন—"না, দেখতে পারি না—একেবারেই পারিনে, তার কি কোন কারণ নেই?" লক্ষ্মী আর কিছু না বলে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন।

রাণী ছায়া আর কোন উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তবে কি গোঁসাইজীর কথাই কি ঠিক! লক্ষ্মীও তাঁর আশ্রমে আসা নিয়ে বিদ্রূপ করলেন! মনের মধ্যে এ সব চিন্তা তাঁর ঘুরপাক্ খেতে লাগলো। তিনি আস্তে আস্তে উঠে খোলা জানলার ধারে দাঁড়ালেন।

৩

রাণী ছায়া রাজ্যে ফিরে এসেছেন। আজ-কাল অনেক সময়ে একলা থাকেন। বিগত জীবনের ইতিহাসের পাতা উল্টে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন। আর একবার এরই ফাঁকে তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দেয় নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা! বছর-খানেক পরে কুমার সন্তোষ সাবালক হবেন। রাজ্যের ভার যাবে সন্তোষের হাতে, তখন তাঁর নিজের অবস্থা কী হবে? এই রকম কত কি—বিশেষতঃ কুমার যখন পোষ্যপুত্র। তার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে "মা" ডাক ধ্বনিত হলো। রাণী চমকে তাড়াতাড়ি ডাকলেন—"কে সন্তোষ? এসো বাবা এসো।" সন্তোষকুমার মাকে প্রণাম ক'রে ব'ললেন—"মা, দেওয়ান তশীলদার সবাই চ'টে গিয়েছে তোমার উপর আর আমার উপর।" রাণী চিন্তান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন?" সন্তোষ ব'ললেন—"একে তো তুমি সকলকে কাছে আসতে দাও। রাণীর এ সব আদব-কায়দা শোভা পায় না ব'লে রাগ আছে দেওয়ান, তশীলদার ও কর্ম্মচারীদের, তার ওপরে কাল তুমি নিজে বেরোবে আমাকে নিয়ে কাঙালীদের অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করা।

পরিদর্শন করতে। এই নিয়ে মহা গোলমাল হচ্ছে—তোমার হুকুম দেওয়ান চেপে রেখেছেন।" রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—"সন্তোষ, এ কাজে তোমার মত আছে?"

সন্তোষ ব'ল্‌লেন—"আমার এতে খুবই মত আছে মা, আমাকে তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ক'র্‌লেও আমি মনে-প্রাণে জানি যে, আমিও এক দিন ঐ দীন-দরিদ্রেরই সন্তান ছিলাম।" রাণী খুব প্রীত হয়েই ব'ল্‌লেন—"বেশ ভালো।"

কিছুক্ষণ পরে একটি টেলিগ্রাফ এল। রাণী টেলিগ্রাফ খুলেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে বল্‌লেন—"সন্তোষ, গুরুদেব কাল সকালে রাজধানীতে আস্‌বেন।" সন্তোষকুমারও সোল্লাসে বল্‌লেন—"সত্যি মা? তা'হলে ব্যবস্থা করতে হয়।" রাণী বললেন—"তুমি ব্যবস্থা করো দেখি।"—সন্তোষ বল্‌লেন—"দেখ না কি রকম ব্যবস্থা করি।"

রাজধানীতে সেই রাত্রে মহা সোরগোল পড়ে গেল। ষ্টেশনে হাতী ও মোটর গাড়ী যাবে, রাজ্যের সব পদাতিক সৈন্য গুরুদেবকে অভিবাদন করবে মহা সমারোহ করে।

আনন্দে রাণীর রাত্রিতে ঘুম এলো না—তিনি ভাবলেন যে সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষের বহু স্থানে মরণ-কল্লোল উঠ্‌লেও গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে তাঁহার রাজ্যে আজও সে মরণ-কল্লোল এসে উপস্থিত হয়নি।

রাণী নিজেই গুরুদেবকে আনতে যেতেন কিন্তু সেই সময়ে তাঁকে কাঙ্গালীদের অন্ন-বস্ত্র বিতরণের কাজ আরম্ভ ও পরিদর্শন করতে হবে। সেই কারণে সন্তোষকুমারকে পাঠালেন ষ্টেশনে।

সে-দিন তিনি অত্যন্ত সাধারণ কাপড় পরে কর্ম্মস্থানে এলেন। মাথায় রাজছত্র ধরেছেন সামরিক প্রধান কর্ম্মচারী। কাতারে কাতারে কাঙ্গালী সব সমবেত হয়েছে। আহা তাদের মনে কি আনন্দ—মুখে প্রীতির রেখা—রাণীমা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়াবেন, কাপড় দেবেন, টাকা দেবেন। অম্বা দেবীর পূজা তো প্রত্যেক বছরেই হয়, কিন্তু এমন সুন্দর ভাবে তো কাঙ্গালীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয় না। রাজ্যের পুলিশ, শান্তিরক্ষক, কর্ম্মচারী সকলেই তাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করছেন। রাণী পরিদর্শনে ব্যস্ত। তোপ গর্জ্জন হতেই রাণী বুঝতে পার্‌লেন যে গুরুদেব এসেছেন। তোরণের সম্মুখে পদাতিক সৈন্য সব প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। পিতলের কামানের কাছে সব লোক উপস্থিত হলো। রাণী তাঁর বিশেষ প্রিয় হাতী শেখরকে পাঠিয়েছেন গুরুদেবকে আন্‌বার জন্য। দূরে দেখা গেল হাতীকে। ধীরে ধীরে হাতী কাছে এলে দেখা গেল—প্রথম হাতীতে হাওদার উপরে রত্ন-খচিত আসনে বসেছেন গুরুদেব, গোসাইজী আর রাজকুমার। দ্বিতীয় হাতীতে দেওয়ান এবং তাঁর মেম, তৃতীয় হাতীতে সহকারী দেওয়ান, চতুর্থ হাতীতে ফৌজদার, পঞ্চম হাতীতে তহশীলদার। তোরণের কাছে হাতী আস্‌তেই সৈন্যেরা আড়াই শত পিতলের কামানের উপর্য্যুপরি শব্দে অভিবাদন করলে গুরুদেবকে।

গুরুদেব কাছে এলে রাণী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন—"গুরুজীর জয়।" অমনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"গুরুজীর জয়।" গুরুদেব হাতী থেকে নামলেন, রাণী গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করে রাজছত্র সামরিক কর্ম্মচারীর হাত থেকে নিয়ে নিজে গুরুদেবের মাথায় ধর্‌লেন! সেই দেখে সন্তোষকুমার মা'র হাত থেকে রাজছত্র নিলেন।

প্রায় বেলা দুটোর সময় গুরুদেব ও গোঁসাইজীর জন্য ফলাহার রাণী নিজে নিয়ে এলেন। আহারের পর গুরুদেব বললেন—"আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দাও মা। ট্রেণ বোধ হয় ছুটায়, না?" রাণী বল্‌লেন—"দু'-এক দিন থাকবে না ঠাকুর।" গুরুদেব বললেন—"না মা, আমাদের অনেক কাজ আছে আশ্রমে—যাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।" রাণী বললেন—"এখনও অনেক সময় আছে ঠাকুর।" গুরুদেব বললেন—"তুমি খাওয়া-দাওয়া ক'রোনি—যাও খাও মা।"

রাণী ছায়া খাওয়া-দাওয়ার পর গুরুদেবের পায়ের কাছে ব'সে ব'ললেন—গুরুদেব, তোমার আশ্রমে যেতে মন আমার বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।"

গুরুদেব ব'ললেন—"তোমার মনের মধ্যে যদি ব্যাকুলতাই এসে থাকে, তুমি আমাদের নূতন আশ্রমে, সেই কুটীরে থাক্‌বে চলো। সে কুটীর দেখেছো তো মা—বড় কষ্ট—তা কি সহ্য করতে পারবে?"

রাণীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি কুটীর দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হ'ননি। সেই কুটীরে গিয়ে তাঁকে থাক্‌তে হবে?

গুরুদেব ব'ললেন—"কি মা, চিন্তিত হয়ে পড়লে? তাই তো ব'লছি মা, সত্যি ব্যাকুলতা তোমার আসেনি আজও, আর তা ছাড়া যে নিজে এক বিরাট রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সে কি আশ্রমে গিয়ে সাধারণ সাধিকার মতন থাক্‌তে পারবে?" রাণী ব'ললেন—"কেন গুরুদেব—মীরা"—

গুরুদেব মীরার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সন্তোষকুমার এসে জানালেন যে গাড়ী প্রস্তুত। গুরুদেব ব'ললেন—"তবে আসি মা।" রাণী ছায়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গুরুদেবের পায়ের ধূলা নিলেন। গুরুদেব ব'ললেন—"দুঃখ ক'রো না মা। যা কাজ তুমি ক'রছো তাই ভাল করে যাতে সম্পন্ন হয় সেই চেষ্টা ক'রো। এ-ও সেই ভগবানেরই কাজ। এখন তোমার আশ্রমে যাবার সময় হয়নি। সময় যখন হবে তখন আমাকে তোমার আশ্রয় দিতে হবে না। তুমি তখন নিজের আশ্রয় নিজেই করে নেবে।"

গুরুদেব নীচে এলেন। সকলেই পদধূলি গ্রহণ ক'রলেন গুরুদেবের। সন্তোষকুমার ও গুরুদেব গাড়ীতে উঠলেন।

মোটর গাড়ী চ'লতে আরম্ভ ক'রলে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে রাণী ছায়া ধুলোর মধ্যে ক্রমশঃ অদৃশ্য মোটর গাড়ীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

লিওনার্দো-দা-ভিন্চি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মল্লিক

"মোনা লিসা"র নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ এবং এ চিত্রও হয়ত অনেকে দেখে থাকবে। কিন্তু কে এই "মোনা লিসা" এবং কে সেই শিল্পী যিনি আজ "মোনা লিসা"কে জগতে অমর করে গেছেন, সেই সম্বন্ধেই আজ তোমাদের দু'-চার কথা বলব।

"মোনা লিসা" নামে আজ আমরা যাকে জানি, আসলে কিন্তু তাঁর নাম তা নয়। "মোনা লিসা"র আসল নাম ছিল "লা জিওকন্‌ডো" (La Giocondo), এবং ইনি ছিলেন ফ্রানসেস্‌কো ডেল জিওকন্‌ডো (Francesco del Giocondo) নামে এক ইটালীয়ানের স্ত্রী। লা জিওকনডোর অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল অতি সুন্দর এবং তিনি সর্ব্বদা এক মোহিনী ভাব পোষণ করতেন। তাঁর অধীর চরিত্রের মধ্যে একাগ্র আত্মার প্রকাশ-ভাবই শিল্পিমনকে তাঁর দিকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। "লা জিওকন্‌ডো"র রহস্যময়ী হাসিটুকু ছিল লক্ষণীয়। অঙ্কনের সময় যাতে এই ভাব সর্ব্বদা পরিস্ফুট থাকে এই জন্য শিল্পী সর্ব্বদা তাঁর modelকে গান, বাজনা, গল্প প্রভৃতি দিয়ে তুষ্ট রাখতেন। তাঁর সুস্পষ্ট মুগ্ধকরী ভাবই ছিল মুখমণ্ডলের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাঁর চরিত্র যে অতীব কোমল ছিল তা আমরা চিত্রিত হস্তগুলির কমনীয়তা হইতেই সহজে অনুমান করিতে পারি।

ফ্রান্‌সেস্‌কো ডেল জিওকন্‌ডো এক দিন তাঁর শিল্পী বন্ধু "লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি"কে (Leonardo-da-Vinci) তাঁর স্ত্রীর চিত্র অঙ্কনের জন্য অনুরোধ করেন এবং সেই অনুরোধেই শিল্পী চার বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে এই বিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করেন। প্যারিসের 'লোভার মিউজিয়ম' আজ "মোনা লিসার" চিত্র-সম্পদের জন্য গৌরবান্বিত কিন্তু যাঁর অনুরোধে এই বিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করা হয়েছিল সেই হতভাগ্য কখনও এই চিত্রের অধীশ্বর হতে পারেননি। চিত্র সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই লিওনার্দো রাজা ফ্রান্‌সিসের (Francis) অনুরোধে ফ্রান্সে যান, এবং অল্প দিন পরেই সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। ফ্রান্সে যাবার সময় চিত্রটি তাঁহার সঙ্গে থাকে এবং এইরূপে "মোনা লিসা" তার স্বদেশে স্থান না পেয়ে বিদেশে স্থান পায়।

এইবার তোমাদের শিল্পীর কথা বলব।

১৪৫২ খৃষ্টাব্দে লিওনার্দোর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা "সের পিয়েরো দা ভিন্‌চি" (Serr Piero da Vinci) ফ্লোরেন্স কোর্টের এক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। লিওনার্দো তাঁর পিতার বন্ধু আন্দ্রিয়া দেল ভেরোক্কিয়োর (Adrea del Verroahhio) নিকট চিত্রাঙ্কন শিক্ষা সুরু করেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর গভীর শিল্পানুরাগ দেখা যায়; এ সম্বন্ধে একটি ছোট গল্প আছে। একবার তাঁর শিক্ষককে St. John Baptist Christএর একখানি চিত্র অঙ্কন করতে বলা হয়। তখন তাঁর হাতে অতিরিক্ত কাজ থাকায় তিনি 'লিওনার্দো'কে সেই দৃশ্যের একটি পরী আঁকিয়া দিতে বলেন। লিওনার্দোর চিত্রিত পরীটি সমস্ত দৃশ্যটির মধ্যে এমন সুন্দর হয় যে তাহা দেখিয়া তার শিক্ষক প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে আর কখনও তুলি ধরিবেন না। শোনা যায়, তিনি তার বাকী জীবন ভাস্করবিদ্যায় অতিবাহিত করেন।

এর পর লিওনার্দো ডিউক লুডোভিকোর (Duke Ludovico) নিমন্ত্রণে তাঁহার পিতা মিলানের ডিউক অব ফ্রান্‌সিস্‌কোর (Duke of Francisco) এক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে মিলানে যান। ইহাই লিওনার্দোর সর্ব্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হয়েছিল—তাঁকে অশ্বের শরীর-ব্যবচ্ছেদ এরূপ ভাবে শিক্ষা করতে হয়েছিল যে তিনি এ সম্বন্ধে একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি

এই মূর্ত্তি গঠনে লিওনার্ডোর তিন বৎসরের অধিক সময় লাগে এবং অবশেষে ইহাকে মিলানে দাঁড় করান হয়। কিন্তু দুর্ভাগের বিষয় এই যে, মিলান শীঘ্রই ফ্রান্স কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং অধিকৃত হওয়ায় মূর্ত্তিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়াও ইটালীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁর শিল্পের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। মিলানেই লিওনার্ডো 'লাষ্ট সাপার' (Last Supper)এর দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করেন। তার অনুসন্ধিৎসু মন স্বতঃই তাঁকে তাঁর শিক্ষা এবং নিজের প্রতি বিচায়ক করে তুলতো এবং এই জন্যেই এক একখানি চিত্র অঙ্কনে তাঁর বহু সময় ব্যয় হ'ত। যতক্ষণ না তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন ততক্ষণ তিনি এক একখানি চিত্রকে বারংবার রং লাগিয়ে যেতেন। 'লাষ্ট সাপার' অঙ্কনে দেরী হচ্ছে দেখে 'প্রায়র' (Prior) অধৈর্য্য হয়ে ডিউককে বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে যেন শিল্পীকে জানান। লিওনার্ডোকে জানান হলে তিনি বলেন যে, চিত্র অঙ্কনে শিল্পীর সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। যেহেতু, তাঁকে এ বিষয়ে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। তখনও অনিন্দ্যসুন্দর "খৃষ্ট" (Christ) এবং বিশ্বাসঘাতক 'জুডাস' (Juddas) এই দুটি মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়নি। এই দুটি মূর্ত্তি কিরূপ হতে পারে এবং কেমন করে তা প্রকাশ করা যায়, সে সম্বন্ধে লিওনার্ডো তখনও কিছু ভেবে ঠিক করে উঠ্‌তে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন যে, যদি তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রায়রের মস্তক বসিয়ে তিনি চিত্রটি সমাপ্ত করতে পারেন। এই উত্তরে ডিউক এবং প্রায়র খুব খুসী হয়েছিলেন এবং শিল্পীকে তাঁর ইচ্ছামত সময় দিয়েছিলেন। মিলানে অবস্থান কালীন তিনি "মোনা লিসা" চিত্রটি অঙ্কন করেন। তাঁর কৃত শিল্পের মূল্য ছিল বেশী ; কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে এই শিল্প-প্রসূত উপার্জ্জনেই তিনি শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ে নানাবিধ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁকে এ পন্থা বেশী দিন অবলম্বন করতে হয়নি ; কারণ, কিছু দিন পরেই তিনি বার্দ্ধক্যের সুবিধা হেতু রাজা ফ্রান্‌সিসের দরবারে রাজ-চিত্রকর হিসাবে যোগ দেন। রাজা শিল্পীর সকল কার্য্য সংগ্রহের জন্য ফ্রান্স হইতে 'লাষ্ট সাপার' চিত্রটি স্থানান্তরিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে লিওনার্ডো দেহত্যাগ করেন।

লিওনার্ডো-দা-ভিন্‌চির মত এরূপ শক্তিশালী এবং মুগ্ধ চরিত্রের ঋষি আর কখনও ইতিহাসে পাওয়া যায়নি, তাঁর মত এমন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষেরও বোধ হয় আর কখনও জন্ম হয়নি। তাঁর মধ্যে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, যোগ প্রভৃতির কোন্ শক্তিটি বেশী ছিল তা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সর্ব্বদা সর্ব্ব জিনিষের কারণ নির্ণয়ে ছিল ব্যস্ত, তিনি ছিলেন বিশ্লেষক। তাঁর সত্য জ্ঞান তাঁকে পরজীবনে অনেক আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল। বিজ্ঞান-জগতে তাঁর দান অসীম। তিনি ছিলেন সুপটু ইঞ্জিনীয়ার। পয়ঃপ্রণালী, বাঁধ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি অনেক নক্সা করে গেছেন। শোনা যায়, আধুনিক ফ্লোরেন্স সহর তাঁরই নক্সার প্রতিরূপ।

তাঁর মন্ত্র ছিল "দৈবে বিশ্বাস কর না—কারণ দেখ।" তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী এবং তাঁর জীবন ছিল প্রকৃতির কথোপকথন। যখন তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবনের দীপ নিবে আসছে তখন তিনি লিখেছিলেন :—

"মানুষ সর্ব্বদাই নব বসন্ত ও নব নিদাঘের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে এবং অভিযোগ করে বহু লক্ষ বস্তুর অলস গতির জন্য ; কিন্তু দেখতে পায় না সে তার নিজ সমাপ্তির জন্য কত ব্যস্ত। তবুও ঠিক এই ইচ্ছেটাই হচ্ছে পঞ্চভূতের সারাংশ যা আত্মার মধ্য দিয়ে শরীরের আবদ্ধতা হৃদয়ঙ্গম করে এবং সর্ব্বদা ইচ্ছা করে সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু আমি তোমাদের জানিয়ে যাই যে ঠিক এই ইচ্ছেটাই হচ্ছে প্রকৃতির সত্যরূপ এবং মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।"

অদ্ভুত রক্ষা

অরুণকুমার ঘোষ

দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড। তাকে ঘিরে জড় হয়েছে সমস্ত গ্রামবাসীরা। মুখে তাদের একটা ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এই আগুনে আজ তারা পুড়িয়ে মারবে গ্রামের এক ভয়ানক শত্রুকে। লোকটা ডাইনী, অন্ততঃ তাদের তো তাই ধারণা। তা না হলে অত রকমের অদ্ভুত কাণ্ড সে করে কি করে ?

হতভাগ্য বন্দী দাঁড়িয়ে আছে লেলিহান আগুনের সামনে। মুখে তার হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। সম্মুখের আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশাই নেই তার। গ্রামবাসীদের দলপতি এসে তার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ জানাল। বন্দী নিস্তব্ধ ভাবে শুনলে তার কথা। বুঝলে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। কিন্তু সে জানে যে সে নির্দ্দোষ।

আগুনের হলকা এসে লাগছে গায়ে। গ্রামবাসীরা যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ঐ জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তাকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বন্দীর একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তার মুখের উপর ভয়ের যে ছবি ফুটে উঠেছিল সেটা এক নিমেষে কেটে গেল। বন্দী হাসলো—অদ্ভুত একটা হাসি। কেন ?

গ্রামবাসীরা এগিয়ে এল—জোর করে বন্দীকে ফেলে দিতে গেল সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। এক মুহূর্ত্ত ! অকস্মাৎ সেই আগুনের ভেতর থেকে কোন বিদেহী আত্মা যেন বলে উঠল, "সাবধান, সাবধান ! কেউ 'কম্‌টে'র অনিষ্টের চেষ্টা করো না।"

থমকে থেমে গেল হত্যা-পাগল গ্রামবাসীরা। কে বললে এ কথা ? নিশ্চয়ই কোন ভৌতিক আদেশ। কোন্ এক অদৃশ্য প্রেতাত্মা যেন তাদের জানিয়ে দিল যে, 'কম্‌টে'র অনিষ্টের চেষ্টা করলে তাদেরও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে পৃথিবীর বুক থেকে। একটা দারুণ ভয় তাদের মনকে ঘিরে ধরলে। বন্দীকে সেখানেই ফেলে রেখে অজ্ঞ গ্রামবাসীরা নিমেষের মধ্যেই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সরে পড়ল সেখান থেকে। কৌশলে মুক্তি পেয়ে বন্দী প্রাণ খুলে হাসল।

এই বন্দী কে জান ? সুইজারল্যাণ্ডের এক প্রসিদ্ধ যাদুকর Louis Apollinaire Comte। ইনি ম্যাজিক, শব্দানুকরণ, ভেন্‌ট্রিলোকুইজম্ ইত্যাদিতে রীতিমত দক্ষ ছিলেন। তখনকার লোকে যাদুকরদের ডাইনী ভেবে আগুনে পুড়িয়ে মারত। 'কম্‌টে'কেও সেই দারুণ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু ভেন্‌ট্রিলোকুইজম্ (মুখ বুজে কথা বলা) বিদ্যার সাহায্যে তিনি এ ভাবে নিজের উদ্ধার সাধন করেন। অদ্ভুত নয় কি ?

শ্রীসুহাসচন্দ্র মল্লিক

ল্যাংড়া গাছে চড়তে দেখে
উড়ে মালী ভীষণ রেগে
বিশ্রী সুরে বিকট হেঁকে
বল্‌লে, "খোকা নাব্।"
"ফের যদি তুই টিকি নেড়ে
ষাঁড়ের মত চ্যাচাস্ জোরে,"
বল্‌লে খোকা, "ছিঁড়বো তোর ঐ
গাছের যত আঁব্।"
বল্‌লে মালী, "চোদ্দখানা
রয়েছে গাছে দত্যি-ছানা
পালিয়ে এসো উঠ্‌তে মানা
চড়বে ঘাড়ে শেষে।"
"গাছের দত্যি সেরেফ্ মিছে
আসল দত্যি দাঁড়িয়ে নিচে
ভয় করি তাই নাব্‌তে নীচে"
বল্‌লে খোকা হেসে।

ব্যাবিলন-বিজয়

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

অস্তিয়গেস (Astyages) নামে এক রাজা ছিলেন. তিনি মিড (Mede) ও পারসীক জাতির উপর রাজত্ব করিতেন। এক রাত্রিতে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়া বড় ভয় পাইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন,—তাঁহার দৌহিত্র যেন তাঁর স্থলে শাসন করিতেছে।

এই স্বপ্নের কথা তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। ইহার অনেক বৎসর পরে এক দিন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁর মেয়ের এক পুত্র-সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে; এই সংবাদ পাইয়া তিনি বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এই দৌহিত্রকে নিহত করিবার জন্য তাঁর এক জন সভাসদকে পাঠালেন। এই ব্যক্তির নাম হরপাগস্ (Harpagus); এই নির্দ্দোষ শিশু-সন্তানকে নিহত করিতে তাঁহার নিজের মন সরিল না। তিনি এক রাখালকে আদেশ দিলেন—সেই শিশু-সন্তানকে লইয়া গিয়া নির্জ্জন পাহাড়ে ফেলিয়া আসিতে—যাহাতে সেই অবস্থায় শিশু অনাহারে মারা যায় বা কোন বন্য জন্তু দ্বারা নিহত হয়।

ঘটনাক্রমে সেই দিনই সেই রাখালের একমাত্র ছেলে মারা যায়। তাহার স্ত্রী পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া সেই জীবন্ত শিশুটি তাহাকে দিবার জন্য বিশেষ অনুনয়-বিনয় করে; আর অনুরোধ করে ইহার পরিবর্ত্তে তাহার মৃত সন্তানকে পাহাড়ে ফেলিয়া আসিতে, তাহা হইলে এই পরিবর্ত্তনের কথা কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। ফলে ভগবৎ-কৃপায় ও কপালের জোরে রাজার নাতি বাঁচিয়া রহিল।

এই শিশু-সন্তানের নাম কুরুষ (Cryus)। তিনি নিজেকে রাখালের ছেলে বলিয়া জানিতেন। ইনি দেখিতে অতি সুশ্রী, সুন্দর ও বলিষ্ঠ ছিলেন; বাল্যকালেই রাখালের ছেলেরা তাঁহাকে নিজেদের রাজা বলিয়া মানিয়া লইল। এক দিন ঘটনাক্রমে কুরুষ রাজা অস্তিয়গেসের নজরে পড়িয়া গেলেন; তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কে এই কিশোর বালক? দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক রাজার ছেলের মত গর্ব্বিত ভাবে!

এই কিশোর বালকের আকৃতি তাঁহার মন সন্দেহাকুল করিয়া তুলিল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া যত দূর জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁর মনে হইল, এই তরুণ যুবক তাঁর মেয়ের ছেলে ছাড়া আর কেহ নহে। তখন সেই রাজা কি করিলেন জান? হরপাগস তাঁহার আদেশ মত এই যুবককে শৈশব অবস্থায় নিহত করে নাই—এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সেই নিষ্ঠুর রাজা তার প্রিয়পুত্রকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন।

হরপাগস তাঁর পুত্রহত্যার কথা ভোলেন নাই—তিনি অহর্নিশ এই পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কি উপায়ে অস্তিয়গেসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কুরুষকে রাজা করিবেন, তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন ও সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

কুরুষ বড় হইলে তাহাকে তাহার সত্য পরিচয় দিয়া নিজের মতলব খুলিয়া বলিলেন। ইহা শুনিয়া কুরুষ মহা উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন ও সানন্দে সেই নিষ্ঠুর রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন।

রাজা অস্তিয়গেসের কাছে সংবাদ গেল, কুরুষ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সংবাদে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বহু পূর্ব্বে দেখা স্বপ্নের কথা তাঁর মনে অহর্নিশ জাগ্রত ছিল। তিনি হরপাগসকে সেনাপতি করিয়া কুরুষকে দমন করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হরপাগস তার পুত্রহত্যার প্রতিশোধের জন্য ব্যগ্র ছিলেন, ভগবানের কৃপায় সুযোগ মিলিয়া গেল। তিনি অধীনস্থ সৈন্য লইয়া অস্তিয়গেসের আদেশ মত কুরুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া কুরুষের সহিত যোগদান করিলেন। ইহার ফলে কুরুষের নিজের সৈন্য ছাড়া মাতামহের সেনা তাঁহার অধীনে আসিয়া পড়িল।

যুদ্ধে অস্তিয়গেস পরাজিত হইলেন এবং কুরুষ তাঁহার স্থলে দেশের রাজা হইলেন। তিনি তাঁহার মাতামহের মত নিষ্ঠুর-হৃদয় ছিলেন না। তাঁর শৈশব অবস্থায় মারিবার চেষ্টার প্রতিশোধ লইলেন না—পরন্তু, তাঁকে অক্ষত শরীরে রাজ-অতিথিরূপে যথোচিত সম্মান ও সমাদরের সহিত রাজসভায় স্থান দিলেন।

এইরূপে নিজেকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর নূতন নূতন দেশ জয় করিবার বাসনা করিলেন। প্রথমে তিনি লিডিয়ার রাজা ক্রীসাসকে পরাজিত করেন—ইহার ইতিহাস পূর্ব্বে শুনিয়াছ (বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫২)। অবশেষে তিনি সমৃদ্ধিশালী বিশাল বাবিলন নগরী জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই স্থান বাবিরুষ নামে খ্যাত ছিল। এই সময় এই রাজ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অজেয় বলিয়া লোকের ধারণা ছিল—এই সুরক্ষিত নগরী কেহই জয় করিতে সমর্থ হইবে না।

বাবিলন নগরী বর্গক্ষেত্রের মত নির্মিত; চারি দিকে প্রায় ৬০ মাইল দীর্ঘ প্রাচীরে আবদ্ধ। এই বিস্তৃত প্রাচীরের উপরে রাস্তা ছিল। তাহার বাহিরে পরিখা। নগরীর মধ্য দিয়া ইউফ্রেটিস নদী প্রবাহিত—এই নদী দ্বারা বাবিলন দুই সমান ভাগে বিভক্ত ছিল। সমস্ত পথ সরল রেখার মত ছিল; যে সব স্থলে নদীর সহিত এই সব পথ মিলিত হইয়াছিল, তথায় পিত্তলনির্মিত বড় বড় তোরণদ্বার ছিল; এই সব দ্বার দৃঢ়ভাবে বন্ধ করা যাইত। নদীর উভয় পার্শ্ব উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

নগরের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ; সেই রাজপ্রাসাদ অসংখ্য সুন্দর 'টাওয়ারে' শোভিত হইয়া চারি দিকের প্রাচীরের উপর মাথা খাড়া করিয়া গর্বিত ভাবে বিরাজমান ছিল। বাবিলনের সৈন্য শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নগরীর বাহিরে আসিলে কুরুষ সম্মুখযুদ্ধে তাহাদের পরাস্ত করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর হতাবশিষ্ট বাবিলোনীয় সৈন্য নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিল। দৃঢ়বদ্ধ দ্বার, বিস্তৃত পরিখা ও বিশাল প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত নগরী কি করিয়া জয় করিবেন, পারস্যরাজ কুরুষ তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক অসমসাহসিক মতলব ঠিক করিলেন। নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর স্রোত বাঁধিয়া যদি নদীগর্ভ শুষ্ক করা যায়, তাহা হইলে জলশূন্য নদীগর্ভ দিয়া তাহার সৈন্যদল নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু কি উপায়ে এই মতলব কাজে পরিণত করিতে পারিবেন?

নগরের বহির্ভাগে নদীতীরে একটি প্রকাণ্ড জলাধার ছিল, ইহাতে বন্যার সময়ের অতিরিক্ত জল ধরিয়া রাখা হইত। এই জলাধারের স্লুইস গেট খোলা হইলে নদীর জল নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত না হইয়া এই জলাধারে প্রবেশ করিত। নিশাকালে কুরুষ সেই স্লুইস গেটের দরজা খুলিয়া দিলেন; জল নদীগর্ভ দিয়া প্রবাহিত না হইয়া সেই জলাধারে সঞ্চিত হইতে লাগিল। শীঘ্রই জল কমিয়া গিয়া সামান্য স্রোতের আকারে বহিতে লাগিল।

নগরের দুই প্রান্তে যে স্থলে নদী নগরে প্রবেশ করিতেছে ও যে স্থলে নদী নগর হইতে বহির্গত হইতেছে, এই উভয় স্থলে কুরুষ সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। নদীগর্ভ শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দিক্ হইতে পারস্য-সৈন্যদল নদীগর্ভ দিয়া যাত্রা করিয়া যে সব স্থানে নগরের রাস্তা নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে—সেই সব স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। বাবিলনের কেহই স্বপ্নেও ভাবে নাই, এইরূপে নদীর জল শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে—কাজেই নদীর পিত্তলনির্মিত তোরণদ্বার কেহ বন্ধ করে নাই; উহা উন্মুক্ত ছিল। পারস্য-সৈন্যদল সেই উন্মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া অতর্কিত ভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া বাবিলন আক্রমণ করিল। যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকে নিহত করিতে লাগিল অকস্মাৎ নৈশ আক্রমণের জন্য বাবিলনের সৈন্য প্রস্তুত ছিল না; তাহারা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে সমগ্র নগর পারস্য-সৈন্যের অধিকারে আসিল। কিন্তু বাবিলন নগরী এত বিশাল ছিল যে, বাবিলনের অধিকাংশ অধিবাসী জানিতে পারে নাই যে, শত্রু তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা সারা রাত এই বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকিয়া নাচ-গানে ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিল।

এই ভাবে তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাবিলন নগরীর পতন হইল এবং কুরুষ পুনর্বার বিজয়ী হইলেন। এই ভাবে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের পত্তন হইল।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

১২

মহামন্ত্রী শকটালের নিমন্ত্রণে মহামতি বিষ্ণুগুপ্ত মন্ত্রীর গৃহে অতিথি হলেন। সেই রাতেই চন্দ্রগুপ্ত আর শকটাল একসঙ্গে পরামর্শ করলেন—'মনীষী চাণক্যকে যখন সহায় পাওয়া গেছে, আর বররুচি যখন যোগনন্দের সহায় নেই, তখন আমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেরী লাগবে না—শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে—যাতে কৌটিল্য যোগনন্দের উপর চটেন। অন্য নন্দেরা ত গাড়ল, তাদের টিপে মারা বেশী শক্ত হবে না। কিন্তু যোগনন্দ ত আসলে পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত। তাই তাকে মারতে হলে চাণক্য ছাড়া আর কেউ পেরে উঠবেন না'।

পরামর্শ করে পরের দিন সকালে দু'জনে চাণক্যের কাছে নিজের নিজের জীবনের অত্যাচারের কাহিনী খুলে বললেন। তার পর তাঁর পা ছুঁয়ে প্রার্থনা জানালেন—'দেব! আপনি সহায় হোন্—তা হলে নন্দরাজ্য উৎসন্ন দেওয়া যায়'।

চাণক্য সব শুনে হাস্‌লেন, দুর্বোধ্য হাসি। তার পর ধীরে ধীরে বললেন—'মন্ত্রিবর শকটাল! বৎস চন্দ্রগুপ্ত! আমি অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য আর দেবগুরু বৃহস্পতি দু'জনকেই আমার রাজনীতির গুরু বলে মানি। তাই আমি শুধু দৈব বা শুধু পুরুষকারের উপর নির্ভর করে কোনও কাজে এগুই না'।

শকটাল চাণক্যের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন—'প্রভু! চন্দ্রগুপ্তের বাপ মৌর্য্য ছিলেন এ-রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। কারাগারে কি ভাবে তাঁর মরণ ঘটেছে, তা সেনারা জানে না—জানবার সুবিধা পায়নি এ পর্য্যন্ত—তিনি রোগে মারা গেছেন, এই তারা জানে। আসল কথা তাদের কাছে প্রকাশ পেলে তারা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ হয়ে নন্দরাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইতস্ততঃ করবে না'।

চাণক্যের মুখে তেমনি হাসি—খুব আস্তে বললেন—'খুব ভাল। একটা ধাপ গাঁথা হ'ল। এবার খবরটা রাষ্ট্র করবার ভার আপনি নিন। চন্দ্রগুপ্তকে এ কার্য্যটা দেওয়া চলবে না—হয়ত সেনাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারে রাজ্যের লোভে আজ এ কথাটা মিছে

ক'রে রটাচ্ছে—এত দিন কিছু বলেনি কেন? আপনি বললে—প্রধান মন্ত্রীর কথায় সকলেই বিশ্বাস করবে'।

শকটাল মাথা নীচু করে বললেন—'প্রভু! আপনার আদেশ মাথায় পেতে নিলুম। কিন্তু—এ কাজে কিছু সময় লাগবে—এক দিনে ত ঢেঁড়া পেটান যাবে না—তাহলে ত বিদ্রোহের অপরাধে এখনই বন্দী হতে হবে'।

চাণক্য—'কত সময় চাই'?

শকটাল—'মাস তিনেক'।

চাণক্য—'তাই হোক্। এর মধ্যে চন্দ্রগুপ্তকে আর একটা কাজের ভার দিতে চাই'।

চন্দ্রগুপ্ত হাঁটু গেড়ে বসে জোড় হাতে মাথা নীচু করে বললেন—'কি আদেশ, দেব'!

চাণক্য—'সেকেন্দরের নাম শুনেছ মন্ত্রিবর'?

শকটাল—'দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর'?

চাণক্য—'হাঁ, দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর। তবু তাঁরই কাছে হেরে যাওয়া পুরুরাজের কাছে তিনিই আবার পাল্টা হেরে গিয়েছেন'!

শকটাল্ ও চন্দ্রগুপ্ত দম বন্ধ ক'রে একসঙ্গে বল্‌লেন—'কি বল্‌ছেন, প্রভু! আপনি! দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের হার! এ যে অসম্ভব কথা! তবে কি ভারত জয় তিনি করতে পারবেন না'?

চাণক্যের মুখে আবার সেই হাসি! ধীরে ধীরে বললেন—'না—ভারত-জয়ের গৌরব তাঁর ললাটে বিধাতা লেখেন নি। তিন বছর আগে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে আমার ভক্ত শিষ্য পুরুরাজ তাঁর হাতে বন্দী হলেন—আমি তখন তপস্যায়! আর থাক্‌লেই বা কি হ'ত—অজেয় সেকেন্দরের কাছে অল্পবলী পুরু কি করবে! তবু যখন যবন-সেনারা তক্ষশিলার সিংহকে শেকলে বেঁধে সেকেন্দরের সামনে এনে হাজির করলে, তখন প্রাণের ভয়ে পুরুর একগাছা চুলও একবার কাঁপেনি—বিজয়ী সেকেন্দরের কাছে মাথা সে একটুও নোয়ায়নি'!

শকটাল্ ও চন্দ্রগুপ্ত—'তার পর'—!

চাণক্য—'সেকেন্দর সে বীরমূর্ত্তির পানে তাকাতেই বীরের হৃদয়ে বোধ হয় দোলা দিলে। বন্দীর উদ্ধত ভাব দেখে বিরক্ত না হ'য়ে গুণগ্রাহী বীর সেকেন্দর জিজ্ঞাসা করলেন পুরুকে—'বীর! পুরুরাজ! আপনি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেন'? তার উত্তরে পুরুরাজ কি বলেছিল জানো—বলেছিল—আহা! আজ তিন বছর বাদে এ কথা বল্‌তেও আমার বুকখানা গর্ব্বে ফুলে উঠছে!—শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাজসিংহ গর্জ্জে উঠেছিল—'বীর আপনি! রাজা আপনি! আমিও কাপুরুষ নই। রাজার কাছে রাজা যে ব্যবহার পেতে পারে, ঠিক সেই ব্যবহারই আপনার কাছে পেতে চাই'!

চন্দ্রগুপ্তের হাত দুখানা মুঠো হ'য়ে উঠেছে শুনতে শুনতে—নিশ্বাস পড়ছে কি না সন্দেহ। চাণক্য স্নেহের সঙ্গে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—'সেকেন্দর—বীর সেকেন্দর—বিশ্ববিজয়ী জনগণের অন্তরজয়ী সেকেন্দর তখন নিজের সিংহাসন ছেড়ে উঠে নিজের হাতে পুরুর হাতের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে টেনে বসালেন পুরুরাজকে নিজের সিংহাসনের আধখানা জায়গায়—নিজের পাশে। পুরুরাজ যেমন হেরেও জিতেছিল, সেকেন্দর তেমনি জিতেও হেরে যেতে যেতে হার সাম্‌লে নিলেন কোন রকমে'।

চন্দ্রগুপ্তের মুখে কথা ফুটলো—'ধন্য, বীর দু'জন—ধন্য পুরুরাজ! ধন্য সেকেন্দর'!

চাণক্য—ধন্যবাদ পরে দিও। এখনও পুরুরাজ শয্যাগত—আমি তার লগ্নচক্র বিচার ক'রে যত দূর দেখছি—সে আর উঠ্‌বে না—যুদ্ধে সে আঘাত পেয়েছে সাঙ্ঘাতিক। দীর্ঘ দিন সে মরণের সঙ্গে যুঝ্‌ছে, তবে তার শেষও আসন্ন। তবু এই বীরের মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে সেকেন্দর চলে যেতে পারছেন না—অন্য দেশের বিজয়-যাত্রায়। সেকেন্দর এখনও তক্ষশিলায়—পুরুরাজের অতিথি! ভারতের দুর্দ্দান্ত গরম সইতে পারছে না—তাঁর সেনারা! তারা জিদ ধরেছে—একটু ঠাণ্ডা দেশে ঘুরে আসতে। সেকেন্দর তাদের খুসী করতে অচিরে ভারত ছেড়ে যাবেন। তবে তিনি যে ভেবেছেন—আবার ফিরে আস্‌বেন ভারত অধিকার করতে—সে তাঁর দুঃস্বপ্ন—সে স্বপ্ন তাঁর আর কোন দিনও পূর্ণ হবে না। তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা—তাঁর পাপের ফল ফলবার সময় হয়েছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি—সেকেন্দর ভারত ছেড়ে যাবেন—আর ভারতে ফিরে আসবার সুবিধা পাবেন না—তিনি এবার ভারতের বাইরে পা দিলেই ইহলোক থেকে বিদায় নেবেন। তাই বলি, চন্দ্রগুপ্ত! তুমি একবার যাও, সেকেন্দরকে তোমার কাহিনী শুনিয়ে সাহায্য চাও গে—যাবার আগে যদি তিনি কিছু লোকবল দিয়ে তোমায় সাহায্য করেন'।

চন্দ্রগুপ্ত—'দেব! আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, আপনিই বলুন না কেন—আমি কি সেকেন্দরের সাহায্য পাবার সৌভাগ্য লাভ করব'?

চাণক্য কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে বল্‌লেন—'সম্ভব—নয়। তবু তোমাকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে বলি। কেবল দৈবকে আঁকড়ে ব'সে থাকা—কোষ্ঠীতে ফল বলা নেই ব'লে চুপ ক'রে থাকা—এ আমার মত নয়'।

চন্দ্রগুপ্ত—'তাঁকে না পাই—পুরুরাজের মত বীরের সাহায্য পাব কি'?

চাণক্য—'না বৎস! পুরুরাজের জীবন শেষ হ'তে আর কয়েক দিন মাত্র বাকি! এই বীর শেষ নিশ্বাস ছাড়লেই সেকেন্দরও ভারতের মাটি হ'তে পাট ওঠাবেন—তিনি ভাবছেন আপাততঃ এ বছরটার মত বিদায় নেবেন—আসছে বছর শীতকালে পুরু ত থাক্‌বেন না—নিষ্কণ্টকে ভারতের সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি তা নয়—বিধাতা তাঁকে ডাক্‌বেন লোকান্তরে যেতে—অচিরে তাঁকে সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে—যাবার আগে তিনি ভারতের সীমান্ত ধ্বংস ক'রে যাবেন—আর সেই পাপে ব্যাবিলনে পৌঁছেই তাঁরও দেহান্ত হবে'।

চন্দ্রগুপ্ত—'তবে আমায় যেতে আদেশ করছেন কেন, প্রভু'?

চাণক্য—'তোমার যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি ঘোড়ার পিঠে যাও। রোজ যেখানে সন্ধ্যা হবে সেখানে বিশ্রাম করবে। সকালে উঠে নন্দরাজদের অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়ে দেশবাসীকে এক হ'তে বলবে—আরও বলবে যে 'ছ'মাস বাদে আমি আপনাদের সাহায্য নিতে আসব তখন যেন বিফল হ'য়ে না ফিরতে হয়'। অবশ্য মগধের মধ্যে এটা কোরো না—তা হ'লে চরের মুখে খবর পেয়ে তোমার মাথা কেটে নেবে নবনন্দ। নন্দরাজ্যের এলাকার বাইরে গিয়ে এই প্রচারকার্য্য আরম্ভ কর। একশ' দিন তোমায় সময় দিলুম

এর মধ্যে ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে এস। যদি সেকেন্দরের দেখা পাও—ভালই; নয়ত সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে প্রচার করা ত হবে। সে একটা মস্ত বড় কাজ'।

চন্দ্রগুপ্ত—'আপনার আদেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কিন্তু আমার মুখের কথায় কি সারা ভারতের লোক বিশ্বাস করবে'।

চাণক্য—'তোমার কপালে ভারতের রাজদণ্ডের ছাপ বিধাতা নিজের হাতে এঁকে দিয়েছেন—আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি; তোমার এই মুখ সারা ভারতের উৎপীড়িত জনগণের মনে আশার সঞ্চার করবে—তোমারই মধ্যে খুঁজে পাবে তারা তাদের ভাবী নেতাকে—অবিসংবাদী পথ-প্রদর্শককে। তোমার বাবা আর একশ' ভাইএর নিষ্ঠুর হত্যার কাহিনী—মন্ত্রী শকটালের ছেলেদের শোচনীয় হত্যার কথা—জ্বলন্ত ভাষায় লোকেদের কাছে প্রকাশ করবে—তারা বিশ্বাস করবে তোমার কথা—তারা শপথ করবে তোমার সাহায্য করতে—তারা তোমার সঙ্গে মিলতে বাধ্য হবে—এ ত কোন বিধি-লিপি নয়—এ যে দৈব-পুরুষকারের মিলন—এর অসাধ্য কিছু নেই—এ কথা ধ্রুব সত্য জেনো, বৎস'!

বল্‌তে বলতে চাণক্যের দীর্ঘ দেহ যেন আরও দীর্ঘায়ত হ'য়ে উঠল। কি যেন এক অপার্থিব তেজে নয়ন দুটি তাঁর জ্বলতে লাগল। মুখে প্রকাশ পেল দিব্য দীপ্তি। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে শকটাল ও চন্দ্রগুপ্ত হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন জোড় হাতে। তাঁদের দু'জনের মাথায় দুই হাত রেখে সমাধিস্থ মহাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে রইলেন চাণক্য। কতক্ষণ যে কেটে গেল এই ভাবে কারুরই সাড়া ছিল না। তার পর চাণক্য আবার প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বললেন—"বৎস, চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কালই রওনা হও। কাল অতি উত্তম দিন, আমি তোমার লগ্নশুদ্ধি, রবিশুদ্ধি, চন্দ্রশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি দেখে ঠিক করেছি। কালই তোমার জয়যাত্রার সুরু হবে। তবে মনে রেখো কাল থেকে একশ' দিন বাদ দিয়ে একশ' এক দিনের দিন আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। যদি ঐ দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ফিরতে না পার, চাণক্যের সাহায্য তুমি আর পাবে না। মন্ত্রিবর! তোমার প্রচারকার্য্য আরম্ভ করবে—আর তিন দিন পরে। তোমার সময় তিন মাস—তিন মাস বাদে পরীক্ষা করব—সেনারা তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করতে রাজি কি না'।

শকটাল ও চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের পায়ের ধুলো নিলেন।

চাণক্য আর একবার চন্দ্রগুপ্তের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—'বৃষল! 'বৃষল' বলছি ব'লে চ'টো না—এ আমার আদরের ডাক'!

চন্দ্রগুপ্ত তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—'প্রভু! চিরদিন যেন আপনার এই আদরের 'বৃষল' ডাকই শুন্‌তে পাই'।

চাণক্য—'বৃষল' কুসুমপুরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ছোট একটি গ্রামে আমার সখা ইন্দুশর্ম্মা একা বাস করেন। যাবার সময় তাঁকে ব'লে যেও—'বিষ্ণুগুপ্ত আপনাকে স্মরণ করেছেন'।

চন্দ্রগুপ্ত—'যথা আজ্ঞা, প্রভু'! সে-দিনের মত মন্ত্রণা শেষ হ'ল।

[ক্রমশঃ

[ভালোবাসা]

মনোজিৎ বসু

পৃথিবীতে এমন অনেক গল্প আছে, যা তৈরী করা গল্পের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর, বেশি মধুর। সেই সব গল্প, নিছক গপ্‌প নয়, সত্যিকারের ঘটনা থেকেই তার সৃষ্টি। তাই তার মূল্য অনেক।

তোমরা হয়তো জানো, এদেশের হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রীতি আছে যে, পিতার অবর্তমানে তাঁর ছেলেরাই তাঁর সম্পত্তি সমান অংশে পায়। বড় ছেলে বড় ব'লে বেশি পাবে আর ছোট ছেলে ছোট ব'লে কম পাবে, এমনটা হয় না। আইনও তাই। কিন্তু এই সম্পত্তির অংশ নিয়ে একবার ভারি একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল, সেই গল্পই তোমাদের বলছি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেছ তো? বাঙ্‌লা সাহিত্যের উন্নতির মূলে যাঁরা এদেশে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি ক'রে গেছেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই এক জন। বহু ভালো ভালো প্রবন্ধ রচনা ক'রে এক দিকে তিনি যেমন খ্যাতিলাভ করে গেছেন, অন্য দিকে তেমনি আবার বাঙ্‌লা-সাহিত্যকে পরিপুষ্টও করেছেন তিনি। তাঁর কাছে আমাদের সাহিত্য বিশেষ ভাবে ঋণী।

সেই ভূদেব বাবু প্রথম জীবনে দরিদ্র ইস্কুল-মাষ্টার ছিলেন। কিন্তু শেষ-জীবনে অগাধ সম্পত্তি রেখে যান তাঁর দুই ছেলের জন্যে। তাঁর দুই ছেলেতে খুব ভাব, পরস্পরকে তাঁরা গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। দু-ভাইয়ের এই সম্প্রীতির কথা ভূদেব বাবু জানতেন। আর একথাও জানতেন যে, তাঁর অবর্তমানে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করবে না।

তবু তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে গেলেন। তাঁর দুখানি বাড়ী ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল চুঁচুড়ার হুগলী নদীর তীরে। সেই বাড়িখানিই ছিল সব দিক থেকে সুন্দর আর ভালো। তিনি সেখানি ছোট ছেলেকে দিয়ে গেলেন।

উইল প'ড়ে ছোট ছেলে চল্‌লো বড় ভাইয়ের কাছে। গিয়ে বলল—'এ কি ক'রে হয়? তুমি হ'চ্ছ বাবার বড় ছেলে—ভালো বাড়িখানি তোমারই হওয়া উচিত।'

বড় ভাই গোবিন্দদেব সে কথা শুনে একটু হাসলেন। হেসে বললেন—'না ভাই, বাবাকে ব'লে ও-বাড়িখানি আমি তোমার জন্যেই রেখেছি। আর তাছাড়া এই তো ঠিক হয়েছে। আমি তোমার চেয়ে বয়সে সাত বছরের বড়ো। এই সাত বছরে আমি বাবার যে স্নেহ পেয়েছি, সে-কথা একবার ভাব তো? তার কি কোনো দাম নেই? এক দিকে সাত বছরের সেই পিতৃস্নেহ আর অন্য দিকে ঐ বাড়ি রেখে তুলনা করে দেখ তো, ওজনে কোন্‌টা ভারি—কে বেশি জিতেছে?'

নরসুন্দর সভাসুন্দর কথা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

সে-কালের এক গল্প শোনো, আমরা যা ছোটবেলায় শুনেছিলাম।

এক নাপিত আর এক ধোপাতে ভয়ানক বন্ধুত্ব ছিল। নাপিত ধোপার বাড়ীর সকলের চুল-দাড়ী কামিয়ে দিত, আর ধোপা কেচে দিত নাপিতের বাড়ীর সমস্ত কাপড়-চোপড়।

একবার এক বিদেশী নাপিত এসে গ্রামে কারবার সুরু করলো; গাঁয়ের নাপিতের কাছে আর কেউ আসে না, বিদেশী না কি বেশী আরাম দেয়, চুল কাটবার পর গা-হাত-পা টিপে দেয়, পয়সাও কম নেয়।

এক দিন লেগে গেল দু'জনে খুব ঝগড়া, বিদেশীর গায়ে জোর বেশী, সে বাঙালী নাপিতকে বেশ মার লাগালো।

এ গিয়ে তার ধোপা বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এলো।

ধোপা বললে, ওর সঙ্গে ত ভাই জোরে পারব না, এক বার ঠ্যাং দুটো ধরতে পারলে আছাড় দিতে পারি। কত ভারী ভারী সতরঞ্চি মাথার ওপর তুলে আছড়াই, তার চেয়ে কি আর এ ভারী হবে?

এখন ওকে ফেলা যায় কি ক'রে?

তার গায়ে অনেক জোর, কাজেই দুই বন্ধুকে পেছনে দেখে সে একটুও ভড়কালো না।

হঠাৎ ফিরে দেখ্‌তে গিয়ে নাপিত তাকে মেরেছে এক ল্যাং, বিদেশী 'হাজাম' আছাড় খেয়ে পড়েছে।

ওঠ্‌বার আগেই ধোপা তার পা দু'টো ক্যাঁক ক'রে ধরে ফেলেছে, ধরে ফেলেই এক হ্যাঁচকা টানে মাথার ওপর, তার পরেই এক আছাড়, 'ধোপি আছাড়' যাকে বলে!

দম নেবার আগেই আবার তুলে আবার আছাড়!

তিন আছাড়ের পর তার আর আওয়াজ নেই, চোখ বুজে শুয়ে রইলো। এরা খানিক ঘুরে এসে দেখে, শুধু পালায়নি—দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, কারণ তার ঘরেও কোনো জিনিষ নেই।

দিন কতক বাদে দুই বন্ধু দেশভ্রমণে বেরোল।

এক দেশে গিয়ে শুনলে, সে দেশের রাজা ব্রাহ্মণ-বিদায় করছেন—প্রতি ব্রাহ্মণকে সোনার ঘড়া, রূপোর বাসন, আর গরদের কাপড় দিয়ে। এরা দু'জনে লোভে লোভে দুটো পৈতে যোগাড় ক'রে গলায় ঝুলিয়ে কাঁধে এক চাদর নিয়ে গম্ভীর ভাবে সেই সভায় ঢুকে পড়লো।

সভা ভ'রে যেতেই তখন সদর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে করযোড়ে বল্‌লেন—আপনারা সকলেই সৎ-ব্রাহ্মণ, আমি জানি। তবু দান নেবার আগে আমার কানে একবার গায়ত্রী মন্ত্রটা শুনিয়ে দেবেন আস্তে আস্তে।

ও-দিকে এরা দু'জন ভারী মুস্কিলে পড়লো। গায়ত্রী মন্ত্র ত' জানে না, বলবে কি? এখন পালাবারও উপায় নেই, দরজা বন্ধ। আসল ব্যাপার টের পেয়ে গেলে রাজার লোক ধ'রে মার লাগাবে।

ধোপারই ভয় হল বেশী, সে বোকা মানুষ। ধূর্ত্ত নাপিত বললে, তুই চুপ ক'রে বোস্ না, আমি মাথায় একটা মত্‌লব ভাঁজছি।

ক্রমে ওদের যখন পালা এলো, ওরা উঠ্‌লো।

চললো হেলে-দুলে যেন কত বড় পণ্ডিত [illegible]।

কাছাকাছি গিয়ে নাপিত মন্ত্রীকে বল্‌লে—তুমি কি একটা কথা তখন বল্‌ছিলে বাপু, দূরে বসেছিলাম, শুনতে পাইনি। কি কথাটি?

মন্ত্রী সবিনয়ে বল্‌লেন, বল্‌ছিলুম প্রভু, গায়ত্রী মন্ত্রটা আমায় কানে কানে শুনিয়ে দানটা গ্রহণ করুন!

নাপিত তখন চোখ পাকিয়ে কপট রাগ দেখিয়ে বললে, কী! এত বড় স্পর্দ্ধা। বেদমাতা গায়ত্রীকে বিক্রয় করব?

মন্ত্রী মুষড়ে গিয়ে বল্‌লেন—বিক্রয় বল্‌ছেন কেন?

বিক্রয় নয়? তোমাকে শুনিয়ে দান গ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে গায়ত্রী মাতাকে বিক্রয় করা। সে আমরা করতে পারব না। রইলো তোমার দান। আমরা চ'লে যাচ্ছি, দ্বার খুলে দাও। আর যাবার আগে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাই যে—

কথা আর শেষ করতে হ'ল না, মন্ত্রী তার পা চেপে ধরলেন, রাজা শুনে ছুটে এলেন, পাত্র-মিত্র-অমাত্য তটস্থ,—ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন—সকলেরই মুখে।

ফলে যা পাবার তা'ত পেলেই, অধিকন্তু আরো অনেক জিনিষ পেলে।

তখন টিকি নাড়তে নাড়তে বগল বাজাতে বাজাতে তারা দেশে ফিরে গেল।

ঝড়ের রাতের পাড়ি

শ্রীগঙ্গা রায়চৌধুরী

কলকল জোয়ারের খলখল হাস্য—
গরজন ঘনঘোর, বিদ্যুৎ-লাস্য—
তাই কি রে মনে তোর ছোঁওয়া লাগে শঙ্কার।
চঞ্চল মন তাই, ছলছল চোখ কি,
জরজর বুক তোর ঝরে আঁখি শোক কি—
জাগুক না ঝঞ্ঝায় যত জোর ঝঙ্কার।
টলে তরী ঠকবি যে আজ হলে ভুল রে,
ডরিস্ না, টলনামা এ গাঙের কূল রে
নিবি খুঁজে কাণ্ডারী পণ কর ভাই আজ,
তরী কাঁপে থরথর নামিয়ে দে পালটা,
দরিয়ায় জাগে ঢেউ ধর কষে হালটা,
নয় আর ক্রন্দন আজ শুধু চাই কাজ।
পশ্চাৎ তাকানোর ফল সব মিথ্যে—
বন্দর মিলবেই ভরসা নে চিত্তে
মন খুলে গেয়ে চল জীবনের জয়গান।
যত হবে পথ শেষ রবে না এ ঝঞ্ঝা
লঙ্ঘিব পারাবার, বল তুই, পণ যা'
রাখবোই নয় ভয়, ভয়ই যে রে শয়তান।
আশীষ যে আঁখিজলে সব চোখে নামছে—
হলো জয় আজ তোর, ঝড় বুঝি থামছে—
দৃঢ় তোর মন তাই হার মানে ঝঞ্ঝা।
নয় আর ভয় শোক উৎসব আজ যে
ডংকায় দুঃসাহসীর জয় বাজছে
হুসিয়ার কাণ্ডারী, রেখেছিস্ পণ যা'।

হীনমন্যতা

শ্রীচিত্রগুপ্ত

৫

এবার প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে হীনমন্যতার আধিপত্য নিয়ে আলোচনা করা যাক্।

এর আগে আমরা দেখেছি, প্রথম শৈশবে যে ভাবে ছেলে-মেয়েরা গড়ে ওঠে তারই প্রভাবটা তার পরবর্ত্তী জীবনটাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। সমাজের সাধারণ নর-নারীর প্রত্যেকের জীবনেরই সর্ব্বপ্রধান অংশ হচ্ছে তাদের বিবাহিত জীবন। এই জীবন নিয়েই সে সমাজকে পরিপুষ্ট করে—সামাজিক শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে। কাজেই এই বিবাহিত জীবনই যদি মানুষের ব্যর্থ হয় তাহলে তার জীবনটাই যে ব্যর্থ হয়ে গেল, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আর যে মানুষগুলোকে নিয়ে সমাজ, সেই মানুষগুলোরই জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে সে সমাজেরই সমূহ ক্ষতি।

তাই মানুষের ব্যক্তিগত হীনমন্যতা রোগই একটা দেশ ও জাতির সর্ব্বনাশ করতে পারে। কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েকে তাদের শৈশব থেকেই যদি ঠিক ভাবে মানুষ করতে পারা যায়, যাতে না কি হীনমন্যতা রোগ তাদের কোনো মতেই পেয়ে বসতে না পারে, তাহলেই সেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হতে পারে। সেই জন্যে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি চাইতে গেলে ছোটো বেলা থেকে তাদেরকে সুষ্ঠু সামাজিক জীবনের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যেমন দরকার, সুষ্ঠু বিবাহিত জীবন ও সুস্থ যৌন-জীবন যাপনের উপযুক্ত শিক্ষাও তেমনি তাদের অতি অল্প বয়স থেকেই ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে শেখানো চাই। এই শিক্ষা এমন সহজ ভাবে তাদের দিতে হবে, যাতে তারা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনে সুশৃঙ্খল সুখময় বিবাহিত জীবন যাপনের প্রতি আগ্রহ পোষণ ক'রতে ক'রতে নিজেকে তার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলতে যত্নবান হয়। অর্থাৎ তারা যেন গোড়া থেকেই এটা বেশ ভালো ক'রে বুঝতে পাবে যে, সুখশান্তিময় বিবাহিত জীবনটা এক সন্ধ্যার দু'টো মন্ত্র পড়ার 'ম্যাজিকের' ফলেই করায়ত্ত হবার নয়। এটা দস্তুর মত একটা সাধনা-সাপেক্ষ জিনিষ।

বিবাহিত জীবনের সুখশান্তির মূল উৎসই হ'চ্ছে অপরিসীম স্বার্থত্যাগ। আর আগের পরিচ্ছেদগুলির আলোচনায় এ-কথাটা খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখানো হ'য়েছে যে হীনমন্যতা রোগের মূলে থাকে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। নিজের মনের স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মম্ভরিতা নিয়ে আর যাই সম্ভব হোক, প্রেমিক বা প্রেমিকা স্বামী বা স্ত্রী হওয়া যায় না। প্রেমের মূল কথাই হচ্চে দান—গ্রহণ নয়। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ মানুষটির হাতে নিজেকে নিঃশেষে দান করবার শক্তিতেই মানুষের বিবাহিত জীবনের সাফল্য লাভ সম্ভব।

সামাজিক জীবনে সাফল্য লাভের যে মূলমন্ত্র, বিবাহিত জীবনে সাফল্য লাভেরও সেই একই মূল-মন্ত্র। শুধু নিজের কথা নয় অন্যের কথাও মনে রাখার শিক্ষাটি উভয় ক্ষেত্রেই অপরিহার্য্য। যে মানুষের মন সুস্থ, নিজের ওপর যার আস্থা আছে, সাহসের যার অভাব নেই, সেই লোকই কি সামাজিক জীবনে আর কি বিবাহিত জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই সুখী হয়। এই সব সুস্থ লোক জীবনের কঠোরতাকে দেখে ভয় পেয়ে জীবনের অকেজো দিক্‌টায় ছুটে পালায় না। সে প্রকৃত বীরের মত সহজ ভাবে জীবনের সব-কিছু সমস্যারই সম্মুখীন হয় এবং নিজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও শক্তির বলে নিজেই সেই সব সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়; অবশেষে বিজয়ীর প্রাপ্য পুরস্কারস্বরূপ সাফল্যমণ্ডিত সুস্থ সামাজিক জীবনকে আয়ত্তে পেয়ে নিজেই নিজের পুরস্কার অর্জ্জন করে। এদের বন্ধু, সঙ্গী ও প্রতিবেশী থাকে। তাদের সঙ্গে জীবনের পথে চলতে এদের তালের গরমিল হয় না।

যে-লোক উপরিউক্ত গুণগুলির অধিকারী নয়, প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে সে-লোক কখনই নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আমরা এ কথাটা ভেবেই দেখি না। যে-ছেলে কাজকর্ম্ম ক'রে রোজগারপাতি করছে সাধারণতঃ তাকেই আমরা সুপাত্র ব'লে ধ'রে নিই। এই সামান্য লক্ষণটিকে বরের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো লক্ষণ ব'লে মনে ক'রে আমরা সুপাত্রের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণটির দিকে তাকিয়ে দেখতে ভুলে যাই। সে লক্ষণটি হ'চ্ছে পাত্রের সমাজপ্রিয়তা। ভুলে যাই যে, অসামাজিক সঙ্কীর্ণমনা লোক কখনও বিবাহের সুপাত্র হ'তেই পাবে না।

বিবাহের ক্ষেত্রে সমান অধিকার-বোধটা হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো কথা। মনে রাখতে হবে, 'রাহুর প্রেমে'র মত সর্ব্বগ্রাসী প্রেম বিবাহিত জীবনের পক্ষে সর্ব্বনাশা ব্যাপার। মনে রাখতে হবে যে, বিবাহের সূত্রে এক জন নর বা নারীকে বন্ধন ক'রে স্বামী বা স্ত্রী কেউই অপরের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের অধিকারী হয় না। বিজয়ীর ভঙ্গী নিয়ে সুখী স্বামী বা স্ত্রী হওয়া যায় না। সমান অধিকার-বোধের দ্বারা পরস্পরের প্রতি অগ্রসর হয় যে প্রেম, একমাত্র সেই প্রেমই বিবাহিত জীবনকে সফল করতে পারে।

এবার দেখা যাক্, বিবাহের জন্যে কি ভাবে মানুষের নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নেওয়া দরকার। এজন্যে যৌন আকর্ষণের সঙ্গে সমাজ-মুখিতার ছন্দপতন যাতে না হয়, সেই ধরণের শিক্ষা পাওয়াই ছেলেমেয়ের জীবনে একান্ত দরকার। এ-কথা সকলেই জানেন যে, সাধারণতঃ ছেলেরা নারী-সঙ্গীর আদর্শ হিসেবে এবং মেয়েরা পুরুষ-সঙ্গীর আদর্শ হিসেবে ছোটবেলা থেকেই যথাক্রমে মা ও বাপকেই তাদের কল্পনার পুরোভাগে স্থান দেয়। কাজেই বড় হয়েও বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলেরা বিবাহের জন্যে সেই পাত্রীকেই খোঁজে—মায়ের সঙ্গে যার মিল আছে। মেয়েরাও সেই ভাবে সেই পাত্রকেই খোঁজে—বাপের আদর্শের ছাঁচে যাকে ফেলা যায়।

কিন্তু অনেক সংসারে এমনও ঘটে, যেখানে ছেলের শৈশবে মায়ের সঙ্গে তার মনের এমন গরমিল ঘটে যার ফলে মায়ের প্রতি তার একটা বিমুখিতা দেখা দেয়। এই সব ক্ষেত্রে ছেলেরা বড় হ'য়ে বিবাহের সময় বেছে বেছে তেমন মেয়েকে বাদ দিতেই চাইবে—তার মায়ের সঙ্গে যে মেয়ের মিল আছে। এ ক্ষেত্রে সে তার মায়ের উল্টো প্রকৃতির মেয়েকেই বিয়ে ক'রতে চাইবে।

শৈশবে এ অবস্থায় ছেলেদের মনের ওপর যে গভীর ছাপটা পড়ে তার প্রভাব এত প্রবল যে, এই সব ছেলে বিয়ের সময় পাত্রী-নির্ব্বাচনে শুধু মায়ের প্রকৃতিই নয়, মায়ের চেহারার খুঁটি-নাটি—যেমন ভ্রূ, চোখ, চুল, দেহের গঠন এবং রঙ, পর্য্যন্ত বাদ দিতে চেষ্টা করে। আবার এও দেখা যায় যে, যে-সংসারে ছেলে ছোটবেলায় দেখেছে যে

তার মায়ের দাপটে বাড়ীর সবাই সন্ত্রস্ত থাকে, সে-সংসারের ছেলে বড়ো হ'য়ে বিবাহ জিনিষটাকেই ভয় করতে থাকে। এমন কি, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা বা প্রেম করার ব্যাপারে পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, এই সব ছেলেরা সাধারণতঃ সেই ধরণের মেয়েদের দিকেই ঝোঁকে—যারা নম্র, ধীর, শান্ত, এমন কি একটু দুর্ব্বল প্রকৃতিরও। আর ছেলেটি যদি আবার মায়ের মত হয় তাহ'লে বিয়ের পরে সে স্ত্রীর সঙ্গে ক্রমাগত কলহ করবে—তার ওপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করবে।

শৈশবে ছেলেদের মধ্যে প্রকৃতিগত যে সব বিশেষ বিশেষ লক্ষণের আভাস দেখতে পাওয়া যায়, বড়ো হ'য়ে বিবাহ বা প্রেমের ব্যাপারে তাদের সেই সব লক্ষণগুলিকেই আরও স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্‌তে দেখা যায়। আশৈশব হীনমন্যতার রোগী বড়ো হ'য়ে বিবাহিত ও যৌন ব্যাপারে কি রকম আচরণ ক'রবে তাও আগে থেকেই অনুমান করা যায়। যে-ছেলে নিজেকে দুর্ব্বল ও অন্যের তুলনায় ঊন বলে ভাববার অভ্যাস ক'রেচে, সে-ছেলে বৈবাহিক ও যৌন ব্যাপারেও অন্যের ওপর নির্ভর করবার চেষ্টা করবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, এই ধরণের ছেলেরা প্রিয়ার মধ্যেও মাকেই খোঁজে। তারা চায় তাদের স্ত্রী তাদেরকে সেই রকম আদর-যত্ন করুক—যে রকম আদর-যত্ন তাদের মায়েদের কাছ থেকে তারা ছোটবেলায় পেয়েছিলো। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে স্বামীটি তাঁর স্ত্রীর কাছেও নেহাৎ 'আদুরে খোকাটি' হ'য়ে থাকতে চান। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের ঊনতার পরিপূরক হিসাবে তার আচরণটা উল্টো পথও ধ'রতে পারে। সে অবস্থায় সে অত্যাচারী উৎপীড়ক স্বামী হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া এক্ষেত্রে আরও জটিল ব্যাপারও ঘটতে পারে। সেটা এই যে, এই রকম ক্ষেত্রে তারা ইচ্ছে ক'রেই হয়তো বেশ কড়া ধাতের একটা মেয়েকেই বিয়ে করে বসলো এবং তার ওপর জুলুম চালাতে আরম্ভ করলো। এর কারণ আর কিছুই নয়, কড়া ধাতের মেয়ের ওপর জুলুম চালিয়ে তাকে বাগ মানিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভের স্পৃহা। এর আসল কারণটি হ'চ্চে কিন্তু তার মনের বদ্ধমূল হীনমন্যতা।

এর ফল কিন্তু পুরুষ ও নারী কারোর পক্ষেই লাভজনক হয় না। মানুষের অন্তর্নিহিত হীনমন্যতা বা শ্রেয়ঃমন্যতার তালটা গিয়ে তাদের বিবাহিত ও যৌন জীবনের ওপর গিয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করাটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নয়, কিন্তু বাস্তব জগতে এ অন্যায় যে হামেশাই ঘটছে এ তো আমরা নিত্য দেখছি।

বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেখানে নর বা নারীকে জীবনের সঙ্গিনী বা সঙ্গী খুঁজতে দেখা যায়, সেখানে আসলে তারা খোঁজে শীকার। এরা এটাও বুঝতে পারে না যে, এই মতলবে যৌন সম্বন্ধের ওপর জুলুম চালানো চলে না। কারণ, এক পক্ষ বিজয়ীর ভঙ্গী নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর জুলুম চালাতে গেলে প্রতিপক্ষও বেশীক্ষণ সেটা সইবে না। শেষাশেষি সে-ও 'ফুঁসে' দাঁড়াবে। তখন ফলটা হবে 'তুম্ ভি মিলিটারী হাম ভি মিলিটারী' গোছের এবং মধুর পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধটা গিয়ে পরিণত হবে হাতাহাতি চুলোচুলি আর ঝটাপটিতে। আর পাড়ার লোকে কর্ত্তা-গিন্নীর এবম্বিধ আসুরিক প্রেমালাপ শুনে হাততালি দিয়ে হাসবে আর টিট্‌কিরি দিয়ে গেয়ে উঠবে—'দ্বন্দ্বে ধ্বাতনম্!'

নিজের নিজের মনের কম্‌প্লেক্সের ইন্ধন যোগাবার মতলব নিয়ে যারা পতি বা পত্নী নির্ব্বাচন করে, তাদের ঐ আচরণের মধ্যে দিয়ে এমন কতকগুলো বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার প্রকাশ লাভ করে যা অন্য ক্ষেত্রে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন অনেকে যারা স্বেচ্ছায় দুর্ব্বল, রোগী বা বৃদ্ধ পতি বা পত্নী নির্ব্বাচন করে তারা ভাবে যে, এর ফলেই বুঝি তারা জীবনে প্রকৃত সুখের সন্ধান লাভ করবে। অনেকে আবার বেছে বেছে বিবাহিত পুরুষ বা নারীর প্রেমে পড়ে বসে থাকে। শেষোক্ত দলের এই আচরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এরা এর দ্বারা এমন একটি সমস্যার সৃষ্টি করে যার সমাধান করতে যাবার উপায়ই থাকবে না। অর্থাৎ এরা আসলে প্রকৃতিগত ভাবে এমনই জীব, যারা জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান করতে চায় না। অর্থাৎ অন্য সব ক্ষেত্রে যেমন প্রেমের ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো ঝঞ্ঝাট পোহানোটা এদের ধাতে সয় না। তাই শুধু 'আহা উহু' করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারার একটা সোজা রাস্তা এরা বার করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। সফল সার্থক প্রেমের দায়িত্ব বহন করার চেয়ে এই রকম করাটা এদের বুদ্ধিতে ঢের বেশী সহজ ঠেকে।

অনেক ছেলে বা মেয়েকে আবার একসঙ্গে দু'টি নারী বা পুরুষের প্রেমে পড়তে দেখা যায়। এ-ও এক ধরণের ফাঁকিবাজী। অর্থাৎ একসঙ্গে দু'জনের প্রেমে পড়া মানে আসলে কারোরই প্রেমে পড়া নয়। প্রেমের ক্ষেত্রে একসঙ্গে দু'জন 'প্রিয়' বা প্রিয়ার' ওজন গোটা একটা 'প্রিয়' বা 'প্রিয়ার' চেয়ে ঢের কম। এর ফলেও এরা পূরো একটা মানুষের সঙ্গে ঠিক ঠিক প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনের গুরু দায়িত্বটিকে এড়িয়ে যায়।

হীনমন্যতার রোগীরা ঘন ঘন পেশা বদল করে, জীবনের সমস্যাগুলিকে সব সময় পালিয়ে পালিয়েই এড়িয়ে যায় এবং কোনো কাজই কোনো দিন শেষ করে না। প্রেম, বিবাহ ও যৌন-ব্যাপারেও তারা ঠিক ঐ রকম আচরণই করে। সে ক্ষেত্রেও তাদের স্বভাবই তাদের ঘাড়ে ধরে হয় তাদের কোনো বিবাহিত মানুষের প্রেমে পড়ায় আর নয় তো প্রেমের পথে একসঙ্গে দু'টি প্রণয়াস্পদ জুটিয়ে আনে। যার ফলে শেষাশেষি তাকে কোনো দায়িত্বই ঘাড়ে নিতে হয় না। আর আসলে এইটাই তো তাদের মন চায়! তাছাড়া সারা জীবন ধ'রে কোর্টশিপ্ চালিয়ে চালিয়ে আসল ব্যাপার যে বিয়ে সেইটেকে এড়িয়ে চলার মতন রকমফের আবিষ্কার করতেও এদের অসুবিধা হয় না।

আদুরে ছেলেরা বিয়ের পরেও তাদের স্বভাব বদলায় না। বিয়ের আগে বা বিয়ের পরে নতুন নতুন কিছু কাল পর্য্যন্ত ব্যাপারটা তাদের প্রিয়াদের কাছে বেশ মিঠেও লাগ্‌তে পারে। কিন্তু সেই 'কিছু কালটা' কেটে যাওয়ার পরেই বাধে মুস্কিল। তাছাড়া বর আর বধূ দু'জনেই যদি ঘটনাচক্রে একই আদুরে stock থেকে এসে জোটে মুস্কিলটা তাহ'লে আবার আরও ঘোরালো হ'য়ে ওঠে। দু'পক্ষই তখন হাত-পা এলিয়ে দিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে শুয়ে আদুরে খোকা-খুকুর মত কেবলই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে 'আবদার খাওয়া'র 'বায়না' ধরলে তাদের ভোলাতে আসবে কোন্ তৃতীয় ব্যক্তি? তখন উভয়েরই যে যার মনের মধ্যে জমা ক'রে তুল্‌তে থাকে অপরের বিরুদ্ধে নালিশ—সে নালিশের আর কিনারা হবে কি ক'রে?

স্বামী ভাবতে থাকে স্ত্রী তাকে বুঝলো না, স্ত্রী-ও ভাব্‌তে থাকে স্বামী তাকে বুঝ্‌লো না। তখন অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই

স্বপ্ন-শেষ

শ্রীকরুণাময় বসু

শ্রাবণের মেঘ যেন গগন-কোণায়
ঘনায় আপন মনে চিকণ সোণায়
ললিত শ্যামল রঙে, সেই সব ছবি
এখনি ভুলিয়া গেলে হে মোর মাধবি ?

শরতের কুসুমিত শিউলির বনে
ঝরেছে শিশিরকণা করুণ নয়নে,
ভিজে ফুলগুলি লয়ে গাঁথিয়াছি হার,
ভুলেছ কি সে-দিনের সেই উপহার ?

তারা-পরী জেলেছিল সাঁঝের প্রদীপ,
তোমার কপালে ছিল কাচপোকা টিপ,
কোমল কপোল-তলে রেখেছিলে হাত,
স্বপনে মিলাল সেই হিমন্ত রাত।

ফাগুনে পলাশ-বনে জেগেছিল রং,
পাখীর গলায় ছিল গৌড়সারং ;
রাতগুলি বেজেছিল বেহালার মীড়ে,
আগুন কে জেলে দিল সে দিনের নীড়ে ?

ক্ষীণ নদী জেগেছিল বালুর চড়ায়,
বালিহাঁস সেথা বসি পালক ঝরায় ;
ঝিরি ঝিরি জল চলে ডাকে জলপিপি
ও-পারে খড়ির বনে ; উদাস পৃথিবী।

বিদেশী মেঘের দল পাগড়ী মাথায়
রঙের ভেলায় চড়ি চলেছে কোথায় ?
ভিজে ঘাসে হিমকণা ঝরে টুপটাপ,
গাছের নিরালা কোণে চলেছে আলাপ।

কোথায় সে-দিন গেল, সে-দিনের রাত,
রাঙা রাখী চেয়েছিল দু'জনার হাত ;
মায়াময় জ্যোৎস্নায় কাঁপে যুঁই ফুল,
আজ শুধু মনে হয় সে কি সব ভুল ?

আকাশে উড়িয়া গেছে সময়ের পাখী,
ঠোঁটে বুঝি নিয়ে গেল সে-দিনের রাখী ;
তুমি গেছ ওই পার—আমি এই পারে,
ভাঁটার স্রোতের ফুল ফেরে কি জোয়ারে ?

হয়! আমাকে বুঝ্‌লো না এই ধারণার ফলে লোকে নিজেকে বঞ্চিত ভাবে। নিজেকে বঞ্চিত ব'লে ভাবা মানে তাদের মনে জমে ওঠে ঊনতা বোধ। আর মনে ঊনতা বোধ জমে উঠ্‌লে জাগে এড়াবার বা পালাবার আগ্রহ। কিন্তু বিবাহের 'সাতপেকে' গাঁঠে-বাঁধা জীবন থেকে তখন আর পালাবার পথ কোথা? তাই তখন দারুণ ক্ষোভে প্রতিপক্ষের ওপর নিজের ব্যর্থতার শোধ তোলবার আক্রোশ জাগে। আর শোধ তোলবার সব চেয়ে সাধারণ রাস্তা হ'চ্চে বিশ্বাসভঙ্গ।

তারা নিজেরা কিন্তু এ কথাটা হয়তো মান্‌তে চাইবে না। তারা বল্‌বে 'শোধ তোলা-তুলি' আবার কি? ও-সব নয়। আসল কারণ হ'চ্ছে জীবনের পথে উদিত নতুন মানুষটির প্রতি প্রগাঢ় প্রেমই আসলে তাদের স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কারণ হ'য়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিন্তু মোটেই তা নয়। তা মুখে 'নতুন' প্রেমের স্বপক্ষে বড় বড় কথা ব'লে যত তারস্বরেই তারা গলাবাজি করুক। আসল কারণ হ'চ্চে স্বামী বা স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাদের মনের গোপনে সঞ্জাত আক্রোশ আর তার ফলে প্রতিশোধ নেবার তাগিদ।

[ক্রমশঃ।

আয়ুর্ব্বেদে দ্রব্যবিজ্ঞান

শ্রীনলিনাক্ষ দাস মহাপাত্র

আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ কতকগুলি চেতন ও অচেতন দ্রব্যের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই দ্রব্যগুলি কি এবং কি হ'তে এদের উৎপত্তি হল সে সম্বন্ধে বোধ হয় আপনাদের ভাল ভাবে জানা নাই; এই সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থরাজি সমালোচনা ক'রে আপনাদের সময় নষ্ট করব না। শুধু সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্য-দর্শনের মূলতত্ত্বটুকুই আলোচনা করব।

যখনই একটা সুন্দর ফুল দেখি, সেই ফুলটি কি; কি রকম তার গাছ, কোন্ দেশে পাওয়া যায় বা কোন্ মাটিতে জন্মে, কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি প্রশ্নে আমাদের মন ভ'রে যায়। কিরূপে উৎপন্ন হয় এই প্রশ্নের জবাব মিলে হয়ত সেই জাতীয় ফুলগাছটি অন্য এক গাছের কোন ডাল বা বীজ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমেই যে গাছটির সৃষ্টি হ'য়েছিল তার বীজ কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের জবাবে জড়বিজ্ঞানের উপাসক বলেন যে, এ প্রকৃতিতে আপনা আপনি হয়েছে। দ্বৈতবাদীরা বলেন, এ ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, সূক্ষ্মসত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ই চেতন ও অচেতন দ্রব্যরূপে সৃষ্ট হয়েছেন। এই সৃষ্ট জগৎই ভগবানের একমাত্র বিকাশ। এই সমস্ত উত্তর অবলম্বন করে আমাদের সাংখ্যদর্শনকার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আয়ুর্ব্বেদেও তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই জগৎসৃষ্টির মূলে। পরম সূক্ষ্ম অব্যক্তের ব্যক্ততাই জগৎ। এই একমাত্র অব্যক্তের পৃথক্ পৃথক্ অংশ পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য শক্তিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন জীবরূপে এবং চেতনাশক্তিহীন অব্যক্তের অবশিষ্টাংশ পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে। অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি, প্রধান এইগুলি একার্থবাচক; পরম-সূক্ষ্ম চেতনাশক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষ। সুশ্রুতে আছে—"সর্ব্ব-ভূতানাং কারণং অকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণং অষ্টরূপং অখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুঃ অব্যক্তং নাম। তদেকং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং অধিষ্ঠানং সমুদ্র ইব ঔদকানাং ভাবানাম্। উভৌ অপি অনাদী উভৌ অপি অনন্তৌ উভৌ অপি অলিঙ্গৌ উভৌ অপি নিত্যৌ উভৌ অপি অপরৌ উভৌ চ সর্ব্বগতৌ ইতি। একা তু প্রকৃতিঃ অচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণী অমধ্যধর্ম্মিণী চেতি। বহবস্তু পুরুষাঃ চেতনাবন্তঃ অগুণাঃ অবীজধর্ম্মিণঃ অপ্রসবধর্ম্মিণঃ মধ্যস্থধর্ম্মিণশ্চেতি।" অব্যক্ত কি তা আগে বলা হয়েছে এবং বিস্তারিত ভাবে পরে বলা হচ্ছে। একটি মাত্র সমুদ্রে যেমন নানাবিধ সামুদ্রিক জীব থাকে সেইরূপ [illegible]

এবার পুরুষ ও মূল প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বলা হচ্ছে। পুরুষ ও মূল প্রকৃতি উভয়েরই উৎপত্তির কোন কারণ নাই, নাশ হওয়ারও কোন কারণ নাই। এঁদের উভয়ের কোন চিহ্ন নাই যদ্দারা এঁদের চেনা যায়। উভয়েই চিরস্থায়ী ও পরম শ্রেষ্ঠ। ব্যাপকতার জন্য উভয়েই যে কোন আকার ধারণ করতে পারে। তবে উভয়ের তফাৎ এই যে, সমুদয় জগৎসৃষ্টির মূলে মূল প্রকৃতি মাত্র একটি কিন্তু পুরুষ অনেক, প্রকৃতি অচেতন কিন্তু পুরুষ চেতনা-শক্তি। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণবিশিষ্ট কিন্তু পুরুষ নিগুণ। প্রকৃতিই বীজস্বরূপ এবং তাহ'তে ক্রম বিকাশ হয়ে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পুরুষের কোন সৃষ্টির ক্ষমতা নাই। প্রকৃতিই সুখ-দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু পুরুষ সুখ ও দুঃখে নির্লিপ্ত। সাংখ্যাচার্য্য বলেছেন— "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সত্ত্ব হচ্ছে শুদ্ধ প্রকাশ, রজঃ হচ্ছে ক্রিয়াশক্তি আর তমঃ হচ্ছে জড়ভাব। অতএব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর সমান অবস্থা হচ্ছে জড়শক্তির শুদ্ধ প্রকাশ মাত্র এবং ইহাই মূল প্রকৃতি। সৃষ্টির প্রারম্ভে মাত্র জড়ভাবের প্রকাশ হয়েছে এবং তন্নিহিত শক্তি তখন মাত্র কর্ম্ম সাধনে উন্মুখ হয়েছে এই অবস্থাই মূল প্রকৃতি। তৎপরে যখন কর্ম্ম সাধিত হল তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর বৈষম্য অবস্থা উৎপন্ন হল এবং তার নাম হল মহান্। এবং এই ত্র্যাত্মক মহান্ থেকে অপর এক বৈষম্য-যুক্ত অবস্থার উৎপত্তি হল—তার নাম হল অহঙ্কার। এইরূপে সত্ত্বাধিক অহঙ্কার থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—শ্রবণ, স্পর্শন দর্শন, রসন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়; পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং বুদ্ধি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক মন এই এগারটির উৎপত্তি হয়েছে। তমোঽধিক অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্র যথা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হল, আবার এই পঞ্চতন্মাত্র থেকে যথাক্রমে আবার পঞ্চ মহাভূতের, যথা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্, ও ক্ষিতির উৎপত্তি হয়েছে। মূল প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবিশিষ্ট বলে তদ্জাত পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়ও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট। তবে আকাশভূত সত্ত্বগুণবহুল, বায়ুভূত রজোবহুল, অগ্নিভূত সত্ত্ব ও রজোবহুল, অপ্‌ভূত সত্ত্ব ও তমোবহুল এবং ক্ষিতিভূত তমোবহুল। মন সত্ত্ববহুল এবং দশেন্দ্রিয় রজঃ ও তমোবহুল। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে পরম সূক্ষ্ম মূল প্রকৃতি অব্যক্ত। এই অব্যক্ত হ'তে ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত হয়ে মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটিও সূক্ষ্ম প্রকৃতি। কাজেই মোট আটটি সূক্ষ্ম প্রকৃতির মধ্যে রাজস অহঙ্কার থেকে ব্যক্ত হয়ে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কার থেকে জাত পঞ্চতন্মাত্র থেকে ক্রমশঃ ব্যক্ত হয়ে ব্যক্ততার ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্, ও [illegible] এই [illegible] উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে মোট আটটি

সূক্ষ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটি স্থূল বিকৃতি ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটি, আটটি সূক্ষ্ম প্রকৃতির ক্রমবিকাশমান অবস্থা। এবং এই ষোলটিই চেতন ও অচেতন জাগতিক বিবিধ দ্রব্যতেই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সুশ্রুতে আছে—"অন্যোন্যানুপ্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ। যে যে দ্রব্যে তু সর্ব্বেষাং ব্যক্তং লক্ষণমিষ্যতে। তস্মাৎ তেন ভূতানি তদ্গুণাস্তেব চাদিশেৎ। তৈশ্চ তল্লক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামো ব্যতজ্যেত।" প্রত্যেক দ্রব্যই প্রকৃতির অংশবিশেষ এবং প্রত্যেক দ্রব্যের বিভিন্নতার একমাত্র কারণ প্রকৃতির অংশবিশেষের বিভিন্নতা। প্রকৃতির যে অংশবিশেষের সহিত পুরুষ সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত হয়, সেই অংশবিশেষে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতের সম্যক্ বিকাশ হয় এবং তাকেই বলে চেতন দ্রব্য বা জীব। পুরুষব্যতিরিক্ত প্রকৃতির অংশবিশেষ সমূহই বিবিধ অচেতন দ্রব্য। অচেতন দ্রব্যে আর একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় না। মাত্র পঞ্চমহাভূতেরই বিকাশ হয়, কাজেই প্রকৃতির অংশবিশেষ হইতে ব্যক্ত বিশিষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতের সহিত বিশিষ্ট পুরুষের সমবায় সম্বন্ধে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়েই বিশিষ্ট জীবের সৃষ্টি, আর প্রকৃতির অন্যান্য অংশবিশেষ হতে ব্যক্ত বিশিষ্ট পঞ্চমহাভূত সমবায় সম্বন্ধে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়েই বিশিষ্ট দ্রব্যরূপে সৃষ্ট হয়েছে।

তাহ'লে এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র প্রকৃতির অংশবিশেষ হ'তে ব্যক্ত পঞ্চমহাভূত সমূহ জড় পদার্থের মূল উপাদান আর জীব-সমূহের মূল উপাদান হচ্ছে পঞ্চমহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পুরুষ। এই মূল উপাদানসমূহ কি জীব, কি জড় পদার্থ প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সমবায় সম্বন্ধে রয়েছে। এই সমবায় সম্বন্ধ বিচ্যুত হ'লেই জীব বা জড় পদার্থের নাশ হয় এবং তন্মুহূর্ত্তেই অন্য সমবায় সম্বন্ধে নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এইরূপে ধ্বংস ও সৃষ্টি অবিরত চ'লেছে। আগেই বলা হয়েছে পুরুষ বহু। মানুষের পুরুষ, বাঘের পুরুষ, কৃমির পুরুষ ও উদ্ভিদের পুরুষ এক নয়। মানুষের পুরুষ প্রকৃতির যে অংশের সহিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত হওয়াতে মানবজাতি সৃষ্ট হয়েছে, ব্যাঘ্রের পুরুষ, কৃমির পুরুষ বা উদ্ভিদের পুরুষ প্রত্যেকেই প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ-বিশেষের সহিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত হওয়াতে ব্যাঘ্রজাতি, কৃমিজাতি বা উদ্ভিদ্জাতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক জাতির ভিতর আবার অনেক রকমের পুরুষ আছে। মহাত্মা গান্ধীর পুরুষ আর আপনার আমার পুরুষ এক নয়। মহাত্মার পুরুষ প্রকৃতির এক মহান্ অংশের সহিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত এবং সেই জন্য গান্ধীই মহাত্মা। আমরা সাধারণ মানুষ, কেন না, আমাদের প্রত্যেকের পুরুষ, প্রকৃতির বিভিন্ন সাধারণ অংশের সহিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত। এইরূপে বহু রকমের মানব বহু রকমের ইতর জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে

এখন এই মূল উপাদানসমূহের গুণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। পুরুষ সম্বন্ধে আগেই বলেছি। শাস্ত্রে আছে— "পঞ্চভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা। শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ।" অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি শব্দতন্মাত্র হ'তে ব্যক্ত আকাশ-ভূতের গুণ শব্দ, এইরূপে স্পর্শতন্মাত্র হ'তে ব্যক্ত বায়ুভূতের গুণ স্পর্শ, রূপতন্মাত্র হতে ব্যক্ত অগ্নিভূতের গুণ রূপ, রসতন্মাত্র হ'তে ব্যক্ত অপ্‌ভূতের গুণ রস এবং গন্ধতন্মাত্র হ'তে ব্যক্ত ক্ষিতিভূতের গুণ গন্ধ। আবার সুশ্রুতে আছে—"বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বচনাদানানন্দবিসর্গবিহরণানি।" অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় রস এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ। বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় ভাষণ, পাণীন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ, উপস্থ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের বিষয় আনন্দ, পায়ু ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ গুহ্যদেশের বিষয় মলাদির ত্যাগ, পাদ ইন্দ্রিয়ের বিষয় চলাফেরা। অতএব কর্ণ দ্বারা আকাশভূতের, ত্বক্ দ্বারা বায়ুভূতের, চক্ষু দ্বারা অগ্নিভূতের, জিহ্বা দ্বারা অপ্‌ভূতের এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা ক্ষিতি-ভূতের বেশ উপলব্ধি করা যায়। এ ছাড়া পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। চরকে আছে—"খরদ্রবচলোষ্ণত্বং ভূজলানিলতেজসাং। আকাশস্যাঽপ্রতীঘাতঃ" অর্থাৎ ক্ষিতিভূতের ধর্ম্ম খরত্ব অর্থাৎ কঠিনতা বা ঘনতা বা ভারিত্ব, অপ্‌-ভূতের ধর্ম্ম দ্রবত্ব অর্থাৎ তরলতা, বায়ুভূতের ধর্ম্ম চলত্ব অর্থাৎ গতিশীলতা, অগ্নিভূতের ধর্ম্ম উষ্ণত্ব ও আকাশভূতের ধর্ম্ম অপ্রতীঘাতত্ব অর্থাৎ অবকাশ। আবার জড় পদার্থ বা জীবশরীরে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক্ ক্রিয়ারও উল্লেখ সুশ্রুত-সংহিতায় আছে।

আকাশভূতের কর্ম্ম "সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততা চ" অর্থাৎ দ্রব্যের ছিদ্র-সমূহ (Perosity) বা প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যস্থিত অবকাশ (Intramdecular space)। বায়ুভূতের কর্ম্ম "সর্ব্বচেষ্টাসমূহঃ সর্ব্বশরীরস্পন্দনং লঘুতা চ" অর্থাৎ দ্রব্যোৎপাদনে উহার প্রতি কণার পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য গতিবেগ (Intramdecular force) জীব-শরীরের স্পন্দন এবং দ্রব্যকে হাল্‌কা করা। অগ্নিভূতের কর্ম্ম "বর্ণসন্তাপৌ ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষস্তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ" অর্থাৎ দ্রব্যোৎপাদনে ইহার বর্ণ (Colour) উত্তাপ, দীপ্তি, পরিপাকক্রিয়া, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা, বীরত্ব (জীবশরীরে) উৎপাদন করা। অপ্‌ভূতের কর্ম্ম "সর্ব্বদ্রবসমূহো গুরুতা শৈত্যং স্নেহো রেতশ্চ" অর্থাৎ দ্রব্যোৎপাদনে উহার তরলাংশ, ঘনত্ব, শীতলতা, তৈলাক্ত ভাগ উৎপাদন করা। ক্ষিতিভূতের কর্ম্ম "সর্ব্বমূর্ত্তিসমূহো গুরুতা চ" অর্থাৎ দ্রব্যোৎপাদনে উহার বিভিন্ন আকার গঠন করা এবং ভারিত্ব (Weight) উৎপাদন করা। এইরূপে প্রত্যেক দ্রব্যে পঞ্চমহাভূত-সমূহের কোন্‌টি কি পরিমাণে সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত, তাহা মোটামুটি ভাবে উহাদের গুণ, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া দ্বারা জানা যায়। সমস্ত দ্রব্যের উপাদান পঞ্চমহাভূত হলেও প্রত্যেক দ্রব্যে কোন না কোন ভূতের আধিক্য থাকে। যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে সেই দ্রব্যকে তদ্ভৌতিক বলা হয় এবং সেই দ্রব্যে সেই ভূতের গুণ, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া বিশেষ প্রকাশ পায়। অন্যান্য ভূতের গুণ, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া অল্প প্রকাশ পায়।

এইরূপে প্রত্যেক ভূতের আধিক্য অনুসারে দ্রব্য-সমূহকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। ক্ষিতিভূতের আধিক্য-বিশিষ্ট দ্রব্যকে বলা হয় পার্থিব (Solids), অপ্‌ভূতের আধিক্য-বিশিষ্ট দ্রব্যকে বলা হয় আপ্য (Liquids), বায়ুভূতের আধিক্য বিশিষ্ট দ্রব্যকে বলা হয় বায়বীয় (Gases & Vepours), অগ্নিভূতের আধিক্য-বিশিষ্ট দ্রব্যকে বলা হয় আগ্নেয় (Heated substances) এবং আকাশভূতের আধিক্য-বিশিষ্ট দ্রব্যকে বলা হয় আকাশীয় (Ither)। এই পঞ্চজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক জাতীয় দ্রব্যকে অন্য চারিটি ভূতের

প্রত্যেকের অধিক পরিমাণে সংযোগ হেতু আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—অন্যান্য ভূতের তুলনায় ক্ষিতিভূতের অত্যাধিক্য হেতু কতক পার্থিব দ্রব্য খুব ভারী,—যেমন লৌহ, স্বর্ণাদি ধাতু দ্রব্য। আবার ক্ষিতিভূতের সহিত অন্য ভূতের তুলনায় একটু বেশী বায়ুভূতের সংযোগ হওয়ায় কতক পার্থিব দ্রব্য খুব হাল্কা—যেমন তুলা। এইরূপ তেজবহুল পার্থিব দ্রব্য—যথা কয়লা, অপ্‌বহুল পার্থিব দ্রব্য—যথা মাংসপেশী। আকাশবহুল পার্থিব দ্রব্য—যথা ধূম্র। আবার অত্যধিক অপ্‌বহুল আপ্য দ্রব্য—যথা পরিশ্রুত জল। ক্ষিতিবহুল আপ্য দ্রব্য—যথা খনিজ জল, দুগ্ধ। তেজবহুল আপ্য দ্রব্য যথা—মদ্য। বায়ুবহুল আপ্য দ্রব্য যথা—তৈল। আকাশবহুল আপ্য দ্রব্য—যথা আন্তরীক্ষ জল। অত্যন্ত তেজবহুল আগ্নেয় দ্রব্য যথা—সূর্য্য। বায়ুবহুল আগ্নেয় দ্রব্য যথা—অগ্নিশিখা। আকাশ-বহুল আগ্নেয় দ্রব্য যথা—বিদ্যুৎ। অপ্‌বহুল আগ্নেয় দ্রব্য যথা—বাড়বাগ্নি। ক্ষিতি-বহুল আগ্নেয় দ্রব্য যথা—অঙ্গার। অত্যন্ত বায়ু-বহুল বায়বীয় দ্রব্য যথা—ঝটিকা। আকাশবহুল বায়বীয় দ্রব্য—পার্ব্বত্য বাতাস। অপ্‌বহুল বায়বীয় দ্রব্য মলয় বাতাস। তেজবহুল বায়বীয় দ্রব্য মরুজ বাতাস। ক্ষিতিবহুল বায়বীয় দ্রব্য যথা—গন্ধবহুল জাঙ্গল বাতাস। অত্যন্ত আকাশবহুল আকাশীয় দ্রব্য যথা Absolute vaccum। বায়ুবহুল আকাশীয় দ্রব্য নীল আকাশ। তেজবহুল আকাশীয় দ্রব্য যথা—বজ্র। অপ্‌বহুল আকাশীয় দ্রব্য যথা—ইথার। ক্ষিতিবহুল আকাশীয় দ্রব্য যথা—মাছের পোটা। এগুলি কেবল উদাহরণ মাত্র। এইরূপ পঞ্চমহাভূতের কম বেশী পরিমাণে সমবায় সম্বন্ধ জগতের যাবতীয় দ্রব্যের সৃষ্টি হয়েছে আবার দ্রব্যের রস আপ্য হ'লেও মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ছয় রকম আস্বাদনের বিভিন্নতাও যে কোন দুইটি ভূতের বাহুল্যে উৎপন্ন হয়। পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের রস ক্ষিতি ও অপ ভূতাধিক হ'লে মধুর স্বাদ হয়। অপ্‌ ও অগ্নিভূতাধিক হলে অম্লস্বাদ। ক্ষিতি ও অগ্নিভূতাধিক হ'লে লবণস্বাদ, বায়ু ও অগ্নিভূতাধিক হ'লে কটুস্বাদ, বায়ু ও আকাশ ভূতাধিক হ'লে তিক্ত স্বাদ, এবং ক্ষিতি ও বায়ুভূতাধিক হ'লে কষায়স্বাদ হয়। দ্রব্যের রস ঐ দ্রব্যের পাঞ্চভৌতিক আপ্য অংশ ছাড়া কিছু নয়। আবার দ্রব্যের রস যে আস্বাদ-বিশিষ্ট এবং সেই আস্বাদ যে যে ভূতের বাহুল্যের জন্য হয়েছে, সেই সেই ভূতের আধিক্যও তদ্‌রসাশ্রিত দ্রব্যে থাকে। এইরূপে যে যে দ্রব্যে একাধিক রসের আস্বাদ যে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সেই দ্রব্য তদনুরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট সেই সেই ভূতাধিক হয়। আবার শরীরের উপর প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়া, শক্তি বা বীর্য্য আছে। শীত তদ্‌বিপরীত উষ্ণ, স্নিগ্ধ তদ্‌বিপরীত রুক্ষ, গুরু, লঘু, মৃদু, তীক্ষ্ণ এই আটটি বীর্য্যও এক বা একাধিক ভূতের বাহুল্যে উৎপন্ন হয়। যথা অগ্নিভূতের বাহুল্যে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ-বীর্য্য, ক্ষিতি ও অপ্‌ভূতের বাহুল্যে গুরু ও শীতবীর্য্য, অপ্‌ভূতের বাহুল্যে স্নেহবীর্য্য, বায়ুভূতের বাহুল্যে রুক্ষবীর্য্য, অপ্‌ ও আকাশভূতের বাহুল্যে মৃদুবীর্য্য, অগ্নি আকাশ ও বায়ুভূতের বাহুল্যে লঘুবীর্য্য। জীব-শরীরে দ্রব্যের বিভিন্ন ক্রিয়াও ভূতাদির বাহুল্যের উপর নির্ভর করে। যথা যাবতীয় বিরেচক দ্রব্য ক্ষিতি ও অপ্‌ভূত-বহুল। বমনকর দ্রব্য অগ্নি ও বায়ুভূত-বহুল। ক্ষিতি, অপ্‌, অগ্নি ও বায়ুভূতবহুল দ্রব্য কারক ও বিরেচক উভয়বিধ গুণবিশিষ্ট। আকাশভূতবহুল দ্রব্য সংশমন। বায়ু-বহুল দ্রব্য সংগ্রাহী। অগ্নিভূতবহুল দ্রব্য দীপন। বায়ু ও অগ্নিভূতবহুল দ্রব্য লেখন, ক্ষিতি ও অপ্‌ভূতবহুল দ্রব্য বৃংহণ। এইরূপ ভূতাদির তারতম্যে বহুবিধ ক্রিয়াশীল দ্রব্য আছে।

উপরোক্ত রূপে আমরা প্রত্যেক দ্রব্যে পঞ্চমহাভূতের উপলব্ধি করি মাত্র কিন্তু কোন দ্রব্যকে বিশ্লেষণ ক'রে আমরা পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেককে পৃথক্‌ করতে পারি না। বিশ্লেষণ করে যা যা পাই তাহারা প্রত্যেকে এক এক জাতীয় পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য-বিশেষ। এইরূপ যে যে দ্রব্য সংযোজন করে আমরা নূতন দ্রব্য পাই সেই সেই দ্রব্যের কোনটিই পঞ্চমহাভূতের কোন একটি ভূত নয় অপিচ সেইগুলি প্রত্যেকই বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য-বিশেষ। যখন দুইটি বা ততোধিক পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের রাসায়নিক সমবায় সম্মিলনে কোন নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি হয় তখনই পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলির প্রত্যেকেরই পাঞ্চভৌতিক সমবায় সম্বন্ধ ধ্বংস হয় এবং ঐ দ্রব্যগুলি হ'তে জাত মিলিত প্রত্যেকটি ভূত বিভিন্ন পরিমাণে অন্যান্য ভূতাদির সহিত নূতন সমবায় সম্বন্ধে মিলিত হ'য়ে নূতন দ্রব্য সৃষ্টি করে। দ্রব্যের বিশ্লেষণ সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে যে দ্রব্যকে বিশ্লেষণ করা যায় তাতে তার সমবায় সম্বন্ধ নষ্ট হয় এবং সেই দ্রব্যের উপাদানভূত পঞ্চ মহাভূত প্রত্যেকে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ভূতের এই এক এক ভাগ লইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ দুই বা ততোধিক পঞ্চ মহাভূতের সমবায় সম্বন্ধে দুই বা ততোধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে নিত্যই কত দ্রব্যের ধ্বংস হচ্ছে আবার কত নূতন নূতন দ্রব্য সৃষ্টি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই।

আগেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চমহাভূতের পৃথক্‌ কিছু সত্তা নাই দ্রব্যতে উহাদের উপলব্ধি হয় মাত্র। এইরূপ এক এক ভূতাধিক পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যে উপলব্ধির বিষয়। তবে যত সূক্ষ্ম ভাবে এক এক ভূতাধিক পাঞ্চভৌতিক মূল দ্রব্য আবিষ্কার করা যায় ততই তাদের সংযোজন ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে নূতন নূতন দ্রব্যাবিষ্কার নিশ্চিত হয়। আগেকার বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল, ৯২টি পাঞ্চভৌতিক মূল পদার্থ থেকেই যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এখন সে ধারণা বদ্‌লে গেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে ধন্যবাদ। তাঁরা এখন বল্‌ছেন যে, পাঁচটি মূল পদার্থই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদের মূলে তাদের নাম প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, পজিট্রন এবং আর এক অনাবিষ্কৃত। প্রাচ্যমতে ঐ গুলি একটি একটি পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পঞ্চ মূল পদার্থ যে যথাক্রমে পার্থিব, আগ্নেয়, আপ্য, বায়বীয় ও আকাশীয় এই পঞ্চ মূল পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংস্করণ নয়, তার সঠিক উত্তর কে দিবে?

সাত বছর পরে

শ্রীশান্তি পাল

শরতের সকাল—

বাংলা দেশের মেয়েদের জন্যে একটি 'সুইমিং পুল' প্রবন্ধ সবে মাত্র কয়েকটি কথা লিখেছি, এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে বাবু, এক জন ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।

হাতের লেখা ফেলে নীচে এসে দেখলুম, আনন্দ-মেলার সুধা মুখুয্যে ও আরও কয়েক জন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ও আপনারা ? আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য ! তা কষ্ট করে একখানি পথ ঠেলে আসবার কারণটা জানতে পারি কি ?

আমরা মেয়েদের জন্তে একটা সাঁতারের আয়োজন করছি। এ উৎসবে বোম্বাইয়ের মেয়ে-সাঁতারুরাও যোগ দিতে আসছেন। তা ছাড়া এক জন অষ্ট্রীয়ান ও এক জন হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে-সাঁতারুও আসছেন—তার পেয়েছি। আপনাকে সাহায্য করতে হবে।

সাহায্য !—কি রকম ?

বাংলা দেশের মেয়ে-সাঁতারুদের একত্র ক'রে আপনাকে ট্রেণিং দিতে হবে। লীলাকেও চাই।

তা ত আনন্দেরই কথা, কিন্তু, পাঁচ-সাত বছর হ'ল আর ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে বড় একটা ঘেঁসি না—আমিও না, লীলাও না। সাঁতার-টাঁতার এক রকম ভুলে গেছি বললেই চলে, কাজেই আমাকে মাপ করবেন। আপনারা আর কাউকে চেষ্টা করুন।

ঘণ্টাখানেক ধরে হাঁ-না করে কেটে গেল। নিরুপায় হয়ে বললাম—আচ্ছা বিকালে একবার ক্লাবে আসবেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।

বিকালে যথাসময়ে অলকা তাঁর স্বামী ডাঃ বিমল উকীলকে সঙ্গে ক'রে আমাদের ক্লাবে এলেন, তারপর আমাকে এক রকম জোর করে মোটরে তুলে লীলার বাড়ী নিয়ে গেলেন।

লীলার স্বামী সুধাংশুকুমার বাড়ীতেই ছিল। ওপরের একটা ঘরে গিয়ে সকলে বসলাম। অলকা উকীল কথা প্রসঙ্গে সাঁতারের কথা পাড়লেন। বললেন—লীলাকে চাই। তা না হলে আমাদের আয়োজন ব্যর্থ হবে। আপনি কিন্তু অমত করবেন না।

আমার আবার মতামত কি ? শান্তিদাকে বলুন, উনি যা করবেন তাই। সুধাংশুকুমারের কাছে ভরসা পেয়ে অলকা উকীল আমাকে কথার জালে ফেললেন জড়িয়ে। আমি আর 'না' বলতে পারলাম না। উৎসবের মাত্র আর ২২ দিন বাকি।

সমিতির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পরের দিন সকালে লীলাকে হেদোর জলে নামিয়ে দিলুম। কে বলবে যে সাত বছর ধরে তার হেদোর জলের সঙ্গে মিতালি নেই ! সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক-টানা ৪০০ মিটার সাঁতার কেটে দিল। আমি ত একবারে অবাক্ ! হাত-পাড়ি ঠিকই আছে। তবে গতি-বেগ কিছু মন্দ ! তা হোক্। সাঁতার থামাতে বললাম—বা ! লীলা, চমৎকার সাঁতার কাটো ত তুমি !

সাত বছর পরে লীলা আবার জলে নেমেছে, খবরটা সাঁতারু-মহলে দাবানলের মত পড়ল ছড়িয়ে। মেয়েদের মধ্যে পড়ে গেল একটা সাড়া, দেখতে দেখতে ৫০-৬০ জন স্কুল-কলেজের মেয়ে হেদোয় আমার কাছে এলো সাঁতার শিখতে। দলে পুরানো সাঁতারু রমা সেনগুপ্তা ও গীতা ব্যানার্জিও আছেন।

বিদেশিনীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্তে আমি কেবল রমা, লীলা ও গীতাকে মনোনীত ক'রে তাঁদের খুব যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগলাম। স্কুল-কলেজের মেয়েদের কেবল মাত্র হাত-পাড়িগুলো একটু পরিষ্কার করে দিয়ে কোন রকমে কাজ চালাবার উপযোগী করে ছেড়ে দিলাম। সকাল থেকে ছুটো পর্য্যন্ত কেবল সাঁতার আর সাঁতার। মেয়েদের সে কি অধ্যবসায় ! সে কি উৎসাহ !

১৯৪৪-এর ২৭শে আগষ্ট, রবিবার। সাঁতারের উৎসব। হেদোয় তিল ধারণের স্থান নেই ! বাড়ীর ছাদে, মেরাপের চালে, গাছের ডালে, এমন কি, পুকুরের হাঁটু জলে পর্য্যন্ত উৎসুক দর্শকেরা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কি উল্লাস ! সে-দিন সাঁতারুদেরও দুর্গতির আর সীমা ছিল না। সাঁতারের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা ভিজে 'কসটুমে' মঞ্চের ধারে বসেছিল। কারণ, 'প্যাভেলিয়নে' ফিরবার কারও সাধ্য ছিল না—সামর্থ্যও ছিল না। সকলেই বলাবলি করতে লাগল—এ-রকম ভিড় কস্মিন্ কালেও দেখিনি ! উঃ !

চারটের সময় লাট-পত্নী মিসেস কেসি এলেন। মেয়েদের ১০০ মিটার এলো-পাড়ির সাঁতার খেলা হ'ল শুরু। মিস্ ব্যালেনটাইন তাঁর সহজ ও সরল ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে লীলাকে হারিয়ে দিলেন। চার-পাঁচ সেকেণ্ডের ব্যবধান। বোম্বাইয়ের সাঁতারুদের সে কি উল্লাস ! এতক্ষণ তাঁদের মুখে হাসি ফুটল।

প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট্ দেবার আয়োজন প্যাভেলিয়নেই করা হয়েছিল। উৎসব-অনুষ্ঠান খুব সংক্ষেপেই সারা হল।

১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। সেনট্রালের বার্ষিক সন্তরণ-উৎসবের দিন। সেদিন ১০০ মিটার এলো-পাড়ি, বুক-পাড়ি ও পিঠ-পাড়িতে লীলাকে এক রকম জোর করে নামিয়ে দেওয়া হ'ল।

বললুম—একবার চেষ্টা করে দেখ না যদি রেকর্ড করতে পার।

লীলা কথার উত্তর দিল না, কিন্তু কাজে আমার কথার মান রাখল। ১০০ মিটার—১ মিঃ ৫১ সেঃ। ভারতীয় রেকর্ড।

পশ্চিম ভারত সন্তরণ-উৎসব বোম্বাইর সি সি আই বাথে অনুষ্ঠিত হবে, দেরী নেই। ব্যালেনটাইনের সঙ্গে আর একবার সাঁতার কাটবার জন্তে লীলা ধরল জিদ। সে বোম্বাই যাবে। বলল—শান্তিদা, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। এখনও ত' এক মাস সময় হাতে আছে।

সমিতির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে লীলাকে আবার নামিয়ে দিলাম হেদোর জলে। অকস্মাৎ এক দিন মিসেস্ অলকা উকীল তাঁর স্বামীকে সঙ্গে ক'রে এলেন ক্লাবে। কথায় কথায় বললেন—শান্তিদা, অলিম্পিকের সাঁতার খেলা এবার লাহোরে হচ্ছে শুনেছেন কি ? ব্যালেনটাইন, রুথ গ্রেসার, ম্যাকলাস্কা এঁরা সকলেই আসছেন। রমা গীতা যাচ্ছে। লীলা যাবে ত ? হাঁ, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে ?

আমরা ওয়েষ্টার্ণ-ইণ্ডিয়া সন্তরণ-উৎসবে যাবো।

সে দেখা যাবে।

দু'নৌকোয় পা দিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়লাম। লীলার এলো-পাড়ির সময়-সীমা এখনও বিশেষ কমেনি। আরও দু'-এক সেকেণ্ড কমাতে পারলে ভাল হয়। বললাম, লীলা গায়ে তেমন জোর পাচ্ছে না।

তা হোক্, তবু ওকে যেতে হবে। লীলা ছাড়া ব্যালেনটাইনের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারবে না—এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। কাল বেলা চারটের সময় মোটর আসছে। দু'জনে ঠিক হয়ে থাকবেন।

৮ই অক্টোবর। রবিবার। বাংলার সাঁতারুদের বিদায়-অভ্যর্থনার জন্তে হাওড়ার ক্রীড়ামোদীদের বেশ ভিড় হয়েছিল।

দলটি ভারি চমৎকার। দলে আছে হাটখোলার যামিনী দাস,

মেয়েদের বিভাগ :—

সিঙ্গলস :—মিস-এম ব্রডী (বোম্বাই) ১৪—২১, ২১—১৬, ২৩—২১ ও ২১—১১ গেমে মিসেস ক্যামাকে (বোম্বাই) পরাজিত করে।

ডাবলস :—মিস এম ব্রডী ও মিস্ পি মদন (বোম্বাই) ১১—২১, ২১—১৩, ১৫—২১, ২১—১৪ ও ২১—৮ গেমে মিস্ ই, বোকারো ও মিসেস্ নাসিকওয়ালাকে পরাজিত করে।

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রদেশের ক্রমিক পরিচয় ?—

	খেলা	জয়	পরাজয়	শতকরা
বোম্বাই	৮	৮	০	১'০০০
দিল্লী	৮	৬	২	'৭৫০
মহীশূর	৮	৪	৪	'৫০০
বাঙলা	৮	৪	৪	'৫০০
মাদ্রাজ	৮	২	৬	'২৫০
হায়দ্রাবাদ	৮	২	৬	'২৫০
পাঞ্জাব	৮	০	৮	'০০০
হোলকার	৮	০	৮	'০০০
অন্ধ্র	৮	০	৮	'০০০

ব্যাডমিন্টন :—

টেবিল টেনিসের ন্যায় ব্যাডমিন্টনেরও নিখিল ভারতীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক অনুষ্ঠান এ বৎসরে বোম্বায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের জয়জয়কার হইয়াছে। সিঙ্গলসে বিজয়ী ও বিজিত দুই জন খেলোয়াড়ই পাঞ্জাবের প্রতিনিধি। গত বারের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় দেবীন্দর মোহন প্রকাশনাথের নিকট পরাজয় মানিতে বাধ্য হয়। ডাবলসে এই দুটি বোম্বায়ের ম্যাডগাভকার ও মাগুয়েকে পরাজিত করে। মহিলা বিভাগে পশ্চিম-ভারতের সেরা খেলোয়াড় মিস্ মমতাজ চিনয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন।

ফলাফল

পুরুষদের :—

সিঙ্গলস—প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) দেবীন্দর মোহনকে (পাঞ্জাব) ১৫—১, ১—১৫ ও ১৫—১২ পয়েন্টে পরাজিত করে।

ডাবলস—লুইস ও দেবীন্দর মোহন (পাঞ্জাব) মাগুয়ে ও ম্যাডগাভকারকে (বোম্বাই) ১৫—৫ ও ১৫—১ পয়েন্টে পরাজিত করে।

মেয়েদের,—

সিঙ্গলস—মিস্ মমতাজ চিনয় (বোম্বাই) মিস সুন্দর দেওধরকে (পুণা) ১১—৬ ও ১২—১ পয়েন্টে পরাজিত করে।

ডাবলস—মিস চিনয় ও মিস তালেয়ার খাঁ (বোম্বাই) মিস সুমন ও সুন্দর দেওধরকে (পুণা) ১৫—১০, ৬—১৫ ও ১৫—৬ পয়েন্টে পরাজিত করে।

মিশ্রডাবলস :—প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) ও মিস সুমন দেওধর (পুণা) দেবীন্দর মোহন (পাঞ্জাব) ও মিস সুন্দর দেওধরকে (পুণা) ১৮—১৩, ৮—১৫ ও ১৫—১০ পয়েন্টে পরাজিত করে।

আজাদ হিন্দ হকি দল :—

প্রলয়ঙ্কর দ্বিতীয় বিশ্বসমরে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত বিভিন্ন দেশের ও রাষ্ট্রের খেলোয়াড়গণ কর্মবহুল জটিল কার্য্যতালিকার ফাঁকে সামরিকগণের মধ্যে পরস্পর খেলাধূলায় যোগদান করে। অষ্ট্রেলিয়ার সেনাদল ইংলণ্ডে, মার্কিণ ও ইংরেজ সেনাদল ভারতে, রুশ-সেনাদল অধিকৃত প্রদেশে এই জাতীয় খেলোয়াড়ী সফরে যথেষ্ট উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক জোগায়। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত একটি হকি-সম্প্রদায় খ্যাতনামা ভারতীয় হকি-খেলোয়াড় দারাশার নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া পর্য্যটন করে ও সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া হকি-জগতে ভারতের একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্বের সুনাম অটুট রাখে। ব্রিটিশ সেনাদলের অন্যতম ক্যাপ্টেন দারা আজাদ হিন্দ ফৌজে কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েন। স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ভারতীয় হকিদলের অধিনায়ক যাদুকর ধ্যানচাঁদের জরুরী বেতার সংবাদে ভারতীয় হকি-ফেডারেশন দারাকে বিমানযোগে বার্লিনে পাঠান। সেখানে সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলায় দারা অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

পরিহাস

আবুল কাসেম মাহতাবউদ্দিন

সেই ভালো—ফাগুনের উদাসী বাতাস
তুমি কর মোরে পরিহাস।
ঘুমভাঙা মধুরাতে কাক-জ্যোছনায়
তোমার কূজন শুনি ভুলেছিনু হায়,
বুঝি নাই নহে প্রেম, নহে তব অন্তরের
ভীরু আবেদন।
এক দিন তোমা তরে মুক্ত ছিল তাই মোর
রুদ্ধ বাতায়ন।'

ভেবেছিনু ভুলি মোর সকল দীনতা—
ভুলি মম জীবনের উত্থান-পতন,
তুমি মোরে করিবে গ্রহণ।
তাই তব হৃদয়ের সুখ-স্বপ্নখানি
আমারই বক্ষের-মাঝে নিয়েছিনু টানি,
আপনারে রিক্ত করি রচিনু আপনি
জীবনের তিক্ত ইতিহাস।
তাই মোরে কর পরিহাস।

শ্রীতারানাথ রায়

নতুন শক্তি কারা ?

একটা হিটলার বা একটা চার্চ্চিল, একটা ষ্টালিন বা একটা ট্রুম্যান দুনিয়ার রাজনীতিক পরিস্থিতির স্রষ্টা নয়। এ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে এক দিকে যেমন রাজনীতিক চক্রান্তকারীরা, অন্য দিকে তেমনি স্বার্থ-সর্ব্বস্ব রাজনৈতিকদের রসদদার—বিভিন্ন দেশের ধনিক আর ধনিকদের অর্থপুষ্ট মারণাস্ত্র-বিশারদ বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী আর গুপ্তচররা। এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে এক দিকে যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির কর্ণধারগণ, অন্য দিকে তেমনি ওলট পালট করা সকল সর্ব্বনাশ ও দুর্দ্দশার মধ্যে থেকে মৃতাবশিষ্ট যারা আত্মরক্ষার জন্য আর্ত্তনাদ করছে তারা। এদের আর্ত্তনাদের নানা ধ্বনি থেকে আজ সমরান্তর বিশ্বের নতুন নতুন নীতি, মতবাদ ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সৃষ্টি করবে।

সে এক কাল ছিল, যখন রাজা-উজিরের উত্থান-পতনই ছিল রাষ্ট্রের ইতিহাস। সে এক কাল ছিল, যখন রাজা-উজিরের রাজনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রের ইতিকথায় ঠাঁই পেত দুই-এক জন রাষ্ট্রনায়কের সমর্থিত ধর্ম-মতবাদ। জনসাধারণ সে দিন ইতিহাসে ঠাঁই পায়নি। রাজভক্ত তথা রাজকাহিনী আজ যেমন মানুষ মানতে চাচ্ছে না, তেমনি রাজতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত রাজনীতিক চাঁই ও মোড়লদের আন্তর্জ্জাতিক হত্যাষড়যন্ত্রে হৃতসর্ব্বস্ব মানুষগুলো আত্মরক্ষা, আশ্রয়রক্ষা ও স্বজন-স্বদেশ রক্ষার জন্য কেউ বাঁচতে চাচ্ছে, কেউ বিজয় গর্ব্বোদ্ধত এক মুটি রাষ্ট্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যেমন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল মহাশ্মশানের কপাল-করোটির উপর, দ্বিতীয় মহাসমরের পরেও তেমনি পৃথিবীর তিন সাঙ্গাত আপন আপন স্বার্থানুকূল নয়া দুনিয়া স্থাপনের জন্য প্রতিযোগিতা করতে আরম্ভ করেছে। এ সব রাষ্ট্রীয় রাক্ষসদের ভোজ্য হ'ল য়ুরোপ আর এশিয়ার জনসাধারণ—যারা উৎপাদন করবে অথচ খেতে পাবে না; যাদের শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও রুগ্ন মরতে বাধ্য হবে রণপন্থীদের নির্ম্মম হত্যার চক্রান্তে।

নিরন্ন ও নিরাশ্রয়ের দল—

কোথাও পেট-ভরা অন্ন নেই। ওদের হিসাবে একটা মানুষের অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে বাঁচতে হলেও দিনে ২৫০০ ক্যালোরি পরিমাণ খাবার চাই—এর অর্দ্ধেক খরচ হয় অনিচ্ছাকৃত দৈহিক প্রক্রিয়ায়, অর্দ্ধেক দরকার হয় হাঁটতে খেতে বলতে কইতে। এ পরিমাণ খাবার আজ কোন জাতির নেই।

ফরাসীরা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে, গ্রীক, পোল, বেলজিয়ান, স্পেনিয়ার্ড, যুগোশ্লাভ—কতক দেশের অবস্থা এই।

ফলে মানুষ মরছে। ফ্রান্সের মৃত্যুহার শতকরা ১৮ জন বেড়েছে! গত বছর থেকে পোল্যাণ্ডে টাইফাস রোগের তাণ্ডব চলছে। ১৯৪২ সালে এখানে ৫০ হাজার লোক এ রোগে মরে। জার্ম্মাণী, ক্রোটিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াতেও এই রোগের ভয়ঙ্কর প্রতাপ। যে ম্যালেরিয়া এত দিন মালয়, ব্রহ্ম ও ভারতের শোণিতই শোষণ করে এসেছে, সে আজ য়ুরোপ ও আমেরিকাতেও অভিযান আরম্ভ করেছে।

সর্ব্বত্র ক্ষয় রোগ। শিশুরা বাড়তে পারছে না। অনশন ও অর্দ্ধাশনে রোগের সঙ্গে যুঝবার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আর এক ভয়াবহ পরিণামের আভাষ বিচক্ষণরা দিচ্ছেন—"With some, cannibalism has become a habit to which they are inclined even after other food is available."

তার পর আশ্রয়, বসন, জ্বালানী কয়লা ও তৈলের সমস্যা—অর্থনীতিক কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থা। যুদ্ধের পর কোন দেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না। ক্রমেই খাদ্য ও অর্থ অপেক্ষাকৃত বিত্তবানদের হাতে গিয়ে পড়ছে—যা কিছু খাদ্য আছে তা সংগ্রহ করছে বলবানরা। মাঝখান থেকে না খেয়ে মরছে জনসাধারণ।

য়ুরোপের দুর্দ্দশা—

গ্রীসের অবস্থা—"The issue in Greece is no longer between monarchy and republic, but between economic ruin and stability." সেখানে নিত্য চলেছে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট। এর সুযোগ নিচ্ছে গ্রীক কম্যুনিষ্টরা। তারা দাবী করছে, ইংরেজরা গ্রীস থেকে সরে যাক। সমস্ত দেশ গ্রীসের বৃটিশ রাষ্ট্র-প্রতিনিধি সার রেজিনাল্ড লীপারকে লক্ষ্য করে বলছে—"We prefer Liberty to Leeparty."

জার্ম্মাণীর যে অঞ্চল আমেরিকানরা নিয়ন্ত্রণ করছে, সে অঞ্চলে অনাহার ও অপুষ্টি-জনিত রোগের প্রাবল্য বড্ড বেশী হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা চললে জাতটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে অনেকে আশঙ্কা করছে। সোভিয়েট-প্রভাব অঞ্চলের অবস্থা প্রায়ই একই রকম—"German civil population is bitter at what they say are Soviet starvation policies, in which all things of value are seized and removed. Many Germans are frankly apprehensive of the Communist parties now rising in Germany and declare that some American policies may be driving the civil population in the direction of Bolshevism and chaos.'

অনাহারে আর ব্যাপক বেকার অবস্থায় জার্ম্মাণরা যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। এ দুর্দ্দশার সুযোগ পেয়ে মার্কিণ সৈন্য জার্ম্মাণ তরুণীদের সঙ্গে প্রেমে মত্ত হয়েছে। ওর না কি অভিজ্ঞতা এরূপ—"With a package of cigarettes, he can get twenty" যে সব জার্ম্মাণ বন্দী ছাড়া পেয়েছে তারা তাদের নারীর উপর এ অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করছে—"If wide spread unemployment persists, the sentiments behind

them may provide popular rallying points of activities which might grow to organized resistance directly against the occupation forces."

এশিয়ায় শোষণ—

শ্বেতাঙ্গ রক্ত-চোষা জাতগুলো এশিয়ার রক্ত-মাংস পর্য্যন্ত আজ টানতে চাচ্ছে বলে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন ও কোরিয়ায় আগুন জ্বলে উঠেছে। সে দিন তাই পার্ল বাক তাঁর দেশবাসীকে স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়েছেন—"It is a revolt against White aggression···I see a human danger in all this silly talk about a war with Russia"—বলেছেন, তোমরা ভয় দেখাচ্ছ এটম বোমার। তোমাদের সে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় না। এটম বোমা না রইলেও মানুষে মানুষে মিতালী হয়।

জাপানে—

জাপানের নিশ্চল মৃতদেহ না কি দানা পেয়েছে। ইংলণ্ডের 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড' সাপ্তাহিক পত্র অন্ততঃ এ কথা বলছেন। পত্রের টোকিও সংবাদদাতা বলছেন—দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা এবং প্লেগ দেশটাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে, যে-কোন মুহূর্ত্তে যে মরিয়া জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করবে, তার লক্ষণ এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। ওসাকার ভূতপূর্ব্ব সৈনিকরা দল বেঁধে খাদ্য-ভাণ্ডারের মার্কিণ-প্রহরীদের আক্রমণ করে খুন করছে। ইয়োকোহামা আর টোকিওতে যে সব জাপ-তরুণী পথে পার্কে আমেরিকানদের সঙ্গে ভাব করছে, ছাত্রদল তাদের প্রকাশ্য রাজপথে মার-ধর করছে। খালে নদীতে নিহত মার্কিণ সৈনিকদের মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি হাজার হাজার জাপানী ভবনে জাপ-জাতীয় পতাকা উড়তে আরম্ভ করেছে, বাপ-মা-রা সন্তানদের শেখাচ্ছে ঐ পতাকার সম্মুখে মাথা নত করতে।

শ্যামে—

লড়াই-এ শ্যাম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এই ভয়ঙ্কর অপরাধের জন্য ইংরেজরা দাবী করছে যে, শ্যামকে মালয় আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাপ-কবলমুক্ত দেশগুলোকে তার বেশীভাগ ধান দিতে হবে। আমেরিকা শ্যামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কখনও করেনি। তাই মার্কিণরা শ্যামের হয়ে বলছে যে, শ্যামের গেরিলা লড়াইএর ফলে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে। কিন্তু এ ধরণের কাহিনী ইংরেজ শুনতে চায় না। তারা আমেরিকাকে শুনিয়ে দিয়েছে—"they are determined to exact Siamese reparations even they have to do it unilaterally." শুনা যাচ্ছে, আমেরিকার সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের একটা রফা হয়ে গেছে। আমেরিকা থাইল্যাণ্ডকে সমর্থন করছে। মার্কিণ সংবাদপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার' জানিয়েছেন—"The United States' intervention may have kept Britain from enforcing complete political tutilage in Siam, but the British extracted huge economic concessions as part of the hand bargain."

১লা জানুয়ারী (১৯৪৬) সিঙ্গাপুরে শ্যামের সঙ্গে ওরা সন্ধি করেছে। সন্ধিপত্রে সই করেছেন এডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা মিঃ ডেনিং, শ্যামের রাজকুমার জয়ন্ত আর আমাদের এনি মহাশয়। সন্ধির প্রধান সর্ত্ত—আগামী ২১ মাস (অর্থাৎ ১৯৪৭, সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) ১৫ লক্ষ টন ধান তাকে বৃটেনের কাছে বিক্রী করতে হবে। আর এক বড় সর্ত্ত—ইংরেজের অনুমতি না নিয়ে শ্যাম উপদ্বীপে খাল কেটে শ্যাম উপসাগরের সঙ্গে ভারত সাগরের যোগ করতে পারবে না।

পশ্চিম-এশিয়ায় রুশিয়া—

রুশিয়া না কি ইরাণের ভিতর দিয়ে তুর্কী পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করবার মতলব করছে, অন্ততঃ আরবদের তাই ধারণা। এ জন্য ইংরেজের মিত্র আরব লীগ আফগানিস্থান, তুর্কী, ইরাক, সিরিয়া, ট্রান্স জর্ডন ও লেবাননে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ-দল গড়তে চেষ্টা করছে। তবে এ-ও শোনা যাচ্ছে যে, মিশর বা সাউদী আরব এ-দলে যোগ দিবে না। আরবী নেতাদের কিন্তু বদ্ধমূল ধারণা যে, ইরাণে সোভিয়েট প্রভাবের গতিরোধ করা অসম্ভব। ইংরেজ এ-কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে রুশিয়াকে উপদেশ দিয়ে বলছে—তোমরাও যেমন মনে করছ যে ইরাণ সরকারকে সমর্থন করছে বৃটিশ আর আমেরিকান সরকার, আমাদেরও তেমন মনে করবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, পারসী আজেরবাইজানে যে নয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে তাতে সোভিয়েট প্রভাব ও প্ররোচনা পরিস্ফুট। কাজেই তোমরা পশ্চিম-এশিয়ার আগুন নিয়ে খেলা ছেড়ে দাও। বৃটিশ মুখপত্র 'টাইমস্' বললেন—"Yet Russia is playing with fire when she stretches the nerves of Middle Eastern Countries. There comes a time when a small nation will refuse to be brow-beaten by a great power. The last war began when Poland resisted the demands of Germany"—এ কথার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই—'পোল্যাণ্ড যেমন জার্ম্মাণীকে বাধা দিয়েছিল বলে গেল যুদ্ধ বেধেছিল, ইরাণও তেমনি রুশিয়াকে বাধা দিবে—ফলে বাধবে নতুন মহাযুদ্ধ।' 'টাইমস' কিন্তু পোল্যাণ্ডের পেছনে কারা ছিল তার কথা গোপন রেখেছে।

ইরাকে কুর্দ্দ-গ্রামবাসীরা না কি সেকেলে বন্দুক বদলিয়ে আধুনিক রুশ রাইফল সংগ্রহ করছে। জনরব যে, কুর্দ্দ বিপ্লবী মোল্লা মুস্তাফা বাজানিকে গত বছর ইরাকী সীমান্ত পার করে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বরফ গলতে সুরু করলেই সে না কি রুশ সমর্থন পুষ্ট হয়ে ইরাকের উপর উপদ্রব চালাবে।

রুশিয়ার মিশর-প্রেম-প্রীতি—

আরব এবং আরবীদের সম্বন্ধে রুশরা সম্প্রতি অস্বাভাবিক দরদ দেখাচ্ছে। পটস্‌ডাম বৈঠকে ষ্টালিন মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে বলেছিলেন যে, প্যালেষ্টিন সমস্যা সম্পূর্ণ ইঙ্গ-মার্কিণ সমস্যা, ওতে তাঁর হাত দেবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু শুনা যাচ্ছে, রুশরাও সোভিয়েট ইহুদীদের প্যালেষ্টিনে পাঠাতে চাচ্ছে পাল্টা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হিসাবে।

আবার এ-ও শোনা যাচ্ছে যে, আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারল আবদুল রহমান আজ্জাম বে মস্কো যাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন। আর সহসা রুশ তীর্থযাত্রীদের প্যালেষ্টিন ও মক্কা যাবার জন্ত ভীড় বেধেছে।

খুব স্পষ্টই বোধ হচ্ছে যে, ইংরেজ আর আমেরিকানদের বিরুদ্ধে রুশিয়া মিশরে ও সাউদী আরবকে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করছে। ইংরেজরা নাকি উত্তর-ইরাণ থেকে সরে যাবার জন্ত রুশিয়াকে অনুরোধ করেছিল। জবাবে রুশিয়া বলেছে, তোমরাও প্যালেষ্টিন ও মিশর থেকে সরে যাও। ("Russians have definitely replied to the British request to evacuate North Persia with the retort that they equally ask for evacuation of British troops from Palestine and Egypt."

আরব-ইহুদী সংগ্রাম ক্রমে পেকে উঠ্‌ছে; মাত্র 'প্যালেষ্টিনের নয় সমস্ত আরব দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। আরবী নেতারা ইহুদী পণ্য বর্জ্জনের আয়োজন করলেও, সাধারণ আরবী ক্রেতারা ইহুদী পণ্য কিনতে ভীড় করছে দেখে নেতারা বিমর্ষ হয়েছেন। আরব লীগ অবশ্য ইহুদী সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোরা বর্জ্জন আন্দোলন চালাচ্ছেন। কিন্তু আরবী নেতারা দুঃখ করে বলছেন—"The Arabs are fickle and laking in the spirit of sacrifice". আরব মহিলা সমিতির (Arab Women's Society) সদস্যা মিসেস আলেকজান্দ্রা জরিফা "deplores this defeatism and urges that sacrifice for the sake of the homeland should have no bounds."

ইহুদী বয়কট কার্য্যকরী করবার জন্ত আরবী নেতারা বৃটিশ ও মার্কিণ রপ্তানী বণিক্‌দের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে সঙ্কল্প করেছে।

তুর্কী বনাম রুশ—

তুরস্কের কাছেও রুশিয়ার কিছু দাবী আছে শুনা যাচ্ছে। রুশিয়া বলছে, সোভিয়েটতন্ত্রের প্রাথমিক দুর্ব্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তুর্কী কারস ও আর্দ্দেহান অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল, আজ রুশিয়া সে অঞ্চল ফিরে পেতে চায়, আজ সে দার্দানেলিসে ঘাঁটির দাবী করে। তুর্কী বলছে তা কেমন করে হবে? "Why should we allow foreign bases on our territory?"

রুশ জর্জ্জিয়ানরা কৃষ্ণোপসাগরের তটবর্ত্তী ৯টি তুর্কী প্রদেশের দাবী করছে। রুশিয়ার এ সব দাবীর প্রতিবাদ করে তুরস্কের তরুণরা নাকি বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। তুর্কী সংবাদপত্র 'আকশাম' বলছেন—সম্ভবতঃ এ নিয়ে রুশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হবে—("The possibility of announcing a Sacred War against Russia by the Western World")

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায়—

বৃটেন-ফ্রান্স আর ওলন্দাজরা আজ এক যোগে দক্ষিণ-এশিয়ার নির্য্যাতন-বিপন্ন মরিয়া জাতগুলোর উত্থান দমিয়ে রাখছে—কোথাও তাদের দলে ভেদ বাধিয়ে, কোথাও বলপ্রয়োগ করে; কিন্তু তাতে দৈন্য ও অত্যাচারের ক্ষত আরোগ্য হবে না। ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণের আন্দোলনকে, আনামের ভিট-মিন আন্দোলনকে বা ভূতপূর্ব্ব স্বাধীন ব্রহ্মের অধুনা-অন্তর্হিত আন্দোলনকে কোণ-ঠাসা করলেও সে সব আন্দোলন জগতের প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণে যে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে, তার প্রধূমিত বহ্নি হঠাৎ কোন দিন দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে এক সাথে।

গত যুদ্ধে ওলন্দাজরা বৃটেনকে যে সাহায্য করেছিল, বৃটেনের পক্ষ নিয়ে সর্ব্বপ্রথমে যে সে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তারই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ বৃটেন আজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর ওলন্দাজ-প্রভুত্ব মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বৃটেনের এই মিত্রপ্রীতি নিছক নিঃস্বার্থ ব্যাপার নয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার সমর্থন সে করতে পারে না, ওলন্দাজ সরকার সম্মত হলেও পারে না। কারণ, ইন্দোনেশিয়াকে যদি স্বাধীন করে দেওয়া হয় তাহলে স্বাধীন মালয়, স্বাধীন ব্রহ্ম, স্বাধীন সিংহল, এমন কি স্বাধীন ভারতের কথাও এসে পড়ে। এ জন্তই বৃটিশ সমাজ-তন্ত্রবাদী সরকার পর্য্যন্ত চার্চ্চিলপন্থী ফ্যাসিষ্টদের বাক্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে সুরু করেছে—"in the interest of the natives, Britain cannot divest herself of the responsibilities she has undertaken in these areas."

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, য়ুরোপের তিন শক্তি—বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়াবাসী আর আনামবাসীদের উপর বৈদেশিক শাসন আবার চাপাতে চাচ্ছে। আর এক শ্বেতাঙ্গ জাত—আমেরিকা ভার নিয়েছে জাপানীদের চরিত্তির একেবারে অহিংস করে দিতে। জাপানীরা প্রকৃতপক্ষে আজ পদানত জাতি। আমেরিকা বলছে, জাপানীরা নিছক চাষীর জাত না হওয়া পর্য্যন্ত মার্কিণ ফৌজ নিপ্পন ছেড়ে আসবে না। কাজেই এশিয়া আজ ক্রীত-দাসের মহাদেশে পরিণত।

ওরা বলছে—এশিয়াবাসীদের পাশ্চাত্য সভ্যতার পাঠ দিতে হবে। পাঠ দেবার বরাদ্দ চমৎকার। আড়াই কোটি আনামবাসীর শিক্ষাদানের জন্ত ফ্রান্স ছয় ছয়টা মাধ্যমিক বিত্তালয় স্থাপন করেছে! ইন্দোনেশিয়ার তিন শো বছরের মধ্যে ওলন্দাজরা পাঁচ শতের এক জনকে শিক্ষাদান করতে পেরেছে! কিন্তু ওরা ইন্দোনেশিয়ানদের ভাল করেই শিক্ষা দিতে পেরেছে! ওদের 'হেট কালটুর ট্রেলসেলর' কৃপায় যবদ্বীপে গত ৩০ বছর বেগার শ্রমিকদের প্রয়োগ ও পেষণ চলেছে। এ ব্যবস্থার ফলে ইন্দোনেশিয়ার ৮ লক্ষ পরিবার দাস-পরিবারে পরিণত হয়েছে।

আগুন নিয়ে খেলা—

বর্ম্মায় ইংরেজরা নতুন করে প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত উঠে-পড়ে লেগেছে। তারা সেখানকার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আপোষ যে করবে এমন কোন বাস্তব মনোভাব দেখাচ্ছে না। ওদিকে জন-সাধারণের অবস্থা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে; নিত্য অবহেলিত কৃষক-সম্প্রদায় দেশী-বিদেশী মানুষ ব্যবসায়ীদের কাছে শিশুদের, বিশেষ করে বালিকাদের বিক্রী করছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রচারিত সংবাদ নয়। দুনিয়ার সভ্যতাদর্পী সমাজের জন্ত লিপিবদ্ধ করে রাখবার মত তথ্য—

"Needy parents in small up-country villages where the war's devastation left many without any source of income are bringing their

children to the larger towns and particularly to Rangoon for sale to wealthy families. Girls for household duties are in the greatest demand because of the servant shortage and fetch the highest prices. For a strong, good-looking girl between 13 and 14 years of age as much as Rs. 350 is asked and paid. The price never goes below Rs. 200."

শ্যাম ব্রহ্মদেশের অন্ন-সম্পদ আর কন্যা-জননীদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গরা যে উচ্ছৃঙ্খল লীলা করছে তার বর্ণনা করে একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন—

"Judging from the bitter words whispered to me by dozens of men in Bangkok···I feel that the paradise may be short lived and the embrace of Siamese women dancing with Briti partners in cabarets may turn into a Shivaji-Afzal Khan embrace."

ভারত কোন পথে—

ভারত ত আর দুনিয়া ছাড়া নয়। আন্তর্জ্জাতিক যে ষড়যন্ত্রকারীরা আপনাদের বিত্তবান করবার জন্য পৃথিবীর শ্রম-শিল্প-সম্পন্ন বণিক্ জাতগুলোর পণ্যশালা এশিয়ার বাজারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রতিযোগিতা করছে—আর প্রতিযোগিতা করবার জন্য খাসা চাল চালছে ভারতও সে চাল থেকে বাদ পড়েনি। দৃষ্টান্তঃ রুশিয়ার প্রভাব এখানে বুঝা যাচ্ছে না। রুশ আদর্শবাদপন্থী কমুনিষ্টরা এখানে কোন আদর্শ সম্বল করে হৈচৈ করছে, তাও খুব খোলসা নয়। ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতার পরিপন্থী হলেও ইংরেজের সৃষ্ট ভারতের ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন তারা করছে। অর্থগত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধাচরণও অবশ্য তারা করছে। কংগ্রেস আদর্শও এখানে খোলসা নয়। হিংসার স্বাধীনতা লাভের প্রশংসা এঁরা খুবই করছেন, অথচ এদের কেতাব ও মজলিসে সর্ব্বদা একই বুলি—কর্ণের কাণা মারলেও হরদম প্রেম দাও। গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ভাল করেই প্রমাণ করেছেন, ভারতে কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, প্রমাণ করেছেন মসলেম লীগ একটা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, কমুনিষ্ট বা হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক অস্তিত্ব নগণ্য। কাজেই ইঙ্গ-মার্কিণ আঁতাত রুশিয়ার বিরুদ্ধে তথা আপনাদের অন্নক্ষেত্র রক্ষার জন্য এশিয়ায় যে প্রেমের ক্ষেত্র তৈরী করতে চাচ্ছে, সে আঁতাতকে ভারতের কারও সঙ্গে যদি ভাব করতে হয় তবে করতে হবে কংগ্রেসের সঙ্গে। হয়ত কংগ্রেস ভাবছেন, একবার রাজনৈতিক হাতিয়ার হাতে ৎ না, তার পর রাজনৈতিক গতি-পদ্ধতির কথা দেখে নেওয়া ঃ দেশ যদি তখন কমুনিষ্ট হতে চায়, পাকিস্তান চায় বা রাম চায় তা স্বাধীন ভারত বিচার করবে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যেন কিছু করে যাওয়া নিরস্ত্র জাতের হাতিয়ার অভিমান, ও গোঁয়া সম্বল করে তার প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে কেউ হাতিয়ার চালায় ! না। ভারতের নির্ব্বাচন পরীক্ষার পর মসলেম লীগ বা তাদের কমুনিষ্টরা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগীদের কার সঙ্গে যোগ দি বুঝা যাচ্ছে না। পশ্চিম-এশিয়ায় যে রুশ-প্রভাব স [illegible] তাদের প্রভাবান্বিত করবে? যে রুশ-প্রভাবের সমর্থন চীনে, [illegible] ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ দলে, ব্রহ্মবিপ্লবীদের অন্তরে, সে [illegible] সঙ্গে লীগ ও কমুনিষ্টরা যোগ দিবে? ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্র [illegible] দিল দিব্য আধ্যাত্মিক প্রভাবে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে কংগ্রেস বৃটে [illegible] তথাকথিত সমাজতন্ত্রী দলের হাত থেকে স্বরাজ গ্রহণ করবার তোড়জোড় সম্পূর্ণ করেছে, একদা সমাজতন্ত্রীদের শক্র ছিন্ন [illegible] দল তাতে বাদ সাধলেও ভারতীয় কমুনিষ্ট-দলের [illegible] সাম্রাজ্যবাদের লোভমুক্ত (?) বৃটিশ সরকারের এ দান কি [illegible] সাম্যবাদীরা মঞ্জুর করবে না?

রাজনৈতিক এ সব ঘোঁটচক্র—রাজনৈতিক নেতাদের [illegible] প্লাবন এবং সফরের ঝঙ্কার পেছনে কিন্তু দরিদ্র ভারত [illegible] অনাহার, রোগ, মৃত্যু ঘরে ফিরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে বারম্বার। বছর ভিটেয় যে চালাখানা ভেঙ্গে পড়েছিল, এবার আর তার নাই। ভারতে দিক্ দিক্ থেকে আসন্ন দুর্ভিক্ষের সংবাদ আ বিলাত থেকে ভারতের ভাগ্যবিধাতারা কেমন করে আসা [illegible] তা চোখে দেখতে—আমাদের আর্ত্তনাদ ও চীৎকার সাচ্চা কি [illegible] তা কানে শুনতে ভারতে প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছেন।

এর পর ভারতের ভাগ্য ভবিতব্যই বলতে পারে। [illegible] বিশ্বপ্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন জানিয়েছেন [illegible] সামরিক বিভাগের আশঙ্কা যে ভারতে ইংরেজ সৈন্যকে [illegible] উত্থানের সম্মুখীন হতে হবে। এজন্য মার্কিণ সৈন্যদের জন্য [illegible] বেয়নেট ও অন্যান্য রসদের বরাদ্দ করা হয়েছে।

উত্থান যদি সত্যি হয়, সে উত্থানে কারা উপিত [illegible] বাইরে প্রকাশ নেই। তবে দেখা যাচ্ছে, সর্ব্বদল-প্রভাবমুক্ত [illegible] কিশোর ও নওজোয়ানেরা নতুন প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠে তারাই কি নয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতা? জয় হিন্দ্।

[শিল্পী—অশোক মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

গত ১০ই পৌষ ১৩৫২ মীরাট কলেজের নব-নির্ম্মিত হলে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োবিংশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। মূল সভাপতি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন। অভ্যর্থনা সভার সভাপতি—ডাঃ সুবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। শিল্প ও বাণিজ্যশাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন যুক্তপ্রদেশের আইন প্রণয়ন কাউন্সিলের সভাপতি—সার সীতারাম। ইতিহাস-শাখার কোনো অধিবেশন হয়নি। বর্ত্তমান অধিবেশনে সম্মেলনের নাম পরিবর্ত্তিত ক'রে ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন রাখা হয়েছে। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে জানা গেল, এত বড় প্রতিষ্ঠানের পুঁজি বড়ই কম। বর্ত্তমানে অর্থ না থাকলে কোনো কাজই সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, তাই বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় আগামী দু'বছরের মধ্যে সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহের একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হ'য়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু অতুলপ্রসাদ স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যকর। সার সীতারামের ভাষণের ও সম্মেলনে যোগদানের মধ্যে তাঁর বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতি ও আন্তঃপ্রাদেশিক মিলনের শুভ সূচনা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেজন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এত বড় একটা বিরাট বঙ্গ-সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলনে এক জনও বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না কেন? বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিভাগে সভাপতিত্ব করবার মত বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ বাঙ্গালীর কি সত্যিই অভাব পড়েছে? সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষকে এই সব গুরুতর ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। এ বিষয়ে তাঁদের ঔদাসীন্য ও সংগঠন-শৈথিল্য সত্যিই দুঃখের। এবারে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গ-ও নেই, সাহিত্যও নেই—আছে শুধু প্রাণহীন সম্মেলন! এবারে সম্মেলন স্থির করেছেন সামনের বছরের সম্মেলনের আগে কলিকাতায় একটি বিশেষ অধিবেশন হ'বে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের কথা বিশেষ ভাবে স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদের শোনাবার জন্য। এ সম্বন্ধে কলিকাতাবাসীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও সহানুভূতি থেকে তাঁরা বঞ্চিত হ'বেন না।

এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম

তন্দ্রাচ্ছন্ন এশিয়া আজ মুক্তির আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ সাম্রাজ্যবাদের শাসানি ও হাজার রকমের বিধি-নিষেধের বন্ধনকে এশিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চায়। কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের যে অমানুষিক শোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতা এশিয়ার বুকের উপর দিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়াছে, আজ এশিয়া নব-যুগের মহাসন্ধিক্ষণে তাহার বিরুদ্ধে এক হইয়া ইস্পাত-প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। এই মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে আজ বর্ম্মা, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া। ইতিহাসের এই গুরু দায়িত্ব আজ ভারতবর্ষ ও চীনেরই বহন করা উচিত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সম্ভব হয় নাই। আজ মহাচীন তাহার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া মার্শাল চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। চিয়াং কাইসেকের চীন সমগ্র এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে এই কারণে। এশিয়ার আশা-ভরসা ও অনুপ্রেরণার উৎস হইবে চীন, এশিয়ার বিরাট মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে চীন, কিন্তু মহাচীন আজও নির্ব্বিকার, উদাসীন। এমন কি, বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভায় চিয়াং কাইসেকের প্রতিনিধির এমন সাহস হয় নাই যে, এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করেন। মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মোসাহেবি ও দালালি করাই চিয়াং কাইসেকের চীনের অন্যতম নীতি হইয়াছে। আজও নির্লজ্জের মতো মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় চিয়াঙি চীন সমগ্র চীনে কুয়োমিন্টাঙের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। মার্শাল চিয়াং তাঁহার নিজের শ্রেণীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব চীনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য লইতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছেন না। তাঁহার আজ এমন সৎসাহস নাই যে, তিনি তাঁহার কুয়োমিন্টাঙের অনুচরবর্গ লইয়া চীনে স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনে নিজেদের গণ-প্রতিনিধিত্বের দাবী যাচাই করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। তাঁহার এমন সাহসও নাই যে, চীনের গৃহযুদ্ধেও তিনি তাঁহার নিজের শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া চীনের প্রগতিশীল জনসাধারণের বিপুল সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কাপুরুষতা ও আত্মসর্ব্বস্বতার প্রতিমূর্ত্তি মার্শাল চিয়াং আজ চীনের জনকল্যাণ ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য আদৌ উৎকণ্ঠিত নন। তাঁহার একমাত্র আদর্শ হইল স্বশ্রেণীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া চীনে একনায়কত্বের নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা কায়েম করা। চীনের চিয়াং কাইসেকের এই নীতি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকেও প্রভাবিত করিয়াছে। বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ চিয়াঙি আত্মঘাতী নীতি বর্ণে বর্ণে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখনও আমাদের ভারতের নেতৃবৃন্দ দেশের মধ্যে দলাদলির পথে অগ্রসর না হইয়া জাতীয় ঐক্যের পথে চীন ও সমগ্র এশিয়াকে পরিচালিত করিতে পারেন। ভারত আজও চীনকে পথ দেখাইতে পারে এবং এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে। সমগ্র এশিয়ায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ঐতিহাসিক গণ-অভিযানের পথের নির্দ্দেশ আজও একমাত্র ভারতই দিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সেই নির্দ্দেশ আজ কোথায়? কোথায় তাঁহাদের সেই ঐতিহাসিক পথে অভিযানের জন্য আহ্বান?
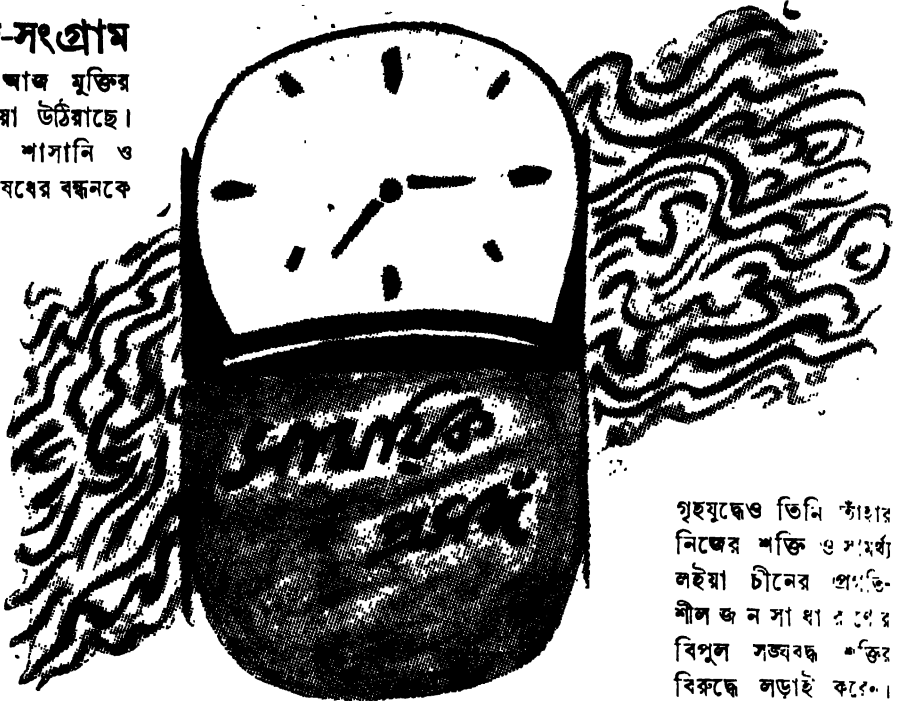
আনন্দের বিষয় এই যে, বর্ম্মা, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া আজ ভারত ও চীনের দিকে এই নির্দ্দেশ ও নেতৃত্বের জন্য তাকাইয়া নাই। তাহারা নিজেদের পথ ধরিয়া অবিচলিত চিত্তে সংগ্রামের পথে আগাইয়া চলিয়াছে এবং সেই পথই ঐতিহাসিক পথ। এই ঐতিহাসিক পথ ঐক্যের পথ, জাতীয় সংহতির পথ, চিয়াং কাইসেকের আত্মঘাতী গৃহবিরোধের পথ নয়।

ঐক্যের পথে ব্রহ্মদেশ

যুদ্ধকালীন প্রতিরোধ আন্দোলনের (Resistance Movement) মধ্য দিয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশ আজ সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের এক দুর্ভেদ্য ইস্পাত-প্রাচীর গঠন করিয়াছে। এই একতার প্রতিমূর্ত্তি হইল ব্রহ্মদেশের "ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী পিপ্‌ল্‌স্ ফ্রিডম্ লীগ্" (Burma Patriotic Front)। এই স্বাধীনতা লীগের অন্তর্ভুক্ত আজ "বর্ম্মা প্যাট্রিয়টিক্ ফোর্সেস্" (Burma Patriotic Forces বা B. N. A), "কম্যুনিষ্ট পার্টি", "পিপল্‌স রিভল্যুশানারী পার্টি" (Peoplos Revolutionary Party), "মাওচিত পার্টি" (Meyo-Chit Party), "অল্ বর্ম্মা ইউথ্ লীগ্" (All Burma Youth League), "আরাকান ন্যাশনাল কংগ্রেস" (Arakan National Congress) "কারেন্ সেণ্ট্রাল্ অর্গানাইজেশন্" (Karen Central Organisation) ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও এই স্বাধীনতা লীগের সহিত আজ ব্রহ্মদেশের "থাকিন্ পার্টি" (Thakin Party), "সিন্‌ইয়েথা পার্টি" (Sinyetha Party), "বর্ম্মিজ মুসলিম্ লীগ" (Burmese Muslim League) প্রভৃতি দলগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই সহযোগিতা করিতেছে। তরুণ বীর মেজর জেনারল আউঙ্ সান্ (Aung San), ব্রহ্মদেশের প্রতিরোধ বাহিনী অর্থাৎ জাতীয় সেনাবাহিনীর (B. N. A.) সর্ব্বাধিনায়ক এই স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং কম্যুনিষ্ট নেতা থান্ তুন্ (Than Tun) এই লীগের জেনারল সেক্রেটারী। এই স্বাধীনতা লীগই আজ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদলীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং মেজর-জেনারল আউঙ্ সান্ আজ ব্রহ্মদেশের জাতীয় বীরের সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই লীগই আজ ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার জন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছে। ১৯৪৫ সালের ১৯শে আগষ্ট রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মেজর জেনারল আউঙ্ সানের সভাপতিত্বে নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

"For many years the people of Burma have struggled to attain their right of self-determination. Since the outbreak of war in 1939 between Britain and Germany, the struggle for Burma's freedom has become more intensified and extensive in that *it has developed an armed mass movement.* The people of Burma in co-operation with the United Nations have driven from Burma the fascists, the protagonists of the darkest forces of reaction in the world.

Therefore, the free democratic world will have to recognise the right to freedom of the people of Burma, according to the world leaders' declarations, such as the Atlantic Charter, the Teheran Agreement and the Yalta Agreement.

The people of Burma will exercise their right of self-determination and determine their constitution through a Constituent Assembly."

অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আজ দাবী করিতে স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদ গঠন করিয়া ব্রহ্মদেশ তাহার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিতে চায়। এই দাবী আজ সমগ্র ব্রহ্মদেশের দাবী। এই দাবীই আজ ব্রহ্মদেশের বৃহত্তম সর্ব্বদলীয় গণ-প্রতিষ্ঠান "ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা লীগের" দাবী। এই প্রস্তাবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ব্রহ্মদেশে সশস্ত্র গণ-আন্দোলনের বিকাশের কথা।

ঐক্যের পথে ইন্দোচীন

ইন্দোচীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদলীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম "ভিয়েট্ নাম্ ডক্‌লাপ্ ডঙ্ মিন্" (Viet Nam Doclap Dong Minh), সাধারণতঃ প্রথম ও শেষ অক্ষর "ভিয়েট্ মিন্" নামেই পরিচিত। ইহার অর্থ হইল "ভিয়েট্ নাম্ স্বাধীনতা লীগ"। ইন্দোচীনের উপকূল-প্রদেশকে প্রাচীন কালে "ভিয়েট্ নাম" বলা হইত। সেই নাম হইতেই ইন্দোচীনের স্বাধীনতা লীগের বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে। ভিয়েট্ মিনের প্রেসিডেণ্ট, পঞ্চান্ন বৎসরের বৃদ্ধ হো-চি মিন্ (Ho-chi Minh) বার বৎসর বয়স হইতে গুপ্ত ফরাসী-বিরোধী আন্দোলনের সহিত জড়িত। তিনি ৪৩ বৎসর-ব্যাপী ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রাম করিতেছেন। সমগ্র ইন্দোচীনের তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা। বহু বার গুজব রটিয়াছে যে, হো-চি মিন্ ধরা পড়িয়াছেন, ফরাসীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি সশরীরে জীবিতই আছেন এবং ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি নেতা। শেষ পর্য্যন্ত সকলে দেখিয়া বিস্মিতও হইলেন যে, এই বৃদ্ধ হো-চি মিন্‌ই উত্তর টন্‌কিনে জাপানীদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের গেরিলা সৈন্তদের যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। এই বৃদ্ধই "স্বাধীন ইন্দোচীন গবর্ণমেণ্টের" প্রেসিডেণ্ট। বৃদ্ধ হো-চি মিন্ বলেন: "Viet Minh is a combination of all classes of social elements on a single plank of independence". এই "ভিয়েট্ মিনের" মধ্যে রহিয়াছে "ন্যাশনাল পার্টি" (পূর্ব্বে "আন্নামাইট্ কুয়োমিন্‌টাঙ" নামে পরিচিত ছিল),

"নিউ আন্নাম্ পার্টি" (New Annam Party), "কম্যুনিষ্ট পার্টি", "ইউথ্ লীগ", শ্রমিক ও কৃষকসঙ্ঘ ইত্যাদি। এই 'ভিয়েট্ মিন্' আজ ইন্দোচীনের জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট স্বাধীনতার আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাকে অহিংস আন্দোলন বলা যাইতে পারে না। ভিয়েট্ মিনের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা ড্রান্ ফান্ গাইউ এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "small bands based on units of twelve, pyramiding up to a strategic group (Chidai) of 144 partisans" হইল ভিয়েট্ মিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভিত্তি। অর্থাৎ বার জন করিয়া এক একটি ছোট ছোট গেরিলা সৈন্যের দল, স্তরে স্তরে ১৪৪ জনের একটি বড়ো দল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত। এই বৃহৎ দলকে বলে "চিদাই।" ইহাই হইল ইন্দোচীনদের সামরিক সংগঠন, এবং এই সামরিক সংগঠন ও শক্তি আজ ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণ-স্বরূপ। ফরাসী কামান-বিমান, গুলী-গোলা আজও তাই ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারে নাই। ফরাসী বাহিনার কয়েক জন অফিসার ইন্দোচীন হইতে ফিরিয়া প্যারীতে আসিয়া বলিয়াছেন : "আমরা একটির পর একটি গ্রাম দখল করিয়া পুনরায় ইন্দোচীন করতলগত করিব। ইন্দোচীনের অবস্থা আজ নিদারুণ জটিল। ভিয়েট্ মিন্ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী এবং ইহাকে দমন করিবার জন্য জেনারেল ক্লার্ক ৬০ হাজার সৈন্যের প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন।"

ফরাসী অফিসারদের এই নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায়, ইন্দোচীনের স্বাধীনতা লীগ "ভিয়েট্ মিন্" কতখানি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের সংগ্রামের কৌশলও ফরাসী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে যে রীতিমত চিন্তান্বিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ তাহাদের একটির পর একটি গ্রাম দখল করিয়া সমগ্র ইন্দোচীন অধিকার করার সমস্যা দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ ইন্দোচীনের প্রত্যেকটি গ্রামে পর্য্যন্ত আজ "ভিয়েট্ মিনের" সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটি সাম্রাজ্যবাদী জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছে। ইন্দোচীন আজ সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে, বিরাট প্রতিরোধ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের মতোই সশস্ত্র গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রতিদিন নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। তাই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের দংশন ইন্দোচীনের ঐক্য ও গণ-সংহতিকে কিছুতেই চূর্ণ করিতে পারিতেছে না। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের মধ্যে ইন্দোচীনের দৃঢ়তা ও একতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

"ভিয়েট্ মিনের" পরাজয় নাই। ভিয়েট্ মিনের স্বাধীনতা আদর্শ আজ আন্নামের প্রাক্তন রাজাকে পর্য্যন্ত উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আন্নামের প্রাক্তন রাজা বাও দাই (Bao Dai) বলিয়াছেন :—

"I appeal first of all to the Government of the French Republic···I solemnly announce the birth of the democratic Republic of Indochina······Placing the interests of my motherland above those of the throne, I prefer to be a citizen of an independent country to being king of an enslaved one···"

আমাদের ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বোধ হয় এই ঘোষণার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। কিন্তু আন্নামের রাজা পারেন এবং পরাধীন দেশে রাজা হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া তিনি অনেক বেশী গৌরবের বলিয়া মনে করেন। ভিয়েট্ মিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপকতা কতখানি তাহা এই দৃষ্টান্তটি হইতেই অনুমান করা যাইবে।

ঐক্যের পথে ইন্দোনেসিয়া

ইন্দোনেসিয়া আয়তনে নেদারল্যাণ্ড অপেক্ষা প্রায় ৫৬ গুণ বড়ো। ইন্দোনেসিয়ার মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। জনসংখ্যার তিন-ভাগের দুই ভাগ জাভা ও মাদুরায় বসবাস করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ইন্দোনেসিয়ায় জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বলা চলে। বৈদেশিক শাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে যেমন জাগৃতি আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং সেই জাগৃতি আন্দোলন (Ranaissance Movement) যেমন ধীরে ধীরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটা রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে, ঠিক তেমনই ইন্দোনেসিয়াতেও মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ও উচ্চশ্রেণীর জাগৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়া জাতীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। "বোয়েদি এতোমা" (Boedi Etoma) নামে যে প্রতিষ্ঠান ইন্দোনেসিয়ার বুদ্ধিজীবীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গঠন করে তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রাথমিক যুগের ভারতীয় কংগ্রেসের মতোই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু দিন পরে "সারিকৎ ইস্লাম" (Sarikat Islam) নামে আর একটি দল ধর্ম্মরক্ষা ও অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। বিদেশী খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও প্রসার হইতে ইন্দোনেসিয়ার ইস্লাম ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহার সহিত দেশের অর্থনৈতিক দাবী মিটাইবার জন্য "সারিকৎ ইস্লাম" সংগ্রাম করিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনও গড়িয়া উঠে এবং ১৯১৯ সালে একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। রেলওয়ে, ট্রাম, ছাপাখানা প্রভৃতিতে ধর্ম্মঘটের বন্যা আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মূলধনের কেন্দ্রস্থল চিনির কারখানাগুলিতেও এই ধর্ম্মঘট ছড়াইয়া পড়ে। "শারিকৎ ইস্‌লাম" ও "কেন্দ্রীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান" এই ধর্ম্মঘট পরিচালনা করে। ধর্ম্মঘটের ফলে বিদেশী শাসকদের রীতিমত মাথাব্যথা দেখা দেয় এবং দেশের মধ্যে বিরাট এক রাজনৈতিক সাড়া পড়িয়া যায়। ১৯১২ সালে যে "ইন্দোনেসিয়ান্ সোস্তাল ডিমক্র্যাটিক পার্টি" (Indonesian Social Democratic Party) গঠিত হয় তাহার ভিতর হইতেই সংগ্রামের তাগিদে ১৯২০ সালে "পার্শাই কম্যুনিষ্ট ইন্দোনেসিয়া" (Partai Kommunist Indonesia) গড়িয়া উঠে; ১৯২৩ সালে "শারিকৎ ইস্‌লাম" প্রতিষ্ঠানও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করে। ১৯২২-'২৩ সালে আবার এক ধর্ম্মঘটের জোয়ার আসে। ইন্দোনেসিয়ার গবর্ণর জেনারল ফক্ বিচলিত হইয়া তাঁহার ক্ষমতা যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতে থাকেন এবং কয়েক জন শ্রমিক-নেতাকে বন্দী করেন। ১৯২৪ সালেই ইন্দোনেসিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির ৩১,০০০ সভ্য হয় এবং ১৯২৬ সালের মধ্যেই ইহা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। কারণ, তখন ইয়োরোপের চারি দিকেও বিপ্লবের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। এই সময় ইন্দোনেসিয়ায় প্রায় ১৩,০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার মধ্যে প্রায় ১৩০৮ জন বন্দীকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়া নিউ গিনির বন্দিশিবিরে প্রেরণ করা হয়। ১৯২৮ সালে "Sarikat Kaoem Boeroch Indonesia" নামক আর একটি শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানের নেতাদের নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৯২৭ সালে "National Indonesian Party" নামে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। ১৯২৯ সালে এই দলের নেতা সোয়েকার্ণো চার বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই ভাবেই প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি ও সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের ভিতর দিয়া ইন্দোনেসিয়ায় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক দল, অনেক প্রতিষ্ঠান ইন্দোনেসিয়ায় গড়িয়াছে ও ভাঙিয়াছে, কিন্তু আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সমস্ত পীড়ন, জুলুম, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া ইন্দোনেসিয়ার জনসাধারণ স্বাধীনতার পথে নির্ভীকচিত্তে অভিযান করিয়াছে। নেতারা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, হাজার হাজার দেশকর্ম্মী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ন্যায় ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদও অসহায়, নিরস্ত্র ইন্দোনেসিয়ার জনসাধারণের উপর নির্ব্বিচার চিত্তে অত্যাচার করিয়াছেন কিন্তু জনসাধারণের চেতনা তাহাতে লোপ পায় নাই, ক্রমেই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪২ সালে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর ইন্দোনেসিয়ার জাতীয় আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। এক দল ডাঃ সোয়েকার্ণোর নেতৃত্বে জাপানী ফ্যাশিষ্টদের সহযোগিতায় ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ হন এবং আর এক দল ফ্যাশিষ্টদের বিরোধিতা করিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করিতে থাকেন। ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী প্রগতিশীল জাতীয় নেতাদের মধ্যে শেষোক্ত দলের অন্যতম হইতেন ডাঃ মহম্মদ হাত্তা, বর্ত্তমানে স্বাধীন ইন্দোনেসীয় রিপাব্লিকের সহঃ-সভাপতি। জাপানীরা ডাঃ সোয়েকার্ণোর নেতৃত্বে একটি গবর্ণমেণ্টও গঠন করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ডাঃ সোয়েকার্ণো জাপানী ফ্যাশিষ্টদের স্বরূপ বুঝিতে পারেন এবং তাহাদের সহযোগিতায় স্বাধীনতা লাভের দুঃস্বপ্ন সম্বন্ধেও তাঁহার চেতনা হয়। তিনি তাঁহার মারাত্মক ভুল স্বীকার করেন এবং অনুতপ্ত হন। ইন্দোনেসিয়ায় যে সব দল ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য ডাঃ সোয়েকার্ণো উদ্‌গ্রীব হন। পুরাতন মারাত্মক মতবিরোধ ভুলিয়া গিয়া প্রতিরোধ আন্দোলনের সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও ফ্যাশিষ্ট বিরোধী জাতীয় নেতারা ডাঃ সোয়েকার্ণোকে তাঁহাদের সহিত আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন। তাহার পর হইতেই ইন্দোনেসিয়ায় এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরাতন ভেদাভেদ ও মতবিরোধ ভুলিয়া ইন্দোনেসিয়ার প্রত্যেক রাজনৈতিক দল আজ একই স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একত্রে সংগ্রাম করিতেছে। এই সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংহত জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য আজ ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সকল সাম্রাজ্যবাদীরাই হাত মিলাইয়াছেন। ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ইন্দোনেসিয়া জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করিতেছে। চরকা, গ্রামোন্নয়ন ও অহিংসা ইন্দোনেসীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের হাতিয়ার নয়। ইন্দোনেসিয়ায় যে গণ-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সশস্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন (armed mass movement)। ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনেও এই সশস্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি। ব্রহ্মদেশ হইতে ইন্দোনেসিয়া পর্য্যন্ত এই যে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র গণ-আন্দোলন আজ গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাকে দমন করিবার জন্য আজ সাম্রাজ্যবাদীরাও একত্রিত হইয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত আজ এসিয়ায় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মেজর জেনারল আউজ

সান্, হো-চি মিন্, ডাঃ সোয়েকার্ণো, হাত্তা ও সরিফুদ্দিন, আজ এই গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছেন। তাঁহারা এক নূতন যুগ ও নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিতেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান-চর্চ্চা পাশ্চাত্ত্য রীতিতে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নহে। এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পর হইতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব দাবী করিতে পারে। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলয়ম জোন্স এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। ইহার পর আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, কিন্তু এ-গুলির কোনটিতেই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনার বিশেষ সুবিধা ছিল না। এই অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘকাল পরে ভারতের কয়েক জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ্ বৃটিশ এসোসিয়েশনের অনুকরণে একটি ভারতীয় বিজ্ঞান-সমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ পি এস ম্যাকমোহন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ জি এস্ সাইমন-সেন-প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ্‌রা এই কাজে অগ্রণী হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, প্রতি বৎসর যদি একটি করিয়া বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠান করা যায় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ও চিন্তাধারার পারস্পরিক আদান-প্রদানের যেমন সুযোগ পাওয়া যাইবে, তেমনই জনসাধারণের মধ্যেও বিজ্ঞান অনুশীলনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের বিজ্ঞানীরা এ-সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন তাহা জানিতে চাহিয়া তাঁহারা ১৯১১ সালে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। তদনুযায়ী ১৯১২ সালে প্রথম বিজ্ঞান-সম্মেলনের অনুষ্ঠানের জন্য ভারতের সতের জন শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিককে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ বৎসরই ২রা নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় "রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটি" হলে একটি সম্মেলন হয় এবং উহাতে এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত করা হয় যে, প্রতি বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন বসিবে। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। ইহাই ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উৎপত্তির ইতিহাস। ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চ্চায় সহিত যে সকল দেশী বা বিদেশী মনীষী সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত।

এই বৎসর (১৯৪৬, জানুয়ারী) ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশন হইয়াছে মহীশূর রাজ্যের রাজধানী বাঙ্গালোরে। বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক আফজল হোসেন এই বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মূল সভাপতি হন। ১৯৩৩ সালে অধ্যাপক হোসেন ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসে কৃষিবিদ্যা বিভাগে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩৮ সালে করেন কীটবিজ্ঞান বিভাগে। ১৯৩৫ সালে মিশরে আন্তর্জ্জাতিক পঙ্গপাল সম্মেলনে অধ্যাপক হোসেন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৮ সালে জেনেভায় তিনি ভারতের কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি-নিধিত্ব করেন। এই মাসেই তিনি ব্রুসেল্স, বার্লিন, মিউ-নিক্, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানের বৈজ্ঞানিক-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। ১৯৪৪ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে মধ্য-প্রাচ্যের কৃষি-সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান। ভারতীয় বিজ্ঞা-নের ইতিহাসে অধ্যাপক হোসেনের অবদান অতুলনীয়।

অধ্যাপক আফজল হোসেন তাঁহার মূল সভাপতির অভিভাষণে বিশ্বের খাদ্য সরবরাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, আজ ইউরোপ, সুদূর প্রাচ্য ও ভারতে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ভারতে খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের সঠিক হিসাবের অত্যন্ত অভাব। এই হিসাব যত দিন না পাওয়া যাইবে তত দিন কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব হইবে না। সেই জন্যই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে হিসাব ও সংখ্যাবিজ্ঞানের (Statistics) উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা থাকা উচিত। অধ্যাপক হোসেন বলেন যে, ১৯৪১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯৩১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ। এই অনুপাতে বর্ত্তমানে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ। ১৯৬০ সালের পূর্ব্বেই ভারতের জনসখ্যা ৫০ কোটি হইবে। ১৯৭০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৬৫ কোটি দাঁড়াইবে। তখন ভারতকে আরও ৩৫ কোটি অতিরিক্ত অধিবাসীর খাদ্য সংগ্রহের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে চাল, ডাল, শাক, সব্জী, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি সকল প্রকার খাদ্যের উৎপাদন ও পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক হোসেন বলেন, এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে একটি "খাদ্য-বিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ভারতে যুদ্ধকালীন ইস্পাত-শিল্প

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও খনিজতত্ত্ব শাখার সভাপতি মিঃ ফিরোজ কুটার ভারতে যুদ্ধকালীন ইস্পাত-শিল্পের (Steel Industry) প্রসার সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—

"বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলিতে প্রধানতঃ বাড়ী-ঘরের কাঠামো এবং রেল-লাইন

তৈয়ারীর উপযোগী সাধারণ কার্ব্বন ইস্পাতই তৈয়ারী হইত, উচ্চস্তরের খাদ-মিশ্রিত ইস্পাত অথবা ইস্পাতের যন্ত্রপাতি প্রকৃত পক্ষে এখানে প্রায় তৈয়ারীই হইত না। ১৫ বৎসর আগে এই ধরণের চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং হাওড়ার নূতন সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনার দরুণ উহার সুযোগও পাওয়া যায়। টাটা কোম্পানী এই সময়ে 'টিস্‌ক্রম' নামে এক উচ্চস্তরের ইস্পাত তৈরী করে এবং উহার প্রায় ১৭ হাজার টন নূতন হাওড়া সেতু নির্ম্মাণের কাজে লাগানো হয়। উহার পর 'টিস্‌কর' নামে যে শ্রেণীর ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষয়-নিরোধক এবং রেলওয়ে কার, ট্রাক প্রভৃতি তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। খাদমিশ্রিত ইস্পাত প্রভূত পরিমাণে তৈয়ারীর প্রথম বড় রকমের সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৪০ সালে, যখন টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীকে সাঁজোয়ার পাত তৈয়ারীর জন্ম অর্ডার দেওয়া হইল। এই ধরণের ইস্পাত তৈয়ারীর কোনও পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল না, বাহিরের কোনও সাহায্য পাওয়ারও উপায় ছিল না। কিন্তু ব্যাপক ভাবে গবেষণার ফলে এখানে বুলেট-নিরোধক যে সাঁজোয়ার পাত তৈয়ারী করা হইল, তাহা অন্যান্য দেশের পাত অপেক্ষা যদি উৎকৃষ্টতর না-ও হয়, তথাপি কোনও অংশে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। উত্তর-আফ্রিকায় অষ্টম আর্ম্মির অভিযানে এই পাত যথেষ্ট কাজ দিয়াছে। এই সময়ে এই ধরণের ইস্পাত ছাড়া, প্যারাশুটের সাজ, শিরস্ত্রাণের জন্ম চুম্বকশক্তিহীন বুলেট-নিরোধক ইস্পাত প্রভৃতিও তৈয়ারী করিয়া সরবরাহ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের এই ব্যাপক চাহিদা মিটাইতে গিয়া অবশ্য অসামরিক চাহিদাকেও তাচ্ছিল্য করা হয় নাই। ভারতে খুচরা মুদ্রার ঘাটতি পড়িলে টাকশালগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ম প্রচুর পরিমাণ ইস্পাতের ছাঁচ সরবরাহ করা হইয়াছিল। ভারত সরকারের ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগকেও কয়েক প্রকার চুম্বকশক্তিবিশিষ্ট ইস্পাত উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করা হয়। ইহার পর আসিল ছুরি, কাঁচি, শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্য দাগহীন ইস্পাতের চাহিদা। ভারতীয় লৌহ-শিল্পের আর একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব হইতেছে দ্রুতবেগে নিক্ষেপের উপযোগী ইস্পাত উৎপাদন। ইহা সম্ভব না হইলে কামানের গোলা প্রভৃতি রসদ তৈয়ারীতে বিঘ্ন জন্মিত। এই সকল ইস্পাত উৎপাদনে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সাজ-সরঞ্জাম একটার বদলে আর একটা দিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে, কারখানাগুলিও যন্ত্রপাতির দিক্ দিয়া কোন মতেই পূর্ণাঙ্গ ছিল না। মোটের উপর দেখা যায় যে, ভারতের ইস্পাত-শিল্প আজ উন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে এবং দেশে শিল্পপ্রসারের পরিণতিতে খাদ-মিশ্রিত ইস্পাতের যে বিপুল চাহিদা দেখা দিবে তাহা পূরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

ভারতে পারমাণবিক শক্তির গবেষণা

ভারতে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ এইচ জে ভাবাকে লইয়া একটি বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন। পরিষদ এ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :

"জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই অভিমত পোষণ করেন যে, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ রূপান্তর গোপন রাখার সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা একান্ত অহেতুক, কেন না, পারমাণবিক শক্তির মৌলিক তথ্যাদি ইতিপূর্ব্বে সাধারণের গোচরে আসিয়াছে। এমতাবস্থায় পারমাণবিক শক্তির তথ্যাদি গোপন রাখা হইলে মারাত্মক অস্ত্রাদির উৎপাদন বৃদ্ধির যে প্রতিযোগিতা সুরু হইবে তাহাতে পরিণামে আবার যুদ্ধ বাধিবে। পারমাণবিক শক্তিজাত বিভিন্ন মারণাস্ত্রের হাত হইতে মানব-সভ্যতাকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে আন্তর্জ্জাতিক-সঙ্ঘ গঠন করিয়া বিশ্বের সকল দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির মৌলিক বিকাশ সম্পর্কে ভাব-বিনিময় এবং কল্যাণকর কার্য্যে পারমাণবিক শক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন দেশের জাতি সমূহকে এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল কমিটি গঠন করিবেন, ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ সানন্দে তাহার সহযোগিতা করিবে।"

ভারতের দেশীয় রাজ্যের অবস্থা

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি (Native States) যে মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা, অমানুষিক দারিদ্র্য ও রাজকীয় বিলাসিতার একটি 'crossword puzzle' বিশেষ তাহা সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোন লোকেরই জানিতে আজ আর বাকি নাই। যে ভারতের দারিদ্র্য জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে, সেই ভারতের বিলাসিতাও এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। ভারতের দেশীয় রাজারা আজও সেই মধ্যযুগীয় বর্ব্বর বিলাসিতার ধারা বহন করিয়া চলিয়াছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বালাই নাই, যুগোপযোগী চিন্তাধারার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। লক্ষ লক্ষ নিরীহ, অসহায় প্রজাদের শোষণ করিয়া, শাসন করিয়া, এই ভারতের দেশীয় রাজারা আজও মনের আনন্দে পশু-শীকার করিতেছেন, মণিমুক্তার মেলা খুলিতেছেন, রমণী-সম্ভোগ করিতেছেন এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাহাতে চিরদিন কায়েম থাকে তাহার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি আজও তাই প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরতার যুগে পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে পৃথিবী বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি হাজার হাজার যুগ পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। দুই-এক জন দেশীয় নৃপতি শাসন-সংস্কার এবং প্রজাদের তথাকথিত মঙ্গলের দিকে নজর দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা এতই সামান্য যে, তাহা উল্লেখ করা চলে না। এই দেশীয় রাজারা চিরদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের "পঞ্চম বাহিনী" বলিয়া পরিচিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক একটি স্তম্ভ দেশীয় রাজ্যগুলি। সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রদেহে মারাত্মক "ক্যান্সার"রূপে এই রাজ্যগুলি বিরাজ করিতেছে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে এই দেশীয়

রাজ্যগুলি চিরন্তন সমস্যা-বিশেষ। এ-সম্বন্ধে সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উক্তি বিশেষ ভাবে প্রণিধেয়।

উদয়পুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনের ৭০তম অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার অভিভাষণে দেশীয় রাজ্য ও রাজাদের সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"অতীত ভারতের এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংসাবশেষ, এগুলি সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল। বৃটিশ শক্তিই ইহাদের অনেকগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভারতে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার জন্য এ-গুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছে।

"লর্ড ক্যানিং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—'বহু দিন পূর্ব্বেই স্যার জন ম্যালকম বলিয়াছেন যে, ভারতকে যদি আমরা বিভিন্ন জেলায় ভাগ করি তবে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল আমাদের সাম্রাজ্য টিকিবে না। কিন্তু যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা-বিহীন কতকগুলি দেশীয় রাজ্য রাখিয়া দিই, তবে যত দিন ধরিয়া নৌশক্তিতে আমরা প্রাধান্য অধিকার করিয়া আসিতেছি তত দিন পর্য্যন্তই আমরা ভারতে থাকিতে পারিব। এই অভিমতের সত্যতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নাই।

"জনৈক লেখক দেশীয় রাজ্যগুলিকে 'ভারতের বৃটিশ পঞ্চম বাহিনী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। গত দেড়শ' বছরের ইতিহাস এই আখ্যার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি রাশব্রুক উইলিয়ামস্ ১৯৩০ সালে লিখিয়াছেন,—'এই দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান একটি বড় রকমের রক্ষাকবচ। ইহাদের অবস্থান কতকটা সংশয়পূর্ণ দেশের ভিতর দুর্গাবলী সমাবেশের মত। এই অনুগত দেশীয় রাজ্যগুলির জন্যই বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতে ব্যাপক বিদ্রোহ সম্ভব নয়।' এই দেশীয় রাজ্য-সমূহের শাসকবর্গের নিন্দাবাদ আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। কিন্তু ইহারা বৃটিশ শক্তির ছায়া মাত্র এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের অবনত অবস্থার ও সমস্ত দায়িত্ব তাহাদের রক্ষকদের। এ-কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, প্রগতিবাদী অথবা স্বাধীন মতাবলম্বী রাজন্যবর্গকে ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ সুনজরে দেখেন না। ইহাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক বিভাগ কর্ত্তৃক মনোনীত মন্ত্রিবর্গকে লইয়া গদীয়ান আছেন। সুতরাং দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে লড়াই করার অর্থ হইতেছে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে লড়াই করা। যে মুহূর্ত্তে এই সরকার ভারত ত্যাগ করিবে সেই মুহূর্ত্তে সমস্যার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। ১৯৪২ সালে স্যার জিওফ্রে ড মণ্টোমোরেন্সী তাঁহার "দেশীয় রাজ্য ও ভারতীয় ফেডারেশন" বইয়ে লিখিয়াছেন,—'ভারতে এত অধিক সংখ্যক দেশীয় রাজ্য এখনও রহিয়া গিয়াছে যে, বিবর্ত্তনের পথে এগুলি বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বৃটিশ যদি ভারতে সর্ব্বপ্রধান শক্তি হইয়া না থাকে তবে এই রাজ্যগুলির বিলোপ সাধন অবশ্যম্ভাবী।'

"রাজপুতানার কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে এমন সব ঘৃণ্য প্রথা প্রচলিত আছে যাহা আধুনিক কোন রাষ্ট্রই সহ্য করিবে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, জনগণ যদি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তবে এই সব প্রাচীন ও ক্ষতিকর প্রথা বিলুপ্ত হইবেই।

"কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করিয়া একটি ইউনিট গঠন মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অনুন্নত এলাকাগুলিকে সম্মিলিত করিলে কোনই উন্নতি হইবে না, যুক্ত করিতে হইবে প্রদেশগুলির সঙ্গে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকবর্গ কিছু পেন্সন পাইবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত তাঁহারা বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অন্যান্য রাজ্যগুলিতে (সংখ্যায় এগুলি ১৮ হইতে ২০'র বেশী হইবে না এবং এগুলি মিলিত হইয়া ফেডারেশনে স্বায়ত্ত-শাসিত ইউনিট গঠিত করিবে) শাসকবর্গ গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে শাসনকর্ত্তা হইয়া থাকিবেন।

"স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৪২ সালে ক্রিপস্‌-প্রস্তাবে বিভিন্ন প্রদেশের নির্ব্বাচিত এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসকবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া একটি গণ-পরিষদের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যের ৯ কোটি জনসাধারণ উপেক্ষিত হইয়াছে এবং তাহারাও ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ইহাও একটি কারণ। এই ভাবে কোন গণ-পরিষদ বা অন্য কোনরূপ পরিষদ গঠিত হইতে পারে না এবং ন্যায়মত কাজও করিতে পারে না। ফেডারেশন সম্পর্কেও একই কথা।

"এ-কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে আইন-সভা থাকিলেও তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। বহু-সংখ্যক মনোনীত সদস্য লইয়াই এই সকল আইন-সভা গঠিত। স্বাধীন ভারতের অচ্ছেদ্য অংশরূপে দেশীয় রাজ্যগুলিতে পূর্ণ প্রতিনিধিমূলক সরকার থাকিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূল নীতি। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের কার্য্য ও আমাদের প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের জন্যই—বিশেষ করিয়া যাহারা সমাজের একেবারে নীচে পড়িয়া আছে তাহাদের জন্যই। যে সকল শহীদ আমাদের সংগ্রামে প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তেহরি ষ্টেটের শ্রীদেব সুমনের নাম আমি বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি। ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষের নিপীড়নের ফলেই তিনি কারাগারেই মারা গিয়াছেন।"

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

এইবার সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকার চিলি প্রদেশের অধিবাসিনী গ্যাব্রিয়েলা মিষ্ট্রাল। এখন তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর। তিনি ব্রেজিলের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী পেট্রোপলিসের কনসাল। চিলিয়ান কবিদের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বহু দিন অধিকার করিয়াছিলেন, এখন জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, বাংলার ভোটাধিকার-প্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসপন্থী। যে কারণেই হোক, হিন্দু-মহাসভা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভোটাধিকার-প্রাপ্ত মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেস-দলভুক্ত বা তথা-কথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কোন প্রতিনিধিই নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। বাংলার মুসলিম লীগের কর্ত্তারা মন্ত্রিত্ব করিবার সময় নানা উপায়ে যে তাঁহাদের পার্টিফণ্ড পুষ্ট করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে; এবং সেই পার্টি-ফণ্ডের সহিত মুসলিম লীগের প্রভাব বিস্তারের যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাও সকলেই জানেন। কিন্তু কারণ যাহাই হোক, এবং মুসলিম কর্ত্তাদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য যাহাই হোক, আজ যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও কৃষকশ্রেণীর মুসলমানেরা লীগের প্রভাবে কংগ্রেস-বিদ্বেষী ও পাকিস্থান-পন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মনোভাবের ফলে বাংলাদেশের বহু স্থানে যে পাকিস্থানপন্থী মুসলমানেদিগের হাতে হিন্দুদিগকে নির্য্যাতিত হইতে হইতেছে, তাহা চক্ষু থাকিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মপন্থায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন একটা প্রধান অঙ্গ। গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের জন্ম যে সমস্ত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, সেগুলি যে সুফলপ্রদ হয় নাই, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এক সময়ে কংগ্রেসের কর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন যে, মুসলিম দলপতিদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া যদি সোজাসুজি মুসলিম জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারা যায় যে, তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত হিন্দু জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের কোন প্রভেদ নাই, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কৃত্রিম বিরোধ দেখা যায়, তাহা সম্ভবতঃ লোপ পাইবে। কিন্তু মুসলিম দলপতিদিগের চেষ্টায় কংগ্রেসের সে শুভেচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুসলমান দলপতিদিগের স্বার্থহানির সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই চারি দিকে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলিম লীগের কর্ত্তারা প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, মুসলমানের হিন্দুদিগের হইতে পৃথক্ একটা নেশন। মুসলমানের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ভাষা, আচার-ব্যবহার, ঐহিক-পারত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী—সবই না কি হিন্দুদের হইতে বিভিন্ন; এবং ভারতবর্ষের ভিতর মুসলমানদের জন্ম দুই একটা পৃথক্ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে না পারিলে ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ না কি একেবারে অন্ধকারময়।

গত সাত শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কে কাহার উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, আপাততঃ সে প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই। কিন্তু মুসলিম লীগের চেষ্টায় বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের সমস্যা ক্রমশঃ যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতারা যে সমস্ত প্রদেশবাসী সে সমস্ত প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। কাজেই, তাঁহারা যে সব সময় বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিন্দা করিয়া অহিংসা সাধন সম্বন্ধে দুই একটা ভাল ভাল তত্ত্বকথা বলিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। বাংলাদেশে যে সমস্ত ছোট ছোট কংগ্রেসী নেতা আছেন তাঁহারা কে কোন্ উপায়ে নিখিল-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্ত হইবেন, সেই চিন্তাতেই বিভোর! এ দিকে প্রত্যেক নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রেই কংগ্রেস-ঘেঁষা মুসলমানেরা লীগের হাতে মার খাইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। অনেকে বেগতিক দেখিয়া লীগের দলে যোগ দিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের পাকিস্থান-বিরোধী হিন্দুগণ লীগপন্থীদিগের হাত হইতে আপনাদের ঘরবাড়ী বিষয়-সম্পত্তি বাঁচাইবার জন্ম ভয়ে ডরে চুপ করিয়া রহিলেন। লীগপন্থীদিগের বাংলা সংবাদপত্রগুলি উর্দ্দু মিশ্রিত বীভৎস বাংলা ভাষায় নিজেদের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন এবং বাংলা সাহিত্য হইতে হিন্দুদের প্রভাব কেমন করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে পারা যায়, তাহার জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন।

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা শুধু নিষ্কাম ভাবে প্রেম বিতরণের উপদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত হন; কিন্তু এই প্রেম বিতরণের ফলে কেমন করিয়া যে বাংলায় পাকিস্থান গঠন বন্ধ হইবে, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন—"আপাততঃ লীগপন্থী মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের ভিতর আনিবার চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। শুধু সেবা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা কর।" কিন্তু কার্য্যতঃ কোন কংগ্রেসী নেতাকে লীগ-বিধ্বস্ত পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে দেখা যাইতেছে না।

বাংলার হিন্দুরা দেশের স্বাধীনতা চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভাষা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষা করিতে চায়। প্রেম-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাংলাদেশটাকে লীগপন্থীদের হাতে তুলিয়া দিবার প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও আপনাদের কৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালী হিন্দুর চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে কংগ্রেসের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

শরৎচন্দ্র বসাক

২২শে পৌষ রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটে কলিকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ডক্টর শরৎচন্দ্র বসাক কালিম্পং হইতে দার্জিলিং মেলে কলিকাতায় আসিবার পথে জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ছাত্রজীবনে ডাঃ বসাক এক জন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ১০ টাকা ও এফ-এ পরীক্ষায় ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। বি-এ—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও গণিত-শাস্ত্রে অনার্স

[পদা]র্থবিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ও রিপণ কলেজ হইতে বি-এল পাশ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এম-এল পরীক্ষায় পাশ করেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডি-এল উপাধি পান।

—

কবিরাজ দীননাথ শাস্ত্রী

কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী সুপণ্ডিত কবিরাজ দীননাথ শাস্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শত শত ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে বাড়ীতে রাখিয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

—

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী। বঙ্কিম-সাথিরূপে বাংলা সাহিত্যের নব যুগ সৃষ্টির জন্য তাঁহার সাধনা ও চেষ্টা মাত্রই উল্লেখযোগ্য নয়, সম-সাময়িক সাহিত্যের সম্পাদকরূপে তাঁহার কৃতিত্বও অবিস্মরণীয়। তাঁহার ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনা, তাঁহার জাগ্রত সমাজ-চেতনা, তাঁহার

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাঁহার নির্ভীক রাজনৈতিক মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যমুখী মোহান্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন ও চিন্তাধারা গঠনে কতটা সহায়তা করিয়াছিল, আজ সে কথা বিস্মৃতির অতল তলে অবলুপ্ত। তাই হুগলী-চুঁচুড়াবাসী আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী পাঠক ও জনসাধারণকে এই সাহিত্য-সাধকের কথা স্মরণ করাইবার জন্য শতকোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর, হুগলী মহসীন কলেজে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন খাঁটি সাহিত্যিক, খাঁটি দেশপ্রেমিক, খাঁটি বাঙ্গালী। তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা সাহিত্যচর্চ্চা নয়—তাহা সাহিত্য-সাধনা এবং এই সাধনা প্রযুক্ত হইয়াছিল লোকশিক্ষা ও জনসেবার ব্রতে। তাঁহার এই জীবনব্যাপী সাধনা ও ব্রতের অবসান ঘটে তাঁহার মৃত্যুতে। ১৯১৭, ২রা অক্টোবর, ৭১ বৎসর বয়সে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে পরলোক গমন করেন।

—

অজিতমোহন বসু

১৩ই পৌষ সন্ধ্যা ৭-৩০টায় সার জগদীশচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার অজিতমোহন বসু তাঁহার বালিগঞ্জস্থ বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। হৃদযন্ত্রের পীড়ায় তিনি কিছু কাল ধরিয়া ভুগিতেছিলেন।

ন্যাচুরোপ্যাথী, এক্স-রে এবং হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক চিকিৎসা-পদ্ধতি যাঁহারা প্রথম ভারতবর্ষে ব্যবহার করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জুরিকে তিনি ইণ্টারন্যাশনাল রেডিওলজিক্যাল কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বার্লিন কনফারেন্সে তিনিই একমাত্র নিমন্ত্রিত ভারতীয় ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের হাইড্রো-ইলেকটিক এবং এক্স-রে যন্ত্রপাতি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে দান করিয়াছেন। হাসপাতালে এই বিভাগের তিনিই কর্ত্তা ছিলেন।

তাঁহার বাটীতেও তিনি রোগীদের জন্য একটি 'বাথ' করিয়া দিয়াছিলেন। মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব্বেও তিনি রোগীদের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

২৪শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৫২ [৪র্থ সংখ্যা

"তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তি-পথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার!"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
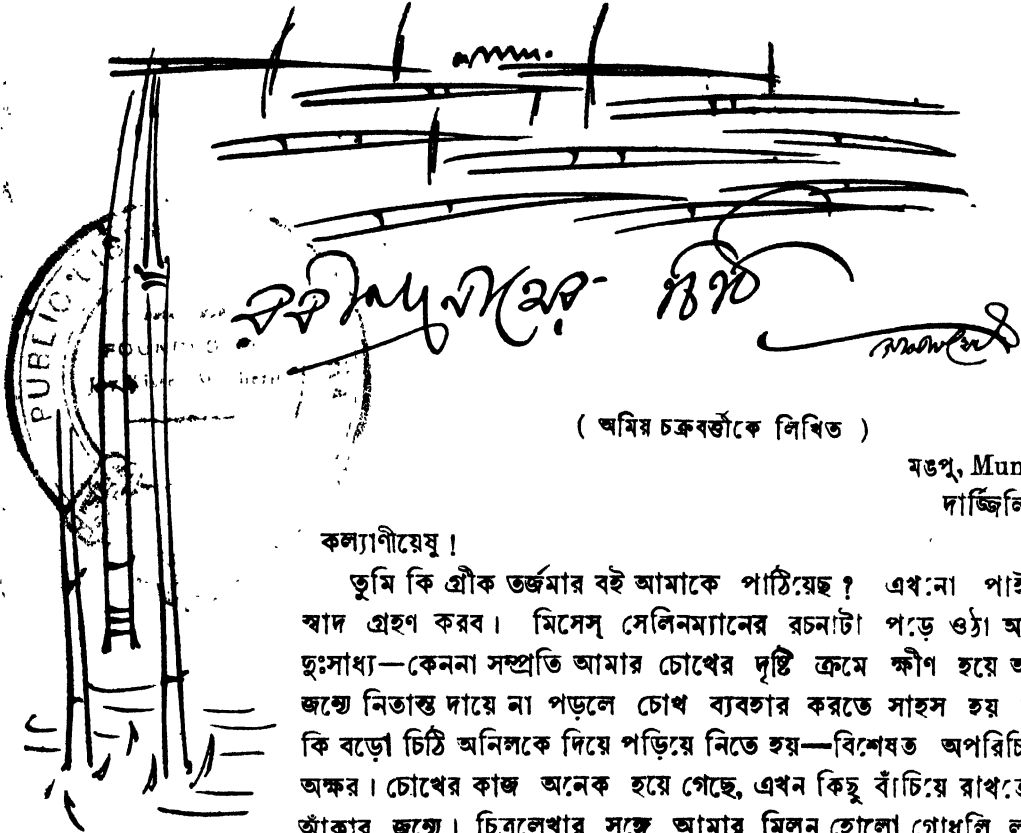
(অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত)

মংপু, Mungpoo.
দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু !

তুমি কি গ্রীক তর্জ্জমার বই আমাকে পাঠিয়েছ ? এখনো পাইনি, পেলে স্বাদ গ্রহণ করব। মিসেস্ সেলিনম্যানের রচনাটা পড়ে ওঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য—কেননা সম্প্রতি আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে, সেই জন্যে নিতান্ত দায়ে না পড়লে চোখ ব্যবহার করতে সাহস হয় না। এমন কি বড়ো চিঠি অনিলকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়—বিশেষত অপরিচিত হাতের অক্ষর। চোখের কাজ অনেক হয়ে গেছে, এখন কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চাই ছবি আঁকার জন্যে। চিত্রলেখার সঙ্গে আমার মিলন হোলো গোধূলি লগ্নে, আসন্ন রাত্রির মুখে, ভেবেছিলুম যাকে বলে হানিমুন, নির্জ্জনতায় তাকে সম্ভোগ করা যাবে—তাকে আচ্ছন্ন করচে কাজে এবং জনতায়—এদিকে চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে আসচে।

ম্যাকনিকলের ঈশোপনিষদের তর্জ্জমা আমার ভালো লাগল না। ঐ উপনিষদটি আমার সব চেয়ে প্রিয়—ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য্য গভীর। কিন্তু অনুবাদক এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। দেখা হোলে বলব—আরো অনেক কথা বলবার আছে। আমরা নামব জুলাইয়ের আরম্ভে। যদি তার আগেই তোমরা আস এখানে একবার আসতে পারো। ইতি ১৭।৫।৪৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

রথীরা চলে গেল। আমি আর কিছুদিন পরে সুবিধামত জাহাজ অবলম্বন করে যাব স্থির করেছি। যদি শরীর ভালো থাকে তবে ১লা বৈশাখে হয়ত যাব।

কবিতার জন্যে বিচিত্রা তাড়া দিচ্চে। কিন্তু ওরা ফাঁকি দিয়ে পেতে চায়—অতএব চুপ করে থেকো। বসুমতী যা পায় তার দাম দেয়।

আমার সব লেখাগুলো শ্রেণীবদ্ধ ক'রে পাকা ভাবে বাঁধিয়ে রাখবার জন্যে সুরেনকে বোলো।
এখানে কষে বৃষ্টি হয়ে গেল। তোমাদের ওখানেও আশা করি ভদ্র রকম বৃষ্টি হয়েচে।

শরীরটা ক্লান্ত আছে।

ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, এই কবিতাটি* এতদিনে অন্য কোনো সূত্রে দেখে থাকবে, তবু তোমাকে পাঠালুম। আজ বিকালে আমার বক্তৃতা আছে। কাল সকালে অন্যত্র যেতে হবে। দেখবার জিনিষের অন্ত নেই কিন্তু এমন করে ঘুরে বেড়াবার শক্তি আমার কই। শুধু দেহ নয়, মন ক্লান্ত হয়ে যায়—কেননা আমার মন আপনাতে নিবিষ্ট হয়ে ভাবতে ভালোবাসে। যে পাখী ডিমে তা দিতে চায় বাইরে থেকে তাকে কেবলি তাড়া দিতে থাকলে তার যে দশা হয় আমার মনের সেই দশা।

চিঠিতে নানা বকুনি বকেচি,—সেগুলো পত্রযোগে দেশে পাঠানো হয়েচে। মালয় উপদ্বীপে বাইরে দৃষ্টি দেবার যোগ্য কোনো প্রলোভন না থাকায় আপন মনের এই সকল যা'—তা'—বহুল কথাগুলো জমে উঠ্‌ছিল। এখানে তার জো নেই—বাইরের জগৎ সর্ব্বদা ডাক পাড়চে।

অক্টোবরের শেষ অংশে দেশে পৌঁছব বলে আশা করি। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

অমিয়

——পত্রিকা থেকে বিশ্বভারতীর মারফৎ আমার ঘাড়ে একটা গল্প লেখার ফরমাস চাপিয়েছে। সেই ঘাড়ের উপর যে মাথাটা টলটল করচে সেটা প্রায় গজভুক্ত কপিত্থবৎ——লিখতে হয় কষ্টে মন্থর গতিতে। অন্যান্য সকল কাজকে সে মুড়িয়ে খেতে খেতে চলেছে।

আধুনিক কাব্যপরিচয় পেয়েছি, পড়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছি। দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে আসচে। কবির প্রেয়সী বুড়ি হয়ে মারা যায় না। আজও এসে বাতায়নে আঘাত করে চম্পক অঙ্গুলির। এই যে চির-আধুনিক এর স্বরূপ কী, চিরসনাতনীর সঙ্গে মূলগত প্রভেদ কী সে কথাটা বুঝিয়ে বলবার ভার তোমারই পরে। তুমি হচ্চ আমার লিপিকার সেই প্রভাত ও সন্ধ্যার মতো——তোমার একদিকে সূর্য উঠচে যূথী বনে আর একদিকে সন্ধ্যা আসন বিছাচ্চে নক্ষত্র সভায়। তোমার নিজের মধ্যে তুমি একত্রে অধিকার করেছ প্রাচ্য প্রতীচ্যের উদয়াস্ত লোককে। আমি আজ মুখ ফিরিয়ে চলেছি একদিকে, তাকে কী নাম দেবে জানিনে।

এই সংকলন গ্রন্থে এখনো অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কালশিল্পী বিকৃতিকে নূতনত্ব ব'লে স্পর্দ্ধা করেছে। বিকৃতি তার অস্বাভাবিকতা দ্বারা চমক লাগায়——যে জন্যে আপন পোষা জীব জন্তুর মধ্যে ইচ্ছা ক'রে মানুষ বিরূপের সন্ধান করে। অদ্ভুত এবং অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সে তো কবিরাই জানে বিজ্ঞানীর কাছে দুইয়ের মূল্যই সমান।

আমার সময় অত্যন্ত কম এবং শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

ইতি ২২।৮।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* 'জাভার পথে' কবিতার ইংরাজী তর্জমা।

★
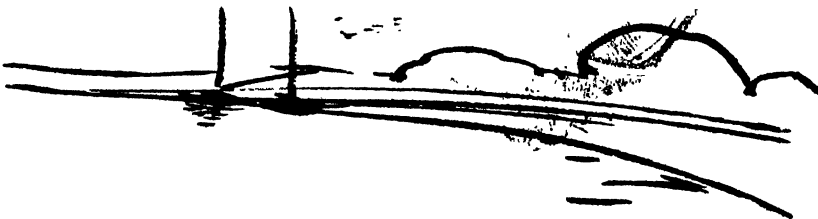
"যাদের হাতে টাকা, তার
রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠো
ভেতর রেখেছে, প্রজাদে
লুটছে, শুষছে, তার পর সেপা
করে দেশ-দেশান্তরে মর
পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাঁদে
ঘর ভরে ধনধান্য আসবে
আর প্রজাগুলো তো সেই
খানেই মারা গেল,—হে রাম
চমকে যেওনা, ভাঁওতা
ভুলো না!"

"আত্মরক্ষার জন্য, জাতিরক্ষা
জন্য যুদ্ধ। যে তলোয়ার
চালাতে পারে, সে হয় বড়;
যে তলোয়ার না ধরতে পারে,
সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে
কোনও বীরের তলোয়ারের
ছায়ায় বাস ক'রে জীবন ধারণ
করে।"

"যে চাষ করলে, সে পেলে
ঘোড়ার ডিম, যে পাহারা
দিলে, সে জুলুম ক'রে কতকটা
আগ-ভাগ নিলে; অধিকাংশ
নিলে ব্যবসাদার, সে বয়ে নিয়ে
গেল। যে কিনলে, সে এ
সকলের দাম দিয়ে মোলো!!
পাহারাওয়ালার নাম হলো
রাজা, মুটের নাম হলো
সওদাগর। এ দু'দল কাজ
করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো
মারতে লাগলো। যে জিনিষ
তৈরী করতে লাগলো, সে
পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান'
ডাকতে লাগলো!"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজী

★

★

নেতাজী

"আমি শৈশব হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিনিয়াছি, কুটনীতিতে ওস্তাদ তাহারা, কিন্তু সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা দিতে পারে নাই, পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাহা পারিবে না। আমি আজীবন ভারতবর্ষের সেবক, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাহাই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি থাকি না কেন, একমাত্র ভারতের প্রতিই আমার আনুগত্য ও ভক্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

—বার্লিন ৫।৫।৪২

ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর স্বাধীনতার জন্য আমরা রক্তপাত করিব এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে শত্রুরও রক্ত ক্ষয় করিব। আর অ-সামরিক ভারতীয়দের শ্লোগান হইবে—'সর্ব্বস্ব বলি দাও, সর্ব্বস্ব দান কর।"

—১৯৪৫ জানুয়ারী

"ভারতবাসীর ইহা স্পষ্ট জানা উচিত যে এই বিপুল পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মাত্র শত্রু আছে, যে শত্রু শতাধিক বর্ষকাল তাহাকে শোষণ করিয়াছে, যে শত্রু ভারত-মাতার জীবন-শোণিত চুষিয়া লইতেছে—সে শত্রু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ।"

—সুভাষচন্দ্র
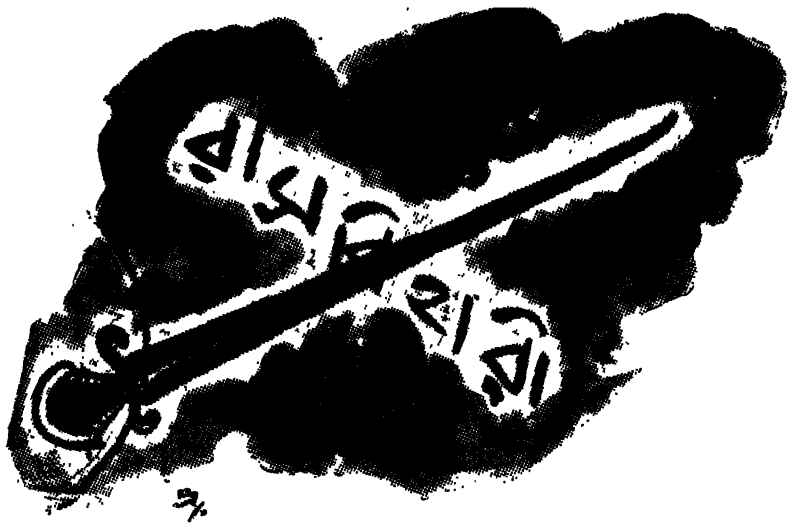
শ্রীপঞ্চানন প্রামাণিক

বাংলার বিপ্লববাদ যখন পাঞ্জাবীকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল সেই সময় দেরাদুন বনবিভাগের ডক্লার্ক রাসবিহারী বসু পঞ্জাবের ষড়্‌যন্ত্রে যোগদান করেন তাহাদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ১৯১২ সালের শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিংজ যখন নূতন দিল্লী নগরীতে াভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তাঁহারই ভূদ্দে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাতে মানুষ মারা ড়ল, বড়লাট ও তাঁর পত্নী আহত হন। লেডী ডিংজ বোমার আওয়াজে এমনি আঘাত পান যে, তিনি র ভাল করিয়া সারিতে পারিলেন না এবং উহাই হার মৃত্যুর কারণ বলিয়া শোনা যায়। এই ঘটনার বহু ষড়্‌যন্ত্র ও বোমা-নিক্ষেপের ব্যাপারে রাসবিহারী শ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯১৩ সালে কলিকাতা রাজাবাজার বোমার আড্ডা বিষ্কারের ফলে সেখানকার কাগজপত্রে সরকার বেশ ঝলেন যে, দিল্লীর এই কাণ্ড রাসবিহারী ও তাঁহার বলেরই কীর্তি। ১৯১৪ সালে সরকার এই সব পত্র হইতে সংগৃহীত তথ্যাবলীর দ্বারা দিল্লী ষড় যন্ত্রের লা খাড়া করিলেন। ইহাতে তাহার সহকর্মীদের নকে ধরা পড়িল এবং অনেকের ফাঁসী হইল। বিহারীকে গ্রেপ্তারের জন্য বারো হাজার টাকা পুর- র ঘোষণা করা হয় এবং হিন্দুস্থানের সর্বত্র তাঁহার প্রচার করা হয়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পুলিশ ও য়েন্দাদের চক্ষে ধুলি দিয়া বাংলার ও পঞ্জাবের মধ্যে ব-সূত্র গ্রথিত করিবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষ্ণুগণেশ পিংলে ক জনৈক মারাঠা যুবক বহু কাল আমেরিকায় বাস য়া দেশে ফিরিলেন। তিনি আমেরিকায় 'গদর' ও ন্য বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতে বিপ্লব-জাগরণে সহায়তা করিবার নিমিত্তই আসিয়াছিলেন এবং বাঙালী বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিপ্লব-ভাবাপন্ন লোকদের একত্র করিয়া দেশকে কেমন করিয়া স্বাধীন করা যায় সে সম্বন্ধে নানা পরামর্শ করিলেন। রাসবিহারীর সংগঠনের অত্যদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি পিংলে, মোহন সিং, কর্তার সিং, শচীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিলেন; কয়েকটি স্থানের সৈনিকেরা রাজী হইল। স্থির হইল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কৃপাল সিং নামক এক জন বিপ্লবী পুলিশের নিকট সমস্ত বলিয়া দেয়। সরকার তখনই গোরা পল্টন আনাইয়া বারুদঘরে, তোপখানায় বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করিয়া সতর্ক হইলেন। সরকারের ভাবগতিক ও আয়োজন দেখিয়া সৈনিকেরা ভয় পাইল।

চারি দিকে খানাতল্লাসী ধরপাকড় চলিল। রাস-বিহারীর এক বাসায় অনেক রিভলবার, গুলী, বোমা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু সে-বারও পুলিশ রাসবিহারীকে ধরিতে পারিল না। কয়েক দিন পরে মিরাটের এক কেল্লার মধ্যে পিংলে কতকগুলি বোমা সমেত ধরা পড়িল। সরকারী মতে বোমাগুলি এমন উপাদানে গঠিত যে, সেগুলি অনায়াসে অর্ধেক রেজিমেণ্ট উড়াইয়া দিতে পারিত। পিংলের ফাঁসী হইল। ইহার পর ব্যাপক ভাবে খানাতল্লাসী করিয়া লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা চলিল। এই সময় ভারতীয় বিপ্লববাদীদের বিপ্লবের বিচিত্র চেষ্টার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

ইহাদের সহিত আমেরিকাবাসী গদরের ঘনিষ্ঠ যোগ, আমেরিকাস্থ জার্মাণ কন্সাল ও গুপ্তচরদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের আয়োজন, বাংলার বিপ্লবীদের সহিত

যুক্ত হইয়া সেখান হইতে বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক আমদানী, ডাকাতি ও হত্যা প্রভৃতি ভীষণ কার্য্য জনসাধারণ জানিতে পারিল। বিচারে কয়েক জনের ফাঁসী ও কয়েক জন খালাস পাইল; অবশিষ্টদের নানা সময়ের জন্য জেল হইল। কয়েক জনের দ্বীপান্তরও হইয়াছিল; তন্মধ্যে অধ্যাপক ভাই পরমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার পর সরকার ভারতরক্ষা আইনের সাহায্যে ১৬৮ জন পাঞ্জাবীকে বিপ্লবী সন্দেহে ও Ingress Ordinance বিধি অনুসারে ৩৩১ জন লোককে আবদ্ধ করা হয়; প্রত্যাগত শিখদের মধ্যে ২,৫৭৬ জনকে নিজ নিজ গ্রামে আবদ্ধ রাখা হইল।

লাহোর ষড়্‌যন্ত্রে প্রধানতঃ শিক্ষিত লোক ছিল। তাহারা সকলেই মরিল অথবা জেলে পচিতে লাগিল। মোট কথা, এই ব্যাপারের পর বিপ্লবের শেষ আশা নষ্ট হইল। এই সকল রাজনৈতিক বিপ্লব দমনকল্পে শিখ সর্দ্দারগণ, পাঞ্জাবী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ সরকারকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত কেবল পুলিশের পক্ষে এরূপ ভাবে কাজ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

রাসবিহারী লাহোরে বিদ্রোহ-জাগরণে অসমর্থ হইয়া ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ছদ্মবেশে দেশত্যাগী হইলেন। রাসবিহারীর নামে হুলিয়া ছিল। তথাচ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি পুলিশকে ফাঁকি দিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইতেছেন। রাসবিহারী P. N. Tagore নাম লইয়া ও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়—তাঁহার পূর্বে জাপানে গিয়া ব্যবস্থাদি করিতে হইবে এই অজুহাতে Pass-port প্রভৃতি লইয়া দেশত্যাগী হইলেন। রাসবিহারীর জাপান পৌঁছানর এক মাস পরে বৃটিশ সরকার যখন বুঝিলেন তিনি জাপানে আছেন, তখন জাপান সরকারকে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ করেন। জাপান সরকারও ইহাতে রাজী হন।

রাসবিহারী তখন জাপানী পোষাক পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাত্রে বেশ তুষারপাত হইয়াছিল। পথগুলি তখনও বরফে আবৃত ছিল। রাসবিহারী গলিপথ ধরিয়া তখনকার দিনের এক মামুলী মন্ত্রীর ঘরে উপস্থিত হন। মন্ত্রিকন্যা তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করেন। তিনি মন্ত্রিকন্যার সহিত যখন চা-পান করিতেছিলেন তখনই জানিতে পারিলেন যে, দরজায় পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে।

রাসবিহারী বুঝিলেন, এবার তাঁহাকে বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, যদি পলাইয়া যান এবং ধৃত হন তবে তাঁহাকে শমন-ভবনে গমন করিতে হইবে। আর যদি ধৃত না হন তবে বাঁচিয়া থাকিবেন মাত্র। তিনি বাঁচিয়া থাকাটাই পছন্দ করিলেন এবং পিছন দরজা দিয়া মন্ত্রিকন্যার সহিত নিকটস্থ গেইসা বালিকাদের আড্ডায় গিয়া তাহাদের পোষাক পরিধান করিয়া এবং পরচুল লাগাইয়া গেইসা বেশে থাকিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ছয়টি মাস জাপানী পুলিশ খুঁজিয়া পায় নাই। অবশেষে তিনি ব্লেক-ড্রেগনদের সাহায্যে জাপানী প্রজা হইতে সক্ষম হন। ইহারা জাপান সরকারের বিরুদ্ধবাদী দল।

তিনি ঐ অঞ্চলের সকল বিপ্লবীকে সংঘবদ্ধ করিলেন এবং চীনদেশস্থ জার্ম্মাণদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সাংহাইএর জার্ম্মাণ কন্সালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিলেন। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সাংহাইতে এক জন চীনার দ্বারা অনেকগুলি পিস্তল ও টোটা ভারতে বিপ্লব সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু বৃটিশ পুলিশ সন্ধান পাইয়া উহা বাজেয়াপ্ত করে। বৃটিশ সরকারের অনুরোধক্রমে জাপ সরকার তাঁহাকে পাঁচ দিনের মধ্যে সাংহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি আট বৎসর আত্মগোপন করিয়া ছিলেন।

ইহার পর তিনি জাপানে "ভারতের স্বাধীনতা লীগ" প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা পরিচালনা করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি জাপানী ভাষায় পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড-লিখিত "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" পুস্তক জাপ-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। জাপ-ভাষায় তিনি একখানা সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। উক্ত সংবাদপত্রে ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হইত। তিনি ভারত সম্পর্কে জাপ সংবাদপত্র সমূহেও বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং জাপানীদের নিকট বহু বক্তৃতাও করিয়াছেন।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে টোকিওতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অর্থসংগ্রহের কাজে লাগিয়া যান। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতন হয়। বৃটিশ সৈন্যগণ পূর্বাহ্নেই পলায়ন করেন, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদলকে কিছু না জানাইয়া তাহাদের অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর ফেলিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে সিঙ্গাপুরের সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন।

এই সকল ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী ভারতীয়গণকে যাহাতে জাপানীদের পক্ষে যুদ্ধে লাগাইতে পারেন সেই হিসাবে মেজর ফুজিয়ারা ইহাদের নেতৃবৃন্দকে একটি সংঘ গঠন করিতে বলেন। ইহারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কোনরূপেই জাপানী তাঁবেদার হিসাবে গণ্য হইতে অস্বীকার করেন। ইহার পর মার্চ মাসের শেষে রাসবিহারীর সভাপতিত্বে টোকিওতে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়—পূর্ব-এশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইহাই
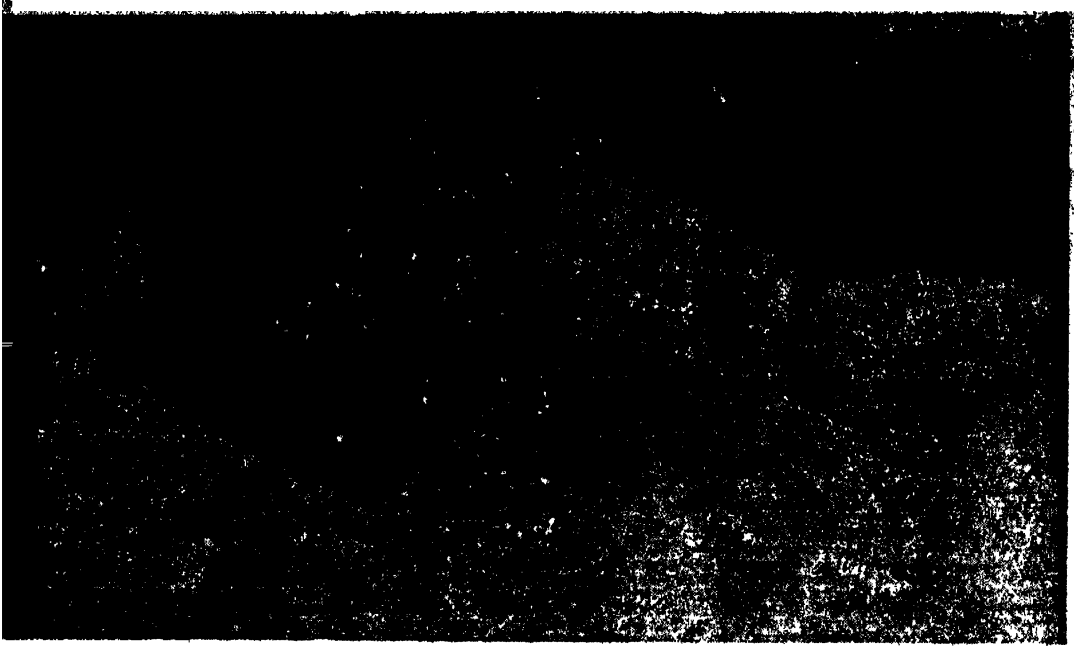
প্রকৃষ্ট সময়। এতদ্দ্বারা গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ কেবল সামরিক প্রয়োজনে জাপানের নিকট হইতে নৌবল ও বিমানবল প্রভৃতি চাহিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার অধিকার স্বয়ং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপর বর্তিবে। ভারতের জাতীয় মালিক কংগ্রেসই সেই অধিকারের মালিক।

জুন মাসে ব্যাঙ্ককেও একটি প্রতিনিধি-সম্মেলনে আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের মূল নীতি নির্ধারিত হয়। এই সম্মেলন হইতে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ্ সংঘ গঠিত হয়। ইহার সভাপতি হন রাসবিহারী বসু। ভারতীয়গণের এই স্বাধীন প্রচেষ্টা জাপান কিছুতেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মনেও ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাছে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতি হয় এই জন্য জাপান অচিরেই এই সংঘ-গঠিত সৈন্যবাহিনী ভাঙিয়া দেয়।

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুর পৌঁছেন। পুনরায় তিনি ২নং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করিবার নিমিত্ত ৪ঠা জুলাই এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাহাতে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সকল আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই নবগঠিত পরিষদে রাসবিহারী বসু তাঁহার প্রধান পরামর্শ-দাতা ছিলেন।

জয়

রক্ত রক্ত আরও রক্ত

গত ২৯শে নভেম্বর দিল্লীর লালকেল্লার সামরিক আদালতের যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে — তাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা জানা যায়। সেদিন সরকার পক্ষের সাক্ষী হাবিলদার গোলাম মহম্মদ গত জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুনের মিঙ্গলডান শিবিরে নেতাজী 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র সৈন্যদের কাছে যে কথা বলেন—তার উল্লেখ করেন। নেতাজী সেদিন বলেছিলেন, "বর্ত্তমানে দিল্লী চলো ধ্বনির সঙ্গে আর একটি ধ্বনি যুক্ত হবে। তা হচ্ছে 'রক্ত রক্ত এবং আরও রক্ত'। তার অর্থ হলো—আমরা ৪০ কোটি লোকের স্বাধীনতার জন্য শত্রুর রক্ত চাইব। দক্ষিণে যে সব ভারতীয় আছে, তাদের ধ্বনি হবে—'করো সব নিচবর আউর বনো সব ফকির' অর্থাৎ সব বিসর্জ্জন দিয়ে ফকির হও।"

—সুভাষচন্দ্র
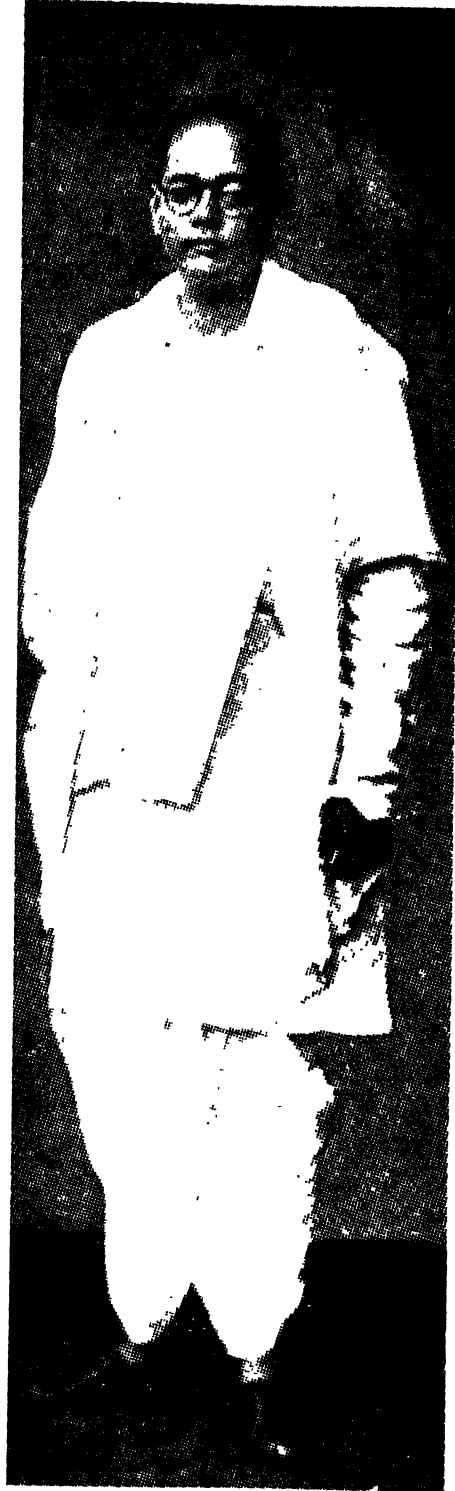
ইংরাজকে চাই না

"আজ যে [illegible] চাই না, তাহাদের [illegible] মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা তাঁহারা বিদেশী বলিয়া নহেন, তাহার কারণ আমাদের কল্যাণের অভিভাবকত্বের ছলে তাঁহারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার নজির দেখাইয়াছেন। স্বদেশে পুঁজিপতির পকেট ভর্ত্তি করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহারা আহুতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, অন্যায় অবিচারের পর ভদ্র ইংরাজ অন্ততঃ নীরব থাকিবেন—আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমাদের প্রতি অন্ততঃ কৃতজ্ঞ থাকিবেন, কিন্তু আহতকে অপমান করিয়া কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া তাঁহারা সৌজন্য ও শালীনতার শেষ সীমারেখা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।"

—সুভাষচন্দ্র

কেন স্বদেশ ত্যাগ করিলাম

সুভাষচন্দ্র বসু

ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ !

যে তীব্র উৎসাহের সহিত অভিনন্দন জানাইয়া আপনারা আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তাহার জন্ম আজ সর্ব্ব প্রথম আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার যে বিপুল সংখ্যক ভগ্নী তাহাদের দেশাত্মবোধকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহারা বিশেষ করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিচার করিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, হোনান ও মালয়ে আগামী সংগ্রামে আমার দেশবাসীরাই জয় হইবে। একদিন যে স্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পীঠস্থল ছিল আজ সেই স্থানই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর দেশত্যাগ করিয়া কেন আমি এই বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করিলাম তাহা আপনাদের সম্মুখে পরিষ্কাররূপে বলিতে চাই।

আপনারা জানেন, ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ পার হইয়া উহার পরবর্ত্তী সকল স্বাধীনতা আন্দোলনেই আমি সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছি। গত কুড়ি বৎসরের সকল আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত আমার ঘনিষ্ঠসংযোগ ছিল। ইহা ব্যতীত, অহিংস অথবা সহিংস সকল প্রকার গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত থাকায় সন্দেহক্রমে বহু বার আমাকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া বলিতে পারি যে, আমি যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছি, ভারতে অন্য কোন জাতীয়তাবাদী নেতা সেরূপ অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন না।

এই অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করিয়া আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্য হইতে আমরা যত তীব্র আন্দোলনই করি না কেন তাহা আমাদের দেশকে বৃটিশ-প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যকার সংগ্রামই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নির্ব্বোধের ন্যায় বিনা প্রয়োজনে এই বিপদের ঝুঁকি লইতাম না।

আমার ভারত ত্যাগ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহাকে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে বহিসাঁহায্য ব্যতীত কাহারও পক্ষেই ভারতকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বহিসাঁহায্য অবিলম্বে প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে একান্ত অল্প। ইহার কারণ এই যে, চক্রশক্তির আঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় আসন টলায়মান হইয়া পড়িয়াছে; ফলে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আমাদের দেশবাসীর যে সাহায্য প্রয়োজন তাহার দুইটি দিক আছে—নৈতিক ও কায়িক। প্রথমতঃ, তাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, একদিন তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করিবেই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বাহির হইতে তাহাদের সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের সম্ভাব্য ফল কি তাহা বিচার করিতে হইবে। দ্বিতীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, প্রবাসী ভারতীয়গণ মাতৃভূমিকে কি সাহায্য করিতে পারে এবং যদি প্রয়োজন হয়, দেখিতে হইবে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করা সম্ভব কি না।

প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতে চাই যে, সর্ব্বশক্তিশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এমন কি, পরাধীন ভারতের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা জটিল পরিস্থিতির প্রয়োজনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিলে কিছুই অপরাধ করা হইবে না।

শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে আজ সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পন্থা ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ একটি সংগ্রামশীল বাহিনী গঠন করিতে যাইতেছে। এই বাহিনী ভারতস্থিত বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে। আমরা যখন আক্রমণ করিব, তখন ভারতের অভ্যন্তরেও বিপ্লব শুরু হইবে। এই আন্দোলন কেবল বেসামরিক জনসাধারণই করিবে না, বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সৈনিকগণও বিদ্রোহ করিবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশ এই উভয় দিক্ হইতে আক্রান্ত হইবে, তখন ইহা অচল হইয়া পড়িবে এবং ভারতীয় জনগণ সেই সময়ে পুনরায় তাহাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে।

সুতরাং আমার পরিকল্পনা অনুসারে চক্রশক্তি ভারত সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব পোষণ করে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যদি মাত্র বিদেশস্থিত ভারতীয়গণ তাহাদের কর্ত্তব্য করিয়া যায়, আমি বলিতেছি, তাহা হইলে ভারতে বৃটিশ-প্রভুত্বের অবসান নিশ্চয়ই ঘটিবে।

সুবিধাবাদীরা মন্তব্য করিতে পারে যে, যদি ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসী বৃটিশ শক্তিকে বহিষ্কৃত করিতে না পারে, তাহা হইলে মাত্র ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের দ্বারা ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? বন্ধুগণ! আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বৃটিশের অধীনস্থ ৩০ লক্ষ আয়ারবাসী সামরিক আইনের আওতায় থাকিয়াও মাত্র পাঁচ হাজার সিন্‌ফিন্ সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে ১৯২১ সালে বৃটিশ-প্রভুত্বের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আজ ৩০ লক্ষ ভারতীয় মাতৃভূমিতে এক শক্তিশালী বিপ্লবের সাহায্য পাইয়া কেন বৃটিশ-প্রভুত্বের কবল হইতে চিরতরে মুক্তিলাভের আশা করিতে পারে না? আমি চাই, প্রবাসী ভারতীয়গণ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ এই কার্য্যে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চাই। এই গভর্ণমেণ্ট প্রবাসী ভারতীয়গণকে সংহত করিবে এবং ভারতস্থিত বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিবে। যখন আমরা এই সংগ্রামে জয়লাভ করিব ও ভারত স্বাধীন হইবে, তখন এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গভর্ণমেণ্টের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনমতের দ্বারা গঠিত হইবে।

বন্ধুগণ! আপনারা আজ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়—যাহারা পূর্ব্ব-এশিয়ায় বাস করিতেছে, তাহাদের পক্ষে আর্থিক ও জনশক্তি এবং অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভার কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে মনের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি সমগ্র ও সম্পূর্ণ-রূপে সংহত শক্তি চাই, ইহা অপেক্ষা কিছু কম নহে। কারণ আমরা বহু বার আমাদের শত্রুপক্ষের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, ইহা সামগ্রিক-যুদ্ধ। আপনারা আজ আপনাদের সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের এক অংশ—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে দেখিতে পাইতেছেন। অন্য এক দিন তাহারা তাহাদের আনুষ্ঠানিক কুচ-কাওয়াজ টাউন হলের সম্মুখে করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা স্থির করিয়াছে যে, ভারতের প্রাচীন নগরী দিল্লীর লাল কেল্লার সম্মুখে কুচ-কাওয়াজ করিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। "দিল্লী চল, দিল্লী চল", ইহাই তাহারা শ্লোগানরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুগণ! পূর্ব্ব-এশিয়ার ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের এই চরম যুদ্ধের জন্য চরম সংহতির শ্লোগান হউক—'দিল্লী চল'।

আমি এই চরম সংহতির মধ্য হইতে কমপক্ষে তিন লক্ষ সৈন্য এবং নয় কোটি টাকা পাইতে আশা করি। আমি এতদ্ব্যতীত মৃত্যুভয়হীন বাহিনীর জন্য এক দল সাহসী মহিলা চাই। একদা ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝান্সীর রাণী যে বীরত্বের সহিত তরবারি পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই নারী বাহিনীকে সেইরূপ পরিচয় দিতে হইবে।

বন্ধুগণ! আমরা বহু দিন যাবৎ ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের কথা শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের স্বদেশবাসী বর্ত্তমান সময়ে চূড়ান্ত ভাবে নির্য্যাতিত হইতেছে, তাহারা এখন দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবী করে। আমাকে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত সংহত শক্তি দান করুন, আমি দ্বিতীয় ফ্রন্টের প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাস্তবিক পক্ষে যাহা ভারতের সংগ্রামে দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর জয়যাত্রার দুটি অমর মন্ত্র—'দিল্লী চলো', 'জয় হিন্দ্'।

"...তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ; তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, পাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?...ইয়োরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ কোরে, আমরা বেঁচে থাক্‌বো।......ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"বলপ্রয়োগ ও কাপুরুষতার মধ্যে কোন একটি পছন্দ করিয়া লইবার প্রশ্ন উঠিলে, আমি বল-প্রয়োগকেই বাছিয়া লইবার পরামর্শ দিব..."

—মহাত্মা গান্ধী

প্রস্তুত হও—সময় নাই

"দেশবাসিগণ! আর সময় নষ্ট করিও না। তোমরা প্রস্তুত হও এবং এই মুহূর্ত্তেই শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। শীঘ্রই আমরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিব এবং ভারতভূমিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিব। অতঃপর দিল্লী অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হইবে। সর্ব্বশেষ ইংরাজটি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেই এ যাত্রা শেষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে। দিল্লীর বড়লাট-ভবনে যেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তিফৌজ প্রাচীন লাল-কেল্লার অভ্যন্তরে বিজয়-উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারিবে—কেবলমাত্র সেদিনই এ অভিযানের শেষ হইবে।"

—সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশনামা

ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের উদ্দেশ্য

সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত এক আন্দোলনের প্রতীক। উহা ভারতের জনসাধারণের রাজনৈতিক মুখপাত্র এবং তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতীক। ইহা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যাহার পুষ্টি ও উন্নতিলাভের শক্তি ভারতীয় জাতির ন্যায় সীমাহীন। কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি ও উন্নতি আভ্যন্তরীণ তাগিদের ফল; অবশ্য বাহিরের ঘটনাবলীর দ্বারা ঐ তাগিদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আভ্যন্তরীণ তাগিদের ফলেই ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হইয়াছে। কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার কিম্বা আকস্মিক ঘটনার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে এই নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। কংগ্রেস তাহার বিবর্ত্তনের পথে নূতন অবস্থায় প্রবেশ করিবে বলিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের আবির্ভাব হইয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে—কংগ্রেসের পুষ্টি ও উন্নতি কিরূপে ঘটে। উহার অন্তর্নিহিত নিয়ম কি? ইহার ব্যাখ্যাস্বরূপে কয়েকটি যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে হেগেলের মতানুবর্ত্তী যুক্তি আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণীয় এবং আমার মতে বাস্তবের অতি নিকটবর্ত্তী। প্রগতি একপথগামী কিম্বা সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ নহে। অনেক সময় বিরোধের ভিতর দিয়াই প্রগতি ঘটে।

জীবিত কিম্বা প্রগতিশীল প্রত্যেক আন্দোলনেই একটা অদৃশ্য বাম শাখা বা বিরোধী দল থাকে। সময় পরিপক্ক হইলে এই অদৃশ্য বাম শাখা সুস্পষ্ট হয়, এবং উহার সাহায্যে ইহার আরও পুষ্টিলাভ এবং উন্নতি ঘটে। ঐ বাম শাখাকে নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় কিরূপ প্রকৃষ্ট ভাবে পরিচালিত করা যায় তাহা নির্দ্ধারণের জন্যে রাজনৈতিক এবং সময় সময় দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, বাম শাখা দক্ষিণ শাখার সহিত আপোষ ও সহযোগিতা করিয়া শক্তি সঞ্চয় এবং প্রভাব বিস্তার করে। ভিন্নরূপ অবস্থায় ইহা না-ও হইতে পারে। তাহা হইলে বাম শাখার পক্ষে দক্ষিণ শাখার সহিত উহার পার্থক্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং শক্তিবৃদ্ধি ও অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তীব্র মতভেদের সৃষ্টি অপরিহার্য্য হইতে পারে; ঐ মতভেদ সাময়িক ভাবে ব্যথাদায়ক হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রগতির সহায়ক। কোনও প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পক্ষে উহাতে বাম শাখার পুষ্টি ও আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক। বাম শাখাকে মূল প্রতিষ্ঠান হস্তগত করিতে কিম্বা দক্ষিণ শাখাকে আপন মতাবলম্বী করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত দক্ষিণ শাখার সহিত সহযোগিতা করিয়া হউক বা বিরোধিতা করিয়া হউক, পুষ্টিলাভ করিতে হইবে। ইহা সম্পন্ন হইলে এবং বাম শাখার নিকট হইতে আর কোন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তনক্রমে নিশ্চয়ই নূতন এক বাম শাখার উদ্ভব হইয়া পরিণামে পূর্ব্বের বামপন্থীদিগকে বিতাড়িত হইবে। ১৯২০ সালে গান্ধীপন্থীরা কংগ্রেসে বামপন্থী ছিলেন; ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় না যে, বর্ত্তমান সময়েও তাঁহারা বামপন্থী। অতীতের বামপন্থীরা সর্ব্বদা না হইলেও অনেক সময়েই ভবিষ্যতে দক্ষিণপন্থী হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণ শাখার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকা উচিত নহে, ইহা বলা এবং অখণ্ড কংগ্রেস বামপন্থী এই যুক্তি প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, উহার সম্মুখীন হইবার সময় আসিয়াছে।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যার সমাধানের জন্য [illegible]

২৯শে এপ্রিল যখন কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সুরু হয়, তখন দেখা গেল যে, বামপন্থী দল দক্ষিণপন্থীদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক। এই সময়ে বামপন্থীরা বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব ধরিলেন ; কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা এক মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জিদ ধরিলেন। ইহার ফলে দেখা গেল, দক্ষিণপন্থীরাই আপোষ-মীমাংসা, সহযোগিতা এবং ঐক্যের অবসান ঘটাইলেন। আজ দক্ষিণপন্থীরা চাহিতেছেন যে, বামপন্থীরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের বাধ্যতা স্বীকার করুক। ঐক্যের খাতিরে বামপন্থীদের ইহাতে কি সম্মত হওয়া উচিত? যদি তাঁহারা এই ভাবে বাধ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাহার ফলাফল কি হইবে? এই ভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমরা কি প্রগতির রথচক্র তৈলসিক্ত করিব—না, আমাদের নিজেদের ভিতর যে প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে তাহাই সমর্থন করিব?

কংগ্রেসের ভিতরে গতিহীনতা ও সংস্কারবিমুখতাকে চিরস্থায়ী করা হইবে। আমরা এইরূপ করিতে পারি না—আমাদের এইরূপ করা উচিতও নহে। সুতরাং বর্ত্তমানে বামপন্থীদের পক্ষে দক্ষিণপন্থীদিগের সহিত পৃথক্ হইয়া নিজেদের শক্তি সংহত করিবার সময় আসিয়াছে। এই কার্য্যটি নিষ্পন্ন হইলেই বামপন্থীরা কংগ্রেসের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। ইহাই আজ বামপন্থীদের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্যই ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বামপন্থীদের যে সমস্ত দল আছে, সেই সমস্ত দল বামপন্থীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কার্য্য সুরু করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, তাঁহারা তাহা করেন নাই। গত বৎসর বামপন্থী কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ যখন বামপন্থী ব্লক গঠনের প্রস্তাব আলোচনা করেন, তখন মনে হইয়াছিল যে, বিভিন্ন বামপন্থী দল এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু পরে তাঁহারা মত পরিবর্ত্তন করেন। অতঃপর বামপন্থীদের মধ্য হইতে নূতন লোক লইয়া ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করা অপরিহার্য্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গরজেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হয় নাই। ইহা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৃষ্ট। তদুপরি বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা ইহার উদ্ভব একান্ত আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে এবং এইরূপ অবস্থায় সৃষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে না। ইহা আমাদের রাজ-

দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। এখন ঐক্যের খাতিরে আমরা বামপন্থীরা যদি তাঁহাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করি, তবে তাহা কি সঙ্গত হইবে? যদি তাঁহাদের কোনও সক্রিয় কর্ম্মপন্থা থাকিত তবে এইরূপ করা চলিত। কিন্তু গত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমার যে সব পত্র-বিনিময় হইয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইতে স্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছে যে, তিনি আর আসন্ন সংগ্রামের কথা চিন্তা করিতেছেন না। মন্ত্রিমণ্ডলী এবং তাঁহাদের যে সমস্ত পরিচালক কংগ্রেসের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহারাও সংগ্রামের কথা চিন্তা করেন না। এইরূপ অবস্থায় দক্ষিণপন্থীদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাহিরে ঐক্যের ঠাট বজায় রাখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে

নৈতিক বিবর্ত্তনে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। ইহা স্থায়ী হইবে এবং দিন দিন ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহারা আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে কংগ্রেসের এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ভাবী ইতিহাস লক্ষ্য করুন।

ছাত্র-সমাজের প্রতি সুভাষচন্দ্র

"সমগ্র দেশের ছাত্র-বন্ধুদের প্রতি এই আমার সতর্ক-বাণী যে, তাঁহারা যেন শুধু বাহ্য ঐক্যেই তৃপ্ত না হন, তাঁহারা যেন নিজেদের মধ্যে একটা স্থায়ী মিলন স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের পক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে ছাত্রদের ব্যাপার এমন সব বিষয়েই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা এবং বিতর্কমূলক বিষয় যাহার সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং যাহার ফলে গুরুতর মতবিরোধ হইবারই সম্ভাবনা—তাহা এড়াইয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের ছাত্র আন্দোলনের এখনও শৈশব অবস্থা এবং কিছু দিন ইহাকে অতিশয় সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে। এই সময় গুরুতর মতবিরোধ ঘটিতে পারে কিংবা দলাদলি হইতে পারে এমন সব বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হইবে।" (১৩৪৫)

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সময় অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পরই পুণ্যশ্লোক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দল স্থাপন করেন। তাঁহাদের স্মৃতি এবং ভারতের অন্যান্য বীর সন্তান এই সঙ্কটে আমাদের অনুপ্রাণিত করুন; এবং আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিস্থিতি দূর করিয়া আমাদের জাতিকে পথ প্রদর্শন করুন।

১৯৩৮ সালে হরিপুরায় কংগ্রেসের পর আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে মিউনিক চুক্তি হয়, তাহা বিশেষ জরুরী। ঐ চুক্তিতে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন হীন ভাবে নাৎসী জার্ম্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে; ফলে ফ্রান্সের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, আর জার্ম্মানী বিনা অস্ত্রে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি গণতান্ত্রিক স্পেনের পতনে ফ্যাসিস্ত ইটালী ও নাৎসী জার্ম্মানীর শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র হইতে আপাতত সোভিয়েট রুশিয়াকে মুছিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্রে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন ইটালী ও জার্ম্মানীর সহিত যোগ দিয়াছে। কিন্তু রুশিয়াকে কত কাল দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে এবং রুশিয়াকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের কি লাভ হইয়াছে? সম্প্রতি ইউরোপ ও এসিয়ায় যে সকল আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও মর্য্যাদা যথেষ্ট খর্ব্ব হইয়াছে।

এখন আমাদের স্বদেশের রাজনীতি আলোচনা করা যাউক। আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া আমি কয়েকটি জরুরী সমস্যার মাত্র উল্লেখ করিব।

গত কিছু কাল যাবৎ আমি বোধ করিতেছি যে এখন আমাদের স্বরাজের দাবী উত্থাপন করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে

সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ

বন্ধুগণ, কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা মেঘাচ্ছন্ন; কংগ্রেসের মধ্যে নানা বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে সেই জন্য আমাদের বহু বন্ধু নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আমি অত্যন্ত আশাবাদী—যে মেঘ আজ দেখা দিয়াছে তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে। দেশবাসীর দেশপ্রেমের উপর আমার প্রবল বিশ্বাস আছে, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, অচিরে আমরা বর্ত্তমান বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া উঠিতে পারিব এবং আমাদের দলসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইব।

চরমপত্র দেওয়া কর্ত্তব্য। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করিবার নীতি অবলম্বনের সময় বহু পূর্ব্বে গত হইয়াছে। কখন আমাদের উপর যুক্তরাষ্ট্র চাপান হইবে, এখন আর আমাদের সমস্যা নহে। ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইবার আশায় যদি কয়েক বৎসর যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন স্থগিত রাখা হয়, তবে আমরা কি করিব, উহাই এখন সমস্যা। চতুঃশক্তি চুক্তি দ্বারাই হউক, আর অপর কোন উপায়েই হউক, যদি একবার ইউরোপে স্থায়ী শক্তি স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই গ্রেট বৃটেন যে কঠোর সাম্রাজ্য-নীতি অবলম্বন করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেকে দুর্ব্বল বলিয়া বোধ করিয়াই বৃটেন প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগের প্রতিকূল ভাবে আরবদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টার আভাস দিতেছে অতএব আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর চাহিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট চরমপত্র দেওয়া উচিত। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন উত্তর না পাওয়া যায়, কিম্বা প্রাপ্ত উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় দাবী পূরণের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সেই ব্যবস্থা হইতেছে আইন অমান্য সত্যাগ্রহ। আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখন সর্ব্ব-ভারতীয় সত্যাগ্রহের ন্যায় বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে পারিবেন না।

আমি, দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, কংগ্রেসে এমন লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিষয়টি আমি বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও নৈরাশ্যের অণুমাত্র কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। আটটি প্রদেশে শাসন-ক্ষমতা লাভ করায় আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটিশ ভারতে গণ-আন্দোলন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহেও অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দেখা দিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিও আমাদের অনুকূল, এতদবস্থায় স্বরাজলাভের পথে চূড়ান্ত ভাবে অগ্রসর হইবার—আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইহার চেয়ে আর কি সুসময় উপস্থিত হইতে পারে?

আমি স্থিরমস্তিষ্ক বাস্তববাদী-হিসাবে বলিতে পারি, বর্ত্তমান পরিস্থিতি আমাদের এত অনুকূল যে এখনই সাফল্যের সর্ব্বাধিক আশা পোষণ করা উচিত। আমরা যদি কেবল ভেদ ও বাদ-বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয় আন্দোলনে আমাদের সমগ্র শক্তি ও সম্পদ্ নিয়োজিত করি তাহা হইলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অপ্রতিহত আক্রমণ চালাইতে পারিব। বর্ত্তমান সুযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিব অথবা জাতীয় জীবনের দুর্লভ সুযোগ হেলায় হারাইব।

দেশীয় রাজ্যসমূহে জাগরণের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, দেশীয় রাজ্য-সম্পর্কে আমরা হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবে যে

রাসবিহারী

[illegible]ভাব প্রকাশ করিয়াছি, তাহা পরিবর্ত্তন করা উচিত। [illegible]ভাবে কংগ্রেসের নামে দেশীয় রাজ্যসমূহে কোন [illegible] চালান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদনুসারে দেশীয় [illegible] কংগ্রেসের নামে পার্লামেন্টারী কার্য্য কিম্বা

তবে এতদুদ্দেশ্যে একটি বিশেষ [illegible] হইবে। এই কার্য্যে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ [illegible] পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নি[illegible] রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনের সহযোগিতা[illegible]

স্বরাজ লাভের জন্য যে আম[illegible] অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহা [illegible] করিয়াছি তজ্জন্য যথেষ্ট আয়োজন দরকা[illegible] ক্ষমতার লোভে আমাদের মধ্যে যে দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, প্রথমতঃ নির্ম্মম হস্তে তাহা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশের কিষাণ-আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া-মিশিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দেশের সর্ব্বপ্রকার চরমপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালাইবার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একযোগে অগ্রসর হইতে হইবে।

বন্ধুগণ, আজ কংগ্রেসের ভিতরে কলহের মেঘ দেখা দিয়াছে। এই কারণে আমাদের বহু বন্ধু নিরুৎসাহ বোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই নিরাশ হই না, আমাদের দেশবাসীর স্বদেশপ্রেমে আমার বিশ্বাস আছে। আমার দৃঢ় ধারণা, অচিরেই আমরা এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিব। আমাদের মধ্যে পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। 'বন্দে মাতরম্।' [ত্রিপুরী]

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই,—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হইতেছে ঘরে ঘরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

এসে উপস্থিত। ছেঁড়া মাদুরের উপরই তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। ক্রমে পরিচয় হলো। এক জন হচ্চেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। গরীবের ছেলে; তবু মোটা মাইনের সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে জয় মা ব'লে অসহযোগের তরঙ্গে তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন। অতি শান্ত ও বিনীত। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি হচ্চেন ক্যাপ্টেন সুরেশ ব্যানার্জি। ডাক্তার মানুষ—প্রফুল্ল বাবুর মতই সর্ব্বত্যাগী। প্রথম মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অসযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটি—ভদ্রলোক বলা মিছে; একেবারে বাচ্ছা বল্‌লেই হয়। দিব্যি ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ; ঠোঁটের ডগায় চাপা হাসি। মুখ-চোখ উজ্জ্বল। বন্ধু হেমন্তকুমার পিছন থেকে চুপি চুপি ব'লে দিলেন—ঐ সুভাষ!

ওঁরা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে। কেন আমরা অসহযোগ আন্দোলনের খুঁত ধরি—কেন আমরা অহিংসার কথা শুনে বিদ্রূপ করি।

সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে তর্ক চল্‌লো রাত একটা পর্য্যন্ত। অসহযোগের পক্ষ নিলেন প্রধানতঃ [illegible] আর সুরেশ বাবু। সুভাষ শুধু শুনছিল, আর মাঝে মাঝে হাসছিল। শেষে প্রফুল্ল [illegible]সা করলেন—সারা দেশ যদি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ [illegible] দেয়, তাহলে গবর্ণমেণ্ট ভেঙে পড়বে না কেন?

[illegible] ভেঙে পড়বে না এই জন্য যে ইংরেজ আপনাদের মতো অহিংস নয়। সে [illegible] করে নিয়ে আপনাদের আচ্ছা করে ঠ্যাঙানি দেবার ব্যবস্থা করবে। উচ্চৈঃ স[illegible]নমর্ষিক হতে হবে, নয় তো মারা পড়তে হবে। [illegible] স্বদেশভে[illegible] [illegible]নিলেন না: আমরাও তাঁদের মত্ত মেতে [illegible] আছে—

যুষ্মৎপ্রতাপোঽস্তু বিবর্দ্ধমান
ঈশো ভবেদ্ বঃ শ্রবণাবধানঃ।
উল্লঙ্ঘ্য যুষ্মানভিমায়িনো যে
তে ভস্মনা যান্তু লয়ং সমানম্॥

৪

ভোঃ! দেহলীং গচ্ছত তারবন্তো
জাতীয়কেতুং স্ববলাদ্ বহন্তঃ।
নিখায় তঞ্চারুণবর্ণদুর্গে
মুহুঃ কুরুধ্বং লহরীয়মাণম্॥

"আবার যদি সমরানল প্রজ্বলিত হয়, কে জানে রুশিয়া কোন্ দিকে থাকিবে? আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে বাঙালী জাপানকে চায় না, জার্ম্মানীকে চায় না, রুশিয়াকেও চায় না। বাঙালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার দেশরক্ষার যে ভার, সেই বোঝার অংশ মাথায় তুলিয়া লইতে চায়। বাঙালী অস্ত্রধারণের অধিকার চায়,...তাই বাঙালী সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতেছে। এই যে বাঙালীর নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা ইহাকে তাচ্ছিল্য করিও না, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিত করিও না।

মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি, তাহা পরিবর্ত্তন করা উচিত। উক্ত প্রস্তাবে কংগ্রেসের নামে দেশীয় রাজ্যসমূহে কোন কোন কাজ চালান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদনুসারে দেশীয় রাজ্যসমূহে কংগ্রেসের নামে পার্লামেণ্টারী কার্য্য কিম্বা আন্দোলন চালান যাইবে না কিন্তু কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি যে সার্ব্বভৌম শক্তি অধিকাংশ স্থলেই দেশীয় রাজ্যের শাসন-কর্ত্তাদিগের সহিত একজোট হইয়াছে। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হওয়া উচিত নহে কি? বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কি তৎসম্বন্ধে আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই।

দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইতে হইবে। তাহা ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটিকে ব্যাপক ও প্রণালীবদ্ধ উপায়ে দেশীয় রাজ্যসমূহে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র লাভের জন্য আন্দোলন চালাইতে হইবে। দেশীয় রাজ্যে এযাবৎ কেবল বিক্ষিপ্ত ভাবে কাজ করা হইয়াছে, কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা অনুসারে হয় নাই। এখন ওয়ার্কিং কমিটিকে এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাপক ও প্রণালীবদ্ধ আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে এতদুদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাব-কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কার্য্যে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ ও সহযোগিতা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনের সহযোগিতাও লইতে হইবে।

স্বরাজ লাভের জন্য যে আমাদিগের চূড়ান্ত ভাবে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তজ্জন্য যথেষ্ট আয়োজন দরকার। প্রধানতঃ ক্ষমতার লোভে আমাদের মধ্যে যে দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, প্রথমতঃ নির্ম্মম হস্তে তাহা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশের কিষাণ-আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া-মিশিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দেশের সর্ব্বপ্রকার চরমপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালাইবার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একযোগে অগ্রসর হইতে হইবে।

বন্ধুগণ, আজ কংগ্রেসের ভিতরে কলহের মেঘ দেখা দিয়াছে। এই কারণে আমাদের বহু বন্ধু নিরুৎসাহ বোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই নিরাশ হই না, আমাদের দেশবাসীর স্বদেশপ্রেমে আমার বিশ্বাস আছে। আমার দৃঢ় ধারণা, অচিরেই আমরা এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিব। আমাদের মধ্যে পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। 'বন্দে মাতরম্!' [ত্রিপুরী]

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই,—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে।..."

—রবীন্দ্রনাথ

সমরসঙ্গীতম্

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

('কদম কদম বাঢ়ায়ে যা'-র সংস্কৃতানুবাদ)

১

পদম্পদং বর্দ্ধয়তাগ্রযানং
স্বলীলয়া গায়ত হর্ষগানম্।
স্বজাতিহেতোর্ননু জীবনং যদ্
জাত্যৈ তদেবাস্তু বিতীর্য্যমাণম্।

২

ভো হিন্দসিংহাঃ! ভজতাগ্রযাত্রাং
মৃত্যোর্ভিয়ং জাত্বপি নাণুমাত্রাম্।
উচ্চৈঃ সমুন্নীয় শিরোঽভ্রচুম্বি
স্বদেশতেজস্তনুতেধ্যমানম্।

৩

যুষ্মৎপ্রতাপোঽস্তু বিবর্দ্ধমান
ঈশো ভবেদ্ বঃ শ্রবণাবধানঃ।
উল্লঙ্ঘ্য যুষ্মানভিমায়িনো যে
তে ভস্মনা যান্তু লয়ং সমানম্॥

৪

ভোঃ! দেহলীং গচ্ছত তারবন্তো
জাতীয়কেতুং স্ববলাদ্ বহন্তঃ।
নিখায় তঞ্চারুণবর্ণদুর্গে
মুহুঃ কুরুধ্বং লহরীয়মাণম্॥

"আবার যদি সমরানল প্রজ্বলিত হয়, কে জানে রুশিয়া কোন্ দিকে থাকিবে? আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে বাঙালী জাপানকে চায় না, জার্ম্মানীকে চায় না, রুশিয়াকেও চায় না। বাঙালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার দেশরক্ষার যে ভার, সেই বোঝার অংশ মাথায় তুলিয়া লইতে চায়। বাঙালী অস্ত্রধারণের অধিকার চায়,···তাই বাঙালী সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতেছে। এই যে বাঙালীর নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা ইহাকে তাচ্ছিল্য করিও না, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিত করিও না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভায়া হে, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে ব'লে তুমি আমাকে মহা বিপদে ফেলেছ। যখন সুভাষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তখন মনে করতুম তার অনেকটাই আমি জেনেছি, বুঝেছি। এখন আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি তার শক্তির নির্ণয় করবার সামর্থ্য আমার এখনও নেই, কোন দিনই ছিল না। সুভাষ সম্বন্ধে বন্ধু মহলে আলোচনা করবার সময় আমরা অনেক সময় বলতুম—That man will go very far—বহু দূর পর্য্যন্ত সে ছুট্‌বে; এত দূর যে সে ছুটবে, তা' কোন দিনই কল্পনা করতে পারিনি।

প্রথম যখন সুভাষের সঙ্গে দেখা হয় ১৯২১ সালে। তখন আমরা আন্দামান থেকে ফিরে এসে 'নারায়ণ' আর 'বিজলী' চালাচ্ছি। সুভাষ তখন আই, সি, এস হবার মোহ কাটিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারের কাছ থেকে সুভাষের গল্প প্রায়ই শুনতুম। সুভাষের সাধু হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন্‌ সাহেবকে ঠ্যাঙানি, তার puritan চাল-চলন—কত গল্পই না হতো! সুভাষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা ছিলাম কংগ্রেসী দলের বাইরে; কাজেই দেখা-শুনা হবার বাধাও একটু ছিল।

'বিজলী'তে তখন প্রতি সপ্তাহেই মহাত্মাজী আর তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে মহা ফুর্ত্তিসে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছি। ঐ অহিংস যুদ্ধের আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা আমি কস্মিন্‌ কালেই হজম করে উঠতে পারিনি। এক দিন সন্ধ্যায় সময় দেখি, বন্ধু হেমন্তকুমারের সঙ্গে তিন জন ভদ্রলোক

এসে উপস্থিত। ছেঁড়া মাহুরের উপরই তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। ক্রমে পরিচয় হলো। এক জন হচ্ছেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। গরীবের ছেলে ; তবু মোটা মাইনের সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে জয় মা ব'লে অসহযোগের তরঙ্গে তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন। অতি শান্ত ও বিনীত। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সুরেশ ব্যানার্জি। ডাক্তার মানুষ—প্রফুল্ল বাবুর মতই সর্ব্বত্যাগী। প্রথম মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অসযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটি—ভদ্রলোক বলা মিছে ; একেবারে বাচ্ছা বল্‌লেই হয়। দিব্যি ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ ; ঠোঁটের ডগায় চাপা হাসি। মুখ-চোখ উজ্জ্বল। বন্ধু হেমন্তকুমার পিছন থেকে চুপি চুপি ব'লে দিলেন—ঐ সুভাষ !

ওঁরা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে। কেন আমরা অসহযোগ আন্দোলনের খুঁত ধরি—কেন আমরা অহিংসার কথা শুনে বিদ্রূপ করি।

সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে তর্ক চল্‌লো রাত একটা পর্য্যন্ত। অসহযোগের পক্ষ নিলেন প্রধানতঃ প্রফুল্ল বাবু আর সুরেশ বাবু। সুভাষ শুধু শুনছিল, আর মাঝে মাঝে হাসছিল। শেষে প্রফুল্ল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সারা দেশ যদি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়, তাহলে গবর্ণমেণ্ট ভেঙে পড়বে না কেন ?

আমি বল্‌লুম ভেঙে পড়বে না এই জন্য যে ইংরেজ আপনাদের মতো অহিংস নয়। সে আপনাদের ক্ষেতের ধান লুঠ করে নিয়ে আপনাদের আচ্ছা করে ঠ্যাঙানি দেবার ব্যবস্থা করবে। দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করবে। তখন হয় পুনর্মূষিক হতে হবে, নয় তো মারা পড়তে হবে। কোন দিকেই ইংরেজের ক্ষতি নেই।

তর্কের ফল হলো এই—আমাদের মতও তাঁরা মেনে নিলেন না ; আমরাও তাঁদের মত মেনে নিলুম না। অনেক রাত হয়ে গেছে যখন সভা ভঙ্গ হলো, তখন সুভাষ বল্‌লে আস্তে আস্তে—দেখাই যাক দিন কতক ! সত্যিই কি আর একেবারে অহিংস হয়ে গেছি !

* * * *

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল চৌরিচৌরার সঙ্গে। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স থামিয়ে দিয়ে মহাত্মাজী ঠিক কাজ করলেন কি ভুল করলেন তা নিয়ে বাংলা দেশে মতভেদ বেশ প্রবল হয়ে উঠলো। অনেকের মনে হলো ক্ষণিক উত্তেজনার পর দেশটা যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। কি ক'রে লোকের মন চাঙ্গা করে রাখা যায় তা নিয়ে নেতাদের মধ্যেও মতভেদ দেখা গেল। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স এন্‌কোয়েরি (Civil Disobedience Enquiry Committee) কমিটি তাঁরা রায় দিলেন যে দেশের লোক এখনও প্রস্তুত হয়নি ; অতএব আপাততঃ সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ব্যবস্থাপক সভাগুলোর ভিতর থেকে গবর্ণমেণ্টকে নানা রকমে অতিষ্ঠ করে তোলবার চেষ্টা করা হোক। এই নিয়ে কংগ্রেসের ভিতর দলাদলি প্রবল হয়ে উঠল। এক দিকে রইলেন বিশুদ্ধ খদ্দরপন্থী নৈষ্ঠিক অসহযোগীর দল ; অপর দিকে খাড়া হলেন স্বরাজ্য দল। বাংলা দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হলেন স্বরাজ্য দলের নেতা, আর সুভাষচন্দ্র হলেন তাঁর প্রধান লেফ্‌টেনাণ্ট।

'বিজলী' কাগজখানা তখন উঠে গিয়েছিল নানা কারণে। মহাত্মা-পন্থী অসহযোগীদের উপর তখন আমি বিষোদ্গার করছিলুম 'আত্মশক্তি'র ভিতর দিয়ে। কতকগুলো লেখা ভাল লেগেছিল দেশবন্ধুর ; আর সেই সূত্র অবলম্বন ক'রে আমি ক্রমশঃ গিয়ে পড়লুম স্বরাজ্য দলের মধ্যে। বৌবাজারের চেরি প্রেসে ছাপা হতো 'আত্মশক্তি' ; আর সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত হলো স্বরাজ্য দলের প্রধান আড্ডা। সেই সময় সুভাষচন্দ্রকে একটু ভাল ক'রে জানবার অবসর পেয়েছিলুম। কেমন ক'রে গান্ধীপন্থীদের হাত থেকে বাংলার কংগ্রেসটাকে উদ্ধার করা হবে, কেমন ক'রে সমস্ত দেশটার শক্তি সংঘবদ্ধ ক'রে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ঘায়েল করা যেতে পারে—এই সব নানা প্রসঙ্গের আলোচনা সুভাষের সঙ্গে দিন-রাতই চলতো।

দেখলুন, সুভাষের মনে ঐ এক দেশের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই ছিল না। এমন অক্লান্তকর্ম্মী আর দেখিনি। বাংলা দেশের অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবটা একটু ঢিলে-ঢালা রকমের। সব কাজেই একটু হচ্চে-হবে ভাব। সুভাষের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরেজীতে যাকে বলে Bull-dog tenacity তা সুভাষের ছিল পুরোমাত্রায়। একটা কাজ হাতে নিলে শেষ না করে ছাড়তো না। আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই—কাজ চলেছে। অপরকে এলিয়ে পড়তে দেখলে সে একেবারে ক্ষেপে যেত। রাগে, অভিমানে ফুলতো। এক এক সময় ছেলেমানুষের মতো কেঁদেও ফেলতো। সবাই যখন জেলে যাচ্ছে, তখন দেশবন্ধু সুভাষকে জেলে যাবার অনুমতি দেননি বলে সুভাষ কেঁদেই অস্থির। দেশবন্ধু হাসতে হাসতে তার নাম দিয়েছিলেন—Our crying captain !

* * * *

সব কাজেই সুভাষের নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। ন্যাশনাল কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সুভাষ ছিল তার প্রিন্সিপ্যাল। বেঞ্চি সাজানো থেকে আরম্ভ করে ছেলেদের পড়ানো পর্য্যন্ত সব কাজেই তার সমান উৎসাহ। পাই পয়সা পর্য্যন্ত হিসাব ঠিক রাখতে এক একদিন গভীর রাত্রি হয়ে যেত। সেদিকে সুভাষের ভ্রূক্ষেপ নেই। সব কাজ শেষ না করে সে উঠবে না, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। ক্রমে ছেলেদের উৎসাহ কমে গিয়ে যখন তারা একে একে সরে পড়লো, তখনও সুভাষ অচল, অটল। সুভাষকে একদিন সেখানে খুঁজতে গিয়ে দেখি বন্ধুবর কিরণশঙ্কর নীচের তলায় কাগজ পড়ছেন। জিজ্ঞাসা করলুম—"সুভাষ কোথায় ?" কিরণ বাবু হেসে জবাব দিলেন—"সুভাষ ! সে তার ক্লাসে বেঞ্চিগুলোকে পড়াচ্চে।" উপরে গিয়ে দেখি—ক্লাসে ছাত্র নেই ; সুভাষ আসনের উপর সোজা হয়ে বসে নিশ্চিন্ত মনে লিখচে। ছেলেরা নাই-বা এলো ! তার নিজের কর্ত্তব্য তো তাকে করতে হবে !
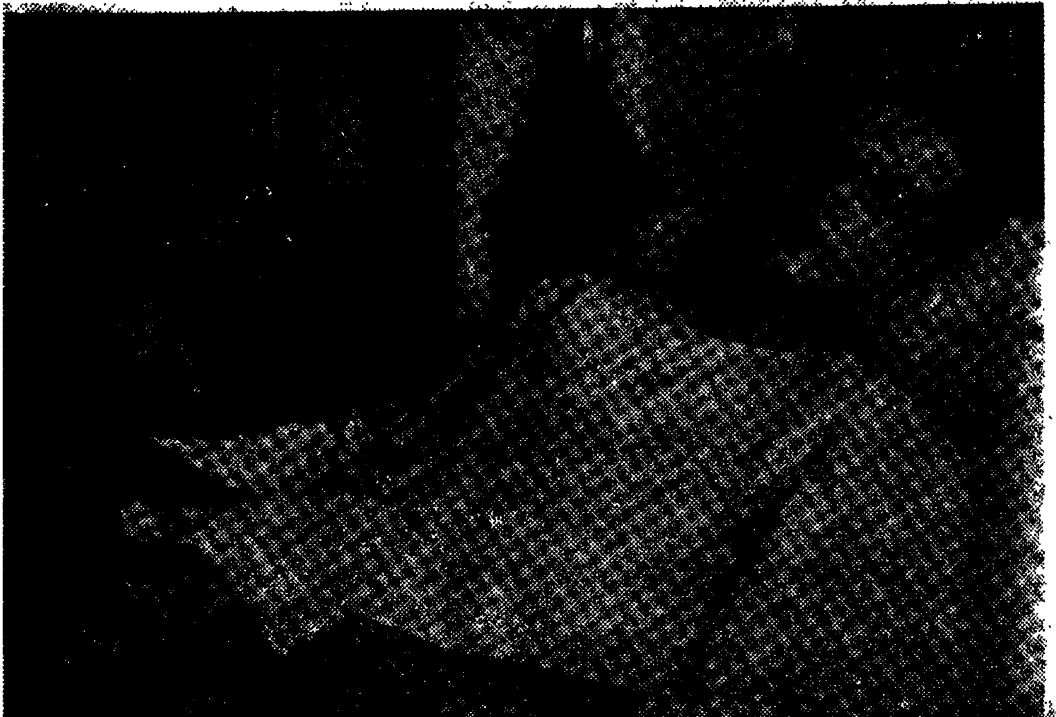
সন্ধ্যার একটু আগে সুভাষের কাজ শেষ হলো। তখন ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তাদের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের মনান্তর হয়েছে। ছেলে-মহলে রব উঠেছে—ট্রাম গাড়ী বয়কট করো। কাজে কাজেই সুভাষও ট্রাম গাড়ীতে চড়বে না। হাতীবাগান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চল্‌লো ভবানীপুরে। চৌরঙ্গীর কাছাকাছি গিয়ে বল্‌লে—চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। আমাকে আসতে হবে শ্যামবাজারে। সুভাষ আবার হাতীবাগানের কাছে এসে পড়্‌লো। আমি দেখলুম, এই পাগলের পাল্লায় পড়ে যদি পরস্পরকে এগিয়ে দেওয়া-দেওয়ি করতে থাকি তাহলে রাস্তাতেই সারা রাত কেটে যাবে। আমি বৌবাজার পর্য্যন্ত ফিরে এসে সুভাষকে বললুম—"যাও, ভাই, বাড়ী গিয়ে শোওগে। আজকের মতো ভারতমাতাকে একটু বিশ্রাম দাও।"

* * * * *

সুভাষের মত কষ্টসহিষ্ণু ছেলে খুব কমই দেখিছি। A. I. C. Cর অধিবেশনে যোগ দিতে তখন অনেক বার নাগপুর, বোম্বাই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গুড়ের নাগরীর মতো ঠাসাঠাসি করে সবাই চলেছি—খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা কিছুরই ঠিক নেই; কিন্তু সুভাষের মুখে কখনও বিন্দুমাত্র কষ্টের বা বিরক্তির চিহ্ন দেখতে পাইনি। বাংলা দেশে দেশবন্ধু তখন স্বরাজ্য দল গড়ে তুলছেন। সুভাষ তাঁর দক্ষিণ হস্ত। পুরাতন বিপ্লববাদীদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খদ্দরের টুপি মাথায় এঁটে রাতারাতি প্রচণ্ড অহিংসাবাদী হয়ে পড়েছিলেন। সুভাষের ইচ্ছা, বিপ্লববাদীরা যখন পুরাতন পন্থা ছেড়ে দিয়েছে, তখন তারা স্বরাজ্য দলে যোগ দিক। তিনি দেশবন্ধুকে সেই পরামর্শ দিলেন। দেশবন্ধু সকলকে ডেকে বললেন—অহিংসা আমার আদর্শ বটে; তবে গান্ধীজীর মতো আমি অহিংসা-খোর নই। আর চরকা যারা কাটছে কাটুক। চরকা কাটলে সুতো হয়, সুতো থেকে খদ্দর হয়, সবই বুঝি, কিন্তু খদ্দর থেকে যে কি ক'রে স্বরাজ হবে, তা
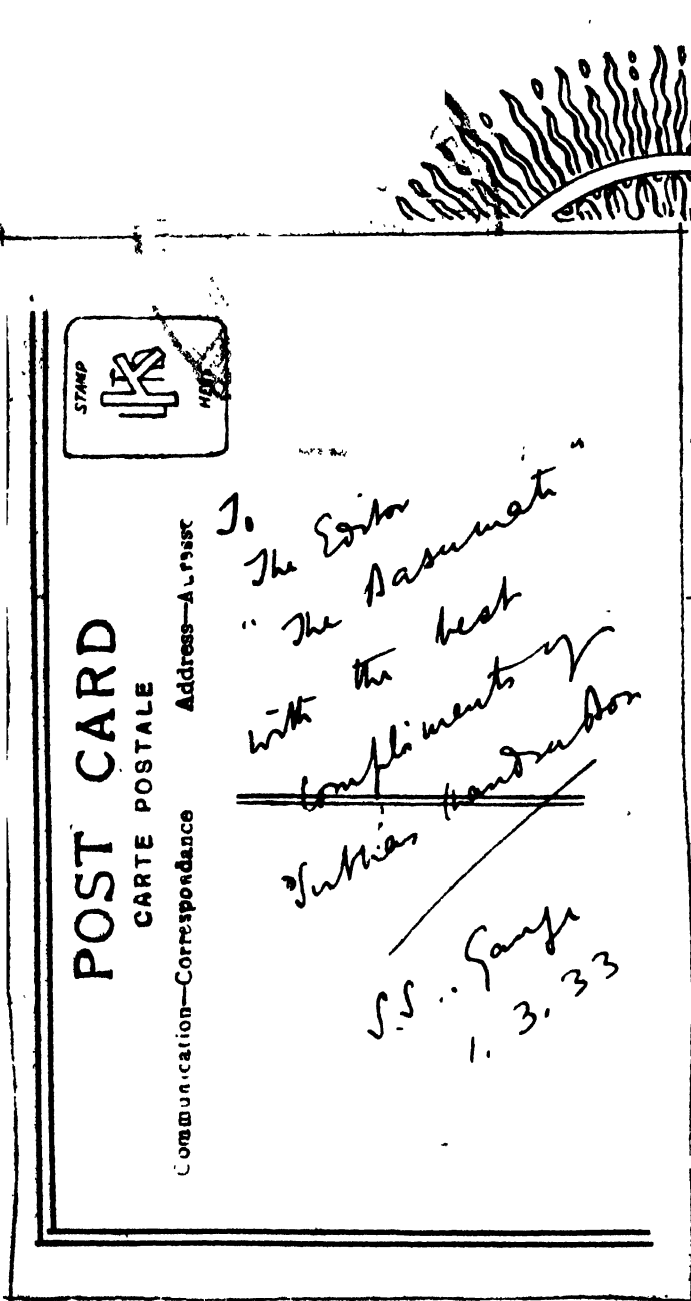
বুঝিনে। সিবিল ডিসো-বিডিয়েন্স উঠে গেল; অথচ কংগ্রেসের গঠন-মূলক কর্ম্মপন্থার ভিতর কোথাও একটা spirit of resistanceএর লক্ষণ নেই। ঐ resistanceএর ভাবটা যদি মরে যায়, তাহলে আন্দোলনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাউন্সিলে গেলে সেই ভাবটা বাঁচিয়ে রাখতে পারা যাবে; আর তা' থেকে দরকার হলে সিভিল ডিসোবিডি-য়েন্সও আরম্ভ করা যেতে পারবে।"

বিপ্লববাদীরা সে কথা মেনে নিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে policy হিসাবে তাঁরা অহিংসাটাকে আপাততঃ মেনে নেবেন।

সুভাষচন্দ্রের মহা স্ফুর্ত্তি। স্বরাজ্য দলের কর্ম্মপন্থা প্রচার করবার জন্যে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে ঢাকা, মৈমনসিং প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। এক রকম জোর করেই আমাকেও ধরে নিয়ে গেলেন। মতলবটা তখন ঠিক ধরতে না পারলেও পরে বুঝতে পেরেছিলুম। সুভাষের ইচ্ছা ছিল, স্বরাজ্য দলের ভিতর এমন একটা inner wide গড়ে তোলা হয় যাদের লক্ষ্য শুধু কাউন্সিল বা আনুষঙ্গিক কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এবং যারা ক্রমশঃ সমস্ত কংগ্রেসটাকে একটা বিপ্লবী সংঘে পরিণত করতে পারবে। অসহযোগ আন্দোলন দুই-এক বার বিফল হলেই কংগ্রেসের নেতারা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা রফা করে ফেলতে চেষ্টা করবেন, সে সন্দেহ সুভাষের মনে তখন থেকেই গজিয়েছিল।

বিপ্লববাদী নেতাদের মধ্যে দুই-এক জন কংগ্রেসে যোগ দেননি। তাঁরা poling হিসাবেও অহিংসাটাকে মেনে নিতে রাজী হননি। তবে তাঁরা কিছু দিনের জন্য কোন রকম terrorist কাজ-কর্ম্মের ভিতর যাবেন না, এ আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাঁদের দলের ছেলেরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের কাজ-কর্ম্মের ফলে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট সব পুরাতন বৈপ্লবিক নেতাদের ধরে জেলে পুরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যেতে হলো। তবে সুভাষের উপর গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়েনি দেখে আমি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলুম।

* * * *

বৃথা আশা! এক বৎসর যেতে না যেতেই দেখলুম, সুভাষচন্দ্র ও আরও কয়েক জন স্বরাজ্য দলের পাণ্ডাদেরও গবর্ণমেণ্ট জেলে পুরলেন। সুভাষ তখন কলকাতা করপোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। তাকে জেলে পুরে জেলের কর্ত্তারা বিব্রত হয়ে উঠলেন। কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে চিফের মতামত নেবার জন্যে করপোরেশনের চিফ এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারীদের মাঝে মাঝে জেলে গিয়ে সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে হতো। সাক্ষাতের সময় দুই-এক জন সি, আই, ডি ইন্‌স্‌পেক্টরকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হতো। খদ্দর-পরা সুভাষচন্দ্র চেয়ারে গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট, আর হ্যাটকোটধারী চিফ এঞ্জিনীয়ার কোট্‌স্ সাহেব চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে খাতা-পত্র দেখাচ্ছেন। সি, আই, ডি ইন্‌সপেক্টরদের সে দৃশ্য দেখে কি স্ফূর্ত্তি। সাক্ষাৎ শেষ হয়ে যাবার পর এক জন বললেন—"ঠিক হয়েছে! মামাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, আর মামারা আমাদের উপর তম্বি করেন। সুভাষ মামাদের ঠিক সায়েস্তা করেছে! এখন দাঁড়িয়ে থাকো বাবা—সুভাষের সামনে টুপি খুলে, আর বলো—Yes Sir."

সি, আই, ডি-দের উপর সুভাষের একটা আন্তরিক ঘৃণা ছিল। এক দিন করপোরেশনের এক জন কর্ম্মচারী সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সুভাষ তাঁকে যে সমস্ত প্রশ্ন করছিলেন, তার সব কথাগুলো সি, আই, ডি অফিসারটি বুঝতে পারছিলেন না। অথচ বুঝতে না পারলে গবর্ণমেণ্টের কাছে ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেওয়াও চলে না। তিনি সুভাষকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওটা কি বললেন, স্যর?" সুভাষ সে কথার জবাবও দিলেন না। তাঁর দিকে ফিরেও দেখলেন না। খানিকক্ষণ পরে আবার ঐ একই প্রশ্ন হলো। সুভাষ কিছু না ব'লে তার দিকে শুধু একবার কট্‌মট্ করে চেয়ে দেখলেন। তৃতীয় বার আবার প্রশ্ন হলো—"ওটা কি বললেন, স্যর?" সুভাষ হাতের কলমটা রেখে দিয়ে সি, আই, ডি প্রভুকে বললেন—"You just shut up." সি, আই, ডি ইন্‌স্‌পেক্টর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়ে কর্ত্তাদের কাছে নালিশ করলেন। সুভাষকে আলিপুর জেল থেকে বদলি হয়ে প্রথমে যেতে হলো বহরমপুর, তার পর একেবারে মান্দালয়।

* * * *

জেল থেকে সুভাষ যখন ছাড়া পেলেন তখন দেশবন্ধু পরলোকে। বাংলার কংগ্রেস তখন স্বরাজ্য দলের হস্তগত; কিন্তু তাঁদের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট নিয়ে মতভেদ হওয়ায় আমি ক্রমশঃই ঐ দল থেকে দূরে সরে এসেছিলাম। সুভাষ জেল থেকে ফিরে আসবার পর তাঁর সঙ্গে সেনগুপ্ত সাহেবের মতভেদও প্রবল হয়ে উঠেছিল। দূরে থেকে আমি সব সময় বুঝতে পারতুম না সুভাষ সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছেন কেন। আমার মতো অনেকেই হয় ত তাঁকে ভুল বুঝেছিল। অনেক সময় তীব্র ভাবে তাঁর কাজের সমালোচনাও করেছি। আজ মনে হয় যেন বুঝতে পেরেছি সুভাষ কি খুঁজছিলেন। বাংলাদেশের দলাদলির ভিতর যা করা সম্ভব হয়নি, বাংলার আবহাওয়ার বাইরে গিয়ে তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে সব কথা ভেবে কোন লাভ নেই। Too late.

[ক্রমশঃ

কটকে বেণী মাষ্টার ১৪।১৫ বছরের সুন্দর ছেলেটির মধ্যে কি যেন দেখেছিলেন।

সে যুগের মাষ্টাররাই ছিলেন ঐ রকমের। ছেলেরাও ছিল অদ্ভুত। সবারই মাথায় ভারত উদ্ধার করবার বাতিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রত্যেকটি কলেজের বড় ছেলেরা অপূর্ব এক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখাপড়ার চাইতে সেবা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে যুব ও ছাত্রসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্য প্রাণপণ করছিল।

সেকালের Young Bengalএর নেতামাত্র নয়—নব্য ভারতের প্রথম বিপ্লবী, রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কি পরামর্শ হয়েছিল (১৮৯৮) তা জানি না, কিন্তু এ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, আজ যাঁদের বয়স যাটের কোঠায়, তাঁরা যুগ-প্রবর্ত্তক এ দুই শক্তি-সঞ্চারকের প্রভাবে বাংলায় অন্ততঃ যে কর্ম্মতরঙ্গ প্রবাহিত করেছেন, তার প্লাবন আজও বইছে। এ সময় প্রত্যেকটি যুবক মনে করত—শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম-বিচার ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন—তুই যে বীর রে! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীর-ভাবের সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য্য করিতে হইবে। এবং অহরহ এই ভগবদ্বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে—"তুই যে বীর রে!"

সে হ'ল প্রাণমন্ত্রের যুগ। শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের ঘোষণায় (১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর) নবীন বাংলা আভাষ পেল—"India is awake not only to survive but to conquer". এর মাসখানেক আগে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরে কিসের যেন আভাষ পেয়ে ঘোষণা করলেন—দেশ মুক্তি পাবে "by purification by blood and fire"; বললেন—Proletariat সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যখন মুক্তিসংগ্রামে অগ্রগামী হবে, কেবল তখনই দেশ মুক্ত হবে।
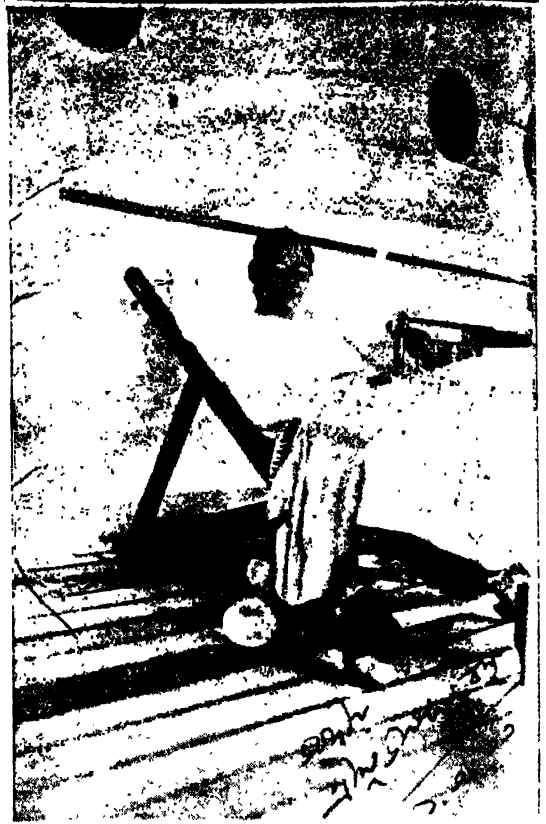
বাংলার প্রতি কেন্দ্রে যুবশক্তি যুগপ্রবর্ত্তকদের এই এই প্রভাবে পরিচালিত হয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় যেমন মাতল, তেমনি মাতল আপন আপন দেশ ও মন গড়তে—পরম উদ্দেশ্য, জন্মভূমির শৃঙ্খলমোচন।

গিরীশ ব্যানার্জ্জি নামে কটক কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের এক ছাত্রের মাথায় এমনই একটা পাগলামী চেপেছিল। আদর্শ যুবক—বয়স ২৪।২৫, বার মাস ভোগে হাঁপানীতে, প্রতি বছর করে ফেল, তবু কটকের ছেলেদের কাছে দেবতা। তাকে কেন্দ্র করে সেখানে সেদিন গড়ে উঠেছিল যে আদর্শ বন্দিদল, কিশোর সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাদের একজন; আর ছিলেন শৈলেন ঘোষ, অন্নদা চৌধুরী, নৃপেন বসু, আরও অনেক। প্রাণমাত্র সম্বল গিরীশ এদের যে প্রাণের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, আজও এঁরা তা ভোলেননি, এঁদের সঙ্কল্পই ছিল—"সারা জীবন অবিবাহিত থেকে দেশ স্বাধীন করব।"

বেণী মাষ্টার কৃষ্ণনগর থেকে কটকে এসে ১৪।১৫ বছর বয়সের সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তাই সেদিন রত্নের সন্ধান পেয়েছিলেন।

শৈশবের এসব কথা উঠলেই স্বল্পভাষী সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বল চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাল ছেলে, দিন-রাত কাঙ্গাল-দুঃখীর কুটীরে ঘুরে বেড়ান। দিন-রাত ধর্ম্ম আলোচনা। রামকৃষ্ণ-কথামৃত যেন বেদ। ঘরে মা'র সঙ্গে ধর্ম্মকথার আলোচনা, বাইরে বন্ধুদের কাছে কুর্ম্মবৃত্তি। কটকের কিশোর-জীবনের সে সব কথা সুভাষ বলতে চাইতেন না, যেন মনের বনে সঙ্গোপনে রাখবার কথা।

বেণী বাবুর কাছে খবর পেয়ে হেমন্তকুমার সরকার কটকে গিয়ে সুভাষের সঙ্গে ভাব করলেন। দু'জনেই সমবয়সী। হেমন্ত বাবু সে সময় সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে পড়েছেন। হেমন্ত বাবুর মধ্যস্থতায় সুভাষের সঙ্গে সুরেশ বাবুর পত্র লেখালেখি হতে থাকে। কিশোর সুভাষের মনে তখন বিবেকানন্দের আদর্শ প্রবল।

স্বামীজীর মাদ্রাজ বক্তৃতার বৈদ্যুতিক প্রেরণা তখন প্রত্যেক যুবকের অন্তরে। মনীষী রোমা রোঁলার বিবেকানন্দ-জীবনীর এ অংশটুকু সুভাষচন্দ্রের মুখে কতবার শুনেছি—"From that day the awakening of the torpid Colossus began. If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India today has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shock to the mighty.

'Lazarus, come forth'

of the Maessage from Madras".

স্বামীজী বলতেন, "দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে কাঁদ আর ভগবানের কাছে সাহায্য চাও। সাহায্য আসবেই।" কিশোর সুভাষের প্রাণে একথা মাত্র যে বিঁধেছিল তা নয়, তাঁর সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্কিত থেকে আমরা দেখেছি, এদিক্ দিয়ে তাঁর অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণতা আমাদের কাছে মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর বলে মনে হয়েছে।

৩৫ বছর আগের কথা, তখন বাংলার প্রত্যেকটি ছেলের উপর দুই মহাপ্রভাব—স্বামীজীর আর শ্রীঅরবিন্দের। প্রত্যেক জেলায় এক এক জন শক্তিশালী তরুণ নেতা প্রত্যক্ষভাবে স্বামীজীর ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চিরকুমার দল গড়ে তুলছেন সেবা ও সন্ন্যাসের আদর্শে; যেমন, কলিকাতায় সুরেশ বাঁড়ুজ্জের দল, উত্তর বাঙ্গালায় যতীন রায়ের দল ইত্যাদি। কিন্তু পাশাপাশি এমন রুদ্র বিপ্লবী দলও গড়ে উঠেছে বাংলার প্রতি সহরে, যারা ব'লত—সন্ন্যাস সন্ন্যাস করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। এরা direct actionএর পক্ষপাতী। এদের স্বপ্ন, ফরাসী বিদ্রোহের মত ভারতের Proletariat দ্বারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ—এদের স্বপ্ন ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ। ১৯০৬-৭ এর সরকারী নিপীড়ন আর মুসলমান উত্তেজনার মূলে যে দুর্ব্বলতা, হীনমন্যতা, অপকর্ষতা-বোধ, বিপ্লবী দল সোজাসুজি তা নষ্ট করবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েছিল গেরস্ত থেকেও। তারা তখন বলত—"It is the knowledge of our weakness that this despotism, be it of a Government or of a Community thrives and the necessity of replacing it by strength"—চরিত্রগঠনের ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে ষোল আনা নজর দিলেও এরা কাণে তুলসীপাতা দিয়ে বৈরাগী সাজবার পক্ষপাতী ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের মুখে শুনেছি, তিনি যে "Puritan brotherhood"এর প্রভাবে মনে যে ধর্ম্মভাব

পেয়েছিলেন। সে দলে তাঁর সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা উত্তরকালে no-changer দলে পরিণত হন। পাকা বেপরোয়া বিপ্লবী অনুশীলন দলের কিশোর প্রফুল্ল ঘোষের ও সেদিন মারামারি কাটাকাটির চাইতে নির্দোষ ও বিশুদ্ধ সেবা-ধর্ম্মই ভাল লেগেছিল।

১৯১৩তে ১৬ বছর বয়সে সুভাষ যখন ম্যাট্রিকে দ্বিতীয় হয়ে কটক থেকে কলকাতায় পড়তে এল, তখন সে বরাবর উঠেছিল ৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সুরেশ বাঁড়ুজ্জের আড্ডায়। ম্যাট্রিকে সে-বা'র প্রথম হয়েছিল যে প্রমথ সরকার সেও সেই আড্ডায়। হেমন্ত সরকার পাশ করে কৃষ্ণনগরে থাকলেও এই আড্ডার সঙ্গে তার যোগ ছিল। আড্ডায় আরও ছিল শশাঙ্ক, নৃপেন বসু (স্কটিশে থার্ড ইয়ার), জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, ধীরেশ চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল ঘোষ, জীবনরতন ধর। কলকাতায় কেন, গোটা বাংলায় তখন সেটা সব চাইতে বড় ছাত্রদল; অনুশীলন দলের মত বাংলার সব জেলায় তার উপনিবেশ। সুভাষকে পেয়ে সুরেশ বাবুর কত আনন্দ! সুরেশ বাবু বলতেন—'সে যে কালে বড় হবে, এ কথা প্রথম দেখার সময় হতেই আমার মনে জেগেছিল।' এ কথা আমি অন্যান্য সকলকে বহু বার বলেছিও। তাকে ৩ নংএ আমার ঘরে আসতে দেখলে পাশে বসা সাথীদের অনেক সময় বলতাম—"Look, the Lion comes."

৩ নংএ সুভাষ অনেক সময় পড়ে থাকত। বাড়ীতে যেতে চাইত না। মনে তখন ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম। কাজ-কর্ম্মের কথা বললেই তাঁর মুখ কাঁদ-কাঁদ হত। এক দিন এক বন্ধু তাঁকে কাজের কথা বলতেই সুভাষ সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'সুরেশ দা, আমার না কি কাজ করতে হবে?' সুরেশ বাবু সান্ত্বনা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন—'না, না, কে বললে তোমায় কাজ করতে হবে—ভগবান লাভেই তোমার সারা জীবন কাটবে।'

এই দলে ভিড়ে সুভাষকে অনেক adventure করতে হয়েছে! হেমন্ত বাবুর কাছে শুনেছি, একবার নবদ্বীপ থেকে নৌকায় কৃষ্ণনগর ফিরতে সুভাষচন্দ্র আর হেমন্ত বাবুকে গুন টানতে হয়। সুভাষের সে কি গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থা!

সুভাষের আই-এ পড়বার সময়ই এই যুবসঙ্ঘের মনে সন্ন্যাস নেবার ভাব প্রবল হয়। সকলেই—সুভাষও, তখন থেকে সন্ন্যাসীর চিহ্ন, গেরুয়ার লেংটি পরতে আরম্ভ করেন। (১৯১৪-ডিসেম্বর) এক বড়দিনের ছুটিতে সন্ন্যাসি-জীবন যাপন করবার উদ্দেশে শান্তিপুরে এক বাড়ী ঠিক হয়। সকলের কাপড় গেরুয়া রং করা হয়। গুরুদাস, যুগল, প্রফুল্ল ঘোষ, যোগেন সাহা, বিধু রায়, শশাঙ্ক মুখুজ্জে, প্রমথ সরকার, সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত সরকার, অরবিন্দ মুখুজ্জে, আরও কয় জন গেরুয়া পরে শান্তিপুরে নিমাই হতে গেলেন। যেমন করে বিবেকানন্দের গুরু-ভাইরা শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন, এরাও শান্তিপুরে তা করতে লাগলেন। সুভাষ বলতেন, "সে কি উৎসাহ—শীতের শেষ রাত্রে গঙ্গার সেই ঠাণ্ডা জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান!" সুভাষ বলতেন, "দেশের সেবায় সর্ব্বক্ষণ সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হলে সন্ন্যাসী না হলে চলে না।" তাঁদের ব্রাদারহুডের মত ছিল—"সর্ব্বসাময়িক দেশসেবীদের জন্যই আগে ছিল গেরুয়ার uniform."

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধল, সে সময় ভারতের সব বিপ্লবী দলের মধ্যে একটা মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সে সময় যে চেষ্টা হয়, তা কতকটা I. N. A. গঠনের মত। সে-বার জার্ম্মাণীর সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তাও হয়েছিল। সর্ব্বদলীয় বিপ্লবী বৈঠকে সন্ন্যাসী-দলের নেতারও ডাক পড়েছিল। তিনি তাদের উগ্রপন্থা সেদিন মানতে রাজি হননি, এমন কি ছেলে সংগ্রহের ভারও নেননি। সুভাষের উপর এর প্রভাব কেমন হয়েছিল একবার জিজ্ঞেস করলে, তিনি মৃদু হেসেছিলেন, কোন জবাব দেননি। তিনি তখন আই, এ পরীক্ষার পড়া নিয়েই ব্যস্ত। তবে উগ্রপন্থার ছোঁয়াচ সে সময় তাঁর মনে যে লেগেছিল তার কতকটা পরিচয় তাঁর অধ্যাপক ওটেনকে উত্তম-মধ্যম দেবার, ও ছাত্র-ধর্ম্মঘট পাকাবার ব্যাপারে দেখতে পাই।

১৯১৫তেই যেন মনে হয় সুভাষচন্দ্রের মনে ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের—বিশেষ করে বিপ্লবমূলক কর্ম্মের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সুরেশ বাঁড়ুজ্জের দলের নীতিতে তাঁর মন সায় দিতে পারেনি। সেবা ও ধর্ম্মপন্থী প্রফুল্ল ঘোষ, নৃপেন বসু, গিরীশ, যোগেন প্রভৃতি সন্ন্যাস আঁকড়ে রইলেন,

কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও হেমন্তকুমার মাত্র সাবুর বাটি দিয়া নিপীড়িত জনগণের দুর্দ্দশা মোচন করা যাবে এ কথা বিশ্বাস করতে না পেরে সে সময়ের বিপ্লবী-ঝঞ্ঝার প্রবাহের সমর্থন করতে লাগলেন। পরবর্ত্তী কালে অহিংস এই সাবুর বাটি ও সুতো কাটার দলের সঙ্গে গান্ধীবাদের সামঞ্জস্য হলেও, স্বাভাবিক সেবা ও ধর্ম্মপ্রবণ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের মত-বিরোধ বরাবরই হয়েছে।

কয়েক বছর আগে রাসবিহারী বোসের অসমসাহসিক ক্রিয়া-কলাপ, যতীন মুখুজ্জের বালেশ্বর সংগ্রাম আর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই ভারত-ব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য ভারতে যুব-সাধারণের অক্লান্ত কর্ম্ম-প্রেরণার প্রভাব থেকে সুভাষচন্দ্র মুক্ত হতে পারেননি।

অভিভাবকরা তাঁকে যখন বিলেত পাঠিয়ে দিলেন, তখন অমৃতসর হত্যা-কাণ্ডের পরিস্থিতি—রাউলাট কমিটির রিপোর্টে অভূতপূর্ব্ব যুব-আন্দোলনের পরিচয় প্রকাশে জনসাধারণ এক দিকে যেমন আশান্বিত, অন্য দিকে শ্রেষ্ঠ তরুণদের বন্ধন ও বিচ্ছেদ-বেদনায় বাংলার মাত্র নয়, ভারতের প্রতি গৃহ বেদনাতুর। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ, গান্ধীজী চঞ্চল, ডাঃ সত্যপাল ও কিচলু নির্ব্বাসিত। যুবসমাজ বিক্ষুব্ধ। তবু অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীজী মন্টেগু-মাকালকে বরণ করবার জন্য ব্যগ্র। বাংলার চরমপন্থীদের মুখপাত্র চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র বিদ্রোহী।

এই বিক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়ে সুভাষচন্দ্র বিলেত গেলেন আই-সি-এস হতে। মেধাবী ছাত্র অরবিন্দেরই মত সেখানে পরীক্ষার ৪র্থ স্থান অধিকার করলেন, অরবিন্দেরই মত ক্যামব্রিজের ট্রাইপোজ লাভ করলেন। এ সময় বিলেতে থাকা কালে, চরমপন্থী বৃটিশ শ্রমিক দল আর আইরিশ 'ফায়না-ফেলে' দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয় বলে শুনেছি। ডি' ভ্যালেরার কার্য্যপদ্ধতি তাঁর চিত্ত আকর্ষণ করেছিল।

যখন সুভাষ ফিরে এলেন—অথবা ভারতের মহাবিপ্লব যখন তাঁকে আহ্বান করল, তখন অরবিন্দেরই মত আই-সি-এসের তকমা ফলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন অসহযোগ আন্দোলনে। '২১এর কংগ্রেসকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য অনুশীলন প্রভৃতি দল তখন চেষ্টা করছে। চিত্তরঞ্জন সদ্য কারামুক্ত যুব-নেতাদের কয়েক বছরের জন্য থামিয়ে রাখলেও ওঁরা কংগ্রেসের পাশা-পাশি পৃথক্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। কংগ্রেসের হাটুরে কর্ম্মী সংগ্রহ, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে, সুতাকাটা আর খদ্দর ফেরী করবার অতি নগণ্য কর্ম্মপদ্ধতিকে তারা বিদ্রূপ করছে, আর তলে তলে কখন এস, আর, দাশ, কখন চিত্তরঞ্জন—এঁদের সমর্থনে আপনাদের সংগঠন শক্ত করে অনাগত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সুভাষ এলেন। অরবিন্দ-ভক্ত চিত্তরঞ্জন সুভাষের মধ্যে অরবিন্দকে দেখতে পেলেন। ২৮ বছর আগে অরবিন্দ যেমন দেশে ফিরে প্রথমেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ পদ নিয়েছিলেন, চিত্তরঞ্জন তেমনি সুভাষকে সর্ব্ববিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ পদ দিলেন। অধ্যাপক হলেন হেমন্ত সরকার, সাবিত্রী চাটুজ্জে প্রভৃতি। কিন্তু এ নিয়ে তিনি খুসী হতে পারেন নি। কর্ম্মোন্মাদনার যুগে লেখাপড়া করতেও যেমন কোন ছেলে প্রস্তুত ছিল না, শান্ত ভাবে লেখাপড়া শেখাতেও কোন শিক্ষক প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময়ই বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনকে ন্যাশনাল মিলিশিয়া গড়বার জন্য চাপ দিতে থাকেন। অনুশীলনের পুলিন দাসকে ভার দেবার কথা হল। তিনি ইউনিফর্ম্ম ও হাতিয়ার চাইলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে হিংসা আর অহিংসার সে কি তর্ক! বাংলার বিপ্লবীদের যুক্তি তিনি

ভারতের সৌজন্যে

...র করতে অসমর্থ হয়ে হিমালয়ে প্রব্রজ্যা নেবার উদ্য...লেন। সুভাষ এই দলের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। ...আজাদী ফৌজ গড়বার যে কল্পনা ও সঙ্কল্প ২৩বছর আগে ...ষের মনে উপ্ত হয়—২৩ বছর পরে I. N. A. গঠনে ...র্থক হতে পেরেছিল। এ সময় থেকেই সুভাষের ...লড়াইএর ভাব প্রবল। এ সময় থেকেই তাঁর মাথায় ঢুকেছিল—"The Congress Offices are the forts where we have to entrench ourselves and whence we have to stir out every day in order to raid the Bureaucratic Citadels, Congress Committee are our army and no place of campaign, however skilfully devised,

can succeed unless we have a strong, efficient and disciplined army at our command."

—এ সময় থেকেই সুভাষের স্বপ্ন—

"I stand for an Independent Federl Republic. *That is the ultimate goal which I have before me...I want India to have her own flag*, her own navy, her own army and her own ambassadors in the capitals of free countries. Freedom is to me an end in itself... Verily did the Swami Vivek nand say—'Freedom is the Song of the Soul—Freedom is the real Amrita—The real nector—on this side of the grave."

'২১ সালে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন-রূপেই ইংরেজরা সুভাষকে গ্রেপ্তার করে ছ'মাস জেলে রাখে। এই গ্রেপ্তারের ঠিক ৭ বছর পর সুভাষচন্দ্র এই বাহিনী গঠন করবার আবার চেষ্টা করেন কংগ্রেসের ৪৩শ তম অধিবেশনের G. O. C. সেজে। এতে দেখেছি তাঁর মধ্যে আইরিশ প্রেরণা—তাঁর মাইকেল কলিন্স সাজবার চেষ্টা। যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা তখন তাঁর সঙ্গে সহযোগী। এ সময় সুভাষের এই আজাদী বাহিনীর ক্রিয়া-কলাপ সে সময়ের এক সাংবাদিকের ভাষায় সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

"...Before day break the footpaths along the route were lined with a patient crowd, every inch of the terraces, verandahs, balconies and windows were taken up by eager faces,—straining eyes were keenly waiting the hour and beautiful heads had once lifted the purdah to welcome the President of the Forty-third Session of the Indian National Congress. My be, but certainly they were gathered to welcome a greater thing, a thing of higher import and nobler national significance—the birth among a non-martial race of a keen desire for martial honours. Indeed, a new day was dawning for Bengal, a new tradition was sought to be created;—and th wave of hope and enthusiasm swept back th Purdah just as in olden days it would swee back the cold cruel veil when the conquerin heroes marched back in triumph at the hea *of victorious forces and balconies and case ments opened wide to rain down love an admiration*, to shower flowers and goo wishes. So they rained, so thay showere so they beamed forth joy and hope on th proud head of the General Officer Comman ding as he stood valiant in his commandin pose on tho motor car, the conquering he of the morning who had conquerd a people apathy and timidity to the sound of drum and trumpets. No, not an eye could igno him, not a camera could miss him. He sto mastery as a commander as the car crawl on, his sweeping hand only directing times like a general signalling an army action. He looked every inch a general—th air of self consciousness, the silent look self-assurance, and the apparent self-sati faction of a hero were there unmistak stamped on his face and figure...It wa sight—no, it was a vision,—a promise of future."

এ স্বপ্ন সার্থক করেছেন নেতাজী আর তাঁর আ হিন্দ বাহিনী। কিন্তু কি ভাবে অক্লান্ত বৈপ্লবিক কোলাহলের মধ্যে থেকেও তরুণের স্বপ্নকে বাস্তব করেছেন তা তাঁর মনোরাজ্যের ব্যাপার। বার সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে—তিনি নিরুৎসাহ হন আমরা নিরুৎসাহ হ'লে বন্ধু বলতেন—"The tragic element in our character is th we do not look ahead; we are upset by failures. We lack the dogged city of John Bull—and unlike him, not threfore fight a losing game."

✱

পোলের উপর এই মাঘ
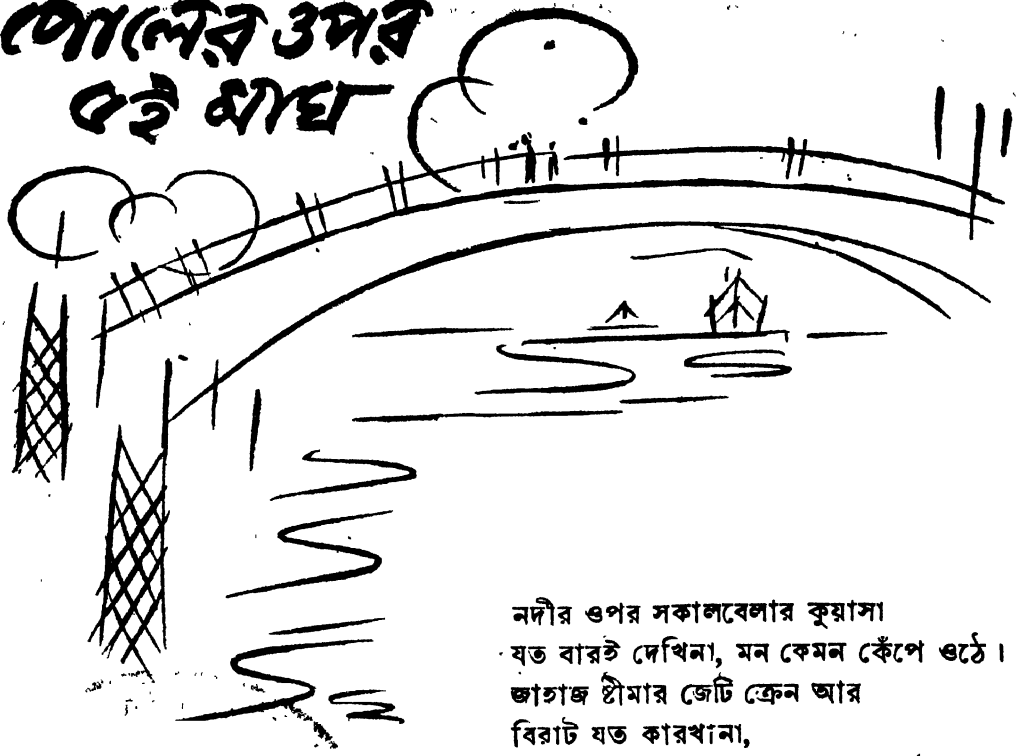
নদীর ওপর সকালবেলার কুয়াসা
যত বারই দেখিনা, মন কেমন কেঁপে ওঠে।
জাহাজ ষ্টীমার জেটি ক্রেন আর
বিরাট যত কারখানা,
নদীর ওপর হুমড়ে-পড়া আকাশ-কাটা শহর
মনে হয়, এই গেল মুছে,
জল-মাখান তুলির টানে কাঁচা ছবির মত।

কি আছে সেই ছবির তলায়,—একেবারে শাদা
ভাবীকালের কোন ভাবুকের
দিশাহারা রঙ্‌ না-লাগা ভাবনা,
মন বুঝি তা টের পেয়েছে একটু।

আমার ছায়া পড়ল না আজ
রোদ-লুকোন ভোরে
নতুন পোলের গায়ে;
এই আনন্দে তবু হ'লাম পার,
পাঁচুই মাঘের ঝাপ্‌সা তারিখ
ময়লা কাচের মত,
আমার বুকের হাই লেগে' ও
একটুখানি হবে পরিষ্কার,
আরেক অবাক্‌ নতুন ছবির জন্যে।

শুধু নয় সুন্দর অপ্সর-যৌবন
কম্পিত অধরের চম্পক-চুম্বন।
শুধু নয় কঙ্কণে ক্ষণে-ক্ষণে ঝংকার
আভরণহীনতার আবরণক্ষীণতার।
শুধু নয় তনিমার তন্ময় বন্ধন।
কিছু তার দ্বন্দ্ব, কিছু তার ছন্দ।

পুষ্পের নিশ্বাস, রেশমের শিহরণ,
রত্নের রক্তিমা, কনকের নিক্কণ।
গন্ধের বাণী নিয়ে পরশের সুরকার
অঙ্গের অঙ্গনে আনিলো যে-উপহার
সে তো শুধু বর্ণের নহে গীতগুঞ্জন।
কিছু তার স্বর্ণ, কিছু তার স্বপ্ন।

বিলসিত বলয়ের মত্ত আবর্তন,
মূর্ছিত রজনীর বিদ্যুৎ-নর্তন।
বিহ্বল বসনের চঞ্চল বীণাতার
উদ্বেল উল্লাসে আঁধারের ভাঙে দ্বার।
সে কি শুধু উদ্দাম উন্মাদ মন্থন।
কিছু তার সজ্জা, কিছু তার লজ্জা

শুধু নয় দু'জনের হৃদয়ের রঞ্জন,
নয়নের মন্ত্রণা, স্মরণের অঞ্জন।
রঙ্গিণী কবরীর গরবিণী কবিতার
জাদুকর-তির্যক ইঙ্গিত আনে যার,
সে কি শুধু দেহতটে তরঙ্গ-তর্পণ।
কিছু তার দৃশ্য, কিছু বা রহস্য।

এসো শুভ লগ্নের উন্মীল সমীরণ,
করো সেই মন্ত্রের মগ্নতা বিকীরণ
যার দান বিরহের অনিমেষ অভিসার
মিলনের ক্ষণিকার কণ্ঠের মণিহার,
সেথা বিজ্ঞানিকের বৃথা অনুবীক্ষণ।
কিছু তার জৈব, কিছু তার দৈব।

অমিয় চক্রবর্তী

তোমাকে দেবো না বেশি কিছু ভার
আমার ভালবাসার।
শুধু গান, শুধু বনপথে যেতে
ফুল তুলে দেবো চারু অলকেতে,
চঞ্চল মায়া কল্পনে গেঁথে
সাজাবো বাণীর হার।
নিয়ো তুমি যাহা সহজে কুলায়,
মাধুরীর রঙে ভাবনা দুলায়,
যা-কিছু তোমাকে ক্ষণিকে ভুলায়
রাখে না বেদন তা'র।
যাতে খুসী হও, শুধু তাই লও
এই খেলা দু'জনার॥

প্রাণে যদি মোর কিছু বেশি রয়
রেখো না তাহার ভয়।
গভীর আগুনে যদি রাখি জ্বেলে
ঘুমহারা প্রাণে শিখা দেয় মেলে,
স দাহ তোমা কাছে গেলে
হবে জেনো আলোময়।

এ-জীবন ভ'রে যে-মিলন খুঁজি,
যে-মানসে প্রিয়ে, তোরে প্রাণে পূজি',
হারানোর পারে যে-পাওয়াকে বুঝি,
তারি এই পরিচয়—
ভোরের আকাশে আলোর প্রকাশে
জাগরণ-বিনিময়।

মোর ভালোবাসা দেবে না বোধনে
কোনো ভার জেনো মনে।
দিনের শান্তি স্থির সন্ধ্যায়
তিমিরে তারায় যবে মিলে যায়,
দাঁড়াবো একাকী তব দরজায়
মিলনের সে লগনে।
চক্ষের জল—সে ভরা বুকের,
নয় নয় তাহা মর্ত্য দুখের,
চরম তিয়াষে মৌন মুখের
বাণী সে সুখের ধনে।
রবে তারি ভাতি চিরপথ-সাথী
দু'জনার এ জীবনে॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাত্রি,
আর অন্ধকার,
আর ভয়,
আকাশের বুক হ'তে বুকের আকাশে
অনন্ত নিঃশব্দ বিনিময় !
অচল ত্রিকালচক্র রথ।
ভরা ভাদ্র, মেঘান্ধ অমায়,
মৃতপ্রায় খুঁজিতেছি যে আমার মায়
সম্মুখে দক্ষিণে বামে,
হয়ত পশ্চাতে,
শুধু হাতড়াই;—
স্পর্শ নাহি পাই।
বিশ্বব্যাপী মহা-অবগুণ্ঠনের—
টেনে চলে জের—
একটানা ঝিল্লীধ্বনি।
দৃষ্টির পরিধি
চোখের তারার মাঝে হ'তেছে তন্ময়।
চিত্তমাঝে নিত্য ভয় মাগিছে আশ্রয়।
অসীমা এ অমা !—
সেই কি আমার মাতা
চির অন্বেষিতা নারী মহত্তমা ?

যার হিমস্নিগ্ধ বক্ষ আশ্রয় মাগিয়া
নিরাশ্রয় লেলিহ অঙ্গুলি
অন্ধকার ধরি' টানে
অনন্ত কাঁচুলি ?
স্তনন্ধয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর
যার স্তনবৃন্ত লাগি উন্মুখ কাতর ?
অঙ্গে অঙ্গে যে অঙ্গের আশ্বাস লাগিয়া
খুঁজিতেছি ভয়ে ভয়ে
আর অন্ধকারে,
আর রজনী জাগিয়া ?
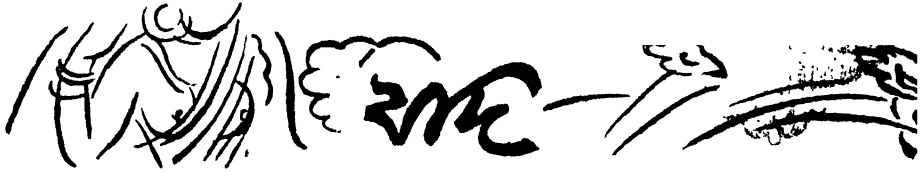
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার দিঠির দূতী যদি তব কাছে যায়, সখি,
তনুটি জড়ায়ে লয়ে মরমের আকুতি জানায়,
কানে কানে কহে কথা—অলিসম ফুলের কানায়
আকুল মিনতি তার সফল হবে না তবুও কি ?
মোর পানে পাঠাবে না সুচটুলা তোমার দূতীরে ?
উজল ডাগর চোখে একবার চাহিবে না ফিরে ?
যদি ফিরে চাও সখি, হেরি মোরে বিভল উতলা
ও রাঙা অধর হতে একটি পাঠাবে না কি লিপি ?
রঙীন আখরে লেখা সুগোপন হাসি টিপি-টিপি
আধেক সদয় মায়া, আধেক চপল ছলা-কলা।
যদি ভুল করে সখি একবার চাও হাসি মুখে,
সে হাসির লিপিটিরে যতনে রাখিব লিখি বুকে।
যদি হেসে কথা কও। যদি বা দাঁড়াও কাছে এসে
বসিয়া আমার পাশে কহ কথা—কি চাও পথিক !
যদি হাতে হাত রেখে দাও মধু-পরশ ক্ষণিক
যদি করুণার সাথে একটু মমতা এসে মেশে !

যদি—যদি—আঁখি মোর কেঁদে কয়, হায় যদি—যদি
তোমার আমার মাঝে না বহিত এই খর নদী।

জ্বলন্ত তলোয়ার

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বাঁকা বিদ্যুৎ বিদীর্ণ মেঘে মেঘে
ঝলসি উঠিছে দিক্-দিগন্ত ঘেরি'
সেই দুর্য্যোগে ঘন ঘন ফুৎকারে
কাহার কণ্ঠে নিনাদিত রণভেরী ?

তারি সাথে সাথে দূরে,—অদৃশ্য হ'তে
চমকিয়া ওঠে জ্বলন্ত তলোয়ার
শত্রু-আগল এখনি ভাঙিবে বুঝি
দুর্দ্দম বেগে ছুটে চলে আসোয়ার।

ঘন অরণ্য গিরি-গুহাতল ব্যাপি'
মুক্তি-সেনার আনন্দ-কোলাহলে
পথের দু'ধারে গৃহ-দ্বার খুলি যায়
নর-নারী শিশু ছুটে আসে দলে দলে।

কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত লক্ষ সেনা
তুলিল শঙ্কাহরণ জয়-ধ্বনি
মুক্তি-সাধন জীবন-মরণ পণে
লুটায় জীবন পরম ভাগ্য গণি'।

পায়ে পায়ে চলে আনন্দে গান গাহি'
জীবনে জীবনে সুপ্রচুর প্রাণধারা
দৃঢ় হস্তের প্রচণ্ড অভিঘাতে
এবার ভাঙিবে রুদ্ধ পাষাণ-কারা।

শিরায় শিরায় রক্তের দোলা লাগে
অধীর আবেগে চঞ্চল তার গতি,
নয়নে নয়নে মৃত্যুর লাল নেশা
জাগিল অযুত লক্ষ অভয়-ব্রতী।

জাগিল হেথায় মুক্তির ঝন্‌ঝনা
বন্দিশালার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে
হোথা চলে তারি মরণ-মহোৎসব
অজ্ঞাত পথে, পর্ব্বতে জঙ্গলে।

দূরে বহু দূরে সিন্ধুর পরপারে
নদ-নদী বন ভূখণ্ড ছাড়াইয়া
লঙ্ঘিয়া শত পর্ব্বত, সম্মুখে
মা আমার আছে দুই বাহু বাড়াইয়া।

আমার জননী আমার জন্মভূমি
সকল স্বর্গ হ'তে তুমি গরীয়সী।
মম যৌবন-নিকুঞ্জ তব বনে
তোমার মাটিতে মৃত্যুর বারাণসী।

আত্মীয় আজ ডাকিছে আকুল হয়ে
ডাকে রাজপথ, ডাকিতেছে রাজধানী
রক্তের টানে রক্ত নাচিয়া ওঠে
অন্তরে শুনি মা'র আহ্বান-বাণী।

সমুখে রয়েছে সুদীর্ঘ ওই পথ
সে-পথ রচিত বহু সহীদের খুনে
সে পথের ধূলি চিরপবিত্র আজি
মাতৃপূজার অমোঘ মন্ত্র-গুণে।

তারা চলে এল নির্ভীক মহাবীর !
মুক্তির পথ সঙ্কট ক্ষুরধার।
জানো কি তাদের পথের দিশারী হয়ে
সম্মুখে এল জ্বলন্ত তলোয়ার ?

তাহারি আলোকে এখনো আকাশ জ্বলে
এখনো পৃথিবী তাহারে করিছে নতি,
বাঁকা বিদ্যুতে ঘসা সুতীক্ষ্ণ ধার
ঘোর দুর্য্যোগে দুর্জ্জয় তার গতি।

থামেনি থামেনি এখনো থামেনি তার
জয়-যাত্রার অপূর্ব্ব অভিযান.
বন্ধ হয়নি প্রহরে প্রহরে পূজা
মা'র মন্দিরে সহস্র বলিদান।

এখনো পূজার থালা ভরে' আছে ফুলে,
আছে চন্দন আছে ধূপ-দীপ-জ্বালা,
অভয় মন্ত্রী সন্ন্যাসী জপিতেছে
অরণ্যে বসি রুদ্রাক্ষের মালা।

যদিও রাত্রি আঁধারে ভয়ঙ্করী,
তবুও রাত্রি এখনি প্রভাত হবে ;
তিমির বিদারি উষার আলোকছটা
দিগ্-দিগন্তে কেন দেখা যায় তবে ?

শেষ আহুতির লগ্ন যায়নি বয়ে ;
তপস্যারত যোগাসনে কাপালিক !
তাঁহারি স্পর্শ পাই যে বুকের মাঝে,
তাঁহারি মন্ত্রে মুখরিত চারিদিক্।

আকাশে বাতাসে তাঁরি আহ্বান জাগে !
সূর্য্যকিরণে জ্বলন্ত তলোয়ার
ঝলসি উঠিবে, আবার আচম্বিতে
দুর্গম পথযাত্রীরা হুঁসিয়ার !

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আমাদের জীবনের সব কথা যায় নাকো বলা
সোজা-বাঁকা অলি-গলি নানা পথে আমাদের চলা
যে কথা ভাষায় বলি মনের আসল কথা চেপে
বিচারেতে নির্ভুল সুবিধার নিক্তিতে মেপে
স্বাক্ষর দিতে তাই বার বার হাত ওঠে কেঁপে।

*

গুরুবাদী মন বলে শোন্ শোন্ গুরু বিনে নেই মুক্তি,
মায়াময় ইহ খলু সংসার রজতের ভ্রম শুক্তি॥

*

স্বপ্ন যাদের অন্তরাগ
ঢুলু ঢুলু আঁখি রাঙা মেঘে
জেগে থেকে যারা ঘুমে মগন
ঘুম তাদের ভাঙাবে কে ?

*

যে দেশের চতুষ্পদও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রাদ্ধের বাসরে
'সকলি খল্বিদং ব্রহ্ম' এ-সত্য কে অপলাপ করে ?

*

খেতাপ টেতাপ থাকলে পরে
কেতাব লেখায় সুখ,
ছাপমারা বাঘ আঁচড়ে চলে
দেশের নরম বুক॥

*

ভুজঙ্গের শিরে মণি, দন্তে তার বিষাক্ত মরণ
রূপসীর রূপে মায়া, প্রেমে তার দুঃখ অগণন॥

*

হাই তুলে তুড়ি মেরে, 'জীবতু শতং'!
বৃদ্ধেরা শুভাশীষে করেছে খতম্,
আমাদের জীবনের ইহ-পরকাল
যমের অরুচি হ'য়ে সন্ধ্যা সকাল
বুদ্ধির বোঝা বয় এ পোড়া কপাল।

*

সংস্কার না কি অপরিবর্ত্তনায়—
প্রাণ-পুরুষের প্রাক্তন প্রহেলিকা ?
মন বলে দেখে নিও
অভ্যাসে চলে আবহমানের অনাদি গড্ডলিকা!

*

ঝড়ে পড়ে গেছে পোড়ো-বাড়ী আর ভাঙা-দেয়াল
জীর্ণ প্রাসাদ ঘুণধরা মাচা খড়ের চাল,
শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে গিয়েছে প্রপিতামহিক অশথ বট,
বানে ভেসে গেছে বন্দর-জেটি পলিতে ঢেকেছে
নদীর তট।
বাপ-পিতামোর উড়ে গেছে ভিটে থালা ঘটি
বাটি অস্থাবর
ওড়েনি কেবল পায়ে-চলা পথ, উড়ে গেছে শুধু
ধূলি-কাঁকর॥

*

আকাশে অদৃশ্য ঝড়। অরণ্য চঞ্চল
উদ্বেলিত প্রাণ-সিন্ধু। হে নাবিক মন
কোটি বক্ষে গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন
নির্ভয়ে ঘোষণা করে বলিষ্ঠ জীবন
হেলায় লঙ্ঘন কোরে কালো বন্যাজল॥
জীবনের বার্ত্তাবহ নির্ভীক কাণ্ডারী
হে ঝড়, হে বিপ্লবের মত্ত প্রভঞ্জন,
সাম্রাজ্যের স্তম্ভ যতো দক্ষিণ-দুয়ারী
বজ্রাঘাতে করো তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন।

*

পোড়ো জমি ঝরাপাতা বুনো ঝোপ-ঝাড়
ভাঙা-বাড়ী পড়ে আছে মরা নিঃসাড়
কড়ি-কাঠে দোল খায় চাম্‌চিকেরা
থমথমে অতীতের স্বপ্ন-ঘেরা।
কত ঘৃণা, কত প্রেম, কত বিদ্বেষ
বালিখসা পাঁচিলেতে নেই স্মৃতি-লেশ।

*

মেকি-সমাজের শেষ দিন সমাগত
প্রাচীনা পৃথ্বী ভস্ম-বিমণ্ডিতা,
শাসিতের রোষ সমাজে পুঞ্জীভূত
শাসকের তাই জ্বেলেছে ধ্বংস চিতা।

*

ইট-পাথরের গাঁথ্‌নি ফুঁড়ে
অশথ-চারা ভিত্তি জুড়ে
লক্ষ শেকড় চালিয়ে কাটায় বিশাল অট্টালিকা,
সূর্য্যালোকে বৃষ্টিধারায়
মাতন লাগে সবুজ চারায়
ছোট্ট কচি পাতায় কাঁপে শ্যামল রুদ্র-শিখা।

*

দেখেছি স্পর্দ্ধা ছ'কান কাটার
হবু গার্জেন আধুনিকতার
প্রগতির পথে ঘৃণ্য কাঁটার দেখেছি খচ্‌খচানি।
কয়েক বছর কাগজ চালিয়ে
পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙিয়ে
আভিজাত্যের আসর জাঁকিয়ে কথার কচ্‌কচানি।
অতিবুদ্ধির বহর দেখেছি সম্পাদকীয় স্তম্ভে
আত্ম-গরিমা প্রচারের মোহে দেখেছি
ফাট্‌তে দম্ভে।

*

শুধু লেখা চলবে না বাহুবল চাই
চাই কূটবুদ্ধিতে খেলোয়াড় মাথা,
বাজে ব'কে ক্লান্তিতে শুধু ওঠে হাই
বুক্‌নিতে ভরে যায় কেতাবের পাতা।

*

সরস্বতি, ক্ষমা করো কলম এবার খড়্গা,
চাই না তোমার কমলবনে শ্বেত-পাপড়ির স্বর্গ
কাব্যি করার দিন গিয়েছে ধুঁকছে গুষ্ঠীবর্গ ॥

সরস্বতি ক্ষিধের জ্বালায় কণ্ঠাগত আত্মা
স্বদেশ জুড়ে অত্যাচারের বইছে ঘূর্ণিবাত্যা
ছিন্ন-বীণায় সুর বাজে না, নেই মরালের পাত্তা।

*

পতঙ্গ-পিঁপ্‌ড়েরা মরে লাখে লাখ
পায়ে পিষে, বাজে তবু অহিংস-ঢাক
হুজুগে চেলার দল স্বরাজ-চড়কে
বছুরে গাজন গায় জাতের মড়কে ॥

*

আদিরস খেয়ে নেড়া বোষ্টম
আদিগঙ্গার পাঁকে
নাকে হাড়িকাঠ আঁকে
চণ্ডীদাসের পিণ্ডি পাকায়
টিকি উড়াইয়া টাকে ॥

*

পাষাণে জাগে না প্রাণ, পাষাণ কি জাগে
কোনো কালে?
দাসত্বের ক্ষতচিহ্ন শত শত ভক্তের কপালে
যুগ যুগ আঁকা থাকে। উদাসীন স্তব্ধ ভগবান
হতভাগ্য পুজারীর কোনো কালে রাখে না সন্ধান।

*

নিরাশা, ক্লান্তি, পরাজিত মনোভাব,
নরকের কালো-সিঁড়িতে এরাই ধাপ;
এরাই শত্রু জীবনের সংগ্রামে
বাধা দেয় নিতি দক্ষিণে আর বামে,
উদাসী মনের সীমাহীন বালুচরে
এরা চিরদিন প্রেতের নৃত্য করে ॥

*

সমুদ্র দিয়েছে ডাক ভাসালাম তরী
ওপারে যেতেই হ'বে বাঁচি আর মরি;
উচ্চ শিরে শক্ত ক'রে ধরে রাখি হাল
রাত্রি এলে দুঃসাহস জ্বালাবে মশাল।

★

ছোটো বড়ো

(রস-রচনা)

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

নামাবলী-গায়ে ভট্‌চায্‌-গিন্নি স্নানাহ্নিক সেরে নদীর ঘাট থেকে উঠ্‌লেন। 'নাঃ আর জাত-জন্ম কিছু রইলো না।' বিরক্তির সঙ্গে বলতে বলতে এঁকে বেঁকে চল্‌লেন—কোনওরূপে যেন অপবিত্রতার ছোঁয়াচ পায়ে না লাগে! তাঁর বিরক্তির কারণ, ছোট লোকের ছেলে-মেয়েরা শুধু নদীর জল অপবিত্র করছে, তা নয়, তাঁর মত ব্রাহ্মণ-বিধবার গায়ে জল ছিট্‌কে দিতেও কুণ্ঠিত হচ্চে না। 'মরবে, মরবে,—ব্রাহ্মণের শাপে উচ্ছন্ন যাবে সব।'

কিন্তু দেখা গেল কেউ মরলো না। ব্রাহ্মণীর নিষ্ফল ক্রোধ শুধু তাঁকেই দগ্ধ করতে লাগলো। 'হায়, হায়, বড়োর দিন গত হয়েছে, এখন ছোটোর আস্পর্দ্ধা ক্রমেই বাড়ছে।' ব্রাহ্মণী চিন্তা করে' শেষটা এমনিতর একটা সিদ্ধান্তে গিয়ে হাজির হলেন।

কে বড়ো? কে ছোটো? চেনবার জো নেই। ছেলেবেলায় পড়া গিয়েছিল, 'বড়ো যদি হতে চাও, ছোটো হও তবে।' সে চেষ্টাও করা গেল। কিন্তু বড়ো হওয়া যত সোজা, ছোটো হওয়া ঠিক তত সোজা নয়। লেখাপড়া শিখে, নামের সঙ্গে দুই-একটা লেজুড় জুড়ে', নত হয়ে', অশিক্ষিত ব্রাদারদের মধ্যে মিশ্‌তে গেলাম। কিন্তু সে হলো তেলে-জলে মেশা। মিশ্‌তে হয় কেমন করে সে বিদ্যেটাই শেখা হয়নি যে! লেখাপড়া রইলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে', ইতর লোক গেল সব সরে।
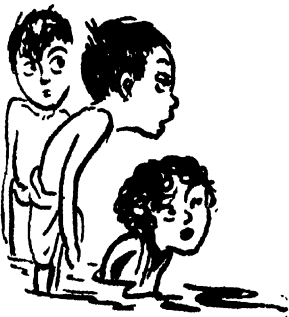
টাকা রোজগার করা গেল, ব্যবসা ফেঁদে বস্‌লাম। কিন্তু গোলমাল বেধে গেল কারিকরদের সঙ্গে। টাকা আমার, কারখানা আমার, আমারই চাকর সব, কিন্তু আমাকে তুড়ে' দিয়ে তারাই হয়ে বস্‌তে চায় মালিক! আমি কিছু না? সুতরাং ছোটোর সঙ্গে আর কোন মতেই এঁটে ওঠা গেল না। সংসারে থেকে আর সুখ নেই। বিশ্বময় চলেছে এই ছোটোদের জুলুম। এর মানে, বিশ্বামিত্র ঋষি বলে গেছেন—ছোটো হবে বড়ো আর বড়ো যাবে তাদের পায়ের তলায়। কিন্তু বাড়াবাড়িটা কিছু অতিরিক্ত বলেই বোধ হচ্চে না? বিশ্বামিত্র মশায়ও বোধ হয় এতটা প্রত্যাশা করেননি।

রাজাই রাজ্য শাসন করেন, এই কথাই শাস্ত্রে বলে। কিন্তু আজ একি কাণ্ড দেখছি? ঘোর কলি, ঘোর কলি! রাজাকে দিল ফুঁয়ে উড়িয়ে, আর প্রজারা বস্‌লো রাজার তক্তে! রাজা যদি ছোটোদের না মানেন, তবে কোন দিন নিজের মুণ্ডুটাই উড়ে যাবে।

কিন্তু কথা হচ্চে, কোথায় গিয়ে এর শেষ? আজ চার্চিলের মাথায় টোপর, কাল অ্যাটলির মাথায়। আজ হিট্‌লার, কাল? আজ হিরোহিটো কাল আবার কে হবে? হিরোহিটোর মিলিটারী পোষাক বাতিল হয়েছে,—এরা কৌপীন পরিয়ে ছাড়বে না ত? নিঃস্ব নিঃসহায় বাঙালীর ধুরন্ধর ছেলে ব্রিটিশ-সিংহের দাঁত গুণ্‌তে স্পর্দ্ধা করেছিল। বলিহারি যাই! ছোটো আর ছোটো রইলো কোথায়? যারা হিল্লি দিল্লী পর্য্যন্ত ছুটতে চায়, লাল কেল্লা ফতে করতে চায়, বলি, তারা কি ছোটো না বড়ো? ইতিহাস যা বলে বলুক। কিন্তু আমার মতো ক্ষুদ্র লোকের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন উপায় নেই। সব হিসাব, সব ধারণা ওলট-পালোট করে দিলে গা। ভেতো বাঙ্গালী, ভীতু বাঙালী, চিরকেলে গরীব বাঙ্গালী আজ বিশ্বের সেরা! হায় রে হায়! শাস্ত্র পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল বাঙ্গালীর ছেলের কাছে!

ছোটোরই জয়-জয়কার—একথা না বলে' উপায় নেই। বড়ো বড়ো কামান, আট হাজার পাউণ্ডার বোমা, উড়ো জাহাজ, ভীষণ ৪৫ হাজার টন্ রণতরী—সব গেল তল, আর অ্যাটম্ তাক্ লাগিয়ে দিলে! আমি বিজ্ঞানের ধার ধারিনে কিন্তু এটুকু জানি যে পরমাণুর মতো ছোটো জিনিষ কিছু নেই। সেই পরমাণুরই প্রতাপ হলো সব চেয়ে
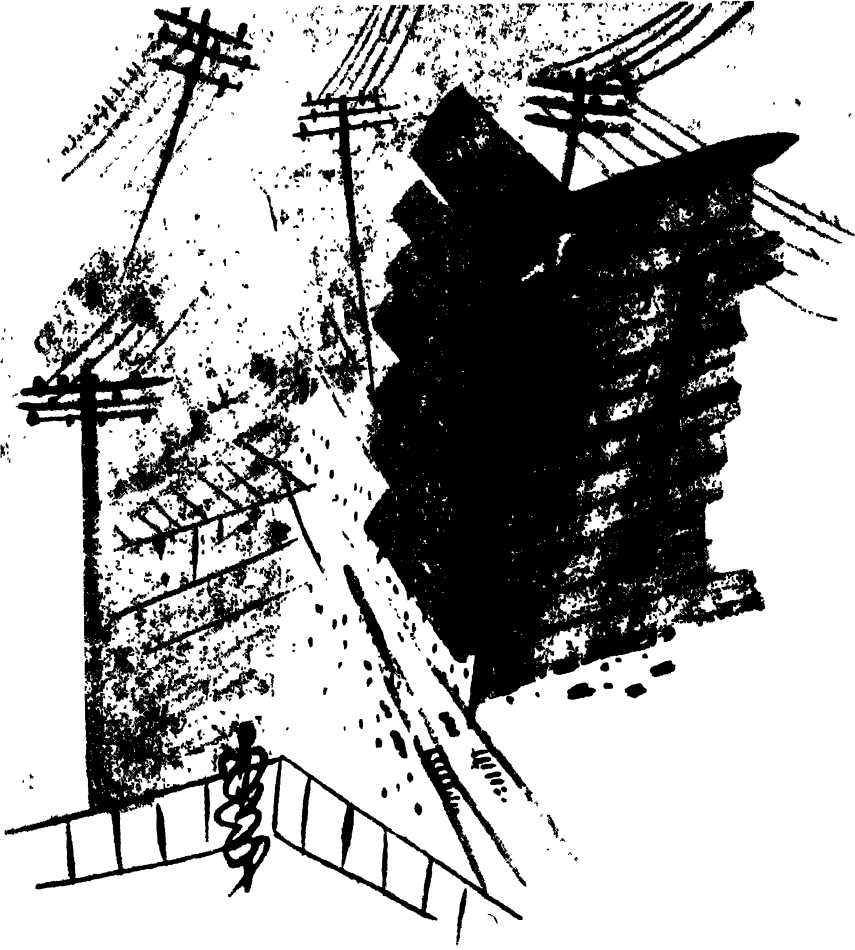
বড়বাজার

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

বেশী? এর চেয়ে ভেল্‌কী বোধ হয় কোনও যাদুকরও কল্পনা করতে পারেনি! আপনারাই বলুন তো, যে পরমাণু চর্মচক্ষে দেখা যায় না, যে পরমাণু একেবারে অবিভাজ্য, সে-ই পরমাণু ফাট্‌লো আর লক্ষ লক্ষ লোকের কপাল ভেঙে চুরমার হলো? এ কেমন কথা? অবশ্য এ পরমাণু ফাটাতে অনেক কাঠ-খড় লাগে। এইটুকুই বিধাতা যা একটু সুরাহা করে' রেখেছেন। কিন্তু তাও বা কত দিন? পারমাণবিক বোমা তৈরী হতে কতক্ষণ? পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক শকুনিগুলির দৃষ্টি যখন এদিকে পড়েছে তখন অতি সুলভে আণবিক বোমা তৈরী হতে কতক্ষণ?

ছোটোর চেয়েও যে ছোটো, অণুর চেয়েও অণু—পরম অণু, তার প্রতাপে আজ সমস্ত রাজশক্তি থরহরি কম্পিত। কি জানি, কার হাতে এই মৃত্যুবাণ কবে পড়বে আর সে সর্ব্বনাশ করে' ছাড়বে। যুদ্ধে আর চতুরঙ্গ সৈন্য চাই না, গোলাগুলি বারুদ চাই না, রণদ যান-বাহনেরও কি দরকার? পরমাণু ফাটাও আর 'বিজয়শ্চ হস্তে।' যুদ্ধ আমরা জিতেছি বটে, কিন্তু কি দুরন্ত পণে! চারি দিক্ থেকে পরমাণুর বিভীষিকা এসে আমাদের শান্তির চিন্তা দিচ্ছে দিক্-চক্রবালের বাইরে তাড়িয়ে।

জয় বাবু বল্‌লেন—ওঁর পুরো নামটা কি জানিনে জয়-গোবিন্দ না জয়রাম না জয়হিন্দ্ এমনি একটা কিছু হবে—

বল্‌লেন—এ আর বুঝলে না ভায়া, হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি আর কি! যত কম অষুধ তত তার দুরন্ত শক্তি! জয় বাবু মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি করেন। নাঃ, হোমিওপ্যাথিতে আর বিশ্বাস না করলে চল্‌ছে না। বিধাতা এত জিনিষ থাক্‌তে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের মধ্যে এত শক্তি, এত মারাত্মক প্রতাপ লুকিয়ে রেখেছেন, তাই ভেবে অবাক্ হয়ে যাই।

অতএব ছোটোকেই নমস্কার করো। বড়োর আর জাত-জন্ম রইলো না—ভট্‌চায-গিন্নি ঠিকই বলেছিলেন।

কোরিয়া সম্বন্ধে কোন দিন বিদেশীরা বিশেষ কিছু জানতে পারেনি। কারণ জাপানী সেন্সর। কোন কোরিয়াবাসী, যাকে জাপানীরা বিপজ্জনক মনে করে অর্থাৎ যার সম্বন্ধে তারা সন্দিহান, হয়ত দেশের প্রকৃত কথা বাহিরের লোককে বলে দেবে, তাকে দেশ থেকে বেরোতে দিত না। বাহিরে যাবার চেষ্টা করলে জেলে পুরে ফেলা হত। আর চিঠি, সে তো ছিঁড়েই ফেলা হত। তাই বাইরের লোক ভেতরের কথা কিছুই জানতে পারত না।

বিদেশ থেকে কোন ব্যক্তি জাপান ভ্রমণে গেলে জাপানী টুরিষ্ট ব্যুরো তাদের নিয়ে জাপানের সর্ব্বত্র বেড়াতে যেত। কিন্তু ভ্রমণের লিষ্টে কোরিয়া বাদ দেওয়া হত। যদি কোন নাছোড়বান্দা একান্ত জেদ ধরত কোরিয়া দেখবেই, তবে তারাই সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কোরিয়ার বন্দর ফুসানে নেমে, ব্যুরোর লোকের সঙ্গে ভ্রাম্যমানরা এক চমৎকার ট্রেণে চেপে উঠল গিয়ে কোরিয়ার রাজধানী শিওলে। শিওলের জাপানী নাম কেইজো। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল বিখ্যাত চোজেন হোটেলে। আধুনিক হোটেল। বড়লোকদের ব্যাপার। নরম কার্পেট-পাতা মেজে। চমৎকার খাওয়াদাওয়া। অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত। ঘরের দেওয়ালে কোরিয়ার বিখ্যাত দৃশ্যাবলীর ছবি, প্যারিস সালোঁয় শিক্ষিত জাপানী শিল্পীর আঁকা। লাইব্রেরী ঘরে তারা পড়তে পেল সব কাগজ, মাসিক পত্রিকা। কেবল কোরিয়া দেশের কোন-কিছু পড়ার টেবিলে পেল না। সিনেমা, থিয়েটার, নাচঘর, আর সবই মনোমুগ্ধকর। ভ্রাম্যমানের মন কোরিয়ার প্রতি প্রসন্ন হয়ে গেল। মনে বদ্ধমূল ধারণা, এরা দিব্য সুখে আছে। যে কোরিয়া বঞ্চিত, নিপীড়িত, [illegible] যেখানে অশান্তি ওতপ্রোত, সেখানকার খবর বাইরের লোকে পাচ্ছে শান্তির আলয়। তাদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কোন খবরই কেউ পায় না।

জাপান থেকে কোরিয়ার দূরত্ব প্রায় ১১০ মাইল। পাহাড়ে পরিপূর্ণ এই দেশ। এক জন ভৌগোলিক বলেছেন, "কোরিয়ার সব পাহাড় ভেঙ্গে সমতল করলে গোটা পৃথিবীকেই ঢেকে দেবে।" এই সকল পাহাড় সৌন্দর্য্য ও সম্পদে ভরা। পাহাড়ের গর্ভে প্রচুর সোণা। আর পাওয়া যায় কয়লা (অ্যানথ্রাসাইট), লোহা, রূপা, তামা আর সীসা। কোরিয়ার বহু খনিজ জাপানে চালান দেওয়া হয়, বিশেষ করে এলুমিনিয়াম। কোরিয়ার মাটি খুব উর্ব্বর। প্রচুর শাক-সব্জী ও গম, বাজরা ইত্যাদি জন্মায়। তা ছাড়া আপেল, আঙুর ইত্যাদি ফলও হয়। জাপানী কৃষিবিদ্‌রা উর্ব্বর মাটিতে বৈজ্ঞানিক সার ও চাষের ব্যবস্থা করে ফল-ফুলের প্রাচুর্য্যে দেশটাকে ছেয়ে দিয়েছে। কোরিয়ার মাটিতে কোরিয়াবাসীর পরিশ্রম এই প্রাচুর্য্য—জাপানীর খাদ্যসম্ভার। অথচ সেই দেশের লোকেরা মরছে না খেয়ে। পরাধীন দেশের এই অবস্থাই হয়। যার ফলে সুজলা সুফলা বাঙ্গালা দেশে হয় দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী। বাইরের লোক কোন সংবাদই পায় না। যতটুকু পায় তা অনেক পরিবর্ত্তনের পর, অতি মোলায়েমরূপে।

আবহাওয়াও চমৎকার, সুখপ্রদ। মেঘমুক্ত রৌদ্র, সমুদ্রের হাওয়া। বৃষ্টি খুবই কম। দিনের পর দিন মেঘে ঢাকা আকাশ, অবিশ্রান্ত বারিধারা, কাদায় প্যাচপ্যাচে পথ-ঘাট, এ-রকমটা সেখানে

পাগলের চিকিৎসা

খুব কমই হয়। ঘণ্টা দু'য়েক বৃষ্টিপাতের পরেই রৌদ্রের আলোক, এইটাই বেশী। শীতও যা পড়ে, তা খুব বেশী কন্‌কনে, হাড়ভাঙ্গা নয়। তাই কোরিয়ায় অনেক রকমের রঙ-বেরঙের পাখী আছে। পাহাড়ী এলাকায় বিরাট বিরাট বাঘ। আর তাদের কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সোজা সহরে ঢুকে এসে মানুষ, ভেড়া, গরু—যাকে পেত নিয়ে চলে যেত।

বাঘের চেয়ে ভয়াবহ হ'ল জঙ্গলী শুকর। কি গোঁ। ভয়-ডর কিছুই মানে না। অনেক রকমের হরিণও আছে সেখানে। নেকড়ে, শেয়ালেরও বিলক্ষণ উপদ্রব। তা ছাড়া উত্তরে 'চ্যাং পাইশান' (চিরশুভ্র পর্ব্বত) অঞ্চলে প্রায় শাদা একরকম ভল্লুক থাকে। কোরিয়ান ভল্লুক নামে বিখ্যাত। বছরে বারো মাসের মধ্যে দশ মাস ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়।

কোরিয়ানরা দরিদ্র হলেও সুসভ্য। পূর্ব্বপুরুষ বোধ হয় মঙ্গোলিয়ান। কিন্তু সাধারণ মঙ্গোলিয়ানদের চেয়ে তারা লম্বা, শক্তিশালী, এবং দেখতেও ভাল। রং ফরসা, শীত নয় আর মুখের গড়নও পরিষ্কার। কোরিয়ান মেয়েরা চীনা অথবা জাপানী মেয়েদের চেয়ে দেখতেও অনেক ভালো।

জাপানীরা কোট প্যাণ্ট, কলার, টাই সবই ব্যবহার করে। কিন্তু কোরিয়ানরা ছোট শাদা জ্যাকেটের ওপর লম্বা শাদা আলখাল্লা পরে। সালোয়ারের মত ফাঁপানো পা-জামা পায়ের গোছের কাছটা বাঁধা, কোমরে ফিতে বাঁধা, শাদা অথবা নীল রঙের। শাদা রঙটাই ওদের প্রিয়। বোতাম একেবারেই ব্যবহার করে না। আগে পকেটও ছিল না। অনেক কোরিয়ান খৃষ্টান হয়ে বাইবেল রাখবার জন্য আলখাল্লায় পকেট করেছিল। আজও কোরিয়ানদের জামার পকেটের নাম 'বাইবেল পকেট'।

কোরিয়ানদের জাতীয় পোষাকের রঙ শুভ্র। এই রঙই আবার শোকের রঙ। রাজবংশের কোন ব্যক্তি মারা গেলে প্রত্যেক কোরিয়ানকে তিন বছর শোকসূচক শাদা রঙের পোষাক পরতে হবে। তিন বছর কাটবার আগেই যদি আবার কেউ মারা যায়, তবে আবার তিন বছর শোক চলবে। একবার রাজবংশের লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি মরতে লাগল। আর দেশবাসীরাও শোক প্রকাশ করতে লাগল শাদা পোষাক পরে। এক জনের পর এক জন মরতে থাকে, বেচারারা আর শাদা পোষাক ছাড়তে পারে না। ফলে সেই পোষাকই তারা পরতে থাকল দিনের পর দিন, আর সেই শাদা রঙের পোষাকই হয়ে দাঁড়াল জাতীয় পোষাক। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অবশ্য রঙীন আলখাল্লা (কিমোনো) পরে। পকেটের অভাবে বেচারারা বড় মুস্কিলে পড়ে যায়।

শুভ্র বেশ-পরিহিত সন্ন্যাসীর মত চেহারা কোরিয়ানদের। মাথায় লোমের টুপী। আজ-কাল অবশ্য এ টুপী চলছে না। এই টুপীর বুনানী এতই ফাঁক ফাঁক যে, টুপীর ভেতর দিয়ে মাথার ওপরের ছোট খোঁপা পর্য্যন্ত দেখা যায়। বিবাহিত পুরুষ মাত্রেরই মাথায় এই রকম খোঁপা থাকে। অবিবাহিত পুরুষের চুল আঁচড়ান, খোঁপা নেই। কিন্তু তার আশী বছর বয়স হলেও সে নাবালক। তার কথার অথবা মতামতের কোন দামই নেই। যাহাতক বিয়ে হল, ব্যস। চুল ওপরে উঠে গেল। মাথায় খোঁপা হ'ল। লোকে তাকে মান্য করতে লাগল। মাথার ওপরের খোঁপাটাই হল বুদ্ধির মাপকাঠি।

সময় কাটে কাপড় কেচে

গ্রামে এই প্রথাই এখনও চলে আসছে। অবশ্য সহরের এখন অনেকে পশ্চিমী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। পুরুষেরা চুল ছাঁটছে, টেরী কাটছে। কোট-প্যাণ্টও পড়ছে।

মেয়েদের পোষাক অনেকটা পুরো হাতওয়ালা ব্লাউজের ওপর পায়ের গোছের তলা পর্য্যন্ত ঝোলানো সায়ার মত। পায়ের গোছ কিছুতেই বার করা চলবে না।

মেয়েদের বেশ কম বয়সেই বিয়ে হয় এবং তারা বেশ সুগৃহিণী হয়। বিবাহিত জীবনের অনেকটা সময় কাপড় পিটে পিটে ময়লা ছাড়াতে লেগে যায়। ইস্ত্রী করা হয় পাথরের ওপর পাট করে রেখে ছুটো লোহার গদা দিয়ে পিটে। ভাল ভাবে পিটতে পারলে, চমৎকার ইস্ত্রী আর চমক হয়।

কোরিয়ানদের সংসার সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে তাদের বাড়ীতে থাকতে হয়। বাড়ী মাটির এবং চাল খড়ের। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। বড় বড় জার (Jar) সাজানো। মানুষের চেয়ে উঁচু। তার মধ্যে শীতের খাবার (কিমচি) জমা থাকে। 'কিমচি' মানে চীনা বাঁধাকপি, মাছ, পেয়াজ, রসুন এবং লাল লঙ্কা একত্রিত। কোরিয়ানদের এটা বেশ মুখরোচক খাবার, কিন্তু বিদেশীরা খেলে একেবারে মারা যাবে।

বাড়ীতে ঢোকবার সময় মাথা নীচু করে চৌকাঠে পা না দিয়ে ডিঙিয়ে ঢুকতে হয়। তারা বলে প্রত্যেক বাড়ীতে দেবতা থাকেন। সদরের চৌকাঠ সেই দেবতার গলা। পা লাগলে ভয়ানক পাপ হয়। সংসারের অমঙ্গল এবং অনিষ্ট হতে পারে।

বাড়ীতে সবাই মেঝেয় বসে। চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করে না।

কোরিয়ার জাতীয় পোষাক শুভ্র

বৌদ্ধ পুরোহিত

মেজেটা কিন্তু সর্ব্বদাই গরম—ঘরের হাওয়াও। কোরিয়া ভারী ঠাণ্ডা দেশ। ওরা ঘরকে গরম রাখার জন্য বেশ চমৎকার ব্যবস্থা করেছে। রান্নাঘরে রান্না চলছে, আর সেখানকার গরম হাওয়া এবং ধোঁয়া চালান করে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক ঘরের মেজের তলায়। মাটি থেকে মেজেটা প্রায় এক ফুট উঁচু। তলায় গরম হাওয়া যাবার পাইপ থাকে। মেজে তৈরী করা হয় ছোট ছোট পাথরের টুকরো (slab) দিয়ে। প্রত্যেক জোড়ে সিমেণ্ট লাগান। ধোঁয়া আর ঘরের মধ্যে ঢুকতে পায় না। আর পাথর চট করে গরমও হয়ে ওঠে! মেজেতে বেশ মোটা অয়েল-পেপার দিয়ে মোড়া, তার ওপর আবার কারুকার্য্য করা। অনেকটা পাতলা কার্পেটের মত। ধোয়া-পোঁছাও চলে। শোয়া-বসারও অনেক সুবিধা। দেওয়াল কাঠের। তাতে চায়নীজ স্ক্রল টাঙ্গানো। রঙ-বেরঙের ওয়াল-পেপার। ভারী পরিষ্কার তাদের ঘর। জানলায় কাচের বদলে ওয়াল-পেপার দেওয়া। আলো আসে বটে কিন্তু কিছু দেখা যায় না।

কোরিয়ায় কাচের জিনিষ দেখতেই পাওয়া যায় না। এক টুকরো বোতলভাঙ্গা কাচের টুকরো পেলেই তারা খুশী। অমনি জানলার কাগজে একটা ফুটো করে লাগিয়ে দেবে। ছেলে-বুড়ো সকলে সেই কাচের মধ্যে দিয়ে কত বার বাইরের জগৎ দেখবে তার ঠিক নেই।

রান্না-বান্না মেয়েরাই করে। দিনে ছু'বার রান্না এবং খাওয়া। রাত্রের রান্নার পর উনানে শুকনো পাতা, কাঠের কুচি দিয়ে দেয়। সমস্ত রাত ঘরগুলো সেই গরম ধোঁয়ায় গরম হয়ে থাকে।

কোরিয়ানরা কাঠি দিয়ে খায়। মেয়েরাই পরিবেশন করে। একটা ছোট নীচু টুলের ওপর খাবার দেওয়া হয়। কানা-উঁচু থালাতে

ভাত, আর চারি দিকে চক্রাকারে সাজান ছোট ছোট বাটিতে চাটনী—[illegible]কপির, গাজরের, ব্যাঙের ছাতার, শিমের, সমুদ্রের লতাপাতার —হরেক রকমের। খাওয়া হয়ে গেলে জলের বদলে আদার চা।

বাঘের, ভাল্লুকের অথবা হরিণের ছালের ওপর বেশ মোটা কারু-কার্য্য-করা কাঁথা পেতে তাদের বিছানা হয়। মাথার বালিশ পাইনের [illegible] কাঠের। যাদের অভ্যাস তারা হয়ত কাঠের বালিশে ঘুমোতে পারে, বিদেশীর কিন্তু ঘুম অসম্ভব। নরম কাঠের চেয়ে শক্ত তুলোর বালিশও ভাল।

জাপান অনেক বিষয়ে কোরিয়ার কাছ ঋণী। বলতে গেলে কোরিয়া জাপানের শিক্ষাগুরু। অবশ্য কোরিয়ার শিক্ষা চীন থেকে। ১৫০০ বছরের পূর্ব্বেকার ইতিহাসে জাপানের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না, শিক্ষা তো দূরের কথা। অথচ কোরিয়ানদের সংস্কৃতি কম করেও ৩০০০ বছরের। কোরিয়ানদের কাছে শিক্ষাই সব চেয়ে বড় কথা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ পাপ। জাপানীদের কাছে যুদ্ধই ধর্ম্ম, লেখাপড়া মেয়েলী ব্যসন। ফলে জাপানীদের হাতে পড়ে কোরিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি লোপ পেতে বসেছে।

পূর্ব্বে কোরিয়ানরা চীনাদের মত ছবি এঁকে লিখত। পরে তারা অক্ষর দিয়ে লেখার প্রণালী আবিষ্কার করে। এই প্রণালী এত সহজ যে, দু' সপ্তাহের মধ্যে যে কোন বই পড়ে ফেলার মত বিদ্যা অর্জ্জন করা যায়। খুব সহজ বলে চীনারা এই প্রণালীকে উপেক্ষার চোখে দেখত। নাম দিয়েছিল 'ওনমান' অর্থাৎ ইতর ভাষা। কিন্তু এই ইতর ভাষার সাহায্যে কোরিয়ায় লেখাপড়ার চর্চ্চা খুব বেড়ে গেল। শতকরা আশী জন লোক শিক্ষিত হল।

ধাতুর হরফ (টাইপ), যার ফলে আজ ছাপাখানা চলছে, এও কোরিয়ার আবিষ্কার। আগে ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রতি কথাটি কাঠের ওপর কুঁদে ছাপা হ'ত (উড কাট)। একটা পাতা ছাপার পর সেই কাঠগুলোর (ব্লক) আর কোন দামই থাকত না। প্রত্যেক পাতার জন্য নতুন ব্লক। কত পরিশ্রম, কত খরচ, কত সময় নষ্ট।

চীনে প্রথমে কাঠের হরফ তৈরী হ'ত। হরফ রাখবার ভিন্ন ভিন্ন কেজও তারা করেছিল। টিনের হরফের চেষ্টা তারা করেছিল। কিন্তু কোরিয়ানরাই সেই চেষ্টাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছিল। জগতে আজ যে এত ছাপাখানা, তার জন্মদাতা হ'ল কোরিয়া। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে সেখানে রীতিমত টাইপ-ফাউণ্ড্রী হয়ে গেছে। অবশ্য হরফ ছিল ব্রোঞ্জের, সীসের নয়।

আরও বহু ব্যাপারে কোরিয়া জগতের প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। ঝোলানো পুল (সাস্পেনশন ব্রীজ) জগতে সর্ব্বপ্রথম তৈরী হয় কোরিয়াতে। লোহার পাত-মোড়া জাহাজও (আয়রন ক্ল্যাড শিপ) কোরিয়ার আবিষ্কার। কিঅঙ্গজু (জাপানী নাম কেইশু) সহরে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গবেষণার জন্য অবজারভেটরী এখনও আছে। কোরিয়ার এক জন রাণী তৈরী করেছিলেন প্রায় ১৫০০ বছর পূর্ব্বে। খৃষ্ট-জন্মের আগেও দু'-একটা গবেষণাগার ছিল। তার ধ্বংস-চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কোরিয়ার গবেষণাগার বোধ হয় জগতের সর্ব্বপুরাতন। তারা শুধু ধূমকেতু, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য দেখে এবং তাদের গতি নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্য-গ্রহণ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষে আগে থাকতে বলে দিতে পারত।

প্রথম শিক্ষিত দেশ ভারতবর্ষ। সেই শিক্ষা গেল চীনে, সেখান থেকে কোরিয়ায়। কোরিয়া এগিয়ে দিল জাপানে। ভারত-বর্ষের বৌদ্ধধর্ম্ম তাই তিব্বত, চীন, কোরিয়া এবং জাপানে বিস্তার লাভ করেছে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জাপানের শিক্ষাগুরু। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়ার রাজা কয়েক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে আশপাশের দ্বীপপুঞ্জের বর্ব্বর অসভ্য জাতিদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে পাঠিয়েছিলেন। সেই

মেয়েরাও পরে শুভ্র বেশ

দ্বীপপুঞ্জ জাপান। জাপানে বৌদ্ধধর্ম। শিক্ষা, সংস্কৃতি, মন্দির, মঠ, বিহার সব বৌদ্ধ। এই সন্ন্যাসীরা জাপানীদের লিখতে পড়তে শেখালে। ভৈষজ্য, জ্যোতিষ, স্থাপত্য, গীত, বাদ্য, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান যা কিছু সবই তাদের শেখান। আজ জাপানের ললিতকলা, জ্ঞান, সাহিত্যপ্রীতি, কবিতা ও ফুলের আদর, দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহার যা বিদেশীকে মুগ্ধ করে, সে সবই সেই কোরিয়া-রাজ প্রেরিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অনুগ্রহে।

পিটে পিটে, ইস্ত্রী

সেই কোরিয়া জাপান আক্রমণ করলে। জয় করলে। কোরিয়া স্বাধীনতা হারাল আর সেই সঙ্গে হারাল নিজের শিক্ষা সংস্কৃতি। জাপানীরা মন্দির, মঠ, বিহার সব ধ্বংস করে দিল; স্কুল, লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিলে; শিক্ষিত লোকেদের মেরে ফেললে। দু'বছর ধরে চলল এই ধ্বংসলীলা। কোরিয়াবাসীরা হয়ে পড়ল দরিদ্র, নিঃস্ব।

আজও কোরিয়া মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। প্রতি মুহূর্ত কেটে যায় আহার-সংস্থান করতে, সমস্ত জীবনীশক্তি ক্ষয় হয় কোন মতে বাঁচবার চেষ্টায়। আর্ট, সাহিত্য, শিল্প, সৌন্দর্য্যচর্চ্চা করবে কোথা থেকে? কোরিয়ার কৃষ্টি ধ্বংস পেল। তার বদলে জাপানে সেই কৃষ্টি স্থানলাভ করল। কোরিয়ার মাটির বাসন (পটারী) এক সময় জগদ্বিখ্যাত ছিল। জাপানীরা কুমোরদের মেরে ফেললে। দু'এক জন, যারা খুব ভাল কারিগর, তাদের জাপানে নিয়ে গেল। এই ভাবে জাপানের সংস্কৃতি গড়ে উঠল। কোরিয়ার কারিগর রইল অথচ কোরিয়ার কারুকার্য্য গেল।

জাপানীরা কোরিয়াকে নতুন ভাবে গড়ে তুলল আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে। রাস্তা, রেলপথ তৈরী হল, খনজ কাজ চলতে লাগল। নতুন উপায়ে চাষ আরম্ভ হল। গাছপালা পুঁতে জঙ্গলের সৃষ্টি করা হল। কাঠের, ফল-ফুলের, শাক-সব্জীর ব্যবসা শুরু হল। ব্যাঙ্ক হল, পুলিশবাহিনী হল। এক কথায় ম্যাজিকের মন্ত্রে কোরিয়া যেন নব জন্ম, নতুন রূপ লাভ করল। সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল কোরিয়া। চারি ধারে কোরিয়ার অধিবাসীদের কাজে লাগান হল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। কোরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, কোরিয়াবাসীর পরিশ্রম—লাভ জাপানের। কোরিয়ার তার মধ্যে কোন অংশ নেই। চাকর মাত্র। 'Trade by Japanere with Japanese fo Japanese.'

পাছে শিক্ষা লাভ করলে কোরিয়া বেঁকে দাঁড়ায় এই জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা না করে যতখানি সম্ভব অব্যবস্থা করে দিলে জাপানীরা। ক্রমেই শিক্ষিত কোরিয়া হয়ে পড়ল অশিক্ষিত। আজ তারা মাটি কাটে, পাথর ভাঙে জাপানী ইঞ্জিনীয়ারের নির্দ্দেশ মত। তারা কুলি মজুর। জাপানী কুলি কোরিয়ায় খুব কম, আর কোরিয়ানদের সঙ্গে একমাত্র তাদের কাজ করতে দেওয়া হয় না। যদি কখনও নিরুপায় হয়ে একত্র কাজ করতে বাধ্য হয়, তবে বেতনের তারতম্য করা হয়। কোরিয়ানের বেতনের তিন গুণ জাপানীর বেতন। অবশ্য অনেক সময় কোরিয়ানরা বেতন পায়ই না। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সিপাহীর (ভারতীয় সৈনিক) বেতনের চার গুণ এক জন প্রাইভেটের (বৃটিশ সৈনিকের) বেতন। এই সংসারের নিয়ম।

কোরিয়ান কুলিদের ওপর জাপানী মালিকরা জঘন্য অত্যাচার করে। মার-ধর তো প্রায়ই হয়, মধ্যে মধ্যে গুলীও করে। কিন্তু প্রতিকার কি? কোর্টে কেস নিয়ে গেলে কেউ শুনতেই চায় না। জজ, উকিল সবই জাপানী, আর ভাগ্যক্রমে শুনানী হলেও জাপানীদের সাজা হয় না। হলেও অতি হাল্কা রকমের। বুটের গুঁতোয় চা-বাগানের ভারতীয় কুলিকে সাহেব যদি মেরে ফেলে, অথবা কোন কুলি-রমণীর সতীত্ব নাশ করে, তবে তার সাজা কতটুকু হয়, সে কথা সকলেই জানে।

রেলপথ তৈরী করবার কাজে কোরিয়ানদের বিভলভারের ভয় দেখিয়ে কুলির কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বেতন নির্দ্ধারিত নাই

...এক-তৃতীয়াংশ। না বলবার উপায় নেই। বাড়ীর ... অথবা শরীর অসুস্থতার জন্ত যদি কেউ কোন দিন কাজে ... পারে, তবে তাকে নির্দ্ধারিত বেতনের দ্বিগুণ অর্থাৎ যে ... পায় তার দু'গুণ জরিমানা ... হয়। কিন্তু কোথায় পাবে? ... ধার করতে হয় জাপানী ... কাছ থেকে। সুদ ... হয় মাসে শতকরা ১২৲ ... অর্থাৎ বছরে একশ' টাকার ... একশ চুয়াল্লিশ টাকা। ... আমাদের দেশের সুদখোর ...ওয়ালা!

এই করে দেশের লোকদের ... একেবারেই শোচনীয় হয়ে ...। ভিটে-মাটি সব যায়। যদি ... ব্যবসা করে অবস্থা ফেরাতে ..., তখনই জাপানীরা তাতে ... দেয়। লুঠ করে, আইন ... নয়, আরও আর্টিষ্টিক ...। এক কোরিয়ান দোকান ..., তখনই তার দোকানের ... এক জন জাপানী দোকান ... বসবে। কম দামে মাল ... করবে—লোকসান দিয়েও। ...রিয়ান দোকানদার কম্পি-...নে পারবে না, শেষ পর্যন্ত দোকান-পাট উঠিয়ে দিতে বাধ্য ...। ওদিকে বাজারে বিস্তর দেনা হয়ে যাবে। ঘরের যা কিছু ... সব চলে যাবে দেনা শোধ করতে। তখন জাপানী দোকানদারের লোকসান, জাপান সরকার পূরণ করে দেবে। কোরিয়ান যখন দোকান-পাট বিক্রী করতে বাধ্য হয়, তখন এক জন জাপানী এসে কিনে নেয়। যে দামে তার ইচ্ছে। কি সহজ সরল উপায়!

আবিষ্কার—ছাপাখানার হরফ

সব চেয়ে দুর্দ্দশা হচ্ছে কোরিয়ান চাষীদের। চার ভাগের তিন ভাগ লোক চাষী। কিন্তু তাদের জমি ছলে বলে কৌশলে জাপানীরা অধিকার করে নিচ্ছে। আজ চাষীদের জমির অর্দ্ধেকের ওপর জাপানীর হাতে। তারা মালিক, আর কোরিয়ান চাষীরা তাদের ভৃত্য। জমা নেওয়া জমির বছরের অর্দ্ধেক ফসল দিয়ে দিতে হয় জাপানী মালিককে। যা থাকে তা থেকে আবার কর এবং অন্যান্য দেয় বাদ যায়। শেষ অবধি চাষীর থাকে শতকরা মাত্র ১৭ টাকা। পর-বছরের ফসলের আগে আর রোজগার নেই। কিন্তু এতে তাদের সংসারের খাওয়া-পরা চলতে পারে না। অতএব ভিটে-মাটি বেচতে বাধ্য। কিনবে জাপানী। তার পর ভগবান! আর অর্দ্ধাশন, অনশন, মৃত্যু!

পরাধীন জাতি মাত্রেরই এই দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা। কিন্তু পথ কই। বিদেশী শোষকের হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। পিঠে না মেরে পেটে মারবে।

হৃদয়ের দেশ

শ্রীতরুণ সরকার

হৃদয়ের বৃন্ত হতে ঝরে-যাওয়া দিন
আর বুঝি আসে নাকো ফিরে!
ক্লান্তির সমুদ্রপারে কোনো মন হারায় যদি বা,
কোনোখানে কখনো কোথাও
একটি মেয়ের চোখ জ্বলে' জ্বলে' নিভে যায় যদি,
হৃদয় কি ভুলে থাকে সব?

এ জগতে হায়—
হৃদয় যে সব চেয়ে হৃদয়বিহীন।
প্রণয়ের নদীতীর ছেড়ে এসে তাই
ভুলে গিয়ে পুরাতন বাসনার দেশ
এখানে শুষ্ক মাঠে, তপ্ত বালু পরে
কোথাও দিগন্ত খুঁজে পাই নাকো জল:
কাতর চোখের জল, কপোলের স্বেদ!

এ জগতে হায়
হৃদয়ের বাসনার ধ্রুবতারা নেই।
পুরাণো মেয়ের
চোখ-ভরা জলে তাই ভুলে থাকে মন,
ছায়াময় তীর
একবার দেখা দিয়ে আড়ালে মিলায়!

ভারতের পতঙ্গজনিত মহামারী

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার দেশ এই ভারতবর্ষ শুধু যে শাসক-সম্প্রদায়ের শোষণনীতির ফলে রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে নানা মহামারী তাহার সমগ্র জীবনী-শক্তি তিলে তিলে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। এই সকল মহামারীর মধ্যে পতঙ্গের উপদ্রব বড় কম নহে। কৃষিকার্য্যে, পশু-পালনে ও মনুষ্য-জীবনে পতঙ্গ-শ্রেণী এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। আজ তাই পতঙ্গজনিত মহামারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গের উপদ্রব পুরাকাল হইতেই সুবিদিত। কেমন সুন্দর ফসল ফলিয়াছে; সহসা কোথা হইতে দুরন্ত পোকা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিল! নিরক্ষর অজ্ঞ চাষী এই ব্যাপারকে দেবতার অভিশাপ বলিয়া ভারাক্রান্ত চিত্তে মানিয়া লয় এবং কল্পিত শস্য-দেবতার তুষ্টিবিধানার্থ নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ ও কলা-কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে। সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে এজন্য বেতনভোগী যাদুকরের অভাব নাই। অবশ্য অনেক দেশেই কিছু-না-কিছু ম্যাজিকের প্রচলন আছে। ইটালীতে এই ম্যাজিক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া নিসর্গবিদ্ প্লিনি বলিয়াছেন, তদ্দেশীয় লোকের ধারণা এই যে, যদি কোন স্ত্রীলোক শস্যোদ্যানে উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রের ফলমূলাদি শুঁয়াপোকা লাগিয়া বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু 'ঝাড়-ফুঁক' বা 'তুক্-তাকে' পোকা-লাগা বন্ধ হইবার কতটুকু নিশ্চয়তা থাকিতে পারে?

ক্রমে পাশ্চাত্য দেশে জীব-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি-নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইল। নানা প্রকার পতঙ্গের বিভিন্ন বিচিত্র জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া মানুষ বুঝিতে পারিল, কোন্ প্রকার পতঙ্গ কোন্ বিশেষ রোগের আকর, কেমন করিয়া সেই পতঙ্গের প্রসার লাভ হয় ও কিরূপে তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে।

ভারতের জল-মাটী, আবহাওয়া, বনজ সম্পদ্ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনেক জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি ও নিসর্গবিদ্ এ দেশে অনুশীলন করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পতঙ্গবিদ্ হিসাবে নিসেভিল, অ্যাটকিনসন, উড্ম্যাসন, ডার্জিয়ন, হ্যাম্পসন, গ্রীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দেখা গেল, সকল পতঙ্গই যে জীবের শত্রুতাচরণ করে তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে শত্রু, নিরপেক্ষ ও মিত্র এই তিন প্রকার পতঙ্গ বিদ্যমান। মহামারী হইতে পরিত্রাণের জন্য শত্রুকে স্ববশে রাখিতে হইবে এবং কখনো বা মিত্রভাবাপন্ন পতঙ্গের সাহায্যে শত্রু-পতঙ্গকে উৎখাত করিতে হইবে।

কিন্তু এই ধরণের পতঙ্গানুশীলন এ দেশে সবেমাত্র সুরু হইয়াছে বলা চলে। যদিও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় যাদুঘর (Museum) উদ্বোধনের সময়ে একটি পতঙ্গ-তত্ত্বের বিভাগ খোলা হইয়াছিল, তথাপি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যত দিন না ভারত সরকার পতঙ্গ-জনিত মহামারী নিবারণের জন্য পতঙ্গানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ ও অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন তত দিন—উক্ত বিভাগের কাজ ... সীমাবদ্ধ ছিল।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতা যাদুঘরের পতঙ্গ-তত্ত্ব বিভাগ হইতে ই, সি, কোটসের সম্পাদনায় ১৮৯১এর মধ্যে দুই খণ্ড 'Notes on Economic Entomology' প্রকাশিত হয়। পরে ১৯০৩ এর মধ্যে 'Indian Museum Notes' এই নাম দিয়া আরও পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। পঞ্চম খণ্ডটির সম্পাদনা করেন নিসেভিল সাহেব। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পুসায় Imperial Agricultural Institute স্থাপিত হওয়ায় সরকারী পতঙ্গ বিভাগ কলিকাতা হইতে ঐখানে স্থানান্তরিত হয়। ম্যাক্সওয়েল লেফ্রয় নামে জনৈক বিজ্ঞানী পুসায় ভারতের প্রধান রাজকীয় পতঙ্গবিদের পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জ্জন করেন। সেখানে তিনি নানা মৌলিক গবেষণা ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে তাঁহার 'ভারতের পতঙ্গ-মহামারী' ও 'ভারতের পতঙ্গ-জীবন' নামক গ্রন্থটি অমূল্য সম্পদ্। রাজকীয় পতঙ্গবিদের কর্ম্মক্ষেত্র পরে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় ও এইচ, এম, প্রুথি সেই পদটি লাভ করেন। ক্রমে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নানা প্রদেশে পতঙ্গ-তত্ত্বের বিভাগ খোলা হয় এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই এই অনুশীলনের ফলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে দেখা যায়।

বর্ত্তমান কাল অবধি কোন্ কোন্ মহামারী লইয়া কতখানি গবেষণা হইয়াছে তাহাই এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পঙ্গপাল

ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে যে সব পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে তাহা মরুভূমিজাত পঙ্গপাল—নাম শিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া (Schistocerca Gregaria)। ১৯১২, ১৯১৩, ১৯২৬, ১৯৩০ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এই পঙ্গপাল মারাত্মক অভিযান চালাইয়া ভারতের শস্যক্ষেত্র সমূহের বিষম ক্ষতি করিয়াছে।

পঙ্গপালের জীবন দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম জীবনে ইহারা ঝাঁকহীন একাকী নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে। বৎসরের পর বৎসর এইরূপে অতিক্রান্ত হয়। পরে বারিপাতের ফলে মরুভূমির তাপ ও আর্দ্রতা কোন এক বিশেষ সীমায় উপনীত হইলে অনুকূল পরিবেশ পাইয়া ঐ পঙ্গপালের সুপ্তিভঙ্গ হয়। বহু কাল পরে জাগরণের উন্মাদনা তাহাকে চঞ্চল অস্থির করিয়া তুলে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি অভিনীত হইতে থাকে। এই সময়ে তাহার বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতির বিপুল পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিয়া পূর্ব্বেকার একক পঙ্গপাল বিরাট ঝাঁকের সৃষ্টি করে! এই ঝাঁক তখন আর মরুভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না—আকাশ-পথে বিশাল মেঘমালার ন্যায় সূর্য্যরশ্মি আচ্ছাদন করিয়া উড়িয়া চলে। কয়েক দিন পরে এই পঙ্গপালের দল যে দেশে আসিয়া বসে সে দেশের ফল-মূল-শস্যাদির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের ভারে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখাগুলিও ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে Imperial Council of Agricultural Research কর্ত্তৃক এক বিশেষ পঙ্গপাল-'গবেষণা সমিতি' গঠিত হয় এবং পতঙ্গবিদ্ রামচন্দ্র রাও-এর পরিচালনায় করাচীতে ঐ সমিতির সদর কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়। অবশ্য ইহার গবেষণা-ক্ষেত্র সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও রাজপুতানার মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাঞ্জাবের

...কলেজেও একটি পঙ্গপাল-গবেষণা বিভাগ খোলা হইয়াছে। ...গত সাত বৎসরে পঙ্গপালের গবেষণায় ৫১০১১০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এক্ষণে পঙ্গপাল-গবেষণা সমিতির প্রচেষ্টায় অনেক তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহাদের উপদ্রবও অনেকটা কমিয়াছে। তবে আক্রান্ত অঞ্চলে পঙ্গপাল মারিতে গিয়া আর্সেনিক প্রভৃতি উগ্র রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা ঠিক নহে, কারণ, যে সকল পতঙ্গ বৃক্ষ ... পুষ্পিত হইতে সাহায্য করে তাহারাও পঙ্গপালের সহিত বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত এ দেশের দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে মূল্যবান পতঙ্গনাশী ঔষধ ব্যবহার করাও সম্ভব নহে। তাই মূল হইতেই চিকিৎসার প্রয়োজন। যদি মরুভূমির আর্দ্রতা অথবা নিষ্ক্রিয় পঙ্গপালের পরিবেশ কোনরূপে সমভাবে বজায় রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে এই মহামারী নিবারিত হইতে পারে।

তুলার পোকা

ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা-সমিতি এই তুলা-পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্ম বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এয়ারিয়াস ইনসুলানা (Earias insulana) ও এয়ারিয়াস ফেবিয়া (Earias fabia) নামে দুই জাতীয় ডোরাকাটা পোকা এবং প্ল্যাটিড্রা গসিপাইলা (Platyedra gossypiella) নামে এক জাতীয় গোলাপী বর্ণের পোকায় তুলার বীজ আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের ডোরাকাটা বীজ-পোকার (Spotted Bollworm) সম্বন্ধে দেশপাণ্ডে ও নরকারনি যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা গিয়াছে যে, এই পোকার কোনরূপ নির্জীব নিষ্ক্রিয় অবস্থা নাই। ফলে যদি কিছু কালের জন্ম ক্ষেত্র তুলা-চারা-মুক্ত হইতে পারে তাহা হইলে এই মহামারীর প্রসার ও উৎপাত বন্ধ হয়। কিন্তু তুলা-চারা ভূমি সমতল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও নিষ্কৃতি নাই—যে পর্যন্ত না উহা একেবারে শিকড়-সমেত উৎপাটিত হইতেছে সে পর্যন্ত ডোরাকাটা বীজপোকার বংশবৃদ্ধি কোন মতেই রোধ করা যাইবে না। গুজরাটে তাই একপ্রকার মূলসমেত চারা-তোলা যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, এবং ইহার ব্যবহারে বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের তুলা-গাছ দীর্ঘতর এবং দৃঢ়তর সন্নিবদ্ধ হওয়ায় গুজরাট-প্রচলিত উক্ত যন্ত্রটি সেখানে বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

যুক্তপ্রদেশ-জাত তুলার গোলাপী বীজ-পোকা এক প্রকার তাপ প্রয়োগে (heat treatment) বিদূরিত হইতে পারে। সেখানকার তুলা চাষে তাপ প্রয়োগ তাই বাধ্যতামূলক। এই গোলাপী পোকার যুক্তপ্রদেশে কোন নিষ্ক্রিয় অধ্যায় না থাকিলেও হায়দ্রাবাদের মাটীতে ইহা বৎসরের কোন না কোন সময়ে নিস্পন্দ নির্জীব ভাবে অবস্থান করে।

পাঞ্জাব-জাত তুলার ভয়াবহ শত্রু হইল বিমিসিয়া গসিপাইপারডা (Bemisia gossypiperda) নামে এক প্রকার সাদা মাছি। মে ...ন হইতে সেপ্টেম্বর অবধি এই মাছি অসম্ভব তৎপরতার সহিত নূতন ...াব অনিষ্ট সাধন করিয়া চলে এবং তাহার পর আলু, শালগম, কপি ...ভৃতির চারায় গিয়া আশ্রয় লয়। পরে মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে ...ই সাদা মাছি কুমড়া ও নবোদ্গত তুলা চারা (ratoon cotton) ...ক্রমণ করে এবং এই ভাবে নূতন তুলা চাষে এই ক্ষতি বা ব্যাধি ...ামিত হইয়া পড়ে। তার্পিণ তৈলের এক মিশ্র পদার্থ (rosin compound) পিচকারী সহযোগে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ইহার উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ইহাতে খরচও বেশী পড়ে না—মাত্র দেড় টাকায় এক একর জমি সাদা মাছি মুক্ত করা যাইতে পারে।

মাদ্রাজে তুলা গাছের কাণ্ডে পেম্ফেরিস অ্যাফাইনিস (Pempheres affinis) নামে এক প্রকার ঘুণ ধরিতে দেখা যায়। জমিকে অন্ততঃ তিন মাস যদি তুলা-চারা শূন্য রাখা হয় তবেই ইহার উৎপাত কমিতে পারে।

মেক্সিকোজাত তুলায় এক প্রকার মারাত্মক ধরণের বীজ-ঘুণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও ঐ তুলা এদেশে আমদানী করা হয় তথাপি সেই ঘুণ এখানে সংক্রামিত হইতে পারে না। কারণ বোম্বাই বন্দরে—যাহা বৃটিশ-ভারতে বিদেশী তুলা আমদানীর একমাত্র বন্দর সেখানে—বিশেষ ভাবে তৈয়ারী এক প্রকার নৌকায় সমস্ত তুলা HCN গ্যাস প্রয়োগে বিশুদ্ধীকৃত করিয়া লওয়া হয়।

ইক্ষুর ছিদ্রকারী কীট

ভারতীয় শর্করা-শিল্পের উন্নয়নের জন্ম ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ও Imperial Council of Agricultural Research বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ডগা-ছিদ্রকারী (Scirpophaga nivell), কাণ্ড-ছিদ্রকারী (Argyria sticticraspis ও Diatroea venosata), শিকড়-ছিদ্রকারী (Emmalocera depressella) ও পত্র-ভোজী (Pyrilla) কীটগুলি ইক্ষু-চাষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতের দশটি কারখানা হইতে নমুনা লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া হালডেন হিসাব করিয়াছেন, মাত্র পাঁচ মাসের ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৭,৫০,০০০ টাকা। সম্প্রতি সুব্রামানিয়াম কর্ত্তৃক মহীশূরে ট্রাইকোগামা মাইনুটাম (Trichogamma minutum) নামে এক প্রকার পরজীবীর (parasites) সাহায্যে উক্ত ছিদ্রকারী কীট ধ্বংসের প্রয়াস অনেকখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিভিন্ন ফল-মূল-শস্যাদির কীট

Idiocerus clypealis নামে এক প্রকার ফড়িং আম নষ্ট করিয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, যদি গন্ধক-চূর্ণ ধূলার ন্যায় বর্ষণ করা হয় তাহা হইলে ঐ কীট বিনষ্ট হইতে পারে। মহীশূরে Hongey oil soap ছিটাইয়া আমগাছের উক্ত শত্রুকে বশীভূত করা হইয়া থাকে।

Ophideres নামে এক প্রকার পতঙ্গ অতি অদ্ভুত ভাবে কমলা ও বাতাবি লেবুর ক্ষতিসাধন করে। ইহারা রাত্রিকালে উড়িয়া আসিয়া অর্দ্ধ-পরিপক্ক বা প্রায়-পরিপক্ক ফলে ইহাদের করাত সদৃশ শুঁড়টি ঢুকাইয়া দিয়া খানিকটা রস শোষণ করিয়া লয়। পরদিন প্রাতে আক্রান্ত লেবুগুলিকে আর গাছে ঝুলিতে দেখা যায় না—মাটীতে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। অর্থাৎ একেবারে লোকসান!

দক্ষিণ-ভারতে সাধারণতঃ দুই প্রকার পতঙ্গ দেখা যায় যাহা ফলমূলাদি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করে—(১) Icerya নামে এক শঙ্কপোকা (fluted scale) এবং (২) Nephantis serinopa নামে নারিকেলের শুঁয়াপোকা। প্রথমোক্ত পোকাটি সম্ভবতঃ ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া হইতে নীলগিরি অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে।

Novins নামক লেডি-বার্ড পোকার (lady-bird beetle) সাহায্যে এক্ষণে শল্কপোকার আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়া থাকে। নারিকেলের শুঁয়াপোকা লইয়া এখনও গবেষণা চলিতেছে।

চাউলের ফড়িং (Hieroglyphus banian Fabr.) ও দাক্ষিণাত্যের পক্ষহীন ফড়িং (Colemania sphenarioides Bol.) লইয়া মহীশূর কৃষিবিভাগের পরিচালক কোলম্যান সাহেব যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। শস্যচারার উপরে মুখ-খোলা থলি চাপা দিয়া ঐ ফড়িং ধরিতে হয়।

যুক্তপ্রদেশে আপেল গাছের শিকড়-কর্ত্তনকারী পোকা ও লোমশ উকুন লইয়া, পুণায় যবাদি শস্যবিনাশী থ্রিপ্‌স্ লইয়া এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভয়াবহ San Jose Scale লইয়া রীতিমত গবেষণা চলিতেছে। এ ছাড়া সঞ্চিত শস্যকণা (stored grains) কেমন করিয়া বিবিধ পতঙ্গের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায় তাহারও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পতঙ্গবিদ্‌গণ বিশেষ শ্রম-স্বীকার করিতেছেন। উদ্ভিদের virus-ব্যাধি যে পতঙ্গেরই কারসাজি তাহাও এক্ষণে জানা গিয়াছে।

আসাম, দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের কফি ও চা-বাগানে অনিষ্টকারী পতঙ্গনাশের জন্য কেরোসিন তৈলের 'ইমালসন' ও গন্ধক-চূর্ণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাতে আংশিক সাফল্য পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত 'Paris green,' 'Bordeaux mixture,' 'London purple' প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার পতঙ্গনাশী ঔষধের বেশ চলন আছে।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজ-স্থিত পতঙ্গতত্ত্বের বিভাগটিও নানা বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বহু ছাত্র রেশম-কীট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে রায়চৌধুরী মহাশয় অধ্যাপনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঙ্গালা সরকারের রেশম-সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক পদে নিযুক্ত আছেন।

আরণ্য বৃক্ষের অনিষ্টকারী পতঙ্গ

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত দেরাদুনের রাজকীয় বন-গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Imperial Forest Research Institute) হইতে বহু তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। Hoplocerambyx spinicornis নামে কাষ্ঠভেদী পোকায় আরণ্য বৃক্ষের প্রভূত ক্ষতি হয়। ইহাদের নিবারণ জন্য তাই এক অভিনব ফাঁদ পাতা হইয়া থাকে। বড় বড় কয়েকটি গাছ বেশ করিয়া চিরিয়া রাখা হয়। আক্রমণোদ্যত উড্ডীয়মান পতঙ্গ বৃক্ষের সেই চেরা-দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। তখন তাহা বিনষ্ট করিতে বিলম্ব হয় না।

সেগুন, শিশু ও তুঁতগাছের (Mulberry) পত্রনাশী পতঙ্গকে অন্য প্রকারের পরজীবী পতঙ্গের সাহায্যে উৎখাত করিবার চেষ্টা হইতেছে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে। ব্রহ্মদেশে ও মাদ্রাজের নীলাম্বুরে সেগুন পত্রনাশী পতঙ্গের পরজীবীর পারস্পরিক আদান-প্রদান হইয়াছে এবং পাঞ্জাবের তুঁত ও শিশু গাছের পত্রনাশী পতঙ্গের পরজীবীর কৃত্রিম উপায়ে বংশ বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে তাহা সরবরাহ করা হইতেছে।

মাদ্রাজের বন-বিভাগ চন্দন গাছের গুটিকা-ব্যাধি (Spike disease) লইয়া গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

সাধারণতঃ অপরিণত লার্ভা-স্তরের পতঙ্গ দ্বারাই আরণ্য বৃক্ষের অনিষ্ট সাধিত হয়। এই অপরিণত লার্ভা ও পরিণত কীটের মধ্যে এমন বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান যে, উভয়কে কোন ক্রমেই এক-জাতীয় বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই। ফলে প্রতি পদেই ভুল-ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইলে বিভিন্ন পতঙ্গের শ্রেণী-বিভাগ ও ক্রমিক রূপান্তর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজন। দেরাদুনের পতঙ্গতত্ত্ববিদ্ গার্ডনার (Gardner) সম্প্রতি এ-বিষয়ে খানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কোলিঅপ্‌টেরা সম্বন্ধে তাঁহার নানা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

পশু-স্বাস্থ্যহানিকর পতঙ্গ

পশু-চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে পতঙ্গতত্ত্ব বিভাগের উদ্বোধন সাম্প্রতিক বলা চলে। পশু-রোগ বিষয়ে পতঙ্গানুশীলনের সকল প্রচেষ্টাই এত দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে শুধু ভারত সরকারের চিকিৎসা ও কৃষিবিভাগ এবং প্রাণি-পরিদর্শন বিভাগ করিয়া আসিয়াছেন। এই ব্যাপারে ব্রুনেটির (Brunetti) নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। 'Fauna of British India' বা 'বৃটিশ ভারতের প্রাণিকুল' নামক পুস্তকে তিনি ১৯১২, ১৯২০ ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পরজীবী ডিপ্‌টেরাবর্গের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'Records of the Indian Museum'-এ তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধাবলী তাঁহার বিস্তৃত গবেষণার স্মারক হিসাবে শোভা পাইতেছে।

ব্রুনেটির পরেই প্যাটন ও ক্র্যাগের (Patton & Cragg) নাম উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে যুগ্ম গ্রন্থকার হিসাবে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'A Text-book of Medical Entomology' প্রণয়ন করিয়া ইঁহারাই Veterinary Entomologyর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহারা দেখাইয়াছেন Musca দূষিত ক্ষত হইতে সরাসরি অদূষিত ক্ষতে আগমন করে, এবং এই ভাবে দূষিত ক্ষতের প্রসার বৃদ্ধি পায়। অ্যানোফেলিস মাছি যে লার্ভা-স্তরে রক্তশোষক হইয়া থাকে তাহাও প্যাটন প্রমাণ করিয়াছেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পতঙ্গবিদ্ সিনিয়র হোয়াইট কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে কিউলিসিডি, ট্যাবানিডি ও সিমুলিডি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। আসামের খাসিয়া পাহাড় ছিল ইঁহার গবেষণা-ক্ষেত্র।

ইহার পর এম, শরিফ (১৯২৪-২৮) ও আই, এম, পুরীর (১৯৩২-৩৫) অবদান প্রশংসনীয়। শরিফ এঁটুলি-পোকা সম্বন্ধে এবং পুরী সিমুলিডি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। মুক্তেশ্বরে এস. কে. সেন (১৯৩৫) এক অভিনব উপায়ে গৃহপালিত পশুদেহ হইতে এঁটুলি পোকা তুলিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি পাত্রে চ্যাটারটন আবিষ্কৃত এক প্রকার আঁঠাল প্রলেপ মাখাইয়া লইয়া যদি তাহা পশুদেহে বাঁধিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে যেখানে যত এঁটুলি পোকাই থাকুক না কেন সবই ঐ পাত্রে উঠিয়া আসে।

মুক্তেশ্বরের রাজকীয় পশুচিকিৎসা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ও প্রাদেশিক পশুচিকিৎসা বিভাগগুলিতে বর্ত্তমানে নানা মহামারীর পতঙ্গরূপী বাহক বা বাহন (carrier) সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। ইহাদের

মধ্যে অশ্ব প্রভৃতির কালঘুম (Surra) রোগ ও গো-বসন্ত মড়ক (Rinder pest) লইয়া বিশেষ ভাবে চর্চ্চা হইতেছে। ক্রস, প্যাটেল এবং কাহন সিং বলিয়াছেন, অশ্বাদি পশুতে কালঘম রোগ কয়েক জাতীয় ট্যাবানিড মাছির দ্বারা সংক্রামিত করা যাইতে পারে; আর ভাটিয়ার মতে গো-বসন্তের বাহক হইল ট্যাবানাস ওরিয়েণ্টালিস (Tabanus Orientalis) নামে এক প্রকার মাছি। অবশ্য এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট গবেষণা ও আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে।

মনুষ্যের অনিষ্টকারী পতঙ্গ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কত পতঙ্গ যে কত ভয়াবহ রোগের আকর এবং কিরূপ অবলীলাক্রমে যে পতঙ্গ-বাহন হইতে ব্যাধি-বীজাণু সুস্থ নরদেহে সংক্রামিত হয়, তাহা ভাবিলে যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, টাইফাস প্রভৃতি নানা সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু বিশেষ বিশেষ পতঙ্গদেহে নিরাপদ আশ্রয়ে সুপ্তিমগ্ন থাকে এবং সুযোগ ও অনুকূল পরিস্থিতি পাইলেই তৎক্ষণাৎ মনুষ্যদেহে আস্তানা গাড়িয়া বসে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে।

মানুষের প্রতি পতঙ্গের এই বৈরতাচরণের কাহিনী প্যাটন ও ক্র্যাগ কর্ত্তৃক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে A Text-book of Medical Entomologyতে প্রকাশিত হইলে দেশে নানা পতঙ্গ-ব্যাধি নিবারণী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানে কোশলীর 'Central Research Institute' কলিকাতার 'School of Tropical Medicine' এবং মাদ্রাজের 'King Institute of Preventive Medicine দুরন্ত পরজীবী পতঙ্গের প্রভাব হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য প্রভূত অর্থ-ব্যয় করিতেছেন।

প্রথমে কৃষ্টোফার ও বেরো (Barrraud) কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া-বাহক এনোফিলিস ও ফাইলেরিয়া-বাহক কিউলেক্স মশার বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। পরে ষ্টিক্ল্যাণ্ড ও পুরী এনোফিলিসের লার্ভান্তর নিরূপণ ও অভিচিহ্নিত করেন। ইহার পর কি ধরণের জলে—অর্থাৎ জলের রাসায়নিক উপাদান কোন্ প্রকারের হইলে—এনোফিলিস বংশ-বৃদ্ধি করে তাহা সিনিয়র হোয়াইট, আয়েঙ্গার, গ্রিফি ও মেটা কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। পরিশেষে 'কভেল মশ প্রতিরোধের উপায়' নামে এক প্রয়োজনীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি D D T বা ডাইক্লোটো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরেথেন নামে ঔষধটি মশককুল নির্ম্মূল করিতে অদ্বিতীয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

Phlebotomus নামে এক জাতীয় মাছিকে কালাজ্বরের বাহক বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

কিং, পণ্ডিত ও তাঁহাদের সহযোগিগণের গবেষণায় কিউলেক্স মশা (Culex fatigans) ফাইলোরিয়া, রোগের অন্যতম বাহক বলিয়া জানা গিয়াছে।

গয়েলের (Goyle) সাম্প্রতিক ঘোষণায় এক প্রকার ইঁদুরে-মাছি প্লেগ-রোগের বাহন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে।

একটি নহে—কয়েক প্রকার পতঙ্গ টাইফাস রোগের বাহক হইতে পারে। ক্র্যাগ উকুনকে টাইফাসের বাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ইহার প্রমাণ দিতে গিয়া তিনি নিজেই ঐ উকুন সংক্রামিত টাইফাসে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতি সম্প্রতি কভেল ও মেটা Xenopsylla cheopis নামক ইঁদুরে মাছিকেও উক্ত রোগের বাহক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার মেগাউ (Magaw) বলিয়াছেন, সিমলা শৈলের এক প্রকার এঁটুলি পোকা (tick) হইতেও টাইফাস সংক্রামিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের পতঙ্গজনিত মহামারী-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা যদিও এই অল্প সময়ের মধ্যে বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি দেশের দরিদ্র-কৃষক-সাধারণকে আধুনিক উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করিবার মত শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, অথবা নিরক্ষর জনসাধারণকে সাধারণ স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয় নাই। তাহারা পূর্ব্বে যে তিমিরে ছিল আজও প্রায় সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। সরকার বা মুষ্টিমেয় জন-কয়েক শিল্পপতি লাভের আশায় প্রণোদিত হইয়া পশুপালন বা কৃষিক্ষেত্রে হয়ত কয়েক জন অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে শ্রমজীবী জনসাধারণের কতটুকু সুসার হইবে? দেশের শাসন পরিষদে যদি কোন দায়িত্বশীল দূরদর্শী ও হৃদয়বান্ সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবেই এই ধরণের লোকশিক্ষার আশা করা যাইতে পারে।

পাহাড়ে সন্ধ্যা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

পাহাড়ের কোলে দেখেছো কখনো সন্ধ্যা নামে?
দূর ডেরা থেকে ইতস্ততঃ ছড়ানো যে সব
বুনো ঝোপঝাড় ঘাসের মতন হয়েছে মনে,
বৃষ্টির ছোপ শিশিরের মত বিদায়ী রোদে
চিকমিক করে ধাঁধিয়েছে না কি কখনো চোখ?

দেখেছো কখনো পাহাড়শীর্ষে সন্ধ্যা নামা—
রোদের স্পর্শ খসে যায় ক্রমে কি অভিমানে,
ধোঁয়াটে জটলা মতলব নিয়ে দ্বন্দ্ব জোড়ে—
অজানা পাখীরা দল বেঁধে সব কখনো বা
পাহাড় ডিঙিয়ে সরে যায় কোন্ তেপান্তরে;
সজীব পাহাড় সায়ং-প্রভায় মৌনী হয়?

দেখেছো কখনো নির্জ্জন বনে পাহাড়-চূড়ায়
এসেছে সন্ধ্যা মৃদু ও মন্দ পদক্ষেপে,
পেতেছে আসন এখানে সেখানে, বনের ধারে-
পাহাড়ের বনে, কিংবা পাহাড়ে বাহারে ভাবে
দিনের গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে সম্মোহনে?
দেখেছো সন্ধ্যা? এমন সন্ধ্যা—পাহাড়-চূড়ায়!

কলিকাতার ইতিহাস

শ্রীনিখিলচন্দ্র রায়

কলিকাতা নগরীর প্রাচীন ও পুরাকালীন অস্তিত্বের যথেষ্ট ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকিলেও ইহার উৎপত্তি-কাল যে বেশ দূর অতীতের বিষয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক-গুরুত্বে এবং পৌরাণিক গল্প ও গাথার বিষয়রূপেও পৃথিবীর বৃহৎ নগর সকলের মধ্যে কলিকাতার স্থান বেশ উচ্চে।

ইহার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিলে পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, সতীদেহের এক অংশ কালীঘাটে পতিত হইয়াছিল। এরূপ কিংবদন্তীও আছে যে, গৌড়ের রাজা বল্লাল সেন কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারকে "উত্তরে দক্ষিণেশ্বর হইতে দক্ষিণে বাহুলা (বেহালা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত" এক ভূখণ্ড ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। ইহা হয়ত নিম্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতিমাত্র, কিন্তু কালীঘাটের বিষয়ে প্রামাণ্য উক্তি ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস রচিত মনসা নামক বাংলা কবিতায় প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে অনুমান ১৫৭৭ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ আছে এবং তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রচিত ক্ষেমানন্দের চণ্ডীকাব্য নামক আর একটি বাঙ্গালা কাব্যেও ইহার বিষয় লিখিত হইয়াছে। অনুমান ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে লিখিত প্রসিদ্ধ গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী নামক কাব্যে বর্ণিত আছে যে, "কালীঘাট এক আশ্চর্য্যময় স্থান, এখানে ব্রাহ্মণগণ দেবীপূজার সময়ে উচ্চকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করেন এবং তৎসহিত অতিশয় ঘটা এবং বলিদান সহ পূজাক্রিয়া সম্পন্ন করেন।" এই কালীঘাট কলিকাতারই একটি অংশ এবং ইহার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সহিত কলিকাতার অস্তিত্বও জড়িত।

এই সকল বর্ণনাকে ঠিক ঐতিহাসিক স্থান এবং তদুপযোগী মূল্য না দিলেও, ইতিহাস খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোগল সম্রাট্ আকবরের প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজল কর্ত্তৃক ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত আইন-ই-আকবরী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে কলিকাতার প্রথম উল্লেখ আছে। ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, সাতগাঁও সরকার বা সপ্তগ্রাম প্রদেশ (সরকার অর্থে প্রদেশ) রাজকোষাগারে বাৎসরিক ২৩৪৯৫৻ টাকা করদান করিত এবং ইহার মধ্যে "কালকাট্টা মহাল" বা কলিকাতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরি-উক্ত পুস্তকে আরও লিখিত আছে যে, মানসিংহ যখন সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তখন তিনি ভবানন্দ মজুমদার ও লক্ষীকান্তের নিকট তাঁহার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ সম্রাটের নিকট হইতে ইঁহাদিগকে জায়গীর দান করাইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণবংশীয় এবং ইহাদের মধ্যে লক্ষীকান্তের বংশধরগণ এক্ষণে সাবর্ণ চৌধুরী নামে খ্যাত। ইহারাই কলিকাতা ও তাহার সংলগ্ন সম্পত্তির প্রথম স্বামী হইয়াছিলেন এবং পরে ইংরেজেরা তাঁহাদের নিকট হইতেই কিনিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম আধুনিক হুগলী সহর। তখন ইহা সরস্বতী নদীর একটি প্রধান পোতাশ্রয় ছিল। এই নদী বর্ত্তমান নদীর কিছু পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বর্ত্তমান গার্ডেনরীচের নিকট উহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা পলিমাটিতে ক্রমশঃ বুজিয়া গিয়া জমির সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিলিয়া গিয়াছে। এই পোতাশ্রয়ে সেই সময়ে পোর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণের ছোট জাহাজ আসিয়া থাকিত। তখন চট্টগ্রামে পোর্ত্তুগীজদিগের পোর্টোগ্রাণ্ডে (Portogrande) নামক সুবৃহৎ পোতাশ্রয় স্থাপিত ছিল। তাহাদের বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজগুলি বাণিজ্য ব্যপদেশে একেবারে সাতগাঁও পর্য্যন্ত যাইতে পারিত না বলিয়া গার্ডেনরীচের নিকট নোঙর করিয়া অবস্থান করিত। ছোট ছোট দেশীয় নৌকা নদী বাহিয়া দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া রেশম, মস্‌লিন এবং অন্যান্য রপ্তানির পণ্য আনয়ন করিত। তখন অধিকাংশ বণিকেরাই নদী-তীরে সাতগাঁওয়ের দিকে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্তুবায়-শ্রেণীর বিখ্যাত বসাকবংশীয় চারি ঘর বণিক্ এবং ধনের আদান-প্রদান ব্যবসায়ী (banker) শেঠবংশীয় এক ঘর বণিক্ পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত বাণিজ্যের সুবিধা করিবার নিমিত্ত সাতগাঁও হইতে নদী বাহিয়া স্রোতের মুখে আরও নিম্ন দিকে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আধুনিক ফোর্ট উইলিয়মের নিকট তাঁহাদের বংশদেবতা গোবিন্দজিউর নামানুসারে গোবিন্দপুর নামে এক গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই গ্রামের কিছু উত্তরে নদীর একটি খাঁড়ি (creek) ছিল। তখন ঐ খাঁড়ি এখনকার হেস্টিংস্ ষ্ট্রীটের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং উহার স্মৃতি এক্ষণে ক্রীক রো নামক রাস্তায় রক্ষিত হইয়াছে। ঐ খাঁড়ির অপর পারে তাঁহারা সূতানুটি (অর্থাৎ সূতার গুটি) নামে একটি সূতার বাজারও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহাদিগকে অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তন্তুবায়দিগকে আনিয়া তথায় স্থাপন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা ঐ স্থানে সূতার গাঁটের এক উন্নতিশীল ব্যবসায় পত্তন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যবসায় পরবর্ত্তী কালে ইংরেজ বণিক্‌সঙ্ঘকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে বাণিজ্য-ব্যাপারে পোর্ত্তুগীজদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইবার পর ডাচেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিলেও সম্রাট্ সাহজাহানের সময়ে ইংরেজেরা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা রাজপুত্র সুজার নিকট হইতে এক সনদ দ্বারা বৎসরে ৩০০০৻ টাকা করদানে এই দেশে ব্যবসা করিবার অধিকার পাইলেন এবং তাঁহারা সূতানুটিতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া কলিকাতার শেঠ ও বসাকদিগের সহিত সূতা ও রেশমের কারবার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু পরে ইংরেজ বণিকেরা এই দেশে দ্রুতগতিতে শিল্পশালা খুলিয়া নিজেদের বাণিজ্যের উন্নতি করিতে লাগিলেন দেখিয়া মোগল রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা সুনজরে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না এবং ইংরেজদিগের সহিত তাহাদের প্রায়ই ঝগড়া হইতে লাগিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার তাঁহার বিনা অনুমতিতে কতকগুলি কার্য্য করার জন্য ইংরেজদিগের শাস্তিবিধান করিলেন। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ইংরেজ বণিক্‌সঙ্ঘের (English Company) প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ জব চার্ণক হুগলী নগর লুঠ করিলেন। তখন বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে ইংরেজেরা পশ্চাদপসরণ করিয়া সূতানুটিতে আসিয়া নবাবের নূণের গোলা এবং টানা ও গার্ডেনরীচ নামক দুর্গদ্বয় ধ্বংস করিয়া হিজলী অধিকার করিলেন। এই স্থানে নবাবের সৈন্যদল ইংরেজদের অবরোধ করিয়া ফেলিল। ইহাতে তাহাদের দুর্গতির সীমা রহিল না। অবশেষে জব চার্ণক নবাবের সহিত এই সর্ত্তে সন্ধি করিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি

নবাবের আদেশ লইয়া কার্য্য করিবেন এবং তাঁহার কোন ক্ষতি করিবেন না। এই সন্ধি করিয়া তিনি ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স এই ঘটনায় জব চার্ণককে কর্তৃপদ হইতে অধস্তন পদে নামাইয়া দিয়া বঙ্গদেশের সমস্ত ইংরেজ উপনিবেশ মান্দ্রাজে সরাইয়া লইলেন। অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার পরবর্ত্তী নবাব ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে ইংরেজেরা পুনরায় জব চার্ণককে কর্তৃপদে লইয়া এই প্রদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা সুতানুটিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাসস্থান সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে দেশীয় লোকেরা সব লুঠ করিয়া লইয়া বাকী সব পুড়াইয়া দিয়াছে। জব চার্ণক মজুমদারদিগের কাছারি-বাড়ী এবং পোর্ত্তুগীজদিগের ধর্ম্মমন্দির কিনিয়া লইয়া সেই স্থানে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান ও নথিপত্রাদি রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। জব চার্ণক এদেশীয় একটি স্ত্রীলোককে সতীদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই জন্য বিধর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে এক অপবাদ রটিয়াছিল। তিনি ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একবার মেদিনীপুরের হিন্দু রাজা শোভা সিং মোগল শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া হুগলী ও মুর্শিদাবাদ অধিকার করেন। তিনি যখন সুতানটি আক্রমণের উদ্যোগ করিতে-ছিলেন তখন বাঙ্গালায় নবাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরেজদিগকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে অনুমতি দিলেন। ইহাতে কলিকাতার যেখানে এখন জেনারেল পোষ্ট অফিস, কাষ্টমস্‌ হাউস এবং ই, আই, রেলওয়ে হাউস অবস্থিত সেই স্থান ইংরেজেরা অতি দ্রুত দুর্গাদি দ্বারা সুদৃঢ় করিতে লাগিল। তখন হুগলী নদী বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার তীরেই রক্ষণের জন্য সমস্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য সংসাধিত হইল। এইরূপে ভবিষ্যৎ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গোড়া-পত্তন হইল। শোভা সিংহের বিদ্রোহ নিরস্ত হইবার পরেও কিন্তু এই প্রাথমিক দুর্গ রহিয়া গেল।

এতাবৎ কাল ইংরেজ বণিকদল এ দেশের ভূমির উপর কোন স্বত্বাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে যখন সম্রাট আওরংজেবের পৌত্র নবাব আজিমউসান বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন তখন তাঁহার লোভী পুত্র ঐ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ইংরেজদের কাছে ১৬০০০৲ টাকা উপঢৌকন লইয়া পিতার নিকট হইতে তাহাদিগকে এক সনদ পাওয়াইয়া দিলেন। ইহার বলে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধর ও সাবর্ণ চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র রায়, মনোহর ও অন্যান্য কয়েক জনের নিকট হইতে বাৎসরিক ১৩০০০৲ টাকা খাজনায় ইংরাজরা গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলিকাতা ইজারা লইল। তৎপরে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ উপনিবেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট চার্লস্‌ এইয়ার (Charles Eyre) ইংলণ্ডের তখনকার রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন এবং তখন হইতে দুই বৎসর পরে এই দুর্গের উপর ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack) পতাকা সর্ব্বপ্রথম উড্ডীন করা হইল। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ফ্যাক্টরী বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইল। ইহাই বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিংস্‌ এর গোড়াপত্তন। এইরূপে এই স্থানে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইল। এই উপনিবেশের মধ্যস্থলে ছিল পুষ্করিণী সমেত "দুর্গের সম্মুখস্থ সবুজবর্ণের ময়দান" (the ground before the fort) যাহা এক্ষণে লালদীঘি বা ডালহৌসি স্কোয়ার নামে পরিচিত।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরংজেবের মৃত্যুর পর সাহ আলম যখন সম্রাট হইলেন তখন ইংরেজ কোম্পানী বাণিজ্যের যে সকল সুবিধা এত দিন ভোগ করিতেছিলেন তাহা তাঁহার নিকট হইতে নূতন করিয়া মঞ্জুর করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে ৪৫০০০৲ টাকা দিয়া এক পরোয়ানা লইলেন। কিন্তু এক্ষণে ধনশালী হওয়াতে লোভী রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট ঐ পরোয়ানার বলে তাঁহাদের কোনই অব্যাহতি হইল না। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ইংরেজদিগকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার প্রজাস্বত্ব ক্রয় করিবার অধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ তিন গ্রামের উপর তাহাদিগের কোন মালিকানা বা জমিদারী স্বত্ব ছিল না। মোগল রাজকর্ম্মচারিগণ ইংরেজ কোম্পানীকে উর্দ্ধতন জাইগীরদারের করদায়ী অধীন প্রজা হিসাবে দেখিতেন এবং এই কারণে রাজস্ব বা বাণিজ্যের শুল্ক প্রভৃতি আদায়ের ও অন্যান্য ব্যাপারে তাহাদের সহিত বেশ সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদাবাদে রাজধানী সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেও ইংরেজ কোম্পানী অনেক আবেদন করিয়া কোন ফল পাইলেন না। এমন কি, জন রাসেল (John Russel) যিনি ইংলণ্ডের গর্ব্বিত রক্ষক (Proud Protector) অলিভার ক্রমওয়েলের প্রপৌত্র এবং কলিকাতায় ইংরেজ উপনিবেশের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি ইংরেজদিগের নেতারূপে দিল্লীর সম্রাটের নিকট "তাহাদের পুরোভাগে থাকিয়া ভূমিতে শির ঘর্ষণ করিতে করিতে অলৌকিকত্বের আসনস্বরূপ রাজসিংহাসনের (throne which is the seat of miracles) প্রতি দাসের যেরূপ প্রগাঢ় সম্মান দেখান কর্ত্তব্য সেইরূপ সম্মানপুরঃসর" এক ঘৃণ্য দরখাস্ত (abject petition) করিয়াও কোন ফল পাইলেন না।

অবশেষে ইংরেজ কোম্পানী স্থির করিলেন যে, স্বয়ং সম্রাটের সমীপে যাইয়া আবেদন করিবেন। এই নিমিত্ত ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহারা একদল দূতকে সম্রাটের নিকট হইতে আবশ্যকীয় "ফারমান" বা হুকুম আদায়ের চেষ্টা করিবার জন্য দিল্লী প্রেরণ করিলেন। সম্রাট ফারুক শিয়ার (Furruk Shiar) এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণের জন্য "৩০ হাজার পাউণ্ড বা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের নানাবিধ আশ্চর্য্য কাচের বাসন, ঘড়ি, কিংখাপের কাপড় এবং বহুমূল্য পশম ও রেশমের নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট পরিচ্ছদ" লইয়া ৭ই জুলাই ১৭১৫ সালে ঐ দল দিল্লী পৌঁছিলেন। তাঁহারা রাজসভায় অতিশয় সম্মান ও মর্য্যাদার সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট ইংরেজ কোম্পানীর প্রার্থিত ফারমানের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা বা তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার রাজকার্য্যে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে যত দিন তাঁহার এক রাজপুত রাজকন্যার সহিত আসন্ন বিবাহ সম্পন্ন না হয় ততদিন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইতিমধ্যে আবার সম্রাট অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে আরোগ্য করিতে রাজভিষগ্‌দিগের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে কেবল বিবাহ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিল তাহা নহে, সম্রাটের জীবনও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে ঐ দূতদলের মধ্যে উইলিয়াম

হ্যামিল্টন নামে এক ডাক্তার সম্রাটের চিকিৎসা করার প্রস্তাব করায় সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে সম্মত হইলেন। এই ইংরেজ ভিষকের চিকিৎসা এত ফলবতী হইয়াছিল যে, রুগ্ন সম্রাট শীঘ্রই স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং রাজকীয় বিবাহ যথানুষ্ঠানে সম্পন্ন হইল। সম্রাট ঐ ডাক্তারকে পুরস্কারস্বরূপ যে কেবল বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিলেন তাহাই নহে, তাঁহাকে ঈপ্সিত ও দানযোগ্য অন্য যে কোন পুরস্কার চাহিতে বলিলেন। হ্যামিল্টন তৎক্ষণাৎ ইংরেজ দৌত্যের বিষয়ীভূত আবেদন পুরস্কারস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর দিল্লীতে অবস্থানের পর ১৭১৭ সালের জুন মাসে ঐ দূতদল তাঁহাদের অভিলষিত "ফারমান" প্রাপ্ত হইলেন। এই ফারমানে ইংরেজদিগকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে হুগলী নদীর উভয় তীরে কলিকাতা হইতে দক্ষিণে ১০ মাইলের মধ্যে আরও ৩৮টি গ্রাম ক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া ছিল এবং ইংরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার অর্পিত হইয়াছিল।

এইরূপে নিজেদের উপনিবেশের এবং তাহার চতুর্দিকস্থ গ্রামসকলের স্বত্বাধিকারী সাব্যস্ত হইয়া ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতায় নিজেদের সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত করিলেন। এই কলিকাতা এত দিনে একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার আয়তন প্রায় ১৮৬১ একর (৫৬৪১ বিঘা) ও লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ—এদেশীয় ও ১০।১২ শত ইউরোপীয় হইয়াছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে অনুমান ৩ মাইল এবং প্রস্থে ১ মাইল এবং ইহার সীমা নদী হইতে আজকালকার চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বড় রাস্তা দিয়া তখনকার দিনে কালীঘাটের মন্দিরে তীর্থযাত্রিগণ যাতায়াত করিত। যে তিনটি গ্রাম লইয়া ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে সুতানুটি উত্তরে চিৎপুর হইতে জোড়াবাগান ঘাট পর্য্যন্ত এবং নিমতলা ঘাটের কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখান হইতে ডিহি কলিকাতা আরম্ভ হইয়া বাবুঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখান হইতে গোবিন্দপুর আরম্ভ হইয়া আদিগঙ্গার কাছে গিয়া শেষ হইয়াছিল। এই আদিগঙ্গা বহু পূর্ব্বে ভাগীরথীর অংশ ছিল এবং ইহার মধ্য দিয়া ঐ নদীর স্রোত প্রবাহিত হইত। পরে ইংরেজেরা মেটিয়াবুরুজ হইতে বজবজ পর্য্যন্ত এক খাল কাটিয়া সংযোগ করিয়া দেওয়ায় তাহার মধ্য দিয়া প্রধান স্রোত প্রবাহিত হইয়া আদিগঙ্গা শুকাইয়া যায়। এই আদিগঙ্গাকে পরে "সুরমানের নালা" বলিত এবং ইঞ্জিনিয়ার টলী সাহেব ইহাকে পুনরায় কাটিয়া সংস্কার করাতে আজকাল ইহা "টলীর নালা" (Tolly's Nullah) নামে পরিচিত হইয়াছে। ১৭৪২ সালে মারহাট্টা লুণ্ঠনকারীদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরেজগণ বাংলার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁয়ের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তাহাদের সম্পত্তির চতুর্দ্দিকে এক গভীর খাল কাটাইতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য মারহাট্টারা ইহা সহজে পার হইয়া আসিতে পারিবে না। এই খাল মারহাট্টা ডিচ্ (Marhatta Ditch) নামে পরিচিত। প্রায় চারি শত মাইল পরিমিত খাল কাটা হইবার পর বাংলার নবাবের সহিত মারহাট্টাদের এই সর্ত্তে এক সন্ধি হইয়া গেল যে, প্রতিবৎসর চৌথ কর দিলে উহারা আর বাংলাদেশ আক্রমণ করিবে না। এই কারণে ঐ খাল অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুতে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। তিনি সিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ কোম্পানীর সহিত তাঁহার বিনা অনুমতিতে দুর্গের বৃদ্ধি-কার্য্য লইয়া বিবাদ বাধিল। যুবক নবাব ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এই আপত্তি ক্রমে শত্রুতায় পরিণত হইল। এই সময়ে ঢাকার হিন্দু শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজকর ফাঁকী দিবার জন্য তাঁহার পিতার সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেলেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে নবাবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে তিনি তাহাদিগের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ অভিযান করিলেন। নবাব প্রথমেই মুর্শিদাবাদের নিকটে কাশিমবাজারে ইংরেজদিগের ফ্যাক্টরী আক্রমণ করিয়া সেখানকার ইংরেজ বণিক্‌দিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। ইহাদের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ছিলেন। ইনি তখন কোম্পানীর এক যুবক কেরাণী কার্য্য করিতেন এবং পরে বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইহার পর নবাব ইংরেজদিগকে ধ্বংস করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া ৫০ হাজার সৈন্য ও ভারি কামান ইত্যাদি লইয়া ১৬ই জুন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের দুর্গ-বহিঃস্থ সেনানিবাস চিৎপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগবাজারের নিকটে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে নবাবকে প্রথমে ইংরেজেরা হারাইয়া দিল এবং নবাব দমদমে ফিরিয়া গেলেন। দুই দিন পরে নবাব সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বর্ত্তমান বৃটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের নিকট ভীষণ যুদ্ধের পর ইংরেজদিগের দুর্গবহিঃস্থ সেনাদিগকে হতাহত করিয়া ভিতরে তাড়াইয়া দিলেন। এই কারণে ঐ রাস্তাটিকে লোকে "হল্লাহাটা গলি" নাম দিয়াছিল এবং কালে বিকৃত করিয়া ইহাকে "রাণীমুদী গলি" বলিত। এই যুদ্ধের ফলে দুর্গের ভিতর এরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল যে ইংরেজ উপনিবেশের শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেব এবং কোম্পানীর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তাড়াতাড়ি নৌকায় চড়িয়া একটি জাহাজে উঠিয়া পলাইয়া গেলেন। পশ্চাতে হাবিল জন হলওয়েলের অধীনে ইংরেজ সৈনিকদিগের একটি ছোট দল এবং কতগুলি স্ত্রীলোক ও শিশু। হলওয়েল অতি সাহস ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ২০শে মে তারিখে নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। নবাব কোম্পানীর কোষাগারে গিয়া দেখিলেন যে তাহাতে ইংরেজেরা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যায় নাই। ইহাতে অপ্রতিভ হইয়াও নবাব হলওয়েলকে ইংরেজ বন্দীদিগের কোন অকল্যাণ করা হইবে না, এই আশ্বাস দিয়া রাত্রে ঘুমাইতে গেলেন। বন্দিগণকে প্রথমে ছাড়িয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু এইরূপ কথিত আছে যে, তাহারা কিছু মদ্য সংগ্রহ ও তাহা পান করিয়া নবাবের রক্ষীদিগের সহিত মারামারি করিতে আরম্ভ করায় রক্ষিগণ উহাদিগকে ঐ দুর্গের কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এই কারাগারটি লম্বায় ১৮ ফুট ও চওড়ায় ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি ছিল। রাত্রিকালে অনেকগুলি বন্দী গ্রীষ্মের প্রকোপে ও তৃষ্ণায় শ্বাসবন্ধ হইয়া মরিয়া গেল। তাহারা সংখ্যায় কতগুলি ছিল তাহার ঐতিহাসিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহাই ইংরেজের ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole Tragedy) নামে কথিত।

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার নূতন নাম আলিনগর দিয়াছিলেন। এই পতন ও লুণ্ঠনের সংবাদ যখন মাদ্রাজে পৌঁছিল তখন রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসনের অধীনে কোম্পানীর এক দল সৈন্য উহা পুনরধিকার করিতে যাত্রা করিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর ক্লাইভের সৈন্যদল ফলতায় অবতরণ করিয়া বজবজের কেল্লা দখল করিল। এডমিরাল ওয়াটসন হুগলী নদী বাহিয়া কলিকাতায় আগমন করিলে নবাবের সৈন্য বাধ্য হইয়া দুর্গত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ইংরেজের পতাকা পুনরায় ফোর্ট উইলিয়মের উপর উড়িল। ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নবাবের সহিত তাহাদের একটি সন্ধি হইল, ইহাতে তাহারা পূর্ব্বের অবস্থা এবং কিছু অধিক সুবিধা পাইলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ইংরেজ কর্ত্তৃক কলিকাতা পুনরধিকার করার পর হইতে মুর্শিদাবাদে নবাবকে উচ্ছেদ করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্রকারী দলের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহারা নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরেজদিগের সাহায্যে তাঁহার উজির ও সেনাপতি মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবে এই সংকল্প করিতেছিল। ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া মীরজাফরের সহিত এক গুপ্ত সন্ধি করিলেন যে, তাঁহার প্রভুকে দূর করিলে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের মসনদ দিবেন। এই ষড়যন্ত্রের এক জন সহযোগী ছিল উমিচাঁদ নামে কলিকাতার এক শিখজাতীয় লোক। সে সুবিধা বুঝিয়া ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিবে এই ভয় দেখাইয়া ঐ সন্ধিপত্রে তাহার সহযোগিতার মূল্যস্বরূপ তাহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে, এই অতিরিক্ত সর্ত্ত লিখাইয়া লইবার জেদ করিল। ষড়যন্ত্রের ইংরেজপক্ষীয়েরা ইহাতে মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু ক্লাইভ শ্বেত ও লাল বর্ণের দুইটি কাগজে একটি করিয়া সন্ধিপত্র করিয়া এবং শেষেরটিতে ঐ সর্ত্ত রাখিয়া দিয়া মুস্কিল আসান করিলেন। নকল সন্ধিপত্রে এডমিরাল ওয়াটসন নাম সহি করিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহার নাম জাল করিয়া লেখা হইয়াছিল। যখন ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে নবাবের সহিত মুর্শিদাবাদের নিকটে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যখন নবাব-সৈন্যের সংঘর্ষ হইল তখন মীরজাফর নিজের অংশ পূর্ব্বনির্দ্দেশমত সম্পাদন করিলেন। আসল যুদ্ধ কিছুই হইল না—সামান্য কিছু কামান দাগা হইল—ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা বাকী সমস্ত কার্য্য করিল। সিরাজকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার পরামর্শ দেওয়া হইল এবং সিরাজ সেইরূপ করিলে সকল সৈন্যই ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। এইরূপে যুদ্ধ জয় হইলে, লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট শাহ আলমকে কিছু নজর দিয়া কোম্পানীর বঙ্গদেশের উপর দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লইয়া আসিলেন। ইহাতে মীরজাফরকে নবাব করা হইলেও তাঁহার হস্তে নিজামত বা শাসনভার ব্যতীত কিছুই রহিল না। কার্য্যতঃ ইংরেজেরা বঙ্গদেশের প্রভু হইয়া বসিলেন।

এক্ষণে কলিকাতার বৃদ্ধি স্রোতের ন্যায় চলিতে লাগিল, আর কিছুতেই বাধা পাইতে পারিল না। মীরজাফর যে ইংরেজদিগকে জমিদারী স্বত্ব দিলেন কেবল তাহাই নহে, উপরন্তু অপরাপর জমিদারদিগকে আহ্বান করিয়া কোম্পানী তাহাদিগের ভাল-মন্দ যা ব্যবস্থা করেন তাহা মাথা পাতিয়া লইতে বলিলেন। তিনি কোম্পানীকে এবং কলিকাতার কর্ম্মচারীদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন। এই অর্থের কিছু অংশ খরচ করিয়া একটি টাঁকশাল এবং কয়েকটি রাজকীয় অট্টালিকা প্রস্তুত করা হইল এবং গোবিন্দপুরে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইল। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শেঠ ও বসাকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই গোবিন্দপুর নগর, যাহাকে ইংরেজেরা নেটিভ উপনিবেশ বা কালা আদমির নগর বলিত, তাহা হইতে এক্ষণে অধিবাসিগণকে সরান হইল। ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত ঘোষাল বংশীয়েরা খিদিরপুরে ভূকৈলাসে উঠিয়া গেলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই "পলাশীর শোষণ" (Plassey drain) সর্ব্বসমেত ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৭ কোটি টাকা হইয়াছিল এবং ইহাতে কলিকাতার সমৃদ্ধি দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছিল।

ইহার পর বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার (Charter) বা অধিকার নূতন করিয়া মঞ্জুর করিবার সময়ে কলিকাতাকে বৃটিশ-ভারতের রাজধানী এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসকে ভারতে বৃটিশ অধিকারভুক্ত সকল স্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া বঙ্গদেশের "ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির" গবর্ণর জেনারেল পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই কলিকাতা ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃটিশ-ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগর ও রাজধানী ছিল, কিন্তু ঐ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতাকে ইহার ঐ গৰ্ব্বিত স্থান হইতে চ্যুত করিয়া ভারতের চিরন্তন রাজধানী ও মোগলের গঠিত দিল্লী নগরীকে সেই স্থানে উন্নীত করেন।

সে যাহা হউক, হেষ্টিংস্ ইংরেজদের কর্তৃপদে বসিয়া কলিকাতার অনেক উন্নতিসাধন করেন। তিনি বর্ত্তমান হাইকোর্টের অঙ্কুরস্বরূপ সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই নগরে কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ও বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ সার উইলিয়াম জোন্সের সভাপতিত্বে সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল গঠিত হইয়াছিল এবং শিবপুরের রয়াল বোটানিক গার্ডেনও খোলা হইয়াছিল। তাঁহার সময় হইতে কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কেন্দ্র হইয়া উঠিল, কারণ, তখন হইতেই রাজ্যের পর রাজ্য এবং দেশের পর দেশ ক্রমশঃ বৃটিশের অধীনে আসিতে লাগিল। প্রায় দেড় শতাব্দী পর্য্যন্ত কলিকাতা সেই উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং পরে ইংরেজ ভারতের একাধিপত্য পাইলে ইহা কিছু কাল আগে পর্য্যন্তও বরাবর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। নগর স্থাপন হিসাবেও ইংরেজের এই উন্নতির সহিত কলিকাতা ক্রমোন্নতির সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে।

জব চার্ণকের সময়ে ঘোষণা দ্বারা এদেশীয়গণকে সুতানুটিতে ইচ্ছামত গৃহনির্ম্মাণ করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। তখন এখানে কোথাও নিম্ন জলাভূমি, কোথায়ও জঙ্গল ও ঝোপ-সমাচ্ছন্ন স্থান, কোথায় বা টুকরা টুকরা উচ্চ ভূমি এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। যখন ক্রমশঃ অনেক লোক এ স্থানে বসতি করিল তখন খাজনা আদায় করিবার জন্য এক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইল। ইনি "জমিদার" নামে পরিচিত ছিলেন এবং সাধারণের শান্তি, সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য ছিলেন। ইনি পুরাতন বা অনাবশ্যক বৃক্ষ, ঝোপ ইত্যাদি কাটাইয়া ফেলিতেন এবং নগরের প্রণালীগুলি (নর্দ্দামা) পরিষ্কার করাইতেন। ১৭২৭

খৃষ্টাব্দে এক নূতন মেয়রের কোর্ট (Mayor's Court) সৃষ্টি করা হইল। ইহাতে এক জন মেয়র ও নয় জন অল্ডারম্যান অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কোর্ট-গৃহ (Court House) যেখানে এক্ষণে সেন্ট্ এণ্ড্রুজ গির্জা আছে সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত যে রাস্তার শেষ প্রান্তে উহা অবস্থিত ছিল তাহা এখনও ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট নামে পরিচিত আছে। এই কোর্টে কিন্তু পৌরসম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইত না এবং নগরে পূর্ব্বোল্লিখিত "জমিদার" বা কলিকাতার কলেক্টর যেটুকু স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান করিতেন তাহার অধিক কিছুই হইত না। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এক জন রাস্তার আমিন (Surveyor of Roads) নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলেও অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতা নগরী অনিয়মিত ভাবে বাড়িতে লাগিল এবং পরিদর্শক উইলিয়াম ম্যাকিন্টশের (William Mackintosh) ভাষায় "ইহার বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল গৃহ, কুটীর ও চালাঘর সকল এবং বড় রাস্তা, গলিপথ, আঁকাবাঁকা ক্ষুদ্র গলি, নর্দ্দামা ও তৎসংলগ্ন আঁস্তাকুড় ও পুষ্করিণী এরূপ অসমঞ্জস ভাবে সন্নিবিষ্ট এবং ময়লা ও আবর্জ্জনার সহিত জড়িত ছিল যে, ইহাতে মানুষের সদ্বিচার, রুচি, সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য জ্ঞান অতিরিক্ত ভাবে ভঙ্গ হইয়াছিল।"

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সার জন শোরের (Sir John Shore) শাসন-কালে প্রায় ৭০ বৎসর কালস্থায়ী ঐ জমিদারের পদ তুলিয়া দিয়া এই নগরের পৌর-শাসনের জন্ত কয়েক জন জাষ্টিস্ অফ্ দি পীস নিযুক্ত করা হয় এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম নিয়মিত ভাবে মিউনিসিপাল কর ধার্য্য ও আদায় করা হয়। এই জাষ্টিস্‌গণ যথাযথভাবে রাস্তা সকল মেরামত ও বাঁধান এবং ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি কার্য্য প্রকৃত উদ্যমের সহিত করাইতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত কয়েক জন গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কয়েকটি সঙ্ঘ গঠিত হওয়ায় ইহারা কলিকাতার অনেক উন্নতি বিধান করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী কলিকাতার প্রধান প্রধান ৩০ জন নাগরিককে লইয়া একটি নগরোন্নতি বিধায়ক সঙ্ঘ বা কমিটি (Town Improvement Committee) গঠিত করিলেন। ইহারা নগরের যথেষ্ট উন্নতি সম্পাদন ও কতকগুলি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, বেলিয়াঘাটা খাল কাটান ও টাউনহল গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার পরে লটারি কমিটি (Lottery Committee) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারা লটারি বা সুর্ত্তির দ্বারা টাকা তুলিয়া কলিকাতার উন্নতি সাধন করিতেন এবং কলিকাতার ময়দানে স্তম্ভশ্রেণীবিশিষ্ট দেওয়াল (balustiade) নির্ম্মাণ, বহু পুষ্করিণী খনন, কতকগুলি সুন্দর বেড়াইবার উদ্যান (Square) স্থাপন এবং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, উড ষ্ট্রীট, ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড সুপ্রীম কোর্টের জজ সার জন পিটার গ্রাণ্টকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া জ্বর হাসপাতাল কমিটি (Fever Hospital Committee) স্থাপন করেন। এই কমিটিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এবং ইহারা কলিকাতা নগরীর সকল রকম বিষয়ে রিপোর্ট বা মন্তব্য দিয়াছিলেন ; যথা, পয়ঃপ্রণালী (drain) প্রস্তুত, ময়লা আবর্জ্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা (conservancy), হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি এবং এই সকলের খরচ নির্ব্বাহের জন্ত কি পরিমাণ কর ধার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহাও নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

শেষোক্ত কমিটির রিপোর্টের ফলে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সপ্ত কমিশনারগণের বোর্ড (Board of Seven Commissioners) স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত জাষ্টিস্‌গণের নগর সংরক্ষণ বিষয়ক সকল কর্ত্তব্য ঐ কমিশনারগণের উপর বর্ত্তিত হইল। ইহারা রাস্তা মেরামত, রাস্তা ঝাঁট দেওয়া ও তাহাতে জল দেওয়া, রাস্তা আলোকিত করা, নর্দ্দমা পরিষ্কার করা ইত্যাদি কার্য্য করাইতেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির সময়ে এই নগরে রাস্তার নিম্নে পাইপ বসাইয়া সর্ব্বত্র উত্তম পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একটি আইন জারি করিয়া উক্ত সাত জন কমিশনারকে চারিটি বেতনভোগী কমিশনারে পরিণত করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আর একটি বৃহৎ মিউনিসিপাল আইন দ্বারা নগরের প্রকৃষ্ট পৌরশাসন উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট-নির্ব্বাচিত ৩ জন কমিশনারে গঠিত একটি নূতন কর্পোরেশন (Corpcartion) স্থাপিত হয়। ইহাই বিবর্দ্ধমান হইয়া বর্ত্তমান কলিকাতা কর্পোরেশনে (Calcutta Corporation) পরিণত হইয়াছে। এই কর্পোরেশন ব্যতীত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা উন্নতিবিধায়ক ট্রাষ্ট (Calcutta Improvement Trust) সংগঠিত হইয়া কলিকাতার নূতন শ্রী সম্পাদন করিয়াছে। ইহা কলিকাতাকে বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া ইহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং অপরিসর রাস্তা সকলকে প্রশস্ত করিয়া, বহু অনাবশ্যক ডোবা ও পুষ্করিণী ইত্যাদি বুজাইয়া দিয়া, আবর্জ্জনাময় স্থানের সংস্কার করিয়া স্থান স্থানে উদ্যান (park) ইত্যাদি করিয়া দিয়া কলিকাতার চেহারা পূর্ব্ব হইতে একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক New Howrah Bridge Commissioners নিযুক্ত হইয়া গঙ্গার উপর নূতন হাওড়ার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া কলিকাতার এক বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

কিন্তু কলিকাতার উন্নতির প্রকৃত ইতিহাস তাহার ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে খুঁজিলে হইবে না। ঐ ইতিহাস এমন একটি প্রেরণায় নিহিত যাহা বৃটিশ ও ভারতীয় উভয়কেই একই ভাবে প্রণোদিত করিয়াছিল। এই প্রেরণায় উভয়ের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ দূর হইয়া গিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সহযোগিতা ভাব আনয়ন করিয়া নাগরিক উন্নতিকল্পে বিধান সকল অনুষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছে।

দিল্লী বা আগ্রা যেরূপ সাম্রাজ্যের প্রধান নগররূপে বিখ্যাত ছিল, অথবা অযোধ্যা বা পাটলীপুত্র, কিংবা উজ্জয়িনী বা বিজয়নগর যেরূপ অতীতের স্মৃতিপূর্ণ নগররূপে গৌরব অধিকার করিয়া আছে, সেগুলির কোনটির মত না হইলেও বর্ত্তমান সময়ের কলিকাতা নগরী নিকটস্থ বা অতি দূরস্থান-নিবাসী বহু স্ত্রী-পুরুষের চিত্তবিনোদন করিতেছে। এই নগরী এক্ষণে ভারতের রাজধানী না হইলেও, এই বৃহৎ ভারত মহাদেশের মধ্যে এরূপ কোন্ নগর আছে, যেখানে সমুদ্রতীরস্থ বড় নগরের ঈর্ষা উৎপাদনকারী এত বৃহৎ বাণিজ্য-ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, বৃহৎ ও অগ্রগামী বিশ্ববিদ্যালয়

গৌরববান্বিত, যথায় ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চিকিৎসা-বিদ্যালয় অবস্থিত, যেখানে বহু হাসপাতাল এবং দাতব্য ও দেশহিতৈষী অনুষ্ঠান বর্ত্তমান, যথায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে বড় বড় অনুষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, যাহা চিত্রশালা, যাদুঘর ও বৃহৎ চিড়িয়াখানা এবং প্রকাণ্ড ময়দান, বেড়াইবার উদ্যান, খেলিবার মাঠ ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত? ভারতের মধ্যে কোন্ নগর এরূপ প্রতিভা ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে যাঁহারা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে উন্নতির অগ্রদূতস্বরূপ ছিলেন যথা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি? ভারতের মধ্যে এমন কোন নগর আছে যে স্থানে জ্ঞানের অধিকারস্বরূপ এক সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ মহামায়ার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া থাকিতেন, যিনি নিজের জীবনে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় দেখাইয়া সনাতন ধর্ম্মোন্মূলনকারী বিধর্ম্মের বঞ্ঝাবেগ প্রশান্ত করিয়া দিয়া ইহার মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং যাঁহার জ্ঞানস্রোত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জগতের সুদূর প্রান্ত সকল আলোকিত করিয়াছিল? এমন কোন্ নগর আছে যথায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এক যুবক কবির কল্পনামগ্ন চক্ষুর্দ্বয় ভাবের আতিশয্যে নিমীলিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কাব্যরসের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত এবং যাঁহার লেখনীপ্রসূত কবিতাগুলি এক্ষণে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানবের অন্তঃকরণে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতেছে? এবং পুনরায় বলিতে হয় যে, ভারতে অন্য কোন নগর এরূপ এক ব্যক্তির গবেষণা-স্থানের দৃশ্য বুকে করিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে যিনি তাঁহার ঐন্দ্রজালিক দণ্ড আবাহিত করিয়াই যেন জীবিত ও প্রাণহীনের মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্যবধানের উপর সেতু নির্ম্মাণ দ্বারা সমগ্র জগতকে অভিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন, অথবা কোন নগর এরূপ চিত্রশিল্পীর জন্মদাতা যিনি সৃজিত চিত্রণের ভিতর দিয়া অতীত ভারতের গৌরবান্বিত চিত্রকলার সহিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিত্র আদর্শের সংস্রবে উৎপন্ন এক নূতন কলানৈপুণ্য মিলিত করিয়াছেন, যাহা ঐ মিলনের ফলে কোন অংশেই প্রকৃতিগত নিজস্ব হারায় নাই? এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতা সামান্যা নগরী নহে।

চোরাবালি

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

এ কি! এ কি!
এমন নারঙী রোদে
ভাঙা বেলা খ'লে যেতে
আরো ত দেখেছি!

কী হ'লো এ?
এমন ভাটীর টানে
বিদেশী মাঝির নাও
কত ভেসে গেছে!

এর মানে কী?
দূরের হারানো গ্রামে
ঝিমোনো ইটের পাঁজা
দেখিনি কী আর!

এ ত চেনা খুব!
তীরে-তোলা ঐ নৌকায়
ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে
প্রায়ই ত' বসি!

কী আজ হঠাৎ!
দু'খানি হাতের মালা
পলকেতে ছিঁড়ে, কেন
উঠে দাঁড়ালাম!!

অসহায়, এ কি অসহায়!
ঠেকা-দেওয়া ভাঙা নৌকো
ন'ড়েছে বা কতটুকু,
কতটুকু হায়!!

ব্যক্তিত্ববনাম অমরতা

অমল ঘোষ

কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তির জীবনী লিখে অমর হব, কি একটা মহাকাব্য, কিংবা প্রকাণ্ড একখানা উপন্যাস, কি নিদেন-পক্ষে একটা দার্শনিক মতামত জাহির ক'রে আমার অমর হওয়া উচিত কি না, সেই কথাই ক'দিন ধরে' কেবলি ভাবচি। কিন্তু এ সমস্ত ভাবনার পূর্বে বিদ্যা-বুদ্ধিটা ঠিক কি পরিমাণে থাকলে যে বাচলামিতে অদ্বিতীয় হওয়া যায়, সে-কথা মুহূর্তেও একবার চিন্তা ক'রে দেখিনি। না দেখি, তাতে যত না ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার সম্ভাবনা ছিল, তার চতুর্গুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, অমর হবার জুৎসই প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে। যাই হোক, অমর হবার উপায় আবিষ্কারের আশায় যখন ইতস্তত: দৃষ্টি সঞ্চালন করছিলাম, তখন হঠাৎ মনে হ'ল, কোনো একটা মহামারী ব্যাপার ক'রে না হয় জ্যান্ত অবস্থায় কিছুদিক বিখ্যাত হওয়া গেল, কিন্তু, তার পর? মরজগতে আপন অস্তিত্ব শেষ হ'বার সংগে সংগে যদি খ্যাতিটুকুও চোখের পলকে লোপাট হ'য়ে যায়, তখন?

মানুষের ইতিহাসে অমরত্ব-পিপাসু মন যে কেবলি আপন অস্তিত্বই প্রতিষ্ঠিত ক'রে যেতে চায়; কিন্তু কেমন ক'রে তা' সম্ভব? সম্ভাবনা হয়তো থাকতো, যদি নিজেকে অন্তত: প্রতিভাবান্ বলে মনে করতাম। কিন্তু শৈশব থেকে এই মধ্যবয়সের মধ্যেও কই, তার ছিটেফোঁটাও তো চোখে পড়ল না? মনে পড়ল Longfellowর উক্তি "A genius is nothing, but an infinite capacity of taking pains." অর্থাৎ সৃষ্টির জগতে যদি যন্ত্রণা সহ্য করবার অপরিসীম শক্তি থাকে, তবে প্রতিভাস্ফুরণ তো মুখের কথা। উপরন্তু, এর সংগে যদি আবার এডিসন সাহেবের 99 percent perspiration plus one percent inspiration জাতীয় Chemical recombinationএর রস-সংযোগ ঘটে, তবে তো সোনায় সোহাগা! কিন্তু এই drugery depressed perspirationএর জগতে এক ফোঁটা inspirationই বা জোটে কোত্থেকে?

আত্মপ্রশ্নের চাপে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে মনের ছোটো-বড় নানান চোরা-গলি বেয়ে উঠে এলেন জীবতাত্ত্বিক Herbert Spencerএর প্রেতমূর্তি। বললেন, "আরে ঘাবড়াস্ কেন, inspiration সে তো চিরদিনই তোর মধ্যে রয়েচে, ওটা না থাকলে কি আর সামনের ঐ জ্যান্ত প্রাণীর মহামেলাকে প্রত্যক্ষ ক'রতে পারতিস্। ওটা যে জীব-সৃষ্টির মূলগত একটা কারণ সেটা ভুলে যাস্ কেন; যদি ভালো করে একটু দেখিস্ তা'হলে সহজেই চোখে পড়বে, সন্তান-সৃষ্টি, বংশ-সৃষ্টি বা প্রজননশীলতার মধ্যে দিয়ে কি ভাবে ওটা জীব-জগতের বিচিত্র ধারাকে সামনে টেনে নিয়ে চলেচে। অমরতার জন্যে এত যে কান্নাকাটি ক'রে মরিস্ কিন্তু জগতে অমর নয় কে? সামান্য একটু পশ্চাৎ দর্শনের সাহায্য নিলেই দেখবি, আজো তোর ঊর্দ্ধতন চতুঃশত চোদ্দ পুরুষের অমরত্ব বিন্দুমাত্রও ঘোচেনি, আজো সে অমরতা বেঁচে রয়েচে তারি মধ্যে, যেটা বাঁচবেও তোর নিম্নবর্তীদের মধ্যে দিয়ে এক ধারাবাহিত জীবতত্ত্বের নিয়মানুসারে।"

তারি বেয়াড়া লাগছিল ভদ্রলোকের বিটকেল ধরণের কথাগুলো। অমরত্ব-পিপাসু মানুষের কাছে এ রকম বেয়াক্কেলে অমৃতত্ব যে কতখানি বদখত, তা' সহজেই অনুমেয়। ভাবলাম, সৃষ্টির inspiration নিয়ে যতগুলি জীবসৃষ্টি আজ পর্য্যন্ত ক'রেছি, তারা তো স্ব স্ব নামেই আপন আপন ক্ষেত্রে বিচরণশীল। কিন্তু সেখানে এই নিবারণ মাইতি নামক ব্যক্তিটির টিকি কোথায়? তিক্ত কণ্ঠে বললাম, ও-সব নীরস তাত্ত্বিকতায় মনযোগ দেবার সময় আমার অল্প, অতএব তুমি সরে' পড়তে পারো। কথার সংগে সংগে একটা বিকট অট্টহাসি হেসে পণ্ডিতপ্রবরের প্রেতাত্মা তিরোধান করল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবতে লাগলাম, যে ভাবে আমি বাঁচতে চাই সে বাঁচার অর্থ তুমি কোত্থেকে জানবে পণ্ডিত? আমার যা' বাঁচবার আকাংক্ষা সে আকাংক্ষা তোমার ঐ জীবতত্ত্বের সন্তানহীন বেঁচে থাকার মধ্যে নেই, আছে আমার আত্মপ্রকাশের ধারাবাহিকতায় মধ্যে যা' মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে ইতিহাসের পাতায় পাতায় শিল্পিরূপে, কবিরূপে, দার্শনিকরূপে। আমি সেই বাঁচাকেই কামনা করি, যা' এই নিবারণ মাইতিরই পরিচয়-লিপিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবে ভাবী কালের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু সেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণা আমার কই? মন বলে, সে প্রেরণা তো এক দিন আসতেও পারে, যেমন ধর না তোমাদের Miltonএর এক দিন এসেছিল। কিন্তু সে কত দিন পরে বল দিকিন? ধৈর্য্য, হাঁ, এর জন্যে চাই অসাধারণ ধৈর্য্য। বললাম, বর্তমানে Longfellowর "Infinite capacity of taking pains"-এর কামারশালাতেই তা'হলে কিছু দিন আমাকে শিক্ষানবিশী করতে হ'বে। তার পর ধৈর্য্যে কিঞ্চিৎ দুরস্ত হলেই 99 percent perspiration plus one percent inspirationএর রস-সংযোগ, অর্থাৎ কি না কেল্লা ফতে।

ভাবলাম, যাক, অমর হবার programmeটা তো এক রকম ঠিক করাই গেল, কিন্তু আদর্শ? কোন্ আদর্শের পন্থা অনুসরণে বর্তমানে আমার জয়যাত্রা সুরু হ'বে?—আবার সমস্যা! নাঃ! শেষ পর্যন্ত দেখচি যেখানকার বাছা সেইখানেই থেকে যেতে হবে, কিছুই সম্ভব হবে না। বিষণ্ন মনে ভাবচি, এমন সময় অন্তর্জগতে উঠল দারুণ কোলাহল, মনে হ'ল মনের কবরখানা থেকে কারা যেন দলবদ্ধ ভাবে তাড়া ক'রে আসচে আমার একটি মাত্র আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিতে। কিন্তু কে দেবে সেই উত্তর, এই নিয়ে বসল এক বিপুল মেছোহাটা। শুনলাম তবু, সবার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে কে যেন বলচে, জেনো, শিল্পের সাধনাতেই জীবনের শ্রেষ্ঠতা, তুমি শিল্পী হ'বার আয়োজন কর। জগতে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান যাদের এ জগতে কেউই তাঁরা মরেননি, মরতে পারেন না। তুমি বিবেচনা ক'রে দেখ, অমরতার দাবী সবার আগে কার?···মনে হ'ল, সত্যিই তো, জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিল্পেরই তো জয় হ'ল চিরদিন, মানুষ শত দুর্ভোগের মধ্যেও তো কই শিল্পকে বিস্মৃত হ'তে পারচে না। শান্তির পথে, অমরতার পথে, আনন্দের পথে শিল্পই তো জীবনকে করে তুলছে সৌন্দর্য্যময়। মুক্তির বিধানও তো শিল্পের দ্বারাই গড়ে' তোলা সম্ভব, যা' মানুষকে মুগ্ধ করবে, মহনীয় করবে, আত্মপ্রকাশের বেগে জীবনকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করবে।···

শিল্পী হ'বার কল্পিত আনন্দে যখন মন ক্রমে ভ'রে উঠছিল, তখন একান্ত অজ্ঞাত একটি প্রশ্নের তীর হৃদয়ে এসে বিদ্ধ হ'ল। চীৎকার ক'রে উঠলাম, শিল্পের যে নানান বিভাগ রয়েছে, তার মধ্যে

সঙ্গীত, কলা, ভাস্কর্য্য, কাব্য, কোন্‌টা আমার তার উজ্জীবনে গ্রহণ করবে? সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে যাঁর কণ্ঠ আমাকে শিল্পে অনুপ্রাণিত করেছিল, তিনিই উত্তর দিলেন, ভাস্কর্য্য সাধনার মধ্যেই আছে শিল্পের মুক্তি, যা' তোমার খ্যাতিকে মানব-সভ্যতায় চিরস্থায়ী ক'রবে, তুমি ভাস্কর্য্য সাধনায় আপনাকে সমাহিত কর।…চোখের সামনে একে একে ফুটে উঠতে লাগল নানান যুগের শিল্প-মূর্তিগুলি—গ্রীসিয়, রোমিয়, মিশরীয়, কত দেশের, কত রকমের। আজো যা' মানুষের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। ভাবলাম, এই পথে দীক্ষা নেওয়াই আমার জীবনের মূলমন্ত্র হোক্‌। কিন্তু, হায়! স্বপ্ন আমার অচিরেই ভূমিসাৎ হ'ল! শুনলাম, পূর্ববর্তীর বক্তৃতা একটা অর্থহীন নৈর্ব্যক্তিকতায় পর্যবসিত করে কে বলচে, "পূর্ব-পশ্চাৎ জ্ঞান না করে যা' হোক একটা করে ফেলবার পরিণাম কি জানা আছে হে? আনন্দে তো বেশ দিশেহারা হ'য়ে পড়েছো দেখচি! কিন্তু তার কথায় বাধা দিয়ে একান্ত বিরক্তিসূচক ভাবে বলে উঠলাম, কে হে তুমি অর্বাচীন, আমার সুখতন্দ্রাকে এমন ক'রে ভেঙে দিতে চাইচো? বলি মতলব কি? উত্তর হ'ল, আমি এমন একটা হোমরা চোমরা কিছু নই হে, নেহাৎ সাধারণই তোমার মত এক জন মানুষ, তবে জীবনের আদর্শ হিসেবে কাব্যকেই খুব নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেচি এই যা'। এবং সেই কারণে, যৎকিঞ্চিৎ যা' আমার অভিজ্ঞতা, তাই থেকেই তোমাকে জানাই যে ভাস্কর্য্য সাধনার পথে এগুবার লোভকে তুমি সংবরণ কর। ও-পথে অমরতার আকাংক্ষা তোমার বাতুলতা মাত্র। জেনো, যা' রূপে, রসে, ছন্দে, সংগীতে জীবনকে প্রাণময় করে তোলে, আদিম পশুত্ব থেকে মানবাত্মার মুক্তি সাধন করে, মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসকে শাশ্বত করে তোলে, মৈত্রী, করুণা ও কল্যাণের বন্ধনে জনসমাজকে একত্রে মিলিত করে, যা' জীবনের উৎকৃষ্টতম পন্থা, তাকে, অর্থাৎ সেই কাব্যসাধনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলে গ্রহণ কর, দেখবে, চিরন্তন হ'য়ে থাকবে তোমার নাম মানুষের ইতিহাসে। ভাস্কর্য্য সাধনায় হয়তো জীবন তোমার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু, সেই প্রতিষ্ঠার আয়ুষ্কাল সংশয়ের। প্রকৃতির যে কোনো একটা বদ্‌ কমের বিপর্যয়ে তোমার প্রতিষ্ঠার ইমারত মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে কালগর্ভে অন্তর্ধান করতে পারে। কারণ যে শিল্পমূর্তির বাস্তব অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব, তাই যদি দুর্ঘটনার নিমেষ ফুৎকারে নিমেষে নির্বাপিত হয়, তবে কোথায় থাকবে তোমার অমরতার স্বপ্ন, সে কথা কি একবার ভেবে দেখেছ? কিন্তু কাব্য কোনো দিন মরবে না, যত দিন মানুষ থাকবে, কাব্যের বাণী তাদের মুখে মুখে, সহস্র ভাষায়, আলাপে-বিলাপে তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সংগে থাকবে জড়িত। সেই জন্য কাব্যকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। তুমি কাব্যাদর্শেরই অনুসরণ কর, অমর হবে। কবি জীবটির অমৃত বচনে যখন মনটা একটা রসাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল, তখন কার কর্কশ পেচকীয় চীৎকারে চমকে উঠলাম, শুনলাম কে বলচে, আরে রহ রহ, জেনে শুনে যদি জীবনটাকে একটা নির্ঘাত accidentএর মুখে এগিয়ে দিতে না চাও, তবে ঐ মন্দ অভিলাষ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর, শোনোনি কি তোমাদেরই কোনো কবির খেদোক্তি:

"Full many a flower is born to blush unseen
And wastes its sweetness in the desert air."

তাই ঐ দশা যদি তোমারও ঘটে তবে অমরত্ব তোমার থাকবে কোথায় বাপু? তাই বলি কি ও সমস্ত riskএর দিকে ঘেঁসো না। তবে সুনাম ছড়াবার মগজ ও আত্মপ্রকাশের কাগজ যদি জোগাড়ে থাকে, তবে কিছুটাক নাম হয়তো জীবিত কালে করলেও তুমি করতে পারো। কিন্তু অসারত্বই যদি তোমার কাব্যাদর্শের ভিত্তি হয়, তবে মানুষের পিত্তি জ্বলে উঠতে বেশী দেরি হবে না। দু'দিন পরেই দেখবে আবর্জনার টানে তোমার কাব্যসৃষ্টি মানুষের নিষ্ঠীবন-বৃষ্টির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েচে। অতএব ও-সব চালাকি ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক চর্চায় লেগে পড়। কালক্রমে চুঁড়ে বা খুঁড়ে আসল মাল যদি কিছু পয়দা করতে পারো তবেই ফয়দা, নচেৎ অমরত্বের তৃষ্ণা তোমার মৃগতৃষ্ণিকার পিছনেই ঘুরে মরবে, দিশে মিলবে না। তাই বলি, বুদ্ধিমানের মত যদি একটু মন দিয়ে দেখ, তা'হলে অবশ্যই চোখে পড়বে প্লেটো, যিশু, কনফুশিয়াস থেকে বুদ্ধ, শংকর, নিমায়েরা কোন্ পথের সব পথিক ছিলেন। এবং কোন্ সব ব্যক্তিদের বাণী জীবনের আদর্শ হয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে এই মস্ত-বড় সভ্যতাটাকে আজো পর্যন্ত সমানে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেচে? যদি নেহাৎই চোখের মাথা না খেয়ে থাকো তবে এতক্ষণে আমার কথার তাৎপর্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হ'য়েচে বলে আশা ক'রতে পারি কি? বললাম, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু কোনো অধ্যাত্মবাদীর জীবন-বেদ সমানে আমার নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলুক এই বা কি রকম কথা? তা'তে আমার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাজনিত অমরত্ব কোথায়? উত্তর হল, এ-যাবৎ কাল তোমার উচ্ছ্বাসিক পরিকল্পনায় অমরত্ব সম্বন্ধে যত কিছু ভাব পরিকল্পিত হ'য়েচে, সেটা একান্তই অজ্ঞানতাজনিত, আসলে অমরত্ব হল তোমার আত্মমুক্তিতে, নিষ্কাম কর্মদ্যোতনায়। অতএব,

"কায়েন সংবর সাধু সাধু-বাচায় সংবর
মনসা সংবর সাধু সাধু সব্বত্থ সংবর।"

মুস্কিল! এ যে বড় কঠিন কথা, এখন যাই কোথায়, শেষে কি বৌদ্ধিক নির্বাণে অমরত্বের বাসনা আমার এমনি করেই নির্বাপিত হবে! অথচ অত-বড় একটা সত্যকে কেমন করেই বা অস্বীকার করি। কারণ বৌদ্ধদর্শনে তনহান অর্থাৎ বাসনাকেই যে সর্ব অনিষ্টের মূল বলে ঘোষণা করা হয়েচে, যার জন্তে অমরত্বের মিথ্যা কামনায় আমি কলুষিত হয়ে পড়চি, কিন্তু চিন্তাসূত্র হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল, শুনলাম অজ্ঞাত এক কণ্ঠস্বর বলচে, ছোকরার মাথাটা দেখচি বিলক্ষণ খারাপ হয়ে উঠচে, তা' বাপু কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখালে ঐ রকমই হয়। যাই হোক, এতক্ষণ তো নানান কিসিমের বাত-চীজ শুনলে, এখন না হয় দু'টো মোদ্দা কথাই শোনো। বলি কি, ও-সমস্ত অমরতার কল্পনা ছেড়ে দিয়ে যাতে সুস্থ মনে হাত-পা ছড়িয়ে দিনকতক অন্ততঃ আরাম করে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে পারো সেই চেষ্টাই কর, চেষ্টা-চরিত্র করে যদি সত্যই কোনো দিন সহজ ও সুস্থ মানুষ বলে নিজেকে মনে ক'রতে পারো সেই দিনই দেখবে অমরতার চিন্তাগুলো স্রেপ একটা মানসিক জটিলতার ফল। হ্যাঁ, এই জাটিল্য বা complexগুলোই তো আজো পর্যন্ত তামাম মানুষকে খালি নাজেহাল করে মারচে। যেদিন মানুষ জানবে complex সৃষ্টির মূল কারণ কি, সেই দিনই দেখবে, মানুষ নিজেকে সুস্থ বলে মনে করতে পারচে। আঘাত-

প্রত্যাঘাত দমন-অবদমনের নাগরদোলায় তিন কুঠরীওয়ালা যে এগোটি (ego) হরবখত তার রং পালটাচ্ছে, তার এক-একটি রংই হল তোমার এক একটি complex বা জড়ীবুটি। এত বেশী জটিলতা ও-গুলোতে বর্ত্তমান যে সোজাসুজি কিছুতেই ওরা ধরা দিতে চায় না। কিন্তু ধরা পড়লেই যে মরা, একথা সরাসরিই তোমার জেনে রাখা ভালো। তাই বলি, সংসার যাত্রায় মন দাও, চারি দিকে নজর রাখো, কখন কি ভাব রং ধরাচ্ছে মনে এ সম্বন্ধে সজাগ থাকো, দেখবে ঝুটমুট ঘাবড়াবার কোনো কারণই আর তুমি খুঁজে পাচ্ছ না। এই থেকেই বুঝবে, এত লোক থাকতে তোমার মনেই বা অমর হ'বার দুরভিসন্ধি জাগে কেন এবং তার উদ্দেশ্যই বা কি? যখনি বুঝবে কিসের ধাক্কায় মন-লঙ্কা তোমার একটা অর্থহীন ফক্কীকারীর দিকে ক্রমান্বয়েই পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেচে তখন না হেসে তুমি থাকতেই পারবে না। তাই বলি, মিথ্যে ও-সব Higer Complexদের বাত-চীতে নিজের Lower Complex গুলোকে আর অনর্থক উত্তেজিত কোরো না। Neurotic হয়ে পড়বে, সংসারে খোসমেজাজে দিনাতিপাত কর, মনস্তাত্ত্বিক হও, আরাম পাবে।

মনস্তাত্ত্বিকের মোদ্দা কথায় যা' বুঝলাম, তা' যে হেলা-ফেলার নয়, রীতিমত চিন্তার বিষয়, সে-কথা বুঝলাম complexগুলোর conspiracy কথা শুনে। মনে হ'ল তাইতো, complex গুলোই তো জীবনের নানান ঘাটে মানুষকে শুধু নাকে কল্লা ক'রে ঘুরিয়ে মারচে। কবি, দার্শনিক, শিল্পী বা যে যেখানেই থাকুক, তাদের ব্যাবহারিক বা মানসিক জীবনের গতি-প্রকৃতির সংচালকই তো হ'ল এই complexগুলো; যা jaundiceএর মত স্বয়ংসর্ব হয়ে মানুষের চোখে পরাচ্ছে রুগ্ন পরকলা, যা'র মধ্যে দিয়ে তারা স্ব স্ব জগতকে করচে পরিদর্শন এবং সেই দর্শনানুসারে তারা আপন আপন অভিজ্ঞতা পরস্পরের কাছে করছে পরিবেশন। Subjecttive sensation বা বিষয়ীভূত সংবেদনায় মানুষ যেমন নানান অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে, অল্প-বিস্তর সব মানুষের মধ্যেই তো সেই subjective sensation বর্ত্তমান, যা নিয়ত বদলাচ্ছে ও তাদের জীবনগতির পথ নির্দ্দেশ করচে, এর হাত থেকে তো কেউই নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। ভূতে-পাওয়া মানুষের মত সকলকার অবস্থা। কেউ দেখছে তার ভূতকে কুৎসিত কদাকার মার-মূর্ত্তি দানবের মত; কেউ দেখছে রক্ত-কমল কর, রক্ত অধরপুট শ্যামচন্দ্ররূপে; কেউ দেখছে ইট-কাঠ-পাথরের জমাট বাস্তব মূর্ত্তি; কেউ বা শুধু মহাশূন্য ছাড়া এই জীবনমহাভূতকে কোনো রূপেই আর দেখছে না। এই যে sensations, এইগুলিই তো গড়ে তুলচে মানুষের যত কিছু complexকে।

এই সত্যই যদি শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে এর হস্ত-মুষ্টি থেকে কি মনস্তাত্ত্বিক নিজেই নিস্তার পেয়েচে? তারো তা জীবন কোনো একটা complexএরই পরিণাম যা' তাকে মন করে আত্মজিজ্ঞাসু ক'রে তুলেছে, এ কথা কি সে নিজেই স্বীকার করতে পারে? তবে যাই কোথা? তবে দাসত্বের দু'টো র আছে এই যা; মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় যাকে বলা হল, superiority ও Inferiority। হঠাৎ মনে হ'ল, এই কঠিন য় সম্বন্ধে মনোবিদ্ সজাগ আছে বলেই হয়তো কথাচ্ছলে superiorityর দিকে উদ্বুদ্ধ হবার ইঙ্গিত এই মাত্র সে আমায় দিয়ে গেল।

কিন্তু, তাই যদি হয়, তবে সব মানুষের কাছে ঐতিহাসিক অমরতার মূল্যই তো অধিক—যেখানে superiorityর পায়েই মানুষ বরাবর মাথা নামিয়েচে। বলেচে, সেই সব superiorএর চরণ-চিহ্ন রেখাই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত, নচেৎ পশুত্বই যে জীবনের সমস্ত কিছুকে পংকগামী করে তুলবে। আজ বোধ হয় সেই জন্যেই, সেই সব মহাজনদের পন্থা অনুসরণের অজ্ঞাত বাসনা আমার মধ্যে একটা নূতনতম complex সৃষ্টির প্রত্যাশায় উন্মুখ হ'য় উঠেছে। যারা কেউ ছিলেন কবি, কেউ দার্শনিক, কেউ বা শিল্পী; কিন্তু তাঁদের আদর্শ তো সকলের সমান নয়? মনের মধ্যে যে সমস্ত অভিমানবদের মৃত ব্যক্তিত্বগুলো একসঙ্গে জেগে উঠেছে, তারা সকলেই যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, এদের কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখবো? কাউকে যে আমি অস্বীকার করতে পারি না। সকলেই যে আমার লোভনীয়, প্রার্থনার উপভোগের বস্তু। তবে কি এদের সকলকেই আমি অস্বীকার করবো? কিন্তু তাতে লাভ হ'বে কি? এমন কি কোনো উপায় নেই, যার সাহায্যে আদর্শের নানান ধারাকে ঠিক একটি ধারার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করি? দেখেছি, মানুষের মধ্যে ঠিক একটি মাত্র ব্যক্তিত্ব থাকে না, থাকে অসংখ্য, গণনাতীত। যারা সকলেই চায় তাদের আপন আপন ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে যেতে। দেখেচি জীবনের নানান ক্ষেত্রে ব্যক্তি ঠিক এক ভাবে কোনো দিন তার একটি মাত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়নি। প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যেকার অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। যার মধ্য দিয়ে কোনোখানেই প্রকাশ পাচ্ছে না কোনো একটি অখণ্ড ব্যক্তিসত্তার। ভাবচি, যা নিজেই ব্যক্তিসত্তাহীন বিবিধ ধারার একটি মাত্র প্রকাশ, তখন কি হবে মিথ্যাকল্পিত আমার আপন ব্যক্তিত্বের অমরতা কল্পনা ক'রে। আত্মজিজ্ঞাসার এই সংকটজনক অবস্থায় চোখে যখন একটা নৈরাশ্যের ধূসর পর্দ্দা নেমে আসছিল তখন হঠাৎ শুনলাম, কে বলচে, যদি আপত্তি না কর, তবে তোমার সমস্যার একটা মীমাংসা আমি ক'রে দিতে পারি। অর্থাৎ মানুষের মনোজগতে যত কিছু সমস্যার হাঙ্গামা সেখানে একমাত্র আমিই পঞ্চায়েতী করে থাকি কি না, সেই জন্যেই বলছিলাম আর কি। অবশ্য যা তোমার অভিরুচি। তবে কর্ণপাত করলে তোমারই কল্যাণ, না হলে, আমার আর কি বল না। তবে জেনে রেখো, তোমাদের অতি উত্তেজিত নৈরাজ্যবাদী পিতৃপুরুষদের জ্বালায় যখন তোমরা নেহাৎই কাহিল হ'য়ে পড়, ঠিক সেই মুহূর্তে উক্ত দুরাত্মাদের প্রতি যদি আমি কড়া শাস্তির ব্যবস্থা না করি, তাহলে অবস্থা যে তোমাদের কিরূপ সঙ্গীন হয়ে পড়ে, যে কোনো উন্মাদশালা পরিদর্শন করলে আমার কথার সারমর্ম তোমরা বুঝতে পারবে। যাই হোক, এতক্ষণে বোধ হয় চিনেছ আমি কে? যদি না চিনে থাকো তবে শোনো, আমি হলুম তোমাদের Ego অর্থাৎ অহং, আমার কাজই হল মধ্যস্থতা করা, অবশ্য মনোজগতের মানোয়ারী ব্যাপারে যে আমি মাঝে মাঝে ব্যাপার মুড়ে দিই না এমন নয়, তবে সেটা কচিৎ।

যাই হোক, এতক্ষণ ধরে তোমার মনোজগতে যে মেজোহাটা বসেছিল সে হাটায় যে সমস্ত জ্যাঠারা তোমায় তাদের ইচ্ছামত ভাও ক্ষাওলে গেল এক কথায় তাদের ল্যাঠা চুকিয়ে এবার নিজের

একটা ব্যবস্থা কর, তাতে অবস্থা তোমার ফিরে যাবে। এখন এই ব্যবস্থা কি রকমটা করলে তোমার সুবিধে হয় সেই রকমটাই প্ল্যান। পয়লা বাহাল ভবিষ্যতে তোমায় ভাবতে হবে, কি জাতের ব্যক্তিত্বের মালিক হচ্চ তুমি। তার পর দেখতে হবে কোন্ দিকে তোমার ঝোঁক এবং সেই ঝোঁক বুঝে 'শোক' করতে পারলে দেখতে পাবে শনৈঃ শনৈঃ তুমি একটা নির্দিষ্ট আনন্দ-লোকের দিকে এগিয়ে চলেচ।

এই প্রতিষ্ঠা পাবার পর দু'চোখে বিশ্লেষণের চশমা আঁটলে দেখতে পাবে, এক দিন যারা তোমাকে কেন্দ্র করে নানা রকমের আন্দোলন চালিয়েছিল তারা আর কেউ নয়, সেগুলো তোমারই ব্যক্তিত্বের নানান ভগ্নাংশ, যারা এক দিন তোমারি মনের নানান অংশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছিল অর্থাৎ যে সময় তুমি নির্বিশেষ ব্যক্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিকতায় বেজায় দিশেহারা হ'য়ে পড়ছিলে। তার পর বুঝতে পারবে, কেমন করে তোমার বা আমার মধ্যস্থতায় সেই সমস্ত মাল-মশলা বা তোমার উর্দ্ধগামীদের ব্যক্তিত্বের নানান রকম বৃত্তিবিলাস যা এক দিন তোমার মনের নানান কোণে পড়েছিল, তাদের সকলকার কান পাকড়ে তোমার বর্তমান আবেষ্টনের অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই করে কি ভাবে আমি তোমার নিজের ব্যক্তিত্বের ইমারতকে গড়ে তুলেচি, যা' থেকে তুমি খুঁজে পেলে তোমার নিজের আদর্শকে, যার অনুসরণ করতে করতে তোমার মনে হ'ল, যা কিছু তোমার কাজ-কারবার তা হল তোমারই অহংস্থ condition reflexএর ডিগবাজী যেটা হঠাৎ এক দিন দাঁড়িয়ে পড়ে ডুগডুগি বাজিয়ে অমরতার নামে এই কথা শোনাতে পারে যে,

চিরকাল বলে যে কথা আছে,
এ জীবন শেষে সেটা কি বাঁচে?
বাঁচে যদি তবে সে কার কাছে?
মানুষ য'দিন আছে, তত দিন থাকবে সবি
মানুষের যত দার্শনিকতা whim, hobby, সকল রবই।
মানুষের ডাক মানুষেই বোঝে, বনমানুষ—
বুঝবে না সেটা, বুঝবে না লাল নীল ফানুষ,—কেন ওড়ে?
বন থেকে কেন টীয়া ধ'রে এনে খাঁচায় পোরে?
যাই হোক, যত মানুষে-কাণ্ড মানুষই বোঝে,
প্রয়োজন মত ভাঙে গড়ে সবই হারায় খোঁজে, নূতন Poseএ।
অমরতা তাই নরগোষ্ঠীর পুকুরে-সীমা,
নূতন সৃষ্টি টেনেছে যেখানে শেষ প্রাথিমা।

অতএব হে নিবারণ মাইতি, বেশী রসিকতায় আর কাজ নেই, যা' আছো, তাই থাকো এবং এই ভাবে জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দাও, তাতে তুমিও খুশী হবে, পাঁচ জনেও বলবে বাহবা বেশ। আমিও খোস-মেজাজে তোমার মনোরাজ্য পরিচালনা ক'রি, বলি, 'জয়তু ভাই নিবারণ মাইতি, বেঁচে থাকো।'

হিংসা

শ্রীসুবোধ রায়

ঝরা পাতা আর ঝরা মুকুলের রাশ,
প'ড়ে আছে যেন ধরার দীর্ঘশ্বাস!—
ঘোষিছে বিধির অকারণ অপচয়।
আঁধার আকাশে তারকার বুদ্‌বুদ্‌,
ঘূর্ণী ফেনায়ে উঠিতেছে অদ্ভুত,
পলকে টুটিয়া ফুটিয়া পাইছে লয়!

কালের অকাল-বন্যার বরষায়
শত সধবার সিঁদুর মুছিয়া যায়,
চিতায় জ্বলিছে কচি-মাংসের ডেলা!
সোনার ক্ষেতেতে নামিছে পঙ্গপাল
রেখে যায় লিপি—ধরণীর কঙ্কাল—
অমোঘ অবাধ বিধির হিংসা-খেলা!

বিষ-কন্যার মাধুরী সর্ব্বনাশা
ফুলের বনেতে কাঁটার সুখের বাসা—
বাতাসে ও জলে মেশানো বিষের নেশা।
সকল শক্তি যা'র হাতে একজোট্,
সেই অক্ষমে প্রতিপদে মারে চোট্,
ভগবান—তার হিংসা করাই পেশা!

স্বর্গে দৈত্যে-দেবেতে চ'লেছে রণ,
মর্ত্তে হেথায় অমানুষ প্রাণপণ
মানুষের টু টি টিপিয়া মারিতে চায়!
মানবতা শিখা নিভে যায় বুঝি, এ কি!
রুদ্র তখনি জাগিয়া উঠিল, দেখি!
প্রলয় আনে যে সৃষ্টির প্রেরণায়!

দ্যুলোকে ভূলোকে যেদিকে নয়ন যায়
ভীষণ-মধুর হিংসার লীলা তায়,
মৃত্যু জাগায় অমৃত পিপাসা প্রাণে,
নটরাজ যদি নৃত্য বন্ধ রাখে,
জীবনেতে আর ছন্দ কোথায় থাকে,
শ্মশানের শিরে গৃহীই পূজিতে জানে

বীরভূমের কবিওয়ালা

শ্রীগৌরীহর মিত্র

ধর্মরাজ, কালী ও সরস্বতী পূজা এবং বারোয়ারী প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ-উৎসব উপলক্ষে তখন এখানে কবিগণের লড়াই হইত, এবং এই কবিগণের লড়াই দেখিতে প্রত্যহ বহু লোকের সমাগম হইত। তবে এখন নানারূপ বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় ইহার প্রসার যেন দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কবিওয়ালারা প্রত্যেকেই ধীশক্তিমান পুরুষ। তাঁহারা কোন মুখস্থ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেন না। আসরে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে গান রচনা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রশ্ন করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীও তেমনি শক্তিশালী পুরুষ। তিনিও তাঁহার প্রশ্নের পাল্টা জবাব তখনই এমন সুন্দর ভাবে দেন যে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। মুখস্থ করিয়া কেহ এমন সুন্দর ভাবে সমাগত জনসাধারণের সমক্ষে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে পারে না। গানের বিষয় সাধারণতঃ পৌরাণিক ঘটনা অথবা দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া হইয়া থাকে। এই কৌতূহলোদ্দীপক কবিগান যে কেবল নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ তাহা নহে; উচ্চ শ্রেণীর ভাল কবিওয়ালাদের নাম ও খ্যাতির কথা আজও দেশবাসী ভুলিয়া যায় নাই। এই সমস্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাজেয় কবিওয়ালাদের কথা ভাবিলে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না। এই স্থলে আমরা বীরভূমের কয়েক জন বিখ্যাত কবিওয়ালাদের সামান্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

(১) অক্ষয় ঠাকুর—বোলপুরের চারি মাইল পূর্ব্বে বাহিরি গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইনি কবিগান করিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

(২) অটল দাস—কবিওয়ালা বলিয়া সুখ্যাতি শুনা যায়।

(৩) অন্নদাচরণ ঘটক—সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা কৈলাস ঘটকের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি প্রথমে কয়েক বৎসর কবিগান গাহিয়া পরে সুবিখ্যাত ৺নীলকণ্ঠের যাত্রার দলে যোগদান করেন।

(৪) কল্প ডোম—নিবাস ইলাম বাজার সন্নিকট বারুইপাড়া গ্রামে। জাতিতে ডোম হইয়া কল্প পুরাণ পড়িয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। শেষ বয়সে কল্প কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলে লোকে বলিত যে, ডোমের ছেলে যেমন বেদ পড়েছিল এখন তেমনি তার সাজা পাচ্ছে।

(৫) কাল বা হারাধন পাল—সঙ্গীত-রচয়িতা ও কবিওয়ালা। নিবাস সিউড়ী রাণীগঞ্জ রাস্তার চতুর্থ মাইলে মুড়োমাঠ গ্রামে। জাতি সদ্গোপ। অতি বৃদ্ধ অবস্থায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হয়।

(৬) কৈলাসচন্দ্র ঘটক—বাঙলা ১২০৫ সালে বীরভূম জেলার সদর সিউড়ী সহর হইতে সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে সিউড়ী রাণীগঞ্জ পাকা রাস্তার পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রভাগা নদী-তীরবর্ত্তী মল্লিকপুর গ্রামে কৈলাসচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরমোহন এবং পিতামহের নাম সর্ব্বানন্দ সরস্বতী। জাতি ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বংশেরই পাণ্ডিত্যের কথা শুনা যায়। সর্ব্বানন্দ কুল-পরিচয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

কৈলাসচন্দ্র মল্লিকপুরের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কচুজোড় গ্রামে বিবাহ করেন, এবং মল্লিকপুর ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। কৈলাসচন্দ্র তদানীন্তন কবিওয়ালাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। নিকটবর্ত্তী বক্কল গ্রামের বলহরি রায় ইঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও কৈলাস যৌবনে বলহরির সঙ্গে পাল্লা দিয়াছিলেন। বীরভূমের কবিওয়ালারা এখনও উল্লেখ করিয়া গান করে—কবির গুরু সেই বলহরি।

ছিরু ঠাকুরের সঙ্গে ফেরে কৈলাসের যাই বলিহারি ইত্যাদি।

কবিওয়ালারা বলেন যে, রামানন্দ ও কৈলাস একই গুরুর শিষ্য এবং বলহরির প্রতিদ্বন্দ্বী।

কৈলাস বহু কবি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভবানী ও সখী-সংবাদ বিষয়ক বহু পদ আছে। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া গান বাঁধিতে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার রচিত আগমনী, বিজয়া প্রভৃতি গান ভিক্ষাজীবীদের মুখে সময় সময় শুনা যায়।

কৈলাসের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ চণ্ডীকালী ও কনিষ্ঠ অন্নদাচরণ।

১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে ৭৫ বৎসর বয়সে কৈলাসের মৃত্যু হয়।

(৭) ক্ষুদিরাম ময়রা—নিবাস সিউড়ীর এক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে করিধ্যা গ্রাম। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল।

(৮) চরণ বা রামচরণ ডোম—নিবাস ইলাম বাজার থানার অধীন ও বাতিকার গ্রামের নিকটবর্ত্তী পাঁচটকুড়ি গ্রাম। বিখ্যাত কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা।

(৯) চণ্ডীকালী ঘটক—কৈলাসচন্দ্র ঘটকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার কিছু দিন যাবৎ কবিগানের দল ছিল বলিয়া শুনা যায়।

(১০) চাকর যুগী—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। অনুমান এক শত পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বে সিউড়ীর ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে পুরন্দরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কবিগানে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন।

(১১) ছিরু বা শ্রীধর ঠাকুর—নিবাস কচুজোড় সন্নিকট জাম্বুনী গ্রাম, পূর্ব্ব-নিবাস শাল নদী-তীরবর্ত্তী কাখুটিয়া গ্রাম। জাতি বৈদ্য। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ও কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক। ইনি গুরুগিরিও করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

(১২) জীবন উড়ে—নিবাস সিউড়ী রাণীগঞ্জ রাস্তার চতুর্থ মাইলে রায়পুর গ্রাম। সঙ্গীত ও কবিগান রচয়িতা।

(১৩) দশরথ মণ্ডল—কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত।

(১৪) নন্দ চক্রবর্ত্তী—নিবাস সিউড়ীর সেহাড়া পল্লী। ইনি খোঁড়া নন্দ নামে পরিচিত।

(১৫) নিতাই দাস—কবিগান রচয়িতা। নিবাস সিউড়ীর পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বক্কল গ্রাম। পিতার নাম কৃষ্ণদাস। ইনি বিখ্যাত কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ১৩০৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

(১৬) বনোয়ারী চক্রবর্ত্তী—নিবাস সিউড়ীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণবর্ত্তী ইলাম বাজার থানার অধীন কুড়মিঠা গ্রাম। ইনি কবিগান রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

(১৭) বলহরি রায়—বিখ্যাত কবিওয়ালা। নিবাস বক্কল গ্রাম। জাতি রাজপুত। পিতার নাম আনন্দচাঁদ রায়। কর্ম্ম-ব্যপদেশে এ দেশে আসিয়া বাস করেন। অনুমান ইঁহার ১১৫০ সালে জন্ম, এবং ১২৫৭ সালে মৃত্যু হয়।

(১৮) মধু গরাক্রি—নিবাস বোলপুরের অদূরবর্ত্তী পশ্চিমে সুরুল গ্রাম। কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা। ইঁহার অধিকাংশ কবিতা পাল্লা দিবার অবস্থা ছিল।

(১৯) মাধব হাড়ি—নিবাস ইলাম বাজার সন্নিকট বারুইপাড়া গ্রাম। কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা। গান রচনা করিবার ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। পাল্লা দিতে যাইয়া ইনি সহজে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

(২০) রত্নাকর স্বর্ণকার—নিবাস কুড়মিঠা। কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত।

(২১) রাইচরণ রায়—নিবাস বকুল। জাতি রাজপুত। পিতা আনন্দচাঁদ রায়। কবিগান রচয়িতা। ১২৯০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

(২২) রাখাল বাগ্‌দী—নিবাস ইলাম বাজার থানার অধীন ও জয়দেব কেন্দুলীর অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বে সনমুনি গ্রাম। কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত।

(২৩) রাখাল হাড়ি—নিবাস ইলাম বাজার সন্নিকট বেলোএগ্রা গ্রাম। বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন।

(২৪) শ্রীরাঘব সরকার—জাতি কায়স্থ। নিবাস বোলপুরের দশ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গছত্র গ্রাম। বিখ্যাত কবিওয়ালা। ইঁহার দৈনিক দক্ষিণা ৪০৲। ৫০৲ টাকা।

(২৫) রাজারাম গণক—নিবাস পুরন্দরপুরের অদূরবর্ত্তী বাঁশশঙ্খা গ্রাম। কবিগান রচয়িতা ও বিখ্যাত কবিওয়ালা।

(২৬) রাধাচরণ রায়—নিবাস বকুল। ইনি পিতা বলহরির রায়ের ন্যায় কবিগানে পটুতা লাভ করেন। ১৩০১ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

(২৭) রামচরণ বাগ্‌দী—নিবাস ইলাম বাজার থানার অধীন ও বাতিকার গ্রাম সন্নিকট গোল্‌টিকুড়ি গ্রাম। কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত।

(২৮) রামতারণ মণ্ডল—নিবাস নান্নুর থানার অধীন ও নান্নুর গ্রামের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে হাটসেরান্দি গ্রাম। কবিওয়ালাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

(২৯) রামরতন মণ্ডল—নিবাস মৌড়েশ্বর থানার অধীন বীরচন্দ্রপুর গ্রাম, কবি-সঙ্গীত রচয়িতা ও বিখ্যাত কবিওয়ালা। ইনি পাল্কীতে চড়িয়া কবি গাহিতে যাইতেন। তৎকালে ইঁহার সমকক্ষ কবি-গায়ক অতি অল্পই ছিল।

(৩০) রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—নিবাস সিউড়ীর বারুইপাড়া পল্লী। কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

(৩১) রামাই ঠাকুর বা রামানন্দ চক্রবর্ত্তী—নিবাস সিউড়ীর চার মাইল দক্ষিণবর্ত্তী চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ রায়পুর গ্রাম। ইনি কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক এবং সাধারণের নিকট রামাই ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন।

(৩২) লালু নন্দলাল—নিবাস কাহারও কাহারও মতে বীরভূম এবং কাহারও কাহারও মতে অন্যত্র। বিখ্যাত কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত। ইঁহার রচিত বহু বৈষ্ণব-পদও আছে।

(৩৩) সারদা ভাণ্ডারী—নিবাস মল্লিকপুর গ্রাম। কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক, ইঁহার কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাতির কথা শুনা যায়। কবিগানে খ্যাতিলাভ করিলেও ইনি জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই।

(৩৪) হরেন্দ্র ঘোষ—নিবাস নান্নুর থানার বঙ্গছত্র (ব্যাঙ ছাতরা) গ্রাম। জাতি সদ্গোপ। বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। কবিগান ব্যতীত ইনি নখদর্পণ, ভূত-প্রেত ছাড়ান, নল চালান প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৩৪৮ সালে অনুমান ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

চোরা-বাজারের টাকা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষ শেষ হয়েছে। রয়েল কমিশন রায় বার করেছেন, পনর লক্ষ লোক মারা গেছেন এবং মাথা-পিছু হাজার টাকা লুঠেছেন মহাজন ও চাউল-ব্যবসায়ীরা। এ হ'ল সরকারী হিসাব; বেসরকারী লোকেরা বলেন, ৩৫ থেকে ৫০ লক্ষ লোক মারা গেছেন আর চালে যে কত টাকা লাভ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে মোট কথা দাঁড়ালো এই—একটা বিপুল পরিমাণ টাকা বহু মানুষের প্রাণ-বিনিময়ে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে জমা হয়েছে।

চোরা-বাজারের রোজগার চালের সঙ্গেই শেষ হয়নি! দুর্ভিক্ষের পর এল মহামারী; অনেকে আবার পয়সা করলেন ঔষধ ও পথ্যে; অন্যান্য জিনিষের কথা ছেড়েই দিলাম, বস্ত্রসঙ্কট এখনও লেগে রয়েছে, কাপড়ের চোরা-বাজারে শোনা যায় অনেকে কোটি কোটি টাকা করেছেন। এত টাকা, কিন্তু গেল কোথায়?

ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া চলে না; দিলেই বিপদ! আয়কর-অফিসার ব্যাঙ্ক-বই দেখলেই ধরে ফেলবে। আয়করই যদি দিতে হল, তা হলে লাভ করে ফল কি হল? সিন্দুকে পুরে খানিকটা রাখা হল, এতে সমূহ বিপদ, চুরি-ডাকাতির অভাব দেশে নেই। একটি সিন্দুক থেকে ৮০ হাজার টাকার কর্‌করে নোট চুরি হয়ে গেল; আবার এক জন ৫৪ হাজার টাকা হারিয়ে পুলিশকে খবর দিতেও ভয় পেলেন।

বাড়ী, ঘর বা সম্পত্তি কিন্‌তে গেলেও বিপদ; কোথা থেকে টাকা এল এ তদন্ত না হলেও যে টাকা সম্পত্তি কিন্‌তে লেগেছে তার উপর কর ধার্য্য হয়ে যাবে। আজ-কাল Excess profit tax, Super tax ইত্যাদি কম নয়।

আমাদের সুচতুর ব্যবসায়ী বন্ধুগণ (!) কি অত সহজে হার মানবেন? তাঁদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে চোরা-বাজারের টাকার সদ্গতি করবার কত রকম ফন্দি বাহির হয়েছে, তারই দু'-একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

চোরা টাকা—হিসেব-পত্র রাখ্‌তে গেলে বিপদ, কবে কার হাতে পড়ে যায়। হিসেব-পত্র নেই, বেসামাল খরচ চলেছে, কত দাম পড়্‌ছে সে দিকে লক্ষ্য নেই এদের। চোরা-বাজারে ১০,০০০ হাজার টাকার মোটর, ৬ টাকা গ্যালন মোটরের তেল, ২৫০ টাকা একটা টায়ার, ৭৫ টাকা বোতল হুইস্কি ইত্যাদি নানান খরচ বিনা দ্বিধায় অনেকে কর্‌ছেন কিন্তু বিপুল উপার্জ্জন অত সহজে শেষ হয় না।

প্রথমে চল্‌লো সোনা এবং রূপা কেনা। টাকা ফেল—যত ইচ্ছে কেন, কেউ কারু দিকে ফিরেও তাকাবে না। সরকার অনেক সোনা, রূপা বেচেছেন কিন্তু কে যে ক্রেতা তার পরিচয় নিয়েছেন বলে মনে হয় না। সোনা রূপা বেচে Inflation রোধ করা হচ্ছে; পরিচয় নিতে গিয়ে ক্রেতাদের ভড়্‌কে দিলে বাজার নষ্ট হবার সম্ভাবনা। কোন এক জন চাউল-ব্যবসায়ী ৫০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ক্রয় করেছেন। ৫।৭ লক্ষ টাকার খদ্দেরের সংখ্যা অগণিত। লোকে বলে, বিকানীর প্রভৃতি দেশের মাটীতে আজ-কাল সোনার তাল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না

খানিকটা পয়সা এরকম করে আটকে রাখা চলে কিন্তু ব্যবসায়ীদের ধাতে তা সয় না। টাকা ফেলে রাখা নষ্ট করারই সামিল; এরা চায় টাকা খাটাতে।

বেনামীতে বাড়ী, ঘর অনেকে কিনেছেন—বেনামদার, পাছে দাবী করে বসে, এই ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধক নেবার ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে। এভাবে দু'-চার লাখ সাম্‌লানো যায় কিন্তু তার বেশী উঠ্‌তে গেলেই চারি দিকে জানাজানি হয়ে পড়ার ভয়—Income tax-ওয়ালাদের কানে যদি পৌঁছে যায়!

বেনামী করেও সব সময় ফাঁকি দেওয়া চলে না, বেনামদারকে চেপে ধরার সম্ভাবনা আছে। এ-পথও বন্ধ করেছেন কয়েক জন ধুরন্ধর। বর্ম্মা-পলাতক কত লোক এসেছেন, কে যে কত টাকা নিয়ে এসেছেন তার কোন হিসেব নেই। এ-রকম লোক যদি হাতে থাকে তা হলে তার মারফৎ বহু টাকার সদ্‌গতি হতে পারে এবং হয়েছে। আবার বর্ম্মাবাসী যদি পয়সাওয়ালা বলে সরকারী সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারে তা হলে একেবারে পোয়া-বারো।

রেসে ও শেয়ার মার্কেটের আয়ের উপর আয়কর ধরা হয় না। জুয়াখেলা মানুষের স্বভাবগত জুয়াকে জুয়া-খেলা হল, মাঝ থেকে আয়কর বাদ পড়লো। অবশ্যই হার হবার ভয় আছে, তবে এই পাকা ব্যবসায়ীরা হাত না পুড়িয়ে বেশ বেরিয়ে আসেন। এক জন ব্যবসায়ী ১৫,০০০ হাজার টাকা দিয়ে শেয়ার মার্কেটের সভ্য হলেন কিন্তু শুনতে পাই এক মাসের মধ্যেই দ্বিগুণ টাকা করেছেন।

এ উপায়ে অনেক ঘুষের পয়সারও সদ্‌গতি হয়েছে। নগদ টাকায় বাজি ধরলে, জিতের টাকা নগদ নেবার কথা কিন্তু এমন কয়েক জন আছেন তাঁরা জিতের টাকা চেক্ ছাড়া নেন্ না। চেক্‌খানি ব্যাঙ্কে জমা দিতে কোন ভয় নেই, পরিষ্কার জবাব তৈরী। কোন অফিসার এক বছরে লাখখানেক টাকা Raceএ জিতেছেন বলে জানা যায়—ভাগ্যবান্ বল্‌তে হবে।

কিন্তু এভাবে ৫০ লক্ষ বা ততোধিক টাকা সাম্‌লানো যায় না। গত কয়েক বছরে অনেকগুলি ছোট-বড় ভারতীয় ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে বেনামীতে টাকা জমা পড়ছে অনেক এবং এই জমার রসিদ দেখিয়ে ধার নেওয়া হচ্ছে। বড় টাকা লেন-দেন হচ্ছে স্বতরাং বিশেষ হারে কারবার হচ্ছে!

বাৎসরিক ২ টাকা হারে জমা করে—অবশ্যই বেনামীতে—নিজের টাকাই আবার ৩ টাকা সুদে ধার নেওয়া হচ্ছে। বন্দোবস্ত অতি চমৎকার! ব্যাঙ্ক ফাঁকি দিয়ে, শতকরা ১ টাকা পেয়ে গেল আর সরকার ফাঁকে পড়লেন শতকরা ৮০ টাকা।

চোরা-বাজারে কি করে টাকা করা হয় তা হয়তো অনেকেই জানেন, নূতনত্ব তার মধ্যে কিছু নেই, তবু দু'-একটি পরোপকারী নামধারী চোরদের মুখোস খোলা দরকার। গরীব লোকদের উপকারার্থ দুর্ভিক্ষের সময়, পরে এবং এখনও কম দামে মাল ছাড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ও আছে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোক ডেকে মহা সমারোহে শুভকার্য্য সুরু হল। ৫০০ শত মণ চাউল আর ৫০০০ খান কাপড় সস্তায় বিক্রী হ'ল। বাকি ৫০০০ মণ চাউল আর ৫০,০০০ হাজার ধুতি-শাড়ী (অনেকটা আবার সরকারী সরবরাহ) বেনামী দোকান মারফৎ বেমালুম চোরা-বাজারে চালান হয়ে গেল। আসল খাতায় পড়লো মোটা লোক্‌সানের অঙ্ক। আয়কর-ওয়ালাদের অঙ্গুলী প্রদর্শন করে মোটা লাভের সহিত সরকারী ও বেসরকারী মহলে বিস্তর নাম হ'ল।

চোরা-বাজার বন্ধ করার অনেক চেষ্টা চলেছে, ধড়-পাকড়, জেল, জরিমানা অনেক হ'ল কিন্তু চোরা-বাজারের টাকা বের হ'ল না। নিয়ন্ত্রণের ফলে খাতায় ফেলা হল সরকার-নির্দ্ধারিত দর; আর দেখানো হল সামান্য; ফাঁকি পড়তে পড়্‌লো গভর্ণমেণ্ট আর গরীব লোক দাম দিল রক্ত-মাংস দিয়ে।

শুধু যে আমাদের দেশে চোরা-বাজার ও তার টাকা আছে তা নয়; কয়েক দিন আগে কাগজে দেখ্‌লাম, বিলেতেও বহু টাকার নোট চোরা-বাজার মারফত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। আমাদের দেশে হয়তো পরিমাণটা বেশী হয়েছে। সাম্‌লে ফেলা সত্ত্বেও কত টাকা এখনও লুকানো আছে তা সঠিক বলা যায় না; তবে একটি বড় ব্যাঙ্কের কর্ত্তার কাছে শুনেছিলাম ৩০০শ ক্রোর টাকা হতে পারে। তার হিসেব কতখানি নির্ভুল বল্‌তে পারি না, এ বিষয়ে সরকারী কোন ইস্তাহার এ পর্য্যন্ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে একটা মস্ত বড় অঙ্ক যে হবে এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে।

এ টাকা যত দিন লুকানো থাকবে, দেশের উপকারে লাগবে না। অসদুপায়ে মানুষের রক্তশোষা পয়সা টেনে বার করবার উপায় উদ্ভাবন করার সময় এসেছে এবং এরই মধ্যে চোরা-বাজার লোপ করার সহজ উপায় রয়েছে! বড় বড় অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ এর কি একটা সমাধান করতে পারবেন না?

গান

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

চাঁদেতে ওই যে বুড়ি চরকা কাটে
দূরে তার ছোট কুঁড়ে যায় যে দেখা
ঐ চাঁদে ওই দখিণ বাটে।
ত্রিকুলে কেউ নেই তার আপন বলায়
শুধু এক নাতনী ছাড়া
চপলা চঞ্চলা সে ডাগর মেয়ে
রূপে সে চাঁদের বাড়া
রূপে সে চাঁদের বাড়া সবার সেরা
সুন্দরী সে রূপের হাটে।

চাঁদনী রাতে যখন আকাশ বেয়ে
জোছনার ঝরণা ঝরে
সে মোরে হাতছানি দেয়
চাঁদের মেয়ে
সে আমায় পাগল করে
সে মোরে পাগল করে পরাণ হরে
নিঠুর নটী প্রেমের নাটে
চাঁদেতে ওই যে বুড়ী
চরকা কাটে।

পুষ্প-জগৎ—অর্কিড-রাজ্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুষ্প-জগতের অন্তর্ভুক্ত অর্কিড-রাজ্যের বিচিত্র বার্ত্তা পাঠকগণকে বলিব। এই জাতীয় পুষ্প-তরু দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ভূমিজাত ও পরগাছা শ্রেণীর। যাহারা স্বতন্ত্র ভাবে সরাসরি মৃত্তিকায় জন্মায় তাহারা ভূমিজাত বা "টেরেস্ট্রিয়াল।" যাহারা অপর বৃক্ষের বক্ষকে আশ্রয় করিয়া পরগাছারূপে জন্মগ্রহণ করে তাহারাই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। ইংরেজীতে ইহারা 'এপিফাইটিক' আখ্যায় অভিহিত। উভয় প্রকার অর্কিডই বৃক্ষ-জগতের অতি বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। তবে ভূমিজাত অর্কিডগুলি সাধারণতঃ উত্তরস্থ নাতি-শীতোষ্ণ মণ্ডলে দৃষ্ট হয় এবং পরগাছা-শ্রেণীর অর্কিড প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলে দেখা যায়। সমুদ্র-পৃষ্ঠের প্রায়ই সমতল রৌদ্র-দগ্ধ দেশগুলি হইতে তুষারাচ্ছন্ন (৩৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখায় অবস্থিত) উচ্চ পর্ব্বত-পুঞ্জপূর্ণ প্রদেশাবলী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই অপরূপ-রূপাস্পদ পুষ্প-পাদপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভূমির উচ্চতা, পর্ব্বতশ্রেণীর বিস্তৃতি, জলীয় বাষ্পবহুল বাতাসের গতি প্রভৃতি ব্যাপারের উপর ইহাদের অবস্থিতি ও আকৃতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। পরগাছা শ্রেণীর অর্কিডগুলির জন্ম এমন কতকগুলি বৃক্ষ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যাহাদের বল্কলের বুকে ইহারা সহজেই আপনাদের শিকড় প্রসারিত করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া উহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ-সাধনের জন্য এমন কতিপয় কীট-পতঙ্গম প্রয়োজন, যাহাদের সহিত উহারা এক প্রকার বিচিত্র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ। এই সম্পর্ক পরস্পর কল্যাণ-সাধক বা 'সিমবিয়োটিক'। অর্থাৎ পুষ্পের কল্যাণ কীট-পতঙ্গমের উপর এবং কীট-পতঙ্গমের কল্যাণ পুষ্পের উপর নির্ভর করে।

এই জাতীয় পুষ্প-পাদপ শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ জীবন-রহস্য জানিবার জন্য যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম প্রযত্ন করেন তাঁহাদের মধ্যে স্প্রেঙ্গেলের নাম উল্লেখযোগ্য। অর্কিডদিগের রমণীয় কান্তির অন্তরালে যে মধুর ভাণ্ডার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তিনি তাহা প্রযত্নসত্ত্বেও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। পরে প্রসিদ্ধনামা প্রাণিতত্ত্ববেত্তা ডারউইন অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে অনুসন্ধান করিয়া উহা আবিষ্কারে সমর্থ হন। তিনি দেখিতে পান, এই জাতীয় পুষ্পের অভ্যন্তরস্থ নলাকার অঙ্গের ভিতরের ও বাহিরের প্রাচীরাবলীর মধ্যস্থলে মধুর গভীর উৎসগুলি লুক্কায়িত রহিয়াছে। যাহা স্প্রেঙ্গেল জীবনব্যাপী অনুসন্ধানেও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং যাহা জানিতে ডারউইনের ন্যায় নিসর্গ-রহস্যজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও বহু বৎসরব্যাপী সাধনা আবশ্যক হইয়াছিল। প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রেরণার প্রভাবে কীট-পতঙ্গমগণ তাহা সহজেই বাহির করিয়া ফেলে। প্রাণ ভরিয়া মধুপানের পর প্রস্থানের সময় এই সকল প্রাণী পুষ্পের পরাগগুলিকে সঙ্গে লইয়া যায় এবং উহাদের সাহায্যে অন্যান্য পুষ্পকে ফলবান করিয়া তুলে। অর্কিডরা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে বংশবিস্তার করিতে পারে না। বাতাস বা পতঙ্গম এই দুইটির মধ্যস্থতা ভিন্ন ইহাদের যৌন-সম্মিলন কিছুতেই সম্ভব নয়। অবশ্য এ বিষয়ে পতঙ্গমরাই অধিক সহায়ক হয়।

আমরা অর্কিডগুলির নিকট হইতে কোন অর্থনৈতিক সহায়তা পাই কি না এই জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগিতে পারে। এই [illegible] উপকার [illegible] নাই। তবে কোন ব্যাপক অর্থনৈতিক [illegible] ব্যাপক না হইলেও যে কল্যাণ বা কাজ [illegible] নহে। ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের দ্বারা অনেক প্রকার অর্কিড প্রাচীন কাল হইতে ভেষজরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, অথচ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এই জাতীয় বৃক্ষ বা পুষ্পের ভৈষজ্যগুণের কথা ১১২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অবগত হইতে পারেন নাই। প্যারিসে (ঐ সময়) সম্পাদিত কতিপয় পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় অর্কিডগুলির অভ্যন্তরস্থ তৈল যক্ষ্মা প্রভৃতি কতকগুলি রোগ আরোগ্য করিতে সহায়ক হইয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগীকে ইহারা উক্ত ভয়াবহ ব্যাধির সহিত সংগ্রামের শক্তি প্রদান করে এই সিদ্ধান্ত অনেকের অন্তরে আশার সঞ্চার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। অর্কিডের অভ্যন্তরস্থ এই তৈল 'এসেনসিয়াল' বা উদ্বায়ী অর্থাৎ বায়ুর সংস্পর্শে বাষ্পাকারে পরিণতি পায়।

ভূমিজাত অর্কিড শ্রেণীর বৃক্ষগুলির যে অংশ ভূমির উর্দ্ধাংশে থাকে তাহারা ওষধির ন্যায় প্রতি বৎসর মরিয়া যায় কিন্তু ভূমির নিম্নে যে নলাকার শিকড়গুলি লুক্কায়িত থাকে তাহারা 'পিরেনিয়াল' অর্থাৎ দুই বৎসরেরও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে। পরগাছা শ্রেণীর অর্কিডগুলির পরমায়ু ভূমিজাত অর্কিডগুলি অপেক্ষা অনেক অধিক। সকল প্রকার অর্কিডজাতীয় বৃক্ষের পুষ্পপুঞ্জের ভিতর পরস্পর বর্ণ ও ও আকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃতি কর্ত্তৃক তাহারা একই প্রণালীতে প্রস্তুত সন্দেহ নাই। এই জাতীয় প্রত্যেক পুষ্পে তিনটি করিয়া সেপ্যাল বা পুষ্প-বৃতি থাকে। পুষ্পদলের বহিরাবরণের অংশগুলিই পুষ্পবৃতি। এই অংশগুলি অন্যান্য পুষ্পের ন্যায় সবুজ না হইয়া বর্ণবিশিষ্ট। পেট্যাল বা পুষ্পের দলগুলির সংখ্যাও তিনটি। এই তিনটি দল সমান নহে। ইহাদের একটি অবশিষ্ট দুইটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকারের। কখন কখন ফলের ন্যায় আকারের দল দেখা যায়। কখন কখন পতাকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট দল দৃষ্ট হয়। গোসাপের চক্ষু বা ভেকের পদাঙ্গুলির মত দলও আমরা কখন কখন দেখিতে পাই। কোন কোন পুষ্পদলকে দূর হইতে পতঙ্গম বা পক্ষিবিশেষ বলিয়া মনে হয়। আমরা এমন অর্কিড দেখিয়াছি, যাহাদের প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি ঠিক প্রসারিত-পক্ষ প্রজাপতির অনুরূপ। এই জাতীয় পুষ্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য পুং-কেশরগুলি গর্ভকেশর বা বীজকোষের চতুর্দ্দিকে গুচ্ছবদ্ধ ভাবে (রক্ষক বা প্রহরিরূপে) বিরাজিত থাকে না। তৎপরিবর্ত্তে ইহাদের বিশেষ ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত পুং-কেশরগুলি গর্ভকেশর সমূহের সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার স্তম্ভ রচনা করে। সেই স্তম্ভের সহিত দুইটি কক্ষবিশিষ্ট একটি গর্ভকোষ সংযুক্ত থাকে। পুষ্প-রেণু বা পরাগগুলি এই কোষের ভিতর সঞ্চিত থাকে। এই সকল অংশ বা অঙ্গের কল-কব্জার জটিলতা আশ্চর্য্যজনক। অন্যান্য শ্রেণীর পুষ্প অপেক্ষা অর্কিড-জাতীয় কুসুমকুলের যান্ত্রিক জটিলতা অধিকতর দুর্ভেদ্য বলিয়াই স্প্রেঙ্গেলের প্রবল প্রযত্নও সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই এবং ডারউইনের ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষেও বহু বৎসর-ব্যাপী সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন হইয়াছিল। পুষ্প-পাদপ-দলের ভিতর অর্কিডরাই প্রথম স্থানের অধিকারী, এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

এই সকল পুষ্পবৃক্ষ এরূপ অজস্র পরিমাণ বীজ প্রসব করিয়া থাকে যে, দেখিলে আমাদের মনে হইতে পারে শীঘ্রই সমগ্র পৃথিবী এই প্রকার পুষ্প-পাদপে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা হয়

না। কেন হয় না, সেই রহস্য আজিও পণ্ডিতগণ পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। অক্লান্ত অনুসন্ধান—সুগভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সত্ত্বেও পুষ্প-জগতের বহু তত্ত্ব পণ্ডিতরা এখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই এই সত্য সংশয়াতীত। কুসুমকুলের কোমল ও কমনীয় কায়ায় বিভিন্ন বর্ণ-রাগ কিরূপে উৎপন্ন হইল এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক সদুত্তর পণ্ডিতরা আজিও পান নাই। অর্কিডের বর্ণ-বৈচিত্র্য সত্য সত্যই চমকপ্রদ। শ্বেত, বেগুণী, নীল, নীল-লোহিত (মভ), পাটল, ম্যাজেন্টা (ইহাও একপ্রকার নীল-লোহিত), বাদামী, গাঢ় লোহিত ও পীত এই দশ প্রকার বর্ণের বিস্ময়কর প্রকাশ ও বিকাশ আমরা এই জাতীয় পুষ্পদলে দেখিতে পাই! কখন কখন এক একটি ফুল একাই থাকে, কখন বা অনেকগুলি একত্র গুচ্ছবদ্ধ ভাবে অবস্থান করে। কখন ইহারা বিনীত ব্যক্তির মত নতমস্তকে দোদুল্যমান থাকে, কখন বা দাম্ভিক লোকের মত (তীক্ষ্ণাগ্র কীলক বা পেরেকের ন্যায়) উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকে।

ভারতবর্ষের অর্কিড শ্রেণীর পুষ্পবৃক্ষগুলির ভিতর 'আয়োরাইড' নামক পরগাছা-জাতীয় একটি পরিবার আছে। এই বিশাল পুষ্প-পাদপ-পরিবারের চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য ইহাদিগকে অর্কিডরাজ্যে একটি উচ্চ স্থান দান করিয়াছে। ইহারা শুধু এশিয়ায় জন্মায়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে এক পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক ইহা উদ্যানে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। আরণ্য অবস্থায় ইহারা রজ্জুর ন্যায় শিকড়ের সাহায্যে বৃক্ষবিশেষের শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া জীবন-সংগ্রামে রত থাকে। সাধারণতঃ জলাশয়ের তীরবর্ত্তী বৃক্ষেই ইহারা জন্মায় এবং সলিলের সন্নিকটবর্ত্তী শাখাসমূহের বক্ষেই লক্ষিত হইয়া থাকে। এই পরম প্রীতিপদ পুষ্পপ্রসূ পরগাছা শিকড়ের পর শিকড় প্রসারিত করিয়া পাদপটিকে এমন নিবিড় অনুরাগের সহিত জড়াইয়া ধরে যে সাধারণ ঝড়ে ইহারা বৃক্ষচ্যুত হয় না। ঝড়ের বেগ অতি প্রচণ্ড হইলেই বৃক্ষের বক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহাদের ভূতলে লুণ্ঠিত হইবার আশঙ্কা থাকে। ঝড়ের সময় ইহারা যখন বৃক্ষের কণ্ঠে, বক্ষে বা কটিতটে সংলগ্ন থাকিয়া অবিশ্রান্ত দুলিতে থাকে তখন অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত হয় বলা চলে। আকৃতি অনুসারে এই আয়োরাইড নামক পরগাছা শ্রেণীর অর্কিডদিগকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটির পত্রগুলি গোল ও স্থূল বা মোটা। অপরটির পত্রগুলি চামড়ার মত পাতলা এবং সমতল ও বিস্তৃত। ইহাদের ফুলগুলি অনেকে একত্র গুচ্ছবদ্ধ ও উল্টা ভাবে দোদুল্যমান থাকে। এই পুষ্প পরিবারের মধ্যে 'অডোরেটাম' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

নেপালীরা এই শ্রেণীর অর্কিডগুলিকে 'কণ্ঠা' আখ্যায় অভিহিত করে। নেপালী নারীদিগের দ্বারা ব্যবহৃত গুরুভার কণ্ঠহার ও এই জাতীয় বৃক্ষের ফুল কতকটা অনুরূপ বলিয়া এইরূপ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই পরিবার-ভুক্ত মাল্টিফোরাম নামক পুষ্পতরু আসাম, নেপাল, সিকিম ও ব্রহ্মদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্পগুলি অডোরেটাম অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর হইলেও একই চিত্তাকর্ষক বিচিত্র বিন্যাস-প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিতেছে। ফুলগুলির রঙ গোলাপী নীল-লোহিত বা নীলের সহিত মিশ্রিত লাল। ফুলের গায়ে বিচিত্র রেখারাজি। 'এরিডাই'ও এই পুষ্প-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া [illegible]। গাঢ় বেগুণীবর্ণের চিহ্নাবলী এই জাতীয় অর্কিডের পুষ্পপুঞ্জের মনোরঞ্জন বৈশিষ্ট্য। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই শ্রেণীর পুষ্পবৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্মায় এই জাতীয় লোবিয়াই নামক ফুলের গাছ দেখা যায়। দীর্ঘকায় ও শাখা-প্রশাখাশালী শ্বেত ও পাটল পুষ্প-মঞ্জরী ইহাদিগের বৈশিষ্ট্য। সিকিমে, বর্ম্মায় ও খাসিয়া পাহাড়ে ভ্যাণ্ডারাম নামক এই জাতীয় অর্কিড জন্মায়। ভ্যাণ্ডা নামক পরিবারের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া এইরূপ নাম। ইহাদিগের পাতাগুলি গোল। ফুলগুলি আকারে বৃহৎ এবং সুনির্ম্মল, শুভ্র ও সুগন্ধি। ইহারা সাধারণতঃ ৫ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

'এনিক্‌টিবিলি' এক প্রকার খর্ব্বকায় ভূমিজাত অর্কিডের নাম। ইহারা 'জুয়েল অর্কিড' নামেও অভিহিত হয়। পরম সুন্দর পত্রা-বলীর জন্য এই আখ্যা। পত্রগুলি দেখিলে মনে হয়, সবুজ ভেলভেটের গায়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের জাল কে যেন জড়াইয়া দিয়াছে। এই জাতীয় অর্কিডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম জ্যানথোফিলাস। ইহা সিংহল দ্বীপে দেখা যায়। এলিউইজিয়াই, সিকিমেনসিস্‌, গ্রান্ডিফ্লোরাম প্রভৃতি এই জাতীয় অর্কিডগুলি ভুটান, সিকিম ও আসামে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের কোন-কোনটির পত্রে স্বর্ণবর্ণাভ নয়নরঞ্জন রেখারাজি বিরাজিত। কোন-কোনটির পত্র তাম্র ও রৌপ্যবর্ণাভ চিহ্নচয়ে বিচিত্র। ইহাদের চাষ সহজসাধ্য। মৃন্ময় পাত্র বা টুকরীতে রোপণ করা চলে, পত্রগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, কিন্তু পুষ্পগুলি চিত্রাকর্ষণে সমর্থ নহে এই সত্য অনেককে বিস্মিত করিতে পারে।

'আরাছনান্‌থিস' জাতীয় অর্কিডগুলি 'ভ্যাণ্ডা' শ্রেণীর অর্কিড-গুলির সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট। অনেক সময় উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। তবে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে জানা যায়, পূর্ব্বোক্ত অর্কিডগুলির পত্রাবলী শেষোক্ত বৃক্ষের পত্রদল অপেক্ষা বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর। আরাছনানথিসের পুষ্প-মঞ্জরীগুলিও অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান্‌ ও দৃঢ়দেহ। ইহাদের জন্মস্থান নেপাল ও সিকিমের শৈলশ্রেণী। এই পার্ব্বত্য দেশদ্বয়ের অধিবাসীরা এই অর্কিডকে 'বাঘ চামড়া' আখ্যায় অভিহিত করে। পুরু ও পীতাভ পুষ্পদলগুলির দেহে আড়া-আড়ি ভাবে অবস্থিত বিস্তৃত ও বাদামী রেখাগুলির জন্যই এইরূপ নাম। ইহাদের লাটিন নামটির অর্থ 'ঊর্ণনাভ পুষ্প।' উক্ত রেখা বা চিহ্নগুলি কখন কখন মাকড়সার জালের ন্যায় হইয়া থাকে বলিয়া এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর অর্কিডগুলির মধ্যে 'ক্যাথকার্টিয়াই' বৃহত্তম। এই জাতীয় 'ক্লার্কির' ফুলগুলি ছোট ছোট এবং উহাদের গায়ের বিচিত্র চিহ্নগুলি সত্য সত্যই মাকড়সার জালের অনুরূপ। এই রমণীয় রেখারাজির জন্যই লেপচারা ইহাদিগকে 'পুর-ভিং' বলে। নামটির অর্থ সুন্দররূপে চিহ্নিত। এই জাতীয় পুষ্পের কান্ত-কোমল প্রান্তগুলি ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। কিঞ্চিৎ উচ্চ আঁচিলবৎ সন্নিবিষ্ট রহিয়া এই প্রান্তগুলির বৈচিত্র্য আরও বাড়াইয়াছে। এই উচ্চাংশগুলি পুষ্প-প্রান্তে এরূপ আলগা ভাবে সংলগ্ন আছে যে অতি মৃদুস্পর্শেও দুলিতে আরম্ভ করে। পুষ্পিতাবস্থায় আরাছনান্থিস জাতীয় বৃক্ষ হইতে এক প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। এই পুষ্পবৃক্ষের চাষ সহজেই চলিতে পারে। অবলম্বন বা আশ্রয়টি দৃঢ় হওয়া দরকার। শিকড়ের নিকট শৈবাল থাকা প্রয়োজন। কারণ, তাহা হইলে তাহারা প্রাণধারণের উপযোগী আর্দ্রতা সহজেই প্রাপ্ত হয়। ইহাদের পত্রগুলি এক প্রকার কীটের দ্বারা আক্রান্ত

হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে সাবান ও ঈষদুষ্ণ জলের দ্বারা ধৌত করিলে ভাল হয়।

'আরাণ্ডিনা বোম্বাসিফোলিয়া'ও ভূমিজাত অর্কিড। ইহাদিগকে সিকিম-নেপালে, উত্তর-ব্রহ্মে, খাসিয়া পাহাড়শ্রেণীতে এবং নীলগিরি-অঞ্চলে জন্মিতে দেখা যায়। লেপচারা ইহাদিগকে 'পা অন্' নামে অভিহিত করে। এই নামের দ্বারা নল-খাগড়া জাতীয় বৃক্ষের সহিত ইহাদের সাদৃশ্যের কথা প্রকাশ পায়। পুষ্পগুলি গোলাপী, নীল এবং নীল-মিশ্রিত লাল এই ত্রিবিধ বর্ণের সম্মিলনে বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। পুষ্পের প্রান্তগুলি উজ্জ্বল ম্যাজেন্টা এবং নির্মল অরেঞ্জে রঞ্জিত হইয়া নেত্ররঞ্জন। হিমাদ্রি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সার জোসেফ হুকার এই পরম প্রীতিপ্রদ পুষ্প-পাদপ দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম—"শৈলশ্রেণীর বক্ষে এক খণ্ড তৃণ-শ্যাম ভূমি। সেই ভূমির বক্ষে পূর্ণরূপে পুষ্পিত এই পুষ্পতরু। ইহা অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক চিত্রের কথা আমি জ্ঞাত নহি।" আরাণ্ডিনা আমাদের কাছে অধিক কিছু চাহে না। সে সামান্যেই সন্তুষ্ট। খানিকটা খোলা জায়গা, সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ সূর্য্যালোক এবং ভূমির আর্দ্রতা এই তিনটি তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই মুক্ত বায়ু-প্রিয় পুষ্প-তরুকে কাচে রচিত কক্ষে রাখিলে সে ক্রমশঃ শুকাইয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে।

বুলবোফাইলাস একটি অতিবিস্তৃত অর্কিড-পরিবার। ইহাদের ভৌগোলিক অধিকার দূর-প্রসারিত। বহু বিভিন্ন দেশে ইহারা জন্মিয়া থাকে। ইহাদের অন্তর্গত কয়েকটি শ্রেণী এত ক্ষুদ্র যে অর্কিডগুলির ভিতর ক্ষুদ্রতম বলিলেও ভুল হয় না। দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ একটি বৃক্ষখণ্ড ইহাদের জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাদের কতকগুলি এরূপ যে বৃক্ষবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কেহ তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইবে না। তবে কয়েকটি শ্রেণী বিশেষ সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কতকগুলির গন্ধ ঠিক নূতন-কাটা ঘাসের ন্যায়। ইহাদের ভিতর এমন কয়েকটি গাছ আছে যাহাদের দেহ হইতে মৃত জন্তুর দেহ-নির্গত দুর্গন্ধের ন্যায় এক প্রকার অত্যন্ত অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। এই জাতীয় সর্ব্বপ্রকার অর্কিডের পুষ্পপুঞ্জের কাণ্ডগুলি বাতাসের অতি মৃদু শ্বাসেও নয়নাভিরাম নৃত্য আরম্ভ করে। এইরূপ নৃত্যের উদ্দেশ্য সেই সকল কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করা যাহারা ইহাদিগকে বংশবিস্তারে সহায়তা করিবে। এই জাতীয় অর্কিড উদ্যানে উৎপন্ন করিতে প্রবল প্রযত্ন প্রয়োজন হয় না। কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া ইহারা একবার মাথা তুলিলে এবং ভূমির আর্দ্রতা ও স্নিগ্ধ আবেষ্টন বজায় রাখিবার জন্য প্রচুর শৈবাল বিদ্যমান থাকিলে ইহাদের পূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

'ক্যালানথিস' শব্দের অর্থ সুন্দর পুষ্প। এই জাতীয় অর্কিডগুলি এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে সন্দেহ নাই। এই ভূমিজাত অর্কিড চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। হিমাচলের পূর্ব্বাঞ্চলে ৪ হাজার হইতে ১ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে ইহারা জন্মায়। গাছগুলির অধিকাংশই বৃহৎ ও ঋজু। পাতাগুলি ভাঁজকরা বলিয়া অধিক মনোরম। প্রসারিত পুষ্পদলগুলির সৌন্দর্য্য সত্যই অসাধারণ। নেপালীরা ইহাদিগকে 'ধোতিজনাথেরি' আখ্যায় অভিহিত করে। বস্ত্রের অনুরূপ দীর্ঘ ও প্রশস্ত পত্রের জন্যই এইরূপ নাম। 'বিকোলা'র পুষ্পগুলি পীতবর্ণ খণ্ডসমূহে মণ্ডিত। ইহাদের গায়ে বেগুণী বর্ণের রেখা এবং দীর্ঘ প্রান্তগুলি নীললোহিত। 'আলপাইনা'র আবাসস্থল ১০ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতপার্শ্ব। পুষ্পের অংশগুলি শুভ্র ও সবুজ বর্ণসম্পদে সমৃদ্ধ এবং পুষ্পের প্রান্তগুলি সিন্দুরবর্ণ। 'হোয়াইটানা'র পীতাভ সবুজ ফুলগুলি সুমধুর সুরভিশালী। পুষ্পের প্রান্তগুলি উজ্জ্বল পীত ও সম-চতুষ্কোণ। নেপালের পর্ব্বতশ্রেণী ইহাদের লীলাস্থল। এলিসমিফোলিয়া টেরাই প্রদেশে জন্মায়। ইহাদের পুষ্পগুলি অনেকে একত্র গুচ্ছবদ্ধ ভাবে প্রস্ফুটিত থাকে। পুষ্পদলের বহিরাবরণ এবং প্রান্তগুলি শুভ্র। প্রান্তগুলিতে ভায়োলেট বর্ণের বা শ্বেত আঁচিলবৎ উচ্চাংশ। এই জাতীয় অর্কিডের ভিতর 'ভেরাট্রিফোলিয়া' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। মে ও জুন মাসে বিশুদ্ধ শুভ্রতায় সমৃদ্ধ বৃহৎ ও সুস্নিগ্ধ সুরভিবিশিষ্ট কমনীয় কুসুমকুল এই শ্রেণীর বৃক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্পের প্রান্তগুলি খোদাই করা এবং পীতবর্ণ চূড়ায় মণ্ডিত বলিয়া পরম মনোরম। 'ক্যালানথিস' জাতীয় অর্কিডের চাষ গৃহে বা উদ্যানে রক্ষিত মৃন্ময় আধারে করা চলে। পাত্রগুলি অর্দ্ধদগ্ধ ইষ্টক সমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পূর্ণ করা দরকার। উহাতে যৎকিঞ্চিৎ বালুকা ও অল্প পরিমাণ পুরাতন গোময় দিলে ভাল হয়। তলদেশে জলের জন্য দুই ইঞ্চি পরিমাপের নালা থাকা আবশ্যক। আধারটি যেন সর্ব্বদা জলসিক্ত থাকে। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ প্রচুর প্রয়োজন।

'সিরহোপেটালাম'ও একটি বৃহৎ অর্কিড-পরিবার। ইহারা পরগাছা শ্রেণীর। এই জাতীয় অর্কিড একা সিকিমেই ১৭ প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহল, আসাম ও ব্রহ্মদেশেও এই জাতীয় অর্কিড দেখা যায়। এই শ্রেণীর অর্কিডের পুষ্পসমূহের অংশগুলি পাতলা চামড়ার ফালির মত। মঞ্জরীর ঊর্দ্ধাংশে ইহারা একটি চমৎকার চক্র রচনা করে। পুষ্পের পাতলা ও হাল্কা সুদৃশ্য দলগুলি সামান্য স্পর্শে বা মৃদু-মন্দ বাতাসে মাথা নাড়িয়া নয়নরঞ্জন নৃত্য আরম্ভ করে। এই অর্কিড চীনেও দেখা যায়। লিণ্ডলির মতে এই জাতীয় অর্কিডের কমনীয় কুসুমকুলের নেত্রাভিরাম নৃত্য দর্শন করিয়াই চীনারা (উহাদিগের অনুকরণে) এক প্রকার বিচিত্র মূর্ত্তি রচনা করে। এই মূর্ত্তির মস্তক ও চিবুক সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতে দেখা যায়। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে এই জাতীয় অর্কিডের পুষ্পসমূহের অংশগুলির মানুষের জিহ্বা ও চিবুকের সহিত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। 'রিফ্রাক্টাম' নামক অর্কিডও এইরূপ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। ফুলগুলি সর্ব্বদা নড়ে বলিয়া ইহাকে উইণ্ডমিল অর্কিডও বলা হয়। এই অর্কিড কুমায়ুন ও সিকিমে দেখা যায়। লেপচারা ইহাকে 'ওন-রিক' বলে। পুষ্পগুলির গাত্রে বিচিত্র চিহ্নাবলীর জন্যই এই নাম। ফুলের রঙ ফ্যাকাশে-সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ। চিহ্নগুলি বেগুণীবর্ণের। 'কাণ্ডাটাম' নামক এক প্রকার অর্কিড আছে, লেপচারা ইহাকে 'সি-পিয়ার' আখ্যায় অভিহিত করে। নামটির অর্থ 'মাছের পুচ্ছের ন্যায়'। পুষ্পবৃন্তগুলি দীর্ঘ এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত। হিমাচলের পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদিগকে দেখা যায়। এই পরিবারভুক্ত 'মেডিইজি' সিংহল দ্বীপেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকা এই জাতীয় অর্কিডকে বংশবিস্তারে সাহায্য করে। আন্দোলিত পুষ্পবৃন্তগুলির উপর দিয়া কীট-দল কম্পিতকায় পুষ্পপ্রান্তগুলিতে উপনীত হয় এবং তার পর মধুর আধারটিতে প্রবেশ করিয়া মধুপান করিবার সময় যৌন

সম্মিলন ঘটাইয়া দেয়। ইহাদিগকে উদ্যানে উৎপন্ন করিবার পদ্ধতি বুলবোফলামের ন্যায়।

'জিৱাটা' এই পরগাছা-জাতীয় অর্কিড বৃক্ষে এবং গিরিগাত্রে উভয় স্থানেই জন্মিতে দেখা যায়। এই সিকিমবাসী পুষ্পবৃক্ষকে লেপচারা 'লুসোনি' আখ্যায় অভিহিত করে। ডিম্বাকার মূলগুলি অনেকটা রশুনের ন্যায় বলিয়া এইরূপ নাম। রশুনকে লেপচারা লুসোন বা লুসন বলিয়া থাকে। এই জাতীয় বৃক্ষের কাণ্ডে দুইটি করিয়া পত্র। দুগ্ধশুভ্র পুষ্পপূর্ণ স্তবকগুলি নতদেহে অবস্থান করে। পুষ্পের প্রান্তগুলি পীত। ইহারা রেখারাজিতে রমণীয় এবং চূড়া-বিশিষ্ট। এই অর্কিড কাহারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না তবে গুচ্ছবদ্ধ ভাবে থাকিতে ভালবাসে। 'করিমবোজা' নেপাল, সিকিম ও মণিপুর রাজ্যে জন্মায়। ইহাদের পুষ্প-সংখ্যা অল্প হইলেও সুরভি বিস্ময়কর। সারা ফুলের গায়ে হরিদ্রাবর্ণ উচ্চাংশ সমূহ। পুষ্পের প্রান্তগুলিতে বাদামী রেখা। এই পরিবারভুক্ত অর্কিডের সংখ্যা অল্প নহে। সিকিম ও ব্রহ্মের দীর্ঘকায় শৈবাল-শ্যাম পাদপদলের বক্ষে 'প্রেকস্ন' নামক অর্কিড জন্মিতে দেখা যায়। ফুলগুলিতে বেগুনী ও গোলাপীর সমন্বয় দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রান্তগুলির বর্ণ পাণ্ডুর হইলেও গুটান ও ঝালরযুক্ত বলিয়া মনোরম। 'প্রেকস্ন এলবা' নামক এই জাতীয় অর্কিড দার্জ্জিলিঙের নিকটে দেখা যায়। লেপচারা ইহাকে পাক্-রিক্ আখ্যায় অভিহিত করে। শব্দটির অর্থ 'মালিকাপুষ্প'। হমিলিস্ ও হুকারিণা (সার জোসেফ হুকারের নাম হইতে) উভয়েই খর্ব্ব-তনু। হুকারিণার পুষ্পগুলিতে নীলের সহিত লালের সম্মেলন দেখা যায়। পুষ্পপ্রান্তগুলির বর্ণ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে। এই অর্কিডগুলি সিঙ্গেলাহ্ নামক পর্ব্বতশ্রেণীতে এবং ৯ হইতে ১০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে জন্মায়। অনেক সময় ইহারা কয়েক দিন ব্যাপিয়া তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন থাকে কিন্তু কোন অনিষ্ট হয় না। প্রকৃতি দেবী ইহাদিগকে তুষারশুভ্র সমুচ্চ শৈলশীর্ষে বাস করিবার উপযোগী শক্তি ও স্বভাবে ভূষিত করিয়াছেন।

ক্রিপটোচিলি একটি ক্ষুদ্র অর্কিড-পরিবার। সিকিম এবং সিংহল এই দুইটি দেশ ইহাদের বাসস্থল। বুরুষের ন্যায় আকারের ফুলগুলি এই শ্রেণীর চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। লেপচারা 'প্যাচ্ছইনিয়া'কে তা-গ্রিন-রিপ্ আখ্যায় অভিহিত করে। শব্দটির অর্থ 'শুক-কীট-পুষ্প'। উজ্জ্বল লাল ও বেগুণী বর্ণের ফুলগুলি অপরূপ রূপের আধার সন্দেহ নাই। ঘন-সন্নিবিষ্ট পুষ্পমঞ্জরীগুলি ইহাদিগকে অধিকতর মনোমুগ্ধকর করিয়াছে। 'কিম্বিডিয়ামস্' একটি বৃহৎ ও বিশেষ সুন্দর পুষ্প-পরিবার। উত্তর-পূর্ব্ব হিমাচল হইতে আসাম ও ব্রহ্মের ভিতর দিয়া চীন পর্য্যন্ত প্রসারিত অতি বিস্তৃত ভূখণ্ড ইহাদের লীলাস্থল। মূলগুলি খর্ব্ব বা খাটো কিন্তু পত্রগুলি দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ। ফুলগুলি বৃহৎ ও চিত্তাকর্ষক। দীর্ঘ ও বঙ্কিম মঞ্জরীগুলি ইহাদিগকে সুন্দরতর করিয়াছে সন্দেহ নাই। লাটিন ও নেপালী উভয় নামই পুষ্পের প্রান্তগুলির গহ্বরাকার অংশগুলিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। 'কিম্বি' এই লাটিন শব্দের অর্থ নৌকা এবং নেপালী নাম বেরালির দ্বারা বিড়ালের মুখ বুঝায়। লেপচারা ইহাকে 'সিয়াম-রিক' বলে। এই শব্দের অর্থ অলঙ্কারী পুষ্প। ৫ হইতে ৭ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে এই অর্কিড জন্মায়। এই জাতীয় কোন কোন পুষ্পবৃক্ষ ৩ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতপার্শ্বেও দেখা যায়। আদিম উদ্ভব-ভূমিতে ইহাদিগকে মহীরুহ-সমূহের শৈবাল-শ্যাম শাখা সকলের সহিত নিবিড় ভাবে সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। এই সকল শাখা-সঞ্চিত সলিল ও (বৃক্ষচ্যুত) পত্রগুলি শিকড় সমূহকে বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন থাকিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি দেবী যেন উহাদের জন্য জল ও সারযুক্ত আধার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বৃক্ষচ্যুত গলিত পত্রগুলি শিকড়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে সন্দেহ নাই।

'পেণ্ডুলাম' নামক অর্কিডের পুষ্পগুলি বেগুনী কিন্তু পুষ্পের প্রান্তগুলি পীত। সিকিমের ৭ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতপার্শ্বে ইহারা জন্মিয়া থাকে। 'লঙ্গিফোলিয়াম্' এইরূপ উচ্চতাতেই উৎপন্ন হয়। সবুজ ফুলের গায়ে বেগুনী রেখারাজি বিরাজিত। পুষ্পের পীতাভ প্রান্তগুলি অবশেষে সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণে পরিণতি পাইয়া বিশেষ প্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছে। প্রান্তগুলির গাত্রস্থ বিচিত্র বেগুনী রেখাগুলিও উল্লেখযোগ্য। 'গ্রাণ্ডিফোরাম' ৫ হাজার ফিট বা উহা অপেক্ষাও উচ্চতর স্থানে অবস্থানকারী। পুষ্পের বৃতি ও দল দুইটি সবুজ এবং প্রান্তগুলি বেগুনী রেখায় মণ্ডিত। এই অর্কিডের বংশধরদিগের দেহে এই বেগুনী ক্রমশঃ লোহিতে রূপান্তরিত। আমরা উপরে কিম্বিডিয়ামস নামক যে অর্কিডের কথা বলিয়াছি উত্তাপে উহাদের চাষ করা তেমন কঠিন নহে। অগভীর টুকরি বা উত্তাপযুক্ত কোন বৃক্ষের বক্ষে ইহারা অনায়াসে বিকাশ লাভ করিতে পারে। শুধু প্রসারের উপযোগী প্রচুর স্থান থাকিলেই হইল। ইহারা দৃঢ় এবং স্থূল মূলগুলিকে স্বাধীন ভাবে প্রসারিত করিতে ভালবাসে। ইহাদিগকে তিন বা চার বৎসরের মধ্যে পাত্রান্তরে স্থাপন করা উচিত নহে। কারণ, বিকাশের সময় ইহারা এইরূপ হস্তক্ষেপ আদৌ পছন্দ করে না। উদ্ভিদ্‌রাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রিয়, ইহা আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি। ইহাদের পূর্ণ বিকাশের জন্য কতকগুলি ভাঙ্গা পাথর, কিছু মোটা বালি, কিঞ্চিৎ গলিত পাতার সার ও শৈবাল প্রয়োজন। সুতীব্র সূর্য্যকর হইতে ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। প্রচুর বিশুদ্ধ বাতাস এবং ভূমি ও বায়ুর আর্দ্রতা ইহাদের উৎকর্ষের অনুকূল।

'কিপরিপেডিয়ামস্' জাতীয় অর্কিডের চাষ করাও কঠিন নহে। পত্র ও পুষ্প দুই-ই প্রীতিপদ। এই জন্য পুষ্প-পাদপপ্রিয় ব্যক্তিরা এবং অর্কিড সংগ্রহকারীরা ইহাদিগকে বিশেষ ভালবাসে। পুষ্পগুলি খর্ব্বকায়। পুষ্পদলগুলির বক্ষে বিরাজিত থলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট অংশ সমূহকে ইহাদের বৈশিষ্ট্য বলা চলে। পুষ্পের প্রান্তের পার্শ্বগুলি গুটাইয়া গিয়া এইরূপ আকারে পরিণত হয়। লাটিন নামটি এবং লেপচাদের প্রদত্ত 'পা-হ্ণ' আখ্যাটি (অর্থ টাকার থলে) এই বৈশিষ্ট্যকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। নেপালীরা ইহাদিগকে 'দার চুখি' বলে। নামটির অর্থ 'খোলা মুখ ও গোঁফ।' নেপালীরা এই পুষ্পবৃক্ষকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট মনে করিয়া পবিত্র জ্ঞান করে। 'কিম্বিডিয়ামস্' ও 'ভ্যাণ্ডা' জাতীয় অর্কিডের মত ইহাদিগকেও সহজে বিভিন্ন বর্ণ-সঙ্কর পুষ্পে পরিণত করা যায়। হিমালয়, আসাম, ব্রহ্মদেশ, ও নীলগিরি ইহাদের বাসস্থল। এই পরিবারভুক্ত অর্কিডদিগের ভিতর আসামবাসী 'ইন্‌সিগনে' সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। পাতাগুলি লম্বা ও সবুজ। পুষ্প-বৃতিগুলির তলদেশ শ্যামল এবং ঊর্দ্ধাংশ শুভ্র কিন্তু বাদামী রেখারাজিতে মণ্ডিত। পুষ্পের দলগুলি পীত কিন্তু প্রান্তগুলি বাদামী

আভায় ভূষিত সবুজ। দশ প্রকার বর্ণ-সঙ্কর বা মিশ্র অর্কিড ইন-সিগ্‌নে হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে 'ইনসিগনিয়ে স্যাণ্ডেরি' উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ব-হিমাচলে ইহাদিগকে দেখা যায়। পুষ্পগুলি হরিদ্রাবর্ণের। শুভ্র পুষ্পবৃতিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদামী চিহ্নে মণ্ডিত হইয়া মনোমদ।

'হিস্নটিসিমাম' আসাম ও ব্রহ্মে জন্মায়। এই অর্কিডের পত্রগুলি সঙ্কীর্ণ ও সবুজ। পুষ্পের অংশগুলির তলদেশ বেগুনীবর্ণের আভায় বিমণ্ডিত সবুজ। উহাদের ঊর্দ্ধাংশ ব্রোঞ্জের স্থায় বাদামী। পুষ্পের প্রান্তগুলি ব্রোঞ্জবর্ণবিশিষ্ট। এই অর্কিডের মূলগুলি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুষ্প হইতে এক প্রকার প্রদাহজনক বিষাক্ত তৈল বাহির হইয়া থাকে। 'ফেয়ারীনাম'কে 'লষ্ট অর্কিড' বা হারাণো অর্কিড নামেও অভিহিত করা হয়। জনৈক তরুণবয়স্ক ইংরেজের দ্বারা চুম্বি-উপত্যকায় এই অকিড আবিষ্কৃত হয়। ইনি যখন এই বৃক্ষ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন সমুদ্রবক্ষেই সহসা ইঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর ভুলক্রমে অর্কিডটি সমুদ্র-সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রসিদ্ধনামা অকিড-সংগ্রহকারী মেসার্স স্যাণ্ডার্স এই বৃক্ষের জন্ম সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আবিষ্কারকের মৃত্যু এবং অর্কিডটির শোচনীয় পরিণতির সংবাদ শুনিয়া ইঁহারা অতিশয় হতাশ হইয়া পড়েন। যিনি এই অর্কিড পুনরায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন তাঁহাকে ১ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে, মেসার্স স্যাণ্ডার্স কর্তৃক এইরূপ ঘোষণা প্রচার করা হয়। মিঃ সীব্রাইট অর্কিডটি পুনরাবিষ্কারে সমর্থ হ'ন এবং এই পুরস্কার লাভ করেন। এই অর্কিডের পুষ্পগুলি একান্ত মনোরম। পুষ্পবৃতিগুলি বেগুনীরেখায় বিমণ্ডিত সবুজ। পুষ্পের গাঢ়-বেগুনী দলগুলি এক প্রকার লোমাকার আবরণে আচ্ছাদিত। দলের শীর্ষটি কতকটা মহিষের শৃঙ্গের অনুরূপ।

'ডেণ্ড্রোবিয়াম'ও একটি জনপ্রিয় অর্কিড। ইহাও সহজে উদ্যানে উৎপন্ন হয়। ইহা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া জন্মিতে দেখা যায়। ব্রহ্মে এবং তথা হইতে এক দিকে মালয় এবং অন্য দিকে চীন পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড ভূখণ্ড ইহাদিগের লীলাস্থল। লেপচারা ইহাদিগকে 'বাদো-রিক' বলে। মূলগুলি ঋজু বা সোজা বলিয়া (ডেণ্ড্রন শব্দ হইতে) ডেণ্ড্রোবিয়াম এই নামের উৎপত্তি। প্রায়ই সারা বৎসর ব্যাপিয়া এই অকিডকে পুষ্পিত দেখা যায়। পুষ্প-মঞ্জরীগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে বিরাজিত থাকিয়া বিশেষ নয়নরঞ্জন দৃশ্য প্রকটিত করিয়া তুলে। বায়ুভরে, আন্দোলিত পুষ্পস্তবকগুলি দর্শকের অন্তরে অপূর্ব্ব হর্ষধারা সঞ্চারিত করে। বর্ণগত বৈচিত্র্য ইহাদিগকে চিত্তাকর্ষক করিয়াছে সন্দেহ নাই। বায়ুপ্রবাহপূর্ণ উষ্ণ আবহাওয়া ইহাদের বিকাশের অনুকূল। হস্তক্ষেপ ইহারাও পছন্দ করে না। পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হইলে সেই সময়ে করা উচিত যখন বৃক্ষটি আর পুষ্প প্রসব করে না—নূতন অঙ্কুর উদ্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাটির পাত্রে ইহারা বেশ বাড়িয়া উঠে। শৈবাল, কাঠ-কয়লা ও পাতার সার—এই তিনটি পদার্থও ইহাদের জন্ম প্রয়োজন। পাত্রান্তরে স্থাপনের অব্যবহিত পরে জল দেওয়া কখন উচিত নয়।

প্রায় প্রত্যেক সংগ্রহকারীর নিকট আমরা 'নোবিলি' দেখিতে পাইব। পরম সুন্দর বর্ণসঙ্কর পুষ্পসমূহ উৎপাদনে ইহাদের উপযোগিতা শুধু অসাধারণ নয়—অদ্বিতীয়। ইহারা নিজেও সুন্দর। ভারত হইতে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড ভূখণ্ড ইহাদের বাসস্থল। ৫ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীতেও ইহারা উৎপন্ন হয়। ইহাদের নেপালী নাম 'কুসুম'। কুসুম শব্দের অর্থ ফুল নয়, বেগুনী বর্ণ নেপালীরা ইহাদিগকে কুর্সনও বলে। এই শব্দের মর্ম্ম উজ্জ্বল লেপচাদের দ্বারা এই অর্কিড 'সা-মন-রিক' আখ্যায় অভিহিত হয় অর্থ 'রক্তবর্ণ পুষ্প'। বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইলেও ম্যাজেণ্টা জাতীয় নীল-লোহিতই ইহাদের প্রধান বর্ণ-সম্পদ। পুষ্পাংশগুলি সাদা বা গোলাপী। পুষ্পের প্রান্তগুলি 'মভ' জাতীয় নীল-লোহিত। ইহার বৃহৎ ও বিস্তৃত। প্রান্তের পার্শ্বগুলি ম্যাজেণ্টা রঙের। উহাতে ভেলভেটের স্থায় বেগুনী আঁচিল বা উচ্চাংশ। এই পুষ্পবৃক্ষে যুগপৎ বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়া দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে। আমরা আসামে একটি বৃক্ষে একই কালে ২ শত ২০টি ফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। প্রচুর রবিকর ও বায়ুর অবাধ গমনাগমন ইহাদের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। মূলগুলি যেন স্থূল থাকে অর্থাৎ পুষ্টির অভাবে ক্ষীণকায় না হইয়া যায় সেই দিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। পাত্র-পরিবর্ত্তন না করাই ভাল। করিতে হইলে নূতন অঙ্কুর বাহির হইবার পর করা উচিত। অগ্নিপক্ক ইষ্টকের টুক্‌রা, কাঠ-কয়লা, গলিত পাতার সার, যৎসামান্য বালুকা ও শৈবাল এই সকল ইহাদের বিকাশের সহায়ক।

'মসচাতুন' নামক অর্কিডের কুসুমকুলের প্রান্তগুলি গোক্ষুর সর্পের ফণার অনুরূপ বলিয়া ইহাকে লেপচারা 'পা-তুন-রিপ' (গোক্ষুরফণা-বিশিষ্ট পুষ্প) বলে। 'ক্রিসানথ্‌ম' নামক অর্কিডের বাহ্য সৌন্দর্য্য অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা স্বর্ণের স্থায় পীতাভ বর্ণে সমৃদ্ধ ভেণ্ড্রোব নামক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সিকিমে এই শ্রেণীকে 'সোণাকেরি' বা স্বর্ণপুষ্প বলা হয়। এক প্রকার অর্কিড সার জোসেফ হুকারের নাম হইতে 'হুকারিয়ানাম' আখ্যায় অভিহিত। এই পুষ্প-বৃক্ষ আসাম ও ব্রহ্মে দৃষ্ট হয়। পুষ্পশালী বৃন্তগুলি প্রায়ই ৫ ফিট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই জাতীয় বড় বড় পুষ্পগুলির অপরূপ রূপ সত্য সত্যই আশ্চর্য্যজনক। পুষ্পের প্রান্তগুলিতে দুইটি করিয়া বেগুনী অংশ রহিয়াছে। শঙ্গিকর্ণু সিকিমে ও খাসিয়া পাহাড়ে দেখা যায়। ফুলগুলি শুভ্র। ফুলের প্রান্তগুলি কতকটা শৃঙ্গের স্থায় আকারের বলিয়া লেপচারা 'রণ-রিপ' বা শৃঙ্গ-পুষ্প বলে। নেপালীরা তাহাদিগের দুই প্রকার কর্ণাভরণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদিগকে 'লুকা' ও 'সিতি' আখ্যায় অভিহিত করে। নেপালী লোক-সাহিত্যে এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। পুরাকালের কোন নেপালী নৃপতি তাঁহার কর্ণ হইতে রত্নাভরণ খসাইয়া উহা একটি শিলাখণ্ডের উপর রাখিয়াছিলেন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি ঐ কর্ণাভরণটির কথা ভুলিয়া যান এবং উহা ঐ শিলাখণ্ডের উপরেই পড়িয়া থাকে। ঐ রত্নরচিত কর্ণ-ভূষাটি ক্রমশঃ সেই শিলার সহিত সংলগ্ন হইয়া অবশেষে এই জাতীয় পুষ্পে পরিণতি পায়।

'গুড্‌উয়েরাজ' ও 'স্পাইরাণথিস' উভয়েই ভূমিজ অর্কিড। শেষোক্ত নামটির কারণ এই অর্কিডের ফুলগুলির আকৃতি স্পাইরালের স্থায় পেঁচাল। বৃন্তের চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত শ্বেত বা পাটল পুষ্পগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। দলগুলি দলাকার। পত্রগুলির বৈচিত্র্যও চিত্তরঞ্জক। এই অর্কিড শুধু ভারত ও ব্রহ্ম নয় পৃথিবী ব্যাপিয়া

রুপার্ট ব্রুক্

শ্রীসময় সরকার

পৃথিবীতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, যদিও যুদ্ধের মত এত বড় ক্ষতিকর জিনিষ আর কিছুই নেই। এর কারণ পৃথিবীতে কখনও স্বার্থান্বেষী দস্যুর অভাব ঘটবে না, এবং সৎলোকে এই অন্যায় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি একত্র করে বাধা দেবে। প্রথমে মিষ্ট কথায়, সদুপদেশে ঘৃণ্য কাজ হতে দস্যুদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা হয়, কিন্তু এ সমস্ত নিষ্ফল হলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর অস্ত্র ধারণ করতে হয়। অন্যায়কে বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তির ফল হয়ত বস্তুতান্ত্রিক জগতে কল্যাণকর না হতে পারে, কিন্তু এই বাধা দেওয়ার মধ্যে যে কল্যাণ অন্তর্নিহিত থাকে, মানুষের স্বভাব সেই কল্যাণকে স্মরণ করে অন্যায়কে বাধা দেওয়া। বিখ্যাত ইংরেজ কবি—নাট্যকার John Drinkwater তাঁর Abraham Lincoln নামক নাটকে Lincolnএর মুখে বলেছেন—The best of us have an instinct to resist aggression if it won't listen to persuasion. You may say it's a wrong instinct, I don't know······I don't believe it's a wrong instinct.

জার্মাণী যখন ১৯১৪ সালে তার লোলুপলালসা নিয়ে পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়ে ইয়োরোপের প্রতিবেশি-রাষ্ট্রের উপর আঘাত হানতে নামল তখন এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে শান্তিকামী ইংলণ্ডকে অস্ত্র গ্রহণ কর্‌তে হল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রবৃত্তি ও অনুপ্রেরণা জোগাতে ইংলণ্ডের কয়েক জন যুবক-কবি নিজেদের ক্ষমতা যথাসাধ্য প্রয়োগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। এমন কি তাঁদের মধ্যে কয়েক জন কবি, যথা, Rupert Brooke, Julian Grenfell, Francis Ledwidge, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen ইত্যাদি এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়ে সৈন্যদলে যোগদান কর্‌লেন। এই তরুণ কবিরা প্রথমে উৎসাহের আতিশয্যে যুদ্ধের ভয়াবহ দিকটিতে দৃষ্টিপাত করেননি, কিন্তু Sassoon এবং Owen পরে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

এই সকল কবিদের মধ্যে অগ্রণী হচ্ছেন রুপার্ট ব্রুক্। যুদ্ধ আরম্ভ হবার মাসখানেক পরেই তিনি নৌবিভাগে যোগদান করেন, কিন্তু আট মাস বাদে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পরে তিনি সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর নিকট আদর্শের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন ও St. Rupert of England নামে খ্যাত হলেন। ইতিপূর্বেই কবি হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পরেই নিজ ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি সমসাময়িক সাহিত্যে সুদৃঢ় আসন অধিকার কর্‌লেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল তাঁর মাত্র আটাশ।

১৮৮৭ সালে ৩রা আগষ্ট রাগবীতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন রাগবী-স্কুলের house-master এবং ঐখানেই রুপার্টের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয়। কাব্যে বুৎপত্তির জন্য স্কুলে তিনি

বিরাজিত বলিলে ভুল হয় না। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতেই ইহাদিগকে দেখা যায়। য়ুরোপে ইহাদিগকে 'লেডিজ্ ট্রেসেস্' নাম দেওয়া হয়। অতীতের মঠবাসী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীর স্মৃতি ইহারা উদ্রিক্ত করে। মধ্যযুগে মঠবাসী মঙ্করাই গাছ-গাছড়ার রহস্য ও ব্যবহার জানিতেন। এই জন্য বহু য়ুরোপীয় পুষ্পের নাম যিশুজননী কুমারী মেরীর নামের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট। প্রবল প্রাণশক্তির প্রভাবে প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই পুষ্পবৃক্ষদ্বয় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া থাকে। 'রেট্‌সা' গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ৩ হাজার ফিট উচ্চ উপত্যকাতেও বাস করে। ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাসস্থান মন্দগামী নদ-নদীর তীরবর্ত্তী শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় জলা-জঙ্গলগুলি। আমরা ব্রহ্মসীমান্তের ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এবং সর্প সমূহের লীলাস্থল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে এই পুষ্পবৃক্ষ অনেক দেখিয়াছি। এক প্রকার তীব্র গন্ধের দ্বারা ইহাদের বিদ্যমানতা দূর হইতেও জানা যায়। ফুলগুলি প্রথমে দেখা যায় না। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে চামড়ার কালির ন্যায় পত্রপুঞ্জের অন্তরালে এক প্রকার বিচিত্র চিহ্নপূর্ণ পাটল পুষ্প-মঞ্জরী দৃষ্টিগোচর হয়। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই অর্কিড আবিষ্কৃত হয়। ঐ সময় একটি গাছ ৭২ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত। 'রেণানথেরি' ব্রহ্ম ও আসামের অধিবাসী। ইহাদের সৌন্দর্য্য অসাধারণ। আরণ্য অবস্থায় বৃক্ষগুলি ১৬ হইতে ১৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। পত্রগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ইঞ্চি। পুষ্পমঞ্জরীগুলি লম্বা বা ধনুকের ন্যায় বক্র উভয় প্রকারই হইয়া থাকে। ফুলগুলি দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত রক্তবর্ণ প্রজাপতি-দল উড়িতে উদ্যত হইয়াছে।

'কজিনিয়া'র অপরূপ রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া হ্যারল্ড ম্যাভেঞ্জ ইঞ্চ সুন্দর কবিতায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম, রক্তবর্ণ পুষ্পরাজি তিমিররাশিকে রতনে খচিত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। 'রেনামথেরি' নামক পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ভিতর শ্বেত হইতে মিশ্র গোলাপী পর্য্যন্ত নানা রকম বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা অর্কিড-জগতে বিরল সেই বিরল নীলও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান। এই শ্রেণীর ভিতর 'সেরিউলিয়া' সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহা খাসিয়া পাহাড়ে উইলিয়াম গ্রিফিথ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। পরে সার জোসেফ হুকার ইহা দেখেন এবং সেই দেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটি' কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত বা গৃহীত হয়। ২০ বৎসর পূর্ব্বে শিলঙের সন্নিকটস্থ প্রায় প্রত্যেক এক বৃক্ষে এই অর্কিড দেখা যাইত। কুঞ্জবনগুলিকে উহারা মায়া-কাননে রূপান্তরিত করে বলিলে ভুল হয় না। আমরা শিলঙ ও চেরাপুঞ্জির মধ্যবর্ত্তী শৈলমালায় এই অপরূপ রূপাস্পদ পুষ্প-পাদপ দেখিতে পাইয়াছি।

'ভ্যাণ্ডা রক্সবার্ঘিয়াই' আমাদের দেশে প্রচুর জন্মায়। এই পরগাছা জাতীয় অর্কিড রাস্না আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহার অশেষ ভৈষজ্যগুণ আয়ুর্ব্বেদে কীর্ত্তিত। বাঙ্গলার রাস্না প্রায়ই আমগাছে জন্মিতে দেখা যায়। আমরা অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য বৃক্ষের বক্ষে ইহাদিগকে দেখিয়াছি। রাস্না, নাকুলী, পুরসা, সর্পগন্ধা, পলঙ্কষা, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী, সুগন্ধি ও শ্রেয়সী—এতগুলি নাম সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃত ভাষা এই অর্কিডকে দান করিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বা ভাষায় একটি বৃক্ষের এতগুলি নাম দেখা যায় না। রাস্না—কফ, বায়ু, শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাত-শূল, উদর-রোগ, কাস, জ্বর ও বিষ নাশ করে। বিশেষ ৮০ প্রকার বাত রোগ ইহার দ্বারা নষ্ট হয়। এই পরিবারভুক্ত নাকুলী'র লাটিন নাম অফিয়োক্সিলন সার্পেন্টিন্যম'। সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক, ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নাশ করা ইহাদের বিশেষ গুণ।

পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজ King's Collegeএ প্রবেশ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য, মিষ্ট আলাপ, তীক্ষ্ণ মেধা ও কবি-প্রতিভার গুণে তিনি ছাত্রদের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন। ছাত্রদের সকল অনুষ্ঠানেই তিনি অগ্রণী হতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে Marlowe Dramatic Society স্থাপন করতে সাহায্য করেন ও নিজে এ্যামেচার অভিনয়ে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে Fabian দলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এই দলের প্রতি তাঁর অনুরাগ চলে যায়; কারণ, তাঁর মনে যে আদর্শ কল্পনায় গড়ে উঠেছিল সেই আদর্শের অভাব ছিল এই দলের। এই সময়ে তিনি যা বলেছিলেন তা হতে তাঁর কবি-মনের পরিচয় পাওয়া যায়—

"There are only three things in the world : one is to read poetry, another is to write poetry, and the best of all is to live poetry !"

এই সঙ্গে ক্লাসিক্স্-এ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি পড়া-শুনাতেও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। তার পরে বছর তিনেক তিনি প্রধানতঃ কেম্ব্রিজের কাছেই Grautchesterএ ছিলেন ও কবিতা লিখে ও এলিজাবেথীয় নাটক পাঠ করে তাঁর সময় কাটত। ১৯১১ সালে তিনি মিউনিক্ ও ফ্লোরেন্স পরিভ্রমণ করেন ও পর বছর বার্লিন ঘুরে আসেন। ১৯১১ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই Poems প্রকাশিত হয়। দু'বছর বাদে এলিজাবেথীয় নাট্যকার John Webster সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে তিনি Fellowship অর্জন করেন। এই বছরেই মে মাসে তিনি আমেরিকা ও দক্ষিণ সমুদ্র ভ্রমণ করতে যায় হন ও পর-বছর জুন মাসে লণ্ডনে ফিরে আসেন। অল্প দিন বাদেই শুরু হল মহাসমর। ব্রুক্ সেপ্টেম্বর মাসে Royal Naval Divisionএ Sub-lieutanant হিসাবে যোগদান করে এ্যান্টোয়ার্প অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন ও ১৯১৫ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী দার্দানেলিস অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই সময়েই তাঁর জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়্‌ল। সেই বছরেই ২৩শে এপ্রিল Aegean সাগরে Scyros দ্বীপে blood poisoningএর জন্য তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রুপার্ট ব্রুকের জীবনে রোমাঞ্চকর ঘটনার বাহুল্য নেই। তাঁর অল্প জীবনের প্রায় সবটাই অতিবাহিত হয়েছে পড়া-শুনা ও কবিতা লেখার মধ্যে। ১৯১১ সালে তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ Poems প্রকাশিত হবার সময়ে বয়স ছিল চব্বিশ। এই বইখানির মধ্যে তাঁর আরো অল্প বয়সের কবিতা স্থান পেয়েছে। এর অনেকগুলি কবিতাই ১৯০৫-১৯০৮এর মধ্যে রচিত। এই কবিতাগুলিতে কাঁচা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি তখন মহা উৎসাহের সঙ্গে লিখে গেছেন—ছন্দের সৌন্দর্য ও শব্দাড়ম্বরের প্রতিই লক্ষ্য তাঁর বেশী, কোনও রকম সংযমেও তিনি আবদ্ধ হননি—তাই কাব্য-সৌন্দর্য অপেক্ষা ভাষার-অলঙ্কারই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯০৮-১১ সালের কবিতাগুলিতে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। তখনও অবশ্য ভাবানুভূতির প্রকাশের মধ্যে আতিশয্য ও গভীর আত্মপ্রসাদজনিত একটা উচ্ছ্বাস তাঁর কবিতাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে, তথাপি তাঁর কবিতাগুলিতে সত্যিকারের সৌন্দর্যশ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ের কবিতার মধ্যে কবি ডন্-এর প্রভাবযুক্ত Human Body ও আরো গোটা তিনেক সনেট অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। Dining-room Tea কবিতাটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর পরে ১৯১২ সালে তিনি The Old Vicarage, Grautchester নামে একটি অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন। এখানে তাঁর খেয়াল-কল্পনা নম্র-মধুর ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নির্মল কাব্যরসের দ্বারা সিঞ্চিত হয়েছে। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিউমারের সহিত সৌন্দর্যের সংমিশ্রণের প্রথম নিদর্শন এই কবিতাটি। কবিতাটি জার্মাণীতে লেখা বলে এর মধ্যে ইংলণ্ডের প্রতি গভীর প্রেমের উল্লেখ রয়েছে। এই সময় হতেই ব্রুকের রচনা সত্যিকারের কাব্য হয়ে উঠতে লাগলো। Clouds এবং Psychical Research নামক সনেট, Tiare, Tahiti, The Great Lover ইত্যাদি কবিতাগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক। এই কবিতাগুলি ব্রুকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত 1914 & other Poems নামক কাব্যগ্রন্থে The South Seas নামক পরিচ্ছেদে সঙ্কলিত হয়েছে। সবে মাত্র তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেশের লোকের কাণে এসে পৌঁছেচে এমনি সময়ে প্রকাশিত হ'ল এই গ্রন্থখানি—সকলেই উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সহিত এই তরুণ সৈনিক কবির কবি-প্রতিভার প্রতি সচেতন হল ও সর্বত্র তাঁর যশঃ ছড়িয়ে পড়ল। গ্রন্থখানির প্রথমেই আছে 1914 নামক একটি পরিচ্ছেদ। এর অন্তর্গত সনেট পাঁচটি যুদ্ধের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই লেখা। সনেট কয়টির নাম Peace, Safety, The Dead ও The Soldier। কবিতাগুলি রচনা করার সময়ে কবি মহাসমরে লিপ্ত ছিলেন ও সৈনিক-জীবনের কর্তব্যের গুরুভারে ভারাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু তথাপি বিষয়-বস্তুর উপর দখল ও সুচারু লেখনীর গুণে কবিতাগুলি সুষমা-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের যুবকেরা যে একটা মহান্ আদর্শের জন্য যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন সেই কথাটাই তিনি পরিষ্কার করে এই সনেটগুলিতে বলেছেন। এই আদর্শকামী যুবকেরা পঙ্কিল জগৎকে নির্মল করে তোলবার ব্রত নিয়ে মৃত্যুর দ্বারে যেতে প্রস্তুত। মৃত্যুর ভয় তাঁরা করেন না। পৃথিবীর সমীরণ, সুনির্মল প্রভাত, মানুষের সুখ-দুঃখ, ঘনকৃষ্ণ নিশীথ রাত্রি, কূজিত বিহঙ্গম ইত্যাদি অমর জিনিষের সঙ্গে তাঁরা চিরকাল অমর হয়ে জড়িত থাকবেন। তাঁরা যে সৌধ রচনা করেছেন, মহাকাল সে সৌধ কোন দিনই ধ্বংস করতে পারবে না। নিরাপদে তাঁরা এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যাবেন—

> Safe shall be my going,
> Secretly armed against all death's endeavour ;
> Safe though all safety's lost ; safe where men fall ;
> And if these poor limbs die, safest of all.

এই আত্মোৎসর্গী যুবকরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা বিসর্জন দিয়েছেন ! তাঁরা পার্থিব সকল সুখ-সুবিধাই হারিয়েছেন কিন্তু তারা উচ্চ আদর্শ, স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ—এই সব গুণগুলির পুনরুদ্ধার করেছেন। এঁদের

মৃত্যুর পরিবর্তে ফিরে এসেছে ইংলণ্ডের লুপ্ত মহিমা। কবি তাঁর তৃতীয় সনেটে এই সৈনিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলছেন—

"Blow, bugles, blow! They brought us, for our death,
Holiness, lacked so long, and Love and Pain,
Honour has come back, as a king, to earth,
And paid his subjects with a royal wage;
And Nobleness walks in our ways again;
And we have come into our heritage."

চতুর্থ সনেটটিতেও কবি এই সৈনিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। নিজেদের জীবনে সুখ-দুঃখ-প্রেম ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না রেখে এঁরা যৌবনেই পৃথিবী হতে বিদায় নিচ্ছেন—কারণ তাঁদের হৃদয়ে জেগে আছে মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসা। কিন্তু কবি স্থির জানেন যে, এই স্বদেশপ্রেমিক যুবকেরা স্বর্গে অমর শান্তি ও সম্মান লাভ করবেন। কারণ

"He leaves a white
Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining peace, under the night."

এই কবিতাটির মধ্যে Tennysonএর "Ode on the death of the Duke of Wellington" কিংবা "Charge of the Light Brigade"এর উগ্র স্বদেশপ্রেমের সন্ধান নেই, আছে একটি দরদী কবির করুণ বেদনা-অনুভূতি—যিনি চেয়েছেন বিস্মৃত সামান্য সৈনিকদের স্মৃতিকে স্মরণ রাখতে।

রুপার্ট ব্রুকের গভীর স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত পরিচয় পাই পঞ্চম সনেট "The Soldier"এর মধ্যে। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে এক জন খাঁটি ইংরেজ। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর পরেও তিনি ইংরেজ থাকবেন। বাস্তবিক তাঁর কল্পনা, তাঁর চিন্তাধারা সমস্তই ইংলণ্ডীয়। ইংলণ্ড তাঁকে ধারণ করেছে, তাঁকে মানুষ করে তুলেছে—তাঁর সব কিছুই ইংলণ্ডের; এমন কি মৃত্যুর পরেও তিনি English Heavenএর কামনা করেন—

"If I should die, think only this of me;
That there is some corner of a foreign fild
That is for ever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once, her flowers to love, her ways to room,
A body of England's, breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home
And think, this hreat, all evil shed away,
A pulse in the eternal mind, no less
Gives somewhere back the thoughts by England gives;
Her sights and sounds; dreams of happy as her day;
And laughter, learnt of friends; and gentleness,
In hearts at peace, under an English heaven."

এই কবিতাটি চিরকাল রুপার্ট ব্রুকের নামের সঙ্গে বিজড়িত থাকবে, কারণ, তাঁর মনের পরিচয় মেলে এর মধ্যে। এটি যেন তাঁর Epitaph—শান্ত এবং সুন্দর। অবশ্য কাব্যবিচারে এটি প্রথম ও তৃতীয় সনেট অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

কবিতা ব্যতীত নাটক রচনার প্রতিও রুপার্টের ঝোঁক ছিল, কিন্তু Lithuaina নামে একটি এক অঙ্কে সমাপ্ত Melodrama ভিন্ন তাঁর অন্য কোন নাট্য রচনা নেই। গদ্য তিনি অল্পই লিখেছেন, তবে গদ্যেও তাঁর নিপুণতা ছিল। John Websterএর সম্বন্ধে প্রবন্ধ বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—এই প্রবন্ধটির মধ্যে তাঁর সমালোচনা ও বিশ্লেষণী-শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তাঁর Letters from America শীর্ষক গ্রন্থখানি সরসতায় পরিপূর্ণ ও মাধুর্যে অতুলনীয়। এই পত্রগুলিতে তাঁর দৃষ্টির বিস্তৃতি লক্ষ্য করে আমরা মুগ্ধ হই।

অনেকে রুপার্ট ব্রুকের তরুণ বয়সে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে হয়ত তাঁর পরিণত বয়সের সম্ভাবনার জন্য দুঃখ করবেন। কিন্তু কবি হিসাবে রুপার্ট ব্রুককে ঠিক শ্রেষ্ঠ বলা চলে না, যদিও তাঁর কবিতার মধ্যে অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠত্বের আভাস পাওয়া যায়। তিনি নির্মল দৃষ্টিতে জগৎকে দেখেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা অনুসারে সুস্পষ্ট ভাবে জগতের চিত্রাঙ্কন করেছেন। তথাপি রুপার্ট ব্রুকের নাম চিরকাল সকলের মনে জেগে থাকবে তাঁর হৃদয়ের উচ্চ আদর্শের জন্য—চিরকাল কানে বাজবে তাঁর সমর-সনেটগুলি, যে-গুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে মিঃ চার্চিল বলেছেন—"A voice had become audible, a note had been stiuck, more true, more thrilling, more able to do justice to the nobility of our youth in arms than any other—more able to express their thoughts of self surrender, and carry comfort to those who watched them so intently from after."

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৮

শশাঙ্কদের সাঁতরায় যাইবার প্রায় বছর দেড়েক পরের ঘটনা এটি। আরও মাস-ছয়েক গেল এবং ইহার মধ্যে শশাঙ্কর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। পেটের ব্যামো,—এ্যালোপ্যাথি এবং কবিরাজীর পুরাতন চিকিৎসায় আর ফল পাওয়া গেল না, রসিকলাল বেলেতেজপুর থেকে একবার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। পেটটা ধরিল, কিন্তু দুর্ব্বলতাটা যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

দুইটা বৎসর কাটিয়া গেছে, মা-বাপের মুখ দেখা নাই। বড় জায়গা, নিজের স্কুল-জীবন তো আছেই, এ ছাড়া পাঁচটা হুজুগও আছে—যাত্রা, অপেরা, কথকতা, গঙ্গায় বাচ-খেলা; সমাজপতিত্ব লইয়া গোঁসাই-লাহিড়ীদের দলাদলি সম্পর্কে আরও পাঁচটা হুজুগ,—অন্য সময় অতটা কষ্ট হয় না। তাহা ভিন্ন আগে যতটা হইত, এখন অভ্যাসের জন্যও ততটা হয় না। কিন্তু অসুখের সময় মা ভিন্ন কাহাকেও মনেই পড়ে না। অন্য সময় মায়ের মুখটা আবছায়া-আবছায়া হঠাৎ কখনও চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, কিন্তু অসুখের সময় সেই মুখ নিজের বেদনার মধ্য দিয়া বড় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অভিমান হয়; নিস্তারিণী দেবী গায়ে হাত বুলান, শশাঙ্ক মুখ ফিরাইয়া চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকে, যে-আদর পাইতেছে তাহার মধ্যে তৃপ্তি পায় না। ঠাকুরমায়ের চেয়ে মাকে সাধারণ ভাবে সে বেশি ভালবাসে এমন নয়, তবে পাইবার উপায় নাই বলিয়া মনটা সেইখানে পড়িয়া থাকে।···এক এক সময় মুখ ঘুরাইয়াই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। নিস্তারিণী দেবী ব্যাকুল হইয়া পড়েন; পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"আসুক, এসে নিয়েই যাক্, কি, যা-হয় একটা ব্যবস্থা করুক; বুড়ো মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে। আমারও যে অদৃষ্টে কি আছে,—নিজে ঘাড় পেতে যে কেন নিতে গেলাম!"

শশাঙ্ক ফোঁপানোর মধ্যেই বলে—"আমি যাব না!"

একে নিরীহ প্রকৃতির, তায় রোগ-দুর্বল, অল্প কথাতেই অভিমান আসিয়া পড়ে।

শৈলেন একটু অন্য ধরণের। তাহারও অভিমান যে না হয় এমন নয়, তবে শরীরটা সুস্থ বলিয়া তাহার অবসরটা কম। তাহা ভিন্ন যখন হয় অবসর অভিমানের, তখন তাহার সঙ্গে এক ধরণের আক্রোশ মিশানো থাকে একটু। ওর মনটা একটু নাটকীয় সুরে বাঁধা বলিয়া কেমন করিয়া একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেছে যে উহাদের দুই ভাইকে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছে। কাজটা খুবই অন্যায় হইয়াছে, তবে শৈলেনের তাহাতে বিশেষ দুঃখ নাই,—ও নিজের কল্পনা লইয়া বেশ এক রকম থাকে। মনে হয়, দাদার সঙ্গে রামচন্দ্রের বেশ সাদৃশ্য আছে—ঐ রকম ভালো মানুষ, দুর্বল; নিজে যেমন দয়া-পরবশ, তেমনই আবার দয়া জাগানও অপরের মনে;—ভাগ্যিস্ লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্ববান প্রভৃতি ছিল, নহিলে কী অবস্থাটাই যে হইত! দাদাও সেই রকম; ভালোমানুষ বলিয়া আসলে নির্বাসনটা দাদাকেই, শৈলেন যেন লক্ষ্মণ-ভাই হইয়া স্ব-ইচ্ছায় আসিয়াছে। ভাবিতে বেশ লাগে; একটু ভবঘুরে গোছের ধাতটা, পাঠশালার অতিরিক্ত সময়টা এখানে-ওখানে, পুকুরধারে, পোড়ো ভিটায়, আগাছার জঙ্গলে ঘুরিয়া মনের ভাবটিকে পুষ্ট করিয়া ফেরে। পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য, এমন কি—গ্রামে হনুমানের যথেষ্ট উপদ্রব থাকায়—কিষ্কিন্ধ্যারও অভাব হয় না। দাদাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য বাবার ওপর যে অভিমানটা হয় তাহাতে এক ধরণের আক্রোশও মিশিয়া থাকে। এইখানে মূল রামায়ণের একটা রকমফের হয়,—শৈলেন এক একবার ভাবে এমন কিছু একটা ঘটিবে—কিছু একটা—যাহা রামায়ণেও কস্মিন্ কালে ঘটে নাই—যাহার জন্য বাবার আর আপশোষের শেষ থাকিবে না। বাল্মীকির আশ্রমে লব-কুশ দুই ভায়ের কাছে রামচন্দ্রের সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজয়ের কথাটা কল্পনার সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণের কাছে দশরথের পরাজয়ে রূপান্তরিত করিয়া বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। যদি কখনও আক্রোশের চেয়ে অভিমানের ভাগটা বেশি থাকে, তখন লক্ষ্মণের মৃত্যুতে দশরথের শাস্তির কথাই ভাবিতে ভালো লাগে। বাবা অনুতপ্ত হইয়া লইতে আসিয়াছেন দুই ভাইকে,—আসিয়া দেখেন শৈলেন নাই, হঠাৎ কি হইয়াছিল, যে দিন পৌঁছিলেন বাবা, তাহার আগের দিনই মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেছে। শৈলেন কল্পনাকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া কোন্ দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে—মনে একটি কথাই ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে—বেশ হয়—বেশ হয় তা'হ'লে—বেশ হয়···আসিয়া শৈলেনকে দেখিতে পাইতেছেন না, সবাই বলিতেছে—দাদাকে বড্ড ভালোবাসত বলে অভিমান করে চলে গেছে···"

চাহিয়া চাহিয়া মনটা গুমরিয়া উঠে,—বাবা আসিয়াছেন, শৈলেনকে ডাকিতেছেন—আওয়াজ পর্য্যন্ত যেন শুনিতে পায় শৈলেন।

মায়ের উপর অভিমান হয় না, ঠিক যে-কারণে কৌশল্যা বা সুমিত্রার উপর কোন অভিমান ছিল না লক্ষ্মণের। মায়ের জন্য কষ্টই হয়। মা এদেরই দলে, নিতান্ত অসহায়, এদেরই দুই ভাইয়ের মতো শক্তিমান্ বাবার অন্যায়ের আধার। মনে পড়ে আসিবার সময় মায়ের মুখখানি—চোখে জল, জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শাল্পেনির মধ্যে থেকে শৈলেন দেখিতে লাগিল—অনেক দূর পর্য্যন্ত, তাহার পর শাল্পেনিটা হঠাৎ মোড় ঘুরিল।

মাহেশের রথের মেলা চলিয়াছে। শশাঙ্কের শরীরটা রসিকলালের ঔষধ খাইয়া এখনো ভালো আছে, কিন্তু তাহার যে এখানে থাকা চলিবে না এটা সবাই বুঝিয়া গেছে, বিপিনবিহারীকে লেখাও হইয়াছে কয়েক বার। ভালো আছে; কিন্তু পাছে কোথায় যাইয়া কোন রকম অনাচার করে সেই জন্য তাহাকে চোখে চোখে রাখা হইয়াছে, বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় নাই।···রথের মেলায় আর কিছু নয়—পাঁচুর মায়ের পাঁপরভাজা আর ফুলুরি বিশেষ লোভনীয়। প্রথমটা শৈলেন রাজি হয় নাই, তাহার পর দাদার কাতরাণির জন্য গোপনে কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়; আজ বিকাল থেকে দাদার পেটের ব্যথাটা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। শৈলেন বসিয়াছিল দাদার কাছে খানিকক্ষণ, তাহার পর ঠাকুরমা আসিতে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ দাদার খাবার চাওয়ার কাতরাণি অপেক্ষা দাদার পেটের যন্ত্রণার কাতরাণি শোনা বেশি ক্লেশকর, তদুপরি ঠাকুরমা আসিয়া গে'ছেন, কাতরাণির কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিবে। শৈলেনের মনটা খুবই বিষণ্ণ আজ। দাদার কষ্টের বৃদ্ধির জন্য বাবার উপর অভিমান আর আক্রোশটা খুবই বাড়িয়া গেছে। পাঁপড়-বেগুণি জোগাইয়া দিবার কথা ভুলিয়া ঐ দু'টি অনুভূতিকেই পুষ্ট করিয়া লইয়া অলস ভাবে পায়চারি করিতে করিতে, রেলের চবখির পাশে যে নীচু দেয়ালটা আছে তাহার উপর আসিয়া শৈলেন বসিল। সন্ধ্যা হয়-হয়; আকাশে মেঘ থাকায় ছায়াটা আরও গাঢ় বোধ হইতেছে, মনের সঙ্গে আকাশের সুর তানে-লয়ে একেবারে যেন মিশিয়া গেছে। লক্ষ্মণের মৃত্যুর কথা আজ চক্ষু দুইটিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া এমন একটা তৃপ্তি দিতেছে যে, শৈলেন খুব ফেনাইয়া ফেনাইয়া সেই চিন্তাটাকেই মনের কোণ পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে।···বেশ হয় যদি আজই মরিয়া যায় শৈলেন।···একটা ট্রেন সিগ্‌ন্যাল দিয়াছে—দূরে লাইনের বাঁকে ইঞ্জিনের মুখ দেখা গেল—হুস্-হুস্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে—বেশ হয় যদি হঠাৎ এমন কিছু হয় যে গাড়িটা লাইন ছাড়িয়া শৈলেনের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, ব্যস, খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে শৈলেন কোথায় গেল···ও স্বর্গে থেকে শুনিবে বাবা ওর নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছেন।···গাড়িটা আসিয়া পড়িল বলিয়া; শৈলেন দেওয়ালের মাথা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি রাস্তার নিরাপদ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল—হুস্ হুস্ করিয়া গোটা কতক দ্রুত উগ্র শব্দ; হঠাৎ সেটা ভেদ করিয়া একটা টানা শব্দ উঠিল—কে ডাকিল—"শৈলে—ন!"

শৈলেন ইঞ্জিনটা যে দিক্ থেকে আসিতেছিল সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মনে হইল শব্দটা যেন পিছন দিক্ থেকে আসিল। সে সচকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"কে?"

যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় তাহাকে ডাকিবার মতো কেহ নাই; ঘুরিয়া চারি দিকে দেখিল, কেহই নাই। শৈলেন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই আর একবার হাঁকিল—"কে ডাকলে?—কে?" সঙ্গে সঙ্গে তাহার গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। সামনে চৌধুরীদের অপরিচ্ছন্ন বাগানটা,—লম্বা লম্বা কতকগুলা দেবদারু গাছ, তাহার পিছন দিকে মুকুন্দদের পোড়ো বাড়ীটা। পোড়ো মানে ভাঙা-চোরা নয়,—একটা কি দোষ আছে, ভাড়াটে হয় না।

একটা হাওয়া উঠিয়া মেঘের উপর আর এক পয়দা মেঘ আনিয়া ফেলিয়া সন্ধ্যাটাকে হঠাৎ আরও মলিন করিয়া ফেলিল। রাস্তায় লোক নাই বলিলেই হয়, খুব দূরে এক-আধ জন আসন্ন বর্ষার ভয়ে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে; শৈলেন যে কি করিবে যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। আকাশ-বাতাস, সেই অকারণ শব্দ, পোড়ো বাড়ী—সব মিলিয়া অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল যে মনে হইল, যে-মৃত্যুকে শৈলেন খুঁজিতেছিল সে যেন হঠাৎ বিকৃত মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যায় না কিন্তু কি এক রকম অদ্ভুত ভাবে অনুভব করা যায়।···শরীরটা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। জোর হাওয়ায় বাগানটা আর পোড়ো বাড়ীটা হঠাৎ শব্দমুখর হইয়া উঠিল—শৈলেনের আহত চৈতন্যে যেন মনে হইল—সামনে, পিছনে, চারি দিকেই চাপা হিস্-হিস্ শব্দ হইতেছে—শৈলেন!—শৈলেন! শৈলেন!—শৈলেন!!——শৈলেন!!···

বাড়ীর দিকে পা বাড়ানো অসম্ভব—পোড়ো বাড়ী আর বাগানটা টানা ঐদিকেই চলিয়া গেছে। এদিকে হাত-পা ক্রমে অবশও হইয়া আসিতেছে। কি হইত বলা যায় না, তবে এই সময় দাশুর-মা'কে আকাশকে গাল পাড়িতে পাড়িতে শৈলেনদের বাড়ীর দিক্ থেকেই হন্-হন্ করিয়া আসিতে দেখা গেল। সে বাড়ী বাড়ী গঙ্গাজল জোগায়, কাঁখে একটা ঘড়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"শৈল ঠাকুর যে গো,—অসময়ে এখানে?"

শৈলেন বলিল—"এই একটু ছিদামের দোকানে যাব, বাতাসা কিনতে।"

"তা এ দুর্য্যোগে যাবে কেন? আমায় পয়সা দাও, বাড়ীতে দিয়ে এসব খ'নি।"

বিপদে শৈলেনের বুদ্ধি জোগাইয়া গিয়াছিল,—ছিদামের দোকানটা গঙ্গার ধারেই; সঙ্গে যাওয়া হইবে আবার সঙ্গেই ফিরিয়া আসা হইবে। দাশুর মায়ের প্রস্তাবে একটু থতমত খাইয়া গিয়া বলিল—"না, হরির-লুটের বাতাসা কি না, আমায়ই নিয়ে আসতে বলেছেন, একটু গঙ্গাজলের ছিটে মাথায়—দিয়ে।"

"তা চলো তবে।"—বলিয়া দাশুর-মা অগ্রসর হইল। দুই পা গিয়া বলিল—"ভট্‌চায্যি বামুনের বাড়ী, তোমাদের সবই একটু বাড়াবাড়ি বাপু তা হক্ কথা বলব। আমি নে এসলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো!"

লোক পাইয়া শৈলেনের একটু ভূতের চর্চা করিবারই ইচ্ছা হইল; কথাবার্ত্তাও হইতে থাকে, তাহা ভিন্ন ভয়ের সম্ভাবনা না থাকায় ভয়ের কথা কহিতে লাগেও ভালো। শৈলেন প্রশ্ন করিল—"'এখানে অসময়ে'—তুমি অমন কেন বললে দাশুর-মা?—অসময়টা কিসে হলো? ও-বাড়ীটায় বুঝি রাত্তিরে যাঁদের নাম করতে নেই তাঁরা থাকেন?—আর সন্ধ্যে হলেই···"

"ওমা, থাকেন না? সাঁতরায় একথা কে না জানে গো"—বলিয়া দাশুর-মা কাহারা কবে ও-বাড়ীতে ভাড়ায় আসিয়াছিল, তাহাদের কি অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহার একটা দীর্ঘ ইতিহাস দিয়া গেল।

শৈলেন দাশুর-মার গায়ের কাছে খুব ঘেঁসিয়া হন্-হন্ করিয়া চলিতেছিল, ওদিকে পাড়ার মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে, সব শুনিয়া বলিল—"একটা কথা বলব দাশুর-মা—দোষ হবে না তো?"

"কি কথা? গঙ্গাতীরে আবার দোষ কি?"

"আমায় কে যেন ডাকলে এখানটায়, ঐ বাড়ী থেকে।"

দাশুর-মা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল—"সব্বনেশে! উত্তুর ছাওনি তো?"

"হুঁঃ, আমি উত্তুর দেবার ছেলে কি না! জানি না নাকি যে তিন বার না ডাকলে উত্তুর দিতে নেই?"

"ভাগ্যিস্!—দিলে আর দেখতে হোতনি।"

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বাবা আসিয়াছেন। শশাঙ্কর শয্যার পাশে বসিয়া ঠাকুরমা, মনোমোহিনী পিসিমা, খেতন দাদা প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করিতেছেন, দাদাও অনেকটা সুস্থ, বোধ হয় বাবাকে পাইয়াই। বিপিনবিহারী শৈলেনকে কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"পেয়েছিলি শুনতে?—তোকে চরখির কাছে যে ডাকলাম গাড়ী থেকে?"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—পাইয়াছিল; তাহার কত পুরানো কথার সঙ্গে সদ্য অর্জিত অভিজ্ঞতা মিশিয়া তাহার বুকটা আলোড়িত করিয়া দিল,—"মার কাছে যাব আমি"—বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাবা যে-কটা দিন রহিলেন কী আনন্দেই যে কাটিল বলিয়া শেষ করা যায় না! দুই বৎসরের যত অপূর্ণ সাধ প্রাণ ভরিয়া মিটাইল—খাওয়া-পরা সব দিক্ দিয়াই; বরং এমন অনেক কিছু হাতে আসিল যাহার সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। শুধু একটা সাধ মিটানো হইয়া উঠিল না। চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহার আলোচনাটা বহু দিন ধরিয়া পরিবারে চালু ছিল বলিয়া এখনও মনে আছে শৈলেনের:

ষ্টেশনে যাইবার দুইটা পথ ছিল; একটা পথ দুই দিকে গোঁসাইদের বাড়ী রাখিয়া গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের অলস অভিযানে যখন শৈলেনের ষ্টেশনে যাইবার ইচ্ছা হইত, এই পথ দিয়াই যাইত। জমিদার গোঁসাইদের বড় বড় অট্টালিকাগুলার মধ্যে অসীম বিস্ময় ছিল, বিশেষ করিয়া দুপুরে সেগুলা যখন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত। বাঁ দিকে বাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাইত গঙ্গা,—জাহাজে, নৌকায়, ওপারের লাট-সাহেবের বাগানে, আর জোয়ার-ভাঁটার হ্রাস-বৃদ্ধিতে নিত্য নূতন; এই পথটাই ভালো লাগিত। কিন্তু এই পথে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল সম্পূর্ণ এক অন্য জিনিষ। রাস্তাটা যেখানে ঘুরিয়া খালের উঁচু পুলটা পার হইয়াছে সেইখানে একটু ভিতরে গিয়া ডান দিকে একটা দোকান। খোলার চালের নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন দোকান, ধুঁয়ায় ভিতরকার চাল, দেয়াল সব অন্ধকার; সেই অন্ধকারে মাঝখানটিতে অয়েলক্লথ-বিছানো টেবিলের উপর কতকগুলি আর-আর দ্রব্যের মধ্যে একটি এনামেলের থালায় থাকিত আস্ত ডিমের কি এক অদ্ভুত "মেওয়া"। টক্‌টকে লঙ্কার টুকরার সঙ্গে খুব গ উবড়া-খাবড়া কি এক রকম মসলা লাগানো। এদের নধর কা আর সোনার রঙে সমস্ত দোকানটা যেন আলো করিয়া আছে কি যে ছিল ওগুলার মধ্যে—এত জিনিষের মধ্যে কোনটা শৈলেনের কল্পনাকে অমন করিয়া উদ্রিক্ত করিতে পারিত না বিধবার বাড়ী, ডিম আসিত না বলিয়া ডিমটাই একটা অমূল্য সম্পদ ছিল, তাহার উপর আবার ঐ রূপ; অনাচারের ভয়ে দুই ভাইয়ের কাহারও হাতেই পয়সা দিতেন না ঠাকুরমা! যদি-বা কোন রকমে দু'-একটা পয়সা আসিল তো ও-ধরণের অসম্ভব রকম মূল্যবান জিনিষের কাছে ঘেঁসিতে সাহস হইত না। আরও না ঘেঁসিবার কারণ ছিল,—দোকানদারের চেহারা এবং তাহার খদ্দেরের চেহারা। কেমন যেন অদ্ভুত গোছের। ছিদাম ময়রা বা সহদেব মুদির দোকানের সামনে যেমন স্বচ্ছন্দে গিয়ে দাঁড়ানো যায় এ যেন সে রকম নয়,—লোভের পাশে পাশে গা'টাও ছমছম করে। কিন্তু সে অসম্ভব লোভ,—এদিক্ দিয়া যাইলেই পুলের রেলিঙে ঠেস দিয়া শৈলেন সতৃষ্ণ নয়নে সেই হলদে-হলদে ডিমের স্তূপের পানে চাহিয়া থাকিত।···কী অপরূপই না স্বাদ হইবে! ভাঙিলে ভিতর থেকে যে সোনার গুঁড়ার মতো বাহির হয়, এ-ডিম ভাঙিলে কি সেই রকমই বাহির হইবে, না, অপূর্ব আরও কিছু? রীডারে সে—'গুজ্ অ্যাণ্ড দি গোল্ডেন এগ্'-এর কাহিনী পড়িয়াছে, সে কি এই ধরণের কিছু একটা না, আরও অদ্ভুত?—তাই যদি হয় তো কল্পনা সেখানে পৌঁছিতে পারে না।···লোকেরা আসে, বসে, কেনে, খায়,—শৈলেনের মনে হয় যেন কল্প-লোকের জীব সবাই। পকেটে পয়সা থাকিলে এক একবার লুব্ধ আবেগে মুঠাইয়া ধরে, পা বাড়াইতে ইচ্ছা হয়, তাহার পর সাহস ভাঙিয়া পড়ে। কম বয়সের ছেলেও যে একটা নাই,—যেমন ছিদামের দোকানে থাকে।···কত রকম কি ভাবিয়া, কত বার পা উঠাইয়া এক সময় খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়··· প্রায় দুই বৎসর এই করিয়া চলিতেছে।

আসিয়া অবধি বিপিনবিহারীর আদরটা যেন শৈলেনকে ঘিরিয়াই বেশি; শশাঙ্কর উপরও আছে, তবে শৈলেনকে জিজ্ঞাসাবাদ বেশি; সে যাহা চাহিতেছে তাহারই এক-আধটা শশাঙ্কর জন্য আসিতেছে, এক একটি জিনিষ বোধ হয় বাদ পড়িয়াও যাইতেছে শশাঙ্কর ভাগ্যে। খাওয়ার জিনিষের সম্বন্ধে তো কোন কথাই নাই,—শশাঙ্কর পেটই খারাপ। দাদার উপর একটু দয়া হইতেছিল, তবে লাগিতেছিল মন্দ নয়—যাই হোক, স্নেহেরও তো একটা বিজয়-দর্প আছে,—আমায়ই বাবা বেশি ভালবাসেন!

পরে কারণটা জানিয়াছিল; শৈলেনকে অবশ্য বলিয়াছেন দুই জনেই যাইবে পাণ্ডুল, কিন্তু লইতে আসিয়াছেন শুধু শশাঙ্ককে।

চার-পাঁচ দিন পরে বলিলেন—"কেমন শৈলেন, সব তো হোল, ছবিরবই, জামা, জুতো, মার্বেল, লাট্টু,—আর কিছু চাই না কি? এই বেলা বলো।"

পাণ্ডুলে বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারি, এত সাধিয়া প্রশ্ন করা তো অসম্ভবই তাঁহার পক্ষে, আবদার করিয়া উত্তর দেওয়াও শৈলেনের সাহসে কুলাইবে না। এখানে বহু দিন পরে ছেলেদের দেখিয়া বাবাও অন্য রকম হইয়া গেছেন, শৈলেনেরও বিদেশে কেমন একটা মুক্ত ভাব—যে-কথাগুলা মায়ের মধ্যস্থতা ভিন্ন হইতে পারিত

না, এখন বেশ অনায়াসে বাবাকে বলা যাইতেছে।···মায়ের অভাবে বোধ হয় ছেলেরা বাপের মধ্যে মা আর বাপ উভয়কেই পায়।

শৈলেন বলিল—"একটা জিনিষ খাবে বাবা।"

মনোমোহিনী দেবী আর নিস্তারিণী দেবী কাছেই ছিলেন, দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন। মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"ও পেট-সর্বস্ব দামোদর,—ওর আবার জামা, বই!···"

বিপিনবিহারী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"জিনিষটা কি শুনি?"

সে-সময় আর কোন মতেই বলিতে পারিল না শৈলেন। লজ্জিত হইয়া প্রথম সুযোগেই কোথায় গা ঢাকা দিল।

বিকাল বেলা বিপিনবিহারী একা শৈলেনকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ছিদামের দোকানের কাছাকাছি গিয়া, পিঠে হাত দিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি খেতে চাইছিলি রে শৈলেন? বল্, লজ্জা কি?—খাওয়ার লজ্জা মেয়েছেলেরা করে, বেটাছেলে খুব খাবে, খুব হজম করবে, খুব হুটোপাটি করবে—তবে তো! তোদের বয়সে আমি খুব খেতুম, তাই তো আর একটু যখন বড় হয়েছি, গঙ্গা পেরিয়ে গেছি, না বিশ্বাস হয় ছিদাম ময়রাকে জিগ্যেস্ করবি চল্। একবার জাহাজের মুখে পড়ে কি রকম বেঁচে গিয়েছিলাম—সে গল্প বলব আজ তোকে। খাবি, তার আবার লজ্জা!···ছিদামের দোকানের কিছু?"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

"তবে?"

"গোঁসাইপাড়ার রাস্তায়।"

বাপ-বেটায় গোঁসাইপাড়ার রাস্তা দিয়া চলিলেন। পাড়ায় ঢুকতেই একটা বেশ বড় দোকান, বিপিনবিহারী কাছে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, শৈলেন আস্তে আস্তে বলিল—"এ দোকানে নয় বাবা।"

এই দোকান হইতেই গোঁসাই-জমিদারদের দেউড়িতে খাবার-টাবার যাইত বলিয়া মনে পড়ে বিপিনবিহারীর। তাহা হইলে আরও ভালো দোকান হইয়াছে না কি ইদানীং?

প্রশ্ন করিলেন—"এ দোকানে নেই সে জিনিষ?"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

কৌতূহল হইল,—ছেলের উঁচু-নজর দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে প্রীত হইলেন। রাস্তার মোড় ফিরিয়া শৈলেন বাবার সঙ্গে পুলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কুণ্ঠিত ভাবে মুখ নীচু করিল। বিপিনবিহারী একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এখানে দাঁড়ালি যে?"

শৈলেন দোকানের পায়ে-হাঁটা রাস্তাটা যেখান থেকে খালের পাশে-পাশে নামিয়া গিয়াছে সেইখানে গিয়া আবার মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাস্তার ওপারে গঙ্গার ধারে সুরকির কল, এদিকে খালের ধারে [illegible] বস্তির মতো খানিকটা,—এমন তো কোন দোকানই চোখে পড়ে না যাহার জন্য সাঁতারা থেকে এই মাইল খানেকের ওপর পথ হাঁটিয়া আসা চলে। বিপিনবিহারী বলিলেন—"কৈ শৈলেন, এখানে কোন ময়রার দোকানই···"

চোখের সামনে ডিমের গুটী অন্ত বাহার করিয়া থাকিতেও যখন [illegible] নজরে পড়িতেছে না, তখন কিছু একটা গলদ আছে বলিয়া সন্দেহ হইল শৈলেনের, চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একেবারে থার্ড ক্লাস পল্লী, বিপিনবিহারীর গা ঘিন-ঘিন করিতেছিল, একটু বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি যেন একটু আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ঐ ডিমের কথা বলছ না তো শৈলেন?"

শৈলেনের মধ্যে তখন আর শৈলেন নাই, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

বিপিনবিহারী শুধু বলিলেন—"বাড়ী চলো, ছিঃ!"

রাস্তায় একটি কথাও হইল না; শৈলেন যেন একটা কলের পুতুল, কে দম দিয়া দিয়াছে—খট্-খট্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়াছে।

পরে কথাটা যত পুরানো হইয়াছিল সেটা লইয়া ততই হাসি হইত। বিপিনবিহারীই শাখাপ্রশাখা-যোগে বর্ণনা করিতেন,—টের পাইয়াছিলেন ওটা আর কিছুই নয়। শিশুর নির্দোষ রসনাবিকার মাত্র। সেদিন কিন্তু তাঁহার মনের অবস্থাটা অন্য রকম ছিল। শৈলেন সেটা টের পায় মনোমোহিনী পিসিমার মুখে। রাত্রি হইয়া গেছে, বাবা, খেতন-দাদা বাহিরে গেছেন, পিসিমা শৈলেনকে ছাদে লইয়া গিয়া গলা নামাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ রে শৈল, তুই সুরকির কলের সামনে চাটের দোকানে ঐ সব খেতে যাস না কি? ছি-ছি;—ওসব দোকানে কলের মজুররা নেশা করে যা-তা খায়। ওদের সঙ্গে মিশিস না তো তুই? আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর দিকিন···দাদাকে নিয়ে সেইখানে টেনে তুলেছে গা! কী হবে, কী ঘেন্নার কথা!···"

বাবার সঙ্গে এক দিন দুই ভাইয়ে বেলেঘেজপুর বেড়াইয়া আসিল। এক দিন গেল শিবপুরে। আদরের যেন একটা মরশুম পড়িয়া গেছে। কয় দিন ধরিয়া বাবার আদর নানা দ্রব্যসম্ভারে যেন মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। মামার বাড়ীর আদরটা পাওয়া গেল আবার দুই জায়গায় ভাগ করিয়া। এর পরে সামনে রহিয়াছে পাণ্ডুল। এত পাওয়ার মধ্য দিয়া দিনগুলা হইয়া পড়িয়াছে যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের দিন; এমন অদ্ভুত সব ব্যাপারও ঘটে জীবনে—এত অল্প দিনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া।

এই আনন্দ-বিস্ময়ের মাঝখানেই আসিয়া পড়িল মোহভঙ্গ—একেবারে যেন ঝুপ করিয়া। বৈকালে গাড়ি, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শৈলেন জানিতে পারিল তাহার যাওয়া হইবে না। বাবা অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, তাহারও যাওয়ার কথা ছিল, তবে মহাদেব মাষ্টার জোর করিয়া বলিলেন এ ক'টা দিন থাকিয়া যাইতে, পরীক্ষার পর একেবারে নূতন ক্লাসে উঠিয়া যাইবে। আর কুল্যে দুই মাস, দুই মাস পরেই বিপিনবিহারী নিজে আসিয়া লইয়া যাইবেন। আরও যাহা যাহা ইচ্ছা কিনিবার জন্য দুইটা টাকা দিলেন, যতক্ষণ রহিলেন অনেক বুঝাইলেন। শৈলেন মুখ ভার করিয়া রহিল। যাহা এত সত্য ছিল আশায়-আহ্লাদে, তাহা হঠাৎ এত মিথ্যা কি করিয়া হইয়া গেল তাহার যেন বোধগম্যই হইতেছিল না; কি ক্ষতি হইতেছে যেন বুঝিতেই পারিতেছিল না। তাহার পর জামা-জুতা পরিয়া বইয়ের পুঁটলি হাতে শশাঙ্ক যখন সবাইকে প্রণাম করিয়া বাবার পিছনে পিছনে উঠানে নামিল, সে পিসিমার কোল

থেকে একেবারে আছাড় খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও মাগো, আমি একলা থাকতে পারব না, দাদাকে রেখে যেতে বলো !..."

৯

দাদা চলিয়া যাইতে সাঁতরা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। দাদা যে নিত্যসঙ্গী ছিল এমন নয়, তাই যত দিন ছিল, তত দিন অত বুঝা যায় নাই। যখন পাণ্ডুলে চলিয়া গেল তখন অভাবটা বুঝা গেল। শৈলেনের এমনই বাড়ীতে মন বসিত না, আরও যেন কোন আকর্ষণ রহিল না। দাদার চলিয়া যাওয়া, তাহার না যাওয়া, বাবার এই ব্যবহার—এই চিন্তা লইয়াই সারা দুপুর টং-টং করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার হইয়া উঠিল বিলাস। পাঠশালা কামাই হইতে লাগিল, গুরুমশাইয়ের নিকট মার খাইতে লাগিল,—জীবনটা হইয়া উঠিল যেন ছন্নছাড়া।

অভিমানে পিতার উপর মনটা বিদ্রোহ করিয়া উঠিল,—আর কখনও তাঁহার কাছে কিছু চাহিবে না, তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহাও স্পর্শ করিবে না।—কেন প্রবঞ্চনা করিয়া তিনি রাখিয়া গেলেন ?...আশ্চর্য্য, এই মনের ভাবটা গিয়া এক দিন দাদার উপরও পড়িল,—যখন কয়েক দিন পরে দাদার বিচ্ছেদটা সহনীয় হইয়া আসিল। এটা বোধ হয় এক ধরণের ঈর্ষাই ; কিন্তু শৈলেন মনকে বুঝাইল দাদাও এই চক্রান্তের মধ্যে ছিল, নিজে সব জানিত অথচ শৈলেনকে বলে নাই। বলিলে শৈলেন পলাইয়া গাড়ির এক কোণে লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত তো ?...ঠাকুরমা পিসিমা, খেতন-দাদা—সবাই এই চক্রান্তের মধ্যে, শৈলেন সব থেকেই যেন আলাদা হইয়া দাঁড়াইল,—সবাইকেই চিনিয়াছে সে !

ক্রমে একে একে আর সবাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়া সমস্ত মন জুড়িয়া রহিল শুধু মায়ের মুখখানি। যেমন দীপ্ত তেমনি বিষণ্ণ সে মুখ, সমস্ত জগৎ ধরিয়া মাত্র ঐ একটি মুখে শৈলেন নিজের মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। সংসারের যত অন্যায় মায়ের উপর, আর শৈলেনের মতোই তিনি অসহায় ভাবে সহিয়া যাইতেছেন। বাবা ছেলেদের লইয়া আসিলেন—হয়তো মাকে এই রকম মিথ্যা দিয়া ভুলাইয়াই—মা শুধু বন্ধ ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলেন—চোখ দুইটি এখনও যেন দেখা যায়—এ শক্তি নাই যে দুই পা বাহিরে আসিয়া নিজের ছেলেদের ফিরাইয়া লইয়া যান।...বাবা ফিরিয়া গেছেন, মা জিজ্ঞাসা করিবেন শৈলেনের কথা—দুই ভাই যে একসঙ্গে আসিয়াছিল,—বাবা এই রকমই একটা মিথ্যা বলিয়া আবার তাঁহাকে ভুলাইয়া দিবেন। মা আবার তেমনি অসহায় ভাবে কোন একটি জানালার গরাদ ধরিয়া সজল চক্ষে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিবেন। কোন সময় হয়তো ভাবিবেন শৈলেন নাই বলিয়াই আনা হইল না, নহিলে এক ভাই আসিল, এক ভাইয়ের আবার কি হইল ?—সেই তো ছোট, তাহারই তো মায়ের জন্য বেশি মন-কেমন করবার কথা—আগে আসবার কথা।

কোন একটা দিকে চাহিয়া চাহিয়া শৈলেনের মনটা ভরিয়া ওঠে—মায়ের দুঃখে কি নিজের দুঃখে বুঝিতে পারে না। মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা আলোড়িত হইয়া ওঠে, কিছু একটা করিতে, কিছু একটা হইতে ইচ্ছা করে। কী সে করিতে চায় ভাবে শৈলেন : ধরো, একটা তার করিয়া দেওয়া হইল—শৈলেন মৃত্যুশয্যায়। কিম্বা খেতন-দাদার হাতে-পায়ে ধরিয়া লইয়া যাইতে বলিলে কেমন হয় ?... চিন্তাটা খানিক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, কল্পনাতেই নানা রকম ভাঙ্গা গড়া করিয়া মনটা চঞ্চলও হইয়া ওঠে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন একটা মীমাংসাই হইয়া ওঠে না।

এক দিন হঠাৎ মনে হইল, ঠাকুরদাদা তো সতের বৎসর বয়সে পাণ্ডুলে পলাইয়া গিয়াছিলেন—এই বাড়ী হইতেই। সতের বৎসরের বয়সটা ঠিক কি প্রকারের জিনিষ অতটা ভাবিয়া দেখিতে পারে না দরকারও হয় না দেখিতে,—তাহার কৈশোরের শিরা-উপশিরায় পিতামহের রক্তের উচ্ছ্বাস জাগে। আর সতের বৎসরটা যেমন বড়, তেমনি ঠাকুরদাদা গিয়াছিলেন পায়ে হাঁটিয়া ; শৈলেন যেমন ছোট তেমনি রেলের সুবিধা আজ-কাল,—একই কথা দাঁড়ায় না ?—গুরুজন আসিয়া যেন শৈলেনের হাত ধরেন।

দু'-চার দিনের মধ্যেই বাধা-বিঘ্নের ভয় সব কাটিয়া গিয়া সঙ্কল্পটা দৃঢ় হইয়া গেল।—পাণ্ডুলে পলাইতে হইবে ; ঠাকুরদাদা এক দিন যে কাজ করিয়াছিলেন, নাতির চোখে সেটা অন্যায়ও ঠেকিল না, অসম্ভবও ঠেকিল না।

এক দিন দুপুরে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন, খেতন দাদা অফিসে, শৈলেন বাবার দেওয়া নূতন জামা আর জুতা-জোড়াটা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। টাকা দু'টো তখনও নিজের কাছেই ছিল, পকেটে ফেলিয়া লইল। ওঁরা যেদিন যান, সেদিন কান্না বন্ধ করবার জন্য ঠাকুরমা আর মনোমোহিনী পিসিমার কাছে একটা করিয়া চার আনি পাইয়াছিল, সে দু'টাও রহিল। প্রথমটা একটু পায়ের জড়তা বোধ হইল, তাহার পর সদর রাস্তায় উঠিতে সেটা বেশ কাটিয়া গেল। পথের কথাটা আর চিন্তার মধ্যেই আসিল না ;—পরন্তু এ-সময় সে যে পাণ্ডুলে এরই বিস্ময়ের আনন্দটা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল ;—সাঁতরা বাড়ী থেকে দূরত্বটা যতই বাড়িয়া যায় ততই যেন সে নিশ্চিন্ত হয়। ষ্টেশনের দিকে একটা ঘোড়ার গাড়ি যাইতে-ছিল, শৈলেন তাহার পিছনের তক্তাটাতে গিয়া বসিয়া পড়িল। এ-ব্যাপারটাতে সে বেশ অভ্যস্ত,—তক্তাটায় বুক চাপিয়া পা ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া যায়, কোচম্যানকে যদি কেহ জানাইয়া দেয়, গাড়ির ছাদের উপর শপাৎ করিয়া ছিপটির দড়ি আসিয়া পড়ে, কখনও কাঁধে-মাথায় আসিয়া লাগে, কখনও কোচম্যান লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়, শৈলেন টুপ করিয়া নামিয়া পড়ে। আজ কেমন একটু গুছাইয়া বসিতে ইচ্ছা হইল ; নূতন জামা, নূতন জুতা পরিয়াছে, তক্তার উপর উঠিয়া গাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়া সোজা হইয়া বসিল শৈলেন। যখন বেশ অন্যমনস্ক হইয়া গেছে, শপাৎ করিয়া কোচম্যানের ছিপটি হাতের উপর আসিয়া পড়িল। শৈলেন সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া পড়িল এবং উল্টা লাফানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। যখন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কোচম্যানটা চলতি গাড়ির উপর দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে-হাসিতে তাহাকে আবার আসিয়া বসিতে আহ্বান করিতেছে।

চোট লাগিয়াছে। ডান হাতের কনুই এবং ডান কানের উপরটা ছড়িয়া গেছে, বাঁ হাতে ছিপটির রাঙা দাগ। রাস্তাটার এক দিকে রেল-লাইন, এক দিকে নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের খোলার বাড়ী। কোনখানে হাসি উঠিল, কেহ সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করিল—আঘাত

লাগিয়াছে কি না। শৈলেন অপ্রতিভ ভাবটা চাপিয়া অগ্রসর হইল; কেমন যেন একটা কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া তাহার যেন দিশাহারা লাগিয়া গেল। ···বেশ বড় ষ্টেশন, গলি-ঘুঁচি অনেক। কোথায় টিকিট পাওয়া যায়? ছোটদের কিনিতে দেয় কি? কয় টাকা লাগিবে টিকিটে? দুইটাই যদি লাগে তাহা হইলে খাইবে কি? আর যদি দুই টাকায় না কুলায়? আর একটা কথাও এতক্ষণে মনে পড়িল,—একটা ছোট ছেলে টিকিট কিনিতেছে দেখিয়া কেহ যদি সন্দেহ করে—পলাইতেছে!

ষ্টেশনের যেখান দিয়া ঘোড়ার গাড়িগুলা প্রবেশ করে, সেই-খানটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একটা লোক ষ্টেশনের দিক্ থেকে তাহার দিকে আসিল। কাঁচা-পাকা মোটা গোঁফ উপর দিকে ঠেলা, চোখ দুইটা একটু রক্তাভ, বেশ যণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা, গায়ে একটা নীল রঙের জামা। শৈলেনকে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি চাহি তোমার খোঁখাবাবু?"

ওর উগ্রতায় সম্মোহিত হইয়া গিয়া শৈলেন মুখের পানে চাহিয়া রহিল। লোকটা আবার বলিল—"কি চাহি বোলো না, ডর কি আছে?"

শৈলেন বলিল—"পাণ্ডুলে যাবো।"

"পণ্ডোল?—সে তো দরভঙ্গা জিলা; আমার অপ্পন জিলা আছে। কার জড়ে যাবে?"

উগ্র-দর্শন লোকের সঙ্গে সম্বন্ধের বা আবাস-স্থানের নৈকট্য আবিষ্কার করিলে, মনে এক ধরণের ভরসা আসে, বোধ হয় ভীরুতার উল্টা দিক্; শৈলেন গোপনীয় কথাটা বলিয়া ফেলিল—"একলা যাবো।"

"অকেলা!"—বলিয়া লোকটা একটু বিস্মিত ভাবে চাহিল; তাহার পর তাহার মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিল, তাহার পর চারি দিকে একবার চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"টিকিস্ কাটিয়েছ?"

"না, কোথায় কাটাতে হয় জানি না।"

"হুঁ···টাকা আছে?···কো টাকা?"

"দু'টো টাকা আছে।"

আবার একটু চিন্তা।

"হুঁ···এদিকে আসো তুমি।"

শৈলেনকে লইয়া যেয়া প্রাঙ্গণটার একটা নির্জন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"দু টাকায় হোবে না, পাঁ—চটি টাকা লাগবে।"

শৈলেন একটু নিরাশ হইয়া বলিল—"আর তো নেই আমার কাছে।" কি মনে হইল, আর চার-আনি দুইটার কথা বলিল না।

লোকটা আর একবার চারি দিকে নজর বুলাইয়া লইল, তাহার পর শৈলেনের পিঠে দুই-তিনটা লঘু চাপড় দিয়া বলিল—"হুঁ··· আচ্ছা তুমি দুঃখু মৎ করো; হামি বাকি টাকা আপনা পাশসে দিয়ে দোব। মুলুক্'কা আদমি আছে। পাণ্ডুলের বাঙ্গালী বাবুদের ছইলা, না? হু···বাবুদের হামি চিনে।"

শৈলেনের মনে হইল যেন কত বড় এক আত্মীয় পাইয়াছে; যেন এখনই মত বদলাইয়া ফেলিতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি টাকা দুইটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া দিল।

"তুমি এইখানে খাড়া থাকো; খোবোরদার কেউ ডাকলে যাইও না, কুছু বোলো ভি না, বোড়ো বদমাসের জগহ আছে। হামি দু' মিনিটমে টিকিস্ কিনে আসছি।"

দু' মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, বোধ হয়, দু' ঘণ্টাও কাটিয়া গেল, খান-চারেক ট্রেণ দুই দিক্ হইতে আসিয়া দুই দিকে চলিয়া গেল,—কাহারও দেখা নাই। চোখ দিয়া কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে, কাহাকেও বলিতে কিন্তু সাহস হইতেছে না। ভয়ে নৈরাশ্যে কেমন যেন জড়ভরত করিয়া দিয়াছে, কেবলই নিজেকে লোকচক্ষু হইতে গোপন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আরও খানিকটা সময় কাটিয়া গেল, টিকিট বা টাকা পাইবার আশায় নয়, পরন্তু পা উঠিতেছিল না বলিয়াই শৈলেন দাঁড়াইয়া রহিল। ভয় হইতে লাগিল এখনই জানাজানি হইয়া যাইবে, তাহার পর যে কি হইবে সেটা মনের সে অবস্থায় কল্পনাতেও আসিল না।

এক সময় একটা গাড়ি আসিয়া যখন নূতন লোকের ভিড় নামিল, শৈলেন নিতান্ত চোরের মতো দলে মিশিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রেলের এ-দিক্‌টা সহর, ও-দিক্‌টা জঙ্গল, ঝোঁপ, ডোবা; এখানে ওখানে ছড়ানো ছ্যাঁচা বেড়ার বাড়ী কয়েকখানা। শৈলেন লাইনের ফটক পার হইয়া হন্-হন্ করিয়া খানিকটা চলিয়া গেল, কান্না আর আটকাইয়া রাখা যায় না, কেবলই মায়ের মুখ মনে পড়িতেছে। খানিকটা গিয়া বেশ গভীর গোছের একটা ডোবা, আশে-পাশে বাড়ী নাই; শৈলেন নারিকেল-গুঁড়ির সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি খানিকটা নামিয়া গেল, তাহার পর বসিয়া পড়িয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; মুখ দিয়া শুধু বাহির হইতে লাগিল—"মাগো—মাগো—ওগো মা!"

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মনটা কতক হাল্কা হইল। তেষ্টাও পাইয়াছে, পুকুর থেকেই কয়েক আঁচলা জল পান করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল; এবার চিন্তা আসিল ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে।

বিকাল হইয়া গেছে। এই সময় তাহার পাঠশালায় থাকিবার কথা, খোঁজ পড়িয়া গেছে নিশ্চয়; খোঁজ পড়িয়া যাওয়ার কথায় তাহার মনটা হঠাৎ আতঙ্কে ভরিয়া গেল, এবং চিন্তার স্রোতটা ভিন্ন-মুখে ছুটিল,—বাবার ক্রুদ্ধ মুখ—ঠাকুরমা, পিসিমা, খেতন-দাদা, রাগিয়া সবাই কাঁই হইয়া রহিয়াছেন—পাড়ার সবাই জড়ো হইয়াছে—আজ রাতটা পোহাইলেই কাল গুরুমশাই, এত উগ্র-মূর্তি যে কল্পনা যেন থৈ পায় না।···টাকার কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর ধরা পড়িবেই প্রবঞ্চিত হওয়ার এই অদ্ভুত ইতিহাস! উগ্র ভয়ের মধ্যে ফেরার পথটা বন্ধ হইয়া গেল শৈলেনের কাছে; কয়েকটা মুহূর্ত ধরিয়া অবস্থাটা দাঁড়াইল ত্রিশঙ্কুর মতো—না ফেরার উপায় আছে, না আগে যাওয়ার সম্বল। তাহার পর আগে যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিল শৈলেন।

হ্যাঁ, হাটিয়াই যাইবে পাণ্ডুল। সঙ্কল্পটা উদ্ভব হইল অবশ্য ভয় থেকেই, কিন্তু একবার স্থির করিয়া ফেলার পর মনটা যাওয়ার আনন্দেই ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ বোধ হয় পিছনকার ভয় থেকে মুক্তি; কিন্তু ক্রমে ক্রমে গোড়ার ভাবটাই আবার ফিরিয়া আসিল,—সেই মায়ের জন্যই পাণ্ডুলে যাওয়ার সঙ্কল্প।

মাঝখানে পথের চিন্তাটা আর খুব স্পষ্ট রহিল না,—আবছায়া ভাবে খানিকটা ছকিয়া লইল—ঠাকুরদাদার মতো হাঁটিয়াই যাইবে—কেহ না কেহ দয়া করিয়া খাইতে দিবেই পথে—ঠাকুরদাদার চেয়ে ছেলে-মানুষই তো?···ঠাকুরদাদা এক দিন রাত্রে তো ছুরি দিয়া কাঁচা লাউ কাটিয়া খাইয়াছিলেন, না হয় সে-ও খাইবে। তাহা ভিন্ন সঙ্গে আট আনা পয়সা আছে তাহার; দুই বেলা দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইলে বোল দিন। ঠাকুরদাদা গিয়াছিলেন পনের দিনে, তাহার না হয় কুড়িটা দিনই লাগুক—না হয় এক মাস—সব দিনই কি কিনিয়া খাইতে হইবে?···একটু শঙ্কা বোধ হয় আছে মনের কোথাও লাগিয়া, কিন্তু ভবঘুরেপনার অভ্যাস—একটা অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দই ধীরে ধীরে মনটাকে পাইয়া বসিল। আর, মায়ের মুখটা ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—হাসি-হাসি মুখটা যেন দেখা যায় সামনেই।

রেলের এদিক্‌কার রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল শৈলেন; গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, একটু ঘুরিয়া একেবারে পরের ষ্টেশনের ওদিকে চলিয়া গেছে। নির্জন রাস্তা, এইটাই নিরাপদ, এর পরের ষ্টেশনের একটু ওদিকে একটা অন্য পথে নামিয়া একেবারে লাইনের উপর গিয়া উঠিবে, তাহার পর লাইন ধরিয়া বরাবর—বরাবর একেবারে মোকামা-ঘাট পর্য্যন্ত—তাহার পর গঙ্গা পার হওয়া—কিছু একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই; তাহার পর আবার লাইন ধরিয়া একেবারে পাণ্ডুল।··· অতটা কষ্টের পর মনটা একটা সমাধান আর অবলম্বন পাইয়া যেন হালকা হইয়া গেছে, গতি হইয়া উঠিয়াছে বেশ ক্ষিপ্র। রেল-লাইনে পৌঁছাইতে বিকালের আলো ম্লান হইয়া আসিল। পথ ছাড়িয়া শৈলেন লাইনের পাশে পায়ে-হাঁটা পথ ধরিল। দুই দিকে প্রচুর ঘর-বাড়ী, বেশ একটা ভরসার উপরই হন্‌-হন্‌ করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। এক একবার দুপুরের টহলে আসিয়াছেও এদিকে, ছুটির দিনে।···নূতন জুতা, খুব বেশি অভ্যাস হয় নাই, পায়ে একটু যেন ফোস্কা পড়িয়াছে দু'-এক জায়গায়।···একটা গাড়ি হুস-হুস করিয়া দিয়া সামনের দিকে চলিয়া গেল। মনটা একটুখানির জন্য দমিয়া গেল।—কেমন হাত গুটাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে সব গাড়িতে! টাকা দুইটা অমন ভাবে না যাইলে সে-ও অমনি ভাবে বসিয়া যাইত তো? বোধ হয় এই গাড়িতেই।···শৈলেন আবার নৈরাশ্য কাটাইয়া ওঠে—বেশ সহজেই এক রকম; মনকে মনে করাইয়া দেয়—ঠাকুরদাদা তো হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে দুই দিকে। আরও পা চালাইয়া দিল শৈলেন। সামনে ওটা মেঘ না কি আকাশে? হ্যাঁ, মেঘই সামান্য একটু। শৈলেন আরও পা চালাইয়া দিল। ফোস্কা-গুলায় লাগিতেছে বেশ—ফাটিয়া গেল না কি? জুতাজোড়া খুলিয়া হাতে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।···দুই পাশের বাড়ীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা জ্বলিয়া শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিল। শৈলেনের মনটা কোন্‌ এক উঁচু স্তর থেকে হঠাৎ যেন নীচুতে আসিল।···সাঁতরার বাড়ীতে আলো জ্বলিল, শাঁক বাজিল,—কে বাজাইতেছে? ঠাকুরমা, না, বৌদিদি?···ঠাকুরমার মুখখানা হঠাৎ শৈলেনের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল,—সন্ধ্যার নূতন আলো ঠাকুরমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, রাগ নাই, বিষণ্ণ আর ভয়াকুল; চোখে জল।···মায়ের মুখ যেন আর তত স্পষ্ট নয়।

বোধ হয় বৃষ্টি হইবে। বাস্তব যেন ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল শৈলেনকে,—আজ রাত্রিটা কাটাইতে হইবে কোন্‌ খানে?··· ওর যেন এই প্রথম মনে হইল, কুড়ি দিনের সঙ্গে কুড়িটা রাত্রিও আসিবে এমনি করিয়া। একটু যেন কি-রকম মনে হইতে লাগিল, একটু একটু গা-ছমছম করা গোছের।

তবুও কল্পনা একেবারে লুপ্ত হয় নাই,—সামনে ষ্টেশন, রাতটা সেখানেই কাটাইবে, ষ্টেশন তো বেশ ভালো জায়গাই। সে ষ্টেশনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে; ষ্টেশন-মাষ্টার নিশ্চয় আসিবে সে-দিকে একবার না একবার, নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবে আহার হইয়াছে কি না—বাড়ী লইয়া যাইবে, খাওয়াইবে,—শৈলেন ছেলেমানুষ তো?

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া অন্ধকার হইয়াছে, সরু রাস্তার উপর দু'-এক স্থানে পাশের বনের লতা-গুল্ম আসিয়া পড়িয়াছে। সামনে হাত দশ-বারো দূরে দুই জন লোক গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল—বোধ হয় কোন কলের মজুর—তাহারা হঠাৎ রেলের বাঁধ থেকে নামিয়া ডাইনের দিকে কোথায় চলিয়া গেল। শৈলেনের অস্বস্তিটা আরও একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল; সাহস যেন ডাকিয়া আনিতে হইতেছে।··· দূরে ষ্টেশনের পাখার লাল-নীল আলো লি-লি করিতেছে।

হঠাৎ গুড়-গুড়-গুড়-গুড় করিয়া একটা শব্দ হইল। শৈলেন ফিরিয়া দেখিল, পিছনের সমস্তটা ঘিরিয়া ঘন কালো মেঘের রাশি। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার চার দিকে চাহিয়া দেখিল,—ভয়টা যখন আসিয়া পড়িল, মেঘের মতোই চারিদিক্‌ দিয়া ঘিরিয়া আসিল। এতক্ষণ একটা আবেশের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল, এখন ভয়ের দৃষ্টিতে সব কিছুরই রূপ যেন একসঙ্গে বদলাইয়া গেল। চারি দিক্‌ নিস্তব্ধ, হাওয়ার দুই-তিনটা হলকা দুই দিক্‌কার বনের উপর দিয়া একটা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ তুলিয়া বহিয়া গেল; আবার সব নিস্তব্ধ, শুধু সামনে নক্ষত্রপুঞ্জ চাপা দিয়া পিছন থেকে মেঘের স্তূপ বিদ্যুতের মশাল ধরিয়া গড়াইয়া আসিতেছে। কাছে বাড়ী নাই, বহু দূরে অন্ধকারের মধ্যে শুধু গোটা দুই-তিন আলো দেখা যায়—এখানে-ওখানে ছড়ানো—সাহসের বদলে কেমন যেন ভয়েরই সঞ্চার করে। হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যে কি হইয়া গেল,—ষ্টেশনের পাখার জ্বল-জ্বলে আলো-গুলাও যেন মনে হইতেছে কাহাদের রক্ত-চক্ষু।···না; আসলে তাহা তো নয়—রেলের পাখাই তো ওটা,—মনে জোর করিয়া এটা বুঝাইয়া শৈলেন আরও জোরে পা চালাইয়া দিল, এবং কয়েক পা গিয়াই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

একেবারে মেঘের ডাক আর উগ্রতর হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি নামিল। দৌড়াইবার পথ নাই। সরু পথের উপর লাইনের পাথর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই পথটা পিচ্ছল হইয়া পড়িল। শৈলেন একবার পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। হাতে-পায়ে কয়েক জায়গায় জ্বালা করিতেছে; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আবার ছুটিল, যেন কিসের কাছে তাড়া খাইয়াছে, একটুও দাঁড়াইলে চলিবে না। মানুষের শব্দ শোনা যেন আবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে,—শৈলেন "মাগো!" বলিয়া চেঁচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলিল।

তবুও ছুটিয়াছে; আর একবার পড়ো-পড়ো হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। মাথা নীচু করিয়া ছুটিতেছিল, সোজা হইতেই দেখিল ডান দিকে একটা চরখি। লাইন ছাড়িয়া দিল এবং চরখি ঠেলিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মাথার উপর দিয়া অবিশ্রান্ত

ধারায় বৃষ্টি পড়িয়া যাইতেছে, শীতে শরীরটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে ; কাঁদিতেছে জোরেই, নিজের কান্নাটাই কানে লাগিয়া নিজেকে বড় অসহায় বলিয়া মনে হইতেছে···ক্রমাগতই বাঁকিয়া ঘুরিয়া চলিতেছে রাস্তাটা, কোথা দিয়া কত দূর যে গেল খেয়াল নাই। অসম্ভব বৃষ্টির ঝাপ্‌টা, চোখ তুলিবার জো নাই। এদিকে একটু একটু থামিয়া মেঘের উগ্র গর্জন !

হঠাৎ একবার মনে হইল যেন ছাদের নল দিয়া ছড়-ছড় করিয়া জল পড়িতেছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে নীচু মুখেই একবার চোখ তুলিয়া দেখিল রাস্তার ধারে একটা বাড়ী, একটু মাথা তুলিয়া বুঝিল দোতলা। রাস্তার উপর সদর দরজা ; "দোর খোল !"—বলিয়া একটু জোরে ধাক্কা দিতেই দরজাটা এমন হঠাৎ খুলিয়া গেল যে প্রায় পড়ো-পড়ো হইয়া শৈলেন উঠানে যেন ছিটকাইয়া গেল ; কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। একটা বিদ্যুৎ-ঝলকে ডান দিকে কাছেই একটা সিঁড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

কয়েকটা মুহূর্ত এই দারুণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা ছাড়া শৈলেনের মনে যেন কিছুই আসিতে পারিল না,—মাথার উপর বৃষ্টি নাই, একটা বাড়ীতে আসিয়া ছাদের নীচে দাঁড়াইয়াছে। —একটা অপূর্ব্ব নিশ্চিন্ততার অনুভূতি !···তাহার পর একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার, বাহিরের চেয়ে ঢের বিকট—যেন জমাট বাঁধিয়া গেছে ; নীচে, বারান্দায় কোনখানেই চার-পাঁচ হাতের ওদিকে আর কিছুই দেখা যায় না ; তেমনই নিস্তব্ধ—এক ঐ বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দ ছাড়া ! চোখ দুইটা যথাসম্ভব আয়ত করিয়া মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারি দিকে চাহিল শৈলেন—চক্ষু নিজেই যেন আয়ত হইয়া যাইতেছে—আরও—আরও, তাহার পর সমস্ত শরীরটা উৎকট ভয়ে ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল,—সাঁতরায় সেই চরখির সামনে সেদিন যেমন মনে হইয়াছিল তাহার চেয়েও যেন কত গুণ বেশি ; শৈলেন বুকের ভিতর থেকে কিসের একটা চাড়েই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে আছ গা এ-বাড়ীতে—কে···?"

তাহার পরের খানিকটা স্মৃতি একেবারে অবলুপ্ত ! এর পরেই মনে পড়ে সে একটা চৌকির উপর পাতা বিছানায় শুইয়া আছে, মাথার কাছে একটি স্ত্রীলোক বেশ একটু ঝুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইল যেন মায়ের মতো মুখটা, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া দেখিবার পূর্বেই মুখটা যেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া আবার সব অন্ধকার হইয়া গেল।

আবার যখন চাহিল, সেই স্ত্রীলোকটি কপালে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"কাদের ছেলে তুমি ?"

শৈলেন, নিজের কানে যায় না এই রকম একটু নূতন রকম স্বরে উত্তর করিল—"মার কাছে যাব।"

"যেয়ো ; এই দুধটুকু খেয়ে নাও দিকিন, লক্ষ্মীটি।"

এখন পর্যন্ত গলায় যেন স্বরটুকু লাগিয়া আছে শৈলেনের—দুধও যে এত চমৎকার সে এর পূর্বে জানিত না, যন্তটা গেল একটা আতপ্ত স্পর্শে সমস্ত অবসাদকে যেন দুই দিকে ঠেলিতে ঠেলিতে গেল।

প্রশ্ন হইল—"কোথায় মা তোমার ?"

"পাণ্ডুলে।"

"কোথায় সে ?"

শৈলেন গুছাইয়া উত্তর দিবার জন্য চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—"আচ্ছা তুমি শুয়ে থাকো চুপ করে। পাণ্ডুল তো ? আমি জানি, তোমায় ভাবতে হবে না।"

আদেশে নয়, ক্লান্তিতেই শৈলেন আবার চক্ষু মুদিল। অনুভব করিতেছে মায়ের নরম আঙুলের মতো কয়েকটি আঙুল চুলের গোড়ায় সঞ্চালিত হইতেছে। হঠাৎ বুকে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিল, আর কিছু না পাইয়া স্ত্রীলোকটির আঁচলের খানিকটাই দুই হাতে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল, এবং একটু পরেই, তাহার মুদ্রিত দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটি অপর হাত দিয়া মুছাইয়া দিল,—বলিল—"কেঁদো না, কী রকম মা তোমার ?"

নিশ্চয় বলার উদ্দেশ্য ছিল—কি রকম মা যে এই দুর্যোগেও ছেলেকে ছাড়িয়া দেয় ; শৈলেনের কিন্তু অস্পষ্ট চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি মাত্রই অনুভূতি ছিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল—"তোমার মতন।"

আঙুলের সঞ্চালন যেন আরও কোমল হইয়া গেল, আরও মায়ের মতো শুনিতে পাইল—"শুয়ে থাকো, আমি উঠিয়ে খাওয়াব'খন ; কিছু ভয় নেই, আমি এইখানেই বসে আছি।"

সে রাত্রের আর এইটুকুই মনে পড়ে যে একবার উঠিয়া দারুণ ঘুমের ঘোরে এক রকম চক্ষু বুজিয়াই কি আহার করিয়াছিল—বোধ হয় ভাত, একটু দুধ, একটু কি মিষ্ট,—মায়েব মতোই কে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিল···

জীবনে একটি যেন মস্ত বড় রহস্য হইয়া আছে—কে ছিল সে—অত মায়ের মতো ?

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া গেল, একটু অন্ধকারই ছিল চারি দিকে লাগিয়া তখনও। রাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো মনে পড়িতেছে—একটি স্ত্রীলোক—আদর করিল—খাওয়াইল—মায়ের মতো···কিন্তু কোথায় সে ?

চারি দিকে চুণ-বালি-খসা একটা ঘর, মনে হয় না যে কেহ ব্যবহার করে ; দেয়াল বাহিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছিল—লম্বা লম্বা অনেকগুলা ধারা নীচে পর্যন্ত নামিয়া গেছে।···অবশ্য বিছানাটা রহিয়াছে ঠিকই। শৈলেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। দুয়ার খোলা, বাহিরে আসিল। ঘরটা দোতলায়, বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিল সমস্ত বাড়ীটা আগাছার জঙ্গলে ঢাকা এক রকম—সামনে ভাঙা-চোরা আরও দুইটা ঘর।···আবার সেই কাল রাত্রের মতো সমস্ত শরীরটা ভয়ে ঝিম-ঝিম করিয়া আসিতেছে। তবু দিন, শৈলেন পাশের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল—পা কাঁপিতেছে, কিন্তু কেন যেন কালকের মতো সাড়া লইতে সাহস হইতেছে না। মনকে খুব শক্ত করিয়া খোলা দরজা পার হইয়া শৈলেন রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

কে ছিল স্ত্রীলোকটি ?

ছেলেবেলার সমস্ত অংশটাই, অর্থাৎ জীবনের সমস্ত রূপ-কথার যুগটা ব্যাপিয়া শৈলেনের মনে বিশ্বাস ছিল কেহ মায়ের রূপ ধরিয়া আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছিল। মা-শীতলা সাঁতরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, খুব সম্ভব তিনিই আসিয়াছিলেন, ঠাকুরমা প্রায়ই তো

মানৎ করিতেন ওদের তিন ভাইয়ের জন্ম। মা-শীতলা যে এই রকম ভাবে ভালো করিয়া বেড়ান,—সাঁতরার কত বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছেন, কত রুগ্নের গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইয়া নীরোগ করিয়া দিয়াছেন,—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেমেয়েরা না কি তাঁর আরও আদরের পাত্র।

উত্তর-জীবনে আরও মত বদলাইয়াছে,—থিয়োজফিতে বলে যাহাকে প্রাণপণে ভাবা যায় তাহার আত্মা না কি জীবিত অবস্থাতেই দেহরূপ ধরিয়া উপস্থিত হয়—আত্মার আকর্ষণে—স্বপ্নাবস্থায় অথবা কখনও মূল দেহকে পরিত্যাগ করিয়াও। কত অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে।···তাহার মানে, শৈলেনের আকুল আহ্বানে মা-ই আসিয়াছিলেন—পাণ্ডুলে ঘুমাইয়া পড়িয়া। আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, হয়তো পূর্ণেন্দুকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন,—শশাঙ্ক-শৈলেনকে স্বপ্নে দেখিয়া আসিতেন—একথা তো প্রায়ই বলিতেন মা। আবার যেটা সহজ সম্ভাবনীয় সত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেটাতে সায় দেয়, সেটাও মনে হইয়াছে।—একটা জীর্ণ, পরিত্যক্ত বাড়ীতে শুধু নিজের প্রিয় জনের জায়গাটুকু পরিষ্কার রাখিয়া একটিমাত্র স্ত্রীলোক কালাতিপাত করিতেছে—বাংলা দেশে এ দৃশ্য বিরল নয়; সধবা কি বিধবা, ঠিক বয়স কতটা আন্দাজ, মনের সেরূপ অবস্থায় শৈলেনের নিশ্চয় ঠাহর করা সম্ভব ছিল না। মায়ের কথাই সমস্ত মন জুড়িয়াছিল, অবিরাম মায়ের সান্নিধ্যই কামনা করিতেছিল, তাই যাহাকে পাইল সেই স্বল্পালোকিত ভাঙা চোরা ঘরটিতে, সেই ক্ষীণ চৈতন্যের মধ্যে, তাঁহাকেই মা বলিয়া মনে হইয়াছিল, বরং অন্য কেহ বলিয়া মনে হওয়াই অসম্ভব ছিল এক-রকম।···সকালে দেখিতে পায় নাই—সেটা তো কিছুই নয়,—এই সব স্ত্রীলোকেরা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করে, হয় তো গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে 'সদিন একটা' যোগ ছিল; না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না।···আরও কত কি হইবার সম্ভাবনা আছে,—স্ত্রীলোকটি হয় তো স্থায়িভাবে থাকে না, সহরে থাকে—খাজনাপত্র আদায় করিতে বা ক্ষেতের শস্য বা বাগানের ফল-মূল সংগ্রহ করিতে পুরানো, পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটায় আসিয়াছিল, একা মানুষ—নিজেই সব করিতে হয়। হয় তো বা চাকর-বাকর কেহ ছিলও—নীচে, অন্য কোন ঘরে। কত রকম কি হইতে পারে—নিতান্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই। কিন্তু ভালো লাগে না সত্যের এত উজ্জ্বল আলোক। ছেলেবেলার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাকে ছেলেবেলার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে দেখিতেই ভালো লাগে—শেষ কেমন মা সমস্তটির কেন্দ্রগত হইয়াছিলেন। মাকে সন্তান শিশু হইয়া দেখিতে চায়—তা, যত বয়সই হোক না কেন। বাহিরে আর পাঁচ জনের মধ্যে নিশ্চয় বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু নিজের অন্তরে এই লাগে ভালো।

সাঁতরার বাড়ীতে আসিয়াই শৈলেন শয্যা গ্রহণ করে। কঠিন অসুখ—জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস, আরও নানা রকম জটিলতা। তৃতীয় দিবস হইতে চৈতন্য হারায়; যখন জ্ঞান হইয়াছে একটু, দাদা বা মায়ের কথা লইয়া প্রলাপ বকিয়াছে। পাঁচ দিন এই ভাবে কাটার পর যখন একটু চিনিবার বুঝিবার মতো অবস্থা হইল, দেখে চৌকির পাশে বাবা বসিয়া আছেন। আরও দিন সাতেক পরে আরোগ্য লাভ করিয়া শৈলেন বাবার সঙ্গে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ।

এ-কেমন-দেশে

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

এ-এক নতুন দেশে আজ নামলাম।

আর ভাবলাম:
এমন কেমন-দেশ তোমরা তো আর দেখ নাই।
ভাবো দেখি কী আশ্চর্য: ট্রাম নাই, বাস নাই,
ইলেকট্রিক আলোটিও নাই।

পিচ্-ঢালা পথ নাই, ইট-কাঠ-পাথরের দেশ
এখানে আজকে রাতে একেবারে হয়েছে নিঃশেষ
এখানে শুধুই ধূলো, ঘাস, আর সবুজ পাতারা;
পথে পথে আলো দেয় সারারাত আকাশের তা[রা]
বেতারে সেতার সাধা এখানে তো কেউ শোনে না
এখানে গায়ক যতো গাছে গাছে নীল পাখীরাই

শুধু এই? নয় ভাই। আরো আরো আছে।
এখানে মানুষ যারা মরে মরে বাঁচে।
পান্তায়-লংকায় দিন-অতিপাত।
মাথায় 'ম্যালেরি' কাঁপে, কটিদেশে বাত।
খানায় ডোবায় আর নালায় নালায়
সুপেয় অমৃত হেথা বয়ে চলে যায়।
বস্ত্রের সংকটে এরা বারো মাস
দাদু ও বাবা ও ছেলে পরে কটিবাস।
উদর নিরন্ন আর বস্ত্রহীন দেহ:
মানুষের প্রহসন: দেখেছ কি কেহ?

আজ রাতে নামলাম এ-কেমন-দেশে—
আমাদের নগ-নদী-নগরীর শেষে।

শিল্পী—কানু মুখোপাধ্যায়

সদাশয়

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

[এ গল্পের রচয়িতা আরকেডি এ্যাভেরচেন্‌কো (Arkedy Averchenko) আধুনিক রুশ-সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। রুশ-জনসাধারণের জীবনকে কেন্দ্র করে ইনি বহু গল্প ও কথাচিত্র রচনা করেছেন। শ্লেষাত্মক রচনায় এঁর দক্ষতা অসাধারণ। জারের সময়কার আমলাতন্ত্রের ইনি যে শ্লেষাত্মক চিত্র অঙ্কন করেছেন তার তুলনা রুশ-সাহিত্যে দুর্লভ। এঁর রচনাবলী ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সুধীসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর ইনি স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং সেই অবধি প্রবাসেই জীবনাতিপাত করেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে প্রাগ্‌ শহরে এঁর মৃত্যু হয়।]

নিস্পন্দ পৃথিবীর বুকের উপর বিবর্ণ আকাশটা ঝুঁকে পড়েছে যেন। পেঁজা তুলোর মতো ঝুর-ঝুর করে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে চতুর্দ্দিকে, কে যেন পথ-ঘাট ঢেকে দিয়েছে একখানা শাদা পুরু চাদরে। কিন্তু প্রকৃতির এই দুঃসহ কদর্য্যতাকে উপেক্ষা করে অসংখ্য নরনারী বেরিয়ে পড়েছে পথে। উৎসবের আনন্দকে পূর্ণ করতে যার যা কিছু দরকার সংগ্রহ করতে হবে আজ। উৎসবের রঙীন নেশায় মন মশ্‌গুল, সবাই সোৎসাহে চলেছে হাট-বাজার করতে।

সরকারী কর্ম্মচারী প্রৌঢ় হিয়াকিন্‌ তাঁর বাইরের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, দৃষ্টি তাঁর রাজপথের কোলাহল-মুখর জনতার দিকে নিবদ্ধ। হঠাৎ তাঁর চোখ দু'টো জলে ভরে আসে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে তিনি বলেন, "আজকের রাত্রিটি পরম শুভ পবিত্র, প্রভু যীশু আজ পৃথিবীতে এসেছিলেন বেদনার্ত্ত মানুষকে আশার বাণী শোনাতে, কিন্তু হায়! আজকের এই আনন্দময় রাত্রিতেও কত হতভাগ্য নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করছে দারিদ্র্যের অভিশাপে—তাদের গৃহ নেই, আত্মীয়-পরিজন নেই, নেই কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ। আমি যদি ওদের দুঃখ মোচন করতে পারতাম—অন্ততঃ ওদের এক জনকেও একটুখানি আনন্দের আস্বাদ দিতে পারতাম—ঐ সব দুঃখী ছেলেমেয়েদের দু'চার জনকে, আর কিছু না হোক, সুন্দর ছোট্ট একটি 'ক্রিস্টমাস্‌ ট্রি' উপহার দিতে পারতাম!···সত্যি, জগতে দুঃখ-দৈন্যের অন্ত নেই কিন্তু মানুষ নিষ্করুণ, কেউ কা'রও দিকে তাকায় না!"

টুপী আর ফারকোটটা পরে হিয়াকিন্‌ বাড়ী থেকে বেরুলেন—দুঃখী মানুষের প্রতি করুণায় ও সহানুভূতিতে মন তাঁর উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

উৎসব-মত্ত নর-নারীর দল তাঁর পাশ দিয়ে চলেছে প্রবল জল-স্রোতের মতো। রাস্তার বাঁকের কাছে এসে হিয়াকিন্‌ থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ, মাথার মধ্যে সেই একই চিন্তা পাক খাচ্ছে ক্রমাগত। হিয়াকিন্‌ চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন।

আশ্চর্য্য! পরস্পরের প্রতি এতটুকু মমতা নেই ওদের! নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত—অপরের জন্য একটুও মাথা ঘামায় না কেউ!···অথচ ওদেরই মধ্যে যে শত শত দুঃস্থ ক্ষুধার্ত লোক রয়েছে—যারা এতটুকু করুণা ও সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল—এ বিষয়ে সংশয় নেই।

একটা কুকুর এসে কাছে দাঁড়াল, নাকটা ঘষতে লাগল তাঁর জুতোয় এবং কান্নার সুরে মৃদু একটা আওয়াজ ক'রে বরফে-ঢাকা শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিলে।

হিয়াকিনের মন করুণায় গলে গেল, গভীর সহানুভূতিতে কুকুরটার উপর ঝুঁকে পড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি বললেন, "হতভাগা গৃহহীন জীব, এই শীতের রাতে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি কেউই তোমার পানে তাকিয়ে দেখছে না। চলো আমার সঙ্গে আমি তোমায় পেট ভরে খাওয়াবো আর পুরোনো একখানা কার্পেট জোগাড় করে দেবো শোবার জন্যে।"

কুকুরটার গায়ে হাত বুলোবার জন্যে হিয়াকিন্‌ হাত বাড়ালেন, কিন্তু কুকুরটা গর্জ্জন করে উঠল ভীষণ ভাবে। মুখটা হাঁ করে সে তার ধারালো দাঁত বসিয়ে দিলে হিয়াকিনের হাতে।

"কে হে তুমি?······আমার কুকুরটাকে বিরক্ত করছ কেন?" কে এক জন ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জ্জন করে উঠল পিছনে এবং পরমুহূর্ত্তেই পাশের একটা দোকান-ঘর থেকে বেরিয়ে এক জন হোম্‌রা-চোম্‌রা লোক কট্‌মট্‌ করে তাকাল বিপন্ন হিয়াকিনের দিকে।

"বেচারা শীতে কষ্ট পাচ্ছে, আমি তাই ওকে বাড়ী নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম," আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন হিয়াকিন্‌।

"বটে!" আগন্তুক বললে শ্লেষের সুরে—"আচ্ছা ধড়িবাজ তো!···একশো রুবল্‌ দামের আমার আসল স্প্যানিয়েলটাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছিলে বাড়ী! মতলবটা তোমার বুঝেছি। তোমাকেই নিয়ে যাওয়া উচিত আর কোথাও—বাড়ীতে নয়, ফাঁড়িতে;" আগন্তুক

একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানে হিয়াকিনের দিকে। হিয়াকিন্ কি যেন বলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কথা যোগায় না মুখে।

"হিপো! হিপো!" আগন্তুক ডাক দিল কুকুরটাকে। কুকুরটা অমনি ল্যাজ নেড়ে চলতে সুরু করল মনিবের পিছু পিছু।

পূর্ব্বের মতোই আনন্দ-পিয়াসী নরনারীর দল পথ বেয়ে এগিয়ে চলে, দূরে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায় তারা, তাদের স্থান অধিকার করে আর এক দল।

গরম ফারকোট প'রে পথ চলতে চলতে হিয়াকিন্ আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। আজকের এই মহোৎসবের রাতে গরীব-দুঃখীর কথা বার বার মনে জাগে তাঁর। হিয়াকিন্ ভাবেন, "উঃ! কী জোরেই না ঝড় বইতে সুরু করেছে—হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে যেন! এখানেই যখন এমন, না জানি ঐ প্রান্তরের মাঝে ঝড়ের দাপাদাপি কী ভয়ঙ্কর রূপই ধারণ করেছে! ওখানে এ সময় যদি কোন নিঃসঙ্গ পথিক ঝড়ের মুখে পড়ে গিয়ে থাকে, তবে বেচারার কষ্টের আর অবধি নেই। তার শতছিন্ন পোষাকের ভিতর দিয়ে কন্‌কনে ঝড়ো বাতাসের অভিযান চলেছে অব্যাহত, তার ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে, চোখে ঘনিয়ে এসেছে মৃত্যুর অবসাদ। খানিকটা পথ যেতে না যেতেই হয়তো তার কানে এসে পৌঁছয় দূর থেকে ভেসে-আসা নেকড়ের ডাক, বুকটা কেঁপে ওঠে গুরু গুরু ক'রে, মনে হয় ঐ বুঝি বাজে তার মরণের ডঙ্কা! তবু সাহসে ভর করে সে এগিয়ে চলে, পথ চলা একান্ত দুঃসাধ্য, প্রতি পদক্ষেপেই পা দু'টো বরফে ব'সে যায় হাঁটু পর্য্যন্ত, তবু সে এগিয়ে চলে প্রাণপণ প্রয়াসে······ এই মর্ম্মান্তিক ক্লেশ বেচারাকে ভোগ করতে হয় কেন? অর্থ নেই বলে তো? অর্থ থাকলে ও অনায়াসে একটা ঘোড়া ভাড়া করতে পারত এই দুর্য্যোগের রাত্রে।···ঝড়ের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য বেচারা হয়তো পুরোনো জীর্ণ কোটটার কলার উঁচু করে তুলে, ঘাড় নীচু করে এগিয়ে চলবে খানিকক্ষণ, তার পর হঠাৎ নিঃশব্দে শুয়ে পড়বে বরফের উপর···"

কোটের আস্তিনটা দিয়ে হিয়াকিন্ এক ফোঁটা অশ্রু মুছে ফেললেন চোখ থেকে, তার পর পাশের একটা নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ রাস্তায় প্রবেশ করলেন। এক জন অসহায় দরিদ্র গোছের লোক কোটের কলারে কান দু'টো ঢাকতে ঢাকতে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল।

হিয়াকিনের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।—"ওহে, শুনছো? দাঁড়াও একবার।" তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হিয়াকিন্ নাগাল ধরলেন পথিকের এবং কোন কথা না বলেই তার হাতে গুঁজে দিলেন তিনটে রুবল।

কলারে ঢাকা মুখখানা তুলে লোকটি একদৃষ্টে তাকাল হিয়াকিনের দিকে।

"এর মানে কী?" জিজ্ঞাসা করলে অপরিচিত লোকটি।

"না না, তুমি সঙ্কোচ বোধ করো না। সামান্য কিছু দিলাম তোমায়। আমি বেশ বুঝতে পারছি অনেকটা পথ যেতে হবে তোমায় অথচ একটা ঘোড়া ভাড়া করবার সামর্থ্য তোমার নেই। আমায় ধন্যবাদ দিও না, বন্ধু—আমি যা পারি সেইটুকু করেছি।··· ওই ঐ প্রান্তরে ঝড়ের দাপাদাপি না জানি কী ভয়ঙ্কর ভাবেই চলেছে···"

"কী স্পর্দ্ধা তোমার!" অপরিচিত লোকটি গর্জ্জন করে ওঠে—"জানো আমি কে? এই অপরাধের জন্য তোমায় জেলে পাঠাতে পারি!···কী ঔদ্ধত্য!"

কথা শেষ করেই লোকটি তার লম্বা কোটটা ঝট্ করে খুলে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল তার তক্‌মা-আঁটা প্রশস্ত বুকখানা—রাস্তার আলোয় তক্‌মাগুলো ঝিকমিক করে ওঠে।

"আমি খুব দুঃখিত··· বুঝতে পারিনি···" জড়িত স্বরে বলেন হিয়াকিন্।

"মদ খেয়েছ বুঝি?···ইয়ারকি করবার আর জায়গা পাওনি!"

বাতাসের বেগটা আরও বেড়ে উঠেছে, বরফের কণা গায়ে বিঁধছে তীক্ষ্ণ সূচের মতো। ঘুরতে ঘুরতে হিয়াকিন্ এসে পড়লেন এক সুবিস্তৃত জনাকীর্ণ রাস্তায়।

"কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে!" বিষণ্ণ মনে ভাবেন হিয়াকিন্, "কবিরা যাদের প্রশস্তি করেন কাব্যে, এই কঠিন পৃথিবীর বুকে যারা পুষ্পকলির মতো কোমল ও সুন্দর, আজ এই উৎসবের রাত্রে ঘুরছে পথে পথে, ক্ষুধার পীড়নে জর্জ্জরিত—খাবারের দোকানে সাজানো রকমারি খাবারের দিকে তারা হয়তো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লুব্ধ-দৃষ্টি নিয়ে, কিন্তু কেউই দয়া করে সামান্য কিছু খাবার দিচ্ছে না তাদের হাতে তুলে। জীবনের সব-কিছু আনন্দ থেকে ওরা বঞ্চিত, জননী ধরিত্রীর ওরা দুর্ভাগা সন্তান···"

আবেগে হিয়াকিনের চোখ সজল হয়ে আসে, কান্না ঠেলে ওঠে বুকের মধ্যে। একটি সুসজ্জিত খাবারের দোকানের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছোট একটি মেয়ে বার বার তাকাচ্ছিল খাবারের দিকে।
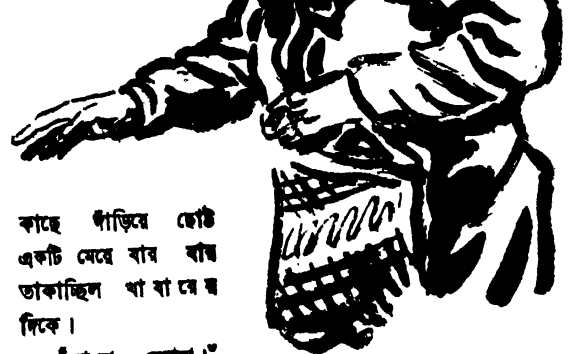
"আহা বেচারা!"

হিয়াকিন্ এগিয়ে গেলেন দোকানের কাছে। মেয়েটির হাতখানি ধরে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "ভারী খিদে পেয়েছে খুকী, মা? এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমায় নানান্ রকম খাবার কিনে দেবো আর আমার ওখানে শীতে কষ্ট পাবে না তুমি, দিব্যি আরামে বসে খাবে।"

"মা! মা!"—মেয়েটি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্ত স্বরে।

নিকটেই একটা পোষাকের দোকানের 'শোকেস্'-এর সামনে দাঁড়িয়ে এক জন মহিলা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে মেয়েদের পোষাকের কাট-ছাঁট নিরীক্ষণ করছিলেন, মেয়েটির চীৎকার শুনে ছুটে এলেন ব্যস্ত ভাবে।

"ছেড়ে দাও ওকে! পাজী বদমায়েস কোথাকার!" মহিলাটি চীৎকার করে উঠলেন—"ছেড়ে দাও বলচি…নইলে এখুনি এই ছাতা দিয়ে মাথা ভাঙ্‌বো তোমার।…তোমার সাহস দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি—আমি রয়েছি ঐ দোকানে আর তুমি কি না আমার সামনে থেকে মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়তে চাও!"

"লোকটা পাকা বদমায়েস, নইলে এত লোকের মাঝখান থেকে মেয়ে চুরি করবার সাহস পায়!"—কে এক জন বলে উঠল ভীড়ের ভিতর থেকে।

"বিশ্বাস করুন আমাকে", হিয়াকিন বিব্রত ভাবে বললেন, "মেয়েটিকে আমি বাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলাম এই ঝড় আর বরফের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য…দেখতেই তো পাচ্ছেন, ঠাণ্ডায় মেয়েটির কী কষ্ট হচ্ছে…"

"পাজী ভণ্ড কোথাকার! ভাল-মানুষ সেজে পার পেতে চাও!…নাভাইল, চলে এসো তাড়াতাড়ি…"

মেয়েটিকে সঙ্গে করে মহিলাটি হন্-হন্ করে এগিয়ে গেলেন।

ঝড়ের বেগ যেন কমতে চায় না, বরফও পড়ছে সমান।

হিয়াকিন্ আবার একটা নির্জন রাস্তায় ঢুকে হাঁটতে শুরু করেন। মনটা তখনও বিষাদ-ভারাক্রান্ত। মানুষের দুঃখ-দৈন্যের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না যেন।

"এক জনেরও দুঃখভার আমি যদি লাঘব করতে পারতাম—এক জনকেও যদি দিতে পারতাম আনন্দের ক্ষীণতম আস্বাদ!" হিয়াকিনের বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে; "প্রকৃত দরিদ্র যারা তাদের আত্মসম্মান-বোধ অত্যন্ত উগ্র, নিজেদের দুঃখ-দৈন্য তারা গোপন করতে চায় সযত্নে। তাই দরিদ্রকে সাহায্য করতে হলে চাই বিশেষ সতর্কতা, যাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে। দাতার আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায় যেখানে, দরিদ্র সেখানে দান প্রত্যাখান করে।"

এক জন দীর্ঘাকৃতি লোক হঠাৎ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। গায়ে তার হলদে রঙের একটা কোট, দড়ি দিয়ে বাঁধা, মাথায় টুপী, টুপীর অর্দ্ধেক ছেঁড়া। লোকটি হিয়াকিনের মুখের দি তাকাল।

"এতক্ষণে বোধ করি ভগবান্ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন" হিয়াকিনের মন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

"ভারী দুর্য্যোগ, না?" সমবেদনার সুরে হিয়াকিন্ বললেন।

"যা বলেছেন—রাস্তায় বেরোয় কার সাধ্য?" আগন্তুক স দিলে তাঁর কথায়।

"মনে হচ্ছে বাড়ী থেকে বেরুবার সময় গরম জামা-কাপড় পর ভুলে গেছ তুমি," হিয়াকিন্ বললেন সতর্কতার সঙ্গে—"দশ রুব ধার পেলে তোমার হয়তো খানিকটা সুবিধা হতে পারে—কি বল?"

"না, আপনি বরং আপনার কোটটা খুলে দিন আমায়," আগন্তু জবাব দিলে সপ্রতিভ মুখে—"দেরী করবেন না মশায়, দি চট্ করে!"

"কিন্তু…আমি গায়ে দেবো কী?" হিয়াকিন্ হতভম্ব হয়ে পড়েন

"আমার এই পুরোনো ভেড়ার চামড়ার জামাটা আপনি ব্যবহা করতে পারবেন। অনর্থক দেরী করবেন না, দিন চট্ করে। আ আপনার ঐ দশ রুবল্ গেল কোথায়? ওটাও দিয়ে দিন এই সঙ্গে।…ওঃ, এক গাদা নোট নিয়ে বেরিয়েছেন যে! নিচ্ছিই যখন, তখন সবটাই নেওয়াই ভাল।…ঘড়িটা ফেরত চান?…কি বলছেন, সোনার নয়? আপনার মতো এক জন পদস্থ লোক রূপোর ঘড়ি ব্যবহার করে কেন বুঝতে পারি না।"

• • • •

ঝড়ের বেগ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, বরফও পড়ছে অবিশ্রান্ত ধারায়।

বরফে-ঢাকা রাস্তা দিয়ে এক জন বৃদ্ধ চলেছে ক্লান্ত অবসন্ন পদে। গায়ে তার দড়ি দিয়ে বাঁধা জীর্ণ একটা ভেড়ার চামড়া, পায়ে ছেঁড়া বুট, বিড় বিড় করে কি বকছে আপন মনে।

মেয়েদের জ্যাকেট-পরা ছোট্ট একটি ছেলে এগিয়ে এল তার কাছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে, "আমায় কিছু দিন না মশাই—খাবার কিনে খাব…"

"খাবে?" কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন হিয়াকিন—"দাঁড়াও, দিচ্ছি খেতে।" হিয়াকিন্ ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন ছেলেটার গালে।

এতক্ষণে হিয়াকিনের পরোপকার করবার বাসনা চরিতার্থ হল। অর্দ্ধ-নগ্ন ক্ষুধার্ত্ত ছেলেটা হিমে ঠাণ্ডায় জমে যেতে বসেছিল, হিয়াকিনের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে শরীরটা তার গরম হয়ে উঠল চট্ করে।

কালো মেয়ের গান

(পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ডিক্‌সি যাবার পথে দক্ষিণেতে
(হৃদয় হৃদয় মোর ছিন্ন করি)
আমার প্রেমিক, কালো প্রিয়তম সে,
ওরা যে দিয়েছে তার গলায় দড়ি।

ডিক্‌সি যাবার পথে দক্ষিণেতে
(বিক্ষত দেহ তার শূন্যপরে)
"সাদাদের ভগবান যিসাস্ প্রভু"
বলো, ওরা প্রার্থনা কেন যে করে!'

ডিক্‌সি যাবার পথে দক্ষিণেতে
(হৃদয় হৃদয় মোর গিয়েছে ছিঁড়ে)
আমার প্রেমেরই আহা মৃত্যু দেখ'
গাছের শাখায় মরা প্রিয়তমরে;

(Langston Hughes' 'Song for a Dark girl' হইতে)

নেতাজীর গল্প

গল্পদাদু

পৃথিবীতে যাঁরা বড় হয়েছেন, বাল্য-জীবনেই তাঁদের চরিত্রে এমন অনেক কিছু বিশেষত্ব দেখা গিয়েছে—পড়াশোনা বা খেলা-ধূলার ভিতর দিয়েই ভাবী জীবনের আদর্শরূপে যেগুলি ফুটে উঠেছে। ইতিহাসে তোমরা পড়েছ—বালক নেলসন্ তাঁর দিদিমার মুখে ভয়ের কথা শুনে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ভয় কি দিদিমা! ভয় বলে আমি ত কিছু জানি না?' এমনি বালক নেপোলিয়ানের ছেলে-খেলা ছিল নকল লড়াই করা। শীতকালে ও-দেশে বরফ পড়ে স্তূপের মত হয়ে থাকে। সেইগুলো ভেঙে গোলার মতন করে ছেলেরা ছোড়াছুড়ি করত। উঁচু একটা জায়গাকে কেল্লা ঠিক করে এক দল ছেলে তাকে রক্ষা করতো, আর এক দল ছেলে তাকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ চালাতো জয় করবার মতলবে। এ খেলার ফন্দী বেরুত নেপোলিয়ানের মাথা থেকে আর তিনিই হতেন আক্রমণকারী-দলের নেতা।···শিবাজীও ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে মহাভারতের বীরপুরুষদের বীরত্ব-কাহিনী শুনতে শুনতে তন্ময় হোয়ে বলে উঠতেন, 'ঠাকুমা, ঠাকুমা, তুমি দেখো—এক দিন আমিও ওঁদের মতন যোদ্ধা হবো, লড়াই করে সবাইকে হারিয়ে দোব।'

আমাদের নেতাজীর বিশাল জীবন-তরুর গোড়ার অঙ্কুরগুলির সন্ধান করলে এমনি অনেক কথা জানা যায়—যেগুলি শুনলে তোমাদের তরুণ মনগুলিও আনন্দে দুলে উঠবে, সেই সঙ্গে বোঝবার ও ভাববার অনেক উপকরণও মিলবে।

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, আমাদের নেতাজীর বাল্যজীবন কেটেছিল কটক শহরে। কলিকাতা যেমন বাংলার রাজধানী ও প্রধান নগরী, উড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান নগর তেমনি কটক। সরকারী আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, বেসরকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান—সব কিছুই কটক শহরে বিদ্যমান। নেতাজীর বাবা জানকীনাথ তখন কটকের সরকারী উকীল, তাছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সুরু করে যত কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান—প্রত্যেকটির তিনি মাথা। তখনকার দিনে কৃতবিদ্য যে কয় জন বাঙালী বাংলার বাইরে গিয়েছেন শিক্ষা বিজ্ঞান আইন বা চাকরীকে অবলম্বন করে, তাঁরা প্রত্যেকে অসাধারণ প্রতিভা ব্যক্ত করে এমনি দেশের মাথা হয়ে বসেছিলেন। তাঁদের কথা তোমাদের আসরে পরে শোনাবার ইচ্ছা রইল। এখন জানকীনাথের কথা বলি। তিনি ছিলেন যেমন নামী, মানী আর গুণী, তেমনি তাঁর প্রকৃতিও ছিল গম্ভীর। তাঁর মতন রাসভারী মানুষের কাছে সহজে কেউ ঘেঁসতে সাহস করত না।

সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, বাড়ীর যিনি মাথা, আর রাসটিও খুব ভারি, বাড়ীশুদ্ধ লোক তাঁকে ভয় করে চলে—তিনি যেটি পছন্দ করেন না, ভুলেও কেউ সে কাজ করতে এগোয় না, কর্ত্তার মন যুগিয়ে চলাটাকে সকলে কর্ত্তব্য মনে করে। গম্ভীর প্রকৃতি জানকীনাথকে বাড়ীর সকলে এমনি ভয় করতেন, সবাই চলতেন তাঁর ইচ্ছার তালে তালে। কিন্তু বালক সুভাষকেই প্রথম দেখা যায় নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বা রুচির দিকে চেয়ে চলতে। তাঁর বিদ্রোহী প্রকৃতির অঙ্কুরটিও ফুটে ওঠে শৈশব জীবনে—তিনি যখন এগারো-বারো বছরের বালক।

তখনকার মান্যগণ্য মানুষদের মতন জানকীনাথও অনেকটা সাহেবী চালে চলতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। বাড়ীর আদব-কায়দায় তার নিদর্শন পাওয়া যেত। ছেলেপুলেরা সকলেই সাহেবদের ছেলেদের মতন পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষাও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট স্কুলে—সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা জানকীনাথ পছন্দ করতেন না, কাপড়-চোপড় পরারও তিনি বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু বালক সুভাষ একটি একটি করে এই প্রথাগুলি পাল্টে দিলেন। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট স্কুলে তিনি যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলেন, জিদ ধরে সেখান থেকে নাম কাটিয়ে ভর্ত্তি হলেন র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে। ক্লাসে বসে পরিচিত মুখগুলি দেখে খুসিতে মন ভরে গেল তাঁর। চেয়ে চেয়ে দেখেন—বাঙালী, উড়িয়া, মাদ্রাজী, মুসলমান ছেলেরা আশে-পাশে বসে, সবাই তাঁর দেশের ছেলে। আর এমনি আশ্চর্য্য, এক দিনেই যেন তারা আপনার হয়ে গেছে। শিক্ষক মহাশয়রাও এই প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে দেখে, তাঁর মিষ্ট ও শিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে প্রীত হলেন। সুভাষও মুগ্ধ হলেন তাঁদের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব দাস মহাশয় তখন এই স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক। তাঁর বাঙালীসুলভ সাদাসিধা পরিচ্ছদ, শিক্ষার ধারা, অমায়িক আচরণ সুভাষের মনের উপর একটা প্রভাব সৃষ্টি করল। মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে তিনি বাড়ীতে ফিরলেন, সেই সঙ্গে একটা সঙ্কল্পও দৃঢ় হয়ে উঠল তাঁর মনে।

পরদিন ক্লাসের ছেলেরা অবাক্ হয়ে দেখেন, তাদের বিশিষ্ট সহপাঠী—শহরের বিখ্যাত ব্যক্তি 'জানকী সাহেব'এর ছেলে তাদেরই মতন ধুতি পিরান পরে চাদর গায়ে দিয়ে স্কুলে এসেছে। এ যেন একটা তাজ্জব কাণ্ড! কিন্তু এই বেশ-পরিবর্ত্তন—সহপাঠীদের সঙ্গে আন্তরিকতায় সঙ্গে মিলনের ব্যবধানটুকু সব যেন নিশ্চিহ্ন করে দিল। জানকী সাহেবের ছেলের সঙ্গে আজ ক্লাসের সব ছেলেরা মন-প্রাণ খুলে অবাধে মিশতে পারল, আপনার করে নিল। দূরদর্শী শিক্ষাব্রতী মনীষী দাস মহাশয়ও এক নজরে এই ছেলেটির আপাদ-মস্তক দেখেই বুঝতে পারলেন, এ ছেলে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, এক দিন এর আভায় সমগ্র দেশ ও জাতি হবে উজ্জ্বল।

কথাটা জানকীনাথের কানে যেতেই সুভাষকে কাছে ডেকে

জিজ্ঞাসা করলেন—এই জন্যে কি জিদ করে এ স্কুলে ঢোকা হয়েছে? পোষাক বদলাবার কারণটা কি?

গম্ভীর প্রকৃতি যে-পিতার সামনে দাঁড়িয়ে কোন ছেলেই মুখোমুখি কথা বলতে সাহস করেননি কোন দিন, তাঁকে বোধ হয় এই প্রথম স্তব্ধ করে নির্ভীক কণ্ঠে সুভাষ উত্তর দিলেন—এই ত আমাদের জাতীয় পোষাক বাবা! দেখলাম, প্রধান শিক্ষক দাস মহাশয়ও কাপড়-জামা পরে ক্লাসে আসেন আর সব ছেলেদের মতন। আমার কি উচিত সেখানে একটি সাহেব সেজে বসা? কাপড় পরে আমাকে কি ভালো দেখাচ্ছে না? আমিও বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছি।

ছেলের কথাগুলি স্তব্ধ হয়েই পিতা শুনলেন, বোধ হয় মনটিও তাঁর দুলে উঠেছিল। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছেলের কথাগুলি যে যুক্তিপূর্ণ, সেটা যেন উপলব্ধি করেই বললেন—বেশ, কাপড় পরে তুমি যদি আরাম পাও, তাতে আর কথা কি। কাপড় পরেই তুমি স্কুলে যেও।

এর পর জানকীনাথ তাঁর বিশিষ্ট প্রতিবেশী বন্ধু র‍্যাভেনস কলেজের অধ্যাপক রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়কে বললেন—সুবি এমন ভঙ্গিতে আর নির্ভয়ে কথাগুলো বলল যে, আমি তাতে সায় না দিয়ে পারিনি।'

রায় বাহাদুর হাসতে হাসতে বলেন—'একটা কথা আছে না—উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়! এও তাই; আপনি শুধু সুবিকে লক্ষ্য করে যাবেন।'

অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেদের নিয়ে সুভাষ একটা দল গড়ে বসলেন। শুধু তাঁর ক্লাসের ছেলেরা ছাড়াও অন্যান্য ক্লাসের ছেলেরা তাঁর দলে যোগ দিল। হয়ত উঁচু ক্লাসে পড়ে, আর বয়সে বড়—এমন অনেক ছেলেও দলে মিশে সুভাষকে সরদার বলে মেনে নিল। সেই বয়সেই বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের চালাবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন সুভাষ।

জানকীনাথের কানেও এ সব খবর পৌঁছাতে দেরী হয় না। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা তিনি পছন্দ না করলেও সুভাষকে নিবারণ করতে বা বাধা দিতে কুণ্ঠিত হন তাঁর পড়াশুনার আশ্চর্য্য রকম পরিণতি দেখে। ছেলে শুধু তার ক্লাসে নয়—সারা স্কুলের মধ্যে সেরা ছেলে। ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত—প্রত্যেক বিষয়েই মার্কের দিক দিয়ে রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, আঁকে পুরোপুরি একশো মার্কই পায়, আর আর বিষয়ে নব্বুইএর নীচে মার্ক নামে না। কাজেই পড়াশোনায় যে ছেলে এত ভালো, কি করে তাকে বারণ করেন তিনি—বাইরের ছেলেদের সাথে মিশতে।

কিন্তু এক দিন এ ধৈর্য্যের বাঁধও তাঁর ভেঙ্গে গেল—একটি ঘটনায়। তখন গ্রীষ্মকাল, স্কুল বন্ধ। সুভাষ কিন্তু খুব ভোরেই কাউকে কিছু না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়; ফিরে আসে দুপুরে। বাড়ীর সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়; ছেলের খাবার নিয়ে মা থাকেন বসে। ছেলে না খেলে মা কি করে খেতে পারেন! অত বেলায় বাড়ী ফিরে স্নান সেরে মায়ের সঙ্গেই খেতে বসেন। মাকে বুঝিয়েছিলেন, খুব একটা দরকারী কাজে এই ভাবে কিছু দিন যেতে হবে। মা তলিয়ে অত জানতে চাননি কাজটি কি! কথাটা জানকীনাথের কানে যেতেই মনে তাঁর সন্দেহ জাগে। এর ফলে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন তিনি—ছেলের কাজটি খুবই সাংঘাতিক; তার ক্লাসের একটি ছেলের 'স্মল পক্স' হয়েছে, দলের ছেলেরা পালা করে তার সেবা চালাচ্ছে। আর সুভাষ হচ্ছেন দলের মাথা, তাই সকাল থেকে বারোটা পর্য্যন্ত নিজেই সেবা করে, আর সব ব্যবস্থাই তাকে করতে হয়। শুনেই তিনি আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সুভাষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই অকপটে তিনি সত্য কথাই বললেন।

পিতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'জানো, এ রোগ কি রকম ভয়ঙ্কর আর সংক্রামক, এর সংস্পর্শে যেতে তোমার ভয় নেই?'

মুখখানা শক্ত করে সুভাষ উত্তর করলেন—'এ রোগ যে সংক্রামক তা জেনেই আমি সাবধানের সঙ্গে তার সংস্পর্শে যাই। ফিরে এসেই ভালো করে স্নান করি, আমার কাপড়-চোপড় আলাদা করে লোসন দিয়ে সাফ করিয়ে নিই। আর, রোগের ভয়ে যদি রোগীর সেবা না করি, তাহলে রোগ সারবে কি করে?'

এর পর জানকীনাথকেই উদ্যোগী হয়ে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তিনি স্বয়ং। চিকিৎসকরা তোড়-জোড় করে রোগীর বাড়ীতে গিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, জানকী সাহেবের ছেলের সুব্যবস্থায় রোগী আরোগ্যের পথে এসেছে, তার জীবনের আর কোন আশঙ্কা নেই। তাঁরা মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করলেন সুভাষের।

সুভাষ তখন বাবাকে বললেন—'রোগ যখন দেখা দিয়েছে শহরে, এখন থেকেই তার প্রতীকার করা উচিত।'

জানকীনাথ ছেলের যুক্তি নিয়ে যে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে স্বাস্থ্য-বিভাগকে নির্দেশ দিলেন, তার ফলে শহরে আর এ ব্যাধি বিস্তৃত হতে পারল না। এই প্রসঙ্গে জানকী সাহেবের ছেলের নামে লোকের মুখে মুখে সুখ্যাতি উঠল।

এর কিছু পরে হঠাৎ এক দিন শহরের প্রান্তভাগে মুসলমান বস্তীতে লাগল আগুন। সে কি ভীষণ কাণ্ড। আগুনের বিভীষিকায় লোক-জন যখন ব্যাকুল হয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করছে, সেই সময় এক দল ছেলে যেন দেবদূতের মতন ধেয়ে এল আগুন নেবাতে—দলের নেতা বালক সুভাষ। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে র‍্যাভেনস কলেজের অধ্যাপক মিষ্টার গাঙ্গুলীও অকুস্থলে এসে পড়লেন। বালকদলের উৎসাহ, উদ্যম ও সাহস, আর দলপতি সুভাষের চালনাশক্তি দেখে উল্লাসের সুরে বাহবা দিলেন তিনি—সাবাস—সাবাস—বাহাদুর ছেলে।

শ্রদ্ধার সুরে সুভাষ বলে উঠলেন—আসুন স্যর, আপনি যখন এসেছেন, আর ভয় কি! আগুন আমরা নেবাবই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সমবেত চেষ্টায় আগুন নিবে গেল।

★

অজিত দত্ত

সব রকমের গল্প বুড়ি ভর্তি রাখে ঝুড়ি,
যখন তখন গল্প বিলোয় দু'দশ হাজার কুড়ি।

ছোট্টো ছেলের পছন্দসই মিষ্টি-মাখা গল্প,
পণ্ডিতেরও মনের মতো হরেক পুরাকল্প,
একটু বড়োর স্বপ্ন-মাফিক গল্প অসম্ভাব্য,
তরুণ জনের ফরমাসি সে গল্প তো নয় কাব্য,

মাথায় নিয়ে বাজে কথার ঝুড়ি
রাস্তা চলে আদ্যিকালের বুড়ি।

সত্যি-যুগের, মিথ্যে-যুগের, হাল্কা, ভারি, মিষ্টি,
লম্বা ছোটো গল্প যতো সব আছে তার লিষ্টি।
মনের পথে রাত-বিরেতে সময়-অসময়ে
কাজের ফাঁকে ঘুমের ঘোরে গল্প বেড়ায় বয়ে।

রাশভারি কি হাল্কা মেজাজ, চটুল কিম্বা বাজে,
সবাই শোনে বুড়ির আওয়াজ হঠাৎ মাঝে মাঝে

চিন্তাশীলের গল্প আছে তত্ত্ব কথায় পূরতি,
হাল্কা-কথার খরিদ্দারের গল্পে গাঁথা ফূর্তি,
যার যেমনই পছন্দ আর যার যতোটা চাই
আদ্যিকালের বুড়ির কাছে মিলবে হামেশাই।
বিলোয় বুড়ি গল্প-গাথা গঙ্গা থেকে কঙ্গো,
হাজার ছাঁদের গল্প রে তার লক্ষ তাদের ঢং গো,
কেউ বা শুধু কুড়িয়ে রাখে মনের ঝাঁপি ভর্তি,
কেউ কাগজে কালোর দাগে কুড়োয়
ঝড়্তি পড়্তি,
কেউ বা করে গল্প-বিলাস, গল্প লেখে অন্তে,
বুড়ির ঝুড়ি ভর্তি তবু ভবিষ্যতের জন্যে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম

নূতন অভিযান

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, "আর পড়তে হবে না মাণিক, ফেলে দাও তোমার ঐ খবরের কাগজখানা। আমি রাজনীতির কচ্‌কচি শুনতে চাই না, আমি জানতে চাই নতুন নতুন অপরাধের খবর। কিন্তু আমি যা চাই তোমার ঐ খবরের কাগজে তা নেই। অপরাধীরা কি আজ-কাল ধর্ম্মঘট করেছে? এ হ'ল কি? এত বড় কলকাতা সহর, কিন্তু এখানে কেউই একটা অপরাধের মতন অপরাধ করতে পারছে না।"

মাণিক কাগজখানা মেঝের উপরে নিক্ষেপ ক'রে হাসতে হাসতে বললে, "কারুর পোষ মাস, কারুর সর্ব্বনাশ। তুমি চাও অপরাধীদের, কিন্তু সাধু নাগরিকদের পক্ষে তারা কি দুঃস্বপ্ন-লোকের জীব নয়?"

জয়ন্ত বললে, "অপরাধ হচ্ছে বিচিত্র। সাধু মানুষদের চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে অপরাধীরাই। মহাভারত পড়বার সময় তুমি কি অনুভব করনি মাণিক, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুর্য্যোধন আর দুঃশাসনের কথা জানবার জন্যেই আমাদের বেশী আগ্রহ হয়? মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্য প'ড়ে দেখো। তার মধ্যে রামের চেয়ে বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে রাবণের চরিত্রই। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন হচ্ছে একেবারেই বেরঙা, কিন্তু রঙের পর রঙের খেলা দেখা যায় অপরাধীদের জীবনেই।"

মাণিক সায় দিয়ে বললে, "তা যা বলেছ ভাই, এ-কথা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু কি আর করবে বল, কলকাতা-পুলিসের সুন্দর বাবুও তিন মাসের ছুটি নিয়ে ব'সে আছেন, তিনিও যে 'হুম্' ব'লে কোন নতুন মামলা নিয়ে আমাদের এখানে ছুটে আসবেন তারও আশা নেই। অগত্যা আমাদের বাধ্য হয়েই বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে।"

ঠিক এমনি সময়ে মধু-চাকর এসে খবর দিলে, এক জন লোক না কি জয়ন্তের সঙ্গে এখনি দেখা করতে চায়।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কি-রকম লোক মধু?"

—"একটি ছোক্‌রা বাবু! বয়স বোধ হয় বাইশ-তেইশের বেশী হবে না। তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় তিনি যেন ভারি ভয় পেয়েছেন।"

—"আচ্ছা মধু, বাবুটিকে এইখানেই নিয়ে এস।"

তার একটু পরেই সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ জাগিয়ে একটি লোক ব্যস্ত ভাবে ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রেই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "জয়ন্ত বাবু কোথায়? আমি এখনি জয়ন্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

—"আমারই নাম জয়ন্ত। আপনি বড়ই উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি, ঐ চেয়ারখানার উপরে গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসুন।"

আগন্তুক সামনের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ধপাস্ ক'রে তার উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "উত্তেজিত না হয়ে কি করি বলুন দেখি। কাল রাত্রে আর একটু হ'লেই আমার প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়া হয়ে যাচ্ছিল যে!"

জয়ন্ত হাসি-মুখে বললে, "তা'হলে ঘটনাটা নিশ্চয়ই গুরুতর বটে, কিন্তু কি জানেন, শান্ত ভাবে না বললে কোন ঘটনার ভিতর থেকেই আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি না।"

আগন্তুক অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বললে, "জয়ন্ত বাবু, এইবারে আমার কথা বলতে পারি কি?"

—"বলুন। আপনার কথা শোনবার জন্যে আমাদেরও আগ্রহের অভাব নেই।"

—"আপনাদের তো আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু কাল আমার ঘাড়ে চেপেছিল মস্ত-বড় এক কুগ্রহ। আজ যে বেঁচে আছি সে হচ্ছে ভগবানের দয়া।"

—"বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সব-চেয়ে বড় কথা। অতএব বেঁচে যখন আছেন তখন নির্ভয়ে আপনার সমস্ত ইতিহাস আমাদের কাছে বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নামটি কি?"

—"সুব্রত সরকার।"

—"বেশ, এইবার আপনার কি বলবার আছে, বলুন।"

সুব্রত বললে, "কাল রাত্রে মশাই, আমার বাড়ীতে ভয়ঙ্কর এক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি এখনও বিবাহ করিনি, নিজের বাড়ীতে একলাই থাকি। কাল রাত্রে দিব্য নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হ'ল অনেকগুলো হাত দিয়ে অন্ধকারে কারা যেন আমাকে চেপে ধরেছে! আমি বাধা দেবার চেষ্টা ক'রেও কিছুই করতে পারলুম না; কারণ, চার-পাঁচখানা হাত দড়ি দিয়ে আমাকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে। আমার মুখেও গুঁজে দিলে বিছানার চাদরের খানিকটা, আর চোখের উপরেও বাঁধলে একখানা কাপড়। সেই অবস্থাতেই অনুভব করলুম, 'সুইচ' টিপে কারা আলো জ্বাললে। তার পর শুনলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলার শব্দ। তার খানিক পরেই ঘরের আলো গেল আবার নিবে। কয়েক জনের পায়ের শব্দ বাইরে চলে গেল, তার পর আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হ'ল। তার পর আর কারুর কোন সাড়া-শব্দ পেলুম না বটে, কিন্তু আমাকে সেই অবস্থাতেই কাণা আর বোবার মতন চুপ ক'রে থাকতে হ'ল। সকাল বেলায় চাকর এসে আমাকে মুক্তিদান করলে।"

জয়ন্ত বললে, "আপনার ঘরের ভিতরে বাইরের লোক এল কেমন ক'রে?"

—দরজা দিয়ে মশাই, দরজা দিয়ে! আমার একটা বদ

অভ্যাস আছে, গ্রীষ্মকালে আমি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমোতে পারি না।"

—"তার পর? বিছানা থেকে নেমে আপনি কি দেখলেন?"

—"দেখলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলা প'ড়ে রয়েছে। তার ভিতরে শ'-পাঁচেক টাকার নোট আর কিছু গয়নাও ছিল, কিন্তু সে-সব কিছুই চুরি যায়নি। চোরেরা নিয়ে গিয়েছে কেবল একটি জিনিষ, যা ছিল সোনার আনারসের মধ্যে।"

জয়ন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "সোনার আনারস! সে আবার কি?"

মাণিক বললে, "সোনার পাথরবাটির কথা শুনেছি, কিন্তু সোনার আনারসের কথা শুনলুম এই প্রথম।"

সুব্রত বললে, "তাহ'লে একটু গোড়ার কথা বলতে হয়। কোন্ খেয়ালে জানি না, আমার প্রপিতামহ পিতল দিয়ে গড়িয়েছিলেন এই আনারসটি। এই আনারসের উপরে সোনার কলাই-করা ছিল ব'লে আমরা একে সোনার আনারস বলেই ডাকি। আমার প্রপিতামহ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এই সোনার আনারসটি পিতামহের হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, 'যদি কোন দিন তোমার বিশেষ অর্থাভাব হয় তাহলে এই আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান!' আমার পিতামহ মৃত্যুকালে আমার বাবাকে ঠিক এই কথাই ব'লে গিয়েছিলেন। বাবাও যখন মৃত্যুমুখ, তখন তাঁর মুখে শুনেছিলুম এই কথাই। এই সোনার আনারসটি টানলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষরা ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু আমি ধনী নই। তাই সোনার আনারসের ভিতর থেকে অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে পেয়েছিলুম খালি এক-টুকরো কাগজ। আর সেই কাগজের উপরে লেখা ছিল যে কথাগুলো, তা প্রলাপের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কথাগুলো কি?"

সুব্রত একটু ভেবে বললে, "কাগজে লেখা ছিল একটি ছড়া। কিন্তু তার প্রথম আর শেষ দিক্‌টার কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে পড়ছে না।"

—"যেটুকু মনে প'ড়ছে, বলুন দেখি।"

সুব্রত বললে, "ছড়ার প্রথম দিক্‌টায় আছে এই কথাগুলি—

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বুদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।'

বলতে পারেন জয়ন্ত বাবু, এর মধ্যে কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি? বুদ্ধ বট না কি আয়নাতে তার মুখ দেখে গান ধরেছে! এমন কথা শুনলে কি হাসি পায় না?"

জয়ন্ত মাথা হেঁট ক'রে ভাবতে ভাবতে বললে, "আমার একটুও হাসি পাচ্ছে না সুব্রত বাবু! ছড়ার শেষ দিক্‌টায় কি আছে?"

সুব্রত বললে, "শেষ-দিক্‌টায় আছে—

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা!'

হ্যাঁ জয়ন্ত বাবু, এগুলো কি পাগলের প্রলাপ নয়?"

জয়ন্ত প্রায় পাঁচ-মিনিট কাল স্তব্ধ ও স্থির হয়ে ব'সে রইল। তার পর হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে ব'সে বললে, "ছড়ার মাঝখানকার কোন কথাই আপনার মনে নেই?"

—"এ-রকম একটা বাজে ছড়ার কথা মনে রাখবার কেউ কি চেষ্টা করে জয়ন্ত বাবু? চোর ব্যাটারা কি নির্ব্বোধ! তারা কি না লোহার সিন্দুক খুলে কেবল এই ছড়ার কাগজখানা নিয়েই স'রে পড়েছে!"

জয়ন্ত বললে, "চোরেরা বেশী নির্ব্বোধ কি আপনি বেশী নির্ব্বোধ সেটা এখনি আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু ছড়ার কিছু-কিছু অর্থ আমি যেন আন্দাজ করতে পারছি।"

—"পারছেন না কি? আমি তো কত বার ঐ কাগজখানা প'ড়ে দেখেছি, কিন্তু অর্থ বা অনর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি।"

জয়ন্ত বললে, "এখনও

আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি, এটা হচ্ছে আশ্চর্য্য কথা। আপনার বাড়ীতে এক দল চোর এল, তারা আপনার লোহার সিন্দুক খুলে মূল্যবান্ কিছুই নিয়ে গেল না, নিয়ে গেল কেবল এক-টুকরো কাগজ যার উপরে লেখা ছিল এই ছড়াটি, আর আপনার পূর্ব্বপুরুষরা ব'লে গেছেন যার মধ্যে পাবেন আপনি দুঃসময়ে অর্থের সন্ধান! 'সর্পনৃপের দর্প ভেঙে বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা!' এটুকু প'ড়েও আপনার মনে কোন সন্দেহের ইঙ্গিত জাগেনি?"

সুব্রত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "কিছু না, কিছু না। সর্পনৃপই বা কি, আর তার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কই বা কি?"

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বৈ কি! মাণিক, তুমি কিছু বুঝতে পারছ কি?"

মাণিক বললে, "পাগল! ধাঁধা নিয়ে আমি কোন কালেই মাথা ঘামাবার চেষ্টা করি না।"

জয়ন্ত মৃদু হাস্য ক'রে বললে, "কিন্তু ঐ চেষ্টাই হচ্ছে আমার জীবনের তপস্যা! চিরদিনই আমি ধাঁধার জবাব খুঁজতে চাই। যাক্-গে সে-কথা। সুব্রত বাবু, আপনাকে আমি দু'-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"

—"করুন।"

—"এই ছড়ার কথা আপনি আগে আর কারুর কাছে বলেছিলেন কি?"

—"তা বলেছিলুম বৈ কি! অনেক লোকের কাছেই ঐ ছড়াটা দেখিয়েছিলুম। যে দেখেছে, সেই-ই অবাক্ হয়ে গেছে! ওর মধ্যে কোনই মানে খুঁজে পায়নি। যার মানেই নেই, তার মধ্যে আবার মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি জয়ন্ত বাবু?"

জয়ন্ত সেই জিজ্ঞাসার কোনই জবাব না দিয়ে বললে, "সুব্রত বাবু, আপনি বললেন যে, আপনার পূর্ব্বপুরুষরা না কি ধনী ছিলেন। তাঁরাও কি কলক তাতেই বাস করতেন?"

—"না। আমাদের আদি বাস হচ্ছে দক্ষিণ বাংলার কোদালপুর গ্রামে। আমার পূর্ব্বপুরুষরা ছিলেন জমিদার। দেশে আজও আমার কিছু জমি জমা আছে, আর তার ব্যবস্থা করতে এখনো আমি মাঝে মাঝে দেশে যাই বটে; কিন্তু নিজেকে আর জমিদার ভেবে আত্মগৌরব লাভ করতে পারি না।"

—"দেশে আপনাদের বসতবাড়ী আছে তো?"

—"আছে, এইমাত্র। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, চার-চারটে মহল, তার চারিধার ঘিরে মস্ত-বড় বাগান, কিন্তু সে-সমস্তই আজ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে আর বন-জঙ্গলে। বসতবাড়ীর একটা মহলের কিছু কিছু সংস্কার ক'রে খান-ছয়েক ঘর কোন-রকমে মানুষের বাসের উপযোগী ক'রে নিয়েছি, যখন দেশে যাই সেই ঘরগুলো ব্যবহার করি।"

—"আপনাদের দেশের বাগানে পুকুর আছে?"

—"নিশ্চয়ই আছে, প্রকাণ্ড পুকুর—কলকাতার গোলদীঘির চেয়ে প্রায় চার-গুণ বড়।"

—"আর সেই পুকুরের ধারে কোন পুরানো বটগাছ আছে কি?"

—"ভারি আশ্চর্য্য তো, আপনি এমন প্রশ্ন করছেন কেন? হাঁ মশাই, পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা মস্ত বটগাছ, তার কত কেউ তা জানে না।"

—"আর সেই বটগাছের উপরে বাস করে বকের দল?"

সুব্রত বিপুল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "এ আপনি জানলেন কেমন ক'রে?"

—"পরে বলব। আপাতত আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিন।"

—"সেই বটগাছের উপরে চিরদিন ধ'রেই বাস ক'রে আ[...] বকের দল। ও-গাছটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন তাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বসে রইল নীরবে। তার পর হঠাৎ উঠে দাঁ[...] নিজের রূপোর শামুকের ভিতর থেকে এক-টিপ নস্য নিয়ে ব[...] "মাণিক, জাগ্রত হও।"

—"ব্যাপার কি বন্ধু? খুব খুসি না হ'লে তুমি নস্য নাও [...] কিন্তু খুসির কারণটা কি?"

—"আর আমরা অলস হয়ে ব'সে থাকব না। ওঠ, ম[...] পোঁটলা-পুটলি বাঁধতে বল। আজ থেকেই সুরু হবে আমাদের ন[...] অভিযান!"

—"কিন্তু যাবে কোন্ দিকে?"

—"সুব্রত বাবুর দেশে, কোদালপুর গ্রামে।"

সুব্রত খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে ব'সে রইল। তার পর বি[...] স্বরে বললে. "ও জয়ন্ত বাবু, ঐ ছড়ার প্রলাপের ভিতর থেকে আ[...] কোন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন না কি?"

—"আপনার পূর্ব্বপুরুষরা ব'লে গেছেন, ছড়ার মধ্যে অর্থের স[...] পাওয়া যাবে। তাঁদের কথা মিথ্যা নয়। সত্য সত্যই এই ছড়া[...] ভিতরে আছে গভীর অর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি স[...] ছড়াটির কথা আমাকে বলতে পারলেন না। তাহ'লে হয়তো এ[...] সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত।"

—"এমন জানলে আমি যে ছড়াটা একেবারে মুখস্থ ক[...] রাখতুম!"

—"যাক্-গে, যেটুকু সূত্র পেয়েছি তাই নিয়েই এখন কাজ আ[...] ক'রে দি। মাণিক, সুন্দর বাবুকে আমাদের সঙ্গে যাবার [...] আমন্ত্রণ ক'রে এস—তিনি এখন ছুটিতে আছেন। সুন্দর বাবু [...] না থাকলে আমাদের কোন অভিযানই ভালো ক'রে জমে না।"

[ক্রমশঃ

অং-বং-চং

কুমারী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

সংসারেতে হিংসা এবং বিসংবাদের চোটে—
বংশীবাবু কাংস্য বেচে জংগলেতে ছোটে।
সংশয় হয় আছেন কি না মীমাংসা তার কী?
গুরু জোটেন পরম-হংস ত্রিংশ টাকা ফি!
অং বং চং হ্রীং ক্রীং ক্লীং মন্ত্র দিলেন তিনি।
অসংশয়ে বংশীবাবু স্বর্গ নিলেন কিনি।

★

ছবি—[illegible] রায়

ভাব—উৎপলা মুখোপাধ্যায়

চায়ের সেট সাজিয়ে খুকু
রয়েছে বসে আসবে টুকু
হয়ত সাথে আসবে হেনা
তার সঙ্গে নতুন চেনা !!

দেখছে চেখে কেমন হ'ল
বেশ হয়েছে যেই যা বল
এল না তারা বয়েই গেল
সবার ভাগ একাই খেল

চারটে বাজে কই গো তারা ?
ভেবেই খুকু হচ্ছে সারা
এল না তবে নিজেই খাই
কাপেতে চা ঢালছে তাই।

আরাম ভারী গরম চা'তে
বিস্কুটটি অন্য হাতে—
দিব্য সুখে খাচ্ছে খুকু
নাই বা এল হেনো ও টুকু

আণবিক বোমার দানবিক সৃষ্টি

সুহাসচন্দ্র মল্লিক

মহা সমরের মহা অস্ত্রের নাম
তোমরা শুনেছ সবে—শোন অবিরাম।
নাম বোমা আণবিক,
সৃষ্টি তা' মানবিক,
প্রচণ্ড দানবিক শক্তি ভীষণ।
বিজ্ঞানীদের নব আবিষ্করণ।
এই বোমা আগ্নেয় অস্ত্র সমান,
রাক্ষুসে শক্তির দিয়াছে প্রমাণ।
বুবুম্ বুবুম্ রবে ধ্বংসেরি তাণ্ডবে
জাপানেরে খাণ্ডবে করেছে দহন—
পাশুপাত অস্ত্রের সংস্করণ!
জাপানের ধ্বংসের অংশেরি নাম—
হিরোসিমা, নাগাসাকি ; শোন পরিণাম!
লক্ষ লোকেরে সেথা
চক্ষের পলকে তা'—
ভস্মে করেছে যেথা শেষ পরিণাম—
এটি ডিম্বাকার 'ইউরেনিয়াম'।
বিস্ফোরণের ক্রিয়া নহে আজই শেষ
ভবিষ্যতের মাঝে রেখে গেছে রেশ।
বোমা হ'তে নির্গত
'গামা-রে'র ক্রিয়া মত'
বদলাবে মা'র যত ভাবী সন্তান ;
অতি মানুষের দেখা পাবে যে জাপান।
অতি মানুষের অতি বিদ্ঘুটে রূপ :
দু'টি হৃৎপিণ্ডতে বুক ধুপ্ ধুপ্,
তিনখানি চোখ রবে
অথবা অন্ধ হবে,
হাত হীন হবে নয় দু'ডজন হাত।
নিপ্পন-ভাবীদের জবর বরাত!
জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের জ্ঞানী-অনুমান
অদূর ভবিষ্যতে হবে যে প্রমাণ!
এই সব অদ্ভুত
মানুষ অথবা ভূত
জনমিলে কোন্খানে পাবে তারা ঠাঁই—?
সে কথা ভাবিয়া কূল কিনারা না পাই।
কোন্খানে রবে তারা? চিড়িয়াখানায়?
নয় ত' কি ফাঁসী যাবে? কিংবা থানায়?
অথবা কি যাদুঘরে
রাখবে তাদের ধ'রে?
হয়ত' 'ক্লাউন' হ'লে ভালোই মানায়!
উতলা হয়েছি এই মহা ভাবনায়।

এক গাড়ী খড়

মনোজিৎ বসু

তোমরা রামতনু লাহিড়ীর নাম শুনেছ তো? বাংলা ও সাহিত্য তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁ বিদ্বান, পণ্ডিত মানুষ খুব কম জন্মেছে এদেশে। কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যক্ষ পদটি এখন তাঁর চলছে। সেই রামতনু লাহিড়ী মশায়ের ছোট ভাই ছিলেন কা লাহিড়ী। তাঁরই একটি গল্প বলছি এখানে।

লাহিড়ী মশাইদের বাড়ী কৃষ্ণনগরে। তাঁরা কৃষ্ণনগরের অভি পরিবার। সকলেই তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভালো হলে তাঁর প্রশংসা করে বলো? কালীচরণ বাবু ছিলেন ডাক্ত তখনকার দিনে তাঁর মত ভালো ডাক্তার কৃষ্ণনগরে তো ছিল কলকাতায়ও খুব কম দেখা যেত।

ভালো ডাক্তার বলতে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, তিনি খুব রকম চিকিৎসা করতে পারতেন, তাই না? হ্যাঁ, ভালো চিকিৎসা তিনি করতেনই, উপরন্তু, মনটাও তাঁর ছিল খুব ভ ভালো ভাবে রোগীর খুঁটিনাটি সব পরীক্ষা তিনি তো করতেনই, ছিল তাঁর কর্তব্য—তার ওপরে নিজে থেকে রোগীর অবস্থা নানা ভাবে তার সাহায্যও তিনি করতেন। আজকালকার দি বড় একটা কেউ করে না বা করতেও চায় না।

মনে করো, এক জন রোগী এলো ;—ডাক্তারকে ভিজিট দে টাকা তো দূরের কথা, নিজের ওষুধ বা পথ্য কেনবারও ক্ষমতা নেই। কালীচরণ বাবু কি তাকে ফিরিয়ে দেবেন? মো না। তিনি তাকে পরীক্ষা করে, ওষুধ দিয়ে, বাজার থেকে নিজের খরচ ক'রে পথ্য আনিয়ে—দরকার হ'লে লোক দিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেবেন। ক'জন এ রকম করতে পারে বা করে? যাই সেই কালীচরণ বাবু এক দিন এক রোগীর জন্য কি 'ব দিয়েছিলেন তাই বলছি।

এক দিন তিনি খুব গরীব এক রোগীকে দেখতে গেলেন বাড়ীতে। তাকে দেখে-শুনে ওষুধ-পত্রের একটি প্রেস্‌ক্রিপশ ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিলেন, আর তার তলায় লিখলেন—'এক খড়'। কম্পাউণ্ডার তো সেই প্রেসক্রিপশন দেখে অবাক্। ভাবলে—হয়তো ডাক্তার বাবু অন্যমনস্ক ভাবে কি লিখতে কি ফেলেছেন, তাই সে গেল ডাক্তার বাবুর কাছে। কিন্তু কালী বাবু বল্লেন—"না হে, আমি লিখতে ভুল করিনি, ঠিকই লিখে তুমি এক গাড়ী খড় পাঠিয়ে দাও লোকটির বাড়ীতে, ওর ঘর ছাইতে হবে। ঘর ছাওয়া না হ'লে, ঠাণ্ডা লেগে লোকটির বাড়বে, তখন আর আমার ওষুধে কোনও ফল হবে না। ফলই হবে না, তা হ'লে আর চিকিৎসা ক'রে লাভ কি?"

পৌরাণিক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বহুদিনকার কথা একদিন শ্রাবণে
সহদেব তেড়ে এলো দশমুখো রাবণে :
ভোজনের যম শুধু, দম নেই বুকেতে
কাওয়ার্ডের এক-শেষ,—বোল খালি মুখেতে।
বানর-সেনার সাথে কুপোকাৎ লড়ায়ে,
দু'টো হাতে দেবো তোর বিশ'গাল চড়ায়ে।
কচি দু'টো ছেলে আর গোটা-কয় বন্ধু
তাইতেই অস্থির,—বীর বটে ধন্য!
শ্যাওড়ার ডাল বেয়ে নেমে এলো ত্রস্তে
মহাবীর দশানন মোটা লাঠি হস্তে।
বাজখাঁই আওয়াজেতে হেঁকে কয় ধমকে
সহদেব বেচারার পিলে ওঠে চমকে :
থাম্ থাম্, পুঁটিরাম বড়ো দেখি মন্দ
বুকে নেই বল তিল,—ভীতুর বেহদ্দ।
ভায়েদের কাছা ধরে ফেরো বাছা নিত্য
শকুনি মামাকে মেরে দেখালি বীরত্ব!
লড়াইয়ের সাধ যদি চলে আয় সামনে
ঠ্যাং ধ'রে আছড়াবো—শ্রীগুরুর নাম নে।
বটে বটে : চটে ওঠে কনিষ্ঠ পাণ্ডব
মালকোচা মেরে নিয়ে শুরু করে তাণ্ডব :
ঘনায়েছে শেষ দিন দেখছি নিতান্ত
চোখ মেলে চেয়ে দেখ সামনে কৃতান্ত।
তার পর দুম্দাম্ ধুপ-ধাপ শব্দ।
দু'জনে করিতে চায় দু'জনারে জব্দ।
সহসা বাতাস ভরে সুরার সুগন্ধে
বলরাম এলো সেথা লাঙল স্কন্ধে।
এদের ব্যাপার দেখে চোখ দুটো কুঁচকে
চীৎকার করে বলে : ওরে জোড়া পুঁচকে
মরেও শান্তি নেই—এখানেও যুদ্ধ
মরবো তোদের তরে আমরা কি শুদ্ধ!
শীগ্‌গীর ফেল তোরা ঝগড়াটা মিটিয়ে
নইলে লাঙল দিয়ে দেবো খুব পিটিয়ে।
তাই শুনে সহদেব কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে
সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়ে রাবণের দু'পায়ে :
রাবুদাদা মাপ চাই অন্যায় আমারই
তুমি যে শ্বশুর হও পিসতুতো মামারই।
তাই না কি : হেসে ফেলে দশানন তখুনি :
কোলে এসো বাপ মোর—আর নয় বকুনি।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

১৩

চন্দ্রগুপ্ত যাত্রা করবার পর এক শত দিন পূর্ণ হ'তে চলেছে। 'আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত যদি ফিরে আস্তে না পারেন, তবে বিষ্ণুগুপ্ত আর তাঁকে সাহায্য করবেন না'—এই ছিল বিষ্ণুগুপ্তের প্রতিজ্ঞা—এই প্রতিজ্ঞার কথা তিনি সকালে উঠে মহামন্ত্রী শকটাল্‌কে জানিয়ে দিয়েছেন। শকটালের মুখেচোখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ পড়েছে তাই। অবশ্য এ একশ' দিন শকটাল মোটেই চুপ-চাপ মেরে ব'সে কাল কাটাননি। তিনি কোথাও নিজে গিয়ে, কোথাও বা চর পাঠিয়ে সেনা-নায়কদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়েছেন—কৌশলে তাঁদের মনের ভাব জেনে তার পর নিজে প্রস্তাব জানিয়েছেন যে, ইঙ্গিত পেলে নিজের নিজের সেনাদল নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আস্‌তে হবে—রাজার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, প্রায় পনর আনা সেনা-নায়করাই নন্দের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট! মৌর্য্য সেনাপতির ছেলে চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। নন্দরাজদের সেনাবল ত কম নয়—আশী হাজার ঘোড়সওয়ার, দু'লাখ পায়ে হাঁটা সেনা, আট হাজার রথ আর ছয় হাজার হাতী। এই সেনার পরিমাণ জান্‌তে পেরে স্বয়ং সেকেন্দার পর্য্যন্ত তক্ষশিলার পরে আর ভারতের ভিতর দিয়ে এগুতে সাহস করেননি। তিনি আরও সৈন্য সংগ্রহ না করে ভারত জয় করতে ইতস্ততঃ করছিলেন। কাজেই দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার যার সৈন্যসংখ্যার কথা শুনে ভড়কে যান, সেই নন্দ রাজাদের সেনার পনর আনা হাতে আসা মানে কর্ম্ম ফতে আর কি!

ওদিকে চাণক্য নিজেও কিছু ঘুমিয়ে কাটাননি—এ তিন মাস। কুসুমপুরের উপকণ্ঠ থেকে তাঁর বাল্যবন্ধু ইন্দুশর্ম্মা চন্দ্রগুপ্তের মুখে খবর পেয়ে বন্ধুর কাছে এসে পড়তেই দুই বন্ধুতে মিলে ঠিক করলেন যে, ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতকে হাত করা দরকার। ইন্দুশর্ম্মা এক ন্যাংটা সন্ন্যাসীর (ক্ষপণকের) ছদ্মবেশে চলে গেলেন পর্ব্বতকের কাছে। পর্ব্বতকের কাছে চাণক্যের কথামত প্রস্তাব করলেন, যদি তিনি তাঁর পাহাড়ী ম্লেচ্ছ সেনা দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করেন, তা হ'লে জিত হবার পর চন্দ্রগুপ্ত অর্দ্ধেক রাজ্য পর্ব্বতককে দেবেন। ইন্দুশর্ম্মাও দু'দিন আগে ফিরে এসেছেন—পর্ব্বতক লোভে প'ড়ে রাজি হয়েছে—এই খবর নিয়ে।

আজ সকাল থেকেই চাণক্য ধ্যানস্থ। ইন্দুশর্ম্মা পূজা-হোমে ব্যস্ত। শকটাল্ শুধু ঘর-বার করছেন—এদিকে সব ঠিক-ঠাক—

এখন শুধু চন্দ্রগুপ্ত ফিরলে হয়। সেকেন্দরের সাহায্য মেলে—ভালই। না মেলে—তাতেও ক্ষতি নেই। তবে আজকের সন্ধ্যার আগে তাঁর দেখা চাই—নইলে এত চেষ্টা সব পণ্ড হবে। চাণক্য আবার ফিরে যাবেন তপস্যায়!

বেলা তৃতীয় প্রহর। ইন্দুশর্ম্মা যাগ শেষ করেছেন। চাণক্য ও তাঁর খাওয়া শেষ হয়েছে। শকটাল্ খেতে বসেছিলেন, কিন্তু উৎকণ্ঠায় খেতে পারেননি। তাঁর শুক্‌নো মুখ দেখে চাণক্য চাপা হাসি হেসে বললেন—'মন্ত্রিবর! অত ভাবনা কেন? চন্দ্রগুপ্ত দু' দণ্ডের মধ্যেই এসে পৌঁছে যাবে—এ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। তবে সেকেন্দরের সাহায্য সে পায়নি। তা না পাক, সে সারাটা পথে দেশের লোকের সহানুভূতি পেয়েছে—আর পেয়েছে বহু অভিজ্ঞতা—এই দু'টি লাভ তার হয়েছে। এতেই তার সিংহাসনের ভিত শক্ত হবে'।

শকটাল, এই কথায় একটু উৎসাহ পেলেন। এমন সময় মনে হ'ল যেন দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—অতি অস্পষ্ট। প্রথমে ভাল বোঝাই যায় না। কিন্তু চাণক্য ব'লে উঠলেন—'মন্ত্রিবর! সে আসছে—ঐ তার ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কৌটিল্যের কখনও ভুল হয় না—আপনি এগিয়ে দেখুন'।

শকটাল বাইরে বেরিয়ে দেখলেন—দূরে যেন অশ্বারোহী নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। প্রতিক্ষণে সে এগিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে যখন তার চেহারা অস্পষ্ট থেকে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, তখন শকটাল দেখলেন—তাঁর পুরানো বন্ধুর ছোট ছেলেই বটে! এই তিন মাস না খাওয়া না শোওয়ায় ঝড়-জল-রোদ্দুর আর পথের পরিশ্রমে যেন আধখানা রোগা হয়ে গেছে চন্দ্রগুপ্ত। তবু সেই বটে! একটি দিন পার হতে দেয়নি—যথাসময়ে ঠিক এসে পড়েছে! হাত জোড় করে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—'হে জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

চন্দ্রগুপ্ত যখন মন্ত্রিবরের সাম্‌নে এসে ঘোড়াটাকে দাঁড় করালেন, তখন দারুণ পরিশ্রমে ঘোড়াটা কাঁপছিল থর থর ক'রে—মুখে উঠছিল ফেনার গাঁজলা—সারা গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ঘামের ধারা। চন্দ্রগুপ্তও ঘেমে নেয়ে উঠেছিলেন—গায়ের কাপড়-চোপড় সব ভিজে গিয়েছিল শ্রমজলে, মুখখানা হয়ে উঠেছিল লাল। সজোরে নীচের ঠোঁট কাম্‌ড়ে ধ'রে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন, তাই ঠোঁটটা কেটে গিয়ে ঝরছিল রক্ত। তবু সে-দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ঘোড়াটা তাঁর বড় আদরের—সে থর থর কাঁপছে দেখে চন্দ্রগুপ্ত তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে। তার পর ঘোড়ার মুখের লাগাম ধ'রে তাকে হাল্‌কা কদমে এদিক্-ওদিক্ চালাতে লাগলেন। তিনি জান্‌তেন—খুব লম্বা পথ সজোরে ছুটে আসবার পর শ্রান্ত ঘোড়াকে যদি হঠাৎ রাস টেনে থামিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে ঘোড়া উত্তেজনার মাথায় হঠাৎ থেমে গেলে উত্তেজনা সহ্য করতে পারে না—মাটিতে প'ড়ে দম ফেটে মরে যায়। তাই তখনও তাকে আস্তে আস্তে চল্‌তে দেওয়া দরকার—তাতে দম বেরিয়ে মরবার সম্ভাবনা থাকে না। তাই তিনি দশ-বিশ কদম ঘোড়াকে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিজের চাদর দিয়ে তার গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিলেন—ঘোড়াটা তখন স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। চন্দ্রগুপ্ত এবার নিজের গা-মুখ মুছে শকটাল্‌কে বললেন—'আপনার চাকরদের বলুন, ঘোড়াটাকে আগে একটু ডলাই-মলাই করে কিছু ঘাস-জল দিক। এইবার চলুন—আচার্য্যদেবকে প্রণাম করি'।

শকটাল্ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—'সব মঙ্গল ত সেকেন্দরের সঙ্গে দেখা হ'ল'?

চন্দ্রগুপ্তের মুখে ম্লান হাসি—'হাঁ, দেখা হ'ল বটে! তবে কোন কাজ হ'ল না! উল্‌টে তাঁর কাছে গিয়ে খুবই বিপদে পড়েছিলুম। দৈবের কৃপায়—আচার্য্যের আশীর্ব্বাদে আর আপনাদের শুভেচ্ছায় কোন রকমে সে বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেয়ে এসেছি'।

শকটাল্—'কি রকম? কি রকম'?

চন্দ্রগুপ্ত—'চলুন, যাই আচার্য্যদেবের কাছে—তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁরই সামনে সব কথা খুলে বলব'।

শকটাল হাত ধ'রে চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে ঢুকলেন বাড়ীর ভিতর। তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য্য লাল হ'য়ে উঠেছেন—অস্ত যেতে আর আধ দণ্ডও দেরী নেই।

চন্দ্রগুপ্ত ভিতরে গিয়ে প্রথমে শ্রীবিষ্ণুগুপ্তকে প্রণাম করলেন চরণ স্পর্শ করে। তার পর ইন্দুশর্ম্মাকেও ঐ ভাবেই প্রণাম করলেন। শেষে শকটালের পায়ে তিনি হাত দিতে যাচ্ছেন—শকটাল্ তাড়াতাড়ি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাই দেখে চাণক্য তাঁর চির-পরিচিত দুর্ব্বোধ্য হাসি হেসে বল্‌লেন—'মন্ত্রিবর! বৃষল ভাবী রাজা বটে! তবু তোমার ত ছেলের মত। ওকে তোমার পা ছুঁতে দাও—কোন অসম্মান হবে না তাতে।' এর পর চন্দ্রগুপ্ত আর বারণ শুন্‌লেন না—শকটালেরও পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

সকলে স্থির হ'য়ে বস্‌লে চাণক্য বল্‌লেন—'বৃষল! তোমার সঙ্গে সেকেন্দরের দেখা হ'লেও যে কোন ফল হবে না—তা আমি জানতুম। তবু কি ভাবে তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল—সব খুলে বল—আমরা সকলেই শুন্‌তে ব্যাকুল হয়েছি'।

চাণক্যের কথায় চন্দ্রগুপ্ত হলেন অবাক্। ধীরে ধীরে বল্‌লেন—'আমি যে বিফল হয়েছি এ কথা আপনি জানলেন কি ক'রে? আমি ত শুধু মন্ত্রিবরকে ব'লেছি—কিন্তু তিনি ত আমার সঙ্গেই রয়েছেন—আপনাকে ত আমরা কেউ এখনও কিছুই নিবেদন করিনি, তবে আপনি জান্‌লেন কি করে? আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ'?

চাণক্যের মুখে সেই অস্পষ্ট হাসি—'বৃষল! ঘরে ঢোক্‌বার সময় তোমার আর মন্ত্রিবরের মুখ দেখে অনুমান করা শক্ত ছিল না যে তোমার কাজ সফল হয়নি! কিন্তু তাও ঠিক নয়। আমি আগেই বুঝেছিলুম—তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। মন্ত্রিবরকে তা জানিয়েছিলুম তোমার আস্‌বার আগে। না, মন্ত্রিবর'?

শকটাল্ হেঁটমুখে বল্‌লেন—'প্রভু সর্ব্বজ্ঞ'!

চাণক্য হাসিমুখে উত্তর দিলেন—'সর্ব্বজ্ঞ আমি নই! তবে আমার বন্ধুবর ইন্দুশর্ম্মার কাছে কিছু কিছু জ্যোতিষ শিখেছি এ কয় মাস। তাঁরই সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের রাশিচক্র আলোচনা ক'রে বুঝেছিলুম—সেকেন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে শুভ হবে না'!

চন্দ্রগুপ্ত—'প্রভু! আপনার ও আপনার বন্ধুর গণনা অতি অদ্ভুত। সেকেন্দরের সঙ্গে দেখা আমার পক্ষে কেবল ব্যর্থ নয়—অশুভই হয়েছিল'।

চাণক্য 'এইবার বল সেই কাহিনী—আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েছি।'

তখন চন্দ্রগুপ্ত বল্‌তে সুরু করলেন! মাঝখানে ব'সে চাণক্য—তাঁর ডাইনে ইন্দুশর্ম্মা, বাঁয়ে শকটাল্—সামনে জোড়হাতে হাঁটু গেড়ে ব'সে চন্দ্রগুপ্ত।

'আমি যখন গিয়ে হাজির হলাম তক্ষশিলায় তার কয়েক দিন আগেই বীর রাজা পুরু দেহরক্ষা করেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য পাইনি—শুনলুম, তাঁর শেষ কাজ হয়ে যাবার পরই সেকেন্দর সদল-বলে ভারত-সীমান্তের দিকে এগিয়ে গেছেন। ভাবলুম, তিনি মাত্র পাঁচ দিনের পথ এগিয়েছেন—নানা লটবহর নিয়ে—আমি একা—দু'দিনে তাঁকে ধ'রে ফেল্‌ব। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম সেই দুর্গম পাহাড়ে পথে। তিন দিনের দিন সকালে নজর পড়্‌ল যবন-সেনার শিবির। এগিয়ে গেলুম। শিবিরের পাহারা সেনারা এগিয়ে এল—'কে তুমি'—ভাবা বুঝলুম না, তবু প্রশ্নের ধরণ দেখে বুঝলুম তারা আমার পরিচয় চায়। আমি ত ভাষা বুঝি না—ইসারায় বুকে হাত দিয়ে মাথা নীচু ক'রে বুঝিয়ে দিলুম যে আমি বন্ধু—শত্রু নই—আশ্রয় চাই। তবু আমি বন্দী হলুম পাহারাদের কাছে—তারা নিয়ে গেল তাদের কর্ত্তার কাছে। শুনলুম—ইনিই যবনদের সেনাপতি—নাম তাঁর সেলুকাস্ নিকেটর। লোকটিকে দেখে মনে হ'ল—অসম্ভব ধূর্ত্ত—আর ক্রূর প্রকৃতির—ভারতের উপর যেন তার জাত-ক্রোধ। আমি মাথা নীচু ক'রে সম্মান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'আমাকে বন্দী করা হ'ল কোন্ অপরাধে'? সেনাপতির কাছে দোভাষী এক জন ভারতীয় ছিল; সে লোকটি বুঝিয়ে দিল—শত্রুর চর সন্দেহে আমাকে বন্দী করা হয়েছে। আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলুম—'আমি যদিই চর হই, তবু ত আমি একা—সঙ্গে ছোট একখানা তরোয়াল ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। তবু আমাকে এত ভয় কেন'? তখন সেনাপতি যেন একটু লজ্জা পেয়ে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিতে আদেশ করলেন। তাঁর প্রশ্ন হ'ল—'আমি কে? কি চাই'? আমি উত্তর দিলুম—'আমি ভারত-সম্রাট্ মহাপদ্ম নন্দের প্রধান সেনাপতির ছোট ছেলে—চন্দ্রগুপ্ত। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের সাহায্য চাই'। যবন বেটাদের ত জিবের আড় ভাঙেনি কি না! বেটারা চন্দ্রগুপ্ত কথাটাই উচ্চারণ করতে পারলে না—সেলুকাস্ অনেক কষ্টে বললেন—'স্যাণ্ড্রাকোটাস্'! আমি ত অনেক কষ্টে হাসি চাপলুম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর—অবশ্য আমাকে খেতে দিয়েছিল ভাল জিনিষ—দুধ—জল—মাংস—আমাকে সেলুকাস্ নিয়ে হাজির করলেন সেকেন্দরের সাম্‌নে। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর! বয়সে বোধ হয় আমার সমান—কি কিছু ছোটই হবেন। কিন্তু বিধাতার দেওয়া অদৃশ্য রাজতিলক কপালে জল্‌জল্ করছে—যার চোখ আছে সেই দেখ্‌তে পাবে। আমার চেয়ে মাথায় বোধ হয় আধ হাত উঁচু—আর শরীরের বাঁধুনী অপরূপ। মনে হয় যেন দেব-সেনাপতি স্বর্গ থেকে মর্ত্তে নেমে এসে যবন-বেশ ধরেছেন! তার ওপর সে কি আকাশস্পর্শী দম্ভ! মাথা এমন ভাবে উঁচু করে আছেন, যেন সূর্য্যে গিয়ে মাথাটা ঠেকছে! অত সুন্দর মু রুক্ষতায় আর অহঙ্কারে বিকৃত। দোভাষী কাছে ছিল। প্র করলেন—'কে তুমি? কি চাই'? আমি ধীরে ধীরে আমা পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বললুম। তার প আমার প্রার্থনার কথাও নিবেদন করলুম। সে উগ্রমুখে করা হাসি ফুটে উঠ্‌ল। বললেন সেকেন্দর—'বালক'! 'বালক' কথা শুনে গা যেন জ্বলে গেল—একবার নড়ে-চ'ড়ে তরোয়ালে হাত দিে গেলুম—দেখলুম বাজপাখীর মত সেলুকাসের দৃষ্টি আমার দিে নিবদ্ধ। অথচ সেকেন্দরের ভ্রুক্ষেপও ছিল না এ সব দিকে। তখ সাম্‌লে নিলুম। সেকেন্দর ব'লে চল্‌লেন—'বালক'! তোমার স্পর্দ্ধ ত কম নয়! ভারত-সম্রাট্ নন্দরাজদের সৈন্যবলের কথা শুে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর পর্য্যন্ত এবার ভারত আক্রমণ করতে চাইছে না—আরও বেশী প্রস্তুত না হ'য়ে—আরও সেনা যোগাড় না করে সেকেন্দর এ কাজে হাত দেবে না। আর তুমি অসহায় বালক—সেই নন্দ রাজাদের সঙ্গে লড়বে! আর যদি লড়তেই চাও ত আমা সাহায্য-ভিক্ষা চাইতে এসেছ কেন? বিদেশীর ভিক্ষা দেওয়া সাহায্যে তুমি ভারতের সম্রাট্ হবে—তোমার লজ্জা করে না এ কথা ভাবতে। যদি সত্যি রাষ্ট্রপতি হ'তে চাও—নিজের চেষ্টায় হও—বিদেশীর সাহায্য চেও না'। আমি মাথা নীচু ক'রে বললুম—'সেকেন্দরের শিক্ষা মাথা পেতে নিলুম'। তখন দাম্ভিক সেকেন্দর ব'লে উঠ্‌লেন—'কিন্তু মনে রেখো, যদি তুমি নন্দরাজাদের হারিয়ে ভারতের সিংহাসন পাও, তা'হলেও বেশী দিন তা ভোগ করতে হবে না—কারণ, শীগ্‌গির আমি ফিরে আস্‌ছি—ভারত জয় করতে'। আমিও তখন সদম্ভে উত্তর দিলুম—'দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর! আপনিও যদি আসেন, তখন দেখ্‌বেন যে আপনার দিগ্বিজয়ী নামের গৌরব রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। কারণ, আমার গুরুদেব বিষ্ণুগুপ্তের কৃপা থাক্‌লে এ ধারে নন্দরাজারা ও ওধারে সেকেন্দর—দু'ধারই আমি সাম্‌লাতে পারব'।

আমার উদ্ধত উত্তর শুনে সেকেন্দর প্রথমটা থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'এমন অলৌকিক শক্তি যদি তোমার গুরুর—তবে তাঁর সাহায্য না নিয়ে আমার সাহায্যের জন্যে ছুটে এলে কেন—সারা ভারত ডিঙিয়ে?' আমিও উত্তর দিলুম—'গুরুর আদেশে আপনার বল পরীক্ষা করতে এসেছিলুম'। সেকেন্দর তখন গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'পরীক্ষায় কি বুঝ্‌লে?' আমি বললুম—'বুঝ্‌লুম—দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শুধু নামেই—কাযে নয়—তক্ষশিলার ছোট জমিদার পুরুর কাছেই যে ধাক্কা খায়, তার কর্ম্ম নয় ভারত জয় করা! নন্দরাজাদের যে ভয় করে—তার সাহায্য না নেওয়াই ভাল'।

সেকেন্দর গর্জ্জে উঠ্‌লেন—'কি! এত স্পর্দ্ধা এ বালকের! একে আজ বন্দী রাখ। কাল এর বিচার হবে'।

✱

মনে হোল, ভগবান্ যে-মানুষের উপর একবার বেঁকে বসেছেন আর তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। গ্রীষ্মের সুরুতে [illegible] হওয়ার কথা তা' হোল না। মেঘহীন নীল প্রখরতায় সারা [illegible]কাশ দিনের পর দিন উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। তাপ-দগ্ধ মাটির [illegible] তৃপ্ত হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক-ফালি মেঘও দেখা [illegible] না, আকাশের নির্দয়তায় রাতের আকাশে তারাগুলি হাসে।

ওয়াঙ মরিয়া হয়ে লাঙ্গল দেয় মাঠে। জমি শুকিয়ে ওঠে—চিড় [illegible] এখানে-সেখানে। বসন্তের আগমনে গমের বীজ থেকে যে [illegible] অংকুরের দল উদ্ধত মাথা [illegible] ধরেছিল আকাশের দিকে [illegible] যখন দেখলে মাটি বা আকাশ [illegible] থেকেও আর আশা [illegible] কিছু নেই, তখন [illegible]রাও বাড়া বন্ধ করে [illegible]। প্রথম কিছু দিন [illegible] রোদে তারা থমকে [illegible], তার পর তাদের [illegible] রঙ ঝল্‌সে হল্‌ [illegible], শেষে শুকিয়ে তারা [illegible] খড়ে পরিণত [illegible]। যে ধান-ক্ষেতে [illegible] বীজ বুনেছিল সে [illegible] যেন পাথরের টুক্‌[illegible] মত হয়ে উঠল। [illegible] আশা ছেড়ে দিয়ে [illegible] বাঁকে করে জলের পর [illegible] নিয়ে যায় ধানের [illegible] দিকে। কাঁধের [illegible] খাঁজ পড়ে যায় [illegible], বাটির মত বড় বড় ফোস্কা পড়ে [illegible] বৃষ্টির সংকেত আসে না।

অবশেষে জল শুকিয়ে পুকুরেও কাদা দেখা দেয়। এমন কি, কূয়ার জলও এত নীচে নামে যে ওলান এক দিন বলতে বাধ্য হয়—'যদি ছেলেদের জল খেতে হয় আর শ্বশুরের জন্য গরম জল রাখতে হয় তা'হলে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া বন্ধ করতে হবে।'

অনুবাদক—
শিশির সেনগুপ্ত ও
[illegible]কুমার ভাদুড়ী

ওয়াঙ উক্ত জবাব দেয় বটে কিন্তু সে-জবাব শোনায় ঠিক [illegible] [illegible]। 'যদি ফসল শুকিয়ে মরে সবাই শুকিয়ে মরবে। মাটিই আমাদের জীবন।'

কেবলমাত্র নগর-প্রাচীরের নালার ধারের জমিতেই এবার যা' ফসল হোল এবং তাও বিনা বৃষ্টিতে গ্রীষ্ম কেটে যাওয়ায়। ওয়াঙ অন্য সকল জমির আশা ছেড়ে দিয়ে এই একটি মাত্র জমিতে সারা দিন কাজ করে। নালা থেকে জল তুলে তৃষ্ণার্ত মাঠে ঢেলে দেয়। এই বছরই সে প্রথম মাঠ থেকে শস্য তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করে দিল। রূপার মুদ্রা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রুদ্ধ স্পর্দ্ধায়। মনে করেছি করবই। ওয়াঙের দেহ ভেঙে পড়েছে, এক মুঠো মুদ্রার [illegible] সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। যা' ইচ্ছা হ'বে তাই সে ক[illegible] এই টাকা নিয়ে। দ্রুত সে হোয়াঙ-প্রাসাদে গিয়ে জমির দালা[illegible] সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিনা ভূমিকায় বলে—'নালার ধারে আমার জ[illegible] গায়ে-লাগা জমিটুকুও কিনতে চাই।' ওয়াঙ এখানে-ওখানে কা[illegible] ঘুঁসা শুনেছিল যে, এ বছর হোয়াঙ-প্রাসাদেও দারিদ্র্য কর[illegible] ছায়া বিস্তার করেছে। বুড়ীমা বহু দিন তার বরাদ্দ আফি[illegible] পাননি। নেশার তাড়নায় তিনি ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত প্রতিদি[illegible] জমির দালালকে অভিসম্পাত করেন[illegible] হাত-পাখা দিয়ে তার মুখে আঘাত ক[illegible] গর্জ্জে ওঠেন—'আর কি এক টুকরো জমি নেই?' শুনে দালা[illegible] ছুটে পালায়।

কর্মচারীটি আজ-কাল দালালীর টাকাও রাখে না নিজের জন্যে। এত বিপর্য্যস্ত হয়েছে সে। তাও সব নয়। বড় কর্ত্তা আবার একটি রক্ষিতা গ্রহণ করেছেন। যৌবনে যে দাসীকে তিনি উপভোগ করেন এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় যাকে এক জন বাড়ীর চাকরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন তারই মেয়েকে তখন তিনি গ্রহণ করেছেন। মেয়েটির বয়স ষোলোর বেশী হ'বে না। কর্ত্তা যতই জবুথবু হয়ে পড়েন, যতই মেদবহুল অকর্মণ্য হয়ে উঠছেন, ততই তাঁর কামনাও উদগ্র হয়ে উঠছে দিন দিন। কাম-পিপাসার আর যেন শেষ নেই তাঁর। কিশোরী বা শিশু কিছুতেই বাধ বিচার আর নেই। বুড়ীমা'র আফিমের নেশার মতই তার কাম-লোলুপতা। তাকে কেউ বোঝাতে পারবে না যে প্রিয়তোষিণীদের কর্ণাভরণ বা চারু হস্তের স্বর্ণবলয়ের অং[illegible] নেই আর। সারা জীবন যে হাত বাড়িয়ে [illegible] আর মুঠি মুঠি ভ'রে নিয়েছে, 'টাকা নেই' এ কথা তার মন মানে না।

ক্ষুদে কর্ত্তারা যখন দেখতে পেল বাপ-মা'র এই অবস্থা তখ[illegible] তারাও জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার নেশায় মেতে উঠল। অনেক বৈষম্যের মধ্যে একটি কাজে তাদের মধ্যে পূর্ণ একতা দেখ[illegible] যেত—সে ম্যানেজারকে জমিদারী পরিচালনার বিশৃংখলতার জ[illegible] তিরস্কার করার সময়। নায়েবটি আগে ছিল নধর, মেদবহুল আয়েসী—এখন হয়েছে সন্ত্রস্ত, ঝরে যাওয়া। শরীরের মেদ জী[illegible] পোষাকের মতই ঝুলছে যেন শরীরে।

হোয়াঙ-পরিবারের জমিদারীতেও এক ফোঁটা বৃষ্টি পাঠালেন ন[illegible]

স্বর্গের দেবতা। কাজেই ফসল হয়নি সেখানেও। তাই ওয়াঙ যখন এসে নায়েবকে জানাল, 'আমার কাছে টাকা আছে।' ক্ষুধার্ত নায়েব যেন শুনল—'খাবার আছে আমার কাছে।'

নায়েব ছোঁ মেরে নিল টাকাটা। এ-রকম ক্ষেত্রে আগে যেখানে চলত চা পান এখন সেখানে দু'জনের মধ্যে কী যেন অধীর কানাকানি হোল। সমস্ত বক্তব্য শেষ করতে যেটুকু সময় লেগেছে তার চেয়েও তাড়াতাড়ি টাকাটা হাত বদল হয়ে চলে গেল আর এক হাতে। কাগজে সই-সাবুত শিলমোহর হোল। জমি চলে এলো ওয়াঙের দখলে।

যে-টাকা ওর রক্ত-মাংসের সামিল তা দিয়ে দিতে কষ্ট হ'ল না ওয়াঙের। ঐ টাকা দিয়ে সে এত দিনের চাওয়াকে মুঠোর মধ্যে পেল। বিস্তৃত উর্বরা জমির মালিকানা তার। এ জমি তার পুরাতন জমির দ্বিগুণ। শুধু উর্বরতার চেয়েও বড় হ'ল এই সত্য যে, এই জমি এক দিন একটি বনেদী পরিবারের খাস-দখলে ছিল। এবার কাউকেই কিছু জানায়নি ওয়াঙ—এমন কি তার বৌকেও নয়।

মাসের পর মাস কেটে যায়—বৃষ্টি আর নামে না। শরতের মুখে আকাশের কোণে কোণে ছোট ছোট অনিচ্ছুক হালকা মেঘের আনাগোনা সুরু হয়। গ্রামের পথে পথে দেখা যায় উদ্বিগ্ন চোখ অলস লোকের জটলা! আকাশের দিকে মুখ তুলে তারা মেঘের প্রকৃতি বিচার করে—কোন্‌গুলি জলভরা মেঘ তাই নিয়ে চলে গভীর আলোচনা। কিন্তু আশা-সঞ্চারী প্রচুর মেঘ জমার আগেই উত্তর-পশ্চিম দিক্ থেকে একটা দমকা হাওয়া ছোঁ মেরে আসে। সুদূর মরুভূমির ঊষর হাওয়া আকাশ-আঙিনীর ধুলা যেন ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেয়। বন্ধ্যা আকাশে শূন্যতা আবার হা-হা করে। মহিমায় নিঃসঙ্গ সূর্যদেবের বিজয়যাত্রা চলে উদয়াস্ত। আর রাত্রির আকাশের স্বচ্ছ ভূমিকায় চাঁদ জ্বলে দ্বিতীয় সূর্যের মত।

ওয়াঙ এবার তার মাঠ থেকে শক্ত মটরের সামান্য ফসল পেল। ধানের জমি যখন হলুদ হয়ে গেল, উদ্‌গত চারাগুলি তুলে জলাজমিতে রুইবার আগেই সব মরে গেল—তখন সে হতাশায় এই সব শস্যশীর্ষগুলি নিয়ে এল ঘরে। মাড়াইয়ের সময় একটি দানাও নষ্ট হ'তে দিল না। মাড়াইয়ের পর ছোট ছেলে দু'টোকে কচি কচি আঙুল দিয়ে ধুলা ছেঁকে ছেঁকে পড়ে থাকা কলাই সংগ্রহ করতে লাগিয়ে দিল সে। স্বামি-স্ত্রী মিলে মাঝের ঘরের মেঝেতে খোসা ছাড়ায়—ছড়িয়ে-পড়া প্রতিটি কলাইয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। সে যখন খোসাগুলি জ্বালানির জন্য সরিয়ে রাখে তার বৌ বলে তাকে—'না, না' পুড়িয়ে নষ্ট করো না ওগুলো। মনে আছে, ছোটবেলায় সানটাংয়ে এমনি এক বছর আমরা খোসা গুঁড়িয়ে খেয়েছিলাম। ঘাসের চেয়ে সে ঢের ভাল!'

ওলানের কথায় সবাই কেমন চুপ হয়ে যায়—এমন কি শিশুরাও। আজকের এই ঝকঝকে দিনে যখন মাটী থেকেও কোন আশ্বাস পাওয়া যায় না, মনে কেমন দুর্যোগের আতংক ঘনিয়ে আসে। কেবল কচি মেয়েটারই ভয় নেই। তার খোরাক আছে মায়ের বুকে। ওলান তাকে মাই দিতে দিতে বিড় বিড় করে বলে—'অভাগী, যতক্ষণ আছে যত পার টেনে নাও।'

যেন আর ভয়ের যথেষ্ট কারণ নেই—ওলান আবার সন্তানসম্ভবা হয়। বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। শংকাগ্রস্ত ঘর ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না ভরে ওঠে।

শরতে কি করে খাবার জুটল প্রশ্ন করলে ওয়াঙ বলত—'জানিনে। এখান সেখান থেকে কিছু মিলেছিল তাই।'

কিন্তু এ কথা তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবার নেই। সারা গ্রামে কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে না—'কেমন করে পেট চল্‌ছে;' কেবল নিজের কথা ছাড়া কেউ কিছু বলে না—'আজ কি খাব?' আর বাপ মায়েরা বলে—'কেমন করে চলবে আমাদের? ছেলেমেয়েরা কি খাবে?'

ওয়াঙ যত দিন পেরেছে তার বলদটাকে খাইয়েছে। যত দিন ছিল পশুটাকে দিয়েছে খড়ের টুকরো, মুটো মুঠো মটর-ডগা। তার পর গাছের পাতা সংগ্রহ করে এনেও খাইয়েছে তাকে। তার পর শীত এল। গাছেরা রিক্ত হোল! একে ত বীজ বুনলে সে বীজ শুকিয়ে মরে যায়—তা' ভিন্ন যা' কিছু বীজের পুঁজি ছিল ইতিমধ্যেই তা' তারা খেয়ে ফেলেছে। সুতরাং বলদটাকে ছেড়ে দিতে হয় নিজের মনে চরতে। বড় ছেলেটা বলদের পিঠে বসে থাকে সারা দিন নাকের দড়ি ধরে—যাতে কেউ না তাকে চুরী করে নিয়ে পালাতে পারে। কিন্তু পরে এও করতে তার ভয় হোত। কারণ গ্রামবাসীরা—হয়ত তার পড়শীরাই—ছেলেটাকে হটিয়ে বলদটাকে কেড়ে নিয়ে মাংসের জন্য মেরে ফেলতে পারে। কাজেই ওয়াঙ বলদটাকে উঠানেই বেঁধে রাখে—না খেয়ে-খেয়ে পশুটা কংকালসার হয়ে যায়।

কিন্তু এমন দিনও আসে যখন ঘরে একটি দানাও চাল থাকে না—একটি দানাও গম না। শুধু কয়েকটা মটরদানা আর স্বল্পপরিমিত অন্য শস্য। বলদটা ক্ষুধায় আর্তনাদ করে। বৃদ্ধ এক দিন বলে—'এক দিন বলদটাকে মেরে খাব।'

ওয়াঙ যেন শোনে বাবা বলছেন—'এর পর মানুষ খাব।'

এ বলদটি ওর মাঠের সঙ্গী। এত দিন রোজ পশুটার পিছু-পিছু সে গিয়েছে মাঠে। মেজাজ মত সে গাল দিয়েছে, আদর করেছে তাকে। নিজের ছেলেবেলা থেকে তাকে দেখেছে, বাবা যখন বাছুর কিনে এনেছিলেন তখন থেকে।

—'বলদটাকে যে খাবে মাঠে লাঙ্গল দেবে কি করে শুনি?'

কিন্তু বৃদ্ধ শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দেয়। 'তোমার বাঁচা আর পশুটার বাঁচা—তোমার ছেলের বাঁচা আর জন্তুটার বাঁচা। মাঠের কাজের জন্যে জন্তু কিনতে পারবে কিন্তু মানুষের জান কিনতে পারবে না তো।'

কিন্তু ওয়াঙ সে-দিনই পশুটাকে মারতে দিল না। পরের দিনও কেটে গেল—তার পরের দিনও। ক্ষিদের জ্বালায় ছেলেরা অধীর কান্না জুড়ে দেয়—কোন সান্ত্বনাই মানে না। শিশুদের জন্যে মা কাতর চোখ তুলে তাকায় স্বামীর দিকে। ওয়াঙ বুঝতে পারে—আর রোখা যাবে না। রুক্ষ কণ্ঠে সে বলে, 'বেশ মেরেই ফেল। আমি মারতে পারব না—'

নিজের ঘরে গিয়ে ওয়াঙ মাথায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। পশুটার মরণ আর্তনাদ শুনতে চায় না সে।

ওলানই উঠে এল। রান্নাঘরে রাখা বড় লোহার ছুরীটা সে পশুটার গলায় জোরে বসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল তাকে। একটা পাত্রে সমস্ত রক্ত ধরে রেখে দিল মণ্ড করে খাবে বলে আর মৃত দেহটাকে ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। যতক্ষণ না

এই সমস্ত কাজ শেষ হয়ে রাঁধা মাংস ওলান টেবিলের উপর রাখল তক্ষণ ওয়াঙ উঠলই না। খেতে বসে বলদের রক্ত মুখে তুলতেই সমস্ত যেন বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে মনে হোল—এক টুকরোও পেটে নামাতে পারলো না ওয়াঙ। শুধু একটু ঝোল খেলো সে। স্বামীকে তখন বললে ওলান—'ওটা জন্তু বই ত কিছু নয়। আর বুড়োও হয়ে পড়েছিল। খেয়ে নাও। আবার একটা নতুন আমরা কিনব। এটার চেয়েও ভাল।'

এ-কথা শুনে ওয়াঙ একটু সান্ত্বনা পায়। এক এক গ্রাস করে খানিকটা খায়। বাকী সকলেও খায়। তার পর এক দিন বলদের মাংসও খাওয়া হয়ে যায়। শেষে মজ্জার জন্য অস্থিগুলোও গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। তাও শেষ হয়; শুধু কঠিন চামড়াটা ছাড়া আর কোন কিছুই থাকে না বলদটির। একটা বাঁশের ওপর ওলান চামড়াটাকে টান টান করে টাঙিয়ে রাখে।

প্রথম প্রথম ওয়াঙের বিরুদ্ধে গ্রামের মধ্যে একটা আক্রোশ সঞ্চিত হয়েছিল। সবার ধারণা ওয়াঙের ঘরে টাকা আর খাবার লুকানো আছে। তার অভুক্ত খুড়োই প্রথমে তার দুয়ারে এসে খাবারের জন্য অনুনয় করতে লাগল। সত্যি খুড়ো-খুড়ী আর তাদের সাত ছেলে-মেয়েদের জন্য ঘরেতে কিছুই নেই। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ওয়াঙ কাকার জামাতে মাপা কিছু মটর দিল আর দিল এক মুঠো বহু মূল্য চালের দানা। তার পর কঠিন হয়ে বলল—'এই শেষ। ছেলে-মেয়েদের কথা ছেড়ে দিলেও আমাকে প্রথমে বুড়ো বাপকে দেখতে হবে।'

খুড়ো আবার এলে ওয়াঙ বললে তাকে—'শুধু বাপ-মায়ের ভালবাসায় আমার ঘরের ছেলে-মেয়েদেরও ক্ষিদে মিটছে না।' এই বলে সে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল কাকাকে।

সেই দিন থেকে তার কাকা তাড়িয়ে-দেওয়া কুকুরের মত তার বিরুদ্ধতা শুরু করেছে। সারা গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে সে বলে বেড়ায়—'আমার ভাইপোর ঘরে টাকা আছে, খাবার আছে কিন্তু সে কিছুতেই দেবে না আমাদের। এমন কি আমাকেও না—আমার ছেলে-মেয়েদেরও না। ওদের সঙ্গে ত রক্তের সম্বন্ধ আছে। শুকিয়ে মরা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই।

গ্রামের ঘরে ঘরে যতই শস্য-সঞ্চয় ফুরিয়ে আসতে লাগল, সহরের শূন্যপ্রায় বাজারে শেষ কপর্দকও পর্যন্ত খরচ হয়ে গেল আর যখন ইস্পাতের ছুরীর মত ধারাল, শুষ্ক শীতের উত্তুরে হাওয়া তেড়ে আসতে লাগল মরুপ্রান্তর থেকে তখন গ্রামবাসীরা নিজেদের পেটের জ্বালায় আর ক্রন্দনমান শিশুদের ক্ষুধার যন্ত্রণায় হারিয়ে ফেলতে লাগল বিবেক-বুদ্ধি। এমনি সময় যখন শীর্ণ কুকুরের মত অস্থিসার ওয়াঙের কাকা শীতে কাঁপতে কাঁপতে গ্রামময় ঘুরে ঘুরে বলে বেড়াতে লাগল—'এক জনের ঘরে খাবার আছে। এক জন আছে যার ছেলেমেয়েরা আজ বেশ মোটাসোটা'—তখন এক দিন রাত্রে গ্রামবাসীরা লাঠি হাতে ওয়াঙের দ্বারে এসে হানা দিল। লাঠির আঘাত শুনে ওয়াঙ দরজা খুলতেই গ্রামবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর—টান মেরে বাইরে বের করে দিল তাকে আর তার আতংকিত ছেলেমেয়েদের। তার পর তারা প্রত্যেক আনাচ-কানাচ আঁতিপাঁতি করে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল কোথায় খাবার লুকিয়ে রেখেছে মজুতদার। কয়েকটা শুকনো মটর-দানা আর এক বাটির মত শুক্‌নো ধানের দরিদ্র সঞ্চয় পে[য়ে] তারা নিরাশায় আর্তনাদ করে উঠল। তখন তারা প্রত্[যেকে] আসবাব, টেবিল, বেঞ্চ, বিছানা সব টেনে বার করতে লাগল। [বুড়ো] বাপ ভয়ে কাঁদছিলেন শুয়ে। ওলান তাদের সামনে এসে [দাঁড়িয়ে] দিল। পুরুষদের কোলাহলকে ছাপিয়ে ওলানের স্পষ্ট কণ্ঠ বাজ[তে] লাগল। সে চীৎকার করে বলল—'ও-সবে হাত দিও না। সে স[ময়] এখনও আসেনি'। এখনও আমাদের ঘর থেকে বিছানা টেবিল [নিয়ে] নেবার সময় হয়নি'। আমাদের খাবার যা' ছিল সব নি[য়েছ] তোমরা। কিন্তু কই তোমাদের নিজের ঘরের টেবিল বেঞ্চ কেউ এখনও বিক্রী করনি'। আমাদের গুলো রেখে দাও। এ[খন] আমাদেরও সমান অবস্থা। তোমাদের চেয়ে আমাদের একটি মট[র] দানা বা ক্ষুদকণাও বেশী নেই। বরং আমাদের চেয়ে তোমাদের বে[শী] আছে। তোমরা আমাদের যা' ছিল সব নিয়েছ। এর বেশী কি[ছু] যদি নাও ভগবান তোমাদের মারবেন। এখন থেকে আমরা সব বের হব গাছের ছাল আর ঘাসের খোঁজে। তোমরা তোমা[দের] ছেলেমেয়েদের জন্যে বের হবে। আর আমরা আমাদের গুলোর জন্যে—আর যেটি আসছে এই দুঃসময়ে পৃথিবীতে—' বলতে বলতে ওলা[ন] পেট চেপে ধরে হাত দিয়ে। লোকগুলো তার সামনে লজ্জিত হয়ে এ[কে] একে বাইরে চলে আসে। এরা ক্ষুধার্ত কিন্তু বদমাইস ত নয়।

শুধু এক জন গেল না। নাম তার চীং। বেঁটে, চুপচাপ—হলদে দেখতে। প্রাচুর্যের দিনেও তাকে দেখায় বাঁদরের মত। অ[থচ] এখন কোটরগত উদ্বিগ্ন চেহারা। সে হয়ত অনুতাপ-মিশ্র কি[ছু] বলত। কারণ সে লোক ভালই। কিন্তু ঘরে ক্রন্দনমান শিশু তাকে এ-কাজ করতে বাধ্য করিয়েছে। ওর বুকের কাছে চুরী-ক[রা] এক মুঠো মটরদানা লুকানো আছে। এ কথা জানালে হয়ত ফের[ত] দিতে হ'বে এই ভয়ে সে নিঃশব্দে হতভাগ্য দৃষ্টিতে ওয়াঙের দি[কে] কিছুক্ষণ চেয়ে বের হয়ে গেল।

ওয়াঙ দাঁড়িয়ে থাকে উঠোনে, যেখানে বছরের পর বছর সে তা[র] সোনার ফসল মাড়াই করেছে। বহু মাস এ উঠানে কাজ করেনি সে। বাপ আর ছেলেমেয়েদের খাওয়ানর কিছু নেই—বৌকেই ব[া] কি খাওয়াবে? শুধু বৌয়ের জন্যই নয়—যে আছে তার জঠরে তাকে[ও] খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে। গর্ভাশ্রয়ী যে মানব-শিশু শোষকে[র] মত মা'র রক্ত-মাংস থেকে নিজের খাদ্য শুষে নিচ্ছে। হঠাৎ কেমন যে[ন] অত্যন্ত ভয় করতে লাগল। তার পর মদের আরামের মত রক্তে একট[া] সান্ত্বনার প্রবাহ নেমে আসে। মনে মনে উচ্চারণ করে ওয়াঙ—'এরা আমার জমি কেড়ে নিতে পারবে না। আমার শ্রম আর ক্ষেতের ফসল এমন জিনিষে খাটিয়েছি যা' কেউ নিতে পারবে না। আমার যদি টাকা থাকত এরা কেড়ে নিত। যদি টাকা দিয়ে খাদ্য মজুত করতাম নিয়ে নিত এরা। পৃথিবীর মাটি আমার আছে আর সে মাটির খাস অধিকার আমারই রইল।'

৯

উঠোনের চৌকাঠে বসে বসে ওয়াঙ ভাবে এবার কিছু করা দরকার। এ শূন্য ভিটেতে মরে পড়ে থাকার কোন অর্থ নেই। শরীর কৃশ হয়েছে, গায়ের পোষাক টেনে টেনে বাঁধে ওয়াঙ, তবু বাঁচার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে ওঠে দিন দিন। জীবনের সব-চেয়ে সোনালী দিনে নির্বোধ ভাগ্যের হাতে সে মার খেতে প্রস্তুত নয়। মনের ভিতরের দুঃসহ জ্বালা

বাইরে প্রকাশের পথ পায় না। কখনো কখনো মাথার ভিতর একটা আগুন জ্বলে ওঠে, চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে সে উপরের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে—'বুড়ো ঠাকুর, তুমি অতি খল।' আবার মনের ভিতর যখন ভয় জড়ো হয় ওয়াঙ কেমন চাপা আর্তনাদ করে—'যা' হয়েছে এর চেয়ে আর খারাপ কি হ'বে।'

এমনি এক দিনে অনশন-কৃশ পা ছু'টিকে টেনে নিয়ে সে গিয়ে উঠল পৃথ্বী মায়ের মন্দিরে। দেবতা ছু'টি তেমনি নির্বিকার হয়ে বসে আছেন। ওয়াঙ তাদের মুখের উপর থুতু দিয়ে এল। দেবতাদের সামনে কত দিন ধূপ জ্বলেনি। কতগুলি মাস কেটে গেছে—তাদের নববর্ষের রঙীন সাজ খসে গেছে,—ভিতরের মাটি দেখা যাচ্ছে। দেবতাদের মুখে কোন বিকার নেই। ওয়াঙ দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ফিরে এল বাড়ীতে, সোজা গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

আজকাল সবাই সারা দিন শুয়ে থাকে। ওঠার তাগিদই থাকে না। ক্ষুধার্তের চোখে নেমে আসে ঘুম ঝোঁকে ঝোঁকে। কড়াইয়ের খোসা খাওয়া শেষ হয়েছে—ছাল নেই কোন গাছে। গাঁয়ের মানুষ শীতের দিনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে দেখে কোথায় ঘাস পাওয়া যায়। একটি পশু নেই সারা এলাকায়। বেশ ক'দিন ঘুরে এলেও একটি গৃহপালিত জন্তু কারুর চোখে পড়ে না।

শূন্য বায়ু ছেলে-মেয়েদের পেটের খোল বাড়িয়ে তোলে। কোথাও কোন ছেলে-মেয়ে খেলা করে না। ওয়াঙের ছেলে ছু'টি উঠান অবধি হামাগুড়ি দিয়ে আসে—তার পর জ্বলন্ত রোদে চুপ করে বসে থাকে। একদা নধর তাদের শরীর এখন কৃশতায় কুৎসিত। হাড়গিলে চেহারা হয়েছে তাদের। কচি মেয়েটার বসার বয়স হয়েছে, কিন্তু সে সারা দিন একটা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে চুপটি করে। প্রথম প্রথম তার কচি গলার ক্রুদ্ধ গঞ্জন শোনা যেত—এখন সে শান্ত হয়ে গিয়েছে। হাতের কাছে যা পায় শুয়ে শুয়ে তাই চুষে চুষে খায়। আর অভিযোগ করে না। বুড়ীদের মত তারও গালে গর্ত হয়েছে—ঠোঁট ছু'টি হয়েছে নীল আর কালো—চোখের চাউনিতে কেমন শূন্যতা।

এই অভাবের পরিবেশের মধ্যে এই ছোট মেয়েটির করুণ অস্তিত্ব বাপের স্নেহকে জাগিয়ে তোলে। আনন্দের সংসারে নানা কলরবের মধ্যে মেয়ে হিসেবে এ শিশুটি হয়ত পিতার এতখানি মমতা পেত না। কখনো কখনো ওয়াঙ মৃদু কণ্ঠে বলে—'অভাগী, ওরে অভাগী মেয়ে আমার।' এমনি এক দিন পিতার মমতা-মাখা কথার উত্তরে সেই দন্তহীন শিশুটির মুখ হাসিতে ফুলের মত ফুটে ওঠে। ওয়াঙ তাকে তুলে বুকের মধ্যে জাপটে নেয়—দেয় তাকে আপন দেহের উত্তাপ। দুই চোখে এত দিনের জমা অশ্রু ঝরতে থাকে। সেই দিন থেকে কখনো কখনো ওয়াঙ তার এই কচি মেয়েটিকে বুকে করে নিয়ে চৌকাঠের ধারে গিয়ে বসে। জলহীন, রিক্ত মাঠগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওয়াঙের প্রহর যায়।

এ-পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধ বাপই যা' কিছু পান। ছোট ছেলে-মেয়েদের অভুক্ত রেখেও ওয়াঙ খাদ্য যা' কিছু মেলে বাপের হাতে তুলে দেয়। বাপকে তার মৃত্যুকালে অযত্ন করেছে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না ওয়াঙকে—এ চিন্তায় তার বুক ভ'রে ওঠে। আপন শরীরের মেদ-মাংস দিয়েও সে বুড়ো বাপকে বাঁচিয়ে রাখবে।

দিন-রাত্রি বেশীর ভাগ বৃদ্ধ ঘুমিয়েই কাটান। শুধু দুপুরে যখন রোদের তেজ বেড়ে ওঠে তিনি গুড়ি মেরে আঙিনায় গিয়ে বসেন, সেটুকু সামর্থ্য তাঁর আজও অবশিষ্ট আছে। বাকী সকলের চেয়ে তাঁর খুশী-খুশী ভাব। এমনি এক দিন বাঁশবনে হাওয়ার শব্দের মত বৃদ্ধের কাঁপা গলা শোনা যায়—'এর চেয়েও খারাপ দিন আমি দেখেছি। খুব খারাপ দিন। তখন বাপ-মা ছেলে-মেয়ের মাংস খেয়েছে।'

কি একটা বিশ্রী আতংক হয় মনে। ওয়াঙ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—'সে আমাদের বাড়ীতে কখনো হবে না।'

এক দিন প্রতিবেশী চীং এসে হাজির হয়। সে যেন প্রেত-লোকের বাসিন্দা। মাঠের মতই শুষ্ক বিবর্ণ ঠোঁট ফাঁক করে চীং ওয়াঙকে বলে—'সহরে সবাই কুকুর, ঘোড়া, মুরগী খাচ্ছে। গাঁয়ে আমরা ঘরের বলদ, গাছের ছাল আর ঘাস খেয়েছি। আর কি বাকী রইল খাবার।'

হতাশায় ওয়াঙ মাথা দোলায়। বুকের ভিতর লুকিয়ে-রাখা কচি মেয়েটির অস্থিসার রক্তহীন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ওয়াঙ। মেয়েটি সর্বক্ষণ বাপের মুখের দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকে। বাপের সঙ্গে চোখোচোখি হলেই সেই কচি মুখে হাসির ঝিলিক ওঠে।

আরো কাছে মুখ এনে চীং বলে—'গাঁয়ে ওরা মানুষের মাংস খাচ্ছে। তোমার কাকা-কাকীরাই খাচ্ছে নিশ্চয়ই। নইলে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবার গতর পাচ্ছে কোথা থেকে ওরা, শুনি। ওদের আবার কোন্ কালে কি ছিল?'

যমদূতের মত চীংয়ের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় ওয়াঙ। প্রায়-বোঁজা চোখে চীংকে দেখাচ্ছে বীভৎস। কি একটা অজানা ভয়ে ওয়াঙের শরীরে কাঁপুনি ধরে। গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় সেই ভয়কে।

ওয়াঙ চেঁচিয়ে বলে—'আমরা এখান থেকে চলে যাব। চলে যাব দক্ষিণে। আমাদের দেশে সব জায়গাতেই মানুষ শুকিয়ে থাকে। ভগবান্ এমন নিষ্ঠুর হবেন না যে হানের বংশধরদের একেবারে লোপ করে দেবেন।'

প্রতিবেশী নিস্তাপ কণ্ঠে জবাব দেয়—'তোমার কপাল ভাল, আজও তোমার বয়স আছে। আমরা দু'জনে বুড়ো হয়ে গেছি আর থাকার মধ্যে আছে একটি মেয়ে। এখানেই আমরা মরব।'

ওয়াঙ তাকে বলে—'সে কথা ধরলে তোমার অবস্থাই ভাল। আমার বুড়ো বাপ আর তিনটি কচি ছেলে-মেয়ে। তা'ছাড়া আরও একটি শীগ্‌গির আসছে। পাছে ক্ষিদের জ্বালায় পাগল হয়ে নিজেরাই নিজেদের মাংস খেয়ে বসি—তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাই।'

আজকাল ওলান আর বিছানা ছেড়ে ওঠে না। কথাও বলে না মুখে। ঘরে খাবার নেই, উনুনে আগুন নেই, গৃহস্থালীর কাজ বলতেও কিছু নেই, সুতরাং শুয়েই থাকে ওলান। ওয়াঙ এসে বৌকে বলে—'জ্বান, আমরা দক্ষিণে চলে যাব।'

ওয়াঙের গলায় যেন নূতন খুশী বাজতে থাকে। এ সংসারে অনেক দিন এমন খুশীর আওয়াজ কেউ শোনেনি। ছেলেগুলি মুখ তুলে তাকায়—বৃদ্ধ বাপ নিজের ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসেন আর ওলান দুর্বল দেহ টেনে এনে দরজায় ধারে দাঁড়িয়ে বলে—'সেই ভাল। অন্ততঃ পথে চলতে চলতে মরাও ভাল।'

শীর্ণ শরীর ওলানের। পেটের ভিতর পুরন্ত শিশুটির জন্যে সমস্ত

পেটটা ঝুলে পড়েছে। গালে মাংস নেই—তাই গালের হাড় দু'টি কঠিন হয়ে উঠেছে। 'কাল অবধি অপেক্ষা কর' ওলান বলে—কালকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। পেটের নড়াচড়া দেখে আমি বুঝতে পারছি কি না।'

'কালই ঠিক'—বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওয়াঙের বুক মমতায় ভরে ওঠে। এত দুঃখের মধ্যেও সে আর একটি শিশুকে পোষণ করছে।

'তুমি হাঁটবে কেমন করে, জানি না।' ফিস্ ফিস্ করে সে বৌকে বলে। বাইরের দরজায় তখনো চীং দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় ওয়াঙ বলে—'যদি তোমার কিছু থাকে আমার ছেলে-মেয়ের জন্যে এক মুঠো পাঠিয়ে দিও। এক দিন আমার ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিলে সে-কথা আমি ভুলে যাব।'

লজ্জায় লাল হয়ে চীং নীচু-গলায় জবাব দেয়—'সত্যি, সে-দিন থেকে তোমার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল না। তোমার কাকাই ত আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, তোমার ঘরে ফসল মজুত আছে। ভগবানের দিব্যি করে বলছি আমার ঘরের দরজায় পাথরের নীচে কিছু শুকনো লাল মটর আছে। যদি সত্যি মরতে হয় ত শেষ সময়ে এক মুঠো করে খেয়ে মরব বলে আমি আর আমার বৌ রেখে দিয়েছিলাম। তবুও তা' থেকে তোমায় আমি আধাআধি দেব। তোমরা চলে যেও কালই। আমি ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকব। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে—ছেলেও নেই। আমার মরতে কি?'

খানিক পরেই চীং ফিরে আসে। ছোট একটা নেকড়ায় মুড়ে নিয়ে আসে দু'মুঠো মাটি-মেশান লাল মটর। খাবার দেখে ছেলেরা কলরব করে ওঠে—বৃদ্ধের দু'টি চোখ চক্‌চক্ করে কিন্তু ওয়াঙ তাদের এড়িয়ে সেগুলি নিয়ে যায় বৌয়ের কাছে। তাকে খেতে দেয়। অনিচ্ছায় ওলান একটি একটি করে মটর মুখে তোলে। আসন্ন প্রসব-যন্ত্রণায় খালি পেটে থাকলে একেবারে মরে যাবার ভয়ে খানিকটা খেয়ে নেয় ওলান।

কয়েকটি মটর মুখের মধ্যে নিয়ে ওয়াঙ চিবোয়। মুখের ভিতর একটি নরম মণ্ড তৈরী করে। তার পর কচি মেয়েটার ঠোঁট দু'টি ফাঁক করে মুখের ভিতর ভরে দেয় মণ্ডটি। মেয়েটির মুখ যখন নড়ে ওঠে ওয়াঙ নিজেকে নিবৃত্তভুখ মনে করে।

সে-রাত্রে মাঝের ঘরে বসে থাকে ওয়াঙ। ছেলে দু'টি দাদুর কাছে শুয়েছে। তৃতীয় ঘরটিতে একাকী ওলান পৃথিবীর নতুন মানুষটির জন্য যন্ত্রণা পাচ্ছে। নিঃশব্দে বসে বসে শোনে ওয়াঙ যেমন শুনেছিল প্রথম বার। ঘরের ভিতর জলের পাত্র রেখেছে ওলান। প্রসবের পর নিজেই সব পরিষ্কার করে নেয়—যেমন পশু-মা কিছুতেই প্রসব-চিহ্ন রাখতে দেয় না বাসায়।

বসে বসে উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ওয়াঙ কান পেতে থাকে একটি তীক্ষ্ণ চীৎকারের আশায়। ছেলে-মেয়ে যাই হোক তাতে আর কিছুই আসে যায় না, শুধু আর একটি খাওয়ার হাঁ বাড়ল সংসারে।

'যদি মরা ছেলে হয় ত বাঁচি।' বিড় বিড় করে বলে ওয়াঙ। সেই সময়ই কানে আসে একটি নির্জীব কান্না। চারি পাশের চুপচাপের ভিতর সেই আওয়াজটুকুও প্রখর হয়ে উঠল। 'দয়া নেই সংসারে'। মনে মনে ভাবে ওয়াঙ। তার পর আবার কান পেতে শোনে।

আর কোন আওয়াজ কানে আসে না। সারা বাড়ীতে ছিদ্রহীন নীরবতা। এ নীরবতা সব বাড়ীতে। ঘরে ঘরে মৃত্যুর অপেক্ষা কর্মহীন মানুষের নীরব প্রতিমা। এ শব্দহীনতা কেমন যেন হয় না তার। প্রাণের ভিতর একটা ভয় ডানা ঝাপটা দেয়। ওলানের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে সে কথা কয়। নিজের গলার আওয়াজে যেন কত সাহস আসে।

'ভাল আছ ত।' তার পর উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে শোনে। যদি মরে গিয়েই থাকে ওলান। ঘরের ভিতর থেকে একটা খস্‌খস্ আওয়াজ শুধু শোনা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওলান। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাসের মত জবাব আসে—'ভিতরে এস।'

ভিতরে যায় ওয়াঙ। বিছানায় শুয়ে আছে ওলান। পাশে কেউ নেই।

'সে কোথায়?'

মৃদু একটা হাতের ভঙ্গিমায় ওলান মেঝের প্রান্তে নির্দেশ দেয়। মেঝের উপর শিশুটির দেহ পড়ে আছে।

'মরে গেছে।'

'মরে গেছে?'

মাথা নীচু করে ওয়াঙ সেই একমুঠি শিশু দেহকে পরীক্ষা করে। চামড়ায় ঢাকা দেওয়া কয়েকটি অস্থির সমষ্টি। একটি মেয়ে। ওয়াঙের গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে—'তবে যে কান্না শুনলাম।' বলতে গিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় ওয়াঙ। দু'টি চোখই বুঁজে আছে ওলান—মুখের রং ছাইয়ের মত। সহ্যের শেষ সীমা পার হয়ে একেবারে নির্বাক্ হয়ে গেছে যেন ওলান। চুপ করে থাকে ওয়াঙ। একটি দুর্যোগের মাঝে ওয়াঙ শুধু নিজেকেই বহন করে বেড়িয়েছে আর ঐ মেয়েটি নিজের ক্ষুধার্ত দেহের রস দিয়ে আর একটি শিশু পালন করেছে,—বহন করে বেড়িয়েছে। না খেতে দিতে পারার মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছে।

মৃত শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে ওয়াঙ তাকে একটি ছেঁড়া মাদুরে মুড়ে ফেলল। ছোট মাথাটি কাঁধের দু'পাশে ঝুলে ঝুলে পড়ে। গলার কাছে দু'টি কালচে হয়ে যাওয়া ক্ষতের চিহ্ন দেখতে পায় ওয়াঙ। নিঃশব্দে সে মাদুর ঢাকা মৃত শিশুটিকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যায়। যত দূর শক্তি হয় তত দূর নিয়ে গিয়ে একটি পুরাতন কবরের পাশে কবর দেয়।

পশ্চিম মাঠের শেষ সীমানার কাছে অযত্নে এখানে অনেক কবর পড়ে আছে। শিশুটিকে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে একটা রোগা নেকড়ে কুকুর ছুটে এসে পড়ে তার একেবারে কাছে। পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারে ওয়াঙ তার দিকে। বাঁ পাশের পাঁজরায় লাগে। কুকুরটা একটু সরেই আবার অপেক্ষা করতে থাকে। পা 'দুটো অবশ হয়ে আসে—হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ওয়াঙ ফিরে আসে বাড়ীর দিকে।

'যেমন রইল ঐ ভাল'—নিজের মনে বলতে বলতেই সে [illegible] এই প্রথম ওর সারা মন গভীর হতাশায় ভরে ওঠে।

পরের দিন নিস্তরঙ্গ নীল আকাশে আবার যখন সূর্য উঠল, ও ভাবল হয়ত কাল দুঃস্বপ্নেই ও বৃদ্ধ বাপ, রোগা বৌ, আর ক্ষুধা[illegible]

ছেলে-মেয়েগুলিকে নিয়ে এ ভিটে ছেড়ে যাবার সংকল্প করেছিল। শত যোজন দূরে কোথাও যদি থাকে কোন প্রাচুর্যের দেশ এরা নিজেদের দুর্বল দেহ সেখানে টেনে নিয়ে যাবে কি করে? কে জানে দক্ষিণের সেই সব দেশে খাওয়ার বস্তু মিলবে কি না? এ নির্দয় আকাশের কি শেষ আছে? হয়ত এত কষ্ট করে তারা সে-দেশে যাবে শুধু বিদেশী আর অনাহারী লোক দেখতে। হয়ত নিজেদের ভিটেতে মরে থাকা তার চেয়েও ভাল। বাড়ীর চৌকাঠে বসে বসে বিবর্ণ শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে হাজারো চিন্তায় তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

টাকা আর নেই। শেষ কপর্দকটি অবধি কবে শেষ হয়ে গেছে। বাজারে খাদ্যবস্তু মিলছে না—টাকা থাকলেও কোন লাভ হোত না। প্রথম দিকে ওয়াঙ যখন শুনত যে সহরে চোরা কারবারী আর মজুতদাররা ধান মজুত করে রেখেছে চড়া দামে শুধু বড় লোকদের বিক্রী করবার জন্য, তখন রাগে তার গা' জ্বলত। আজকাল আর রাগও হয় না। সহরে যদি অমনি খাদ্য মেলেও তবু সহর অবধি যেতে হয়ত তার সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠবে না। মনে হচ্ছে যেন ক্ষুধারই শেষ হয়ে গিয়েছে।

পেট আর আগের মত আঁকড়ে ধরে না। মাঠ থেকে মাটি এনে তারা আজকাল খাচ্ছে। মাটির ভিতরও খাদ্যপ্রাণ আছে—তাতে কিছুটা পুষ্টি হয় কিন্তু মৃত্যু ঠেকানো যায় না। তবু আজকাল মাটির ঝোল করেই ছেলেরা খাচ্ছে—শূন্য উদরের কিছুটা ভরে উঠছে। মটর-দানাগুলির কথা চিন্তা করে না ওয়াঙ। অনেকক্ষণ পরে বৌ যখন একটি একটি খায় ওয়াঙের মন শান্তি পায়।

এমনি অলস মনে হাজারো চিন্তা নিয়ে ওয়াঙ চৌকাঠে বসে থাকে। ইচ্ছা হয় একবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে, তার পর ঘুমের সড়ক ধরে মৃত্যুর রাজ্যে গিয়ে হাঁফ ছাড়ে। মাঠের পার থেকে চারটি প্রাণী যে ওর দিকে এগিয়ে আসছে দেখেও কোন কৌতূহল হয় না মনে তার।

কাছে এলে ওয়াঙ দেখলে তিনটি অপরিচিত লোকের সঙ্গে তার কাকা আসছেন। দরদ-ভরা প্রসন্ন কণ্ঠে কাকা বললেন—'কত দিন তোমায় দেখিনি; কেমন আছ তোমরা। আমার দাদা কেমন আছেন।'

কাকার চেয়ে কৃশ হয়েছে বটে, তবে যতটা আশা করা যায় ততটা যেন নয়। নিজের ক্ষুধা-শীর্ণ শরীরের প্রতিটি কোষে একটা আক্রোশ যেন ফেটে পড়তে চায় তার এই কাকার প্রতি।

'আপনি কোথা থেকে খেতে পাচ্ছেন—কাকা কি খাচ্ছেন আজকাল!' ভারী গলায় প্রতিপ্রশ্ন করে ওয়াঙ। এই সব অপরিচিতদের প্রতি কোন সৌজন্যের ভাব আসে না মনে। কাকার শরীরের মাংসের উপর যেন ওয়াঙের আক্রোশ হয়। আকাশের দিকে হাত তুলে বিরাট হাঁ করে কাকা বলেন—'খেয়েছি? আমার বাড়ীতে দেখবে চল না। চড়ুই পাখীর জন্যও একটা দানা নেই। তোমার খুড়ী—কত মোটা ছিলেন জানই ত? কেমন নাদুস-নুদুস—তেল-চকচকে গা' ছিল। এখন হয়েছে যেন বাঁশের মত। সাতটি ছেলে-মেয়ের চারটি আছে—তিনটি মরে সাফ হয়ে গিয়েছে। আমার অবস্থা ত নিজের চোখেই দেখছ।' জামার আস্তিন দিয়ে দু'টি চোখ মুছলেন কাকা।

নির্বোধ ঔদ্ধত্যে তবু ওয়াঙ বলে—'আপনি খাচ্ছেন।'

কথার মোড় ঘুরিয়ে কাকা বলেন—'আমার শুধু তোমাদের জন্যে ভাবনা। আমার সহোদর ভাই আর তার ছেলে বৌ নাতিদের জন্য দুশ্চিন্তা। আর তারই প্রমাণ দিতে আমি এসেছি। এই সব ভালো লোকদের কাছে আমি কথা দিয়েছিলুম যে কিছু খাবারের বিনিময়ে আমি এই গাঁয়ে ওঁদের কিছু জমি খরিদের ব্যবস্থা করে দেব। আমার মনে ছিল তোমাদের কথা—তোমরা যারা আমার আপন জন। ওঁরা তাই তোমাদের জমি কিনতে এসেছেন—জমির বদলে তোমরা পাবে খাবার, টাকা আর বাঁচার জোর।' কথাগুলি শেষ করে কাকা হাত জড়ো করে পিছনে সরে দাঁড়ালেন।

ওয়াঙ কথা কয় না—নড়েও না। শুধু মুখ তুলে চেয়ে দেখে যে আগন্তুক লোক তিনটি সহরের বাসিন্দা—তাদের পরনে পুরানো সিল্কের লম্বা কামিজ, নরম হাতে তাদের লম্বা লম্বা নখ। লোকগুলির চেহারায় সু-ভোজীর পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তীব্র বিদ্বেষে ওয়াঙের মন ফণা তোলে। সহর থেকে এসেছে ভোজন-বিলাসীর দল তার অনশন-শীর্ণ কুটীরে যেখানে মানুষের ছেলেরা মাঠের মাটি খেয়ে বাঁচার বিফল চেষ্টা করছে। দুঃখের চরম সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে যারা তাদের কাছ থেকে জীবনের চেয়ে দামী যে জমি তাই শোষণ করে নিতে এসেছে। শূন্যগর্ভ দৃষ্টি তুলে ওয়াঙ চেয়ে থাকে এই দস্যুদের দিকে।

'আমি জমি বেচব না।'

কাকা দু' পা এগিয়ে এলেন। ঠিক এই সময় ওয়াঙের ছোট ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে এল। অনেক দিন না খেয়ে খেয়ে ছেলেটি এত দুর্বল হয়েছে যে, আবার শিশুদের কোঠায় গিয়ে পড়েছে।

'ঐ ছেলেটি? ওকেই না গত বার গরমের সময় একটা তামার পয়সা দিয়েছিলাম? তখন কত মোটা-সোটা ছিল!' কাকার উৎকণ্ঠিত স্বর শোনা যায়।

সকলেই ফিরে তাকায় ছেলেটির দিকে। এত কালের রুদ্ধ অশ্রুজল হঠাৎ ওয়াঙের চোখের দু'কূল ছাপিয়ে নেমে আসে। গলার ভিতর কি একটা জট আটকে যায়।

'কত দাম দেবেন'—ধরা-গলায় কথা কয় ওয়াঙ। বাচ্চা তিনটিকে খাওয়াতে হ'বে ত আর বুড়ো বাপকে। স্বামি-স্ত্রী ওরা দু'জনে মাঠের জমিতে কবর খুঁড়ে নিশ্চিন্ত শুতে পারবে কিন্তু এরা?

সহুরে তিন জনের ভিতর যার এক চোখ কানা সে এগিয়ে এসে বলল—'আহা! তোমার ছেলের মুখ চেয়ে আমরা তোমাকে বেশী দামই দিতে রাজী আছি। এ দাম তুমি কোথাও পাবে না। তোমাকে দেব—' একটু থেমে আবার কর্কশ গলায় বললে সে—'প্রতি একর জমিতে আমরা একশ' পেন্স দিতে রাজী আছি।'

কটু কণ্ঠে হেসে উঠল ওয়াঙ—'তার চেয়ে ওটা দান বলে নিয়ে যান না। কিনেছিলাম যখন ওর বিশ গুণ দাম দিয়েছিলাম।'

'দুঃস্থদের কাছ থেকে জমি কেনার বেলা সে কথা খাটে না।' আর একটি সহুরে কথা কয়।

তিন জনেই তারা এই গরীব চাষীটির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এর ক্ষুধার্ত্ত ছেলে-মেয়ে—এর অসহায় ক্ষুধাজর্জ্জর বৃদ্ধ বাপ। সব হারাবার বিপত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওয়াঙের সারা গা রাগে জ্বলে ওঠে। হিংস্র শ্বাপদের মত ওয়াঙ লাফিয়ে ওঠে।

'জমি আমরা বেচব না।' আর্ত্ত চীৎকার করে ওঠে ওয়াঙ—'ঐ জমির মাটি তিল তিল করে আমি ছেলে-মেয়েদের খাওয়াব। তারা যদি মরে ঐ জমিতেই তাদের গোর দেবো। তার পর আমরাও মরব,—বাবা, আমি, আমার বৌ। মরে থাকব ঐ মাটিতেই। ঐ মাটি আমাদের জীবন।'

একটা অসহায় রুক্ষতায় ওয়াঙের সারা শরীর ঠক্-ঠক্ করে কাঁপে—ডুকরে ডুকরে কাঁদে ওয়াঙ। লঘু হাসিমুখে তিনটি লোক দাঁড়িয়ে থাকে। কাকারও ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয় না। চাষা ওয়াঙ পাগলামি করছে—তার মন নিস্তাপ হয়ে আসার অপেক্ষা করতে থাকে তিনটি শহুরে প্রাণী আর দালালটি।

এমন সময় হঠাৎ ওলান এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। অনুচ্চ সহজ ভঙ্গীতে সে বলে—'জমি আমরা বেচব না। দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরে এসে আমাদের তখন কি থাকবে। বেচব আমরা ঘরের টেবিল, বিছানা দু'টো, চারটে বেঞ্চি—এমন কি উনুনের মত বড় কড়াটাও বেচতে রাজী আছি। জমির যন্ত্রপাতিও বেচব না—লাঙ্গল আর মই ছাড়া আর বাকী সব।'

ওয়াঙের রাগের চেয়েও বৌয়ের স্বাভাবিক কণ্ঠে কাজ হয় বেশী।

কাকা কেমন বেচাল হয়ে বলেন—'তোমরা সত্যি যাবে না কি দক্ষিণে?'

তিনটি সহুরের মধ্য কানাকানি চলে। অবশেষে এক জন বলে—'তোমাদের ঘরের জিনিষে ত জ্বালানীর কাজ চলবে। যাই হোক্—ও-সব জিনিষের জন্যে আমরা দু'টো রূপো দিতে পারি। হয়ত বল।'

ওলান তৎক্ষণাৎ বলে—'দু'টো রূপো একটা বিছানার দাম। তবু নগদ এখুনি যদি দিতে পারেন ত জিনিষ নিয়ে যেতে পারেন।'

কোমর থেকে টাকা বার করে দেয় একচোখ লোকটি। সাগ্রহে হাত পেতে নেয় ওলান। তার পর তিনটি প্রাণী নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে সব জিনিষ বার করে। বৃদ্ধের ঘরের কাছে গিয়ে কাকা ফিরে আসেন। বুড়ো বড় ভাইকে মেঝেতে শুইয়ে এরা যে তার বিছানা শুদ্ধ খাট বার করে নেবে এ তিনি দেখতে চান না। শূন্য রন্ধনশালার দিকে চেয়ে ওলান স্বামীকে বলে—'দেখ, এ দু'টো থাকতে থাকতেই আমাদের যেতে হবে। নইলে লোভের বশে হয়ত ভিটে-টুকুও আমরা বেচে ফেলব। দক্ষিণ থেকে ফিরে তখন ছেলে-মেয়েদের আর মাথা গোঁজার জায়গা থাকবে না।'

'সেই ভাল'—ওয়াঙের গলা বুজে আসে।

মাঠের আর এক ধারে বিলীয়মান শস্যের দিকে চেয়ে ওয়াঙ শেষে যেন নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—'জমি ত আমাদের রইল। আমাদেরই ত রইল জমি।'

[ক্রমশঃ

হীনমন্যতা

শ্রীচিত্রগুপ্ত

৬

মনের শিক্ষার সম্পূর্ণতার দ্বারা যুবক-যুবতী বিবাহ করবার সত্যিকার অধিকারটি অর্জ্জন ক'রেচে কি না তা' পরীক্ষা করবার একটি চমৎকার প্রাচীন প্রথা জার্ম্মাণীতে প্রচলিত আছে।

তখনকার গ্রামাঞ্চলে বিবাহার্থী প্রণয়ি-যুগলের হাতে একখানা 'দু'জনে-চালাবার' (দু'দিকে-হাতল-ওয়ালা) করাত দিয়ে,—ত দিয়ে একটা গাছের মোটা গুঁড়ি কাটতে বলা হয়। তদনুসারে তা যখন দু'জনে মিলে ঐ গুঁড়িটি কাটতে থাকে তখন তাদের শুভানুধ্যা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ঐ কাঠকা দেখে। এই কাঠকাটা দেখেই তারা বিচার করে যে ঐ প্রণ যুগল বিবাহের প্রকৃত অধিকার লাভ করেচে কি না।

কারণ, ঐ রকম করাত দিয়ে ও-ভাবে কাঠকাটা কাজটা আস এক জন লোকের একার কাজ নয়। ঠিক ভাবে কাটতে গে ওখানে দু'জন লোকের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্যে সমতা থাকা চাই প্রত্যেককেই নজর রাখতে হবে অন্য মানুষটি কি ক'রছে এ কি ভাবে হাত চালাচ্ছে। সেটি লক্ষ্য ক'রে সে যখন দস্তরম সহযোগিতা ক'রে তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের হাত চালা পারবে তখনই সহজ ভাবে কাজটি করা সম্ভব হবে। কাজে মানুষ দু'টি তাদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনকেও এই ভাবে স যোগিতা ক'রে চলতে পারবে কি না, তার চমৎকার পরীক্ষা নেও সম্ভব হয় এই সুন্দর প্রথাটির সাহায্যে।

এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজে যে-সব লোক নিজেদে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলবার যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রেচে, কেবলমা তাদের পক্ষেই প্রেম, বিবাহ ও বিবাহিত জীবন যাপন করাটা সহ হতে পারে। আর এ শিক্ষা যারা লাভ করেনি তাদেরই প্রে ও বিবাহিত জীবনে দেখা দেয় যত-কিছু জটিল সমস্যা।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহের পর দম্পতির বৈবাহিক জীব যে ছন্দ-পতন দেখা যায় তার কারণ সেই দম্পতির হয় কো এক জনের আর না হয় উভয়েরই সামাজিকতা-বোধের অভাব সে ক্ষেত্রে এই ত্রুটি সংশোধন করার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে স্বামি স্ত্রীর নিজেদের অন্তর্নিহিত গলদটি দূর করা।

বিবাহ এবং বিবাহিত জীবনের সুখ কোনো এক জন লোকে হাতে থাকে না। জিনিষটা আগাগোড়াই হ'চ্ছে দু'জনের সাম্মিল ব্যাপার। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয় উভয়েরই, আর না হয়, কোনো এক জনের ভেতর যদি এ সহযোগিতার অভাব ঘটে তাহ'লেই ঘটে অশান্তি। আর যেখানে এই সহযোগিতার অভাব দেখা যায় সেখানেই অনুসন্ধান ক'রে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে যে দম্পতির মধ্যে হয় উভয়েই, আর না হয় কোনো এক জন, হীনমন্যতার রোগী। তাই এই সামাজিকতা-বোধের অভা এবং বিরোধ।

এই হীনমন্যতা যে আবার তাদের মধ্যে বিবাহের সময়ে বা পরে হঠাৎ দেখা দেয়, তা-ও নয়। এ রোগ তাদের মধ্যে বাসা বাঁধে

তার অনেক আগে—তাদের বিস্মৃত শৈশব কালে। তবে এত দিন যে সেটা টের পাওয়া যায়নি তার কারণ, এই রোগটি আত্মপ্রকাশ করবার মতন উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এত দিন পড়েনি।

এটি কেন হয়? কারণ, আমরা সাধারণতঃ জীবনে যে সব কাজ শিক্ষা করি তা হয় একা একা সম্পন্ন ক'রতে হয়, আর না হয় দশ-বিশ পঞ্চাশ জনে মিলে অর্থাৎ দলগত ভাবে সম্পন্ন ক'রতে হয়। স্বার্থসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক লোকরা (এরাই হীনমন্যতার রোগী) একা একা কাজ করতে যেমন অসুবিধা বোধ করে না—বহু লোকের সঙ্গে কাজ করবার বেলাতেও তেমনি তাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয় না। সেখানেও অনেক লোকের 'আড়াল'এর সুযোগ নিয়ে তারা আত্মকেন্দ্রিক ভাবেই কাজ ক'রে যেতে পারে ব'লে তাদের সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত হবার প্রয়োজনও হয় না এবং তা জাগ্রতও হয় না। সেই জন্যে দীর্ঘকাল এদের রোগটি লোকচক্ষুর আড়ালে চাপাই থেকে যেতে পারে। ধরা পড়ে মাত্র বিবাহের পরে। কারণ, তখন মাত্র আর এক জন লোকের সঙ্গে মিলে সমান অধিকার বোধ এবং পূর্ণ সংযোগিতার সঙ্গে তার চলবার দরকার হয়! অথচ সে-ধরণের শিক্ষা লাভ করবার তার সুযোগই ঘটেনি কোনো দিন।

কিন্তু এ শিক্ষালাভের সুযোগ তাদের অতীত জীবনে না ঘটে থাকলেও দম্পতির উভয়েই যদি নিজেদের মধ্যেকার ত্রুটিগুলির অনুসন্ধান করে, ত্রুটির দেখা পেলে যদি সে ত্রুটির কথা অকপটে স্বীকার করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সে-ত্রুটিকে সংশোধন করতে যত্নবান্ হয় তা হ'লে দাম্পত্য জীবনের সকল সমস্যারই সমাধান হ'তে পারে। কারণ এ ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করা মানে অপর পক্ষের সমাজ অধিকারের দাবীকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করা।

চরিত্রের যে-সব ত্রুটির জন্য দম্পতির বিবাহিত জীবন অশান্তিময় হ'য়ে ওঠে তার মূল অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে, সে সব ত্রুটি তাদের আশ্রয় করে তাদের শৈশবে। শৈশবে তাদের মনের ওপর যে সব প্রভাব বদ্ধমূল হ'য়ে বসে, সেই সব কুপ্রভাব থেকে তাদের মুক্ত ক'রতে পারলে তাদের ত্রুটি সেরে যায়। সেই জন্যে এ্যাডলার মনে করেন যে, অশান্তিময় দাম্পত্য জীবন-সমস্যার সমাধান করতে হ'লে বিবাহ-বিচ্ছেদের বদলে Individual Psychologyতে অভিজ্ঞ উপদেষ্টার শরণাপন্ন হবার ব্যবস্থা থাকলেই বেশী সুফল পাওয়া যেতে পারে।

এই সব উপদেষ্টা বিবাহ-বিচ্ছেদের উপদেশ দেবেন না। এঁরা ভদ্র লোকেদের মত বলে ব'সবেন না, "তোমাদের মধ্যে যখন বাপু কিছুতেই 'বনি-বনাও' হচ্ছে না, তোমরা ক্রমাগত শুধু ঝগড়া ক'রেই মরচো, তখন মিছিমিছি ও-বিয়ের বাঁধনটুকু রেখে আর কি হবে? তার চেয়ে ও-বাঁধন কেটে ফেলে যে যার আলাদা হও। তার পর আবার নতুন ক'রে যে যার মনের মতন বর-কনেকে গিয়ে বিয়ে করো।"

আসলে এ-রকম উপদেশ কোনো কাজেরই নয়। কারণ, মনের মতন পাত্র-পাত্রী তারা পাবে কোথায়? আসলে ঐ মনের মধ্যেই যে তাদের যত 'গণ্ডগোল'। সুতরাং ডাইভোর্সের ফলে কী হবে? মনের যে-গণ্ডগোলের জন্যে একটা বিবাহকে বিচ্ছিন্ন করা হোলো সে-গণ্ডগোলকে না শুধরেই তো সে আবার বিবাহ করবে? এবং তার ফলে দ্বিতীয় বার ডাইভোর্সের প্রয়োজন হবে মাত্র!

হ'চ্ছেও এ-রকম হামেশাই। কত লোককেই তো দেখা যায় —যারা একটার পর দু'টো, দু'টোর পর তিনটে, হরদমই নতুন নতুন বিয়ে এবং তা'র অপরিহার্য্য ফল বার বার-ই ডাইভোর্স করে চ'লেচে। এ ক'রে কি আর তারা কোনো দিন নিজেদের বৈবাহিক জীবনের সমস্যার সমাধান ক'রতে পারবে? তা' যদি পারতে তাহ'লে তো তাদের জীবনে প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদটিও দরকার হোতো না। আসলে এরা একটা ভুলেরই পুনরনুষ্ঠান বার বার করে বই তো নয়? বৈবাহিক উপদেষ্টা-কুলের কাছে উপদেশ নেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হ'লে এই সব লোক অনেক আগেই এ বিষয়ে ঠিক ঠিক কার্য্যকরী উপদেশটি পেয়ে যেতে পারতো। বস্তুতঃ এর ফলে যেমন অনেক অবাঞ্ছিত বিবাহ ঘটতে পারতো না তেমনি অনেক অবাঞ্ছিত ডাইভোর্সেরও প্রয়োজন হোতো না।

অনেক ভুল ধারণা শৈশবেই ছেলেদের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে যে-গুলো বিবাহের সময়ে বা পরে ছাড়া ধরা পড়ে না। যেমন, অনেক ছেলের মনে এক ধরণের হীনমন্যতা বাসা বেঁধে নেয়—যার ফলে তার ধারণা হ'য়ে যায় যে তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে 'হতাশা' অবশ্যম্ভাবী। 'হতাশ হতে হবে' এই দুর্ভাবনায় জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিনই এরা একটু নিশ্চিন্ত শান্তিতে থাকতে পায় না।

এই সব ছেলেরা ছোটো বেলায় কোনো সময়ে কোনো স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়েচে যা'র ফলে তার প্রাপ্য আদরটা অন্যে ভোগ ক'রেচে, আর না হয়, শৈশবে কোনো একটা ক্ষেত্রে কোনো দিন এমন ভাবে ঠকেছে যার ফলে তার মনে বদ্ধমূল কুসংস্কারের মতনই একটা ভয় জন্মে গেছে যে, তাকে আবার কোন্ দিন কোন্ অবস্থায় না ঐ রকম ভাবে আবার ঠকতে হয়! হতাশা সম্বন্ধে এই ধরণের ভয় থেকেই বিবাহিত জীবনে ঈর্ষা, দ্বেষ ও সন্দেহাদি জন্মলাভ করে।

মেয়েদের মধ্যে একটা অতি সাধারণ গলদ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এটা হ'চ্ছে তাদের মনের এই ধারণা যে, পুরুষদের কাছে তারা একটা খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছুই না এবং পুরুষ-মানুষ মাত্রেই চরিত্রের দিক্ থেকে অবিশ্বাস্য।

এ রকম ধারণা যেখানে বদ্ধমূল থাকে, বিবাহিত জীবন সেখানে কিছুতেই সুখের হ'তে পারে না। কী করে হবে? এক পক্ষ যেখানে একেবারে 'সাফ' জেনেই বসে আছে যে অন্য পক্ষ বিশ্বাসহন্তা হ'তে বাধ্য, সেখান থেকে সুখ-শান্তির আশা মাত্রই যে দৌড় না মেরে পারে না!

প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে এ্যাড্লার আর একটি গুরুতর কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে মানুষ যে ভাবে সর্ব্বদা উপদেশাদি শোন্বার আগ্রহ দেখায় তা' থেকে এইটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই প্রশ্নটাই নিশ্চয় জীবনের সব চেয়ে বড়ো প্রশ্ন। তিনি বলেন Individual Psychologyর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটি কিন্তু ঠিক তা নয়! তাঁর মতে প্রেম ও বিবাহ জীবনের অন্য সব চেয়ে বড়ো প্রশ্নের মতই একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন বটে—যার গুরুত্বকে কোন মতেই অবহেলার চক্ষে দেখা চলে না, কিন্তু তাই বলে এই প্রশ্নটা যে জীবনের আর সব প্রশ্নের মধ্যে

এক মাত্র শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন, তা নয়। Individual Psychology অনুসারে জীবনের কোনো একটা প্রশ্নই অন্য প্রশ্নের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দাবী ক'রতে পারে না।

যে-সব লোক অন্য প্রশ্নগুলোকে অবহেলা ক'রে শুধু প্রেম ও বিবাহের প্রশ্নটার ওপরেই জীবনে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বের আরোপ করে তাদের সমগ্র জীবনের সাবলীল গতির পথে 'ছন্দ-পতন' অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু তবুও মানুষের জীবনে এই ভুলটা ঘটতে প্রায়ই দেখা যায়। এটা কেন দেখতে পাওয়া যায়? কারণ, এই জিনিষটার সম্বন্ধে বিবাহের পূর্ব্বে আমরা কোনো রকম নিয়মিত শিক্ষাই লাভ করি না। আমাদের জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিতে ছন্দ রক্ষা ক'রে চলতে হ'লে জীবনের তিনটি দিকে সমান ভাবে তাল রেখে চলবার আমাদের দরকার হয়। সেই জন্যে গোড়া থেকেই এই তিনটি ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা লাভ করা দরকার।

সেই তিনটি হ'চ্ছে যথাক্রমে,—

(১) সমাজ ও গোষ্ঠীর সঙ্গে তাল রেখে চ'ল্‌তে শেখা।

(২) যে বৃত্তি গ্রহণ ক'রে জীবনের পথে চল্‌তে হবে সেই বৃত্তি গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা।

(৩) প্রেম ও বিবাহের জন্যে প্রস্তুত হবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে অন্ততঃ কতকটা শিক্ষা আমরা ছোট্টো বেলা থেকেই লাভ করি। জীবনের প্রথম দিন থেকেই মানুষ, সমাজের অন্য মানুষদের সম্পর্কে কী ভাবে চলতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা এমনিতেই পায়। পেশা সম্পর্কেও তো তাকে বেশ যত্নের সঙ্গেই শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তৃতীয়টির সম্পর্কে অর্থাৎ প্রেম ও বিবাহের উপযুক্ততা অর্জ্জনের ব্যাপারে সুবিধে হয় এমন শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা সাধারণতঃ আমাদের জীবনে থাকে না।

সেই জন্যেই জীবন-পথের ঐ স্থানটিতে এসে লোকে সাধারণতঃ সব চেয়ে জোরে একটা আচমকা 'হুঁচোট' খায়। এখানে একটা কথা অনেকের মনে হ'তে পারে যে, কেন? প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে তো বহু বই এর প্রচলন আছে—বিশেষ ক'রে ইংরেজীতে? কিন্তু এ-কথা মনে হওয়াটা আসলে ভুল। কারণ, এ বিষয়ে বই যা পাওয়া যায়, তা' হয় শুধু প্রেম সম্পর্কে আর না হয় শুধু বিবাহের পরবর্ত্তী ব্যাপার সম্পর্কে—যৌন ব্যাপারটাই যার মধ্যে প্রায় সবটা জুড়ে বসে থাকে।

কাজেই এ-রকম বই-এর কথা এখানে বলা হ'চ্ছে না। কারণ, এ জাতীয় বইয়ে আসল সমস্যার সমাধানের কোনো ইঙ্গিতই নেই। এ ক্ষেত্রে যেটা দরকার সেটা হ'চ্ছে প্রেম ও বিবাহের পক্ষে উপযুক্ততা অর্জ্জনের শিক্ষা। প্রেম, বিবাহ ও বিবাহের পরবর্ত্তী ব্যাপার তো আসবে ঢের পরে। তার আগে, অর্থাৎ বিবাহের যোগ্যতা অর্জ্জন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার আগেই যদি বিবাহ-কার্য্যটাই সমাধা ক'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে তো আসল ভুলটাই আগে করে বসা হোলো! তার পর আর তো কোনো বই বিশেষ কাজে লাগবার কথা নয়?

প্রেম-সম্পর্কিত গ্রন্থাদির সম্পর্কেও সেই একই ভুল হ'তে পারে। মনে হ'তে পারে 'প্রেম' নিয়েই তো সাহিত্যের যা-কিছু! তবে কেন এ কথা বলা হ'চ্ছে? আসলে কিন্তু প্রেম সম্পর্কে সাধারণ সাহিত্যে যা' পাওয়া যায় তা দিয়ে প্রেমের উপযুক্ততা অর্জ্জ শিক্ষালাভের দিক্ থেকে কোনো লাভই হয় না। বরং সাহি মধ্যে দিয়ে প্রেমকে যে দৃষ্টিতে দেখবার শিক্ষা মানুষ লাভ করে, ত হিতের চেয়ে বিপরীত ফলটাই বেশী ফলে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তো সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রেম নর-নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের প্রতিই আমাদের দৃষ্টিকে সম আকৃষ্ট করা হয়। আর তার ফলে প্রেম মাত্রেরই সঙ্গে এই দ্ব দেখে দেখে আমরা নিজেদের অজ্ঞাতেই প্রেমের নাম মাত্রেই সঙ্গে দ্বন্দ্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ কল্পনা ক'রে নিতে অভ্যস্ত হই। কা মানুষ যে সহজেই প্রেমকে ও তথা বিবাহকে আগে থেকেই চোখে দেখ্‌তে শিখ্‌বে এটা তো নেহাৎই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই গলদটি ঘটেছে কিন্তু আজ নয়— বলতে গেলে সভ্য গোড়া থেকেই। বাইবেলের গল্পই মানুষকে শিখিয়েচে যে মা জীবনের যা কিছু অশান্তি, যা-কিছু 'পাপ' তার সূত্রপাত ক' নারী। এই গল্পই জীবনে নর-নারীর সমান অধিকারবোধের মস্ত বাধার সৃষ্টি ক'রেচে আর তার থেকেই হ'য়েচে বিবাহিত জী যত-কিছু গণ্ডগোলের উৎপত্তি।

নারীদের জীবনে হীনমন্যতা সৃষ্টির ইতিবৃত্তের মূলও ঐখা নিবদ্ধ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই অসমতার বীজ তার মনের উপ্ত হয়। আর সারা জীবন ধ'রে তাকে এই কল্পিত অসম সঙ্গে লড়াই ক'রতে হয়। যে-মেয়ে বাধ্য হ'য়ে অসন্তুষ্ট মনেও কথাটাকে সত্য ব'লে মেনে নিয়ে বশ মানার ভাণ করে সে এর মধ্যেকার অন্যায়টার পীড়নকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রতেই থা সে যেমন এর থেকে উদ্ভূত হীনমন্যতার হাত থেকে রেহাই পায় তেমনি যে-মেয়ে এটাকে অন্যায় বলে উপেক্ষা করবার কিম্বা অ বলে প্রমাণ করবার চেষ্টায় প্রাণপাত করতে থাকে তা হীনমন্যতার অত্যাচারেই জর্জ্জরিত হ'তে হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু এই রকম একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে ত কী অনর্থক পণ্ডশ্রমই না ক'রতে হয়! কল্পিত ঊনতা বা ওঠবার কঠিন সাধনায় কত শক্তিই না তাদের বৃথা ব্যয়িত হয়! অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে পুরুষদের চেয়ে তাদের বেশী আত্মকে হ'তে হয়।

বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞানের এই উন্নতির চর্চ্চার যুগে এর প্রতি হওয়া উচিত। এখন মেয়েদের ছোটো বেলা থেকেই নিজের ক সমাজের প্রতিই বেশী আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠবার মতন শিক্ষা দে প্রয়োজন হ'য়ে পড়েচে। তাদের মন আত্মমুখী না হ'য়ে সমাজ হ'য়ে উঠলে সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হ'য়ে উঠ্‌বে। কি ক'রতে গেলে সুস্থ মনেই তা ক'রতে হবে। 'পুরুষ নারীর বড়ো' এই কুসংস্কারটিকে নর-নারীর প্রত্যেককেই আগে ক ক'রতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পুরুষ বা নারী একে অ চেয়ে বড়ো এ ধারণাটা অসত্য—আসলে পুরুষ ও নারী বি বটে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তবুও তারা সমানই—এইটাই সত্য।

এইখানে আরও একটা সত্য কথা মনে রাখা প্রয়োজ সেটি এই যে, সমষ্টিগত বিচারে নারীকে পুরুষের তুলনায় এ বেশী আত্মকেন্দ্রিক ব'লে মনে হয় বটে কিন্তু সেটা সে নারী ব নয়—সমাজ গঠনের ও সমাজ-প্রচলিত ধারণার চাপে প

ফলেই। তাছাড়া বর্ত্তমান অবস্থাতেও এটা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। অর্থাৎ এটা যদি দোষ হয় তাহ'লেও দোষটা আসলে কোনো নর বা নারীর নিজের নয়, এর জন্তে তার শৈশবের শিক্ষাই আসলে দায়ী।

নারীর তুলনায় বেশী পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক পুরুষও তো সমাজে কতই র'য়েচে! সে-সব পুরুষদের মনে শ্রেয়মন্যতার ছদ্মবেশে হীনমন্যতাই আধিপত্য ক'রচে! এ্যাড্‌লার এই ধরণের একটি লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, এ-ধরণের লোকরা আসলে বিবাহে অনধিকারী।

লোকটি একটি সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে এক নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগী বিবেচনায় তাদের মধ্যে বিবাহের কথা প্রায় পাকা হ'য়ে উঠেছিল। এমন সময় দেখা গেল, লোকটি মেয়েটিকে হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা মারলে যে, মেয়েটি আর একটু হ'লে ছিট্‌কে প'ড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাত পেতো। ব্যাপার দেখে তার এক বন্ধু যখন তাকে ও-রকম কাণ্ড করার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে তখন সে ব'লে উঠ্‌লো, "বা রে! নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার চশমাখানা যখন মেঝের ওপর প'ড়ে গেছ্‌লো তখন যে ও (মেয়েটি) না দেখে প্রায় সেখানা মাড়িয়ে ফেলেছিলো! ধাক্কা মেরে সরিয়ে না দিলে চশমাখানি যে যেতো গুঁড়িয়ে!"

এই থেকেই বোঝা যায় যে, ওই পুরুষটি আসলে বিবাহ করার যোগ্যতাই অর্জ্জন করেনি। সুখের বিষয় যে, মেয়েটিও এই ঘটনায় তা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছিলো বলেই তাকে আর বিবাহ করেনি।

পরবর্ত্তী জীবনে ঐ পুরুষটি ডাক্তারের কাছে এসে জানায় যে, সে মেলাঙ্কলিয়ায় (বিষাদ-রোগে) ভুগ্‌চে। অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক লোকদের জীবনে এ রোগ অবশ্যম্ভাবী।

এই রকম হাজারো রকমের লক্ষণ দেখে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, কোনো লোক আসলে বিবাহের উপযুক্ততা অর্জ্জন ক'রেচে কি না।

যে লোক প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে কথা দিয়ে বা সময় ঠিক ক'রে তা ঠিক রাখ্‌তে পারে না, বুঝ্‌তে হবে যে সে আসলে বিবাহের জন্তে তৈরী হয়নি। এ রকম লোকদের মন তখনো দ্বিধা সন্দেহ-দোলায় দুল্‌চে। এ দেখে বুঝতে হবে যে, জীবনের সঙ্গে উপযোগী ক'রে নিজেকে গ'ড়ে নেবার শিক্ষার অভাব আছে এদের জীবনে।

দম্পতির মধ্যে যখন একে অন্তকে ক্রমাগত শেখাতে, উপদেশ দিতে বা সমালোচনা করতে চেষ্টা করে তখন বুঝতে হবে যে সে-লোক (পুরুষ বা নারী যেই হোক) বিবাহের জন্তে তৈরী না হ'য়ে ভুল ক'রে বিবাহ ক'রে বসেচে। দাম্পত্য-জীবনে দম্পতির কোনো এক জনের মধ্যে অতিরিক্ত মানসিক স্পর্শ-কাতরতা (sensitiveness) একটা দুর্লক্ষণ। কারণ, এ থেকে বোঝা যায় যে মানুষটি হীনমন্যতার রোগী।

যে-লোকের বন্ধু বান্ধব নেই এবং যে সমাজে ভালো ক'রে মিশতে পারে না সে-ও বিবাহের জন্তে তৈরী হয়নি। কোনও পেশা অবলম্বন করতে যখন লোকে দেরী করে তখন বুঝ্‌তে হবে যে, তা অবস্থাটি বিশেষ সুবিধের নয়! 'হতাশ' ধরণের (pessimistic) লোককে অনুপযুক্ত বলেই বিবেচনা ক'রতে হবে, কারণ জীবনের অবশ্যম্ভাবী সমস্যাগুলির সম্মুখীন হবার মতন সাহসের তার অভাব আছে।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও জীবনে ঠিক সঙ্গীকে খুঁজে নেওয়া অসম্ভব ব'লে মোটেই শক্ত নয়। যদিও ঠিক-মত আদর্শ নর বা নারী কদাচিৎ চলে, এমন মানুষ সংসারে বিরল, তবুও মোটামুটি ভাবে যাকে নিয়ে 'ঘর করা' চলবে এমন সঙ্গী একটু বিচার ক'রে দেখলেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর সেই নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে সেই মানুষটিকে বাদ দেওয়াই ভালো—যে মানুষ নিজে ঠিক আদর্শ সঙ্গীটির দেখা পাচ্ছে না বলেই কিছুতেই মনস্থির ক'রতে পারছে না। কারণ, তার মন আসলে আজও স্থিরই হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনো দিন হবে কি না তাতেও ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

[ক্রমশঃ।

প্রশান্তি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সৌন্দর্য্য দেখেছি আমি পৃথিবীতে এখানে-সেখানে।
খোলা প্রসারিত মাঠে, সূর্য্যালোকে উদয়াস্তকালে।
তটিনী নিয়েছে বাঁক যেইখানে সমুদ্রের টানে।
ভ্রমর-চুম্বিত ফুলে, ঊর্দ্ধ-বাহু অশ্বত্থের ডালে।

রাত্রির রূপালী চাঁদ, হেমন্তের প্রথম শিশির।
দুরন্ত ঝড়ের রাতে বাতাসের গুরু-গুরু ধ্বনি।
বসন্ত-বাতাসে যতো খসে'পড়া পাতাদের ভিড়।
সৌন্দর্য্য রেখেছে ঢেকে প্রকৃতির বিরাট ধমনী।

কিন্তু আমি যেইমাত্র অন্য দিকে দু'চোখ ফেরাই।
সমস্ত নয়ন ভ'রে অদ্ভুত প্রশান্তি ব্যাপ্ত হয়।
তোমার সুন্দর মুখে অপূর্ব্ব বিস্ময় টের পাই।
প্রকৃতির কোনো রূপ তোমার রূপের মতো নয়।
যুগে-যুগে এই মুখ দেখে-দেখে অনেক হৃদয়
হ'য়েছে যে অভিভূত, অপগত যতো শঙ্কা ভয়॥
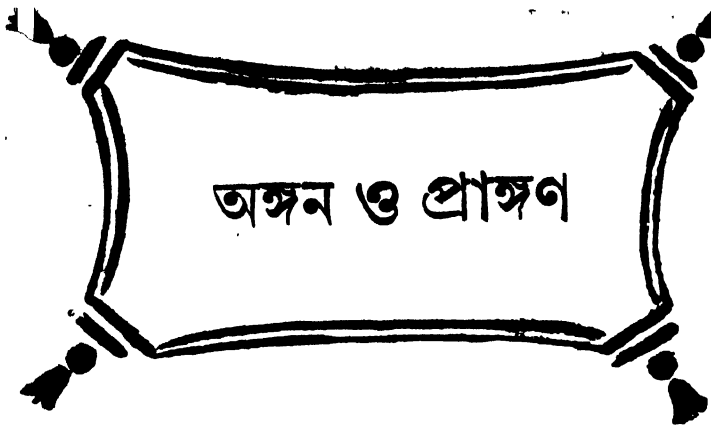
ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা

ভগিনী নিবেদিতা

অনুবাদিকা—শ্রীমতী বেলারাণী দে

আধুনিক যুগের মন বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও ভূগোলবিদ্যা এই তিনটি পরিধির মধ্যে বিচরণ করে এবং ইহাদের সাহায্যে সকল প্রকার চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা জাতীয়তা-বোধকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতেছে; এই জাতীয়তা-বোধকে আমাদের বিভিন্ন প্রথা, জাতি, ভাষা ও অন্যান্য উপাদানে গঠিত স্বজাতির ইতিহাস অধ্যয়নের ফল বলিয়া মনে করিতে হইবে, সেই অভাবে আমাদের নগরগুলির অবস্থিতি ও যুগে যুগে তাহাদের পরিবর্ত্তনের কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের পৌর-চেতনা জাগরিত করা আবশ্যক।

আবার কোন একটি জাতিকে কেবলমাত্র তাহার অতীতের এবং নিজস্ব পরিস্থিতির সহিত বিচার করি -ে চলিবে না, অন্যান্য জাতির সহিতও তাহাকে তুলনা করিতে হইবে। এই স্থানে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের আবশ্যকতা আসিয়া পড়িতেছে। তাহার পর ইতিহাসকে ভৌগোলিক আলোকে ও ভূগোলকে ঐতিহাসিক আলোকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আদর্শ আধুনিক নারীর গৌরব ও মর্য্যাদার বৃহত্তর অংশ তাঁহার এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিবে। তাঁহার গৃহ যেন তারকার আলোকে উজ্জ্বল বিশ্বের পটভূমিকায় এক রাত্রির জন্য প্রোথিত তাঁবুস্বরূপ। প্র তটি গতিশীল মুহূর্ত্ত যেন অনন্ত কাল-স্রোতের একটি বিন্দুমাত্র। তাঁহার আয়ত্তের মধ্য দিয়াই সেটি যেন বাধাহীন ভাবে চলিয়া যাইতেছে এবং তিনি ইচ্ছামত সেটিকে শান্তি অথবা দুঃখবিধানের জন্য ব্যবহার করিতে পারেন। এই জাতীয় মনোবৃত্তির অন্তরালে রহিয়াছে কঠিন মানসিক অনুশীলন। ব্যক্তিগত সময়ের সহিত স্থান-কালের যে আনুগতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান ভাবের পক্ষে যথোপযুক্ত নহে। উপরন্তু, আধুনিক মন তথ্য এবং তাহার সহিত সত্য ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ জানিতে চায়। অন্যান্য যুগে প্রচলিত সত্যের ধারণা হইতে এই বিশেষ সত্যের রূপটি সম্ভবতঃ অধিক অভ্রান্ত নহে। কিন্তু ইহাই যুগের বৈশিষ্ট্য এবং বর্ত্তমান বিশ্বসংগ্রামে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদের এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। তথাপি এই বহু-বাঞ্ছিত নির্দ্ধারিত সত্য অসীম ও সুবিস্তৃত ভাবধারার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—সেই ভাবধারার মধ্যে বিবর্ত্তন ও বিজ্ঞানের বিভা- করণ ইতিহাসের ও ভূগোলের কার্য্য ক- থাকে।

প্রকৃতি, পৃথিবী এবং কাল এই তি- প্রতেকের সাহায্যে আধুনিক মন নিজের স্ব- জানিতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে ইহা- সম্পূর্ণ ব্যবহার করিবার পন্থা মানুষ এ- আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত ইহাদেরই স্বরূপ নির্ণয় করিবার সংগ্রামভূ- প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে এই প্রচেষ্টাকে মন্ত- রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস নিহিত রহিয়া- যাঁহারা ভারতীয় নারীর নিকট বর্ত্তমান ভাব- বহন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের যে ভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া নিজেদের জীবন-যুদ্ধে উদ্দেশ্য সা- শ্রেষ্ঠতর উপায় শিক্ষা করা উচিত। ভাবটি একবার করিতে পারিলে পরিশেষে ভারতীয় নারীরাই এক জন অপ- শিক্ষা দিতে পারিবে। মধ্যবর্ত্তী সময়টিতে সকল গ্রহণ- উপায়ই অবলম্বন করা উচিত। ভ্রাম্যমাণ ভাগবত-ব্যাখ্যা ও কথকতা বা ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে বিভিন্ন তীর্থস্থানের দৃ- দেখাইয়া ভূগোল-বিদ্যাকে জনপ্রিয় করিতে পারা যায়। উপায়েই রামায়ণ ও মহাভারতের বহির্ভূত ইতিহাস সম্বন্ধে লো- পরিচয় ঘটান যাইতে পারে। এই ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদের সমবেত জনতা এবং পর্দ্দার অন্তরালে মহিলাদের সম্মুখে শরীর ও স্বাস্থ্যবিধান এবং চারি পাশের জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া যাইতে পারে। কেবল মাত্র ছায়াচিত্রই ভাব, ও মাতৃভাষাকে একত্রে সর্ব্বপ্রথম বাস্তবে রূপায়িত করিবার বিশেষ। স্বদেশপ্রেম প্রচার করিবার পূর্ব্বে যে দেশকে ভালবা- হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হওয়া প্রয়োজন। যে - তাহারা কল্পনা করিতে পারে না, সে সম্বন্ধে নারীসমাজ কি উৎসাহিত হইতে পারিবে?

কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ছোট বড় বিদ্- গৃহের মধ্যে ও বাহিরের শিক্ষাকেন্দ্র, প্রাথমিক ও উচ্চ শি- সবগুলিই একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এইগুলি ভারতীয় - ধারার অনুযায়ী হওয়া উচিত; তাহার বিপরীত হওয়া ক- উচিত নহে। মনকে বিদ্যালয় ও গৃহ দুইটি বিরুদ্ধ জগতের সংস্থাপিত করিলে তাহা বিনষ্ট হইতে বাধ্য। গৃহ-শিক্ষার আ- নীতিগত ভাবে সমর্থন করাই বিদ্যালয়ের চরম উদ্দেশ্য এবং বিদ্যালয়ে অধীত বিষয়কে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করা উচিত। এই স- কোনরূপ ব্যতিক্রম নারী-সমাজের গভীর অজ্ঞতারই পরি- হইবে।

বালকদের মত বালিকাদের জীবনের পক্ষেও বিদ্যালয়ের শি- অপরিহার্য্য করিয়া তুলিবার মধ্যে আমরা এমন কিছু - করিতে যাইতেছি যাহা কখনও অস্বীকৃত হইবে না। প্র- যুগকেই তাহার উত্তরকালের বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির - সমস্যার দায়িত্বকে বহন করিতে হইবে। ইহা মানব-স- একটি চিরন্তন ও স্বাভাবিক কার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষা-স- অধিকাংশই সময়ের অসুবিধার উপর নির্ভর করিতেছে। আ- দেশকে প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই লইয়া যাইতে হইবে। এ-

আধুনিক যুগ-চেতনার মূল বিষয়টি আমাদের ভারতীয় মাতৃভাষাগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে সকল সমস্যার অবসান ঘটিবে। কারণ, বিদ্যালয় বা শিক্ষকদের অপেক্ষা আমরা মাতৃভাষা হইতে অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। সেই গৌরবময় দিনকে আনিবার জন্য মহামাতৃকা স্বয়ং বিরাট্ আধ্যাত্মিক বীরদিগের শপথ ও সেবাকে আহ্বান করিতেছেন। নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা সুচারুরূপে ও সুগভীর ভাবে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য শত শত যুবকের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন। সম্ভবতঃ অধিকাংশ ছাত্রই ছুটির সময় বৎসরে বারটি করিয়া পাঠ তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে ও গ্রামে শিখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারেন। এই জাতীয় প্রচেষ্টা মোটেই আয়াসলব্ধ নহে, অথচ ইহার দ্বারা কত পরিমাণ কাজ করা যাইতে পারে!

মাতৃভাষার সাহিত্যকে গঠন করিবার কার্য্যে অনেকে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন; যে সকল অজ্ঞাত স্থানে শিক্ষকের পদচিহ্ন কখনও পড়িতে পারে না, সেখানে পুস্তকাদি ও সাময়িক পত্রিকাগুলি যাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে পারেন। পাঠাগার বা গ্রন্থসমূহকে মূক বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। বুদ্ধ বা অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বা আকবর সম্বন্ধে জানিতে হইলে যদি বিদেশী ভাষাই প্রথমে আয়ত্ত করিয়া লইতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় মহিলারা ভারতের ইতিহাস কেমন করিয়া বুঝিবেন? আপনাদের উচ্চ আশা গোপনে রাখিয়া যাঁহারা নারী ও জনগণের নিকট আধুনিক জ্ঞানের বার্ত্তা বহন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবেন।

নারী সমাজের পক্ষ হইতে প্রথম যুগে পুরুষদেরই এই কার্য্যে অগ্রগামী হইতে হইবে বলিয়া অনেকে হয়ত তাঁহাদের এই মহানুভবতা এবং নিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উপহাস করিবেন। যাঁহারা ভারতীয়দের গভীর ভাবে জানেন, তাঁহারা এই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন অনুমোদন করিতে পারেন না। ভারতের সামাজিক জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ়। এখানকার সভ্যতা ক্রমোন্নতি-পূর্ণ, সংহিত, আধ্যাত্মিক ও পরার্থপর। জনৈক ভারতীয়, রামমোহন রায়ের অন্তঃপ্রেরণাহেতু সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়াছিল। আবার এক বিবাহকে আদর্শ বিবাহ বলিয়া প্রচলন করিবার কালে বাংলার বিদ্যাসাগরের নিকট হইতেই প্রথম উৎসাহ আসিয়াছিল। প্রাচ্যে অন্তরের কোন স্বার্থপ্রসূত আন্দোলন দ্বারা মহৎ সংস্কার ও সুখ-সুবিধার প্রসার সাধিত হয় না। বিপক্ষ দল স্বতঃপ্রবৃত্ত ও মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া অধিকার দান করিয়া থাকে। অথবা যদি কোন নারী কোন তীব্র প্রয়োজনের তাড়না অনুভব করিয়া কোন অন্যায়ের সংশোধন দাবী করেন তিনি কি নর ও নারী উভয়ের মাতৃস্থানীয়া হন না? তিনি কি পুত্রকে যে ব্রতে নিয়োজিত করিতে চান সেই বিষয়ে শৈশবেই তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন না? এই ভাবে তিনি কি তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত যে অস্ত্রচালনা করিতে সক্ষম তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অস্ত্র শাণিত করিতে পারেন না? বিদ্যাসাগর-জননী এই শ্রেণীর নারী ছিলেন এবং এই জাতীয় উৎসাহই তাঁহাকে নারী সমাজের পৃষ্ঠপোষক করিয়াছিল।

যে সমস্যা লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছি তাহার ভার বর্ত্তমান শতাব্দী যে সকল নবীন বিদ্যার পূজারিগণের হস্তে অর্পণ করিতে চান তাঁহাদের প্রতি একটি সতর্ক ও নির্দ্দেশ-বাণী আছে। সমালোচনা ও নিরুৎসাহ দ্বারা কখনও শিক্ষা-বিস্তার সম্ভব হয় না। যিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে মহান্ বস্তুর সন্ধান পান একমাত্র তিনিই যোগ্য শিক্ষক হইতে পারেন। কেবলমাত্র ভারতীয় জীবনের মহত্ত্বে দ্বারাই আমরা ভারত-বহির্ভূত জগতের মহত্ত্বের আভাস দিতে পারি স্বদেশবাসীকে ভালবাসিয়াই আমরা মানবপ্রেম শিখিতে পারি ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর আস্থাই আমাদের সেই ভাবী যুগের অভ্যুদয়ের যোগ্য করিয়া তুলিবে। যে নারী স্বীয় জীবনে সমগ্র ভারতের অতীত গৌরব হৃদয়ঙ্গম করেন তাঁহারই কল্পনা আশাপথে নবীন বিদ্যার প্রচারককে উৎসর্গ করা হউক। সেই প্রচারক আশা করুন ও একান্ত ভাবে প্রার্থনা করুন, যেন আমাদের এই যুগেই সমস্ত গ্রামে গ্রামে গান্ধারীর মত মহীয়সী, সাবিত্রীর মত পতিপরায়ণা, সাহসিনী, সীতার মত শুদ্ধমতি ও কোমলপ্রাণা রমণী আমরা দেখিতে পাই। ভবিষ্যতের পদতলে অতীত যেন পদ্মস্বরূপ হইয়া বিরাজ করে। অতীতের সাফল্য অনাগত সাফল্যের ধাপস্বরূপ হউক। প্রত্যেক ভারতীয় নারীই যেন আমাদের নিকট সেই মহামাতৃকার সত্তা লইয়া এবং মূর্ত্তিমতী জন্মভূমির বৃষ্টি ও স্বদেশ-রক্ষয়িত্রী রূপে আবির্ভূতা হন। ভূম্যা দেবী। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! বন্দে মাতরম্।

—উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৫২

শেষ চাওয়া

শ্রীসুলতা সেনগুপ্তা

ওগো আমায় তুমি আর চাবে না যখন
যেন সে কথা গোপন রেখো তরুকন্তায়
তব স্বপ্নে বিভোল এই তন্দ্রালু মন
থাক এমনি মধুর চির চঞ্চলতায়।

তুমি ভুলালে যারে আজ শতেক গানে,
শুভ শুভ্র হৃদয় দিলে অর্ঘ যারে,
কভু এই ভুবনের যেন কেহ না জানে
সেই গ্লানির কথা যবে ভুলিবে তারে।

লিখো এমনি কোরেই প্রেম-পত্রখানি,
নীচে তীব্র জহর মেখো নামের গায়ে,
তাও এমনি আবেশ ভরে পোড়ব জানি
শেষে সে নাম চুমি শোব মহুয়া-ছায়ে।

সাঁঝে উঠবে শশী দূর নীল গগনে
চেয়ে দেখবে নয়ন মম মৃত্যু-মলিন
রাতে ফুটবে কুসুম ঐ কেয়ার বনে
তার সুবাস লয়ে আমি হ'ব চিরলীন।

তবু ভেঙ না স্বপন মম ভেঙ না প্রিয়
যদি তোমার স্বপন ভাঙে কোরো ছলনা
আমি ডুবেছি ডোবাই মম বাঞ্ছনীয়
তুমি অসঙ্কোচে কোরে প্রবঞ্চনা।

নারী

চীন

চীনে স্বামী স্ত্রীকে কি চোখে দেখে? উত্তর অত্যন্ত সোজা। স্বামী স্ত্রীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, কারণ সামাজিক মাপকাঠিতে স্ত্রী স্বামীর চেয়ে অনেক নীচে, কিন্তু এতে স্ত্রীর দোষ কি? শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে, ব্যবহারে স্ত্রী স্বামীর চেয়ে অনেক নীচে এ কথা সত্য, কিন্তু এর জন্য দায়ী সমাজ। স্ত্রী নয়। মেয়েদের চিরটা কাল এক ঘরে করে রাখা হয়। বাপ-ম পর্য্যন্ত মেয়েকে ভাল চোখে দেখে না। শিক্ষা-দীক্ষাও বিশেষ কিছু পায় না। সমাজে মেলা-মেশার সুযোগ তাকে দেওয়া হয় না। ফলে তার কেবল মাত্র শারীরিক গঠন হয়, কিন্তু মানসিক অথবা সামাজিক গঠন একেবারেই হয় না। তার পর স্বামীর ঘরে গিয়ে সে পায় শুধু লাঞ্ছনা আর নির্য্যাতন। তাই মানসিক বৃত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীকে আসবাবের সামগ্রী মনে করে। যেমন ভাবে রাখবে, ঠিক তেমন ভাবেই থাকবে। আর সন্তান বহন করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন। কারণ সন্তান না হলে বংশলোপ পাবে। বাপ-পিতামহ জল পাবে না। তাছাড়া দাসীগিরি, বিনা পয়সায়। শুধু পেট-ভাতায়। বাড়ীর মধ্যে নিকৃষ্ট ভোজন, নিকৃষ্ট জামা-কাপড় তার প্রাপ্য। সুতরাং স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসার পাত্র—ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র মনে করে না। তার মতে স্বামী মালিক—প্রভু। তাকে ভয় করতে হবে, কুর্ণিশ করতে হবে। মনিব এবং চাকরের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা ভাঙ্গা চলবে না। ভাঙবার সাহসও অবশ্য তার নেই। ভালবাসবার মনোবৃত্তিও তার মরে গেছে।

স্ত্রীও যে মানুষ, স্বামীর মনে এ ভাব কোন দি জাগে না। স্ত্রীকে সে কোনো দিনই ভালবাসতে শেখে স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক সেখানে চিন্তারও অগোচর। স্বামী করে অবজ্ঞা। বহু ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর দেখা পর্য্যন্ত না, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীর কাছে এল। না হ'ল, এল না। স্ত্রীর কোন দা নেই।

পথে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে একত্র বার হয় না। স্ব খাবার আগে খায় না। বাড়ীর সব পুরুষদের খাওয়া গেলে তবে মেয়েরা খায়। অসুখে-বিসুখে তাদের চিকিৎসা বিশেষ কিছুই হয় না। কারণ নারীর পুরুষের অবহেলা, অবজ্ঞা, আর কিছুটা চীনাদের দারি যতটুকু চিকিৎসা হয়, তা কোন কাজেরই নয়। মন্ত্র ফুক, ভূত-প্রেত তাড়ান এই তাদের চিকিৎসা প্রণা

কনফুসিয়াস, তার উপদেশ-বাণীর মধ্যে বলেছেন, চেয়ে বড় কথা দেওয়া-নেওয়া, 'রেসিপ্রসিটি'। কিন্তু বিব জীবনে এই লেন দেনের ব্যাপার তিনি এড়িয়ে গে সর্ব্বতোভাবে। বহু যুবতী বধু চীনে আত্মহত্যা ক নিষ্ঠুর নির্দ্দয় স্বামী, যত ইচ্ছা স্ত্রীকে যন্ত্রণা লাঞ্ছনা দি কেন, তার কোন ক্ষতি হয় না। এমন কি আদা পর্য্যন্ত কোন বিচার নেই, সাজা পাবে না। কেবল কথা বললেই স্বামীর দোষ ক্ষালনের পক্ষে যথেষ্ট হবে স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা শোনে না। আইন তৈরী করার কনফুসিয়াস যদি বিবাহিত জীবনে রেসিপ্রসিটির নিয়ম মান তাহলে চীনা নারীর অবস্থা এত শোচনীয় হ'ত না।

ডিভোর্স, বিবাহ-বিচ্ছেদ চীনে প্রচলিত। যদি কোন অবাধ্য হয়, বেশী বকা-বকা করে, চুরি করে অথবা কারও অসদুদ্দেশ্যে মেলা-মেশা করে তবে তাকে তালাক দেওয়া কারণ এই অপরাধগুলির স্থান হত্যার ঠিক পরেই। যদি কোন স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, অথবা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাকে তালাক দেওয়া হয়। তালাক দিলে মেয়েদের হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে আসতে হয়। বন্ধ্যা হওয়ার অ চীনে সবচেয়ে বেশী বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ।

বিধবা-বিবাহ মধ্যে মধ্যে হয়। তবে সতী হওয়ার ব্যা আছে। বহু বিধবাকে জোর করে গলায় দড়ী দিয়ে মারতে করা হয়। পরে সেই মৃতদেহ পোড়ান হয়। তবে বেশীর ক্ষেত্রেই বিধবা অবস্থাতেই নারীরা থেকে যায়। বিবাহ আত্মহত্যা এ দু'য়ের বাইরে।

ছেলেদের নারী সাধারণতঃ ভাল বাসে। চীনেও এর ব্যতি ঘটেনি। কিন্তু সন্তানস্নেহশীলা মা, কন্যার প্রতি যে ব্য করে তা সত্যাই নিষ্ঠুর। যদি প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে হয়, তখন মা সেই মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফে ভাবে এই বলিদানে দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে শীঘ্র পুত্র সন্তান দে এক ছেলের পর দু'-একটা মেয়ে হলে, তারা বেঁচে যায়। কিন্তু বেশী মেয়ে হয় তাহলে তাদের বাঁচবার সম্ভাবনা কম। বহু মা, মেয়ে হলে, নিজেম মেরে মেরে ফেলে। কিন্তু ছেলে অথবা

হওয়া একটা অ্যাকসিডেন্ট মাত্র। তবু ছেলের আগমনের আশায় আনন্দ আর মেয়ের দুর্ভাবনায় দুঃখ। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আনন্দ আর বিষাদের মাঝে মা খায় দোলা। দিন গোণে অতি ভয়ে ভয়ে। মেয়ে জন্মালে মার ভাগ্যে লাঞ্ছনা আর নির্য্যাতন। আর মেয়ের ভাগ্যে হয় মৃত্যু, না হয় জীবনব্যাপী অপমান। চীনে এত বেশী ছোট মেয়ে হত্যা করা হয় যে, সেই মৃতদেহ রাখবার জন্ম 'বেবী টাওয়ার' আছে। রাস্তায় যেখানে সেখানে ফেলে রাখলে জনসাধারণের অসুবিধা হয়, স্বাস্থ্যহানি হয়। কুকুর, শেয়াল, চীল, শকুনে রাস্তায় হাড়-মাংস ছড়াবে বলে বাড়ী। তবু অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকে পথে, মাঠে, ঘাটে।

মেয়েদের পোষাক অনেকটা ঢিলা সেমিজের মত। গলার কাছ থেকে আড় ভাবে এসে পাশ পর্য্যন্ত বোতাম। বেশী কাট-ছাঁট নেই। কাপড় মোটেই নষ্ট হয় না। পোষাকে বিশেষ ফ্যাশন নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। বেশী আঁট পোষাকে স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। শীতকালে তুলো-ভরা সেমিজ ব্যবহার করে। যেমন গরম, তেমনি নরম। দিব্য আরামের। অথচ এই সব পোষাকে খরচও কম। শ্লীলতা বজায় থাকে পূরো মাত্রায়। পোষাকে এ ছাড়া আর কি দরকার! পকেট অবশ্য কোন পোষাকেই নেই।

মেয়েরাও পুরুষদের মত পায়জামা পরে। স্কার্ট. এক সংহই ছাড়া অন্য কোথাও পরে না। এই পোষাকেই ওদের বেশ দেখায়, কারণ, প্রত্যেকেই রঙীন, কারুকার্য্য-করা সেমিজ পায়জামা ব্যবহার করে। চুল বাঁধে অনেকটা বম্মাজ মেয়েদের মত। অবশ্য অত বায়দা করা নিখুঁত নয়।

অনেকের ধারণা, প্রত্যেক চীনা মেয়ের পা বেঁধে ছোট করা হয়। এটা ভুল। অনেক যায়গায় অবশ্য এ রীতি আছে, কিন্তু বহু স্থানে, বিশেষ করে কৃষিপ্রধান যায়গায় এ রীতি একেবারেই নেই। ক্ষুদে ক্ষুদে পা নিয়ে ভাল ভাবে চলতেই পারবে না তো কাজ করবে কি করে? দরিদ্রের ঘরে এ-ফ্যাশান অচল। এই বেদনাদায়ক সৌন্দর্য্য বড়ঘরের মেয়েদের জন্য। যাদের বেশী কাজ করতে হয় না। ষ্টাইলের খাতিরে মেয়েরা অনেক কষ্টই সহ্য করে নীরবে, হাসি মুখে।

এই ফ্যাশান এল কি করে? অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা হয়েছে এই নিয়ে। কেউ বলেন, এক জন সম্রাজ্ঞীর কুশ পা ছিল। হাঁটতে পারতেন না। তাই সব মেয়েদের পা বেঁধে ছোট করে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন। যাতে সব মেয়েরই হাঁটার অসুবিধা হয়। কেউ বলেন, মেয়েরা নির্য্যাতিত হয়ে পাছে স্বামীর গৃহ ছেড়ে পালিয়ে যায় তাই এই ব্যবস্থা। ছোট (বিকলাঙ্গ?) পায় ছুটে পালাতে পারবে না। কেউ বলেন, ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে চ্যান-বংশের সম্রাট্ হাউ চাউ, নিজ উপপত্নীদের পা বেঁধে ছোট করার হুকুম দিয়েছিলেন; পা এত ছোট হবে যে সোনার পদ্মের মধ্যে যেন রাখা যায়। সত্যকারের সোনার পদ্ম বিছিয়ে দিয়েছিলেন তাদের ঘুরে-ফিরে বেড়াবার জন্ম। এই ব্যাখ্যাই বোধ হয় ঠিক। কারণ, নারীর 'ছোট পা'কে চীনা ভাষায় বলে 'কামলিন'। আর কামলিন মানে স্বর্ণ-পদ্ম। নারীর পদবিক্ষেপের নাম চীনা ভাষায় 'লিন-পো', যার অর্থ পদ্মপদ বিক্ষেপ। আধুনিক মান-চু সরকার এই অস্বাস্থ্যকর প্রথা বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। এক জন চীন সত্যই বলেছেন, 'ফ্যাশনের প্রতাপ সম্রাটের প্রতাপের চেয়েও অধিক।'

পুরুষ ও নারীর মধ্যে মেলামেশা চীনারা ভাল চোখে দেখে না। এদের মতে এটা শ্লীলতা-বিরুদ্ধ। নৈতিক অবনতি ঘটতে পারে। চীনা নারী সাধারণতঃ খুবই লাজুক এবং চরিত্রবতী। ওদের মতে মেয়েদের স্বাধীনতা দিলেই চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। তাই নারী শিক্ষা পায় না, সমাজে সমান ভাবে মিশতে পায় না।

এত বাধা-নিষেধের ফলে চীনা মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশী কুসংস্কার-ভাবাপন্ন। চীনের পুরাতন সামাজিক আচার নিয়ম-কানুন মেয়েরাই এখনও জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু ধর্ম্মে অথবা সামাজিক ব্যবস্থায় মেয়েদের জন্ম কিছুই সুবিধা নেই। বৌদ্ধ পুরোহিত কোন শুদ্ধমতি সতী নারীকে স্বর্গে যাবার অথবা মোক্ষ পাবার আশা দিতে পারেন না। খুব বেশী বলতে হলে, আশীর্ব্বাদ করেন, আগামী জন্মে এই সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের জন্ম পুরুষ হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য লাভ কর।

রবীন্দ্রনাথের গান

শ্রীকিরণশশী দে

এক

সন তারিখ ঠিক মনে নেই। বোধ করি শরৎকাল—আকাশে খেলছিল দুপুরের একটানা রোদ্দুর। মাত্র দিন কয়েক হল আমি কোলকাতায় এসেছি। সেদিন মধ্যাহ্নের আহারাদি সেরে ছবির একটা 'এ্যালবাম্' দেখে একলা ঘরে সময় কাটাচ্ছিলুম।

খট্ খট্ খট্!......

ঘরের ভেজানো দুয়ারটা ঠেলে ঢুকলে তুমি। পায়ে তোমার উঁচু হিলের জুতো—তারই আওয়াজ। একটা দামী জর্জেটের শাড়ী ইঙ্গ-বঙ্গ ফ্যাসানে তোমার সমস্তটা দেহে জড়ানো, তার আবার চওড়া রুপোলী বর্ডার—হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি বা কোন এক কাপড়ের দোকানের শো-কেস্‌'এ সাজানো এক আধুনিকার প্রতিমূর্তি। হাতে ছিল 'ভ্যানিটি ব্যাগ্'—আর খানকয়েক খাতা-পত্তর, বোধ হয় তুমি কলেজ থেকে ফিরছিলে।—অবশ্যি তোমার আগমনটা আমার নিকট একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, তবু জিজ্ঞেস করলাম: "আরে—উৎপলা যে! খবর কী? এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে হঠাৎ কী মনে করে?"

—"আমাকে গোটাকয়েক রবীন্দ্র-সংগীত শিখিয়ে দিতে হবে। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের গান বড়ো ভাল লাগে। কী সুন্দর তার কথা ও ভাব, সবখানেই এর কত চাহিদা—অথচ রবীন্দ্র-সংগীতের কোন সঞ্চয়ই আমার নেই।"

—সত্যি কথা বলতে কি—আমরা কলেজে-পড়া মেয়েদের মুখে এমনিধারা অভিযোগ কদাপি প্রত্যাশা করিনি, তাই স্বভাবতঃই কিছুটা দুঃখিত হলুম। ভাবলুম, একবার জিজ্ঞাসা করি—রবীন্দ্রনাথের গানের সঞ্চয় নেই—তবে কোন্ মহাকাব্যের সঞ্চয় আছে, জানতে পারি কি? কিন্তু সে প্রশ্ন না করে শুধু বললাম:—"আচ্ছা বসো ঐ চেয়ারটায়। তুমি তাহোলে আজকাল গান-টান্ গাইছো খুব। তা বেশ ভাল কথা...কারো কাছ থেকে শিখ্‌ছো বুঝি?"

—"হাঁ, বাড়ীতে এক জন মাষ্টার আসেন, তিনি ক্লাসিক্যাল গান শেখান..." এই বলে তুমি চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালে।

ভাবলে—হয়ত বা আমি কিছু বলবো। কিন্তু আমি চুপ করে আছি দেখে' তুমি আবার বললে:—"জানেন, আমার মাষ্টার মোশাই কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়াটা মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, ওতে না কি গলা নষ্ট হয়ে যায়—অথচ আমার এই ক্লাসিক্যাল্ গান শিখ্‌তে একটুও ভাল লাগে না। ভাবছি, ছেড়ে দেব।"

আমি হেসে বললাম: "এ তোমার ভুল ধারণা উৎপলা। ক্লাসিক্যাল্ গান যদি ভালো গুরুর কাছে শেখ, তখন দেখ্‌বে, এ তোমার ভাল না-লেগে পারেই না, এবং পরিশেষে এইটাই হবে তোমার বড়ো সম্পদ্—অবশ্যি ভবিষ্যতে যদি গান গাওয়াটাকে ছেড়ে না দাও।···আর রবীন্দ্র-সংগীত ওতো কোন ক্লাসিক্যাল্ সংগীতকে বাদ দিয়ে সৃষ্ট হয়নি। যদিচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের গানগুলোতে প্রয়োজন মত দেশ বিদেশের বিবিধ রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ করেছেন এবং ভারতীয় সংগীতে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি করে গেছেন—যা-মা কি কেবলমাত্র সম্ভবপর হোয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভারই বলে। তথাপি দেখ্‌তে পাবে, কবির প্রথম বয়সের অধিকাংশ গানগুলোতেই কিন্তু তিনি নিজে হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল্ সংগীতের রাগরাগিণী এবং গঠন-প্রণালী প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভাবে মেনে চলেছেন এবং সেগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে গাওয়া, বিশেষ করে যারা ক্লাসিক্যাল সংগীত কখনো চর্চ্চা করেননি, তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। সুতরাং ক্লাসিক্যাল সংগীতকে একদম বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত শিখে নেওয়াটা তোমরা যত সহজ মনে কর, আসলে কিন্তু তা নয়।"

আমার কথাগুলো শুনে দেখলুম—তুমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছ। আমার কথায় তুমি বিশেষ খুসী হলে কী না জানি না, তবে বেশ মনে হোলো, তুমি যেন আমার কথা যথাযথ বুঝতে পারনি। আমি বললাম: "যাক্ গে ও-সব বাজে কথা। যদি কোন দিন সময় আসে রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে আলোচনা করবার, তখন এ-সব কথার অর্থ নিজেই বুঝতে পারবে। আজ থাক্—আজ তোমার গান শুনবো। দেখি কী কী গান শিখ্‌লে মাষ্টারের কাছ থেকে।"

—"ত-হোলে আমার গান শেখাটা কী আজকে হবে না?"

—"নিশ্চয় হবে,—হবে না কেন? আমি তো আর এক্ষুনি কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না—আর তুমিও তো গান শিখ্‌তেই এখানে এসেছ, সুতরাং একটু ধৈর্য্য ধর।"

—"আমি তো বাংলা গান জানি না—হিন্দী গানই গাইব কিন্তু।"

—"তা' বেশ তো, হিন্দি গানই করো। নিজে হিন্দী গান গাইতে পারি না বলে' কী সে গান আমার শোনবারও কোন অধিকার নেই?"—আমার এ কথাটা শুনে যেন কিছুটা লজ্জিত হ'য়ে আর কোন প্রতিবাদ না করেই হারমোনিয়মটা নিয়ে তুমি গান গাইতে সুরু কোরলে।

তুমি যে কী গাইছিলে—তা' আজও নিশ্চয় তোমার মনে আছে। সেই দিন তোমার গান গাওয়া শেষ হোলো। তুমি আমায় শুধালে: —"কেমন লাগলো আপনার?"

আমি নির্ব্বাক্ হয়ে রইলুম—জবাব দেবার আমার কীই বা [illegible]। [illegible]

চালালে একটা রাগিণীর আলাপ তার পর চল্‌লো তার বিস্ত[illegible] ধরা পড়তে সুরু হোলো—ঐ রাগিণীর আরোহ এবং অবরো[illegible] প্রায় স্বরগুলির মধ্যেই একটা অসহ্য রকমের অস্পষ্টতা।···[illegible] গান তোমার ঐখানে থামলেই আমি বাঁচতাম।···কিন্তু [illegible] নয়, তখন আবার ঐ রাগিণীর উপর দেখা দিল কথার সংযোজ[illegible] সে-ও বাংলা নয়, একেবারে হিন্দী! মধ্যে মধ্যে বেখাপ্পা [illegible] তানের চরকিবাজিও চলছিল। হিন্দী কথার প্রত্যেকটা আওয়াজ কী বিকৃত ভাবেই না উচ্চারণ করছিলে—সে আর কী বলবো! [illegible] তুমি লাখ্‌নৌ গিয়ে গান শিখ্‌ছো এবং তোমার এ-সব উচ্চার[illegible] কথা ভেবে তোমার নিজেরই খুব হাসি পাচ্ছে—নয় কি[illegible] বাঙ্গালীদের মুখে, হিন্দী না শিখেই, হিন্দী ভাষার উচ্চারণটা যে[illegible] উৎকট শুনায়, সে আজকাল আমার চাইতে হয়তো তুমিই [illegible] বুঝবে। অবশ্যি ছোটরা সহজেই উচ্চারণটা শুধরে নিতে পার[illegible] কিন্তু বয়স্কদের পক্ষে সে কতই না কঠিন। তবে কঠিন [illegible] অসাধ্য আমি বলছি না। আমি বলছি, এই হিন্দী ভাষার [illegible] মাত্র বর্ণপরিচয়ের অ, আ, ক, খগুলির উচ্চারণকে বিশুদ্ধ [illegible] আয়ত্ত করা এক জন বয়স্ক বাঙালীর পক্ষে যে কত দূর শ্রমস[illegible] ব্যাপার, সে যারা কোন দিন হিন্দী ভাষার শিক্ষার্থী হয়ে[illegible] তারাই জানেন।

যাক্ গে, সেদিন তুমি হয়তো মনে আঘাত পেতে, সেই [illegible] আমি আর গান সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করলুম না। শুধু বললুম: "মাষ্টারকে বলে দিয়ো, আস্‌ছে দিন থেকে তিনি যেন তো[illegible] বাংলা গান শেখান।···আর তাছাড়া আমি তো এখানে মাসখা[illegible] থাকব, তোমার যখন খুসী এসে গান শিখে যেয়ো—কেমন?···আজ বাদ দাও।"

দুই-তিন দিন পর তুমি আবার এসে হাজির।···এসেই বল্‌[illegible] "আজ কিন্তু আপনাকে একটা বাংলা গান শোনাব।"

—"গানটা কার লেখা?"

—"সে তো জানি নে। তবে এ গানটা না কি আধুনিক বা[illegible] সংগীত। আমার মাষ্টার রেকর্ড থেকে শুনে শিখেছেন। বাস্তবি[illegible] কথাগুলি তার কী চমৎকার:

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
জাগার বেলা হোলো—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।"

তোমার এ আবৃত্তি শুনে আমি মনে মনে শুধু হাস্‌লেম, এ[illegible] দুঃখও হোলো।···তোমরা কলেজে পড়—শিক্ষিত বলে' নিজেদে[illegible] পরিচয় দেবার জন্যে তোমরা কতই না উদ্‌গ্রীব। প্রায় প্রত্যেকে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' 'চয়নিকা' প্রভৃতি অনেক কবিতার পুস্তক হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াও, অথচ যে কবিতা তোমার মনকে পা[illegible] মুগ্ধ করতে, তার রচয়িতার নামটা জানবারও কোন উৎসা[illegible] তোমাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না।···তার দৃষ্টান্ত এই-ই[illegible] যেমন, 'ইহা একটি আধুনিক বাংলা সংগীত'—তোমার মাষ্টারের এ[illegible] জবাবেই তুমি সন্তুষ্ট।···সমুখে বললাম: "বেশ ত, আধুনি[illegible] সংগীতই শোনা যাক্ আজকে।"

গান গাইতে আরম্ভ করলে তুমি হারমোনিয়ামের সংগে।·· [illegible] হরি।···কী আর স্বরের বাহার!—দু'একটা লাইন গাইবার স[illegible]

সংগেই আমি কেবল কামনা করছিলাম—'হে বসুন্ধরা দ্বিধা হও।' কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন কই। মনে হলো তোমার এই আধুনিক বাংলা গানের চাইতে সেদিনকার হিন্দী গানই যে ছিল ঢের ভালো। কিছুতেই আর সইতে পারছিলুম না আমি। সুরের মধ্যে কী যেন বিশ্রী রকমের থিয়েটারী ঢং-এ একটা ন্যাকামোর ইঙ্গিত, আর অস্বাভাবিক ভাবে মৃদুকণ্ঠে তার প্রকাশ।···অবশ্যি মনে কিছুই করতুম না যদি এটা অন্য কারো গান হোতো। কিন্তু আসলে গানটা ছিল রবীন্দ্রনাথেরই।···তাঁর লেখা সবগুলি গানের সুর কবির নিজেরই দেওয়া। এই সব গানের উপর কারসাজি করবার অধিকার কারোরই নেই—গায়ক, তিনি যত বড়ই ওস্তাদ হউন না কেন! সুতরাং সে সুরকে যদি কখনও কেউ গাইতে গিয়ে multilate করে বসে সেটা শ্রোতাদের যাদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, তাদের পক্ষে যে কতো 'নি অসহনীয়, আশা করি তুমি আজকে ভাল করেই বুঝতে পারছ।···সে দিন তুমি এ-সব কিছুই তো জানতে না···জানলে নিশ্চয় হুঁসিয়ার হোতে; তাই বাধ্য হলাম, তোমাকে গান গাওয়ার মধ্যেই বারণ করতে—"উৎপলা, এ গানটা আর গেয়ো না"—এবং গম্ভীর হয়েই বললাম: "যাও উপরে গিয়ে ওদের কাছ থেকে এই গানের গ্রামোফন রেকর্ডখানা চেয়ে নিয়ে এসো—গানটা গেয়েছেন কনক দাশ H. M. V-তে—ওদের আমার কথা বলো।"
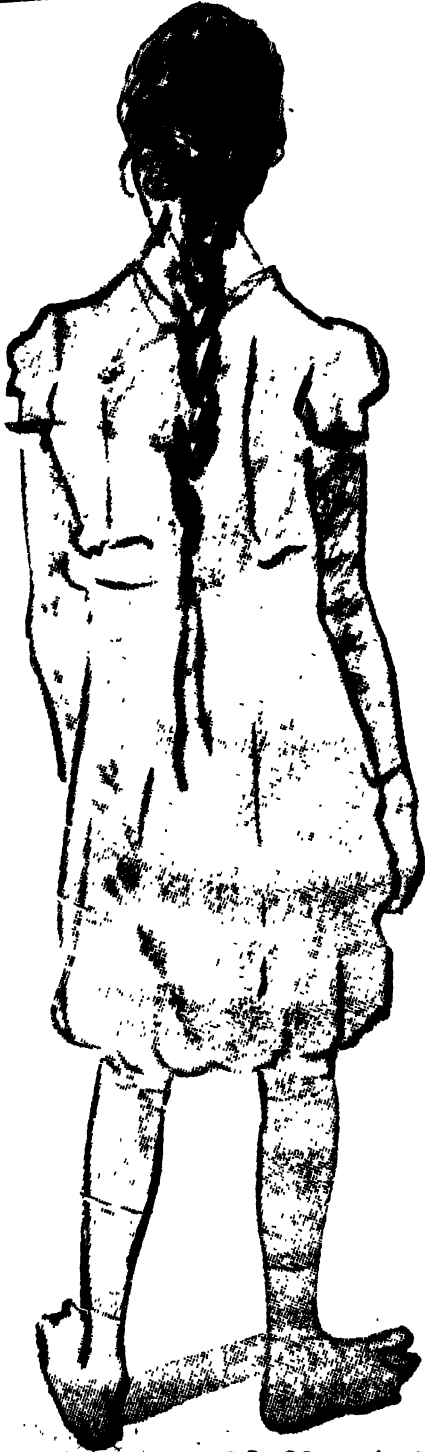
শিল্পী—[illegible]

তুমি তো খুব খুসী হয়ে রেকর্ড আনতে ছুটে গেলে। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিলুম—এই তো আমাদের দেশের গানের মাষ্টারদের বিদ্যে। তারা অনভ্যস্ত কান (untrained ear) নিয়ে গান শেখে আবার ঐ গানই অন্যদের শেখায়। তারা জানেও না, গান তাদের ভুল হচ্ছে কী শুদ্ধ হচ্ছে। কারণ, সেটা জানতে হোলে কোন একটা মিউজিক স্কুলে regular course নিতে হয় এবং সেটা দস্তরমত সময়-সাপেক্ষ।···আমাদের দেশের লোকদের ধারণা—যার একটুখানি সুর-বোধ আছে সে-ই এক জন ওস্তাদ গাইয়ে। এই প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই বাংলাদেশের অলিতে গলিতে ভুঁইফোঁড় গানের ওস্তাদের সংখ্যা যে দিনকে-দিন কত বেশি বেড়ে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই।···শুধু গান গেয়েই তাঁরা খুসী নন্—তাঁরা কবিতা নিয়ে তাতে সুর সংযোজনা করেন। কী আশ্চর্য্য···সুরজ্ঞ হওয়ার আগেই 'সুরকার' সাজবার সখ তাঁদের এতোই উৎকট।··· হাসি পায়—এ যেন ভিক্ষুকের ঐশ্বর্য্য বিতরণ।···গান গাইতে হ'লে সর্বপ্রথমেই যে কান-তৈরী এবং কণ্ঠ-সাধনার কত বেশী আবশ্যকতা আছে সেটা আমরা বাঙ্গালীরা যেন ভাবতেই পারি না। এই কারণে আমাদের মধ্যে তালছাড়া, ছন্দছাড়া, ছিঁচকাদুনে গাইয়ে এবং বাজিয়েদের কোন কালেই বড়ো একটা অভাব হয় না এবং সংগীত-বিদ্যা না শিখেই সংগীত-শিক্ষক হবার পথও আমাদের দেশে প্রশস্ত।···প্রায়ই দেখা যায়, গান গাওয়ার মধ্যে একটা অবোধ্য অপ্রীতিকর কিছু দেখিয়ে সেটাকে ক্লাসিক্যাল সংগীত বলে চালিয়ে দিতে আমাদের বাঙ্গালী গায়কেরা মোটেই ইতস্ততঃ করেন না। তার কারণ আর কিছুই নয়—এটা জানা কথা যে, সকলে তো আর ক্লাসিক্যাল সংগীত জানে না এবং বোঝেও না; সুতরাং তাদের সামনে নিজেদের খেয়াল মত মনগড়া সুরে গান গাইলেই বা কী আর তার উপর যদি সঙ্গীতিক পর্দাকে নিয়ে অর্থহীন ভাবে হেলানো দোলানোর কায়দাটা একটু জানা থাকে—তা হোলে তো সভা মাৎ···এবং গানও যখন হচ্ছে হিন্দী ভাষায় তখন একেই উচ্চাঙ্গের ক্লাসিক্যাল সংগীতের নাম দিয়ে শ্রোতাদের কাছে চালিয়ে দিতে

...দের আর কতক্ষণ।...তার পর থেকেই লোকেরা বলে বেড়াবে—"আহা! উনি কত বড়ো উঁচুদরের গাইয়ে"—আর ভাল না লাগলেও বলতে হবে—"আমরা সাধারণ লোক, সংগীতের কী-ই বা বুঝবো! উনি ওস্তাদ লোক কি না—তাই গান হিন্দীতেই গেয়ে থাকেন। বাংলা গান—সে সব বড়ো একটা গান-টান্ না।"...আসল কথা—বাঙালীদের সামনে বাংলা গান গাইলে নিজেদের দুর্বলতা ধরা পড়বার সম্ভাবনা, তাই ওস্তাদ মোশাই বাংলাগান গান না এই কথা ঘোষণা করে দিয়ে নিরাপদ পন্থাই অবলম্বন করেন বটে কিন্তু বড়ো করুণা হয় যখন ভাবি এদের কী এ-টুকুও বুঝবার ক্ষমতা নেই যে, যাঁরা যথার্থ ই ক্লাসিক্যাল সংগীত চর্চা করেন, তাঁদের কান এবং গলা (ear and voice) এতো চমৎকার ভাবে তৈরী থাকে যে, তাঁদের সামনে যে-কোন ভাষার যে-কোন গানই গাওয়া হোক্ না কেন—সেসব গানের সুরটা একেবারে ঠিক ঠিক ফটোগ্রাফের মতোই তাঁদের কানে দাগ রেখে যায় এবং ফলতঃ কোন প্রকারের বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই তাঁরা সেই সুরকে নিখুঁত ভাবে কণ্ঠেও প্রকাশ করতে পারেন।...তবে মাঝে মাঝে দেখা যায়, অনেক বড়ো বড়ো ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতজ্ঞ আছেন যাঁরা বেজায় রক্ষণশীল—নিজেদের সংগীত শাস্ত্রের বাইরে সহজে পা ফেলতে চান্ না তাঁরা। কিন্তু, যদি তাঁদের কখনো এ সংকীর্ণতার গণ্ডী থেকে টেনে আনা যায় তা হোলে দেখেছি, তাঁরা নির্ভুলভাবে যে কোন গানের সুরকেই ধরতে পারেন এবং অতি সহজে চমৎকার ভাবে reproduce করতেও জানেন। সুরের বিশুদ্ধতার দরুণ তাঁদের গান শ্রুতিমধুরও হয় ঢের। তবে একটা কথা, গানটা যদি বিজাতীয় ভাষায় হয়, তা হোলে অনভ্যস্ততার দরুণ কথাগুলির উচ্চারণে তাঁদের অসুবিধা হোতে পারে; কিন্তু সুরকে তাঁরা বিকৃত করেন না কখনও—করতে পারেন না, কারণ এখানেই হোলো ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতজ্ঞদের নিপুণতার পরিচয় ক্ষেত্র! আর যদি চেষ্টা করেও কোন ক্লাসিক্যাল গাইয়ে উক্ত কাজে বিফল হন, তাহোলে বুঝতে হবে, তাঁর সংগীত শিক্ষার ভিতরে নিশ্চয় কোন গলদ রয়ে গেছে।

ভালবাসা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

লুচি পাতে রয়ে গেল, দুধটুকু খেয়ে নাও।
স্পঞ্জ দুটো ফেলো না কো, লক্ষীটি মাথা খাও।
চিংড়ির কালিয়াটা আরেকটু এনে দি।
আধ-পেটা খেয়ে উঠে দিন দিন গেল শ্রী।
কোনো কথা শোনো না কো, দিন-রাত কাজ, কাজ।
পায়ে ধরি আয়নাতে চেহারাটা দেখ আজ।
ছি, ছি, ও কি উঠে গেলে, কিছুই যে খেলে না।
রান্না কি ভালো নয়, কোন স্বাদ পেলে না?

মালয়ে সাড়ে তিন বছর

জাপানী রাজত্ব

শ্রীমতী রেবারাণী ঘোষ

১৯৪১ সালে ৮ই ডিসেম্বর রাত চারটার সময়, জাপান দেশে যুদ্ধ ঘোষণা করে; ঠিক ঐ সময়েই সিঙ্গাপুরে কত প্লেন এসে বম্ করে যায় এবং নিদ্রিত অবস্থায় বহু লোক মারা পরের দিন রেডিওতে এ-খবর আমরা পেলাম। এখনও প্রতি ঘণ্টা অন্তর প্লেন এসে বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে! কোটা[illegible] শুনা গেল, ৮ই ডিসেম্বরে ল্যাণ্ড করছে ও বৃটিশ আর্মি খুব যুদ্ধ করছেন। এই সকল সংবাদে দেশবাসীরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, নির্দ্দয় জাপান অন্ততঃ এত তাড়াতাড়ি নামবে। মানুষ যা ভাবে সব সময় কাজে তা ঠিক হয় না, কে আমরা ভেবেছিলাম, যুদ্ধের এখন অনেক দেরী আছে, সুবিধে দেশে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু এমন হঠাৎ যুদ্ধ লাগায় আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ক'দিন আগে থেকে প্রত্যহ আমাদের এ প্লেনের শব্দ আমরা পেতাম, কিছু দেখা যেত না সবাই সন্দেহ শব্দটা অদ্ভুত, হয়ত জাপানীর প্লেন। ৮ইএর পর থেকে সর্ব্বদাই প্লেনের শব্দ পাওয়া যায়, কোন্ দিক্ হতে আসে ও ঠিক বোঝা যায় না। রেডিওতে শুনা গেল, সিঙ্গাপুরে ক্রমাগ[illegible] হচ্ছে। অনেকেই মারা যাচ্ছে, বৃটিশ সরকার তারই জন্য [illegible] লোককেই ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তাদের জীবন রক্ষা জাহাজও নিয়মিত পিনাং সিঙ্গাপুর ছাড়ছে পেপারে দেখা আমার কিন্তু সাহস হচ্ছে না এ সময় সিঙ্গাপুর বা পেনাং জাহাজে ওঠা। রেডিওতে ত সর্ব্বদাই শুনা যাচ্ছে কো কি হচ্ছে, দিনে কত বার বোমাবর্ষণ হচ্ছে। কোটাবারু জাপানীরা অর্দ্ধেক প্রায় গ্রাস করেছে। শুনতে শুনতে ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

২

২০শে ডিসেম্বর বৈকালে মিসেস্ সিসিলী এসে আমাকে নিয়ে ষ্টেশনে এলেন, তিনি আজ বড় দুঃখিত। আজ কোটাবারু থে রেডক্রশ-ট্রেণ আসছে আহত সৈন্যদের কি ভাবে শুশ্রূষা করতে তার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন, তিনি আমাকে বড় করতেন, আমিও তাঁকে খুব ভালবাসতাম ও সম্মান করতাম। ন[illegible] সম্বন্ধে আমাকে নিজ হাতে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি অ[illegible] গরমের জামা টুপী নিজে তৈরী করেছেন, সৈন্যদের আজ [illegible] পরিয়ে দেবেন। আমাকেও এ-সব তিনি করতে দিয়েছিলেন, [illegible] মত শেলাই করে তাঁকে পাঠাতাম। ষ্টেশনে এসে আমাকে [illegible] দেখালেন, খাবারের আয়োজন করে রেখেছেন—চা বিস্কুট কেক্ [illegible] ফল ইত্যাদি। ট্রেণ এসে যথাসময় থামল, লোকে লোকা[illegible] সকলেই আজ খাবার অনেক রেখেছে চা রুটী ডাল কলা [illegible] লাড্ডু ইত্যাদি, সবাই হাত ভরে আহত সৈন্যদের খাওয়াতে লাগ[illegible] মিসেস্ সিসিলী হাতে বড় একটি ব্যাগ তুলে নিলেন এবং আমা[illegible] নিয়ে গাড়ীর ক্যারাজে উঠলেন, দেশীয় সৈন্য দেখে আমার খুব আ[illegible] হল, হাতে করে চা ফল ডিম্ তুলে দিলাম। মিসেস্ সি[illegible]

তখন ব্যাণ্ডেজ খুলে ওষুধপত্র দিয়ে বাঁধছেন। চোখে তাঁর জল, রুমালে মুছলেন। আমায় বল্লেন, খাবার সকলকে ভাল করে দাও এক ঘণ্টা গাড়ী থামবে, পরে এসে আমায় সাহায্য কোরো। তাঁর কথা মত সব করে গেলাম, আহতদের দেখে নির্দ্দয় জাপানের উপর অভিসম্পাত দিলাম—"তোরা শেষ হবি মরবি।" ঈশ্বর তখন তা শুনেছিলেন বোধ হয়। এক ঘণ্টার পর বাঁশী বেজে গাড়ী ছাড়ল, সিঙ্গাপুরে যাবে ট্রেণখানি। ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করে আমরা সৈন্যদের কাছে গেলাম, তারা সুস্থ হোক, জয়ী হোক, সুখী হোক—ঐ বলে বিদায় দিলাম। ট্রেণ ছেড়ে চলে গেলে আমরা বাসায় ফিরলাম, মিসেস্ সিসিলী বল্লেন, প্রতি সপ্তায় বড় ক্রশ ট্রেণ দু'বার করে আসবে। আমাদের এ ভাবে যেতে হবে ও দেখা-শুনা করতে হবে। আমি বল্লাম, নিশ্চয়ই, আপনি যা বলবেন আমি নিশ্চয়ই কোরব আপনার কাছ হতেই আমার শেখা।

৩

৬ই জানুয়ারী সকালের পেপারে জানা গেল, জহোর বাতে খুব বম্ হয়েছে এবং দেশীয় লোক-জন সব এদিকে পালিয়ে আসছে। বড় ভাবনায় পড়া গেছে। আমাদের এদিকে আবার বম হবে না ত? সরকার থেকে আমাদের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যে বাড়ীর কাছে সব সেল্টার কাটতে হবে, নিজেদের জীবনরক্ষা করার জন্য তাঁরা আগেই সাবধান করলেন। এখন দিনে দিনে প্লেনের যাতায়াত বেড়ে চলেছে, অনেকেই সহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, মিলিটারী থাকার জন্য অনেকে বাড়ী খালি করে দিতে লাগলেন। আমাদের এখন ভাবনা ধরল কোথায় যাওয়া যাবে। ঠিক ঐ সময় কোথা হতে জানি না কতকগুলি প্লেন এসে আজ আমাদের সহরের উপর দিয়ে উড়ে গেল। আজই প্রথমে ভাল করে জাপানী প্লেন দেখা গেল। আমার ভয়ানক ভয় হয়ে গেল, ঐ ত জাপানী প্লেন এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে, এখন কি করা যায়!

বৈকাল বেলা আমার কথা ভেবেই হয়ত মিসেস্ সিসিলী এলেন, বসতে দিয়ে তাঁকে বললাম, আমার ভয় হয়েছে খুব, আপনি এসেছেন বড় সুখী হলাম। তিনি বললেন, আজ ট্রেণে রাত্রি ১২টায় আমি সিঙ্গাপুর যাচ্ছি, তাই শেষ দেখা করে গেলাম। আমি হতচকিত হলাম, কেন আপনি চললেন, কিছু ভয় আছে কি? তিনি বললেন, আমাদের যেতেই হবে তাই—তবে তোমরা সহরের ভিতরে থেক না, অন্য কোথাও চলে যেও। আরো কিছুক্ষণ কথার পর তিনি উঠে চললেন, গাড়ীতে তাঁর সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা হ'লো, তার পর তিনি চলে গেলেন। পরের দিন সকালে, আমরা চা'এর টেবিলে বসেছি, মিসেস্ সিসিলীর কথাই বলাবলি করছি, তিনি চলে গেছেন মনটা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে আছে, তাঁর নূতন একটি আংটী আমায় উপহার দিয়েছেন, চিহ্নস্বরূপ সেটি রেখে দিয়েছি ভাল করে।

সকাল বেলাতেই আজ আবার প্লেন এলো, ভয়ে আমরা ছেলেদের নিয়ে সেলটারে গিয়ে ঢুকেছি। সহরের উপর প্লেন এলো—ভারি রকমের দল ২০০ অন্ততঃ হবে। আস্তে আস্তে সহর ঘুরল, এত নীচু হয়ে যাচ্ছে যে তাদের মাথার টুপী মুখ হাত কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে,—হেঁট হয়ে আবার তারা মাটীর দিকে দেখছে, বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট জায়গাগুলি ঠিক করে রাখছে। ঘণ্টাখানেক ঘুরে প্লেনগুলি আস্তে আস্তে চলে গেল। ভয়ে ত আমি কাঁপছিলাম কি কেন জানি না, রাস্তার ধারে এসে দেখি লোক সব পালাচ্ছে, ভ খেয়ে গেছে তারাও খুব, জীবনে যারা যুদ্ধ কি জানে না, বোম্ পদার্থ কি অনুভব করেনি তারা এই প্লেন ঘোরা দেখেই এত অস্থির হ পড়েছে, যখন সত্যই বোম্ পড়বে তখন কি হবে তাই ভাবলাম দোকান-পাট সবই খোলা আছে, আজ ভীড়ও খুব বেশী। বিপদ এগি আসছে, খাবার সঞ্চয় করে রাখা চাই, তাই কিনতে লোক জড় হয়েছে নানা জাতির লোক এদেশে আছে তার মধ্যে চীনার সংখ্যাই বেশি দোকান-পশার তারাই চালায়। টিনের খাদ্যই বেশী দিন রাখা যা তাই লোকে বেশী কিনছে। সহর ছেড়ে যদি জঙ্গলেই থাকতে হ তবে অনেক অসুবিধাই হবে, শাক-শব্জী পাওয়া যাবে না, বাজা হয়ত আর বসবে না। জঙ্গল থেকে পায়ে হেঁটে ২।৩ মাইল অন্ত মালয়দের কামপোং (গ্রাম) আছে, সেখানে গেলে তবে কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে। শুক্‌না মাছ তরকারী ও আরো অদ্ভুত জিনি এরা খায় কিন্তু আমাদের মত প্রবাসী বাঙালীর শাক পাতা না হলে চলে না, ভাবনা তাই আমাদেরই বেশী। টিনের জিনিষ সঞ্চয় করে আমরাও অনেক দিন রেখেছি, কেন না, কখন হয়ত সরতেই হবে। দিন-রাত যে ভাবে প্লেন উড়ছে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা আর চলে না; প্রতিদিনই লোক চলে যাচ্ছে সহর ছেড়ে।

মালয়দের সাথে তাদের গ্রামে থাকা আমাদের চলে না, তারই জন্য রবারের স্টেটে গিয়ে থাকা হবে এই রকম মনে হচ্ছে কিন্তু কোন ঠিক এখনও হচ্ছে না; আমার স্বামী এতক্ষণ কাজেতেই ব্যস্ত ছিলেন, আমাকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেরা কোথায়? এ ভাবে দাঁড়িয়ে থেক না, ভয়ের তত কিছু নাই। আমি চুপ করেই রইলাম। তাঁর অফিসে ভয়ানক কাজ, আজ কয় দিন অসম্ভব কাজ বেড়েছে, খাবার নাইবার সময়ও থাকে না। অফিসে তখন মিলিটারীর কাজই বেশী, সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর, তবুও মাঝে মাঝে এসে আমাকে সাবধান হতে বলেন। তাঁর অফিসের সাথেই আমাদের বাড়ীটি লাগান তাই অনেক সুবিধা দেখাশুনা করার। হঠাৎ বোমের ভীষণ শব্দ সুরু হল, আমি চিৎকার করে উঠলাম, খুবই নিকটে বোম হচ্ছে বলে মনে হল। ছোট খোকাকে কাছে টেনে নিয়ে কি কোরব ভেবে পাচ্ছি না, হয়ত প্লেনগুলি আমাদের মাথার উপর এক্ষুনি এসে বম্ ফেলবে, ভয়ে পা কাঁপছে বুক ধড়াস ধড়াস করছে। ভয় খাব না ভাবতাম কিন্তু দূরে কোথায় বম্‌এর শব্দে এখানে এত কাঁপছি যখন সত্যই এখানে আসবে তখন হয়ত মারাই যাব। আধ ঘণ্টা কি করছিলাম জানি না, বমএর শব্দ আর শুনেছি কি না জানি না কিছুই মনে নাই, চমক ভাঙল, উনি এসে আবার যখন ডাকলেন। ভাবলাম কি করছিলাম আমি এতক্ষণ, বেঁচে আছি তবে?

উনি ডেকে বললেন, তখন প্লেনগুলো যে গেলো তারা সিঙ্গাপুর বম্ করে ফিরছিল বোধ হয় "গিমাস" ষ্টেশনে এখন বম্ করে চলে গেল। কোন একটা জায়গায় আজ তোমাদের পাঠাতেই হবে, এখানে থাকা চলবে না, বিপদের ভয় এদিকেও আছে, রেলের ষ্টেশন যখন কাছে তখন সরাই দরকার। বললাম, যা হয় করো, ভেবে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, পা কাঁপছে ভয়ানক রকম। উনি বল্লেন

ছিলেন। জঙ্গলে ছেলেদের নিয়ে সাহস করে তোমাকে থাকতে হবে ত একলাই, আমার ত শেষ পর্য্যন্ত কাজ, যাবার উপায় নাই, তখন এত নারভাস্ হয়ে যেও না, একটু ধৈর্য্য থাকা দরকার।

উনি ত বেশ উপদেশ দিয়ে গেলেন, কোনটাই আমার পছন্দ হল না। আমি চলে যাব, ঠিক, কিন্তু পরে প্লেন এসে যদি সারা সহরে বাড়ীতে দোকানে অফিসে বম্ ফেলে, তবে ওঁর অবস্থা? কাজ ফেলে যাবার উপায় নেই, সাহেবরা সঙ্গে কাজ করছেন। কি উপায় হবে আর এক ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লাম।

পর পর আরো দু'দিন ঐ ভাবেই ভয় ও ভাবনায় কেটে গেল। বোম্ এদিকে এবার হবেই; তার চিহ্ন দেখা গেল,—প্লেন এসে কাগজ ফেলা আরম্ভ করল, এবং সমস্ত দিনই আমাদের সেলটারের ভিতর বসে বসে কাটাতে হল।

বৈকাল বেলা সেদিন উনি ঠিক করলেন, কাছেই কোন রবারের ষ্টেটে আমাদের রেখে আসবেন। উনি বাড়ীতেই থাকবেন, যখন সাহেবের হুকুম পাবেন তখন আমাদের কাছে ফিরে আসবেন!

যুক্তিমত পরের দিন সকাল বেলা একখানি লরিতে কিছু জিনিষপত্র খাবার-দাবার ও আমাদের তুলে দিলেন এবং সাইকেল করে পিছু পিছু আসতে লাগলেন। প্রায় চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে প্রকাণ্ড রবারের ষ্টেটে এসে লরিটি থামল। আমরা গাড়ী হতে নামলাম, উনি বললেন, কোন কষ্ট হবে না এখানেই সুবিধা সব দিক আছে আর সকলেই আমাকে খুব জানে, এখানের বড়বাবু খুব ভদ্রলোক। পরে তিনি এলে কথাবার্ত্তা হোলো। সামনেই কুলীদের সারি সারি ঘর, তারা আমাদের দেখে বেরিয়ে এল এবং জিনিষপত্রগুলি তোলার সাহায্য করতে লাগল। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী অনেকগুলি আছে, বড়বাবু খালি করিয়ে রেখেছিলেন, দেখলাম বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বোধ হয় অনেকেই আমাদের মত এখানে আসবেন। আমাদের দেখতে পেয়ে বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন, আসুন, আসুন, বলে অভ্যর্থনা করে তাঁর বাংলোয় নিয়ে গেলেন, এবং তাঁর সমস্ত বাড়ীখানি আমাদের ছেড়ে দিলেন। তিনি মালাবারী ভদ্রলোক, স্ত্রী দেশে, এখানে তাঁর চিন্তার কিছুই নাই, বেশ নিশ্চিন্তই আছেন। ষ্টেটের ডাক্তারটিও মালাবারী ব্রাহ্মণ, তাঁর বাসাও এই কাছেই। সকলের সাথে আলাপ হয়ে গেলে, উনি আবার সহরে ফিরে গেলেন। সকলের সঙ্গে আরো কথাবার্ত্তা কইলাম তাঁরা আমায় আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, ভাববেন না, এখানে আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান, এত লোক থাকতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না, এখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার গুছিয়ে পেতে নিন।

সমস্ত দিনটা অত্যন্ত খারাপ লাগছিল, সবই নূতন, ভাল ভাবে চেনা নাই কারুর সাথেই। তবুও সন্ধ্যার দিকে দেখলাম খালি বাড়ীগুলি ক্রমশঃই পূর্ণ হতে লাগল; আমাদের সহরের ভদ্রলোকরাই এসে দখল করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'-এক জন বাদে সবাই ফ্যামেলী-ম্যান। লোকসংখ্যা বাড়ল দেখে একটু সাহস পেলাম, কিন্তু আনন্দ পেলাম না, সহরে উনি ঐ বিপদের মধ্যে চাকরটিকে নিয়ে একাই রইলেন। সন্ধ্যার পর রাত এল, রবারের বাগান ছয়টার পরই যেন অন্ধকার, যে যার ঘরে ছোট ছোট আলো জ্বেলে দুয়ার বন্ধ করেছে, আমিও তাই দেখে একটি হারিকেন জ্বেলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

[ক্রমশঃ।

নীরব পরিচয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

যখন ছিল বাসর ভরা ভীড়
অচেনা দুই নর-নারী বাঁধতেছিল নীড়
সবাই যখন ব্যস্ত ছিল কাজে
বেহাগ সুরে সানাই যখন বাজে
সেই লগনে
সংগোপনে
মোদের পরিচয়
তোমার চোখে লজ্জা ছিল, আমার ছিল ভয়
সবার মাঝে নীরব ভাষায় মোদের পরিচয়

অঙ্গে তোমার ছিল নাকো নববধূর বেশ
যুঁই চামেলী জড়ায়নিকো তোমার কালো কেশ
ছিল না কো বরণমালা
একটিও দীপ হয়নি জ্বালা
অন্ধকারে
মনের তারে
গোপন কথা করল' কানাকানি
সবার মাঝে নীরব ভাষায় মোদের জানাজানি;

বাসর যখন মুখর হল গানে
বধূ যখন চাইল বঁধুর পানে
সলজ্জ তার ঘোমটাখানি
দিল টানি
মেয়েরা সব মিলে
তোমার চোখের নীরব ভাষা আমায় দোল দিলে
মনে তোমার হয়ত ছিল আশা,
হয়ত ভালোবাসা
ঝঙ্কারিল তোমার মন-মাঝে
লগ্ন-শেষের শঙ্খ যখন বাজে!

ওগো আমার অনেক দিনের চেনা
লগ্ন-বেলায়
অগ্নি-খেলায়,
নাই বা হল মনের লেনা দেনা
আকাশ ভরা তারার মত
নীরব হয়ে অবিরত
জাগবে মনে তোমার আমার শুভ পরিচয়
নীরব সুরে হ'ল সারা, মুখর গানে নয়।

★

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

তাহার পরের দিন ভূপেন আর কিছুতেই মুখ তুলিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিতে পারিল না। শুধু-যে অন্যায় করিয়াছে সে জন্যই নয়—কাজটার বহুদূরপ্রসারী ফলাফল চিন্তা করিয়াও বটে। দরিদ্রের রূপহীনা কন্যার মনে যে আশা কখনও জাগিত না, জাগিতে সাহস করিত না—যে অনুরাগ শুধু মাত্র থাকিত এক-তরফা, যাহার কোন প্রতিদান না পাইলেও তাহার আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করিতে হইত না—সেই আশা ও অনুরাগকে অকারণে প্রশ্রয় দিবার কোন অধিকার পর্য্যন্ত তাহার নাই! কল্যাণীও লজ্জায় সঙ্কোচে প্রাণপণে সারাদিন তাহাকে এড়াইয়াই চলিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগেই ভূপেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া, সাময়িক ভাবে অন্তত, এই দুর্নিবার লজ্জা ও আত্মগ্লানির হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। যাওয়ার সময় শুধু রাধুকে বলিয়া গেল, আমি সালেকদের বাড়ী যাচ্ছি, রাত্রে আর ফেরা হবে না।

সালেকদের বাড়ী নিশ্চয় এক দিন যাইবে কথা দিয়াছিল কিন্তু এত দিন একটা সুগভীর আলস্য ও আরামে এমনই জড়ত্বের মধ্যে দিন কাটিয়াছে যে যাই-যাই করিয়াও কিছুতে যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই। এধারে ছুটিও এক মাস কাটিয়া গিয়াছে আর চার-পাঁচ দিন বাদেই স্কুল খুলিবে এখন আর না গেলে প্রতিশ্রুতিটা রাখা যায় না। সুতরাং সেজন্যও কতকটা তাহাকে মরিয়া ভাবে বাহির হইতে হইল।

সালেক এত দিনে আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিল, সহসা ভূপেনকে দেখিয়া সে প্রায় নাচিতেই শুরু করিয়া দিল। গফুর মিয়াও যথেষ্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—তখনই হিন্দুপাড়া হইতে লুচি ভাজাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিলেন; ঘরে শুধু গরু দুহিয়া ক্ষীর হইল অর্থাৎ তাহার জাতিটা রক্ষা করা চাই-ই। এমন কি তাহার স্নানের জল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দুকে দিয়াই তোলাইয়া দিলেন।

আহারাদির পর বাহিরেই চৌকী পড়িল। সে-দিনও সালেক আসিয়া বসিয়াছিল তাহার পদসেবা করিতে। কিন্তু ভূপেন তাহাকে পায়ে হাত দিতে দিল না, জোর করিয়া কাছে টানিয়া আনিল। তার পর চলিল গল্প—অধিকাংশই লেখাপড়াব কথা। সালেক কি কি পড়িয়াছে এই ছুটির মধ্যে, কোন্‌টা কোন্‌টা বুঝিতে পারে নাই—তাহারই বিবরণ! শেষ পর্য্যন্ত উৎসাহের আতিশয্যে রাত দুইটা নাগাদ সালেক উঠিয়া লণ্ঠন জ্বালিল এবং বই-খাতা লইয়া রীতিমত পড়িতে বসিল। একেবারে যখন দুজনেরই হুঁস্ হইল তখন পূর্ব্বাকাশ রীতিমত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সালেক একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল কিন্তু তখন আর নূতন করিয়া ঘুমাইতে ইচ্ছা হইল না ভূপেনের, সে একেবারে মুখ-হাত ধুইয়া বিদায় লইল।

বিজয় বাবুদের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তাহার তখনও লজ্জাই বোধ হইতেছিল কিন্তু কল্যাণী আজ তাহার সহিত সহজ-ভাবেই কথাবার্ত্তা বলিল। স্নানের ব্যবস্থা করা, জলযোগের আয়োজন সবই নিত্যকার মত চলিতে লাগিল, যেন কোথাও কোন সঙ্কোচের কারণ ঘটে নাই। বোধ হয় সে মনে করিয়াছিল যে তাহার আগের দিনের অপ্রতিভ ভাবটাই ভূপেনকে বাড়ী-ছাড়া করিয়াছে; সেই জন্য আজ সে জোর করিয়াই সহজ হইল।
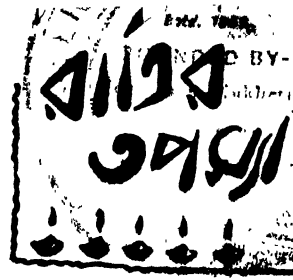
ভূপেনেরও ক্রমে ক্রমে লজ্জাটা কাটিয়া গেল, যদিও রাত্রে সে অত্যধিক গরমের অজুহাতে কল্যাণীর কোন নিষেধ না শুনিয়া, এক-রকম জোর করিয়াই, বাহিরে বিজয় বাবুর পাশে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ছুটি শেষ হইল, নূতন হেড্‌মাষ্টারও আসিয়া পৌঁছিলেন। এ ভদ্রলোকের নাম ললিত বাবু—ইঁহার বয়স বেশী না হইলেও ইতিমধ্যেই অনেক ঘাটের জল খাইয়াছেন, ঘুরিয়াছেন বহু ইস্কুল। সেই জন্য বিশ্বাস করেন না কাহাকেও, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও হুঁশিয়ার, তাহার উপর ভবদেব বাবুর চাকরী কেন গিয়াছে, সে খবরটা তিনি ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন, ফলে সতর্কতার মাত্রা আরও বাড়িয়াছে। অবশ্য বিশ্বাস যেমন পরকেও করেন না তেমনি নিজের সহজ বিচার-বুদ্ধিকেও না। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই আগে আইন খুঁজিতে বাসন, অর্থাৎ ইস্কুলে কী নিয়ম চলিয়াছে এত দিন। যেখানে সে রকম কিছু খুঁজিয়া পাওয়া না যায় সেখানে সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান। চারটি পয়সা খরচাও তিনি নিজের দায়িত্বে করেন না, একটি বেয়ারিং চিঠি রাখিবেন কি না, এক দিন এ অনুমতির জন্যও সেক্রেটারীর কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন! ...শিক্ষকরা সহসা কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন।

সুতরাং বিপদ বাধিল তাঁহার সব চেয়ে ভূপেনকে লইয়া। তাহার ধরণ-ধারণ, পড়াইবার পদ্ধতিও সব যেন নূতন, সেজন্য তাঁহার প্রথম প্রথম দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পরে যখন জানিলেন যে এ ব্যাপারে সেক্রেটারীর অনুমোদন আছে, তখন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, যদিও অস্বস্তিটা কিছুতেই গেল না। এক দিন এই প্রসঙ্গে ভূপেন তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, ছাত্ররা পড়িতেই আসে এখানে, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেকখানি। পড়ানোটা কেমন করিয়া ভাল হয় সেইটাই সর্ব্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন তাঁহাদের, আর সেজন্য যদি নূতন কোন পদ্ধতি ভাল বলিয়া মনে হয় কিম্বা সেটার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান ত সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে ক্ষতি কি? কিন্তু ললিত বাবু দায়িত্বটা ষোল আনা মানিয়া লইলেও নূতন কোন পথ পরীক্ষা করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, এ কথাটা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, সেখানে কোন যুক্তিই তাঁহাকে ভূপেনের সহিত একমত করিতে পারিল না। যুক্তির জবাব দিতে পারেন না এটাও যেমন ঠিক, তেমনি কথাটা যে মানিয়া লইতে পারেন না এটাও ঠিক! বহু দিনের অনভ্যাসে তাঁহার বিচার-বুদ্ধি যেন, একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। মন কোন কাজকে সঙ্গত মনে করিলেও সেটাকে করিতে সাহস করেন না, যতক্ষণ না উপরওয়ালাদের কাছ হইতে অনুমোদন আসে! তাঁহার সেই এক বুলি, ভাল মন্দ বুঝিনে মশাই, যা চলে আসছে তাই চলুক। কী দরকার অত ঝামেলায়।

এটা যদি শুধু তাঁহার নিজেরই সব কাজে হইত ত ভূপেন অতটা উদ্বিগ্ন হইত না। সে এত দিনের চেষ্টায় অন্য মাষ্টার মহাশয়দের শিক্ষকতার দায়িত্ব সম্বন্ধে কতকটা সচেতন করিয়া আনিয়াছিল,

আবার তাঁহারা গা ঢালিয়া দিলেন। তাঁহাদের যুক্তিও প্রায় ...ত্য, আমাদের ওপরওলা যদি আমাদের কাছে ফাঁকিই চায় ত, কি দরকার ভাই বেশী পরিশ্রমে?

একা ভূপেন প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে ... মনে মনে একটা ক্লান্তি, একটা হতাশাও যেন অনুভব করে। ...—হয় ত এ অপচয়, এ দেশে আর কিছুতেই কিছু করা ...।

সহসা আর এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

...টি খুবই ছোট বলিয়া এখানে কোন বেশ্যা-পল্লী ছিল না। আবাদের শেষের দিকে দুই ঘর হাড়ী আসিয়া ইস্কুলের ... ডাঙাটায় ঘর বাঁধিতে শুরু করিল। ভূপেন এসব খবর জানিত না, সংবাদটা দিলেন পণ্ডিত মশাই। এ অঞ্চলে ... এই ডোমপাড়া বা হাড়ীপাড়া এক সাংঘাতিক স্থান। ... গৃহস্থের মত সংসারও করে আবার ইহাদের স্ত্রীলোকরা ...ই বেশ্যাবৃত্তি করে। এখানকার অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম সব, সেখানকার বহু কিশোর এবং তরুণেরই না কি বহু সর্ব্বনাশ ...য়া গিয়াছে এই সব হাড়ীপাড়ায়। শুধু যে নৈতিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দৈহিকও। এমন সব কুৎসিত ব্যাধি ...দের কাছে হইতে আসে যাহার আর কোন চিকিৎসাও সম্ভব হয় না—ফলে বংশপরম্পরায় নানা রকমের রোগ ও অকালমৃত্যু ...তে থাকে।

সব সংবাদ ও তথ্য শেষ করিয়া রাধাকমল বাবু শুষ্ক মুখে বলিলেন, তোমার এত সখ ভাই ছেলেদের মানুষ ক'রে তোলবার, কিন্তু আর বোধ হয় পারলে না! এই যা যা, এতেই সব যাবে।—

ভূপেন উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা করবেন না আপনারা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সর্ব্বনাশটা দেখবেন?

—কি করবো ভাই? আমি একা কি করতে পারি? তাছাড়া শহর-বাজারে তারাই পারলে না কিছু করতে—তা আমরা—

ভূপেন হেডমাষ্টারের কাছে গেল। কহিল, এর একটা বিহিত করবার চেষ্টাও করবেন না স্যার! এমন একটা কাণ্ড বিনা বাধায় ঘটবে?—

ললিত বাবু বলিলেন,—বিলক্ষণ! একে আমি নতুন লোক, তায় মাষ্টার। মাষ্টারদের কথা কি কেউ শোনে মশাই? কেউ শোনে না। আর ওরা ঘর বাঁধছে অত দূরে, আপনার ছাত্রদের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক বলুন! আপনারাই না হয় একটু সাবধান থাকবেন।

ভূপেন তবুও যখন জেদ্ করিতে লাগিল তখন তিনি পরিষ্কারই বলিলেন,—ওসব আমার দ্বারা হবে না মশাই, সাফ কথা! আমি এসেছি চাকরী করতে—সোশ্যাল রিফর্ম্ম করতে ত আসিনি। কার এত দায় যে ঐ-সব ক'রে বেড়াবে এখন। আর তাছাড়া কেউ যে কাজ করতে পারলে না, আমি কি এমন মহাবীর যে সেই গন্ধমাদন ধারণ করব।

তার পর একটু থামিয়া, যেন ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, সেক্রেটারী ত আপনার হাত ধরা, তাঁকেই বলুন না?

—তাঁকেই বলব। সংক্ষেপে উত্তর দিয়া ভূপেন চলিয়া গেল।

কাছেই ছিলেন অপূর্ব্ব বাবু, হাসিয়া কহিলেন, ... বঙ্গক মাষ্টার মশাই, ওরা সব পারে। দেখুন না, আপনা... গেল। 'সেক্রেটারীকে বলব' কথাটার মানে বুঝ...ন না?

অপূর্ব্ব বাবু আবারও মিষ্ট ভাবে হাসিলেন।

শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়া ললিত বাবু মুখ কালী ক... রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সেক্রেটারীর কাছে কথাটা পাড়িতে তিনি একেবারে ... হইতে পড়িলেন। কহিলেন, মশাই যত ঝঞ্ঝাট কি আপ... নিয়ে! আমার ও ডাঙাটা অনেক দিন ধরে পড়েছিল—ত... যাহোক দু' ঘর প্রজা বসল। তা ছাড়া ওরা যেখানে থাকে ... ঘর থাকে না, দেখতে দেখতে আরও দু'-চার ঘর এসে পড়বে। ... আয় বাড়ল এই কথাই ভাবছি, তা আপনি আবার সেথ... এলেন বাগড়া দিতে।

ভূপেন কহিল, কিন্তু আপনার আয় ওতে সামান্যই বা... অথচ কতগুলো ছেলের সর্ব্বনাশ হ'তে পারে একবারে ... দেখুন দিকি! আমি ত এখানে নতুন লোক, কিছুই জা... কিন্তু আপনি ত সব খবর রাখেন—কত ছেলের ইহকাল পর... ওরা নষ্ট ক'রে দিয়েছে আপনিই বলুন!

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সেক্রেটারী জবাব দিলেন, তা অবশ্য ব... অতটা আমি ভেবে দেখিনি। ওটা ত প্রায় সব জনবসতির ধা... থাকে, যারা নষ্ট হবার তারাই হয়—যারা ভাল থাকবার ... ঠিক থাকে, এই কথাই ভেবেছিলুম।...আমারই এক শালীর ছে... মশাই, fine young man, বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে, অ... বিষয়। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়েছিল, বৌও খুব সুন্দরী অথচ কলেজে পড়বার সময় কী যে দুর্ম্মতি হ'ল, দু-তিন ... বদ বন্ধুর সঙ্গে হাড়ীপাড়ায় যেতে শুরু করলে। ব্যাস্।... বছর তিনেক ভুগে মারা গেল। কত পয়সা খরচা করা হ'ল... কিছুতেই কিছু হ'ল না। বোলপুর শহরে তিন মহল বা... খাঁ খাঁ করছে—শুধু দুটি বিধবা থাকে।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু এসব জেনেও ... সর্ব্বনাশ করবেন আপনি?

তাই ত! সেক্রেটারী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলে... কিন্তু দলিল টলিল সব হয়ে গেছে, তা-বাদে আমার ত একল... জমি নয়, অন্য সরিকরাও আছেন, এখন কি আর কিছু ক... সম্ভব হবে?

কিছু একটা করতেই হবে আপনাকে। দুই হাত জো... করিয়া ভূপেন কহিল, দোহাই আপনার! আমার নিজের দে... নয়, আজ আছি কাল হয়ত থাকব না, কিন্তু এ আপনারই ... দেশ, আপনারও ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের কথা ভাবুন।

আরও বার-কয়েক শুধু 'তাই ত' বলিয়া এক সময় তি... উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, দেখি কি করতে পারি। একবা... এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে, যা বুঝতে পারছি। আচ্ছা! আপনি যান, যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

উজ্জ্বল মুখে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদটা দিতে ললিত বাবু... কালীমাখা মুখে যেন আরও খানিকটা কে কালী মাড়িয়া দিল... তিনি কোন কথাই কহিলেন না। শুধু অপূর্ব্ব বাবু জবা...

...লেন, দুনাত আর কত বাচাবেন ভূপেন বাবু। আমাদের ...লেরই ত ঐ অবস্থা। সমাজের চারি দিকেই ত ঘুণ ধরেছে। ...দি ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করার চেয়ে ত ...ল্যাবাড়ী যাওয়া ভাল!, কি বলেন আপনি?

অপূর্ব্ব বাবু শেষের কথাগুলি বলিয়া যেন কি এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এই বক্রোক্তির ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও অকস্মাৎ ভূপেনের সর্ব্বাঙ্গে যেন কে বিষ ছড়াইয়া দিল, সে আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া কহিল, তাই বা জোর ক'রে বলি কি ক'রে বলুন। ওতে অন্ততঃ রোগের হাত থেকে ত বাঁচা যায়! কিন্তু এসব প্রসঙ্গ থাক্—খারাপ যা তার সবটাই খারাপ, প্রয়োজন হ'লে সবটার সঙ্গেই লড়াই করতে হবে।

সে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সোজা হোষ্টেলের পথ ধরিল।

অপূর্ব্ব বাবুর বাঁকা মন্তব্যের সোজা অর্থটা বোঝা গেল কয়েক দিন পরেই।

ছুটির পর হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলেও ভূপেন প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বিজয় বাবুদের বাড়ী যাইত এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া গল্পগুজব করিত। ইতিমধ্যে মাহিনার টাকা পাইয়া উহাদের আরও কিছু চাল-ডাল-আটা কিনিয়া দিয়াছে সে। এবারও কল্যাণী কোন আপত্তি করে নাই; কারণ, করিবার উপায় নাই তাহা সে ভাল করিয়াই জানে, শুধু মাথাটা তাহার আরও নত হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ এক কথায় ইঁহাদের পরিবারের সম্পূর্ণ ভারই সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। যদিচ, তাহার ফলে বাড়ীতে সে যে টাকা পাঠাইত, তাহার পরিমাণটা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে সেখান হইতে পিতৃদেবের অত্যন্ত কড়া এবং করুণ চিঠি আসিয়া তাহাকে কিছু বিব্রতই করিয়া তুলিয়াছে। এসব ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে পড়ে সন্ধ্যার কথা, কিন্তু ধনি-দুহিতা সন্ধ্যার চিঠি আজ-কাল সংখ্যায় ও পরিমাণে এতই কমিয়া আসিয়াছে যে, সে চিন্তাটা শুধু অভিমান নয়, ব্যথারও কারণ হইয়া উঠিয়াছে ভূপেনের কাছে। তাই সে সন্ধ্যার চিঠিতে কথাটার আভাস পর্য্যন্ত দেয় না।

সে যাই হোক্—সে দিনও ছুটির পর সে অভ্যাস-মত বিজয় বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল। কিন্তু আজ আর বিজয় বাবু অন্য দিনের মত কলরব করিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন না—বরং অভ্যর্থনার বাণী উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন করুণ ও গম্ভীর শোনাইল। শুধু তাই নয়, অন্য দিন তাহার গলা পাইলেই কল্যাণী ছুটিয়া আসে—চা করিয়া দিবার চেষ্টা করে, হাসিতে, গল্পে মুখরিত হইয়া ওঠে, কিন্তু আজ কোথাও তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। সে যে ইচ্ছা করিয়াই বাহির হইল না—এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

অর্থাৎ কিছু-একটা ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কি তাহা কিছুতেই সে অনুমান করিতে পারিল না। শেষে বিজয় বাবুর সহিত মিনিট-কয়েক গল্প জমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া এক সময় সে সোজাসুজিই প্রশ্ন করিল, কল্যাণীকে দেখছি না কেন? তার অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

ন্-না! বিজয় বাবু যেন মুহূর্ত্ত-কয়েক ইতস্তত: করিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন, ভালই আছে, রান্না করছে বোধ হয়।

দেখি তার ব্যাপার কি! এতক্ষণের মধ্যে একবারও তার চিহ্ন দেখা গেল না—এত কি রান্না করছে সে!

ভূপেন উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইল। উনান... কিছুই নাই—কিন্তু তাহারই সামনে স্তব্ধ হইয়া নত মুখে বসি... আছে কল্যাণী। দরজার দিকে পিছন ফেরা বলিয়া মুখটা দে... গেল না বটে, তবু তাহার বসিয়া থাকিবার ভঙ্গিটাই যথেষ্ট উদ্বে... জনক। ভূপেন আশা করিয়াছিল, তাহার পদশব্দে কল্যা... নিজেই মুখ তুলিয়া চাহিবে কিন্তু মিনিট-দুই দ্বার-পথে দাঁড়াই... থাকিবার পরও যখন ও-পক্ষ হইতে কোন সাড়া মিলিল না, তখ... সে নিজেই ডাকিল, কল্যাণী।

কল্যাণী যেন সে ডাকে একবার শিহরিয়া উঠিল কিন্তু মাথা তুলিল না কিংবা সাড়াও দিল না।

ভূপেন পুনশ্চ ডাকিল, কী হয়েছে কল্যাণী?

তবুও কোন সাড়া নাই।

এতক্ষণে ভূপেনের সন্দেহ হইল যে, কল্যাণী নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে তখন জুতা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পিছন হইতে জোর করিয়া তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক, বহুক্ষণ রোদনের ফলে কল্যাণীর শীর্ণ মুখখানি প্লাবিত হইয়া বুকের আঁচল পর্য্যন্ত অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে। এত... খানি বেদনার কি এমন কারণ ঘটিতে পারে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কতকটা হতভম্বের মতই ভূপেন প্রশ্ন করিল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না কল্যাণি, কি হয়েছে বলবে না? কোন বিপদ-আপদের খবর এসেছে কি?

কল্যাণী যেন কি একটা উত্তর দিতে গেল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার কণ্ঠ ভেদিয়া কোন স্বরই বাহির হইল না, বরং এই চেষ্টাতেই সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ সেই মেঝের উপরই লুটাইয়া পড়িয়া ভূপেনের দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

ভূপেন বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, ছি, ছি, কল্যাণী লক্ষ্মীটি, অমন ক'রে কাঁদে না। তুমি ত অত দুর্ব্বল নও, তুমি এমন ছেলেমানুষী করলে চলে কি ক'রে? বলো আমায় কি হয়েছে—খুলে না বললে যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওঠো, লক্ষ্মীটি, ওঠো—

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কল্যাণী উঠিয়া বসিল বটে কিন্তু একটি কথাও কহিতে পারিল না, মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে, বিজয় বাবু যে দিকে বসিয়াছিলেন, বাহিরের সেই দিক্‌টা শুধু দেখাইয়া দিল।

ভূপেনও তাহার অবস্থা বুঝিয়া, আর পীড়াপীড়ি করিল না, সান্ত্বনা দিবারও বৃথা চেষ্টা করিল না, ফিরিয়া আসিয়া বিজয় বাবুর চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, ব্যাপার কি বলুন ত? কি হয়েছে? কল্যাণী ছেলেমানুষ সে বলতে পারলে না কিন্তু আপনিও যদি ইতস্তত: করেন তা'হলে চলে কি ক'রে?

তবুও বিজয় বাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিলেন; তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, ভাই এ কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবার আগে মৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল বোধ হয় কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই বড়, তিনি মৃত্যু না দিলে ত মরতে পারব-না!

তার পর আর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, তোমার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য নেওয়া ভাই আমাদের সম্ভব হবে না। এতে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি যা হচ্ছে সে আশঙ্কার চেয়ে বড় আশঙ্কা আমার এই যে, তুমি আমাদের কত না অকৃতজ্ঞ ভাববে কিন্তু তবু এইটাই বলতে হ'ল।

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথাটা যে এই দিক ঘেঁষিয়া যাইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। তাহার অপরাধী অন্তরে একটা কথা বার বার উঁকি মারিতে লাগিল, তবে কি সে রাত্রের কথাটাই কোনমতে বিজয় বাবু জানিতে পারিয়াছেন? সে মুহূর্তকয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু কেন তাও কি আমাকে বলতে পারবেন না? মনে হচ্ছে অন্যায়টা আমারই—অপরাধীর অপরাধের কথাটা না জানিয়ে শাস্তি দেওয়াটা কি উচিত?

ছি ছি! বিজয় বাবু ব্যাকুল ভাবে সোজা হইয়া বসিলেন, ও কথা বলতে নেই ভাই। তোমার পক্ষে যে কোন অপরাধ করা সম্ভব নয় তা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না।···সে বড় নোংরা কথা বলেই বলতে চাইনি ভাই—যাঁরা বলেছেন তাঁরা হয়ত সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন বলেই বলেছেন, তবু সে কথাটা নোংরাই। ···পাড়ায় না কি কথা উঠেছে—পাড়ায় কেন সমস্ত গ্রামেই—যে আমি, আমার কন্যাকে বেচে খাচ্ছি! এর চেয়ে মৃত্যু যে অনেক ভাল ভাই!

অসহায় ভাবে অন্ধ চোখ দুইটি মেলিয়া বিজয় বাবু চাহিয়া রহিলেন, তাঁহারও দুই চোখের কোল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে যেন চুপি চুপি কহিলেন, আমার জন্য ভাবি না, এমন কি কল্যাণীর জন্যও না—কিন্তু তোমার মত দেবতার গায়েও যদি কালী লাগে ত সইব কে ক'রে? তোমার সাহায্যের যদি এই কদর্থ হয়—শুনেছি আ[...] সহকর্মীরাও এই কথা বিশ্বাস করেন, কেমন ক'রে তা সম্ভব [...] তাই ভাবছি।

তাঁহার ভগ্ন-কণ্ঠ যেন একেবারেই বুজিয়া আসিল কিন্তু ভূপে[...] কোন কথা কহিতে পারিল না। শুধু পায়ের যেখানটা তখ[...] কল্যাণীর অশ্রুতে ভিজা সেইখানটায় যেন একটু বেশী রকমের [...] বোধ হইতে লাগিল। এ সব কথা কাহাকেও বলিবার নয়, [...] লোকে কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না কিন্তু কল্যাণীর এই কা[...] সম্পূর্ণ অর্থটা তাহার বোধগম্য হইয়া ভূপেনকে কিছুক্ষণের জন্য [...] জড়, অনড় করিয়া দিয়া গেল।

সে বহুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পর কোনমতে [...] প্রশ্ন করিল, আচ্ছা আমি যদি নিজে আর না আসি, অন্য কো[...] লোক মারফৎ কিছু পাঠাই তা'হলেও কি কিছু নিতে পারবেন না[...]

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বিজয় বাবু উত্তর দিলেন, না ভাই, ত[...] ক'রে আমি তোমার কাছে নিজেকে অপরাধী বোধ করব! [...] অন্যায় হবে।

একবার ভূপেনের মনে হইল, সে প্রশ্ন করে তা'হলে উপা[...] কিন্তু পরক্ষণেই সে প্রশ্নের মূঢ়তাটা নিজের কাছেই ধরা পড়ি[...] যাওয়াতে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বিজয় বাবু নিশ্[...] হইয়া ভগবানকে দেখাইয়া দিবেন।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে এক সম[...] উঠিয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ

ডাক

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সাঙ্গ মেঘ-সফর এবার শুনেছি সেই ডাক—
যে-ডাক দেয় পাহাড়ভাঙা ভূ-কম্পন ঘোর,
যে-ডাক দেয় সবুজ শীষে হাওয়া, হাওয়া নূপুর।
পিছনে মেঘপুরীর মূঢ় তোরণ হতবাক।
সামনে ঘুমভাঙার আসর আলোয় ভোর ভোর।

দেখলুম এই চলতি পথ ধূলো-ধূসর···দূর···
চলতি জন-সমুদ্রের স্বপ্ন-ভাঙা শাঁখ
হাওয়ায় তোলে তুফান, ঝড়ে ওড়ায়ধূলো জোর,
হৃদয় তবু গান শোনায়···সবুজ-সোনা সুর।
এবার ঘুমভাঙার আসর এবার সেই ডাক।

যাযাবর

সাত

সাধ্বী স্ত্রী, পিতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতৃবৎসল অনুজ এবং প্রভুপ্রাণ সেবকের দৃষ্টান্ত আছে আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে একাধিক। জনক-তনয়া সীতা, দশরথাত্মজ রামচন্দ্র, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং রামানুচর হনুমানের কাহিনী জানে এ-দেশের আ-পামার সাধারণ। কিন্তু পত্নী অনুগত স্বামীর উদাহরণ জানতে চাও তো সর্ব্বাগ্রে দেখে আসা প্রয়োজন ন'মাসিমার বান্ধবী ইন্দুমতী রায়ের বর প্রিয়নাথ বাবুকে। ইন্দুমতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনের পরিচয়-লিপিতে ইন্দুমতী ছিলেন দাশগুপ্তা। গোখ্‌লেতে পড়েছেন ইংরেজী, সঙ্গীত-সম্মেলনীতে শিখেছেন সেতার। ফুল স্লিভ্‌সের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে মাঘোৎসবের দিনে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা'য় করেছেন গান। তাঁর এক দাদা রেলের অফিসার, অন্য ভাই ব্যারিষ্টার।

ইন্দুমতীর বাবার সিন্দুকে রূপা ছিল প্রচুর, কিন্তু নিজের দেহে রূপ ছিল না এতটুকুও। ফলে কয়েক বছর আই, সি, এস, বিলাত ফেরৎ এবং ডেপুটি প্রভৃতির জন্য অযথা আকুলি-বিকুলির পর অবশেষে যৌবনের প্রান্ত সীমায় পৌছে এক শুভ মাঘে মাসি শুক্ল পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ কণ্ঠলগ্না হলেন প্রিয়নাথ বাবুর। বিয়ের পরে কনের বদল হলো পদবী, বরের বৃদ্ধি হলো পদ। এ্যাসিসটেন্ট থেকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। 'পয়' আছে ইন্দুমতীর।

প্রিয়নাথ বাবু তাঁর স্ত্রীর নাথ তো নিশ্চয়ই, বোধ করি প্রিয়ও হবেন। হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার পক্ষে······। থাক্‌, সে-কথা। আমি তো আর তাঁকে জামাই করছিনে।

মহাদেও রোডে প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ীটি। 'বি' টাইপ কোয়ার্টার। নয়াদিল্লীতে বাজারের ডিম থেকে সুরু করে বসত বাড়ী পর্য্যন্ত সবই গ্রেড করা। এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। হীরার বিচার ঔজ্জ্বল্যে, মসলিনের বিচার সূক্ষ্মতায়। সরকারী কর্ম্মচারীর মূল্য নিরূপিত হয় বেতনে। পি, ডব্লিউ, ডি'র খাতায় বেতন অনুযায়ী ভাগ করা আছে বাড়ী। পাঁচ শ' থেকে ছ'শ টাকা মাহিনার কর্ম্মচারীর জন্য "এ" টাইপ কোয়ার্টার, চার শ' থেকে পাঁচ শ'-ওয়ালারা পায় "বি"। ছ'শর উপরে মাইনে যাদের তারা পায় "বাংলো"। তারও শ্রেণী-বিভাগ আছে। গঠন বা ব্যবস্থায় ন অবস্থানেও। ঠিকানা শুনে বলে দেওয়া যায় লোকটা বেতনের পরিমাণ। হেষ্টি রোডের বাসিন্দা পায় তি থেকে চার হাজার, তোগল রোডে তার নীচে। এ হাজারের বেশী না পে বাংলো মিলে না বাঁ সিনা রোডে।

নম্বর মিলিয়ে সন্ধা করলেম বাড়ীর। বারান্দা পাশের ঘরে আধ-ময়লা গে গায়ে একটি ভৃত্য ইলেকট্রি ইস্ত্রী দিয়ে একখানা চকোলে রং-এর বেনারসী শাড়ীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলেম "এইটে প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ী?"

"হ্যাঁ, মিঃ রায়ের বাড়ী।"

গলার স্বরে বিরক্তি এবং কপালে কুঞ্চিত রেখা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল, 'বাবু' সম্বোধনটা শ্রোতার পক্ষে শ্রবণ-সুখকর নয়। সুতরাং ভ্রম সংশোধন করতে হলো।

"মিঃ রায়কে একটু খবর দিতে পার।"

"আমিই মিঃ রায়।"

গড সেভ্‌ দি কিং। মিসেস্‌ ইন্দুমতী রায়ের স্বামী যে সকাল আটটার সময় শাড়ী ইস্ত্রি করবেন তা' কল্পনা করবো কেমন করে? কিন্তু এখন তো আর ফিরবার উপায় নেই। ন'মাসিমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে হলো, দিতে হলো সংক্ষিপ্ত আত্ম পরিচয়। মিঃ রায় অন্দর থেকে যথারীতি নির্দ্দেশ লাভ করে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। "উনি" চান করছেন, আসতে বিলম্ব হবে না আশ্বাস দিলেন।

ড্রয়িং রুমটির মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা, তার উপরে ছোট মির্জ্জাপুরী কার্পেট। টিপাইর উপরে পুষ্পহীন ফুলদানী। এক কোণে একখানা ভাঁজকরা কেম্বিসের ইজিচেয়ার। তার মাথায় কাছটা উপবেশনকারীদের তৈলসিক্ত শিরের অজস্র চিহ্নের দ্বারা মলিন। দেয়ালে কাচ দিয়ে বাঁধানো খান-দুই সূচীশিল্পের নমুনা। এই সীবন কারুকর্ম্মের শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকের মনে পাছে কিছুমাত্র সংশয় ঘটে সেজন্য বড় বড় হরফে এক কোণে লেখা আছে, 'ইন্দু'। একটাতে একটা ঝুড়ি, তাতে কয়েকটি গোলাপ ফুল। আর একটাতে একটা বিচিত্র বর্ণের কুকুর। লাল, নীল, সবুজ, হলদে রং-এর যদৃচ্ছ এবং অকুণ্ঠ ব্যবহার। ভিবজিওর বললেই হয়। কুকুরটির মাথার উপরে ইংরেজী অক্ষরে লেখা,—গড ইজ গুড। বোঝা গেল, গৃহস্বামিনী ধর্ম্মশীলা। কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য তো সারমেয়ের প্রয়োজন ছিল না। বোধ করি, লেখার ভুল। ডগ ইজ গুড হবে।

প্রিয়নাথ বাবুর সঙ্গে খানিক আলাপ হলো। আলাপ অর্থে তিনি বক্তা, আমি শ্রোতা। প্রায় সবটাই 'উনি'-প্রসঙ্গ। উনি

আবার বিছানায় এক পেয়ালা গরম চা না পেলে সকালে উঠতে পারেন না। উনি রোজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে চাল-ডাল মেপে দেন। বাজারের খাবার উনি বাড়ীর ত্রিসীমায় আনতে দেন না। নয়াদিল্লীর বঙ্গ-মহিলা সমিতির যা কিছু তা তো সব উনিই করেন। লেডী মিত্র তো উনি ছাড়া এক পা' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইন্দুমতী রায়ের প্রবেশ। মিঃ রায়ের উত্থান। সেটা ইংরেজী রীতি।

মিসেস্ রায় আসন পরিগ্রহ করলেন। প্রথমে গৃহে স্থানাভাবের বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। তবে ছ'মাস পরেই গুরুদ্বোয়ারা রোডে বাংলো পাওয়ার আশা আছে। এ-বাড়ীতে ঘর-দোর এখনও ভালো করে গুছোতে পারেননি। সিমলা থেকে নামবার পরে অনেক আসবাব-পত্রের প্যাকিং খোলারই সময় পাননি। কী করে দিল্লী সিমলা করেন। গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে এই প্রথম। এবার গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার শৈলবিহার বন্ধ। নতুন কম্যাণ্ডার ইন চীফ না কি বলেছেন, সিমলা গেলে যুদ্ধ-জয়ে বিঘ্ন ঘটবে। উনি একবার যত অনাসৃষ্টির কথা। আরও বেশী গরম পড়লে কিন্তু তিনি সিমলা না গিয়ে পারবেন না, তা, বাপু' তোমরা যাই কেন না বল। বেবী—অর্থাৎ ন'মাসিমা—এখন আছে কোথায়? তার মেয়ের বিয়ের কত দূর? বেবী তো চিঠিপত্র লেখে না। তিনি নিজেও অবসর পান না। কত ঝামেলা! ওই তো আজ চারটায় আছে এক পার্টি। হ্যাগা, শাড়ীটা ইস্তিরি করে রেখেছো তো?

হাতের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেম।

"এখনি উঠবে? হ্যাঁ, তা বেলা হয়েছে বটে। আছ ক'দিন? দিল্লী থেকে যাবে কোথায়? বিলেতের কী হলো? যুদ্ধ না থামলে ইটো আর যেতে পারছো না। বম্বিংএর সময় লণ্ডনে ছিলে বুঝি? সেখানকার অবস্থা কি রকম? বাজারে ড্রিন স্যাম্পু পাওয়া যায়? ট্যাঞ্জি লিপ্‌স্টিক? এখানে তো ছাই কিছু মিলে না। একটু চা-টাও তো খেলে না। ওঁর আবার আপিসের বেলা হচ্ছে। আচ্ছা, আর এক দিন এসে খেয়ে যেয়ো কিন্তু।"

আরও একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার ফরমাস ছিল। ঠিকানা জানা ছিল না। প্রিয়নাথ বাবু, থুরি, মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেম, "ভি, আর, ভেঙ্কটশরণের বাড়ীটা কোথায় জানেন? কোন্ ডিপার্টমেণ্টের যেন এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী।"

"প্রচণ্ড বিস্ফোরণ" বলে একটা কথা বাংলা পত্রিকায় আজ-কাল প্রায়ই দেখা যায়। সেটা ঠিক কী রকম জানা ছিল না। প্রিয়নাথ রায়ের অবস্থা দেখে কিছুটা অনুমান করতে পারলেম।

"এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী? ভেঙ্কটশরণ বলেছে বুঝি? চাল, কেবল চাল। চাল দিতে দিতেই গেল মাদ্রাজীটা। জানে আপনি নতুন লোক, ধরতে পারবেন না। এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী, হুঃ। রিটায়ার করার দু'-এক বছর আগে যে হতে পারে সে তো ভাগ্যবান। এখন যুদ্ধের বাজার, তাই। সেকেণ্ড ডিভিসন ক্লার্কেরা পর্য্যন্ত সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হচ্ছে। নইলে মশায়, এ্যাসিষ্টেণ্ট হতেই যে চুলে পাক ধরে। আমি যে-বার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলাম, উর্ডহেড সায়েব—স্যার জন উডহেড, পরে বাংলাদেশের গভর্ণর অবধি উঠলো,—ডেপুটি সেক্রেটারী। ডেকে বললেন, রয়, তোমার মতো এমন কাজের লোক···।"

অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেম। অনিচ্ছাক্রমে এবং নিজের অজ্ঞ যে অপর লোকের গভীর মনস্তাপের কারণ হতে হয়, তারই দৃষ্টান্ত

ভেঙ্কটশরণের গৃহ আছে, গৃহিণী নেই। থাকলে বিপদ। তিনি প্রাচীনপন্থী হলে তাঁকে গলায় দড়ি দিতে হতো, আধু হলে প্রথমে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পলায়ন এবং পরে বাংলা সি নায়িকা। মাতাল বর নিয়ে ঘর করা যায়, কলহ করা অন্যানুরাগী স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু উদাসীন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার দুর্ভাগ্য নেই জগতে। প্রেম ভালো, বিদ্বেষ দুঃখের, কিন্তু সব মারাত্মক ইণ্ডিফারেন্স, যে কাছেও টানে না, দূরেও ঠেলে না, ভুলে থাকে।

ভক্তেরা বলেন, ধ্যান, জ্ঞান, নিদিধ্যাসন সমস্তই ভগবানে উ না হলে ঈশ্বর লাভ ঘটে না। বরদারাজলু ভেঙ্কটশরণ ভগবান্ প্রা জন্য উদ্‌গ্রীব নন। কিন্তু ভক্তের ঐকান্তিকতা নিয়েই আর করছেন সেক্রেটারিয়েটের। আপিস, আপিস, আর আপিস। কাজ, আর কাজ।

সকালে সাড়ে ন'টায় সবে মাত্র ফরাস যখন ঘর ঝাট দিয়ে তখন এসে বসেন নিজের টেবিলে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে যায় স আঁধারে, উর্দ্ধ ও অবস্তন কর্মচারীরা চলে যায় নিজ নিজ বা সহকর্মীরা একে একে করে প্রস্থান। একা ভেঙ্কটশরণ কাজ যায় অনন্যমনা। বাড়ী ফিরেন কখনও রাত আটটায়, কখনও তারও পরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ঐ একই ধারা। ছুটি ক্যাসুয়েল লীভ নেই। রবিবার দুপুরে অনেক দিন আসেন আপি ফাইল নিয়ে লেখেন নোট, ফ্ল্যাগ দিয়ে দাগ দেন, "ফ্রেস রি অথবা "পি ইউ সি", পেপার আণ্ডার কনসিডারেশান। বন্ধু-বান্ধ ঠাট্টা করে বলে, "ভেঙ্কট, কেবল খেটেই গেলে, জীবনটা করবে কখন?"

ভেঙ্কটশরণ হাসেন আর ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বোধ মনে মনে বলেন, ভোগ! হুঃ, থার্ড ডিভিসন ক্লার্ক থেকে সেকে সেকেণ্ড থেকে এ্যাসিষ্টেণ্ট, এ্যাসিষ্টেণ্ট থেকে সুপারিনটেণ্ড সুপারিনটেণ্ডেণ্ট থেকে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী। অনেকটা পা ভোগের জন্য জীবন তো আছেই পড়ে। চাই প্রমোশান, উন্নতি। চাকুরীরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

ভেঙ্কটশরণের অনুজ ছিলেন বিলাতে। আই, সি, এস মান সেখানেই পরিচয়। ভাইএর অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি তারও চরি আশা করি, একদা সিভিল লিষ্টের পাতায় নাম ছাপা হবে সগৌরবে

ভেঙ্কটশরণের স্বজাতীয়েরা নয়াদিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভার সরকারের দপ্তর গোড়াতে ছিল কলকাতায়। লালদীঘির কাছে বাড়ীতে এখন বাংলার লাট থাকেন, সেখানে বসতি ছিল ওয়া হেষ্টিংস থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জের। তখন সেক্রেটারিয়েটে বাঙ্গালী ছি বহু। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। তখন থে তাদের সংখ্যা হয়েছে হ্রাস; পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী নানা জা এসেছে ধীরে ধীরে। দখল করেছে চাকুরীর মসনদ। সে অভিযা মাদ্রাজীরা সর্বাগ্রে। তারা খাটে বেশী, ফাঁকি দেয় কম।

নয়াদিল্লীতে মাদ্রাজীদের ক্লাব আছে, সংঘ আছে, স্কুল আছে বোর্ডিং হাউসও আছে একাধিক। সেখানে স্কুলের ডেস্কের মত ছোট ছোট টেবিল। তার উপরে কদলীপত্রে আহার। চার আনা

মিলে খাদম, কুটু, সম্বর ও আপ্পালম। এক জন মদ্রদেশীয়ের নিয়মিত খাদ্য। কোন দিন ওর সঙ্গে পাওয়া যায় তৈয়রপত্তচডি অর্থাৎ নারকেলের কুঁচি সহযোগে দৈ। সে-দিন তো রীতিমত ভূরিভোজন।

শুধু অশনে নয়, বসনেও যথেষ্ট মিতাচারী দাক্ষিণাত্যের লোক। একখানা বিছানার চাদর দ্বিখণ্ডিত করে হয় পরিধেয়, একটি সাধারণ ফতুয়া দিয়ে গাত্রাবরণ। কাঁধে একটি তোয়ালে, পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল। ব্যস! আপিস ছাড়া সর্বত্র স্বচ্ছন্দ চিত্তে চলাফেরা করে এই বেশে। আর যাই হোক, পোষাক নিয়ে শোক করে না মাদ্রাজী কোন দিন।

তাদের মেয়েদেরও সজ্জা বাহুল্য-বর্জ্জিত। ভূষণ পরিমিত। অবশ্য সংখ্যায়। মূল্যে নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী গৃহিণীরও কানে আছে হীরার ফুল। তার দাম শুনে অনেক বাঙ্গালী স্বামী চক্ষে সর্ষে ফুল দেখবেন। বেশীর ভাগ মাদ্রাজী তরুণীদের রূপ নেই, কিন্তু রুচি আছে। তাদের গৃহদ্বার সকাল-সন্ধ্যায় আলিম্পনের দ্বারা সুদৃশ্য, তাদের কবরী-বন্ধন পুষ্পস্তবকে সজ্জিত। সঙ্গীতে দক্ষতা আছে প্রায় সবারই।

সদ্য-পরিচিত এক জন পদস্থ মাদ্রাজীর গৃহে আমন্ত্রণ ছিল ডিনারের। ভদ্রলোক দু'হাজার টাকা মাইনে পান। অথচ আহারের আয়োজন দেখে রসনার বদলে চক্ষু জলসিক্ত হওয়ার উপক্রম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পারদর্শিতা আছে বীণা-বাদনে। অপূর্ব্ব সুর সৃষ্টি করলেন তারযন্ত্রে। জঠর যদি বা রইল অভুক্ত, শ্রবণ হলো তৃপ্ত। স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্ষমা করা গেল তাঁর ভোজন-সভার অতি কৃপণ আয়োজন।

মাদ্রাজীদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের তফাৎ এইখানে। আচার এবং আচরণে পাঞ্জাবীরা শুধু মডার্ণ নয়, আলট্রা-মডার্ণ। যুবক, বৃদ্ধ, সবাই মিল করছে উর্দ্ধশ্বাসে বিলাতীর নকল। শুধু ছেলেরা হলে ক্ষতি ছিল না। মেয়েরাও।

রেস্, ক্লাব ও কার্ণিভ্যাল—অতি আধুনিকতার এই তিন তীর্থক্ষেত্রে পাঞ্জাবী মহিলারাই প্রধান পাণ্ডা। তাঁরা চার রাউণ্ড পেগ্ সাবাড় করতে পারেন হাসতে হাসতে। রজনীর শেষ প্রহর পর্য্যন্ত ফক্সট্রট নাচতে পারেন অক্লান্ত চরণে। তাঁদের দেহে শোভার চাইতে স্বাস্থ্যের অধিক। তাঁরা বিয়ের আদিতে তন্বী, অন্তে বিপুলা। তাঁদের বর্ণ গৌর কিন্তু আনন লালিত্যহীন। চাকর-চাকরাণীদের শাসন-কার্য্যে স্বহস্তে উত্তম-মধ্যম প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না এতটুকুও। দেহে কিম্বা মনে পাঞ্জাবিনীর নাইকো কোমলতা।

ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ভাবধারার প্রথম উন্মেষ ঘটলো বাংলাদেশে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রথম বরণ করলো বাঙ্গালী। সে-যুগের বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর, প্রতিভা ছিল প্রখর। ইংরেজের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সে গলাধঃকরণ করলো না, করলো গ্রহণ। আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জারক রসে পরিপাক করে তাকে সে একান্তরূপে আত্মসাৎ করলো। পশ্চিমের চিন্তাধারাকে সে ধার করলো না, ধারণ করলো। তাই বাঙ্গালীর মধ্যে সম্ভব হলো মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। সাহিত্যে, শিল্পে ও ললিতকলায় বাংলাদেশ সূচনা করলো সমৃদ্ধিযুক্ত নবযুগের, আনলো দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা। যৌবনকে দিল অভয় মন্ত্র, নারীকে দিল আত্মচেতনা। সে-দিন সর্ব্বভারতের অধিনায়িকার আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন বঙ্গজননী।

য়ুরোপের সংস্পর্শে সর্ব্বশেষে এসেছে পাঞ্জাব। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় শত বর্ষ পরে লর্ড ডালহৌসী দখল করেছিলেন পাঞ্জাব। কিন্তু য়ুরোপকে পাঞ্জাব অন্তরের মধ্যে পায়নি, শুধু বাইরে থেকে করছে অনুবর্ত্তন। য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে অনুসরণ করেনি অনুকরণ করেছে। সে ভারতবর্ষকে দেয়নি কাব্য, দেয়নি সঙ্গীত দেয়নি বিজ্ঞান বা দেশসেবার আদর্শ। আধুনিক ভারতবর্ষে তার দান একদল পি, ডব্লিউ, ডির এঞ্জিনিয়র, সৈন্যদলের সুবেদার এবং আই, এম, এসের ডাক্তার। একমাত্র লাজপৎ রায় ছাড়া পাঞ্জাবের আর কেউ হয়নি আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

কলকাতার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীঘির আকার চতুষ্কোণ। কিন্তু এখানকার গোল মার্কেট সার্থকনামা। সেটা গোলই বটে। চারটি রাস্তার সংগম-স্থলে বৃত্তাকার দ্বীপের মত এ-বাজারটি। দোতলা বাড়ী। উপরে দরজীর দোকান, নীচে শাকসব্জী, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি। পৃথক্ পৃথক্ কক্ষ। ইংরেজীতে লেখা আছে বিজ্ঞপ্তি,—কোনটাতে মাছ, কোনটাতে বা মাংস। প্রবেশ-পথগুলিতে সূক্ষ্ম তারের জাল-আঁটা দরজা। স্প্রিং দেওয়া আছে, যাতে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। মাছের ঘরটিতে উঁচু সিমেন্টের বেদীকে রাখা হয় মাছ। তার উপর দিয়ে গেছে জলের কলের সছিদ্র পাইপ। ছিদ্রপথে অবিরাম বিন্দু বিন্দু করে ঝরছে জল। আপনি ধুইয়ে নিচ্ছে বেদীটি। আইসচেষ্টের ভিতরে থাকে মাছ। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মাছির উপদ্রব নেই, কর্দ্দমাক্ত জল-সিঞ্চনে বসন পঙ্কিল হওয়ার আশঙ্কা নেই ক্রেতাদের। মার্কেটের দু'ধারে মনোহারী দোকান, মুদী ও ময়রা ইত্যাদি। বাঙ্গালীর দোকান আছে কয়েকটি। তার মধ্যে একটিতে মিলে দৈ, সন্দেশ ও অন্যান্য বাঙ্গালীর খাবার।

গোল মার্কেটের পথে লেডী হার্ডিঞ্জ কলেজ, ভারতবর্ষে পুরুষের সম্পর্কশূন্য একমাত্র মহিলা মেডিক্যাল কলেজ। বিদ্যার্থিনীদের মধ্যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আছে, মাদ্রাজী আছে, মারাঠী আছে, বাঙ্গালী নেই একটিও। এক পাঞ্জাবী অধ্যাপক-বন্ধুর শ্যালিকা পড়েন ফোর্থইয়ারে। সুদর্শনা। বাংলার বাইরে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে সুন্দরীর সাক্ষাৎ মিলে। রূপের অভাবটাই সেখানকার মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার কারণ নয়। পড়াশুনাটা নয় বিয়ের আগের টপ্ গ্যাপ্।

মেয়েটি মেধাবী, ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পরীক্ষায়। বললেন, মেডিসিনের চাইতে সার্জ্জারীতে আগ্রহ বেশী। পাশ করে হবেন সার্জ্জেন। সর্ব্বনাশ!

প্রাচীনারা হাতে ধরতেন সম্মার্জ্জনী। ঘরের মেঝে থেকে অবাধ্য স্বামীর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তার অপক্ষপাত ব্যবহারের দ্বারা সংসারযাত্রাকে তাঁরা নিরঙ্কুশ রাখতেন। আধুনিকাদের হস্তে শোভে ভ্যানিটি ব্যাগ। তার গর্ভে নিহিত প্রসাধন সামগ্রী নিজের স্বামীর হৃদয়ে ত্রাস এবং পরের স্বামীর হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। অতি-আধুনিকারা যদি ধরেন ফরসেপ্স তবে বেচারী পুরুষ জাতিকে আত্মরক্ষা সমিতি স্থাপন করতে হবে অচিরে! রসবোধ আছে তরুণীর। কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

লেডী হার্ডিঞ্জে বাঙ্গালী ছাত্রী না থাকলেও অধ্যাপিকা আছেন এক জন। মহিলার এক ভাই আই, সি, এস, এক ভাই আই, এম, এস, দুই ভাই একাউন্টস্ সার্ভিসের উচ্চপদস্থ অফিসার। এক বোন শিল্পী।

ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা—ইণ্ডিয়ান ফার্মিংএর চিত্র সম্পাদিকা। অন্যান্য ভাই-বোনেরাও সকলেই কৃতী। তিনি নিজে ডব্লিউ, এম, এস, অর্থাৎ আই, এম, এসেরই মহিলা-সংস্করণের অন্তর্ভুক্তা। মাইনে পান অনেক, ডাক্তারী করে আয়ও করেন যথেষ্ট। ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক ভাষণ, সহৃদয় আচরণ। লেডী ডাক্তারী গন্ধ নাই তাঁর চরিত্রে। কলেজের সংলগ্ন সরকারী কোয়াটার। সেখানে গৃহসজ্জায় গৃহস্বামিনীর সুরুচির পরিচয় পরিস্ফুট।

নয়াদিল্লীতে মহিলা-ডাক্তার আছেন একাধিক। যুক্তপ্রদেশের আছেন জন-দুই। লেডী হার্ডিঞ্জের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি মদ্রদেশীয়। একটি আছেন পাঞ্জাবী। এর জনক ধরমবীর পাঞ্জাবে সুপরিচিত, জননী য়ুরোপীয়া। তাঁরা দু'জনেই জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ। মহিলা বিয়ে করেছেন একটি বাঙালী। এরা দু'জনেই ডাক্তার। স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই রাজনীতিক বা স্কুল মাষ্টার হওয়ার চাইতে ভালো। পলিটিক্যাল ইকনমির মতো দাম্পত্যেও ডিভিসন অব্ লেবার আছে। সেখানে স্ত্রীর অংশ কথা বলার, স্বামীর অংশ কথা শোনার। দু'জনেই বক্তা হলে গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যরক্ষায় নিদারুণ বিঘ্ন ঘটে।

কনট্ প্লেসকে বলা যায় দিল্লীর চৌরঙ্গী। সাহেবী এবং সাহেবী ধরণের দোকান-পসার সেখানে। স্যুট বানাবার দর্জ্জী, ফটো তোলার ষ্টুডিও, প্রভিসানসের ষ্টোর, চুলে ঢেউ খেলাবার বিউটি পার্লার, লাঞ্চ খাওয়ার হোটেল, সিনেমা দেখার ছবিঘর—সবই এই কনট্ প্লেসে। শুধু চৌরঙ্গী নয়, ক্লাইভ ষ্ট্রীটও। ব্যাঙ্ক ও আপিসপাড়াও এইটেই। বার্ড কোম্পানীর পেটেন্ট ষ্টোন, মার্টিনের টাইলস, ডালমিয়ার সিমেণ্ট কিনতে হলে আসতে হবে কনট্ প্লেসেরই আশে-পাশে।

কনট্ প্লেসের নামকরণ হয়েছে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের পিতৃব্য পরলোকগত ডিউক অব কনটের নামে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মসের ফলে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের সৃষ্টি। তারই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে ভারতে আসেন তিনি। জালীওয়ানাবাগের নরঘাতন নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তখনও স্পষ্ট জাগ্রত ভারতীয়দের মনে। বৃদ্ধ ডিউকের উদ্বোধন-বক্তৃতায় তার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, ছিল আন্তরিকতার সুর ;—"দু' পক্ষেই ভুল-ত্রুটি ঘটেছে বিস্তর। আজ তার পর্য্যালোচনায় প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা সবাই অতীতের কথা বিস্মৃত হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি। ফরগিভ্ এ্যাণ্ড ফরগেট।" কিন্তু ফরগেটনেস তো চলে শুধু সমানে সমানে। শাসক-শাসিতের মধ্যে তার স্থিতি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতোই ক্ষণিকের। মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন করে স্মরণের কারণ ঘটে এক পক্ষের ক্ষমতাগর্ব্বিত আস্ফালন ও অপর পক্ষের নিরুপায় নিস্ফল আর্ত্তনাদ। জালীওয়ানাবাগ ভুলতে না ভুলতে আসে হিজলী, তার স্মৃতি শূন্যে মিলোবার আগে ঘটে কাঁথী বা তমলুক।

কনট্ প্লেসের আকৃতি গোলাকার। বৃত্তের ভিতরের দিকে মুখ করে এক সারি দালান। তার পিছনে অনুরূপ এক সারি। তাদের মুখ বাইরের দিকে। সেটার নাম কনট্ সার্কাস। রোমান পদ্ধতির বিরাটাকার থামের উপরে প্রসারিত বারান্দা। সেখানে অপরাহ্ণ বেলায় ভীড় জমে সুবেশ নরনারীর, সওদা করে সৌখীন ক্রেতারা, আলোকোজ্জ্বল শো-কেসে বিচিত্র দ্রব্যের দর্শন কৌতূহলী জনতা।

দালানের পরেই প্রশস্ত রাজপথ। তার ঠিক মাঝখানে দাগ দিয়ে পার্কিংএর নির্দ্দেশ, সেখানে থাকে অপেক্ষমাণ মোট[র] ও টাঙ্গা। দু'পাশ দিয়ে চলে যানবাহন। রাস্তার পরে বিস্তীর্ণ [মাঠ], লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা ফুটপাথ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানে বিশ্রামা[র্থীদের] জন্য আছে বেঞ্চি, ক্রীড়াচঞ্চল শিশুদের জন্য আছে তৃণাচ্ছাদিত [ভূমি] এবং পুষ্পবিলাসীদের জন্য আছে অজস্র ফুলের আয়োজন।

ঘাস জিনিষটার মূল্য যে কত তা জানা নেই বাংলা[র]। যেখানে দু'দিন না হাঁটলে পায়ের তলায় গজায় ঘন ঘাসের [স্তর]। অপদার্থ ব্যক্তিকে ঘাস খেতে বলে গাল দেওয়ার উপায় নেই উ[ত্তর] ভারতে। ভাতের চাইতে সেটা অনেক বেশী দুর্ঘট। গ্রীষ্মে[র] সূর্য্যের তাপ যেখানে একশ' তেরো ডিগ্রীতে ওঠে এবং সারা [বছরে] যে দেশে মাত্র কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, সে-দেশে ঘাস জন্মাতে প্রয়া[স] প্রয়োজন। নয়াদিল্লীর কনট্ প্লেসের প্রত্যেকটি ঘাস হাতে [রো]বোনা এবং হাতে ধরে বাঁচানো। সরকারী হর্টিকালচার ডিপার্ট[মেন্ট] থেকে যে পরিমাণ যত্ন, জল ও অর্থ ব্যয় করা হয় তার হিসা[ব] যে কোন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের জ্বালাময়ী প্রবন্ধ রচ[নার] উপাদান হতে পারে অনায়াসে।

ফুল সম্পর্কে আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষ করে বাঙালী যথেষ্ট সচেতন নই। ফুল এবং চাঁদের আলো একমাত্র ক[বিতা] ম্যাগাজীনে কিশোর-বয়স্কদের প্রথম পদ্য রচনা ছাড়া আর কে[ান] কাজে লাগে বলে জানা নেই। আর্টিষ্টিক জাতি বলে বাঙালী[র] মনে যে আত্মাভিমান আছে সে নিয়ে তর্কে জেতা যায়, কি[ন্তু] তথ্য দেওয়া যায় না। সাধারণ স্বল্পবিত্ত ইংরেজ-পরিবা[রে] খাওয়ার টেবিলে বা বসার ঘরে সামান্য কিছু ফুলের সন্ধ[ান] মিলে নিশ্চিত। অতি স্বচ্ছল বাঙালীর গৃহে পুষ্পগুচ্ছের [চিহ্ন] দেখা যায় কদাচিৎ। অর্থের প্রশ্ন নয়, রুচির প্রশ্ন। বেশীর ভ[াগ] বাঙালী-পরিবারে ফুলের প্রয়োজন হয় জীবনে মাত্র দু'বার[—] ফুলশয্যার রাত্রিতে এবং শবাধার সজ্জায়।

পুরাকালে পরিবারে গৃহদেবতার পূজার রীতি ছিল। সেজ[ন্য] প্রয়োজন ছিল গন্ধপুষ্পের। বাড়ীতে থাকতো দু'-একটি ফুলে[র] গাছ। আধুনিকতায় গৃহদেবতার স্থান নেই। পূজা যদি করতে হয়, তবে পাথরের ঠাকুর অপেক্ষা রক্তমাংসের দেবতাদের [পূজা] করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ফল মিলে হাতে হাতে। তাই এযুগে আমাদের ভজন-পূজন হয় আপিসের বড় সাহেব, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতার। আমাদের ঠাকুরঘরে জায়গা ড্রয়িং রুম দখল করেছে। কিন্তু জবা, দোপাটি [ও] নাগকেশরের স্থান কার্নেশান, ডালিয়া বা গ্ল্যাডিওলাস এসে পূ[রণ] করেনি। সখীপরিবৃতা আধুনিকা শকুন্তলাকে পুষ্পবীথিকায় তরু আলবালে জলসিঞ্চনরতা দেখার সম্ভাবনা মাত্র নেই। তা[ই] দর্শনাভিলাষে দুষ্মন্তকে যেতে হবে মেট্রো সিনেমায়, নয়তো লেকে। কলকাতায় ফুল যে লোক ঘরে রাখে সে নেহাৎই ফুলবাবু।

এ শহরে ফুলের সাক্ষাৎ মিলে প্রচুর। পথের দু'পাশে সরকারী বাংলোগুলির বিস্তৃত অঙ্গন পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। পথচারীদে[র] দৃষ্টি মুগ্ধ হয়। রাস্তার চৌমাথায় বৃত্তাকৃতি পার্কগুলিতে আছে

ফুলের কেয়ারী। ডাকঘরের গায়ে, হাসপাতালের মাঠে ফুটে রয়েছে মর্সুমী ফুল রাশি রাশি। কনট্ প্লেসে আছে "কেনা" ফুলের ঝাড়। শীতের দিনে তাদের পুষ্পাভরণের অজস্রতা কল্পনা করা যায় গ্রীষ্মের ভগ্নাবশেষ দেখেই।

নয়াদিল্লীর আকাশে আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিঃস্বের হতাশ্বাস, মাটিতে আছে তপস্বিনীর কাঠিন্য। কিন্তু তার পথপার্শ্বে সযত্ন-রোপিত তরুশ্রেণী পথচারীর জন্য প্রসারিত করেছে ছত্র-ছায়া, তার শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিৎ অঞ্চল, তার বহু বিচিত্র কুসুমের দল রচনা করেছে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রজাল। প্রণয়ি-যুগলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবেষ্টন আছে নয়াদিল্লীর সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে তার জন-বিরল, ধ্বনি-বিরহিত গন্ধ-বিহ্বল পথে পাশাপাশি চলতে গিয়ে সদ্য বিবাহিত তরুণ-তরুণীর হৃদয় উদ্বেল, কণ্ঠ হয় ক্ষীণ, নত হয়ে চুপি চুপি বলতে অভিলাষ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ কোন কথা যার না আছে অর্থ, না আছে সংহতি, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই স্তব্ধ সায়াহ্নে এক জনের ঝুমকাদোলানো কানের অত নিকটে আর এক জনের মুখ আনতে গেলে তা' দু'-একবার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়াও একেবারে বিচিত্র নয়।

[ক্রমশঃ।

একটি সবুজ রাতে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সবুজ সন্ধ্যার মত পৃথিবীর সব রং মুছে দিয়ে
ঝিলিমিলি ঘাস নীল রাত নামে—সবুজাভ রাত ;
একা একা পথ চলি বালুতে-কঙ্করে পথ দু'পায়ে গুঁড়িয়ে
বহু দূরে—ক্রোশার্দ্ধ ছাড়িয়ে
অশ্বত্থ-ছায়ায় দাঁড়ালাম
মুছে ফেলে ঘাম।

এখনো অনেক পথ অরণ্য, কাঁটাল, বটগাছ হ'য়ে পার
যেতে হবে—ঝাড় ভেঙ্গে কল্মী লতার
ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে কত শ্রমের পাহাড়।
অশ্বত্থ-ছায়ায় ব'সে দূরে দূরে চেয়ে চেয়ে দেখি :
আর ভাবি, রাত নেমেছে কি
সবুজ সন্ধ্যার মত রাত ?

একটু অরণ্য ঘেঁষে রাতের আঁধারে,
অস্পষ্ট দুইটি মূর্ত্তি পাশাপাশি ব'সে যেন—দু'টি নদী
থেমে গেছে বালু-চক্রবালে ; বারে বারে
উহাদের বিশ্রম্ভালাপ
রক্তের সমুদ্রে আনে চাপ।
—ওরা কা'রা ? পৃথিবীর সেই সব মেয়ে ও পুরুষ
পান করে নিরিবিলি
সবুজ সন্ধ্যার মত কত রাতে
ভালবেসে কথার প্রদীপ জেলে ধরে।
—ওরা ব'সে কত রাত করে ?

হয়ত কিছুই নয়
আমার হৃদয় তবু স্বপ্নে হিরণ্ময়
সবুজ সন্ধ্যার মত রাতে
অশ্বত্থ-ছায়াতে।

জয়তু নেতাজী

শ্রীগজেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার

বাঙ্লা মায়ের শান্ত ছেলে—বিষের জ্বালা বক্ষেতে,
অশ্রু যে তার শুকিয়ে গেছে, আগুন জ্বলে চক্ষেতে।
তেপান্তরে কাটায় জীবন—সন্ন্যাসী সে ঘরছাড়া,
প্রতিশোধের তপস্যাতে মগ্ন সদা, নাই সাড়া।
সহসা তা'র ধ্যান ভেঙে যায়, দৈববাণী—'রক্ত চাই !'—
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভাঙ্তে ছুটে চল্লো তাই!

কোন্ অ-জানা শক্তি আসি' আসন নিলো অন্তরে,
'জয় হিন্দ্' আর 'দিল্লী চলো'—মাত্র দু'টি মন্তরে—
বন্দিনী-মা'র মুক্তি-রণে ক'রে নূতন দীক্ষিত—
'আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ' গড়ি'—ক'র্লো তা'দের শিক্ষিত।
মোহনীয়া যাদুকরের যাদুর মোহন স্পর্শেতে—
মরণ-নেশায় ঘুমন্ত-প্রাণ উঠ্লো নেচে হর্ষেতে।
গগন-পবন মুখর করি'—কাঁপায়ে দেশ-দেশান্তর,
কর্ম্মযোগীর মন্ত্র প্রাণে আন্লো সে-এক যুগান্তর।

'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা'—জয়-যাত্রার পথ বেয়ে,
বক্ষে নিয়ে মুক্তি-বাণী—'খুশী কা গীত' যায় গেয়ে।
মায়ের পূজার বলিদানে চাই যে আপন পুত্র রে,
মন ছুটে যায় পেয়ে সবুজ কিশোরদলের সূত্র রে।
অপুত্রকের পুত্র হ'লো—রক্ত-লেখায় অঙ্কিত,
বীর সেনানীর পায়ের চাপে পৃথ্বী হ'লো কম্পিত।

আস্লো ছুটে পিতার ডাকে—'ঝাঁসীর রাণী' কন্যা রে,
পথের বাধা পিছন ফেলে—বন্ধনহীন বন্যারে,
নূতন গুরু—মন্ত্র নূতন, নূতন সেনার অভ্যুদয়,—
কণ্ঠ অযুত উঠ্লো গাহি'—'জয়, নেতাজী, তোমার জয়!'
ঘর-ছাড়া সেই সন্ন্যাসী বীর—তুমি সুভাষ, বাঙলা-মা'র,
দেশ-গৌরব, জন্মদিনে, জানাই প্রাণের নমস্কার!

খুশনজরজী

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

রাজার 'সালগিরা' অর্থাৎ জন্মতিথি উৎসব এসে পড়েছে।

মাজী সাহেবদের (রাজমাতাদের) প্রাসাদ থেকে অন্তঃপুরের মহারাণীর প্রাসাদ, অন্য রাণীদের সৌধ অট্টালিকা প্রাসাদ পর্দায়েৎ পাশোয়ানদের মহলে মহলে নাচ-গান পান-ভোজনের নানা তালিকায় উৎসব শুরু করার যোগাড় হচ্ছে। সর্দ্দার খোজা খুশনজরজীর কাজের ভিড়ের শেষ নেই।

ক্ষীণকায় বার্দ্ধক্যে শীর্ণ ঈষৎ আনমিত দেহ খুশনজরজী অন্তঃপুরের পর অন্তঃপুরের—প্রাসাদের পর প্রাসাদের মহলের পর মহলের অলি-গলি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন পোষ্যপুত্র খুদাবক্স।

খুশ্‌নজর ওঁর নাম নয়, 'খুশনজর' খেতাব ; যার অর্থ, যাকে দেখলে চোখে প্রীতির উদ্রেক হয়। নাম ওঁর আল্লাবক্স। দীর্ঘ কাল আকৈশোর বা আবাল্য রাজদরবারে অন্তঃপুরে সমস্ত তত্ত্বাবধান করেছেন ; রাজার প্রিয় প্রয়োজনীয় বহু কার্য্য সম্পন্ন করেছেন ; এবং অন্তঃপুরিকাদের—প্রাসাদবাসিনীদের তেমনি কারণহীন অপ্রীতি-কর কর্ত্তব্যও বহু করতে হয়েছে। পুরস্কারস্বরূপ বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে রাজদরবার থেকে যার জন্য খুশনজর খেতাব লাভ করলেন, আর 'খেলাত' পেলেন বছরে তিন হাজারের জায়গীর। হয়ত রাজার জন্মতিথির আগামী উৎসবে 'তাজিমী'র সম্মানও পাবেন। 'তাজিমী' অর্থে রাজাকে ও তাজিমীপ্রাপ্তদের জন্য উঠে সম্মান ও সমাদর জানাইতে হয়।

মহারাণীর অন্তঃপুরের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হ'ল। মাজী-সাহেবের প্রাসাদেও পুত্রের জন্মতিথি উৎসবের নিয়ম-অনুষ্ঠান পূজা-পাঠ মিষ্টান্ন পাঠানোর সব ব্যবস্থা করা হল। বাকি অন্য রাণীরা এবং 'পর্দায়েৎ' 'পাশোয়াল'। যাঁরা কেউ কেউ এবারে রাজার কাছে 'তাজিমী' পাবেন সোনার মল পাঁইজোরএ ভূষিত হবেন।

যার কথা কেউ জানে না, কেঁ আভাস মাত্র জানে, এ সব ি আভাস সকলের আগে 'খুশনজ পান। অন্তঃপুরের কখন কার ভ মালা আছে, কার ভাগ্যে জ্বালা ে একটুখানি খুশনজরজীই বলতে পারে

মহলের পর মহল অতিক্রম করে খুশনজরজী। কোনোখানে শুধু নিম আমন্ত্রণ করে চলে যান, কোনঃ ছোট-বড় ষড়যন্ত্র-তোষামোদের কাহি গোচরে আসে। আর আসে-পাশে দাঁড়ায় নানা রঙয়ের ওড়না কুর্ত্তা পাজ পরা পরম রূপবতী, সুশ্রী, টানা চে সুরমা-কাজল আঁকা বালিকা পাত্রি বিচিত্র ঘাগরা ওড়না-পরা একটু বড় বয় তরুণী যুবতী সখীরা। কেউ-বা রাজ চোখে কখনো পড়েছে, কখনো অগোচর রয়ে গেছে। আজন্ম আবাল্য অন্তঃপ বাসিনী, একান্ত নারী-জগৎবাসিনী যারা শুধু উৎসবের জলশায় নতুন ক বাহির-জগতের কথা শুনতে প খুশনজরজীর কাছেই ; তাদের কৌতূহলের সীমা নেই। রাওলার রাওলার (মহলের)—দরজা খোলে, আর আস্তে আস্তে তারা এ একটি করে এসে, মখমলের ওপর জরীর কাজ করা চোগা মাং জরীর টুপী সাদা চুড়ীদার পাজামা ও জরীর নাগরা পরা খুশনজরজী ও তাঁর পোষ্যপুত্র পরম সুন্দর সুশ্রী দীর্ঘকায় খুদাবক্স ঘিরে দাঁড়ায়।

পুরুষহীন নিরাপদ্ অন্তঃপুরে এই বহু যুগান্তরের নারী-শান্তি মাঝে মাঝে দাসী-সন্তান জন্ম ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ছাড়া কোনো নূত ঘটনা প্রায় ঘটে না। আর কোনো নূতন বার্ত্তাও আসে না বাহি থেকে। এবং পৌরুষহীন পুরুষ খুশনজরজীকে তাদেরও ভয় নে অন্তঃপুরবিলাসী কর্ত্তৃপক্ষেরও ভয় নেই।

ছোট ছোট 'পাত্রী'রা এসে পরম বিস্ময় কৌতূহলে খুশনজরজী জরীর জুতার কারুকার্য্য দেখে, জামার ওপর হাত বুলিয়ে জরী কলকার আয়তন পরিমাণ করে। কেউ বা উৎসবদিনের খাদ্য আহার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। আর তরুণী সখীরা কখনো জরী নাগরা লুকিয়ে তাদের পায়ের ছোট লাল জুতা রেখে যায়। কখনো আবেদন করে, কিছু 'সুর্‌মা', বা নূতন জামা কাঁচুলীর ছিটের জন্য বেণী-বন্ধনের রঙীন রেশমের সূতার জন্য। হরিণীর মত সরল দীর্ঘায়ত কাজল পরা চোখ উজ্জ্বল হাসি কথা কৌতুকের মাঝে চকিত ও ত্রস্ত হয়ে ওঠে থেকে থেকে। পাছে তিনি অসন্তুষ্ট বা বিরূপ হন। কিন্তু বৃদ্ধ খুশনজরজী পরম স্নেহে ও করুণায় তাদের আবেদন শোনেন, তাদের কৌতুকে হাসেন, আর প্রশ্নের জবাব দেন। নিমন্ত্রণ শেষ হয়ে আসে। দিনও শেষ হয়ে এলো।

প্রাঙ্গণ থেকে গলি-পথ, তার পর সুড়ঙ্গ-পথ, আবার কারো মহলের আঙিনা, আবার সুড়ঙ্গ—পিতা-পুত্রে অতিক্রম করে যান। সুড়ঙ্গ-পথে দিবালোকেই অন্ধকার—তার বহু দূর কোণে কোণে

স্তিমিত প্রদীপ-শিখা পথিকের পথ নির্দেশ করে। উপরের ছোট বাতায়পথে সন্ধ্যার আলোও মিলিয়ে আসে।

খুশনজরজী একটি মহলের খোলা অলিন্দে সান্ধ্য-নমাজ সেরে নিলেন।

এবার পাশোয়ানজী প্রেম রায়ের মহল।

সুড়ঙ্গ-পথের নীচে পড়ে দাসী পাত্রীদের সখীদের পদানুযায়ী কক্ষাবলী।

২

খুশনজরজী নতশিরে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করছিলেন, সহসা গলির মোড়ের কোণে দীপ-শিখা থর থর করে কেঁপে উঠ্‌ল। একটি গোলাপী ওড়না মাথায় ঢাকা একটি পরম সুন্দর মুখ এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল।

খুশনজরজী চকিত ভাবে চাইলেন, বুঝলেন, প্রেম রায়ের মহলের কোনো বালিকা পাত্রী কৌতুক করবার জন্য এসেছিল। কিম্বা হয়ত পৃথক্‌ ভাবে কিছু আবেদন করতে চায়। সুড়ঙ্গের এ মোড় শেষ হয়ে গেল। সুমুখে বহু দূর আবার অন্য মোড়ের অপেক্ষায় সোজা পথ পড়ে আছে, এবং সুদূর অপর প্রান্তে তারও একটি বৃহৎ প্রদীপ জ্বলছে।

বিস্ময় ও সংশয়ভরে বৃদ্ধ একটু থামলেন ও সামনে চাইলেন। কেউ কোথাও নেই। পিছনে চাইলেন, পুত্র পিছনে আসছেন।

পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সামনে কাকে দেখলে না!'

আশ্চর্য্য হয়ে পুত্র বললেন, 'না, কাকে?'

একটু চুপ করে পিতা বললেন, 'দেখ তো, সামনে কোনো 'বাঈ' (কন্যা) লুকিয়েছে কি না। আমি অন্ধকারে যেন কাকে দেখলাম! কাবেরী বাঈ? না',—কিন্তু থেমে গেলেন আর কোনো নাম বললেন না।

খুদাবক্স সুড়ঙ্গ-পথে এগিয়ে গেলেন। তাঁর গায়ের বাতাসে ও-কোণের প্রদীপ কেঁপে উঠল এ-কোণের প্রদীপের মত।

পুত্র ফিরে এলেন, বললেন, 'না, কেউ তো নেই।' তার পর বললেন, 'আর এখনো তো 'রাওলা'র (মহলের) চাবী খোলেনি। আসবার 'হুকুমনামা' না পেলে তো কেউ দরজা খোলা রাখবে না।'

পিতা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তো। চল তবে।'

প্রেম রায়ের মহলের দুয়ার খুল্‌ল।

বালিকা পাত্রী, তরুণী সখী, যুবতী সহচারিণী দু'-চার জন সেলাম করে এসে দাঁড়াল। খুশনজরজী সস্নেহে শান্ত হাস্যে সকলের সঙ্গে কথা কইলেন। প্রেম রায়ের কাছে নিমন্ত্রণ জলসায় উৎসবের আলোচনা ব্যবস্থার কথাও শেষ হল।

শুধু গোলাপী রঙের ওড়না পরা কোনো সুন্দর মুখ চোখে পড়ল না।

জন্মতিথি বা 'সালগিরা'র উৎসব যথারীতি পদানুসারে—পাত্র অনুসারে 'খেলাত' 'খেতাব' 'জায়গীর' 'তাজিমী' ভোজ্য পানীয় বিতরিত হয়ে শেষ হয়ে গেল। সুন্দরী রূপবতী নবীনা সখীরা কেউ কেউ 'পার্দায়েৎ' হলো। যুবতী পাত্রীরা সখীদের পর্য্যায়ে পড়ল। 'তাজিমী'র সম্মান পেলেন খুশনজরজী, সঙ্গে পেলেন সোনার পদভূষণ। পুত্র খুদাবক্সও পারিতোষিক পেলেন স্বর্ণখচিত শিরোপা।

এবং মহলে মহলে প্রাসাদের বিভাগে বিভাগে—সকল রাণীর অন্তঃপুরে ও সখীদের নাচে গানে নিমন্ত্রিতদের পান-ভোজনে সোনা রূপার মোহর-মুদ্রার 'ভেট' 'নজরে' উৎসব শেষ হয়ে গেল।

৩

প্রহরী এসে দাঁড়াল খুদাবক্সএর ঘরের সামনে। বললে, 'খুশনজরজী সেলাম দিয়েছেন।' ভাদ্র মাসের গরম। খসখসের পর্দা ফেলা, আধ অন্ধকার কক্ষতলে শ্বেত মর্ম্মর চৌকীতে খুশনজরজী শুয়েছিলেন। সুমুখে প্রকাণ্ড জরী-জড়ানো আলবোলার নল নীচের গালিচার উপর পড়ে আছে। মাথার জরীর টুপীটাও খোলা রাখা রয়েছে। মাথার ওপর টানা পাখা মৃদু ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

খুদাবক্স অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আব্বাজান, আপনার শরীর কি অসুস্থ?'

গালিচার পাশে পুত্রকে আসন গ্রহণ করতে ইঙ্গিত করে পিতা বললেন, 'না' অসুস্থ নয়।'

খুদাবক্স চুপ করে বসে আদেশের বা বক্তব্য শোনার অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরম সুন্দর সুশ্রী দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ খুদাবক্সের দিকে খুশনজরজী অন্য মনে চেয়েছিলেন।

ছোট্ট রোগা, শীর্ণকায় অনুজ্জ্বল তামার মত রঙ। সাদা চুড়ীদার পাজামা আর আঁট সাদা আচকান পরা খুশনজরজীকে পিছন হতে যেন বালকের মত মনে হয়। গালিচার পাশে রাখা জরীর জুতা জোড়াটিও যেন ছোট বালক বা মেয়েদের পায়ের বলে ভ্রম হয়।

তাঁকে দেখলে তিনি খুদাবক্সের যে কেউ নন তা বোঝা যায়।

চৌকীর পাশে গালিচার ওপর একখানি চিঠি পড়েছিল। খুশনজরজী চিঠিটা হাতে করে তুলে নিলেন। তারপর বললেন, 'তোমার কি তোমার মাকে মনে আছে?'

খুদাবক্স মাথা নাড়লেন, মনে আছে।

'তোমার মার কথা তো তুমি কিছুই জানো না? কেমন করে এখানে তিনি এলেন, আমার কাছে রইলেন?' খুশনজরজী চুপ করলেন পুত্রের পানে চেয়ে।

'জী, না' বলে খুদাবক্সও আর কিছু বললেন না। প্রশ্ন করা আদবকায়দা বহির্ভূত, জিজ্ঞাসু ভাবে বসে রইলেন।

'তোমার মাকে আমি দেখি দিল্লীতে প্রথম। সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। 'হুজুরসাহেব' (মহারাজা) দিল্লী গেলেন—হরিদ্বার বৃন্দাবন সব যাবেন। আমাকে সব বন্দোবস্ত করবার জন্য আগে যেতে হ'ল। মহারাণী যাবেন, পার্দায়েত সখীরা কতক জন যাবে। কোথায় কি ভাবে থাকার ব্যবস্থা তাদের হবে, আর অন্তঃপুরের নানা কাজ, জান তো অন্য লোকের ওপর ভার দেওয়া নিয়ম ছিল না।

তখন আমার বয়স তোমার এখনকার চেয়ে বেশী বটে, কিন্তু বুড়ো হইনি।

হঠাৎ আমাকে আমার দিল্লীওয়ালা এক বন্ধু বললেন তোমার মা'র কথা। তাঁদের কোন্‌ দূর-আত্মীয়ের স্ত্রী তিনি, বিধবা হয়েছেন—তোমাকে নিয়ে বড়ই অসুবিধায় পড়েছেন। বয়স কম, দেখতেও ভাল ছিলেন, কিন্তু আবার বিবাহ করতে ইচ্ছুক নন। কোথাও থাকতেও পারেন না, কেউ রাখতেও চায় না। [illegible]

অর্থাভাব তো ঘটেই। তোমার বাবার একটা কাচের বাসনের দোকান ছিল, সে দোকান তাঁর মৃত্যুর পরই উঠে গেছে।

আমি অনেক দিন ধরেই আমার বাড়ীতে কোনো স্ত্রীলোকের অভাব বোধ করছিলাম। কিন্তু আমাদের ঘরে আর স্ত্রীলোক কি জন্ত আসবে! কোন্ সম্পর্কের সম্মান তাকে দোব!"

খুশনজরজী আবার একটু চুপ করলেন।

পুত্র নতশিরে পা মুড়ে করতল বদ্ধ হয়ে পিতার কথা শুনছিলেন।

পিতা বললেন, 'আর আমি কি করে এখানে এলাম, তাও তোমাকে কখনো বলিনি। আমাকে আমার কোন এক আত্মীয় আমার আগে এই পদে যিনি ছিলেন তাঁকে বেচে দিয়েছিলেন, তিনি ও আমরা খুব গরীব ছিলাম। আমি তখন শিশু। আমার কিছুই বিশেষ মনে পড়ে না। আমি আমার আর কোনো পরিচয়ই জানি না, এই পালক-পিতা ছাড়া। আর তিনিও আমাকে কবে এই পদের উপযুক্ত করে নিলেন তাও আমি জানি না।'

বাইরে থেকে খসখসের পর্দার জল ছিটিয়ে গেল ভিস্তি এসে, ঘরের হাওয়া আরো শীতল হয়ে উঠল।

'যাক্। তার পর তোমার মার কথা শোনো। আমাদের ঘরে স্ত্রীলোক আনার কোনো অর্থই নেই, কি ভাবে তাঁকে আনি, বললুম তোমাকে। আমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম, সেই বন্ধুকে দিয়ে, আমার কথা সব বলে; যদি তিনি আসেন, আমার আত্মীয়ার মতই সম্মানে তিনি থাকতে পাবেন। সংসারিক সুখ-শান্তি স্নেহ মমতার অধিকার আমাদের নেই, এই পদের অবশ্যম্ভাবী অবস্থা যেটা। তবু যা পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে তোমাকে আমি দেখেছিলাম বন্ধুর বাড়ীতে। আমার লোভ হ'য়েছিল তোমার ওপরেও। যেমন অপত্যহীন লোকের ধনের ওপর 'যখ' দেওয়ার লোভ হয় শোনা যায়। তেমনি আমাদের এই পুরুষানুক্রমিক পদের মোহ ধনের লোভ আমারও কেমন মনের মধ্যে লুকিয়েছিল। তোমাকে দেখে মনে হল, তোমাকে আমার পদের উত্তরাধিকারী করতে পারব, হয়ত তোমার দরিদ্র জননী আপত্তি করবেন না। দরিদ্রের কাছে ধনের মোহ—সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ তো কম নয়?' বলে একটু থেমে তিনি আলবোলার নল তুলে মুখে দিলেন কিন্তু আগুন নেই, নিবে গেছে। পুত্র তাম্রকুট-বরদারকে ডাকলেন। বেলা আর নেই। দক্ষিণের দুয়ারের খসখসের পর্দা তুলে দিতে ভৃত্যকে আদেশ করে বৃদ্ধ আলবোলার নলে মুখ দিলেন। ঘরে আলো ভরে গেল। আরাবল্লীর পশ্চিমের ছোট একটি শিখরের পাছে সূর্য্য হেলে পড়ছিল। রাজপুতনার অসহ্য গরমেও ঘরে বর্ষায় ভরা দুর্গ-পরিখা তালকাটারার উপর থেকে উষ্ণ ও স্নিগ্ধ একটা মিশ্র হাওয়া বয়ে এলো।

বৃদ্ধ বললেন 'আর আমি তোমাদের দু'জনকেই পেলাম। তুমি ছিলে দু'বছরের শিশু। আর তোমার মা ছিলেন বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। তাঁর নাম ছিল 'নুরনেহার।' তিনি মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন। আমার তাঁর কাছে তোমাকে নেবার অনুমতি নেওয়া হয়নি। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হল, সামান্য অসুখে। আমি আগে অনুমতি নিতে ভরসা করিনি। পাছে আপত্তি করেন। আর বাধা রইল না, তুমি আমারই হয়ে গেলে।'

বৃদ্ধ উন্মন ভাবে আলোর দিকে চেয়ে রইলেন। যেন ঐ পরম সুন্দর যুবার কাছে কেমন অপরাধী ও অপ্রস্তুত মনে খুদাবক্স নতমুখেই বসে রইলেন।

এইবার চিঠিখানা পুত্রের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই চি তোমার মা'র এক ভাইঝির। তিনি তার দু'টি ছেলে নিয়ে আসতে চান। আজকে রাত্রে এসে পৌছবেন, তুমি নিয়ে এসো।'

৪

উৎসব-আনন্দহীন ভবিষ্যৎ-আশাহীন খুশনজরজীর ক্ষ লিপ্‌সুন্দের ষড়যন্ত্ররত অট্টালিকা সহসা নারীর আর শিশুর মধুর আনন্দ কোলাহলে ভরে উঠ্‌ল। বালকের তুচ্ছ খেলার জিনিসে অলিন্দ কক্ষ ভরে উঠ্‌ল। অকারণ কথায়, অপ্রয়োজনীয় জিনি অনাবশ্যক আনন্দের যেন একটা স্রোত এসে পড়ল বাড়ীতে।

আর নূরনেহারের ভাইঝি গুলসুরৎ যেন অকস্মাৎ কর্ত নারীস্পর্শহীন বাড়ীতে নতুন যত্ন সেবা সাহচর্য্যের এনে দিল।

এই নূতন ধরণের উৎসব-উল্লাসময় জীবনের ধারায় খুদাবক্স যেমন খুসী মনে ডুবে গেলেন, তেমনি বৃদ্ধ খুশনজরজীর বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদ দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ল।

বৎসর শেষ হবার আগেই এক দিন সহসা বৃদ্ধ খুদাবক্সকে পাঠালেন। তাঁর রাজকার্য্যের ভার, অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণের আপনিই খুদাবক্সের হাতে এসে পড়েছে। বৃদ্ধ আর বড় বে পারেন না। গুলসুরতের দু'টি ছেলে আর কন্যার মত গুলসুর নিয়ে তাঁর সময় কাটে। বালক হকিকত আর হবিব তাঁকে 'দ বলে ডাকে, আর খুদাবক্সকে বলে মাতুল। আর গুলসুরৎ খুদাবক্স 'ভাইসাহেব' বলেন।

বাসন্তী অপরাহ্ণ। খুদাবক্স পিতার আহ্বানে এসে দাঁড়ালেন প্রচুর আলো-রৌদ্রে ঝলমল নবপল্লব ও শুষ্ক পত্রের সমারো অট্টালিকা-সংলগ্ন উপবন-বাগান ভরে গেছে। বসন্তের পাতা ঝর মর্ম্মর ভেসে আসছে চার দিকের মাটি থেকে। উপরে গাছে বা হরিৎ পত্রাবলীর আন্দোলনের বিরাম নেই।

পুত্রকে বসতে বলে খুশনজর বললেন, তোমার মনে আ 'সালশিরা'র নিমন্ত্রণের দিনের কথা? প্রেম রায়ের মহলে যখ আমরা যাচ্ছিলাম?'

পুত্র বললেন, 'জী, মনে আছে!'

পিতা বললেন, 'সেই যে মেয়েটিকে আমি দেখেছিলাম, কা রাত্রে তাকে দেখলাম। চিনতে পেরেছি এবারে।'

পুত্র আশ্চর্য্য হয়ে পিতার পানে চাইলেন। এই অন্তঃপুরে আর কেউ মেয়ে তো কখনো আসেনি।

পিতা বললেন, 'সে গোদাবরী বাঈ। কাল আমি স্বপ্ন দেখলাম, সেই গোলাপী ওড়না পরা মেয়ে সেই পথেই আমার আগে আগে চলেছে। হঠাৎ প্রেম রায়ের মহলের তোষাখানার (মাটির নীচের কুঠুরী) দিকের পথে সে চলে গেল। যাবার সময় তাকে আমি স্পষ্ট দেখলাম, আর চিনতে পারলাম। আমি এত দিন প্রায় ভাবতাম সে কোন্ মেয়ে, যাকে আমরা আর দেখতে পেলাম না—কোথায়

লুকোলো। আজ বুঝলাম সে লুকোয়নি। সে গোদাবরী বাঈ। যাকে আমি বাঁচাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।'

পুত্র প্রতিবাদ করলেন না, চুপ করেই রইলেন। যদিও তাঁর মনে হচ্ছিল পিতার চোখের ভ্রম। সুড়ঙ্গের বহু বৎসরের মলিন দেওয়ালে উপর থেকে আসা সন্ধ্যার আলোয় প্রদীপের স্তিমিত কম্পিত শিখায় কোনো তরুণী মানবীর ছায়া রচিত হয়েছিল, পিতার বার্দ্ধক্য-স্তিমিত চোখের দৃষ্টির সুমুখে; আর কিছু নয়।

গুলসুরৎ এসে বসেছিলেন। সামনের বারান্দায় তাঁর পুত্রেরা খেলা করছিল।

এবারে খুশনজরজী বললেন, 'তার পর আমার মনে হল আমায় দিন আর বেশী নেই। তাই আজ তোমাদের ডেকেছি, একটা কথা ভাববার জন্যে। তোমরা জানো বোধ হয়, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের 'জায়গীর' ধন-দৌলত সব রাজ্যে 'খালসা' (রাজ্যেয়াপ্ত) হয়ে যায়। কেন না, আমাদের উত্তরাধিকারী কেউ থাকে না। আমার পালক-পিতা তাই আমাকে তাঁর পদের জন্য দৌলতের জন্য পোষ্য নিয়েছিলেন। আর আমিও খুদাবক্সকে তার জন্যই নিয়েছিলাম। আর খুদাবক্সের পর কে ওর পদ অধিকার করবে সে কথাও আমি এত দিন ভেবেছি। আমার ধন-দৌলত জায়গীর খেতাব খেলাত এ সব রাজ্যে 'খালসা' হয়ে যাবে, কারুকে পাব, অথবা খুঁজে দেখব এই আমার বহু দিন ভাবনা ছিল।'

গুলসুরতের দিকে চেয়ে বললেন, 'এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম। দেখলাম, তুমিই আমাকে আমার ভাবনা থেকে মুক্ত করলে।'

বাইরে হকিকত আর হবিবের খেলা ও গল্প শোনা যাচ্ছিল।

সেদিকে চেয়ে উৎকর্ণ ভাবে বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ধন-দৌলত খেলাত সম্পত্তি প্রচুর আছে! কে ভোগ করবে! এত দিন অবধি আমি তাই ভাবছিলাম।'

গুলসুরতের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আর বেটি, তোমারো ইচ্ছে যে আমি খুদাবক্সের জন্য হকিকতকে বা হবিবকে পোষ্য নেই!

গুলসুরৎ বললেন, 'জী, আপনার মেহেরবাণি।'

আর তোমার? খুদাবক্স?'

খুদাবক্স যেন বুঝতে পারছিলেন পিতার কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বললেন, 'আপনি যা আদেশ করবেন।'

পিতা এবারে বললেন, 'তুমি ডাকতো একবার ওদের।'

খুদাবক্স বালক দু'টিকে নিয়ে এলেন। পরম সুন্দর সুশ্রী দীপ্ত চোখ উজ্জল মুখ দু'টি বালক জননীর পাশে দাঁড়াল। খুদাবক্সও দাঁড়িয়েছিলেন। বৃদ্ধ অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন চার জনের দিকে, তার পর বললেন, 'যাও বেটা, তোমরা খেলা করগে।'

তারা চলে গেল।

এবারে বললেন, 'জানো বেটা, এই গুলসুরৎ আর ওই বাচ্চারা আসার পর থেকে আমি কি ভেবেছি? আমি ভেবেছি, আমি যদি এই গুলসুরৎকে পেতাম বধূর মত করে, আর ওরা তোমার ছেলে হ'ত!

খুদাবক্স মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। গুলসুরৎ আরক্ত হয়ে উঠলেন।

খুশনজরজী বললেন, 'বেটা, এ 'শরম' আমার, তোমার নয়। তুমি মাথা নীচু কোরো না। আমিই তোমাকে আমার ধনের দৌলতখানার 'যখ' বানিয়েছি।

তার পর গুলসুরতের দি'কে চেয়ে বললেন, 'আর বেটি, আমি তোমার ছেলে নোব না।'

গুলসুরৎ অবাক্ হয়ে চাইলেন। খুদাবক্সও একটু আশ্চর্য্য হলেন। যেন সকলের চোখের সামনে ভেসে এল এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য রাজ্যে 'খালসা' হয়ে গেছে। গুলসুরৎ দিল্লী ফিরে গেছেন সেই দারিদ্র্য-মথিত সংসারে! আর খুদাবক্স? তাঁর মৃত্যুর পর সব যাবে। আগে নয়—তবু। দু'জনেই চুপ করে চেয়ে রইলেন।

খুশনজরজী বললেন, 'আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, তাই ভেবেছিলাম আমি এই কাজটা করেই যাব। কিন্তু না, তা আর করব না।'

এইবার গুলসুরৎ বললেন, 'কিন্তু কেন আপনি ভাবছেন এত কথা। আমার তো ওরা দুজন আছে। আপনি এক জনকে নিন্।'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন, তার পর বললেন, 'বেটি, ছেলে তোমার দু'টি জানি। কিন্তু ওদের 'জিন্দগী' তো একটি করেই! জীবন তো আর একটা তুমি ওদের এসে দিতে পারবে না। ওই চমৎকার সুন্দর শিশু বড় হয়ে যখন সকলের মত জীবনের সুখ আশা কল্পনা আনন্দ খুঁজবে, তুমি দিতে পারবে কি? আমি কি পেরেছি দিতে? না, আমি আর আমার দৌলতখানার 'যখ' ওদের বানাব না। ওরা মানুষের মতই বড় হোক, মানুষ হোক। না হয় গরীব থাকবে।'

কালো দীপ্ত চোখ সুন্দর মসৃণ কপাল সুস্থ বালক দু'টি তখন সামনের ছাতে তাদের খেলা-ঘর পেতেছে, তাদের মধুর কণ্ঠে গৃহ-রচনার পরিকল্পনা শোনা যাচ্ছিল। খুদাবক্স শান্ত নির্লিপ্ত ঈষৎ বিষন্ন চোখে চুপ করে সেই দিকে চেয়েছিলেন। যা তাঁর জীবনে আসেনি,—মানুষের মোহ প্রেম আশা,—তা থেকে ওরা বঞ্চিত হোক অথবা পাক্, কি ভাবছিলেন জানা গেল না।

গুলসুরৎ নতশিরে নীরবে বসে রইলেন।

শ্রীতারানাথ রায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—

বৃটেন আর আমেরিকা যুদ্ধে জিতেছে। নয়া দুনিয়া ওরা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, যে দুনিয়ায় হিটলারের প্রচার নেই। জল বলে কৌশলে হিটলারী নিশ্চিহ্ন করলেও ওরা আজ তাল পাচ্ছে না কি করে নয়া দুনিয়া তৈরী করবে। দুনিয়া বলতে ওরা বুঝে ইউরোপ আর আমেরিকা। ইউরোপ আজ শ্মশান, সেখানের শ্মশানে বিলাপ করছে বুভুক্ষু জনসাধারণ, যাদের অন্ন চিরদিন জুগিয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার অন্নক্ষেত্র। নয়া দুনিয়া তৈরী করতে হলে, এই অন্নক্ষেত্র হতে মোড়লীস্পর্দ্ধী ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-বাদকে আপন জনগণের বুভুক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রাণরস শোষণ ও সংগ্রহ না করে উপায় নেই। এই শোষণ ও সংগ্রহের প্রতিযোগিতাই নয়া দুনিয়ার রাজনীতি।

এই প্রতিযোগিতায় আজ এক দিকে যেমন ইঙ্গ-মার্কিণ শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রাচ্যের ঘোটিদেনেওয়ালাদের খোসামোদে পঞ্চমুখ, অন্য দিকে তেমনি অর্থনৈতিক ও ভাব-সাম্রাজ্যবাদী রুশিয়াও প্রাচ্য জাতিবর্গের ওকালতী করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাধা দিতে প্রস্তুত।

প্রাচ্যের তোরণে—

সোভিয়েট নির্ব্বাচনী বেতার বক্তৃতায় রুশ পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ ইঙ্গিতে বলেছেন—

পরাজিত লক্ষ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈনিককে ইঙ্গ-মার্কিণ-অধিকার এলাকায় রাখা হয়েছে;

ইটালীতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি পোল-ফ্যাসিষ্ট জেনারল এণ্ডার্সের সহস্র সহস্র সৈন্যকে এখনও সমর্থন করছে।

রুশিয়া বলছে যে, গ্রীসে ইংরেজ সৈন্য থাকবার জন্য রাজপন্থী ফ্যাসিষ্টরা উস্কানী পাচ্ছে। গ্রীসে বৃটেন যে ভূমিকার অভিনয় করছে, তা ইন্দোনেশিয়ায় তার মোড়লী করবার মতই অসহ্য।

রুশিয়ার প্রকাণ্ড অভিযোগ—

বিদেশী বেয়নেটের পাহারায় গ্রীসে ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থাই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

—সাধারণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা "অসহ্য"।

—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপ সৈন্যকে নিরস্ত্র করা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

—আন্তর্জাতিক অছি-পরিষদ স্থাপন করতে যে দেরী করা হ[illegible] তাতে বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, অধীন ও অর্দ্ধ-পরাধীন দেশগুলো স[illegible] প্রতিক্রিয়া-পন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্ধারকর্ত্তা ষ্ট্যালিন—

রুশিয়া নাকি নির্য্যাতিত জনগণের উদ্ধারের জন্য সোভি[illegible] মার্কা নয়া-দুনিয়া গড়বার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ[illegible] গ্রহণ করবার জন্য রুশিয়া তার ১৯০৪এর জার-সাম্রাজ্যবাদী [illegible] ত্যাগ করতে পারেনি। এক বছর আগে (১১, ফেব্রুয়ারী ১৯[illegible] ত্রিমূর্ত্তি—রুজভেল্ট চার্চ্চিল ষ্ট্যালিন ইয়াল্টায় যে গোপন [illegible] করেছিলেন, তার কাহিনীও ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে। এ কাহি[illegible] দেখছি বিশ্ব সর্ব্বহারাদের পরিত্রাতা হজরৎ ষ্ট্যালিন বহির্ম্মঙ্গোলি[illegible] চীনের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্র না করে, সোভিয়েট ছত্রাধীন মঙ্গল প্রজ[illegible] গড়বারই ব্যবস্থা করেছেন, মাঞ্চুরিয়াতে আজ প্রজাতন্ত্র স্থ[illegible] করবার সদিচ্ছা তার হয়নি, সাম্রাজ্যবাদী জাতগুলোর মত রুশ[illegible] কুরাইল দ্বীপগুলো গ্রাস করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী সাঙ্গাতদের ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে।

পশ্চিম-প্রাচ্যখণ্ডে—

পশ্চিম-এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ কুমতলবের কথা কাক কাছে [illegible] আর অজানা নাই। রুশিয়াও খোলাখুলি ভাবে এংলো-[illegible] অভিসন্ধির কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। পশ্চিম-এশিয়ায় ইংরে[illegible] সঙ্গে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষণ যে না দেখা যায় তা নয়, কি[illegible] দুই শ্বেতাঙ্গ জাতেরই এ অভিসন্ধিতে ভেদ নাই যে, ইহুদী জাতিয়া[illegible] সাহায্যে এশিয়াবাসীকে স্বদেশ ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত [illegible] আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করা। প্যালেষ্টাইনের আরবরা এটা বুঝ[illegible] পেরেছে বলেই, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এ জন্যই আর[illegible] লীগের সৃষ্টি। রুশিয়া কিন্তু বলছে যে, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্ব[illegible] ইঙ্গিতেই আরবলীগের জন্ম। লীগের নেতারা এ অভিযোগ বিশ্[illegible] করে না। পূর্ব্ব বা পশ্চিম-এশিয়ার আরও দু'-চারটি দেশ যে আর[illegible] লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করে রুশিয়া তা চায় না—অর্থাৎ রুশি[illegible] তুর্কী বা ইরাণকে আরবদের সঙ্গে মিতালী করতে দিতে চায় ন[illegible] আরবীরা স্বভাবতঃ তুর্কীবিদ্বেষী, মস্কো বেতার কেন্দ্র এই বিদ্বে[illegible] ইন্ধন দিতে চায়।

American League for Free Palestineএর স[illegible] কারী সভাপতি অধ্যাপক জোহান স্মেরটেস্কো বলেছেন, ট্রান্সজর্ডানে[illegible] স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজের চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ইবনসাউদে[illegible] সৈন্যরা দেশটাকে গ্রাস করবে। এ-দেশের ৩ লক্ষ লোকের অর্দ্ধেক যাযাবর, কাজেই স্বাধীন-ট্রান্সজর্ডন হতেই পারে না! ট্রান্সজর্ডনে[illegible] আমির আব্দুল্লাও ইংরেজের সাহায্য ছাড়তে চান না।

এশিয়ার বন্ধু রুশিয়া—

ইরাণে সোভিয়েট প্রহার খেয়ে বৃটেন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেছে[illegible] ষ্ট্যালিন আশা করছেন, এইবার ইরাণের সঙ্গে সোভিয়েট মিতালী পাক[illegible] হবে। ইংরেজ বেশ বুঝছে যে, ভারতে আর বৃটেনের মাঝখানে রুশিয়া মাত্র ভূমধ্যসাগরের জলপথের ব্যবধানই কণ্টকাকীর্ণ করতে[illegible] চায় না, পশ্চিম-এশিয়ার স্থলপথ—যাকে ভারতে যাবার আধাপথ[illegible] বা Half way house বলা হয়, তা পর্য্যন্ত কণ্টকিত করতে[illegible] চায়। তাই সোভিয়েট ইউনিয়ন এখানে অতর্কিতে বৃটেনকে আক্রম[illegible] করে দাবী করছে—

—মিশর থেকে ইংরেজ ফৌজ দূর হটো।

—আরব লীগের দাবী পূর্ণ কর!

আরব লীগের সঙ্গে রুশিয়ার ঘরোয়া অনেক শলা-পরামর্শ হচ্ছে। রাজা ইবন সাউদ চাচ্ছেন, পারস্যোপসাগরের তট থেকে প্যালেষ্টাইনের হিফা পর্য্যন্ত যে হাজার মাইল তৈলপাইপ লাইন (আমেরিকার সম্পত্তি) গিয়েছে, এ তাঁর হউক। এতে তিনি সুয়েজ খালের চড়া টোল এড়াতে চাচ্ছেন। এই সাউদী আব্দার ট্রান্সজর্ডন মেনে নিতে চাচ্ছে না। রাজা ইবন সাউদ আরও মতলব করেছেন যে, আকোয়াবা বন্দর দখল করলে আব্দুল্লার সম্মতির ধার না ধেরেই প্যালেষ্টাইন পর্য্যন্ত পাইপ লাইন টেনে নেওয়া যাবে। সম্ভবতঃ তাঁর এই চেষ্টায় রুশ-সমর্থন আছে।

ইংরেজরা বলছে, রুশিয়ার এ সব অভিসন্ধির মূলে পশ্চিম-এশিয়ার সব তৈলক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার বাসনা। তারা বলছে, যদি রাজা ইবনসাউদ আর রাজা ফারুক এমনি করে রুশ মিতালীর জন্য ব্যগ্র হন, তবে সহসা একদিন তাঁদের চৈতন্য হ'বে। তাঁরা তখন বুঝবেন, সবল সহজ ভদ্রলোক ইংরেজের প্রভুত্বের জায়গায় কড়া কাঠখোট্টা কমুনিষ্ট-প্রভুত্ব এসে পড়েছে।

আরবীরা উত্তরে বলছে—রুশিয়া ত মিশর বা সাউদী আরবের কাছে কিছু দাবী করেনি। পশ্চিম-এশিয়ায় আরবী মহল দাবী করছে—ইংরেজ তার ফৌজ হটিয়ে নিক্। রুশিয়া তাদের এই দাবীরই প্রতিধ্বনি করছে, একটু উঁচু গলায়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া—

মালয় আর সিঙ্গাপুর যে ইংরেজের কবলচ্যুত হয়েছিল তার মূলে জাপানের আঘাত ত ছিলই, তার সঙ্গে ছিল ইংরেজের প্রতি এশিয়াবাসীর জাতক্রোধ—বিশেষ করে চীনাদের। আজ সুবিধাবাদী চীনা-ডিক্টেটার চিয়াংকাইশেক এক দিকে আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড, অন্য দিকে তাঁর চিরঘৃণ্য রুশিয়াকে লোভ দেখিয়ে চীনকে রক্ষা করেছেন বলে বলছেন। কিন্তু বৃটেন বা আমেরিকা বা রুশিয়া এখন যখন দাম চাচ্ছে, তখন চীনারা খাপ্পা। চীনা বিপ্লবীরা, যাদের মধ্যে ছাত্ররাই বেশী, তারা চীনা-দুনিয়া গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। ওরা বলছে—ফিরিয়ে দাও হংকং। ওরা সহযোগিতা করছে কোরিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে। কে জানে এক দিন ওরাই হয় ত মালয় চাইবে। তাই ত সেদিন (২১শে জানুয়ারী) বিলাতের লর্ডস্ সভায় ভাইকাউণ্ট এলিব্যাঙ্ক আর্ত্তনাদ করেছেন—"Unless we are careful, we shall hand over Malaya and Singapore to the Chinese". সিঙ্গাপুরের শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী চীনা।

এংলো-স্যাক্সন শক্তিরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জনগণের উত্থান দাবিয়ে রাখবার চেষ্টায় যেন কতকটা সফল হয়েছে—কতক ভেদ বাধিয়ে, কতক বল প্রয়োগে, কতক বা আপাত মিষ্ট ব্যবহার করে! ইন্দোনেশিয়ার লড়াই এখন হচ্ছে প্রধানতঃ আলাপ-আলোচনায়। আনামী বিপ্লবের কথা আর শোনা যাচ্ছে না। বর্ম্মার বিপ্লবীদের চেষ্টা প্রকাশ্যে হচ্ছে বলেও সংবাদ নেই।

ভারতের আন্দোলন—

ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবস্থা থমথমে। মজলিস-পরিষদপন্থীদের কলরব প্রবল। চরমপন্থীদের চেষ্টা অপ্রকাশ। তবে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস আপাততঃ নিয়মতান্ত্রিক পন্থাই অবলম্বন করে সব প্রদেশে আপনাদের প্রভাব প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর। ফরওয়ার্ড ব্লক, সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি চরমপন্থীরাও এই চেষ্টায় আপাততঃ সহযোগিতা করছেন আপনাদের দলকে প্রবল করবার জন্য। কমুনিষ্ট দল সহজ পথে আপনাদের প্রভাব স্থাপন করতে পারবেন না বুঝেই যেন এক দিকে যেমন কংগ্রেসের গান্ধীপন্থীদলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন, অন্য দিকে মসলেম লীগের পাকিস্থানী জিগিরের প্রতিধ্বনি করছেন। ওদিকে সমস্ত দেশ আজাদী হিন্দের বৈদ্যুতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। সেই প্রেরণা থেকে মনে হচ্ছে চরমপন্থী এক নতুন তরুণ দলের উদ্ভব হবে। অভিনব অবস্থায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান তরুণদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব মিলনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভারত প্রাচ্য-ভাবাপন্ন হলেও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি যেন অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয়েছে।

পহেলে হাড়ী হটাও—

কিন্তু ওরা বলে, প্রাচ্য—প্রাচ্য, পশ্চিম—পশ্চিম; দুই-এ মিল হবে না কখন। হয়ত এ প্রভেদ দেশ আর কালের। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপ আর বিংশ শতাব্দীর এশিয়া যেন এক। পশ্চিমে না কি একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। এই স্বৈরতন্ত্র এক দিকে ইউরোপের জনগণকে যেমন ক্রীতদাস করেছে তেমনি ক্রীতদাস করেছে এশিয়া আর আফ্রিকাকে। এশিয়ায় এই স্বৈরতন্ত্রের অন্য নাম সাম্রাজ্যবাদ। ষোড়শ শতাব্দীর মুমুক্ষু ইউরোপের জনসাধারণ যেমন রাজাকে কেটে, ব্যাষ্টাইল ভেঙ্গে, রাজতক্ত ধূলোয় লুটিয়ে ঘোষণা করেছিল মানুষ জন্ম থেকেই স্বাধীন কিন্তু সর্ব্বত্র তার পায়ে শেকল—এ শেকল ভাঙ্গতে হবে, বিংশ শতাব্দীর মুমুক্ষু এশিয়ার জনসাধারণ তেমনি দাবী করছে স্বাধীনতা। সে-কালের সেই ব্যাষ্টাইল ভাঙ্গার দলের সৃষ্ট অভিনব গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বৈজ্ঞানিক শোষণ প্রক্রিয়া থেকেও এশিয়া যেমন চায় মুক্তি—রুশ রোম্যানফদের নাউটে ক্ষত-বিক্ষতদেহ সাইবেরিয়া-প্রত্যাগত বিপ্লবীদের সৃষ্ট অভিনব সমাজতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদের কূটনৈতিক প্রভাব ও প্রেমালিঙ্গন থেকেও তেমনি সে-চায় রেহাই। এশিয়া চায় স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার সাথে মুক্তি। মার্কিণ সাংবাদিক Louis Fischer বলেছেন—

"The goal is independence plus freedom of speech, freedom of the press, assembly and worship—Freedom from private exploitation and destructive hand of the totalitarian state—Freedom from hunger, disease, insecurity and ignorance—Freedom from domestic despots."

কিন্তু ইহ বাহ্য—সার কথা—

"The East wants freedom from imperial domination. That is the indispensable first."

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট :—

ভারতীয় ক্রিকেট-জগতের পুরাতন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ট্রায়াঙ্গুলার হইতে কোয়াড্রাঙ্গুলার শেষ পর্য্যন্ত পেণ্টাঙ্গুলার পর্য্যায়ে এই নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার পরিণতি ঘটিয়াছে। ধর্ম্মগত বৈষম্য এই অনুষ্ঠানের দল-সংগঠনের ভিত্তি। এই প্রচলিত বিধি খেলার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সংক্রামিত করিতে পারে। সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধকল্পে বহু প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়োৎসাহী ভারতীয় বাজাদল এই প্রতিযোগিতা হইতে বিরত থাকার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলাফল বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাদানুবাদ যথেষ্ট হইয়াছে। যুক্তি-তর্কের শেষ নিষ্পত্তি কোন দিন সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রেও বহু আলোচনা ও সমালোচনার পরেও প্রতিযোগিতার অধিবেশন বন্ধ হয় নাই। কিন্তু বিরুদ্ধমতাবলম্বী প্রদেশভুক্ত বা দেশীয় রাজ্য সমূহের অধীনস্থ খেলোয়াড়গণের মধ্যে নাইডু ভ্রাতৃদ্বয়, মুস্তাক আলী, সর্ব্বাতে, জগদেল, আমীর এলাহী, গুলমহম্মদ, হাজারী, অমরনাথ প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতনামা ও ভূয়োদর্শী ক্রিকেট-ধুরন্ধরগণের অভাবে এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ এবারে বহুলাংশে হ্রাস পায়। শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদল এ বৎসর এই প্রতিযোগিতায় ৩১০ রাণে পার্শীদলকে পরাজিত করিয়া চরম বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করে।

এই বাৎসরিক ক্রিকেট-উৎসব ব্র্যাবোর্ণ ষ্টাডিয়ামে ১ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম খেলায় অবশিষ্ট দল পার্শীদলের বিরুদ্ধে এক ইনিংস ও ১২১ রাণে শোচনীয় ভাবে বিপর্য্যস্ত হয়।

রাণ-সংখ্যা :—

অবশিষ্ট দল

১ম ইনিংস—১১২ (স্কার্ণাভেজ ১৪, খোট ৪১ রাণে ৪টি, উদ্রিগার ১৮ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—১৪৩ (ফ্র্যাঙ্ক ৪১, ডিসুজা ২৫, খোট ২৭ রাণে ৬টি)

পার্শী—১ম ইনিংস—৩৭৬

দ্বিতীয় খেলায় হিন্দু দল ঠিক এক ইনিংসের ব্যতিক্রমে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করিয়া শেষ সীমায় উন্নীত হয়। ইউরোপীয় দলের হইয়া বিলাতী আন্তর্জ্জাতিক পেশাদার কম্পটন একবার ৯ রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হইয়া দ্বিতীয় দফায় ১২৪ রাণ করিয়া গৌরব অর্জ্জন করে। হিন্দু দল ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৫০৪ রাণ করিয়া ইনিংস ঘোষণা করিয়া দেয়। মহারাষ্ট্র খেলোয়াড় হেজারী প্রথম আ, ... পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় শতাধিক রাণ করার কৃতিত্ব দেখায়। কিষেণচাঁদ ও উদয় মার্চেণ্ট শতাধিক রাণ করে। হিন্দুবোলারগণের মধ্যে মানকড়ের বল কার্য্যকরী হয়।

রাণ-সংখ্যা :—

ইউরোপীয়—১ম ইনিংস—২১২ (কম্পটন ৯১, সিম্পসন ৩০, এস ব্যানার্জ্জী ৫৩ রাণে ৬টি, মানকড় ৭৯ রাণে ৩টি)

এম, ডি, ডি,

২য় ইনিংস—২১১ (কম্পটন ... সিম্পসন ৫৯, সিগুন ৫৬; মা... রাণে ৭টি)

হিন্দু—১ম ইনিংস—৬ উইকেটে ... (হেজারী ১০১, কিষেণচাঁদ ১৫৫, মার্চেণ্ট ১৩২)

মুসলিম দল সেমিফাইন্যালে পা... নিকট প্রথম ইনিংসের ফলাফলে প... হয়।

রাণ সংখ্যা :—

মুসলিম ১ম ইনিংস—১৬৩, (আ... হোসেন ৪৫, উদ্রিগার ২৬ রাণে ৫টি,

২য় ইনিংস—৮ উইকেটে ২৭৫, (ই... ৭৮, তারাপুর ৬২ রাণে ৩টি)

পার্শী :—১ম ইনিংস—২৬২ (... ৭৯, আম্বরা ৬৪; লতিফ ৩৭ রাণে

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ১৬৩

পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় হিন্দুদল ৩১০ পার্শীদলের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। হিন্দুদল টসে জয়ী হয় ও ... ব্যাট করে। চরম নিষ্পত্তির এই খেলায় কেহ শতাধিক রাণ ক... পারে নাই।

রাণ সংখ্যা :—

হিন্দু : ১ম ইনিংস—৩৬৮ (মানকড় ৭৪, সোহনী নট আ... ৫৭, সিদ্ধে ৪৯; খোট ৭৬ রাণে ৩টি, তারাপুর ১৩৫ ৩টি)

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ২১৩ (কিষেণচাঁদ ৭২, নঙ্গলকার আউট ৫১, পালিয়া ১৩ রাণে ৪টি)

পার্শী :—১ম ইনিংস—১৭৭ (আর এস মুদী ৫৫, স... নট আউট ২৬; ফাড়কার ১২ রাণে ৩টি, সিদ্ধে ... রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৯৪ (সিদ্ধে ৩১ রাণে ৪টি ও ফাড়কার ১৫ রাণে ৩টি)

যোগদানকারী দলের খেলোয়াড়গণ :—

অবশিষ্ট :—পি কদম, এব্রাহাম, ডিসুজা, কোহেন, ফ্র্যাঙ্ক, বোলকার, পেরুমল, ফার্ণাণ্ডেজ, গাণ্ডী, স্যালভী ও ব্রোচ।

পার্শী :—পালিয়া কোলা, আর এস মুদী, আম্বরা, খোট, উদ্রিগার, তারাপুর, সাখা, প্যাটেল, ডক্টর ভেলইয়ার।

ইউরোপীয় :—সিম্পসন, জাক, সিগুন, পামার, ডেনি-কম্পটন লায়ন, ডোব্রাক্যারী, ইংগ্রাম জনসন, ব্রাউন, এবসষ্টন ও ব্রেশ।

হিন্দু :— বিজয় মার্চেণ্ট, হিন্দলকর, মানকড়, হেজারী নঙ্গলকার, উদয় মার্চেণ্ট, কিষেণচাঁদ, ফাড়কার, এস ব্যানার্জী, সিদ্ধে ও সোহনী।

মুসলিম :—ক, সি. ইব্রাহিম ; আলিমুদ্দীন, গজ্জালী, আনোয়ার হোসেন, আসঘার আলী, এনায়েৎ খাঁ, সৈয়েদ আমেদ, আব্দুল্লা, গোলাম আমেদ, মাকা ও লতিফ।

ভাঙা চাঁদ

রাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কপালের বাঁ দিকে ছোট্ট আলুর মত একটা আব। খাট-খাটো হাতে-পায়ে গাঁটে-গাঁটে মাংস। ঘাড়টা বেঁকিয়ে যখন খুদু চলে, মনে হয় গুঁতোবে বুঝি, কিন্তু আসলে ওর চোখ দুটো গরুর মত বোকা—কিছু বা নীরেটও।

বেশী কথা বুঝবে না। তবু একবার যা বুঝল, আঠার মত লেপটে রইল ওর মাথায়। তা' থেকে টলায় ওকে কার সাধ্যি!

যেখানে ওরা থাকে সেটা ঠিক বস্তি নয়, বসতি—গরীব-গুরবোদের। টিনে ছাওয়া, বাঁশ-চেঁচা বেড়ায় মাটি লেপা মুখোমুখি দু' দু' বারোখানা খুপরি। একটু বড়ো রান্নার জায়গা। শেষ বরাবর একটা ঘরেই থাকে খুদু আর খুদুর মা। দেশে আকালে খেতে না পেয়ে বছর দু'য়েক আগে ওরা এসেছে এখানে। চাকরি খুদু একটা করছে—বন্দুকের কারখানায়, ইছাপুরে। ভোরে বেরোয় সন্ধ্যায় ফেরে। মাইনেও নিন্দের নয় পঁয়ত্রিশ—দু'বছরে আট টাকা বেড়ে তেতাল্লিশে পৌঁছেচে। ডি, এ আছে সমান, সেই সাড়ে তেরো।

অভাব বড় একটা নেই বলেই হয়ত স্বভাবটা উড়নচণ্ডে গোছের। কথাটা মোক্ষম বুঝেছিল নগেন মাষ্টারের এই হ্যাংলা চুলবুলে মেয়ে অমলি। বয়েস তখন তেরো হলেও সখ সতেরো আনা। বিকেল বেলা পাতলা ঠোঁটে আলতা মেখে একমুঠো চুল ফাঁপিয়ে বেঁধে সাড়া-কাচা সাড়ীতে কুঁচি দেয়া ওর চাই—আর দু'টো ভুরুর মাঝখানে বসের-গোলা ফুটকুড়ি। মাষ্টার ত' মেয়ের আদিখ্যেতায় ত্যক্তবিরক্ত। তবু বাজারের চোরাই চার পয়সা বাঁচিয়ে কানবালা ক্লিপ কিনতে ছাড়ে না অমলি—বা এটা-ওটা খাবার।

লজেঞ্চুস দেখে জিভের ঝোল টেনে নিয়ে দাঁড়াত মনিহারি দোকানের ছোকরা ভোলার পাশে,—দে' না দু'টো। খেতে সাধ যাচ্ছে।

ভোলা পিটপিটে চোখে চেকনাই এনে বলতো ওর আলতা-মাখা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে,—যা বলব তাই শুনবি বল্?

—ইল্লি, হাঁ করে মাইরী বল দিকি!—মিটি মিটি হাসে অমলি তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

ভোলা কাউণ্টারের সামনে ঝুঁকে পড়ে,—ওই রে বাবু আসচে! নে লজেঞ্চুস, পালা। একটু পরে আসবি কিন্তু।

কাঁচকলা!—লজেঞ্চুস নিয়ে অমলি হাওয়া।

এমনি তরো খুচরো চাহিদা ওর মিটত বরাবরই, তবু যা পেত তার চেয়ে দিতে হয় ওকে অনেক বেশী। বা যা দেয় তার দাম সম্বন্ধে ও টনটনে।

সেদিন যেমন বক্সীদা'র কাছে দু'পয়সা আলুকাবলি খেয়ে চলেছিল। বক্সী প্যাণ্ট পরে, বিড়ি খায়। কি একটা মলমের কারখানায় ... নাকের তলায় খানিকটা ঠোঁট নেই। স্যাঁতসেঁতে ... দাড়ি। নজর ছিল তার অমলির ওপর অনেক দিন থেকেই। ... বদলে বড় জোর কোলে বসিয়ে গালে নাক ঘসা কি বা খুনসুটি।

সেদিন বক্সী বলল,—কোলে বসবি খানিক, তবে আলুকাবলি।

বোঁচা। পাহাড় পার। ইঁদুরের বেড়াল ধরবার সখ। বক্সীর ... ঘেন্না ধরে। গা ছ্যাকার করে অমলির। তবু খানিক চোখ বুজে থেকে পরে চোখ চেয়ে চেয়ে একশ' মিনিট ধরে আলুকাবলি ... কি এমন বোকামি! নাজি হয়ে গেল অমলি।

এরই ভেতর এক দিন ভাড়াটে এল খুদুরা। অমলি হাতে স্বর্গ ... যেন। যা চায় তক্ষুনি দেয়। বদলে কিছু চায় না। এমনি ... আর ভাল খুঁদা!

খুদুর এক-রোখা স্বভাব, নীরেট বুদ্ধি আকর্ষণ করলো অমলি। ... বে আর স্বভাবে মানুষ চিনতে দেরী হয় না ওর। তাই মনে হয় খুদুর দেওয়া চিন্তায় কোথায় যেন প্রাণের প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে। কি জানি কেন অমলি ওকে আর সবাইয়ের চেয়ে আলাদা করে দেখে। হয়ত' কখনো কখনও ওর কাছ থেকে কিছু আশা করে, একটু আদর একটু বা পাগলামী। কিন্তু খুদু নির্বিকার। ভোঁতা। না আছে ... না আছে ভাব। তুমি আদর করে জড়িয়ে ধর কিন্তু কাঠের পুতুল আদর করতে জানে না। খুঁদা যেন কি! বিরক্ত হয় অমলি কখন সখনো।

এই ত' সেদিন খুদুর পয়সায় ও কিনলে একগাছা কুচের মালা। মালাটার দিকে তাকিয়ে থাক ...

মত জোলো চোখে অমলি বুঝি দেখতে পেল একটু ইঙ্গিতের ঝিলিক। ওর গায়ে গা' ঠেসে বসে একটু আভাষ দিলে,—আমার বুকের ভেতর কেমন করচে খুঁদা।

—কেন রে ?

—তোমার চাউনি দেখে।—একটু হাসি মিশিয়ে অমনি গা ছেড়ে দেয়।

কপালের ঢ্যাপ্পল আবটা চুলকোতে চুলকোতে খুদু কি যেন ভাবে। অন্য ছেলের মত অমলির আলতা-মাখা হাসিতে খাবি খায় না।

—কি ভাবচ অত ?

—দেশের কথা। আমাদের দেশে পালদের দোকানের পাছারে কত কুঁচ পড়ে শুকিয়ে যায় মাড়িয়ে যাই আমরা। কুঁচ যে আবার পয়সা দিয়ে কিনতে হয় কে জানত। ধুস্, কোলকাতা ভাল লাগচে না আর।

ওর মোটা বুদ্ধি কলকাতার সুক্ষ্ম তারে বাজে না। দেশের সোঁদা মাটিতে সোজাসুজি চলতে জানে। ওর মনের ছাঁচে এঁটে গেছে ওদের গাঁয়ের ভিজে মাটি। রূপসার ধারে ঢল খেয়ে নেমে গেছে পলিমাটির পাড়, তারই কাছে ওদের ঘর। উঠোনে চালতে গাছে চড়ে বসে রূপসার রূপোলী ফালির তলায় ঢালা সবুজ ক্ষেত মিশে আছে ওর চোখে। চোখে এঁটে গেছে প্রতি সন্ধ্যায় রাঙা জলে ছোট ছোট জেলে-ডিঙির ছায়া, ভোরে উঠে নদীর আশে-পাশে খেজুর গাছে উঠে বাবুই পাখীর বাসা ভাঙা, বা গুলতি তাক করে মাছরাঙা বালিহাঁস মারবার বৃথা চেষ্টায় বিলের ধারে এধার ওধার করা।

—ধুস্, বিচ্ছিরি তোদের কোলকাতা!—যেন কলকাতা আর অমলি দু'জনকে মিশিয়ে ফেলেচে খুদু। অমলির আর কলকাতার দেনা-পাওনার ব্যবসাদারী ঘোরপ্যাচ বুদ্ধিটা খুদুর চোখে এক হয়ে গেছে যেন।

ঠোকর খায় অমলি,—তাই যাও না। গাঁয়েই যাও, গেঁয়ো-ভুত কোথাকা'!

খুদু মিইয়ে যায়, হঠাৎ হয়ত' কি বলে ফেলেচে যা বলা উচিত হয়নি।

খোঁচায় খুঁচিয়ে তোলা যায় না, ছেলেটা কে রে! অমলি অবাক্ হয়। গরমে গরম হয় না বা টলে না কথার ঝাঁজে। একেবারেই গবেট। এর সঙ্গে পোযাবে না অমলির। বকসাঁদা'র বিড়ি খাওয়া লাল মাড়ির লোভানিটাও যেন খুদুর চেয়ে ভাল লাগে অমলির। এ একেবারে ন্যাকড়ার পুতুল। চলে যায় সে।

বয়েস আন্দাজে অমলি হাঁপালো। ইদানীং আরও আরও চেকনাই বেড়েচে ওর হাতের ডোলে পায়ের গোলে। কোমর টনটনিয়ে ওঠে ভারে। ছিমছাম চঞ্চলতা নেই। নেই কথায় কথায় ছুটোছুটি হুটোপুটি। বুকে কোমরে টসটসে ভারে নিজেই নুয়ে পড়ে কখনও-সখনও। সখ আর লোভ বেড়েচে আরও। দার্জিলিং-এর মালা কিংবা পুঁতির মটরে মন ওঠে না। চাই রূপোর ঝুমকো বা সোণার কলী।

জীবন ড্রাইভারের পিসী নগেন মাষ্টারকে শুনোলে সেদিন,—বলি শুনচ ম্যাষ্টার, মেয়েত' ইদিগে হাড়-বজ্জাত, তায় যৈবন সময়। বে'-থা' দাও। নইলে যে ট্যাকা যায় না গা।

—কেন ?—পরীক্ষের খাতা থেকে মুখ না তুলেই মাষ্টার শু

—কেন আবার কি ? মেয়ের বে' দেবে না ?

তেমনি মুখ নীচু করেই মাষ্টার বলে—না।

—আ ম'লো মিনষে! ভালো ভীমজালে পড়নু দেখচি

আসলে জীবন ড্রাইভার স্ত্রী বর্ত্তমানেও অমলির পেছনে করছে দু'-চার দিন। পিসী প্রমাদ গণে এসেচে তার ভাইপো ভীমজাল থেকে বাঁচাতে। এক দিন সাহসে ভর করে অমলিকে করে তেড়ে গিয়েছিল। জীবন আগুন,—ভালো হবে না পিসী! পরের মেয়েকে ক্যাট্-ক্যাট্ করেছ কি তোমাদের টুকরো করে

অমলি হেসে সরে পড়েছিল। তাই পিসী এসেছে আ বাপের সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত করতে।

—তা'লে ওর বে' দেবে না ?

—না। তবে আমায় দেখবে কে ?—বিপত্নীক নগেন মুখ না তুলেই বলে।

পিসী চলে যায় গজ গজ করতে-করতে। যেমন কুকুর তেমনি বেটি!

আড়াল থেকে অমলি শুনেছিল সব। হঠাৎ রেগে বেড়া পিঠে একটা কিল বসিয়ে বলে,—দূর হ' মপ্পুড়ি!

অমলি হয়েছে যেন বসতির মক্ষিরাণী। ছোঁক-ছোঁক বেড়ায় মৌমাছির দল। অমলি চোখের ঝিলিকে টুকরো হা হাতে রাখে সবাইকে। সাবধানে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে। ছে জন্তে হাত বাড়ালে মিষ্টি হেসে হাতটা সরিয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি নয়। এখন নয়। আরও সাধনা করো।

খুদু কিন্তু হাত বাড়ায় না! ওর হাতটা মোচড়াতে না অমলির রাগ ওর ওপর যতখানি অনুরাগও তত। এখনও অমলিকে এটা-ওটা দেয়। চোখে তৃষ্ণা নিয়ে নয়, দয়া করে অনেকটা। অমলি জ্বলে যায়। খুদু অত-শত বোঝে না।

শীতের রাত্রি তখনও ভোর হয়নি। কুয়াশা কাটেনি তখন আকাশ কালো। তারায় ভরা। খুদু কাঁপতে কাঁপতে গলায় মাফলারটা জড়িয়ে প্যান্টের বেল্ট আঁটে। কারখা বেরোতে হবে। এখনই। কস-দাঁতে সিকিটা চেপে হালু কৌটোটা পকেটে নেয়।

উঠোন পেরোতে গিয়ে মাফলারে হেঁচকা লাগে,—খুঁদা

—কে, অমলি ? এত ভোরে ?

—কথা আছে।

—এখন নয়। ফিরে এসে শুনব।

ফিরে আসবে সেই সন্ধ্যে বেলা। আবার যখন আকাশ কালে তারায় ভরা। কাঁপতে কাঁপতে হালুয়ার শূন্য কৌটো হাতে ফিরবে খু

এলও তাই। নিজেই ডাকলে অমলিকে ওর ছোট খুপরিতে মা যখন রান্নাঘরে।

—কেন এত ডাকাডাকি ?

—বা রে; তুই যে কি বলবি ?

ভুরু দু'টো জিজ্ঞাসার চিহ্নর মত কুঁচকে যায় অমলির। ব্যাজ মুখে বলে,—অ। বলে কাজ নেই আর।

খুদু বলতে পারে না আর কিছু। একটু বিস্মিত একটু বা ভীত হয়ে তাকায়।

—বললে কি করতে পারবে শুনি? পারবে জীবন বাইবারকে দু'টো গোঁত্তা মারতে বা ঠুঁসে দিতে?

খুদু খাবি খায়। চোখ দু'টো বাষ্পাচ্ছন্ন।

—ভরসন্ধে বেলা চেপে ধরলে আমায়। আস্পর্দ্ধার বলিহারী! যে যা মন নেয় করবে? কেন, এতই ফ্যালনা আমি! তুমি আছ কি করতে?

খুদু আছে মৃত্যুর মত সত্যি। কিন্তু কি করতে পারে ওই হোঁৎকা ড্রাইভারের সামনে। চোখ খুদুর আছে কিন্তু তাতে সরষে ফুল ছাড়া আর কিছু দেখে না সে।

—পারবে না? তার চেয়ে চল না কোথায় সরে পড়ি আমরা। থাক না পড়ে তোমার মা-বুড়ী আর কারখানা। আমি কি এতই ফ্যালনা?

খুদুর চোখে বরফ জমে।

—চল আমাদের দেশে। তোতে আমাতে থাকব বেশ আর—

শেষ হতে পায় না খুদুর জল্পনা। অমলি ফেটে পড়ে। বলতে পারে না একটা কথা। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কি বঁবেট মানুষ ওটা। বলচে কি না দেশে যেতে! কি কথায় কি কথা! আন বলতে ধান বোঝে!

অমলি বেরিয়ে যায় তক্ষুনি। খুদু বাইরে তাকায়। আকাশটা বড় কালো।

রাঁধছিল অমলি। বক্সী এল ঘটি হাতে। এক ঘটি জল! স্বাভাবিক নাকী স্বরে বলে—এই জলটুকু গরম করে দিবি? কিচু মনে করিসনি মাইরি!

মেজাজটা অমলির সপ্তমে—পয়সা লাগে। অমনি হয় না।

বক্সী যেন ইঙ্গিত পায়,—পয়সা, নে না। জল গরম নিয়ে ঘরে আসিস। মাথা খাস। একটা টাকা ছুঁড়ে দেয় অমলির সামনে।

—চা-টা যদি করে দিস নিজে হাতে। কোন্ শালা মিছে কথা বলে, তোর হাতে চা খেতে বড় সাধ।

—যাও, যাও। গজ-গজ কোরো না।

—ও বাবা!

বকসী লাল মাড়ি আরও ফাঁক করে। তা-না-না-না করতে করতে চলে যায়।

* * * * *

চাকরিটা খুদুর গেল। যুদ্ধ থেমে গেছে! লোক কমতে সুরু করেচে সমস্ত কারখানায় আপিসে। পয়লা দিনেই খুদুর কাজ গেল। মাথায় আকাশ ভাঙল।

মা বলছে, গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে। যেতে হবেই। কিন্তু সেখানে কি আছে আর কিছু? তবু রূপসার তীরে ভিজে মাটির টানে খুদু খুসী হয় যেন। বোদা পানসে কলকাতায় সমুদ্রের স্বাদ নেই। এঁদো পুকুর যেন। দিল খুলে সাঁতরাতে যাও ধাক্কা খাবে। যে দিকে তাকাও দেয়ালে ঠোক্কর খাবে চোখ। টুকরো আকাশ দেয়ালে বন্দী। যদি বা চাঁদ ওঠে, তার আলো আটকে যায় মন্দিরের চূড়োয় বা প্রাসাদের চিলে-কোঠায়। পেটরোগা প্যাঁচাটে মানুষের ভীড়।

কেটে গেল কয়েক দিন। যাবার সময় হয়ে এল প্রায়। আর দিন নেই তবু এ ক'দিনেও অমলিকে একটা কথা জানাতে পারেনি খুদু। হয়ত বা ভরসা পায়নি। ওকে এড়িয়ে চলে অমলি। কিছু দিন থেকেই দেখলে ঠোঁট উলটে চোখ ঘুরিয়ে বেঁকে চলে যায়। কাছাকাছি হলে চোখে চোখ পড়লে চোখের দমকে কথা সরে না খুদুর। তবু অস্বস্তি থাকে কিছুই বলা হোল না।

ঘুম ভেঙ্গে গেছে শেষ রাতে। মুসলমানের পাড়ায় মুরগী ডাকে। আজ আর প্যান্টের বেল্ট বাঁধবার তাড়া নেই। শিরশিরে ঠাণ্ডা। কাঁথা মুড়ি দিয়ে গোঁজ হয়ে বসে খুদু। দরজাটা খোলা। সামনে উঠোনে আবছা আলো। আকাশে টুকরো ভাঙা চাঁদ।

বক্সীর খুপরি থেকে টুক করে বেরোল কে! তাকাল এদিক সেদিক। খুদুর চোখ পড়ে। সুট্ করে ঢুকে পড়ে নগেন মাষ্টারের ড্যারায়। অমলির মত যেন। অমলি!

খুদুর চোখে বরফ গলে। শেষে কি না বক্সীটাকেই! হয়ত ভাবে খুদু। গরুর মত চোখে ওর সাড় নেই, নেই কোন সাড়া। ভাঙা-চোরা টাল-খাওয়া প্রেম ওর পড়েই থাকবে রাস্তার ধারে। ফিরেও তাকাবে না আর। আর হয়ত আসবে না খুদু এখানে। কাল ওরা দেশে চলে যাবে। আর আসবে না।

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজজী হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অব... যে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা তাহার সমাধানের জন্য নিজ স... শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার যুগনেতা আ... সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। সূক্ষ্মকেশী ঋষির ন্যায় তিনি অনু... করিয়াছিলেন যে এই শতধা-বিচ্ছিন্ন, বিরোধ-বিড়ম্বিত হি... সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সঙ্ঘবদ্ধতা এবং শক্তিসা... হিন্দুধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক দার্শনিক আলোচনা হই... থাকে। কিন্তু যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায়,—যাহার আত্মরক্ষ... শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার পক্ষে সূক্ষ্ম দার্শনিক ... বিচার একটা হাস্যকর প্রহসন ভিন্ন আর কি? তাই তিনি ... মুমূর্ষু জাতির কর্ণে সঞ্জীবনী প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহ... দেহে নব শক্তি ও হৃদয়ে নব আশা-উদ্দীপনা সঞ্চারে ব্রতী হই... ছিলেন। তাঁহার "প্রণবানন্দ" নাম সার্থক। তিনি হিন্দুকে নূত... আশার বাণী শুনাইয়াছেন, নব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নূতন পথ... নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনা জড়বাদ ... আলস্যের প্রশ্রয়স্থল হইয়াছিল তাহার মধ্যে নব প্রাণ-শক্তির বৈদ্যু... সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে প্রের... দিয়াছিলেন। নিভৃত সাধনা মন্দির হইতে তাঁহাকে জগতের বাস্ত... সমস্যা-সম্মুখ কর্ম্মক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই অভ...

পথনির্দ্দেশের জন্তই তিনি যুগনেতার বরণীয় পদে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

যে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার নেতৃত্ব-শক্তির সম্মুখে আমরা বিস্ময়াবনত হইয়া পড়ি। তাঁহার অসামান্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অসাধ্যও সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চুম্বক যেমন বিচ্ছিন্ন লৌহকণাকে আকৃষ্ট করিয়া সংহত করে, তিনিও তেমনি আমাদের হিন্দু সমাজের ব্যক্তিসর্ব্বস্ব অণু-পরমাণুগুলিকে এক মহান্ আদর্শের ঐক্যে সংহতি দিয়াছেন। আজ তাঁহারই অনুপ্রেরণায় এই বহু-বিচ্ছিন্ন জাতির খণ্ডাংশগুলির মধ্যে নষ্ট যোগসূত্রের পুনর্গ্রহণ হইয়াছে, আজ হিন্দু সমাজ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রাণিদেহের মতন সর্ব্বাঙ্গে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শিরা-উপশিরায় একই

স্বামী প্রণবানন্দ

রক্তপ্রবাহ অনুভব করিতে শিখিয়াছে। মাত্র ২৫ বৎসরে এই বহু শতাব্দীর অসম্পন্ন কার্য্য সমাপ্তির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। যখন বিরাট্ সৌধ গড়িয়া উঠে, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিয়া আমরা তাহার অতীত ইতিহাস, তাহার প্রথম প্রচেষ্টার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা ভুলিয়া যাই। যে বিরাট্ শক্তির বলে কীর্ত্তি স্তম্ভ গড়িয়া উঠে, তাহা সেই স্তম্ভের পশ্চাতেই আত্মগোপন করে। হয়ত এক দিন স্বামীজীও তাঁহার উদ্‌যাপিত ব্রতের সাফল্যের কীর্ত্তিচ্ছটায় আমাদের নিকট অদৃশ্য হইবেন। ইহাই তাঁহার সাধনার চরম সিদ্ধি, নিষ্কাম কর্ম্মীর পরম পুরস্কার। স্বামীজীর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ আর এক দিক্ দিয়া হিন্দু সমাজের পক্ষে স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা, সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বদা ত্যাগ ও নিরাসক্তির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। আমাদের রাজসিংহাসনও গৈরিক বসনাবৃত, আমাদের ভোগের তুষ্টি ত্যাগের বিপরীত আকর্ষণে শিথিল। গার্হস্থ্য জীবনে আমরা যে সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করি, তাহাদের পিছনে নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা যদি না থাকে তবে সেগুলি অনুবর্ত্তন ও জড় অভ্যাসে পরিণত হয়,

সেই জন্তই গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হও আমাদের সমাজের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দৈবের হেতু হইয়াছে। শা উৎসের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে অবিচ্ছিন্ন শক্তি-প্রবাহ আসিবে কে হইতে? জীবন্ত স্রোতঃপ্রবাহের সঙ্গে বিযুক্ত হইলে জল বদ্ধজলের আধার হইয়া ইহার স্বাস্থ্য ও গতিবেগ হারায়। নি ধর্ম্মের কথা আমরা গীতাতে ও অন্তান্ত ধর্ম্মগ্রন্থে শুনিয়া থাকি, কিন্তু উপদেশে কি শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়? সন্ন্যাসের মা নিষ্কাম ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী যখন গৃহস্থ বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে ডাক দেন, তখনই আমরা গার্হস্থ্যের প্রকৃত উদ্দে ও প্রশস্ত পটভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠি। তাই হিন্দুধ পুনর্জীবনের ইতিহাসে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রভাব ও কৃতিত্ব খুব বেশী বিবেকানন্দ হইতে সন্ন্যাস ও নিষ্কাম ধর্ম্মের এই গৈরিক প্লাবন নি হইয়া স্বামী প্রণবানন্দজীর ভিতরে তাহা সুপরিপুষ্ট পূর্ণতা লা করিয়া আমাদের মনকে বৈরাগ্যের ধূসর রঙে রঞ্জিত করিয়াছে— সেবার, কল্যাণের, জনহিতের, শক্তি গঠনের আদর্শ আমাদের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আমাদের ধর্ম্মকে সজীব ও ক্রিয়াশীল করিয়াছে,— আমাদিগকে বৃহত্তর মুক্তির আস্বাদ দিয়াছে। এই দিক্ দিয়া স্বাম প্রণবানন্দজীর প্রভাব আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষে অশে কল্যাণকর হইয়াছে।

এই মহাপুরুষের তিরোধান আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব? কি কি উপায়ে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি যোগ্য মর্য্যাদা ও সম্মান দেখাইব। সন্ন্যাসীর কোন পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন নাই, তিনি আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক। অবশ্য তাঁহার অসংখ্য ভক্ত শিষ্যবৃন্দ তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার জীবন ব্যক্তিগত সব কিছুর অনেক ঊর্দ্ধে। মৃত্যু গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে একটা বিভীষিকা। মৃত্যুর সংস্পর্শে আমাদের মনে যে ছবি জাগিয়া উঠে তাহা শোকাকুল স্ত্রীপুত্র-পরিজন, অসহায় আত্মীয়-কুটুম্ব ও মুহ্যমান বন্ধু-বান্ধবের। সন্ন্যাসীর তিরোধানের সঙ্গে এই সমস্ত বেদনা-ভরা ছবির কোন সংস্পর্শ নাই। আমরা আত্মা অবিনশ্বর—ইহা বিশ্বাস করি। যদি এই বিশ্বাস আমাদের আন্তরিক হয়,—কেবল মাত্র অর্থহীন, মূঢ় আবৃত্তি না হয়, তবে শোকের ত কোন অবসর নাই। যত দিন স্বামীজীর আদর্শ আমাদের মনে জাগরূক ও সক্রিয় থাকিবে, তত দিন তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই বলিয়াই আমাদের স্থির বিশ্বাস। যত দিন তাঁহার আদর্শানুযায়ী হিন্দু-সংগঠন কার্য্য চলিতে থাকিবে, গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে শত শত মিলন-মন্দির গড়িয়া উঠিবে, তত দিন তাঁহারই অশরীরী আত্মা আমাদের পথ দেখাইতেছেন মনে করিতে হইবে।

আসুন, আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, তাঁহার কার্য্য তাঁহার অভাবে অসম্পূর্ণ থাকিবে না। প্রত্যেক হিন্দু তাঁহার সমস্ত উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা তাঁহার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে আত্মনিয়োগ করিবে? তীর্থ সংস্কার ও মিলন-মন্দির স্থাপনে ধর্ম্মের সমস্ত গ্লানি ও আবর্জ্জনা বর্জ্জনে, সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধনে, তাঁহার মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে এবং চরম পথে না পৌঁছান পর্য্যন্ত এ যাত্রার বিরতি হইবে না।

বাংলার নবজীবন

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনতার কথা বলিলে এ দেশের ছেলেরা হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিত। দেশের যে স্বাধীন হওয়া দরকার বা স্বাধীন হওয়া সম্ভবপর, এ কথা ভাবিতে তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যাইত। চীনে বক্সার বিদ্রোহের সময় এক জন জাপানী এক জন বাঙ্গালী যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমাদের দেশ স্বাধীন হইবে কবে?" যুবক উত্তর দিয়াছিল—"স্বাধীন! কই, সে কথা তো আমরা কখনও ভাবি নাই?" দেশের পেশাদারী রাজনৈতিক পাণ্ডারা তখন ভাল ভাল ইংরেজী গৎ মুখস্থ করিয়া বাহবা লইয়া বেড়াইতেন। এক শত কি দুই শত বৎসর পরে যখন আমরা ভাষায়, ভাবে, আচার ব্যবহারে ফিরিঙ্গিস্থানের একটি নকল সংস্করণ হইয়া উঠিতে পারিব, তখন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বা ঐ রকম একটা কিছু আমাদিগকে বখ্‌সিসস্বরূপ দান করিয়া দিবেন—এই আশায় ও [illegible] আমাদের পাণ্ডারা মসগুল হইয়া থাকিতেন। ভারত-উদ্ধারের কথা তখন একটা উদ্ভট কল্পনা বলিয়া মনে হইত।

একটা মোহের আবরণ আসিয়া আমাদের অতীত ইতিহাস আমাদের চক্ষু হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছিল। নিজেদের দেশকে আমরা চিনিতাম না, বুঝিতাম না। কাহেজ-পাঠ্য ইতিহাস যাহা পড়িতাম তাহা শুধু আত্মগ্লানির কথা, ভীরুতার কথা, কাপুরুষতার কথা, বিশ্বাসঘাতকতার কথা। চক্ষের সম্মুখে যাহা দেখিতাম তাহা শুধু তোষামোদের ছবি, দুর্ব্বলতার ছবি। স্বদেশ-প্রেমের কথা বলিতে হইলে বাঙ্গালীকে তখন মহারাষ্ট্র হইতে শিবাজী বা পাঞ্জাব হইতে গুরুগোবিন্দকে ধার করিয়া আনিতে হইত।

তাহার পর এক দিন সাত শত বৎসরের অন্ধকার ভেদ করিয়া বাংলার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইল। বাঙ্গালীর ছেলে বুঝিল যে এত দিন পরে তাহার ডাক আসিয়াছে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বিবেকানন্দের তপস্যা বৃথায় যায় নাই। জাতীয় জীবনের কোন্ নিভৃততম গুহায় সেগুলি এত দিন নীরবে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। বাঙ্গালীর ছেলে যেন এই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় এত দিন বুকে বেদনা ও লাঞ্ছনার ভার লইয়া পাষাণের মত পড়িয়াছিল। এই বার মহাশক্তির আশীর্ব্বাদী স্পর্শে তাহার [illegible] পৃষ্ঠ [illegible] সোজা হইয়া গেল। মোহের ঠুলি তাহার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়িল। সে বুঝিল যে, এত দিন ধরিয়া দেশে যে রাজনীতির অভিনয় হইয়া আসিয়াছে, তাহা শুধু কাঙ্গালের আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলের ক্রন্দন, মোহাবিষ্টের দুঃস্বপ্ন মাত্র। নিজেদের জন্মস্থানকে স্বদেশ বলিবার অধিকার যাহার নাই, স্বদেশ ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই তাহার একমাত্র রাজনীতি।

সেই আন্দোলনের [illegible]

আবির্ভাব হইল। বাংলার কণ্ঠে দেশের বন্দনা-গীতি ধ্ব[illegible] হইয়া উঠিল, বাঙ্গালীর প্রাণ ছ[illegible] স্ফীত হইল, বাঙ্গালীর শীর্ণ বা[illegible] বল দেখা দিল। আসমুদ্র-হিমাচলব্যা[illegible] বাংলার সৌন্দর্য্য বাঙ্গালীর ছে[illegible] মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সে বুঝিল সে-ও মানুষ; উন্মুক্ত আকাশের ত[illegible] উচ্চশির হইয়া দাঁড়াইবার অধি[illegible] তাহারও আছে।

তাহার পর বহু বৎসর কা[illegible] গিয়াছে। বাঙ্গালীর আত্মোদ্ধার এখনও উদ্‌যাপিত হয় নাই। [illegible] উদ্‌যাপনের পথে যত কিছু বাধা [illegible] বর্ত্তমান, একে একে সেগুলির প[illegible] বাঙ্গালী পাইয়াছে। এদেশে [illegible] যখন বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের ধুম লা[illegible] তখন একখানা ফিরিঙ্গি সংবাদ[illegible] হুমকি দিয়া এদেশের লোককে জানাইয়া দিয়াছিল যে, যে[illegible] জাতি সাম্রাজ্য গড়ে (Imperial race) তাহাদের ম[illegible] ব্যাঘ্র-ধর্ম্ম (Tiger qualities) সুপ্ত হইয়া থাকিলে একেবারে লুপ্ত হয় না। আবশ্যক মত সেই সব শাণিত ন[illegible] দন্তের সদ্ব্যবহার করিতে তাহারা ইতস্ততঃ করে না। আজ কলিকাতার মোড়ে মোড়ে সেই ব্যাঘ্র-ধর্ম্ম পুলিসের লাঠি ও সার্জ্জেন্টে[illegible] পিস্তলের রূপ ধরিয়া বিরাজমান।

কিন্তু বাঙ্গালীর স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প বন্দুকের গুলীতে মরে নাই, কারাগারের লৌহ শৃঙ্খলেও বাঁধা পড়ে নাই, ফাঁসিকাঠেও নিস্তব্ধ হইয়া যায় নাই। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঝঞ্ঝার পর ঝঞ্ঝা বাঙ্গালী[illegible] মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় জীব[illegible] তাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। আজ আর আত্মগ্লানি, বিক্ষোভ [illegible] বিভ্রম এ জাতিকে মারিতে পারিবে না। মৃতসঞ্জীবনী ভাব-মন্দাকিনী[illegible] অমিয় প্রবাহ স্পর্শে পদদলাঞ্ছিত পতিত জাতি আজ নবজীবনে[illegible] পূর্ব্বাস্বাদ পাইয়া সতেজ ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে জাতি[illegible] গৌরবময় অতীতের কথা নিত্য কাণে বাজে, সে জাতি মরে না। আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে ক্ষণেকের জন্য হয় ত পদস্খলন হয়, কি[illegible] ধ্বংস হয় না। আত্মবিশ্বাসের অভাবে হয় তো আমরা মাঝে মাঝে[illegible] পথ নির্দ্দেশের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ি; কিন্তু স্বরাজের ব্যাখ্যা[illegible] করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী একবার জলদ-গম্ভীর স্বরে যে কথাগুলি ঘোষণা করিয়াছিলেন সেগুলি যেন অগ্নিময় অক্ষরে আমরা হৃদয়ের ভিতর লিখিয়া রাখি। তিনি বলিয়াছিলেন—

"Swaraj has to be experienced by each one for himself. One drowning man will never save another Slaves ourselves, it will be mere pretention to think of freeing others."

"প্রত্যেককে আপনার হৃদয়ের ভিতর স্বাধীনতার অনুভূতি লাভ করিতে হইবে। যে পরমুখাপেক্ষী দাস, সে কখনও অপরা[illegible]

এই আত্মবিশ্বাস স্বাধীনতা লাভের গোড়ার কথা। সুভাষচন্দ্রের ভিতর এই আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আজ নেতাজী নামে অভিহিত। আজ ভগবানের পাঞ্চজন্য মুক্তিকাম সাধকের কাণে মরণ-বরণ মন্ত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছে; আজ সেই আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া সকল-ভোলা, সকল-হারা কর্ম্মীর দল প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ের অন্বেষণে ছুটিয়াছে। বৈরি-রোষানলকে অবহেলার হাসিতে তুচ্ছ করিয়া আপনাদের সর্ব্বস্ব তাহাতে আহুতি দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। আজ আর এ জাতির আত্মবিস্মৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

আজ চাই শুধু সাহস, ধৈর্য্য আর আত্মবিশ্বাস।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া

বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের খাদ্যসঙ্কট গুরুতর হওয়ার আশঙ্কার কথাই শুধু ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে জানাইয়াছেন। এই খাদ্যসঙ্কট যে কত গুরুতর, কত বেশী ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা সে-সম্বন্ধে কোন আভাস দিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। কিন্তু আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা কয়েক জন দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, এই দুর্ভিক্ষ এত ভয়ঙ্কর হইবে যে, তেরশ' পঞ্চাশের বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষও তাহার কাছে ছেলেখেলা বলিয়া মনে হইবে। তাঁহাদের নিকট উক্ত সংবাদদাতা আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, এই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইবে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমি এবং দশ কোটি লোক এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িবে। বাঙ্গালার কথা উক্ত সংবাদদাতা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা পরিভ্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, এই জেলার কয়েকটি স্থানে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের যে-কোন অঞ্চলেই দুর্ভিক্ষ হউক না কেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে বাঙ্গালাও মুক্ত থাকিবে না—বাঙ্গালায় আবার দুর্ভিক্ষ হইবে, যদি সময় থাকিতে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা যায়। কিন্তু মিঃ বি আর সেনের বক্তৃতায় প্রতিকারের জন্য সরকার যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন বা করিবেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি তাহা মোটেই আশ্বস্ত হইবার মত নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে আসন্ন দুর্ভিক্ষে দশ কোটি ভারতবাসী পড়িবার সম্ভাবনা, কি ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-সচিব সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, কি খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেন কাহারও কাছেই তার সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা জানিতে পাই নাই! এই দুর্ভিক্ষ আশঙ্কার সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হইল আমেরিকায়।

সরকারের নিষ্ক্রিয়তা স্বেচ্ছাকৃত ?

ইউরোপে দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কার কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু ইউরোপে দুর্ভিক্ষ হইলেও সামান্য রকমই হইবে, ভারতের মত ভয়াবহ হইবে না। উক্ত সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশগুলি ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়াছেন। অজ্ঞ থাকিবার কারণ কি ইহাই নয় যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের এজেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের প্রকৃত খাদ্য-পরিস্থিতির কথা তাঁহাদিগকে জানান নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন? তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা কি স্বেচ্ছাপ্রসূত? ইহা কি কোন উদ্দেশ্যমূলক? এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? ভারত সরকার যে পরিমাণ চাউল ব্রহ্ম হইতে পাইবার আশা করিয়াছেন, সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড ক তাহার অর্দ্ধেক মঞ্জুর করিবার যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহ কারণ ইহাই যে, সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ডকে ভারতের ভয়াবহ খা সঙ্কটের কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই। সার রবার্ট হাচিংস হ এই বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন; কিন্তু তখনও প্রকৃত ত প্রকাশ করা হইবে কি না কে জানে? গত তেরশ' পঞ্চা দুর্ভিক্ষের সময়ও আমরা দেখিয়াছি, মিঃ সুহরাওয়ার্দি ভারতের অন্য প্রদেশের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার অন্নাভাব সম্বন্ধে উদাসীন থাকার অ যোগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে, বাঙ্গালায় খাদ্য ভাব নাই বলিয়া বাঙ্গালা সরকার যে-প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলে তাহারই ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জানিতে পারে নাই বাঙ্গালায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তখন চলিতেছিল। আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে উহারই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই আসন্ন ভয়াব দুর্ভিক্ষ আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেখা দিবে এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্ক এখনই বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ভারত গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বিক সমাধিমগ্ন যোগীর মতই নির্ব্বিকার। 'নিউইয়র্ক টাইমস'র উক্ত সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, 'কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্য-সংক্রান্ত বিতর্ক শুনি নিরপেক্ষ ব্যক্তির মনে হইবে যে, বৃটেন ইচ্ছা করিয়া দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিতেছে।" এই উক্তি সংস্কৃত ব্যাকরণে সংক্ষিপ্ত সূত্রের মতই তাৎপর্য্য পরিপূর্ণ। দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে এবং হয়ত বড়লাট জন গণের বিশ্বাসভাজন নেতাদিগকে লইয়াই তাঁহার শাসন পরিষদ গঠন করিবেন। তখন দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা সমূহের উপর চাপাইবার চেষ্টা আবার চলিলেও দুর্ভিক্ষ যে আমাদের পরাধীনতারই দান সে-সত্য তাহাতে চাপা পড়িবে না। কিন্তু আর একটা অধিক তর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মৃত্যুস্নান হইতে ভারতবর্ষকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য কেহ আছে কি?

ভারতময় অন্নাভাব

ভারতে আসন্ন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায়, আমাদের শাসকবর্গ উদ্বিগ্ন না হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ পিটার ফ্রেজার ভারতবর্ষ আবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হওয়ার কথা ঘোষণা করায় সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ভারতের শোচনীয় খাদ্য-পরিস্থিতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহের অবস্থাই শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত অদূর ভবিষ্যতে যে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের মত কোন স্থান বিশেষে আবদ্ধ থাকিবে না, সমগ্র ভারতে ব্যাপক ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, মিঃ ফ্রেজারের এই আশঙ্কা মোটেই অমূলক নহে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতের এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা ভারত গভর্ণমেণ্টের 'জী হুজুর' প্রতিনিধির মুখ হইতে বাহির হয় নাই, অথবা আমাদের দেশ শাসক বৃটেনের প্রতিনিধিও এই আশঙ্কার কথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিদের কাছে পেশ করা প্রয়োজন

বলিয়া মনে করেন নাই। অধিকন্তু, ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা প্রেরিত ভারতে দুর্ভিক্ষ আশঙ্কার কথা ভারত হইতে ওয়াশিংটনে প্রেরিত সরকারী রিপোর্টে সমর্থিত হয় নাই। দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দেশের লোকদিগকে খাওয়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের যে দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে, আমাদের শাসকবর্গ কি ভাবে এই দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব? তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতে আমাদের শাসকবর্গ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহা বুঝা যায় কি? সমগ্র ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কায় বাংলার কথাই সর্ব্বপ্রথম আমাদের মনে পড়িলে মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সে-দিন বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এ সি হার্টলি জানাইয়াছেন, বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না। ডিরেক্টার অব ষ্টোরেজ ব্রিগেডিয়ার এইচ ডিমলার বলিয়াছেন, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বহু দূরে। এই সকল উক্তি যে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্তব্যের প্রতিবাদ তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু কি কারণে তাঁহারা এইরূপ আত্মসন্তুষ্ট মনোভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের বিবৃতি হইতে তাহা কিছুই বুঝা গেল না। আসন্ন দুর্ভিক্ষ বোম্বাই মাদ্রাজ এবং দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করাতেই কি তাঁহারা এত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন? কিন্তু তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ১৩৪৩ সালেও দক্ষিণ-ভারতেই দুর্ভিক্ষ হইবে বলিয়া প্রথমে আশঙ্কা করা হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বাঙ্গালায়।

ভারতের কোন স্থান-বিশেষেও যদি এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, বাঙ্গালায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার আশঙ্কা মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। বাঙ্গালায় আমনের ফসল এবার ভাল হয় নাই। সরকারী গুদামে প্রবেশ করিলেই আটা, ময়দা, চাউল পচিয়া নষ্ট হয়, ইহা পুনঃ পুনঃই আমরা দেখিতেছি। গত ডিসেম্বর মাসে লাহোরে যে নিখিল ভারত অর্থ নৈতিক সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এইচ সি ঘোষ তাঁহার '১৯৪৬ সালে বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রামাণ্য তথ্যাদি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৫০ মণ চাউল কম পড়িবে। অর্থাৎ বাঙ্গালায় এই বৎসর ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাদ্য কম পড়িবার আশঙ্কা। ইহার অর্থ, প্রায় দুই মাসের চাউল আমাদের কম পড়িবে। কিন্তু বাহির হইতে বাঙ্গালা দেশ এই পরিমাণ চাউল পাইবার আশা করিতে পারে কি? মাদ্রাজের অবস্থা যে খুব সঙ্কটজনক তাহা মিঃ ভেঙ্কটসুব্বা রেড্‌ডি গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় পরিষদে উল্লেখ করিয়াছেন। মাদ্রাজ একটি ঘাটতি প্রদেশ। বাহির হইতে আমদানী চাউলের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় অনেকখানি। মাদ্রাজের তাঞ্জোর, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা জেলাতে ভাল ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই কয়েকটি জেলাতেই অনাবৃষ্টি অথবা ঘূর্ণীবাত্যায় ফসল নষ্ট হইয়াছে এবং অন্য স্থান হইতে খাদ্যশস্য না আনিলে এই জেলাত্রয়ের অভাব মিটিবে না। অন্যান্য জেলাগুলি ঘাটতি অঞ্চল। মিঃ রেড্‌ডি বলিয়াছেন, এই ঘাটতি জেলাগুলিকে ভুল করিয়া উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়া ধরা হইয়াছে; কি দুর্ভিক্ষের ভুল হইবে কি? লীগদলীয় সদস্য মিঃ আহম জাহ কেন্দ্রীয় পরিষদে বলিয়াছেন, বোম্বাই প্রদেশে বিশেষ করিয়া কর্ণাটকে খাদ্য-সঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। উত্তর কানাড়ার অধিবাসীরা চাউল ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। ধারওয়ার জেলায় জোয়ারের দাম শতকরা সাড়ে বার ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। বে-সরকারী হিসাব মতে বোম্বাইয়ে ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়াছে। মাদ্রাজের ৬ লক্ষ টন খাদ্য কম পড়িবে এইরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন, বোম্বাইয়ে ৪ লক্ষ টন এবং মাদ্রাজে ৬ লক্ষ টন, মোট ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্য ১৯৪৬ সনে কম পড়িবার আশঙ্কা। কি ভাবে এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, তাহা ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেনের বক্তৃতায় যেমন আমরা পাই নাই, তেমনি ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী সার ফিরোজ খারেগেট যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেও তাহার কোন আভাষ পাইলাম না।

খাদ্যসমস্যার সমাধান কি?

ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি যে সঙ্কটজনক, এ কথা ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ডকে বুঝাইতে সমর্থ হন নাই, 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা এই মর্ম্মে মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটনে অবস্থিত বৃটিশ খাদ্য-মিশনের কর্ম্মচারিবৃন্দ না কি এ কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু সমস্যাটা শুধু স্বীকার অস্বীকারের প্রশ্ন নয়। ভারতে অন্ততঃ পক্ষে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন। ব্রহ্মদেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহার পরিমাণ উহার প্রায় অর্দ্ধেক। কিন্তু সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড উহাও মঞ্জুর করিবেন না, এই আশঙ্কা কি সত্যই মিথ্যা? যদি মিথ্যাই হইবে, তাহা হইলে সার রবার্ট হাচিংসের ওয়াশিংটন যাওয়ার কারণ কি? ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর জানিয়াও কি সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড ভারতবর্ষকে প্রয়োজনীয় চাউল ও গম মঞ্জুর করিতে অনিচ্ছুক? তাই যদি হয়, তবে নিরন্ন ভারতবাসীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানের আর কি উপায় আছে? গত চারি বৎসর ধরিয়া 'অধিক খাদ্য উৎপাদনে'র আন্দোলনের নামে সরকার শুধু অর্থই ব্যয় করিয়াছেন। উহা দ্বারা জনকতক সরকারী কর্ম্মচারীর অন্ন-সমস্যার সমাধান হইলেও এক ছটাক খাদ্যশস্যও বেশী উৎপন্ন হয় নাই। সার ফিরোজ খারেগেট অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন, তাহার ফল পাইতে এখনও বহু দেরী। কিন্তু দ্বারে দুর্ভিক্ষের করাঘাত এখনই শোনা যাইতেছে। 'মরণ হলো এখন তখন, ওঝা হলো ছয় মাসের পথ', এই প্রবাদবাক্যের কথাই শুধু সার ফিরোজের বক্তৃতা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আমাদের সর্ব্বপ্রধান অব্যবহিত প্রয়োজন সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড যাহাতে ভারতের জন্য অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মঞ্জুর করেন, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ ফ্রেজারের ঘোষণায় জানা গেল

যদি সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড ভারতের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের দিক্ হইতেও যদি আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে হয়ত ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। খাদ্যশস্য পাওয়া গেলেও আনিবার জাহাজ পাওয়ার সমস্যাও যে কম হইবে না, তাহা গত দুর্ভিক্ষের সময় আমরা দেখিয়াছি। আমাদের দ্বিতীয় প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন। কিন্তু যে সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইতে হইবে সেই সরিষার মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তাহা হইলে রেশন ব্যবস্থা চালু হইলেও, হয় মানুষের অখাদ্য খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না হয় অর্দ্ধ-অনশনেই দিন কাটিবে। কি হইবে তাহা আমরা অনুমান করিতে অসমর্থ। কিন্তু সরকারী আত্মপ্রসাদ ও ঔদাসীন্যের সম্মুখে আসন্ন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিণামের কথা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

চট্টগ্রাম

বাঙ্গালার চট্টগ্রাম বাঙ্গালার গৌরব। কিন্তু সে-কথা বোধ হয় আমরা অনেকেই আজ ভুলিয়া গিয়াছি। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে চট্টগ্রামের কথা তিনি মনে রাখিবেন। চট্টগ্রামের কথা শুধু গান্ধীজী কেন, ভারতবাসী, এমন কি বিশ্ববাসীও মনে রাখিবে। মনে রাখিবার মতো কাজ করিয়াছে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বীরত্ব, চট্টগ্রামের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা, চট্টগ্রামের অতুলনীয় দেশপ্রেম ভুলিবার নহে। চট্টগ্রামকে ভুলিলে নিজেকে ভোলা হইবে, নিজের দেশবাসীর ইতিহাস, দেশের ইতিহাস ভুলিয়া যাওয়া হইবে। বাঙ্গালার গৌরব চট্টগ্রামকে তাই আমরা ভুলিতে পারি না।

১৯২১ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন বাঙ্গালার সমস্ত জেলার মধ্যে চট্টগ্রামই প্রথম সেই আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দেয়। চট্টগ্রামেই প্রথম স্কুলে ও কলেজে ধর্ম্মঘট হয়। বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট এবং এ-সম্পর্কে পরলোকগত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে চট্টগ্রামবাসীর আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর অধ্যায় হইয়া থাকিবে। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে চট্টগ্রাম যে ভূমিকা গ্রহণ করে তাহাও আজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন শুধু বাঙ্গালায় নহে সমগ্র ভারতে, এমন কি বিলাতে পর্য্যন্ত বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ নন্দী বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকগণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনীকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের অগ্রদূত বলিয়া গণ্য করিবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের যাহারা মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাঁহাদের সহযোদ্ধা ও তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী বীর যোদ্ধাদের মুক্ত করা নয় কি? আজ যদি সর্ব্বাগ্রে এই বীর যোদ্ধাদের মুক্ত করিবার শপথ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে বুঝিতাম, বীর হইয়া তাঁহারা বীরের মর্য্যাদা রাখিতেছেন। আশা করি, তাঁহারা এই মর্য্যাদা বাঙ্গালায় আসিয়া নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

যুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম যে কি নিদারুণ দুঃখকষ্ট ও নির্য্যাতন করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, ঔ নাই, নিরাপত্তা নাই, চট্টগ্রামের চারিদিকে কেবল মৃত্যুর আতঙ্ক আকাশে জাপানী বোমার বিভীষিকা। প্রতিটি মুহূর্ত্তে মৃ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া চট্টগ্রামবাসী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়া চট্টগ্রামের সেই সংগ্রামের কাহিনী শুনিলে রোমাঞ্চ হয়। ১৯ সালের ৮ই মে পতেঙ্গার বিমান ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ হইতে আ করিয়া ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিনগুলি আজ একবার যদি আমরা স্মরণ তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব কি নির্ম্মম দুর্দ্দিন, কি নিষ্ঠুর আ চট্টগ্রাম বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছে। সেই সময় যখন অনন্ত গণেশ ঘোষ এবং চট্টগ্রামের অন্যান্য বীর দেশপ্রেমিকরা দেশবাসীর (করিবার জন্য, নিদারুণ দুর্দ্দিনের সময় দেশবাসীর পাশে দাঁড়াইবার মুক্তি চাহিয়াছিলেন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ যখন তাঁহাদের মুক্তি করিয়াছিল তখনও সরকার তাঁহাদের মুক্তি দেন নাই। চট্টগ্রা উপর বিদেশী সরকারের প্রতিহিংসার খড়্গ যেন চিরদিনই উ হইয়া রহিয়াছে।

১৬ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীব নন্দী কসাই-পাড়া গ্রামের সাম্প্রতিক সামরিক উৎপীড়ন সম্প মহাত্মা গান্ধীর নিকট নিম্নলিখিত বিবরণ পেশ করিয়াছেন:—

গত ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকার সময় স্থানীয় বা মিঞার পত্নী শুকুজুয়াল নিকটস্থ জলাশয়ে জল আনিতে যায়। (সময় গণ্ডাম পাইওনিয়ার কোরের ৪ জন লোক তাহাকে আক্র করে। তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক সমবেত হয় এ আক্রমণকারীদের তাড়াইয়া দেয়।

আধ ঘণ্টা বাদে আক্রমণকারীরা ৫০।৬০ জন লোক লই আবার আসিয়া হানা দেয়। এই সময় গ্রামবাসীদের সহি তাহাদের সংঘর্ষ হয় এবং তাহার ফলে হাজি খাঁ গুরুতর ভাবে আহ হন। কিন্তু এবারও তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায় তৃতীয় বার তাহারা পাঁচ শত লোক লইয়া হানা দেয়। তাহাদে হাতে লাঠি, পেট্রল এবং টর্চ্চ লাইট ছিল এবং তাহারা পেট্রল ঢালি আগুন জ্বালাইয়া দেয়; পুরুষদের গুরুতর ভাবে আক্রমণ করে নারীদের শ্লীলতাহানি করে এবং দরিদ্র নিরস্ত্র নিরীহ গ্রামবাসীদে ধনসম্পত্তি লুঠপাট করে। ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) ৪খানি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ ছাড়া অন্য সকল গৃহ পুড়িয় ছাই হইয়া গিয়াছে। এই গৃহগুলির মধ্যে ৬২টি পরিবার বাস করিত

(২) সমস্ত অঞ্চল জুড়িয়া কেবল গৃহ-পালিত পশু-পক্ষী মৃতদেহ দেখা যায়। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই কসাই, কাজেই তাহাদের গৃহে অসংখ্য গৃহপালিত জীবজন্তু ছিল। এখন প্রায় সকলই খোয়া গিয়াছে।

(৩) আমরা বহু ধান্য ও বিচালীর গোলা জ্বলন্ত অবস্থা দেখিতে পাই।

(৪) পরিধেয় বস্ত্রাদি, তৈজসপত্র, নগদ টাকাকড়ি কারেন্সী নোট প্রভৃতি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

(৫) হেয়াত আলি নামক এক ব্যক্তি পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

(৬) হামিদা খাতুন এবং মাজু বিবি ভয়ানক আঘাত পাইয়া হাসপাতালে আছেন।

(৭) ভাল মিঞার স্ত্রী মাথায় আঘাত পাইয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৮) প্রায় দশ জন নারী সামান্য আঘাত পায়।

(৯) হামিদা খাতুনের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে।

(১০) ইদ্রিস মিঞা ও সালে আহমদকে নির্দ্দয় প্রহার করা হয়। ইহা ব্যতীত আরও বহু লোক সামান্য আঘাত পায়।

সামরিক গুণ্ডামীর ইহাই প্রথম নিদর্শন নয়। ১১শে ডিসেম্বর এক দল সশস্ত্র গুর্খা একটি চায়ের দোকানে হানা দিয়া লোকজনকে এমন মারপিট করে যে, তাহাদের হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছিল। ছত্রেশ্বরী বাড়ীতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সামরিক লোকেরা গিজুলিস্থিত আশ্রম আক্রমণ করে। চলতি গাড়ীতে প্রায়ই সামরিক গুণ্ডামী চলিতেছে।

আজও চট্টগ্রামের উপর নিদারুণ নির্য্যাতনের ঝড় বহিয়া যাইতেছে। কসাইপাড়া গ্রামে সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সভ্যতার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনা যায় নাই। কিন্তু চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের সংগ্রামের নিজস্ব কৌশল ও নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। দুঃখে-কষ্টে, বিপদে-আপদে, দুর্দ্দিনে, দুঃসময়ে, মন্বন্তরে, মহামারীতে, সাম্রাজ্যবাদ নির্য্যাতনে ও ফাসিষ্ট আক্রমণে চট্টগ্রাম যে ভাবে বরাবর তাহার বীর সন্তানদের মতো এক হইয়া বুক ফুলাইয়া জীবন পণ করিয়া প্রতিরোধের সঙ্কল্প লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবারেও কসাই-পাড়ার কসাইদের প্রতি বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম সেই দল ও মত-নির্ব্বিশেষে এক হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম যেমন অতীতে অনেক বার সমগ্র দেশকে পথ দেখাইয়াছে, এবারেও চট্টগ্রাম সেই সংগ্রামের পথ দেখাইবে, ইহাই আমরা বীর চট্টগ্রামবাসী-দের নিকট হইতে প্রত্যাশা করি। চট্টগ্রামের জয় সমগ্র দেশকে গৌরবান্বিত করিবে। চট্টগ্রামের জয় প্রত্যেক দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবে। চট্টগ্রামের কথা আমরাও ভুলিব না কোন দিন।

অরুণা আসফ আলী

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন ছোট-বড় সকল কংগ্রেস নেতাকে ব্যাপক ভাবে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়া হয় এবং গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে গ্রেপ্তার করেন, সেই সময় কয়েক জন ক্ষুদ্র নেতা আত্মগোপন করেন। তাঁহারা খ্যাতনামা জননায়ক না হইলেও আত্মগোপনের পর আমলাতন্ত্রীদের চক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহারা তৎকালীন অবস্থায় যাহা ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করেন তদনুযায়ী গোপনে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। উহাতে মহিলাগণও যোগ দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মধ্যে উষা মেহতা ও এ্যালিস এলভারেসকে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যিনি আমাদের নিকট অধিকতর পরিচিত, সেই অরুণা আসফ আলীকে তাঁহারা গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করেন, কিন্তু গোয়েন্দা বাহিনী তাঁহার সে স্থান লাভে ব্যর্থ হয়। আত্মসমর্পণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া তাঁহার গৃহের দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। আত্মসমর্পণের মেয়াদ অতিবাহিত হইল, কিন্তু অরুণা আসফ আলীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁহার গৃহ ও মোটর বাজেয়াপ্ত হইল এবং তাঁহার নামে ৭টি অভিযোগ দাখিল করা হইল। কারারুদ্ধ পাণ্ডাদের উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহার সম্পর্কে সংবাদ জানিবারও ব্যবস্থা হইল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না।

জানুয়ারী মাসের শেষে দিল্লীর কমিশনার অকস্মাৎ অরুণা আসফ আলীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল করিয়া এক নির্দ্দেশ দিলেন। আপত্তিকর পুস্তক ও কাগজপত্র প্রচার এবং নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ না করার অভিযোগেই তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

অরুণা আসফ আলী কলিকাতায় আছেন এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লী আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ রটিয়া গেল। গত ৩০শে

জানুয়ারী তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর কিছু নহে এবং তাঁহার উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হওয়ায় তিনি সুখীও নহেন। কেন না, ভারতমাতার স্বাধীনতাকামী বহু পুরুষ ও নারী এখনও কারান্তরালে নির্য্যাতিত হইতেছেন। আত্মপ্রকাশের পর কলিকাতায় প্রথম বক্তৃতায় তিনি বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন ও বড়লাটের সহিত আলাপ-আলোচনা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেন।

তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সময়ে ব্যস্ত থাকায় সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় নাই। তিনি স্বামী আসফ আলীর নিকট তার করেন।

যাহা হউক, দীর্ঘ ৪২ মাস গোপন ও বিপজ্জনক জীবন যাপনের পর তিনি দিল্লী ফিরিয়াছেন। স্বামীর গুরুতর পীড়ার সময় তাঁহাকে দূরে থাকিতে হইয়াছিল। কেন না, গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন সদা-সর্ব্বদাই তাঁহার পিছনে লাগিয়াছিল। আসফ আলী আজ সুস্থ হইয়াছেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সমর্থন কমিটি ও কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। যে অরুণা আসফ আলী ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালাইতে সঙ্কল্পবদ্ধ, সেই অরুণা আসফ আলীকেই এখন শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে।

—

বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ

বিলাতের পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও প্রীতি জ্ঞাপন করিবার জন্য যে সমস্ত সদস্যকে এদেশে পাঠাইয়াছেন, মেজর উডরো ওয়াট তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি তিনি বোম্বাই সহরে একটি সভায় বলিয়াছেন—"ক্রিপ্স সাহেব যে সমস্ত প্রস্তাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন সেগুলির এখন আর কোন মূল্য নাই। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতি ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্য্যায়ভুক্ত করিবার কথা বলিয়াও এখন কোন লাভ নাই। ডোমিনিয়নগুলিতে প্রধানতঃ বৃটিশ জাতির বংশধরেরা বাস করেন। ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির বাস। কাজেই ভারতবর্ষ কখনও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নে পরিণত হইতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মেজর উডরো ওয়াট বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর বিলাতের লোকের চিন্তার ধারা না কি একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। এক জাতি যে অপর জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা বিলাতের লোকের অনভিপ্রেত। ভারতবর্ষের অনেকে মনে করেন যে, বিলাতী নেতৃবৃন্দের মুখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সমস্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি বিশুদ্ধ ভাঁওতা মাত্র। ওয়াট সাহেব বলেন, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিলাতের লোকেরা না কি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এক জাতি অপর জাতির উপর প্রভুত্ব করিলে শুধু যে পরাধীন জাতির ক্ষতি হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিজেতা জাতিরও অধঃপতন ঘটে। কাজেই বৃটেনের এখন আর ভারতের উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা নাই। এই দুইটি দেশ কেমন করিয়া স্বাধীন ভাবে সমান মর্য্যা[দায়] প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরস্পরের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে প[ারে] তাহা আবিষ্কার করিবার জন্যই বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ এ[দেশে] শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে যদি একটা ন[ূতন] "ইণ্ডো-বৃটিশ ইউনিয়ন"-এর সৃষ্টি হয় তাহা হইলেই তাঁ[হারা] আপনাদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করিবেন।

এই ইণ্ডো-বৃটিশ ইউনিয়নটা যে কি জিনিষ, তাহা ও[য়াট] সাহেবের কথা হইতে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষ বৃটিশ কবল হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীন হয়, তাহা হইলে তাহার শত্রু ও কে তাহার মিত্র তাহা ভারতবর্ষ নি[জ] জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারেই বিচার করিবে; এবং সেই বিচার-বুদ্ধির উ[পর] নির্ভর করিয়াই ভারতবর্ষ অন্যান্য জাতির সহিত আপনার স[ম্বন্ধ] স্থির করিবে।

এই ইণ্ডো-বৃটিশ ইউনিয়নের স্বরূপ যাহাই হউক না কে[ন], বর্ত্তমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দি[তে] বিশেষ আগ্রহান্বিত, তাহা মনে করিবার কারণ দেখিতে পা[ওয়া] যায় না। ভারতবর্ষে এখনও শান্তিরক্ষার নামে যাহা কি[ছু] ঘটিতেছে, তাহা যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাত, তাহা তো ম[নে] হয় না। এই যে বড়লাট বাহাদুর সেদিন নিতান্ত ভালমানু[ষের] মতো বলিলেন—"অতীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাও[য়া] ও পরস্পরকে ক্ষমা করাই বাঞ্ছনীয়"—কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার অ[ধীন] কর্ম্মচারিবৃন্দের যে কোনরূপ মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাঁহা[দের] কার্য্যকলাপ দেখিয়া তো তাহা মনে হয় না। রাজনৈতিক বন্দী এখনও এদেশের কারাগারগুলি পরিপূর্ণ। যুদ্ধের সময় লোক[ের] স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া যে সমস্ত আইন-কানুন রচিত হইয়াছি[ল] সেগুলি এখনও বর্ত্তমান। এই তো সেদিন দিল্লীর চীফ কমিশ[নার] স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা বাহির করিতে নিষেধ করি[য়া] দিলেন! এগুলি কি বৃটিশ শাসনকর্ত্তাদের সদিচ্ছার পরিচায়ক? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে ওয়াট সাহেব যাহা বলেন তাহাতে স[ন্দেহ] ভঞ্জন হয় না। তিনি বলেন—"There were a numb[er] of things which were foolish, silly irrilati[ng] and tiresome…but these were actions of loc[al] officials and were certainly not directe[d] against India's demand of independence"—"স্থানীয় কর্ম্মচারীদের এই সমস্ত কাজগুলি বিরক্তিকর ও নির্বুদ্ধিত[ার] পরিচায়ক; কিন্তু এগুলি ভারতের স্বাধীনতার দাবীর বিরুদ্ধাচ[রণ] নহে।" ওয়াট সাহেবের উত্তরে এদেশের লোক সন্তুষ্ট হই[তে] পারিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সমস্ত ছোট ছো[ট] অত্যাচারের কাহিনী তো বড়কর্ত্তাদের নজরে আসে। তাঁহারা বা এগুলির প্রতিকার করেন না কেন? যাঁহারা দে[শের] স্বাধীনতাকামী তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া মুখে স্বাধীনতা[র] বুলি আওড়াইলে লোকে সে সব কথায় বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া?

ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের সদিচ্ছার ভিতর যে অনে[ক] রাজনৈতিক প্যাঁচ আছে—এরূপ ধারণা হইবার আরও কারণ আছে। ব্রেলসফোর্ড সাহেব এক জন ভারতহিতৈষী বলিয়া পরিচিত। সেদিন তিনি বোম্বাই-এ একদল সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছিলেন—

"The British Government were certainly prepared to quit India, but not before it was decided to whom power should be handed over."—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত ; তবে কাহার হাতে শাসন-ভার তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করা সম্ভবপর নয়।" 'কানু সেন গুণনিধি'কে কাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া যাইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া শ্রীমতীর মরণ-পণ ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। ভারতের শাসন-ভার কাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি পরিশেষে এদেশে থাকিয়া যাওয়াই স্থির করেন, তাহা হইলেও আমরা বিস্মিত হইব না।

মুসলিম লীগের সম্মতি না পাইলে তাঁহারা যে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন না, এ প্রতিশ্রুতি তো তাঁহারা জিন্না সাহেবকে পূর্ব্বেই দিয়াছেন। এখন আবার বড়লাট বাহাদুর রাজেন্দ্রমণ্ডলীকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহাদের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরের যে সমস্ত সন্ধিপত্র আছে সেগুলি তাঁহাদের বিনা সম্মতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে না। ইংলণ্ডের সহিত রাজেন্দ্রমণ্ডলীর সম্বন্ধ যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহা হইলে ভারতে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। কাজেই ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা কাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই এই জটিল প্রশ্নকে আরও অধিক জটিল করিয়া তুলিতে পারেন। অথচ ভারতবর্ষ কে শাসন করিবে, সে প্রশ্ন লইয়া তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অধিকার একমাত্র এদেশের লোকেরই আছে—অন্য কাহারও নাই।

বৃটেন যে তাহার অধীন দেশগুলিকে অব্যাহতি দিতে চাহে বৃটিশ মন্ত্রীদিগের কথাবার্ত্তা শুনিলে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। হার্ব্বার্ট মরিসন সম্প্রতি আমেরিকার কয়েক জন সাংবাদিককে বলিয়াছিলেন—"We are great friends of the jolly old Empire and are going to stick to it"—

"প্রাচীন সাম্রাজ্যটিকে আমরা বড় ভালবাসি, ইহা আমরা কিছুতেই ছাড়িব না।" এগুলি চার্চ্চিল সাহেবের কথারই প্রতিধ্বনি ; এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে টোরিগোষ্ঠী যেরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প, শ্রমিক-দলও ঠিক তাই। কাজেই বৃটিশ শ্রমিক নেতাদের মুখ হইতে স্বাধীনতার কথা শুনিয়া ভারতবাসী যদি আশ্বস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কি দোষ দেওয়া যায় ?

—

যুব-জাগরণে সর্ব্বত্র বাধা

৯।১০ই ফেব্রুয়ারী। কায়রোর উপকণ্ঠে ফুদা আওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র ছাত্র বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে সহরের অভিমুখে অগ্রসর হয়। স্টিল-উষ্ণীষ ও ব্যাটনধারী পুলিস বাধা দিলে তাঁহারা বহু লরী ও মোটর গাড়ী লইয়া অগ্রসর হয়। পুলিস মোটর গাড়ীর টায়ারের উপর গুলী চালায়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানে সমবেত হইয়া সঙ্কল্প করে, প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাহারা কলেজে যাইবে না। ক্রুদ্ধ ছাত্রদল রাজা ফারুকের জন্মোৎসবের আলোক-সজ্জা সম্পূর্ণ নষ্ট করে। পুলিসের গাড়ীর নীচে এক জন ছাত্র নিহত হইলে তাহার মৃতদেহ লইয়া ছাত্র শোভাযাত্রা করিলে পুলিস বাধা দেয়। সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ছাত্ররা টহলদারী পুলিসের গাড়ী আক্রমণ করে, ড্রাইভারদের বলপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া গাড়ী কাড়িয়া লয় ও সেগুলি চূর্ণ করে। তাহারা পাথর ছুড়িলে পুলিস ব্যাটন চার্জ্জ করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারবৃন্দ ও অরবিন্দ বসু

ঠিক এ-সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানেও—কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, জলন্ধর এবং প্রায় সকল বড় বড় সহরে যুব-বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম ক্যাপ্টেন আ ব্দু [illegible]

ছাত্রদের দণ্ড-আদেশ বিক্ষুব্ধ ও জ্বলনোন্মুখ গণচিত্তে ইন্ধন যোগায়! মসলেম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না সরকারকে পূর্ব্ব হইতেই নোটিশ দিয়াছিলেন যে, অঘটন ঘটিবে এবং ঘটিয়াছেও। কংগ্রেসের সভাপতি অবশ্য এই গণ-বিক্ষোভকে সমর্থন করিতেছেন না। নভেম্বরের গণ-বিক্ষোভের সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, এবার মৌলানা আজাদও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, "স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অসৎ প্রকৃতির কয় জন যুবকদের উত্তেজিত করিতেছে এবং অবস্থার সুযোগ লইয়া নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে।"

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এবং বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"সহরের গুণ্ডা ও কাণ্ডজ্ঞানহীন মহলগুলিরই সুবিধা হইয়াছে···সহরের উচ্ছৃঙ্খল মহলগুলি যুবকদের উত্তেজিত করিবার জন্য সহরের এই অবস্থার সুযোগ লইয়াছে।" কংগ্রেস নেতারা বলিতেছেন—"জনসাধারণ যেন কেবল কংগ্রেসের নির্দ্দেশেই চলেন. যাহারা আমাদিগকে বিপথে চালিত করে, তাহাদের ভাঁওতায় না ভোলেন।"

উত্তেজনাকারী কাহারা?

এ সব উত্তেজনাকারী কাহারা? মসলেম লীগের কয়েক জন বিশিষ্ট কর্ম্মী এই গণ-বিক্ষোভকে সমর্থন করিতেছেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব জমিদার-নেতা লাল মিঞা—যিনি সম্প্রতি মসলেম লীগের নেতা ও কমুনিষ্ট দলের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন, তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"গত কল্য আমরা আমাদের সংগ্রামের প্রথম দিন জয় লাভ করিয়াছি। কিন্তু সংগ্রাম কেবল আরম্ভ; আমাদের এখনও সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।" ভারতের বিভিন্ন স্থানে মসলেম লীগের কর্ম্মীদের সহিত কমুনিষ্টদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইতেছে। নানা স্থানে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট ও শ্রমিক-উত্তেজনা হইতেছে, এবং ইহা আরও ব্যাপক হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ভকলির লালসবুজ প্রীতি

কলিকাতায় গত নভেম্বর বিক্ষোভের সময় কংগ্রেসের বিরোধী মসলেম লীগের নেতা মিঃ শহীদ সুরাবর্দ্দী ও খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও বাংলায় কাটুনে দলের অহিংস নেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কোন প্রকারে যুব-বিক্ষোভকে সমর্থন করেন নাই। এইবার কি জানি কেন করিতেছেন। মিঃ শহীদ সুরাবর্দ্দীর দল এক দিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমান-প্রার্থীদের উপর ও তাঁহাদের শান্ত নির্ব্বাচনী সভার উপর বেপরোয়া লাঠি চালাইতেছেন, অথচ এ দিকে গান্ধী-পন্থীদের বাংলার প্রতিনিধির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। এই দুই ব্যাপারের সামঞ্জস্যের সন্ধান করিতে হইলে ভারতের দলগত রাজনীতির পঙ্ক হাতড়াইতে হইবে। বাংলায় কমুনিষ্টরাও যে এ বিক্ষোভের সুযোগ লইতেছে ইহা সুস্পষ্ট। তাঁহারা ত পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের মূলনীতির সহিত তাঁহাদের মূলনীতির কোন ভেদ নাই। তাঁহারা এবং তাঁহাদের মিত্রপক্ষগণ কাহারও যে সুভাষচন্দ্রের আজাদী দলের প্রতি সহানুভূতি আছে এরূপ কোন স্পষ্ট ঘোষণা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কয় দিন পূর্ব্বে আজাদী বাহিনীর মেজর-জেনারল শা নওয়াজের উপর মসলেম লীগদলের যে আক্রমণ হইয়াছিল, তাহা এই ফৌজের প্রতি সহানুভূতিদ্যোতক নহে। মসলেম লীগের মুখপত্র 'আজাদ' এ-বাহিনীকে কোন দিন সমর্থন করেন নাই। ভারতের কমুনিষ্ট পার্টিও নাই। গান্ধীপন্থী রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা সতীশ দাশগুপ্তও করেন কিন্তু আজ সহসা এই প্রেম গজাইবার নূতন কি কারণ [illegible] আবিষ্কার করিলেন? জিন্না না কি বাংলায় আসিতেছেন। [illegible] প্রেম কি ভাবে পাকে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

উত্তেজনার ফাঁদে পড়িও না

কংগ্রেসের সভাপতি ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের [illegible] উত্তেজক মহলকে সমর্থন করিতেছে সরকারী উত্তেজনাকারী পু[illegible] সৈনিকরা। জনসাধারণ নিরস্ত্র। তাহাদের উপর বেপরো[illegible] গুলী চলিয়াছে তাহার পর্য্যাপ্ত কারণ দেখা যায় না। বিক্ষোভ সর্ব্বত্র হয়, কিন্তু সে বিক্ষোভের প্রতিকার [illegible] বিক্ষোভ নয়—সহানুভূতিপূর্ণ শান্ত সুব্যবহার। এই বি[illegible] নির্ব্বিচারে যে হত্যা চলিয়াছে, সে হত্যায় হতাহতদের নাম প্রকা[illegible] হইয়াছে। এ সকল হতাহত ব্যক্তির সহিত রাজনৈতিক [illegible] দলের কোন সংস্রব ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগ কি আবি[illegible] করিতে পারিয়াছে? গুলীর আঘাতে যাহারা হতাহত তা[illegible] সকলেই নিরীহ পথচারী। যাহারা অনাচার করিয়াছে, তা[illegible] হয়ত বন্দুকের পাল্লার কাছে-ভিতেও থাকে নাই। নি[illegible] পুলিস ও নির্ব্বীর্য্য মিলিটারীর শুভ্রধরদের বিক্রম নরম পথচারীর [illegible] যদি না হয়, তবে বিলাতী সংবাদ-পরিবেশকগণ কি ভাবে ভার[illegible] কদর্য্য অবস্থার কথা লইয়া ডামাডোল করিতে পারিবে? আম[illegible] মনে হয়, এশিয়ার সর্ব্বত্র যে জন-জাগরণ দেখা যাইতেছে, ভা[illegible] তাহার শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তাঁহার আ[illegible] হিন্দ বাহিনী, আর তাঁহাদের অভিনব ধ্বনি—জয় হিন্দ। ভার[illegible] সকল দল, তথা বৃটিশ সরকার আত্মবিলোপ হইতে আত্মরক্ষা কর[illegible] জন্য চাহে জনসাধারণের উপর এই চরমপন্থী বীর-বাহিনীর বৈশিষ্ট্য প্রভাব স্তিমিত করিয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং [illegible] তাহারা unholy alliance করিতেও প্রস্তুত। ভারতের জা[illegible] জনগণ, বিশেষতঃ পরিশুদ্ধ-চিত্ত শক্তিশালী যুবসম্প্রদায় যেন এ-স[illegible] মামুলীদলের ফাঁদে পা দিয়া নবসংগ্রামের বৈশিষ্ট্য নষ্ট না করেন।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো

সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার ৫ বৎসরের চুক্তিতে ৪ জ[illegible] (বেসামরিক) একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার-এর জন্য ইংলণ্ডে বিজ্ঞাপ[illegible] দিয়াছেন। এই সকল গুণাবলীর প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ ক[illegible] হইয়াছে—(১) সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংএর গ্রাজুয়েট; (২) পোষ্ট গ্রাজুয়ে[illegible] ১ বৎসরের শিক্ষা, (৩) কোন দায়িত্বশীল পদের ৫ বৎসরে[illegible] অভিজ্ঞতা। বয়স ৩২ বৎসরের কম হইলে চলিবে না। বেতন ১ শ[illegible] টাকা; মাসে ৫০৲ টাকা হইতে ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দ্বিবর্ষান্তক্রমি[illegible] বেতন বৃদ্ধি। মাসিক ৩৮৲ টাকা ওভারসী বেতন। এশিয়াবা[illegible] নহে এরূপ লোকদের রাহা-খরচ। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড।

১৩ জন প্রার্থী সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। তন্মধে[illegible] ৯ জন বৃটিশ ও ৪ জন ভারতীয়। বৃটিশ-প্রার্থীরা অধিকাং[illegible] সৈন্যদলের ছাঁটাই। এক জন ভারতীয়কেও গ্রহণ করা হয় নাই মনোনয়ন-বোর্ড ভারতীয়দের সম্বন্ধে অত্যন্ত সহানুভূতিহীন! [illegible] পদগুলি সৈন্যদলের ছাঁটাই লোকদের দেওয়ার ইচ্ছাই সকলের প্রবল

উক্ত বোর্ডের এক জন সদস্য হইতেছেন বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব চীফ এঞ্জিনীয়ার মিঃ হ্যারিসন। তিনিই বিশেষ ভাবে বিরোধী ও মারমুখী!

উক্ত বোর্ড তাড়াতাড়িই উক্ত পদে লোক নিয়োগ করিতে চাহেন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যে, বাঙ্গালার নির্ব্বাচনের পরে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহারা উক্ত পদ পূর্ণ করিতে ব্যগ্র।

বৃটিশ সৈনিক বিভাগের বেকার লোকদের এদেশে ঢুকাইয়া উক্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিয়াছে। নিজ দেশের বেকারের বোঝা কমাইবার জন্য ভারত সরকারের সহিত একযোগে বৃটিশ সরকার যে যুদ্ধ-ছাঁটাই ইংরেজদের এদেশের ঘাড়ে চাপাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার স্পষ্ট আভাষ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে।

ঐ সকল পদের উপযুক্ত কোন ভারতীয় নাই বলিয়াই কি ঐরূপ করা হইয়াছে? উপযুক্ত লোক পাওয়ার জন্য বাঙ্গালার সীমার মধ্যে কি কোন চেষ্টা করা হইয়াছে? ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি সাদা অফিসার আমদানীর জন্য যতটা উৎসাহী, খাদ্যশস্য আমদানীর বেলায় যদি তাঁহারা তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ উৎসাহও প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম।

বিদেশী আমদানীর জন্য দেশ প্রচুর মূল্যই দিয়াছে। দেশের সন্তানদের বিরুদ্ধে এরূপ পক্ষপাতিত্ব আর সহ্য করা হইবে না। পদানত ভারতীয়দের পক্ষে এইরূপ ভাবে ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া এবং এইরূপ অবমাননা সহ্য করিবার দিন মৃত অতীতের বুকে বিলীন হইয়া গিয়াছে!

বাঙ্গালার জনগণের নিকট বাঙ্গালা সরকারের কৈফিয়ৎ দিবার দায়িত্ব আছে। যে কোন যুক্তিই থাকুক না কেন, তাঁদের পক্ষে ইংলণ্ড হইতে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ আমদানী ও ঘাড়ে চাপাইবার নীতি বর্জ্জন করাই ভাল কাজ হইবে।

ব্রেটনউডস্ ও ভারত

ভারত গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং ভারতের জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় পরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহারা ব্রেটনউড্স্ পরিকল্পনায় যোগদান করিবেন না। ব্রেটনউড্স্-সম্মেলনে ভারতের অবস্থা কিরূপ হীনতাব্যঞ্জক হইয়াছিল এবং ভারতের ষ্টার্লিং-তহবিলের একটি সামান্য অংশমাত্র খালাস করিবার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ হইতে উত্থাপিত প্রস্তাব বৃটিশ এবং মার্কিণ প্রতিনিধিদের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য ব্যর্থ হইয়াছিল, সম্মেলন-প্রত্যাগত স্যার সন্মুখম চেটি-প্রমুখ দুই জন সদস্যের বিবৃতি হইতে তাহা দেশবাসী জানিতে পারিয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারতবাসীর অকুণ্ঠ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট সব জানিয়া শুনিয়াই ভারতীয় জনমত উপেক্ষা করিয়া এবং হয়ত কেন্দ্রীয় পরিষদের অভিমত ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে হইবে না অনুমান করিয়াই উক্ত পরিকল্পনার মূল সদস্য হিসাবে যোগদান করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রেটনউডস্ পরিকল্পনা ইংলণ্ডেও অসন্তোষ কম সৃষ্টি করে নাই। আমাদের যতটুকু মনে পড়িতেছে, বৃটেন কর্ত্তৃক উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ আমেরিকা কর্ত্তৃক বৃটেনকে ঋণদানের অন্যতম সর্ত্ত ছিল। সুতরাং বৃটেনের পক্ষে এই পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ পাওয়া সম্ভব ছিল না। রুশিয়া আজ পর্য্যন্তও উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই। ভারতের দিক্ হইতে এমন কি গরজ আছে যে, ভারতবাসীর অভিমত গ্রহণ না করিয়াই ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন? উক্ত পরিকল্পনা ভারত গ্রহণ করিলে ভারতের প্রভূত ক্ষতি হইবে। পৃথিবীর বাণিজ্যে এবং কাঁচা মালে সকলেরই যাহাতে সমান অধিকার অর্জ্জিত হয় এবং বাণিজ্য-শুল্ক যাহাতে হ্রাস হয় তাহারই উদ্দেশ্যে

[illegible]

পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যই ভারতের শিল্পোন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসারের পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে।

আন্তর্জাতিক তহবিলের এবং ব্যাঙ্কের কাউন্সিলে ভারতকে স্থায়ী আসন না দিবার পক্ষে লর্ড কীনস্ মিঃ মর্গেনথাউকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মিঃ সিদ্দিকী তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত কাউন্সিলে ভারত স্থায়ী আসন পাইলে ষ্টার্লিং-তহবিল সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্ম ভারতবর্ষ অগ্রাধিকার দাবী করিতে পারিবে।" বৃটেন ভারতের দাবীতে না বলিতে পারিবে না, অথচ বৃটেনের নিকট আমেরিকার প্রাপ্য ঋণ দিতে বিলম্ব হইয়া যাইবে, এই যুক্তিতেই লর্ড কীনস্ আমেরিকাকে তাঁহার পক্ষে আনিতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকা তখন ভারতের স্থায়ী আসন পাওয়ার বিরুদ্ধে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল যে, ভারতকে স্থায়ী আসন দিলে কাউন্সিলে বৃটেনের দুই ভোট হইবে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ১২ই ডিসেম্বর কমন্স সভায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব বলিয়াছিলেন, ভোটের যে-কোটা বর্ত্তমানে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ কমনওয়েলথ্ এবং আমেরিকার প্রায় সমান সমান ভোটাধিকার লাভ হইয়াছে। সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টস্বরূপে ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্রেটনউডস্ পরিকল্পনা গ্রহণে অত্যধিক আগ্রহশীল হওয়ার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। চীন এবং ভারত এই দুইটি দেশ বৃটেন এবং আমেরিকার তৈরী পণ্য বিক্রয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত বাজার। কাঁচা মাল সংগ্রহের পক্ষেও ভারতের মত দেশই বা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কাজেই ভারত উক্ত পরিকল্পনায় যোগদান করুক, এইরূপ অভিপ্রায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের থাকা স্বাভাবিক এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিয়াই ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত পরিকল্পনায় যোগদান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কারণ আছে? উক্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্ম যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলিব না। কিন্তু রিপোর্ট যাহাই হউক, উহা গ্রহণ করা না করার অধিকার কেন্দ্রীয় পরিষদের।

—

লেনিন

লেনিন ছিলেন রুশ-বিপ্লবের নেতা। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি রুশিয়ার জারের স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্ম গোপনে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৯৩ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাকে রুশিয়ায় গুপ্ত ভাবে এবং বিদেশে অবস্থান করিতে হয়। এই সময়ে তিনি বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল গঠন করেন। এই দলের মধ্য হইতে পরে চূড়ান্ত বিপ্লবী বলশেভিক দলের সৃষ্টি হয়। লেনিন এই দলে নেতৃত্ব করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেনিন বিদেশ হইতে রুশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রুশিয়ায় জারের উচ্ছেদের পর কেরেনস্কীর নেতৃত্বে যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে তাহার উচ্ছেদ করিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করে। ইহা অক্টোবর-বিপ্লব নামে বিখ্যাত। লেনিন কার্ল মার্ক্সের নীতি অবলম্বন করিয়া দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

করেন। এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেন। ... বিপ্লবের পর রুশিয়ায় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ... প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃ... মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার ছিলেন।

আজ যে রুশিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে ... হইয়াছে এবং দেশ হইতে দারিদ্র্যকে নির্ব্বাসন দিয়াছে, ... মূলে ছিলেন লেনিন। লেনিনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অ... করিয়া রুশিয়া সকল বিপদ কাটাইয়া সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে আপ... দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। লেনিনের পুরা... ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন।

লেনিনের জীবনযাত্রা ছিল অতি সরল। তিনি ... অঞ্চলের এক ভাড়া-বাড়ীতে সস্ত্রীক বাস করিতেন। এমন ... সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্রনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ... সরকারী ভবনের একখানি ঘর মাত্র অধিকার করিয়াছে... তিনি সাধারণ ভোজনাগারে গিয়া জনসাধারণের ন্যায় নির্দ্ধ... পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। বিদেশ হইতে যাঁহারা লে... সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তাঁহারা মনে করিতেন যে, সো... রাষ্ট্রগুরু যে ভাবে থাকিতেন ও আহার করিতেন তাহাতে পা... ইউরোপের কোন সাধারণ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

যুদ্ধের সময় লেনিন তাহার অন্যান্য সুখ-সুবিধা গ্রহণ ক... অস্বীকার করেন। দেশের সর্ব্বত্র হইতে তাঁহার জন্ম যে ... খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী প্রেরিত হইত, তিনি তাহা শিশু-প্রতি... সদনকে দান করিতেন।

লেনিন সাধাসিধা পোষাক ও আসবাব-পত্র ভালবাসিতেন। প্রয়োজনীয় পুস্তক-সম্বলিত ঘূর্ণায়মান পুস্তকাধারটি না হইলে তাঁহার চলিত না। উহা সর্ব্বদাই তাঁহার হাতের নিকট থাকিত।

জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি সরলতা ও বিবেচনার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। দেখা হইলে তিনিই প্রথমে অভিবাদন করিতেন। সকলেই তাঁহার সহিত স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারিতেন। তিনি যাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহার সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন অথচ নিজের প্রতি তাঁহার আদৌ চিন্তা ছিল না। স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের ছুটি লইবার জন্য তাঁহার বিশেষ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইত।

লেনিনের সংগঠনী-শক্তি ছিল অসামান্য। তিনি যখন সোভিয়েট আইন পরিষদ-কক্ষে প্রবেশ করিতেন সেই সময় বাতাস খেলিবার ব্যবস্থা ও জানালাগুলি উন্মুক্ত আছে কি না দেখিয়া লইতেন। তিনি সেখানে কাহাকেও ধূমপান করিতে দিতেন না এবং আলোচনার সময় নিস্তব্ধতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। বক্তাগণ যাহাতে সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করিতে পারে এই জন্য তিনি আইন পরিষদের সভাপতিরূপে বক্তাদের সময় বাঁধিয়া দিতেন!

যে সকল প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও ব্যাপক ভাবে কাজ চালাইতে পারিত

এই সংখ্যাটি পরিকল্পনা করিয়াছেন প্রাণতোষ ঘটক

না, লেনিন সেইগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি চাহিতেন যে, সকল কার্য্য যেন শেষ পর্য্যন্ত ও যথারীতি সম্পাদন করা হয়।

ঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি অধীনস্থ ব্যক্তিদের বলিতেন যে, নির্দ্দেশ জারী করিবার সময় তাহাদের সর্ব্বদাই ঐ নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হয় কি না দেখা প্রয়োজন। কথায় ও কার্য্যে তাঁহার নিজের যেরূপ সামঞ্জস্য ছিল সেইরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য তিনি অপরকেও বলিতেন।

অবসর সময় কি ভাবে অতিবাহিত করিতে হয় লেনিনের তাহা ভাল ভাবেই জানা ছিল। অবসর পাইলেই তিনি বিশেষ করিয়া রুশ ও বিশ্বসাহিত্যের অমর গ্রন্থরাজি পাঠ করিতেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই চেকভ, কোভ্রিন, পুশকিন, গোগোল, মোপাশা ও অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত লেখকের কথা উদ্ধৃত করিতেন। তিনি সঙ্গীত ভালবাসিতেন। বিঠোভেনের রচিত গানগুলি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই মস্কো আর্ট থিয়েটার ও অন্যান্য রঙ্গালয়ে যাইতেন।

খেলাধূলার ক্ষেত্রেও লেনিনের নৈপুণ্য দেখা যায়। তিনি ভাল সাঁতার কাটিতে, গুলী নিক্ষেপ করিতে এবং সাইকেল চালাইতে পারিতেন। তিনি মদ্য বা ধূমপান করিতেন না।

লেনিন ছিলেন সদাপ্রফুল্ল। গোর্কি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন যে, লেনিন সজল নয়নে শিশুর ন্যায় হাস্য করিতে পারিতেন। তাই তাঁহার হাস্য ছিল অমায়িক। কথাবার্ত্তার সময় লেনিনের ব্যঙ্গকৌতুক অপরূপ হাস্য ও উত্তেজনার সঞ্চার করিত। এক কথায় লেনিন ছিলেন শ্রমিকদের মহান নেতা, অক্লান্ত কর্ম্মী, শ্রমিকদের উন্নতিকামী ও সদা-প্রফুল্ল কর্ম্মব্যস্ত এবং অধ্যয়নরত পুরুষ।

শরৎচন্দ্র-স্মৃতি-মন্দির

শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুরে যে স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা হইল, সেই মন্দির-ভবনের জন্য আনুমানিক ব্যয় হইবে কুড়ি হাজার টাকা এবং তাহার মধ্যে এগার হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া ভবন নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইতেছে; হুগলী জেলা শরৎচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ হুগলী জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই ভবন নির্ম্মাণের জন্য বক্রী নয় হাজার টাকার জন্য শরৎ-সাহিত্যানুরাগী

দেশবাসিগণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আশা করি, দেশবাসী এই সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না। রাজেন্দ্র-ভবন, পোঃ উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী ঠিকানায় শরৎচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সভাপতির বা কোষাধ্যক্ষের নিকট অর্থ-সাহায্য পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

—

স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্নে গুঁড়া থার্ড লেনে পুণ্যশ্লোক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতালে কর্ত্তৃপক্ষের আয়োজনে বাঙ্গালার কৃতী সন্তান রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্মৃতি-বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক লেঃ কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হইবার কথা ছিল কিন্তু সহরের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ চিকিৎসা-ভবনটি পরিদর্শন করিয়া আনন্দিত হন এবং চিকিৎসকগণের আগ্রহ ও রুচির প্রশংসা করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়। তিনি রামচন্দ্রের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে রামচন্দ্র মাত্র বন্ধু সতীশচন্দ্রের পুত্র নহে, বাঙ্গালা জননীর বরেণ্য সন্তান। দৈনিক বসুমতীর সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নিয়োগী বলেন—"রামচন্দ্রের অকালে ঝরিয়া পড়া বিকাশোন্মুখ প্রতিভার অক্ষয় ভাবধারা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্তরে অক্ষরিত রহিয়াছে।" সুলেখক শ্রীগণপতি সরকার রামচন্দ্রের কার্য্যকলাপের ভিতর নূতন ভাবধারার প্রশংসা করেন। রামচন্দ্রের সহকর্ম্মীদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। হাসপাতালের তরফ হইতে ডাঃ গৌরমোহন রায় রামচন্দ্রের বিভিন্ন গুণের কথা আলোচনা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সমবেত জনতা এক মিনিট দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নবীনচন্দ্র শতবার্ষিকী

গত ২৭শে মাঘ রবিবার সেনেট হলে স্যার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে মহাকবি নবীনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। দেশকে তিনি শুনাইয়াছেন উদাত্ত গম্ভীর ছন্দে বোধের বাণী, ধর্ম্মের বাণী ও উদার বিশ্বমানবতার বাণী। শ্রী দীনবন্ধু ও বঙ্কিম-প্রতিভার ত্রিবেণী ধারা যেদিন বাংলার জীবনে বন্যা আনিয়াছিল, সেদিন তাঁদেরই সুযোগ্য অনুগ আসিয়াছিলেন কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। যে পলাশীর যুদ্ধে প্রবঞ্চিত ভারতবর্ষ পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হই সেই শোচনীয় পরাজয়ের কাব্য লিখিয়াই নবীনচন্দ্র যশস্বী তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থত্রয় "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র," " বাঙালী ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন মন্ত্র পাইয়াছে। নবী মতবাদ ও ভাবাদর্শের স্বরূপ সম্যক্ ও সমগ্র ভাবে উপল করিলে বাঙালী জাতি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে। আজ এই প্রাতঃস্মরণী কবির উদ্দেশে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি

মধু-স্মৃতি

জন্ম—২৫শে জানুয়ারী ১৮২৪] [মৃত্যু—২৯শে জুন

১২ই মাঘ তারিখটি বাঙালী জাতিকে আবার স্মরণ ক দিতেছি। এই পুণ্য তারিখে বাংলা কাব্যের নবযুগস্রষ্টা ম মাইকেল মধুসূদন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ থেকে এক শত বাইশ বৎসর আগে। আজ তাই :

"জনারণ্য রাজপথে আনমনে চলিতে চলিতে—
"দাঁড়াও, পথিকবর! বঙ্গভূমে জন্ম যদি তব,—"
নহে ক্ষীণ অনুরোধ, এ আদেশ কে পারে করিতে?
থমকি দাঁড়ানু মুগ্ধ রুদ্রাদেশ শুনি অভিনব।
শোকান্ধ রাবণ তুমি অনির্ব্বাণ চিতাবহ্নি হ'তে
হা পুত্র! হা পুত্র! বলি ঝঞ্ঝাস্বরে ডাকিছ সবায়।
মূঢ়মতি আমি কবি, তব পূজা জানাব কোথায়?
স্বর্গের উদ্দেশ্যে? কিম্বা গোরস্থান মলিন মরতে?
নেহারিনু কাব্যলোকে, রাঘবারি-মিত্র ওগো দেখা দিলে স্বর্গ হ'তে

[বিমলচ

সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

২৩শে মাঘ ডাঃ সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী পরলোক গমন করেন। কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তিনি সমগ্র জগতে খ্যাতিলাভ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনি প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। ৭ই জুন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জামালপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডাঃ নীলমণি ব্রহ্মচারী সেখানকার নাম-করা ডাক্তার ছিলেন। সার উপেন্দ্রনাথ প্রথমে হুগলি কলেজে পড়েন। পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন। এম-এতে রসায়নশাস্ত্র বিষয়-বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। অতঃপর মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এম-বি ও এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মনোবিজ্ঞানেও পি-এচ-ডি ছিলেন। তিনি কোটস মেডেল, গ্রিফিথ মেমোরিয়্যাল পুরস্কার, কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মিণ্টো মেডেল লাভ করেন।

ডাঃ ব্রহ্মচারীর কর্ম্মবহুল জীবনের ইতিহাস বহু ব্যাপ্ত। প্রথমে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২০-২৬ পর্য্যন্ত একটি বিখ্যাত ভারতীয় গবেষণাগারে গবেষণা করেন। এই সময়েই তিনি কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাভ করলেন খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ। ১৯২৩-২৭ পর্য্যন্ত তিনি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক ছিলেন। পরে বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বায়োকেমিষ্ট্রীর অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি লণ্ডনের 'রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন' এবং 'রয়েল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও হাইজিনের' মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯২৮-২৯ তিনি বাঙ্গালার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি বাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের' সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ ভারতী বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং প… চিকিৎসা বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩… কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ কংগ্রেসে জুবিলি অধিবেশনে তিনি চিকিৎসা বিভাগের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু কেবল বাঙ্গালা অথবা ভারত নয়, সমগ্র জগৎ এক জ… উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসককে হারাইল।

সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

যতীন্দ্রনাথ বসু

যতীন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণী যতীন্দ্রনাথ বসু বৃহস্পতিবা… সকাল সাড়ে দশ ঘটিকায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভব… পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎস… হইয়াছিল। তিনি হিন্দু স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শি… লাভ করেন। যতীন্দ্রনাথ প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও আইন সভার সদস্য ছিলেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল লিবারে… ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং কলিকাতা ইনকরপোরেটেড … সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ইংলণ্ডে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বাঙ্গালার প্রতি… নিধিস্বরূপে যোগদান করেন। শিক্ষা… প্রসারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লি… ছিলেন। দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি… জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তিনি ক্রীড়ামোদী ছিলেন এবং বহু বৎস… মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সত্যই এক জন সমাজহিতৈষী লোকের অভাব হইল।

ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ

চুঁচুড়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুদর্শী চিকিৎসক শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ১৭ই পৌষ মঙ্গলবার রাত্রি ২-১৫ মিঃ সময়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের এক দরিদ্র সম্মানিত কায়স্থ বংশে ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ চুঁচুড়ার কোন সরকারী আফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। শরৎচন্দ্র চুঁচুড়ার মিশন হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। উক্ত স্কুলে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া Dux পদক প্রাপ্ত হ'ন ও Entrance পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হ'ন। ১৯০৫ সালে হুগলী কলেজ হইতে এফ, এ পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন ও মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হ'ন। তথা হইতে মেডিসিনে স্বর্ণ

পাস করিয়া ১৯১০ সালে এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া চুঁচুড়ার বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দরিদ্রের প্রতি দয়া এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহারে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী

গত ২১শে ডিসেম্বর শনিবার রাত্রে স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় তাঁহার হিন্দুস্থান পার্ক (বালিগঞ্জ) স্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

অঘোরনাথ পাবনা সহরের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যার্জ্জন সমাপ্তির পর তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বঙ্গভঙ্গের সময় আসামে শিলচর নর্ম্যাল ট্রেণিং স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হ'ন। এই বিদ্যায়তনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। আসাম নিবাসকালে অধিকাংশ সময়েই অঘোরনাথ কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার অনুন্নত পাটনী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার আদম-সুমারী সম্পর্কিত গবেষণার ফলে তিনি ইংলণ্ডের 'রয়াল এ্যানথ্রপলজিক্যাল সোসাইটি'র সভ্য মনোনীত হ'ন। অঘোরনাথের রচিত বহু শিক্ষামূলক পুস্তকের মধ্যে 'বিধি-বিধান', 'পদার্থ-পরিচয়' ইত্যাদি সুধীজন-সমাদৃত।

রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী

তাঁহার ন্যায় মহানুভব পরোপকারী কর্ম্মী ব্যক্তির অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। এ অভাব তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দেশবাসী সহকর্ম্মীরা বহু দিন অনুভব করিবেন।

তারিণীচরণ লাহা

কলিকাতার বিখ্যাত লাহা বংশ-সম্ভূত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জমিদার তারিণীচরণ লাহা মহোদয় বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রত্যুষ ৪টা ১৫ মিঃ সময় ৩৭ নং বাদুড়বাগানস্থিত তাঁহার স্বকীয় বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ সমাপনান্তে তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মেসার্স কৃষ্ণদাস লাহা এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি অন্যতম অংশীদাররূপে মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানীতে যোগদান করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

ত্রিপুরা জিলাস্থিত তাঁহার জমিদারীর অন্তর্বর্তী কাদবাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত "তারিণীচরণ লাহা" হ[illegible] নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন [illegible] গিয়াছেন। বদান্যতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। [illegible] চক্ষুর অন্তরালে তিনি অসংখ্য প্রার্থিগণের দুঃখমোচন [illegible] গিয়াছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিশু-[illegible] নির্ম্মাণকল্পে তিনি ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্[illegible] কলিকাতাস্থ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ এবং শিমূলতলাস্থিত দাতব্য ঔষধা[illegible] তাঁহার দান সামান্য নহে।

লাহা মহোদয় সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করি[illegible] যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারা সকলেই [illegible] অমায়িক স্বভাব এবং প্রকৃতিগত মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হই[illegible] তিনি মৃত্যুকালে ছয় পুত্র এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

তারিণীচরণ লাহা

সুশীলকুমার বসু

আমাদের বন্ধুস্থানীয় একনিষ্ঠ দেশসেবক সুশীলকুমার বসু [illegible] মাঘ বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে [illegible] বয়স ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। বৎসরাধিক কাল যাবৎই তিনি [illegible] ভুগিতেছিলেন। চিন্তাশীল লেখক ও সাংবাদিক হিসাবেই [illegible] সুধী-সমাজে পরিচিত, কিন্তু যশোহর জেলার কৃষক আ[illegible] সংগঠনে তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠন-কর্ত্তা। '[illegible] মাসিক পত্রিকায় 'দেশের কথা' তাঁহার প্রবন্ধে সমৃদ্ধ থা[illegible] 'প্রগতি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদনা করিয়াছিলেন। 'দৈনিক বসুমতীর' সহিতও [illegible] কিছু কাল ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে [illegible] বিদ্যালয় ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও [illegible] দলের সংস্পর্শে আসেন। তদবধি তিনি রাজনীতি [illegible] প্রধান কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে [illegible] এক জন স্বদেশানুরাগী, ত্যাগী, অসাধারণ বাগ্মী ও সুসা[illegible] হারাইয়াছে।

শ্রীসজনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হিমানী
কোকোনাট অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত, ভেষজ-গুণান্বিত ও ভারতীয় প্রাকৃতিক সুগন্ধ সমন্বিত "হিমানী কোকোনাট অয়েল" কেশবৃদ্ধি করে মরামাস খুস্কী নিবারণ করে ও কেশের অকাল পক্বতা দূর করে।
HIMANI WORKS CALCUTTA
হিমানী — কলিকাতা

সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া,
চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন।
আমি ধ্যান করছিলাম ; ধ্যান করতে
করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ী !
রসকে ম্যাথর। মনকে বললুম থাক্
শালা ঐখানেই থাক্। মা দেখিয়ে
দিলেন, ওর বাড়ীর লোকজন সব
বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভেতরে সেই এক
কুল-কুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র।

—শ্রীরামকৃষ্ণ
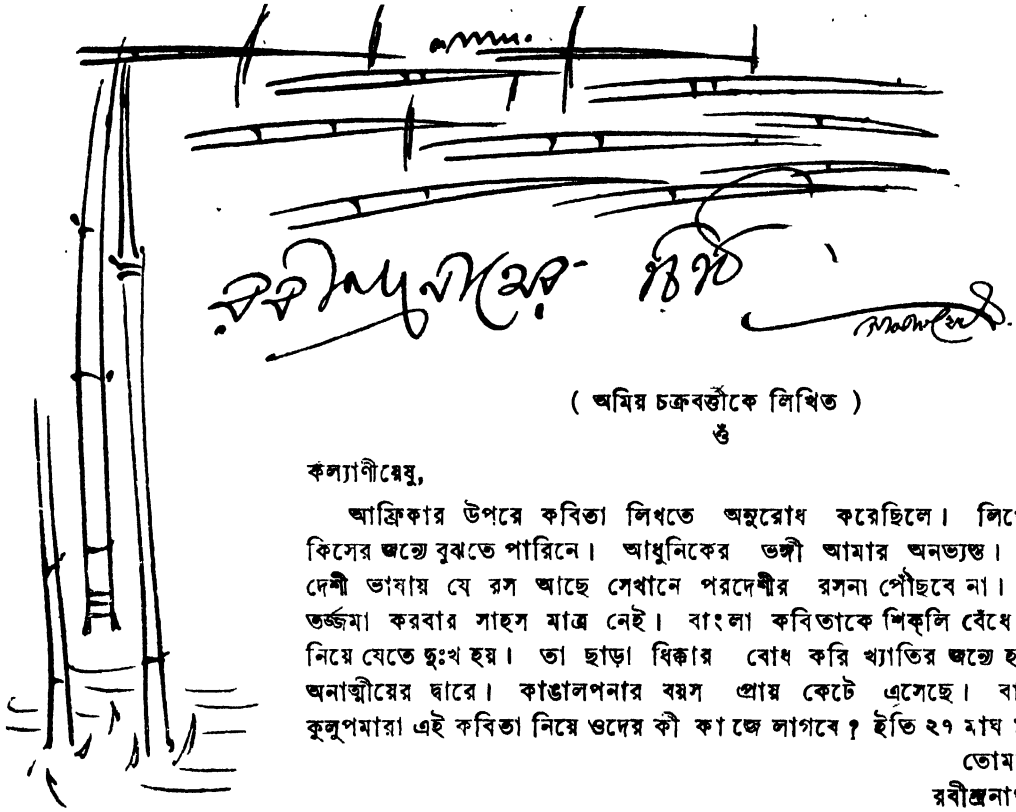
(অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আফ্রিকার উপরে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলে। লিখেছি। কিন্তু কিসের জন্যে বুঝতে পারিনে। আধুনিকের ভঙ্গী আমার অনভ্যস্ত। আমার নিজ দেশী ভাষায় যে রস আছে সেখানে পরদেশীর রসনা পৌঁছবে না। ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার সাহস মাত্র নেই। বাংলা কবিতাকে শিকলি বেঁধে পরের হাটে নিয়ে যেতে দুঃখ হয়। তা ছাড়া ধিক্কার বোধ করি খ্যাতির জন্যে হাত পাততে অনাত্মীয়ের দ্বারে। কাঙালপনার বয়স প্রায় কেটে এসেছে। বাংলা ভাষার কুলুপমারা এই কবিতা নিয়ে ওদের কী কাজে লাগবে? ইতি ২৭ মাঘ ১৩৪৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অনেক দিন থেকে তোমার প্রতীক্ষা করে আসচি। মাঝে মাঝে জনরব শুনি আজ আসচ কাল আসচ হপ্তাখানেকের মধ্যে আসচ। অসম্ভব ভিড়ের আক্রমণ নিরবচ্ছিন্ন চলেছে—বোধ হয় স্থানাভাবের আশঙ্কায় আসনি। এলে কোনোমতে জায়গা করে দিতুম। আমার মুস্কিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন, কেন না মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ—তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়—তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোকে বুঝতেই পারে না।

দুই রাজার অভ্যুদয় হয়েছে। এক রাজা কাল ভোরে চলে যাবেন। আওয়াগড় হয় তো আরো কয়েক দিন থাকবেন—উনি অত্যন্ত সাদা মানুষ ওঁর থাকার মধ্যে কোনো ভার নেই।

যাই হোক তুমি যদি আসতে পার, খুশি হব। আমাকে তৈরি হতে হবে, পয়লা বৈশাখের জন্যে—কিন্তু মন তৈরি হবার সময় পাচ্চে না। এই রকম অবস্থায় সুদূরে কোথাও দৌড় মারতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই সুদূরও হয় তো তাড়া করবে। Yeatsএর সেই দ্বীপটা কোথায় জানো? স্বয়ং কবিও তার সন্ধান পাননি। আকাশপ্রদীপ আকাশকুসুমবনের ইসারা করে কিন্তু পথ দেখায় না। আসল পথটা সেইখানেই যেখানে আজ শালের মঞ্জরী ধরেছে আজ অজয় নদীর ধারে নাগকেশরের বনের খবর পাওয়া যাচ্চে। ইতি—৩১।৩।৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণীয়েষু,

শুনচি বৃষ্টির চিহ্ন নেই। আমার দ্বারের কাছে যে গাছপালাগুলি অতিথি আছে তাদের অন্নজলের একান্ত অনটন যেন না ঘটে। তোমার নিজের অবস্থা কি রকম?

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অন্ত্রসহ যে লেখাটা পাঠাচ্চি তার থেকেই সব বুঝতে পারবে। যথাস্থানে চালান করে দিতে দেরি কোরো না।

যে একটা কবিতা তোমাকে পাঠিয়েছি ডাকযোগে সেটা এখনো পেয়েছ কিনা জানিনে। যাই হোক তার প্রথম দুটো লাইন বর্জ্জনীয়। অর্থাৎ তার প্রথম লাইন হবে—

"সাগর-জলে সিনান করি সজল এলোচুলে।"

৪ অক্টো ১৯২৭ ইতি স্নেহানুরক্ত

"কিন্তা" জাহাজ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

চিঠি লেখার সময় পাইনে। গোলমালে দিন কাটচে। দেশটা সুন্দর। আজ বালী অভিমুখে যাচ্চি—সেখানে আরো সুন্দর। দেশে ফেরবার পূর্ব্বে বিস্তারিত খবর কিছুই পাবে না। তোমাদেরও খবর বিশেষ কিছু পাইনে। স্রোতের শেওলার মত ভাসচি। কোথাও কোনো মাটির সঙ্গে যোগ আছে মনে হ'চ্চে না।

২৩শে আগষ্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

অমিয়,

এই রকম দু'টো লাইন যোগ করলে কী রকম হয়?

হে উদার, কর সবার অহঙ্কার মুক্ত,
স্মরণে তব চরণে হ'ব ত্যাগ-যোগযুক্ত।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

(জনৈক পত্রলেখকের উত্তরে)

কল্যাণীয়েষু,

আমার 'সময়হারা' কবিতাটি কোনো পক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে লিখিনি, ওটা যে একটা সকৌতুক কবিতা সে কথাটা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে। সেই জন্যে তোমার চিঠি পড়ে খুশি হলুম—তুমি ওর স্বাধীন মূল্য অনুভব করেছো।

রাজপুতানা কবিতাটি আমি যখন প্রথম লিখেছিলুম তখনো সেখানকার রাজারা নিজেদের এমন শোচনীয় হেয়তা অবারিত করেনি—আজ তাদের ব্যবহারে আমার ঐ কবিতাকে সপ্রমাণ করচে।—তোমার ইংরেজি তর্জমা ভালো হয়েছে—একবার চেষ্টা করব এর উপরে হাত বুলিয়ে নিতে।—ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না—কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি

১৭।২।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী" নামক কবিতার দু'টি লাইনের পরিবর্ত্তিত রূপ। দু'-একজন বৌদ্ধ বন্ধু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে "মহাভিক্ষু" ব্যবহার হয় না, এই ভাব প্রকাশ করায় কবি এই দু'টি নূতন লাইন লিখেছিলেন।

ঝড়ে ঝরা পাতা

পাঁচ দিন

[এগারই ফেব্রুয়ারী]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কায়স্থের ছেলে। পূর্ব্বপুরুষের ইতিকথার মধ্যে কোন রাজারাজড়ার কাহিনী প্রচলিত নাই, উপাধিতে রায় চৌধুরী কিম্বা শুধু রায় কি শুধু চৌধুরীত্বের অলঙ্কার নাই; শুধু মিত্র; আছে শুধু "ঘোষ বোস মিত্র কুলের অধিকারী" প্রবাদ অনুযায়ী কুলগৌরব। সুতরাং এককালে নিঃসংশয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত ছিল—বর্ত্তমানে কোন্ শ্রেণীতে পড়বে সে কথা বিবেচনা-সাপেক্ষ। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ছিল—বর্ত্তমানে বিত্ত নিঃশেষিত। জীবিকায় 'দিন আনে দিন খায়' নয় বাঁধা মাইনের বাবু পদবীর চাকুরে—কিন্তু দিন আনার ব্যবস্থা না করলে দিন যায়.না। আপিসের দারোয়ানদের কাছে ধার করে মাসের মাইনে থেকে সুদ-সমেত টাকা শোধ করে। কাবুলীর কাছে ধার করে মধ্যে মধ্যে, তারা দু'-তিন জন মিলে পাড়ার গলির মুখে ব'সে থাকে; দারোয়ানের দেনা শোধের পর উদ্বৃত্ত থেকে তাদের টাকা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসে নিঃশেষিতবিত্ত হয়ে। তবু চালে চলনে প্রাণপণে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রত্যন্ত সীমার শেষ খুঁটাটি কোন রকমে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে। সংসারের সংস্থানে বিত্ত নিঃশেষিত—অন্তরের মধ্যে চিত্তও অসার। ছেলেগুলো যে ভবিষ্যতে লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হয়ে দুঃখ ঘুচাবে এ কল্পনাটুকু করবারও শক্তি অথবা প্রবৃত্তি নাই। নিজে পড়েছিল ম্যাট্রিকুলেশন থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত—সে অনেক দিনের কথা—তখনও ক্লাস গণনা—নীচে থেকে গুণে থার্ড ক্লাসকে ক্লাস 'এইট' বলত' না। বর্ত্তমানে সেকালের পড়া খান কয়েক বইয়ের নাম মাত্র মনে আছে,—তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে ব্যাকরণ-কৌমুদী—মলাটে তার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি ছাপা ছিল—ইংরেজী ব্লাকী এ্যাণ্ড স্মিথস্ রীডার;

ভিতরের বস্তুর মনে থাকিবার মধ্যে আছে—নরঃ নরৌ নরাঃ—আর টেল মি নট ইন মোর্ণফুল নাম্বার্স—লাইফ ইজ বাট এ্যান এম্পটি ড্রীমের একটা প্যারাগ্রাফ মাত্র। বাংলা বইগুলোর নাম মনে নাই, তবে গল্প-টল্প—জীবনীকথা দু'-চারটে মনে আছে। ছেলেগুলো পথে মারামারি করে, গুলি খেলে, স্কিপিং করে অনবরত নাচে, ধুলো মাখে, অশ্লীল গাল দেয় পরস্পরকে—তাও মনে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় না। চেয়ার-টেবিলে বসে চাকরী নয়; খিদিরপুর থেকে হাওড়ার পোল পর্য্যন্ত শেডে ইয়ার্ডে জেটীতে ঘুরতে হয়; একস্পোর্ট ইম্পোর্টার কোম্পানীর সরকার বাবু—মাল খালাস মাল বোঝাইয়ের তদারক এবং হিসেব রাখা কাজ; দাঁড়িয়ে রোদে জলে পুড়ে ভিজে কাজ দেখে মধ্যে মধ্যে আপিসে এসে রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টের প্রকাণ্ড বড় টেবিলের সামনে একখানা হাতল ভাঙা চেয়ার টেনে বসে রিপোর্ট লিখে দাখিল করে। বড় বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, কৈফিয়ৎ দেয়—বড় বাবু তিরস্কার করেন, ইংরেজ বড় সাহেব তিরস্কারের ধার ধারেন না—সোজা বলেন—ইডিয়ট, ননসেন্স; রাস্কেল; গোপেন মাথা নীচু ক'রে—লজ্জায় বা দুঃখে কিম্বা ভয়েও নয়; মাথা উঁচু করে শুনলে বড় বাবু বা বড় সাহেব বেশী চটে যাবে ব'লে মাথা নীচু করে সে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত রুমালে কপাল এবং মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বলে—শালা! কাকে বলে সে, অর্থাৎ গালাগালিটা বড় বাবুকে বা বড় সাহেবকে অথবা যে দুঃসময়টা গেল তাকে কিম্বা নিজের ভাগ্যকে—কি সবগুলোকে জড়িয়ে সকলকেই দেয় কিম্বা কাউকেই না দিয়ে শুধু অভ্যাস বশতই বলে সে-কথা সে নিজেও জানে না। এর পরই সে বিড়ির তৃষ্ণা অনুভব করে, জল খেয়ে, টাইপরাইটারের রিবনের কৌটা—যেটাকে সে বিড়ি-কেস হিসেবে ব্যবহার করে—সেইটা বের করে প্রথমে ঢাকনার উপর একটা আঙুলের টোকা দেয়—তার পর সেটাকে খুলে টিপে-টিপে দেখে একটি নিটোল বিড়ি বেছে নিয়ে দুমুখে ফুঁ দিয়ে মুখে পুরে ধরিয়ে উঁচু দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। বাড়ীতে ফিরে কোন দিন ছেলেগুলোকে প্রহার করে—কোন দিন স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে, মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর কান্নাও শোনা যায়। সম্ভবত প্রহারও করে। কোন দিন সকালে গিয়ে ফেরে তিনটে চারটেয়, কোন দিন বেলা এগারটায় বেরিয়ে রাত্রি ন'টায়। চাকরীর সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী অংশটুকু হল ট্রামে যাওয়া-আসা, কোম্পানী ওকে একখানা শ্যামবাজার সেকসনের মান্থলী টিকিট দিয়েছে, কোম্পানীর কাছে মাইনের কৃতজ্ঞতার চেয়েও এই কৃতজ্ঞতাটাই অনেক বেশী। বিশেষ ক'রে রাত্রে ফেরার সময় ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাসে বসে দু'ধারে আলোকোজ্জ্বল দোকানদানীর দিকে অলস দৃষ্টিতে চেয়ে ফেরাটা একটা বিলাস। ন'টার পর ট্রামের ভিড়ও কম হয়ে আসে। দু'-একদিন ভিড় হয় কিন্তু গোপেনের সব চেয়ে বড় সুবিধে সে ওঠে একেবারে ডালহৌসি অথবা এসপ্লানেডে একেবারে ছাড়ার জায়গা হ'তে।

ট্রাণ্ড রোড হেঁটে এইটুকু এসে সে খালি গাড়ীর সিটে জানালার ধার ঘেঁসে বসে। সিটের মধ্যে তার আবার বাছাই করা সিট আছে। নতুন ট্রামে সে বসতে চেষ্টা করে—দরজার পাশেই লেডিস সিটের পিছনের সিংগল সিটটিতে। যে ট্রামে একেবারে সামনে গাড়ীর পিছনের দিকে মুখ ক'রে বসবার আসন আছে সে ট্রামে গোপেন সেই সিটে বসে। অন্য সিটের লোকে যখন ঘাড় বেঁকিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে লেডিস সিটের দিকে তাকায় তখন ঐ সিটে বসে সে মুচকে হাসে।

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আজ আসছিল সে খিদিরপুর থেকে। কোম্পানীর লরীতে গঙ্গার ধার দিয়ে এসে সে মোড়ে নামল। মোটরের ইঞ্জিনের গরম এবং পেট্রোলের গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে আরাম বোধ করলে। অভ্যাস মত একবার বললে—শালা:! তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলে। শরীর তার সবল—এবং এই কাজের অভ্যাস তার পঁচিশ বছরের, ক্লান্তি সে বড় বোধ করে না। ডালহৌসির কোণে সে এসে দাঁড়াল। এ কি রে বাবা! ট্রাম যে সারি সারি দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কি?

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯ ৬ সাল, রাত্রি সাড়ে ন'টা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক—ক্যাপ্টেন রসিদ আলি খাঁর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্রশোভাযাত্রীদের উপর বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত পুলিশ দু'বার লাঠিচার্জ্জ করেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো পিচের রাস্তার উপর রক্তের দাগ রঙ দেখে আর চেনা যায় না, আলো বাতাস লেগে রক্তের লাল জৌলুষ কালচে হয়ে পিচের রঙের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এক আধটা জায়গায় জমাট-বাঁধা রক্তের ভিতরটা এখনও কাঁচা আছে। হাফসোল মারা সত্ত্বেও গোড়ালী ক্ষয়ে-আসা স্যাণ্ডেলের তলাটা—দুপুরের গলা পিচের মত আঠালো কিছুতে পড়ে চট-চট করে উঠল।

ফেয়ারলি প্লেসের সামনে; উত্তর-মুখে চলে গিয়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

কি লাগল পায়ে? কে জানে কি? হন্ হন্ করে চলেছে গোপেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে? জনশূন্য ডালহৌসি স্কোয়ার। খালি ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ডাক্টার ড্রাইভারেরা উদাসীনের মত দাঁড়িয়ে অথবা বসে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। গোপেন চলেছিল—সব চেয়ে অগ্রগামী শ্যামবাজারের গাড়ীখানার উদ্দেশে। স্কোয়ারের এ মাথায় এসে গোপেনের খেয়াল হল—কড়া পুলিশ পাহারা রয়েছে চারিদিকে। মনটা এবার তার ছ্যাং করে উঠল।

সাইড কার লাগানো মোটর বাইকে তিন জন সার্জ্জেণ্ট ভট্-ভট্ করে তাকে অতিক্রম করে লালবাজারে গিয়ে ঢুকল। লালবাজার থেকে লরী-বোঝাই পুলিশ বার হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। খড়ের ঘরে আগুন লাগার প্রথম অবস্থায় পোড়ার মৃদু গন্ধে যেমন মানুষ চমকিত এবং সন্ধানী হয়ে উঠে—তেমনি ভাবেই সে সতর্ক হয়ে উঠল। একটু ভেবে নিয়ে সে সামনে না-এগিয়ে—স্কোয়ারের কোণেই যে ট্রামখানা দাঁড়িয়েছিল, সেইখানাতে গিয়ে উঠে বসল।

কণ্ডাক্টার তার দিকে একবার তাকালে, তার পর মুখ ফিরিয়ে বসল।

গোপেন প্রশ্ন করলে—গাড়ী বন্ধ কেন ভাই? ব্যাপার কি?

কণ্ডাক্টার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—এঃ, রক্ত? আপনি বুঝি মাড়িয়ে এলেন?

গোপেন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে—রক্তে জুতোর ছাপ পড়েছে ট্রামের মেঝেতে। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে—ডান পায়ের স্যাণ্ডেলের সোলের পাশে জমাট রক্তের কুটি লেগে রয়েছে এখনও। কিছু বুঝতে না পেরে সে কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে তাকালে। মনে হ'ল কণ্ডাক্টার জানে—তার কথাটা মনে পড়ল বিদ্যুতের মত—আপনি মাড়িয়ে এলেন বুঝি?

কণ্ডাক্টার বললে—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—খিদিরপুর থেকে। কি ব্যাপার বলুন তো ভাই?

—ষ্টুডেণ্টস প্রসেসনের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করেছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে লরী পুড়ছে, গুলী চলছে। ট্রাফিক বন্ধ। গোপেন নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। সর্ব্বনাশ! কি বিপদ বল দেখি! লরী পুড়ছে, গুলী চলছে, ট্রাম বন্ধ; তাকে যেতে হবে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়।

আবার গোপেনকে দাঁড়াতে হল। শুধু দাঁড়াল না, দু' পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। ট্রামের জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো পড়েছে রাস্তার উপর। রক্তের দাগ! দিনের আলোয় লোকে সভয়ে সসম্মানে পা দিয়ে মাড়িয়ে যায় নাই—পাশ কাটিয়ে গিয়েছে! রাত্রের অন্ধকারে দু'-চারটে পা পড়েছে। তার মধ্যে একটা ছাপ তার পায়ের স্যাণ্ডেলের। হেঁট হয়ে দেখলে গোপেন। গোঁ-গোঁ করে পুলিশের লরী যাচ্ছে। শিউরে উঠে গোপেন খাড়া হয়ে দাঁড়াল; তারপর হন-হন করে চলতে আরম্ভ করলে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। সে কি এখানে? গির্জ্জের মাথার ঘড়িতে বাজছে পৌনে দশটা।

মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এবং উত্তেজনা পাশাপাশি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক চোখে আতঙ্ক এক চোখে উত্তেজনা—এখনি মানুষের চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠছে—পরমুহূর্তেই চোখে উত্তেজনার ঝিলিক খেলে যাচ্ছে; হাত মুঠি বেঁধে উঠছে। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হন-হন করে চলছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে। সামনের দিকটা যতদূর সাধ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কোথাও পুলিশ কি সার্জ্জেণ্ট রয়েছে কি না? কান সজাগ করে রেখেছে—লরী কি মোটর-বাইকের শব্দ শুনলেই গলিতে ঢুকতে হবে—অথবা কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। নভেম্বর মাসে একটা হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। সে জানে—যেতে যেতে ওরা ধাঁই করে গুলী ছুঁড়ে দিয়ে যায়। যে মরল—সে মরল। রাস্তার মোড়ে—বিশেষ ক'রে বড় রাস্তার মোড়ে—থমকে দাঁড়াতে হবে। মোড় ফিরবার আগে—উঁকি মেরে দেখে নিতে হবে—ওদিকে কি ব্যাপার চলছে—তারপর, হয় পিছিয়ে আসতে হবে অথবা দ্রুতগতিতে সেই রাস্তার পড়ে এক ধার ঘেঁষে চলতে হবে। গোপেনের বন্ধু বীরু রসিক লোক; থিয়েটার নিয়েই মেতে আছে, সে বলেছিল—"মোড়ের মাথায় এসে স্রেফ নাকটি আগে বাড়িয়ে দিবি। স্রেফ নাকটি। নাকের পাশ দিয়ে বাঁকা চোখে দেখবি। তারপর একবার হাতখানি বাড়াবি। তাতেও যদি বন্দুকের আওয়াজ না শুনিস, তখন আর একবার ভাল করে দেখে, সট্। সাঁ ক'রে বেঁকে—সন্ সন্ করে একদম হাওয়া।"

কথাটা রসিক বীরুর মুখে বেশ লেগেছিল সেদিন। আজ সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউর মুখে এসে কথাটার চেহারা পালটে গোপেনের মনে উদয় হল। থমকে দাঁড়াল গোপেন।

সামনে বউবাজার সেণ্টাল এ্যাভিনিউ জংসন। চৌমাথায় চারটে আলোর ছটা পড়েছে। পুলিশ-লরী দাঁড়িয়ে আছে। বউবাজারের দু'দিকের ফুটপাত ফাঁকা; দু'দিকের দোকানপাট—অধিকাংশই কাঠ-কাঠরার দোকান সব বন্ধ। সাড়ে দশটায় অবশ্য সবদিনই দোকানগুলো বন্ধই থাকে—কিন্তু দোকানের গায়ে পান বিড়ি সিগারেটের দোকানগুলো খোলা থাকে। প্রত্যেক দোকানের সামনে দু'-চারজন বসে থাকে বেকার এবং রসিকের দল। গুলতান করে। আজ বিড়ি সিগারেটের দোকানও বন্ধ। রাস্তার গ্যাস পোষ্ট—ট্রামের পোষ্টগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে! দূরে ভট-ভট শব্দ উঠছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে একটা একটা জোরালো আলোর ঝাঁটার মত ছটা—রাস্তার জংসনের উত্তর-পশ্চিম কোণের বাড়ীটার গায়ে পড়ে ক্রমশঃ পশ্চিমমুখী হচ্ছে। এসপ্ল্যানেড থেকে সার্জ্জেণ্টের মোটর-বাইক বউবাজারে—পশ্চিমমুখ মোড় ফিরছে নিশ্চয়। চঞ্চল হয়ে উঠল গোপেন। আলোটা এইবার তার উপর পড়বে। হঠাৎ সে আতঙ্কে চমকে উঠল। দু'টো বাড়ীর মাঝের একটা সরু বদ্ধ গলির মুখ থেকে দু'জন লোক তীরের মত ছুটে বেরিয়ে তাকে অতিক্রম করে তারই পাশের উত্তরমুখী একটা গলিতে সেঁধিয়ে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল গোপেনের।

দুম—দুম—দুম। বন্দুক বা পিস্তলের আওয়াজ হচ্ছে কোথাও। ওদিকে আলোটা তার পাশে এসে পড়েছে। গোপেন মুহূর্ত্তে পাশের ওই উত্তরমুখী গলিটাতে ঢুকে গেল।

অন্ধকার গলি-পথ অনেকটা দূরে দূরে এক একটা গ্যাস জ্বলছে। গোপেন নিজের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। একটু আগেই একটা বাঁকের আড়ালে সেই লোক দু'টি দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে বিচিত্র ভীত এবং ভয়াল পলকহীন দৃষ্টি।

তাদের সামনে পড়ে চমকে দাঁড়িয়ে গেল গোপেন। কে এরা? হাতে ছুরী নাই তো? লোক দু'টি আঙুলের ইসারা করে মৃদুস্বরে বললে—চলে যাও। গলি গলি চলে যাও। দাঁড়িয়ো না।

গোপেন ছুটতে লাগল।

—আস্তে। এত জোরে পায়ের শব্দ করো না।

আবার দাঁড়িয়ে গোপেন পিছন ফিরে দেখলে। লোক দু'টি এগিয়ে চলেছে সন্তর্পণে। লোক দু'টির হাতে কি?

ট্রামের পথের পাথর। ষ্টোন ব্যালাষ্ট।

অবাক্ হয়ে গেল গোপেন। গুলীর উত্তরে ওরা ঢেলা ছুড়ছে। এরা পাগল না কি?

দুম—দুম। পিস্তলের আওয়াজ হল বউবাজারে।

লোক দু'টি আবার গলিতে ঢুকে পড়ছে দ্রুতপদে।

গোপেন ছুটল আবার সভয়ে। গলি-পথ যে দিকে চলেছে—সেই পথে চলেছে সে। ছুটে চলার গতিবেগে হঠাৎ সে গলির মোড় ফিরে একেবারে আলোকিত প্রশস্ত রাজপথের উপর এসে পড়ল।

সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ।

সামনেই রাস্তার ওপর ধোঁয়া এবং আগুন। মিলিটারী ট্রাকে আগুন জ্বলছে। রাস্তার দু'পাশে জনতা। আগুনের লালচে আলোর আভা পড়েছে সকলের মুখের উপর। জ্বলন্ত মিলিটারী ট্রাক্‌টার সামনে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত জন কয়েক মিলে কি যেন টেনে নিয়ে আসছে। ডাষ্টবিন—ময়লা-ফেলা হাত-গাড়ী—কোথা থেকে কার একখানা মাল-বওয়া ঠেলাও নিয়ে

শিল্পী—গোপাল ঘোষ]

[১১ই ফেব্রুয়
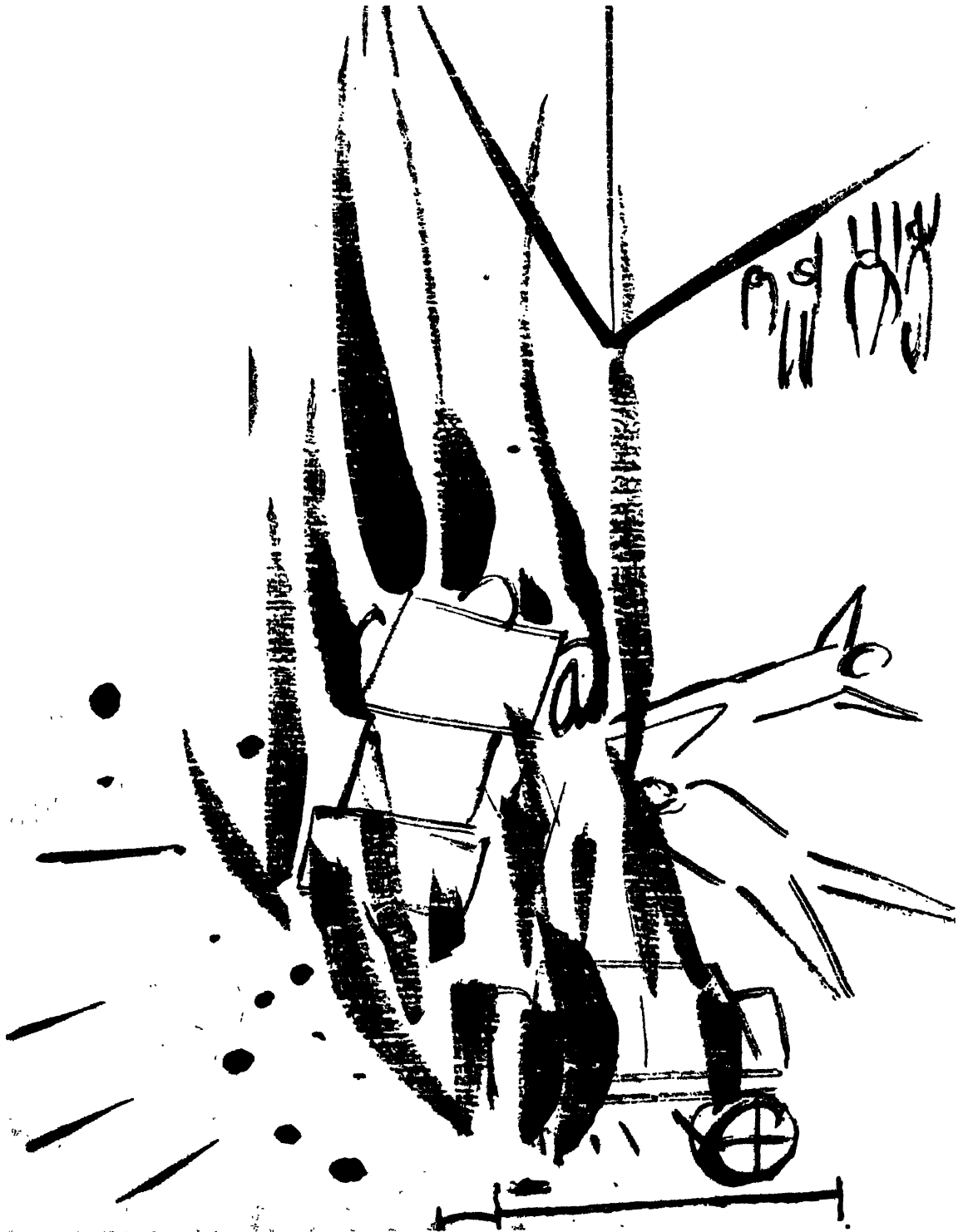
এসেছে। পাশাপাশি সাজিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে। ব্যারিকেড তৈরী করে রাস্তা বন্ধ করছে।

—আসছে—আসছে। দূরপ্রসারী প্রখর উজ্জ্বল দুটো আলো—সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মত মোটরের আওয়াজ।

ঢুকে পড়ল গোপেন গলির মধ্যে।

আওয়াজ হচ্ছে বন্দুকের।

ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে। পা দুটো ভেঙ্গে পড়ছে। চোখ ফেটে কান্না আসছে। অন্ধকার গলিপথে ঘুরে ঘুরে উত্তরমুখে চলেছে। কিন্তু এখনও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ পার হয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের দিকে আসতে পারেনি।

হ্যারিসন রোড ও এ্যাভিনিউ জংসনে দু'খানা লরী এখনও জ্বলছে। গুর্খা পুলিশ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জ্জেন্ট পাহারা দিচ্ছে ওখানটায়।

হ্যারিসন রোড পিছনে ফেলে অনেকখানি উত্তরমুখে এসে সে আবার একবার চেষ্টা করলে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ পার হবার; স্থানটা বেশ নির্জ্জন। একটু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে দেখে, সে এক ছুটে এপারে এসে পড়ল। একটু আগে পূর্ব্বমুখী একটা গলি। গলিতে ঢুকে সে একটা বাড়ীর সিঁড়িতে বসে হাঁপাতে লাগল। একটা বিড়ি ধরালে। এবার ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই শীত ফুরিয়েছে, তার উপর এই ছুটোছুটি, এই উৎকণ্ঠা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। তেলচিটে ময়লা রুমালখানা বার করে সে মুখ মুছলে। এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হয়ে সে মন্থর পদক্ষেপে চলতে চলতে উৎকণ্ঠার পরিবর্ত্তে ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল।

মিটিং আর প্রসেসন। প্রসেসন আর মিটিং। দিল্লী চলো, জয় হিন্দ্‌ বন্দে মাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, ভারত ছাড়ো! চীৎকার—চীৎকার আর চীৎকার। গুলী খাচ্ছে, মরছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে কলিকাতার পিচের রাস্তা!

—ওদের আছে বন্দুক, ওদের আছে পিস্তল—পুলিশের হাতে লাঠি—গুলী চালাচ্ছে—লাঠি মারছে। বন্দুকের ডগায় আছে সঙ্গীন। মারছে খোঁচা। কুকুরের মত মারছে, শেয়ালের মত মারছে। মার—মার—মার—মেরে নে। সাধ মিটিয়ে মেরে নে। ভগবান্ আছেন!

পথের পাশের একটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ হচ্ছে।

এক, দুই, তিন...সাত-আট-দশ—এগারো—এগারোটা বাজল।

সহরের এদিকটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়েছে সব। ফট—ফট। দুম—দুম। নিস্তব্ধতার মধ্যে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ে গুলী চলার শব্দ এত দূরেও শোনা যাচ্ছে। এখনও চলছে গুলী। ঢেলার বদলে গুলী। হে ভগবান্!

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার পরিসর রাক্ষুসে হাঁয়ের মত। ওখানে গিয়ে পড়লে আর পাশ কাটাবার জায়গা নাই। নিশ্চয় সেই গোল জায়গাটায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে গুর্খা পুলিশ ফিরিঙ্গী সার্জ্জেন্ট। ওটা একটা হাঙ্গামার ঘাঁটি। নভেম্বর মাসে ওখানে গুলী চলা গোপেন স্বচক্ষে দেখেছে।

সে শিউরে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে অকারণে—নিজের অজ্ঞাতসারে মধ্যরাত্রির জনহীন নিস্তব্ধ রাজপথ ধ্বনিচকিত করে চীৎকার করে উঠল—আ—হা-হা হা! নিজের জানুর উপরে একটা ঘুঁসি চালিয়ে দিলে।

গলি-পথে খানিকটা এসে সে বড় রাস্তাটা পার হল। নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। ছোট রাস্তা ধরে বাগবাজার ষ্ট্রীটে পড়ে সে নিশ্চিন্ত হল।—শা—লা:!

মাঝ-রাত্রির কলকাতার পথ অত্যন্ত বিশ্রী। গা ছম ছম করে। কোথাও জনমানব নাই, দু'পাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দোর বন্ধ—জানালা দিয়ে দেখা যায় ভিতরে অন্ধকার থম থম করছে। লাইটপোষ্টের মাথায় গ্যাস বাতিগুলো স্থির ভাবে জ্বলছে; ওতেই যেন ভয় বেড়ে যায়।

দু'জন লোক! সতর্ক হল গোপেন। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালের গায়ে কি করছে? পরক্ষণেই তারা রাস্তার দিকে ফিরল। গোপেনের উল্টো মুখে চলে গেল। দু'জন অল্পবয়সী ছেলে; ছেলে নয়—কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হবে। আচ্ছা চিনতেও যেন পাচ্ছে ওদের। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলে, খবরের কাগজে লাল কালীর মোটা হরফে কিছু লিখে দেওয়ালে সেঁটে বেড়াচ্ছে।

কেয়াবাৎ রে বাবা! বহুৎ আচ্ছা ভাই। ঠিক আছে এরা। রাত্রে ঘুম নাই, বুকে ভয় নাই, কাগজের উপর লাল কালীর হরফে কথার আগুন জ্বালিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলছে। কাল সকালে যে পড়বে তার বুকে লাগবে। কি লিখেছে?

"বিপ্লব—বিপ্লব।

বিপ্লবের প্ল্যান চাই; মন্ত্রিত্ব নয়।

লক্ষ প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত; নেতৃত্ব কই?"

অশ্বস্তি বোধ করল গোপেন। সে দ্রুতপদে চলতে লাগল। একটু আগেই তার বাড়ী।

ঢং।

কোন বাড়ীর ভেতরে ঘড়ি বাজছে। বোধ হয় একটা বাজছে।

ছোট-ছোট

"বনফুল"

১

জীবন মরণ দুই তীর
সংশয়ের আলো ছায়া আঁকা
আলো কভু হতেছে তিমির
তিমির কখনও আলো-মাখা।

২

জ্যোতিষ্কলোকের পারে কি আছে তা জানি
শূন্যতার মাঝখানে পূর্ণতার বাণী।

৩

সুর-বেসুরের দ্বন্দ্ব নিয়ে আস্ফালনের জাল না বুনি
তোমার বাঁশী তুমি বাজাও আমার শোনা আমি শুনি

৪

তোমার আমার মাঝখানে
কি যেন অদৃশ্য সেতু আছে
জনতার মাঝখানে, বল,
না হলে কি করে এলে কাছে;

৫

কোন্ পথে যাব ভেবে মূর্খ বসে থাকে জড়বৎ
সে অলস জানে না কো পথের সন্ধান দেয় পথ।

৬

পূর্ণ তখন হ'ল আশা
গাছের ডালে পুষ্পরূপে
ফুটল যবে আলোর ভাসা।

ঢং। পানওয়ালার বন্ধ দোকানটার মধ্যে ঘড়ি বাজছে। ঢং। মিষ্টিওয়ালার দোকানের ঘড়ি এটা।

নিজের বাড়ীতে বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়লে সে।

পাশের বড় বাড়ীতে ঘড়িটায় এতক্ষণে একটা বাজল—ঢং।

—রুবি! রুবি! এই রুবি।

গোপেনের মেয়ের নাম রুবি। ঘুমিয়েছে না মরেছে সব। ছেলেগুলো ঘুমাতে পারে—ছেলেমানুষ—ভাবনা-চিন্তা তাদের হবার কথা নয়। কিন্তু বিভা ঘুমালো কি করে! রাত্রি একটা বাজল, কলকাতার পথে গুলী চলছে সন্ধ্যে থেকে—খবর নিশ্চয় পেয়েছে—তবু সে ঘুমায় কি করে?

প্রচণ্ড জোরে কড়া নাড়লে গোপেন। চীৎকার করে ডাকলে—বিভা! এই! রুবি!

বাক—উঠেছে। দাঁতে দাঁতে টিপে—হাতের চড় সে ঠিক করে রাখলে। খুলে দিক দরজা।

[ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বারে সুভাষ সম্বন্ধে যা' লিখেছিলুম তার তলায় তোমরা ছোট করে একটি 'ক্রমশঃ' জুড়ে দিয়ে আমায় বিষম ফ্যাসাদে ফেলেছ। পাক দিয়ে সুতো লম্বা করবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। লোকের কৌতূহলের যে শেষ নেই তা জানি, কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার চিন্তার ধারা যে একেবারে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! বেশ গম্ভীর হয়ে লিখতে বসেছি; সুমুখে যোদ্ধবেশে সুভাষের ফটো। কিন্তু লিখবো কি ছাই? আমার কেবলি মনে হচ্ছে—O fairest flower, no sooner blown but blasted! কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত তেজ ঐ চোখের ভিতর পোরা রয়েছে। সবই কি শূন্যে মিলিয়ে গেছে? সত্যই কি সুভাষ আর ইহজগতে নেই?

মহাত্মাজীর আদর্শে আস্থাবান্ হবার সৌভাগ্য যে আমার কখনও হয়নি, তা' তোমরা বেশ করেই জান। অধিকন্তু, মহাত্মাজী সুভাষের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যে আমার মনের কোণে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে বেশ খানিকটা বিদ্বেষ যে জমা হয়ে আছে তা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। মহাত্মাজী যখন বলেন যে সুভাষ-সৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহস, নিয়মানুবর্ত্তিতা, স্বদেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সবই তাঁর কাছে প্রশংসনীয়; কেবল তাদের যুদ্ধ-স্পৃহাটার ভিতর তিনি অমঙ্গলের বীজ দেখতে পান, তখন আমার হাসিও পায়, রাগও ধরে। আমার মনে হয়, যতগুলি সদ্‌গুণের তিনি উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিই ঐ যুদ্ধ-স্পৃহাকে আশ্রয় করেই ফুটে উঠেছে। ঘড়ির ভিতর থেকে হেয়ার স্প্রিংটি আস্তে আস্তে টেনে বের করে নিলে ঘড়ির যে অবস্থা হয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিতর থেকে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবার স্পৃহাটুকু বাদ দিলে মহাত্মাজী যে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রশংসা করেছেন সেগুলি একে একে সবই লোপ পাবে। তা হোক, মহাত্মাজী সুভাষ সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, যে দিন সভাস্থলে তিনি বলেছিলেন—"I repeat—Subhas is alive"—সে দিন আমার মনে হয়েছিল বুড়োকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে গা-ময় মাখি। মুখে তাঁর ফুল-চন্দন পড়ুক। একশো পঁচিশ বৎসর কেন, তিনি চিরজীবী হয়ে রামরাজ্যের মহিমা প্রচার করতে থাকুন।

আজকাল এক এক সময় কি মনে হয়, জানো?—মনে হয়, আহা! সুভাষের যদি একটা ছেলে থাকতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। সুভাষ ছিল একবারে আকাট ব্রহ্মচারী। তার ধারণা ছিল এ যুগে যে স্বদেশ উদ্ধার করতে যাবে, তাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিতে হবে দেশ-মাতৃকার চরণে। তার ভক্তি, ভালবাসার আর অন্য ভাগিদার থাকা চলবে না। মেয়েরা দলে দলে দেশের কাজে নেমে পড়ুক, এটা সে সর্ব্বান্তঃকরণে চাইতো, আর এ বিষয়ে তাদের উৎসাহ দিতে সে কখনও কুণ্ঠিত হতো না। নারী-জাগরণ বলতে সে বুঝতো মেয়েরা ছেলেদের মতো লেখা-পড়া শিখবে, সভা-সমিতিতে যোগ দেবে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুরুষদের অগম্য স্থানে স্বদেশপ্রেম প্রচার করবে, স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে কুচকাওয়াজ করবে, আর্ত্তের সেবা করবে—ব্যস! এ ছাড়া কোমল সুরের আর কিছু দেখলে বা শুনলে সুভাষ অবাক্ হয়ে যেত, বিরক্ত হতো। তার মুখে একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠত।

১৯২৩ সালে যখন দেশবন্ধু তাঁর স্বরাজ্যদলের কার্য্যপ্রণালী প্রচার করবার জন্যে মৈমনসিংহে গিয়েছিলেন তখন তাঁর দলের ভিতর সুভাষও ছিল; আমিও ছিলাম। তখনকার no-changer দলের মৈমনসিংহ ছিল একটা প্রধান আড্ডা। দেশবন্ধুর কাউন্সিল দখল করা প্রোগ্রামের উপর লোকের বেশী আস্থা ছিল না। No-changerদের ঐ কেল্লাটা দখল করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। আক্রমণের বেগ প্রবাহিত হতে লাগলো ত্রি-ধারায়। স্বয়ং দেশবন্ধু সেখানকার উকিলদের নিয়ে পড়লেন; আমি ঢুকে পড়লুম পুরাতন বিপ্লবপন্থী দলের ছেলেদের ভিতর; আর মৈমনসিংহের নৈষ্ঠিক অসহযোগপন্থী নারীবাহিনীকে তর্ক-যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে দেবার ভার পড়লো সেনাপতি সুভাষচন্দ্রের উপর।

মহা উৎসাহে মেয়েদের এক সভা ডাকা হলো। সুভাষ আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবেই। আমি করজোড়ে বিনীত ভাবে নিবেদন করলুম—"ভাই, মেয়েদের যে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কেউ কিছু বোঝাতে পেরেছেন, এ বিশ্বাস আমার নেই। তবে তোমার সাহসের অন্ত নেই। ও কাজটা তুমিই চেষ্টা করে দেখ।" সুভাষ রেগে গিয়ে বললে—"মেয়েদের কাজে আপনার কখ্‌খনো উৎসাহ দেখতে পাই নে। আপনি কি মনে করেন মেয়েরা না এলে

দেশের কাজ এগুবে ?" আমি আরও বিনীত ভাবে বললুম—"তুমি ভুল বুঝছ ভাই, মেয়েদের উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা। তাঁরা বেড়ি-খুন্তি নিয়ে রণক্ষেত্রে না এগুলে আমাদের যে শুকিয়ে মরতে হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।"

সুভাষ মুখখানা খুব গম্ভীর করে চলে গেল।

* * * * * *

সভায় না যাবার একটা কারণ ছিল তা সুভাষের কাছে ভেঙে বলিনি। আমি খবর পেয়েছিলুম যে, যে বাড়ীতে আমরা অতিথি হয়েছিলুম তাঁর স্ত্রীই হচ্ছেন ওখানকার মেয়েদের নেত্রী। শিক্ষিতা আর বুদ্ধিমতী বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, সুভাষের মেয়েদের মিটিং-এ তিনি যাননি। হেঁসেল থেকে অতিথিদের ভূরি ভোজনের আয়োজন নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আমি ঠিক করেছিলুম যে, মেয়েদের সহানুভূতি যদি পেতে হয় তা'হলে হেঁসেল ঘরের এই বৌ-ঠাকরুণটির শরণাপন্ন হতেই হবে। কি করে তাঁর কাছ থেকে অন্ন পাওয়া যায় আমি আহারাদির পর শুয়ে শুয়ে সেই চিন্তাই করতে লাগলুম।

ভগবান্ সদয়—। সুযোগ মিলতে বেশী বিলম্ব হলো না। ঐ বাড়ীরই একটি ৬।৭ বছরের মেয়ে কি জানি কি মনে করে আমার কাছে এলো। আমি তার সঙ্গে গল্প করতে করতে তারা কয় ভাই, কয় বোন, তাকে কে বেশী ভালবাসে—তার মা, না বাবা—তার গলায় ঐ দাগটা কিসের—প্রভৃতি নানা প্রশ্ন করে যে জ্ঞান সঞ্চয় করলুম, তার উপর নির্ভর করে সামুদ্রিক বিদ্যার পরীক্ষা দিতে বেশী কষ্ট হয় না।

তার পর আমি দেখতে আরম্ভ করে দিলাম, তাহার হস্ত-রেখা। কোথায় তার বিয়ে হবে, তার বর দেখতে কেমন হবে—এই সব পরম গুহ্য তত্ত্ব যখন অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ভিতর থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগলাম, তখন মেয়েটি তো একেবারে আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল।

মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার মা-ঠাকরুণটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। বাটনা-টাটনা বাটছিলেন বোধ হয়—হাতে হলুদের দাগ। বাঁ হাতখানা আমার কাছে এগিয়ে দিলেন—"আপনি দেখছি সামুদ্রিক বিদ্যা-বিশারদ। আমার হাতখানা একবার দেখুন দেখি।" আমি মনে মনে বললুম—"এই যে মাছ টোপ গিলেছে।" মুখে বললুম—"না, বৌঠাকরুণ, ও-সব আমি কিছু জানিনে।" বৌঠাকরুণ সে কথা শুনলেন না। বললেন—"খুকিকে আপনি যা যা বলেছেন, সব মিলে গেছে। আমার হাত আপনাকে দেখতেই হবে।"

দেখতেই যখন হবে, তখন শ্রীগুরু-স্মরণ করে দেখতে আরম্ভ করলুম। হুঁ। স্বাস্থ্য-রেখা কিঞ্চিৎ অপরিস্ফুট। আপনার শরীরটা তো আজকাল ভাল নেই—না ? (বলা বাহুল্য, মুখ দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়, সামুদ্রিক বিদ্যার বিশেষ কোন দরকার হয় না)। বৌ-ঠাকরুণ বললেন—"হাঁ, প্রায় আট-ন' মাস হলো শরীরটা সারছে না।" কাছে দোলনায় একটি ছোট মেয়ে ঘুমুচ্ছিল ; অনুমান করলুম তার বয়স আট-নয় মাসের বেশী হবে না। আর তাঁকে বেশী কিছু বলতে হলো না। আমি অন্তর্নিহিত সামুদ্রিক বিদ্যার প্রভাবে গড় গড় করে সব বলে যেতে লাগলুম।

তার পর দেখলুম—বিদ্যার রেখা, বুদ্ধির রেখা, ধনের রেখা, নেত্রীত্বের রেখা। বৌঠাকরুণের মুখ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগলো। এমন সময় মস্-মস্ করতে করতে আদালত থেকে ফিরে এলেন আমাদের উকিল গৃহস্বামী। আমি হাত দেখছি দেখে তিনি তো হেসেই আকুল। জিজ্ঞাসা করলেন,—"দাদার আবার ও বিদ্যেও আছে না কি ?" সার্টিফিকেট দিলেন স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী—"না, গো ; দাদা যা'-যা' বলেছেন সব ঠিক। তুমি হাসছ কি ?"

উকিল ভায়া বললেন—"তা হলে আমার হাতটাও একবার দেখে দিতে আজ্ঞা হোক।"

আমি স্বামী ও স্ত্রীর দু'খানি হাত পাশাপাশি রেখে গভীর গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তার পর আস্তে আস্তে বললুম—"কিছু মনে কোরো না ভাই। ওকালতিতে তোমার নাম আছে বটে ; কিন্তু এই দেখ বুদ্ধির রেখা। বৌ-ঠাকরুণ তোমার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমতী। আর তুমি যে করে খাচ্ছ, তা তাঁরই ভাগ্যের জোরে।"

প্রচণ্ড হাস্যধ্বনির মধ্যে সামুদ্রিক বিদ্যাচর্চ্চা শেষ হয়ে গেলো ; আর আরম্ভ হলো চা-পান। উকিল ভায়াটির ঝোঁক নৈষ্ঠিক অসহযোগের দিকে, যদিও তিনি আদালত ছাড়েননি, কিন্তু আমাকে তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করতে বেশী বেগ পেতে হলো না। সামুদ্রিক বিদ্যার জোরে যাঁর হাতের ভিতর প্রবল বুদ্ধির রেখা আর নেত্রীত্বের রেখা আবিষ্কার করেছিলুম, এবারে অগ্রণী হলেন তিনি স্বয়ং। সামুদ্রিক বিদ্যার সঙ্গে স্বরাজ্যদলের প্রপাগাণ্ডার এই গভীর সংযোগ দেখে আমি বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করলুম।

নর বানর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হরিদ্বারেতে রম্য শীতল;
গম্বুজ ঘর উচ্চ ত্রিতল,
মুক্ত জানালা—ভোজনে বসিব
সাজানো বিবিধ ভোজ্য,
অণুবোমা নয়—ছোট হনুমান
সব লয়ে দিল চম্পট দান,
অলিন্দে বসি খাইতে লাগিল
হাসিয়া করেছি সহ্য।

গৃহদ্বারেতে আমি বিপন্ন
প'রিচিত নর মান্যগণ্য
হস্তে গণিয়া মূল্য লয়েছে
বিনিময়ে দিবে দ্রব্য,

কোথায় দ্রব্য? সব বিস্মরি'
দেখা হলে হাসে আমি লাজে মরি
অবাক্ হইয়া চেয়ে থাকি আর
ভাবি নর কত সভ্য।

যে যাই বলুক মনে নাহি ধরে
অনেক প্রভেদ নরে ও বানরে
হনু তো নিজের মুখ পোড়াইল
পোড়াইতে গিয়া লঙ্কা,
দেখি মানুষের নাই বটে লেজ
সব চেয়ে বেশী তবু তার তেজ
জগৎ পোড়ানো না পোড়ায়ে মুখ
নাই ঘৃণা লাজ শঙ্কা।

ইতিমধ্যে নারীসভার বক্তৃতা শেষ করে উৎফুল্ল নয়নে হাজির হলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। বৌ-ঠাকরুণ সুভাষের চা-প্রীতির কথা জানতেন। বক্তৃতা-ক্লান্ত সুভাষের জন্যে বড় একটা টাম্বলারে চা আনবার জন্যে তিনি রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন। আমি সুভাষকে বললুম—"সেনাপতি! বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করো। নারীবাহিনীর সংবাদ কি?"

সুভাষ সানন্দে মহিলা-সভার বিবরণ দিতে লাগলো। কি তাঁদের আগ্রহ, কি তাঁদের স্বদেশ-প্রেম! কি তাঁদের নিষ্ঠা!—ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই না কি নিঃশব্দে এক ঘণ্টা ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনেছিল!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"হাঁ কোরে তাঁরা তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেননি?"

সুভাষ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তার মানে?"

আমি বললুম—"মানে আর কিছু নয়। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে, তাঁরা বক্তৃতা শুনতেও আসেননি, আর কোন্ দলের কি প্রোগ্রাম তা' জানবার জন্যে তাঁদের বিশেষ মাথা-ব্যথাও নেই। তাঁরা এসেছিলেন শুধু তোমাকে দেখতে, আর তোমার মুখের কথা শুনতে। আমি তোমার সঙ্গে মহিলা-সভায় যাইনি কেন জান? তোমার চাঁদ-মুখের পাশে আমার এই ভোঁদা মুখখানা থাকলে অর্দ্ধেক effect নষ্ট হয়ে যেত। তুমি মহিলাদের মাঝখানে স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রাম ব্যাখ্যা না করে যদি উল্টো কিছু ব্যাখ্যা করতে, তা'হলে আমার মনে হয় মহিলারা তাই মেনে নিতে ইতস্ততঃ করতেন না। এ বিষয়ে তাঁরা বিষম উদার!

গৃহস্বামী বন্ধুটি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। সুভাষ হাসবে কি রাগবে তাই স্থির করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় এক প্রকাণ্ড টাম্বলারে চা নিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের অতিথি-বৎসলা গৃহকর্ত্রী।

চা পেয়ে সুভাষ আর ক্রুদ্ধ হবার সময় পেলে না। আমি তাড়াতাড়ি নিতান্ত ভাল মানুষের মতো বলে উঠলাম—"জানেন, বৌ-ঠাকরুণ! সুভাষ বাবুর মহিলা-মিটিং খুব successful হয়েছে। সুভাষ বাবুর মুখে তো আর আপনাদের এখানকার মহিলাদের সুখ্যাতি ধরছে না। সুভাষ বাবুর যত যুক্তিই না কি তাঁরা শোনবার আগেই মেনে নিয়েছেন।"

সুভাষ চায়ের টামলার থেকে মুখ তুলে একবার কটমট করে আমার দিকে চেয়ে দেখলো। বৌ-ঠাকরুণের অধরপ্রান্তে একটা অস্ফুট হাসির রেখা মিলিয়ে গেল।

* * * *

শুনলাম তার পরদিন বৌ-ঠাকরুণ মহিলা-সভায় স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রাম অনুমোদন করে একটা প্রস্তাব করেছিলেন, আর তা' বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। আমাদের মৈমনসিংহ-বিজয়ের প্রথম অধ্যায় শেষ হলো। দেখলুম—বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে যা' বলেছিলেন তা' একেবারে খাঁটি কথা—চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়!

দুঃখের বিষয়—চাঁদ নিজের জয়ের কারণ নিজেই জানে না। [ক্রমশঃ

সুভাষের সঙ্গে বারো বছর

(১৯১২—১৯২৪)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

"আমি রাত্রি, তুমি ফুল।
যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়াছিনু
আঁধার আকাশ জুড়ি,
সমস্ত নক্ষত্র লয়ে
তোমারে লুকায়ে বুকে;
যখন ফুটিলে তুমি
সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল;
ফুরাল আমার কাল
আলোকে ভাঙিয়া গেল
রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি
গুন্‌গুন্ মধুকর
চারি দিকে তুলিয়াছে
বিস্ময়-ব্যাকুল স্বর;
গাহে পাখী বহে বায়ু,
প্রমোদ হিল্লোল ধারা
নবস্ফুট জীবনেরে
করিতেছে দিশেহারা!
এত আলো, এত সুখ
এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে;
আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি
সমতল নীরবতা
শুধু চেয়ে থাকা আঁখি
শুধু মনে মনে কথা।"

তার মথুরার লীলার কথা সকলেই জেনেছেন—কিন্তু সে যখন বৃন্দাবনে রাখাল বালকদের সঙ্গে গোঠে-মাঠে খেলা করতো, সে দিনগুলির কাহিনী অনেকেই শোনেননি। সেই লীলার প্রথম ও প্রধান সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সুখ-স্মৃতি আমি যক্ষের মত এত দিন বক্ষে লুকিয়ে ধরে রেখেছি। আজ হয়তো সময় এসেছে দেশবাসীর সামনে সেগুলিকে নিবেদন করার।

শারদীয়া সপ্তমীর সুপ্রভাত। ইংরেজী ১৯১২ সালের একটি সকালে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি অলস ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কটক সহরের উড়িয়া-বাজার পল্লীতে অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয়ের বৈঠকখানায় ব'সে আছি।

এমন সময় একটি গৌরবর্ণ কৃশাকৃতি তরুণ কিশোর এসে তার ছোট্ট কর দু'টি জোড় করে আমায় নমস্কার করলো। আমি অবাক্ হয়ে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নির্বাক্ হয়ে চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রভাতের শিশির-স্নাত কুসুমের মত তার পবিত্র মুখখানি, চোখে সোনার ফ্রেম দেওয়া চশমা, গায়ে ফিকে নীল রংয়ের বরফি-কাটা ছিটের লম্বা কোট, তার উপর একখানি পাট-করা সাদা চাদর, পরণে ধুতি এবং পায়ে কালো রংএর ফিতে-আঁটা স্যু। এই মূর্ত্তি দেখে আমি মনে করলাম, যে মানুষ আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—এ-ই সে! ভাবের আবেগে আমি তাকে প্রতি-নমস্কারটি পর্য্যন্ত করিনি—কিন্তু মুহূর্ত্তের অবসরে তার পায়ে আমার জীবন নিবেদন করে দিয়ে মনে মনে অনুভব করলাম, এই সেই বালকবেশী মহাপুরুষ যে এক দিন নিজের চরিত্র-মহিমায় ও কর্মগৌরবে ভারতের মুক্তি আনবে।

অনেকক্ষণ পরে সে বললো—"মাষ্টার মশায় লিখেছেন তুমি আমাদের বাড়ীতে উঠবে, তা ওঠনি কেন?"

আমি বললাম—"ভাই, তোমরা এত বড়লোক যে আমার মত গরীবের ওখানে উঠতে ভয় করে।"

তার চোখ ভিজে উঠলো—"বড়লোকের ঘরে জন্মেছি বলে তুমি আমায় খোঁটা দিলে, আমার কি অপরাধ বল তো, ভাই?"

তার পর দু'জনে বসলাম কথা কইতে। সে কথা বহু দিন বহু বৎসরেও শেষ হয়নি।

এই কিশোরটি সুভাষচন্দ্র, আর এই মাষ্টার মশায় শ্রীযুত বেণীমাধব দাস, পরবর্ত্তী কালে যিনি কুমারী বীণা দাসের পিতারূপে লোকসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

বেণী বাবু কটকের র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। সুভাষ কটক ইউরোপিয়ান স্কুল থেকে র‍্যাভেনশা কলেজিয়েটে ভর্ত্তি হয়। এই স্কুলে সে বেণী বাবুর কাছে দুই বৎসর পড়ে। বেণী বাবু সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না—তাঁর জীবনের মহৎ আদর্শ ও দেশ-হিতৈষণা তিনি ছাত্রগণের মধ্যে প্রাণ দিয়ে ঢেলে দিতেন। সুভাষ এক নিমেষেই তাঁর প্রিয়তম ছাত্র হ'তে পেরেছিল। বেণী বাবু যখন কটক থেকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে হেড্‌মাষ্টার হ'য়ে বদলি হন—তখন সুভাষ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কতক্ষণ না কেঁদেছিল।

আমার বয়েস তখন বছর পনেরো। সুভাষেরও তাই। কৃষ্ণনগরে এসে বেণী বাবুর স্নেহ-দৃষ্টি আমার

উপর পড়লো। আমার শরীর ভাল না থাকায় তিনি পুরীতে চেঞ্জে যাওয়ার জন্যে সুভাষকে একখানা পত্র আমার হাতে দিয়ে কটকে পাঠালেন। পুরীতে সমুদ্রের ধারে সুভাষদের বাড়ী ছিল। সেই বাড়ী বা অন্য কোথাও আমার থাকার ব্যবস্থা করতে তিনি সুভাষকে অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু এটা একটা উপলক্ষ মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন সুভাষের সঙ্গে আমার মেলা-মেশা। এবং সেই মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে একটি যুগ্ম-জীবন-ধারার সৃষ্টি।

মাষ্টার মশায় আশা করতেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সুভাষ ও আমার মধ্যে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করবে। সুভাষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং ৭০০র মধ্যে ৬০৯ নম্বর পায়। আর এক জন সরকার প্রথম স্থান পায় ৬১৬ পেয়ে, কিন্তু সে আমি নই, আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার, যিনি পরে সিটি কলেজ ও পোষ্ট্-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

সুভাষের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে ক্লাসের পড়া-শুনো থেকে আমার মন উঠে গিয়েছিল। এক নূতন জীবনের আস্বাদে ও কল্পনার রঙীন নেশায় আমি একেবারে মশগুল হ'য়ে পড়েছিলাম।

প্রথম যে-দিন সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল—সে-ও দৈনন্দিন জীবনের আচরিত পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। কখনও সকালে বাড়ীর বার হয় না, সে দুপুর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কথায় বিভোর হ'য়ে থাকলো। স্নেহময়ী মা তার জন্য খাবার নিয়ে ব'সে আছেন, স্মরণ-হওয়ায় সে দুপুরে বাড়ী ফিরে খাওয়া শেষ করেই আবার আমার কাছে এলো।

"ক্রমান্বয়েণ"—গল্প করতে করতে অধিক রাত হ'য়ে গেল - আমরা হাঁটতে হাঁটতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত কাটজুড়ি নদীর বাঁধের উপর বেড়াচ্ছিলাম। চারটি দিন কটকে থেকে বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যায় সুভাষের নিকট বিদায় নিয়ে পুরী গেলাম।

সুভাষের ডাক নাম ছিল 'সুবি'।

সুভাষের মা অতি পুণ্যশীলা রমণী ছিলেন। আটটি পুত্রের ও ছয়টি কন্যার তিনি জননী ছিলেন। সুভাষের বাবা রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু শৈশবে অতি দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। উড়িষ্যার বাঙালীদের তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কটকের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানরূপে তিনি সহরের সকল সাধারণ কাজে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর আদি-বাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। কটক, পুরী, কার্সিয়ং ও কলিকাতায় পরে তিনি বাড়ী ক'রেছিলেন। ছেলেদের ইউরোপীয় স্কুলে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই পুত্রগণের সকলেই পরবর্ত্তী জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করেছেন। বড় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হয়েছিলেন। এবং বর্ত্তমানে দক্ষিণ-কলিকাতা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস-মনোনীত সদস্য-পদপ্রার্থী। মেজ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি ওকালতি পাশ ক'রে কলকাতায় হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করতে আসেন। পরে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্যতম প্রধান সহকারী হিসাবে ইনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হ'য়ে এবং ফরোয়ার্ড পত্রিকার ভার নিয়ে প্রথম রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণীই সুভাষের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন। সুভাষের সেজদা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বসু উড়িষ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি ঐ পদ ত্যাগ ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইব্যুনালের অন্যতম এসেসর-রূপে নিযুক্ত আছেন। ন'দা সুধীরচন্দ্র টাটা কোম্পানির কয়লার খনিতে এক জন বড় অফিসার। ফুলদা সুনীলচন্দ্র কলিকাতার এক জন বড় হার্ট-স্পেশালিষ্ট্ ডাক্তার। সুভাষ পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান। ছোট ভাই শৈলেশচন্দ্র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। আর একটি ভাই অল্প বয়সেই মারা যান।

সুভাষদের বাড়ীতে সাহেবী চাল-চলনের প্রাদুর্ভাব খুবই ছিল। ধর্ম্মপ্রাণা মাতা এ জন্য একটু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। আটটি ছেলের মধ্যে সুভাষই তাঁর প্রিয়তম ছিল। সুভাষের ধর্ম্মপ্রাণতা সে মায়ের নিকট থেকেই পেয়েছিল। মায়ের কাছে রামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করতে তার বড় ভাল লাগতো।

কটকে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুভাষ স্থির করলো, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ ক'রে দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। এই সংকল্প গ্রহণের মূলে একটু ইতিহাস আছে।

ইংরেজী ১৯১১ সালে আমি ও আমার এক দাদা স্বাস্থ্যলাভের জন্য পূজার ছুটিতে অক্টোবর মাসে দেওঘরে বেড়াতে যাই। দেওঘর হাই-স্কুলের বোর্ডিং তখন পূজাবকাশে খালি ছিল। সেখানে দুজনে উঠি। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগলকিশোর আঢ্য নামে মেডিকেল কলেজের দুই জন ছাত্র তখন ওখানে ছিলেন। এই সুরেশচন্দ্রই পরবর্ত্তী জীবনে আই, এম, এস হয়েছিলেন, কুমিল্লা অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন।

সুরেশচন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হ'য়েছিল। তখন তিনি মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তেন—যুগলচন্দ্র পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তখনকার দিনে যুগলচন্দ্রের মত মেধাবী ছাত্র মেডিকেল কলেজে আর কেহ ছিলেন না; তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হইতেন এবং গোল্ড মেডাল পেয়েছিলেন ও মাসিক ৮৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

সুরেশচন্দ্রের সংকল্প ছিল আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। যুগলচন্দ্র ছিলেন তাঁর এই সংকল্পের সহায়ক। দেশের যুবকদের নিয়ে একটা দল বেঁধে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই ছিল পরিকল্পনা। এই উদ্দেশ্যে আমিই তাঁর প্রথম শিষ্য হই এবং নিরামিষ আহার ত্যাগ করে একবারে মুর্গীর ডিম খেতে আরম্ভ করি।

কলিকাতা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে ৫৩ নং বাড়ীতে আমাদের প্রথম আড্ডা বসে। সেখানে সুরেশদা ও যুগলদা ছাড়াও শ্রীযুত আশুতোষ দাস নামে মেডিকেল কলেজের এক জন ছাত্র ছিলেন। আশুদা পরবর্ত্তী জীবনে ডাক্তারি পাশ ক'রে গ্রামে চিকিৎসা করতেন। এক সময়ে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে কমিশন নিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে এসে কিছু দিন পরে অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

৫৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে ৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা মেডিকেল মেসে পরে সুরেশদা'রা আসেন। কটক থেকে ফিরে এসে সুভাষের সমস্ত কথা সুরেশদাকে বলি। সুভাষের সঙ্গে সুরেশদা'র চিঠিপত্র চলতে থাকে। আমিই সুভাষকে দলে ভিড়াই।

আমি কটক থেকে চলে আসার পর সুভাষ বাংলা ভাষায় প্রথম আমায় চিঠি লেখে। সে চিঠি যেন ইংরেজীর অনুবাদ। একটি লাইন মনে আছে—"মাষ্টার মশায়কে বলিও আমায় চিঠি লিখিতে।" দুঃখের বিষয় চিঠিখানি আমার কাছে নাই।

১৯১৩ সালের ১লা মার্চ আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়। পূর্ববৎসরের পূজার ছুটি থেকে পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমরা নূতন জীবনের আলোড়নে পড়াশুনায় তেমন মন দিতে পারিনি। ব্রহ্মচর্য্য পালন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, রোগী এবং দুঃস্থের সেবা ইত্যাদিতেই কটকে সুভাষের ও কৃষ্ণনগরে আমার সময় কাটতে লাগলো।

কটকে ছেলেদের একটি মেস ছিল। সেই দলের সর্দার ছিলেন শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেঁপো রুগী, কিন্তু জনসেবায় নিবেদিত-প্রাণ। সুভাষ গিরীশদার সংস্পর্শে এসে রুগী এবং আর্ত্তগণের সেবায় নিযুক্ত হল। একটি বসন্ত রোগীর সেবা করছে শুনে সুভাষের পিতা আতঙ্কিত হন। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরূপে এই রোগ যাতে বিস্তৃত না হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তিগণের যথোচিত শুশ্রূষা হয়, তিনি তার ব্যবস্থা অবিলম্বে করলেন—কিন্তু সুভাষকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

পরীক্ষার পর সুভাষ কৃষ্ণনগরে আমার কাছে এসে কিছু দিন থাকবে, কটক থেকেই স্থির করে এসেছিলাম। ১৯১৩ সালের মে মাসে সুভাষ কৃষ্ণনগরে এল। আমাদের বাড়ীতে উঠলো। সুরেশদা ঠিক করেছিলেন, সদলবলে কৃষ্ণনগর এসে পলাশী মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাবেন। কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেণে আমরা পলাশী গেলাম। ষ্টেশন থেকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র মাইল তিনেক হবে। পলাশীর সে আম্রকানন আর নেই। দর্শকদের জন্য একটি ডাক-বাংলো ও যুদ্ধের বিজয়-স্মৃতিস্তম্ভ মাঠের মাঝখানে লর্ড কার্জনের আদেশে তৈরি হ'য়ে রয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করতে করতে আমি কবি নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" সমস্তটা স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করেছিলাম, মনে আছে। সেনাপতি মোহনলালের মুখে যে শেষ কথাগুলি কবি শুনিয়েছেন, তার আবৃত্তি শুনে সুভাষচন্দ্র চোখের জল ফেলে'ছিল।

পলাশীর স্মৃতি-স্তম্ভের ফলকের গায়ে সুরেশদা খড়ি-মাটি দিয়ে লিখে দিলেন—"Monument of Glaring Treachery!" চৌকিদার এসে ধমক দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা সযত্নে মুছে দিল।

পলাশী দেখে আমরা চললাম মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে। বহরমপুর গিয়ে উঠলাম আমার এক সম্পর্কীয় মামার বাড়ীতে। শ্রীযুক্ত অমূল্য উকিল, অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত, যুগলদা প্রভৃতি আমরা ছয় জন ছিলাম। মামীমা অতি আদর ক'রে আমাদের খাওয়ালেন। বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদ মাইল ছয়েক হবে। আমরা হেঁটে যাত্রা সুরু করলাম। সঙ্গে ছিল নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদ কাহিনী।" মধ্যে মধ্যে পড়া হ'তে লাগলো।

লালবাগ গিয়ে দেখা হ'ল হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হরিপদ তখন ওখানকার স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। আমাদের পেয়ে সে তো একেবারে পাগল। সে তার কাকার ওখানে থেকে পড়তো। আমাদের থাকতে জায়গা না দিতে পেরে সে খুবই লজ্জিত হ'ল। আমরা চ'লে যেতে চাইলাম। হরিপদ ঠোঙায় ক'রে অনেক খাবার এনে আমাদের খাওয়ালো। যাওয়ার মুখে ভীষণ বৃষ্টি এল। মোক্তার লাইব্রেরীর ঘরের চাবি এনে হরিপদ আমাদের মাথা-গোঁজার জায়গা ক'রে দিল। এই হরিপদ তার পর বহু দিন আমাদের সঙ্গে একত্রে কাজ

করেছে, পরে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হয়েছে, বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার এবং বিষয়-সম্পত্তিও করেছে।

মুর্শিদাবাদ সহরে গিয়ে আমরা উঠলাম ডাঃ রবিরুদ্দিন আমেদের বাসায়। সুরেশদা ও যুগলদা'র এঁর সঙ্গে মেডিকেল কলেজ থেকেই পূর্ব হ'তে আলাপ ছিল। অসময়ে উপস্থিত হই—তখন গৃহস্থের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। তবুও ডাঃ আমেদ ছাড়লেন না—আলুভাতে ভাত ঘি দিয়ে খাওয়া হল। এই ডাঃ আমেদই পরবর্তী কালে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যে নগরের প্রাসাদ, মোতি ঝিল, হাজার দুয়ারি, নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবর প্রভৃতি দেখার সুবিধা হল। বরানগরে রাণী ভবানীর মন্দির পর্য্যন্ত দেখে আমরা ফিরলাম। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস—রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মিষ্টি আম খেতে খেতে গিয়েছিলাম।

সিরাজউদ্দৌলার কবরের অনাড়ম্বর সজ্জা দেখে আমাদের প্রাণ খুবই ব্যথিত হয়েছিল। সন্ধ্যায় একটি মাত্র রেড়ির তেলের প্রদীপ দেওয়া হ'ত।

এই ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে গিয়ে আজ একটি ব্যথাময় স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। আমরা হেঁটে চলেছি—মাঠের দু'ধারে অড়র ক্ষেত। সুভাষের জীবনে পল্লীর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। অত বড় সবুজ ক্ষেত দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলো—এটা কিসের বন? আমি উত্তর করলাম—অশ্বত্থ-গাছের বন। খানিক দূর এগিয়ে আর একটা অড়র ক্ষেত দেখে সুভাষ বললো—কত বড় আর একটা অশথ বন, দেখ। সঙ্গীরা সকলে হেসে উঠলেন। সুভাষ হাসির কারণ বুঝতে না পেরে ছল ছল চোখে আমায় জিজ্ঞাসা করলো—এরা হাসলো কেন? আমি বললাম—ওগুলো অশথ গাছ নয়, অড়র গাছ। সুভাষ আমায় সুধালো—তুমি আমায় এমন অপ্রস্তুত করলে কেন? বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে ধারা বয়ে জল পড়তে লাগলো। এই নিষ্ঠুর পরিহাসের ব্যথা আজও যেন আমার বুকে কাঁটা হ'য়ে আছে। সেই থেকে আর কোনও দিন আমি তার সঙ্গে পরিহাস করিনি।

সুভাষ ঠাট্টা বুঝতো না। তার সরল কোমল প্রাণে এই আঘাত দেওয়ার কথা আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। সুভাষ কথা কইতো কম—তার মনটা যে কত নরম ছিল, তার পরিচয় আমি কতই না পেয়েছি এবং তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে আমি ভবিষ্যতে অত্যন্ত সাবধান ছিলাম। ছেলেবেলায় ক্ষিধে পেলে সে মুখ ফুটে কখনো বলতো না—হাতের বুড়ো আঙুলটি মুখে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুষতে থাকতো। তার এক বুড়ী ঝি ছিল, সে বুঝতে পেরে তখনি দুধ-খাবার এনে খাওয়াতো।

মুর্শিদাবাদ থেকে আমরা একখানি নৌকো ভাড়া ক'রে ফিরলাম বহরমপুরে। বর্ষার গঙ্গা, জ্যোৎস্না রাত, দাঁড়িরা তালে তালে দাঁড়ের শব্দ ও তার প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। আমরা নৌকোর ছাদে বসে। সুভাষকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললাম একখানি গান করতে, সে আমার কথায় রাজি হলো—গাইলো:

"দূরে হের চন্দ্রকিরণে উদ্‌ভাসিত গঙ্গা

* * *

ধায় মত্ত হরষে, সাগর-পদ পরশে

কূলে কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময়ী বরষা

শ্যাম ধরণী সরসা—"

[ক্রমশঃ।

পাখীদের মন

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়ত পেতেও পারি পাখীদের মন।
শুধু আর শস্য নয়, নীড় নয়, নয় শুধু ভার ;
আর এক বিদ্রোহী ধিক্কার—
পৃথিবী পরাস্ত করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ।
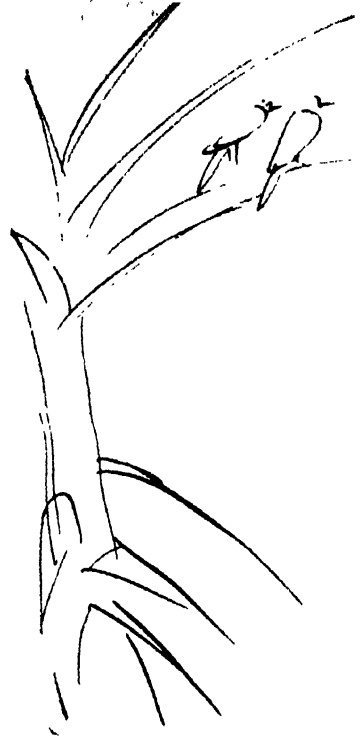
প্রেমেন্দ্র মিত্র

পৃথিবীর মাঠে ঘাটে, আজো তারা মাটি খুঁটে খায়,
মেনে নেয় সব কিছু দায় ;
তবু এক সুনীল শপথ,
তাদের বুকের রক্ত তপ্ত করে রাখে।
জীবনের হাটে হাটে, যত গ্লানি, যত কোলাহল,
ব্যাধের গুলির মত বুকে বিঁধে রয়,
সে উত্তাপে গলে হয় ক্ষয়।
শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্য্য-সাধা ডানা,
আকাশের কোনোখানে মানে না সীমানা।

কোনোদিন এ হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,
হয়ত পেতেও পারি পাখাদের মন,
—আর এক সূর্য্য-সচেতন।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
আকাশের আহ্বানের থেকে—
চাঁদের আদুর থেকে কখনো ছু'হাতে চোখ ঢেকে
সামান্যের বনচ্ছায়ে নিজেরে লুকাই।
মনে হয়, এই জীবনের খেলাঘরে
ধুলো-বালি-কাঁকরের মলিন অক্ষরে
সহজে বোঝার মতো, সহজে মোছার মতো
হিজিবিজি লিখে
ঢেকে রাখি চেতনার অতল খনি-কে।
মনে হয়, অন্ধকারে ঘুরি
মনের সূর্যের সাথে,
প্রাণের তারার সাথে
খেলি লুকোচুরি।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
সীমাহীন কল্পনার থেকে
আকাশে উড়ন্ত যতো চিন্তাকে
সুদূরে ফেলে রেখে
জীবনের ক্ষীণ সুতো ছু'হাতে গুটাই।
সহজ কথার আর সহজ কাজের জাল বুনে'
কখনো নিশ্চিন্ত সুখে
স্মৃতির জমানো কড়ি গুণে'—

ইচ্ছা হয়,
আয়ুর এ ছোটোঘরে সংসার সাজাতে
মনে হয় ভেসে যাই
অর্বুদ ঢেউয়ের সাথে সাথে।

অজিত দত্ত

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
অনন্তের বন্ধনের থেকে—
তৃপ্তিহীন ত্বরাশার অগ্নিবর্ণে গিরিভস্ম মেখে'
নিজের সত্তার সব ঐশ্বর্যের দাম ভুলে যাই।
আত্মাকে আড়ালে রেখে.
কর্মের নিশ্ছিদ্র বিস্মৃতিতে
কর্তব্যের জনারণ্যে লতাগুল্মে চাই মিশে দিতে
আমার আমিরে।
সুখে-ঘেরা অবসর খুঁজে ফিরি,
সুপ্তির তিমিরে।
সন্তোষের কপট নিদ্রায়
প্রাণের সখারে করি অপমান বৃথা ছলনায়।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই—
হে অসীম, বিচিত্র, শূন্যতা!
প্রাণের সারথি! দূর দিনান্তের অদৃষ্ট আঁধারে
অবিরাম যাত্রা শেষে—
কতদূরে—
ছুটি মোর কোথা?

কবি কথা

অমিয় চক্রবর্তী

আলোর মিলন বারেবার
এই খেলা, প্রিয়ে, দুজনার।
আবেগ সমুদ্র দুঃখ রাতে
পার হব আপনার সাথে
তরঙ্গে যুঝিয়া দুর্নিবার।
জয়ের কুঁড়িটি হাতে নিয়ে
হাসিমুখে ভোরে গিয়ে
পুনরায়
দাঁড়াব তোমার দরজায়॥

তুমি জেনো সহজে আমারে,
কী কাজ ভিতরে দেখিবারে।
তুমি নিয়ো যদি ভালো লাগে
যে-গান হঠাৎ কণ্ঠে জাগে
বেদনার দীপ্তির ঝলকে।
বিপুল ভাবনা খনি
নিয়ো তার শ্রেষ্ঠ মণি
লীলাভরে দুলায়ো অলকে।
ভুলে যেয়ো আর কিছু—
আমি মাথা ক'রে নীচু
ফিরে যাবো একা প্রাণলোকে
তোমার ধেয়ান নিয়ে চোখে॥

এই শোক, তোমার লাগিয়া
একা আমি রহিব জাগিয়া।
রৌদ্ররেখা দীর্ঘপথ
মোর সারা ভবিষ্যৎ—
সেই পথে করি আনাগোণা।
খুসি বা প্রেমের মধুভরে
স্বপনে আপনি রূপ ধরে
তাই দিয়ে তোমার সাধনা।
প্রতিদানে মাগি লব
চমকিত দৃষ্টি তব
সোনা হবে আমার কল্পনা।
তার পরে মৌন বুকে
অজানিত মোর সুখে দুখে
গোপনে যা কিছু রয় ধন
তাই দিয়ে, এলে সুলগন,
আঁকিব বিশ্বের এক ছবি,—
পরম ব্যথায় হব কবি॥

হেমন্ত কুয়াশায়

সকাল-সন্ধ্যাবেলা আমি সেই নারীকে দেখেছি।
জেনেছি অনেক দিন—তারপর তবুও ভেবেছি।
তারপর ঢের দিন পৃথিবীর সেই শাদা সাধারণ কথা
ছোট বড় জিনিষের বিস্মরণে ক্রমে ভুলে গেছি।
আকাশ আমাকে বলে: 'সে না তুমি আত্মসমাহিতি?'
পৃথিবী আমাকে দেখে ভেবে যায়: এর প্রাণে, আহা,
লাখেরাজ হয়ে প'ড়ে র'য়েছে সততা;
যে নারীকে নদীর কিনারে জলে ভালোবেসেছিল
সময়ের সুবাতাস মুখ ছুঁয়ে চ'লে গেলে যদি তার কথা
ভুরু কোঁচ্‌কায়ে ভেবে নিতে হয়, মানবহৃদয়
তবে সে কোন রকম।'
হেমন্তের কুয়াশায় বেড়াতে বেড়াতে কারু দাবী
অমল ঋণের মত গ্রহণ ক'রেছি আমি নিতে ভুলে গিয়ে;
তার ভালোবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সৎ হয়ে
আছি—ভাবি।

নক্ষত্র আকাশ নদী পাহাড়ের বধির গরিমা
দূরে যায়, কাছে এসে ক'রে যায় ভাব;
নিজেকে শত্রুর মত মনে ক'রে চিরদিন যদি
নষ্ট ক'রে দেওয়া যেত তাহাদের মিথ্যা প্রভাব;
নিজেকে বন্ধুর মত মনে ক'রে যদি অপলক
অনুভব করা যেত তাহাদের অবহিত মন;—
অনেক চতুরানন ম'রে গেছে এই সব ভেবে।—
জেনে হো-হো ক'রে হাসে একজন চতুর আনন।

সুবিনয়

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।
এক সাথে বেরাল ও বেরালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য্য শক্তি ছিল ভুয়োদর্শী যুবার।
ইঁদুরকে খেতে খেতে শাদা বেরালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হতে হতে সেই ভারিক্কে ইঁদুর:
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তারা দুই জনে কতখানি দূর
ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচ্‌কা
মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছু দিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা ক'রে দিতে যেত,—মাটির
দরের মত রেটে
তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেত ব'লে বেরালের পেটে
ইঁদুর 'হুরুরে' ব'লে হেসে খুন হত সেই খিল কেটে কেটে

নুপম ত্রিবেদী

খন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
দিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড় গোল পেটের ভিতরে
শরীরে ;—টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা
ক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয়
মানুষের কথা
দয়ে জাগায়ে যায় ;—টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়
দিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ নিজ চিন্তার বিষয়
নিঃশেষ ক'রে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে
খন ঘুমায়ে আছে,—তাহাদের ঘুম ভেঙে দিতে
জের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে—ঐ পারে মৃত্যুর তালা
বেদী কি খোলে নাই?—তান্ত্রিক উপাসনা মিষ্টিক
ইহুদী কাবালা
শার শবোত্থান—বোধিক্রমের জন্ম মরণের থেকে
সুরু ক'রে
গেল ও মার্ক্স : তার ডান আর বাম কান ধ'রে
ই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিল ;—এমন সময়
পকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়
জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল
মাটি মানুষের প্রেম ;
প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হ'ল একটি টোটেম্ :
উটের ছবির মত—একজন নারীর হৃদয়ে ;
মুখে চোখে আকুতিতে মরীচিকা জয়ে
চ'লেছে সে ;—জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মত শাড়ী ;
ভালো ক'রে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
দিব্য মহিলা এক ;—কোথায় যে আঁচলের খুঁট ;
কেবলি উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট
ঘুরে যায় ষ্টালিন, নেহেরু, ব্লক, অথবা রায়ের
বোঝা ব'য়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?
তাহ'লে তা' প্রেম নয় ;—ভেবে গেল ত্রিবেদীর
হৃদয়ের জ্ঞান :
জড় ও অজড় ডায়ালেক্‌টিক্ মিলে আমাদের
দুদিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে
দিয়েছিল টান।
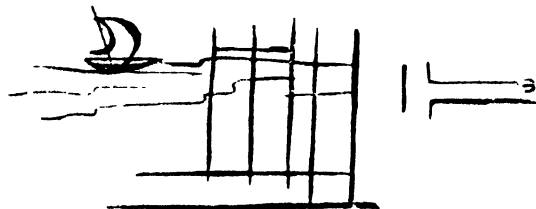
১

জানি হে জানি একদা এই পুরোনো মন টলবে
আজ না হয় দু'দিন পরে ; বিপথে তবু চলবে ?
আকাশ-ছোঁওয়া দম্ভে আর পুরোনো আভিজাত্যে
দলছো অভিশপ্ত কোটি মন্ত্রহীন ব্রাত্যে !
হে জনবুল, একদা এই মনের ভুল ভাঙবে
তীব্র নীল-রক্ত লাল বর্ণাভায় রাঙবে,
মিথ্যা তেজ হে ইংরেজ, সর্ব্বনাশ আনছো
শান্তি-বনস্পতির মূলে কুড়ুল তাই হানছো।
হিংস্র নয় প্রাচ্যদেশ হানছো তাই অস্ত্র
স্বাধীনতার নাম শুনেই হ'চ্ছো সন্ত্রস্ত !

দেখলে না হে, দু'চোখ খুলে স্বার্থ ভুলে দেখলে না
লক্ষকোটি নিঃসহায় শাসন ভয়ে কাঁপছে
কাঙাল প্রেম পথের ধূলায় কাঁদছে,
শৃঙ্খলিত শোষণ-ফাঁস আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধছে।
জানি এ বাঁধা টিকবে না,
আইন করা নির্য্যাতনের মিথ্যা এ ফাঁস টিকবে না !

ছাড়ো হে ছাড়ো পুরোনো জেদ পরের ধনে
পোদ্দারি
রঙটা কটা পেয়েছ ব'লে কিসের এত গর্ব্ব ?
লোভটা বরং করো না কিছু খর্ব্ব ?
এ কোন্ ধারা বদ্‌মেজাজ, একগুঁয়েমির বায়না ?
যাদের দেশ তারা তো তোমার মোড়লী
কেউ চায় না ?
স্বদেশ ছেড়ে চায় না তা'রা বিদেশবাসীর রাজ্য
দেশের পরে দাবী তাদের জন্মগত ন্যায্য।

এ দেশ এবার ছাড়তে হ'বে এ কথা নয় মিথ্যে
জেগেছে রোষ অসন্তোষ প্রতিটি গণচিত্তে ;
ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না প্রতিজ্ঞাতে শেষটা
ধ্বংস ক'রে ফেলতে কি চাও এমন সোনার
দেশটা !
জেলে পাঠালে ফাঁসিতে দিলে বাধলো না খুন করতে
তবুও লোকে ভয় পেলো না মরতে।
তুমি তো নও রক্তপায়ী পশুর মত ঘৃণ্য
প্রাণি-জগতে তুমি তো নও মানুষ থেকে ভিন্ন ?
তোমার আছে প্রবল-প্রাণ দল ভাঙানোর শক্তি
তাই তো যত দেশদ্রোহী ভয়েতে করে ভক্তি।

দেশকে যারা ভালবেসেছে প্রাণ দিয়ে—
বলো তো আজ স্পষ্ট ক'রে, তারা কি সব পাপী ?
আজকে যারা শান্তি চায়, বাঁচতে চায় সুখে
কেমন করে লাথি চালাও তাদেরি ভাঙা বুকে ?
আজকে যদি বুদ্ধ, খৃষ্ট, গান্ধি, শ্রীচৈতন্য,
এশিয়া ছেড়ে 'গ্রেট-ব্রিটেনে' নিতেন গিয়ে জন্ম—
তোমারও তবে দশাটা কি যে হোতো ?
হিংসা ভুলে বৈদেশিকের থাকতে পদানত !
শান্তিবাদের সান্ত্বনাতে জ্বলতো বুকের ক্ষত !
তুমি কি তোমার দেশকে ভালোবাসো না ?
নাজীরা এত 'বম্ব্' ফেলেছে তুমি কি তাতে
রাগো না ?
তুমি তো সবই বোঝো
কাজের কথা সুরু হ'লেই হাজার ছুতো খোঁজো !

২

সেলাম করি, সেলাম তোমায়, ঢের হয়েছে
ক্ষান্ত হও,
পরের ভালো নাইবা হ'ল, ভূতের বোঝা
মিথ্যে বও।
অনেক ভালো করলে দেশের, অনেক রকম উন্নতি
দাও হে এবার ভালোয় ভালোয় এ দেশ-
ছাড়ার সম্মতি ;
ভক্ত যারা দিকগে তা'রা আঙুল কেটে দক্ষিণা।
আমরা তোমার মিষ্টিকথায় এবার প্রভু
ভুলছি না।
জানাই তোমার লোহায় বাঁধা চারটি ক্ষুরে দণ্ডবৎ
নিজের দেশের ঠাণ্ডা-মাঠে চালাও তোমার
দম্ভ-রথ ;

এবার চিঁড়ে ভিজবে না আর মিষ্টি কথার থুৎকারে
ত্রিংশ কোটি অগ্নিগিরি ক্ষোভের আগুন উদ্গারে ;
চলছে বটে প্রবঞ্চনা হিংসাতে আর অহিংসায়
বিপ্লবেরি জোয়ার ভাঁটা মুক্তি পথের ঐক্য চায় !
শান্তিবাদের সান্ত্বনাতে ভুলছে না তাই বৈশ্বানর
নির্য্যাতনের ভস্ম ফুঁড়ে উঠছে জ্বলে ভয়ঙ্কর !
"শেকল-বাঁধা-মুক্তি"তে দেশ স্বাধীন হ'বে ?
—মনের ভুল !
ভিক্ষা এ নয়। সম্মিলিত দেশের দাবী
হে জন বুল !!

সহকর্ম্মী

১৯২১ সাল। তখনও নন-কো-অপারেশনী কংগ্রেসের পত্তন ভাল করে হয়নি বাংলায়। মডারেট কংগ্রেসের বাংলা শাখার সম্পাদক তখন মিঃ বি কে লাহিড়ী। এস, আর, দাশ, প্রভাস মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ—এঁদের চেষ্টায় বিপ্লবী নায়কদের তখন আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বা জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সিটিজেন প্রটেকশন লীগের দূতেরা বিভিন্ন বিপ্লবিকেন্দ্রে গিয়ে বিপ্লববাদীদের সৎপরামর্শ দিতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের অনুশীলনী কেন্দ্র-গুলোয় কংগ্রেসের শাখা-প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ভারতসেবক সঙ্ঘের আফিস খুলে বসেছে। কংগ্রেসের আয়ুধ চরকা, তাঁত, খাদি। ওদের আয়ুধ ভাস লাইব্রেরী, হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স। বিপ্লবীরা খাদি পরে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে কংগ্রেসী সাজছে, ভারতসেবক সঙ্ঘে গিয়ে আবার ছত্রভঙ্গ দলের রাইগুলো কুড়িয়ে বেল করতে চেষ্টা করছে। ওদের প্রকাশ্য মুখপত্র 'শঙ্খ' চরকাবাদের তীব্র নিন্দা করছে। ওদের অপ্রকাশ্য বুলেটিন 'হক-কথা' শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে ছাপা হয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যাপক ভাবে বিলি করা হচ্ছে।

সুভাষ মগ্ন তাঁর সর্ব্ববিদ্যায়তন নিয়ে। দেশবন্ধু যে সব বিপ্লবী নেতাকে সাময়িক ভাবে সংযত রেখে, তাঁদের বৈদ্যুতিক বৈষ্টনীর মধ্যে বসে নব নব সংগঠন ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করছিলেন, সুভাষের সঙ্গে তাঁদের খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। সুভাষ তখন থেকেই গান্ধীবাদে অনাস্থাবান, সুতো তিনি কাটেননি কখনও।

এমন সময় এক জেলায় এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে। এক সেন্ট্রাল জেল ভেঙ্গে সুশৃঙ্খল ভাবে প্রায় ৭।৮শ কয়েদী বেরিয়ে আসে, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে। তাদের প্রায় ৩ মাইল মার্চের মধ্যে সরকারী পুলিশ ফৌজ বাধা দিতে সাহস পায়নি। সশস্ত্র কয়েদীরা—স্থানীয় কলেজের কাছে এসে গলার তক্তি ভাঙ্গে, জেলের উর্দ্দী, জাঙ্গিয়া মাঠে-পথে ছড়িয়ে যখন ফেলে ছাত্ররা আপন আপন বস্ত্র তাদের দেয়। সহরে কোন জুলুম না করে, সহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে তারা গ্রাম-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ সংবাদে প্রতি জেলার বিপ্লবীরা উল্লসিত হয়। সুভাষ ও তাঁর বন্ধু হেমন্তকুমার এবারে একটু চঞ্চল হয়েছিলেন।

জেল-দুর্ঘটনার পর ভয়ঙ্কর ব্যাপার। দেখা গেল, এর কয় দিন পর জেল থেকে গাড়ী বোঝাই করে করে গলিত শব সহরের বাহিরে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা তা ধরে ফেললেন। কংগ্রেসের সম্পাদক তদন্ত করতে এলেন। রিপোর্ট প্রকাশ করা হল, কাউন্সিলে প্রশ্ন উঠল, তার পর সব হল ধামা চাপা। শুনেছি এ ব্যাপারে এই সেন্ট্রাল জেলে বন্দী যে সব রাজনৈতিক বন্দীকে দায়ী করা হয়েছিল, তার মধ্যে হরদয়াল সিং অন্ততম। জানি না আজও তিনি মুক্তি পেয়েছেন কি না।

এ সময় দেশ আইন অমান্যের জন্য তৈরী কি না তার একটা কংগ্রেসী তদন্ত চলছিল। মনে আছে উপরের এই ঘটনা সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ পুলিশের মনোভাব অবগত হয়ে বাংলা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল,—এ প্রদেশ সৈন্যদলে বিদ্রোহ বাধাবার জন্য তৈরী।

সত্যি কথা বলতে গেলে, দেশবন্ধু যদি রাশ টেনে না ধরতেন, তা হলে ১৯২১এ না হোক ২২এ একটা অঘটন বাংলার বিপ্লবীরা ঘটিয়ে ফেলত। এ সময় সুভাষের সংগঠন-শক্তির কথাই বাংলা জেনেছে।

মনে হচ্ছে সেটা ২২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। নওগাঁর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যারুকী মধ্যরাত্রিতে স্বয়ং এক কংগ্রেসকর্ম্মীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে অনুরোধ করছেন—দেশ বাঁচাও। বন্যা। সাহায্যের জন্য কলকাতায় তার কর। সে উঠল। নেমে পড়ল জলে। নদীর সাঁকো দেখা যায় না। সান্তাহারের পথে সাঁতার জল। সাঁতারই সে কাটল প্রায় ২ মাইল পথ। ষ্টেশনে আর্ত্তনাদ, কলরব আর চার দিকে বন্যার জলের কলকল ধ্বনি। ষ্টেশন-মাষ্টার বললেন—লাইন নষ্ট, তার হবে না। দুর্দ্দান্ত যুবক ভয় দেখিয়ে, অনুরোধ করে রাজসাহী পৌঁছল, তখন রাত শেষ হয়ে গেছে। তার পরনে তখন এক ভেসে-যাওয়া গামছা বা কানি। তার করা হ'ল সুভাষচন্দ্রকে আর প্রফুল্লচন্দ্রকে।

—সর্ব্বনাশ! বাঁচাও। সহস্র নর-নারী তোমাদের চাইছে।

দেখি, সুভাষ এসেছে। সান্তাহারে। সঙ্গে কাপড়ের গাঁট, খাবার। এসেই সাহায্যের আয়োজন। স্থাপিত হ'ল বেঙ্গল রিলিফ কমিটী। তার পর কি করল যে কমিটী, তা ত সবারই জানা।

সুভাষ মেতে রইল কাজে। ধনীর দুলাল, তখনও শ্রম-সহিষ্ণু নয়। দরিদ্র দেশ, নিরুপায় দেশ, আর তার সহিষ্ণু সরল উৎপাদক নর-নারীর সঙ্গে সেদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সাবুর বাটি দিনের পর দিন সুভাষ ওদের মুখে তুলে দিয়েছে, তবু প্রত্যক্ষ করেছে ওদের কষ্ট ঘোচে না। সেদিন সেই বন্যাত্রাণ শিবিরে সুভাষ কর্ম্মীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে ভাব-বিনিময় করলেন; শ্রমসহিষ্ণু বাংলার প্রথম শ্রেণীর কিশোর ও যুবকদের অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি দেখে তাঁর যে আশা হয়েছিল, তা নিবে গেল যখন সুতোকাটার আর খদ্দরের কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য লক্ষপতি শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালের অদ্ভুত ব্যবসায়-সংগঠন-শক্তি নিয়ে আত্রাই বন্দরে খাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, রিলিফ কমিটীর উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে।

এর কয়েক মাস পর দেশবন্ধু জেল থেকে মুক্ত হয়ে সুভাষকে তাঁর নূতন কর্ম্ম-পরিকল্পনায় যোগ দিতে ডাকলেন। আত্রাই থেকে তিনি কলকাতায় গিয়ে মগ্ন হলেন দেশবন্ধুর কাজে।

গান্ধীপন্থীরা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে, নাগপুরে বাংলার বিপ্লবীরা সংযত রইলেও তারা চুপ করে রইবে না। তারা ঘোঁট পাকাতে লাগল। কংগ্রেস থেকে ওরা দেশবন্ধুর কাউন্সিল-প্রবেশপন্থীদের তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

এ সময় গয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে দেশবন্ধু বললেন—"মনে কর কাল যুদ্ধ বাধল। আমার মতে সে ক্ষেত্রে হিন্দু-

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(Walt Whitmanএর "O Captain ! My Captain !"
নামক সুবিখ্যাত কবিতা অবলম্বনে লিখিত)

ওগো নেতা ! মোর নেতা ! সাঙ্গ হ'ল
আমাদের ভয়াবহ অভিযান !
মোদের অর্ণবপোত ধ্বংসের বিরুদ্ধে জয়ী—
আনে কাম্য পুরস্কার ।
বন্দর নিকট ! শুনি শঙ্খধ্বনি !
প্রমুক্ত জনতা প্রমত্ত উল্লাসে,
যত চক্ষু নির্নিমেষ, চেয়ে দেখে দুঃসাহসী
দুর্দ্দম পোতের দিকে ;
কিন্তু রে হৃদয় ! হৃদয় ! হৃদয় !
হায়, বিন্দু বিন্দু রাঙা রক্তঝারা !
পোতপৃষ্ঠে হেরি পাতিত নেতাজী,
মৃত ও শীতল ।

ওগো নেতা ! মোর নেতা ! জাগো, জাগো !
শোনো উঠে ওই শুভ শঙ্খধ্বনি
জাগো, জাগো ! তব তরে পতাকা চঞ্চল,
তব তরে জয়ডঙ্কা বাজে

তব তরে আসে পুষ্পাঞ্জলি, তব তরে
তীরে তীরে বিক্ষুব্ধ জনতা,
তব তরে তাদের আহ্বান, খোঁজে তারা
তোমাকেই উদগ্র আগ্রহে

এই নাও নেতা ! প্রাণাধিক পিতা !
বাহুখানি মোর কর শিরোধান !
দেখেছি দুঃস্বপ্নে পোতপৃষ্ঠে তুমি
মৃত ও শীতল ।

মোর নেতা নিরুত্তর । ওষ্ঠাধরে স্ফুট তাঁর
বিবর্ণতা, নিঃশব্দতা
নাই যে পিতার স্পর্শ-অনুভূতি, নাই ইচ্ছাশক্তি,
ধমনী-স্পন্দন

জাহাজ নঙ্গরবদ্ধ—অক্ষত, নির্ব্বিঘ্ন,
যাত্রা তার আজি অবসিত
ভয়াবহ অভিযানে যুদ্ধজয়ী পোত
আনিয়াছে কাম্য পুরস্কার

কর শঙ্খধ্বনি ওগো তটভূমি ।
আমি কিন্তু এসে শোকার্ত্ত চরণে
পোতপৃষ্ঠে দেখি শায়িত নেতাজী,
মৃত ও শীতল ।

মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর সে সুযোগে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ক্ষান্ত হয়ে আইন অমান্য আরম্ভ করা উচিত। তুর্কীর যুদ্ধ (সে সময় তুর্কীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছিল) এশিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধ।···কংগ্রেস এ প্রস্তাবের আলোচনা পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করেছেন, কাজেই আমি আর এ অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসে থাকিতে পারি না।"

২৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী দেশবন্ধু বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি-পদও ত্যাগ করলেন। সুভাষকে শিক্ষা-বোর্ডে নেওয়া হলেও তিনি তাতে কাজ করতে অসম্মত হলেন।

যশোহর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (এপ্রিল, ১৯২৩) অধিবেশনে দেশবন্ধুপন্থী মেদিনীপুরের বিপ্লবী নেতা বীরেন শাসমল যখন প্রস্তাব করলেন—"ভারতবাসীর স্বত্ব ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের উপায়স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত এবং কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্ত্তৃক গৃহীত অহিংস অসহযোগ নীতির প্রতি এ সম্মিলন অবিচলিত আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে"—তখন 'স্বত্ব ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা' আর 'স্বাধীনতা লাভের উপায়' কথায় দেশবন্ধুর বিরোধীরা প্রবল আপত্তি করল। বরিশালের শরৎ ঘোষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কচকচি উঠালেন। স্বত্ব ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্থানে "স্বরাজ" চাইলেন, বললেন—বৃন্দাবনকে যদি কাগাদার পর্য্যন্ত টেনে আনা যায় আপত্তি কি ?

সম্মিলনের সভাপতি পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সেদিন যশোরে "নাচিয়াছিলেন"। সুতাকাটা দলের সুরেশ মজুমদার, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, হরদয়াল নাগ, যতীন্দ্রমোহন রায়, মাখন সেন পণ্ডিতজীকে বেষ্টন করিয়া কংগ্রেসকে বিপ্লবীদের হা[illegible] রক্ষা করবার জন্ত দলবদ্ধ হলেন।

তখনকার যে সকল সংবাদপত্র দেশবন্ধুর বিরো[illegible] ছিলেন—তাহার মধ্যে প্রবলতম ছিল 'বসুমতী', '[illegible]বাজার পত্রিকা', 'সার্ভেণ্ট', আর নগণ্যতম ছিল সুরেশ মজুমদার আর মাখন সেনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'।

প্রচার-বহুল একখানি কাগজ ব্যঙ্গ করে লিখলেন—

"হায় চিত্ত ! নিজকর্ম্ম দোষে
কংগ্রেস ভাঙ্গিলা আর আপনি মজ্জিলা !
যদি সত্য আশা তব, দেশে জনগণ
ঢেরা সহি দিয়া যাবে—তব রায়ে রায়,
তবে কেন নিজে তুমি বিমুখ হে আজি
প্রবেশিতে রণাঙ্গনে ? সে বিশ্বাস
যদি না থাকে তোমার, তবে কোন্ ভরসায়
লঙ্ঘিলে মহাত্মা-বাক্য—চূণ-কালী দিলে
নিজ গালে—হাসাইতে ব্যুরোক্রাট দলে ?"

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

পরজন্ম আছে সখী, সেই ভরসায়
প্রেমোৎকণ্ঠিত প্রাণ এখনো না যায়।
এ জন্মের প্রেম-ঋণ করিলে না শোধ ;
হেরো ধীরে পড়ে আসে জীবনের রোদ,
নির্ব্বাপিত বনস্থলী ; শুধু উচ্চ শাখা
জীবন-সূর্য্যের শেষ রশ্মির সে মাখা।
পরজন্মে কি যে হবে দেখিতেছি মনে।
কুণ্ঠিতা কিশোরী হ'য়ে গোপন-প্রেক্ষণে
সাধিবে আমায় তুমি। আমি সে কিশোর
বারে বারে ছিন্ন করি মুগ্ধ সেই ডোর
পালাবো নূতন ছলে, তুমি ধাবে পিছে ;
তব পরজন্ম সত্তা আমায় সাধিছে
প্রেমপুষ্প অর্ঘ্য বহি, হঠাৎ কখন্
জল-ভরে ভারি হবে তোমার নয়ন ॥

২

অথবা পূর্ব্বের জন্মে তোমারে কি সখী
করিনি ব্যথিত আমি? হঠাৎ চমকি
সেই স্মৃতি চিত্তে জাগে। সেই ঋণ-দায়
এ জন্মে আমারে সখী তোমারে সাধায়।
তুমি যে সাধিকা ছিলে, আমি মুগ্ধ নর,
চিত্ত মোর হরেছিল চতুরা অপর
না জানি কুহকে কোন্! যে-অশ্রু তোমার
নিমীলিত নেত্র হ'তে ঝরেছে অবার,
স্বয়ম্বর মালা গাঁথি সেই মুক্তাধারে
জানি সখী বারম্বার সেধেছ আমারে।
সেই ঋণ শুধিতেছি এই জন্মে প্রিয়ে,
রুদ্রাক্ষ অশ্রুর ধারে মালিকা গাঁথিয়ে
পথে পথে ভ্রমিতেছি। কটাক্ষ প্রেক্ষণে
আমার দুর্দ্দশা হেরি হাসিতেছ মনে ॥

একটা পা কাটা বলেই ধরা পড়ল, নইলে পড়ত না।

হাতের কাজ হয়েছিল নিখুঁত। পাখীর পালকের চাইতেও নরম আর আলগা ছোঁয়ায় পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছিল। ট্রামের দরজার সামনে যা ভিড় হয়েছে এবং যে ভাবে মানুষ পাগলের মতো ওঠবার চেষ্টা করছে তার ভেতরে কেউ যে ঘুণাক্ষরে টের পেতে পারে এমন আশঙ্কাও মনে জাগেনি। বিকেল সাড়ে ছটার সময় ডালহাউসি-ফেরৎ ট্রামের মতো শিকারের এমন অপূর্ব্ব জায়গা আর কী আছে!

আর মাত্র একটা স্টপ এগোতে পারলেই সে নেমে পড়তে পারত। মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে পারত যুদ্ধরত কলকাতার উন্মত্ত উদ্দাম জনারণ্যের মধ্যে। তার পরে লালাজীর মদের দোকান। তিন-চার বোতলের দাম বাকী পড়েছে, আজকেই মিটিয়ে দিয়ে প্রাণ ভরে খেয়ে নিতে পারত। আস্তে আস্তে স্তিমিত-দীপ কলকাতার ওপর দিয়ে পিঙ্গল রাত্রি আসত ঘনিয়ে; ডাস্টবিন্, ডিমের খোলা আর কাঁচা নর্দমার পেঁকো গন্ধ-ভরা গলিতে অবগুন্ঠিত একটা গ্যাস্‌পোস্টের নীচে বসন্তের দাগ-লাগা মুখের ওপর সস্তা পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে যেখানে মেহেরজান দাঁড়িয়ে আছে খরিদ্দারের আশায়—টলতে টলতে সেখানে গিয়েও পৌঁছুতে পারত। একটি রাত্রি কেটে যেত—আকাশ বাতাস পৃথিবীর আকার অবয়বহীন পিণ্ডাকার একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত্রি!

যে কল্পনাটা মনের মধ্যে নীহারিকার মতো ধরছিল পরিপূর্ণ একটা রূপ পাওয়ার আগেই আচমকা খানিকটা ঝড়ো হাওয়ায় সেটা দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

ট্রাম ছুটছিল পুরো দমে। অভ্যস্ত ডান হাতটা পাখীর পালকের মতো নরম আলগা ছোঁয়ায় পকেট থেকে স্ফীতকায় ব্যাগটা তুলে নিয়েছিল। কিন্তু লেডিজ সীটের পাশে কোণার ছোট জায়গাটিতে যে ছোকরা বাবুটি মন দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল সে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

—নিলে, নিলে—পকেটমার—

—কে, কে, কই?—প্রচণ্ড হট্টগোল। ট্রামের দড়িতে টান পড়ল, ঘচাং করে থেমে গেল গাড়িটা।

তখন আর উপায় ছিল না। বিদ্যুৎবেগে সেই অবস্থাতেই নীচে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই সঙ্গেই তার ঘাড়ের ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ল আরো পাঁচ-সাত জন। হাতে হাতে ধরা পড়ল বুলাকীরাম।

ব্যাগের মালিক ছোঁ দিয়ে ব্যাগটা তুলে নিলেন। আধ-বয়সী

প্রৌঢ় লোক, গলাবন্ধ কোটের সঙ্গে জড়ানো সিল্কের চাদর। ইয়োরোপীয়ান ফার্মের বড়বাবু।

আশঙ্কায় ভদ্রলোকের মুখ নীল হয়ে গেছে।—কী সর্বনাশ, এখুনি পাঁচশো টাকায় ঘা দিয়েছিল শালা।

—দেখুন, দেখুন—সব ঠিক আছে কি না!

ত্রস্ত-হাতে ব্যাগ খুলে নোটের তাড়াটা দেখে নিলে ভদ্রলোক।

বুলাকী কী বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু বলতে পারলো না। চার দিক্ থেকে নির্বিচারে কিল-ঘুষি আসছে বন্যার মতো। নিঃসাড় নির্জীব হয়ে প'ড়ে রইল বুলাকী। এর পরে থানায় যেতে হবে। নাক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত রাস্তার ধুলোর ওপরে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু ভদ্রলোক দয়ালু।

—ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! ব্যাগ তো পাওয়াই গেছে, এখন আর—

ঘণ্টা বাজিয়ে ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম শ্যামবাজারে চলে গেল।

বুলাকী অবশ্য বেশিক্ষণ পড়ে রইল না পথের ধারে। কাঠের পা-টায় ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। চড়ের জ্বালায় গাল দু'টো চিন-চিন করছে। মুখের ভেতরে একটা কেমন নোন্‌তা নোন্‌তা স্বাদ, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে নিশ্চয়। নাকের রক্তে বুকের জামাটায় তিন-চারটে বড় বড় ছোপ পড়েছে।

—শা—লা—

বিরস মুখে বিড়ির জন্যে পকেটে হাত দিলে বুলাকী। বিড়ি নেই। ব্যাগের সন্ধান করতে গিয়ে ভদ্রবাবুরা বিড়িগুলো সব ছড়িয়ে দিয়েছে পথের ওপর—ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট দুঃখের কারণ নয় বুলাকীর। মেহেরজানের জন্যে এক শিশি সৌখীন আতর সে কিনেছিল ওই সঙ্গে সেই শিশিটাও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে একেবারে।

বিলীয়মান ট্রামটার দিকে একবার আগুন-ঝরা চোখ মেলে তাকালো বুলাকী। আবার বললে, শা—লা—

আশপাশের ভিড়টা সম্পূর্ণ কাটেনি এখনো। চার দিক্ থেকে নানা রকমের মন্তব্য কানে আসছে।

—ভারি বদমায়েস এই ব্যাটারা মশায়। সেদিন পকেট থেকে আমার শেফার্স কলমটা দিব্যি তুলে নিয়ে গেল।—পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল হারামজাদাকে।

হারামজাদা! বুলাকীর রক্ত গর্জে উঠল ফণা-তোলা সাপের মতো। সঙ্গে যদি একখানা ছোরা থাকত আর অবকাশটা যদি অনুকূল হত তাহলে এর জবাব দিতে পারত বুলাকী! কিন্তু সে সময় নয়, সে সুযোগও নেই। মেছোবাজারের সংকীর্ণ গলির পথে এখানে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসেনি। এখানে কলকাতার বড় রাস্তার ওপরে এখনো দিনের ঝকঝকে আলো ঝলকাচ্ছে; এখানে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে ট্রাম, ছুটে চলেছে বাস, রিক্সা, ট্যাক্সী আর মিলিটারী কন্‌ভয়ের সারি।

পকেটের ফুল-কাটা সৌখীন রুমালে নাক-মুখ মুছে নিলে বুলাকী। আড়ষ্ট পায়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল। মাথাটা ঘুরছে, কিল-চড়গুলো কিছুমাত্র দয়া করেনি। কোথাও একটু বসা দরকার। একটু চা খেতে পেলেও ভালো হত।

বেলা ডুবে আসছে। কলকাতার বুকে সন্ধ্যা। ঠোঙাপরা আলোগুলো জ্বলে উঠছে একটার পর একটা। হেদুয়ার গাছগুলোতে কাকেরা কোলাহল করছে। পার্কে জনতা। ওখানে বসা চলবে না। একটু নিরিবিলি দরকার—একটু নির্জনতা।

হারামজাদা! কানের ভেতরে তখনো কথাটা যেন সুচের মতো বিঁধছে। বুলাকীর রক্ত ফেনিয়ে উঠতে লাগল। মেছোবাজারের দুর্গন্ধ গলিতে যদি ঘনিয়ে আসত ধোঁয়াটে অন্ধকার; যদি বুলাকীর কাছে একখানা ছোরা থাকত; যদি ওই ভদ্রবাবুদের এক এক জন করে সে পেত—

শা—লা—

সাপের গর্জনের মতো চাপা আক্রোশটা আবার বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

কিন্তু আর হাঁটতে পারছে না। কাঠের পা-টা অত্যন্ত বেশি ভারী বলে মনে হচ্ছে। এ পায়েরও জোড়গুলো যেন আলগা হয়ে গেছে সব। আর এত দুঃখের মধ্যেও ভাঙা আতরের শিশিটা থেকে একটা উগ্র গন্ধ যেন তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। যেন ঠাট্টা করছে বুলাকীকে।

মেহেরজান। চিৎপুরের গলি। ল্যাম্প পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে জাফরান-রঙ একখানা শাড়ি পরে। রঙীন কাঁচুলির বাহার প্রলোভন জাগিয়ে উঁকি দিচ্ছে পাতলা শাড়ির আড়াল থেকে। আবছা আলোয় ভরা মেহেরজানের ঘর। মেজেতে নরম বিছানা পাতা—একরাশ ছোট-বড় বালিশ।

কিন্তু—না। অনেক দিন কিছু দেওয়া হয়নি বেচারীকে। ওরও বড় কষ্ট। বয়েস হয়ে গেছে—সস্তা পাউডার মেখেও মুখের দাগগুলো ঢাকা পড়ে না, খরিদ্দার দেশলাই জ্বালিয়েই অন্য দিকে এগিয়ে যায়। আক্রার বাজার, কায়ক্লেশে দিন চলে। তবু বুলাকীকে কখনো বিমুখ করে না মেহেরজান। ভালোবাসে? কে জানে, কিন্তু ভয় করে বই কি। বাঘের মতো হিংস্র বুলাকী, সাপের মতো ভয়ঙ্কর। একখানা পা নেই বটে, কিন্তু ছোরা চলে নিখুঁত এবং নির্ভুল ভাবে। তাই হয়তো বিনা প্রতিবাদেই আত্মসমর্পণ করে, সোহাগের কথা বলে, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়।

কিন্তু বুলাকীরও তো একটা ধর্মভয় আছে। সত্যি বড় কষ্ট মেহেরজানের। শাড়ী ছিঁড়ে গেছে। পেট ভরে খেতে পায় না যুদ্ধের বাজারে। কুৎসিত মুখ দিনের পর দিন আরো কদর্য্য হয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে যদি বুলাকী ওকে কিছু দিতে পারত,—অন্ততঃ একখানা শাড়ী দিয়েও—

পাখীর পালকের মতো নরম আলগা ছোঁয়ায় ব্যাগটা চমৎকার
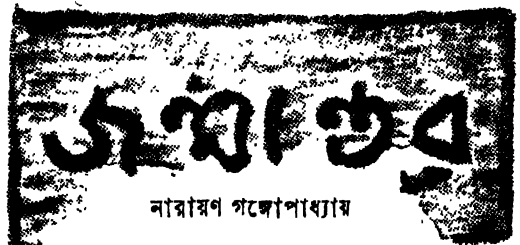
হাতের ভেতরে চলে এসেছিল। বেশ পুরু ব্যাগটা—পাঁচশো টাকা ছিল। উঃ—পাঁচশো টাকা! ভাবতেও গায়ের লোমগুলো শির শির করে উঠল। ওই টাকায় কী হতে পারত এবং কী হতে পারত না! ইস্—হাতের মধ্যে এসেও ফস্কে গেল, শুধু একটুর জন্যে!

—হারামজাদা—

কিন্তু আর চলতে পারছে না। মাথা ঘুরছে। বুলাকী আবার পার্কটার দিকে তাকালো। বড় ভিড় ওখানে, ভদ্রলোকের ভিড়। একটু নির্জনতা দরকার বুলাকীর—একটু নিরিবিলি।

—এ রিক্‌স—

ঠন ঠুন করে রিক্‌সওয়ালা এল।

—কাঁহা যাইয়েগা?

—রথতলা ঘাট, গঙ্গা।

—আঠ আনা লাগেগা।—একবার বুলাকীর সর্বাঙ্গে সংশয়ভরা দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে রিক্‌সওয়ালা।

—চলো ভাই চলো। সব ঠিক হো যায়গা।

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্। রিক্‌স চলেছে। বীডন ষ্ট্রীট—ঠোঙ্গাপরা আলো, আর অন্ধকার। হেমন্তের কুয়াসা আর উনুনের ধোঁয়া আকাশে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ। ওখান দিয়ে একটু এগিয়ে মসজিদবাড়ীতে ঢুকলেই—

সেই গলি। গ্যাস-পোষ্ট। জাফরান-রঙা শাড়ীপরা মেহেরজান। ঘরের মেজেতে নরম গদী আর তাকিয়া। হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচশো টাকা কেমন অবলীলাক্রমে চলে এসেছিল। উঃ—ভদ্রলোক—ওই ভদ্রলোকদের একবার হাতে পেলে দেখে নেবে বুলাকী। ছোরার মুখে একটা তাজা কলিজাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিতে কতক্ষণ লাগে!

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন। চিৎপুর দিয়ে রিক্‌স চলেছে। পথের দু'দিকের রোয়াকে চোখে পড়ছে আরো অনেক মেহেরজানকে। ওদের প্রায় সকলকেই চেনে বুলাকী, বুলাকীকেও ওরা চেনে। কিন্তু সবাই মেহেরজান নয়। খালি-পকেট প্রেমিককে ভালোবাসা বিলোতে রাজী নয় ওরা—ওদেরও বুলাকীরা আছে!

—উতারিয়ে—

ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের রেল-লাইন পেরিয়ে রিক্‌স চলে এসেছে রথতলা ঘাটে। সামনে অন্ধকার গঙ্গা। দূরে একটা মালগাড়ির এঞ্জিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অকারণে হুশ হুশ করছে।

—উতারো ভাই, গঙ্গাজী আ গিয়া—

—ঠারো বাপ ঠারো! থোঁড়া আদ্‌মি—

কাঠের পা-টা আগে বাড়িয়ে দিয়ে নামল বুলাকী। শরীরটা টাল খেল একবার। একটুর জন্যে পড়েনি। ভদ্রলোকেরা শরীরে আর কিছু রাখেনি, মেরে একেবারে থেঁতলা করে দিয়েছে।

কোমরের কষি থেকে সাবধানে বুলাকী খুঁজে বার করলে গেঁজেটা। আড়াই টাকার মতো সম্বল আছে এখনো। আট আনা পয়সা দিয়ে রিক্‌সওলাটাকে সে বিদায় করে দিলে।

সামনে হেমন্তের গঙ্গা। জোর হাওয়া দিচ্ছে—শীত শীত করতে লাগল। কিন্তু বুলাকীর ভালো লাগল, এই হাওয়াটা যেন তার দরকার ছিল। যেন এরই জন্যে এতক্ষণ প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা করে ছিল সে। মাথার ভেতর যে আগুনটা জ্বলছিল, গঙ্গার হাওয়া তার অনেকটাই যেন নিবে এল।

চার দিকটা প্রায় নির্জন। একে অন্ধকার, তার ওপর শীতের বাতাস। শুধু গঙ্গার ঘাটে দু একজন লোক বসে আছে ভালো করে তাদের বোঝা যাচ্ছে না, কয়েকটা ছায়া-মূর্তি বলে মনে হচ্ছে। এদিকে বিস্তীর্ণ পোস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে আছে—এ শীতের সন্ধ্যায় ওখানে বসে হাওয়া খাওয়ার সখ নেই কারো।

সিঁড়ি দিয়ে বুলাকী নীচে নেমে এল। গঙ্গায় ভরা জোয়ারের টান, জল অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে, ছল ছল করে ইটের গায়ে বাজিয়ে চলেছে মিষ্টি জল-তরঙ্গ। ওপারে হাওড়ার আলো, দু'-তিনটে বড় বড় কলের চোঙার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাঝ গাঙে দু'টো নারকোলের জাহাজ নোঙর করে আছে, অন্ধকার স্রোতের ওপরে লাল-সবুজ আলোর দীর্ঘায়িত রেশ নাচানাচি করছে।

হাত দু'টো জলে ডুবিয়ে দিতেই একটা স্নিগ্ধ ভালোবাসার স্পর্শ যেন বুলাকীর সমস্ত শরীরের ভেতরে আনন্দিত হয়ে উঠল। আঁজলা আঁজলা করে সে ঘোলা গঙ্গাজল খেল, মাথা-মুখ সমস্ত ধুয়ে নিলে। অর্দ্ধেক গ্লানি যেন তার কেটে গেছে। গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে আশ্চর্য্য একটা ঘুম-পাড়ানি।

আঃ—

কী অসম্ভব ভালো লাগছে। কোনোখানে আর এতটুকু যন্ত্রণা নেই—যেন ঘুমিয়ে পড়বে এক্ষুনি। একটা বিড়ি পেলে কাজ দিত; কাছাকাছি চেনা দোকানও আছে, কিন্তু বুলাকীর উঠতে ইচ্ছে করল না আর। সিঁড়ির পেছন দিকে পোস্তার দেওয়াল ঘেঁষে বুলাকী লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

বাতাসে আতর উড়ছে। গন্ধটা শুধু বুলাকীর নাকে নয়, মুখের ভেতরেও ঢুকছে, যেন জিভটাকেও মিষ্টি করে তুলছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়তে লাগল মেহেরজান, ডালহাউসি স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজারের ফিরতি ট্রাম, সেই পাঁচশো টাকার নোটে ভর্ত্তি মোটা ব্যাগটা, তারপর—

তারপর বুলাকী ঘুমিয়ে পড়ল। নির্জন গঙ্গার ওপর ঘন হতে লাগল রাত্রি, ওপারে হাওড়ার আলোগুলো কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অতলে মিলিয়ে যেতে লাগল একে একে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল।

নেশায় বেহুঁস হয়ে সে মেহেরজানের দোর-গোড়ায় এসে পড়েছে। মেহেরজান করেছে কী, কোথা থেকে এক বালতি ঠাণ্ডা জল এনে ওর মাথায় ঢেলে দিয়েছে আর তার সঙ্গে জোর পাখার হাওয়া। শীতে নেশা ছুটে গেছে, ধড়ফড় করে উঠে বসেছে সে। সত্যিই ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। অন্ধকার পোস্তা, অন্ধকার গঙ্গা। রাত কত হয়েছে কে জানে। আকাশে অল্প অল্প মেঘ করেছে, তারা ডুবে গেছে আর গঙ্গা থেকে উঠে আসছে জোর জলো হাওয়া। নেশা করেনি বুলাকী, মেহেরজানও নয়, শুধু মারের জ্বালায় একটা অবসন্ন নিরুপায় শরীর নিয়ে সে রথতলা ঘাটের পোস্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

উঠতে যাবে এমন সময় চমক ভেঙে গেল।

চার দিকে ঘন অন্ধকার—তবু বুলাকীর অভ্যস্ত চোখ দেখতে পেল শাদা মত কে একজন সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে গঙ্গার দিকে নেমে

যাচ্ছে। সিঁড়ির পাশে ছায়ার মধ্যে বুলাকী তলিয়ে আছে, সুতরাং তাকে সে দেখতে পায়নি। রোমাঞ্চিত হয়ে বুলাকী শুনতে পেল সেই মেয়েটা কাঁদছে। চাপা গলায় আকুল হয়ে কাঁদছে। একটি মেয়ে। দ্বিধামন্থর শঙ্কিত পায়ে সে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে—এগিয়ে চলেছে গঙ্গার দিকে।

সর্বনাশ!

একটা সম্ভাবনার কথা মনের ভেতর উঁকি দিয়েই বুলাকীর স্নায়ুগুলো দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। মেয়েটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে না তো? এই নিশিরাত্রে নিরিবিলি গঙ্গার ঘাটে অমন ভাবে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কেন? এর অর্থ কী হতে পারে?

খট্ করে কাঠের পা-টা টেনে বুলাকী উঠে পড়ল। বললে, কে?

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে?

তবু জবাব নেই। যেন একটা পাথরের মূর্তি। বুলাকীর মনে হল মেয়েটা থর থর করে কাঁপছে।

বুলাকী এগিয়ে এসে গঙ্গা আড়াল করে মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে তুমি? কী করছ এখানে?

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত একটা কান্নার জোয়ার। প্রবল ফোঁপানির সঙ্গে আকুল মিনতি শোনা গেল: ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে। দোহাই তোমার, আমাকে পুলিশে দিয়ো না।

বুলাকী সস্নেহে হাসল। আকস্মিক একটা করুণায় মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু খুন নয়, শুধু গুণ্ডামি নয়, শুধু মাতলামি নয়। আজ রাত্রে আশ্চর্য ভাবে একটা কিছু ভালো করবার সুযোগ পেয়েছে বুলাকী। একটা কিছু মহত্তর—একটা এমন কিছু যা সে জীবনে কখনো করেনি, যা করবার অবকাশ তার কোনো দিন ঘটেনি। বিচিত্র উত্তেজনায় রক্তে দোলা লেগে গেল বুলাকীর—এই মুহূর্তে যেন সে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে।

—না, না, কোনো ভয় নেই মা। আমি পুলিশ নই।

পকেটে বিড়ি নেই, দেশালাইটা আছে। খস্ করে সেইটেই জ্বালালো বুলাকী। ভীতি-বিহ্বল একটা পাণ্ডুর মুখ চকিতে দেশালাইয়ের আলোয় আভাসিত হয়ে উঠল। কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ভদ্রলোকের মেয়ে। গায়ে গয়নার দীপ্তি শাদা কাপড়ে জড়ানো একটা পুঁটলি বুকের ভেতরে আঁকড়ে ধরে আছে। গলায় সোনার হার, ভারী লকেটটা থেকে পলকের জন্যে বুলাকীর চোখে একটা ঝিলিক জাগিয়ে কাঠিটা নিবে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই বুলাকীর মন বলে উঠল: মেহেরজান-অনেক টাকা দরকার, নির্জন গঙ্গার ঘাটে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ের এক-গা গয়না—দুখানা লোহার মতো হাতের মুঠি বাড়িয়ে দিলেই—

কিন্তু না—না। আজ একটা দুর্লভ মুহূর্ত পেয়েছে বুলাকী। দুর্লভ মুহূর্ত—বুলাকীর জীবনে ভালো হওয়ার, ভালো করবার। আজ সে লোভ নিয়ে আসেনি, স্বার্থ নিয়েও আসেনি। এই মেয়েটিকে সে বাঁচাবে—রক্ষা করবে একটা অমূল্য জীবন।

বুলাকী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সঙ্গে ওটা কিসের পুঁটলি মা? গলার স্বরে মেয়েটি বোধ হয় ভরসা পেয়েছে। দেশালাইয়ের আলোর আরো দেখতে পেয়েছে যে বুলাকী পুলিশ নয়। সভয় শঙ্কিত স্বরে জবাব দিলে, আমার—আমার ছেলে।

—একেবারে কচি ছেলে। ওকে নিয়ে ডুবে মরতে যাচ্ছিলে? অন্ধকারের ভেতরে মেয়েটি যেন শিউরে উঠল, জবাব দিলে না।

বুলাকী বললে, ছিঃ মা, ডুবে মরবে কেন? এর চেয়ে কী আর পাপ আছে? গঙ্গাজীতে ডুবলেও নিস্তার নেই, জিন-পেত্নী হয়ে থাকতে হবে। রামচন্দ্রজী যে জান দিয়েছেন সে কি নষ্ট করবার জন্যে!

কথাটা বলে নিজের মধ্যেই কৌতুক বোধ করলে বুলাকী। সে ধর্মকথা বলছে, উপদেশ শোনাচ্ছে! সে—বুলাকীরাম, জীবনে এমন বদ্মায়েসি নেই যা সে করেনি। আজ—গঙ্গার ধারে পরম বিস্ময়কর এই মুহূর্তটিতে তার জন্মান্তর হয়ে গেল না কি! দলের লোকেরা এ কথা শুনলে তাকে বলবে কি!

বুলাকী বললে, শোনো মা, আমিও তোমার ছেলে। আমার কাছে লজ্জা কোরো না। কী দুঃখ তোমার? তোমার স্বামী মাতাল, তোমাকে খুব কষ্ট দেয়, তাই না?

বিহ্বল গলায় মেয়েটি জবাব দিলে, হুঁ।

বুলাকী হেসে উঠল, হেসে উঠল পরম পরিতৃপ্ত ভাবে। আজ তার জন্মান্তর। শুধু অবিচ্ছিন্ন ভাবে অন্যায়ই নয়, সে ভালো করতে পারে। শুধু দুঃখ দিতে পারে তাই নয়, দুঃখ মোচনও করতে পারে।

—এই দুঃখে তুমি মরে যেতে চাও? ছিঃ ছিঃ! আমার নাম জেনে রাখো মা, আমি বুলাকীরাম, আমি মুর্গীহাটার নামদার গুণ্ডা। এক কথায় আমি মানুষ খুন করতে পারি!

অন্ধকারের ভেতরে মেয়েটির অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল।

মিষ্টি করে হাসতে গিয়েও বুলাকী তীব্র কর্কশ গলায় হেসে ফেলল। না, না, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে মা বলেছি। তোমার স্বামীর নাম আমাকে বলো, এমন ভাবে শাসিয়ে দেব যে কখনো তোমার গায়ে হাত তুলতে ভরসা পাবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

শীতের হাওয়ায় মেয়েটি কাঁপছে, থর থর করে কাঁপছে। গঙ্গার জলে ঢেউয়ের কলধ্বনি। পোস্তার ওপরে একটা বিচ্ছিন্ন অন্ধকার গাছের ডালে-পাতায় বাতাস শোঁ শোঁ করছে। ভীত অস্পষ্ট আওয়াজ এল: থাক।

—ওঃ, ভয় করছে? আমি গুণ্ডা—হাতের ঠিক নেই, তোমার স্বামীকে হয়তো মেরে বসতে পারি—তাই না—বুলাকী এক সারি শাদা দাঁত বার করে বললে, স্বামীর জন্যে এত দরদ, আর তার জন্যেই ডুবে মরতে যাচ্ছিলে মা? মেয়েমানুষ এমনি তাজ্জব জানোয়ারই বটে।—নিজের রসিকতায় ঝামা ঘষার মতো শব্দ করে সে হাসতে লাগল।

মেয়েটি জবাব দিলে না।

—আচ্ছা যাক, মায়ের যখন অত ভয়, তখন বাবাকে আমি এ যাত্রা কিছু আর বলবো না। কিন্তু আমার ঠিকানাটা জেনে রাখো মা। যখনি বিপদে পড়বে, খবর দিয়ো। যদি জেলে না থাকি, যা পারি আমি করব।—বুলাকী ঠিকানাটা বললে: মনে থাকবে তো? মনে থাকবে তো মা?

আশ্চর্য দরদ আর আন্তরিকতা বুলাকীর গলায়। নিজের সে

যাকে কোন্ ছেলেবেলায় হারিয়েছিল, স্মৃতির ভেতরে বহুবার হাতড়েও যার মুখখানা বুলাকী কখনো মনেও করতে পারেনি,—নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন অন্ধকার গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আজ তাকেই সে ফিরে পেল না কি! সামনে ভরা ভাঁটার বিশাল জলস্রোত কলকল করে ছুটে চলেছে. দু'পাড়ে নিঃসাড় ঘুমের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে আছে মহানগরী, আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে লঘু মেঘ বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের ভেতরে নিজের শরীরটাকে যেমন সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, তেম্নি নিজের মনটাকেও কি সে হারিয়ে ফেলল? সে—বুলাকীরাম!

তবু অদ্ভুত ভালো লাগছে—অপূর্ব একটা আনন্দে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তবু ভালো, আজ নেশা করেনি বুলাকী, নিজের শিরাগুলোকে জ্বালিয়ে রাখেনি দেশী মদের তরল আগুন দিয়ে। তা হলে কী হত কে জানে। দেশলাইয়ের আলোয় ওই সোনার লকেটটার ঝলক আভাসে তাকে সেই কথাই বলে দিয়েছে। নিঃশব্দে একটা নির্বিঘ্ন খুন করে হাওয়া হয়ে যেতে তার কতক্ষণ লাগত। সামনে গঙ্গার খরধারা ছিল. ভোর হওয়ার আগে হয়তো মড়াটা গিয়ে ডায়মণ্ড হারবারেই ভেসে উঠত।

না—না, নিজেকে বিশ্বাস নেই। আর দেশলাই জ্বালবে না। প্রশ্রয় দেবে না নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা শয়তানটাকে। এই রাত্রিটা বুলাকীর জীবনে ব্যতিক্রম। এমন মুহূর্ত কাল আর আসবে না, এমন রাত্রিও না। শুধু কাল কেন, কোনো দিনই হয়তো আসবে না। অনাগত রাতগুলোকে অভ্যস্ত নিয়মে পরিপূর্ণ করে রাখবে জুয়ার আড্ডা, মদের গেলাস, অনেক অনেক অকীর্তি, অনেক মারামারি আর সাপের মতো মেহেরজানের আলিঙ্গন। সেই সব সময়ে, সেই সব মত্ততার অবকাশে যখন একটুখানি নিজের মধ্যে ফিরে আসবে বুলাকী, তখন হয়তো এই রাতটাকে মনে পড়বে, মনে পড়বে তার হঠাৎ পাওয়া ভালো করে না-দেখা মাকে, মনে পড়বে ক্ষিপ্রগতিতে বয়ে যাওয়া ধ্বনি-মুখরিত এই নিশীথ গঙ্গাকে, মনে পড়বে অকারণ হাসির মতো আঁধার ডাল-পালার শন্ শন্ শোঁ শোঁ শব্দটাকে—

বুলাকী যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। নেশা করেনি, তবু এ এক নতুন নেশা। ভালো হওয়ার নেশা, একটা বিচিত্র ব্যতিক্রমের রাতকে চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করে নেবার নেশা।

স্নেহসিক্ত কোমল গলায় সে আবার বললে, মনে থাকবে মা, মনে থাকবে তো?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। দেখা গেল শীতে সে কাঁপছে, যেন আর দাঁড়াতে পারছে না।

—তা হলে ফিরে চলো। বাড়ি চলো।

মেয়েটি নড়ে না।

—চলো, ফিরে চলো।

মেয়েটি তবুও স্তব্ধ।

—ভয় করছে? বেশ, আমি তোমায় এগিয়ে দিচ্ছি। আমি বুলাকীরাম—যতক্ষণ সঙ্গে আছি, কেউ তোমার গা ছুঁতে পারবে না। তোমাকে মা বলেছি, ছেলে থাকতে তোমার ভাবনা কী।

মেয়েটি দ্বিধা করছে। কেমন বিহ্বল বোধ করছে, কেমন বিচলিত হয়ে গেছে। ফিরে যেতে তার পা উঠছে না যেন। এবার যেন বুলাকী কেমন একটা নৈরাশ্য অনুভব করলে। এতক্ষণ ধরে কথা বলছে, এমন ভাবে আশ্বাস দিচ্ছে, তবু তার মা ভালো করে সাড়া দিচ্ছে না, খুশি হয়ে উঠছে না. একটা পাথরে-গড়া প্রতিমূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে আছে।

আকস্মিক একটা তিক্ততা মনের ভেতর ঠেলে উঠেছিল, বলতে ইচ্ছে করল, তবে মরো গে যাও। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে বুলাকী। আজকের রাতটা সে নষ্ট করতে দেবে না, কিছুতেই এই অপূর্ব মুহূর্তটার সুর কাটতে দেবে না। বুলাকী আবার বললে, চলো, চলো।

—কিন্তু—একটা জড়িত স্বর।

—আর কিন্তু নেই—তোমাকে ফিরে যেতে হবে।—কেমন যেন জেদ চেপেছে বুলাকীর: চলো মা চলো। তোমার বাড়িটা আমি দেখব। তুমি নিজে কিছু না বলো, তোমার দুঃখের প্রতীকার আমিই করব।

মড়ার মতো অসাড় পায়ে নিরুপায়ের মতো চলতে সুরু করলে মেয়েটি।

অন্ধকার স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে দু'জনে এগিয়ে চলল। কেউ কোনো কথা বলছে না। মেয়েটি কী ভাবছে কে জানে। কিন্তু মেয়েটির কথা গুণ্ডা বুলাকী ভাবছে না,—তার নিজের মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে। কী আশ্চর্য একটা বিপুল অনুভূতি—যেন জন্মান্তর, বুলাকীর জন্মান্তর!

রেল-লাইনটা পেরিয়ে একটা গলির মুখে মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো।

—কী মা, চলতে পারছ না? কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা, তোমার ছেলে আমার কোলে দাও।

দূরে একটা ল্যাম্প-পোষ্টের অস্বচ্ছ আলো। তাতে দেখা গেল, মেয়েটি যেন শিউরে উঠল।

বুলাকী হাসল: ভয় নেই, ভয় নেই। গুণ্ডার হাত, কিন্তু ছেলে ধরতে পারব।

তেম্নি জড়িত গলায় মেয়েটি বললে, ঘুমুচ্ছে।

—ঘুমুক, জাগাব না—বুলাকী হাত বাড়িয়ে সযত্নে পুঁটুলিটা বুকের মধ্যে টেনে নিলে। কাপড়ের ভেতরে একটা নরম শিশু-দেহের আভাস পাওয়া গেল।

আবার মেয়েটির অস্পষ্ট স্বর: আমি আগে আগে হাঁটতে পারছি না, ভয় করছে।

—বেশ, আমি আগে আগে যাচ্ছি—

বুলাকী চলতে সুরু করলে। গলির পর অন্ধকার গলি। পরম স্নেহে বুলাকী শিশুটিকে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছে, একটু ব্যথা না লাগে, ঘুম না ভাঙে। মনের ভেতরে তেম্নি একটা অপূর্ব কৌতুক বোধ করেছে সে। নামদার গুণ্ডা বুলাকীরাম ছেলে আগলে নিয়ে চলেছে,—অত্যন্ত যত্নে, অত্যন্ত সাবধানে। দলের লোকেরা যখন শুনলে—

না, না, কেউ শুনবে না। আজ রাত্রে বুলাকী সম্পূর্ণ আলাদা লোক। আজ তার একটি ব্যতিক্রমের মুহূর্ত। এ তার নিভৃত মনের মধ্যেই লুকোনো রইল।

অন্ধকার গলির মধ্যে কতক্ষণ চলেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মুখের ওপর টর্চের ঝাঁঝালো আলো। কড়া গলায় ধমক এল: কোন্ হ্যায়?

সামনে এসে পড়েছে একটা সার্জেণ্ট আর দু'জন কনেষ্টবল।

—এই কেয়া হ্যায় তুমারা পাস ?

—মাইজী কো লেড়কা।

—মাইজী ? মাইজী কাঁহা ?

চমকে বুলাকী পেছন ফিরল। মাইজী নেই, গঙ্গার ঘাটে পরম মুহূর্তে কুড়িয়ে পাওয়া তার মায়ের চিহ্ন নেই কোথাও। টর্চের আলোয় ঝল্‌কে উঠেছে সরীসৃপের মতো অন্ধকার শূন্য গলিটা। বুলাকী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

—উতারো, কেইসা মাইজীকা লেড়কা তুমারা ?

বুলাকীকে কিছু করতে হল না, টর্চের আলোয় পাহারাওলারা কাপড়ের মোড়কটা খুলতেই চোখে পড়ল রক্তস্নাত একটি সদ্যোজাত শিশু। শুধু সদ্যোজাত নয়, তাকে গলা টিপে খুন করে ফেলা হয়েছে যাতে জন্মের পর তার একটুকু কান্নার শব্দও এত মানুষের পৃথিবীতে এক বিন্দু সাড়া জাগাতে না পারে।

টর্চের আলোয় সে বিভীষিকাটা যেন পাতাল-পুরীর দুঃস্বপ্ন !

—শা-লা, খুনী !

হাতের ব্যাটনটা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বুলাকীর মাথায় ঘা বসালো সার্জেণ্ট। মাথা ঘুরে বুলাকী পড়ে গেল মাটিতে, ড্যালহাউসি ফেরৎ ট্রামের ভদ্রবাবুদের প্রহারে যেমন করে জর্জরিত হয়ে সে পড়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে অন্ধকার গলি, টর্চের আলো একসঙ্গে আবর্তিত হয়ে গেল, গঙ্গার ধারে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার মুহূর্তটি চরমার হয়ে তলিয়ে গেল সীমাহীন একটা তমসার ভেতরে।

ARZI HUKUMATE AZAD HIND.
(THE PROVISIONAL GOVERNMENT OF FREE INDIA)

[illegible]
29.11.44

My dear boys,

On the eve of my taking off from the soil of Nippon, I want to send you my love and all good wishes for the success of your work. I have no son of my own but you are to me more than my own sons because you have dedicated your life to the cause, which is the one and only [illegible] my life — the freedom of [illegible]. I am confident that you will always [illegible] true to the CAUSE and to Bharat Mata.

I am sorry that I could not see you again before leaving — but you know that I am always with you in spirit.

God bless you
[illegible]
Subhas Chandra Bose

জার্ম্মাণীতে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক গঠিত আজাদ [illegible] ব্যাজ, ব্যাজের উপরে ফ্রী ইণ্ডিয়া বা "স্বাধীন [illegible]" শিরোনামা।

বেলাভূ

শিল্পী—শ্রীশৈল চক্র
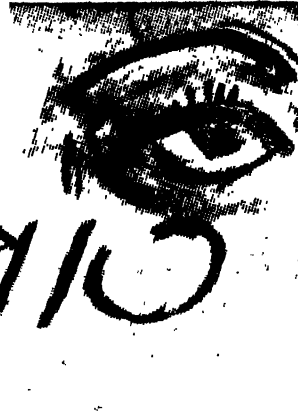
যাযাবর

আট

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো একটি মেয়ের চেঁচানিতে। শুধু আজ নয়, প্রত্যহই ভাঙে। অবশ্য আমি বলি চেঁচানি। মেয়ের মা বলেন গান। মেয়েটি গান শিখছে।

পৃথিবীতে সঙ্গীত কে কখন সৃষ্টি করেছেন জানিনে। কিন্তু এত-কাল এইটুকু বিশ্বাস ছিল, যিনিই করুন, তাঁর মনে কোন নিষ্ঠুর অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু সে-ধারণা বজায় রাখা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটির গলায় সুরের লেশ মাত্র নেই, অথচ জোর আছে প্রচণ্ড। সেটা আরও সাংঘাতিক। ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা—এই পাকা দুটি ঘণ্টা সে প্রত্যহ সঙ্গীতাভ্যাস করে। সপ্ত সুরের সঙ্গে কুস্তি করে বললেই ঠিক হয়। আশে-পাশের প্রতিবেশীরা যে এখনও ননভায়োলেণ্ট আছে সেটা গান্ধীজীর শিক্ষায় নয়, একান্ত নিরুপায় হয়েই সভ্যতার অনেক দণ্ড আছে। তার মধ্যে এ-ও একটা।

য়ুরোপ আমাদের অনেকগুলি মন্দ জিনিষ দিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কোন্‌টা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাক্তারেরা বলেন সিফিলিস, গুরুজনেরা বলেন ফ্রি-লভ এবং গান্ধীজী বলেন কলকারখানা। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে য়ুরোপের সব চেয়ে ক্ষতিকর আমদানি হারমোনিয়াম। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর নিদারুণ অত্যাচারের এমন দ্বিতীয় যন্ত্র নেই। আশ্চর্য্য নয় যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, জনসভায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করার আগে যখন কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে উদ্বোধন-সঙ্গীত শুরু করে তখনই তাঁর অদম্য অভিলাষ হয়, জনতার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ বাদ্যযন্ত্রটাকে পদাঘাতের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করেন।

জড় পদার্থের একটা সুবিধা আছে। তার সহনশীলতা অপরিসীম। সে বিদ্রোহ করে না। দিনের পর দিন দু'ঘণ্টা বেসুরো চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আওয়াজ বের করা একমাত্র হারমোনিয়ামের পক্ষেই সম্ভব। গত দশ দিন ধরে সেই এক সুরে—'বঁধু, তুমি যে চলে গেলে, ফিরে তো নাহি এলে।' বঁধু লোকটা যে কে ঠিক জানিনে। যেই হোক, বেচারীর অবস্থা কল্পনা করতে পারি। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ থাকলে হাতজোড় করে বলতেম, বাছা, চলে যে গেছে, সে নেহাৎ প্রাণের দায়েই গেছে এবং তোমার ঐ গান না থামালে সে আর ফিরছে না এও নিশ্চয়! প্রেম যত গভীরই হোক প্রাণের মায়া, অর্থাৎ কাণের মায়ার চাইতে সে বড় নয়!

মেয়েটির অপরাধ নেই। তার মাকেও দোষ দেওয়া বৃথা। তিনি জানেন, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। পাত্রপক্ষ কনে দেখতে এলে গানের পরীক্ষা আছেই। সুতরাং তার জন্য মেয়েকে তৈয়ার করা আবশ্যক। তাই কিনতে হয় হারমোনিয়াম, রাখতে হয় গানের মাষ্টার, মেয়েকে প্রাণান্তকর কসরৎ করতে হয় কণ্ঠস্থলীর। এ-দেশে সর্ব্বগুণান্বিতা হবার দাবী মেয়েদের উপরে। বিবাহ-যোগ্যা কন্যাকে হতে হবে বিদুষী, কলাবতী, সুন্দরী ও গৃহকর্ম্মনিপুণা। যে-মেয়ে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি, এস, সি পাশ করেছে তাকেও কার্পেটে ফুল তোলা শিখতে হয়, বড়ির ফোড়ন দিয়ে মোচার ঘণ্ট রাঁধতে জানতে হয় এবং সম্ভবপর বরের বন্ধুদের কনে বাছনির সময় মহাত্মা গান্ধীর একটি অতি পরিচিত ফটোগ্রাফের ভঙ্গীতে মাদুরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরতে হয়—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে' ইত্যাদি।

বিবাহের দরবারে পুরুষের কাছে প্রত্যাশা সামান্য। ডাক্তার বরের মাসিক আয়ের খোঁজ নিয়েই মেয়ের মায়েরা খুশী থাকেন, তার ক্রীড়া-দক্ষতা অভিনয়-পারদর্শিতা কিম্বা বক্তৃতা শক্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেখাপড়া, নয় ফুটবল, নয়তো ইনকেলাব জিন্দাবাদ। মেয়েদের বিচার কোন একটা মাত্র কৃতিত্বে নয়, সব কিছু মিলিয়ে। তাদের দাম প্রথমতঃ রূপে, তার পর তাদের বিদ্যায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের সূচীশিল্পে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিতৃকুলের ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের পরিমাপে।

পুরাকালে রাজকন্যারা নিজেরা পতি নির্ব্বাচন করতেন। পুরুষের হতো পরীক্ষা। বীর্য্যবত্তার পরীক্ষা। পুরুষকে তখন স্বয়ম্বর-সভায় নারীর বরমাল্যের যোগ্য হওয়ার সাধনা করতে হতো। একালে মেয়েরা সহজলভ্যা। তাদের জন্য হরধনু ভাঙতে হয় না, প্রতিবিম্ব দেখে মৎস্যচক্র বিদ্ধ করতে হয় না। তাদের লাভ করতে বাঁধা মাইনের একটা চাকরি হলেই যথেষ্ট। একালের রাজপুত্র কোটাল-পুত্রদের কুঁচবরণ কন্যার খোঁজে ঘর ছেড়ে বিদেশে বেরোতে হয় না। দুধ সাগরের জলের নীচে যে-রূপার কৌটায় কালো ভোমরার মধ্যে আছে রাক্ষসের প্রাণ তার সন্ধান করতে হয় না। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে হয় না। সরকারী দপ্তরখানায় অফিসারের তকমা এঁটে তাঁরা বীরদর্পে প্রজাপতি ঋষিকে নিজের দুয়ারে হাঁক দিয়ে বলেন, লে আও নিপুণিকা, চতুরিকা, মালবিকার দল। তোমার রেণুকা সেন মাধুরী রায়, ডলী দত্ত বা অরুন্ধতী চাটার্জ্জীদের! একালের কেশবতী রাজ-কন্যারা নক্ষুই ভরি সোনা আর তিন প্রস্থ ফার্ণিচারের খেয়া

নৌকা চেপে আপনি এসে উত্তীর্ণ হন বাসরঘরের ঘাটে। পথের টাকায় কারেন্সী নোটের মালা বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম"।

আমার কর্ণপটাহ-বিদীর্ণকারিণী সঙ্গীত-অভিলাষিণীকে চোখে দেখিনি। শুনেছি একেবারে রূপহীনা নন, লেখাপড়ায়ও ভালো। তা হোক। কিন্তু গান তাকে শিখতেই হবে। আমরা হতভাগ্য প্রতিবেশী—আমাদের ললাটে দুঃখ আছে; খণ্ডাবে কে?

দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে আর একবার নিদ্রার উদ্যোগ করলেম। বৃথা। এবার গান নয়, কার্ড। দর্শনপ্রার্থী এক ভদ্রলোক। কার্ডের উপরে ছাপা—পি, সি, সমাদ্দার, বি, এ, ডেপুটি এ্যাসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার। ভদ্রলোক আজ সকালে আসবেন কথা ছিল বটে। কিন্তু সকাল মানে যে সাড়ে ছ'টা তা ভাবতে পারিনি।

এই যে, নমস্কার। ঘুমুচ্ছিলেন না কি? বড় অন্যায় হয়ে গেছে তাহলে। আমি? আমি মশাই ঠিক পাঁচটায় উঠে খানিকটা হেঁটে আসি। বারখাম্বা ধরে ফিরোজ শা রোড, উইণ্ডসর প্লেস, কুইনসওয়ে হয়ে বাড়ী। মাইল দুই হবে। আছি ভালো মশাই। ডিসপেপসিয়াটা অনেকটা চাপা আছে। চা? আচ্ছা দিন এক কাপ, একবার অবশ্য হয়ে গেছে। আপনার বুঝি এখনও রুনি? সাতটার আগে বিছানা ছাড়েন না? খাশা আছেন মশাই। দশটা-ছটা আপিস করতে হয় না, কারো তোয়াক্কা নেই! হাই সার্কেলে মুভ করেন। হ্যাঁ, ভালো কথা, জিজ্ঞাসা করেছিলেন না কি। নেহেরুকে? ঐ যে ডিয়ারনেস্ এলাউন্সের ব্যাপারটা?

নেহেরু মানে, আর. কে, নেহেরু। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। ভদ্রলোক নিজে আই, সি, এস, এবং স্ত্রী বিদেশিনী, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি দু'জনারই সত্যকার টান আছে।

ত্রুটি স্বীকার করতে হলো। স্মরণ ছিল না। কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে হাল ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "আজ একটু মনে রাখবেন। আছি তো সাড়ে সত্তর পারসেণ্ট করবার কথা হয়েছে। কিন্তু কত মাইনে অবধি এলাউন্সটা দেবে সেইটেই আসল কথা। পাঁচশ টাকার উপরে মাইনে হলে দেবে না বলে কেউ কেউ বলছে। দেখুন তো একবার অন্যায়টা। কেন, আমাদের অপরাধটা কী? জিনিষপত্রের দামতো আর শুধু পাঁচশর নীচেওয়ালাদের জন্যেই বাড়েনি। দুধের দর টাকায় ছ'সেরের জায়গায় এক সের দিতে হচ্ছে তাকেও, আমাকেও। বলুন সত্যি কি না? তবে কেন ডিয়ারনেস এলাউন্সের বেলায় আমরা বাদ পড়ব? এ সব ইনজাষ্টিসের জন্যেই তো মশাই গভর্ণমেণ্টের কাজে ঘেন্না ধরে যায়। গান্ধী মহারাজ কি আর অমনি সয়তানী গভর্ণমেণ্ট বলেন?'

গান্ধীভক্তকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হলো যে, গান্ধীজী পাঁচশ টাকার বেশী কারো মাইনেই রাখতে রাজী নন।

"না, না, সেটা ঠিক নয় মশাই! তিনি মহাত্মা, তাঁর কথা আলাদা। ঋষিতুল্য লোক। একটু ছাগলের দুধ পেলেই হলো। আর পাঁচ জনের তো তা নয়। এই ধরুন না আমারই কথা। আপনি তো ঘরের লোকের মতো, আপনাকে বলতে আর কি? আটশ' টাকা পাই। ইনকামট্যাক্স, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কেটে নিয়ে হাতে আসে সাড়ে তের টাকা পাঁচ আনা। কি মাসেই শেষের দিকে টানাটানি না কোনটা না করলে হয়? গাড়ী আছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলেকে বিলাতে পাঠাতে হবে। পাঁচশ টাকার সীমা কিছু কাজের কথা নয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়াতে হবে, তা না হলে ভারতবর্ষের উন্নতি নেই। দেখুন না বিলাতে, এমেরিকায়। হ্যাঁ, সাহেবগুলিকে তাড়িয়ে দিন না। ওরা করে কী? শুধু দস্তখত। যা কিছু তো আমরাই লিখে-পড়ে দি। কিন্তু পাঁচ শ'র উপরে যদি মাইনে না থাকে, তবে চাপরাশীর মাইনে যে মাসে আট আনায় দাঁড়াবে। দাঁড়াবে না? বরং এখনকার চাইতে আরও বাড়বে? অবাক করলেন মশাই! কী জানি; আপনাদের কংগ্রেসীদের কি বিচার বুদ্ধি, আপনারাই জানেন।"

কংগ্রেসীদের বিচার-বুদ্ধি, ব্যাখ্যা করার মতো ধৈর্য্য বা সময় কোনটাই ছিল না। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্য ক্রিপস আলোচনার কথা তুললেম। দেখা গেল তাতে আগ্রহের একেবারে অভাব নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হবে মনে হচ্ছে কি? হলে বাঁচা যায় মশায়। ইংরেজ ব্যাটাদের আচ্ছা শিক্ষা হয়। ছিল বটে আগের দিনে সব দিলদরিয়া সায়েব। যথার্থ মা-বাপের মতো। আমি তখন সবে সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছি। আমাদের সুপারিটেণ্ডেণ্ট ছিলেন মহাতপ বাবু। মহাতপ ঘোষ, খড়দায় বাড়ী। বুড়ো হয়েছেন, বয়স সার্ভিসের কাছাকাছি। সার্ভিস বুকে লেখা আটচল্লিশ। পেন্সনের আরও পাঁচ বছর বাকী। চোখে ভাল দেখতে পেতেন না, সই করতে হাত কাঁপতো। এক দিন একেবারে ফাইলে লেখার উপরই দস্তখত করে বসে আছেন। আমরা তো ভয়ে সারা। আজ রক্ষে নেই। মারে সায়েব ছিল আমাদের সেক্রেটারী। ডেকে নিয়ে বললে, মহাটপ, তোমার ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে? না করে থাকে তো ক্ষতি নেই! কাল নিয়ে এসো, ভর্ত্তি করে দেব। তুমি এবার রিটায়ার কর। অনেক খেটেছ, এখন ডিসার্ভড্ওয়েল-আর্ণড রেষ্ট। আর এখন মশায়, আমার মেজ শালা কলকাতা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। দু'বছরের চেষ্টায় ঢোকাতে পারছিনে।

শুধু মেজ শ্যালকের চাকুরি প্রাপ্তিতে ব্যর্থতা নয়। নিজের প্রমোশন সম্পর্কেও অভিযোগ ছিল।

স্বরাজ না হলে আর চাকরী করে সুখ নেই মশাই। ইংরেজ ব্যাটাদের কাছে এখন মুসলমানেরা হচ্ছে বড় পিয়ারের! তাদেরই পোয়া বারো। কাজ জানুক আর নাই জানুক, মাথায় ফেজ থাকলেই হলো। পেটে বোমা মারলে এক কথা শুদ্ধ ইংরেজী বেরোয় না এমন সব লোক অফিসার হয়ে এসে বসছে। খান্ বলে আমাদের এক নতুন কণ্ট্রোলার এসেছে। আকাট মূর্খ। সেদিন এক ফাইলে রেফারেন্স লিখতে দুটো R দিয়ে বসে আছে। গত মাসে দু'বছরের জুনিয়র এক জন মুসলমান আমাদের চার জনকে ডিঙ্গিয়ে ডেপুটি চীফ হয়ে গেল। এসব অবিচার কি চিরকাল সইবে? ইংরেজের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর হবে নাই বা কেন? মুসলমানদের ফেলো ফিলিং আছে। চাকরী নিয়ে, প্রমোশান নিয়ে তাদের লীডারেরা সব সময়ে লড়ছে। পান থেকে চুণ খসেছে কি, অমনি এসেম্বলীতে পাঁচটা মুসলমান মেম্বার পাঁচটা প্রশ্ন করবে, উইল দি অনারেবল মেম্বার বি প্লিজড্ টু ষ্টেট। একটা মুসলমান

চাপরাশীকে কিছু বলেছেন তো মিনিষ্টারেরা কৈফিয়ৎ তলব করবে! আর আমাদের হিন্দুরা? সব কংগ্রেসী। তাঁরা কেবল উচ্চাঙ্গের কথা বলে বলেই গেলেন। স্বরাজ, স্বাধীনতা, কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। আরে চাকরী বাকরীগুলি সবই যদি অন্যের হাতে গেল তবে স্বরাজ নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? আমি স্পষ্ট কথা বলবো মশাই, আমাদের কংগ্রেসের কর্ত্তারা প্রাকটিক্যাল পলিটিক্স একেবারেই বোঝেন না। তাই কেবল জেলখানায়ই জীবন কাটাচ্ছেন।

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে লাভ নেই, তর্ক করাও নিরর্থক। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের অতি পরিচিত আবহাওয়ায় মানুষ। চাকুরীকে জানেন জীবনের অনিবার্য্য অবলম্বন গভর্ণমেন্ট পোষ্টকে আকাংক্ষিত সৌভাগ্য। তার ধ্যান, ধারণা, চিন্তা ও স্বপ্ন সমস্তই এই চাকুরীকে কেন্দ্র করে। ক্যারেক্টার রোল নিয়ে তার প্রারম্ভ, পেন্সান নিয়ে তার শেষ। এবং এই আদি ও অন্তের মাঝখানে প্রমোশন দিয়ে তার বিস্তার।

আপিসের বেলা হচ্ছিল। সমাদ্দার বাবু গাত্রোত্থান করলেম। আচ্ছা, এখন তা'হলে উঠি। আফিস আছে। আজ আবার এ মাসের এরিয়ার ষ্টেটমেণ্টটা পাঠাতে হবে। বিকেলের দিকে আর একদিন আসবো। বিকেলে বাড়ী থাকেন না? তা'হলে সকালেই আসবো। আচ্ছা, চলি এখন। ঐ ডিয়ারনেস এলাউয়েন্সের কথাটা কিন্তু আজ একবার কাইণ্ডলি ………।

বিকালের দিকে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। নয়াদিল্লীর প্রেস ক্লাব টি পার্টি দিচ্ছেন স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে। ক্রিপ্‌স চা, লাঞ্চ ও ডিনারের বহু নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র প্রেস ক্লাব ছাড়া আর কারো কোন আমন্ত্রণই তিনি গ্রহণ করেননি। বললেন, তাঁর প্রতি ভারতীয় সাংবাদিকদের সহৃদয় ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং সে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই চা চক্রে তিনি যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লকের প্রাঙ্গণে চা-পার্টির আয়োজন। স্বদেশীয় বিদেশীয় সাংবাদিকদের নিয়ে নিমন্ত্রিত প্রায় শ'দেড়েক। কয়েকজন মহিলাও আছেন। অবশ্য তাঁরা সবাই বিদেশিনী।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাঙ্গালী। উষা নাথ সেন। ভারতে সাংবাদিকদের গুরুস্থানীয় এবং এসোসিয়েটেড প্রেসের জন্মদাতা স্বর্গীয় কে, সি, রায়ের সহকর্ম্মী ছিলেন। বর্ত্তমানে এসোসিয়েটেড প্রেসের অন্যতম কর্ণধার, দিল্লী আপিসের কর্ম্মসচিব। বয়স ষাটের উপরে, শরীর সুগঠিত। বিরলকেশ, তীক্ষ্ণনাসা, উজ্জ্বল দৃষ্টি। কথাবার্ত্তা, চালচলন ও বেশভূষায় প্রখর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন আছে। ভদ্রলোক অকৃতদার। নয়াদিল্লীতে কোন দিন চিরকুমার সভা বসলে তিনিই হবেন তার সর্ব্বজনসম্মত পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট।

টি-পার্টির পরে সাংবাদিক সম্মেলন। নয়াদিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী ইতিহাসে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রেস কনফারেন্স। সাউথ ব্লকের কমিটিরূপে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই কনফারেন্সে ক্রিপ্‌স তাঁর পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বিভিন্ন সাংবাদিকদের শতাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী, তাঁর ক্ষিপ্রতা, তাঁর ক্লান্তিহীন উৎসাহ উপস্থিত সমুদয় সাংবাদিকদের প্রশংসা অর্জ্জন করলো। তাঁর রসবোধও আছে। মাঝখানে একবার হঠাৎ বললেন, সবুর। তার পর গায়ের কোটটা খুলে রেখে আস্তিন গুটিয়ে বললেন, "এবার আসুন"! বিপুল হাস্যরোলে ধ্বনিত হয়ে উঠলো কনফারেন্স।

স্যার ষ্টাফোর্ড বিলাতের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীবদের অন্যতম। আইন ব্যবসায়ী মহলে তাঁর বার্ষিক উপার্জ্জনের পরিমাণ বহু লোকেরই ঈর্ষাজড়িত বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এই সাংবাদিক-বৈঠকে যুক্তিতর্কে ব্যারিষ্টার ক্রিপ্‌সের অসামান্য দক্ষতা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু মানুষ মাত্রেরই ধৈর্য্যের সীমা আছে। সে-কথাটা অত্যন্ত অপরিহার্য্যভাবেই ক্রিপ্‌সও সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। জনৈক সাংবাদিকের এক অভদ্র প্রশ্নে অবশেষে কঠিন স্বরে বললেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ধৈর্য্য অসাধারণ, কিন্তু তারও শেষ আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোন অভদ্র ইঙ্গিত আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের, বিশেষ করে রিপোর্টারদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কৃতিত্বও কম নয়। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রবোধ নেই। তাঁরা যে রাজনীতিক নন একথাটা তাঁরা কদাচিৎ স্মরণে রাখেন। এযুগে প্রেস না হলে পলিটিক্স চলে না, কিন্তু পলিটিক্স না হলেও প্রেস চলে। যথা,—হরিজন। এদেশের সাংবাদিকেরা শুধু প্রথম শ্রেণীর রিপোর্টার হয়েই খুশী থাকতে চান না, প্রথম শ্রেণীর পলিটিসিয়ানও হতে চান। তাই অনেক সময়েই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। শুধু তাঁদের দোষ দিতে চাইনে। স্পেশিয়েলাইজেসনে এদেশে কারুরই বিশ্বাস নেই। এখানে যে-ডাক্তার জ্বরের চিকিৎসা করেন, তিনিই ফোঁড়াও কাটেন এবং দরকার হলে দাঁতও তোলেন।

ক্রিপ্‌স প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেল। প্রস্তাবটির সমস্ত গুরুত্বই ভবিষ্যতে। জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীজী ক্রিপসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন,—a post-dated chejue। অতি উৎসাহী কোন কোন সাংবাদিক তার সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য যোগ করলেন, on a crashing bank। মুখে মুখে এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিও গান্ধীজীর মূল উক্তি বলেই চলতে লাগলো। ইচ্ছাকৃত কিম্বা অনবধানতায় সত্য বিকৃতির এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে।

সেদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধু নিয়ে গেলেন একটি ক্লাবে।

নয়াদিল্লীর সবচেয়ে নামকরা ক্লাব আই, ডি, জি। ইম্পিরিয়েল দিল্লী জিমখানা। ক্লাব বর্ণাশ্রমে দ্বিজোত্তম। প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শুধু ব্যয়বাহুল্যের দ্বারা নয়, লিখিত অনুশাসনের দ্বারা। এ্যাডমিশান ফি ও মাসিক চাঁদা দুইই গুরুভার। তা'ছাড়া আই, সি, এস, আই, পি, অডিট একাউণ্টস ইত্যাদি অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর চাকুরে ছাড়া সরকারী লোক আর কারও পক্ষেই আই, ডি জির সদস্য হওয়ার উপায় নেই। বেসরকারী ডাক্তার, জার্ণেলিষ্ট, ব্যারিষ্টারদের পক্ষে ঠিক এ-রকম বাধা না থাকলেও নতুন সদস্য গ্রহণের সময় ক্লাবকর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন যাতে একমাত্র তাঁরাই মেম্বার হন আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মর্য্যাদা যাদের শীর্ষস্থানীয়, ইংরেজীতে যাকে বলে এ-ওয়ান। ক্লাবের কৌলীন্য যাতে কলুষিত না হয় সেজন্য সজাগ দৃষ্টি আছে কর্ত্তৃপক্ষের।

ক্লাবের টেনিস কোর্ট আছে, স্যুইমিং পুল আছে, ব্যাণ্ড আছে। তার নিজস্ব ধোবা পর্য্যন্ত। নয়াদিল্লীতে এইটি এক মাত্র ক্লাব যেখানে শুধু পান, ভোজন ও অবসর বিনোদনের নয়, স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থাও আছে। আই ডি জি কেবলমাত্র তাস খেলা বা আড্ডা দেওয়ার জায়গা নয়, সেটা পুরাপুরি ক্লাবই বটে।

দু'নম্বর ক্লাব—চেমসফোর্ড। সেক্রেটারিয়েটের কাছাকাছি রাইসিনা রোড ও কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের সংগমস্থলে এই ক্লাবটি সব চেয়ে সরগরম। প্রথমত: এর দক্ষিণা তেমন সাংঘাতিক নয়, দ্বিতীয়ত: এর অবস্থিতি অনেকটা সুবিধাজনক এবং তৃতীয়ত: এখানে অভারতীয় নেই। সদস্য গ্রহণেও অতটা কড়াকড়ি নেই। চেমসফোর্ডের স্যুইমিং পুলে কি বছর এখানকার সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে হয় নাচ। শীতের দিনে ঘরের ভিতরে, গ্রীষ্মকালে বাইরে। বাইরে অবশ্য কাঠের ফ্লোর নয়, শান বাঁধানো। বাগবাজারের রসগোল্লার মতো চেমসফোর্ড ক্লাবের পকৌড়া—অর্থাৎ ফুলুরীরও নাম আছে।

মহিলাদের এখানে পৃথক্ চাঁদা দিতে হয় না। স্বামীর গরবে গরবিনীরা স্বচ্ছন্দে এসে বসেন পুরুষ বন্ধুদের তাসের টেবিলে। সুদক্ষ পার্টনার পেলে কেবলই ডামি হন। না পেলে তিন রঙের তিনখানা মাস্টার্স কার্ড সম্বল করে মিছি সুরে ডাকেন, টু নো—ট্রাম্পস। সুদের মতো হারের হার বাড়ে হু হু করে। খেলার শেষে চিটে সই করে আসেন নিঃশঙ্কে। মাসের শেষে স্বামী বেচারা কম্পিত হৃদয়ে মুখ বুজে চেক লিখে দেন আর বোধ করি মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করেন।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বেশীর ভাগ ভারতীয় অফিসারেরাই চেমসফোর্ডের সদস্য। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ কেউই বাদ নেই। কিন্তু উপস্থিতির দিক্ দিয়ে পাঞ্জাবীরাই প্রধান। বিশেষ করে শিখ। তাঁরা বিকালে এসে তিন সেট টেনিস খেলেন, সন্ধ্যায় পাঁচ রাবার ব্রিজ। তিন পেগ হুইস্কি ও চার কোর্সের ডিনার খেয়ে তাঁরা যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তার আগেই কেলেণ্ডারে ইংরেজী তারিখের পরিবর্ত্তন ঘটে। এঁদের গৃহিণীরাও পিছনে পড়ে থাকবার পাত্র নন। ক্লাবে পাঞ্জাবী-দম্পতিদের দেখলে সহধর্ম্মিণী কথাটার মানে বুঝতে কষ্ট হয় না।

বন্ধুদের ক্লাবটি শহরের অপর প্রান্তে। ছোট ক্লাব। এর চাঁদা অল্প, সভ্য-সংখ্যাও বেশী নয়। বাঙ্গালী আছে, মাদ্রাজী আছে, আসামী আছে এবং আরও অন্যান্য প্রদেশের লোক। এটিও ছেলে এবং মেয়েদের সম্মিলিত ক্লাব। মেয়েদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টীয় সমাজের।

ক্লাবের খাতায় যাই হোক, ঘরে মেয়ের সংখ্যাই যেন বেশী। তার পনর আনাই কুমারী। গায়ের রং কালো, নোখের রং লাল এবং গালের রং ছাই-ছাই। বলা বাহুল্য, শেষের দুটো ভগবান দত্ত নয়। তার পেছনে ফরাসী প্রসাধন কোম্পানীর অনেকখানি হাত আছে। বিচিত্রতর বসন, বিচিত্র ভূষণ। একটি মহিলা পরেছেন বেগুনী রংএর একটি সায়ার উপরে একখানা মশারীর নেট, তাতে টিনের পাড় বসানো। আর এক জনার লেসবসানো ব্লাউজে সুতার ব্যাপারে এত কঠোর মিতব্যয়িতা যে তার দিকে চোখ তুলে তাকালে মন আপনিই লাল হয়ে ওঠে।

বয়স বেশীর ভাগই ত্রিশের ঊর্দ্ধে। দেহ কারো বা ইউক্লিডের সরলরেখা, কেউ বা অঙ্কশাস্ত্রের ইল্লিস। আমাদের মেয়েদের ভূগোলে নাতিশীতোষ্ণের স্থান নেই—হয় উত্তর মেরু, নয়তো দক্ষিণ মেরু। কেউ করেন মাষ্টারী, কেউ নার্স, কেউ বা ষ্টেনোগ্রাফার।

ক্লাবে ব্যাড্মিণ্টান আছে ক্যারম আছে, পিং পং আছে। কিন্তু খেলার চাইতে ঢং এবং কথার চাইতে ন্যাকামীর পরিমাণ বেশী। একটি পঁয়ত্রিশ বছরের বিপুলা মহিলা কোন এক সাহায্য অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর কথাবলার ভঙ্গী ও আচরণ দেখে বারম্বার ইচ্ছা হচ্ছিল, আলাপ করে বলি, ভদ্রে, আপনার নিশ্চয়ই ধারণা যে আপনার ষোল বছর এখনও পার হয়নি। কিন্তু সেটা যে কুড়ি বছর আগেই কেটে গেছে সে-কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার।

জানি, এদের উপরে রাগ করে লাভ নেই। ভগবান এদের রূপ দেননি, দেয়নি বিত্ত। এদের পিতৃকুল আভিজাত্যের খ্যাতিতে গৌরবান্বিত নয়। বয়স এদের ঊর্দ্ধগামী, যৌবন অপগতপ্রায়। অথচ ঠিকুজী মিলিয়ে অভিভাবকদের পাত্র স্থির করারও দিন বেটে গেছে। স্কুলে ছাত্রীকে জিয়াগ্রাফিয়েল ইনফিনিটিভ মুখস্থ করিয়ে দেহে ও মনে নেমেছে ক্লান্তি, রাত জেগে অনাত্মীয়, অপরিচিত রোগীকে থার্ম্মোমিটার আর আইসব্যাগ দেওয়ার কাজে ধরেছে বিরক্তি, আপিসে "উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার নাম্বার" টাইপ করে করে জীবনে এসেছে বিতৃষ্ণা। প্রিয় ও পরিজন নিয়ে নীড় রচনার চিরন্তন মোহ আছে নারীর রক্তে। একখানি ছোট গৃহ, একজন প্রেমাসক্ত স্বামী ও একটি, দুটি সুস্থ সবল শিশু—এই কল্পনা সে যুগযুগান্তর ধরে পেয়ে আসছে মায়ের কাছ থেকে, মাতামহীর কাছ থেকে, জগতের আদি মানবী আদমপত্নী ইভের কাছ থেকে। সে-কল্পনা সত্য হতে পারলো না, সে-কামনা সার্থক হলো না। অতৃপ্ত বাসনার সহস্র নাগিনী জাগায়ে জর্জ্জর বক্ষে সে বৃথাই প্রতীক্ষা করেছে এই দীর্ঘকাল। দেহে তার একদিন রূপ না থাকলেও স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু আজ তার শ্রী গিয়েছে ঘুচে, নারীর স্বাভাবিক কমনীয়তা হয়েছে দূর এবং তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা হয়েছে লুপ্ত। অবশেষে বঞ্চিত হৃদয়ের অপরিসীম বেদনাকে ঢাকতে সে প্রাণপণে প্রয়াস করছে নানা ভাবে। কেউ করছে মহিলা সমিতি, কেউ করেছে রেডিওতে বক্তৃতা আর কেউ বা রুজ, পাউডার ও লিপষ্টিক মেখে পুরুষের সঙ্গে করছে নির্জ্জলা ফ্লার্ট।

ক্লাবের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে কলেজের ছাত্র আছে, সেক্রেটারিয়েটের কর্ম্মচারী আছে, বীমার দালাল আছে, ডাক্তার আছে। প্রায় সবাই তরুণ। বিবাহিত সদস্যেরা বেশীর ভাগ খৃষ্টান এবং কুমার সভ্যেরা বেশীর ভাগ হিন্দু। কারণ সুস্পষ্ট।

পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নূতন আবেষ্টন। তার ফলে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে আমাদের কর্ম্মে এবং চিন্তায়। আমাদের আহার, বিহার, বসন ভূষণ বদল হয়েছে। বদল হয়েছে রীতি নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এত কাল নারীকে শুধু মাত্র পুরুষের আত্মীয়রূপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি, পিসি, দিদি, বৌদি কিম্বা শ্যালিকা। কিন্তু জননী জায়া এবং অনুজা ছাড়া নারীর যে আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে সে সম্পর্কে আমরা বর্ত্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সখী।

প্রাণি-জগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্ত্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। নারীর মূল্যেরও যুগে যুগে তারতম্য ঘটেছে। একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিল সর্ব্বপ্রধান। সে-দিন পরিবার পরিচালনা থেকে বংশ পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নির্ণীত হতো মাতার নির্দ্দেশে, সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কেল ফেমিলী বিলুপ্ত হলো। রাজমাতার চাইতে রাজরাণীর মর্য্যাদা হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসারের কর্ত্রী হলেন জননী নয়, গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বউএর আঁচলে আত্মসমর্পণ করলো।

বলা বাহুল্য, এই হস্তান্তরের ফলে মায়েরা খুশী হলেন না। কেউ অধিকার রক্ষার জন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফল হলো না। হার হলো তাঁদেরই। শুধু বউকাঁটকী শাশুড়ী আখ্যা পেয়ে নাটক, নভেলে তারা নিন্দিত হলেন। যাঁরা বুদ্ধিমতী, তাঁরা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ চিত্তে নয়। জগতের সমস্ত মাতৃকুলের অব্যক্ত অভিযোগ আজও জেগে রইল বধূশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। য়ুরোপ আমেরিকায় সমাজে পত্নীকর্ত্তৃত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পরে ছেলের সংসারে তার মায়ের স্থান নেই, কিম্বা থাকলেও সে স্থান উল্লেখযোগ্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত অকার চিহ্নের মতো তার স্থিতি আছে, গুরুত্ব নেই।

কিন্তু স্ত্রী বলতে যে দিন ভাবী সন্তানের গর্ভধারিণী বা গৃহকর্ত্রী মাত্র বুঝতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিবঃ সখী প্রিয়-শিষ্যা ললিতকলাবিধৌ। কিন্তু একজনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা করা শুধু কালিদাসের কাব্যেই শোভা পায়, বাস্তবক্ষেত্রে নয়। এযুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক বেশী। সে দশটা পাঁচটায় আপিস যায়, কারখানায় খাটে, শেয়ার মার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস, কিম্বা মিটিং। রাত্রিতে ক্লাব, অথবা সিনেমা। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই গৃহিণীরও আবশ্যকতা নেই। আগে সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করতে হতো। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পার্ব্বণে প্রয়োজন ছিল ভার্য্যার। কিন্তু ধর্ম্ম এখন শুধু ইলেকশানে ভোট সংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড় একটা কাজে লাগে না। তাই এযুগে সহধর্ম্মিণীর চাইতে সহকর্ম্মিণীকে নিয়ে বেশী রোমান্স লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্তই। তার খাওয়ার জন্ত আছে রেস্তোঁরা, শোয়ায় জন্ত হোটেল, রোগে পরিচর্য্যার জন্ত হাসপাতাল ও নার্স। সন্তান-সন্ততিদের লালন পালন ও শিক্ষার জন্ত স্ত্রীর যে অপরিহার্য্যতা ছিল, বোর্ডিং স্কুল ও চিলড্রেনস্ হোমের উদ্ভব হয়ে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্য্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশীটা বান্ধবী। সে কর্ত্রীও নয়, ধাত্রীও নয়,—সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যতঃ ছিল ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এযুগের স্ত্রীরা একান্তভাবে স্বামি-উপজীবিনী নয়। তারাও দরকার হলে আপিসে গিয়ে টাকা আনতে পারে। তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন প্রধানতঃ ভর্ত্তারূপে নয়, বন্ধুরূপে।

ভারতবর্ষও এই নব ভাবধারার বন্তাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি। ঢেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আত্মীয় পরিজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। গ্রাম্য সভ্যতার ভিৎ বিধ্বস্ত, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগ-নগরীর বিস্তৃতি ঘটছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে নূতন সভ্যতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবন ধর্ম্মের উদ্ভব অপরিহার্য্য। এদেশেও পুরুষের জীবনে এবার আবির্ভাব হয়েছে সখী, নারীর জীবনে সখা। সেটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করতে পার, মনু পরাশর উদ্ধৃত করে মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখতে পার। কিন্তু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

স্ত্রী-পুরুষের জীবনে সখাসখীর যে উপলব্ধি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমাজও একেবারে উদাসীন ছিল না। কিন্তু পতিকে পরম গুরু এবং পত্নীকে সেবিকা বানিয়ে দাম্পত্যে তারা সখ্যের অবকাশ রাখতে পারেননি। ট্রান্সফার্ড এপিথেটের মতো সেটা পুরুষের পক্ষে বউদি এবং স্ত্রীর পক্ষে দেবরের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সংসারে এর চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জানা নেই।

কিন্তু এযুগে জীবনযাত্রার উপচার বহুবিধ এবং ব্যয়সাধ্য। যে লোক দু'শ টাকা পায় তার পক্ষে বউকে কাছে রাখাই কঠিন, বউদি দূরে থাকুক। মেয়েরাও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হলে বরই জুটবে না অনেকের, দেবর তো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা খেয়ে মন দিয়ে মেনেছেন যে, বেশী আশা করে ফল নাই, একটি নির্ভরযোগ্য সহৃদয় বন্ধু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকেরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে অনেক লোভে লাভ নেই, তার চেয়ে বরং চাই শুধু একটি বান্ধবী। প্রিয় বান্ধবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত নয়। সাধারণ মুসলমান পরিবারেও নয়। সেখানে বান্ধবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথম যে অনাত্মীয়া নারীর সান্নিধ্য ঘটে তিনি নিজের স্ত্রী। তাই ক্লাবে, পার্টিতে, বিলাতফেরৎ ও বড় চাকুরেদের ড্রয়িং রুমে তরুণের দল আসে। কাউকে ডাকে ললিতাদি, কাউকে বলে বীণা বউদি, কাউকে বা শুধু পদবীর আগে মিস্ জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করে—মিস্ গুপ্ত, মিস্ আয়েঙ্গার বা মিস্ সোনেরা জাহীর।

[ক্রমশঃ।
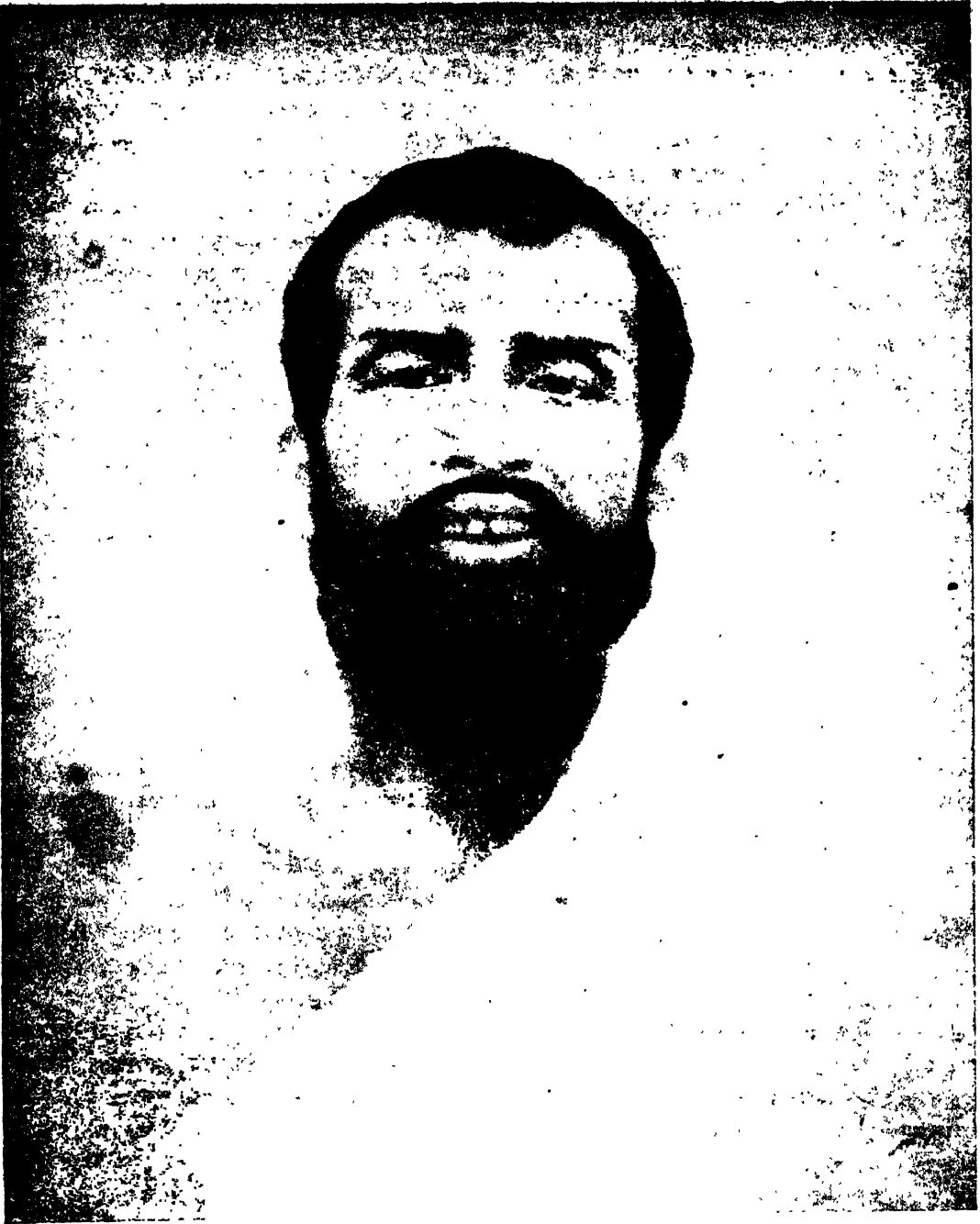
[শিল্পী—ফ্রাঙ্ক ঘোরক]

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

—রবীন্দ্রনাথ

রু মর্গের হত্যাকাণ্ড

[এডগার এল্যান পো]

বিশ্লেষণী-শক্তি বলে যে-সব মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলোর কদাচিৎ বিশ্লেষণ করা চলে। ওগুলোকে কেবল মাত্র তাদের প্রভাবের সাহায্যেই বুঝতে পারি আমরা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমরা তাদের সম্বন্ধে এটা জানি যে, যখন কারও এই শক্তি খুব বেশি থাকে তখন সেটা তার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ হয়ে থাকে। বলিষ্ঠ মানুষ যেমন তার শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে একটা গর্ব অনুভব করে এবং তার পেশীগুলোকে যাতে সক্রিয় করে এমন ব্যায়াম করে আনন্দ পায়, তেমনি বিশ্লেষণকারীও জটিলতা ভেদ করে গৌরব বোধ করে থাকে। যাতে তার এই শক্তির চর্চা হয় এমন তুচ্ছতম কাজ করেও সে আনন্দ লাভ করে। সে ভালবাসে ধাঁধা, সাঙ্কেতিক লিপি: এগুলোর সমাধান করে সে প্রত্যেকটিতে এমন একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয় যে সাধারণ বুদ্ধির কাছে সেটা অতীন্দ্রিয় শক্তি বলে মনে হয়ে থাকে। তার বিশ্লেষণ-প্রণালীর সাহায্যে সে যে পরিণামে উপনীত হয় সেটা সত্যি মনে হয় যেন প্রজ্ঞার (intuition) ফল।

পুনঃসমাধানের (re-solution) এই শক্তিটি হয়ত গণিত-চর্চার দ্বারা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে, বিশেষতঃ গণিতের শ্রেষ্ঠ যে অঙ্গ তার সাহায্যে,—যাকে তার বিপরীতমুখী ক্রিয়ার জন্য, গৌরবার্থে 'বিশ্লেষণ' নাম দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু হিসেব করাটা বিশ্লেষণ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দাবাড়ে হিসেব করে, কিন্তু বিশ্লেষণের চেষ্টা করে না। এ থেকে এই বলা যেতে পারে যে, মানসিক গঠনের ওপর দাবাখেলার প্রভাব সম্বন্ধে ধারণাটা খুবই ভ্রান্ত। আমি আপাততঃ নিবন্ধ লিখতে উদ্যত হইনি, কতকটা বিচিত্র রকমের কাহিনীর ভূমিকাস্বরূপ খুবই এলোমেলো ভাবে কয়েকটা মন্তব্য করছি মাত্র। সেই জন্য আমি এখানে এই বলব যে, মননশীল বুদ্ধির উচ্চতর শক্তির প্রয়োগ দাবার জটিল তুচ্ছতার চেয়ে জাঁকজমকহীন ড্রাফ্‌ট (draught) খেলাতে বেশি নিশ্চিত এবং প্রয়োজনীয় রূপে হয়ে থাকে। পরবর্তী খেলায় গুটিগুলোর বিভিন্ন এবং উদ্ভট রকমের চাল আছে যার গুরুত্ব বিচিত্র এবং পরিবর্তনশীল—এই যে শুদ্ধ মাত্র জটিলতা এটাকে গভীর বিষয় বলে ভুল করা হয় আর ভুলটা কিছু অসাধারণও নয়। এতে খুবই জবরদস্ত অভিনিবেশের প্রয়োজন; যদি মুহূর্তের জন্য অভিনিবেশ শ্লথ হয়, লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে, তার ফল হয় ক্ষতি কিম্বা পরাজয়। সম্ভব চাল যে শুধু বহু তা নয়, জটিল সমন্বও, তাতে লক্ষ্যচ্যুতির সম্ভাবনা বহুগুণিত হয়ে যায়। আর, দশটির মাঝে ন'টি ক্ষেত্রে বেশি তীক্ষ্ণবুদ্ধি খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি অভিনিবিষ্টেরই জিৎ হয়ে থাকে। অপর পক্ষে 'ড্রাফ্‌ট' খেলায় চাল একেবারেই অভিনব, কিন্তু রকমফের তাতে অতি সামান্য; লক্ষ্যচ্যুতির সম্ভাবনা স্বল্প, শুধু মনোনিবেশের কাজ আপেক্ষিক ভাবে নেই বললেই চলে, সুতরাং অপর পক্ষ যা-কিছু সুবিধা পায় সেটা তার উৎকৃষ্টতর তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে। অতি সূক্ষ্ম ভাষায় কথা না বলে একটা ড্রাফ্‌ট খেলা ধরা যাক যাতে কেবল মাত্র চারটি 'রাজা' আছে, সুতরাং এখানে কোনো কিছু যে লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে সেটা আশাই করা যায় না। খেলোয়াড়দের সমান ধরে নিলে, এখানে জিৎ হতে পারে শুধুমাত্র কোনো একটা সুন্দর চালের দ্বারা যা হবে বুদ্ধি-শক্তির প্রবল প্রয়াসের ফল। সাধারণ পন্থা হাতে না থাকায় বিশ্লেষণকারী বিরুদ্ধ পক্ষের অন্তরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয় এবং তখন প্রায়ই এক নজরেই সে সম্পূর্ণ প্রণালীটাকে (যা বাস্তবিক কখনো কখনো খুবই সরল হয়ে থাকে) আবিষ্কার করে ফেলে যার সাহায্যে বিরুদ্ধ পক্ষকে সে ভ্রান্তির পথে প্রলুব্ধ করতে পারে অথবা তাড়াতাড়ি তাকে ভুল অনুমানে প্ররোচিত করতে পারে।

যাকে আমরা অনুমান-শক্তি বলি তার ওপর প্রভাব আছে বলে 'হুইষ্ট' খেলার একটা অনেককেলে খ্যাতি আছে। খুব উঁচুদরের বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরা এই খেলায় দৃশ্যতঃ অকারণ আনন্দ পেয়ে থাকেন, যদিচ দাবা খেলাকে তাঁরা বাজে বলে বর্জন করে থাকেন। নিঃসন্দেহ এর মত এমন আর কিছুই নেই যা বিশ্লেষণী-শক্তিকে এত বেশি খাটাতে পারে। খৃষ্টীয় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবার খেলোয়াড় হয়ত কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়েই হতে পারেন; কিন্তু হুইষ্ট খেলায় দক্ষতার মানে, মনের সঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে মনের সংগ্রাম সেই সব বড় বড় ব্যাপারে কৃতকার্য্যতার ক্ষমতা। 'দক্ষতা' বলতে আমি সেই নিখুঁত খেলার কথা বলছি যাতে সেই সমস্ত বিষয়ের ধারণা বোঝায় যার সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত সুবিধা লাভ করা যেতে পারে। এর নানা রকম এবং নানা রূপ, মনের এমন গহনে এরা থাকে যে প্রায়ই সাধারণ-বুদ্ধি এদের ধরা-ছোঁয়াই পায় না। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করার অর্থ হচ্ছে স্পষ্ট মনে রাখা। এই পর্য্যন্ত অভিনিবিষ্ট দাবা-খেলোয়াড় হুইষ্টও ভালোই খেলবে। এই কারণে মনে রাখবার শক্তি আর নিয়মমত চলা একেই ভালো খেলার মূল বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্লেষণকারীর যে কৌশল সেটা প্রকাশ পায় কেবলমাত্র নিয়মের সীমার বাইরে যে সব ব্যাপার তাতে। সে নীরবে বহু জিনিষ লক্ষ্য করে, নানা রকমের

অনুমান করে। তার সঙ্গীরাও হয়ত তাই করে। কিন্তু তথ্যজ্ঞানের পরিমাণ সম্বন্ধে যে পার্থক্য দাঁড়ায় সেটা অনুমান (inference) করবার যৌক্তিকতার উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা ঐ পর্যবেক্ষণের জাতিগত বিভেদের উপর। কি যে পর্যবেক্ষণ করতে হবে সেইটে জানাই হল আসল জানা। আমাদের খেলোয়াড় নিজেকে মোটেই সীমাবদ্ধ করেন না। খেলাটাকেই লক্ষ্য মনে করে খেলার বহির্ভূত ব্যাপার থেকে অনুমান করতে তিনি বিরত হন না। তিনি তাঁর দোসরের মুখভাব পরীক্ষা করবেন, সাবধানতার সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধ-পক্ষীয় প্রত্যেকের মুখভাবের সঙ্গে তার তুলনা করবেন। প্রত্যেকের হাতে কার্ডগুলো সাজানোর রীতি লক্ষ্য করবেন; প্রায়ই লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকটি 'ট্রাম্প' এবং 'অনার' আর যাদের হাতে সেগুলো আছে তাদের চোখের দৃষ্টি। খেলা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেক মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন; নিশ্চয়তা, বিস্ময়, বিজয়োল্লাস অথবা বিরক্তি লক্ষ্য করে মনে মনে জড়ো করবেন বহু সিদ্ধান্ত। তাসের 'পিঠ' কুড়োনোর ভঙ্গী থেকে তিনি ঠিক করবেন যে সেই লোকটি ওই বাজিতে আবার তাসের পিঠ পাবে কি না। তিনি টেবিলের ওপর যে ভাবে তাস ফেলা হয় তা থেকে বুঝতে পারবেন যে ওটা ছলনামাত্র কি না। একটা হঠাৎ বলা কিম্বা অসতর্ক কথা, হঠাৎ পড়ে যাওয়া বা উল্টে যাওয়া তাস এবং সেটাকে গোপন করবার আনুষঙ্গিক উদ্বেগ অথবা নিরুদ্বিগ্ন ভাব, 'পিঠ' গোণা এবং সেগুলো সাজানোর ক্রম, বৈফল্য, ইতস্ততঃ ভাব, আগ্রহ অথবা চাঞ্চল্য তাঁর আপাত প্রতীয়মান সহজবোধের কাছে বাস্তবিক অবস্থার সূচনা দেয়। দু'-তিন বার খেলা ঘুরে আসার পর তিনি প্রত্যেকের হাতে কি আছে না আছে সম্পূর্ণ ভাবে জেনে ফেলেন এবং তার পর থেকে তিনি এমন অভ্রান্ত লক্ষ্য নিয়ে তাস ফেলতে থাকেন যে, মনে হয় যেন দলের অন্যেরা তাঁদের তাস-গুলোকে তাঁর দিকেই উলটিয়ে ধরে রেখেছেন।

সাধারণ চতুরতাকে বিশ্লেষণী-শক্তি বলে ভুল করা উচিত নয়। বিশ্লেষক চতুর হবেই, কিন্তু চতুর ব্যক্তি প্রায়শঃই বিশ্লেষণ করতে বিশেষ রকম অপটু হয়ে থাকে। খেয়াল (fancy) এবং কল্পনার (imagination) মাঝে যে পার্থক্য, চতুরতা এবং বিশ্লেষণী-শক্তির মাঝে তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য রয়েছে, যদিচ দুয়ের মাঝে খুব একটা সাদৃশ্য আছে। বাস্তবিক দেখা যাবে যে, চতুর লোকেরা সব সময়ই খেয়ালী (fanciful) আর সত্যিকার কল্পনাশীল (imaginative) যারা তারা বিশ্লেষক না হয়েই পারে না।

যে কাহিনী নীচে দেওয়া হল, সেটা ওপরে যে মতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে কতকটা তারই টীকা বলে মনে হবে পাঠকের কাছে।

১৮— খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মেরও কতকটা যখন আমি পারী নগরীতে ছিলাম মঁসিয়ে ওগুস্ত দ্যুপ্যাঁর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হয়। এই তরুণ ভদ্রলোকটি খুবই ভালো, সত্যি বলতে কি, একটি বিখ্যাত পরিবারের সন্তান কিন্তু অনেকগুলো দুর্ঘটনায় এমন দরিদ্র-দশায় উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁর চরিত্রের তেজটা তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল এবং জাগতিক ব্যাপারে উদ্যম থেকে তিনি বিরত হয়েছিলেন এবং নিজের সৌভাগ্য পুনর্লাভ করার ইচ্ছাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাওনাদারদের সৌজন্য-বশতঃ তিনি তখনও তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষুদ্রাবশেষের অধিকারী ছিলেন আর এ থেকে যা আয় হত তা দিয়েই, জীবনের বাহুল্য সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে, কঠোর মিতব্যয়িতার সাহায্যে আবশ্যক প্রয়োজনগুলো মেটাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর একমাত্র বিলাস অবশ্য বই ছিল, আর পারীতে এগুলো ছিল সহজলভ্য।

রু মঁ মার্ত্র-এর একটা অজ্ঞাত লাইব্রেরীতে আমাদের প্রথম দেখা হয়, যখন ঘটনাচক্রে আমরা দুজনই একই অতি দুষ্প্রাপ্য এবং উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সন্ধানে যাই এবং তাতেই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়। বার বার আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতাম। ফরাসীরা নিজের বিষয় যে-রকম অকুণ্ঠ ভাবে বলতে পারে তেমনি করেই ইনিও যখন তাঁর ক্ষুদ্র পারিবারিক ইতিহাসের বিস্তৃত বর্ণনা করেছিলেন আমি তা গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুনেছিলাম। তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপকতায়ও আমি বিস্মিত হয়েছিলাম; সর্বোপরি তাঁর কল্পনার সতেজ নবীনতা এবং উগ্র উদ্দীপনা আমার হৃদয়কে যেন আলোকিত করে তুলেছিল। তখন আমি পারীতে যে-সব বস্তুর সন্ধান করছিলাম তার সন্ধান করতে করতে এই লোকটির সংসর্গ আমার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ্ বলে মনে হয়েছিল। আর আমার এই ধারণাটি সরল ভাবে তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলাম। অবশেষে এই স্থির হয়েছিল যে, যত দিন আমি পারীতে থাকব তত দিন একসঙ্গেই থাকব। আর আমার সাংসারিক অবস্থাটা তার মত তত বিপন্ন ছিল না বলে তিনি আমাকে আমাদের উভয়ের অদ্ভুত ধরণের মানসিক বিষণ্ণতার সঙ্গে খাপ খায় এমন একটি অদ্ভুত কালদষ্ট পুরানো বাড়ী ভাড়া করে তাকে সেই ভাবে সজ্জিত করবার অধিকার দিয়েছিলেন। বাড়ীটা ছিল প্রায় পড়-পড় এবং অন্ধসংস্কার বশে বহু কাল যাবৎ পরিত্যক্ত (অবশ্য তার কারণ জানবার চেষ্টা আমরা করিনি), আর ফোবুর্গ সাঁ্যাস্ত জারম্যাঁর একটা নিভৃত জনশূন্য অংশে অবস্থিত।

এখানে আমাদের জীবনযাত্রার ধারাটা যদি সংসার জানত তাহলে আমরা উন্মাদ বলে বিবেচিত হতাম, যদিচ নিরীহ পাগল বলেই হয়ত। আমাদের বিচ্ছিন্নতাটা ছিল সম্পূর্ণ। কেউ আমাদের দেখা পেত না। সত্যি আমার নিজের পূর্বতন সঙ্গীদের কাছ থেকে আমাদের নিরালা নিবাসটিকে সযত্নে গোপন রেখেছিলাম। আর দ্যুপ্যাঁকে তো বহু বর্ষ পূর্বেই পারীর লোকেরা ভুলে গিয়েছিল। তিনিও পারীর লোকদের ভুলে গিয়েছিলেন। আমাদের নিজেদের মাঝেই আমরা একাকী বিরাজ করছিলাম।

কল্পনার খেয়াল বশতঃই—তাছাড়া আর কি-ই বা বলব?—আমার বন্ধু রাত্রিকে ভালো বাসতেন রাত্রি বলেই। আর তাঁর অন্যান্য বিষয়ের মত, এই উদ্ভট খেয়ালটাও নিঃশব্দে আমাকে পেয়ে বসল। সম্পূর্ণ বেপরোয়া ভাবে আমি তাঁর পাগলা খেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। কৃষ্ণা দেবী সর্বক্ষণ আমাদের কাছে থাকতেন না, তবু আমরা তাঁর উপস্থিতির ভাণ করতে পারতুম। প্রভাতের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরানো বাড়ীর সবগুলো ভারি ঝিলমিলি বন্ধ করে দু'টো তীব্রগন্ধ বাতি জ্বালিয়ে দিতাম যা থেকে শুধু ভয়ানক রকমের এবং অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মি নির্গত হত। এই-গুলোর সাহায্যে আমাদের মন স্বপ্নমগ্ন হয়ে পড়ত। চলত লেখাপড়া আর কথোপকথন, যতক্ষণ না ঘড়ি আমাদের জানাত যে সত্যিকার অন্ধকারের আবির্ভাব হয়েছে। তখন আমরা পরস্পরের বাহুবদ্ধ হয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়তাম; দিনের বেলাকার আলোচনাই

চলতে থাকত অথবা ঘুরে বেড়াতাম নানা দিকে দূরে দূরে আর জনাকীর্ণ নগরীর উৎকট আলো-ছায়ার মধ্যে শান্ত পর্যবেক্ষণ-জাত অপরিসীম মানসিক উত্তেজনার সন্ধান করতাম।

যদিও তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্য্য এ-রকম আশা করতে আমার মনকে তৈরী করেই রেখেছিল, তবু এই সব সময়ই দ্যুপ্যাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত বিশ্লেষণী-শক্তি দেখে সেটা লক্ষ্য না করে এবং তার প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারতাম না। এই শক্তির ঠিক আস্ফালন করে না হলেও অন্ততঃ প্রয়োগ করে তাঁর আগ্রহপূর্ণ আনন্দ হত বোধ হয় এবং এ থেকে যে তাঁর আনন্দ হত সেটা তিনি প্রকাশ করতেন দ্বিধাহীন ভাবেই নিম্নস্বরে খিল-খিল করে হেসে। গর্বভরে তিনি আমায় বলতেন যে, তাঁর কাছে বেশির ভাগ লোকেরই বুকের বাতায়নগুলো খোলা এবং আমার নিজের মনের সম্বন্ধে তাঁর অন্তরঙ্গ জ্ঞান সম্বন্ধে চমকপ্রদ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে তিনি ওই রকম উক্তির সমর্থন করতেন। এমন সময় তাঁর ভাব-ভঙ্গীটা হত কঠোর এবং নৈর্ব্যক্তিক (abstract), তাঁর দৃষ্টি হয়ে পড়ত লক্ষ্যহীন এবং স্বভাবতঃ 'টেনর' কণ্ঠস্বর এমন ট্রেব্‌লএ গিয়ে উঠত যে উচ্চারণ-ভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সুচিন্তিত না হলে কণ্ঠস্বর খিটখিটে বলেই মনে হতে পারত। এই রকম অবস্থায় তাঁকে দেখে আত্মার দ্বৈতরূপ সম্বন্ধে যে প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ আছে সেই কথা ভাবতাম আমি আর ডবল দ্যুপ্যাঁ—স্রষ্টা এবং বিশ্লেষক—সম্বন্ধে কল্পনা করতাম।

এই মাত্র যা বললাম তা থেকে যেন কেউ এটা মনে না করেন যে, আমি কোনো রহস্য-কথা বলছি অথবা রোমান্স লিখছি। ঐ ফরাসী ভদ্রলোক সম্বন্ধে যা বললাম তা শুধু উত্তেজিত মস্তিষ্কের অথবা হয়ত একটা ব্যাধিগ্রস্ত বুদ্ধির ফল মাত্র, কিন্তু ঐ সব মুহূর্ত্তে তিনি যে ধরণের মন্তব্য করতেন একটা দৃষ্টান্ত দিলেই সেটা সব চেয়ে স্পষ্ট হবে।

এক দিন আমরা রাত্তিরে প্যালে রয়ালএর সন্নিকটে একটা লম্বা নোংরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমরা দু'জনেই বাস্তবতঃ চিন্তামগ্ন ছিলাম, তাই অন্ততঃ, পনেরো মিনিট কেউ কোনো কথা বলিনি। অকস্মাৎ দ্যুপ্যাঁ এই কথাগুলো বলে উঠলেন, "সত্যি লোকটা খুব ছোট (Theatre des Variete) তিয়েত্র দে ভারিয়েতেয় ওকে মানাত বেশি!"

বক্তা যে কি অদ্ভুত ভাবে আমার ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে উত্তর দিলেন প্রথম সেটা লক্ষ্য না করেই (এতই ভাবনায় ডুবে ছিলাম আমি) নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি উত্তর দিলাম, "তাতে কোনো সন্দেহ নেই।" এক মুহূর্ত্ত পরেই আমি নিজের মাঝে ফিরে এলাম যখন, গভীর বিস্ময় জাগল মনে।

গম্ভীর ভাবে বললাম, "দ্যুপ্যাঁ, এ তো আমার ধারণার অতীত। আমি অকুণ্ঠ ভাবে বলছি আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, আমার ইন্দ্রিয়কে যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে। আমি কার কথা ভাবছি তা আপনি কি করে টের পেলেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "শাঁতিলীর কথা। থামলেন কেন? আপনি বলতে যাচ্ছিলেন যে ওর ছোট্ট চেহারাটা ট্রাজিডির অনুপযুক্ত।"

ঠিক এই কথাটাই আমার চিন্তার বিষয় ছিল। শাঁতিলী ছিল রু স্যাং ডেনিসের পূর্বতন মুচি; অভিনয়-পাগল হয়ে গিয়ে সে Xerxesএর পার্ট (তথাকথিত Crebillon's tragedy) করতে চেষ্টা করে এবং ফলে বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়ে।

আমি বলে উঠলাম, "সত্যি যদি কোনো প্রণালী থাকে তো বলুন তো এ বিষয়ে আপনি আমার মনের গোপন কথা কি করে আবিষ্কার করলেন?" বাস্তবিক আমি যতটা ইচ্ছে করে প্রকাশ করেছিলাম তার চেয়েও অনেক বেশি বিস্মিত হয়েছিলাম।

বন্ধু উত্তর দিলেন, "ওই ফলওয়ালাটাকে দেখে আপনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, সেই জুতো-মেরামতকারী Xerxesএর অভিনয় করবার পক্ষে যথেষ্ট লম্বা নয় এবং ঐ শ্রেণীর কেউই না (id genus omne)।

"ফলওয়ালা! আপনি আমায় তাজ্জব করলেন, আমি কোনো ফলওয়ালাকেই জানিনে।"

"এই সড়কে পড়তেই যে লোকটা আপনার গায়ে এসে পড়ল, মিনিট পনেরো হবে হয়ত।"

তখন আমার মনে পড়ল যখন হঠাৎ রু স—থেকে এই সড়কটায় আমরা পড়েছিলাম, সত্যি তখন একটা ফলওয়ালা মাথায় মস্ত একটা আপেল ফলের ঝুড়ি নিয়ে আমাকে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল। কিন্তু এর সঙ্গে যে শাঁতিলীর যোগটা কোথায় তা আমার মোটেই বোধগম্য হল না।

দ্যুপ্যাঁর মাঝে কণামাত্র ধাপ্পাবাজি ছিল না। বললেন, "আমি বুঝিয়ে বলছি তবে। আপনি যাতে সবটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন আমি আপনার ভাবনাগুলোকে শুরু থেকে বলি অর্থাৎ যখন আপনার সঙ্গে কথা আরম্ভ করেছিলাম তখন থেকে ফলওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত। চিন্তাধারার প্রধান গ্রন্থিগুলো হল, শাঁতিলী, ওরিয়ঁ, ডাঃ নিকল, এপিক্যুরস, ষ্টিরিওটোমী, সড়কের পাথর, ফলওয়ালা।"

এমন লোক খুবই কম পাওয়া যাবে, যাঁরা জীবনের কোনো না কোনো সময় কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর আবার সেই চিন্তাধারার অনুসরণ করেননি যার সাহায্যে তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই কাজটি প্রায়ই খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে আর যিনি সর্বপ্রথম এই চেষ্টা করেন তিনি চিন্তার আরম্ভ এবং পরিণতির মাঝে আপাত প্রতীয়মান অসীম দূরত্ব এবং অসঙ্গতি দেখে বিস্মিত হয়ে থাকেন। তাই যখন ঐ ফরাসী ভদ্রলোকের ওই কথাগুলো শুনলাম আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, তাঁর কথাগুলো ঠিক।

তিনি বলতে লাগলেন "যদি ভুলে না গিয়ে থাকি তা হলে রু স—তে আসার ঠিক পূর্ব্বে আমরা ঘোড়ার কথা বলাবলি করছিলাম। সর্বশেষের আলোচনার বিষয়টা ছিল এই। পার হয়ে এই সড়কে আসার সময় একটা ফলওয়ালা মস্ত ঝুড়ি মাথায় হন হন করে আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় আপনাকে এক রাশি পাথরের স্তূপের ওপর ফেলে দিলে; সেটা স্তূপীকৃত হয়েছিল সেইখানটায় যেখানে বাঁধানো সড়কের মেরামত হচ্ছিল। আপনি একটা আলগা টুকরোর ওপর পা পড়ায় পিছলে পড়ে গেলেন এবং পায়ের গাঁটটা সামান্য মচকে গেল; মনে হল বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি অস্ফুট কণ্ঠে কয়েকটা কথা বললেন, তার পর সেই স্তূপটার দিকে ফিরে তাকিয়ে নিঃশব্দে অগ্রসর হতে লাগলেন। আপনার ক্রিয়া-কলাপের প্রতি আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না।

কিন্তু কিছু কাল থেকে পর্যবেক্ষণ আমার কাছে যেন এক রকম প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে।

"মাটির দিকে আপনার চোখ ছিল এবং বিরক্তিভরে পথের গর্ত্ত এবং চক্রচিহ্নগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে লামার্ত্তিন নামক ছোট গলিটার কাছে এলেন যেটা পরীক্ষা-মূলক ভাবে টুকরো টুকরো পাথর জোড়া দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। (এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে আপনি তখনো পাথরগুলোর কথা ভাবছিলেন।) এইখানটায় এসে আপনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং আপনার ঠোঁট নড়তে দেখে আমার সন্দেহ রইল না যে আপনি 'ষ্টিরিওটোমী' শব্দটা উচ্চারণ করছেন যা এই ধরণের বাঁধানোর প্রতি অত্যন্ত জাঁকালো ভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আমি জানতাম যে, আপনি 'ষ্টিরিওটমী' কথাটি বলতে গিয়ে, (Atomies) 'এটমী' (অণু) এবং এপিকিউরসের (আণবিক) মতবাদের কথা না ভেবেই পারবেন না। বেশি দিনের কথা নয়, আমরা ঐ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম এবং আজকালকার নীহারিকা থেকে বিশ্বসৃষ্টির মতবাদটির দ্বারা মহান্ গ্রীকদের অস্পষ্ট অনুমান কি বিচিত্র ভাবে সমর্থিত হচ্ছে (যদিও খুব কম লোকই সেটা লক্ষ্য করছেন) সেই কথাটিও বলেছিলাম। আমার মনে হল, আপনি তখন ওরিয়ঁতে (Orion—কালপুরুষ) যে বিশাল নীহারিকা রয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারবেন না আর আমি নিশ্চয়ই মনেও করেছিলাম যে আপনি তাকাবেন। আপনি তাকালেনও। তখন আমি নিশ্চিত বুঝলাম যে আমি ঠিক ঠিক আপনার চিন্তাধারার অনুসরণ করেছি। কিন্তু কালকের মিউজে (Musee) পত্রিকায় শাঁতিলী সম্বন্ধে যে তীব্র নিন্দা বেরিয়েছে তাতে বাঙ্গকারী বক্তিন (ট্রাজিডি অভিনেতাদের পুরোহিত বিশেষ পাত্রক।) ধারণের পর সেই মুচির নাম-পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কতকগুলো অশোভন ইঙ্গিত করে এক ছত্র লাতিন উদ্ধৃত করেছেন যার সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই আলোচনা করেছি। আমি সেই ছত্রটার কথা বলছি:

Perdidit antiqum litera prima sonum

আমি বলেছি আগেই যে, এটা ওরিয়ঁকে (Orion) লক্ষ্য করেই লেখা, পূর্ব্বে লেখা হ'ত ইউরিয়ন (Urion)। এই ব্যাখ্যার মধ্যে যে তিক্ততা ছিল তা থেকে আমি বুঝেছিলাম যে আপনি ওটাকে ভুলতে পারবেন না। সুতরাং এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে আপনি ওরিয়ঁ আর শাঁতিলীর কথা দু'টোকে সংশ্লিষ্ট না করে পারবেন না। আপনি যে তা করেছিলেন সেটা আমি আপনার মুখের ওপর দিয়ে যে মৃদু হাসি খেলা করে গেল তা থেকেই বুঝলাম। আপনি বেচারী মুচির নিগ্রহের কথা ভাবছিলেন। এতক্ষণ আপনি ঝুঁকে চলছিলেন কিন্তু এবার দেখলাম আপনি একেবারে সোজা হয়ে উঠলেন। আমি তখন নিশ্চিত বুঝলাম যে আপনি শাঁতিলীর খর্ব্বাকৃতির কথা ভাবছেন। এইখানে আমি আপনার চিন্তাকে বাধা দিয়ে বললাম যে, বাস্তবিকই শাঁতিলী অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির লোক ছিল, তিয়েত্র্ দে ভারিয়েতেয় ওকে বেশি মানাত।"

এর অল্পকাল পরেই 'গেজেত্ দে ত্রিবিউনো'র সান্ধ্য সংস্করণের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে নীচের প্যারাগ্রাফটির দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল।

"অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড—আজ সকালে প্রায় তিনটার সময় 'কার্তিয়ে স্যাঁত রশে'র অধিবাসীরা রু মর্গের একটি বাড়ীর চার তলা থেকে কতকগুলো ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনে ঘুম থেকে জেগে ওঠে; সে বাড়ীতে না কি মাদাম লেস্পানাইয়ে এবং মাদ্‌মোয়াজেল কামিল লেস্পানাইয়েই ছিলেন একমাত্র অধিবাসিনী। সাধারণ উপায়ে প্রবেশ করবার ব্যর্থ-চেষ্টায় কিছুক্ষণ কাটার পর একটা শাবল (crowbar) দিয়ে গেটটা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং দু'জন পুলিসকে সঙ্গে করে আট-দশ জন প্রতিবেশী প্রবেশ করেন। তৎক্ষণে চীৎকার-ধ্বনি থেমে গিয়েছিল; কিন্তু দলের লোকেরা যখন প্রথম সিঁড়িটার ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে উঠছিল, তখন দু'-তিনটি রুক্ষ কণ্ঠের ক্রুদ্ধ বাদ-প্রতিবাদের মত শোনা গিয়েছিল আর মনে হয়েছিল যেন শব্দটা বাড়ীর ওপরের অংশ থেকে আসছে। সিঁড়ির দ্বিতীয় মোড়টায় যখন পৌঁছানো গেল তখন শব্দগুলোও থেমে গেল আর চারি দিক্ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দলের লোকেরা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং দ্রুত কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যেতে লাগল। চার তলায় পেছন দিকের একটা বড় কামরায় পৌঁছে, ভেতর থেকে চাবি দিয়ে বন্ধ করা দোর ভেঙে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল তাতে প্রত্যেকেই যেমন বিস্ময়াকুল তেমনি ভয়বিহ্বলও হয়ে পড়ল।

"কামরার ভেতর তখন বিশৃঙ্খলার চরম, আসবাব-পত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে; ঘরে একটি মাত্র পালঙ্ক ছিল তা থেকে বিছানাটা সরিয়ে মেঝের মাঝখানটায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একটা চেয়ারের ওপর পড়েছিল রক্ত-মাখানো একটা ক্ষুর। অগ্নিকুণ্ডের ওপর দু'-তিনটে দীর্ঘ এবং স্থূল মানুষের অর্দ্ধপক্ব কেশগুচ্ছ, সে-ও রক্ত-লিপ্ত এবং মনে হচ্ছিল টেনে গোড়া থেকে ওপড়ানো। মেজের ওপর পাওয়া গেছে চারটি নেপোলিয়ন মুদ্রা, পোখরাজের একটা ইয়ারিং, তিনটে বড় বড় রূপোর চামচ, তিনটে ছোট ছোট আলিজিয়ার্সের মুদ্রা আর প্রায় চার হাজার ফ্রাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা-ভরা দু'টি থলে। এক কোণের একটা টেবিলের ড্রয়ারগুলো খোলা পড়েছিল এবং বোধ হয় সেগুলো হাতড়ানো হয়েছিল, যদিচ তাদের মাঝে অনেক জিনিষই পড়েছিল। বিছানার নীচে (খাটের নীচে নয়) একটা ছোট আয়রণ-সেফ পাওয়া গিয়েছে, চাবি-ঢোকানো অবস্থায় ওটা খোলা ছিল। কয়েকখানি পুরানো চিঠি আর অনাবশ্যক অল্প কাগজপত্র ছাড়া তাতে আর কিছুই ছিল না।

"মাদাম লেস্পানাইয়ের কোনো চিহ্নই ছিল না সেখানে; কিন্তু অগ্নিকুণ্ডে অসামান্য পরিমাণ ঝুল দেখা যাওয়ায় চিমনীটার ভেতর সন্ধান করা হল এবং তার ভেতর থেকে সেই মেয়ের মৃতদেহটা (মাথাটা ছিল নীচের দিকে) টেনে বার করা হল; চিমনীর সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ওটাকে ঠেলে অনেকখানি ওপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শরীরটা তখনো বেশ গরম ছিল। পরীক্ষা করে অনেকগুলো ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেল; জোর করে ভেতরে ঢোকানো এবং বার করার সময়ই নিশ্চয় ওগুলো হয়েছিল। মুখের ওপর অনেকগুলো ভীষণ আঁচড় ছিল আর গলায় কালো কালো কালশিরে এবং আঙুলের নখের গভীর দাগ ছিল যেন মৃতকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল।

"বাড়ীর প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর যখন আর কিছু পাওয়া গেল না, তখন দলের লোকেরা বাড়ীর পেছন দিক্‌কার একটা ছোট প্রাঙ্গণের দিকে গেল। সেখানে বৃদ্ধ

মহিলার মৃতদেহ পড়েছিল এবং তার গলাটা এতখানি কাটা ছিল যে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করতেই মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। শরীর এবং মাথা দুই-ই ভীষণ রকম ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়েছিল; শরীরটা যে মানুষের, তাও বোঝা এক রকম অসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

"আমাদের বিশ্বাস যে, এই ভয়ঙ্কর রহস্যের ক্ষীণতম সন্ধানসূত্রও পাওয়া যায়নি।"

পরদিনকার কাগজে যে খবর বেরিয়েছিল তা এই:

"রু মর্গের ভয়ঙ্কর ঘটনা—এই অত্যন্ত অসাধারণ এবং ভয়ানক ব্যাপার সম্পর্কে অনেককেই ডেকে তদন্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করবার মত কোনো কিছুই জানা যায়নি। যা কিছু বাস্তব সাক্ষ্য পাওয়া গেছে তা নিয়ে দেওয়া গেল। "পলীন দ্যুবুর্গ নাম্নী ধোপানীর বক্তব্য এই যে, সে তিন বছর যাবৎ তাদের কাপড় ধোয় এবং তাদের দু'জনকেই জানে। বৃদ্ধা মহিলা এবং তাঁর মেয়ে দু'জন পরস্পরকে খুবই ভালবাসতেন। প্রাপ্য দেওয়া সম্বন্ধে এঁরা চমৎকার লোক ছিলেন। তাঁদের জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং উপায় সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তার বিশ্বাস যে, মাদাম ল—ভাগ্যগণনা করে জীবিকা অর্জন করতেন। সঞ্চিত অর্থ আছে বলে লোকেরা জানত। যখন কাপড় নিতে বা দিতে যেত, কখনো সেই বাড়ীতে সে কাকেও দেখেনি। এ বিষয়ে সে নিশ্চিত যে, তাদের কোনো চাকর ছিল না। বাড়ীর চার তলা ছাড়া আর কোনো অংশে সে কোনো রকম আসবাব-পত্র দেখেনি।

"পীয়ের মোরো নামক তামাক-বিক্রেতার জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, প্রায় চার বছর যাবৎ সে মাদাম লেস্পানাইয়েকে অল্প-স্বল্প তামাক এবং নস্য বিক্রয় করে এসেছে। ঐ পাড়াতেই তার জন্ম এবং ঐখানেই সে বরাবর থেকে আছে। প্রায় ছ'বছরের বেশী-কাল যাবৎ মৃতা মহিলা এবং তাঁর কন্যা বাড়ীর ঐ অংশটায় ছিলেন, যেখানে মৃতদেহগুলো পাওয়া গিয়েছিল। পূর্বে এখানে এক জন জুয়েলার থাকতেন যিনি ওপরের ঘরগুলো ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভাড়া দিতেন। বাড়ীটা মাদাম ল—এরই সম্পত্তি ছিল। তাঁর ভাড়াটে বাড়ীটার অসদ্ব্যবহার করায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি নিজেই এতে উঠে আসেন এবং কোনো অংশ ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। বৃদ্ধা মহিলাটি ছেলেমানষী-প্রকৃতির ছিলেন। ছ'বছরের মধ্যে এই সাক্ষী মেয়েটিকে বার পাঁচ-ছয়েক দেখেছে। ঐ দু'জন ভয়ানক নিভৃত জীবন যাপন করতেন এবং টাকা-পয়সা আছে বলে তাঁদের খ্যাতি ছিল। প্রতিবেশীদের কাছে সে শুনেছিল যে, মহিলা ভাগ্য-গণনা করেন, কিন্তু সে এ কথা বিশ্বাস করেনি। ঐ বৃদ্ধা মহিলা আর তাঁর মেয়ে ছাড়া একটা কুলিকে বার দুয়েক আর এক জন ডাক্তারকে বার আট-দশেক ও-বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেখেছে, তাছাড়া কখনো আর কাকেও সে প্রবেশ করতে দেখেনি।

"আরো অনেক প্রতিবেশীই এই ধরণেরই জবানবন্দী দিয়েছে। ও-বাড়ীতে কোনো লোক যে প্রায় যাওয়া-আসা করত এমন কথা কেউ বলেনি। মাদাম ল—এবং তাঁর মেয়ের কোনো জীবিত আত্মীয় আছেন কি না জানা যায়নি। সামনের জানালাগুলোর ঝিলমিল কদাচিৎ খোলা হত। পেছন দিকের গুলো সব সময় বন্ধ থাকত শুধু চার তলার একটি কালো ঘর ছাড়া। বাড়ীটা ভালো—খুব পুরানো নয়।

"পুলিস কনস্টেবল ইসিডোর ম্যুসের জবানী থেকে জানা যায় যে ভোর রাত তিনটের সময় ও-বাড়ীতে তার ডাক পড়ে এবং সেখানে গিয়ে সে দেখে যে, বিশ-ত্রিশ জন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। অবশেষে, শাবল দিয়ে নয়, একটা বেয়নেট দিয়ে দোরটা জোর করে খোলা হয়। ডবল অর্থাৎ ভাঁজওয়ালা দরজা হওয়াতে আর তার নীচে ওপরে ছিটকিনী না থাকায় খুলতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। গেট খোলার পূর্ব পর্যন্ত চীৎকার হচ্ছিল—তার পর হঠাৎ থেমে যায়। খুব যন্ত্রণায় কোনো ব্যক্তি (বা ব্যক্তিরা) যেন আর্ত চীৎকার করছিল—একটানা আর জোরে হচ্ছিল শব্দ, দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত নয়। দর্শকেরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। সিঁড়ির ওপর প্রথম মোড়টায় (দাঁড়াবার জায়গায়) দু'জনকে জোরে এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বাদ-বিতণ্ডা করতে শোনা যায়—একটা মোটা গলা আরেকটা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ—খুবই অদ্ভুত ধরণের গলার আওয়াজ। প্রথম ব্যক্তির কয়েকটা কথা সে বুঝতে পেরেছিল, কথাগুলো কোনো ফরাসীর ছিল। নিশ্চিত যে, সেটা নারীকণ্ঠ ছিল না। 'সাক্রে' (অভিশপ্ত) এবং দিয়াব্‌ল (শয়তান) এই দু'টো কথা বোঝা গিয়েছিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠটা কোনো বিদেশীর ছিল। পুরুষ কি নারীর সে কথা ঠিক করে সে বলতে পারে না। কি যে বলেছিল তা সে বলতে পারে না, কিন্তু তার বিশ্বাস ভাষাটা স্পেন দেশের। ঘর এবং মৃতদেহ সম্বন্ধে এর বর্ণনা আমাদের কল্যকার দেওয়া বর্ণনার অনুরূপ।

"আঁরি দ্যুভাল নামক এক জন প্রতিবেশী রৌপ্যকার তার জবান-বন্দীতে বলে যে, যারা প্রথম ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল তাদের এক জন ছিল সে। ম্যুসের জবানবন্দীর মোটামোটি ভাবে সমর্থন করে সে। অত রাত্রেও খুব দ্রুত ভিড় জমতে থাকার দরুণ গেটটা খুলেই তারা জনতাকে বাইরে রাখবার উদ্দেশ্যে আবার বন্ধ করে দেয়। এই সাক্ষীর মনে হয় যে, সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরটা কোনো ইতালীয়ানের ছিল। সে মাদাম ল—আর তাঁর মেয়েকে জানত। প্রায়ই সে তাঁদের সঙ্গে কথা বলত। এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ঐ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরটা মৃতদের কারও ছিল না।

"—ওডেন হাইমের, রেস্তরাঁওয়াল—এই সাক্ষীটি নিজে থেকেই জবানবন্দী দেয়। ফ্রেঞ্চ বলতে না পারায় দোভাষীর সাহায্যে জবানবন্দী নেওয়া হয়। আমস্টার্ডমের অধিবাসী সে। চীৎকার যখন হয় তখন সে বাড়ীটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল; কয়েক মিনিট ধরে—সম্ভবতঃ দশ মিনিট ধরে চীৎকার হচ্ছিল। চীৎকার বেশ জোরে আর একটানা ছিল—অতি ভয়ানক এবং কষ্টকর। যারা ভেতরে ঢুকেছিল তাদের এক জন ছিল সে। পূর্বেকার জবানবন্দীগুলোর সবই সমর্থন করল সে একটি বিষয় ছাড়া। তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে তীক্ষ্ণ আওয়াজটা পুরুষের এবং ফরাসীর ছিল। যে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিল তা সে বুঝতে পারেনি। কথাগুলো জোরে জোরে এবং তাড়াতাড়ি অসমান ভাবে বলা হয়েছিল।—ভয়ে এবং ক্রোধে বলা হয়েছিল কথাগুলো। আওয়াজটা তত তীক্ষ্ণ (মিহি) ছিল না যতটা কর্কশ। ওটাকে সে তীক্ষ্ণ আওয়াজ বলতে পারে না। রুক্ষ আওয়াজে বার বার বলতে শোনা গিয়েছিল, 'সাক্রে', 'দিয়াব্‌ল' আর একবার 'মঁ দিও' (হে ভগবান)।

"জুল মিঞো, রু দিলোর‍্যানের মিঞো এণ্ড সন্সএর খাজাঞ্চী।

ইনি মিঞো (সিনিয়র)। মাদাম লেস্পানাইয়ের কিছু সম্পত্তি ছিল। আট বছর পূর্বে বসন্তকালে তাঁর ব্যাঙ্কিং-হাউসে মাদাম একটা একাউণ্ট খুলেছিলেন, অল্প অল্প পরিমাণে প্রায়ই টাকা জমা দিতেন। কোনো দিন চেক দেননি; কেবল মৃত্যুর তিন দিন আগে নিজে এসে চার হাজার ফ্রাঙ্ক ওঠান। টাকাটা স্বর্ণমুদ্রায় দেওয়া হয় এবং এক জন কেরাণী সঙ্গে যায় টাকা নিয়ে।

"এডলফ ল্য বঁ, মিঞো এণ্ড সন্সএর কেরাণী, জবানবন্দীতে বলে যে আলোচ্য দিবসের দ্বিপ্রহরে সে দু'টো থলেয় করে চার হাজার ফ্রাঙ্ক নিয়ে মাদাম লেস্পানাইয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত যায়। দোর খোলা হলে পর মাদমোয়াজেল ল—দেখা দেন এবং তাঁর হাত থেকে একটি থলে নেন এবং বৃদ্ধা মহিলা অন্য থলেটি নেন। নমস্কার করে তখন সে বিদায় নেয়। সেই সময় সড়কে সে কাকেও দেখেনি। ওটা একটা ছোট সড়ক—খুবই নির্জন।

"উইলিয়ম বার্ড, দর্জি, বলে যে বাড়ীতে প্রবেশকারীদের মধ্যে সে-ও ছিল। সে জাতিতে ইংরেজ। পারীতে দু'বছর হল আছে সে। সিঁড়ি বেয়ে যারা প্রথম গিয়েছিল তাদের মধ্যে সে-ও ছিল। বাদ-বিতণ্ডার আওয়াজ সে শুনেছিল। রুক্ষ আওয়াজটা ফরাসীর ছিল। কয়েকটা কথা সে বুঝতে পেরেছিল তবে সব ভালো মনে পড়ে না। স্পষ্ট শুনেছিল 'সাক্রে' আর 'দিয়াব্‌ল'। ঐ সময় যেন কয়েক জন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে, এমনি ধরণের খস-খস আওয়াজ হয়। তীক্ষ্ণ আওয়াজটা রুক্ষ আওয়াজের চেয়ে জোরালো, অনেক বেশি জোরালো ছিল। ইংরেজের কণ্ঠস্বর ছিল না এটা নিশ্চিত, কোনো জার্মানের বলে মনে হচ্ছিল। স্ত্রীলোকের গলাও হতে পারে। জার্মান ভাষা সে জানে না।

"ওপরে যে চার জন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে তাদের আবার ডাকা হলে পর তারা বলে যে, যখন দলের লোকেরা সেই ঘরের কাছে যায় যার ভেতর মাদমোয়াজেল ল—এর দেহ পাওয়া যায়, তখন সেটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল সব, কোনো রকম আর্তনাদ বা গোলমাল হয়নি। দোর খুলে কোনো লোককে দেখা যায়নি। পেছনের এবং সমুখের কামরার জানালাগুলো ভেতর থেকে শক্ত করে বন্ধ ছিল। কামরা দু'খানির মাঝে যে দরজা ছিল সেটাও বন্ধ ছিল, যদিচ তালা দেওয়া নয়। সমুখের ঘরের বাইরে চলা-ফেরার পথের ওপর যে দোর ছিল সেটা তালা দেওয়া ছিল। চাবি ছিল তার ভেতর দিকে। এই চলা-ফেরার পথের ওপরে, চার তলায় বাড়ীর সমুখ দিকে যে ছোট ঘরখানি তার দোর আধ-খোলা ছিল। এই ঘরটা পুরানো বাক্স-বিছানা ইত্যাদিতে বোঝাই করা ছিল। এগুলো সাবধানে সরিয়ে তল্লাসী নেওয়া হয়েছিল। বাড়ীর কোথাও তিলমাত্র স্থানও ছিল না যে ভালো করে দেখা হয়নি। চিমনীর ওপর থেকে নীচে সবটায় সম্মার্জনী চালানো হয়েছিল। বাড়ীটা চার তলা, ছাতের ওপর ঘর আছে। ছাতের একটা চাপা-দুয়ার (trap door) খুব ভালো করে কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল, যা বহু বৎসর যাবৎ খোলা হয়নি বলে মনে হয়। বাদ-বিতণ্ডার শব্দ শোনা আর ঘরের দোর খোলার মাঝে যে সময়টা অতিবাহিত হয়েছিল সেটার সম্বন্ধে বিভিন্ন সাক্ষীর বিভিন্ন মত। কেউ সংক্ষিপ্ত করে আনল তিন মিনিটে, কেউ দীর্ঘ করে নিল পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত। দোরটা খুলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

"আলফন্সো গারসিও, মুর্দোফরাস (গোর দেবার কাজ করে যারা) বলেছে যে, সে রু মর্গে থাকে। স্পেনের অধিবাসী সে। বাড়ীর ভেতর যারা ঢোকে তাদের এক জন সে। সে ওপরে ওঠেনি। 'নার্ভস'-প্রকৃতির বলে সে উত্তেজনার ফল খারাপ হবে ভেবে ভীত হয়েছিল। একটা তর্কাতর্কির শব্দ সে শুনেছিল। রুক্ষ আওয়াজটা ফরাসীর ছিল, কিন্তু কি বলছিল তা বুঝতে পারেনি। তীক্ষ্ণ আওয়াজটা ইংরেজের ছিল এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। ইংরেজী জানে না সে কিন্তু উচ্চারণ-ভঙ্গী দেখে বলছে।

"মিঠাইওয়ালা আলবার্তো মন্তানীর বক্তব্য এই যে, সিঁড়ি দিয়ে যারা প্রথম উঠেছিল সে তাদের এক জন। আলোচ্য কণ্ঠস্বরগুলো স শুনেছিল। রুক্ষস্বরটা ফরাসীর ছিল। কয়েকটা কথা বুঝতে পেরেছিল। বক্তা বারণ করছিল কিছু। তীক্ষ্ণকণ্ঠের কথা সে বুঝতে পারছিল না। সে খুব দ্রুত এবং অসমান ভাবে কথা বলছিল। তার রুশীয় কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়। সকলে যা বলেছে সে তার সমর্থন করে। নিজে সে ইতালীয়। কোনো রুশীয়ের সঙ্গে সে কথনো কথা বলেনি।

"পুনরাহূত কয়েক জন সাক্ষীর মন্তব্য এই যে, চার তলার সবগুলো ঘরেরই চিমনী এত সরু যে তা দিয়ে মানুষের প্রবেশ অসাধ্য। গোলাকার ঝাঁটা দিয়ে বাড়ীর প্রত্যেকটি চিমনী ওপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত দেখা হয়েছে। বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে কোনো পথ নেই যা দিয়ে, দলের লোকেরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়, কেউ বাইরে নেমে যেতে পারে। মাদমোয়াজেল লেস্পানাইয়ের শরীর চিমনীর মাঝে এমন শক্ত ভাবে আটকেছিল যে, সেটাকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি যতক্ষণ না দলের চার-পাঁচ জন লোক তাদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করেছিল।

"ডাক্তার পল দুমা বলেন যে, প্রায় যখন ভোর হয় তখন তাঁকে ঐ দেহগুলো দেখতে ডাকা হয়। যে-ঘরে মাদমোয়াজেল ল-কে পাওয়া যায় সেইখানে পালঙ্কের ওপরকার ক্যাম্বিসের ওপর দেহগুলো শায়িত ছিল। তরুণী মহিলার দেহ খুব বেশি ছড়ে গিয়েছিল। এই চিহ্নগুলোর কারণ এই যে, দেহটা চিমনীর ভেতর ঠেলে ঢোকানো হয়েছিল। গলাটা খুব বেশি ঘসা খেয়েছিল। চিবুকের ঠিক নীচে কয়েকটা গভীর আঁচড় ছিল, তাছাড়া অনেকগুলো নীল কালো দাগ ছিল যা স্পষ্টতই আঙুলের চিহ্ন ছিল। মুখটা ভয়ানক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল আর চোখের তারাগুলো বেরিয়ে পড়েছিল। জিভটার খানিকটা কেটে গিয়েছিল। পেটের ওপর একটা মস্ত চোট দেখা গিয়েছিল, সম্ভবতঃ হাঁটুর চাপে ওটা হয়েছিল। মঁসিয়ে দ্যুমার মতে কোনো অজ্ঞাত লোক বা লোকেরা মাদমোয়াজেল লকে গলা টিপে হত্যা করেছে। মাতার মৃতদেহ ভীষণ ভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। ডান পা এবং বাহুর অস্থিগুলো অল্প-বিস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাঁ পায়ের হাঁটুর নীচের (tibia) অস্থিটা খুব ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছিল আর বাম-পঞ্জরের অস্থিগুলোও। সমস্ত শরীরটা ভয়ানক ভাবে ক্ষত-বিক্ষত (bruised) এবং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ বলা সম্ভব নয় যে, কি ভাবে আঘাত করা হয়েছিল। ভারী কাঠের গদা কিম্বা লোহার চওড়া ডাণ্ডা, অথবা চেয়ার—যে-কোনো বড় ভারী এবং ভোঁতা ধরণের অস্ত্র থেকে এই ধরণের চিহ্ন হতে পারে—যদি খুব শক্তিশালী

রাত্রি

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনো অস্ত্র দিয়েই ঐ ধরণের আঘাত করা সম্ভব নয়। সাক্ষী যখন মৃতার মাথাটা দেখেন তখন সেটা দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল আর সেটাও খুব থেৎলানো ছিল। গলাটা স্পষ্টই খুব ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে—সম্ভবতঃ রেজর দিয়ে কাটা হয়েছিল।

"সার্জ্জন আলেক্সান্দর এতিয়েনকে দেহগুলো দেখবার জন্ত মঁসিয়ে দ্যুমার সঙ্গে ডাকা হয়েছিল। তিনিও মঁসিয়ে দ্যুমার মত এবং সাক্ষ্যের সমর্থন করেন।

"যদিও আরো কয়েক জনের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে, নূতন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় জানা যায়নি। হত্যাকাণ্ড যদি বা হয়েও থাকে; সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে এতখানি বিভ্রান্তিকারী এবং এমন রহস্যময় হত্যাকাণ্ড এ পর্য্যন্ত প্যারীতে কখনো হয়নি। এ ব্যাপারে পুলিস একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে—এই ধরণের ব্যাপারে এটা সম্পূর্ণ অসাধারণ ঘটনা। এর সন্ধান-সূত্রের ছায়ারও আভাস দেখা যাচ্ছে না কোথাও।"

সংবাদপত্রের সান্ধ্য-সংস্করণে বলা হয়েছে যে, 'কার্তিয়ে স্যাঁত রশ্'-এ তখনো ভয়ানক চাঞ্চল্য বিদ্যমান: ঘটনা-স্থলটির আবার সতর্ক খানাতল্লাসী করা হয়েছে এবং নতুন সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কিন্তু 'পুনশ্চ'তে বলা হয়েছে যে, আডল্‌ফ ল্য বঁকে ধরে বন্দী করা হয়েছে, যদিচ যা বলা হয়েছে ইতিপূর্বে তা ছাড়া তাকে দোষী সাব্যস্ত করবার মতো কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

রথীন চৌধুরী

আদিম সৃষ্টির কালে অরণ্যের গানে
অর্থ কি ছিল তার পাতার মর্ম্মরই ভালো জানে।
তবু জানি মানুষের দল
স্থির অচঞ্চল,
নক্ষত্রালোকে
চিনেছিলো নিজ সত্তাকে।
আমি বংশধর
জন্মেছি অনেক যুগ পর।

আমি জানি সময়ের উপত্যকা বেয়ে
গিরিগাত্রে বাঁকা পথে মিছিলের স্রোত
যাবে ধেয়ে।
কলহাস্তে তুষারের ভেঙে মৌনতা
সমতলে নামিবে তা।
দিকে দিকে সংবাদ আসে
জন-স্রোতে
দূর দেশ হ'তে
অসংখ্য আকাশে।

তারি স্বপ্ন-বোনা চোখে। তারি রূপকথা
পাহাড়ে হাতীর সার নামে যেন অসংখ্য দলে,
ধূসর মেঘেরা মিলে গ্রাম নদী দেশ যেন
নির্জ্জনে করে মায়াময়।
রুক্ষ মাঠ নীল পদ্মবনে শেষ হয়।
মনে হয় এই দেশ—হলুদ ফুলের দেশ।
এখানের সবুজে প্রজাপতি
ডানা দিয়ে রোদ্দুর ভেঙে পেল গতি।
আর চৌকো-আল ধান ক্ষেতে, নদীরা নেমেছে
পাহাড়ের এতদিন-জমানো-নীহার।
পাখীদের জনপদে, নৌকো-বাওয়া দেশে
নবান্নের দেরী নেই আর।
অনেক অনেক উঁচু নীল-মেঘে ওড়ে যত চিল
ডানায় ছিটিয়ে জ্যোৎস্না রঙে চোখে দেয়
ঝিলমিল।

জানি জানি তুষারের ভেঙে মৌনতা
নদী হয়ে নামে যে তা।
সন্দেহের নেই অবকাশ,
স্বপ্নবোনা সমস্ত আকাশ।

জানি আজ সব গাঁ-ই ফাঁকা।
মাঠ ফাঁকা। সব ঘরই খালি।
গোলা খালি। ভেঙেছে চাতাল—
ধান-কোটা বন্ধ বহুকাল।
কথা নেই ঘাট জনহীন।
নদীমাতৃক দেশে আজ শুধু কান্নার দিন।
গরুড়ের ক্ষুধা তাই দিগ্বিজয়ে বার হোতে চায়
আজ সারা দুনিয়ায়
কে তাহারে বাধা দেবে, কে করিবে জয়?
প্রাগৈতিহাসিক গুহা, পাথরের ঘর,
কুয়াশায় ঢাকা মাঠ হিম-অন্ধকার,
এক-গাছ জোনাকিরও আলো নেই যার—
তবু যারা বেঁচে থাকে, তার নেই ক্ষয়,
তার জয়ে নেই সংশয়।

মহাদেশ গড়ে ওঠে তাহাদেরি ঘরে
গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে
জানা অজানার ভীড়ে কাজে ও কথায়।
বিনতা-নন্দন হাতে বন্দিনী-মাটি মুক্তি পায়।

খুসীর খেয়ালে তাই চোখ আসে বুঁজে,
মন ফেরে জনতার পথে কথা খুঁজে।

খেজুরের ছায়া বেঁকে পড়ে নদী-জলে।
নদী হোতে জল এল খালে।
খাল হোতে জল তুলে নালা দিয়ে জলেরে
পাঠালো।

মাঠময় জলে ভেসে গেল।
তার পর চাষ শেষ হতে ঘর ফিরতে সেবারে
বৃষ্টিশেষ শ্রাবণের রাত্রির পৃথিবীর মতো
স্তম্ভিত—হে শ্রাবণ-দেবী, দেখি যে দুয়োর ধরে
রয়েছ, কথা-না-কওয়া বৃষ্টি থামা বনেদের
মতো বিস্মিত।
তোমার চোখেতে ছিল সেদিনের আকাশের ছবি,
আর মুখে চাপা ছিল হেমন্তের ফসলের গান।
তোমার তুলনা দিতে জগতেতে তুলনা ত নাই,
হে অনন্যা তোমাকেই জন্মে জন্মে
ফিরে যেন পাই।

ওদের এসব কথা ছবি হোতে চায়,
এমন অনেক গান আছে অপেক্ষায়,
আমার সে সাধ্য নাই—নই রূপকার
কবি নই—জনতার নই কথাকার।
খুসীর খেয়ালে তবু চোখ আসে বুঁজে
মন ফেরে জনতার পথে কথা খুঁজে।
তাই যত ছবি পাই, যত টুকিটাকি
তুলোটে তুলির টানে রেখে যাই আঁকি।

আদিনা মসজিদের অভ্যন্তর

হজরৎ পাণ্ডুয়া

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১১৩৮ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী, সে প্রায় ৮ বৎসর আগের কথা, আমি হজরৎ পাণ্ডুয়া বেড়াইতে যাই। বেলা আটটা ত্রিশ মিনিটে আসিয়া আদিনা ষ্টেশনে নামিলাম। পূর্ব্বেই ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়কে আমার আসিবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া একখানা গোরুর গাড়ী প্রস্তুত রাখিতে লিখিয়াছিলাম। মাষ্টার মহাশয় সে ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফাল্গুন-প্রভাতের সূর্য্য প্রভাতেই প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়েই চা পান করিয়া আদিনা চলিলাম। গোরুর গাড়ীর ভাড়া ঠিক হইয়াছিল ২৲ টাকা।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "সাবধানে যাবেন, পথটা নিরাপদ নয়। জল খাবেন না। আমি এখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখবো।" আরও বলিলেন—"সন্ধ্যার আগে ফিরতে চেষ্টা করবেন। কিছু দিন আগেও ঐ পথটা দিয়ে বাঘ চলাফেরা করেছে।"

গোরুর গাড়ীতে উঠিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে গাড়ী চলিল। [illegible] দিকে মাঠ ও [illegible] [illegible] পথ আসিয়াই পড়িলাম—বালুকাকীর্ণ পথে। সে বালি এত গভীর যে গাড়ীর চাকা সম্পূর্ণ ভাবে ডুবিয়া যাইতেছিল। কাজেই গাড়ী একেবারেই অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। যদি এই গোরুর গাড়ীর উপর নির্ভর করিয়া চলিতে [illegible] হইলে বেলা দুইটার আগে কোনরূপেই পাণ্ডুয়া পৌঁছান সম্ভবপর হইবে না, এ জন্ত গাড়োয়ানকে আদিনা মসজিদের নিকট গাড়ী আনিতে বলিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। দুই দিকে গভীর বন-জঙ্গল—পথে বালুকার গভীরতার জন্ত ভয়ানক ক্লেশ বোধ হইতেছিল, পা হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছিল। ওদিকে মাথার উপর ফাল্গুনের প্রখর রৌদ্র—তপ্ত বালুকারাশি পাথর, দুই পাশে এমন নিরাপদ স্থান নাই যে একটু বিশ্রাম করি। তবু পাণ্ডুয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিবার উৎসাহে চলিতে লাগিলাম এবং বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় পাণ্ডুয়া আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে পাণ্ডুয়ার দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল হইবে।

দিনাজপুরের রাস্তার উপরে উঁচু পথ। সম্মুখে পাইলাম একটি তোরণ-দ্বার। তাহার কাছে একটি ইন্দারা। এই পথটি যে ইট দিয়া বাঁধানো ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। যে রাস্তা ধরিয়া বরাবর আদিনা ষ্টেশন হইতে আসিয়াছিলাম, সে পথটি পাণ্ডুয়ার মধ্য দিয়া বরাবর দিনাজপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এ জন্ত এ পথটির নাম দিনাজপুর রোড।

আমরা প্রথমেই পাইলাম সেলামি-দরজা। এই দরজাটি সরকারী রাস্তার ঠিক পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। কথিত আছে, প্রথমে যখন বিখ্যাত মুসলমান-সাধু শাহ জালাল এখানে আসেন তখন এ স্থানে উপবেশন করেন। শাহ জালালউদ্দীন তবরেজী সর্ব্বপ্রথম বাঙলা দেশে আসিয়াছিলেন। 'শেক শুভোদয়া' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে, উহা হলায়ুধ মিশ্রের রচিত বলিয়া কথিত আছে। অনেকেই মনে করেন এ কথা সত্য নহে, কেন না বইখানি অশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। রাজ-মন্ত্রী মহাপণ্ডিত হলায়ুধ যে অশুদ্ধ সংস্কৃতে একখানি বই লিখিবেন তাহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সে যাহা হউক, ঐ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শাহ জালালউদ্দীন লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কালে গৌড় নগরে আগমন করেন এবং লক্ষ্মণসেন উক্ত শাহ জালাল উদ্দীনকে উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্ত বাইশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সেক শুভোদয়ায় লিখিত

আছে যে, ১২২৪ সংবতে ১০৬৮ খৃঃ অঃ শাহ জালালউদ্দীন গৌড়ে আসেন এবং একাদিক্রমে তাঁহার সভায় বার বৎসরকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এ কাহিনী অলীক। সেক শুভোদয়াকে কোনরূপেই প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা যায় না। ইতিহাসের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে প্রতীতি হয় যে, শাহ জালালউদ্দীন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেই এদেশে আসিয়াছিলেন। ইনি পারস্যের অন্তর্গত তব্রেজ সহরের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া নামের সহিত তব্রেজী নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। শাহ জালালউদ্দীন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন,— তিনি জ্ঞানান্বেষিরূপে বহু গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আবু সহিদ তাঁহার প্রথম গুরু। প্রথমে তিনি দিল্লী আসেন, কিন্তু নানারূপ অশান্তির জন্য ব্যথিত মনে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন। বাঙ্গালাদেশে আসিয়া তিনি বিস্তর সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, ঐ সম্পত্তির আয় ছিল বাইশ হাজার টাকা, সেজন্য উহা বাইশ হাজারী নামে প্রসিদ্ধ। শাহ জালাল এই সম্পত্তির আয় দীন-দুঃখী ও ফকিরদের সেবায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। আনুমানিক ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে শাহ জালালের মৃত্যু হয়। শাহ জালালের দরগা কোনও প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে। দরজার মাথার উপরিস্থ কাঠের উপরে লেখা আছে—"ইয়া আল্লাহো ও শাহ জালাল।" রাস্তার দুই দিকে বাঁশের ঝাড়, বেতের ঝাড়, বনজঙ্গল ও ভাঙ্গা ইটের ছোট ছোট বাড়ী ও সমাধি, আর স্থানীয় লোকের বাড়ী-ঘর। জনসংখ্যা খুবই কম।

সেলাম দরজা পার হইয়া অল্প খানিকটা দূরে বাইশ হাজারী বা বড় দর্গা অবস্থিত। এই দর্গাটি সুসংস্কৃত, দেখিলে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই মসজিদের গায়ে যে প্রস্তর-লিপি আছে তাহাতে সংস্কারের যে সন তারিখ লিখিত আছে তাহা হইতেছে হিজরা, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ। মসজিদ্ নিৰ্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে খোদিত বাক্য রহিয়াছে তাহার অর্থ, 'মোসলেম দীপ্তিমান্ হউক।' এই দর্গা সাধারণের নিকট জালালউদ্দীন মখদুম শার দরজা নামেও পরিচিত। জালালউদ্দীনের এই দর্গা ৭৪২ হিজ্রা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং উহা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন আলি মোবারক। কোথায় গেল সেই পুরাতন অট্টালিকার চিহ্ন! এই মসজিদের বহির্ভাগে একটি কবর আছে। কবরটি হইতেছে চাঁদ খাঁ কোতোয়ালের। এই মসজিদের উপকরণ সমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহা যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তির এবং মন্দিরাংশের ভগ্নাবশেষ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বড় দর্গার ধারে একটি পুকুর আছে। পুকুরটির জল বেশ ভাল দেখিলাম। পুকুরটির চার পাড় সুরক্ষিত। ঐ পুকুরটির ধারে একটি দালান আছে,তাহা সাধারণের নিকট লক্ষ্মণসেনী দালান নামে পরিচিত। স্বর্গত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেন, কেন যে ইহাকে লক্ষ্মণসেনী বলে, তাহা জানা যায় না। বড় দরগার এই অংশ কি রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ের অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে? কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেন নামক এক ব্যক্তি কিছুকাল এই দরগার মোতওল্লি ছিলেন, তিনি উক্ত দালান নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রস্তর-ফলকে দেখা যায়, বরদকল রাজের পুত্র রামরাম কর্ত্তৃক মহম্মদ আলি নামক অধ্যক্ষের আদেশে ১১১১ বাংলা সনে এই পুরাতন অট্টালিকার জীর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। এখানে আর দুইটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিলাম— একটির নাম ভাণ্ডারখানা। ১০৮৪ হিজ্রাতে বা ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে চাঁদ খাঁ এই দালানটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আমার সঙ্গে এখানে স্থানীয় কয়েক জন মুসলমান ভদ্রলোকের আলাপ হইল, তাঁহারা ও মোতওল্লী সাহেব আমাকে যত্নের সহিত সব দেখাইয়া দিতেছিলেন এবং অনেক কাহিনী বলিয়া যাইতেছিলেন— তাঁহারা আমাকে সযত্নে তন্দুরখানাটি দেখাইলেন। তন্দুরখানা ১০১৩ হিজ্রাতে সাদুল্লা খাঁ নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে, এই গৃহে শাহ জালালের চুল্লি আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, শাহ জালাল যখন তাঁহার গুরু সেখ শিহাবুদ্দীন শহরওর্দির সঙ্গে মক্কা যাত্রা করেন, তখন মাথার উপরে যে চুলা রাখিয়া নিজের গুরুকে গরম জল প্রদান করিতেন, ইহা সেই চুল্লির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। আসল চুলাটি না কি মাটির নীচে আছে! স্থানীয় লোকেরা বলিলেন যে, বড় দরগার সাধন-স্থানটিকে বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা রৌপ্যনির্ম্মিত রেলিং দিয়া সুশোভিত করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর বড় দর্গায় শাবান ও রজব মাসে এখানে মুসলমানদের মেলা হয়। শাহ মখদুম জালাল তবরিজীর সমাধি ইত্যাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এক কালে ২২,০০০ বিঘা পীরোত্তর নিষ্কর ভূমি ছিল। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে বাইশ হাজারী দর্গা বলে। এ স্থানে আরও অনেক পুরানো কবর দেখিলাম। কোন কোনটিতে খোদিত লিপিও রহিয়াছে।

পাণ্ডুয়া সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম পাণ্ডুয়া, অপর ভাগের নাম আদিনা।

বড় দর্গা হইতে আমরা ছোট দর্গা দেখিতে আসিলাম। এই দর্গাটি দিনাজপুরের রাস্তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দিনাজপুরের বালুকাকীর্ণ রাস্তাটি হইতে একটি রাস্তা ছোট দর্গার দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই দর্গার অপর নাম ছয় হাজারী দর্গা। এই দর্গার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্বে ৬০০০ হাজার বিঘা পীরোত্তর নিষ্কর জমি ছিল।

এই দরগার ইতিহাস এইরূপ—সেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক্ নামে এক জন সাধু ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম আসাদ্ লাহোরি। আলাউল হক্ আরবের বিখ্যাত খলিফা খালেদ্ বিন্ওয়ালিদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং রাজসরকারে কার্য্য করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। আলাউল হকের প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল, গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সুবর্ণগ্রামে ইঁহার অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। আখি সেরাজউদ্দীন ওস্মান ছিলেন ইঁহার গুরু। গৌড় নগরের অন্তর্গত সাদুল্লাপুরে এই মহাপুরুষের সমাধি রহিয়াছে। আখি সেরাজউদ্দীন দিল্লীর বিখ্যাত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। আখি সেরাজ বেশী বয়সে গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যু হইলে ইনি গৌড়নগরে আগমন করেন। গৌড়ের পাঠান নৃপতিরা অনেকেই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। আখি সেরাজউদ্দীন ওসমানের সমাধি-মন্দিরটি শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহে নির্ম্মাণ করেন। পরে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালে ঐ সমাধি-স্থানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। আখি সেরাজুদ্দীন পীরান্-পীর অর্থাৎ পীরেরও পীর এই নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।
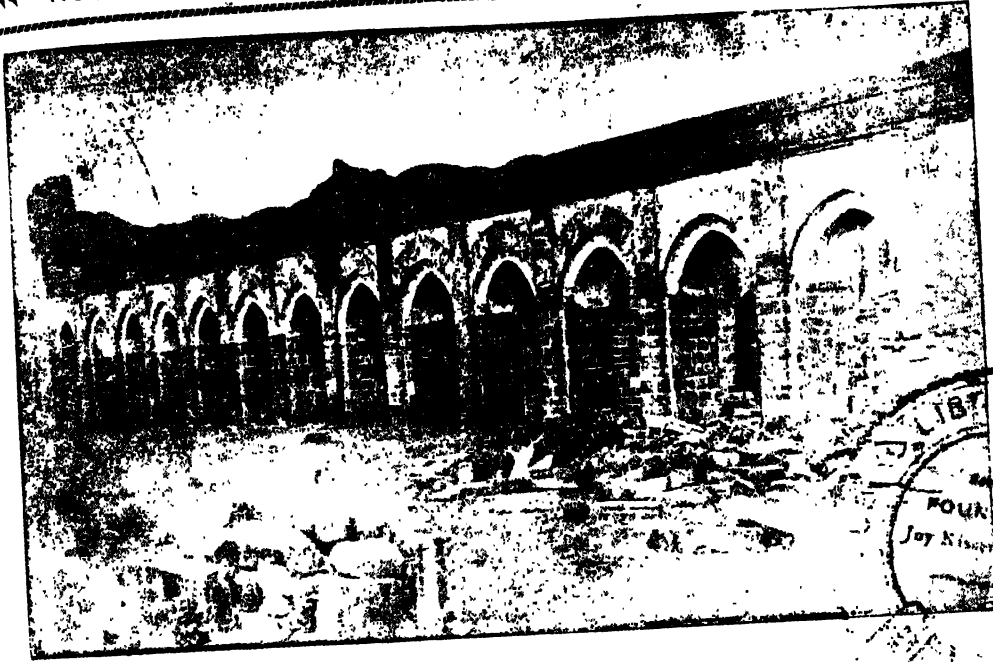
আদিনা মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

একটি গল্প আছে যে, আলাউল্ হক্ অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন—তাঁহার অহংকারের জন্য নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে —তুমি মূক হইয়া থাকিবে। আলাউল হক্ বোবা ছিলেন, পরে আখি সেরাজের শিষ্য হইলে তাঁহার মূকত্ব দূর হইয়াছিল।

আখি সেরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া নানা স্থানে যাতায়াত করিতেন, আলাউল হক্ তাঁহার সহিত পায়ে হাঁটিয়া চলিতেন এবং গুরুর সেবার জন্য সর্ব্বদা উষ্ণ খাদ্য মস্তকে ধারণ করিতেন। ইহাতে আলাউল হকের মাথায় টাক পড়িয়া গিয়াছিল।

সময় সময় শিষ্যকে লইয়া শিষ্যের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীও যাইতেন,—উদ্দেশ্য ছিল শিষ্যের অহংকার দূর হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করা।

আলাউল হক্ তৎকালে বিখ্যাত দাতা বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি এত দূর উদার—ছিলেন যে, একবার একটি লোককে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি আট হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের দুইটি বাগান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঐ বাগানে সে ব্যক্তির কোনরূপ স্বত্ব ছিল না। তাঁহার দান দেখিয়া সুলতান সেকেন্দর শাহের ঈর্ষার উদয় হয়। সেকেন্দর আলাউলকে সোনার গাঁয়ে পাঠাইলেন। সোনার গাঁয়ে তখন সেকেন্দরের পুত্র গিয়াসউদ্দীন রাজত্ব করিতেছিলেন। পিতা-পুত্রে সদ্ভাব ছিল না। আলাউল হক্ গিয়াসউদ্দীনের নিকট আশ্রয় পাইলেন। এখানে গিয়া দ্বিগুণ পরিমাণ দান করিতে লাগিলেন। সুলতান সেকেন্দরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াসউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিলে আলাউল হক্ তাঁহার সঙ্গে পাণ্ডুয়ায় আগমন করিলেন। তথায় ৮০০ হিজ্‌রাতে পরলোক গমন করেন। পাণ্ডুয়ায় ইঁহার কবর আছে। পিতা-পুত্রের কবর দূরবর্ত্তী নয়। আলাউল হকের সমাধি বাঙ্গালার স্বাধীন নবাব সুলতান নসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ছোট দর্গা যে নূর কুতব আলমের পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে তিনি আলাউল হকের পুত্র। ইনি রাজকুমার আজম শাহের সঙ্গে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর নামক নগরে হামিদউদ্দীনের নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করেন। নূর কুতব আলম হিন্দুরাজা গণেশের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা গণেশের সময় তিনি পাণ্ডুয়াতেই অবস্থান করিতেন।

নূর কুতব আলম ৮৫১ হিজরাতে (১১৪৭ খৃষ্টাব্দ) পরলোক গমন করেন। কুতব আলমের সমাধি-মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ছয় হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে। পাণ্ডুয়ার বড় দর্গাটি হইতেছে শাহ জালালের দরগা আর কুতব আলমের দরগার নাম ছোট দরগা। পাঠান রাজারা শাহ জালাল ও কুতব আলমের অত্যন্ত সম্মান করিতেন। প্রতি বৎসর রজব মাসের (শ্রাবণ) ২২শে তারিখে পাণ্ডুয়ায় শাহ জালালের উৎসব হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালার বাহির হইতে মুসলমান ফকির ও গৃহস্থেরা এই মেলায় আসে।

হজরৎ শাহ জালাল মোকামপীর নামেও পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। শাহপুরে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ ও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। শাহপুর, মোকদমপুর, কুতবপুর প্রভৃতি গ্রাম ইঁহাদের পবিত্র স্মৃতি স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শাহ জালালের সময় হইতে মোকদম সন নামে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল।

ছোট দরগার অপর নাম ভোলেশ্বরী। গৌড়ের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেন, কেন যে ইহাকে ভোলেশ্বরী বলে, তাহা জানা যায় নাই। অনুমিত হয়, এই সম্পত্তি ভোলেশ্বরী দেবীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থ হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। মুসলমানেরা ভোলেশ্বরীর সমুদয় ধ্বংস করিয়া দরগা স্থাপন করিলে সম্পত্তিটি দরগার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হয়।

আমরা বড় দরগার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছোট দরগা

দেখিতে আসিলাম। দর্গাটি কুতব আলমের মৃত্যুর প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণকর্ত্তার নাম লতিফ খাঁ (হিজরা ৮৬৩)। তখন বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন নাশিরউদ্দীন মহমুদ শাহ—তাঁহার রাজত্ব-কাল হইতেছে ১৪৪২ খৃঃ—১৪৬০ খৃঃ অঃ। লতিফ খাঁ সে সময়ে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

আমরা দর্গার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দিকের একটি ছোট ঘরের মধ্যে একটি তাম্রনির্ম্মিত বৃহদাকার জয়ডঙ্কা দেখিতে পাইলাম। নবাব মীরকাসিম এই জয়ডঙ্কাটি উপহার দিয়াছিলেন। মিঠা তালাও নামক ছোট দরগা সংলগ্ন পুষ্করিণীটির তখন সংস্কার চলিতেছিল।

মোজফর শাহ কর্ত্তৃক কুতব আলমের উত্তরাধিকারিগণের জন্ম চিল্লা বা বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরেরা কেহ কেহ এখনও সেই ধ্বংসপ্রায় অট্টালিকাতে বাস করিতেছেন।

দ্বিতীয় মামুদ শাহের রাজত্ব-কাল ৮১৬ (১৪১৩ খৃঃ অঃ) হিজরায় উলুক মজলিশ খাঁ যে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার শিলালিপিখানি এখানে রহিয়াছে।

ছোট দরগার মসজিদ ও চিল্লা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই দরগার প্রবেশ-দরজার নাম 'বেহেস্ত দরজা।' প্রাচীরের বাহিরের দিকে প্রাচীর ও রাস্তার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আলাউল হকের কবর আছে। নূর কুতব আলমের সমাধির পার্শ্বস্থিত প্রবেশ-পথের উপর নিম্নলিখিতরূপ খোদিত-লিপি আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে, "পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যু সুনিশ্চিত। (কোরাণ শরীফ ২য়, ১৮২)। বিধাতার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে কেহ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে যাইতে পারে না " (কোরাণ শরীফ ১০ম, ৫০) তিনি আরও বলেন,—পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই বিনষ্ট হয়, কিন্তু তোমার প্রভুর বদনমণ্ডল পূর্ণ গৌরব ও সম্ভ্রমে চির উজ্জ্বল থাকে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রভু—ইসলামের শিক্ষক, ধর্ম্ম-সমাজের প্রধান পুরুষ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ইস্‌লাম ও মোস্‌লেমের সাক্ষি-স্বরূপ যিনি হতভাগ্য ও দুঃস্থগণের প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন, সাধুদিগের ও অপর যাহারা ইচ্ছা করে, তাহাদের পরিচালক। সেই রাজার রাজা, বিশ্বাসীদের নগরের রক্ষক নাসির-উদ্দীন আবুল মোজঃফর মোহম্মদ সাহের (পরমেশ্বর তাঁহাকে নিরাপদে রাখুন) রাজত্বকালে, ৮৬৩ হিজরায় জিলহিজ্জি মাসের সোমবারে এই নশ্বর জগৎ হইতে চিরস্থায়ী বাসভবনে প্রস্থান করেন। এই সমাধি লতিফ খাঁ (পরমেশ্বর তাঁহাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।" *

পাণ্ডুয়া মুসলমান ধর্ম্মানুরাগীদের কাছে বিশেষ আদরণীয়—তাহার কারণ হইতেছে মখদুম শাহ জালালউদ্দীন ও নূর কুতব আলমের নাম-মাহাত্ম্য ; পাণ্ডুয়ার তীর্থযাত্রিগণ যে স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন, সেই বিশ্রামস্থলের নাম 'রাই হো'।

ছয় হাজারি দরগা হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইতেই সোনা মসজিদের কাছে আসিলাম, পথে কয়েক জন সাঁওতালের সহিত দেখা হইল, তাহারা কুঠার ও কোদাল হাতে করিয়া বনের দিকে চলিয়াছে। বাঙ্গলা বলিতে পারে। আমাকে বলিল, "তুই কি দেখতে আসৃচিস্।" আমি বলিলাম 'হাঁ, এবং প্রশ্ন করিলাম, তোরা কি করিস্ ? তাহারা হাতের কুড়াল উঁচু করিয়া কাঠ কাটিবার ভঙ্গী করিয়া দেখাইয়া কহিল, কাঠ কাটি, জঙ্গল পরিষ্কার করি, এ কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। অদ্ভুতকর্ম্মী এই সাঁওতালেরা। ম্যালেরিয়া ও বন্য হিংস্রজন্তুর আক্রমণ-ভীতি পরিহার করিয়া তাহারা পাণ্ডুয়ার আশে-পাশে পল্লী গঠন করিয়া চাষবাস করিতেছে।

মসৃজিদটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। স্থাপত্য-গৌরবে ইহা অতুলনীয়। মসৃজিদটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮০ × ৪০ ফুট। ইহা চতুষ্কোণ। ইহার চারি দিকে ইটের প্রাচীর—প্রাচীর প্রায় সাত ফিট পুরু। দরজাগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত।

আমরা স্থানীয় এক জন পথ-প্রদর্শক লইয়া মসৃজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরটি অতি সুন্দর, দুই ভাগে বিভক্ত—দরদালানের অনুরূপ। বারোকোণী থাম দ্বারা পৃথক্‌কৃত। উহার উপরে দশটি গুম্বজ। অতি উজ্জ্বল নীল মীনাকরা ইষ্টক দ্বারা এই মসৃজিদের গুম্বজ শোভিত ছিল বলিয়া ইহা সোনা মসৃজিদ নামে পরিচিত। সাধারণতঃ এই মসৃজিদটি কুতবশাহী মসৃজিদ নামে পরিচিত। মসৃজিদের গাত্র-সংলগ্ন তিনটি প্রস্তরলিপি হইতে মসৃজিদ নির্ম্মাণের ইতিহাস জানা যায়। মসৃজিদের মধ্যে দরজার প্রস্তরগাত্র সংলগ্ন খোদিত লিপিতে ৯১০ হিজরা; বেদীর উপর ৯৯২ হিজরা এবং প্রবেশ পথের তোরণ-দ্বারে ৯৯৩ হিজরা তারিখের খোদিত লিপি সংযুক্ত রহিয়াছে।

এই সোনা মসৃজিদের নির্ম্মাতার নাম—শাহ মখদুম আবিদ-রাজী। নির্ম্মাণের তারিখ ৯৯৩ হিজরা—১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ। সে সময়ে পাণ্ডুয়া এইরূপ পরিত্যক্ত বিজন অরণ্যানীতে পরিণত হয় নাই। মখদুম শাহ এই মসজিদের নাম কুতবসানি রাখিয়াছিলেন। কেন না, মখদুম আবিদরাজি—কুতববংশীয় মহম্মদ খালিদির পুত্র।

সোনা মসজিদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানটি বনজঙ্গলে ঢাকা। অল্প দূরেই ছোট একটি ডাক-বাংলো অবস্থিত। বেলা প্রায় ১টা বাজিয়াছিল। প্রখর রৌদ্রতেজে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তবু এই সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিবার কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই। আমরা এইবার একলাখী মসৃজিদ্ দেখিতে চলিলাম। দিনাজপুরের রাস্তাটি পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের রাস্তার অল্প দূরে সোনা মসৃজিদের পূর্ব্ব দিকে একলাখী মসজিদ অবস্থিত। একলাখী মসৃজিদটি এক সময়ে বন-জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল। এই মসৃজিদের ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থার চিত্র রেভেন্‌শ (Ravenshaw) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। মসৃজিদের মধ্যে জালাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহের সমাধি রহিয়াছে। তিনটি কবর আছে—মধ্যবর্ত্তী কবরটি স্ত্রীলোকের হইবে, কেন না, উহা পূর্ব্ব দিকের কবরটির মত তত বড় নহে। কানিংহাম সাহেবের মতে এই মসৃজিদের মধ্যে যদুর নিজের, যদুর স্ত্রীর ও তাহার পুত্র সামসুউদ্দীন আহম্মদের কবর আছে। মসৃজিদের অভ্যন্তর ভাগ অষ্টকোণী। উহার ব্যাস হইবে সাড়ে ৪৮ ফুট। প্রত্যেক কোণে অষ্টকোণী স্তম্ভ আছে। র‍্যাভেন্‌শ সাহেবের মতে এই কবর তিনটি সুলতান গিয়াসউদ্দীন, তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূর। ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র।

এই একলাখী মসৃজিদটি পাণ্ডুয়ার অতীত স্থাপত্য-সমৃদ্ধির পরিচায়ক। অভ্যন্তর ভাগ অতি সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত।

---

* গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, পরিশিষ্ট ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
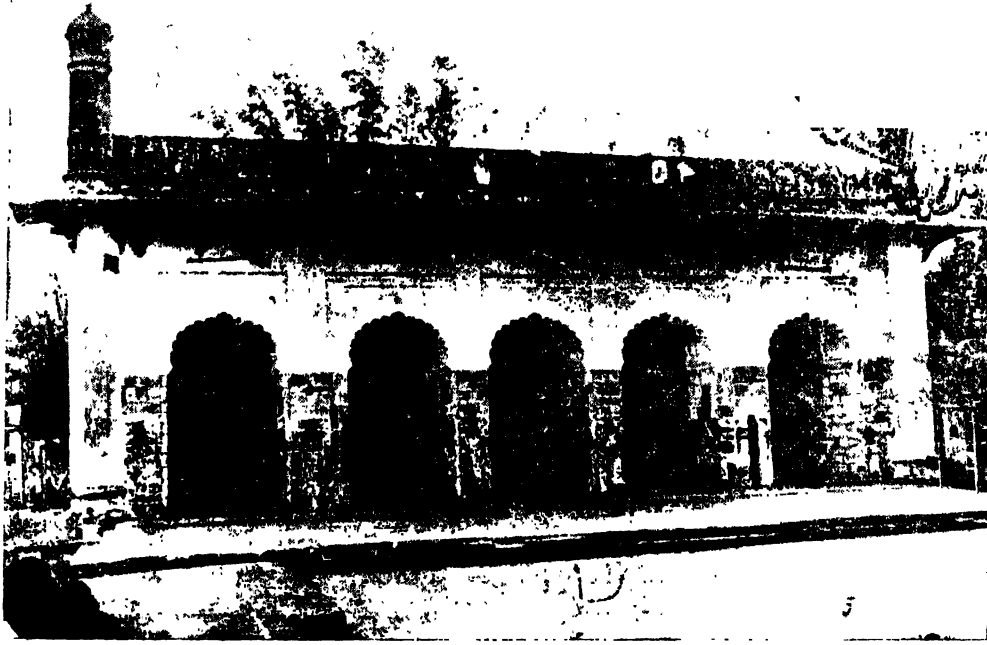
বড় দর্গা—পাণ্ডুয়া

মসৃজিদ্‌টি যে হিন্দু মন্দিরের বিবিধ উপকরণ দ্বারা নিম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই সমাধি-মন্দির ও মসৃজিদ্‌ নিম্মাণে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল; সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছে একলাখী মসৃজিদ। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"জালালউদ্দীন মহ্‌ম্মদ্‌ শাহের রাজ্যকালের কোন শিলা-লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। রিয়াজ্‌উস্‌ সালাতীন অনুসারে তিনি গৌড়ে একটি মসৃজিদ্‌, দুইটি জলাশয় ও একটি পান্থশালা নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।" কথিত আছে যে, তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া জন-পরিপূর্ণ বিস্তৃত জনপদে পরিণত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন রাজধানী গৌড় পুনরায় জনসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছিল। গোলাম হোসেন বলেন যে, পাণ্ডুয়ার একলাখী নামক হর্ম্ম্য জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ, তাঁহার পুত্র ও পত্নীর সমাধি। রাভেনস্‌ বলিয়াছেন যে, একলাখী সুলতান গিয়াসউদ্দীন, তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূর সমাধি। বাঙ্গালাদেশে গিয়াসউদ্দীন উপাধিধারী তিন জন মুসলমান রাজা ছিলেন; বল্‌বনের প্রপৌত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদর শাহ বন্দিরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম্‌ শাহ ঢাকা জিলার মগ্‌ড়াপাড়া গ্রামে সমাহিত আছেন এবং হুসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াসউদ্দীন মহ্‌মুদ শাহ, ভাগলপুরের নিকট কহলগাঁয়ে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং একলাখী জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের সমাধি হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

কানিংহামের মতানুসারে একলাখী বাঙ্গালাদেশে পাঠান রাজ্য-কালের স্থাপত্যের অতি সুন্দর নিদর্শন।

একলাখী সমভুজ চতুষ্কোণ, একটি মাত্র খিলান আছে এবং ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সার্দ্ধ সপ্ত পঞ্চাশৎ হস্ত। কোনও হিন্দু বা বৌদ্ধ-মন্দির ধ্বংস করিয়া একলাখী নিম্মিত হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্য নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। একলাখীর তোরণ এক কালে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধমন্দিরের দ্বার ছিল, কারণ এই ব্রহ্মশিলানিম্মিত তোরণের নিম্নদেশে এখনও খর্ব্বকায় দুই-একটি দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াজউস্‌ শালাতীন্‌ অনুসারে জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ সপ্তদশবর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। এই জালালউদ্দীন ছিলেন রাজা গণেশের পুত্র *

রাজা গণেশ
|
যদু বা জালালউদ্দীন মহম্মদ্‌ শাহ
|
শমসৃউদ্দীন আহমদ্‌ শাহ,

---

* রিয়াজউস্‌ সালাতিন্‌, ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ১১৮ (২) Ravenshaw's Gaur, its ruins and inscriptions, P 58. Cunningham's Report of the Archaeological Survey of India, Vol. xv. p. p 88—99 বাঙলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮২-১৮৩।

রাজা গণেশ ছিলেন পাণ্ডুয়ার এক অসাধারণ প্রতাপশালী হিন্দু ভূপতি। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে কানস্ নামে এক জন হিন্দু জমিদার প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের প্রপৌত্র অথবা বৃদ্ধ-প্রপৌত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫১০ শকে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) ঈশান নাগর রচিত অদ্বৈতপ্রকাশ প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পৃষ্ঠার আছে :

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি' খ্যাত।
সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ও ঝারে বংশজাত।
যেই নরসিংহ যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ।
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদ্সাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা।"

হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা রাজা গণেশের পুত্র যদু কেন মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করেন সে বিষয়ে প্রকৃত সত্য নিরূপণ এখনও হয় নাই। নানা জনে নানারূপ মত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বলেন, যদু ইলিয়াস্ শাহের বংশজাতা কোন সম্ভ্রান্তা মুসলমান রমণীর রূপে মোহিত হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন—যদু আজম শাহের কন্যা আসমানতারার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে, যদুর মুসলমান-পত্নীর নাম ফুলজানি বেগম ইত্যাদি।

আমরা অতঃপর চলিলাম পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মস্জিদ দেখিতে। পথের দুই ধারে জঙ্গল, ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ, অট্টালিকার ভগ্নাংশ, অসংখ্য লেবু গাছে পূর্ণ—আমরা সেই জংলা লেবু অনেক সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। অনেকের মতে—আদিনা মস্জিদের ন্যায় বিশাল মস্জিদ্ ভারতবর্ষে কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। রিয়াজ্-উস্ সালাতীনের মতে এই মসজিদের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। আদিনার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত অনেক হিন্দু দেব-দেবী, হিন্দুমন্দিরের উপকরণ, গণেশ মূর্ত্তি, ভগ্ন হিন্দুমন্দিরের সোপানাবলী এবং মস্জিদটির পশ্চাৎ দিকে একটি গৌরীপট্ট ও জলনিঃসারণ পথে মকর-মুখ জলনির্গম পথ দেখিতে পাইয়াছিলাম। আদিনা মস্জিদের বেদীর নিম্নভাগের ভগ্ন সোপানাবলীর মধ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি ভগ্ন দশভূজা মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল। আদিনা মস্জিদের বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ যাহা আছে তাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ শত ফুট ও প্রস্থে তিন শত ফুট।

আমরা পথ হইতে সিঁড়ি বাহিয়া মসজিদের বিরাট তোরণ দিয়া মস্জিদের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কি বিরাট সুবিস্তৃত অভ্যন্তর ভাগ, মনে হয় এক লক্ষ না হইলেও অন্ততঃ দশ-বারো হাজার লোক এখানে অনায়াসে নামাজ পড়িতে পারিত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরনির্ম্মিত মিহরাব, ফুল, লতা, পাতা, পদ্মফুল প্রভৃতি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সেকালের ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য কিরূপ উন্নত-ধরণের ছিল।

মসজিদের ভিতরের অঙ্গন এখন অপরিচ্ছন্ন এবং স্তূপীকৃত জঞ্জালে পূর্ণ। সেই অঙ্গনের তিন দিকে দুই শ্রেণীর স্তম্ভ ও দুইটি প্রাচীর-বাহিত তিন শ্রেণীর স্তম্ভ ছিল! চতুর্থ দিকে চারি শ্রেণীর স্তম্ভ ও দুইটি প্রাচীর-বাহিত পাঁচ শ্রেণীর স্তম্ভ ছিল। এই দিকের মধ্যভাগে বিশাল তোরণের নিম্নে কারুকার্য্যখচিত কষ্টি পাথরের নির্ম্মিত একটি বেদী, দুইটি মিহরাব ও খিলান আছে। এই দিকের এক দিকটা দ্বিতল। উহার নাম বাদ্শাহ কা তখৎ। আমি উহার উপরে উঠিয়া খানিকক্ষণ শুইয়া বিশ্রাম করিলাম এবং একান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছিলাম চারি দিকের গভীর বনজঙ্গলের ভিতর কত ধ্বংসাবশেষ, কত রাজপথ, কত দীঘি-সরোবর আছে কে তাহার সন্ধান লইবে। মানুষের এত দিনকার শত কীর্ত্তির কি শোচনীয় পরিণাম।

মসজিদের বহির্ভাগে সিকন্দর শাহের পাষাণ-নির্ম্মিত সমাধি বিদ্যমান আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। পরিসর প্রত্যেক দিকে ২১ ফুট ১ ইঞ্চি। দেওয়াল ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি পুরু। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ফাঁকা। এই বিরাট আদিনা মসজিদের—৭৬৬ হিজরায় (১৩৬৪ খৃঃ অঃ) সেকেন্দর শাহের আদেশে নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। রিয়াজ্-উস্ সালাতিনের মতে সেকেন্দর শাহ এ মস্জিদের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আদিনা মস্জিদে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উহা ৭৭০ (১৩৮৬ খৃঃ অঃ) হিজরার রজব মাসের ৬ষ্ঠ দিবসে লিখিত হইয়াছিল। মস্জিদের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে আর বিস্তার পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে। আদিনা মস্জিদে প্রবেশ করিবার দ্বার বেশী নাই। পশ্চাতে ছোট দুইটি খিড়কী দরজা, ঐ পথে সুলতান এবং মোল্লারা মস্জিদে প্রবেশ করিতেন।

"গৌড়ের ইতিহাস"-প্রণেতা স্বর্গত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেন, "কোন প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ভাঙ্গিয়া তাহারই স্থানে এই মস্জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মালমসলা হিন্দুদেবালয় হইতে গৃহীত হইয়াছে।"

সিকন্দর শাহ এই মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ। ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে মস্জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

আমরা মস্জিদের সম্মুখস্থিত ছোট খিড়কি দরজা দিয়া ভগ্ন জীর্ণ ইষ্টক-নির্ম্মিত পথ ধরিয়া সাতাশঘরা দেখিতে আসিলাম। ইহার দূরত্ব আদিনা মস্জিদ্ হইতে প্রায় এক মাইল হইবে। বনজঙ্গলের পথে—বাঁশ-ঝাড় বুনো লতা-গুল্মের মধ্য দিয়া প্রাচীর দীঘি ও পুষ্করিণীর তীরস্থ সর্পসঙ্কুল পথে, কখনও বা মুক্ত মাঠ দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে সাতাশঘরায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রবাদ, এই স্থানে সেকেন্দর শাহের বিরাট প্রাসাদ ছিল, কিন্তু কোথায় তাহার শেষ চিহ্ন মিলাইয়া গিয়াছে! সাতাশঘরা নাম কেন হইল? সাতাশটি ঘর ছিল বলিয়া কি সেই প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল? না সাতাশ ঘর লোকের বসতি ছিল এই পল্লীতে—বলা কঠিন। আমরা ভীত মনে একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চব্বিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এই অষ্টকোণ ঘরটি মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

সাতাশঘরার নিকটেই একটি সুন্দর দীঘি দেখিলাম। দীঘিটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। প্রায় ২০০ হাত দীর্ঘ ১০০ হাত প্রশস্ত হইবে। দীঘির চারি পারেই গভীর জঙ্গল, বড় বড় গাছ—নিবিড় বন, বাঁশ ও বেতের ঝাড়।

এই দীঘির চারি পারের বনাকীর্ণ ভাগ মধ্যে ইষ্টকস্তূপ, প্রস্তর-খণ্ড কত কি যে পড়িয়া আছে ইয়ত্তা নাই। হয়ত এই দীঘিটি হিন্দুরাজা গণেশ খনন করিয়াছিলেন এবং হয়ত একদিন ইহার চারি দিকে রাজপরিষদ ও মন্ত্রিগণ বাস করিতেন।
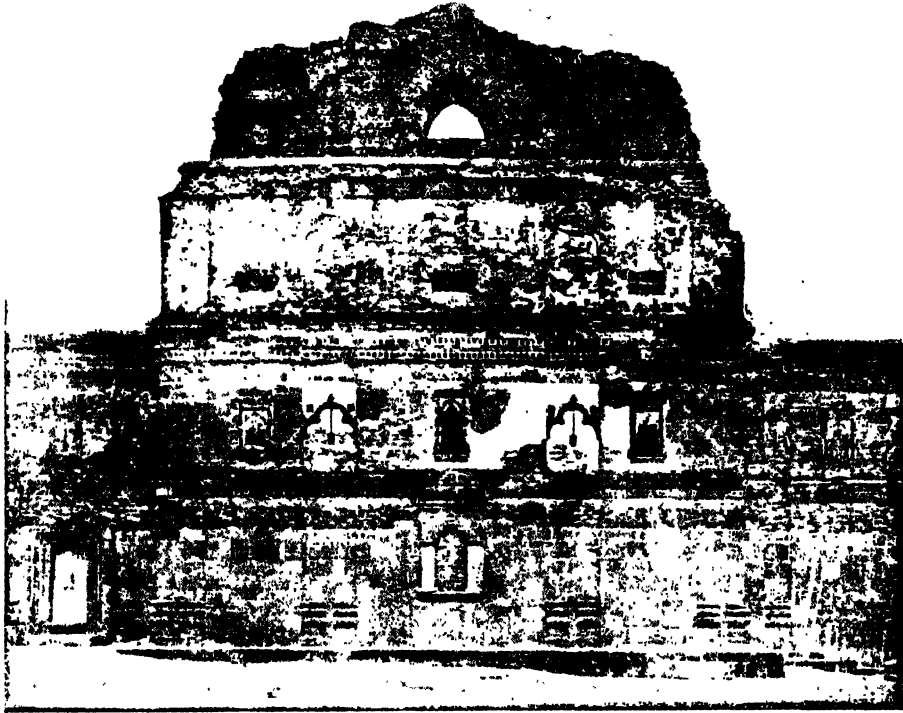
আদিনা মসজিদের পশ্চাদ্ভাগ

পাণ্ডুয়া যে এক সময়ে হিন্দুরাজাদের রাজধানীরূপে এবং বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজাদের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা এখানে আসিলে এখানকার দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে নগরী এক সময়ে দৈর্ঘ্যে ছিল ষোল মাইল, বিস্তার ছিল প্রায় তিন মাইল বা চার মাইল, সেই বৃহৎ ও সুন্দর নগরীর পরিচয় দেওয়া কি সহজ! পাণ্ডুয়ার অতি সামান্য কীর্ত্তি-চিহ্নই আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। কালের কবলে পাণ্ডুয়ার কত কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে তাহার সন্ধান লইবে!

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের অধিকাংশই এইরূপ ভাবে অনাদৃত ও উপেক্ষিত অবস্থায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানের শত কীর্ত্তি-বিভূষিত পাণ্ডুয়া এখন পরিত্যক্ত—বনজঙ্গলাকীর্ণ। এখন যাহা কিছু দেখিবার আছে—তাহা শুধু মোশলেম কীর্ত্তি। হিন্দুকীর্ত্তি—হিন্দুমন্দির বৌদ্ধবিহার সমুদয় মুসলমানের হাতে নির্ম্মম ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। জিয়া বারনির মতে (Zia Barni) একডালা দুর্গ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। রিয়াজের মতে ছিল গৌড়ের কাছাকাছি—এ বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ প্রচলিত।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আদিনা ষ্টেশনে না পৌঁছিলে পথে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাই গাড়োয়ানের তাড়ায় ক্লান্ত ও শ্রান্তদেহে অবসন্নের মত গাড়ীর মধ্যে শুইয়া রহিলাম। আদিনা ষ্টেশনে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন ষ্টেশন-মাষ্টারের গৃহে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়াছে। আমরা কোনরূপে স্নান সারিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের গৃহিণীর সযত্ন-পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলাম। রাত্রি নয়টার সময় যখন গাড়ী আসিল তখন নিশ্চিন্ত হইলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতির বুকে এত দিনের রাজধানী পাণ্ডুয়া নগরী দূরে মিলাইয়া গেল। এমনি করিয়াই মহাকাল ধ্বংসের পর ধ্বংস করিয়া নৃত্য করিয়া চলিয়াছে।

উদ্ভট কবিতা

শ্রীমহাদেব রায়

১

সুখ-শয্যা রচিলেন কমলা কমলে
শয়ন করেন শিব গিয়া হিমাচলে,
মৎকুণের অত্যাচারে নিজে ভগবান্,
সমুদ্রে রচিয়া শয্যা তবে নিদ্রা যান।

২

'অত্যন্ত অমৃত বিষ', সর্ব্বশাস্ত্রে কহে,
পাতালের দণ্ড আজও বলি রাজা বহে,
অতি প্রেমে বাঁধা পড়ি অর্দ্ধ-নারীশ্বর
প্রিয়া-মুখ হেরিতে না পান মহেশ্বর।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১০

বিপিনবিহারী শৈলেনকে লইয়া পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরের কথা। বিকাল থেকে বৃষ্টি নামিয়াছে। কোন্ ছেলের—হয়তো শশাঙ্কর সাধ হইয়াছিল খিঁচুড়ি খাইবার, তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। এটা-ওটা খাইবার সাধ হয় বেশি করিয়া শশাঙ্করই; সাঁতরায় অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার নাড়ী অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এখানকার জল-হাওয়ায় সুস্থ হইয়া পুষ্টি চায়।

শৈলেনের সে রাত্রিটি বেশ মনে পড়ে; বাহিরে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। একটা জানালা দিয়া বাহিরে একটা কিসের ঝোঁপের জমাট অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি দেখা যায়,—সবাই একসঙ্গে আছে বলিয়া ভরসার সঙ্গে একটা নিরর্থক ভয়ের ভাব মিশিয়া চমৎকার লাগিতেছে। এবারে দেশ থেকে বাবা একটা নূতন ধরণের টেবিল-ল্যাম্প কিনিয়া আনিয়াছেন সেইটা জ্বালা হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল আলোকে ঘরটা ভরিয়া গিয়াছে। এক দিকে আছেন বাবা, দুই পাশে শশাঙ্ক আর শৈলেন; সামনের দিকে বসিয়াছে হরেন, পূর্ণেন্দু; হরেনের মুখখানা স্বভাবতঃ রক্তাভ, ভোজনের তৃপ্তিতে আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সামনে মা হাতে একটা রেকাব লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; কি সব গল্প হইতেছে।

এখন, যখন দৃশ্যটি স্মরণ-পথে উদয় হয়, শৈলেনের সারা মনটা একটা পূর্ণতার ভাবে ভরিয়া ওঠে। কৈশোরের মন নিশ্চয় স্পষ্টরূপে ভাবগ্রাহী ছিল না, তবু একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে ঐ ধরণের একটা কিছুর আভাস ছিল বলিয়া মনে হয়! একটা কি হাসির কথা হইয়া গেছে, সবার মুখে প্রসন্নতার জেরটা তখনও লাগিয়া আছে; শৈলেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আহা, অহি যদি থাকত বেশ হোত, না মা?"

অহি একেবারে শয্যা-ধরা, উঠিবার সামর্থ্য নাই।

বেশ মনে পড়ে, মায়ের মুখটা অত আলোর মধ্যেও যেন ম্লান হইয়া গেল। দাদার এই সব বৈশাদৃশ্যের চেতনাটা ছেলেবেলা থেকেই খুব প্রখর, নীচু মুখেই ঘাড় বাঁকাইয়া নীরব তিরস্কারে শৈলেনের মুখের পানে চাহিল। মায়ের মুখ আর দাদার দৃষ্টি—এই দুই মিলাইয়া শৈলেন বুঝিল কথাটা ভুল হইয়া গেছে।

বাবা সামলাইয়া লইলেন; অবশ্য নিজেও একটু কি-রকম হইয়া যাইবার পর; প্রশ্ন করিলেন—"একটা মজার কথা শুনেছ গা?"

মা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন—"কি কথা?"

বাবা বলিলেন—"শৈলেন সেদিন দেশে পাণ্ডুল খুঁজতে বেরিয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তখন…কি বলেছে তোকে রে শশাঙ্ক?"

শশাঙ্ক বলিল—"হ্যাঁ, বলছিল মা এসে যেন…"

শৈলেন লজ্জিত ভাবে বলিল—"যাঃ।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আমায়ও বলছিল, আমার মতন কে যেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে,—ওকে খাইয়ে দিলে…"

বাবা বলিলেন—"ও না কি বলছে তোমার চেয়ে ঢের ভালো।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"তা কি হতে নেই?…কিন্তু তাহলে চলে এল কেন?"

"সে তো আমি নিয়ে এলাম বলে। আবার ভাবছি রেখে আসব,—আরও ভালোই যখন পেয়েছে।"

মা আবার হাসিয়া বলিলেন—"তা' তুমি পার। না বাপু, মন্দ মাকেই ঘেরে-ঘুরে থাকুক সব, দু'টো বছর যা করে কেটেছে, ঠাট্টাতেও ভয় হয়।…শৈল, তোকে আর একটু পায়েস দোব?"

বাবা একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওর দেশের—গর্ভধারিণীর ভয়ে যে তুমি সত্য সত্য ভালো হয়ে উঠছ ওর কাছে!"

অহির উল্লেখের বেদনাটুকু কাটিয়া গিয়া আবার পূর্ণতার রূপটি প্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় শোবার ঘর থেকে খুজনী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিল—"হে দুলহীন, দৌড়্!—অহি-বউয়াকে দেখু!"

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের হাওয়া যেন বদলাইয়া গেল। মা ব্যাকুল, অসহায় ভাবে বাবার পানে চাহিলেন, যেন একটা উৎকট সুনিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন হইতে পা উঠিতেছে না। বাবা ক্ষণমাত্র তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"এসো, দেখি।"

দাওয়াতেই একটা বালতি ছিল, প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই একটা কুলকুচি করিয়া শোবার ঘরে চলিয়া গেলেন। শৈলেনরা চার ভাইও উঠিয়া পড়িল। মা যেন কত দিনের রুগ্নার মতো নিজেকে টানিয়া টানিয়া ও-ঘরের দাওয়া পর্যন্ত গেলেন কোন রকমে—যে-কোন মুহূর্তেই মোক্ষম কথাটা যেন কানে আসিয়া যাইতে পারে; তাহার পর দাওয়ার

দেয়ালে ঠেস দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চাপা-গলায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহারা ছোট তিন ভাইয়ে বিহ্বল ভাবে মাকে ঘিরিয়া বসিল, বড়কে ভগবান বোধ হয় সৃষ্টিই করেন আলাদা করিয়া একটু—শশাঙ্ক আস্তে আস্তে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বাবার কাছে দাঁড়াইল।

প্রায় মিনিট-পাঁচেক পরে বাবা গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"ভালো আছে, এসে বোস একটু, আমি ওষুধ দিই একটা।" সঙ্গে সঙ্গেই রাগিয়াও উঠিলেন একটু—"এ কি অলুক্ষুণে কান্না তোমার! শুধু কেঁদে রাখতে পারবে?"

খঞ্জনী ও-বাড়ী থেকে শৈলেনদের জেঠাইমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ-রকম করে যদি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসো কথায় কথায়, বৌদি, তো…"

ও-বাড়ি থেকে জেঠামশায়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বাবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"সামলে উঠেছে।"

জেঠামশাই একটু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আজ-কাল একটু ঘন ঘন হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, বুধবার দিন হয়েছিল, পাঁচ দিন হোল।"

"তাহলে?"

"ওষুধ দিচ্ছি।"

"একবার মধুবাণী হাসপাতাল থেকে…"

শৈলেন উৎকট ঔৎসুক্যে প্রতি-প্রশ্ন—উত্তরে পারাপারি করিয়া দুই জনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, জেঠামশাইয়ের প্রস্তাবে বাবা এমন করিয়া একটু হাসিলেন যে তিনি কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না।

অহির ছিল আজ-কাল ডাক্তারি-ভাষায় যাহাকে বলে রিকেট্স্। জন্ম হইতেই দুর্বল, ওর বয়স হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাড় ছিল না। যত দিন একেবারে শিশুটি ছিল তত দিন আশায় আশায় ওকে লইয়া সবাই একটু বুঝিল, তাহার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখা গেল ওর দেহ-মন একেবারেই সাড়া দিতেছে না, তখন নিরাশ হইয়া একেবারে স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। কখনও এটা কখনও সেটা—এই করিয়া একটা চিকিৎসা বরাবরই চলিল বটে, কিন্তু তাহার অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতায় সবাই যেন একটু উদাসীন হইয়া রহিল, শুধু অনিশ্চিত ক্ষণিকের অভ্যাগত বলিয়া তাহার উপর সবার করুণাটা ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।…আহা! দু'টো পোষাক ও বেশি পরুক; খা'ক দু'টো ভালো জিনিস—ডাক্তারদের মানা অত দেখিতে গেলে চলে না।

ঠাকুরমা, বাবা, কাকা, কাকিমা—সবাই চরম সত্যটিকে মানিয়া লইয়াছেন; শুধু মানিতে পারেন নাই মা। অহি চিরকালটা নিশ্চয় এমন থাকিবে না—শীতটা গেলেই যখন ফাগুনের নূতন হাওয়া দিবে, অহি এই বয়সে যেমনটি হওয়া উচিত হু-হু করিয়া তেমনটি হইয়া উঠিবে—কামারটুলির পড়াউয়ের বৌ বলিয়াছে।

বসন্ত গেল, পড়াউয়ের বৌ বলিল—এবারে বসন্তে যে আমের মঞ্জরী হইল না, ফাগুনের হাওয়াটায় তেজ ছিল কি না; তাই বলিয়া পরের ফাগুন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না, গরমটা কাটিয়া গিয়া একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই শরীর ঠিক হইয়া যাইবে অহির। পড়াউয়ের বৌয়ের ব্যবস্থায় বড়্হম্ ঠাকুরের পূজা দেওয়া হইতেছে নিত্য। গরম গেল, বর্ষাও শেষ হইয়া শীতের আমেজ শুরু হইল, ঠিক যে সময় গিরিবালা ভাবিতেছেন অহির শীতের জামা এবার একটু বড় করিয়া করাইতে হইবে, পড়াউয়ের বৌ আসিয়া খবর দিল, হস্তা-নক্ষত্রের দুর্জ্জয় বৃষ্টিতে বড়্হম্ ঠাকুরের নিজের চালাটি নষ্ট হইয়া গেছে, তিনি নিজেই একটু বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! গ্রামের সবাই চালাটি আবার তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, হয়, ভালোই, নয়তো বোধ হয় এ-শীতটা এদিকে নজর দিতে পারিবেন না ঠাকুর। তবে পূজা খাইয়াছেন, ভয়ের কারণ নাই।…গিরিবালা লুকাইয়া পড়াউয়ের বৌয়ের হাতে দু'টা টাকা গুঁজিয়া দেন, বলেন—"এই দু'টি ছিল আমার কাছে পড়াউয়ের বৌ, দেখ যাতে ঘরটা শীগ্‌গির ওঠে; কেউ যেন না টের পায় কিন্তু।"

কালচক্র আবর্তিয়া চলে! শুধু তো পড়াউয়ের বৌ-ই নয়, আরও সবাই আছে। শ্যামার ঠাকুরমা বলে—"হে নয়কী দুলহীন, তোমরা বাঙালীরা যে কী বুঝি না বাপু। দুখ্‌নার খুড়ি জলজ্যান্ত ডাইন, অথচ তাকে নৈলে আমাদের চলে না, ছেলে ভালো হবে কি করে?…" গিরিবালার মুখ শুকাইয়া আসে, কিন্তু ডাইন বলিয়াই আরও দুখনার খুড়িকে চটাইতে সাহস হয় না। খোসামোদ করেন—রীতিমতো পূজা—চাল, ডাল, আলু, নুণ, যখন বেটীর জন্য হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। মাগিটা গরীব, কিন্তু ভালোমানুষ, দুলহীনের দয়ার জন্য যথাসাধ্য গতর খাটাইয়া দিয়া যায়। অন্য কাজ না থাকিলে অহিকেই লইয়া খেলা করে। তেলের সঙ্গে এক রকম হলুদ মশলা মিশাইয়া 'উপটন্' তৈয়ার করিয়া ডলিয়া ডলিয়া মাখাইয়া দেয়, বলে—"হে নয়কী দুলহীন! ছেলেটাকে তুমি ও-সব বাজে ওষুধপত্র ছাড়িয়ে আমার হাতে ছেড়ে দাও দিকিন—ডলে-মলে আমি পাথর করে দেব ছেলেকে। আমার দুখ্‌নাকে দেখেছো তো? ছেলেবেলায় ঠিক এই রকমটি ছিল। ভরোসিয়ার দিদিমা ডাইন ছিল কি না, তাই নজর লেগেছিল।… আমার কাছে ডাইন! এমন 'উপটন্' দিয়ে ডলে-মলে দোষ যে ছেড়ে যেতে পথ পাবে না!…"

ডাইনের মুখের কথা, এক ধরণের সাহসও হয় একটা, তাহারই সঙ্গে আবার ভয়; মায়ের মন, ভালো বা মন্দ—কোন একটা অনুভূতিকে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোন একটা ছুতা করিয়া গিরিবালা ঘরের মধ্যে চলিয়া যান, তাহার পর দুয়ার বা জানালার খুব সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র দিয়া উগ্র ঔৎসুক্যে দুখ্‌নার খুড়ির দিকে চাহিয়া থাকেন—কি রকম চোখের ভাবটা!—চাটিয়া দিতেছে না তো!—কোন তুক্ করিতেছে না তো!…কেমন যেন সম্মোহিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, কতটা সময় গেল, খেয়াল থাকে না। একাগ্র-চিত্তে খুব করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া তেল মাখাইয়া ছড়া আওড়ায় দুখ্‌নার খুড়ি—

সোনাকে কটোরামে উপটন্ তেল,
বউয়াকে লাগায় দেলি দশ-বিশ বের—
বাবু, দশ-বিশ বের………

আরও কত কি সব। তাহার পর ডাক দেয়—"কোথায় গো নয়কী দুলহীন! আমি যাই এবার বাপু।" অহিকে সোজা করিয়া

লাগাইয়া বুকের তেলটা মালিস করিতে করিতে ঝোঁকে ঝোঁকে ঠোঁট মুখ বিকৃত করিয়া বলে—"ঝাঁটা মারি আমি ডাইনের মাথায় —সাত ঝাঁটা মারি—মুড়ো ঝাঁটা।······

কি রকম একটা অদ্ভুত শক্তি আসে গিরিবালার মনে। ডাইনিই দুখনার খুড়ি, সেই জন্য সঙ্গোপনে ওর কার্য্যকলাপ দেখিয়া মস্ত বড় একটা ভরসা হয়। খোসামোদ করেন—"বড্ড ভালোবাসিস অহিটাকে না রে দুখ্‌নার খুড়ী? দে ওকে ভালো করে, এক জোড়া শাড়ি পাবি তোকে।···তোকে সর্ব্বদাই যে আসতে বলছি তা নয়, গরীব মানুষ, নানা জায়গায় গতর খাটিয়ে খাস, সময় কোথায় তোর?"

যদি দু'মুঠা ডালের জন্য আসে, দু'টি চালও দিয়া দেন কোঁচড়ে; চালের জন্য আসিলে দু'মুঠা চিঁড়াও দিয়া দেন; বলেন—"গরীব মানুষ, তোরা দু'টো খেতে পেলে আমার অহির কল্যাণ। সত্যিই তোর মন বলছে যে ছেলেটা ভালো হয়ে যাবে?"

দুখ্‌নার খুড়ি বর্ষীয়সী, গিরিবালার চেয়ে ঢের বড়, কৃত্রিম রাগের সহিত একটু ধমক দেয়, বলে—"অলুক্ষুণে ভাবনাগুলো তুমি ছাড়ো দেখি লক্ষ্মী ঠুলহীন। ফাগুন মাসটা দো'রসার সময়, একটু গরমটা ভালো করে পড়ুক, অহি যদি ছুড়মুড়িয়ে মাথা-ঝাড়া দিয়ে না ওঠে, তুমি দুখ্‌নার খুড়িকে ডেকে সাত ঝাঁটা গুণে গুণে মেরো।"

গ্রীষ্ম ভালো করিয়া পড়িতে একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিল। এত দিন পর্য্যন্ত এক অতিরিক্ত দৌর্ব্বল্য আর বুদ্ধির অভাব ছাড়া আর অন্য কোন দোষ ছিল না, বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে মাঝে মাঝে ফিট হইতে লাগিল। মধুবাণী হইতে ডাক্তার আনিয়া দেখান হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না, ফল হইবে বলিয়া ডাক্তার কোন ভরসাও দিতে পারিলেন না। বৈশাখ মাসে একবার হইল; বিপিনবিহারী শ্বশুরকে লিখিয়া একটা ঔষধ আনাইয়া লইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি একবার হইয়া আষাঢ় ও প্রায়-সমাপ্ত শ্রাবণ মাসটা ভালো রহিল অহি। শ্রাবণের শেষাশেষি হইতে কিন্তু হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন আসিল ভাদ্র মাসের গোড়ায়, তাহার আগে দিন-বারোর মধ্যে দুইবার ফিট হইয়া গেছে অহির, আবার পাঁচ দিনের মাথায় তাহার সামনেই হইল।

গিরিবালার মোহেও ভাঙন ধরিল। মৃত্যুর এমন স্পষ্ট সূচনা দেখিয়া কি যে করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন অবস্থা হইয়াছে যে আক্রমণটা হইলে তিনি আর সামনে যাইতে পারেন না, মাঝ-পথেই তাঁহার যেন পা ভাঙিয়া মুড়িয়া যায়, বসিয়া পড়েন। তাঁহাকে লইয়াই যেন একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

বিপিনবিহারী যখন সাঁতরায় যান তখন অহির এ-রকম ভাবটা ছিল না। নূতন চিকিৎসায় শ্রাবণ মাসটা বরং ভালই ছিল এক হিসাবে, নহিলে তিনি মাকে লইয়া আসিতেন। আসিয়া অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য চণ্ডীচরণকে লেখে পাঠাইয়া দিলেন।

আয়োজনের মধ্যে দিয়া মৃত্যু যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল গিরিবালার কাছে। একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে মৃত্যুর সঙ্গে। আতঙ্ক, অথচ প্রতিক্ষণেই তাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে নিকট থেকে আরও নিকটে। তাহার পর ওর ছায়াও যেন স্পষ্ট দেখা যায়।···অহিকে রাখা যাইবে না? কতবার শুনিয়াছেন মৃত্যুর পথ কেহ অবরোধ করিতে পারে না, দেখিয়াছেনও; কিন্তু আজকের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামনে সে-সবের যেন কোন অর্থই নাই। কী যে মনে হইতেছে ধরা যায় না, কী যে করিতে হইবে বোঝা যায় না। মাঝে-মাঝে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ওঠে মনে—আজ এই বৃহস্পতিবার—আসছে বৃহস্পতিবারে অহি কি আছে বাড়ীতে?···যদি না থাকে!

প্রতিদিনই একটু বেশি করিয়া স্বল্পবাক্ হইয়া উঠিতেছেন গিরিবালা।

রৈয়াম থেকে ছোট-জা আসিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"তুই এ-দিক্‌টা দেখ বৌ, আমার বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে কথায় কথায়, অহির কাছে থাকি আমি।···ওকে যাবে না বাঁচানো?—তোর কি মনে হয়?"

"বাঁচবে বৈ কি দিদি; ছি, ও কি অলুক্ষুণে কথা?"

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার জায়ের পানে চাহিলেন—সেই প্রবঞ্চনার ভাষা,—আজ কয় বৎসর ধরিয়া দুখ্‌নার খুড়ি, শ্যামায় ঠাকুরমা, আরও সবাই যাহা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে—ও-বাড়ীর জা পর্য্যন্ত, এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। গিরিবালা কিন্তু সে লইয়া কিছু বলিলেন না; "তুই দেখ এ-দিক্‌টা বোন"—বলিয়া অহির কাছে গিয়া বসিলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আর একবার ফিট হইল। গিরিবালা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বেশ জোরেই ডাকিয়া উঠিলেন—"ছোট বউ!"

আসিলে অজ্ঞান অহিকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ, এই রকম করে দেয়!"

—যেন কোন্ অমোঘ ক্রুর, অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল অনুযোগ করিতেছেন—এই রকম করে দেয়!

শশাঙ্ক ছুটিয়া বাহির হইতে বিপিনবিহারীকে ডাকিয়া আনিল, ও বাড়ী থেকেও সবাই আসিলেন। ভালো হইয়া গেলে বেটাছেলেরা যখন চলিয়া গেল, ছোট-জা প্রশ্ন করিলেন—"একটু হরির মাটি এনে ঠোঁটে দিয়ে দিই দিদি?"

যেন কত দিনের ক্লান্তির জের টানিয়া গিরিবালা বলিলেন—"দিবি দে;···কিছু হয় না।"

শুক্রবারে রাত্রি দুপুরে আর একটা আক্রমণ হইল, তাহার পর শেষ রাত্রি শেষ আক্রমণ।

অহির মৃত্যু ছাপাইয়া শৈলেনের মনে পড়ে মায়ের শোকের মূর্ত্তি। এইটিই যেন সে-দিনের মুখ্য ঘটনা। সবাইকে কাঁদিতে দেখিল, নিজেও কাঁদিয়াছিল কম নয়; কিন্তু সব চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তাঁকে যিনি মোটেই কাঁদেন নাই। কোল থেকে অহিকে লইয়া গেল, শুষ্ক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন মা—সমস্ত উঠানটায় যতক্ষণ দেখা গেল, চোখ ফিরাইয়া। বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে যাইতে যাইতে ও-বাড়ীর জেঠাইমাকে বলিলেন—"ওটাকে আগে কোন রকমে কাঁদাও বৌদি, নয় তো পাগল হয়ে যাবে।"

সবাই ঘিরিয়া বসিল, মা দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, কোন মতেই কাঁদানো গেল না।···আশ্চর্য ব্যবস্থা!—জাতক যখন জন্মাইবে, তাহার নিজের কাঁদা চাই, তাহার যখন মৃত্যু তখন কাঁদা চাই অপর সকলের, নহিলে উভয়ত্রই গোলমাল। জীবন মৃত্যু যাহার ক্রীড়নক তাহার রসজ্ঞানের বলিহারি দিতে হয় বৈ কি।

বৈকালে নিস্তারিণী দেবী আসিয়া পড়িলেন; নিশ্চয় বধূর অবস্থার কথা শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই একটা আঘাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন—"ও বৌমা, আমার অহিকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে?…"

"মা গো, রাখতে পারলাম না।"—বলিয়া গিরিবালা তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

—কান্না নামিল।

মায়ের আলোচনা হইলেই—বিশেষ ভাবেই হোক বা সাধারণ ভাবেই হোক, প্রথমেই কি করিয়া দুইটি ছবি শৈলেনের চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—রুগ্ন অহি কোলে, তুলসীমঞ্চের মাটি খাওয়াইয়া মা এ-দিকে চোখ ফিরাইতেই মুখে অস্তমান সূর্য্যের রাঙা রশ্মি আসিয়া পড়িল। আর এই দৃশ্য—অহিকে লইয়া গেল, শুষ্ক উদাস দৃষ্টিতে মা চাহিয়া আছেন।

যা যেন আগে বেদনা, তাহার পর আনন্দ।

১১

নিস্তারিণী দেবীকে গঙ্গার তীরে মরিবার আশাটা আপাতত ত্যাগ করিতে হইল; শোকটা গিরিবালার এমন ভাবে লাগিয়াছে যে রীতিমতো চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। শরীর তো ভাঙিয়া গেছেই তাহার অতিরিক্ত নিজের উপর কেমন একটা অবিশ্বাস আসিয়া গেছে যে, শাশুড়ি চলিয়া গেলে তিনি আর কোন ছেলেকেই বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন না। শাশুড়ি দেখিলেন এটা তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার ভান মাত্রই নয়, সত্যই দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটা দেহের চেয়েও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এ-ভাবটা না গেলে তাঁহার পাণ্ডুল ছাড়া চলিবে না।

এক হয়, বধূকে যদি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তিনি সাঁতরায় ফিরিয়া যাইতে পারেন। এমন একটা শোকের পর করা উচিতও ব্যবস্থা, একটু অন্যমনস্ক করিয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার; কিন্তু এদিকে পাণ্ডুলের চাকরি লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, হঠাৎ কিছু যদি একটা হইয়া যায় তো আশ্চর্য নয়, এ-অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকাটা সমীচীন নয়। আরও একটু ব্যাপার হইয়াছে,—বিপিনবিহারী দ্বারভাঙ্গায় কয়েক বৎসর পূর্বে একটু জমি কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধীরে-সুস্থে দুইখানি ঘর তুলিতেছিলেন, এখন সাঁতরায় ছেলেদের পড়ার বন্দোবস্ত টিকিল না দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার কথা চিন্তা করিতেছেন। কি আকারে বন্দোবস্তটা করিবেন তাহারই খসড়া করিতেছিলেন, এমন সময় অহিভূষণ লইয়া এই বিপদটা আসিয়া পড়িল। সব ওলটপালট হইয়া গেল।

এই রকম অব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে দেখিতে চারিটা মাস কাটিয়া গেল, ক্ষেত্রের ফসল তুলিবার সময় আসিয়া পড়িল। কাজের তাড়া-হুড়ার মধ্যে গিরিবালার যেন একটু পরিবর্তন দেখা দিল, মনে হইল, এই ঝোঁকে তিনি শোকটাকে কাটাইয়া উঠিবেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না, শোকটা ভিতরে যেন কোথায় ভাঙন ধরাইয়াছে। নিস্তারিণী দেবী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; মালা-হাতে বধূর কাজে অল্প অল্প সাহায্য করিতেছিলেন, এবার তাঁহাকে সরাইয়া নিজেকেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

কেমন একটা সময় আসিয়াছে, সব ব্যবস্থাই যেন উলটাইয়া যাইতেছে বিপিনবিহারীর, সামনেও যেন একসঙ্গে অনেকগুলা বিপদের ছায়াপাত হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে ঠিক এ-ধরণের দুঃসময় আর আসে নাই। বড়ই ব্যাকুল উদ্বেগে দিন কাটিতে লাগিল।

মাসখানেক আরও গেল, তাহার পর হঠাৎ এমন একটা বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িল যাহা ছায়াপাতও করে নাই কিঞ্চিৎমাত্র: চণ্ডীচরণের রৈয়ামের চাকরিটি গেল। চাকরিটা কতকটা অস্থায়ী গোছেরই ছিল, কিন্তু বেশি আশা ছিল সেটা পাকা হইয়া যাইবারই। বরং পাণ্ডুলের চাকরির যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিপিনবিহারী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন গেলে ওইখানেই গিয়া উঠিবেন; ওইখানেই সূত্রপাত হইল বিপদের।

তা হোক, কিন্তু সুদিনের আলোও দেখা দিল এই দুর্বিপাকের পিছনেই।

চণ্ডীচরণ আসিয়াছেন খবর পাইয়া বিপিনবিহারী একটু সকাল সকালই আফিস থেকে ফিরিলেন। পা যেন উঠিতে চাহিতেছে না। দুর্বল-চিত্ত আদৌ নন তিনি, কিন্তু বিপদটা ভাইয়ের উপর দিয়া আসিল বলিয়াই বেশ খানিকটা মুশড়াইয়া গেছেন। নূতন উঠন্ত ভাইয়ের, উঠতির সময়ই এই আঘাত, কি করিয়া যে তাঁহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিবেন, কি বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবেন!…বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখেন চণ্ডীচরণ হরেনকে বুকের কাছে লইয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন, সামনে মা বসিয়া, দেয়াল ঘেঁসিয়া গিরিবালা দাঁড়াইয়া আছেন। কি একটা যেন হাসির কথা উঠিয়াছিল, সবার মুখেই তাহার জের লাগিয়া রহিয়াছে, চণ্ডীচরণের মুখটা একটু বেশি প্রদীপ্ত।

দাদা আসিতেই চণ্ডীচরণ নিজেকে সংযত করিয়া উঠানে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিপিনবিহারী একটা তেপাই টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, ভাইয়ের মুখের পানে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতেই চাহিয়া লইয়া চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ কি হোল?"

"ঠিক বুঝলাম না দাদা, তবে বোঝবার চেষ্টাও করিনি। মনে হয় ভালোই হয়েছে।"

জ্যেষ্ঠ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি নিজে ছেড়ে দাওনি তো?"

"না, ভালোই হয়েছে এই জন্যে বলছি যে নীলকুঠির অবস্থা দিন দিন কি হচ্ছে দেখতেই তো পাচ্ছি; অথচ না ছাড়ালে কামড়েই পড়ে থাকতে হোত; তাও আবার রৈয়ামের মতো জায়গায়!…"

জ্যেষ্ঠের নমিত মুখের পানে চাহিলেন, বিরক্তির লক্ষণ আছে কি না দেখিবার জন্য। কিছুই না দেখিতে পাইয়া অপ্রসন্ন হইয়া চলিলেন—"তাই বলছিলাম ভালোই হয়েছে, মা বৌদিকেও সেই কথাই বলছিলাম। আমার প্ল্যানও ঠিক হয়ে গেছে।"

ভাইকে অবসাদগ্রস্ত না দেখিয়া বিপিনবিহারী একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, তবু সে একটু বিমূঢ় হইয়া না পড়িয়াছিলেন এমন নয়, প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করেছ?"

"ছেলেদের দ্বারভাঙ্গায় পড়াবার জন্যেই তো বাড়ীটা করেছেন আপনি, আমি সেইখানে গিয়ে ওদের ভর্তি করে দিয়ে বসি।

তার পর সেইখান থেকে চাকরির চেষ্টা-চরিত্র করতে থাকি। আজকাল তো নানান দিকে সুবিধে দাদা—রেলের কত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, ছুটো জেলা-কোর্ট রয়েছে, কত রকম ওপ্‌নিং; আর বৈরামে পড়ে থাকলে…"

বিপিনবিহারী চাকরটাকে ডাকিতে তামাক দিয়া গেল। কিছু না বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে হুঁকা টানিতে লাগিলেন। এতগুলা কথার উপর কোন রকম অভিমত না পাইয়া চণ্ডীচরণ চুপ করিয়া গেলেন, বার-দুয়েক দাদার মুখের পানে আড়-চোখে দেখিলেন মাত্র। বিপিনবিহারীর মুখটা ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; এক সময় হুঁকাটা নামাইয়া বলিলেন—"মা, তোমার মনে আছে কি না জানি না—বাবা এক সময় বলেছিলেন—বিপিন যদি কখনও মনে করে সে পাণ্ডুলের মতন ছোট জায়গায় পড়ে থেকে নীলকুঠির আওতায় ও বাড়তে পাচ্ছে না তো ও বেরিয়ে পড়ে সেই ভালো, তাতে দুঃখ করবার কি আছে?…আমার দ্বারা হোল না, কেন না হঠাৎ মারা গিয়ে আমার পথ বাবা নিজেই বন্ধ করে গিয়েছিলেন। আজ কিন্তু চণ্ডীর মুখে বাবার সেই কথা শুনে আমার বুকখানা দশ হাত হয়ে গেছে মা। একটা সুলক্ষণ যে আজ যে করেই হোক, তুমি রয়েছ সামনে, শুনলে বাবার মুখের কথাটা। ওকে আশীর্ব্বাদ করো—নিজের নাম পর্য্যন্ত যারা ঠিক মতন বানান করতে পারে না সেই সব কুঠিয়ালদের দাবড়ানি ওকে যেন না সইতে হয় আর। অন্ত যেখানেই চাকরি করবে—রেলই হোক বা আদালতই হোক—ভদ্র, শিক্ষিত সমাজ পাবে। তার অভাবটা যে কি, বাবা অত প্রতিপত্তির মধ্যেও হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছেন, চিরকালটা আপশোষ করে গেছেন এই নিয়ে, আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দাও।…চণ্ডীর কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে মা! ও যদি না মুশড়ে পড়ে তো আমি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করি না।"

চণ্ডীচরণের ঐ একটু কথাতেই সমস্ত সংসারের উপর থেকে যেন একটা গুমোট কাটিয়া গেল। এই আকস্মিক আঘাতটা বিপিনবিহারীকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, ওঁর গতিবিধি পূর্ব্বের চেয়েও সবল হইয়া উঠিল, বিপদের মুখে দৃষ্টি হইয়া উঠিল সতেজ, অবসাদমুক্ত। শুধু তাহাই নয়, চণ্ডীচরণ ভাইপোদের লইয়া খেলা—বই-পড়ার এমন একটা মাতন তুলিয়া দিলেন যে বাড়ীর আবহাওয়াটাই বদলাইয়া গেল। সব চেয়ে পরিবর্ত্তন হইল গিরিবালার। শ্বশুরবাড়ীর প্রথম সঙ্গী এই দেওরটির উপর বরাবরই তাঁহার একটু বেশি টান ছিল, কিন্তু বিবাহের সেই প্রথম বৎসরের পর আর এত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পান নাই; গল্পে, আলাপে, সেই প্রথম দিনের আলোচনায় তাঁহারও মনের অবসাদটা যেন কাটিয়া যাইতে [illegible]ল, অন্ততঃ এটা বেশ টের পাওয়া গেল যে ভিতরে যাহাই থাক, [illegible] বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে; চেহারাও অনেকটা [illegible] গেল।

[illegible]-ক্ষেত্রেও বিপিনবিহারী এত দিন একটু সন্তর্পণে কাটাইতে[illegible], [illegible] ভাবটা ছাড়িয়া কতকটা বেপরোয়া হইয়া উঠিলেন।

[illegible] উপর চাবি দিয়ে দিয়াই জীবন যেন কতকটা [illegible] হইয়া [illegible]

দিতে বিপিনবিহারী চণ্ডীচরণের সঙ্গে ধারভাঙায় গিয়াছিলেন, একা হইতে নামিতে চাকর খবর দিল এক জন বাঙালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।

প্রশ্ন করিলেন—"কখন?"

"আজ সকালে।"

"খাওয়া-দাওয়া করেছেন? দেখা-শুনো করেছিলি তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বৈঠকখানাটা একটু ঘুরিয়া গেলেন। দেখেন দাওয়াতে এক জন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। সৌম্য কান্তি, শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথায় দীর্ঘ শুভ্রকেশ—কাঁধের উপর আসিয়া কুঞ্চিত হইয়া আছে। তবে সন্ন্যাসের কিছু দেখিলেন না। নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথা থেকে আসছেন?"

"আপাততঃ পশুপতিনাথ থেকে।"

এই সময় নেপালে পশুপতিনাথের মেলা হয়। যাওয়ার অথবা ফিরিবার পথে এক-আধ-জন যাত্রী এখানে এক-আধ-দিন আটকাইয়া যায়, কচিৎ দু'-এক জন বাঙালীও থাকে।

বিপিনবিহারী সাধারণ আতিথ্যের ভদ্রতায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন রকম অসুবিধে হয়নি?"

"কিছু না; আপনি জামা-টামা ছাড়ুন গিয়ে।"

"হ্যাঁ, এসে আলাপ-পরিচয় করা যাবে; এখুনি আসছি।"

নিস্তারিণী দেবী ও-বাড়ী গিয়াছেন। বিপিনবিহারী প্রবেশ করিতে গিরিবালা বলিলেন—"বাইরে পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হোল?"

"কোন্ পণ্ডিত মশাই?"

"বেলেতেজপুরের।"

আজ প্রায় ষোল-সতের বৎসরের কথা, বিপিনবিহারী একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। "পণ্ডিত মশাই!"—বলিয়া তিনি যেমন ছিলেন সেই ভাবেই ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন। একেবারেই ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আপনি! আর আমি দিব্যি কাষ্ঠ-লৌকিকতা করে ভেতরে চলে গেলাম!"

পণ্ডিত মশাই উঠিয়া বিপিনবিহারীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—"দোষ হয়নি, কম দিনের কথা নয় তো। আমিও আত্মপ্রকাশ করলাম না, ভাবলাম আগে জামা-জুতো ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নেওয়াই ভালো। গিরি দিদিমণি বুঝি বলে দিলে?"

"বলে দিতে যে হোল এর লজ্জা আমি কি করে ঢাকি বলুন! কী যে মনে হচ্ছে আমার!…"

"অনেক দিন হোল, তার সঙ্গে বয়েস এসেছে, তার ওপর আমিও তোমায় একটু ধোঁকা দিলাম; আর সব চেয়ে ধোঁকা দিলেন বোধ হয় ইনি—সে সময় তো ছিলেন না"—বলিয়া নিজের দীর্ঘ শ্মশ্রুর উপর দিয়া একবার হাতটা টানিয়া লইয়া হো-হো করিয়া তাঁহার সেই পুরাতন হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিলেন বৈ কি, আপনি বলে। উনি যদি না করতেন তো বোধ হয় চিনে [illegible]

[illegible] ফুরিয়ে দিলে। তা

দূর থেকে আসছ। তার পর ধীরে-সুস্থে গল্প হবে। উঃ, কত দিন পরে সে দেখছি তোমাদের, আর কী যে আনন্দ হোল! ছেলে দু'টির সঙ্গে দেখা হোল না শুধু, দু'টো দিন বিলম্ব হয়ে গেল।"

"সে কি কথা পণ্ডিত মশাই? দ্বারভাঙ্গায় নতুন একটু কুঁড়ে তুলেছি। আপনার পায়ের ধুলো দিতে হবে। আপনাকে পাওয়া—আমার এত বড় সৌভাগ্য বাড়ী বয়ে যখন এসেছে…"

প্রীতিভরে হাসিতে হাসিতে পণ্ডিত মশাই বলিলেন—"তুমি তো সৌভাগ্যটা বুঝতে পারছ না বিপিন ভায়া। তা যাবো দ্বারভাঙ্গায়, পথেই তো পড়ে। তবুও তো একটু খুঁৎ থেকেই যাবে;—সেই কথাই বলছিলাম—মানে, তোমাদের সব ক'টিকে এক সঙ্গে দেখা আর আলাদা আলাদা দেখা…"

সামনের একটি চৌকিতে কম্বল পাতা থাকে, মুখোমুখি হইয়া বিপিনবিহারী তাহার উপর বসিয়াছেন। গোড়াতেই একটা ত্রুটি হইয়া যাওয়ায় একটু অনুশোচনায় মিশিয়া আনন্দটা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; বলিলেন—"আমি কালই সহরে লোক পাঠিয়ে দোব পণ্ডিত মশাই, সবাই একসঙ্গে পায়ের ধুলো নোব। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!—ভাবতেও পারিনি কখনও যে আপনি এতটা পথ বেয়ে দয়া করে আসবেন। এটা নিতান্ত পশুপতিনাথের পথ বলে……"

পণ্ডিতমশাই একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ভায়া, পশুপতিনাথ যদি মনের কথা না জানতে পারতেন তো ফাঁকি দিয়ে ও-পুণ্যটুকু নিয়ে নিতাম। কিন্তু তিনি যখন জানেনই সব তখন আসল কথাটা প্রকাশ করে বলাই ভালো,—তোমাদের উপলক্ষ করে পশুপতিনাথ দেখে গেলাম কি পশুপতিনাথকে উপলক্ষ করে তোমাদের দেখতে এলাম—কোনটে আমার আসল উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধে ঠিক করে বলতে পারি না। আরও উদ্দেশ্য ছিল—পুণ্যভূমি মিথিলা দেখা—ন্যায়ের জন্মদাত্রী মিথিলা; আরও ছিল—বোধ হয় তুমি আন্দাজ করে নিয়েছ……"

বিপিনবিহারী বলিলেন—"হিমালয় দেখা।"

পণ্ডিত মশাইয়ের মুখটি ভাস্বর হইয়া উঠিল। বলিলেন—"ভায়া, কী অপূর্ব্ব জিনিষই যে দেখলাম! কবিবরেরই কথা একটু অন্য অর্থে ব্যবহার করে বলতে ইচ্ছে করে—"সুখং মু দুঃখং মু বা"… অন্য অর্থে এই জন্যে বলছি যে দেখে এবং পেয়ে যতটা আনন্দ পেলাম তার চেয়ে দুঃখই হোল বোধ হয় বেশি—এই ভেবে যে সারা জীবনটা কি মনে বঞ্চিত রয়ে গেলাম।…বার্ধক্য এসে গেল; ঘোরবার ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি, সব কমে এসেছে, এমন কি মনের বৃত্তিও নিস্তেজ হয়ে এসেছে, এই অসময়ে, শুধু মনের আপশোষ বাড়াবার জন্যে পশুপতিনাথ ডাক দিলেন…"

পণ্ডিত মশাই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে আস্তে আস্তে যেন [illegible] হইয়া গেলেন, কেহ যে কাছে আছে যেন ভুলিয়াই গেছেন, [illegible] একটা অস্পষ্ট হাসির সঙ্গে একটা অতৃপ্তির আভাস লাগিয়া [illegible] সন্ধ্যার পানে চাহিয়া আছেন!

[illegible] মনে পড়িয়া গেল—পণ্ডিত মশাই পণ্ডিত, [illegible] কিন্তু সর্বোপরি তিনি কবি, ওঁর এই প্রকৃতিটি [illegible] অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ওঁর [illegible] নীরবে বসিয়া রহিলেন

অল্পক্ষণ পরেই পণ্ডিত মশাইয়ের মনটা ফিরিয়া আসিল। প্রশ্ন করিলেন—"তুমি যাওনি ওদিকে, নয়?…যেও, নিশ্চয় যেও।"

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন পণ্ডিত মশাই যে আমি নীলকুঠিতে কাজ করি।"

পণ্ডিত মশাই বলিলেন—"ও-কথা বললে শুনব না ভায়া, আমি তোমার মনের পরিচয় বহু দিন আগেই পেয়েছি। তোমার সেই হিমালয়ের বর্ণনা এখনও আমার চোখের সামনে যেন জ্বল-জ্বল করছে। বাঃ, তুমিই তো আমায় এ-পথের পথিক করেছ। মা, যেও একবার নিশ্চয় ফুরসৎ করে…"

দিন পনের থাকিলেন পণ্ডিত মশাই। বহু দিন পরে বিপিনবিহারীর সংসারটি যেন চারি দিক্ দিয়া পূর্ণ হইয়া উঠিল; মা আসিয়াছেন, ভাই ছেলেদের লইয়া দ্বারভাঙ্গা থেকে আসিলেন, তাহার উপর পণ্ডিত মশাই। আরও পূর্ণতা এই জন্য যে পণ্ডিত মশাইকে কেন্দ্র করিয়া ছোট শিশু থেকে মা পর্য্যন্ত সবার রূপ যেন নূতন করিয়া ফুটিল। বিশেষ করিয়া মা'র—সাঁতরায় ধর্মালোচনা লইয়াই থাকিতেন; শীতলা-তলা, গৌরাঙ্গের মন্দির, যাত্রা, কথকতা, গঙ্গাস্নান; ক্বচিৎ বাহিরের এক-আধটা তীর্থ;—এখানে আসিয়া অন্তরে অন্তরে সে-সবের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, পণ্ডিত মশাই কতকটা পূরণ করিলেন। নিস্তারিণী দেবী ডাকিয়া শাস্ত্রালাপ শোনেন দুই বাড়ীর বধূদের সঙ্গে লইয়া; কখন শাস্ত্রালাপ, কখন তীর্থভ্রমণ-কাহিনী; বিপিনবিহারীকে বলেন—"কী চমৎকার মানুষ বিপিন; একটু ভড়ং নেই, একটু ধর্মের ভাণ নেই, অথচ ধর্ম যেন উপচে পড়ছে ওঁর শরীর-মন বেয়ে! এমনটি তো আর কোথাও দেখলাম না।"

গিরিবালা যেন বর্তাইয়া গেছেন। কি করিবেন, কোথায় রাখিবেন যেন ভাবিয়া পান না। প্রয়োজন পণ্ডিত মশাইয়ের খুব অল্পই, গিরিবালা কিন্তু সব আয়োজনই টানিয়া টানিয়া বাড়াইয়া যতটা সম্ভব তাঁহারই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। পূজার ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতির বহর দেখিয়া পণ্ডিত মশাই হাসিয়া বলেন—"এ যে আমার ঠাকুরকে তুমি বিগড়ে দিচ্ছ দিদি! ভবঘুরে মানুষ, নমো নমো করে খানিকটা করে জল দিয়ে তুলিয়ে রাখি,—ধূপের জন্যেও জল দিচ্ছি, নৈবেদ্যের জন্যও জল দিচ্ছি, আবার আহারের শেষে তাম্বুলের জন্যেও এক আঁজলা জলই দিচ্ছি, আর তুমি এ যে…"

গিরিবালা বলেন—"তা হোক ঠাকুরদা', আপনি নির্লোভ মানুষ, আপনাকে তো লোভ দেখিয়ে টেনে আনবার জো নেই—এই [illegible] আঠার বছরের মধ্যে একবার এলেন, তাই আপনার ঠাকুরকে [illegible] দেখিয়ে রাখছি, তিনি যদি আনেন টেনে…"

সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগ করেন—"তাও এলেন তো একলা, ঠাকুরমাকে কত দিন দেখিনি, আমার মুখ চেয়েও যে তাঁকে নিয়ে আসবেন… না ঠাকুরদা', আসছে বছর আনতেই হবে তাঁকে। মা আমার মুখে তাঁর সুখ্যেত শুনেই কতো দুঃখু করছিলেন। আর বাবার কথাও বলি ঠাকুরদা', একবারও কি আসতে পারতেন না? আসলে গিরিকে আর মনে নেই কারুর…"

এই সময়টা একলা পাইয়া রেলেভেজপুরের কথাই হয় অনেকখানি

—সেই আগেকার বেলেতেজপুরের কথা, আগের এখনকার বেলেতেজপুরের কথাও : ভাইয়েরা সব শিবপুরে, বাড়ীটা নিশ্চয় খাঁ-খাঁ করে··· নিকুঞ্জ-জেঠাদের খবর কি ?···দুলাল বাগদিদের কোন খবর রাখেন ঠাকুরদা' ?···

পূজা আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইয়া যায়। পণ্ডিত মশাই হাতে করিয়া আচমনের জন্য জল তুলিয়া লইয়া গল্পে অন্যমনস্ক হইয়া যান—দুলালের অবস্থাটা এখন একটু ভালো, দু'টি ছেলে রোজগার করিতেছে, হোক ছোট জাত—বাপ-মায়ের উপর টান আছে দু'জনেরই—দুলাল অবশ্য এখন আর কিছু করে না, বয়স হইয়াছে, তায় বরাবরই একটু রুগ্ন; এই পণ্ডিত মশাই বাহিরে, দুলালই এখন বাড়ী আগলাইতেছে···

গিরিবালা প্রশ্ন করেন—"আর ঠাকুরমা ?—তিনি তো রয়েছেন ওখানেই ?"

পণ্ডিতমশাই হাতের জলটা ফেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—"রয়েছেন বৈ কি···"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার গণ্ডূষের জন্য জল লইয়া অন্য কথা আরম্ভ করিয়া দেন—"হ্যাঁ, আসবার খুব ইচ্ছে ছিল, রসিকলালেরও, তবে সংসারী মানুষ···"

গিরিবালা বলেন—"আপনিও তো সংসারী মানুষ ঠাকুরদা'···"

পণ্ডিত মশাই হাতের জলটা ফেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—"তা তো বটেই, তবে কথা হচ্ছে···"

অভিমানে গিরিবালার মুখটি অন্ধকার হইয়া ওঠে, বলেন—"আসল তা নয়, গিরিকে দু'জনেই ভুলে গেছেন ঠাকুরদা'—তা যাক, কে আর নাতনিকে আর চিরদিন কে মনে করে বসে থাকে ?···নিকুঞ্জ জেঠার এ-পক্ষের ছেলেটি না কি নোকসান হয়ে গেল ঠাকুরদা ?"

কথাটা ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এই রকম প্রসঙ্গে আসিয়া পৌঁছায়, পণ্ডিত মশাই অস্বস্তি ভাবে আসনে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসেন, কুশিটাকে হাতে আবার গণ্ডূষের জল লইয়া তাড়াতাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন—"হ্যাঁ, বছর-খানেক হয়ে···"

"কেন যে আসে পেটে শত্রুরা···"

পণ্ডিত মশাই মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলেন—"শত্রুই বৈ কি, ওদের কথা ভাবতে আছে ?"

সঙ্গে সঙ্গেই একটু জোর করিয়া হাসিয়া ত্বরিত ভাবে বলেন—"ও দিদি, ক'বার আচমনের জল নিয়ে ফেলে দিলাম বলো দিকিন ? তোমার ঠাকুর যে শুকিয়ে মরবেন !"

গিরিবালাও হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"তা বটে ঠাকুরদা', তা বেলেতেজপুরের কথা দেন কেন মনে করিয়ে বলুন ? কষ্ট দেওয়ার মতলব থাকলে নিজেও কষ্ট পেতে হয়।"

হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িয়া বলেন—"না, সত্যই দেরি হয়ে গেছে ঠাকুরদা', আপনি বসুন পূজোয়; আমি যাই ওদিকে একটু।"

যাইবার পূর্ব দিন সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত মশাই বিপিনবিহারীকে বলিলেন—"বিপিন, তুমি আজ বাইরের ঘরেই শুয়ো, আমি একেবারে ভোরেই বেরুব, এক রকম রাত্রি থাকতেই।"

"যখনই বেরুবেন ডেকে নেবেন পণ্ডিত মশাই। অবশ্য শোবার কথা বলছি না, কিন্তু ভেতরের সবাইকে তো ডাকতেই হবে।"

"না, ওঁদের কাছে রাত্রেই বিদায় নিয়ে নোব; আমার এক রকম রাত থাকতেই বেরুতে হবে।"

কথার মধ্যে কি একটা ছিল, বিপিনবিহারী একবার মুখের পানে চাহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

শেষ রাত্রে পণ্ডিত মশাইয়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়াই কিন্তু বিস্মিত হইয়া গেলেন—নিজের দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস হয় না: পণ্ডিত মশাই-ই, তবে আগাগোড়া একটা গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরা, মাথায় একটা ঐ রঙের পাগড়ি জড়ানো। সঙ্গে একটা বেশ বড় গোছের লাঠি আনিয়াছিলেন, তাহার উপর কম্বলটা পাট করা রহিয়াছে।

বিপিনবিহারীর ঘোরটা একটু কাটিলে পণ্ডিত মশাই অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন—"এ বেশে গিরি দিদিমণির সামনে দাঁড়ালে কান্নাকাটি করত, তাই ও-পাট কালই চুকিয়ে রেখেছি। এবার পশুপতিনাথ গিয়ে এই পথ অবলম্বন করলাম ভায়া,—আরও ঠিক করে বলতে গেলে এই আজ থেকে আরম্ভ হোল।"

বিপিনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"সন্ন্যাস নিয়েছেন ?"

"ও-কথাটা মস্ত বড় কথা বিপিন। লোকে অবশ্য সন্ন্যাসীই বলবে, আমি কিন্তু নিজেকে বলি পরিব্রাজক মাত্র। সন্ন্যাসীরা চোখ বুজে যাঁকে খুঁজছে, আগে ঘুরে-ফিরে দু'চোখ ভরে তাঁর বাইরের রূপটা দেখি বিপিন—আশ মিটছে না, কী যে অপরূপ !···পশুপতিনাথ গিয়েছিলাম—দেখি, এক হিমালয় দেখতেই তো কত জন্ম কেটে যাবে—তার পরে তো তার স্রষ্টা···?"

আয়ত দৃষ্টিতে, গৈরিকমণ্ডিত দীর্ঘচ্ছন্দ শরীরে একটি প্রসন্নতা যেন ঝলমল করিতেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিপিনবিহারীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু—ইয়ে—ঠানদিদি, পণ্ডিত মশাই ?"

পণ্ডিত মশাই দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিপিনবিহারীর মাথায় হাত দিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—দিদিমণির কাছে লুকিয়েছি, তাকে বড্ড ভালোবাসত কি না, দেখলাম একটা মস্ত বড় শোক পেয়েছে···এ-শোকের বেগটা না কমলে আর তোমার দিদিমণির এ-সংবাদটা দিও না তাকে। আমার এ-বেশের কথাও বোল না।··· যখন বলবে তখন এটুকুও বলে দিও যে বাড়ীটা দুলাল বাগদিকে দিয়ে এসেছি—আমারও বড্ড সেবা করেছিল, তা ভিন্ন আমার শিষ্য আর শিষ্যবন্ধুর বড় প্রিয় ছিল পরিবারটা···"

শেষের কথা কয়টা বলিতে মুখটা হাসিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বিপিনবিহারী একটু চকিত হইলেন, মনের দ্বিধাটা প্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, পণ্ডিত মশাই তাঁহার মাথায় হাতটা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করিতে করিতে বলিলেন—"বুঝেছি বিপিন যা বলবে। ওটুকুও যদি মন থেকে সরিয়ে ফেলতে না পারব তো এ-পথে পা বাড়িয়েছি কেন ? যদি কখনও হতে পারি সন্ন্যাসী তো বুঝব ঐখানেই ভগবান্ তার গোড়া পত্তন করেছিলেন।···দুলাল অনেক ব্রাহ্মণের চেয়েই দানের উপযুক্ত পাত্র বিপিন—হোক না কেন তা অস্ত্রাসনই—স্বামি-স্ত্রী উভয়েই বড় পবিত্র স্বভাব···নারায়ণ, নারায়ণ, মানুষকে জাতের জন্যে ছোট ভেবে তাঁর সৃষ্টির যেন অপমান না করতে হয় কখনও।···এবার সময় হয়েছে বিপিন এসো আলিঙ্গনটা করে নি; আমার গুরু এই গ্রামের শেষেই অপেক্ষা করছেন, এই

পনেরটা দিন তাঁর কাছে ছুটি পেয়েছিলাম। হয়েছে, অত পায়ের ধূলোয় কি হবে?...স্বস্তি—স্বস্তি!"

পথে নামিয়া আর একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না, দৃঢ়, ঋজু গতিতে সম্মুখের পথ ধরিয়া এক সময় একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বিপিনবিহারীর মনে হইল, প্রভাত-সূর্য্যের একটি রশ্মি কক্ষচ্যুত হইয়া নামিয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল।

১২

আফিসের ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতে লাগিল। আমলাদের মধ্যে বরাবর একটা ঐক্য ছিল, ক্রমে সেটুকুও যাইতে বসিল। ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া ছোট সাহেব দু'-এক জন নিম্নস্তরের আমলাকে হাত করিল, এদিক'কার কথা ওদিকে পৌঁছিতে লাগিল, খিটিমিটি বাড়িতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় আরও বছর-খানেক টানিয়া টুনিয়া গেল, তাহার পর, যে আগুন ধূমাইতেছিল, এক দিন সামান্য কারণেই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নীলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কুঠিতে আখের চাষের পরীক্ষা চলিতেছে। চার্জে ছোট সাহেব। বিলাত থেকে একটা আখ-পেড়াইয়ের কল আসিয়াছে; কুঠি থেকে মাইল-খানেক দূরে সাগরপুর বলিয়া একটা জায়গা আছে, কলটা সেইখানে বসানো হইবে। কৈলাশচন্দ্র আফিসে কাজ করিতেছিলেন, ছোট সাহেবের আর্দালি আসিয়া বলিল—"বাবু, আধ সের তেল চাই, কলটা চালানো হবে।"

কৈলাশচন্দ্র একটু বিরক্তির সহিত কাজের মধ্য হইতে মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"তেল—তা এখানে কেন? গুদামনবিশের কাছে যা।"

"গুদামনবিশ আসেননি, তাঁর ছুটি।"

"কে দিয়েছে ছুটি?"

"ছোট সাহেব।"

কৈলাশচন্দ্র একটু থমথমে হইয়া রহিলেন, তাঁহার যেন মনে হইল ব্যাপারটা সাজানো, বলিলেন—"তেল বের করে দেওয়া আমার কাজ নয়।"

আর্দালি গিয়া উত্তরটা জানাইতে ছোট সাহেব নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবটা বেশ একটু চড়া, প্রশ্ন করিল—"তেল দেওয়া হয়নি কেন?"

কৈলাশচন্দ্রও একটু রুখিয়াই বলিলেন—"তেল বের করে দেওয়া আমার কাজ নয়।"

"গুদামনবিশ ছুটিতে থাকলে বড়-বাবু হিসেবে তুমিই ব্যবস্থা করবে না?"

"তা করতে হলে গুদামনবিশ যে ছুটিতে সেটাও আমার জানা উচিত ছিল।"

"তোমার খোঁজ রাখা উচিত ছিল।"

"সে যে অনুপস্থিত আমার ভাববারই অবসর হয়নি, কেন না ছুটি চাইতে হলে তার আমার কাছেই চাইবার কথা।"

বেশ খানিকটা গরম-গরম আলাপ হইল, সুবিধা করিতে না পারিয়া সাহেব অযথাই তম্বি করিয়া চলিয়া গেল। ব্যাপার যে-রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা কিছু করা নিতান্ত দরকার, সকলেই আসিয়া কৈলাশচন্দ্রের টেবিল ঘেরিয়া দাঁড়াইল। স্থির হইল সকলের দস্তখতে একটা দরখাস্ত দিতে হইবে বড় সাহেবের কাছে।...দরখাস্ত লিখিয়া সবার দস্তখৎ করাইয়া তৈয়ার রাখা হইল। সবাই একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল—নিষ্পত্তিটা যাহাই হোক না কেন।

বৈকালে বড় সাহেব আফিসে আসিল, অন্য দিনের চেয়ে একটু বিলম্ব করিয়াই। নিয়ম-মতো কৈলাশচন্দ্র ক্যাশ-বুক প্রভৃতি তাঁহার খাতা-পত্র দস্তখৎ করাইবার জন্য লইয়া আসিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর সাহেবের মুখটা আজ। এই সময় দস্তখতের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিদিনের কাজ লইয়া কৈলাশচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা হয়। আজ সাহেব একটি কথা বলিল না, বাঁ হাতের আঙুলে চুরুটটি ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া ওলটানো পাতার উপর খস-খস করিয়া দস্তখৎ করিয়া যাইতে লাগিল—এই দস্তখতের শব্দ আর [illegible] রকমই শুধু নিশ্বাসের আওয়াজ ঘরটার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।...ওদিকে আফিসের হলটাও একটা আসন্ন কিসের আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া আছে।

শেষ পাতাটির উপর দস্তখৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ খানসামা কুলদীপ প্রসাদ দুয়ারের পাশ হইতে বাহির হইয়া দরখাস্তটা সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে গেল।

সাহেব একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কুলদীপ প্রসাদ হাত হইতে দরখাস্তটা বোধ হয় ছাড়িবার পূর্ব্বেই সেটা ছিনাইয়া, মুঠার মধ্যে দুমড়াইয়া তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"বেরোও, বেরোও আমার সামনে থেকে সব বেরিয়ে যাও—তোমরা দল বেঁধে কুঠির সর্বনাশ করতে চাও..."

সোজা না বলিলেও কৈলাশচন্দ্র এই অপমানসূচক হুকুমের মধ্যে পড়িয়া গেছেন, সংযত কণ্ঠেই বলিলেন—"আপনি অন্যায় করছেন আমাদের ওপর, ছোট সাহেবের..."

সাহেবের উগ্রতাটা সোজা আসিয়া কৈলাশচন্দ্রের উপর পড়িল, বলিল—"তুমিই যত নষ্টের গুরু, দল পাকিয়ে..."

কৈলাশচন্দ্রের কণ্ঠস্বরও কড়া হইয়া উঠিল, বলিলেন—"মিথ্যা অপবাদ দেবার আগে আপনি কথাগুলো ভালো করে ভেবে দেখবেন..."

সাহেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে—"হাউ ডেয়ার ইউ!..." বলিয়া কণ্ঠস্বর আরও চড়াইয়া তুলিতে বিপিনবিহারী এবং কৈলাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র জগদানন্দ হল থেকে বাহির হইয়া আসিলেন। জগদানন্দ নূতন আফিসে ভর্ত্তি হইয়াছেন, কুস্তি করা শরীর, তেজী যুবক—জামার আস্তিনটা প্রায় গুটাইয়া রাখিলেন; বিপিনবিহারী একটা রুল লইয়া খাতায় লাইন টানিতেছিলেন, অনবধানবশত সেটা হাতেই ছিল।...রুল আর আস্তিন-গোটানো দুইটাই আকস্মিক, সাহেব কিন্তু দেখিয়াই—"হামারা বন্দুক লে আও!"—বলিয়া নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়াইল।

কতকটা ভুলে, কতকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই সমস্ত ব্যাপারটা এক্তিয়ারের বাহিরে চলিয়া গেল, বন্দুকের নাম করিতেও—"লে আও তোম্‌হারা বন্দুক"—বলিয়া বিপিনবিহারী ও জগদানন্দ দুই জনেই অগ্রসর হইলেন। আফিসের সংলগ্নই সাহেবের বাংলো, সাহেব দ্রুত পা চালাইয়াই প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল; আর সব আমলারা আসিয়া ইহাদের দুই জনকে ধরিয়া ফেলিল।

সেদিনকার নাটকে এখানেই যবনিকা-পাত হইল।

এর পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। আমলারা বিচারের জন্ম উপরের কর্তাদের দ্বারস্থ হইলেন, অবশ্য খুব বেশি আশা না রাখিয়াই। আশঙ্কাটাই ফলিল; পাণ্ডুলের আফিস প্রায় এক রকম নূতন করিয়াই গড়া হইল। পাণ্ডুলের প্রায় সত্তর বৎসরের জীবনের অবসান ঘটিল।

পাণ্ডুল।—এ-পরিবারের জীবনে মিথিলার এই সুদূর গ্রামটি বড় একটা পবিত্র স্মৃতি, প্রায়ই আলোচনা হয়, হইলেই সবার মন একটি সজল স্নিগ্ধতায় ভরিয়া ওঠে। চলিয়া আসার স্মৃতিটি বড়ই করুণ। শৈলেনরা তখন দ্বারভাঙ্গায় পড়িতেছে, বিদায়ের অভিজ্ঞতাটা প্রত্যক্ষ হইতে পায় নাই; মায়ের কাছে প্রায় গল্প শুনিত, কিছু কিছু বাবার কাছেও।—

চলিয়া আসিতে হইবে এ-কথাটা যেদিন থেকেই পাকা হইয়া গেল, পাড়ায় যেন একটা চাপা হাহাকার পড়িয়া গেল। সত্তর বৎসর ধরিয়া "মধু"-বাবুর এই দুই পরিবার সমস্ত পাণ্ডুলের প্রীতিই অর্জন করিয়া আসিয়াছে—এই দুইটি বাড়ীতে যে আর কেহ আসিয়া থাকিবে এটা কেহ ভাবিতেই পারিত না। সমস্ত দিন বাড়ী—পাড়ার প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। এক দিন দুলারমনের ঠাকুরমা আসিল। আর এক রকম নড়িতেই পারে না বলা চলে; প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পরে—নিস্তারিণী দেবী সাঁতরা হইতে ফিরিলে একবার দেখা করিতে আসিয়াছিল, আর এই। লাঠি ধরিয়া, নাতির উপর ভর দিয়া আসিল, ধনুকের মতো বাঁকিয়া গেছে, নিস্তারিণী দেবী তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া কম্বলে বসাইলেন। দুলারমনের ঠাকুরমা পরিশ্রমের জন্ম হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"দুলহীন, একবার বিপিনকে ডেকে পাঠাও।···এই সব দেখবার জন্যেই বেঁচে ছিলাম···"

বিপিনবিহারী আসিলে বলিল—"কাছে এসে বোস্ বিপিন।"

বিপিনবিহারী পাশে আসিয়া বসিলেন। ছোট ছেলেকে যেমন করে, বুড়ী সেই ভাবে বিপিনবিহারীর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল—হাঁপাইতেছে, চোখে জল ঝরিতেছে—তাহার মাঝেই বলিল—"তোকে কোলের ওপর নিয়ে উঠোনের ঐখানটায় পা ছড়িয়ে ব'সে "উপটন" মাখাতাম—দুলহীনকে বলতাম—'ছেলের তোমার লোহার শরীর করে দোব, যত বিপদ, আপদ, কুনজর—গায়ে লেগে সব ছিটকে পড়বে,—আমি থাকতে থাকতেই সেই বিপিন পাণ্ডুল ছেড়ে চলল।···দুলহীন, কথা কইছ না যে তুমি?"

কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নাই, এক বিপিনবিহারী ছাড়া; কিন্তু তাঁহার অবস্থা সকলের চেয়ে আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখের জল ফেলার অভ্যাস একেবারেই নাই—কোন অবস্থাতেই, কিন্তু আর সামলানো যায় না। হঠাৎ উঠিয়া যাওয়া শক্ত, অথচ এদিকে রগ দুইটা এত টনটন করিয়া উঠিতেছে যে চোখের জলের লজ্জা আর বুঝি ঠেকাইয়া রাখা যায় না। অসহ্য অবস্থায় পড়িয়া কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল—"দোস্ত, আছ?"

বিপিনবিহারী পরিত্রাণ পাইলেন—"ফণীন্দ্র এসেছে বুঝি?" —বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুলারমনের ঠাকুরমাকে বলিলেন—"পাণ্ডুল ছেড়ে গেলেও পাণ্ডুল কি আমায় ছাড়বে দাদী? তোমাদের টানে আবার কত বার···"

শেষ না করিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ফণীন্দ্র ঝা বাল্যবন্ধু, সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝার বংশের ছেলে; শান্ত প্রকৃতি, বেশি কথা কয় না, আড়ম্বর করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরে নাই কখনও; কিন্তু বিপিনবিহারীর চেয়েও বিপিনবিহারীর কথা যে বেশি করিয়া ভাবে অনেক বারই সেটা ধরা পড়িয়া গেছে। বাংলার মতো এখানেও পাতাবার রেওয়াজটা ছিল সে সময়, দু'জন পরস্পরকে ডাকেন—"দোস্ত," অর্থাৎ স্যাঙাৎ।

"দোস্ত, হঠাৎ অসময়ে যে?"

ফণীন্দ্র ঝার এদেশী প্রথায় ত্রিকচ্ছ করিয়া কাপড় পরা, বাঁ হাতে একটা কৎবেলের নস্যাধার, গায়ে এদেশী প্রথাতেই একটা চাদর জড়ানো, ডান হাতটা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। বিপিনবিহারীর প্রশ্নে একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বাঁ হাতের নস্যদানিটা আঙুল দিয়া দু'-এক পাক ঘুরাইল মাত্র, কোন উত্তর দিল না।

বিপিনবিহারী বলিলেন—"তা বোস, অসময়ে আসতে মানা আছে বলেছি না কি?···বরং এসে বাঁচিয়েছ আমায়—যা পাল্লায় পড়েছিলাম···"

চৌকিতে বসিতে বসিতে বলিলেন—"দাদী দেখা করতে এসেছে। বুড়িয়া এসেই কচি ছেলের মতন আমায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে সেই সব দিনের কথা—কবে কোল পেতে উপটন্ মাখিয়েছিল, কবে কি করেছিল।···যেতে হবে, মনটা আজ-কাল এমনই খারাপ থাকে, তার ওপর বিনিয়ে বিনিয়ে সেই সব পুরনো কথা—আমি ভাবছি দিলে বুঝি বুড়িয়া আমায় এই বুড়ো বয়সে কাঁদিয়ে—এমন সময় তুমি···"

ফণীন্দ্র ঝা বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলেন, কি যেন একটা চেষ্টা করিতেছেন ভিতরে ভিতরে—আস্তে আস্তে ডান হাতটা বাহির করিয়া নেকড়ায় জড়ানো একটা কিসের তাল বিপিনবিহারীর সামনে চৌকির উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"এইটে রাখো দোস্ত।"

বিপিনবিহারী গল্পের মধ্যেই হঠাৎ থামিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি এ দোস্ত?"

ফণীন্দ্র ঝা যেন আরও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—"তোমাকে হঠাৎ যেতে হচ্ছে—এই সময় আবার চণ্ডীরও চাকরীটা গেল—অবস্থাটা তো জানিই দোস্ত বাকাজির মৃত্যুর পর ভালো রকম সামলে উঠতেও পারনি—কিছু নগদ তোমার হাতে থাকলে হোত ভালো—তা আমার অবস্থাটা তো জানোই—পণ্ডিতের বংশের ছেলে, পুঁথিতে যদি কাজ হোত, এক সিন্দুক সঙ্গে করে দিতাম···"

ফণীন্দ্র ঝা একটু হাসিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হালকা করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার আগের মতোই দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিলেন—"তাই এগুলো নিয়ে এলাম—আমি নিয়ে এলাম কি তোমার দোস্তের বৌ-ই গছিয়ে দিলে—খান-কতক রূপোর গয়না—এক-আধখানা বোধ হয় সোনার থাকতে পারে, দেখিনি অত—আমাদের সবই তো রূপোর গয়না, জানোই তো—আর অল্পই—এতে যে কি হবে—তবে আর তো নেই বিশেষ···"

বিপিনবিহারী সম্মোহিতের মতো বাণ্ডিলটার দিকে চাহিয়া আছেন। আজ যেন অশ্রুর লজ্জা হইতে পরিত্রাণ নাই-ই, কোন রকমেই নাই, এক জায়গায় রেহাই দিয়া সে এক জায়গায় একেবারে

টারকুইন ও লুক্রেশিয়া

শিল্পী—টিন্‌টোরেট্টো (১৫১৮-৯৪)

ঘিরিয়া ধরিল। বিপিনবিহারী বাধা দিবার কোন চেষ্টাও করিলেন না, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিলেন—"পাঙুল থেকে শেষে আমায় এই বয়ে নিয়ে যেতে হবে দোস্ত, ?"

ফণীন্দ্র ঝা যেন মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন, সমস্তটা সম্পূর্ণ ভাবে স্ত্রীর উপর চাপাইয়া বলিলেন—"আবার সামলে উঠলে তখন··· আর মুস্কিল, তোমার দোস্তর বৌ কোন মতেই ফিরিয়ে নেবে না—মাঝে পড়ে আমি···আর তোমাকে যদি ওরা কখন আলাদা করে দেখত···"

বিপিনবিহারী চারিটা আঙুল বাণ্ডিলটার উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আর বলতে হবে না দোস্ত, এই আমি নিলাম; কিন্তু আপাতত তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে দাও গে; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দরকার যদি পড়ে আবার তাঁর হাত থেকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

আসিবার দিন সমস্ত গ্রাম যেন ভাঙিয়া পড়িল, শাম্পেনীতে উঠিলেন—হায়-হায় এর সঙ্গে শুধু আশীর্ব্বাদ—

গিরিবালা বলেন—"সবটাই খুব কষ্টকর, কিন্তু তার মধ্যেও দুলারমন আর খঞ্জনীর মুখ যেন মনে গেঁথে বসে আছে। আপনাদের বাড়ীর চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দুলারমন শাম্পেনীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু' হাতে আঁচল তুলে মুখের প্রায় সমস্তটাই ঢেকে ফেলেছে, চোখ দিয়ে জল উপচে উপচে পড়ছে। আঙুলের ওপর দিয়ে আমার পানে চেয়ে আছে—যেন যতটা পারে, যতক্ষণ পারে, দেখে নিতে চায়।

আর একটু এগিয়ে, শাম্পেনী থেকে অল্প একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে খঞ্জনী—কান্না নেই, কিছু নেই, ফ্যাল ফ্যাল করে আমার কোলে অরুর দিকে চেয়ে আছে—মুখ দেখলে মনে হয় তার যেন কিছুই রইল না জীবনে—যেন বুঝতে পারছে না কি হোল—যারা ছেড়েই যাবে তাদের জন্তে ও কেন এমন করে সব ছেড়ে দিয়ে বসল···"

[ক্রমশঃ

...ক-নিপাত, যুদ্ধ-বিরতি, বিজয়োল্লাস, আণবিক বোমার অকস্মাৎ আগমন, ডেথ রে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা, বস্ত্রের রাজ্য এবং সর্ব্বোপরি কন্‌ট্রোলের সুনিয়ন্ত্রিত বিধি-ব্যবস্থা—আহা আনন্দের ... আত্ম-শ্রাদ্ধ! এরূপ অবস্থায় তোমার আগমন অবাঞ্ছিত না হলেও সত্যই অপ্রাসঙ্গিক নয় কি জননী? এসেছ যখন যেতে ... অশোভন। যে ব্যবস্থা তা'তে ঘর-জামাই পর্য্যন্ত পালিয়ে বাঁচে, দেবতা ত কোন্ দূরের কথা! দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে যাঁহারা সহজ, সরল এবং সাঙ্গ করার ভার গ্রহণ করেছেন তাঁদের পূজাই সর্ব্বপ্রথম। বাঁচি যদি তোমার আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করবো ইচ্ছা রইলো। অক্ষমদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা কোরো মা!

বৎসরান্তে এসে সন্তানদের দেখে তোমার খুসীর সীমা নাই নিশ্চয়ই! প্রকৃতি যেমন অনুকুল তেমনই বাঙ্গালীর সাংসারিক অবস্থা—দুঃখ আছে বটে দারিদ্র্য নেই; ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে গর্ব্ব হয়। বিশ্বাস না হয় শ্রীমান্ গণেশকে একবার পরিদর্শনের জন্য পাঠাও ...কের রাস্তায়—দেখবে কত শত জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে ...কাল মধ্যে আর দেশ অগ্রসর হয়েছে শিল্পে ও বাণিজ্যে। গণেশের ...পাদৃষ্টি ওদিকে থাকাই বিধেয়, কারণ প্রতিষ্ঠায় যেমন তাঁর প্রয়োজন ...বার পতনেও তেমন দরকার।

এবারের উল্লেখযোগ্য বিষয়—খাদ্য-রেশন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাজির কন্‌ট্রোল। আশ্চর্য্য কন্‌ট্রোলের মহিমা! ইহার স্পর্শে ... উবে যায় কর্পূরের মত। সেই জন্য দেখতে দেখতে আর একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করেছে দৈত্যকুলের ...দের মত। সেই সর্ব্বজন-পরিচিত ব্যবসার রাশ নাম—'ব্ল্যাক্ মারকেট'। কন্‌ট্রোল ও ব্ল্যাক মারকেট যেন যমজ ভাই—জগাই

আর মাধাই, কায়া আর ছায়া, জন্ম আর মৃত্যু। একটির অভাবে অপরটির রূপ উঠে ফুটে। কন্‌ট্রোলে যা দুষ্প্রাপ্য ব্ল্যাক্ মারকেটে তা সহজপ্রাপ্য, দর-দস্তুর নাই, হাতে হাতে আদান-প্রদান, ...দের বালাই নাই। দেওয়া, নেওয়া, সটকান দেওয়া। এ ব্যবসার ... যেমন সহজ উন্নতি তেমনই দ্রুত, মাসখানেক খাটতে পারলে লাল হয়ে যায়—'যদি না পড়ে ধরা'। বাড়ী এবং গাড়ী ...কার জননী! এই অভাব-অনাটনের দেশে পলিটিক্সের মত এ বিদ্যাটিকে স্কুল-কলেজে অবশ্যপাঠ্য করার বিশেষ প্রয়োজন। জানি না কবে সে সুদিন আসবে। খাবি খাওয়ার আগে ছেলেটাকে পারদর্শী দেখে গেলে নিশ্চিন্ত হতাম।

অভাব আমাদের কিছুই নেই কেবল যা দুঃখ অন্ন-বস্ত্রের!

বিলম্বে প্রাপ্ত

শৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

লক্ষ্মীমন্ত দেশে শ্রীমতী লক্ষ্মীকে একবার পাঠাও রেশন কার্ড দিয়ে। ষষ্ঠীতে বেরুলে নবমীতে এসে পৌঁছবেন দু'সের ছ' ছটাক চাল, আর আধ সের চিনি নিয়ে। একবারেই আক্কেল হবে আর এমুখো চাইবেন না জননী! দৃশ্যও সেখানকার মনোরম—যেন মোগল-সরায়ের থার্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুম। যাত্রীরা ঠেসাঠেসি করে হত্যা দিচ্ছে পিতৃপক্ষে গয়ার টিকিটের জন্য!

দুঃখ কোরো না ভগবতী—আনন্দের মাত্রা এখানে কম নয়! দিকে দিকে বস্ত্র-সঙ্কটে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এখানে ও-ব্যাপারটি নেই; এই দিগম্বরের রাজ্যে আত্মহত্যার বস্ত্রেরও অভাব। তথাপি বাহির হ'তে বস্ত্র-দৈন্য বোঝবার জো রাখিনি জননী! ধোপদস্ত কাঁধ-সেলাই পাঞ্জাবীর সঙ্গে ধোয়ান মাঝ-সেলাই হর-গৌরী কাপড়খানা আস্তে তুলে ধরি রাস্তায়! বাড়ীর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত কোরো না জননী—কাজ সেরেনি—আণ্ডার-অয়্যারে, অথবা গামছায়, অথবা ছেঁড়া তানায় ব্যাস—! সরকার বন্দোবস্তের ত্রুটি করেন নাই। রাস্তায় রাস্তায় দোকান বস্ত্র-সম্ভারে সজ্জিত। কোটা এলেই মোটারা নিয়ে পালায়, তোমার বেটারা পারমিট হাতে তাকায় ফ্যাল ফ্যাল করে। শক্তি ও উত্তম বর্দ্ধনের জন্য শিবালয়বাসীদের যেতে হয় তিন মাইল দূরে শিউপুরে আর লক্সাবাসীদের আসতে হয় লঙ্কায়। সকালে বেরিয়ে বিকালে ফিরতে হয় অভুক্ত অবস্থায় শুধু হাতে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে। শ্রমের সুরাহা হয়েছে—সাড়ী অদল-

বদলের পালা সাঙ্গ হয়েছে, হাঙ্গামা বেঁচেছে। কাপড়ের ব্যাপার অজেয় হিমালয় অভিযানের ছোট-খাট দ্বিতীয় সংস্করণ। তার জন্য দিন-ক্ষণ চাই, সাজ-সরঞ্জাম্ করতে হয়—যথা বেস ক্যাম্প অর্থাৎ বাড়ী হ'তে যাত্রা করে যেতে হয় ফার্ষ্ট পারমিট সপ, লক্ষ্মীচৌতারায়—লেখা আছে—সির্ফ লংক্লট হ্যায়। অপ্রয়োজনীয় বিধায় পৌঁছতে হয় সেকেণ্ড পারমিট সপ, চকে—পড়ে আছে মাত্র আট হাত সাড়ী ছোট বহরের। চাহিদা মত না পাওয়ায় এগিয়ে চলি মদনপুরার থার্ড পারমিট সপে—সেখানে আছে রঙীন লুঙ্গী—! আমরাও

ছাতী বগলে ব্যাকওয়ার্ড মার্চ্চ করি গৃহ পানে উইথ এ মারচিং সং—'সাজ আমার ধূলা-খেলা সাজ আমার বেচা-কেনা···'।

সব্জী-বাজারের অবস্থা মন্দ নয়। সব আছে, ঘেঁসতে পারা যায় না। পোড়া কুমড়াও দর-দামে পাল্লা দিচ্ছে পটলের সঙ্গে। সগর্ব্বে চলেছে কচু আর ভিণ্ডি। একটি আমরা সারা জীবন পোড়া খাই গুরুজনের দয়ায়, অপরটি তুলনা হয় পিণ্ডির সঙ্গে। আলুর কথা ভুলে গেছি, তাই ত সবেরা দেখ্‌লে আঁতকে উঠি। মাছে-ভাতে বাঙ্গালী—এ কথার তাৎপর্য্য বোঝা গেছে হাড়ে-হাড়ে এ বৎসর। সেখানেও কন্‌ট্রোল ঢুকেছে। 'কন্‌ট্রোল মাছ এসেছে'—শুন্‌লে লোকে দৌড়তে থাকে উর্দ্ধশ্বাসে দোকান পানে—যেন করেছে ষাঁড়ে তাড়া! এখানে মৎস্য কন্‌ট্রোল সপ্‌, অভিনব, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব! টিয়াপাখীর খাঁচার অতিকায় সংস্করণ। বাহিরে চতুর্দ্দিকে ভীড় জমে দক্ষিণ উর্দ্ধবাহুর। আহা! সুরবল্লী কষায়ের জীবন্ত বিজ্ঞাপন! খণ্ড-প্রলয়ের পর পাওয়া যায় মাছ, দিশেহারা হয়ে গৃহে ফেরে স্বর্গ-জয়ের আনন্দ নিয়ে। ইলিশ উঠলে নালিশ কমবে। প্রভাতের কস্‌রত বাঁচবে।

দেশের বুকে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তা বোধ হয় অনুভব ক'রেছ। বৎসর বৎসর বদলাচ্ছে জাতীয় পরিচ্ছদ। এবার এসেছে তরুণদের ফুল প্যাণ্ট, হাফ সার্ট, প্লাস বাটার ছ'টাকা পনের আনার কাবুলী চপ্পল্‌। কি স্মার্ট যে দেখায় তা বর্ণনা করতে পারি না। তরুণীদের বড়ই দুর্বৎসর জননী! মিল-বস্ত্র না মেলায় তাঁত আর ছাপা রাখলে মান। দুই-একটি তরুণী সাথে লয়ে তরুণের অগ্রগতি—পথিমধ্যে হঠাৎ জাগ্রত করে অতীত ইউরোপের বীর নাইটদের স্মৃতি—গর্ব্বে, উল্লাসে, গেয়ে উঠি···'আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত'।

নৈতিক চরিত্র যথেষ্ট উন্নত এবং বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। দিকে দিকে পান-শালা স্থাপিত হইয়াছে। সিঁধেল চোর শীঘ্র মেলে না। ভদ্র পকেটমার বাজার গরম রেখেছে। পাশ-পকেট দু'টি তাঁদের হাতে সমর্পণ করে বেরুতে হয় রাস্তায়। বহু আশীর্ব্বাদে পরের হাতে পিছ্‌লে না গিয়ে হাত-ঘড়ী থাকে হাতে।

এরই মধ্যে চঞ্চল হ'লে চলবে না চিন্ময়ী! যাবার আগে একটি নিবেদন আছে জননী! কন্‌ট্রোল-ব্যবস্থা স্বর্গরাজ্যেও প্রবর্ত্তন করতে হবেই। অপচয় হ্রাস ও অত্যধিক সঞ্চয় প্রশমিত হবে। দেবরাজ্য কর্ম্মিবহুল—তোমার আত্মীয়বর্গেরও অভাব নেই। এক-একটিকে বাগাল কোরো এক-এক দিকে। যুদ্ধান্তে কমরেড কার্ত্তিকেয় নিষ্কর্ম্মা। খুলে দিও তাঁকে একটি ক্লথ রেশন সপ্‌, নচেৎ ব্লাড-প্রেসারে ভুগবেন। দুর্ভিক্ষের দুর্নিবার আক্রমণ হতে দেবতাদের বাঁচাবার ভার নেবেন স্বয়ং লক্ষ্মী—খুলবেন গ্রেণ কন্‌ট্রোল সপ্‌। যুদ্ধোত্তর স্বর্গে শিল্প এবং বাণিজ্য অত্যাবশ্যকীয়, চারু শিল্প, দর্শন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে বীণাপাণি ভার গ্রহণ করুন—"সরস্বতী কেমিক্যাল ও ইনডাস্ট্রিয়েল ওয়ার্কস্‌এর।" এতে মানও আছে দামও আছে। এখন বাকী কেবল তুমি। জানি দেবরাজ্যে সান্ধ্য মজলিসে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তুমি অগ্নিময়ী বক্তৃতা বর্ষণ কর, কিন্তু দেবী তা'তে আমাদের পেট ভ'রে না—মন পূরে না। এই দুঃখ-ম্লান দৈন্য-ক্লিষ্ট মজুর ও কৃষকের দেশে মহা ভৈরবের আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক। আমাদের বিনীত নিবেদন তুমি পৌঁছে দিও তাঁর চরণে।

টাইম-চেঞ্জে হাওড়ায় হচ্ছে হুলস্থুল। কর্ম্মচারিগণ খাচ্ছেন হিম-শিম আর যাত্রীরা হচ্ছেন নাজেহাল। কাজ নেই ওদিকে এগিয়ে, উঠে পড় জননী প্লেনে—এ আসেও কুইক্‌ যায়ও কুইক্‌।

পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তাহ'লে কোনদিন না কোনদিন গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ কল্লেও তেমনি তার ফল একদিন না একদিন নিশ্চয় ভোগ করতে হবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

দরজা এঁটে বন্ধ করে তালা লাগান ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। জামা-কাপড় যা আছে গায়েই পরে নিয়েছে তারা। ছেলে দু'টির হাতে ওলান একটি করে সানকি আর এক জোড়া ভাতের কাঠি গুঁজে দিল। কচি কচি দৃঢ় মুঠিতে তারা সেগুলি ধরে থাকে। এ যেন ভাতেরই প্রতিশ্রুতি। তার পর মাঠের উপর দিয়ে তাদের চলা সুরু হয়। আহার-অন্বেষী ছোট দলটি এত আস্তে হাঁটে যে মনে হয় যেন নগর-দেয়াল পর্যন্ত আর বুঝি তারা পৌঁছতে পারবে না কখনো।

মেয়েটাকে নিজের কোলে নিয়েছে ওয়াঙ। খানিক পরে যখন সে দেখলে যে বুড়ো বাপ এইবার মাটিতে মুখ গুঁজে মুখ থুবড়ে পড়বে হয়ত তখন মেয়েটাকে ওলানের কোলে দিয়ে একটু নীচু হয়ে বাপকে সে তুলে নিল নিজের পিঠে—তার পর ওলানের মত হালকা বুড়োর শুকনো দেহ পিঠে নিয়ে পা টেনে টেনে চলতে লাগল। নিঃশব্দে তারা ছাড়িয়ে গেল সেই মন্দির যার ভিতরে দেবদেবীর মূর্তি অবিচল মহিমায় আসীন। নশ্বর সংসারের কোন ঘটনাতেই ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁদের। তীক্ষ্ণ শীতের হাওয়া সত্ত্বেও ওয়াঙের দুর্বল শরীর ঘেমে ওঠে। এই হাওয়ারও যেন বিরাম নেই। ক্ষুধার্ত মানুষের পিঠে সে যেন চাবুক চালাতে থাকে। ছেলে দু'টি শীতে কাঁদে। ওয়াঙ তাদের বোঝায়—'তোমরা এখন বড় হয়েছ! তোমরা চলেছ দক্ষিণে যেখানে শীত নেই। সেখানে রোজ খাবার পাওয়া যায়—শাদা ফুরফুরে ভাত মেলে। সেখানে গিয়ে শুধু খাবে আর খাবে।'

একটু করে এগোয় আর বিশ্রাম করে তারা। এমনি ভাবে শেষে তারা নগর-দ্বারে এসে পৌঁছায়। এখানকার পাথরের ঠাণ্ডা হাওয়া এক সময় খুশী করত ওয়াঙকে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বরফ-জল যেমন ছুটে চলে তেমনি ভাবে এই সুড়ঙ্গ-পথে ছুটে চলেছে কনকনে দমকা শীতের হাওয়া। পায়ের নীচে কাদা বেশ পুরু হয়ে উঠছে আর ফাঁকে ফাঁকে বরফের সূচ। ছোটরা এগুতে পারে না। ওলানের কোলে মেয়ে। তা' ভিন্ন নিজের ভারেই সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। বুড়ো বাপকে পিঠে নিয়ে ওয়াঙও চলেছে কোন মতে শরীর টেনে টেনে। বাপকে পিঠ থেকে নামিয়ে ওয়াঙ প্রত্যেক ছেলেকে তুলে তুলে পার করে দেয় জায়গাটা। এতটুকু পরিশ্রমেই

অনুবাদক

শিশির সেনগুপ্ত ও

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ওয়াঙের গা' বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে টপ-টপ করে। স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকে ওয়াঙ। আর তার পরিবারবর্গ তাকে ঘিরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে অপেক্ষা করে।

এতক্ষণে তারা সেই ফটকের কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু রুদ্ধ অর্গল উঁচু লোহার বাধা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! দু'পাশে জলে ভেজা, রোদে পোড়া দু'টি ধূসর সিংহ-মূর্তি। ফটকের সিঁড়িতে জড় হয়ে শুয়ে আছে কতকগুলি ছিন্নবসন অনাহারী নারী, শিশু, পুরুষ। শেকল আঁটা ফটকের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তারা। ওয়াঙ যখন দুঃস্থ দলটি নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক জন বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে বললে—'দেবতাদের মতই বড় লোকদেরও প্রাণে দয়া-মায়া নেই একটুও। ওদের ঘরে এখনও চাল মজুত রয়েছে। চাল দিয়ে ওরা মদ চোলাই করে আর আমরা না খেতে পেয়ে মরি।'

কথা শেষ হতে না হ'তেই আর এক জন রুদ্ধ আক্রোশে বলে—'যদি এক বার এই দু'টো হাতে জোর ফিরে পেতাম তাহলে এদের ফটকে, প্রাসাদে, মণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিতাম! সে আগুনে নিজে পুড়ে মরতেও আমার ভাল লাগত। যে বাপ-মা এই হোয়াঙ কর্তাদের জন্ম দিয়েছে ধিক তাদের।'

কিন্তু ওয়াঙ এ-সবের কোন জবাব না দিয়েই নিঃশব্দে এগিয়ে যায় দক্ষিণের দিকে।

সহরের ভিতর দিয়ে তারা দক্ষিণ প্রান্তে চলে এল। এত শামুক-গতিতে হেঁটেছে তারা যে ইতিমধ্যেই বেলা পড়ে এসেছে। আঁধার ঘনিয়ে আসছে চারি দিকে। ওয়াঙ দেখলে তাদের মত দুঃস্থ চেহারার বিরাট একটি দল দক্ষিণের দিকে চলেছে। দেয়ালের কোন কোণে সবাই মিলে জড়াজড়ি করে একটু ঘুমিয়ে নেবে এ-কথা ভাবতে ভাবতেই তারাও সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেল। ওয়াঙ এক জনকে জিজ্ঞাসা করল—'এত সব লোক যাচ্ছে কোথায়?'

লোকটি জবাব দিল—'এখানে খেতে পাচ্ছি না। আগুনে গাড়ী ধরে দক্ষিণে যাব। ঐ যে দূরের বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে গাড়ী ছাড়বে। নাম মাত্র ভাড়ায় নিয়ে যাবে আমাদের মত লোকদের।'

আগুনে গাড়ী! গল্প শুনেছে ওয়াঙ। অনেক দিন আগে

চা'য়ের দোকানে লোকের মুখে শুনেছে এই গাড়ীর কথা। শেকলে বাঁধা বগীর পর বগী। মানুষ বা পশুতে টানে না, ঠিক ড্রাগনের মত নাক দিয়ে গরম বাষ্প আর আগুন উদ্গার করতে করতে একটা যন্ত্র টেনে নিয়ে চলে সেই ভারী লম্বা গাড়ী। বহু বার সে ভেবেছে কোন ছুটির দিনে গিয়ে দেখে আসবে নিজের চোখে। কিন্তু মাঠের এটা-ওটা নানান কাজে কোন দিনই আর সময় হয়ে ওঠেনি'। তাছাড়া লোকে যা জানে না, বোঝে না, তার প্রতি অবিশ্বাসই আসে। প্রতিদিনের জীবনে যার প্রয়োজন নেই তা' না জানাই মঙ্গল।

কিন্তু সে যাই হোক, এখন সে সন্দেহ-সংকুল মন নিয়ে বৌকে জিজ্ঞাসা করে—'আমরাও কি তাহলে ঐ আগুনে গাড়ীতে যাব ?'

বৃদ্ধকে আর শিশু দু'টিকে তারা চলমান জন-চাপের বাইরে দূরে টেনে এনে উৎকণ্ঠিত চোখে নিরীক্ষণ করে। মুহূর্তের বিরতিতে বৃদ্ধ মাটিতে ভেঙ্গে পড়েন। ছোটরাও ধূলায় বসে পড়েছে। চারি দিকের পায়ের ঠেলাঠেলি তাদের ভূমি-আসন থেকে টলাতে পারে না। মেয়েটি এখনও ওলানের কোলে কিন্তু তার মাথা ওর হাতের উপর ঢলে পড়েছে। তার স্তিমিত চোখে-মুখে এমন একটা মৃত্যুর সংকেত যে ওয়াঙ সব ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে—'খুকী কি মরে গেল ?'

ওলান মাথা নাড়ে।

'এখনও যায়নি'। এখনও ধুক ধুক করছে। কিন্তু আজ রাত ভোর হ'বে না। আমাদেরও না—যদি না—'

তার পর যেন সে আর কোন কথা বলতে পারছে না এমনি ভাবে শীর্ণ শ্রান্ত চোখে তাকায় স্বামীর দিকে। ওয়াঙ এর কোন জবাব দেয় না। মনে মনে ভাবে সে আর এক দিন এমনি হাঁটলে রাতের মুখেই তারা সবাই মরবে। তবু সাহস দেওয়া হাসির ভাণ করে সে ছেলেদের বলে—'উঠে পড়। দাদুকে ধরে তোল। আমরা ঐ আগুনে গাড়ী চেপে দক্ষিণে যাব।'

কিন্তু যদি না সেই অন্ধকারের বুক চিরে ড্র্যাগনের গর্জনের মত একটা হুংকার আসত আর দু'টো বড় বড় চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটত, তারা আর নড়ে বসত কি না বলা যায় না। কিন্তু ঐ গর্জনে সবাই ভয়ে হাউ-মাউ করে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল এবং এই বিশৃংখলতার মধ্যে নানা দিকের চাপ খেতে খেতে তারাও এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। কিন্তু কিছুতেই যুথভ্রষ্ট হল না। অবশেষে সেই অন্ধকারে বহু কণ্ঠের চীৎকার আর আর্ত্তনাদের মধ্যে তারা কোন প্রকারে একটা ছোট্ট দরজা দিয়ে বাক্সের মত ঘরে ধাক্কা খেয়ে ঢুকে পড়ল। আর ড্র্যাগনটা তাদের জঠরে পূরে নিয়ে অবিশ্রান্ত গর্জনের সঙ্গে অন্ধকারকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে করতে ছুটতে লাগল।

১১

দু'টো রূপোর মুদ্রা দিয়ে ওয়াঙ শতাধিক মাইল যাবার টিকিট কিনেছে। অফিসারটি মুদ্রা দু'টি নিয়ে এক মুঠো তামা ফেরৎ দিয়েছে তাকে। গাড়ী থামলে জানালা দিয়ে সে খাবারয়ালার কাছ থেকে চারটে ছোট রুটি আর মেয়েটার জন্য এক বাটি নরম ভাত কিনলে। সেখানে গেল কয়েকটি পেন্স। বহু দিন পরে তারা আজ একবার খেতে পেরেছে। 'বহু দিন অনাহারে থাকলেও খাবার মুখে পূরতেই খাওয়ার ইচ্ছা চলে যায়। ছোটদের ত অনেক সাধ্য-সাধনা করে তবে খাওয়ান গেল ; শুধু বুড়ো নিদন্ত মুখের মাড়ি দিয়ে এক-টুকরো রুটি চুষতে থাকেন সর্বক্ষণ।

আগুনে গাড়ী ঝম-ঝম করে ছোটা শুরু করতেই প্রতিবেশী যাত্রীদের দিকে চেয়ে সস্নেহে বৃদ্ধ বলতে থাকেন—যেতে হবেই। বহু দিন না খেয়ে-খেয়ে খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেছে। তবু খাওয়ার ইচ্ছা নেই বলে মরার ইচ্ছা নেই আমার।' শুকনো কাঠের মত ছোট একটা বৃদ্ধ শিশুকে হাসতে দেখে সব ক্ষুধার্তের মুখেই একটা হাসির ঝিলিক হাসে।

কিন্তু সবগুলো পেন্স ওয়াঙ খাবার কিনে খরচ করলে না। যত দূর সম্ভব কিছু বাঁচিয়ে রাখলে দক্ষিণে পৌঁছে থাকার জন্য ছাউনী তৈরী করার চাটাই কেনার সম্বল হিসেবে। এই গাড়ীতেই এমন আরো মেয়ে-পুরুষ আছে যারা এর আগেও দক্ষিণে গিয়েছে। কেউ কেউ আছে যারা প্রতি বছরই দক্ষিণের সমৃদ্ধ সহরগুলিতে দিন-মজুরী খাটতে যায়। ভিক্ষা করে খেয়ে দিন-মজুরীর পয়সা বাঁচায়। এই অনভ্যস্ত পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে বাইরের ছুটন্ত গাছপালা ও মাঠের নূতনত্বের ঘোর কেটে গেল যখন, তখন ওয়াঙ আশে-পাশের লোকগুলির কথা শুনতে মন দিলে। অনেকগুলি নির্বোধের কৌতূহল নিবৃত্ত করে সেই ক'টি অভিজ্ঞ মেয়ে-পুরুষ।

উটের মত ঝোলা রুক্ষ ঠোঁট এক জন বললে—'দু'টি চাটাই কিনতেই হবে। প্রতি চাটায়ের জন্য দু'পেন্স। ঘটে বুদ্ধি থাকে ত এক একখানার দাম দু'পেন্স দে। আর যদি গেঁয়ো চাষা হও ত তিন পেন্স আদায় করবে। যতই বড় লোক হোক্ দক্ষিণেরা আমায় বোকা বানাতে পারবে না।' লোকটা মাথা দুলিয়ে চারি দিকে তাকায় প্রশংসার লোভে। অনন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে শোনে ওয়াঙ।

'তার পর ?' গাড়ীর মেঝেতে থ্যাবড়া মেরে বসে ওয়াঙ প্রশ্ন করে। এ বগীখানিতে বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। মেঝের ফাঁক দিয়ে ধূলো আর বাতাস উড়ে আসে। লোকটি পূর্বের চেয়েও গলা চড়িয়ে বলে—'তার পর ?' চাকার ঝনঝন আওয়াজ ছাপিয়ে ওঠে তার গলা। 'তার পর চাটাইগুলো জোড়া দিয়ে কুঁড়ে তৈরী করে ভিক্ষায় বের হ'বে। প্রথম প্রথম কাদা আর ময়লা মেখে চেহারাটাকে যত দূর সম্ভব হতচ্ছাড়া করে নেবে।'

ওয়াঙ জীবনে কখনো কারুর কাছে হাত পাতেনি। দক্ষিণের অজানা মানুষদের কাছে এমনি ধারা ভিক্ষা করার চিন্তায় মন কিছুতেই সায় দেয় না তার।

'ভিক্ষা করতে হবে ?' প্রশ্ন করে ওয়াঙ।

'নিশ্চয়।' উত্তর আসে রুক্ষ চেহারা লোকটির—'অবশ্য যতক্ষণ না কিছু খেতে পাচ্ছ। দক্ষিণের লোকদের ঘরে এত চাল আছে যে প্রতিদিন সকালে যে কোন সস্তা লঙ্গরখানায় গিয়ে এক পেনী দিলে পেটে যত ধরে তত সাদা চালের মাড় খেতে পাবে! খাওয়ার পর আরাম করে ভিক্ষায় বেরুতে পারবে। তার পর কড়াইশুঁটির ঘুগনী, বাঁধাকপি আর রশুন কিনে খেও।'

ওয়াঙ সবার থেকে একটু দূরে সরে এসে গোপনে কোমরের বেল্টে হাত ঢুকিয়ে ক'পেন্স আছে গুণে দেখল। ছ'খানা চাটাই আর এক পেনীর চাল কেনার পক্ষে যথেষ্ট। এ-সব করেও তিন পেন্স থাকছে। আবার নূতন করে জীবন আরম্ভ করবে এই চিন্তায় আরাম পায় ওয়াঙ।

... হাতে করে পথচারীর কাছে ভিক্ষা করতে হবে এই ... হতে থাকে তার মন। বুড়ো বাপের পক্ষে, বাচ্চা ... পক্ষে, এমন কি তার বৌ'র পক্ষেও হয়ত ভিক্ষাই ভাল কিন্তু ... ত দু'টো ... হাত আছে।

... লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা, সেখানে কি ... করবার কোন কাজ পাওয়া যায় না?'

'কাজ?' ঘৃণার সঙ্গে লোকটি মেঝেতে থুথু ফেলল—'ইচ্ছা ... হলদে রিকশ'য় ধনী লোকদের টানতে পার! দৌড়তে দৌড়তে ... হয়ে ঘাম ঝরবে। তার পর আবার ডাকার অপেক্ষায় বসে থাকা। ততক্ষণে সেই ঘাম জমে শুকিয়ে গায়ে বরফের জামা জড়িয়ে দেবে। আমার কাছে ভিক্ষাই ভাল।' এই বলে এমন বিশ্রী ভাবে সে মুখ-খারাপ করলে যে ওয়াঙের আর তাকে প্রশ্ন করার ভরসা রইল না।

কিন্তু তবু লোকটির কথা শুনে ওয়াঙের ভালই হোল। আগুনে গাড়ী যতক্ষণে না গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সবাইকে মাটিতে নামিয়ে দিল ততক্ষণে সে মনে মনে একটা হিসাব ঠিক করে ফেলেছে। একটা লম্বা ধূসর দেয়ালের ধারে বাপ আর ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখে এবং বৌকে তাদের উপর নজর রাখতে বলে সে চাটাইয়ের খোঁজে বেরিয়ে গেল। বাজারের পথ কোন্‌টা, রাস্তার একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল। এখানকার মানুষগুলো এমন তীব্র নিখাদে কথা বলে যে প্রথমটা সে কিছুই ধরতেই পারলে না। বার-কয়েক সে একই কথা জিজ্ঞাসা করল। তারাও ধরতে পারে না ওয়াঙের কথা—শেষে রেগে ওঠে। ক্রমে সে কাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে বুঝতে পারে—বেছে নেয় কে ঠাণ্ডা-মেজাজী। দক্ষিণের এই লোকেরা একটুতেই সহজে চটে যায়।

অবশেষে সহরের উপকণ্ঠে চাটাইয়ের দোকানের হদিস পেল ওয়াঙ। সব-জান্তার মত গদীতে দাম রেখে সে চাটাই নিয়ে ফিরে এল যেখানে সে অন্য সবাইকে রেখে গিয়েছিল। সবাই বসে আছে তারই অপেক্ষায়। সে ফিরে আসতেই ছেলেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কলরব করে উঠল। অপরিচিত জায়গায় অপেক্ষা করতে করতে তারাও বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শিশুদের মত বিস্মিত আনন্দে বৃদ্ধ বাপ চারি দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। ওয়াঙ আসতেই তিনি বিড়-বিড় করে বললেন,—'দেখেছ এই দক্ষিণের লোকেরা কী মোটা! এদের চামড়া কেমন ফ্যাকাশে আর তেলতেলে। নিশ্চয়ই এরা রোজ শূয়োর খায়।'

কিন্তু পথচারীরা কেউই ওয়াঙ-পরিবারের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সান-বাঁধান পথ দিয়ে লোকেরা আসা-যাওয়া করছে। অতি ... তাদের ভঙ্গী। ভিখারীদের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না কেউ। আর একটু পর-পর আসছে গাধার দল। তাদের পিঠের দু'পাশে ঝুলছে ইঁটের ঝোড়া অথবা বড় বড় শস্যের থলি। প্রত্যেক দলের চালক পিছনের সর্বশেষ পশুটির পিঠে চড়ে চলেছে। হাতের চাবুকটা সে মাঝে-মাঝে ধমকানির সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে পশুদের পিঠে কসাচ্ছে। ওয়াঙের পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেকে তার দিকে এমন উদ্ধত ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাচ্ছে যে, কোন রাজপুত্রও বোধ হয় এই ময়লা জামা-পরা চালকদের মত এমন রূঢ় চোখে তাকায় না পথে ভিড়-করা দুস্থদের দিকে। বিদেশী মানুষদের সামনে এসেই চালকেরা পশুর পিঠে সপাং করে একবার চাবুক মারছে। চাবুকের তীক্ষ্ণ শব্দে এরা কেমন ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠছে দেখে তারা হো-হো শব্দে হাসিতে ফেটে পড়ছে। দু'-তিন বার এ-রকম ঘটার পর ওয়াঙ রীতিমত চটে গেল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে দেখতে লাগল কোথায় তার কুঁড়ে সে তৈরী করবে।

আশে-পাশে দেয়ালের গায়ে-গায়ে ইতিমধ্যেই কয়েকটি কুঁড়ে তৈরী হয়েছে। কিন্তু ঐ দেয়ালের ওধারে কি আছে কে জানে! জানবারও উপায় নেই। বহু দীর্ঘ উঁচু ধূসর রঙের দেয়াল। পায়ের কাছে ছোট ছোট চাটাইয়ের ছাউনীগুলো যেন কুকুরের লেজে মাছির মত দেখাচ্ছে। অন্য ছাউনীগুলো লক্ষ্য করে করে নিজের ছাউনী রচনায় লেগে গেল ওয়াঙ। কিন্তু শরের ডগা চিরে চিরে তৈরী করা শক্ত চাটাই দিয়ে কি করে ছাউনী হয় হাজার চেষ্টা করেও পারে না সে। নিরাশ হয়ে ওঠে ওয়াঙ! ওলান ওকে বলে—'আমি পারব, দাও ছেলে-বয়সে তৈরী করেছি মনে আছে।'

মেয়েটাকে মাটিতে বসিয়ে সে চাটাইগুলো টেনে বেঁকিয়ে গোল ছইয়ের মত করে মাটিতে গুঁজে দিল। বেশ উঁচু হোল। এক জন মানুষ অনায়াসেই তার নীচে বসতে পারবে—মাথায় গুঁতো লাগবে না। চাটাইয়ের যে দিক্‌টা মাটিতে পোঁতা সে পাশটায় সে কয়েকটা ইঁট বসিয়ে দিল। কুঁড়ে তৈরী হলে তারা ভিতরে ঢুকল, একখানা চাটাই সে কাজে লাগায়নি। সেখানা মেঝেতে বিছিয়ে সবাই বসল তার উপর। যাক্‌—আশ্রয় মিলল।

এই ভাবে বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এখন আর মনেই হয় না যে কাল তারা ছেড়ে এসেছে তাদের ঘর-বাড়ী ক্ষেত-খামার—অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। আবার সেখানে ফিরতে কত দিন কেটে যাবে—হয়ত ফেরার পথেই তারা পথে মরে পড়ে থাকবে।

এই সব-পেয়েছির দেশে, যেখানে কাউকেই ক্ষুধার্ত বলে মনে হয় না সেখানে ওদের মনও যেন একটা প্রাচুর্যের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। ওয়াঙ যখন বলে—'চল, সস্তা লঙরখানা খুঁজে বের করা যাক্‌' তখন সবাই খুশী মনে উঠে দাঁড়ায়—আবার চলতে শুরু করে। ছোটরা যেতে যেতে আনন্দে ভাতের কাঠি দিয়ে সানকি বাজায়। এবার সানকিতে ভাত মিলবে। একটু দূরে উত্তর প্রান্তের শেষাশেষি একটা পথ দিয়ে চলেছে শূন্য বাটি, বালতি আর টিনের পাত্র হাতে ভুখাদের মিছিল। তারাও চলেছে দুঃস্থদের ভোজনাগারে। এতক্ষণে ওয়াঙ বোঝে কেন এই দেয়ালের গা বেয়ে কুঁড়েগুলো তৈরী হয়েছে। একটু গিয়ে এই পথের শেষেই লঙরখানা। ওয়াঙরাও মিশে যায় সেই জনতার ভিড়ে। এবং অবশেষে এসে উপস্থিত হয় চাটাইয়ের তৈরী দু'টো বড় বাড়ীর সামনে। সবাই বাড়ীর লাগোয়া খোলা চত্বরে এসে জটলা শুরু করে।

প্রত্যেক বাড়ীর পিছনে আছে সারি সারি মাটির উনুন। অত বড় উনুন ওয়াঙ জীবনে কখনো দেখেনি। সেই সব উনুনে ছোটখাট পুকুরের মত লোহার কড়া বসান। বড় কাঠের ঢাকনিগুলো এক পাশ থেকে একটু উচুঁ করলেই দেখা যায় চমৎকার সাদা ভাত ফুটছে ভিতরে, টগবগ শব্দে একটা মিষ্টি বাষ্পের বেগ ঠেলে উঠছে উপরে। ফোটা ভাতের গন্ধ নাকে লাগতেই জনতার মনে হয় এই বুঝি জগতের সেরা সুবাস। সবাই ঝুঁকে আসে সামনের দিকে। হৈ-হট্টগোল শুরু হয়। মায়েরা রাগে ভয়ে চীৎকার করে পাছে কেউ তাদের বাচ্চাদের

পায়ের তলায় মাড়িয়ে দেয়। ছোট ছোট শিশুরা কেঁদে ওঠে। আর যারা ঢাকনা একটু তুলেছিল তারা গর্জ্জন করে এদের ঠেকায়—'অনেক আছে—অনেক আছে। সবাই পাবে।'

কিন্তু কোন কিছুই এই বভুক্ষু নারী-পুরুষের জনতাকে শান্ত করতে পারে না। যতক্ষণ না তাদের উদর-পূর্তি হচ্ছে ততক্ষণ তারা শুধু পশুর মত হুটোপুটি করতে থাকে। ওয়াঙও এই ভিড়ে জমে যায়। কিন্তু কি করবে সে। বাপ আর ছেলে দু'টোকে আঁকড়ে ধরে এক সময় সে-ও ভিড়ের চাপে ভাসতে ভাসতে বড় কড়ার সামনে এসে হাজির হয়। ওয়াঙ নিজের পাত্র এগিয়ে ধরে। ভাত পূর্ণ হলে পেন্স দু'টো ছুঁড়ে দেয়। শুধু এই সময়টুকুর জন্য সে নিজেকে খাড়া করে রাখে—জনস্রোতকে ঠেকিয়ে রাখে।

আবার তারা ফিরে এল বড় রাস্তায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাত খেল—পেট পূরেই খেল। তবু বাটিতে কিছু পড়ে রইল। সে বললে—'এটুকু বাড়ী নিয়ে যাব—বিকেলে খাওয়া যাবে।'

ওদের কাছেই একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। হয়ত প্রহরীই হ'বে। তার গায়ে নীল আর লাল রংয়ের কোর্তা। ঝাঁঝাল কণ্ঠে সে বলল—'না, ওটি চলবে না। পেটের ভিতর যা ধরে তার বেশী এক কণাও নিয়ে যেতে পারবে না।'

এ কথা শুনে বিস্মিত ওয়াঙ বলে—'কেন, আমি যখন পয়সা দিয়েছি তখন পেটের ভিতর পূরে নিয়েই যাই আর বাইরে রেখে নিয়েই যাই তা' নিয়ে তোমার মুরুব্বিয়ানার দরকার কি হে বাপু?'

লোকটির জবাব আসে—'এ নিয়ম রাখতেই হয় আমাদের। কারণ এমন মানুষও আছে যারা এই দরিদ্রের অন্ন সস্তায় কিনে ঘরের শূয়োরদের খাওয়ায়। এক পেনীতে এত ভাত ত আর কোথায় মিলবে না। এ ভাত মানুষের জন্য—শূয়োরের জন্য নয়।'

বিস্মিত চোখে ওয়াঙ গিলল লোকটার কথাগুলো। বলল—'এমন নির্দয় লোকও আছে। কিন্তু কেন এই কাঙালী-ভোজন—কে তিনি যিনি খাওয়াচ্ছেন।'

'সহরের ধনী আর বনেদী লোকেরাই এর উদ্যোগী। কেউ কাঙালী খাইয়ে পুণ্য সঞ্চয় করছেন—কেউ বা করছেন লোকের প্রশংসা কুড়োবার জন্য।'

'উদ্দেশ্য যাই হোক মহৎ এ কাজ'—বলে ওয়াঙ—'কেউ হয়ত হৃদয়ের তাগিদেই এ কাজ করে।' তার পর প্রহরীটিকে কোন উত্তর না দিতে দেখে নিজের কথাই সমর্থন করে বলে—'অন্ততঃ কয়েক জন নিশ্চয়ই এমন আছেন।'

কিন্তু লোকটি আর কথা কইতে চায় না। পিছন ফিরে সে গুন-গুন করে গান করতে করতে চলে যায়। ওয়াঙ সবাইকে নিয়ে ফিরে আসে নূতন কুঁড়েতে। শুয়ে ঘুমায় সকাল অবধি। গ্রীষ্মের পর এই প্রথম তারা পেট পূরে খেতে পেয়েছে। ঘুম তাদের সম্পূর্ণ বেঁহুস করে ফেলে।

পরের দিন সকালে উঠেই দেখা গেল আরো পয়সার প্রয়োজন! যা' ছিল কালই সব খাওয়া হয়ে গেছে। চিন্তিত মুখে তাকায় সে ওলানের দিকে। কি করা যায় এখন। ফসলহীন মাঠের দিকে চেয়ে যে হতাশ চোখে সে এত দিন ওলানের দিকে তাকাত সে চাউনি এখন আর নেই। এখানে রাস্তায় ভরা-পেট লোকের আনাগোনা, বাজারে মাংস আর তরকারির ছড়াছড়ি, মাছের বাজারে বালতিতে মাছেরা সাঁতার কাটে—এখানে ছেলে-পুলে নিয়ে উপোসে থাকা সম্ভব নয়। এ তাদের সে দেশ নয় যেখানে টাকার বিনিময়েও খাবার মেলে না—কারণ খাবার সেখানে নেই-ই।

ওলান যেন অনেকটা দৃঢ় অভ্যস্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়—'আমি আর ছেলেরা ভিক্ষা করতে পারি। শ্বশুরও পারবেন। তাঁর পাকা চুল দেখে কারুর না কারুর দয়া হবেই।'

ওলান ছেলেদের ডেকে আনে কাছে। শিশু—সুতরাং পেট-ভরার সঙ্গে সঙ্গেই সব ভুলে গেছে তারা। নূতন দেশে এসেছে। তারা ছুটে ছুটে যায় রাস্তায়—যা' দেখে বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে সব গিলতে থাকে।

'নিজেদের বাটি হাতে নিয়ে এমনি করে কেঁদে কেঁদে বল—' নিজের শূন্য পাত্র সামনে ধরে কান্না-ভাঙ্গা সুরে বলতে থাকে ওলান—'দয়া করুন রাণীমা—দয়া করুন রাজা বাবু। ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করবেন। আপনারা কত দিকে কত পয়সা বাজে খরচ করেন—তারই একটিতে একটি অনাথ ছেলের জান বাঁচবে।'

ছোট্ট ছেলেরা চেয়ে থাকে মা'র দিকে। ওয়াঙও। কোথায় এ শিখেছে এমন ভাবে ভিক্ষা করতে? এ মেয়েটির সম্বন্ধে জানতে তার আর কত বাকী আছে!

তার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বৌ বলে—'আমি যখন ছোট ছিলাম এই ভাবে ভিক্ষা করে খেয়েছি। এই রকম একটি দুর্বছরে আমাকে বিক্রী করেছিল ওরা।'

বৃদ্ধ ঘুমিয়েছিলেন—এতক্ষণে জেগে উঠলেন। তিনিও একটি বাটি নিলেন। তার পর চার জনে রাস্তায় বেরুল ভিক্ষা করতে। ওলান প্রত্যেক পথচারীর সামনে বাটি ধরে ভিক্ষা করছে। অনাবৃত বক্ষে শিশুটি ঘুমিয়ে আছে। সে যখন বাটি নিয়ে এদিক্-ওদিক্ ছুটছে ঘুমন্ত মাথাটিও দুলছে এদিক-ওদিক। ভিক্ষার সময় শিশুটিকে দেখিয়ে সে চীৎকার করে বলছে—'আপনারা যদি দয়া না করেন এই বাচ্চাটি মরে যাবে—আমরা না খেয়ে মরব।' নেতিয়ে পরা শিশুটিকে মরা বলেই মনে হয়। কেউ কেউ অনিচ্ছাসত্ত্বে সামান্য কিছু ছুঁড়ে দেয় তার দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই ছেলেদের কাছে ভিক্ষা করাটা খেলা বলে মনে হ'তে থাকে। বড়টির কেমন লজ্জা করে। ভিক্ষার সময় সে লাজুকের মত দাঁত বের করে হাসতে থাকে। মা'র নজরে পড়া মাত্রই ছেলে দু'টিকে মা কুঁড়েতে টেনে নিয়ে গিয়ে মুখে কয়েকটা চাটি বসিয়ে দেয়। রাগে গর-গর করে বকতে থাকে—'মুখে বলছ উপোসের কথা আবার দাঁত বের করে হাসছ। বোকাগুলো উপোসেই মর তাহলে।' মারতে মারতে ওলানের হাতে ব্যথা করতে থাকে। ছেলেদের গাল বেয়ে জল গড়ায়।

'এইবার ঠিক ভিক্ষে করতে পারবে। ফের হাসলে আরো মার চলবে।'

রাস্তায় বের হয়ে একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে করতে রিকশ-ওয়ালাদের আস্তানায় এসে হাজির হয় ওয়াঙ। এখানে রিকশ ভাড়া পাওয়া যায়। সে আট আনা কবুল করে সারা দিনের জন্য একটা রিকশ ভাড়া করল। রাত্রে ফিরে দাম দিতে হবে। তার পর রিকশটাকে টেনে নিয়ে এল রাস্তায়।

এই রোগা লিকলিকে দু'-চাকার গাড়ীটাকে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ওর মনে হয় রাস্তার সবাই নিশ্চয় ওকে বোকা ঠাওরাচ্ছে।

লাঙলে নতুন বলদ জুতলে তার যেমন অবস্থা হয় ওয়াঙের অবস্থাও ঠিক তেমনি হাস্যাস্পদ হয়েছে। ভাল করে সে চলতেই পারে না। কিন্তু জীবিকা অর্জন করিতে হলে তাকে টানতেই হবে রিকশ। এই সহরে কত জনই ত সোয়ারী নিয়ে ছুটছে এই ভাবে। ওয়াঙ একটা সংকীর্ণ গলির রাস্তায় এল যেখানে কোন দোকান নেই। শুধু গৃহস্থের বাড়ীর বন্ধ দরজার সারি। এইখানে সে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলবার জন্য কিছুক্ষণ রিকশ নিয়ে গলির এ-মোড় ও-মোড় ছুটাছুটি করল। যখন প্রায় সে হতাশায় ঠিক করে ফেলেছে রিকশ টানার চেয়ে ভিক্ষা করাই তার পক্ষে শ্রেয় তখন একটা বাড়ীর দরজা খুলে গেল। পণ্ডিতের মত পোষাকপরা চোখে চশমা আঁটা এক জন বৃদ্ধ বেরিয়ে ডাকলেন তাকে।

ওয়াঙ গোড়াতেই তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে নতুন লোক, কিন্তু বদ্ধ কালা লোকটি তার কিছুই শুনতে পেলেন না। শুধু শান্ত ভাবে রিকশর হাতল নামিয়ে তাকে উঠতে দেবার জন্য সংকেত করতে লাগলেন। বৃদ্ধের ভদ্র-সাজ এবং জ্ঞানী চোখের সামনে কি করবে বুঝতে না পারে ওয়াঙ বাধ্য হোল গাড়ী নামাতে। বৃদ্ধ গাড়ীতে উঠে সোজা হয়ে বসে বললেন—'কনফুসিয়াসের মন্দিরে নিয়ে চল।' বলে সোজা হয়ে বসলেন। বৃদ্ধের শান্ত ভঙ্গিমায় এমন কিছু আছে যার সামনে কোন তর্ক চলে না। কাজেই কনফুসিয়াসের মন্দির কোথায় তার বিন্দুবিসর্গ ধারণা না থাকলেও ওয়াঙ সবাইকে যেমন করতে দেখেছে তেমনি ভাবে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

জিজ্ঞাসা করতে করতে এগিয়ে চলল ওয়াঙ। তাই ভিড়ের মাঝা দিয়েই যেতে হয় মন্দিরে। বাজারের দোকানীরা ঝুড়ি নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। মেয়েরা চলেছে বাজারে। ঘোড়া ছুটছে গাড়ী নিয়ে আর তার মত চলেছে অনেক রিকশ। ভিড়ের মধ্যে একটার ঘাড়ে আর একটা এসে পড়বার যোগাড় সুতরাং ছোটবার উপায় নেই। ওয়াঙ যত দূর পারলে জোরে যেতে লাগল। পদে পদে পিছনের যাত্রিবাহী আসনটি ঝাঁকনি দিয়ে উঠছে। পিঠে বোঝা নিয়ে ছোটায় সে এত কাল অভ্যস্ত ছিল বটে কিন্তু বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়ায় অভ্যস্ত সে নয়। এদিকে মন্দিরের দেয়াল দৃশ্য হবার আগেই আর হাত টাটাতে থাকে—হাতের তালুতে ফোসকা পড়ে যায়।

মন্দিরের দরজায় এসে ওয়াঙ রিকশ থামালে বৃদ্ধ শিক্ষক নামলেন রিকশ থেকে—তার পর বুকের কাছে হাত দিয়ে একটা ছোট রূপোর মুদ্রা বের করে ওয়াঙকে দিয়ে বললেন—'এর বেশী আমি দেই না। ওজর-আপত্তি করে লাভ নেই।'

আপত্তি করার কথা চিন্তা করা ত দূরে থাক, এই ধরণের মুদ্রা ওয়াঙ আর পূর্বে কখনো দেখেনি'। ভাঙ্গালে ক'টা পয়সা পাবে তাও জানে না।

কাছের একটা চালের দোকানে গিয়ে মুদ্রাটা ভাঙ্গিয়ে সে ছাব্বিশটা পেন্স পেল। দক্ষিণ দেশে পয়সা কত সহজ—তাই ভাবতে থাকে ওয়াঙ। আর একটা রিকশয়ালা দাঁড়িয়ে দেখছিল ওয়াঙকে। এবার সে বলল তাকে—'মাত্র ছাব্বিশ পেন্স। কত দূর থেকে টেনে এনেছ ঐ বুড়োটাকে?'

ওয়াঙ যখন খুলে বলল সব কথা, সে ত শুনে চেঁচিয়ে উঠল—ভারী কঞ্জুস বুড়োটা। মাত্র অর্ধেক ভাড়া দিয়েছে। টানবার আগে কতোয় ঠিক হয়েছিল।'

'আমি ত ঠিক করিনি'। উনি বললেন 'চল'—আমিও চললুম।'

লোকটা ওয়াঙের দিকে তাকায় করুণার চোখে।

যারা আশে-পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের ডেকে সে বলতে লাগল—'গেঁয়ো ভূত কোথাকার। এক জন বললে 'চল' উনিও চললেন। বোকার ঝাড়! জিজ্ঞাসাও করল না 'কত দেবেন?' আরে গর্দভ, শুধু বিদেশী শাদা আদমীদের ভাড়া ঠিক না করে নিয়ে যাওয়া যায়। তারা যখন বলে 'এস'—অমনি শুনবে। তারা এত গাধা যে কোন কিছুর আসল দামই তারা জানে না। তাদের পকেট থেকে জলের মত টাকা বেরিয়ে যেতে দাও।' যারা দাঁড়িয়েছিল একথা শুনে তারা হাসতে থাকে।

ওয়াঙ কোন উচ্চবাচ্য করে না। এই সহরবাসীর ভিড়ে নিজেকে তার অত্যন্ত নগণ্য, বোকা মনে হয়। কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে সে রিকশ নিয়ে চলে যায়।

'যাই হোক এতে আমার ছেলেদের কালকের খাওয়া চলবে'—একগুঁয়ের মত বলে সে নিজেকে। কিন্তু তখনই মনে পড়ে যায় রাত্রে গাড়ীওয়ালাকে টাকা দিতে হবে। অথচ তার অর্ধেকও ত এখনও রোজগার হয়নি'।

সকালের দিকটা আরো এক জনকে টেনেছে ওয়াঙ। এর সঙ্গে দরাদরি করে একটা ভাড়া ঠিক করেছে প্রথমে। বিকালে আরো দু'জন তার রিকশ ভাড়া করেছে। কিন্তু রাত্রে যখন সে সমস্ত রোজগার গুণল দেখা গেল জমার টাকা দিয়ে মাত্র একটা পেন্স অবশিষ্ট রয়েছে। ওয়াঙ ফিরতে থাকে কুঁড়েতে দারুণ বিতৃষ্ণায়। ক্ষেতে সারাদিন যা খাটে তার চেয়ে বেশী শ্রম করেও সে মাত্র একটা তামার পেন্স রোজগার করতে পেরেছে। এতক্ষণে ওর জমির স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে। এই বিচিত্র দিনগুলিতে একবারও সে জমির কথা ভাবেনি। কিন্তু নিজের জমি থেকে এত দূরে থাকলেও এই চিন্তায় ওয়াঙের মন শান্তি পায় যে তার ক্ষেত তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ঘরে ফিরে এসে দেখল, ওলান সারাদিন ভিক্ষায় পাঁচ পেন্সের কিছু কম পেয়েছে আর ছেলেদের মধ্যে বড়টি পেয়েছে আটটি আর ছোটটি পেয়েছে তেরটা ছোট মুদ্রা। সব একত্র করে দেখা গেল সকালের খাবার কেনার পক্ষে যথেষ্ট পেয়েছে তারা। কনিষ্ঠের হাত থেকে পয়সা নিতে গেলে সে কান্না শুরু করে দিল। ভিক্ষালব্ধ অর্থের প্রতি কেমন একটা মমতা জন্মে গেছে তার। সে পয়সা হাতের মুঠিতে নিয়ে ঘুমোলো রাত্রে। যতক্ষণ না নিজের ভাতের দাম হিসেবে পয়সাগুলি দিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই তার হাত থেকে সেগুলো কেড়ে নেওয়া যায়নি'।

কিন্তু বৃদ্ধ কিছুই পায়নি। সারা দিন সে মাঠের ধারে নির্দেশমত বসেছিল কিন্তু ভিক্ষা করেনি। মাঝে মাঝে সে ঘুমিয়েছে আবার জেগে উঠে চলমান জনতা লক্ষ্য করেছে। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হ'লে আবার ঘুমিয়েছে। বৃদ্ধ বলে এর জন্য তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। হাত শূন্য দেখে শুধু সে বলল—'আমি মাঠে লাঙ্গল দিয়েছি, বীজ বয়েছি—ফসল তুলেছি। এই ভাবে ভরেছি আমার ভাতের পাত্র। আর তাছাড়া আমার ছেলে—ছেলের ছেলেরা রয়েছে।

তার নাতি-পুত্র আছে। কাজেই সে শিশুর মত সরল বিশ্বাসে আছে যে তারাই তাকে খাওয়াবে—তার ভরণ-পোষণ করবে।

[ক্রমশঃ

সোভিয়েট নাট্যশালা

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯১৭-র অক্টোবর-বিপ্লব সোভিয়েট রাশ্যার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আকাশে যেমন বিপুল সমারোহের সঞ্চার ক'রেছিলো তেমনি শিল্প ও প্রগতির জোয়ার এনেছে মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে, নাট্যশালায় ও নাট্যকলায়। বিপ্লবের আগে ১৯১০ সালে যেখানে মস্কোতে ছিলো মাত্র সাতটি নাট্য-প্রতিষ্ঠান সেই জায়গায় বর্ত্তমানে জাঁকিয়ে উঠেছে চল্লিশটি নাট্যশালা কেবল মস্কোতে এবং পাঁচশোটি সারা রাশ্যা জুড়ে।

বিপ্লবের আগে মস্কোর অন্যতম নামকরা নাট্যশালা ছিলো কর্স থিয়েটার। এখানে শিল্পকলা বা নাট্যরস নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামাতো না কেউ! শুধু চলতো প্রত্যেক হপ্তায় নিত্য-নতুন যেমন তেমন নাটকের যা'-হোক্ অভিনয়। কেন না, সেখানকার পরিচালকবৃন্দ জানতেন, হপ্তায় হপ্তায় নতুন নাটক না দিতে পারলে আসর জমবে না এবং আর্থিক সাফল্যও সুদূর-পরাহত। কিন্তু অভিনয় জমানোর পক্ষে যা' একান্ত দরকার—ভালো নাটক এবং সু-অভিনয়, তার দিকে খেয়াল না ছিলো মঞ্চ-বিধাতার না ছিলো মঞ্চ-দর্শকের। কাজেই প্রতি শুক্রবারে নতুন নাটকের শুভ উদ্বোধনই ছিলো কর্স থিয়েটারের বিশেষ আকর্ষণ ও বিশিষ্ট সংবাদ। মস্কো ড্রামাটিক লিটল্ থিয়েটারের ব্যবস্থা ছিলো একটু ভিন্ন রকমের, তবে তাল একই। এঁরা জোর দিতেন বেশী কেবল ভূমিকা নির্ব্বাচনের দিকে। নাটক যেমন তেমনই হোক্ তথাকথিত সু-অভিনেতা দিয়ে সকল দৈন্য ঢাকবার অন্তহীন প্রচেষ্টাই ছিলো তাঁদের প্রোগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য। দু'-এক জায়গায় আবার মাত্র চার-পাঁচটা মহড়া দেবার পরই নাটক মঞ্চস্থ হোতো বিপুল ধুম-ধড়াক্কার মধ্যে। তবে তারই মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির খানিকটা আগ্রহ ছিলো মস্কো আর্ট-থিয়েটারের। কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগের সোভিয়েট নাট্যশালার চেহারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রেণিহীন সমাজের অগণিত জনের সর্ব্ব-সাধারণের উৎসাহ, প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য আধুনিক নাট্যশালার দৃষ্টি নাটক নির্ব্বাচন, অভিনেতা নির্ব্বাচন, সুপরিচালনা, দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, এবং প্রেক্ষাগৃহের সুখ, সুবিধা ও আরামের ব্যবস্থার দিকেও সমান ভাবে সতর্ক এবং সজাগ। নতুন যুগের দর্শকদল শুধু নিছক বিলাস ও আমোদ-প্রমোদেই সন্তুষ্ট নয়; মঞ্চে তারা চায়—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির মীমাংসা ও সমাধান। ফলে মঞ্চ-ব্যবসায়ীরাও তাঁদের দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হ'য়ে পারেন না।

এফিনোজেনভের 'কালো জঙ্গল' নাটকের একটি দৃশ্য (থিয়েটার ফর ইয়ং স্পেকটেটর, মস্কো)

কার্শ্মানভের 'বিদ্রোহ' নাটকের একটি দৃশ্য
(মস্কো ট্রেড ইউনিয়ন থিয়েটার)

নাটক নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ কোরে প্রাচীন রাশ্যা ও আধুনিক বিপ্লবোত্তর যুগের রাশ্যাকে পটভূমিকায় রেখে যে সমস্ত নাটক রচিত হয় তার ওপরই জোর এবং উৎসাহ দেওয়া হয় বেশী। জার-তন্ত্রের আমলের রাশ্যার সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা পত্তরকে কেন্দ্র ক'রে অনেক নতুন নাটক মঞ্চের জন্যেই বিশেষ কোরে লেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে এ্যালেক্সী টলষ্টয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সম্প্রতি সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ জানানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে সোভিয়েট সাহিত্যের ক্ষতি যা' হোলো তার চেয়ে বেশী হোলো আধুনিক সোভিয়েট নাট্যশালার। বিপ্লবের সময়কার এবং তার পরের অবস্থার দৃশ্যও মঞ্চ থেকে বাদ যায় না।

বিষয়-বস্তুর নতুনত্ব ও রাজনৈতিক মাল-মশলাই যে কেবল এই সমস্ত নাটকের সর্ব্বস্ব তা' মনে করলে ভুল হবে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, অদ্ভুত ও সার্থক চরিত্র-সৃষ্টি, দৃশ্য ও অঙ্ক বিভাগ এবং চরিত্রানুযায়ী স্থানকাল-উপযোগী সংলাপের দিকেও নাট্যকারকে দৃষ্টি রাখতে হয়। এ ছাড়া আছে ক্লাসিককে নাট্যরূপ দিয়ে তার অভিনয়। এই ধরণের নাট্যরূপ কিন্তু কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। দেশ-বিদেশের ক্লাসিকও এই ধরণের উন্নততর নাট্যরূপ পেয়ে থাকে। কাউণ্ট লিও টলষ্টয়, গোর্কী, গোগোল এঁদের লেখা ত আছেই, তা ছাড়া আছে সেক্সপীয়ারের নাটক, ইউজীন ও' নীলের নাটক এবং অন্য অনেক সেরা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের নাট্যরূপ।

আধুনিক যুগের সোভিয়েট নাট্যশালার সবচেয়ে বড়ো কীর্ত্তি ঋষি টলষ্টয়ের যুগান্তকারী ও অমর উপন্যাস 'রেশারেক্শন'এর নাট্যরূপ দিয়ে তাকে সুষ্ঠু ও সফল ভাবে মঞ্চস্থ করার গর্ব্ব ও গৌরব। সেটি ১৯৩০ সালের ঘটনা। নাট্যকার ও প্রয়োজককে রীতিমত মুস্কিলে পড়তে হয়। উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দিতে গিয়ে, হয় টলষ্টয়ের ধর্ম্ম ও দর্শনের আদর্শবাদকে বজায় রাখতে হয় নতুবা এর অন্ত-র্নিহিত সামাজিক ও দার্শনিক তত্ত্ব ও গুরুত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে অপেক্ষা ক'রে কেবল নায়ক-নায়িকা নেখলু্যডভ্ ও ক্যাথারিনের প্রেম ও রোমাঞ্চ কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রেই নাটক দাঁড় করাতে হয়। কিন্তু প্রগতিশীল ও সুপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক মস্কো আর্ট থিয়েটারের শিল্প-নির্দ্দেশক, নাট্যকার, প্রয়োজক ও পরিচালক টলষ্টয়ের ঐ নীতি-বাদ কিংবা বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ও তাঁর পরিচারিকার প্রেম ও প্রণয় কাহিনী ছাড়া আরো অনেক কিছু যেন আবিষ্কার করলেন। জার-অধ্যুষিত রাশ্যার অত্যাচার, নির্য্যাতন, উৎপীড়ন, সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই তাদের অজ্ঞাত ও অদ্ভুত এবং বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ের উদ্দাম দুর্ব্বার বিলাস-ব্যসন—একই সঙ্গে সমস্ত তাঁরা ফুটিয়ে তুললেন অমর উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপের মধ্যে।

সোভিয়েটের প্রথম শ্রেণীর নাম-করা নাট্যশালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মস্কো আর্ট থিয়েটার, মায়ারহোল্ড-পরিচালিত রঙ্গমঞ্চটি ডি, ডাথানগোভ্ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিচালিত নাট্যশালাটি এবং বিশেষ কোরে কামার্ণী থিয়েটারটি। শেষোক্ত মঞ্চটি বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছে শক্তিমান নাট্যকার ইউজিন্ ও' নীলের সেরা সেরা নাটকের অভিনয়ের জন্যে। অন্যান্য নাট্য-প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া-কলাপ ও অনুষ্ঠান সমান না হ'লেও সামান্য নয়। "মস্কো ক্রাসনায়া প্রেসন্যা থিয়েটার," 'মস্কো থিয়েটার অফ্ দি রেভল্যুশন্', "লেনিনগ্রাড্ ড্রামাটিক থিয়েটার" মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জার জন্য বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরও আছে, সোভিয়েট অপেরা এবং ব্যালে—তার জন্যে আলাদা নাট্যসঙ্ঘ এবং নাটমঞ্চ আছে।

সোভিয়েট রঙ্গ-জগতের আর এক বৈশিষ্ট্য—মঞ্চবিধাতা ও দর্শকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সম্প্রীতি। এর পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ ক'রে কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রঙ্গমঞ্চগুলিতে, লাল-ফৌজএর পৃথক্ নাট্যশালাতে আর শিশু ও কিশোরমণ্ডলীর জন্য স্বতন্ত্র নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে। উৎসাহী দর্শকদের নিয়ে সমিতি ও বৈঠক গঠিত হয় নাটক ও নাটমঞ্চ-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য এবং তাতে কলকারখানার প্রতিনিধিরাও নামকরা মঞ্চ-প্রয়োজক, পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গের সঙ্গে পরিচিত হবার এবং তাঁদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়। মঞ্চের প্রোগ্রাম, কর্ম্মব্যবস্থা, অভিনেয় নাটক ইত্যাদি ব্যাপারে ঐ সব প্রতিনিধির মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং আবশ্যক-বোধে সেগুলিকে রূপদানও করা হয়। নাট্য-লোক ও সাহিত্য-জগতের রথী, মহারথী ও কর্ম্মকর্ত্তাদের এবং দর্শক ও রসবেত্তাগণের এই সোজাসুজি সংস্পর্শ ও মন-খোলা আলাপ-আলোচনার ফলে দু'পক্ষের মধ্যে যে যোগসূত্র গ'ড়ে ওঠে তা' সব দিক্ দিয়েই কল্যাণকর। মঞ্চ-পরিচালকগণ শুধু কিন্তু এতেই ক্ষান্ত নন। মাঝে মাঝে তাঁরা "স্পেক্টেটস কনফারেন্স" বা দর্শক-সাধারণের সুযোগ ও সুবিধামত সম্মেলন আহ্বান করেন, ব্যবস্থা করেন। সেখানে সাম্প্রতিক ও সাময়িক নাটক, নাট্যকার, নাট্যবস্তু, অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে খোলাখুলি হৃদয়গ্রাহী আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক সমালোচনা চলে, গুণী শিল্পিসঙ্ঘকে পুরস্কৃত ও প্রশংসায় ভূষিত করা হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ও মঞ্চকে আরও উন্নত এবং প্রগতিশীল ক'রে তোলার উপায় ও পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়।

তাই ব'লে দর্শকবৃন্দের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের মতের অমিল ও গরমিল যে একেবারেই হয় না তা'ও নয়। তবে এই অবস্থার উদ্ভব হয় একান্ত ভাবে বিশেষ ক্ষেত্রেই। বহু-বিতর্কিত ও মতদ্বৈধ-মূলক বিষয়-বস্তুর অবতারণা অথবা প্রযোজকের কোনো পরীক্ষামূলক বিধিব্যবস্থা থেকে এটি ঘ'টে ওঠে। তখন দর্শক-সাধারণের মধ্যে সাধারণতঃ দুটি দল গড়ে উঠতে দেখা যায়। এক দল সমালোচনা করেন নির্ম্মম ও

নির্দ্দয় ভাবে আর এক দল কেবলি যেন মঞ্চ-মালিকের তরফ থেকে করতে থাকেন জবাবদিহি। শ্রমিক ও সাধারণ কর্ম্মীর কাছে থিয়েটার একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠছে দিন দিন। মায়ারহোল্ড কিংবা মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাম বহু দূর-দূরান্তরের নিভৃততম পল্লী-কোণেও বিশেষ জানা-শোনা ও পরিচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বত্র থেকেই নাট্য-প্রতিষ্ঠানের কাছে উপরোধ ও অনুরোধ আসে সেই সব জায়গায় গিয়ে অভিনয় ও নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়ে আসবার। কর্ম্মকর্ত্তারা তখন বেরিয়ে পড়েন অভিনয়-অভিযানে বিপুল দর্শকের দূরাগত নিমন্ত্রণ ও আহ্বানে সাড়া দিতে। এই ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় অভিনেতৃসম্প্রদায় ও নাট্যকার স্থানীয় জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে অনেক কিছু জানবার, শেখবার ও ভাববার সুযোগ পান। এই অভিযানকালে শিক্ষামূলক কাজও অনেক চালিয়ে থাকেন এঁরা। বক্তৃতা এবং বিবরণী পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁরা সাধারণ লোককে মঞ্চের জন্ম, ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত ও সজাগ ক'রে তোলেন। তা' ছাড়া অনেক মঞ্চে আবার আছে ছোট ছোট নাটুকে দল—তাঁদের কাজ হোলো শ্রমিকসঙ্ঘের এবং কর্ম্মীদের ক্লাবের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামের মহলা দিয়ে—তার রূপদান করা। এই ছোট ছোট দলকে প্রায়ই কলকারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের খাবার সময়ের ঐটুকু ফুরসতের মধ্যেই তাদের যথাসম্ভব আনন্দ দেওয়া ও চিত্তবিনোদন করার দায়িত্ব পালন করতে হয়। চাষা-ভূষোদের কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তাদেরও ঐ মাঠে মাঠে ছোট-খাটো অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

লালফৌজের জন্য নির্দ্দিষ্ট পৃথক মঞ্চগুলির লক্ষ্য তোলো আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলের মধ্যে শিক্ষা বিকিরণ করা এবং সাথাসুজি তাদের সাংস্কৃতিক দিকের পরিপুষ্টি সাধন করা। যুবক সম্প্রদায়ের শিক্ষালয় ব'লেও এই মঞ্চগুলিকে গণ্য করা হয়। বড় বড় প্রত্যেক সহরেই প্রায় লালফৌজ ক্লাব আছে। এই ক্লাবগুলির তত্ত্বাবধানে আছে বড় বড় লাইব্রেরী, সঙ্গীত-সংসদ, নাট্যসঙ্ঘ। এই সব নাট্য-মঞ্চে সব জাতীয় নাটকই মঞ্চস্থ ও অভিনীত হয়, তবে বিশেষ ক'রে হাল্কা নাচ-গান-বহুল নাটক ও হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের জনপ্রিয়তাই খুব বেশী। বিশিষ্ট এই সব স্বতন্ত্র নাট্য-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আবার সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে অভিনয় দেখাতে হয়। সাধারণ মঞ্চে ক্লাসিক আখ্যা পেয়েছে যে সব নাটক, তা'ও এঁদের প্রোগ্রাম থেকে বাদ যায় না। রেড আর্ম্মি থিয়েটার কর্ত্তৃক প্রযোজিত, মঞ্চস্থ ও অভিনীত স্ত্রোভস্কি'র নাম-করা নাটক "দি জেষ্টারস্" এক সময় বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলো এবং আজো বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে লালফৌজের কাছে।

শিশু ও কিশোর-মণ্ডলীর প্রতি নাট্যশালার দরদ, মমত্ব ও দায়িত্ব-বোধ সোভিয়েটে যেমন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে এমন বোধ হয় আর কোথাও হয়নি। সেখানে অবিশ্যি বয়স্ক অভিনেতা-সম্প্রদায়ই কিশোরোপযোগী চিত্তাকর্ষক নাটকের অভিনয় করেন। ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-ভরসাস্থল শিশু ও কিশোরকে মানুষ ক'রে তোলার

ম্যাক্সিম গর্কির 'য়েগর বুলিশেভ' নাটকের একটি দৃশ্য
(ভক্তাঙ্গব থিয়েটার, মস্কো)

ভার অনেকখানিই যেন এর ওপর ন্যস্ত। এই সব মঞ্চাধ্যক্ষকে শিল্পের উৎকর্ষ ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দ বিতরণ ও শিক্ষা-বিকিরণের দিকে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এই অভিনয় দেখতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করার ভার থাকে বিদ্যালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষের ওপর। অভিনেয় নাটক, তার বিষয়-বস্তু, ঘটনা ও সংলাপ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে বিদ্যালয় থেকে শিশু ও কিশোরদের অভিনয় দেখতে যাবার আগেই পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ নাটকের ব্যাপারে তাদের ভালো লাগা-না-লাগা এবং যা' কিছু প্রতিক্রিয়া সবই অতি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন মঞ্চ-পরিচালকগণ। তা ছাড়া লেনিনগ্রাডের শিশু ও কিশোর-মঞ্চটির কর্ত্তারা মাঝে মাঝে এই সব ছোট ছোট দর্শকদের বৈঠক আহ্বান করেন। সেই সব বৈঠকে তাঁরা শিশু-মনের সাম্প্রতিক খবরাখবরের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত হবার সুযোগ এবং অবকাশ লাভ করেন। শিশুর গঠন ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার মনের নিত্যনতুন ভাব ও বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র ক'রেই নাটকের বিষয় বস্তু নির্ব্বাচিত হয়। এই সব নাটক সাত আট বছর থেকে চোদ্দ পনেরো বছরের বালক-বালিকার কাছে মনোমত এবং খুবই প্রিয়। এই শিশুমঞ্চের জনৈক প্রখ্যাতনামা পরিচালকের মতে—Whoever wishes to play with children must become a child himself, and that means—be sincere in everything to himself.

এই যে সহযোগিতা, সম্প্রীতি, আন্তরিকতা—এ শুধু শিশু ও কিশোর মঞ্চেরই বৈশিষ্ট্য ও মূলমন্ত্র নয়, এ কথা সত্য সমগ্র ভাবে—সোভিয়েট নাট্যশালার বেলায়, ধনী, দরিদ্র, শ্রমিক, লালফৌজ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ নাট্যশালার মূলমন্ত্রে ও আদর্শে ঐ একই ঐক্যতান অনুরণিত হ'য়ে চলেছে।

যদি বলি

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

উদ্ভট-বর্ণিত যে সকল কারণে মুরারির দারুময়ত্বের রটনা আছে, তার থেকে কঠিন শত কারণ থাকতেও আমরা যে কেন ভস্মীভূত হইনি, এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে' আজ আর কোন শ্লোক রচিত হয় না। বর্ত্তমান জীবনের বিষম বিপর্য্যস্ত অবস্থা সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবীণ এক সাহিত্যরসিক সে-দিন এই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

উদ্ভটে তিনি বহু কাল রস পেয়েছেন। এ রস-পরিবেষকের অভাব তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে উদ্ভটকার আর কেউ নেই। উদ্ভটকারের জন্ম হয় সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির একটি বিশেষ স্তরে। উদ্ভট শ্লোক যে হাসি জাগায় তা গা-করা অট্টরোলও নয়, মুখবোজা কাষ্ঠহাসিও নয়। রসবোধের প্রসন্নতাজাত মাধুর্য্যেই এই ধরণের পরিহাস-গর্ভ শ্লোকের মর্য্যাদা। এবং এই বোধ ও প্রসন্নতা তখন মানুষের মুখে-চোখে ভেসে উঠে যখন জীবনের গতি হয় সহজ এবং তার ছন্দ হয় লঘু।

স্বচ্ছন্দে যে চলে না তার গতির বিকৃতি যে হাসি জাগায় তাতে থাকে ব্যঙ্গের ক্রূরতা। জীবনের ছোট-খাট ত্রুটি বিচ্যুতি স্খলন-পতন নিয়ে যে হাসি, তাতে একে অপরের সঙ্গে নির্দ্বন্দ্বে যোগ দিতে ভয় পায় না। আজ আমাদের কথায় কাজে আমরা পরস্পরকে এ ভাবে হাসাতে পারি না। হাসি অবশ্য বন্ধ হয়নি, তাই নিজে নিজে হাসি এবং গোপন আনন্দের ক্রূরতা দিয়ে আঘাত করি পরস্পরকে। এর সব চেয়ে বড় কারণ যে আমরা সকলে জানি যে, কারো চলা তার আপন ছন্দে নয়।

আমরা দলকে দল ঘরোয়া কথায় যাকে বলে ছন্নছাড়া অর্থাৎ ছন্দহারা। এটাকে সুস্থ অবস্থার লক্ষণ বলে স্বীকার করা চলে না, সে জ্ঞান আমাদের অনেকেরই আছে। অসহজ এই প্রকাশ্য বিষণ্ণতাকে সহজ প্রমাণ করবার জন্য আমরা কেউ কেউ বলি যে, ছন্দে চলা—গতানুগতিকতা-পথ করে আমরা চলি, আমরা ব্যস্ত!

হঠাৎ দেখলে আমাদের বেশীর ভাগ লোককেই ব্যস্ত বলে ভুল হবার সম্ভাবনা; বাড়ীতে, কুঠিতে, সমাজে, সমিতিতে আমাদের চাঞ্চল্যের অন্ত নেই। আমরা পুরানো দিনের হিসাবে তাড়াতাড়ি চলি, দ্রুত কথা বলি—আমরা ব্যস্ত। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে যাঁরা দেখেন তাঁদের চোখে পড়ে এ ব্যস্ততায় তৎপরতার একান্ত অভাব।

তৎপরতা আমি তাকেই বলি, যার পরিচয় পাওয়া যায় সুকল্পিত কর্ম্মে পরম অভিনিবেশে। এই অভিনিবেশ তখনই পরিস্ফুট কল্পনার পরিধি যখন সুনির্দ্দিষ্ট, কর্ম্মের গতি যখন সুনিয়ন্ত্রিত। স্বতন্ত্র সমাজেই এই ব্যবস্থার চরম পরিণতি সম্ভব, এ কথা স্বীকার করলেও, তৎপরতা যে আমাদের কোন কর্ম্মেই আত্মপ্রকাশে বাধা পাবে, এ অস্বীকার কঠিন বলে মনে হয়, এবং এর একান্ত অস্বীকার প্রায় অসম্ভব বিধায় আমাদের কাজে যা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে তৎপরতার ভাণ।

স্নায়ু রোগী যেমন দুর্ব্বলতা লুকোবার চেষ্টায় শক্তিমত্তার আস্ফালন করে, আমরা সামাজিক হিসাবে তেমন তৎপরতার একান্ত অভাবকে ঢাকবার প্রয়াসে ব্যস্ততার ভাণ রাখি। এ কথা বহু বার শুনি যে আমরা ব্যস্ত, কারণ বহুতর সমস্যায় যে আমরা পরিবেষ্টিত, উৎপীড়িত!

লণ্ডনে এক কালে মাদাম তুষাদ বলে এক মহিলার বিভীষিকার এক ঘর ছিল। লোকে পয়সা খরচ করে' সেই ঘরে যেত ভয় পাবার বিলাস-লালসে। আমাদের সমাজকক্ষে সার-বাঁধা সমস্যার বিভীষিকা আছে এবং বিনা খরচেই যার দর্শন মেলে তার তুলনায় তুষাদের আয়োজন নগণ্য বলে ধারণা করলে অসঙ্গত হবে কি?

আমাদের দেশে মরবার সহস্র সঙ্গীন কারণ থাকতেও লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং দেশে কৃষি উপযোগী ভূমির পরিমাণ বাড়া সত্ত্বেও অন্ন কমছে। অন্নের অনটন এবং অর্থাভাবের ফলে দারুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। অপিচ অন্নহীন ও স্বাস্থ্যহীন জনগণের বুদ্ধির অপবিণতি অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধির বৃদ্ধি নির্ভর করে পুষ্টি ও শিক্ষার উপর। শক্তিহীনকে শিক্ষা দিয়ে উত্তেজিত করা আর দানাপানি না দিয়ে চাবুকের জোরে ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াকে দিয়ে গাড়ী টানানো রুচিমানের কাছে এক শ্রেণীর অপরাধ বলে গণ্য। প্রচণ্ড কর্ম্মোদ্যমের মধ্যে বেকার বাড়ছে অথচ বেগারের আর শেষ নেই—এমনিই এ দেশে বড় বড় সমস্যার ভিড়, ছোট সমস্যার তো আর অন্ত নেই।

সমস্যা নিয়ে কারবার করা চলে তিন ভাবে। এক—সমস্যার তীক্ষ্ণতায় বা প্রচণ্ডতায় অভিভূত হয়ে 'পারলাম না' বলে ভীষ্মদেবের অনুকরণে সমস্যার শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করা। অন্নসংগ্রহে নিতান্ত অপারগ হয়ে কোটি লোক আমাদের দেশে এই ভাবে প্রাণ ত্যাগ করেছে—অন্নাভাব-সমস্যা তারা সমাধান করতে পারেনি, কোন সাহায্যও তারা পায়নি—তাদের ইচ্ছা-মৃত্যুর তুলনায় ভীষ্মদেবের তিরোধান সামান্য হয়ে গেছে!

দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, যে ভাবে সমাধান সম্ভব তার উপযুক্ত বিচার করে প্রয়োজনীয় অবস্থার উদ্ভবে আপ্রাণ চেষ্টা-মন্ত্রের সাধনে তন্ত্রের আশ্রয় এবং অনন্যমনে ব্রত উদ্‌যাপন।

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে সমস্যা-বিলাস। এ দেশে এক শ্রেণীর সাধুবেশধারী ভিক্ষোপজীবীকে দেখি, যারা গাছের কাঁটার বিছানা পেতে শুয়ে থাকে কিম্বা চাকা-লাগানো কাঠের তক্তায় লোহার ধারাল ফলার উপর বসে' দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কৃচ্ছ্রের বাহাদুরী সকল দেশেই আছে, তবে এ ধরণের কণ্টক-বিলাস কেবল এ দেশেই দেখা যায়।

কৃচ্ছ্রের এই ব্যর্থ বিলাস আর যাকেই অভিভূত করুক না কেন, শিক্ষিত মনকে পীড়িত করে নিশ্চয়, অথচ আমাদের দেশে বারংবার দেখি যে, সমস্যার পর সমস্যা পুঞ্জীভূত করে কমিটির (committee) কণ্টকশয্যায় নিরন্তর নিরুদ্বেগে বসে আছি!

এক শ্রেণীর লোক আছে দুঃখ-বেদনায়, ঘর্ষণে-ধর্ষণে যারা একটা চোরা-সুখ পায়। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই, হয়ত অনেক উৎপাত বহু দিন সহ্য করবার অভ্যাসের ফলে, এ ধরণের মানুষকে বেশী দেখা যায়। মুখে-চোখে তাদের ব্যথার ছাপ, কথায় তাদের কান্নার সুর—এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় তারা কেবলই তাদের দুঃখের কথা বলে বেড়াচ্ছে, কেঁদে ঘুরছে, কি ছিল তার কি হোল, কি করতে পারলে, কি হোত!

ক্ষত তা সে দেহেরই হোক বা মনেরই হোক, সারাবার অপেক্ষা রাখে। চিকিৎসক বা দরদী ব্যতীত অপরকে তা দেখাবার নয়। অথচ ক্ষত নিয়ে প্রদর্শনী করে এ-হেন মানুষ যেখানে অগণিত, দেশ

বা দল হিসাবে যখন এ ধরণের মানুষ দেখা দেয় তখন সে সমাজের অবস্থা যে রুগ্ন, এ বিচার বোধ করি ভুল নয়।

সমস্যা যেখানে উদগ্র, দিনে দিনে পুঞ্জীভূত, সেখানে কেবল তার তালিকা রচনা এবং উচ্চ কণ্ঠে তার প্রচার শুধু কর্ত্তব্যের নিশানার অভাব নয়, সামাজিক স্বাস্থ্যহীনতার সুস্পষ্ট লক্ষণ। অথচ এ ছাড়া আমরা আর করি কি?

মানসিক ব্যথা যদি সারে আত্মীয়-মিলনে, আর শরীরের ক্ষত যদি সারে বৈদ্যের সাহায্যে তবে সমাজ-শরীর ও সামাজিক-মনের উৎপাত সম্পর্কেও সেই ব্যবস্থা মন্দ কি?

ফরাসী মনীষী ভলটেয়ার প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে, সূর্য্যকেন্দ্রিক এই বিরাট বিশ্বের পাগলা-গারদ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীটা। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের নানা ব্যবস্থা ও বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে বিরক্ত হয়ে পরিহাস-মুহূর্ত্তে ভলটেয়ার যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ পাগলা-গারদে তত দিন শাস্তি পেত, যত দিন না মৃত্যু আনতো পরম শান্তি। পাগল ছিল তখনকার সমাজে এক সমস্যা!

এই পরিহাসের উল্লেখ করে ইংরেজ পণ্ডিত হ্যাভলক এলিস পরিহাসচ্ছলে ভারি সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ভলটেয়ারের পরিহাসের তীক্ষ্ণতা কেটে গেছে: কারণ, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যেটা ছিল গারদ, আজ তার নাম হয়েছে আশ্রম বা চিকিৎসালয়। শাস্তি ও অবহেলার পরিবর্ত্তে সেবা ও শুশ্রূষার আদর্শকে আমরা শ্রদ্ধাভরে মেনে নিয়েছি, কর্ম্মে সামাজিক কল্যাণে রূপায়িত করছি।

মস্তিষ্কের বিকার কেন হয়, পণ্ডিতের কাছে আজও এ প্রশ্ন সুষ্ঠু উত্তরের অপেক্ষা রাখে: কিন্তু বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ আজ আর সমাজের সমস্যা নয়। ও-ধরণের রুগ্ন ব্যক্তি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা সঙ্গত তা নিয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই এবং এ-সম্বন্ধে যে আয়োজন সভ্য-দেশ মাত্রেই তা পূর্ণাবয়ব।

সমস্যা নির্দ্ধারণ ও তার বিচার, নানা ভাবে সেই সব ত্রুটি ও অপূর্ণতার আলোচনা ও প্রচার এ সকল কার্য্যের কোনটিই নিরর্থক নয় বরং প্রত্যেকটিই অবস্থাবিশেষে প্রয়োজনীয়। এ প্রয়োজনীয়তার এক মাত্র নিরিখ হচ্ছে সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টায়।

সমস্যার পরিণতি তার সম্যক্ সমাধানে, এ কথা যদি সর্ব্বজন-স্বীকৃত হয়, তবে অবহিত হয়ে সেই চেষ্টা করা সঙ্গত, যাতে সকল অপূর্ণতা দূরীভূত হয়। বাধা বলে যাকে জানছি তাকে অপসারিত করা কর্ত্তব্য হয়ে উঠে।

অথচ আমরা তা করি না! নাগরিক জীবনের একটা সমস্যা ও সেই সম্বন্ধে আমাদের এ যাবৎ কৃতি নিয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের সহরে সহরে বস্তি আছে। দুষ্ট ক্ষতের মত এর প্রকাশ ও বিস্তার অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষিত হয়েছে। কুৎসিত এবং ভয়ানক, অপরিচ্ছন্ন ও বীভৎস এই বস্তি ও সেখানকার কদর্য্য জীবনযাত্রার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। সাহিত্যে তা রূপায়িত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে সেই কাহিনী যেন মাদাম তুষাদের বিভীষিকার ঘর।

এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, বস্তির জন্ম নগর-গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আসে না—এই বস্তি কোন সহরের সহজাত অবয়ব নয়। বিশ্বাস করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে যে, নগরের সঙ্গে বস্তি বিস্ফোটক ছাড়া আর কিছু নয় এবং দ্রুত তা আরোগ্য করা নাগরিকতার প্রধানতম কর্ত্তব্য।

অনেকেই জেনেছেন যে, বস্তিরূপ দুষ্ট রোগ সংগ্রহ আয়োজন-সাপেক্ষ। এই ক্ষত বজায় রাখায় যাদের স্বার্থ এই রোগ সংগ্রহ ও তার সযত্ন পালন-পোষণে তাদের হাত কতখানি সে কথাও অনেকের অবিদিত নেই। একটা নগরের সকল লোকই কিছু এ সব স্বার্থে বিজড়িত নয়, লাভের লোভে বিমূঢ় নয় অথচ তাদের অনেকের কল্যাণময় গৃহস্থালীর গা ঘেঁষে এই বস্তির লজ্জাহীন কদর্য্য অবস্থিতি তো বাধা পায় না। কলকাতার রাজপথে অন্ধকূপ-হত্যার মিথ্যা স্মৃতিস্তম্ভ তত দিনই নির্লজ্জ ভাবে দাঁড়িয়েছিল যত দিন না প্রশান্ত কল্পনা ও সঙ্গত কর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে তাকে চিরদিনের মত অপসারিত করেছে! শিক্ষিত ও মার্জ্জিত বুদ্ধি ও কল্যাণ-শ্রীমণ্ডিত জীবনের অপমান-স্তম্ভরূপে যে বস্তি নগরের ভদ্র-জীবনকে লাঞ্ছিত করছে তাকে ধূলি-অবলুণ্ঠিত করতে হলে চাই পরিচ্ছন্ন কল্পনা ও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। সমস্যার সহজ সমাধান তখনই অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মাঙ্গ যখনই কর্ম্মেচ্ছু মানুষের আয়ত্তাধীন। বস্তি থাকে, কারণ তাকে উৎসন্ন দেবার কর্ম্মাঙ্গ আজও আমাদের পরিজ্ঞাত হলেও অনায়ত্ত।

ব্যক্তি হিসাবে আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের এই টেকনিকের জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছি। ব্যক্তি-বিশেষে এই কর্ম্মাঙ্গের পরিস্ফুটবোধ আমাদের গৌরবের কারণ হয়েছে! যদি বলি যে—সমষ্টি হিসাবে, সমাজ-সংঘাতরূপ কর্ম্মাঙ্গের জ্ঞান ও সেই বোধজাত কর্ম্মশক্তি অবাধ নয় তা বোধ হয় ভুল বলছি না।

আমাদের চাতুর্য্যের অভাব আছে, এ অপবাদ গ্রাহ্য করা যায় না; কিন্তু সেই চাতুরীর নিশ্চয়ই অনাটন যা প্রতিষ্ঠা দেয় অথচ মনুষ্যত্বের প্রকাশকে আবৃত করে না, স্বার্থ পূরণ করবার অছিলায় মনুষ্যত্ব হরণ করে না। প্রতিষ্ঠার সন্ধানে আমরা অনেকেই মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসি। রাজনৈতিক ব্যাপারে, অর্থ-নৈতিক ব্যবহারে, সামাজিক ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠায় বারেবারেই প্রতিবেশীকে অতিষ্ঠ করে তুলি, পরবাসী যদি কেউ থাকে তাকে করে দিই বিরক্ত।

আমাদের শিক্ষিত সমাজ জানেন যে, এ ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থা বলা কঠিন: তাই ঘরে-বাহিরে আমরা সর্ব্বদা বিব্রত ভাবে বাস করি, বিহার করি। এই ব্যস্ততাকেই বলছিলাম তৎপরতার অভাব। এ চাঞ্চল্য যা সূচিত করে তা হচ্ছে অপ্রতিষ্ঠা বা অসৎ প্রতিষ্ঠা।

উদাহরণ দিলে দোষারোপ করছি বলে ভুল হবার সম্ভাবনা। অপিচ কারোর দিকে আঙুল দেখিয়ে সমাজের কথা যখন বলা হয় তখন সে আঙুল কম্পাসের কাঁটা কাঁটার মত বারে বারেই যে নিজের দিকে ফেরে সে কথা জেনে রাখাই শোভন ও সঙ্গত। বলতে যা চাই তা হচ্ছে অনায়ত্ত কর্ম্মাঙ্গ নিয়ে কাজের আঙ্গিনায় যাদের ঘোরা-ফেরা করতে হয় তারা অপ্রতিষ্ঠায় বা কর্ম্মনাশে উঠানের দোষ না দিয়ে কোন মতে নিজেদের মর্য্যাদা রাখতে পারে না।

এই দোষারোপ আমাদের মধ্যে এত বেশী যে, তা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে প্রতিষ্ঠার অভাব ঘটছে অথচ সে অভাবের মূলে আছে কর্ম্ম সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং কর্ম্মকে তার যথানির্দ্দিষ্ট পরিণতিতে সার্থক করবার মত শক্তিহীনতা।

পরের ঘাড়ে এই ভাবে দোষ চাপাবার চেষ্টায় ব্যস্ততা থাকতে পারে, তবে সেই ছিদ্রপথে যে, প্রকৃত কর্ম্মে নিশ্চেষ্টতা শনির মত শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করতে পারে, এ সন্দেহ নিরর্থক মনে করি না। সাম্রাজ্যবাদ থেকে আরম্ভ করে চোরাকারবারী পর্যন্ত সবাইকে আমরা দোষী করেছি। এ কাজ যে একেবারে ভুল সে কথা বলা চলে না। এখানে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-সম্প্রদায়, রাজানুগৃহীত পরদেশী ও স্বদেশী ব্যবসায়ী এবং কর্ম্মিগোষ্ঠী, রাজানুগ্রহপালিত নানা ভাবের শোষকমণ্ডলী এবং রাজকৃপালোলুপ অন্যান্য ব্যক্তি বা দল নানা কৌশলে মঙ্গল কর্ম্মে বাধা দেয়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। কর্ম্মের কৌশলে স্বদেশের ও স্বসমাজের কল্যাণকর্ম্মীর হস্ত হবে সে বাধা সমূলে উৎপাটিত করা। আমি বলছিলাম যে নিজেদের যতটুকু কল্যাণ সাধন সম্ভব ততটুকুতেও পরাঙ্মুখ হয়ে অপরে দোষারোপ করা তাদের স্বভাব, স্বাবলম্বনে আস্থা যাদের কম।

মন্ত্র-উপদিষ্ট কন্যার মত আমরা দলকে দল নানা বয়সে বিভিন্ন ও বহুগণিত অভিভাবক দ্বারা শাসিত হয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। অচল কর্ম্মে যেমন শরীরের মাংসপেশীর ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হয়ে চলনেও অঙ্গবিকৃতি ও গতিবিকৃতি সৃষ্টি করে, বহু আচার-পীড়িত মনেও এই ভাবে ভারকেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটে। খনিতে যে বহু দিন কাজ করেছে তার চলাফেরা অঙ্গভঙ্গী তার কাছে সহজ বোধ হলেও স্বাভাবিক নয়। সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধির প্রকাশও তেমন স্বাভাবিক নয়। নিজের প্রয়োজন কি তা জানা এবং প্রয়োজন সাধন উপযোগী কৌশল আয়ত্ত করে সিদ্ধিলাভে অভিনিবেশ স্বাধীনতার লক্ষণ। আমাদের অভ্যাস ঠিক এর বিপরীত—আমরা যে-কোন অভিভাবক লালিত। আমাদের এই অভিভাবক কখনও দেখা দেয় জীবিত ব্যক্তিরূপে কখনও বা প্রাচীন ঐতিহ্যের আকারে। কর্ম্মে তাঁদেরই জীবন বাধা হয় না যাঁরা এই ব্যক্তিকে বন্ধু ও সহকর্ম্মিরূপে পেয়ে থাকেন এবং ভার না হয়ে প্রাচীন পরামর্শ হয় যাঁদের মনের অলঙ্কার।

অভিভাবকের প্রয়োজন আছে, জাতির জীবনে নেতার আবির্ভাব কল্যাণের কারণ। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে দিয়ে বিরাট চিন্তা ও কর্ম্ম সমাজকে অগ্রসরের পথে অতীতে বহু বার সাহায্য করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। জাতীয় জীবনে এ সময় আসে যখন উপযুক্ত মানুষের নেতৃত্ব মেনে চলাই পৌরুষ সাধনের একমাত্র উপায়। সুতরাং এই কথাই থাকল যে, অভিভাবক বা নেতা যে চালনার উপযুক্ত, চালিত হবার পূর্ব্বে শিষ্যের বা ভক্তের সে বিচার থেকে মুক্তি নেই। নির্ব্বিচারে কাউকে মেনে নেওয়ায় যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে এবং এ দেশের অভিভাবক-শাসিত মানুষের জীবন এই প্রত্যবায় দূষিত, বিভ্রান্ত।

কর্ম্মের সুস্পষ্ট ধারণা ও সঙ্গত সাধনা না করতে পারলে নেতৃ-বরণে লাভ কি? বিরাটতম নেতৃত্বও এ দু'টির অভাবে অসার্থক হয়ে যাবে। গত কয়েক মাসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দেশে অন্যমনস্ক লোকেরও চোখে পড়ছে। আকস্মিক উৎসাহের দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্যে মানুষগুলি নেতৃ-সন্নিধানে অসম্ভব জনতা রচনা করছে, অবিরাম চীৎকার করছে এবং অবিমিশ্র কর্ম্মহীনতাকে দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ মনে ক'রে যে আত্মপ্রসাদে মগ্ন হচ্ছে তাকে সাক্ষাৎ প্রমাদের স্বখাত সলিলে ডুব দেওয়া ছাড়া আর কিছু বলা চলে কি?

তবু বোঝা যায়, এই চাঞ্চল্যে তারা প্রমাণ করছে যে তারা পূজা ব্যপদেশে নেতাদের কথা না শুনলেও এ কথা তারা জানাতে চায় যে তারা বেঁচে আছে। প্রাণ-চাঞ্চল্যে অধীর এই মানুষগুলিকে সার্থক জীবনের মন্ত্রে উদ্‌বোধিত করে সুবিহিত কর্ম্মে নিয়োগ করবার অধিকারী তাঁরাই কর্ম্মাঙ্গ যাঁদের করায়ত্ত, সমাজের হিত-চিন্তা যাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগের মত সহজ। এই সব মানুষের জীবনে ছন্দ দিয়ে যে কাব্য রচিত হবে, তাতে উদ্ভট শ্লোকের মধুর হাসি নয়, উদ্বেলিত হয়ে উঠবে কল্যাণের ধারা, শ্লোকে শ্লোকে বেজে উঠবে সকল প্রাণের আনন্দ-স্পন্দন।

আকাশ

প্রসাদ মিত্র

তোমার অসীম বিস্তৃতি হায় পড়েছে ধরা
জানালার ফাঁকে উঁকিমারা নীল চতুষ্কোণে
হে আকাশ! তুমি বিস্তার করো বিপুল পাখা
দিগন্ত হতে দূর দিগন্ত অন্বেষণে,
তবুও তোমার ছায়া পড়ে এসে আমার মনে,

সোনালী সকাল আলো-ঝলমল সূর্য্যালোকে
তুমি ভেসে গেছো সুদূর শূন্যে লঘু পাখায়
তোমার সর্ব্ব শরীর আবরি যে রঙ নামে
বাতায়ন-ফাঁকে হাতছানি দিয়ে সে ডেকে যায়,
আমিও যে বাঁধা নিমন্ত্রণের নীল মায়ায়।

আবার কখনো ঘন-বরষার কৃষ্ণ মেঘে
কালো ছায়া নামে নীল সমুদ্রে স্বচ্ছ জলে
দুর্দাম ঝড়ে সভয়ে কাঁপিছে প্রদীপ-শিখা
সে ছায়া তো নামে গাঢ়তর হোয়ে মনের তলে,
বিরহের রাত তোমার কথাই প্রকাশি বলে।

তবু তুমি দূর বহু দূর হোতে কেবল চাওয়া
বাতায়নিকের মন যেতে চায় তোমার পাছে
ইঙ্গিতে আর ইসারায় বলো কী যায় জানা?
তুমি কী পারো না নিম্নে নামিতে মাটির কাছে?
আমার পৃথিবী তোমার পানেই চাহিয়া আছে!

বন্দী আমারে তুলে নাও তবে সুনীল নভে
তোমার বক্ষে বিপুল মুক্তি ঋজু প্রসার
দূর হোয়ে যাক্ আলোক-রেখার মেঘের ফাঁকে
নীচে ফেলে-আসা স্বপ্নশেষের অন্ধকার,
শুধু তুমি আমি তোমার আমার আমি তোমার।

কবিকঙ্কণ

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত চণ্ডীকাব্য-রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে বর্দ্ধমান জিলার দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের বাসস্থান ছিল। কিন্তু এই গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি হইলেও বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রামে তিনি বাস করেন নাই। এই স্থান মুকুন্দরামের পৈতৃক বাস্তুভূমি এবং এই গ্রামেই অন্ততঃ পক্ষে তাঁহার ঊর্দ্ধতম সাত পুরুষের বাসস্থানের পরিচয় যদিও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি এই দামুন্যা গ্রামে বাস করেন নাই। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যেমন স্থানীয় জমিদারের অত্যাচারে পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও সেইরূপ গ্রাম্য ডিহিদারের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় খুঁজিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামে যাইয়া তথাকার রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত এই রাজা বাঁকুড়া রায় মুকুন্দরামকে আশ্রয় দান করিয়া স্বীয় পুত্রদিগের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। "কবিকঙ্কণ,"—এই উপাধিও রাজা বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় কর্ত্তৃক তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বাঁকুড়া রায়ের বংশধরগণ বর্ত্তমানে সেনাপতি গ্রামে বাস করিতেছেন। এই গ্রামে ইঁহাদের বাটীতে মুকুন্দরামের স্বহস্ত-লিখিত একখানি চণ্ডী-পুঁথি এখনও প্রত্যহ ফুলচন্দনে পূজিত হইয়া থাকে।

"কবিকঙ্কণ,"—মুকুন্দরামের সম্মান-সূচক রাজ-প্রদত্ত উপাধি। তাঁহার রচিত মনোহর চণ্ডীকাব্যখানিও বোধ হয় সেই জন্যই "কবিকঙ্কণ চণ্ডী' নামে সাধারণে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। মুকুন্দরামের সম্পূর্ণ নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। সাধারণ্যে তিনি "চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিলেও তাঁহার অন্যতর উপাধি ছিল,—"মিশ্র।" কবি "মিশ্র" উপাধিতেই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র। মাতার নাম ছিল দেবকী। পুত্রের নাম শিবরাম ও কন্যার নাম ছিল যশোদা। পুত্রবধূ ও জামাতার নাম পাওয়া যায় যথাক্রমে চিত্রলেখা ও মহেশ। পৌত্রের নামও জানিতে পারা যায়—অভিরাম।

কবিবর যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে "কবিচন্দ্র" নামক তাঁহার যে এক জন অগ্রজ ছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায়। এই "কবিচন্দ্র" যে মুকুন্দরামের অগ্রজের আসল নাম নহে, পরন্তু একটি উপাধি মাত্র তাহাই মনে হয়। ফল কথা, এই কবিচন্দ্রও যে এক জন সু-কবি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সে-কালের বহুপ্রচলিত এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতার একান্ত প্রিয় শিশুপাঠ্য একখানি পুস্তক ছিল। তাহার নাম "শিশুবোধক।" এই শিশুবোধকে "দাতাকর্ণ" ও "কলঙ্কভঞ্জন" নামক যে দুইটি কবিতা আছে, উহা কবিচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত। অনেকে বলেন, এই কবিতা মুকুন্দরামের অগ্রজ কবিচন্দ্রের রচিত। তাঁহার রচিত আরও অনেক কবিতা আছে, ইহাই অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিচন্দ্রের আর কোনও রচনার অনুসন্ধান পাই নাই।

মুকুন্দরাম স্বরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিজের যে বংশপরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, শিবরাম ব্যতীত কবির আর এক পুত্র ছিল। তাঁহার নাম পঞ্চানন। তা ছাড়া রমানাথ বা রামানন্দ নামে কবির আর এক জন ভ্রাতা ছিলেন বলিয়াও মনে হয়।

মুকুন্দরামের বংশধরগণ এক্ষণে ছোট বৈকুণ্ঠান গ্রামে বাস করিতেছেন। এই স্থান বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত এবং দামোদর নদের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। যে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সাত পুরুষের বাসস্থান দামুন্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই মামুদ সরিফের বংশধরগণ বর্ত্তমানে হুগলী জিলার অন্তর্গত ময়াপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

সে যাহাই হউক, এই কবিবর মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতঃপর আমরা সেইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। যে মহাকবির অসামান্য কবিত্ব-সৌরভে আজও বাঙ্গালা দেশ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং যাঁহার আবির্ভাবে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা অদ্যাবধি হয় নাই। মুকুন্দরামের মনোহর কাব্যগ্রন্থখানির অমৃত রস বাঙ্গালার আপামর সাধারণ এত দিন ধরিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এই অনুপম কাব্যের রচয়িতাকে জানিবার জন্য কেহ যে অনুরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন মনে হয় না।

মুকুন্দরামের জীবন-কথা জানিতে হইলে, তাঁহার কাব্যের সূচনা-ভাগে তিনি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ প্রদানচ্ছলে যেরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমাদিগকে তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। তা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কবিবরের এই স্বকৃত বিবরণী হইতেই তাঁহার জীবনের যাহা কিছু ঘটনা আমাদিগকে জানিয়া লইতে হইবে এবং ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই বলিয়াই তিনি যে কত দিন জীবিত ছিলেন তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় আমাদিগের নাই। কাজেই আমরা এই বিবরণ অবলম্বন করিয়াই অতঃপর কবির আবির্ভাব কাল নিরূপণের চেষ্টা করিব।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সূচনা-ভাগে প্রদত্ত "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" মধ্যে রাজা মানসিংহের উল্লেখ আছে। আমরা এ স্থানে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিফ।"

এই ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারেই তিনি দামুন্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে কথারও উল্লেখ এই বিবরণে রহিয়াছে।

"ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ,
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।"

ইত্যাদি বর্ণনার পর অন্য এক স্থানে আছে,—

"দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবি যখন দামুন্তার বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন রাজা মানসিংহ বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের অধিপতি ছিলেন। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কোন্ সময়ে মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজা মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এবং ঐ সময় হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। মানসিংহের শাসনকালের মধ্যেই যে কবিবরকে ডিহিদারের অত্যাচারে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা কবির স্বরচিত এই গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণী হইতে বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং মানসিংহের সুবাদারি প্রাপ্তির কিছু কাল পরেই যে কবি এই কাব্যরচনা করিয়াছিলেন তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে:

ইহা ব্যতীত গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে বাঁকুড়া রায় ও রঘুনাথ রায়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

"দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই,
আড়রায় হইনু উপনীত॥
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
পাঁচ আড়া মাপি দিল ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রাজা গুণে অবদাত,
গুরু করি কবিল পূজিত॥"

এই আড়রা গ্রামে অবস্থান কালেই মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গ্রন্থমধ্যে তাঁহার স্বলিখিত আত্মপরিচয়ে সে কথার উল্লেখ রহিয়াছে। যে সময়ে তিনি দামুন্তা পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে চণ্ডীদেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ প্রদান করেন। আড়রা গ্রামে যাইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে চণ্ডীকাব্য রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রাজা রঘুনাথ কর্ত্তৃক "কবিকঙ্কণ" উপাধিও কবিকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের প্রতিপালক আড়রা ব্রাহ্মণভূমির এই রাজা রঘুনাথদেব রায় ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উৎসাহ পাইয়া কবি যে এই অতুলনীয় রসভাবময় চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কবি স্বয়ং এই কাব্যগ্রন্থের বহু স্থানেই সে কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থরচনা কালে কবিবরের যে পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। এক স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে:

"শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ন।"

গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণেও কবি এক স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন:

"কাঁদে শিশু ওদনের তরে।"

এই শিশু যে তাঁহার পৌত্র অভিরামকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই মনে হয়। এই সকল বিষয়ের একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া কবির আবির্ভাব-কাল আমাদিগকে নিরূপণ করিতে হইবে। কবির স্বলিখিত "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ"টি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে মানসিংহের সুবাদারি প্রাপ্তির কিছু কাল পরেই তিনি এই চণ্ডীকাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে কবির এই কাব্যরচনার কাল যদি আমরা ১৫৯৫ বা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না এবং রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালের সহিতও ইহা বেশ মিলিয়া যায়। যেহেতু, রঘুনাথ রায়ের রাজত্ব-সময় ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। মানসিংহেরও বাঙ্গালায় আগমন ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং শাসনকাল ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই হিসাবে মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্য রচনার কাল যদি আমরা ১৫৯৫ অথবা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করি এবং গ্রন্থ রচনাকালে কবিবরের বয়ঃক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর ধরিয়া লই (যেহেতু তখন কবির পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ৪৫।৪৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পৌত্র হওয়া সম্ভব।) তাহা হইলে আনুমানিক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হইয়াছিল ইহা বলিতে পারা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিতে হইলে এইরূপ অনুমান ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে?

কবিবরের জীবনী সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যখন তেমন কোন আলোচনা অদ্যাবধি হয় নাই, তখন কবি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে যে আত্মপরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে কবির জীবনের ঘটনা সমূহ জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা সেই জন্য কবির গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবন-কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অন্য উপাই নাই, তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে উল্লিখিত আছে,—শিবকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন:

"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ-জল,
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই তো পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি একান্ত শিবভক্ত ছিলেন। এবং তাঁহার এমনও বিশ্বাস ছিল যে, শিবপূজার ফলেই তিনি প্রথম হইতে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রচিত ভাবসম্পদে অতুলনীয় সুবিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ব্যতীত তিনি "শিব-সংকীর্ত্তন" নামক একখানি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন,—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের দুই স্ত্রী ছিল। যাঁহারা এ কথা বলেন,—তাঁহারাও কবির গ্রন্থোক্ত বর্ণনা হইতেই তাঁহাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন:

"এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।"

তাঁহার কাব্যের অন্যতর গায়ক ধনপতির দুই স্ত্রী যেরূপ কোন্দল করিয়াছে, তাঁহার নায়িকা ফুল্লরা ভগবতীর আগমন-দর্শনে সতীন আশঙ্কায় যে প্রকার ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অবশ্য মনে হয়

বটে যে, এই সপত্নী সম্বন্ধে কবিবর এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বা ভুক্তভোগী ছিলেন। কিন্তু এ কথাও বলি যে, এই সপত্নী ব্যাপারের এ প্রকার সুনিপুণ বর্ণনা পাঠ করিয়া কবির দুই স্ত্রী ছিল বলিয়া যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহাদের অনুমান যে একান্তই সত্য, এমনও বলা যায় না। কারণ, মুকুন্দরাম স্বভাবকবি ছিলেন। তিনি তৎকালীন সামাজিক চিত্র নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তখনকার লোকের অবস্থা-ব্যবস্থার কথা যথাযথ ভাবে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য-সমালোচনা কালে সে পরিচয় পরে দিতেছি। এক্ষণে তাঁহার এই সপত্নী ব্যাপারের বর্ণনা সম্বন্ধে আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে, এই বর্ণনা পাঠ করিয়া কবির দুই স্ত্রী ছিল, এরূপ অনুমান করা আমাদের সঙ্গত না-ও হইতে পারে। একালে বহু-বিবাহ সমাজে তেমন প্রচলিত না থাকিলেও মুকুন্দরামের সময়ে তাহা ছিল। কাজেই কবি তৎকালীন সমাজচিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া ইহার প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারেন নাই। তিনি তৎকালীন সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি লইয়া যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন, তখন এত বড় একটা সপত্নী ব্যাপারের বর্ণনা তাঁহার কাব্যের মধ্যে থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নহে এবং তাহাই মাত্র দেখিয়া তাঁহার একাধিক স্ত্রীর অস্তিত্ব অনুমান আমাদের পক্ষে সঙ্গত নহে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার গ্রন্থে সপত্নী কোন্দলের চরম বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই দুই তিনটি করিয়া সতীন হাজির করিয়াছেন। ইহাদের সময় বহু বিবাহের প্রচলন বহুল ভাবে কমিয়া আসিয়াছিল। এমন কি, এ সময় তাহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেই চলে। এই সকল লেখকের গ্রন্থমধ্যে সপত্নী ব্যাপারের আলোচনা থাকিলেও ইহাদের একাধিক স্ত্রী ছিল না। সুতরাং মুকুন্দরামের কাব্য মধ্যে সপত্নী-কোন্দলের বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহার যে একাধিক স্ত্রী ছিল, ইহা অনুমান করা যে একান্তই সঙ্গত হইবে তাহা ত বলিতে পারিতেছি না।

মুকুন্দরাম কিরূপ লেখাপড়া জানিতেন, এক্ষণে আমরা তাহাই জানিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার সময়ে দেশে সংস্কৃত শিক্ষারই প্রচলন ছিল। সুতরাং এই সংস্কৃতবিদ্যা যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেন, তাঁহারাই তৎকালে দেশ মধ্যে শিক্ষিত এবং বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতেন। মুকুন্দরাম যে সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের কাব্যে উল্লিখিত বর্ণনার মধ্যে অনেক স্থলেই কালিদাসের বর্ণনায় ভাব পাওয়া যায়। তাঁহার "কমলে কামিনী" বর্ণনা মহাকবি কালিদাসের "অকাল বসন্তোদয়" বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিল আছে মনে হয়। তা ছাড়া তাঁহার কাব্যের নায়ক শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার বর্ণনাচ্ছলে তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়াছেন। মনে হয় এই তালিকাভুক্ত গ্রন্থের সমস্ত না হউক, অন্ততঃ কতকগুলিও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আর এক কথা, এই সহায়সম্বলহীন অপরিচিত ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাইলেই বা রাজা বাঁকুড়া রায় তাঁহাকে সমাদরে আশ্রয় দিয়া পুত্রদিগের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন কেন? তখন ত ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ছিল না অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও লইতে হইত না। তখনকার দিনে শিক্ষা বলিতে সংস্কৃত শিক্ষাই ছিল এবং বিদ্বান্ বা শিক্ষিত বলিতে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝাইত। সুতরাং কবিবর মুকুন্দরাম যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, ইহা আমরা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করিতে পারি।

এইবার কবিকঙ্কণের চণ্ডীগ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দুইটি উপাখ্যান আছে। একটি কালকেতুর উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ নরনারীর অতি প্রিয় এই মনোহর উপাখ্যান পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। চণ্ডীর গান, মনসার গান ও ধর্ম্মঠাকুরের গান অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। এ সকল কথার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তবে ইহাই মাত্র বলিতে চাহি যে, এই বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া উত্তরকালে যে কত কবি কত চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, চণ্ডী, মনসা এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য বহু কবির হাত দিয়া আসিয়াছে। আমাদের আলোচ্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপাখ্যানের মৌলিকতা যে মুকুন্দরামের সৃষ্টি নহে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই উপাখ্যান মুকুন্দরামের কাব্যরচনার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। কোন্ ব্যক্তি যে সর্ব্বপ্রথম এই উপাখ্যানের সৃষ্টি করেন তাহা নির্ণয় করা সহজ কথা নহে। ফল কথা, মুকুন্দরাম পূর্ব্ব-প্রচলিত এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছেন। তিনি অবশ্য নূতন ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া এবং মনোহররূপে সাজাইয়া তাহা আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। অনেকে বলেন,—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী এবং বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মুকুন্দরামের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম কাব্যরচনা কালে সেইগুলি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেইগুলিকেই সংশোধন করিয়া লইয়া এই মনোহর নূতন চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে এ কথারও উল্লেখ আছে :

"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।"

ইহাতে মনে হয় যে, বলরাম কবিকঙ্কণকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি এ কথা বলিতেছেন। তাহা হইলে বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি যে স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহাই বিশ্বাস হয়। কিন্তু তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, মাধবাচার্য্য অথবা বলরাম কবিকঙ্কণ কেহই চণ্ডীমঙ্গল উপাখ্যানের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। ইঁহাদেরও বহু পূর্ব্ব হইতে চণ্ডীর গান প্রচলিত ছিল।

সে যাহা হউক, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানে মৌলিকতা না থাকিলেও কবিকঙ্কণ চণ্ডী যে রচনার শিল্পচাতুর্য্যে, ভাবমাধুর্য্যে এবং কবিত্বসম্পদে একখানি অতুলনীয় মহাকাব্য তাহা অসঙ্কোচেই বলিতে হইবে।

মুকুন্দরামের এই মনোহর কাব্যগ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সমগ্র গ্রন্থখানির ভাব যেমন অপূর্ব্ব করুণরসে পরিপূর্ণ এবং মনোহর কবিত্বময়; ইহার ভাষাও তেমনি আগাগোড়া একান্তই সরল। গ্রন্থের কোন স্থানেই তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশের এতটুকু প্রয়াস করেন নাই। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাষার পরিপাট্য, ছন্দের চমৎকারিত্ব অথবা বর্ণনার উজ্জ্বল ছটা মুকুন্দরামের কাব্য মধ্যে পাই না। কিন্তু মুকুন্দরামে যাহা পাই, তাহা ভারতচন্দ্রে পাই না। মুকুন্দরামের ভাষায় কোন আড়ম্বর নাই,

পাণ্ডিত্য-প্রকাশের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই, বর্ণনায় অপরূপ ভঙ্গীতে লোককে চমক লাগাইবার এতটুকু চেষ্টা নাই। তাই বলি তিনি স্বভাব-কবি। তিনি মানুষের প্রাণের স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের সাধারণ কথা সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাবে আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন, পণ্ডিতকবি ভারতচন্দ্র বোধ হয় তেমনটি পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালার গ্রাম জননীর স্নেহ-শীতল কোলে বসিয়া তৎকালীন বাঙ্গালার গ্রাম্য লোকের সুখ-দুঃখের কথা বর্ণন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, গ্রাম্য গৃহস্থের ঘর-কন্নার প্রত্যেক খুঁটিনাটি লইয়া যেমন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সেকালের লোকচরিত্রের যেমন সত্যকার ছবি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে বলিতেই হইবে যে, তিনি স্বভাবকবি। মানুষের স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং সাধারণ অভাব-অভিযোগের কথা লইয়া তিনি যে ভাবে আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে বলিতেই হইবে যে, তিনি এক জন প্রকৃত কবি। বাঙ্গালার মহাকবি কৃত্তিবাস অথবা কাশীরাম দাসের পরেই যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আসন, তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

দুই রূপ

(শ্রীঅরবিন্দকে)

গোপাল ভৌমিক

যুগ বিস্মৃত-প্রায়:
বাংলার আকাশে-বাতাসে
জেগেছিল বিপ্লবের বাণী—
তরুণের তাজা রক্তে হল কাণাকাণি
রক্তের বদলে রক্ত চাই
মাতৃ-অভিষেক-কল্পে;
অন্য পথে স্বাধীনতা নাই।
প্রাণের প্রাচুর্য্য নিয়ে
সেই ডাকে দিয়েছিলে সাড়া,
ভেবেছিলে হিংসা দিয়ে
হিংসারে করিবে তুমি জয়।
দেশ-মাতৃকার বুকে যে-কলঙ্ক-ভয়
যুগে যুগে হল স্তূপাকার—
নির্ভীক বীরের দর্পে
সে অন্যায়ে দিয়েছ আঘাত—
ফল তার রাজ-রোষ, রাজ-কারাগার।
নির্যাতিত অগ্নি-গর্ভ হাজার চোখের
পেয়েছিলে সমর্থন
পেয়েছিলে শ্রদ্ধা অন্তরের।

★

তার পর যুগ কেটে গেছে:
হাজার চোখের অগ্নি
জ্বলে আজ কোটি কোটি চোখে;
সেই অগ্নি-দাতা তুমি
পেয়েছ কি নতুন সন্ধান
তুমি ভালো জানো।
নিজের জীবন করে দান
পেতে চাও সত্যের আস্বাদ—
মানুষের জীবনের দুঃখ পরিবাদ
নির্বিশেষে মুছে দিতে চাও।
তোমার নতুন ব্রতে
কারও মুখে সুবিমল হাসি—
কারও মুখে সন্দেহের ছায়া—
ভূতপূর্ব বিপ্লবীর এ কেবল মতিভ্রম-মায়া!
দুই রূপ দুই আদর্শ—
বিচারের মাপকাঠি কই?
আমরা মাটির জীব
ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রই…
সময়ের বিচার-প্রত্যাশী,
বিপ্লবী তুমিই বড়—
কিংবা বড় শান্তিকামী মহান্ সন্ন্যাসী!

★

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২

নদী-মেখলা বিস্তীর্ণ গণ্ড-গ্রাম শ্রীনগর। এক কালে না কি কোন প্রগতিশীল নগরীর পর্যায়ে উঠেছিল, কালচক্রে আর সব দিকে ভাঙ্গন ধরালেও, নামের দিক্‌টা ঠিক বজায় আছে। এখনো দেখতে পাওয়া যায় অতীত গৌরবের কোন না কোন নিদর্শন—হর্ম্য-দেউলাদির ভগ্নাংশ। গড় পরিখা ও পোস্তাগুলি মধ্যযুগের স্থাপত্য-শিল্পের সাক্ষিরূপে দর্শক-মনে স্বাজাত্য-গৌরবের সম্ভ্রম সৃষ্টি করে। শোনা যায়, একদা গোটা বাংলার প্রাণ-স্বরূপ বারোভূঁইয়ার মুকুট-মণি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পঞ্চক্রোশী রাজধানীর দ্বারভূমি ছিল বিভিন্নমুখী নদীসংলগ্ন এই অঞ্চলটি। এখনো কোন কোন ঝিল বিল ও দীর্ঘিকার পংকোদ্ধার কালে ধরিত্রীর তলদেশ থেকে অর্ণবযানের কত কি প্রতীক—ক্ষোদিত পোতরক্ষ, জীর্ণ তরী, ভগ্ন ক্ষেপণি, অঙ্গারবর্ণ পাইলদণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খনকের খনিতযন্ত্রের সাহায্যে লোকচক্ষুর সম্মুখে এসে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গভীর গবেষণার উপাদান হয়ে থাকে। বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রগুলির গর্ভ থেকেও বিবিধ কংকাল ও আয়ুধ আত্মপ্রকাশ করে কত বিচিত্র কাহিনীর উপকরণ যোগায়। কিন্তু আশ্চর্য এইখানে যে, অঞ্চলবাসীদের সক্রিয় বা অবচেতন মনে এগুলি কোনরূপ প্রভাব স্থাপনে সমর্থ হয় না—অতীতের সংকেত-চিহ্নগুলি অসংলগ্ন ভাবে চার দিকে বিকীর্ণ দেখেও প্রতি বঙ্গটির জীবন-উৎসের অনুসন্ধানে কারো আগ্রহ নেই। সমাজ এখানে মূক, জাতি অতীতের সুখ-সমৃদ্ধির গল্প শুনে আক্ষেপ করে—হায় রে সে কাল! আবার বর্তমানের বহু অসুবিধার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে অদৃষ্টকেই করে দায়ী। বাহিরের অনুসন্ধিৎসুরা বাংলার পঞ্চদশ শতকের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সর্বাধিক স্মরণীয় ও বরণীয় সুন্দরবন-সংলগ্ন এই দুর্গম ভূভাগটি পরিদর্শন করে বাসিন্দাদের পানে তাকিয়ে যখন মনে মনে প্রশস্তির ভঙ্গিতে ভাবেন—একদা যারা এই বীরতীর্থে দাঁড়িয়ে অসীম শৌর্যের সঙ্গে বাদশাহী পলটনকে রুখেছিল, এরা তাদেরই বংশধর, এদের প্রত্যেকের ধমনীতে বইছে শৌর্যশালী 'সহিদ' পিতৃপুরুষদের শোণিত;—তখন যাদের উদ্দেশে এই প্রশস্তি, তারা ভেবে পায় না, সুস্থ শরীরকে নানা কষ্ট ও দুর্ভোগে এ-ভাবে বিব্রত করে এঁদের কি লাভ! দুর্ভাগ্য দেশের অতীত কীর্তি-চিহ্নিত প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলের এই অবস্থা! সন্ধানী দৃষ্টির রশ্মিরেখায় বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সেগুলি উদ্‌ঘাটিত করে মাতৃভূমিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা দিতে কোন আগ্রহই এদের দেখা যায় না। আবিষ্কারের প্রয়াস, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এবং সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা বা প্রয়োজন যেখানে স্তব্ধ, স্বার্থপরতার নেশায় চুর হয়ে সমাজ-প্রগতির প্রতিরোধের চেষ্টাই সেখানে প্রবল। কিন্তু সমাজ পিছিয়ে থাকলেও সময় যে চিরদিনই এগিয়ে যায়, তার চাকা ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকেই চলে—একটি ছেলে হঠাৎ এই অঞ্চলে এসে লোকের চোখে আঙুল দিয়েই যেন সেটা জানিয়ে দিলে।

এ অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম শ্রীনগরে ছেলেটি জন্মগ্রহণ করলেও অধিক দিন এর সংস্পর্শে থাকবার সুযোগ তার অদৃষ্টে ঘটেনি। মাতৃ-জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার মাস কয়েক পরেই দুর্ভাগ্য তাকে মাতৃহীন করে। অসহায় শিশুটিকে মায়ের আদরে পালন করবার জন্য পরিবারভুক্ত কোন মহিলা সংসারে না থাকায় নিরুপায় পিতা তাকে একশ' মাইল তফাতে জেলার সদর সহরে মাতামহীর তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন। ছেলেটি সেইখানেই প্রতিপালিত হতে থাকে। এদিকে বিপত্নীক পিতা পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করে ভাঙ্গা গৃহাশ্রমকে নবীন উদ্যমে যোড়াতালি দিয়ে সাজিয়ে তোলেন। মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে ছেলের খবর অবশ্য নিতেন, তাছাড়া জমি-জমার ব্যাপারে মামলা-মকদ্দমার সম্পর্কে সদরে গেলে ছেলেকে দেখেও আসতেন; কিন্তু পাল পার্বণে বা অন্য কোন বাবদে ছেলের উদ্দেশে কিছু পাঠিয়েছেন কোন দিন, এমন কথা পাড়া-প্রতিবাসীদের কারো জানা নেই। ও পক্ষও প্রত্যাশা করতেন না কিছু, বাপের কথা উঠলে প্রচলিত ছড়া কাটতেন—'মা-মরা ছেলের বাপ আবার বিয়ে করলে সে বাপ হয় ছেলের তালুই!' বেঁচে থাকুক ওর মামারা, বাপের কাছে যেন হাত পাততে না হয়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে এক দিন বাপের কাছেই এসে ছেলেকে দাঁড়াতে হোল। তার বয়স তখন তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পড়েছে। গৃহবিবাদে মামারা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে, মাথা রাখবার জায়গা পর্যন্ত নেই। কেউ গিয়ে উঠেছে শ্বশুরবাড়ীতে, কেউ বা হোয়েছে দেশান্তরী, যার ওপরে ছিল ছেলেটির অখণ্ড জোর তিনিও দিয়েছেন পরপারে পাড়ি। ইতিমধ্যে কিন্তু ছেলেটির বিদ্যার খ্যাতি সদর থেকে শ্রীনগরেও [illegible] হয়েছিল। মাইনর পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পায় সে। শ্রীনগরের পুরাতন মাইনর স্কুলটিও এই সময় স্থানীয় ভূস্বামী এবং গ্রামের জনৈক কৃতবিদ্য শিক্ষাব্রতীর সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ায় উদ্যোক্তারা প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত যাদব রায়কে জানালেন যে, তাঁর এখন কর্তব্য হচ্ছে গুণী ছেলেটিকে মামার বাড়ী থেকে আনিয়ে কাছে রাখা, আর গ্রামের নতুন ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তাকে জাঁকিয়ে তোলা। প্রস্তাবটি ছেলের অদৃষ্টেই যেন 'শাপে বর' হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে এসে তার অপরূপ সুন্দর চেহারা, আর শিষ্ট সুষ্ঠু ব্যবহারে গ্রামশুদ্ধ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

সত্যাই একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছেলে এই মৃগেন। মনটি এখনো শিশুর মত সরল, ফুলের মত কোমল। কারো সঙ্গে চোখোচোখি হলেই আলাপের আগেই মুখখানি তার হাসিতে ভরে ওঠে—এ হাসি জীবনের তিক্ততম দিনেও ম্লান হয় না, জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনেও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু মৃগেনের সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু ওর দুটি চোখ—এ চোখ যার আছে, জীবনে তার কি নেই! আশ্চর্য্য গভীর চোখ, কালো কালো দুটি তারা যেন দীঘির অতল জল স্পর্শ করে। এ চোখ মানুষকে মাতাল করে তুলে, এ চোখ দ্রষ্টাকে সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের পথে টেনে নিয়ে যায় যেন। এ চোখে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় যেমন, তেমনি প্রকৃতির পরিপূর্ণ মাধুর্যও ধরা দেয়। তাই এখানে এসেই জন্মভূমির বর্তমানের রূপ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই

অতীতের তেজোময় রূপটিও ফুটে ওঠে তার এই চোখে—যখনি বিপুল ভাবের বেগ লাগে তার ভাষায়, মননশক্তি জাগ্রত হয় তার পরশে, রূপায়িত হতে থাকে অতীতের বিস্মৃত অতিমানুষগুলি—যাঁরা এক দিন এই দেশের মাটির মর্যাদা রাখতে দিয়েছেন আত্মবলি।

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশে বিদ্যালয়ের সমর্থ ছাত্রগণ একটা রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। রচনাটির বিষয়-বস্তু থাকে—জন্মভূমির অতীত ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা। অনেকগুলি ছেলে মামুলী ধারায় দেশের কথা লেখে। কিন্তু নবাগত এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর ছাত্র মৃগেনের প্রাঞ্জল রচনা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অবাক্ করে দেয়। রচনার প্রতি ছত্রটি স্বদেশপ্রেমে অনুরঞ্জিত, ওজস্বিনী ভাষার ভিতর দিয়ে যেন ভাবের বন্যা ছুটেছে বেগবতী হয়ে; বালকের লেখায় মাতৃভূমি ও তার পূর্ববর্তী বীর সন্তানদের প্রতি এত দরদ ও অনুভূতি কি করে সম্ভব হোল? প্রথমে ভেবেছিলেন, ছেলেটি বুঝি কোন অভিজ্ঞ লেখকের কণ্ঠস্থ-করা কথাগুলি কালি-কলমে এ ভাবে ফুটিয়েছে—জেলার সদরে শিক্ষা পেয়েছে যখন, পড়ার বই ছাড়া বাইরের বই পড়ার সুযোগও সেখানে আছে। কিন্তু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ও নানারূপ জেরা করে বুঝলেন, তাঁর সন্দেহ মিথ্যা—ছেলেটির সাহিত্য-প্রতিভা সত্যই সহজাত। এর পর তিনি বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ সভায় ছাত্রদের অভিভাবক এবং অঞ্চলবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করে আনিয়ে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ছাত্র মৃগেনের দেশপ্রীতি-মূলক প্রবন্ধটি শোনাবার ব্যবস্থা করেন। প্রবন্ধ পড়ে মৃগেন নিজে। প্রিয়দর্শন ছেলেটির আবৃত্তি সভায় সমবেত নর-নারী-নির্বিশেষে সকলকেই আকৃষ্ট করেছিল, উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি মুগ্ধ করল প্রত্যেককে, সভায় শতমুখে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠলো। প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তার প্রশস্তি কীর্তন করে আশ্বাস দিলেন, কালে এই বালক প্রতীচ্যের হেল্‌স্ এণ্ডারসনের মতন খ্যাতিলাভ করবে। সেই ছেলেটির বাল্যজীবনেও এমনি করে সাহিত্য-প্রতিভার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

ছেলের প্রশংসায় যাদব রায়ের বুক আনন্দে দুলে ওঠে। আর একটি লোক সভাস্থলেই দাঁড়িয়ে জোর-গলায় বাহবা দেন তাকে, তিনি হচ্ছেন গ্রামের মৃন্ময়-শিল্পী পীতাম্বর অধিকারী। বলেন—প্রথম দিন ঐ ছেলেটির চোখ দুটো দেখে বলেছিলাম ওর বাবাকে—যাদব, তোমার ছেলের চোখ সাধারণ চোখ নয়, এই চোখেই সাধক তার সাধনার নিধিকে খুঁজে পান। আমার কথা মিছে হয়নি, জন্মভূমিতে এসেই ও দেখেছে দেশ-জননীর সত্যিকার রূপ। মায়ের রূপের আলো ওর কলমেই ফুটে উঠে আঁধার কাটিয়ে দেবে দেখো।

পীতাম্বরের মেয়ে মায়াও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী। গ্রামে বালিকাদের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকায় প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই বিদ্যালয়েই ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে শিক্ষক মহাশয়ের দুই ধারে দুইখানি আলাদা বেঞ্চ থাকে ছাত্রীদের জন্য। অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে সেদিন মায়াও সভায় আসে। শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ পেয়ে মৃগেন যতক্ষণ তার রচনাটি মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে পড়ে, মায়া ততক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার অপরূপ মুখখানির দিকে, অপূর্ব এক উল্লাসে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হতে থাকে। ছেলেটির চমৎকার দুটি কালো কালো চোখের গভীর দৃষ্টি, তার মুখের তেজোদৃপ্ত প্রতি কথাটি যেন মনোমন্দিরে লুকায়িত একটা তারে অজ্ঞেয় অলক্ষ্যে পরশ দিয়ে অভিনব এক ঝংকার তোলে। পড়া শেষ হতে ছেলেটি বসতেই শতমুখে যখন তার প্রশংসা ওঠে, মায়ার ক্ষুদ্র বুকখানি তাতে আনন্দে দুলতে থাকে, মনে হয় তার—ঐ সব সুখ্যাতির খানিকটা সে-ও বুঝি পেয়েছে! পরক্ষণে পীতাম্বরের মুখেও ছেলেটির প্রশংসা শুনে তার কি আহ্লাদ! ইচ্ছা হতে থাকে—ছুটে গিয়ে বাবার গলাটি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে বলে—'বেশ বলেছ বাবা!'

ঠিক সেই সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের মুখে নিজের নামটিও শুনে চমকে ওঠে মায়া। রচনা-প্রতিযোগিতায় সেও যোগ দিয়েছিল, আর আঁকা-বাঁকা অক্ষরে কতকগুলি আবল-তাবল কথাও লিখেছিল। কিন্তু এই ছেলেটির রচনা শুনে মনে হচ্ছিল তার—কি ছেলেমানুষীই করেছে সে! হয়ত শিক্ষকরা কত নিন্দাই করবেন; সেই জন্যই বুঝি ডাক পড়েছে তার। ও মা, তা ত নয়; তাকে ত ডাকেননি লেখাটি পড়তে—নিজেই যে তিনি তাই নিয়ে আলোচনা করছেন! লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে তার সুগৌর মুখখানা, বুকের ভিতরটা চিপ-চিপ করতে থাকে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তখন বলছিলেন—'আর যারা রচনা লিখেছে, তাদের মধ্যে কুমারী মায়া দেবীর লেখাটি যদিও কাঁচা আর বিষয়-বস্তুটির ঠিক অনুসরণ করতে পারেনি, তবুও জননী আর জন্মভূমির যে বাস্তব ব্যাখ্যা সে করেছে তার জন্যেও আমরা তাকে প্রশংসা করছি, উৎসাহ দিচ্ছি।' সে তার প্রবন্ধে লিখেছে: 'জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে বড়। কিন্তু আমার জননীকে আমি দেখি নাই। আমার জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে ফেলিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আমি এক্ষণে আমাদের ঘর-বাড়ী উঠান বাগান পুকুর এইগুলিকেই আমার জন্মভূমি মনে করিয়া থাকি। আমার জননী যে ছোট ঘরখানিতে আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে পূজার ঘর ভাবিয়া আনন্দ পাই। সেই ঘরে আমার জননীও জন্মভূমি একসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন জানিয়া ভক্তির সহিত গড় করি। আমি বড় হইলে আমার জন্মভূমি আরও বড় হইবে।'...... মায়ার কথাগুলিও খুব মনোজ্ঞ হয় সভায়, শুনিয়া অনেকে বেশ কৌতুক বোধ করে, অনেকের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

সেই দিন সভাভঙ্গের পর পীতাম্বর অধিকারী সপুত্র যাদব রায়কে তার বাড়ীতে নিয়ে যান। বাড়ীর বাইরে যে চণ্ডীমণ্ডপটি তাঁর শিল্প-সাধনার পীঠ, সেখানেই মাদুর পেতে বসিয়ে অভ্যর্থনা করেন, জলযোগের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়। যাদব রায়ের মুখেও মায়ার প্রশংসা যেন ধরে না। আর সেই সন্ধিক্ষণে মায়ার সঙ্গে মৃগেনের রীতিমত ভাব হয়ে যায়। এর পর মৃগেনও তার লেখার এক জন সমঝদার শ্রোত্রী পেয়ে বর্তে যায় যেন।

এমনি করে পর পর ক'টি বছর কেটে যায়। মৃগেনের সাহিত্য-সাধনা পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে, শ্রোত্রী ও উৎসাহদাত্রী মায়া। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা যখন নানারূপ খেলা-ধূলায় পাড়া মাথায় করে বেড়ায়,—এরা দুটিতে তখন কোন নির্জন বাগানে, শষ্পাচ্ছন্ন প্রান্তরে কিংবা ইছামতীর তীরে বসে কাব্য-রস উপভোগ করে। মৃগেন তার সদ্য-রচিত রচনা সোৎসাহে পড়ে, মন-প্রাণ নিবিষ্ট করে উৎকর্ণ হয়ে শোনে মায়া।

জমিদার-বাবুদের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকতো, প্রায় প্রতি পর্বোৎসবেই শহরের পেশাদারী যাত্রাদল

সাড়ম্বরে এসে আসর জমাতো। আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ যেন ভেঙ্গে পড়ত শ্রীনগরে কৌতূহলের এক অদম্য আকর্ষণে। প্রত্যেকেরই ভিতরকার রসজ্ঞ মানুষটিও যেন জেগে উঠত আনন্দময় হয়ে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে রসসৃষ্টি এবং আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতির বিশিষ্ট উপায় যাত্রা-সম্প্রদায়ের ভাবোদ্দীপক গীতাভিনয়। অধুনা সাধারণ পাঠাগারগুলি যেমন সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের উপলক্ষ হয়েছে, দীর্ঘ শতাব্দী ধরে গ্রামাঞ্চলে গীতাভিনয়কে উপলক্ষ করে তেমনি এই প্রমোদ-প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষালোক বিস্তার করে এসেছে। আধুনিক মঞ্চ ও সিনেমাগুলি আর্টের নামে যে দুর্নীতি ও কুরুচির প্রচার করে সমাজ-জীবন বিষাক্ত করে তুলছে, যাত্রা-সম্প্রদায়গুলির অভিনয় পালায় তার ছায়া পড়েনি কোন দিন। তারা দেশবাসীকে শুনিয়েছে পুরাণেতিহাসের অমৃতময় কাহিনী, প্রচার করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে আদর্শবাদ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই পেয়েছে চরিত্র গঠনের অবলম্বন। এখানেও যাত্রার অভিনয় তরুণ রস-শিল্পীর প্রাণে যোগায় প্রেরণা, বর্ষের পর বর্ষ ধরে এরই সাধনা চলে। আশায় উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে দুটি তরুণ-চিত্ত।

কিন্তু এই মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় পাড়ার আর একটি ছেলে, নাম তার কানাই। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছেলে, দুঃসাহসী হলেও বওয়াটে বলে দুর্নাম আছে। বিধবা জননী সারদা তার অভিভাবিকা; হাতে বেশ টাকা থাকায় চড়া সুদে তিনি বাড়ীতে বসেই মহাজনী করেন। স্বগ্রাম ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু দায়গ্রস্তকেই তাঁর দ্বারস্থ হতে হয়। কানাইয়ের উপনয়ন দেবার পর থেকেই তাঁর মনের মধ্যে বাসনা জেগেছে, ছেলের জন্যে টুকটুকে বউ একটি ঘরে আনেন। পীতাম্বর অধিকারীর মেয়ে মায়াকে তাঁর মনে ধরে; তলে তলে জানতে পারেন, ছেলের মনও মায়ার দিকে ঝুঁকেছে। এর ওপর এ-খবরও তাঁর অবিদিত নয় যে, যাদব রায়ের ও-পক্ষের ছেলে হঠাৎ উড়ে এসে যে রকম করে জুড়ে বসেছে অধিকারী-বাড়ীতে, তাতে মায়াকে হাত করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তাই তিনিও তলে তলে অধিকারীর ছোট ছেলে অতুলকে আগে থাকতেই হাত করে ফেলেছেন; উদ্দেশ্য, অতুলের সাহায্যে মায়াকে আয়ত্তে আনবেন।

এ ব্যাপারে অতুলের প্রতিপত্তির হেতু এইটুকু যে, মায়া তারই সহোদরা বোন। পীতাম্বরের প্রথম স্ত্রীর এক মাত্র ছেলে গোকুল। দু'বছরে সে মাতৃহীন হলে পীতাম্বরকে এক বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করতে হয়। সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র অতুল এবং কন্যা মায়া। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তিনটি সন্তানকেই এমন চুলচেরা ওজনে লালন-পালন করেন যে, গোকুল কোন দিন আপন মায়ের অভাব অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু মায়ার জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই পীতাম্বর দ্বিতীয় বার বিপত্নীক হন। পিতার স্নেহ আর মায়ের যত্ন মিলিয়ে শিশু-কন্যাকে কোলে তুলে নেয় পীতাম্বর, বড় দাদা গোকুলও তাতে নিবিড় ভাবে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু অতুলের প্রকৃতি ছেলেবেলা থেকেই যেন আলাদা ধাতুতে গড়া, নিজের সুখ-সুবিধার দিকেই তার লক্ষ্য; বোনটিকে গলগ্রহ মনে করেই বিরূপ হয় সে। শিশুরাও অনুভব করতে পারে—সত্যিকারের স্নেহের পরশ পায় কার কাছে গেলে। কাজেই বাপ আর বড়দার অনুরক্তই হয় সে শৈশব থেকে। এই ভাবে সংসারটি রূপ আর হাসির ঝলকে আলোকিত করে বাড়তে থাকে মায়া। পীতাম্বরের বড় সাধ, মায়া উপযুক্ত শিক্ষা পায়; তাই নিজেই অগ্রণী হয়ে মায়াকে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করে দেন, তাঁরই আগ্রহে প্রধান শিক্ষক মহাশয় গ্রাম্য মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থায় অবহিত হন। গৃহস্থালীর কাজের মত পড়াশোনাতেও মায়ার মাথা বেশ খুলে যায়, তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রকৃতি শিক্ষকগণকে চমৎকৃত করে। পরে রচনা-প্রতিযোগিতায় যদিও মৃগেনই একমাত্র প্রতিষ্ঠা পায়, কিন্তু সে-ব্যাপারে মায়ার ভাগ্যেও যেটুকু খ্যাতি লাভ হয়েছিল, অন্যের পক্ষে তা পর্বত। সেই থেকেই গ্রামের এই মেয়েটির ওপর কানাইয়ের নজর পড়ে, আর সেটা তার মা সারদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে যায়।

মায়া কিন্তু কানাইকে দেখলেই জ্বলে যেত। পয়সাওয়ালী মায়ের ছেলে হলে কি হবে, তার ধৃষ্টতা আর বেহায়াপনা মায়ার গায়ে যেন কাঁটার মত বিঁধত। কানাই যে মায়ার মনোভাব বুঝতে পারত না তা নয়, তথাপি নানা ছলে সে মায়ার সংস্পর্শে আসবার চেষ্টা করত, তাকে খুসি করতে অসাধ্য-সাধনেও সে ভয় পেত না। মৃগেন কবিতা লেখে, যাত্রা শুনে তার অনুকরণে পালা বেঁধে মায়াকে শুনিয়ে অনেকটা হাত করে ফেলেছে দেখে, কানাইও মাথা খেলিয়ে এক মতলব স্থির করে ফেলে। সে দেখলে, কবিতা লিখে বা পালা বেঁধে মৃগেনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ নয়, কিন্তু এর চেয়েও মেয়েদের মন পাবার আর একটা সহজ উপায় আছে—সেটি হচ্ছে 'মনসার ভাসান' সুর করে গাওয়া, এতে মেয়েদের মন না ভিজে পারে না। আর, এতে এক ঢিলে দুটো পাখী ঘাল করা যাবে। মায়ার ছোড়দা অতুল মনসার ভাসানের ভারি ভক্ত; নিজের বাড়ীতেই সে একটা দল বসাবে বসাবে করছে, কিন্তু অর্থের অভাবে পেরে উঠছে না। এ সময় সে যদি এটা রপ্ত করে ফেলে, তা হলে আর তাকে পায় কে। মহোৎসাহে সে কপালীপাড়ায় গিয়ে মনসার ভাসানের কসরৎ করতে লেগে গেল।

এদিকে যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরলে জানা গেল, মৃগেন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে; আর বাংলা সাহিত্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় বিশেষ প্রশংসাপত্র পেয়েছে। কানাইও পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু গেজেটে তার নাম ছাপা হয়নি শুনে সারদা দেবী পাড়া মাথায় করে জানান যে, তাঁর ছেলের নাম ছাপতে ওরা ভুলে গেছে। টেষ্টেও কানাই ফেল হয়, কিন্তু তার মায়ের পীড়াপীড়ি আর ধমকীতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাকে না পাঠিয়ে পারেননি। কানাইয়ের মায়ের খরচে পরে ইউনিভারসিটি থেকে নম্বর আনিয়ে দেখা যায় যে, অংক ছাড়া আর কোন বিষয়েই সে কুড়ির বেশী 'মার্ক' পায়নি, শুধু অংকেই তার 'মার্ক' উঠেছে পঁয়তাল্লিশ। তাই কানাইয়ের মা হুংকার দিয়ে জানান—'তাই কি চাড্ডিখানি কথা না কি? আঁক কষে কষেই ত হিমসিম খেতে হয় বাছাকে। বেঁচে থাক ওর আঁক, ওর অভাব কিসের—নাই বা হোল পাস, কি দরকার তার? যে ট্যাকা ওর ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে আছে, তার হিসেব রাখতে পারলেই হোল!'

পরীক্ষার অনেক আগেই উভয় পক্ষের দুই অভিভাবকদের মধ্যে যেমন বিয়ের কথাটি চুপি চুপি পাকা হয়ে যায়, অতুলের সঙ্গে তেমনি সারদা এ সম্বন্ধে একটা গোপন প্যাক্ট করে মনসার ভাসানের দল গড়বার জন্যে তার হাতে নগদ ত্রিশটি টাকা তুলে দেন।

বাড়াও কথা হয় যে, ভালয় ভালয় বিয়েটি হয়ে গেলে দলটাকে জাঁকিয়ে তোলবার জন্যে হাজার দু'-হাজার ঢালতেও তিনি পেছপাও হবেন না। অতুলের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং একান্ত প্রিয়পাত্র ভেবেই জামাইকে বিশেষ প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করে। পক্ষান্তরে, মৃগেন হয় তার চক্ষুঃশূল, দেখলেই জ্বলে যায়, কথার খোঁচা দিয়ে তার আসার পথে বেড়া দিতে চায়। ভিতরের কথা কিন্তু মায়া কিছু কিছু জানতে পারে, সে মৃগেনকে জানায়, 'কাজ কি ছোড়দার সামনে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে— লুকোচুরি খেলাতে তুমি ত ওস্তাদ, তাই চলুক না। এর পর যেদিন 'চিচিং ফাঁক' হয়ে যাবে, তখন দেখবে মজা!' মায়া জানে, বড়দা মৃগেনের দিকে; আর তার বাবা—তিনি ত কথা পাকা করেই রেখেছেন! কেবল পণের টাকাটা যোগাড় হবার ওয়াস্তা!

কিন্তু পাকা কথাও যে কেঁচে যায়, স্থায়ী ব্যবস্থাও তুচ্ছ একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে পালটায়, সেটা বোধ হয় মায়া কোন দিন ভাবতে পারেনি। এক দিন যে হঠাৎ সামান্য একটা কথার ঘায়ে পাকা কথা ভেঙ্গে গিয়ে তার কণ্ঠ দিয়ে কান্না ঠেলে আসবে, কে তা জানত! আশার পথে সত্যিই বুঝি পড়ে কাঁটা! শেষ পর্যন্ত কি মা-সরস্বতী বিমুখ হলেন, আর মনসা ঠাকরুণই কলা খেলেন?

বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে নবনির্মিত কালীপ্রতিমার সামনে সে দিন ক্ষণে যে ঝড়ের সংকেত ওঠে, তারই রুদ্র রূপের তাণ্ডব সুরু হলো বাড়ীর ভিতরে সংসারের কয়টি প্রাণীকে নিয়ে।

* * *

বাড়ীর ভিতরে তিনটি বড় বড় শোবার ঘর—মাঝখানে ছোট একটা উঠান। ঘরগুলি তারই তিন দিকে। সব ক'টি ঘরের সংগে একটি করে ছোট দাওয়া। এক দিকে রান্না ও ভাঁড়ার-ঘর। ঘরগুলো মাটির।- ছোট ছোট জানালাও রয়েছে চার দিকে। সব ঘরগুলিই প্রায় এক রকম। কোণের দিকে যে ছোট ঘরখানিতে আঁতুড় হত, মায়া সেটিকে ঠাকুর-ঘর করেছে। এই নিয়ে দুই ভাজের সঙ্গে তাকে অনেক তকরার করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ার জিদই বজায় থাকে। উঠানের দক্ষিণ দিকে সদরে যাবার দরজা। উত্তর দিকে খিড়কি; সে দিকেই পুকুর, আর তার এক দিকে পীতাম্বরের শোবার ঘরখানির গায়ে ছোট এক ফালি জমি বেড়া দিয়ে ঘেরা। আগে আগাছায় জায়গাটি ভর্তি ছিল, মায়াই সখ করে ফুল ফসলের গাছ লাগিয়ে বাগান করেছে। উঠানের এক ধারে ছোট একটি মরাই।

উঠোনের মাঝখানে গোকুল ও অতুল দুই ভাই মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছিল। দু'জনেরই বয়স হোয়েছে—গোকুল তিনের কোঠার মাঝখানে এসেছে। আর অতুল সবে পা দিয়েছে। বয়েসের দিক দিয়ে ভাই দুটিতে তেমন বেশী তফাৎ নয়—যতটা তফাৎ বোনটির সঙ্গে। বউ দুটিও সোমত্ত, আর বয়সে উভয়েই মায়ার চেয়ে অনেক বড়। গোকুল কতকটা রাসভারী গোছের মানুষ, মনটিও সাদাসিধা, বধূ করুণাকে সে নিজেদের সংসারটির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। পক্ষান্তরে, ছোট বধূ প্রসাদী এ-বাড়ীতে এসে অবধি হাল্কা প্রকৃতির অমানুষ বরটির নাকে দড়ি দিয়ে এমন কৌশলে চালাচ্ছে যে তার কোন হদিসও কেউ পায়নি। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বাধলেই করুণা ছুটে এসে দু'জনকে থামাবার জন্যে যখন ব্যাকুলি-ব্যাকুলি করত, প্রসাদী তখন অপ্রসন্ন মুখখানা বিকৃত করে গোঁজ হয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতো, ভাসুরের সঙ্গে বচসা অচল—নইলে কোমর বেঁধে স্বামীর পক্ষ নিয়ে ও-পক্ষের খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিত সে! তার শেখানো কথাগুলোই যে স্বামী তড়বড় করে বলতে থাকে—সে ত তার অজানা নয়, তবে সব কথা যে স্বামী বেচারা গুছিয়ে বলতে পারে না—তার দুঃখ ত সেইখানেই।

এ-দিনের কলহের মূলেও কানাই—তাকে নিয়ে বাড়াবাড়িটা চরমে ওঠাতেই বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হয় গোকুলকে। আর, এই বিশ্রী ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হওয়া প্রয়োজন জেনেই বড় বউ করুণা আজ আর ঝগড়া থামাতে ছুটে আসেনি। কানাইয়ের মতন নিঃসম্পর্কের একটা বওয়াটে ছেলেকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গানের আসর বসাতে তারও পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল রাগে।

গোকুল প্রথমে ভাল কথায় ছোট ভাইকে বোঝাতে চেয়েছিল; কিন্তু অতুলের কিছুই বোঝবার সাধ্য ছিল না—স্ত্রীর শেখানো কথাগুলিই তার মাথায় গিস্-গিস্ করছিল, তাই চড়া গলায় শুনিয়ে দিল।

গোকুল জোর গলায় জানাল: আমি বলছি কানাই এ-বাড়ী আসবে না, বাড়ীর অন্দরে তাকে নিয়ে আড্ডা হবে না।

অতুলও অনুরূপ সুরে উত্তর করল: হাজার বার আসবে কানাই, এটা কি তোমার একলার বাড়ী?

এই সময় পীতাম্বর এসে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন: কি, কি, ব্যাপার কি—আজ আবার হোল কি? বলি, ত্রিশটা দিনের একটা দিনও কি তোদের কামাই নেই ঝগড়ার?

বাপের দিকে চেয়ে সুরটা একটু নরম করে গোকুল বলল: আমি কি করব বল! তোমার ছোট ছেলে যে ঐ বওয়াটে কানাই ছোঁড়াকে এনে রাত-দিন বাড়ীতে মনসার পালা ভাঁজবে আমি তা হতে দোব না! বলি, বাড়ীতে যে একটা আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে —সে দিকে খেয়াল নেই!

অতুলও সঙ্গে সঙ্গে পালটা জবাব দিল: আর তোমার পেয়ারের মিগেন যে হামেশাই বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘোরে—তাতে কোন দোষ নেই নয়? কানাই আসবে, একশো বার আসবে। তবে আমি বলি, মায়ার সঙ্গে আমি ওর বে দোব।

কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে পীতাম্বর হুমকী দিলেন: মুখ সামলে কথা বলবি অতলো, আমি বাড়ীর মাথা, আমায় ডিঙিয়ে তুই মায়ার বিয়ে দিবি কি রে হতভাগা—

গোকুল সোৎসাহে বলল: আহাম্মুক কি না, তাই ও-কথা মুখে আনতে লজ্জা পেল না; আর কি না মৃগের মতন হীরের টুকরো ছেলের কথা তুলে খোঁটা দেয় ও! তবে এ-ও শোন বাবা, মৃগেনের সঙ্গে মায়ার বিয়ে আজই আমি পাকা করে ফেলতে চাই—তার ব্যবস্থাও···

অন্য দিন হলে কথাটা লুফে নিতেন পীতাম্বর। কিন্তু একটু আগেই বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে মৃগেনের বাবার সঙ্গে এই নিয়ে যে বচসা হয়, তাঁর স্নায়ুমণ্ডলে সেগুলো রীতিমত উত্তাপ ছড়াচ্ছিল, মুখ দিয়েও তার জ্বালা নিঃসৃত হোল: খবরদার গোকলো, ফের আমার মুখের ওপর কথা! আমি বাড়ীর কর্তা, আমার প্রাপ্তি নেই! আমি বলছি, ঐ চশমখোর যেদো রায়ের ঘরে আমি মায়াকে পাঠাবো না—কক্ষনো না।

বাপের কথায় হকচকিয়ে গেল গোকুল। বরাবরই সে জানে—মৃগেনের হাতে মায়াকে তুলে দেবার জন্যে কি আগ্রহই না তাঁর ছিল; লাখরাজ জমিটুকু বিক্রী করেই পণের টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত হলে গোকুলই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল—জমি বেচতে হবে না বাবা, পণের টাকা আমিই যেমন করে হোক যোগাড় করে দোব। তারই সম্ভাবনা হতেই এই মাত্র সে বিয়েটা পাকা করবার কথা তোলে। কিন্তু তার উত্তরে বাবার মুখে এ কি বিপরীত কথা।

বিস্ময়ের স্বরে গোকুল জিজ্ঞাসা করল: তার মানে?

ফস্ করে অতুল বলে উঠল: মানে—মায়ার বে হবে ঐ কানাইয়ের সনে।

গর্জ্জন করে গোকুল বলল: চোপরাও! ফের যদি তোর মুখে ওর নাম শুনি আর ঐ হতচ্ছাড়া যদি এ বাড়ীতে ঢোকে—

অতুলও অনুরূপ স্বরে উত্তর করল: আলবৎ ঢুকবে কানাই।

মারমুখী হয়ে গোকুল বলল: কী!

দুই ভায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ হাতখানা তুলে শাসনের ভঙ্গিতে পীতাম্বর হাঁকলেন: গোকুল, আমি এখনো বেঁচে আছি। অতুল, তোর যে ভারী রোক দেখছি,—নির্বিষ সাপের কুলো পানা চক্কর হু! ওগো বড়মানুষের ঝিয়েরা, তোমরাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে শোন—আজ থেকে সব আলাদা করে দিলুম। কেউ কারুর কোন তোয়াক্কা রাখবে না···কথা বন্ধ—মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত। যে যার ঘর আর তার হিস্যের দাওয়াটুকু নিয়ে আলাদা সংসার পাতো—রাঁধো বাড়ো খাও—যা সাধ যায় প্রাণে করো, কারুর কিছু বলবার কইবার থাকবে না—ব্যাস। এর পর ফের যদি ঝগড়া শুনি ত লাঠিপেটা করে তাড়াব—তা সে যেই হোক্।

বাড়ীর কর্তার মুখ দিয়ে যে হঠাৎ এমন নির্ঘাত কথা বেরুবে, কেউ তা কল্পনাও করেনি। শুনে সবাই যেন কাঠ হয়ে গেল। একটু পরে গোকুল অবস্থাটা উপলব্ধি করে আর্ত্তস্বরে বলে উঠল: বাবা, করচ কি! এত দিনের সংসার···

গোকুলের স্ত্রী করুণা দাওয়া থেকে ছুটে এসে শ্বশুরের দুটি পা ধরে ধরা-গলায় বলল: ছেলেদের ওপর রাগ করে এমন সর্ব্বনাশ করবেন না বাবা!

অতুল এই সময় মুখখানা বিকৃত করে বলল: আমি সব জানি. আমাকে জব্দ করবার জন্যেই এ একটা ফন্দী করা হচ্ছে। বেশ ত, দাও না আলাদা করে; এখুনি আমি কানাইকে নিয়ে মনসামঙ্গলের দল খুলবো আমার ঘরে। কানাই···কানাই···উত্তেজিত কণ্ঠে সে কানাইকে ডাকতে লাগলো, যেন সে কাছেই দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে।

কানাইয়ের নামেই গোকুলের মাথা আবার গরম হয়ে উঠল। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল: আসুক না দেখি কানাই, বাড়ীতে সেঁধুলেই আমি তাকে খুন করব।

পীতাম্বর চোখ পাকিয়ে বললেন: আবার! গোকুল, তোর লজ্জা নেই! আমার ব্যবস্থার ওপর কথা! অতুলো তার ঘরে বসে যা সাধ যায় তাই যদি করে—তোর বলবার তাতে কি আছে শুনি? ও যদি কানাইকে নিয়ে ভ্যাংটো হয়ে সেখানে নাচে—তার তাতে কি মাথাব্যথা রে ছুঁচো?

মুখখানি নীচু করে নম্র কণ্ঠে গোকুল বলল: তুমি ঠিক কথাই বলেছ বাবা, আমিই ভুল করেছি। আমাদের পৃথক্ করে দেওয়াই যদি তোমার ইচ্ছে হয়···

গোকুলের কথায় বাধা দিয়ে পীতাম্বর দৃঢ় স্বরে বললেন: ও ইচ্ছে-টিচ্ছে নয়—একবারে পৃথক্ করেই দিলুম। কারুর সঙ্গে আর কারুর সম্বন্ধ নেই; আমি একা, তুই একা, ও একা—যে যেমন আনবে, খাবে; কোন কথা নেই আর।

'বেশ তাই হোক্ বাবা!'—বলেই গোকুল তার ঘরের দিকে চলে গেল। স্বামীকে করুণা ভালো করেই চিনতো, আঁচলে চোখ দু'টি মুছতে মুছতে সেও ধীর পদে স্বামীর পিছু নিল। অতুল মুখখানায় একটা বিকৃত ভঙ্গি করে বলে উঠলো: আচ্ছা—আচ্ছা, ভালোই ত, এ আমার পক্ষে শাপে বর হোল—বুঝলে?

পিছনের দাওয়ার উপরে শালের খুঁটিটি ধরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল মায়া। সকলে চলে গেলে আস্তে আস্তে পীতাম্বরের কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করল: আর, আমি বাবা? আমার কি হবে?

মায়াকে দেখেই পীতাম্বর ফোঁস করে উঠে রুক্ষ স্বরে বললেন: তুই ত শতেকখোয়ারী ছুঁড়ি, তোর জন্যেই ত···

কিন্তু এই পর্যন্ত বলেই মায়ার সজল পদ্মের মত দুটি চোখের মৌন দৃষ্টিতে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর ও সুর কোমল করে দীর্ঘ হাত দু'খানি বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে এনে বললেন: না, রে না—তোর দোষ কি মা, আর ভাবনাই বা কি; ওরা পৃথক্ হলেও তুই থাকবি আমার কাছে। আমরা দু'জনে এক সঙ্গে থাকবো—বুঝলি? তুই রাঁধবি, আমি ঠাকুর পড়বো···কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না আর!

মুখখানা নীচু করে মায়া চেয়ে রইল মাটির দিকে। পীতাম্বর লক্ষ্য করল তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে ঠিক মুক্তার মত। মনে পড়ল তাঁর—মাতৃহারা মেয়েটিকে কত যত্নে মানুষ করেছেন—এই মেয়েকেই কি না বিনা দোষে নিষ্ঠুরের মত···

সমস্ত অন্তরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল পীতাম্বরের, তাঁর শুষ্ক দুটি চোখও জলে ভরে এল। মেয়ের দিকে চেয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন তিনি। মায়াও এই সময় চোখ দুটি মেলে চাইল পিতার পানে, অমনি বুকখানি দুলে উঠল তার গভীর একটা বেদনায়। গাঢ় স্বরে সে ডাকল: বাবা!

চমকে উঠে পূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের ম্লান মুখখানার পানে তাকালেন পীতাম্বর। ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন: তোকে বকেছি না রে! কিন্তু কি করি বল ত মা, রাত-দিন কিচি কিচি, কাঁহাতক সহ্য করি! এই বেশ হয়েছে, ওরা জব্দ হোক্। তুই ভাবিস্‌নি মা, তোর বিয়ে আমি আরো ভাল ঘরে দোব। আমায় বলে কি না পুতুল তৈরী করি! এ যে আমার কত বড় সাধনার কাজ—তুই কি জানবি টাকার পিশাচ? হ্যাঁ ভাখ্ মা, এখন থেকে শক্ত হবি, ঐ ইতরের ছেলেটা এবার এলে···

মুখখানা শক্ত করেই মায়া বলে উঠলো: শক্তই হব বাবা, এবার এলে ঐ চেলা কাঠ দিয়ে ঠ্যাং তার ভেঙে দেব!···বলেই সে গভীর দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে তাকালো। পীতাম্বরের মনের ভিতর তখন কি ভাবের তরঙ্গ বইছিল তিনিই জানেন!

নিগ্রো মজুরদের গান

(গানগুলো কার রচিত জানা যায়নি, কিন্তু প্রকাশের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন Ralph Schaltz)

বলিলাম মোর কর্তারে আমি, "পা-দুখানি মোর
হয়েছে ঠাণ্ডা-অবশ,"
"জাহান্নামেতে যাক্ গে পা তোর ; গাড়ী চালু রাখ্
ঘোড়াটিরে রেখে স্ববশ।"
"কর্তা গো কর্তা, 'বুড়ো বেন্' চলে না!"
"—মরুক্ গে পাজি ঘোড়া—
চাপাও জোয়াল তুমি। ফের কথা বলে না।"
"কর্তামশাই, দেখছ না কি রাস্তা রয়েছে বৃষ্টিতে ভেজা?
"ওরে 'ব্ল্যাক্-বয়' ক'ষে মার বেত,"
সন্ধ্যা অবধি যদি বা না চলে মেরে কর তুলো-পেঁজা!
"কর্তা গো কর্তা, দেখেও কি দেখ না
পথ ভিজে পিচ্ছিল ঝরে' ঝরে' বরফের কণা?"

★

কেন আমি কাজে প'ড়ে থাকি মন দিয়া?
(মরি হায়) কেন আমি কাজে প'ড়ে থাকি মন দিয়া :
(আরে বাবা) কেন আমি নিজ কাজ করি মন দিয়া
কড়া কাফি, কবোষ্ণ ফ্ল্যাম্‌বোটিয়া!
(হায়) কড়া কাফি. কবোষ্ণ ফ্ল্যাম্‌বোটিয়া!
(ওরে) কড়া কাফি, কবোষ্ণ ফ্ল্যাম্‌বোটিয়া!
(হায়) তাই আমি কাজে প'ড়ে থাকি মন দিয়া।

★

পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি,
সারাদিন জান্ দিয়ে খাটি।
টাকা এক থোক্!
ভদ্দরলোক, আমি ভদ্দরলোক!
টাকা কম কী?
মাসে মাসে বারো টাকা আর খোরাকী!
কম কি মাহিনা?
মাস-মাস বারো টাকা আর খানাপিনা।
ম'রে যাই, ম'রে যাই,
ফুর্তির চোটে আমি ম'রে যেতে চাই।
—চেষ্টাও কম করিনি!
হায়, তবু পারিনি,
(কেন জানো?)
—মনে প'ড়ে কর্তার মেয়েমবাবী!

অনুবাদক : [illegible] সেনগুপ্ত

আণবিক যুগ

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জাপানী হেরেছে। আণবিক বোমা একেবারে ফিরিয়ে দিয়েছে যুদ্ধের গতিকে। দু'টো বোমা—ব্যস! যুদ্ধ খতম। সহজেই অনুমেয় কি বিরাট শক্তি এই বোমার।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগ এসে পড়ল। আণবিক শক্তির যুগ। এই শক্তি আজকের নয়, নতুনও নয়—এ শক্তি চিরদিনের। বেদেও এই শক্তির কথা আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলেছে এই শক্তিতে। সূর্য্য, নক্ষত্র অগ্নিময় এই শক্তির কৃপায়। অসীম অনন্ত এই শক্তি ধরা আছে অতি ক্ষুদ্র একটি অণুর মধ্যে।

অণু যেন একটি সৌর জগৎ। মধ্যে অণু-বীক্ষণিক সূর্য্য, আর তার চারি ধারে ঘুরছে গ্রহ। প্রত্যেকের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট। এই গতির মধ্যে লুকিয়ে আছে শক্তি। এই শক্তির ফলেই গ্রহগুলি ঘুরছে ঠিক পথে, মধ্যের সূর্য্যকে ত্যাগ করে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে না। যদি কোন মতে একটি অণুকে ভাঙ্গা যায়, অর্থাৎ গ্রহ গতি-পথ ত্যাগ করে, তবে এই লুক্কায়িত শক্তি ছাড়া পায়। ইউরেনিয়াম এবং আরও কয়েকটি মৌলিক দ্রব্যের অণু এই ভাবে ভাঙ্গা যায়। বিশ্বের অনন্ত শক্তি ছাড়া পেয়ে তাণ্ডব লীলা করে।

আগুন পুড়িয়ে মারে, ধ্বংস করে। কিন্তু সেই তাণ্ডব লীলা যদি নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়, তবে কত উপকার পাওয়া যায়। তেমনই আণবিক শক্তি হঠাৎ ছাড়া পেলে যেমন ধ্বংস করতে পারে, তেমনই সেই শক্তি—বিরাট, সেই শক্তি মানুষের কত কাজে যে লাগতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। কারণ, এমন কোন বাধা নেই যা এই শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, এমন কোন কাজ নেই যা একে হার মানাতে পারে। এই শক্তি অসীম, বিশ্বজয়ী।

একে একে যুগ বদলে যাচ্ছে। প্রথম যুগ ছিল প্রস্তর-যুগ। তার পর ক্রমে বদলে বদলে এল লৌহ-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ। এখন চলছিল যন্ত্র-যুগ—কয়লা, তৈল, পেট্রোলের যুগ। এইবার আরম্ভ হবে আণবিক-যুগ। শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লা, তেল ব্যবহার করতে হবে না। অণু ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন করা হবে। হাজার হাজার টন কয়লা অথবা তেল থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় না, মাত্র দু'-এক টন ইউরেনিয়াম থেকে সেই শক্তি উৎপাদিত হবে। আণবিক বোমার সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু মাত্র ধ্বংসের দিক্‌টা। যতক্ষণ বৈজ্ঞানিকরা এই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারছেন, ততক্ষণ কোন মতেই এর ব্যবহার কার্য্যকরী হতে পারে না। তাই আজ প্রত্যেক বড় বড় বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিকরা দিবারাত্র কেবল এই শক্তি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় ব্যস্ত। বিরাট, বিরাট, সাইক্লোট্রন নিয়ে চলছে অণু ভাঙ্গার গবেষণা।
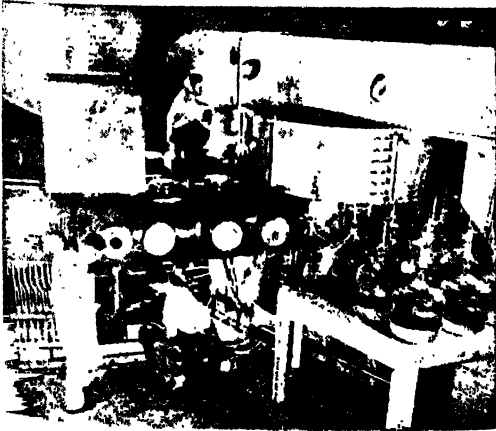
অণুভাঙা যন্ত্র

উড়ো-জাহাজ

উড়ো-জাহাজেও কত নূতনত্ব আসবে। সব চেয়ে অসুবিধা ছিল প্লেন নামবে কোথায়, উঠবে কোথা থেকে। প্রকাণ্ড সমতল
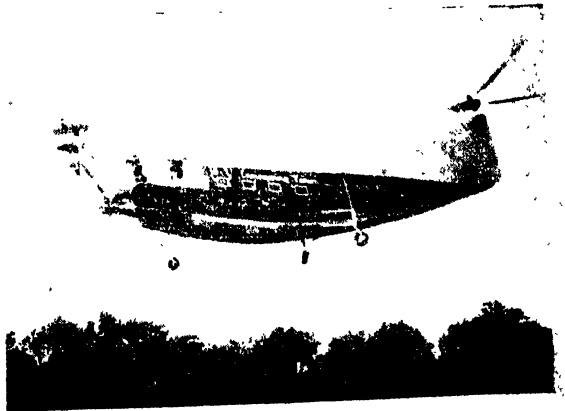
উড়ো জাহাজ

জমির প্রয়োজন। এখন আর সে সবের দরকার নেই। নূতন হেলিকপ্টারে জমির দরকার নেই। বাড়ীর ছাদ থেকে সোজা ওপরে উঠে যাবে। আর সাইজেও হবে প্রকাণ্ড, লম্বায় ৪৮ ফুট, উঁচু ১৩ ফুট। দশ জন আরোহী, দু'জন চালক। তাছাড়া খাওয়ার ব্যবস্থা ভেতরে থাকবে। আর উঠবেও অনেক উঁচুতে। দরকার হলে জলের ওপরেও নামতে পারবে।

নতুন কাচ

নতুন লেন্সে

কাচের ওপর আলো পড়লেই প্রতিফলিত হয়। ক্যামেরার লেন্সের ওপর সেই আলো পড়লে ছবি তোলবার পর দেখা যায় ছবিটা

পুরাণো লেন্সে

ঝাপসা হয়েছে। বেশীর ভাগ সময়ই রৌদ্রের আলোর ছবি তোলা হয়। তাই এই আলোর গণ্ডগোল অনিবার্য্য। বৈজ্ঞানিকরা নতুন

নতুন লেন্সে

এক রকম কাচ বার করেছেন, যাতে আলো মোটেই প্রতিফলিত হবে না। কাচের উপর ম্যাগনেশিয়াম ফ্লোরাইডের আবরণ দিয়ে প্রতি-

পুরানো লেন্সে

ফলন বন্ধ করা হয়। পুরানো লেন্সে আর এই ধরণের তৈরী লেন্সের ছবির মধ্যে অনেক তারতম্য।

খবরের কাগজ

পৃথিবীর এক স্থানে কিছু ঘটল, বেতারে চলে গেল প্রত্যেক দেশে। টাইপ হয়ে মেসিন থেকে খবর বেরিয়ে এল। তার পর কাগজওয়ালারা সেই খবর সাজিয়ে ছেপে কাগজ বার করলে। এইবার আরও এক পা এগিয়ে যাবে। এক দেশে কাগজ ছাপা হবে, খবর সাজিয়ে,

বেতারে খবরের কাগজ

ছবি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ছেপে কাগজ বার হবে অন্য দেশে—বেতারে। কলিকাতার কাগজ ট্রেণে করে যাবে মফস্বলে—সেখানকার পাঠকরা পাবে অনেক পরে। এখন আর দেরী হবে না। একই সময় কলিকাতায় ও মফস্বলের লোক কাগজ পাবে। প্রত্যেক পাঠকের বেতার যন্ত্র থেকে ছাপা কাগজ বেরিয়ে আসবে।

—

খাদ্য-ভাণ্ডার

খাবার ভাল রাখতে গেলে রেফ্রিজারেটর ছাড়া উপায় নেই। এক দিন ভাল রান্না হল একটু বেশী। সবটা খরচ হ'ল না। ফেলা যাবে? অথবা ভাল ফল এসেছে। কিছু দিন ধরে খেতে হবে। কিন্তু উপায়? রেফ্রিজারেটর। ঠাণ্ডা করে জমিয়ে রাখা। কিন্তু দেখা গেছে, অত্যধিক ঠাণ্ডা হলে ফলের অথবা খাদ্যের স্বাদ বদলে যায়। গরম করলেও ঠিক হয় না। সময়ও লাগে অনেক। রান্না করা খাবারের স্বাদ অনেকটা ফিরে এলেও, ফল নিয়ে ভারী মুস্কিল হয়। নতুন এক রকম যন্ত্র বেরিয়েছে। খাবার গরম হবে ইলেকট্রনিক টিউব দিয়ে। খুব বেশী কম্পনের রেডিও-তরঙ্গ দিয়ে এই কাজ করা হয়। দেড় সের বরফের মত ঠাণ্ডা করা (প্রায় বরফ
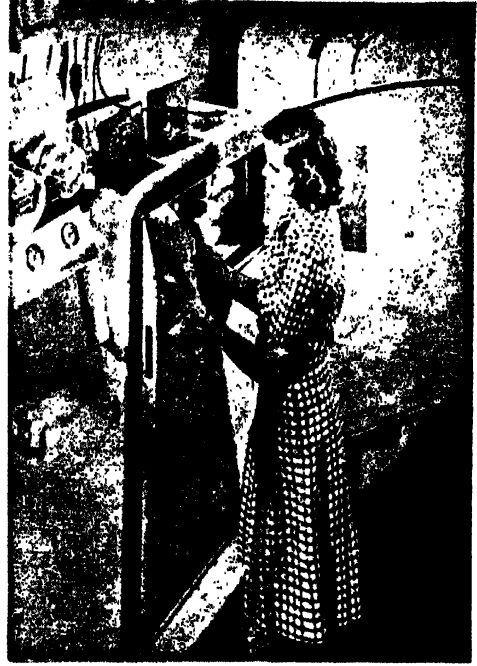
খাদ্য-ভাণ্ডার

হয়ে যাওয়া) চেরী ফল গরম হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে মাত্র এগারো সেকেণ্ডে। এই যন্ত্রে খাদ্য ষ্টেরিলাইজ

ঠাণ্ডা খাবার গরম করা

করা, প্লাষ্টিক গরম করা, এমন কি পাঁউরুটি সেঁকা, মাংস রান্না পর্য্যন্ত চলবে।

★

আধুনিক মেয়ে

শ্রীমতী নমিতা গুপ্তা

আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সত্যিই আশংকার কথা। এঁদের স্বপক্ষে বলতে গেলে অপর পক্ষের তীব্র সমালোচনায়, অনেক সময় আলোচনা নয়, অযৌক্তিক কটূক্তিতে পর্য্যুদস্ত হতে হয়, অথচ এঁদের সন্তুষ্ট করতে হলে অবিচার ও সত্যের অপলাপ অবশ্যম্ভাবী। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এ-পক্ষের অনেকেই আধুনিকাদের সমালোচনা করেন তাঁদের মনের নিগূঢ় ঈর্ষার জন্তে—এর মূলে যে সর্বদাই যুক্তিসংগত কারণ থাকে তা নয় কারণ সে বিচার করার মতো স্থৈর্ব, উদার দৃষ্টি এবং সহানুভূতি অনেকেরই নেই।

এই আধুনিকতার ধারা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো, এর ক্ষীণ স্পন্দন সুরু হয়েছে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের কিছু পরেই। অবশ্য তাই বলে ইতিহাসের পরিশিষ্টের মতো এটাকে ইংরেজ শাসনের একটি সুমহৎ কীর্তি বলে গদগদ হবার কিছু নেই। তখনকার বৃহত্তর জগতে যে পরিবর্তন এসেছিল, তারই একটা স্রোত এ দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমস্ত মনো-জগতে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিলো, তারই একটি ভগ্নাংশ এ দেশের পরিবর্তনের মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথের তখনকার গল্পে, উপন্তাসে; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ইত্যাদির রচনায় আমরা তখনকার শিক্ষিতা আধুনিকাদের দেখা পাই। ঘোড়ার গাড়ী চড়ে স্কুলে যাওয়া, জুতা-মোজা-পরা তের-চোদ্দ বছরের মেয়েরা ছিল এ দেশের আধুনিক মেয়ে—উপন্তাসে তারাই ছিল শিক্ষিতা নায়িকা। সাধারণতঃ ব্রাহ্ম-ঘরে, কচিৎ সংস্কারপন্থী হিন্দুর বাড়ীর মেয়েরা ছিল এই প্রথম দলে। তখনকার উপন্তাসে, প্রবন্ধে, কবিতায় এদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও বর্ষিত হোত অকৃপণ ভাবে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের মর্মান্তিক বিদ্রূপে ভরা কবিতাটি তখনকার দিনে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। সাহিত্যে বিদ্রূপ, সনাতনপন্থীদের হা-হুতাশ, জনসাধারণের বিমুখতা কিন্তু এই নূতন ঢেউকে ঠেকাতে পারলো না, আধুনিকতার চাকা বন্ধুর পথেই গড়িয়ে চললো। তার পর আমরা পাই আধুনিকতার দ্বিতীয় ধাপ। তখন আমরা দেখছি অধিকাংশ সহরেই মেয়েদের স্কুল, কোথাও বা কলেজও গড়ে উঠছে। বড়ো বড়ো বাসে আধুনিক কেতায় সাজ-সজ্জা করা মেয়ের দল স্কুল-কলেজে চলেছে—খবরের কাগজে তাদের বিস্ময়কর কৃতিত্বের কথা ছাপা হচ্ছে—প্রতি পত্রিকায় মেয়েদের পাতা বলে আলাদা জায়গা রাখা হয়েছে—ট্রামে-বাসে তাদের মার্কা দেওয়া জায়গা—এমন কি রাজনীতি, খেলা-ধূলাতেও মেয়েদের যোগ দিতে দেখা যাচ্ছে। তার পরে এল আধুনিকতার তৃতীয় ধাপ অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালের আধুনিকতা।

অবশ্য এইখানে একটা কথা আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, এই আধুনিকতা ভারতের বৃহত্তর নারী-সমাজকে একেবারেই দোলা দিতে পারেনি। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি। আধুনিক মেয়ে নিয়ে আলোচনা করার গোড়াতেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা আমাদের দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্বন্ধেই বলছি,—যে বৃহত্তর অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত নারী সমাজ এর বাইরে রইলো, তাদের সম্বন্ধে বলার অনেক কিছু থাকলেও আমাদের আজকের বিষয়-বস্তুর মধ্যে তারা পড়ে না।

যাই হোক, উপরি-উক্ত দ্বিতীয় ধাপ পর্য্যন্ত এই আধুনিকতা—অনুকূলে এবং প্রতিকূলে অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও, একটা অন্ধ আবেগে এগিয়ে এসেছে। এই এগিয়ে আসাটাকে অনেকে ভুল বুঝেছে, প্রথম দৃষ্টিতে নূতন প্রবর্তিত আলোকের বিপজ্জনক অবস্থা কেটে গিয়ে 'মেজর অপারেশন' সফল হয়েছে বলেই মনে হয়; কিন্তু আমরা বলি 'মেজর অপারেশনে'র সময় এবার এসেছে। এত দিনে যা হোল তা কি সত্যিই প্রগতি? এবং আধুনিকতাই যদি হয়, তাহলে এর সার্থকতা কি?—এ কথাটা জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

অবশ্য এইখানে আমাদের একটা কথা সুস্পষ্ট ভাবে জানতে হবে যে, আধুনিক এবং তথাকথিত আধুনিক মেয়েতে সীমাহীন পার্থক্য—যদিও এই কথাটা না জানাতেই অধিকাংশ তর্ক, ব্যঙ্গ, শ্লেষের উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক মেয়ে (এই কথাটিকে ব্যবহার না করে আজকালকার মেয়ে বললেই বেশী সুস্পষ্ট হবে) বলতেই সাধারণের চোখে ভেসে ওঠে—উগ্র আধুনিক ভাবে সজ্জিত, অবিনয়ী, উদ্ধত, অলস, ইংরেজী বলা, পুরুষ-ঘেঁষা, ক্ষীণাঙ্গী, সস্তা দামের এসেন্সের উগ্র গন্ধের মতো ঝাঁঝালো এক মেয়ে। আধুনিক মেয়ে বলতেই যাঁদের রসনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শাণিত হয়ে ওঠে, তাঁরা এই ধরণের একটা উদ্ভট চরিত্রের কল্পনা করেন। শতাব্দীর লাঞ্ছনা, অপমান মুহূর্তে সরিয়ে দেবার অসম্ভব ইচ্ছায় এই তীব্র ঝাঁকুনী—বহু দিনের অচলায়তনের বাঁধ-ভাঙ্গার চেষ্টা যাদের ছিলো, তাদের এক দল এই ধরণের ছিলো, এখনও কিছু আছে। কিন্তু এদের দেখে সমস্ত আধুনিক মেয়ের বিচার করা আর এক পৃষ্ঠা পড়ে বইয়ের সমালোচনা সমান হাস্যকর। বরং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে এটা মেনে নেওয়াই চিন্তাশীল ও সুস্থ মনের লক্ষণ। অবশ্য এই দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমরা অশ্রদ্ধা, অবিনয় ও কর্ম্ম-বিমুখতাকে পক্ষান্তরে প্রশংসাই করছি; আমরা শুধু এই বলতে চাই যে পৃথিবীতে যখনই কোন নূতন প্রবর্তনা এসেছে, তখনই প্রথম প্রথম এই ধরণের বাড়াবাড়ি দেখা গেছে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে পুরাতনকে এক মুহূর্তে সরিয়ে দেবার অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষাই এর কারণ। আমাদের দেশেও, মনস্তত্বের এই নিগূঢ় কারণে এই বাড়াবাড়ির ব্যতিক্রম হয়নি। যাই হোক, এই উৎকট

আধুনিকতার ঢেউ যে স্তিমিত হয়ে পড়েছে, এটা সকলেই স্বীকার করবেন।

আর এক দল তথাকথিত আধুনিক মেয়ের কথা বলব, যাদের স্বরূপ অনেকেই জানেন না। স্কুল-কলেজে-পড়া অধিকাংশ মেয়েই এই দলে পড়ে—তাদের আধুনিক সাজসজ্জা, কলাচর্চ্চা, দেশী বিদেশী সাহিত্যের উদ্গিরণ, নকল স্বদেশীয়ানা প্রথমটা প্রতারিত করলেও পরে তাদের স্বরূপ বোঝা কঠিন নয়। এদের আধুনিক প্রেসে ছাপা ঝকঝকে মলাট দেখলে চোখ প্রথমটা ধাঁধিয়ে যায়—কিন্তু মলাট উল্টালেই দেখা যাবে, এ সেই চিরন্তনী বটতলার পুঁথি—মলাট দেখে ঘাবড়ে না গেলে চিন্তার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এদের হীরকের ভার আছে, দ্যুতি নেই—এই মেয়েদের আমরা আধুনিক মেয়ের পর্যায়ে ফেলবো না, কারণ জানি এরা সেই সনাতনপন্থী, সময় এলে সমস্ত অন্যায়-অবিচারকে বিনা দ্বিধায় সয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত, বাইরে যতো ঝলকানীই থাক্, মনে মনে প্রতি পদে মর্য্যাদাহীন পরাধীনতা মেনে নেবার জন্যে এরা লালায়িত। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ছাত্রী-জীবনে এরা সতন্ত্র শাসন, অনুশাসন মেনে কুসংস্কারকে আঁকড়ে থাকে। এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, এরা মনেও তার প্রতিবাদ করে না—মুহূর্ত্তের জন্যেও এই নৈতিক অত্যাচারে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে না—বিবাহিত জীবনেও এদের জীবন-যাত্রায় না থাকে কোন বৈশিষ্ট্য, না থাকে উদার, সানন্দ, সুস্থ জীবনছন্দ। এই জাতীয় মেয়েদের মনের আলেয়ার আলোকে আগুন বলে ভুল করলে চলবে না। আধুনিকতার মুখোশে আঁটা এই নির্বীর্য মেয়ের দলও আমাদের বিষয়-বস্তুর বাইরে। আমাদের প্রধান সমস্যা হোল সত্যিকারের আধুনিক মেয়েদের নিয়ে। যারা আধুনিকতার ভাণ করে না—সত্যিকারের চিন্তা করে, এগিয়ে যাওয়ার আশা রাখে—বর্ত্তমান অচল, অনড় সমাজ-ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করা উচিত বলে মনে করে—এক কথায় আত্মমর্যাদাশালিনী, অকুণ্ঠ, সুস্থ, দৃঢ় মনের জাগ্রত দেশাত্মবোধ আছে এমন মেয়েই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এদের সংখ্যা কম হলেও শক্তি কম নয়—এদেরই বিপ্লবের সুর স্থবিরতাকে বার বার আঘাত করছে।

—শিল্পী অনিল সেন

আমাদের প্রবন্ধ যাঁরা শেষ পর্যন্ত পড়বেন, সেই মুষ্টিমের ক'জনও যদি ভালো করে চেয়ে দেখেন, সত্যিকারের চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই অবরুদ্ধ অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে—বিপ্লবের প্রথম ঢেউ নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এই বিপর্যয় কেউ লক্ষ্য করছেন কি না জানি না, কিন্তু যে আসছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের মায়েদের একটি বিষম ত্রুটি হোল, তাঁরা মেয়েদের মনের খবর রাখেন না, যদি রাখতেন তাহলে তাদের অসন্তুষ্ট, লুব্ধ, অপমানিত মনের চেহারা দেখে বিস্মিত হতেন সন্দেহ নেই। উচ্চ, মধ্যবিত্ত এবং ধনী সম্প্রদায়ের অভিভাবকরা স্কুলে-কলেজে পড়িয়ে, গান-বাজনা শিখিয়ে, ব্যাচিং বাড়ীর কম্পাউণ্ডে খেলার বন্দোবস্ত করে দিয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মনে করে নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু এটা যে কতো বড় ভুল, তা বোঝবার মতো অনুভব-শক্তি এঁদের নেই। আসলে এই আধুনিক মেয়েরা নিষ্প্রাণ পুতুল নয়, তারা সাধারণ মানুষের প্রাপ্য স্বাধীনতা ও মর্যাদারই দাবী করে—এই স্বাধীনতা ও মর্যাদাই হোল তাদের শ্রেষ্ঠ পাওনা, অথচ আমাদের সমাজ ঠিক এই দুটি স্বাভাবিক দাবীই পূরণ করে না। স্ত্রীশিক্ষার অঙ্কের পরিমাণ যতই বেড়ে চলুক, খবরের কাগজে গান-বাজনা, লেখা-পড়া, খেলা-ধূলায় কৃতী মেয়েদের ছবি যতই আড়ম্বরে ছাপা হোক, সত্যিই আমাদের দেশের জনমত এবং সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না, সে কথা পাঠক-পাঠিকারাই চিন্তা করে দেখুন। শিক্ষা যে বিয়ের পাসপোর্ট, সৌন্দর্যচর্চা ও স্বাস্থ্য হোল বরপক্ষকে ভোলানোর জন্যে (এর চেয়ে ভদ্র-ভাষা ব্যবহার করা যায় না) আর সংস্কৃতি কলাচর্চা সে-ও তারই জন্যে এ কথাটা যখন মেয়েরা প্রতিপদে শোনে, তখন সে শিক্ষা শুধু যে একটা প্রহসন বলে মনে হয়, তা নয়; একটা বিজাতীয় ঘৃণা তাদের তিক্ত করে তোলে। আমাদের দেশে গৌরীর তপস্যা আজও শেষ হয়নি। কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে সহস্র শাসন অনুশাসন মেনে, অভিভাবকের সতর্ক স্নেহকুটিল দৃষ্টির সামনে বেড়ে উঠে, সযত্নে করা প্রসাধন, কলাচর্চা, ও শিক্ষা সবই যে পরিবারের বিশেষত্ব, যার জন্যে তাকে আর যাই হোক মহাদেব বলা চলে কি? অভিভাবকরা তাঁদের সাবালিকা শিক্ষিতা মেয়েদের এতটুকু বিশ্বাস করেন না, মর্যাদা দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা যে কি বিড়ম্বিত জীব, তা তারা ছাড়া আর কারুর বোঝবার ক্ষমতা নেই। শিক্ষাটা তাদের পোষাকী কাপড়,—স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে এসে কাপড় বদলানোর সংগে সংগেই শিক্ষাটাকে বদলাতে হয়। যা অন্যায়, যা অর্থহীন বলে শিখছি বাড়ীতে এসে ঠিক সেইগুলিকে মেনে চলতে হবে। আজও শতকরা নিরানব্বইটা বাড়ীর লোকই—তা সে কালচার্ড বলে যতো গর্বই থাকুক, মেয়েদের মুখে কোন উচ্চ আদর্শের বা প্রতিবাদের কথা শুনতে প্রস্তুত নন। ফলে এই আধুনিক মেয়েদের হতে হয়েছে অভিনেত্রী—ঘরে বাইরে। এই বিভিন্ন অভিনয়ের গ্লানি তাদের জীবনকে প্রতিপদে শোচনীয় রকমে ব্যর্থ করে। আমাদের দেশের এই অভিভাবকেরা আজ এক অদ্ভুত অবস্থায় এসেছেন; এঁদের অধিকাংশ সেই সনাতনীই আছেন—মেয়েদের সম্বন্ধে লেখা বাছা বাছা মোক্ষম শ্লোকগুলি অধিকাংশই কম-বেশী বিশ্বাস করেন, অথচ বিয়ের বাজারের সার্টিফিকেটের জন্যে মেয়েদের খুঁটীর দড়িটা একটু আলগা করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এই দুই নৌকায় পা দেওয়ায় ঘটেছে অনর্থ ও বিশৃঙ্খলা। সাগর-পারের অনুকরণে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, কলাচর্চা করাচ্ছেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিবাহিত রাখছেন অথচ তাদের মন, তাদের ব্যক্তিত্বকে রাখতে চাইছেন হাতের মুঠোয়। যে সব মেয়েরা শিক্ষিতা হয়েও মনে এক শতাব্দী পিছিয়ে সেই চিরাচরিত বৃত্তের মধ্যেই ঘুরছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মতে তাদের শিক্ষাই সার্থক। যে সব বালিকা এবং শিক্ষিতা বধূ সে যুগের বারো বছরের বালিকা-বধূর মতো সলজ্জ, অজ্ঞ, ভীরুতার আচরণ করবে, তারাই শ্বশুরগৃহের সুদুর্লভ প্রশংসা লাভ করবে। এই সব আধুনিক মেয়েদের কাছে কুমারী-জীবনে তাদের অভিভাবকরা আশা করেন শিশুসুলভ অজ্ঞতা, সরলতা, নির্ভরতা, নির্বোধ বাধ্যতা। বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েদের পক্ষে যেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অর্থাৎ শিক্ষিত, সবল, আদর্শবাদী যুবকদের সংগে মালিন্যহীন বন্ধুত্ব কিংবা পরিণয়ের কামনা দেখলে নিষ্ঠুর হাতে তার প্রতিরোধ করবেন—বয়ঃপ্রাপ্তাদের মনের এই দিকে কোন আগ্রহ দেখলে তাঁরা শিউরে ওঠেন। এর পর বিবাহিতা জীবনে ও-পক্ষের পরিবারবর্গও বধূর কাছে পঞ্চাশ বছর পূর্বের বালিকা বধূ-সুলভ আচরণের একটা মধুর প্রত্যাশা করেন—তার পরিবর্তে মর্যাদাশালিনী, নির্ভীক, অকুণ্ঠ ও দৃঢ়চেতা বধূকে দেখলেই বাড়ীতে অশান্তির সীমা থাকে না। কিন্তু বিয়ে দেবার সময় ছেলের মনোরঞ্জনের জন্যে এবং ফ্যাসানের অনুরোধে তাঁদের প্রধানতঃ ঝোঁক থাকে শিক্ষিতা আধুনিক মেয়েদের উপরেই, তখন তো পাড়াগাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিতা কিশোরীকে আনার আগ্রহ তাঁদের দেখা যায় না!

শিক্ষা ও আচরণের এই পার্থক্যে, এই বিচিত্র দাবী মেটাতে গিয়ে আধুনিক মেয়েদের মনে যে আগুন জ্বলে উঠেছে, তার খোঁজ কেউ রাখেন কি না জানি না। দুঃখের সংগেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, তারা আর একে অভিভাবক এবং সমাজের স্নেহের অনুশাসন বলে মেনে নিতে পারছে না—অস্পষ্ট ভাবে তাদের এটাকে শাসনের নাগপাশ বলেই মনে হচ্ছে। অর্থনৈতিক পরাধীনতাই যে এর কারণ, তা বুঝতে এদের ভুল হচ্ছে না এবং এ কথা অপ্রিয় এবং অবিশ্বাস্য হলেও এই বিড়ম্বিত মেয়েদের মন থেকে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়েছে। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার যদি আজও পরিবর্তন না হয় তাহলে এই অশ্রদ্ধা এবং ধূমায়মান ক্ষুব্ধতা ও অসন্তোষ যে এক দিন বিপুল বিপ্লবের রূপ নিয়ে প্রতিটি সংসারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষার নামে এই ঘৃণিত অশিক্ষা—আধুনিকতার নামে আধুনিকতার এই ইতর কাষ্ঠহাসি তাদের তিক্ত করে তুলেছে। কালের পদক্ষেপকে, জাগ্রত মনের দাবীকে সহজ ভাবে মেনে যদি আজও স্থবির পরিবর্তনহীন ব্যবস্থা ও মতের পরিবর্তন না হয়, তাহলে আজকের এই বিক্ষোভের গুঞ্জন বিপুল হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে শান্তিপূর্ণ সংসার-সৃষ্টির আশাকে চিরদিনের জন্যে মরীচিকার মতো অবাস্তব করে তুলবে।

স্বামি-স্ত্রী

বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে এবং মেয়ে দু'জনের চোখেই থাকে রঙীন কাচ, মনে সোনালী স্বপ্ন। একত্রে থাকবার পর কিছু দিনের মধ্যেই পরস্পরের নিকট পরস্পরের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। এটা খুবই স্বাভাবিক। একসঙ্গে থাকতে গেলেই

মানুষকে নিজের স্বাভাবিক রূপে থাকতে হবে। সব সময় নিজেকে কৃত্রিম আবরণে ঢেকে রাখা সম্ভবপর নয়।

কোন স্বামীর হয়ত' যেখানে সেখানে জুতো খুলে রাখা অভ্যাস। হয়ত' স্ত্রী বাপের বাড়ীতে এই শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছে যে রাস্তার জুতো সিঁড়ির কাছে খুলে রাখবে। ব্যাপারটা কিছুই নয়, কিন্তু এ থেকে অনেক গণ্ডগোল দাঁড়াতে পারে। স্ত্রী যদি স্বভাববশত বিরক্ত হয়ে আপত্তি করে, স্বামী যাবে চটে। আর যদি চুপ করে থাকে, তা'হলে তার স্নায়ুতন্ত্রীতে আঘাত লাগবে। ভুলকে ভুল বুঝেও চুপ করে থাকার অর্থ নিজের ব্যক্তিত্বকে চেপে রাখা, মেরে ফেলা। হয়ত' স্ত্রীর অভ্যাস আলমারী থেকে বই নামিয়ে পড়ে ঠিক স্থানে আবার তুলে না রাখা। স্বামীর কিন্তু বই এদিক্ ওদিক্ হলেই মেজাজ যায় চটে। হয়ত' গোড়ায় গোড়ায় স্বামী কিছু বলবে না, পরে মৃদু ভাবে অভিযোগ করবে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বকাবকি মনোমালিন্য হবেই।

যদি উভয় উভয়ের দোষ-ত্রুটি না দেখে, দেখেও কিছু না বলে, তাতে তখনকার মত গোলযোগ না হতে পারে, কিন্তু পরে হবেই। কারণ দু'জনেই মনে মনে গুমরোতে থাকবে। শেষে অতি সামান্য কারণে এক দিন ফেটে পড়বে। ফলে উভয়ের জীবনে যে ফাট ধরবে, চট করে তার জোড় লাগবে না। ভুল ধরা এবং আপত্তি করাই ভাল। অবশ্য এমন ভাবে এমন ভাষায়—যাতে অপর পক্ষ চটে না যায়। একটু হেসে, মিষ্টি করে বললে অনেক সময় বেশী কাজ পাওয়া যায়। আর গোড়া থেকে ভুল ধরলে দুই পক্ষই বুঝতে পারে, ভুল শোধরান দরকার। সেই সঙ্গে যদি অপর পক্ষ নিজের ভুল স্বীকার করে, ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে সেই ভুল আর না করে, তবে স্বামি-স্ত্রীর জীবন খুব সুখের হয়।

যাত্রী

শ্রীমতী কবিতারাণী চক্রবর্ত্তী

চির রাত্রির যাত্রী গো আমি চলেছি যাত্রাপথে
এই ধরণীর পান্থশালায় লভি ক্ষণ বিশ্রাম,
মোর জীবনের আদিম উষায় সেই কবে সুরু হ'তে,
সেই কবে হ'তে যাত্রা আমার, কভু ধীর উদ্দাম।
পথের বিরাম নাহিকো তবুও, যাত্রার শেষ নাহি,
জীবনের পথে কতখানি আজি হয়েছি অগ্রসর!
কত দিন গেল অস্ত ও-পারে, কত রাত এল চাহি,
অতীতের স্মৃতি বিস্মৃতি-কূলে লুটায়ে নিরন্তর।
কত কণ্টক ফুটিয়াছে পায়ে আর কত ফোটে নাই,
নিজেরে বাঁচাতে মরিয়াছি কত আর বাঁচিয়াছি মরে,
দুঃখ-সুখের ঝড়-ঝঞ্ঝায় পেতেছি কেবল ঠাঁই,
নিত্যকালের জমায়েছি পাড়ি নীরব মুখর স্বরে।
যাত্রী গো আমি চির রাত্রির, পথ তবু নাহি জানা,
মনে হয় তবু ছুটিয়া চলেছি সেই দিকে উন্মুখ,
জানি না কখন ফুরা'বে সেথায় আমার এ-দিনখানা,
শান্ত দিয়া সে যাত্রা আমার ল'বে রাত্রির বুক

মালয়ে সাড়ে তিন বছর

জাপানী রাজত্ব

শ্রীমতী রেখারাণী ঘোষ

৫

সকাল হবার আগেই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কুলী নারী ও পুরুষরা হাতে একটি করে ছোট আলো ও একটি গাছ-কাটা ছুরি নিয়ে এদিকে লাইন ধরে কাজ করে যাচ্ছে ও নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, মিনিটের মধ্যে একটি করে গাছ কেটে যাচ্ছে। গাছের গা কাটার সুন্দর কৌশল আছে। গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নালীর মত করে তার তলায় ছোট ছোট হাঁড়ী বেঁধে দিল, সেকেণ্ডের মধ্যে রবারের দুধ টুপ টুপ করে হাঁড়ীগুলিতে পড়তে লাগল। তাদের সেই দলের মধ্যে একটি বছর সতেরর মেয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল এবং হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল, কখন এসে মা তুমি? কোথা থেকে এসেছ, ভাল আছ ত? তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এত ভোরে উঠে কাজ করছিস্? এক-মুখ পানের পিচ্ ফেলে মাথাটা জোরে দুলিয়ে সে বলল, কি বল মা তুমি? এমন কি এত সকাল? বেলা হয়ে এল ত? আমরা সেই—চারটের সময় উঠি, রান্না করে খেয়ে পান মুখে দিয়ে কাজে আসি, দু'ঘণ্টায় তিন শ' গাছের গা কেটে হাঁড়ী বেঁধে দিয়ে যাই, তার পর গাছ কাটা শেষে গুণে সব শেষ হয়ে গেলে, আবার বাঁকে করে প্রতি গাছ থেকে দুধ-পূর্ণ বাটিগুলি টিনেতে ঢেলে ছোরে নিয়ে যাই, ওজন করা হয়, পরে প্লেটে ঢেলে ওষুদ দিয়ে জমিয়ে তখুনি মেসিনে ফেলে প্রেস্ দিয়ে রবারের সীট বার করা হয়, তখন কি সুন্দর দেখতে।

আশ্চর্য্য হলাম তার কাজের তালিকা শুনে। প্রায় তিন শত কুলী—নারী ও পুরুষ প্রতিদিন অন্ধকারে উঠে এই নিয়মে তারা কাজ করে। তাকে বললাম, তোর সাথে থেকে এক দিন আমি দেখব তোদের কাজ, কেমন সুন্দর রবারের দুধ থেকে প্রস্তুত হয় ঐ চাদর। সে বলল, মশার কামড় সইতে পারবে ত? বললাম, তা পারব! সে হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তার কাজে চলে গেল। দলের লোকরা তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

একটু একটু করে বেলাটা বেশ বাড়ল, আমি সেই ভাবেই বসেছিলাম বারান্দায়। একটু পরে বড়বাবু এলেন, সুপ্রভাত জানিয়ে বসতে দিলাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনরূপ কষ্ট হয়নি ত? মাথা নেড়ে বললাম, না, মোটেই না, এত লোক রয়েছি, কোন কষ্ট নেই, তবে যদি কিছু হয় আপনাকে জানাব।

মনে মনে ভাবলাম, রাতে কি ভয়ে চোখ বুজেছি? তিনি বললেন, নিশ্চয় যখন যা দরকার হবে কুলীদের দিয়ে বলে পাঠাবেন। আমি একটু পরেই সহরে যাব, আপনাদের খবর আপনার বাসাতে জানিয়ে দেব। মিষ্টার ঘোষ হয়ত ভাবছেন, কাজের দায়িত্বর জন্য তাঁরও আসার সুবিধা নাই, যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলুন জানিয়ে দেব। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম—বললাম, ধন্যবাদ, আপনি আমাকে এত স্নেহ করেন এর জন্য ভগবান আপনার ভাল করবেন। তিনি বললেন, আপনি ছেলেপুলে নিয়ে আমার বাড়ীতে আশ্রিতা, তাই আমার কর্ত্তব্য করছি মাত্র।

আমি বললাম, আপনি যদি টাউনে যান তবে ওঁকে বলবেন, যেন শীঘ্র একটা টেলিগ্রাম পাঠান তাঁর ছোট ভাই অনন্তকে। সে এখন সিঙ্গাপুরে কলেজে পড়ছে, যদি ছুটি পেয়ে চলে আসতে পারে। তিনি সম্মতি জানিয়ে সেদিনের মতন উঠলেন। আমিও উঠে সংসারের কাজে মনোনিবেশ করলাম। মনটা ভয়ে ভয়ে শিউরে উঠছে, দশটা প্রায় বাজল, প্লেন এবার হয়ত আসবে,—ঐ এল, ঐ আসছে! দূর থেকে লরী বা বাস চলার শব্দেও অনেক সময় প্লেনের শব্দ বলে ভ্রম হয়। আমার প্লেনের শব্দটা কিছুতেই সহ্য হয় না কেন তা জানি না। অনেক সময় ভাবি, কাছের শব্দ তবু ত শুনিনি, শুনলে হয়ত মারাই যাব। আমি অত্যন্ত ভীতু বলেই হয়ত ঈশ্বর একটু শিক্ষা দিয়ে পরীক্ষা করলেন বেলা দশটা থেকে সুরু করে বারটা পর্য্যন্ত ২।৩ বার প্লেন এল ও বম্বিং করে গেল। ছেলেদের কাছে করে চুপি চুপি রবারের গাছের তলায় গিয়ে বসে পড়েছি, হায় ঠাকুর কি হবে উপায়? ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি, কেঁপে কেঁদে অস্থির হয়ে যাচ্ছি, আজ একেবারে একা। এখানে ত কিছু নয় কিন্তু সহরে কি হ'ল?—আমার বড় ছেলে বুকু এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার প্রশ্ন তুলল, মা, আমাদের বাড়ী ও অফিসে কি বোম্ হল? বাড়ী চল। বললাম, চুপ কর কথা বোল না। সে-ও হতচকিত হয়ে গেল, বললে, তবে তুমি কাঁদছ কেন? বললাম, তোমাদের নিয়ে ভয়ে আছি তাই।

সর সর গুম্ গুম্ ভারি শব্দ যেন গাছের মাথায় ঠেকছে, এবার কি আমাদের পালা,—কেমন করে কি ভাবে প্লেনগুলি আবার চলে যাবে, বাড়ীর কি করে খবর পাব এই ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে প্লেনগুলি মাথার উপর দিয়ে সরে সরে চলে গেল। অনেকগুলি কাঠপিপড়ার কামড়ে অসহ্য হয়ে যখন গাছতলা থেকে বাসার দিকে আসছি তখন তাকিয়ে দেখি, অনেকেই গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু আমার মত কেউ অত ভয় পায়নি, সবাই হাসছে আমার দিকে চেয়ে। বিশ্রী মনে হল, এরা এখানেই থাকে তাই ভয় কম, আমার মত মনের অবস্থা ত ওদের নয়।

৬

বারান্দায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছি নিজের মধ্যে সাহস আনার চেষ্টা করছি, এমন সময় সমস্ত চিন্তা ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেল দূরে আমার ছোটদাকে দেখতে পেয়ে। তিনি অনেক দূরে এক টীন-মাইন্সে ভাল কাজ করেন, তাঁর আসার কথা ছিল। তা হলে ঠিক এসেছেন। হাসি মুখেই তিনি এগিয়ে আসছেন। দৌড়ে কাছে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, এখনই এলে দাদা?

দাদা বললেন, না রে, কাল সন্ধ্যায় এসেছি, তোরা বাসায় নেই এখানে আছিস্ শুনলাম, তাই চলে এলাম; একা আছিস্ তা ভয় পাসনি ত? টাউনে কোথাও ক্ষতি হয়নি, ষ্টেশনের দিকেই মনে হল বোম্ পড়েছে। তিনি বেশ সহজ ভাবে বললেন, কিন্তু আমার তা হজম হ'ল না, দেখা যাক খবর পাওয়া যাবেই—ষ্টেশন অতি নিকটেই, হয়ত ক্ষতি তত হয়নি। দাদার সঙ্গে ঘরে এলাম। আমিই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি যে আসতে পেরেছেন তার জন্য আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে কিন্তু আমাদের সহরের ও বাড়ীর আর ওঁর ভাবনাই বেশী তাও দাদাকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, অত চঞ্চল হোস্‌নে, জীবনে অনেক কিছুই আমাদের এখন দেখতে ও শুনতে হবে। কষ্টেরও অনেক আছে সবই সহ্য করতে হবে। আমি বললাম, জানি না, দাদা, আজ সকাল থেকেই যেন অদৃষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। দাদা বললেন, আমার ত কিছু মনে হল না, মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়ছে তবুও আমি বেশ এলাম, তবে মনে হল পাহাড়ের দিকেই বোম হ'ল। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি স্নান করতে গেলেন। আমিও উঠলাম। ভাবনায় মাথা ভরতি। সম্মুখে বড়বাবুকে দেখলাম তিনি বাড়ীর দিকেই আসছেন, তাঁর মুখের চিহ্ন দেখে মনে হল ভয়ের কিছুই নেই, এবং তিনি পৌঁছে তাই সংবাদই দিলেন—সহরে গিয়েছিলাম, তিনি ভালই আছেন, সে রকম ক্ষতি কিছু হয়নি। বম হয়েছিল তবে সহরের বাইরে, আমি সহরে এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। ভয় সকলেই পেয়েছিল, যাই হোক সে রকম কিছু ভয় নেই নিশ্চিন্ত থাকুন। তাঁর কথায় অনেকটা সাহস পেলাম, তবু উনি আমাকে খবর দিয়েছেন। আমার শত ধন্যবাদ জানালাম। তিনি উঠলেন, বললেন, আমি বলতে ভুলে গেছি, মিঃ ঘোষ বলেছিলেন, তাঁর ভাই হয়ত আজই সন্ধ্যায় এসে পড়বে, সে টেলিগ্রাম করেছে তা আপনি চিন্তিত হবেন না আজ সন্ধ্যার দিকে ট্রেণও আছে, এই বলে তিনি চলে গেলেন। দাদাকে বললাম বড়বাবু যা-যা বলে গেলেন। দাদা বললেন, তবে ত ভালই হল, এখন আমি তা হলে সহরে যাই হালচাল দেখে অনন্ত যদি আসে তাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরব'খন, ততক্ষণ একলা থাকতে পারবি কি? বললাম, হ্যাঁ—খুব—এক দিন ত একাই কাটালাম। বেলা ছয়টা নাগাদ দাদা বেরিয়ে গেলেন। আমি স্নান সেরে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে রবারের বাগানে বেড়াচ্ছি, একটি মালয় পিওন এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বলল, তোয়ান দিয়েছেন সহরে গিছলাম। চিঠিখানি নিলাম, সে নমস্কার দিয়ে চলে গেল। চিঠিখানি দেশ হতে আসছে আমার বাবার লেখা—তিনি বড়ই ভাবিত হয়েছেন এ দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, তিনি পেপারে সে খবর জেনেই এয়ার মেলে চিঠি পাঠিয়েছেন। হয়ত এই চিঠির পরে আর চিঠি পাওয়া যাবে না, যাই হোক তাড়াতাড়ি জবাব লিখে দিতে হবে ওনার অফিসে, চিঠিখানি আসায় তাড়াতাড়ি লোক মারফৎ পাঠিয়েছেন। বেড়ান বন্ধ করে ঘরে এলাম, চিঠির জবাব লিখতে বসলাম, সামান্য লেখার পর আর লেখা গেল না—যা চেঁচানর শব্দ! বাইরে এসে দেখি কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে অদ্ভুত সুরে চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে আমাদের বারান্দায় এসে জুটেছে। বললাম, তোরা কে, চাস্ কি? কি জন্য চেঁচাচ্ছিস্? এর নাম কি খেলা না কি? আমায় দেখেই তারা সব চুপ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে বড় ছেলে একটি বছর বার হবে বয়স, সে এগিয়ে এসে বলল, না মা আজ আমাদের নামতা ও পদ্য পড়ার দিন, তাই আমরা প্রতি হপ্তায় এখানে এসে পড়ি বলে আজও এসেছি, তা আপনি যদি বকেন তবে আমরা চলে যাই। বললাম, এবার থেকে গাছতলায় যেয়ে পড়বি; কেন না এখানে এখন সব লোকের বাস হয়েছে অত চেঁচাস নে। তারা মাথা নেড়ে সবাই দল বেঁধে চলে গেল। ভয়ানক আশ্চর্য্য হলাম, তাদের পড়া মুখস্থ করা মন্দ নয়, যা হোক লেখাপড়া!

সাড়ে আটটা সময় নাগাদ দাদা ও অনন্ত বাড়ী এল। এতক্ষণ একলাটি ভয় করছিল এখন অনন্তকে পেয়ে গল্প আরম্ভ হ'ল। কেমন অবস্থা সিঙ্গাপুরের, কি অবস্থা লোকেদের? সে বলল, আট তারিখ থেকে সমানে প্রতিদিন অনেক বার করেই বম্ হচ্ছে, তাই আমরা ছুটি নিয়ে জহোরবারু হয়ে অতি কষ্টে ট্রেণ ধরে আসতে

পেরেছি ; জিনিষ-পত্র সবই ছেড়ে এসেছি কিছুই আনার উপায় নেই, গাড়ী পাওয়া যায় না, সবই মিলিটারীর ব্যবহার হচ্ছে।

৭

১০ই জানুয়ারী সকাল বেলা দাদা ও অনন্ত সহরের দিকে বেড়াতে গেছে কিছুক্ষণ হবে মাত্র, আবার প্লেনের শব্দ শোনা গেল, আবার বোম হবে হয়ত। এরা সবে গেছে এরি ভিতর প্লেন আসছে! কি হবে—ভয়ানক ভয় হ'ল।

ক্রমশঃ শব্দ অতি নিকটে এল, ছেলেদের নিয়ে আবার সেই রবারের গাছের ঝুপির মধ্যে গিয়ে বসেছি। মেসিন গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে, পট্-পট্ করে গুলী চলছে যেন গাছের পাতায় ছোঁওয়া দিয়ে যাচ্ছে। উঁকি মেরে তবুও ঝুপির মধ্যে দিয়ে দেখলাম, যতটা গুণলাম চল্লিশখানা হবে। সারা সহরে আবার বোম্ হবে, কত প্রাণী আজ মারা যাবে। ভয়ে শিউরে উঠছি, হাত-পা যাওয়া! কালও ভয়ে কেঁপে কেঁপে অস্থির হয়েছি, আজ কাঁপছি। উঠে আজ ঘরে যাবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই, যতক্ষণ না কেউ ফিরে আসে খবর নিয়ে ততক্ষণ এই ভাবেই বসে কাটাব, বরাতে যা হবে হ'ক। রান্না-খাওয়ার আয়োজন করতে হবে, লোক আছে এতগুলি সবই ভুলে গেলাম। এক ঘণ্টা ধরে শব্দ শুনা গেল কখনও কাছে কখনও দূরে। ক্রমশঃ তা মিলিয়ে গেল, এবং ষ্টেটের মধ্যে লোকজন চলা ফেরা সুরু করল, দু'-চার জন জিজ্ঞাসা করল কেন আর বসে আছ উঠে ঘরে যেতে পার। বললাম, এই ভাল, আজকে ঘরে যাওয়া হবে না। ছেলেরা ক্ষুধায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ব'কে তাদের চুপ করিয়ে রেখেছি। ভগবান হয় ত দয়া করেছিলেন অনন্ত সাইকেল করে তাড়াতাড়ি আসছে দেখলাম, আমাকে খুঁজে বার করে সেও হতাশ হয়ে পড়েছে। আমার এতটা শোচনীয় অবস্থা হয়ত সে আশা করেনি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, বৌদি কি ভয় পেয়েছেন? আপনাকে দেখবার জন্যই সত্যেনদা পাঠালেন, প্লেন আসায় আমরা যা হ'ক রাস্তার ধারে একটা নর্দ্দমায় বসেছিলাম, এক ঘণ্টার পর বেরিয়ে তবে আমরা নিশ্বাস নিতে পেরেছি। আপনি খুব ভয় পেয়েছেন, না? তারই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এলাম, সত্যেনদা পায়ে হেঁটে সহরে গেছেন, আমাদের বাসায় যাবেন, দাদা কেমন আছেন দেখে আসবেন, আমি আপনার জন্যই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এবার আমি তাকে বকলাম, খুব অন্যায় করেছ দাদাকে পায়ে হেঁটে একা পাঠিয়ে। পৌঁছতে ত দু'ঘণ্টা লাগবে, তিনি ত সাইকেলে যেতে পারতেন, যাও, এক্ষুনি তোমার দাদার খবর নিয়ে তবে ফিরবে না হলে কি হবে ভাবতে পারছি না; অফিসে যদি বোম হয় তবে! সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আচ্ছা আপনি ঘরে যান আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, আপনি স্থির হোন, তাড়াতাড়ি খবর নিয়ে ফিরব। সে চলে গেলে আমি বারান্দায় এসে বসলাম, আকাশ-পাতাল ভাবনা, তার আর শেষ নাই।

ছেলেদের খেতে দিতে হবে, ঘরে গেলাম। আজ এখনও রান্না হয়নি, বিস্কুট ও দুধ দিয়ে বললাম, এখন এই খাও, কাকা মামা সব এলে তবে রাঁধব, তখন খেও। এখন আমার কিছু ভাল লাগছে না। মায়ের আজ কি হয়েছে মা এত ভয় পেয়েছে কি জন্য সেই জন্য তারাও ভাবছে। শিশুর মন অতি কোমল অল্পেই আঘাত লাগে, কি আর ওদের বোঝাব, কাছে নিয়ে চুপ-চাপ বসলাম। মানুষের জীবন গেলে কেউ ত তা ফেরত দিতে পারে না। পয়সার জন্য আজ এত দূরে আসা। চাকরি গেলেও নিজের স্বাধীনতার অভাব ত হবে না। পেছন হতে কে ডাকল "মামী"—চেয়ে দেখি আমাদের বাসার পাশেই ষ্টেশন-মাষ্টার থাকেন তাঁর বড় মেয়ে রাণী। বললাম, বস। সে বলল, মামী চলুন বড়বাবুর অফিসে, আপনি আপনার স্বামীকে ফোন্ করবেন। সহরের খবর আমরা জানতে চাই—আমাদের বাবা আজ এখনও ফেরেননি, ট্রেণ আসা পর্য্যন্ত ওখানেই থাকবেন, তাই মা খুব ভাবছেন। বললাম, আমার লোক সহরে গিয়েছে এক্ষুনি ফিরে আসবে, তাদের কাছেই সকল খবর পাওয়া যাবে, তা ছাড়া সহরে এখন কি অবস্থা কিছুই জানি না, ফোন করে কোন লাভ নেই। আর ষ্টেশনের পথ দিয়েই ত যাবে আসবে, ততক্ষণ অপেক্ষা কর, তারা ফিরলে তোমার মাকে জানাব। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে ষ্টেশন-মাষ্টারের স্ত্রীও আমার মত চঞ্চল হয়েছেন, সবার অবস্থাই সমান! কয়েক ঘণ্টার পর আমাদের চাকরটি মাথার উপর একটি ব্যাগ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। কি হল কি? তাকে ডেকে বললাম, কাঁদছ কেন? কি হয়েছে খবর ভাল ত? সে তখন স্থির হয়ে বলল, মা, তুমি ত বেশ চলে এসেছ, আজ দু'দিন যে বম্ হচ্ছে খবর কি জানো? কাল রাত্রে বললাম, বাবু, চলুন আমরা হেঁটে যাই, তা বাবু বললেন, না আমার যাওয়া হবে না তুই যা। সাহেবরা আমাদের বাড়ীতেই আছে, অফিসে কাজও অনেক। আজ বোম্ হতেই সবাই যে কোথায় পালিয়েছে কিছুই জানি না—আমি বাবু বাবু করে এক ঘণ্টা চেঁচিয়েছি, কত খুঁজেছি তবুও দেখতে পেলাম না। সহর সব খালি, ভয়ে জঙ্গলে দৌড়লাম কত চেঁচিয়ে ডাকলাম, অন্য লোকরা বলল, তিনি অন্য দিকে সাহেবদের সঙ্গে গেছেন। কি কোরব বাড়ীতে এসে বসে বসে কাঁদছিলাম। তার পর ছোট দাদাবাবু বাড়ীতে এসে বলল, শীঘ্র ষ্টেটে যাও, মা একা আছেন দেখ গে। বাবুকে আমি খুঁজছি। জানি না তাঁরা সারা সহর হয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তখনও সে কাঁপছে, বয়স হয়েছে বুড়ো মানুষ বলে খুব কষ্ট পেয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দাদাকে দেখেছিস্? সে বলল, তাও দেখেছে, তার কাছে বাবুর খবর না পেয়ে তিনিও খোঁজে গেছেন। সব শুনেও চুপ-চাপ করে রইলাম, কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হল না। আজ তিন দিন ধরে চিন্তা ভয় ও ভাবনা চলছে, ঈশ্বর যা করেন তাই হবে।

আরো কতক্ষণ অপেক্ষার পর দাদা ও অনন্ত ফিরে এল, কিন্তু ওনার দেখা কোথাও নাই, তারা দুঘণ্টা ধরে সমস্ত সহর জঙ্গল খুঁজেছে তবুও দেখা পাওয়া গেল না; ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত সহর খালি, দোকান বাজার সব খোলা, বাড়ী ঘর ছেড়ে লোকেরা যে কে কোথায় গেছে কোন্ দিকে গেছে দেখাই যায় না। রবারের ষ্টেটের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে লোকে জীবনরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছে। যারা সহরের কাছে রবার বাগানে গেছে তাদের আর আস্ত কেউ নাই—কারো মাথা উড়ে গেছে, কারো আধখানা দেহ ছটফট করছে, কারো পেটের ভিতরের সমস্ত বেরিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে চীনার সংখ্যাই বেশী। রেডক্রশ, এ্যাম্বুলান্স, এসে টেনে টেনে আহতদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে। একটা চীনা ছোকরা তার দোকান ছেড়ে বাড়ীতে এসে দেখে তার মা চিৎকার করছে। বাপ তার ঐ ষ্টেটে পড়ে আছে। মাথাটি কোথায় উড়ে গেছে পাওয়া যাচ্ছে না। অনন্তকে ছোকরাটি বলল,

অনুগ্রহ করে মাথাটি গুঁজে দিতে,—কিন্তু তাদের তখন অবস্থা কি! জীবনে যারা এই বীভৎস-লীলা প্রথম দেখছে তাদের নিজের দেহে প্রাণ ঠিক আছে কি না সে বিশ্বাসও হারিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তারা ফিরে এসে আমাকে এই খবর দিল, ভগবান আছেন তিনিই রক্ষা করবেন, উনি হয়ত নদীর ধারে কোথাও যেয়ে থাকবেন, তাই খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু প্লেন ত অনেকক্ষণ চলে গেছে, দেখা যাক আরো খবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ক্ষুধার্ত্তদের এখন খাওয়ার জোগাড় দেখা যাক্। দাদার মুখ অসম্ভব গম্ভীর, ভাবনা-চিন্তায় তিনিও মুসড়ে গেছেন। যে ব্যাপার আজ দেখে এসেছেন, এর আগে কখনও তা দেখেননি। আরো কত যে শত শত ঐরূপে দেখতে পাওয়া যাবে তা বলাই যায় না, হয়ত অনেক চেনা লোকও আছে তাদের মধ্যে।

[ক্রমশঃ।

হে সূর্য্যরথী

আশা দেবী

মহাকাল রথঘর্ঘর ধ্বনি বাতাসে উঠেছে বাজি,
গণজনতার বুকের রক্তে সরণি রয়েছে সাজি।
হে সূর্য্যরথী তুমি এসো নামি রাঙা আল্পনা পরে,
তোমার আমার আগমনী গান মন্দ্রিছে ঘরে ঘরে॥

এসো গো হে তুমি দীপ্ত দীপ্তি অন্ধ জড়তা নাশি,
অমৃত কিরণে মৃত্যু-মলিন তমিস্রা উদ্ভাসি,
নিয়ে এসো সাথে নূতন মন্ত্র চির নবীনের গান,
করোটী বক্ষে জাগুক আবার নবীন আশার বান।

জ্যোতি-হারা মহাব্যোম শূন্যেতে তুমি
জেলে দাও শিখা
ধরিত্রী-বুকে এঁকে দাও নিতি সোনার পত্রলিখা।
রথচক্রের ঘূর্ণনে তব ঘোরে জরা-যৌবন,
তব ভ্রূকুটিতে অনাহত-কাল করিছে চংক্রমণ।

শিশু অতীতের মধুর কণ্ঠে শুনেছিলে সাম গান,
যুগ-সমুদ্র-মন্থনে আজ সে প্রভাতী অবসান।
তব অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনি, শুব্ধ কাকলী রব,
জরার্ত্ত ধরা কেঁপে ওঠে ত্রাসে শ্মশানে কাঁপিছে শব।

হে সূর্য্যরথী তুমি কি দেখেছ অস্থিচূর্ণ ধূলি?
ঘূর্ণি হাওয়ার হাহাকার ওড়ে দিগন্ত সমাকুলি,
তপ্ত অশ্রু করিছে পূর্ণ শূন্য নদীর জল,
তুমি কি শুনেছ জীব-দানবের উন্মাদ কোলাহল।

লক্ষ বুকের লাক্ষা রঙিল কঙ্কাল স্তূপ পরে,
সূর্য্যমুখীরা নয়ন মেলিছে নব-প্রভাতের তরে।
যুগবিপ্লবী অভিজিৎ জাগে ভাঙি বাধা-বন্ধন,
সূর্য্য-সারথি তুমি এসো নামি গাহি তব আবাহন।

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান

শ্রীনিরুপমা পাল

ভারতীয় নারীর সম্বন্ধে অনেকে অনেক সময় এমন সব কথা বলে গেছেন যাতে আমাদের লজ্জা অনুভব করতে হয়। যেমন কারো কারো মতে ভারতে নারীর স্থান অতি নীচে,—মেয়েরা আমাদের দেশে চিরকাল না কি পুরুষদের কাছে অত্যাচার ও অবিচার পেয়ে এসেছে—এক কথায় ভারতীয় মেয়েরা যেন পুরুষদের দাসী। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এই সমস্ত মতবাদ ভারতীয় নারী সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছুই নয়।

যারা এইরূপ মিথ্যা প্রচারের জন্য দায়ী তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ইউরোপীয়। সাধারণতঃ ও-দেশের লোকের ধারণা, আমাদের চেয়ে ওরা মেয়েদের স্থান দিয়েছে সমাজে অনেক উঁচুতে, ও-দেশের মেয়েরা মানুষ হিসাবে যেটুকু সুখ, সুবিধা ও সম্মান পায়, আমাদের দেশের মেয়েরা না কি সেটুকু সুখ, সুবিধা ও সম্মান কোন দিন পায়নি এবং এখনো পায় না। যদি জিজ্ঞেস করা যায় এর কারণ কি? তবে তার উত্তরে তাঁরা বলে থাকেন, দুই সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম ও কৃষ্টিগত যে তফাৎ আছে, তারি ফলে দুই সমাজে নারীর মূল্যও তফাৎ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যি কি পাশ্চাত্যে মেয়েদের স্থান উচ্চে এবং ভারতে মেয়েদের স্থান অনেক নীচে? বর্ত্তমান সমাজের মূলে আছে খৃষ্টধর্ম্ম, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা। যাঁরা ইতিহাস পড়েছেন, তাঁরা জানেন প্রাচীন গ্রীসের গৌরবময় যুগেও সমাজে নারীরা বেশী সম্মান পেত না। যে কোন ঐতিহাসিকের লেখা বই পড়লে অতি সহজেই আমরা গ্রীক সমাজে নারীর স্থান কি ছিল তা জানতে পারি। ডিকিন্সনের মতে গ্রীক দেশের মেয়েদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুরুষের কাম চরিতার্থ করা এবং সন্তানের জন্ম দেওয়া। লেকী বলেছেন, প্রাচীন গ্রীসে বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সমাজের জন্য নতুন নতুন নাগরিকের জন্ম দেওয়া; এমন কি, স্পার্টাতে এমন নিয়ম ছিল যে দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ স্বামীদিগকে তাদের যুবতী স্ত্রীদের সন্তান উৎপাদনের জন্য সুস্থ, সবল লোকেদের কাছে পাঠিয়ে দিতে হোত। গ্রীস কিংবা রোমে যে সমস্ত মেয়েরা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার সুযোগ পেত, তাদের কখনো সম্মানের চোখে দেখা হোত না, সাধারণের চোখে তারা সমাজের গণিকা বলেই পরিগণিত হোত।

খৃষ্টানরা মেয়েদের যে দৃষ্টিতে দেখেছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে আছে, ভগবান না কি নারীকে বলেছিলেন, দুঃখ-যন্ত্রণা ভুগে সন্তানের জন্ম দেওয়াই নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য এবং স্বামী ছাড়া নারীর অন্য কোন গতি নেই। বাইবেলে আছে, মেয়েরা পুরুষদের কখনো কিছু শিক্ষা দেবার স্পর্দ্ধা রাখবে না, কিংবা তাদের উপর কখনো কোন কর্ত্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টা করবে না। সেণ্ট পল্ বিবাহিতা স্ত্রীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন —তোমরা তোমাদের স্বামীদের ভগবান-জ্ঞানে পূজা কর। খৃষ্টান চার্চ্চের প্রাথমিক যুগে মেয়েরা কখনো ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কাজ কর্ম্মে সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে পারত না। প্রাচীন খৃষ্টীয় আইনে মেয়েদের এক রকম মানুষ বলেই গণ্য করা হোত না, কেন না তারাই না কি ছিল পুরুষের পতনের প্রথম কারণ। বস্তুতঃ অনেক পাদ্রীর

সেখানে দেখতে পাই, মেয়েদের বলা হয়েছে তারা নরকের দ্বারস্বরূপ—বিশ্বের পুঞ্জীভূত পাপের মূলে না কি মেয়েরাই। এমন কি মার্টিন লুথার—যিনি ছিলেন খৃষ্টান চার্চ্চের এক জন প্রসিদ্ধ সংস্কারক, তাঁরও মতে মেয়েরা না কি সন্তানোৎপাদন যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েদের মোটেই সম্মানের চোখে দেখা হোত না। ফরাসী ঐতিহাসিক টেইন বলেছেন, নর্ম্মান বিজয়ের সময়ে মেয়েদের ইংলণ্ড থেকে ক্রয় করে নিয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডে বিক্রয় করা হোত। যারা এই ক্রয়-বিক্রয় করত তারা এই সমস্ত মেয়েদের বিক্রয় করার আগে বেশী মূল্য পাবার জন্য তাদের গর্ভবতী করে নিত। এই ত সেদিন ব্ল্যাকস্টোনের সময়েও ইংলণ্ডে নারীদের বলতে গেলে কোন রকম অধিকারই দেওয়া হয়নি। সেকালে মেয়েরা যদি কোন প্রকারে পুরুষদের দ্বারা অত্যাচারিত হোত, মেয়েরা তার বিচার প্রার্থনা কোন রাষ্ট্রীয় কোর্টে করতে পারত না, সে বিচার হোত চার্চ্চের কোর্টে।

বাস্তবিক, আধুনিক কারখানা-শিল্প প্রবর্ত্তনের আগে পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েদের এক রকম দাসী করেই রাখা হয়েছিল। কুটীর-শিল্প ধ্বংস করে যেদিন কারখানা-শিল্পের প্রচার আরম্ভ হোলো সেদিন থেকে ও-দেশে মেয়েরা অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছে বটে। কিন্তু এই প্রকার নারী-প্রগতির মূলে কোন সুচিন্তিত দর্শন নেই, আছে নিছক আকস্মিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। যখন কারখানা-শিল্পের প্রচলন হোল তখন দেখা গেল, কারখানায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের সহযোগিতা পেলে আর্থিক লাভের অংশ আরো বেড়ে যাবে। কারখানাতে এমন অনেক কাজ আছে যেখানে বিশেষ করে ধৈর্য্যের এবং সূক্ষ্ম কর্ম্ম-কুশলতার প্রয়োজন, এবং বেশীর ভাগ সময়েই মেয়েদের মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়। কাজেই সহজেই এই সমস্ত কাজগুলির জন্য মেয়েদের নেওয়া হোল। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েরা এমনি ভাবে কতকটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেল। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্বাধীনতার মূল্য যে কি, পাশ্চাত্যে মেয়েরা এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই কতকটা অনুভব করে নিল। কাজেই পাশ্চাত্যের নারীরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে নূতন নূতন দাবী নিয়ে সমাজে আন্দোলন আরম্ভ করে দিল। অনেক ক্ষেত্রে এই আন্দোলন অনেকটা সফল হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যাদের আছে তারা যে সহজেই তাদের প্রয়োজনমত দাবী-গুলো আদায় করে নিতে পারবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নারী-প্রগতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত নারী-প্রগতির মূল দৃষ্টি-ভঙ্গী অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্যে মেয়েরা আজ নানা ক্ষেত্রে স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জনের সুবিধা পেয়েছে, এবং তারই ফলে তারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে রাষ্ট্রে ভোট দেওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রীয় আইন সভার সভ্য হওয়ার অধিকার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়ার এবং শিক্ষা দেওয়ার অধিকার, সংবাদপত্রে কাজ করার অধিকার, বিচারালয়ে ব্যবহারাজীব হওয়ার অধিকার এবং আরো কত কি অধিকার।

অথচ নারী-প্রগতি তখনি সত্যিকারের নারী-প্রগতি হয়ে উঠবে যখন শুধু তার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দিকই থাকবে না, একটা নৈতিক দিকও থাকবে। আজ পাশ্চাত্যের নারীরা চায় তাদের পূর্ণ অধিকার লাভ করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে অধিকার লাভ করতে হলে তাদের যে কর্ত্তব্য পালন করা উচিত, তারা অনেকেই যেন সে কথা ভুলতে বসেছে। পাশ্চাত্য নারী চায় আজ সর্ব্ব-বিষয়ে পুরুষের সমান হতে, অথচ নারী যে সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান নয়, কোন ক্ষেত্রে তারা বড় এবং কোন ক্ষেত্রে তারা ছোট, এই মহা সত্য তাঁরা ভুলে যাচ্ছে। আধুনিক পাশ্চাত্য নারী প্রাচীন কালের পাশ্চাত্য নারীর অপেক্ষা অনেক উন্নত, কিন্তু তাঁরাই কি উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে?

আমাদের বিবেচনায় ভারতে নারী-প্রগতি এক দিন যত দূর যত সুন্দর ভাবে অগ্রসর হয়েছিল, পৃথিবীর আর কোন দেশের নারীর দ্বারা কখনই তা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন বৈদিক যুগে ধর্ম্ম-বিষয়ে নারীর পুরুষের সমান অধিকার ছিল। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ শুধু পুরুষেরাই রচনা করেননি, মেয়েরাও তার কোন কোন অংশ রচনা করেছে। মেয়েদের মধ্যে যারা বেদ রচনায় সাহায্য করেছে তখনকার দিনে তাদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হোত। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনায় এবং লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াতে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে সে যুগে একটা নৈতিক আদর্শ ছিল যা আজিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা কদাচিৎ কোথাও দেখতে পাই। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেছিলেন, —স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, এই উভয় ভালবাসারই মূলে আছে প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার উন্নত-তর বিকাশ। বৈদিক যুগে অনেক সময় আমরা মেয়েদের যোদ্ধৃবেশেও দেখতে পাই—ঋগ্বেদে মেয়েদের অনেক বীরত্বকাহিনীর বর্ণনা আছে। পৌরাণিক যুগেও মেয়েদের স্থান আমাদের সমাজে খুব উচ্চে ছিল। সে-কালে নারী চরিত্র যে কত দূর উন্নতিলাভ করেছিল তা সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী প্রভৃতি কয়েকটি নারীচরিত্রের উল্লেখ করলেই আমরা সহজে আন্দাজ করে নিতে পারব। এই সমস্ত নারী চরিত্র সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের আদর্শ হয়ে থাকবে। হিন্দুদের মধ্যে প্রথম দেব-দেবীর কল্পনা কবে করা হয়েছিল, সঠিক বলা কঠিন; কিন্তু যখন দেখতে পাই, আমাদের দেবতাদের মধ্যে অনেককেই স্ত্রীলোক কল্পনা করা হয়েছে, যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে সামাজিক ক্ষেত্রেও ঐরূপ কল্পনার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

ভারতীয় ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি লোককেই নারী-প্রগতির পথে বিশেষ করে বাধা দিতে দেখতে পাই; তিনি মনু। হিন্দু সমাজের অনেক নিয়ম-কানুন রচনা করার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। কি জন্য যে তিনি মেয়েদের স্বাধীনতার পথে এত সব বাধা এনে দিয়েছিলেন তা বলা কঠিন। হয়ত বা তিনি ভেবেছিলেন নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করেই তিনি সমাজের দুর্নীতি দমন করতে পারবেন। মনুই প্রথম মেয়েদের বেদপাঠ বারণ করলেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন, ধর্ম্ম-কর্ম্মে মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু মনুর বিরুদ্ধে আমরা যাই বলি না কেন, একথা আমাদের মানতেই হবে যে, এই 'স্ত্রীএকসানারী' মনু পর্য্যন্তও নারীর জন্য দরদ দিয়ে অনেক কথা বলে

গিয়েছেন। তাঁর মতে, নারীরা যেখানে সম্মানিতা দেবতারাও সেখানে সুখী; আর যেখানে নারীর প্রতি সম্মান দেখান হয় না, সেখানে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্ফল হয়। মনু বলেন, যে পরিবারে মেয়েরা কষ্ট পায় সে পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য্য; আর যে পরিবারের মেয়েরা সুখী, সে পরিবার সর্ব্বদাই উন্নতি লাভ করে। স্ত্রী যদি শত দোষেও দোষী হন, তবুও মনুর মতে, স্বামী তাকে বিন্দুমাত্র আঘাত দেবে না। মনু এমন কথাও বলেছিলেন যে, পিতার চেয়ে মাতাকেই বেশী সম্মান করা উচিত।

যাই হোক, নারীর স্বাধীনতার পথে মনু যে সমস্ত বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সেই সমস্ত কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিল। বৈদিক যুগের ন্যায় বৌদ্ধযুগেও মেয়েরা সর্ব্ব-বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার আবার ফিরে পেয়েছিলেন। পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে এই সময়ে খনা, লীলাবতী প্রভৃতি নারীরা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতী সেই তর্কে বিচারের জন্ম নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন।

মুসলমান আক্রমণের সময়েও আমরা দেখতে পাই, আমাদের দেশের নারী কি বিপুল বিক্রমেই না পুরুষদের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন! অনেক সময় মুসলমানদের বিপুল সৈন্য-সামন্তের তুলনায় আমাদের বীরগণের অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যবল ছিল। কিন্তু তখনো আমাদের দেশের নারী পুরুষকে মরণ-পণ করে স্বাধীনতার জন্ম লড়তে উৎসাহিত করেছিল। অসামান্য সাহস-সম্পন্না চাঁদবিবিকে আমরা দেশের যোয়ান-অব-আর্ক বলে অভিহিত করতে পারি। তিনি পরম পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে আহম্মদ নগরের দুর্গরক্ষার্থে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক সময় হাজার হাজার স্ত্রীলোক সাহসী বীরের ন্যায় যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছেন। যাঁরা কোন কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারেননি, তাঁরা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ না করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। আত্মসম্মানরক্ষার্থে যে দেশের মেয়েরা এত সাহস, এত আত্মত্যাগ দেখিয়েছিলেন, সে দেশের সমাজে মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখা হোত না, এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

মুসলমান-বিজয়ের পর ভারতে একে একে অনেক পরিবর্ত্তন আসতে লাগল। মুসলমানরা তখন দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা—তাদের মধ্যে আবার অনেকে ছিল দুশ্চরিত্র এবং নারীর সম্মান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। হিন্দুরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে একেবারে যেন নিঃসহায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নারীর সম্মান এবং সামাজিক বিশুদ্ধতা-রক্ষার্থে কিছু না করলে চলে কি করে? গুণ্ডাদের লোলুপদৃষ্টি থেকে মেয়েদের বাঁচবার জন্ম পর্দ্দা-প্রথার আশ্রয় নেওয়া হল। ঠিক একই কারণে মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতাও হারাল।

কিন্তু এই পর্দ্দা-প্রথার প্রবর্ত্তনের ফলে যদি কেউ মনে করেন যে, সেদিন থেকে ভারতীয় সমাজে মেয়েদের স্থান হ'ল নীচুতে, তবে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন। সেদিন মেয়েদের স্বাধীন গতি কতকটা খর্ব্ব হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রতি সাধারণের যে সম্মান-সূচক দৃষ্টি ছিল, তার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। তাছাড়া, মুসলমানদের এই পর্দ্দা-প্রথা ভারতের সর্ব্বত্র সমান ভাবে কোন দিন গৃহীত হয়নি; কেবল যে যে স্থানে মুসলমান-প্রভাব ছিল খুব বেশী সেই সেই স্থানেই এই প্রথার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

মুসলমানদের পর বৃটিশরা এসে আমাদের সমাজে আবার নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে এবার হিন্দুরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। এই বৃটিশ-বিজয়ের বিরুদ্ধে কোন কোন সময় ভারতীয় নারী যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ঝান্সীর রাণীর বীরত্বকাহিনীর কথা কে না জানে? কথিত আছে, লর্ড বেণ্টিক যখন পাঞ্জাবে রঞ্জিৎসিংহের কাছে যান তখন তিনি ৭০ জন নারী-সৈন্যকে হলদে রঙের সিল্ক পরে কুচকাওয়াজ করতে দেখেছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় ধর্ম্ম কিংবা সংস্কৃতিতে মেয়েদের স্থান খুব উঁচুতে ছিল, মেয়েরাও তাদের নিজেদের দানে আমাদের সমাজকে গৌরবময় করে রেখেছেন। এই সমস্ত গৌরবময় কাহিনী স্মরণ করে আজকের মেয়েরা সমাজে তাদের উপযুক্ত স্থান বেছে নিতে পারবে। আমাদের দেশের মেয়েরা আজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলার চেষ্টা করছে। পুরুষদের কাছে সর্ব্ববিষয়ে তারা ছোট, এই মনোভাব আজ তাদের ভিতরে নেই। ১৯১৯ সালের রিফর্ম্ম আইনে প্রথমটায় নির্ব্বাচন ব্যাপারে মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাই বলতে লাগলেন, নারীকে রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার না দিলে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়। বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষের এই তারতম্য ভারতীয় রীতি-বিরুদ্ধ। মেয়েদের এই রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচন-ক্ষমতা দাবী করে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে প্রতিনিধি পাঠানো হল। পার্লামেণ্ট ভারতীয় মন পরীক্ষা করার জন্ম নির্ব্বাচনী আইনের সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করে বললে, যদি কোন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভা পৃথক ভাবে মত প্রকাশ করে মেয়েদের নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে চায়, কেবল মাত্র তাহলেই সেই প্রদেশে মেয়েরা নির্ব্বাচন-ক্ষমতা লাভ করবে। এর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বৃটিশ-ভারতের সর্ব্বত্র মেয়েরা নির্ব্বাচন-ক্ষমতা পেল।

প্রায় দুই শত বৎসর বৃটিশ-রাজত্বের পরও আমাদের দেশে শতকরা মাত্র দশ-বারো জন লোক লিখতে পড়তে জানে। শিক্ষিতের সংখ্যাই যেখানে অল্প, মেয়েদের পক্ষ থেকে সেখানে বেশী কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে অল্প কয়জন মেয়েরা আমাদের দেশে শিক্ষিতা হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, ডাক্তার, ব্যবহারাজীব ইত্যাদি হিসাবে কাজ করছেন। এমন কি, কেউ কেউ যথেষ্ট সুনামও অর্জ্জন করছেন। সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রিত্ব করেছেন, এবং বর্ত্তমানে আমেরিকায় গিয়ে ভারতের পক্ষে মতবাদ তৈরী করতে গিয়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। হাজার হাজার নারী আজ স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে নানা রকম নির্য্যাতন সহ্য করছেন। ভারতীয় নারী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর নেতৃত্বে 'রাণী-অব্-ঝান্সী' রেজিমেণ্টের কথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। আজ আমাদের দেশের মেয়েরা আইন সভায়, কর্পোরেশনে, মিউনিসিপালিটিতে, ডিষ্ট্রীক বোর্ডে, শিক্ষা বোর্ডে, ইউনিভার্সিটিতে, ব্যাঙ্কে সর্ব্বত্র

পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে কাজ করছেন। লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় নারী রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। আজ আমাদের দেশের মেয়েরা বিদেশে গিয়ে শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ সম্মান নিয়ে দেশে ফিরে আসছেন।

অবশ্য, আজও আমাদের দেশে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা মেয়েদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতে জানে না। তবে তার কারণ, শিক্ষার একান্ত অভাব। শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয়নি বলে আমাদের দেশের লোকেরা সমাজে নারীর সম্মানসূচক স্থান সম্বন্ধে ততটা সজ্ঞান হয়ে ওঠেনি। কিন্তু স্পষ্ট ভাবে কথায় ও কাজে মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখায় না এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে আজো খুব বেশী নয় এবং তাদের প্রতিবেশীরা সর্ব্বত্র তাদের ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। এদের মধ্যেও কিন্তু এমন কেউ নেই যারা নিজেকে তাদের মা'র চেয়ে বড় মনে করে। আমাদের সমাজে মায়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে। সাধারণ হিন্দু নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতীয় নারী পাশ্চাত্য নারীর মত শুধু পুরুষের সমান হতে চায় না। তারা জানে, সর্ব্ব বিষয়ে নারী পুরুষের সমান নয়, কোথাও নারীর কৃতিত্ব বেশী কোথাও বা পুরুষের বেশী। তাদের এতটুকু আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে যার ফলে তারা শুধু নিছক অধিকারের জন্য ব্যস্ত না হয়ে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করার জন্যই ব্যগ্র হয়। জীবনে নৈতিক উন্নতির জন্য অধিকারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সত্যিকারের অধিকার লাভ করতে হলে যে কর্ত্তব্য করতে হয়, তা ভারতীয় নারী জানে, যা ইউরোপীয় নারী সমাজ অনেক সময় জানে না। কাজেই নারী-প্রগতির কাজে আমাদিগকে আমাদের দেশের নারীর আদর্শের কথা ভুললে চলবে না। ইউরোপে নারী চায় শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার, কিন্তু ভারতীয় নারীর আদর্শ শুধু অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক নয়। নৈতিক কর্ত্তব্যজ্ঞান তাদের কাছে সবচেয়ে বড়।

কাছে চাই

শ্রীমতী রুচিরা বসু

দূরে চ'লে যেতে, কেন চাও বারে বারে ?
ছলনা কি প্রেম, বুঝিতে পারি না মনে
বুকে টেনে রাখি বৃথা নয়নের ধারে
যেতে দিতে প্রাণ নাহি চায় কোনক্ষণে।
ওগো অকরুণ, এ কী অভিনয় তব ?
চলে নিশিদিন, এ কী লুকোচুরি খেলা !
ভালোবাসো যদি, কেন কাছে নাহি রব ?
কেন বহে যাবে মধু মিলনের বেলা !

ভালো নাহি লাগে যদি বলো কোন দিন
শুধু করুণায় মোর কাছে আসো ফিরে,
সে আঘাত হোক্ যত বড় সুকঠিন
তুমি চ'লে যেয়ো আমি রহিব না ঘিরে !
ওগো প্রিয়তম, ঘন আষাঢ়ের মেঘে,
ঝর ঝর ধারা ঝরে যদি দিনমান,
একেলার ঘরে আমি রবো শুধু জেগে
বুকে নিয়ে মোর গত বরষার গান।

যদি ভালো লাগে পুরাতন প্রেম টানে
পুরাতন তুমি, পুরাতন সেই আমি
এই ধরণীর নূতনের মাঝখানে
মোরা দুই জনে চিরদিনকার স্বামী !
এত শ্যামলতা, এত সবুজের ঘোর
নবীনের বেশ এত যদি রমণীয়,
শুধু কাছে চাই বাঁধি দু'টি বাহুডোর
ব্যবধান যাক্ ওগো মনোহর প্রিয় !

শিক্ষা ও মাতৃভাষার সেবা

শ্রীসুবোধ রায়

যুদ্ধোত্তর নানা পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা-পদ্ধতির রূপান্তর ও নবায়ন অন্যতম। সরকার পক্ষ থেকে এই উদ্দেশ্যে সার্জেণ্ট পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের রীতি ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং বর্ত্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা পূরণে এর অকৃতার্থতা একান্ত সুস্পষ্ট। এর সংশোধনকল্পে দেশের নানা স্থানে মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এই সব নূতন পরিকল্পনাকে জাতীয় জীবনে কার্য্যকরী ক'রতে হ'লে অনেক পরীক্ষা, অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। সে দিকের চিন্তা ও কর্ম্মভার দেশনায়ক ও শিক্ষা-পরিচালকদের হাতে। যত দিন দেশের সর্ব্বত্র নূতন কোনো পদ্ধতিতে নব শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তিত না হয়, তত দিন প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যে থেকেও মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে কি ভাবে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সাক্ষরীকরণের এবং সেই সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের কাজ চ'লতে পারে, সেই কথাই ব'লব। গ্রামের শিক্ষাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা দেশে হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে নর্ম্মাল ট্রেণিং স্কুল আছে। এই সকল স্কুল থেকে পাশ ক'রে বছর বছর বহু ছাত্র গ্রামে গিয়ে শিক্ষকতা ক'রে থাকেন। বাংলার অসংখ্য গ্রামের পাঠশালা, প্রাইমারী ও মাইনর স্কুলগুলি এক রকম এঁরাই চালান। এক কথায় ব'লতে গেলে,—বাংলার গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ভার এঁদেরই হাতে। গ্রামে এঁদের চির-প্রচলিত নাম হ'চ্ছে বাংলা-মাষ্টার বা বাংলা-পণ্ডিত। মাতৃভাষার মাধ্যমেই এঁরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তবু পল্লীগ্রামে শতকরা পঁচানব্বই জন এখনও নিরক্ষর কেন,—সেখানে অজ্ঞানতার অন্ধকার এত প্রগাঢ় কেন? তার কারণ, এঁরা শিক্ষাদানকার্য্য করেন পেটের দায়ে, প্রাণের আনন্দে নয়; মাতৃভাষাকে এঁরা ব্যবহার করেন রুজী-রোজগারের উপায়স্বরূপ, মাতৃভাষার সেবা করবার মত অবকাশ বা প্রেরণা তাঁদের নেই। নিজেরা যে পদ্ধতিতে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অধীত বিদ্যা এঁরা মুখস্থ ক'রে এসেছেন, ছাত্রদেরও সেই এক রুটিন-বাঁধা পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে যান।

একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, প্রাত্যহিক জীবনের গতানুগতিক অভ্যস্ত কাজগুলি আমরা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে যন্ত্রচালিতবৎ ক'রে থাকি। প্রাণধর্ম্ম এবং প্রাণিধর্ম্ম থেকেই তার উদ্ভব। মনোধর্ম্ম অথবা মনন-ধর্ম্মের লক্ষণ তা'তে থাকে না। চিন্তার স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যজনিত নিত্য নূতন আনন্দের সৃষ্টি মনোধর্ম্মের একটি লক্ষণ। আর পাঁচটা প্রাণধারণের উপযোগী কাজের মত শিক্ষাদান কাজটাও নিতান্ত অভ্যস্ত ও একঘেয়ে হ'য়ে গেলে, শিক্ষাদান শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই একটা বিরক্তিকর কর্ত্তব্য মাত্র হ'য়ে পড়ে। সেবার মাধুর্য্য তা'তে থাকে না, মাহাত্ম্যও নয়। তার ওপর বাংলার বিশ্বজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও পরাধীন দেশের মাতৃভাষা হওয়ার জন্য এর মূল্য এবং মর্য্যাদা গ্রামের লোকেরা এবং স্বয়ং এই সব শিক্ষকেরাও বুঝেন না। ইংরেজী না শিখ্‌লে চাকরী মেলে না, ইংরেজী না জানলে সমাজে দশ জনের এক জন হওয়া যায় না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে গ্রামে বাংলার যোগ্য কদর নেই! ভাল ইংরেজী জানেন না—নিছক 'বাংলা-মাষ্টার,' 'বাংলা-পণ্ডিত' হ'য়েছেন—এ জন্য শিক্ষকদের মনেও নিজেদের সম্বন্ধে একটা হীনতা বোধ আছে। গ্রামবাসী এবং শিক্ষক উভয়ের দিক্ থেকেই এই অযথার্থ লজ্জাকর মনোভাব দূর করতে না পারলে গ্রামে শিক্ষার উন্নতি এবং এই শিক্ষকদের দ্বারা যথার্থ মাতৃভাষার সেবা হ'তে পারে না। এই সম্পর্কে গ্রামবাসী ও দেশ-কর্ম্মীদের অতি প্রয়োজনীয় আশু করণীয় আছে। গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে মহাত্মাজীর ১৮ দফা গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা দেশ গ্রহণ করেছেন। এই গ্রামসেবক কর্ম্মীদলের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হ'বে:—(১) এই শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা ক'রে এঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা, (২) সমাজ-জীবনের গঠন, স্থায়িত্ব ও উন্নতির পক্ষে এই শিক্ষকদের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মনে এঁদের সম্বন্ধে সত্যবোধ জাগ্রত করা। একমাত্র এই উপায়েই এই সব হৃত-গৌরব নষ্ট-সম্মান শিক্ষকদের গৌরবের আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁদের মন থেকে অবাঞ্ছনীয় হীনতাবোধ দূর করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হ'বে যে, শত শত জ্ঞান-তপস্বী ও চিন্তানায়কদের বাণীর উত্তরাধিকারী তাঁরা। তাঁদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হ'বে যে, তাঁরা হচ্ছেন এক যুগ থেকে আর এক যুগে এই পবিত্র ও প্রদীপ্ত জ্ঞানের মশালবাহী। এই ধারণা তাঁদের মনে জাগ্রত ক'রতে পারলেই, তাঁদের প্রাত্যহিক সামান্য শিক্ষাদানের মধ্যেই দেখা দেবে অসামান্য দায়িত্ব ও মহত্ত্ব-বোধ। শিক্ষকতার মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পাবেন ব্রতের নিষ্ঠা ও সেবার মাধুর্য্য।

আগেই ব'লেছি, বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শ চালিত হ'য়ে এই শিক্ষকদের কাজ করার পথে প্রধান বাধা তাঁদের দারিদ্র্য। গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করতেই তাঁদের সকল শক্তি ও সময় ব্যয়িত হয়। অন্য কাজ তাঁরা কখন করবেন এবং কি ক'রে? এর উত্তরে ব্যবহারিক জীবনে কি উপায়ে এই সব শিক্ষক সক্রিয় ও সচেতন ভাবে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা ক'রতে পারেন, নিজেদের অর্থোপার্জ্জন কোন রকমে ব্যাহত না ক'রে প্রাত্যহিক রুটিন কাজের মধ্যেও এঁরা কিরূপে বৈচিত্র্য ও আনন্দের সৃষ্টি করতে পারেন, সংক্ষেপে এখন সেই কথাই আলোচনা করবো।

এই সকল শিক্ষকের কর্ম্মক্ষেত্র বাংলার অসংখ্য গ্রামে; সেই সব গ্রামের ও জেলার নিজস্ব সম্পদ্ মাতৃভাষার বহুমূল্য বস্তু হয় গুপ্ত হ'য়ে আছে, না হয় লুপ্ত হ'তে বসেছে। সেই লুপ্ত রত্নোদ্ধার এই সকল শিক্ষকের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। আমি ছেলে-ভুলানো ছড়া, জন-প্রবাদ, কিম্বদন্তী ও কাহিনীর কথাই বলছি। এইগুলিই হচ্ছে খাঁটি লোকসাহিত্য বা গণ-সাহিত্য। গণ-চেতনার আধুনিক শ্রেষ্ঠ প্রকাশভূমি রুশিয়া নানা জাতি ও উপজাতি (Nationalities) নিয়ে গঠিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট (Central Supreme Soviet) বিপুল প্রয়াস ও সবিশেষ যত্নসহকারে বিভিন্ন জাতির লোকসাহিত্য বিভাগে এই রকম অক্ষয় সাংস্কৃতিক দান সংগ্রহ করছেন। গণ-চেতনার উদ্বোধনে সমুৎসুক আমাদের দেশকর্ম্মীর দল এখনও এ সম্বন্ধে যথোচিত সচেতন ও সক্রিয় হতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই লোক-সাহিত্যের যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে। ১৩০১-২ সালে তিনি ছেলেভুলানো ছড়ার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করে তার ভূমিকায় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছেন:—

"ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহু কাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে. এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসঙ্গীতস্বর জড়িত হইয়া আছে. এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল লোকে এই ছড়াগুলি ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে ছোটো-বড়ো অনেক জিনিষ অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

পঞ্চাশ বৎসর পরেও রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা ও অনুরোধ পূর্ণ হয়নি।

এই ছড়া ছাড়াও, লোকসাহিত্য বা গ্রাম্য-সাহিত্যের আর একটি বড় অংশ হচ্ছে গান বা গাথা। বাউল, ভাটিয়ালি, নানা রকম পালা গান (মনসার গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি), গ্রাম্য-কাহিনী নিয়ে গাথা (ময়মনসিংহ গীতিকা)—এই সকলের মধ্যে আমাদের প্রাচীন গ্রামজীবনের যে ছবি লুকিয়ে আছে, সরল মাধুর্য্যময় রূপে ও রসে তা অনবদ্য। বাউল গানের মধ্যে যে সাহিত্যের সম্পদ ও ভাবের গভীরতা দেখতে পাওয়া যায় তা শুধুই স্থানীয় বা গ্রাম্য নয়—বিশ্ব সাহিত্যের আভাসও তার মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Hibbert বক্তৃতার মধ্যে বিশ্বের মনীষীদের সমক্ষে এই বাউল গানের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করে এসেছেন। ময়মনসিংহ গীতিকা অথবা ফরিদপুরের মুর্শীদ্যা গান আমাদের সাহিত্যকে কত দূর সমৃদ্ধ করেছে, তা আজ সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য-সাহিত্যের অতি অল্প অংশই এই ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। অধিকাংশই এখনো অনাবিষ্কৃত ও লুপ্তপ্রায়! এই লুপ্ত রত্নোদ্ধার এক দিনের বা এক জনের কাজ নয়, বহু দিনের ও বহু জনের সাধনা-সাপেক্ষ। এ জন্য প্রাত্যহিক কাজের ব্যাঘাত বা আর্থিক ক্ষতিস্বীকারের প্রয়োজনও নেই। ছুটীর দিনে অথবা দীর্ঘ অবকাশের সময় নানা স্থানে ঘুরে ও ধীরে ধীরে অনুসন্ধান করে শিক্ষকরা এই কাজ করতে পারেন। এতে শুধুই মাতৃভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা হবে না, তাঁদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য ও আনন্দের আস্বাদ তাঁরা পাবেন, বিভিন্ন গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ক'রে তাঁদের জ্ঞান-ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হ'বে। ছাত্রদের সঙ্গে নিয়েই তাঁরা এই সব সাহিত্য-অভিযান করতে পারেন এবং তা ক'রলে ছাত্র ও শিক্ষক, উভয়েই উপকৃত হ'বেন।

এই সম্পর্কে আর একটি কাজ হ'চ্ছে বাংলার পল্লীর লুপ্তপ্রায় উৎসবগুলির পুনঃ-প্রবর্ত্তন। বার মাসে তের পার্ব্বণ বাংলার পল্লী-জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল এবং এই সকল আনন্দ-উৎসবে প্রধান স্থান অধিকার করতো যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি। এতে শুধু যে মুখে-মুখে চলতি প্রাচীন সাহিত্যের ধারাটি অব্যাহত থাকতো তাই নয়, এই সব উৎসবক্ষেত্র ছিল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দময় মিলন-তীর্থ। এই সকল উৎসবের পুনরুজ্জীবন এবং যুগোপযোগী নূতন উৎসবের প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রাচীন লোকশিক্ষার একটি সহজ ও সুন্দর বাহনকে বাঁচিয়ে তোলা হবে; তাছাড়া কৃত্রিম ভেদাভেদের কলুষময় বিষ-বাষ্পকে নিরাময় প্রাণবায়ুতে রূপান্তরিত ক'রে নূতন শক্তি, চেতনা ও আনন্দ-সঞ্চারে সবিশেষ সহায়তা করা হ'বে। যাঁরা বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত "বৃক্ষরোপণ" "হলকর্ষণ" প্রভৃতি উৎসব দেখেছেন, তাঁরা এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

পরিশেষে নিরক্ষর বয়স্ক গ্রামবাসীদের সাক্ষরীকরণের অনুরোধ জানিয়ে আমার এই নিবেদন শেষ করবো। রুশ এবং চীন এই দু'টি দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানকার ছাত্র ও শিক্ষক-মহল কেবল মাত্র তাঁদের ছুটীর সময়ে কাজ করে এই সাক্ষরীকরণের কাজ কি রকম দ্রুত অগ্রসর ক'রে দিয়েছেন। এই শিক্ষকগণও যদি তেমনি মনে মনে শপথ গ্রহণ করেন যে, অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রতি মাসে অন্ততঃ এক জন নিরক্ষর গ্রামবাসীকে অক্ষর-জ্ঞান দান করবেন এবং সেই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারেন, তাহ'লে বৎসরের শেষে এঁদের কাজের সমবেত ফল দেখে দেশবাসী পুলক-বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে যাবে।—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"

এর চেয়ে বৃহত্তর পরিকল্পনা ও মহত্তর সঙ্কল্প আর কি হ'তে পারে? মাতৃভাষার সেবকের পক্ষে এই ভাষাহীনদের ভাষাদান করাই সব চেয়ে বড় ও সব চেয়ে পবিত্র কর্ত্তব্য। আমার এই কথার সমর্থনে আমি তাই সব শেষে ভাষার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় উক্তি স্মরণ করি:—

"সমাজ এবং সমাজের লোকেদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান-প্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি, সে হ'চ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক ক'রে তুলেছে—নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মানবধর্ম্ম থেকে বঞ্চিত হ'ত।

* * * *

"জাতিক সত্তার সঙ্গে এই যে ভাষা অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে, এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি, যে-চোখের দ্বার দিয়ে নিত্য নিয়মিত আমাদের পরিচয় চ'লছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু এক দিন মানুষ ভাষার সৃষ্টিশক্তিকে দৈবশক্তি ব'লে অনুভব ক'রেছে যখন দেখি বাইবেলে আছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্য। যখন শুনি ঋগ্বেদে বাগ্দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা ক'রে বলছেন:—

আমি রাজ্ঞী। আমার উপাসকদের আমি ধন সমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু স্থানে প্রবেশ ক'রতে দিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষ, যার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না, তারা ক্ষীণ হ'য়ে যায়।

আমি স্বয়ং যা' ব'লে থাকি তা' দেবতা এবং মানুষদের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি, তাকে বলবান্ করি, সৃষ্টিকর্ত্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান্ করি।"

গাঁয়ের গান

শ্রীশান্তি পাল

গোলের ছাউনী ঘেরা,—
পল্লী মায়ের কুটীর আমার রাজপ্রাসাদের সেরা।
এক দিকে তার ধানের মরাই আর দিকে গোল-ঘর,
আউড়ির গায়ে বেতের বাঁধন দেখিতে কি সুন্দর।
বাতায় বাতায় ফলিয়াছে লাউ, জালি-কুমড়ায় ভরা,
তারি গায়ে ফোটে ঝিঙেফুল সীম রং-এ রং-এ রং করা।
আর ফুটিয়াছে টগর শিউলি আঙিনার মাঝখানে,
রক্তকরবী গন্ধরাজের নয়নে নয়ন হানে।
গোলাপ গুরোল পাঁচমুখী জবা জহুরী দোলনচাঁপা,
লাল সাদা বক ঝুমঝুমি নীল বেণীতে দোলায় ঝাঁপা।
সোনাচাঁপা কলি বকুল মালতী কাঁটালি-চাঁপা সে কত,
কামিনী কেশর ভাণ্ডী ও ভাঁটা আম গাঁদা শত শত।
আশে-পাশে তার নারিকেল তাল, বেড়-বাগানের গায়ে
আম ও কাঁটাল জাম সুরসাল গুবাক গাছের ছায়ে;
মাদুদের মেটে বাড়ী,—
চারিদিকে হেরি ভেন্নার বেড়া, ভালকো বাঁশের সারি।
পশ্চিমে প'ড়ে পতিত-পালান, পূর্ব্বে পুকুর-পাড়,
বাঁশ্‌নে ও জাওয়া আছে গুটিকত, তল্লা বাঁশের ঝাড়।
উত্তর বেড়ে পালঙের ক্ষেত, কিছুটা বা মুলো ক্ষেত,
তাহার মাঝারে ফলিয়াছে কত মেটে আলু রাঙা শেত।
বাঁধাকপি ফুল শালগম বিট্ গাজর টমেটো আর,
বেগুন লঙ্কা ছোলা বরবটী বরণিব কত তার।
দক্ষিণ বাগে সজনে নাজনে আমড়া চালতা নোনা,
পিয়ারা ও আতা জামরুল লিচু করমচা লতা-সোনা
কেলে কোঁড়া আর আকনিধি—লতা, দেয়াড়ে লতার বন,
কামরাঙা কুলে, সবেদা ও গাবে, জড়ায় সে অনুখন।
তারি মাঝে মাঝে আল দিয়ে গড়া পায়ে চলা পথ-হাঁটা,
দুটি ধারে আছে দন্তা পদ্ম মান গুঁড়ি কচু কাঁটা।
ইহারি একটু দূরে,—
পথের কিনারে দাঁড়ায়ে রয়েছে দামুর মায়ের কুঁড়ে।
আড়ে ও দৈর্ঘ্যে পাঁচ-সাত হবে জানলা নাহিক তাতে,
দাওয়ায় উঠিতে ছাঁচটি ঘরের ঠেকে সে সবার মাথে।
ঘরের বাঁ-দিকে মনসার দে'ল, তুলসী-মঞ্চ আর,
কচা-কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা, বাঁধিয়াছে চারিধার।
তারি পাশে ছোট সরিষার ক্ষেত, মটর কলাই ফুলে,
রং বেরং-এর নাকছাবি প'রে উত্তর বায়ে দুলে।
মুগ ও মসুর ধনে অড়হর করে তারে সঙ্কেত,—
সবুজ শাড়িতে ফুল বুনে তুলে, হলদে পাটল শ্বেত!
মাঝে মাঝে তারি কুশো কেশে বেনা দুর্বো ও বেজা ঘাসে,
উলু মেলে দেয় মেলিয়া আঁচল জড়াইয়া বাহুপাশে।
কি জানি সে কবে দামুর বাপ সে ভিন গাঁও থেকে এসে
এক মুঠো টাকা বাবুদের দিয়ে ভিটেখানি গড়ে শেষে,
জোত-জমিটুকু বানায়ে গিয়াছে অর্দ্ধেক খেয়ে পেটে,
মাথার ঘাম সে পায়েতে ফেলিয়া জন ও মজুর খেটে।
দামুও গিয়াছে বাপের পরে সে ক'দিন ভুগিয়া জ্বরে,
বুড়ীর বুকের পাঁজর খসেছে, কেহ নাই আর ঘরে।
ভিক্ষা করিয়া ভাসান গাহিয়া কষ্টে কাটায় দিন,
অস্থি-চর্ম্ম হইয়াছে সার, দৃষ্টিও অতি ক্ষীণ।
ব'সে ব'সে গান গায়,—
চম্পাতলার ঘাটে ঘাটে লোক কাতারে কাতারে ধায়।
বেহুলা কলার মাদাসে বসিয়া মৃত স্বামী ল'য়ে কোলে
ভাসিয়া চ'লেছে গাঙুরের জলে,—'ওঠ ওঠ নাথ' ব'লে।
'কি লিখন বিধি লিখেছেন ভালে, জানি না কাহার কাজ,
বাসর-রাত্রে স্বামীরে আমার দংশিল সাপে আজ।'
ভাবিতে ভাবিতে ভাসিয়া চলিল—কাগা-ঘাটে গিয়ে উঠে,
মড়ির গন্ধে কাগার গোষ্ঠী অমনি আসিয়া জুটে।
মন্ত্র পড়িয়া বেহুলা তখন কাগারে বন্দী ক'রে,
সরিয়া পড়িল সেখানে হইতে, ব্যাঘ্র-ঘাটায় প'ড়ে;
ব্যাঘ্র-ঘাটায় থুইয়া বেহুলা জোঁকা ও জগাৎ-ঘাটে,
হাতের কাঁকণ ফেলিয়া পলায়,—সূর্য্য নামিল পাটে।
গোদাগণ এলো ধেয়ে,—
গাঙুরের জলে ভাসাইয়া ডিঙে তাড়াতাড়ি বোঠে বেয়ে।
বেহুলা কহিল—ছুঁয়ো না আমায় সুবাদে শ্বশুর হও,
আমার দুখের কাহিনী শোন গো, একটু তফাৎ রও।
হারায়েছি আমি প্রাণ-পতি মোর উজান-ভাটায় যাই,
ইহ সংসারে আমার যে কেহ আপন বলিতে নাই!
কিছুই না জানি পুণ্য ও পাপ আদুরী দুলালী মেয়ে
পতিরে জীয়াতে দিবস-রজনী উধাও চ'লেছি ধেয়ে।
রুধিও না পথ, ছেড়ে দাও মোরে, ভিখ্ মাঙি কর পাতি,
স্বামী যে আমার ইষ্টমন্ত্র, স্বামী জীবনের সাথী।
গোদাগণ গেল ফিরে—
বেহুলা একেলা ভাসিতে লাগিল গাঙুরের তীরে তীরে।
সেজুয়া পাহাড়ে দেবী,—
পাইল পদ্মা পরম পীরিতি শিবের চরণ সেবি।
স্বপনে তখনি চলিল পদ্মা বেহুলার আগে আগে।
গাঙুরের জলে ভাসিতেছে যেথা সোয়ামীর অনুরাগে।
পদ্মা ডাকিয়া কহিল—বেহুলে, বোয়ালের 'দ'-র জলে,
লখিন্দরের অস্থি ধুইতে এই বেলা যাও চ'লে।
অস্থি ধুইতে হাঁটুর মালাটি যেমনি খসিয়া গেল,
রাঘব বোয়াল ছিল সে তথায় অমনি গিলিয়া খেল।
শাড়ীর আঁচল ছিঁড়িয়া বেহুলা, গাঁথিয়া হাড়ের মালা,
গলায় পরিয়া দু'বাঁক ঘুরিয়া, থামিল সহসা বালা।
সুরপুরীর সে ঘাটে,—
নেত্য ধোপানী কাপড় কাচিছে আছাড়ি-পিছাড়ি পাটে।
ছেলেটি নেতোর চঞ্চলমতি জ্বালাতন করে মা'রে,
জননী তখনি একটি চাপড়ে মারিয়া ফেলিল তারে।
কাপড় কাচিয়া আরেক চাপড়ে জীয়াইল মৃত ছায়,
বেহুলা তাহার মুখের পানেতে অবাক্ নয়নে চায়।
ইহারে ধরিলে হয়তো আমার স্বামীরে জীয়াতে পারি;
'মাসি মাসি' ব'লে সম্ভাষি তারে, সমুখে দাঁড়াল তারি।

"কে ডাকে মাসি ব'লে বল তো শুনি—
ও রাম রাম।—
চম্পাই নগরে ঘর চাঁদ অধিকারী,
তাঁর পুত্র আমার পতি বিবা হইল,
নিছনি নগরে ঘর সায় সদাগর,
তাঁর ঘরে আছে ঐ অমলা বেণেনী,
তাঁর কন্যা ডাকি আমি বেউলো সুন্দরী।"

নেত্য ধোপানী কাপড় কাচে সে শুধু খারে আর বোলে,
বেহুলা সতী সে কাপড় কাচিল কেবলি গঙ্গা-জলে।
কাপড় নাড়িয়া করিল বেহুলা ইন্দ্রের আরাধনা,
চন্দন-ধারা দাও গো দেবতা—এই মোর প্রার্থনা।
তার পর নেতো কাপড় লইয়া ভাণ্ডড়ের আগে যেয়ে,
কাপড় দিতে গে. ভাণ্ডড় পুছিল—কাপড় কেচেছে কে এ?
কহিল নেত্য—ত্রিজগৎ মাঝে কে আছে আমার পিতে,
তোমার লাগিয়া এত সুন্দর কাপড় কাচিয়া দিতে?
কহিল ভাণ্ডড় সত্য বল গো, ক'য়ো এমন যা' তা,'
মিথ্যা বলিলে পাতকী হইবে, খাইবে পিতের মাথা!
নেত্য তখন সত্য করিয়া কহিল সকল কথা,
কাপড় কেচেছে সায়ের কন্যা সতী সে পতিব্রতা।

"বেউলো আয় গো আয়—
তোর দরশনের সময় ব'য়ে যায়"।

কহিল বেহুলা নেতোরে তখন—কাঁচা সরা দু'টি দাও,
শোন রজকিনী একবার তুমি কুমোরের বাড়ী যাও।
সেই সরা লয়ে যাবে এ অভাগী দেবতার সভা মাঝে,
যেথা আছে শিব শিবানীরে লয়ে, বম্ বম্ গাল বাজে।
বেহুলার কথা শুনিয়া ধোপানী সরা আনিবারে যায়,
আট পণ কড়ি মূল্য দিয়া সে দুইখানি সরা পায়।
সরা লয়ে সতী 'সম্ভাষা' দেয় মহাদেবের সে আগে,
সিদ্ধির নেশা ছুটিল অমনি, শিবসুন্দর জাগে,
কহিল শম্ভু বেহুলারে হেরি—হলুদের ছিটে দেখি,
সারা গাও ভরি!—সিঁথি কেন খালি?—বল বল সতী এ কি!

"দেবী আয় গো আয়।—
নাচে বেউলো সতী দেব-সভায়,
হুঙ্কারেতে ডাকে পদ্মা অষ্ট তো নাগিনী,
দেবী আয় গো আয়।—
পাটরাজ পরে পদ্মা পাটের না শাড়ী,
কলুইবোরা পরে পদ্মা পায়ের না মল,
চন্দ্রবোরা পরে পদ্মা কাঁকালে না গোঁট,
উদুইকাল পরে পদ্মা সিঁথের না সিঁদুর,
জাতনাগ পরে পদ্মা হাতের না কঙ্কণ,
তক্ষকনাগ পরে পদ্মা কানের না কড়ি,
সুতসঙ্খার পরে পদ্মা আঙুলে না বিছুট,
অষ্টনাগ সাজায় তখন পদ্মা তো কুমারী,
রাগরথ সাজায় তখন পদ্মা তো কুমারী"।

রাগরথ চ'লে হের সবে আজি মহাদেবের সে আগে,
'সম্ভাষা' দিয়ে ডাকে সতীরাণী, কৈলাসে দোলা লাগে।

কহিল শম্ভু পদ্মারে ডাকি—এ কি তব ব্যবহার!
জীয়াইয়া দাও লখায়ে পদ্মা; সতী পাক পতি তার।
পরম ভক্ত চাঁদ সদাগর, আমার সেবক জেনো.
বিবাদ ক'রো না তাহার সহিত, সর্ব্বদা তারে মেনো।
কহিল পদ্মা—ক্ষমা কর দেব, চাঁদ সদাগর-ঘরে
পূজা না পাইয়া মরমে দহি গো, ঘৃণা বড় মোরে করে।
এই কথা শুনি মহাদেব ধায় বোয়ালের কূলে কূলে,—
জাল লয়ে ফেলে প্রথম খেওনে ঝিল আর খোলা তুলে,
তার পর তোলে জোবার শেওলা, অবশেষে সেই বো'ল,
নখে খাল করি, মালা বা'র ক'রে, জুড়িয়া পেটের খোল;
ছাড়িয়া দিল সে আবার তাহারে বোয়ালের 'দ'-র জলে,
হাঁটুর মালাটি জুড়িতে অমনি লখাই হাঁটিয়া চলে।
কহিল শম্ভু বেহুলারে ডাকি—সাবিত্রী দেবী সম,
এয়োতী থাকো মা, জন্ম জন্ম, ঘচুক মনের তম।
কল্যাণে তব অন্ধজনেরও চক্ষু ফুটিয়া যাক,
আজি হতে যেন সবার মাঝারে পদ্মাও পূজা পাক।

দুই

ফণিমনসার বেরা—
পল্লী মায়ের কুটীর আমার রাজপ্রাসাদের সেরা।
গ্রামের মায়া যে কাটাতে পারি না তাই তো নিয়ত আসি,
ঘোষেদের ভাঙা কোঠারে দেখিয়া অশ্রু-সায়রে ভাসি।
কোথায় বা সেই শিরি-সম্পদ রাস-দেউলের চূড়া,
ঝুলন-মন্দির, দুর্গাবাড়ী সে ভাঙিয়া হয়েছে গুঁড়া।
ভাগ্যের সাথে লড়াই করিয়া যুগ-যুগান্ত ধরে,
ভিটে মাটি চাটি হইয়া গিয়াছে, অনেকেই গেছে ম'রে।
লক্ষ্মী সে কবে ছাড়িয়া গিয়াছে, লক্ষ্মীছাড়া না হ'য়ে,
দু'-এক সরিক এখনো রয়েছে মুখটি বুজিয়া স'য়ে।
সাক্ষী দিতেছে আজিও তাহার বৃদ্ধ অশথ তরু,
দেউড়ীর পাশে ঝুরি নামিয়াছে অজস্র মোটা সরু।
ডাহিনে ও বাঁয়ে ভাঙা ইটগুলো জমিয়াছে স্তূপাকারে,
নাচ-দরজার উত্তর দিকে খানাটার ঠিক ধারে,
পুরানো পুকুর শেওলায় আর কলমী-লতায় ভরা,
ফুলগুলো আজো আলো ক'রে আছে, নয়ন শীতল করা।
সেদিন দুপুর বেলা,—
শুনিলাম সেথা শিবের কোঁদল, লক্ষ্মীর অবহেলা!
ভিখারী সে এক ভিটেয় বসিয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া গায়,
পল্লী-কবিও তাহারি সহিত আখর ধরিয়া যায়।...
চ'লেছে নারদ কৈলাস গিরি বীণাখানি লয়ে হাতে,
ভেটিলেন গিয়ে বিহান বেলায় মহেশ্বরের সাথে।
নারদে দেখিয়া আস্তে-ব্যস্তে আসন ছাড়িয়া উঠে,
'এসো এসো' ব'লে—'ভাগ্নে আমার' ধরে শিব করপুটে।
তার পর লয়ে বসাল তাহারে রত্ন-সিংহাসনে,
কহিল নারদ—কহ গো মাতুল, উমা কেন আনমনে?
আঁখি কেন তব ছল-ছল করে, বাঘছাল গেছে খসে,
ডম্বরু কেন ধরায় লুটায়, ভোম হ'য়ে কেন ব'সে?

কহিল শম্ভু—দুঃখের কথা তোমারে বলিব কি,
কত না দুঃখ দিতেছে আমারে হিমালয়ের এ ঝি !
পাঁচ বাড়ী সেধে ভিখ্ মেঙে আনি নুণ তেল আর চাল,
মামীটি তোমার ঘরেতে বসিয়া নিত্য পাড়িছে গাল।
এ-সব দুঃখ এ-বুড়া বয়সে আর না সহিতে পারি,
তোমার মামীর জ্বালায় এবার পালাব এ-ভিটে ছাড়ি'।
নতুবা আত্মহত্যা করিব, যাইব দেশান্তরে,
থাকুক পড়িয়া কৈলাসপুরী, একা থাক উমা ঘরে।
কহিল নারদ—শোন গো মাতুল, করিও না এত রোষ,
নারীর কথায় মরিতে যে যায় লোকে দেয় তারে দোষ।
স্বামী যদি কারো ক্রুদ্ধ হয়ও নারী যদি তার হাসে,
সকল দুঃখ দূর হ'য়ে যায়, স্বর্গ এহেন বাসে।
তবে যদি নারী ক্রুদ্ধ হয় সে ক'রে বসে অভিমান,
পণ্ডিত স্বামী হাসিয়া অমনি করে তাঁরে প্রেম দান।
এই কথা বলি নারদ যেমনি উঠিল আসন ছাড়ি,'
নন্দী আসিয়া 'রহ রহ' ব'লে, ধরিল হস্ত তারি।
কহিলেন উমা—শুনে যাও মোর দুঃখের বিবরণ,
সোয়ামীর ঘরে অন্ন জুটে না গাল পাড়ে অকারণ।
শুনেছি পুরাণে নারীর ভাগ্যে পুরুষেরা ধন পায়,
তবে কেন নর নারীরে এমনি দুই পায়ে থেঁতলায়!
নারী দেয় নরে বুকভরা প্রেম প্রীতি ভালবাসা আর,
পুরুষ দেয় সে পুত্র তাহারে লয় সে সকল ভার।
সংসারে কেন এমন রীতি সে কিছুই বুঝিতে নারি,
চঞ্চলা নারী যা'র ঘরে থাকে অন্ন জুটে না তারি।
লক্ষ্মী তাহারে ছেড়ে চ'লে যায়, সর্ব্বদা বৈমুখ,
উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে কখনো পায় না সুখ।
বাপ-মা আমারে শিক্ষা দিয়াছে, নহি চঞ্চল-মতি,
ত্রিভুবনে মোরে 'সন্তাষা' দেয়, উমা যে লক্ষ্মী সতী!
বৎসর পরে জেদাজিদি ক'রে বাপের বাড়ীতে যাই,
মায়ের দেওয়া সে শঙ্খ ও শাড়ি প'রে ফিরে আসি তাই।
ভুলিয়া কখনো সোয়ামীর কড়ি করি না সে অপচয়,
তবে কেন হায়, কথায় কথায় আমারে দেখায় ভয়!
বিবাহ করিতে এসেছিল যবে আমাদের গিরিপুরে,
তখন তাহার পয়সা ছিল না, জানে সে ভুবন জুড়ে।
বন্ধু ছিল না, বান্ধব নহে, ছিল গো ভূতের পাল,
বরের পরণে ছিল সে কেবল একখানি বাঘছাল।
পাল্কী ছিল না, ডুলিও ছিল না, এসেছিল বৃষ' পরে,
শিরে জটাভার, আভরণ হীন, আঁখি ঢুলু ঢুলু করে।
বিষধর ফণী করে কিলিবিলি, গাও দিয়ে উঠে খড়ি,
স্বামীর ভিটেয় দেখিনি কখনো একটিও কাণা-কড়ি।
কোচের বাড়ী সে গতাগতি করে, সিদ্ধি ও গাঁজা খেয়ে,
কাটাইত রাত তাণ্ডবে সেথা, আগম পুরাণ গেয়ে।
ভাগ্যের দোষে পড়েছি আমি এ কপাল-পোড়ার হাতে,
লক্ষ্মী কবে সে ছাড়িয়া গিয়াছে. কেন থাকি পেট-ভাতে!
কহিল শম্ভু—কি বলিছ মোরে, লক্ষ্মীছাড়া সে আমি ?
ভুল বুঝিয়াছ উমারাণী তুমি, জানে অন্তর্যামী।

আর কত কথা লিখিব গো বল লেখা-জোকা নাহি যায়,
পল্লী-কবিও হেথা হতে ফিরে চলিল আরেক গাঁয়।

তিন

ছোণের ছাউনী ঘেরা—
পল্লী মায়ের কুটীর আমার রাজপ্রাসাদের সেরা।
যেথায় সকালে ঘুম ভেঙে যায় বনের পাখীর ডাকে,
উষার আলোক ফুটিয়া উঠে সে হাসনাহানির ঝাঁকে।
যেথায় প্রথম সূর্য্য উঠে সে নাংলা বিলের ধারে,
সোনালী আলোয় বিলের জলটি ঝিকিমিকি ঝিকি করে।
যেথায় মাথার উপরে উড়িয়া উড়িয়া শতেক পাখী,
আকাশ বাতাস মুখরিত করে রঙীন আলোক মাখি;
যেথায় দোয়েল শালিক পাপিয়া কোকিলের কুহু গানে,
জুড়াইয়া যায় শ্রবণ-যুগল, ঘরের বাহিরে টানে;
যেথায় বাবুই রাতকাণা ঘুঘু টিমটিমে দিনকাণা,
গাছের আগায় পক্ষ ঝাপটি বনে বনে দেয় হানা;
যেথায় শ্যামায় বৌ-কথা-কও, বৌ-কথা-কও ব'লে,
পাড়া-পড়সীর কাজ ভাডাইয়া ব্যাকুল করিয়া তোলে;
যেথায় ফিঙে ও বুলবুলি টুনি মাঠের মাঝারে উড়ে,
চোখ-গেলো কুকো সরষে-কোটোর পিছনে পিছনে ঘুরে;
যেথায় সরাল রাম-চখা ডাক মাচাল কুল্লো শত,
ভিন্ গাঁও থেকে শামকুটে লয়ে আসিতেছে অবিরত;
যেথায় পাপ্ড়া হর্ টিটি কাঁক ঢাঙ্গিবক কুঁচবকে,
এক পা গুটায়ে ভাবুকের মত দাঁড়াইয়া থাকে ঝঁকে;
যেথায় কাস্তে-চোরা ও শামুক খোলেরে লইয়া সাথে,
মদনটাক ও করমকুলির ঠুকারিয়া মারে মাথে;
যেথায় দিঘেল মাণিক গয়াল হলদে বাটাং কান,
পাঁক ঘুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাদা ঘেঁটে হয়রান;
যেথায় গো-বক বক-চরে ব'সে মৎস্য ধরিয়া খায়;
ভিন্ গাঁ-র নেয়ে কাড়ায় বসিয়া বেগোণ মারিয়া যায়;
যেথায় গোলের কিস্তির মাঝি হাল-মাচানের 'পরে,
সমুখে পিছনে হেলিয়া দুলিয়া পারানির ঝিঁকে ধরে;
যেথায় টাপুরে গাঁও-না'রে ফেলে যায় সে ঢেউয়ের আগে,
তুফান ভাঙিয়া শিঙের ডগায় ছলাৎ ছলাৎ লাগে;
যেথায় ভোরের বাতাসে বাদাম খাটায়ে বসিয়া নেয়ে,
সারি গানের সে দু'-একটি কলি সকরুণ সুরে গেয়ে;
গাঙের দু'পার আকুল করিয়া ব্যাকুল বেগেতে যায়,
কলসীর জল কটিতে কাহার উপছিয়া পড়ে পায়;
কোন্ সে তরুণী কাহার ঝিয়ারী কেবা সে বলিতে পারে,
নদীর ঘাটে গো এমন সময় জল যায় আনিবারে!

কেন মিছে কর জ্বালাতন	থামা থামা কুহুতান
প্রেমে জর জর তনু-মন	জ্বলে পুড়ে যায় প্রাণ।
একা আছি আমি ভালো বেশ	দোকা মোর কাজ নাই,
তুমি কেন মিছে তোলো রেশ	পিছে পিছে মোর ধাই!

ডাকিছে দোয়েল ডাকিছে কোয়েল ডাকিছে পাপিয়া কত,—
বনের আড়ালে শিস্ দিয়ে ডাকে শ্যামা সে-ও অবিরত।

লজ্জার মাথা খাইয়া বসেছে চঞ্চলা বিরহিণী
শাশুড়ী ননদে শঙ্কা না করে এমনি কলঙ্কিনী !
বাঁশ-বনে বাঁশ-ঘুঘু ছিছি বলে, ঘুঘু-ঘু ঘুঘ-ঘু ডাকে,—
বৌ-কথা-কও ছুটিয়া পলায় সম্ভাষে নাহি তাকে !
মনে পড়ে আজি এমনি প্রভাতে কত দিন হেথা এসে,
খেজুরের বন, বাবলার বন, হিজল বনের শেষে ;
ডাঙায় বসিয়া হেরিয়াছি কত উদয়-অস্ত রবি ;
সোনার আলোয় নাহিয়া নাহিয়া, কোথা গেল সেই ছবি !
আহা সেই ছবি, ঢল ঢল মুখ, সিঁদূরের টিপ প'রে
ভোরের আলোয় অরুণের মুখ দিত যে মলিন ক'রে।
সেই মুখখানি নয়নের আগে ভাসিতেছে অবিরাম,
আজি এ-বিহানে তাই এ বিজনে স্মরিতেছি তারি নাম।

যেমনি যাইত জলে,—

জলের মেয়েরা জড়ায়ে আঁচল সোহাগে পড়িত ঢলে।
গোবরন হাজি নেড়া-সেঁজি গোল হোগলা কেওড়া কেয়া,
তারি গাও ঘেঁসে টাপুরের মাঝি মারিত গো পার-খেয়া।
হরগাছা উলু ওড়া শর বেত ঝাউ নল শত শত,
নদীর দু'-ধারে তাহারে হেরিয়া মাথাটি করিত নত।
মালোদের ডিঙে বাচাড়ী ও গোড়ে যাইতে গাঙের জলে,
অবাক্ হইয়া বারেকের লাগি থামিত সে কুতূহলে।

না'য়েরে কিনারে থুয়ে,—

মাঝিরা ডিঙেয় বসিয়া থাকিত আড়ি-গুড়োয় পা ধুয়ে।
কোন মাঝি র'ত পা-দুটি ছড়ায়ে তেয়াক্সি খোপের 'পরে,
কেহ বা থাকিত ডরার খোপেতে শুইয়া চুপটি করে।
কোন মাঝি র'ত পালের গুরোয় সুদূরের পানে চেয়ে,
কেহ বা বাতায় গড়ায়ে পড়িত গোড়ে-টাগ সামলেয়ে।

সামালিতে নাহি পেরে,—

পল্লী-কবিও পাড়ি জমাইল গাঙের কিনার ছেড়ে।
পাশাপাশ যেয়ে শরবন ভাঙি মালোদের এক কুঁড়ে,
ঝুলিছে যেথায় আড়ার উপরে সারাটি আঙিনা জুড়ে' ;
খেপলা ও দড়া বেঙ্কি পারসে হরেক রকম জাল,
ডালি ও ঘুন্সী, পোলো কালা কোঁচ, লাঙলের দু'টি ফাল—
দাওয়ার উপরে পড়িয়া রয়েছে, ভাঙা ভাঙা দু'টি ঢোল ;
দুইখান ঢেঁকি ঢেঁকশালে প'ড়ে, দুইখান মই যো'ল।
আর আছে গোটা ফুলের বাগান একধারে আঙিনায়,
দু'-একটি তারি বাখানিতে চাহি, ক্ষমা কর গুণরায়।
ফুটিয়াছে সেথা হলদে ও সাদা পাটকিলে জবা কাঁটা,
কাপাস পদ্ম-থল চীনে-গাঁদা, কল্‌কে দোপাটি নাটা।
কাঞ্চন হেনা আকন্দ ঘেঁটু মল্লিকা বন-জুঁই,
ঢোল-কলমীর গায়ে ঢলে পড়ে বেলা চম্পক-ভুঁই !

ফুলের সুবাস নিয়া—

ঘুরিতে ঘুরিতে আরেক মালোর কুটীরে জুটিনু গিয়া।

ছাঁচের তলায় তারি,—

বসিয়া সেথায় শুনিনু কত সে মাদার মিঞার জারি।
গাহিছে মাদার সবার সমুখে বন্দনা করি সবে,
ছন্দে গাঁথিয়া দু'-একটি কলি সবারে শুনাই তবে।

"প্রথমে বন্দিলাম আমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
তার পর বন্দিলাম আমি কার্ত্তিক গণপতি।
তার পর বন্দিলাম আমি সভায় যত জন ;
তারপর বন্দিলাম আমি শিক্ষা-গুরুগণ,
একে একে প্রণাম জানাই সব দেবতার পায়।"···

কণ্ঠ ছাড়িয়া বিভোল হইয়া মাদার মিঞা সে গায়।
লা'-এরে ফেরাও, লা'-এরে ফেরাও, ফেরাও লা' এই ঘাটে,
পতির জ্বালায় সতী যে জ্বলিছে, বক্ষ বিদরি' ফাটে।
পান্‌সী পুরিয়া দিব টাকা-কড়ি পতিরে দাও গো ছাড়ি,
দিবস-রজনী গুমরিয়া মরি থামাও লা'-এর পাড়ি।
যতটুকু মোর সিরিতির পথে উদয় হয়েছে তার,
ততটুকু বলি রসিক সমাজ, করিও না অবিচার।
উত্তরে না কি মেঘ জমিয়াছে, আঁধার ছেয়েছে ঘিরে,
পুঁটি-মাছে ঝাঁক বাঁধিয়াছে গাঙে, চিকণ ধানের চিড়ে।
তুমি যদি যাও লা'-এ লা'-এ মাঝি, আমি যাব তলে তলে,
তোমার ও-পারে আমার এ-পারে ঢেউ তরঙ্গ চলে।
সে ঢেউ ভাঙিছে কাহার চরণে, চম্-চমাচম্ ক'রে,
পল্লী-কবিও তাহারি দোলায় ভাসিতেছে হাল ধ'রে।

* * * *

মাদার এবার গাহিল সভায় মাণিক পীরের গান,
গোকুল নগরে না কি বাস করে নামটি যাহার কান।
যমুনার কূলে বাছুরি চরায় বাজায় বাঁশের বেণু,
মাহিনা তাহার বেশী কমী নহে নবতি লক্ষ ধেনু।
বাদসার ছেলে কবে কোন্ কালে মাণিক জান্দা পীর,
কিশোর বয়সে সংসার ছাড়ি হয়েছিল সে ফকির।
গিয়াছিল কবে মাণিক জান্দা কানাই ঘোষের বাড়ী,
আশাটি লইয়া হস্তে তাহার, একমুখ লয়ে দাড়ি।
কানাই ঘোষের মা-ও না কি ক'ল—নন্দ ঘোষেরে ডাকি,
ফকির এসেছে সকাল বেলায় ভিখ দেবো বল না কি ?
এই কথা বলি পয়সা ও চাল বাটায় ভরিয়া লয়ে,
যেমনি এসেছে ফকিরের আগে, ফকির উঠিল ক'য়ে—
চাল পয়সার ফকির নহে মা, চাল পয়সা না লব,
একটু দুগ্ধ দাও মা আমায় দোয়া করে যাই সব।
কহিলা গৃহিণী—কারে দোয়া কর, কত দোয়া তুমি জান ?
দুধ নাহি ঘরে, ফিরে যাও বাছা, করিও না মিছে ভাণ।
কহিল মাণিক—সুবুদ্ধি নারী, কুবুদ্ধি কেন ঘটে ?
দুগ্ধ থাকিতে ফকিরে ভাঁড়াও এমনি বাচাল বটে !
আর কত গান গাহিল মাদার—গ্রন্থ বাড়িয়া যায়,
পল্লী-কবিও আসর ছাড়িয়া গাঙের কিনারে ধায়।

* * * *

নদীর ধারে পাকুড় বট তাহার নীচে ঘাট,
ওই ঘাটেতে ডুব দিয়েছে সুদূর গাঁয়ের বাট।
ওই ঘাটের ওই বাঁকের ধারে ধোঁয়ার মতন গাঁ,
মালোর মাঝি হাপর টেনে বাঁধছে যেথায় না'।
ওই গাঁয়েরি একটি ছেলে এক মেয়েকে সে,
বাসতে ভালো গিয়ে তারে হারিয়ে গেছে সে।

ওই ঘাটে সে নিতুই যেমন, তেমনি আসে আজ,
পাকুড় তলের ছায়ায় বসে, ঢেউ গোণা তার কাজ।
ওই ঘাটেতে নাইতে আসে পাড়ার যত মেয়ে,
জল ঘুলিয়ে আকাশ পানে রয় গো তারা চেয়ে।
টাপরে মাঝি গোণ-বেগোণে গান গেয়ে সে যায়,
বাইতে না'য়ে ক্ষণেক সেথা হাল ছেড়ে দে' চায়।
মকর-মুখো কিস্তিগুলো নঙর ফেলে থোয়
হাল-মাচানে ব'সে মাঝি জাল টেনে গুটোয়।
খেয়ার নেয়ে ভিড়িয়ে ঘাটে দেয় সে খেয়া-পার,
ঘট ভ'রে নে' চুল ভিজিয়ে বৌ চ'লেছে কার?
ছিপছিপে তার গড়নখানি কাঁচা সোনার রং,
চলতে পথে চাইছে ফিরে আ মরি কি ঢং!

প্রিয়ার মত মুখের আদল এলিয়ে নাজা গা,
বিহান-বায়ে 'ঝুল' দিয়ে যায় পাল তোলা কোন্ না'!
উঠছে বেজে কলস-কানা কাঁকন লেগে তার,
উথ্‌লে ওঠে ঘটের জল মল বাজিছে পা'র।
আর বাজিছে কবির বুকে কাঁটার মতন বিঁধে,
বুঝ্‌ল না সে হায় দরদী চুকলো গাঁয়ে সিঁদে।
ডাগর চোখে রইল চেয়ে পল্লী-কবি ওই,
তার পরে যা ঘটলো শোন আরেক ছাঁদে কই।

* * * *

সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে,—
মাথার উপরে দূর-দিগন্তে একটি তারকা ভাসে।
মনে পড়ে আজি প্রিয়তমা মোর অনেক দিন সে আগে,
আসান লইতে গাঙের কিনারে আসিত সে অনুরাগে।
হেরিতাম দোঁহে সোনালি আকাশ সবুজ বনের পারে,
ছায়ায়ে যেথায় গোধূলি বেলায় খুঁজিয়া বেড়াই কারে!

প্রকৃতির এ কি অযাচিত দান ভাবিয়া না পাই কূল,
কোথায় শিল্পী তুলির ডগায় ধ'রে রাখ নির্ভুল।
শ্যাম সরোবর খাল বিল নদী বিস্তৃত খোলা মাঠ,
মাথার উপরে রঙীন আকাশ, দীঘল গাঁয়ের বাট।
এমন স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা সে খুঁজিয়া কোথা না পাই,
বন-বিহঙ্গ বিহানে-বিকালে বন্দনা গাহে তাই।
ঝিল্লি মেয়েরা উৎসব করে নূপুর বাজায়ে পায়,
পল্লী-কবিও বাউল হইয়া এ গাঁও ও-গাঁও ধায়।
কুহেলির মত ধোঁয়াইয়া উঠে, রঙীন নেশার ভরে
আরো কিছু চায় প্রকৃতির এই অন্তর ভেদ ক'রে।

আরো চাই—আরো চাই,—
হে দেবি তোমারে সেবিয়া এখনো হৃদয় যে ভরে নাই।
ভাণ্ডারে তব কত রং আলো অফুরান—অফুরান—
আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিস্ময়ে ভরে প্রাণ!
তোমার মহিমা তুমি জান দেবি, অন্ত নাহিক' তার,
অসীমের মাঝে তোমারে ছুঁইতে হারাই যে বারে বার!
তরুছায়া ভরা সীমাহীন বাট, ছোট ছোট কত গ্রাম,
ছবির মতন যেন পটে আঁকা, জানি না তাহার নাম।
সমুখে পিছনে ঘন তালীবন সুশীতল ছায়াতলে,
ওই হের ডুবে রাঙা রবি-ছবি, গেল সে অস্তাচলে।
প্রকৃতির সাথে পরাণ যে মোর এক হ'য়ে হয় লীন,
হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারি বাজে পূরবীর রিনি-ঝিন্।
আর বেজে ওঠে কাঁসর-ঘণ্টা দূর দেউলের মাঝে
গাঁয়ের বধূরা ঘট কাঁখে ফিরে ঘোমটা টানিয়া লাজে।
চলে পায় পায় পল্লীর পথে, ঘরে ঘরে জ্বলে দীপ,
কলকণ্ঠের কল-কল ভাবে মুখরিত চারি দিক্।
সারাটি পথ সে রাঙাইয়া যায়, আলতা রঙীন পায়
পল্লী-কবিও সে রং মাখিয়া আপন কুটীরে যায়।

তৃতীয় সার্ব্বভৌম সংগ্রাম

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শীঘ্রই কি আবার একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধিবে? বিগত সর্ব্ববিধ্বংসী সংগ্রামের অবসান হইতে না হইতে সর্ব্বদেশের মনীষা সম্পন্ন মানবদিগের মানস-কন্দর মথিত করিয়া এই একই প্রশ্ন উঠিতেছে,—আবার কি আর একটা এতদপেক্ষা ভীষণতর জনপদ-বিধ্বংসী সংগ্রাম উপস্থিত হইবে? একথা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধকালে সংগ্রাম-নিরত জাতিরা যে সকল বাক্যব্যয় করিয়াছিলেন, যুদ্ধ-শেষে তাহার একটিও তাঁহারা রক্ষা করেন নাই। এখন কেবল পরাজিত পক্ষের উপর সকল দোষ চাপাইয়া সাধু সাজিবার প্রয়াসই বিজয়ী জাতিরা পাইতেছেন। মার্কিণের মনস্বিনী মহিলা পার্ল বাক গত আগষ্ট মাসের 'এসিয়া' পত্রে "মার্কিণে সাম্রাজ্য-বাদ গঠিত হইতেছে" এই নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"কতিপয় লোক বলিবেন যে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার পরিকল্পনা করিবার জন্য সানফ্রান্সিস্কোতে পরামর্শ-পরিষদ বসান হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা সত্য নহে। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, তথায় দুইটি পরিকল্পনা লইয়া কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল। একটি পরিকল্পনা ছিল—ধরাপৃষ্ঠস্থ সর্ব্বদেশের লোককে কি করিয়া স্বাধীন করা যাইতে পারে; আর দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল—যুদ্ধে জয়ী হইলে বিজয়ী জাতিরাই পৃথিবী শাসন করিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"এখন কেবল সামরিক যুদ্ধে জয়লাভ করা হইয়াছে, আসল যুদ্ধে এখনও জয়লাভ হয় নাই।" শ্রীমতী পার্ল বাক যখন ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন জনৈক জার্ম্মাণের দানবিক প্রজ্ঞাপ্রসূত আণবিক বোমা আস্থিতে মার্কিণের অস্ত্রাগার হইতে রূপ গ্রহণ করিয়া প্রাচ্যখণ্ডের জাপানীদিগের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে নাই, এক নিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ পশুতুল্য এসিয়াবাসীর সদ্য মোক্ষ লাভ করিবার ব্যবস্থা হয় নাই,—জাপান আত্মসমর্পণ করে নাই। মার্কিণী-সভ্যতার সমুজ্জ্বল ছবিও ধরাবাসী লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হয় নাই। তবে ঐ যুদ্ধে যে মিত্রপক্ষ জয় লাভ করিবে তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াই পার্ল বাক ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে এই সংগ্রামবিজয়ের ফলে এখন বিশ্বে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না—হইতে পারে না। ইহা সামরিক বিজয় মাত্র। এখন বিজয়ী জাতিরা জয়লাভের পরে এই বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিরূপ করেন তাহারই উপর বিশ্বের ভবিষ্যৎ শান্তি নির্ভর করিতেছে।

আজ হঠাৎ-প্রাপ্ত দানবিক আণবিক বোমার ব্যবহারে মার্কিণ প্রাচ্যখণ্ডে জাপানকে পরাজিত করিয়াছেন, তাই মথুরায় রাজা হইয়া তাঁহারা ব্রজের বুলি ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে আজ সেই সর্ব্বজনীন স্বাধীনতার বুলি বাহির হইতেছে না। এখন মার্কিণ এশিয়াখণ্ডে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছেন। গ্রেট বৃটেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতী। উভয়ের লক্ষ্যগত একটা পার্থক্য আছে। মার্কিণ বুঝিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদে লাভ নাই,—উহা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটা প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা ভবিষ্যৎ বিবাদের বীজ লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা [illegible] দেখিতেছেন না। রুশিয়ার মনোভাব ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তবে ইহা সত্য যে, রুশিয়ার অন্য দুই মিত্রের কেহই প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। রুশিয়াও তাহা বুঝে। অন্য জাতিও তাহা বুঝে না বলিয়া মনে হয় না। তাই এবার যুদ্ধের পর অস্ত্র-সঙ্কোচের কথাই উঠিতেছে না। তিনটি বিজয়ী জাতিই তাহাদের সামরিক শক্তি অটুট রাখিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন।

এই মহাযুদ্ধের অবসানে যে শান্তি স্থাপিত হয় নাই—নরমেধ-যজ্ঞ চলিতেছে, তাহা ইন্দোনেশীয়া, প্যালেষ্টাইন এবং মিশরের ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। ভারতেও শান্তি নাই। চীনেও অশান্তি প্রকট। পারস্যের সংবাদ সন্তোষজনক নহে। তবে তথায় জনসাধারণ যে শান্তির এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে, তাহা যেন মনে হইতেছে না। তাহার প্রকৃতিদত্ত সম্পদ্ তেলের খনির উপর বিদেশী বন্ধুদিগের লোলুপ-দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে। কোরিয়াতেও শান্তি নাই, তাহারা স্বাধীনতা চাহিতেছে। এদিকে মার্কিণ এবং রুশিয়ার মধ্যে একটা কি বুঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় নাই। এই বুঝা-পড়ায় ভিতর গ্রেট বৃটেন নাই। চীনের কমিউনিষ্ট দলের সহিত চিয়াং কাইসেক দলের মনোমালিন্য ঘটে নাই, তথায় যুদ্ধও হইতেছে। এক কথায় এই বিশাল এসিয়াখণ্ডের ১ শত সাড়ে ১৩ কোটি লোক অশান্তির জ্বালা ভোগ করিতেছে। যে ক্ষেত্রে ধরিত্রীর অর্দ্ধেক লোক অশান্তির এই জ্বালা ভোগ করিতেছে সে ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা মনে করাই ভুল। পার্ল বাক যথার্থই বলিয়াছেন—"যদি আমরা আমাদের শক্তি পরাধীন জাতিকে পরাধীন রাখিবার জন্য পরিকল্পনা করিতে নিয়োগ করি, এবং বিজিত জাতির দেশ সামরিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভস্মসাৎ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে ভবিষ্যতে আর একটা ভীষণতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং সে যুদ্ধ শীঘ্রই সংঘটিত হইবে।" ইহা যেন দৈববাণীর মতই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। যে অবস্থায় ধরাতলের অধিকাংশ লোকের মনে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার করিতেছে সে অবস্থা কখনই মানব সমাজে শান্তির শোভা বিস্তৃত করিতে পারে না। দিগ্‌দাহী মরুস্থলীতে স্বর্গীয় পারিজাত প্রস্ফুটিত হইবার আশা কেহই করিতে পারেন না।

কেবলমাত্র কুমারী পার্ল বাকই সংগ্রাম-নিবৃত্তি যে শান্তির কারণ হয় নাই একথা বলেন নাই। সকল দেশের মনীষীর কণ্ঠ হইতে ঐ একই ধরণের বাণী বাহির হইতেছে। ভারতীয় মনীষী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিণামে কোন সুফল ফলে নাই। সে জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। প্যালেষ্টাইনে এবং ইন্দোনেশিয়ায় যেরূপ অশান্তির অনল জ্বলিতেছে তাহাতে মনে হয় বিগত বিশ্বসংগ্রাম বৃথাই গিয়াছে। বিজয়ী জাতিরা শান্তিলাভের জন্য নানারূপ কুটিল কৌশলজাল বিস্তৃত করিতেছেন।" তিনি আশা করিয়াছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ জগৎ-বাসীকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। ইহা ভিন্ন বিলাতের অধ্যাপক ওলিফান্টও ঐ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে রুশিয়ার প্রতি বেশ একটু অবিশ্বাসের ভাব দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"রুশিয়ার আভ্যন্তরিক শক্তি যেরূপ তাহাতে সে সকলকেই ছাড়াইয়া উঠিতে পারে।" ইহা ভিন্ন আরও বহু মনীষী ঐ একই কথা বলিয়াছেন। সকলের কথা উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে।

আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর লইবার আমাদের সামর্থ্যও নাই অধিকারও নাই। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার সহিত আমাদের জীবন-মরণের সম্বন্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের নাভিশ্বাস উপস্থিত, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শীঘ্র বাধে, তাহা হইলে আমরা আর রক্ষা পাইব না। যুদ্ধ জয় করিবার পরও যখন বিজয়ী জাতিদের মধ্যে কেহই অস্ত্র সংযমন করিতে ভরসা করিতেছেন না, তখন এই যুদ্ধের অবসান হইয়া সম্পূর্ণ শান্তির সম্ভাবনা কোথায় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের ভাগ্য-বিধাতা বৃটিশ জাতির সহিত মার্কিণের প্রীতির সম্বন্ধ কত দূর গভীর তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। বৃটেনিয়ার শ্রমিক-কর্ণধার মিষ্টার এটলি মার্কিণে যাইয়া মার্কিণী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের গলা জড়াইয়া ধরিয়া যে প্রণয়-সঙ্গীতের আলোচনা করিতেছেন তাহাতে বিশ্বপ্রেমের ঝঙ্কার আছে,—খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রাতৃভাবের টঙ্কার আছে,—আর আছে কবি-কল্পনার কৌমুদীরাশি। কথার ভাঁওতায় বিশ্ব জয় করিবার এরূপ কৌশল রাজনীতি ক্ষেত্রেও অতি বিরল। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল মানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনে মার্কিণ কতটা পটু, তাহা নিগ্রোদের সহিত মার্কিণের ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশমান। অধিক দিনের কথা নহে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পোর্টো রিকো দ্বীপটিকে মার্কিণী সরকার খৃষ্টীয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই কি নিজ কুক্ষিগত করিয়াছিলেন? ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কি কারণে স্পেনের হস্তচ্যুত হইয়া মার্কিণের হস্তে আসিয়াছে? আবার এখন যে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের উপর মার্কিণী ঘাঁটি বসাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা কি মার্কিণের খৃষ্টীয় ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনের জন্য স্বার্থলেশহীন মানবপ্রীতির প্রচেষ্টা মাত্র? বৃটিশ শ্রমিক দলের ধ্বজাধারী মিষ্টার এটলি ইহার জবাব দিতে পারেন কি? অবশ্য যেখানে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, সেখানে পাল্টা জবাবে মার্কিণী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শ্রমিকদিগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে। ইহাই ত বিশিষ্ট রাজনীতি বা ডিপ্লোম্যাসী। এই সকল উক্তিতে কি বক্তাদিগের আন্তরিক মনোভাব প্রকাশ পায়?

অনেকেই বুঝেন বৃটিশ রাজনীতির সহিত মার্কিণী রাজনীতির প্রভেদ বিদ্যমান। সে প্রভিন্নতা কেবল কার্য্যগত বা শাসন-পদ্ধতিগত নহে—আদর্শগত। মার্কিণে সাম্রাজ্য-বিস্তারবিরোধী লোকের অভাব নাই,—বৃটিশ দ্বীপের শতকরা ১৫ জন সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ঝঞ্চাট পোহাইতে চাহে না,—তাঁহারা চাহে পশ্চাৎপদ জাতিদিগের ধনরত্ন উন্নত যান্ত্রিক শিল্পজ পণ্যের বিনিময়ে নির্ম্মম ভাবে আহরণ করিতে। এ বিষয়ে তাহারা কতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, তাহা বুঝা কঠিন। অথচ যিনি যখন মার্কিণের শাসন-তরণীর কাণ্ডারী হইবেন, তাঁহার এবং তাঁহার দলের প্রভাবে মার্কিণের রাজনৈতিক পদ্ধতি পরিচালিত হইবে। ইংলণ্ড বা বৃটিশ দ্বীপ চাহে বিদেশে রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক শাসন-ব্যবস্থা উভয়ই বজায় করিতে। বৃটিশ শ্রমিকগণ কখনই সর্ব্বভৌম সমাজতন্ত্র সমর্থন করিতে পারে না। তাহারা যে সমাজতন্ত্রের বুলি বলে, তাহা তাহাদের দ্বীপ মধ্যে আবদ্ধ। বৃটিশ দ্বীপের বাহিরে অন্যান্য জাতির পক্ষে তাহা প্রযোজ্য মনে করিলেও তাহারা প্রাণের দায়ে তাহা স্বীকার করিতে পারে না। কারণ বিদেশী অন্ন নহিলে তাহাদের জঠরাগ্নির নির্ব্বাণ হইতে পারে না। প্রত্যেক বৃটেনবাসী জানে যে যদি তাহাদিগকে বহিস্থ অধিকার পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সপ্তদশ শতাব্দীর দুর্দ্দশায় আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেই জন্য শ্রমিক দলের সাধারণ লোক হ্যারল্ড লাস্কি প্রভৃতির ন্যায় মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল বৃটিশ শ্রমিকদিগের কথায় কর্ণপাত করিতেছে না বা করিতে পারিতেছে না। অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন—"সকল দলের নেতারা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই যুদ্ধ হইয়াছে। এই কথাগুলির অর্থ যে কোন জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ বা জন্মের অপেক্ষা রাখে না। এই কথাগুলি বৃটিশ জাতি যদি পালন করিতে অবহেলা করেন, তবে গত ৬ বৎসর কাল আমরা যে সকল নরনারীকে জীবন দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম তাহাদের সকলের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।" কথাগুলি সত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত সুবিধা বা গরজকে উপেক্ষা করিয়া শাশ্বতী নীতি ধর্ম্মের বাণী শুনিতে চাহে না। একটা কথায় বলে—গরজ কি নেহি লাজ। অবশ্য সকল জাতিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতা দিলে জগতে আর যুদ্ধ সংঘটিত হইবার শঙ্কা থাকিতে পারে না। কিন্তু সাত মণ তেলও পুড়িল না রাধাও নাচিল না।

এখন দেখা যাউক, মার্কিণী জাতির সহিত বৃটিশ জাতির সখ্য-বন্ধনের দৃঢ়তা কত অধিক। উভয় জাতির মধ্যে মতভেদ আছে,—ইহা স্পষ্টতঃ প্রকাশমান। কিন্তু মতভেদ হইলেই যে মনোভেদ হইবে, আর মনোভেদ হইলেই যে যুদ্ধ ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। কেবল যেখানে পরস্পর স্বার্থরক্ষাকল্পে সম্মিলিত হয়, সেখানে যদি দুই বা ততোধিক জাতির মধ্যে কোন গুরু স্বার্থ লইয়া মনোভেদ ঘটে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই হউক বা সুদূর ভবিষ্যতেই হউক, তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

গত ২৪শে অক্টোবর মার্কিণের 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর নিন্দা করা হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছে যে বৃটিশ উপনিবেশবাদ মার্কিণী জাতিকে ব্যবসায়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এই উক্তিটি বাস্তবিক শঙ্কাজনক। কারণ যেখানে এক জাতি মনে করে অন্য জাতি তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছে,—সেইখানেই উভয়ের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার কারণ দুরন্ত বিস্ফোরক পদার্থের ন্যায় পলে পলে সঞ্চিত হইতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। বাণিজ্যগত স্বার্থ লইয়াই পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই যুদ্ধ বাধিয়া আসিতেছে। যুরোপীয় জাতিরা যখন বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিল তখন বাণিজ্যগত স্বার্থ লইয়াই তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল। ডুপ্লে ও ক্লাইভের লড়াই তাহারই অভিব্যক্তি। মালয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন এলাকায় ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক যে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রয়োজক কারণ বাণিজ্যগত স্বার্থ। কাজেই 'ওয়াশিংটন পোষ্টে'র এই উক্তি পড়িয়াই আমাদের মনে শঙ্কার সঞ্চার হয়, ঐ বুঝি আবার যুদ্ধ বাধে। কিন্তু যুদ্ধ এখন বাধিবে না, কারণ উভয় পক্ষই এখন রণশ্রান্ত এবং উভয় পক্ষেরই এখন একান্তভাবে সম্মিলিত থাকিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। উভয় দেশেই আভ্যন্তরিক গোলযোগ তথাকার শ্রমিক-বিক্ষোভেই পরিদৃশ্যমান।

এখন প্রধান কথা হইতেছে রুশিয়াকে লইয়া। রুশিয়ার রাজনৈতিক আদর্শ এবং লক্ষ্য অপর দুই বিজয়ী জাতি হইতে স্বতন্ত্র। রুশিয়া ধনিকতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের সমর্থন করে না বরং উহার ঘোর বিরোধী; গতপূর্ব্ব মহাযুদ্ধে যে নবীন রুশিয়ার জন্ম হইয়াছে,—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই রুশিয়া বিশেষ বলবান হইয়াছে। রুশিয়ায় শ্রমিক-চাঞ্চল্য নাই—আভ্যন্তরিক প্রজা-বিক্ষোভ নাই বলিয়া প্রকাশ। অবশ্য রুশিয়ার সমস্ত সংবাদ বাহিরে প্রকাশ পায় না। যাহা হউক, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ পাঠে যত দূর জানা যায় তাহাতে মনে হইতেছে,—ধনতান্ত্রিক বৃটেনিয়ার এবং মার্কিণের সহিত সাম্যবাদী রুশিয়ার নীতিঘটিত বিবাদ বাধিতেছে,—উহা এখন মন-কষাকষিতে পর্য্যবসিত হইতেছে। গত ২০শে অক্টোবর 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া'র রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহের ও সোভিয়েট ইউনিয়নের যে মন-কষাকষি চলিতেছিল, তাহা ক্রমশঃ চরম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পোলাণ্ডে রুশিয়া তাহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, ইংরেজ এবং মার্কিণী সরকারও তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে পূর্ণ সেনাবল সজ্জিত রাখিতেছেন। তাহার পর ২১শে অক্টোবর সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃটিশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ওলিফাণ্ট বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহৃত হইলে সভ্যতা লোপ পাইবে এবং বৃটিশ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইবে। এই বৃটিশ অধ্যাপকটি সাইক্লোট্রোণ যন্ত্র লইয়া পরমাণু বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। সুতরাং ইঁহার কথা উপেক্ষণীয় নহে। ইনি আরও বলিয়াছেন যে রুশিয়ার মধ্যে এরূপ শক্তি আছে যে, রুশিয়া অনুসন্ধান দ্বারা আণবিক বোমা সম্পর্কিত ব্যাপারে মার্কিণকে পশ্চাতে ফেলিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে। আবার এ কথা প্রকাশ পাইয়াছে, রুশিয়া বলিয়াছে মার্কিণী আণবিক বোমা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বোমা আবিষ্কার করা কঠিন নহে, ফলে আণবিক বোমা-রহস্য চিরকালই গোপন থাকিবে না।

সুতরাং আণবিক বোমার রহস্য গোপন রাখিলেই যে যুদ্ধ হইবে না তাহা মনে করা বাতুলতা। এখনই ইন্দোনেশিয়ায়, জাভায় এবং চীনে যুদ্ধ হইতেছে। একটা বিশেষ কথা এই যে, আণবিক বোমার রহস্য যতই গোপন রাখিবার চেষ্টা হইবে, ততই উহা জানিবার জন্য অন্য লোকের আগ্রহ বাড়িবে। খৃষ্টানরা বলিয়া থাকেন, ভগবান্ মানুষকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য সয়তান মানুষকে ঐ ফল খাইতে প্রলুব্ধ করিতে পারিয়াছিল। এ সয়তান আর কেহ নহে লোভ। আজ তাই সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া জগতে ভীষণ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা জাগিয়াছে। সভ্যতা বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা লয় পাইবে। তাই আজ গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার এট্‌লী মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার ট্রুম্যানকে ধরিয়া বসিয়াছেন যে, এই ভীষণ জীবসংহারক অস্ত্র যেন নরলোকে যুদ্ধার্থ ব্যবহৃত না হয়। মার্কিণ, বৃটেন এবং কানাডা এই ত্রিশক্তি মিলিয়া চুক্তি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মার্কিণ এ বিষয়ে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু বড় গরজ পড়িলে সে প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে কি? মনুষ্যত্বের খাতিরে এই পাশুপত অস্ত্র জাপানের উপর নিক্ষেপ করিতে মার্কিণ কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিল কি? এদিকে রুশিয়া তাহাকে দূরে রাখিয়া এই ত্রিশক্তি সম্মেলনে অসন্তুষ্ট এবং নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে! ইহা ভাল কথা নহে। সে অধিকতর উদ্যমের সহিত এ বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত। ফলে কি দাঁড়াইবে কে জানে?

এই বিজয়ী শক্তি তিনটির মধ্যে ভবিষ্যতে বিবাদ বাধিবার বীজ উপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা সত্য! কিন্তু তাই বলিয়া শীঘ্র যে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে তাহা মনে হয় না। কারণ ত্রিশক্তিই রণশ্রান্ত। রুশিয়া জার্ম্মাণ হস্তে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। বৃটেনের আর একটা ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সে এখন গঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহে। মার্কিণের ট্রুম্যান ধীরে ধীরে মার্কিণবাসীদের আস্থা হারাইতেছেন। কাজেই কেহই এখন হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে নামিবে না। তবে একটু দূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা যথাযথ ভাবে অনুমান করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদিগকে বলিতে হয়,—ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধের্ম্মনসি স্থিতম্।'

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রুতি-প্রসঙ্গে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত কলা বিদ্যাটি সম্বন্ধে এ দেশের জনসাধারণ যে ঠিক কতখানি অবহিতচিত্ত সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এমন কি গান গাওয়াই যাঁদের একমাত্র পেষা,—হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে,' সেই সব অতিখ্যাত ওস্তাদদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই যে সঙ্গীতশাস্ত্রের গোড়ার কথাটা জানেন না,—এমন কথাও আমরা প্রায়ই শুনতে পাই! কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এই সব অশিক্ষিত ওস্তাদদের উদ্দেশ্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে যে সব উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীত-সংস্কারক সাধারণকে সঙ্গীত-বোদ্ধা ক'রে তোলবার আশায় পুস্তক বা পত্রিকার মারফৎ কলম চালনা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন না,—সে প্রমাণও পাওয়া যায় ঐ পুস্তক বা পত্রিকা মারফৎই।

কথাটা একটু খুলে বলা দরকার।

পূজনীয়েরা বলেন, আমরা যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে ক্রমশই অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠ্‌ছি তার একমাত্র কারণ উচ্চশিক্ষার প্রেরণা। কিন্তু উচ্চশিক্ষা কথাটা, বর্ত্তমানে, সাধারণ অর্থে ইংরেজি শিক্ষাকেই বোঝায়। সুতরাং আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে সকল বিদেশী পণ্ডিত ইংরেজি ভাষায় বিবৃতি প্রকাশ করে গেছেন,—আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় শুধু সেই সব বিবৃতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়াই: কারণ ইংরেজিটা আমরা যেমন ভাল বুঝি নিজের দেশের প্রাচীন ভাষাটা তেমন বুঝি না। ফলে পরিচিত হই বিদেশী পণ্ডিতদেরই নানাবিধ মন্তব্যের সঙ্গে এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলি নিজেদের ধারণা।

বলা বাহুল্য, গোলযোগের সূত্রপাত হয় এইখান থেকেই। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের সাঙ্গীতিক ধারণা গড়ে তোলেন সেই সব বিদেশী পণ্ডিতের মন্তব্য থেকেই যাঁরা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মাত্র প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গীতকলাটি সম্বন্ধে দু'-চারটি মন্তব্য করে গেছেন। অথচ—Strangway, Capt. Day, Willard, Clement, Rev.

Popley প্রমুখ যে সব বিদেশী পণ্ডিত বিশেষ ভাবে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেই গ্রন্থ লিখে গেছেন, এ দেশের জনসাধারণের নিকট এমন কি অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটও তাঁরা পরিচিত নন।

কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যাটি শুধু গুরুমুখী বিদ্যাই নয়,—বেদের সহজাত বস্তু। সুতরাং এর গোড়ার কথাটা জানতে হলে আমাদের পক্ষে শরণ নেওয়া কর্ত্তব্য সেই জাতীয় গ্রন্থের যা দেব-ভাষায় লিখিত বা সেই শ্রেণীর লোকের যাঁরা এ দেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তথা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরূপে পরিচিত। কিন্তু এই দ্বিবিধ পন্থার কোনটাই আমরা গ্রহণ করতে পারি না; তার কারণ, প্রথমতঃ আমরা দেবভাষা বুঝি না বলেই ইংরিজির সাহায্য গ্রহণ করি; দ্বিতীয়তঃ ইংরেজি ভাষাভাষীদের মর্য্যাদা দিই বলেই এদেশীয় পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য দিতে পারি না!

অবশ্য এ কথা সত্য যে, বিদেশী পণ্ডিতগণের পক্ষে এদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহযোগিতা ব্যতীত ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন কিছু ধারণা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, যা কিছু তাঁদের সংস্কারের বিরোধী সে সম্বন্ধে যদৃচ্ছা বিরুদ্ধ মন্তব্য করতেও তাঁরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না।

বলা বাহুল্য, আমাদের জীবনে এই বিরুদ্ধ মন্তব্যগুলিই বিরাজ করে অখণ্ড যুক্তিরূপে এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মন্তব্যের বিরুদ্ধে এই যুক্তিগুলিকেই প্রয়োগ করি আমরা প্রধান অস্ত্র হিসাবে।

ফলে, এদেশের জনসাধারণকে আজ "হিন্দু-সঙ্গীতের" প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে অভিনব ব্যাখ্যা শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'বে,—কারণ এগুলি confirmed by the big guns of the Western Front। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের ৩৭ নম্বর গ্রন্থ—"হিন্দু সঙ্গীত" নামক পুস্তিকাখানির অন্যতম গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সাধারণের জ্ঞাতার্থে লিখছেন :—

"হিন্দু-সঙ্গীতের ক খ জিনিষটা কী?—বলছি।

আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যা, আমাদের সঙ্গীতেরও মূল তাই—অর্থাৎ শ্রুতি।

শুনতে পাই, এই শ্রুতি নিয়ে সঙ্গীতাচার্য্যের দল বহু কাল ধরে বহু বিচার ক'রে আসছেন, কিন্তু আজ-তক্ এমন কোন মীমাংসা করতে পারেননি, যাকে উত্তর বলা যেতে পারে,—অর্থাৎ যার উত্তর নেই।...

আমার মতে শ্রুতি হচ্ছে সেই স্বর যা কানে শোনা যায় না। যেমন দর্শন দেখবার জন্য দিব্যচক্ষু চাই, তেমনি শ্রুতি শোনবার জন্যে দিব্য-কর্ণ চাই।"—ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যার সংগ্রাহকবৃন্দ নিশ্চয়ই এমন অব্যবসায়ী নন্ যে কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখাবেন এবং প্রাচীন গ্রন্থকারও এমন উন্মাদ নন্ যে, যা তিনি নিজে বোঝেন না, তা অপরকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। অথচ যাঁদের আমরা অতীত বিলাসী বলে এড়িয়ে চলি, তাঁরা প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের এইরূপ সরল ব্যাখ্যা শুনেও স্তম্ভিত বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে যান্। এঁদের অভিমত :—

সকল শাস্ত্রের মূল বেদকে যে অর্থে শ্রুতি বলা হয়, তার সঙ্গে সঙ্গীতের শ্রুতির কোন সম্বন্ধই নেই। তাছাড়া হিন্দু-সঙ্গীতের ক খ-টা শ্রুতি নয়, নাদ। বৈদিক ঋষিগণ এই নাদ-ব্রহ্মের স্বরূপ অন্ততঃ পক্ষে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলেই,—বিবর্ত্তনবাদের ফলস্বরূপ,—বহু পরবর্ত্তী যুগের মার্গ সঙ্গীত বিশ্লেষণকারী,—অধুনালুপ্ত গান্ধর্ববেদ-প্রণেতা ভরত ঋষি কর্ত্তৃক নয়টি শ্রুতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর হ'য়েছিল।

প্রাচীনপন্থীদের এবম্বিধ বক্তব্যের বিরুদ্ধে অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, গান্ধর্ববেদের মতো কোন লুপ্ত গ্রন্থের দোহাই পাড়াটা যুক্তি নয়।

কিন্তু তাতেও এঁদের নিরস্ত করা যায় না। কারণ, হিন্দু-সঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সে যুগের গ্রন্থকারগণ এত বেশী পুঁথি-পত্র লিখে গিয়েছেন যে, তার অধিকাংশ লুপ্ত হ'য়ে গেলেও, আজও যা বর্ত্তমান আছে তার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। গান্ধর্ব্ববেদ লুপ্ত হ'য়ে গেছে সত্য; কিন্তু নাট্যশাস্ত্র আজও বর্ত্তমান। এই গ্রন্থটির মধ্যে শ্রুতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা না থাকলেও, সঙ্গীত রত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেব নিজের গ্রন্থের মধ্যে ভরত মতের কথা যেরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা ক'রে গেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্ব্বোপরি এই সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থটি থেকে এও জানা যায় যে, বিশ্লেষণের ফলে সেই সেই সময় শ্রুতির সংখ্যা ৯ স্থানে ২২ হ'য়েছিল এবং সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞগণ সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞও ছিলেন।

এমন কি, এ কথাও যদি কেউ বলেন যে, প্রাচীন অর্ব্বাচীনেরা শ্রুতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বা একালের কোন ওস্তাদ শ্রুতি সম্বন্ধে কিছু বোঝেন,—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। কারণ, যা আমরা (উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরূপে যাঁরা আজ সঙ্গীতের সংস্কার সাধনে উদ্যত) বুঝি না, তার অস্তিত্বই থাকতে পারে না। তার উত্তর এই যে :—

প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিলেও এ যুগের ওস্তাদগণও যে শ্রুতি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নন, সে সংবাদ সঙ্গীত-শিক্ষার্থীমাত্রেই রাখেন। চর্চ্চার অভাবে প্রাচীন যুগের অনেক রাগ লুপ্ত হ'য়ে গেলেও, দরবারি তোড়ি-মূলতান প্রভৃতি এমন অনেক রাগ আজও প্রচলিত রয়েছে, যার রূপ বিস্তার করা সম্ভবপর হয় শুধু ঐ শ্রুতিরই হেরফেরে। দরবারি তোড়ি ও মূলতান, উভয় রাগেই ব্যবহৃত হয় একই সপ্তক,—সা ঋা জ্ঞা হ্মা পা দা না। কিন্তু মূলতানের গান্ধার যেমন তীব্র কোমল, দরবারি তোড়ির গান্ধার তেমনি অতি কোমল। সুতরাং একই স্বরের মধ্যে এইরূপ অতি-মধ্য-তীব্র প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার করার দ্বারা এই সত্যই প্রকটিত হয় যে, এ যুগের সঙ্গীতজ্ঞদের পক্ষে সে যুগের বাইশ শ্রুতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভবপর না হ'লেও ব্যাপারটা যে তাঁরা স্থূল ভাবেও কিছুটা বোঝেন, তাতে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে এও বলা যায় যে, সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই শ্রুতি সম্বন্ধে একটা—অন্ততপক্ষে স্থূল সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হ'তে পারে। যাঁরা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের লেখার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অবশ্যই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। উদাহরণস্বরূপ শেষোক্ত ভদ্রলোকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকের মতো ইনিও গান গাইতে পারেন না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববিখ্যাত লোকের সাঙ্গীতিক অভিমতও অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করে, ইনি বলেছিলেন, শ্রুতি আমি বুঝি। ব্যাপারটা "স্বর ও সঙ্গতী" গ্রন্থে লেখা আছে। প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের শ্রুতি সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করব।

সাংখ্যকারিকায় বেদান্ত

দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য

শ্রীচিদ্ঘনানন্দ স্বামী

সকল দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য দুইটি। তন্মধ্যে যাহা প্রথম ও প্রধান তাহা মুক্তি, এবং যাহা দ্বিতীয় ও গৌণ বা আনুষঙ্গিক তাহা জগৎ-কারণনির্ণয়। এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও মতভেদ নাই। যাহা কিছু মতভেদ তাহা পথে বা উপায়ে।

যেমন মুক্তি বিষয়ে দেখা যায়, সাংখ্যমতে ২৫টি তত্ত্বের জ্ঞানে মুক্তি অথবা প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানে মুক্তি, পাতঞ্জল যোগমতে ২৬ তত্ত্বের জ্ঞানে মুক্তি, অথবা ঈশ্বরানুগ্রহসহকৃত প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানে মুক্তি। ন্যায়মতে ১৬টি পদার্থের জ্ঞানে মুক্তি, অথবা আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান সহকৃত আত্মজ্ঞানে মুক্তি। বৈশেষিক মতে সপ্ত পদার্থের জ্ঞানে মুক্তি, অথবা ন্যায়মতের অনুরূপ আত্মজ্ঞানে মুক্তি। বেদান্তমতে যাবদ্ দৃশ্য বস্তু মিথ্যা—এই জ্ঞান সহকৃত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞানে মুক্তি। মীমাংসার মতে বন্ধে মুক্তি, অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা ভোগ্যবস্তুলাভ এবং তদনন্তর ভোগ সমাপ্ত করিয়া বাসনাশূন্য হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

এইরূপ সকল দর্শনের লক্ষ্য এক মুক্তি হইলেও তাহাদের উপায়ে বা সাধনে তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তদ্রূপ দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত অথবা দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদী উপাসকগণের মতেও উপাস্য ভগবানের জ্ঞানের ফলে যে উপাসনা হয়, সেই উপাসনার ফলে ভগবৎ-কৃপালাভ, আর সেই ভগবৎকৃপার ফলে মুক্তি স্বীকার করা হয়।

তদ্রূপ অবৈদিক বৌদ্ধ জৈন চার্ব্বাক নাস্তিক প্রভৃতি সকলেই মুক্তি চাহেন, আর তাঁহাদের মতেও সেই মুক্তি জ্ঞানদ্বারাই সম্ভব হয়, অন্য উপায়ে নহে। ফলতঃ, সকলের মতে জ্ঞানেই মুক্তি, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানদ্বারা হউক, অথবা কর্ম্ম উপাসনাদি পরম্পরায় হউক, তাহাতে কোন মতভেদ নাই।

তাহার পর এই মুক্তির মধ্যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিও সকলেরই অভীষ্ট। বেদান্তমতে কিন্তু দুঃখনিবৃত্তির সঙ্গে পরমানন্দপ্রাপ্তিও স্বীকার করা হয়। সাংখ্যমতে বা অন্য কতিপয় দার্শনিকমতে কিন্তু পরমানন্দপ্রাপ্তি মুক্তিতে স্বীকার করা হয় না।

এইরূপে মুক্তির স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, সকলের মতেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, সেই হেতু অজ্ঞানই বন্ধন—ইহাই সিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে সকল দর্শনের একবাক্যতা সিদ্ধ হয়। বিবাদ কেবল পথে বা উপায়ে। ইহা হইল সকল দর্শনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

অতঃপর সকল দর্শনের দ্বিতীয় লক্ষ্য—জগৎকারণনির্ণয়। কারণ, জগৎকারণ নির্ণীত হইলে আমাদের শক্তি সামর্থ্য এতই বৃদ্ধি পাইতে পারে যে, আমরা প্রায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিব। সুতরাং আমরা আমাদের সুখ ও দুঃখের প্রকৃত মূল কারণই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। কারণ, আমাদের যে সুখদুঃখ তাহার সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কারণ—এই জগৎ বা এই জগতের পদার্থসমূহই হইয়া থাকে, ইহাই দেখা যায়। আর সুখ ও দুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে দুঃখবিনাশের ও সুখলাভের বিবিধ অভিনব উপায় আবিষ্কার করিতে পারিব। এমন কি, পরিশেষে জগৎই যদি আমাদের দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে জগৎকারণের জ্ঞানের বলে আমরা জগতের আবির্ভাব, তিরোভাব ও পরিবর্ত্তন সাধনেও সমর্থ হইব। যেহেতু, কারণের জ্ঞানেই কার্য্যের নিয়ন্ত্রণ করিবার সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে। আর তাহার ফলে আমরা আমাদের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারিব। আর জগৎ যদি দুঃখের কারণ না হয়, কিন্তু জগৎ-সম্বন্ধিত আমাদের ব্যবহারই দুঃখের কারণ হয়, সুতরাং যদি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভবপরই না হয়, তাহা হইলে তাহাও যথাসম্ভব আমরা করিতে পারিব। এই কারণে সকল দার্শনিকই কার্য্যকারণনির্ণয় অথবা জগৎকারণনির্ণয়ে তৎপর হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, কারণের জ্ঞান না থাকিলে কার্য্যনিয়ন্ত্রণ কেহই সমর্থ হয় না। যেমন রোগের কারণ নির্ণীত না হইলে রোগ নিবারণ করিতে পারা যায় না। যেমন সাংসারিক দুঃখের কারণ, দারিদ্র্য নিবারণ করিতে না পারিলে সাংসারিক সুখ সম্পাদন করিতে পারা যায় না। যেমন জাতীয় সুখ দুঃখের কারণ পরাধীনতা দূর করিতে না পারিলে জাতীয় অভ্যুদয় সাধিত হইতে পারে না। তদ্রূপ জাগতিক বস্তুর মধ্যে কার্য্যকারণনির্ণয় এবং পরিশেষে জগৎকারণনির্ণয় করিতে না পারিলে আমরা আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না। এই কারণে সকল দার্শনিকেরই দ্বিতীয় বা গৌণ লক্ষ্য জগৎ-কারণনির্ণয় করা।

এইরূপে মুক্তি ও জগৎকারণনির্ণয়—এই দুইটিই সকল দার্শনিকেরই লক্ষ্য হইয়া থাকে। পরিণামে এই দুইটি লক্ষ্যই একটি লক্ষ্যেই পরিণত হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয় সকল দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য।

বেদই সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার

এখন মানব জাতির আদি জ্ঞানভাণ্ডার বেদ। বেদ সম্বন্ধে শুকানুপ্রশ্নে (বঙ্গবাসী মহাঃ ১৬৩৫ পৃষ্ঠায়) ২৩১ অধ্যায়ে আছে—

> অনাদিনিধনা বিদ্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
> আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥৫৭
> ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ।
> নামরূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্ ॥৫৮
> বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নিম্মিমীতে স ঈশ্বরঃ।
> নামধেয়ানি চর্ষীণাং যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ।
> শর্ব্বর্য্যন্তে সুজাতানাম্ অন্যেভ্যো বিদধাত্যজঃ ॥৫৮

ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। তথায় "বিদ্যা" শব্দের স্থলে "নিত্যা" এবং "বেদময়ী" শব্দের স্থলে "বেদময়ী" ইত্যাদি পাঠভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত আর একটি শ্লোক দেখা যায়।

> "সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
> বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের এই যাহা কিছু ব্যবহার, শব্দ দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে, সে সমুদায়ই বেদের শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন হইতেছে। বেদের ভাষাই আমরা সংস্কার করিয়া ব্যবহার করিতেছি, আর তাহারই নাম দিয়াছি সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষা ঈশ্বর তুল্য নিত্যা।

অন্যত্র গোকপিলীয় সংবাদে ২৬১ অধ্যায় ৪৩ শ্লোকে আছে (২৬৮১ পৃ বঙ্গবাসী-সং)

> "সর্ব্বং বিদুর্ব্বেদবিদো বেদে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
> বেদে হি নিষ্ঠা সর্ব্বস্য যদ্যদস্তি চ নাস্তি চ ৪৩।

ইহার তাৎপর্য্য, যিনি বেদবিৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। বেদে সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। বেদেই সকলের নিষ্ঠা। যাহা আছে বা যাহা নাই সকলেরই নিত্যরাং স্থিতি বেদেই। (এতদ্ভিন্ন "বেদ মানিব কেন" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যদর্শনই আদিদর্শন

সেই বেদ হইতে সকল দর্শনশাস্ত্র বা যাবতীয় দার্শনিক মতবাদ সাক্ষাৎ ভাবেই হউক, বা পরম্পরায় হউক, উদ্ভূত হইয়াছে।

[illegible] পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদসমূহের মূলও বেদমধ্যেই দৃষ্ট হয়। [illegible], ভাষা ও ব্যবহারশিক্ষার মূলই বেদ। আর সেই বেদানুসারেই আদিবিদ্বান্ আজন্মসিদ্ধ পরমর্ষি কপিলের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত সাংখ্যদর্শনকেই অনেকে আদি দর্শনশাস্ত্র বলিয়া থাকেন।

ইহারও কারণ—বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বেদব্যাস স্বমতস্থাপনের জন্ম অর্থাৎ বেদান্তমত স্থাপনের পর পরমতখণ্ডনের প্রসঙ্গে সাংখ্যমতকেই প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়ে আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিয়াছেন—দেখা যায়। ন্যায় এবং যোগ প্রভৃতি অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের খণ্ডনের জন্ম সেরূপ যত্ন করেন নাই। বস্তুতঃ, সাংখ্যমত হইতে যে সকল মতের উদ্ভব, উহাই যে আদিদর্শন, তাহাও মহাভারতেই কথিত হইয়াছে, যথা—মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে—

"জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র।
(৩০১ অঃ ১০৮ শ্লোঃ)
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে।
জ্ঞানং চ লোকে যদ্ ইহাস্তি কিঞ্চিৎ
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্ মহাত্মন্। (৩০১ অঃ ১০৯ শ্লোঃ)
নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।"
(৩১৬ অঃ ২ শ্লোঃ)

এইরূপ বহু শ্লোক সাংখ্য সম্বন্ধে মহাভারতে দৃষ্ট হয়। কপিল ব্রহ্মার মানস পুত্র, সৃষ্টির আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা "কপিল" শব্দে হিরণ্যগর্ভকেই বুঝায়—এই জন্যও তাঁহাকে আদিবিদ্বান্ বলা হয় এবং তাঁহার দর্শনকে আদিদর্শন বলা হয়। ব্যাসভাষ্যের ১।২৫ সূত্রে কপিলকে আদিবিদ্বান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তম্ অধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিঃ আসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ (১।২৫)

সাংখ্যসিদ্ধান্তের উপযোগিতা

এই জন্য সকল দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্যভূত মুক্তিরূপ লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে আদিদর্শন সাংখ্য শাস্ত্রের কি সিদ্ধান্ত, তাহা এ স্থলে আমাদের সর্বাগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক। অধিক কি, যাঁহারা বেদান্তসিদ্ধান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদেরই এই সাংখ্যমতের জ্ঞান প্রথমেই আবশ্যক হয়। আর তজ্জন্য বর্ত্তমানে যাহা সাংখ্যমতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ, যাহা মহর্ষি ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যামুখে বেদান্তমতের তুলনা করা যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে সাংখ্যকারিকা যেন প্রকারান্তরে বেদান্তসিদ্ধান্তই বিবৃত করিতেছে। গীতা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের বহু স্থানে সাংখ্য শব্দের অর্থ "বেদান্তই" করা হইতেছে। এজন্য সাংখ্যকারিকা মধ্যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত যে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

সাংখ্যশাস্ত্রের পরিচয়

কিন্তু সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের সাংখ্যশাস্ত্রের পরিচয় কিছু লাভ করা উচিত। কারণ, সাংখ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় বহু আছে। যেহেতু ইহার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—ইহার আবির্ভাবকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার বহু পরিবর্ত্তন বা রূপভেদ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় দেখিলেই পাওয়া যায়। তথায় পঞ্চশিখ, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীষ্ম, কপিল, বৈশম্পায়ন এবং রুদ্র প্রভৃতি সকলেই অল্পবিস্তর বিভিন্ন সাংখ্য মতেরই বিষয় বলিতেছেন। এ জন্য ২১৮ অঃ হইতে ৩৫২ অঃ মধ্যে ২১টি অধ্যায়ে ১টি উপাখ্যান দেখা যায়।

বস্তুতঃ, মহাভারত অপেক্ষা সাংখ্যশাস্ত্রের প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। কেবল সাংখ্যশাস্ত্র কেন, কলিযুগ আরম্ভের পূর্ব্বে ভারতে কত কি ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার ইতিহাস মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর আমাদের নাই। কথায় বলে—যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে। যাহা হউক, এখন যাহা সাংখ্যমতের প্রাচীন প্রামাণিক বলিয়া পৃথক্ গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা মহাত্মা ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকা। ইনি সাংখ্যমতের প্রবর্ত্তক পরমর্ষি কপিলের শিষ্য যে আসুরি সেই আসুরির শিষ্য যে পঞ্চশিখ, সেই পঞ্চশিখের শিষ্য। ইঁহার কারিকায় যে আত্মপরিচয় আছে তাহা দেখিলে মনে হয়, ইনি পঞ্চশিখের সাক্ষাৎ শিষ্য। ইনি পঞ্চশিখের বিস্তৃত ষষ্টীতন্ত্র নামক গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া সাংখ্যকারিকা রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ সাংখ্যমতবর্ণনা কালে মহাভারত এবং তৎপরে এই সাংখ্যকারিকার বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ জন্য সাংখ্যকারিকার বাক্য বেদান্তদর্শন শাঙ্করভাষ্য ১।৪।৮ ও ১।৪।১১ সূত্রে এবং মহাভারতের সাংখ্যমত বেদান্তদর্শন ২।১।১ সূত্রে দেখা যায়।

অতঃপর কপিলের সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যদর্শন বলিয়া যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাকে আর কপিলের প্রণীত গ্রন্থ না বলাই উচিত। আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার ভাষ্যরচনাকালে বলিয়াছেন—

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।"

অর্থাৎ জ্ঞানরূপ চন্দ্রমা কালরূপ সূর্য্যের দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে। তাহার এক কলা অর্থাৎ ষোল ভাগের এক ভাগ বর্ত্তমান, আমি অমৃতময় বাক্য দ্বারা তাহার ১৫ ভাগ পূর্ণ করিতেছি। অতএব ইহা মহাত্মা বিজ্ঞানভিক্ষুরই কীর্ত্তি বলাই ভাল। ইহার সূত্রগুলির অধিকাংশ সাংখ্যকারিকার শ্লোকের অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। তাহার পর এই সাংখ্যসূত্রের মধ্যে একটি সূত্রে পঞ্চশিখের নামই রহিয়াছে যথা—"আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখ," ৫।৩২ এখন এই সাংখ্যসূত্র যদি কপিলের রচিত হইত, তাহা হইলে কপিল কি তাঁহার প্রশিষ্যের নাম করিয়া সূত্র রচনা করিতেন? এ জন্য এ গ্রন্থ কপিলের নয়। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের কোনও সূত্র কোন প্রাচীন আচার্য্য যথা বাচস্পতি মিশ্র উদয়ন শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কেহই উদ্ধৃত করিতেছেন, ইহা দেখা যায় না। অতএব সাংখ্যকারিকার ন্যায় ইহা প্রামাণ্য নহে এবং তদপেক্ষা ইহা প্রাচীনও নহে।

তাহার পর সাংখ্যমতে অপর একখানি প্রাচীন গ্রন্থের কথা শুনা যায়। ইহার নাম তত্ত্বসমাসসূত্র। অনেকে মনে করেন, ইহাই আদি কপিলের রচিত। কিন্তু ইহাতে কোন বলবৎ প্রমাণ নাই। ইহার সূত্রের সংখ্যা মোট ২২টি। ইহাতে কেবল তত্ত্বগুলির নাম ও বিভাগ মাত্র নির্দ্দেশ আছে। ইহা হইতে সাংখ্য মত আবিষ্কার করা অসম্ভব। অতএব সাংখ্যকারিকাই এ জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ইহা হইতে প্রাচীন ও প্রামাণিক একমাত্র মহাভারতই বলা যাইতে পারে। [ক্রমশঃ।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বিশ্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাসমরও অবশেষে শেষ না হইয়া পারে নাই। আজ না হউক, কাল হইলেও আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সস্তা না হইয়া পারিবে না, এই আশায় জনসাধারণও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। যুদ্ধের পরে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে, মহাসমরের অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারতের শিল্পপতি এবং বাণিজ্যপতিরা এই আশা পোষণ করিয়াছেন। মহাযুদ্ধের অবসানে তাঁহাদের সেই আশা পূর্ণ হইবার কতখানি সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, যুদ্ধকালীন ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা হইতে তাহা কতকটা অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিতে পারি। যুদ্ধোত্তর বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের স্থান কোথায়, যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গঠনবিন্যাস (composition) এবং গতি-প্রকৃতি (direction) হইতে তাহার কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই দিক্ হইতে ভারতের যুদ্ধকালীন বহির্ব্বাণিজ্যকে বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমে ভারতের মোট বহির্ব্বাণিজ্য, মোট আমদানি ও রপ্তানি এবং বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত বা মুনাফা (balance of trade) সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা আবশ্যক। নিম্নে ১নং তালিকায় যুদ্ধপূর্ব্ব বৎসর এবং যুদ্ধের বৎসরগুলিতে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের হিসাব প্রদত্ত হইল এবং ২নং তালিকায় উল্লিখিত বৎসরগুলিতে ভারতের মোট বহির্ব্বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তের হিসাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

১নং তালিকা— কোটি টাকার হিসাবে মূল্য

বৎসর	আমদানি	রপ্তানি (পুনঃ রপ্তানি সহ)
১৯৩৮-৩৯ (যুদ্ধপূর্ব্ব বৎসর)	১৫২.৩২	১৬৯.২১
১৯৩৯-৪০	১৬৫.২৯	২১৩.৫৭
১৯৪০-৪১	১৫৬.৯৭	১৯৮.৭১
১৯৪১-৪২	১৭৩.৩০	২৫৯.৯১
১৯৪২-৪৩	১১০.৫০	১৯৪.৭০
১৯৪৩-৪৪	১১৯.৭৭	২০৯.৯৯
১৯৪৪-৪৫	২০০.৯৮	২২৭.৭৩
১৯৪৫-৪৬ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাস	১৪২.২৬	১৩৭.৭৯

২নং তালিকা— কোটি টাকার হিসাবে

	মোট বহির্ব্বাণিজ্য	উদ্বর্ত্ত
১৯৩৮-৩৯ (যুদ্ধপূর্ব্ব বৎসর)	৩২১.৫৩	+ ১৬.৮৯
যুদ্ধ বৎসর—		
১৯৩৯-৪০	৩৭৮.৮৬	+ ৪৮.২৮
১৯৪০-৪১	৩৫৫.৬৮	+ ৪১.৭৪
১৯৪১-৪২	৪৩৩.২১	+ ৭৯.৬১
১৯৪২-৪৩	৩০৫.২০	+ ৮৪.২০
১৯৪৩-৪৪	৩২৯.৭৬	+ ৯০.২২
১৯৪৪-৪৫	৪২৮.৭১	+ ২৬.৭৫
১৯৪৫-৪৬ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাস	২৮০.০৫	—৪.৪৭

উল্লিখিত তালিকা দুইটি হইতে দেখা যায়, প্রাক্‌যুদ্ধ বৎসর ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় যুদ্ধের বৎসরগুলিতে ভারতের মোট বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে শুধু এক ১৯৪২-৪৩ সাল ছাড়া এবং আমদানির মোট মূল্যও ১৯৪২-৪৩ সাল ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু রপ্তানির মূল্য ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় যুদ্ধের প্রত্যেকটি বৎসরেই বেশী হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানির মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত বৃদ্ধি চরমে উঠিয়াছে [illegible] ৪৩-৪৪ [illegible]। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, বাণিজ্যিক [illegible] ৪৪ [illegible] ৯২.২২ কোটি টাকা হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে [illegible] কোটি টাকায় আসিয়া নামিয়াছে। তথাপি উহা [illegible] সালের বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তের দ্বিগুণের প্রায় কাছাকাছি। উল্লিখিত তালিকা দুইটি হইতে আরও দেখা যায় যে, যুদ্ধপূর্ব্ব বৎসর ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি শতকরা ৪৬ ভাগ এবং ভারতে বিদেশী পণ্যের আমদানি শতকরা ৩২ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। রপ্তানি বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় ১৯৪৪-৪৫ সালে। কিন্তু এই আলোচনা হইতে ভারতের যুদ্ধকালীন বহির্ব্বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাস (composition) সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারা যায় না। উহা হইতে শুধু এইটুকু ধারণাই আমাদের জন্মিতে পারে যে, যুদ্ধের সময় ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য বিপুল ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া ভারতের অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে,—এই বৃদ্ধিটা রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতই নিছক মায়া, না উহার প্রকৃত সত্তা কিছু আছে তাহা জানিতে হইলে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের আরও গভীরতর প্রদেশে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে।

আমরা এতক্ষণ শুধু মূল্যের দিক্ হইতেই ভারতের যুদ্ধকালীন বহির্ব্বাণিজ্যের আলোচনা করিয়াছি। যুদ্ধের সময় সকল দেশেই উৎপাদন-ব্যয় খুব বাড়িয়া গিয়াছে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও। কাজেই জিনিষপত্রের দামও বাড়িয়াছে। ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধির মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি কতখানি প্রতিফলিত রহিয়াছে এবং আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রতিফলিত হইয়াছে কতখানি তাহা না জানিলে ভারতের যুদ্ধকালীন বহির্ব্বাণিজ্যের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। মূল্যের দিক্ দিয়া যুদ্ধের সময়ে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি উভয় বাণিজ্যই যে ১৯৩৮-৩৯ সনের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা উল্লিখিত দুইটি তালিকায় আমরা দেখিয়াছি। বহু বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হয়। উহাদের পরিমাণ হিসাব করিবার মাপকাঠিও বিভিন্ন রকমের। এই জন্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের পরিমাণের কোন তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, মূল্যের দিক্ দিয়া আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য উভয়ই বৃদ্ধি পাইলেও পরিমাণের দিক্ দিয়া উভয়েরই হ্রাস হইয়াছে। পরিমাণের দিক্ হইতে যুদ্ধের প্রথম বৎসর ১৯৩৯-৪০ সালের রপ্তানি বাণিজ্য ১৯৩৮-৩৯ সালের সমানই ছিল। উহার পর হইতে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে এবং কমিতে কমিতে ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রাক্‌যুদ্ধ বৎসরের শতকরা ৫৩ ভাগে নামিয়া আসে। এত কম যুদ্ধের আর কোন বৎসর হয় নাই। আমদানির পরিমাণ প্রাক্‌যুদ্ধ বৎসরের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে যৎসামান্য বৃদ্ধি পাইলেও উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। অতঃপর আমদানির পরিমাণ কমিয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রাক্‌যুদ্ধ বৎসরের শতকরা [illegible]

ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের পরিমাণের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতের যুদ্ধকালীন অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তের বৃদ্ধিটা রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে যতটা অর্জ্জিত না হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী অর্জ্জিত হইয়াছে আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণের হ্রাস হইতে। ১৯৪৪-৪৫ সালে বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তের হ্রাসের পরিমাণ হইতে এই সত্যটিকে খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি। ২নং তালিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য ছিল ৩২৭·৭৬ কোটি টাকা। ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪২৮·৭১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মোট বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে ১০০·৯৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বাণিজ্য শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের বৃদ্ধির জন্যই যদিও এই বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমদানি শতকরা ৭০ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু রপ্তানি শতকরা ৬ ভাগের বেশী বাড়ে নাই। কাজেই মোট বাণিজ্য শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াও বাণিজ্যিক অনুকূল উদ্বর্ত্ত ৯২·২২ কোটি টাকা হইতে একেবারে ২৬·৭৫ কোটি টাকায় আসিয়া নামিয়াছে।

ভারতের যুদ্ধকালীন আমদানি বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কতগুলি পণ্যের আমদানি বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল তৈয়ারী পণ্য। যুদ্ধের সময় তৈয়ারী পণ্যের আমদানি বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তৈয়ারী পণ্যের পরেই ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান কাঁচা মালের। ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে দ্রব্য উৎপাদনের উপাদানস্বরূপ অনেক রকমের কাঁচা মাল ভারতে আমদানি করিতে হয়। যুদ্ধের সময় কাঁচা মালের আমদানি বৃদ্ধি ভারতের যুদ্ধকালীন আমদানি-বাণিজ্যের একটা প্রধান বিশেষত্ব। কাঁচা মালের পরেই খাদ্যজাতীয় দ্রব্যের আমদানির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। খাদ্যশস্য, ডাল এবং ময়দা এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে আমদানি-খাদ্যের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। যুদ্ধের সময় খাদ্যশস্যের আমদানি হ্রাস যুদ্ধকালীন ভারতীয় আমদানি বাণিজ্যের আর একটি অন্যতম বিশেষত্ব। ভারতের যুদ্ধকালীন আমদানি-বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাস বুঝিবার জন্য তৈয়ারী পণ্য এবং কাঁচা মাল আমদানির একটি হিসাব ৩ নং তালিকায় দেওয়া হইল।

৩নং তালিকা—

বৎসর	কোটি টাকায় মূল্য তৈয়ারী পণ্য	কাঁচা মাল
১৯৩৭-৩৮	১০৮·১০	৪০·১০
১৯৩৮-৩৯	৯২·৭০	৩৩·২০
১৯৩৯-৪০	৯১·৮০	৩৬·১০
১৯৪০-৪১	৮১·৫০	৪২·১০
১৯৪১-৪২	৯৩·৭০	৫০·০০
১৯৪২-৪৩	৪১·৬০	৫১·১৫
১৯৪৩-৪৪	৪৫·১২	৬৪·০৮
১৯৪৪-৪৫	৬২·৬৪	১১৭·২৬

৩ নং তালিকা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে তৈয়ারী পণ্যের যে প্রাধান্য প্রাক্যুদ্ধ যুগে ছিল যুদ্ধের সময়ে [illegible] অধিকার করিয়াছে কাঁচা মাল। তৈয়ারী পণ্যের আমদানি ১৯৩৭-৩৮ সালে ১০৮·১০ কোটি টাকা হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে একেবারে ৪৫·১২ কোটি টাকায় নামিয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে তৈয়ারী পণ্যের আমদানি হঠাৎ খুব বেশী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে তৈয়ারী পণ্যের আমদানি হ্রাস পাইয়া ৮১·৫০ কোটি টাকা হইলেও ১৯৪১-৪২ সনে আবার ৯৩·৭০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইউরোপীয় যুদ্ধে ১৯৪০-৪১ সালটি মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। ১৯৪১ সালে জুন মাসে জার্ম্মাণী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করায় মিত্রশক্তিবর্গ ১৯৪১-৪২ সালে একটু শ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে তৈয়ারী পণ্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া ৬২·৬৪ কোটি টাকা হইলেও ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় এবং মোট আমদানি-বাণিজ্যের তুলনায় উহা অনেক কম। ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট আমদানি-বাণিজ্যের শতকরা ৬২ ভাগই ছিল তৈয়ারী পণ্য। কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে তৈয়ারী পণ্য আমদানি হইয়াছে মোট আমদানির শতকরা ৩১·৫ ভাগ মাত্র। তৈয়ারী পণ্যের আমদানি হ্রাস হওয়ার কারণ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা কেহই পোষণ করেন না। যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও প্রসার হওয়ায় তৈয়ারী পণ্যের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে, এইরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। যে-সকল শিল্পপ্রধান দেশ হইতে ভারতে তৈয়ারী পণ্য আমদানি হইয়া থাকে সেই সকল দেশের মধ্যে জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপান শত্রুদেশে পরিণত হওয়ায় ঐ সকল দেশ হইতে তৈয়ারী পণ্য আমদানি বন্ধ হইয়া যায়। মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির উৎপাদন-শক্তি সমর-উপকরণ নির্ম্মাণে বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হওয়ায় ঐ সকল দেশ হইতেও তৈয়ারী পণ্য ভারতে আমদানি করা সম্ভব হয় নাই। ইহাই তৈয়ারী পণ্যের আমদানি হ্রাস হওয়ার অন্যতম কারণ, একথা বলিলে একটুকুও ভুল হয় না। যুদ্ধের জন্য জাহাজ পাওয়ার অসুবিধাকে আর একটি কারণ বলা যাইতে পারে।

তৈয়ারী পণ্যের আমদানি হ্রাস সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমদানিকৃত তৈয়ারী পণ্যগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) ব্যবহার্য্য পণ্য এবং (২) মূল পণ্য বা কলযন্ত্র ইত্যাদি। যুদ্ধের মধ্যে মূল পণ্য অর্থাৎ কলযন্ত্র ইত্যাদির আমদানি হ্রাস ভারতের যুদ্ধকালীন আমদানি বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন। যুদ্ধের মধ্যে কলযন্ত্র ইত্যাদির আমদানি কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে, নিম্নের ৪ নং তালিকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৪নং তালিকা—

বৎসর	কলযন্ত্র ইত্যাদির আমদানি (কোটি টাকায় মূল্য)
১৯৩৮-৩৯ (প্রাক্যুদ্ধ বৎসর)	১৯·৭২
যুদ্ধ বৎসর:—	
১৯৩৯-৪০	১৫·৩৭
১৯৪০-৪১	১০·৫৩
১৯৪১-৪২	১৩·৭১
১৯৪২-৪৩	১১·৮৩
১৯৪৩-৪৪	১১·৫০
১৯৪৪-৪৫	১৩·২১

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায়, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই কলযন্ত্র ইত্যাদির আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে মাত্র ১০'৫৩ কোটি টাকা মূল্যের কলযন্ত্র আমদানি হয়। ১৯৪১-৪২ সালে আমদানি কিছু বাড়িলেও ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে আবার হ্রাস পায়। যুদ্ধ-বৎসরগুলির মধ্যে ১৯৪৪-৪৫ সালেই কলযন্ত্র আমদানির মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইলেও উহা প্রাক্‌যুদ্ধ বৎসরের তুলনায় তিন কোটি টাকারও অধিক কম। যুদ্ধের সময়ে কলযন্ত্র ইত্যাদির দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এই বর্দ্ধিত দামের কথা বিবেচনা করিলে শুধু মূল্য দ্বারা কলযন্ত্রের আমদানি হ্রাসের পরিমাণ অনুমান করা কঠিন। কিন্তু কলযন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি এবং মূল্যের দিক্ হইতে আমদানি হ্রাস, এই দুইটি বিষয় একসঙ্গে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় যুদ্ধের সময়ে কলযন্ত্রের আমদানি প্রকৃত পরিমাণের দিক্ হইতে অনেক বেশী কম হইয়াছে। কলযন্ত্রের আমদানি সম্পর্কে আরও একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মোটের উপর কলযন্ত্রের আমদানি কম হইলেও সমর-উপকরণ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আমদানি অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়াছে।

কাঁচা মালের আমদানির হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯৩৭-৩৮ সাল অপেক্ষা ১৯৩৮-৩৯ সালে কাঁচা মালের আমদানি ৭.৭০ কোটি টাকা কম হইয়াছে। শেষোক্ত বৎসরে আমদানি পণ্যের মোট মূল্য ছিল ১৫২'৩২ কোটি টাকা। সুতরাং ঐ বৎসর মোট আমদানির শতকরা ২২ ভাগ মাত্র ছিল কাঁচা মাল। যুদ্ধের বৎসরগুলির প্রতি-বৎসরেই কাঁচা মালের আমদানি ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ১১৭.১৭ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা মাল আমদানি হয়। উহা ১৯৩৭-৩৮ সালে কাঁচা মালের আমদানি মূল্যের তিন গুণের কাছাকাছি। ১৯৪৪-৪৫ সালে ২০০'১৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছিল। সুতরাং ঐ বৎসর মোট আমদানির শতকরা ৫১ ভাগ কাঁচা মাল আমদানি হইয়াছে। ভারতীয় কতগুলি শিল্পের উপাদান হিসাবে কাঁচা মাল আমদানি হইয়া থাকে বলিয়া কাঁচা মালের আমদানি বৃদ্ধি যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সূচক বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রধানতঃ সমর-উপকরণ নির্ম্মাণের প্রয়োজনেই কাঁচা মালের আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছিল।

খাদ্যশস্যাদির আমদানির হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সাল অপেক্ষা যুদ্ধের প্রথম বৎসর ১৯৩৯-৪০ সালে ৮'০৩ কোটি টাকার খাদ্যশস্যাদি বেশী আমদানি হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে এবং ১৯৪১-৪২ সালে যথাক্রমে ১৪'৩৫ কোটি টাকা এবং ১৫'০২ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছিল। ভারতের খাদ্যশস্যের প্রধান যোগানদার ব্রহ্মদেশ। ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে। ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে খাদ্যশস্যের আমদানি এতই হ্রাস পায় যে, ঐ বৎসর এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩০ লক্ষ টাকার বেশী খাদ্যশস্য আমদানি হয় নাই। সুতরাং খাদ্যশস্যের আমদানি একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিলেও ভুল হয় না। বাংলার ভেরশ'-পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের জন্য যে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানি বন্ধ হওয়াকে দায়ী করা হইয়াছে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু সমগ্র ভারতের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুধু বাংলাতেই। গ্রেগরী কমিটির রিপোর্টে ভারতে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যে সুপারিশ করা হইয়াছে তাহার কিছু ফল আমরা দেখিতে পাই ১৯৪৪-৪৫ সালের আমদানি-বাণিজ্যের মধ্যে। এই বৎসর ৮'০১ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ভারতে আমদানি হইয়াছে।

ভারতের যুদ্ধকালীন আমদানি-বাণিজ্যের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তৈয়ারী পণ্যের আমদানি হ্রাস এবং কাঁচা মালের আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছে। পরিমাণের দিক্ হইতে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য হ্রাস হইলেও গঠন বিন্যাসের (composition) দিক্ হইতে তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কাঁচামালের রপ্তানি হ্রাস ভারতের যুদ্ধকালীন রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত কাঁচা মালের রপ্তানিকারক দেশ ছিল, যুদ্ধের মধ্যে তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের মোট রপ্তানি-বাণিজ্যে ১৮০'১ কোটি টাকার মধ্যে কাঁচা মাল রপ্তানি হইয়াছে ৮১'৪ কোটি টাকার আর ৫৫'৩ কোটি টাকা মূল্যের তৈয়ারী পণ্য রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে উভয়ের পরিমাণই হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৭৩'৩ কোটি টাকা এবং ৪৭'৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। যুদ্ধের সময় কাঁচা মাল ও তৈয়ারী পণ্য রপ্তানির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে নিম্নের ৫ নং তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইল।

৫নং তালিকা—

বৎসর	কোটি টাকায় মূল্য	
	কাঁচা মালের রপ্তানি	তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানি
যুদ্ধপূর্ব্ব বৎসর—		
১৯৩৭-৩৮	৮১'৪০	৫৫'৩০
১৯৩৮-৩৯	৭৩'৩০	৪৭'৬০
যুদ্ধ বৎসর—		
১৯৩৯-৪০	৮৬'০০	৭৫'৮০
১৯৪০-৪১	৬১'৮৬	৮১'১০
১৯৪১-৪২	৬৫'৩৩	১০১'৪১
১৯৪২-৪৩	৪২'৭৬	৯৮'৩৩
১৯৪৩-৪৪	৪৪-৬৪	১০৫'৮৯
১৯৪৪-৪৫	৪৮'৪২	১০৮'০০

কাঁচা মাল রপ্তানির হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় যুদ্ধের প্রথম বৎসর কাঁচা মালের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া ৮৬ কোটি টাকা হয়। অতঃপর কাঁচা মালের রপ্তানি হ্রাস পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে ৬১'৮৬ কোটি টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালে ৬৫'৩৩ কোটি টাকা হইলেও ১৯৪২-৪৩ সালে কাঁচা মালের রপ্তানি অভূতপূর্ব্বরূপে হ্রাস পায়। ঐ বৎসর মাত্র ৪২-৭৬ কোটি টাকার কাঁচা মাল রপ্তানি হয়। অতঃপর কাঁচা মালের রপ্তানি কিছু বৃদ্ধির দিকে দেখা গেলেও ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৪'৬৪ কোটি টাকার এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৪৮'৪২ কোটি টাকার বেশী কাঁচা মাল রপ্তানি হয় না। ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৪৫'৮ ভাগ ছিল কাঁচা মাল। ১৯৪৪-৪৫ সালে কাঁচা মালের রপ্তানি মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ২১'৮ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে কাঁচা তুলা, তৈলবীজ, চামড়া, কাঁচা পাট প্রভৃতি কাঁচা মাল প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধের ফলে ঐ সকল পণ্যের ইউরোপীয়

এবং জাপানের বাজার বন্ধ হওয়ায় কাঁচা মাল রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহে কাঁচা মাল রপ্তানি বৃদ্ধিই যুদ্ধের প্রথম বৎসর কাঁচা মাল রপ্তানি বেশী হওয়ার কারণ। ইহার পর হইতেই অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। হিটলার সমগ্র ইউরোপ দখল করায় ভারতীয় পাট, তুলা, চামড়া, খইল, তৈলবীজ প্রভৃতির ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের বাজার বন্ধ হওয়ায় ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে ক্ষতির পরিমাণ মিক-গ্রেগরী কমিটির রিপোর্টে ৩০ কোটি বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ভারতের কাঁচা তুলা রপ্তানির কথা পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতে প্রধানতঃ খাটো আঁশের তুলা উৎপন্ন হয় এবং ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে ঐ তুলা বেশী ব্যবহৃত হয় না। এই তুলার প্রধান খরিদদার ছিল জাপান। ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ড নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা তুলা ক্রয়ের সর্ত্তে স্বীকৃত হয়। যুদ্ধের জন্য জাপানের বাজার হাতছাড়া হইয়া যায়। বিলাতের কাপড়ের কলগুলি সমর-উপকরণ নির্ম্মাণে নিয়োজিত হওয়ায় ইংলণ্ডেও ভারতীয় তুলার চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ ফল ভারতে খাটো আঁশের তুলা মজুত থাকার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ভারতে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার গাইট খাটো আঁশের কাঁচা তুলা মজুত ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষে এই মজুতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার গাইট। রপ্তানি-বাজারের অভাবেই এত প্রচুর পরিমাণ কাঁচা তুলা ভারতে মজুত রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় বাজার বন্ধ হওয়ায় তৈলবীজও জমিয়া উঠিতে থাকে। ভারতের তৈল-নিষ্কাশন শিল্প এই সুযোগ গ্রহণ করায় তৈলবীজ প্রচুর পরিমাণে মজুত হওয়ার সঙ্কট হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। অতঃপর ইংলণ্ড তাহার নিজের জন্য তৈলবীজ ক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং ইউরোপীয় দেশগুলি মুক্ত হওয়ার পর উহাদের জন্যও তৈলবীজ ক্রয় করা হইতেছে। সুতরাং তৈলবীজের রপ্তানি বাণিজ্য আবার কিছু কিছু চালু হইতেছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ক্রয়-নীতি এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যের জন্য বর্ত্তমানে তৈলবীজের রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারত বিশেষ কিছুই সুবিধা করিতে পারিতেছে না। তৈলবীজের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী আর্জ্জেণ্টিনা। যুদ্ধকালীন তৈলবীজের বাণিজ্যে আর্জ্জেণ্টিনাই বিশেষ সুবিধা পাইয়াছে।

যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণগত যে হ্রাস হইয়াছে কাঁচা মাল রপ্তানির পরিমাণ হ্রাসই উহার জন্য দায়ী। যুদ্ধকালীন মূল্যস্ফীতির জন্য মূল্যের দিক্ হইতে রপ্তানী বর্দ্ধিত হইলেও তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানি যুদ্ধের মধ্যে কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ৫ নং তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তালিকা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের মোট রপ্তানি-বাণিজ্যে তৈয়ারী পণ্যের অংশ ছিল মাত্র শতকরা ২৯'৮ ভাগ। ১৯৪৪-৪৫ সালে তৈয়ারী পণ্যের অংশ হইয়াছে মোট রপ্তানি-বাণিজ্যের শতকরা ৫৪'৩ ভাগ। যুদ্ধের বৎসরগুলিতে কার্পাসজাত দ্রব্য, চিনি এবং চা-ই রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার কার্পাসজাত দ্রব্যকেই প্রধান স্থান দিতে হয়। ১৯৩৮'৩৯ সালে ভারত হইতে মাত্র ৭'১১ কোটি টাকার তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৯'৪০ সালে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি-মূল্য দাঁড়ায় ৮'৫৭ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে উহা এক লাফে দ্বিগুণে পরিণত হয়। ঐ বৎসর ১৬'৪৯ কোটি টাকার তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালে তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি-মূল্য পূর্ব্ব-বৎসরের রপ্তানির দ্বিগুণকেও ছাড়াইয়া যাইয়া ৩৬ কোটি টাকায় উঠে। তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি চূড়ান্ত রকম-বৃদ্ধি পায় ১৯৪২-৪৩ সালে। ঐ বৎসর ৪৬ কোটি টাকার তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। অতঃপর তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস হইয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৯'৬২ কোটি টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৩৭ কোটি টাকা হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত বৎসরেও তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানি-বাণিজ্যে তুলাজাত দ্রব্যই পাটজাত দ্রব্যের পরেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি-মূল্যের এই বৃদ্ধির মধ্যে শুধু মূল্যস্ফীতিই পরিস্ফুট হয় নাই, পরিমাণ বৃদ্ধিও যে পরিস্ফুট রহিয়াছে তুলাজাত কাপড় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেই তাহা বুঝা যায়। নিম্নে ৬ নং তালিকায় তুলাজাত কাপড় রপ্তানির পরিমাণ প্রদর্শিত হইল।

৬নং তালিকা—

তুলাজাত কাপড় রপ্তানির হিসাব (পুনঃ-রপ্তানি সহ)

বৎসর	কোটি গজ হিসাবে পরিমাণ	বৎসর	কোটি গজ হিসাবে পরিমাণ
১৯৩৭-৩৮	২৫'৩৮	১৯৪১-৪২	৮৫'৭৬
১৯৩৮-৩৯	১৯'২৭	১৯৪২-৪৩	৮৩'৫৩
১৯৩৯-৪০	২৩'৮০	১৯৪৩-৪৪	৪৬'২৯
১৯৪০-৪১	৪৩'৬৬	১৯৪৪-৪৫	৪১'৫৩

প্রাক্‌যুদ্ধ বৎসর ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত হইতে ২৬'২২ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম বৎসর ৪৮'৭২ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। ১৯৪০-৪১ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৫'৩৮ কোটি টাকা হইলেও ১৯৪১-৪২ সালে ৫৩'৮৮ কোটি টাকা পর্য্যন্ত উঠে। ১৯৪২-৪৩ সালে হঠাৎ হ্রাস পাইয়া ৩৬'৪০ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। কিন্তু উহার পর ক্রমবৃদ্ধি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে যথাক্রমে ৪৯'৪৭ কোটি টাকা এবং ৬০'৪২ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছে। তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানির মধ্যে চিনির কথা পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত হইতে মাত্র ৪ লক্ষ টাকার চিনি রপ্তানি হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম বৎসর হইতেই চিনির রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯-৪০ সালে ৭'৯০ লক্ষ টাকার, ১৯৪০-৪১ সালে ২৭'২০ লক্ষ টাকার, এবং ১৯৪১-৪২ সালে ৩১'৭৮ লক্ষ টাকার চিনি রপ্তানি হয়। এই বৃদ্ধি ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐ বৎসর ৪২ লক্ষ টাকার চিনি রপ্তানি হইয়াছিল। অতঃপর হ্রাস পাইয়া ১৯৪৪-৪৫ সালে ৩১ লক্ষ টাকার চিনি রপ্তানি হয়।

ভারতের যুদ্ধকালীন বহির্ব্বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা আমাদের শেষ হইল। এ সম্বন্ধে সরকারী যে-বিবরণ কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে, "যুদ্ধকালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের সম্পূর্ণ হিসাব অবশ্য ইহাতে পাওয়া যাইতেছে

না। কারণ ঋণ ও ইজারা-সূত্রে এবং সামরিক বিভাগের অধীনে যে সকল আমদানি-রপ্তানি হইয়াছিল এই হিসাবে সে-সব ধরা হয় নাই। সেগুলি ধরা হইলে যুদ্ধকালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ যে আরও বাড়িয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই।" খুবই সত্য কথা তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঋণ-ইজারা এবং সামরিক বিভাগের অধীনে যে সকল পণ্য ভারত হইতে রপ্তানি এবং ভারতে আমদানি হইয়াছে তাহার হিসাব বহির্বাণিজ্যের হিসাবের মধ্যে ধরা হইলে উহার পরিমাণ যে আরও বাড়িয়া যাইত এবং ভারতের বাণিজ্যিক মুনাফা যে আরও বহু গুণ বেশী হইত, ষ্টার্লিং তহবিলের স্ফীত কলেবর হইতেই তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু কেহ যদি নিজে উপবাসী থাকিয়া মুখের গ্রাস বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে উহাকে আর যাহাই বলি না কেন, বাণিজ্য বলিয়া কিছুতেই অভিহিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ষ্টার্লিং তহবিলে ভারতের যুদ্ধকালীন বাণিজ্যিক মুনাফা পর্য্যন্ত সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু ষ্টার্লিং তহবিল হইতে ভারত আজ পর্য্যন্তও কোন সুযোগ-সুবিধা বা উপকার পায় নাই। বরং বৃটেনই উহার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একা ভোগ করিতেছে। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাসে (composition) যুদ্ধের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাও হইয়াছে বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে যাইয়া। ভারতের আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্য যে ভাবে যুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে তাহাতে ভারতের যুদ্ধকালীন গঠনবিন্যাসে এইরূপ পরিবর্ত্তন না হইয়া উপায় ছিল না। ভারতের নিজস্ব জাহাজী ব্যবসা নাই। প্রধানতঃ বৃটেনের এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশগুলির জাহাজেই ভারতের বহির্বাণিজ্য-সম্ভার বাহিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময়ে অসামরিক পণ্যবহনের জন্য ঐ সকল দেশের জাহাজ পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ সঙ্কুচিত হওয়ার উহাও অন্যতম কারণ, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গঠনবিন্যাসে আবার পরিবর্ত্তন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৪৫ সনের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসের ভারতীয় আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে ৭ নং তালিকায় উক্ত সাত মাসের আমদানি, রপ্তানি ও বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তের সংক্ষিপ্ত হিসাবে দেওয়া গেল।

৭নং তালিকা—

এপ্রিল—অক্টোবর মাসের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের হিসাব

মাস	কোটি টাকায় মূল্য		
১৯৪৫-৪৬ সাল	আমদানি	রপ্তানি (পুনঃ রপ্তানি সহ)	উদ্বর্ত্ত
এপ্রিল	১৮'৩২	১৬'৮৫	—১'৪৭
মে	২১'৪৫	১৬'৫২	—৪.১৩
জুন	২৩'৩৬	১৮'২০	—৫'১৬
জুলাই	২০'০৬	১৮'৩৮	—১'৬৮
আগষ্ট	২১'০৭	২১'৩১	+০'২২
সেপ্টেম্বর	১৮'৮৬	১৮'৭০	—০'১৬
অক্টোবর	১৯'০৪	২৭'৭৫	+২'৭১
মোট	১৪২'২৬	১৩৭'৭৯	—৪'৪৭

এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত ৪'৪৭ কোটি টাকা ভারতের প্রতিকূল হইয়াছে। অর্থাৎ এই সাত মাসে ভারত যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করিয়াছে তাহা অপেক্ষা ৪'৪৭ কোটি টাকার পণ্য বেশী আমদানি করিয়াছে। ১৯৪৪ এবং ১৯৪৩ সালের উক্ত সাত মাসের বহির্বাণিজ্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, ১৯৪৪ সালের ঐ সাত মাসে ভারতের অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত বা মুনাফা হইয়াছিল ২৫'৪৩ কোটি টাকা এবং ১৯৪৩ সনে হইয়াছিল ৫১'০২ কোটি টাকা। ১৯৪৪ সনের ঐ সাত মাসে ভারতে ১১০'৫৯ কোটি টাকার পণ্য আমদানি হইয়াছিল এবং ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছিল ১৩৫'১৬ কোটি টাকার পণ্য। ১৯৪৫ সনের ঐ সাত মাসে ভারতে ১৪২'২৬ কোটি টাকার পণ্য আমদানি হইয়াছে এবং ভারত হইতে ১৩৭'৭৯ টাকার পণ্য হইয়াছে রপ্তানি। ১৯৪৩ সনের এই সাত মাসে মোট ৬০'৩৯ কোটি টাকার পণ্য মাত্র আমদানি হইয়াছে, আর রপ্তানি হইয়াছিল ১১৭'৪১ কোটি টাকার পণ্য। বহির্বাণিজ্যের গঠনবিন্যাসের দিক হইতে দেখা যায়, এই সাত মাসে কাঁচা মালের আমদানি বেড়ে বাড়িয়া ৬৫'৫৬ কোটি টাকা হইতে ৭৫'২২ কোটি টাকা হইয়াছে। তেমনি কাঁচা মালের রপ্তানি ২৮'০৪ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৩'২২ কোটি টাকা হইয়াছে। গঠন-বিন্যাসের পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় তৈয়ারী পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি হ্রাসের মধ্যে। ১৯৪৩ সনের উক্ত সাত মাসে ২৩'৪১ কোটি টাকার তৈয়ারী পণ্য আমদানি হইয়াছিল। ১৯৪৪ সনের উক্ত সাত মাসে হইয়াছিল ৩৩'২৫ কোটি টাকার তৈয়ারী পণ্য। আর ১৯৪৫ সালের ঐ সাত মাসে তৈয়ারী পণ্যের আমদানির পরিমাণ ১৯'৫ কোটি বাড়িয়া ৫২'৭৩ কোটি টাকা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের উক্ত সাত মাসে ৫১'৬১ কোটি টাকার তৈয়ারী পণ্য রপ্তানি হয় এবং ১৯৪৪ সালের উক্ত সাত মাসে রপ্তানি হয় ৭১'২৮ কোটি টাকার তৈয়ারী পণ্য। ১৯৪৫ সালের ঐ সাত মাসে তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানি ১১'১৯ কোটি টাকা হ্রাস হইয়া ৫৯'২৯ কোটি টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে ১৯'৫০ কোটি টাকার তৈয়ারী পণ্য বেশী আমদানি হইয়াছে, আর ১১'১৯ কোটি টাকার তৈয়ারী পণ্য কম রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু তৈলবীজ, কাঁচা পাট ও তুলার রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে; আমদানির মধ্যে কলযন্ত্র ও যন্ত্রপাতির তুলনায় ব্যবহার্য্য পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাস যে আবার প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের কাঠামো অনুসারী হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সমস্ত লক্ষণই সূচিত হইয়াছে গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের মধ্যে। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে এবং জাপানে যে বাজার হারাইয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান ভারতীয় কাঁচা তুলার এক জন বড় খরিদ্দার ছিল। তাহার স্থান পূরণ করিবার মত কোন দেশ পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব অল্প। যুদ্ধের সময় তৈয়ারী পণ্য রপ্তানির যে সকল নূতন বাজার পাওয়া গিয়াছে যুদ্ধোত্তর যুগে যে সেই সকল বাজার সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে সে-সম্বন্ধেও তেমন কোন ভরসা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না।

ফুল, পাখী আর হাওয়া যখন কথা বলতে পারতো, সে সময়ে এক দিন—

একটা পাখী, চমৎকার দেখতে, রঙিন আর নরম পাখা, ঠোঁটটা একটু সূচলো—কিন্তু ফিকে হলদে রংএর, দেখলেই মনে হয় তুলে এনে আদর করি আর আস্তে আস্তে পালকগুলো খুলে নিই।

একটা মস্ত বাগান, সেই বাগানটা পার হয়ে বেশ খানিকটা গেলে একটা মাঠ, মাঠের শেষেই চাপাই নদীর সীমানা যেখানে সুরু হয়েছে সেইখানে একটা গাছ, বেশ বড় গাছ, চারি দিক্ ফাঁকা, কিন্তু গাছটা খুব জমকালো—এই গাছের উপর মা-বাবা-ভাই-বোনদের নিয়ে এই পাখী বাস করে। তবে ভোর হলেই সে এই মস্ত বাগানটায় আসে, এখানে একটা প্রকাণ্ড গোলাপফুল তার বন্ধু।

বাগানের সেই গোলাপফুল আর এই পাখী দু'জনে নিবিড় বন্ধুত্ব।

ভোরের দিকে গোলাপের উপর যে শিশিরগুলো পড়ে—গোলাপ সেগুলো রেখে দেয়—সকাল হলে তার এই পাখী-বন্ধু এসে সেইগুলো খায়—আর দু'জনে গল্প করে।

পাখীর ঠোঁট দু'টো খুব তীক্ষ্ণ, সে যখন শিশিরগুলিকে খায় তার ঠোঁটের ধার মাঝে মাঝে গোলাপের কোমল গায়ে ব্যথা দেয়, কিন্তু ব্যথা পেলেও সে বন্ধুকে কিছু বলে না—কারণ সে তার পাখী-বন্ধুকে বড্ড ভালোবাসে।

এই রকম করে দিন যায়।

এক দিন রাত্তে খুব ঝড়, জল। চারি দিক্ অন্ধকার, সোঁ-সোঁ করে বাতাস বইছে, বৃষ্টির ছাঁটগুলো তীরের মত গায়ে বিঁধছে। সব পাখীদের বাসায় গোলযোগ সুরু হয়েছে। যে যার সব বাড়ী-ঘর আর বাচ্চা সামলাচ্ছে।

গোলাপের বন্ধুর বাড়ীতেও সেই একই ব্যাপার। সবাই সব সামলাচ্ছে। কাচ্চা-বাচ্চাগুলো রীতিমত চেঁচাচ্ছে। সুন্দর পাখী করলো কি—ভাই-বোনদের সব ডাকলো, বললে, চুপ করে সব বোস দেখি, আমি গল্প বলছি শোন···

একবারে ছোট্ট ছানাটা বলে উঠলো, কি রকম ভয়ানক ঝড়, বাসা ভেঙ্গে যাবে যে, আমার ভারী ভয় করছে।

... উপরের বাচ্চাটা বলে উঠলো।

—আমায় তোমার ডানা দিয়ে ঢেকে রাখো—ও বড়দা গো···গিন্নির ক'দিনের নতুন ছানা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে বললো।

সুন্দর পাখী ধমক দিয়ে বললে: আমরা তো আছি, মরে যাইনি তো। এক ফোঁটা ছেলে-মেয়েদের পাকামী। নাকে কান্না রেখে এই আমার কাছে এসে সব বোসো।

ছোটগুলা আর কি করে, সারি সারি এসে বড়দার কাছে গোল হয়ে বসলো। কর্ত্তা আর গিন্নি বাসার দরজায় পিঠ দিয়ে দু'জনে গল্প করতে বসলো। সুন্দর পাখী সুরু করলে—এক যে ছিল রাজা······

গল্প শুনতে শুনতে কচিগুলো ঘুমিয়ে পড়লো। তার পর মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভোর হয়ে এলো। এদিকে তখন ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ পরিষ্কার।

সুন্দর পাখী এবার বাসা ছেড়ে বেরুলো, বন্ধুর কাছে যেতে হবে। মা বলে দিলো সকাল সকাল ফিরিস্···

পাখী এলো তার বন্ধু গোলাপের কাছে। মনে হচ্ছে কখন পৌঁছব বন্ধুর কাছে, সারা রাত কথা বলে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, আগে গিয়ে শিশির খেয়ে তার পর কাল রাতের ঘটনা সব বলবো।

কিন্তু গিয়ে দেখে তার বন্ধুর গায়ে এক ফোঁটা শিশির নেই। সুন্দর পাখী রেগে গিয়ে বললে: আমার জল কই?

গোলাপ তার মখমলের মত দলগুলো নেড়ে বললে: জানো না, কাল রাতের ঝড়ে আমার গায়ের সব শিশির উড়ে গেছে, পড়ে গেছে, একটুও যে নেই।

—তাহলে আমি এখন কি খাবো? জানো কাল সারা রাত আমি কথা বলেছি, আমার গলা শুকিয়ে আছে, আর তুমি বললে একটুও নেই—ভীষণ রেগে পাখী বললে।

গোলাপ হাসলো, তার পর বললে: আমি তো জানি, কিন্তু কি করব বল ভাই, আমি তো ইচ্ছা করে ফেলে দিইনি।

—ইচ্ছা করে ফেলে দিইনি। তোমার একটু আক্কেল নেই—পাখী রাগে গর্জন করে উঠলো।

গোলাপের ভারী দুঃখ হচ্ছে: এত অবুঝ কেন তার বন্ধু, প্রতিদিনই তো সে তার জন্য শিশির রাখে। এক দিন এমনি—

—চুপ করে আছ কেন? আমি এখন কি খাবো? কি রকম পিপাসা পেয়েছে তুমি যদি বুঝতে—বিরক্ত স্বরে পাখী বললে।

—গোলাপ মলিন হাসি হেসে বললে: আমি বুঝেছি, তুমিই অবুঝ—আচ্ছা তোমার যদি অত পিপাসা, এসো তোমার ঐ ধারালো ঠোঁট দিয়ে আমার বুকে যেটুকু মধু আছে খেয়ে নাও।

—তাই করতে হবে, তাছাড়া আমি কি করবো এখন বলো, কাল সারা রাত একটুও ঘুমোইনি, খালি কথা বলতে হয়েছে।

—বেশ তো ভাই, এসো, মধু খাও—

সুন্দর পাখী দেখতেই সুন্দর, ভারী নিষ্ঠুর, তার নিজের কথাই সে ভাবলো, বন্ধুর কথা মনেও হলো না। তাড়াতাড়ি এসে সে ঠুকরে ঠুকরে গোলাপের বুক থেকে মধু খেতে লাগলো।

তার তীক্ষ্ণ ঠোঁট গোলাপকে আঘাত দিচ্ছে গোলাপ মুখ বুজে সেই চোখবোঁজ বুক পেতে নিচ্ছে। পাখী একবারও ভাবলো না তার বন্ধু তার জন্য কত কষ্ট করছে।

একটা ফুলের বুকে কতটুকু আর মধু থাকে, প্রায় খাওয়া হয়ে এসেছে, তখন গোলাপ আর্তনাদ করে উঠলো, তার অপর বন্ধু বাতাসকে ডেকে বললে: বন্ধু বাতাস তুমি তাড়াতাড়ি এসো, আমাকে বাঁচিয়ে দাও, আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

বাতাস গোলাপের আকুল আহ্বান শুনতে পেলো—কিন্তু সে আসবার আগেই গোলাপের দলগুলি একটি-একটি করে ঝরে পড়বার উপক্রম হলো। অসহ্য যন্ত্রণায় গোলাপের টাটকা দলগুলি মলিন হয়ে গেল—পাখীর ধারালো ঠোঁট লেগে গোলাপের বুকটা ফাঁক হয়ে এসেছে—আর ক্লান্ত স্বরে গোলাপ ডাকছে: বাতাস বন্ধু, তুমি এসো, আর আমি পারি না। হু-হু করে বাতাস ছুটে এলো, বললে: কে তোমার এমন অবস্থা করেছে ভাই?

পাখী তখনও গোলাপের ডালে বসে আছে, তার ধারালো ঠোঁটে ফুলের রেণু লেগে।

বাতাস রুক্ষ দৃষ্টিতে একবার পাখীর দিকে চাইলে আর একবার ঝরে-পড়া গোলাপের দিকে চেয়ে পাখীকে বললে: তুমি না গোলাপের বন্ধু, তাই বন্ধুত্বের চিহ্ন এই?

পাখী চুপ করে রইল। তার অপরাধ সে বুঝতে পেরেছে।

গোলাপের সব দলগুলি প্রায় ঝরে গেছে, মলিন হাসি হেসে সে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিলো। তার শেষ অস্ফুট ধ্বনিতে কি যে বলতে চাইলো বোঝা গেল না।

বাতাস ঝরে-পড়া বন্ধুর দিকে চেয়ে চলে গেল নালিশ জানাতে তাদের প্রভুর কাছে। • • • •

সুন্দর গোলাপের গায়ে এখন কাঁটা বেরিয়েছে। দুষ্টু পাখী, দুষ্টু লোক, অনিষ্টের ইচ্ছায় হাত বাড়ালেই গোলাপ কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। ভালো লোকে সন্তর্পণে তুলে আনে, ভালবাসে, গোলাপ তার জন্য মিষ্টি সুবাস [illegible]—অভিনন্দন জানায়।

দরকার—অদরকার

মনোজিৎ বসু

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা তোমরা পড়েছ নিশ্চয়ই? বাঙলা ভাষায় তিনি অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখে গেছেন। অবিশ্যি তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই এখন লুপ্তপ্রায়, দু'-একটা যা পাওয়া যায়, তা তোমাদের ঐ ইস্কুলের পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই কবির জীবনেরই ছোট্ট একটি কাহিনী তোমাদের শোনাচ্ছি।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রর বাড়ী ছিল যশোহর। তাঁর মতো সাধু-প্রকৃতির লোক, সে-যুগ কেন এ-যুগেও মেলা ভার! তাঁর চাল-চলন কথাবার্তা যেমন ছিল সহজ ও সাধারণ, তাঁর মনটিও ছিল তেমনি নরম ও সরল।

যশোহরের সরকারী স্কুলে তিনি ছিলেন সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক। মাইনে পেতেন যৎসামান্য, সাধারণত: ইস্কুল-মাষ্টারদের ভাগ্যে যা জুটে থাকে। সেই মাইনেতেই তাঁর সংসার-খরচ এক-রকম ক'রে চ'লে যায়। লোক মাত্র দু'জন। তিনি আর তাঁর বুড়ো চাকরটি। হঠাৎ কবি এক দিন শুনতে পেলেন যে, তাঁর মাইনে না কি বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এ-রকম খবর শুনে সাধারণত: সকল লোকই আনন্দিত হয়, কিন্তু কবি কৃষ্ণচন্দ্রের ভাবের কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি ইস্কুল ছুটির পর বাড়ী ফিরে তাঁর বুড়ো চাকরটিকে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁ রে, তোকে যে মাস মাস টাকা দিই, তা দিয়ে কি সংসার খরচ কুলায় না?"

বৃদ্ধ চাকরটি তার মনিবের এই প্রশ্ন শুনে অবাক্ হয়ে জবাব দিল—"কেন চলবে না? দু'জন মানুষের আর কত লাগে, ওতেই তো কুলিয়ে যাচ্ছে।"

পরদিন মজুমদার মশাই ইস্কুলে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে কি বললেন জানো? তিনি তাঁদের বললেন যে ইস্কুল থেকে তিনি যে মাইনে পান, তাতেই যখন সংসার-খরচ কুলিয়ে যাচ্ছে, তখন আর মিছি মিছি তাঁর মাইনেটা বাড়িয়ে লাভ কি? তার চেয়ে, যে মাষ্টার মশাইর সংসারে অভাব, তাঁকেই ওই টাকাটা দেওয়া হোক। তাঁর দরকারের চেয়ে অন্যের বেশি দরকার থাকতে পারে। যাঁর সংসারে বেশি অভাব তাঁর মাইনেই বাড়ানো সঙ্গত।

কি ভাবছ? ভাবছ, এই শিক্ষক কবিটি কি বোকা, না? কিন্তু কার দরকার আর কার অ-দরকার এই জ্ঞানটা বোধ হয় আমাদের চেয়ে ঐ কবিরই বেশি ছিল। তাই অমন ক'রে তিনি নিজের সামান্য উপার্জনে সন্তুষ্ট থেকে, পুরস্কারের অংশটুকু সহকর্মী অন্য শিক্ষককে দিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। ক'জনা এমন পারে বল তো?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বিতীয়

ভূষো-পাগ্‌লা

জয়ন্তরা কোদালপুর গ্রামে গিয়ে দেখলে, সুব্রত কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেনি। তাদের পৈতৃক অট্টালিকাখানি কেবল প্রকাণ্ড ব'ললেই যথার্থ বলা হল না, অত বড় অট্টালিকা রাজধানী কলকাতাতেও বোধ হয় দু'-চারখানার বেশী নেই। আর সেই অট্টালিকার চারি পাশ ঘিরে বিরাজ করছে যে উদ্যান, তার সীমানা নির্দ্দেশ করাও হচ্ছে রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং এক সময়ে যে তার সৌন্দর্য্যও ছিল অপূর্ব্ব, সে-বিষয়ে নেই কোনই সন্দেহ। কিন্তু তার বর্ত্তমান রূপ দেখলে মন হা-হা ক'রে ওঠে।

অট্টালিকার কোন কোন অংশ ধ্বংসে প'ড়ে রচনা করেছে পাহাড়ের মতন স্তূপ। এবং তার কোন-কোন অংশ কোনক্রমে এখনো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের বর্ণহীন, বালুকাহীন ও গঠনহীন বড় বড় ফাট-ধরা গায়ের উপরে বিরাজ করছে রীতিমত বন-জঙ্গল। মস্ত মস্ত অশথ, বট ও নিম-গাছের দল প্রায় তাদের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন ক'রে আছে আর সেই-সব গাছের ডালে ডালে বাদুড়, প্যাঁচা ও আরো নানা-জাতীয় পাখীরা এসে বাসা বেঁধেছে। এবং সেই-সব গাছের তলদেশ জুড়ে আছে নানা-শ্রেণীর আগাছার ঝোপ্-ঝাপ্।

অট্টালিকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জমি, আগে যার নাম ছিল উদ্যান, এখন তারও অবস্থা ভয়াবহ বললেও চলে। আজ কেউ তাকে কল্পনাতেও উদ্যান ব'লে সন্দেহ করতে পারবে না, কারণ, তার নানা স্থানেই আশ্রয় নিয়েছে এমন গভীর জঙ্গল, যা দেখলে মহা অরণ্য 'সুন্দরবনে'র কথাই মনে পড়ে। এক-সময়ে যখন এখানে ছিল ফুলবাগান আর ফলবাগান, তখন যে চারি দিকেই ছিল উচ্চ ও কঠিন প্রাচীর, নানা জায়গায় আজও তার চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আজ প্রাচীরের অধিকাংশই ভেঙে-চুরে একেবারে হয়েছে ভূমিসাৎ।

সুন্দর বাবু রীতিমত ভীত কণ্ঠে বললেন, "হুম্! জয়ন্ত, তুমি কি বলতে চাও, গভীর অরণ্যের মধ্যে এই বিপুল ভগ্নস্তূপের ভিতরেই এখন কিছু কাল ধ'রে আমাদের বাস করতে হবে? উঁহু, উঁহু, কিছুতেই আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই কেউ আমাকে এখানে থাকতে রাজি করাতে পারবে না। যত-সব পাগলার পাল্লায় এসে পড়েছি! বাব্বাঃ, বেড়াতে এসে শেষটা কি পৈতৃক প্রাণটিকে নষ্ট করব? এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিষধর সর্প যে আছে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তার উপরে এখানে যে বাঘ-ভাল্লুক জাতীয় বদ্-মেজাজী জানোয়াররা নেই এমন কথাও জোর ক'রে বলা যায় না। আমি আজই এখান থেকে সবেগে পলায়ন করতে চাই।"

সুব্রত বললে, "মাভৈঃ সুন্দর বাবু, মাভৈঃ! এই ভাঙা অট্টালিকার মধ্যে এমন একটা অংশ আছে, যা ছোট্ট হ'লেও একেবারে আধুনিক ব'লে মনে হবে। যে-কয় দিন আমরা এখানে থাকব, সেই অংশটাই হবে আমাদের বাসস্থান।"

জয়ন্ত অধীর কণ্ঠে বললে, "সুব্রত বাবু, ও-সব বাজে কথা এখন ছেড়ে দিন। আপনি যে বড় পুষ্করিণীর কথা বলেছিলেন, আমি আগে সেইখানেই যেতে চাই।"

সুব্রত অগ্রসর হয়ে বললে, "আসুন আপনারা, আমি এখন সেই দিকেই যাত্রা করছি।"

বহু আগাছার ঝোপ্ এবং লতা-পাতার জাল দিয়ে ঘেরা বনস্পতির মতন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের 'জনতা' ভেদ ক'রে মিনিট পাঁচেক ধ'রে অগ্রসর হয়ে খানিকটা খোলা জায়গার উপরে এসে পড়ল তারা। সেখানেও ঝোপ্-ঝাপ্ আছে বটে, কিন্তু বড় গাছের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তারই মাঝখানে দেখা গেল যেন ঘাসের সবুজ-মাখা মস্ত একটা সমতল জমি।

মাণিক বললে, "সুব্রত বাবু, আপনাদের বাগানের ভিতরে এত বড় একটা সবুজ মাঠ কেন?"

সুব্রত হেসে বললে "ওটা মাঠ নয় মাণিক বাবু, ঐটেই হচ্ছে আমাদের বাগানের প্রধান পুষ্করিণী! ওর অধিকাংশই ঢেকে গিয়েছে পানায় আর পানায়, তাই ওকে দেখাচ্ছে সবুজ মাঠের মতন! ওখানে লাফ্ দিয়ে পড়লে মোটেই মাটি খুঁজে পাবেন না, তলিয়ে যাবেন একেবারে অতল তলে।"

সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্! এত-বড় পুকুর আমি কলকাতাতেও দেখিনি! এ কি পুকুর, এ যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ! উঃ! সুব্রত বাবুর পূর্ব্বপুরুষরা কি ধনীই ছিলেন!"

এই-রকম সব্ কথা বলতে বলতে সকলে সেই সরোবরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল।

মাণিক বললে, "দেখছি, পুকুরের ঐ ভাঙা ঘাটের কাছে পানার অত্যাচার নেই।"

সুব্রত বললে, "বাগানের পাঁচিলের বেশীর ভাগই ভেঙে গিয়েছে, গ্রামের লোকজনরা তাই অবাধে এইখানে এসে ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করে। একটি নয় মাণিক বাবু, এই পুকুরের চারি দিকে এখনো আটটি ঘাট বর্ত্তমান আছে। সব ঘাটেরই অবস্থা শোচনীয়, তবু দারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন এখানকার সব পুকুরই জলশূন্য হয়ে যায়, তখন গাঁয়ের লোকেরা এসে এই পুকুরেরই জল ব্যবহার করে, কারণ, আমাদের এই পুষ্করিণী এত গভীর যে, এখানে কোন দিনই জলের অভাব হয় না।"

জয়ন্ত বললে, "এটা তো দেখছি পুকুরের উত্তর দিক্। সুব্রত বাবু, আপনি বলেছেন, এই পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে

একটা সেকেলে বটগাছ। আমি এখন সেই গাছটার কাছেই যেতে চাই।"

সুব্রত বললে, "তাহ'লে আসুন আমার সঙ্গে।"

সরোবরের পূর্ব্ব তীর দিয়ে সকলে বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে অগ্রসর হ'ল। তার পর পাওয়া গেল সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত।

সুব্রত অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক'রে বললে, "ভাঙা ঘাট আর পুকুরের জলের উপরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ঐ সেই বুড়ো বটগাছ! জয়ন্ত বাবু দেখুন, এর ভিতর থেকে আপনি কোন রহস্যের চাবি আবিষ্কার করতে পারেন কি না?"

জয়ন্ত সেই বটগাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, "এ বটগাছটা দেখছি শিবপুরের 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে'র বিখ্যাত বটগাছটার সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে! এর চার দিক্ দিয়ে যে-সব ঝুরি মাটির উপরে এসে নেমেছে, তার প্রত্যেকটাই তো হচ্ছে এক একটা গাছের গুঁড়ির মতন!"

সুব্রত বললে, "শুনতে পাচ্ছেন কি, ঐ বটগাছের ভিতর থেকে জেগে উঠছে কত চীৎকার? ও চীৎকার হচ্ছে বক আর তাদের বাচ্ছাদের। দিনে-রাতে এই অশ্রান্ত চীৎকার কখনো থামে না। তাই গাঁয়ের লোকেরা এই গাছটাকে বটগাছ না ব'লে 'বক-গাছ' ব'লে ডাকে।"

হঠাৎ শোনা গেল, চীৎকার ক'রে কে যেন একটা কবিতা আবৃত্তি করছে!

জয়ন্ত সচমকে বললে, "কথাগুলো যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! এগিয়ে গিয়ে দেখতে হ'ল!"

তার পরেই শোনা গেল চেঁচিয়ে কে বলছে—

"আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।"

মানিক সবিস্ময়ে বললে, "এ-যে সোনার আনারসের ভিতরে পাওয়া সেই ছড়াটারই গোড়ার দিক্!"

জয়ন্ত বললে, "চুপ্! ছড়ার পরের অংশ শোনো।"

শোনা গেল—

"পশ্চিমাতে পঙ্ক পোয়া,
ঘুঘিমামার ঝিক্‌মিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলদ টিকটিকি।"

এই পর্য্যন্ত ব'লেই কণ্ঠস্বর আবার হ'ল স্তব্ধ।

জয়ন্ত সহাস্যে ব'লে উঠল, "এ-যে দেখছি ছড়ার দ্বিতীয় শ্লোক!"

সুব্রত বললে, "হাঁ জয়ন্ত বাবু, ছড়াটা আমার মুখস্থ নেই বটে, কিন্তু এখন শুনে বেশ বুঝতে পারছি এটা তার দ্বিতীয় শ্লোকই বটে।"

জয়ন্ত আবার বললে, "চুপ! শোনো!"

অজানা কণ্ঠস্বরে আবার শোনা গেল—

"অগ্নিকোণে নেইকো আগুন,
—কাঙাল যদি মাণিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্টভাগে।"

কণ্ঠস্বর আবার স্তব্ধ হল।

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, "ও ছড়াটা কে বলছে জানেন? ও হচ্ছে এই গাঁয়েরই একটি লোক। ওর নাম হচ্ছে ভূষণ। এখানকার লোক ওকে ভূষো-পাগলা ব'লে ডাকে। শুনেছি ওর বাবা ছিলেন আমাদের নায়েব। কিন্তু সোনার আনারসের ঐ ছড়াটা কি ক'রে যে ওর কণ্ঠস্থ হ'ল সে-রহস্য আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে যখনি এখানে এসেছি, তখনি ওর মুখে শুনতে পেয়েছি ঐ ছড়ার পংক্তিগুলি। লোকে বলে, ঐ ছড়া মুখস্থ করতে করতেই ও পাগল হয়ে গিয়েছে!"

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "কিন্তু আপনাদের ঐ ভূষো-পাগলা থেমে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে ঐ ছড়াটার নতুন-কোন অংশ ওর মুখেই আমরা শুনতে পেতে পারি।"

ঠিক সেই সময় পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরের ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে উঠল একটি মূর্ত্তি। তার একেবারে শীর্ণ দেহ, মাথার চুলে জট বেঁধেছে, মুখে রাশীকৃত দাড়ী-গোঁফ এবং সর্ব্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত, কেবল কটিদেশে একখণ্ড কৌপীনের মতন বস্ত্র তার লজ্জা রক্ষার চেষ্টা করছে।

ভূষণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তদের দিকে তাকিয়ে রইল।

পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে সুব্রত শুধালে, "কি গো ভূষো-পাগলা, এই দুপুরের রোদে ঘাটে বসে তুমি কি করছ?"

ভূষণ মাটির দিকে মুখ নামিয়ে যেন আপন মনেই বললে, "কিছুই করছি না, কিছুই করছি না, অনেক-কিছুই করবার আছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না!"

—"করতে পারছ না কেন?"

—"করতে পারছি না কেন, করতে পারছি না কেন? ছড়ার সঙ্গে পৃথিবী মিলছে না!"

—"মিলছে না কেন?"

—যে-পৃথিবীতে সোনার আনারস ফলে, মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কোন দিনই তার মিল হয় না। সোনার আনারস, সোনার আনারস! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!"

—"তুমি ও ছড়াটা শিখলে কোথায়?"

—"বাবা শিখিয়েছেন গো, বাবা শিখিয়েছেন— বাপ ছাড়া ছেলেকে আর কে শেখাবে বল?"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু ছড়ার সবটা তো তুমি এখনো আমাদের শোনালে না?"

ভূষণ সে-কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠল—তার মুখে-চোখে ফুটল রীতিমত ভয়-ভয় ভাব! তার পর চারি দিকে ব্যস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল!

সুব্রত বললে, "হঠাৎ কি হ'ল ভূষো-পাগলা, চারি দিকে অমন ক'রে তাকাচ্ছ কেন?"

সুব্রতের কথা সে শুনতে পেলে বলে মনে হল না। বিড়-বিড় করে কি বকতে লাগল তাও বোঝা গেল না।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে তার একখানা হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "কি তুমি বিড়-বিড় করছ? আমাদের কথার জবাব দাও!"

ভূষণ একেবারে বোবা হয়ে গেল। সভয়-বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইল এক দিকে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জয়ন্তও ফিরে দেখতে পেলে অল্প দূরেই রয়েছে একটা বড় ঝোপ।

কিন্তু সে ঝোপটা একেবারেই স্থির। সেখানে সন্দেহজনক কিছুই নেই।

হঠাৎ ভূষণ বলে উঠল, "হুমমণ, হুমমণ!"

সুব্রত বললে, "হুমমণ আবার কে?"

—"আমি হুমমণদের গন্ধ পাচ্ছি!"

—"কোথায়?"

—"এই বাগানে।"

—"বাগানে থালি তো আমরাই আছি!"

—"যেখানে ভগবান, সেইখানেই থাকে সয়তান!"

—"কি পাগলামি করছ!"

ভূষণ গান ধরলে—

"আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগলা ছেলে—"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "ভূষণ, ও-গান থামিয়ে তুমি সেই ছড়ার সবটা আমাদের শুনিয়ে দাও।"

—"সোনার আনারসের ছড়া?"

—"হ্যাঁ।"

—"সে ছড়া তো তোমাদের শোনাতে পারব না!"

—"কেন বল দেখি?"

—"তোমরা শুনলে হুমমণরাও শুনতে পাবে।"

—"হুমমণ এখানে নেই।"

—"আছে গো আছে গো আছে! আজ-কাল রোজই এখানে হুমমণদের গন্ধ পাই!"

—"তারা কারা?"

—"জানি না। তারা থাকে দূরে দূরে আর আনাচে-কানাচে মারে উঁকি-ঝুঁকি!"

—"তুমি ভুল দেখেছ।"

—"না গো, না গো, না! আমার চোখ ভুল দেখে না।"

—"বেশ তো, তুমি চুপি-চুপি ছড়াটা আমাদের শোনাও না। তাহ'লে দূর থেকে হুমমণরা কিছুই শুনতে পাবে না।"

—"তোমরা হুমমণ নও। ছড়াটা তোমাদের শোনাতে পারি।"

—"বেশ, তবে শোনাও।"

ভূষণ সুরু করলে—

"আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বুদ্ধ বট—"

এই পর্যন্ত ব'লেই হঠাৎ থেমে প'ড়ে ত্রস্ত চক্ষে আবার সেই ঝোপটার দিকে তাকালে।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তেরও দৃষ্টি ফিরল সেই দিকে। তার দেখাদেখি আর সকলেও ফিরে দাঁড়াল।

মুহূর্ত-দুই পরে দেখা গেল, খানিকটা ধোঁয়া ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে।

প্রায় আধ মিনিট পরে আবার সেই দৃশ্য।

ভূষণ বলে উঠল, "হুমমণ!"

সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্, ঝোপের ভিতরে ব'সে নিশ্চয় কেউ বিড়ি কি সিগারেট খাচ্ছে!"

ভূষণ আবার বললে, "হুমমণ!"

জয়ন্ত বললে, "এগিয়ে দেখতে চল।"

জয়ন্তের পিছনে পিছনে আর সকলেও অগ্রসর হ'ল—কেবল ভূষণ ছাড়া। সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের মনে বিড়-বিড় ক'রে কি বকতে লাগল।

মিনিট-খানেকের মধ্যেই সকলে গিয়ে হাজির হ'ল ঝোপের কাছে। বিড়ি বা সিগারেটের ধোঁয়া তখন অদৃশ্য। ঝোপটা বেশ বড়, তার ভিতরে অনায়াসেই দশ-বারো জন লোকের ঠাঁই হ'তে পারে।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে পাওয়া গেল না জনপ্রাণীকে। তবে পাওয়া গেল একটা প্রমাণ। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ!

জয়ন্ত হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে কি তুলে নিয়ে সকলকে দেখালে। সেটা হচ্ছে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের অংশ।

মাণিক বললে, "তাহলে এখানে ব'সে নিশ্চয়ই কেউ সিগারেট ফেলে লম্বা দিয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "এটা কি সিগারেট দেখছ?"

—"হুঁ। গ্রেট এক্সপ্রেস ৫৫৫!"

—"যে এ-রকম দামী সিগারেট ব্যবহার করে, তার ধনবান হওয়াই উচিত। ঝোপের ভিতরে সিগারেটের গন্ধ ছাড়া আর একটা গন্ধও পাচ্ছি। এসেন্সের মিষ্ট গন্ধে এখানকার বাতাস এখনো ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি এখন এখানে লুকিয়েছিল, সে কেবল ধনবান নয়, রীতিমত সৌখীনও।"

সুন্দর বাবু বললেন, "এই ঝোপটার ফাঁক দিয়েই দেখতে পাচ্ছি, ও-দিকে বিশ-পঁচিশ হাত তফাতে আরো একটা বড় ঝোপ রয়েছে। সেই সৌখীন ধনবান ব্যাটা এখান থেকে পালিয়ে ঐখানে গিয়ে লুকিয়ে নেই তো?"

জয়ন্ত বললে, "এখনি সে সন্দেহ ভঞ্জন করা যেতে পারে। চলুন।"

ঠিক সেই সময়ে আচম্বিতে পুষ্করিণীর দিক থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল! তার পরেই চারি দিক আবার স্তব্ধ।

জয়ন্ত এক লাফ মেরে ঝোপের ভিতর থেকে বাইরে গিয়ে পড়ল। তার পর চট্‌পট্ চারি দিকে বুলিয়ে নিলে নিজের খর দৃষ্টি। কিন্তু কোন দিকেই কারুকে দেখতে পেলে না।

তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাণিক বললে, "কই, কেউ তো কোথাও নেই। তবে আর্তনাদ করলে কে?"

—"আমার বিশ্বাস আর্তনাদ করছে ভূষো-পাগলা।"

—"কিন্তু সে পাগলাই বা কোথায়? তারও যে টিকি দেখতে পাচ্ছি না।"

—"এস, আর একবার ঘাটের কাছে যাওয়া যাক্।"

সুন্দর বাবু জয়ন্তের পিছনে পিছনে অগ্রসর হ'তে হ'তে বললেন, "এ কি-রকম ম্যাজিক্ বাবা? ঝোপের মাথায় সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ে, কিন্তু ঝোপের ভিতরে মানুষ নেই! পুকুরের ধারে আর্তনাদ জাগে, কিন্তু কারুকে দেখতে পাওয়া যায় না! এসব তো ভালো কথা নয়!"

কিন্তু পুকুরের ধারে গিয়েও আর্তনাদের বা ভূষণের অদৃশ্য হওয়ার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত পুকুরের ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললে, "ঘাটের ধাপে ওটা কি প'ড়ে রয়েছে?"

মাণিক এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললে, "এ-যে দেখছি বাঁশের বাঁশী!"

সুব্রত বললে, "ও হচ্ছে ভুলো-পাগলার বাঁশী। সে বাঁশী বাজাতে ভারি ভালোবাসে, আর ও-বাঁশীটিকে কখনো কাছ ছাড়া করে না।"

জয়ন্ত বললে, "যখন অমন প্রিয় বাঁশীকে সে পুকুর ঘাটে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছে, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে!"

—"দুর্ঘটনা!"

—"হ্যাঁ। ভুলো-পাগলা হয় ভয়াবহ কিছু দেখে দারুণ আতঙ্কে আর্ত্তনাদ ক'রে বাঁশী ফেলেই বেগে পলায়ন করেছে, নয় কেউ বা কারা তাকে বন্দী ক'রে এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

সুন্দর বাবু বললেন, "কোন অর্থই বোঝা যাচ্ছে না! এখানে ভয়াবহ কিছুই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না! আর ভুলোর মতন একটা পাগলাকে বন্দী ক'রে কার কি লাভ হ'তে পারে?"

জয়ন্ত কেবল বললে, "বোধ হয় শীঘ্রই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।"

[ক্রমশঃ।

দক্ষিণমেরু অভিযান

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

দক্ষিণ মেরু জায়গাটা সম্বন্ধে আগে কিছু তোমাদের বলি। তা না বললে দক্ষিণ মেরুর প্রতি মানুষের যে অভিযান—সে যে কত শক্ত ব্যাপার তা তোমরা বুঝতে পারবে না। সকলেই তো ভূগোল পড়েছ, কাজেই মেরু প্রদেশ কাকে বলে তা জানো। আরো জানো, পৃথিবী অনেকটা গোল কমলালেবুর মত, এখন এই কমলালেবুর ঠিক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে যদি একটা সরল রেখা টানা যায়, তাহলে রেখাটি কেন্দ্র অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর সীমান্তে যেখানে স্পর্শ করবে, সেই বিন্দুটি হলো পৃথিবীর উত্তর মেরু আর দক্ষিণ সীমান্ত যেখানে স্পর্শ করবে, সেটি হলো দক্ষিণ মেরু। এই দুটি মেরুকে যে প্রদেশ বেষ্টন করে আছে তাকে বলা হয় মেরুপ্রদেশ—উত্তর মেরু প্রদেশ ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশ। এদের বলা হয় যথাক্রমে আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিক প্রদেশ। তুষার-শীতল এই প্রদেশ দুটি সব সময় বরফে আবৃত, এখানে ছ'মাস ধরে দিন থাকে, ছ'মাস রাত্রি। সে যে কি হিম এবং কি দুর্গম পথ, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না।

কিন্তু মানুষের অভিধানে অসম্ভব বলে কোন জিনিষ নেই। যে মাটির মানুষ আকাশ-পথে অভিযান করেছে পৃথিবী থেকে ১৪ মাইল উঁচুতে আবিষ্কারের অভিযানে চলেছে—তার কাছে এই দুর্গম মেরু প্রদেশ যে অজেয় থাকবে না এ আর অসম্ভব কি? উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু দুই-ই আজ মানুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। উত্তর মেরু আবিষ্কৃত হোলো ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল, আবিষ্কার করলেন লেফটানেণ্ট রবার্ট পিয়ারি (Robert Peary)। দক্ষিণ মেরু আবিষ্কৃত হোলো ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর এবং পুনরায় স্বাধীন ভাবে ১৯১২ সালের ১৬ই জানুয়ারীতে। প্রথম বার নরওয়ের ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড, আমাণ্ডসেন (Capt Roald Ammnysen) এবং দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন আর. এফ. স্কট (R. F. Scott) বিভিন্ন ভাবে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন।

এখন, মানুষের এই অভিযানের দিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর পার্থক্য বুঝিয়ে দিই। এক দিক থেকে দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুর চেয়ে দুর্গম, উত্তর মেরুতে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সোজা। উত্তর মেরুর খুব কাছেই তিনটি মহাদেশের প্রান্তভূমি—এশিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকা। ম্যাপ খুলে দেখবে যদি গ্রীণল্যাণ্ড, নোভা জেম্বলা (Nova Zembla) বা স্পিৎস্‌বার্গেন (Spitszbergen) দ্বীপগুলির উত্তরতম স্থান থেকে যাত্রা করা যায়—অবশ্য তোমার জাহাজ এমন হওয়া চাই যে ভাসমান বরফের স্তূপে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে না যায়—তাহলে খানিকটা সমুদ্র (প্রায় ৩০০ মাইল) পার হলেই, বরফঢাকা অঞ্চলে পা দিয়ে এস্কিমো ও স্লেজের সাহায্যে উত্তর মেরু পৌঁছান যায়। অবশ্য কথাটা বললাম যেমন সহজ ভঙ্গীতে, কাজটা তত সহজ নয়। বহু বার চেষ্টায় পর মানুষ এই মেরুতে পৌঁছতে পেরেছে।

উত্তিষ্ঠত

শ্রীচিন্ময়কুমার বসু

পথ চল পথ চল
আঁধারের যাত্রী
টুটে ফেল ঘোর অমা রাত্রি।
সমুখের কাল পথে
আজ শুধু বেগে ধাও
জীবনের গ্লানি ক্লেদ
মুছে দাও...মুছে দাও।
পশ্চাতে ফেলে আসা—
দৈন্যের হোক শেষ
মিলাক দিগন্তরে—
দুঃখের যত বেশ।
বিগত দাসত্বের
ঘুচে যাক বন্ধন,
অতীতের পুঞ্জি পাপ,
তার লাগি ক্রন্দন?
সম্মুখে মুক্তি
আছে তার পুণ্য
অতীতের স্মৃতি ভয়ে
থাক শুধু শূন্য।

এদিক থেকে দক্ষিণ মেরু অভিযান বহু গুণ দুর্গম। প্রায় ৯০০ মাইলের অধিক দুস্তর সাগর পার হয়ে তবে এর কাছাকাছি পৌঁছন যায়। আর একটা মজার কথা কি জানো? উত্তর মেরু অঞ্চল জলের মধ্যে, অবশ্য সে জল বরফ হয়ে আছে। অঞ্চলটা অনেকটা পেয়ালার মত, পেয়ালার চারি পাশের ধার হোলো এশিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকার সীমান্ত রেখা। অপর পক্ষে দক্ষিণ মেরু অঞ্চল হলো একটি বিরাট স্থলভাগ, অবশ্য বরফে ঢাকা। এই স্থল ভাগে পৌঁছুতে প্রায় ১৪০০ মাইল সমুদ্র পার হতে হয় এবং এই সমুদ্র প্রায় সব সময়েই তরঙ্গ-সমাকুল এবং ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ। শুধু তাই নয়, এই যে স্থল ভাগ—এটা সমতল ভূমি নয় যে 'স্লেজ' করে মেরু-বিন্দুতে পৌঁছলাম। একে তো চারি ধারেই বরফ আর বরফ—তার উপর উঠতে হবে ক্রমাগত উঁচুতে, অন্ততঃ ১০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠলে তবে মেরু-বিন্দু পাওয়া যাবে। এই বরফের স্তূপ একটা টুপির মত এবং এই বরফের সর্ব্বাপেক্ষা বেশি গভীরতা হলো প্রায় ২০০০ ফুট। এই স্তূপের উপর দিয়ে উঠে তবে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছান যায়।

এই মেরু প্রদেশের আয়তন বড় কম নয়। এটি একটি বিরাট তুষারাবৃত স্থল ভাগ। এর আয়তন পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ-মাইলেরও বেশি, অর্থাৎ রাশিয়া বাদ দিলে ইয়োরোপ এবং অষ্ট্রেলিয়ার যা আয়তন ততটা। এটা একটা মহাদেশবিশেষ কেবল জনমানবহীন। উত্তর মেরু অঞ্চলে ৬০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখার মধ্যেও অন্ততঃ দশ লক্ষ নরনারী এবং নানা প্রকারের জন্তু-জানোয়ারের বাস পাওয়া যায়। এই রেখার মধ্যে বহু প্রকারের মূল্যবান বৃক্ষাদিও পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ মেরু হলো বরফের মরুভূমি—তরুলতাহীন, জন-মানবহীন, নির্জীব মহাদেশ। আছে কেবল তুমুল পশ্চিম-পূর্ব্ববাহী ঝড় যা নিরন্তর অবাধে বইছে। তার পর এর চার পাশের সমুদ্রে এসে পড়েছে বড় বড় বরফের চাঁই। এই রকম একটা চাঁই কোন রকমে দক্ষিণ মেরু প্রদেশের তীরের সঙ্গে হিমবাহের ধারা—যাকে বলা হয় Glaciers—সংলগ্ন হয়ে আছে। এই চাঁই-এর আয়তন প্রায় ফ্রান্সের মত। ১৮৪১ সালে ক্যাপ্টেন বার্কলস যখন প্রথম এই বরফের স্তূপে পৌঁছান, তখন এর উচ্চতা ছিল ৫০ থেকে ২০০ ফুট।

এই মেরু প্রদেশ জয় করবার অভিযান আরম্ভ হয়েছে ১৭৭০ সাল থেকে। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই লোকে মনে করতো দক্ষিণ দিকে কোথাও একটা তৃতীয় পৃথিবী (Third World) আছে। তৃতীয় কেন জানো তো? আমেরিকা হোলো দ্বিতীয় পৃথিবী—এখনো একে বলে New World.

এই তৃতীয় পৃথিবীর অনুসন্ধান বহু বার হয়েছে—কিন্তু মেরু প্রদেশ অনুসন্ধান করবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৮১১ সালে। ঐ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে দু'টি জাহাজ যাত্রা করে জানার উদ্দেশ্যে। একটির চার্জ্জে ছিলেন ক্যাপ্টেন রস—তাঁর জাহাজের নাম হোলো 'Erebus' আর একটির চার্জ্জে ছিলেন কমাণ্ডার ক্রোজিয়ার (Crogier)। তাঁর জাহাজের নাম হলো 'Terror'। ক্যাপটেন রস সবশুদ্ধ তিনটি অভিযান করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও খাস আণ্টার্টিক অঞ্চল পৌঁছতে পারেননি। এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল ১৯১১-১২ সালে। প্রথমে ক্যাপ্টেন আমাণ্ডসেন এবং পরে ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন। আমাণ্ডসেনের অভিযানের গোড়ার উদ্দেশ্য ছিল উত্তর মেরুর অনুসন্ধান। কিন্তু শেষে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করেন এবং দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে তাঁদের জাহাজের গতি ফেরান—তাঁর জাহাজের নাম ছিল ফ্রাম (Fram)। এই অভিযান সম্পূর্ণ গোপনীয় ছিল। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল ম্যাডিরা দ্বীপ থেকে তাঁদের জাহাজ কোন বন্দরে না থেমে রস-সি (Ross Sea) রস-সাগর পর্য্যন্ত এসে পৌঁছয়। কাজেই পৃথিবীর কাছ থেকে এই অভিযানের সংবাদ সম্পূর্ণ গুপ্ত ছিল। তার পর চার জন সঙ্গী তাদের পায়ে স্কি (Ski) জুতো বাঁধা, এবং বাহান্নটি কুকুর সঙ্গে নিয়ে তিনি ১৪ই ডিসেম্বর দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছান।

এরই প্রায় এক মাস পরে ১৮ই জানুয়ারী ১৯১২ সালে ক্যাপ্টেন স্কট আলাদা পথ দিয়ে দক্ষিণ মেরু পৌঁছান। স্কটের জাহাজের নাম ছিল টেরা নোভা' (Terra Nova) নূতন পৃথিবী। এর আগেও প্রায় ১০ বৎসর আগে ইনি আর একবার চেষ্টা করেছিলেন দক্ষিণ মেরু অনুসন্ধানের জন্য, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। তাঁর দ্বিতীয় অভিযানের জন্য তাঁর দল যথেষ্ট তোড়জোড়-বন্দোবস্ত করেছিলেন। পনি, মোটরে টানা স্লেজ কুকুর, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সবই ছিল, কিন্তু মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা তো মানুষ না। জাহাজ থেকে নেমে স্থলপথে অর্থাৎ বরফের ওপর দিয়ে মেরু অভিমুখে যখন যাত্রা সুরু হল—দেখা গেলো স্লেজের মোটরগুলো অচল হয়ে গেছে, এমন কি, হিমে পনিগুলো পর্য্যন্ত একে একে মরে গেল। এবং শেষে তাঁদের অদম্য চেষ্টা ও মনের দৃঢ়তায় যখন দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছলেন, দেখলেন বরফে প্রোথিত একটি কালো পতাকা আমাণ্ডসেনের জয় ঘোষণা করছে।

কিন্তু এইখানেই এই কাহিনীর শেষ নয়। ভগ্নহৃদয় স্কট ফিরলেন। আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল। রক্ত জল করা নয় এক বরফ করা হাওয়া বইছে অনবরত। স্কট এবং তাঁর চার জন সঙ্গী বরফ ঠেলে চলেছেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁদের এক জন সঙ্গী ইভান্স (Evans) বরফের উপর পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না। খানিক পরে আর এক জন—ওটস—নিরতিশয় দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। বুঝলেন তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া মানে সঙ্গীদেরও মৃত্যু। তিনি অন্য পথে গিয়ে নিজের জীবন অবসান করলেন। তার পর এই দলের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। প্রায় আট মাস পর তাঁদের তাঁবু সেই বরফের উপর আবিষ্কৃত হয় এবং স্কটের নিজের হাতের লেখা ডায়েরী পাওয়া যায়। ডায়েরীতে ২৯শে মার্চ্চ তারিখের তলায় লেখা আছে—'The end cannot be far—I do not think I can write more'—মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই, আর লিখতে পারবো বলে মনে হয় না...'

মুরগীচোরের কাহিনী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

সে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। ইংল্যাণ্ডে তখন চলছে রাণী এলিজাবেথের যুগ, সেই সময় ইংল্যাণ্ডে ছিল এক মুরগীচোর। অভাবে পড়েই অবশ্য সে মুরগী চুরি করেছিল।

কিন্তু অবশেষে সে এক দিন ধরা পড়ল। তাকে নিয়ে যাওয়া হোল সেই প্রদেশের গভর্ণরের কাছে। গভর্ণর বিচারান্তে তার প্রতি বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন। বেত খাওয়ার পর অপরাধী ভাবতে লাগল কি করে সে এর প্রতিশোধ নেবে। অপমান—হাঁ। দারুণ অপমান হয়েছে তার। অনেক ভেবে সে ঠিক ক'… পদ্য—পদ্য লিখেই সে প্রতিশোধ নেবে।

যদিও সে এর আগে কোন দিন গল্প বা পদ্য কিছুই লেখেনি, তবুও সে সারা রাত মাথা ঘামিয়ে কঠোর পরিশ্রমের পর অনেক কাটাকুটি করে একটা পদ্য লিখে ফেলল গভর্ণরকে ব্যঙ্গ করে। তার পর সেই পদ্য প্রচার করে দিল সাধারণের মধ্যে। কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র করেই সে মনে মনে সন্তুষ্ট হতে পারল না। অবশেষে সে সেই কবিতাটা একটা কাগজে লিখে নিয়ে গিয়ে চুপিসাড়ে কাগজটা গভর্ণরের বাড়ীর সামনের ফটকে টাঙিয়ে দিল এক অন্ধকার রাতে।

সকাল বেলায় গভর্ণরের এক চাকরের চোখে পড়ল সেই কবিতা-লেখা কাগজটা। সে তৎক্ষণাৎ সেটা নিয়ে গিয়ে দিল গভর্ণরের হাতে। গভর্ণর তখন সপরিবারে প্রাতরাশে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কবিতাটা পড়েই সক্রোধে এক গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়লেন। সেই মুহূর্তেই সেই চাকরের চাকরী গেল। কারণ গভর্ণর ভেবেছিলেন, চাকরটা নিশ্চয়ই লেখাপড়া জানে এবং সে নিশ্চয়ই লেখাটা পড়েছে।

এর পরেই গভর্ণরের কোপদৃষ্টি গিয়ে পড়ল মুরগীচোরের উপর। কাজেই সে বেচারাকে দেশছাড়া হোতে হোল।

অনেক বছর পরে যখন মুরগীচোর দেশে ফিরে এল তখন তার মত কবি আর সুলেখক দেশে আর বেশী নেই!

তোমরা বোধ হয় ভাবছ, "এই মুরগীচোর কে?" এই মুরগীচোরই হচ্ছেন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক সেক্সপিয়র।

এই ভাবেই এক সামান্য মুরগীচোর হয়ে উঠল এক জন দেশ-প্রসিদ্ধ লেখক।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

১৪

রুদ্ধ নিশ্বাসে শকটাল বললেন—'তার পর—'?

'তার পর'—চন্দ্রগুপ্ত ব'লে চললেন—'তার পর—গ্রীক্ সেনাদের হাতে আমি হলুম বন্দী। সেকেন্দারের প্রধান সেনাপতি সেলুকাস্ নিকেটরের প্রবল উল্লাস তাতে—অন্ততঃ তাঁর মুখের ভাব দেখে আমার ত তাই মনে হ'ল। পরের দিন বিচার হবে—আমি ত বুঝলুম আমার দিন ফুরিয়েছে। কিন্তু একটা সন্দেহ কেবলই মনে জাগছিল—আমার না হয় প্রাণটাই গেল—কিন্তু গুরুদেবের কথা মিথ্যা ত হ'তে পারে না—তিনি আমায় কি বিদেশে বেঘোরে যবনের হাতে প্রাণ দিতে পাঠালেন—এতটা ভুল তাঁর ত হ'তেই পারে না'।

—তার গলায় এই কথাগুলি এক নিশ্বাসে ব'লে চন্দ্রগুপ্ত যেন হাঁফিয়ে পড়লেন। বিষ্ণুগুপ্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন যে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন—চোখ দু'টি বোজা—মুখে মৃদু হাসি। ইন্দুশর্ম্মার মুখে কোন ভাবের চিহ্নই নেই। শকটাল উত্তেজনায় থর-থর ক'রে কাঁপ্‌ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আবার ব'লে চললেন—'দিন গেল—এল রাত—আমার তাঁবুর সামনে খোলা তলোয়ার হাতে চার জন যবন সেনা পাহারা। আমার যদি হাতে অস্ত্র থাকত—তা হ'লে চার জন কেন বার জনের শির নিয়ে পালাতে পারতুম। কিন্তু নিরস্ত্র আমি—তায় হাত পা বাঁধা। রাত যখন প্রায় আড়াই প্রহর—তখন একটু তন্দ্রা এসেছে—কি ক'রে যে এল তা আমি নিজেই এখন ভেবে পাই না—সকাল হ'লেই মার শিরশ্ছেদ নিশ্চিত, তার ঘুম যে কি করে আসে—এ আমি নিজেই ভেবে পাই না। সবই বোধ হয় বিধাতার লীলা! থাক্—যেন স্বপ্নের ঘোরে মনে হ'ল—কেউ আমায় ডাকছে—আমার নাম ধ'রে—যদিও নামটি জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করছে—'স্যাণ্ড্রা কোট্টাস্'—'স্যাণ্ড্রা কোট্টাস্'—এই ভাবের বিকৃত উচ্চারণ করছে। আমি ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠতেই কে আমার মুখে হাত চাপা দিলে—বুঝলুম এ লোক যেই হোক্ আমায় অন্ধকারে হত্যা করতে আসেনি—কারণ আমায় মারবার ইচ্ছা থাক্‌লে সে অনায়াসেই অনেক আগে কাজ শেষ করতে পারত—ঘুম আমার আর ভাঙত না। আমি উঠে বসতেই সে লোকটি এক হাত আমার মুখে চাপা দিলে—বুঝলুম কথা কইতে বারণ করছে—চুপ ক'রে রইলুম। তখন সে লোকটি তার হাতের ছুরি দিয়ে আমার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলে, আমি ত উঠে দাঁড়ালুম … সে তখন আমার হাতে যবন সেনার সাজ দিলে—তার ইঙ্গিতে বুঝলুম—সে আমাকে ঐ পোষাক পরতে বলছে। কলের পুতুলের মত তার ইঙ্গিত মত যবন সেনা সাজলুম। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কাঁকালে কোমরবন্ধ তার সঙ্গে তলোয়ার আঁটা—পায়ে হাঁটু অবধি চামড়ার জুতো। এর পর সে দিল ছুরি একখানা, একটা ঢাল, একখানা চাদর আর বড় একটা বর্শা। তার পর হাত ধ'রে আমায় তাঁবুর বাইরে নিয়ে এল। চাঁদের আলোয় দেখ্‌লুম—লোকটি এক জন যবন—বয়সে প্রৌঢ় হলেও যুবকেরই মত সুন্দর দেখ্‌তে—অন্য পাহারাদের সেই বোধ হয়—সর্দার—কারণ আর তিন জন পাহারা যারা দোরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের চেয়ে এর পোষাক জমকালো। লোকটি ইসারায় বোঝালে যে তার দেওয়া যে পানীয় খেয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে—তাতে নেশার জিনিষ মেশানো ছিল। এর পর আমাকে হাত ধ'রে সে টেনে নিয়ে গেল যবন-শিবিরের গণ্ডীর বাইরে বনের মধ্যে—দেখলুম আমার ঘোড়া সেখানে এক গাছের ডালে বাঁধা রয়েছে। তখন বুঝতে বাকি রইল না যে এই লোকটি আমায় পালাবার জন্যে সাহায্য করছে। আমি কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করলুম—যবনের ভাষা জানি না—কোন কথা বলতে পারলুম না। কিন্তু লোকটি পরিষ্কার কথা বললে পঞ্চনদের প্রাদেশিক ভাষায়—বললে—স্যাণ্ড্রা কোট্টাস্'! আমি বাধা দিলুম—'স্যাণ্ড্রা কোট্টাক্ নয়—চন্দ্রগুপ্ত'। তখন সে আবার বললে—'আমাদের এক জন সেনাপতির মুখে আপনার নাম শুনেছিলুম—স্যাণ্ড কোট্টাস্—তাই এই ভুল উচ্চারণ করেছি—মাপ করবেন! চন্দ্রগুপ্ত! আপনার বীরত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—তাই আপনাকে বাঁচাতে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করেছি। হয়ত আমাদের বীর সম্রাট্ সেকেন্দরও আপনার প্রশংসা করতেন—যদি না আমাদের তরুণ সেনাপতি সেলুকাস্ তাঁকে কুমন্ত্রণা দিতেন। আমাদের এই সেনাপতিটি বড় কুটিল। তাঁরই [illegible]

আপনার শিরশ্ছেদ হ'ত। আমি আপনার গুণে মুগ্ধ—তাই আপনার মুক্তি চাই। আপনি এই পথে পালান—পথ আপনার নিশ্চয় জানা আছে। সারা রাত সারা দিন ঘোড়া ছোটাবেন—থামবেন না—কারণ হয়ত আপনার খোঁজে সেনারা বেরুতে পারে'।

চন্দ্রগুপ্তের কথা শুনতে শুনতে মহামন্ত্রী শকটালের চোখ দু'টি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল—কিন্তু চাণক্য পাষাণ-প্রতিমার মতই অচল অটল। চন্দ্রগুপ্ত আবার সুরু করলেন—'আমি তখন জিজ্ঞাসা করলুম—'বন্ধু! কে তুমি আমার প্রাণদান করলে'? সে প্রৌঢ় সেনানায়ক তখন হেসে বল্লে—'আমি এক জন সাধারণ গ্রীক সৈনিক, আমার আবার পরিচয় কি? নাম আমার এ্যান্টিগোনাস্।' আমি তখন এ্যান্টিগোনাস্‌কে সস্নেহে আলিঙ্গন করলুম। তার পর সে তার শিবিরে ফিরে গেল—আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম আর্য্যাবর্ত্তের দিকে'।

শকটাল্ এবার কথা কইলেন—'তার পর? পথে আর কোন বিপদ্ বা বিশেষ ঘটনা ঘটেনি ত?'

চন্দ্রগুপ্ত হেসে উত্তর দিলেন—'গুরুদেবের কৃপায় আর কোন বিপদ্ আমায় স্পর্শ করতে পারেনি বটে, তবে ঘটনা ঘটেছে একটি অতি অদ্ভুত'।

শকটাল—'কি রকম—শুনি'?

চন্দ্রগুপ্ত—'সে রাতের শেষটুকু—পরের দিন বন্ধু এ্যান্টিগোনাসের পরামর্শ মত ঘোড়া ছোটালুম এক দমে। পরের দিন সন্ধ্যা হয় হয়, তখন মনে হ'ল যে মাথার ভিতর বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। চার পাশে নিবিড় বন—কাছে একটা সরোবর দেখতে পেয়ে তার পাড়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লুম—ভাবলুম, একটু জিরিয়ে নিয়ে সরোবরে স্নান করব—তার পর বনের ফলমূল কিছু খেয়ে নিয়ে আবার—রওনা হব। এই ভেবে ঘোড়াটাকে দিলুম ছেড়ে—যাতে সে একটু চ'রে ঘাস জল খেয়ে জিরুতে পারে। আমি সরোবরের পাড়ে কচি কচি সবুজ ঘাসের উপর গায়ের পোষাকগুলো খুলে বিছিয়ে দিলুম—ঘামে সেগুলো ভিজে গিয়েছিল। আমার তখন এমন শক্তি ছিল না যে, সরোবরে নেমে মুখ-হাত-পা ধুয়ে আসি। আমি নিজেও ঐ ঘাসের বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। ভেবেছিলুম—একটু গড়াগড়ি দিয়ে উঠে স্নান করব। কিন্তু এতই ক্লান্ত হয়েছিলুম—আর সরোবরের ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু এত মিষ্টি লাগছিল যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে দু'চোখ ভ'রে গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি—ঠিক নেই—হঠাৎ যেন মুখের উপর কিসের স্পর্শ পেয়ে ঘুমের চটকা ভেঙ্গে গেল—দেখি চার পাশে অন্ধকার বেশ ঘন হ'য়ে নেমে এসেছে। আর আমার পাশে ব'সে এক প্রকাণ্ড কেশরওলা সিংহ। যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তখন আমার সারা গায়ে ঘাম ছুটছিল—সিংহটা তার লম্বা লকলকে জিব দিয়ে সেই গায়ের ঘাম চেটে নিচ্ছিল। মুখের উপর তার সেই জিবের স্পর্শ পেয়েই আমার তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল'।

শকটাল্ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—'কি সর্ব্বনাশ! তার পর তার পর—'?

চন্দ্রগুপ্ত—'আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই সিংহটা আমাকে আক্রমণের চেষ্টা না ক'রে পোষা কুকুরের মত লেজ নাড়তে নাড়তে আমার চার দিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগ্‌ল—তার পর ধীরে ধীরে বনের মাঝে ঢুকে গেল—দূর থেকে শুধু ভেসে আস্‌তে লাগ্‌ল [illegible] ছিল যেন একটু আনন্দের আভাস—যেন সে বহু দিন পরে এক বন্ধুর দেখা পেয়েছে—এম্‌নি একটা ভাব'।

এতক্ষণে শকটাল তাঁর বদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন—'কি আশ্চর্য্য! এ ভগবানেরই অনুগ্রহ'!

চন্দ্রগুপ্ত মাথা নীচ ক'রে বললেন—নিশ্চয়। তার উপর শ্রীগুরুদেবেরও কৃপা—নইলে দু' দু'বার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে কে রক্ষা পায়'।

এইবার কৌটিল্যের ধ্যানে স্তিমিত চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল। তিনি চাইলেন চন্দ্রগুপ্তের দিকে—নয়ন থেকে তাঁর যেন করুণার মধুধারা ক্ষ'রে পড়ছিল। চন্দ্রগুপ্ত সে দৃষ্টির সাম্‌নে মাথা নীচু ক'রে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে। স্নেহভরে চন্দ্রগুপ্তের মাথায় হাত রেখে তিনি কোমল স্বরে বললেন—'বৃষল! তুমি আর্য্যাবর্ত্তের ভাবী সম্রাট্—ঈশ্বরের এই নির্দ্দেশ পত্রখানা তোমার কাছে ব'য়ে এনেছিল। এ পর্যান্ত দেবগুরু আর অসুর-গুরুর কৃপায় আমার দৃষ্টি কোথাও বাধা পায়নি। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পার'।

চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলে করযোড়ে বললেন—'প্রভু! সেকেন্দরের সাহায্যের বদলে তাঁর ক্রোধের আগুন মাথার উপর নিয়ে ফিরে এসেছি। অসহায় আমি—কি উপায়ে প্রবল নন্দ রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব? যদি বা আপনাদের কৃপায় নন্দ রাজাদের সেনাদের পরাস্ত ক'রে যুদ্ধ জিতি, তবে আসছে বছর সেকেন্দরের আক্রমণের সামনে কিছুতেই দাঁড়াতে পারব না। দিগ্বিজয়ী এ বছর ফিরে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আগামী বছরের বর্ষার পর তিনি যে আবার ভারত আক্রমণ করতে আস্‌বেন—এ কথা আমি এ্যান্টিগোনাসের মুখেই শুনে এসেছি। সে আক্রমণের গতিরোধের শক্তি আমার যে হবে না—তা আমি বেশ বুঝি'।

এবার কৌটিল্য তাঁর স্বভাব-সুলভ কুটিল হাসি নীরবে হেসে বললেন—'বৃষল! দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর এ বছর ভারতের প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছেন। আগামী বছর এমনি দিনের পর তাঁকে ব্যাবিলন নগরে চিরদিনের জন্য চোখ বুজ্‌তে হবে। বর্ষা কাটিয়ে ভারত দখল করতে আসার অবকাশ আর তিনি পাবেন না—আমি আর আমার বন্ধু ইন্দুশর্ম্মা তাঁর কোষ্ঠী গণনা ক'রে এই ভবিষ্যৎ ফলটুকু জেনেছি। তার পর আর এক কথা। তুমি ভাবছ—পুরুরাজ তাঁর বিপুল সৈন্য নিয়ে তাঁর কাছে হেরেছেন—তুমি সেখানে কি ক'রে জিতবে! ভয় নেই! সেকেন্দর আর ভারতে আস্‌বেন না—তাঁর জয়-করা দেশগুলোর উপর প্রভুত্ব করবার ইচ্ছায় তাঁর সেনাপতিরা গৃহবিবাদ আরম্ভ ক'রে দেবেন—ভারত-জয়ের সুযোগ তাঁরাও হেলায় হারাবেন'।

এবার চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসু ভাবে আবার প্রশ্ন করলেন—'প্রভু! আপনি কি জানেন—এই এ্যান্টিগোনাস্ লোকটি কে'?

কৌটিল্য—'লোকে—অন্ততঃ যবন দেশের লোকে ব'লে থাকে—সেকেন্দরের পিতা ফিলিপ এ্যান্টিগোনাসেরও পিতা। তবে এ্যান্টিগোনাসের মা গরীবের মেয়ে ছিলেন ব'লে তাঁকে ফিলিপ রাজরাণীর আসন দিতে সাহস করেননি। এজন্যে সাধারণ লোকে এ্যান্টিগোনাসের জন্ম নিয়ে অনেক কুৎসা রটনা করে। আসলে [illegible] তবে লোকনিন্দার ভয়ে

সবিতার গল্প

শ্রীকল্যাণকুমার সোম

কবিতার ছোট বোন সবিতা
বারে বারে আসে মোর ঘরেতে,
বলে, 'তুমি লিখ্‌ছো কী কবিতা ?'
হেসে-হেসে মৃদু-মধু স্বরেতে।

তুলতুলে ফুটফুটে মেয়েটি,
একরাশ কোঁকড়ানো চুল তার,
আমি বলি, 'বোসো কাজ সেরে নি।'
দুষ্টুমি করে তবু বার বার।

বলে মোরে, 'চুপ চাপ কী করো ?
কাজ বুঝি আর তব কিছু নেই ?'
হেসে বলি, 'এই মেয়ে, কী করো।'
বাধা তবু মানে না সে কিছুতেই।

চঞ্চলা সবিতা হেসে কয়,
'এখন লিখো না তুমি কবিতা।'
মেয়েটার এতোটুকু নেই ভয়,
গল্প শোনাতে বলে সবিতা।

কী করিব, সুরু করি গল্প,
'খুব বড়ো ভালো রূপকথা চাই,
মানিব না এতোটুকু অল্প'—
খুকীর হুকুম আমি শুনে যাই।

অর্ডার করি ওর সাপ্লাই,
সহসা সবিতা কহে, 'এই শেষ ?'
বলিলাম, 'এর পর কিছু নাই।'
রাগিয়া মেয়েটি কহে, 'বেশ, বেশ!

তুমি তো কিছুই দেখি জানো না,
বসে' শুধু থাকো এই ঘরটায়,
ভালো মোরে এতোটুকু বাসো না'—
সবিতা দাঁড়ালো উঠি শেষটায়।

'লক্ষ্মীটি, রাগ তুমি কোরো না,
শোনাবো তোমারে আমি কবিতা।'
'মোর কথা কভু তুমি শোনো না,
কিছুই চাহি না।' বলে সবিতা।

ওর রাগ দেখে হাসি আসে মোর,
তুলতুলে মুখখানি তুলে' কয়,
'পাগলামি করো তুমি দিনভোর,
তোমার এখানে আসা বৃথা হয়।'

কবিতার ছোট বোন সবিতা,
যাওয়া-আসা করে হেথা বার বার;
আমি আজ লিখিব না কবিতা—
গল্প লিখিব আজি সবিতার।

তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে সরিয়ে রাখেন লোকের চোখের সামনে হ'তে। সেকেন্দর পরলোকে গেলে পর ইনি কিছু দিন প্রবল প্রতাপে রাজ্য করবেন—তখন সেলুকাস্ নিকেটর পর্য্যন্ত এঁর সঙ্গে লড়াইয়ে সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারবেন না। পরে রণক্ষেত্রে বীরের মত এঁর মৃত্যু হবে—তবে তার এখনও বহু বিলম্ব'।

চন্দ্রগুপ্ত—'প্রভু! 'নিকেটর' শব্দের অর্থ শুনে এসেছি—'বিজয়ী'। সত্যই কি সেলুকাস্ খুব কুশলী সেনাপতি? বয়সে ত মনে হ'ল তরুণ সম্রাটের সমবয়সী—কিংবা দু'-এক বছর এদিক্ হ'তে পারে। এই অল্প বয়সে সত্যই কি তিনি খুব বড় সেনাপতি হ'য়ে উঠেছেন'?

কৌটিল্য—'তাতে আর সন্দেহ কি? তবে সেকেন্দরের মৃত্যুর পর—সেলুকাস্, এ্যাণ্টিগোনাস, এ্যাটিপেটার প্রভৃতি সেনানায়কদের চেষ্টায় রাজ্য ভাগাভাগি হবার ফলে অচিরেই যবন-সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে—এ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু বৎস! তুমি তখনও থাক্‌বে—অক্ষয়, অচল, অটল। ঐ সেলুকাস্‌কেই এক দিন তোমার পায়ে ধরতে হবে। যাক্—সে সব কথা, আপাততঃ আমাদের কাজে নামা যাক'।

চন্দ্রগুপ্ত ও শকটাল—'যথা আজ্ঞা'।

[ক্রমশঃ

[উপন্যাস]
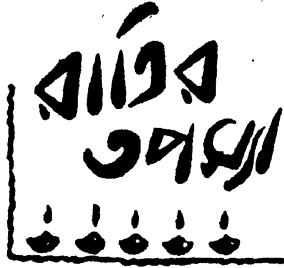
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

এত তাড়াতাড়ি এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভূপেন একবারও ভাবে নাই। বিজয় বাবু ঈশ্বরের উপর বরাত দিয়া যতটা সহজে নিশ্চিন্ত হইলেন, ততটা সহজে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কৈ? প্রায় সওয়া এক মাস ইহাদের ঘরে বাস করিয়া দারিদ্র্য ও অভাবের যে চেহারাটা সে দেখিয়াছে, তাহার পরও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, আর ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া একই ব্যাপার। একবার সে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে ত কল্যাণীদের কেহ হয় না—সেও যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, তেমনি ভাবেই হয়ত আর কেহ আসিয়া পড়িবে, ভগবান্ কাহার মারফৎ কখন কি সাহায্য পাঠান তা কে বলিতে পারে? কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়—কেমন যেন সর্ব্বদা নিজেকে অপরাধী বলিয়া বোধ হয়। রোরুদ্যমান সেই শীর্ণ মুখে সেদিন যদি কোন অভিযোগ থাকিত, কোন ভর্ৎসনা থাকিত কিংবা কোন আশাও থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় ভূপেনকে এতটা চঞ্চল করিতে পারিত না। অভিযোগের মধ্যে যে আশাভঙ্গের কথাটা আছে সেটুকু আশাও সে মেয়েটি রাখে না, সে জানে এটা কত অসম্ভব। ভূপেন তাহাকে লইয়া যদি আরও খানিকটা খেলা করিত তাহা হইলেও বোধ হয় কল্যাণীর মনে অন্ত কোন সম্ভাবনা, কোন আশা দেখা দিত না। সে জানে এ আশা তাহার অন্যায়, এ কল্পনাও অসম্ভব। ভূপেন অনেক উঁচুতে, ভূপেন অনেক সুদূর—কল্যাণীর মত মেয়ের কোন তপস্যাই তাহাকে কোন দিন ধরিতে পারিবে না।···তাই সেদিন তাহার চোখে শুধু নিরতিশয় বেদনা ও দুঃখেরই একটা মর্ম্মান্তিক অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই দুঃখই শুধু নিবেদন করিয়াছিল সে ভূপেনের পায়ে মাথা রাখিয়া—অবোধ, মূক এক প্রকারের দুঃখ, যাহা প্রতিকার খোঁজে না, দেবতার পায়ে নিবেদিত হইয়া নিশ্চিন্ত হয়।

উপায় অবশ্য আছে একটা। এই দুর্নামটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিলে কোন কথাই কাহারও বলিবার থাকে না।

কিন্তু বিবাহ করা? এখন? ঐ মেয়েটিকে?

তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বলিয়া ওঠে—না, না, এ অসম্ভব! এ কখনও হইতে পারে না। এত তাড়াতাড়ি বন্ধন সে মানিয়া লইতে পারিবে না।

এক দিন শিক্ষকতার কাজ সে লইয়াছিল নিতান্তই সাময়িক ভাবে, উন্নতির পথে সোপান হিসাবে কিন্তু আজ তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়াছে, আজ বুঝিয়াছে সে ঈশ্বর বা অদৃষ্ট—যদি ঐ রকম কোন একটা শক্তি থাকে ত সে শক্তি তাহাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। তাহার দেশের, তাহার জাতির যত কিছু দৈন্য, যত কিছু ত্রুটির মূল কারণটা সে বুঝিতে পারিয়াছে আসল গলদটা আর তাহার অজানা নাই। সেই ত্রুটি, সেই গলদ, জাতির যত কিছু অপমান ও দুঃখের সেই মূল কারণ দূর করাকেই শুধু তাহার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করা সম্ভব হইবে না—তবু যদি সে কিছুটাও করিয়া যাইতে পারে ত জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। সাধারণ ভাবে বাঁচাও সাধারণ ভাবে মরার অর্থ সে কোনও দিনই খুঁজিয়া পায় না। ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল অন্য—খুব বড় লোক হইবে সে—হয় প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী নয়ত প্রচণ্ড দেশনেতা, ঐশ্বর্য্য ও যশ এই ছিল তাহার স্বপ্নের চরম কথা। কিন্তু আজ সে ভাবে যে, যদি একটি ছেলেকেও সে মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে পারে—একটি ছেলেকেও যদি সে বুঝাইয়া দিতে পারে প্রকৃত শিক্ষা কি, মানুষের জীবনে আত্মসম্মান-বোধের মূল্য কতটা, আর পরাধীন দাস-জাতির আত্মসম্মান জ্ঞান কী—তাহা হইলেই তাহার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। কারণ সেই যে একটি ছাত্র তৈয়ারী হইবে—সেই ত বীজ, আবার কত বীজের সম্ভাবনা সেই একটি মাত্র বীজ বহন করিতে।

কিন্তু সে তপস্যার মধ্যে বিবাহ, ঘরকন্না করা—বাসা বাঁধিবার স্থান কোথায়? দরিদ্রের সংসার মানেই ত পাপ। 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।' এক পাপই ত অন্য পাপ ডাকিয়া আনে। একটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা, একটা আত্মাবমাননা মানুষকে আর একটার মধ্যে নিক্ষেপ করে। একা একটা লোক সব কিছু কষ্ট সহ্য করিতে পারে কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দুঃখ দেখা অত্যন্ত কঠিন তাহা সে নিজে বিবাহ না করিয়াই বুঝিতে শিখিয়াছে। তাছাড়া তাহার বাবা আছেন, মা আছেন—অবিবাহিতা বোনেরা আছে সংসারের প্রতি এমনিই অনেক কর্ত্তব্য আছে তাহার। সে সব ত কিছু কিছু করিতেই হইবে। আবার নিজের সংসারের বোঝা বহন করা—

না, না, সে হয় না। সংসারে দুঃখ কষ্ট আছেই। এমন হয়ত কত পরিবারেই ঘটিতেছে। কোন একটি দরিদ্র পরিবারের অভাব মোচনের জন্য নিজেকে সে চিরকালের মত অভাবের মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলিতে পারিবে না। দুটি কি তিনটি মানুষের জন্য সে নিজের তপস্যাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। কল্যাণীদের দুঃখ সহিতে হয়—উপায় কি? তাহার জীবনের উদ্দেশ্য তাহার ব্রত আরও অনেক বড়। এই বিশেষ দুটি তিনটি লোকের কষ্টের কথা ভুলিলে হয়ত পৃথিবীর আরও বহু লোকের দুঃখ-কষ্ট সে দূর করিতে পারিবে।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যত বড়ই হোক্—শেষ পর্য্যন্ত তাহা পালন করা কষ্টকর হইয়াই ওঠে। কথাটা কাঁটার মতই অহোরাত্র মনের মধ্যে খচ্-খচ করিতে থাকে। আর হয়ত কয়টা দিন, চার-পাঁচ দিন বাদেই সকলের উপবাস শুরু হইবে—এই কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই তাহাদের সব কয়জনের সেবা যত্নের স্মৃতিটা মনে পড়িয়া মুখের মধ্যকার আহার্য্য বিষাইয়া ওঠে, বহু রাত্রি পর্য্যন্ত চোখের পাতায় তন্দ্রা নামে না। বিশেষ করিয়া কল্যাণী, তাহার সেই সজাগ সতর্ক সেবা ও অতন্দ্র মনোযোগ বারবার ভূপেনকে উন্মনা করিয়া তোলে। তখন মনে হয়—মনুষ্যত্বের এত-বড় অপমান করিয়া সে কী মানুষ গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখে! সে যা করিতে চাহিতেছে আজ, [illegible] বা, তাহার অসংখ্য দেশবাসী

প্রতিদিন অবলম্বন বলিয়া ধরিতেছে। নিজের কর্ত্তব্য পালনের জন্ত সে যদি কোন স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারে ত অপরকে স্বার্থত্যাগের কথা শিখাইতে যাইবে কোন্ লজ্জায়!······

এমনি দ্বিধার মধ্যে তাহার দিন কাটে। না পারে মন স্থির করিতে, না পারে মন হইতে কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে! সব সময়েই সে অন্যমনস্ক থাকে, ছাত্ররা প্রশ্ন করিয়া কথার জবাব পায় না, শিক্ষকরা বিদ্রূপ করেন।

অথচ দিনের পর দিন সংবাদ আসিয়া পৌঁছায়—পাড়ার লোক কিছু কিছু ভিক্ষা দেয় তবে বিজয় বাবুদের মধ্যে মধ্যে সংসারে হাঁড়ি চড়ে।···রাগ হয় তাহার অপূর্ব্ব বাবুদের দলের উপর কিন্তু নিষ্ফল ক্রোধে নিজেরই অন্তর তিক্ততায় ভরিয়া ওঠে—অপূর্ব্ব বাবুদের কোন ক্ষতি হয় না তাহাতে।

এমনি করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতে সহসা এক দিন ভূপেন আবিষ্কার করিল যে শুধুই পরোপকার-প্রবৃত্তি নয়, তাহার এই অশান্তির মধ্যে আর একটা বড় রকমের শূন্যতা-বোধ আছে—সে সম্বন্ধে এত দিন সে, কতকটা জোর করিয়াই, নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। আজ সে নিজের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে ইতিমধ্যেই ঐ রূপহীনা, শীর্ণা মেয়েটি তাহার মনের অনেকখানিই দখল করিয়া বসিয়াছে। শেষের দিকে বিজয় বাবুদের বাড়ী সে শুধু বিজয় বাবুর জন্যই যাইত না এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি তাহার অপক্ষপাত স্নেহও ছিল না টান তাহার সব চেয়ে বেশী ছিল কল্যাণীর উপরই—তাহার কথা, তাহার সেবা, তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেশার মতই তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যে ঘটনাটাকে সে এত দিন নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে করিয়া অনুতপ্ত হইতেছিল, তাহার ভিতরে মনের অবচেতন গহ্বর হইতে একটা অনুমোদন ছিলই—

সত্যটা অনুভব করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই লজ্জায়-ভয়ে সে যেন মুষড়াইয়া পড়িল। ছি! ছি! এ কী দুর্ব্বলতা তাহার—এত ছোট, এত সাধারণ সে? সব চেয়ে আঘাত লাগিল তাহার এই খানটায়—তাহার আত্মসম্মানে এত দিন যে ধারণা ছিল সে অসাধারণ, সে বিজয় বা তাহার আর পাঁচজন সহপাঠীদের মত নয়—এইবার সেই ভুলটা ভাঙিতেই সে যেন মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাইল। তাহা হইলে সে-ও এই?

তবু শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে স্বীকার করিতেই হয়। সত্য যখন এমনি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রকাশ পান, তখন বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তার আগে ঘটনাটা গোড়া হইতেই বলা দরকার—

আহারাদির যে ব্যবস্থাই হউক, রাধুদের সব কয়জনকেই সেক্রেটারী ইস্কুলে ফ্রি করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া পড়াশুনাটা তাহাদের বন্ধ হয় নাই। তাহারা নিয়মিতই আসিত, যদিচ ভূপেন সেদিন চলিয়া আসার পর হইতে আর কোন দিনই তাহাদের ডাকিয়া কোন কুশল প্রশ্ন করে নাই। সেটা করে নাই কোন রাগ বা অভিমানে নয়—অনর্থক বলিয়া! তাহাদের চেহারায় ক্রমবর্দ্ধমান শীর্ণতা ও মুখের অপরিসীম শুষ্কতাতেই সে যা জানিতে চায় তাহা প্রকাশ পাইত সুতরাং অনর্থক প্রশ্ন করিয়া লাভ কি? কোন প্রতিকার যখন সে করিতে পারিবে না তখন দুঃখের সংবাদটা জানিয়া শুধু মন খারাপ করার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সেদিন কি জানি কেন ভূপেন কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। ইস্কুলের ছুটির পরই দ্রুতপদে গিয়া মাঠটার বাঁকে দাঁড়াইয়া রহিল, এই পথেই রাধুদের যাইতে হইবে—এইখানে দেখা করাই নিরাপদ।

রাধুকে ডাকিতে সে শান্ত মুখে কাছে আসিল। ছেলেটি বরাবরই একটু বেশী শান্ত, এখন যেন সে ভাবটা আরও বাড়িয়াছে। শুধু সে যে খুশী হইয়াছে সেটা তাহার দৃষ্টিতেই বোঝা গেল। কিন্তু ভূপেনের প্রধান সমস্যা হইল, কেমন করিয়া এই বালকের কাছে কথাটা পাড়িবে। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, কতকগুলা নিরর্থক কুশল প্রশ্নের পর এক সময়ে সে প্রায় মরিয়া হইয়াই কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, আচ্ছা, শুনেছিলুম মহেশ বাবু ইস্কুল থেকে কিছু কিছু সাহায্য দেবার চেষ্টা করছেন, কিছু করেছেন কি?

নতমুখে রাধু জবাব দিল, হ্যাঁ, এই মাস থেকে দশটা করে টাকা পাওয়া যাবে।

মাত্র দশ টাকা!

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর শুধু প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাতেই ত চলবে না, আর কি উপায় হচ্ছে?

রাধুও একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দিদি বাড়ীতেই একটা পাঠশালা বসাবার চেষ্টা করেছিল—অ আ শেখাবে, যা দু-এক আনা পাওয়া যায়—কিন্তু সে সুবিধে হয়নি! এখন—ঐ ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আর শালী দু'জনেরই শরীর খারাপ বলে দিদি ওদেরও রান্না করে দিয়ে আসে; উনি দশ সের চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন সেদিন, আর তিন টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন।

কথা কয়টা চাবুকের মতই আঘাত করিল ভূপেনকে। কল্যাণী রাঁধুনীর কাজ লইয়াছে! পরের বাড়ী তিন টাকা বেতনে দাসীবৃত্তি করিতেছে!

অথচ আর কী-ই বা সে করিতে পারিত! আর ত কোথাও কোন পথ খোলা নাই!

রাধুকে বিদায় দিয়া সেদিন বহু রাত্রি পর্য্যন্ত ভূপেন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। দেশের আর পাঁচ জন দরিদ্র সাধারণ মানুষের মতই কল্যাণীর চিন্তা যে সহজে মন হইতে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না, এই কথাটা সেই দিনই প্রথম সে নিজের মনের কাছে মানিতে বাধ্য হইল। কিন্তু পথও কোথাও যেন দেখিতে পাওয়া যায় না—যে একমাত্র পথ খোলা আছে সেটাকে বাছিয়া লইতে গেলে নিজের সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। চিরকালের মতই ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিতে হয়! তা ছাড়া তার কী-ই বা বয়স, এতগুলি অনূঢ়া ভগ্নী থাকিতে এই বয়সে বিবাহ করিলে লোকেই কি বলিবে? সে যে এখানে জড়াইয়া পড়িয়াছে, বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এমনি একটা বিশ্রী ইঙ্গিত উঠিবে না কি? কথাটা যে সে রকম কিছু নয়, এ কথা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হইবে। এমন কি, এই সমস্ত গোলমালের মূল যে, সেই অপূর্ব্ব বাবুর দলও তাঁহাদের মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রমাণ করিয়া লোকের কাছে বাহবা লইবেন।

এমনি করিয়া মনে মনে শুধু আলোচনাই করে ভূপেন, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে না। শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত হ

উত্তেজিত হইয়া ওঠে। অবশেষে রাখুর সহিত দেখা হইবারও দিন পাঁচেক পরে সহসা এক দিন সে স্কুলের ছুটির পর আবার বিজয় বাবুদের বাড়ীর পথই ধরিল। বিশেষ কিছু ভাবিয়া নয়—এমনিই, হয়ত অপূর্ব্ব বাবুর দলকে উপেক্ষা করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল কিংবা কোন রকমের মন স্থির করিবার পূর্ব্বে আর একবার কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হওয়া—

বিজয় বাবু তাহাকে আশা করেন নাই, তবু খুশী হইলেন, একটু লজ্জিতও হইলেন। আন্দাজে আন্দাজে দুইটা হাত বাড়াইয়া দিয়া টানিয়া কাছে বসাইলেন, কিন্তু কুশল প্রশ্ন ছাড়া একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। অপরে কুৎসা রটাইয়াছে সে অপরাধও যেন তাঁহার—এমনি মনের ভাব তাঁর।

কথার ফাঁকে ফাঁকে ভূপেন চারি দিকে চোখ বুলাইল। বিজয় বাবু ছেলে-মেয়েদের চেয়েও কৃশ হইয়া গিয়াছেন। জিনিষপত্র এমনিতেই কম ছিল, এখন যেন কিছুই নাই—এমন কি ঘরের মধ্যেকার কাঁটাল কাঠের ভারী চৌকীটা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

একটু পরে বিজয় বাবু ঘরে গিয়া সান্ধ্য-পূজায় বসিলে কল্যাণী নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপেন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার দিকে ভাল ভাবে চাহিয়া দেখিতে পারিল না—দৃষ্টি তাহার পায়ের কাছাকাছি মাটির উপরই স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণীই প্রশ্ন করিল, ভালো আছেন?

হ্যাঁ। কোন মতে জবাব দিল ভূপেন।

তার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া যেন চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, তুমি কি ওঁদের বাড়ী সেরে এসেছ?

না।

একটু বিস্মিত হইয়া ভূপেন বলিল, তবে কি এখন আবার যেতে হবে? এই সন্ধ্যাবেলা?

কল্যাণী মুহূর্ত্ত কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, না, আর যেতে হবে না। আমি ওদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছি।

'কাজ ছেড়ে দিয়েছি' কথাটা যেন নূতন করিয়া আঘাত করিল ভূপেনকে, তবু কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই সে প্রশ্ন করিল, ওখানে আর যাও না তুমি? কেন?

আবারও উত্তর দিতে সময় লাগিল কল্যাণীর। সন্ধ্যার সেই গাঢ় অন্ধকারেও মনে হইল যেন সে শিহরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় বহু চেষ্টার পর কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া লইয়া সে জবাব দিল, সে কথা আপনার কাছে বলতে পারব না।

সে আর দাঁড়াইল না, যেন এইটুকু বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কি একটা কাজের অছিলায় দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

কল্যাণীর কম্পিত কণ্ঠের এই কয়টি শব্দ ক্ষণকালের জন্য তাহার সমস্ত দেহে যে আগুন ছড়াইয়া দিয়া গেল, তাহাতেই ভূপেন কল্যাণী সম্বন্ধে তাহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিল। ফলে তাহার লজ্জা ও আত্মধিক্কারের যেমন অবধি রহিল না, তেমনি তাহার কর্ত্তব্য-পথও স্থির হইয়া গেল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইবার পর মন ঠিক করিয়া ভোরের দিকে সে উঠিয়া মাকে চিঠি বহু উচ্ছ্বাস করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আসল বক্তব্যে পৌঁছিয়া কলম কাঁপিতে লাগিল তাহার। তাহার বাপ-মা তাহার সম্বন্ধে কত আশা পোষণ করিতেন তাহা সে জানে। এই রকম কিম্ভূত-কিমাকার বিবাহে তাঁহাদের কতখানি আশাভঙ্গ হইবে তা ভূপেনের চেয়ে বেশী বোধ হয় কেহই বুঝিবে না। শুধু যে কন্যা রূপসী নয় বা সে মোটা যৌতুক হইতে বঞ্চিত হইল তাহাই নহে—বধূ শ্বশুরঘর করিতেও যাইতে পারিবে না! অন্ধ বিজয় বাবু ও ছেলেমেয়েগুলির ভার কাহারও উপর দেওয়া চলিবে না, অন্ততঃ কল্যাণী এ অবস্থায় তাহার বাবাকে ফেলিয়া স্বর্গেও যাইবে না এটা ঠিক। সুতরাং রাখুর বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র সংসার প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত কল্যাণীকে এখান হইতে কোথাও লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

যাই হোক—তবু শেষ পর্য্যন্ত সে চিঠি শেষ করিল। মোহিত বাবুর কাছে তাঁহার শিক্ষা—কর্ত্তব্যকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা সে কখনও করিবে না। চিঠি খামে আঁটিয়া ঠিকানা লিখিয়া সে অত ভোরেই বাহির হইয়া পড়িল এবং কোন রকম মানসিক দুর্ব্বলতায় মত পরিবর্ত্তন করিবার আশঙ্কায় নিজে হাতে ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কৈ?

বিনিদ্র রজনীর সমস্ত তাপ ও ক্লান্তি চোখের পাতায় বহন করিয়া সে মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিল সোজা পূর্ব্ব দিক্ লক্ষ্য করিয়া। মনে কত রকমের ঝড় বহিতেছে তাহার যেন সীমা-পরিসীমা নাই। এক একবার সমস্ত ব্যাপারের উপর বিরক্ত হইয়া ওঠে। মনে হয় এ সমস্তই কোন অদৃশ্য শক্তির চক্রান্ত। নিজের উপরও রাগ তখন কম হয় না—কী প্রয়োজন ছিল বিজয় বাবুদের সহিত এত অন্তরঙ্গতা করার। এ বোকা কেবলমাত্র তাহারই, এমন ভাব দেখানরই বা কী এমন মাথা-ব্যথা পড়িয়া গিয়াছিল? বিজয় বাবু তাহার কে?

আবার এক সময়ে সেই ভগবদ্ভক্ত নিরীহ মানুষটির কথা মনে পড়িয়া মন স্নিগ্ধ হইয়া আসে। না, অনুতাপের কোন কারণ নাই। নাই বা গেল তাহার জীবনের স্রোত স্বচ্ছন্দ গতিতে। তাহার অদৃষ্ট হাত ধরিয়া তাহাকে যে বিচিত্র পথে লইয়া যাইতেছে সেই পথেরই অভিজ্ঞতা থাক্ তাহার অন্তর ভরিয়া—

আচ্ছা, কল্যাণীকে কি সে ভালবাসে?

এ প্রশ্ন যেন নিজের কাছে করিতেও ভয় হয়। হয়ত ভালবাসা নয়। তাহার সেবা, তাহার ঐকান্তিকতা, তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য ভূপেনকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার কাছে গেলে ভাল লাগে, সে কষ্ট পাইতেছে মনে হইলে নিজেরও বেদনাবোধ হয়—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ভালবাসাতে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, কামনার সে অসহ তীব্রতা তাহার কৈ কল্যাণী সম্বন্ধে? তবে কি সে একটা মস্ত ভুলই করিতেছে?…কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সারা জীবন কাটাইতেছে এ এটা কল্পনা করিতে গেলেই যে রকম স্ত্রীলোকের কথা তাহার মনে হয়, অন্তরের সেই মানসীর সঙ্গে যেন সন্ধ্যার অনেকটা মিল আছে। সেই উৎসাহ, শিক্ষা সম্বন্ধে সেই শ্রদ্ধা আর সেই আশ্চর্য্য চোখ দুটি—

সন্ধ্যা ধনি-দুহিতা, সন্ধ্যা সুদূর। সন্ধ্যা তাহার জীবনে শুধুই একটা অতৃপ্তি, একটা উচ্চাশার অভিশাপ। তা ছাড়া সন্ধ্যা তাহার ছাত্রী, তাহার স্নেহের, আশীর্ব্বাদের পাত্রী। সন্ধ্যা সম্বন্ধে কোন কলুষিত চিন্তা যেন মনে কখনও স্থান না পায়। সন্ধ্যা তাহার আত্মার একমাত্র আনন্দ, দুর্দ্দিনের একমাত্র আশ্রয়। হয়ত জীবনে আর তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবে না—দু'জনের জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র দু'জনকে চিরকালের মতই বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্ত্তী করিয়া রাখিবে, তবু তাহার সম্বন্ধে চিন্তাটাও পবিত্র থাক। স্মৃতির মধ্যে যেন একটা স্নিগ্ধতা, একটা আনন্দ মেলে!

হ্যাঁ—সন্ধ্যার কথা থাক।

কল্যাণী অনেক নিকটে—তাহার সমস্যাটা ঢের বেশী বাস্তব।

কল্যাণী সম্বন্ধে হয়ত ঠিক তেমন করিয়া ভাবা যায় না এখন! কিন্তু হিন্দুর ঘরে কোন স্বামীই বা স্ত্রীকে বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই কামনার সহিত কল্পনা করে? আমাদের দেশে বিবাহটা আগে, ভালবাসাটা পরে। কল্যাণী সম্বন্ধেও হয়ত সেই শতকরা নিরানব্বইটি বিবাহের কথাই খাটিবে—হয়ত একদিন তাহার সম্বন্ধেও আকাঙ্ক্ষা ভূপেনের তীব্র হইয়া উঠিবে।

অন্তুতঃ কল্যাণীকে লইয়া সে অসুখী হইবে না, এটা ঠিক। স্ত্রী স্বামীর মানসী যদি বা না-ই হয় ক্ষতি কি? গৃহিণী হইলেই চলিবে।

ভূপেন এক রকম জোর করিয়াই মন হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দ্বিধা সরাইয়া ফেলিল। কর্ত্তব্য যখন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে তখন আর এসব ভাবিয়া লাভ নাই। জীবনের পথ যে তাহার সুখের পথ নয় তাহা ত আগেই বোঝা গিয়াছে।

সে হোষ্টেলের পথ ধরিল, মনে মনে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে।

আর সে কোন কথা ভাবিবে না। কিছুতে না।

বাড়ী হইতে চিঠি আসিল এক দিন পরেই. বাবা ও মার পৃথক্ চিঠি।

মার চোখের জলে চিঠির কাগজ বার বার ভিজিয়া উঠিয়াছে—তাহার চিহ্ন স্পষ্ট। ওখানকার ডাইনি মেয়েটা যে ভূপেনকে 'গুণ' করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—নহিলে সে এমন কথা লিখিতে পারিল কি করিয়া? লোকটার চোখের মাথা খাইয়াও কি লজ্জা হয় নাই? মহাপাপ না থাকিলে এমন রোগ হয় না! আবারও মহাপাপে লিপ্ত হইতেছে কোন্ সাহসে? তাঁহার বাছাকে এই ভাবে ভুলাইয়া এত বড় সর্ব্বনাশ করিতে তাহাদের বুক কাঁপিতেছে না? তাঁহার মাথার দিব্য রহিল—ভূপেন যেন পত্র-পাঠ চাকরীটা ছাড়িয়া ঐ ডাইনিদের সংস্পর্শ কাটাইয়া চলিয়া আসে। যদি এমনি না আসিতে পারে ত মায়ের অসুখ বলিয়া দুই দিনের ছুটিতে যেন বাড়ী আসে, তার পর এখান হইতে চাকরীটা ছাড়িয়া দিলেই চলিবে। পাত্রী তাঁহার হাতে ভালই আছে যেমনি রূপসী তেমনি শান্ত! পয়সা-কড়িও কিছু দিবে। ভূপেনের যদি এতই বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে ত সে একটা মুখের কথা বলে নাই কেন? বাপ মার কথা যদি সে নাও ভাবে, ছোট বোনগুলার কথা কি তাহার একবারও মনে পড়িল না? ঐ মেয়েটার ছলা কলা ত দু'দিনের, তাহাতেই সে সব ভুলিয়া গেল—তাঁহাদের এত দিনের স্নেহ, এত দিনের এত যত্ন? আবারও মাথায় দিব্য রহিল সে যেন পত্র-পাঠ এখানে আসে। ইত্যাদি—

উপেন বাবুর চিঠি এতটা করুণ-রসাত্মক নয় বরং তাহার বিপরীত। তিনি তাহাকে প্রথমেই কুলাঙ্গার, স্বেচ্ছাচারী, কামুক প্রভৃতি বহু গালাগালি দিয়া লিখিয়াছেন—

"তোমার যে এত-বড় অধঃপতন হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এই জন্যই কি এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম! এর চেয়ে ছেলেবেলা থেকে কোন লোহার কারখানায় ঢুকিয়ে দিলে বোধ হয় আমার বেশী উপকার হ'ত। বাপ, মা, নিজের বোন এদের প্রতি কর্ত্তব্যের চেয়েও কি তোমার ঐ কর্ত্তব্য বড় হল? বোনগুলোর এখনও বিয়ে হ'ল না—নিজে বিয়ে ক'রে সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়লে এদের ত কোন উপায়ই হবে না। তুমি আমার একমাত্র ছেলে—সে কথাটা মনে রাখা কি উচিত ছিল না?... এখানে ঐ বড়লোকের মেয়েটাকে এত দিন পড়ালে, যদি তার সঙ্গে জড়াতে পারতে ত বুঝতুম একটা কিছু হ'ল। কিন্তু তাতে যে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হ'ত। তুমি এমন আহাম্মক্ বাঁদর যে তাকে ফেলে ঐ কালটি ছুঁড়ির ফাঁদে পা দিলে। যাই হোক—পাগল না হয়ে গেলে এমন অসম্ভব প্রস্তাব কেউ করতে পারত না, বুঝেছি যে, তারা তোমাকে পাগলই করে দিয়েছে। কিন্তু আমার সম্মতি ত পাবেই না—বিনা অনুমতিতে যদি করো ত আমাদের অভিশাপ মাথায় নিয়েই করবে। তা ছাড়া আমি সহজে ছাড়ব না, তুমি যদি হপ্তা-খানেকের মধ্যে চাকরী ছেড়ে বাড়ী ফিরে না এস, তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে ওদের যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে আসব এবং তোমার ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছেও সব কথা জানিয়ে আসব, যাতে ওখানে বাস করতে আর না হয়।"

চিঠিটা হাতে করিয়া ভূপেন বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাবা কথাটা মিথ্যা বলেন নাই—বাপ-মা-বোনদের প্রতি কর্ত্তব্যটাই তাহার আগে। অবশ্য সেখানে মাথার উপর বাবা এখনও আছেন, সক্ষম তিনি। কন্যাগুলি তাঁহারই, তাহাদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব তাঁহার—ভূপেনের নয়। তবু দরিদ্র পিতাকে যে সাহায্য করা উচিত সে কথাই বা সে অস্বীকার করে কেমন করিয়া? অথচ এখানেও—

বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী চিন্তা ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দোটানায় পড়িয়া অনেক ভাবিয়াও সে কূল-কিনারা পাইল না। বাবা-মা তাহার উপর কিছুটা অবিচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মতই ভাবিয়া লইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় পড়িলে সবাই বোধ হয় এমনিই ভাবিত। তাহাদেরও দোষ দেওয়া যায় না—একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু—কল্যাণী ও বিশেষ করিয়া বিজয় বাবুর কথা যখন মনে পড়ে তখন চঞ্চল না হইয়া পারে না। অমন নিরীহ ও ভগবদ্ভক্ত লোকটিকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দেয় কি করিয়া? তিনি অবশ্য ভগবানের উপর বরাত দিয়া বসিয়া আছেন কিন্তু ভগবান ত নিজে হাতে কিছু দিবেন না, কাহারও না কাহারও হাত দিয়াই দেওয়াইবেন। হয়ত বা তিনি তাহাকেই সেই মধ্যবর্ত্তী হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন।

এখানে আসিয়া এম-এ পরীক্ষার খুব বেশী কিছু হয় নাই সত্য কথা। এত দিন তেমন ইচ্ছাও ছিল না—ভিত্তি হইতে মানুষ গড়া

ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিলাতী সফর :—

আগামী গ্রীষ্ম ঋতুতে ভারতীয় ক্রিকেট দল সরকারী ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ড সফর করিবে। এতদুদ্দেশ্যে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনী কমিটি মাদ্রাজে আহুত ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভার অধিবেশনে গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাপন্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ক্রিকেট-প্রতিভা প্রিন্স দলীপ সিংজী এই কমিটিতে আসন পান নাই। ক্রিকেট-জগতে দলীপের অবদান অতুলনীয়। যোগ্যতার দাবী যদি নির্ব্বাচক হওয়ার মাপকাঠী হইত তবে দলীপের স্থান সকলের আগে ও উপরে। কিন্তু খেলার মধ্যে দলাদলি বা ভেদনীতি এরূপ মাত্রায় বর্ত্তমান যে বিলাতী ক্রিকেট সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়াড় দলীপ সিংজীকে নির্ব্বাচক না করার স্পর্দ্ধাও আমাদের ক্রীড়া-কর্ত্তৃপক্ষগণের মনে জাগে। এই বিষয়ে দেশে ও বিদেশে বহু সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যবস্থায় দলীপের অসম্মান হয় নাই, ভারতের ক্রিকেট-বোধের ব্যর্থতা প্রকট হইয়াছে।

এবারেও অন্যান্য বারের ন্যায় মামুলী প্রথায় অধিনায়ক মনোনয়নে রাজন্যবাদ বজায় রাখা হইয়াছে। ভারতে ভ্রাম্যমাণ ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ান্ দলগুলির বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সহিত নেতৃত্ব করিয়াও খ্যাতনামা খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট আমাদের ক্রিকেট-কর্ত্তাদের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হইতে পারেন নাই। তাহার ফলে পাতৌদীর নবাবের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। ভারতের বাহিরে খেলিয়া অমর খেলোয়াড় রঞ্জী ও উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপের ন্যায় পাতৌদীকেও ইংলণ্ডের পক্ষে অবতীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি টেষ্ট ম্যাচ খেলিয়াছেন। কিন্তু কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তিনি আর সক্রিয়ভাবে খেলার সহিত সংশ্লিষ্ট নাই। ভারতে বহু প্রতিনিধিত্ব-মূলক ও বিশেষ প্রদর্শনী খেলায় সময় মত তাঁহাকে আত্মগোপন করিতে দেখা গিয়াছে।

তবে বিলাতী আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট খেলোয়াড় হিসাবে পাতৌদী যদি তাঁহার বৈদেশিক অভিজ্ঞতা এই সফরের কাজে লাগাইতে পারেন, ভারতীয় দলের পক্ষে তাহা খুব ফলপ্রসূ হইবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার সহকারী হইবেন ভূয়োদর্শী খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট। আর প্রত্যেক দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন—ইহারা দুই জন ও অমরনাথ।

এম. ডি, ডি,

এই বারের অভিযানে মোট ১৬ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পাতৌদীর নবাব (অধিনায়ক), বিজয় মার্চেণ্ট (সহকারী অধিনায়ক), এল, অমরনাথ, আব্দুল হাফিজ, মুস্তাক আলী, সি, এস, নাইডু, সি, টি, সর্ব্বাতে, আর, বি, নিম্বলকর, গুলমহম্মদ, এস, ডাব্লিউ, সোহনী, আর এস মোদী, ডি ডি হিন্দেলকার, বিনু মানকড়, এস, ব্যানার্জ্জী, ভি, এস, হাজারী, ও এস, জি, সিন্ধে।

টীম মনোনয়ন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। মার্চেণ্ট, মোদী, অমরনাথ, হাজারী, মুস্তাক আলী প্রভৃতির ন্যায় ধুরন্ধর খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত এই দল ব্যাটিংয়ে পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। মানকড়, অমরনাথ, হাজারী ও হাফিজের ন্যায় অল-রাউণ্ডারের সাহায্য যে কোন আন্তর্জাতিক দলের পক্ষে অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের পরিচায়ক। এস, ব্যানার্জ্জী, সর্ব্বাতে, সি এস নাইডু প্রভৃতির ন্যায় কৃতী বোলার যে কোন শক্তিশালী দলকে আউট করিবার পক্ষে যথেষ্ট। বাম হাতের খেলোয়াড় হিসাবে গুলমহম্মদ ও হাফিজ প্রতিপক্ষ ফিল্ডিংএর পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। বিগত সফরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছয় জন খেলোয়াড় এই দলে আছে, যথা—মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলী, অমরনাথ, সি. এস, নাইডু, এস ব্যানার্জ্জী ও ডি. ডি, হিন্দেলকার। নবীন ও প্রবীণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সংগঠিত এই দল এবার আমাদের—ভারতীয় ক্রিকেটকে নূতন গৌরবে গৌরবান্বিত করিবে। অবশ্য, ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে দলগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশগত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া দল গঠন খুব কঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমীর এলাহীর ন্যায় খ্যাতনামা 'স্পিন' বোলারকে দলভুক্ত না করায় কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

১৯৩৬ সালের সফরে যে অশুভ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল—যাহার ফলে অমরনাথকে ভারতে ফিরাইয়া দেওয়া হয় ও বোমণ্ট অনুসন্ধানী কমিটি নিয়োগ করা হয়—সে বিষয়ে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ যেন অবহিত থাকেন।

দলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরস্পরের মধ্যে বোঝা-পড়ার ব্যবস্থা না থাকিলে ভারতীয় দলের বিলাতী সফর গত বৎসরের সিংহলী সফরের ন্যায় ব্যর্থতায় ও প্রহসনে পর্য্যবসিত হইবে। এই দলের নির্ব্বাচিত সুযোগ্য ম্যানেজার আমাদের মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত বহু বার বহু খেলা-দলের দায়িত্ব লইয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। সুশৃঙ্খল ভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই বিজয়াভিযানের সারথি মিঃ গুপ্তের কর্ত্তৃত্বাধীনে আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের খ্যাতি প্রসার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

বেশী প্রয়োজন এটা বুঝিয়া সে নিজেকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল—কিন্তু চেষ্টা করিলে পরীক্ষাটা দেওয়াও এমন কিছু কঠিন হইবে না। এক-এ পাশ করিলে অন্ত ইস্কুলে বেশী মাহিনায় কাজ পাওয়া যাইবে, হয়ত বা হেড্‌-মাষ্টারীও জুটিবে। তাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়াও কিছু আয় বাড়ানো যাইতে পারে। তাছাড়া সে ভাবিয়া দেখিল যে, বিবাহ হইলেও যেমন টাকা সে গত দুই মাস বাড়ীতে পাঠাইয়াছে সে টাকা পাঠানোর কোন অসুবিধা হইবে না। বাবা যদি রাগের মাথায় এখন কিছু দিন না-ই টাকা নেন্ ত পোষ্ট আফিসে টাকাটা মাসে মাসে জমানো যাইতে পারে। সেটা শান্তির বিলোতর সময় প্রয়োজনে আসিবে।

না, মন যখন সে স্থির করিয়াই ফেলিয়াছে তখন নিজের কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। অদৃষ্টে যাহা আছে থাক— [ক্রমশঃ

বন্ধু, মৃন্ময়ীকে তুমি কী কখনও দেখেছো ? দেখনি, না ? কত দিন কত সন্ধ্যাতে আমি তোমার কাছে যত গল্প করেছি মালতী নামের আড়ালে, সেই মালতীই আমার মৃন্ময়ী। যার গল্প তার নাম গোপন করবার কোন গূঢ় কারণ ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টতার ভিতর আমার মনের সে নরম সুখটুকু ঠিক ধরা দেবে না বলেই একটা মানসী মূর্ত্তি রচনা করে তোমার কাছে ধরেছি। তুমি ভাবতে আমাদের যে বয়স, সেই বয়সের এ এক রকম উচ্ছ্বাস; উচ্ছ্বাসই তো বটে; কিন্তু কেউ সে উচ্ছ্বাস পারে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে, কেউ পারে না; আমার মধ্যে এমনিই একটি সুখ-প্রেম-আনন্দের বান ডেকেছিল, যা আমি নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারিনি। আমার মনের সে টলমল উচ্ছ্বাস নিয়ে আমার পক্ষে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব ছিল না, ভাবনা ছিল বাইরে এ নিয়ে হাসা-হাসি করে কে সস্তা করে দেবে। তোমাকে যখন বলেছিলুম তখন কি তোমার একবারও মনে হয়েছিল এটা সম্পূর্ণ অলীক, কেবল আকাশ-কুসুম। তুমি বুঝতে বলেই তোমাকে বলে এসেছি বন্ধু, কিন্তু আর তোমার কাছে সন্ধ্যেতে যাবো না, কারণ আর তো বলবার মত কিছু নেই। পাখীর কতটুকু শক্তি, কিন্তু তবুও পাখী যখন প্রাকৃতিক ঝড়-ঝাপটের ভিতর দিয়ে একটি একটি কাঠি সংযোগে একটা ছোট্ট নীড় রচনা করতে দৃঢ়-পরিকর হয়, তখন প্রথমটায় দর্শকের চোখে সত্যি হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু যেদিন রচনা শেষ হয়, সেদিন ? বন্ধু, সেদিন, কার শক্তির জয় হয় ? হোক সে নীড়ের মেয়াদ অল্প, কিন্তু ঐ তো সফলতার ক।

আমিও তাই ভেবেছিলুম সব কিছু পণ করে মৃন্ময়ীকে পাবো একদিন, কিন্তু সেদিন বুঝিনি অসাধারণ মৃন্ময়ীকে পেতে গেলে পণের প্রয়োজনই হয় না।

আমার প্রথম সন্ধ্যাতে মৃন্ময়ীর বাড়ী যাওয়া এবং ফিরে এসে তোমার কাছে যাওয়া মনে পড়ে ? তার সঙ্গে আলাপ হবার যোগাযোগটা সত্যি অদ্ভুত ! তাকে অনেক দিন আগে এক কালে ক্রমান্বয় মাসের পর মাস প্রতিটি দিন বোধ হয় দেখেছি—সে সময় বোধ হয় আমাদের ছিল পাঠ্যাবস্থা,—কিন্তু সে দেখার মধ্যে বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তার কোন খেয়াল সমাপনের অভিলাষ তখন ছিল না, তাই সে দেখা যেমন রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে অগণিত মানুষ দেখি, চলন্ত ট্রেণ থেকে ছুটন্ত গাছ দেখি, দোকানে দোকানে স্তরে স্তরে নানা দ্রব্যসম্ভার দেখি, তেমনি দেখা ছিল—অর্থাৎ সে দেখা মনেতে কোন ছাপ ফেলেনি।

তার পর বহু বর্ষ পরে পরিণত বয়সে হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল একটি গানের মজলিসে। আগে সে প্রত্যহ চোখে পড়েও ঠিক চোখে পড়েনি, সেদিন কিন্তু সবাইএর ভিতর একমাত্র সেই কেবল আমার চোখে বিশেষ করে পড়লো। সেদিন সে কি সাজ করেছিল, সে কথা তোমাকে বন্ধু, বহুবার বলেছি, আবার বলতে ইচ্ছে করছে। সাজের মধ্যে তার বাহুল্য এতটুকু ছিল না; সাদা সুতোর শাড়ী, তাতে লাল ও কালোর রূপার টাকার মত আকারে ছাপ; পাড়টাতে ছিল লালের আধিক্য তারই দুপাশে সরু কালো রেখা। এই তো শাড়ী, কত মেয়েই সেদিন সেজেছিল এর চেয়ে কত বেশী। প্রসন্নতায় ভরা ছিল মুখ আর ঠোঁটের কোণে হাসির রেশটুকু স্তব্ধ হোয়ে। চোখের ওপর চোখ পড়তেই কেন জানি না দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে দুজনেই পারিনি কতক্ষণ !—এইখানেই সুরু হোলো সৃষ্টিকর্ত্তার খেয়াল-খেলা। দেখলুম

বিন্দুমাত্র

শ্রীগীতা বসু

সরু সরু কৃষ্ণকালো ভ্রুযুগলের মাঝে ছোট্ট ছোট্ট একটু লালের বিন্দু। মনে হোলো ঐ লালের বিন্দুটুকু মৃন্ময়ীকে শ্রীমণ্ডিত করেছে বিশেষ করে, নিয়ে গেছে তাকে অপরূপের জগতে। আরও কত মেয়ে তো ছিল, ছোট-বড় রং-বে-রংএর কত টিপ পরে কত মেয়ের ছিল শূন্য শুভ্র কপাল, কিন্তু মৃন্ময়ী ছাড়া সেদিন কেউ আমার চোখেই পড়লো না। কেবল মৃন্ময়ীর যুগল ভ্রূর মাঝে লাল বিন্দুটুকু আর ঠোঁটের কোণে থেমে আসা হাসির রেশটুকু আমার মনে কি যে সেদিন সৃষ্টি কোরলো—সে আমি তখন বুঝিনি, তোমাকেও বোঝাতে পারিনি, তুমি কেবল অনুমান করেছিলে

আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় হঠাৎ কে দিয়েছে প্রদীপটি জ্বালিয়ে।

চঞ্চল, উজ্জ্বল কালো নয়নযুগলের মাঝে লাল বিন্দুটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে ছিল তা নয় বন্ধু, তার চেয়ে আরও একটা জিনিষ আমাকে বেশী অভিভূত করেছিল, তা ঠিক সেই লাল বিন্দুর রেখায় অবস্থিত মৃন্ময়ীর সুগঠিত চিবুকের মধ্যদেশে একটি কালো বিন্দু! আশ্চর্য্য! মৃন্ময়ীর চিবুকের ওপর অমন সুন্দর যে একটি তিলফুল ছিল তা আমি আগে দেখতে পাইনি। এখন বহু দিনের ফেলে-আসা অতীতের দিকে চেয়ে মনে হয়, মৃন্ময়ী এ কালো বিন্দুটিকে আড়াল করে রাখবারই চেষ্টা কোরতো।

গানের মজলিস ভাঙবার আগেই মৃন্ময়ী বিদায় নিয়ে উঠে পড়লো। লালের ও কালোর চাকৃতি নিয়ে তার সাড়ীর আঁচলের প্রান্তটুকু যে মুহূর্ত্তে চোখের আড়াল হোলো, সেই মুহূর্ত্তে মনে হোলো সমস্ত রাগ-রাগিণী যেন বেসুরো তালে কেবল কলরব সৃষ্টি করছে। আমিও উঠে পড়লুম। আমার নিজেকে সেদিন এমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, নিজের মনের এ যে কী ধরণের তাগিদ আমি তা নিজেই বুঝতে পারিনি তা তোমাকে বোঝাব কি করে বন্ধু।

নীচে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে পৌঁছলুম; একটা গ্যাস-পোষ্টের নীচে মৃন্ময়ী অপেক্ষা করছিল। আমি সেদিক্ দিয়ে যাবো কি যাবো না ভাবছিলুম, কারণ নিজের আচরণের সবটাই কেমন নিজের কাছে নতুন মনে হচ্ছিল, মন যা চাইছে তা ভাবতে নিজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিলুম—পরিণত বয়সে, কর্ম্মজীবনের সাফল্যের ভেতর এ ধরণের হাওয়া কোনও দিনও বয়নি, তাই হয়তো এ অস্বচ্ছন্দতা। হঠাৎ মৃন্ময়ী আমার দিকে চেয়ে তার হাত দুটি জুড়ে আমাকে ছোট্ট নমস্কার করে এগিয়ে এসে বললে—"চিনতে পারছেন?" আলাপ করবার মতলবই তো ছিল আমার অন্তরের অন্তস্তলে, কিন্তু মৃন্ময়ীর প্রশ্নে সমস্তটা গোলমাল হয়ে গেল। হয়তো মৃন্ময়ীর চোখে আমার আচরণের অশোভনত্ব কোথাও ধরা পড়ে গেছলো সেং সেন সেটাকেই ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে মৃন্ময়ী এগিয়ে এলো!

আমি প্রতি-নমস্কার করে বললুম,—"চিনতে কেন পারবো না, কি খবর?" আমার পুরুষ-কণ্ঠে যতটা দৃঢ়তা থাকা দরকার ততটা দৃঢ়তা সেদিন ছিল না। কেন যে এমন হয়েছিল, বন্ধু, সত্যি আমি তখন বুঝিনি; আমার হৃদয়ের এ আবেগের কথা সেদিন তাই স্পষ্ট করে বোঝাতেও পারিনি, কিন্তু বন্ধু তুমি তো এতটুকুও অবাক্ হওনি, বরং পিঠ চাপড়ে বলেছিলে—"এমন লগ্ন প্রত্যেকের জীবনে এক বারও অন্ততঃ আসে।" মৃন্ময়ী তার পর বললো—"কোন দিকে যাবেন?" আমি প্রতিপ্রশ্ন করলুম—"আপনি কোন দিকে?" মৃন্ময়ী তার স্নিগ্ধ- তরল কণ্ঠে বললে—"বালিগঞ্জের দিকে "কিসে যাবেন?" আমি বিবেচনা না করেই উত্তর দিলুম—"কেন, মোটর গাড়ীতে?" মৃন্ময়ী বলে উঠলো—"আচ্ছা আজ তাহলে আসি।" বলে মৃদু হেসে একটি নমস্কার করে চলতে সুরু করে দিল। আমি গাড়ীর কাছে এগিয়ে গেলুম, আমার চোখের সামনে অবনত কিন্তু কালো চঞ্চল দুটী চোখের মাঝখানে স্থির লাল বিন্দুটি ও তারই সমরেখায় অবস্থিত সুগঠিত চিবুকের মধ্যখানে কালো তিলটুকু মিষ্টি হাসির গুঞ্জরণের ভিতর ভাসছিল। মনে হোলো হঠাৎ যেন জীবনের একটা অপার্থিব [illegible] অপার্থিব আনন্দ দিয়ে অকস্মিতে চলে গেল।

গাড়ীতে উঠে বসতে ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে দিল। একটা মোড় ঘুরতেই দেখি রাস্তা পার হবার জন্যে মৃন্ময়ী এদিক্-ওদিকে তার সাবধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। লজ্জায় সমস্ত শরীর স্তম্ভিত হয়ে গেল এই ভেবে যে মৃন্ময়ীকে তো জিজ্ঞেস করিনি একবারও সে ফিরবে কিসে? ভুল-ত্রুটি মানুষের তো আছেই, এই ভেবে মনে জোর করে নেবে পড়লুম গাড়ী থেকে; মৃন্ময়ীর কাছে গিয়ে বললুম—"অপরাধ হয়ে গেছে, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি!" মৃন্ময়ী আমার দিকে তার চঞ্চল কালো চোখের দৃষ্টি স্থির করে বললে—"তা কি করে হয়, কোথায় আলিপুর আর কোথায় বালিগঞ্জ, আর তাছাড়া আমার বাড়ীও কাছে, আমি পৌঁছে যাবো। ধন্যবাদ।" লাল টিপের আর কালো তিলের এমন বাহার আমি আর কখনও দেখিনি। হাসির মৃদু গুঞ্জরণের সঙ্গে কালো চোখের চঞ্চল চাহনী আমার মনকে এমন স্বপ্ন-রাঙ্গা করে দিল। বন্ধু, তোমাকে যখন এ সব কথা বলেছিলুম, তুমি কেবল স্নেহের সঙ্গে হেসেছিলে, কিন্তু আজ যখন গল্পের শেষ কোরবো, আমার জন্যে কি দু'ফোঁটা চোখের জল তোমার গড়িয়ে পড়বে না?—৫ই বৈশাখের [illegible] দেরী নেই।

মৃন্ময়ীকে বললুম—"কাছেই তো বাড়ী বলছেন, চলুন বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি—গাড়ী আমার এইখানেই থাক।" মৃন্ময়ী হাসলে —কিছু বললে না, অর্থাৎ এতে তার অসম্মতি নেই সেটা [illegible] বুঝলুম। যখন আমরা আলোর তলা দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন তার সাড়ীর লাল-কালো বুটীগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আবার যখন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন ওর কালো চঞ্চল দুটি চোখের মাঝখানের লাল বিন্দুটি আর তারই সমরেখায় অবস্থিত সুগঠিত চিবুকের ওপর কালো তিলটি আমার মনের ভিতর দোলা দিচ্ছিল। কিছু পরেই তার বাড়ীতে পৌঁছে গেলুম।

মৃন্ময়ী তার বাড়ীর রোয়াকের ওপর উজ্জ্বল আলোর তলায় দাঁড়িয়ে আমাকে নমস্কার করে বললে—"অনর্থক খানিকটা সময় নষ্ট করলেন, কষ্টও পেলেন—আজ রাত হয়ে গেছে তাই ভেতরে এসে বসতে বলতে পারছি না, কিন্তু যদি কোন দিন অবকাশ হয় তো আসবেন নিশ্চয়।" মৃন্ময়ীর কালো চঞ্চল দুটি চোখের মাঝে লাল বিন্দুটি স্থির হয়ে রইল, কিন্তু কালো তিলটি হাসির হিল্লোলে জীবন্ত হয়ে উঠলো। এর পর তো আর থাকা যায় না, বললুম—"আচ্ছা আসি তাহলে আজ, কিন্তু সত্যই আসবো একদিন, তখন কিন্তু আবাহন করেছেন বলে আপশোষ করবেন না।" রাস্তায় খানিকটা দূর গিয়ে, একবার পিছু ফিরে দেখবার ইচ্ছে হোলো, জানি তা অশোভন, জানি তা অভদ্রতা, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে দমন করতে পারলুম না—পিছু ফিরে দেখলুম শূন্য রোয়াকের ওপর তীব্র আলোটা একলাই জ্বলছে! এই ছিল, এই নেই, যেন কোন মায়া!

এর পর মৃন্ময়ীদের বাড়ী আমার আসা-যাওয়া কত ঘন ঘন হয়েছিল, বন্ধু তা তোমার অবিদিত নেই। প্রতিটি দিনের খুচরো হাসি গল্প দিয়ে আমাদের ভিতর যে আনন্দভূমি সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিটির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। "আপনি" থেকে "তুমি"তে আমরা কত তাড়াতাড়ি নেমে এলুম, আলাপের বাহির মহল থেকে বন্ধুত্বের অন্দর মহলে কত শীঘ্র আমরা প্রবেশ করলুম। মৃন্ময়ীর [illegible] সহ হাসি [illegible] দিতালী পাড়িতে যে অসাধারণ, অপূর্ব্ব

কালো বিন্দুটি তার সুগঠিত চিবুকের ওপর স্থান লাভ করেছিল, তার প্রতি তার যেমন অবজ্ঞা ছিল, তেমনি ছিল বিতৃষ্ণা, আর আমার কিন্তু সবচেয়ে দেখতে ভালো লাগতো ঐ তিলফুলটি।

এক দিন মৃন্ময়ীর মা-বাবার কাছে আমার মনের ইচ্ছাটা জানালুম। মৃন্ময়ীর মা ও বাবা দুজনেই যে শুনে খুব খুসী হয়েছিলেন সে কথা তুমিও বন্ধু যথাকালে জানতে পেরেছিলে। অসুখী হবার তো কোনও কারণ ছিল না, কেন না ভিতরে ভিতরে তাঁরা আমার স্বভাব-চরিত্র, বংশ-মর্য্যাদা, উপার্জ্জন-ক্ষমতা ইত্যাদি মেয়েদের সৎপাত্রে দিতে গেলে যা যা খোঁজ করার প্রয়োজন, খোঁজ করেছিলেন;—করবেন নাই বা কেন?—মৃন্ময়ীর সুখ ও ভবিষ্যৎ তো তুচ্ছ করবার মত নয়। এই সব খবরাখবর যখন সংগৃহীত হচ্ছিল তখন আমি এসব কিছুই শুনিনি—আমি তখন মৃন্ময়ীকে নিয়ে স্বপ্নের পর স্বপ্ন রচনা করে চলেছিলুম—সত্যই তো স্বপ্নের পর স্বপ্ন ছাড়া আর কী?

যেদিন আমি অনুমতি পেলুম সেদিন মৃন্ময়ী পরেছিল সেই প্রথম দিনের লালেতে-কালোতে বুটি দেওয়া ছাপার সাড়ীখানা, আর চঞ্চল কালো চক্ষু দু'টির মধ্যখানে এঁকে দিয়েছিল ছোট্ট একটি সিঁদুরের বিন্দু, আর তারই সমরেখায় তার সুগঠিত চিবুকের ওপর ছিল সৃষ্টিকর্ত্তার নিজের তুলি দিয়ে আঁকা কালো বিন্দুটি।

মৃন্ময়ীর মা-বাবার কাছ থেকে ফিরে এসে যখন তাকে সংবাদটি দিলুম, তখন তার চঞ্চল কালো চোখ দু'টি চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো, সেই লাল বিন্দুতে যত লালিমা পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সব ছড়িয়ে পড়লো তার সুকুমার মুখটিতে, আর তার ঠোঁটের মৃদু কম্পনে প্রকম্পিত হয়ে উঠ্‌লো কালো বিন্দুটি তার সুগঠিত চিবুকের ওপর। যেদিন প্রথম ঐ কালো তিলটি আমার চোখে পড়েছিল, সেই দিন থেকেই তো সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর খেয়াল-খেলা সুরু করে দিয়েছিলেন, আমি তখন বুঝিনি বন্ধু, এখন কিন্তু বুঝেছি, নইলে সমস্ত জগৎ যে বিন্দুটির প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো তাকে নির্ম্মম ভাবে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে মৃন্ময়ী কেন এত ব্যগ্র হোয়ে উঠেছিল? অসাধারণ মৃন্ময়ীর সব কিছুই অসাধারণ বলে বোধ হয়! আমি সেদিনের সন্ধ্যাতে মৃন্ময়ীর কালো তিলের ওপর আমার প্রেমের প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলুম।

এই ঘটনার পর থেকে আমি আর তোমার কাছে যাইনি বন্ধু; কারণ এর পরের দিনগুলিতে মৃন্ময়ী ও আমাতে মিলে যে জগৎ সৃষ্টি করলুম, সে জগতে আর কাউকে বরণ করে নেবার অবকাশ ছিল না।

এত দিন পরে গল্পের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছানো গেছে—এই পূর্ণ সমাপ্তির খবরটুকু তোমাকে না দিয়ে থাকতে পারছি না, কারণ প্রথমটুকু তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

মৃন্ময়ীর মা-বাবার মত পেলুম বটে, কিন্তু তিথি-নক্ষত্র এমন শয়তানী কোরল যে সাড়ে তিন মাসের পূর্ব্বে শুভদিন ধার্য্য করা কিছুতেই সম্ভব হোলো না। বলেছি না, সৃষ্টিকর্ত্তার খেয়াল-খেলা তখন সুরু হয়ে গেছে, তাই তো তিথি-নক্ষত্র এমন কোরে নিজেদের জায়গা উল্টো পাল্টা করে নিল।

তবুও আমি অধীর ভাবে এই বৈশাখের দিন গুণতে লাগলুম।

এদিকে, মৃন্ময়ীর সুগঠিত চিবুকের ওপর ঐ কালো বিন্দুটি যে ওর সমস্ত মুখের সৌন্দর্য্য কীটদষ্ট করে দিয়েছে এ ধারণা মৃন্ময়ী কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছিল না। আমি কত ওকে বুঝিয়েছি ঐ তিলের মোহিনী শক্তির কথা, ও কেবল চঞ্চল চোখে দুষ্টু হেসে অবিশ্বাস করেছে। মৃন্ময়ীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে যে শেষ, তার নিজের চিবুকের ওপর কালো বিন্দুটির সঙ্গে লড়াইএ মাতবে এ কথা আমি কেন, কেউই তখন বুঝতে পারিনি। মৃন্ময়ীর ছেলেমানুষী ভেবে মৃন্ময়ীর মা-বাবা এ নিয়ে তার কোনও অনুযোগেই কোন দিন কান দেননি। আমার পক্ষে সে ছোট্ট কালো বিন্দুটি উৎপাটনে মত দেওয়া কতখানি অসম্ভব, বন্ধু, তুমি তা তো জান। বরাবরই দেখে এসেছি মৃন্ময়ীর সব কিছুই অত্যন্ত অসাধারণ; অমন বুদ্ধিমতী মৃন্ময়ীকে শেষে অসাধারণ ছেলেমানুষীতে পেয়ে বোসলো।

তখন শুভ-দিনের পনেরো দিন মাত্র বাকী আছে; এক দিন সন্ধ্যা বেলায় মৃন্ময়ী কি করলে জান? একটা ছুঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই তিলটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলে। তার সুন্দর চঞ্চল দু'টি কালো চোখের মাঝখানে যে সিঁদুরের বিন্দুটি আঁকা থাকতো তা থেকেই যেন রক্ত ঝরে তার সুগঠিত চিবুকের ওপরে ছোট্ট কালো বিন্দুটিকে রক্ত-রাঙ্গা করে দিল।

দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন···

তার পর বন্ধু পঞ্চম দিনের গোধূলি লগ্নে সেই দু'টি চঞ্চল কালো নিমিলিত আঁখির মাঝে লাক্ষের ফোঁটা পরিয়ে, আর তারই সমরেখায় অবস্থিত সুগঠিত চিবুকের অস্বাভাবিক স্ফীততার ভিতর সৃষ্টিকর্ত্তার তুলির পরাজয় ও মৃন্ময়ীর ছুঁচের জয়ের নিশানা নিয়ে আমার চোখের ওপর দিয়ে ওরা মৃন্ময়ীকে নিয়ে গেল।

বন্ধু! এই বৈশাখ আসতে মাত্র দশটা দিন বাকী আছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীতারানাথ রায়
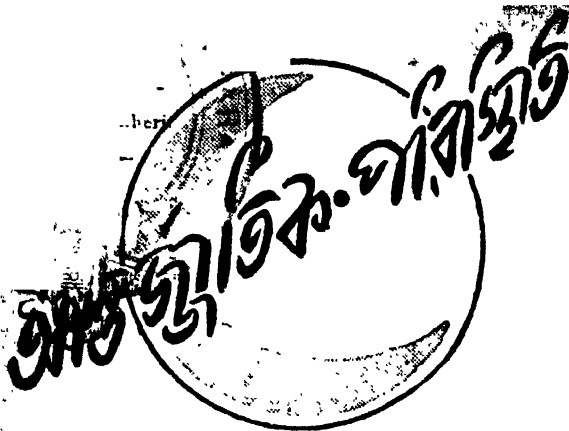
রুশিয়ার বিরুদ্ধে—

ফুলটনে উইনষ্টন চার্চ্চিল এক বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপের প্রতিষেধক ব্যবস্থা করতে বলেছেন ইঙ্গ-মার্কিণ মৈত্রীসঙ্ঘ স্থাপন করে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জর্জ বার্ণার্ড শ এ সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন—"যে ইঙ্গ-মার্কিণ মৈত্রীর প্রস্তাব চার্চ্চিল করেছেন তা সার্থক হলে বলতে হবে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। চার্চ্চিলের প্রস্তাবের অর্থ প্রাচীন ব্যালেন্স অব পাওয়ার বা শক্তি-সাম্য নীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন—অর্থাৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তি-সংঘ গঠন—এর মানে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ।

বৃটিশ শ্রমিক-দলের সভাপতি অধ্যাপক হেরল্ড লাস্কি জিজ্ঞেস করেছেন—"চার্চ্চিল কি বলপ্রয়োগ করে কমুনিজমের গতি রোধ করতে চান?···বৃটেনের সঙ্গে আমেরিকার সুসম্পর্কে দুই দেশেরই কল্যাণ, কিন্তু বৃটেনের সঙ্গে রুশিয়ার সম্পর্ক হৃদ্যতর হলে তাতে কল্যাণ সমগ্র পৃথিবীর।···চার্চ্চিলের এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, তিনি যতই গালভরা বক্তৃতার বাহাদুরী করুন না, মার্কিণ সিনেটের পররাষ্ট্র কমিটী পশ্চিম-এশিয়া এবং অন্য স্থানে বৃটিশ-নীতির সমর্থন করবেন না।"

চার্চ্চিলের প্রস্তাব বৃটিশ সংবাদপত্রমহল সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করলেও মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি তার সমর্থন করেনি। 'হেরল্ড ট্রিবিউন' জিজ্ঞেস করেছেন—"তা-হলে গ্রীসে, পূর্ব্ব-এসিয়ার, ভারত, ব্রহ্ম ও মালয়ে বর্ত্তমানে বৃটেন যে দখল নিয়ে আছে, তা কি তারা ছেড়ে দেবে?"

মার্কিণ সাংবাদিক জোসেফ ও ষ্টুয়ার্ট এ-সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—"India is likely to prove the Achilles' heel of any policy aimed at conserving the existing power relationship for at any time the British power system may be crippled by an explosion there."

পূর্ব্ব-য়ুরোপের উপর সোভিয়েট প্রভাবের ফলাফল ব্যাখ্যা করে চার্চ্চিল বলেছেন—যে য়ুরোপের মুক্তির জন্য আমরা লড়াই করলাম একে নিশ্চয় সে মুক্ত য়ুরোপ বলা চলে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সভাপতি কালিনিনও 'বলশেভিক' পত্রে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে যুদ্ধের পর রুশিয়ার বাহিরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এ সব দেশে বুড়ো রাজনীতিকদের সংখ্যা এত বেশী হয়ে পড়েছে যে, তারা জনসাধারণকে প্রতারিত করছে। কাজেই সত্যিকার গণতান্ত্রিক আর দেশভক্তদের কর্ত্তব্য হবে এদের মুখোস খুলে ফেলা।

তৃতীয় মহাসমর?—

ওয়াশিংটনের 'ড্যান্টন ওয়াকার' পত্রিকা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শীঘ্রই, সম্ভবতঃ দুই-এক মাসের মধ্যেই তৃতীয় মহাসমর বাধবে। পত্রিকাখানি বলছেন যে, ওয়াশিংটনে কূটনৈতিক মহলে প্রবল জনরব যে, আগামী এপ্রিল বা মে মাসে রুশিয়া তুর্কীর দিকে অগ্রসর হলে বৃটেন তুরস্ককে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধে নামবে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' সংবাদ প্রচার করেছেন যে, রুশিয়া মাত্র তুর্কীর কাছে কার ও আর্দ্দামান অঞ্চল ছেড়ে দেবার দাবী করেছে তা নয়, সোভিয়েট সরকার বৃটেন আর আমেরিকাকেও জানিয়েছে যে, এ অঞ্চলগুলো সোভিয়েট ইউনিয়নকে ফিরিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য।

তুরস্ক কি মনোভাব নেবে, ইংরেজরা তাকে কি ভাবে সাহায্য করবে তার কোন কথাই এখনও জানা যায়নি। তবে পূর্ব্ব-ইয়োরোপ, ও পশ্চিম-এশিয়ায় রুশিয়া তাহার প্রভাব বিন্দুমাত্র শিথিল করবে বলে মনে হচ্ছে না।

পূর্ব্ব-ইউরোপে—

গ্রীসে শ্বেতাতঙ্ক—কথাটা ঠিক হ'ল না, বলা উচিত গ্রীসে শ্বেত-আপদ্। অন্ততঃ রুশিয়া তাই বলছে। মিত্রশক্তিবর্গের নিরাপত্তা বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধি আন্দ্রি ভিশিনস্কি সুস্পষ্ট ভাবে দাবী করেছেন—গ্রীস থেকে ইংরেজ সৈন্য দূর হটো! তিনি বলেছেন—এ কথা অবশ্যি সত্যি যে এক সময় গ্রীসে ইংরেজ সৈন্য রাখতে সোভিয়েট ইউনিয়ন আপত্তি করেনি। সেটা জার্ম্মাণদের তাড়াবার জন্য। আজ জার্ম্মাণরা গ্রীসে নেই। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এখনও যদি ইংরেজ সৈন্য সেখানে থাকে তাহলে গ্রীসের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় গোল বাধবে। ইংরেজ এতে খাপ্পা। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন বলেছেন—"আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে রুশ কমুনিষ্ট পার্টি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ একই সুরে বৃটেনকে আক্রমণ করতে সুরু করছে।

মিশরে—

মিশরবাসীরা ক্রমেই অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌ছে। সেখানেও ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ। সেখানেও ইংরেজের সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে। ইংরেজরা মিশরকে এ সব হাঙ্গামার জন্য দায়ী করে ক্ষতিপূরণ চাচ্ছে। ওয়াফদ্-নেতা নাহাশ পাশা বলেছেন, ইংরেজ সৈন্যরাই গুলী চালিয়ে প্রথমে হাঙ্গামা বাধায়। প্রধান মন্ত্রী সিদকী পাশার অভিযোগও তাই। ইংরেজরা বলছে, হাঙ্গামা ও জনবিক্ষোভ সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে নতুন ইঙ্গ-মিশরী সন্ধির কথাবার্ত্তা চালান হবে না। কিন্তু মিশর থামছে না। সে বলছে, ইংরেজকে মিশর ছেড়ে যেতেই হবে। ইতিমধ্যে প্রবল জনরব, মিশর ইঙ্গ-মিশরী সন্ধি বর্জ্জন করে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য মিত্রপক্ষের কাছে আবেদন করবে।

ইরাণে—

লণ্ডনের 'ডেলি মেল' পত্র বলছেন, উত্তর-পশ্চিম ইরাণে সৈন্য রাখবার সঙ্কল্প করায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপনের আশা নষ্ট

হতে চলেছে। কিন্তু 'ডেলি মেল' এ কথা একবারও বলেননি যে, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীনে বৃটিশ সৈন্য স্থাপন আর ভারত ও ব্রহ্মে বৈদেশিক শাসন কায়েম করায় বিশ্বশান্তি শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। ২রা মার্চ্চ সোভিয়েট সৈন্যের ইরাণ ছেড়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু যায়নি। ইরাণী সরকার মাত্র নয়, বৃটিশ ও মার্কিণ সরকারও এর জন্য সোভিয়েট সরকারের কাজের প্রতিবাদ করেছে। আমেরিকা একটু কড়া করেই বলেছে যে, শীগ্‌গির লালফৌজ ইরাণ থেকে সরিয়ে না নিলে, সে চুপ করে বসে থাকবে না। লণ্ডনের রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা বলেছে যে, রুশরা মত পরিবর্ত্তন না করলে বৃটেন আর আমেরিকা বেশ স্পষ্ট প্রতিবিধান ব্যবস্থা করবে।

বিলাতী 'সানডে অবজার্ভারে'র কূটনৈতিক সংবাদদাতা মন্তব্য করেছেন, গত ছয় মাস ইরাণে রুশিয়ার কর্ম্ম-কৌশল বিশ্লেষণ করলে এই বুঝা যায় যে, উত্তর-ইরাণে আপন আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে সে সম্মত নয় কিছুতেই।

চীনে—

চীনে কমুনিষ্ট ও কুওমিনটাং দলে মিল হয়ে গেছে বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বহির্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় আবার ঘরোয়া লড়াই পেকে উঠেছে। এর জন্য সবাই দায়ী করছে সোভিয়েট আর চীনা কমুনিষ্টদের। চীনা-সোভিয়েট সন্ধি হয়ে গেলেও এক দিকে যেমন রুশ সৈন্য মাঞ্চুরিয়া থেকে সরে যাওয়া দূরের কথা, বড় বড় সহরে নতুন নতুন সৈন্য-ব্যারিক গড়ে তুলছে, অন্য দিকে তেমনি চীনা সরকার এ-অঞ্চলের শাসন-কর্ত্তৃত্ব এ পর্য্যন্ত হাতে নিয়ে উঠতে পারেননি

যে সব অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্য মোতায়েন সে সব অঞ্চলে যে সব চীনা রাজকর্ম্মচারীকে দখল নিতে পাঠান হয়েছিল তারা খুন হয়েছে। ডিয়েরেন ও লাইরেণ বন্দরে চীনা সরকারী সৈন্যদের অবতরণ নিষিদ্ধ হলেও, এ অঞ্চলে কমুনিষ্ট সৈন্যসংখ্যা ৩ লক্ষ হয়েছে। এ সব সৈন্যের হাতে জাপানী হাতিয়ার। মাঞ্চুরিয়ার চাং-চোঙ্গিন রেলপথ সোভিয়েট-করতে। প্রায় সব সংবাদপত্র ও কারখানা এখনও কমুনিষ্টদের হাতে। যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি মাঞ্চুরিয়ায় ছিল, তা সব রুশিয়ায় চালান গেছে। সেখানেও কমুনিষ্টরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

মালয়ে কমুনিজম্—

যুদ্ধের পূর্ব্বে মালয়ের লোকেরা কমুনিজম বলে কিছু জানত না। আজ সেখানকার শ্রমিকদের অনেকের মধ্যে কমুনিজমের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) সিঙ্গাপুরে এক দল বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীর উপর পুলিস গুলী চালায়। এ বিক্ষোভ সংগঠন করেছিল কমুনিষ্টরা। লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন ধমক দিয়ে বলেছেন—সংগঠিত বা অসংগঠিত কোন হাঙ্গামা বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু চণ্ড-চাবুকে ত গণ-আন্দোলনকে কেউ কাবু করতে পারেনি। মালয়ের রবার-প্ল্যাণ্টার সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যখন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারল না, তখন বাধ্য হয়েই তাদের কমুনিজমের বাণী গ্রহণ করতে হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায়—

ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা এখনও শুরু হয়নি। ডাঃ সুলতান জহরির চরমপন্থীদের সমর্থন পাননি বলে অনেকে মনে করেছিলেন যে কথাবার্ত্তা শুরু হলেই চরমপন্থীরা প্রবল ভাবে বাধা দিবে। তাদের দাবী খুব হলে ডাঃ জহরির অবস্থাও সঙ্গীন হতে পারে। ওদিকে বাটাভিয়ায় নতুন নতুন ওলন্দাজ সৈন্যদল নামান হচ্ছে, ওলন্দাজরা বাঙ্কা ও বালী দ্বীপ জাপ সৈন্যের হাত থেকে দখল নিয়েছে। সেমারাং ও সুরাবায়াতে নতুন সৈন্য আসবে বলে শুনা যাচ্ছে।

যবদ্বীপে ইংরেজের বিশেষ প্রতিনিধি সার আর্চিবল্ড ক্লার্ক কের মনে করিতেছেন যে, ইন্দোনেশিয়া সম্ভবতঃ ইউনাইটেড নেশন্স অর্গানাইজেশন-ভুক্ত হইবে।

ভারতের স্বাধীনতা—

ভারতের হাতে না কি স্বাধীনতা তুলে দেবার জন্য ইংরেজের সদ্বুদ্ধি হয়েছে। অন্ততঃ মুখে ওরা তাই বলছে। স্বয়ং বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব বলে ফেলেছেন যে—ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করলে, বর্ত্তমান অবস্থায় চাইতে ব্যবসার সুযোগ বৃটেন পাবে, আর সেই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতিতেও সাহায্য করা হবে।

কিন্তু বৃটেনের এই সদিচ্ছার উপর এ-দেশের বেশীর ভাগ রাজনৈতিক নেতা যেমন আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না, তেমনি ভারতের বাহিরেও অনেক দেশ পারছে না।

সোভিয়েট পত্র 'বলশেভিক' বলছেন—"If England desires to achieve a normal situation in India and to prevent new and more powerful demonstration of the Indian people, it should follow decisive and cardinal changes in its Indian policy."

প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক লুই ফিসার বলছেন—ভারতকে বুঝতে এটলী আমেরিকাকে সাহায্য করেছেন। ২রা ফেব্রুয়ারী জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মভূমি নদামটনশায়ারের সুলগ্রেভ ম্যানরের বক্তৃতায় এটলী এডমণ্ড বার্কের এই প্রসিদ্ধ বাণী পাঠ করেন—

"If I were an American, as I am Englishman, while foreign troops landed in my country, I would never lay down my arms—never, never never. Did Attlee think of India when he spoke those words to America?"

এটলীর যদি সদিচ্ছাই থাকে, এবং তাঁর জাতের যদি সত্যি বাঁচবার সুবুদ্ধি থাকে তবে ভারতকে আর যেন বাঁটান না হয়। যৌবন-জলতরঙ্গ উত্তাল। এতে "বাধা দিলে বাধবে লড়াই।"

এ বছরেই স্বাধীনতা !

কংগ্রেসের নেতাদের দৃঢ় ধারণা যে এ বৎসরের (১৯৪৬) মধ্যেই ভারত স্বাধীন হইবে। সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের ইহাই ধারণা। পণ্ডিত জওহরলালেরও ধারণা ইহাই। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদেরও ধারণা—বিদেশীর হাত হইতে ভারতবাসীর হাতে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার আর দেরী নাই। এ অবস্থায় এমন কোন অবস্থার উদ্ভব করা সঙ্গত হইবে না যাহাতে ভারতের এই আশু কাম্য লাভে বিঘ্ন হইবে। ধর্মঘট, হরতাল বা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করা এ সময় সঙ্গত নয়। ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে উহারা সম্মত না হইলে যথাসময়ে কংগ্রেস তূর্য্যধ্বনি করিবে। ইতিমধ্যে সকল শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। নব ভাবের আশু প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে আমরা খুবই সচেতন, তরুণরা যে আজ অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে সে-কথাও আমরা ভাল করিয়াই জানি। বন্ধু রহ ধৈর্য্যম্।

তাঁহাদের আরও ধারণা যে, ইংরেজ সরকার ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যখন আন্তরিক আগ্রহ দেখাইতেছেন, তখন বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের যে প্রতিনিধি দল ভারতে আসিতেছেন কংগ্রেস নিজবুদ্ধিতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা করিবেন। যদি সন্তোষজনক ফল না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস শেষ বাস্তব সংগ্রাম করিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, কংগ্রেস বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিদের সহিত আপোষ মনোভাব লইয়া আলোচনা করিলেও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না। নেহেরুজীর ধারণা, ইংরেজরা মাত্র জানিতে চায় যে, স্বাধীন ভারতে তাহারা বাণিজ্য-সুবিধা পাইবে কি না। তিনি ইংরেজদের জানাইতেছেন—"কি ভাবে তোমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে চাও, তাহার উপর এই সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করিবে।"

পাত্তাড়ি গুটাও

পার্লামেণ্টারী কমিশন ভারত ভ্রমণ করিয়া গেলেন। দেশে ফিরিয়া তাঁহারা ভারতের কি ছবি সংগ্রহ করিলেন তাহা স্বদেশবাসীকে জানাইয়াছেন। মিসেস্ মুরিয়েল নিকোল ত্রাস-কম্পিত কণ্ঠে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন—"কানপুরে শ্রমিক নরনারীরা সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ করিয়া মাত্র ৫০৲ টাকা পায়, আর তাহাদের পুত্র-কলত্র না খাইয়া মরে।...কলিকাতার কাঙ্গালদের যাহা জাগ্রত চক্ষুতে দেখিয়াছি, দুঃস্বপ্নেও কখনও এমন আমি দেখি নাই। দেড় শত বৎসর আমরা আছি ভারতে, তবু এ অবস্থা! লজ্জা হয় না আমাদের?" তিনি অগণিত জনতার নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"When we clear out from India, and clear out we must, there shall dawn in India a glorious period of social progress. What does it matter if they quarrel. Let us get out." আমরা যখন ভারত হইতে সরিয়া পড়িব—আর সরিতেও হইবেই—তখন ভারতের সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির এক গৌরব-যুগের আবির্ভাব হইবে। উহারা কলহ করে, তাহাতে আমাদের কি? আমরা চলিয়া আসি না কেন?

মিঃ রেজিনাল্ড সোরেনসেনেরও ঐ কথা—

"It is our business to quit India; this conviction is shared by high British officials in India."

বৃটিশ মন্ত্রিসভার দৌত্য

তার পর বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিরা আসিতেছেন। তাঁহারা কোন্ কোন্ সমস্যার সমাধান করিবেন তাহার বিশদ কোন কথা জানা যায় নাই। শুনা যাইতেছে, তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন নেতার সহিত কথা বলিবেন না। সম্ভবতঃ নয়া দিল্লীতে একটা গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি ও বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি বড়লাটের আলোচনা হইবে। বিলাতী শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে—ইন্দো-বৃটিশ ইউনিয়নের জন্য একটা সন্ধির খসড়া তৈয়ারী করিবার সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিরা আসিতেছেন। অবশ্য এ সন্ধির মোটামুটি ছক লইয়াই তাঁহারা আসিতেছেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বৃটিশ মন্ত্রি-সভার প্রতিনিধিদের সর্ব্বসম্মত এবং উভয় পক্ষের সুবিধাজনক সর্ত্তে বৃটেনের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই এই সন্ধির প্রয়োজন। 'রয়টার' কিন্তু বলিতেছেন যে, বৃটিশ প্রতিনিধিরা যে পরিকল্পনা লইয়া আসিতেছেন তাহা নূতন কিছুই নয়। তাঁহারা জানিতে চাহেন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে নেতারা সম্মত? না, তাঁহারা তাহার কোন অদল-বদল চাহেন? ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা নাকি ভারতের নয়া শাসন-বিধান গঠনের জন্য একটি পরিষদ গঠন করা যায় কি না ও রাজনীতিক ভিত্তিতে বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করা যায় কি না সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। ভারতের নয়া শাসনতন্ত্রের কাঠাম নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই, তবে এ বিষয়ে তাঁহারা নেতাদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন।

নির্ব্বাচনের গতি

ইতিমধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনের ডামাডোল আরম্ভ হইয়াছে।

মহম্মদ আলি জিন্নার কল্পিত পাকিস্থানের একটি স্থান আসাম। [illegible] করিয়াছেন যে,

এ-প্রদেশে মসলেম লীগের দল বাঁধিয়া গঠিত দল হইবার চেষ্টা বৃথা। আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা মোট ১০৮ জন, ইহার মধ্যে কংগ্রেস-দল ৫৮টি আসন দখল করিয়াছেন। আসাম পরিষদে বিভিন্ন দলের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ—

কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সমর্থক		লীগপন্থী ও কংগ্রেস-বিরোধী	
কংগ্রেস	৫৮	মসলেম লীগ	৩১
জমিয়ৎ-উল-উলেমা	৩	স্বতন্ত্র	৭
		ইউরোপীয়	৯
	৬১		৪৭

ফলে লীগপন্থী সিদ্ধবাদ সাত্বলাকে আসামের শাসন-গদী ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে গৌহাটী কলেজের তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলুইএর হাতে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস যে শাসনাধিকার করায়ত্ত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, তাহার প্রথম পত্তন হইয়াছে আসামে।

মহম্মদ আলি জিন্নার পাকিস্থানের আর একটি স্থান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এখানেও কংগ্রেস-দল প্রমাণ করিয়াছেন যে মুসলমান-প্রধান সীমান্ত প্রদেশ জিন্নার জিগিরের প্রতিধ্বনি করিতে সম্মত নহে। ৯ই মার্চ ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে এখানেও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে।

পাকিস্থানের আর একটি স্থান পাঞ্জাব। এখানে প্রাদেশিক পরিষদের ১৭৫টি আসনের মধ্যে বিভিন্ন দলের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ—

কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সমর্থক		লীগপন্থী ও কংগ্রেস-বিরোধী ও সন্দেহযুক্ত	
কংগ্রেস, ইউনিয়নিষ্ট ও আকালী দল	৮৯	মসলেম লীগ	
ইহার মধ্যে ১০জন মুসলমান		স্বতন্ত্র	
		উপনির্ব্বাচন (এখনও হয় নাই)	
			৮[illegible]

ফলে এখানে সম্মিলিত দলের মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। পাকিস্থান-পন্থীদের পরাজয় এখানেও।

এখন মাত্র পাকিস্থানের অপর 'পাক' বাংলার নির্ব্বাচন বাকী। জিন্নার ভরসা মাত্র এইখানে। তিনি এখানে শুভাগমন করিয়া পাক-চক্রীদের প্রাণে নব বলের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে মুসলমান দেশপন্থীরা পাকপন্থীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেও মনে হইতেছে পাঞ্জাবের মত বাংলায়ও লঘিষ্ঠ দলগুলির সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে।

যে সকল প্রদেশে মসলেম লীগের কোন জারি-জুরি খাটে না—বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা—এ সব স্থানে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাধিক্যে যে শাসনতন্ত্র করায়ত্ত করিবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

যুক্তপ্রদেশের মোট ২২৮টি আসনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমান-প্রার্থীদের সাফল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেসপন্থীরা ১৪০টির অধিক আসন লাভ করিবেই। ইতিমধ্যেই ৮০ জন

দিল্লীর রাজপথে ভারতব্যাপী গণবিক্ষোভ

কংগ্রেসের হিন্দু ও মুসলমান-প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের মত উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইএ কংগ্রেসের দল নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক ভোটে জয়লাভ নিশ্চিত।

এই বিজয়ের পর কংগ্রেস পৃথিবীর নিকট বলিবার দাবী করিবেন যে, ভারতে শাসন বিষয়ে যদি কোন কথাবার্ত্তা, সন্ধি বা-সংঘাত করিতে হয় তাহা গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সহিতই করিতে হইবে, মসলেম লীগ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক আংশিক জয়লাভ করিলেও তাহাকে তুষ্ট করিলে ভারতের রাজনীতিক সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হইবে না!

অশুভ মিতালী

এই নির্ব্বাচনে স্থানে স্থানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে অসম ও অশুভ দলপ্রেমের নিদর্শন দেখা যাইতেছে তাহা হইতে সাম্প্রদায়িক দলগুলির স্বরূপ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ভারতের সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্ট ও মসলেম লীগের গুণ্ডামীর কথা দেশের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইলেও লীগ আত্মদোষ ক্ষালনের কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই, এবং এই গুণ্ডামী দমন করিয়া স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী নিরাপদে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা করিয়া দিবার জন্ত প্রাদেশিক বা কেন্দ্রী সরকার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। ভোট-সংগ্রামে

কংগ্রেসের সহিত শক্তি পরীক্ষায় পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়া মসলেম লীগ কম্যুনিষ্ট এমন কি তাহাদের চিরশত্রু হিন্দুসভার সহিতও সহযোগিতা করিতেছে। যুক্তপ্রদেশের বুদাউন সহরের ভোটদান-কেন্দ্রগুলিতে মসলেম লীগের কর্ম্মীদের হিন্দুসভার প্রার্থীর জন্ত ভোট ক্যানভাস করিতে দেখা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রের সংবাদদাতার ভাষা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন—

"The Hindu Sabha camp, with the 'Om' flag flying high, was packed up with Muslim Leaguers. The public was surprised as to how a Hindu Sabha worker could catch hold of a dozen Muslim Leaguers. It is commented that now the Sabha will help the League in establishing Pakistan, while the League in its turn would leave no stone unturned in establishing a Hindu Rashtra."

পাঞ্জাবে মিঃ জিন্নার উপদেশ অনুসারে পাঞ্জাবের লীগ-নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও শিখদের জানাইয়াছেন যে, লীগের বিক্ষোভ ব্যবস্থাগুলি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় নাই। (League demonstrations are not directed against them.)

পাকিস্থানের ঝুটো দাবী

কিন্তু প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী পরিষদের নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপর পাকিস্থানের কৃত্রিম দাবী নির্ভর করা ঠিক হইবে না। জাতীয়তাবাদী ভারতের সমবেত ও অখণ্ড দাবীর প্রতিষেধকরূপে জিন্না বা আম্বেদকার বা অন্য সাম্প্রদায়িকতা-পন্থীদের সৃষ্টি করা হইয়াছে অতি কৌশলে এবং দেশবাসীর মানসিক সঙ্কীর্ণতা বা দুর্ব্বলতার—দুই একটি সুযোগ লইয়া। রুগ্ন এবং খিন্ন দেহ ও মনের দুর্ব্বলতা যেমন সুস্থ দেহ ও মন নহে, তেমনই পরাধীনতা এবং নিরন্নতার জন্ত রুগ্ন ও খিন্ন জাতীর দেহ ও চিত্তের এই সঙ্কীর্ণভাব প্রকৃত সুস্থ ভারতীয় জাতীয় জীবন নহে। সাম্প্রদায়িক রুগ্নতাকেই ও অস্বাভাবিক পর-প্ররোচিত মনোভাবকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া স্বার্থপরায়ণ বৃটেনের স্বকপোল-কল্পিত নির্ব্বাচকমণ্ডল ও নির্ব্বাচনাধিকারে গঠিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী নির্ব্বাচনকে গণমত বলিয়া মানিয়া লওয়া ঠিক হইবে না। ৪ঠা মার্চ্চ বিলাতের 'নিউ ষ্টেটস্ম্যান এণ্ড নেশন' পত্রে প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিঃ এইচ এন ব্রেলসফোর্ড বলিয়াছেন—

"We must not again make self-government depend upon a prior agreement between Hindus and Muslims or allow treaties with the [illegible] in the way." ইংরেজ এ

সকল ভারত-বন্ধুর পরামর্শ লইয়া self-government বা মাত্র স্বায়ত্ত-শাসন মেহেরবাণী করিলে কিন্তু ভারত তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। ভুপালের স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ শাউব মহম্মদ কুরেশি সেদিন পুণায় এক সাংবাদিককে বলিয়াছেন যে, তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, মিঃ জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনাকে রুশ সরকার সমর্থন করিতেছেন ও অর্থ দিয়া পুষ্ট করিতেছে। ("The Pakistan scheme of Mr Jinnah is being supported and financed by the Russian Government") এই মুসলমান ভদ্রলোকের কথার প্রতিবাদ মসলেম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না আজ পর্যন্ত করেন নাই। কাজেই জাতীয়তাবাদী ভারত দেশকে খণ্ডিত

করিবার কোন ফিকির বা ফন্দী এবং এ সম্পর্কে কোনও মধ্যস্থতা মানিয়া লইবে না। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থা যেমন দেশের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ করতলগত করিতে চায়, কনিষ্ঠ দেশভক্তগণও তেমনি যে কোন উপায়ে অসহ্য বন্ধন মোচন করিতে চায়।

আবার মৃত্যু ?

আবার দুর্ভিক্ষ! মৃত্যু যে আবার রূপ গ্রহণ করিয়াছে আমাদের তাহা বুঝিতে দেওয়া হইতেছে না। সম্পূর্ণ ভারতবাসীর প্রয়োজনে না হইলেও দেশের খাদ্য-সম্পদ সম্পূর্ণ সরকারের করায়ত্ত। তাঁহারা উৎপাদন না করিলেও, কৃষকের ফসল ও শস্য তাঁহারাই তাঁহাদের কৃপাপুষ্ট দালালদের মারফত সংগ্রহ করিয়াছেন, বণ্টন করিয়াছেন, নষ্ট করিয়াছেন এবং বৃটেনের ইঙ্গিতে ও প্রয়োজনে অভুক্ত ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ভারতের বাহিরে প্রেরণ করিয়াছেন, বাহির হইতে ভারতে যাহা আনিয়াছেন তাহা নগণ্য। প্রাদেশিক প্রত্যেক সরকার আসন্ন খাদ্যসঙ্কটে ভীত হইয়াছেন। এখন হইতেই প্রত্যেক প্রদেশে খাদ্য বণ্টনের মাত্রা হ্রাস করা হইতেছে। কেন্দ্রী পরিষদে এ ব্যাপারে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গেল তাহার দ্বারা চিপিটক রসসিক্ত হয় নাই। গত ৩১শে জানুয়ারী আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্র "ভারতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আবির্ভূত" শিরোনামা দিয়া লিখিয়াছেন—

'An impartial observer could draw from the food debate in the Central Assembly today was a positive charge that Britain was deliberately ignoring famine prospects."

গণবিক্ষোভে পুলিসের লরী ভস্মীভূত

আজ কেন্দ্রী পরিষদের খাদ্য [illegible] বিতর্ক হইতে নিরপেক্ষ দ্রষ্টা এই সিদ্ধান্তই করিবেন যে, [illegible] যে সে ইচ্ছা করিয়াই আসন্ন দুর্ভিক্ষের [illegible] আনিতেছে না। মাকিণ সাংবাদিকরা বিভিন্ন বি[illegible] প্রদেশ হইতে এই কথাই সংগ্রহ করিয়াছেন যে, এবার যে দুর্ভিক্ষ হইবে তাহাতে বিশেষতঃ বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমির কমপক্ষে ১০ কোটি লোক বিপন্ন হইবে। ভারতীয় সাংবাদিকদের কণ্ঠ শাসন-সংযত, তাঁহাদের গতিবিধির স্বাধীনতা ইংরেজ দেয় নাই, দিলে তাঁহারাও মাকিণ সাংবাদিকদের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেন—

"The fear for August and September are wholly justified, and a high official predicted it may make the Bengal 1943 famine look like a picnic"—আগামী গ্রীষ্মের আশঙ্কা অমূলক নহে। এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, এবারকার দুর্ভিক্ষ যেরূপ হইবে তাহার তুলনায় '৫০-এর মন্বন্তর' যেন শমনের চড়িভাতি।

আসন্ন দুর্ভিক্ষে বিপন্ন ভারতবাসীকে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকার বিশ্বপ্রসিদ্ধ লেখিকা পার্ল বাকের সভানেত্রীত্বে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-সঙ্কট কমিটী (India Famine Emergency Committee) গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটীর বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে আছেন—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আয়েনষ্টাইন, মিঃ সামনার ওয়েলস্ প্রভৃতি। কমিটীর গঠন-সভায় পার্ল বাক বলিয়াছেন—"ইউরোপের দুর্দ্দশার অপেক্ষা ভারতের দুরবস্থা অধিকতর নৈরাশ্যজনক। সরকারী হিসাব ইহাই যে, আগামী কয় মাস পর্য্যাপ্ত খাদ্য তথায় আমদানী না হইলে প্রায় ১ কোটি

৩০ লক্ষ নর-নারী বিপন্ন হইবে। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে এমন প্রচুর খাদ্যশস্য আছে যাহা দ্বারা পৃথিবীর সকল অনশন-ক্লিষ্ট নর-নারীর প্রাণ বাঁচান সম্ভবপর।"

অন্নাভাবের হেতু রপ্তানি ?

বড়লাট ওয়াভেল ঘোষণা করিয়াছিলেন, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কোন খাদ্যশস্য ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয় নাই। কিন্তু ইহার প্রতিবাদে কেন্দ্রী পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্বামী বেঙ্কটাচলম্ শ্রেষ্টি সদ্য প্রকাশিত সরকারী হিসাব হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে নভেম্বরের মধ্যে ৪৫ হাজার টন চাউল ভারত হইতে বিদেশে পাঠান হইয়াছে।

এলাহাবাদে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনে ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেনও বলিয়াছিলেন, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত হইতে কোন খাদ্য রপ্তানি হয় নাই। কিন্তু মাড়বারী চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি মিঃ এম এল খেমকা বলিয়াছেন, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মাত্র জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে কলিকাতার বন্দর হইতেই ৬ লক্ষ ৭ হাজার ৬০৮ মণ চাউল রপ্তানি করা হইয়াছে। যোদ বড়লাট বা বি আর সেন এ সকল হিসাব ও বিবৃতির প্রতিবাদ এ পর্য্যন্ত যখন করেন নাই, তখন বুঝিতে হইবে খাদ্য রপ্তানি যাহাতে অন্নাভাবের আসল হেতুরূপে কারণ বলিয়া গণ্য না হয়, এ জন্য সরকার গোপন রপ্তানির উপর চাপা দিয়া উৎপাদন হ্রাসই অন্নাভাবের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

মাত্র অন্ন নহে, বস্ত্রও

সরকার যথেচ্ছ ভাবে এরূপ ভারতীয় উৎপাদনের শোণিতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করিতেছেন অথবা তাঁহাদের কৃপাসিক্ত বণিকগণকে করিতে দিতেছেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'রয়টার' চুকিং হইতে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন—ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, প্রভূত পরিমাণে উদ্বৃত্ত বস্ত্র জাহাজে তাঁহারা সাংহাই প্রেরণ করিবেন তাহাতে থাকিবে মোটা ও চিকণ বস্ত্র, ড্রিল এবং অন্য অনেক প্রকারের বস্ত্র। চুক্তি-এ বর্ত্তমানে যে বাজার দর তদপেক্ষা সিকি মূল্যে এগুলি চীনে বিক্রয় করা হইবে।

অথচ ভারতের অর্দ্ধনগ্ন নর-নারীর বস্ত্র থাকিতেও বস্ত্র পাইবে না। সরকার অন্ন ও বস্ত্রের আড়ৎদার সাজিয়া কোথায় করদাতাদের সুবিধা করিয়া দিবেন, তাহা না করিয়া কৃত্রিম "উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করিতেছেন এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থে না হৌক, বৃটেনেরই স্বার্থে বৃটিশ-মিত্রদের সে "উদ্বৃত্ত" দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন। আর দেশবাসী নীরবে মরিতেছে। মরিয়াও তাহাদের হাড় জুড়াইতেছে না অর্থগৃধ্নু বণিক—ভারতীয় রপ্তানি বণিকরা আমাদের কঙ্কাল করোটির সম্মানও দিতেছে না। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, কলিকাতার এক সওদাগরী আফিস ৬৭৫০ টাকা মূল্যের মানুষের হাড় কলিকাতা বন্দর হইতে নিউইয়র্কে পাঠাইয়াছে। দেশবাসীর উহারা হাড়ও খাইতেছে মাংসও খাইতেছে এবার চামড়া দিয়া যে বাদ্য বাজাইবে তাহা শুনিবার জন্য হয়ত তাহারা উৎকর্ণ হইয়া আছে।

ভারত সরকারের বাজেট

কেন্দ্রী পরিষদে ভারত সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন অর্থ সদস্য সার আর্চিবল্ড রোলাণ্ডস। তিনি বলিয়াছেন, ভারত সরকারের ইহাই শ্বেতাঙ্গ-স্পর্শপূত শেষ বাজেট। অর্থ-সদস্য জানাইয়াছেন, ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে মোট ৪৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। যুদ্ধ শেষ হইলেও বাজেটে সামরিক ব্যয়ের বিশেষ কোন হ্রাস করা হয় নাই। মাত্র ১৮ কোটি টাকা কম খরচা ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ আলোচ্য বৎসর ভারতের যুদ্ধের ব্যয় ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই অস্বাভাবিক ব্যয়-বরাদ্দের কারণ ও ওজুহাত অনেক দেখান হইয়াছে। যুদ্ধ ইংরেজের। বৃটেনের প্রাণরক্ষার যুদ্ধে ভারতরক্ষা যদি অপরিহার্য্যই হইয়া থাকে তাহা হইলে সে ব্যয় ত বৃটেনেরই বহিবার কথা। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-বিরোধী। এই বরাদ্দ পরিষদে পেশ হইলে তাঁহারা কোন্ পন্থা অবলম্বন করেন তাহা দেখা যাইবে।

দিল্লীতে 'বিজয়-দিবস' উপলক্ষে প্রবল জন-বিক্ষোভ, ক্রুদ্ধ জনতা রাজপথে টহল দিতেছে

বাজেটে অতিরিক্ত মুনাফা-কর বাতিল করা হইয়াছে। রূপারীর উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তামাকের উপর আরও চড়া ট্যাক্স বসান হইয়াছে। লবণ বা দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স হ্রাস পায় নাই।

সরকারী মহাপুরুষরা কথার ভাঁজে বুঝাইয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীতে স্বর্গগঙ্গা বহাইয়া ভারতের জনসাধারণকে বড় ধনী করিয়াছেন; ভাত আর কাপড় ব্যতীত সকল দুঃখই তাহাদের ঘুচিয়াছে, সুতরাং ট্যাক্স দিতে তাহারা বাধ্য।

কংগ্রেস দল ও বাজেট

অর্থবিল সম্বন্ধে কেন্দ্রী পরিষদে কংগ্রেস দলের কি মনোভাব হইবে তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা প্রচার করিতেছেন। অর্থ সদস্য না কি কংগ্রেস দলকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, কতকগুলি পরোক্ষ কর হ্রাস করিয়া অসংখ্য দরিদ্র দেশবাসীর কথঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইবে, ইহা সম্ভবপর হইবে অর্থবিল বিবেচনা করিলে। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদও না কি এই মর্মে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে, কংগ্রেস দল দাবী করিবেন, মণ প্রতি পাঁচ আনা লবণ ট্যাক্স হ্রাস, দিয়াশলাই-এর উপর শুল্ক হ্রাস, সুপারী শুল্ক হ্রাস বিশেষতঃ পুরাতন পোষ্টকার্ডের মূল্য পুনঃ প্রবর্তন। অর্থ-সচিবের মনোভাবের উত্তরে মনে হইতেছে কংগ্রেস দল বলিবেন—আমাদের ইচ্ছা মত করভার হ্রাস করিলে আমরা তোমার অর্থবিল পাশ করিব। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১২ই মার্চের বৈঠকে না কি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা অর্থবিল অগ্রাহ্য করিবেন।

শিখ ও অনুচরগণ কর্তৃক মহামান্য আগা খাঁনের সম্বর্দ্ধনা

বাজেটের তথ্য বিক্রয়?

বোম্বাই-এর 'ফ্রি প্রেস জার্ণালে' মিঃ ডি বি তিলক কেন্দ্রী সম্বন্ধে বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। যে দিন বাজেট কেন্দ্রী পরিষদে পেশ হয়, সে দিন অপরাহ্নে বিভিন্ন স্থানে শেয়ার ও সোনা-রূপার বাজারে যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন স্পেকুলেটর বাজেটের সকল কথা পূর্ব্ব হইতে অবগত হইতে পারিয়াছিল। শেয়ার লইয়া যাহারা কারবার করে তাহারা সাধারণতঃ বাজেটের কর স্থাপন প্রস্তাবগুলির জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে বিশেষতঃ আয়কর প্রস্তাবগুলির প্রভাব সরকারী ঋণ, ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্স শেয়ারগুলির উপর অত্যধিক। আয়করের হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাতে এ সকলের দরের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

নূতন বাজেটের ট্যাক্স প্রস্তাবগুলি প্রকাশের তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই সোনা-রূপার বাজারে অনেক অসাবধানী ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় হ্রাসের ফাঁদে পড়িয়া যান। টক এক্সচেঞ্জের বড় বড় অপারেটররা মুনাফা কর বাতিল, সোনার উপর শুল্ক এবং রূপার উপর শুল্ক বৃদ্ধির সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করেন। ফলে নামজাদা অপারেটারগণ দামী দামী শেয়ার প্রভূত সংখ্যায় সংগ্রহ করিতে থাকেন। মুনাফা কর রদ হইয়াছে পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়া ছোট বড় বিক্রেতারা তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অনেকে ভেলিভারী মূল্যের উপর ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উচ্চমূল্যে সোনা ক্রয় করিতে থাকে। এ সকল পূর্ব্বাহ্নিক তথ্য প্রকাশের জন্য দায়ী কে কেন্দ্রী সরকার

তাহার তদন্ত করিয়াছেন কি ? বাজারে ত প্রবল জনরব যে এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। পূর্ব্বেও অনেক বা'র এইরূপ গুপ্ত তথ্য প্রকাশের অভিযোগ হইয়াছে, কিন্তু অপরাধীর দণ্ড হয় নাই।

অরুণার পথ

শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি বলিয়াছেন—গণ-ক্রোধ শান্ত কর ; জনসভার উপর নিষেধ আদেশ উঠাইয়া লও। কেন সাময়িক হিংসা-কার্য্য হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলিবার জন্য নেতৃবৃন্দকে সুযোগ দাও। কিন্তু গান্ধীজী হইতে পণ্ডিতজী পর্য্যন্ত সকল কংগ্রেস-নায়ক শ্রীমতী অরুণাকে যেন গুপ্ত বিপ্লবীদলের সহিত জড়িত করিয়া তাঁহার অবলম্বিত পন্থার নিন্দা করিয়াছেন। গান্ধীজীর ধ্বনির সহিত ধ্বনি মিলাইয়া নেহেরুজী বলিয়াছেন—অতীতের মত বর্ত্তমানেও আমাদের স্বাধীনতা-সমরের আয়ুধ হইল অহিংসা, মাত্র এই সংগ্রাম-বৈশিষ্ট্য ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় ও বিশ্ব-পরিস্থিতিতে আকাঙ্ক্ষিত। হিংসামূলক সংগ্রাম করিতে হইলে হিংস্র রাষ্ট্রগুলির অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হিংস্র ব্যবস্থা না হইলে চলে না। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পরাজয়ের হেতু হিংস্র বা অহিংস্র পদ্ধতি নয়, পরাজয়ের হেতু অধিকতর শক্তিশালী বহিঃশক্তি। সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে হইলে, করিতে হইবে যথাযোগ্য সময়ে, ব্যাপক ভাবে এবং যথাযোগ্য আয়োজনের পর। এখানে সেখানে সামান্য হিংস্র-প্রচেষ্টা মাত্র অহিংস আন্দোলনেরই প্রতিবন্ধক নয়, ব্যাপক সশস্ত্র উত্থানেরও প্রতিবন্ধক।

যে গণ-উত্থানে বিপন্ন জনগণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কতকটা আভাস দিয়া শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি এলাহাবাদের এক ছাত্র-সভায় বলিয়াছেন—"ঘটকালীর আপোষে স্বাধীনতা পাইবে না। স্বাধীনতা হাতের মুঠায়—এ ধ্বনিতে ভুলিও না। স্বাধীনতা যদি করতলেই তবে কেন রাজনীতিক বন্দীরা আজও কারাবদ্ধ ? জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী যদি বলেন, ইহাই পরবর্ত্তী পন্থা—মানিয়া লও ! পণ্ডিত জওহরলাল যদি কোন যুক্তি দেন—আপত্তি করিও না ! সর্দ্দার বল্লভভাই যদি বলেন, 'দিল্লী চলো' বা 'জেলে চল'—চলিতে পার তাঁহার পশ্চাতে, কিন্তু স্বাধীনতার পন্থা উহা নহে।"

অরুণার পথ—

(১) ১৯৪২এর আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইলে সংগঠন দৃঢ় কর ;

(২) আসন্ন দুর্ভিক্ষে কর্ত্তব্য, ছাত্রগণ দলে দলে গ্রামে গিয়া পঞ্চায়েৎ-রাজ গঠন কর, জনসাধারণকে আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে সতর্ক কর ;

(৩) বিদেশী পণ্যের আঘাতে আবার ইংরেজ ভারতকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন কর—কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব সার্থক কর।

সিপাহী-বিদ্রোহ

ভারতীয় নৌ-দলের বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের ক্ষত-চিহ্ন আজিও লক্ষ্ণৌর অঙ্গ হইতে মুছিয়া যায় নাই। ভারতীয় নৌ-সিপাহীদের উপর বহু কাল অবিচার করা হইতেছিল। শ্বেতাঙ্গরা বেশ, বেতন, ছুটি, আবাস প্রভৃতির সুবিধা পাইতেছিল, আর দরিদ্র ভারতীয় সিপাহীরা প্যারেয়া বলিয়া গণ্য হইতেছিল। অথচ এ-সকল সিপাহীই জাহাজ চালায় এবং তাহারাই ইংরেজের পতাকার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কাজেই তাহারা ধর্ম্মঘট করে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘট করে রয়াল এয়ার ফোর্সের সিপাহীরা। তার পর চলে গুলী। ঘোষণা করা হয় জঙ্গী-আইন। দলে দলে হতভাগ্য ভারতীয়গণ হতাহত হইতে থাকে। তবু তাহারা মাথা নত করে না। নিরুপায় হইয়া বোম্বাই সরকার কংগ্রেসের নেতা সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের শরণাপন্ন হন। তাঁহার মধ্যস্থতায় হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। কংগ্রেস-নেতারা বলিলেন—এ সব কেন ? এ ভাবে কি স্বরাজ লাভ হয় ? কিন্তু সিপাহীরা স্বরাজের জন্য ধর্ম্মঘট করে নাই, অন্নের জন্য করিয়াছিল। তাহারা অবশ্য কংগ্রেস-পতাকা আন্দোলিত করিয়াছিল, 'জয় হিন্দ' নিনাদ অবশ্য করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন বোম্বাই, করাচি ও কলিকাতার নরনারী বিক্ষোভ অবশ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্বরাজ লাভের জন্য নহে। অপমান, অবিচার, প্রহার ও মৃত্যুর আঘাতে ক্ষিপ্ত সিপাহীরা—শহিদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড যখন পতাকারূপে বহন করিয়াছিল তখন এ সমস্যা তাহাদের নিকট স্বরাজের সমস্যা অবশ্যই হয় নাই। যাহা হউক, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায় তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ৩১৩ জন সিপাহীকে বন্দি-নিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। বিচারও হইবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় কংগ্রেস-নায়ক নেতৃবৃন্দ যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আশা করা যায় ইহাদের জন্যও তাঁহারা অনুরূপ চেষ্টা করিবেন।

সৈন্যবিভাগে ভেদ প্রবর্ত্তন

ভারতীয় নৌ-সিপাহীদের এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিলাতে বেশ জল্পনা-কল্পনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দি রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি ও রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের অধিকাংশ সিপাহী শিক্ষিত, এবং ইহাদের অধিকাংশই রাজনীতিক চৈতন্যসম্পন্ন। বাংলা ও মাদ্রাজ-নিবাসী এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিয়াছে ঐ শিক্ষিত এবং রাজনীতিক-বুদ্ধিসম্পন্ন সিপাহীরা। অনেকে এমন মনে করিতেছেন যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের পর যেমন ভারতের সৈন্য বিভাগে সৈনিক সংগ্রহের ব্যাপারে যুদ্ধপ্রবণ ও অন্য জাতির পার্থক্য করা হয়, তেমন পার্থক্য আবার চালু করা হইবে। সাময়িক সঙ্কট অবস্থায় এবার এই পার্থক্য করা হয় নাই বলিয়াই বিদ্রোহ-ভাব প্রকট হইয়াছে, ইহাই বিলাতী সমালোচকগণ মনে করিতেছেন। তাই সঙ্কটকালীন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরেজভক্ত প্রদেশগুলির ইংরেজভক্ত জাতি হইতে ভবিষ্যতে সৈন্য সংগ্রহের সুপারিশ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইণ্ডিয়া আফিস নাকি মন্ত্রিসভার নিকট গোপন সুপারিশ করিয়াছে। সুপারিশে আছে—

(১) যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে যুদ্ধপ্রবণ ও অন্য জাতির যে পার্থক্য ছিল, তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন।

(২) সর্ব্ব সম্প্রদায় হইতে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভিতে সৈনিক গ্রহণ প্রথার লোপ।

ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন

(৩) পুনঃ পুনঃ সৈন্য বিভাগের ভারতীয় কারণ সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, সে প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা ভারত সরকারের পক্ষে কঠিন হইলেও নৌ ও বিমান বিভাগের সকল সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পদ যথাসম্ভব বৃটিশ হস্তে রাখিতে হইবে।

(৪) কোন জাহাজ নিছক ভারতীয় নাবিক দলের হস্তে থাকিতে পারিবে না, জাহাজের শতকরা ২৫ ভাগ নাবিক বৃটিশ হইবে।

দেশের নেতৃবৃন্দ এ সকল গোপন চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করিবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা বর্তমানে জানিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। সমগ্র শাসন-কর্তৃত্ব যখন জাতির করায়ত্ত করিবার জন্ত তাঁহারা ইংরেজের সহিত আপোষ-ব্যবস্থা করিতেছেন তখন অবশ্য সৈন্যদলের ভারতীয়দের স্বার্থ বর্জন তাঁহারা কখন করিবেন না।

লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী

সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নারী বিভাগের অধিনায়িকা লেঃ কর্ণেল ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন ভারতে ফিরিয়াছেন। ভারতে ফিরিয়া ঝাঁসি রাণী রেজিমেন্টের এই বীরনারী তাঁহার অতীত গৌরবের বিশেষ কোন কথাই প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বাহিনীর যে সামান্য পরিচয় তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে পাইয়াছি। ভারতীয় জনসাধারণ সুভাষচন্দ্রের সহিত সমান পর্য্যায়ে লক্ষ্মীকে মান প্রদান করিয়াছে। লক্ষ্মী ভারতে কোন নারী-সংগঠন মনোনিবেশ করিবেন কি না প্রকাশ করেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন—"Politics will not be her field. She will not give up medicine"—রাজনীতি তার কর্মক্ষেত্র নহে। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় ছাড়িবেন না। তবে কি তাঁহার আত্মসমর্পণের পর এমন কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহাতে তিনি সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে দুঃস্বপ্নের ন্যায় মনে করিয়া বর্জন করিয়াছেন? কি সর্তে তিনি ভারতে ফিরিয়াছেন তাহাও জানা যায় নাই। আমরা এই বীরনারীর অতীত প্রচেষ্টাকে অভিনয় বলিয়া মনে করিতে ব্যথা পাই। ভারতের জনসাধারণ অরুণা ও লক্ষ্মী দুই শ্রেষ্ঠ নারী-বিপ্লবীর নূতন কর্ম্ম-পরিকল্পনায় নব নব সম্ভাবনার কল্পনা কি নিরর্থক করিতেছে?

বিক্ষোভে নেতাদের আপত্তি

আজাদী বাহিনীর বীরদের দণ্ডের প্রতিবাদে এবং নৌবাহিনীর বিক্ষোভে গান্ধীজী কিছু বেজার হইয়াছেন। এ সকল গণ-উত্থান বা গণবিপ্লব সম্বন্ধে তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "ইংরেজের নৌবাহিনীতে এই বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের পরে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা অহিংস নয়। 'জয় হিন্দ' বা অন্য কোন গণ-ধ্বনি একটা লোককেও উচ্চারণ করিতে বাধ্য করিলে স্বরাজের কাফনে

পেয়েক আঁটার সামিল হইবে। গির্জ্জা ধ্বংস করা বা ঐ প্রকারের চেষ্টা কংগ্রেস ব্যাখ্যাত স্বরাজলাভের পন্থা নয়। লুণ্ঠন ও ট্রামগাড়ী বা অন্য কোন সম্পত্তিতে অগ্নিদান, য়ুরোপীয়দের ক্ষতি করা বা তাহাদের অপমান করা, আমার মতে অহিংসা ত দূরের কথা উহা কংগ্রেসী অহিংসাও নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন এই হিংসা-পথের ভ্রান্ত ও অজ্ঞাত নেতৃবৃন্দ তাঁহারা কি করিতেছেন তাহা যেন ভাবিয়া দেখেন।...হিংসা কর্ম্মের জন্য হিন্দু, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের মিলন শুভ নয়। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতিহিংসারই পন্থা প্রশস্ত হইবে।" ইংরেজদের নিকট আবেদন করিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন—"শাসনকর্ত্তারা ভারতীয় শাসনের অনুকূল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেশবাসীর বুকে যে অশান্তি লুকান আছে, তাহার অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া তাহাদের সে সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে যেন বিলম্ব না হয়।"

গান্ধীজী স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন—"এ কথা আমি ভাবিতে পারি না যে, ইংরেজ নর-নারীকে যে অপমান করা হইয়াছে, সে সকল গুণ্ডাদের কাজ। গুণ্ডা কাহারা? ইংরাজের শাসন যখন থাকিবে না, তখন কি এ-সকল গুণ্ডা থাকিবে না? গুণ্ডাদের স্কন্ধে দোষ চাপাইবার ফ্যাসন ত্যাগ করিতে হইবে। আমরাই এ জাতীয় লোক তৈয়ারী করিতেছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেই ইহাদের উদ্ভব।"

কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোর প্রভৃতি স্থানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দী সৈনিক ও নায়কবর্গের মুক্তির জন্য যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, তাহার নেতৃত্ব করে প্রধানতঃ ছাত্রসমাজ। ছাত্রগণের ভাব প্রবণতার সুযোগ কম্যুনিষ্ট ও মসলেম লীগ মাত্র নহে, অন্যান্য কতিপয় আপোষ-বিরোধী দলও গ্রহণ করে। তাহার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বলেন—"ছাত্ররা নেতৃত্ব করিবেন না, নেতৃত্ব করিবেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।"

নব ভাব-প্রবুদ্ধ যুব-সাধারণের কার্য্যে বাধা প্রদানের শক্তি এ সকল নেতার না থাকিলেও, বিক্ষুব্ধ আদর্শবাদীদের প্রচেষ্টা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বাস্তব কোন চেষ্টা ইহারা করিতেছেন না, বাচনিক উপদেশ প্রদান ব্যতীত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভাইস-চ্যান্সেলার পদে মনোনীত করিয়া প্রকৃত গুণী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির সমাদর করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধার যে পরিচয় ছাত্রাবস্থায় তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল উত্তরকালে তাহাই দেশের শিক্ষা ও নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মটদহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম-এ, বি-এল প্রভৃতি পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় প্রতিভার দীপ্তিতে তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রাচীন ভারতের রীতি-নীতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে পি-আর-এস উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রথম বার ১৯১৭ সালে হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে গি[য়া] তিনি শাসনতান্ত্রিক আইন ও অপরাধ-বিষয়ক আইনে প্র[থম] শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্র[দান] করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিতও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট আছেন ব[হু] দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদ[স্য] হিসাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নানা বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত [ও] পরামর্শ দিয়া তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা যে বিস্তৃ[ত,]

ব্যাপক ও গভীর, যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তাহা মোটেই অজ্ঞাত নহে। স্যাডলার কমিশনের সদস্য [রূপে] ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং ১৯২১ সালে [লণ্ডনে] অনুষ্ঠিত নিখিল বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে যোগদান করিয়া যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী জ্ঞান তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু ভাবেই লাভবান্ হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার এই বিদ্যাবত্তা কেবল আত্মকেন্দ্রিক হইয়াই থাকে নাই, বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলের জন্যও তাহা সর্ব্বদা সচেষ্ট। বর্ত্তমানে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী, দিল্লী, নাগপুর, [মাদ্রাজ,] আগ্রা, বোম্বাই, পাটনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট।

শুধু শিক্ষা ব্যাপারেই নয়, শাসনকার্য্য পরিচালনেও তাঁহার দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বাঙ্গলার হক মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে। ১৯৪১—৪৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাজস্ব, বিচার, আইন ও অসামরিক সরবরাহ-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং [ঐ সময়] জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় লোকে যখন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতেছিল তখন তাঁহার চেষ্টাতেই সহর-ত্যাগকারীদের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। মেদিনীপুরের বন্যার সময় প্রমথ বাবুর চেষ্টার ফলে জনসাধারণের দুর্গতি তবু কিছুৎ পরিমাণ লাঘব হয় এবং গভর্ণমেন্ট আর্ত্তত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে রাজী হইয়াছিলেন। স্যার জন হার্বাটের আমলারা মেদিনীপুরে যে বর্ব্বর তাণ্ডব অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ

করিয়াছিলেন, অন্য দুই জন মন্ত্রীর সহিত প্রমথ বাবুও সে সম্বন্ধে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দান করেন এবং ইহারই ফলে ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিত্বের যবনিকা-পাত হয়। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হিসাবে বস্তুতঃ তাঁহারই চেষ্টায় প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রিসভার আমলে দামোদর খাল-সংক্রান্ত কর সাড়ে পাঁচ টাকা হইতে দুই টাকা নয় আনা হ্রাস করা হয়। ইহা ভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের সাহায্যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমদানীর অপচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করিয়াও তিনি জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

বর্তমানে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বাহাত্তর বৎসর। ল-কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ উন্নতির ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস, তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনাধীনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব এবং সুনাম অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে।

স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট সলিসিটার স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র প্রথমে মেসার্স অর্থ ওয়াটসন, বাটলার-এর সহকারী হন; তৎপরে তিনি মেসার্স এন এন সেন অ্যাণ্ড কোম্পানীতে যোগদান করেন। সহকারী হিসাবে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য্য করেন। স্বর্গীয় সেন মহাশয় যখন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিজ নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, তখন বঙ্কুবিহারী দত্ত তাঁহার সহিত যোগদান করেন এবং এই ভাবে মেসার্স দত্ত এণ্ড সেন প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ হয়।

স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র সেন মিত্র ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন এবং তথা হইতে ১৯০৭ সালে ১৭ বৎসর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্কশাস্ত্রে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্য তাঁহার কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার মাতার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আইন কলেজে ভর্ত্তি হন এবং স্বর্গীয় এম এম চাটার্জীর আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হন। তিনি বি-এল পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এটর্ণীশিপ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ইনকর্পোরেটেড ল' সোসাইটির বেলচেম্বার্স স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি এডভোকেট ও নোটারী পাবলিক হিসাবে তালিকাভুক্ত হন এবং কিছু কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডভোকেট ক্লাসের লেকচারারের কার্য্য করেন।

তিনি অতি অল্প বয়সেই ব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জন করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট সলিসিটার হিসাবে পরিগণিত হন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক ভারতীয় কোম্পানী আইন ও ভারতের ইনসিওরেন্স আইন সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করিবার জন্য বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হন। বস্তুতঃ কোম্পানী আইন সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা [illegible]।

তৎকালীন আইন সদস্য স্যার এন এন সরকারের তিনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতীয় কোম্পানী আইন ও ইনসিওরেন্স বিল পরিচালনা করেন। সরকার-সেন সম্মেলন সমগ্র আইন সভার প্রশংসা লাভ করে এবং সকল দল, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই পরিচালিত কংগ্রেস দল উহার সুখ্যাতি করেন।

স্বর্গীয় সেন মহাশয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের কলিকাতার সলিসিটার নিযুক্ত হন। উক্ত পদ ঐ বৎসরই প্রথম সৃষ্ট হয়। বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী

পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং ঐ সময় ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য পদত্যাগ করেন।

তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সি-বি-ই উপাধি লাভ করেন।

তিনি স্যার এন এন সরকারের সহিত যুক্ত ভাবে ভারতীয় কোম্পানী আইন পুস্তক রচনা করেন; প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে উহা সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।

তিনি ১৯২১ হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন এবং ভারতীয় জুটমিলস এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি হন। তিনি ১০ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা সাউথ ক্লাব ও অন্যান্য বহু জন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি যাদবপুর টিউবারকুলোসিস এসোসিয়েশনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সুশীলচন্দ্র স্বনামধন্য ডি গুপ্তের পুত্র আর. সি. গুপ্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা আশালতাকে বিবাহ করেন।

সুশীলচন্দ্র সেন কেবল যে এক জন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন [illegible]

প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়া তিনি তাঁহার ৺পিতামহের নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, যাদবপুর-যক্ষ্মা হাসপাতাল ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন।

সুশীলচন্দ্র আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অতি নিকট-আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহার পুত্র ও কন্যারা দীর্ঘজীবী হউন এবং বিখ্যাত পিতা ও পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করুন। 'সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র' এই প্রবাদ সেন-বংশে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুশীলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রচন্দ্র সেন এটর্নীশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বেল-চেম্বার পদক লাভ করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি হাইকোর্টের এটর্নীদের তালিকাভুক্ত হন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সমরেন্দ্রচন্দ্র সেন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গ্রেজ ইন হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন এবং উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার তালিকাভুক্ত হন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রচন্দ্র সেন দত্ত সেন ফার্মের অন্যতম অংশীদার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নিকট আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক। প্রত্যেক পুত্রই পিতার সুনাম বজায় রাখিয়াছেন।

মৃত্যুকালে সুশীলচন্দ্র চারিটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা বেবার কর্পোরেশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস রায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শিশির রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ... নমিতা এবং চিত্রা এখনও অবিবাহিতা। দত্ত সেন কোম্পানির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকৃষ্ণ দেব মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ্য পরিচালনায় সুশীলচন্দ্রের পুত্রেরা ক্রমোন্নতি করিবেন এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শরৎচন্দ্র ধর

কলিকাতা সোয়ালো লেনস্থিত সুপ্রসিদ্ধ ... ব্যবসায়ী স্বর্গত কানাইলাল ধর মহাশয়ের একমাত্র ... টিন ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র ধর মহাশয় গত বুধবার ... ফাল্গুন (৬ই মার্চ) তারিখে সকাল ৬ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল। শরৎ বাবু আহিরীটোলাস্থিত সুপ্রসিদ্ধ ধরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ প্রতিভা-বলে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া আদর্শ স্থানীয় হন। ভারতের গৌরব টাটা টিন প্লেট কোং (স' ওয়ালেশ) প্রথম যখন দেশীয় টিন তৈয়ারী করেন তখন হইতে ইনি কলিকাতার একমাত্র সেলিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া বাজারে মাল চালু করিয়াছিলেন। ইহার উত্তম ও অধ্যবসায়ে ধর টিন ফ্যাক্টরী আজ বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টিন শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত। ইনি বহু ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়া গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। বহু জনহিতকর কার্য্যে শরৎ বাবু মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। আহিরীটোলাস্থিত 'শী... মাতার মন্দির'—কানাইলাল ফ্রী বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতি... শরৎ বাবুর বদান্যতার সাক্ষ্য। ইহা ছাড়া বহু হাসপাতাল ... অনাথ বাঙ্গালী পরিবার ও বিধবাদের তিনি অর্থ সাহায্য করিতে... গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে বহু অতিথিকে অন্ন ও বস্ত্র দিয়া শরৎ ... জীবন ও লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। এরূপ পরোপকারী ধর্ম্ম... ও অমায়িক লোকের মৃত্যুতে শুধু পরিবারেরই নয়, অনেকেরই যে ক্ষ... হইল তাহা অপূরণীয়। মৃত্যুর সময় তিনি বিধবা স্ত্রী, সাতটি ক... ও দুইটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা মৃতের আত্মার মঙ্গ... কামনা করিতেছি।

পরলোকে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

পণ্ডিত-কুলপতি ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌ... ৺আশুতোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ম...

৫৩ বৎসর বয়সে গত বৃহস্পতিবার (২৩শে ফাল্গুন) অপরাহ্ণ সা... ৫ ঘটিকায় 'করোনারি থ্রম্বসিস' রোগে সজ্ঞানে পরলোক গম... করিয়াছেন। তিনি জনপ্রিয়, উদার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। প্রাচ... দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শিল্পানুরাগ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় তাঁহার অঙ্কিত চিত্র একাধিক বার প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী, তিন কন্যা ও ৮টি পুত্র বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

বারানসীর একপ্রান্তে

ছবি—

রমলা রায়
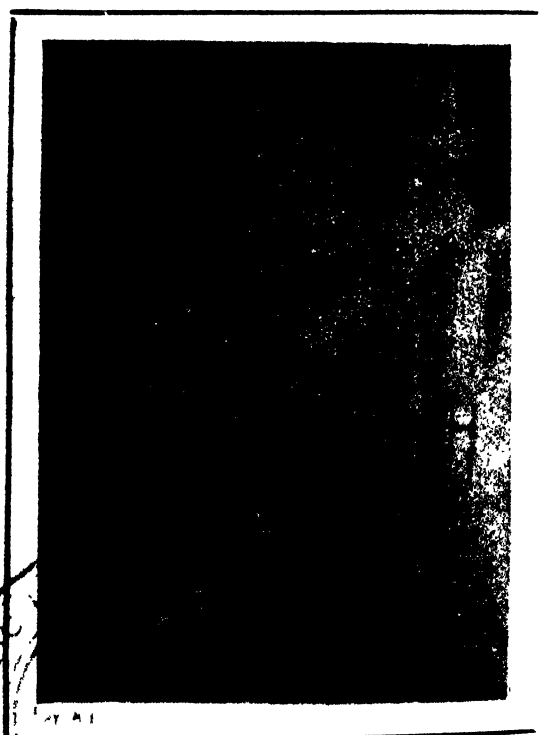
পড়া হয়নি তবুও স্কুলে

২৪শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৫২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

তুমি ইংরেজ বাহাদুর, তুমি যে মেজের উপর এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বলি দিব না। দেশের মঙ্গল? কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি কিন্তু আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাঁদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

—[illegible]
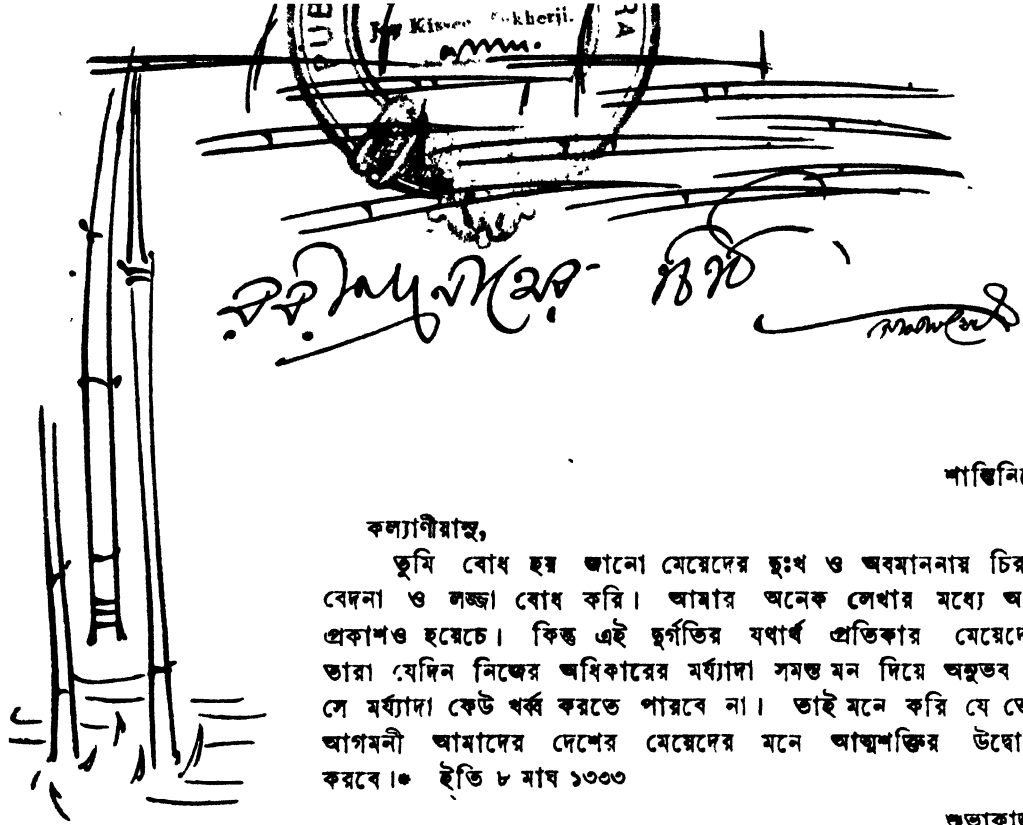
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি বোধ হয় জানো মেয়েদের দুঃখ ও অবমাননায় চিরদিন আ
বেদনা ও লজ্জা বোধ করি। আমার অনেক লেখার মধ্যে অনেকবার
প্রকাশও হয়েছে। কিন্তু এই দুর্গতির যথার্থ প্রতিকার মেয়েদেরই হাতে
তারা যেদিন নিজের অধিকারের মর্য্যাদা সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করবে সেদি
সে মর্য্যাদা কেউ খর্ব্ব করতে পারবে না। তাই মনে করি যে তোমার লে
আগমনী আমাদের দেশের মেয়েদের মনে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কা
করবে।* ইতি ৮ মাঘ ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত]

চন্দননগর

কল্যাণীয়েষু,

এতদিনে চার অধ্যায়ের কৃত তর্জ্জমা আমাদের শেষ হোলো। তুমি ইংরেজি পাঠকের দিকে তাকিয়ে অনেকটা বদল সদল করেছ—তাতে বাঙালী পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়—এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি আশঙ্কা আছে। ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের ওখানকার উপদেষ্টারা যদি আধুনিকতার প্রলেপ দিয়ে দেন ভালোই, কিন্তু ভাব বদলানো সঙ্গত হবে বলে মনে করিনে। বাংলা বইটা নিয়ে যদিও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যাচ্চে তবু লোকের বিশেষ ভালোও লেগেছে সন্দেহ নেই। এক সংস্করণ শেষ হ'য়ে গেছে। শেষ সপ্তকটা সমঝদাররা ভালোই বলছে। আজ কালিদাস নাগের চিঠিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া গেছে। এর পরে একটি ছোট্ট পদ্য কাব্যের বই ছাপা সুরু করেছি। লোকে না মনে করে প্রাচীনের কলমে ছন্দ সরতে চাচ্চে না। এ বইটার নাম হ'বে ছায়াছবি। গোটা ৩৫শের বেশি কবিতা দেব না। ভূরি-ভোজন কবিতার পক্ষে বর্জ্জনীয়, শরীরের পক্ষেও ভালো নয়, এ কথা তোমার দৃষ্টান্তের দ্বারা তুমি প্রচার করতে থাকো।

রথীরা আর দিন ১০।১২র মধ্যে দেশে পৌঁছবে। তখন তোমাদের সব খবর পাওয়া যাবে। এণ্ড্রুজ সিমলায় নির্জ্জনে বসে কি একটা লেখায় মগ্ন। আমরা আশ্রমে ফিরলে তিনি বোধ হয় আসবেন। কবিতার সঞ্চয়ন কার্য্য কি কিছু এগিয়েছে? ওটা সম্বন্ধে সেখানকার পাঁচ জনের মতই গ্রাহ্য। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তীর মাতৃদেবী স্বর্গতা অনিন্দিতা দেবীকে লিখিত।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অনেক দিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। আমিও বার বার তোমাকে চিঠি লিখি-লিখি করেছি। কিন্তু প্রাণ যখন সচল ছিল তখন সে আপনার বোঝা আপনিই বয়েছে, এখন সে স্থাবর হয়ে পড়াতে ছিয়াত্তর বছরের আয়ুর ভারে মন্থর মনটাকে কোনো কাজে চেতিয়ে তোলা বড় শক্ত হয়ে পড়েচে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে স্থাণু হয়ে থাকা তো চলে না, সেই জন্যে আজকাল প্রকৃতির সাহচর্য্য আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে। উভয় পক্ষেই পরস্পরের কাছে কোনো দাবীদাওয়া নেই। আর একটা আনন্দ পাই বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্যে। ওদের জীবনলীলায় বয়স যেন থেমে আছে, ওরা প্রাচীন নবীন এক সঙ্গেই—বয়সের ক্লান্তি ওদের একটুও নেই। ঐ শাল গাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল আজো ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্চে কিন্তু কণিকায় আমি ত্রিশ বছর আগে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে। আমার কবিতার ভিতর দিয়েই কুষ্ঠীর গণনা করা যেতে পারে, তার মধ্যেই রয়ে গেছে বয়সের হিসাব। আকাশের উপর দিয়ে যে দিন রাত্রি আসে যায় কালিদাসের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের ছায়া আলোর সম্পদ একই, অথচ ৭০ বছরের মধ্যেই তারা আমার দেহ মনকে যেন বহু জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসচে। সঞ্চয় ফেলতে ফেলতে চলেছি, পরিচয়ের বদল হচ্চেই। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই যে আমাদের পারিপার্শ্বিক আমাদের পরিণতির নূতন পর্ব্বকে সহজে স্বীকার করতে চায় না, এক কালের দাবী অন্য কালেও চাপাতে চায়। এই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চাশের পর সমাজের রঙ্গভুমি থেকে নেপথ্যে সরে যেতে বলে।

এ দেশের উপদেশ অনুসারে সমাজ অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ—জীবনের মাঝখানটাতে। বাল্যকালও দায়িত্ববিহীন, বৃদ্ধ বয়সও। সামনের জীবনের জন্যে বালককে যখন প্রস্তুত হতে হয় তখন সংসার তার উপরে কর্ত্তব্যের দাবী করে না। কিন্তু মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত হওয়া উচিত। মৃত্যুকে যারা নঙর্থক বলেই জানে, তারা, যেন চিরদিনই বাঁচতে হবে সেই রকম ভঙ্গীতে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ঠিক মতো করে থেমে যাওয়াতেই প্রাণের পূর্ণতা প্রকাশ পায় এটা মনে রাখলে সেই থামবার জন্যেই সাধনা করা চাই। বস্তুতঃ সকলে মিলে ঠিক সময়ে আসতে দিতে চায় না বলেই শেষ বয়সটা এত ক্লান্তির কারণ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর প্রবেশ-প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ অবকাশ অপেক্ষা ক'রে আছে তাকে যদি বাইরের সংসার এবং অন্তরের পূর্ব্বাভ্যাসে মিলে নষ্ট করতে না থাকে তাহলে সেটা খুব সুন্দর। য়ুরোপের নকল করে বর্ম্মপূজাকে আমরা এত বড় কৃত্রিম মূল্য দিয়েছি যে জীবনটা যে একটা আর্ট, সুতরাং সমাপ্তিতে তার একটা সম্পূর্ণতা আছে বাহাদুরী করে এটা আমরা ভুলতে বসেছি। বৃদ্ধের আদর্শ যারা, অর্থাৎ যারা ঠিক মতো করে বুড়ো হ'তে জেনেছে একদিন আমাদের সমাজে তাদের খুব বড়ো জায়গা ছিল। আজ সে জায়গা তাদের দিতে চায় না বলেই তাদের তারুণ্যের ভাণ করতে হয়। কম্যুনাল এওয়ার্ড নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। সাহিত্যের মজুরিগিরি চালাতে হয়, forward লেখা, নবজাত মাসিক পত্রে আশীর্ব্বাণী পাঠানো, নতুন রচনা সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া ইত্যাদি হাজার রকম উপদ্রব মেনে না নিলে কর্ত্তব্যত্রুটির অপবাদ আক্রমণ করে। আগে অরণ্য ছিল এখন তাও নেই, গিরিশিখরে সমুদ্রতীরে আধুনিক বানপ্রস্থের রসদ জোগানো যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়। অতএব দেখতে পাচ্ছি সুন্দর করে মরাটা অদৃষ্টে নেই, ক্লান্তিতে জীর্ণ জীবনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মাঝ রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে অজায়গায় থামতে হবে।

তোমাকে আর এক খণ্ড "পত্রপুট" দিতে বলব। আশা করি নূতন সংস্করণের গদ্য বইগুলিও তোমাকে পাঠানো হচ্চে। প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে দেখি সেগুলি পাঠ্য। ইতি ১৩ জুলাই ১৯৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের নিয়ে ক'টা দিন বেশ আনন্দে ছিলুম। এখানে মুখর লোক ঢের আছে কিন্তু কথা কবার লোক নেই বললেই হয়—মনটা যেন উপবাসী থাকে। দেশ জুড়ে নানা কাগজে নানা চেঁচামেচি শুনি—যেন বুড়ো বুড়ো ইস্কুলের ছেলে ছুটি পেয়েছে তারা চেঁচাতে জানে ভাবতে জানে না—এ দেশে বুদ্ধির সুর নেবে যায়। অতএব তোমার উচিত হচ্চে কোনো ছুতোয় এখানে এসে পড়া—তোমাকে পাঞ্জাবীদের কোনো দরকার নেই। তোমার বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। ইতি ১৬।১০।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বারোই ফেব্রুয়ারী

দুই
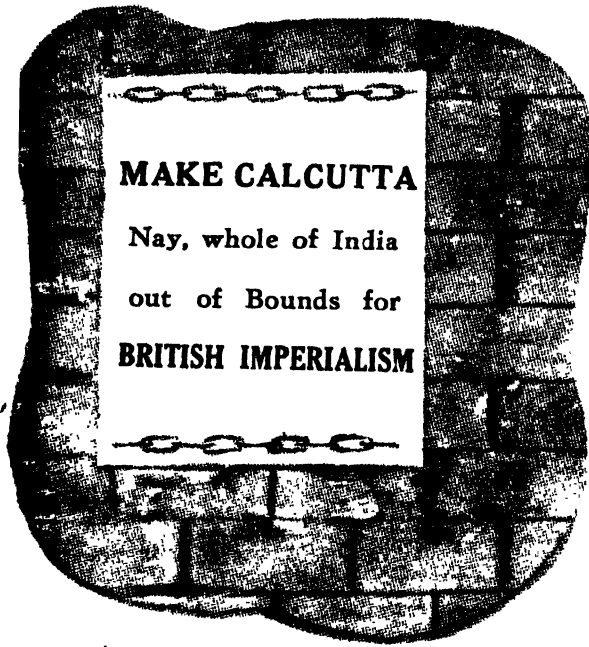
রাত্রি দুটোয় শুয়ে ভোর ছ'টায় ওঠা। বেঙ্গল টাইম ছ'টা—স্বাভাবিক ভাবে ঘুম ভাঙে নাই; ঘুম ভাঙিয়ে দিলে স্ত্রী। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে তবে ঘুম ভাঙল।

ছেলেগুলো তার আগে থেকেই চীৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ঘুমের পাতলা ঘোরের মধ্যে দূরের আওয়াজের মত কানেও আসছিল, খোলা জানালা দিয়ে সকালের আলোও লাগছিল চোখের বন্ধ পাতার উপর, কিন্তু তার ক্লান্ত চৈতন্যের উপর শব্দের আহ্বান আলোর স্পর্শ স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি এবং প্রতিচ্ছটা তুলে তাকে সজাগ করতে পারে নাই। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলোর অবস্থা ঢিলে হয়ে পড়া তারের যন্ত্রের মত; অযত্নে-পড়ে-থাকার ফলে মাকড়সার জালে ঢাকা ক্যামেরার লেন্সের মত। যে প্রয়োজন মত বিশ্রামের তৃপ্তি এবং পুষ্টিতে স্নায়ুতন্ত্রী সুস্থতা এবং পরিমার্জ্জনা লাভ করে—সে বিশ্রাম তার তখনও হয় নাই। তার গায়ে হাত দিয়ে স্ত্রী ডাকলে—"ওঠ। শুনছ। ওঠ।"

অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং বেহায়া এই মেয়েটা। কাল রাত্রে এক চড় খেয়েছে। আবার চড় খাবার জন্য ঝুঁকে মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে তাকে ডাকছে। চড় মারবার জন্য তার অন্তরে প্রবৃত্তি গর্ত্তের মধ্যে খোঁচা-খাওয়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে লাগল।

—"ওঠ। সবাই বলছে ট্রাম বন্ধ। হেঁটে আপিস যেতে হলে—"

—"ট্রাম বন্ধ?" এবার ধড়মড় করে উ বসল গোপেন।—"কে বললে?"

—"কানু বলছে।"

—"কানু?"

—"বিলাস বাবুর ছেলে কানু।"

কানুর পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না গোপে কাছে। শুধু গোপেন কেন—এ পাড়ায় ক আপনার পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। গোপেন বল চেয়েছিল—কানু যখন বলেছে তখন খবর খ সত্য।

এখান থেকে খিদিরপুর তক। অন্তত: ষ্ট্রা রোড—আপিস পর্য্যন্ত। তার পর আপিসের ল আছে। অন্তত: সুপারভাইজার ফিরিঙ্গী সায়ে টু-সাটার মোটরটার পিছনে ক্লীনার-সীটটা আছে

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রে রাস্তার অবস্থার কথা। হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ছেলেগুলোর উপর। বড় ছুটোতে একটা তের পতাকা নিয়ে বাড়ীর সামনে পথের উপরে মুভমেণ্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। এই সে-দি নেতাজীর জন্ম-দিন আর স্বাধীনতা দিবস ২৩শে জানুয়ারী আর ২৬শে জানুয়ারী উপলক্ষে ন্যাকড়া কেটে রঙ করে—সেলাই করে জুড়ে পতাকাটা তৈরী করেছিল সে আর তার স্ত্রী। এখন সেই ঘাড়ে নিয়ে বড় ছুটো চীৎকার করছে—জয় হিন্দ্ ব—ন্দে—মা—তরম! জয় হিন্দ্!

পিছনে থেকে ছোটগুলো সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুলছে

গোপেন দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড আক্রোশে এগি এসে বড় ছেলেটার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।—"হারামজাদা—শূয়ার—বদমাস!"

তার পর হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে —এখনি তার সঠিক খবরের প্রয়োজন। জাহাজে মা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বোঝাই হচ্ছে; মাল নামছে। ট্রামের মাস্থলী, সুবি দরে র‍্যাশন—চল্লিশ টাকা মাইনে। গেলে আ হবে না।

* * *

আশ্চর্য্য!

বাড়ীর দোরে রোয়াকে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো নাগাড় চেঁচিয়ে যাচ্ছে।—জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্! ব—ন্দে-মা—তরম্।

জয় হিন্দের খুদে পল্টন! গোপেনের বস্তী হাঁপানীর রোগী বুড়ো ধরণী চাটুজ্জে আবার এদের না বার করেছে জয় হিন্দের কাঠবেড়ালী। রামায়ণ অ

ঝড় ও ঝরা পাতা

পড়েছে গোপেন ; সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধবার সময় কাঠবেড়ালীদের কাহিনীটুকু খুবই চমৎকার কিন্তু তবুও এই নামকরণের জন্য গোপেনের আগে রাগ হ'ত ; আজ সে দাঁতে দাঁত ঘষে বরাবর ওই নামটাই উচ্চারণ করলে মনে মনে।

বড় রাস্তায় এখানে ওখানে জটলা। দাঁড়িয়ে শোনবার অবকাশ নাই গোপেনের, শ্যামবাজারের চৌমাথা পর্য্যন্ত না গেলে তার প্রয়োজনীয় সঠিক খবর মিলবে না। কিন্তু না শুনেও সে বুঝতে পারছে জটলায় কি জট পাকাচ্ছে তারা। স্বাধীন ভারতের দল খুব তড়পাই চালাচ্ছে। চালাক। কারও বাপের পয়সা আছে, কেউ বেকার। কর, তোমরা ভারত স্বাধীন কর। গোপেনকে তোমরা বাদ দাও। গোপেনের সঙ্গে তোমাদের কারু মিল নাই। আদার ব্যাপারীর চেয়েও সে হীন ব্যক্তি, তবু তাকে জাহাজের খবর রাখতে হয়। তাকে যেতে হবে ষ্ট্রাণ্ড রোড, খিদিরপুর। ট্রাম চাই তার।

ট্রাম বন্ধ।

বাসগুলো এসেছিল—সেগুলো সামনে গ্যারেজ বোর্ড টাঙিয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানগুলো বন্ধ। পাঁচ মাথার ফুটপাথে এরই মধ্যে লোক জমেছে ! মজা দেখতে এসেছে সব। দেখ—মজা দেখ। তরী-তরকারীর বাজার বন্ধ করবার সুর উঠেছে। যে যা পারছে সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হঠাৎ সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বসল। এরাও দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে। দোকানটা গোপেনের চেনা, গোপেনকেও ওরা চেনে। গোপেন নিজের র‍্যাশন থেকে কিছু-কিছু চিনি সরবরাহ করে থাকে ওদের। চিনি খেতে মিষ্টি—ভাল, কিন্তু অবস্থার কুলোয় না, তাই আপিসের সওদাদরের চিনি এখানে চড়া দামে দিয়ে কিছু আয় বৃদ্ধি করে নেয়।

খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বললে—এক কাপ চা দিও তো।

—চা ?

—হ্যাঁ। এখনও চা খাইনি। দাও।

খবরের কাগজ! এই এক জঞ্জাল! ভোরে উঠেই লোককে জানিয়ে বেড়াচ্ছে এই হ'ল—এই হ'ল—এই হ'ল ; এখন তোমরা এই কর—এই কর—এই কর। জাহাজ বোঝাই করতে হয় না, কাগজে লিখে—দাও ফেলে সীসের অক্ষর সাজিয়ে—কালী মাখিয়ে—দাও ফেলে কলে—বাস, হাজার হাজার ছাপা হ'য়ে গেল ; তার পর—জোর খবর বাবু, কলকাতায় গুলী চললো—রক্তারক্তি কাণ্ড! হাঁকে ভরে গেল গোটা কলকাতা—গোটা দেশ। এই যে—মোটা মোটা হরফে ছেপেছে—

সোমবার পুনরায় কলিকাতায় নিরস্ত্র ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের আক্রমণ

গুলীর আঘাতে এক জন নিহত, ১১ জন আহত

লাঠি চার্জ্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার

লাঠির আঘাতে ২০ জন আহত : ২৭ জন গ্রেপ্তার।

সকলের নীচে মোটা মোটা হরফে—

২০খানি মিলিটারী ট্রাকে অগ্নি-সংযোগ।

মুহূর্ত্তে তার দৃষ্টির সম্মুখে খবরের কাগজের বুকে পিপড়ের সারির মত ছাপা হরফের লেখা মুছে গেল—মিলিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—আবছা আলোর মধ্যে রাস্তার উপর মিলিটারী ট্রাক জ্বলছে। লাল আলো—তার আভা পড়েছে মানুষের মুখে, চোখের সাদা ক্ষেত্রে লাল ছটা ঝিক্‌মিক্ করছে।

একটা উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। আবার পড়তে আরম্ভ করলে।

"আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির উপর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের সম্মিলিত শোভাযাত্রার উপর মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটা এবং অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারে পুলিশ দুই বার লাঠি চার্জ্জ করে। ইহার ফলে ২০ জন ছাত্র আহত হয়। ২৭ জন গ্রেপ্তার হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক আমেদ হোসেন নামক জনৈক যুবকের আঘাত বেশী বলিয়া তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।"

চঞ্চল হয়ে গোপেন এবার তার সাণ্ডেল-জোড়াটার দিকে তাকালে। কিছু আর নজরে পড়ে না। ডালহৌসি—থেকে বাগবাজার পর্য্যন্ত গলি রাস্তার বুকে লাল রক্তের ছাপ মেরে মুছে গিয়েছে। ধারে—যেন লেগে আছে। হ্যাঁ।

উঠল গোপেন।

অনেকে হেঁটে আপিস চলেছে।

ট্রাম বন্ধ। বাস বন্ধ। রিক্সাও বন্ধ। কাগজেই রয়েছে—ট্রামওয়ে-ওয়ার্কাস, বাস-ওয়ার্কাস এবং রিক্সা-মজদুর-ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহম্মদ ইসমাইল সোমবার রাত্রে বিবৃতি প্রচার করেছেন—এই লাঠি চার্জ্জের প্রতিবাদে সব আজ ধর্ম্মঘট করেছে। হরতাল পালন করবে।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার আর কোন উপায় নাই।

পুলিশের লরী চলে গেল একখানা। গুর্খা এবং সার্জেণ্ট। গুর্খারা রাইফেল বাগিয়ে ধরে চলেছে, সার্জেণ্টদের হাতে রিভলভার।

দাঁতে-দাঁত টিপে সে দাঁড়িয়ে রইল। শাসন, শাসন, নিষ্ঠুর শাসন, অকারণ নিষ্ঠুর শাসন ছাড়া আর কিছু নাই এই দুনিয়ায়! বারকয়েক নিজের মাথাটা সে ঝাঁকি দিয়ে উঠল। মাথার বড় বড় চুল-গুলো ছড়িয়ে পড়ল মুখের উপর। সে-গুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে সে বাড়ীর দিকে চলল। ছুটতে হবে! এখুনি ছুটতে হবে! এ আর সহ্য হচ্ছে না!

* * *

গায়ে-মাথায় জল ঢালবার সময়—বিশেষ করে শীতের দিনে গোপেন চীৎকার করে মন্ত্র বলে যায়। মন্ত্র নয়—লোকে বাইরে থেকে কথাগুলো কি বলছে বুঝতে না পেরে ভাবে মন্ত্র পড়ছে। হয়তো 'কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ পুণ্যানেতানি'—অথবা 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব'—অথবা 'জয় ভগবান সর্ব্বশক্তিমান' এমনি ধারার কিছু। কিন্তু তা' নয়—গোপেন চীৎকার করে খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে "যে করে পাপ—সে হয় সাত বেটার বাপ; যে করে পুণ্যি—তার ভাগ্যে শূন্যি, তাকে লাগে শাপ-মণ্যি"—আরও অনেক নিজেই বানিয়ে বানিয়ে বলে। কবিত্ব-শক্তি ওর ছিল এমন নয়—একটুকু মিল করবার শক্তি মানুষ মাত্রেরই আছে।

আজ সে উঁচু দিকে মুখ তুলে উচ্চ চীৎকারে যা বলে চলেছিল তার মধ্যে ছন্দ নাই মিল নাই—জীবনের যে কৌতুক-বোধটুকু রাত্রিতে বিশ্রামের পর সকালে মল্লী ফুলের মত ফুটে ওঠে তা-ও নাই। সে বলছিল—মুখ তুলে ভগবানকেই সম্ভবতঃ বলছিল—"মেরে দাও বাবা, মরে যাই, চুকে যাক্ আপদ। মরণের তো হাজার-দুয়ারী খুলেছ বাবা—ঝড়, বোমা, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, নিমোনিয়া, হার্টফেল, টিটেনাস, মিলিটারী লরী, ট্রাম, বাস, বুলেট, বেয়োনেট, ছোরা-ছুরী, গাঁঠ থেকে আম-কলার খোসা পর্য্যন্ত; তাই কর বাবা, কলার খোসায় পা-পিছলে ফেলে দাও কংক্রিট-করা ফুটপাথের উপর, নির্ঘাৎ মাথাটা ঠুকে চ্যাপ্টা করে দাও! ব্যাস্, ঝঞ্ঝাট মিটে যাক।"

স্নান শেষ ক'রেও তার ক্ষোভ মিটল না। ভাত হয়নি, বাসী রুটি থাকে ছেলেদের জলখাবারের জন্য; তাই গিলতে লাগল গুড় দিয়ে।

জেটি-সরকারের স্ত্রী তার অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আজ ট্রাম-বাস বন্ধ শুনে অনুমান করেছিল আজ সকালেই স্বামীকে রওনা হতে হবে, তাই সে ছেলেদের রুটি দেয় নাই। সকালে মধ্যে মধ্যে ছুটতে হয় গোপেনকে, সে দিন এই ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। রুটি গিলতে গিলতে গোপেন মৃত্যু-কামনার জন্ত সাফাই গাইছিল—"লাভ কি বেঁচে? আঠারো আনা লোকসানের বরাত, চল্লিশ টাকা মাইনেতে দশটা থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত

জেটিতে ডকে ঘুরে মরে। পঙ্গপালের মত ছেলে। রাস্তার কুত্তার বাচ্চা সব। হবে না?" হঠাৎ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললে—"মা-টা যে নেড়ী কুত্তী।" স্ত্রী এবার রূঢ় দৃষ্টিতে চাইলে স্বামীর দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি গ্রাহ্য করলে না গোপেন—সে বলেই গেল—"চাল ডাল বয়ে আনতে হবে আপিস থেকে, কাপড়ের জন্যে যেতে হবে কণ্ট্রোলের দোকানে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাক শালা দাঁড়িয়ে। তবু তো শালা ব্ল্যাক-আউট ঘুচেছে আজ-কাল। ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাও বাদুড়ের মত। একজোড়া স্যাণ্ডেল শালা পাঁচ টাকা। মার ঝাঁটা শালা বেঁচে থাকার মুখে। একটা গুলী আজ যদি বুকে লাগে—"

স্ত্রীর আর সহ্য হল না, সে স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"তুমিও বাঁচবে—আমিও বাঁচব।"

—"কি বললি?"

স্ত্রী ভয় পেলে না, সে সরে গেল না, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল স্বামীর দিকে চেয়ে।

গোপেন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের কবচটা মাথায় স্পর্শ করলে, হাতে থাকে একটা রূপোর তৈরী পলার আংটী, সেটা স্পর্শ করলে দুই ভ্রূর ঠিক মাঝখানটিতে। তার পর হন্-হন্ করে রওনা হ'ল।

* * *

গলি গলি যাওয়া নিরাপদ। কিন্তু বড় রাস্তায় হয় তো এক-আধখানা মাল-বওয়া লরী মিলতে পারে। ডকে কাজ ক'রে অনেক লরী-ড্রাইভারের সঙ্গে 'জান-পহ্চান' মানে জানা-শোনা আছে।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার ফুটপাথ লোকে ভ'রে গিয়েছে। একেবারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মজা দেখছে সব। দেখ বাবা। গোপেনের মজা দেখবার ভাগ্য নয়। হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়ে একখানা এ-এফ-এস মার্কা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী দ্রুতবেগে এসে নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে রাইমার কোম্পানীর ওষুধের দোকানের পাশে থামল।

কোথায় আগুন? এখানে কোথাও আগুন লেগেছে না কি? দাঁড়াল গোপেন। এ-এফ-এস লরীর নায়ক লরী থেকে নেমে এগিয়ে গেল রাস্তার ওপারে ফায়ার এলার্মের লোহার বাক্সটার দিকে।

হরি—হরি! কেউ বদমাসী করে কাচের ঢাকনিটা ভেঙে হাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এদের হায়রাণ করার মতলব। আপন মনেই গোপেন বললে—"হুঃ!"

ছেলেগুলো লরীখানার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা পনের-ষোল বছরের ছেলে সকলের দিকে চেয়ে বললে—"চল ভাই—লরীতে চেপে আমরা যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে যাই।"

চেপে বসল সে। তার দেখাদেখি টপাটপ উঠতে আরম্ভ করলে ছেলেদের দল।—"সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের। চালাও।"

ও বাবা! বিচ্ছুর দল রে বাবা! হ'ল কি?

ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য না দাঁড়িয়ে গোপেন পারলে না। চাকরীতে তাকে টানছে, কিন্তু এর আকর্ষণও অদম্য। ভয়ঙ্কর কিছুর ভূমিকা যেন তৈরী হচ্ছে লঘু কৌতুকের ভঙ্গিতে।

একটা ছেলে লরী-ড্রাইভারকে বললে—"ওদিকে তাকাচ্ছ কি! পুলিশ নাই—ভেগেছে। চল—চল।"

এতক্ষণে গোপেনের খেয়াল হ'ল, পাঁচ মাথার মাঝখানে গোল জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখলে—সত্যই সেখানে এক জনও পুলিশ নাই।

লরীটা চলতে আরম্ভ করলে। নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে পশ্চিম মুখেই চলছে। একটু হাসি দেখা দিল গোপেনের মুখে।

* * *

হাঁটার বেগ ধীরে ধীরে বাড়ছে তার। পায়ের ডিমটা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছে। এক-কালে গোপেন একসারসাইজ করত; প্রথম আরম্ভ করত ধীরে ধীরে, তার পর সর্ব্বাঙ্গের মাস্‌লগুলো যত শক্ত হ'ত তত তার গতি বাড়ত। হেঁটে চলার মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার।

আপিসের বাবুরা রুমালে বা ন্যাকড়ায় বাঁধা খাবারের কৌটো ঝুলিয়ে চলছে। ওদের দেখলেই চেনা যায়। গোপেন খাবার নিয়ে যায় না। কুলোয় না। নেহাত যেদিন ক্ষিদে পায় সেদিন দু' পয়সার ছোলা-ভাজা কি ঘুঘনি-দানা আর এক কাপ চা খায়। দোকানের চা নয়, বড় পেতলের কেৎলী ভরে ভাঁড়ে ক'রে যারা পথের ধারে চা বিক্রী ক'রে—তাদের চা কিনে খায়। দু' পয়সায় এক ভাঁড়।

ফড়েপুকুরের মোড়ে বাদাম গাছটার তলায় এক-দল বাবু দাঁড়িয়ে আছে। গোপেন দেখেই বুঝলে এরা আপিসের বাবু নয়। এরা হল খুচরো দালাল। বড় বড় আপিসের সঙ্গে এদের কারবার আছে, বড় সাহেব বড় বাবুকে খাতির এবং ভয় দুই-ই করে, তোষামদও করে—তবু দু'-এক দিন আপিস কামাই করলে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। গোপেনের আপিসের থিয়েটার-পাগলা বন্ধুটি ওদের নাম দিয়েছে—'স্বাধীন জেনানা'। ওরা দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বা বাসের ব্যর্থ-প্রত্যাশায়। যদি হঠাৎ মিলে যায় কোনক্রমে—তবে আপিসে যাবে; নয় তো বাড়ী ফিরে আরাম করে ঘুম দেবে।

ওদিকের মোড়ে অর্থাৎ ফড়েপুকুরের দক্ষিণ মাথায়

এক দল ছেলে ট্রাম-লাইনের সদ্য-তুলে-ফেলা পাথরের ইটগুলো নিয়ে রাস্তা বন্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে।

বলিহারি বাবা! কাঠবেড়ালীরা ব্যারিকেড বানাচ্ছে।

জন-চারেক বড় ছেলে—পনের-ষোল বছরের কিশোর; হ্যাঁ—ভাল ভাল কেতাবে এদের কিশোরই বলে; জন-চারেক কিশোর রাস্তায় দু' মাথার পোষ্টের গায়ে দড়ি বেঁধে একটা পোষ্টার টাঙাচ্ছে।

"হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাই।"

"রসিদ আলির মুক্তি চাই।"

"রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।"

একটা দেওয়ালের সামনে কয়েক জন জমেছে। খুব কৌতুকের সঙ্গে কি দেখছে। তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেনও থমকে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে ব্যাপারটা। এও একটা ইস্তাহার। ইংরেজীতে লেখা।

MAKE CALCUTTA

Nay, whole of India

Out of Bounds for

BRITISH IMPERIALISM

ঠিক হ্যায়। জিতা রহো ভাই।

ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম কথাটা পড়েই গোপেনের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তার আপিসের বড় সাহেবের মুখ! বড় সাহেবের মুখ মিলিয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে এক জন পুলিশ সার্জ্জেন্টের মুখ। উৎসাহিত হয়ে উঠল গোপেন। শালা! অভ্যাস মত বেরিয়ে পড়ল কথাটা।

মেতে উঠেছে—ক্ষেপে উঠেছে কলকাতার ছেলের দল। মোড়ে মোড়ে ওদের আয়োজন চলছে। গোপেনের চোখে ওদের চেহারা পাল্টাচ্ছে। মনে মনে বার বার বলছে—'বহুৎ আচ্ছা—জিতা রহো'!

বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে—গোপেনের মনটা একেবারে পাল্টে গেল। ছেলের দল একটা মোটরকে আটকেছে।

—নামো, গাড়ী থেকে নামো! আর গাড়ী চড়ে যেতে পাবে না।

—আগুন লাগিয়ে দাও! লাগাও আগুন।

গোপেনের বুকের ভেতরটা নেচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। লাগাও আগুন' ধ্বনিটা বুকের ভেতরে হাজার খিলান-ওয়ালা ইমারতের মত প্রতিধ্বনি তুলেছে। তার মনে পড়ে গেল—মোটরের সামনে কত বার অতর্কিতে পড়ে সে চমকে উঠেছে, ড্রাইভারের ধমক খেয়েছে, গালাগাল খেয়েছে, কত বার তার জামা-কাপড়ে কাদার ছিটে লেগেছে।

গাড়ী থেকে নামল একটি সায়েবী পোষাক-পরা ভদ্রলোক। বললে—দেখ আমি ডাক্তার। রোগী দেখতে যাচ্ছি। চার-পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। গাড়ীতে না গেলে কি ক'রে আমি এদের দেখব বল? পায়ে হেঁটে কি দেখা সম্ভবপর?

—ডাক্তার আপনি?

প্যাণ্টের পকেট থেকে ষ্টেথিস্কোপ বার করলে ভদ্রলোক; বললে—গাড়ীর কাচেও লেখা আছে দেখ।

—কিন্তু আপনি সায়েবী পোষাক পরেছেন কেন?

হেসে ডাক্তার বললে—টাই পরিনি, দেখ, গলায় টাই নাই। তবে নানা ধরণের রোগী দেখি, ছোঁয়াচ বাঁচাতে ঢিলে কাপড়-জামায় অসুবিধা হয়।

—আচ্ছা। যান আপনি।

—না। দাঁড়ান।

—আবার কি?

—বলুন—বন্দে মাতরম্।

—বন্দে মাতরম্।

—বলুন—জয় হিন্দ্।

—জয় হিন্দ্!

—বলুন—রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—নিশ্চয়। রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—বলুন রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—আচ্ছা, যান আপনি।

ডাক্তার মোটরে চড়ল, চড়বার সময়ে সে নিজেই বললে—বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্!

প্রত্যুত্তরে ছেলেদের সাড়া দেবার সময় ছিল না। আর একখানা মোটর আসছে।—রোখো—রোখো। হাতে হাত বেঁধে ওরা নিজেরাই ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—নামো—উতারো।

গাড়ীর ভিতরে মেয়েছেলে নিয়ে এক ভদ্রলোক রয়েছেন। হাঁ—লাগাও, এইবার লাগাও, ভাল ক'রে লাগাও। এক হাত ক'রে সোনার গয়না ঝকমক করছে, চুড়ি কঙ্কণ;—কি বলে—কি নাম যেন আর একটা হাল-ফ্যাশানে গয়নার?—চুড়, হ্যাঁ চুড়। আরও আছে নাম জানে না গোপেন। মেয়েদের পরনে শাড়ী জামা ঝলমল করছে; তলহাত রাঙা টকটক করছে, গায়ের চামড়া আপেলের মত চকচকে! চলেছে মোটরে চড়ে। উতার দাও। দাও নামিয়ে! লাগাও আগুন মোটরে। হাঁ—হাঁয়া! লাগাও!

ভদ্রলোক নেমে বললে—খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি বাপু! দেখছ না—মোটরে মেয়েছেলে রয়েছে।

—ও সব আমরা শুনব না।

শুনো না, কখনও না। কভি নেহি!

দূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দক্ষিণ দিক থেকে একখানা গাড়ী আসছে। হুডখোলা মোটর; মোটরের উপর দাঁড়িয়ে মেগাফোন দিয়ে কারা কি বলছে! পতাকা উড়ছে গাড়ীখানায়। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা কংগ্রেস পতাকা! গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল।

বন্দে মাতরম্!
জয় হিন্দ্!
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ—
ধ্বংস হোক!
হিন্দু-মুসলমান—
এক হোক।

লেগে গেল মাক্কল। গোপেনের অন্তর যেন নাচছে।

* * *

খানিকটা ক্ষুব্ধ হল গোপেন। পতাকা উড়িয়ে মেগাফোন নিয়ে যারা এল তারা এই মোটরের ভদ্রলোক এবং মেয়েছেলেদের গাড়ীখানা ছেড়ে দিলে; সামনে এগিয়ে যেতে অবশ্য দিলে না, কিন্তু গাড়ীতে চড়িয়ে বাড়ী ফিরিয়ে দিলে। বললে—ওরা আমাদেরই মা-বোন—ওঁদের অসম্মান করলে কার অসম্মান হবে? তাছাড়া এ ভাবে আমাদের কাজ করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের লোকের অসম্মান করে, মোটর পুড়িয়ে—ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তি হবে না। গত কাল পুলিশ যে উদ্ধত হিংস্র বর্ব্বরতা দিয়ে আমাদের উপর নির্য্যাতন করেছে—বাধা দিয়েছে—তারও কোন প্রতিকার হবে না। এ বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্ম আমরা আজই বেলা বারোটার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়ে মিটিং করব। হিন্দু-মুসলমান নেতারা সেখানে আসবেন। তাঁরা আমাদের নির্দ্দেশ দেবেন। অত্যাচারীর উগ্র পাশবিকতার উপযুক্ত উত্তর আমরা দেব। প্রয়োজন হয় আমাদের বুকের রক্তে ভাসিয়ে দেব কলকাতার রাজপথ। পিছু হটব না আমরা। সুতরাং আপনারা এই ভাবে কাজ না করে দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে আজ আমরা অগ্রসর হব! দেখি কোন্ শক্তি আমাদের গতিরোধ করতে পারে! চলুন—চলুন—দলে দলে সব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চলুন। এমন ভাবে পথ বন্ধ করে কোন কাজ হবে না।

বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্! ইনকিলাব-জিন্দাবাদ! চলুন, দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ছেড়ে দাও; রাস্তা ছেড়ে দাও ভাই। ওঁদের বাড়ী ফিরে যেতে দাও। যান—আপনারা বাড়ী ফিরে যান। কোন কাজের অজুহাত আজ শুনব না আমরা। যান—ফিরে যান।

মোটর-ড্রাইভার মোটরের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। না হোক যাওয়া—বেঁচে গিয়েছে, খুব বেঁচে গিয়েছে।

হঠাৎ গোপেনের কি হল। সে দুই হাত তুলে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।—কভি নেহি! রোখো গাড়ী!

সকলে সবিস্ময়ে তাকালে তার দিকে।

গোপেন বললে—মেয়েছেলেরা গাড়ীতে যাক, কিন্তু ওই ভদ্রলোককে নামতে হবে। হেঁটে যেতে হবে।

ছেলের দল আবার ক্ষেপে উঠল। মুহূর্ত্তে তারা মোটরটাকে ঘিরে দাঁড়াল।—নামতে হবে। মেয়েরা যাক মোটরে, ওঁকে হেঁটে যেতে হবে।

মেগাফোনধারী এক জন ভদ্রলোক এ গাড়ী থেকে নেমে বেষ্টনী ভেদ করে এদের গাড়ীর দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি নামুন মশায়। আপনাকে হেঁটেই ফিরতে হবে। নামুন। নামুন। দেরী করবেন না!

ভদ্রলোক নামলেন। খুসী হয়ে উঠল গোপেন। অন্যান্য খুসী হয়ে উঠল।

গোপেন চেঁচিয়ে উঠল—জয় হিন্দ্!

ছেলেরা সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুললে—জয় হিন্দ্।

গোপেন চলতে আরম্ভ করলে এবার। খুব জোরে হাঁটছে সে।

ছেলেরাও চলছে। এক জন চেঁচিয়ে উঠল—চলো—চলো!

সকলে বললে—দিল্লী চলো।

এক জন গান ধরলে—কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—!

ঠিক হ্যায়। গোপেনও তাদের সঙ্গে গান ধরলে—খুসীসে, গীত গায়ে যা।

* * *

দু' ধারের দোকান-পাট সব বন্ধ।

ইট কাঠ লোহার কলকাতা যেন দাঁতে দাঁতে টিপে মুখ বন্ধ করে শুষ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে; থম থম করছে। রুদ্ধ মুখ—শুষ্ক দৃষ্টি কলকাতার অন্তরের মধ্যে যা হচ্ছে তারই খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসে রাজপথ বেয়ে চলেছে। মাণিকতলার মোড় থেকে লোক চলছে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকে।

—লাগ গিয়া, আগুন লাগা দিয়া।

থমকে দাঁড়াল গোপেন। মোড় ফিরল সে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকেই চলল। লরীর প্রত্যাশা মিছে। যেতে হবে হেঁটেই। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে আফিস কাছে হবে। গত রাত্রের সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি সে বিস্মৃত হয় নাই, রাত্রির অন্ধকারে জলন্ত লরীর আগুনের আভায় মানুষগুলির সে মুখ তার মনের মধ্যে জল্ জল্ করছে। তফাৎ শুধু

গত রাত্রের সে আতঙ্ক তার আর নাই। গাদাবন্দী বাসন পাথরের মেঝের উপর ঝন্ ঝন্ করে পড়লে—অন্ত বাসনেও তার সুর বাজে, কিন্তু সে বাসনে যদি জিনিষ কিছু থাকে তবে সে ইট-পাথরের মতই শব্দহীন হয়ে পড়ে থাকে। তার বুকের বাসনে কাল ছিল ভয়ের বোঝা, সকালেও ছিল চাকরীর ভাবনার বোঝা—এখন যেন সব খালি হয়ে গিয়েছে। হন্ হন্ করে সে চললো।

ফট-ফট-দুম-দুম!

আরম্ভ হয়ে গিয়েছে! সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর মুখে এসে সে দাঁড়াল। কোন্ দিকে শব্দ উঠছে? উত্তর দিক্‌টা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; গলিতে গলিতে লোক ঢুকে যাচ্ছে! হাঁ—ওই—ওই আসছে লরী। চলন্ত লরীর লোহার বেড়ায় বুক দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়ছে। সার্জ্জেণ্ট পুলিশ—গুর্খা পুলিশ।

চমকে উঠল গোপেন।

মাথার উপর থেকে ঠিক তার পাশেই সশব্দে খসে পড়ল কার্ণিশের খানিকটা অংশ, আধখানা ইট সমেত পলেস্তারা। বন্দুকের গুলী এসে লেগেছে ওখানে।

ওই চলে আসছে লরী। ওই!

লোকেরা গলিতে সেঁধিয়ে পড়ছে। গোপেনও ফিরল; কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে ভাঙা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে ঢুকে গেল মাণিকতলা ষ্ট্রীটের পাশের একটা গলিতে।

সশব্দে লরীটা বেরিয়ে যেতেই উদ্যত হাতে ইটটা নিয়ে ছুটে সে বেরিয়ে গেল সেন্‌ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকে।

শালা:!—দাঁতে দাঁতে টিপে রইল। ইটখানা লাগেনি। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। বুকের ভেতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে।

লোক ছুটছে উত্তরমুখে গ্রে ষ্ট্রীটের দিকে।

কিছুক্ষণ সে ভাবলে। দক্ষিণ-মুখে টানছে খিদিরপুর ডক। জাহাজ বোঝাই হচ্ছে। কিন্তু—। উত্তর দিকে লোক দলে দলে ছুটছে। পুলিশ গুলী চালিয়ে এল। তবে কি—? ঘুরল গোপেন উত্তরমুখে।

* * *

জনতার বেষ্টনী ভেদ করে ঢুকল সে। কাউকে সে ভ্রূক্ষেপ করলে না। যাকেই সে ঠেলে পথ করে নিলে—সে-ই ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে তাকালে তার দিকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে লোকে পথ ছেড়ে দিলে। গোপেনের মনেও এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠল না। অবসরও ছিল না। সমস্ত লোককে কাঁধে ধরে পিছনে পাশে সরিয়ে সে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি ছেলে। ছেলে মানুষ।

এখনও গল গল করে রক্ত বার হচ্ছে।

—দত্তদের ছেলে। মনোরঞ্জন—মনোরঞ্জন দত্ত।

স্থিরদৃষ্টিতে গোপেন চেয়ে রইল ছেলেটির দিকে।

একটা ইট এসে মাথায় লাগল। রাস্তার ওপার থেকে কেউ ছুড়েছে! শালা:! বাঁ দিকে কানের ইঞ্চি-দুয়েক উপরে। রাস্তার আলোগুলো চরকীর মত পাক খাচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে ক্ষত স্থানটা চেপে ধরে সে বসে পড়ল। হাতের তালুতে ঠেকল যেন আগুন। আগুন নয়—আগুনের মত গরম রক্ত; হাতের তালু ছাপিয়ে কানের দু'পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে। এক জন তাকে ধরে নিয়ে গেল পাশের গলির মধ্যে।

এইবার তার যেন সম্বিৎ ফিরল।

রাত্রি হয়ে গেছে। কত রাত্রি বুঝতে পারলে না। মাণিকতলা ষ্ট্রীট—সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু জংসনে মনোরঞ্জনের রক্তাক্ত দেহের সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। তার পর কি ঘটেছে স্পষ্ট তার মনে নাই। আবছা-আবছা মনে পড়ে—রাস্তায় রাস্তায় লোক; ভাগাহোসি জোয়ার! তার পর চৌরঙ্গির মাঠে মাঠে গাছের তলায় তলায় সে কালীঘাটের দিকে ছুটেছিল। জগুবাবুর বাজারে জোর কাণ্ড-কারখানা চলছে খবর পেয়েছিল সে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ে লরী পোড়ার মধ্যে ছিল কিছুক্ষণ; তার পরই এল সাথে সাথে লোক ঝাণ্ডা নিয়ে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে—সে মিশে গেল তাদের সঙ্গে। ছুটল দক্ষিণ-মুখে কালীঘাট—কালীঘাট—জগুবাবুর বাজার!

মনে পড়ছে হাজরা রোডের উপর দাউ-দাউ করে আগুন। একখানা লরীর পেট্রোল-ট্যাঙ্ক সেই মুহূর্ত্তে ফেটে জ্বলন্ত পেট্রোল রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালী কা রাত, হাঁ—দেওয়ালীর রাত বানিয়ে দিলে। মনে পড়ছে—ওদিক থেকে গুর্খারা বন্দুক হাতে হাঁটু গেড়ে বুকে হেঁটে এসেছে। মধ্যে মধ্যে গুলীর ঝাঁক ছুটে আসছে। মানুষ পড়ছে। আম্বুল্যান্সের লরী আসছে সাদা পোষাক পরা দেশী ডাক্তারেরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! ডাক্তার ভাইরা!

আবছা-আবছা মনে [illegible] সব। ইটটা কিন্তু জোর হাঁকড়েছে। [illegible]। শালা ঝাঁক কাটিয়ে দিলে, [illegible]।

কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর সামনে সে এল।

ডিপোর ভিতরে ট্রাম পুড়ছে। দেওয়ালী চলছে। মনে পড়ছে আগুন দেওয়া। ডিপোর দেওয়াল টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ছে সব, হাতে জ্বলন্ত মশাল। মানুষের সর্ব্বাঙ্গটা দেখা যায় না, বুক থেকে মুখ পর্য্যন্ত

অমিয় চক্রবর্তী

ঊঁচু ডাঙা পরিচ্ছন্ন, লাল মাটি, প্রান্তে নীল রেখা
ছোটো পাহাড়ের ধারে অজানা ও কাছের সংসার
লতায় দেয়াল ঢাকা, পরিতৃপ্ত দুটো চারটে বাড়ি,
ঐখানে এসো আজ একটি ঘর বাঁধি দু'জনার।
আমার বুকের ইচ্ছা তোমাকে তো আনবেই টেনে
অগণ্য মাইল থেকে স্বপ্নে এসে মিলবে সেখেনে ;
কত সুখ তার পর দুজনার রোজ কত কাজে,
বিরল মাঠের ধারে গোরু-চরা ওটুকু সমাজে।

ব্যাকুল বিরহী মন ঘিরে ধরে তোমাকে কোথায়
সুন্দর ইচ্ছার বেগ স্বচ্ছ দিনে সব ফিরে চায়।
মানে না কোনই বাধা, জানে বাধা নেই প্রাণলোকে,
তোমার আমার ধ্যান শুভ্র হবে সকলের চোখে।
এই দূর মাঠে বাটে নির্মল আকাশতলে, প্রাণ,
অমৃত ক্ষুধার তুমি দেবে না কি কল্পনাতীত দান ?
ট্রেণ চলে যায়,
স্বপ্নের কুটীর ঐ রাঙা সন্ধ্যা আলোয় মিলায়॥

—

দেখা যায়—জলন্ত মশালের আলোয় লালচে হয়ে উঠেছে। বাখারী—ছোট লাঠির মাথায় মবিল পেট্রোল দিয়ে ভিজানো জুট-কটন বেঁধে জ্বেলে নিয়েছে। দাউ-দাউ করে জলছে। একটার পর একটা মশাল পাচীলের উপর উঠছে আবার পড়ছে নীচে লাফিয়ে। সে-ও লাফিয়ে পড়েছিল তাদের সঙ্গে।

বেরিয়ে এসে দেখছিল রোশনাই। দাঁ ক'রে এসে লাগল ইটটা।

খুব জলছে ট্রাম-ডিপো।

একটা ছেলে—গলির মুখ থেকে গান গেয়ে উঠল—

বসন্তে ফুল গাঁথ-লো—আমার জয়ের মা-লা—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

সিনেমার গান। গোপেন গানটাকে সিনেমার গান বলেই জানে। রেডিওতেও ঐ গানটা প্রায় বাজায়। বহুৎ আচ্ছা ছোক্‌রা! ঠিক গান ধরেছে!—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

গাইতে গাইতে ফিরল গোপেন। কালীঘাট থেকে বাগবাজার। কুছ-পরোয়া নাই। ভয় নাই ; ডর নাই ; মুখে-কানের পাশে রক্তের দাগ, গায়ের জামায় [illegible] হাতে পোড়ানো লরী থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া এক টুকরো লোহা—তা ছাড়া কলকাতা-শুদ্ধ লোকই তো আজ [illegible]। ক্লান্তিও নাই—আশ্চর্য্য—পা ভেরে যাচ্ছে না আজ! [illegible] হন করে সে চলল। ওই গানটা গাইতে গাইতে সে ফিরল।

কালীঘাট থেকে বাগবাজার। চলো মুসাফের। হুঁসিয়ারী শুধু মিলিটারীকে! লাট সাহেব আজ নাকি [illegible] না কি মিলিটারী বসিয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। গলি-গলি চলো!

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—
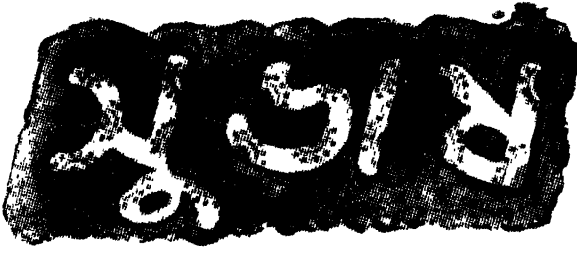
[ক্রমশঃ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলা দেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐ আন্দোলনের মধ্যে; কিন্তু চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার পর মহাত্মাজী যখন ঐ আন্দোলন থামিয়ে দিলেন, তখন দেখতে পাওয়া গেল যে, দেশের মধ্যে ক্রমশঃ একটা উৎসাহভঙ্গ জনিত অবসাদ এসে পড়েছে। ন্যাশনাল স্কুল-কলেজের বেঞ্চিগুলি খালি পড়ে রইল। ছেলেরা আস্তে আস্তে আবার তাদের পুরানো স্কুল-কলেজে ফিরে যেতে লাগলো। উকিল মোক্তারের আবার পড়াচুড়ো বেঁধে আদালতে ফিরে গিয়ে ভাল প্রাকটিস জোটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে সব রায় বাহাদুরের দল চাঁদা দিয়েও উপাধি বর্জন করেননি, তাঁরা অতি বিজ্ঞ ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন—"ও সব ঢের দেখিছি হে, ঢের দেখিছি। আমরা আগে থেকেই জানতুম, ও সব কিছুই হবে না। মাঝে থেকে সায়েব-সুবোকে চটিয়ে ছেলেগুলোর চাকরী-বাকরীর দফা ঘোলা হয়ে গেল।" যাঁরা খদ্দর পরতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার মিলের ধুতি পরতে সুরু করলেন। মাকড়শা ঘরের কোণে চরকায় সুতো কাটতে লাগলো।

অবসাদগ্রস্ত লোকের মনে আবার আশা আর উৎসাহ ফিরিয়ে আনবার জন্যে দেশবন্ধু তাঁর স্বরাজ্য দল গড়লেন। শান্ত ভাবে চরকা কেটে বা শুধু ঐ রকম গঠনমূলক কাজ ক'রে সারা দেশকে যে তাড়াতাড়ি আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা যাবে, এটা তিনি মনে করতেন না। তার চেয়ে দেশে মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড প্রভৃতি যে সমস্ত আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলো যদি দখল করা যায় আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলো দখল ক'রে যদি বিদেশী শাসনকর্ত্তা আর তাঁদের স্বদেশী বন্ধুরা মিলে দেশে যে দু-ইয়ার্কির (Dyarchy) সৃষ্টি করেছেন, সেটা যদি ভেঙ্গে দেওয়া যায়, তা হলে দেশের লোকে বুঝতে পারবে যে গড়নের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গনেরও দরকার। দেশে একটা বিপ্লবী আবহাওয়া তা থেকে সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর আরও একটা ধারণা ছিল যে, বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে যদি ঘায়েল করতে হয়, তা হলে যারা প্রধানতঃ কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক, শুধু সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যেও তা' হবে না। দেশের কৃষক, বিশেষ ক'রে শ্রমিকদের সাহায্য দরকার।

এই দু'-ইয়ার্কি ভাঙ্গা বা পৃথক্ শ্রমিক আন্দোলন সৃষ্টি করা নৈষ্ঠিক অসহযোগীরা বেশ সুনজরে দেখতেন না। সকলেই কংগ্রেসের আদর্শে প্রণোদিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিক—এইটাই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। শ্রমিক বা কৃষকেরা যে নিজেদের শ্রেণীগত অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্যে পৃথক ভাবে সংঘবদ্ধ হোক— এটা তাঁরা পছন্দ করতেন না। তাঁরা মনে করতেন এ থেকে শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়ে জাতীয় আন্দোলন দুর্ব্বল হয়ে পড়বে।

কিন্তু দেশবন্ধুর ধারণা ছিল একটু অন্য রকমের। রাষ্ট্রীয় শক্তি যদি শুধু মধ্যবিত্ত বা ধনি-শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে যে দেশের মঙ্গল হবে তা তিনি মনে করতেন না। এমন কি, ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, দেশের শাসন-শক্তি যদি কখনও শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়ে, তা' হলে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লড়াই করে তিনি তা কেড়ে নিতেও কুণ্ঠিত হবেন না।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, এবং সুভাষচন্দ্রও সেই একই কারণে রাষ্ট্রীয় মহাসভা (National Congress) ও ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আরও একটা লক্ষ্য ছিল, সামরিক কায়দায় একটা কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা। বলা বাহুল্য, নৈষ্ঠিক অসহযোগীদের যে ভগ্নাবশেষ বাংলা দেশে ছিল—তাঁরা এ সমস্ত কিছুই পছন্দ করতেন না। তাঁদের কেউ বলতেন—স্বরাজ্য দল প্রচ্ছন্ন মডারেটদের দল; কেউ বলতেন—ওদের অহিংসার উপর তেমন আস্থা নেই। অতএব কংগ্রেসী মহলে ওদের অপাংক্তেয় করে রাখা উচিত।

যত দিন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁর আশ্রয়ে সুভাষচন্দ্রের কাজ করবার খুব সুবিধা ছিল। তাঁর পরিশ্রম করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। কলকাতা করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে তাঁকে খাটতে হতো সমস্ত দিন। কোন খুঁটি-নাটি তাঁর চক্ষু এড়াতে পারতো না। সব কর্ম্মচারীদের একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো। ধাঙ্গড়-মেথররা পর্য্যন্ত কাজ করছে কি ফাঁকি দিচ্ছে তা তদারক করবার জন্যে man-holeএর ভিতর নেমে পড়তেও তাঁর আটকাতো না।

বাংলা দেশের পুরানো বিপ্লবী দলের মধ্যে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই স্বরাজ্য দলের ভিতর এসে পড়েছিলেন। তাঁদের

ভিতরকার পুরানো দলাদলির ভাব লোপ না পেলেও তাঁদের সকলেরই টাঁক ছিল সুভাষচন্দ্রের উপর; আর তাঁরা মনে করতেন যে, সুভাষকে নিজেদের দলে টানতে পারলেই বাংলা দেশে তথা বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। সুভাষের চেষ্টা ছিল কোন বিশেষ দলে যোগ না দিয়ে সব দলগুলিকে স্বরাজ্য দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেশকে সংঘবদ্ধ করার কাজে লাগানো। এদিকে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। একে তো স্বরাজ্য দলের ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি দখল করা তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। তার উপর ভাবলেন যে, স্বরাজ্য দলের ভিতরে ঢুকে পুরানো বিপ্লবপন্থীরা যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দখল করে, তা'হলে হয়ত দেশে একটা ভীষণ গণ্ডগোল বেধে যাবে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা বিপ্লবীদের ভিতর থেকে বেছে-বেছে কতকগুলি লোককে ১৮১৮ সালের তিন ধারায় ফেলে জেলে পুরলেন। আমিও তাঁদের মধ্যে পড়ে গেলুম।

আমরা ভাবলুম, সুভাষচন্দ্রের উপর সরকার বাহাদুরের শনির দৃষ্টি সম্ভবতঃ তখনো পুরোমাত্রায় পড়েনি। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়তে বেশী দিন লাগলো না। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁরা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র ও আরও দুই-এক জন স্বরাজ্য দলের বিশিষ্ট কর্ম্মীকে টেনে নিয়ে জেলে পুরলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন জেল থেকে ফিরে এলেন তখন দেশবন্ধু পরলোকে। দেশবন্ধুর পাঁচ জন বিশিষ্ট সহকর্ম্মী স্থির করে রেখেছিলেন যে, দেশবন্ধুর পরে তাঁরাই বাংলা দেশে স্বরাজ্য দল পরিচালনার ভার নেবেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দেশবন্ধুর অন্যতম সহকর্ম্মী হলেও, এঁরা সেনগুপ্তকে একটু দূরে রেখেই চলতেন। দেশবন্ধুর পরলোক-গমনের পর কে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করবেন তা' স্থির করবার ভার পড়লো মহাত্মাজীর উপর; আর মহাত্মাজী কলকাতায় এসে ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন যে, শুধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নয়, কলকাতা করপোরেশন ও বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দলকে পরিচালনা করবার ভার থাকবে সেনগুপ্তের উপর। স্বরাজ্য দলের যে বিশিষ্ট পাঁচ জন নেতার কথা পূর্ব্বে বলেছি, এবং যাঁরা সে সময় Big Five নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁরা এ ব্যবস্থায় বেশ তুষ্ট হননি; কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে কোন রকম বিরোধিতাও করেননি।

কিন্তু তা' সত্ত্বেও বাংলা দেশ ক্রমশঃ তীব্র দলাদলিতে ভরে গেল। নৈষ্ঠিক অসহযোগীরা অনেকটা হীনবল হয়ে পড়েছিলেন বটে; কিন্তু স্বরাজ্য দলটা ভাগ হয়ে গেল সেনগুপ্ত সাহেবের দলে আর Big Fiveএর দলে। তার উপর বীরেন্দ্র শাসমলের নেতৃত্বে আরও একটা ছোট দল গড়ে উঠেছিল, যাঁরা মনে করতেন যে, দেশবন্ধুর অবর্ত্তমানে শাসমলের উপরই বাংলার নেতৃত্ব-ভার পড়া উচিত ছিল।

জেল থেকে খালাস পাবার পর সুভাষচন্দ্রকে ফাঁপরে পড়তে হয়েছিল। কোন উপদলের নেতাদেরই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না; সুতরাং কোন দলের সঙ্গেই তাঁর ষোল আনা মনের মিল ছিল না। কিন্তু পারিবারিক ও অন্যবিধ কারণে সুভাষকে প্রথমতঃ Big Fiveদের কাছ ঘেঁসেই থাকতে হতো। এঁদের সাহায্যেই তিনি আবার স্বরাজ্য দলের ছিন্ন সূত্রগুলি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে গুটিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতা করপোরেশন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি সব প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে এক আদর্শ-প্রণোদিত হয়ে এক নেতৃত্বাধীনে কাজ করতে পারে, সে চেষ্টা করতে গিয়ে সুভাষকে পদে পদে বাধা পেতে হয়েছিল। তাঁর অনেক পুরানো বন্ধু ও সহকর্ম্মী তাঁকে অযথা-ক্ষমতা-পিপাসু মনে করে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। এ সন্দেহও তাঁর মনে হয়েছিল যে পুরানো বিপ্লবী দলগুলির যে সমস্ত কর্ম্মী তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা প্রকৃত পক্ষে আপন আপন উপদলেরই অনুগত। শুধু নিজেদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁরা বাহ্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন, এ সন্দেহ সুভাষের মনে উঠেছিল। সেই জন্য তিনি চেষ্টা করে ছিলেন নূতন নূতন ছেলেদের নিয়ে একটা নিজস্ব দল গড়ে তোলবার।

এই সমস্ত গণ্ডগোলে তাঁর মনটা বিশেষ ভাবে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তার পর যখন তিনি দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়ে দেখলেন যে, নিখিল ভারতীয় নেতারাও তাঁর উপর বিরূপ, তখন তাঁর মন তিক্ততায় ভরে উঠলো। এ ধারণা তাঁর মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, কংগ্রেসের নেতারা মুখে স্বাধীনতার কথা বললেও প্রকৃত পক্ষে যে রাস্তা ধরে চলেছেন তাতে দিনকতক পরে ইংরেজের সঙ্গে একটা রফা করা ছাড়া আর তাঁদের গত্যন্তর থাকবে না। অথচ দেশের সাধারণ যুবক-সম্প্রদায়ের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ। দল ছেড়ে গিয়ে একটা কিছু সুবিধা করা যায় কি না তা' পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা সেই সময় থেকেই তাঁর মনে উঠতে আরম্ভ করেছিল।

* * *

যাঁরা শব-সাধনায় সিদ্ধ, তাঁরা বলেন যে, প্রথম প্রহরের পর ভূত, প্রেত, পিশাচ এসে সাধককে ভয় দেখায়। সে ভয়ে যদি তিনি সাধনা থেকে বিচলিত না হন, তো দ্বিতীয় প্রহরে মায়াবিনীরা এসে তাঁর কাছে আত্মীয়-স্বজনের রূপ ধরে মায়া-কান্না কাঁদতে থাকে। তাতেও

অরুণ মিত্র

আমার বয়সের খাদে শুরু শুরু গড়ায় তারা.
প্রতিমাগুলো ব'য়ে এনেছিলাম
মাথা ভ'রে কাঁধ ভ'রে এত উঁচুতে
তারা এখন ভাঙ্‌ল।
আমার চিন্তায় ভাবনায় তাদের ভাঙা চাঙের
কড়্‌করে চাপ
আমার মগজে তাদের পতনের উদ্বেগ
আমার অহঙ্কারের জমকালো সিলুয়েট ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে।
তাদের ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটের বাঁকে আমার আগ্রহ
থুব্‌ড়ে পড়্‌ল
পচিয়ে-যাওয়া মিলিয়ে-যাওয়া জোড়া উরুর আদিম-
প্রতাপ আমাকে নাড়িয়ে দিল ভূমিকম্পে।

তারা ভাঙ্‌ল
তাদের উল্টোনো চোখের ছোঁয়াচে বোবা দৃষ্টি
ফুটলো ঢিবিগুলোয়
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল ঘাসের শুকনো শীষ।

এই অসুন্দর অস্তিত্বকার উপর দাঁড়িয়ে আমি
ফাঁকা আলিঙ্গনে কাকে জড়াতে চাই?

এক দিন কাদা থেকে পা দুখানা জোর ক'রে উপ্‌ড়ে
উঠে এসেছিলাম
চাষকর বসতি দুপায়ে দ'লে এসেছিলাম
নিজেদের তৈরী ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠে এসেছিলাম।
আমার সেই সিঁড়ি ভাঙার কাহিনী মহৎ কাহিনী,
দু' দুটো মুঠোয়, দু' দুটো কাঁধে, বাঁকানো কোমরে
আমার ভার বহনের সে ছবি মহৎ শিল্প!
সমবেদনার ঝাঁঝে আমি গ'লে যাইনি
মিহ্‌যি-হাসিতে সুরেলা কান্নায় স্তোকে উপচাসে
সকাল-বিকেলের ঘুরন্ত চাকায়
সমবেত সঙ্গীতে
আমার টগ্‌বগে শিরা-উপশিরা বেজেছিল জঙ্গী বাজনায়,
আমি অতিকায় মূর্তিতে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

এক সময় থেকে আর এক সময় পর্যান্ত এক একটা
গহ্বরের উপর দিয়ে যে সব সেতু বেঁধেছিলাম
সেগুলো কিন্তু, চমৎকার দেখাচ্ছে।
বহু ব্যবহার সইবার মতো আমার মেহনৎ:
শীতে গ্রীষ্মে এলো-মেলো ধাক্কায় শক্ত হ'য়ে আছে
গুরুভার পদক্ষেপে এখনও গম-গম করছে।

নিঃশব্দ অস্তিত্বকার পিঠ থেকে ঐ সব অতীত কীর্তি
নজরে পড়ে।
সে কি যন্ত্রণা? সে কি সান্ত্বনা?
বিপন্ন শিখরে আমি দাঁড়িয়ে আছি
নীচে তাকিয়ে গড়ানো প্রতিমাগুলো দেখি,
পরিশ্রমের আবকে ফাঁপানো আমার দৈত্য মূর্তি
চুপ্‌সে আসছে।
ভবিষ্যতের পটে কি একটা তিল-পরিমাণ বিন্দু
হ'য়ে থাকব এইখানে?

কিন্তু এক প্রবল স্বস্তির শূন্য আমাকে টানছে
আর এক অভিজ্ঞতার শিখরে
নিকটবর্তী দিনে পাথা ভর দেবার সুযোগ পাব যেন,
ইতিমধ্যে অনুভব করছি আমার কপালের ঘাম
নিঃসাড়ে শিশির হ'য়ে ফুটছে।

যদি তাঁর মন না টলে, তো তৃতীয় প্রহরে মহামায়া মহান্‌ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেন। মুক্তি শুধু তাঁরই লভ্য, যিনি এই তিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। সুভাষচন্দ্র প্রথম দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শেষ পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। যদি তিনি ইহলোকে থাকেন, তা'হলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের মুক্তিদাতারূপে আবার জগতের সামনে আত্ম-প্রকাশ করেন।

পটীয়সী

মাখন সোজা হয়ে বসল। এবং আমিও।

দু'জনেই লক্ষ্য করলাম।

"আশ্চর্য্য রূপ!" গুন্ গুন্ করল সে। "মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এত সুন্দর যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না।"

মেয়েদের সম্পর্কে মাখন স্বনামধন্য। সামান্য তাপেই গলে যায়, আর অনর্গল। কিন্তু তাহলেও, তার মতো জহুরির মুখ থেকে এ-হেন উক্তিকে উচ্চ প্রশংসাই বল্‌তে হবে।

মেয়েটিকে চোখে লাগে, মিথ্যা না। রঙ্, গড়ন, এমন কি, চলার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত নিখুঁৎ। খুব লম্বাও না, বেঁটেও নয়। মোটা তো নয়ই, রোগা বলাও কঠিন।

মোটের ওপর সব মিলিয়ে (তার মধ্যে কবিতার মিলকেও ধরা হয়েছে) মেয়েটিকে তন্বী বলাই উচিত। কেন না, তরুণী যে বহ্নিমতী তা আমার বন্ধুর কথার ধূম থেকেই ধরা পড়ে।

সাপ্লাই আপিস থেকে বেরিয়ে কার্জ্জন পার্কের পাশ ঘেঁষে পশ্চিম-মুখো চলেছিলো মেয়েটি। আমরা পার্কের মধ্যে বিশ্রাম করছিলাম।

নরম ঘাসের ওপর লম্বা হয়েছিলাম। মেয়েটিকে বেরুতে দেখেই বিচলিত হয়ে উঠে বসেছি। আমাদের পার্কের ঘাসে পর্য্যবসিত করে' সে চলে গেল।

"ন্যাতো সুন্দর মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।" মাখনের গুঞ্জনধ্বনি গঞ্জনা হয়ে দাঁড়ালো।

"আমিও না।" আমি সায় দিলাম—পুনশ্চ ধরাশায়ী হয়ে।—"এবং দেখতেও পাবো না—যতোক্ষণ না আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি।"

"এরকম মেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয় না। ওকে আমি আর এ জীবনে দেখতে পাবো না।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ল মাখন। এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

"দেখতে পেয়েও কোনো লাভ ছিল কি? ও মেয়ে তোমার সে ধরণের মেয়ে নয়, দেখলেই বোঝা যায়। ওখানে তোমার ট্যাঁ ফোঁ চল্‌বে না।"

মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো মাখনের। ওর এই পটীয়সী ক্ষমতার জন্যে সবাই আমরা ওকে ঈর্ষা করতাম। কাজেই এই সুযোগে একটু খোঁচা দিতে কে ছাড়ে?

"বাজি রাখো," বল্‌ল মাখন।

আমি বল্‌লাম, "দশ টাকা।"

"তথাস্তু।"

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বলেই মাখন উঠে পড়ল। জামা-কাপড় ঝেড়ে ঝুড়ে পা বাড়ালো তক্ষুণি। নিজের সর্ব্বনাশের পথেই—আমি স্পষ্ট দেখলাম।

সমর-কৌশলে মাখন নেহাৎ কম যায় না। ষ্ট্র্যাটেজি-বিদ্যায় সে বিশারদ। জ্যামিতি-জ্ঞানেও তার কিছু কমতি নয়। মেয়েটি তখন মোড় ঘুরে পার্কের পশ্চিমধারী রাস্তা ধরে' দক্ষিণ-মুখো চলেছিলো। মাখন করলো কি, অবাক হয়ে দেখলাম, সোজাসুজি কার্জ্জন পার্কের কোণাকুণি পাড়ি দিল। ত্রিভুজের দুই ভুজ তৃতীয় ভুজের চেয়ে বিলম্বিত এই জ্যামিতিক সত্যগ্রহের সাহায্যে সে অবিলম্বে মেয়েটির মুখোমুখি গিয়ে পড়ল।

তাহলেও, অবিচলিত বিশ্বাসে ওর কার্য্য-কলাপ দেখছিলাম। আমার দশ টাকা মারা যাবার একটুও আশঙ্কা করিনি। গায়ে পড়ে ভাব করতে দেবে সে ধরণের মেয়েই ও নয়—দেখলেই বোঝা যায়। আমার দশ টাকা তো অক্ষয় বটেই, সেই অক্ষয় বটের থেকে আরো এক ঝুরি নামার আশা আমার ছিল। সেই সঙ্গে বাজি জেতার আরো দশ প্লাস্ ওর দুর্দ্দশা দেখবার জন্যে আমি প্রস্তুত।

মেয়েটির সামনে পড়ে মাখন অদ্ভুত কায়দায় এক নমস্কার ঠুকল আমি দেখলাম। হাত পা নেড়ে কী যেন বল্‌ল বোধ হোলো। মেয়েটি দাঁড়িয়েছে, ওর কথার জবাব দিয়েছে,—মাখনের অদ্ভুত আচরণে যেন খারা মজা পেয়েছে বলেই মনে হচ্ছিল।

কোনো প্রতিবাদ না, বিরক্তি-প্রকাশ নয়, যা আশা করা গেছল তার কোনোটাই না। মেয়েটির সুবিস্তৃত

এক চড়ে মাখনকে গালের দিকে প্রথম হতে দেখব প্রত্যাশা করেছিলাম, হতাশ হতে হোলো। তার পরেই মাখন আর মেয়েটিকে পাশাপাশি রেড্ রোডের পথ ধরে' হেঁটে যেতে দেখলাম।

পরের দিন সকালেই মাখনকে আমার ফ্ল্যাটে দেখতে পেলাম। হাওয়ায় যেন উড়ছে!

"ফ্যালো দিকি টাকা দশটা!" আওয়াজ পাওয়া গেল ওর: "অতসীকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় আমি গোল্ডেন্ ড্রাগনে যাচ্ছি—বিকেলটা লাইট্ হাউসে কাটিয়ে তার পর তোমার টাকায় মজা করে' খাওয়া যাবে।"

"কে অতসী?" আমি জিগেস্ করি।

"সেই মেয়েটি—যার চেয়ে সুন্দর মেয়ে আর ভূভারতে নেই—"

"ভণিতা রাখো।" আমি বাধা দিলাম: "কি করে' ভজালে তাই বলো।"

"কলার সাহায্যে।" মাখন প্রকাশ করে: "সাদা বাংলায় যাকে আর্ট বলে—তাই। আর, যে কোনো মেয়েই হোক্' আর্টের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারে না।"

"তুমি তোমার আর্ট।"

"মেয়েটিকে দেখেই টের পেয়েছিলাম এ বড় কঠিন ঠাঁই। আমাদের চলতি কলাবিদ্যা এখানে চলবে না। তক্ষুণি মাথা খাটিয়ে সিঙ্গাপুরের কলা এনে ফেললাম।"

"সিঙ্গাপুরের কলা? সে আবার কি?"

"সিঙ্গাপুরের আর্টও বলা যায়। আমি সিঙ্গাপুরী বনে গেলাম—তক্ষুণি তক্ষুণি। সিঙ্গাপুরের প্রবাসী বাঙালী, যুদ্ধের বন্যায় ভেসে এসেছি—ভালো করে' বাংলা বল্‌তেও পারিনে। এই ভূমিকা নিয়ে পেল্লায় এক নমস্কার ঠুকে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলাম। বল্‌লাম, 'আমাকে মাপ করিবেন, আমি কলিকাতা উত্তমরূপে পরিচিত না। বিপদে ভয়ানক পড়েছি।' শুনে মেয়েটি থম্‌কে দাঁড়ালো। সেই সুযোগে আমার সিঙ্গাপুরের ব্যাপার ফাঁস করে' আমি বল্‌লাম, 'কলিকাতার আপনাদের মনুমেণ্ট সেই বিখ্যাত কোথায় আমাকে বলবেন?'

"কী বল্‌লো সে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কী আর বলবে! মনুমেণ্ট্ অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেখিয়ে দিল। এজন্য বিশেষ তাকে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু তারপর আমি ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ল দেখতে চাইলাম—'অবশ্যই তার যদি কোনো কাজ ক্ষতি কিম্বা অসুবিধাজনক না করতে হয়।' সে বল্‌লে, এমন কি আর অসুবিধা, বিদেশী বাঙালীকে সাহায্য করা তো বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব, তাকে কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ দিতে আমরা দুজনে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়লের দিকে রওনা দিলাম।"

"সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এখানে বসে বসেই।" আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করি।

"মেয়েটি আমার প্রতি দয়ালু হয়ে মেমরিয়ল ছাড়াও অনেক কিছু দেখালো। মোহনবাগান ক্লাব, ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, মিউজিয়ম্—মেট্রোসিনেমা। মেট্রো দেখবার পর ভদ্রতার খাতিরে, সিনেমাটা আমিই ওকে দেখালাম। না দেখালে ভালো দেখাতো না! কিন্তু সিনেমাতে গিয়েই বাধলো বিপদ।"

"কী—কী বিপদ?"

"সিনেমার গোলমালে গুলিয়ে আমার সিঙ্গাপুরী খোলস খুলে পড়েছিল—কখন্ যে, তা টের পাইনি। সহজ বাঙালীর মতই কথাবার্ত্তা কইছিলাম। কিন্তু যাই বলো, অতসীর মতো মেয়ে আর হয় না। ধরা পড়ে গেছি দেখেও সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরল না। আমার ত্রুটি-স্বীকারের আগেই অকাতরে আমায় মার্জ্জনা করে' দিলো। যেমন চেহারায় তেমনি ব্যবহারে—এমন চমৎকার মেয়ে আমি দেখিনি। দাও দিকি টাকা দশটা।"

মাখন যেন ঘোড়ায় জীন্ দিয়ে চলে গেল। পকেটের দিকে হাল্‌কা করে' গেলেও মনের দিকটা সে বেশ ভারী করে' গেছল। এই বিপুল জগতে নিজেকে একান্তই বিরল বোধ করছিলাম। অবিরল বিরলতার বিড়ম্বনা! এই দুঃসহ বোধ নিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে আমার অক্ষুণ্ণ ফ্ল্যাট

থেকে বেরুলাম—বেরিয়ে পড়লাম বিরাট লোকারণ্যের অন্তরালে। যে এক-কে পেলে এই জনসঙ্কুল শূন্যতা এই মুহূর্তেই অপরিমেয় হয়ে উঠতে পারে সেই একদা কবে আসবে আমার জীবনে?

উজলা এড়িয়ে হাজরা রোড পেরিয়ে চলেছি—দূর থেকেই দেখলাম মেয়েটিকে। কলেজ থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছিল। পার্কের ধার ঘেঁষে।

এর আগেও দেখেছি মেয়েটিকে। দূরে দূরেই দেখা—নিতান্তই একতরফা। একজনেরই একচোখোপনা, বলতে গেলে। কখনো কাছে যাবার সাহস হয়নি। আজ কিন্তু নির্ভয়েই এগিয়ে গেলাম।

"নৌমোস্কার্।" আমি বললাম: "মাপ করিবেন। একটা জিজ্ঞাসা কথা করি।"

মেয়েটি অবাক হয়ে দাঁড়াল—"কী বলুন।"

"কলিকাতার ভিক্টোরিয়াল্ মেমরিয়াল্ বিখ্যাত খুব শুনেছি।" আমি বল্লাম: "সে কোথায়?"

প্রশ্ন তো করলাম, কিন্তু কোন্ কৌশলে নিজেকে সিঙ্গাপুরের আমদানি বলে' জানিয়ে বাঙালী মাত্রেরই কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত হবো সেই কথাই ভাবছি. মেয়েটি তাকালো আমার দিকে। ভয় হলো, রবীন্দ্রনাথ আউড়ে 'হতাশ পথিক, সে যে আমি—সেই আমি।' না হয়তো বলে' বসে।

অবশ্যি, বল্লেও কোনো ভুল হোতো না। নিখিল রাণী এবং বিজয়িনীদের প্রতিনিধির মতই সে। 'আমিই memo এবং আমিই real,' বলাটা তার পক্ষে কিছুমাত্র অত্যুক্তি ছিল না।

কিন্তু মেয়েটি কিছু না বলে' শুধু তাকালো।

দেখলাম তার চোখের তারা কালো। আর কী কোমল তার চাউনি!

"সে তো অনেক দূর। এখান থেকে তো দেখানো যায় না। তবে আপনি যদি হাইকোর্ট দেখতে চান—"

"নিস্চোয়। যদি দয়া করেন আমাকে দেখাতে।" সবিনয়ে আমি বললাম।

মেয়েটি কিছু বলল না। শুধু একটুখানি হাসলো। আর কী মিষ্টি যে সেই হাসি কি বলবো!

আমাকে নিয়ে সে চললো—হাইকোর্টের দিকেই বলতে হয়। কিন্তু হাইকোর্ট লক্ষ্য হলেও পথের অন্যান্য উপলক্ষের প্রতিও তার বেশ ঝোঁক রয়েছে দেখা গেল।

কয়েক পা এগুতেই প্রস্তর-খচিত এক অট্টালিকা পড়ল বাঁ ধারে। প্রায় ঐশ্বর্য্যের মতই বলা উচিত।

"এই হচ্ছে আমাদের আশুতোষ কলেজ।" মধুর স্বরে সে জানালো। আহা, তার কণ্ঠস্বরে কী মাধুরী!

আমার দুই চোখ ভরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কলেজের রূপসুধা পান করলাম। যতক্ষণ সম্ভব এবং যতটা পারা গেল। তার পরে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে' জানালাম—"বেশ কোলেজ। বেশ ভালো কোলেজ।"

আমাদের সিঙ্গাপুরে এরকম নেই, সেই ফাঁকে এই কথাও বলে' এতক্ষণ পরে একটুখানি শিঙা ফোঁকার সুযোগ নিতে যাবো, এমন সময়ে সে অদূরবর্ত্তী আরেকটা বাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পায় পায় এগিয়ে আমরা বাড়ীটার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। লাল ইঁটের বানানো বিচ্ছিরি চেহারার কাঠখোট্টা এক বাড়ী—প্রথম দর্শনেই মনের মধ্যে বিভীষিকা জাগায়।

"এই হচ্ছে ভবানীপুরের থানা।"

আমার খটকা লাগে। থানা কেন? এত জায়গা থাকতে হঠাৎ ভবানীপুরের থানা?

পটীয়সী বিদ্যা অঘটন-ঘটন বলে' শোনা ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতালব্ধ বাণী, অবিশ্বাস করার কিছু নেই। শোনার জিনিস বাণী দিয়েই বানানো হয়—ওস্তাদ্ লোকেরা বানিয়ে থাকেন—অপরের কানের উদ্দেশেই। যদিও পরের শোনায় কান দেয়ার বিপদ আছে, কান নিয়ে, এমন কি, প্রাণ নিয়েও টানাটানি ঘটতে পারে—কিন্তু কান না দিয়েই বা রেহাই কি?

অবশ্যি, শোনা জিনিসের কতটা খাঁটি আর কতখানি খাদ তা পরীক্ষাসহ। খাদের শিক্ষা আবার উপর উপর দেখে ঠিক হয় না, তলিয়ে গিয়ে ঠেকে শিখতে হয়। আমি কি তবে সেই অতলস্পর্শী-সম্ভাবনার সামনেই এসে দাঁড়িয়ে নাকি? বলা বাহুল্য, আমার গতি মন্দীভূত হয়ে আসে।

"বেশ থানা! বেশ ভালো থানা।" যতোটা পারি, গদ্গদ হয়েই প্রকাশ করি তথাপি।

"এবং ঐ যে! থানার সামনে দাঁড়িয়ে—" লম্বা চৌড়া বিরাটকায় পাহারোলাটাই এবার তার দৃষ্টান্তস্থল বোঝা যায়—"ও হচ্ছে এক পাহারোলা।"

"বাঃ। আপনাদের পাহারোলারা বেশ ভালো। বেশ দেখতে। কেমন লাল পাগ্ড়ি।" অভিভূত হয়ে আমি বলি। যদিও, বলতে আমার কথা বাধে। বাধ বাধ গলাতেই বলতে হয়।

দেখতে দেখতে ওর কোমল দৃষ্টি কঠিন হয়ে আসে। মিষ্টি হাসি মিলিয়ে যায়। কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে ওঠে।

"এখন শুনুন! এক, দুই, তিন—এই গুণ্তে না গুণ্তে যদি না আপনি আমার সামনে থেকে কেটে পড়েন তো এক্ষুণি আমি আপনাকে—আমার পিছু নিয়েছেন বলে—ওই পাহারোলার জিম্মা করে দেব।"

মেয়েটি এক গুণ্বার আগেই আমি কেটে পড়েছি। এক ছুটে আমার ফ্ল্যাটে এসে একেবারে ফ্ল্যাট!
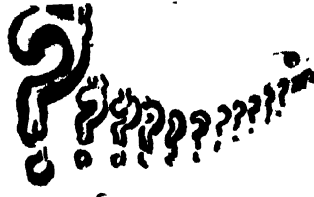
বিমলচন্দ্র ঘোষ

অগ্নিবর্ণ সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়ে
একটি অজেয় প্রশ্ন :
একটি তরুণ দৃপ্ত শাণিত জিজ্ঞাসা
উচ্চারিত মেঘমন্দ্র কোটি কণ্ঠে আজ
হতভাগা মানুষের :
কোন্ সত্যে দীক্ষা নেবো ?
কোন্ সে উজ্জ্বল সুস্থ পথ—
আমাদের নব-জীবনের ?

সাম্প্রতিক প্রশ্ন ওঠে :
হে সত্যার্থী, হে মহেশ, ওগো সিদ্ধকাম,
তোমার অসহযোগী অহিংস সংগ্রাম
কী করুণ পরিণাম !
পদে পদে ব্যর্থতার উত্তুঙ্গ শিখরে
মুক্তি-স্বপ্ন ছিন্ন তাই নিৰ্জ্জীব নখরে।
বাংলায় পাঞ্জাবে মারাঠায়
অজেয় তরুণ দল কৃপাণ শাণায়
নিভৃতে নির্জ্জনে যুগে যুগে।
আজ তারা রক্তশূন্য অহিংসায় ভুগে
মুক্তিপথে ব্যর্থকাম
অট্টহাসি হাসে তাই স্কন্ধকাটা নিরস্ত্র সংগ্রাম !

ক্ষোভের জিজ্ঞাসা ওঠে :
হে পবিত্র সত্যাগ্রহী, ওগো পূজ্যপাদ,
পেয়েছ কি বিধাতার নিগূঢ় নূতন আশীর্ব্বাদ
স্বাধীনতা-সংগ্রামের বার বার ব্যর্থ আন্দোলনে ?
বৈশ্য ষড়যন্ত্রে আজ অভিনব আত্মসমর্পণে
এ কোন্ অদ্ভুত স্বাধীনতা ?
চাপাও দেশের স্কন্ধে করুণ শঠতা,
বণিকের স্বার্থরক্ষাপণে
দুর্দ্দিনের অগ্নিময় যুগ-সন্ধিক্ষণে ?

আরো প্রশ্ন আছে শোনো হে সত্য-সারথি :
মিথ্যার কলঙ্ক দিয়ে আরো কত কাল
বলো বলো আরো কত কাল
ব্রহ্মচারী যৌবনের লাঞ্ছনার প্রশ্রয় জোগাবে ??
তোমার স্নেহের শিষ্যদল
পবিত্র সংযমী যতো অহিংস সাধক
ফুৎকারে নিবাতে চায় যৌবনের জ্বলন্ত পাবক
প্রচারের ভেরি, তূরী, পটহ, মাদলে
চৌর্য্যলব্ধ ঐশ্বর্যের বলে
অসত্যের জয়গানে আজ তা'রা উন্মত্ত পিশাচ :—
আত্মঘাতী আদর্শের মঞ্চে মঞ্চে নাচে ঘৃণ্য নাচ!
বলো বলো আরো কতকাল
অসত্যে প্রশ্রয় দেবে অহিংসার কৌটিল্য-ভাষণে ?

শেষ প্রশ্ন শোনো সত্যকাম :
একটি উজ্জ্বল প্রশ্ন, জীবন্ত জিজ্ঞাসা
জ্বলে ওঠে রক্তমেঘে বিদ্যুতের উদ্দাম ঝলকে,
লক্ষকোটি হতভাগ্য-হৃদয়ের বাষ্প দিয়ে গড়া
রক্তবর্ণ বিহঙ্গম বিপ্লবের অগ্নিময় ডানা—
দেশে দেশে প্রাণবন্ত অজেয় বিশাল,
তোমায় নেতৃত্ব চায় ভারতের হে-প্রাণ-পুরুষ
তুমি কি দেবে না সাড়া বিপ্লবের বলিষ্ঠ আহ্বানে ?
তোমার বিধাতা যদি তোমারে ঠকায়
ভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশের স্বর্গীয় সঙ্কেতে—
কে তোমায় মুক্তি দেবে ?
হরিজন-মুক্তিপণ ভেসে যাবে ভ্রান্তির বন্যায় ?

* * * *

জিজ্ঞাসা মিলায় শূন্যে চক্রান্তের কালো ধোঁয়া লেগে
অগ্নিদগ্ধ নির্য্যাতিত নরগোষ্ঠী তবু রয় জেগে
স্বাধীনতা! কা'র স্বাধীনতা ?
পরস্পর ম্লানমুখে প্রশ্ন করে বিদ্রোহী জনতা !

সহকর্মী
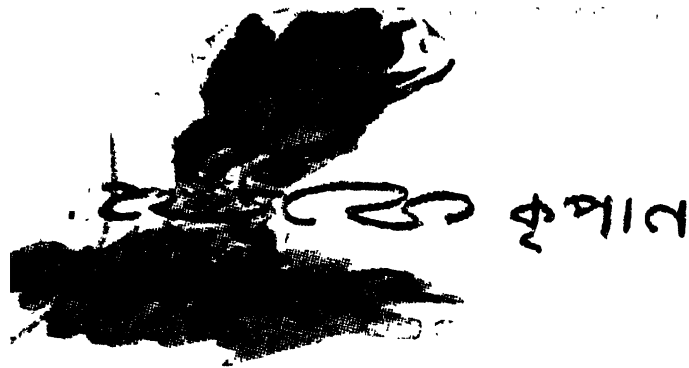
বাংলার চরমপন্থীদের সমর্থিত দেশবন্ধুর নতুন কার্য্য-পদ্ধতিকে চার দিক থেকে এমনি করে বেপরোয়া আক্রমণ করা হতে লাগল। যারা আক্রমণ করছিল, তাদের অধিকাংশের রাজনৈতিক কোন ত্যাগও ছিল না, অথবা কোন কোন স্থলে অতীতের নির্য্যাতন-বুনিয়াদ থাকলেও নতুন সংগ্রামমূলক কর্ম্মপদ্ধতি অনুবর্ত্তন করবার আগ্রহও তাঁদের ছিল না। তকলির আবর্ত্তনে স্বরাজ, কৌপীনে স্বরাজ, ট্রেনের থার্ড ক্লাশে স্বরাজ, আশ্রম বেঁধে প্রভাতে রাম নাম আর সন্ধ্যায় চোখ বুঁজে উপাসনার বক্তৃতায় স্বরাজ—এ সবের ভেতর দিয়ে অনাগত স্বরাজের আভাসে গান্ধীজীর খণ্ডাবতারদের অঙ্গে অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল।

গয়া কংগ্রেসে এরা চিত্তরঞ্জনের C. R. নাম কেড়ে নিয়ে দিল গান্ধীপন্থীদের শুক্রাচার্য্য চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালকে। চৌরীচোরা ও বরদৌলির গণবিক্ষোভে গান্ধীজী যখন চটে গিয়ে ৩১শে ডিসেম্বরের স্বরাজ আনা বন্ধ করে দিলেন, তখন বাংলার সব দেশকর্ম্মীই গান্ধী-আন্দোলনের উপর অন্তরে অন্তরে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এক জন গান্ধী-পন্থী বিশিষ্ট যুব নেতা আলিপুর জেলে বসে দুঃখ করেছিলেন—"চৌরীচোরার মত একটা সামান্য ঘটনার জন্যই যদি ভারত-জোড়া এত বড় একটা বিরাট আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে ভবিষ্যতে এ পথে মুক্তির আশা কোথায়?"

এরা জেলে যাবার সময় দেখে গেছলেন ভারতব্যাপী বিরাট সংগ্রাম-প্রচেষ্টা—সহস্র সহস্র ছাত্র দেশের সেবায় মগ্ন, সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব গণ-সমর্থন ও জন-উদ্দীপনা—সর্ব্বত্র হিন্দু মুসলমানে মিলন। সত্যি কথা বলতে এমন ব্যাপক ও গভীর আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবার জন্য বাংলার বিপ্লবী কর্ম্মীরা গান্ধীজীকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারেননি, ভবিষ্যতে পারবেনও না।

তবে গোষ্ঠীচ্যুত কয়েক জন যুব নেতা—বয়স বেশী হবার জন্যই হউক বা তাঁদের শিরায় শিরায় রজোগুণের প্রবাহ কমতি হয়ে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হবার জন্যেই হোক—সংগ্রাম-আঁচড় এসবে পিউরে উঠতে লাগলেন। সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক কীর্ত্তনীয়াও এসে বাংলার জগাই-মাধাইদের উদ্ধার করবার জন্য শ্রীখোলে চাঁটি দিতে লাগলেন। এ চাঁটি অনেক ক্ষেত্রে অহিংসার সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তাই দেখেছি—'২৩ সালে এদের ধ্বনি হয়ে পড়েছিল—"চিত্তকে ছাপ মারা করম্।"

গয়া কংগ্রেস থেকে দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষ আর বাংলার বিপ্লবী নেতারা অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে যখন ফিরলেন তখন তাঁদের মনে জাগল রাজনৈতিক একটা দৃঢ় সঙ্কল্প—একটা সুদৃঢ় কর্ম্মপদ্ধতি। নতুন দল সংগঠনের ভার পেলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বীরেন শাসমল, সুভাষ, হেমন্ত সরকার, উপেন বাঁড়ুয্যে, কিরণশঙ্কর রায়ের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবাদপত্রে অপপ্রচারের [illegible] করবার জন্য বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করা [illegible]। স্থির হল, বাংলার প্রতি স্থানের প্রত্যেকটি সরকারী, [illegible] জাতীয় এবং অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান বিপ্লবীরা capture [illegible] তোড় জোড় চলতে লাগল। জেল থেকে বেরিয়ে দেশবন্ধু [illegible] প্রচার কাজ করতে বের হলেন। মনে আছে, সে সময় তাঁকে [illegible] বেগই না পেতে হয়েছিল! প্রতি জিলায় কর্ম্মীরা তাঁকে [illegible] প্রাণের কথা অকপটে বলেছিলেন। নেতা সম্বেতে [illegible], আর বাংলার সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মীদের গৌরবে তাঁর বুক দশ হাত [illegible]। এ সব কর্ম্মীর সমর্থনে দেশবন্ধু যখন কংগ্রেসের দিল্লীর [illegible] তাঁর নতুন কর্ম্মধারা পাশ করিয়ে নিলেন, তখন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর, হরদয়াল নাগ, আর জিতেন ব্যানার্জ্জি—অন্তরী, [illegible], মহম্মদ আলির আদালতে চিত্তরঞ্জনকে অভিযুক্ত [illegible] সুবিধে করে উঠতে পারেননি।

বাংলার বিপ্লবী কর্ম্মীরা গান্ধীপন্থী পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের [illegible] কংগ্রেস থেকে যখন দূর করে দিল, তখন এক দিন [illegible] সহচর প্রফুল্ল ঘোষ দুঃখ করে বলেছিলেন—"সুভাষ [illegible] ভুলে গেছে।"

সুভাষকে আমরা একথা বলেছিলাম। শুনে [illegible] ছল করেছিল। তবু তাঁদের পরোক্ষ কর্ম্মক্রিয়াকে সুভাষ [illegible] করতে পারেননি।

দিল্লী কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে দেশবন্ধুর সমর্থক বিপ্লবী যুবনেতারা গ্রেপ্তার হলেন, তিন আইনে। কাজের [illegible], তা অনেকে অনেক রকম আন্দাজ করলেও, স্পষ্ট কিছু বুঝা যায়নি। বিপ্লবী নেতারা এরই মধ্যে যে বাংলা দৈনিক 'স্বদেশ' প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। অপর প্রচারপত্র বারীণের 'বিজলী'ও উঠে গেল। উপেন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি'র (জসাম্যবাদের প্রথম প্রচারক) ভার [illegible] নিলেন।

অন্য দিকে সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মনোমোহন ভট্টাচার্য ইংরেজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশ করবার আয়োজন করতে লাগলেন। সুভাষের এ অদম্য নীরব কর্মশক্তির পরিচয় সেদিন

আমরা পেয়েছি তা ভুলবার নয়। ধর্মতলার হটকুষল ম্যানসানে কেশ র‍্যাক সাজান থেকে আফিস পত্তন সবই তাঁকে সেদিন করতে হয়েছিল। মনোমোহন বাবুকে ম্যানেজারী করতে আর হয়নি, তাঁকেও ওরা ধরে নিয়ে গেছল। 'সার্ভেণ্ট' ভেঙ্গে কর্ম্মীরা এসে যোগ দিল 'ফরওয়ার্ডে'। বাংলার সাংবাদিকতার সে নতুন যুগ। এ যুগের ইতিহাস লিখবেন 'ফরওয়ার্ডে' যুগপ্রবর্ত্তক সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী। এই ক্ষুদ্র মানুষটি, বিরাট প্রাণ আর অনির্ব্বাণ আগুন বুকে নিয়ে দিনের পর দিন লেখনীর মুখে আর হরফের ছাপে ছাপে যে বৈদ্যুতিক বন্যা পরিবেশন করে গেছেন, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সাফল্যের মূলে তা নিশ্চয় অপরিহার্য্য হয়েছিল।

প্রচার ও শিক্ষাদানের দিকটাই বরাবর সুভাষচন্দ্রের পছন্দসই ছিল। এই দুই বিভাগে নীরবে সংগঠন কাজ যেমন করা যায়, তেমনি ভাবী প্রচেষ্টার জন্য কর্ম্মী সংগ্রহেরও সুবিধা হয়। যখন সুভাষ এসে হঠাৎ ২২ সালের কর্ম্মপ্লাবনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তখন রাজনৈতিক প্রধান যুব-নেতারা—কেউ কেউ খালাস হয়েছেন কিন্তু বেশীর ভাগ নেতা কেউ আন্দামানে, কেউ দীর্ঘ মিয়াদী কারা-ক্লেশ ভোগ করছেন। বাইরে তাঁদের তৈরী যুবকরা কংগ্রেস আন্দোলন আপনাদের কাজে প্রয়োগ করতে ব্যস্ত—ঢাক-ঢোল পিটে নয়—নীরবে। তরুণ সুভাষের সঙ্গে এ সব পাকা সংগঠকদের সাক্ষাৎ পরিচয় তখন খুব বেশী হয়নি। ২২ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এ সব বিপ্লবী নায়করা দেশবন্ধুকে নিয়ে যখন বেঙ্গল নন-কো-অপারেশন ভলান্টিয়ার কোর, কংগ্রেস কমিটী কোর, সেণ্ট্রাল মহমেডান ভলাণ্টিয়ার কোর গড়িয়ে নিয়ে নিজেরা কুম্ভবৃত্তি অবলম্বন করলেন, সুভাষ তখন তাঁদের হয়ে প্রচার কাজের ভার নিয়েছিলেন। নতুন সংশোধিত ফৌজদারী আইনে তখন নেতা ও কর্ম্মীরা নির্ব্বিচারে ধরা পড়ছে—সাজা পাচ্ছে আর জেলগুলোতে চাঁদের হাট বসাচ্ছে। এদের প্রচার-সচিব হিসাবেই দেশবন্ধুর সই করা একখানা নোটিশ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের ও গ্রেপ্তারের বিবরণ সম্বলিত এক চিঠি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আফিসে সুভাষ পাঠিয়েছিলেন। ফলে সুইনহোর এজলাসে তাঁকে অভিযুক্ত করলেন পাবলিক প্রসিকিউটার তারক সাধু। জেলে হ'ল বিচার। দণ্ড হ'ল ছ'মাস বিনাশ্রম কারাবাস। সুভাষ রায় শুনে হেসে বললেন—"মাত্র ছ'মাস"—কি লজ্জার কথা!

আলিপুর জেলে তখন বাংলার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কর্ম্মীরা—রাজাবাজার বোমার মামলায় অমৃত হাজরা (১৯১৬, ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ বছর নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত), প্রাগপুর মামলায় আশু লাহিড়ী (১৫ সালের ২০শে নভেম্বর—১০ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত), বরিশাল সাপ্লিমেণ্টারী ষড়যন্ত্র মামলায় ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও মদনমোহন ভৌমিক (১০ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত), শিবপুর ডাকাতি মামলার নরেন ঘোষ চৌধুরী, অনুকূল চট্টোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন বসু ও ভূপেন্দ্র ঘোষ (১৯১৬, ১৫ই ফেব্রুয়ারী যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত), ১৯১৬, মল হাঙ্গামায় যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনে দণ্ডিত যতীন নন্দী ও মহেন্দ্র দাস, ১৯১৭ ঢাকা গুলী মারার মামলায় ১২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত প্রফুল্লরঞ্জন রায়, গৌহাটী গুলী মারার মামলায় ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শালকিয়া ডাকাতি মামলায় ১৪ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত মোহিনীমোহন ঘোষ, ৮ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত পাঞ্জাবী হরদয়াল সিং—এ রকম ২০।২২ জন বাছা বাছা কর্ম্মী। দেশবন্ধু সুভাষ প্রভৃতি অসহযোগী দেশভক্তরা দলে দলে জেলে আসছেন একথা এই নীরব বিপ্লবীরা তাঁদের সলিটারী ব্যোমকেশী সেলগুলোতে বসে বসে শুনতো মেট ওয়ার্ডারদের কাছে, আর মধ্য রাত্রে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে আপনাদের মধ্যে আলোচনা করত। বাইরের দুনিয়া—আকাশ, বাতাস, আপন জন—যে দেশের জন্য তাদের জান কবুল করা—সেই দেশ যেমন তাদের দেহের চোখের কাছে বন্ধ তেমন বন্ধ এই বাইরের হৈ হৈ জাগরণ। নতুন আন্দোলন, নতুন কর্ম্মী, নতুন নেতা স্বেচ্ছায় দলে দলে আনন্দ করতে করতে দশে মিলে জেলে আসা—জেলে এসে বিপুল বেদনায় অন্তর্ম্মুখী না হয়ে, আনন্দ উৎসব কলরবে কারাগার মাৎ করে দেওয়া। নিষিদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে খোঁজ রাখবার ফুরসৎ কেউ না পেলেও, দেশবন্ধু সুভাষ, হেমন্ত এদের খোঁজ নিতেন। ওদের অদম্য অপ্রতিরোধ্য নীরব প্রভাব ও দুর্জ্জয় ব্যক্তিত্ব গভীর রাতে আলিপুর বন্দিশালাকে থমথমে করে দিত। ওরা আলোচনা করত আপন বিপ্লবী-গোষ্ঠীর মধ্যে—কান পেতে তাই শুনতো বারোয়ারী আন্দোলনের বোষ্টম দেশভক্তরা। তাদের গাঁ ছম ছম করত। তারা বিদ্রূপ করতে সাহস পেত না। ওদের পিঞ্জরের তালাগুলো মাঝে মাঝে খটাখট করে বেজে উঠত—সাধারণ কয়েদীরা ১।২।৩।৪ করে নম্বর শুনতো—নিশাচর ওয়ার্ডার হাঁকত—সব ঠিক হায়—তার পর ব্যোমকেশী বন্দির জরা তাদের মুলতুবী নৈশ আলোচনা আবার চালিয়ে যেত। দেশবন্ধু শুনে গম্ভীর হয়ে যেতেন। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর কেঁদে ফেলতেন। সুভাষ ছটফট করত।

২৩ সালে দেশবন্ধু যখন বিপ্লবী স্বরাজ্যদলের প্রচারপত্র 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশের জন্য আয়োজন করলেন, তখন সে ভার সুভাষচন্দ্র সানন্দে গ্রহণ করলেও কার-প্রাচীরের অন্তরালে মাত্র না—ভারত থেকে নির্ব্বাসিত দেশভক্তদের কথা ভুলতে পারেননি। 'স্বদেশ', 'বিজলী' 'আত্মশক্তি' আর 'বাংলার কথার' সঙ্গে এ সব বন্দীদের যেমন সম্পূর্ণ যোগ ছিল, 'ফরওয়ার্ড' দৈনিক পত্রের সঙ্গেও এদের যোগ তার চাইতে ঢের বেশী ছিল।

সুভাষের সঙ্গে বারো বছর

(১৯১২—২৪)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে যাওয়ার আগে সুরেশদা, যুগলদা, গুরুদাসদা, সুভাষ ও আমি নবদ্বীপ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে ...দের এক ঠাকুরবাড়ীতে উঠলাম। নাদুস-নুদুস বাবাজী মশায়ের ... সেবাদাসী ছিল। খাওয়ার সময় তরুণী সেবাদাসীটি আমায় ... জ্বলে উঠলেন এবং বললেন—'ধর্মের নামে বাড়ী-ঘর ছেড়ে ...নে এসে বুঝি বেশ্যাগিরি করা হচ্ছে!' বাবাজী কাছেই ছিলেন, ... আগুন হ'লেন! ফলে আহার শেষেই সেখান হতে বিদায় ...তে হলো।

সন্ধ্যার পর নৌকায় কৃষ্ণনগর ফিরবার পথে উজান স্রোতে ...দের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মাঝিটি আনাড়ি হওয়ায় ...দা হাল ধরলেন, আর যুগলদা, সুভাষ ও আমি গুণ টানতে ...লাম। আগের অভ্যাস থাকায় সুরেশদা'র হাল ধরতে কোনও ... হয়নি। কিন্তু সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয়েছিল সুভাষের। ...লোকের ছেলে, সোনার চাঁদের মত চেহারা, ছোটকাল অবধি ...-আহ্লাদের মাঝে লালিত-পালিত, দুঃখের আঁচড় গায়ে লাগে ...ই যে কখনো।" সুভাষকে নিবৃত্ত হ'তে বললেও সে কথা ...সেনি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর সময়টা নষ্ট না করে কৃষ্ণনগর শ্রমজীবি-...-বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হ'য়েছিলাম। কলিকাতা থেকে ...ক শৈলেন ঘোষ এসে এই কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ...ছিলেন। ইনি পরে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং ... বৎসর পরে ফিরে এসে কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-সচিব ...ছিলেন। এখন ইনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষের ...রূ আছেন।

আমাদের নৈশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে সুভাষ মধ্যে মধ্যে ... যোগ দিত। জুলাই মাসে কলেজ খুললে সুভাষ প্রেসিডেন্সি ...লেজে ভর্তি হ'ল। ম্যাট্রিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে মাসিক ...৲ টাকা বৃত্তি পেলেও, কটকে না পড়ায় জন্য সে ঐ বৃত্তি থেকে ...ত হ'ল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি ...। লজিক, সংস্কৃত ও অঙ্ক তার optional subject ছিল। ...ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম— ... দলের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগরের কাজ করার জন্য আমাকে ...নগর কলেজেই ভর্তি হ'তে হ'ল। নীলমণি সেনগুপ্ত ব'লে ...-প্রবাসী একজন সহপাঠীকে সুভাষচন্দ্র কৃষ্ণনগরে পাঠালো। ...মণি টিউসন করতো এবং সুভাষচন্দ্র নিজের স্কলারসিপের ... থেকে তাকে সাহায্য করতো। নীলমণি পরে বি-এস-সি ... ক'রে দৌলতপুর কলেজে ডিমনস্ট্রেটর হয়। অরবিন্দ মুখার্জি ... আর একজন সহপাঠী আমাদের দলে এই সময়ে কৃষ্ণনগরে ... হয়। অরবিন্দ পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাপ্তাহিক 'বাংলার ...' প্রিণ্টার ও পাবলিসাররূপে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত ... আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দেশবন্ধু, সুভাষ ও আমার সঙ্গে ... অরবিন্দ এখন বিহারে বেতিয়ার একটি ইস্কুলে ...রী করছে।

কৃষ্ণনগরে আমরা শুক অঞ্জনা নদীর ধারে রোজ বিকেলে সমবেত হতাম। ধর্মচর্চা, রাজনীতি আলোচনা হ'ত। কলকাতা থেকে এসে সুরেশচন্দ্র, সুভাষ প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত ও হেমচন্দ্র সরকার আমাদের কাজে সহায়তা করতেন। পরে যুগলদা'কে যখন বিলাত পাঠানো হয়, তখন এঁরা দু'জনেই অর্থসাহায্য করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে সুভাষচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যাপকগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হ'য়েছিল এবং কলেজের ম্যাগাজিন, ডিবেটিং ক্লাব এবং poor fund প্রভৃতি সংগঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের হাওয়া বদলে যায়। অধিকাংশ ছেলেই বড়-ঘরের। সুভাষচন্দ্রের সাদাসিধা পোষাক, আদর্শ জীবন, পরোপকার বৃত্তি প্রভৃতি ছাত্রগণের মনোহরণ করেছিল। ৩৮।২নং এলগিন রোডের বাড়ী থেকে ট্রাম-লাইন ৫।৬ মিনিটের পথ। কলেজ যাওয়ার জন্যে পকেটে যে ট্রাম-ভাড়া নিয়ে সুভাষ বেরুতো তা ঐ রাস্তাটুকুর ভিতর অনেক সময় ভিখারীদের দিতেই ফুরিয়ে যেতো। হেঁটেই সুভাষকে কোনও কোনও দিন ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সি কালেজে যেতে হ'ত। এর ফলে ক্লাসে লেট্ হ'ত। কিন্তু সহৃদয় অধ্যাপকরা সে জন্য তাকে কিছু বলতেন না এবং present মার্ক ক'রে রাখতেন! কেবল এক দিন প্রোফেসর ষ্টার্লিং present করতে চাননি। সুভাষ ক্লাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় ষ্টার্লিং বললেন "আমার বিনানুমতিতে যেতে পাবে না।" সুভাষ তখন অনুমতি নিয়ে ক্লাসের বাইরে চ'লে গেল।

কলেজের ছুটির পর সুভাষ ৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট অথবা আমার কাছে অনেক সময় কৃষ্ণনগর চ'লে আসতো। আবার হয়তো পরদিন সকালে ওখান থেকে কলেজে আসতো। ৩নং মির্জাপুরের দল তখন বেশ ভারী হ'য়ে উঠেছে। কটক-কেন্দ্র থেকে গিরিশ ব্যানার্জি, নৃপেন বসু, বিধু রায়, অন্নদা চৌধুরী, শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে আসতেন। ঢাকা-কেন্দ্র থেকে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ যোগ দিয়েছিলেন। আর কলকাতায় শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র, ভূপেন দাসগুপ্ত, হেমেন ঘোষ, দেবেন বাঁড়ুয্যে, প্রমথ সরকার, ধীরেন চক্রবর্তী, সুধীন রায়, অজিত ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। কৃষ্ণনগর থেকে আমি, হেমেন্দু সেন প্রভৃতি আসতাম। শ্রীযুক্ত জীবনরতন ধরও ৩নং মির্জাপুর থেকে মেডিকেল কলেজে পড়তেন। তাঁর ভ্রাতা নীলরতন ধর ১১০নং কলেজ ষ্ট্রীটের একটা মেসে থাকতেন। সেখানে শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি প্রভৃতি ডাঃ পি, সি, রায়ের মেধাবী ছাত্রগণ থাকতেন। এঁদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করতাম। এই মেসে বিপ্লবী-নেতা যতীন মুখুয্যে মাঝে মাঝে আসতেন—তাঁর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছিল। এ ছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দু হোষ্টেলেও আমাদের কয়েক জন থাকতেন। সেখানে বহু ছাত্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় ঘোষ, যোগেন সাহা, শশাঙ্ক মুখুয্যে, শৈলেন ঘোষ, মণিলাল সান্যাল, মন্মথমোহন ভট্টাচার্য—এঁদের অন্যতম।

এই সময়টা স্বদেশী ডাকাতির যুগ। হিন্দু হোষ্টেলে এবং ওয়ার্ডে ছোট ছোট কুটুরি ছিল—এখানে রিভলবার প্র্যাকটিস্‌ চলতো। একদিন সুভাষ ও আমি ওখানে থাকতে থাকতে পুলিশ-সার্চ হ'য়ে গেল। ফাঁড়া ভালয় ভালয় কেটে গেল।

আমরা মাঝে মাঝে বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে যেতাম। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা রাজনীতির প্রশ্রয় দিতেন না। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী-মূলে সুভাষ গিয়ে বসতো। একদিন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে সে ডুবে গিয়েছিল—প্রফুল্লদা তাকে উদ্ধার করেন। সুভাষ সাঁতার জানতো না। কৃষ্ণনগরে গিয়ে জলঙ্গী নদীতে নাইতে নাইতে আমার কাছে একটু একটু সাঁতার দেওয়া শিখেছিল।

কৃষ্ণনগর থেকে একদিন সুভাষ, অরবিন্দ, ধীরেন মণ্ডল ও আমি চললাম বার্গাচড়া গ্রামে। আমাদের সঙ্গে একজন মুসলমান সহপাঠী ছিল। তার নাম দেওয়া হ'ল 'বঙ্কিম'। শান্তিপুরের নিকট বার্গাচড়া আমার পৈতৃক বাসস্থান। এই গ্রামে আলিপুর বোমার মামলার আসামী নিরাপদ রায় ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ ও তাঁর ভাই স্বামী বাসুদেবানন্দ জন্মেছিলেন। নিরাপদদা দশ বছর দ্বীপান্তর বাস ক'রে তখন গ্রামে ফিরে এসে তাঁত নিয়ে বসেছেন। গৌরবর্ণ রং, ছোট্ট-খাট্টা মানুষটি পরণে গেরুয়া ছোপানো ধুতি, গলায় সাদা ধবধবে পৈতাগাছি, মুখে হাসি লেগেই আছে, এই সাধকের সামনে গিয়ে আমরা প্রণাম করলাম। সুভাষের পরিচয় পেয়ে নিরাপদদা খুব খুশী হ'লেন এবং প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করলেন, যাতে আমরা বড় হ'য়ে দেশের কাজ করি এবং গ্রামকে না ভুলি। কিছু দিন পরে নিরাপদদা নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। এই নীরব সাধকের আশীর্ব্বাদ ও কথাগুলি চিরদিনের জন্য আমাদের মনে ছাপ দিয়ে যায়।

কিছুদিন পরে ইন্দ্রদাস বাবাজী নামে উদাসী শিখ-সম্প্রদায়ের এক তরুণ সন্ন্যাসী কৃষ্ণনগরে এলেন। ইনি নদীর ধারে ধুনি জ্বেলে ব'সে থাকতেন। বৃষ্টি এলে মাথায় একটা হাঁড়ি দিয়ে থাকতেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সমানভাবে আকাশতলে ব'সে কাটাতেন। ইনি হঠযোগী ছিলেন। ভোর রাতে ৪টার সময় নদীতে নাইতে গিয়ে "নেতি-ধৌতি" করতেন। মেয়েরা বাবাজীকে ফল-মূল-দুধ উপহার দিতেন। অনেক ভক্তও জুটেছিল। কেউ কোনও ওষুধ চাইলে ইন্দ্রদাস বাঁশের ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করতেন এবং বলতেন—"ভাগো হিয়াসে, মার ডাণ্ডাসে পিট দেগা। বাবাজী ডাক্তার হ্যায়?" এই তরুণ সন্ন্যাসীটির নিকট সুভাষ ও আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাদিগকে খুবই ভালবাসতেন। কয়েক মাস পরে বললেন—"তোমাদের উপর আমার এমন মায়া ব'সে গেছে যে সন্ন্যাসীর পক্ষে তা বিপজ্জনক।" হঠাৎ একদিন বাবাজী উধাও হ'লেন। তারপর প্রয়াগের কুম্ভ মেলা থেকে আমাদের একখান চিঠি লিখেছিলেন। সুভাষের ও আমার প্রয়াগ যাওয়ার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু নানা কারণে ঘটেনি। ইন্দ্রদাস ইতিপূর্ব্বে নানক শরণদাস বাবাজী নামে আলিপুরনিবাসী আর একজন শিখ-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেন। নানক শরণ বাবাজীর কাছে আমরা মধ্যে মধ্যে যেতাম।

কোনো ইনটেলেক্‌চ্যুয়াল মেয়ের প্রতি

অমল ঘোষ

জোনাথন্‌ সুইফট্‌
গালিভারকে দিলেন যেখানে লিফট্‌,
সেখানকার প্রফিট্‌
কোন ব্যাঙ্কে রেখেছ জমা,
হে মনোরমা?
কাটাচ্ছি দিন এখন চ্যারিটিতে
সুপারম্যানের সুপিরিওরিটিতে কাজ নেই,
নেহাৎই কংক্রীট
বলব না তাই কোনো দিনই
"আই য়্যাম্‌ ডায়িং ইজিপ্ট"
আমায় কর ক্ষমা।

জানি কায়েন্টের দেশের যক্ষ
তোমার লক্ষ্য,
তাই ক্ষণিক সখ্যও কি গো সইবে না?
হায়, বাঁশীর ডাকে কি রাধা কোনো দিনই ঘরে রইবে না।
তবে সে যমুনা প্রেমের আস্তানা নয়
এই যা' বিস্ময় বা বিশ্বাস,
যেখানে বোধির বিদ্যুতে জ্বলে রাত্রির প্রান্তে
বোধিদ্রুমের অশ্বত্থ নিশ্বাস।
কিন্তু তোমার মাথায় তো সেই সিন্দুর,
সতী নারীর যা' ছাড়পত্র,
পারের কড়ি যা' শত হিন্দুর।
তা'হলে কেমন করে যাবে তুমি সেই দেশে,
একলা ভেসে ভেসে,
কায় ক্লেশে?

তোমার তো নয় প্রকাণ্ড
বোধিভাণ্ড।
যা' চালায়
জোনাথন্‌ সুইফট, বা গালিভারকে পরম জ্বালায়।
অতএব ওগো বুলবুলি,
ঝোটন বাঁধা ছোট্ট তোমার খুলি
একটু রাখো তুলি
নয়ন তাকিয়াতে;
তাকিয়ে দেখ গান ধরেছে সবুজ ডালে দোয়েল পাপিয়াতে,
ঝরঝরিয়ে ঝরছে রাঙা আলো
এই জগতের মানুষেরে একটু বেসো ভালো

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আইভি লতা :

মিগুকে লতা।
ঘুরে ঘুরে ওঠে
আমারই জানলা বেয়ে।
নিষ্ঠুর আমি,
দিয়েছি কেটে তার উদ্ধত গতিকে
অনেকবার,
তাও আঙুল বাড়িয়ে দেয় নিঃসঙ্কোচে
আমার দিকে।
লোক চিনেছে, সে!
আমার স্বভাব,
কাকেও ঘিরে লতিয়ে ওঠা॥

দুপুর :

তীক্ষ্ণ দুপুর।
চীলের স্বরের মত
কানে এসে লাগে
উজ্জ্বল স্তব্ধতা।
একটা গাছেও
নড়ছে না কোনো পাতা।
ইজি-চেয়ারের কোলের ওপর মাথাটি রেখে,
ভাবছি,
যে দিন ভাবতে শিখেছি দুপুর দেখে॥

দীপা :

কালো দীঘির পাড়ে.
গ্রামের চেনা মেয়ে
মেঘ-ডুম্বুর শাড়ী পরে
দুলে দুলে চলছে আপন মনে।
আমি কাছে এসে বলি :
কেমন আছো দীপা?
ওমনি হঠাৎ ডালিম ফুলের মত
লজ্জায় রাঙা হয়ে
পালিয়ে যাবার আগে—
আঁচল থেকে বকুল ফুলের মালাখানি
দিল ছুঁড়ে আমারি গায়ে—
এমন লাজুক মেয়ে॥

অবরোধ
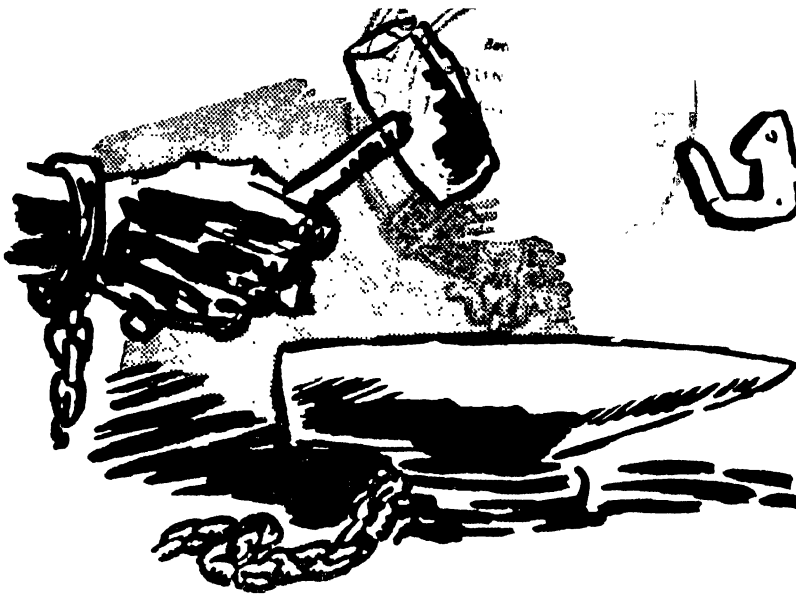
শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য

লোহার গেটের ডান দিকটা দেওয়ালের কাছে একটা কাঠের টুলের ওপর ব'সে ঝিমোচ্ছে বুড়ো দরোয়ান—গজানন। মাথার ওপরকার আলোটা গোল হ'য়ে এসে প'ড়েছে গজাননকে কেন্দ্র ক'রে। শূন্যে ঝুলন্ত আলোটাকে ঘিরে উড়ছে এক ঝাঁক দেয়ালী পোকা।···গজাননের ডান দিকে লিফ্‌ট। লিফ্‌ট-এর ডাইনে পাক দিয়ে উঠে গেছে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি।···অস্পষ্ট আলোয় গোটা দৃশ্যটাই দেখাচ্ছে খোদাই করা উড্‌কাঠের আলো-আঁধারির ছবির মত ছম্‌ছমে।···সামনে টানা চওড়া বারান্দার ওপর দিয়ে বন্দুক ঘাড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে মহাবীর—সান্ত্রী; ভূতের মত নড়ছে চড়ছে জুতো ঘ'সটে ঘ'সটে আর হঠাৎ থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছে অদৃশ্য শত্রুকে তাগ্‌ ক'রে—আবার চ'লছে জুতো ঘ'সটে! ঘুরতে ঘুরতে লোহার গেটটার গায়ে হাত রেখে দাঁড়াতেই গেটটা যান্ত্রিক শব্দে কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ শব্দ ক'রে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় বুড়ো দারোয়ান গজাননের—কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ শব্দটা সে কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারে না।

গজানন। চুহা বা!

মহাবীর। হুক্ক হোলা!

মুখে গাঁই গুঁই আর চাপ্‌ চুপ্‌ শব্দ ক'রতে ক'রতে ঝিমোতে থাকে গজানন।···মহাবীর জানে বুড়ো গজাননের এই দুর্ব্বলতা, তাই দুষ্টুমি ক'রে সে আবার গেটটা নাড়তে থাকে।···টনক নড়ে যায় বৃদ্ধের। প্যাট প্যাট করে বুড়ো মহাবীরকে একটু লক্ষ্য করে—এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে; তারপর একটু পরে আবার ঝিমোতে থাকে। কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ শব্দের কিন্তু বিরাম নেই—এবার একটু জোরেই আরম্ভ করেছে মহাবীর। ঘুম ভেঙে যায় আবার বুড়োর। নাটা নাটা দু'টো চোখ তাকিয়ে সে ঠিক কোনখানে শব্দটা হচ্ছে সেটা আঁচ করতে চেষ্টা করে। মহাবীর কিন্তু সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে মুখটিপে হাসছে আর মাঝে মাঝে গেটটা নাড়ছে তাল বুঝে।

গজানন। আরে কেয়া হায় রে।···খালি কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কিঁচ্‌!

মহাবীর। (কৃত্রিম রোষে) কাঁহা কিঁচ্‌ কিঁচ্‌!

চরিত্র পরিচিতি

মিঃ সেন	···	···	কারখানার মালিক
মিঃ মুখার্জ্জি	···	···	উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী
রেবতী বাবু	···	···	ম্যানেজার
কবি	···	···	মিঃ সেনের বন্ধু
মিঃ সরকার	···	···	ঐ বন্ধু
নকড়ি	···	···	দালাল
গজানন	···	···	দরোয়ান
মহাবীর	···	···	সশস্ত্র প্রহরী
ঈশ্বর পণ্ডিত	···	···	শ্রমিক প্রতিনিধি

ওসমান, নগিন, ছোটকচি, বুধাই, গিট্টু···শ্রমিক।
ঠিকাদার, মঙ্গল মিস্ত্রী, কর্ম্মচারিগণ, শ্রমিকগণ,
নিমন্ত্রিতের দল, বেয়ারা ইত্যাদি।

সুচিত্রা ··· মিঃ সেনের স্ত্রী। সাবিত্রী ··· কবিপত্নী।

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

কারখানা—ন্যাশনাল মোটার ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী। যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপে রাত্রেও কাজ চ'লছে কারখানায় পূরোদমে। সামনে টানা চাওড়া করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় বিরাট একটা খিলেন। অস্পষ্ট আলোকে দেখা যায় গেটের লোহার দু'টো দরজা লোহার পাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে খানিকটা হাঁ হয়ে আছে। খিলেনের পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে করগেটের টিনের বিরাটকায় এক-পাল্লার দরজা—ওপর নীচে খানিকটা ক'রে ফাঁক—ভেজানো রয়েছে। দপ্‌—সির্‌-র্‌-র্‌-র্‌—একটা যান্ত্রিক আবহ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নীচের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে অবিরাম ফুলকি উড়ছে আগুনের। আর কানে আসছে একটা চাপা গোঁঙানির শব্দ। যান্ত্রিক অর্কেষ্ট্রা বাজছে—ঘট্—ঘটাং—ঘটাং—ঘট্, ঘট্—ঘটাং—ঘটাং—ঘট্, ঘট্—ঘটাং—ঘটাং—ঘট্···

গজানন। আরে শুনা তো শালা চুহা না কেয়া বা ইধর উধর হরদম কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কর্ রহা হৈ।

মহাবীর। কাহা চুহা। চুহা তো দেখতাহি নেহি।···চুহা চুহা চুহা, আরে বুঢ্ঢা তেরে শিরমা চুহা। স্বপ্নেমে সিরফ্ চুহাই দেখতে হো, হোগি। এত্তো ঠুল ঠুল মোটা মোটা চুহা, হোগি।

গজানন। আরে রাম রাম রাম রাম।···কাঁহা থা অউর কাঁহা আ গয়া। আরে রাম রাম রাম রাম।

মহাবীর। (একটু এগিয়ে যায়) কাঁহা থা।

গজানন। আরে কেয়া বাতাউ তোসে স্বপ্নেকি বাত। শালা চুহানে বিলকুল মাটি কর দিয়া। খালি কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্।···ফির কেয়া উ আবেগা! মাইনামে এক দো তো ব্যস্, বহুৎ খুসী···শালা চুহা।

(মহাবীর অন্য দিকে মুখ ঘোরায়)

এ মহাবীর; ইয়ে চুহা না, শালা বহুৎ খারাপ হৈ। বাবাজীসে হাম শুনা কি ইয়ে চুহা জীন্‌কা বহুৎ পিয়ারা হৈ। ভগ্‌বান যিস্কো ভালা চাহাতে হ্যায় জীন্ উস্কে উস্কো পাশ তুরন্ত ভেজ দেত্তেহৈ। দেখতেহি উস্কি জিন্দিগি খতম কর দেনাহি ধরম হ্যায়। তো কেঁও নেই তু উস্কো মারডালা।··· আব্ সে ঠিক করলে যে এক চুহে কো দেখা কি ব্যস, একদম খতম কর দে জানসে। তব তেরা ধরম কদম কদম বাঢ় যায়েগা। য্যাসা শও চুহা খতম করনে পরজ্ঞান তুঝে ছু নেহি সক্‌তা। সমঝা।

মহাবীর। কেয়া বোলতা হ্যায় রে বুঢঢা। রাতমে সারাব পিয়া হৈ খুব, হোগি।

গজানন। আরে রাম রাম রাম রাম।

মহাবীর। তো কেয়া বোলতেহো। বাতাও।

গজানন। আরে বিটিয়া আ রহা হৈ স্বপ্নেমে। মেরি বিটিয়া। উস্কি মা ভি আ রহি হৈ। থোড়িসি বাতচিত ভি হোনে লাগিথি মেরা সাথ হাঁসতে হাঁসতে, ইস্‌বখত কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্, শালা চুহা···

মহাবীর। (হেসে) এত্না বুঢ্ঢা হো গয়া তব্‌ভি স্বপ্নেমে আওরৎ দেখতে হো।···মেরা ভি তো এক সুন্দর পিয়ারী হৈ দাজ্জিলিং মে, এক রাতভি উস্কো নেই দেখতা। আর শালা ভররাত টহল দেগা তো আবেগা ক্যায়সে আওরৎ স্বপ্নেমে?

গজানন। চুহা মার দশ বিশ, আ যাওয়েগা।

মহাবীর। য্যায়সে, শোনেকেকি কই জরুরত্ নেহি হ্যায়।

গজানন। আরে তু তো খাড়ে খাড়ে হি শো সকতা হ্যায়।

মহাবীর। মৈঁ কেয়া ঘোড়া হুঁ······লঃ, কাল সে হাম রাতমে শুত রহেগা, লঃ।

মহাবীর স'রে যেতেই গজানন আবার ব'সে ব'সে ঝিমোতে সুরু করে। পেছনে কারখানায় তেমনি কাজ চলছে। কখন কখন ফোরম্যানের হাঁক শোনা যায় দুরাগত সাইরেনের মত। একটু পরে গজাননকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখে মহাবীর কৌতুকভরে এগিয়ে আসে। খবর পাতার কাছে আঙুল নেড়ে গজাননের ঘুম পরীক্ষা করে। তারপর বন্দুকটা পাশে রেখে লঘু দ্রুত পায়ে আশপাশ থেকে একখানা আধময়লা সাদা চাদর ও গজাননের পায়ের কাছে গোটা করা রঙ্গীন আলোয়ানটা নিয়ে সরে দাঁড়ায়। তারপর পায়ের কোর্ত্তার ওপরেই সাদা চাদরটা শাড়ী ক'রে কোমরে জড়িয়ে আর রঙ্গীন আলোয়ানটা মাথায় ওড়না ক'রে প'রে গজাননের পাশে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরেই ঘুমোতে ঘুমোতে ঝুল খেয়ে টনক ন'ড়ে ওঠে গজাননের—মনে হয় সামনে যেন কোন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে বেঁকে ভেঙে। চকচকিয়ে যায় বুড়ো গজানন। চোখ তাকিয়ে সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে অপরিচিতার। একবার মনে হয় ভূত নাকি! ভয়ে ভয়ে মহাবীরকে ডাকে।

গজানন। এ মহাবীর। কাঁহা গৈল বা···রাম রাম রাম রাম··· তুম কোন হো!

(সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপে মহাবীরের হাসিতে)

আরে এ মহাবীর।···কেয়া জানে কোন বা। মহাবীর হো।

কোন সাড়া নেই। একটু ইতস্ততঃ ক'রে গজানন ভাল করে নিরীক্ষণ করে নারী মূর্ত্তিটাকে। আশপাশে তাকিয়ে দেখে রঙ্গীন আলোয়ানটা উধাও হয়েছে। একটু পরে মহাবীরের জুতোটা সে যেন আন্দাজ করতে পারে। এতক্ষণে একটু হৃষ্ট হ'য়ে ওঠে বুড়ো। ঠিক ধরেছে এইবার। তবু রহস্য সে ভাঙতে চায় না! না বোঝার ভান ক'রে অভিনয় সুরু করে।

আব মৈঁ কেয়া করু।···এ মহাবীর, মহাবীর হো।···কেয়া জানে বাবা।···স্বপ্নেমে আওরৎ আ রহা থা, আব কেয়া উ সাচমুচ্ আ গিয়া হৈ! মগর ইঁয়ে ক্যায়সে হো সক্‌তা। কাঁহা দারভাঙ্গা কাঁহা কলকাত্তা। কেয়া মালুম।···আচ্ছা পুছেঁ দেখে একদফা, কেয়া হোগা উসমে।···ইয়ে···তুম কোন্ হো বা। কোন হো বা তোম।···কেয়া দেবীকো শুনাই নেহি পড়তা।···আরে বাতাও না মুঝে প্যারী, কেঁও ঘাবড়াতি! তুম কোন হো!

মহাবীর। মৈঁ আওরৎ হুঁ।

গজানন। আওরৎ হুঁ!

মহাবীর। হাঁ জী।

গজানন। হাঁ হাঁ আরে উ তো য়্যাসাই মালুম হোতা মুঝে, মগর মেরা সওয়াল কেয়া তুম কোন হো, কাঁহা সে আয়ি বা, বাতাও।···কেয়া সরম আতি হৈ! আরে মুঝে কেয়া সরম! মৈঁ তো বুঢ্ঢা হুঁ, আঁ।···ঘুঙট পটকো খোল দিয়া যায় দেবী, মৈঁ কৌশিশ করতা হুঁ তুঝে।

মহাবীর। ঘুঙট পট কেয়া খোলা যাতা হ্যায়, খোলনা পড়তা হ্যায়।

গজানন। ইয়ে বাত সাচ।···নেহি নেহি ছলনা করতি হ্যায়।

মহাবীর। আওরৎ কভি ছলনা নেহি করতি।

গজানন। আরে হাঁ হাঁ ইয়ে তো ঠিক বাতই হ্যায়—আওরৎ কভি ছলনা জান্তা নেহি। হামারা ভুল হো গয়া, ভুল হো গয়া। আচ্ছা দেখব তো; দেখব তো কাঁহাকা আওরৎ।···অঁ—বহুৎ খুপ্‌সুরৎ মালুম হোতা।

ঘোমটা খুলে দেখে মহাবীর স্ত্রীলোকের সরম মুখে টেনে চোখ বুঁজে আছে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারে না। হেসে ফেলে ভারী গলায়। সঙ্গে সঙ্গে গজাননও নিজমূর্ত্তি ধরে কৃত্রিম রোষে মহাবীরকে মারতে থাকে লাথি ঘুঁসি

তব্ রে শালা···(লাথি মারবে ব'লে পা তোলে)

এমন সময় ছুটির সিটি বেজে ওঠে। সকাল হয়ে এসেছে প্রায়। মহাবীর দৌড়ে গিয়ে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে যথারীতি গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়, অন্য দিকে দাঁড়ায় গজানন।

একটু পরেই কারখানায় ঢোকবার টিনের বড় পাল্লাটা যান্ত্রিক শব্দে খুলে যেতেই কারখানার ভেতর থেকে এক রাশ ঘন ধোঁয়া মঞ্চের ওপর এসে পড়ে। আর সেই ঘনকৃষ্ণ ধূম্রকুণ্ডলীর ভেতর থেকে মজুরদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। ঘামে ভেজা শরীরগুলো তাদের সব জলী সমারোহে চক্ চক্ ক'রে ওঠে দিনের আলোয়।

(পটক্ষেপ)

২য় দৃশ্য

মিঃ সেনের অফিস-ঘর। ফাইল কোন ও খাতাপত্রে ঠাসা টেবিল সমুখ ক'রে ব'সে আছেন মিঃ সেন ডেক-চেয়ারে আর কোম্পানীর সব কাগজপত্তর দেখছেন। ডাইনে বামে দরজার পর্দা ঠেলে মাঝে মাঝে ঢুকছেন কোট-প্যাণ্ট পরা উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ—দরকারী কাগজ ও বিল দেখিয়ে সই নিয়ে যাচ্ছেন মালিকের।

মিঃ সেন। Hallo miss, I have not got the connection yet. NO. Cal 32500···thank you,

(বেয়ারার প্রবেশ। ঘাড় নেড়ে slip অনুমোদন করলে বেয়ারার প্রস্থান)

(মিঃ ঘোষের প্রবেশ)

কর্মচারী মিঃ ঘোষ এসে মিঃ সেনের হাতে বড় এক সিট কাগজ দিল।

মিঃ সেন। (কাগজ দেখে) এ Quotation cancell করতে হবে immediately, নয়তো order secure করবার কোন সম্ভাবনা নেই।···কি আশ্চর্য্য···silly! ভাবলে বেশী ক'রে quotation ফেললেই বুঝি কোম্পানীর খুব স্বার্থ দেখা হ'লো। cancell করে দিতে বলুন এটা immediately. আবার নতুন ক'রে quotation পাঠাতে হবে। এ কে, করেছে কে এটা, নিশ্চয়ই মুখুজ্জো···আচ্ছা আপনিই বলুন তো যে এটা quotation হয়েছে না তার শুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে! insufferable ব্যাপার ঘটছে সব অফিসে। কি যে সব আপনাদের···

(কাগজ সহ মিঃ ঘোষের প্রস্থান)

(রিং বাজতেই) Hallo, yes speaking। কে সরকার। আরে ভাই সে এক কাণ্ড···কেন! না না না; হ্যাঁ, তবে কথা হচ্ছে··· হ্যাঁ, না সে তো ঠিকই···না কক্ষনও না···আরে তাই কি পারে নাকি!···ঐ রকম···কিছু না কিছু না···বলছিল। উঁ···আচ্ছা ব'লে দেব, আচ্ছা, আচ্ছা। তারপর হ্যাঁ শোন, immediately আমার সাড়ে চার হাজার piece কম্বল ভাই তোমায় ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে—হ্যাঁ হ্যাঁ any damn stuff হলেই চলবে। কুলীরা বড্ড জ্বালাতন করতে সুরু ক'রেছে। Contract'এর কাজ, কুলী ভাগতে আরম্ভ ক'রলে তো···বুঝতেই পারছ। হ্যাঁ···হ্যাঁ···আর শোন, আমার কিছু লণ্ঠন চাই। I mean হ্যারিকেন। Can you manage? কে···তোমার জামাইবাবু···বেশ তো তা হ'লে তো ভালই হ'লো।···ঐ সাড়ে চার হাজারের মতই···ও ও···তাই নাকি!···জানতুমই না। যাক ভালই হ'লো। তা আসছো তো আজ, সন্ধ্যাবেলা। আচ্ছা আচ্ছা, সাবিত্রী দেবী!···কথা তো আছে। হ্যাঁ কবি তো থাকবেই···আচ্ছা আচ্ছা many thanks, চিয়ারিও।

(রিং বাজাতেই বেয়ারার প্রবেশ)

বোলা লেও।

(বেয়ারার প্রস্থান এবং নকড়ির প্রবেশ)

নকড়ি। এই যে নকড়ি, বোস।···তাখ অজ্ঞাতকুলশীল ঐ সব বাজে পার্টি···

নকড়ি। না সে আপনি আর তার কি ব'লবেন মানে···

মিঃ সেন। না না কথাটা ব'লতে দাও আমায়।

নকড়ি। না তা সে আপনি বলুন, বলুন।

মিঃ সেন। তোমার ধারণা যে তুমি খুব একটা চালাক লোক, কেমন!

নকড়ি। না মানে কথা···

মিঃ সেন। মানে কথাটথা না, তুমি নিজেকে তাই ভাবো।···যা হোক শোন।

নকড়ি। বলুন, বলুন।

মিঃ সেন। ঐ সব অচেনা অজানা পার্টির সঙ্গে খবরদার আর কক্ষনও কোন রকম transaction করতে যেয়ো না। তাখো তুমি বেশী দালালি মার, That I don't grudge, কিন্তু ব্যবসাটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। সামান্য তিন টন নারকেল তেলের transaction করতে গিয়ে দেখছি তুমি কোম্পানী ফাঁসিয়ে দেবে। গবর্ণমেণ্ট কি ঘাস খায়! তোমাকে তো জেলে যেতেই হবে, মায় কর্ত্তাকে ধরে পর্য্যন্ত টানাটানি করবে! খবরদার ঐ ধরণের লোক আর এনো না! কি কাণ্ড!···হ্যাঁ, আর শোন, গ্লিসারিন আর ব্লিচিং পাউডার···পাঁচ, পাঁচ টন, মালটা আমি তোমার কাছেই বিক্রী করতে চাই। তারপর তুমি সে মাল কা'কে দেবে কি করবে, সে তুমি বুঝে দেখবে।···মালটা একটু দূরে আছে জানলে, স্থানীয় কোন party পাও তো ভাল, আর টানা-হ্যাচড়া যদি একান্ত করতেই হয় তো freight-চার্জ্জ বাবদ, এ শুধু তোমার খাতিরেই, কিছু টাকা আমি ছাড় দিয়ে নিতেও রাজী আছি। But I must get the money immediately. নিতে পারবে তুমি মালটা!

নকড়ি। এক্ষুনি নেবো। বাবা, দেব-দুর্ল্লভ ধন—বাজার একেবারে গরম হয়ে আছে।

মিঃ সেন। রিসিট টিসিট কিন্তু কিচ্ছু দিতে পারবো না।

নকড়ি। কিচ্ছু দরকার নেই,···ও সে আপনি মুখে বলেছেন এই যথেষ্ট।

মিঃ সেন। টাকা কিন্তু আমার আগাম চাই।

নকড়ি। এখন বলেন তো এখুনই দেই।

মিঃ সেন। না এখন মানে, তোমাকে বলে রাখলুম আগে থেকে, কর্ত্তার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে হবে তো। তবে সে কিছু না, একবারটি শুধু বলে নেয়া।

নকড়ি। তা আমি আর কখন আসবো?—ফাইনাল একটা তো কিছু হলো না।

(রিং বেজে উঠল)

মিঃ সেন। হ্যাঁ, তুমি আসবে, Just a minuite···Hallo yes, Aloknanda firm speaking···না তিনি এখনও আসেননি।···ঠিক বলতে পারি না। তবে চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ আপনি একবার রিং করতে পারেন।···না, আজকাল একটু কমই আসেন। আছেন, ভালই আছেন। আচ্ছা, আচ্ছা নমস্কার। (phone রেখে) হ্যাঁ তা হলে তুমি আসবে··· এই সাড়ে চারটে নাগাদ একবার এসো। কর্তার সঙ্গে ইতিমধ্যে একটু কথা কয়ে রাখি।

নকড়ি। সাড়ে চারটে, আচ্ছা!···সন্ধ্যের পর বাড়ীতে সময় হয় না।

মিঃ সেন। সন্ধের পর বাড়ীতে···

নকড়ি। আচ্ছা আমি সাড়ে চারটে নাগাদই আসবো'খন।

মিঃ সেন। হ্যাঁ সন্ধ্যের পর আবার—তুমি সাড়ে চারটে নাগাদই এসো। positively.

নকড়ি। positively.

(নকড়ির প্রস্থান ও গোপালের প্রবেশ)

গোপাল দাসগুপ্ত মিঃ সেনের সহপাঠী বন্ধু। পরণে খদ্দর বগলে ব্যাগ—দেশী বিদেশী publicatlonএ ঠাসা।

মিঃ সেন। (ভাল করে আগন্তুককে দেখে কৌতুকভরে হেসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে) বলছি বলছি···তুমি,—তোমার নাম—আচ্ছা দাঁড়াও—তোমার নাম হৃষিকেশ, না?

গোপাল। আজ্ঞে না, আমার নাম গোপাল। গোপাল দাসগুপ্ত।

মিঃ সেন। গোপাল গোপাল। আমি হৃষিকেশ বলছি। যা হোক ঐ এক কথাই হলো। বসো···

গোপাল। হ্যাঁ হৃষিকেশও আমাদের সঙ্গে পড়তো। ঐ একসঙ্গেই আমরা ঘুরতাম টুরতাম।

মিঃ সেন। জানি জান, চিনেছি আমি তোমায় ঠিকই তবে,···দেখ কত বচ্ছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

গোপাল। না খুব বেশী দিন আর কি এমন! তবে তোমার পক্ষে ভোলাটা খুব স্বাভাবিক···মস্ত বড় লোক হয়ে গেছ এখন··· দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে খবরের কাগজে ছবি বেরুচ্ছে!

মিঃ সেন। কি রকম!

গোপাল। হ্যাঁ দেখলুম দিব্যি কাগজগুলো সব সে দিন বেশ ফলাও করে ছেপেছে। একেবারে পাশাপাশি কাঁধে হাত দিয়ে···

মিঃ সেন। কেন তোমার ভাল লাগেনি!

গোপাল। আরে ছি সেই কথাই তো বলছি, গর্ব্বের কথা। খারাপ লাগবে তুমি বলছো কি হে! ক'জনের সে সৌভাগ্য হয়। টাকা তো অনেকেরই আছে!

মিঃ সেন। You did like it then!

গোপাল। Of course, সেই দেখেই ত এলাম।—কত বড় লোক হয়ে গেছ আজকাল···

মিঃ সেন। কত বড়লোক না,—যাকগে তারপর আছো কেমন? কলকাতাতেই থাকো, না আর কোথাও···

গোপাল। না এখানেই আছি।

মিঃ সেন। কোথায়?

গোপাল। সেই মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, পিসিমার বাড়ী। মনে আছে তোমার পিসিমার কথা!—সেই ফরাসের ওপর বসে আমতেল দিয়ে মুড়ি খাওয়া—

মিঃ সেন। আমতেল দিয়ে মুড়ি খাওয়া?···বহু দিনের কথা হয়ে গেল কিন্তু···

গোপাল। না বহু দিন আর এমন কি, এই তো বছর তিন-চারেকের কথা।—আচ্ছা কমলার কথা মনে পড়ে? পিসিমার মেয়ে কমলা! উচ্ছ্বাসের মাথায় যাকে একদিন তুমি ভালবাস বলেছিলে। মনে পড়ে?

মিঃ সেন। ভালবাসি! আমি বলেছিলাম!

গোপাল। জানি না এখন কি ব'লেছিলে তুমি তাকে। সে কিন্তু বিশ্বাস ক'রেছিল। অনেক দিন অনেক ছলে সে আমায় তোমার কথা জিজ্ঞেস্ ক'রেছে—কোথায় থাকে, কি করে,—একবারটি দেখা হয় না হেমেনদার সঙ্গে ইত্যাদি—মেয়েদের যা হয় আর কি! যাগ গে সে সব কথা তোমার হয়তো আজ মনেও নেই। তা সম্প্রতি বিয়ে হয়ে গেল কমলার। সে কিছুতেই করবে না, শেষ কালে আমিই এক রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে···

মিঃ সেন। হ্যাঁ এইবার মনে প'ড়েছে, মনে প'ড়েছে,—কমলা, কমলা that কমলা···

গোপাল। মনে পড়েছে!···ভাল। আমি তো ভাবতেই পারছিলাম না যে এতক্ষণ তুমি ভুলেছিলে কি ক'রে? যা হোক—

মিঃ সেন। না দেখ মানে কম দিনের কথা হ'লো না তো। আর কত দিন out of touch—

গোপাল। যত দিনেরই কথা হোক, দেখ হেমেন—(সমস্কে গিয়ে) কি বলছি!

মিঃ সেন। কি হ'লো!

গোপাল। না মানে—তোমার সময় নষ্ট করছি না তো!

মিঃ সেন। আরে কিছু না কিছু না! কি আশ্চর্য্য। এত দিন পরে এলে।—চা খাও?

গোপাল। তা খাই।

মিঃ সেন। খাও। (কলিং বেল টিপলো)

(বেয়ারার প্রবেশ)

এক পট চা দিয়ে যেতে বল।

(বেয়ারার প্রস্থান)

(সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট নিজে নিয়ে কেসটা গোপালের সামনে খুলে ধরলো)

হুঁ, তারপর!

(জনৈক অফিসার উঁকি দেন। হাতে কতকগুলো বিল)

কে! কি, আসুন না।

অফিসার। এই কতকগুলো বিল পাশ ক'রতে হবে।

মিঃ সেন। দেখি, (বিলগুলো দেখে) আচ্ছা যান আপনি, আমি sign ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি—এ সবগুলোই কি আজকেই পাশ করতে হবে? এটা,—Malcolm কোম্পানীর বিলটা। তার পর গুপ্ত দত্ত! আর পাটকেলওয়ালা খাণ্ডেলওয়ালা কোম্পানীর বিলগুলো।৮ রেবতী বাবু কি বললেন, পাশ ক'রতে হবে?

অফিসার। উনি তো আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

মিঃ সেন। আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আচ্ছা আমি রেবতী বাবুর সঙ্গে কথা কইছি।···আপনি যান আমি পাঠিয়ে দেবখন।

[অফিসারের প্রস্থান।

(বিলগুলো ভাল করে দেখে নম্বর টিপে ঘুরিয়ে phone তুললেন) রেবতী বাবু! যে বিলগুলো পাঠিয়েছেন তার সবগুলোই কি আজ পাশ ক'রতে হবে, না, হ্যাঁ, due over হ'য়ে গেছে। (হাত ঘড়ি দেখে) না আজ তো ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'য়ে গেছে। ও—ও, আচ্ছা Malcolm কোম্পানীর বিলটা আমি পাশ করে দিচ্ছি কিন্তু গুপ্ত দত্তকে আপনি ব'লে দেবেন যে অত Prompt আমরা আর হ'তে পারবো না। They must wait more. আর খাওেলওয়ালা! এটাও দিতে ব'লছেন। ও, উঁ উঁ, I know I know, বলেছেন! আচ্ছা এবারটা দিয়ে দিন তা হ'লে।···আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(ফোন রেখে sign ক'রতে ক'রতে)

তারপর গোপাল, চুপ করে রইলে বলো কিছু, কি হে!

(কলিং বেল বাজতেই বেয়ারার প্রবেশ)

Accounts. [বেয়ারার প্রস্থান।

গোপাল। Certainly I am disturbing you;

মিঃ সেন। কিছু না কিছু না। কি আশ্চর্য্য! আরে, এ রকম ব্যস্ত আমায় থাকতেই হয়।

গোপাল। খুব কাজ, না!

মিঃ সেন। হ্যাঁ তা কাজ তো ক'রতেই হয়।—কাজ না করলে···তা যাক গে এইবার তোমার কথা বলো।

গোপাল। আমার কথা মানে—সংক্ষেপেই বলছি।

মিঃ সেন। বেশ।

গোপাল। জান না নিশ্চয়ই আমি বইএর Business করছি—mostly foreign publications, অবিশ্যি আরম্ভ করিছি এই কিছু দিন হলো···

মিঃ সেন। আচ্ছা।

গোপাল। Modern foreign literature, I mean fiction বলতে যা কিছু তারপর তোমার books on criticism, up-to-date anthology এ ছাড়া Works of great literatures যেমন তোমার Shelly, Keats, Byron, Shakespeare, Ibsen, Shaw. তারপর Politics, Social, Science, Economics ও History'র ওপরেও আধুনিক নামকরা লেখকদের ভাল ভাল বই আমি রাখি।

মিঃ সেন। বটে!

গোপাল। দেখ না catalogueখানা। দেখলেই বুঝতে পারবে!

মিঃ সেন। (বইটা হাতে নিয়ে) That's all right. কিন্তু what you want me to do!

গোপাল। Well you can choose for yourself, দেশের সব গণ্যমান্য নেতাদের সঙ্গে মিশছো, নিশ্চয়ই অনেক up-to-date information রাখতে হয় তোমাদের। You will need them.

মিঃ সেন। বই অবিশ্যি দেখলেই কেনবার সখ হয়, কিন্তু ভাই already যা কিনে ফেলেছি তাই তো পড়ে উঠতে পারছি না।

গোপাল। আজ না পড় দু'দিন পরে পড়বে। বই যাদের কেনা regular অভ্যেস তারা আর পড়ে উঠতে পারে সত্যিকারের ক'খানা বই বলো! Mostly যে আন্দাজে কেনে লোকে বই, পড়ে তার চাইতে ঢের কম, এ তোমার হয়ই।

মিঃ সেন। দূর, এত পড়বার আমার এখন সময় কোথায়!

গোপাল। আহা পড়তে তো তোমাদের হয়ই, পড়বে, পরে পড়বে।

মিঃ সেন। আর তা ছাড়া I have a heap of such stuff in my study. Actually বাড়ীতে বই রাখবারই আমার আর জায়গা নেই, believe me, আর তারপর শুধু শুধু কিনেই বা করবো কি বলো! পড়তে তো আর পারবো না!

গোপাল। কেন?

মিঃ সেন। সময় কোথায় ভাই, মোটে সময় পাই না।···অবিশ্যি তুমি এসেছো আশা ক'রে, I must not dishearten you, তবে তোমাকে ভাই একটা অনুরোধ করবো।

গোপাল। কি রকম।

মিঃ সেন। Of course you must not mind for taking that trouble.

গোপাল। না mind মানে কি ব'লছো আমি একদম বুঝতে পারছি না।

মিঃ সেন। বলছি, আচ্ছা কম পক্ষে কত টাকার বই আমি কিনবো তুমি expect করে এসেছো, বলো।

গোপাল। Expect মানে···

মিঃ সেন। না মোটামুটি একটা ভেবে এসেছো তো তুমি, যে এই বইগুলো হেমেনকে গছাতে হবে। বলো না, frankly বলো না!

গোপাল। সে তুমি যেমন select করবে তেমনি তার···

মিঃ সেন। আরে তুত্তোর কলা নিকুচি ক'রেছে তোমার selection-এর, সময় কোথায়! বল্লুম না তোমায়! বই পড়বো কখন!

গোপাল। তা হ'লে—

মিঃ সেন। তা হ'লে এসেছো যখন ম্যাদ্দিন পর তখন শুধু হাতে নিশ্চয়ই আমি তোমায় ফিরিয়ে দেবো না। (চেক কেটে) এই নাও,—খুসী তো।

গোপাল। তুমি আমায় অপমান ক'রছ হেমেন।

মিঃ সেন। আরে কি আশ্চর্য্য!

গোপাল। আমি তো তোমার কাছে সাহায্য চাইতে আসিনি।

মিঃ সেন। কি মুস্কিল, সাহায্য বলে কি আমিই তোমায় টাকা দিচ্ছি! ···বেশ তো, বই দেবে তো আমার নাম ক'রে তুমি যে কোন একটা Public Libraryতে দু'শ টাকার বই দিয়ে দিও. হলো তো!

গোপাল। থাক ভাই, যথেষ্ট হয়েছে। আমার ভুল হয়েছে তোমার কাছে বই বিক্রী করতে আসা।

মিঃ সেন। তুমি আমায় ভুল বুঝছো গোপাল।

গোপাল। ভুল বুঝছি, না! সবাই তোমায় ভুলই বুঝে গেল, না? চমৎকার যুক্তি!

মিঃ সেন। মেয়েদের মত অভিমান করে বেশ তো কথা বলতে পারো তুমি গোপাল!

গোপাল। হেমেন!

মিঃ সেন। চেকটা না নিয়ে খুব ভুল করলে গোপাল।

গোপাল। তোমার চেক্…

মিঃ সেন। খুব রাগ হচ্ছে, না! হুঁ…ঐ রকম হয়। চেক যারা কাটে, তাদের ওপর চেক যারা কাটতে পারে না—তাদের খুব রাগ।…দূর তুমি দেখছি কিছু শেখোনি। বই বুঝি শুধু বেচই, পড় না একখানাও।

গোপাল। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেব না।

মিঃ সেন। মিথ্যে ঐ দেমাকটুকু না থাকলে বাঁচবে কিসের জোরে! I appreciate your indignation Gopal!

গোপাল। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

মিঃ সেন। Oh so kind of you.

গোপাল। তুমি যে এতটা ইতর…

মিঃ সেন। চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না! ঐ রকম হয়। কিন্তু দাঁত কটাই যে ভাই তোমার ভেঙে যাবে কড়মড়িতে।

গোপাল। থাক আর বাকবৈদগ্ধ দেখাতে হবে না তোমায়: তোমার মত…

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় মিঃ সেন। চেকটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে।

[গোপালের প্রস্থান।

(সিগারেট ধরিয়ে একটু ঝিম ধরে ব'সে থেকে নম্বর ঘুরিয়ে phone তোলে মিঃ সেন) Accounts, রেবতী বাবু! শুনুন, নকড়ির টাকাটা আপনি Loan Accounts'এ জমা করে নেবেন as usual বুঝতে পেরেছেন! হ্যাঁ—হ্যাঁ—কত! ত্রিশ হাজার! হ্যাঁ, ম্যানোয়ারী ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন আচ্ছা thats all right then. আচ্ছা আচ্ছা।

(কর্ম্মচারী ঈশ্বর পণ্ডিতের প্রবেশ)

মিঃ সেন। (খাতা থেকে মুখ তুলে) হুঁ, তারপর এই যে পণ্ডিত।

ঈশ্বর। আজ্ঞে—

মিঃ সেন। আজ্ঞে না, ব'সো তোমার সঙ্গে আমার মোকাবিলা করতে হবে কয়েকটা বিষয়ে।

ঈশ্বর। আমার সঙ্গে!

মিঃ সেন। হ্যাঁ ব'সো, আপত্তি আছে!

ঈশ্বর। কি যে বলেন।

মিঃ সেন। না যা আজকাল শুনতে পাচ্ছি সব তোমার নামে!

ঈশ্বর। মন্দ লোকে অনেক কথা বলে।

মিঃ সেন। মন্দ লোকে, না! জগতশুদ্ধ লোক মন্দ হ'য়ে গেছে আর তুমিই যা আছ একমাত্র সাচ্চা লোক, কেমন?

ঈশ্বর। জগতশুদ্ধ লোক আমায় মন্দ ব'লছে! তা যদি বলে তো নিশ্চয়ই আমি মন্দ, কিন্তু ঠিক ঠিক ব'লছে কি!

মিঃ সেন। তোমার কি ধারণা!

ঈশ্বর। আমি তো জানি, অবিশ্যি জগতশুদ্ধ লোকের কথা বলতে পারবো না, বহু লোকের আমার সম্বন্ধে মোটামুটি ভাল ধারণাই আছে। অনেক সময় এই পোড়া কানেই তারা বলছে শুনি পণ্ডিতের মত লোক হয় না। তা…বেশী কথা কি, আপনিই বলুন না…লোক কি আমি খারাপ?

মিঃ সেন। খারাপ তুমি ছিলে না, হ'চ্চো।

ঈশ্বর। হচ্চো, হইনি তো এখনও।

মিঃ সেন। বড় বাকীও নেই।

ঈশ্বর। আপনি বলছেন?

মিঃ সেন। হ্যাঁ বলছি, বলতে বাধ্য হচ্ছি।

ঈশ্বর। বলতে পারেন। আপনি মালিক।

মিঃ সেন। না ও মালিক টালিকের কথা নয় পণ্ডিত। বড়কর্ত্তার মত কর্ম্মচারীদের ওপর আমি সে মালিকানার দেমাক দেখাই না। আসল কথা হচ্ছে কোম্পানী। কোম্পানীর চাইতে আমার কাছে কেউই বড় নয়। কারণ তুমি মালিকই বল আর শ্রমিকই বল—কোম্পানী না টিকলে কেউই টিকতে পারে না।

ঈশ্বর। সে তো অবশ্যই।

মিঃ সেন। কি অবশ্যই! এখন তো বলছ অবশ্যই কিন্তু কথাটা হয়তো একটু রূঢ়ই শোনাবে, সত্যি ক'রে বল তো ক'জন কর্ম্মচারী এই কোম্পানীর মঙ্গল চায়?

ঈশ্বর। কেন, আমি তো জানি প্রত্যেকেই চায়। চায়, কারণ রুজীর সম্বন্ধ রয়েছে যে।

মিঃ সেন। প্রত্যেকেই চায়, না! আর সেই জন্যেই বুঝি কোম্পানীর এই দুর্দ্দিনে মায় মাগ্‌গী ভাতার টাকাটা পর্য্যন্ত মাইনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার জন্যে তোমরা জেদ্ ধরেছো? হুঁঃ! আরে বাবা কোম্পানীর যদি সেই অবস্থাই থাকতো তো ব'লতে হ'তো না তোমাদের, এমনিই পেতে। কেন, পাওনি! পঞ্চাশ সনের মন্বন্তরে এক এই বাংলা দেশেই কমসে কম তিরিশ চল্লিশ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরে গেছে। কেউ বলতে পারে ন্যাসনাল মোটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর একটা মুদ্দাফরাস, মরে যাওয়া তো দূরের কথা, এক বেলা না খেয়ে থেকেছে? দিয়েছে কোম্পানী তোমাদের সেই দুর্দ্দিনে, বলো! চাল বলো ডাল বলো, নুণ বলো, তেল বলো, আটা বলো, এমন কি অনেক ভদ্দর লোক পর্য্যন্ত মাথা কোটাকুটি ক'রে যে সব জিনিষের হদিস্ পায়নি, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী না চাইতেই সেই সব দুর্ম্মূল্য জিনিষ কোম্পানীর প্রত্যেকটি মজুরের হাতে খুসী হ'য়ে তুলে দিয়েছে। নাকি বল দেয়নি?

ঈশ্বর। না সে তো বলছিই বলি—

মিঃ সেন। কৈ বলছ, বলছি! তাই যদি বলবে তো এই বুঝি তার প্রতিদান। চোখ রাঙিয়ে বলছো ভাতার টাকা মাইনের সঙ্গে যোগ দিলে কি থাকলাম, আর নয় তো দিলাম তুড়ে তোমার কোম্পানী, ছিঃ! দেখ নুণ খাবার পরও যে গুণ গায় না, তাকে এক কথায় নেমকহারামই বলে। তোমরা সব নেমকহারাম।

ঈশ্বর। তা আমাকে এখানে একলা ডেকে এনে এ সব কথা শোনাচ্ছেন কেন! ইউনিয়নকে বলুন না!

মিঃ সেন। কিসের ইউনিয়ন। মানি না আমি তোমাদের ঐ ইউনিয়ন। ইউনিয়ন! Cheek.

ঈশ্বর। আপনি মিথ্যেমিথ্যি চট্‌ছেন।

মিঃ সেন। মিথ্যে কি সত্যি—আমি পারি সব তোমাদের একবার দেখিয়ে দিতে, জানলে পণ্ডিত! শুধু···নিজের কথাটাই ভাবো না কেন। ছ'বছর আগে, মনে পড়ে! মরতে তো ব'সেছিলে মাগ-ছেলেপুলে নিয়ে;···কি খেয়ে বাঁচতে ষ্যাদ্দিন যদি এই কোম্পানী না থাকতো। আজ বলছো তুমি ইউনিয়ন, শ্রমিক-স্বার্থ, সব বড় বড় কথা।

ঈশ্বর। তা সে কোম্পানী তো বাঁচিয়েছেই আমি বলছি।

মিঃ সেন। বলছি আর এই বুঝি তা'র নমুনা! ছিঃ, শেষকালে ঈশ্বর তুমি আপনার লোক হয়ে যে এই রকম করবে···হেড্ মিস্ত্রী বলে সাধারণ কারিগরদের ওপর তুমি ইউনিয়নের কথা ব'লে হামলা কর।—

ঈশ্বর। ইউনিয়নের কথা বলে আমি হামলা করি?

মিঃ সেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কি কর আর না কর তার প্রত্যেকটা খবরই আমার কানে এসে পৌঁছয়, সে আর তোমায় বলতে হবে না; এখন কথা হচ্ছে যে কে তোমাকে এই কারখানার হেড-মিস্ত্রী ক'রে দিলে, ইউনিয়ন? না এই হেমেন সেন? তাই বলি। এই যুগে লোকের ভাল কক্ষনও করতে নেই। কেউ তার মর্য্যাদা রাখে না। হ্যাঁ বুঝতাম খুব অসুবিধেয় রেখেছে কোম্পানী, নিজেরা টাকা করছে আর তোমাদের সব না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে, তখন বলতে পারতে।

ঈশ্বর। আমরা কিন্তু সত্যিই শুকিয়ে মরছি!

মিঃ সেন। কি শুকিয়ে মরছি, তুমি শুকোচ্ছো?

ঈশ্বর। হ্যাঁ তা কিছুটা তো—

মিঃ সেন। কই—এ কথা তো বলনি তুমি আমায় কস্মিনকালে।

ঈশ্বর। আমি তো একলাই নয়, আমার মত আরও অনেকে···

মিঃ সেন। ছাখ পণ্ডিত, মিথ্যেমিথ্যি ঐ শেখানো বুলিগুলো আর ক'পচো না—আমার মত অনেকেই! ভাবচো খুব একটা বিশ্ব-প্রেমের কথা বলছো! আরে বাবা সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে ঐ বৈষম্যটা রয়েছে। ছ'টো আঙ্গুল পর্য্যন্ত কারো এক নয়। তুমি তো ভারী বলছো···ছাখ বড় বড় কথা আউড়ো না, বুঝলে পণ্ডিত!··· আমার মত অনেকেই—কথা বেশ বলে। হুঃ, যাক গে তারপর আছো কোথায় আজকাল।

ঈশ্বর। সেই গলির মধ্যেই।

মিঃ সেন। গলি, ও সেই যে গিয়েছিলাম একদিন রাত ক'রে! ওফ্স্! সে কি ঘিঞ্জি···

ঈশ্বর। হ্যাঁ তা একটু ঘিঞ্জিই বটে।

মিঃ সেন। থাকো কি ক'রে ওর ভেতরে।

ঈশ্বর। আমিও ভাবি মাঝে মাঝে কথাটা।

মিঃ সেন। কেন তুমি আমাদের কারখানার ভেতরের একটা ঘরে থাকতে পারো না! ছ'-চারখানা ঘর তো দেখি এমনিই খালি প'ড়ে থাকে। হয় না সুবিধে?

ঈশ্বর। না সে তো হয়ই, তবে আমি তো একলাই নই, আর পাঁচ জনা—

মিঃ সেন। আঃ, দেখ ঈশ্বর, ঐ আর পাঁচ জনার কথা ছাড়, বুঝলে! আর পাঁচ জনা! দেখছো নিজেরই দাঁড়াবার জায়গা নেই। কি বিশ্ব-প্রেম রে বাবা! কোন মানে হয়! যা বললাম তাই কর। আর অত advance নাও কেন, মাস গেলে তিন টাকা সাড়ে সাত আনা, এক টাকা ছ' পয়সা মাইনে পাও, ব্যাপারটা কি?

ঈশ্বর। ব্যাপার খুব স্পষ্ট। যা রোজগার করি তাতে করে সংসার চলে না।

মিঃ সেন। কই সংসার চলে না, এ সব কথা তুমি তো কক্ষনও বলনি আমায়?

ঈশ্বর। দরখাস্ত একখানা দিলাম।

মিঃ সেন। দরখাস্ত, আরে দরখাস্ত ও-রকম রোজ হাজারখানা পড়ছে। দরখাস্ত দিলে কি হবে।···আর তুমি দরখাস্ত করবে কেন? চাকরী করবার সময় তুমি কি দরখাস্ত ক'রে চাকরী পেয়েছিলে? এ ধরণের মনোভাব তোমার হলো কি ক'রে পণ্ডিত?—দরখাস্ত, appeal, protest letter—যত সব। ছাড় বুঝলে, ও-সব ছাড়। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাল মানুষের মত কাজ কর, তোমার কোন অসুবিধে হবে না—কোন অসুবিধে হবে না।

(কবির প্রবেশ)

[কবির গায়ে একটা ওভার-কোট, পরণে যোধপুরী পায়জামা। মাথায় গান্ধী টুপী। সঙ্গে সাবিত্রী দেবী। ফর্সা চেহারা। টিকালো নাক। কপালে লাল টিপ। কমলা-নেবু রংয়ের একখানা শাড়ী আঁট করে জড়িয়ে পরা।]

মিঃ সেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) কে, কবি, আরে এসো এসো।—আসুন সাবিত্রী দেবী। What a fortune—আচ্ছা ঈশ্বর তা হলে তুমি এখন এস। আর—দেখছি আমি তোমার ব্যাপারটা। দেখছি।

(ঈশ্বরের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে তুমুল হট্টগোল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য।)

কবি। গোলমাল কিসের।

সাবিত্রী। কারা?

মিঃ সেন। ও কিছু না, কারখানার একটা shiftএর বোধ হয় ছুটী হ'লো। বসুন সাবিত্রী দেবী।

(নিমেষের জন্যে একটু মুহ্যমান হ'য়ে পড়েন মিঃ সেন। একটু পরেই তৎপরতার সঙ্গে সিগারেট কেস্ খুলে ধরেন কবির সামনে) smoke তারপর দেবীর দিকে যে আজ দেখি একেবারে চাওয়াই যাচ্ছে না, কবি!

সাবিত্রী। সত্যি!

মিঃ সেন। না কবি!

কবি। আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। তবে নিজের বলাটা নেহাৎই একেবারে খারাপ দেখায় বলে চেপেছিলাম এতক্ষণ।···আহা মা কি হইয়াছেন!

সাবিত্রী। মুখে তোমার আজকাল কিছু আটকায় না।

কবি। খারাপ কিছু বলিছি, মিঃ সেন!

মিঃ সেন। আরে দূর দূর, কথা হলো। তুমি কবি, কথা বললেই

যে অমৃত হ'য়ে যায়। খারাপ কি বলছ। Poet'দের কথাই আলাদা—divine musicians.

কবি। বলো ভাই, একটু বলো আমার হ'য়ে।

মিঃ সেন। Of course, তবে এর চাইতে আর বেশী বলবো না কিন্তু—over-acting হয়ে যাবে।

(মিঃ সরকারের প্রবেশ)

মিঃ সরকারের পরনে স্যুট, বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা—চোখে রিমলেস্।

মিঃ সরকার। বেশ জমেছে দেখছি!

মিঃ সেন। আরে এই যে মালেক, এসো এসো। কি কাণ্ড!

সাবিত্রী। কি লোক বাবা, চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন তো!

মিঃ সরকার। শুনলেও over-acting তো হয়নি কারো! সুতরাং —না কি বল হে!

মিঃ সেন। Right right, বড্ড জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ হে, নয় তো over-actingই হয়তো ক'রে ফেলতুম ভদ্র লোকদের সামনে।

মিঃ সরকার। You will find Sircar always a savior—ত্রাতা!

কবি। হ্যাঁ ভাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অনুবাদটা করে গেও। বড্ড মিষ্টি লাগে শুনতে।

মিঃ সেন। এটা কি অকবির মত একটা কথা বল্লে হে কবি, অনুবাদ মিষ্টি লাগে!

সাবিত্রী। দেখলেন তো, কথা বল্লেই অমৃত হয় না। Divine musicians even betray.

মিঃ সেন। Oh ho, what a lawyer, a Danial came to Judgement.

মিঃ সরকার। কি রকম হলো, রসিকতাটা তো একেবারেই ধরতে পারলাম না।

সাবিত্রী। Look, a savior could not save himself।

মিঃ সেন। (হাসি) হা হা হা হা, A savior couldn't save himself right, right. What a wit কবি? Oh! সাবিত্রী দেবীর আজকে যে দেখি একেবারে full form. spairing none.

মিঃ সরকার। It is definitely very bad to strike some body unaware. This is not sportsmanlike.

সাবিত্রী। There can be no law in love and war.

মিঃ সেন। সরকার Blush ক'রছে, কবি দেখ সরকার Blush ক'রছে।

মিঃ সরকার। I presume none of us is encountering either of the feats—কবি। Help me.

কবি। I dunn'o I dunn'o

(বয় কফি দিয়ে গেল)

সাবিত্রী দেবী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকলেন। সরকার rugged his shoulder.

মিঃ সেন। A saviour couldn't save himself. সরকার, ছি ছি ছি ছি—এ লজ্জা তুমি রাখবে কোথায়

সরকার। "আহা এ কি ঘোর দুস্তর লজ্জা, আঁ"।—(হাসি চেপে) সত্যি মিঃ সেন আমি নির্লজ্জ হয়ে বসতে পারছি নে।

(সাবিত্রী দেবী সরকারের দিকে কফি এগিয়ে দিলেন এক কাপ)

সাবিত্রী। কফি খান গরম গরম, দেখবেন লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। চিনি দেব ক' চামচে, বলুন!

সরকার। সোয়া দুই। তার চাইতে একটা দানা যেন কম বেশী না পড়ে।

সাবিত্রী। চিনি তো আর গুণে নিতে পারবেন না।

মিঃ সেন। Who told you.

সাবিত্রী। No, I would believe it, If it was possible for a son of man.

সরকার। (হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়) For your information only, a son of a bitch. (ছুঁড়ে ফেলে দেয় কাপ) (সবাই উঠে দাঁড়ায়।)

মিঃ সেন। সরকার!

সরকার। Shut up you bloody hound.

মিঃ সেন। What the devil do you mean.

সরকার। (ঘুরে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীকে) And I will prove it, a son of a bitch.

[সরকারের প্রস্থান।

কবি। Wait Sircar, I will come with you. Sircar.

(সাবিত্রী দেবী faint হ'য়ে পড়েন)

মিঃ সেন। কবি, শোন। কবি, কি হচ্ছে কি সব! ছুটে এসে টেবিলের ওপরকার জলের গ্লাস থেকে বার কয়েক ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারলো সাবিত্রী দেবীর চোখে মুখে। সোফার ওপর সাবিত্রী দেবীকে যুত করে শুইয়ে দিয়ে একটা বালিশ টেনে দিল সাবিত্রীর মাথার নীচে। ঠাণ্ডা জলের হাত দিয়ে ঘাড়টা মুছিয়ে দিল। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকারে দরজার কাছে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলো।

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

দৃশ্যপট প্রথম দৃশ্যের মত। দোতলার সিঁড়ির মুখে মিঃ মুখার্জ্জি দাঁড়িয়ে রয়েছে—মুখে পাইপ। ডান দিকের উইংস্-এর কাছে জনা-দুয়েক দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। লোহার গেটের পেছন দিক দিয়ে পাঁচ-ছ' জনা জোয়ান চেহারার লোককে ধাক্কা মারতে মারতে গোটা আষ্টেক পাইক ঢুকলো। কালো লোক ক'টা সামনে হুড়মুড় ক'রে পড়লো মুখ থুবড়ে ধাক্কা খেয়ে।

প্রথম শ্রমিক। এ সরকার, মাফ কিজীয়ে। কসুর মাফ কিজীয়ে। এ সরকার তেরে গোড় লাগি! আউর কভি হাম কুচভি নেহি মাঙেগা, এ সরকার। (মারতেই) আরে বাপ রে বাপ,।

প্রথম দরোয়ান। চিল্লাওগে তো বিলকুল খতম কর দুঙ্গা—শালা হারামি বেইমান কাঁহাকা।

শ্রমিকগণ। (সমস্বরে) নেহি নেহি, এ মেরে সরকার। কসুর

মাফ কিজীয়ে। ম্যায় কম্বল নেহি চাহাথা। হামে ছোড় দে রে সরকার। এ রাজা।

তু' নম্বর পাইক। আব দেখা দে হিম্মত, শালা গিদ্ধোড় কাঁহাকা। ঔর ফিন্ মু সে বাত নিকললেগি তো শালা ডাণ্ডা ঘুসা দেঙ্গে ধোঁড়য়ে। শালা হারামি···

জনৈক শ্রমিক। (আর্তকণ্ঠে) অ-র অ-র অ অ—অউই—আ।

জনৈক পাইক। চোপরাও।

দ্বিতীয় শ্রমিক। এ মেরে ভগবান—নই-নই-নই-উ-উ।

দরোয়ান। চুপরহো।

সমস্বরে। ও—ও—হো—ও—ও—হো।

মিঃ মুখার্জ্জি। আলাদা আলাদা করকে সব কৈ কো দশ দশ চাবুক লাগাও।

সমস্বরে। নেহি নেহি এ সরকার! গোড় লাগতাহুঁ, নেহি!

মিঃ মুখার্জ্জি। নেহি তো কেয়া। নেহি নেহি সরকার!

সমস্বরে। এ মেরে রাজা। এ মেরে বাপ।

মিঃ মুখার্জ্জি। লাগাও চাবুক।

সমস্বরে। হ রে—সরকার—এ বাপ্!

মিঃ মুখার্জ্জি। ছোড় দো। উস্‌বখত্ কেঁও নেহি সমঝাতে! কেত্তি দফা মাঁয় তুম লোঁগোকো বোলা কি ইয়ে গবর্ণমেণ্টকা জরুরী military অর্ডার হ্যায়; জুন মাহিনাকা অন্দরমে সমুচা কাম খতম করনা পড়েগা।

সমস্বরে। ঘাট তো রাজাজী, হামলোগ ঔর কভি কুচ নেই বোলেগা।

মিঃ মুখার্জ্জি। তুম কম্বল মাঙ্গতাহা, বালটি মাঙ্গতাহা, বাত্তি মাঙ্গতা—উ তো হাম সব মান লিয়া। মান লিয়া কেঁও কি ইয়ে চীজ্ নেই মিলনেসে তো কামকা বহুৎ অসুইস্তা হোতা হ্যায়। ব্যস, উ মান্ লিয়া তো ফিন তুম নয়া দাবী পেশ কর দিয়া—কেঁও কি মজুরী বঢ়ানা চাহিয়ে। ইয়ে কেয়া বেইমান নেমকহারামকো কাম নেহি হ্যায়! ঔর ইস্ লিয়ে তুম লোগ বিলকুল মজুতরোঁকো বোলতে রহে কি কন্‌ট্রাক্টরকা কাম ছোড় দেও—ইয়ে কেয়া ইমানদারী হ্যায়?

সমস্বরে। কসুর মাফ কিজীয়ে সরকার।

মিঃ মুখার্জ্জি। কেত্তি দফে হাম তুম সর্দ্দার লোঁগোকো বোলা হ্যায় কেয়া ইয়ে অর্ডার ঠিক ঠিক supply করোগে তো কোম্পানীসে লেবারকো বহুৎ বকসিশ, মিল যায়েগা। ব্যস্ শুনাই পড়তা নেহি। উ সব মিলেগা তব মিলেগা, মগর মজুরী বঢ়ানেকে লিয়ে যো দাবী পেশ কিয়ে হ্যায় আজভি উ মান লেও তুম,—মতলব ইয়ে থা কি নেহি? সব চোর ডাকুকু হ্যায় তুম লোগ—বিলকুল বদমাস আদমী। লাগাও চাবুক।

সমস্বরে। কসুর মাফ কিজীয়ে সরকার, ঔর কবভি এস্তা না হোগা। গোড় লাগতাহু মেরে রাজা।

মিঃ মুখার্জ্জি। দফাওয়ারী দাবীওয়ালা তুম লোঁগোকো হাম ডাণ্ডাসে আব আচ্ছিতরে সমঝা দেঙ্গে। শালা বেইমান কাঁহাকা।—বিল্লী ঔর কুত্তেকে সাথ মোকাবিলা এক ডাণ্ডা ঔর জুতিসে হো সকতা, ঔর কিসিতরেসে নেহি। বেইমান নেমকহারামকো বাচ্চা।···যাও আব লে যাও, ফাটকমে আচ্ছিতরসে বন্ধ কর দো। দানা-পানি কুছভি না দো, ঔর ফিন চিল্লাচিল্লি করে তো লাগাও চাবুক, ডাণ্ডা। দফাওয়ারী দাবীদারকো বিলকুল খতম কর দো। যাও—লে যাও জলদি।

[দরোয়ান ও মহাবীর বাদে আর সকলের প্রস্থান।

বুড়ো দরোয়ান গজানন হেলতে দুলতে সেই টুলটার ওপর গিয়ে ব'সে খইনি বানাতে লাগল থাবড়ে থাবড়ে আর মহাবীর টহল দিয়ে ফিরতে লাগলো।

গজানন। এ মহাবীর, মহাবীর!

(মহাবীর ঠাট্টাচ্ছলে এসে কুচকাওয়াজের ভঙ্গীতে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়।)

আঁ, আব, ঠিক হ্যায়। মুঝে এইসি আশা রাখনি চাহিয়ে। সাচ নেহি! ম্যায় তো এ কারখানাকা সব সে বড়া জমাদার হুঁ—মুঝে এইসি সরম করনা চাহিয়ে, ঠিক নেহি!

(মহাবীর ঠাট্টাচ্ছলে আবার সেলাম দেয়)

(গজানন হাসে) সাচ বোলা কি নেহি বোল! হে হে (হাসে)।

(মহাবীর ফের সেলাম দেয়)

আর কেয়া তু দিল্লাগী করতা হ্যায় মেরে সাথ। উঃ, হাম বুঢ়া আদমী, কারখানাকা সবসে বড়া জমাদার হ্যায়, মেরে সাথ দিল্লাগী, আঁ।

মহাবীর। নেহি তুম্ তো মেরে মালিক হো।

গজানন। তব—সেলাম দো।

(মহাবীর সেলাম দেয়।)

গজানন। হে হে, আব তো ঠিক হ্যায়, খেয়াল রাখনা, হ্যাম্ ··· কারখানাকা সবসে বড়া জমাদার হ্যায়, আঁ। হে হে—লো লেঃ, খইনি খা লে। কারখানাকা সবসে বড়া জমাদারকা খইনি লে লে।

মহাবীর। হাম তো নেহি খাতে। আচ্ছা নেহি খইনি।

গজানন। কেয়া তু বড়া জমাদারকা খইনি খারাপ করতা হ্যায় রে বুড়বাক্!

মহাবীর। তু বুড়বাক।

গজানন। কেয়া তু বড়া জমাদারনে খারাপ বাত বোলতা। ··· তেরি নকরি খতম হো যায়েগি।

মহাবীর। কোন খতম করেগা। বুঢ়া গজানন হোগি!

গজানন। তব! হাম কারখানাকা সবসে বড়া জমাদার হ্যায়, ···কো তু মানতা নেহি রে পাগলা। য়েঁ! (খইনি খায়) লো খা, হাম তুমকো মাঙ্গতা নেহি, ভাগ হিঁয়াসে। তেরি নকরি খতম হো গেয়ি! যা ভাগ।

মহাবীর। তব রে বুঢ়া।

(মহাবীর বুড়ো গজাননের পেটের ওপর সঙ্গীন তুলে ধরে)

গজানন। এই এই হে হে—আরে মর যায়েগা রে পাগলা, দেখ্ লে দেখ্ লে। গির পড়েগা। হে হে। ছোড় দে। তব রে, (জুতো তুলে ছুড়ে মারতে যায়। মহাবীর সরে যায়) হে হে, দেখ লিয়া রে তু সবসে বড়া জমাদারকো হিম্মত!

(মহাবীর আবার সঙ্গীন নিয়ে তেড়ে যেতেই গজানন বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে মহাবীরের কান টেনে ধ'রে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করে।)

আব কেয়া, হে হে বড়া জমাদারকা সাত তু দিল্লাগী কর্ রহা থা? এঁ্যা! (মহাবীর পড়ে ছটফট করে আর হাসে।)

মহাবীর। নেই নেই হাম সেলাম তুজ রে বুঢ্ঢা, ছোড় দে ছোড় দে, ই—ই—ই!

(গড়িয়ে সরে যায়)

হঠাৎ কেউ আসছে মনে করে মহাবীর সচকিত হয়ে গজাননের হাত থেকে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে সান্ত্রীর ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।

গজানন। কেয়া কোন বা?

মহাবীর। নেহি কৈ নেহি।

গজানন। কেয়া জানে কৌন হো বা।···মহাবীর, মহাবীর, দেখলে, আজ রাতমে বহুৎ হুঁসিয়ার সে টহল দেগা, আঁ, বহু চোর ঔর ডাকু রাতমে ইধর উধর ঘুমতা হ্যায় শুনা হ্যায়। কেও কি কারখানাকা অন্দরমে আটঠো জবরদস্ত ডাকু সরকার বন্ধ কর রাখ্যা হ্যায়। বহুৎ হুসিয়ারসে টহল দেগা, সমঝা।

মহাবীর। কেয়া উ ডাকু হ্যায় সব?

গজানন। তো ঔর কোন হো বা। ডাকু নেই তো কেয়া? সরকার সব কৈ কো এগ্যাই বন্ধ কর রাখ্যা হ্যায়? হুঁঃ।

মহাবীর। হাম শুনা কেয়া উ লোক তো সব মজদুর হ্যায়।

গজানন। হাঁ তো একই বাত হ্যায়! ডাকু বঁহেতে হ্যায় উন্কো।

মহাবীর। ভাগ। ডাকু নেহি।

গজানন। তো কেয়া এগ্যাই মার ডালা,—ঔর বন্ধ কর দিয়া?

মহাবীর। কুছভি খারাপ কাম কিয়া হ্যায়, কেয়া জানে!

গজানন। খারাপ কাম! খারাপ কাম কিস্কো বোলা যাতা রে? কাম্পানী যেতনা তলব দেতা উসমে তো ভর-পেট খানা মিলতাই নেহি, বাল-বাচ্চা সব ভুখা মরতা হ্যায়, ঔর ইস লিয়ে তো উলোক সব মজুরী বঢ়ানাকে বাত বোলা। ইয়ে কেয়া খারাপ কামকা বাত হ্যায়!

মহাবীর। নেহি খারাপ কাম ইয়ে ক্যায়সে হোগা!

গজানন। তো তব তু সে বোলা উ খারাপ কাম কিয়া হ্যায়?

মহাবীর। কোন! হাম নেই, বুঢঢা, তু বোলা, ডাকু কোন বোলা আগাড়ি?

গজানন। হাঁ রে হাঁ মান লেতা। হাম বোলা হ্যায়। লেকিন দেখ লে, মালুম কর লে আব তু সব কৈ কা ঢং—ডাকু কিস্কো বোলা যাতা হ্যায়। সরকার কেয়া এগ্যাহি মার ডালা হ্যায় উন লোগ্‌কো?

মহাবীর। কেয়া জানে বাবা।

গজানন। আঁ, তো ইস লিয়ে হাম বোলতে রহে হ্যায় কি ইয়াদ্ কর লে সব। কেয়া বাবা নয়া সনসার কা ঢং।

(সুর করে) দুনিয়া রঙ্গমে বদলি বাবা, দেখলে নয়া—ঢং।

মহাবীর। হে হে হে হে, বুঢ্ঢাকা গানা হোতাহি নেহি, হে হে—

গজানন। হাসনে লাগা তু! কেয়া বোলেগা বাবা তুমকো—শালা বিলকুল ঘোড়া হো গিয়া রে তু পাগলা,—বিলকুল ঘোড়া হো গিয়া। দুখদরদ সব নাশ হো গিয়া তেরা।

মহাবীর। (ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে) হে-স্-হেস্—স্-স্।

গজানন। বা ভাগ, তেরা কাম্ তু করলে, দে টহল দে, রাতভর টহল দে—ডাণ্ডা ঔর বন্দুক ঔর চাবুক ঔর জীনকা পিয়ায় চুহা—ই সব্ লেকে ভররাত খট্ খট্ খট্ টহল দে!

[ক্রমশঃ।

শিল্পী: কানু মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্য্যায়

১

কথাটা একটু উঁচুদরের দার্শনিকতার মতো শোনায়, কিন্তু সুখ-দুঃখ সত্যই আপেক্ষিক। এক সময় যাহা অশ্রু উদ্বেল করিয়া তোলে, তাহারই মধ্যে কোথায় যে আনন্দের, মুক্তির উপাদান লুকানো থাকে বোঝা যায় না। একদিন ভগ্নহৃদয়েই পাগুল ছাড়িতে হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল জীবনের সব সঞ্চয় বুঝি বিনষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু উত্তর জীবনে এইটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাগুল ছাড়াটা, জীবনের পূর্ণতর উপলব্ধির জন্ত গিরিবালার প্রয়োজন ছিল। হয়তো সব সময় বোঝা যায় না, কিন্তু প্রবাসমাত্রেই জীবনকে খানিকটা পঙ্গু করে, আরও বেশি করিয়া করে যখন সে-প্রবাসের অর্থ পাগুলের মতো একটা সঙ্কীর্ণ পল্লী-জীবন। বাঙালী মেয়ের জীবন ছড়ায় সংসারের মধ্যে দিয়া—স্বামি-পুত্র-কন্তা, স্বজন-পরিজন লইয়া এই গৃহস্থালীর সংসারটা তাহার জগৎ—বাইরের যে বড় জগৎ সেখানে সে চিরদিনই অসূর্য্যম্পশ্যা। সেই জন্ত তাহার সংসারটি একটা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে পাতিতে না পারিলে তাহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয় না; জীবনকে আরও পাঁচ জন বড়, ছোট, সমকক্ষর সঙ্গে মিলাইয়া দেখা যায় না। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বড় হইয়া থাকিলে মনে হয় দিব্য আছি, চরমে প্রতিষ্ঠিত আছি, একটু নামিয়া গেলে মনে হয় অতলে ডুবিয়া গেলাম, আর উপায় নাই।

অবশ্য পাগুলের স্মৃতি চিরকালই মিষ্ট ছিল, খানিকটা কারুণ্যের সংযোগে আরও মিষ্ট—অতি, খঞ্জনী, নূতন জীবনে বিদেশিনী সঙ্গিনী সব, স্বজাতি-বিরহের মধ্যে দুইটি পরিবারের স্নিগ্ধ জীবন—এক অন্তকে পূর্ণ করিয়া; তবু কিন্তু এক একবার এক ধরণের কাতরতার সহিতই পাগুল মনে পড়িত, গিরিবালা হাসিয়া বলিতেন—"জেঠামশাই কী বনবাসেই পাঠিয়েছিলেন যে! ঐগানেই যদি পড়ে থাকতে হোত!"

মায়ের প্রথম দ্বারভাঙ্গায় আসার ব্যাপারটা শৈলেনের বেশ [illegible]

থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে,—পাঁতরার মতো পাঠশালা বা মাইনর স্কুল নয়, একেবারে বড় হাই স্কুল না হোক, তবু হাই স্কুলেরই অংশ একটা, ছোট ছোট বাঙালী ছাত্রদের জন্ত রাজের হাই স্কুলের একটা শাখা। ক্লাসের সংখ্যা কম বলিয়া অল্প বয়সের ছাত্ররাও বেশ মাতব্বর। কত রকম কথা জানে, কত রকম নূতন ছড়া, সে সবের কি অদ্ভুত মানে!—পাগুলের কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারে না। একটা ছড়া রাজস্কুলের হেড মাষ্টারের টাক লইয়া, ফোর্থ ক্লাস, অর্থাৎ এখানকার সব চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র ঘোঁৎনা রচনা করিয়াছে। ঘোঁৎনা নিজেই কি একটা বিরাট ব্যাপার! তিন বছর এক ক্লাসে আছে—এক দিন থার্ড মাষ্টারের মুখের ওপর বলিল—"আমার গোঁফ বেরিয়ে গেছে স্যার, বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বললে কথা রাখতে পারব না, বাবাও আমায় ঘোঁতন বলতে সুরু করে দিয়েছেন। ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে তো?"

—হেড মাষ্টার পর্যন্ত শুনিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

পাঁচুর বাবার নাম শিবনাথ, কোন মাষ্টার অনুপস্থিত থাকিলে মাঝে মাঝে পড়াইতে আসেন, পাঁচু সোজা 'শিবুদা' বলিয়া ডাকে! শৈলেনের নিজের কানে শোনা, ওদের ক্লাসেই পড়ে পাঁচু। বলে—"পাড়ার সবাই ঐ বলে ডাকে, আমি তো তবু নিজের ছেলে রে!"

এ তো গেল স্কুলের কথা, তা ভিন্ন দ্বারভাঙ্গা সহর, রাজার জায়গা, প্রতিনিয়তই সেখানে কত কি হইতেছে। বহু দিন আগে একবার শশাঙ্ক আর শৈলেন পাগুলে গিয়াছিল, তখন বাংলা স্কুলেও এত শেখে নাই, দ্বারভাঙ্গা সম্বন্ধেও এতটা জানিত না, তাইতেই এ-বাড়ির ও-বাড়ির সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিল, নেহাৎ জেঠামশাই, বাবা না হোক, মা-জেঠাইমা পর্যন্ত তো নিশ্চয়। মা আবার জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া শুনিতেন, যেন জারাইয়া জারাইয়া।...সে গেল অনেক দিন আগের কথা, তাহার পর দুই ভাইয়ে আরও অনেক কিছু দেখিয়াছে, শিখিয়াছে, আরও বেশি করিয়া সহুরে হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে পাগুলের জীবনটি আরও দীন করিয়া হইয়া গেছে সোঁদা। একটা অদ্ভুত ধরণের অনুকম্পা লাগিয়া থাকে—ছোট ভাই-বোনদের উপর তো বটেই—মা, খুড়িমাও বাদ যান না—আহা, কত কম জানে!—পাগুলের মানুষ সে!—পাড়াগাঁয়ের!...শোনাবার পক্ষে মা যেন আরও ভালো। মা বড় বলিয়া শোনাবার সময় নিজেকে [illegible]

সেই মা আসিতেছেন, খবর শুনাইবার জন্ত দুই ভাইয়ে যেন রেষারেষি পড়িয়া গেছে।

দাদার মনেও যে এই একই প্রবাহ সে-খবর শৈলেন কতকটা আকস্মিক ভাবেই টের পাইল।—গুন্-গুন্ করিয়া গানের সঙ্গে হাতের-লেখা লিখিতেছিল, শশাঙ্ক—"কি লিখছিস, দেখি"—বলিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, দু'-একটা অক্ষর সম্বন্ধে এলোমেলো অভিমত দিয়া বলিল—"হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ে গেল,—মা এলেই শৈল যেন—'শুনেছ মা, শুনেছ মা'—বলে তাঁকে উত্তমফুত্তম করে তুল না, তেতে-পুড়ে আসছেন একে।"

শৈলেন ঠিক না বুঝিয়াই হোক, বা কতকটা সন্দেহেই হোক, ঘুরিয়া দাদার মুখের দিকে একটু চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বিজ্ঞের মতো স্বরটা গম্ভীর আর হ্রস্ব করিয়া বলিল—"মা এলে তো আগে পায়ের ধুলো নোব।"

ঘুরিয়া আবার লিখিতে লাগিল।

একটু নীরবে গেল। তাহার পর শশাঙ্ক আবার গলাটা অভিভাবকের মতো করিয়া বলিল—"পায়ের ধুলো নিয়েই যত রাজ্যের গল্প এনে জড়ো করবে তো? জিরুতেও দেবে না একটু?…"

শৈলেন লিখিতে লিখিতেই একটু ভাবিয়া লইল, না ঘুরিয়াই উত্তর করিল—"জিগ্যেস করলে আমি কি করব? অবাধ্য হোতে পারি না তো?—গুরুজন…"

এবার শশাঙ্কর একটু চুপ করিয়া থাকিবার পালা গেল, তাহার পর কাঁধটায় ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"আচ্ছা, সে আমি দেখে নোব'খন, জিগ্যেস না করলেই হোল তো?"

মন-জানাজানি খানিকটা হইয়াই গেল, আর ঢাকাঢাকি দরকার নাই। শৈলেন কলম ছাড়িয়া ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—"তুমি বুঝি আগে ভাগে বলে দেবে সব?"

শশাঙ্ক আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বরে বলিল—"আমি বড়ো, বাঃ!"

শৈলেন স্থির দৃষ্টিতে দাদার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর "বেশ" বলিয়া আবার লিখিতে সুরু করিয়া দিল।

ছেলেবেলার এই "বেশ" কথাটা মারাত্মক; শশাঙ্ক খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"বেশ" বললি যে, করবি কি তুই?"

"আমি যা বলবার বাবাকে বলব।"

তাহার মানে নালিশ,—দীর্ঘ ফর্দ আছে তাহার, ছেলেবেলায় যা এবেলা-ওবেলা ফর্দ বাড়িয়া চলে। অবশ্য শৈলেনের বিপক্ষেও আছে—দীর্ঘতর, কিন্তু সে একটু গোঁয়ার গোছের, প্রহার-লাঞ্ছনাকে ততটা গায়ে মাখে না।…অনেক তর্ক-বিতর্কের পর একটা রফা হইল: কতকগুলো খবর শশাঙ্ক দিবে, কতকগুলো দিবে শৈলেন।—রাজের … মাছটাকে … পায় … কিছু …—সে খবরটা দিবে শশাঙ্ক, তেমনি শৈলেনের ভাগে রহিল …—কাপরাইট গোছের—তাহার একটা শব্দও শশাঙ্ক মায়ের … বলিতে পারিবে না। … সরকারি … নিমন্ত্রণের কথাটা বলিবে শশাঙ্ক, কলিকাতা হইতে কি কি … আনিয়াছিল সে সমস্তই, তেমনি … আগুন লাগার … দিবে শৈলেন—ধরো যদি ভুলিয়া বলিয়াই ফেলে সে তাহাতে একটা লোকও পুড়িয়া মরিয়াছিল তো শশাঙ্ক কিছু বলিতে পারিবে … তাহার ভাগে তো … [illegible]

কে কে পড়ে, আর কে কি-রকম—সে নিজের নিজের। হেড মাষ্টার শশাঙ্কর, তেমনি সেকেণ্ড আর থার্ড মাষ্টার শৈলেনের ভাগে। রাজের ইন্দ্রপূজাটা লইয়া একটু গোল বাধিল। সে একটা বিরাট ব্যাপার;—পূজা-অংশটা অনুষ্ঠিত হয় দেউড়ির ঠিক বাহিরেই—যাগযজ্ঞ, সাত-আট দিন ধরিয়া মেলা, কত দেশ থেকে কত রকম দোকান পাট আমদানি হয়, কত নূতন ধরণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা; লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। তাহার পর বিসর্জনের অংশটা,—ষ্টেশনের কাছে, শৈলেনদের বাড়ির পাশেই বিরাট দীঘিটার চারি দিকে বাঁশ-বাঁখারির খিলান করিয়া তিন থাকে কাচের গেলাসের মতো এক-রকম প্রদীপ টাঙাইয়া দেওয়া হয় অজস্র, তাহাতে আবার রঙিন তেল দেওয়া; রাস্তার দু'ধারে মিনা বাজার বসে, আর প্রশস্ত দীঘিতে অসংখ্য নৌকা—সাঁতরায় গঙ্গার বড় বড় ভাউলিয়ার মতো—আলোয় আলোয় ছয়লাপ—নাচ-গান আতসবাজি…দুইটা মিলাইয়া প্রায় এক পক্ষ ধরিয়া ইন্দ্রের আগমনে সমস্ত সহরটা যেন সত্যই অমরাবতী হইয়া ওঠে।…ও-সব না হয় হইল; কিন্তু এই ইন্দ্রপূজার বর্ণনাটা কে দিবে মায়ের কাছে? এটা যার ভাগে পড়িবে দাঁড়ি-পাল্লাটা তাহার দিকে এমন ঝুঁকিয়া যাইবে যে সমস্ত ভাগ-বাঁটরা একেবারে নিরর্থক হইয়া যাইবে। কাহিনীটাতে গাল ভরিয়া বর্ণনা করিবারও অনেক মাল-মসলা; তা' ভিন্ন আর একটা মস্ত বড় লোভ—মা বেলেতেজপুরের সিংহবাহিনী পূজার কথা বলেন, মাকে স্বীকার করিতে হইবে দ্বারভাঙ্গারই জিৎ। এরা সব এখন দ্বারভাঙ্গারই মানুষ—মা বেলেতেজপুরের চেয়ে কত বড় জায়গায় এলেন এ কথা জানাইয়া দেওয়ার গৌরব অন্তের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চলে কি করিয়া?

শশাঙ্কর অঙ্কের মাথাটা ভালো, ব্যাপারটাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া সমস্যাটা মিটাইল—দেউড়ির অংশ আর দীঘির অংশ। লটারিতে দেউড়ির অংশটা শশাঙ্কের ভাগে পড়িল। একটু ক্ষুণ্ণ হইল মনে মনে,—শুকনো ডাঙার মেলা বাচখেলার সামনে নিষ্প্রভই, একটু ভাবিয়া, আনন্দের একটা বুক-ভরা নিশ্বাস টানিয়া বলিল—"ভালোই হোল আমার।"

শৈলেন সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"ভাসানের মেলা তো বাড়ির কাছেই হবে, মা দেখবেনই এই ক'মাস বাদে।"

শৈলেন বলিল—"আমি দেউড়িটা নোব।…"

শশাঙ্ক সহজে রাজি হইতে চাহিল না, তবে শেষ পর্য্যন্ত হইল রাজি, বলিল—"তাজ্জব হোক তুই ছোট ভাই।"

কিশোর-মনের একটা প্রবণতা হিসাবে কথাগুলা মনে পড়ে, বেশ কৌতুক বোধ হয়, কাহার কি গল্প বলা হইয়াছিল, কি হয় নাই তত মনে নাই। এটা মনে আছে যে, সমস্তদাই কিছু বলা হয় নাই। বাড়ির নিচেই ছোট গাড়ি, বাঁশের পুলের উপর দিয়া দুই ভাই তাঁদের প্রতীক্ষায় রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়াইল, বাকা গেছেন ষ্টেশনে…ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। নামিলেন সবাই; এরা মুখে অনেক আস ফুটাইয়া আছে, উরা কিন্তু সবাই বিষণ্ণ। শশাঙ্ক-শৈলেনের স্বপ্ন ভঙ্গ—বিষণ্ণ হইবার তো কথা—মুখের ভাবটা বদলাইয়া লইল, বা আপনিই বদলাইয়া গেল। বোধ হয় গাড়ির [illegible]

বাবা, কাকা কেমন একটা ক্লান্ত অবহেলায় জিনিষ-পত্র নামাইতে লাগিলেন। ঠাকুরমা, মা, খুড়িমা বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তিন জনেই একটা একটা কি প্রশ্ন করিলেন—মায়ের কথাগুলা মনে আছে—"তোরা ভালো আছিস্ তো রে?"—গলাটা একটু ধরা।

পুলটা পার হইয়া এদিকে পা দিতেই মা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আসিয়া একটু একলা পাইয়া শৈলেন খুড়িমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁদছেন কেন গা মা খুড়িমা?"

খুড়িমার চোখ দুইটিও ভিজিয়া গেছে, আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন—"অহিকে যে আনতে পারলেন না, বাবা।"

এমন কিছু ব্যাপার নয়,—সবাই বিষণ্ণভাবেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, বেশির মধ্যে মায়ের চোখে না হয় দুই ফোঁটা জল। কিন্তু শৈলেনের বেশ মনে পড়ে ঐটুকুতেই সেদিন তাহাকে বেশ অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল। হইতে পারে যে ঐ অশ্রুর জন্যেই অত আড়ম্বর করিয়া জমানো গল্প বন্ধ রাখিতে হইল বলিয়া ওর কিশোর-মন একটা ধাক্কা খাইয়াছিল, অন্য কিছুও হইতে পারে—ঠিক মনে পড়ে না, এখন শুধু এইটুকুই মনে পড়ে যে ঐ একরত্তি চোখের জলে মা সেদিন আর সকলের চেয়ে আলাদা হইয়া গিয়াছিলেন। মায়ের যেন একটা নূতন রূপ খুলিল যাহাতে শৈলেনের মনটা একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে ভরিয়া রাখিল। ঠাকুরমা, বাবা, খুড়িমা—কেহই দূরে গেলেন না, তবে মা যেন পূর্বের চেয়ে আরও অনেক কাছে আসিয়া পড়িলেন।···ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না; ঐ বিস্ময়ের পাশেই কখন বিষাদ আসিয়া জড়ো হইল; চিররুগ্ন, ম্লানদৃষ্টি অহির জন্য বুকটা টন্-টন্ করিতে লাগিল। অর্থাৎ মায়ের চোখের জলে বাড়ির হাওয়ায় যে একটা করুণ সুর উঠিয়াছে, শৈলেনের সমস্ত মনকে সেটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ছেলেবেলার মন, অহেতুকী তাহার গতি, সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই হইল যে এই বিষাদই এক সময় একটা অকারণ অভিমানে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বিষণ্ণভাবে এদিক্-ওদিক্ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে শৈলেন খালের ওপারে একটা নির্জন জায়গায় গিয়া বসিল।...সে যেন মরিয়া গিয়াছে, অহির মতো; তাহার পর কত কি হইয়া গেল, পাণ্ডুল ছাড়িয়া আজ যেমন সকলে দ্বারভাঙ্গায় আসিয়াছেন, তেমনি দ্বারভাঙ্গা ছাড়িয়া আবার যেন অনেক দূরে কোন্ এক জায়গায় গিয়াছেন।···সকলেই আছে, শুধু শৈলেন নাই। সবাই নূতন ঘরে উঠিল, বিষণ্ণ, শুধু মায়ের চোখে দুই বিন্দু জল চক-চক করিতেছে—শৈলেনকে যে আনিতে পারিলেন না তিনি।··· নির্জনে বসিয়া শৈলেনের চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল ঠোঁট দুইটি বারংবার থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।···কিসের থেকে যে কি হইয়া যাইত ছেলেবেলায়!

অবশ্য সমস্ত স্মৃতিটা যে এই রকম করুণ তা নয়। অনেকক্ষণ গুমরিয়া গুমরিয়া একটু রাত হইতে যখন ঘরে আসিল দেখে একটা আলোর সামনে বসিয়া শশাঙ্ক প্রবল উৎসাহে ইন্দ্রপূজার বাচখেলার গল্প বলিয়া যাইতেছে—মা, খুড়িমা, হরেন, টাবু—না আবার শুনিতেছেন সব চেয়ে যেন বেশি আগ্রহের সহিত, শশাঙ্কর পিঠে ডান হাতটা, ঘাড়টা তাহার পানে ফিরানো, মুখে একটু একটু হাসি।

শৈলেনের মনটা আবার একটা ধাক্কা খাইল,—বাঃ, তাহার এমন চমৎকার গল্প বলিবার সন্ধ্যাটা তা'হলে শুধু শুধুই তো বেশ নষ্ট হইয়া গেল!

মনটা দাদার উপর আক্রোশে মিশান, এক-রকম ঈর্ষায় আর মায়ের অদ্ভুত আচরণের জন্য নিরাশায় সে কী উৎকট ভাবেই ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে কথাও খুব স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে।

২

দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হইল। প্রথমেই মনটা এখানকার বাড়ির বড় বড় জানালা দেখিয়া যেন প্রসার লাভ করিল।··· পাণ্ডুলের সেই ঘুলঘুলি, সেই উগ্র অবরোধ,—গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে মনটা হাঁপাইয়া উঠিলে, অতি কষ্টে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে বাহিরের জগতের সামান্য একটু পরিচয় লাভ,—গুটিকতক গাছ, মাঠের একটা ছোট্ট ফালি, চারি দিক থেকে অবরুদ্ধ আকাশের একটুখানি নীলিমা,—সব একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।···এখানে বড় জানালার কাছে দাঁড়াইলে একটা গোটা দিকের প্রায় সমস্তটা ধরা দেয়। তা' ভিন্ন তাহাতে কত বিচিত্রতা! বাড়ির প্রায় গা ঘেঁসিয়াই খালটা—এখানে বলে নহর। নিতান্ত অপরিসর, কিন্তু সেই জন্য আরও চমৎকার লাগে। শ্রাবণের শেষ। নদীতে একটা বন্যা আসিয়াছে, নহর বহিয়াই তাহার জল একটি সংযত স্রোতে চলিয়াছে সামনের দীঘিটার পানে—ও-দীঘির পর আর একটা দীঘি, তাহার পর আর-একটা।···চণ্ডীচরণ বলিলেন—"বৌদি, দীঘি-পুকুর দেখতে হয় তো দ্বারভাঙ্গা; তুমি বর্দ্ধমানের গল্প কর, কাছে ঘেঁসতেই পারে না। একদিন গাড়ি করে তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসব, তখন বলবে!"

নহরের পরে অল্প একটু জমি, মাঝখানে একটা পুরানো ইঁদারা। তাহার পরেই আবার একটু খানা-গোছের, নহরে আর সেটায়—মাঝখানের জমিটুকুকে যেন একটা ছোট্ট দ্বীপ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরই প্রশস্ত টানা রাজপথ—সব মিলিয়া—বাড়ি থেকে সাত কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই। রাস্তাটা গাড়ি-ঘোড়া, নানা রকমের মানুষে সদাই গম-গম, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে বসিয়া, বেশ নিশ্চিন্তভাবেই বসিয়া বসিয়া দেখা যায়। আসিবার তৃতীয় দিনের কথা,—গিরিবালা রান্নাঘরে ছিলেন, ছোট জায়ের ডাকে ঘরের জানালার সামনে আসিয়া একেবারেই একটা নূতন জিনিষ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।—সামনে আর পিছনে দুই জন করিয়া চারি জন ঘোড়-সওয়ার—চামড়ায়-পিতলে ঝকমকে সাজ ঘোড়ার—লাল, মোটা বনাতের ওপর জরির কাজ-করা পোষাক ঘোড়সওয়ারের। মাঝখানে আরও অপূর্ব্ব ব্যাপার—মখমলের সাজ পরা, মাথায় সামলা দেওয়া, ষোল বেয়ারার একটা পালকি, মখমলের উপর অজস্র সাঁচ্চার কাজ-করা তাহার ঘেরাটোপ, দুই দিকে চার পাঁচ জন করিয়া নানা রঙের কাপড়-পরা দাসী, দুই জন ঘেরাটোপের গায়ে রূপায় বাঁধানো চামর দুলাইতে দুলাইতে চলিয়াছে, বাকি কাহারও হাতে সোনা-রূপার গঙ্গাযমুনী ঝারি, কাহারও হাতে রূপার পানবাটার মতো কি, প্রায় সব হাতেই রূপার মোটা মোটা গহনার ঝলমল। দুই জায়েই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—

কথাটা মুহূর্তের জন্ম যেন ছেলেমানুষ হইয়া গেছেন—রূপকথার খানিকটা জীবন্ত হইয়া সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

শশাঙ্ক স্কুলে যাইবে, ভাত চাহিতে আসিয়া মা-মাসিমা'র অবস্থা দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার গুমরে মনে মনে ফুলিয়া উঠিল। বাহিরে নিতান্ত অবহেলার সহিত চাহিয়া দেখিয়া বলিল—"রাণী দেখছ বুঝি? —আমাদের স্কুলের কাছ দিয়ে তো রোজ মন্দিরে যান।"

রাজধানীর বড় রাস্তা, সাধারণে অসাধারণে মিশানো নিত্য এই জনস্রোত; একটু মনটা চঞ্চল হইলেই গিরিবালা একবার জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়ান। রাজপথের পরে একটা আমবাগান, তাহার পরই গাড়িতে-ইঞ্জিনে গমগম দ্বারভাঙ্গার প্রকাণ্ড রেল-ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ। নিজ, ষ্টেশনটা একটু ওদিক্ পানে বলিয়া যাত্রীর কোলাহলটা অত কানে আসে না—শুধু গতিশীল জগতের একটি পরিপূর্ণ রূপ চোখের সামনে সদাই নিজেকে মেলিয়া ধরিয়া থাকে। পাণ্ডুলের মতো অসহায় মনে হয় না, মনে হয় না যে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আছি—সে যে এক কি অসহ্য মনের ভাব!

ছোট-জা একদিন কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"দিদি, পাণ্ডুলের সম্বন্ধে অবিশ্যি বলতে নেই একথা—বাবা পাণ্ডুলেই এসেছিলেন তো—তবু ধরো দ্বারভাঙ্গাতেই যদি এঁদের ভালো কাজ হয়, এখানেই যদি থাকতে পাই আমরা…"

অনেক দিন পরে এই ধরণের একটা মনোভাব গিরিবালার মুখেও প্রকাশ পাইয়াছিল, সামান্ত উপলক্ষ্যেই। একটা ছোটখাট কি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে; শশাঙ্ক প্রথম স্থান পাইয়াছে—মাকে আসিয়া খবর দিল। গিরিবালা স্থির নেত্রে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—হবিই তো, তোদের বিকাশ-মামার আশীর্ব্বাদ, তোরা বড় জায়গায় বড় হবি ব'লে ভগবান আমাদের এনেছেন দেখছিস না?"

সত্যই, পাণ্ডুলের চেয়ে এখানে মনের আশাও বড় হইয়াছে; সবার আশীর্ব্বাদ ফলুক এখানে—জেঠামশাই, বাবা, পণ্ডিতমশাই, কাতু মাসি, বিকাশ দাদা—সবার প্রাণ-ঢালা আশীর্বাদ; যাহাদের লইয়া জীবন তাহারা এইখানে বড় হইয়া গিরিবালার জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলুক।

জায়গার মতো মানুষের সঙ্গেও পরিচয় হইতে লাগিল। আসিবার দ্বিতীয় দিনের কথা: সন্ধ্যা হইয়াছে, জিনিষ-পত্র এখনও সব গোছানো হইয়া ওঠে নাই, নিস্তারিণী দেবী ঘরের মধ্যে সেই কাজেই ব্যাপৃত আছেন, গিরিবালা শাঁক বাজানো শেষ করিয়াছেন, এই-বার ধুইয়া তুলিয়া রাখিবেন এমন সময় সদর দোর বাহিয়া জন-চারেক স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক জন বর্ষীয়সী, বিধবা, সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে যতটা বোঝা গেল বেশ টকটকে রং, কাঁচি দিয়া ছাঁটা চুল কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাকি তিন জনের মধ্যে এক জন প্রায় গিরিবালারই মতো, এক জন বছর কয়েকের ছোট হইবেন। একটি ছোট মেয়ে, বছর বারো কি তেরো বয়স। পাণ্ডুলের কড়া পর্দার অভ্যাসে এদেশে ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক ঠেকিল যে গিরিবালা যেন মূঢ়ের মতো ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। অদ্ভুত অভ্যর্থনা দেখিয়া উঁহারাও একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন, বড় দুই জনের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত ছোট তিনি হঠাৎ দুই পা বাড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—"মুখফোড় বলে আমার বদনাম আছেই, রাগ করবেন না বৌদি, আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের দূর থেকে দেখেই বুঝি আপনি শাঁক বাজিয়ে অভ্যর্থনা করবেন, কিন্তু এখন দেখছি…"

দলের মধ্যে অল্প একটু চাপা হাসি উঠিল। ততক্ষণে গিরিবালারও সম্বিৎ হইয়াছে, শাঁকটা তুলসীমঞ্চের উপর রাখিয়া আগাইয়া গিয়া বলিলেন—"আসুন, আসুন।"

বর্ষীয়সী এবং তাঁহার অপর সঙ্গিনীকেও বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া, ছোট মেয়েটির মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"এসো মা।"

একটু লজ্জায় পড়িয়া গেছেন, জড়িত কণ্ঠে আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বর্ষীয়সী বলিলেন—"ননীর কথায় কেউ কান দেয় না মা, কিছু মনে করো না। শাশুড়ী কোথায়?"

যাঁহাকে ননী বলা হইল তিনি ঠোঁটে হাসি চাপিয়া বলিলেন—"বুদ্ধিমান হলেই দেয় কান; নইলে তো এতক্ষণ ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকতেন হাঁ করে।"

এবার সকলে একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, তাহারই মধ্যে গিরিবালা বর্ষীয়সীকে বলিলেন—"মা ঘরেই আছেন, ডেকে দিই।"—বলিয়া একটু পা চালাইয়াই ভাঁড়ার-ঘরের পানে চলিয়া গেলেন, এবং তখনই একটি কম্বল হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনারা বসুন, মা এলেন বলে।"

বারান্দায় কম্বলটা বিছাইয়া দিলেন।

ওঁদের বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তারিণী দেবী হাত-পা গামছায় ভালো করিয়া মুছিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুলের অভ্যাসে ওঁরও একটু আড়ষ্টভাব, বর্ষীয়সীই বলিলেন—"আমরা এলাম আপনাদের এখানে বেড়াতে।"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বড় আহ্লাদের কথা; আমরা আপনাদের আশ্রয়েই এসে পড়েছি।"

সঙ্গিনী তিন জনকে প্রণাম করিবার আদেশ করিয়া বর্ষীয়সী বলিলেন—"বিদেশে সবাই আমরা পরস্পরের আশ্রয়।…চণ্ডীর মুখে, আপনারা এসেছেন শুনে কাল ভাবলাম যাই, সন্ধ্যের পরে একটু আটকে গেলাম—পোড়া জায়গায় দিনমানে তো আর বেরুবার জো নেই, পর্দা নষ্ট হবে। আর, এটুকু পথ গাড়ি করে আসাও চলে না।"

প্রণামের পালার মধ্যে গিরিবালা একটু ফাঁফরে পড়িয়াছেন। এঁরা ব্রাহ্মণ না কি? বধূর অস্বস্তির ভাবটা বুঝিয়া নিস্তারিণী দেবীও কি করিয়া তত্ত্বটা সংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, ননীবালা হাসিয়া বলিলেন—"বৌদি, মা আমাদের বামুনেরই মেয়ে।"

সবাই একসঙ্গে একটু হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালা তাড়াতাড়ি নত হইয়া পায়ের ধুলা লইলেন, বর্ষীয়সী আশীর্ব্বাদ করিয়া নিস্তারিণী দেবীর দিকে একটু চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দেখলেন তো?—মুখে একটু যদি আগল থাকে, আমাকে পর্যন্ত নিয়ে…"

পরিচয় হইল। এঁরা এখানকার পুরানো বাসিন্দা। যেমন হিসাব পাওয়া গেল, মধুসূদন যে-সময় পাণ্ডুলে আসেন ইঁহার স্বামীও প্রায় সেই সময় বরাবর দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং চাকরি ও সেই সঙ্গে নানা রকম কারবার করিয়া এই সহরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বছর দুয়েক হইল তাঁহার

স্বর্গলাভ হইয়াছে, এখন বড় ছেলে কারবার দেখেন। তিনি ছাড়া আরও তিনটি ছেলে, তাহারা লেখাপড়া করে, খবর পাওয়া গেল একটি শশাঙ্করই সহপাঠী। গল্পচ্ছলে যতটা পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে নিস্তারিণী দেবী আর গিরিবালা বুঝিলেন, সহরে এঁদের বেশ প্রতিপত্তি আছে, বাঙালী সমাজে তো বটেই, তাহার বাহিরে পর্যন্ত। কথাবার্ত্তার মধ্যে চমৎকার একটি মার্জিত রুচির ছাপ, বর্ষীয়সীর তো বটেই, বাকি তিন জনেরও। তিনটির মধ্যে বড়টি পুত্রবধূ, মাঝেরটি কন্যা, এবং ছোটটি দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার কন্যা; সম্বন্ধে নাতনি। পুত্রবধূটি বৌ-মানুষ বলিয়া একটু স্বল্পবাক্, ছোট মেয়েটি নেহাৎই ছোট, ঠাকুরমার গা ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। মেয়েটি কথাবার্ত্তায়, গতিবিধিতে একটু মুক্ত, একটু বেশি রহস্যপ্রিয়ও।···বাঙালীর মেয়েছেলে পথ বাহিয়া দেখা করিতে আসিল দেশের মতোই—গিরিবালার শুধু যে ভালোই লাগিতেছিল এমন নয়, আশ্চর্যও বোধ হইতেছিল। এঁদের মুখেই শুনিলেন অনেক বাঙালী পরিবারের কথা—দূরের কথা আলাদা, তবে পাড়ার মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া-আসা আছেই। বর্ষীয়সী একটু দুঃখ করিয়া বলিলেন—"তবে ঐ সন্ধ্যের পর। দেশের মতো দুপুর হোল, কি বিকেল হোল, একবার কাছে-পিঠে থেকে বেড়িয়ে এসে মনটা হালকা করে এলাম সেটি হবার জো নেই। নেহাৎ গায়ে-গায়ে বাড়ি হোল, চোরের মতন এদিক ওদিক দেখে ছুট করে যদি চলে যেতে পারা গেল তবেই; কী কঠিন পর্দা দিদি, বোলো না আর; কত পাপেই যে বিদেশে বুড়ো বয়স পর্যন্ত ক'নে বৌয়ের মতন কাটাতে হোল···"

কতকটা যেন আপনা-আপনিই গিরিবালা শাশুড়ীর পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বৌমার আমার পাড়ুলের কথা মনে পড়ে গেল। আপনি এইতেই দুঃখু করছেন, সে-পর্দা যদি আবার দেখ্‌তেন!"

ননীবালা বলিলেন—"আমরা কিন্তু মার মতন অত মানি না জেঠাইমা।"

বর্ষীয়সী বলিলেন—"তোরা মানিস্ না, তোদের মানায়; তোরা হলি এখানকার ঝিউড়ি মেয়ে, এখানেই জন্ম, এখানেই সব। বুড়ো হলেও আমরা তো বউই এখানকার, বলুন দিদি?"

ননীবালা নিজের ভাজের পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"বৌদিদিও মানেন না।"

তিনি শঙ্কিত-ভাবে বলিলেন—"ওমা, এমন কথা বলো না ঠাকুরঝি, আমি আবার কবে না মানলাম?"

"এই যে বেড়াতে এলে, সন্ধ্যেই হোক, আর যাই হোক, বৌমানুষ তো?"

"ওমা, এ তো মার সঙ্গে এসেছি!"

"শুনছ মা নিজেই এখনও বৌ-মানুষ!"

সকলেই এক-সঙ্গে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বর্ষীয়সী হাসির মধ্যেই অনেকটা ক্লান্তভাবে বলিলেন—"পারি না আর তোর জ্বালায়। চোপোর দিন এই করছে দিদি, আর বলবেন না। অত কথা কি, আপনাদের বাড়িতে এই প্রথম এলো, ঢুকতে না ঢুকতেই বৌমার সঙ্গে···"

ননীবালা বলিলেন—"তোমারই বৌমা, আমার তো বৌদিদিই।"

"তা' বলে প্রথম সম্ভাষণেই ঠাট্টা করতে হবে?"

"ননদ হয় ঠাট্টা করে, নয়তো কোঁদল, কোনটে ভালো হোত বল না?···শুনুন্ জেঠাইমা, এতগুলি লোক বাড়িতে ঢুকলাম, বৌদি কোথায় এসে 'আসুন বসুন' বলে খাতির করবেন, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—কোঁদলের ব্যবস্থাই তো? সে জায়গায় যদি কোঁদল না করে ঠাট্টা করে থাকি···তাহলে তো দেখছি আসাই মুস্কিল।···"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"না মা, তুমি সর্বদাই এসো আর নিজের ভাজ জেনে কোঁদল-ঠাট্টা যখন যা খুশি তাই কোরো; একটি নয়তো, দু'টি ভাজ তোমার এখানে, বিদেশে পাড়াগাঁয়ে থেকে ওঁরা যে কী মানুষ-কাংলা হয়ে গেছেন!"

আরও খানিকক্ষণ গল্পের পর উঁহারা ঘর-দুয়ার আসবাব-পত্র দেখিয়া ইঁহাদের যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় গিরিবালা একটু একান্তে পাইয়া ননীবালার হাত ধরিয়া বলিলেন—"খুড়িমা ছুট বলতেই আসতে পারবে না, আপনি কিন্তু আসবেন ভাই।"

ননীবালা গলা নামাইয়া বলিলেন—"আমার কি অসাধ? কিন্তু যম যে এখানেই।"

নূতন সম্পর্কে ননদ-ভাজের মধ্যে একটু হাস্যবিনিময় হইল, গিরিবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়াই বলিলেন—"সে তো ভালো কথাই আরও, তিনিই পাইক হয়ে আসবেন, নিয়ে যাবেন।"

উঁহারা চলিয়া গেলে গিরিবালা বলিলেন—"কী চমৎকার মানুষ সব, না মা?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"হ্যাঁ, ভালোই মনে হোল তো, দিব্যি মিশুকে, মেয়েটিও বেশ হাসিখুশি।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে আমরা কবে যাবো মা ওঁদের বাড়ি? বলে গেলেন যেতে···"

নিস্তারিণী দেবী বধূর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন, 'যা' শব্দটার উপর ঝোঁক দিয়া বলিলেন—"আম্—রা!"···একটু সবুর করো মা, সহরের চাল কি অত তাড়াতাড়ি ধরতে আছে?···আমার মালাছড়াটা এনে দাও তো।"

মালা দিয়া আসিয়া গিরিবালা জাকে বলিলেন—"শুনলি তো ছোটবৌ?···আমাদের আবার সহরে বাড়ি হওয়া। পাড়ুল মজ্জায় মজ্জায় সেঁধিয়ে রয়েছে।"

ছোটবৌ বলিলেন—"উনি আবার ওখানেই চুল পাকালেন। ভাগ্যিস চুল কাঁচা থাকতে থাকতেই আমরা চলে আসতে পেরেছি!···না দিদি, পাড়ুল মাথায় থাকুন, পাঁচটা লোকের মুখে পাঁচ রকম কথাও তো শুনতে পাব এখানে? তা' ভিন্ন আমি তোমার মত অত মুশড়ে পড়িনি।"

বড় জায়ের মুখের পানে চাহিয়া মিটি-মিটি হাসিতে লাগিলেন। গিরিবালা রহস্যটা ভেদ না করিতে পারিয়া বলিলেন—"বুঝলাম না···"

"ঐ ননী ঠাকুরঝি;—ও-কি না টেনে নিয়ে গিয়ে ছাড়বে ভেবেছ নাকি?···মার কোন জারিজুরিই খাটবে না—আমার কথা লিখে রাখো···"

সেই রহস্যপ্রবণ নাছোড়বান্দা মেয়েটির সামনে শাশুড়ীর অসহায় ভাবটা যেন উপলব্ধি করিয়া দুই জনে কৌতুকরসে হাসিয়া উঠিলেন। [ক্রমশঃ।

২ [এডগার এল্যান পো]

এই ঘটনার অগ্রগতির প্রতি দ্যুপ্যাঁর চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে মনে হল। অন্ততঃ তাঁর ভাব-গতিক দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল। কারণ, তিনি কোনো মন্তব্যই করছিলেন না। শুধু ল্যবঁর গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ যখন প্রকাশিত হল তখন তিনি ওই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। এটা সমাধানের অতীত রহস্য বলে সারা পারী নগরীর যে-মত ছিল আমিও সেই মতে সম্মতি দিলাম মাত্র। হত্যাকারীকে জানার কোনো সম্ভব উপায় আমার চোখে পড়ল না।

দ্যুপ্যাঁ বললেন, জবানবন্দীর এই বাহ্যিক বিবরণ থেকে উপায় সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করাই চলে না। পারী-পুলিশের সূক্ষ্মদৃষ্টির খ্যাতি আছে কিন্তু তারা চতুর, এর বেশি কিছুই নয়। তাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে তাৎকালিক প্রণালী ছাড়া আর কোনো প্রণালীই নাই। ব্যবস্থা করবার একটা প্রকাণ্ড ভড়ং করে তারা; কিন্তু অনেক সময়ই এই ব্যবস্থাগুলো লক্ষ্যসাধনের পক্ষে এত অনুপযোগী হয়ে থাকে যে তাতে মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ'র (robe-de chambre—pour mieux entendre la musique) ভালো করে গান শোনবার জন্য ড্রেসিং গাউনের এর কথাটাই মনে পড়ে। প্রায়ই তারা আশ্চর্য-জনক ফলও পেয়ে থাকে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা তাদের পরিশ্রম আর কর্মতৎপরতার ফল মাত্র। যখন এই গুণগুলো দিয়ে কোনো কাজ হয় না, তখন তারা অকৃতকার্য্য হয়ে থাকে। ধরুন ভিডক (Vidocq) খুব সুন্দর অনুমান করতে পারতেন আর ব্যবসায় ছিল তাঁর। কিন্তু সুশিক্ষিত চিন্তার অভাবে তাঁর অতি তীব্র অনুসন্ধানের ফলেই তিনি ক্রমাগত ভুল করতেন। লক্ষ্যবস্তুটাকে অত্যন্ত কাছে ধরে তিনি তাঁর দেখবার শক্তিকেই বাধাগ্রস্ত করতেন। হয়ত দু'-একটা বিষয় তিনি অসাধারণ স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেতেন কিন্তু এ রকম করতে গিয়ে সমগ্র ভাবে বিষয়টাকে দেখতে পেতেন না। মাত্রাতিরিক্ত গভীর বলে একটা বস্তু আছে। সত্য সবসময়ই যে কূপের তলদেশে থাকে তা নয়। বাস্তবিক অধিকতর প্রয়োজনীয় সত্য সম্বন্ধে তো আমার বিশ্বাস যে সেটা অনিবার্য্য-ভাবেই অগভীর। গভীরতা জিনিষটা হচ্ছে প্রান্তরের, যেখানে আমরা সত্যের সন্ধান করি, কিন্তু পর্বতচূড়ায়—যেখানে তাকে পাওয়া যায়—সেখানে গভীরতা নেই। অতি মাত্র গভীরতার ফলে আমাদের চিন্তা দুর্বল এবং জটিল হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে, অত্যন্ত বেশি অভিনিবেশ সহকারে অতি সোজাসুজি তাকিয়ে থাকলে আকাশের শুকতারাও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

"এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোনো মতামত তৈরী করবার পূর্বে চলুন নিজেরা পরীক্ষা করে দেখি একটু! অনুসন্ধানে আমোদ পাওয়া যাবে ('আমোদ' কথাটা যেন কেমন অদ্ভুত লাগল আমার, কিন্তু বললাম না কিছু) তাছাড়া, ল্যবঁ আমার একটা উপকার করেছিল আর আমি কৃতজ্ঞ আছি তার কাছে সেই জন্য। ঘটনা-স্থলটা গিয়ে আমরা নিজের চোখে দেখব। পুলিশের বড়কর্ত্তা (Prefect) গ—কে আমি জানি। দরকারী অনুমতি পেতে কোনো রকম বেগ পেতে হবে না আমায়।

অনুমতি পাওয়া গেল, আমরা অবিলম্বে রু মর্গের দিকে যাত্রা করলাম, রু রিশলিও এবং রু স্যাংরশ-এর মাঝখানে যে সব বিশ্রী সড়ক আছে এটা তারই একটা। আমরা যেখানে থাকতাম এই পাড়াটা সেখান থেকে অনেক দূরে, যখন আমরা পৌঁছলাম তখন অনেকখানি বেলা পড়ে গেছে। বাড়ীটা সহজেই পাওয়া গেল। কারণ অনেকে তখনও লক্ষ্যহীন কৌতূহল বশতঃ পথের অপর পার্শ্ব থেকে বন্ধ ঝিলমিলগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। এটা ছিল একটা গেটবিশিষ্ট সাধারণ পারীসীয় বাড়ি। একপাশে তার একটা প্রহরী থাকার ঘর, জানালায় স্লাইডিং প্যানেল লাগানো তার ওপর লেখা দরোয়ানের ঘর '(loge de concierge)'। প্রবেশ করবার পূর্বে আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে একটা গলি ধরে আবার বাঁক ঘুরে বাড়ীর পেছন দিকে উপস্থিত হলাম। দ্যুপ্যাঁ বাড়ী এবং তার সমগ্র পারিপার্শ্বিকটাকে তীক্ষ্ণ অভিনিবেশ সহ পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন—যদিচ তাঁর লক্ষ্যটা যে কি হতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না।

ফিরে বাড়ির সামনে আবার এসে ঘণ্টা বাজালাম। আমাদের নিদর্শন-পত্র দেখার পর যাঁদের তত্ত্বাবধানে বাড়িটা ছিল তাঁরা আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা সেই ঘরে গেলাম যেখানে মাদমোয়াজেল লেস্পানাইয়েকে পাওয়া গিয়েছিল। দু'জনেরই মৃতদেহ তখনো সেখানেই ছিল। সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে, ঘরের বিশৃঙ্খল অবস্থাটা তেমনি রাখা হয়েছিল। গেজেত দে ত্রিবিউনোতে যা বর্ণিত হয়েছিল তার বেশী আর কিছুই দেখলাম না। দ্যুপ্যাঁ প্রত্যেকটি বস্তু খুঁটিয়ে দেখলেন,

মৃতদেহগুলোও বাদ গেল না। তার পর আমরা অন্য কামরাগুলোয় গেলাম, তার পরে সেই প্রাঙ্গণে। এক জন কনষ্টেবল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল। বাড়ি ফেরার পথে আমার সঙ্গী ক্ষণকালের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকার আফিসে প্রবেশ করলেন।

আমি বলেছি যে, আমার বন্ধুটির খেয়াল ছিল বহু বিচিত্র আর আমি করতাম তার ব্যবস্থা (Je les menageais)। এখন তাঁর খেয়াল হল যে পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোনো আলোচনা তিনি করবেন না। তখন তিনি আমাকে অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জায়গায় আমি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছি কি না।

'বিশেষ' কথাটার ওপর জোর দেবার এমন একটা ভঙ্গী করলেন তিনি যে আমি কি জানি কেন শিউরে উঠলাম।

"না, বিশেষ কিছুই না" বললাম আমি, "অন্তত: কাগজে যা আমরা বর্ণনা পড়েছি তা ছাড়া কিছুই না।"

"আমার মনে হয় এই ব্যাপারের যে অসাধারণ বিভীষিকা, 'গেজেত' সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেনি। কিন্তু ছাপার এই সব অলস উক্তিগুলোর কথা বাদ দিন। আমার মনে হয় যে কারণে এটাকে সহজ মীমাংসার যোগ্য বলে মনে করা উচিত অর্থাৎ এই ব্যাপারের যে বাহুলক্ষণটা, তার জন্যই এই রহস্যটা মীমাংসার অতীত বলে মনে হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু এই হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতার একটা উদ্দেশ্যের প্রতীয়মান অভাব পুলিশকে হতবুদ্ধি করেছে। বাদবিতণ্ডারত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, অথচ নিহত মাদ্‌মোয়াজেল লেস্পানাইয়ের কাছে ওপরে কাকেও যে পাওয়া গেল না এবং ওপরে যারা গিয়েছিল তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে যাবার কোনো উপায় ছিল না, এই তথ্যগুলোর সঙ্গতি রক্ষার অসম্ভাব্যতাও পুলিশকে হতবুদ্ধি করেছে। ঘরের বিপুল বিশৃঙ্খলা; নীচের দিকে মাথা করে মৃতদেহকে চিমনীর ওপর দিকে ঢোকানো; বৃদ্ধা মহিলার শরীরের ভয়ঙ্কর কাটা-ছেঁড়া; পূর্বে যা বলেছি তার সঙ্গে এই সব বিবেচনা এবং আরো অন্যান্য কথা যা এখানে বলার প্রয়োজন মনে করি না, গভর্ণমেণ্ট-এজেণ্টদের গর্বিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে তাদের শক্তিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। অসাধারণকে গভীর বিষয় মনে করবার যে সাধারণ অথচ স্থূল ভ্রান্তি পুলিশ সেই ভ্রান্তিতে পড়েছে। কিন্তু সত্যের সন্ধানে যুক্তি সাধারণের থেকে যে ব্যতিক্রম তারই সাহায্যে অগ্রসর হয়ে থাকে। এখন আমরা যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি তাতে আমাদের এ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে 'কি হয়েছে,' তার চেয়ে প্রশ্ন করতে হবে 'এমন কি হয়েছে যা পূর্বে কখনো ঘটেনি'। সত্যি বলতে কি, যতখানি সহজে আমি এই সমস্যার সমাধান করব বা করেছি, পুলিশের চোখে এর সমাধানের প্রতীয়মান দুরূহতাটা ততখানিই বেশি।"

নির্বাক্-বিস্ময়ে আমি বক্তার দিকে চেয়ে রইলাম।

আমাদের কামরার দোরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, —এখন আমি সেই লোকটির জন্য প্রতীক্ষা করছি যে নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কিছু না কিছু সংশ্লিষ্ট যদিও এই কসাইগিরি হয়ত সে করেনি। এই অপরাধের যেটা সব চেয়ে গুরুতর অংশ হয়ত সে সম্বন্ধে সে নির্দোষ। আমি আশা করি যে আমার এই অনুমান সত্য; কারণ এরই ওপর আমার এই রহস্য সমাধানের আশা প্রতিষ্ঠিত। এইখানে, এই কামরায় প্রতি মুহূর্ত্ত আমি সেই লোকটির প্রতীক্ষা করছি। এ কথা সত্য যে সে আসতে না পারে; কিন্তু সম্ভাবনা এই যে সে আসবে। যদি সে আসে তাকে আটক করা দরকার হবে। এই নিন পিস্তল; ব্যবহার করা দরকার হলে কি করে করতে হয় আমরা দু'জনেই জানি।

যা শুনলাম তা বিশ্বাস করতে না পেরেও, নিজের অজ্ঞাতসারেই পিস্তল উঠিয়ে নিলাম। দ্যুপাঁ যেন আপন মনেই কথা বলে যেতে লাগলেন। সময়-বিশেষে তাঁর দূর-মনস্কতার (abstract manner) কথা ইতিপূর্বে বলেছি। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো না হলেও এমন ছিল যা সচরাচর বহু দূরস্থ কাকেও বলবার বেলা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। শূন্য-দৃষ্টিতে তিনি দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, 'সিঁড়ি দিয়ে যারা উঠেছিল তারা যে বিতণ্ডারত কণ্ঠস্বর শুনেছিল সেটা যে ওই মহিলাদের ছিল না সেটা জবানবন্দীর সাহায্যে সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হয়েছে। বৃদ্ধা মহিলা প্রথমে কন্যাকে হত্যা করে শেষে আত্মহত্যা করেছেন কি না এই প্রশ্নের সম্বন্ধে আমাদের সব সংশয় এতেই নিরস্ত হল। শুধু বিচার-প্রণালীর খাতিরেই বিশেষ করে আমি এই কথা বলছি। তা না হলে তাঁর মৃতকন্যার দেহটি যে ভাবে চিমনীর ভেতরে ঢোকানো পাওয়া গিয়েছিল, ওভাবে ঢোকানো মাদাম লেস্পানাইয়ের শক্তির অতীত। আর তাঁর নিজের শরীরেও যে রকমের ক্ষত তা থেকেও আত্মহত্যার কল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং হত্যাকাণ্ড তৃতীয় কারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তৃতীয় দলেরই কণ্ঠস্বর বিতণ্ডায় শ্রুত হয়েছিল। এখন ওই কণ্ঠস্বরগুলোর সম্বন্ধে যে প্রমাণ পাওয়া গেছে সে সমস্তের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ওই প্রমাণের মধ্যে বিশিষ্টতা কি ছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। আপনি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছেন?

আমি বললাম যে যদিও রুক্ষ স্বরটি যে ফরাসীর সে সম্বন্ধে সকল সাক্ষীই একমত, তীক্ষ্ণ অথবা কর্কশ (যেমন একজন এই কণ্ঠস্বরকে বর্ণনা করেছেন) কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে।

দ্যুপাঁ বললেন, "এটা তো হল সাক্ষ্য, কিন্তু সাক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য এটা নয়। আপনি বৈশিষ্ট্য কিছু লক্ষ্য করেননি। কিন্তু তথাপি একটা বিষয় লক্ষ্য করার ছিল। আপনি যেমন বলছেন সাক্ষীরা রুক্ষ কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে সহমত, এ বিষয়ে তারা সকলেই একমত। কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে বিশিষ্টতা এই নয় যে তারা বিভিন্ন মতের ছিল। পরন্তু এই যে ইতালীয়, ইংরেজ, স্পেনদেশীয়, হলণ্ডনিবাসী এবং ফরাসী এরা প্রত্যেকেই এই কণ্ঠস্বর বর্ণনা করবার সময় একে বিদেশীয় কণ্ঠস্বর বলে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকেই নিঃসংশয় যে এটা তার দেশবাসীর কণ্ঠস্বর নয়। কেউই এই কণ্ঠস্বরকে এমন জাতির লোকের কণ্ঠস্বর বলছে না যার ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, পরন্তু তার বিপরীত। ফরাসীটি অনুমান করছে যে ওটা স্পেন-দেশীয়ের কণ্ঠস্বর; স্প্যানিশ ভাষা জানা থাকলে সে কিছু কথা বুঝতে পারত। ডচম্যান বলছে যে ওটা ফরাসীর কণ্ঠস্বর ছিল; কিন্তু এও বলা হয়েছে দেখছি যে ফরাসী ভাষা না জানায় সাক্ষীকে দোভাষীর সাহায্যে জেরা করা হয়েছিল। ইংরেজ মনে করছে ওটা জার্মানের গলা বলে, কিন্তু সে জার্মান ভাষা বোঝে না। স্প্যানিয়ার্ড 'নিশ্চিত' জানে যে ওটা ইংরেজের গলা কিন্তু সে 'উচ্চারণের ভঙ্গী' দেখেই এ রকম মনে করে

কারণ ইংরেজী সে মোটেই জানে না। ইতালীয়ান বিশ্বাস করে যে ওটা রুশের গলা কিন্তু কখনো সে রুশিয়াবাসীর সঙ্গে কথা বলেনি। আর একজন ফরাসী,—প্রথম ফরাসী থেকে ভিন্ন—তার মতে ওটা ইতালীয়ানের গলা এবং ইতালীয়ান ভাষা না জানার দরুণ স্প্যানিয়ার্ডের মতই উচ্চারণ-ভঙ্গী দেখে তার ওই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে। এখন কি বিচিত্র এবং অসাধারণ সেই কণ্ঠস্বর যার সম্বন্ধে এই রকমের জবানবন্দী দেওয়া যেতে পারে। যার উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যে ইউরোপের পাঁচটি বড় বড় দেশের অধিবাসীরা কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পায়নি। আপনি বলতে পারেন ওটা এশিয়াবাসীর—আফ্রিকাবাসীর গলা হতে পারে। পারীতে এসিয়াবাসীও বেশি নেই। আফ্রিকাবাসীও বেশী নেই। কিন্তু এই অনুমানকে অস্বীকার না করে আমি শুধু তিনটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এক জন সাক্ষী এই কণ্ঠস্বরকে 'তীক্ষ্ণ' না বলে 'কর্কশ' বলেছে; আর দু'জন একে 'দ্রুত' এবং 'অসমান'। কোনো সাক্ষীই কথা অথবা কথার মত শব্দ শুনেছে বলে বলেনি।

"আমি জানি না" দ্যুপ্যাঁ বলতে লাগলেন, "এ পর্যন্ত আমি আপনার মনে কি ধারণা উৎপন্ন করেছি। তবে এ কথা আমি বিনা দ্বিধায় বলব যে জবানবন্দীর শুধু এই অংশ থেকে—রুক্ষ আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের সম্বন্ধে যে অংশ তা থেকেই যে সঙ্গত অনুমান (deduction) করা যেতে পারে তা এমন সন্দেহ উৎপন্ন করবার পক্ষে যথেষ্ট, যার সাহায্যে এই রহস্যের কারণানুসন্ধানের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। আমি 'সঙ্গত অনুমান' বলায় আমার সবটা বক্তব্য প্রকাশ পায়নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, ওই অনুমানগুলোই একমাত্র সঙ্গত অনুমান আর ওগুলো থেকে একটি সন্দেহ অনিবার্য ভাবেই জেগে ওঠে। সেই সন্দেহটা কি তা কিন্তু আমি এখনও বলছি না। আমার এইমাত্র ইচ্ছা যে আপনি মনে রাখবেন আমার কাছে ওই সন্দেহ এত প্রবল হয়েছিল যাতে সেই কক্ষে আমার অনুসন্ধান একটা নিশ্চিত রূপ ধারণ করেছিল, একটা বিশেষ দিকে গতিপ্রবণ হয়েছিল।

"কল্পনায় চলা যাক এবার সেই কক্ষে। এখানে আমরা প্রথম কিসের সন্ধান করব? খুনেরা কি উপায়ে বেরিয়েছে তার। এখানে এটা বলা বাহুল্য হবে না যে আমরা কেউই অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। মাদাম এবং মাদ্‌মোয়াজেল লেস্পানাইয়ে ভূতের দ্বারা নিহত হননি। এই হত্যাকারীরা ভৌতিক এবং ভৌতিক উপায়েই পলায়ন করেছিল। কিন্তু কেমন করে? সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে যুক্তির প্রণালী একটি, সুতরাং এই যুক্তি আমাদের একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য। এক এক করে নির্গমনের সব উপায়গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক। এটা স্পষ্টই যে লোকের দল যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তখন খুনেরা সেই কক্ষ ছিল যেখানে মাদ্‌মোয়াজেলকে পাওয়া গেছে কিম্বা তার পাশের কক্ষ অন্ততঃ পক্ষে। সুতরাং এই দুটি কক্ষ থেকেই শুধু বেরোনোর পথ খুঁজতে হবে। পুলিশের লোকেরা মেঝে খুঁড়ে ফেলেছে, ছাত খুঁড়েছে, দেয়ালের গাঁথুনিকে প্রত্যেক দিকেই খুঁড়েছে! তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে কোনো গুপ্ত নির্গম-পথ এড়িয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু তাদের চোখের উপর বিশ্বাস না করে আমি নিজের চোখেই পরীক্ষা করেছি। কোনো গুপ্ত পথই সেখানে নেই। বেরুবার পথে যে দু'টি দোর সেই কক্ষ দু'টি থেকে, সেগুলো ভালো ভাবে তালা বন্ধ ছিল, যার চাবি ছিল ভেতর দিকে। চিমনীগুলোর দিকে দেখা যাক। যদিও অগ্নিকুণ্ডগুলোর ওপর আট দশ ফুট অবধি ওগুলো মামুলি রকমের চওড়া তবু সমস্তটা চিমনীর ভেতর দিয়ে একটা বড় বেরালও যেতে পারবে না। এই সব দিক্ দিয়ে বেরোনো যখন একেবারেই অসম্ভব তখন একমাত্র জানালাই বাকী রইল। সামনের ঘরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পথের ওপরকার ভিড়ের দৃষ্টি এড়িয়ে পালানো একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং খুনেরা পেছনের ঘরের জানালা দিয়ে নিশ্চয় পালিয়েছে। নিঃসংশয়িত উপায়ে যখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তখন আপাত প্রতীয়মান অসম্ভাব্যতার দরুণ এটাকে বর্জন করা যুক্তির দিক্ দিয়ে অসঙ্গত। এখন আমাদের কেবল এইটে প্রমাণ করতে হবে যে আপাত প্রতীয়মান অসম্ভাব্যতা-গুলো বাস্তবিক 'অসম্ভব' নয়।

"ওই কক্ষে দু'টি জানালা; একটি আসবাব-পত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ নয়, সম্পূর্ণ দৃষ্টিগম্য। অন্য জানালার নিম্নাংশটা ভারী পালঙ্কের মাথাটার জন্য দৃষ্টির আড়ালে; কারণ ওটাকে ঠেলে জানালার গায়ে লাগানো হয়েছে। প্রথম জানালাটা ভেতর থেকে ভালো করে আটকানো পাওয়া গিয়াছিল। যারা ওটাকে ওঠাবার চেষ্টা করেছিল তারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও পারেনি। ওই জানালাটার ফ্রেমের বাঁ দিকে একটা বৃহৎ ছিদ্র করা ছিল এবং একটা খুব শক্ত কাঁটা একেবারে মাথা পর্য্যন্ত বসানো ছিল তাতে। অন্য জানালাটা পরীক্ষা করেও তাতে ওই রকমেরই একটা কাঁটা ফিট করা আছে দেখা গেল। এই সাসিটাকে ওঠাবার প্রবল চেষ্টাও ব্যর্থ হল! পুলিশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নিল যে, ওই জানালাগুলো দিয়ে নির্গমন ঘটেনি। আর এই কারণেই কাঁটাটা বার করে জানালাগুলো খোলা অনাবশ্যক বাহুল্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

"আমার নিজের পরীক্ষা একটু বেশি খুঁটিয়ে করেছিলাম আর তার কারণটা আমি এইমাত্রই বলেছি—কারণ আমি জানতাম যে এইখানে যা সব অসম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছিল সেগুলো বাস্তবিক তা নয় এটা প্রমাণ করতেই হবে।

"এই কার্য্য থেকে কারণানুসন্ধানের পদ্ধতি ধরে আমি এই ধরনের চিন্তা করতে অগ্রসর হলাম। হত্যাকারীরা নিশ্চয় এই জানালা-গুলোর একটা দিয়ে পালিয়েছিল এটা যখন স্থির তখন তারা সার্সি-গুলো যে রকম বন্ধ দেখা গিয়েছিল ভেতর থেকে সে ভাবে আবার বন্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই যুক্তিটা অত্যন্ত সোজা বলেই পুলিশ এই দিকে আর খুঁটিয়ে দেখা বন্ধ করেছিল। কিন্তু তবু সার্সিগুলো বন্ধ ছিল। সুতরাং সার্সিগুলোর নিশ্চয়ই নিজে থেকেই বন্ধ হবার ক্ষমতা আছে। এই সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোনো দিকে যাবার উপায়ই নেই। আমি অবারিত জানালাটার কাছে গেলাম, সেই কাঁটাটাকে একটু কষ্ট করে বার করে সার্সিটাকে ওঠাবার চেষ্টা করলাম। আগে থেকেই যেমন ভেবেছিলাম, আমার সমস্ত প্রয়াস প্রতিহত হতে লাগল। তখন আমি বুঝলাম যে কোনো গুপ্ত স্প্রিং নিশ্চয়ই আছে। আমার ধারণা এই ভাবে সমর্থিত হওয়ায় আমি এটা স্থির বুঝলাম যে, আমার premises (প্রাথমিক ধারণাটা) অন্ততঃ ঠিক আছে, কাঁটা সংক্রান্ত ব্যাপারটা তখনও যতই রহস্যময় মনে হোক। শীগ্‌গিরই সতর্ক অনুসন্ধানের পর গুপ্ত স্প্রিংটা

আবিষ্কৃত হল। ওটাকে চেপে আমি যা আবিষ্কার করলাম তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমি সার্সি ওঠাতে বিরত হলাম।

"কাঁটাটাকে এবার যথাস্থানে রেখে, ওটাকে বেশ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। কোনো লোক এই বাতায়ন দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওটাকে আবার বন্ধ করতে পারে এবং তাতে স্প্রিংটাও আটকে দিতে পারে সাসিটাকে, কিন্তু কাঁটাকে আবার সেখানে ঢোকাতে পারে না। এ সিদ্ধান্ত সোজাই ছিল, সুতরাং আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। হত্যাকারীরা তা হলে নিশ্চয় অন্য জানালাটা দিয়ে পালিয়েছে। প্রত্যেক সার্সির স্প্রিং একই ধরণের এটা ধরে নিলে—কারণ এটাই সম্ভব—কাঁটাগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো পার্থক্য আছে; অন্ততঃ তাদের বসানোর প্রণালীটা ভিন্ন না হয়েই পারে না। পালঙ্কের ক্যাম্বিসটার ওপর উঠে, পালঙ্কের মাথার দিকের খাড়া তক্তাটার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় জানালাটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তক্তাটার পেছনে হাতটা নামিয়ে আমি স্প্রিংটাকে বার করে সেটাকে টিপে দেখলাম যে আমার ধারণার অনুরূপ, এটাও সেই অন্য স্প্রিংটারই মতো। এবার আমি সেই কাঁটাটার দিকে তাকালাম, এটা সেই কাঁটার মতই মজবুত আর ফিট করাও ছিল সেইটেরই মতো প্রায় মাথা পর্য্যন্ত বসানো।

"আপনি বলবেন আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। যদি তাই মনে করে থাকেন, তা হলে আপনি আমার (induction) অনুমানগুলোর স্বরূপ বুঝতে পারেননি। আমি একটুও ভ্যাবাচ্যাকা খাইনি। আমার সন্ধান-সূত্র এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছিন্ন হয়নি। আমার যুক্তি-শৃঙ্খলার একটি গ্রন্থিও দুর্বল ছিল না। আমি রহস্যকে তার শেষ সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করেছি আর সেই সীমায় রয়েছে ওই কাঁটা। এই কাঁটাটা অন্য জানালায় যে কাঁটা ছিল বাহ্যতঃ ঠিক সেইটের মতই ছিল সব দিক্ দিয়ে। কিন্তু এই তথ্যটি যত চরম এবং নিশ্চিতই মনে হোক, কখন একে এই কথাটির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা যায় যে সমস্ত সন্ধান এইখানে এসে থেমেছে, তখন এই তথ্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলতেই হবে। আমি তাই মনে মনে বললাম যে, এই কাঁটার মধ্যে নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে। আমি স্পর্শ করলাম ওটাকে; মাথাটা প্রায় সিকি ইঞ্চি ডাঁড়া সহ আমার আঙুলের সঙ্গে উঠে এল; কাঁটার বাকী ডাঁড়াটা সেই ছিদ্রটার মাঝেই ছিল যেখানে সেটা ভেঙে গিয়েছিল। অনেক আগেকার ভাঙা ছিল এটা, কারণ ভাঙা কিনারাটা মরচে-ধরা ছিল আর দৃশ্যতঃ ওটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ভাঙা হয়েছিল যাতে কাঁটার মাথার অংশটা খানিকটা সার্সির মধ্যে বসে গিয়েছিল। তখন আমি সাবধানে মাথার অংশটা যেখান থেকে নিয়েছিলাম, আবার সেখানে রেখে দিলাম, মনে হল ঠিক আস্ত কাঁটাটিই আছে, কারণ ভাঙা অংশটা দেখা যাচ্ছিল না। স্প্রিংটাকে চেপে সার্সির কয়েক ইঞ্চি ওঠালাম, কাঁটার মাথাটা সার্সির সঙ্গে উঠে গেল সার্সির মধ্যে আঁটা অবস্থায়ই। জানালাটা বন্ধ করলাম তখন আবার পূর্ণাঙ্গ কাঁটার চেহারাটি সম্পূর্ণ ফিরে এল।

এই অবধি তো রহস্যের মীমাংসা হল। হত্যাকারী সেই জানালা দিয়ে পালিয়েছিল যেটা পালঙ্কের সামনাসামনি ছিল, সে বেরিয়ে যাবার পর সার্সিটা যখন নিজে নিজেই পড়ে গেল অথবা ইচ্ছে করেই যখন সেটা ভেজিয়ে দেওয়া হল তখন স্প্রিংএর জন্য ওটা বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ ভুল করে স্প্রিংএর কাজটাকে কাঁটার কাজ বলে মনে করেছিল—আর সেই জন্যই অধিক অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়েছিল।

"এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে অবতরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে। আপনার সঙ্গে যখন বাড়ির পেছন দিকে হেঁটে গিয়েছিলাম তখনই এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক সমাধান পেয়েছিলাম। আলোচ্য জানালার প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট নীচে দিয়ে তড়িৎ-বাহক দণ্ডটি গেছে। এই দণ্ড থেকে বাতায়ন দিয়ে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, ওই অবধি পৌঁছানোও কারো পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে সার্সিগুলো একটু অদ্ভুত ধরণের, প্যারী-নিবাসীরা যাকে ferrades বলে থাকে, আজকাল এ ধরণের সার্সি যদিচ কদাচিৎ লাগানো হয়ে থাকে, লিয়ঁ এবং বুর্দোর খুব প্রাচীন বাড়ীগুলোয় কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়। এগুলো সাধারণতঃ দোরের মতো—ফোল্ডিং দোরের মতো নয়, শুধু নীচের অংশটা জাফরিওয়ালা (latticed) যা হাত দিয়ে ধরা যায় বেশ ভালো ভাবেই। এই জানালার সার্সিগুলো পুরো সাড়ে তিন ফুট চওড়া। যখন আমরা ওগুলোকে বাড়ীর পেছন দিক্ থেকে দেখি তখন ওগুলো আধ-খোলা অবস্থায় ছিল—অর্থাৎ ওগুলো দেয়ালের সঙ্গে লম্বা ভাবে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ পুলিশ এবং আমি বাড়ীর পেছনটা নিরীক্ষণ করেছিলাম; কিন্তু তাহলে পরে, ওই ferrades-গুলোর দিকে তাদের বিস্তারের সমসূত্রে তাকানোর দরুণ, তারা এর বিপুল বিস্তৃতিটা লক্ষ্য করেনি কিম্বা আর যাই হোক, এর সম্বন্ধে যথোপযুক্ত বিবেচনা করেনি। আর বাস্তবিক ওই দিকে বেরোনো সম্ভব নয় এই ধারণা করে নেবার পর স্বভাবতঃই তারা ওদিকে নিতান্ত সাধারণ ভাবে চোখ বুলিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ল যে পালঙ্কের সামনা-সামনি বাতায়নের সার্সিটা সম্পূর্ণ ভাবে ঘুরে গেলে সেটা তড়িৎ-বাহকের দু' ফুটের ভেতরে চলে যেতে পারে। এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, অতি অসাধারণ কর্মপটুতা এবং সাহসের সাহায্যে তড়িৎ-বাহক থেকে বাতায়নে প্রবেশ করা যেতে পারে। এখন সার্সিটা সম্পূর্ণ খোলা ছিল ধরে নিলে পর, তার ঠিক আড়াই ফুটের ভেতর থেকে কোনো দস্যু জাফরিটাকে শক্ত করে ধরতে পারে। তার পর তড়িৎবাহক দণ্ডটা ছেড়ে দিয়ে দেয়ালে ভালো করে পা চেপে তা থেকে লাফিয়ে সার্সিটাকে বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে ঠেলা দিতে পারে। আর যদি বাতায়নটাকে খোলা ছিল বলে মনে করা যায়, তা হলে কক্ষের ভেতরও গিয়ে পড়তে পারে।

"আপনাকে বিশেষ করে স্মরণ রাখতে বলছি যে আমি এতখানি বিপজ্জনক এবং কঠিন কাজে সাফল্য লাভ করার পক্ষে যে অতি অসাধারণ কর্মপটুতার প্রয়োজন সে কথা বলেছি। আমি আপনাকে প্রথমতঃ এটা দেখাতে চাচ্ছি যে, এ কাজটা সম্ভব, কিন্তু দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ আমি আপনার মনে ওই কাজের সাফল্যের জন্য যে গতিপটুতার (agility) প্রয়োজন তার স্বরূপটা যে অতি অসাধারণ এমন কি অলৌকিকের কাছাকাছি সেই ধারণাটি জাগাতে চাচ্ছি।

অবশ্যি আইনের ভাষায় আপনি বলবেন যে আমার 'কেস'টা খাড়া করতে হলে এই ব্যাপারে যে কর্মপটুতার প্রয়োজন সেটাকে

যতটা পুরোপুরি হতে পারে, তার চেয়ে কম করে ধরাই উচিত। আইনের ক্ষেত্রে এই রীতি হতে পারে, কিন্তু যুক্তির ক্ষেত্রে নয়। আমার শেষ লক্ষ্য শুধু সত্য। আমার আপাত লক্ষ্য হল এই যে, যে অসাধারণ কর্মতৎপরতার কথা বলেছি তার পাশাপাশি সেই অতি অদ্ভুত রকমের তীক্ষ্ণ (অথবা কর্কশ) এবং 'অসমান' কণ্ঠস্বরটিকে স্থাপন করা, যার জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনো দু'জন সাক্ষী একমত হতে পারেনি, এবং যার উচ্চারণের মধ্যে কেউ কোনো শব্দাংশও (syllable) আবিষ্কার করতে পারেনি।"

এই কথাগুলো শুনতেই দ্যুপ্যাঁর কথার একটা অস্পষ্ট এবং অর্ধগঠিত ধারণা আমার মনের মাঝে খেলে গেল। আমার মনে হল যেন বুঝি বুঝি করছি অথচ বুঝতে পারছি না যেমন কখনো কখনো স্মরণ করতে গিয়ে আমাদের হয় যেন মনে পড়ছে, অথচ স্পষ্ট কিছুতেই মনে পড়ে না। বন্ধুটি আমার বলে যেতে লাগলেন।

তিনি বললেন, "দেখুন, এখন নির্গমনের প্রশ্ন থেকে প্রবেশের প্রশ্নে এসে পড়লাম। আমার বলার অভিপ্রায় এই যে, ওই একই জায়গা দিয়ে আসা এবং যাওয়া হয়েছে। এখন কক্ষের ভেতরে যাওয়া যাক্। ভেতরের দৃশ্যটা পরীক্ষা করা যাক্। এ কথা বলা হয়েছে যে টেবিলের ড্রয়ারগুলো থেকে চুরি করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ভেতরে তখনও পরিধেয় অনেক জিনিস অবশিষ্ট ছিল। এ একটা অসম্ভব সিদ্ধান্ত। এটা শুধু একটা অনুমান, অত্যন্ত নির্বোধের মত অনুমান, তা ছাড়া কিছুই নয়। কি করে জানব আমরা যে ড্রয়ারে আগে যা ছিল সেই সমস্তই পাওয়া যায়নি? মাদাম লেস্পানাইয়ে এবং তাঁর মেয়ে অত্যন্ত নিভৃত জীবন যাপন করতেন, কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, কদাচিৎ বাইরে যেতেন, [illegible] করবার জন্য বেশি কাপড়-চোপড়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না [illegible]। এই কাপড়গুলো যে কোনো মহিলার পক্ষে বেশ ভালোই। যদি চোর কিছু নিয়েই থাকে, তো সব চেয়ে ভালোগুলো [illegible]নি কেন, আর একেবারে সবই বা নেয়নি কেন? এক কথায় [illegible]স্য যে, সে এক-মোট কাপড় নিতে গিয়ে চার হাজার ফ্রাঙ্কের [illegible]টি বা পরিত্যাগ করল কেন? সোনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। [illegible]রি মঁসিয়ে মিঞো থলের যে-টাকার কথা বলেছিলেন প্রায় [illegible]ই মেঝের ওপর পাওয়া গিয়েছিল। এই জন্য আমি বলতে চাই আপনার মন থেকে আপনি ওই অভিসন্ধি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাটা [illegible] দিন যেটা বাড়ীর দরজায় টাকা দেওয়া সম্বন্ধীয় জবানবন্দী পুলিশের মস্তিষ্কে গজিয়েছে। এর চেয়ে অনেক বেশি উল্লেখ[illegible] ঘটনা—সমকালিকতা (Coincidence) (যেমন টাকা [illegible] হল কাকেও এবং দেওয়ার তিন দিনের মধ্যেই তাকে খুন করা) আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে হয়ে থাকে যা ক্ষণিকের জন্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যাঁরা সম্ভাব্যতা-থিওরী (Theory [illegible] Probabilities—মানবিক অনুসন্ধানের শ্রেষ্ঠতম বস্তুগুলো [illegible] কাছে ঋণী) জানেন না, সেই সব চিন্তাশীল ব্যক্তিরা [illegible]ইক সংঘটন (Coincidence) দেখে সাধারণতঃ ভ্রমে [illegible] হন। এই বর্তমান ব্যাপারে, যদি সোনাটা চুরি যেত, [illegible] তিন দিন আগে ওই জিনিষটা দেওয়া সমকালিক সংঘটনের [illegible]ক্তর বলে গণ্য হত। তখন এটা অভিসন্ধির ধারণাকে সমর্থন করত। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনাটা যে-রকম ভাবে যদি সোনাটাকে এই হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য বলে ধরা যায়, তাহলে হত্যাকারীকে এমনই অস্থির-চিত্ত মূর্খ বলে অনুমান করতে হয় যাতে সে তার লক্ষ্য-বস্তু সোনাটাকেই পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে।

আমি যে-সব বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি—সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বর, সেই অসাধারণ গতিপটুতা, এই ধরণের অদ্ভুত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিসন্ধিহীনতা—সেইগুলোর দিকে মনকে স্থির নিবদ্ধ রেখে এবার হত্যাকাণ্ডটার দিকে তাকানো যাক্। একটি নারীকে দৈহিক বল-প্রয়োগের দ্বারা শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং তার মাথাটাকে নীচের দিকে করে চিমনীর ভেতরে ঢোকানো হয়েছে। সাধারণ হত্যাকারীরা এই ভাবে হত্যা করে না, আর নিহত ব্যক্তিকে এই ভাবে সরাবার চেষ্টা তো আরো কম করে থাকে। যে ভাবে শরীরটাকে চিমনীর ভেতর প্রবেশ করানো হয়েছে আপনি স্বীকার করবেন যে এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, হত্যাকারীকে অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির মনে করলেও মানবিক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে তার সঙ্গে এর সঙ্গতি এতটুকুও নেই। আর যে ছিদ্রপথ থেকে শরীরটা নীচে টেনে আনতে কয়েক জন লোকের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তাকে ওপর দিকে ঠেলে ঢুকিয়েছিল যে-ব্যক্তি তার শক্তি যে কতখানি সেই কথাটাও ভেবে দেখুন!

"অত্যন্ত আশ্চর্যজনক শক্তি যে প্রয়োগ করা হয়েছিল তার অন্যান্য নিদর্শনের দিকে এবার তাকানো যাক্। অগ্নিকুণ্ডের ওপর মানুষের চুলের খুব মোটা মোটা গুচ্ছ পাওয়া গিয়েছিল। এগুলোকে গোড়া থেকে ওপড়ানো হয়েছিল। কুড়ি-ত্রিশটি চুলকেও একসঙ্গে টেনে তোলা যে বহু শক্তিসাধ্য তা আপনি জানেন। আপনিও আলোচ্য কেশগুচ্ছগুলোকে দেখেছেন। তাদের গোড়ায় খুলির মাংসও লেগেছিল—কী বীভৎস সেই দৃশ্য! এক এক বারে যে প্রায় কয়েক লক্ষ চুল টেনে তুলেছিল তার অসামান্য শক্তির এটা নিশ্চিত নিদর্শন। বৃদ্ধা মহিলার গলা যে কেবল কাটা হয়েছিল তা নয়, মাথাটাকে শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল: মাত্র একটা রেজর ছিল তার অস্ত্র। এই কাজগুলোর যে পাশবিক হিংস্রতা সে দিকেও আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। মাদাম লেস্পানাইয়ের দেহে যে-সব আঘাত-চিহ্ন ছিল সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। মঁসিয়ে দ্যুমা এবং তাঁর যোগ্য সহায়ক মঁসিয়ে এতিয়েন মত প্রকাশ করেছেন যে ওগুলো কোনো ভোঁতা অস্ত্রের সাহায্যে হয়েছে। ভদ্রলোকেরা খুব ঠিক কথাই বলেছেন। স্পষ্টতঃই ওই প্রাঙ্গণের পাথুরে মেঝেটাই সেই ভোঁতা অস্ত্র যার ওপর পালঙ্কের সামনের বাতায়ন থেকে ওই নিহত নারীর পতন হয়েছিল। এই কথাটা এখন যতই সোজা মনে হোক না কেন, সার্সির প্রশস্ততাটা পুলিশ লক্ষ্য করেনি বলেই তারা এটাও লক্ষ্য করেনি। কারণ ওই কাঁটার ব্যাপার থেকেই, বাতায়ন খোলার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি একেবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

"এখন এই সব বিষয়গুলোর সঙ্গে সেই কক্ষের অদ্ভুত বিশৃঙ্খলার কথা যদি ভালোভাবে বিবেচনা করা যায় তাহলে আমরা একসঙ্গে পাই অসাধারণ গতিপটুতা, অমানুষিক শক্তি, পাশবিক হিংস্রতা, অভিসন্ধিবিহীন হত্যাকাণ্ড, মানুষের সাধ্যাতীত বীভৎস বিভীষিকা

বহু জাতির লোকের কানে অপরিচিত এবং এমন কণ্ঠস্বর যাতে স্পষ্ট উচ্চারিত কোনো শব্দ বা শব্দাংশও ছিল না। এ থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যায়? আপনার মনে আমি কি ধারণা উৎপন্ন করলাম?"

দ্যুপ্যাঁ যখন আমায় এই প্রশ্ন করলেন, আমার কেমন গা ছম্-ছম্ করতে লাগল। আমি বললাম, এ কোনো পাগলের উদ্দণ্ড পাগলের কাণ্ড, যে কাছের কোনো পাগলা-গারদ থেকে পালিয়েছে।

তিনি উত্তর দিলেন, "কতকাংশে আপনার ধারণা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু পাগলদের কণ্ঠস্বর, তাদের ভয়ানক উদ্দণ্ড অবস্থায়ও, সিঁড়ি থেকে যে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল তার সঙ্গে মেলে না। পাগলারা কোনো না কোনো জাতির লোক হবে, আর তাদের ভাষায়, কথা যতই অসম্বদ্ধ হোক না, শব্দাংশের মধ্যে সম্বদ্ধতা নিশ্চয়ই থাকবে। তাছাড়া আমার হাতে যে চুল রয়েছে তা পাগলের চুলের মত নয়। এই ছোট কেশগুচ্ছটি আমি মাদাম লেস্পানাইয়ের দৃঢ়বদ্ধ আঙুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। বলুন তো এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?"

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আমি বললাম, "দ্যুপ্যাঁ! এ যে অত্যন্ত অসাধারণ চুল, এ তো মানুষের চুল নয়!"

তিনি বললেন, "আমি তো তা বলিনি। কিন্তু এটা মীমাংসা করার আগে, এই কাগজে আমি যে ছোট ছবি এঁকেছি সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। জবানবন্দীর এক অংশে যাকে মাদমোয়াজেল লেস্পানাইয়ের গলার ওপর 'কালো আঘাত এবং গভীর নখ-চিহ্ন' বলা হয়েছে, অন্যত্র যাকে (মঁসিয়ে দ্যুমা এবং এতিয়েনের দ্বারা) 'কতকগুলো নীল-কালো দাগ, যা স্পষ্টতঃই আঙুলের চিহ্ন' বলা হয়েছিল এটা তারই facsimile প্রতিলিপি।"

আমাদের সমুখের টেবিলের ওপর কাগজখানা খুলে ধরে বন্ধু বলতে লাগলেন, "আপনি লক্ষ্য করবেন যে, এই চিত্রে শক্ত করে স্থির ভাবে ধরার পরিচয় পাওয়া যায়। আঙুল ফসকাবার বা স্থানচ্যুত হবার কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। যে ভাবে আঙুল দিয়ে প্রথম ধরা হয়েছিল, প্রত্যেকটি আঙুল শেষ পর্যন্ত—সম্ভবতঃ মৃত্যু পর্যন্ত সেই ভাবে ধরেছিল। এখন একসঙ্গে আপনি যে রকম ছাপগুলো দেখছেন ঠিক সেই ভাবে আপনার সবগুলো আঙুল এর ওপর রাখুন।"

আমি চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হলাম।

তিনি বললেন, "আমরা কাজটা ঠিক ভাবে হয়ত করছি না। কাগজটা সমতলের ওপর ছড়ানো রয়েছে; কিন্তু মানুষের গলা তো বর্তুলাকার। এই একটা কাঠের গুঁড়ি রয়েছে এর ঘেরটা প্রায় মানুষের গলার ঘেরেরই মতো হবে। ছবিটাকে এর চার দিকে জড়িয়ে তার পর আবার পরখটা করুন তো।"

আমি তাই করলাম। আগের চেয়েও এবার বাধা স্পষ্টতর হয়ে উঠল। আমি বললাম, "এটা কোনো মানুষের হাতের চিহ্ন নয়।"

দ্যুপ্যাঁ উত্তরে বললেন, "এখন ক্যুভিয়ের (Cuvier) বই থেকে এই অংশটা পড়ুন তো।"

এটা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃহদাকার হরিদ্বর্ণ ওরাঙ উটাঙের দৈহিক গঠন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম এবং সাধারণ ভাবে বর্ণনাত্মক বিবরণ ছিল। এই স্তন্যপায়ী জন্তুদের প্রকাণ্ড দৈর্ঘ্য, অমানুষিক শক্তি এবং কর্মপটুতা, রক্তহিংস্রতা, এবং অনুকরণপ্রিয়তার কথা সকলেরই ভালো করে জানা আছে। হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা এক মুহূর্তেই আমি উপলব্ধি করলাম।

পড়া শেষ করে আমি বললাম, 'আঙুলের বিস্তৃতির যে বর্ণনা আছে সেটা ছবির সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। আপনি যে আঙুলের চিহ্ন এঁকেছেন এইখানে বর্ণিত ওরাঙ উটাঙের ছাড়া আর কোনো প্রাণীর হতে পারে বলে মনে হয় না। এই হলদে চুলের গুচ্ছও ক্যুভিয়েরের বর্ণিত জন্তুর চুলেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ। কিন্তু আমি এই ভয়ানক রহস্যের খুঁটিনাটি ব্যাপারের (particulars) সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারছি না। তাছাড়া বিতণ্ডারত দু'টি কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল আর তাদের একটি নিঃসংশয়রূপে ফরাসীর ছিল।"

"তা ঠিক; সাক্ষীরা জবানবন্দীতে একবাক্যে এর কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত "মঁ দিও (হে ভগবান!)" কথাটা আপনার মনে আছে। ঐ অবস্থায় এই কথা ক'টি যে বিরক্ত করবার উদ্দেশ্যে মিনতির ভাব-ব্যঞ্জক তা এক জন সাক্ষী (মিঠাইওয়ালা মন্তানী) যথার্থই বলেছে। এই রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধানের আশা এই দু'টি কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। এক জন ফরাসী এই হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরেছিল। এটা সম্ভব—সম্ভবের চেয়েও বেশী—যে এই যে রক্তাক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এতে অংশ নেওয়া সম্বন্ধে সে লোকটি নিরপরাধ। ওরাঙ উটাঙটা তার হাত থেকে পলায়ন করেছিল। সে হয়ত সন্ধান করে ওই কক্ষে এসেছিল কিন্তু যে উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার আরম্ভ হয়েছিল, সে ওটাকে আবার আবদ্ধ করতে পারিনি। ওটা এখনও মুক্ত অবস্থায়ই আছে। আর এই সব অনুমানের অনুসরণ করব না, এগুলোকে অনুমানের চেয়ে বেশি কিছু বলার অধিকার নেই আমার। কারণ যে সব চিন্তার ওপর এই সব অনুমান প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে খুব গভীর বলে আমি মনে করি না, আর অন্যকে সেগুলো বোঝাবার মত স্পর্দ্ধাও রাখি না। আমরা এগুলোকে অনুমানই বলব আর অনুমান বলেই এদের সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমি যেমন মনে করছি, যদি ওই ফরাসী এই নৃশংস ব্যবহার সম্বন্ধে নিরপরাধ হয় তা হলে এ বিজ্ঞাপন, যা আমি গতরাত্রি ফেরার পথে ল্য মঁদ (সংসার) পত্রিকায় (যাতে জাহাজ সংক্রান্ত ব্যাপার ছাপা হয় এবং যা নাবিকেরা খুব বেশি পড়ে) দিয়ে এসেছি, তাকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসবে।"

তিনি একটা খবরের কাগজ আমার হাতে দিলেন, তাতে এই রকম পড়লাম:

ধৃত—বুলোনের জঙ্গলে—তারিখ (খুনের পরদিন সকাল বেলা) একটি খুব বড় হরিদ্বর্ণ বোর্ণিওর ওরাঙ উটাঙ। এর মালিক (যাকে মাল্টার জাহাজের নাবিক বলে জানা গেছে) সন্তোষজনক ভাবে সনাক্ত করতে পারলে, একে ধরার এবং রাখার খরচ দিয়ে নং—রু—ফাবুর্গ সাঁৎ জার ম্যাতে তিনটের সময়ে পেতে পারেন।"

আমি প্রশ্ন করলাম, লোকটা যে মাল্টার জাহাজের নাবিক, এ কথা আপনি জানলেন কি করে?"

দ্যুপ্যাঁ বললেন, "এটা আমি জানি না, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। কিন্তু এই এক টুকরো ফিতে রয়েছে যার আকৃতি এবং তেলেটে চেহারা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটা দিয়ে নাবিকেরা যেমন লম্বা বেণী বাঁধতে ভালোবাসে তেমনি করে চুল বাঁধবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এই যে গ্রন্থিটা এটা নাবিকেরা ছাড়া অল্প লোকেই জানে আর মাল্টাবাসীদের মাঝেই এটা বিশেষ ভাবে প্রচলিত। তড়িৎ-বাহক দণ্ডের নীচে আমি এই ফিতে কুড়িয়ে

পেয়েছিলাম। মৃতদের মাঝে কারো এটা হতে পারে না। এই ফিতে থেকে আমি যে অনুমান করেছি (যে এই ফরাসীটি মাল্টার জাহাজে নাবিক) যদি তা ভুলই হয় তবু বিজ্ঞাপনে যা লিখেছি তাতে কারো কোনো অনিষ্ট করা হয়নি। যদি আমি ঠিক হই, তাতে একটা মস্ত লাভ আছে। হত্যা সম্বন্ধে নিরপরাধ হয়ে অথচ তার কথা জেনে সেই ফরাসী স্বভাবতই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিতে—ওরাঙ উটাঙটাকে চাইতে—ইতস্ততঃ করবে। সে এই ভাবে চিন্তা করবে: আমি নিরপরাধ, আমি দরিদ্র, আমার ওরাঙ উটাঙটা খুবই দামী, আমার অবস্থার লোকের পক্ষে এটা এক মহা সম্পদ, মিথ্যা বিপদের আশঙ্কা করে কেন এটাকে হারাব? এই তো আমার হাতেই এসে পড়েছে। হত্যাকাণ্ড যেখানে হয়েছে সেখান থেকে অনেক দূরে বুলোনের জঙ্গলে একে পাওয়া গেছে। কেমন করে এমন সন্দেহ হবে যে, এটাই হত্যা করেছে। পুলিশ কিছু বুঝতে পারছে না, কোনো রকম সন্ধান পায়নি তারা। যদি বা তারা জন্তুটাকে অপরাধী বলে ধরে আমি যে সে কথা জানি তা প্রমাণ করতে কিম্বা আমি জানি বলে সে জন্য তার সঙ্গে আমাকে দোষী করা অসম্ভব। তাছাড়া আমাকে জেনে ফেলেছে। বিজ্ঞাপনদাতা আমাকে জন্তুটার মালিক বলে বর্ণনা করছেন। ঠিক জানি না, তিনি কত দূর কি জানেন। এই মহামূল্য জন্তুটা যা আমার বলে জানা হয়ে গেছে, যদি আমি দাবী না করি, তা হলে জন্তুটার ওপর অন্ততঃ সন্দেহ হবে। জন্তুটার প্রতি কিম্বা নিজের প্রতি আমি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না। বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে ওরাঙ উটাঙটাকে নিয়ে কিছু কাল লুকিয়ে রাখব যত দিন এই ব্যাপারটা চাপা না পড়ে যায়।"

এমন সময় সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ শোনা গেল।

দ্যুপ্যাঁ বললেন, "পিস্তলগুলো নিয়ে তৈরী থাকুন, কিন্তু আমি ইসারা না করা পর্য্যন্ত ওগুলো ব্যবহারও করবেন না, দেখাবেনও না।"

বাড়ীর সুমুখের দরজাটা খোলা রাখা ছিল, ঘণ্টা না বাজিয়েই সে প্রবেশ ক'রে সিঁড়ির কয়েক ধাপ এগিয়ে এল। কিন্তু তার পর যেন সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। তখনই শোনা গেল সে নেমে চলে যাচ্ছে। দ্যুপ্যাঁ দ্রুত দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় আবার তাকে ওপরে আসতে শোনা গেল। দ্বিতীয় বার আর সে ফিরল না, স্থির সঙ্কল্প হয়ে সে উঠে এসে আমাদের ঘরের দোরে টোকা দিল।

উৎফুল্ল এবং সহৃদয় কণ্ঠে দ্যুপ্যাঁ বললেন, "ভেতরে আসুন।"

এক জন লোক প্রবেশ করল। স্পষ্টতঃই লোকটি নাবিক, দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পেশীবহুল লোক, মুখে একটা অতি বেপরোয়া ভাব, একেবারেই যে দেখতে খারাপ তা নয়। অত্যন্ত রৌদ্রদগ্ধ মুখখানির অর্দ্ধেকের বেশি দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন। তার হাতে ছিল মস্ত একটা ওক কাঠের লাঠি কিন্তু তাছাড়া নিরস্ত্র বলেই মনে হচ্ছিল। সে awkwardly নমস্কার করে ফরাসী ছাঁদে আমাদের শুভ সন্ধ্যা জানালে, যদিচ উচ্চারণ-ভঙ্গীটা কতকটা neufchatellish, তথাপি প্যারিসীয় নিদর্শন তাতে যথেষ্ট ছিল।

দ্যুপ্যাঁ বললেন, "বসুন, বন্ধুবর, আমার বোধ হয় আপনি ওরাঙ উটাঙটার সম্পর্কে এসেছেন। সত্যি বলছি আপনার সম্পত্তিটির প্রতি আমার এক রকম লোভ হয়েছে বললেও হয়। খুব চমৎকার আর নিঃসন্দেহ খুবই মূল্যবান্ জানোয়ারটি। ওটার বয়স কত বলে মনে হয় আপনার?"

যেন একটা দুর্বহ ভার থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে নাবিক উত্তর দিলে, "তা আমি বলতে পারি নে, তবে চার-পাঁচ বছরের বেশি হবে না। ওটা কি আপনার এখানেই আছে?"

"না, না; এখানে রাখার কোনো সুবিধে নেই। কাছেই রু দ্যু বুর্গের আস্তাবলে (livery stable) আছে। সকালে নিতে পারেন। অবশ্য আপনি ওটাকে সনাক্ত করতে পারবেন?"

"নিশ্চয়, মশায়।"

"ওটা দিতে আমার কষ্ট হবে" বললেন দ্যুপ্যাঁ।

"মশাই, আপনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন সেটা বৃথা যাবে না! সে-রকম আমি আশাই করিনি। এই জন্তুটাকে পাওয়ার জন্য, আপনাকে যা কিছু সঙ্গত, পুরস্কার দিতে আমি খুব রাজী।"

আমার বন্ধু উত্তর করলেন, "খুব ভালো কথা নিশ্চয়। ভেবে দেখি। কি চাই আমি? ও হ্যাঁ, বলছি, আমার পুরস্কার হবে এই। রু মর্গের হত্যাকাণ্ডগুলোর সম্বন্ধে আপনার যথাশক্তি সমস্ত তথ্য আমাকে বলতে হবে আপনাকে।"

শেষের কথাগুলো দ্যুপ্যাঁ অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে এবং অত্যন্ত শান্ত ভাবে বললেন। আর তেমনি শান্ত ভাবে দোরের কাছে গিয়ে তাতে তালা দিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রাখলেন। তার পর তিনি বুক থেকে পিস্তল বার করে একটু উত্তেজিত না হয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন।

নাবিকের মুখটা লাল হয়ে উঠল, যেন তার নিশ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। সে দাঁড়িয়ে উঠে লাঠিটা ধরল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভয়ানক কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল আর মুখটা তার মৃত্যু-বিবর্ণ হয়ে গেল। একটি কথাও বলল না সে! আমার হৃদয় তার জন্য করুণায় ভরে গেল।

দয়ার্দ্র স্বরে বন্ধু বললেন, "বন্ধু, আপনি বৃথা শঙ্কিত হচ্ছেন; সত্যি বলছি। আমরা আপনার কোনো রকম অনিষ্ট কামনা করিনে। আমাদের ভদ্রতার এবং ফরাসী নামের শপথ করে বলছি আপনাকে, আমাদের কোনো অনিষ্ট করবার অভিপ্রায় নেই। আমি খুব ভালো করে জানি যে, রু মর্গের নৃশংসকাণ্ডের সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিন্তু আপনি এর সঙ্গে কতকটা জড়িত সে কথা অস্বীকার করলে চলবে না। যা আমি বলেছি তা থেকেই আপনি অবশ্য বুঝতে পারছেন যে এই ব্যাপার সম্বন্ধে এমন উপায়ে আমি খবর পেয়েছি যা আপনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই। আপনি এমন কিছু করেননি যা আপনি না করলেও পারতেন আর নিশ্চয়ই আপনি এমন কিছুই করেননি যাতে আপনাকে অপরাধী করা যেতে পারে। আপনাকে ডাকাতির অপরাধেও অপরাধী করা চলে না যদিচ আপনি নির্ভয়ে ডাকাতি করতে পারতেন। আপনার গোপন করবার কিছুই নেই। অপর পক্ষে আত্মসম্মানের খাতিরে আপনি যা-কিছু জানেন তা স্বীকার করতে আপনি বাধ্য। যে-অপরাধের আসামীকে আপনি দেখিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন। সেই অপরাধে এক জন নিরপরাধ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়ে কয়েদ হয়ে রয়েছে।"

ব্যাপারটা যখন এই কথাগুলো বললুম, তখন সেই লোকটি আপনাকে অনেকখানি সামলে নিলে, কিন্তু তার প্রথমকার সাহসিক ভাবটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল।

একটুখানি থেমে বলল সে, 'ভগবান্ আমার সহায় হোন। এই ব্যাপারের আমি যা কিছু জানি সবই বলব। কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছি তার অর্দ্ধেকও যে আপনারা বিশ্বাস করবেন তা আমি আশা করি নে, যদি করি তা হলে আমি নেহাৎ বোকা। তবু আমি নির্দোষ; যদি মরতেও হয় এ জন্ত, তবু আমি সব কথাই বলব।"

লোকটি যা বলল তা সংক্ষেপে এই। কিছু কাল হল সে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে গিয়েছিল। যে দলে সে ছিল সেই দল বোর্ণিওতে নেমে সেই দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভ্রমণানন্দের উদ্দেশ্যে। সে এবং তার এক সাথী ওই ওরাঙ উটাঙটাকে ধরে। সঙ্গীটি মারা যাওয়ায় ওটা একান্ত ভাবে তারই অধিকারে আসে। বন্দী জন্তটার অনমনীয় হিংস্রতার জন্ত ফেরার পথে অনেক যন্ত্রণা ভোগের পর অবশেষে সে ওটাকে তার প্যারীস্থ নিজের বাসায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়! এখানে প্রতিবেশীদের অপ্রীতিকর কৌতূহল থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জাহাজে ওটার পায়ে আঘাত লেগে যে ঘা হয়েছিল সেটা না সারা পর্যন্ত সে সাবধানে ওটাকে নিভৃতে রাখে। তার শেষ লক্ষ্য ছিল ওটাকে বিক্রয় করবার।

সেই রাত্তিরে, অথবা হত্যাকাণ্ড যে ভোরে হয় তখন, সে কয়েক জন নাবিকের সঙ্গে প্রমোদে কাটিয়ে বাড়ী ফিরে দেখে যে পাশের ঘরে যেখানে তাকে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল বলে মনে করা গিয়েছিল, সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে জন্তটা তার বিছানা দখল করেছে। সাবান-ফেনা লাগিয়ে রেজর হাতে সে আয়নার সামনে বসে কামানোর চেষ্টা করছিল, যে কাজ করতে সে তার মালিককে ওই কক্ষে চাবি লাগানোর ছেঁদা দিয়ে নিশ্চয়ই দেখেছিল। এই হিংস্র জানোয়ারের হাতে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র দেখে যা সে খুব ভালো রকম ব্যবহার করতে পারত, সে ভীত হয়ে কি যে করবে বুঝতে পারল না। কিন্তু সে এই জন্তটাকে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত অবস্থায়ও একটা বেতের সাহায্যে শান্ত করতে অভ্যস্ত ছিল, এবারেও সে তাই করতে অগ্রসর হল। বেতটা দেখে ওরাঙ উটাঙ তৎক্ষণাৎ কক্ষের দোর দিয়ে লাফ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তার পর দুর্ভাগ্যবশতঃ খোলা একটা জানালা দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

সেই ফরাসী হতাশ হয়ে তার অনুসরণ করতে লাগল; বনমানুষটা তখনো হাতে রেজর নিয়ে মাঝে মাঝে থামতে লাগল আর পেছনে তার অনুসরণকারীর দিকে তাকিয়ে অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। অবশেষে লোকটি প্রায় তার কাছে এসে পড়ল। এমনি করে পশ্চাদ্ধাবন চলল অনেকক্ষণ ধরে। রাস্তাগুলো তখন ভীষণ নিস্তব্ধ। রাত প্রায় তিনটে তখন। রু মর্গের পেছন দিকের একটা গলি দিয়ে যেতে-যেতে পলাতকের দৃষ্টি মাদাম লেস্পানাইয়ের বাড়ীর চার তলার কক্ষের খোলা জানালা দিয়ে যে আলো জ্বলছিল সেটার দিকে আকৃষ্ট হল। ওই বাড়ীর দিকে ছুটে গিয়ে ওটা তড়িৎবাহক দণ্ডটা দেখতে পেয়ে অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে গিয়ে জানালার সাসিটাকে আঁকড়ে ধরল যেটা সম্পূর্ণ ভাবে খোলা থাকায় দেয়ালের গায়ে লেগে-ছিল। তার পর সাসিটার সাহায্যে সোজা পালঙ্কের মাথার ওপর দিয়ে পড়ল। এই ব্যাপারটা হতে এক মিনিটও লাগল না। কক্ষে প্রবেশ করে ওরাঙ উটাঙটা লাথি মেরে আবার সাসিটাকে খুলে দিলে।

ইতিমধ্যে নাবিক আনন্দিত হল, বিব্রতও হল। তার খুব আশা হল যে এবার জানোয়ারটাকে সে বন্দী করতে পারবে। কারণ যে ফাঁদে ও সাহস করে ঢুকেছিল তা থেকে দণ্ডটি ছাড়া কোনো উপায়ে পলায়নের আর পথ ছিল না, সুতরাং নামবার সময় এইখানেই তাকে আটক করা যেতে পারবে। অপর পক্ষে উদ্বেগেরও যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল বাড়ীর ভেতরে কি ক'রে বসবে ভেবে। এই পরবর্তী ভাবনাটাই তাকে পলাতকের অনুসরণ করতে প্রেরণা দিতে লাগল। তড়িৎবাহক দণ্ড বেয়ে ওঠা কিছু কঠিন নয়, বিশেষতঃ নাবিকের পক্ষে; কিন্তু যখন সে জানালা পর্য্যন্ত উঠে গেল, যেটা তার বাঁ দিকে বেশ দূরে ছিল, তার গতি থেমে গেল। যেখান থেকে কক্ষের অভ্যন্তরটা দেখা যেতে পারে তার বেশি অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। এই দেখে তার এমন ভয় হল যে, সে ওই দণ্ড থেকে হাত ফসকে প্রায় পড়েই গিয়েছিল। ঠিক এমনি সময় রাত্রি ভেদ করে সেই ভয়ানক চীৎকার ধ্বনি উঠতে লাগল, যাতে রু মর্গের অধিবাসীরা ঘুম থেকে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। মাদাম লেস্পানাইয়ে এবং তাঁর মেয়ে রাত্রিবাস পরিহিত অবস্থায়, যে লোহার সিন্দুকের কথা বলা হয়েছে সেইটেকে কক্ষের মাঝখানে এনে তাতে বোধ হয় কিছু কাগজ-পত্র গুছোচ্ছিলেন। সিন্দুকটা খোলা ছিল, তার জিনিষ-পত্র পাশে মেঝেয় পড়েছিল। নিহত নারীদ্বয় নিশ্চয়ই জানালার দিকে পিঠ করে বসেছিলেন। সম্ভবতঃ জানোয়ারটার প্রবেশ করা আর ওই চীৎকার-ধ্বনির মাঝে যে সময় অতিবাহিত হয়েছিল তা থেকে মনে হয় যে তাঁরা তৎক্ষণাৎ এটাকে দেখতে পাননি। স্বভাবতঃ সাসির নড়ার শব্দটা তাঁরা হাওয়ার দরুণই মনে করে থাকবেন।

নাবিক যখন কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করল তখন ওই প্রকাণ্ড জন্তটা মাদাম লেস্পানাইয়ের চুল ধরেছে (তাঁর চুল খোলা ছিল এবং তিনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন) নাপিতের রেজর নাড়ার অনুকরণ করে তাঁর মুখের সামনে রেজরটাকে নেড়ে আস্ফালন করছে। মেয়েটি নিস্পন্দ অবস্থায় শায়িতা ছিলেন, কারণ তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধার চীৎকার এবং মুক্তি-প্রয়াসে (যাতে মাথা থেকে চুল ছিঁড়ে গিয়েছিল) বোধ হয় ওরাঙ উটাঙের শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় ক্রোধে পরিণত হল। পেশীবহুল বাহুর একটি দৃঢ় সঙ্কল্পিত সঞ্চালনে মহিলার দেহ থেকে মাথাটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। রক্ত দেখে ওর ক্রোধ, উন্মাদ উত্তেজনায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে করতে, চোখে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে, ওটা মেয়েটির শরীরের দিকে ছুটে গিয়ে ওর হিংস্র নখগুলো গলায় বসিয়ে দিল এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত শক্ত করে ধরেই রইল। ঠিক এই সময় ওর ভ্রাম্যমাণ উগ্র দৃষ্টি পালঙ্কের মাথার ওপর গিয়ে পড়ল যার ওপর দিয়ে তার মালিকের ভীতি-কঠিন মুখখানি দেখা যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই তখন সেই ভয়ানক বেতের কথা মনে পড়ায় তার উগ্রতা এক মুহূর্ত্তেই ভয়ে পরিণত হয়েছিল। শাস্তিযোগ্য কাজ করেছে বুঝতে পেরে ও নিজের রক্তাক্ত ক্রিয়াকাণ্ড গোপন করতে ইচ্ছুক হয়ে স্নায়বিক উত্তেজনায় ক্লিষ্ট হয়ে কক্ষের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর তখন পালঙ্ক থেকে বিছানাটা টেনে ফেলে, আসবাব-পত্র টানা-হেঁচড়া করে লণ্ডভণ্ড করতে লাগল। অবশেষে প্রথমে মেয়ের মৃতদেহটা

ধরে চিমনীর ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে যে অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়াছিল পরে; তার পরে বৃদ্ধা মহিলার দেহটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

বনমানুষটা যখন সেই কাটা শরীরটা নিয়ে জানালার দিকে অগ্রসর হল তখন ভয়ে তড়িৎদণ্ডে নাবিকের শরীর সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং এক রকম হাত পিছলে যাওয়ার মত করেই সে নীচে নেমে গেল এবং এই হত্যাকাণ্ডের ফলাফলের কথা ভেবে এবং ভয়ে ওরাঙ উটাঙের অদৃষ্ট সম্বন্ধে সমস্ত দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে সে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে এল। সিঁড়ির ওপর থেকে লোকেরা যে কথা শুনেছিল সেগুলো ওই জানোয়ারের অস্ফুট শয়তানী কিচিমিচির ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত ওই ফরাসীর ভয়-বিভীষিকার আর্ত্ত ধ্বনি ছিল।

আর আমার কিছুই বলবার নেই। নিশ্চয়ই দোর ভাঙার পূর্বে জানোয়ারটা ওই জানালা দিয়ে বেরিয়ে ওই দণ্ডের সাহায্যে পলায়ন করেছিল এবং বাতায়ন দিয়ে যাবার সময় ওটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে মালিক নিজেই ওটাকে ধরে এবং এর জন্য Jardin des Plantes 'বোটানিকাল গার্ডেনে'র কাছ থেকে মোটা টাকা পায়। পুলিশের বড়কর্ত্তা আপিসে ওই ঘটনার বর্ণনা (দ্যুপ্যাঁর টিপ্পনী সহ) শুনে ল্য বঁকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। ওই কর্ত্তা ব্যক্তিটি কিন্তু আমার বন্ধুর প্রতি সদয় ভাবাপন্ন হলেও ঘটনায় এই রকম মোড় ফিরে যাওয়ার দরুণ তাঁর ওপর যে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ চাপতে পারলেন না এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের চরকায় তেল দেওয়া সম্বন্ধে দু'-চারটি শ্লেষবাক্য উচ্চারণ করে তৃপ্তিবোধ করলেন।

উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বোধে দ্যুপ্যাঁ বললেন, "বলতে দিন ওকে বলতে দিন, তাতে বিবেকটা একটু শান্ত হবে। তাঁরই দুর্গের ভেতর তাঁকে পরাস্ত করেই আমি তৃপ্ত। কিন্তু উনি যে এই রহস্যের মীমাংসা করতে অকৃতকার্য্য হয়েছেন এতে বিস্ময়ের কারণ নেই। কারণ, সত্যি, আমাদের বন্ধু পুলিশ-প্রিফেক্টএর বুদ্ধি-চাতুর্য্যটা গভীরতার চেয়ে বেশি। তাঁর জ্ঞানের কোনো বীর্য নেই, দেবী Lavernaর চিত্রের মত শুধু মাথাই আছে দেহ নেই, অথবা খুব বেশি বলতে হলে বলা যায়, কড মাছের মত মাথা আর স্কন্ধসার। কিন্তু মোটের ওপর লোকটি ভালো। আমি তাঁকে পছন্দ করি, তাঁর একটি চমৎকার চালের জন্য যার সাহায্যে তিনি চতুরতার খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমি তাঁর "যা আছে তাকে অস্বীকার করবার এবং যা নেই তাকে ব্যাখ্যা করবার "di nier ce qui est, et d'expliquer ce qui nest pas" পদ্ধতির কথা বলছি।"

অনুবাদক—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

অলস দিন

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এ আকাশ নীল, এ আকাশে কোন
ক্লান্তি নেই—
দুঃখ এই।
অলস মনের এ ফাঁকা আকাশে
চড়াই-খেলা,
আমার পৃথিবী অবোধ অবাক্
দুপুর বেলা:
ঝিমানো মনের প্রাঙ্গণে তাই
দাঁড়ালো কাক।
আকাশের ছায়া এ মাটির বুকে
শুধু অবাক!
বর্ব্বর ধুলো পথে পথে ওড়ে,
কি যে খেয়াল!
এ দুটো চোখের সামনে এখন
ছোট দেয়াল।
আমার সাগরে ভেঙে ভেঙে পড়ে
সময়-ঢেউ;
তুমি আছ শুধু, আর কোথা নেই
আমরা কেউ।
উতল সাগর, গর্জ্জনে তার
ক্লান্তি নেই—
দুঃখ এই।

প্রতীক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দিগন্তে ঘেরা দূর পাহাড়ের অন্তরাল
ওরি পশ্চাতে প্রতীক্ষমাণ মোর প্রভাত
তেপান্তরের পথে একা চলা সে কত কাল?
কবে শেষ হবে নিঃস্ব হওয়ার আঁধার রাত।

আবার কখন উদয়-শিখরে জাগিবে আলো
দূর পশ্চিমে একাকার হবে আলো ও ছায়া
ফিকা বুননের মসৃলিনে রঙ্, হাল্কা কালো
আবছা আলোতে ডাক দেবে তব চোখের মায়া!

যদিও অতলে ভ্রাম্যমাণের স্বপ্ন রচে
শুধু গেঁথে চলা বিনি সূত্রের পুষ্পহার
সুদূর আকাশে তাহাদের চোখে কী রঙ্ লাগে!
আমি দেখি গাঢ় নিঃসীম এই নীল আঁধার।

কালো পাথরের মৌন কারায় দৃষ্টি তার
আজও খোঁজে পথ মুক্ত আকাশে—বাতায়নিক
আজও চঞ্চল তারকায় ফোটে বিম্ব কার?
তেপান্তরের পথে পাড়ি দেওয়া কোন পথিক?

আমি তো দিয়েছি সমুখে বাড়ায়ে দু'খানি হাত
তোমার তনুর উষ্ণ কোমল স্পর্শ কই?
অন্ধ আঁখিতে রশ্মি তীরের কোথা আঘাত
আজও আমি তাই দূর দিগন্তে চাহিয়া রই।

[ধুবড়ীর মহাদেবের মন্দির প্রাচীনতায় এবং পবিত্রতার বিখ্যাত। মন্দিরের সবায়েৎ দুই জন—হরিশ এবং হরেন্দ্র—কিন্তু দুই জন হইলে কি হইবে দুই জনের মধ্যে বিষম বিরোধ। এক জন আরেক্ জনের নাম সহিতে পারে না। মামলা-মোকদ্দমার অন্ত নাই। যে কাহিনী রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এইটুকু ভূমিকাই হয়তো তাহার পক্ষে যথেষ্ট।]

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মন্দিরের বারান্দার একাংশ

সময় রাত্রি। আরতি চলিতেছে। নরনারীর দল দেবদর্শন করিতেছে।

দা'ঠাকুর। (হুঁকো টানিতে টানিতে) বলি শুনচো হে রমেশ, সেবায়েৎদের মামলায় আমাদেরও যে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে!

রমেশ। দাঁড়াতে হয় দাঁড়াবো, কিন্তু সত্য কথা যে বল্‌বে তার আর ভাবনা কি?

দা'ঠাকুর। তা' যা বলেচো, কিন্তু হরিশ আর হরেন্দ্র দু'জনেই তো দারুণ সুপারিশ সুরু করেচে। এখন বল দিকিন্ কাকে ফেলে কাকে রাখি!

রমেশ। (স্বগত) মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া আর কমলাকান্তের মত ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ যাদের পেশা তাদের পক্ষে এটা সমস্যাই বটে! (দা'ঠাকুরের দিকে ফিরিয়া এবং গলা নীচু করিয়া) তা কে কত দিতে চাইছে?

দা'ঠাকুর। ত্থাখ্, রমেশ, এই হুঁকো দিয়ে তোর মাথায় মার্‌ব দু'ঘা। আমি কবে তোর পাকা ধানে মই দিয়েচি বল্‌তো যে, তুই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌বার মতলবে আছিস? (প্রণাম করিয়া) বাবা মহাদেব জানেন কারু হাতের পাতা দিয়ে এখন অবধি কিছু গলেনি।

রমেশ। আচ্ছা দা'ঠাকুর, জীবনে আজ অবধি পুণ্যি-টুণ্যি কিছু করচো না শুধু কোর্ট-ঘরই করেচো? আর ক'টা দিনই বা বাঁচ্‌বে এবার পরকালের ভাবনা ভাবো।

দা'ঠাকুর। পরকাল ফরকালের ধার আমি ধারিনে রমেশ, কিন্তু কি জানো মামলাটা এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া, একবার ঢুকলে আর রক্ষে নেই। হয় তুমি বাঁচবে না হয় সে বাঁচবে।

রমেশ। সে কথা জানি বলেই তো বলচি, বাবা মহাদেবের কৃপায় এই বিষম ব্যাক্টিরিয়া মরে তো বাঁচি আর বাঁচে আমাদের এই অনাদি অনন্ত কালের দেবস্থান—যেখানে দিনে-রাত্রে হাজার হাজার নর-নারী ধর্ণা দিচ্ছে, মানত করছে, আর কাল-ভৈরবের পায়ের তলায় একটু স্থান পাবার জন্য উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছে।

যতীন। (উভয়ের কথোপকথন শুনিতে শুনিতে) ত্থাখ্ রমেশ, আমার কী মনে হয় জানিস্? এই যে বিবাদ-বিসম্বাদ এও বাবার লীলা, নইলে যারা দেবতার সেবায়েৎ তারা কি না তুচ্ছ করলে দেবতাকে, মেতে রইল দেবতার প্রাপ্য, দেবতার ভোগ্য যে অর্থ তারই লুটের হল্লায়। (হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া) দ্যাখ্…চেয়ে ত্থাখ্ বাবা হাসছেন…আরে হাঁ হাঁ, ঐ ত্থাখ্ তাঁর এক চোখে অশ্রু, আর চোখে হাসি! এই হাসি-কান্নার সরোবরে ফুটচে তাঁরই লীলাকমল যা যুগে যুগে মানুষের মনোহরণ করে এসেচে…মানুষকে হাসিয়েচে, কাঁদিয়েচে, আর ছলনা করেচে! দেবতার যারা সব চাইতে কাছে, আজ তারাই সব চাইতে দূরে!

দা'ঠাকুর। ত্থাখ্ যত্‌নে, তোর কথাগুলো যেন কেমন ধারা। আমি যখন মনে করি বুঝেচি ঠিক তখনই যেন ঠেলে আসে ধারণা কিচ্ছু বুঝিনি: সেই বোঝা না-বোঝার ল্যাঠা বিষম দায় হয়ে ওঠে আমার। ভালও লাগে আবার ভয়ও করে!

যতীন। ভয় কিসের দা'ঠাকুর? বাবার কাছে ছেলের ভয়! শিশুরা যখন সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়িয়ে মনে করে মস্ত সম্পত্তি জড়ো করেচি, বাবা তখন হাসেন। কিন্তু যে সম্পদ আহরণ হলো তা বলে তা'তো আর তুচ্ছ নয়—বাবার তাতেই তৃপ্তি! কিন্তু সেই নুড়ি নিয়ে যখন সুরু হয় বিবাদ তখন বাবা গণেন প্রমাদ। ডম্বরু তখন বেজে ওঠে কাঁড়া-নাকাড়া…প্রলয় নাচন তার হয় সুরু…ধরণী শিহরায়!

দা'ঠাকুর। যত্‌নে, ওই তো তোর বিপদ্। যখন কথা বলবি এমন ভয় ধরিয়ে দিবি যে চোখের সামনে ভেসে উঠবে বাবার রুদ্র মূর্ত্তি, রুক্ষ জটাজাল, আর নিকরুণ দৃষ্টি-দাহন।

যতীন। দাহন বলচ কেন দা'ঠাকুর? তুমি তাঁকে যে চোখে দেখবে…কল্পনা করবে সেই চেহারায় তিনি হবেন মূর্ত্ত। যে

আগুনে মানুষ হয় শুদ্ধ পূত পবিত্র···নিষ্কলঙ্ক তাকে তুমি দাহন বলো না···বলো—অবগাহন।

রমেশ। যতীন, তোদের বাক্য-বিন্যেস্ একটু থামা না বাপু। ওই ছাখ, একদল পুর-নারী আসছেন বাবাকে সঙ্গীত-নিবেদন করতে।

[পুরনারীদের প্রবেশ করিতে করিতে গান]

হাসি কান্নার সরোবরে ফুটিল কি ফুল ?
দুঃখ-দাহনের কলেবরে ভাঙিল কি ভুল !
চুনি-পান্নার লীলা-দলে বর্ষিলো বনফুল ;
ভুল-ভরে চুম্বন-ছলে স্পর্শিলো এলোচুল ?
ধরণীর কিনারায় কিনারায়
যে-ইসারা শিহরায় শিহরায়
নাই যে রে তার তুল্
তবু আজ ভাঙিবে না ভুল ?
আকাশের আঙিনায় আঙিনায়
যে-বাণীটি উছলায় উছলায়
তারি তরে এত ফুল ?
তবু আজ ভাঙিবে না ভুল ?

যতীন। রমেশ, আজ উঠি ভাই। (দা'ঠাকুরের দিকে চাহিয়া) পেন্নাম হই দা'ঠাকুর। দোহাই তোমার, এই ঠাকুর-দেবতার লীলা-ক্ষেত্রে তুমি নারদ মুনি সেজ না যেন। ধুবড়ীর শিবমন্দিরে যে কলঙ্ক প্রবেশ করেছে তাকে উচ্ছেদ করতেই হবে।

[প্রস্থান]

রমেশ। আমিও উঠি দা'ঠাকুর। রাত হ'ল ঢের···নইলে আমার গিন্নীটিকে জান তো ? একেবারে ঘরে খিল এঁটে ব'লে বসবেন ···No admission···সুতরাং চলি।

দা'ঠাকুর। বলি গিন্নী কি তোদের একার ঘরেই আছে, না আমাদেরও এক-আধটা আখেরের সম্বল আছে ? হরি শ্রীমধুসূদন ! আজ-কালকার ছোঁড়াগুলো হ'ল কি ! কেবল গিন্নী···গিন্নী··· গিন্নী ! (স্বগত) এ দা'ঠাকুরের ঘরেও একটি গিন্নী আছেন··· তিনি গিন্নীও বটেন এবং গিনিও বটেন অর্থাৎ বাপের বাড়ীর কিছু সম্পদ্ সোয়ামীর ঘরেও টেনে এনেছেন। তাকে গিনি ছাড়া আর কি-ই বা বলব ? কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে আমার টান নেই। হরি শ্রীমধুসূদন ! দেখি হরিশই বেশী দেয়, না হরেনই বেশী দেয়···সবই বাবার কৃপা ! হরি শ্রীমধুসূদন ! (রমেশের দিকে চাহিয়া) চল, চল···আর দেরী নয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মহাদেবের মন্দিরের সামনে দুই জন সেবায়েৎই উপবিষ্ট। পূজারী পূজা শেষে বন্দনা করিতেছেন। সামনে বিরাট্ শিবলিঙ্গ। ধূপ-ধুনার গন্ধে পূজা-মণ্ডপ সুগন্ধময়]

পূজারী। (দেব-নিবেদনান্তে) "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

(সেবায়েৎদের প্রণাম)

পূজারী। (ক্রোধে গর্জ্জিয়া) প্রণাম করো না, প্রণাম করো না। তোমরা দেবতার কাছে অস্পৃশ্য। আজ আমি ত্রিশ বৎসরের পূজো শেষ করলুম···এবার আমার যাবার পালা···এবার আমার ঠাকুরের যাবার পালা···এবার তোমাদের ধ্বংসের শুরু ! হরেন্দ্র, হরিশ, এই যে দেবস্থান দেখ্‌চো, যেখানে হাজার হাজার বছর কাল-ভৈরব প্রহর গুণেচেন···দলে দলে কাতারে কাতারে নর-নারী জন-স্রোতের মত ছুটে এসেচে তাঁর স্বচ্ছন্দ লীলা-নিকেতনে —সেইখানে তোমরা পত্তন করেচো এক বিরাট্ শ্মশানের ; যে শ্মশানে শবের আরাধনা হবে—শিবের নয়। বল তোমরা ধ্বংস চাও, না স্থিতি চাও···শিব না শব ?

হরিশ। এ প্রশ্ন কেন আজ করচেন ?

হরেন্দ্র। আমরা তো আপনাকে কিছু বলিনি···কোন পূজার্চ্চনায় ব্যাঘাত ঘটাইনি···তবু আপনি এত রুষ্ট কেন ?

পূজারী। তোমাদের বলাটাই কি সব ? তোমাদের ক্ষমতা কতটুকু ? সামান্য মানুষ হ'য়ে···কাল-পরিক্রমার মধ্যে বুদ্‌বুদের মত যারা জন্মায় এবং লোপ পায় তাদেরই এক জনা হ'য়ে বাবা মহাদেবের প্রাপ্য নিয়ে তোমরা মামলা চালিয়েছো এ কথা কি সত্যি ? দেবতার চাইতে কি দানবেরাই বড় হ'ল ? আমি হরিশকেও বুঝি না, হরেন্দ্রকেও বুঝি না, আমি বুঝি আমার ঠাকুর···সেই ঠাকুরকে লোক-লোচনের সাম্‌নে নামিয়ে নিয়ে হাসি-তামাসার পাত্র ক'রে তুলেছো ? কার প্রসাদে তোমাদের প্রাসাদ··· তোমাদের দু'বেলার দু'মুঠো অন্ন ?

হরিশ ও হরেন্দ্র। (উভয়েই সমস্বরে) পূজারী ঠাকুর, আপনি পূজো করুন। পূজোর বাইরে যা' কাজ সে তো আমাদেরই দ্রষ্টব্য। তা' নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

পূজারী। বটে !! চমৎকার !!! ওরে মূঢ়···ছাখ, ছাখ চেয়ে··· ঠাকুর কি বলছেন শোন ! বুঝিস কিছু ওঁর ভাষা ! আজ আমি ত্রিশ বছর ঠাকুরের সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি তাঁর সঙ্গে আছি। কাল তিনি আমায় কী বলেছেন জানিস্—বলতে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে···জিহ্বা শুকিয়ে ওঠে···চারি দিকে আগুনের লক্‌লকে শিখা লেলিহান হয়ে দেখা দেয়। বলছেন—"শঙ্কর, পাট তোল···এ পটে আর চলল না।" মানুষ তার মূঢ়তায় যাকে নিয়ে তার শ্রেষ্ঠ অহমিকা তাকে অপমান করে তাড়াবার জল্পনা কল্পনা কেঁদেছে···যে তার শ্রেষ্ঠ আভরণ তাকে তুচ্ছতার আবরণে ঢাকবার প্যাঁচ কস্‌চে···তাকে আইনের হাতিয়ার দিয়ে বধ্যভূমিতে পাঠাবার প্রয়োজনা করছে। বাজা···বাজা এবার ধ্বংসের বিষাণ, রুদ্রের কাঁড়া-নাকাড়া···দুর্ব্বার ডম্বরু। মানুষ মরুক্। শবে শবে ধরণী হোক্ শ্মশান।···পৃথিবী টলুক, আর তারি মাঝখানে বাবা বাজাবেন তাঁর মৃদঙ্গ। পত্তন হবে নতুন পৃথিবীর···নতুন ধরণীর। যেখানে থাকবে না হরিশ-হরেন্দ্রের লোভের লোল-জিহ্বা···যেখানে থাক্‌বে না ঐশ্বর্য্যের গগন-স্পর্শী ঔদ্ধত্য···যেখানে মানুষে মানুষে শুধু গড়ে উঠবে স্বচ্ছন্দ মিতালী।

[হাত তালি দিতে দিতে উন্মাদের মত প্রস্থান]

হরিশ। পূজারীর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে।

হরেন্দ্র। মাথা খারাপ ? তা জানি না ! আজ ত্রিশ বছরের মধ্যে তো এক দিনের তরেও এ ক্রোধ দেখিনি।

হরিশ। আমার অতো ঠুনকো মন নয়। আমার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় যতক্ষণ না সব হিসেব দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছ ততক্ষণ অবধি মামলার অবসান নেই। ঠাকুর-দেবতার ভয়ে মামলা তো আর হারতে পারব না!

হরেন্দ্র। উকিল-ব্যারিষ্টারের যুক্তিটাকেই সব চাইতে বড় বলে বুঝলে?

হরিশ। বল কি? দশ মোহর 'ওপিনিয়ান'টা বলব ধেলো? ছোঃ! যদি সব হিসেব-পত্র আসচে তারিখের ভেতর বুঝিয়ে দাও তো ভালো, আর তা যদি না দাও তো এই শিব-মন্দিরের সব কিছু যাবে রিসিভারের হাতে।

হরেন্দ্র। (স্বগত) পূজারীর মুখ দিয়ে কি ঠাকুরই তাঁর আদেশ বলালেন? জানি না···বাবা, তোমার ইচ্ছাই কি তাই?

[হরিশ ও হরেন্দ্রের দুই দিক্ দিয়া দুই জনের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সময়—রাত্রি

স্থান—মন্দির-প্রাঙ্গণ। বিগ্রহের সম্মুখে।

[হরেন্দ্রের কন্যা মালতী বিগ্রহকে ফুল দান করিয়া, ধূপ-ধুনা দিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন]

মালতী। (গলবস্ত্রে বিগ্রহকে প্রণাম পূর্ব্বক) ঠাকুর, এ কি সত্যি কথা, তুমি বলেছ আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবে? এই শিব-ক্ষেত্র হবে শ্মশান? এত দিন তোমায় দিলুম যে ফুল, ফল, বেলপাতা—সব নিবেদনই কি তুমি দিলে ফিরিয়ে? আজ চোখের জলে যে তোমার পা ভিজিয়ে দিলুম তাতেও কি পাষাণ ভিজলো না—গললো না? ঠাকুর এ কি তোমার ছলনা!

পূজারী। (প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণের পর) কি রে মালতী, তোর চোখে জল কেন রে? দু'দিন তো পূজো-মণ্ডপে আসিসনি ···তোর শরীর কি ভাল নেই? ভারি ভাবনা হ'য়েছিল আমার তোর জন্যে···তোর ফুল না পেলে ঠাকুরের পূজো যেন সম্পূর্ণই হয় না।

মালতী। (আঁচলে অশ্রু মোচন করিয়া) এ কথা সত্যি যে তোমার ঠাকুর আমার ফুল পেলে সন্তুষ্ট হন? বল...বল পূজারী, ছলনা কোরো না!

পূজারী। মালতী, আমার ঠাকুর তোর বাবার লোহার সিন্দুকের চাবির জন্য লালায়িত নয় রে পাগ্‌লী···সে যা চায় তা মাটির সোনা নয়, মনের সোনা—কালের কষ্টিপাথরে যে চিরকাল অমর, অমর! ওই আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ্···ওরা কি বলে জানিস···বলে—ঘরের ছাদে মানুষের দল আটকে আছে, আমাদের ছাদ আকাশ, যার আঙিনায় প্রতি মুহূর্ত্তে চলেছে জীবন শিল্পীর বিচিত্র রঙের আলপনা। রঙে রঙে রঙীন আমাদের খেলা-ঘর···সে ঘরের চাবিকাঠির সন্ধান মর্ত্ত্য-লোকের মানুষদের হাতে গিয়ে পৌঁছয়নি। মালতী, তোকে দেখে আমার কি ইচ্ছে ক'রে জানিস? ইচ্ছে করে পাঠিয়ে দিই ওই তারাদের দেশে···যেখানে দ্বেষ নেই দ্বন্দ্ব নেই; আছে শুধু আলো আর গান। যেখানে স্বার্থের সংঘাত নেই, পয়সার প্রয়োজন নেই, মানুষে মানুষে নেই কাড়াকাড়ি, হানাহানি··· যেখানে নেই গোলা···যেখানে নেই বারুদ···যেখানে আছে শুধু যুঁই ফুলের মত জ্যোৎস্না আর শিউলীর মত নরম হৃদয়।

মালতী। ছলনা ভাল লাগে না পূজারী, তুমি কি বলেছ তা জান?

পূজারী। জানি, আর জানি বলেই তো বলছি মালতী, তুই যেন এই মরুভূমির মাঝখানে একটা স্থলপদ্ম, যার পাঁপ্‌ড়িতে জড়ানো মায়া, স্বপ্ন সেবা। ঠাকুর কবে চ'লে যেতেন, তিনি শুধু বাঁধা পড়ে আছেন তোর আঁচলের গেরোতে···সে বাঁধন বড় কঠিন ঠাঁই। মালতী, তোকে একটা কথা বলব?

মালতী। (কাছে সরিয়া আসিয়া পূজারীর হাতে হাত দিয়া) বল··· বল···বল, দেরী ক'র না।

পূজারী। মালতী, তুই তোর বাবার সঙ্গে হরিশের বিরোধের একটা অবসান করতে পারিস?

মালতী। বাবাকে রাজী করাতে পারি, কিন্তু হরিশ কাকা?

পূজারী। আচ্ছা···সে ভেবে দেখব, কিন্তু এমন এক দিন আসতে পারে তোর হাতে এ বিরোধ মেটানোর ভার গিয়ে পৌঁছুতে পারে। সেদিন যেন পিছিয়ে পড়িসনি। সেদিন আমার আদেশ তোর বাবার আদেশের চাইতেও যেন বড়ো হয়। ছাখ মালতী, আজ আকাশে কত জ্যোৎস্না···এত আলো যেন আকাশ তার ভার বইতে পারছে না, ওই আকাশের ছায়া-পথ বেয়ে নেমে আসে সুর-পরীর দল এই পৃথিবীর আঙিনায়। তুই আজ একটা গান কর্ মালতী। ঠাকুর অনেক দিন তোর গান শোনেননি।

[মালতীর গান]

এই বিরোধের ছলনা ভাল লাগে না ভাল লাগে না—
এই কল্পনার জল্পনা ভালো লাগে না ভাল লাগে না।
চমকে চমকে উঠি শিহরি
গমকে গমকে কাঁপে বল্লরী
ওগো কিছু ভাল লাগে না—ভালো লাগে না,
এই বিরোধের ছলনা ভাল লাগে না ওগো ভাল লাগে না।

পূজারী। ওই ছাখ, হরিশের ছেলে কল্যাণ আসচে।

(কল্যাণের পূজারীকে প্রণাম)

কল্যাণ। আমি কাল রাত্রে আপনাকে স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রী স্বপ্ন।

পূজারী। আমাকে?

কল্যাণ। হ্যাঁ—আপনাকেই। আপনি যেন মৃত্যু-লোক থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন।

পূজারী। (উচ্চ হাস্যে) মৃত্যু-লোক থেকে? ঠিক, ঠিক বলেছ কল্যাণ! আমার অপমৃত্যু ঘটেছে তা নইলে যে ঠাকুরকে আজ ত্রিশ বছর আমি প্রতি পলে পলে সেবা ক'রে এসেচি, সেই ঠাকুরকে নিয়ে তোমার বাবা-কাকারা দাঁড় করালেন আইন-আদালতের সামনে?

কল্যাণ। ও কথা আমাকে বলবেন না, মালতীকে বলুন।

পূজারী। (সস্নেহে) যদি মালতীকেই বলতে হয় তো তা থেকে তুমিও বাদ পড় না! যে পরিমাণে মালতী দোষী তুমিও ততখানিই। কিন্তু তোমাদের দু'জনকেই বলছি যে, এই বিরোধের মাঝখান থেকে যদি না ঠাকুরকে উদ্ধার করো তো

আমিও মৃত্যু-লোকে, আর নীলকণ্ঠের হলাহল উদ্‌গিরণ অনিবার্য্য …তাতে কেউ বাঁচবে না। এই সনাতন শিব-মন্দির ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে হরিশ-হরেন্দ্র…ধ্বংস হবে মালতী ও কল্যাণ… সত্য হবে তোমার স্বপ্ন! তোমরা কি তাই চাও? ভালো ক'রে ভেবে ভাখো।

[পূজারীর প্রস্থান।

মালতী। যে বিরোধের কাঁটা নিয়ে আমাদের বাপ-পিতামহ জ্বলেছেন তুমি কি চাও সেটা আমাদের গায়েও বিঁধিয়ে দিতে?

কল্যাণ। মালতী ঝগড়া করাটা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু একটা কথা তো তুমি বোঝ…কর্ত্তব্যটা কখনও একতরফা হয় না?

মালতী। যদি তুমি সেই কর্ত্তব্যেরই দোহাই দিতে চাও তো সেটা নিজের পৌরুষত্বের ওপর ফেলে না দিয়ে এক জন নারীর ঘাড়ে চাপাচ্ছো কেন বলতে পার?

কল্যাণ। তুমি তো জান, এই দেনা-পাওনার বিরোধে আমার কথা কত তুচ্ছ, আর কত কাল ধরে এই বিরোধ ছাই-চাপা আগুনের মত জ্বলে জ্বলে আজ নিজেকে প্রলয়ের পোষাকে প্রকাশ করেচে।

মালতী। এতো কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু যেটাকে মিথ্যে বলে জানি সেইটেকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে আসল সত্য যা, আমাদের এই হাজারো বছরের ঠাকুর, যার একটু অপ্রসন্নতায় রাজার সিংহাসন ওঠে টলমলায়মান হয়ে সেই ঠাকুরকে তুচ্ছ করব? আর ঠাকুর তাই সইবেন?

কল্যাণ। ঘরের চৌকাঠে ঘুণ ধ'রেছে। সেই ঘুণ কেটে ছারখার ক'রে দেবে বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় কি?

মালতী। নিষ্ফল ক্রোধ ক্লীবের আভরণ। আজ সেই ক্ষণ এসেচে যখন ঠুন্‌কো কাচের বাসনকে সশব্দে ভেঙে খান্‌খান্ ক'রে গুঁড়িয়ে দিতে হবে পথের ধূলোয়…রাখতে হবে তাকে, নৈবেদ্য দিতে হ'বে তাকে যা কালত্রয়-বাধিত সত্য, শিব ও সুন্দর। ওই ঠাকুরের দিকে তাকাও…তিনি কি বলচেন শোন। বলচেন যে, আমি মানুষকে যুগে যুগে কালে কালে ছেঁচে ঢালছি, ভাঙ্‌ছি আর গ'ড়ছি, সেই আমি আজো সৃষ্টির মধ্যে ধ্বংস… ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি। তাকে অস্বীকার করবার দুঃসাহস করিসনি…ঠকবি…চোখের জলে বানচাল হ'য়ে যাবি। কল্যাণের প্রশস্ত পথে অকল্যাণকে ডেকে আনিসনি…ভালো হ'বে না, ভালো হবে না!

কল্যাণ। মালতী, তুমি বড় কাছে অথচ বড় দূরে। বড় সহজ অথচ বড় কঠিন। মনে হয় তুমি মর্ত্ত্যলোকের নও…এই মানুষের দেশে তুমি বড় বেমানান।

মালতী। হেঁয়ালী রাখো। যদি ঠাকুরের ডাক শুনে থাক, যদি ঠাকুরের চোখের ভাষা বুঝে থাক তো আর দেরী ক'র না। পূজারী কী বলেচেন শুনেছ তো? যুক্তি মানুষের রোগ, বিশ্বাস মানুষের ভরসা। যদি বিশ্বাস করো আমাদের এই ঠাকুর জাগ্রত…যদি বিশ্বাস কর মানুষ তাঁর হাতে ক্রীড়নক মাত্র… তবে আর দেরী ক'র না।

কল্যাণ। মালতী, এই পৃথিবীতে কি সত্য আর কি মিথ্যা জানি না। শুধু জানি ছেলে-বেলা থেকে এই শিব-মন্দিরকে…যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বছরে বছরে আসে পূজো দিতে, ঠাকুরের … পেতে, সেই ঠাকুরের রোষ তুচ্ছ জিনিষ নয়।

মালতী। যদি তাই জানো তো দ্বিধা কিসের? কিসের … বাধা? ঠাকুরের পায়ের কাছের ওই জবা ফুলটাকে দেখো… উঃ! কী লাল? কার রক্তে এত লাল? ওই লাল, ওই … বুঝি দেব-রোষে কোন দিন আমাদের ধুবড়ীকে রাঙা করে দেবে… রাঙা করে দেবে ব্রহ্ম-পুত্রকে! উঃ! ঠাকুর!

(মালতীর মূর্চ্ছা)

কল্যাণ। (নতজানু হইয়া) মালতী…মালতী…এ কী হল?

(পূজারীর পুনরায় প্রবেশ)

পূজারী। এ কী হল এখনও বুঝচো না কল্যাণ? আমার মালতী যেন ঠাকুরের হাতের বাঁশী, সেই বাঁশীর সুরে আজ বিষে… ব্যঞ্জনা। অমৃত গ্যাছে শুকিয়ে—উঠেচে শুধু গরল। তা নইলে নীলকণ্ঠ নাম কি অমনি হল! নীল শুধু নিঃসীম নীল…সেই নীলে জন্ম নিলে তাঁর লীলা-কমল—এই মালতী! (ঠাকুরের সেবা-জল ছিটান) এই জেগে উঠেচেন মা আমার কল্যাণী, শিবানী, লীলাময়ী! রাত আজ অনেক হয়ে গেছে। তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।

—

চতুর্থ দৃশ্য

সময়—প্রাতঃকাল

স্থান—মন্দির প্রাঙ্গণ

[সখীদের লইয়া মালতীর প্রবেশ, সকলের হাতেই ফুলের সাজি]

ঈপ্সিতা। ভাখ্, মালতী, তুই আর জন্মে এই পৃথিবীর মানুষ হয়ে ঘর করিসনি এটা ঠিক।

মালতী। কেন বল্‌তো ঈপ্সিতা? আমার তো মনে হয় তোর সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধুত্ব!

ঈপ্সিতা। তুই একটা বিষম পাগলী কিন্তু এত মিষ্টি যে কেবল … খেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, তোকে কাছে পেলে নিঃশেষ করে ফেলি।

মালতী। ভাখ্, আমি দূরের জিনিষ কাছে পাওয়ার মর্য্যাদা বুঝি রাখ্‌তে পারব না।

ঈপ্সিতা। বটে…সে আমার বেলায়, কল্যাণকুমারের বেলায় নয়।

মালতী। কথায় কথায় তোরা ওঁকে টানিস কেন জানি না কিন্তু আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে।

ঈপ্সিতা। ঠিকই বলেছিস মালতী, ভয় করে পরে যাকে ভালবাসা যায় সে ভালবাসা বেশ টেকসই হয়।

মাধবী। বটে, বটে! ঈপ্সিতা ঠাকরুণ এত প্রেমতত্ত্ব শিখলেন কোত্থেকে বলতো মালতী?

ঈপ্সিতা। ভাখ্, মাধবী, তুই ডেঁপোমি করিসনি বেশী। জানিস— তুই বয়সে আমার কত ছোট?

মাধবী। বেশ, আজ থেকে দিদি বলে ডাকব। সুবিধেই হবে, তোর বরের সঙ্গে দু'টো ঠাট্টা-ইয়ার্কি তো চলবে।

ঈপ্সিতা। আমার আবার বর কোত্থেকে এলো ?

মাধবী। বেশ, হাটে হাঁড়ি ভাঙ বো ? কেমন ?

মালতী। মাধবী, হাঁড়ি যখন ভাঙে তখন তার শব্দ শোনা যায়। যখন সে শব্দ শুনব উলুধ্বনি করব। তা বলে ফাঁকা আওয়াজে মাতবোনা।

ঈপ্সিতা। বাঃ, এই তো কোন্‌টা ফাঁকা আওয়াজ আর কোন্‌টা আসল বেশ চিন্‌তে শিখেচ ! তা আসলেই যখন এগিয়েচো তখন দ্বিধা কিসের ? আমরাই না হয় আজ উলুধ্বনি করি—ওটা তো বড় রকমের মাঙ্গলিকী।

(সকলের উলুধ্বনি)

করুণা। তোরা তো হাসচিস—কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে। যে মালতী ছিল দশের সে হ'চ্ছে একের। আমাদের যে মালতী—বিদায়-গীতি গাইতে হ'চ্চে সেটা বুঝেছিস ?

মাধবী। করুণা, তুই মালতীকে ওই জায়গাটায় ভুল করিসনি। মালতী সেই ধরণের মেয়ে যাকে কেবল পাওয়াই চলে—হারাণো চলে না। হারায় তো সব ঠুন্‌কো জিনিষ, যা শাশ্বত তা হারায় না। মালতী সেই শাশ্বতী যে যাদুমন্ত্রে পাষাণের ভেতর জাগিয়ে তুলতে পারে প্রাণ ; মূককে দিতে পারে ভাষা। মালতীকে হারাণো কি সহজ ?

করুণা। মাধবী, তুই হয়তো ঠিকই বলেছিস। মাটির মানুষেরা মালতীকে হয়তো ঠিক ঠাহর করতে পারে না। মালতী হ'ল দেবলোকের—আঁখি প্রদীপ। দেখছিস না ওর চোখে মায়া অঞ্জন ?

মালতী। তোদের কথার বন্যায় মালতী বুঝি সত্যিই হারিয়ে গ্যাছে। ছেলো কথা রাখ্, দিদিন্, ওই সূর্য্যি-দেবতা উঠ্‌চেন। এবার চল সব।

করুণা। এবার চল তোরা সব। ফুল-কুমারীকে নিয়ে ফুলের খোঁজে যাত্রা করা যাক।

[সাজি হস্তে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মন্দির-প্রাঙ্গণ

সময়—রাত্রি

[মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে করিতে]

হরিশ। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিচি ঠাকুর মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ কখনও হ'তে পারে ? আমাদের হাজারো বছরের ঠাকুর ! পূজারীটা আমাদের মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে। (দেবতার বেদীর পানে চাহিয়া) তাই তো ঠাকুর নেই···সত্যিই যে ঠাকুর নেই। বাবা, তুমি কোথায় গেলে ! ঠাকুর—আমাদের ঠাকুর ! শূন্য সিংহাসন ! উঃ !

(পূজারীর প্রবেশ)

পূজারী। হরিশ, সে জবাবের জন্য নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস কর। ঠাকুর তোমারও নয় আমারও নয়···যে শ্রদ্ধা করে ঠাকুর তার।

হরিশ। পূজারী, তুমিই ঠাকুরকে লুকিয়েছো।

পূজারী। ঠাকুরকে লুকোয় সাধ্য কার ? ঠাকুরকে নিয়ে পথের ধুলোয় দিয়েচো তাঁকে ফেলে একটা মাটির ঢেলার মতন। এও কী তিনি সইবেন ? বজ্রের নির্ঘোষ শুনেচো···কড়্-কড়্ করে যখন বেজে ওঠে, ঝন্-ঝন্ করে কেঁদে কঁকিয়ে গড়িয়ে পড়ে রাজার গগনচুম্বী প্রাসাদ তার কম্পনে। শোনো মূঢ়···ঐ শোনো, আকাশে বাতাসে কী করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি ! তুমি প্রকৃতিকে কাঁদিয়েচো···প্রকৃতির দেবতাকে হাতে পেয়ে হেলায় হারিয়েচো আবার জিজ্ঞেস করচো ঠাকুর কোথায় গেলেন ! লজ্জা করে না, চাঁদ যখন বামনের হাতে নিজেকে ধরা দিয়েছিল···স্বেচ্ছায়, স্বচ্ছন্দে, করুণা ভরে···তখন তার মর্য্যাদা দাওনি—আর আজ এসেচো তাঁকে খুঁজতে। খোঁজ···মাথা খুঁড়ে মর, কিন্তু পাষাণের প্রাণ আজ পাষাণেই পর্য্যবসিত হয়েছে।

(হরেন্দ্রের প্রবেশ)

হরেন্দ্র। (শূন্য বেদীর পানে চাহিয়া) দেব-স্থানে দেবতা নেই ! উঃ ! পূজারী···তুমি তো ঠাকুরের সঙ্গে কথা কয়েচো, তাঁর ভাষা জানো, বোঝ,···বল এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত ?

পূজারী। প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লেও প্রায়শ্চিত্তের অধিকার প্রয়োজন। তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের অধিকারও নেই। প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির, মনের ময়লা না তাড়ালে সেখানে ঠাকুরের সিংহাসন পাতা যায় না। মানুষ নিজেকে কতটুকু চেনে—কতটুকু বোঝে ? সে রাজমুকুট মাথায় দিয়ে মনে করে রাজা হয়েছি। আভরণের আবরণে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখে। আভরণ খুলে নিজেই তার নিজ স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে,—দীনতায়, হীনতায়, ক্লেদে, কদর্য্যতায় সে কুকুরের অধম। এই ধুবড়ীর শিব-মন্দির, যার চারি দিকে ছোট ছোট পাহাড়, পায়ের নীচে কুলু-কুলু ব'য়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র : যেখানে ফুলের অজস্রতায় মনের খুসীতে লাগে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের ছোপ্ : এই মন্দিরের পাষাণ-শিলায় এক দিন জেগেছিল দেবতার প্রাণ : এসেছিল লক্ষ লক্ষ নর-নারী তাকে ফল, ফুল, সেবা, প্রেম নিবেদন করতে ; কিন্তু যারা মন্দিরের দাসানুদাস তাদের মনে জাগলো লোভ—সেই লোভ তাদের হ'ল অপমৃত্যুর কারণ। তাই আজ তোমরা হরিশ ও হরেন্দ্র ভিখারীর অধম···তোমাদের প্রাসাদ-চূড়ায় ওই দেখ শকুনি বসেচে—অকল্যাণের দূতেরা ভীড় ক'রে আসচে।

হরিশ। মামলা তো আমাদের ভেতর চলেছে। ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের বিরোধ কিসের ?

পূজারী। যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগাবার পালা আমার নয়। দেখচো পূর্ণিমার চাঁদকে মেঘ ঢেকে দিয়েছে···আজও বুদ্ধির ছলনা ? আজও তর্কের অবতারণা ?

হরিশ। বল পূজারী, কি করলে ঠাকুর আবার ফিরে আসবেন ?

হরেন্দ্র। পূজারী তুমি যা বলবে আমরা তাই করবো। কিন্তু ঠাকুরকে ফিরিয়ে আনা চাই।

পূজারী। তোমরা স্বপ্ন দেখচো তার অন্তর্দ্ধানের···আমিও দেখেচি : তিনি কি বলেচেন জানো ? তিনি আবার আসবেন, আবার মূর্ত্ত হবেন। আবার এখানে—ধুবড়ীর এই শিবমন্দিরে জীবন-

দেবতার পায়ের আলপনা পড়বে—যদি তোমরা মামলা মিটিয়ে নাও।

[হরিশ ও হরেন্দ্র উভয়ে সমস্বরে আজই মেটাচ্ছি।

পূজারী। শুধু তাই নয়। ধুবড়ীর এই শিব-মন্দির ভারতবর্ষের পীঠস্থান হবে, যদি তোমরা এর সেবায়েতের গদি ছেড়ে দাও তাদের জন্ম যারা সত্যিই ঠাকুরকে সেবা ক'রে এসেছে। এতে দুঃখের কিছু নেই···মালতী ও কল্যাণ এই শিব-মন্দিরের ভার নেবে। রাজী? আমি মালতীর সঙ্গে কল্যাণের বিয়ে দেব।

হরিশ। তাই হোক্, তাই হোক্।

হরেন্দ্র। কত বছরের বিরোধের আজ অবসান হ'ল!

পূজারী। হরেন্দ্র, বিরোধ কথাটাকে মানুষের অভিধান থেকে তুলে দেওয়া চলে না? বিরোধ নয়···বিরোধে বিরোধে ধরণী বিষিয়ে উঠেচে। বিরোধের কালনাগিনীরা বিষের বাষ্পে পৃথিবীটাকে কালো করে দিয়েচে,—আজ দেখচো না চারি দিকে শুধু রক্ত, শুধু অগ্নি, শুধু জ্বালা, শুধু ত্রাস। শুনচো না, ধ্বংসের দেবতা ধনুকে টঙ্কার দিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন—ম্যয় ভুঁখা হুঁ···ম্যয় ভুঁখা হুঁ!! মায়ের কোলের ছেলের ছেলে, স্ত্রীর বুকের স্বামী আজ সব শব-যাত্রায় চলেছে। দুনিয়া লাগে লাল। আজ সত্য কিছু নেই, সত্য শুধু রক্তের তৃষ্ণা। মায়া-মৃগ আজ চোখে লাগিয়েছে বিরোধের বিষ। ওই মালতী আসচে···বাঁচলুম—আমার ঠাকুর মালতীর প্রেমের কাঙাল। (হরিশের দিকে চাহিয়া) কাল রজনীতে ঠাকুরের অভিষেক হবে, নতুন করে···নতুন সেবক-সেবিকার মিতালীতে। ওই দেখ মালতী ও কল্যাণ আসচে।

(মালতী ও কল্যাণের প্রবেশ)

হরেন্দ্র। পূজারী, ও কি! ও কি! (সবিস্ময়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার) ওই যে, ওই যে···হরিশ, মালতী, পূজারী···ওই যে ঠাকুর সিংহাসনে, বাবার দু'চোখে হাসির জোয়ার উপচে পড়চে! দেবাদিদেব মহেশ্বর!! (আনন্দের উন্মাদনায় করতালি)

পূজারী। মালতী ঠাকুরকে কেউ এরা চোখে দেখতে পাচ্ছিল না। ঠাকুর ভাবলেন দেবতাকে এরা দেবত্ব থেকে নির্ব্বাসন দেবার মতলব করেচে। তিনি চোখের দৃষ্টি এদের রাখলেন অব্যাহত, কিন্তু তাকে দেখবার যে দৃষ্টি তা তিনি নিলেন কেড়ে। চোখ থাকলেই চাওয়া যায়···কিন্তু দেবতাকে দেখা যায় না। দেবতাকে দেখতে হ'লে সেই চোখের প্রয়োজন যে চোখে নেই হিংসা, যে চোখে নেই লালসা, যে চোখে নেই চোয়া-বালির খাদ। হরেন্দ্র, ওই···তোমাদের ঠাকুর তোমাদের ঘরেই ফিরে এসেছেন। এস কল্যাণ, এস মালতী, ঠাকুরের আরতি কর, বন্দনা কর; যারা ঠাকুরকে ভুলে—গিয়েছিলো তারা ঠাকুরকে আবার ফিরে পেয়েছে। এবার তোমাদের পালা।

মালতী। পূজারী ঠাকুর, তোমার সাধনা ধন্য।

পূজারী। মালতী, তুই একটা পাগ্‌লী। আমি দেবতার দাস মাত্র। মনে আছে তোকে এক দিন বলেছিলুম, তুই-ই এ বিরোধ মেটাবি···আজ সেই শুভক্ষণ সমাগত। আজ থেকে তুই এবং কল্যাণ শিব-মন্দিরের সেবায়েৎ···তোদের মিলনেই বাবার তৃপ্তি হবে।···তোদের কল্যাণ হবে···হরিশ হরেন্দ্রের মিতালী হবে। বাবার জন্যে ফুল এনেচিস তো? তাঁর প্রিয় রক্ত করবী, ধুত্‌রো···দে, ছিটিয়ে দে সব ঠাকুরের পায়ে···আর একটা গান কর—মিষ্টি গান, যা শুনে দেবতার চোখে জাগবে এই সহজ, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ মিতালীর একটা নির্ব্বাক্ আশীর্ব্বচন। ওই আকাশের তারাগুলোর ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছিস? ওদের চোখেও যেন খুসীর আমেজ···ওই দ্যাখ, কারা সব এসেছে।

(সখীদের প্রবেশ ও মালতীকে ঘিরিয়া গান)

আকাশের চাঁদ এলো বুঝি ধরণীতে
শিহরিল গরবিনী—
মায়া অঞ্জন আঁকিল কে আঁখি-পাতে
বাজিল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণি!
খুসী জাগে ক্ষণে ক্ষণে
বিরহীর বাতায়নে
মনে হয় ভালবেসে ধরা দিল অবশেষে
হের ঐ মায়াবিনী।
দূরের স্বপন যদি বা এলো কাছে
এত কেন তার জ্বালা?
কাছে এসে ফিরে চলে যায় পাছে
তাই আনিয়াছি মালা
আজ যদি গান জাগে পরাণের অনুরাগে—
তারে দিয়ো আঁখি-জল বেদনায় টলোমল
ওগো শিব-সীমন্তিনী!

জাগ্রত জনবল

শ্রীসত্যসাধন মুখোপাধ্যায়

অন্ধ তামস ঘন গম্ভীর বন্ধুর পথতল,
দুর্ব্বার গতি ছুটিয়া চলেছে নবীন যাত্রীদল।
রক্তের তাল বক্ষে উছলে,
মশাল জাগিছে আকাশের কোলে,
হাঁকে ভৈরব-বিষাণ সঘন স্পন্দিত হিমাচল,

পুণ্য হোমের কে হবি সমিধ! জ্বলিয়াছে হোমানল।
জাগিয়াছে আজি জনগণদেব! জাগ্রত জনবল!
মুক্তির ডাক উঠে উতরোল,
আকাশে বাতাসে জাগে হিন্দোল,
অযুত কণ্ঠে জেগেছে সিন্ধু উদ্দাম চঞ্চল।

সাহিত্যিকের চিঠি

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

প্রবীণ সম্পাদক প্রভাস সরকার রোজ সকালে নানান্ রকম কাগজের মাঝখানে ডুবে থাকেন, কিন্তু কোন দিনও তাঁর [illegible] লাগে না লেখা ফেরৎ পাঠাতে। এক দিন তাঁর ডাকে [illegible] একখানা চিঠি, পড়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন, নির্বাক্ নিস্পন্দ···

[illegible] কণিক,—

নিষ্প্রভ সন্ধ্যার শেষ প্রান্তে তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম। [illegible]খানা আমার অন্ধকার, মন আমার অবসন্ন, দেহ ক্লান্ত, জীবনে আমি একা, প্রদীপের স্তিমিত অন্ধকারেও আমার ঘুমন্ত শিশুর মুখশ্রী [illegible]। তিন বছরের ছোট্ট ছেলেটি তিন দিনের জ্বরে মারা গেছে তিন ঘণ্টা আগে। আমার মাতৃত্বকে দানবীয়তা বলে ভুল কোর না। মৃত শিশুকে পাশে শুইয়ে কোন মা কখনও এমন করে চিঠি লিখতে পারত না, এ আমার জানা আছে। আমি নিজেও পারতাম না, কিন্তু জীবনে এমন এক-একটা সময় আসে যখন অসম্ভব কোন কিছুই থাকে না। আজকের সন্ধ্যা তেমনি একটা সময়, আমার জীবনের অন্যান্য বিচিত্রতার মধ্যে অন্যতম। সময় অল্প, আমি আজ আছি, কাল হয় ত থাকব না, এখন ব'সে লেখবার ক্ষমতা আছে, কাল হয় ত থাকবে না। আমার জীবনের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বসেছি, একাকিত্বের বোঝা হাল্কা করব বলে···আমার আজকের থাকা এবং কালকের থাকার মধ্যে অল্প সময়টুকুর মাপকাটিতে সমস্ত জীবনের ইতিহাসটুকু লিখে যেতে চাই।

অর্থাৎ এ চিঠি আমার জীবনের একটি স্বর্ণ পরিচ্ছেদ, তোমার [illegible] নিয়ে। আগেই তোমাকে বলেছি ছেলেটি আমার মারা গেছে। এখন আমি এত বড় পৃথিবীতে একা—ভয়ানক একা, এ কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে, তাই তোমায় অপরিচিতা আমি, তোমাকেই জীবনের মধ্যে টেনে নিলাম, তোমার স্মৃতির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে নিঃস্ব করে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যে। তুমি আছো, তুমি আমার জীবনে একান্ত আপনার হয়ে আছো, এ কথাটা বার বার নিজেই বলছি নিজের মনকে, তত বলছি ততো ভালো লাগছে। তোমার স্মৃতির একটা মোহ আছে, তোমার সস্নেহ উপস্থিতি অনুভব করছি আমার নিরালা ঘরের কোণে। কখনও তোমায় দেখি আমার ঠিক পাশে, কখনও আমার ছেলের শিয়রে। তোমার উপস্থিতি সুন্দর, তার চেয়ে সুন্দর তোমার সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি। কল্পনায় তোমার সাথীত্ব দিয়ে মনটাকে রাঙিয়ে নিয়ে বসেছি বলতে তোমাকে আমার জীবনের কয়েকটা কথা। বিশ্বাস কর, কখনও কাউকে বলিনি তোমাকেই শুধু বলতে চাই। জানবে, তুমি নিশ্চয় জানবে, কিন্তু জানবে আমার মৃত্যুর পর। যদি চিঠি শেষ করেও মৃত্যুকে সহজ করে বরণ করতে না পারি, যদি তোমার দুর্নিবার আকর্ষণ, তোমায় আরও একবার দেখবার প্রলোভন আমাকে মরতে না দেয় তাহ'লে এ চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলবো। যদি আমার চিঠি পাও, জেনো এটা মৃতের ইতিহাস, জীবনের পারে। আজীবন নিস্তব্ধতার পর শেষ মুখরতা, তোমার প্রতি আমার অনন্ত ও নীরব ভালোবাসার শেষ প্রকাশ। সমস্ত জীবন তোমার আরাধনায় কাটিয়ে মৃত্যুর কোলে নিজেকে সমর্পণ করে, তোমার কাছে আমার শেষ প্রণাম।

ভয় পেও না। মৃত্যুর কোলে শুয়ে মমতা চাই না, দয়াও নয়, দাক্ষিণ্যও নয়। মরণের স্পর্শ যে পায় জীবনের উষ্ণতা সে চায় না। কিছু দিতে তোমাকে হবে না কেবল বিশ্বাস কোর। আমি যা কিছু বলছি সব সত্যি, এ আমার মনের অলীক কল্পনা নয়—এ আমার আজীবন সাধনার ইতিহাস, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের অর্ঘ্য। আমার আত্মসমর্পণ তুমি গ্রহণ কর সহজ বিশ্বাসের স্পর্শ দিয়ে। আমার ঠিক পাশে মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ বুকে করে আমার ছেলে শুয়ে আছে, তার পাশে বসে পারি কি মিথ্যে কিছু বলতে? কোন মা কি পারে?

ওগো মাণিক, তোমাকে নিয়েই আমার জীবনের আরম্ভ, তখন আমার বয়স তেরো। তার আগের ইতিহাস জানি না, মনেও নেই। কি হবে জেনে কোথায় আমার জন্ম, কোন্ কালে কার কোলে, কোন্ কালো সংসারে। মনে আছে শুধু তোমার প্রথম পরিচয় পাওয়ার দিনটি তার পরের সমস্ত মুহূর্ত্তগুলি।

মা-মরা মেয়ে আমি, [illegible] [illegible] মানুষ হয়েছি বাবার

তত্ত্বাবধানে। বাবা আমার স্নেহশীল কিন্তু শক্ত; সরল কিন্তু গম্ভীর, বিদ্বান্ কিন্তু দাম্ভিক। দিদির অপরিসীম আদর যত্ন স্নেহ আর দয়া যেদিন হঠাৎ সরে গেল দিদির বিয়ের পর সেদিন আমার নিজেকে লাগলো অসহায়। বাবার সমস্ত দিনের মধ্যে অল্প ছিল অবসর। সে অবসর কাটতো তাঁর নিজের কাজে, লেখা-পড়ায়। মা মারা যাবার পর কাজই ছিল তাঁর প্রাণ; আমার জন্যে যেটুকু ছিল সেটা কর্ত্তব্যের বোঝা, অর্থ দিয়ে আমাকে স্বাচ্ছন্দ্যের কোলে বিলিয়ে দেওয়া! বয়স তখন আমার তেরো।

হঠাৎ এক দিন সকাল বেলায় পাশের বাড়ীতে মহা সমারোহে ঘর-দোর পরিষ্কারের ধুম পড়ে গেল। টেবিল এলো, এলো নানান রকমের ছবি, বই, বাসন, বিছানা আর বাক্স। সঙ্গে এল চাকর তারই তত্ত্বাবধানে বাড়ীটা দেখতে দেখতে হেসে উঠল। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে সে আসত এক টুকরো কাগজ চাইতে, কিম্বা একটা পেন্‌সিল। তোমার নামটা সে বড় করে লিখত, গর্ব্বভরে উচ্চারণ করত। বড় ভালো লাগত তার প্রভুভক্তি, তার অকাতর পরিশ্রম। এ সব কথা অবান্তর নয়। এ সবের মধ্যে দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্ব আমার মনকে নাড়া দিল তোমারও আগে। মনে মনে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বাড়ী সাজানো দেখতাম, তোমার ঘর সাজাতাম কল্পনায়, তোমার চাকর আমাকে দেখত, হয়ত অবাক হয়ে ভাবতো, কে আমি, কেন আমি অমন করে দাঁড়াই। মাঝে মাঝে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ত তার পর একটু হেসে আবার তার কাজ আরম্ভ করত।

এমন সময় এলে তুমি। তুমি ঠিক যে সময় এলে বাবা আমাকে ডাকলেন কাজে, আমি চলে গেলাম। কাজ সেরে যখন আবার এলাম বারান্দায় তখন তোমার শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। অনেক করে তোমাকে দেখতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। মোটা পুরু পর্দার অন্তরালে তুমি রইলে আমার কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে; তোমার উপস্থিতি আমার মনকে প্রচ্ছন্ন করে রাখল। সমস্ত রাত আমার ঘুম হলো না তোমার কথা ভেবে।

তখন আমি স্কুলে পড়ি, বই পড়ার ভয়ানক সখ। আমার পড়ার ঘর থেকে তোমার লাইব্রেরী দেখা যেত। অবাক্ হ'য়ে দেখতাম তোমার কত বই, ভাবতাম কেমন করে তুমি এত বই পড়লে। কল্পনা করতাম তোমার কত বুদ্ধি, তুমি কত বিদ্বান্, তোমার সুনাম, তোমার যশ, তোমার সব কিছু। বাবার ঘরে গিয়ে পরিষ্কার করবার ছলে বাবার বইগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখতাম, কিছুই বুঝতে পারতাম না। ভাবতে চেষ্টা করতাম তোমার বইগুলো কেমন, কার লেখা, তাতে কি লেখা, তুমি কেমন করে পড়!

এক দিন দুপুর বেলা আমাদের স্কুল তাড়াতাড়ি বন্ধ হ'য়ে গেল, তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে ফিরছিলাম, কি মনে হল, গেট্ খুলে তোমার বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। ত্রস্ত পদে, ভীরু কপোতীর মতন কাঁপতে কাঁপতে বাইরে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এলাম। ভয় হল, লজ্জাও হল, ভাবলাম কি করছি, এক ছুটে পালিয়ে যাই, কিন্তু পারলাম না, তোমার আকর্ষণ আমাকে এমনই সম্মোহিত করেছে। দরজার কড়া নাড়বার জন্যে হাত বাড়ালাম, হাতটা মাঝপথে থেমে গেল, শীতকালের দুপুর বেলায় ঘামতে আরম্ভ করলাম, কান দুটো লাল হ'য়ে উঠল, মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করল। তোমার বারান্দার বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে দাঁড়ালাম, এসেছি যখন, তোমাকে না দেখে কোন মতেই যাবো না, এমনি ধারা তোমার আকর্ষণ আমাকে স্মৃষ্টি ছাড়া করেছে। দরজার কড়া নাড়তে তোমার চাকর বেরিয়ে এল। বাঁচলাম, তুমি দরজা খুললে হয়ত হার্টফেল করতাম। সে আমাকে চিনত, দেখে সচকিত হ'য়ে প্রশ্ন করল, 'কি দিদিমণি'!

কি বলব, বলবার তো কিছু নেই, অবাক্ হ'য়ে তোমার বাইরের ঘর দেখছি—সামনেই তোমার প্রকাণ্ড অয়েল-পেণ্টিংটা। ওর কোন কথার উত্তর না দিয়ে বিভোর হয়ে তোমার বাইরের ঘরে ঢুকলাম তোমার ছবির ওপর দৃষ্টি রেখে। আমার এ ধরণের পাগলামী দেখে তোমার চাকর হতবাক্ হ'য়ে রইল; তার পর হেসে প্রশ্ন করলে, ভয় পেয়েছেন বুঝি। ওর প্রশ্ন শুনে প্রথম মনে হল এ আমি কি করেছি! কেন আমার এমন পাগলামী। লজ্জায় লাল হ'য়ে অস্পষ্ট বললাম, স্কুল থেকে ফিরছিলাম, একটা লোক আমার পেছন পেছন আসছিল, তাই ভয় পেয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারিনি, এইখানেই ঢুকে পড়েছি। লোকটা বোধ হয় গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে! সে বললে, আপনি বসুন, বলে বেরিয়ে গেল। আমি তোমার ছবিখানার সামনে দাঁড়ালাম। চিরদিন কল্পনা করতাম তুমি হয়ত বাবারই মতন গম্ভীর, বুড়ো, হয়ত তোমার চোখে চশমা, তোমার পাকা চুল। কিন্তু তোমার ছবিখানা দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলাম—তুমি কত সুন্দর—আজও ঠিক তেমনি সুন্দর আছো, যেমন তুমি সেদিন ছিলে। ওধারে তোমার বই—ইংরেজি বাংলায় আরও কত কি ভাষায়। অবাক্ হ'য়ে তুলে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলাম, কিছুই বুঝলাম না। ইতিমধ্যে তোমার চাকর এসে জানালো বাইরে কেউ নেই, আমার ভয় ভিত্তিহীন। তোমার ছবির সান্নিধ্যে আমার সাহস বেড়েছে, মনটাও হয়েছে সুস্থির, হাসতে হাসতে বললাম, তোমাকে দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়ে পালিয়েছে, ধন্যবাদ। বাড়ী ফিরে গেলাম। তোমাকে না দেখার বেদনা আমার মিটে গেছে তোমার ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে। দেব-দর্শন তো এমনি ভাবেই হয়। মনটাও ঠিক সেদিন দেব-দর্শনে প্রীত হবার মতন আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে উঠল চকিতে।

সেদিন থেকে আমার কি যে হল জানি না, কেবলই ভাবতাম পৃথিবীটা কত সুন্দর। কাজের ঠিক মাঝখানে থমকে দাঁড়াতাম, বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রকৃতিকে দেখতাম, নিজেকেও—মৌমাছির গুন-গুন শব্দ ভালো লাগতো, প্রজাপতির চঞ্চল পাখার মধ্যে একটা অপরূপ জ্যোতি দেখতে পেতাম। ফুল দিয়ে ঘর সাজাতাম, ফুলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ভাবতাম কত সুন্দর এরা। তোমার ঘরে রজনী-গন্ধার ঝাড় দেখেছিলাম, ঐটাই আমার প্রিয় ফুল হ'য়ে উঠল। ভালো লাগতো ওর শুভ্রতা, ভালো লাগতো ওর মন-মাতান মধুর গন্ধ। আমার মনে হ'ত এ-গন্ধ ফুলের নয় আমার নিজের, ঐ সৌন্দর্য্যও ফুলের নয় আমার দৃষ্টিভঙ্গীর। এক দিন সকাল বেলায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে সাড়ী সামলাতে সামলাতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাথার চুল ঠিক করছিলাম। হাতের পাশ দিয়ে তোমার মুখখানা আয়নার ওপর ভেসে উঠল। মনে হল একদৃষ্টে তুমি আমাকে দেখছ। ভয়ানক লজ্জা হল, বুকের কাপড়টা তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিলাম। তখন

সত্যিই ভেবেছিলাম বুঝি তুমি আমার ঘরে কিন্তু তাতো নয়, তবে কেন আমার লজ্জা ! এমনি একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করে সেই জন্যও অনেকটা লজ্জা পেলাম। একলা ঘরে কান দুটো আমার লাল হ'য়ে উঠল। আয়নায় আমার প্রতিচ্ছবিটার ওপর দৃষ্টি রেখে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলাম। লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা···এ কী লজ্জা—এ আমার কী হল ? এ কোন নতুন জাগরণ, এ কোন নতুন আলোক, এ কোন আমার নব জন্ম। চকিতে বুঝতে পারলাম যৌবনের স্পর্শ লেগেছে আমার দেহে-মনে। নতুন ছন্দে আমার মন নেচে উঠল, নতুন সুরে আমার জীবন ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল। আমার দৃষ্টিতে নব রূপ, আমার সৃষ্টিতে নব সৌন্দর্য্য, আমার দেহে নব জাগরণ, মনে নতুন স্বপ্ন। আমার দেহে যৌবন, আমার মনে নারীত্ব···এ আমার নতুন জন্ম।

সেদিন থেকে আমার কি যে হল আমার জানা নেই, গম্ভীর হ'য়ে গেলাম, কিন্তু চলার ছন্দটা রইল হাল্‌কা। যে সব ছোট ছোট জিনিষে আনন্দ পেতাম, সেগুলো হল অবান্তর। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আগে আগে নিজের মুখখানা দেখতাম, কারণ আমি সুন্দর, এখন আমার দৃষ্টি পড়ল আমার দেহের ওপর, দেহের প্রতিটি রেখার ওপর, প্রত্যেক রেখাটির এঁকে-বেঁকে ছুটে চলার ওপর। ভালো লাগতো দেখতে, হাত দিয়ে মেপে দেখতাম আমার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে যাওয়া কটিতট। মনে হত কোন্ সুনিপুণ শিল্পীর স্পর্শ লাগছে আমার দেহের ওপর প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। এ সবের মধ্যে একটা সুগভীর আনন্দ ছিল, ছিল তৃপ্তি। এ নতুন জীবনের ওপর একটা মোহ ছিল, নিজের প্রতি ছিল একটা সুন্দর আকর্ষণ। আমার মনের এই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগল আমার চারি ধারের পৃথিবীর ওপর। আগেকার অপরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য এখন পেল একটা পরিপূর্ণ রূপ। আগেকার সৌন্দর্য্য ছিল দেখার, দৃষ্টির, এখনকার সৌন্দর্য্য মনের, উপলব্ধির। কিন্তু এই পরিপূর্ণ আনন্দের এ অনুভূতি তার অন্তরালে ছিল বেদনা। কেন যে ঐ বেদনা তা আমি বুঝিনি, কেবল মাঝে মাঝে মনে হত আমার মনের কোণে কোথায় যেন একটা বিরাট্ গহ্বর আছে, সেটা কোন মতেই পূর্ণ হয় না, কেবলই শূন্যতার হাহাকার দিয়ে আমায় উদাস করে দেয়, মনটাকে নিয়ে যায় আমার চারি ধারের সৌন্দর্য্যের মাঝখান থেকে টেনে না-জানা কোন্ অসীমের পারে। আমার সব-কিছুর শেষে যে বেদনারাশি, সেটা তো বুঝি, অনুভব করি কিন্তু কোন রকমেই দূর করতে পারি না—এ বেদনা কিসের, কেন, কেমন করে দূর হবে ? এই কি যৌবনের ধর্ম্ম ? মনে এমনি ধারা নানান রকম প্রশ্ন জাগতো, এক দিন রবি ঠাকুরের একটা কবিতার দুটো লাইন পড়ে পেলাম আমার প্রশ্নের উত্তর।

"আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো"

বুঝতে পারলাম আমার আনন্দের শেষে বেদনা নয়, বেদনার শেষে আনন্দ। আমার মনের ঐ শূন্যতা, আমার জীবনের ঐ অপরিপূর্ণতার হাহাকারের ওপর ভিত্তি করে আমার সৌন্দর্য্যময় দৃষ্টি, আমার দৃষ্টির সৌন্দর্য্য। আমার উদাসীনতার ভিত্তির ওপর ঐ ভালো লাগার ইমারত। যত বুঝলাম তত ভালো লাগলো, যত ভালো লাগলো তত ভালোবাসলাম। তুমিই তো আমার এ নব জাগরণের মূলে সৃষ্টি-দেবতা—তুমিই আমার সব সৌন্দর্য্যের শিল্পী—তোমারই সুন্দর স্পর্শ পেয়েই আমার নতুন জন্ম, নতুন জীবন। তাই মনে মনে তোমাকে সেদিন থেকে অর্পণ করলাম আমার সব কিছু—তোমার অধিষ্ঠান হল আমার সব কিছুর ওপরে। তোমাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হল আমার নীরব সাধনা, তোমার ছবির ওপর পড়ল আমার কল্পনার রঙ, সেই কাল্পনিক মূর্তির পায়ে আমার ভালবাসার অর্ঘ্য। আমার ছোট পৃথিবী গড়ে উঠল তোমাকে কেন্দ্র করে।

এক দিন আচম্‌কা তোমার দেখা মিলল, বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা। সুপ্রীতি আমার বাল্যবন্ধু, আমার নিত্যকালের সহচরী। তারই বাড়ী থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলাম সন্ধ্যা বেলা, তিথিটা আমার মনে নেই, রাতটা অন্ধকার ছিল। তোমার গেটের সামনে দিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ নারীকণ্ঠের কলহাস্যে দিগন্ত সচকিত হ'য়ে উঠল। বসন্তের বৈজয়ন্তী উড়বার আগে যেমন কোকিলের কণ্ঠস্বর মধুর লাগে তেমনি লাগল। বেশ ভালোই তো লাগল প্রথমটা, ঐ কলহাস্যে সজীব প্রাণের স্পন্দন ছিল আর ছিল স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস। প্রথমটা ভালো লাগার মূলে ছিল আমার নীরব, নির্জ্জন, জীবন আমার নতুন নারীত্বের নতুন রূপ-পরিগ্রহের স্বপ্নবিলাস।

থমকে দাঁড়ালাম, ভালো করে দেখব বলে একটু পিছিয়ে গেলাম। আবছায়া অন্ধকারে দেখলাম, তুমি তোমার সারা দেহ দিয়ে ওকে ঘিরে রেখেছ আমার দৃষ্টি বাঁচিয়ে। ঘরের ক্ষীণ আলোর যে কণাগুলো বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে তারই দু'-একটা ওর ডান হাতের ওপর, তোমার বাঁ কাঁধের ধারে। আমার পা অবশ হ'য়ে উঠল, মাথা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল রাগে ঈর্ষায় অভিমানে ! কেন রাগ হল, কেন হল ঈর্ষা, কেনই বা অভিমান ? এমন তো কত দিন কত মেয়েকে তোমার বাড়ী থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ত্রস্ত হরিণীর মতন ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেছি, কখনও তো ঈর্ষা হয়নি, কখনও হয়নি রাগ, আজ তবে হঠাৎ আমার মনের এ কোন্ বিকৃতি ? ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে তোমাদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙে দি, ঐ কলহাস্য-মুখরিত নারীকে অপমান করে, লাঞ্ছনা করে বিদায় করে দি কটু কথা বলে। গেটের ধারে দাঁড়িয়ে এমনি নানান কথা ভাবছি, এমন সময় তোমরা এসে পড়লে হাসতে হাসতে হাত-ধরাধরি করে, আমি ছুটে পালিয়ে যেতে চাইলাম ঐ অসহ্য দৃশ্যকে এড়িয়ে যাব বলে। আমার বিক্ষুব্ধ মন আমাকে অন্ধ করে দিল, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে তুলে ধরলে, জিজ্ঞেস্ করলে লেগেছে কি না। লজ্জার একটা প্রবল স্রোত আমাকে লাল করে দিল, কোন রকমে ছুটে পালাতে পালাতে বললাম, না। তোমাকে মৌখিক ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দেওয়া হল না। ছুটতে ছুটতে অস্পষ্ট শুনতে পেলাম, মহিলাটি বললেন, সুন্দর মেয়েটি, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভয় পেয়েছে। তুমি বললে, হ্যাঁ। আর কিছু নয়।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে তোমার কথাই ভাবলাম। তোমার কোমল স্পর্শ আমার দুই হাতে, তোমার ক্ষণিক সান্নিধ্যের সৌরভ আমার মনে, তোমাকে প্রথম দেখার স্বপ্ন আমার প্রত্যেক মুহূর্তে। সজাগ প্রহরীর মতন ঐ একটি মুহূর্ত্ত আমার বিনিদ্র রজনীর ওপর স্বপ্নের আবেশ ছড়াল। সামনের খোলা জানলার মাঝখানে এক ফালি বাঁকা চাঁদ ভোরের একটু আগে উঁকি মারল ঠিক আমার চোখের ওপর। জানলার

ধারে এসে দাঁড়ালাম, তোমার শোবার ঘর অন্ধকার। স্পষ্ট অনুভব করলাম তোমার প্রত্যেকটি নিশ্বাসের মৃদু স্পন্দন, তোমার এলোমেলো এক-মাথা চুল, কোনটা মুখের ওপর কোনটা কানের পাশে। গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন, মুখে ক্ষীণ হাসি, দেহ এলায়িত, একটুখানি বাঁকা। বালিশের ওপর তোমার মাথাটা ডান দিকে ঝুঁকে, হাত দুটো বুকের ওপর বিক্ষিপ্ত। এ সবই তো আমার কল্পনা কিন্তু অলীক নয়। কেন জানি না, কেবল আমার মনে হল এই ভাবেই তুমি শোও, এমনি করেই তোমার রূপশ্রী পরিপূর্ণতা লাভ করে নিদ্রার কোমল স্পর্শে। ইচ্ছে করল এক ছুটে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি, তোমার মাথার কাছে বসে তোমাকে হাওয়া করি। তোমার ঐ ঘুমন্ত মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে আমি যুগ যুগ কাটিয়ে দিতে পারি—এ কথা বার বার আমার মনে হল। হঠাৎ নতুন করে মনে পড়ে গেল সন্ধ্যার ছোট্ট ঘটনাটি, তোমার স্পর্শের সুখ-স্মৃতি নিয়ে নয়, তোমার সার্থক মাধুর্যময়ী মহিলাটির প্রতি ঈর্ষার বোঝা মাথায় বয়ে। তোমার নিদ্রা, তোমার শুয়ে থাকার সঙ্গে ঐ মহিলার কোথায় যেন একটা গভীর যোগাযোগ আছে, এ কথা আমার কৈশোরের নব জাগরিত কৈশোরের নানান কল্পনার একটা অঙ্গ। কি যে যোগাযোগ, কেনই তাতে ঈর্ষা, তোমার যে মধুর স্পর্শ সে পেতে পারে তার একটু আমি পেয়েছি, হলই না হয় তা একটি মুহূর্তের। এমনি অকাট্য যুক্তিতে মনটা ভরে রাখলাম কিন্তু পারলাম কৈ। ঈর্ষার লেলিহান শিখা আমাকে প্রত্যেক মুহূর্ত প্রজ্বলিত করে দিল। ভয়ানক ঈর্ষা, কি অসহ্য তার বেদনা, রাগ হল তোমার ওপর, কেন মেশো এদের সঙ্গে, কেন আসতে দাও এদের তোমার বাড়ীতে, তাই তো এত বদনাম তোমার। এমনি রাগে দুঃখে অভিমানে কেঁদে ফেললাম। এক ছুটে বিছানার ওপর এসে লুটিয়ে পড়লাম। সে যে কি কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তা আমিই কেবল জানি। অবাধ কান্নার স্রোতে আমার বালিস ভিজে গেল, কিন্তু কী যে মন তবু প্রবোধ মানল না। কান্নার জোয়ার এসেছে, কোন যুক্তিই শুনব না।

কখন বাঁকা এক ফালি চাঁদ নিবে গেছে, কখন ভোরের পাখী ডেকেছে, কখন প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম কিরণ আমার কপোল স্পর্শ করেছে কিছুই আমার জানা নেই; কেবল মনে আছে ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে কেঁদেছি ঠিক ঘুমোবার আগে। ঘুম ভাঙল একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠে। সে যে কী ভয়ার্ত ভীষণ দুঃস্বপ্ন তা আমিই শুধু জানি। আজও আমার মনে আছে স্পষ্ট, কারণ সেদিন যে করাল ছায়া পড়েছিল আমার মনে আজও তার রেশ টানছি জীবনে। ভয় সেদিন পেয়েছিলাম, আজ আর নেই তা। শুনবে আমার স্বপ্নের কথা? বলি তাহ'লে।

হঠাৎ মনে হল কোন এক অচেনা দেশে পৌঁচেছি, নাম তার জানা নেই। সেখানকার লোকদের চেহারা কি রকম অদ্ভুত, সব সময় তারা হাসে, চুপি চুপি কথা বলে। তাদের সকলের চোখগুলো কি সমরেখার মতো, তীব্র দৃষ্টি, যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে সব সময়। মিট-মিট করে তারা চায় আড়চোখে। দৃষ্টি ফেরায় না কোন মতেই, হঠাৎ উন্মত্তের মতন হেসে ওঠে। এক জন হাসলেই চারি দিক থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে অন্যান্য সকলের হাসিতে—তার পর একের পর এক জন পাল্লা করে হেসে চলে, কেউ চীৎকার করে, কেউ মৃদু মুখ বিকৃতি করে। সকলেই আমার দিকে চেয়ে তারা হাসছিল—সে যে কি পাগলের মতো হাসি তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হল, তোমাকে দেখে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে তোমার সমস্ত দেহ দিয়ে সযত্নে ঢেকে নিলে, মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সস্নেহে প্রশ্ন করলে, ভয় করছে? আমি কোন কথা বললাম না, অবাক্ হ'য়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, তার পর তোমার বুকের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে ওদের বিকৃত দৃষ্টিকে উপেক্ষার দৃষ্টি দিয়ে অভ্যর্থনা করলাম। ওদের হাসি থেমে গেল। তুমি বললে, বাড়ী যাও। আমি বললাম, তুমি যা'ব না? বললে, না, এখানেই আমার দেশ, এদের মধ্যেই আমার জীবন, এ পথে তুমি কেন এসেছ? তার পর থেমে আবার বললে, একলা যেতে পারবে? পারব, আমি শুধু ক্ষণিকের জন্যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে, তোমার আশ্বাসের হাসিতে অবগাহন করে, ফিরে বললাম, তোমার ঐ ক্ষণিকের স্পর্শ, তোমার ঐ সস্নেহ আলিঙ্গন, তোমার ছোট কয়েকটা কথা—ঐ রইল আমার রক্ষা-কবচ। ঐ লোকগুলো কত হাসল বিকৃত শব্দ করে বিদ্রূপের বন্যা বইয়ে দিয়ে। আমি তবু রইলাম অবিচলিত। তোমার স্পর্শ আমাকে আমার অজান্তেই নিয়ে গেছে অন্য এক লোকে, যেখানে ভয়ের লেশ নেই, ভাবনার চিহ্ন নেই, ভয়ার্তের চীৎকার নেই, বিদ্রূপের বিকৃত প্রকাশ নেই। অনেকখানি পথ চলে এসে একটা পথের বাঁকে দাঁড়ালাম। শেষ বারের মতন পেছন ফিরে চাইতেই দেখলাম তখনও তুমি মৃদু হাসছ। তোমার সেই মৃদু হাসি আজও আমার মন ভ'রে আছে।

ঘুম ভেঙে গেল। বেশ ভালোই লাগল, প্রখর সূর্য্যকিরণে আলোকিত সকাল। বেলা হয়েছে, উঠে বসলাম। সকালটা ভালো কিন্তু মনটা খুব ভালো নয়, কেবল আমার থেকে থেকে মনে হ'তে লাগল, তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এই ভাবনাটা মনে আমার কাঁটার মতন বিঁধে রইল। আমার দিনের চপল গতি, স্কুল, পড়া, পরীক্ষার ভাবনা, কিন্তু সবার ওপরে স্পষ্ট হ'য়ে রইল ব্যবধানের ভয়, বিদায়ের বেদনা। তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, এটা অসহ্য। তোমার সান্নিধ্যের যে মাধুর্য্য সেটা মিলবে না, জীবনের প্রতি মুহূর্তে তোমার অভাব অনুভব করব। তোমার ঘরের আলো, তোমার বাড়ীর বাগান, তোমার দরজার পর্দা সব মিলিয়ে আমার মনের যে তুমি, তার কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত হ'তে হবে এই ভাবনাই আমাকে সচকিত করে দিল। দিনের গতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা বেড়ে উঠল। স্কুলে গেলাম না দেহের দোহাই দিয়ে, সমস্ত দিন কাটল জানলায় দাঁড়িয়ে তোমার ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তোমাকে একবার দেখতে পেলাম বারান্দায়। একখানা বই নিয়ে তুমি ইজি-চেয়ারে এসে বসলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে। বইখানা কিছুক্ষণ পরে সরিয়ে রেখে তুমি চোখ বুজে ফেললে। আমি অবাক্ হ'য়ে তোমাকে দেখলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। বাবা ডাকলেন, নেহাৎ বিরক্ত হয়েই গেলাম। শুনলাম দিদির অসুখ, রাত্রের ট্রেণেই যেতে হবে। দু'ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নিলাম। গাড়ীতে উঠবার আগে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম। তুমি তো জানো না, তোমার কাছে থেকে বিদায় না নিলে আমার যাওয়া হবে না। জানলায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু তোমার দেখা মিলল না। কাঁদলাম, তবু মিলল না। কে যেন বললে কাল

বিদায় নিতে এসেছি বলে তুমি ব্যথিত হয়েছ। আমার মর্মবাণীর এ ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যাওয়ার সাহস দিল। মনে মনে তোমাকে জানলায় দাঁড়িয়েই প্রণাম জানালাম। চোখ তুলেই দেখি তুমি পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলে। আমার বিদায়ী প্রণাম তোমাকে বাইবে টেনে আনল। ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। কি যে আনন্দ হল বলতে পারি না, হাসি-মুখেই যাত্রা করলাম। ভগবান্ আছেন একথা দিদির কাছেই শুনেছি কিন্তু তুমি দিলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেন জানি না, মনে হল তুমিই আমার ভগবান্। তা না হ'লে বুঝলে কেমন করে আমার মনের কথা, শুনলে কি করে আমার বিদায়ের আবেদন, আসলে কেন তুমি বাইরে—অকারণে এসেছিলে তা তো আমি দেখেছিলাম!

ছ'বছর তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ছ'বছর দিদির কাছে ছিলাম লেখাপড়ার জন্তে বাবার অনুরোধে। বাবা আমাকে ভালোবাসতেন, তার চেয়ে ভালোবাসতেন বেশী দিদিকে। দিদি আমার জীবনে মার চেয়ে বেশী স্নেহ দিয়েছে—তার স্নেহ-নীড়ে আমি মানুষ, তাই দিদির অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারলাম না। আমি তো শুনলাম তুমি সাহিত্যিক, একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করলাম তোমার পত্রিকার মধ্যে দিয়ে।

প্রথম প্রথম তোমার বিরহ আমাকে উন্মাদ করে তুললো। আমি ভেবেই পেলাম না কেমন করে তোমাকে ছেড়ে থাকব। কত দিন খালি নির্জনে কাঁদতাম, তোমাকে চিঠি লিখতাম, কিন্তু সে চিঠি ডাকে দেওয়া হয়নি, আজও সেগুলো আমার কৈশোরের সোনার শৃঙ্খল হ'য়ে আমার আছে কাছে। আমার প্রথম প্রেমের প্রথম নৈবেদ্য সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছি, তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে সেগুলো তোমার অর্ঘ্য করে নিবেদন করে যাবো বলে।

এক দিন বিকেল বেলা নিস্তব্ধ বাড়ীতে চুপ-চাপ বসেছিলাম নির্জনে। তোমাকে কিছু লিখব বলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম, ভাষা কোন মতেই খুঁজে পেলাম না। কি লিখব, কেমন করে তোমাকে বোঝাবো আমার মনের আবেদন, কোন কথা বলব? সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, স্তিমিত অন্ধকারে চারি দিকের পৃথিবী, প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল তোমার ব্যবধানের বিরহ-বেদনা। জানলার সামনে বিরাট্ পাহাড় দৈত্যের মতন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অচল অটল গগনস্পর্শী তার রূপ। ধূসর গোধূলিতে ঐ পাহাড় মনে হল তোমার স্থির, ধীর, প্রশান্ত মূর্ত্তি, আমার মাথা আপনা থেকেই নত হ'য়ে এলো। রাত্রের অন্ধকার নামল পাহাড়ের বুকে, আমার সামনের ঐ বিরাট্ পাহাড় সেই অন্ধকারে ডুবে গেল, তুমি গেলে না। আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকল তোমার রূপ, তোমার বিরাট্ ব্যক্তিত্ব। স্পষ্ট শুনতে পেলাম তুমি বলছ—পেরিয়ে এস এই ব্যবধান, পূর্ণ কর আমাদের মধ্যেকার এই অসীম শূন্যতা তোমার ভাষা দিয়ে, তোমার কথা দিয়ে, তোমার ছন্দ দিয়ে, তোমার প্রাণ দিয়ে। সেই স্পষ্ট ডাক আমাকে উন্মাদ করে তুললো···সে ডাক আমাকে ক্ষেপিয়ে দিলে। আমার ইচ্ছে করল ছুটে বেরিয়ে পড়ি দিক্-বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে। মনটা রইল তোমার ওপর, দেহের পরিবর্ত্তে কলম ছুটে চললো অপ্রসিক্ত কাগজের বুকের ওপর দিয়ে। আমার সেই প্রথম কবিতা 'অর্ঘ্য' আমার তোমার ছোট্ট অভিনন্দন চিঠি। তোমার সেই ছোট্ট চিঠির সামান্য কয়েকটা কথা যেন ভাবের ঝর্ণাটিকে চালিয়ে দিল আমার মনের ঠিক মাঝখান দিয়ে, ভাষার প্লাবন এল। যে আমি ভাষা দাও ভাষা দাও বলে কেবল কেঁদেছি সেই আমি আভাসে শুধু পাতার পর পাতা লিখে গেছি, তুমি সযত্নে তা নিয়েছ দিনের পর দিন তোমার পত্রিকার অঙ্গের ভূষণ করে। আমাকে তুমি কান দিনও জানোনি, তোমার কাছে নিজের পরিচয়ও আমি দিইনি, কিন্তু কবি আমাকে তোমার অনেকখানি কাছে টেনেছ—অনেকখানি কাছে, সেইটাই আমার প্রেমের মূল্য। কিন্তু সেইখানে যদি আমার আশার স্বপ্ন পূর্ণ হত তাহ'লে আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার প্রয়োজন হত না। তা তো কোন দিনও ছিল না আমার উদ্দেশ্য। কেবল কথার মালা গেঁথে তোমাকে উপহার দেবার মতন মন তো আমার ছিল না, আমি যে চেয়েছিলাম আমার জীবনের উত্তাপ দিয়ে তোমার জীবন সুন্দর করে তুলতে, আমার সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে তোমার জীবনে একটি প্রদীপ জ্বালতে; আমার ভাষা নয়, ছন্দ নয়, কবিতাও নয়, নিজেকে নিবেদন করতে। আমার কবিতা হল তার উপলক্ষ। আমার কবিত্বের পথ বেয়ে তোমার কাছে যাওয়া আমার সহজ হল। কাব্য-লক্ষ্মী আমার মনের কথা বুঝে জীবনের পথ সহজ করলেন। তোমার আশীর্ব্বাদের এই প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আমার প্রণাম।

ছ'বছর কেবল কবিতা লিখেছি তোমাকে উদ্দেশ্য করে। তোমার সঙ্গে কবি কমলার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে চিঠিতে। তুমি কলকাতায় আসবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছ বারে বারে কবি কমলাকে। আমি আনন্দিত হয়েছি; তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ করবার পথ আমার সহজ হয়েছে এই কথা ভেবে। কিন্তু কে জানতো যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার কবি-মন আমার নারীত্বকে বড় করে এগিয়ে দিয়ে সরে যাবে! আমার কবি-মন তো তোমারই সৃষ্টি, তাই বোধ হয় সে তোমার বিরাট্ অস্তিত্বের সামনে লজ্জায় দাঁড়াতে পারেনি।

ছ'বছর পরে ফিরলাম কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার অজুহাতে। অজুহাত ছাড়া আর কিছুই তো নয়। লেখাপড়ায় আমি এমন কিছু ছিলাম না যার জন্তে বিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন ছিল। যে কোন কলেজেই আমার বি-এ পরীক্ষার পড়া চলতে পারতো স্বচ্ছন্দে, কিন্তু তোমার দুর্নিবার আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা কি আমার ছিল? তাই অযথা অভিমান করে, রাগারাগি করে, একলাই এক দিন কলকাতা সহরে এসে দাঁড়ালাম। ছ'বছরের প্রাত্যহিক বিরহ বেদনার ম্লান স্পর্শ আমাকে তোমার যে কত কাছে এনেছে তা বুঝলাম হাওড়া ষ্টেশনে প্রথম পদার্পণ করে। বড় সহরের জনতার মাঝখানে নারী চিরদিন অসহায় এ কথাই জানতাম, কিন্তু আমার উপলব্ধি আমাকে এক মধুর আবেশে প্রচ্ছন্ন করে দিল। আমি তোমার কাছে, ইচ্ছে করলে ছুটে গিয়ে তোমাকে দেখে আসতে পারি, তোমাকে স্পর্শও করতে পারি এই যে নিশ্চয়তা, এ যে কতখানি তৃপ্তি তা সেদিন আমি উপলব্ধি করলাম। আনন্দের আবেগ-ছন্দ আমার প্রতি পদক্ষেপে, সুগভীর তৃপ্তির প্রচ্ছন্ন প্রকাশ আমার দৃষ্টিতে, আমার চলার বেগে, আমার কথায়। ছ'বছরের যে একাকিত্বের বোঝা আমার মাথায় পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে আমাকে উদ্ভ্রান্ত, উদাস করেছিল, ভাবনার লেশ টেনেও তার সন্ধান মিললো না। মিলনের শুভ মুহূর্ত্ত আসছে, মনে মনে তার পদশব্দ শুনছি, মুহূর্তে

মুহূর্ত্তে আনন্দের আতিশয্যে তার পল গুণছি—সে যে কী তীব্র আনন্দের অনুভূতি সে কথা তো বর্ণনার অতীত; সে উপলব্ধি বোঝবার, মনে মনে অনুভব করবার, প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই কারো।

সন্ধ্যার অনুজ্জ্বল আলোকে তোমার বাড়ীর পথে পা বাড়ালাম ছোট্ট এটাচি-কেস্ হাতে নিয়ে! পরণে আমার ছিল বাসন্তী রংয়ের সাড়ি, পায়ে হিল-তোলা জুতো। সাজবার কামনা আমার কোন দিনই ছিল না, কিন্তু সাত বছর আগে তোমার সঙ্গে সেই যে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম, তার কথা আজও ভুলতে পারিনি, তার চেয়ে নিজেকে সুন্দর করে তোমার কাছে নিবেদন করব এই ছিল আমার আশা! তাকে আমি ঈর্ষা করতাম, আজ করি না। সহজেই আমি ট্রামে কিম্বা বাসে যেতে পারতাম কিন্তু গেলাম ট্যাক্সিতে, সময়ের অপচয় করতে মন চাইলো না, তোমার দর্শনের জন্যে মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল, আজ আমার সময়ের মূল্য যত কম, সেদিন ছিল তত বেশী। আজ তাদের গতি শ্লথ, সেদিন ছিল শুধুই প্রবল ছুটে চলা। সুদীর্ঘ সাত বছর যে মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেছি, সাত মুহূর্তের অবহেলা দিয়েও তার অপমান করতে চাইনি! তোমার সঙ্গে যে মিলনের মুহূর্তটিকে বার বার কল্পনায় ভেঙ্গেছি গড়েছি. আজ বাস্তবের আলোতে তাকে কেমন করে বরণ করব, তাই শুধু ভেবেছি, দেরী সইব কেমন করে?

তোমার বাড়ীর গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম, প্রত্যেক পদক্ষেপে একটা সুমধুর সঙ্গীত। রাত্রের অন্ধকার-মাখা নির্জন পৃথিবীর বুকে আমার চলার শব্দ, সুরের অপরূপ মূর্চ্ছনা, মিলনের ঝঙ্কার। আমার হৃদয়ে আনন্দের কম্পন—বুকটা কাঁপছে ঠিক যেমন করে ঝড়ের প্রবল বেগে প্রকাণ্ড তাল গাছ দোলে, আমার দৃষ্টিতে স্বপ্নের রঙিন মায়া, আমার মনে দেবতার স্পর্শ, আমার চারি দিকে মিলনের শঙ্খ।

তোমার ঘরে আলো জ্বলছে, তোমার আমার মাঝখানে ব্যবধান শুধু কয়েকটি মুহূর্তের, আমাদের দৃষ্টি-বিনিময়ের মাঝখানে কেবল একটা দরজার। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে তোমার ঘরের আলোই শুধু দেখেছি—আরও অনেকক্ষণ দেখতে পারতাম। তোমার প্রদীপ্ত ঘর, তোমাকে বুকে করে রাখে, তুমি সেখানে আছো—ঐটাই তো আমার পৃথিবী। স্বপ্নের ঘন আবেগ কাটিয়ে কলিং-বেলে হাতখানা রাখলাম, টিপতে পারলাম না, হঠাৎ জীবনটা আমার ছ'বছর পেছিয়ে গেল। ত্রয়োদশী বালিকার দুর্বলতা, ভয়, শঙ্কা আমার মনকে আচ্ছন্ন করল। কান দুটো গরম, সমস্ত শরীর শীতের রাত্রেও ঘামছে, হাত কাঁপছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে…এ আমার কি দুর্বলতা।

বেল টিপলাম।

অপেক্ষার মুহূর্ত নয়, এক-একটা যুগ। ভাবলাম দরকার নেই, পালাই; কিন্তু সেই তুমি আমার পালাবার পথ রোধ করলে। আমার পেছনে পর্বত-প্রমাণ বাধা পথ আগলে আছে তোমাকে দেখবার, তোমার সঙ্গে কথা বলবার দুর্নিবার আকর্ষণ। তোমার চাকর দরজা খুলে দিল। নতুন চাকর, চিনলো না। বসতে ব'লে তোমাকে ডাকতে গেল।

সেই তোমার প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিং, কোণে সেই বই, ফুলদানীতে সেই [illegible]। আমার সেই তুমি, ঠিক তেমনি আছো, কেবল আমি [illegible] জীবনে নতুন। আমি নিজে তোমার কত কাছে

তুমি কিন্তু আমার কত দূরে। আমি তোমাকে কত চিনি, কত জানি—আমার কত দিন, কত বিনিদ্র রজনী তোমার কল্পনার রঙে [illegible] অথচ তোমার একটি মুহূর্তও আমার নয়। তুমি আমার জীবনে ধ্রুবতারার মতন স্পষ্ট, সুনিশ্চিত, আমার সমস্ত অস্তিত্ব তোমার আলোকে উজ্জ্বল, তোমার জীবনে আমি অথচ অবাস্তব—এ এক অদ্ভুত অনুভূতি।

কখন তুমি ঘরে এসেছ আমার জানা নেই, স্বপ্নের [illegible] মুহূর্তগুলি আমারই—একান্ত আমারই ছিল, তাই তোমার [illegible] আসবার সময় আমি জানতে পারিনি। জীবনেই পারিনি, [illegible] তো ছোট।

তুমি আমাকে চিনতে পারলে না। যে ছ'বছরের ব্যবধান তোমাকে আমার কাছে এনেছে জীবনের সর্বস্ব করে, সেই ব্যবধান তোমাকে নিয়ে গেছে আমার বালিকা-জীবনের অনেক দূরে। আমি চোখ নীচু করে বসে রইলাম, সে আমার কী লজ্জা। উপলব্ধি করলাম তুমি আমার রূপ দেখে মোহিত হয়েছ, তোমার মুগ্ধ দৃষ্টি আমার সারা দেহে মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করেছি. ইচ্ছে হলো তোমার ঐ প্রজ্বলিত দৃষ্টিকে অভ্যর্থনা করি নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়ে, কিন্তু পারলাম না। আমার বুকে হৃৎকম্পন, আমার [illegible] ওপর তোমার বিরাট্ অস্তিত্বের ছায়া আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি আমার সামনে, আমার মনের দরজা-জানলা উন্মুক্ত, কিন্তু তবু চোখ তুলতে পারলাম না।

তুমি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলে, যেন কত দিনের [illegible] অথচ প্রতি মুহূর্তেই আমি জানলাম, তুমি আমার কিছুই. [illegible] না। তুমি নাম জিজ্ঞেস করলে। বলতে পারলাম কি আমিই কমলা? বললাম, আমি কমলার ছোট বোন। যে কমলা তোমার আন্তরিক স্পর্শ পেয়ে এ পৃথিবীতে মাথা তুলেছে সে কমলা যে [illegible] নারী, কবি-মনের এ অপমান আমি নিজেকে দিয়ে করতে পারলাম না। আর কমলা হয়ে তো আমি তোমার কাছে যাইনি, নারী হয়ে গিয়েছিলাম। কবি আমি তোমার অভিনন্দন নিতে যাইনি, নারী আমি গিয়েছিলাম নিজেকে সমর্পণ করতে।

তুমি কত কথা বললে, কত গল্প। কমলার প্রতি কবিতার কত বিশ্লেষণ, অভিনন্দনের কি অপূর্ব প্রকাশ, তার কবিত্বের [illegible] ব্যাখ্যা, তার কবি-মনের কি বিচিত্র বর্ণনা আমি তন্ময় হয়ে শুনলাম। কত বার ভাবলাম নিজেকে প্রকাশ করি, কিন্তু পারলাম না। কে যেন আমাকে বাধা দিল—প্রবল বাধা। তুমি কত [illegible] বললে আমি শুধু শুনলাম। কত প্রশ্ন করলে, সংক্ষেপে [illegible] জবাব দিলাম। তোমার উপস্থিতির আবহাওয়ায় ডুবে রইলাম। আমার জীবনের চিরকাম্য এ অপূর্ব মুহূর্তগুলিকে কোলাহলে [illegible] করলাম না। কেন জানি না, কেবলই মনে হয়েছিল এই তোমার শেষ দেখা, আমার জীবনের প্রথম ও শেষ বাসর। আমি আমার কথা বলে তা নষ্ট করতে চাইনি, তোমার কথা শুনে তা [illegible] রাখলাম। তুমি খেয়ে যাবার কথা বললে, আমি না [illegible] পারলাম না।

তোমার কী অপূর্ব্ব কথা বলার ধারা, আমি সম্মোহিত শুনে গেলাম। তোমার হাসি, তোমার কপট অভিমান, [illegible] তোমার ছেলেমানুষী সব মিলিয়ে কি অদ্ভুত তোমার ভঙ্গিমা।

বার বার তোমাকে দেখলাম অর্দ্ধ-নিমীলিত দৃষ্টি দিয়ে, যত দেখলাম, তত মোহিত হলাম, মুগ্ধ হলাম। তোমার বই দেখাবার ছলে তুমি আমার আঙুল স্পর্শ করলে, আমার সারা দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। খাওয়ার টেবিলে তোমার পা হয়ত তোমার অজান্তেই আমার পা দুটিকে মৃদু স্পর্শ করে গেল। তোমার স্পর্শের যে কি উত্তেজনা, কি যে তার মাধুর্য্য ভাষায় তার প্রকাশ নেই। এ যে তোমার পৌরুষের লোলুপতা তা তো আমি জানি। আমার রূপ তোমাকে মুগ্ধ করেছে আমার যৌবন করেছে তোমাকে আকর্ষণ, এ তো আমার নারীত্বের অনুভূতি দিয়ে বুঝেছিলাম, তবু ভালো লেগেছিল। কত বার তোমার হাত আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ফটো অ্যালবামের পাতা ওল্‌টাতে গিয়ে আমার গাল স্পর্শ করেছে তাও আমি জানি, তাও ভালো লেগেছিল। তোমার স্পর্শে ছিল গভীর উত্তেজনা, ছিল অপরিসীম উৎকণ্ঠা, ছিল সুগভীর ভাবের ব্যঞ্জনা, ছিল ভালোবাসা। ভালোবাসা আমার দেহের লাবণ্যের প্রতি, ক্ষতি কি তাতে, তবু তো আমার কিছু তোমাকে আকর্ষণ করেছিল? হোক না তা আমার দেহ, না হয় হল কেবলই আমার সৌন্দর্য্য, আমার নারীত্বের অপভ্রংশ আমার যৌবনোচ্ছল আমিত্ব: নিজেকে দেব বলে তো আমি প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম—যেমন ভাবে তুমি আমাকে চাইবে তেমনি ভাবে।

রাত বেড়ে উঠল, খাওয়া-দাওয়া সারতে অনেক রাত হ'য়ে গেল; তবু তোমার গল্প শেষ হল না, শেষ হল না তোমার কবি কমলার অভিনন্দনের মালা গাঁথা। বাড়ী যাওয়ার কোন কথাই কেউ তুললে না, তুমিও না, আমিও না। তুমি জানতে আমি মেসে থাকি, আমি জানতাম আমি থাকব বলেই এসেছি। সময় ছুটে চলল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল, বাড়ল রাত্রির নির্জ্জনতা, চারি দিকের নিস্তব্ধতা, সঙ্গে সঙ্গে তোমার চাঞ্চল্য। মুহূর্ত্তের জন্যে বিচলিত হয়ে হঠাৎ তুমি প্রশ্ন করলে, ফেরবার কি আমার তাড়া আছে কোন? অবিচলিত ও মনে মনে আনন্দিত হ'য়ে বললাম, না। বুঝলাম আমার কথা তোমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছে, কিন্তু কেন যে আশ্চর্য্য হয়েছ তা ভেবেও পেলাম না।

আজ তোমার সেদিনকার আশ্চর্য্য হবার কারণটা আমি সহজেই বুঝতে পারি। আমি জানি, নিজেকে নিবেদন করবার মূলে নারীর থাকে অনেক কপট বাধা, আপত্তি, থাকে সরে গিয়ে ধরা দেবার প্রবৃত্তি। তারা চায় পুরুষের প্রাণস্পর্শী আবেদন, তারা চায় কল্পনার রঙিন কথা, নানান রকম আশার মিথ্যা কুহক, আরো কত কি! বিনা দ্বিধায় যারা আত্মসমর্পণ করে, হয় তারা সৌন্দর্য্য-ব্যবসায়ী না হয় সারল্যের প্রতীক। কিন্তু তুমি তো জানতে না, তোমার কাছে আমার আত্মনিবেদনের মূলে ছিল আমার অনন্ত কালের আশা, আমার চির জীবনের অর্ঘ্য।

যাই হ'ক, আমার সহজ স্বীকৃতি তোমার মনে স্পষ্ট হ'য়ে রইল প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতন। তুমি অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে বারে বারে চাইলে, মাঝে মাঝে হতবাক্ হয়ে রইলে, মনটাকে জানতেও তো কম চেষ্টা করনি! তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, তোমার সুনিশ্চিত স্পর্শ, তোমার তপ্ত নিশ্বাস, সবার মাঝখানে তোমার বিরাট, পৌরুষ কেবল একটা প্রশ্নই বার বার আমার মনে ছায়া ফেলল,—তুমি বুঝতে পারলে আমি অন্য সকলের মতন তোমার একটি রাত্রের সাথীর কামনা করে আসিনি, আমার মধ্যে গোপন কিছু আছে। তোমার উদ্দাম কৌতূহল বার বার প্রশ্নের আকারে এসে এসে ফিরে গেল, আমার অন্তর স্পর্শ করতে পারল না। আমার গোপন কথা, আমার জীবনের অর্ঘ্য আমার গোপন রইল আমার সারল্যের অন্তরালে।

রাত্রি আরও গভীর হল, নিস্তব্ধতা আরও হল নিবিড়।

তুমি বাড়ী দেখাবার ছল করে আমাকে নিয়ে গেলে তোমার অন্দর-মহলে। এসে দাঁড়ালাম তোমার শোবার ঘরে। আমি অবাক্ হ'য়ে চারি দিকে চাইলাম। এ ঘর আমার কত পরিচিত। নিস্তেজ নীল আলো, ও-ধারের ঐ নীলাভ পর্দা— এ সব আমার কল্পনার রঙে রাঙান'। তুমি তো জানতে না কত দিন কত রাত কল্পনায় কত বার আমি এ ঘরে এসেছি তোমার এই শোবার ঘরে— আমার এই ছোট্ট অথচ সারা পৃথিবীতে। আনন্দে, উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হ'য়ে এল। এখনও যখন ভাবি সেদিনের কথা, অশ্রুরাশি দিয়ে স্মৃতিতর্পণ করি। এ-বাড়ীর সব আমার চেনা, সব আমার জানা। আমার বাল্যের আশার আলোকে উদ্ভাসিত। আমার চির জীবনের সমস্ত স্বপ্নের আধার তোমার এই ঘর। আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ঘেরা—আমার সর্ব্বস্ব—আমার সব-কিছু ঐ একটি ঘরের সীমানার মধ্যে একত্রিত। আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, আমার চির জীবনের আরাধনা—তুমি, আমি, তোমার ঐ ঘর···

নিস্তব্ধ পৃথিবী···

অনন্ত নীরবতা···

নিঝুম রাত্রি, গোপন মুখরতা···

আমার আত্মনিবেদন, আমার চির জীবনের অর্ঘ্য···

আমার নারীত্ব, আমার যৌবন···

আমার পূজা···

সেদিন আমার বাড়ী ফেরা হল না। এ যে আমার প্রথম ও শেষ মুখর রজনী···ঐ যে আমার নারীত্বের প্রথম উন্মোচন, তা তুমি জানতে না, আজও বোধ হয় জানো না। তোমার কোন বাধা আমি দিইনি, তোমার কাছ থেকে কোন মতেই আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখিনি, এ কথা তুমি জানো। আমার নারীত্বকে তোমার পায়ে নিবেদন করে মাতৃত্বকে বরণ করে নিলাম, সে তোমার দান, আমার চির জীবনের আরাধ্য তুমি, তাই আমি আনন্দের ও আত্মতৃপ্তির আভরণ দিয়ে তাকে বরণ করলাম।

ভয় নেই, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করনি, তুমি আমাকে কোন প্রলোভন দেখাওনি, তুমি কোন মিথ্যা কুহকেরও সৃষ্টি করনি, আমি নিজেই নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, নিজেই গিয়েছিলাম আমার ভাগ্যের সঙ্গে অভিসারে। ঐ একটি রাত্রের জন্যে আছে আমার তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞতা। রাত্রের অন্ধকারে ঘুম ভেঙে যখন চোখ মেললাম, তুমি অবসন্ন, নিদ্রিত। তোমার ঐ নিদ্রাভরণে রূপরাশি কত বার কল্পনায় দেখেছি কত ভালো লেগেছে। সেদিন আকাশের বুকে চাঁদ ছিল না তবু তোমার শ্যামল ঘুমন্ত চেহারার শ্যামল রূপরাশি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি তোমার পাশে শুয়ে শুয়ে তোমার হৃৎকম্পন অনুভব করেছি, তোমার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ শুনেছি, তোমার উষ্ণ দেহ স্পর্শ করেছি। নির্জ্জন রাত্রে কেবল তুমি আর আমি—আমার বিশ্বে শুধু তুমি। তোমার ঐ অপরূপ নিকটত্বের

আনন্দে এবং অব্যক্ত বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করেছি। ওগো, তুমি বিশ্বাস কর ঐ একটি রাত্রের বোঝা সমস্ত জীবন বয়েছি, আজও বয়ে চলেছি, কিন্তু কখনও তার জন্তে অনুতাপ করিনি! ভোরের আলোয় আর পাখীর কাকলীতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। তুমি মৃদু হাসলে, বললে এবার তোমার যাবার সময় হয়েছে। পরিতৃপ্ত আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ। বিদায়ের বেদনায় আপ্লুত আমি কাঁদিনি তো, কেঁদেছিলাম?

যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরে তুমি আমার দিকে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলে অনেকক্ষণ। কিছু কি ভাবছিলে? ভুলে যাওয়া কোন স্মৃতি কি মনকে তোমার আলোড়িত করছিল? না, আমার আত্মতৃপ্তির সৌন্দর্য্য তোমাকে মুগ্ধ করেছিলো? তুমি আমাকে আদর করে বিদায় দিলে, যাবার সময় বললে, রাত্রির সৌন্দর্য্যময় রজনীগন্ধা—ওগুলো তোমার। একটি সম্পূর্ণ রাত্রির সুখ-স্মৃতির প্রতীক চারটে রজনীগন্ধা আমি বুকের কাছে টেনে নিলাম।

নিষ্প্রভ প্রাণহীন তারা আজও আমার মহার্ঘ্য সম্পদ্। একটি রাত্রির বিচিত্র অভিসারের সৌরভ নিয়ে আজও তারা আছে আমার হারের লকেটে।

তার পর তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তার পরের চার বছরের ইতিহাস—সে আমার নিজস্ব। সে কথার বোঝা দিয়ে তোমার আজকের পরিপূর্ণ জীবনকে আমি ক্ষুন্ন করতে পারবো না। এই বিকৃত পৃথিবীর কলঙ্ক-কালিমার কালো আভরণ পরেও আমি জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। কোন কলঙ্ক, কোন অপমান তোমার স্মৃতির সৌরভ ম্লান করেনি। বিদায়ের সময়ে তোমার শেষ দৃষ্টি আমার জীবনে সজাগ প্রহরী হয়ে আমাকে পাহারা দিয়েছে। আমার তিন বছরের সুন্দর শিশু তার সাক্ষ্য। আমার আত্মনিবেদন গ্রহণ করে তুমি আমাকে দিয়েছিলে যে অপরিসীম আনন্দ, আমার মাতৃত্বকে জাগরিত করে দিয়েছিলে যে গর্ব, তাকে আমি ক্ষুন্ন করিনি।

এবার বিদায়ের পালা। বিদায়ের আগে তোমাকে আমার নাম ঠিকানা জানাবো না, চলে যাবো একেবারে অপরিচিত, অজানিত, অশ্রুত…। কবি তোমার প্রেমের অতুল ঐশ্বর্য্যের আভরণে বিভূষিত কবি কমলাই যে এক দিন তোমার দ্বারে তার আশীর্বাদ ও আত্মদানের ঝুলি পেতেছিল এ কথা তুমি জানলে, কিন্তু জানলে না কখনও কে এই কমলা, কি তার বংশ-পরিচয়। কখনও তো আর জানাইনি তোমাকে আমার কোন কথা, আজ তা হলে বিদায়ের বেদনা গভীর করি কেন সে কথা জানিয়ে। তোমার অপরিচিত [illegible] আমি—সেই আমার মৃত্যু সহজ হবে, যে মৃত্যু তোমায় বেদনা [illegible] সে মৃত্যু আমি চাই না, চাই না, চাই না।

আর লিখতে পারছি না, মধ্য-রাত্রির সুনিবিড় গোপনীয়তা আমাকে তার আহ্বান জানাচ্ছে, আমার মৃত শিশু একলা [illegible] এবার আমায় বিদায় দাও লক্ষ্মীটি। তুমি কিছু ভেব না, যা [illegible] তার জন্তে অনুতাপ কোর না। সাহিত্যিক তুমি, সুপ্রসারিত তোমার কর্মক্ষেত্র, তোমার সাধনার পথে আমার স্মৃতি—আমার [illegible] যেন অন্তরায় না হয়। এই অপরিসীম সৌন্দর্য্যময় পৃথিবীর একটি ছোট্ট কণা আমি, পেয়েছিলাম তোমার একটি রাত্রের সপ্রেম সান্নিধ্য, তোমার সর্বস্ব। আমার সব চেয়ে বড় তৃপ্তি আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমার মৃত্যু। তোমার প্রতি আমার যে গভীর ভালোবাসা সে কথা আজ জানাতে পেরেও কম তৃপ্তি পেলাম না। এই সুন্দর পৃথিবী, যার কানায় কানায় সৌন্দর্য্য ভরা, যার বুকে তোমার মত মানুষ আছে, একে ছেড়ে যেতেও আমার দুঃখের লেশ নেই, কারণ তোমাকে ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদনের পথ পেয়েছি! তোমার কাছে তার জন্তে আমি চির কৃতজ্ঞ! আমার আরও তৃপ্তি কি জানো? আমি তোমাকে ভালোবাসি, অথচ আমার ভালোবাসা তোমার জীবনে বোঝা কোন দিনও হবে না। ভগবানের এই আন্তরিক আশীর্বাদ আমার জীবনের অন্যতম বড় সম্পদ্।

তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। রজনীগন্ধার ঝাড় তোমার ঘরে রেখ, যেমন চিরদিন রাখতে। ওরাই শুধু জানে আমার জীবনের আনন্দের ইতিহাস। তোমার জীবনে ওরাই [illegible] শুধু দেবে আমার অস্তিত্বের নীরব সাক্ষ্য! বিদায়। ইতি

তোমারই চিরদিনের আমি

কবি কমলা।

পুঃ—চিঠি শেষ করে হঠাৎ মনে হল, ভগবান্ নেই এই পৃথিবীতে। যত বার তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিদায় নেব বলে চোখ বুজছি তত বারই তোমার মুখ ভেসে উঠছে। তাই জানি, ওগো দেবতা, তুমিই শুধু আছো, তুমিই আমার বিদায় দাও। আর আত্মহত্যার কলঙ্ককে কর ক্ষমা। এ তো আমার আত্মহত্যা নয়—আত্মনিবেদন।

গান

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

যখন আমি হারিয়ে যাব ওই গগনের কোণে
আমার কথা বারে বারে পড়বে তোমার মনে।

ঘুম-ভাঙানো ভোরের পাখী
করবে যখন ডাকাডাকি
সেই সুরে মোর সুরের আভাস
জাগবে অকারণে।

গভীর রাতে বিশ্ব যখন স্বপন-ঘুমে ভরা
একলা তুমি রইবে জেগে আঁখি পলক হারা!

তারার দেশে তারা হয়ে
তোমার পানেই র'ব চেয়ে
তোমার আঁখি-তারার সাথে
মিলাবো ক্ষণে ক্ষণে।

...তখন অনেকটা কমে এসেছে। ওয়াঙ ... ছেলেমেয়ে ও বুড়ো বাপ সকাল-সন্ধ্যায় কিছু খেতে পায়। নিজে পরিশ্রম করে যা রোজগার করছে সে, প্রয়োজন মত তার ঘাটতি পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করে ওলান তার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। ধীরে ধীরে এই বিভ্রমের বিদেশীয়ানার মন থেকে সরে যাবার পর ওয়াঙ চেষ্টা করতে লাগল সহরটিকে জানবার—যে সহরের উপান্তে মানুষের ছাউনিতে সে পথের বাসা বেঁধেছে। ইতিমধ্যেই পথ থেকে পথে রিক্সা টেনে টেনে সে পথের মোটামুটি নক্সাটি চিনে ফেলেছে, জেনে ফেলেছে গোপন সড়কগুলি। এখানে সকালবেলা মেয়েরা যায় হাটে, পুরুষেরা হয় যায় স্কুলে, না হয় ত রিক্সায় চেপে অফিসে, ব্যবসায় যায়। সে সব স্কুল কেমন ধারা তা জানে না ওয়াঙ। অফিসও কেমন তা সে জানে না। কেন না যাত্রীকে সে নগরের নানা বাড়ীর দরজা অবধি পৌঁছে দেয় মাত্র।

রাত্রে ওয়াঙ পুরুষদের পৌঁছে দেয় চায়ের মজলিসে, আমোদ-ঘরে। এ আমোদ কোথাও প্রকাশ্য, কোথায় গোপন। আড্ডার ভিতর থেকে গান ও হল্লা ছিটকে এসে পড়ে পথে, শোনা যায় কাঠের পাটাতনের উপর আইভরির টুকরো নিয়ে বাঁশ দিয়ে কি সব খেলা হয়। আর অপ্রকাশ্য যে প্রমোদ তার অভিনয় চলে অলক্ষিতে, দেয়াল-ঘেরা ঘরের নিভৃতে। কিন্তু সহরের নিভৃত কি প্রকাশ্য কোন আমোদেই ওয়াঙের ভাগ নেই। নিজের বাসার চৌকাঠ ছাড়া আর কোথাও সে প্রবেশ পায় না। তার সব পথের শেষেই অজানা বাড়ীর চৌকাঠ, যেখানে গিয়ে তার চলা শেষ। এই সমৃদ্ধিশালী নগরীতে ওয়াঙ বাস করে বড়লোকের বাড়ীতে ইঁদুরের মত। এখানে ওখানে লুকিয়ে বেড়ায়, ঐশ্বর্য্যের অপচয় খেয়ে বেঁচে থাকে, নাগরিক-জীবনের অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠতে পারে না।

জলপথের চেয়ে চলা-পথের দূরত্ব কম হলেও, নিজের দেশের চেয়ে মাত্র একশ মাইল-দূরত্বের এই দক্ষিণ সহরে ওয়াঙ আর তার পরিবার যেন বিদেশীর মত বাস করে। এখানে মানুষের চেহারা, তার চুল, তার চোখ সবই ওয়াঙের পরিবারের মত তাদের দেশের মানুষের মতই। এখানকার মানুষের কথা বুঝতে একটু কষ্ট হলেও এখানকার মানুষের মুখে তারই দেশের খবরাখবরী।

অনুবাদক
শ্রীশিশির সেনগুপ্ত
শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

... কিন্তু আনহুই আর কিয়াংসু ... ওয়াঙের দেশ আনহুয়ে মানুষ কথা কয় ধীর ভাবে। জিহ্বার তল থেকে কথা সহজ ভাবে এসে পড়ে। কিন্তু এখানে মানুষের মুখের কথা যেন জিহ্বাগ্র ভাগ থেকে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে। তার দেশে মাটিতে চাষ চলে ধীর গতিতে, বৎসরের দুটি প্রধান ফসলের মধ্যে জমিতে চাষ চলে রশুন অথবা কড়াইয়ের। তার মধ্যে অনাবশ্যক তাগিদ থাকে না। কিন্তু এখানকার জমিতে এরা অবিরত মানুষ ও প্রাণীর বিষ্ঠা ফেলছে, জমির উর্বরতা বাড়িয়ে ধান ও যবশস্য ছাড়াও অন্যান্য ফসল প্রচুর ভাবে ফলাবার চেষ্টা করছে।

বড় একটা রুটি আর কিছুটা রশুন পেলেই ওয়াঙের দেশে মানুষ খুসী হয়। কিন্তু এখানে এরা কত রকমের মাংস রান্না করে, শাক-সব্জীর ব্যঞ্জন খায়। পাড়াগাঁয়ের কোন লোক যদি মুখে রশুনের গন্ধ নিয়ে এসে দাঁড়ায়, তারা নাক সিঁটকে বলে—ঐ আসছে উত্তুরে লোক। অতি হারামজাদা। রশুনের গন্ধ পেলে দোকানদাররা জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়।

সহরের উপান্তে বিরাট প্রাচীরের কোণঠাসা হয়ে এখানে যে দরিদ্র-পল্লীটি গজিয়ে উঠেছে, তারা কিছুতেই বিদেশীয়ানা কাটিয়ে উঠতে পারে না। এমনি এক দিন কনফুসিয়ানের মন্দিরের কোণে একটি ছেলের বক্তৃতা শুনতে লাগল ওয়াঙ। ছেলেটি বলছিল যে, ঘৃণ্য বিদেশীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে, চীনকে প্রস্তুত হতে হবে বিপ্লবের জন্য। ওয়াঙের আতঙ্ক হোল, হয়ত তাদেরই মত অনাহূতদের লক্ষ্য করে ছেলেটি বিদেশীদের উল্লেখ করছে। আরও এক দিন সহরের আর একটি কোণে (এ সহরে ওয়াঙ অবিরত ছেলেদের বক্তৃতা শোনে) আবার একটি ছোকরা উঠে দাঁড়িয়ে যখন বলে যে, চীনকে এক হতে হবে, শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে, ওয়াঙের মনে হোল না যে ছেলেটি যে চীনের কথা বলছে, তার সঙ্গে ওয়াঙের কোন সম্পর্ক আছে।

যা কোন দিনও ভাবেনি এক দিন তাই ঘটল। সিল্ক বাজারের কাছে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে এক দিন ওয়াঙ জানতে পারলে যে এ সহরে তার চেয়েও বিদেশী মানুষ আছে। এই সব দোকানে মেয়েরাই সওদা করতে আসে, রিক্সা-ওয়ালাদের খুসী করে ভাড়া দেয়। সেদিন একটি দোকান থেকে বেরিয়ে এসে এমন একটি প্রাণী দেখলে যার মত আর সে কখনো দেখেনি। মানুষটি মেয়ে না পুরুষ তাও বুঝতে পারলে না ওয়াঙ। সারা গায়ে এক ধরণের কালো লম্বা

জামা, গলায় বেড় দেওয়া একটা অদ্ভুত চামড়া। সেই অদ্ভুত মানুষটি ইঙ্গিতে ওয়াঙকে রিক্সা থামাতে বললে। তার পর গাড়ীতে উঠে যখন ভাঙা উচ্চারণে ওয়াঙকে ব্রীজ ষ্ট্রীটের দিকে যেতে বললে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগল ওয়াঙ—কি যে সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার সম্বন্ধে তার ধারণাই হোল না। অবশেষে পথের ধারে আর একটি জানা রিক্সাওয়ালাকে সে জিজ্ঞাসা করলে— 'এ কাকে নিয়ে যাচ্ছি বল ত ? এ কি প্রাণী ?'

লোকটি ওকে জবাব দিল, 'তোমার কপাল ফিরেছে আজ। বিদেশী, আমেরিকান মেয়েছেলে পেয়েছ।'

কিন্তু ওয়াঙের ভয় কাটে না। ছুটতে ছুটতে সে যখন ব্রীজ ষ্ট্রীটে পৌঁছে যায়— তখন সারা গা দিয়ে দুরন্ত ঘাম ছুটছে।

গাড়ী থেকে নেমে মেয়েটি আবার ভাঙা উচ্চারণে বল্লে—'অমন মরতে মরতে না ছুটলেও পারতে' বলে ওয়াঙের হাতে দু'টি রূপার মুদ্রা দিলে। দিলে স্বাভাবিক ভাড়ার দ্বিগুণ।

এত দিনে ওয়াঙ জানতে পারলে যে, এ সহরে তার চেয়েও বিদেশী এই সব মানুষ। এদের জাতই আলাদা।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরে ওয়াঙ বৌকে রূপো দু'টি দেখিয়ে সেই আশ্চর্য মানুষের গল্প করলে। ওলান বল্লে—'আমিও দেখেছি! ওদের কাছে ভিক্ষে করলে ওরা তামার বদলে রূপো দিয়ে দেয়।'

এই অভিজ্ঞতায় ওয়াঙ একটা নূতন জিনিষ শিখলে যা সেই বক্তৃতায় সে শিখতে পারেনি। এই দেশের সব কালো চুল আর কালো চোখ মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে তারও এক জাত।

এই বিরাট সহরের সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করতে করতে ওয়াঙের ধারণা হোল যে, এখানে খাদ্যাভাব থাকতে পারে না। যে দেশ থেকে ওয়াঙ এসেছে সেখানে মানুষ যখন খেতে পায় না, তখন সেখানে খাদ্যই থাকে না। অকরুণ আকাশের নির্দয়তায় ফসল ফলতে পারে না মাঠে। যেখানে খাদ্য নেই সেখানে রূপোরও দাম নেই।

এ সহরে সর্বত্রই খাদ্যের প্রাচুর্য। সহরের গা-ঘেঁসা নদী থেকে রাত্রে ধরা বড় মাছ এখানকার বাজারে জেলেরা সারি দিয়ে বসে বিক্রী করে। ছোট চকচকে জাল দিয়ে ধরা মাছ ছাড়াও, নিরীহ কাঁকড়ারাও বাজারে সওদা হয়ে আসে। এখানকার বাজারে এত বড় বড় চালের ঝুড়ি আছে যার ভিতরে অলক্ষিতে মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। তা ভিন্ন যব, কড়াই, আর কত রকমের জিনিষ।

মাংসের বাজারে বড় বড় শূয়োর ঝোলান থাকে। পেটের মধ্যিখান দিয়ে চেরা সেই সব শূকর দোকানীরা বাবুদের দেখায়, কেমন নরম চর্বি, নধর গা, তুলতুলে মাংস। দোকানে সাজান থাকে হাঁস, মুরগী। রান্না করা, নুন দেওয়া, আরও কত রকমের।

মানুষের শ্রমে খুসী হয়ে মা বসুন্ধরা কত রকমের ফসল দেন। লাল মূলা, সাদা পদ্মডাঁটা, সবুজ কপি, বাঁকা কড়াইশুঁটি, বাদাম, নানা সুগন্ধের আনাজ। মানুষের ক্ষুধা যা কিছু লালসা করে সব মিলবে এই পথের বাজারগুলিতে। পথে পথে ফেরীওয়ালারা বেচে কত রকম খাবার। মিষ্টি ফল, বাদাম-তেলে ভাজা গরম মিষ্টি আলু। আঠালো চালের তৈরী মিষ্টি কেক। সহরের কচি কচি ছেলেমেয়েরা মুঠোয় করে পেনী নিয়ে ছুটে আসে—কিনে খায় যার যা খুসী। ছেলেদের গালগুলি কেমন তেল চুকচুকে।

তবু প্রতিদিন ভোর হবার পরই ওয়াঙ স্ত্রী-পুত্র আর বুড় বাপকে নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে ভুখাদের মিছিলের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রতি কুঁড়ে থেকেই এমনি ধারা মানুষ বেরিয়ে আসে, হাতে সরা আর ভাতের কাটি। পরনের পাতলা ছেঁড়া পোষাকে কুয়াসার স্যাঁৎসেতে আর্দ্র হাওয়ায় ওদের শরীর কাটে। এই সব মানুষের দল লঙরখানার দিকে এগিয়ে চলে, সেখানে এক পেনীতে এক সরা ভাতের মণ্ড পাওয়া যায়। ভোরের কনকনে হাওয়ায় ওদের শরীর সামনে ঝুঁকে পড়ে। যতই রিক্সা টানে ওয়াঙ আর যতই বেশী মন দিয়ে ওলান ভিক্ষা করুক কিছুতেই তারা নিজেদের কুঁড়েতে বেঁধে খাবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে না। যদি কোন দিন ভাত কেনার পর একটি-দু'টি পেনী অতিরিক্ত থাকে, তাই দিয়ে ওরা কপির টুকরো কেনে। যেদিন কপি কেনা হয় ছেলেদের কাজ বাড়ে। পথ দিয়ে যে সব গাড়ী খড় আর ঘাস নিয়ে যায়— তার থেকে ছেলেরা এক-এক মুঠি নিয়ে আসে। দু'পাশে ইঁট-বসানো উনুনে সেই খড় জ্বালিয়ে মা কপি রান্না করে। মাঝে মাঝে চাষীদের হাতে মারও খায় ছেলে দু'টি। এর মধ্যে বড়টি নিরীহ বেশী। এক দিন সে বাড়ী ফিরল ফোলা চোখ নিয়ে। কিন্তু ছোটটি দিব্যি সেয়ানা হয়ে উঠেছে। ভিক্ষার চেয়ে টুকিটাকি হাত সাফাই করতে সে বেশী পটু।

মার কাছে এ সবের কোন দাম নেই। ভিক্ষা করতে গিয়ে হেসে ফেলার জন্য সে যদি কিছু রোজগার করতে না পারে, পেট ভরানোর জন্য সে ক্ষেত্রে চুরি করতে কোন দোষ নেই। বৌয়ের যুক্তির বিপরীতে দাঁড়াতে না পারলেও, ওয়াঙের বুকের ভিতর রাগ ফুলতে থাকে ছেলেদের এই অসাধুতায়। বড়টি যে চুরি করে রোজগার করতে পারে না তার জন্যে বাপ খুশী। এই বিরাট প্রাচীরের ছায়ায় যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে ওয়াঙ, তার প্রতি তার কোন মমতাই নেই। এই চিন্তায় মন খুসী থাকে যে, এক দেশে এক মমতাময়ী মাটি—মা তার জন্য পথ চেয়ে আছে।

এক দিন দেরী করে বাড়ী ফিরে ওয়াঙ দেখলে বাড়ীতে ওলান কপির তরকারীতে মাংস দিয়ে রান্না করেছে। নিজেদের পুরাতন প্রিয় সাথী বলদটিকে খাবার পর আর মাংস খেতে পায়নি ওয়াঙ। দুটি চোখ তার উজ্জল হল আনন্দে।

'আজ নিশ্চয়ই কোন বিদেশীর কাছে ভিক্ষা পেয়েছ, না ?'

ওলান জবাব দেয় না। কিন্তু ছোট ছেলেটি তার শিশু-বুদ্ধিতে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের দম্ভে তাড়াতাড়ি বলে বসে—'আমি এনেছি বাবা। ওটা আমারই ভাগে পড়া উচিত। এই টুকরোটা কেটে যেই কসাই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে অমনি আমি এক জন মেয়ে খদ্দেরের বগলের তলায় ঢুকে এটাকে সরিয়ে ফেলেছি।'

'এ মাংস আমি খাব না।' তপ্তকণ্ঠে বলে ওয়াঙ—'কিনে খেতে পারি, ভিক্ষে করেও খেতে পারি। কিন্তু চুরি করে নয়। আমরা ভিখিরী, কিন্তু চোর নই।' উঠে পড়ে দু' আঙুল ডুবিয়ে ওয়াঙ মাংসটুকু বাইরে ফেলে দিলে। ছেলেটির কান্নার দিকে ফিরেও তাকালে না।

এতক্ষণে ওলান উঠে এল। পথ থেকে সেটিকে কুড়িয়ে এনে জল দিয়ে ধুয়ে সে পাত্রে রাখল। মুখে শুধু বললে—'মাংসের আবার এমন-তেমন আছে না কি ?'

...র মাথা ঝলতে লাগল। ওলান সকলকে সেই মাংস ভাগ করে দিলে, নিজেও নিলে। কিন্তু ওয়াঙ তা ছুঁলে না। খাওয়া দাওয়া খাওয়ার পর ওয়াঙ ছোটটিকে পথের একটা দূর কোণে টেনে নিয়ে গেল। তার পর তাকে বগলের নীচে চেপে ধরে বেদম প্রহার করতে করতে বললে—'চোর, চোরের এই শাস্তি।'

ছেলেটি যখন কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী চলে গেল, নিজের মনেই ওয়াঙ বললে—'নিজেদের জমিতে ফিরে যেতেই হবে আমাদের।

১৩

এই নগরের ঐশ্বর্য্য যে দারিদ্র্যের বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে, তারই ভিত্তিমূলে ওয়াঙ দিন কাটায়। এ সহরের বাজারে খাদ্য উপচে পড়ে, পথের ধারের দোকানগুলিতে কালো, লাল আর কমলানেবু রঙের সিল্কের পতাকা ওড়ে। সাটিন আর পশম পরনে ধনীরা সেই পথে আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের হাতগুলি ফুলের মত সুবাসিত, আরাম জীবনের সৌন্দর্য্য তাদের সর্বাঙ্গে, সর্ব ভঙ্গিমায়। এই রাজকীয় প্রাচুর্যের সহরে যেখানে ওয়াঙ থাকে সেখানে মানুষের দুরন্ত ক্ষুধা শান্তি জানে না, হাড়ের কাঠামো ঢাকার সামান্যতম আবরণও মেলে না।

ধনীদের উৎসবের জন্য রুটি আর কেক তৈরীর লোকেরা সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। শিশুরা ভোর থেকে মাঝ-রাত অবধি পরিশ্রম করে তেল-চিটচিটে নোঙরা শরীর নিয়ে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন ভোরে কোন মতে ক্লান্ত দেহ টেনে নিয়ে যায় চুল্লীর ধারে। পরের জন্য যে দামী রুটি তৈরী করে তারা তার এক টুকরো কেনবার মত পয়সা পায় না এরা। মেয়ে-পুরুষের দল শীতের জন্য ভারী ফার আর বসন্তের জন্যে হাল্কা ধরণের ফার দিয়ে কিংখাপের কাজ-করা সিল্কের পোষাক বানায়, তাদের জন্য যারা সংসারের প্রাচুর্যের ভাগীদার। নিজেদের নগ্নতা ঢাকার জন্য এরা নীল খেলো তুলোর কাপড়ের টুকরো জোড়াতালি দেয়।

যারা নিজেদের রক্ত দিয়ে পরের আনন্দের উপকরণ প্রস্তুত করে তাদের মধ্যেই ওয়াঙের দিন কাটে। কত রকমের আশ্চর্য কথা কানে লাগে তার, কিন্তু মনে যেন লাগে না। এদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ তারা কথা কয় না। পাকা দাড়ী নিয়ে তারা রিক্শা টানে, ঠেলা-গাড়ী করে কয়লা আর কাঠ ঠেলে নিয়ে যায় বেকারীতে আর ধনীর প্রাসাদে। খোয়া-বসান রাস্তা দিয়ে মালপত্র বোঝাই ভারী গাড়ীগুলো ঠেলতে ঠেলতে তাদের পিঠ ধরে যায়, পেশীগুলো দড়ির মত টান হয়ে ওঠে। এরা অপ্রচুর খাদ্যে পেট ভরাতে চেষ্টা করে, খোলাতে শুয়ে স্বল্প রাত্রি কাটায়। প্রতিবাদ করে না। ওলানের মত এরাও বোবা, ভাবহীন। কেউ জানে না এদের মনে কি আছে। এরা মুখ খোলে শুধু খাবার সময়—শুধু পয়সা পাবার সময়। রূপোর কথা কদাচিৎ এরা মুখে আনে—কদাচিৎ রূপো পায় হাতে।

বিশ্রামের সময়েও এদের মুখ এমন কুঁচকে থাকে যে দেখলে মনে হবে বুঝি দারুণ রেগে রয়েছে এরা। কিন্তু সে রাগ নয়। বছরের পর বছর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা তুলে এদের উপরের ঠোঁট এমনি কুঁচকে গেছে, সামনের দাঁত এমনি বেরিয়ে এসেছে যে সারা মুখে একটা খেঁকানীর ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। চোখ আর মুখের ধারণাই নেই। গৃহস্থালীর জিনিষপত্র বোঝাই গাড়ীতে যাওয়া একটা আয়নাতে এক জন নিজের চেহারা দেখে চীৎকার করে বলেছিল—'ঐ দেখ, লোকটা কী কুৎসিত।' অন্যেরা যখন তার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল, লোকটার মুখও একটা বেদনার্ত্ত করুণ হাসিতে ভরে গেল। সে হাসি কান্নার মত করুণ।

ওয়াঙের চালার পাশেই ছোট ছোট কুঁড়েতে এরা থাকে বস্তাবন্দী হয়ে। মেয়েরা অবিরত ছেঁড়া ন্যাকড়া জোড়া দেয় শিশুদের গায়ে দেওয়ার জন্য। এরা নিত্য প্রসূতি। কৃষকদের ক্ষেত থেকে এরা বাঁধাকপির পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আসে, বাজারে মুদীর দোকান থেকে মুঠি ভরে চাল চুরি করে আনে। সারা বছর পাহাড়ের কোলের মাঠে ঘাস কাটে। ফসল কাটার সময় এরা মুরগীর মত চাষীদের পিছু ধরে থাকে। তীক্ষ্ণ চোখে সর্বদা পড়ে-যাওয়া শস্যকণা আর খড়ের দিকে নজর রাখে। এই সব চালা-ঘরে শিশু আসে আর যায়। জন্মায়, মরে, আবার জন্মায়। মা-বাপ মনে রাখতে পারে না ক'টি শিশু তাদের জন্মাল। কতগুলো বেঁচে আছে তারও পাত্তা রাখে না। শুধু কতগুলো হাঁ ভরাতে হয় প্রতিদিন তার হিসাব রাখে মনে মনে।

এই মেয়ে-পুরুষ আর শিশুর দল বাজারে কাপড়ের দোকানের আশে-পাশে ঘোরে। সহরের ধারে গ্রামের আনাচে-কানাচে টো-টো করে বেড়ায়। এদেরই মধ্যে ওয়াঙ আর তার ছেলে-মেয়ের দিন কাটে।

বুড়ো-বুড়ীরা এই জীবনকে মেনে নেয়। কিন্তু শিশুরা যখন আর শিশু থাকে না, যখন বয়সের জোয়ার আসে মনে, তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যুবকদের মধ্যে চলে বক্ষ্যমাণ আলোচনা। তার পর বয়স বাড়ে, বিয়ে হয়। ক্রমবর্দ্ধমান পরিবারের দুশ্চিন্তায় মন যখন ভরে যায়, তখন যৌবনের এই সব বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ একটা ধ্রুব চাপা আক্রোশে রূপান্তরিত হয়। মুখে আসে হতাশা। সে আক্রোশ এই কারণে যে, সারা জীবন এরা এক মুঠো অন্নের জন্য পশুর মত পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ পেট তাদের ভরছে না। এই ধরণের আলোচনা শুনতে শুনতে এক দিন ওয়াঙ জানতে পারে সেই বিরাট প্রাচীরের উল্টো পিঠে কি আছে—কারা আছে।

বিলম্বিত শীতের পর এক দিন মনে হয় বসন্ত বুঝি ফিরে আসবে। বরফ-গলার জন্য কুঁড়ের চারি ধারের মাটি কর্দমসিক্ত। মাঝে-মাঝে জল ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর। এখন ইট পেতে শুতে হয় বলে ইঁটের খোঁজ লেগে যায় চারি দিকে। কিন্তু সিক্ত মাটির অসুবিধা সত্ত্বেও আজ রাত্রে বাতাস কেমন যেন স্নিগ্ধ লাগে। সে কোমল স্নিগ্ধতায় ওয়াঙের মন চঞ্চল হয়। ভোজকার মত খাওয়ার পর ঘুমোতে না গিয়ে সে পথে এসে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

এখানে তার বুড়ো বাপ নিত্য দেয়ালে ঠেস দিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে থাকেন। আজও তিনি খাবারের বাটি নিয়ে সেখানে এসে বসেছেন। কুঁড়ের ভিতর ছেলেরা কলকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে। ওলান তার কোমরের এক-ফালি কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ সেটিকে ফাঁসের মত করে এক হাতে ধরে থাকেন। ছোট মেয়েটা সেই ফাঁসের ভিতর বন্দী হয়ে চারি দিকে ঘুরপাক খেতে চেষ্টা করে। বুড়োর দিন আজ-কাল নাতনীকে নিয়েই কাটে। নাতনীটি দুরন্তও ... এক দণ্ড থাকতে

চায় না মেয়েটি। তা ছাড়া ওলানের আবার ছেলে হবে। বাইরে থেকে পেটের উপর চাপ এখন আর সহ্য হয় না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সান্ধ্য বায়ুর স্নিগ্ধ পরশ গায়ে নেয় ওয়াঙ। চলে-আসা দেশের মাটির জন্ত দুর্নিবার আকুতি হতে থাকে।

'এমনি দিনেই ত'—সে বললে বাবাকে, 'জমি উলটে দিয়ে গম বুনতে হয়।'

প্রশান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলেন—'তোমার মনের ইচ্ছা আমি বুঝি। আমার এই বয়সে দু'বার এমনি হয়েছে। আসছে ফসলের জন্ত মাটির বুকে একটি দানাও নেই জেনে তবে ত জমি ছেড়ে এসেছি।'

'কিন্তু তুমি ত প্রতিবারই ফিরে গিয়েছ।'

'জমি ত তোমারই আছে।'

এ বছর সম্ভব না হলে আসছে বছর তারা ফিরবে নিশ্চয়ই। যত দিন জমি থাকবে ফিরে সে যাবেই। তার জমি তার জন্তে অপেক্ষা করছে। এত দিনে বসন্তের বারিধারায় সিক্ত তার জমি শ্রীমতী হয়ে উঠেছে ভাবতেই চঞ্চল হয়ে উঠল মন। কুঁড়েতে ফিরে এসে অযথা কর্কশ কণ্ঠে ওয়াঙ স্ত্রীকে বললে—'বেচবার যদি কিছু থাকত, বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যেতাম। বুড়ো বাপ যদি না থাকত, হেঁটেই চলে যেতাম। না হয় মরতুম উপোস করে। ছেলে-মেয়েরা যাবেই বা কি করে? আর তুমি? তোমার ঐ পেটের বোঝা নিয়ে।'

জল দিয়ে ভাতের কাটিগুলো ধুচ্ছিল ওলান। আস্তে আস্তে বললে—'মেয়েটা ছাড়া আর বিক্রী করার কিছু ত নেই।'

ওয়াঙের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

'ছেলে-মেয়ে আমি বেচব না।'

'আমিও বাজারে বিক্রী হয়েছিলাম। আমায় বেচে দিতে পেরেছিলেন বলেই বাপ-মা সেদিন ঘরে ফিরে যেতে পেরেছিলেন।'

'সেই জন্তেই কি তুমি এখন মেয়ে বিক্রী করবে?'

'আমার ইচ্ছের কথা যদি বল, বিক্রী করার আগে মেয়েকে আমি মেরে ফেলব। দাসীর দাসী হয়ে জীবন কাটিয়েছি আমি। তবু তোমার মুখ চেয়ে আমি মেয়ে বিক্রী করব। তুমি তোমার নিজের জমিতে ফিরে যেতে পারবে।'

'তা কখনই হতে দেব না।' দৃঢ় প্রতিবাদ জানায় ওয়াঙ। 'সারা জীবন এই বিদেশ বিভূঁয়ে কাটালেও মেয়ে বেচব না।'

কিন্তু বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই চিন্তা আসে। ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে ওয়াঙ। ঠাকুরদা কাঁস ধরে আছেন, আর মেয়েটি অবিরত ওঠা-পড়া করছে। প্রতিদিনের খাদ্যে দুর্বল দেহ পুষ্ট হয়েছে। আজও কথা বলতে শেখেনি বটে, কিন্তু সামান্ত যত্নেই দিব্যি মোটা-সোটা হয়ে উঠেছে। পাকা গিন্নীর মত মুখের গড়ন। পুরানো দিনের মতই আজও ওয়াঙ তার দিকে তাকালে সে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মনে মনে ভাবে ওয়াঙ, 'বুকের ভেতর আশ্রয় পেয়ে অমনি ধারা করে যদি হাসতে না জানত, কবে আমি ওকে বেচে দিতুম।'

আবার মনে পড়ে জমির কথা। আবেগে ওয়াঙের মন দোল খায়। 'আর কি কখনো এ পোড়া চোখে দেখতে পাব? ভিক্ষা করে, এত খেটেও পেট ভরাতে পারি না।'

অন্ধকার থেকে কে যেন ঘরঘরে গলায় বলে—'তুমিই একমাত্র গরীব নও। তোমার মত এক লাখ আছে এ সহরে।'

ছোট বাঁশের পাইপ টানতে টানতে একটা লোক এগিয়ে এল সমুখে। ওয়াঙের পাশের চালার পরিবারটির কর্তা। দিনের আলোতে লোকটিকে দেখা যায় কম। সারা দিন যে ঘুমোয়, রাত্রে মালের ভারী ভারী গাড়ী ঠেলে। দিনের বেলা রাস্তায় গাড়ীর ঠেলাঠেলিতে এই বড় গাড়ীগুলো চলাফেরা করতে পারে না। কখনো কখনো ওয়াঙ তাকে দেখেছে ভোরের মুখে ঘরে ফিরতে। হৃতশক্তি শান্ত মানুষটির কাঁধ দু'টি শ্লথ হয়ে নেমে পড়েছে। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় দেখা হয়। সবাই যখন দিনের শেষে শুতে যাবার চেষ্টা করে তখন তার কাজে যাবার সময় হয়।

তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ওয়াঙ, 'তবে কি চিরকাল এমনি চলবে?'

তিন বার পাইপ টেনে মাটিতে থুতু ফেলে লোকটা বলে, 'না, চিরকাল নয়। পুঁজিদার যখন চরমে ওঠে তারও শেষ পথ ঘনিয়ে আসে। গরীব যখন সবহারা হয় তখন পথের খবর আসে। গত শীতে দু'টি মেয়েকে বেচেছি। সে দুঃখও সয়েছি। এবার শীতে যে আসবে, সে যদি মেয়ে হয় তাকেও বেচে দেবো। একটি মেয়েকে শুধু কাছে রেখেছি। তবে মেরে ফেলার চেয়ে বেচে ফেলা ভাল। কেউ কেউ আবার হবার সাথে-সাথেই মেয়ে মেরে ফেলে। গরীবের অবস্থা যখন চরমে পৌঁছোয় তার উপায় এই পথে। বড়লোকের অতি বাড়ের পথও অমনি। ভুল যদি না করে থাকি তবে শেষের দিন এলো বলে।' মাথা দুলিয়ে লোকটি পাইপের বাঁট দিয়ে পিছনের দেয়ালের দিকে সঙ্কেত করলে—'ঐ দেয়ালের ওপারে কি আছে জান?'

বড় বড় চোখে তাকিয়ে ওয়াঙ মাথা নাড়ল। লোকটি বলতে লাগল—'আমি আমার একটি মেয়েকে ওখানে বিক্রী করতে গিয়েছিলাম। তখন দেখে এসেছি। তোমার বিশ্বাসই হবে না, টাকা কি ভাবে আসা-যাওয়া করে সেখানে। শোন না বলছি। চাকররা সেখানে রূপোর বাঁট-লাগান হাতীর দাঁতের কাটি দিয়ে ভাত খায়। দাসীদের কানেও মুক্তো আর দামী পাথর দোলে। জুতোয় থাকে মুক্তো বসান। সে জুতোয় কাদা লাগলে বা জুতো একটু ছিঁড়ে গেলে—যে ছোঁড়াকে আমরা ধর্তব্যই মনে করি না—তারা মুক্ত-শুদ্ধো জুতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'

লোকটি পাইপে জোরে টান দেয়। ওয়াঙ হাঁ করে কথা গেলে।

দেওয়ালের ওপরে তবে এত কাণ্ড।

'বড়লোকদের বাড়তির মুখে সেই দিন ঝপাৎ করে এসে পড়বে।' বলে লোকটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তার পর যেন অলস কণ্ঠে বললে—'যাক্, কাজ করে যাও ভাই।' তার পর তেমনি করেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

যে প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে তার উপোসী দিন-রাত্রি কাটে, তারই ওপারে সোনা-মুক্তো আর দামী জুতোর এত প্রাচুর্য, একথা ভেবে রাত্রে ঘুম হয় না ওয়াঙের।

লেপ নেই গায়ে দেবার। একটি জামা পরেই তার দিনের পর দিন কাটছে। রাজশয্যার জন্ত ইটের উপর পাতা একটা চাটাই। একটা দুরন্ত লোভ মনের ভিতর পাখা ঝাপটা দেয়। মেয়েকে বেচব। মেয়েকে বেচব।

মনে মনে ভাবে ওয়াঙ, হয়ত ঐ রাজপ্রাসাদেই মেয়েটাকে বেচে ফেলা ভাল হবে। যদি [illegible]

[illegible] পারে ভালো খেতে-পরতে পাবে। গহনা পরতে পাবে। আবার [illegible] চিন্তার জবাব আসে নিজের মনেই, যদি বিক্রীই করি, [illegible] দামে কি সোনা-মুক্তো পাব? যদি দেশে ফিরে যাওয়ার টাকা পাই, বাড়ীর টেবিল, আসবাব, খাটের পয়সা পাব কোথায়? [illegible]লেও যদি উপোস থাকে ভাগ্যে তাহলে কি করব? খেতে পাই [illegible] জমি বেচে? দেশে জমিতে বোনার বীজ ত নেই।

অথচ লোকটি যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেল সে পথ তার জানা নয়। 'বড়লোকের বাড়তির মুখেই সেই সড়ক হঠাৎ মোড় নেয়।'

১৪

এই সব চালা-ঘরেও বসন্ত এলো। আজ-কাল মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা পাহাড়ে কবরখানায় ঘুরে বেড়ায়। কচি কচি পাতা গজিয়েছে যে সব উদ্ভিদ্ আর লতানো গাছে সেগুলি খুঁড়ে ঘরে নিয়ে আসে। সব্জীর জন্যে আর ভিক্ষা করতে হয় না। ছুরি, খোন্তা, ভাঙা বাঁকা টিন নিয়ে দলে দলে ছেলে-মেয়ে চালা-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে—বাঁশের ছোট ছোট ঝুড়িতে ভরে নিয়ে আসে মাঠ থেকে পথ থেকে পড়ে থাকা খাদ্যের কণা। ভিক্ষার প্রয়োজন হয় না—পয়সা লাগে না। ওলানও ছেলে দু'টিকে নিয়ে তাদের দলে গিয়ে ভিড়ে যায়।

পুরুষেরা তেমনি খেটে যায়। আজ-কাল রোদ কড়া চড়ছে, দিন হচ্ছে দীর্ঘতর—অকস্মাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামছে। অসন্তোষের সঙ্গে মেশানো কেমন একটা আকুলতা আসে মনে। শীতের সময় খড়ের চটির নীচে বরফ দিয়ে ছুটেছে তারা, নিঃশব্দে সহ্য করে গেছে প্রকৃতির নির্মমতা। সন্ধ্যা হ'লে ঘরে ফিরে সারা দিনের পরিশ্রম আর ভিক্ষার পয়সায় যা জুটেছে তাই খেয়ে ঘুমিয়েছে জটলা করে। খাদ্যে যা মেটেনি, ঘুম দিয়ে তা ভরাবার চেষ্টা করেছে। শুধু ওয়াঙের চালাতেই নয়—সব ক'টি প্রতিবেশীর ঘরেই যে এক কাহিনী তা সে ভালো করেই জানত।

বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মানুষের ভিতরের রুদ্ধ উৎসমুখ খুলে গেছে। আবার প্রতিবাদের ভাষা জোরালো জীবন্ত হয়ে উঠছে। সন্ধ্যার পরও এখানে-ওখানে সব জটলা করে আলোচনা করে। সারা শীত যাদের প্রায় দেখাই যায়নি—তাদেরও দেখা মিলেছে আজ-কাল এই সব আড্ডায়। প্রতিবেশীদের ঘরে কার মেজাজ রুক্ষ—কে বৌকে ধরে ঠেঙায়—কে ছিল গুণ্ডাদের সর্দার—এ সব গল্প ওলান কখনো স্বামীকে বলে না। তাই ওয়াঙ তার প্রতিবেশীদের জানতেও পারেনি। এই সব আড্ডাতে তাই নিঃশব্দে ওয়াঙ এসে বসে—অবাক্ মুখে সব শোনে।

এই সব মানুষদের প্রতিদিন শুধু খাটুনি আর ভিক্ষাকে কেন্দ্র করেই ঘোরে। নিজেকে এদের সমশ্রেণীর মনে হয় না ওয়াঙের। তার নিজের জমি আছে—যে জমি তার ফিরে আসার পথ চেয়ে আছে। এরা শুধু ভাবে কি করলে কাল এক টুকরো মাছ খেতে পাবে, পারবে দু'পেনী জুয়া খেলতে। এদের জীবনের দিন এমন অভাবকে ঘিরে ঘোরে—এমন অসন্তোষ নিয়ে কাটে [illegible], নিজেদের অসহায় হতাশায় এরা জুয়া খেলে।

কিন্তু নিজের মনে ওয়াঙ ভাঙা-গড়া করে। কেমন করে নিজের জমিতে ফিরে যেতে পারবে তারই আশায় দিন গুজরাণ করে। বড়লোকদের সংসারের অপচয়-প্রত্যাশী এই সব মানুষদের দলে সে নয়। বড়লোকদেরও কেউ নয় ওয়াঙ। তার আত্মীয়তা তার জমির সঙ্গে। এই সব বসন্তের দিনে হাল চালাতে না পারলে, কাস্তে নিয়ে কাজ করতে না পারলে, পায়ের নীচে প্রাণের চেয়ে জমির স্পর্শ বোধ করতে না পারলে তার শান্তি হয় না। জীবনের অন্য কোন প্রাচুর্যই মনের সেই স্বস্তিকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। এই সব মানুষদের প্রতিবেশিত্ব এড়িয়ে তাই ওয়াঙ এদের কথা শোনে আর মনে মনে লুকিয়ে রাখে তার জমির মালিকানার কথা, তার পিতৃ-পিতামহের গম ফসলের মাঠের কথা, বড় বাড়ীর কাছ থেকে কেনা সুফলা ধান-জমির কথা।

এরা শুধু টাকার কথা কয়। এক হাত কাপড়ের জন্যে ক' পেনী খরচ করেছে—এক আঙুল মাছের জন্যে ক' পয়সা নিয়েছিল দোকানী অথবা আজ সারা দিনে কত রোজগার করতে পেরেছে। সব কথার শেষে তারা আফশোষ করে এই বলে যে, পাঁচীলের ওপারের বাসিন্দাটির কাছে যত সোনা থাকে—তা থাকলে তারা কি কি করতে পারত। সব কথার শেষ কথা হয় এমনি ধারা।

'যত সোনা আছে ঐ লোকটার, যত রূপো ওর গায়ে ঝোলে সব যদি পেতুম—যদি পেতুম ওর বৌয়ের চুণী-পান্না-গুলো, ওর রক্ষিতার হীরা-মুক্তোগুলো—তাহলে দেখতে...'

ওয়াঙ বসে বসে শোনে এই সব মানুষদের কথা। এরা যদি ঐ সব পেত তাহলে না কি তারা এমন ভালো খাবার খেত যা ঐ লোকটাও ভাবতে পারে না। সারা দিন কেবল ঘুমোত আর বড়ো আড্ডায় জুয়া খেলত। শুধু সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে কিনে লালসা মেটাত। আর কিছু করত না।

ওয়াঙ এক দিন হঠাৎ বলে ফেললে—'আমি যদি ঐ সব হীরে জহরৎ আর সোনা পেতাম আমি জমির পর জমি কিনতাম। সেই সব জমি থেকে সোনার ফসল ফলাতুম।'

ওয়াঙের কথা শুনে সব ক'টি মানুষই তার দিকে ফিরে তাকাল। ভর্ৎসনার সুরে বল্লে—। 'পাড়াগেঁয়ে ভূতটার কথা শোনো। সহরের পয়সা দিয়ে কি করা যায় কিছুই জানে না ভূতটা। যাই দাও ও শুধু বলদ আর গাধা নিয়ে ক্রীতদাসদের মত খেটে মরবে। পয়সা পেয়ে উড়িয়ে দেবার পথ ভালো করে জানে বলে সকলেই সদম্ভে তাকায় ওয়াঙের দিকে।

কিন্তু এ শ্লেষ ওয়াঙের মনে ধরে না। নিজের মনেই সে বলে—'আমি হলে সব হীরা-মুক্তোই জমিতে লাগাব।'

এই সব চিন্তায় মনের আকুতি আরো বাড়ে।

জমির কথা ভাবতে ভাবতে আজ-কাল ওয়াঙের মনে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব এসেছে। সহরের জীবন যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। এই আশ্চর্য বোধকে ওয়াঙ সহজ ভাবেই গ্রহণ করলে। চারি পাশের সব কিছুই যেন স্বাভাবিক। যে কাগজগুলি হাতে এসে পড়ে সেগুলিও।

যৌবনে অথবা অন্য কোন সময়েই ওয়াঙ পড়তে শেখেনি। এই সব কাগজে কি থাকে তাই সে কিছুই বুঝতে পারে না। সহরের দেয়ালে কারা সব এই কাগজ মেরে রাখে, হাতে হাতে চালু করে—সস্তায় বিক্রী হয়। ওয়াঙ দু'বার এই রকম কাগজ হাতে পেয়েছে।

প্রথম কাগজ দিয়েছিল এক জন বিদেশী, যায় মত এক জনকে সে রিক্সা করে ব্রীজ ষ্ট্রীটে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। শীর্ণ কৃশ লোকটিকে দেখলে বোঝা যায় সংসারের অনেক ঝাপ্‌টা সে সয়েছে। সেই লোকটির চোখে একটা বরফের মধ্যে নীলাভা, সারা মুখে দাড়ী। সমস্ত চেহারাতে মানুষটার এমন অমানুষী ভাব যে ওয়াঙ তার হাত থেকে কাগজ নিতে ভয়ই পেয়েছিল। কাগজখানি নিয়ে দেখেছিল ওয়াঙ একটি ছবি। সাদা এক জন মানুষ আড় করা কাঠের উপর ঝুলছে। কোমরে সামান্য একটু ফালি ভিন্ন লোকটি উলঙ্গই। কাঁধের উপর লোকটির মাথা ঝুঁকে পড়েছে—চোখ দুটি বোজা, দেখেই মনে হয় মরে গেছে মানুষটা। এই আশ্চর্য ছবিটার দিকে কেমন একটা উৎসুক আতঙ্কের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিল ওয়াঙ কিন্তু নীচে লেখা অংশটুকুর মর্ম্মভেদ করতে পারেনি।

বাড়ীতে বাপের সঙ্গেও আলোচনা করেছিল ওয়াঙ। ছবিটির অর্থ করতে চেষ্টা করেছিল। ছেলে দু'টির ত ভয় আর উল্লাস একসঙ্গে :

'গায়ের পাশ দিয়ে কেমন রক্ত পড়ছে দেখ।'

বাপ বললেন—'এমন ভাবে ফাঁসি হয়েছে যখন, লোকটা নিশ্চয়ই বদমায়েস ছিল।'

ওয়াঙ ভয়ে ভয়ে ভাবত, কেন এক জন বিদেশী তাকে এ ছবি দিয়েছে। হয়ত বিদেশী মানুষটির কোন ভাইকে এমন ভাবে মেরে ফেলেছে কেউ, হয়ত তারই প্রতিশোধ সে নিতে চায়। সেই ভয়ে বিদেশীর সঙ্গে যে রাস্তায় দেখা হয়েছিল সেই পথ এড়িয়ে চলতে লাগল ওয়াঙ, তার পর এক দিন সব ভুলে গেল। বাড়ীতে ওলান সেই কাগজটি অন্য কয়েকটি কাগজের সঙ্গে জুড়ে জুতোর শুকতলায় লাগিয়ে দিলে।

পরের বার আর একটি ছোকরা তাকে কাগজ দিলে। কিছু একটা হলেই সহরে যারা ভিড় করে তাদের হাতে বিলি করতে করতে ছোকরাটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি সব বললে। এ কাগজখানিতেও মৃত্যু আর রক্তের ছবি। কিন্তু মরা লোকটির চেহারা বিদেশী নয়, ওয়াঙের মতই তার রঙ হলুদ, চুল আর চোখ কালো। ওয়াঙের মতই লোকটির পরণে ছেঁড়া পোষাক। সেই মৃতের শরীরের উপর বসে এক জন মোটা লোক দীর্ঘ একটা ছুরি দিয়ে তাকে বার বার যেন আঘাত করছে। সেই বীভৎস করুণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নীচের লেখাগুলি পড়বার চেষ্টা করতে লাগল ওয়াঙ।

পাশের লোকটিকে ডেকে সে বললে—'এতে কি লেখা আছে পড়ে আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো?'

লোকটা তাকে বললে—'চুপ করে শোন না ঐ ছোকরা পণ্ডিত কি বলছেন। উনিই সব বুঝিয়ে দেবেন।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াঙ সেই সব আশ্চর্য কথা শুনলে যা সে কোন দিন ভাবতেই পারেনি!

'তোমরাই ঐ মরা মানুষ। আর যে লোকটা তোমাদের ছুরি মারছে, মরে গিয়েছো তা না জেনেই ছুরি মারছে তারাই হোল ধনী—তারাই পুঁজীবাদী। তোমরা গরীব মুখ থুবড়ে পড়ে আছ কেন না সংসারের সবই বড়লোকদের কবলে।'

এর আগে নিজের সব দুর্ভাগ্যের জন্য ওয়াঙ দোষী করেছে ভগবান্‌কে। যে ভগবান্ তাকে গরীব করেছেন, যে ভগবানের জন্য অনাবৃষ্টিতে মাঠ জ্বলে যায়, যে ভগবানের নির্দয়তায় অতিবৃষ্টি হয় মানুষকে কষ্ট দেবার জন্য। যে বছরে রোদে-বৃষ্টিতে দোল খেয়ে জমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়—শস্যশীর্ষগুলি পূরন্ত হয়ে ওঠে, সে বছরে নিজেকে গরীব মনে হয় না ওয়াঙের। ভগবান্ যখন বর্ষা পাঠালেন না, সে সময় বড়লোকেরা কি করতে পারে সে সম্বন্ধে আগ্রহ করে শুনতে চাইল ওয়াঙ। কিন্তু ছোকরা পণ্ডিত অনেক কথা বললেন, কিন্তু ওয়াঙের মনের প্রশ্নের জবাব দিলেন না যখন, তখন সাহস সঞ্চয় করে ওয়াঙ বললে—'আচ্ছা বাবু, যে বড়লোকরা আমাদের অত্যাচার করে তারা আমাদের জমির জন্যে বর্ষা আনতে পারে কেমন করে?'

এ কথা শুনে ছোকরাটি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বললে—'তোমাদের বোঝাবে কে, তোমরা যারা আজো বেণী রাখো মাথায়। বর্ষা যখন হয় না, তখন কে কি করতে পারে? আর তার সঙ্গে দরকারই বা কি? বড়লোকদের যা আছে তারা যদি আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয় তা হলেই আমরা খেতে-পরতে পাবো। বৃষ্টি হোক্ না হোক্ কিছুই আসে যায় না।'

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটা হল্লা উঠল, কিন্তু ওয়াঙের মন খুসী হল না। কথা সত্যি। কিন্তু জমিই যে আসল। টাকা আর খাদ্য শেষ হবে এক দিন। কিন্তু রোদ-বৃষ্টির যদি সামঞ্জস্য না থাকে আবার উপোস মৃত্যুভয় নিয়ে আসবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওয়াঙ হাত পেতে কাগজগুলি নিলে। ঘরে ফিরে সেগুলি ওলানের হাতে দিয়ে বললে—'জুতোর শুকতলার জন্যে কাগজ এনেছি।'

সে-দিন সন্ধ্যায় কিন্তু সব লোকগুলি ওয়াঙের মুখে ছেলেটির কথা শুনে উৎসুক হল। তাদের আর ঐ বড়লোকের মধ্যে যে ইটের পাঁচীল আছে তা ক'টা শাবলের ঘা-ই বা সইতে পারবে। কাঁধের উপর দিয়ে যে ভারী কাঠের বাঁক বয়ে নিয়ে বেড়ায় এরা—তাই বোধ হয় যথেষ্ট হবে।

এই বসন্ত ঋতুর উন্মাদনা ছাড়াও সেই ছেলেটির বক্তৃতার বিপ্লবের ঝড় এদের মনকে অস্থির করতে লাগল। যাদের আছে তাদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের আক্রোশ। দিনের পর দিন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় আলোচনা করতে করতে এই অসন্তোষ তরুণদের মনে ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। দিনের পর দিন অতি পরিশ্রমেও যখন উপার্জ্জনের পরিমাণ বাড়ল না, মনের ভিতর আদিম আকুতি দুরন্ত হয়ে উঠতে লাগল গলিত তুষারের দুদ মতায় নদীর জল যেমন ফুলে ফুঁসে উঠতে থাকে।

সব অনুভব করতে পারল ওয়াঙ। এদের রুদ্ধ ক্ষোভ তারও মনে একটা অস্বস্তির বোধ আনল। কিন্তু সে শুধু সর্ব-মন দিয়ে কামনা করতে লাগল সেই দিনকে, যেদিন নিজের জমির স্নিগ্ধ স্পর্শ সে পায়ের নীচে পাবে।

এই সহরের নব নব বিস্ময়ের মধ্যে ওয়াঙ এখানে আর একটি বিস্ময়ের জাগরণ দেখলে যার অর্থ সে বুঝতে পারলে না। এই সময় এক দিন শূন্য রিকশা টেনে নিয়ে যেতে যেতে ওয়াঙ দেখলে এক দল সৈন্য এক জন লোককে ধরেছে। লোকটি প্রতিবাদ করতেই সৈন্যেরা তার মুখের সামনে ছুরি ঘোরাতে লাগল। তার পর সৈন্যেরা আবার এক জনকে ধরলে। তার পর আরও এক জনকে। এরা সবাই গরীব লোক। তাদের মধ্যে এক জন ওয়াঙের পাশের কুঁড়েতে

থাকে। এরা সবাই খেটে খায়—তবে কেন···? বিস্মিত দৃষ্টিতে ওয়াঙ চেয়ে থাকে।

এরা কেন ধরা পড়েছে, কোথায় এদের নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যেরা মিছামিছি—এদের মধ্যে তা কেউ-ই জানে না। রিকশা নামিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে ওয়াঙ দ্রুত-পায়ে ছুটে একটা গরম জলের দোকানের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে রইল যতক্ষণ না সৈন্যেরা সে এলাকা ছেড়ে গেল। সেইখানে বসে ওয়াঙ দোকানীকে জিজ্ঞাসা করল এ সবের অর্থ। বৃদ্ধ দোকানী যেন উদাস কণ্ঠেই বললে—'আবার কোথাও যুদ্ধ বেধেছে হয়ত। কে জানে কিসের জন্যে এত যুদ্ধের হিড়িক। সেই ছেলেবেলা থেকে এমনিই দেখে আসছি। মরে যাব—তবু এই হিড়িকের শেষ হবে না হয়ত।'

'তা এরা সব নিরীহ মানুষদের ধরছে কেন? কোথায় নতুন লড়াই বেধেছে আমিও যেমন জানি না, আমার প্রতিবেশীও তেমনি জানে না।'

ওয়াঙের জিদ দেখে দোকানী বললে—'এই সব সৈন্যেরা কোথাও লড়ায়ে যাচ্ছে। তাদের রসদ আর গোলা-বারুদ বইবার জন্য কুলী চাই ত। এরা তাই জোর করে কুলী জোগাড় করছে। তা তুমি আসছ কোন্ প্রদেশ থেকে? এ দৃশ্য ত সহরে নতুন নয়।'

'কিন্তু, তার পর কি হবে? মাইনে কত দেবে—পাবো কি?'

বৃদ্ধ দোকানীর নিজের আর চাওয়ার লোভ নেই—তাই সে তেমনি অনুৎসুক কণ্ঠে বললে—'মাইনে-পত্তর নেই। তবে দু'টুকরো শুকনো রুটি পাবে আর পুকুরের থেকে জল। ওদের ডেরা অবধি পৌঁছিয়ে দিয়েও যদি প্রাণ থাকে ঘর-মুখো যেতে পারো, যেও।'

'কিন্তু আমার পরিবার, ছেলেমেয়ে—'

'তাদের তাতে কি?' বলে দোকানী তার গরম জলের ঢাকনা খুলে দেখতে লাগল। বাষ্পের একটা তপ্ত মেঘ এসে তাকে প্রায় অদৃশ্য করে তুললো। অনেকক্ষণ পরে দোকানী যখন মুখ ফেরালে, ততক্ষণে পথে আবার সৈন্যেরা এসে পড়েছে। খুঁজছে চারি দিকে শক্ত-সামর্থ্য মানুষ।

'আরো ঝুঁকে দাঁড়াও।' দোকানী ওয়াঙকে সতর্ক করে—'ওরা এসে পড়েছে।'

ঝুঁকে পড়ে অপেক্ষা করতে থাকে ওয়াঙ। সৈন্যদের ভারী চামড়ার জুতার আওয়াজ পশ্চিমে মিলিয়ে গেলে ওয়াঙ দোকান থেকে বেরিয়ে শূন্য রিক্শা টানতে টানতে বাসায় ফিরে আসে।

ততক্ষণে ওলান কোথা থেকে কতকগুলো সবজি জোগাড় করে এনে রান্নায় বসেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে ভাঙা-ভাঙা কথায় ওয়াঙ তাকে নিজের লোমহর্ষক বেঁচে যাওয়ার কথা বলে। বলতে বলতে আবার একটা আতংকের দৈত্য তাকে যেন গ্রাস করতে আসে। যদি ওকে তারা টেনে নিয়ে যেত লড়ায়ে, হয়ত সেখানকার মাটি ওয়াঙের রক্তে ভিজে উঠত, হয়ত তার নিজের জমি আর সে জীবনে দেখতে পেত না। ওলানের দিকে একটা বেদনার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওয়াঙ বললে—'সত্যি আমার লোভ হচ্ছে বৌ, মেয়েটাকে বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যাই।'

স্বামীর কথা শুনে অনেকক্ষণ কি ভাবলে ওলান। তার পর তেমনি অকম্পিত গলায় বললে—'আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর। আশ্চর্য কথা সব ঘটছে চারি দিকে।'

[ক্রমশঃ

একটি পুরানো চীনা কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ শুধু চ'লতেই থাকবে।—দিন আসে দিন যায়;
তোমার আমার এই যে বিরহ, ছেড়ে যাওয়া
চিরটি জনমের মতো।···
যেন দশ হাজার মাইল পেছনে ফেলে আমরা গিয়েছি চ'লে
নিরুদ্দিষ্ট পৃথিবীর দু'টি শেষ সীমানায়।
মাঝখানের পথটিতে র'য়েছে পার্থক্য আর দূরত্ব;
কী ক'রেই বা আমরা মুখোমুখী আবার এসে মিলিত হবো?
তাতারের ঘোড়া বেছে নিয়েছে উত্তরের হাওয়া;
ইউয়েহ্র পাখী দক্ষিণের কোনো গাছের শাখায় বেঁধেছে
তার বাসা।
এরি মধ্যে আমাদের বিচ্ছেদের দিন হ'য়েছে কতো দীর্ঘ।
প্রতিদিনই আমার পোষাক বুকের কাছটিতে আল্‌গা হ'য়ে
আসছে।···
ভেসে আসা মেঘ, সম্পূর্ণ সূর্যটিকেই ফেলে ঢেকে!
তোমার চিন্তা হঠাৎ আমার বয়সে এনেছে বার্দ্ধক্য;
মাস থেকে বছর দ্রুত এগিয়ে চ'লেছে সমাপ্তির দিকে।···
তোমাকে আমি মন থেকে ফেলবো ঝেড়ে; আর
ভুলে থাকবো এ জীবনের মতো—
খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাতেই এখন থেকে

যাত্রা

অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ রজনী আরও যে গভীর হ'লো
এখনও জাগেনি অমোঘ অরুণ সত্তা
যুগের যাত্রী আজও বলে খোলো খোলো
প্রভাতের দ্বার, কোথায় সে নিরাপত্তা।

অজানা প্রহর কতই যে কেটে গেল
দিগন্ত-ঘেরা আঁধার র'য়েছে তবু,
যাত্রী বলিছে হে প্রহরী আঁখি মেলো
জয়ের যাত্রা ব্যাহত ক'রো না কভু।

অবাক প্রহরী বহিছে প্রহার-দণ্ড
প্রাচীরের দ্বারে জেগে আছে সারা রাত্রি
শতেক প্রয়াস হলো যে খণ্ড খণ্ড
দুর্গম পথ ব'য়ে চলে যুগ-যাত্রী।

রাত পোহাবার আর কত আছে বাকী
হে বিজয়ী বীর চলো চলো তুমি আগে
লাথি মারিবে না হিরণ্যকশিপু কি

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

বাঁশের একটা গেঁটে লাঠি ঘরের মেঝের ওপর সজোরে ঠুকতে ঠুকতে যাদব রায় আস্ফালন করছিলেন : ঠ্যাং ছুটো তোমার লাঠি দিয়ে ভেঙে দেব—ফের যদি তুমি ঐ পুতুলওলার বাড়ীমুখো হয়েছ !

আওয়াজ শুনে রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন সুলোচনা। স্বামীর কাণ্ড দেখে গণ্ডে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, তার পর মুখখানা ঘুরিয়ে শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন : কাকে ঠ্যাংয়ানো হচ্ছে অমন করে ? ঘরের মেঝেটা যে বসে গেল !

স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে এবং তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই যাদব রায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নিজের কথাগুলিই বলে চললেন : যখন-তখন ঐ বেহায়া ছুঁড়িটার সঙ্গে কেন মিশিস্ রে হতভাগা—কেন, কেন ? লজ্জা করে না ! এস তুমি বাড়ীতে ফিরে—ও-বাড়ীতে যাওয়া তোমার ঘোচাচ্ছি···

কথাটা শেষ করেই মেঝের ওপর জোরে উপর্যুপরি লাঠির গোটা কয়েক ঘা দিলেন।

সুলোচনা এগিয়ে গিয়ে হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়ে বললেন : থাক্, ঢের হয়েছে, মুখে আর গগন ফাটিয়ে কাজ নেই। তখনি ত কয়েছিনু গো—যত করবে পুতু-পুতু, তত হবে ছোলার ছাতু। এখন সামলাও।

এক ছত্রের ছড়াটির সঙ্গে স্ত্রীর আঁতের কথাটিও উপলব্ধি করতে যাদব রায়ের বিলম্ব হল না। মামার বাড়ী থেকে মৃগেনকে এ বাড়ীতে এনে তার ভার সুলোচনার ওপর দিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। নিজের ছেলে-পুলে ও সংসার নিয়েই সুলোচনা বিব্রত, এর ওপর দীর্ঘ কাল পরে সতীন-পুত্রের আকস্মিক আবির্ভাব তাঁর পক্ষে যে প্রীতিকর হয়নি, যাদব রায় ভালো ভাবেই সেটা বুঝেছিলেন। সেই জন্তে মৃগেনের সুখ-সুবিধার দিকে তাঁকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়েছে ; আর, এ পর্য্যন্ত সেটি পরিপূর্ণ ভাবে বজায় আছে। ছেলের সামান্ত একটু অসুখ হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন, তাড়া-হুড়ো করে ডাক্তার এনে তাঁর মুখে ভরসার কথা শুনে তবে হন নিশ্চিন্ত। কোন দিন ছেলের গায়ে হাত-তোলা ত বড় কথা, কড়া কথা বলেছেন বা তার মুখের পানে চোখ রাঙিয়ে চেয়েছেন—এমন ঘটনা বাড়ীর বা পাড়ার কারুর জানা নেই। তাই, ছেলের প্রতি স্বামীর এই সব অতি আদর—মাঝে মাঝে যখন সুলোচনার চোখে একান্ত অশোভন বলে মনে হোত, তিনি ঐ প্রচলিত প্রবচনটি সুর করে শুনিয়ে দিতেন। এ-দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং সূচের মত ফুটে জানিয়ে দিল—এত দিন পরে স্ত্রীর কথাটি সত্যি সার্থক হয়েছে। যে-ছেলেকে জোরে একটি ধমকও কোন দিন তিনি দেননি, আজ তাকে লক্ষ্য করে তার উদ্দেশে মাটির ওপরে জোরে জোরে লাঠির ঘা দিচ্ছেন ! কিন্তু······

সেটা সুলোচনাই শ্লেষের সুরে বলে ফেললেন : মেগা যদি এখুনি সামনে এসে দাঁড়ায়, পারবে এই লাঠির ঘা তার পিঠের ওপর বসাতে ?

যাদব রায়ের মনেও এই মাত্র এই প্রশ্নই সূচিত হয়েছে। বিস্ময়ে তিনি স্ত্রীর তীক্ষ্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে।

মুখখানা মচকে ঝংকার দিয়ে সুলোচনা বললেন : একেই বলে ইল্লীর ধুপধুপুনি বিল্লীর ঘাড়ে ! মিছিমিছি মেঝেটাই দুরমুশ করলে ! এদিকে খেয়াল নেই যে—আকাশে যে ধুলো ছুঁড়ছো আপন চোখেই এসে পড়ছে ! ঐ লাঠি তোমার নিজের পিঠে ঘা দিয়েছ তা জানো ?

যাদব রায়ের রোখ ও কোপ এতক্ষণে দমে গেছে। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন : তুমি কি বলছ ?

মুখ ঝাপটা দিয়ে সুলোচনা বললেন : যেন ন্যাকা, কিছু বোঝেন না ! ছেলে গান বাঁধে, পালা লেখে, সে সুখ্যাতি ত মুখে ধরে না। তুমিই ত আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথা ওর খেয়েছ ! অধিকারীর মেয়ের সঙ্গে তলে তলে বিয়ের সম্বন্ধ চলেছে, তোমরা লুকুলেও এ-কথা কে না জানে ? মেগা ত মনে মনে ঠিক দিয়েই রেখেছে—মায়া ওর হবু ক'নে, তুমি তাকে ঘটা করে বৌ করে আনবে।

যাদব রায়ের রোখ আবার চড়ে উঠলো, গলায় জোর দিয়ে বললো : না, না, ঐ ইতরটার মেয়ে আমি ঘরে আনবো না—কখ্খনো না। ওর চেয়ে ঢের ভালো মেয়ে আছে—টাকাওলা লোকের মেয়ে।

নাক-মুখ সিঁটকে সুলোচনা বললেন : টাকাওলা লোকের ত আর নজর নেই, বয়ে গেছে তাদের এ-ঘরে মেয়ে দিতে। বুড়ো ঢেঁকি বসে বসে খালি খালি হাঁড়ি গিলছেন, এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই ; মাকে ত জন্মেই খেয়েছেন, এখন আমাকে খেলেই সুখের চার-পো হয় ! কে তোমার টাকাওলা আমীর আছে শুনি—ওর হাতে মেয়ে দেবে ?

স্ত্রীর মুখে ছেলের নিন্দা শুনে যাদব রায়ের পিত্তি জ্বলে উঠল রাগে। মুখখানা বিকৃত করে চড়া-সুরে বলে উঠলেন : ঢের ঢের আমীর আছে—যারা আমার মৃগের হাতে মেয়ে দিলে বর্ত্তে যাবে মনে করে। তুমি ত ওর নিন্দে করবেই, কিন্তু আশ-পাশের দশখানা গাঁয়ে ওর সুখ্যাতিতে ভরে গেছে একথা কে না জানে। রূপে-গুণে বিদ্যেয় ওর মতন একটা ছেলে আনো দেখি বার করে ! ও গান বাঁধে, পালা রচে, এ কি চাড্ডিখানি কথা না কি···

যাদব রায়ের বক্তব্য আরো অনেক ছিল, কিন্তু এইখানে বাধা দিয়া সুলোচনা বললেন : ছেলে যদি তোমার এত গুণের, তাহলে তাকে উদ্দেশ করে লাঠি হাঁকরানো হচ্ছিল কি জন্তে ? ঘরে বসে এ রকম আধিক্যেতা করবার কি দরকার হয়েছিল শুনি ? আমি ত সৎমা, ওকে দেখতে নারি, নিন্দে না করে আর গালমন্দ না দিয়ে জল খাইনে, কিন্তু তোমার হয়েছিল কি ?

যাদব রায়ের রোখ আবার নিস্তেজ হয়ে এল ; কণ্ঠের স্বর নীচু ও নরম করে বললেন : হ্যাঁ, একথা তুমি বলতে পারো, কিন্তু এখন তাহলে তোমাকে বলি—রাগটা আমার ঠিক ছেলের ওপর হয়নি—

কথায়ের মধ্যে আমি তাকে বলেছিলুম—যে যে-রকম ঠাকুর চায়, তাই গড়লেই ত পার, তাহলে তোমার কষ্টও ঘোচে, মানও বজায় থাকে। এতেই সে কি-না চটে উঠে যা-তা শুনিয়ে দিলে আমাকে। আমিও ছাড়বার পাত্র না কি, তার ওপর ছেলের বাপ ; বলে দিলুম স্পষ্ট করে—তোমার মতন ইতরের মেয়ে আমি ঘরে নিচ্ছিনে।

মুখখানা ঘুরিয়ে সুলোচনা বলল : আমিও ত তাহলে ঠিকই ধরেছিলুম—ইল্লীর ধুপধুপনি পড়েছে বিল্লীর ঘাড়ে। অধিকারীর ওপর রাগ করে ঘরের ছেলেকে সামলাতে চাও। কিন্তু পারবে? ছেলে তোমার কাব্যি করে, পালা রচে, অধিকারীর মেয়েকে না শুনিয়ে তার ঘুম আসে না—ভাত হজম হয় না, তা জান?

বিস্ময়ের সুরে যাদব রায় বললেন : তুমি এ সব কি করে জানলে?

সুলোচনা বললেন : আমি যে মা, আমাকে সব জানতে হয়। তুমি মনে কর না যে, সৎমা বলে আমি মেগার শত্তুর, তার ভাল দেখি না। অবিশ্যি, তোমার মতন তার সুখ্যাতিতে আমি গলা-বাজি করি না, কিন্তু মনে মনে আমি তার হিত কামনাই করি। তাই বলি, বাহিরে যা হয়েছে—তাই নিয়ে বাড়ীতে আর অশান্তি বাড়িয়ো না, মেগাকে কোন কথাই ব'ল না।

বলছ কি তুমি? ওদের সঙ্গে মিশতেও বারণ করব না?

না। যা বলবার আমি বলব ; তুমি কিছু বলবে না।

আমি কিছু বলব না মানে?

তুমি কিছু বললেই অনর্থ হবে। তার বুক ভেঙ্গে যাবে, এর পরে আর কখনো ও-বাড়ীর সঙ্গে মিল হবে না।

তুমি কি মনে কর এর পরেও আবার মিল হবে?

হবে। অধিকারীকে আমি চিনি। রগ-চটা মানুষ, রাগলে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু মনটি ওঁর গঙ্গাজলের মত সাদা। তিনি নিজেই এসে তোমাকে সাধবেন দেখো। আর, এ কথাও তোমাকে বলে রাখছি—মায়ার সঙ্গে যদি মেগার ছাড়াছাড়ি হয়, তোমার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হবে। ছেলেকে তুমি শুধু ভালবাসতেই শিখেছ, কিন্তু তার মনটিকে চিনতে পারনি, চেষ্টাও করনি।

বজ্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্ত্রীর স্নিগ্ধ মুখখানির পানে চেয়ে থেকে যাদব রায় বললেন : সত্যি, আজ তুমি যেন নতুন কথা শোনালে, সেই সঙ্গে নতুন রূপটিও দেখালে। বেশ, এ ব্যাপারে আমি মুখ বন্ধই করলুম।

নতুন একটি পালার পরিকল্পনা করে মায়াকে শোনাবার জন্যে ক'দিন ধরেই মৃগেন যেন ছটফট করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ঘটেনি। বেপরোয়া হয়েই সে বাগান ডিঙিয়ে মায়ার ঘরের জানালার নীচে ধর্ণা দিয়েছিল, কিন্তু সেখানেও বিঘ্ন দেখা দেয়। হতাশ হয়ে সন্তর্পণে নিজের পড়বার ঘরে সবার অজ্ঞাতেই সে আশ্রয় নিয়েছিল। বাবার আস্ফালন এবং বিমাতার সঙ্গে বিতর্ক সবই তার শ্রুতি স্পর্শ করে। স্তব্ধ বিস্ময়ে সে-ও বুঝি আজ রূঢ়ভাষিণী বিমাতার সত্যকার পরিচয় পেল ; সারা অন্তরটি মথিত করে একটা অপূর্ব্ব পুলকের প্রবাহ বহে গেল যেন! প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে মেঝের মাথা ঠেকিয়ে এই মহীয়সী দেবীর উদ্দেশে মাথা নত করল সে।

বাড়িয়েছে—সামনে দৃষ্টি পড়তেই মৃগেনের বিমর্ষ মুখখানা চোখে পড়ে—মনে মনে এই মুখখানাই যে ভাবছিল সে! দূরে থেকেই দু'জনের চোখোচোখি হোল···মৃগেন উন্মুখ হয়ে তাকায়, হঠাৎ যেন কাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। মায়াও ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনের দিকে চাইতেই দেখে, কানাই হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে এই পথে···মায়াকে দেখেই মুখখানা তার হাসিতে ভরে ওঠে···মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি মায়া ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

মায়াকে দেখতে দেখতে কানাই ঘাটের কাছে এগিয়ে আসে। মায়া তখন নিজের মনে বাসন মাজতে বসেছে···কানাই সুর করে মনসা মঙ্গল পালার একটা ছড়া ধরলে :—

আমায় বিয়ে কর্ রে লখা আমায় বিয়ে কর্।
আমি যেমন যুব-কন্যা তেমনি তুমি বর।'

গাইতে গাইতে ঘাটের সামনে এসে দাঁড়ালো কানাই। চার দিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে বললো : মুখের একটা বাহোবাও দিলে না মায়া।

বাসন মাজতে মাজতেই মায়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো : মুড়ো ঝাঁটা-গাছাটা যে সঙ্গে আনিনি···

কানাই বললো : বটে, মেগার বেলায় হেসে হেসে কথা, আর আমার বরাতে মুড়ো ঝাঁটা! কিন্তু সে গুড়ে ত বালি, পথে পড়েছে কাঁটা, ভরসা এখন কানাই—তাই বলি···

মুখখানা শক্ত করে মায়া বলল : ভালো চাও ত দূর হও বলছি, নইলে এই ঝামা দিয়ে ঘষে পোড়ার মুখ বোঁচা করে দোব—

নির্লজ্জের মতন হেসে কানাই বলল : তা দেবে বৈ কি! শহরে চলেছি, তোমাকে দেখেই মনে হোল জেনে যাই যদি কিছু আনবার ফরমাস পাই—তাই ছুটে এলুম জানতে, আর তুমি চাইছ ঝামা দিয়ে মুখখানা ঘষে দিতে! বেশ, তাই দাও—এতেও আমার স্বর্গসুখ, তোমার হাতের পরশ ত পাব! বলেই আবার মনসা-মঙ্গলের একটা ছড়া ধরে :—

বারো গাড়ী কাঠ গো কন্যে বারো ঘড়া জল।
আনতে হবে আরো কিবা, তাই কন্যে বল্।

মায়া : যে চুলোয় যাচ্ছ যাও না, আমায় জ্বালাচ্ছ কেন?

কানাই : জ্বালাব কেন, জিজ্ঞেস করছি শহর থেকে তোমার জন্যে কি আনবো?

মায়া : এক গাছা দড়ি এনো।

কানাই : দড়ি? সে কি! দড়ি নিয়ে কি করবে?

মায়া : তোমার গলায় দিয়ে ঐ তেঁতুল গাছের ডালে লটকে দোব, আমার হাড়-মাস জুড়োবে।

কানাই : আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই হবে। সত্যিই গলায় ঝুলিয়ে এমন একখানা চীজ আনবো তোমার হাড়-মাসে লাগবে মিঠি হাওয়া, আর কাণ হবে ঝালাপালা···আচ্ছা চললুম······

কানাই চলে যেতেই বাসন ক'খানা নিয়ে মায়া উঠলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো নিকটে আর কেউ আছে কি না! কিন্তু বাঞ্ছিত মানুষটির কোন সন্ধানই পেল না—কানাই চলেছে ইষ্টিশানের

চাতালে উঠতে ছোট বৌদি—অতুলের স্ত্রী প্রসাদীর সঙ্গে দেখা। হেসে জিজ্ঞেস করল সে: কানাই যে শহরে চলেছে, তোকে খুঁজছিল; দেখা হয়েছে ত—তোর জন্যে কি আনতে বললি?

জলন্ত দৃষ্টিতে মায়া বৌদির পানে চেয়ে 'দড়ি আর কলসী'—এই বলে ছুটে চলে গেল।

প্রসাদী মুখ মুচকে বলল: মেয়ের কথার ছিরি দেখ না।

পিছন থেকে বড়বৌ করুণা এসে জিজ্ঞাসা করল: কি হয়েছে রে ছোটকী? মায়া অমন করে গেল যে?

প্রসাদী ঝংকার দিয়ে বলে উঠল: জানি নে বাপু, ঘাটে দাঁড়িয়ে কানাইয়ের সাথে ঠাট্টা-মস্করা হচ্ছিল, আমি এসে জিজ্ঞাসা করলুম—কানাই ত শহরে যাচ্ছে তা তোর জন্যে কি আনতে বললি! এতেই মেয়ে একেবারে রেগে টং! মুখ-ঝাপটা দিয়ে বলে কি না—দড়ি আর কলসী আনতে বলেছি।

করুণা মায়ার পক্ষ নিয়ে বলল: কত দুঃখে যে মায়া এ কথা বলেছে তা বোঝবার ক্ষ্যামতা তোর যদি থাকত ছোটবৌ, তাহলে এইখানেই মুখ বন্ধ করতিস্!

ছোটবৌ কথাটা ভালিয়ে না বুঝে ঝাঁঝিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বড়বৌ করুণা মুখখানা শক্ত করে শুনিয়ে দিল: বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয়। কানাই পরের ছেলে—সে শহরে যাচ্ছে বলে মায়া তাকে ফরমাস করবে কেন্ লা? আর সে হতভাগাই বা মায়াকে জিজ্ঞেস করতে আসে কোন্ সাহসে—তোরাই ত তার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিস্।

* * * *

বাইরের চালা-ঘরে নতুন প্রতিমার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ কাঠামোর ওপর খড়-দড়ি বাঁধতে বাঁধতে পীতাম্বর মায়ার সঙ্গে কত কথারই চর্চা করছিল। আলাদা সংসার আর খাওয়া-দাওয়ার কথা উঠতেই বলে উঠল সে: বেশ হয়েছে···সব এখন চুপ···কিন্তু আমাদের ত মন্দ চলছে না, মা কালীর প্রতিমা দেখে খুসি হয়ে পালবাবুরা আরো পাঁচ টাকা বেশী দিল···আর এই জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা গড়ে যা পাবো—দুটো মাস নিশ্চিন্তি, গোকলোর ত উপায় আছেই, কিন্তু অতলোর চলছে কি করে সেই ত ভাবনা···ভেবেছিলুম হতভাগা দু'দিনেই টিট হয়ে হয়ে মাপ চাইবে—আমিও ক্ষমা-ঘেন্না করবো,—কিন্তু কই—হপ্তা কেটে গেল—নীচু ত হোল না······

মায়া বলল: কি করে হবে, পেল্লাদে কানাই যে নাচাচ্ছে, ছোড়দার তো এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই—পরের পয়সায় নবাবী চলছে আর ছোট বৌদি তাতেই জাঁক করে জানাতে চায়—আলাদা হয়ে কি সুখই ভোগ করছেন—

পীতাম্বরের রক্ত গরম হয়ে উঠল, বলল: আমার যে 'উল্টো বুঝলি রাম' হোল রে মায়া!···ভাবলুম এক, হোল আর। আজ কি না ঐ হাড়হাবাদে বখা ছোঁড়া কানায়ে হয়েছে ওদের মুরুব্বী! আর এমনি অধঃপাতে গেছে ওরা—পরের দানে পোড়া পেট ভরাচ্ছে—যাক্ চুলোয় যাক্, কি দরকার ওদের কথায় থেকে—আলাদা যখন করে দিয়েছি!···বলতে বলতে হঠাৎ মায়ার পানে চেয়ে বললেন: হ্যাঁ রে মিগেন আর আসে না বুঝি?

মায়ার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো, অমনি সে মুখ শক্ত করে জবাব দিল: না বাবা, চালা কাঠখানা খালি-খালি তোলাই আছে—একবার এলে হয়।

মেয়ের মুখের পানে চেয়ে মনের ভাবটুকু বুঝি উপলব্ধি করেই ফিক করেই হেসে পীতাম্বর বললেন: পাগলী মেয়ে! আমি কি সত্যি সত্যিই তাকে চালা কাঠ দিয়ে ঠ্যাং ভাঙতে বলেছিলুম রে! ওর চশমখোর বাপই যে আমায় তাতিয়ে দিয়ে গেল,—বলে কি না আমি পুতুল গড়ি! এই যে খড়-দড়ি-মাটি নিয়ে বসেছি—এ কি পুতুল তৈরীর খেলা? তোর সঙ্গে কথা বলছি, হাত চলছে, আর এর মধ্যে চলছে সাধনা—মা আমার মূর্তি ধরে বিরাজ করবেন এখানে—এ যে ওঁরই কাজ—ওঁরই প্রতিমা; আর ঐ বেকুব বলে কি না—আমি গড়ি পুতুল! তাইতেই ত ওর ওপর রাগ করে—নৈলে আমি কি মিগেনকে লক্ষ্য করে ও-কথা বলি···আর ও-কি আমার প্রাণের কথা রে? তোরা শুধু আমার বাইরেটাই দেখিস্—ভেতরটার পানে ভুলেও তাকাস্ না···

গাঢ় স্বরে ডাকলো মায়া: বাবা!

ততোধিক গাঢ় স্বরে বললেন পীতাম্বর: আমি যে ওকে কত ভালবাসি কেউ তা জানে না। ওরে, আমি যে ওর ভেতরটা দেখেছি···কি দেখেছি শুনবি? আমারই মতন ও-যে মায়ের এক দরদী শিল্পী—দুজনেই আমরা কারিকর। খড় দড়ি মাটি রং তুলি নিয়ে আমি গড়ি প্রতিমা,—আর কাগজে কলমে কালি দিয়ে ও রচে মন্তর—যাতে মৃন্ময়ী প্রতিমা হয় চিন্ময়ী মা!

বাপের কথায় মায়ার চোখ দুটি অপূর্ব হয়ে উঠে।

* * * *

রাস্তায় এই সময় নিজের রচিত একটি গান গাইতে গাইতে পীতাম্বরের বাড়ীর দিকে আসছিল মৃগেন—

মা! তোর এ কি মজার খেলা!···

বাড়ীর খিড়কীর দিকে যে ঘরে পীতাম্বর ও মায়া থাকে—তার পিছনে ছোট একখানি বাগান। এক দিকে বাড়ী, তিন দিকে বেড়া দেওয়া। বাগানের পাশ দিয়ে সরু রাস্তাটি এঁকে-বেঁকে গিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে। বাড়ীর-ও চেনা শোনা লোকেরা এ-বাড়ীতে আসতে যেতে এই রাস্তাটি ব্যবহার করে। মৃগেন চুপি-চুপি এই রাস্তার বাঁকটির কাছে এসে দাঁড়ালো ঠিক যেন চোরের মতন। সে চারি দিকে চাইতে লাগলো। হঠাৎ দেখতে পেল—একটা ছাগল মন্থর গতিতে রাস্তাটি ধরে আসছে। অমনি তার মাথায় একটা ফন্দি জাগলো—ছুটে গিয়ে ছাগলটাকে ধরে বেড়ার গায়ে বাঁশ দিয়ে তৈরী খোলাটার আগড়টার এক দিক তুলে ছাগলটাকে বাগানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মাথাটি গলিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল। তার পর ছাগলটাকে তাড়া দেবার ভঙ্গিতে উৎসাহী হয়ে জিভ ও তালুর সংযোগে চেঁচিয়ে উঠলো: হেট্ হেট্ হেট্···

পরক্ষণেই পীতাম্বরের ঘরের পূর্ব-পরিচিত জানালাটির গরাদের উপর ভেসে উঠলো একখানি কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমাখা মুখ! চাপা গলায় প্রশ্ন করল মায়া: ও কি হোল? মৃগেনের মুখখানাও হাসিতে ঝলমল করে উঠলো, কিন্তু মুখের হাসি চাপবার চেষ্টা করে বলে উঠল সে—দেখছ না, হতভাগা ছাগলটা বাগানে ঢুকে গাছপালা গুলো খেয়ে সব সাবড়ে দিল! হেট্, হেট্, হেট্,—

মায়া: ছাগলকে ঢোকালে কে?

মৃগেন : তার মানে?

মায়া : মশাই ত বাঁশ-কল তুলে ওকে সাঁধ করিয়ে দিলেন, এখন বলা হচ্ছে—হেট্‌, হেট্‌, হেট্‌,—মতলবটা কি শুনি?

মৃগেন : শোননি, সুন্দর বিত্তের সঙ্গে দেখা করতে সুড়ঙ্গ কেটেছিল, আমার ত সে ক্ষমতা নেই, তাই···ওই যা! শালার ছাগল বেগুন গাছটা সত্যি সত্যিই মুড়িয়ে দিলে যে···হেট্‌, হেট্‌, হেট্‌···

মায়া : এই, চুপ, চুপ,—ছোড়দা আসছে—

মৃগেন : এই রে, চোর এবার বমালশুদ্ধ ধরা পড়ে বুঝি কোটালের হাতে! এর পর মশানের পালা—বলতে বলতে ছুটে গিয়ে ছাগলের কান দুটো ধরে চেঁচিয়ে উঠলো—হেট্‌ হেট্‌ হেট্‌···

অতুল বড় রাস্তা থেকে নেমে এই পথেই আসছিল। ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো পাকিয়ে মৃগেনের পানে চেয়ে বলে উঠলো : কে রে? কি হচ্ছে ওখানে? য়্যাঁ—মেগা? তুই আমাদের খিড়কীর বাগানে ঢুকিছিস্‌ কেন?

মৃগেন : কেন? দেখতে পাচ্ছ না, এই হতভাগা ছাগলটা ঢুকে বেগুন-গাছগুলো সব সাবড়ে দিচ্ছিল, তাই না কান পাকড়ে ধরেছি! কাদের ছাগল বলতে পারো অতুল দা?

অতুল : যাদের ছাগলই হোক না কেন, তোর তাতে মাথা ব্যথা কিসের শুনি?

মৃগেন : বা-রে! গাছগুলো সব মুড়িয়ে দিচ্ছিল···

অতুল : বেশ করছিল, তোর তাতে কি? তুই আমাদের বাগানে ঢুকবি কেন? ফের যদি এ পথ মাড়াতে দেখি কোন দিন ত ঠ্যাং দুখানা আস্ত রাখবো না···

মৃগেন : তুমি আমাকে খামকা অপমান করছ অতুল দা!—ভাল হবে না কিন্তু—

অতুল : থাক—আর মান কাড়াতে হবে না—একটা পাস করেছে বলে ভেবেছেন উনি সবার মাথায় পা দিয়ে চলবেন! যা-যা-যা—

হুঁ—যা-তা বলে পাগলে—যা পায় খায় ছাগলে—হেট্‌ হেট্‌ হেট্‌—আসল কথাটাই কিন্তু বলা হোল না—হেট্‌, হেট্‌ হেট্‌,—সুর করে বলতে বলতে ছাগলের কান দুটি ধরে টানতে টানতে বাঁশকলের আগড়টার পাশ দিয়ে বেরিয়ে জানালার পানে নির্বাক্‌ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অভিশাপটা যেন জানিয়েই চলে গেল মৃগেন।

পরক্ষণেই জানালায় মায়াকে দেখা গেল, অতুলকে লক্ষ্য করে ঝাঁঝা সুরে সে বললো : তার চেয়ে রাস্তাটায় বেড়া দিয়ে দাও না ছোড়দা, তাহলে আর এ পথ মাড়াবে না।

অতুল চটে ছিল, মুখ-ঝাপটা দিয়ে জানালো : আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, তোকে আর ফোড়ন দিতে হবে না—

মায়া : ছাগল পড়েছিল বাগানে, তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তাতে যা নয় তাই শুয়ে বললে, আর তোমার পেয়ারের কানাই এসে যখন এখানে দাঁড়িয়ে গজল ভাঁজে—তোমার চোখ দুটো কোথায় থাকে তখন শুনি?

অতুল : যেখানেই থাক্‌ না তোর কি? কানাই আসবে, হাজার বার আসবে—তারে কে ঠেকায়! জানিস্‌, তারই দৌলতে মনসা-মঙ্গলের আখড়া বসিয়েছি আমার ঘরে। সে আসবে, গান গাইবে, শুনতে না পারিস্‌ কানে তুলো দিয়ে থাকিস্‌।

মায়া : আচ্ছা, আসুক বাবা; আসুক বড়দা। তোমার কানায়ের ছেরাদ্দ যদি না পাকাই—

বলেই মায়া জানালার কপাট দুখানা জোরে বন্ধ করে দিল—সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তার ওপরে ঢোলের বাজনার শব্দ মিশে গেল। অতুল চোখ দুটো কপালে তুলে দেখলো—একটা বড় ঢোল গলায় বেঁধে বাজ্‌'তে বাজাতে আসছে কানাই! দেখেই অতুলের মন খুসিতে ভরে গেল। সোল্লাসে সে কানায়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই সরু রাস্তাটি ধরে বেড়ার ধারে এসে অতুলকে দেখতে পেয়েই সোল্লাসে বলে উঠল : শহর থেকে সরাসরি ফিরছি অতুলদা, ঢোল বিনে কি পালা জমে? ইষ্টিশান থেকে তাই না একবারে ধুলো-পায়ে এসে হাজির হয়েছি।

বলেই সে জোরে জোরে ঢোল বাজাতে লাগলো—সঙ্গে সঙ্গে নাচও চললো।

প্রসাদী ঘাট থেকে ফিরছিল পা ধুয়ে। সকৌতুকে সংগত শুনে বলে উঠলো : কি হচ্ছে এখানে সঙের মতন?

অতুল বললো : সঙ নয়, চল না ঘরে। সংগত শুনে তাক লেগে যাবে। কানাই ঢোল কিনে এনেছে শহর থেকে।

কানাই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা চিরুণি বার করে বললো : তোমার কাঁকুই চিরুণী এনেছি বৌদি—এই নাও।

জানালার দিকে চেয়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে ইসারা করে প্রসাদী বললো : এখানে কেন, চার দিকে শত্তুররা সব চেয়ে আছে—ঘরে এসো।

কানায়ের হাত থেকে চিরুণিখানা নিয়ে আঁচলে জড়িয়ে প্রসাদী এগুলো, অতুল ও কানাই পিছু পিছু চললো। যেতে যেতে কানাই জানালার পানে চেয়ে বললো : এই দড়ি-গাছটাও এনেছি কিনে, ঢোলের সঙ্গে দিব্যি মানিয়েছে, নয় কি অতুল দা?

উদ্ভট কবিতা

শ্রীমহাদেব রায়

অদৃষ্ট

রত্নাকরে লক্ষ্মি তুষ্ট কমলার সনে,
পথ করে আর্তনাদ ভিক্ষার কারণে।

ছোট-বড়

চূত-রস পানে গর্ব নাহি কোকিলের,
কর্দমাক্ত জলে ঘোর দুর্গর্ব ভেকের।

পঞ্চানন [illegible]

প্রকাণ্ড একটি বস্তি গ্রাম। অবস্থানটা তার সহরের মাঝখান বরাবর হলেও, সহরের সঙ্গে সম্বন্ধ তার খুবই কম। যত দূর চোখে পড়ে দেখা যায় শুধু নীচু নীচু খোলার ছাউনি।

এক-একটা নোঙরা আবর্জ্জনা-ভরা উঠান, চারি পাশে তার নীচু খোলার ঘরের সার। এই উঠান ও ঘরের সারি নিয়ে গড়ে উঠেছে এক-একটা বস্তি-বাড়ী। একটি বাড়ী থেকে অপর একটি বাড়ীর সীমানির্দ্দেশ করে দিয়েছে সরু সরু গলির পথ।

পাতলা সরু আঁকা-বাঁকা পথ। বস্তির লোকেদের যাতায়াতের একমাত্র পথ, তবু সেখান দিয়ে দু'জন লোক পাশাপাশি একসঙ্গে যেতে পারে না। এক জন লোকের পক্ষেও সহজ ভাবে চলাফেরা করা অসুবিধাকর। দু'পাশের বাড়ীর উপরকার খোলার ছাউনি নেমে এসে গলির উপর দিক্‌টা ঢেকে দিয়েছে। তাই দিনের আলোতেও লোকে লম্প নিয়ে যাতায়াত করে।

দরজায় ঝুলান চামসে-ধরা চটের পর্দ্দাটা বাম হাতে সরিয়ে দিয়ে বাড়ী ঢুকে সুধীর দেখতে পেল, তার স্ত্রী বরুণা অদূরে ঘরের সামনেকার দাওয়ার উপর, ভেঙ্গে-পড়া ছ্যাঁচা বেড়াটার ধারে তোলা-উনানটায় পোড়া-কয়লা জ্বালিয়ে চুপ করে বসে আছে।

উঠানের উপরকার ছড়ান কাঁচের টুকরা, নোঙরা ও আবর্জ্জনার পাশ দিয়ে পোয়াটাক আলু, ফালি-দুই কুমড়া ও একগোছা সস্তা শাক হাতে, সাবধানে পা ফেলে, দাওয়ার কাছ বরাবর এসে সুধীর ডাকল—"বরু!"

চমকে উঠে বরুণা চেয়ে দেখল—স্বামী। রুক্ষ অবিন্যস্ত তার চুল, নিস্তেজ তার দেহ। সরু গলি দিয়ে জোরে চলে আসায় দু'পাশের দেওয়ালের ধুলো ও মাটীর চিহ্ন তার কাঁধে, পিঠে ও মাথায় স্থানে স্থানে লেগে রয়েছে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বরুণা দাঁড়িয়ে উঠে অনুযোগের সঙ্গে উত্তর করল—এ কোথায় এনেছ তুমি

সুধীর ইচ্ছা করে এখানে এসে বাসা নেয়নি। শুধু অভাবের তাড়নায় সে নরকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে ধনী আত্মীয়দের সান্নিধ্য এড়িয়ে শান্তিতে থাকবার জন্যে, বাধ্য হয়েই।

সহানুভূতির স্বরেই সুধীর উত্তর করল—"কি করব বরু, দু'টাকার বেশী ঘরভাড়া দেবার সামর্থ্য তো আমার নেই।"

সুধীরের চোখ জলে ভরে আসছিল। হঠাৎ একটা বেয়াড়া চীৎকারে দু'জনাই চমকে উঠে চুপ করে গেল। ডান দিক্‌কার একখানা ঘরে কয়েকটা মাতাল হল্লা করছিল। সভয়ে বরুণা এসে সুধীরকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ও কি—ও—?"

মাতালদের চেঁচামেচির কামাই নেই। চেঁচামেচির সঙ্গে শোনা যায় দাপাদাপি আর বোতল ছোঁড়ার শব্দ। মাঝে মাঝে অশ্লীল গালি-গালাজ এবং কান্নাও শোনা যায়।

সুধীর যে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিল, তার লাগোয়া ঘরখানা বেশ সাজানো-গোছানো। সুবেশা একটি মেয়ে সেই ঘর থেকে অনেক বারই উঁকি মেরে বরুণার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু বরুণা তার সঙ্গে আলাপ করেনি। সেদিন সে তার দাওয়ার উপর একটা মাদুর বিছিয়ে প্রকাশ্যেই বেশ-বিন্যাস করছিল, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল বরাবরই বরুণার দিকে। এইবার সে তাড়াতাড়ি কাচপোকার টিপটা কপালের উপর লাগিয়ে, ছুটে এসে বরুণাদের দাওয়ার উপর উঠে পড়ে বলল—"কিছু ভয় নেই, ও-সব মাতালের কাণ্ড, কয়েকটা বদমায়েস লোক ওখানে থাকে, থেমে দেয়ে এক্ষুনি চলে যাবে। এ আলাদা বাড়ীওয়ালীর বাড়ী, কোনও ভয় নেই এখানে। তার পর আমি আছি খেঁডরে বিষ ঝেড়ে দেব না। সুরমা কীর্ত্তনী আমি···।"

কথা বলতে বলতে সুরমা ইচ্ছে করেই গায়ের আঁচলটা বার-দুই মাটীতে ফেলে দিল। তার পর মাটীর দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কি ভেবে। প্রায় দিন-দুই হল সুধীর স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। সুরমা এই দুই দিন বরুণাকে বহু বার দেখলেও সুধীরকে ভাল করে দেখবার তার সুযোগ হয়নি। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সুরমা ইচ্ছা করেই এতক্ষণ সুধীরের দিকে চেয়ে দেখেনি। তার ইচ্ছা ছিল সুধীরই যতক্ষণ ইচ্ছে [illegible]

সংবরণ করে সুরমা এতক্ষণে জোর করে সুধীরের দিকে মুখ তুলল। হঠাৎ সুধীরকে দেখে সুরমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সত্যই সে অবাক্ হয়ে গিছল। অস্ফুট স্বরে তার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল, "আরে খো—খোকাবাবু? আ—আপনি—"

এক জন অচেনা অজানা মেয়েকে সুধীরকে এই ভাবে 'খোকাবাবু' বলে সম্বোধন করায় সুধীর ও বরুণা দু'জনাই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল।

কতক্ষণ হতভম্ব ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্তির সহিত সুধীর দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করল—কে খোকাবাবু? আমি? ভুল করেছেন আপনি!

সুরমা কীর্ত্তনী এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল। সে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখল, কি আশ্চর্য্য চেহারার মিল। গলার স্বরের যা কিছু পার্থক্য। তা না হলে, দেহের আকৃতিতে, দৈর্ঘ্যে ও বর্ণের দিক্ দিয়ে তাকে যে-কোনও লোকই খোকাবাবু বলে ভ্রম করতে পারে। অপ্রস্তুত হয়ে সুরমা উত্তর করল, "মাপ করবেন, আপনার চেহারা—চেহারা যে ঠিক আমাদের—আমাদের এক জন—"

সুরমা কীর্ত্তনীর ভাবভঙ্গী গোড়া থেকেই সুধীরের পছন্দ হয়নি। সুধীর বা বরুণা. কারুরই প্রতিবেশী হিসেবে তাকে ভালও লাগেনি। সুধীর বিরক্তির সহিত বলে উঠল, "সে এক জন! কি বলছেন আপনি! কে এক জন? এক জন কে?"

বিলোল কটাক্ষে সুধীরের আপাদ-মস্তক আর একবার দেখে নিয়ে, সুরমা মনে মনে টপ করে কি একটা মতলব এঁটে নিল, তার পর হঠাৎ চোখ দিয়ে অকারণে জল বার করে গলার স্বরটা করুণ করে সুরমা উত্তর করল—"আমার দা-দা। আপনি ঠিক আমার ছোড়দার মত দেখতে। আপনিও আমার দা-দা।"

সুরমার মুখের এই দাদা সম্বোধনটার মধ্যে বোধ হয় কোনও প্রাণ ছিল না। সুধীর বা বরুণা কারো কাণে তা ভাল শোনাল না।

দূরের ঘরের মাতালগুলো তখনও চীৎকার করে চলেছে। বরুণা সভয়ে একবার বদমায়েসগুলোর ঘরটার দিকে আর একবার সুরমা কীর্ত্তনীর লীলায়িত দেহটার দিকে চেয়ে দেখে সভয়ে সুধীরের কাছে আরও একটু সরে এল। মুখ দিয়ে তার কোনও কথা বার হচ্ছিল না।

আশে-পাশের কদর্য্য ঘরগুলোর দিকে আর একবার সুধীর চেয়ে দেখল, দাওয়ায়-দাওয়ায় টাঙান দড়ীর উপর ঝুলান রয়েছে ময়লা কাপড়, দু'-চারটা কোর্ত্তা লেঙট্, রঙ-বেরঙের সস্তা জাপানী ব্লাউজ। উঠানের উপর একটা ছাগল, তার পাশে বাঁধা রয়েছে একটা গাধা। এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া কাঁথা, কানা-ভাঙা চালের হাঁড়ি।

চারি দিক সুধীর ভাল করে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিল, তার পর ধীরে ধীরে সে তার বাষ্পাকুল চোখ দু'টো বরুণার দিকে ফিরিয়ে এনে বলল, "দরকার নেই, বরু, চল তোমাকে দেশে রেখে আসি।"

এত দুঃখে এত ভয়ের মধ্যেও সুধীরের কথায় বরুণা একটু ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিল, "দেশে? দে—"

দেশের যা-কিছু জমী-জমা ছিল, খাজনার দায়ে তা অনেক পূর্ব্বেই নিলাম হয়ে গেছে, বাস্ত-ভিটাটা পর্য্যন্ত। কথা কয়টা বলেই সুধীর অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। আপনা হতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটুকু অস্ফুট স্বর—"না-না-না।" একটু ভেবে নিয়ে সুধীর পুনরায় শুধাল, "তবে তোমার দাদার কাছে? যাবে?" একটু সরে এসে বরুণা উত্তর দিল—"দাদার কাছে, আবার? না,

বিস্মিত হয়ে সুধীর জিজ্ঞেস করল, "এইখানে? পারবে?"

উত্তরে বরুণা বলল, "কি আর করব?" একটু চুপ করে থেকে চোখের জলটা আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে, যা কিছু বেদনা তা' বুকের ভিতর চেপে বরুণা উত্তর করল "এখন ত এসো, খাবার জোগাড় করি। এসো, ঘরে এসো।"

নির্ল্লজ্জের মত সুরমা তখনও সেইখানে দাঁড়িয়েছিল। বরুণার মুখের জোর করে ফুটিয়ে তোলা হাসিটুকু সে অবাক্ হয়ে দেখছিল। অতীব বিরক্তির সহিত সুরমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঝাকড়ায় বাঁধা তরকারীগুলো দাওয়ার উপর নামিয়ে রেখে সুধীর জানায়, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে, বরু, আজ না খেয়েই কাযে যেতে হবে।"

ব্যস্ত হয়ে বরুণা উত্তর করল, "ও মা, না খেয়ে—? বলছ কি তুমি? এ্যা, তবে এ্যা—তবে এগুলো নিয়ে এলে কেন?"

বাজার করতে করতে সেদিন সুধীরের তার এক পুরান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সুধীরের অবস্থার কথা শুনে সে তাকে একটা বেশী মাইনের চাকরী জোগাড় করে দেবার কথা বলেছিল। তাই তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে সুধীরের দেরী হয়ে গিছল। কথা কয়টা সুধীর বরুণাকে বুঝিয়ে বলতে চাইল, কিন্তু তা আর তার বলা হল না। খালের ওপারের তেলের কলের সময়-নির্দ্দেশক ভেঁপুর কর্কশ শব্দ তাকে উতলা করে তুলল। দশটার ভেঁপু বাজছিল, "ভোঁ-ও-ও-ভোঁ-ও—।" আর দেরী করা চলে না। ব্যস্ত ভাবে সুধীর বলল, "অ-ঐ। আমি আসি বরু। কিছু কিনে খাবো'খন, তুমি কিন্তু খেয়ে নিও, লক্ষ্মীটি। বুঝছো তো প্রথম চাকরী। চললাম আমি।"

সুধীরের কথায় বরুণা কাঠ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর করল না। উত্তর করল সুরমা। বরুণার দিকে চেয়ে সে বলে উঠল, "ভয় পেয়েছ বাছা। ভয় কি? আমিও ভদ্দর লোকের মেয়ে, কিছু ভয় নেই, দিন-রাতই এখানে থাকি। কোথাও যাই না।

মাতালগুলোর বিরামহীন হল্লা তখনও পুরা দমে চলছিল। বীভৎস চীৎকারের মাঝে মাঝে শুনা যাচ্ছিল অস্পষ্ট ঘুঙুরের আওয়াজ। সচকিত হয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে সুধীর সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ খালের ওপারের তেলের কল থেকে সতর্কীকরণী ভেঁপু দ্বিতীয় বার বেজে উঠল। আর সে কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না। আশে-পাশে এমন কেহই নেই, যাকে সে অনুরোধ জানিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ব্যাকুল হয়ে শেষে সে সুরমাকেই অনুরোধ জানিয়ে গেল, "আপনিও ত বাঙালী। দেখবেন একটু একে।"

সুধীরের দিকে আর একবার কপোল কটাক্ষপাত করে মুচকে হেসে সুরমা বলল, "দেখব না মানে। হায় রে কপাল। কি বলেন আপনি, নিশ্চয়ই দেখব।"

বরুণা স্থির-দৃষ্টিতে সুধীরের নিক্রমণের পথটির দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর সে ধীরে ধীরে পিছিয়ে এসে ঘরে ফিরে অর্গল বন্ধ করছিল, সুরমা কীর্ত্তনী পিছন পিছন ছুটে এসে শুধাল, 'ওমা, ওঃ ভালমানুষের মেয়ে, রান্না-বান্না করবে না?' উত্তরে বরুণা জানাল, "না দিদি, শরীরটা ভালো না।' কপাট দুইটা বন্ধ

সুধীর বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাতালগুলোর চীৎকার ডুবিয়ে সুরু হল সামনেকার আর একটা ঘরের মধ্যে অশ্লীল গালি-গালাজ। এক জন হিন্দুস্থানী খাটিক ও তার খাটকিন জেনানা কতকটা স্বামি-স্ত্রীর মতই সেই ঘরটায় থাকত। দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে বেধে গেল মার-পিট। মুখের সঙ্গে চলতে লাগল হাত। জেনানা হলেও খাটকিন হটবার পাত্রী ছিল না। দু'-চার ঘা যেমন খেলে, দিলেও সে তেমনি দু'-চার ঘা।

এই খাটিক-পরিবারের সামনের ঘরটায় থাকে এক জন কর্ম্মকার। আসলে পূর্ব্ববঙ্গীয় হলেও, ভোল বদলে সে দেশোয়ালী সেজেছে। হিন্দুস্থানী বলেই লোকে তাকে জানে। ঘরের সামনের দাওয়ার উপর তার একটা হাপর বসান। হাপরের পাশেই একটা উনান, উনানটার সাহায্যে সে লোহা তাতায়, আবার রান্নার কাযও চালিয়ে নেয়।

কলহান্তে খাটকিন জেনানা কর্ম্মকারের ঘরের দিকে চলে আসতে আসতে রুক্ষ স্বরে খাটিককে আধা হিন্দি ও আধা বাংলায় তার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, "তুহর সাথে হামি নেহি থাকবে।"

কর্ম্মকার ভুখিরাম (?) গাঁজার কলকে-হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের সেই কলহের ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল অনেকটা মজা দেখার মতই। খাটকিনকে তারই ঘরের দিকে আসতে দেখে বার-কতক কেসে নিয়ে খুসী হয়ে দাঁত বার করে সে হেসে উঠল হেঁ হেঁ হেঁ। তার পর ছেঁড়া মাদুরটা দাওয়ার উপর বিছিয়ে দিয়ে খাটকিনকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলে উঠল, "মে ভি গররাজী নেহী। ঠিক হ্যায়, আ যাও তু। আ যাও, মেরি জান! আ যা-ও।"

খাটিকের উত্তপ্ত মেজাজ ভুখিরামের এই বিসদৃশ ব্যবহারে অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার পাতাল-পুরীর বস্তি-জীবনের এক অতি সাধারণ এবং নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কিন্তু কোনও স্তরের মানুষই আপন অধিকার সহজে ছাড়ে না। খাটিক তাড়াতাড়ি একটা জ্বালানী কাঠ উঠিয়ে নিয়ে, উঠানে নেমে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "এই খবরদার।. আভি নিকালো উসকো, উ মেরি জেনানা হ্যায়। এ, এই। খবরদার।"

"আ যা তু" বলে, খাটকিন জেনানাকে সাদরে দাওয়ার উপর উঠিয়ে নিয়ে, ভুখিরাম খাটকিন মর্দ্দানার হুমকির প্রত্যুত্তর করল, "কাহে রে, কাহে? কিসিকো উ বহু আছে? মাৎ আও মেরি ডেরামে। ভা-গো—। ভাগো-ও আভি—।"

খাটিক মর্দ্দানার সহ্যের সীমা বহু পূর্ব্বেই অতিক্রম করেছিল। সে আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে সে কর্ম্মকারের গলাটা প্রাণপণে চেপে ধরল। কর্ম্মকারও ছাড়বার পাত্র নয়। খাটিক-পুঙ্গবের পৃষ্ঠে সাধ্যমত মুষ্টি ও চপেটাঘাত প্রয়োগ করে সে-ও তার প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল। হঠাৎ এমনি সময় আশ-পাশের সকলকে সচকিত করে দিয়ে তিন-চার জন বাঙ্গালী এসে সেখানে হাজির হল। বাইরে থেকেই তারা এসেছিল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হুমকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"এই, বহুত হো গিয়া, চুপ হো যাও আভি। চু-উ-প।"

লোকটির নাম খোকাবাবু। লোকে খোকাবাবু বলেই তাকে জানে। [illegible]

গরদের পাঞ্জাবী। পায়ে লপেটা জুতা। হাতে সোনার রিষ্ট ওয়াচ। সযত্ন সুবেশ সাজসজ্জার মধ্যেও তার ক্রুর দৃষ্টি, পশুসুলভ গতি ও সক্রোধ ভাব বেশী ক্ষণ গোপন থাকে না। সামান্য মাত্র আবেগ বা উত্তেজনার কারণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই তা পূর্ণ ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সুপরিচিত স্বর। আদেশ পাবা মাত্র কর্ম্মকার অনতিবিলম্বে নিরস্ত হ'ল! কিন্তু খাটিক সমভাবেই আক্রমণ চালাতে লাগল।

খোকাবাবু সাকরেদদের নিয়ে নিরাপদে থাকবার জন্যে ইচ্ছে করেই এই বস্তি-বাড়ীর খান-দুইটা ঘর বেছে নিয়েছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মগোপন। কিন্তু খাটিকের অবাধ্যতা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না। সে কিছুক্ষণ তার স্বভাব-বিরুদ্ধ অপলক দৃষ্টি হিন্দুস্থানী খাটিকটার উপর নিবদ্ধ করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার দ্বৈতভাবের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাকে বিভ্রান্ত করে তুলছিল। ধীরে ধীরে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। ভুলে গেল তার পরিচয়-গোপনের সার্থকতার কথা। দলের বিপদের কথা তার মনেই এল না। হাতের আস্তিনার তলা থেকে তার ছুরিখানা বের করে, ডান হাতে সেটা তুলে ধরে, বাম হাতে খাটিকের গলাটা চেপে ধরে খোকাবাবু চেঁচিয়ে উঠল—হামি খোকাবাবু আছে। চিনত না হামা? জানবো পরোয়া না করো?

খোকাবাবুর নাম শুনেনি এমন লোক খুব কমই আছে, বিশেষ করে এই তল্লাটে। খোকাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় খাটিকের না থাকলেও তার কীর্ত্তিকলাপের সঙ্গে তার বিস্তর পরিচয় ছিল। কিছু দিন ধরে একসঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করলেও এক কর্ম্মকার ও সুরমা কীর্ত্তনী ছাড়া খোকাবাবুকে খোকাবাবু বলে আর কেউ জানত না। খোকাবাবুর নাম শুনে খাটিক তার স্নায়ুর সবটুকু শক্তি হারিয়ে ফেলল। দশ জনের মত জানের পরোয়া সে-ও করে, কাঁপতে কাঁপতে সে উত্তর করল—মে মাফ, তোলতা, তুমকো না চিনত হামি। মাফ মাঙতা বাবু সাব, গোস্তাকি মাপ কিজিয়ে। হামি ভি আপকো বান্দা আছে।

এই ভাবে অকারণে আত্ম-পরিচয় দেওয়ায় দলের অপর সকলে খোকার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। খোকার প্রধান সাকরেদ গোপীনাথ প্রতিবাদ করে কিছু বলতে চাইল। কোনও কিছুরই প্রতিবাদ খোকা কখনও বরদাস্ত করতে পারেনি। খোকা ভ্রূ কুঞ্চিত করে তার ছুরিখানা খাটিকের মাথার উপর তুলে ধরে বলল, "ঠিক্ হ্যায়, মাফি কর দেতা, লেকেন হুঁসিয়ারিসে রহেনা।

বাইরের গোলমাল বরুণাকে ভীত করে তুলছিল। উঁকি দিয়ে বাইরেটা একবার সে দেখে নিল এবং তার পরেই উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে বরুণা ব্যস্ত ভাবে ছুটে এসে খোকার ছুরি-শুদ্ধ হাতটা চেপে ধরে কেঁদে উঠল—"খুন! এ্যা! খুন করবে তুমি?"

বরুণার ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই হতভম্ব এবং বিস্মিত হলেও খোকাবাবু একেবারেই বিস্মিত হয়নি। খোকাবাবু তার শান্ত ভাব অচিরে ফিরিয়ে এনে মুচকি হেসে উত্তর করল, "আজ্ঞে, আমি নই, ভুল করছেন। আমি অন্য লোক।"

সুরমার মত বরুণাও ভুল করেছিল। মানুষের সহিত মানুষের এই রকম একটা আশ্চর্য্যরূপ মিল কল্পনাও করা যায় না। তবে

তবেই সে তার ভুল বুঝতে পারল। মরমে মরে গিয়ে, এক দৌড়ে রান্নাঘরখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে সে অর্গল বন্ধ করে দিলে।

বয়সের সিটোল, সুঠাম দেহের মাধুরীটুকু গোপীনাথের নজর এড়ায়নি। সে তার আসল অভিযোগ ভুলে গিয়ে মুচকি হেসে বলল, "বেশ, সাঙাতের কপাল ভাল। তবে ও এল কোথা থেকে? কাল সকালেও ত ওকে দেখিনি? আজই এল না কি? তা বেশ বেশ, বাঃ—"

গোপীর এই স্নেহোক্তিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে খোকাবাবু অলক্ষ্যে তার কোমরে বাঁধা সিল্কের থলির মধ্য থেকে একটা ছোট লোহার টুকরো বার করে সেটা কর্ম্মকারের হাতে তুলে দিয়ে নিম্ন স্বরে জানাল, "দেখ, এই ইস্পাতটুকু দিয়ে আর একটা যন্ত্র তৈরী করিস্। গোড়াটা যেন একটু মোটা হয়, তা না হলে বড় তালাগুলো সহজে ভাঙে না, বুঝলি।"

চাল-চলনে দেশোয়ালীদের মত হলেও কর্ম্মকার আসলে ছিল পূর্ব্ববঙ্গীয়। তিন-চারটে দেশীয় ভাষা সে অনর্গল বলে যেতে পারত। ইস্পাতটুকু কোমরের কাপড়ে গুঁজে রেখে সে মাতৃভাষাতেই জিজ্ঞেস করল, "হবে নে, কিন্তু ও ছুড়ীটা অমন কইর‍্যা ছুটা আইস্যা আপনারে কইথ্যা দাঁড়াইল ক্যান? মুই কিছুই ত বুঝতে পারলাম। হুঃ?"

ব্যাপারটা সকলকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সুরমা কীর্ত্তনী অনেকক্ষণ ধরে একটা সুযোগ খুঁজছিল। আঁচলটা বেশ কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে এসে মুরুব্বিয়ানার সহিত সে বলে উঠল, "আরে, ওর যে সোয়ামী আছে না, কি বলব মাইরী, একদম সে ঠিক আমাদের খোকাবাবুর মত।"

সুরমা মনে করেছিল, নূতন একটা কিছু খোকাবাবুকে জানিয়ে দিয়ে সে বাহাদুরি নেবে। কিন্তু খোকাবাবু তাকে নিরাশ করে চাপা-গলায় উত্তর করল, "চুপ কর। ও-সব জানি আমি। আমার লোকই ওকে তেল-কলে চাকরী করে দিয়েছে। ওকে এখানে ঘর-ভাড়া করেও দিয়েছে আমার লোকেরা। কিন্তু খবরদার। ওরা যেন এ সব কথা না জানতে পারে, সাবধান।"

বেশ একটু শাসিয়ে শাসিয়ে সুরমাকে কথাটা বলে খোকা তার লোকেদের নিয়ে তার ঘরের দাওয়ার উপর উঠে পড়ল। ধমক খাওয়ার জন্যে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে সুরমা খোকার পিছন পিছন এগিয়ে আসছিল। তাকে পিছন পিছন আসতে দেখে গলার স্বরটা যথাসম্ভব কোমল করে খোকা বলল, "আয়, ভিতরে আয়, কথা আছে।"

দাওয়ার উপর উঠে পড়ে ব্যথিত স্বরে সুরমা উত্তর দিল, "অবিশ্বাস করেন খোকাবাবু আমাকে।"

সুরমাকে যে খোকাবাবু খুব বিশ্বাস করত তা নয়। খোকাবাবু হেসে উত্তর করল, "চোরেরা কবে মেয়েদের বিশ্বাস করে, আর মেয়েরা কবে তাদের প্রেমে পড়ে? মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করব আমি? এমন বান্দা আমি নই। তোদের বিশ্বাস করা মানে বিপদ ডেকে আনা। তোমাদেরও অবিশ্যি ওদের বিশ্বাস করতে বলি না। তবে ও-সব কথা থাক, এখন তুই আয় ত ভিতরে।"

গোপীর মনের মধ্যে থেকে বরুণার সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্য তখনও অপসৃত হয়নি। গদগদ স্বরে সুরমার হাতখানা চেপে ধরে গোপী বলে উঠল, "কিন্তু মাইরী পিসী, যে রকম করেই হোক যদি···। সপ্তাহভর যা কিছু হিস্যা পাব সবটাই তোকে দেব; মাইরী, মাইরী। আমি-ই তোকে বিশ্বাস করি।"

সুরমা আসলে ছিল এক জন পেশাদারী সংগ্রাহিকা। বড়লোকের বখা ছেলেদের মেয়ে সংগ্রহ করে দিয়ে সে বেশ দু'পয়সা উপায় করে। সুরমা চাপা-গলায় উত্তর করল,—"তা বলেন ত চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু বড় বেয়াড়া মেয়ে। সেয়ানাও বেজায়। তবে খোকাবাবু যদি অনুমতি দেন ত যা হোক কিছু একটা উপায় করা যেতে পারে।"

খোকাবাবু লোকটা ছিল ভিন্ন-প্রকৃতির। মেয়েদের ওপর অনুরাগ ছিল তার যথেষ্ট, কিন্তু জোর বা জবরদস্তির সে একেবারেই পক্ষপাতী নয়। খোকাবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বারেক সুরমার দিকে এবং বারেক গোপীনাথের দিকে কটাক্ষপাত করে ধমকে উঠল "খবরদার। কোনও রকম জোর-জুলুম ওদের উপর যেন না হয়; খামাকা মেয়েদের উপর অন্যায় অত্যাচার আমি পছন্দ করি না।"

মেয়েদের প্রতি ওস্তাদের এইরূপ মনোভাব সম্বন্ধে গোপীনাথ সবিশেষ সচেতন ছিল। গোপীনাথ খোকাবাবুকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে অনুরোধ করে বলল, "আরে না না। যা হবে তা বলে ক'য়েই হবে। ঘাবড়াস কেন তুই।"

উত্তরে খোকাবাবু বলল, "সে অবশ্যি আলাদা কথা।"

[ক্রমশঃ।

ধার

পরিমল রায়

ধারের টাকা যেদিন আহা দিলাম ফিরিয়ে
সেদিন আরো মেজাজ ওঠে চিড়্‌বিড়িয়ে,
ভাবে, এখনি আর কী বলে' দেব খোঁচাটা,
মনের সুখে বেড়ায় দেখি বাগিয়ে কোঁচাটা।
ভেবে চিন্তে বলে, "কিনতে হবে অনেক জিনিস,

সেই টাকাটা আজই আমার এই দণ্ডেই চাই,
কোথায় পাবে? আমার তা'তে কোনো দরকার নাই।
জোগাড় করে' আনো তুমি যেখান থেকে পারো,
হাসো কেন? দেখ্‌লে হাসি পিত্তি জলে আরো,
কাল সকালে একশো টাকা না পাই যদি হাতে

আও নাগা

শ্রীমতী প্রমীলা ভট্টাচার্য্য

এই যুদ্ধ আমাদের নাগা জাতি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়েছে। নাগারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি, তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, রীতি-নীতি একের সঙ্গে অন্যের মেলে না। আমি এখানে আও নাগা সম্বন্ধে বলবো। আওরা নাগা জাতির মধ্যে সব চেয়ে সভ্য ও উন্নত। এদের বাস নাগাপাহাড়ের মোককচাং সাব-ডিভিসনে। এরা স্ত্রী-পুরুষে ক্ষেতের কাজ করে। কুলীর কাজ ও অন্যান্য বেশী পরিশ্রমের কাজ সাধারণতঃ পুরুষেই করে। এদের একটা গ্রামে তিনশো থেকে ছ'শো ঘর লোক থাকে। প্রত্যেক গ্রামে দু'খানা করে বড় ঘর থাকে, তাকে আওরা আর্জু ও শিকিদম বলে। আর্জুতে গ্রামের সাত বছরের চেয়ে বড় ছেলেরা বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত রাতে থাকে, অবশ্য দরকার হলে এর ব্যতিক্রম হয়। শিকিদমটা মেয়েদের জন্যে। ছেলে বিয়ের পর আলাদা থাকে, তবে বাপ-মায়ের দেখা-শুনা ও সাহায্য করা ছেলের অবশ্য-কর্ত্তব্য। সম্পত্তির অধিকারী ছেলেই হয়, এমন কি ছেলে না থাকলে অন্যে পায়, তবু মেয়ে পায় না। তবে বাপ যদি মেয়েকে দিয়ে যায় সে আলাদা কথা। পুরুষ বা মেয়ে নিজের ইচ্ছেমত স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ ও বর্জ্জন করতে পারে, এদের সমাজে তার জন্যে কোনও আটকায় না। বিয়ে বলে একটা সামাজিক আচার থাকলেও তার ওপর বিশেষ জোর দেয় না অর্থাৎ না হলেও বিশেষ এসে-যায় না। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ এদের সমাজে অত্যন্ত দোষণীয়। কুমারী মেয়ে মা হ'লে এরা তাকে ত্যাগ করে না। বাপ বা মায়ের কোনও সামাজিক দোষের জন্যে সন্তানকে শাস্তি পেতে হয় না, এবং বাপ-মায়ের পরিচয় যত ঘৃণ্যই হোক না কেন, তার সন্তানকে সমাজ টেনে নেয়। এদের সমাজে অবৈধ সন্তান বলে কিছু নেই।

আমার এক জন আও-মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি নানা সামাজিক প্রথা আলোচনার মধ্যে বললেন, "আপনাদের হিন্দু সমাজে মেয়ে হয়ে জন্মানো একটা মস্ত বড় অভিশাপ।"

শুনে আমার আপমান বোধ হ'ল। "দেবীর দেশের মেয়ে" আমরা, এমন কথাতে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবু শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" উত্তর দিলেন, "আমি অনেক বাড়ীতে দেখেছি, পর-পর দু'টি মেয়ে হলেই রীতিমত শোকসভা বসে যায়। শুনেছি, আপনাদের পণ না দিলে মেয়ের বিয়ে হয় না। এ-রকম অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের সমাজে নেই।"

আমি চুপ করে রইলাম, একবার ভাবলাম বলি যে, অনেক মহাজনেরা বলেন যে, মেয়ে বাপের সম্পত্তি পায় না বলে বাপের মেয়ের বিয়েতে পণ দেওয়া উচিত। কিন্তু ভয় হল যদি মহিলাটি জিজ্ঞেস করেন এতে মেয়েদের লাভ হয়েছে কি না এবং বাপের ছেলের জন্য সম্পত্তি রাখা কন্যা-পণের মত বাপের কাছে ক্ষমতাতিরিক্ত ও বাধ্যতামূলক কি না, এবং মেয়ের কাছ থেকে বাপ-মা কোনও সাহায্য কখনও পান কি না?

তিনি আবার জিজ্ঞেস্ করলেন, "আপনাদের মধ্যে তো আজ-কাল বড় বড় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়, সাধারণতঃ বিয়ের আগে তাদের আলাপ-পরিচয় হয় না, খাপ খায় কি করে? যাদের স্বামি স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হয় না তারা কি করে?"

"সারাজীবন ঝগড়া করে কাটায়।"

"এত বড় জীবনটা ঝগড়া করে কাটায়, তবু বিয়ে বাতিল করার উপায় নেই?"

"কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে আরেকটা বিয়ে করে। সব সময় ঝগড়ার জন্যে না হোক, অন্য তুচ্ছ কারণে স্বামি-পরিত্যক্তা নির্দ্দোষ মেয়ে বহু ঘরে দেখতে পাওয়া যায়।"

"পুরুষে যদি আর এক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, মেয়েরা কেন পারে না?"

আমি বললাম, "দেখুন, এ সব জটিল কথার উত্তর দেবার মত আমার বিদ্যে নেই।"

তাঁর কৌতূহল আমার কথাতে গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, "এই স্বামি-পরিত্যক্তা মেয়েদের কেমন করে চলে?"

"সাধারণতঃ তারা বাপের বাড়ীতে থাকে, এবং তাদের অভিভাবক কড়া শাসনে চরিত্র ভাল রাখার চেষ্টা করেন। তারা বাঁদীগিরি ও অবসর সময়ে পরের ঘরের চিঠি পড়ে দিন কাটায়।"

"আপনাদের সমাজে বিধবা-বিবাহ হয় না, না?"

"আইনতঃ আটকায় না, কিন্তু সমাজ এখনও তাকে গ্রহণ করেনি।"

"নিঃসন্তান বিধবারা সমস্ত জীবন কি নিয়ে কাটান?"

"ঠিক বলতে পারবো না, তবে কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, আবার বিয়ের প্রবৃত্তি হয় না এবং স্বামি-স্মৃতি তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদ্।"

তিনি একটু হেসে বললেন, "দেখুন, এটা যদি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হত তাহলে যারা বেশী বস্তু তাদের মধ্যে বেশী দেখা যেত। স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটানো এক হিন্দু সমাজ ছাড়া আর কোথাও নেই, তাও আবার শুধু মেয়েদের মধ্যে। অন্য সমাজের কাছে এটা একটা উৎকট আদর্শ।"

মনে মনে আহত হলাম, ভেবেছিলাম 'স্বামি-স্মৃতি' কথায় তাঁর আমাদের হিন্দু-মেয়েদের ওপর না জানি কত শ্রদ্ধা হবে। তবু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তিনি বললেন, "যে কাজ বাধ্যতামূলক তার মধ্যে ত্যাগ বা নিষ্ঠার কথা উঠতেই পারে না। আমরা 'বৌ'-...

বিয়ে হয়েছে, সে তো কুমারী এবং স্বামী-স্মৃতি বলে কিছু নেই, তার জীবন কাটবে কি করে ?"

আমি চুপ করে রইলাম, মনে মনে ভাবলাম, সহরের কথা বলতে পারি না, গ্রামে দেখেছি পাড়া দিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার করতেই বিধবাদের দিন কেটে যায় আর অবসর সময় এমন তত্ত্ব আলোচনা করে যা অতি উদার লোকও ব্রহ্মচারিণীর আলোচনার অন্তর্গত হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করবেন।

এরা অপঘাত মৃত্যুকে অত্যন্ত অমঙ্গলের মনে করে। কারুর অপঘাত মৃত্যু হলে তার বাড়ীর সকলে সে বাড়ী-ঘর জিনিষ-পত্র ফেলে অন্য জায়গায় আলাদা করে বাড়ী-ঘর করে। এমন কি, আগের বাড়ীর জল বা গৃহপালিত জন্তুগুলিকে কেউ স্পর্শ করে না। যদি জন্তুরা অন্যের ক্ষতি করে তাও কেউ তাদের কিছু বলে না। শুধু তাই নয়, অমঙ্গলের ভয়ে মৃত বা মৃতার স্ত্রী বা স্বামীর আবার বিয়ে হয় না, এমন কি ছেলে-মেয়েকে পর্য্যন্ত কেউ বিয়ে করে না।

এদের মধ্যে জাত বা ছোঁয়াছুঁয়ি-বিচার নেই। গরীব ও বড়লোকের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। এরা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে খুব ভাল ভাবে নিয়েছে। অসুখ-বিসুখ হলে উদ্ভট চিকিৎসা বা বৈদ-চিকিৎসা না করে ডাক্তারের কাছে যায়। সহরে যাঁরা থাকেন তাঁদের অনেকেরই বাড়ীতে অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োজনীয় ওষুধ আছে, যে সব ওষুধের কথা আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই খবর রাখেন না।

আকাশ-প্রদীপ

আশা দেবী

কভু নিশীথ চাঁদের দেশে সন্ধ্যাতারা
ছিল একলা জেগে সে কি তন্দ্রাহারা
ম্লান শিরীষ-শাখে
একা পাখী সে ডাকে
"ফিরে এসো প্রিয় ঘরে দাও গো সাড়া।"

তবু পাইনের শিরে আসে স্বপ্ন ঘিরে
বন- মরালের দল আসিছে ফিরে
মোর দেউল-তলে
স্মৃতি- প্রদীপ জ্বলে
একা পাষাণ-দেবতা সেথা জাগিছে কি যে ?

কেন আমার জীবন ঘিরে নামিছে ছায়া,
যদি বা বাসর-নিশি রচে না মায়া।
আজ আমার নীড়ে
শুধু মরণ ফিরে
পরিহাস আনে বহি জীর্ণ কায়া।

যেন সে ছিল আমার প্রিয় কল্প লোকে,
তারি বেদনা ঝরি ধারা নামলো চোখে।
আজ গোধূলি-বেলায়
মোর মরণ-খেলায়
কেন যাত্রা চরণ বাণী হারালো সুখে।

আজ আমার ঝুরঝুরি মেঘ গগন-তলে,
মোর ব্যথার আকাশ-দীপ একেলা জ্বলে।
আজ আমার মনে
কোন নিভৃত কোণে
কবে হারানো স্মৃতির মণি আঁধারে জ্বলে।

প্রিয় জানি তুমি গেছ চ'লে নিশীথ-প্রান্তে,
আজিকার মধু-রাতি গিয়াছে সাথে।
শুধু আমার ঘরে
ব্যথা গুমরি মরে
শুধু আকাশ-প্রদীপ নেবে ঝঞ্ঝা-ঘাতে।

আধুনিকা বধূ ও শাশুড়ী

অমিয়া দেবী

খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, অল্প দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে "তরুণীর শোচনীয় আত্মহত্যা" শীর্ষক নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছিল—

"* * * * নভেম্বর * * * * গ্রামে জনৈক রেলকর্ম্মচারীর অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে চলন্ত ট্রেণের নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে. পারিবারিক কলহ এবং মতান্তর ইহার কারণ। গত শ্রাবণ মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছিল।"

উক্ত তরুণীর মাতা আমার প্রতিবেশিনী, মেয়েটি যখন ১২।১৩ বৎসরের বালিকা মাত্র, তখন হইতে তাহাকে আমি জানি। লেখা-পড়ায় তাহার যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। ছাত্রীরূপে এই সদাহাস্যময়ী চঞ্চলা বালিকা তাহার শিক্ষয়িত্রী এবং সহপাঠিনীগণের অতীব প্রিয় ছিল। তাহার চরিত্রে এমন কোন দোষ দেখি নাই, যাহার জন্য সে পরবর্ত্তী কালে শ্বশুরালয়ের বিরাগভাজন হইতে পারে। অতি শৈশব কালেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাত্র বৎসর কাল হইল ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সামান্য চাকরীতে ঢুকিয়াছে। গত শ্রাবণ মাসে বিধবা মাতা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। পাত্র দেখিতে ভাল, অল্প বয়স, উপার্জ্জনক্ষম, মোটের উপর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের উপযোগী। বিবাহ ভাল ঘরেই হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক মাস যাইতে না যাইতে শোনা গেল যে, সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ঈদৃশী ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নহে। আধুনিক সমাজে পাত্রদের যথেষ্ট বয়স হইয়া বিবাহ হয়, পাত্রীদেরও ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা জন্মে এবং শ্বশুর-শাশুড়ীগণও অপেক্ষাকৃত উদার মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, তথাপি বধূ এবং শ্বশুরালয়-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অ-বনিবনা একরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক হইলেও ইহা নিতান্ত তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের দেশে প্রায় শতকরা নব্বই জনের সংসার এই মনোমালিন্য হেতু বিষময় হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ কেন হইতেছে বা হয় ?

শ্বশুর-শাশুড়ী কিংবা শ্বশুরালয়-সম্পর্কিত আত্মীয়বর্গ যে পুত্রের বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বধূকে নির্য্যাতন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন এরূপ ধারণা অমূলক। প্রায়ই দেখা যায় যে, ছেলের বিবাহে পাত্রী [illegible]

কল্পনা করিয়া থাকেন। "বউমাকে এই গয়নাটি দিব, এই শাড়ী-খানি বউমার জন্ত রহিল, এই পালঙ্কটিতে আমার ছেলে-বউ শয়ন করিবে" ইত্যাদি নানা প্রকার মন্তব্য হইতে ভাবী বধূর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও মমতা সূচিত হয়। তথাপি বধূর আগমনের অব্যবহিত পরেই পারিবারিক অশান্তির সূচনা হয়। চিরদিনের সংস্কার হেতুই হউক কিংবা বয়সের দুর্ব্বলতার জন্ত হউক, শাশুড়ী বুঝিতে পারেন না যে বধূটিকে বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া তাহাকে আপন খেয়াল-খুসী অনুযায়ী খেলার পুতুল করিয়া রাখিলেই তাহার প্রতি সকল কর্ত্তব্যের শেষ হইয়া যায় না। বধূর নিজস্ব একটা সত্তা আছে। বিশেষ করিয়া আজ-কালকার বধূমাতাগণ অপেক্ষাকৃত বয়ঃ এবং শিক্ষাপ্রাপ্তা হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া থাকেন, স্বভাবতঃই তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রাচীনকালীন বধূদিগের অপেক্ষা স্পষ্টতর হইয়া থাকে। শ্বশ্রূমাতাগণ বধূ অবস্থায় যে পরিমাণ সঙ্কুচিতা ও লজ্জাশীলা থাকিতেন এবং ভাল-মন্দ বিচার না করিয়াই তাঁহারা যেরূপ একনিষ্ঠতার সহিত গুরুজনদিগের আদেশানুবর্ত্তিনী হইতেন আধুনিকা বধূদিগের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তাঁহাদের পৃথিবী ছিল স্বামি-পুত্র এবং তৎসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন লইয়া, তাঁহাদের পরিতুষ্ট করাই তৎকালীন বধূদিগের একমাত্র কাম্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সংসারের ক্ষুদ্র পরিসর গণ্ডীর বাহিরে যে তার কিছু থাকিতে পারে তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে বধূদিগের মনের ক্ষেত্র এবং কল্পনা সুদূর-প্রসারী, সুতরাং তাহাদের সুখ-দুঃখ, সন্তোষ-বিরক্তি প্রভৃতি অনুভূতি প্রাচীনাদের মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ণয় করিতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী। অতএব শ্বশ্রূমাতাগণের উচিত, বিগত দিনকে আঁকড়াইয়া না থাকিয়া, অধুনা পরিবর্ত্তিত যুগ-ধর্ম্মের সহিত নিজেদের মানাইয়া লওয়া। ইহাতে সংসারের শান্তি বাড়িবে ছাড়া কমিবে না।

বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ বধূই অল্প-বিস্তররূপে শিক্ষিতা। কিন্তু এই তথাকথিত শিক্ষিতাগণ পুংশিক্ষার আদর্শে পরিচালিত স্কুল-কলেজে যে প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা ভবিষ্যতে তাঁহাদের সুষ্ঠুরূপে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনের পক্ষে অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূল হইয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে, এই সকল তথা-কথিতা শিক্ষিতা মেয়েরা প্রায়ই অল্প-বিস্তররূপে বিলাসপ্রিয়া ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠেন। ফলে পরে তাঁহারা যখন বধূপদ-বাচ্যা হয়েন তখন সংসারে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সুগৃহিণীর যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক হয়, তাহা তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন না।

শকুন্তলা যখন মহর্ষি কণ্বের আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুষ্মন্ত-ভবনে রাজরাণী হইতে যাইতেছেন, তখন সেই জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচীন ঋষি তাঁহার পালিতা কন্যার মঙ্গলার্থ তাঁহাকে বলিতেছেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।"

অর্থাৎ—"হে শকুন্তলে, তুমি ভর্ত্তৃগৃহে গমনানন্তর গুরুজনদিগকে সেবা দ্বারা এবং সপত্নীদিগকে [illegible]

তুষ্ট রাখিবে। স্বামী যদি কখন তোমাকে ভর্ৎসনাও করেন তথাপি রোষপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিকূলচারিণী হইবে না। আশ্রিত পরিজন-দিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে, নিজের ভোগ-সুখের জন্ত কদাচ লালায়িতা হইবে না। এইরূপ যাহারা করিতে পারে তাহারাই পরে সুগৃহিণী হয়, ইহার অন্যথাকারিণীগণ *সকলের বিরাগভাজন* হইয়া থাকে।"

আজ-কালকার বধূগণ এই অনুশাসন-বাণীকে বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিবেন সন্দেহ নাই। সপত্নীগণের প্রতি যে প্রিয় আচরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অবশ্য বর্ত্তমান যুগে প্রযুজ্য নহে। কিন্তু কণ্ব মুনির অন্য উপদেশগুলি আংশিক ভাবে মানিয়া চলিলেও সংসারের তথা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কি দেখি? শ্বশুরালয়ে সর্ব্ববিষয়ে গুরুজনদিগের মতানুবর্ত্তিনী হইয়া চলা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের প্রতি বয়সোচিত সম্মানপ্রদর্শন বা তাঁহাদের সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করাই অনেক বধূ আজ-কাল দাসীজনোচিত মনোবৃত্তি বলিয়া ধরিয়া লন। সাংসারিক গৃহস্থালীর কর্ম্ম করা, সে ত আরও মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, ফলে অধিকাংশ সংসারের ভারই বেতনভোগী দাস-দাসীর উপর ন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্রিত পরিজনদিগকে মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট কে করিবে? বধূ ত নিজ খেয়াল-খুসীকে চরিতার্থ করাই বধূ-জীবনের চরম কাম্য বলিয়া মনে করেন। ফলে অচিরে সংসারে উভয় পক্ষের মধ্যে অ-বনিবনা ও অশান্তি দেখা যায়।

আর এক কথা, আধুনিকাদের মধ্যে যে কারণেই হউক, কল্পনা-বিলাসিতা এবং ভাবপ্রবণতা অতিরিক্ত মাত্রায় দেখা যায়। বিবাহের পর অনেক সময় তাহারা যখন নিজেদের কুমারী-জীবনে কল্পিত ভাবী বিবাহ-জীবন ও সত্যকার বিবাহিত জীবনের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পান না, তখন তাঁহাদের অবাধ্য ভাবপ্রবণতা কল্পনাকে খর্ব্ব করিয়া পারিপার্শ্বিক বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই সাময়িক উত্তেজনার মুখে বহু ক্ষেত্রে সামান্য কারণেই বধূদিগের মধ্যে আত্মহত্যা, গৃহত্যাগ প্রভৃতি উৎকট কাণ্ড ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য সকল ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতাকেই একমাত্র দায়ী করিলে ভুল হইবে। এই প্রবন্ধের প্রথমে আমরা কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর শ্বশ্রূমাতাগণের উল্লেখ করিয়াছি যাঁহারা বধূদিগের প্রতি কোনরূপ বৈরিভাব পোষণ না করিয়াও কেবল কালোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে বধূদিগের মনঃপীড়ার কারণ হয়েন। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর শাশুড়ী আছেন যাঁহারা মনে করেন, 'বধূ' নামক জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করা নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। তাঁহাদের মতে 'বউ-মানুষ' নামে মানুষ হইলেও মানুষের অধিকার পাইতে পারে না। বধূদিগের প্রতি তাঁহাদের নির্ম্মম অত্যাচারের মাত্রা সময়ে যখন সহন-সীমা অতিক্রম করে এবং তাঁহাদের মাতৃভক্ত সন্তানগণ যখন সেই ক্রোধাগ্নি হইতে অত্যাচারিতাদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হন না; তখন অসহায় অন্তঃপুরচারিণী-গণের পক্ষে মানসিক সমতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া ওঠে, ফলে বহু ক্ষেত্রে আত্মহত্যা, গৃহত্যাগ প্রভৃতি উদ্ভট কাণ্

অরণ্যানী

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

অরণ্যের ভয়ঙ্কর হিংস্রতার মাঝে—
শুনেছ কি দিবারাত্রি কি সঙ্গীত বাজে ?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মাটির বন্ধনে
কি বারতা কেঁদে মরে আকুল ক্রন্দনে
সঙ্গীহারা সঙ্গোপনে।
অর্দ্ধস্ফুট বাণী,
স্তব্ধ রাতে আন্দোলিয়া ওঠে অরণ্যানী।
কেহ কি শুনেছ সেই সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা ?
দেখেছ কি নিভৃত সে গোপন অর্চ্চনা ?
অর্দ্ধ রাতে স্বপ্ন-ভাঙা নিশ্চল প্রহরে।
আমি শুনি সেই গান
মর্মতলে কল্পনা লহরে।—
সুরে তালে অপূর্ব ঝঙ্কারে
সকরুণ আবেদন যেন কেঁদে মরে
নিশীথের রুদ্ধ কক্ষ দ্বারে।
নিস্তব্ধ পাষাণপুরী ঘুমে অচেতন
শুধু জাগে পৃথিবীর আদিম বেদন।
আদিম মানস তৃষা স্বপ্নিল কামনা
স্তব্ধ রাতে করে মোরে উদাসী আন্‌মনা।
আমি শুনি সেই গান,
চলমান পৃথিবীর তরঙ্গ-প্রবাহে।
আমি শুনি সেই সুর,
অগণিত মানবের গূঢ় অন্তর্দাহে।
প্রকৃতির সভাস্থলে মিলনের মাঙ্গলিক রবে।
হেমন্ত-সন্ধ্যায় স্ফুট মালঞ্চের মল্লিকা-উৎসবে।
বাসন্তী-পূর্ণিমা রাতে পাপিয়ার বিহ্বল সঙ্গীতে
মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা-প্রাতে গৃহপ্রান্তে নির্জ্জনে নিভৃতে।
শুনেছি সে উতরোল ক্ষুব্ধ মর্মোচ্ছ্বাস।
আমি কি আমারে দেব ? নিঃস্ব করি, রিক্ত করি,
মনে জাগে আশ।
আত্মার আত্মীয় মোর ওই অরণ্যানী,
ওর গান আমারই এ গুপ্ত মর্ম বাণী।

মালয়ে সাড়ে তিন বছর
জাপানী রাজত্ব

শ্রীমতী রেবারাণী ঘোষ

৮

সন্ধ্যা ৭টায় সকাল রান্না করে তাদের খেতে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, অল্পক্ষণ পরে ষ্টেশন-মাষ্টার আস্তে আস্তে আসছেন—খুবই শ্রান্ত। তাঁর ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে কাছে [illegible] দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন,—"মিষ্টার ঘোষের খবর পেয়েছেন ? বললাম, না,—তাঁর খবর সারা দিন পাওয়া যায়নি। তিনি বললেন, ভাববেন না, এক্ষুনি তিনি এসে পড়বেন, খুব চোট খেয়েছেন। সৌভাগ্য তিনি বেঁচে ফিরে আসছেন। ইতিমধ্যে দাদাও বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তাঁর সঙ্গেও ষ্টেশনমাষ্টার অনেকক্ষণ কথা কইলেন, তাঁরা নর্দমায় লুকিয়েছিলেন তাই জাপানীর হাত হতে বেঁচেছেন। গরম চা এনে দিলাম, তিনি খেয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই উনি এসে পৌঁছলেন। সমস্ত মুখ লাল বর্ণ, গায়ে কাদা, হাত-পা ছড়ে গেছে, হাঁটুতে রক্ত—খানিক কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি গেলাম জল গরম করতে। তার পর স্নান করে খেতে বসলেন। ঠিক হল কাল সকালে উনি যেয়ে কাজের সমস্ত চার্জ দিয়ে আসবেন। কালকের দিনটা যদি কোন রকম বোম্ না হয় ত ঈশ্বরের অনেক দয়া বলতে হবে।

সেদিনের রাতটাও ভাবনায় অনিদ্রায় কেটে গেল। ষ্টেটের বাঁশী বেজে উঠল, কুলীরা উঠে আবার তাদের কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। মেয়েরা ঐ আবছা অন্ধকারে উঠে রান্না করছে, খেয়ে-দেয়ে তারা কাজে যায়, মাঝে মাঝে তাদের গল্প ও রান্নার শব্দ শুনা যাচ্ছে।

পরদিন সকালে চা ও জল খাওয়ার পর সকলে মিলে সহরে গেলেন, আমিও উঠে সংসারের কাজে এলাম। ঘণ্টা-দুই পরে দাদা ফিরে এলেন, বললেন, আজ সহরে ভয়ানক ভীড়, অফিসেও খুব কাজ, সমস্ত রাস্তা আজ লরী ও বাসে পূর্ণ, সৈন্যরা আজ সিঙ্গাপুর চলে যাচ্ছে। সরকার তাহলে চললেন, একা আমাদের রেখে গেলেন, পিছন হতে জাপানী এলে কি হবে আমাদের অবস্থা ভগবানই জানেন। মালয়ের দেশ নামেই, কিন্তু চীনার সংখ্যাই বেশী, মালয়রা সবাই যে যার গ্রামে বাস করে। তাদের ভাবনা নাই। এর মধ্যে যদি কোন মনোমালিন্য হয় তবে তার বিচার কে করবে, ইত্যাদি এই সব আলোচনা সমস্ত দিন চলল।

সন্ধ্যার দিকে উনি ফিরে এলেন। আজ সমস্ত দিনটি [illegible] শব্দ শোনা যায়নি, তাই মনটা আজ একটু ভালই ছিল। মিলিটারীরা সব এখন থেকেই চলে যেতে আরম্ভ করেছে, জিনিষ-পত্র প্যাক্ করছে, গাড়ীতে বোঝাই করছে, আজ হয়ত সারা রাত ধরে গাড়ীগুলি যাবে। ওঁর আর কাজে যাবার দরকার নেই। কাল সকালের অবস্থা কি হবে তাই—আমাদের ভাবনা। সহরে আমাদের বাড়ীখানিতে সমস্ত জিনিষ-পত্রই ভরা আছে, প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া আর কিছু আনা হয়নি, ঘর-ভরা সাজান জিনিষ মাত্র চাবি দেওয়া আছে, যদি কেউ চুরি করে। বার বার আমার তা মনে পড়ছে, এখন সেখানে যাওয়ার হুকুম নাই, জানি না কি হবে। সকাল সকাল সেদিন খাওয়া দাওয়া সেরে শোওয়া গেল, ঘুম কারুরই হল না। লরী বাস অনবরত চলেছে, তার শব্দে কে আর ঘুমুবে, চিন্তাতেই সবার রাত কেটে গেছে।

১১ই জানুয়ারী সকাল বেলা যখন আমরা চায়ের টেবিলে এসে বসেছি, দাদা তখন বললেন, আজকের সকালবেলাটি কেমন মনে হচ্ছে ? আমি বললাম, আমার কিন্তু ভয় লাগছে। দাদা বললেন, রাত্রে ভয় হবে বেশী। মনে হচ্ছে একবার টাউনে গেলে মন্দ হয় না, দেখা যাক্ লোকেরা সব কি করছে। আমি একা থাকাটা মোটেই রাজী হলাম না, অগত্যা উনি পাহারাদার রইলেন, দাদা, [illegible]

রবারের বাগান ... চলছে ...
ছড়ান, তারই একটি রাস্তা ধরে এক জন চীনা রমণী ... ঝুড়িতে ডিম পুরে নিয়ে এদিকে এসে দাঁড়াল, আমাকে দেখেই হয়ত এলো। জিজ্ঞাসা করল "মেম্ তুলোর মাওকা" অর্থাৎ ডিম চাও কি? ভাষাটি মালয়, নারীটি চীনা, এদেশে মালয় ভাষাই চলিত ভাষা। বললাম, কত করে জোড়া তোমার ডিম্? সে জবাব দিল দশ পয়সা। বললাম, বাপ রে, পাঁচ দিন আগে তিন পয়সা জোড়া ছিল আজ দশ পয়সা হয়ে গেল কি করে? ব্যবসা আগে করনি বোধ হয়? সে বলিল, না, আগে আমি এই ষ্টেটের সাহেবের বাড়ী আয়া ছিলাম। তাঁরা কাল রাত্রে সব চলে গেছেন, তাই যত হাঁস-মুরগী ছিল আমি নিয়ে গেছি, আমার বাড়ীতে কিছু ডিম ছিল আজ তা বিক্রি করতে এসেছি, তবু ত কিছু উপায় হবে। আমার মাইনা ছিল ১২ ডলার, কাজ ছিল আরামের। তুমি যদি চাও তবে ঐ মাইনে দিলে আমি তোমার কাছে কাজ করতে পারি। বললাম, এখন থাক, দরকার হলে তোমাকে রাখব, যদি দরকার হয় ডাকব আসিস্; কিন্তু ঐ দামে ডিম কিনব না, এখনও এত খারাপ সময় আসেনি যে অত দাম বাড়াতে পারিস্। সে খুব হাসল, নাকি-স্বরে বলল, আচ্ছা। ইংরাজ ত এখান ছেড়ে চলে গেছে, তবে আমাদের ইচ্ছামত জিনিষ বিক্রি কোরব।—এই বলে সে বেণী দুলিয়ে খড়মের শব্দ করতে করতে চলে গেল। ভাবলাম, এই ক'ঘণ্টায় শাসন-কর্ত্তারা চলে যাওয়ায় চীনেরা এত বাড়িয়ে তুলল, আর দুদিন পরে হয়ত কি কোরবে বলা যায় না। মালয়রা থাকে গ্রামে, তাদের কাছে কিছু কিছু জিনিষ-পত্র শাক-পাতা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু গ্রামে যাওয়াও বিপদ্, দল বেঁধে যেতে হবে। দুধওয়ালা এসে দুধ দিয়ে গেল, আমার পুরান লোক ভূধর সিং পাঞ্জাবী, জিজ্ঞাসা করলাম, কা খবর ভূধর সিং? সে বললে, আওর কেয়া মাইজী, চীনা লোক ত চুরী করতে হে সব. লুঠতে জাতা হেয়, দুকান কা সব চিজ্ ওঁাকর সড়কমে ধরা থা, মালুম হোতা সব আগ দেগা ও-লোক। জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের বাড়ীর খবর কিছু জান কি? সে তা জানে না বলল। বললাম, বিকালের দিকে একবার যেও আর বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসো, খাবারের জিনিষও অনেক কিছু কেনা ছিল সেগুলোও দেখে এসো। সে বললে বিকাল নাগাদ সে যাবে। ইতিমধ্যে বড়বাবু বাসায় না থাকায় উনি ফিরে এলেন, সব বললাম সহরের ব্যাপার। উনিও ভূধর সিংহকে বললেন, যখন সহরে উৎপাত সুরু হয়েছে তখন বাড়ী-ঘর লুঠ ঠিক হবে, তার চেয়ে তোমার গরুর গাড়ীখানা নিয়ে চল সহরে যেয়ে বাসার কিছু কিছু জিনিষ ও চাল-ধানগুলো আনা যাক। সে তখন সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

৩

বেলা ১১টা নাগাদ আর এক ঘটনা দেখা গেল। ষ্টেটের কুলী লাইনে হঠাৎ এমন চেঁচামিচি সুরু হল, ব্যাপার কি? প্রত্যেক বাড়ী থেকেই লোকজন ছুটে দেখতে যাচ্ছে। মার-পিট আরম্ভ হল বড় বড় বাঁশ লাঠী কাটারী ইত্যাদি নিয়ে যে পাচ্ছে ছুটছে। একখানি ছোট ঘরের সামনে লোক জমেছে, শব্দ খুব, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানা যাচ্ছে না, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না, খেঁকিয়ে উঠে বলে, বাবু তোমাদের এসব ব্যাপারে দরকার নেই। দাদা ও অনন্ত দুয়ে দাঁড়িয়ে ...

... ছেলেটা ... বোবাও হয়েছে ... তিনি থাকলে কোন শব্দ পাওয়া যায় না ... এত সাহস কিসে পেল কে জানে।

ব্যাপারটা জানবার জন্য আমার বেশ ... বৈকালবেলা যখন বড়বাবু এলেন তখন শুনি বোবা ... হয়েছিল। এদের জাতের মধ্যে প্রথা আছে যে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে বরপক্ষ টাকা দেবে, কন্যার পিতার তাহা লাভ। সেই অনুযায়ী বরেরা টাকা দিয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই, ৫০ ডলার দিয়াছে বার বছর ধরে, এখনও ৫০ ডলার বাকী আছে, ১০০ ডলার দিতে হবে। এই কথাতেই বিয়ে হয়েছিল মেয়েটির। তার দুটি ছেলে, বুড়ো সর্দার হল তার বাপ অর্থাৎ আজ সুযোগ পেয়ে মেয়ের বাপ টাকা চায়, সে প্রতিবারের মত জবাব দেয়, দেব'খন। এতেই সে রেগে গেছে, বলে এত দিন চুপ করে ছিলাম বার বছর ধরে পঞ্চাশ ডলার শোধ হয়নি, আজ সব শোধ না করলে মরণ। এইরূপ বচসায় ঝগড়া হতে মারামারি লাঠালাঠিতে দাঁড়ায়, পরে ঘর ভেঙ্গে জামাই ও তার দাদাকে ধরে বেঁধে মেরে অস্থির করে তোলে। মেয়েটি সহ্য করতে না পেরে তার গহনা কাপড় সব বাপকে দিয়ে ষ্টেট্ ছোড়ে বার বছরের সুখ-দুঃখ-জড়িত আশ্রয় ত্যাগ করে তারা কোথায় চলে গেছে। সেটিও তার বাপের হুকুম, জামায়ের চাকরি সেই করে দিয়েছিল ১৮ ডলার মাইনাতে। শুনে আমার খুবই কষ্ট হলো।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা বসে গল্প করছি—দেশের সাথে সম্পর্ক আমাদের বন্ধ হয়ে গেল, কবে যুদ্ধ থামবে, পরিণাম কি হবে ইত্যাদি নানা রকম আলোচনা চলেছে। এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড কামানের গোলার শব্দে মাটি কেঁপে উঠল, বাড়ীর দেওয়াল দরজা দুম দুম করে উঠল, কি হল, ভয়ে আমরা উঠে দাঁড়ালাম, একে রাত্রি তায় এই শব্দ, ক্রমে অনবরত আরম্ভ হল, আন্দাজে বোঝা গেল সিঙ্গাপুরের নিকটেই কোন জায়গায় হয়ত যুদ্ধ খুব আরম্ভ হয়েছে, জীবনে এই প্রথম কামানের শব্দ এত নিকটে শুনলাম, বুকের মধ্যে গুর গুর করে উঠছে, ভয়ে আমরা সারা হয়ে গেছি, ঈশ্বর ছাড়া উপায় নেই—হে ভগবান রক্ষা কর।

আমরা সেই রাত্রে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুমের সঙ্গে আজ চার দিন সম্পর্ক নাই, বাতি আজ রাত্রে আর জ্বালা হবে না, কেন না, সরকার মানা করে গিছলেন। রাত বারটার সময় হঠাৎ প্লেনের শব্দ পাওয়া গেল, ভয়ে আমার কাঁপুনি সুরু হয়ে গেছে। মনে হল, অন্ততঃ এক শত প্লেন হবে। আজকের প্রভাত থেকে রাত পর্য্যন্ত কি ভাবে যে কাটল, বলাই যায় না। ঘরে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়, সেই অন্ধকারে ছেলেদের টেনে নিয়ে সবাই আবার সেই গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখে কিছুই দেখা যায় না, তায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সাপ ব্যাঙ কিছুরই ভয় তখন নাই, শীতে শরীর কেঁপে উঠছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা ঐ ভাবে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তার পর প্লেনগুলি যখন চলে গেল শব্দও মিলিয়ে গেল, তখন আবার সবাই ঘরে এসে ঢুকলাম। কিন্তু সে রাত্রে শোওয়া আর হল না, বসে বসেই সারা রাত কেটে গেল। ভোরের দিকে সকলেই ঘুমিয়েছিলাম, ভূধর সিংএর পরিত্রাহি চিৎকারে ঘুম ভেঙে ...

তোমার চাকর কোথা গেল? বল্লাম, সবাই কদিন ঘুমায়নি তাই হয়ত ঘুমচ্ছে। ভূধর সিং বললে, সকালে সহরে সে গিছল আমাদের বাসায়, চোর-ডাকাতে ভর্ত্তি হয়ে আছে, অনেক জিনিষ তারা টেনে বাইরেও ফেলেছে, বাবুকে বল শীঘ্র গিয়ে দেখতে, না হলে তোমার কিছুই থাকবে না, লোকগুলো চুরি করে যায়, মানা করলে জবাব দেয় না, খালি কট্‌ কট্‌ করে তাকিয়ে দেখে। কাল দাদা ও অনন্ত গিছল কিন্তু মাঝ পথে কতকগুলি চীনা ভয়ানক ঝগড়া করছিল, হাতে বড় বড় ছুরি ছিল, তাইতে তাঁদের ভয় হয়, সোজা বাড়ী চলে এসেছিলেন। কিন্তু আজ সবাই মিলে যাবার জন্ত মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চা জলখাবার খেয়ে ভূধর সিংকে গাড়ী নিয়ে আমাদের বাসায় যেতে বলে এরা সবাই সহরের দিকে বেরুল। আমি বলে দিলাম, চাল, ধান ও আমার পিয়ানোটা নিশ্চয় যেমন করে হোক আনা চাই। আমাদের ভূধর সিং তবু পাঞ্জাবী, চীনা ডাকাত থাকলেও তত ভয়ের কিছু নাই, পাঞ্জাবীকে তারা বেশ ভয় খায় সেটা আমাদের খুবই পরীক্ষিত, সেই জন্ত মনটা অন্ততঃ নিশ্চিন্ত রইল। আশে-পাশের বউ-ঝিরা একটু পরে এসে জুটল, রান্না-বান্নার সঙ্গে বেশ গল্পও চলল।

১০

বেলা একটা নাগাদ সব ফিরে এল। সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে, রৌদ্রে তিন জনাই খুব ক্লান্ত, তাড়াতাড়ি খাবারের বন্দোবস্ত করলাম, স্নান সেরে সবাই খেতে বসলেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি দাদা, গাড়ী কোথা? দাদা বললেন, গাড়ী পথে থেমেছে, ভূধর বৈকালে আসবে, গাড়ীতে মাল আছে খেয়ে-দেয়ে তবে ত লোকে আসবে। অনন্ত বলল বৌদি, একটা কথা বলব, কাঁদবেন না ত? কান্না ও ভয় আমার এখন সহজেই আসে বলে তার কথায় লজ্জা পেলাম, বললাম, বল শুনি, লুঠ ত হয়েছে, কিছুই নেই বুঝি? দাদা বললেন, বাড়ী শাফ্‌ পরিষ্কার হয়ে গেছে, চাল ও ধানগুলি অতি কষ্টে খুঁজে পেয়েছি, বড় রাস্তার উপর এক জায়গায় কে রেখে গেছে, নিয়ে যাবার সামর্থ্যে কুলায়নি, গাড়ীতে তাড়াতাড়ি তুলে দিয়েছি। খাট-বিছানা আলমারীপূর্ণ ধোওয়া কাপড় জামা নানা রকম ঘর-সাজান জিনিষপত্র কিছুই নাই। দাদা থামলেন, অনন্ত আবার বলল, আপনার আদরের হাঁস-মুরগীদের মাথা, ঠ্যাং ও পালক রান্নাঘরে তাদের চিহ্নস্বরূপ পড়ে রয়েছে। তাই না কি? মাগো —খাওয়ার আর ইচ্ছা হল না। আমার সখের জিনিষ সবই চলে গেছে, লুঠ করে তারা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? এক দিন বুঝবে।

মনে মনে চোরেদের খুবই অভিসম্পাত দিলাম, তোরা মরবি— তোদের হয়ে এসেছে। কি আর কোরব, ঘর-সাজান জিনিষপত্র, পোষা জানোয়ার—এ সব হারালে কার না কান্না পায়? বললাম, সবই ভগবানের ইচ্ছা, তাঁর দেওয়া তিনিই নিয়েছেন আমাদের হাত নেই। আমার হাতের তৈরী ছবিগুলিকে ভেঙ্গে কুচি-কুচি করেছে, শাড়ী ছিল, সেগুলি কি কোরবে ভেবে না পেয়ে লম্বা ভাবে ছিঁড়ে চারি দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, প্লেট বাসন সমস্ত ভেঙ্গে ছড়িয়ে রেখেছে, ওষুধ-পত্র সব ঘরে ছড়িয়ে অদ্ভুত গন্ধ করে রেখেছে, বোতল ভাঙ্গার কুচিতে বাড়ীতে পা দেওয়ার উপায় নাই, এক সেল্‌ফ ভাল বই ছিল, সেগুলি সব পুড়িয়ে ছাই করে রেখেছে! অত্যাচার যথেষ্ট করছে।

দিদি বললেন, শুধু আমাদের বাড়ী নয় অন্ত সবার বাড়ীরই ঐ অবস্থা দেখলাম। অনবরত লোক ঢুকছে ও বেরুচ্ছে যেন হাট বসেছে, যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষপত্র শেষ হয় ততক্ষণ এই ভাবে লুঠ চলবে দেখে যা মনে হল। সহরে দুখানা বড় বড় দোকানে আগুন ধরিয়েছে, এভাবে লুঠ কেউ কখনও দেখেনি, নষ্টই বেশী—ভাঙ্গা ছেঁড়া ও পোড়ান। কাপড়-চোপড় যথেষ্টই লোকে ভারে-ভারে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ত জাতের সংখ্যাও আছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না কাচের কুচিতে ভর্ত্তি হয়ে আছে। লোকের গরু-ছাগলও চুরি গেছে, গরীবরাই ত চোর, তবে ডাকাত চীনারাই—তাদের চেহারা ও পোষাকে প্রমাণ পাওয়া যায়। কামানের বা বোমের ভয় কোনটাই তাদের নেই, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন দিন ত আর পাওয়া যাবে না। অন্ত জাতের সাহস ও সামর্থ্য একটু কম, ভয়টা তাদের আছে, কিন্তু ডাকাত যখন দলে দলে ঘুরছে তখন তাদের ত ভয় হবেই।

এরা যখন সবাই ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, তখন দেখে—আমাদের বাইরের ঘরখানায় অন্ততঃ ত্রিশ জন লোক আছে; বড় বড় প্যাকিং বাক্সগুলি খুলে তা হতে জিনিষ-পত্র চারি দিকে ছড়িয়ে বসে বসে ভারি গলায় গল্প করছে। পোষাকগুলো তাদের একটু অদ্ভুত, কাল রংএর লম্বা প্যাণ্ট, ঝলঝলে ঐ রঙের জামা, বুকটা খোলা আছে, মাথায় ময়লা ছেঁড়া হেলটে টুপী চোখ পর্য্যন্ত টেনে ঢাকা। এদের দেখতে পেয়ে হঠাৎ সবাই চুপ-চাপ হয়ে গেল, কারুরই মুখে কথা নেই। অনন্ত না কি সাহস করে একজনকে জিজ্ঞাসা করতে গিছল যে, এভাবে জিনিষ-পত্র লুঠ করছ কেন? এটা যে আমাদের বাড়ী তা কি জান না? তাদের মধ্যে এক জন জবাব দিয়েছিল যে, এটা কারুর দেশ নয় এখন আমাদের—সব-কিছুই আমাদের। তার উপর আর কিছু বলা উচিত নয়, অবস্থা বড়ই খারাপ। সবই শুনলাম, ভয়ে সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, তাদের মধ্যে যারা এই সব কাণ্ড করছে তারা সবাই প্রায় পরিচিত—রিক্সাওয়ালা, শাক-ওয়ালা, ধোপা ইত্যাদি, কিন্তু এই সময়ের ফেরে ভয়ঙ্কর হয়েছে আর কি। এখন এদের হাতে যদি আমাদের শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ বাঁচে তবেই ভগবান রক্ষা করলেন, না হলে কি হবে এখনও বলা যায় না।

১১

মাইজী, আপকা সব সামান আ গিয়া দেখিয়ে,—ভূধর সিং গাড়ী করে জিনিষগুলি এনে পৌছল ও ডাকল। বাইরে এলাম আমার জিনিষগুলি নামিয়ে দিয়ে সে, বললে, দেখ মাইজি, রাস্তার দুধারে অনেক থান থান ভাল কাপড় ও জুতা নানা রকমের কুড়িয়ে পেয়েছি, ডাকাতরা নিয়ে যেতে না পেরে ফেলে দিয়ে গেছে. কিছু কিছু আমি এনেছি,—যা পারবো পোরব, যা থাকবে দোকান কোরব, বিক্রি কোরব। যাক, গরীব মানুষ কিছু বললাম না, মনে মনে ভাবলাম কাজ কি এ সবে।

সন্ধ্যা নাগাদ উনি রেডিয়ো খুললেন। ক'দিন পেপার পাওয়া যায়নি রেডিয়োও শোনা হয়নি। যুদ্ধের খবর ত জানা চাই তাই আজ সবাই মিলে ব্যাটারী চার্জ দিয়ে রেডিও চালানর বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। সকাল সকাল আজ খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতেই হবে রেডিয়ো শুনতে অনেক ভদ্রলোক আসবেন, ভদ্রলোকদের বসবার জন্ত ঘরখানি পরিষ্কার করে বড় বড় মাদুর পেতে রাখলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, একটি একটি করে লোক এসে জুটলেন, খাওয়া

দাওয়া সেরে আমরা রেডিয়ো শুনতে বসলাম। বড়বাবু এলেন ও তাঁর এক আত্মীয় সঙ্গে এলেন, তিনি "বাহ" বলে একটি জায়গায় চাকরি করেন, এখান হতে ৬০ মাইল হবে! তিনি বললেন, পায়ে হেঁটে তিন দিন ধরে আসছেন—সাইকেল চড়তে জানেন না, তাই পথে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আরো ২০ মাইল তাঁকে যেতে হবে, তবে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছবেন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে সেখানে আছে। রেল বন্ধ হয়ে গেছে গাড়ী-বাস নাই তাই তিনি কষ্ট সহ্য করে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছেন। পথে এই ষ্টেট পড়ায় দুদিন বিশ্রাম নিলেন। তিনি পথে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারই দেখেছেন। বললেন,—জাপানীর বোমে ও মেসিনগানে অনেকেই মারা গেছে, রাস্তায় সব পড়ে আছে, সৎকারের লোক নাই।

রাস্তা ধরে তিনি একা হেঁটে আসছেন, বুনো মোষ একটা তাঁকে তাড়া করেছিল, তিনি অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করেছিলেন, ভাঙ্গা লরীর তলায় এক রাত্রি কাটিয়েছিলেন। তার কাছে গল্প শুনতে আমরা খুবই ভয় পাচ্ছিলাম। আবার তিনি দু'দিন পরে "কারাকে" যাবেন। শুনেছি ও-দিকে রাস্তায় বাঘ, ভাল্লুক, হাতী ও বুনো মানুষের দর্শন পাওয়া যায়। কি করে তিনি এত সাহস নিয়ে একা যাচ্ছেন জানি না, ডাকাতের ভয় ত তার চেয়েও কম নয়। ঈশ্বর তাঁকে ভালোয় ভালোয় তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কাছে পৌঁছে দিন এই আমাদের প্রার্থনা।

"সাকাই" নামে এদেশে এক বুনো লোক (মালয়) বাস করে, গভীর ও খুব উঁচু পাহাড়ে তাদের অধিবাস, জঙ্গলের লতা-পাতা পরে ও নানাবিধ জীব-জন্তু পুড়িয়ে খায়, বড় বড় গাছের উপর মাচার মত ঘর বেঁধে তারা বাস করে। পথে যদি কখনও আসে তবে গাড়ী, মানুষ দেখলে কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু তাদের আশ্রয়ে যদি কেউ যায় তবে বাঁচার আশা থাকে না। সেই জন্য ইংরেজ সরকার অনেক সময় লোক পাঠিয়ে, নিজেরাও কখন কখন গিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন, ভাল দেখে তামাক, কাপড় ও নানা রকম ওষুধ তাদের দিতেন এবং তাদের সভ্যতা শিক্ষার জন্য উপদেশ দিতেন। আমরা কিছু কিছু সাকাই দেখেছি। সাকাই বললে ছোট শিশুরা ভয় খায়, বড় মানুষরাও শিউরে উঠে। ঘড়িতে ন'টা বাজল, উনি এবার রেডিয়ো খুললেন। সিঙ্গাপুরে তখন সাইরেন্ বাজছে, লোককে সেলটারে যাবার জন্য ও সাবধান করবার জন্য। একটু পরে কি ভীষণ বম্ পড়ার শব্দ—বুঝি রেডিয়ো ফেটে যায়। এইরূপ শব্দ বেতারের মধ্যে আমরা কখনও শুনি নাই।

ছোট ছেলেদের চিৎকার, নারীদের কান্নার সুর স্পষ্ট ভেসে আসছে, কোথায় হুড়-মুড় করে কি যেন ভেঙ্গে পড়ল, আমরা কাঠ হয়ে বসে সব শুনছি, কারুরই মুখে কথা নেই! অনেকক্ষণ বাদে যিনি সংবাদ জানান তিনি বললেন, বুকিট্ টিমায় এখন কামানের দাগা পড়ছে, আহত লোক হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। জাপানীর ধ্বংস-লীলার পরিচয় আরো অনেক শুনা গেল, মাঝে মাঝে লোকদের মধ্যে একটি করে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে হুড়-মুড় করে আমাদের ঘরেস্বামী ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল,—বাবু ডাকাত!

ডাকাত! সবাই উঠে দাঁড়াল, রেডিয়ো বন্ধ হল, আমি ছেলেদের নিয়ে দরজার পাশে সরে দাঁড়ালাম, তখন আমার অবস্থা কি রকম হচ্ছিল মনে নাই। সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন; পুরুষ মানুষ সব শুদ্ধ ১১০ জন হবে তাই যা একটু রক্ষা! এগিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে ওরা সবাই দাঁড়ালেন, দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে আমিও একটু দেখবার চেষ্টা করলাম। যতটুকু দেখতে পেলাম, তাতেই আমার প্রাণ কেঁপে উঠল। আন্দাজ ৩০।৩৫ জন চীনা ডাকাত, হাতে তীক্ষ্ণ ছুরি, পা লম্বা প্যাণ্ট, গায়ে জামা কিন্তু বুক খোলা, এবং ময়লা ছেঁড়া হেলমেট চোখ পর্য্যন্ত টেনে ঢাকা—সহজে চেনার উপায় নাই। বড়বাবু আন্দাজে যা যা বললেন, যে এদের ভেতরের লোকগুলি ষ্টেটের কনট্রাক্টারের কুলী বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের হাতেই মাইনা খায় অথচ আমাদের ঘাড় মটকাতে এদিকে এই অদ্ভুত বেশে আসছে কেন? ঠক ঠক করে বোধ হয় সবাই কাঁপছে, আমি দু হাত জুড়ে ঠাকুরকে ডাকছি,—এ কি বিপদে ফেললে ঠাকুর, তুমিই রক্ষা কর। এদের সাথে ত লড়াই করা যাবে না, এক সাথে তারা সোজা রাস্তা ধরে আমাদের বাসার দিকেই এগিয়ে আসছে, হাতে লাল মশাল হাউ হাউ করে জ্বলছে, কোমরে ছুরি চক্ চক্ করে উঠছে, চাপা গম্ভীর-গলায় কথা বলছে, হাঁটার শব্দে পায়ের তলায় শুকনা পাতা মড় মড় শব্দ করে উঠছে। আমাদের আসন্ন বিপদ ভেবে আমরা শিউরে উঠলাম।

আদর

শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

শোন রে খোকন শোন্
তুই যে মোদের কাজ-ভুলানো বুক-জুড়ানো ধন।
জাগরণে ঘুমের মাঝে
তোর সে চলার ছন্দ বাজে
তোর হাসিতে স্বরগ নামে ভুলায় পরাণ-মন।
ঘুমের মাঝে কান্না-হাসি জাগে ঠোঁটের কোণে
স্বপন মাঝে অতীত স্মৃতি জাগে কি তোর মনে?
কান্না-হাসির মালা গেঁথে
বসলি কোলে আসন পেতে
তোরাই যে রে এই ধরাতে পারিজাতের বন।

যন্ত্রযুগ

শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী

জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতে নানা জাতীয় যান্ত্রিক আবিষ্কারের আজকাল জয়-জয়কার। যন্ত্রযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা বিজলী ধরিয়া বহু বড় বড় কার্য্য সাধিত হইতেছে। যন্ত্র সাহায্যে বায়ু, বহ্নি, জল ও জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সংগৃহীত ও পুঞ্জীভূত করিয়া প্রভূত পরিমাণে বিভিন্ন ধরণের প্রধান প্রধান ব্যাপার সমাধা করা হইয়া থাকে। সেই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ প্রক্রিয়া লোকচক্ষুর নিত্য প্রত্যক্ষীভূত, অতএব প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেকে এই সকল ক্রিয়া-কৌশলকে দৈবশক্তি বলিয়া ধরিয়া লইতেন, তাঁহাদের মতে ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির কণশঃ প্রস্ফুরণ। প্রাচীন পন্থিগণের বিশ্বাস—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বহ্নি ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতা বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থ পরম্পরায় প্রভু। এই বিশ্বাসের মূলে আছে শিল্পকলাদি সর্ব্ববিদ্যার আধারভূত বেদাদি শাস্ত্র। শাস্ত্রে জাগতিক যাবতীয় বস্তুরই এক একটি অধি-দেবতা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যুতের অধিদেবতা ইন্দ্র, জ্যোৎস্নার চন্দ্র, প্রাণের বায়ু, তাপের বহ্নি এবং জলের বরুণ। এই বিশ্বাসেই প্রবীণেরা জড়েও চিৎসত্তা অনুভব করিতেন; আর সেই অনুভূতির প্রভাবে ভগবানের বিরাট ভাব সহজে সর্ব্বত্র ধারণায় আনিতে সমর্থ হইতেন। জড় বিজ্ঞানের সহিত চিৎ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুচারু হয় না, কাজেই ক্ষান্ত থাকাই ভাল; তথাপি তথাবিধ অধিদেবতার কারণ কয়েকটি সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র বজ্র—যাহার সাহায্যে তিনি ত্রিলোকজয়ী এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে সৃষ্টি রক্ষার সহায়ক। সেই বজ্রের এক অমোঘ অংশ বিদ্যুৎ। অমৃতকিরণ চন্দ্রের এক কমনীয় শৈত্য শক্তি জ্যোৎস্না, এই জ্যোৎস্নারূপ অমৃতে ওষধিসমূহ সিক্ত হওয়ায় জীব জাতির রক্ষার জন্য শস্যাদি সমুৎপন্ন হয়। এইরূপ জগৎ-প্রাণ বায়ুর প্রবহমান বেগ জীবের জীবন দান করে। বহ্নির উত্তাপ সাধারণ অগ্নিনামে অখিললোকের বহির্ব্যাপারে খাদ্য নির্ম্মাণে রন্ধনাদি কার্য্য ও আন্তর ব্যাপারে 'বৈশ্বানর' নামে বিশ্ববাসীর ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া তাহাদের রক্ষাবিধান করিয়া থাকে। আর জলাধিপতি বরুণের আর বিশেষ বক্তব্য কি থাকিতে পারে? বরুণের জল যাহা প্রাণিমাত্রের প্রয়োজন—জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য অবলম্বন। অধিক কি, এই ইন্দ্রাদি দেবগণ ত্রিলোকের পালনকর্ত্তা। সুতরাং ইঁহাদের শক্তিসমূহের দৈবভাব স্বীকার অস্বাভাবিক নহে।

এই ভাব নবীনদিগের হৃদয় অধিকারে অসমর্থ। তাঁহাদের ধারণা ইহা স্বভাব-সঞ্জাত গতানুগতিক ব্যাপার। তবে একথা একেবারে অসত্য নহে যে, আধুনিক জড়বিজ্ঞান জাত বিমান-বোমাদি আজ যে বিশ্বের সমক্ষে বিস্ময় আনয়ন করিয়াছে, ইহার আকর সেই আদিভূত অধিদেবতা ইন্দ্র ও তৎপ্রভৃতি শক্তি। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুকরণেও হিন্দুবিজ্ঞানের [illegible] অনুরূপ বজ্র বিমানের বা এরোপ্লান ও অটম্ বোমের আবিক্রিয়া। সত্য বা বিশ্বাসের দিক্ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত এবিষয়ে চিন্তা করিলে কিছু না কিছু রহস্য অবশ্যই পাওয়া যাইবে। আর পাওয়া যাইবে প্রাচীন তন্ত্রের একটি খাঁটি কথা। তাঁহারা বলেন—হিন্দুর আদিগুরু ব্রহ্মার বেদ, বাল্মীকির রামায়ণ এবং বেদ ব্যাসের পুরাণে আধুনিক আবিষ্কারের মূল কিছু না কিছু আছেই।
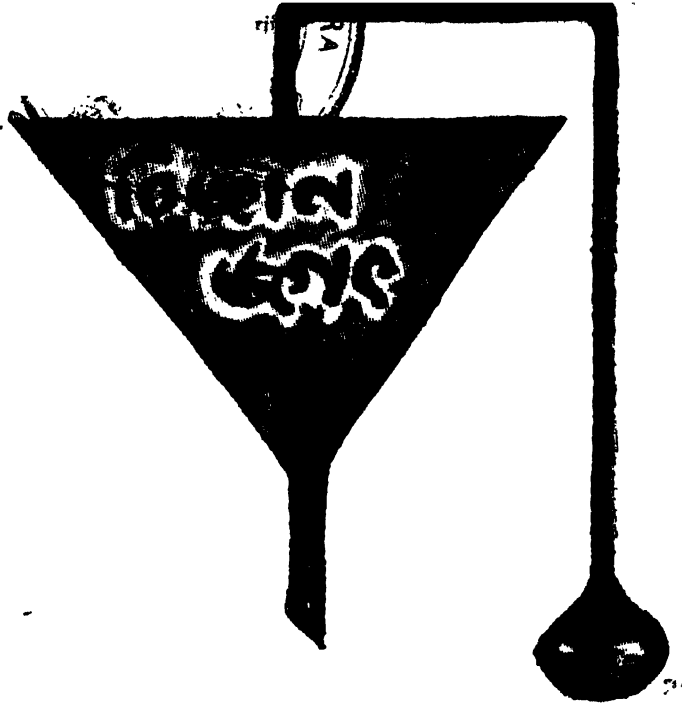
যে সকল শৌর্য্য-বীর্য্যে বরণ্য বীর সমুদ্রের দিকে রাজ্য করিতেন, জলপথে সহজ সম্ভাবিত সর্ব্বদিক্ হইতে শত্রুর তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তাঁহাদের তথাবিধ অমোঘ মারণাস্ত্র অবশ্য অবলম্বনীয় ছিল। ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মর্ত্ত্যের ইন্দ্রজিৎ এই আশুবিনাশক বিমান ও বোমাস্ত্র আয়ত্ত করেন। কিন্তু এই অস্ত্র যে অন্ততঃ বীরজন সমাজে সমাদৃত হইত না, কুরুক্ষেত্রের সমর ক্ষেত্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। সেই যুদ্ধে ঘটোৎকচাদি নিশাচরেরা যোগ দিলে এক দিবস যুদ্ধে সৌভ বিমান ব্যবহার করে; কিন্তু ইহা বীর-জনোচিত নহে বলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যাহা সার্ব্বভৌমিক অশুভাবহ—যাহা আজ জাপানের নিরপরাধ নরনারী সহ বহু সহর সংহার করিয়াছে, তাহার অবাধ ব্যবহার কোন সভ্য জাতির অনুমোদিত হইতেই পারে না। ফলে আধুনিক আণবিক বোমা ব্যবহারে দেশে বিদেশে বিরোধিতা উপস্থিত।

এই প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য জীবন ধারণের উপযোগী যন্ত্র ও আবহাওয়ার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযোগ। প্রসঙ্গতঃ বিজ্ঞান প্রসূত বিস্ময়কর শস্ত্রাদির যোগবার্ত্তা কিছু কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইল। বোমা বিমানের বড় বড় কথা তুলিয়া বৈজ্ঞানিক বিড়ম্বনায় আবশ্যক নাই, যে যন্ত্রের সহিত জীবন মরণের সম্বন্ধ, তাহারই দুই চারিটার আলোচনা করা যাউক।

আজকাল মানুষ মাত্রই অর্থের অত্যন্ত সেবক, সেই অর্থের সাধনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যেমন হয়, অন্য পথে তেমন হয় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ লোক ব্যবহারের উপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্র স্ব স্ব মনীষা অনুসারে আবিষ্কার করিয়া লোক সমাজের আপাততঃ উপকার করিয়াছেন এবং অর্থাগমেরও নানারূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

সমাজে প্রথম সর্ব্বাধিক প্রয়োজন খাদ্য দ্রব্যের; তন্মধ্যে ধান চাউল, কড়াই ডাইল ও গম আটাই আবশ্যক বেশী। প্রাচীনকালে ধান হইতে চাউল, কড়াই হইতে ডাল এবং গম হইতে আটা তৈয়ারীর যন্ত্র ছিল ঢেঁকি ও জাঁতা। এখন সে স্থলে হইয়াছে চাউল-ডাইল-কোটা ও গম ভাঙ্গান কল। এই সকল কলের আবিষ্কার সম্বন্ধে যুক্তি দেখান হয়—লোক সংখ্যা এতই বাড়িয়াছে যে, চাউল প্রভৃতি কলে কোটা না হইলে চাহিদা মেটে না। এ কথার অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায় না। ইহা প্রায়ই দেখা যায়—বড় বড় কলে অনেক কুলি লাগাইয়া অধিক মজুরীতে কাজ করাইয়া মালিকরা এত মাল মজুৎ করেন যে মাসের মধ্যে তাঁহাদিগকে দুই এক সপ্তাহ কল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইতে হয়। তখন কুলীরা কাজ না পাইয়া কষ্ট পায়। যখন ঢেঁকী ও জাঁতায় চাউল ডাল আটা প্রস্তুত হইত তখন চাউল ডাইলের অভাবে কেহ না খাইয়া রহিয়াছে বা মরিয়াছে, এমন কথা শুনা যাইত না। অবশ্য ধান্য গম প্রভৃতি মূল জিনিষের অভাবে যে দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

সেকালের গৃহস্থের গৃহের সংলগ্ন একখানি ঢেঁকি ঘর ও এক একটা করিয়া ঢেঁকি থাকিত। গৃহস্থেরা নিজের আহারের জন্য চাউল ডাইল ত প্রস্তুত করিতই, উহার এক বিশেষ অংশ বিক্রয় করিয়া বয়-বেসাতি নির্ব্বাহও করিত, এই সমস্ত বস্তু তাহারা অবিশ্রান্ত ভাবে প্রস্তুত করিয়া যাইত। অতএব অভাব হইত না। তার পর আমদানী আসিল চাউল কোটা কলের। এত দ্রুত চাউল প্রস্তুত ও মজুত হইতে লাগিল যে, কল প্রায় বন্ধ রাখিতে হইত, আর সেই জনমজুরের কষ্ট। এইরূপ কলের প্রথম আবিষ্কার হইল খুব স্থূলভাবে—কতক মজুর কলের মুখে ধান গুঁজিয়া দিত; কেহ কেহ বেগে ঘুরাইত। তার পর আরও সূক্ষ্ম হইল ইহার সহিত ইলেক্‌ট্রিক যোগ। মজুরের প্রয়োজন কমিয়া গেল, হু-হু তৈয়ারী জিনিষ বাড়িয়া চলিল। যে সব বড় বড় গঞ্জে দুই চারিটা বা ততো'ধিক কল বসিয়া ছিল, প্রায় গেল বন্ধ হইয়া; দুই চারিটা সাহেব কোম্পানীর কল আজও অচল ও অটল। বলা বাহুল্য—ডাইল কোটা ও গম ভাঙ্গাও একই দলে মিলিত হইল। এই কলের চাউল ও ডাইল খাইয়া দেশে দেখা দিল বেরিবেরি। খাদ্য শস্যের গাত্রে তুষের অব্যবহিত নীচে যে এক প্রকার পর্দ্দার মত পদার্থ থাকে তাহা স্বকসার বা ভাইটামিন। এই স্বকসার মানুষের খাদ্য দ্রব্যের পরিপাচক, রস রক্তের বর্দ্ধক ও ওজধাতুর পোষক। কিন্তু কলে এমনই ভাবে উহা কাটিয়া তুলে যে, তাহার চিহ্নমাত্র থাকে না।

এদেশের প্রধান খাদ্য ডাইল ভাত, আজ কাল যুদ্ধের ডাওতায় পড়িয়া দেশের লোক আটা রুটিতে অভ্যস্ত। চাউলের পূর্ব্বোক্ত পরিণাম অনেকেই অনেক পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু ডাইলের দুর্দশার বিষয় চিন্তাও করেন নাই। ঢেঁকিতে কোটায় বা জাঁতায় পেষায় স্বকসার নষ্ট হয় না। কারণ উহার পেষণ হয় আস্তে আস্তে কাষ্ঠে ও পাষাণে; আর কলে হয় লোহায় ও অত্যন্ত দ্রুতবেগে। অবিরাম লোহায় দ্রুত ঘর্ষণে শস্যের স্বকসার বা মাধুর্য্য একেবারেই থাকে না। মানুষ খায় ছিবড়া। এইরূপ খাদ্যে বেরিবেরি ছাড়া আরও অনেক অনিষ্ট মানুষের নিত্য হইয়া থাকে। আজ কাল মস্তিষ্কের বিপর্য্যয় ও রক্তহীনতা জনে জনে প্রত্যক্ষ। যা শেষ সম্বল ডাইল ভাত, সে গুড়েও বালি। সাদাসিদা ডাল ভাত যে স্থলে রাঁধা হইত, সেখানে সুঘ্রাণ সৌরভ অনুভূত হইত, এখন তাহা হয় না। সুঘ্রাণের প্রধান কারণ মাধুর্য্য, তাহার অভাবে সৌরভও লুপ্ত।

সাধারণ নগণ্য কাকের খাদ্য বিচারের একটি ছোট্ট কথা বলি। কোন একস্থানে যদি চাউল ধান রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হয়, তবে কাক আসিয়া প্রথম পড়ে ধানের উপর। তাহারা ঠোঁঠে করিয়া ধান খুঁটিয়া খায়, তথাপি তৈয়েরী চাউল খায় না। ধানের সদ্যোনিষ্কাশিত-তুষ চাউলের সহিত স্বকসার অধিক থাকে, কাঁড়াইলে কিছু কমিয়া যায়, এজন্য মনে হয় কাকেরা ভিটামিন বহুল খাদ্য খায়, তবু বিকৃত খাদ্যে সন্তুষ্ট নয়। কাকও পরিশ্রম করিয়া মাধুর্য্যময় মোটা খাদ্য খায়; আর আমরা বিনাশ্রমে চিকণ চাউল পক্ষান্তরে সহজ লভ্য—ছিবড়া খাইতে ছাড়ি না। ফলে চিকণ খাইতে খাইতে এত চিকণ—এত ক্ষীণ হইতেছি যে, ক্রমে হাওয়ায় উড়িয়া অদৃশ্য হইবার যোগাড়।

মফস্বলের ত কথাই নাই, এই অতি উপাদেয় উপকারী স্থূল যন্ত্র প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে ছিল, সহরেরও অন্যত্র এবং কলিকাতায় অনেকে অনেক দিন আগে দেখিয়া থাকিবেন—উল্টাডাঙ্গার ঢেঁকশাল-সারি, হাটখোলা আহিরীটোলার ডালহাড়াপটী। ভোর পাঁচটার সময় ঘর ঘর শব্দে বহু ডাইল ও গম ভাঙ্গা জাঁতা ঘুড়িত। এখন একটিও নাই।

আর একটি জিনিষ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈল। এই তৈল প্রস্তুত হইত গাছের ঘানিতে। ঘানি টানিত বলদে। কাঠের অকঠিন ঘানি, চলিত বলীবর্দ্দের মৃদু মন্থর গতিতে। টস্ টস্ করিয়া তৈল পড়িত বিন্দু বিন্দু আকারে। সরিষার স্বকসার শাঁসের সঙ্গে নিষ্পেষিত হইয়া এমনি মধুর রসের প্রসব করিত যে, সে-কালের লোক ঘৃতের সহিত সেই তৈলের তুলনা করিতেন। আর এখন? এখন—সেই তৈলবীজ সরিষা কলে পড়ায় সরিষার তৈলের উপকারিতা স্নিগ্ধতা যেন কোথায় অন্তহিত। কেন-যে যান্ত্রিক বস্তুর সুখ্যাতি শাস্ত্রে নাই, এমন কি শাস্ত্রে যাঁহার নিন্দাশ্রুতি বিদ্যমান, যাহার দুষ্টফল বিবিধ ব্যাধির আধিক্য—কলেরা, বসন্ত, মেলেরিয়ার মানুষ মরিয়া উজোড়, তাহাই আজ আমরা ভাল বুঝিয়া গ্রহণ সেবন করিয়া আপনাকে সুখী মনে করিতেছি!

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত জনৈক বিশিষ্ট নেতা এই যন্ত্রযোগকে সংসারের অকল্যাণকর বলেন। বস্ত্র বয়ন বিজ্ঞানে নবীন বৈজ্ঞানিকরা যে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত করিয়াছেন তাহাও তিনি শুভাবহ বলিয়া স্বীকার করেন না। অথচ তাঁহারই কৃতী সন্তান যান্ত্রিক জীবিকা লইয়া সন্তুষ্ট। এ যেন 'মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যৎ' ইত্যাদির মত অ-মহাত্মার পরিচায়ক!

জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার বিজ্ঞানের উপর নির্ভর। ইহার উৎপত্তি ও পালনে বিজ্ঞান যেমন সাহায্য করে, আবার বিনাশেও তদ্রূপ নানা ভাবে বিভাবিত হয়। তন্মধ্যে যাহা খণ্ড প্রলয়, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের কিছু অংশ ধ্বংস হয়, তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ

শাস্ত্রে আছে, কিন্তু মহাপ্রলয়ের কোন প্রতিকার নাই। দ্বিবিধ প্রলয়েই বিবিধ উৎপাত বা উপদ্রব দেখা দিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষে কিছু কম ও বেশী।

উৎপাত দ্বিবিধ—আন্তরীক্ষ ও ভৌম। আন্তরীক্ষ বা আকাশের উপদ্রব—দিক-দাহ, উল্কাপাত, ধূমকেতু, আকাশ হইতে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থের পতন, নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি, গগন হইতে নক্ষত্রের খসিয়া পড়া কিংবা একস্থান হইতে সরিয়া গিয়া অন্যস্থানে লগ্ন হওয়া ইত্যাদি। ভৌম বা মৃত্তিকা হইতে উত্থিত উৎপাত—উষ্ণপ্রস্রবণ, অগ্নিময় ধাতু গলন, ভূমিকম্প প্রভৃতি। এই সকল উৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অগ্নিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। এতন্মধ্যে আন্তরীক্ষ উৎপাতের লক্ষণ ও প্রতিকারোপায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় অন্যতম রত্ন বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদপ্রবর বরাহ মিহিরের পিতা আদিত্য দাস "বৃহৎ-সংহিতা" নামক পুস্তকে বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত করিয়া স্বীয় তনয়কে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। উপশমের উপায় অবশ্য শাস্ত্র-বিহিত যাগযজ্ঞ দুঃখের বিষয় তাহা নবীন সমাজে আজ কাল ফকীকারী আখ্যায় আখ্যাত। নবীন বিজ্ঞানেও অবশ্য যন্ত্রযোগে উৎপাত উৎপত্তির কারণ কিছু কিছু প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপশমের উপায় বড় কিছু বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। যদি বা কিছু বলা হয়, তাহাও বহুকালব্যাপী আলোচনা গবেষণার গর্ভে পড়িয়া দীর্ঘ কালে ফল প্রসব করে, ফলে ইতি মধ্যে দুই এক পুরুষ কাটিয়া যায় ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া থাকে।

অতিরহস্য ভৌম উপদ্রব ভূমিকম্প প্রসঙ্গে একটি হাস্যকর ঘটনা আছে, এই জাতীয় উপদ্রবের উদ্ভব কারণ শাস্ত্রে অতি-সংশ্লিষ্ট, নবীনবিজ্ঞানের সহিত মূলগত মিল থাকিলেও বস্তুগত পার্থক্য নাই।

এ বিষয়ে প্রবাদরূপে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এ দেশের সেকালের বাদশা নবাবেরা ছিলেন খুব খ্যালী। এক সময় বাদশার ঔৎসুক্য হয় ভূমিকম্পের বিষয় জানিতে। সেকালের কৃষ্ণ নগরের রাজা ছিলেন বাদশা নবাবের এই জাতীয় রহস্যময় প্রশ্নের সমাধানকর্ত্তা।

প্রশ্ন হইল ভূমিকম্প কেন হয়? রাজা দেখিলেন শাস্ত্রের কথায় বাদশার বিশ্বাস না হইতেও পারে, চিন্তিত হইয়া রাজা গোপাল ভাঁড়কে বলিলেন। গোপাল ছিলেন খুব বুদ্ধিমান্, *তিনি এক প্রকার মন্ত্রীর মত কার্যকারী, কিন্তু ফষ্টিনাষ্টি অধিক করিতেন বলিয়া তিনি 'মন্ত্রী' নাম না পাইয়া নাম পাইলেন ভাঁড়।* অবশ্য তাঁহার সেই ফষ্টিনাষ্টি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ছিল না বলিয়া তিনি রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

গোপাল গেলেন বাদশার বাক্যের উত্তর করিতে। গোপাল সভায় গিয়া বলিলেন—"হিন্দু মরিয়া অগ্নিদগ্ধ হইয়া ধূমমার্গে আকাশে যায়, তাহারা উপরে কখন কি হয়, তাহাই বলিতে পারে। আর মুসলমান মরিয়া যায় মাটিতে, তাহারা জানে মাটীর নীচের খবর।"

পূর্বেই বলিয়াছি নবাব বাদশাহরা খ্যালী লোক। ডাক পড়িল মুসলমানদের। মুসলমান জ্যোতিষীরা ইহার কোন উত্তর দিতে [illegible] গোপালের গোপালেরই শরণ হইলেন। তখন গোপাল হিন্দুশাস্ত্র সম্মত কারণ বলিয়া দিলেন। সে কারণ পরম্পরা এই—"এই বিশাল পৃথিবী একটি আধারের উপর অবস্থিত। কূর্ম্ম (কচ্ছপ), দিগ্‌গজ, অনন্ত নাগ এবং আধার শক্তিরূপা প্রকৃতি দেবী। তাঁহারা যখন কোন কারণ বশতঃ চঞ্চল হন, তখনই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। তাঁহাদের চঞ্চল হওয়ার কারণ পৃথিবীতে পাপী লোকের পদভর। বলা বাহুল্য—পুরাণে বলা হইয়াছে—"পৃথিবী বলিয়া থাকেন—পর্ব্বত সপ্তসাগর প্রভৃতির ভার হইতে পাপী লোকের পদভর অত্যন্ত অধিক দুর্ভর।"

যাহ'ক, মুসলমান জ্যোতিষীরা গোপালের মুখের কথা একটু গুছাইয়া বলিলেন, বাদশা সন্তুষ্ট হইলেন। গোপাল অবশ্য এই সকল কথা আরও ভাল করিয়া নিজেই বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কৌশলে মুসলমানের মুখ দিয়াই বলাইলেন।

এই ভূমিকম্পের বিষয় নবীন বিজ্ঞানের যন্ত্রেও জানা যায় কোথাও কম্পন হইয়া গেলে—পূর্ব্বে নহে। কম্পের একটা ঝঙ্কার আসিয়া যন্ত্রে পড়ে। এই যন্ত্র কলিকাতার আলীপুরে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পবিত্রতীর্থ কাশীতে মান মন্দিরে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র স্থাপিত ছিল। মন্দির গাত্রে খোদিত সেই সকল যন্ত্রের ধ্বংস বা সংক্ষিপ্ত আকার প্রকার দৃষ্টে স্পষ্টই ভারতীয় বিজ্ঞানের গৌরব সম্যক্ উপলব্ধি হয়। প্রবাদ—অনেক উত্তম উত্তম যন্ত্র উহা হইতে খুলিয়া লইয়া রক্ষণশীল ইংরেজ সরকার তাঁহাদের বিজ্ঞান গবেষণাগারে রক্ষিত করিয়াছেন।

নবীন বৈজ্ঞানিক ভূমিকম্পের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা এই :—

ভূগর্ভের অত্যন্ত তলদেশে কোন সময় গন্ধক উৎপন্ন হয়। ইহা প্রায় মাটির নীচে কয়লার উৎপত্তির মত। দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকিয়া ঐ গন্ধক জমাট ধরে। ইহা ভয়ঙ্কর দাহ্য পদার্থ। উহাতে যেমন উপরস্থ মৃত্তিকার চাপ পড়ে, তখন উহা আপনি-আপনি জ্বলিয়া উঠে। তাহারই বিপুল তাপে পৃথিবীতে হয় কম্পন। তাঁহাদের মতে গন্ধক উৎপত্তির কারণ বিশেষ কিছু বলা নাই

ভূমিকম্প যে ভূগর্ভের ব্যাপার এবং তাহা যে কোন বস্তু-বিকৃতি হইতে উদ্ভূত, এ বিষয়ে নবীন-প্রাচীন উভয় বিজ্ঞানের একই মত। নবীনেরা বলেন সেই বস্তু গন্ধক; প্রাচীনেরা বলেন আধার শক্তির চাঞ্চল্য আর সেই চাঞ্চল্যের কারণ পাপী লোকের আচরিত কদাচার।

কাশীতে কখন ভূমিকম্প হইত না। অতি অসম্ভব কথা অপ্রমাণ করিবার জন্য এক কালে লোকে বলিত—"এ-কি কাশীতে ভূমিকম্প!" এখন সেই কাশীতে ভূমিকম্প হয়। মনে হয়—কাশীতে কোন এক কালে পাপী লোক একবারেই ছিল না। তাই ভূমিকম্পও হইত না।

নবীন যন্ত্রে আবহাওয়া ঝড়বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ বিশদভাবে প্রতিফলিত হয়। ঐ যন্ত্রের কর্ম্মকর্ত্তারা সংবাদ পত্রে প্রচার পরম্পরা দ্বারা সাধারণকে সতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রচার অপেক্ষা সহজে আবহাওয়ার বহুল প্রচারের এক প্রকৃষ্ট উপায় প্রাচীন পরম্পরা প্রচলিত ছিল—যাহা দ্বারা দেশের সাধারণ বিশেষতঃ চাষী বাসী-দিগের সহজ বোধ্য, সহজ ধার্য্য ও উপকার প্রদ ছিল। দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর [illegible] তাহা বিলুপ্ত প্রায়।

এই মন্ত্র কোথাও পাওয়া নাই, ইহা সেকালের লোকের হৃদয়-যন্ত্রে গাঁথা থাকিত, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু ধারণাসপেক্ষ। বহু কাল পূর্ব্বে জ্যোতিষবিদ্যায় বিচক্ষণা খনার মুখে ইহা ব্যক্ত হইয়াছিল। বার মাসের মধ্যে একমাত্র পৌষ মাসকে লক্ষ্য করিয়া খনা ইহার ব্যাখ্যা করেন। সাধারণতঃ এ বিষয়টি অধিক লোকের ধারণার মধ্যে না থাকিলেও স্মরণ করাইয়া দিলে হয়ত অনেকেরই স্মৃতিপথে পতিত হইতে পারে। সমস্ত বৎসরের আবহাওয়ার লক্ষণ সমন্বয় একমাত্র পৌষ ব্যতীত অন্য কোন মাসে হয় না। তাই খনা কহিয়াছেন—"আগে পাছে দিয়া ধনু মীন অবধি তুলা। বিছা মকর কুম্ভ দিয়া মাস খাটিয়ে গেলা।"

৩০ দিনে এক মাস। এক মাসে বারটি রাশির আবর্ত্তন হইয়া থাকে। ৩০ দিনকে ১২ দিয়া ভাগ দিলে এক এক ভাগে হয় ২॥ দিন। রাশিও সংখ্যায় বারটি এবং বৎসরের মাস সংখ্যাও ১২। রাশি বারটির নাম—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক (বিছা), ধনু, মকর ও কুম্ভ। বার মাসে এক বৎসর। এক একটি রাশি এক একটি মাসের নিয়ামক। মেষ রাশিতে বৈশাখ, এইরূপ বৃষে জ্যৈষ্ঠ, মিথুনে আষাঢ়, কর্কটে শ্রাবণ, সিংহে ভাদ্র, কন্যায় আশ্বিন, তুলায় কার্ত্তিক, বৃশ্চিকে অগ্রহায়ণ, ধনুতে পৌষ, মকরে মাঘ, কুম্ভে ফাল্গুন, মীনে চৈত্র। এই ভাবে মাস-রাশির সম্বন্ধ।

খনা বচনে বলিতেছেন—যে বৎসর পৌষের প্রথম ১। দিন আবহাওয়ার অবস্থা যেরূপ থাকিবে সে বৎসর সমস্ত পৌষ মাসের শেষের ১। দিন আবহাওয়া অবিকল তদনুরূপ হইবে। অবশিষ্ট ২৭॥ দিনকে ১১ ভাগ করিয়া প্রত্যেক ২॥ দিনে যে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা প্রকাশ পাইবে, তাহা হইতে ক্রমাগত চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের আবহাওয়া নির্ণীত হইবে। পৌষের অবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পৌষের সোয়া দিনের পর ২॥ দিন পর্য্যন্ত আবহাওয়ার অনুরূপ আবহাওয়া হইবে অনেক পরবর্ত্তী সমস্ত চৈত্র মাসের। এইরূপ তৎপরও ২॥ দিবসের সূচিত অবস্থা তৎপরবর্ত্তী বৈশাখে হইবে। এই প্রকার নিয়মে ক্রমশঃ জ্যৈষ্ঠ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত মাসের অবস্থার বিষয় নিরূপিত হইতে পারিবে। ইহার মধ্যে যে দিন দেখা যাইবে মেঘ-সঞ্চার, বাত বা বৃষ্টিপাত, তখনই দেখিতে হইবে, উহা কোন মাসের আবহাওয়া নিরূপক ২॥ দিনের মধ্যে পতিত হইয়াছে।

এ ভাবের ব্যত্যয় হইতে বড় একটা দেখা যায় না। মনে হয় সমস্ত পৌষ মাসটার সংঘটিত লক্ষণগুলি যদি লিখিয়া রাখা যায়, তবে সহজে ধরিতে পারা যাইবে—সমস্ত বৎসরের ভাবী অবস্থা। ইহা গৃহস্থের পক্ষে কম উপকারের কথা নহে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীর পক্ষেও বহুল ভাবেই আবশ্যক।

পাঠক পাঠিকাগণকে আরও একটু সহজ করিয়া বুঝিবার সুযোগ দিতে চাই। সকলেই জানেন বার মাসের মধ্যে পৌষ মাসের অবস্থা টানা এক ভাব থাকে না। কখনও বেশী শীত, কখনও অল্প শীত, কখন শীতের এমন শূন্যতা যে, দেহে ঘাম দেয়। কোন দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কোন দিন অভ্র, আবার কোন দিন প্রবল বাতাস, কোন দিন বৃষ্টি। এই বৃষ্টি কোন কোন পৌষে ধারা বর্ষণ-রূপেও হইতে দেখা যায়। এই আবহাওয়ার বৈষম্য বা বিকৃতি পৌষেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহাকে বাঙ্গলার লোক মাস খাটান বলে। একমাত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পৌষ মাসের হিসাব করিলে সমস্ত বৎসরে কখন কিরূপ অবস্থা চলিবে, সহজে বুঝিয়া লইয়া চলিতে পারিবে। ইহাতে গৃহস্থ চাষীবাসী প্রভৃত পরিমাণে সকল কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে। পূর্ব্বকালের প্রাচীন চাষীরা এই মাস খাটানর খতিয়ান রাখিত এবং সময় বুঝিয়া বপন-রোপণাদির ব্যবস্থা করিত।

এবার যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বৃষ্টির অল্পতা খুব বেশী। এক দিন মাত্র—পৌষের ৩রা আকাশে সামান্য মেঘ-সঞ্চার হয়। সে মেঘ ঘন নহে কেবল ঘোলা ঘোলা ভাব। ২।১ ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িয়াছিল কিন্তু খুব প্রবল না হউক, বাতাস বহিয়াছিল। এ-বৎসর ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখা দিয়াছে। চৈত্রের গত ৮ই এবং ১৬ই তারিখ হইতে কয়েক দিন মেঘ এবং তৎসহ বাতাস ও বৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পর বৈশাখ মাসের আবহাওয়ার সূচক পৌষের ৬ই তারিখে যে সামান্য মেঘের সহিত বাতাস বহিয়াছিল, ইহাতে মনে হয়—হয়ত কাল-বৈশাখীর ঝড় বড় রকমের দু'-চারটা হইতে পারে, কিন্তু বর্ষণের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক।

এই সব আবহাওয়ার উপর শস্যোৎপত্তি, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের অত্যাবশ্যকীয় জীবন-মরণের আশা-আনন্দের নির্ভর। জানি না, জগদম্বার মনে কি আছে।

পাহাড়ের কোলে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ো পাহাড় যার তলায়
ঘুমোনো গ্রাম হেসে এলায়!
উঠেছে চাঁদ এক ফালি
রয়েছি চেয়ে মন খালি।
উঁচু পাহাড় তার তলায়
ছোট্ট স্রোত হেসে পালায়।
উঠেছে চাঁদ এক ফালি,
ঢেউরা দেয় হাত তালি।
ফিকে আকাশ তার তলে
ধানী বাতাস ধীরে চলে;

ছোট্ট স্রোত তবুও হায়
ভাঙলো পাড় ঢেউয়ের ঘায়!
পুরোনো হাড়, নেই কো সাড়,
শুধু ঝিমায় কালো পাহাড়,
খাড়া ওঁচায় চাঁদ ফালি,
শিহরে মন খালি খালি।
মাঝ রাতে এল জোয়ার
শূন্য মোর ঘর-দুয়ার;
নেই কো মন আমি আছি—
ফুল-বিহীন মালাগাছি।

সাংখ্যকারিকায় বেদান্ত

২

শ্রীচিদ্ঘনানন্দ স্বামী

সাংখ্যমতের জন্য পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্য ও মহাভারত

কেহ কেহ আজ-কাল পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্য এবং তাহাতে উদ্ধৃত পঞ্চশিখাচার্য্যের বাক্যাবলীর দ্বারা সাংখ্যমতের পরিষ্কার সাধন করেন, এবং ইহাকেই সাংখ্যমত নির্ণয়ের সম্যক্ পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশও করেন। যেহেতু, পঞ্চশিখাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের গুরু। ইহা তাঁহার সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন এবং তিনি পঞ্চশিখাচার্য্যের ষষ্ঠী তন্ত্র নামক গ্রন্থের সার সংকলন করিয়া সাংখ্যকারিকা নামক গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাও তিনি স্বয়ংই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যমত বিনির্ণয় ইহা যে কতদূর সমীচীন পন্থা তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ, যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা সাংখ্য ও যোগকে এক অখণ্ড শাস্ত্র বলেন। তাঁহাদের মতে সাংখ্য জ্ঞানযোগ এবং যোগ তাহার সাধনকাণ্ড। এ বিষয়ে তাঁহারা বহু যুক্তিও প্রদর্শন করেন। এই সকল যুক্তির কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে। তথাপি আমাদের মনে হয়, ব্যাসভাষ্যের ও তদুক্ত পঞ্চশিখাচার্য্যের উক্ত সাংখ্যমত, মহাভারতোক্ত পঞ্চশিখাচার্য্যের এবং অপরাপর ঋষিবর্গের সাংখ্যমতের সমকক্ষ হইতে পারে না। ইহার কারণ, পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য যদি পঞ্চশিখাচার্য্যের কয়েকটি বাক্য (১১) উদ্ধৃত করায়, সাংখ্যমতের প্রমাণ হয়, তবে যখন মহাভারতের ব্যাস দুই-দুইবার চারিটি অধ্যায়ে ২১৮ ও ২১৯ এবং ৩২০ ও ৩২১ অধ্যায়ে পঞ্চশিখের মত যথেষ্ট সবিস্তারে বহু শ্লোকের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাহা তদপেক্ষা কেন বলবত্তর প্রমাণ হইবে না? কোথায় ব্যাসভাষ্যের ১১টি বাক্য আর কোথায় ব্যাসের মহাভারতের চারিটি অধ্যায়ে ৩০৬টি শ্লোক। কোথায় যোগসূত্রের ভাষ্যকার আধুনিক ব্যাস, আর কোথায় মহাভারতের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। প্রাচীনতার এবং প্রামাণ্যাধিক্যের সম্ভাবনা কোথায়? তাহার পর মহাভারতে কেবল পঞ্চশিখ যোগ ও সাংখ্যমতের বক্তা নহেন, কিন্তু বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীষ্ম, কপিল, বৈশম্পায়ন ও রুদ্র প্রভৃতি সাংখ্যমত বর্ণনা করিতেছেন, দেখা যায়। সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে; ইহা দেখিলে মনে হয় কালক্রমে সাংখ্যমতের পরিবর্তন বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব এই সব মুনি-ঋষির মুখ দিয়া সাংখ্যমতের বর্ণনা করিয়েছেন।

তাহার পর যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের নামগন্ধ, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না। আধুনিক বৌদ্ধমতের শব্দ ব্যাসভাষ্য মধ্যে দেখা যায়। এইরূপ নানা কারণেই বোধ হয়, মহাভারতের ব্যাস এবং যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের ব্যাস যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, তাহা নিশ্চিত। যাঁহারা যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের বাক্যের প্রামাণাধিক্য ঘোষণা করেন, তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন না। মহাভারতের ব্যাস প্রাচীন, যোগসূত্রের ব্যাস অর্ব্বাচীন। ইহা আজ প্রায় কেহই অস্বীকার করেন না। কেবল তাহাই নহে, পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাসভাষ্যের কথা, খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীর বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বে কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর বাৎস্যায়ন ভাষ্যে ব্যাসভাষ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ভ্রম। তাহাতে যোগশাস্ত্র মাত্রের উল্লেখ আছে, ব্যাসভাষ্যের কোন নিদর্শন নাই।

ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখ ঋষির বাক্য যে ১১টি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেগুলি একত্র করিয়া মধুপুর কপিল মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ [illegible] একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যক সাংখ্যাচার্য্যের ভাষ্য এবং অনুবাদাদি সংযোজিত করা হইয়াছে।

প্রাচীন যোগদর্শন ও পাতঞ্জল যোগদর্শন

নানা যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন যোগসিদ্ধ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (২।১।৩) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে যে যোগসূত্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান পাতঞ্জল যোগসূত্রে দেখা যায় না। শঙ্করাচার্য্য সেখানে যে সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা "অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ো যোগঃ।" পক্ষান্তরে পাতঞ্জল যোগসূত্রে যে সূত্রটি আছে তাহা "যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" ইহা হইতে মনে হয়, যোগদর্শন একাধিক ছিল। কারণ 'এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ' (২।১।৩) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে পাতঞ্জল সূত্রের কোন সূত্র উদ্ধৃত না হইলেও; ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৩ সূত্রের ভাষ্যে "স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা-সম্প্রয়োগঃ" এই ২।৪৪ পাতঞ্জল সূত্রের উল্লেখ দেখা যায়। আবার ২।৪।১২ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ।" এই ১।৬ পাতঞ্জল যোগসূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। বঙ্গে প্রবাদও আছে, যোগদর্শন দুইখানি—একখানি মাহেশ্বর-কৃত এবং অন্যখানি পাতঞ্জল-কৃত। অবশ্য ১০৮ উপনিষদমধ্যে কতক উপনিষদে যোগের কথা যথেষ্ট বিশদভাবে বর্ণিত হইতে দেখা যায়; মাহেশ্বর যোগের গ্রন্থ বলিতে শিবসংহিতা এবং বিশাল তন্ত্র শাস্ত্র ও পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রীয় কোন গ্রন্থ-বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আর পতঞ্জলির যোগ বলিতে হিরণ্যগর্ভ-প্রবর্ত্তিত যোগ বলিতে পারা যায়। তবে যে যোগশাস্ত্রের সূত্র "অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ো যোগঃ" সেই যোগ গ্রন্থের কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। ফলতঃ, ইহা হইতে মনে হয়, এইরূপ যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের সময় প্রচলিত ছিল। আর যাহা আজ লুপ্ত তাহাই সম্ভবতঃ প্রাচীন যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। তবে যে যোগদর্শনের উপর ব্যাসভাষ্য বর্ত্তমান, তাহা পাতঞ্জল যোগদর্শন। এই ব্যাসভাষ্যেই পঞ্চশিখের কথা আছে। অতএব এই ব্যাসভাষ্য যে যোগদর্শনের উপর রচিয়াছে, তাহার আবির্ভাব-কাল জানিতে পারিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পঞ্চশিখের বাক্যের প্রামাণ্য অধিক কি ব্যাসভাষ্যের পঞ্চশিখ বাক্যের প্রামাণ্য অধিক, তাহা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের আবির্ভাব-কাল

দেখা যায় পাণিনি ব্যাকরণের উপর যে মহাভাষ্য আছে, তাহা মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত। ইহার অপর নাম ফণিভাষ্য। কারণ, ফণিপদবাচ্য যে অনন্ত নাগ, তিনিই পতঞ্জলি রূপ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে। এই মহাভাষ্য বা ফণিভাষ্য খৃষ্টপূর্ব্ব ৩।২ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতেছেন। এই পতঞ্জলিকে যোগসূত্রের সূত্রকার বলিলে, এই যোগসূত্রের অস্তিত্ব খৃষ্টপূর্ব্ব ৩।২ শতাব্দী বলিতে হয়। কিন্তু ব্যাসভাষ্যের অস্তিত্ব এই সময় পাওয়া যায় না। অতএব ব্যাসভাষ্য খৃষ্টপূর্ব্ব ৩।২ শতাব্দীর পরে, এই কথা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে।

তার পর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির উদ্দেশ্যে যে প্রণামমন্ত্র ব্যাকরণ-গ্রন্থে দেখা যায়, তাহাতে পতঞ্জলিই যোগসূত্রকার। তিনিই পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার, এবং তিনিই চরক নামক বৈদ্যগ্রন্থের কর্ত্তা বলিয়া অনুমান করা যায়। যথা—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং তং প্রাঞ্জলি-রানতোঽস্মি॥

অর্থাৎ যোগের দ্বারা যিনি চিত্তের মল, পদ দ্বারা অর্থাৎ ব্যাকরণ দ্বারা যিনি বাক্যের মল এবং বৈদ্যক শাস্ত্রের দ্বারা যিনি শরীরের মল বিদূরিত করিয়াছেন সেই পতঞ্জলি দেবকে প্রাঞ্জলি করিয়া প্রণাম করিতেছি।

এখানে যোগ বলিতে পাতঞ্জল যোগসূত্র এবং ব্যাকরণ বলিতে মহাভাষ্য বা ফণিভাষ্য এবং বৈদ্যক বলিতে চরক, এবং গোবিন্দপাদ বিরচিত রসহৃদয় তন্ত্র বলিয়া অনেকে বুঝিয়া থাকেন। কারণ, গোবিন্দপাদকে পতঞ্জলি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। গোবিন্দপাদ যে পতঞ্জলি ইহা পরে বলা হইতেছে। আর পাতঞ্জল যোগমত যে হিরণ্যগর্ভপ্রোক্ত যোগমত, তাহার নিদর্শন মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যে দেখা যায়। যথা ৩৪৯ অধ্যায়—

বিদ্যাসহায়বন্তং চ আদিত্যস্থং সমাহিতম্।
কপিলং প্রাহুরাচার্য্যাং সাংখ্যনিশ্চিতনিশ্চয়াঃ। ৬৮
হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ ছন্দসি সুষ্টুতঃ।
যোঽহং যোগরতির্ব্রহ্মন্ যোগশাস্ত্রেষু শব্দিতঃ।" ৬৯

তদ্রূপ ৩৪৯ অধ্যায়ে দেখা যায়—

"সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে! বিদ্ধি নানামতানি বৈ। ৬৪
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।৬৫

এতদ্দারা বুঝা যায়, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ, পতঞ্জলি মুনিই ইহার সংকলন করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। ইহা মাহেশ্বর যোগ নহে, কারণ, পাশুপত মতের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। আর শাস্ত্র বলিতে সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র বেদ এবং পাশুপত এই পাঁচটি শাস্ত্র বুঝায়। বেদ শব্দে এস্থলে মীমাংসাশাস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব্বমীমাংসা বুঝায়।

তাহার পর উক্ত 'যোগেন চিত্তস্য' শ্লোকে যে 'পদেন বাচাং' বলা হইয়াছে, সেখানে পদ এই শব্দ দ্বারা পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রহণ করা হয়। এবং বৈদ্যক শব্দ দ্বারা যে চরক গ্রন্থ গ্রহণ করা হয়, তাহার প্রমাণ চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাণি দত্তের বাক্য বলা যায়। যথা—

"পাতঞ্জলমহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্‌কায়দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ।"

অর্থাৎ পাতঞ্জল দর্শন, মহাভাষ্য এবং প্রতিসংস্কৃত চরক দ্বারা যিনি মনঃ বাক্য এবং শরীরের দোষ হরণ করেন সেই অহিপতি অর্থাৎ নাগরাজ অনন্তদেবকে নমস্কার।

এতদ্দারা পাওয়া যায় যে, যোগী পতঞ্জলি শেষ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং চরক এই তিন ব্যক্তিই অনন্ত নাগের অবতার। আর ইহাদের সময়ও ৩।২ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দী হয় বলিয়া এবং "যোগেন চিত্তস্য" শ্লোকদ্বারা একই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয় বলিয়া ইঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি। এই তিনটি নামই একই ব্যক্তির নাম।

ভাবপ্রকাশাদি গ্রন্থ পাঠে জানা যায় চরকমুনি, অগ্নিবেশাদি প্রণীত বৈদ্যক গ্রন্থের সংস্কার করিয়া চরকসংহিতা প্রণয়ন করেন। এই চরকমুনি সম্রাট্ কনিষ্কের সময় পুরুষপুরে অর্থাৎ বর্ত্তমান পেশওয়ারে রাজবৈদ্য ছিলেন। সুশ্রুত মুনিও কনিষ্করাজের অস্ত্রোপচারক ছিলেন। এজন্য কনিষ্কের সময় যে ১২ খৃষ্টাব্দ তাহাই চরক মুনি বা পতঞ্জলি দেবের সময় বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও আর একজন চরক ছিলেন ইহাও বুঝা যায়। কারণ পাণিনি ব্যাকরণে "কঠচরকাৎ লুক্" ৪।৩।১০ এই সূত্রে চরক পদের ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। পাণিনি মুনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪।৫ বা ৬৭ শতাব্দীর লোক। মহাভারতেও চরকের নাম দৃষ্ট হয়। মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসরের গ্রন্থ। আরও যজুর্ব্বেদের শাখাগণনায় চরকশাখার নামও দৃষ্ট হয়। এজন্য চরক একাধিক ছিলেন—বলিতে হয়। সুশ্রুত সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয়ের "সনৎসুজাতীয়" গ্রন্থের ১ম ভাগ ৬১৭ পৃষ্ঠা এজন্য দ্রষ্টব্য। বৃদ্ধ চরক ও বৃদ্ধ সুশ্রুতের সময় তন্মতে ১৪।১৫ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দী।

যাহা হউক, পতঞ্জলি চরক মুনি হইলে এই পতঞ্জলির সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩।২ শতাব্দী হইতে খৃষ্টাব্দ ১।২ শতাব্দী বলা যায়। এত দীর্ঘ আয়ুঃ রসায়ন-সেবনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে সম্ভবপর হইত ইহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব। ইনি অনন্ত দেবের অর্থাৎ শেষ নাগের অবতার ইহাও প্রসিদ্ধ। এজন্য উক্ত হালদার মহাশয়কৃত ব্যাকরণের ইতিহাস গ্রন্থ এবং পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোক দেখা যাইতে পারে।

তাহার পর পতঞ্জলি দেবের দীর্ঘায়ুর প্রমাণও আছে। যথা, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদকেও শঙ্করবিজয়াদি গ্রন্থে অনন্তদেব শেষ নাগের অবতার বলা হইয়াছে। এই গোবিন্দপাদকে এজন্য পতঞ্জলি দেবই বলা হয়। এজন্য শঙ্করবিজয় ৫ম অধ্যায় ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এস্থলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নর্ম্মদাতীরে ওঁকারনাথে সমাধিস্থ গুরুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে যে গুরুস্তব শুনাইয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই স্তবে তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া পতঞ্জলি দেবই বলা হইয়াছে, যথা—

"দৃষ্ট্বা পুরা নিজসহস্রমুখীমভৈষুরন্তে বসন্ত ইতি তামপহায় শান্তঃ।
একাননেন ভুবি যস্ত্ববতীর্য্য শিষ্যাননুগ্রহীন্ ননু স এব পতঞ্জলিস্ত্বম্।" ১৫

অতএব এই পতঞ্জলিই গুরু গোবিন্দপাদ বলা যায়। অবশ্য শঙ্করবিজয় গ্রন্থে উদয়ন অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় পরবর্ত্তী আচার্য্যের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎকার এবং বিচারাদি বর্ণিত থাকায় অনেকে শঙ্করবিজয়কে একেবারে অপ্রামাণিক বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত কে টি তৈলাঙ এই কথাটিকে বিশ্বাস করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের সমকক্ষ ইহাদের সময় কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। এজন্য বোম্বে ব্রাঞ্চ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণাল প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ঐতিহাসিক বিষয়ে কোন

যদি কোন অংশ ভ্রম থাকিলে তাহার সর্বাংশ অগ্রাহ্য করিলে তখনও প্রবাদেরই মূল্য থাকে না। অধিক কি কোনও ইতিহাসকেও বিশ্বাস করা চলে না।

যাহা হউক, এই যে, এই গোবিন্দপাদ তাঁহার গুরু, গুরুদেব শিষ্য সিদ্ধযোগী গৌড়পাদের আদেশে শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে উপদেশ দিবার জন্য সহস্র বৎসরাধিক কাল সমাধিযোগে নর্মদাতীরবর্ত্তী ওঁকারনাথ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহার প্রণীত "রসহৃদয় শাস্ত্র" নামে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ আছে। (ইহা লাহোরে মুদ্রিত হইয়াছে।) ইহাতে স্বর্ণজীর্ণকারী পারদ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া আছে। এই পারদের অপর নাম বুভুক্ষিত পারদ। ইহার দ্বারা প্রস্তুত মকরধ্বজ সেবন করিলে আবার নীরোগ শরীরে সহস্র বৎসরাধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে। বৃদ্ধ ব্যক্তি ষোড়শবর্ষীয় যুবকে পরিণত হয়। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ বলিয়াছেন "ভারতে এমন বিদ্যা আছে, যাহাতে সকল মানব সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।" এই গোবিন্দপাদ এই পারদ সেবনে সুস্থ দেহে সমাধিযোগে যে সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের অপর নাম ফণিভাষ্য—একথা নৈষধ চরিতের দ্বিতীয় সর্গে শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন। যথা—"ফণিভাষিত-ভাষ্যফক্কিকা বিষমা কুণ্ডল নামকল্পিতা।" এজন্য যে পতঞ্জলি মহাভাষ্যকার, তিনিই যে অনন্তদেবের অবতার তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর তিনিই গোবিন্দপাদ এবং তিনিই চরক মুনি। তিনিই যোগসূত্রকার। এজন্য

"যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং, মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং তং
প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।"

এই যে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই বলা হইয়াছে। আর তজ্জন্য তাঁহার যে সময় তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩।২ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ১।২ শতাব্দী বলিতে কোন বাধা হয় না। ইনিই যোগবলে সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া গোবিন্দপাদ নামে শঙ্করাচার্য্যকে উপদেশ দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজকাল যোগবলের কথা শুনিলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কিন্তু এতাদৃশ ব্যক্তিগণের অনেকে যে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক ক্ষুদ্র যোগ সিদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হন তাহার বিশেষ উল্লেখ না করাই ভাল। যাহা হউক, এই পতঞ্জলির জন্মস্থান "গণ্ড" নামক একটি স্থান। এজন্য ইঁহার অপর নাম "গোনর্দীয়"। ইনি বৃদ্ধ বয়সে পুষ্য মিত্রের যজ্ঞে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ইহা মহাভাষ্যেই কথিত হইয়াছে। যথা—

"পুষ্যমিত্রো যজতে যাজকা যাজয়ন্তি ইতি।
তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজয়তে যাজকা যাজয়ন্তি
ইতি" (৩।১।২।২৬)।

এই পুষ্যমিত্র মৌর্য্যবংশীয় শেষরাজা বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া ১৮৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এজন্য ইঁহার জীবন-কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৩।২ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ১।২ শতাব্দী হইতে কোন বাধা হইতে পারে না। এই কারণে গোবিন্দপাদ বা চরক বা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি, এবং তিনিই যোগবলে [illegible] শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন এরূপ কল্পনা করিতে কোন বাধা হয় না। বস্তুতঃ এইরূপ প্রবাদও শ্রুত হইয়া থাকে।

ব্যাসভাষ্যের প্রাচীনত্ব দ্বারা যোগদর্শনের প্রাচীনত্ব

তাহার পর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বর্ত্তমান যোগ-দর্শনের বা পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য কোথাও উদ্ধৃত না করিলেও "অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ঃ যোগঃ" এই মাহেশ্বর যোগসূত্রের এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রের কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।৩।৩৩ এবং ২।৪।১২ সূত্র দ্রষ্টব্য। আর তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্যের সময় খৃষ্টীয় ৭।৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান পাতঞ্জল যোগ সূত্রের ব্যাসভাষ্য ছিল না—এরূপ কল্পনা করিবার প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক হয় না। অবশ্য কোন কিছুর অনুল্লেখ তাহার অস্তিত্বের অভাব-বোধক সকল সময় হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও যে ব্যাসভাষ্যের টীকা বাচস্পতি মিশ্র করিয়াছেন, যে ব্যাসভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বহু স্থলে গীতাটীকার মধ্যে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা যদি তদ্রূপ প্রাচীন হয় তবে তাহা যে শঙ্করাচার্য্য উল্লেখ করিলেন না—ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এই সব কারণে বাধ্য হইয়া দুইখানি যোগ সূত্র এবং ব্যাসভাষ্যের অপ্রাচীনত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হয়। অতীত বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা বড়ই কঠিন।

কেহ কেহ পাতঞ্জল যোগসূত্রকে আরও প্রাচীন বলিবার জন্য তাহার ব্যাসভাষ্য দ্বারা তাহাকে কলির প্রারম্ভে বা দ্বাপরের শেষভাগে রচিত বলিতে চাহেন। কারণ ব্যাস এই নামটি কলির প্রারম্ভে মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নেই প্রসিদ্ধ। ব্যাসভাষ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের কথার খণ্ডন থাকায় সেই ব্যাসভাষ্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ নাও হইতে পারে। কারণ, ব্যাসও চিরজীবী এবং বৌদ্ধ মতও গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও ছিল। ইহা বৈদিক ধর্ম্মের গ্রন্থ, যথা বিষ্ণুপুরাণ মহাভারত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ, যথা লঙ্কাবতার সূত্র প্রভৃতিতে দেখা যায়। ব্যাসের সময় ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ ছিলেন। মধ্যে কনক মুনি বুদ্ধের অস্তিত্বও শুনা যায়। এসব কথা বিশ্বকোষ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অতএব ব্যাসভাষ্য দেখিয়া পাতঞ্জল দর্শনকে আরও প্রাচীন বলিতে কোন বাধা হয় না। কিন্তু এসব কথা আজকাল অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদই গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহারা ব্যাসভাষ্যে এমন সব বৌদ্ধমতের কথা দেখিতে পান যে, তজ্জন্য তাহাকে প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য তাঁহারা মনে করেন, ব্যাসভাষ্যের অনেক কথা যখন শঙ্কর মতের বিশেষ অনুকূল, তখন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য পরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র এবং মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় প্রভৃতির ন্যায় ব্যাসভাষ্যের কথা উদ্ধৃত করিলেন না কেন? বস্তুতঃ, এরূপ স্থলে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য ব্যাসভাষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নহে আর তজ্জন্য ব্যাসভাষ্য দেখিয়া পাতঞ্জল যোগসূত্র কলির প্রারম্ভের গ্রন্থ ইহা কল্পনা করা সঙ্গত হইবে না।

আবার কেহ কেহ ব্যাসভাষ্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য বলেন—খৃষ্টপূর্ব্ব ৩।৪ শতাব্দীর ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্যে

এবং পাণিনির মহাভাষ্যে ব্যাসভাষ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল উক্ত ভাষ্যদ্বয়ে ব্যাসভাষ্যের কোনও নামগন্ধ নাই। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে যোগশাস্ত্রের কথা ৪।২ ৪৬ সূত্রে দেখা যায়, কিন্তু তাহা হইতে তাহা যে ব্যাসভাষ্যের কথা এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যোগশাস্ত্র যে অতি প্রাচীন, একথা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু যোগশাস্ত্র এই নাম মাত্র দেখিয়া তাহাকে ব্যাসভাষ্যের কথা বলিয়া কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব ব্যাসভাষ্যের প্রাচীনত্ব কল্পনা এই পথে সঙ্গত হয় না। ন্যায়দর্শনের সেই সূত্রটি এই—

"তদর্থং যমনিয়মাভ্যাম্ আত্মসংস্কারো যোগাৎ চ অধ্যাত্মবিধ্যু-
পায়ৈঃ" ৪।২।২৬

ইহার ভাষ্য আছে—"যোগশাস্ত্রাৎ চ অধ্যাত্মবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ" ইত্যাদি। অতএব এতদ্দ্বারা ব্যাসভাষ্যের প্রাচীনত্ব কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

তাহার পর পতঞ্জলির যোগ—ইহা মহাভারতে নাই। যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ইহাই মহাভারতে দেখা যায়। অবশ্য তাই বলিয়া যে পতঞ্জলি ঋষির নাম পুরাণাদিতে নাই, তাহা নহে। কারণ, বায়ুপুরাণ ৬১ অধ্যায়ে দেখা যায়, মহর্ষি পতঞ্জলি মহর্ষি প্রাচীনযুগের পুত্র। তাঁহারা পিতাপুত্রে উভয়েই কৌথুমদিগের শিষ্য ছিলেন। এই উভয়েই এক একখানি সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে এবং মৎস্যপুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রুর গর্ভে জাত বহু পুত্রের অন্যতম পতঞ্জলি। জীবনীকোষ গ্রন্থে ইহার নাম অনন্তনাগও উক্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের ১১৬ অধ্যায়ে আছে—মহর্ষি পতঞ্জলি এক জন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইহাও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের জীবনীকোষে দৃষ্ট হয়। "প্রাচীন যোগের" তনয় মহর্ষি পতঞ্জলি একজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৬১ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে আলবেরুণি এক জন পতঞ্জলির নাম করিয়াছেন। তবে তিনি যে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এজন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয়ের ব্যাকরণের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক পতঞ্জলি যদি চরক ও গোবিন্দপাদ হন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টীয় ৩।৪ পূর্ব্ব শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এবং যোগসূত্র সেই সময়ের গ্রন্থ। আর যদি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্যকার হন, তবে যোগসূত্র আজ ৫।৬ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে বলা যায়। আর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বা মহাভাষ্যে বা শবর ভাষ্যে বা বাৎস্যায়ন ভাষ্যে বা প্রশস্তপাদ ভাষ্যে অথবা কুমারিল ও প্রভাকর প্রভৃতির গ্রন্থে পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের যখন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তখন ব্যাসভাষ্য গ্রন্থখানি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে বলিতে হয়। অবশ্য প্রশস্তপাদ ভাষ্যের কথাও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অন্য প্রমাণে প্রশস্তপাদ ভাষ্যের অস্তিত্ব শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বলিতে পারা যায়। ব্যাসভাষ্যকেও যদি তদ্রূপ বলা যায় তাহা হইলে অন্য প্রমাণ আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহা এখনও পাওয়া যায় নাই। [ক্রমশঃ।

কান্না

আহ্‌সান হাবীব

প্রেম নেই তবু প্রেমের কান্না মরেনি
তুমি নেই তবু তোমাকে পাওয়ার বাসনার
সোনা ঝরেনি।

এই সর্পিল জীবনের পথে আলগোছে ছুঁয়ে যাওয়া
তুমি যেন কোনো চৈত্র-রাতের দূরসমুদ্র-হাওয়া!

তুমি নেই তবু একটি বিপুল বিস্ময় আছে মনে—
হঠাৎ কখনো পাখী ডেকে যায় বনে,
হঠাৎ কখনো বাতায়ন পাশে হেনার গন্ধ জাগে;
হঠাৎ কখনো দুঃসহ অনুরাগে
একটি ব্যাকুল গান রেখে যাও সেখানে
আমার গানের শ্রান্ত পাখীরা নীড় খুঁজি ফেরে
যেখানে।

কোনো কোনো দিন বৈশাখী মেঘে দোলা
দিয়ে যাও তুমি,
কেঁপে ওঠে ঘন অমাবস্যার নির্জন বনভূমি।

সাড়া দাও তুমি গহন অন্ধকারে,
চেনা পৃথিবীর দিগন্তরেখা ঘুচে যায় বারে বারে।
জাগে শুধু সেই অন্ধকারের গহনে
কুঁড়ির গন্ধ অন্ধ আবেগে অনাদি কালের দহনে।

তোমার পাখীর সুর জেগে ওঠে রূপালী নদীর তীরে,
আমার পায়ের চিহ্ন তখন রাতের পাহাড় ঘিরে,
ছুঁয়ে যেতে চায় তোমার আকাশ আলগোছে
ভালবেসে—

হঠাৎ কখন পথ ঢেকে দাও তোমার কৃষ্ণ কেশে!
যারে পেতে চাই নিজের ছায়ায় ঢাকা সে,
বৈশাখী মেঘ তবু রেখে যায় ঝড়ের ইশারা
আকাশে।

সেই বৈশাখী মেঘের আবেগ আষাঢ়ের আঙিনাতে
যদি কোনো দিন বন্যা নামায় এমনি ঝড়ের রাতে—
এই আশা নিয়ে প্রেমের কান্না জাগে,
দিনের পৃথিবী ঘুমালে তখন স্বপ্নের দোলা লাগে!

[উপন্যাস]
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভূপেন জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল।

রাধাকমল বাবুর ঘরে গিয়া পাঁজী চাহিয়া লইয়া দেখিল বিবাহের দিন আছে আহার পরের দিনই—আর আছে দিন পাঁচেক পরে। অত দিন অপেক্ষা করা নানা কারণে যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া সে আর দেরি করিল না। ইস্কুল হইতে কিছু আগেই ছুটি লইয়া একেবারে সরাসরি বিজয় বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল।

বিজয় বাবু আগেকার মতই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। এই কয়দিনে মুখ যেন আরও কৃশ হইয়া পড়িয়াছে—আরও করুণ, আরও পবিত্র দেখাইতেছে তাঁহাকে। যেটুকু দ্বিধা ছিল এখনও, তাহা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। সে একেবারেই কথাটা পাড়িল।

কহিল, দেখুন আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে। বলুন দেবেন?

বিজয় বাবু দারুণ বিব্রত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কী সর্বনাশ! আমার কাছে? কিন্তু—

বলছি সবই—তার আগে কথা দিন যে আপনার পক্ষে দেওয়া যদি সম্ভব হয় ত নিশ্চয়ই দেবেন?

নিশ্চয়ই দেব—এ কথা কেন বলছ ভাই। কীই বা দেবার আছে আমার—থাকলেই ভাল হ'ত কিন্তু কিছুই যে নেই।

আমি, আমি কল্যাণীকে ভিক্ষা চাইছি। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

বিজয় বাবু আন্দাজে আন্দাজে হাত বাড়াইয়া একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, এ যে আশাতীত সৌভাগ্য আমার! কল্যাণী তোমার মত দেবতার পায়ে ঠাঁই পাবে, এত তপস্যা কি আছে ওর? আমি ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলুম ভূপেন বাবু, বুঝে হতভাগীর বরাতের কথা ভেবে দুঃখ পেতাম। ভাবতাম হতভাগী বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়, ওর দুঃখের শেষ থাকবে না। কিন্তু চাঁদ যে নিজে এসে ধরা দেবেন—

তাহ'লে আপনি কথা দিচ্ছেন?

দিচ্ছি বৈ কি। এ যে আমার এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না। ইতস্তত করবার যদি কিছু থাকে ত তোমারই আছে, আমার কি থাকতে পারে?

তাহার পর একটু থামিয়া যেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, দিদি অথর্ব্ব, ছেলেমেয়েগুলোর ভাত-জল পাওয়াই মুস্কিল—এই যা একটু দুর্ভাবনা। কিন্তু তাই বলে কি ওর ভবিষ্যৎ সুখ ওর জীবনটা নষ্ট করা? যা আছে আমাদের অদৃষ্টে হবে।

ভূপেন আহত কণ্ঠে কহিল, আপনি কি আমাকে এমনিই হৃদয়হীন ভাবলেন যে, আপনাদের এই অসহায় অবস্থায় ফেলে কল্যাণীকে নিয়ে চলে যাবো?···আমিই বিবাহের পর এখানে এসে থাকব।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বিজয় বাবুর মুখে কথা সরিল না। তাহার পর বলিলেন, কিন্তু তোমার বাবা-মা, তাঁরা কি এতে—

না, তাঁরা এতে মত দেবেন না। আমি তাঁদের অমতেই করব।

ক'রে হবে। না, না—সে সম্ভব নয়। সে কোন মতেই হ'তে পারে না—

ভূপেন দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, মনে আছে ত? আর সে কথা বাদ দিলেও, আমার কাছে আপনাদের কোন ঋণ আছে, এ কথা যদি মনে করেন, তাহ'লে আর আপত্তি করবেন না। মনে রাখবেন আমি ভিক্ষা চেয়েছি—

বিজয় বাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর যখন কোন মতে গলা পরিষ্কার করিয়া আবার কথা কহিলেন, তখন তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে,—তুমি সত্যিই দেবতা, তোমাকে আমরা এখনও কিছুই চিনতে পারিনি; এ ত তোমার ভিক্ষা চাওয়া নয়, এ যে ভিক্ষে দেবারই ছল ভাই! কিন্তু আমার যে দুর্নামের শেষ থাকবে না। তোমার বাবা মার অভিশাপ, সকলকার বিদ্রূপ—

হোক না। আমার জন্য এটুকু সইতে পারবেন না? তাঁহার হাতটা ধরিয়া বলিল, ভূপেন।

আমার জন্য ভাবি না ভাই, এমন কি মেয়ের জন্যও নয়। কিন্তু তুমি যদি ব্যথা পাও, তোমাকে যদি মন্দ বলে কেউ?

তার জন্য আমি প্রস্তুতই আছি।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয় বাবু চোখ মুছিয়া কহিলেন,—আরও একটা প্রশ্ন করব। কল্যাণীর প্রতি যদি তোমার সত্যকার স্নেহ না থাকে, এটা যদি শুধুই আমাদের প্রতি করুণা হয়, তাহলে বড় অসুখী হবে ভাই। স্ত্রী যদি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, জীবনে তাহ'লে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকবে না। কল্যাণী সব দুঃখ সইতে পারবে, সে তোমার শুধু সেবা করার অধিকার পেলেই সুখী থাকবে, কিন্তু তোমার পক্ষে সে জীবন হয়ে উঠবে দুঃসহ। অথচ, মনে করে দেখো, কত ভাল পাত্রী পেতে পারতে তুমি—রূপসী, বিদুষী, ধনবানের মেয়ে, তোমাকে পেলে তারাই ধন্য হ'তো। এখনও সময় আছে, ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো···আমার জন্য ভেবো না, না হয়,—না হয় আমি তোমার কাছে ভিক্ষাই নেবো। তোমাকে অসুখী করার থেকে দুর্নামও আমার সইবে।

ভূপেনের যদি বা দ্বিধা থাকিত, তাহা হইলেও এ কথার পর তাহা দূর হইতে দেরি লাগিত না। সে অসহিষ্ণু ভাবেই বলিল, কেন আপনি মিথ্যা আশঙ্কা করছেন, আমি সব দিক ভেবেই মন স্থির করেছি। কল্যাণীকে নিয়ে আমি সুখী হবো বলেই আমার বিশ্বাস।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিজয় বাবু কহিলেন, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হোক ভাই। হয়ত এ ভালই হ'ল। আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনে বলেই আঁক-পাঁক করি।

ভূপেন একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বিয়ের দিন কিন্তু কালই—

কালই? বিজয় বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

হ্যাঁ, তা নইলে অসুবিধা আছে। কোন রকম আড়ম্বর করবার মত ত অবস্থা নেই। শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানই হবে—আচ্ছা, আমি তা'হলে এখন আসি।

[illegible] চুপ করিয়া

রহিলেন। কল্যাণী বাড়ী ছিল না, পানীয় জল আনিতে বাহিরে গিয়াছিল। এখন তাহার ফিরিবার শব্দ পাইয়া বিজয় বাবুর যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিল, গাঢ় কণ্ঠে ডাকিলেন,—মা কল্যাণী, একবার কাছে আয় ত মা।

কল্যাণী তাঁহার কণ্ঠস্বরে ভয় পাইয়া কলসী নামাইয়া কাছে আসিল, কী হয়েছে বাবা?

মা, যা আমি আশা করা ত দূরের কথা, সাহস ক'রে ভগবানের কাছেও চাইতে পারিনি, আজ তাই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন অযাচিত ভাবে। ভূপেন বাবু তোকে বিয়ে করতে চান—তিনি, তিনি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করে ফেলেছেন। এ তোরই তপস্যার ফল মা।

কথাগুলোর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কল্যাণীর বহুক্ষণ সময় লাগিল। সংবাদটা এতই অবিশ্বাস্য, এতই আশাতীত যে, সে বিহ্বল নেত্রে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে যখন কথাটা কিছু মাথায় গেল, তখন শুধু একবার ব্যাকুল ভাবে বলিতে গেল, কিন্তু বাবা—

বাধা দিয়া বিজয় বাবু বলিলেন, সেইখানেই ত সে অত বড় মা। সে তোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না। সেই এখানে থাকবে। তবু কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বিজয় বাবু কিছু উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার হাত ধরিয়া মৃদু একটা টান দিতে সে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া বিজয় বাবুর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল। বিজয় বাবু তাহার মুখটা দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাহার বহু দিনের নিরুদ্ধ বেদনা ও দুরাশা আজ আনন্দ সংবাদের স্পর্শে যখন অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার পরিধেয় বসনের অনেকখানি ভিজাইয়া দিল, তখন তাহার মনটা তিনি পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন।

বিজয় বাবু মেয়েকে বাধা দিলেন না, সান্ত্বনা দিবারও চেষ্টা করিলেন না, শুধু সস্নেহে, নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

বাহিরে আসিয়া ভূপেনের হাসি পাইতে লাগিল। এমন করিয়া নির্লজ্জের মত তাহাকেই তাহার বিবাহের ঘটকালি হইতে উদ্যোগ আয়োজন পর্য্যন্ত করিতে হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল? আর সকলে থাকিতে এমন করিয়া নির্বান্ধব অবস্থায় প্রবাসে এই উৎসবহীন বিবাহ!

হায় রে! বাস্তব যে তাহারই জীবনে এমন করিয়া কল্পনাকে অতিক্রম করিবে, তাহাই বা কে জানিত!

কিন্তু তখন আর দুঃখ করিবারও সময় নাই—ভাবিবারও না। এ যেন কোথা দিয়া কী হইয়া গেল! এরকমটা যে না ঘটিলেই ভাল হইত। তাহা মনে মনে সে-ও যেন অনুভব করিতেছে, অথচ এখন আর পিছানো অসম্ভব। যাহা হইবার হইবে—এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

সে হোটেলে ফিরিয়া গিয়া প্রথমেই রাধাকমল বাবুর কাছে গেল। তিনি তখন সন্ধ্যাপূজা শেষ করিয়া কী একটা বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছেন। অমন উদ্‌ভ্রান্তের মত তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিলেন, কী হে, ব্যাপার কি?

ভূপেন একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া কহিল, আপনার সঙ্গে বিশেষ জরুরী কথা ছিল। একটু মাঠের দিকে আসবেন?

নিশ্চয়ই! বলিয়া রাধাকমল বাবু তাহার পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিলেন, ব্যাপার কি বলো ত ভাই?

কথাটা কোন্ দিক হইতে আরম্ভ করিবে বুঝিতে না পারিয়া ভূপেন কহিল, বিজয় বাবুদের অবস্থা ত সব শুনেছেন। আমিই ওঁদের কিছু কিছু সাহায্য করতুম, তাই চলত। ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব বাবুদের দল রটনা করেন যে, বিজয় বাবু মেয়েকে দিয়ে আমায় ভুলিয়ে টাকা আদায় করছেন!

রাধাকমল বাবু কহিলেন, হাঁ, আমিও এই রকম একটা কি শুনেছিলুম। কিন্তু সে-ত আমরা কেউই বিশ্বাস করিনি ভাই!

আপনি করেননি কিন্তু অনেকে করেছিল। কথাটা বিজয় বাবুর কানে পৌঁছিতে তিনি আমার কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য নেওয়া বন্ধ করেন! অথচ আয় ত ওঁদের মাসিক দশ টাকা মাত্র ত জানেন। একেবারেই উপবাস চলছে ওঁদের, তাতে ক'দিন যে আর বাঁচবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

রাধাকমল বাবু বলিয়া উঠিলেন, বেচারী! বড় ভাল মানুষ আর বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক! ভগবান এই সব লোককেই দুঃখ দেন!... সবই ত বুঝছি ভাই কিন্তু কি করব বলো—আমরাও ত ছাপোষা, এই ক'টা টাকা মাত্র উপার্জ্জন; এতে সংসারই চলে না ভাল করে—

ভূপেন কহিল, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে একটি মাত্র পথ ঠিক করেছি, আমি ওঁর মেয়েকে বিয়ে করব। তাহ'লে ত আর দুর্নামের ভয় থাকবে না!

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণ রাধাকমল বাবুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, অবাক্ হইয়া সেই অন্ধকারেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও ভাই। কিন্তু তোমার বাপ মা? তাঁরা কি রাজী হবেন?

না। আমি তাঁদের অমতেই করব

সেটা কি ভাল হবে ভাই? তাঁরাও অনেক কষ্ট ক'রে তোমাকে মানুষ করেছেন। অবশ্য তোমার উদ্দেশ্য মহৎ—কাজও ভালই করছ, তবু গুরুজনদের নিশ্বাস মাথায় ক'রে শুভ-কাজ করা—

সবই আমি ভেবে দেখেছি পণ্ডিত মশাই। এখন এত দূর এগিয়েছি যে, ও-আলোচনা আর নিরর্থক। ভেবে দেখুন আজকাল ত বহু ছেলেই ভালবাসার জন্য বাপ-মার অমতে বিয়ে করেছে। ধরে নিন্ আমিও কল্যাণীকে ভালবাসি। সে কথা যাক—এখন আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

আমাকে? বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন রাধাকমল বাবু।

হাঁ। আমি আশঙ্কা করছি যে বাবার তরফ থেকে একটা প্রবল বাধা আসবে। তার আগেই আমি এ কাজ সেরে ফেলতে চাই। কালই আমি বিয়ের দিন ঠিক করেছি। কিন্তু এ-সব কথা বেশী লোককে এখন না জানালেই ভাল। আপনি যদি কাল কাজটি সেরে দেন ত বড় ভাল হয়—! ওদের ত কেউ নেই, তাছাড়া টাকা খরচ করবারও সামর্থ্য নেই; সুতরাং আড়ম্বর স্ত্রী-আচার কিছুই হবে না, শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটা সেরে দেবেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধাকমল বাবু কহিলেন

এ কাজ ত কখনও করিনি ভাই—গোপন বিয়ে, শেষে একটা লোকনিন্দার ভাগী হবো না ত ?

ঠিক গোপন বিবাহ যাকে ব'লে এ-ত তা নয়। মেয়ের বাবার মত আছে, সেখানেই হবে। আমার সহকর্মীদেরও আমি বিয়ের আগে জানাবো। মহেশ বাবুর কাছে কাল সকালেই যাবো। এতে আপনাকেই বা নিন্দা করবে কেন ?

আরও কিছুক্ষণ বাদানুবাদের ও যুক্তিতর্কের পর রাধাকমল বাবু রাজী হইলেন। সেইখানে বসিয়াই ভূপেন তাঁহার নিকট হইতে একান্ত আবশ্যকীয় জিনিষগুলির ফর্দ্দ করিয়া লইল। নারায়ণ পণ্ডিত মহাশয় নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন এইরূপ কথা রহিল।

রাত্রে আহারাদির পর ভূপেন বাবাকে, মাকে ও সন্ধ্যাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বাবা-মাকে বেশী কিছু লিখিবার ছিল না, শুধু এ চিঠি যখন তাঁহারা পাইবেন তখন বিবাহ চুকিয়া যাইবে, এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। বধূকে তাঁহাদের আদেশ পাইলে দুই-তিন দিনের জন্ত লইয়া যাইতে পারে—কিন্তু এখন যে তাহাকে এখানেই রাখিতে হইবে, এবং সে-ও শ্বশুর-গৃহে থাকিবে, এটাই জানাইল। উপায় নাই বলিয়াই এ কাজ তাহাকে করিতে হইল—তাঁহারা যেন অপদার্থ ও অকৃতী সন্তানকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যার চিঠিটাই একটু দীর্ঘ হইল। পূর্ব্বাপর সমস্ত ইতিহাসটা জানাইয়া শেষে লিখিল—

'কাজটা ভাল করলুম কি না, তা বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝেছি যে, তোমার কাছে বসে বসে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল ছবি আঁকতুম, তা ছবিই রয়ে যাবে। জীবনে সে সব আর কোন দিন ঘটবে না। উন্নতি করতে গেলে পুরুষকে একাই চল্‌তে হয় জীবনের পথে—দারিদ্র্য আর সংসার, এ দুই বোঝা নিয়ে ওপরে ওঠা একটু কঠিন। যাক্—কী আর করা যাবে! অন্ত লোক কে কী বললে তা নিয়ে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই সন্ধ্যা, তোমার চোখে হয়ত নেমে যাবো বা গেলুম, সে কথাটাই ভাবছি। হয়ত এটাও স্পর্দ্ধা, হয়ত অনেক দিন আগেকার দরিদ্র মাষ্টার মশাইয়ের জীবনে কি হ'ল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার সময়ও নেই—তবু তোমার শ্রদ্ধা হারাবো, এই আশঙ্কাই আজ আমায় সব চেয়ে নার্ভাস্ করে দিয়েছে। যদি এখনও আমার কথা মনে করবার সময় থাকে ত এইটুকু ভেবেই আমাকে মাপ করো যে, দাদুর পায়ের তলায় বসে যে শিক্ষা পেয়েছি, মনুষ্যত্বের সেই বড় শিক্ষার অমর্য্যাদা করিনি আমি। আমি অনেক বড়ো হলে পৃথিবীর মানুষের কী বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তা করতে পারতুম তা জানি না—কিন্তু যে মানুষ চোখের সামনে রয়েছে তার প্রয়োজনের জন্ত সেই নাম-না-জানা ভবিষ্যৎকে যদি বলি দিতে পেরেই থাকি ত তাতে লজ্জা পাবার বা অনুতপ্ত হবার কিছু আছে বলে মনে করি না। শুনেছি, ডাক্তারদের এ একটা বড় পরীক্ষা ছিল আগে যে, কোন বিত্তশালী লোকের বাড়ী আহ্বানে হয়ত চলেছে গাড়ী করে, এমন সময় দেখলে পথের ধারে গাছতলায় একটি দরিদ্র লোক রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছে, তুমি কাকে দেখবে তখন ? দুটোই জরুরী অবস্থা। এই প্রশ্নে যারা 'গাছ তলার রোগীকে আগে দেখব' বলত, তারাই না কি সম্মানে পাশ করত। এ গল্পও দাদুর কাছে শোনা।

যাক্‌গে—এ কৈফিয়তের কোন প্রয়োজনই হয়ত নেই তোমায়—এ কতকটা আমার নিজেকেই বোঝানো।

হয়ত অন্ত কোন ধনী লোকের দারস্থ হ'লেও সমস্তার সমাধান হ'ত—এতটা করবার দরকারই হত না, কিন্তু কী জানি কেন ঠিক ভিক্ষা চাইতে প্রবৃত্তি হল না আর তা-ছাড়া···কী বল্‌ব···হয়ত কল্যাণী সম্বন্ধেও কোন দুর্ব্বলতা ছিল আমার মনে।

মানুষের লোভেরও সীমা নেই—আজ কেবলই সমস্ত মন যেন তোমার উপস্থিতি চাইছে! কিন্তু সে সম্ভব নয় আর তার প্রয়োজনও নেই বলে সময় থাকতে তোমাকে খবর দিইনি।

দাদুকে আমার প্রণাম দিয়ে ব'লো যে, তাঁর আশীর্ব্বাদই আমার জীবনে একমাত্র সম্বল রইল। তাঁর কথা মনে করেই আমি আজ যা কিছু মনে ভরসা পাচ্ছি।

চিঠি কিছু দীর্ঘ হলো হয়ত—কিন্তু তা বলে উত্তর দেবার কোন দায় রইল না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—'

চিঠি শেষ করিয়া ভূপেন যখন আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল, তখন এই কথাটাই বার বার তাহার মনে হইতেছিল যে, সে যেন এইবার সত্য-সত্যই সন্ধ্যার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল, চির-দিনের মত! যতই মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করুক যে ঘনিষ্ঠচিত্তা সন্ধ্যা অনেক আগেই সরিয়া গিয়াছে, তাহার ঔদাসীন্য ও চিঠির সংক্ষিপ্ততাই তাহার প্রমাণ, তবু কোথায় যেন একটা ভরসা ছিল—আজ সমস্তই চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সে আজও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল না—তাহার বিবাহের সঙ্গে সন্ধ্যার কতটুকু সম্পর্ক, তাহাও ভাবিল না, শুধু মনে হইতে লাগিল যে সন্ধ্যার অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসনে সে বসিয়াছিল, সে আসন হইতে চিরতরে নামিয়া যাইতেছে।

তাই সন্ধ্যার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিবার ব্যথাটা যেন নূতন করিয়াই অনুভব করিল। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না—অন্ধকারে এপাশ ওপাশ করিতে করিতে আপন মনেই অস্ফুট কণ্ঠে শুধু তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল,—সন্ধ্যা, সন্ধ্যা!

সকাল বেলা উঠিয়া ভূপেন প্রথমেই মহেশ বাবুর সহিত দেখা করিতে গেল। অত সকালে তাহাকে দেখিয়া মহেশ বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আবার কী? কোথায় আবার কি ফ্যাসাদ বাধালেন?

ভূপেন অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসিল, কিন্তু কোন প্রকার ইতস্তত করিল না, বিনা ভূমিকায় একেবারেই কাজের কথাটা পাড়িল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া সে থামিল, তখন মহেশ বাবু কিছুকাল শুধু অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, মশাই, আপনার সতীর্থরা আপনার আড়ালে আপনাকে কি বলে জানেন? বলে পাগলা মাষ্টার। তা আমি এখন দেখছি যে তারা কিছু মিথ্যা বলেনি। আপনি একটি বদ্ধ পাগল। যা করবেন তাইতেই কি একটা বাড়াবাড়ি আপনার? আশ্চর্য্য!

ভূপেন কোন কথা কহিল না, নত-মস্তকে দূরের চেয়ারের পায়াটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেশ বাবু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পরোপকার

ভাল জিনিষ, কিন্তু তাই বলে আপনার কি দায় মশাই যে, এমন ক'রে সমস্ত ভবিষ্যৎটা মাটি করলেন। উন্নতির আশা রইল না, শ্বশুর-বাড়ী থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা রইল না—এই বয়স থেকে এত-বড় একটা সংসার ঘাড়ে চাপল। শুনেছি ইংরেজীতে একটা কথা আছে ভবিষ্যৎ বাঁধা দেওয়া, আপনিও তাই করলেন। ···আপনি কি মন একেবারে স্থির ক'রে ফেলেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভূপেন জবাব দিল।

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যে দুর্নামটা রটেছিল, তার মূলে কি কোন সত্য আছে ? লজ্জা করবেন না—খুলেই বলুন।

দুর্নামটার মূলে কোন সত্যই নেই, তবে ওঁর মেয়েটির ওপর আমার একটু স্নেহ—বরং ভালবাসাও বলতে পারেন, জন্মেছে বৈ কি !

আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশ বাবু কহিলেন, পরোপকারের জন্ম এত-বড় স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছেন, আপনাকে কী আর বলব ! যান—বরং আমি দেখ্‌ব আস্‌ছে মিটিংএ আপনার কিছু মাইনে বাড়াতে পারি কি না, অন্তত পাঁচ টাকা আমি বললে বাড়াবে বলেই মনে হয়।

ভূপেন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে মহেশ বাবু সহসা প্রশ্ন করিলেন,—ওখানকার উদ্যোগ আয়োজন কে করছে ?

লজ্জিত মুখে ভূপেন কহিল, কেউ ত নেই। পণ্ডিত মশাই একটা ফর্দ ক'রে দিয়েছেন, দেখি যা পাই বাজার করি। ওখানেও ওকেই সব করতে হবে—

ছি ছি ! দেখি দিন আমাকে ফর্দ—আমি সব আনিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে দুপুর বেলা গিয়ে পড়ছি যা হয় আমরাই সব করে-কম্মে নেব।···একে ত এই উদ্ভট বিয়ে, তার ওপর কনে করবে তার বিয়ের যোগাড় আর বর করবে বাজার। ছি ! যান আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন গে। আজ আর কিছু খাবেন না—উপোস ক'রে থাক্‌তে হয়।

মহেশ বাবু যে এতটা করিবেন, তা ভূপেন কখন কল্পনাও করে নাই। কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া গেল, সে হেঁট হইয়া এই প্রথম তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল। মহেশ বাবুও সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, বাহাদুর ছেলে ভাই, হ্যাঁ বুকের পাটা আছে বটে ! এত-বড় কাজ করতে আমাদের সাহসে কুলোত না।

সে প্রায় বাহিরে আসিয়াছে, এমন সময় মহেশ বাবু পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, কিছু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন রাখব ? কাউকে বলতে চান ? মাষ্টার মশাইদের ?

ক্লান্ত কণ্ঠে ভূপেন জবাব দিল, আজ আর কাউকেই জানাতে চাই না। আজ থাক্—

বরং বৌ-ভাতের দিন হবে—এ্যাঁ ? সেই ভাল।

ভূপেন যখন সন্ধ্যার পর একা ক্লান্ত ও উপবাসক্লিষ্ট দেহটাকে কোন মতে টানিয়া লইয়া বিজয় বাবুদের বাড়ী পৌঁছিল, তখন রাধাকমল বাবু আসিয়া গিয়াছেন।

মহেশ বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও একটি দাসী আসিয়াছে, তাঁহারা বিবাহ ও হোমের সমস্ত উপকরণ ইতিমধ্যেই গুছাইয়া ফেলিয়াছেন। মায় বর ও বধূর দুইখানি নববস্ত্রও সংগ্রহ করিতে মহেশ বাবু ভোলেন নাই।

তাহাকে দেখিয়া মহেশ বাবু বলিয়া উঠিলেন, এস এস ভাই ! স্ত্রী-আচার হ'লো না তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু নান্দীমুখটাও বাদ যাবে বলে আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছে। অবিশ্যি বিজয় বাবুকে দিয়ে তাঁদেরটা এক রকম সারিয়ে রেখেছি—যাক্‌ গে কি আর করা যাবে !

ভূপেন স্নান সারিয়াই আসিয়াছিল, কাপড় ছাড়িয়া একেবারে পিঁড়িতে বসিল। ইতিমধ্যে দুই-এক জন প্রতিবেশীও আসিয়া গিয়াছিলেন, মহেশ বাবুই অপরাহ্নে ইহাদের সংবাদ দিয়াছিলেন। কিছু কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী, আর একটি সধবা মহিলা এবং মহেশ বাবুর স্ত্রী বিবাহের সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, মায় স্ত্রী-আচারও বাদ গেল না। অর্থাৎ বিবাহের আনুষ্ঠানিক আয়োজন কিছু যাহাতে বাদ না পড়ে সেদিকে মহেশ বাবু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

ফলে, বিবাহটা যত নিরানন্দময় এবং অদ্ভুত রকমের হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, ততটা হইল না বটে বরং অনেকখানিই সাধারণ বিবাহের মত দেখাইতে লাগিল তবু তাহার মনটা ভার ভার হইয়াই রহিল। কিছুতেই সহজ হইতে পারিল না সে। যে কাজ সে করিতে যাইতেছে তাহা কতটা যুক্তিযুক্ত হইল তাহা আজও জানে না—শুধু এইটা বুঝিতে পারিল যে এ আর কোন মতে ফিরিবে না। যদি হঠকারিতাই হইয়া থাকে ত ইহার ফলাফল তাহাকে আজীবন বহন করিতে হইবে। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব যাহাদের সহিত জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়াছে তাহাদের সকলকে বাদ দিয়া যে মেয়েটির ও পরিবারের সহিত বলিতে গেলে মাত্র দু'দিনের পরিচয় তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘ বাকী জীবনটা সে কাটাইবে কেমন করিয়া ? যদি সুখী না হইতে পারে ? যদি সমস্তটা বিড় না বলিয়া বোধ হয়···হয়ত বা এখনও সময় আছে—এখনও পালানো যাইতে পারে। তাহাতে নিন্দা যতই হোক্—বাঁচিতে পারে সে। এমনিই একটা কিছু করিয়া বসিবে না কি !···এই রকমের নানা উদ্ভট কথা সেই শেষ মুহূর্ত্তেও তাহার মনে আসিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহায় ভাব আসিয়া তাহাকে কেমন বিহ্বল করিয়া তুলিল, মনে হইতে লাগিল যেন কে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছে, বাহিরে কোথাও বাতাস, কোথাও অবসর নাই—

তবু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করা হইল না। এক সময়ে বিবাহের মন্ত্র পাঠ, মায় হোম পর্য্যন্ত হইয়া গেল, বর বধূ বাসর ঘরে উঠিল। জলযোগ—মিষ্টি-মুখের পর অভ্যাগতরাও সকলে চলিয়া গেলেন, শুধু মহেশ বাবুর স্ত্রী ও তাঁহাদের দাসী রহিয়া গেল। কাল সকালের কাজটুকু সারিয়া যাইবেন তাঁহারা, এই কথা রহিল।

বাসর ঘরে জাগিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, বরং শয়নের ব্যবস্থাই হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলে বর বধূ আলাপ করিতে পারিত অনায়াসে কিন্তু সে ইচ্ছা অন্তত ভূপেনের ছিল না। সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, শুইয়া শুইয়া এপাশ ওপাশ করিল তবু কল্যাণীর সঙ্গে কথা কওয়ার কোন চেষ্টাই করিল না। বেচারী কল্যাণী, তাহার নিজের তরফ হইতেই যথেষ্ট ভয় ছিল, এখন ভূপেনের বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বেচারার আশঙ্কা ও উদ্বেগের অবধি রহিল না। তাহার অভিজ্ঞতা কম, তবু নিজের সহজ-বুদ্ধিতে এটা অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছে যে এ ধরণের বিবাহে বর কখনও সুখী হয় না। আত্মীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাহাকে

সারা জীবন কাটাইবে এমন সম্পদই বা তাহার কৈ? নিজের জন্ত সে একবারও ভাবে না, ভূপেনকে স্বামী বলিবার অধিকার পাইয়াছে বলিয়াই সে সৌভাগ্যবতী মনে করে নিজেকে কিন্তু দুশ্চিন্তা তাহার ভূপেনের জন্তই। শেষ পর্য্যন্ত সে জগদ্দল পাথরের মত স্বামীর বুকে চাপিয়া বসিল না ত? পায়ের বেড়ী বলিয়া যদি মনে হয় তাহাকে? সমস্ত রকম সুখ ও সৌভাগ্যের পথে অন্তরায়? তাহা হইলে লজ্জা ও অনুতাপের যে শেষ থাকিবে না, এ পোড়ামুখ কোথায় ঢাকিবে?

এমন করিয়া—যে বিবাহকে প্রণয়-মূলক বলিয়া অনায়াসে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে—সেই বিবাহের বর ও বধূ বিবাহের প্রথম রাত্রিটি পাশাপাশি শুইয়া জাগিয়াই কাটাইল, অথচ কেহ কাহারও সহিত একটি কথাও কহিল না।

রাধাকমল বাবু সেই রাত্রেই হোষ্টেলে ফিরিয়া কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিতে মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অবধি রহিল না। অপূর্ব্ব বাবু সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন বার বার, কেমন? বলিনি? বিজয়কে বুড়ো ভাল মানুষ তোমরা ভাবতে ততটা নয়। কেমন গেঁথে তুললে ছোক্‌রাকে, দেখলে ত? অবিশ্যি রুই গাঁথলে কি পুঁটি গাঁথলে তা বাছাধন টের পাবেন'খন্—তবু 'কালুটি' মেয়েটা ত আপাতত ঘাড় থেকে নাম্‌ল। একমুঠো ভাতের ব্যবস্থাও হ'ল?

অপূর্ব্ব বাবু যা-ই বলুন মাষ্টার মহাশয়দের দল অনেকেই সকাল বেলা অভিনন্দন জানাইতে উপস্থিত হইলেন। মায় ললিত বাবুও, মহেশ বাবু সব ব্যবস্থা করিতেছেন খবর পাইয়া, আসিয়া পড়িলেন। যতীন বাবু কহিলেন, ও-সব শুন্‌ছিনি ভাই, আমাদের খাওয়াটা ফাঁকি দিলে চল্‌বে না। কালকের ভোজটা চাই?

অপূর্ব্ব বাবু পিঠ চাঁপড়াইয়া কহিলেন, বেশ করেছ ভায়া, এই ত মানুষের মত কাজ! তোমার দৃষ্টান্ত দেখে যদি শেখে আজকালকার ছেলেরা ত, মেয়ের বাপরা বাঁচে!

ভূপেন স্মিত-মুখে সকলের কথাই মানিয়া লইল। বিবাহের জন্ত সে পোষ্টাফিসে অতি কষ্টে সঞ্চিত গোটা-কতক টাকা তুলিয়া রাখিয়াছিল, সেইটা সে মহেশ বাবুর হাতে দিয়া কহিল, আপনি ত অনর্থক অনেকগুলো টাকা খরচ করলেন, কালকের খরচটা এই টাকা থেকে চালান। এই ক'জন লোক—যা হয় একটু আয়োজন করুন, আর ছেলেদের জন্ত যদি কিছু রসগোল্লা পাঠানো যায়—

মহেশ বাবু টাকাটা হাতে করিয়া লইয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে যা হয় ব্যবস্থা হবে'খন্। ছেলেদের জন্যও একটা ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি! এখন ত আজকের কাজটা চুকুক।

বাসি বিয়ে সারিয়া ভূপেন ক্লান্ত ভাবে বাহিরের মাঠে আসিয়া বসিল। শ্রাবণের শেষে দিগ্‌দিগন্ত জোড়া মাঠে আর আকাশে যেখানে মেশামিশি হইয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টি নাই অথচ ক'দিন ধরিয়াই এমনি মেঘলা করিয়া আছে। কেমন একটা বিষণ্ণতা চারি দিকে। আরও যেন এই জন্তেই মনটা ভার হইয়া আছে, ভূপেন কিছুতেই কোন উৎসাহ পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে বাড়ীর কথা ভাবিতেছিল। মা আঘাত পাইবেন—বাবার কথা অত সে ভাবে না। তবে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া অনেক কিছু করিতে পারেন। হয়ত বা আসিয়া হাজিরই হইবেন, একটা চেঁচামিচি গোলমাল করাও বিচিত্র নয়—সে সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা বরাবরই আছে। বোনগুলির কথা সে আগে বিশেষ ভাবিত না—এখন তাহাদের কথাও মনে পড়ে। কী আব-হাওয়াতেই না আছে বেচারীরা। না আছে তাহাদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা আর না আছে অন্ত কোন কাজ। মনের বিস্তৃতি লাভ হয়, কূপমণ্ডুকতা দূর হয় এমন কোন ব্যবস্থা নাই তাহাদের জন্ত। কলিকাতার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে অন্ধকার বাড়ীর দুইখানি ঘরে তাহাদের দিনরাত্রি কাটিতেছে, চিরকাল ধরিয়া একই ভাবে। তাহাদের কোন সুবন্দোবস্ত না করিয়া বিবাহ করাটা গর্হিতই হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন করিয়াই হউক্ তাহাদের জন্ত কিছু করিতে হইবে—নহিলে নিজের বিবেকের কাছে এম্‌নি অপরাধী থাকা অত্যন্ত কষ্টকর ...

অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর রাধু ডাকিতে আসিল, জামাই বাবু রান্না হয়ে গেছে, ভেতরে চলুন।

জামাই বাবু! ডাকটা নূতন বটে। মাষ্টার মশাই, এই ডাকেই কান অভ্যস্ত হইয়া গেছে, তাছাড়া নূতন কোন জীবনে যে সে প্রবেশ করিয়াছে এটা এখনও যেন ভাবা যায় না। সে একটুখানি ম্লান হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—বেলা কম হয় নাই।

আহারাদির পর মহেশ বাবুরা চলিয়া গেলেন। কথা রহিল যে পরদিন সকালে আবার তাঁহারা আসিয়া বৌভাত ও ফুলশয্যার উদ্যোগ আয়োজন করিবেন। ব্যাপার যখন সামান্তই তখন আজ হইতে কিছু করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বিদায় হইলে ভূপেন ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল—গত দুই রাত্রির জাগরণ ও ক্লান্তিতে তাহার চোখের দুই পাতা যেন বুজিয়া আসিতেছিল—আর কোন মতেই যেন জাগিয়া থাকা যায় না।...

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমেই মনে পড়িল তাহার কল্যাণীর কথা। আগের দিন হইতে সে বেচারীর সঙ্গে একটিও কথা কওয়া হয় নাই, সে বেচারী যে ভয় এবং দুঃখ দুই-ই পাইয়াছে তাহা ভূপেন বুঝিতে পারিল। বিশেষত এখন বাড়ী একেবারে খালি, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ বাড়ীতে এমন বিষণ্ণ আব্‌হাওয়া লইয়া থাকা যায় না।

সে যখন ঘরের বাহিরে আসিল তখনও তেম্‌নি মেঘলা করিয়া আছে—সন্ধ্যারও বিশেষ দেরী নাই। চাহিয়া দেখিল পিসীমা তখনও ঘুমাইতেছেন, কল্যাণী রান্নাঘরের চৌকাঠে স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া আছে। তাহার সেই বসিয়া থাকিবার দীন ভঙ্গীতে ভূপেনের মন অকস্মাৎ মমতা ও করুণায় ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া চুপি চুপি মিষ্ট-কণ্ঠে ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী চমকিয়া উঠিয়া যেন ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা কহিল না। ভূপেন আবারও বলিল, এখানে এমন করে বসে কেন কল্যাণী, আমার ওপর রাগ করেছ?

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, কল্যাণী কোন উত্তর দিবার আগেই, বাহিরে যেন অনেকগুলি লোকের কথা বলার আওয়াজ কানে গেল। আরও একটু বাদে অতি পরিচিত একটি কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত আহ্বান আসিয়া পৌছিল, মাষ্টার মশাই!

ভূপেন ও কল্যাণী দু'জনেই বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। এ যে সন্ধ্যা!

সত্যই সন্ধ্যা। পিছনে একটি চাকর ও আর একটি মুটের মাথায় বিস্তর জিনিষ চাপাইয়া কৌতুকোজ্জ্বল মুখে সন্ধ্যা আসিয়া ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। ভূপেন কাছে আসিতে প্রণাম করিয়া হাসি মুখে কহিল, চিঠি পেলুম তখন দশটা। তখনই দাদুর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি—কিছু বাজার ক'রে বারোটার গাড়ী ধরে চলে এলুম। এখানের কথা যা শুনেছি, হয়ত কিছুই পাওয়া যাবে না মনে ক'রে বৌভাতের বাজার আমি মোটামুটি করেই এনেছি। আরও ঢের মাল পড়ে আছে ষ্টেশনে, ওরা গিয়ে আনবে। ইস্কুলের ছেলেদের সবাইকে আমি ভাল করে খাওয়াবো আপনি কিন্তু 'না' বলতে পারবেন না। রান্নার লোকও রাত্রের গাড়ীতে আসবে, আর দারোয়ান আসবে কাল ফুলের গহণা নিয়ে।

তার পরই কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, কল্যাণীদি, কথা কইছেন না যে? খুব ফাঁকি দেবেন মনে করেছিলেন না? আমি কিন্তু এ আগেই জানতুম।

সে কল্যাণীকেও একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বুকের মধ্য হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিল। তাহার মধ্যে ছিল এক জোড়া সোনার বালা এবং এক গাছি সরু হার। সস্নেহে ও সযত্নে কল্যাণীকে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, এ যেন আমার [illegible] ভাববেন না ভাই—এ দাদু পাঠিয়েছেন, আশীর্ব্বাদী।

অভিভূত ভূপেন এতক্ষণে কণ্ঠস্বর খুঁজিয়া পাইল। কহিল, এ সব কী করছ সন্ধ্যা? পাগলের মত কত খরচ করেছ?"

অনুনয়ের সুরে অথচ হাসি মুখে সন্ধ্যা কহিল, আজকের দিনটা আর বকবেন না মাষ্টার মশাই, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আপনার বিয়ের খবর পেয়ে কী আনন্দ যে হ'লো তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আজ পাগল না হ'লে কবে হবো বলুন? সত্যি, বিশ্বাস করুন, আমার খুব আনন্দ হয়েছে—বড় খুসী হয়েছি—

কিন্তু ভূপেনের চোখের দিকে চাহিয়া, অকস্মাৎ, মুখের হাসি মিলাইবার পূর্ব্বেই, তাহার সেই আশ্চর্য্য সুন্দর বিস্ফারিত চোখ দুইটির কূল ছাপাইয়া কপোল প্লাবিত করিয়া যেন অনেকক্ষণের জমাট বাঁধা একরাশ অবাধ অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতে কোন মতেই সন্ধ্যা তাহাদের শাসন করিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ

হে রাজকন্যা

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

হে মেঘকন্যা!
কোণের জানালা এখুনি রুধিয়া দিব।
কঠিন মিনতি এই:
দাঁড়ি টানো নয় এইখানেই—
সোণার মৃগের ছায়া-অভিযানে
কভু-না পিছন নিব।
ধবধবে খুব সাদা মনেই—
হে রাজকন্যা!
ফের ডেকে বলি:
আমার কখনো দু'পথ নেই।

এ রাজপুত্র অবাক নায়ক: একরোখা ঘোড়-সওয়ারী—
ছেড়ে যেতে পারে নিমেষে তোমার প্রাসাদ
হাজার-দুয়ারী;
ঝড়ের ঈগল উড়ে চ'লে যায়—
যা-কিছু ঘনায় সমুখে:
হে রাজকন্যা!
দেখো চেয়ে দেখো
একই তীর এই ধনুকে!

হে মেঘকন্যা!
বসুন্ধরার তীরে—
দেখেছ কখনো অলখ তোমার মেঘের মিনার হ'তে:
দুর্বার ঝড়ে তুফান-উতল
অশ্রুনদীর নীরে
কত জীবনের ময়ূরপঙ্খী নাও ভেসে গেল স্রোতে।

দেখেছ কখনো ফিরে—
কারখানা-ঘরে রাজার কুমার
ছেনি ও হাতুড়ি নিয়ে
যখন নিঝুম দিনান্তে মোছে ঘাম:
সে দৃশ্য অভিরাম:
কালীমাখা কালো কুলির পোষাকে
—টুপিটি মাথায় দিয়ে?

হে মেঘকন্যা!
জ্বালো না, জ্বালো না
মেঘমুক্তির দীপ:
ঢের টানা হলো জের,
কপালে আমার আঁকা যে মাটির টীপ:
এখনো পাওনি টের?
দোলা নয় আর কোনোখানেই—
রাজার ঝিয়ারি!
ফের ডেকে বলি:
আপোষে আমার আস্থা নেই।

পৃথিবীর পথে
মুখোমুখী হও
জনতা-গভীর বনে—
নয়, ভুলে যেয়ো—এ' জীবনে!

দস্যি ছেলে

শ্রীউমেশ মল্লিক

ছোট ছেলে সে। বয়স কতই বা হবে তার। পড়া-শুনায় মোটেই মন নেই। বই-শ্লেটগুলোকে মাঠের উপর ছুড়িয়ে ফেলে দিয়ে সারা দিন সে ঘুরে বেড়ায় ঘুঘুর বাসায়, সাপের গর্তে, না হয় পাখীর ছানার খোঁজে। এ জন্যে অবশ্য বাড়ীতে যে তাকে জবাবদীহি করতে হয় না এমন নয়! কিন্তু কে কার কথা শোনে। পড়া-শুনার পরিবর্তে পাখীর ছানা, ঘুঘুর বাসা আর সাপের গর্ত যে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাদের সাড়া না দিয়ে সে কি আর থাকতে পারে?

সে দিন বাড়ীতে পীড়নের মাত্রাটা যেন একটু বেশী হয়েছিল। সুতরাং তাকে বসে থাকতে দেখা গেল চুপটি করে বাড়ীর সামনের বারান্দায়। উদাস চোখে সে চেয়ে আছে নীল আকাশের পানে। আকাশের বুকে একটা শঙ্খচিল পাখা নাড়তে নাড়তে উড়ে চলেছে। তার মনে হতে লাগলো, সে-ও যদি অমন ভাবে উড়তে পারতো তা হলে কি মজাই না হতো। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল একটা বড় রকমের পাখীকে। উড়তে উড়তে পাখীটা এসে বসলো তাদের বাড়ীর সামনের চালাও করা বালীর ঝুপটার উপর। ছেলেটা পাখীটাকে লক্ষ্য করছিলো। এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে পাখীটা হুস্ করে উড়ে গেল। মুখে তার ছেলেটিরই বালির উপর ঘর-করা বাড়ীর মাথার উপরের পতাকার কাঠটা। ছেলেটি পাখীটাকে লক্ষ্য করে যেই দৌড়তে যাবে, পেছন থেকে তার নাম করে কাকে ডাকতে শুনে সে থেমে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলো তার বাবাকে। কি আর করবে বেচারা। মনের দুঃখ তাকে মনেই চেপে যেতে হলো। আবার এসে তাকে বসতে হলো বারান্দার সেই কোণটায়। কিন্তু সে দেখতে ভুললো না পাখীটা কোথায় গিয়ে বসলো।

• • • •

মেঘ করে আসছে। সাদা আকাশটাকে যেন একটা কাল দৈত্য ছুটে আসছে গ্রাস করে ফেলতে। মেঘের ঘনঘটায় লাগলো তুমুল ভাবে উত্তরে হাওয়া। ক্রমে সুরু হলো মেঘে মেঘে ঘষে বাজ পড়ার শব্দ। সে কি ভীষণ! যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করে বিশ্বদেবতা অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করছেন। সেই ছেলেটি খেলার মাঠে থেকে বাড়ীমুখো ফিরে চলেছে। টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগলো। অগত্যা ছুটে এসে সে আশ্রয় নিলো একটা বড় গাছের তলায়। হঠাৎ তার চোখে এসে ধরা পড়লো একটা বড় পাখী। উড়ে এসে বসলো পাখীটা সেই গাছটার ডালে। মনে পড়ে গেল তার সেদিনের সে ঘটনাটা। আর যাবে কোথায়। তর-তর করে সে উঠতে লাগলো গাছের মাথায়।

বৃষ্টি তখন মুসল-ধারে পড়ছে। সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই, সে উঠে চলেছে। একটু বেশী উপরে উঠতেই তার চোখে পড়লো একটা বড় রকমের পাখীর বাসা। সে সেদিক্ লক্ষ্য করে উঠতে লাগল। ক্রমে তার কানে ভেসে আসতে লাগলো পাখীর ছানার কিচির-মিচির শব্দ। কাছে মানুষ দেখে বড় পাখীটা বুক-কাটা চীৎকার করতে লাগলো। ছেলেটি আরো একটু ওপরে উঠলো। বড় পাখী হুস্ করে ওপরের ডালে উঠে পড়ে ভীষণ ভাবে ডাকতে লাগলো। ততক্ষণে ছেলেটির চোখের সামনে জলেভেজা পাখীর ছানাগুলোকে দেখা যাচ্ছে। আনন্দে তার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাত বাড়িয়ে একটাকে যেই পকেটে পুরতে যাওয়া অমনি ফোঁস করে আওয়াজ করে একটা খয়ে-গোখরো মারলো ছোবল বাসাটার ওপর। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে দেখলো যে মাথার উপরে একটা খয়ে-গোখরো দুলছে। লেজটা তার গাছের ডালে পাকিয়ে পাকিয়ে জড়ান।

ছেলেটির অবস্থা তখন সঙ্গীন। মাথার ওপরে গোখরো সাপ ছোবল মারার জন্যে ওত পেতে আছে। রাগে ফুলে ফুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে তার দোল। ফোঁসফোঁসানিও আর তার শেষ নেই। লাফাতে পারা যায় না, নেমে যাবার সময় নেই, সে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। রক্তমুখী ড্রেগনের মত বিভীষিকাময় এ গোখরো সাপের উদ্যত ফণায় তার প্রাণ যেন শুকিয়ে আসছে। কিন্তু মোটেই সে বিচলিত হল না, লক্ষ্য করতে লাগলো সাপটাকে। সাপটা তখন নিষ্ফল ক্রোধে উন্মত্তের মত ছোবলের পর ছোবল মেরে চলেছে। ছেলেটি দেখল, ছোবল মারার সঙ্গে সঙ্গে সাপটা নেমে আসছে তার দিকে। সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সময় বুঝে যেই ছোবল মারা অমনি সে চেপে ধরলো সাপের মুখটাকে। বিন্দুমাত্র দেরী না করে সাপটাও জড়িয়ে ধরলো তার হাতটাকে লেজ দিয়ে। হাতের মুঠোর মধ্যে সাপের প্রাণঘাতী মুখ। যন্ত্রণায় ছটফট করছে হাতের চাপে সাপটা। কি করি কি করি ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল তার পকেটে আম ছাড়াবার ছুরীটার কথা। বাঁ হাত দিয়ে ছুরীটা বার করে বসিয়ে দিলে সে সাপটার গায়ে। ততক্ষণে গোখরো সাপ লেজের চাপে পিষে ফেলেছে ছেলেটির ডান হাতটাকে। ছুরীর ঘায়ে কিছু হয় না দেখে সে নিরুপায় হয়ে সাপের মাথাটাকে কেটে ফেললো দু'ভাগ করে। তার পর একটার পর একটা পাককে কেটে নেমে এল পাখীর ছানাগুলোকে পকেটে পুরে। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। রুধিরাক্ত কলেবরে ছেলেটি পাখীর ছানাগুলোকে পকেটে পুরে বাড়ীর দিকে

[illegible] বাকী

কিয়তে তার ; সে আজ কি বলে কৈফিয়ৎ দেবে। ভাই-বোনেরা, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের ছোট বেলার ঘটনাগুলো থেকে তোমাদের উপহার দিলাম একটা। তোমাদের মত তিনিও ছিলেন বাঙলা মায়ের সুসন্তান, কিন্তু তাঁর সাহসের তুলনা মেলে না।

ভীতু ছেলের কাণ্ড

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যেমন ভীতু তেমনি গোবেচারী ছেলেটি, ডাকে সবাই লুই ব'লে। বাপ তার চামড়ার কাজ করতেন আর ঠাকুরদা ছিলেন এক জন ক্রীতদাস মাত্র। বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড় তেমন নেই, তবে হ্যাঁ, বেশ পরিশ্রমী, হিসেবী আর সব সময়ই খুব সতর্ক। আজে-বাজে সময় নষ্ট করা তার অভ্যাস নয়। এমন কি, খেলাধুলোর সময়টাতে পর্য্যন্ত করত কি,—বাবার চামড়ার কারখানার পাশ দিয়ে যে ছোট নদীটি সমানে ব'য়ে চ'লে গেছে তারই ধারে ব'সে নদীর ছবি এঁকে এঁকে যেমন আমোদ পেতো তেমনি সময়ও কাটিয়ে দিতো। বাবার কারখানাটা ছিলো পূর্ব্ব-ফ্রান্সের আরবয়েস্ ব'লে একটি মফঃস্বল সহরে।

সেবারে হয়েছে কি, আরবয়েসের এক জন কামারের দোকানে রাজ্যের যতো লোকের ভীড় যেন ভেঙে পড়ছে। হৈ-হৈ চেঁচামেচি! নয় বছরের শান্ত ছেলে লুইও ছোটে ব্যাপার কি দেখতে। কিন্তু ভীড়ের ধারে ঘেঁষতেই ব্যাপার দেখে তার ভ্যাবাচাকা লেগে যায়, ছোট্ট ছেলেটির ছোট শরীর ভয়ে আর উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। দেখে কি না,—লাল টকটকে গরম কামারের লোহা নিয়ে এক জন চাষীর শরীরে আর দেহের মাংসের ওপর অনবরত সজোরে ঘা' দেওয়া হচ্ছে। আর তারই শব্দ ঘরখানাময় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। জড়ো-হওয়া লোকেরা সব এ ওর মুখ-চাওয়া-চাযি করে, কানাকানি করে অনেক কিছুই। লুই জানতে পারলে, চাষী লোকটিকে একটা পাগলা নেকড়ে বাঘ ভীষণ ভাবে কামড়েছে, তাই গরম টকটকে লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে তাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে। ভয়ে গলা শুকিয়ে ওঠে লুইয়ের, তাড়াতাড়ি এক ছুটে বাড়ী পালিয়ে এসে যেন বাঁচে সে। সে-রাত্তিরে তার মোটে ঘুম আসে না। কেবলি কামারের বাড়ীর সেই ছবিটা মনে পড়ে আর সেই শব্দ, লোহা নিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার শব্দ তার চার পাশে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। না ঘুমিয়ে ত রাতটা যা' হোক্ ক'রে কাটল। সকালে উঠে শুনলে, সেই চাষী লোকটি মারা গেছে। নিষ্ঠুর লোহার নির্ম্মম ছ্যাঁকা নিষ্ফল হ'য়ে গেছে শুধু। আর জানলে, পাগলা কুকুর বা নেকড়ে বাঘের কামড় থেকে এই যে রোগ এর নাম হাইড্রোফোবিয়া। সে কথা লুই ভুলতে পারেনি বহু দিন। সেই থেকে মানুষের রোগ আর মৃত্যুর ওপর একটা আক্রোশ কেমন যেন তাকে পেয়ে বসে।

লুই ছেলেটি বেশ খাটিয়ে আর মনোযোগী দেখে বাবা তাকে আর নিজের ব্যবসায় না লাগিয়ে স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে তাকে ইচ্ছামত পড়া-শুনা করার সুযোগ দিলেন। ১৮৪২ সালে বিশ বছর বয়সে ফ্রান্সের রয়াল কলেজ থেকে লুই বিজ্ঞানে ডিগ্রী পেলে কিন্তু কেমিষ্ট্রী বা রসায়নবিদ্যায় তেমন ভালো নম্বর না পাওয়ায় ওর মনটা দমে গেল। এর এক বছর পরে প্যারিসের সোরবোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] [illegible] অধ্যাপক জে বি ডুমার বক্তৃতা শুনতে শুনতে লুইয়ের ঝোঁক চেপে যায় এই রসায়ন বিদ্যাতেই। সেদিন এমনি বক্তৃতা শোনার পর [illegible] [illegible] বেরিয়ে আসছে, চোখে তার জল আর মনের মধ্যে কেবল তোলাপাড়া করছে ঐ একটি কথা,—কি সুন্দর কি চমৎকার এই কেমিষ্ট্রী—কি মজার বিজ্ঞান! এই মজার বিজ্ঞানে [illegible] হওয়ার সঙ্কল্প সেদিন তীব্র হ'য়ে ওঠে তার চোখে-মুখে।

আঁকার কাজে আর তার মনও নেই—উৎসাহও নেই। সেই সময়টাও এখন এই মজার বিজ্ঞান রসায়নবিদ্যা [illegible] কাজে কাটে। লুই এইবার নিয়ে পড়ে জীবাণুর জন্ম, ইতিহাস। মানুষের যতো সর্ব্বনাশ যতো ক্ষতি করেছে এবং ক'রে [illegible], এই জীবাণু, তেমন আর কোনো কিছুতেই করে না এবং [illegible] পারে না। যতো মানুষ মরেছে এই জীবাণুর দুষ্ট কবলে [illegible] কখনো কোনো দিন কোনো যুদ্ধেও মরেনি—লুইএর একথা [illegible] তখনকার দিনে বিজ্ঞানী ও সাধারণ লোকে গালে হাত দিয়ে ভাবতে সুরু করলেন। মদ যে প'চে যায়, রকমারি খাবার জিনিষ যে খারাপ হ'য়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, সেও এই এক এক বিশেষ ধরণের জীবাণুর কারসাজি মানুষের রোজকার জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু হোলো এই জীবাণুর দল—যার হাত থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাবার সহজ ও চমৎকার উপায় আবিষ্কার—লুইয়ের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। এবং সেটি দুনিয়ায় পরিচিত 'পাস্তুরাইজেসন্' এই নামে। লুইয়ের উপাধি ছিলো পাস্তুর, এই উপায়ের নামটি তাঁরই উপাধির নাম থেকে জন্ম নিয়েছে। এই উপায়টি তোমরা প্রায় সকলেই জানো; তাই সেকথা এখানে আবার তুলে তোমাদের সময় নষ্ট করলাম না।

গবেষণার পর গবেষণায় দিন কাটে লুই পাস্তুরের। একটানা একঘেয়ে খাটুনী আর মনের মধ্যে ঐ একই কথা, মানুষের দুনিয়াকে বদলাতে হবে অথচ তার জন্যে সময় কত কম। মাত্র এক জনের জীবনে এ কাজ শেষ হবার ত নয়। ল্যাবরেটরীতে ব'সে তিনি পরীক্ষা করেন, অনুশীলন করেন, রকমারি জিনিষ নিয়ে নাড়েন চাড়েন, গবেষণা করেন আর ভাবেন ঐ একই কথা। মানুষের দুনিয়াকে নিরাপদ করতে হবে, সুন্দর করতে হবে, আনন্দময় করতে হবে। যেখানে রোগ-বালাইয়ের ভয় তাকে পঙ্গু করবে না, দিশাহারা করবে না, জীবনকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে না। এই তাঁর ব্রত, এই তাঁর কাজ।

তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। এই ভাবে অনবরত জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেবারে ভীষণ রোগে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লেন তিনি। জীবনের কোনো আশাই কেউ করে না, তবু বহু দিন ভুগে তিনি বেঁচে উঠলেন, সেরে উঠলেন, ফের শক্তি ফিরে পেলেন। তার পর যখন বেশ টের পেলেন যে, তাঁর অনিবার্য্য মৃত্যুর আশঙ্কায় সহকারীরা সব ল্যাবরেটরীর গবেষণায় ইস্তফা দিয়ে কাজকর্ম্ম বন্ধ ক'রে ব'সেছিলো, তখন তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। তাদের বকে-ঝকে একেবারে রসাতল ক'রে তুললেন। কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর একটা দিক্ অক্ষম হ'য়ে পড়লো পক্ষাঘাতের দরুণ, তবু তিনি ল্যাবরেটরীময় ঘুরে বেড়িয়ে ঐ এক কথাই জানাতে থাকেন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের—"দুনিয়া থেকে রোগ-বালাই আধি-ব্যাধি তাড়ানো মানুষেরই কাজ এবং চেষ্টা করলে মানুষ এক দিন না এক দিন একাজে সফল হবেই হবে।" কলেরা ইত্যাদি ভীষণ রোগের

...কাও আবিষ্কার করেন লুই পাস্তুর এবং তাঁর শেষ কীর্ত্তি ঐ হাইড্রোফোবিয়া সারানোর অদ্ভুত উপায়ের আবিষ্কার। দু'-দু'টি বছর ধ'রে সমানে পরিশ্রম ক'রে তিনি এই উপায়টি বের করেন। পাগলা কুকুর কিংবা নেকড়ে বাঘের কামড়ে অস্থির লোক নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো, দুনিয়ার লোক দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ জানালো লুই পাস্তুরকে, কৃতজ্ঞতার প্রকাশে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন তিনি।

১৮৯২ সালের কথা। তাঁর সত্তর বছরের জন্মদিনে উৎসবের আয়োজন হয়েছে সোরবনে। সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীর দল জড়ো হয়েছেন সেখানে পাস্তুরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে, তাঁকে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা জানাতে। নতুন দিনের নতুন বিজ্ঞানীর দলকে, অনাগত ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীকে ডেকে তিনি বললেন—নিজের ওপর বিশ্বাস হারিও না কক্ষনো, মানুষের জীবনে সব সময়ই সফলতা আসে না, তবুও আমি বলবো যে ব্যর্থতার বেদনায় যখন তোমার মন ভ'রে উঠবে তখনো ধৈর্য্য হারাবে না, বিশ্বাস হারাবে না, এই ব্যর্থতার ক্ষণ সত্য নয়। ল্যাবেরেটরী আর লাইব্রেরীর নিরালা কোণে শান্ত নিস্তব্ধতার মাঝখানে শুধু কাজ ক'রে যাবে! প্রথমে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করবে: নিজের শিক্ষার জন্য, জ্ঞান বাড়াবার জন্য উন্নতির জন্য আমি কি করেছি? তার পর নিজের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনে নিজে প্রশ্ন তুলবে: দেশের জন্যে আমি কতটুকু করলুম? তার পর এমন দিন হয়ত আসবে যখন মনে মনে অনবরত তোলাপাড়া ক'রে আর প্রশ্ন ক'রে বেশ তৃপ্তি পাবে: দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যে, বিশ্বের উন্নতির জন্যে কতটুকু কি আমি করতে পেরেছি আর সত্যকার এমনি ধারা কাজ কতটুকু করতে পেরেছি।

এর পর আরো তিন বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ১৮৯৫এর ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিজ্ঞানী বীরের জয়যাত্রা থামলো এই পৃথিবীর বুকে। ছোট বেলার সেই ভীরু ছোট্ট ছেলেটি রেখে গেলেন—মানুষের সব চেয়ে মারাত্মক শত্রু জীবাণুর সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করার আদর্শ ইতিহাস।

সাবালিকা

কুমারী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

ছোট মেয়ে বলে সবাই
ছোট আমি কিসে?
গোবরা মালী বন্ধু আমার
নিবারণের পিশে।
একলা পথে যেতে মানা—
যদিও আমার রাস্তা জানা—
মেলার মধ্যে হারাই না পথ
ভীড়ের সঙ্গে মিশে।
বোনের মেয়ের
মাসী আমি
ভায়ের পোয়ের পিসি!
তফাৎ বুঝি
ধান, গম
তিল এবং তিসি।
তবু কভু বাঁধতে গেলে—
কিংবা হলুদ বাটতে গেলে—

এক মিনিটের গল্প

দেবদূত

মনোজিৎ বসু

বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন অদ্ভুত মানুষ এক দিকে তাঁর মন ছিল যেমন ফুলের মত নরম, অন্য দিকে তাঁর দেহ ছিল যেন লোহা দিয়ে গড়া। ভারী কাজকে তিনি কখনো ভয় পেতেন না, শক্ত কাজকে এড়িয়ে যেতেন না কখনো। পায়ে হেঁটে যেখানে যাওয়া চলে, সেখানে কোন দিন তিনি গাড়ি-ঘোড়া চড়তেন না। এক দিন সেই রকম তিনি হেঁটে চলেছিলেন কালনার পথে।

তাঁর চলার পথের সঙ্গী ছিলেন গিরিশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মশাই। তিনিও এক জন পণ্ডিত মানুষ। দু'জনে তাঁরা কালনা চলেছেন বিশেষ একটা জরুরী কাজে। তাড়াতাড়ি পৌছুতে হবে, তাই বেশ জোরে-জোরে পা ফেলে চলেছেন তাঁরা।

এক জায়গায় এসে তাঁরা হঠাৎ থেমে পড়লেন। দেখতে পেলেন পথের পাশে একটা লোকের কলেরা হয়েছে। সে বেচারা মাটিতে পড়ে রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করছে অসহায় ভাবে। আর, তার পাশেই পড়ে আছে একটা পুঁটুলি! পথের লোক তাকে দেখে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু সাহায্য করবার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছে না। এই তো হচ্ছে রাত-দিন চোখের সামনে। সাধারণ মানুষ আমরা, দূরে দাঁড়িয়ে আমরা কেবল সমবেদনাই জানাতে পারি—কাছে গিয়ে রোগীর পরিচর্য্যা করতে ভয় পাই! কিন্তু অসাধারণ মানুষ যাঁরা—তাঁরা এগিয়ে আসেন দেবতার মত কল্যাণ-হস্ত নিয়ে—সেই করস্পর্শে রোগীর রোগ-যন্ত্রণা দূর হয়, সে প্রাণ পেয়ে বাঁচে।

বিদ্যাসাগর মশাই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সেই লোকটিকে দেখলেন। তার পরক্ষণেই বিদ্যারত্ন মশাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—"আসুন বিদ্যারত্ন, আপনি এই বোঝাটা ঘাড়ে নিন্ আর আমি লোকটাকে কাঁধে তুলে নিই। একে কালনার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, নইলে বোধ হয় লোকটাকে বাঁচানো যাবে না। আসুন, জোরে-জোরে চলুন।" এই ব'লেই তিনি সেই জীর্ণ মলিন ছেঁড়া কাপড়-পরা কলেরার রোগীটিকে অম্লান বদনে কাঁধে তুলে নিয়ে হন্ হন ক'রে হেঁটে চল্লেন। তাঁর পেছনে পেছনে চল্লেন বিদ্যারত্ন মশাই রোগীর সেই বোঝাটি ঘাড়ে ক'রে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পথের লোক চেয়ে দেখল সেই স্বর্গীয় ছবি। যেন কোন দেবদূত মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন মানুষের কল্যাণ কামনায়! বিদ্যাসাগর মশাইকে যাঁরা চিনতেন, তাঁদের চোখে দুঃখে আনন্দে জল ঝরতে লাগলো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা দু' মাইল পথ হেঁটে অবশেষে কালনার হাসপাতালে গিয়ে পৌছুলেন। সেখানে রোগীর চিকিৎসার সকল রকম ব্যবস্থা ক'রে তবে তাঁরা নিজেদের সেই বিশেষ কাজে চ'লে গেলেন। রোগীটি সে-যাত্রায় বেঁচে উঠ্লো।

কর্ত্তব্যের আহ্বানে মানুষ এমনি ক'রে এগিয়ে আসে, ছুটে

মনোজ সান্যাল

প্রবন্ধের নাম দেখে নিশ্চয়ই তোমরা খুব হাসছো,—নয় কি? ভাবছো কি এক আজগুবি জিনিষ! আলোকে না দেখে আবার থাকা যায় না কি! অবশ্য চোখ বুজলে সে কথা আলাদা। কিন্তু খোলা চোখের সামনে ধরা পড়ে না এমন আলোও আছে, পৃথিবীর সব চোখ এক ক'রেও যার টিকি দেখবার উপায় নেই। তবে বৈজ্ঞানিকদের কড়া নজরকে মোটেই ফাঁকি দিতে পারে না কেউ। অদৃশ্য, চোরা আলোও তাই ধরা পড়ে গেছে। সেই কাহিনীই আজ লিখছি। পড়তে পড়তে মনে হবে গল্পের চেয়েও বুঝি বেশী বিস্ময়কর।

তোমরা সকলেই জান যে সূর্য্যের আলোয় কিম্বা যে কোন সাদা আলোয় সাতটা রং লুকিয়ে থাকে, ঠিক যেন সাত ভাই চম্পা। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আকাশের রামধনুতে। রদ্দুরে দাঁড়িয়ে যদি এক-মুখ জল নিয়ে কুলকুচি ক'রে ছিটিয়ে দাও তাহলে দেখবে যে, সেই গুঁড়ি গুঁড়ি জলের ওপর রামধনুর মত সাতটা রং ফুটে উঠেছে,—বেগুনী, নীল, ব্লু, সবুজ, হলদে, কমলালেবু আর লাল, এই সাতটা রঙের সংমিশ্রণেই হয় সাদার জন্ম।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম্ হার্শেল আলোর এই রহস্য আবিষ্কার করেন। পরীক্ষাগারে সূর্য্যরশ্মিকে তিনি একটা কাচের ত্রিশিরের (Prism) ভেতর দিয়ে চালান ক'রে দেন। ফলে আলোর সাতটা রঙের জট আলাদা আলাদা হ'য়ে খুলে ছড়িয়ে পড়ে। এই সাত-রঙা আলোর ফালিটুকুকে বর্ণালী (spectrum) বলা হয়। এর পর স্যার উইলিয়াম একটা তাপমান-যন্ত্র নিয়ে বর্ণালীর প্রত্যেকটা রঙীন আলোর রশ্মির তাপ নির্ণয় করেন। এতে দেখা যায় যে, বর্ণালীর বেগুনী প্রান্তের চেয়ে লাল প্রান্তের তাপ অনেক বেশী। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লাল আলোটুকুর পরেও অন্ধকার জায়গায় আরও অনেক বেশী তাপের অস্তিত্ব ধরা প'ড়ে গেল! এর থেকে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে আলো নেই, সম্পূর্ণ অন্ধকার অথচ কোথা থেকে ওখানে এত তাপ এলো? এই নিয়ে বৈজ্ঞানিক-মহলে ভীষণ হৈ-চৈ সুরু হ'য়ে গেল। তখন প্রমাণিত হোল যে, দৃশ্যমান লালের পাশেই অন্ধকারটুকুতে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য আলো তাপ-শক্তিরূপে লুকিয়ে আছে। এর নাম দেওয়া হোল অবলোহিত রশ্মি (Infra Red Ray) যার মানে লালের পরের রশ্মি।

বৈদ্যুতিক আলো, আগুন কিম্বা যে কোন উৎস থেকেই তাপ আসুক না কেন, তার ভেতর এই অবলোহিত রশ্মি থাকবেই থাকবে। তবে সব চেয়ে জোরালো রশ্মি পাওয়া যায় বিশেষ ভাবে তৈরী টাংস্টেন্ কিম্বা কার্বনের তার লাগান এক রকম বাল্ব থেকে। একে Infra Red Lamp বলা হয় এগুলো দেখতে আমাদের সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের মতই। তবে তা খুবই মৃদু হয়। কিন্তু এর তাপ প্রচণ্ড আর এর রশ্মি যে কো পদার্থের ভেতর অতি সহজেই ঢুকতে পারে। অবলোহিত র এই শক্তিকে কি ভাবে মানুষের কাজে লাগান যায় তাই নি ফন্দিবাজ বৈজ্ঞানিকরা অনেক দিন থেকেই মাথা ঘামিয়ে আসছেন তবে বর্ত্তমান যুগে অবলোহিত রশ্মির খুবই ব্যবহার হচ্ছে; আ যুদ্ধের দরুণ আরও বেড়ে গেছে। তারই গোটাকতক উদাহরণ দিচ্ছি

যুদ্ধের সময় সব জিনিষই তাড়াতাড়ি হওয়া চাই। বিল হ'লে একটুও চলে না। চারি দিকে তখন স্পিডের পাল্লা এমন দিনে কি মানুষ ঢিমে-তেতালার কাজ বরদাস্ত করতে পারে এই ধর না, যেমন সামরিক কারখানায় ট্যাঙ্ক, মোটর লরি প্রভৃতি রং করা হয়; অথচ সেগুলোর রং শুকোতে যদি সূর্য্যের আঁচে কিম্বা উনুনের (oven) আঁচের ওপর নির্ভর করতে হয় তাহলে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাবে। তার কারণ রঙের আস্তর যত পাতলাই হোক্ না কেন, তার ভেতর সাধারণ তাপ ঢুকতে পারে না। তাই ওপরটা যায় শুকিয়ে অথচ ভেতরটা যেমন কাঁচা তেমনি কাঁচাই থাকে। এবার তাই ডাক পড়লো অবলোহিত রশ্মির। কোন কোন বড় কারখানায় ট্যাঙ্ক, মোটর প্রভৃতি রং করা হ'য়ে গেলে সেগুলোকে একটা লম্বা, সরু সুড়ঙ্গ পথে ড্রাইভারেরা চালিয়ে নিয়ে যায়। এই সুড়ঙ্গে সারি সারি অজস্র বাল্ব সাজান থাকে, আর তা থেকে অবলোহিত রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। গাড়ীগুলো যখন দু'-চার মিনিট পরে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে তখন সেগুলো একেবারে শুক্‌নো খটখটে হ'য়ে যায়।

তোমরা সকলেই জান যে, আমাদের দেশে আম, কুল, ওল, মানকচু প্রভৃতি ফল মূল শুকিয়ে রাখার প্রচলন আছে। এতে জিনিষ পচে যায় না অথচ অসময়ে দিব্বি খাওয়া চলে। ইউরোপে এ প্রথা খুবই ব্যাপক। যুদ্ধের দরুণ আরো বেড়ে গেছে। এই ভাবে খাদ্য-দ্রব্য শুকিয়ে রাখা সঞ্চয়ের দিক্ থেকেও যেমন আবার এখানে-ওখানে পাঠানর দিক্ থেকেও ঠিক তেমনি সুবিধাজনক। এক বস্তা আলুকে শুকিয়ে ছোট্ট একটা টিনের ভেতর রাখা যায়। এতে আসল খাদ্যের পরিমাপ সমানই থাকে শুধু ভেতরকার জলটুকু আর থাকে না। আজ-কাল বাজারে এই রকম শুক্‌নো ফল, মাংস, শাকসব্জি প্রচুর পাওয়া যায় এবং সৈন্যদের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রেও পাঠান হয়। এই সব খাদ্য যত তাড়াতাড়ি শুকান যায় ততই এদের ভিটামিন বজায় থাকে। তাই এই কাজে Infra Red Lamp এর উনুন ব্যবহার করা হয়। সাধারণ উনুনে যেখানে দু'-দশ ঘণ্টা লাগে সেখানে এতে লাগে পাঁচ থেকে তিরিশ মিনিট।

এটা তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, গাছ শেকড় দিয়ে মাটি থেকে জলীয় রস টেনে নিয়ে ডালে ডালে, পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দেয়; আর এই করেই তারা বেঁচে থাকে। কিন্তু দুরন্ত শীতে যখন চার দিকের জল জমে বরফ হ'য়ে যায়, তখন গাছপালা বাঁচবে কি ক'রে? আজ-কাল তাই শীতপ্রধান দেশে অনেক কৃষি-প্রতিষ্ঠানে এবং বাগানে ওপরে তার বেঁধে তার সঙ্গে এই ল্যাম্প অনেক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ওর থেকে অবলোহিত রশ্মি এসে গাছের ওপর পড়ে আর সেই জন্যেই শেকড় দিয়ে মাটির রস উঠে অনায়াসেই সারা গাছে ছড়িয়ে পড়তে পারে। নইলে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে গাছ মরে যেত।

আজ-কাল আলোক-চিত্রশিল্পে (Photography) মানুষকে অবাক্ ক'রে দিচ্ছে এই অবলোহিত রশ্মি। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও আলোক-চিত্র তোলা হ'চ্ছে। তবে আর 'আলোক-চিত্র' নামের সার্থকতা রইল কোথায়? বরং এর আর এক নাম 'আঁধার-চিত্র' দেওয়া যেতে পারে,—নয় কি? তবে এই ধরণের ছবি তুলতে হোলে খুব জোরালো ফিল্ম ব্যবহার করতে হয়, যাতে অদৃশ্য রশ্মি চট্ ক'রে ধরা যায়। এই সব ফিল্মকে Infar Red Film বলে।

মনে কর তুমি জঙ্গলে গেছ। চারি দিকে ঘন কুয়াসা,—পাঁচ হাত দূরের মানুষও দেখা যাচ্ছে না। অথচ পাঁচ হাত দূর থেকে একটা দুরন্ত বাঘের ছবি তুমি দিব্বি তুলে নিতে পার, অবশ্য তোমার কাছে যদি এই জোরালো ফিল্ম থাকে। এতে প্রাণের কোনই ভয় নেই। কারণ তুমিও তাকে দেখতে পাচ্ছ না, সে-ও তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না। এদিকে কিন্তু ছবি ঠিক তোলা হ'য়ে গেল। মোটেই এটা হারুন্-অল্-রসিদের গল্প নয়। স্রেফ বিজ্ঞানের কারসাজি। আর এবারকার যুদ্ধে অবলোহিত রশ্মির এই কুয়াসা ভেদ করার ক্ষমতাকে খুব বেশী কাজে লাগান হ'য়েছে। চুপি চুপি কুয়াসার আড়ালে উড়ে গিয়ে বিমান থেকে শত্রুর দেশের ছবি তুলে আনা হ'য়েছে।

অনেক সময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলতে ক্যামেরার লেনসের সঙ্গে এক রকম ছাঁকনি (Filter) জুড়ে দেওয়া হয়। ছাঁকনিটা আর সব রশ্মিকে আটকে দিয়ে শুধু অবলোহিত রশ্মিকেই ক্যামেরার ভেতর ঢুকতে দেয়। এই ভাবে ছবি তুললে ঘাস এবং গাছের পাতাগুলো কেমন এক রকম সাদাটে দেখায়, মনে হয় যেন সব বরফে ঢাকা। আকাশ নরম মেঘে ঢাকা ব'লে ভুল হয়। হলিউডে অনেক সময় Infra Red ফিল্মের সাহায্যে কাঠ-ফাটা রদ্দুরেও ছবিতে চাঁদের আলোর পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্যের নয় কি?

গোয়েন্দা বিভাগে বড় বড় খুনি কিম্বা ডাকাতি কেসে এই ফিল্ম খুবই দরকারি। মূল্যবান্ দলিল-পত্র জাল কি না তাও এর থেকে বোঝা যায়। সাধারণ ফিল্মে তোলা ছবি কিম্বা খোলা চোখকে বেমালুম ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু এই জোরালো ফিল্মে তোলা ছবিতে জাল দলিলে জালিয়াতের হাতের ছাপ পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এই থেকে ক্যালিফোর্ণিয়ার হানটিংটন পাঠাগারের ডাঃ বেনডিক্সন্ বেশ এক মজার ব্যাপার ক'রেছেন। পাঠাগারে একখানা প্রাচীন গ্রন্থ ছিল। কিন্তু বইখানার বেশীর ভাগ জায়গা এমন ভাবে কালি দিয়ে কেটে দেওয়া হ'য়েছিল যে, তার একটি অক্ষরও কেউ পড়তে পারতো না। কোন বিরুদ্ধ কথা লেখা ছিল ব'লেই বোধ হয় বইখানা অমন ভাবে কেটে-কুটে অঙ্গহানি করবার আদেশ দেওয়া হ'য়েছিল তখনকার দিনে। যাই হোক, এত দিন পরে ডাঃ বেনডিক্সন্ বাজেয়াপ্ত লাইনগুলির কবর খুঁড়ে আসল লেখাটি আমাদের কাছে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। এর জন্যে তাঁকে কিন্তু এই জোরালো ফিল্মের সাহায্য নিতে হ'য়েছে। ওপরকার কাটাকাটির কালি ভেদ ক'রে দিব্বি সুড়-সুড় ক'রে ভেতরে ঢুকে গিয়ে আমাদের এই অবলোহিত রশ্মি আসল লেখাটিকে টেনে বার ক'রেছে।

যুদ্ধে শত্রুকে ফাঁকি দেওয়া একটা সামরিক চাল। নানা ভাবে ফাঁকি দেওয়ার কাজ চলে। 'ক্যামোফ্লেজ' তারই একটা কৌশল। এতে কামান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র সবুজ রং করা হয়। বিমান থেকে শত্রুরা কিছুই টের পায় না, কারণ সেগুলো দিব্বি মিশে যায় মাঠের গাছপালা এবং ঘাসের সঙ্গে। তাই বিমান থেকে তোলা সাধারণ ছবি থেকে কামান কিম্বা ট্যাঙ্কের অস্তিত্ব একটুও বোঝা যায় না। কিন্তু Infra Red ক্যামেরাকে মোটেই ফাঁকি দেওয়া চলে না। এর সাহায্যে বিমান থেকে তোলা ছবিতে স্বাভাবিক ঘাস কিম্বা গাছপালা যতটা সাদা দেখায় 'ক্যামোফ্লেজের' সবুজ রং ততটা সাদা দেখায় না,—কেমন যেন কালো লাগে। ফলে সব কারসাজিই ধরা পড়ে যায়। যুদ্ধের দরুণ সামরিক কল-কারখানাগুলোর খুবই প্রসার হ'য়েছে। এমন কি, অনেক কারখানার আয়তন দু'-চার বর্গ-মাইলেরও বেশী। এই বিরাট্ কারখানা পাহারা দেওয়া একটা মস্ত বড় সমস্যা। দু'-দশ জন প্রহরীর পক্ষে পাহারা দেওয়া কি সম্ভব? এবারও তাই ডাক পড়লো অবলোহিত রশ্মির। এই অদৃশ্য রশ্মিকে সাধারণ আলোর মত আয়নায় প্রতিফলিত ক'রে সারা কারখানার সীমানায় বৃত্তাকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর তার সঙ্গে সংযোগ থাকে ঘণ্টার। ঘণ্টার সামনে বসে থাকে প্রহরী। কারখানায় কেউ চুপি চুপি ঢুকতে গেলে অদৃশ্য রশ্মির বৃত্তে ছেদ পড়ে আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে ঘণ্টা। তখনই প্রহরী ছোটে সেই জায়গায় আর খপ ক'রে ধরে ফেলে অপরাধীকে। বেচারী জানতেও পারে না কোথা দিয়ে কি হোল। চোর ধরার এর চেয়ে আর মজার কল আছে কি?

আর নয়,—অদৃশ্য রশ্মির অনেক গুণকীর্তন করলাম। আরো বাকি রয়েছে অনেক। বলবার ইচ্ছে রইল।

বাঁশী

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর সাঁওতাল বাঁশী বাজায়—
বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্তের আঙিনায়—
ওর বাঁশীতে নব নব সুর জাগে।—
উঁস্রিতে আসে ভরা শ্রাবণের প্লাবন।—
শালের বনে ফাল্গুনের শিহরণ লাগে
ওর মনে আনন্দ লোকের বাঁশুরিয়া জেগে ওঠে—
তার সুরে ওর সুর মিলে যায়—
পুলকের ঝর্ণা ঝরে—
আকাশ বলে—ও সুর আমার—
শাল-বীথিকার নব কিশলয় দুলিয়ে—
বাতাস বলে ও আমারই ভালবাসার সুর—
পাহাড়তলীর বিজন গাঁয়ের কুটীরে—
সাঁওতাল মেয়ে কান পেতে ওই সুর শোনে।
রাতের আঙিনা নিশুতি হয়ে ওঠে—
কান পেতে আমিও শুনি ওই বাঁশী—
নিরালা ঘুমের মায়ায় স্বপ্ন হয়ে'—
যেন কে কাছে এসে দাঁড়ায়—
চোখে তার সুদূরতম তারার দৃষ্টি—
মুখে তার—না-দেখা নির্ঝরের অশ্রান্ত মর্মর—
ওই সুরে মিশে আছে—আকাশ আর পৃথিবী—
রাত্রি-দিনের আঙিনায় যারে দাঁড়িয়ে—
তাই বাঁশী বাজায় নিটোল দেহ—কিশোর সাঁওতাল

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তৃতীয়

তীর এবং ধোঁয়া

সুব্রত মিথ্যা বলেনি। সেই মস্ত ভাঙা অট্টালিকার একটা মহলকে মেরামত করে সত্যই সে আবার তার পূর্ব্ব-শ্রী উদ্ধার করেছে। এ অংশটা যেন আলাদা একখানা বাড়ী।

উপরে-নীচে খান-ছয়েক বড় বড় ঘর এবং উপরে-নীচে উঠানের চারি পাশেই আছে বেশ চওড়া দালান। কোথাও অযত্ন বা মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই।

বৈঠকখানা ঘরটির মধ্যে আসবাবের সংখ্যাধিক্য নেই বটে, কিন্তু তার সাজসজ্জার ভিতরে পরিচয় পাওয়া যায় সুরুচির। এক দিকে আছে দু'খানি কৌচ ও একখানি সোফা এবং আর এক দিকে ধবধবে চাদর-পাতা চৌকী, তার উপরে কয়েকটি মোটা-সোটা, শুভ্র ও কোমল তাকিয়া যেন অতিথিদের আহ্বান করছে সাদর মৌন ভাষায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মার্ব্বেলে বাঁধানো গোল টেবিল এবং তার চারি পাশে ঘিরে রয়েছে খান-ছয়েক গদী-মোড়া চেয়ার। টেবিলের উপরে রাখা হয়েছে একটি নীলবর্ণপ্রধান চীনামাটির ফুলদানীতে কয়েকটি রক্ত-গোলাপ এবং ধূম্রসেবকদের ব্যবহারের জন্যে দু'টি কাচের ছাইদান।

দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করছে প্রাচ্য চিত্রকলা-পদ্ধতিতে আঁকা আটখানি ছবি। এখানে বিদ্যুৎ-বাতি নেই বটে, কিন্তু ছাদ থেকে ঝুলছে পেট্রলের এমন একটি বড় লণ্ঠন, যা প্রচুর আলোক বিতরণ ক'রে অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসেই।

ঘরের তিন দিকের জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের পানে তাকালেও এখানকার যা প্রধান বিশেষত্ব, সেই বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ বা আগাছাদের ভিড় চোখে পড়ে না। দেখা যায় স্বধু ঘাসের সবুজ মখমলে মোড়া পরিষ্কার সমতল জমি এবং এখানে-ওখানে ছোট-বড় ফুলগাছদের বর্ণ-বৈচিত্র্য।

সুন্দর বাবু ধপাস্ করে একখানা কৌচের উপরে ব'সে প'ড়ে বললেন, "হুম্! এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য ত্যাগ ক'রে আমরা আবার সভ্য জগতে ফিরে এলুম! দিব্যি ঘরখানি! চোখ জুড়িয়ে যায়!"

মাণিক বললে, "সুব্রত বাবু, জঙ্গল সাফ ক'রে বাড়ীর এই অংশটিকে এমন উপভোগ্য ক'রে তুলতে আপনার তো কম খরচ হয়নি। প্রবাদের কথাই সত্যি—মরা হাতীরও দাম লাখ টাকা।"

সুব্রত একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললে, পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন! আমি একেলে বাঙালী বাবুদের মতন নই মাণিক বাবু! কত যুগ ধ'রে যেখানকার আকাশে-বাতাসে আমার পূর্ব্বপুরুষদের পবিত্র স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, কেমন ক'রে ভুলব সেখানকার মাটির প্রেমকে? তেমন সামর্থ্য থাকলে সমস্ত অট্টালিকা আর উদ্যানের নষ্ট-শ্রী আমার আমি উদ্ধার করতুম, কিন্তু উপায় নেই—উপায় নেই! অট্টালিকার এই একটি অংশকেই বাসোপযোগী করে তুলতে গিয়ে মহাজনের কাছে আমাকে ঋণস্বীকার করতে হয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "সুব্রত বাবু, আপনার উপরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ল! যারা নিজেদের বংশগৌরব আর অতীত মহিমা ভুলে যায়, তারা মানুষ নামের যোগ্য নয়। অথচ বাংলাদেশের যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখতে পাই এমনি অমানুষের দল। তারা আজ নিজেদের গ্রাম ভুলে নবাব আর সহুরে হবার জন্যে কলকাতায় এসে সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল-ক্রিকেট আর হোটেল-রেস্তোরাঁ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। মুখময় তাদের 'স্নো' আর 'পাউডারে'র প্রলেপ, চোখে তাদের সখের চশমা, ওষ্ঠাধরে সিগারেট, হাতে 'রিষ্টওয়াচ,' আর নট-নটীদের ছবি, পরোণে ফিরিঙ্গি পোষাক আর পায়ে মেয়েলি চলনের ভঙ্গি! অথচ তাদেরই অবহেলায় তাদের গ্রাম যে অরণ্যের নামান্তর হতে বসেছে, সে দিকে কারুরই খেয়াল—এমন কি খেয়াল করবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত নেই! আমি এদের কীটপতঙ্গ ব'লে মনে করি—এরা কেবল নরাধম নয়, পশুরও অধম! আপনি যে এ-জাতীয় জীব নন, আপনার মধ্যে যে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, তারই প্রমাণ পেয়ে আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত হলুম ···কিন্তু যাক্ সে কথা। এখন কাজের কথা হোক্। কোদালপুরের মধ্যে এখন সব-চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি কে?"

—"বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে?"

—"সব-চেয়ে ধনী বা প্রতিপত্তিশালী।"

সুব্রত একটু ভেবে বললে, "এখানে এমন কেউ নেই যাকে খুব ধনী বলা যায়। তবে এখানে এমন এক জন লোক আছে স্থানীয় বাসিন্দারা যাকে খুব মানে।"

—"মানে কেন?"

—"ভয়ে।"

—"ভয়ে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। তার নাম প্রতাপ চৌধুরী। সে এক জন দুর্দ্দান্ত লোক। যে তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাকেই বিপদে পড়তে হয়েছে। বার-দুয়েক খুনের মামলাতেও তাকে আসামী হ'তে হয়েছিল, কিন্তু দুই বারেই প্রমাণ অভাবে সে খালাস পায়। এখানকার কোন লোকই তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করে না।"

জয়ন্ত কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, "বটে, বটে? তাহ'লে আরো ভালো ক'রে লোকটির কথা বলুন তো সুব্রত বাবু!"

—"প্রতাপকে চোখে দেখে কিছু বোঝবার যো নেই। বাহ্য

রং, নাদুস-নুদুস বাবাজি চেহারা. সর্ব্বদাই মিষ্টি হাসিমাখা মুখ, এক জামা-কাপড় দু'দিন পরে না—এমনি সৌখীন সে।"

—"তা'হ'লে সে ধনবান্?"

—"এইখানেই একটা আশ্চর্য্য রহস্য আছে। তার পৈতৃক সম্পত্তি নেই. সে নিজেও কোন কাজকর্ম্ম করে না, অথচ তার টাকার অভাব নেই। মাঝে-মাঝে সে বেশ কিছু দিনের জন্যে গ্রাম ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়—কেন যায়, কোথায় যায়, কেউ তা জানে না। প্রতাপের সঙ্গে সর্ব্বদাই এক দল লোক থাকে, সে গ্রাম থেকে অদৃশ্য হ'লে তাদেরও আর দেখতে পাওয়া যায় না। লোকগুলোর চেহারা ভদ্র হ'লেও চাকর-দারবানেরও মত নয়—কিন্তু তারা সকলেই জোয়ান।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দর বাবু, প্রতাপ কি-রকম লোক ব'লে মনে করেন?"

—"সন্দেহজনক।"

—"কেন?"

—"যে অর্থবান্ নয়. অথচ যার অর্থের অভাব নেই, সে লোকের উপরে দৃষ্টি রাখা দরকার। এখানকার পুলিশের কাছে খবর নিলে প্রতাপ সম্বন্ধে হয়তো আরো নতুন কথা জানতে পারব।"

—"তার চেয়ে চলুন না, আমরা নিজেরাই গিয়ে প্রতাপ বাবুর সঙ্গে একটু আলাপ জমিয়ে আসি।"

সুব্রত বললে, "আপনার এ আশা আজ সফল হবে না। আমি এখানে এসেই খবর পেয়েছি. প্রতাপ এখন কোদালপুরে নেই।"

জয়ন্ত বললে, "যাক্, তা'হ'লে আপাতত প্রতাপকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এইবারে স্নানাহারের চেষ্টা করা যাক্।"

সে উঠে দাঁড়াল এবং সেই মুহূর্ত্তেই জানলা-পথ দিয়ে কি-একটা জিনিষ সাঁ ক'রে এসে. তার মাথার পাশ দিয়ে ছুটে দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ঘরের মেঝের উপরে সশব্দে গিয়ে পড়ল।

জয়ন্ত সচমকে জিনিষটার দিকে তাকিয়েই এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মাণিক তাড়াতাড়ি জিনিষটা মাটির উপর থেকে তুলে নিলে।

সুন্দর বাবু সবিস্ময়ে বললেন, "হুম্! এটা যে দেখছি তীর!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ সুন্দর বাবু! ওটা যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারত, তা'হ'লে আর আমার স্নানাহারের দরকার হ'ত না।"

—সুব্রত বললে, "কে তীর ছুঁড়লে? কেন ছুঁড়লে?"

—"কে ছুঁড়লে জানি না। জানলার কাছে এসে তো জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না। তবে কেন যে ছুঁড়েছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। এই কোদালপুরে এমন কোন মহাত্মা আছেন যাঁর ইচ্ছা নয় যে, আমি আর ধরাধামে বর্ত্তমান থাকি।"

—"সে কি জয়ন্ত বাবু, এখানে তো কারুরই আপনার উপরে রাগ থাকবার কথা নয়! এখানে কে আপনাকে চেনে?"

"যাদের চেনা উচিত তারাই চেনে। আমি সোনার আনারসের রহস্য উদ্ধার করতে এসেছি. আমাকে আবার তারা চিনবে না?"

—"তারা কারা?"

—"যারা আপনাকে আক্রমণ ক'রে সোনার আনারসের জড়া চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে, যারা বাগানের কোণে ব'সে আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রেখেছিল, যাদের দেখে ভুলো পাগ্‌লা আর্ত্তনাদ

এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সুন্দর বাবু, মাণিক, আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে—এ শত্রু বড়, সামান্য শত্রু নয়, এরা এখন আমাদের পিছনে পিছনেই ঘুরবে।"

সুন্দর বাবু বললেন, "সুব্রত বাবু, এই বিশ শতাব্দীতেও তীর ছোঁড়ে তো খালি অসভ্য দেশের লোকেরা। আরে ছ্যাঃ, আপনাদের কোদালপুর আমার একটুও ভালো লাগছে না।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দর বাবু, বিশ শতাব্দীতেও সময়ে সময়ে আগ্নেয় অস্ত্রের চেয়ে তীর বেশী কাজে লাগতে পারে। তীর-ধনুক বন্দুকের মতন গর্জ্জন ক'রে পাড়া মাৎ করে না, কাজ সারে চুপিচুপি।... আরে আরে সুন্দর বাবু, আঙুল বুলিয়ে তীরের ফলার ধার পরীক্ষা করছেন কেন? ও তীর যদি বিষাক্ত হয়?"

সুন্দর বাবু আঁৎকে উঠে তীরটা মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "ও বাবা, ঠিক তো! এটা তো আমি ভাবিনি। একটু হ'লেই সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি, হুম্!"

—"যাক্, তীরন্দাজের কথা ভুলে এইবার স্নান-আহার সেরে নেওয়া যাক্। বড়ই বেলা হয়েছে।"

সন্ধ্যার কিছু আগে জয়ন্ত বললে, "সুব্রত বাবু, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

বাইরে বেরিয়ে সুব্রত জিজ্ঞাসা করলে, "জয়ন্ত বাবু, কোন্ দিকে যাবেন?"

—"যে-দিকে প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ী।"

—"কিন্তু সেখানে গিয়ে কি হবে? প্রতাপকে তো পাবেন না।"

—"প্রতাপকে না পাই, তার বাড়ীখানাকে তো পাব।"

—প্রতাপ যখন দলবল নিয়ে অদৃশ্য হয়, তখন তার বাড়ী তালা বন্ধ থাকে।"

—"থাকুক তালা বন্ধ। বাড়ীখানাকে আমি একবার বাইরে থেকে দেখতে চাই। যে কোন বাড়ী তার মালিকের অল্প বিস্তর পরিচয় দিতে পারে।"

সুন্দর বাবু বললেন, "কি যে বল জয়ন্ত. কিছু মানে হয় না।"

—"খুব হয়। একখানা বাড়ী দেখলেই বোঝা যায় তার মালিক কোন্ প্রকৃতির লোক। সে ধনী, না মধ্যবিত্ত, না দরিদ্র? সে সৌখীন, না সাদাসিধে? এমন আরো অনেক কিছুই বাড়ী দেখে আমি ব'লে দিতে পারি।"

—"ইস্, তা'হ'লে আর ভাবনা ছিল না! কারুর বাড়ী দেখেই তুমি ব'লে দিতে পারো সে সাধু, না চোর? সে গাঁজা খায়, না চণ্ডু খায়? যত সব বাজে ধাপ্পা!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দর বাবু, আপনি বড্ড বেশী এগিয়ে যাচ্ছেন, অতটা আমি পারি না।"

মাণিক বললে, সুন্দর বাবু, আপনি ঠিক বলেছেন। আপনার বসত-বাড়ী দেখে জয়ন্ত কিছুতেই বলতে পারবে না যে, তার মালিকের মাথায় আছে কাচের মতন তেলা টাক আর কোমরে আছে মস্ত বড় দোদুল্যমান ভুঁড়ি। হ্যাঁ হে জয়ন্ত, তুমি তা পারবে কি?"

জয়ন্ত হেসে হেসে বললে, "মাণিক, চিরদিনই কি তুমি সুন্দর বাবুকে চটাবার চেষ্টা করবে?"

"হয়, মাণিকের মতন ছ্যাঁচড়ার কথায় আমি আবার না কি রাগ করব ! আরে ছোঃ ! মাণিককে আমি ছুঁচোর মতন বাজে জীব ব'লে মনে করি !"

সুন্দর বাবুকে আরো বেশী রাগাবার জন্যে মাণিক আবার কি বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার সময় আমার নেই। চলুন সুব্রত বাবু, প্রতাপের বাড়ী আমাকে চিনিয়ে দিন।"

সকলে অগ্রসর হ'ল।

কোলাপপুর গ্রামখানি বিশেষ বড় গ্রাম নয়। কাঁচা পথ, তার এধারে-ওধারে মাঝে মাঝে দু' চারখানা মেটে-ঘর এবং মাঝে মাঝে দু'-একখানা কোঠা বাড়ী।

খানিক দূর অগ্রসর হ'লে পাওয়া গেল একখানা লাল-রঙের তিন-তলা বাড়ী। তার চার পাশে আছে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা ন্যাড়া জমি।

সুব্রত বললে, "এই হচ্ছে প্রতাপের বাড়ী।"

সুন্দর বাবু বললেন, "জয়ন্ত ভায়া, তুমি তো বাড়ী দেখে বাড়ীর মালিককে না কি চিনতে পারো ! এ বাড়ীখানাকে দেখে তোমার কী মনে হয় ?"

জয়ন্ত বললে, "আমার কী মনে হয় ? আমার মনে হয়, এ বাড়ীর মালিক অত্যন্ত সাবধানী !"

—"মানে ?"

—"মানে ঐ বাড়ীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় ! প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ীর জানলায় থাকে সোজা চার কি পাঁচটি গরাদে। কিন্তু এ বাড়ীর প্রত্যেক জানলায় দেখছি, সোজা গরাদের সঙ্গে আড়া-আড়ি লোহার গরাদে দেওয়া ! তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ীর মালিক চান যে, বাইরের কোন লোক সহজে যেন এখানে ঢুকতে না পারে ! এতটা সাবধানতার পিছনে নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে !"

সুব্রত বললে, "জয়ন্ত বাবু, প্রতাপের বাড়ী দেখলেন তো ?"

জয়ন্ত বললে, "দেখলুম বৈ কি ! বাড়ীর ফটকে মস্ত এক তালা লাগানো রয়েছে। তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ীর ভিতরে কোন লোক নেই। আচ্ছা, আসুন ! যখন বাড়ীখানাকে পেয়েছি তখন এর চারি দিকটা একবার প্রদক্ষিণ ক'রে দেখা যাক্ !"

—"তাতে আমাদের কি লাভ হবে ?"

—"লাভ ? হয়তো কিছুই লাভ হবে না, তবু আরো কিছুক্ষণ পদচালনা করলে বিশেষ ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা নেই বোধ হয় ?"

সকলে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরে এল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নজরে পড়ল না। বাড়ীর প্রত্যেক জানলা বন্ধ, কোথাও জীবনের কোন লক্ষণই নেই।

গ্রামের উপরে তখন ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। পাখীর দল বাসায় ফিরে গিয়েছে, এখানে-ওখানে গাছের উপর থেকে ভেসে আসছে তাদের বেলা-শেষের কলরব।

জয়ন্ত এক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দর বাবু বললেন "আবার থমকে দাঁড়ালে কেন বাপু ? শেষটা কি অন্ধের মত সাপের খপ্পরে গিয়ে পড়ব ?"

জয়ন্ত চোখ না ফিরিয়েই বললে, "সুব্রতবাবু আপনি তো বললেন, এ বাড়ীর ভিতরে লোকজন কেউ নেই ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বচক্ষেই তো দেখলেন বাড়ীর বাইরে তালা দেওয়া।"

—"তা দেখেছি বটে। কিন্তু এখন আর একটা জিনিষও লক্ষ্য করছি।"

—"কি ?"

—"ধোঁয়া।"

—"ধোঁয়া আবার কি ?"

—"বাড়ীর দোতলার কোণের ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, একটা বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার পর ধোঁয়া।

জয়ন্ত বললে, "ধোঁয়া কি মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে না ?"

মাণিক বললে, "বোধ হয় ওটা রান্না ঘর। কেউ উনুনে আগুন দিয়েছে।"

—"হুঁ। এখন আমাদের কি করা উচিত ?"

সুন্দর বাবু বললেন, "এখন আমাদের কিছুই না করা উচিত। সোজা বাসায় ফিরে চল।"

—"তাই যাব। কিন্তু তার পর গভীর রাত্রে আবার আমরা এইখানেই ফিরে আসব।"

—"কেন ?"

—"বাড়ীর ভিতরটা দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।"

—"দেখব কেমন ক'রে ? দরজায় তো তালা বন্ধ। দরজা ভাঙবে ?"

—"উঁহু। আগে বাইরের প্রাচীর লঙ্ঘন করব।"

—"তার পর ?"

—"তেতলার ছাদ থেকে ঐ যে বৃষ্টির জল বেরুবার নলটা মাটির দিকে নেমে এসেছে, ঐটে অবলম্বন করে সোজা ছাদের উপরে গিয়ে উঠব।"

সুন্দর বাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললেন, "বল কি হে ? ও-সব আমাকে দিয়ে হবে-টবে না বাপু ! তার পর যদি ফস্ ক'রে হাত ফস্কে—উঃ !" তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না, শিউরে উঠে দুই চক্ষু মুদে ফেললেন।

জয়ন্ত বললে, "আপনি সুব্রত বাবুর সঙ্গে বাসাতেই থাকবেন। আমার সঙ্গে আসবে খালি মাণিক।"

মাণিক বললে, "রাজি।"

[ক্রমশঃ।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

১৫

চাণক্য কাজে নামতে বললেন আর চন্দ্রগুপ্ত ও শকটাল্ তাতে আনন্দের সঙ্গে সায় দিলেন বটে, কিন্তু কাজে লাগার ব্যাপারটা যে কত কঠিন, তা সকলেই বুঝেছিলেন। তাই চাণক্য ধীরে ধীরে তাঁর কাজের পদ্ধতি খুলে বলতে লাগলেন, সবাই শুনলেন তা মন দিয়ে ও মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন সেই পথে চলতে।

সে রাত্রির মত মন্ত্রণাসভা শেষ হ'ল। এর পর আরম্ভ হ'ল আসল কাজ। প্রথমেই [illegible]

ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতকের কাছে দূতরূপে। ইন্দুশর্ম্মা ছদ্মবেশ ধরতে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি এক ক্ষপণকের বেশে গেলেন পর্ব্বতেন্দ্রের কাছে। ম্লেচ্ছেরা সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে খুব খাতির করত। নগ্ন জৈন সন্ন্যাসীর বেশে ইন্দুশর্ম্মা যখন তাঁর রাজধানীতে পৌঁছুলেন, তখন তাঁর খাতির দেখে কে! বিশেষতঃ ইন্দুশর্ম্মা খুব ভাল জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক জানতেন। কাজেই রাজসভায় দু'-চার জন মন্ত্রি-সেনাপতির অতীত ভাগ্যফল পটাপট্ বলে ফেলতেই ম্লেচ্ছরাজ ত তাঁকে দেবতা ভেবে নিলেন। এর পর যা ঘটল তা আর খুলে বলবার দরকারই করে না। কারণ পর্ব্বতেশ্বর ক্ষপণকবেশী ইন্দুশর্ম্মাকে নিয়ে নির্জ্জনে মন্ত্রণার ঘরে ঢুকলেন—সেখানে অন্য লোক দূরে থাক—প্রধান মন্ত্রী, যুবরাজ বা মহারাণীর পর্য্যন্ত ঢোকবার হুকুম রইল না। ইন্দুশর্ম্মা পর্ব্বতকের হাত দেখেই বললেন—'মহারাজ! আর্য্যাবর্ত্তের আধিপত্য যে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে—হাতে তার চিহ্ন জল-জল করছে'! পর্ব্বতরাজ ত একথা শুনে আহ্লাদে আটখানা—তাড়াতাড়ি ইন্দু শর্ম্মার পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন—'কিন্তু প্রভু! এ সম্ভব কি ক'রে হ'তে পারে? নন্দরাজারাই ত সারা আর্য্যাবর্ত্তটা গিলে রয়েছে। আমি ছোট-খাট ম্লেচ্ছ রাজা—আমার কি সে সৌভাগ্য হবে কখনও'? ইন্দুশর্ম্মা—'মহারাজ। সন্দেহ করবেন না আমার কথা কখন মিথ্যা হয় না। নন্দরাজাদের সঙ্গে আপনার যুদ্ধ বাধ্‌বে খুব শীগ্‌গির। আর সে যুদ্ধে আপনার জয় নিশ্চিত'। পর্ব্বতক আনন্দে বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বললেন—'বলেন কি, প্রভু! এ কি সম্ভব! এও কি কখন বিশ্বাস করা যায়'। ইন্দুশর্ম্মা গোড়া থেকেই গম্ভীর।—'বিশ্বাস করুন মহারাজ! আপনার সহায় পাবেন খুব বড়'। পর্ব্বতেন্দ্র—'এমন কে সহায় হ'তে পারে আমার যে, নন্দরাজাদের সঙ্গে লড়্‌ব? তবে হাঁ—সম্ভব হ'ত যদি নন্দদের সেনাপতি মৌর্য্য রাজাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন—তা'হ'লে সেনারা সব তাঁরই দিকে ফিরত—এই একটি সুযোগ ছিল বটে! কিন্তু সে ত সব ধুয়ে-মুছে গেছে। শুনেছি—মৌর্য্য সবংশে লোপ পেয়েছে। তবে আর কার ভরসা'। এবার ইন্দুশর্ম্মা মৃদু হেসে বললেন—পর্ব্বতরাজ! তুমি ভুল শুনেছ। মৌর্য্য বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তাঁর ছোট ছেলে চন্দ্রগুপ্ত আজও বেঁচে আছে। মহামন্ত্রী শকটাল্ তাকে সাহায্য করছেন। রাজাদের সেনারা নানা কারণে নন্দবংশের উপর চটে আছে। তা'দের যারা মাথা তারা চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করতে চায়। প্রায় চোদ্দ-আনা সেনাই বিদ্রোহে রাজী। তার পর ঋষিতুল্য কৌটিল্য নিজে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ নিয়েছেন। এইবার যদি তুমি একবার তোমার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়—নন্দবংশ চোখের পলকে নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে'।

এবার পর্ব্বতক গম্ভীর হ'য়ে বললেন—'সব বুঝ্‌লুম, সন্ন্যাসী, কিন্তু আপনি কে? আপনি এত কথা কি ক'রে জানলেন? আপনি যে নন্দরাজাদের চর নন তা বিশ্বাস করি কি ক'রে'। ইন্দুশর্ম্মা—'আমি আপনাকে মহামন্ত্রী শকটাল্, মহর্ষি চাণক্য আর চন্দ্রগুপ্তের হাতের লেখা পত্র ও আঙটি দেখাচ্ছি, তাহ'লে বিশ্বাস হবে ত'! পর্ব্বতক—'নিশ্চয়! মহর্ষি চাণক্য ত শুনেছিলুম হিমালয়ে তপস্যায় গিয়েছিলেন—তিনি কি সত্যিই ফিরে এসেছেন'? ইন্দুশর্ম্মা—'শুধু ফেরেননি—তিনি নন্দবংশ ধ্বংস করতে কোমর বেঁধে [illegible]

করেছেন—আপনার সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস হ'লে আর্য্যাবর্ত্তের অর্দ্ধেক রাজ্য আপনাকে দেওয়া হবে'।

পর্ব্বতক সসম্ভ্রমে চাণক্যের চিঠি মাথায় ঠেকালেন—বললেন—'আমি রাজি আছি, সন্ন্যাসী! আপনি প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে বলবেন—'পর্ব্বতক তাঁর শ্রীচরণের দাস—যখন যা আদেশ করবেন, তাতেই সে রাজি আছে'। বলেন ত আপনাকে আমি চিঠি লিখে দিই'।

ইন্দুশর্ম্মা—'মহারাজ! এখন খোলাখুলি কিছু লিখ্‌বেন না—আপনি মুখে যা বললেন—সেইটুকুই লিখিয়ে দিন একখানা চিঠিতে—পরে তাতে আঙটি দিয়ে শীলমোহর ক'রে দেবেন'

ব্যবস্থা পাকাপাকি হ'য়ে গেল। ঠিক রইল—যথাসময়ে খবর পেলেই পর্ব্বতক নন্দ-রাজ্য আক্রমণ করবেন—এর মধ্যে তিনি গোপনে তোড়জোড় শুরু ক'রে দেবেন—তবে অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁকে দিতে হবে। ইন্দুশর্ম্মা তাঁকে বুঝিয়ে হাত ক'রে বিদায় নিলেন।

● ● ● ●

এদিকে চাণক্য নিজে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন না। শকটালকে দিয়ে রাজ্যের সব সেনানায়কদের ডাকিয়ে আনলেন। শকটালের প্রাসাদে মাটির নীচে গুপ্ত মন্ত্রণার ঘরে বৈঠক বসল গভীর নিশীথে। চন্দ্রগুপ্ত নিজে দোরে পাহারা রইলেন—অস্ত্র হাতে।

নন্দরাজাদের সৈন্যবল ত বড় কম ছিল না। ছয় লক্ষ পদাতি, আশী হাজার অশ্বারোহী, আট হাজার রথ আর ছয় হাজার হাতী…। এ বিপুল সৈন্যদলের সন্ধান পেয়েই ত সেকেন্দর তখনও পঞ্চনদ সিন্ধু পার হ'য়ে ভারতের অন্তরে প্রবেশ করতে সাহস করছিলেন না। বার জন সেনাপতির অধীনে এই বিরাট সেনা চলত ফিরত। বার জনের মধ্যে দশ জন শকটালের কথায় ভিজে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন। সে দশ জনই রাতের বৈঠকে উপস্থিত। বাকী দু'জনের এক জন ছিলেন নিমরাজি—অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের জিত হবার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি রাজার পক্ষ ছেড়ে দেবেন—এই ছিল তাঁর মনের ভাব। তাই তাঁর দোনামনায় সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে চাণক্য তাঁকে এ মন্ত্রণা সভায় ডাকেননি। আর এক জন ছিলেন নন্দরাজাদের বিশ্বস্ত সেনাপতি। ইনি নন্দরাজাদের পুরোনো কূট কৌশলী মন্ত্রী রাক্ষসের নিকট-আত্মীয়। মৌর্য্যকে সবংশে মেরে ফেলবার পর ইনিই হয়েছিলেন নন্দরাজাদের প্রধান সেনাপতি। প্রায় সিকি ভাগ সেনা তাঁর অধীন। রাক্ষসের দলের লোক ব'লে চাণক্য এঁর কাছে কোন কথাই প্রকাশ হ'তে দেননি—কারণ তাহ'লে তাঁদের গোপন ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই ভেস্তে যেত।

ইন্দুশর্ম্মা পর্ব্বতরাজের কাছ থেকে ফিরে এসে দেখ্‌লেন—চাণক্যের মন্ত্রণা-সভা ব'সে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে প্রণাম ক'রে গুপ্ত ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। ইন্দুশর্ম্মা সেই আধ-আলো আধ-আঁধার ঘরে ঢুক্‌তেই তাঁর পিছনে পুরু লোহার কপাট নিঃশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল।

সভার মাঝখানে একটি আসনে চাণক্য নিজে ব'সে। এক পাশে শকটাল—অন্য পাশের আসনখানি খালি—ইন্দুশর্ম্মার জন্যেই তা পাতা ছিল। ব্রাহ্মণ ধীর-গম্ভীর ভাবে এগিয়ে গিয়ে নীরবে সে আসনে বসলেন। সামনে দশখানি আসনে দশ জন সেনাপতি চুপ [illegible] ইন্দুশর্ম্মা বসবার পর চাণক্য নিঃশব্দে তাঁর

ডান হাত তুললেন। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ইন্দুশর্ম্মাও মৌনভাবে ঘাড় নাড়লেন। দুই বন্ধুতে ইশারায় যে কি কথাবার্ত্তা হ'ল—তা সেনানায়কদের কাছে হ'য়ে রইল হেঁয়ালি। তাঁরা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছেন দেখে চাণক্য বললেন—'বীর নায়কগণ! ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতক আমাদের সাহায্য করতে রা'জ হয়েছেন—আমার বন্ধু ইন্দুশর্ম্মা এইমাত্র সে সুসংবাদ নিয়ে এলেন। এখন আপনারা আপনাদের মতামত স্পষ্ট প্রকাশ করে বলুন':

সেনানায়করা কেউ কথা কইলেন না। তবে সকলের যিনি প্রাচীন তিনি উঠে নিজের তরোয়ালখানি চাণক্যের পায়ের তলায় রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্ত সেনাপতিরাও একে একে নিজেদের অস্ত্র চাণক্যের পায়ের তলায় রেখে প্রণাম করলেন। এবার চাণক্য আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রদীপটি উজ্জ্বল করে দিয়ে সেই আলোয় তাকালেন একে একে সেনানায়কদের মুখের পানে। সে কঠিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বড় বড় বীরহৃদয়ও কেঁপে উঠতে লাগল—কি ভীষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! —নিয়তির মতই নিশ্চয়—বিধিলিপির মতই অভ্রান্ত। ভাল ভাবে পরীক্ষা করে চাণক্য বললেন—'উত্তম! নিজের নিজের অস্ত্র তুলে নিন সকলেই। মনে রাখবেন—বিশ্বাসঘাতকের নিস্তার নাই চাণক্যের কাছে। আজ হতে এক পক্ষের মধ্যেই রণক্ষেত্রে নামতে হবে। শকটাল্ সে দিন আপনাদের জানিয়ে দেবেন আজ এই-খানেই শেষ। আপনারা বিদায় নিতে পারেন'!

এবার সেনানায়কেরা চাণক্য ও ইন্দুশর্ম্মার পায়ের ধুলো নিলেন। শকটাল্ সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। বদ্ধ লোহার দরজা খুলে গেল। চন্দ্রগুপ্তের সামনে গিয়ে সকলে তরোয়াল কপালে ঠেকিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে অভিবাদন জানালেন। চন্দ্রগুপ্তও মাথা নীচু করে প্রত্যভিবাদন করলেন। অন্ধকার রাত্রিতে ছায়ামূর্ত্তির মত ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন সেনানায়কেরা।

দোর বন্ধ করে এবার চন্দ্রগুপ্ত ভিতরে ঢুকলেন। এখন কিন্তু চাণক্য আর স্থির ছিলেন না—অত্যন্ত অস্থির হয়ে ঘরের এধার থেকে ওধার পায়চালি করছিলেন। ইন্দুশর্ম্মাই প্রথম তাঁর কাজে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'সখা! আর কেন অস্থিরতা! বার ত রণে নাম্‌তে হবে—এ চাঞ্চল্য রণক্ষেত্রেই দরকার হবে'।

চাণক্য হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—সখা। তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে নবনন্দের এক জন যোগনন্দ—সে হচ্ছে মহাযোগী মহাপণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত। রণজয় সম্বন্ধে আমার কোন আশঙ্কাই নাই আমার ভয়—এই ইন্দ্রদত্তকে। এ যুদ্ধে আহত হ'লেও নিজের শরীর বদলে ফেলে বেঁচে যাবে। নূতন যে শরীর সে নেবে—সে শরীর হয়ত তোমরা কেউ চিন্‌বে না—সুযোগ বুঝে তোমাদের অসতর্ক দেখে সে আবার শত্রুতা আরম্ভ করবে। অস্ত্রে মৃত্যু তার হবে না—তাকে মারতে হ'লে দৈব-ক্রিয়ার দরকার কিন্তু সে যদি কোন গুরুতর অপরাধ না করে—দৈবকৃত্যের সুযোগ ত মিলছে না। এই হচ্ছে আমার অস্থিরতার কারণ'।

এবার শকটাল্ বললেন—'কি ভাবে তার অপরাধ হবে—তার একটা আভাস দিতে পারেন'?

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন—'মন্ত্রিবর! একবার যোগনন্দের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হতে পারে কি? অবশ্য আমার পরিচয় সে যেন আগে হ'তে জানতে না পারে'!

চন্দ্রগুপ্ত এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলেন। সুবিধা বুঝে তিনি বললেন—দিন তিনেক বাদে আগামী ত্রয়োদশীর দিন নন্দরাজাদের বাড়ীতে বার্ষিক শ্রাদ্ধ আছে। আমার উপর ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণের ভার আছে। সেই দিন যোগনন্দের সঙ্গে প্রভুর দেখা করিয়ে দেবার ভার ত মন্ত্রী মশায় নিতে পারেন'।

শকটাল্ ঘাড় নেড়ে জানালেন—ব্যবস্থা হ'তে পারে।

আনন্দে চাণক্যের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন—'আমি বুঝতে পারছি—ত্রয়োদশীর শ্রাদ্ধই যোগনন্দের কাল হ'য়ে দাঁড়াবে। মন্ত্রিবর! যোগনন্দের পরমায়ু আর সাত দিন মাত্র। সখা! একটা অভিচারের আয়োজন করতে থাক। ত্রয়োদশীর রাত্রেই হয়ত তোমায় মারণযাগে ব্রতী হ'তে হবে'।

ইন্দুশর্ম্মা—'আমি ত সদাই প্রস্তুত'।

[ক্রমশঃ।

নূতন পাঠ

হেমেন মল্লিক

সব চেয়ে ভয়ানক ভয়াবহ বল কে—?
কারে দেখে প্রাণ কাঁপে ভয়ে আর চমকে?
ভূত, প্রেত, দানা, জীন, আঁধারের আপদে?
অথবা বনের ভীতি প্রাণঘাতী শ্বাপদে?
পশু করে প্রাণনাশ, ভূতে ঘাড় মটকায়
আঁধারেতে জীন এসে কলিজাটা চটকায়!

মনগড়া মিছে কথা, এতে কেউ ভুল না
মানুষ-ই ভীষণ অরি, নাহি তার তুলনা!
নখে, দাঁতে ছেঁড়া কাটা মানুষের নহে কাজ;
শোণিত-পিপাসু নহে, থাকে না সে বনমাঝ,
লুকায়ে লোভের দাঁত, হিংসার নখরে
হিংস্র মানুষ ফেরে সমাজে ও নগরে!

বল দেখি ছেলে-মেয়ে সব চেয়ে ভালো কে—?
ভয়াবহ দুখ-রাতি ভরে দেয় আলোকে?
সব চেয়ে ভালোবাসে, ভরে স্নেহ আদরে
নিশীথে শীতের ঘুমে, ঢাকে লেপ-চাদরে?
পরী? স্বরগের দূত? স্বপনের সাথীরা?
ফুল ফল? চাঁদ? তারা,—আকাশের বাতিরা?

এ-ও জেনো ভুল, ওরা তোমাদের জানে না,
মানুষের দুখ-সুখ ওরা কিছু জানে না।
মানুষ-ই সবার ভালো মানুষের জগতে
সুখে, দুঃখে, শীতে, তাপে, আষাঢ়ে ও শরতে!
বুক-ভরা প্রেম লয়ে দরদে ও মমতায়
মানুষ-ই ভরেছে ধরা স্বরগের বারতায়!

শ্রীতারানাথ রায়

চক্রব্যূহে বৃটেন—

দুনিয়ার সব দিক থেকে বৃটেন আক্রান্ত হয়েছে প্রত্যেক যুদ্ধ—নেপোলিয়ানের সময়—১নং কুরুক্ষেত্রে। ছলে বলে কৌশলে ধূর্ত্ত ইংরেজ দুনিয়ার সেরা জাত হয়েছিল সম্পদে ও হাতিয়ারে। ১ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গমাইল সাম্রাজ্য আর ৪৫ কোটি পদানত প্রজা তার ভয়ে থরহরি কাঁপত। আজ? এশিয়ার প্রজারা বলছে—দূর হও! ইংরেজরা বুঝতে পারছে, ১৯৪৬ সালে ভারত এমন একটা ঘা দেবে, যাতে তার বুটো প্রতাপ ধরে যাবে। দর্পী ইংরেজ দেখছে রুশিয়া বিজয়ী বলদর্পী—আদর্শপন্থী রুশিয়া এশিয়া ও য়ুরোপে আজ শ্রেষ্ঠতম শক্তি। এ-শক্তি বৃটেনের জীবন-সায়র ভূমধ্যসাগরের উপর চাপ দিচ্ছে বড় জোর। রুশিয়া চাচ্ছে ইংরেজের প্রাচ্যের লুণ্ঠন-ক্ষেত্র আর বাস্তু-ক্ষেত্রের মাঝখানে দুর্ভেদ্য দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে।

পশ্চিম-ইউরোপ—

ভূমধ্যসাগর-তটে রুশ প্রভাব-মণ্ডল দুর্ব্বল করবার জন্ত ইংরেজরা গ্রীসে অনেক কৌশল অবলম্বন করছে। ওখানে প্রধান দল তিন—পপুলিষ্ট, সেণ্টার ব্লক, লিবারাল। নির্ব্বাচনে পপুলিষ্ট বা রাজপন্থী দলই বেশী ভোট লাভ করেছে।

গ্রীক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মস্কো বেতার-কেন্দ্র বলেছেন—অপবাদ প্রচার করে বা ভয় দেখিয়ে ভোটারদের জোর করে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে। রাজপন্থীদের পক্ষে ভোট না দিলে সরকারী কর্ম্মচারীদের চাকরী যাবে, এমন ভয়ও দেখান হয়েছে।

গ্রীসে এমনি করে ইংরেজের কারসাজি চলছে। কিন্তু গ্রীস ছাড়া অন্ত বলকান দেশগুলোতে সোভিয়েট-প্রভাব বেড়ে চলেছে। ইরাণী-পেট্রোল ত রুশিয়ার করতলগত, এবার লেভাণ্টের তৈল-পাইপের উপর তার নজর। সোভিয়েট-কূট-প্রভাবে আরব-লীগ মেতে উঠেছে। তারা তুর্কীকে চাপ দিচ্ছে যাতে দার্দ্দেনেলিসে রুশিয়ার প্রভাব সে অস্বীকার না করে। সোভিয়েট সাঙ্গাত যুগোশ্লাভ-নেতা টিটো আড্রিয়াটিক-তটের ট্রিয়েষ্ট বন্দর আজও চাচ্ছে। ট্রিপোলিটানাতে রুশরা অছিগিরি করবার জন্ত জিদ ধরেছে।

রুশ-আওতায় পোল্যাণ্ড—

পোল্যাণ্ড রুশ-আওতায় স্বাধীনতা কেমন পেল, তার আভাস আজও গঠনকার্য্য শেষ হয়নি। স্বাধীনতা বলতে কি তার স্বাদ পোলরা এখন পর্য্যন্ত পায়নি। ওখানে প্রায়ই রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড চলছে। সোভিয়েট-অধিকারে আজ বিভিন্ন পোলদলের আদর্শ-বাদী সংগ্রাম লেগেই আছে। পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ-পূর্ব্বের সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর মধ্যে যুদ্ধে নিহত হয়েছে ১ কোটি। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ত সেদিন পোল সরকারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন যে, পোল কমুনিষ্ট সরকারের গুপ্ত পুলিশ পোল-নির্ব্বাচকদের রীতিমত ভয় দেখাচ্ছে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালিয়ে। হত্যা চলছে পোল পেজেণ্ট পার্টি বা কৃষাণ দলের উপর। এ দলের নেতা সহঃ প্রধান-মন্ত্রী ষ্টানিস্লস্ মিকোলাজিক্। মিকোলাজিক রুশিয়ার মিত্র হতে নারাজ নন, তবে রুশিয়ার পদানত তিনি কিছুতেই হতে রাজি নন। মিকোলাজিক (৪৭) চাষীর ছেলে। যে দেশের শতকরা ৭৫ জন কৃষক, সে দেশে তিনি কৃষকদের প্রিয়তম নেতা, তাদের প্রতিনিধি—তাদের মুখপাত্র। তাঁর একটা দোষ—তিনি অতিমাত্রায় সাবধানী চালে কোন একটা পথ বেছে নেবার সময় করে ফেলেন ইতস্তত। গেল যুদ্ধে তিনি হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যান, সেখান থেকে ফ্রান্সে। নাৎসীরা তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে বন্দী করে। স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর হাতে জার্ম্মনরা উল্কি-মার্কা দেগে দিয়েছিল—Slave No. 64023.

পোল্যাণ্ডের কমুনিষ্ট দল, যার নাম পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি—এদের সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার। এদেরই হাতে পুলিশ, পররাষ্ট্র, অর্থনীতিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ। এরাই জাতের আজ ভাগ্যবিধাতা। এ দলের নেতা হিলারি মুইন্স্ (৪১) শ্রম-শিল্প-সচিব। নিজে বিলাসী ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান হলেও এঁর উদ্দেশ্য, দেশ থেকে জমিদারী-প্রথা ও ধনিক-তন্ত্র লোপ করা।

পোল সোশ্যালিষ্ট দল কমুনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এ দলের নেতা বর্ত্তমান পোল প্রধান-মন্ত্রী ওসুবকা মোরাওস্কি (৩৭)—ইনি সাধু-প্রকৃতির হলেও শক্ত নন।

বৃটেনের নাভিশ্বাস—

বৃটেন আজ যে অবস্থায় পড়েছে, চার্চ্চিল এ অবস্থায় পড়লে কি করতেন বুঝি না। কিন্তু এ অবস্থায় পড়ে এটলী খাপি খাচ্ছেন। চার্চ্চিলের কৌশলে ইংরেজ হত্যার হাত থেকে বেঁচেছে আহত ও বিপন্ন বৃটেনকে এটলী আর তাঁর পররাষ্ট্র-সচিব বেভিন কি করে বাঁচাবেন? চার্চ্চিলের নেতৃত্বে বৃটেন হাতিয়ার থেকে বাঁচবার জন্ত সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। আজ বৃটেনে ঘর আর উদর শান্ত করবার মূল্য এটলীকে কত দিতে হবে কে জানে? আসছে ২৫ বছরের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বৃটেনের অস্তিত্ব নির্ভর করবে।

চার্চ্চিল বলেছিলেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যে লাল বাতী জ্বালাবার জন্ত বৈঠকের সভাপতিত্ব তিনি করবেন না। এটলী বা বেভিনও তা করবেন না। এটলী বা বেভিন সমাজতন্ত্রবাদী হলেও কমুনিষ্ট নন। রুশিয়ার দাবী তাঁরা মানেননি। ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট সভাপতি কালিনিন এঁদের নাম দিয়েছিলেন—"reactionary socialists."

কিন্তু মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার-সেক্রেটারী মিঃ সামনার ওয়েলেস 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রে বলেছেন—"British Empire—even though Churchill will not be [illegible] preside over its liquidation—has

reached its end. Attlee by his independence pledge to India, has proclaimed the termination of the age of Imperialism."—বৃটিশ সাম্রাজ্যের লালবাতী জ্বালাবার বৈঠকে চার্চিল পৌরোহিত্য না করলেও সাম্রাজ্যের শেষের দিন সমাগত। ভারতকে স্বাধীন করবার যে প্রতিশ্রুতি এটলী দিয়েছেন, তাতেই ঘোষণা করা হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদী যুগের এই শেষ।

আমেরিকার শত্রু রুশিয়া—

মার্কিণ-কংগ্রেসের ডিমোক্রেটি পার্টির সদস্য মিঃ জর্জ আর্লি বলেছেন,—রুশিয়া আমেরিকার পক্ষে মহা ত্রাসস্বরূপ। আমেরিকার এমন শত্রু আর হয়নি কখন। ইনি বলেছেন—রুশিয়াকে আলটিমেটাম দিয়ে বল—আপনার বিবরে ফিরে যাও ত ভাল, না যাও—"I would use the atom bomb on them while we have it and before they get it." কিন্তু রুশিয়াকে না হয় অণুতে মিশালে, তার'লেই কি দুনিয়া নিরাপদ? বৃটেন ত অণু বোমের তথ্য জানে। পৃথিবীর আপদ বড় কে? বৃটেন, না রুশিয়া?

ইঙ্গমার্কিণ মন-কষাকষি—

রুশিয়ার পাক্ষিক পত্র 'নিউ টাইম' লিখছেন, বৃটিশ ও আমেরিকানদের মধ্যে ইরাকের পেট্রোল নিয়ে ভয়ঙ্কর মন-কষাকষি চলছে। অবশ্য এই ঝগড়ার খবর বাইরের দুনিয়া এক রকম জানে না বললেই হয়। এমন প্রস্তাবও না কি হয়েছে যে, ইরাণী-পেট্রোল খনিগুলো আন্তর্জাতিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত হোক।

মাঞ্চুরিয়ায় হচ্ছে কি?—

এক সোভিয়েট সাংবাদিক মহিলা বলছেন—"Manchuria is the dreamland of every Russian who has been there. The climate is good. There is work—where the railways are there will always be work. There are hospitals and universities. I think many will go to Manchuria That would go very well with our Sino-Russian cultural relations, don't you think?"

এক দিকে যেমন প্রচারিত হচ্ছে যে, চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট সৈন্য মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিক যেমনি শোনা যাচ্ছে—"Russians had asked the Chineese Government for additional economic concessions in Manchuria." আরও অর্থনৈতিক সুবিধা রুশরা মঞ্চুরিয়ায় চেয়েছে। পোর্ট আর্থার ও ডাইরেন বন্দরে এজমালী নৌ-ঘাঁটির সুবিধা পেয়েও রুশ চাচ্ছে—মাঞ্চুরিয়ার খনিগুলো, বড় বড় শ্রমশিল্প ও টেলিফোন-লাইন পরিচালনের ভাগীদার তাকে করতে হবে।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সোভিয়েট সৈন্যের মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে যাবার কথা ছিল, এবার তারা বলছে—এপ্রিলের শেষে যাবে।

সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতি—

রুশরা কিন্তু মনে করছে যে, বৃটেন আর আমেরিকা নিরাপত্তা বৈঠকের [illegible] তারা বলছে, যদি রুশিয়া এ কথা ভাল করে বুঝতে পারে যে, [illegible]রিকা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে নিরাপত্তা বৈঠকে [illegible] প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন এ প্রতি[illegible] সম্বন্ধে মত বদলাবে। নিউ ইয়র্কে এই বৈঠকের অধিবেশন [illegible] রুশ-প্রতিনিধি গ্রোমিকোর বেরিয়ে যাবার ব্যাপার নিয়ে ইংরেজ [illegible] বেশ একটু শঙ্কা-ভাব দেখা দিয়েছিল, কিন্তু রুশ সৈন্য ইরাণ [illegible] আসবার সংবাদে, আর মিত্রশক্তি-সঙ্ঘে আস্থা ঘোষণা করে ষ্ট্যালি[ন] জোর বক্তৃতা শুনে ইংরেজরা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে। বাম[পন্থী] 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন' পত্র বলেছেন যে, রুশ পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা দেখে এ কথা অবশ্য মনে হয় না যে, একটা কূটবুদ্ধি [illegible] জেনে-শুনে পররাষ্ট্র গ্রাসের নীতি অবলম্বন করেছে। বরং মনে [হয়] একটা সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত বোকা দৈত্য চার দিকে আপনার গুরুভার অঙ্গ প্রক্ষেপ করে আপনাকেও যেমন আহত করছে, তেমনই আহ[ত] করছে অন্য সবাইকে।

কিন্তু বৃটিশ সরকারী মহল যেন মনে করছেন যে, সোভিয়েট-ইরাণ আপোষের গতিরোধ করবার সামর্থ্য তাঁদের নেই। তার পর ইংরেজ[রা] মনে করছে ষ্ট্যালিনের মত সোজা লোকের সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠতে পারলেও, সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান পরিচালক মলোটোভ আর ভিশিনস্কীর মত শক্ত লোকের সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন হবে।

বৃটেনের প্রতিরোধ চেষ্টা—

পশ্চিম-এশিয়ায় রুশিয়ার বৃটিশ বিরোধী প্রভাব-প্রাচীর প্রতিরোধ করবার জন্য বৃটিশ-তাঁবেদারীতে একটা আরব-তুর্কী দল স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ইরাককে যেমন রাষ্ট্রনীতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তেমনই স্বাধীন মর্যাদা ইংরেজরা ট্রান্স-জর্ডানিয়াকে দিয়েছে। সোভিয়েট সরকারের মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া' ইংরেজের সমর্থিত ও ইংরেজের গঠিত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব-শক্তিসঙ্ঘ সম্বন্ধে লিখেছেন—"Such a federation would occupy the entire territory between the Mediterranean and the Persian Gulf with the exception of a small Jewish territory"—ভূমধ্যসাগর থেকে পারশ্যোপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জুড়ে এমন শক্তি-সঙ্ঘ স্থাপিত হবে—বাদ অবশ্য ছোট্ট একটা ইহুদী রাজ্য।

এ-ছাড়া সোভিয়েট নৌবিভাগ মনে করছেন যে, বৃটেন প্যালেষ্টাইনকে পহেলা শ্রেণীর নৌ ও সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করতে শুরু করেছে। মিশর সিরিয়া আর লেবানন থেকে প্যালেষ্টাইনে সৈন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভূমধ্যসাগরে আগে মালটা বা আলেকজান্দ্রিয়া বৃটিশ নৌ-বাটকের যেমন বড় ঘাঁটি ছিল, এখন হিফা তার চাইতেও বড় ঘাঁটি করা হবে। এর জন্য সাউদি আরব থেকে পেট্রোল পাইপ-লাইন নিয়ে গিয়ে শেষ করা হবে প্যালেষ্টাইনে। আরও হিফা থেকে বাগদাদ পর্য্যন্ত একটা রেলপথ নির্ম্মাণের কথাবার্ত্তাও হচ্ছে।

রুশিয়া কি ফোঁসই করে?—

রুশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করবে, পশ্চিম-এশিয়া গ্রাস করবে, পূর্ব্ব-ইউরোপে আরও প্রভাব বিস্তার করবে বলে ইঙ্গ-মার্কিণ রণ-বাদীরা [illegible]

জেনেও জানে না। যুদ্ধের সময় লাল ফৌজে যে বিলাসিতা ঢুকেছে তারই ফলে ওদের মধ্যে যে ব্যাপক অশান্তি দেখা দিয়েছে সে অশান্তি দমন কি করে করা যাবে তারই হদিস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ ও স্বরাষ্ট্র সচিব কাগোনোভিচ অপেক্ষাকৃত আক্রমণমূলক পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। ষ্টালিন কিন্তু এ কথা বলতে পেরেছেন যে, সোভিয়েট জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটেন আর অমেরিকার সঙ্গে ভাব করে না চল্‌লে চলবে না। সোভিয়েট-তন্ত্রের পরোক্ষ উদ্দেশ্য যাই থাকুক না, প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আজ বহু অন্ন আর বহু বস্ত্রের ব্যবস্থা। খাদ্যের অনটন রুশিয়ায় ভয়ানক। লক্ষ লক্ষ লোক আজও বস্ত্রাবাসে, গিরি গহ্বরে, ভাঙ্গা এরোপ্লেনের আবরণের তলে বাস করছে। বড় বড় বারোয়ারী খামারগুলো যন্ত্রের অভাবে অচল হয়ে পড়ে আছে। রুশিয়ার যে ৭ লক্ষ ট্রাকটার ছিল তার মধ্যে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ট্রাকটার জার্ম্মানরা কেড়ে নিয়ে যায়। ৫০ সালের আগে এ অভাব পূরণ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ক্রেতারা শিল্পজাত দ্রব্য খুব বেশী পাচ্ছে না। রুশরা ষ্টোভ, বিছানা, মোজা, থার্ম্মোমিটার সাইকেল আবার তৈরী করছে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত নয়।

এসিয়ার অণুবোমা—

তাই মনে হচ্ছে, রুশিয়া বা ইংরেজ নূতন করে যুদ্ধে জড়িত হবে না, যতই তর্জ্জন গর্জ্জন করুক না। কিউরাইল দ্বীপে রুশ সৈন্যের আয়োজন-সজ্জার বহ্বাড়ম্বর খবর দেখা গেলেও মনে হচ্ছে ওটা মাত্র তড়পানি। মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এশিয়ার পশ্চিম খণ্ডে ত্রিশক্তির প্রতিযোগিতা থেকে সজ্ঘর্ষ হতে পারে—এই আশঙ্কা করছেন। কিন্তু পশ্চিম-এশিয়ার ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলোকে এংলো-গ্যাক্সন ভেদের যন্ত্র করে তাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ যেখানে করা হচ্ছে, আপনাদের সাম্রাজ্য তথা বাণিজ্য অতি-ক্ষুধার জন্য মুমূর্ষু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে পদানত মাত্র নয় নিঃশেষে শোষণ করবার জন্য যেখানে মৃত্যু বিতরণ করা হচ্ছে—যেখানে তাদের শ্রেষ্ঠ পণ্যশালা ভারতকে ভাঁওতা দিয়ে আর ভয় দেখিয়ে—অর্দ্ধ শতাব্দী শৃঙ্খলিত মাত্র নয় নিরন্ন ও নিঃশোণিত করা হয়েছে,—সেখানে এই দেশ ও জাতগুলো যে অণু বোমার চাইতেও ভীষণ হয়ে পড়েছে—এ গুরা আজ যদি না বুঝে, বুঝবে নির্ব্বংশ ও নিঃস্ব হলে। প্রাচ্যবাসী তারই আয়োজন করছে।

দীক্ষা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অগ্নিবর্ষী দু'চোখে আগুন ঝরে।
সিপাহী ক্ষেপেছে অনেক দিনের পরে।
টলমল আজ কাঁপিছে রাজ্য পদাঘাতে।
ক্ষেপেছে সিপাহী, ভাঙে শৃঙ্খল দৃঢ় হাতে।

দেশপ্রেম নয় নিছক প্রেমের বুলি।
আজকে একথা বুঝে নিয়ো খোলাখুলি।
বন্দুকে যতো বিদ্ধ নিহত অমর প্রাণ।
শেষ সংগ্রামে তুমি কি তৈরী হিন্দুস্থান?

পথে-পথে যতো পদানত প্রাণ ওঠে ক্ষেপে।
অহিংসা রথে চলা দায় হলো ক্ষেপে-ক্ষেপে।
ক্ষেপেছে সিপাহী; ক্ষেপেছে সহরে দেশবাসী।
আজ একপ্রাণ প্রাণ দিতে তাই ছুটে আসি।

এখানে-ওখানে সবখানে আজ মহড়াবে,
ওঠে আলোড়ন, শেষ সংগ্রাম সুরু কবে?
ক্ষেপেছে মজুর, কৃষক, সেপাই—রুদ্ধ শ্বাসে;
করে না পরোয়া মৃত্যুকে পথে রক্তে ভাসে।

জনসমুদ্র কেঁপে-কেঁপে ওঠে,—অনেক ঢেউ
ওঠে আর নামে, তৈরী কি আছে এখানে কেউ?
ছুঁয়ে যাও প্রাণ বিকল হৃদয়—ঘূর্ণি ঝড়।
হৃদয়তন্ত্রী বেগে বেজে ওঠে, তুলেছে স্বর।

সংহত করো সকল শক্তি, ক্ষমতা বলে।
সবার মিলিত শোণিতে সিক্ত এ অভিযান।
উৎসাহ নেই, সহসা নেতারা আজ বিমুখ।
ঢেলেছি রক্ত তবু তো মাটিতে,—সেই তো সুখ।

যাযাবর

নয়

৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় ফিরোজ শা' কোটলায় মুনলাইট পিকনিকের যিনি আয়োজন করেছিলেন, আইভিমেল হোষ্টেস বলে নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। মহিলা সুদর্শনা, পরিহাসপটু এবং প্রিয়ভাষিণী। বন্ধু-সমাগমে আনন্দ লাভ ও আনন্দ দান করার দুর্লভ ক্ষমতা আছে তাঁর।

ফিরোজ শা' কোটলা দিল্লীর পঞ্চম মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের সময়ে দিল্লী নগরী ছিল বর্ত্তমান কুতুবের নিকটস্থ মেহরৌলীতে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ কিছু কাল পূর্ব্বে এই রাজধানীর নগর-প্রাচীর মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আংশিক উদ্ধার করেছেন। জনপ্রবাদ এই যে, নিজ প্রিয়তমা কন্যার যমুনা দর্শনাভিলাষ পূরণার্থে পৃথ্বীরাজই তৈরী করেছিলেন কুতুব মীনার। প্রত্যহ অপরাহ্ণ বেলায় প্রসাধন সমাপনান্তে রাজনন্দিনী আরোহণ করতেন তার শীর্ষে, অবলোকন করতেন দূরবর্ত্তী যমুনার জলধারা। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এ-কাহিনী বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অভিমত, পাঠান সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেক নির্ম্মাণ শুরু এবং আলতামাস শেষ করেন জগতের সর্ব্বোচ্চ বিজয়স্তম্ভ এই মীনার।

দ্বিতীয় দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজী। তাঁর রাজত্বকালে দুর্দ্ধর্ষ মুঘল দস্যুদল ভারতবর্ষ আক্রমণ করলো। হত্যা ও লুণ্ঠনের দ্বারা নগ-নগরী বিধ্বস্ত করে উপনীত হলো দিল্লীতে। দিল্লীর সমতল ভূমিতে তাদের প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না। সম্রাট পশ্চাদপসরণ করলেন কুতুবে। মুঘলেরা দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল দখল করে আমীর ওমরাহদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করলো এবং সাধারণ কৃষকের শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত করলো। অবশেষে দিল্লীর অসহনীয় গ্রীষ্মের প্রখরতায় ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে দস্যুদল দিল্লী পরিত্যাগ করলো। আলাউদ্দিন এই দস্যুদলের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নির্ম্মাণ করলেন সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নব নগরী। নাম দিলেন সিরি। এই নগরীতে সুলতান নির্ম্মাণ করেছিলেন নিজের জন্য এক মহার্ঘ প্রাসাদ, তার স্তম্ভ-সংখ্যা ছিল এক সহস্র। আজ সে প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই।

আলাউদ্দিন খিলিজী ছিলেন অসমসাহসিক যোদ্ধা। রাজ্যজয়ের নেশা ছিল তাঁর রক্তে। তিনি রাজপুতদের পরাজিত করে চিতোর অধিকার করেছিলেন। দাক্ষি- প্রথম মুস্লিম অধিকারও প্রতি- করলেন তিনি। সেই বি- গৌরবকে চিরস্মরণীয় ক- নির্ম্মাণ শুরু করলেন দ্বি- কুতুব। প্রথম কুতুবের পার্শ্বে প্রথম কুতুবের চাইতে এর আ- হবে দ্বিগুণ—এই অভিলাষ ছি- সুলতানের মনে। কিন্তু আ- কাজ শেষ করবার মতো আ- মিয়াদ ছিল না তাঁর। অ- সমাপ্ত এই নব পরিকল্পি- কুতুবের চিহ্ন আজও দর্শকজনে- কৌতূহল উদ্রেক করে। বর্ত্তমানে সিরির স্মারক আছে শুধু প্রত্ন- তাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং কিছুটা সিরাট নগর-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান ফিরোজ শা' তোগ্‌লক। রাজার নামে রাজধানীর পরিচয় ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব নয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতের মুস্লিম নৃপতিদের মধ্যে ফিরোজ শা' তোগ্‌লক্ ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ ৩৭ বছর তিনি প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করেছেন। দিল্লীর মুস্লিম বাদশাহদের মধ্যে একমাত্র ঔরঙ্গজেব ব্যতীত আর সবার চাইতেই তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পরে যখন তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন তখনই তাঁর বয়স ষাটের ঊর্দ্ধে।

ইতিহাসে মহম্মদ বিন তোগলকের নাম অব্যবস্থিতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী নৃপতির উদাহরণরূপে কুখ্যাত। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর চরিত্রে রাজোচিত বহু সদ্‌গুণেরও সমাবেশ ঘটেছিল। মহম্মদ বহু ভাষাবিদ্, কবি, গণিতজ্ঞ এবং সুদক্ষ লিপিকার ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা, সহৃদয় দাতা বলেও তাঁর সুনাম আছে। আবার নিষ্ঠুরতার জন্য নিন্দারও অভাব নেই। প্রসিদ্ধ আরবী পরিব্রাজক ইবন্ বাতুতার আত্মচরিতে সম্রাট মহম্মদের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথার্থ বর্ণনা আছে।—"দান করা এবং হত্যা করা এই দুই ব্যাপারেই রাজার (মহম্মদ) তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। যে-পথ দিয়ে তিনি যান সে-পথে কোন না কোন অতি দরিদ্রকে তিনি ধনী বানিয়ে যান, কোন না কোন জীবিত ব্যক্তিকে তিনি পরলোকে পাঠিয়ে দেন। একাধারে তাঁর মহানুভবতা ও নিষ্ঠুরতার শত শত গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরছে।" ইবন্ বাতুতা নিজে মহম্মদের অধীনে কয়েক বছর দিল্লীর প্রধান বিচারক—কাজী—ছিলেন।

মহম্মদের নানা উদ্‌ভাবনী বুদ্ধি ছিল। কিন্তু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। নানা বিষয়ে পরীক্ষা করার তাঁর ঝোঁক ছিল। বেশীর ভাগ পরীক্ষারই মারাত্মক পরিণতি ঘটেছে। একাধিকবার উত্তর-ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাজধানী স্থানান্তরিত করা, দিল্লী এবং দৌলতাবাদের মধ্যে রাজধানীর সমুদয় অধিবাসীর গমন ও প্রত্যাগমন, রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের মুদ্রার প্রচলন, চীন জয়ের প্রয়াস ইত্যাদি মহম্মদের সর্ব্বনাশা বহু উদ্যোগের কাহিনী স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বাল্যকালে আমরা পড়েছি।

জীবনের শেষভাগে মহম্মদ আপন সেনাবাহিনী নিয়ে বর্ত্তমান করাচীর নিকটবর্ত্তী থাটায় এক দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। সেখানে এক দিন প্রভাতে এক ধীবর সিন্ধু নদে এক অদ্ভুত মৎস্য শীকার করেছিল। সে-মৎস্য রাজসমীপে উপস্থিত করা হলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত আকৃতির এই মৎস্য মানুষের রসনার পক্ষে সুস্বাদু কি না সে পরীক্ষার বাসনা জাগলো মহম্মদের মনে। পাত্রমিত্রের অনুরোধ অবজ্ঞা করে সে-মৎস্য সম্রাট আহার করলেন। ইহলোকে সেই তাঁর শেষ পরীক্ষা। সে-দিনই জীবনান্ত ঘটলো তাঁর। মহম্মদের শত্রুরা একে মাৎস্য-ন্যায় নামে অভিহিত করেছিলেন কি না জানিনে।

মহম্মদের প্রতিভা ছিল, শক্তি ছিল। সে-সময়ে আলাউদ্দিন খিলিজীর রাজধানী সিরি ও প্রাচীন মেহরৌলীর মাঝখানে দিল্লীর বিত্তশালী ব্যক্তিদের বহু প্রাসাদ ও প্রমোদোদ্যান গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু যথোচিত রক্ষা-ব্যবস্থার অভাবে মুঘল দস্যুদের আক্রমণ সম্ভবনা থেকে তা' মুক্ত ছিল না। মহম্মদ তাঁর নিজ প্রাসাদ রচনা করলেন সেখানে। দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলেন সিরি থেকে মেহরৌলী। নব নগরীর নামকরণ করলেন জাহানপান্না—বাংলা ভাষায় যার মানে হলো "জগতের আশ্রয়"। প্রাসাদের নাম দিলেন বিজয়-মণ্ডল। প্রাসাদের সংলগ্ন ভূমিতে বৃহৎ এক হ্রদ খনন করেছিলেন পানীয় জলের সংস্থানে। কুতুবের অদূরবর্ত্তী বর্ত্তমান খিরকী গ্রামে আজও চোখে পড়ে এই প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ। তার গায়ে হ্রদে জল-প্রবেশ ব্যবস্থার চিহ্ন আছে পরিস্ফুট।

বর্ত্তমান কুতুব রোডের নিকটে সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের খনন-কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে মহম্মদের স্নানাগার, তাঁর জেনানা ও তাঁর বিখ্যাত মঞ্চ যেখানে বসে প্রত্যহ তিনি তাঁর সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতেন। আলাউদ্দিনের সহস্র-স্তম্ভ কক্ষের অনুরূপ মহম্মদও একটি বিরাট কক্ষ নির্ম্মাণ করেছিলেন, যার কিছু কিছু চিহ্ন আজও কৌতূহলী দর্শকদের বিস্মিত করে থাকে।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে ফিরোজ শা' তোগলক সম্রাট হলেন। মহম্মদের তিনি আত্মীয় এবং সেনানায়ক ছিলেন। সিন্ধু থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনি ফিরে এলেন দিল্লীতে। রাজ্যের গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করলেন অবিলম্বে। অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, ফিরোজ শা' ভারতের সর্ব্ব-প্রথম নরপতি যাঁর ধমনীতে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক হয়ে মিশেছিল। তাঁর জননী রাজপুতানী।

দুই বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্মিলিত প্রভাব তাঁর চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। বিদ্বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ বলে তিনি খ্যাত ছিলেন এবং প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তাঁর আন্তরিক স্পৃহা ছিল। মুস্লিম যুগের প্রথম কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন ফিরোজ শা'। আজো ওয়েষ্টার্ণ যমুনা ক্যানেল নামে খ্যাত খালটি তিনি খনন করেন। কর্ণওয়ালের নিকটস্থ যমুনার মূল ধারা থেকে উৎসারিত হয়ে এর এক শাখা এসেছে দিল্লীতে অপর শাখা গেছে হিসারে। ফিরোজ শা'র আমলে এই খালের পরিধি বিস্তৃততর ছিল। সম্রাট সাজাহানের আদেশে, তৎকালীন পূর্ত্ত বিভাগের অধ্যক্ষ আলী মর্দ্দান খাঁ এই খালের সংস্কার-সাধন করেন। এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সম্রাট সাজাহানের রক্তেও হিন্দু-প্রভাব ছিল। তাঁর জননী [illegible]

দিল্লী অবরোধ কালে এই খালটি দ্বিতীয়বার বিনষ্ট হয়। পরবর্ত্তী যুগে ইংরেজ শাসকগণের চেষ্টায় তার পুনঃ সংস্কার ঘটে।

সৌধ-নির্ম্মাণে ফিরোজ শা'র গভীর অনুরাগ ছিল। এদিক দিয়েও সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে তার চরিত্রের মিল ছিল। কুতুব মীনারের ঊর্দ্ধতন যে-দু'টি তলা শ্বেত পাথরে গড়া তা ফিরোজ শা'রই কীর্ত্তি। ভূমিকম্পে কুতুবের যে ক্ষতি ঘটেছিল তারও সংস্কার তিনিই করেছিলেন। দিল্লীর হিন্দুরাও হাসপাতালের সংলগ্ন রীজে এখনও তাঁর নির্ম্মিত মৃগয়াগৃহের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান।

সিরি, বিজয়-মণ্ডল ও কুতুবে তিন তিনটি নগরী থাকা সত্ত্বেও ফিরোজ শা' যমুনার ধারে আর একটি নতুন নগরের পত্তন করলেন। একেবারে যমুনার ঠিক গায়ে নির্ম্মাণ করলেন রাজপুরী—ফিরোজ শা' কোটলা। আজ তোরণপথে ঢুকলেই বাঁ দিকে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গন। একদা সেখানে ছিল ফিরোজ শা'র দরবার-গৃহ। আজ আমাদের পিকনিক পার্টির আসর বসলো সেখানে।

দলটি ক্ষুদ্র নয়, ছেলে-মেয়ে মিলে প্রায় জন বারো। কিন্তু অধিনায়িকা আহার্য্য যা এনেছেন তা দিয়ে অনায়াসে তার দ্বিগুণ লোকের উদর-পূর্ত্তি করা যেতে পারে।

পিকনিকে সব চেয়ে যিনি মনোযোগের যোগ্য তিনি মিঃ খোশ্‌লা। বহুল পরিচিত ব্যক্তি। বিশেষ করে মহিলা-মহলে। মেয়েরা এগজিবিশান করছেন, তার গেটে ভল্যান্টিয়ারী করছেন কে? মিঃ খোশ্‌লা। মহিলা সমিতি দামোদর বন্যার সাহায্য-ভাণ্ডারে টাকা তুলছেন। মেয়েদের সঙ্গে বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা আদায় করছেন কে? মিঃ খোশ্‌লা। চাঁদনী বাজার থেকে মিসেস মুখার্জ্জীর উল কিনে আনছেন, মিসেস স্বামীনাথনের জন্য পাঁচ দোকান ঘুরে পণ্ডস ক্রীম জোগাড় করছেন। সমস্তই মিঃ খোশ্‌লা। নয়াদিল্লীতে মেয়েরা আছেন অথচ মিঃ খোশ্‌লা নেই এমন কোন সভা, সমিতি, পার্টি, পিকনিক কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

সাধারণ পাঞ্জাবীর তুলনায় বেঁটে, দোহারা চেহারা। মাথায় চুল ব্যাকব্রাস করা। নির্ব্বাক্ যুগের চিত্রাভিনেতা ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্‌-এর অনুকরণে দীর্ঘ জুল্পী গালের মধ্যপথ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এডলফ্ হিটলারের মতো গোঁফের কায়দা। পরিধানে ব্রাউন রং-এর কর্ডরয়ের প্যাণ্ট, পায়ের গোড়ালীর কাছটা সরু। প্যাণ্টের পিছনে হিপ্-পকেট। তাতে লম্বা রূপার সিগারেট-কেস যার মনোগ্রাম-করা গর্ভে প্রায় পঞ্চাশটা সিগারেট রাখা চলে। গায়ে গ্যাবার্ডিনের কোট প্রায় আজানুলম্বিত, নীচের পকেট দু'টি ইদের চাঁদের আকৃতিতে কাটা। সিল্কের সার্ট। টকটকে লাল রং-এর টাই, তাতে নীল রং-এর ছিট্, ছিট্। মাথায় একটি সবুজ ফেল্টের টুপী, নীচের দিকে নামিয়ে পরেন। পায়ে কখনও কম্বিনেশান সু, কখনও বা বাক্‌লশ্‌-আঁটা 'সডে'র জুতা। দিনের বেলায় চোখে এক জোড়া শাদা মোটা সেলের ফ্রেমযুক্ত সানগ্লাস। রোদ থাক আর নাই থাক। মেয়েদের হাতে রিষ্টওয়াচের মতো মিঃ খোশ্‌লার গগল্‌সও প্রয়োজনের জন্য নয়, শোভার জন্য।

মিঃ খোশ্‌লার প্রকৃত পেশা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে তিনি কণ্ট্রাক্টর, কেউ বলে তিনি দু'তিনটে বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, আর কেউ বা এমন কিছু বলে যার ইংরেজ তর্জ্জমা করলে কথাটা [illegible] পিছনে লেখেন

একটি শব্দ যা দিয়ে নলিনীরঞ্জন সরকার থেকে সুরু করে বাবুগঞ্জের হাটে কাটা-কাপড়ের ব্যবসাদার পতিতপাবন সাহাকে পর্য্যন্ত বুঝানো যায়। মার্চ্চেন্ট। কিন্তু কাজ তার যাই হোক, ব্যস্ততার অভাব নেই। এই দারুণ পেট্রোল রেশনিং-এর দিনেও সারাদিনই দেখা যায় তিনি তার বেবী অষ্টিন নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটছেন সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। পথে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে এক মিনিট কথা বলেই বলেন, "আচ্ছা ভাই, এখন বড্ড ব্যস্ত। স্যাল সি ইউ এগেন!"

পিকনিকে খোশ্‌লা বিপুল উদ্যমে মেয়েদের আহার্য্য পরিবেশন করলেন। সেণ্ডুইচের প্লেট নিয়ে ছুটতে গিয়ে আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। সন্দেশের থালা নিয়ে হন্ত-দন্ত হলেন। কোন মহিলাকে 'প্লিজ' কোন মহিলাকে বা 'ফর মাই সেক্' বলে দু'টো বেশী পোল্ট্রি খাওয়ালেন। একটি তরুণী অন্য কার কাছে এক গ্লাস জল চাইছিলেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মিঃ খোশ্‌লা। তাঁর কানে যেতেই "জল, জল, মিস উপাধ্যায়ের জন্য জল" বলে এমন উতলা হয়ে জলের অন্বেষণে ছুটতে লাগলেন যে, মনে হলো হাতের কাছে অন্য কোথাও না পেলে তিনি বুঝি বা তৎক্ষণাৎ ভগীরথের ন্যায় গঙ্গা-আনয়নের জন্য কৈলাসে ছুটবেন!

ভোজন-পর্ব্বের পর মহিলাদের প্রতি অনুরোধ হলো গানের। কেউ গাইলেন, কেউ "অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি" বলে এড়িয়ে গেলেন। আমাদের অধিনায়িকার সঙ্গীতে দক্ষতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁকে বেশী সাধ্য-সাধনা করতে হয় না। একটি গুজরাটি মহিলা তাঁর স্বদেশীয় সঙ্গীত শোনালেন। তার মধ্যে একটি নরসিংহ মেহতার রচনা। "বৈষ্ণব জনতো তেনে কহি" বলে এঁর একটি গান গান্ধীজির প্রিয় বলে এককালে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

শ্রীমতী সুব্বা রাও প্রস্তাব করলেন চার দিক ঘুরে দেখবার। দেখার মধ্যে যা আছে তা ফিরোজ শা' নির্ম্মিত একটি মসজিদ। সুলতান পাত্র-মিত্র নিয়ে জুম্মার দিনে এখানে প্রার্থনা করতে আসতেন। অনুমান করা অন্যায় নয় যে, সে-দিন এই মসজিদের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। যদিও আজ তার ভগ্নদশা দেখে বিগত সৌষ্ঠব বুঝবার উপায় নেই। তবে তার গঠন-পারিপাট্য লক্ষ্য করার মতো। ইংরেজীতে যাকে বলে প্রোপোরসন, ফিরোজ শা' কোটলার মসজিদ ও অন্যান্য প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষে তা বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান।

ফিরোজ শা'র আমলে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় স্থাপত্যে হিন্দু ও মুস্লিম পদ্ধতির সিনথেসিস্ ঘটেছিল। প্রাগ্‌মুস্লিম যুগের উত্তর-ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য ছিল সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। অতি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে এখনও তার চিহ্ন আছে। বর্ত্তমানে "জৈন পদ্ধতি" নামে অভিহিত এই স্থাপত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় রাজপুতানার মাউন্ট আবু পর্ব্বতোপরি বিখ্যাত জৈন মন্দিরটি।

সে-দিনের হিন্দু স্থাপত্যে আর্চ্চ—অর্দ্ধবৃত্তাকার গঠন ছিল না। তার বৈশিষ্ট্য ছিল চতুষ্কোণ স্তম্ভে। এই স্তম্ভগুলি কারুকার্য্যখচিত। কোনটিতে দেব-দেবীর মূর্ত্তি, কোনটিতে পুষ্পসজ্জা, কোনটিতে বা ঘণ্টা কিম্বা গাছ। প্রস্তরে গঠিত এই স্তম্ভগুলির অলঙ্করণের মধ্যে মিলতো সে-দিনকার স্থপতিদের মণ্ডন-চাতুর্য্যের পরিচয়। সেকালের স্থাপত্যে গম্বুজেরও অস্তিত্ব ছিল না। চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপরে সমান্তরাল প্রস্তর-খণ্ড একটির পর একটি সাজিয়ে দু'দিক থেকে ক্রমশঃ মিলিয়ে আনা হতো মাঝখানে। দ্বার, গবাক্ষ প্রবেশ-পথের উপরাংশে আর্চ্চের পরিবর্ত্তে এই গঠন অনেকটা [illegible] কাটা সিঁড়ির মতো দেখায়। আর্চ্চের ভারবহন ক্ষমতা অধিক। তার ব্যবহার য়ুরোপ ও মধ্য-এশিয়ায় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

এই স্থাপত্যের প্রথম পরিবর্ত্তন ঘটলো দ্বাদশ শতাব্দীর [illegible] ভাগে। দাস-বংশের কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লীতে এসে প্রথম [illegible] করতে চাইলেন একটি মসজিদ যেখানে বসে তিনি আল্লার কা[illegible] পাঠাতে পারবেন প্রচুরতর অর্থ, প্রবলতর প্রতাপ, প্রভূততর শা[illegible] কামনা করে প্রাত্যহিক আবেদন। বলা বাহুল্য, তাঁর নিজ জন্মভূ[illegible] আফগানিস্থানে যে-ধরণের মসজিদের সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচি[illegible] তারই অনুরূপ ভজনালয় নির্ম্মাণ ছিল তাঁর বাসনা। [illegible] মসজিদ পয়েণ্টেড আর্চ্চের,—অনেকটা গণিতশাস্ত্রের দ্বিতী[illegible] বন্ধনী চিহ্নের মতো,—খিলানের উপর তৈরী। রোমানরা ব্যবহা[illegible] করতো বৃত্তাকার আর্চ্চ। আরবীয়েরা পছন্দ করতো পয়েণ্টেড আর্চ্চ। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পয়েণ্টেড আর্চ্চ-সম্বলিত স্থাপত্যে[illegible] প্রথম নিদর্শন হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ইরাকের অন্তর্গত সামারার মসজিদটি। হিন্দু স্থপতিদের জানা ছিল না তার নির্ম্মাণ-কৌশল। কাবুল, কান্দাহার থেকেও মুস্লিম কারিগর আনা সম্ভব ছিল না। সুতরাং দিল্লীর প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে-নিদর্শন রইল সেটা হিন্দু ও মুস্লিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়,—গোঁজামিল। কুতুব মীনারের সংলগ্ন মসজিদে আজও তার প্রমাণ আছে। তার বারান্দায় ও দ্বারপথে অর্দ্ধবৃত্তাকার গঠন সত্যিকার খিলানের উপর নয়। তাতে 'কী-ষ্টোন' নেই।

মুস্লিম স্থাপত্যে দেব-দেবীর মূর্ত্তি বা পুষ্প ও বৃক্ষলতা উৎকীর্ণ করার রীতি ছিল না। কোরাণের বচন উদ্‌ধৃত হতো মসজিদের প্রাচীর-গাত্রে ও আর্চ্চের উপরে। আরবী লিপি ও কোরাণের রচনা সম্পর্কে কুতুবুদ্দিনের মসজিদ নির্ম্মাণরত ভারতীয় রাজমিস্ত্রীদের জ্ঞান ছিল সামান্যই। তাই কৃত্রিম আর্চ্চের উপরে তারা বৃক্ষ অঙ্কন করে তার আশে-পাশে আরবী বচন উৎকীর্ণ করার প্রয়াস করেছে কোন মতে। হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন মসজিদের সংলগ্ন মণ্ডপে আরও অধিকতর প্রকট। তার স্তম্ভগুলি নিঃসন্দেহে কোন হিন্দু মন্দির থেকে আহৃত। সেকালের মুস্লিম নরপতিরা লুণ্ঠনকে লজ্জার বিষয় মনে করতেন না। বরং অপহৃত দ্রব্যের প্রকাশ্য ব্যবহারের দ্বারা বিজয়-স্তম্ভ রচনা করে আপন অপকীর্ত্তির সাক্ষ্য রাখতেন পরবর্ত্তী কালের জন্য!

সুলতান আলতামাস কুতুবুদ্দিন-রচিত মসজিদের বিস্তার সাধনে উদ্যোগী হয়ে গজনী থেকে আনলেন মুস্লিম স্থপতি ও কারিগর। তারা জ্যামিতিক পদ্ধতির মুস্লিম অলঙ্করণ প্রথম প্রচলন করলেন ভারতবর্ষে। খিলিজী যুগে অধিক সংখ্যক মুস্লিম রাজমিস্ত্রী এল আফগান থেকে। তারা প্রবর্ত্তন করলো চতুষ্কোণ স্তম্ভের পরিবর্ত্তে 'কী ষ্টোন'-যুক্ত সত্যিকার আর্চ্চ, সমতল ছাদের বদলে গম্বুজ, চলতি ভাষায় যাকে বলে 'শিকারা' এবং ঘণ্টা, পুষ্প, বৃক্ষ ইত্যাদির বদলে জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সজ্জা। ভারতে, পুরাপুরি মুস্লিম স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা হলো। কুতুবের সংলগ্ন আলাই দরওয়াজা ও নিজামুদ্দিনে জামাতখানা মসজিদ সেকালের হিন্দু-প্রভাব বর্জ্জিত [illegible]

তোগলক্ রাজত্বে, বিশেষ করে ফিরোজ শা'র নির্ম্মিত প্রাসাদ, দুর্গ ও অন্যান্য অট্টালিকায় হিন্দু স্থাপত্যের পুনর্ব্যবহার দেখা গেল। সে-যুগের স্থাপত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো অলঙ্কার ও বাহুল্যবর্জ্জিত গঠন। সাধারণ পাথর ও চুণ-সুরকীর আস্তর দিয়ে তা তৈরী—খিলিজী আমলে ও পরবর্ত্তী মুঘল যুগে ব্যবহৃত লাল বা শ্বেত পাথরের চিহ্ন বড় নেই। বোধ হয় মুঘল দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ও দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রভৃতিতে ফিরোজ শা'র পূর্ব্ববর্ত্তী রাজকোষ শীর্ণ হয়ে এসেছিল, ব্যয়বহুল প্রস্তর ব্যবহার সম্ভব ছিল না। মহম্মদ তোগলক্ বর্ত্তৃক বারম্বার দিল্লীর অধিবাসী-দের স্থানান্তরিত করার ফলে পাথরের কাজে দক্ষ রাজমিস্ত্রীর অভাব ঘটাও বিচিত্র নয়। কিন্তু ফিরোজ শা'র সৌধাবলীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চতুষ্কোণ স্তম্ভের ব্যবহার, দ্বারপথে ও বারান্দায় আর্চ্চের বদলে হিন্দু-পদ্ধতির গঠন এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম-উৎকীর্ণ প্রাচীর-সজ্জা। হাউজ খাসের পরবর্ত্তী যে অংশগুলি ফিরোজ শা' নির্ম্মিত তাতেও আছে এর প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মসজিদের গায়ে যে অট্টালিকার উপরে অশোক স্তম্ভটি আছে, তার আরোহণ-পথ খুব কঠিন নয়: সিঁড়ির ধাপগুলি কিছুটা উঁচু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গী নারীবাহন মিঃ খোশলা থাকতে মেয়েদের চিন্তার কারণ নেই। প্রত্যেকটি মহিলা নিরাপদে উপরে না ওঠা পর্য্যন্ত তিনি নীচে দাঁড়িয়ে তদারক করলেন। বেশী পরিচিতা-দের হাতে ধরে উঠতে সাহায্য করলেন এবং সদ্য পরিচিতাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "মে আই— ?"

অশোক স্তম্ভটি প্রাসাদের যে-অংশে স্থাপিত সেটা ফিরোজ শা'র অন্দর-মহলের অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত। স্তম্ভটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। আম্বালার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক এই স্তম্ভটি স্থাপিত হয়েছিল খৃষ্টজন্মের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে। একদা মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তা' ফিরোজ শা'র চোখে পড়ল। পুরা-কীর্ত্তিতে ফিরোজ শা'র গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। সেখান থেকে স্তম্ভটি তুলে নিয়ে এলেন তিনি দিল্লীতে, তাঁর রাজধানী ফিরোজ শা' কোটলায়। বিয়াল্লিশ চাকার গাড়ীতে চাপিয়ে শত শত মজুর টেনে এনেছিল এই স্তম্ভটিকে। স্তম্ভটির শীর্ষে একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত আচ্ছাদন ছিল, কাটে দস্যুরা দিল্লী লুণ্ঠনকালে তা' আত্মসাৎ করেছে। পরবর্ত্তী কালে স্তম্ভের গায়ে পালি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে। অহিংসা ও সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে ভগবান্ বুদ্ধের অনুগামী সম্রাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে যে নতুন শত অনুশাসন প্রচার করেছিলেন, এই স্তম্ভে তারই একটি সাক্ষ্য রয়েছে।

অশোক স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যায় অদূরবর্ত্তী যমুনার জলস্রোত। ফিরোজ শা'র আমলে যমুনার ধারা কোটলার পাদদেশ স্পর্শ করতো, সে-কথা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

নীচে নেমে সদলবলে বসা গেল খোলা মাঠের মধ্যে। পাশে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। স্থানীয় লোকেরা বলে 'বাউলী'। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে সুলতান অবগাহন করতেন এর জলে, বিশ্রাম করতেন এর তীরবর্ত্তী পাষাণ-বেদিকায়।

কে এক জন বললেন, "তাস থাকলে এক হাত খেলা যেতো।" দু' প্যাকেট সুদৃশ্য ঝকঝকে তাস, নম্বর লেখার ছাপানো প্যাড ও পেন্সিল। সবাই জয়ধ্বনি করে বলল—"একেই বলে দূরদৃষ্টি। সকল কালের সকল রকম দরকারের কথা যিনি আগে থাকতে ভেবে রাখেন, তাঁকেই তো বলে অনাগতবিধাতা।"

ডাক্তার অধিকারী আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ আর্ম্মিতে লেফটেনেন্ট কর্ণেল। অত্যন্ত রসিক লোক। মাথার পাকা চুল দিয়ে মনের কাঁচা ভাবকে ঢেকে রেখেছেন। মাইল দশেক দূরবর্ত্তী ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেছেন পিকনিকে যোগ দিতে কন্ট্রাক্ট ব্রিজে তার জুড়ী মেলা ভার। খুশী হয়ে বললেন, "ক্রীপস্ আলোচনা চলছে। স্বরাজ হলে, আমরা এঁকেই প্রেসিডেন্ট করবো স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট, মিসেস্ বিজয়া ব্যানার্জ্জী। বল, মিসেস ব্যানার্জ্জী কী..."

সবাই উচ্চ ধ্বনি করলেন, "জয়!"

বাধা দিয়ে বললেম, "কর্ণেল, প্রেসিডেন্ট বললেই মনে হয় পলিতকেশ, বিগত-যৌবনা বৃদ্ধা। বলুন মহারাণী।"

কর্ণেল তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন, "ঠিক বলেছ ভায়া মহারাণীই ভালো। দিল্লীর দ্বিতীয় মহিলা সাম্রাজ্ঞী। সুলতানা রিজিয়ার পরে সুলতানা বিজয়া! জয়, সুলতানা বিজয়া কী জয়! বন্দে মাতরম, আল্লা হো আকবর, হিপ্ হিপ্ হুররে।"

ভাবী সুলতানা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "একসঙ্গে তিনটে বল্লেন না কি আপনি?"

"নিশ্চয়। গান্ধী মহারাজ, জনাব জিন্না ও গভর্ণমেণ্টকে খুশী রাখতে হয়। যখন যে পাওয়ারে আসবে আমি তারই দলে আছি অবস্থা অনুসারে যার তাড়াতাড়ি মত বদলায় ইংরেজীতে তাকেই বলে প্রোগ্রেসিভ।"

মিঃ জুবেরী সদ্য আই, সি, এস, হয়েছেন। বিলাতে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে কিছু কাল পড়েছিলেন। সোস্যালিজমে এখনও ভক্তি আছে। বললেন, "মহারাণী তো মনার্কিজম্। ডেমোক্রেসীর যুগে তা' চলবে না।"

কর্ণেল বললেন, "খুব চলবে। ঘরে ঘরে মনার্কিজম্ চলছে, আর ঘরের বাইরে গভর্ণমেণ্টে চলবে না? ভায়া হে, তোমার বয়স অল্প, শিখতে এখনও ঢের বাকী। ডেমোক্রেসী বস্তুটা আছে শুধু ...
... বইতে। আমাদের মিষ্টার ব্যানার্জ্জীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ তাঁর বাড়ীতে তাঁর জানলার পর্দ্দা নীল হবে কি সবুজ হবে, সকালে মুড়ো রান্না হবে কি ছেঁচ্‌কি রান্না হবে, এ-সব সিদ্ধান্ত ব্যানার্জ্জীর ভোট নিয়ে ঠিক হয়, না মহারাণীর হুকুমে চলে? ... করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, হার মেজেষ্টিস্ গভর্ণমেণ্টে আর যাই থাক, লীডার অব দি অপোজিশান নেই।"

প্রবল উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো সভায়।

মহিলা লজ্জাজড়িত আত্মপ্রসাদে রক্তিম হয়ে প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর কথা নয়। আসুন এবার খেলা যাক্।"

সবিনয়ে বললেম, "মাপ করবেন, ও-বিদ্যে আমার একেবারেই জানা নেই।"

"বলেন কি? আচ্ছা, তা হলে খেলা থাক। গান করুন।"

লাফিয়ে পড়তে বলুন। আর গান যদি গাই, তাহোলে লাফিয়ে পড়ার বাসনা অবশ্য আপনাদের হবে।"

ব্যানার্জী বললেন, "তবে আবৃত্তি শোনান, রবি ঠাকুরের কবিতা।"

জবাবে বললেম, "ছোট বেলায় সংস্কৃত শব্দরূপ আর বড় হয়ে জুরিসপ্রুডেন্সের ধারা মুখস্ত করে করে পদ্য মনে রাখবার আর সময় পেলাম কখন?"

মিসেস বললেন, "আচ্ছা, তা হলে গল্প বলুন।"

কর্ণেল এ্যামেণ্ডমেণ্ট যোগ করলেন,—"প্রেমের গল্প।"

হেসে বললেম, "ডাক্তার, প্রেমের হলে সেটা যে গল্পই হবে, সত্যি হবে না, সে তো জানা-কথা। কিন্তু সে-গল্পও আমি জানি না। চান তো ভূতের গল্প বলতে পারি। জানেন এই বাউন্ডারির ধারে, ঠিক আপনার ডাইনে মিসেস মিত্র যেখানটায় বসেছেন, সেখানে রাজ-রক্তের দাগ আছে? সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরকে ঐখানে হত্যা করা হয়।"

"ওঃ মা গো!"—বলে তিড়িং করে লাফ দিয়ে মিসেস মিত্র সরে এসে একেবারে দলের মাঝখানটিতে বসলেন। বার বার নিজ সাড়ীর দিকে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, সত্যিই রক্তের দু'-একটা ছিটে-ফোঁটা তাঁর বসনে লেগেছে কি না সেই আশঙ্কায়। তাঁর খরচে সবাই খানিকটা হেসে নিল কিন্তু অন্যান্য মহিলারাও যে একটু চঞ্চল না হয়েছেন তা নয়।

মিঃ খোশলা মিসেস মিত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ বার বার বলতে লাগলেন এমন ভাবে মেয়েদের ভয় দেখানো উচিত হয়নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে শক্ লাগলে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অধিনায়িকা দমবার পাত্রী নন। বললেন, "বেশ, বলুন ভূতের গল্প। সত্যি ভূতের হওয়া চাই কিন্তু। বানানো নয়।"

"মিসেস ব্যানার্জী, ভূত চিরকালই বানানো হয়ে থাকে। ভূতের গল্পের তো কথাই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাও জানা নেই।"

মহিলা সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "না, না। আপনি কেবল ফাঁকি দিচ্ছেন। তাস খেলা নয়, গান নয়, আবৃত্তি নয়, গল্পও নয়, একটা কিছু করুন।"

কর্ণেল বললেন, "তাই তো হে, তোমার কেস্ খারাপ হচ্ছে। তুমি যদি কোন কিছুই না পার তবে মহারাণীর গভর্ণমেণ্টে তোমার জায়গা হবে না।"

মহিলা বললেন, "সত্যিই তো। আপনাকে নিয়ে করবো কী? গান গাইতে জানেন না যে বৈতালিক হবেন, পদ্য কইতে পারবেন না যে সভাপণ্ডিতের চাকুরী দেবো, গল্প বলতে পারেন না যে ব... করবো। এমন অকর্মা লোক আপনি, ... "

যুক্তকরে বললেম, "আমি ... মালাকর।"

বিপুল হাস্যরোল।

নির্ম্মলাবালা পাল

সার হরিশঙ্কর পালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিমোহন পালের স্ত্রী শ্রীযুক্তা নির্ম্মলাবালা পাল ৮ই চৈত্র শুক্রবার রাত্রি সাড়ে ১০ ঘটিকায় মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দানশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা ও বহু গুণসম্পন্না মহিলা বাঙ্গালা দেশে বিরল। তিনি গোপনে বহু দুঃস্থ পরিবারবর্গকে অর্থ-সাহায্য করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

সুসাহিত্যিক রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় গত ২১শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার সময় মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনায় তিনি বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁর উপন্যাস 'কলঙ্কিনীর খাল', 'সবিনয় নিবেদন', 'বিস্ময়' এবং অধুনা প্রকাশিত 'বেদিয়াছন্দ' বাঙালী পাঠক-পাঠিকা মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। ব্যবহারাজীব ও সাহিত্যিক-জীবনে মানুষ হিসাবে রাধিকারঞ্জনের চরিত্র-মাধুর্য্য ও ব্যক্তিত্ব দলগত ঈর্ষা ও ক্ষুদ্রতার বহু উর্দ্ধে ছিল। আমাদের হাতে লেখকের সাম্প্রতিক লেখা একটি গল্প আছে, বৈশাখে সেটি মুদ্রিত হইবে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার ...

আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা :—

নিখিল ভারতীয় আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার এ বৎসরের অনুষ্ঠান কলিকাতায় সুসমারোহে শেষ হইয়াছে। এই বহু-প্রতীক্ষিত ব্যাপারে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি না দেখা গেলেও খেলার দিক হইতে মোটেই উপভোগ বা উত্তেজনার খোরাক যোগাইতে পারে নাই। আন্তর্জাতিক খেলা-মহলে ভারতের অবিসংবাদী প্রাধান্যের শাশ্বত আসন যে টলমল, তাহার অন্যতর ও জলন্ত প্রমাণ এই বৎসরের এই অনুষ্ঠানের খেলার ধারা। একের পর এক অলিম্পিক অনুষ্ঠানে তিন বার চ্যাম্পিয়ন হইয়া ভারতীয় হকি দল বিশ্বের খেলোয়াড়ী দরবারে নিজেদের কৃতিত্ব ও সুনাম সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু এবারের বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের খেলার পরিচয়ে অতিবড় আশাবাদীকেও নিরুৎসাহ হইতে হইয়াছে এমন কি, চরম মীমাংসার খেলাতেও বিশেষ উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যায় নাই। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের খেলার যেরূপ নিম্নগামী পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ভারতকে নিজ নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এখন হইতে পুনরায় সজাগ হইয়া রীতিমত অনুশীলন সুরু করিয়া দিতে হইবে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে মোট ১৩টি প্রাদেশিক দল এবার যোগদান করে, কিন্তু বোম্বাই শেষ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে না পারায় বাকী ১২টি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। প্রথম দিনে পাঞ্জাব বাঙলা এবং মধ্য-ভারত যথাক্রমে সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং মহীশূরকে ৬—০, ৩—০ ও ৪—১ গোলে পরাজিত করে। বিজয়ী ও বিজিত কোন দলের খেলাতেই কোন বৈশিষ্ট্য বা প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় দিনে পূর্ববর্তী বৎসরের চ্যাম্পিয়ান ভূপাল দল অনায়াসে বেলুচিস্থানকে ৫—১ গোলে পরাজিত করে। অপর খেলায় দিল্লী হায়দ্রাবাদের সহিত গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ করে। হায়দ্রাবাদ গোলরক্ষক মোবারক তাহাদের মানরক্ষা করে কিন্তু পুনরনুষ্ঠানে দিল্লী ৮—০ গোলে হায়দ্রাবাদকে শোচনীয় ভাবে বিপর্যস্ত করে। অপর খেলায় যুক্তপ্রদেশ সীমান্ত প্রদেশের নিকট ২—০ গোলে পরাজিত হইয়া এই প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বাঙলার বিরুদ্ধে ভাগ্যক্রমে ও ত্রুটিজনক পরিচালনার সুযোগে পাঞ্জাব প্রথম দিন অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিয়া দ্বিতীয় দিন ২—০ গোলে জয়ী হয়। সেমি ফাইনালে সীমান্ত প্রদেশকে একমাত্র গোলে পাঞ্জাব পরাজিত করে। এই গোলটিও রেফারীর ভ্রমাত্মক নির্দেশপ্রসূত। অপর প্রান্তে ভূপালকে ২—১ গোলে ও মধ্য-ভারতকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া দিল্লী চরম পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। শেষ খেলায় দিল্লী একমাত্র গোলে পরাজয় বরণ করিলে, পাঞ্জাব দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ান হয়।

এম, ডি, ডি

পাঞ্জাব ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৪১ সালে ... করিয়া প্রথমবার চ্যাম্পিয়ান-শিপ পায়। পুনরায় ১৯৪২ সালে লাহোরে দিল্লীর নিকট তাহারা পরাভব মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। এবার পাঞ্জাব পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে।

বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের খেলোয়াড়গণ :—

পাঞ্জাব :—আনওয়ার, গুরুচরণ সিং (বড়) ও ধরম সিং, গুরুচরণ সিং (ছোট), আমীরকুমার ও মইন, মাসুদ, মামুদ, বলবীর সিং, আজিজ ও ডাকওয়ার্থ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ :—মদনলাল, অযোধ্যানাথ ও কিষেণলাল, মহম্মদ রফিক, মুস্তাক আলি ও আমীর, হানসী খাঁ, আশানন্দ, সলিমুল্লা, রামচাঁদ ও গোবিন্দ।

ভূপাল :—মহসীন মহম্মদ খাঁ, এস মহম্মদ খাঁ ও এক আলি খাঁ, সামশুল লতিফ, বান্নী খাঁ ও কিফায়েৎ, মহম্মদ হোসেন, বদরুদ্দীন, সাকুর, মহম্মদ সরিফ ও আখতার হোসেন।

বেলুচিস্থান :—ফজল হোসেন, এইচ উচং ও আর উচং, ই স্কাথানিয়েল, ভারত ও এস স্কাথানিয়েল, জে স্যামুয়েলস, দেবীন্দর সিং, ই র‍্যাল্ফ, ই ব্ল্যাক ও পি ডেভিড।

বাঙলা :—এম মিত্র, সি হজেস ও আই মীড, টার্ণবুল, বি কাপুর ও ডাফুজ, সি এস দোবে, রেন্টন, জাকী, জ্যাকেন ও রোচ।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার :—নাজির আমেদ, ইয়াসীন খাঁ ও মহম্মদ হোসেন, আর পাণ্ডে, মহাবীর ও সাকুর, আফজল খাঁ, পি জোসেফ, শালিক, নাজীর ও রামলু।

দিল্লী :—ডি এস সোধী, নিয়াজ খাঁ ও আর এস জেন্টল, নবী, গফুর ও যশোবন্ত সিং, কাকার, আজিজ, জামসেদ, মনসুর ও কায়ুম।

হায়দ্রাবাদ :—মোবারক, আব্বাস ও আই আমেদ, এইচ নবী, নরসিংহ রাও ও জনার্দ্দেলু, জি ভানহাম, আমেদ খাঁ, জয়ন্তেলু, সোলেমান ও এম খলিল।

মহীশূর :—রাজশেখর, আর্চার ও রাধাকৃষণ, পদভাতে, এমারী ও ভেঙ্কটেশ, আদাম শেঠ, দশরথ, ফার্ণসাইড, ফিটজেরাল্ড ও সেলভাদুর।

মধ্য-ভারত :—নানে লাল, রাজাল্লা ও কুষ্ণপ্প, দাতারাম, দুর্গা-প্রসাদ ও যোজাবিও গেন্নালাল, জহর, শান্তরাম, মাসুদ ও চম্পালাল।

যুক্তপ্রদেশ :—আর্সাদ, আবিদ ও মামুদ, রবি দেও, মাবরুর ও কাজিম, সুলতান, ব্রাউন, এম ওয়াই খাঁ, মহেন্দ্র সিং ও মইন।

সিন্ধু :—বসির আমেদ, গণজেভস ও আর ক্রুকস, বি বারোজা, এ ক্রইন ও ডি ব্র্যাগাঞ্জা, এম কার্ণাণ্ডেজ, এস মেটা, জে ব্রিটো,

নির্ব্বাচনের পর

ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস ইহার প্রমাণ আছে। ইংরেজ ভারতে যে সামান্ত ও সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতেই কংগ্রেস সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছে গণতন্ত্রমূলক ও পৃথিবীর প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশের মত ভোটাধিকার হইলে কংগ্রেস ব্যতীত কোন দলের অস্তিত্ব এদেশে থাকিত না। এইবার অঙ্ক—

কেন্দ্রী পরিষদে কংগ্রেস ৬০ জন প্রার্থী মনোনয়ন করেন। ইহার মধ্যে ২১ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হন। ৩৭ জন বিজয়ী কংগ্রেস-প্রার্থীর মধ্যে প্রতিপক্ষ অপেক্ষা ১ জন ২৪ হাজার, ২ জন ১৭ হাজার, ২ জন ১৬ হাজার, ৪ জন ১৫ হাজার, ২ জন ১৪ হাজার, ১ জন ১২ হাজার, ১ জন ১১ হাজার, ৩ জন ৯ হাজার ১ জন ৮ হাজার, ১ জন ৭ হাজার, ২ জন ৫ হাজার, ৩ জন সাড়ে ৪ হাজার, ১ জন ৪ হাজার, ১ জন আড়াই হাজার, ১ জন দেড় হাজার ও ১ জন ৩০০ (এ কেন্দ্রে মোট ভোট সংখ্যা ৮৭৭) অধিক ভোট পান। কংগ্রেসের যে ২৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়, তাঁহাদের মধ্যে মাদ্রাজে ৫ জন, বোম্বাইএ ৩ জন, বাংলায় ৬ জন, যুক্তপ্রদেশে ৩ জন, পাঞ্জাবে ২ জন, বিহারে ১ জন, মধ্যপ্রদেশে ২ জন, দিল্লীতে ১ জন; কেন্দ্রী পরিষদের নির্ব্বাচনে প্রমাণিত হয় যে হিন্দু মহাসভা, কমুনিষ্ট বা র‍্যাডিকাল ডিমোক্র্যাটিক দলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নগণ্য। এ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যে ৬০ জন প্রার্থী মনোনয়ন করেন তাহার মধ্যে ৫৬ জন জয় লাভ করেন, পরাজিত হন—বোম্বাইএ ১ জন, পাঞ্জাবে ২ জন ও বিহারে ১ জন।

প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেস-দল মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় সর্ব্বদল-নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই, বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস দল বৃহত্তম। হিসাব এইরূপ—

		মোট আসন সংখ্যা		কংগ্রেসের আসন লাভ		শতকরা কত লাভ
মাদ্রাজ	—	২১৫	—	১৫১	—	৭৪
বিহার	—	১৫২	—	৯৮	—	৬৫
উড়িষ্যা	—	৬০	—	৩৬	—	৬০
মধ্যপ্রদেশ	—	১১২	—	৭০	—	৬২ ১/২
যুক্ত-প্রদেশ	—	২২৮	—	১৩৪	—	৫৯
বোম্বাই	—	১৭৫	—	৮৬	—	৪৯
পাঞ্জাব	—	১৭৫	—	৯৮	—	৩৮
আসাম	—	১০৮	—	৩৩	—	৩১
বাংলা	—	২৫০	—	৫৪	—	২২
উঃ-পঃ সীমান্ত	—	৫০	—	১৯	—	১৬ ১/২
সিন্ধু	—	৬০	—	৭	—	১১ ১/২

বৃটিশ মন্ত্রীদের দৌত্য

বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি ২৪শে মার্চ্চ ভারতে পদার্পণ করি ভারতবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন তাঁহারা ইংরেজের প্রেম বিলাইতে এদেশে আসিয়াছেন। তাহারা না কি এত দিনে নিঃসংশয় হইয়াছেন ভারতবাসী অভূতপূর্ব্ব স্বর্ণ-ভবিষ্যতের দোর-গোড়ায় পা দিয়াছে। ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা—নিজ দায়িত্ব নিজের কাঁধে লওয়া। কাঁধে লইবার এই আশা কত শীঘ্র পূর্ণ করা যায় যে বিষয়ে ভারতের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করিবার জন্তই তাঁহাদের শুভাগমন। মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিনিধিদের কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই নির্দ্দেশই লইয়া আসিয়াছেন, মসলেম লীগের দাবী সম্বন্ধে কোন রকমের একটা রফা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। রফা যদি না-ও হয় তবু প্রতিনিধিরা কথাবার্ত্তা মুলতবী রাখিয়া লণ্ডনে ফিরিবেন না। এ সম্বন্ধে বিলাতী শ্রমিক দলের এক জন বিশিষ্ট মন্ত্রী এক জন সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন—"But if for some reason such an ideal compromise is not reached, the Cabinate Ministers will go ahead and propose a solution which they think most reasonable and which would have the widest support of all responsible political leaders in the country..." যদি কোন কারণে তেমন কোন আদর্শ আপোষ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিগণ এমন একটা সমাধানের প্রস্তাব করিবেন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং যে প্রস্তাব দেশের দায়িত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্যাপক ভাবে সমর্থন করিবেন।

যদি মসলেম লীগ তাঁহাদের অসম্ভব দাবী কিছুমাত্র ত্যাগ করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে মন্ত্রি-প্রতিনিধিরা মসলেম লীগকে বাদ দিয়াই অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করিতে উপদেশ দিবেন।

সেনাপতির মিষ্টি কথা

ওদিকে ভারতের জঙ্গী-লাট জেনারল অচিনলেক বিলাত হইতে ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর প্রতি এক অপ্রত্যাশিত বাণী বেতারে বিতরণ করিয়াছেন। ইংরেজ যে স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধীনতা দিবে, এ বাণীর তাহারই সূচনা করিতেছে বলিয়া এদেশের আশাবাদীরা উল্লসিত হইয়াছেন। এক জন ইংরেজ প্রধান সেনাপতি জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতাদের প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ, ইংরেজের ইতিহাসে ইহা প্রথম ও অভিনব। জেনারল অচিনলেক অভিবাদ করিয়াছেন—"The nationalists of India, who have worked so long and hard for the independence of India"

জাতীয়তাবাদী মনপ্রাণ বীর সৈনিকদের উপর। এখন সৈনিক ইংরেজের বেতনভোগী বাহিনীর মধ্যে যথেষ্টই আছে। তাহাদের প্রতি জেনারেল অচিনলেকের বাণী সুফল প্রসব করুক। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে গোরা পল্টনের প্রতিও সেনাপতির উপদেশ অমূল্য। জানি না ভারতবাসীর হাতে উহারা যদি স্বাধীনতা ভিক্ষা দেয় তখন ভারতীয় সৈন্যদলে শতকরা কত জন গোরা থাকিবে। যতই থাকুক না, জেনারেল অচিনলেকের সাধু পরামর্শে তাহারা ভারতের নিমক খাইয়া যদি হারামী না করে তাহা হইলেই আমরা আনন্দিত হইব।

—

এটলীর ঘোষণা

ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান-প্রসঙ্গে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বলিয়াছেন—"We can not allow a minority to place their veto on the advance of the majority"—সংখ্যাগরিষ্ঠদের অগ্রগতিতে কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বাধা দিবে ইহা আমরা হইতে দিতে পারি না। সেদিন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু বিলাতী মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"Already the wreckers are abroad and nothing will please them more than that the negotiations for a final settlement should break down"—ভাঙ্গনে দল ইতিমধ্যেই কাজ সুরু করিয়াছে। চরম নিষ্পত্তির জন্য যে কথাবার্ত্তা চলিবে তাহা পণ্ড হউক—ইহাই তাহাদের কাম্য। পণ্ড না হইলে তাহারা খুসী হইবে না।

—

ইঙ্গ-লীগ ষড়যন্ত্র

একথাও খুব গোপন নয় যে, মসলেম লীগের নটরাজ জিন্নার সহিত ভারতে যাহারা বৃটিশ লৌহ-পাদ-পীড়ন কায়েম রাখিতে চায়, সে সব বৃটিশ ধনিক বণিক এবং ভারতের অন্নে পুষ্ট শোণিতে বর্দ্ধিত শ্বেতাঙ্গ নোকরদের তলে তলে একটা রফা হইয়া গিয়াছে। ইহারা ইঙ্গ-মসলেম স্বার্থ রক্ষা করিবে আর বিনিময়ে মহম্মদ আলি জিন্না বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে পাকিস্থান গঠনে স্বীকৃত হইবেন।

এই মৈত্রীর পরিচয় কেন্দ্রী পরিষদে আমরা পাইতেছি। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তার পরেও ১৯৪৪, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে মসলেম লীগ কেন্দ্রী পরিষদে প্রত্যেক অর্থ বিল অগ্রাহ্য করিতে কংগ্রেস দলের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে। কিন্তু এইবার মসলেমলীগ এ সহযোগিতায় সম্মত হন নাই। মিঃ জিন্না যেন ইঙ্গ-মুসলিম বাণিজ্য আঁতাতে আবদ্ধ হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা, লবণ-শুল্কে কংগ্রেস বাধা দিলেও লীগ সমর্থন করিয়াছে। অর্থবিল সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি—ব্যয় মঞ্জুরের আগে অভিযোগের কৈফিয়ৎ চাই। কংগ্রেসের নীতি—'যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কর স্থাপন চলিবে না।' লবণ-কর হইতে বৎসরে ৮।১ কোটি টাকা আয় হইলেও সে কর দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি গ্রাসের অন্নের উপর। কোটির লোভে নুন-ভাতের উপর ট্যাক্স চাপান চলে না। অর্থ-সদস্য দুই-একটি ছোট-খাট সুবিধায় সম্মত হইয়াছেন—যেমন তিতটি খাদ্যের হ্রাস করা। নীতির দিক্ দিয়া কংগ্রেস দল এ সব হ্রাস-প্রস্তাবের সমর্থনও করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনও রাষ্ট্র-পরিচালিত করা হয় নাই কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে অর্থ-সদস্য বলিয়াছেন যে, irresponsible Executive"—দায়িত্ব-জ্ঞান-বর্জ্জিত সরকারী পরিচালকদের হাতে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া দিতে পারা যায় না। কংগ্রেস দলও স্থির করিয়াছেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত Executive বা সরকারী কার্য্য-পরিচালকগণ দায়িত্বজ্ঞান-হীন থাকিবে, তত দিন তাঁহারা কোন ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে ভোট দিবেন না।

শুনা যাইতেছে, কুখ্যাত বেঙ্গল সার্কুলারের লিপিকার ও বিগত গোলটেবিল বৈঠকের চক্রী রাইভ ষ্ট্রীটের ভূতপূর্ব্ব 'রয়' এবং বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের 'প্রাইভ রয়' এবং বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের অন্যতম মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডারের বন্ধু ভারত সরকারের অর্থ-সদস্য স্যার আর্চিবল্ড রাওল্যাণ্ডস্ পর্দ্দার অন্তরালে সূত্রাকর্ষণ করিতেছেন। এই ইঙ্গ-মসলেম মৈত্রী ও প্রভাবের আশু উদ্দেশ্য, মধ্যবর্ত্তী অস্থায়ী ব্যবস্থা যাহাতে কেন্দ্রী সরকারের পুনর্গঠন না হয় তাহার চেষ্টা করা। মিঃ জিন্না যে এরূপ অস্থায়ী ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহেন, তাহা ত তিনি প্রকাশ্যেই করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য, পাকিস্থান ও হিন্দু গণ-পরিষদের সমস্যার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দূরপ্রসারী কোন নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন যেন না করা হয়। এক দিকে মন্ত্রী মিশনের অতিথিরা প্রকাশ্যে নেতাদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, অন্য দিকে অপ্রকাশ্যে তাঁহারা মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও মিঃ জিন্নার সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। প্রকাশ্য আলোচনা সম্ভবতঃ এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলিবে।

কংগ্রেস দল কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে, লর্ড ওয়াভেলের সেপ্টেম্বর মাসের ঘোষণা অনুসারে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা কেন্দ্রী সরকারের পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী—ইহা গঠনে আর বিলম্ব হইতে পারে না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে জন-সমর্থিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার পর—প্রাচীন পন্থায় গঠিত কেন্দ্রী সরকারের কাজ করা অসম্ভব।

—

কণ্টকে কণ্টকে মিতালী

মসলেম লীগের প্রার্থীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রকাশ করিয়াছেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক বিবাহের প্রীতি-ভোজে সীমান্তের গভর্ণর স্যার কানিংহাম প্রকাশ্যে জনৈক নবাবকে মসলেম লীগে যোগদান করিতে বলেন। এই প্রদেশের এক জন ইউরোপীয় ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার স্ত্রী প্রকাশ্যে লীগ-প্রার্থীর জন্য ক্যানভাস করিয়া বেড়ান। সেণ্ট্রাল মসলেম পার্লামেণ্টারী বোর্ড বাংলার মসলেম লীগের গুণ্ডামীর নিন্দা করিয়াছেন। ভারতের অখণ্ড স্বাধীনতার পক্ষে কুলের আঁটি অথবা ইংরেজীতে যাহাকে বলে Sore in the throat of Philip,

করিয়া বলিয়াছেন যে, নির্ব্বাচন লড়াইয়ে তাঁহারা যে কেল্লা ফতে করিয়াছেন তাহার তুলনা দুনিয়ায় মিলিবে না। কিন্তু কোন্ হাতিয়ার দিয়া? মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছেন—উৎকোচ, দুর্নীতি, অরাজকতা ও সরকারী কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা দিয়া। মিঃ ফজলুল হক ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—গুণ্ডামীই যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়ুধ হয় তাহা হইলে মিঃ জিন্নার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, "তাঁহাদের এমন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও আছেন, যাঁহারা পরাজিত হন নাই এবং কোন কোন সংগ্রামক্ষেত্রে জিন্নার সমর্থকগণ এমন মার খাইয়াছেন যে, প্রহার-লাঞ্ছনে তাঁহাদের সুকঠিন পৃষ্ঠদেশও মসিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।" লীগের গুণ্ডামীর ফলে আলিগড়ের একটি বড় বাজারের তিন ভাগ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে, ইহার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। সিন্ধু পরিষদে ইউরোপীয় দলের সদস্যগণ একযোগে লীগ মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন করিয়াছেন। লীগ মন্ত্রীরাও আশ্বাস দিয়াছেন—"The vested interests of the Britishers will be safe guarded" বাঙ্গালায় ঢাকার নির্ব্বাচনে গুণ্ডামী সম্পর্কে জনৈক ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন যে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী লীগকে সমর্থন করিবারই যেন নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন। নবদিল্লীর এক বিশিষ্ট নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন—বাঙ্গালার জিলা-কর্তৃপক্ষগণ ভান করিয়াছেন যে, এক মুঠি মুসলমান গুণ্ডার বিরুদ্ধে তাঁহাদের শক্তি নির্ব্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে। ···এক ঝলক বিদ্যুতের গতিতে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ শত শত কংগ্রেস-কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন অথচ লীগ-গুণ্ডাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেই তাঁহারা ক্লীবত্বের ভান করে। সকলেরই মনে সন্দেহ হইয়াছে, প্রাদেশিক পুলিশের এই আচরণের অন্তরে কোন রহস্য আছে নিশ্চয়।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী মহিলাবৃন্দ। (বামদিক হইতে) শ্রীমতী হংস মেহ্‌তা, শ্রীমতী তারাবাঈ মোদক, শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী, শ্রীমতী গোরে, কুমারী ইন্দুমতী চিমনলাল, শ্রীমতী এলাবতী সবরাণী

কমুনিষ্টদের বৃথা আস্ফালন

মুসলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্রগুলিতে লীগের পক্ষ হইতে যে সংঘর্ষ-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, শ্রমিক-নির্ব্বাচন [illegible] কমুনিষ্টদের পক্ষ হইতেও তাহা অবলম্বনে নিরুৎসাহ দেখা যায় নাই; শ্রমিক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ভোটদানের দিবস কলিকাতায় বিভিন্ন কেন্দ্রে কমুনিষ্টদের গুণ্ডামী প্রকট হয়। মুসলমান শ্রমিকগণ লীগ-পক্ষ হইতে নির্দ্দেশ পাইয়াছিল কমুনিষ্ট-প্রার্থীকে ভোট দিতে। অনেক লীগপন্থী মুসলমান কমুনিষ্ট-প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়াছেও। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, লীগ গুণ্ডামী করিয়া জিতিয়া গেল অথচ কমুনিষ্টরা সমপদ্ধতি অবলম্বন করিলেও তাহাদের হিটলারী কৌশল সার্থক হয় নাই!

সিন্ধু গভর্ণরের অপচেষ্টা

কিন্তু বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দল করাচীতে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে আলাপ করেন গভর্ণর সার ফ্রান্সিস্‌ মুদির সহিত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যক্তি যুক্তপ্রদেশে বহু অত্যাচার চালান। যুদ্ধের সময় তাঁহারই চেষ্টায় মানবেন্দ্রনাথ রায় সরকারের সমর্থক হন। চৌধুরী খালেকুজ্জমানের মারফৎ ইনিই মসলেম লীগের রাজনীতিক পরিকল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ইনিই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্যরূপে মসলেম লীগকে উপেক্ষা করিবার জন্য মিঃ ওয়াভেল নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেন। ইহার বিহারের গভর্ণর হইবার কথা ছিল, কিন্তু বিহার কংগ্রেস-প্রধান প্রদেশ, চক্রান্ত বা জালিজুরি এখানে চলিবে না বুঝিয়া ইহাকে সিন্ধুর গভর্ণর করা হয়। তাঁহার চক্রান্তেই সেখানে হিদায়েতুল্লা মন্ত্রিমণ্ডল স্থাপিত। অর্থ ও বুদ্ধির খেলায় ইংরেজ সাম্রাজ্য জিয়াইয়া রাখিবেন বলিয়া যদি আশা [illegible]

বিভীষণের কারসাজি

বহুজেণীর দল যে কুকীর্ত্তি আরম্ভ করিয়াছে আর ইংরেজকে অজুহাত খুঁজিবার সুযোগ দিতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ পরিস্ফুট। ২৬শে মার্চ্চে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সার মহম্মদ উসমান বলেন—"The idea of by-passing the Muslim League which one hears so much, should be given up if the Mission is to succeed"—মন্ত্রি-সভার প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে মসলেম লীগকে এড়াইয়া চলিবার মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে। সার মহম্মদ উসমান ভারত সরকারের অন্যতম সদস্য, সুতরাং কোন দলাবলম্বী হওয়া তাঁহার চলে না। তিনি কেন্দ্রী সরকারের সিদ্ধান্ত ও মতই ব্যক্ত করিবেন, ইহাই সকলের ধারণা। তবে কি বুঝিতে হইবে, ভারত সরকার ও ভারত সচিবের মতের অনৈক্য হইয়াছে?

২৮শে মার্চ্চ কেন্দ্রী পরিষদে অর্থবিল সম্বন্ধীয় বিতর্ক কালে মসলেম লীগের মিঃ সিদ্দিকী কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা মিঃ আসফ আলির বক্তৃতায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—"১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথাই বলুন না। গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমিও লণ্ডনে ছিলাম। খোদা আর খোদার বান্দা মানুষের কাছে মুসলমান আমি বলিতেছি যে, কংগ্রেস দলের লোকগুলি ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ভারতের ঐক্য বিঘ্নিত করিয়াছে, দুষ্ট অভিসন্ধি বশতঃ গোপনে কার্য্য করিয়াছে। সাদা বুদ্ধির অপেক্ষা একটু বেশী বুদ্ধি আমার আছে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমি ইংরেজদের ডাকিয়া বলিব—যদি তোমরা ভারত ছাড়িয়া যাইতে চাও, তাহা হইলে যাহাদের হাত হইতে ভারত তোমরা লইয়াছ, তাহাদের হাতেই ভারতকে দিয়া যাও।"

লীগপন্থীরা ভারত-বিদ্বেষী

লীগপন্থীরা ভারতবাসী নহে। উহাদের সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না বলিয়াছেন তাহারা ভারতবাসীই নহে। বিলাতী সংবাদপত্র 'নিউজ ক্রনিকলের' বৈদেশিক বিভাগের সম্পাদক মিষ্টার নর্ম্যান ক্লিফ মিঃ জিন্নাকে প্রশ্ন করেন—পাকিস্থান সম্বন্ধে আপনার এই আপোষবিহীন মনোভাবের ইহাই কি অর্থ নহে যে, আগে আপনি দেশভক্ত, পরে আপন সম্প্রদায়-ভক্ত? উত্তরে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন—"I do not regard myself as an Indian. India is a State of nationalities including two major nations and our claim is for a distinct sovereign State for our nation."—আমি আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া মনে করি না। ভারত বিভিন্ন জাতির রাষ্ট্র। এ জাতিগুলির মধ্যে দুই জাতি প্রধান। আমাদের দাবী হইল আমাদের জাতির জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ সার্ব্বভৌম একরাষ্ট্রের।

কংগ্রেস যদি মুসলমানদিগকে সমান অংশ দিতে চাহে, মিঃ জিন্না কি তাহা চাইলে সে অংশ লইতে সম্মত হইবেন? এ প্রশ্নের উত্তরেও মিঃ জিন্না বলেন—"No. I do not want to live

বেঙ্গল কেমিক্যালে মালয় মেডিক্যাল মিশনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আজাদ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

want to keep us together? We refuse and if you want to force us you will need to keep your bayonets."

আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স'এর সংবাদদাতা রবার্ট অবা স্মিথ পাকিস্থানের দাবী সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—'Pakistan is no more than a bargaining counter.'

শ্বেতাঙ্গদের সমর-সজ্জা

শ্বেতাঙ্গ বা কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌দল কি বলেন! কলিকাতার হাঙ্গামায় ভীত হইয়া ইউরোপীয় এসোসিয়েশন ভারতে ইউরোপীয়দের ধন-প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সুবিস্তৃত সামরিক প্ল্যান আঁটিয়াছেন। গণ-হাঙ্গামা আরম্ভ হইলে মাত্র মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়গণ নহে, সংখ্যা-বহু ভারতীয়গণকেও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন সংশয়ের বিষয় এই যে, কলিকাতায় অশ্বেত পথচারীরা যেখানে শতকরা ৯৯.১ জন, সেখানে শতকরা আধ জন বা সিকি জন সকেদ-ভক্তের জন্য ওকালতি করা হইতেছে কেন? গত নির্ব্বাচনে প্রকাশ্যে লীগ-গুণ্ডারা যে রক্ত বিতরণ করিয়াছে, কমুনিষ্টরা (অপকীর্ত্তির যোগানদারী করিয়াছে এবং স্বার্থবান্ ইউরোপীয় ও সরকারি কর্ম্মচারীরা যাহাতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছে, অনেক ক্ষে- ... সমর্থন প্রদান করিয়াছে

আসিয়া পড়ে ? মুক্তিকালে জনসাধারণ ইহার আভাস পাইয়াছে, এবং প্রকৃত হইয়াই আছে। আমরা আশা করি, লীগ বা কম্যুনিষ্ট অথবা ইউরোপীয় স্বার্থবান্ বণিকাদি সম্প্রদায় যেন ১৯৪২ সালের দুর্জয় যুব-বিক্ষোভের পুনরভিনয় না হইতে দেন। ইংরেজ সরকার যে "মরেজে" আদর্শবাদী মরিয়াদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই ইহা সহসা ভুলিবার সময় আসে নাই। ইহারা বুঝিতে চাহে না যে বিক্ষুব্ধ জন-সাধারণ ইউরোপীয়দের প্রকৃত পক্ষে কোন লাঞ্ছনা করিতে চাহে নাই। তাহারা হয়ত বা বলিয়াছে, নেকটাই ও হ্যাট পরিতে পারিবে না, বা দাবী করিয়াছে—যে ভারতের নিমকে তোমরা পুষ্ট, বল তাহার জয় হউক—জয় হিন্দ্। খেলোয়াড়-ভাবাপন্ন অনেক ইংরেজ বা আমেরিকান সানন্দে জয় হিন্দ্ বলিয়াছিল—সরল জন-সাধারণ তাহাতেই আনন্দিত হইয়া এই সব খেলাঙ্গকে সম্বর্দ্ধিতও করিয়াছিল। অবশ্য এ বিক্ষোভের সুযোগ লইয়াছিল তাহারা, যাহারা তৃতীয় পক্ষের স্বার্থে কড়ির বিনিময়ে জাতীয় জীবনের কণ্টক হইতে চাহে। ইহারা উপদেশ মানিবে না—লীগও মানিবে না, কম্যুনিষ্টরাও মানিবে না, ইউরোপীয় এসোসিয়েশনও মানিবে না। কিন্তু স্বাধীনতা যাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, এ সকল সাময়িক কণ্টক সবল হস্তে উৎপাটিত করিতে তাহাদের সময় বেশী লাগিবে বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহারা বন্দিশালায়—যাঁহারা নির্ব্বাসনে

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গুপ্ত আন্দোলনের যে সকল কর্ম্মী আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল করা হইয়াছে, অনেককে প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল মুক্তি দিতেছেন। শ্রীযুক্ত অচ্যুত পটবর্দ্ধন আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪২এ গুপ্ত বেতারকেন্দ্র হইতে বিপ্লবী আন্দোলনের সংবাদ ঘোষণা করিবার অভিযোগে '৪৪ সালে শ্রীমতী উষা মেটাকে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁহাকেও যারবেদা জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই সরকার ইহা ব্যতীত ২৩ জন সিকিউরিটি বন্দীকে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। মাদ্রাজ সরকার আগষ্ট আন্দোলনের বহু বন্দীকে মুক্ত করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের নূতন কংগ্রেসী সরকার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ৬৩৭ জন রাজনীতিক কারণে দণ্ডিত ও আবদ্ধ বন্দীকে মুক্তি-দানের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বিহারে ভাগলপুর জেল হইতে প্রায় ২৭৫ জন এবং মধ্য-প্রদেশে নাগপুর ও জব্বলপুর জেল হইতে প্রায় ৪০ জন মুক্তি পাইয়াছেন। কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে কেন্দ্রী সরকার মুক্তি দিয়াছেন।

এ সম্পর্কে আরও কতিপয় দেশভক্তের কথা দেশবাসীকে আমরা স্মরণ রাখিতে বলি—ডাঃ তারকনাথ দাশ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বিপ্লবী ভ্রাতা শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত নাম্বিয়ার, সর্দ্দার অজিত সিং প্রভৃতি। সর্দ্দার অজিত সিং ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা পাইলে তাঁহার সুবিধা চূড়ার উপর ময়ূরপাখা দুই-একটি জওহর, প্যাটেল বা রাজেন্দ্রপ্রসাদ পান তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মাতৃভূমির জন্য সমর্পিত-জীবন দেশের বন্দিশালায় যাঁহারা আজীবন শৃঙ্খল গুণিতেছেন এবং দেশের বাহিরে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাঁহারা যুগ-যুগ নির্ব্বা রহিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া না আসেন তাহা হইলে স্বাধীনতার সকল আনন্দ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

স্বাগত সত্যরঞ্জন

দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ডের' চির-নিগৃহীত সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী ২৬শে মার্চ্চ মুক্তি লাভ করিয়াছেন অবগত হইয়া আ আনন্দিত হইয়াছি। পরাধীনতার অসহ্য বেদনার জ্বালাময়ী সত্য প্রচার করিয়া গণচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবার অপরাধে সত্যরঞ্জন যে ভা দীর্ঘকাল কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন ভারতের কোন সাংবাদি তাহা করেন নাই। অথচ এই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিককে কারামুক্ত করিব জন্য নিখিল ভারত সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মিলনের কলিকা অধিবেশনে একটি দাবী—প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিতে, ভারতের অন্য কো প্রদেশের না হৌক, বাংলার কোন সাংবাদিককে করিতে দে নাই। বাংলার বর্ত্তমান প্রত্যেকটি প্রধান সংবাদপত্রের ভারপ্রা সম্পাদকগণ এবং প্রধান সাংবাদিকগণের অনেকে সত্যরঞ্জনের সহকর্ম্মী তাঁহারা কি করিয়া এত শীঘ্র তাঁহাকে ভুলিয়াছিলেন, তাহা চি করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সত্যরঞ্জনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর্থিক এবং অন্যবিধ ভাবেও যে তিনি নিগৃহীত, তাহা দেশবাসী কি স্মরণ রাখিবেন ? গত নির্ব্বাচনে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে ধর্ম ব্যারিষ্টার মিঃ জে, সি, গুপ্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশা করি, মিঃ গু সত্যরঞ্জনকে নির্ব্বাচিত হইতে দিবার জন্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবা উদারতা প্রদর্শন করিবেন।

টেগার্ট মরিয়াছে

টেগার্ট মরিয়াছে। আইরিশ রাষ্ট্র-সচিব ডি ভ্যালেরার দেশে উহার জন্ম হইলেও জননী আয়ার্ল্যাণ্ডের সে অজ্ঞাত পুত্রও ছিল না মৃতজাত পুত্রও ছিল না এবং মূর্খ পুত্রও ছিল না। ইংরেজের গোয়েন্দা আখড়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড যেমন আইরিশ সিনফিন দেশভক্তদের পশ্চাতে শনির মত লাগিয়া থাকিয়া তাহাদের চেষ্টা পণ্ড করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল এবং বিনিময়ে মরণ-পণ জাতির অভিশাপই লাভ করিয়াছিল, ভারতের নিমক-ভোজী টেগার্ট ও তাহার ধূর্ত্ত সহচরেরা কড়ির বিনিময়ে তেমনি বাংলার দেশভক্ত যুবকদের পশ্চাতে লাগিয়া থাকিয়া প্রায় ২৫ বৎসরের যুব-প্রচেষ্টা পণ্ডের স্পর্দ্ধা করিয়াও নিপীড়ন নির্য্যাতন দ্বারা জাতির অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। এই জাতীয় সরীসৃপের কীর্ত্তি-কাহিনী মালভেনির জেল-কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে। টেগার্ট ও তাহার সহচর কলসনের আঘাতে বাঙ্গালী হিন্দুর কোন্ পরিবার বিক্ষত হয় নাই জানি না। ইংরেজ সরকারের এই পরম পদসেবার পুরস্কারস্বরূপ উহারা তাহাকে মান দিয়াছিল, অর্থ দিয়াছিল। তাহাকে প্যালেষ্টাইনের বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইয়াছিল, দমন সে করিতে পারে নাই। বহু স্থানে বহু বার সে হত্যার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। অবশেষে ৬ই এপ্রিল ভারতের জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবসে সে মরিয়াছে। মাইকেল ও'ডায়ার, জেনারল ডায়ার মরিয়া যে লোক গিয়াছে, টেগার্টেরও সেই লোক প্রাপ্তি হউক।

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু বিদ্যালয়

গত ২০শে চৈত্র মঙ্গলবার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে পরোক্ত প্রতিষ্ঠানের ১০ম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব াংলার লাটপত্নী লেডী বারোজের সভানেত্রীত্বে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায় লেডী

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু বিদ্যালয়ের উৎসবে লাটপত্নী লেডী বারোজ, প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায় ও কুমারী উৎপলা মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে

রোজকে অভ্যর্থনা করেন। বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণ প্রাচ্য- থায় বসন্তোৎসব সঙ্গীতে ও নৃত্যে প্রদর্শন করে। 'বসুমতী'র বাধিকারী পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পরলোকগত চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চার বৎসর বয়স্কা কন্যা কুমারী উৎপলা খোপাধ্যায় একটি কবিতা আবৃত্তি করে। ডাঃ শ্রীকুমার ন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যাগতদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর নগণ মন অধিনায়ক" গানের পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

ধনিক কবলে সংবাদপত্র

এদেশের সংবাদপত্রগুলি ঠিক গণ-মুখপত্র না হইলেও কোন না ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। এক দিন ছিল, যখন তেজস্বী সাংবাদিকগণ কৃপা বা কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া আপনাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আজ সংবাদপত্রের পাঠকগণ সংবাদপত্র-সম্পাদকদের স্বয়ংসিদ্ধ অছিগিরী মানিয়া লইয়া নাবালক হইয়া রহিতে নারাজ। অর্থ ও ব্যবসায়-ঘটিত দুর্ব্বলতা, অনেক সময় অধীনতা, এদেশের সংবাদপত্রগুলিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানিয়া লইতে হয়। বিশেষ বিজ্ঞাপনদাতাদের তুষ্ট করিতে গিয়া অনেক সময় সংবাদপত্রগুলিকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নীতি ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হয়। তবু বর্ত্তমানে এদেশের জনসাধারণ কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। এ জন্য যে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও সংবাদ-পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের আদর্শ ব্যক্ত করে এবং দাবীর প্রতিধ্বনি করে, সে সংবাদপত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনসাধারণের প্রিয়। সম্প্রতি দেখা যাই-তেছে, বিশেষ বিশেষ ধনিক এক একটি সংবাদপত্রগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ সমর্থনের সুযোগ লইয়া জন-মতকে আপন ইঙ্গিতে পরিচালিত করিবার পাকাপোক্ত আয়োজন করিতেছেন। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, বিরলাগণ দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্', এলাহাবাদের 'লীডার', লক্ষৌএর 'ডেলী হেরাল্ড', পাটনার 'সার্চ-লাইট', কলিকাতার 'ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস' ও 'ভারত', নাগপুরের 'নাগপুর টাইম্‌স্', কটকের 'নিউ উড়িষ্যা, করাচীর 'সিন্ধ অবজার্ভার' এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে ব্যবসায় ও নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া বোম্বাইএর 'টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া' প্রায় দুই কোটি টাকায় কিনিয়া লইতে-ছেন। এক দল চেট্টিয়ারের নিকট 'মাদ্রাজ মেল' বিক্রীত হইতেছে বলিয়া জনরব। পাল্টা প্রতিশোধে সংবাদপত্রের কাগজ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়া ভারতের জাতীয়তা বাদী সংবাদপত্রগুলিকে হত্যা করিবার যেন গোপন চক্রান্ত চলিতেছে। ভারত সরকার এই অপচেষ্টার গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছেন না, এবং কেন্দ্রী পরিষদের সদস্যগণ, সংবাদপত্রই যাঁহাদের পক্ষে গণ-নির্দ্দেশ-পত্র এবং আপনাদের মুখপত্র ও প্রচারপত্র, তাঁহারাও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখনও উদাসীন হইয়া আছেন।

চিত্র-পরিচয়

শিল্পী অবনী সেনের 'গতি' ছবিটি লক্ষ্ণৌ ন্যাশানাল আর্ট একজিবিশনে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। আমরা উক্ত ছবিটির জন্য কুমারী মেহেরুন্নেসা ইস্পাহানির সৌজন্য স্বীকার করছি।